সম্প্রদায়ের সর্ব্বতোভাবে দুঃখের অবসান করা কখনও সম্ভবযোগ্য হয় না। ইহারই জন্য প্রধানতঃ মধ্যবিত্তগণের অথবা বুদ্ধিজীবিগণের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আলোচনা করাই আমাদিগের এই প্রবন্ধের প্রধান উদ্দেশ্য হইয়াছে।

যাঁহারা বর্ত্তমান সভ্যতা ও বিজ্ঞানের উপাসক, তাঁহারা প্রায়শঃ বর্ত্তমান দুরবস্থার কথা স্বীকারই করেন না। কৃষিযোগ্য স্থানের পরিমাণ ক্রমশঃ বাড়িয়া যাইতেছে; নানারূপ বৈজ্ঞানিক কর্ষণের পদ্ধতি প্রবর্ত্তিত হইয়াছে; বিবিধ রকমের বাজার নিয়ন্ত্রণের পন্থা আবিষ্কৃত হইয়াছে; অবাধ বাণিজ্য উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে; প্রত্যেক দেশের যান্ত্রিক শিল্পানুষ্ঠান উত্তরোত্তর প্রসার লাভ করিতেছে—ইহা দেখাইয়া মানুষের সম্পদ যে ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে তৎসম্বন্ধে তাঁহারা নিঃসন্দেহ হইয়া থাকেন। বর্ত্তমান অর্থনীতি-বিজ্ঞানের সঙ্কেতানুসারে তাঁহাদিগের কথা যে একেবারে উপেক্ষণীয় নহে, তাহা স্বীকার করিতেই হইবে। কিন্তু সম্পদের পরিমাপ করিবার জন্য বর্ত্তমান অর্থনৈতিক বিজ্ঞানের যে যে সঙ্কেতের কথা বলা হইয়াছে তাহা যুক্তিসহ কি না, তদ্বিষয়ে বিচার করিতে বসিলে দেখা যাইবে যে, গোড়ায়ই গলদ রহিয়াছে। ঐ মাপকাঠি ভ্রম-প্রমাদপরিপূর্ণ। অর্থনৈতিক বিজ্ঞানের কথা ছাড়িয়া দিয়া সাদা চোখে নিজ নিজ পরিচিত পরিবার-বর্গের অবস্থা পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যাইবে যে, গত কয়েক বৎসর হইতে অর্থাভাবশূন্য পরিবারের সংখ্যা ক্রমেই কমিয়া যাইতেছে এবং অর্থাভাবের মাত্রা প্রায় প্রত্যেক পরিবারেই উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে। সাদা চোখে যাঁহারা এইরূপ ভাবে লোকের অবস্থা পর্য্যালোচনা করিতে শিক্ষা করিয়াছেন, তাঁহাদের কেহই মধ্যবিত্তগণের অবস্থা যে ক্রমেই খারাপ হইয়া পড়িতেছে তৎসম্বন্ধে অস্বীকার করিতে পারিবেন না।

ইঁহাদিগের ভবিষ্যৎ অবস্থা কতদূর খারাপ হইতে পারে তাহা নির্ণয় করিতে হইলে ইঁহাদিগের বর্ত্তমান অবস্থা কেন এত খারাপ হইয়া পড়িল তাহা চিন্তা করিয়া দেখিতে হইবে। এইখানে প্রশ্ন উঠিবে, এই বুদ্ধিজীবিগণ অথবা মধ্যবিত্তগণের অবস্থা কি চিরদিনই এইরূপ খারাপ ছিল? এই প্রশ্নের উত্তর দিতে হইলে ইতিহাস ও প্রাচীন সাহিত্যের আশ্রয় লইতে হয়। ইতিহাসের পৃষ্ঠা উল্টাইলে দেখা যাইবে যে, এখন যেরূপ জন-তান্ত্রিকতার প্রাধান্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে, চিরদিন জগতে এইরূপ ছিল না। কয়েকশত বৎসর আগেও জগতে এমন দিন ছিল, যখন রাজন্যবর্গের রাজত্বের দ্বারা জগতের প্রায় প্রত্যেক দেশ নিয়ন্ত্রিত হইত এবং রাজন্যবর্গ নামে রাজা থাকিলেও প্রকৃত পক্ষে মধ্যবিত্তগণই রাজত্ব নিয়ন্ত্রিত করিতেন। মধ্যবিত্তগণ যদি তখন এখনকার মত দরিদ্র হইতেন, তাহা হইলে উঁহাদিগের পক্ষে রাজ্য নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হইত কি?

প্রাচীন সাহিত্যের পৃষ্ঠা উল্টাইলেও মধ্যবিত্তগণের সম্পদের কথাই পাওয়া যাইবে।

এক্ষণে যাহারা মধ্যবিত্ত নামে পরিচিত, তাহাদিগের পিতৃপুরুষগণের অবস্থা সম্বন্ধে যে-সমস্ত কথা শোনা যায়, তাহার দিকে লক্ষ্য করিলেই দেখা যাইবে যে, টাকা পয়সার পরিমাণ হিসাবে হীনতর অবস্থাপন্ন হইলেও প্রায় প্রত্যেকেরই পিতৃপুরুষগণ অবাধ অন্নদান কার্য্যে, আত্মীয়তা ও কুটুম্বিতা রক্ষায় অধিকতর সামর্থ্যযুক্ত ছিলেন।

এক্ষণে আবার প্রশ্ন উঠে, যাঁহারা একদিন সমৃদ্ধি-সম্পন্ন ছিলেন তাঁহারা এক্ষণে দারিদ্র্যের নিপীড়নে নিপীড়িত হইতেছেন কেন? এই প্রশ্নের জবাব দিতে হইলে, যখন মধ্যবিত্তগণ সমৃদ্ধি-সম্পন্ন ছিলেন তখন সমাজ পরিচালনায় কি অবস্থা ছিল তাহার আলোচনা করিতে হইবে। মধ্যবিত্তগণ কখন সর্ব্বাপেক্ষা সমৃদ্ধিসম্পন্ন ছিলেন তাহার সন্ধান করিতে বসিলে দেখা যাইবে যে, যতই অতীতের দিকে পিছাইয়া যাওয়া যাইবে ততই মধ্যবিত্তগণের সমৃদ্ধি অধিক হইতে অধিকতর ছিল এবং এই সমৃদ্ধির সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরাকাষ্ঠা হইয়াছিল ভারতীয় ঋষির সংহিতাপ্রোক্ত সমাজ-গঠন যখন সর্ব্বাপেক্ষা অধিক দৃঢ়তা প্রাপ্ত হইয়াছিল। কাজেই মধ্যবিত্তের সমৃদ্ধির সময় সমাজ-পরিচালনার ব্যবস্থা কি ছিল তাহার আলোচনা করিতে হইলে, ভারতীয় ঋষির সংহিতায় সমাজ-পরিচালনার ব্যবস্থা সম্বন্ধে কি নির্দ্দেশ দেওয়া রহিয়াছে তাহা খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে।

আজকালকার পণ্ডিতগণ ঋষিগণের সংহিতাগুলিকে যেরূপ ভাবে ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন তাহা শুনিলে অথবা অধ্যয়ন করিলে বলিতে হয়, জাতকর্ম্ম প্রভৃতি দশবিধ সংস্কার এবং ব্রাহ্মণগণকে কিরূপ ভক্তি করিতে হইবে, প্রধানতঃ, এবংবিধ

তথাকথিত আধ্যাত্মিকতার কথা ছাড়া, মনুষ্যের ধনসম্পদ্ কিরূপে বৃদ্ধি পাইবে তাহার কোন কথা নাই। আমরা একাধিকবার দেখাইয়াছি যে, ঋষিপ্রণীত ভাষার অর্থ কিরূপ ভাবে গ্রহণ করিতে হয়, তাহার পন্থা সম্বন্ধে ঋষিগণ যাহা নির্দ্দেশ দিয়াছেন সেই নির্দ্দেশ আধুনিক পণ্ডিতগণ বিদিত নহেন এবং আজকালকার পণ্ডিতগণ ঋষিপ্রণীত কথাগুলি যে ভাবে ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন তাহা আদৌ নির্ভরযোগ্য নহে।

মনুসংহিতা যথাযথ অর্থে অধ্যয়ন করিতে পারিলে দেখা যাইবে যে ঋষিরযুগে প্রত্যেক দেশের মনুষ্য-সমাজ প্রধানতঃ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত হইত। জন্মের সঙ্গে সঙ্গে মানুষ যে বিশেষ বিশেষ গুণ ও কর্ম্মশক্তি পাইয়া থাকে তদনুসারে এই শ্রেণীবিভাগ সম্পাদিত হইত। কোন্ শিশু কোন্ শ্রেণীর গুণ ও কর্ম্মশক্তি লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছে তাহা পরীক্ষা করিতে হইলে যে বিচক্ষণতার প্রয়োজন হয়, সেই বিচক্ষণতা-সম্পন্ন মানুষের অভাব তখন হইত না এবং প্রত্যেক শিশু ভূমিষ্ঠ হইলে সেই শিশু কি কি বিশেষ বিশেষ গুণ ও কর্ম্মশক্তি লইয়া জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছে তাহা পরীক্ষা করা হইত এবং ঐ গুণ ও কর্ম্মশক্তি বাড়াইয়া লইতে হইলে যে শিক্ষা ও সাধনার প্রয়োজন হয় সেই শিক্ষা ও সাধনা ঐ শিশু যাহাতে কার্য্যতঃ পাইতে পারে তাহার ব্যবস্থা করা হইত।

প্রত্যেক সমাজের মানুষকে প্রধানতঃ যে যে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইত, তাহার এক শ্রেণীর নাম বুদ্ধিজীবী মানুষ অথবা আর্য্য, আর এক শ্রেণীর মানুষের নাম ছিল শ্রমজীবী অথবা শূদ্র। সংস্কৃত ভাষায় আর্য্য ও শূদ্র এই দুইটী শব্দের অর্থ যথাযথভাবে বুঝিতে না পারিয়া আজকালকার পণ্ডিতেরা ঐ দুইটী পদকে কত রকমেই না ব্যাখ্যা করিয়াছেন, ঐতিহাসিকগণও ঐ ব্যাখ্যাকে ভিত্তি করিয়া কত রকমেরই আজগুবি ইতিহাস আবিষ্কার করিয়াছেন। কিন্তু আর্য্য ও শূদ্র এই দুইটি পদের স্ফোটগত অর্থ কি হইতে পারে তাহা পরীক্ষা করিলে দেখা যাইবে যে, আর্য্য পদের অর্থ বুদ্ধিজীবী ও শূদ্র পদের অর্থ শ্রমজীবী। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই তিন শ্রেণীর মানুষ ছিলেন আর্য্য-শ্রেণীর অন্তর্গত। এখনকার ঐতিহাসিকগণ মনে করেন যে, একমাত্র ভারতবর্ষেই ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই শ্রেণীবিভাগ ছিল এবং আর্য্যগণের স্থান ছিল একমাত্র মধ্যএশিয়ায়। সূর্য্যসিদ্ধান্তের ভূগোলাধ্যায় যথাযথ অর্থে অধ্যয়ন করিয়া মনুসংহিতা যথাযথ অর্থে অধ্যয়ন করিতে পারিলে দেখা যাইবে যে, জগতে সর্ব্বত্রই আর্য্য এবং তদন্তর্গত ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এবং শূদ্র বিদ্যমান ছিল।

মনুসংহিতার নিয়ন্ত্রিতকালে বুদ্ধিজীবিগণকে শ্রমজীবীগণের হিতার্থে জীবনধারণ করিতে হইত এবং শ্রমজীবীগণ কিরূপভাবে কোন্ কার্য্য করিলে অর্থগত, স্বাস্থ্যগত এবং মনোগত প্রভৃতি সর্ব্ববিধ দুঃখ হইতে সর্ব্বতোভাবে মুক্ত হইতে পারে তাহা পরিজ্ঞাত হইতে হইত। শ্রমজীবীগণের অর্থগত সমস্যা সমাধান করিবার সর্ব্বাপেক্ষা সম্মানজনক উপায় ছিল স্বাধীনভাবের কৃষি, স্বাধীনভাবের শিল্প ও স্বাধীনভাবের বাণিজ্য। কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্য কিরূপভাবে নিয়ন্ত্রিত করিলে কৃষক, শিল্পী ও বণিকগণের স্বাধীনতা সর্ব্বতোভাবে অক্ষুণ্ণ রাখা যায় এবং ঐ তিন ব্যবসায় সর্ব্বতোভাবে সর্ব্বথা লাভযোগ্য করা যাইতে পারে, তাহার সঙ্কেত বুদ্ধিজীবীগণকে শিক্ষা করিতে হইত এবং ঐ সঙ্কেত শ্রমজীবিগণকে শিখাইতে হইত। ইহার ফলে কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্য সর্ব্বদাই সম্মানজনক ব্যবসা বলিয়া পরিগণিত হইত এবং উহার কোনটিতেই কখনও কাহারও লোকসান সহিতে হইত না।

কিরূপভাবে চলাফেরা করিলে, কি খাইলে এবং কি না খাইলে, কতখানি খাইলে এবং কতখানি না খাইলে, কোন সময় খাইলে এবং কোন সময় না খাইলে মানুষের স্বাস্থ্য সর্ব্বতোভাবে অটুট থাকিতে পারে, তাহা বুদ্ধিজীবিগণকে শিক্ষা করিতে হইত এবং শ্রমজীবিগণকে উহা শিখাইতে হইত। ইহার ফলে শ্রমজীবী-সম্প্রদায়ও নিজ নিজ পরিবারের অস্বাস্থ্য কি করিয়া দূরীভূত করিতে হয়, সাধারণ রোগ হইলে কিরূপভাবে চিকিৎসা করিতে হয় তাহা পরিজ্ঞাত হইতে পারিত।

নিজের মন কাহাকে বলে তাহা নিজের শরীরের মধ্যে কি করিয়া জানিতে হয়, মনে কেন কখনও কখনও শান্তি থাকে এবং কেনই বা কখনও কখনও অশান্তির উদয় হয়, কি করিলে ঐ অশান্তি সর্ব্বতোভাবে দূরে রাখা যায়—তাহার সঙ্কেত বুদ্ধিজীবীগণকে জানিতে হইত এবং ঐ সঙ্কেত শ্রমজীবীগণকে শিখাইতে হইত।

এইরূপে শ্রমজীবিগণের হিতার্থে বুদ্ধিজীবী-শ্রেণীর শিশুগণকে লালিত ও বর্দ্ধিত করা হইত এবং বুদ্ধিজীবিগণ শ্রমজীবিগণের হিতার্থে সর্ব্বদাই ব্যস্ত থাকিয়া কালাতিপাত করিতেন। বুদ্ধিজীবিগণ শ্রমজীবিগণের জন্ত জীবনধারণ করিতেন বটে কিন্তু তাঁহাদিগের কার্য্যের বিনিময়ে আজকালকার ডাক্তার ও উকিলগণের মত কোনও 'ফি' নির্দ্ধারণ করিতেন না। এমন কি অবস্থাবিশেষে পারিশ্রমিক দিতে আসিলেও তাহা গ্রহণ করিতেন না।

অন্তদিকে বুদ্ধিজীবিগণের সুচিন্তিত সঙ্কেতের ফলে শ্রমজীবিগণ অর্থ, স্বাস্থ্য ও শান্তি সম্বন্ধে এতাদৃশ অধিক পরিমাণে লাভবান্ হইতেন যে, তাঁহারা সর্ব্বদাই কৃতজ্ঞতাবশে আপ্লুত থাকিতেন এবং বুদ্ধিজীবিগণকে সর্ব্বদাই ঈশ্বরের মত শ্রদ্ধা করিতেন এবং নিজেদের সর্ব্বস্ব তাঁহাদিগের পদে উপহার দিবার জন্ত সর্ব্বান্তঃকরণে ব্যাকুল থাকিতেন। বুদ্ধিজীবিগণ শ্রমজীবিগণের সম্পদকে নিজ নিজ সম্পদ্ বলিয়া কার্য্যতঃ মনে করিতে পারিতেন এবং কার্য্যতঃ নিজের ঘরে প্রয়োজনাতিরিক্ত কিছু না লইলেও সর্ব্ববিধ সম্পদের প্রভুত্ব উপভোগ করিতেন।

পাঠক, আজকালকার শ্রমজীবী ও ধনিকের ঝগড়ার দিনে উপরোক্ত চিত্রের মাধুর্য্য কল্পনাচক্ষে লক্ষ্য করিতে চেষ্টা করিবেন কি? অর্থনীতির পণ্ডিত এডাম স্মিথ (Adam Smith) হইতে জোশুয়া ষ্টাম্প (Joshua Stamp) পর্য্যন্ত পণ্ডিতগণ যে যে চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন তাহার কোন চিত্রে উপরোক্ত মাধুর্য্যের কোন পরিচয় পান কি? পাঠক, একটু চেষ্টা করিয়া বুঝুন, কোন্ শ্রেণীর সামাজিক চিত্র ঋষিগণ অঙ্কিত করিয়াছিলেন।

কেন এই চিত্র নষ্ট হইয়া গেল, কেন এই চিত্রের কথা এখন আর মানুষ জানে না—সে অনেক কথা। অত কথা এই প্রবন্ধে আনিব না। এখন আর ঐ চিত্র দেখা যায় না কেন, তাহার সন্ধান করিতে বসিলে দেখা যাইবে যে, উহার একমাত্র কারণ—কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, স্বাস্থ্য ও শান্তি সম্বন্ধীয় যে সঙ্কেত মধ্যবিত্তগণের প্রধান সম্পদ ছিল সেই সম্পদ মধ্যবিত্তগণ হারাইয়া ফেলিয়াছেন। এখনও মধ্যবিত্তগণই সমাজের শিক্ষিত ও বুদ্ধিমান্ সম্প্রদায়; কিন্তু এখন তাঁহারা নামে তালপুকুর—ঘটি আর ডোবে না।

মধ্যবিত্তগণের ঐ আসল সম্পদ হারাইয়া গিয়াছে বলিয়াই শ্রমজীবিগণের মধ্যেও হাহাকার উঠিয়াছে এবং তাহারা অনাহারে অস্বাস্থ্যে ও অশান্তিতে জর্জ্জরিত হইয়া দিশাহারা ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়াছে। বহু সহস্র বৎসর হইতে মধ্যবিত্তগণ তাঁহাদিগের ঐ আসল সম্পদ হারাইয়াছেন। কিন্তু ঐ আসল সম্পদের জোরে একদিন যে গঠনে সমাজ সংগঠিত হইয়াছিল, সেই সংগঠনের ফলে ঐ আসল সম্পদ হারান সত্ত্বেও পরবর্ত্তী কয়েক সহস্র বৎসর পর্য্যন্ত শ্রমজীবিগণ এত অধিক পরিমাণে জর্জ্জরিত হয় নাই। কিন্তু আর চলিতেছে না—চারিদিকে হাহাকার উঠিয়াছে, মানুষ পশু হইয়া পড়িয়াছে। যে মানুষের জন্ত মানুষের জীবন, সেই মানুষের প্রাণ হরণ করিয়া মানুষ গৌরবানুভব করে। পাঠক, অনুমান করিবেন কি, যে কি ভীষণ অন্ধতা? যাহাদের এত পাপ, তাহারা কি করিয়া পাপের শাস্তি না পাইয়া সর্ব্বনিয়ন্তার নিয়ম লঙ্ঘন করিবে?

ইহার জন্ত বলিতেছিলাম যে, আমাদের ভবিষ্যত বড় অন্ধকার।

রক্ষার উপায় কি?—তাহা কি এখনও বলিয়া দিতে হইবে? মধ্যবিত্তগণ যদি আবার মানুষের মত হইতে চায় তাহা হইলে তাহাদিগকে পুনরায় কি করিয়া শ্রমজীবিগণের জন্ত আদরের জীবনকে উপহার দিতে হয়, তাহা শিখিতে হইবে ও শিখাইতে হইবে। আবার যদি মানুষের মত দাঁড়াইবার আকাঙ্ক্ষা তাহাদিগের মনে জাগে, তাহা হইলে কোন্ সঙ্কেতে কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, স্বাস্থ্য ও মনের স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখা যায় এবং কোন সঙ্কেতে কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্য, সর্ব্বাবস্থায় সর্ব্বতোভাবে লাভযোগ্য করা যায় ও অস্বাস্থ্য ও অশান্তি সমাজ হইতে দূর করিতে পারা যায়—তাহা শিখিতে হইবে ও শিখাইতে হইবে।

কোথায় এই সঙ্কেত পাওয়া যাইবে তাহার সন্ধানে ব্যাপৃত হইলে দেখা যাইবে যে, আধুনিক পাশ্চাত্য জগতে এই সঙ্কেত বিদ্যমান নাই। তাহাদের কাছে খুঁজিলে ঐ সঙ্কেতের সন্ধান পাওয়া যাইবে না।

পাশ্চাত্যদেশীয়গণ সংক্রামিক বৎসর হইতে ইহা খুঁজিয়া বেড়াইতেছেন, কিন্তু আজ পর্য্যন্ত তাঁহারা সেই সঙ্কেত খুঁজিয়া পান নাই। প্রথমে পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকগণ ইহার সন্ধান

করিয়াছেন কিন্তু তাঁহাদের নিকট সেই আলোকরশ্মি প্রতিভাত হয় নাই। তাঁহাদের পরে পাশ্চাত্য অর্থ-নৈতিক পণ্ডিতগণ 'Adam Smith' হইতে 'Joshua Stamp' পর্য্যন্ত ঐ সঙ্কেতের অনুসন্ধানে ব্যাপৃত ছিলেন কিন্তু তাঁহারাও সেই সঙ্কেত লাভ করিতে সমর্থ হয়েন নাই। তৎপরে মার্কিন হইতে আরম্ভ করিয়া অধুনাতন অর্থনৈতিকগণ বহুবিধ অনুসন্ধান করিয়াও সফলমনোরথ হন নাই। আজ হিটলারও সেই সঙ্কেতের সন্ধানেই ব্যাপৃত। কিন্তু পাশ্চাত্য খুঁজিয়াও সে সঙ্কেতের সন্ধান মিলিবে না।

ঐ সঙ্কেতের সন্ধান আছে ভারতীয় ঋষির বেদে। সায়ণাচার্য্য ঐ সঙ্কেতের সন্ধান দিতে পারেন নাই। সায়ণাচার্য্য আমাদিগের নমস্য, কারণ, তিনি ঐ সঙ্কেতের সন্ধানে যে সাধনা করিয়াছিলেন, তাঁহার ভাষ্যে তাহার চিহ্ন বিদ্যমান রহিয়াছে। অনুসন্ধিৎসু পাঠক, বঙ্গশ্রী পড়ুন, তাহা হইলে উহার সন্ধান পাইবেন। আর যিনি বঙ্গশ্রী পড়িতে না চাহেন, তিনি সর্ব্বনিয়ন্তার নিকটে কিরূপভাবে কামনা পৌঁছাইতে হয়, সর্ব্বনিয়ন্তাকে সর্ব্বতোভাবে পরিজ্ঞাত হইয়া সর্ব্বনিয়মের সঙ্গে কি করিয়া নিজকে মিশাইয়া দিতে পারা যায় এবং সর্ব্বনিয়ন্তার নিকট হইতে যত কিছু কামনার বস্তু তাহা কি করিয়া আদায় করিয়া লইতে হয়, তাহার অভ্যাসে অভ্যস্ত হউন।

ভারত

— শ্রীঅন্নপূর্ণা দেবী

ভারত আমার জননী আমার
তুষার-শুভ্র কিরীট যার,
জলধি চুম্বে চরণ যুগল
নদী মেখলা হ'য়েছে কার।

কোথাও তোমার মধু-উপবন
কোথাও গভীর অটবী রাজে,
কোথাও মরুভূ করিতেছে ধূ ধূ
কোথাও শস্যশ্যামলা মা যে।

এযে গো আমার সেই দেশ যেথা
ঝঞ্ঝা ও মধুমলয় বহে,
সাগরে সাগরে বাড়ব অনল
অরনি কোথাও বনানী দহে।

কস্তুরী-মৃগ নাভির গন্ধে
যেথানে ছোটে গো পাগল পারা,
শিরিষ শেফালি বেলা ও বকুল
আপনার বাসে আপনহারা।

পরশুরামের বীর্য্য যেখানে
তপনের চেয়ে দীপ্তিময়,
বাসব-বিজেতা অর্জ্জুন যেথা
অজেয় কিরাতে করিল জয়।

কোথায় প্রেমের সমর চলে গো
ভগবান আর মানব সনে,
বজ্র কোথায় গড়িয়া উঠিল
মহামানবের জীবন পণে।

এ যে গো আমার প্রতাপের দেশ
পদ্মিনী আর পান্নার গো,
এ যে গো আমার যক্ষের দেশ
বিরহীর দুখ কান্নার গো।

চণ্ডীদাসের এই ত সে দেশ
প্রেমের রাজ্য এই ত বটে,
বংশীধারীর বাঁশরীর স্বর
এই যমুনার শ্যামল তটে।

বল্মিক মাঝে লভিয়া জনম
হেথা গাহে কবি অমর গান,
শিপ্রা তটেতে বাজিয়া উঠে যে
শ্রেষ্ঠ কবির বীনার তান।

মহাভারতের কাব্য ও নীতি
বেদবেদান্ত চরণে লুটে,
অজয় নদীর কূলে কূলে কার
গীত গোবিন্দ ধ্বনিয়া উঠে।

হেথা গড়ে উঠে অজন্তা গুহা
নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়,
বুদ্ধদেবের নির্ব্বাণবাণী
অর্দ্ধ এসিয়া করিল জয়।

হেথা কৃষ্ণের কর্ম্মবাদও
নিমায়ের প্রেম-বন্যা বহে;
হেথায় কৃষক পথে যেতে যেতে
দর্শন উপনিষদ কহে।

জননী, আমার বিদায়ের দিনে
ছাড়িব যখন তোমার গেহ,
ডাকিবে কি মোরে তোমার পীযূষ
ডাকিবে কি পুনঃ তোমার স্নেহ?

তব নীলাকাশ তোমারি বাতাস
ডাকিবে আমায় বিহগ তব,
ডাকিবে আমারে শ্যাম অঞ্চল
তোমার ক্রোড়েই মানুষ হ'ব।

দুর্গা

—শ্রীহরিপদ দত্ত

পাপের স্বরূপ দৈত্যে করিয়া দমন,
দেবতার, শুনেছি মা, নাশিলে দুর্গতি।
পূজিয়া, অকালে করি তোমার বোধন,
নীতিধর্ম্মাশ্রয়ী রামচন্দ্র মহামতি
করিয়া সবংশে হত পাপ-অবতার
দশাননে, সাধিলেন জানকী-উদ্ধার।

জানে সবে দুর্গা তুমি দুর্গতিনাশিনী।
করধৃত নানাবিধ রণপ্রহরণ,
পাপীর শাসন তরে। জুড়িয়া মেদিনী
উর্দ্ধকরে বরাভয় কর বিজ্ঞাপন।
করিছ অসুরে জর্জ্জরিত অস্ত্রজালে,
না হেরি ভ্রূকুটী তবু প্রশান্ত ও ভালে।

ভাবে লোকে আড়ম্বরে করিয়া বোধন,
বর্ষান্তে আনিতে হয় তোমারে ধরায়।
তবে কি মা, রহ তুমি নিদ্রায় মগন
সম্বৎসর, করে ভঙ্গ মন্ত্রপাঠে তায়?
হায় ভ্রান্ত নর! বিশ্বশকতিরূপিনী
অভিভূতা নিদ্রাঘোরে দিবস যামিনী?

কিম্বা থাক তুমি বিশ্বধেয়ানে মগন,
না টুটিলে, পদার্পণ না কর ধরায়?
তবে কি বোধনে যেবা করে আবাহন,
করুণা পরশ তব শুধুই তাহায়?
সত্য যদি দেখ বিশ্বে বর্ষে দিনত্রয়,
কী-শক্তিচালিত অবশিষ্ট দিনচয়?

বিদ্যমান দীপ্ত তব ত্রিনয়ন 'পরে
সতত সমস্ত বিশ্ব, সৃষ্ট যতকাল—
না দেখিছ আবির্ভূত নূতন আকারে
করি অত্যাচার কত দানবের দল
সর্ব্বসহা বসুমতী 'পরে দিন দিন
নানা মতে, করিছে তাহায় শক্তিহীন?

না দেখিছ কি দশায় নীতা বসুন্ধরা?
অশক্তা দানিতে অন্ন সন্তাননিকরে --
না জন্মে প্রচুর শস্য -- ক্ষেত্র অনুর্ব্বরা—
পূর্ণ দশদিশি অভুক্তের হাহাকারে।
ভাসিবে সন্তান তব চির-অশ্রুজলে,
না কর দমন যদি এ দানব দলে।

তুমি ত আনন্দময়ী, নিরানন্দ-নীরে
বল দেখি সন্তান তোমার কেন ভাসে?
মৌখিক আনন্দ তিন দিন সম্বৎসরে—
জ্বলিলে জঠর, মনে আনন্দ কি আসে?
জানি নিমজ্জিত মোরা স্বখাত সলিলে,
কিন্তু কে দেখিবে বল, তুমি না দেখিলে?

না পারি ডাকিতে, সত্য, ডাকের মতন,
নাহি জপি দুর্গানাম, জপিলে যেমনে
চিদাকাশে তোমার বিকাশ সঙ্ঘটন,
ধ্বান্তরি অম্বরে যথা উষা-আগমনে,
ধাকিত কৃপায় তব তাই নিরন্তর,
দুঃখ, দৈন্য আমাদের চিরসহচর।

তথাপি স্বরূপ তব কর প্রকটিত—
হউক শকতিময়ী, বাঁচি, বসুমতী,
সন্তান হৃদয়ে হ'ক শকতি নিহিত,
হ'ক রুদ্ধ দানবের প্রভাব, প্রগতি।
সর্ব্বব্যাপী প্রাচুর্য্যের ফলে জীবগণ
করুক আনন্দ-নীরে সুখে সন্তরণ।

ফল-আকাঙ্ক্ষায় কিন্তু বৃথা উদ্বোধন;
ভুঞ্জে কর্ম্মফল জীব তোমারি বিধানে—
করে যে, বিচারে তব, পাপ-আচরণ,
নিগ্রহ অবশ্যম্ভাবী, সুকর্ম্ম সাধনে
পুরস্কার অনুরূপ। পাপ পুণ্য ভার
তুলিত নিখুঁত তুলাদণ্ডেতে তোমার।

জাগ্রত অতীত

—শ্রীনারায়ণচন্দ্র রায়

ছেলেটা মরিয়াছে অনাহারে শুকাইয়া। বৌ সেই শোকে পাগল। সমস্ত দিন-রাত্রি অশান্ত ঘূর্ণি হাওয়ার মত ঘুরিয়া বেড়ায় এখানে-সেখানে। কোন দিন হয় ত দুপুর বেলা একখানা কচুর পাতা লইয়া আসিয়া উঠানের মাঝখানে বসিয়া বলে—দাও গো, দুটি ভাত দাও। খোকা ঘুমিয়েছে, এইবেলা দুটি খেয়ে নি।

হরিহর ভাত দিয়া সামনে বসিয়া আদর করিয়া খাওয়ায়। চোখ বাহিয়া তখন বুঝি দুই ফোঁটা জল গড়াইয়াও পড়ে। কোনদিন হয় ত মোটেই এমুখো হয় না। বসিয়া থাকিয়া থাকিয়া হরিহরের বুকের ভিতরটা খালি হইয়া যায়।

লোহার সিন্দুক-ভর্তি একরাশ টাকার মধ্যে হাত ডুবাইয়া হরিহর তাই ভাবিতেছিল—কেহ তাহার নাই আজ। পৃথিবী ভরা অগুন্তি লোকের মাঝখানে সে একান্ত একলা, একান্ত অসহায়। কিন্তু একদিন সবই তাহার ছিল। স্ত্রী-পুত্র, ঘুম, আনন্দ সব—সব। সবান্ধব-অবেষ্টনী তাহার জীবনও মধুময় করিয়া তুলিয়াছিল। আজ সে কথা মনে পড়ে স্বপ্নের মত—আর অন্তরে হুঃ হুঃ করিয়া প্রবল ঝড় বহিতে থাকে। আজ সে বহু টাকার মালিক। এই সিন্দুকটার সমস্ত টাকাই দুই হাতে লইয়া ছিনিমিনি খেলিতে পারে। কিন্তু সেদিন এই টাকা কোথায় ছিল!

কত দিনই বা হইবে। চলিয়া-যাওয়া বৎসরগুলো আঙ্গুলে গুণিয়া ফেলা যায়। হরিহরের স্পষ্ট মনে আছে প্রত্যেকটি তুচ্ছ কথাও। মনে পড়িল—পর পর কয়েকবার জ্বরে ভুগিয়া হরিহর যেদিন অন্নপথ্য করিল সেদিন তাহার কঙ্কালসার, নোয়ানো দেহের দিকে চাহিলে সত্যই কান্না পায়। কিন্তু কাঁদিবার অবসর কোথায়? ঘটা করিয়া চোখের জল ফেলিয়া বিলাসিতা করিবার স্বাচ্ছন্দ্যই বা কোথায়। দুই মাসের অনুপস্থিতিতে এগার টাকার চাকরিটি গিয়াছে। চৌধুরীদের পাইক গণেশ সংবাদটা দিয়া গেল—দুঃখ করে কি আর করছ হরিহরদা। সব এই অদেষ্ট—গণেশ কপালে আঙ্গুল টিপিয়া ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিল।

অদৃষ্টই বলিতে হইবে। আজ তাহার দশ বৎসরের চাকরির জীবনে কই এমন অসুখ ত কোন দিনই করে নাই। বিকট মুখভঙ্গি করিয়া এমন দারিদ্র্যও তাহার সংসারে মাথা গলায় নাই। নির্মম অদৃষ্ট কোথায় ওৎ পাতিয়া বসিয়াছিল কে জানে। পুঁজিপাতি যেখানে যাহা ছিল, অসুখ যেন দেহের সঙ্গে সঙ্গে তাহাও চুষিয়া লইয়াছে। আজ ঘরে এককণা চাল নাই, একটা তামার টুকরাও নাই। বৌ বোসগিন্নির নিকট হইতে এক সের চাল ধার আনিয়াছিল—হরিহর তাই দিয়া অন্নপথ্য করিল। কিন্তু কাল! দারিদ্র্যের রক্তচক্ষু তাহাকে ঘিরিয়া পৈশাচিক নৃত্য করিবে। স্ত্রী-পুত্রের অনাহারক্লিষ্ট মুখ একমুষ্টি অন্নের জন্য আকুলি বিকুলি—! হরিহর শিহরিয়া উঠিল!

পরক্ষণেই তাহার মনে হইল, ছাইপাশ এ সব কি সে ভাবিতেছে। অসুখে তাহার মাথাও কি খারাপ হইয়া গেল! আজ চাল নাই, একটী পয়সাও নাই—সবই সত্য। কিন্তু তাই বলিয়া কি কালও এমন থাকিবে না কি! গ্রামের মধ্যে বন্ধুবান্ধব তাহার কত আছে—আর চৌধুরীমশাই কি তাহাকে আবার চাকরি না দিয়া পারিবেন। হরিহর একগাল হাসিয়া বলিল—বৌ, তুই ভাবিস্ না। গণ্শাটা একটা পাগল তাই যা তা ব'লে গেল। এই আমি চল্লাম মুনিব বাড়ী, তুই নিশ্চিন্দি থাক। হরিহর ছেলেকে একটু আদর করিয়া চৌধুরী বাড়ীর দিকে চলিল।

চৌধুরী বাড়ীর কর্ত্তা রাধাকান্ত ফুরসির নলটা মুখ হইতে নামাইয়া বলিলেন—বুঝলে হরিহর, তুমি যে বেঁচে উঠবে সে আশাই আমরা ছেড়ে দিয়েছিলাম। আর কাজেরও ক্ষতি হচ্ছিল। লোক নিলুম। তা সে লোককে

এখন তাড়ানো চলে না। তুমি অন্য চেষ্টা দেখ, হরিহর। আবার যদি দরকার হয় তবে তোমাকেই নেব।

রাধাকান্ত চৌধুরী এত কথা একবারে বলিয়া একটু হাঁপাইয়া লইয়া নলটা মুখে তুলিয়া দিলেন। হরিহর শক্ত করিয়া মাটি কামড়াইয়া ধরিল—মাথাটা কেমন ঘুরিয়া উঠিয়াছে—দৃষ্টি ঘোলাটে হইয়া আসিতেছে যেন।

চাকরি গিয়াছে, যাক্। আবার একটা চাকরি জুটিবে, না হয় চাষ-বাস করিয়া দিন চালাইবে। সে কাজ এমন কি মন্দ! কিন্তু যে কয়দিন শরীর ভালভাবে সারিয়া না উঠিতেছে, সে কয়দিন কেমন করিয়া চলিবে? হরিহরের মনে পড়িল বন্ধুবান্ধবের কথা। বন্ধুবান্ধবের সংখ্যা গাঁয়ে ত কম নয়। তাহারা কি তাহার কথা ভুলিয়া থাকিতে পারে? হরিহর চাটুজ্জে মশাইয়ের কাছে চলিল পরদিন। চাটুজ্জে মুখ বাঁকাইয়া কহিলেন—কিহে হরিহরবাবু, কোথায় যাওয়া হচ্ছে?

হরিহর প্রণাম করিয়া কহিল—আজ্ঞে, আপনার এই শ্রীচরণে। বড় বিপদে পড়েছি কর্ত্তা।

চাটুজ্জে বিস্মিত হইবার ভাণ করিয়া কহিল—বল কি হে তোমার বিপদ! তুমি হচ্ছ গিয়ে চৌধুরীদের মুহুরী তোমার কাছে বিপদ ঘেঁষতে পারে?

হরিহর কাঁদ-কাঁদ হইয়া বলিল, আর তামাসা কর্বেন না, কর্ত্তা।

চাটুজ্জে মুচ্‌কি হাসিয়া বলিলেন—তা আমার কাছে কেন? আমরা ত অসাধু লোক। তার পর চাপা-গর্জ্জনে চাটুজ্জে কহিলেন—আজ সাহায্য চাইতে এসেছ হরিহর। কিন্তু মনে আছে হাজার টাকা দিতে চেয়েছিলুম? তোমার কেনা গোলাম হয়ে থাকতুম, যদি তুমি বিধবার এত বড় সম্পত্তিটা আমার হাত করে দিতে। তোমার জন্য আমার এত বড় ক্ষতি হয়ে গেল—উঃ। চাটুজ্জে মুষ্টিবদ্ধ হাত দুইটা হরিহরের মুখের উপর নাচাইলেন। হরিহর ভয় পাইয়া পিছাইতে যাইয়া পড়িয়া গেল। চাটুজ্জে হাঃ হাঃ করিয়া হাসিয়া উঠিলেন।

হরিহরের ক্লান্ত দেহের উপর বিপদের ছায়া ঘনাইয়া আসিল। কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া গেল। তাহার দুর্ভাগ্যের কথা বহু পূর্ব্বেই প্রচার হইয়া গিয়াছে। একদিন যে হরিহর চৌধুরীদের আওতায় সকলের বন্ধুর আসন অধিকার করিয়াছিল, আজ সে যে কোন্ আসন পাইবার উপযুক্ত, লোকগুলা ঠিক করিয়া উঠিতে পারিতেছিল না। তাহাদের আগল-ছাড়া ইচ্ছার উপরে যতদিন পর্য্যন্ত হরিহরের প্রতিষ্ঠা ভয়ের উদ্রেক করিতে পারিয়াছিল, ততদিন তাহার সম্বন্ধে বেশী কিছু ভাবিবার অবসর তাহাদের হয় নাই। এখন হরিহরকে তাহারা যে-কোন স্থানে ঠেলিয়া দিতে পারে। আত্মহারা হইয়া সকলে ভাবিল—কি করিলে ঠিক হয়। সঙ্গে সঙ্গে হরিহর যাইয়া হাত পাতিল। যাহারা উপকার পাইয়াছিল তাহারাও মুখ ফিরাইল। হরিহরের বর্ত্তমান অবস্থা বিবেচনা করিয়া, দিলে ফিরিয়া না পাইবার ভয়ে, তাহারাও সরিয়া দাঁড়াইল। তাহাদেরও আয় এবং ব্যয় ধরা-বাঁধা নিয়মেই করিতে হয়। কে জানে আজিকার দানের বিলাসিতায় কাল তাহাদের দান গ্রহীতার স্থান পূর্ণ করিবে কি না।

হরিহর টলিতে টলিতে বাড়ীর দিকে পা বাড়াইল। দুপুর গড়াইয়া গিয়াছে। মাথার উপর ফাঁকা নীল আকাশে সূর্য্য রক্তচক্ষু মেলিয়া শাসাইতেছে। হরিহর একবার রক্তচক্ষু করিয়া সূর্য্যের দিকে সক্রোধে চাহিল। কিন্তু আজ সর্ব্বত্রই তাহার পরাজয়। পরাজয়ের বুঝি বান ডাকিয়াছে। প্রতিষ্ঠা গিয়াছে, ঘুম গিয়াছে, শান্তি গিয়াছে, নিরস্ত্র পরাজিত সৈনিকের মত বুকের আগুনে দগ্ধ হইতেছে। পা দুইটা অচল হইয়া আসিতেছে—সমস্ত শরীর কাঁপিতেছে। হরিহর হাতের লাঠিটা দিয়া জোরে নিজের হাঁটুতে একটা আঘাত করিল।

হরিহর যখন বাড়ী ফিরিল, সূর্য্য পশ্চিম আকাশে তখন অনেকটা ঢলিয়া পড়িয়াছে। ঝাঁ ঝাঁ করা রৌদ্রের তলে গাঁ-খানা নিঝুম হইয়া পড়িয়া আছে অর্দ্ধমৃতের মত। বাড়ী ঢুকিতেই হরিহর শুনিল—বৌ ছেলেটাকে সান্ত্বনা দিতেছে—কেঁদো নি মাণিক। চাল ডাল আনতে গেছে, এলো বলে। এলেই রান্না চাপিয়ে দেব; কেঁদ নি মাণিক। হরিহরের মাথাটা গরম হইয়া উঠিল। ছেলের সম্মুখে যাইয়া শূন্য হাতটাকে বারকয়েক উপুর করিয়া বিকট হাসি হাসিয়া উঠিল—এই নে—খা, খা—আরও খা।

কয়েক দিন হইতে একটানা অনাহার চলিয়াছে।

ছেলেটার কান্না থামিতে চায় না। ঘটি-বাটী, থালা যাহা কিছু ছিল, অনেক পূর্ব্বেই অপরের হাতে চলিয়া গিয়াছে। ধার কেহ দিবে না বলিয়া বুঝি প্রতিজ্ঞা করিয়াছে, হরিহরের তাই মনে হয়। ছেলেটা আঁজলা ভরিয়া জল খাইতেছে আর ঘরের এক কোণে পড়িয়া কাতড়াইতেছে। বাহিরে দাওয়ার এককোণে দুই হাঁটুর মধ্যে মাথা গুঁজিয়া নিশ্চল বসিয়া রহিল হরিহর। তার পর—। তার পর বৌটা পাগল হইয়া গিয়াছে ছেলের শোকে—।

কিন্তু হরিহর আজ বহু টাকার মালিক। হাজার হাজার টাকা তাহার ঐ লোহার সিন্দুকটার মধ্যে সঞ্চিত রহিয়াছে। ঐ কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা লইয়া সে ইচ্ছামত ছিনিমিনি খেলিতে পারে। কিন্তু আজ তাহার কেহ নাই, সে একান্ত একলা, একান্ত অসহায়। তাহার মনে হয় এই টাকা সেদিন কোথায় ছিল!

গাঁয়ের লোকগুলা এখনও তাহাকে ঘৃণা করে। ভয় করে তার চেয়ে বেশী। সবাই বলে হরিহর হাড় কৃপণ। দুর্ভোগ ভোগের ভয়ে সকাল বেলা কেহ তাহার নাম করে না। হরিহর হাসে—তীক্ষ্ণ সে হাসি। সে জানে আজ যে তাহাকে ঘৃণা করে কালই হয় ত সে নির্লজ্জের মত তাহার পায়ে ধরিয়া একশত টাকার দলিল দিয়া পঁচাত্তর টাকা লইতে দ্বিধা করিবে না। তার পরিবর্ত্তে থালা, ঘটি-বাটি হরিহরের ঘরের কোণে জমিবে। ভদ্রাসন হরিহরের বেগুন মরিচের বাগানে পরিণত হইবে। হরিহরের বুকের ভিতরটা তখন আনন্দে ফাটিয়া যাইবার মত হয়। অন্ধকার ঘরে উন্মত্তের মত লাফালাফি করে হরিহর।

সিন্দুকের সামনে বসিয়া ভাবিতে ভাবিতে হরিহর তন্ময় হইয়া গিয়াছিল। নিদ্রিত অতীত একবার জাগিয়া উঠিলে ছায়াছবির মত প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত সমস্তটা চোখের উপর ভাসিয়া বেড়ায়।

হঠাৎ তাহার চমক ভাঙ্গিল বাহিরে কে যেন ডাকিতেছে—ওগো, দোর খোল—আমি এসেছি, আমি। পাগ্‌লীটা আসিয়াছে, হরিহর ব্যস্ত হইয়া তাড়াতাড়ি দরজাটা খুলিয়া দিল।

পাগ্‌লী তাহার হাত চাপিয়া ধরিল—ওগো, পেয়েছি—খোকাকে পেয়েছি! জান কোথায় ছিল। চৌধুরীদের আস্তাকুড়ে এ টোকাঁটার মাঝখানে। আমি গিয়ে দেখি ঐ এটোঁকাঁটা আপ্রাণ চেষ্টায় গিল্‌ছে। খেতে খেতে···ওহো-হো, মাছের কাঁটা গলায় আটকে মরে গেল। ওহো-হো আমার সাম্‌নেই মরে গেল। ওহো-হো খোকা রে···।" পাগ্‌লী আর্ত্তনাদ করিতে করিতে ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল।

হরিহরের বুক ভাসিয়া গিয়াছে জলে। পাগ্‌লীর আর্ত্তনাদ তখনও ভাসিয়া আসিতেছিল।

হরিহর পিছন ফিরিয়া চাহিল। সিন্দুকের মধ্যে রূপার টাকাগুলা যেন দাঁত বাহির করিয়া অট্টহাসি হাসিতেছে। দুই হাতে বুক চাপিয়া হরিহর আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল, "খোকা—খোকা রে...।

কাব্যের উদ্দেশ্য

...বায়ু, তেজ ও রসের অদল-বদলের ও সংযোগের (permutation and combination এর) তারতম্যবশতঃ মনুষ্য শরীরে সর্ব্বদা আটটী রস বিদ্যমান থাকে এবং তাহার শিক্ষা ও সাধনার তারতম্যবশতঃ সর্ব্বসমেত ঊন-পঞ্চাশৎ ভাবের উদয় হইয়া থাকে। মানুষের শরীরে রস বিদ্যমান আছে বলিয়াই তাহার ভাবের উদয় হয়। রস না থাকিলে মানুষ শুষ্ক হইয়া এমন কি মৃত্যুমুখে পর্য্যন্ত নিপতিত হয়। "রস" প্রকৃতিজাত এবং "ভাব" মানুষের স্বভাবজাত। মানুষের সমস্ত ভাব কখনও যুগপৎ উদিত হয় না। শিক্ষা ও সাধনার তারতম্যবশতঃ মন, ইন্দ্রিয় ও শরীরের পটুতা বিভিন্নাকার ধারণ করিয়া থাকে এবং ঐ পটুতার বিভিন্নতার জন্য বিভিন্ন বিষয়ের সংযোগে বিভিন্ন রকমের ভাবের উৎপত্তি হয়। ভাবের বিভিন্নতার সহিত মূল আটটী রসের সম্বন্ধ বিভিন্নাকার ধারণ করে। সুশিক্ষা ও সুসাধনার দ্বারা পরিমার্জ্জিত না হইলে মানুষ সাধারণতঃ তাহার ভাবের সহিত অন্তঃস্থিত সূক্ষ্ম রসের যে কি সম্বন্ধ, তাহা উপলব্ধি করিতে পারে না।

ঐ সম্বন্ধ প্রস্ফুটিত করিয়া সাধারণের পর্য্যন্ত উপলব্ধিযোগ্য করা কাব্যের অন্যতম উদ্দেশ্য।...

জাতীয় মহাসমিতির ইতিহাস*

—শ্রীহেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত

(৬)

বোম্বাই নগরীতে কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশন হইয়াছিল সত্য, কিন্তু কলিকাতাই যে কংগ্রেসের জন্মস্থান এ কথা অস্বীকার করিলে সত্যের অপলাপ হইবে। ১০৮৩ সালে ইলবার্ট বিল, সুরেন্দ্রনাথের কারাদণ্ড এবং লর্ড রীপণের সংস্কার ও ব্যর্থ-প্রয়াস সম্বন্ধে ইতিপূর্ব্বে সবিস্তার বিবরণ প্রদান করিয়াছি। এবারেই ১৮৮৩ সালের ডিসেম্বর মাসে ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের যত্নে আলবার্ট হলে একটী জাতীয় সম্মিলনের অধিবেশনও হইয়াছিল, তবে ইহা প্রাদেশিক সম্মিলনীই ছিল। সুরেন্দ্রনাথ, আনন্দমোহন প্রভৃতি তাহাতে নেতৃত্ব করেন, পার্লামেণ্টের সভ্য Seymour Keay এই সভায় বক্তৃতা দিয়াছিলেন। অম্বিকা চরণ মজুমদার প্রভৃতিও উপস্থিত ছিলেন। পরের বৎসরে (১৮৮৪) ইণ্টার ন্যাশনাল প্রদর্শনীও কলিকাতায়ই হয় বলিয়া সে বৎসরে আর কোন সম্মিলনী হয় নাই। প্রাদেশিক সম্মিলনী বাঙ্গলারই আন্দোলন। কিন্তু সমগ্র ভারতের মধ্যে যে জাগরণের সাড়া পড়িয়াছিল তাহারই অভিব্যক্তি হয় জাতীয় মহাসম্মিলনীতে এবং সেই মহাসমিতির দ্বিতীয় অধিবেশন কলিকাতায়ই হইয়াছিল।

কলিকাতার অধিবেশনে সমগ্র ভারতের প্রতিনিধিবর্গকে অভ্যর্থনা করিবার কোন ত্রুটীই হয় নাই, কারণ বঙ্গবাসী অন্যান্য প্রদেশের ন্যায় আতিথেয়তায় ন্যূন নহে। তবে পার্থক্য এই যে, বাঙ্গালীরা কিছু ভোজন পটু, তাই অপরের পান-ভোজনের ব্যবস্থাও তাঁহারা প্রচুর রকমেই করিয়া থাকেন। কলিকাতায়ও উহার কোন ত্রুটী পরিলক্ষিত হয় নাই।

কলিকাতার অধিবেশনে হিউম সাহেবের আগ্রহে সুরেন্দ্রনাথকে দলভুক্ত করা হয়। তাই আর ন্যাশনাল লিবারেল কনফারেন্সের আবশ্যকতা রহিল না। কংগ্রেসই এখন অনন্ত জনসঙ্ঘ রূপে বঙ্গবাসীকে আকৃষ্ট করে। অতঃপরে ১৯১৭ খৃষ্টাব্দের অধিবেশন পর্য্যন্ত সুরেন্দ্রনাথ আর কখনও অধিবেশনে অনুপস্থিত হন নাই। ক্রমে তিনিই বাঙ্গালীর অবিসম্বাদী জননায়ক হইয়া উঠেন।

কলিকাতায় এ সময়েও রাজনৈতিক মহলে বেশ দলাদলি ছিল। একটী শিশির ঘোষ মহাশয়ের দল, আর একটী আনন্দমোহন বসু ও সুরেন্দ্র বাবুর দল। এই দলাদলির সূত্রপাত হয় ইণ্ডিয়ান লীগ ও ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের গঠনে। সকলকে লইয়া যখন ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন গঠনের



শিশিরকুমার ঘোষ

প্রস্তাব হয়, তাহার কয়েক মাস পূর্ব্বেই নাকি শিশির বাবু কালীমোহন দাস এবং শম্ভু মুখার্জ্জিকে বুঝাইয়া লীগ গঠিত করেন; এবং ইহাতে কিছু কাজও হইয়াছিল। রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ও ইহার একজন স্তম্ভ ছিলেন। এই লীগ অঙ্কুরেই বিনাশ প্রাপ্ত হয়। শিশির বাবু প্রায়ই

* গত বৎসর ভারতীয় জাতীয় মহাসমিতি সম্বন্ধে পাঁচটী প্রবন্ধ বাহির হইয়াছিল। এখন হইতে উহা আবার নিয়মিত ভাবে প্রকাশিত হইবে। কংগ্রেসের জন্ম হয় ১৮৮৫ সালে। ইহার প্রথম অধিবেশন হয় বোম্বাই নগরীতে এবং বাঙ্গলার স্বর্গীয় উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

আক্ষেপ করিতেন, "আমি মফঃস্বলের লোক বলিয়া কলিকাতায় কোন প্রতিষ্ঠা পাইতেছি না।" কিন্তু শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় লিখিয়াছেন যে, আনন্দমোহন বসু প্রভৃতি তাঁহাকে বিশ্বাস করিতেন না, বঙ্কিমচন্দ্রও নানা কারণে শিশির বাবুর উপর সন্তুষ্ট ছিলেন না। আর বিদ্যাসাগর মহাশয় ইঁহাদের উপলক্ষ করিয়া বলিতেন, "ওদের কোন প্রতিষ্ঠানে রাখিলে সব চেষ্টা পণ্ড হইবে।" কলিকাতার অধিবেশনের দশ এগার বৎসর পূর্ব্ব হইতেই এই দ্বন্দ্ব ও গোলমাল সুরু হইয়াছিল, এবং কংগ্রেসের প্রারম্ভেও ইহার প্রভাব একেবারে বিলুপ্ত হয় নাই। তৎকালীন সাময়িক অভিমত যাহাই হউক, অমৃতবাজার পত্রিকা যে দেশের একটা বৃহৎ প্রতিষ্ঠান আর দেশসেবায় ইহার ও স্বর্গীয় শিশির কুমার ঘোষ মহাশয়ের অবদান যে অসামান্য তাহা সর্ব্ববাদী-সম্মত। মণীষী মতিলাল



মতিলাল ঘোষ

ঘোষ মহাশয়ও ইহার কিছু দিন পর হইতেই কংগ্রেসের সহিত বিশেষ ভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন।*

দ্বিতীয় অধিবেশন

যাহা হউক কংগ্রেসের দ্বিতীয় অধিবেশনে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের সভাপতি রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র অভ্যর্থনা



হেমচন্দ্র

সমিতির সভাপতি নির্ব্বাচিত হন, এবং সকলে উৎসাহের সহিত যোগদান করেন। কলিকাতার অধিবেশন হইতেই অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি প্রতিবৎসর একজন নির্ব্বাচিত হইয়া অভ্যর্থনাদির তত্ত্বাবধান-ব্যাপারে নেতৃত্ব করেন, বোম্বাইতে সেরূপ কেহ ছিলেন না।

শিক্ষিত সমাজ এই অধিবেশন উপলক্ষে কিরূপে জাতীয়-ভাবে উদ্দীপ্ত হইয়া উঠে, 'ভারতসঙ্গীত', 'ভারত-বিলাপ' ও 'বৃত্রসংহারের' কবি প্রসিদ্ধ ব্যবহারজীবী কবি হেমচন্দ্রের 'রাখিবন্ধন' কবিতায়ই তাহা প্রমাণিত হয়।

সকলেই জানেন যে, গত পঁয়ত্রিশ বৎসর হইতে বঙ্কিমচন্দ্রের বন্দেমাতরম্-ই জাতীয় মহাসম্মিলনীর জাতীয় মহাসঙ্গীত। কিন্তু তখনও বন্দেমাতরমের মর্ম্ম কেহ বুঝেন নাই। সহযোগী সাহিত্যিকেরাও ইহা পছন্দ করিতেন না। বিদেশী ভাবাপন্ন হইয়া নেতৃবৃন্দ

* ১৮৭৬, ২৬ জুলাই, বুধবার আলবার্ট হলে শ্যামাচরণ সরকারের সভাপতিত্বে যে ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন গঠিত হয় সে আভাস পূর্ব্বে দিয়াছি। সভার উদ্বোধন সময়ে বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়া পাঠান, "ভরসা করি এতদিন পরে এরূপ একটী সভা প্রতিষ্ঠিত হইবে যাহা উপযুক্তরূপে দেশীয় জন-সাধারণের প্রতিনিধিত্ব করিতে সমর্থ হইবে।" লীগের পক্ষ হইতে কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় উক্ত এসোসিয়েশনের প্রতি অযথা কটূক্তি করেন কিন্তু সে আপত্তি খণ্ডন করেন সুরেন্দ্রনাথ। অক্ষয় সরকার মহাশয় বলেন, "শিশির কুমার অর্দ্ধরথী পরামর্শ দিতে পারেন, কিন্তু দিতে জানেন না—তাই লীগ উঠিয়া যায়।" লীগ স্থাপিত হয়—২৫শে অক্টোবর, ১৮৭৫। কিন্তু কমিটি গঠিত হয় ২৪শে সেপ্টেম্বর বেঙ্গল থিয়েটার গৃহে।

আনন্দধ্বনি (cheers) বিদেশীর অনুকরণেই করিতেন। 'বন্দেমাতরম্' তখন তাঁহারা ভাবিতেও আরম্ভ করেন নাই। তবে বঙ্কিম বলিতেন, "একদিন আস্‌বে, তবে আমি সেদিন থাকব না, তোমরা দেখতে পাবে এই বন্দেমাতরম্-এ আকাশ বাতাস কেঁপে উঠবে, ধূলো থেকে আরম্ভ ক'রে গাছের পাতা অবধি লাল হয়ে উঠবে।" কিন্তু অল্পদিন মধ্যে চাকুরী করিতে করিতেই বঙ্কিম শুনিলেন তাঁহারই বন্ধু হেম তাঁহারই সুরে সুর মিলাইয়া তাহারই সঙ্গীতের প্রতিধ্বনি করিয়া এই উৎসব উপলক্ষে 'রাখিবন্ধন' কবিতা রচনা করিয়া উদাত্তকণ্ঠে গাহিতেছেন—

ভারত জননী জাগিল!
পূরব বাঙ্গলা, মগধ, বিহার
দেরাইসমাইল হিমাদ্রির ধার
করাচি মান্দ্রাজ সহর বোম্বাই
সুরাট, গুজরাটী, মারহাটী ভাই
চৌদিকে মায়েরে বেড়িল
প্রেম আলিঙ্গনে করে রাখি ধর
খুলে গেছে হৃদি হৃদি পরস্পর
এক প্রাণ মনে এক কণ্ঠস্বর
সুখে জয়ধ্বনি দিলে।

প্রণয় বিহ্বলে ধরে গলে গলে
গাহিল সকলে মধুর কাকলে
গাহিল "বন্দেমাতরম্
সুজলাং সুফলাং মলয়জ শীতলাং—
শস্য শ্যামলাং মাতরম্।

শুভ্র-জ্যোৎস্না পুলকিত যামিনীং
ফুল্ল কুসুমিত দ্রুমদল শোভিনীং—
সুহাসিনীং সুমধুর ভাষিণীং
সুখদাং বরদাং মাতরম্—
বহুবলধারিণীং নমামি তারিণীং—
রিপুদল বারিণীং বন্দে মাতরম্"।

উঠিল সে ধ্বনি নগরে নগরে—
তীর্থ দেবালয় পূর্ণ অম্বরে
ভারত জগৎ মাতিল।
আনন্দ উচ্ছ্বাস ফুটেছে বদনে
মায়েরে বসায়ে হৃদি সিংহাসনে,
চরণযুগল ধরি জনে জনে
একতার হার পরিল।

কবির সঙ্গীতে বাঙ্গালী উদ্দীপিত হইল। কিন্তু তখনও আমরা ভাবিতাম ইংরাজের ভাবে, কাজ করিতে চাহিতাম ইংরাজের অনুকরণে, যাচ্ঞা করিতাম ইংরাজেরই করুণা-ভিক্ষা। কিন্তু ক্রমে আমরা উহার ব্যর্থতা বুঝিয়াছি। বুঝিয়াছি 'ভিক্ষায়াং নৈব চ নৈব চ।' আমাদের এজিটেশনতো ভিক্ষারই নামান্তর মাত্র। ভারত ইংলণ্ড নহে। ইংলণ্ডে চাহিয়া না পাইলে জোর চলে। কিন্তু আমাদের সে শক্তি নাই। ১২১৫ খৃষ্টাব্দে ম্যাগনাকার্টা, সেই শক্তিরই



বঙ্কিমচন্দ্র

পরিচায়ক—সম্রাট জনকে (King John) জনশক্তি তরবারির ভয় প্রদর্শনে রাণীমীডে ঐ প্রজাধিকার-লিপি সহি করাইয়া লয়। আজ হয়তো তাহাতে দণ্ডবিধি আইনের ১২৪ ধারার প্রয়োগ চলিত; কিন্তু পৃথিবীতে যাহারা স্বাধিকার লাভ করিয়াছে, শক্তির সহায়েই করিয়াছে। ইংলণ্ডাধিপতি চার্লস ফার্ষ্টকেও প্রজারা বিনা-প্রতিনিধিত্বে কর দিবে না বলিয়া দৃঢ়ভাবেই তাঁহার বিরুদ্ধে বুক ফুলাইয়া দাঁড়াইয়াছিল; 'বিল অব্ রাইট্‌স'ও এই শক্তিবলেই মঞ্জুর হইয়া আসে। কিন্তু আমরা যে দাস, আমাদের শক্তি কতটুকু? আমরা ভিক্ষায় কি পাইয়াছি, কি পাইব, কি পাইতে পারি? শক্তিহীন ভারত

কি আবার শক্তিপূজার প্রবর্ত্তন করিবে না ? বঙ্কিমচন্দ্র এই ভিক্ষানীতির বিরুদ্ধেই পূর্ব্ব হইতে শঙ্খ বাজাইয়া জাতিকে জাগাইতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু আমাদের কি কোন দুর্দ্দশা ঘুচিয়াছে ? তবে আমাদের উপায় কি ? আমরা কি আবার সেই পূর্ব্বদিন ফিরিয়া পাইব ? আমাদের বুবুক্ষা, অন্নাভাব ও কর্ম্মহীনতা কিসে বিদূরিত হইবে তাহা কি কেহ ভাবে ? এমন ঋষি কে আছেন যিনি আমাদিগকে এই ঘনান্ধকারে প্রকৃত পন্থা নির্দ্দেশ করিয়া আমাদিগের কার্য্যনির্ব্বাহ পরিচালিত করিবেন ?

যাহাহউক, অধিবেশন হইবার কথা ছিল ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন হল গৃহে, কিন্তু প্রতিনিধি সংখ্যা ৪৩৬ জন হইয়া গেলে টাউনহলে স্থান স্থির করা হয়।



দাদাভাই নৌরজী

সভাপতি পূর্ব্বেই স্থির করা হইয়াছিল দাদাভাই নৌরজী সাহেবকে। ১৮৮৫ সালের কংগ্রেস হইবার পরে দাদাভাই বিলাত গিয়া ফিরিবেন Holborn Division of Finsburyর মেম্বর হইয়া আসেন।

ইনি বোম্বাই কলেজের অধ্যাপনা কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া ইংলণ্ডে গিয়া রাজনৈতিক কাজে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন এবং বিলাতে ভারতের দুঃখ-দৈন্য সম্বন্ধে প্রকৃত অবস্থা ইংলণ্ডবাসীর হৃদয়ঙ্গম করাই তাঁহার প্রধান কাজ ছিল। এই পার্শী নৌরজী সাহেব অপেক্ষা তখন এই মহতী সভার সভাপতি হইবার অন্য কোন যোগ্যতর ব্যক্তি ছিলেন কি না সন্দেহ।

টাউন হলের পূর্ব্ব দিকে এখন যে একটী মঞ্চ আছে তখন তাহা ছিল না। কিন্তু দক্ষিণভাগে একটী মঞ্চ তৈয়ার করা হয়—নতুবা ঈষৎ খর্ব্বাকৃতি নৌরজী সাহেবকে দেখা যাইবার সম্ভাবনা ছিল না। ২৭শে ডিসেম্বর সোমবারে ডাক্তার রাজেন্দ্র মিত্র প্রতিনিধিবর্গকে অভ্যর্থনা করিয়া অভিভাষণ পাঠ করেন এবং প্রথমেই রবীন্দ্রনাথ নিম্নলিখিত সঙ্গীতে সকলকে মুগ্ধ করেন—

আমরা মিলেছি আজ মায়ের ডাকে।
ঘরের হয়ে পরের মতন
ভাই ছেড়ে ভাই ক'দিন থাকে ?
প্রাণের মাঝে থেকে থেকে
আয় বলে ওই ডেকেছে কে !

সেই গভীর স্বরে উদাস করে—
আর কে কারে ধরে রাখে।
যথন থাকি যে যেখানে
বাঁধন আছে প্রাণে প্রাণে
সেই প্রাণের টানে টেনে আনে—
প্রাণের বেদন জানে না কে ?

মান অপমান ঘুচে গেছে—
নয়নের জল গেছে মুছে
নবীন আশে হৃদয় ভাসে
ভাইএর পাশে ভাইকে দেখে !

কত দিনের সাধন-ফলে
মিলেছি আজ দলে দলে,
ঘরের ছেলে সবাই মিলে
দেখা দিয়ে আয় রে মা'কে।

কলিকাতার এই অধিবেশন যাহারা দেখিতে গিয়াছিলেন, তাঁহারা সকলেই বলেন, বিভিন্ন স্থানের অধিবাসিগণের যে শিরো শোভা দেখিয়াছিলেন তাহা অপূর্ব্ব। এখন আর সেরূপ বড় দেখা যায় না। পার্শীদের টুপী, বোম্বাই ও সুরাটের মুসলমানদের টুপী, শিখের পাগড়ী, মহারাষ্ট্রীয় ও মাদ্রাজবাসীর বিভিন্ন পাগড়ী, রাজপুতগণের ভিন্ন ভিন্ন পাগড়ী ও সঙ্গে সঙ্গে বঙ্গবাসীর অনাবৃত মস্তকে কি যে অপূর্ব্ব শোভা হইয়াছিল তাহা অবর্ণনীয়। সিন্ধু দেশের কয়েকজন আসিয়াছিলেন অতি দীর্ঘ পাগড়ী পরিয়া, সেরূপ আর এখন দেখা যায় না। আকৃতিতেও সকলেই বিভিন্ন—বলিষ্ঠ শিখ, সুদৃঢ় পাঠান, দর্পী রাজপুত, সহিষ্ণু মহারাষ্ট্রী, সুহাস মাদ্রাজী ও তীক্ষ্ণ-নয়ন পার্শী ইত্যাদি।

সেই মহতী জনসভায় কলিকাতার জন-সাধারণের পক্ষ হইতে রাজেন্দ্রলাল প্রতিনিধিবর্গকে অভিনন্দন করিয়া বলেন—

"আজ আমার জীবনের সুখস্বপ্ন বাস্তবে পরিণত হইতে চলিল। জাতির ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিক্ষিপ্ত অংশগুলি একত্রীভূত হইয়া যেন একটী অখণ্ড জাতিতে পরিণত হয়—ইহাই ছিল আমার জীবনের আশা। আজ সেই জাতিসঙ্ঘের সূত্রপাত হইয়াছে। ভারতের সুখের সেই দিন প্রায় সমাগত, আজ অরুণোদয় দেখিয়া আনন্দে বিহ্বল হইলাম।…ব্যবস্থাপক সভার পুনর্গঠনই একান্ত প্রয়োজনীয়। উহাই আমাদের রাজনৈতিক উন্নতির প্রধান ভিত্তি। তবে আমরা প্রথমে নরম ভাবেই আরম্ভ করিব, আমাদের কার্য্য-প্রণালীও নরমই হইবে।"

"It has been the dream of my life that the scattered units of my race may someday coalesce and come together; that instead of living merely as individuals we may someday combine as to be able to live as a nation. In this meeting I behold the comencemment of such coalescence… I behold in this Congress the dawn of a better and a happier day for India. I look upon the Legislative Councils as the corner stone of all the topics of political condition. Let your speakers speak moderately. Let yourschemes be moderate."

রাজেন্দ্রলাল আরও বলেন—

We live not under a National Government but under a foreign beaurocracy, our foreign rulers are foreigners by birth, religion, language habits—by everything that divides humanity into different sections They cannot possibly dive into our hearts. They cannot ascertain our wants, our feelings, our aspirations. They may try their best and I have no reason to doubt that many of our Governors have tried hard to ascertain our feelings and our wants, but owing to their peculiar position, they have failed to ascertain them.

রাজেন্দ্রলাল ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন নামক জমিদার সভার সভাপতি ছিলেন। ইনি রাজনীতিজ্ঞ অপেক্ষা পাণ্ডিত্যেরই সমধিক অধিকারী ছিলেন। ইদানীং বধিরতা আসিয়া তাঁহার কর্ণশক্তি খর্ব্ব করিয়া দিলেও লোকহিতকর অনুষ্ঠানে তাঁহাকে সর্ব্বদাই পাওয়া যাইত। সভায় দাঁড়াইয়া তিনি সুন্দর বলিতেন, এবং তাঁহার বক্তৃতা কতকটা কথোপকথনের ধরণে ছিল। কলিকাতার অধিবেশন ধনী, কি মধ্যবিত্ত, কি বৃদ্ধ, কি যুবক কি উচ্চশ্রেণী বা অনুন্নত শ্রেণীর প্রধান ব্যক্তিগণের সম্মিলনবলিয়া বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল।

উত্তরপাড়ার জমিদার রাজা জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয় প্রস্তাব করিয়া দাদাভাই নৌরজী মহোদয়কে সভাপতি পদে বৃত করেন এবং অবশেষে মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর মহাশয় সকলকে ধন্যবাদ প্রদান করিয়াছিলেন।

রাজেন্দ্রলাল, দাদাভাই নৌরজী, রাজা জয়কৃষ্ণ ও মহারাজা যতীন্দ্রমোহন যে প্রতিষ্ঠানের কর্ণধার, তাহা কি যুবকের উত্তেজনা প্রসূত বলিয়া আখ্যা দেওয়া চলে? রাজা জয়কৃষ্ণের বয়স ছিল ৭৯, তিনি দৃষ্টিশক্তিহীন হইয়া পড়িয়াছিলেন তথাপি সেই বৃদ্ধ বয়সেও শারীরিক ব্যাধি ও অপারগতা সত্ত্বেও কংগ্রেসে আসিতে দ্বিধা করেন নাই।

সভাপতি মহাশয় ইংরাজ রাজত্বের প্রকৃষ্ট দিকটারই বেশী উল্লেখ করেন। ২৮, ২৯, ৩০, ও ৩১শে ডিসেম্বর নিম্নলিখিত প্রস্তাবাদি সম্বন্ধে আলোচনা হয়।

কলিকাতার কংগ্রেসই প্রথম প্রতিনিধিমূলক কংগ্রেস। অ্যানী বেসান্ত বলেন,

The first Congress was composed of volunteers and the second of delegates."

ডেলিগেটগণ নির্ব্বাচিত হইয়াই আসেন। উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ হইতে আসেন ৭৪, বোম্বাই ও মান্দ্রাজ প্রত্যেক প্রদেশ হইতে ৪৭, পঞ্চনদ ১৭, মধ্যপ্রদেশ ৮, আসাম ৮, বাঙ্গলা দেশের প্রতিনিধি সংখ্যা স্বভাবতঃই বেশী ছিল। ২৩০ জন প্রতিনিধি উপস্থিত হইয়াছিলেন।

অর্থাৎ বোম্বাই নগরীর ৭২ জনের সংখ্যা হইতে কলিকাতায় ৪০৬ জন প্রতিনিধি লাভ নিতান্ত উপেক্ষার জিনিষ নয় এবং সকলেই কি বিদ্যাবুদ্ধি—কি ধন-সম্পদ—কি প্রভাব-প্রতিপত্তি সকল দিক্ হইতেই শ্রেষ্ঠ ছিলেন। নিম্নলিখিত প্রস্তাবাদি গৃহীত হয়।

(১) আগামী জুবিলি উপলক্ষে (১৮৮৭ সালে) ভারত সম্রাজ্ঞীর প্রতি আনন্দ-সূচক অভিনন্দন প্রদান ;

(২) দারিদ্র্য দূরীকরণ ব্যবস্থা ;

(৩) ব্যবস্থাপক সভার প্রসার এবং প্রসারের নিয়ম প্রবর্ত্তন ;

(৪) সরকারী চাকুরীর কমিশন সম্বন্ধে ব্যবস্থা ;

(৫) জুরী প্রথার সংপ্রসারণ ;

(৬) ওয়ারেণ্ট কেসে (Warrent Cases)এ জুরীর সহায়তায় বিচার ;

(৭) বিচারে জুরীর রায়ের বলবৎ হওয়া উচিত ;

(৮) বিচার ও শাসন-বিভাগের পৃথকীকরণ ;

(৯) দেশীয়গণকে ভলাণ্টিয়ার করিবার প্রস্তাব এবং

(১০) ভারতে ও ইংলণ্ডে সমভাবে সিভিলসার্ভিস পরীক্ষার প্রবর্ত্তন ও পরীক্ষার্থীর বয়স ১৯ বৎসর হইতে ২৩ পর্য্যন্ত বৃদ্ধির প্রস্তাব ।

তৃতীয় প্রস্তাব সম্বন্ধে ডেরাইসমাইল খানের মালেক ভগবান দাস বলেন, "যে দেশে মানুষ কলম পেশা অপেক্ষা তরবারী চালাতেই অধিক সক্ষম সে স্থানের আমি প্রতিনিধি। লোকে বলে, বাঙ্গালীরাই সংস্কারের পক্ষপাতী, আমি কি বাঙ্গালী ? বুদ্ধিমান ব্যক্তিরাই সংস্কার চাইছেন।"

চতুর্থ দিবসে ব্যবস্থাপক সভা কি ভাবে গঠিত হইতে পারে, সেই সম্বন্ধেই আলোচনা হয়। সুরেন্দ্রনাথ বলেন—

"Self-Governmentis the ordering of nature, the will of Dfvine Providence.—Our Panchayet system is as old as the hills and is graven on the hearts and the instincts of the people."

মিউনিসিপ্যালিটি, ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানে উত্তরোত্তর যাহাতে নির্ব্বাচন-প্রথা প্রসারলাভ করে এই ভাবেও একটী প্রস্তাব হয়।

এই সমস্ত আলোচনায় মিঃ রহিমুত উল্লা সিয়ানী, উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, কুঞ্জলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, কেশবচন্দ্র আচার্য্য চৌধুরী, মনোমোহন ঘোষ, কালীশঙ্কর সুকুল, এন-জি চন্দ্রভারকার, আনন্দ চার্লু, রাজা রামপাল সিংহ (অযোধ্যা), ভিন সা ওয়াচা আর, এম সায়ানী, রাজা প্যারীমোহন মুখার্জ্জি, রাও সাহেব সামিনাথ আয়ার, পাঞ্জাবের লালা মুরলীধর, লালা কানাইয়া লাল, জি সুব্রহ্মণ্য আয়ার, এস সুব্রহ্মণ্য আয়ার, ডাক্তার ত্রৈলোক্যনাথ মিত্র, পাটনার গুরুপ্রসাদ সেন ও সরফুদ্দিন, লক্ষ্ণৌর হামিদ্ আলী, নবাব রেজা আলি প্রভৃতি যোগদান করেন।

লালা মুরলীধর জামিনে মুক্ত হইয়া কংগ্রেসে উপস্থিত হন। তিনি জুরী প্রথা সম্বন্ধে বলেন—

"I was considered a public agitator because I have my own opinions and speak what I think without fear, and the protection of jury was, therefore, necessary against such abuses."



ডব্লিউ, সি, ব্যানার্জ্জী

এই অধিবেশনে কলিকাতার যে সকল মুসলমান যোগদান করেন নাই তন্মধ্যে নবাব আবদুল লতিফ খাঁর দল এবং সৈয়দ আমির আলীর দলই বিশেষ উল্লেখযোগ্য। নবাব সাহেব পত্রে জানান,—

"আমাদের দৃঢ় ধারণা জন্মিয়াছে যে, আগামী কলিকাতার অধিবেশনে ভারতবাসীর অবস্থাদির উন্নতি কল্পেই আলোচনা হইবে, এবং আমাদের এই মহৎ উদ্দেশ্য প্রসার কল্পে যেরূপ সহানুভূতি প্রয়োজন, তাহাতে যে ঔদাসীন্য প্রদর্শিত হইতেছে তাহাতে আমরা দুঃখিত, কিন্তু বিশেষ কারণে আমরা সেই মহাসভার যোগদানে বিমুখ হইয়াছি।"

"We are fully convinced that the aim of the forthcoming Congress is to promote measures which, it is considered, will tend to the amelioration of the condition of the people of India and they would greatly regret to do anything which would have even the appearance of withholding from such a worthy object any support which their co-operation might give.'

মোট ৩৭ জন মুসলমান প্রতিনিধি আসিয়াছিলেন। বোম্বাইয়ের প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী রহিমুত উল্লা সিয়ানী, অযোধ্যার নবাব রেজা আলি খাঁন ও বেহারের সরফুদ্দিন প্রভৃতি বহু মুসলমান নেতৃবৃন্দ হিন্দু ও খৃষ্টানগণের সহিত সমভাবে যোগদান করিয়াছেন।

কলিকাতা অধিবেশনের সময় হইতেই প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটী গঠিত হইতে আরম্ভ হয়।

বোম্বাই অধিবেশন হইয়া গেলে কয়েকজন প্রতিনিধি তৃতীয় প্রস্তাবটী, The reform and expansion of the Imperial and Local Legislative Councils ব্যবস্থাপক কাউন্সিল ও পরিষদের সংস্কার ও সংপ্রসারণ, কিরূপে কার্য্যে পরিণত করা যাইতে পারে, সেই সম্বন্ধে আলোচনা করেন, এবং আলোচনার ফলাফল প্রত্যেক প্রদেশস্থ নেতৃবৃন্দের নিকট প্রেরণ করা হয়। অনেক স্থান হইতেই নূতন নূতন অভিমত আসে। অতঃপর মার্চ্চ মাসে দশ হাজার কপি ইংরাজী ভাষায় ও লক্ষাধিক কপি বিভিন্ন ভাষায় প্রস্তাবটি মুদ্রাঙ্কিত করিয়া ভারতের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে পাঠান হয়। ইংলণ্ডের Cobden ক্লাব কর্ত্তৃকও বহু কপি প্রচার করা হয়। প্রত্যেক বহিখানির পরিশিষ্টে "Old man's Hope"—বৃদ্ধের আশা—নামে একটী প্রবন্ধে হিউম্ সাহেব মতামত প্রকাশ করিয়াছিলেন। এবারেও নানা স্থান হইতেই মতামত আসে। এই সব মতামত সম্বলিত বিষয়টী কলিকাতার অধিবেশনে একটী নব কলেবর ধারণ করে। যাহাতে নির্ব্বাচন-প্রথা মনোনয়ন প্রথার স্থান অধিকার করিতে পারে, অর্দ্ধেক লোক নির্ব্বাচিত হয়, এক-চতুর্থাংশ সভ্য মনোনীত হয় ও অবশিষ্ট সভ্য অফিসের প্রধান ভাবে (ex-officio) আসেন এই ভাবেই প্রস্তাব হয়।

কলিকাতায়ই প্রথম পরামর্শ সভা (Subjects Commitee) গঠন আরম্ভ হয় এবং এই পরামর্শ সমিতি সম্বন্ধে রাজেন্দ্রলালের প্রস্তাব (২০-১২-৮৫) তারিখে অগ্রাহ্য হইলেও ২৪ তারিখে ৯ জন লইয়া একটী কমিটী গঠিত হয়। সমস্ত প্রস্তাবের খসড়া ইহারাই করেন। ক্রমে এই সংখ্যার প্রসার হইয়াছে এবং এখন নিখিল ভারতীয় কংগ্রেস কমিটীর সমস্ত সভ্যগণই বিষয় নির্ব্বাচনী সভায় যোগদান করেন।

এই নির্ব্বাচনী সভার সংস্কার সম্বন্ধীয় প্রস্তাবটী যে ভাবে গঠিত হয় তাহাতে রাজেন্দ্রলাল বিশেষ আপত্তি করেন। তিনি এত দ্রুত অগ্রসর হইবার বিরোধী ছিলেন। এমন কি তিনি ভয়প্রদর্শন পর্য্যন্ত করেন যে, উক্ত প্রস্তাবটী পরিবর্ত্তিত না হইলে তিনি কংগ্রেসের সংস্রব পরিত্যাগ করিবেন। তাঁহার মতে মোটে নয়জন ব্যক্তি-কর্ত্তৃক স্থিরীকৃত প্রস্তাবাবলী সকলের কিরূপে বিবেচনাধীন হইতে পারে? ইতিমধ্যে ২৯শে ডিসেম্বর বুধবার কংগ্রেসের প্রতিনিধিবর্গকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য হাইকোর্টের বিখ্যাত উকীল ৺মহেশচন্দ্র চৌধুরী মহাশয় একটী (Steamer Party)—ষ্টীমার পার্টি দেন। এই ষ্টীমার পার্টিতে হিউম্ সাহেব, মিঃ নৌরজী, মিঃ রাণেডে, আনন্দ মোহন বসু, চন্দ্রমাধব বসু, গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতির মধ্যে এই প্রস্তাব সম্বন্ধে পুনরায় আলোচনা হয়। হিউম্ সাহেব একটী সুগঠিত নিয়ম প্রণালীর (scheme) পক্ষে ছিলেন। রাজেন্দ্রলাল schemeটী উঠাইয়া দিতে বলেন। তিনি বলেন, scheme দিয়া কেন আমরা সমালোচনার মধ্যে থাকি। প্রস্তাবটী অনেক পরিবর্ত্তনের ফলে ৩০শে ডিসেম্বর গৃহীত হয়। অধিবেশন শেষ হইবার পরদিনও ৩১শে তারিখে এই বিষয়ের পুনরালোচনা হয়।

আর একটী বিষয়েও কিছু মতভেদ হয়। কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশনে (বোম্বাই) পাবলিক্ সার্ভিস্ কমিশন সম্বন্ধে একটী প্রস্তাব হইয়াছিল। লর্ড ডাফরিণের চেষ্টায় শীঘ্র শীঘ্র ১৮৮৬ সালে ঐ একটী কমিশন গঠিত হয় এবং বৎসরেই কমিশনের কাজ আরম্ভ হয়। ইহার সভাপতি ছিলেন Sir Charles Turner এবং সভ্যদের মধ্যে অনারেবল মৌলভী আবদুল জব্বর ও Mr. Kisch (Postmaster General) প্রভৃতি আরও কয়েকজন সভ্য নিযুক্ত হন। এবার এই কমিশন সম্বন্ধে কংগ্রেসের কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণের জন্য সভাপতি নৌরজী সাহেব একটী প্রস্তাব উত্থাপিত করেন। রাজা রামপাল সিংহ মত প্রকাশ করেন যে, কমিশনের চূড়ান্ত রিপোর্ট দেওয়ার পূর্ব্বে কংগ্রেসের কিছু করণীয় নাই। সুরেন্দ্রনাথ ও লালা কানাইয়া লাল আপত্তি করিয়া বলেন, যে একটী কমিটি যদি গঠিত হয় তবে কমিটীর মতই কংগ্রেসের মত বলিয়া ধরিয়া লইতে হইবে। রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয় বাধা দিয়া বলেন—

"বলেন কি? এত বড় কাজের ভার একটী কমিটীর উপরে ন্যস্ত হইবে?"

গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বলেন যে, এই কংগ্রেস হইতেই কয়েকজন সাক্ষী পাঠান যাক্ না কেন? অবশেষে স্থির হয় যে, একটী কমিটী গঠিত হউক এবং অধিবেশনের শেষ দিবসে উহার রিপোর্ট আলোচিত হইবে।

উক্ত নির্দ্ধারিত দিবসে কমিটী নিম্নলিখিত রিপোর্ট দেন—

(১) ভারতে ও ইংলণ্ডে যেন সমভাবে পরীক্ষা হয়।

(২) ১৯ বৎসর বয়সের স্থলে ২৩ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত পরীক্ষা দিতে পারিবে স্থির হউক।

(৩) অন্যান্য civil appointments বড় চাকুরীতে প্রতিযোগিতা প্রথা প্রবর্ত্তিত হউক।

মহাসভায় রিপোর্টটী গৃহীত হয় এবং অধিবেশন শেষ হইয়া গেলে সভাপতি প্রমুখ একটী ডেপুটেসন লর্ড ডাফরিনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলে তিনি তাঁহাদিগকে বিশেষভাবে আপ্যায়িত করেন। লর্ড ডাফরিন যে এই সমস্ত নেতৃবৃন্দের সহিত দেখা করেন, তাহা ব্যক্তিগতভাবে হইয়াছিল।

যে রাজা রামপাল সিংহ মহাশয়ের কথা বলিলাম, ইনি যুক্তপ্রদেশের একজন জমিদার। ভাল ইংরাজী বলিতে পারিতেন না, তবে যাহা বলিতেন তাহাতেই হাসির উদ্রেক হইত। বিশেষতঃ তাঁহার চেহারাটী ছিল একটু খর্ব্ব। আর বক্তৃতার সময়ে যেরূপ অঙ্গভঙ্গী করিতেন তাহাতে আরও হাসি আসিত। তিনি political intercourse বলিতে এমন একটা কথা মুখ দিয়া বাহির করিয়াছিলেন যে কেহই কিছুতেই হাসি চাপিয়া রাখিতে পারেন নাই। তবে কংগ্রেস প্রথমারম্ভেই নিজ পরিচয় দিতে সমর্থ হইয়াছিল বলিয়াই 'সুচিরামগুরের যাত্রা'র আসরের ন্যায় উহা ভাঙ্গিয়া যায় নাই।

অধিবেশন হইয়া গেলে "Statesman" পত্রিকায় প্রতিনিধিবর্গ সম্বন্ধে প্রশংসাসূচক মন্তব্য বাহির হয়। ষ্টেটস্‌ম্যান পত্রের মতে—

"The Congress was composed of men to whom we could point with pride as the out-come of a century of our rule."

পক্ষান্তরে "London Times" বিষোদ্গার করিতে করিতে ভীতি-পূর্ণ-কণ্ঠে প্রমাদ গণিয়া বলেন—

"It was merely an affair of discontented place-seekers—men of straw with little or no stake in the country......persons of considerable imitative powers, of total ignorance of the real problems of the Government...delegates from all these talking clubs...might become a serious danger to public tranquillity."*

কংগ্রেসের প্রতি পার্লামেণ্টের ইংরাজসদস্যগণের ভয় ও ভাব এখনও পূর্ব্ববৎ-ই আছে।

অধিবেশন শেষ হইলে কয়েকজন প্রধান প্রতিনিধিবর্গের সঙ্গে লর্ড ডাফরিন সাক্ষাৎ করেন। কথাপ্রসঙ্গে তিনি হাসিতে হাসিতে বলেন যে তাঁহাদিগকে প্রতিনিধি হিসাবে তিনি অভ্যর্থনা করিতেছেন না বটে কিন্তু বিশিষ্ট দর্শক (as distinguished visitors to the capital) হিসাবে তাঁহাদের সহিত ভাবের আদান প্রদান করিয়া সন্তোষ প্রকাশ করিতেছেন। প্রতিনিধিবর্গকে তিনি উদ্যান সম্মিলনেও



বদরুদ্দিন তায়েবজী

আপ্যায়িত করিয়াছিলেন। তবে কংগ্রেসের প্রতিনিধিক্ষমতা ভারতেশ্বরীর প্রতিনিধি কর্ত্তৃক গৃহীত না হইলেও কার্য্যতঃ সেই সময় হইতেই ভারতের সকল সম্প্রদায়ই প্রতিনিধি হিসাবে উহা মানিয়া লইয়াছেন।

তৃতীয় অধিবেশন

কংগ্রেসের তৃতীয় অধিবেশন (১৮৮৭) হয় মাদ্রাজ নগরে। আর ইহার সভাপতি হন মুসলমান সম্প্রদায়ের বিখ্যাত জননায়ক বদরুদ্দিন তায়েবজী। ইনি বোম্বাই হাইকোর্টের একজন প্রসিদ্ধ উকীল ছিলেন এবং পরে সেখানে জজও

হইয়াছিলেন। তায়েবজীকে আমরা দেখি নাই, তবে তাঁহার পুত্র আব্বাস তায়েবজীকে ১৯২২ সালের গয়া কংগ্রেসে ও দেশবন্ধুর বাড়ীতে অনেকবার দেখিয়াছি। তখন তিনি একজন No changer ছিলেন। তাঁহার মেয়েটীও সঙ্গে আসিতেন। কোন একবার সত্যাগ্রহ-আন্দোলনে এই মেয়েটী কারাবরণ করিয়াছিলেন। আব্বাস সাহেবের পুত্রও রেঙ্গুনের একজন জন-নায়ক।

এই ১৮৮৭ সালেই ভারতেশ্বরী মহারাণীর অর্দ্ধশতাব্দিব্যাপী রাজত্বের জুবিলি অনুষ্ঠিত হয় এবং তখন এই অনুষ্ঠানের সহিত সংশ্লিষ্ট হওয়া বিশেষ গৌরবের বিষয় ছিল। কলিকাতায় মহাসমারোহে জুবিলি উৎসব অনুষ্ঠিত হয় এবং কলিকাতা কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান উদারমতি হ্যারিসন সাহেবকে দেশীয় নেতৃবৃন্দ বিশেষ সহযোগিতা প্রদান করিয়াছিলেন। মান্দ্রাজে কংগ্রেসের তৃতীয় অধিবেশন দেখিয়া সকলেই মনে করেন যে কংগ্রেস একটি স্থায়ী জাতীয় অনুষ্ঠানে পরিণত হইয়াছে। প্রতিনিধি সংখ্যাও ৬ শতের উপরে উঠিয়াছিল। সমুদ্রের উপকূলে মেকের উদ্যানে (Mackay's gardens) একটী প্রকাণ্ড মণ্ডপের নীচে প্রায় তিন সহস্র লোক সমবেত হয়েন। মণ্ডপের মান্দ্রাজী কথা—Pandal (প্যাণ্ডেল)। এই যে প্রথম উহাকে Pandal বলা হইয়াছিল, আজও সেই প্যাণ্ডেল নামই রহিয়া গিয়াছে। মান্দ্রাজের বর্ণিত প্যাণ্ডেলটী দৈর্ঘ্যে ১৩০ ফিট ও প্রস্থে ৯৫ ফিট ছিল। উদ্যানটীর ভাড়া প্রায় ২৫০ টাকা হইয়াছিল।

বাঙ্গলা দেশের প্রায় ৮০ জন প্রতিনিধি বি, আই, এস, এন কোম্পানীর একখানা জাহাজ (s. s. Nevassa), রিজার্ভ করিয়া সমুদ্রপথে যাত্রা করেন এবং বঙ্গোপসাগরের মধ্য দিয়া প্রচণ্ড বাত্যার সহিত যুঝিতে যুঝিতে ভয়াকুলচিত্তে তিনদিন তিনরাত্রি ভুগিয়া আসিয়া উপকূলভাগে বিপুল হর্ষধ্বনির মধ্যে সেন্ট জর্জ্জের সন্নিকটে পৌছেন।

স্যার রাসবিহারী ঘোষ, রাজা কিশোরীলাল গোস্বামী, ডব্লিউ সি ব্যানার্জ্জি, মতিলাল ঘোষ, বিপিনচন্দ্র পাল, অশ্বিনীকুমার দত্ত প্রভৃতি অনেক প্রতিনিধি জাহাজে করিয়া গিয়াছিলেন। এই রাজা কিশোরীলাল নূতন সংস্কার প্রবর্ত্তিত হইবার পরে (১৯২১) প্রথম Executive Council-এর মেম্বর হইয়াছিলেন।

ষ্টীমারে একত্র আসিবার সময়ে সকলেই রাজনৈতিক বিষয়াদি সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া আসিতে পারিয়াছেন আর খরচও খুব কমই লাগিয়াছে। রেলে First class এ যাতায়াতের খরচ লাগিত ২৪০৲ ও সেকেণ্ড ক্লাসে ১১৬৸৶০ কিন্তু সেই স্থলে যথাক্রমে ১০০৲ ও ৬০৲তেই হইয়া গিয়াছিল। স্যার সুরেন্দ্রনাথ বলেন, Pilgrim fathers এর ন্যায় আমরা মহদুদ্দেশ্য লইয়া সমুদ্রযাত্রা করিয়াছিলাম; যেমন আনন্দ উপভোগ করিয়াছি তেমনি ইহার উপকারিতাও খুব হইয়াছে। (The sea-trip was thoroughly enjoyed by us. Pleasure and business were combined.)

২২শে ডিসেম্বর সকলে ষ্টীমারে রওনা হন এবং ২৫শে তারিখ মান্দ্রাজ পৌছেন

এবারেও নবাব আব্দুল লতিফ তাঁহার নিজ সম্প্রদায়ের লোক যেন কেহ কংগ্রেসে যোগদান না করেন তজ্জন্য বাঁকীপুরে গিয়া সভা করিয়া বক্তৃতা দেন। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও পাটনা বার লাইব্রেরীতে সভা করিয়া যে কয়জন প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন তন্মধ্যে মৌলভী সরফ্উদ্দিন, আমির হাইদর, তফজ্জল হোসেন প্রভৃতি বহু ডেলিগেটের নাম উল্লেখযোগ্য। এই সরফ্উদ্দিন সাহেবই পরে কলিকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি হইয়াছিলেন।

ত্রিবাঙ্কুরের ভূতপূর্ব্ব দেওয়ান রাজা স্যার টি, মাধবরাও কে. সি. এস্. আই বৃদ্ধবয়সে অবসর লইয়া তখন নিভৃতে অবকাশ যাপন করিতেছিলেন। দেশসেবার প্রবল আকর্ষণে তিনিও আসিয়া অভ্যর্থনা সমিতির নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। তাঁহার অভিভাষণে তিনি সকলকে উত্তেজনা পরিত্যাগ করিয়া ধীরতা অবলম্বন করিতে অনুরোধ করেন। বলেন, "এই প্রারম্ভে ভুলভ্রান্তি স্বাভাবিক কিন্তু তাহাতেই যেন কেহ ইহার অসাফল্যের ভবিষ্যদ্বাণী না করেন। লোকে দৌড়াইতে শিখিবার পূর্ব্বে হাঁটিতে শিখে। হাঁটিবার পূর্ব্বে তাঁহারা ভাল করিয়া দাঁড়াইতেই পারে না। জাতি সম্বন্ধেও ঠিক এই কথাই খাটে।"*

*"As a great thinker has said, men learn to run before they learn to walk; they stagger and stumble before they acquire a steady use of their limbs. What is true of individuals is equally true of nations; and it is uncharitable to form

স্বর্গীয় উমেশ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রস্তাবে তায়েবজী সভাপতি পদে বৃত হন। তায়েবজী যে কিরূপ সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ-শূন্য ছিলেন তাঁহার গুটিকয়েক কথাতেই তাহা সপ্রমাণিত হয়। তিনি বলেন, হিন্দু, মুসলমান, পার্শী, খ্রীষ্টান বলিয়া স্বতন্ত্রভাবে কেন আমরা ভাবিব ? আর কেনইবা ইহার ত্রিসীমানায়ও যাইব ? আমরা অখণ্ড ভারতের সন্তান হিসাবেই দেশে গভর্ণমেণ্টের সংস্কার সাধন করিব—

"There is nothing in the position of the relations of the different communities of India, be they Hindus, Mohomedans, Parsis or Christians which should induce the leaders of one community to stand aloof from the others in their efforts to reform the Government."

২৭শে ডিসেম্বর তারিখে সভাপতির অভিভাষণের পরে বিষয় নির্ব্বাচনী সভা গঠিত হয়। পরের তিন দিন (২৮, ২৯, ৩০শে) নিম্নলিখিত প্রস্তাব গৃহীত হয়। কংগ্রেসের বিধি ও নিয়ম সম্বন্ধে প্রস্তাবগুলি করেন ডাক্তার ত্রৈলোক্য মিত্র। কিন্তু প্রস্তাব পাশ হয় নাই। চারিদিকে নিয়মাবলী বিতরিত হয়। এইরূপ কতকগুলি নিয়ম লিপিবদ্ধ হইয়া প্রতি বৎসর পড়া হইত মাত্র। কিন্তু কোন নিয়মাবলী বা গঠন-প্রণালী বিধিবদ্ধ হয় নাই। উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ অনেক বৃদ্ধ নেতা নিয়মকানুন গঠন করিতে ইতস্ততঃ করিয়াছিলেন। মিঃ ব্যানার্জ্জি বলিতেন এত বড় ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের পার্লামেণ্টে কোন constitution নাই, আর আমরা কেন উহা লইয়া এত মাথা ঘামাই ? কিন্তু একদিন ইহার জন্য বিস্তর অনুতাপ করিতে হইয়াছিল। ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে সুরাটে যে গোলমাল হইয়া যজ্ঞভঙ্গ হয় অনেকে এই শৈথিল্যই উহার কারণ নির্দ্দেশ করেন।

a forecast of the future from the failings and weaknesses, if any such should exist, incidental to a nascent stage.......

"Political liberty and liberal education lead the people to an earnest desire to fraternise and unite. To well-balanced minds such a gathering must appear as the soundest triumph of British administration. Let us trustfully place ourselves under the guidance of the great nation and the great Government which are providentially in charge of our destinies and our future will be as satisfactory as it can possibly be."

পাঠকের স্মরণার্থ জানাইতেছি লর্ড মেকলে একদিন বলিয়াছিলেন (১৮৩২), যেদিন ব্রিটেনের স্বায়ত্ত শাসনসম্ভূত বিধানাদি ভারতে প্রবর্ত্তিত হইবে, সেইদিনই ভারতভূমির উপরে ইংরাজ শাসনের চিরস্থায়ী সর্ব্বোচ্চ সৌধ প্রোথিত হইবে—the noblest monument of British Rule in India would be the establishment of Britains free institutions in the land." তাই স্যার. টি. মাধবরাও, লর্ড মেকলের দোহাই দিয়া বলেন—

"England has taken us into her bosom and claims us as her own. We appeal to her by the sweetest, the gentlest, the tenderest and yet withal by the most durable of all ties that which binds the mother to her offsprings to confer upon us the inestimable boon of representative institutions, and I am sure we shall not appeal in vain."

মিঃ ইয়ার্ডলি নর্টন, পণ্ডিত বিষণনারায়ণ দর। মিঃ ডব্লিউ. এস. গ্রাণ্ট এই সম্বন্ধে আলোচনা করেন। নর্টন সাহেবের বক্তৃতাটী খুবই হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল। তিনি এই সংস্কার লাভাশায় ভারতবাসিগণকে জোঁকের মত লাগিয়া থাকিতে বলেন। নর্টন সাহেব তখন মাদ্রাজে ব্যারিষ্টারী করিতেন। পরে তিনি কলিকাতায় আসিয়াছিলেন।

এস. সুব্রহ্মণ্যম্, ডব্লিউ. সি. ব্যানার্জ্জি, মিঃ কালীচরণ ব্যানার্জ্জি, মিঃ নরেন্দ্রনাথ সেন, শালিগ্রাম সিংহ, শঙ্কর নায়ার, গুরুপ্রসাদ সেন, স্যার রামস্বামী মুদালিয়ার, চন্দ্রভাস্কর খড়ে, মৌলবী হামিদ্ আলি, রাজা রামপাল সিং, এস্. অগ্নিহোত্রী, বিপিনচন্দ্র পাল, ত্রৈলোক্যনাথ মিত্র, মিঃ জন আডামস্, মিঃ বি. এইচ. চেট্টার এম-এ, মিঃ হিউম প্রভৃতি বহু চিন্তাশীল ব্যক্তি যোগদান করেন। অস্ত্র আইনের রদ সম্বন্ধে তুমুল বাগবিতণ্ডা হয়। বিপিনচন্দ্র পাল, সুরেন্দ্রনাথ প্রভৃতি সকলেই উক্ত আইনটী যেন উঠাইয়া দেওয়া হয় সেইভাবে তেজস্বিতাপূর্ণ বক্তৃতা করেন। প্রসিদ্ধ উকীল ত্রৈলোক্যনাথ মিত্র মহাশয় আইনটী একেবারে উঠাইয়া দিতে না বলিয়া সংশোধন প্রস্তাব করেন যে, স্থানীয় ও মিউনিসিপাল কর্ত্তৃপক্ষের অনুমতি-পত্র পাইলে ব্যক্তিমাত্রই অস্ত্র ব্যবহারে সক্ষম হইবেন। সমগ্র আলোচনার সময়

হিউম্ সাহেবের বড়ই অস্বস্তি বোধ হইতেছিল। কেন না, তিনি এই সমস্ত গোলমালে অনুষ্ঠানটী সরকারের বিষনজরে যেন না পড়ে কেবল তাহাই ভাবিতেছিলেন। সমস্ত প্রস্তাব ভারত সরকার ও ভারত সচিবকে পাঠাইয়া দেওয়ার প্রস্তাব গৃহীত হয়।

সকলেই জানেন অস্ত্র আইন ও সংবাদপত্র আইন লর্ড লীটন কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত হয়। লর্ড রীপণ প্রথমটী উঠাইয়া দেন কিন্তু দ্বিতীয়টী থাকিয়াই যায়

মান্দ্রাজের গভর্ণর লর্ড কনেমেরা (Connemara) ঐ সম্মিলনে উপস্থিত থাকিতে ইচ্ছুক ছিলেন কিন্তু লর্ড ডাফরিন পরামর্শ দেন যে তিনি নিজে না উপস্থিত হইয়া প্রতিনিধিবর্গকে যেন নিমন্ত্রণ করেন। তাই নর্টন সাহেব যেদিন কংগ্রেসের বন্ধুবর্গকে বিপুল ভোজে আপ্যায়িত করেন সেদিন গভর্ণর বাহাদুর উপস্থিত ছিলেনই, এমন কি পরবর্ত্তী রাত্রিতেও গভর্ণমেণ্ট হাউসে তাঁহাদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া স্বচ্ছন্দভাবে তাঁহাদের সহিত মেলামেশা করেন এবং তাহার আচরণে, সৌজন্য বা আদর আপ্যায়নের কোন ত্রুটীই লক্ষিত হয় নাই। প্রচুর জলখাবারের ব্যবস্থা হয়, প্রতিনিধিগণের আনন্দ-বর্দ্ধনের বিশেষ আয়োজন হয় এবং গভর্ণরের ব্যাণ্ড পার্টি টী ঐক্যতান বাদ্যে সকলের সম্বর্দ্ধনা করে।

মান্দ্রাজে নর্টন সাহেবের উদার ব্যবহারে সকলেই বিশেষ তৃপ্ত হন। ইনি পরে কলিকাতা হাইকোর্টে প্র্যাকটিস্ করিয়া তিনি অনেক টাকা রোজগার করেন। আমি কলিকাতা আসিবার পূর্ব্বেই নর্টন সাহেবের খুব খ্যাতির কথা শুনিতাম। অরবিন্দ, বারীন্দ্র প্রভৃতি ১৯০৮ সালে যে আলিপুর ষড়যন্ত্রের মামলায় জড়িত হন, নর্টন সাহেব তাহাতে হাজার টাকা দৈনিক ফীতে বহুদিন পর্য্যন্ত সরকার পক্ষ সমর্থন করেন। জজসাহেব মিঃ বীচক্রাফট্ ও হাইকোর্টের চীফ্ জষ্টিস্ স্যার লরেন্স জেঙ্কিন্সের কোর্টের তিনি সওয়াল জবাব করেন। আর তাঁহার প্রতিপক্ষ ছিলেন স্বর্গীয় (দেশবন্ধু) চিত্তরঞ্জন দাশ। অতঃপরে নর্টন সাহেব নির্ম্মলকান্ত রায়ের মোকদ্দমাটি যেরূপ দরদের সহিত নিঃস্বার্থভাবে পরিশ্রম করিয়া করেন তাহাতে দেশবাসী তাঁহার প্রতি বিশেষ ধন্যবাদার্হ হন। এবার চিত্তরঞ্জন ছিলেন তাঁহার সঙ্গে। ইঁহারও পরে আলিপুরে চন্দননগর shooting case এ তিনি দুইটী হিন্দু যুবককে সমর্থন করিয়া খালাস করেন। মোকদ্দমাটীর অপর পক্ষে (জাতিবর্গ) লিগাল রিমেম্‌ব্রান্‌সার নিউবোল্ট সাহেবের সম্মতিক্রমে চিত্তরঞ্জন নিযুক্ত হয়েন।

মান্দ্রাজ কংগ্রেস দেখিতে বাঙ্গলার যে প্রতিনিধিগণ গিয়াছিলেন তাহাদের মধ্যে অস্ত্র-আইন সম্বন্ধে বিশেষ বিক্ষোভের সৃষ্টি হয়। একখানি প্রসিদ্ধ মাসিক পত্রিকার স্তম্ভে জনৈক দর্শকের নিম্নলিখিত পত্রখানি বাহির হয়। পত্রখানিতে তদানীন্তন অবস্থা কিছু পরিজ্ঞাত হওয়া যায় বলিয়া এখানে পাঠকের অবগতির জন্য উদ্ধৃত করিলাম। পত্রখানিতে সম্পাদকের সহানুভূতি ছিল।

"বলা বাহুল্য কংগ্রেসে আমি দেখিতে গিয়াছিলাম, দেখাইতে আমি যাই নাই দেখাইবার আমার শক্তিই নাই—সুতরাং বাধ্য হইয়াই আমাকে ঐ সংকল্প অবলম্বন করিতে হইয়াছিল। এবং দেখিতে গিয়াছিলাম বলিয়া কেবল দেখিতেই ছিলাম। সেইজন্য বক্তাদের বক্তৃতার উপর যত কাণ না দিয়াছিলাম, শ্রোতাদের মুখের ভাব-ভঙ্গীর উপর তাহার অধিক দৃষ্টি রাখিয়াছিলাম। হিউম সাহেবের মুখের দিকে তিনদিন ক্রমাগতই আমার দৃষ্টি ছিল। এখানে থাকিতে শুনিয়াছিলাম তিনি না কি একজন দেবতা; সাক্ষাতে যাহা দেখিলাম তাহাতে তাহার উপর আমার ভালবাসার লাঘব হয় নাই, কিন্তু ভক্তির উদয় হয় নাই। তিনি ভারতবন্ধু সন্দেহ নাই, কিন্তু নিঃস্বার্থ ভারতবন্ধু নহেন। তিনি স্বজাতির স্বার্থান্বেষী স্বদেশহিতৈষী ভারতবন্ধু ইহাও সামান্য প্রশংসার কথা নহে। অস্ত্র আইনের রেজলিউসন লইয়া গোলযোগ বাধিবার সময় হিউম সাহেবের প্রথম চিন্তাকুল জ্রভঙ্গি, পরে ব্যাকুল ভাব, ক্রমে অস্থির এবং অধৈর্য্য ভাব, অবশেষে তাঁহার দৌড়াদৌড়ি পর্য্যন্ত দেখিয়া এবং অস্ত্র আইন উঠাইবার প্রস্তাবে তাঁহার নিতান্ত অনিচ্ছা দেখিয়া এবং আর কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কার্য্যে তাঁহার ভাবভঙ্গী দেখিয়া আমার বিশ্বাস হইয়াছে হিউম সাহেব নিঃস্বার্থভাবে কেবল ভারতেরই হিত ইচ্ছা করেন না, স্বজাতির স্বার্থের দিকেও তাঁহার বিলক্ষণ দৃষ্টি আছে। সম্ভবতঃ ভারতের নব-অঙ্কুরিত জীবনের সঙ্গে তাহার স্বজাতির স্বার্থের একটা গ্রন্থি

বন্ধন করিয়া দিবার জন্যই তিনি এত যত্ন করিতেছেন। আমার নিকট বোধ হইল 'কংগ্রেসই' এই গ্রন্থিবন্ধনের চেষ্টা। ইহাতে ভারতের উপকার হইলেও হইতে পারে; কিন্তু আপনাকে আমার মনের কথা বলিতে কি, এই আশার সঙ্গে সঙ্গে আমার একটু আশঙ্কাও হইতেছে। এই নূতন ধরণের গ্রন্থীতে উভয় জাতির স্বার্থকে এক রজ্জুতে বদ্ধ হইয়া ক্রমে বিলাতে-ভারতে "হরিহর" আত্মা হইয়া উঠিবে। কি কোন গভীর জলদকারী চতুর রাজনৈতিকের কৌশলে আমাদের নব-অঙ্কুরিত জীবনীশক্তিটী ভারতের নরম মৃত্তিকা হইতে এই গ্রন্থির টানে উৎপাটিত হইয়া উঠিয়া পড়িবে, কিছুই এখন বুঝিতে পারিতেছি না। প্রথমটী হইতেই ভাল এবং ভরসা করি হইবেও তাহাই। কিন্তু আত্মীয়-কুটুম্বের মনে ভাল অপেক্ষা মন্দের কথাই সর্ব্বদা জাগিয়া উঠে। কংগ্রেসে সামাজিক কথার আলোচনার চেষ্টা যে হইয়াছে এবং আগামী বৎসরে আরও যে পরিষ্কাররূপে হইবে, সেটা আর কিছু নহে নদীর একদিকের স্রোত খাল কাটিয়া আর একদিকে লইয়া যাইবার চেষ্টা মাত্র। "তোমরা কৃষিকার্য্য কর, আমরা অন্নভোজন করি। তোমরা সমাজ লইয়া থাক, আমরা সমাজের মূল—দেশের শাসন কার্য্য লইয়া খেলা করি"। এই মূলমন্ত্রে দীক্ষিত অনেকগুলি রাজনৈতিক পণ্ডিত আছেন। এই শ্রেণীর দুই একটি লোক যে কংগ্রেসে এবার ছিলেন, আমার এরূপ সন্দেহ হইয়াছিল। হিন্দু বিবাহ আইনের কিছু পরিবর্ত্তনের জন্য কংগ্রেস হইতে গভর্ণমেণ্টকে দরখাস্ত করা হউক না কেন, এমন কথাও ঘরোয়াভাবে দুই একজনে উপস্থিত করিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন। কয়েকজন প্রধান প্রধান ব্যক্তির অমত হওয়াতেই এবার এ-শ্রেণীর কোন কথা কংগ্রেসে উঠে নাই। কিন্তু আগামীবারে সামাজিক কথা তুলিবার জন্য আবার চেষ্টা হইবে। কংগ্রেসের পরিচালকগণ কতদিন এরূপ চেষ্টা নিবারণ করিয়া রাখিতে পারিবেন বলা যায় না। কংগ্রেসের নায়কদের মধ্যেও কাহারও কাহারও এই চেষ্টা আছে, ইহাই অধিক চিন্তার কারণ। কংগ্রেসের একজন নায়ক আমাকে পরিষ্কার রূপেই বলিলেন, "আর কিছু না হউক সমুদ্রে জাহাজে এতগুলি বাঙ্গালী আসিল, এটিও কম লাভ নহে।"

কংগ্রেসের স্থায়িত্ব সম্বন্ধে পূর্ব্বপত্রে যে আমার আশঙ্কার কথা লিখিয়াছি তাহার কারণ এবার পরিষ্কার করিয়াই বলিতেছি। প্রথমতঃ কংগ্রেসের যিনি ধাত্রীস্বরূপ সেই মহাত্মার যে-দিকে লক্ষ্য, নদীর স্রোত তাহার অনুকূলে কি না জানি না। নানা পদার্থে গঠিত সাতশত সভ্যের নৌকার ঠিক উপযুক্ত মাঝি তিনি কি না তাহাও বলা যায় না। তাহার পর সুরেন্দ্র বাবু, নরেন্দ্র বাবু, মিঃ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং এই শ্রেণীর কংগ্রেসের আর আর পরিচালকগণের এখনই যখন এক একজনের এক এক দিকে মতি গতি, তাহার উপর ক্ষমতা-প্রাপ্ত হইবার পূর্ব্বেই ক্ষমতা পরিচালনের ইচ্ছায় কতকগুলিকে এখনই এরূপ ঘোর উন্মত্ত দেখিলাম তাহার উপর কংগ্রেসের কার্য্যপ্রণালীর যেমন প্রকরণ-পদ্ধতি দেখিলাম তাহাতে কংগ্রেস পার্লামেণ্টরূপে পরিণত হউক না হউক বিলাতের পার্লামেণ্টের সভ্যদের বাঁদরামিতে কংগ্রেস শীঘ্রই বোধহয় পরিণত হইবে। এবার একজন মান্দ্রাজী ভদ্রলোক ইনকামট্যাক্স রিজলিউসনের সময় কিছু বলিবার জন্য প্লাটফরমে উঠিয়াছিলেন, দুরদৃষ্টবশতঃ তিনি খঞ্জ। উঠিবার সময় যখন তিনি খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে চলিতে লাগিলেন, তখন চারিদিক হইতে অনেক ডেলিগেট হাততালি দিয়া উঠিলেন। থিয়েটার ঘরে অভিনেতাদের কোন ত্রুটী হইলে ।৷৹ টিকেটের গ্যালারীর দিক হইতে যেমন হাততালি ও হো হো শব্দ উঠিতে থাকে সেইরূপ অতি অভদ্রোচিত ও কুৎসিৎ দৃশ্য দেখিয়া আমি যে কি মর্ম্মান্তিক যাতনা পাইয়াছি তাহা বলিতে পারি না। দেশের প্রতিনিধি হইয়া যাহারা ভারতে অদৃষ্টচক্র ফিরাইবার জন্য একস্থানে সমবেত হইয়াছে তাহাদের এরূপ বাল চপলতা দেখিয়া আর কি বলিব বলুন। ফল কথা কংগ্রেসে তামাসা দেখিতেই অনেকে গিয়াছেন। যাহারা ক্ষমতাবান তাহারা আপনাদের ক্ষমতা দেখাইতে গিয়াছেন, কেহ কেহ এই সুবিধায় নিজের সংবাদ-পত্রের গ্রাহক-বৃদ্ধির চেষ্টাতেও ছিলেন। প্রকৃত দেশহিতৈষী এবং ভাল লোকও ছিলেন। কিন্তু প্রায়ই পসারশূন্য মক্কেলহীন অল্পবয়স্ক উকীল এবং সংবাদপত্রের সংশ্রবিত লোক, এবং ২।৪।১০ জন আমার মত শিক্ষায় বঞ্চিত অথচ আলোক-প্রাপ্ত তরুণ বয়স্ক জমিদার সন্তান এবং কতকগুলি অপরিপক্ক স্বদেশ হিতৈষী একত্র হইয়া বিজ্ঞ বিচক্ষণ ব্যক্তিদিগকে কথা বলিবার অবকাশ না দিয়া এবং তাঁহাদের ভালকথা উড়াইয়া দিয়া তালবেতালে সকল সময়ে সমান হাততালি দিয়া কোন রকমে

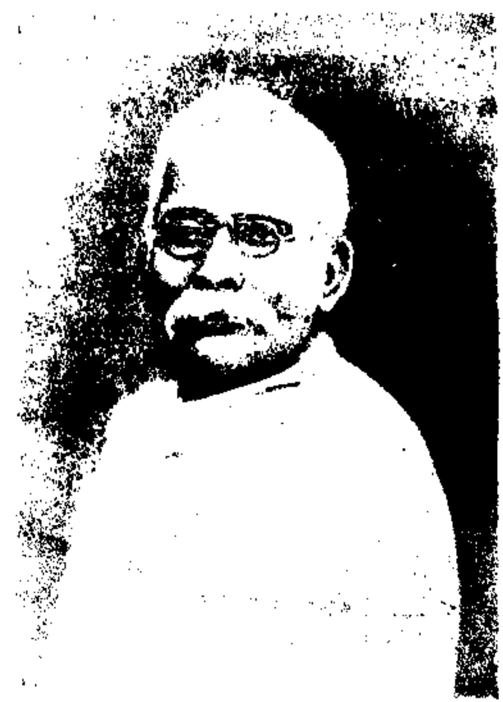
কংগ্রেস ব্যাপারে এবার সমাধান করিয়াছেন। কংগ্রেস দ্বারা উপকার পাইতে ইচ্ছা হইলে, ইহাকে স্থায়ী করিতে ইচ্ছা করিলে,—ন্যায় কতকগুলি লোককে ইহার মধ্যে প্রবেশ করা নিতান্ত আবশ্যক। কার্য্যের লোকের পরিবর্ত্তে কেবল বক্তৃতার লোক লইয়া কংগ্রেস গড়িতে চেষ্টা করিলে সমস্তই নষ্ট হইয়া যাইবে।"

মান্দ্রাজ অধিবেশনের পূর্ব্বে জন-সাধারণের মধ্যে বেশ প্রচার-কার্য্য চলিয়াছিল এবং চাঁদা তুলিবার এক অভিনব প্রথার অনুসরণ করা হইয়াছিল। প্রচার-কার্য্যের ফলে বহুসংখ্যক লোক সাধ্যানুসারে অর্থ সাহায্য করিয়াছিলেন। তাহাতে সাধারণ লোকের নিকট হইতে এক আনাও ছিল, আর প্রধান প্রধান রাজন্যবর্গের নিকট হইতে (ত্রিবাঙ্কুর, মহীশূর ও কোচিন প্রভৃতি) ৫০০ পাঁচশত টাকাও ছিল। প্রসিদ্ধ বীর রাঘব আচারিয়া খুব খাটিয়াছিলেন।

একটী প্রস্তাবে সভায় বিশেষ চাঞ্চল্য পরিলক্ষিত হয়। তাহিরপুরের রাজা শশীশেখরেশ্বর রায় একজন গোঁড়া হিন্দু। হঠাৎ তিনি একটী প্রস্তাবের নোটিস দেন যেন গোহত্যা বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। একেই তো স্যার সৈয়দ আহমেদ প্রভৃতি তখন হইতেই হিন্দু-সংগঠন সন্দেহে কংগ্রেসে যোগদান করিতে অসম্মত হন, তার উপরে এই প্রস্তাব পাশ হইলে সম্প্রদায়-বিশেষের স্বাধীনতা হরণ করা হইত। তাই নেতৃবৃন্দ একটী নিয়ম করেন যে, কোন প্রস্তাব যদি সম্প্রদায় বিশেষের প্রতিকূল হয় তবে সেই সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিগণের অমতে—হৌক না কেন সেই প্রতিনিধিবর্গ সংখ্যায় ন্যূন, কোন প্রস্তাব পাশ হইতে পারিবে না।

নর্টন সাহেবের বক্তৃতা সকলে স্তম্ভিত হইয়া শ্রবণ করেন, আর তিনি বলিয়াছিলেনও খুব নির্ভীকভাবে। আমরা তাঁহার অভিভাষণ আংশিক উল্লেখ করিতেছি—

"I was told yesterday by one for whose character and educated qualities I cherish a great esteem, that in joining myself with the labourers in this Congress I have earned for myself the new title of a 'veiled seditionist.' If it be sedition, gentlemen, to rebel against all wrong, if it be sedition to insist that the people should have a fair share in the administration of their own country, and affairs, if it be sedition to resist tyranny to raise my voice against oppression, to mutiny against injustice, to insist upon a hearing before sentence, to uphold the liberties of the individual, to vindicate our common right to gradual but ever-advancing reform—if this be sedition I am right glad to be called a seditionist and doubly, aye, trebly, glad when I look around me to-day, to know and feel I am ranked as one among such a magnificent army of 'seditionists'."



অশ্বিনীকুমার দত্ত

ভদ্রমহোদয়গণ, গতকল্য আমার একজন বিশ্বস্ত বন্ধুর প্রমুখাৎ অবগত হইলাম যে, কংগ্রেসের এই শ্রমিক সংঘের সহিত যোগদান করায় জন্য 'প্রচ্ছন্ন রাজদ্রোহে লিপ্ত'—সহসা আমি এই নূতন আখ্যায় অভিহিত হইবার যশ অর্জ্জন করিয়া ফেলিয়াছি। বন্ধুগণ, অন্যায়ের বিরুদ্ধাচরণের অর্থ যদি রাজদ্রোহ হয়, দেশের রাজকীয় শাসন-ব্যাপারে দেশবাসীর ব্যক্তিগত অংশ গ্রহণের অধিকার ও তার দাবীর নাম যদি রাজদ্রোহ হয় এবং অবিচার

অত্যাচার ও কু-শাসনের প্রতিবাদ যদি রাজদ্রোহ বলিয়া অভিহিত হয়, যদি দণ্ডপ্রাপ্তির পূর্ব্বে নিজের কথা বলিবার অধিকার দাবী করিবার নাম রাজদ্রোহ বলিয়া বিবেচিত হয়, ক্রম-প্রগতিশীল সংস্কার লোভের জন্ত ব্যক্তিস্বাধীনতার দাবীকে কেহ যদি রাজদ্রোহ বলিয়া আখ্যা দেয়, তবে ভদ্রমহোদয়গণ আমি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতেছি সেইরূপ রাজদ্রোহের অপরাধী বলিয়া গণ্য হইতে এবং সর্ব্বোপরি এই মহান রাজদ্রোহী সংঘের আমিও যে অন্যতম সভ্য এই আত্মবোধ ও সেই সুখ-সংহতির কথা ভাবিতে আমি নিরতিশয় আনন্দ ও গৌরব অনুভব করিতেছি।

এই বক্তৃতা হয় অর্দ্ধশতাব্দীরও কয়েক বৎসর পূর্ব্বে, কিন্তু আজ এই কথার আংশিক ভাব প্রকাশেও সিডিসন্ (রাজদ্রোহ) হয়। গভর্ণমেণ্টের শাসনকে tyranny অরাজকতা ও গভর্ণমেণ্টের বিচারকে অবিচার বলিয়া আখ্যা দেওয়া আজ ঘোর sedition, স্বয়ং নর্টন সাহেবও বোধ হয় তাঁহার কোন মক্কেলকে এই ভাষা ব্যবহারের জন্ত আইনের কবল হইতে উদ্ধার করিতে পরিতেন না। অথচ আইনজ্ঞ নর্টন জানিতেন তিনি ঠিকই বলিয়াছেন।

বরিশালের নায়ক আদর্শ কর্ম্মবীর স্বর্গীয় অশ্বিনীকুমার দত্ত মহাশয় ভারতীয় এবং প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভার প্রসার সম্বন্ধে বক্তৃতা দিতে উঠিয়া বলেন* —

"আমি আপনাদের কাছে ৪৫০০০ লোকের সহিযুক্ত একখানি নিবেদন আনিয়াছি। যখন তাঁহারা ইহাতে স্বাক্ষর করেন, তাহাদের উৎসাহ ও উদ্দীপনা দেখিয়া আমি অভিভূত হইয়াছি—একজন চণ্ডাল আসিয়া বলেন, বাবু আমাদের নিজেদের লোক আইন প্রস্তুত করিবে? কি ভাগ্যের কথা, একজন দীন-দরিদ্র মোসলমান চার আনার পয়সা দিয়া বলেন বাবু ইহা আপনাদের কাজে লাগাইবেন। আর একজন প্রতিবেশীদের সঙ্গে আলোচনা প্রসঙ্গে বলে, দেখ যেমন আমরা পঞ্চাইতি করি ও পঞ্চাইতি বিচার মানিয়া লই তেমন আমাদের লোক আইন করিবেন আর আমরাও খুসী হইয়া মানিয়া লইব—আপনারা দেখুন সাধারণ লোক এই বিষয়ে কিরূপ আগ্রহান্বিত। প্রস্তাবটি সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।"

গভর্ণর বাহাদুর এবং নর্টন সাহেব ব্যতীত মান্দ্রাজের শেরিফ ও প্রতিনিধিবর্গকে একটি ভোজ দিয়াছিলেন।

*"This Congress re-affirms the necessity for the expansion and reform of the council of Governor General for making laws and Provincial Lagislative Councils.

জীর্ণ-তরী

-শ্রীহরিপদ ঠাকুর

অশ্রুরে করি পথের পাথেয়
জীর্ণ-তরণী ল'য়ে,
ভেসে চলিয়াছি নীরব নিশিতে
আঁধারের ভরা ব'য়ে।

জানি না তরণী ডুবে যাবে কি না
এত ভারবাহী তরী,
জীর্ণ-তরণী যাত্রী আমি গো
নাহি তার কাণ্ডারী।

উঠিয়াছে ঝড় লেগেছে তুফান
তরী করে টলমল,
জীর্ণ-তরণী যাত্রী আমি গো
টলকে উঠিছে জল।

না বুঝিয়া আগে ভরিয়াছি বোঝা
এ যে আঁগাছার তরী,
বুঝি ডুবে যায় এস গো ত্বরায়
কে আছ গো কাণ্ডারী॥

অপরাজিত

—শ্রীসুকৃতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

যে শোনে সেই বলে, হ্যাঁ, দেখবার মত ছেলে বটে! দেবুর মাসীমার মুখে বোনপোর সুখ্যাতি ধরে না। এমন কি তাঁর বৌবাজারের দূর সম্পর্কের এক ছোট ননদকে পর্য্যন্ত ঠারে ঠোরে জানিয়ে এলেন, মেয়ের বিয়ে যদি একান্তই দিতে হয় আমাদের দেবুকে ধর।

শর্ম্মিলা কোন জবাব দেন নি। তাঁর ছোট ছেলে অমলের শুনে শুনে কেমন ঝোক ধরল, কি এমন গুণের ছেলে যে, তার সঙ্গে আমার বোনের বিয়ে দেওয়া যেতে পারে! দেখেই আসা যাক্ না কেমন ছেলে সে! এই মনে করে অমল একদিন দেবুর সঙ্গে পরিচিত হ'তে এল।

বাড়িটা খুঁজে বের করতে তার বিশেষ কোন কষ্ট হ'ল না। কেন না আত্মীয়তার সূত্র ধরে মাঝে মাঝে সেখানে তার যাতায়াত ছিল। কিন্তু দেবুর আসার পর থেকে সে এখানে অনেক দিন আসে নি। দেবুর মাসীমা এসে কপাট খুলে দিলেন। সিঁড়ির কাছাকাছি এসে বললেন, উপরে উঠে গিয়ে ডান দিকের ঘরে যাও। আমি আহ্নিক করতে বসেছি, নইলে তোমাকে নিয়ে গিয়ে আলাপ করিয়ে দিতাম।

—থাক থাক, আমি আলাপ করে নিতে পারব। আপনার বোনপো কি এমন কেষ্ট-বিষ্টু লোক যে, তার সঙ্গে আলাপ করবার জন্ম পরিচয় পত্র নিতে হবে। এই ব'লে সে মুখের উপর একটা তাচ্ছিল্যের হাসির রেখা টেনে টক্ টক্ করে শিষ দিতে দিতে উপরে উঠে গেল।

ইচ্ছে করেই সে পা টিপে টিপে এসে ঘরের সামনে দাঁড়াল। উঁকি দিয়ে দেবুকে দেখে তার মনে হ'ল, তার প্রত্যেকটি নিঃশ্বাসের তরঙ্গে যেন ঘরের দেয়াল অবধি কেঁপে উঠছে। তার শরীরের গড়নের ভিতর কোথাও বাঙলার ম্যালেরিয়ার ছাপ নেই। কঠিন-কর্কশ-রুক্ষ একটা পৌরুষ ভাব তার শিরায় শিরায় বিদ্যমান। বুকের ছাতি ঠিক যেন হাপরের যাঁতার মত ওঠা-নামা করছে। বছর পঁচিশ, কি তার কিছু বেশী তার বয়স। গায়ের রঙ তার ময়লা, কিন্তু একটা স্বাভাবিক ঔজ্জ্বল্য আছে। সব চেয়ে অপূর্ব্ব তার স্বভাব! অমল কথা ব'লেই বুঝল।

নিজেই আগে ভূমিকা নিবেদন করল, নমস্কার! আপনি আমাকে চেনেন না। পিসীমার মুখে আপনার নাম শুনে ভাবলাম, একবার আলাপটা করে যাই!

দেবু ঠিক বুঝতে পারলে না। বলল, আপনার পিসীমা—

অমল ত্রস্ত না হয়েই বলল, আপনার মাসীমা। ওঁর সঙ্গে আমাদেরও একটু সম্পর্ক আছে কি না।

দেবু তাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে বলল, বসুন। দাঁড়িয়ে রইলেন কেন?

অমল ঘরের চারদিকে তন্ন তন্ন করে চেয়ারের সন্ধান করল। না পেয়ে বলল, আপনি ঘরে একখানা চেয়ার অবধি রাখেন নি?

দেবু খাতার পাতা ওলটাতে ওলটাতে বলল, ভেবেছিলাম কিনি তার পর ভাবলাম দরকার কি? বিলেতি সভ্যতা থেকে যত দূরে থাকা যায় ততই ভাল।

অমলেন্দু যেন এতক্ষণে কথা বলবার খেই পেল। প্যাণ্টের খাঁজ বাঁচিয়ে চৌকির এক পাশে বসে প্রশ্ন করল, কেন বিলিতি সভ্যতার ভিতর কোন দুরভিসন্ধির খোঁজ পেলেন না কি? না, এটা আপনার একটা মিথ্যা সংস্কার?

অমল ভেবেছিল দেবু আগুনের ফুলকির মত দপ্ করে উঠে কিছু একটা তাড়াতাড়ি জবাব দেবার চেষ্টা করবে। কিন্তু তার মুখ থেকে তথাপি কোন জবাব না পেয়ে সে পুনর্ব্বার প্রশ্ন করল, না এটা আপনার সেণ্টিমেণ্ট?

দেবু আস্তে আস্তে জবাব দিল, যাই বলুন। সেণ্টিমেণ্টও বলতে পারেন সংস্কারও বলতে পারেন, কিন্তু বিলিতি সভ্যতার জন্ম ভারতের সংস্কৃতি যে বিপন্ন হ'তে বসেছে এ বোধ করি অস্বীকার করবেন না।

প্রথম আলাপেই ওদের তর্কটা ঘোরালো হ'য়ে উঠল। অমল মনে মনে হেসে উঠল, বলল, তার এক-আধটা উদাহরণ যদি দেন তা হ'লে বুঝতে পারি।

দেবু নির্লিপ্তের মত জবাব দিল, দেখুন, লোহা-লক্কড় নিয়ে আমার কারবার। সব জিনিষ বোঝবার বা জানবার অবকাশ আমার খুবই কম। তবু যে জিনিষটা আমার চোখে সব চেয়ে বিশ্রী ঠেকেছে সে আমাদের দেশের এই নারী সমাজ। একটা উপমা দিই আপনাকে। মাস খানেক আগে আমি ভবানীপুর যাচ্ছিলাম। ট্রামে এক তিল জায়গা ছিল না। দোরের পাশে আমি বসে ছিলাম। এমন সময় একটি বাঙালী মেয়ে এসে ট্রামে উঠলেন। তাঁর চাল-চলন, পোষাক-পরিচ্ছদ দেখে যদি অভারতীয় বলে কেউ ভুল করেন—অন্যায় করবেন না। এবং আমি তাই-ই করেছিলাম। তাঁকে যথেষ্ট সম্মান না দেখিয়ে বরঞ্চ অসম্মানই করবার চেষ্টা করেছিলাম। অনেক তর্ক, অনেক উপদেশ আর লাঞ্ছনা সেদিন পথে পেলাম। এমনি সময় আর একটি মেয়ে এসে ট্রামে উঠলেন। তাঁকে দেখে আমি সসম্মানে আসন ছেড়ে দিলাম। কেন?

অমল তির্য্যক ভঙ্গিতে জবাব দিল, এর মধ্যে তো কোন যুক্তি-তর্ক নেই। আছে মেয়েদের সম্বন্ধে আপনাদের সেই সনাতন যুগের বর্ব্বর ধারণা আর অকারণ উপেক্ষা। মানুষ বলে তাদের জ্ঞান করাটাকে আপনি হয় ত খুব অন্যায় মনে করেন।

দেবু উঠে পায়চারি করতে করতে জবাব দিল, আপনার সঙ্গে পরিচয় আমার মাত্র কিছুক্ষণের, কিন্তু মনে রাখবেন, অকারণে, বিনা যুক্তি-তর্ক দ্বারা আমার মনোভাবকে অপমান করলে আমি আপনাকে নিরাপদে যেতে দেব না।

অমল তার অর্থ ঠিক বুঝতে পারল না, বলল, What do you mean to say? Do I care you?

তার হাতখানা ধরে বসিয়ে দিয়ে দেবু বলল, মানলুম আপনি আমাকে ভয় করেন না। কিন্তু আমি যদি জিজ্ঞেস করি, আপনি আমার নীতিকে বর্ব্বর বললেন কেন, কি জবাব তার দেবেন?

অমল উত্তেজিত হ'য়ে জবাব দিল, একশোবার বলব। আপনারা চান মেয়েদের ক্রীতদাসী করে রাখবেন সংসারে। তাদের আশা নেই, আকাঙ্খা নেই। শক্তিহীন না জড় পদার্থ তারা? দিনের পর দিন তাদের উপর অত্যাচার চালিয়ে যাবেন। এই আপনারা চান, কেমন?

দেবু হাসতে হাসতে জবাব দিল, আর আপনারা বুঝি তাদের সবাইকে বারাঙ্গনা করে নিয়ে গিয়ে সমাজের শৃঙ্খলা ভেঙ্গে দূরে নিয়ে যেতে চান। সহজলভ্য পদার্থের উপর দরদ থাকা খুবই স্বাভাবিক, এবং বয়সের এইটেই বুঝি ধর্ম্ম? আমেরিকার দৃষ্টি দিয়ে ভারতবর্ষের মেয়েদের বিচার করতে চান আপনি কেমন? কিন্তু প্রকৃতির কাছে কি বলে কৈফিয়ৎ দেবেন?

অমল রীতিমত অবাক্ হ'য়ে গেল, হবারই কথা। সে নিজে ছুটো একটা নারী আন্দোলনের পাণ্ডা। নিজে সে নারী সমস্যার সমাধানার্থে চাঁদার খাতা নিয়ে বড় বড় লোকের বাড়ীতে যাতায়াত করে। দেশের আভিজাত সমাজরা তার এই কর্ম্ম-প্রচেষ্টার প্রশংসায় পঞ্চমুখর। বালীগঞ্জের মিস্ সুলক্ষণা দাস বি, এ, সেবার ওকে একটু ঠাট্টা করে বলেছিল, যখন আমার পুঁজি ছিল অফুরন্ত তখন তুমি এলে না অমল, এলে তোমার এই কঠিন পরিশ্রমের বিনিময়ে যা পেতে তাতে এই চিরকালিনীদের কথা চিরকালই মনে রাখতে।"

স্বয়ং এলাক্ষী সেন পর্য্যন্ত যার সঙ্গে তর্কে কোন দিন পারে নি, তার পাশে এসে দাঁড়িয়ে দেবব্রত চক্রবর্ত্তী? লোহা লক্কড়ের বেচা-কেনা করা যার কাজ, সে নির্দ্দেশ দেবে দেশের নারী সমাজকে কি করে' চলতে হবে? অমল মনে মনে হেসে উঠল। রাঁচি হয়েছে কি সাধে? এই চক্রবর্ত্তীর মত বুদ্ধিমানদের শান দেবার জন্ম। হোপলেস্। বলল, "ক্ষতি কি, মেয়েরা যদি ভ্যানিটি ব্যাগ নিয়ে পথে বেরোয়? যদি চৌরঙ্গীর মেমদের মত গালে রং ঘষে পথে পথে হল্লা করে বেড়ায়? বায়োস্কোপের দোরে গিয়ে ভিড় করে?

—কিছু না। দেবু বলল, ক্ষতি কি, যদি আমি তাকে বসবার যায়গা না ছেড়ে দিই? ভিড়ের মাঝে ধাক্কা দিয়ে যাই?"

অমল বলল, আপনার সংস্কৃতি তাই বলে না কি?

দেবু নির্লিপ্তের মত জবাব দিল, তা বলে না। নারীকে সম্মান করবার কথা আছে বটে। কিন্তু যদি তিনি সত্যি-কারের নারী হন দৃষ্টিভঙ্গিমার বিচারে। শুধু বাহ্যোলঙ্কীকে মানলে হবে না।

—মানে?

—মানে আমাদের প্রাচীন উপনিষদে নারীত্বের এবং এবং সতীত্বের যে সংজ্ঞা দেওয়া আছে এবং তাঁর মধ্যে যদি তার পরম বিকাশ দেখতে পাই; তবেই।

অমল প্রশ্ন করল, সতীত্ব বলতে আপনি কি বোঝেন?

দেবু জবাব দিল, একনিষ্ঠ প্রেম, যেটা 'ডাইভোর্স' বা স্বেচ্ছাচারিতার ভিতর থাকে না। আজকের স্বাধীনতা বলতে যেটা আপনারা বোঝেন, সেটা স্বাধীনতার নামে সমাজে রীতিমত উচ্ছৃঙ্খল আনা। বিশেষ একটা কোন শ্রেণীর হাতে শাসনভার পড়লে যেমন অচল হয়, তেমনি আমাদের সমাজেরও হয়েছে। ভুল, দোষ, ত্রুটি থাকা সম্ভব। তাকে শোধরানোও যায়, তাই বলে তাকে ত্যাগ করবার বা ভাঙ্গবার ভিতর কি এমন মহত্ত্ব থাকতে পারে বুঝি নে। ভারতবর্ষ যদি স্বাধীন হয়, সে তার নিজের সংস্কৃতি, নিজের মৌলিকত্ব বাঁচিয়ে স্বাধীন হবে। যদি তা না হয়, যদি তুরস্কের মত একেবারে নিজেকে ইংরেজদের ছাঁচে ঢালাই করে নিতে চায়, তা হ'লে আমি বলব, যে তার আত্মাকে পর্য্যন্ত ইংরেজদের পায়ে বিক্রি করে দিয়েছে। এবং স্বাধীনতার স্বপ্ন তার ব্যর্থ হয়ে গেছে। ভারতবর্ষ বলে দেশ পৃথিবীর মানচিত্র থেকে মুছে গেছে।

অমল তাকে বাজিয়ে দেখে নেবার অজুহাতে বলল, ভেবেছিলাম আমাদের এই আন্দোলনটা চালাতে আপনার কাছে মাঝে মাঝে কিছু সাহায্য পাওয়া যাবে। কিন্তু—

দেবু বাধা দিয়ে বলল, মাপ করুন, বরঞ্চ যদি সত্যিকারের দেশের কোন অভাব-অভিযোগের প্রতিকার করতে চান আমাকে পত্রযোগে জানাবেন, আমি স্বেচ্ছায় আপনাদের অংশ নেব।

—সেটা কি কাজ? মন্দির গড়া, না সংস্কার করা?

অমল তার পানে কটাক্ষে চাইল। দেবু ঘড়ির পানে চেয়ে জবাব দিল, সময় করে আর একদিন যদি আসেন আপনার প্রশ্নের উত্তর দেব। আমার আফিসের বেলা হ'য়ে যাচ্ছে। এখনও চান করি নি, আহ্নিক করে খেয়ে বেরুতে দেরী হ'য়ে যাবে, নইলে—

অমল উঠে দাঁড়িয়ে বলল, বসুন আপনি। সময় করে উঠতে পারি ত আবার আসব।

বলেই সে নিচে নেমে গেল। সিঁড়িতে তার জুতোর আওয়াজ পেয়ে বিশেশ্বরী এগিয়ে এসে জিজ্ঞেস করলেন, আলাপ হ'ল?

অমল ঘাড় নেড়ে বলল, এই আপনার ভাল ছেলে? কিছু জানে না, কিছু বোঝে না, একগুঁয়ে। কিই বা এমন রোজগার করে? করে তো লোহা-লক্কড়ের দালালি। তবু জানতাম যে কোন সাহেব আফিসে চাকরি করে। না জানে লেখাপড়া, না জানে কিছু? ঐ মুখে আবার এলিস আর ফ্রয়েডের সমালোচনা, হুঁ?

বিশেশ্বরী কপাট দিতে দিতে বললেন, কার সঙ্গে কার তুলনা। তুই হলি দুটো পাশ করা ছেলে, সারা পৃথিবী তোর নাম। নেহাৎ তোর মা বলেছিল, তাই। নইলে আমি কি জানতাম না কত ধানে কত চাল হয়? এই নে তোর চাঁদা।

একটি সিকি গুঁজে দিয়ে কপাট ভেজিয়ে তিনি অন্তর্দ্ধান হলেন। অমল বাইরে এসে আলোর সামনে উল্টে পাল্টে বলল, সিকিটে যে অচল —

বিশেশ্বরী রান্নাঘরে খেতে বসেছিলেন। ভারি গলায় জবাব দিলেন, এখন হাতজোড়া বাবা। চালাবার চেষ্টা করিস রে। শ্রীভগবানের রাজত্বে কি কিছু অচল থাকে?

অমল আর কোন জবাব না দিয়ে সুড় সুড় করে বেরিয়ে গেল।

বাড়ি এসে অমলেন্দু শর্ম্মিলাকে বলল, ওই ছেলেকে আবার তুমি জামাই করতে চাইছ মা? শর্ম্মিলা অবাক হ'য়ে বললেন, কেন রে? কিছু লেখা টেখা করে না কি?

অমল উপেক্ষার ভঙ্গিতে বলল, মেয়েদের সম্বন্ধে যাদের এমন সংকীর্ণ সনাতন ধারণা তার সঙ্গে বিয়ে দেবে নির্ম্মলার? ছাই গড়্। তার চেয়ে ভাল, দড়ি আর কলসী।

ছেলের এই হাল-আমলের ভঙ্গি বুঝতে না পেরে শর্ম্মিলা বলল, ভাল করে খুলে বল বাপু। তোর কথা যদি সহজে কেউ বোঝে!

—পরে বলব এখন। অধীর হ'য়ো না। আগে এক কাপ চা তৈরী করে কাউকে দিয়ে পাঠিয়ে দিয়ো ত মা।

শর্ম্মিলা বললেন, এই বেলা বারোটার সময় চা খাবি কি রে?

অমল ঘুরে দাঁড়িয়ে বলল, অবাক্‌ করলে মা তুমিও দেখছি। চা খাব তারও সময় অসময় আছে না কি?

শর্ম্মিলা আর কোন তর্ক না তুলে চলে গেলেন। আধঘণ্টা পরেই নির্ম্মলা চা নিয়ে এল। অমল নিজে যেচেই তাকে দেবুর পরিচয় পত্র রঙ চঙ করে শোনাল। নির্ম্মলা বেশ বুঝল, এই মানুষটির সঙ্গে পরিণয়-সূত্রে আবদ্ধ হ'লে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম আকাঙ্ক্ষাকে তার বিসর্জ্জন দিতে হবে। তার আজীবনের সাধনা সে কারও সঙ্গিনী হবে, সহধর্ম্মিণী হবে না। অথচ সেইটেই ব্যহত হবার আশঙ্কা। শিউরে উঠল সে মনে মনে। অগোচরে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাল সর্ব্বত্রাণকর্ত্তাকে। দোহাই ঈশ্বর, এমন স্বামী দিও না। সে নিজে পাশ করা মেয়ে। একদা রূপের চেয়ে চাল-চলনের তার খাতির ছিল বেশী। তার সুসভ্য মনের কোণে পতির যে আদর্শ ছবিখানা আঁকা ছিল, তার ভিতর যথেষ্ট আধুনিক রুচি-বোধের ছাপ ছিল। বাপ ছিল তার গাজিয়াবাদের ষ্টেশন মাষ্টার। পনের বছরের উপর ছিল তারা পশ্চিমে। এর ভিতর দুটি ছেলে এসেছিল তার দৃষ্টিতে। কেতনলাল আর অলকেন্দু। কেতনলালের কথা তেমন মনে পড়ে না। ডাউন ট্রেণের গার্ড ছিল সে। প্রায়ই সে এখানে নেমে বিশ্রাম নিত। দিল্লীর ওদিকে তার বাড়ি। খুব কাছাকাছি এসে সে হঠাৎ এত দূরে চলে গেল যে তাকে মনে রাখা আর সহজসাধ্য হ'য়ে উঠল না নির্ম্মলার। কিন্তু অলকেন্দুকে তার মনে আছে। এবং বোধকরি—যদি না অলকেন্দুর তরফ থেকে কোন নিরাশার বাণী আসে—জীবনের শেষ অবধি যদি সিংহাসন পাতা থাকে সেখানে সমাসীন থাকবে যে, সে আর কেউ নয় অলকেন্দু।

অলকেন্দুর সঙ্গে পরিচয় পথে। নির্ম্মলার বাবা ফরাক্কাবাদ থেকে বদলী হ'য়ে সেবার গাজিয়াবাদ চলেছেন। মাঝপথে এসে একটি বাঙালীর ছেলে উঠল। বছর চব্বিশের কাছাকাছি তার বয়স। পরিধানে প্যাণ্ট কোট। জোর করে আভিজাত্য দাবী করবার সস্পষ্ট ভঙ্গি তার মধ্যে প্রকাশমান ছিল। নির্ম্মলার বাবা কথা বলবার অছিলা খুঁজছিলেন। ঘটেও গেল।

ছেলেটিই বললে, আপনাদের 'রিজার্ভ বার্থে' উঠে এসেছি বলে যেন কিছু মনে করবেন না। কোথাও একতিল জায়গা না পেয়ে—

নির্ম্মলার বাবা বললেন, তাতে কি হয়েছে? আমি মনে করছিলাম হয় ত আপনি বাঙালী নন। আপনার নাম কি জানতে পারি?

—অলকেন্দু গাঙ্গুলী। আপনি কতদূর যাবেন?

—যাব গাজিয়াবাদ।

ছেলেটি অবাক হ'য়ে বলল, তাই না কি? বাঃ বাঃ গাজিয়াবাদে আমিও থাকি?

—বটে! ভালই হ'ল। আপনি কি করেন?

অলকেন্দু ধীরে ধীরে বসে বলল, বছর দুয়েক হ'ল বি, এ পাশ করেছি। চাকরীর চেষ্টা করছি।

যেতে যেতেই শুনলে, অলকেন্দুর কাকা ছাড়া কেউ নেই। তিনি এখানকার পোষ্ট অফিসের একজন নাম করা চাকুরে।

শর্ম্মিলা বসে বসে দেখছিলেন ছেলেটিকে। নামবার সময় নিমন্ত্রণ করে বসলেন। এবং সে নিমন্ত্রণ যথাযথ ভাবে অলকেন্দু রক্ষা করে চলতে লাগল। একদিন শর্ম্মিলার মনের কথা প্রকাশ হ'ল। অলকেন্দুকে তিনি আরো কাছে চান। ব্যবধানের দূরত্ব সইবার ভিতর যে নিপীড়ন ছিল অলকেন্দু ও এক দিন মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করল। তখন কাকার কাছে, বন্ধুদের সামনে রেখে, পরোক্ষে দাবি পেশ হ'ল। কাকা ছিলেন ঘোরতর প্রাচীনপন্থী। সটান বলে বসলেন, নিকালো হিঁয়াসে। আমার কাছে ওসব অনাচার চলবে না। বুড়ো ধাড়ী মেয়েকে উনি বিয়ে করবেন, ঈস্! আমি বুঝি দেখি নি তাকে? গালে রঙ মেখে গট্ গট্ করে ঘুরে বেড়ায় ঐ ষ্টেশন মাষ্টারের মেয়ে ত?

অলকেন্দু সজোরে, মেরুদণ্ড আছে প্রমান করবার জন্য, যুদ্ধ ঘোষণা করল। কপাটের কাছে দাঁড়িয়ে উচ্চকণ্ঠে বলল, নিজের দায়ে দাঁড়াতে পারি তো ঐ মেয়েকেই বিয়ে করব, দেখব কে আটকায়।

এই ব'লে সে কিছুকালের জন্য নিরুদ্দেশ রইল। অনেক দিন নির্ম্মলা তার খবর পায় নি। বছর দেড়েক পরেই তার বাবা রিটায়ার করে চলে এলেন দেশে। ক্রমে বৌবাজারের একটা গলিতে একখানা বাড়ি কিনে বসবাস সুরু করলেন। এমন সময় অনেক ঘাটের জল খেয়ে আর অনেক ছাপ খেয়ে

একখানা পুরোনো খাম এসে হাজির। নির্ম্মলার নাম লেখা ছিল। নির্ম্মলা খুলে দেখে অলকেন্দু লিখেছে, মাদ্রাজে এখন আছি। কোন কিছু সুবিধে করতে পারছি নে। আমাকে একটা কুণ্ডেশ্বরী কবচ কিনে পাঠাতে পারেন? লেখা ছিল আরো অনেক কিছু। সেগুলো এমন কিছুই নয়। নির্ম্মলার এই দীর্ঘ জীবনে পাথেয় দিতে গিয়ে সে শেষ হ'য়ে গেছে।

অমলের কথায় তার টনক নড়ল।

ভেবে সে কূলই পেল না, বিশ্বেশ্বরী কি করে তার সঙ্গে বিয়ের কথা পাড়ল। ভাবল, এবার দেখা হ'লে বলতে হবে, বোনপোর বিয়ে দেবেন মাসীমা? একটি ন'বছরের মেয়ের সন্ধান আছে। গরীবের মেয়ে। আমার উপর আপনার এত করুণা কেন? বুঝতে পারছি নে ত!

অলকেন্দু আর দেবু, আকাশ আর পাতাল প্রভেদ।

নির্ম্মলা বলল, দূর দূর! কথায় আছে, অল্পবিদ্যা ভয়ঙ্করী। ওদের মত লোককে নিয়ে আলোচনা না করাই ভাল দাদা। যাই, সতীদের বাড়ীতে আজ জলসা হবে এখুনি হয় ত গাড়ি আসবে

দেবুর কেবলই মনে হয় মানুষ নিজেকে এমন ভুল বোঝে কেন? লোহা-লক্কড়ের কারবার করলেও মনটা ওর অসামাজিক নয়। দেশের এই দুঃখ-দুর্দ্দশা ওকে ভয়ানক পীড়া দেয়। দেশের নেতাদের কোন আনকোরা বক্তৃতা পড়ে মন ওর সাড়া দেয় না। বরং তার উলটোটাই ঘটে যায়। দেখে, দেশের বুকে কেমন অনাচার আর হলাহল চলছে। দেশসেবার নাম করে আত্মসেবায় ব্যাপৃত কর্ম্মীদের কর্ম্ম-কুশলতা শুধু লজ্জারই নয় অকল্যাণের। সংবাদপত্রের বীভৎস রূপ দেখে কিছুতেই ও বুঝতে পারে না যে, এতদিনে পুঁজিবাদীদের জগদ্দল পাথর এক তিলও নড়েছে। একজনের বিরুদ্ধে অপরের শাণিত অস্ত্র দেখে মনে হয় কোন সংবাদ-পত্রই পাঠ না করা ভাল। একটা কঠিন কিছু না করতে পারলে মনে ওর কিছুতেই শান্তি নেই। বন্ধুবান্ধবতার থেকে দূরে থাকে। অমলেন্দু এসেছিল তার কাছে অনেক আশা নিয়ে, নিরাশ হ'য়ে তাকে ফিরে যেতে হয়েছে। কেউ তাকে ভুল বুঝুক বা ঘৃণা করুক—এসে যায় না।

বেলা আটটা। সামনের চৌকির উপর হিসাব-পত্রের খাতা ছড়ান। এমন সময় একজন মহিলার আবির্ভাব হ'ল। সামনে বসে মহিলা বললেন, শুনছি নির্ম্মলার সঙ্গে না কি তোমার বিয়ে?

কোন রকম বিস্ময় না প্রকাশ করেই দেবু বলল, কার কাছ থেকে শুনলেন?

—যার কাছেই শুনি না কেন, মহিলা হাসি টেনে বললেন, বলই না শুনি!

দেবু কাগজপত্র গোছাতে গোছাতে বলল, ভুল শুনেছেন।

প্রেমালয়া বললেন, তবে নির্ম্মলার কথাও অবিশ্বাস করতে হবে?

দেবু অবাক হ'য়ে বলল, নির্ম্মলা!

—দেখ, দেবু ঠাকুরপো শাক দিয়ে মাছ ঢাকবার চেষ্টা কর না। দশ বছর আমি একজন সাহিত্যিককে নিয়ে ঘর করছি। আমি বুঝি নে মানুষের মনের খবর! নির্ম্মলা যে-ভাবে তোমার প্রশংসায় পঞ্চমুখর হ'য়ে উঠল সেদিন, ও-রে বাপ! তার পরেও যদি অবিশ্বাস করতে বল তা হ'লে রামায়ণ মহাভারত পর্য্যন্ত অবিশ্বাস করতে হয়

দেবু বলল, ভুল শুনেছেন বৌদি। সে আমি নই, অন্য কেউ

—দেখ, প্রেমালয়া বললেন, তোমাদের পুরুষ মানুষের ঐ একটা স্বভাব, নিজের নামকে যাচাই না করে নিয়ে শান্তি পাও না। ও-সব কথা ছেড়ে এখন বল ত শুনি লুচির কড়া কবে চড়ছে?

দেবু বলল, বেশ ত, খেতে চান না হয় একদিন খাইয়ে দেব। তাতে কি!

প্রেমালয়া ছাড়বার পাত্রী নন। বললেন, ভবঘুরেদের কাছে একদিনের বেশী আশা করা যায় না। কিন্তু আমি তো একদিনের আশা করি নে। সংসার পাতবে যখন তখন এসে ওঠা যাবে।

দেবু হাসতে হাসতে উঠে পকেট থেকে দশটাকার একখানা নোট এনে প্রেমালয়ার হাতে দিলে। প্রেমালয়া এদিক ওদিক তাকিয়ে বললেন, টাকাটার জন্য যেন তাগাদা দিও না ভাই। তোমার দাদা কাজ-কর্ম্মের চেষ্টা করছেন, হ'লেই দিয়ে দেব। আর শোনো, তোমার মাসীমার কানে যেন না যায়।

দেবু পায়চারি করতে করতে বলল, কারু কানে যাবে না।

মনে করব ও টাকাকটা আমার হারিয়ে গেছে। মাঝে মাঝে আমার এমনি যদি হারিয়ে যায় তাতে আনন্দিত হব। যে অবধি নিরঞ্জনদার কোন চাকরি না হয় ঘর ভাড়ার টাকাটা এই ছোট ভাইটির কাছ থেকে এসে নিঃসঙ্কোচে নিয়ে যাবেন। পৃথিবীর কেউ জানবে না। শুধু আমি আর আপনি কেমন?

প্রেমালয়ার তরফ থেকে কোন জবাব এল না। নোটটা আঁচলে বাঁধতে বাঁধতে বললেন, আমার ভয়ানক ইচ্ছে তোমার বিয়েটা দেখি। নির্ম্মলাও দেখতে মন্দ নয়—

দেবু তাকে থামিয়ে দিয়ে বলল, যদি নিতান্তই কখনও বিয়ে করি আপনি যেখানেই থাকুন নিমন্ত্রণ করে আনব। ভাল কি মন্দ ও-কথা এখন থাক বৌদি। এই সামান্য অবস্থা—না ঘর, না দোর—এই অবস্থায় বিয়ে করা ঠিক নয়। যে দিন বুঝব আমার ছেলে মেয়েকে উপযুক্ত শিক্ষা, আহার, চিকিৎসা দিতে পারব সে দিন কেন বিয়ে করব না। কঠিন বৈরাগ্য আমার ধর্ম্ম নয় বটে, তবে যে অবধি দেশের এই ঘোরতর দুরবস্থা থাকবে ততদিন আর কোন নতুন অতিথিকে ডেকে এনে অপমান করতে চাই নে।

প্রেমালয়া কি বলতে যাচ্ছিলেন, দেবু বলে বলল, পরিপূর্ণ দেহ আর যৌবন নিয়ে যে শিশু আসবে তাকে মানুষ করব কি দিয়ে? বুঝছেন তো সংসার করাটা কি জ্বালা—

প্রেমালয়া বললেন, তোমারা সবাই যদি এই গোঁ ধর তবে সৃষ্টি যে লয় হ'য়ে যাবে।

—আমি আমার কথাই জানি। অন্যে কি করবে তা জানি নে।

এই বলে দেবু জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। প্রেমালয়া এটা ওটা কথার জের টেনে চলে গেলেন। প্রেমালয়া চলে গেলে জানালার দিকে মুখ করে দেবু বসে রইল। মনটা তার আজ নাগালের বাইরে ধাবিত হ'ল। দুঃখকে দুঃখ বলে জ্ঞান সে কোনদিন করে নি। পনের টাকা মূলধন নিয়ে জীবনের গতি নির্ণয় করতে বেরিয়েছিল। কখনও সে ভেঙে পড়ে নি। ইতিহাসের সত্যকে সে প্রমাণ করে দিল। দুঃখ মানুষকে জয় করে না। মানুষই দুঃখকে জয় করে চিরকাল। ইদানিং একটা খবর এসেছে বিহারের কোথায় কার একটা পুরানো লোহার গুদাম বিক্রি হবে। দেবু উঠে-পড়ে তারই জোগাড়ে বেরিয়ে গেল। সারাদিন ঘুরে ঘুরে ও কি করল জানা গেল না। রাত্রের ট্রেণে ও রওনা হ'ল।

পরের দিন তার কোন খোঁজ নেই। ফিরল যখন, মুখে তার হাসি। বিশ্বেশ্বরী রান্নাঘরে ছিলেন, নির্ম্মলা তার পাশে বসে গল্প করছিল। হঠাৎ তার পায়ের সাড়া পেয়ে চমকে চেয়েই সে কপাটটা একটু ভেজিয়ে দিল।

বিশ্বেশ্বরী বলল, কে, দেবু? এত দেরী হ'ল কেন রে?

দেবু ঘাম মুছতে মুছতে বলল, মালটা কিনে বিক্রি করবার জন্যে ঘোরাঘুরি করছিলাম। হ'য়ে গেল। মোটা টাকা লাভ হ'ল মাসীমা।

—কত রে?

দেবু উপরে উঠতে উঠতে জবাব দিল, হাজার আটেক তো পাবই।

ঘরে এসে দেখে টেবিলের উপর একখানা চিঠি পড়ে। খুলে দেখে রেঙ্গুনের একজন কাঠগোলার মালিক লিখছেন। কে একজন মারাঠী ভদ্রলোক কাঠের গোলা বিক্রি করে দেশে চলে যাবেন, ওর দেওয়া দামটাই তিনি গ্রহণ করতে চেয়েছেন। কিন্তু সময় নেই। চিঠিখানা এসেছে পাঁচ দিন আগে—একদিন দেরী হ'য়ে গেছে। আর হ'লে চলবে না। বিকেলের দিকে রেঙ্গুনের জাহাজ। সারাটা দিন তার মন পড়ে রইল জাহাজ ঘাটের দিকে। সুদূর বোর্ণিও ফিলিপাইনের অরণ্য থেকে সমুদ্রের জলে ভেসে যে গাছপালা দল বেঁধে বণিকের বন্দরে আসে, তার সেই বিপণী-সম্ভারের ভিতর যে প্রচ্ছন্ন মোহ ও সৌন্দর্য্য লুকান থাকে তা ওকে রীতিমত আকৃষ্ট করল।

নীচেই নেমে এসেই দেখে নির্ম্মলা মাদুর বিছিয়ে শুয়ে। ওর পায়ের সাড়া পেয়ে সে এতটুকু বিচলিত হ'ল না। দেবু জিজ্ঞেস করল, মাসীমা কোথা গেলেন।

নির্ম্মলা জিজ্ঞেস করল, কেন আপনার খাবার দেব? মাসীমা কলঘরে গেছেন।

দেবু বলল, সময় ত নেই। আপনিই একটু তবে কষ্ট করুন।

কষ্ট! নির্ম্মলা হাসি গোপন করে উঠে গেল। আসন পেতে তার খাবারের থালা নামিয়ে দিয়ে বলল, কিছু মনে

করবেন না, আমার আঁচলখানা উঠিয়ে দিন না। দু'হাতই এঁঠো —

দেবু আহারে বসল। নির্ম্মলা কপাটের আড়ালে দাঁড়িয়ে ভাবছিল, দরকার হ'লে চেয়ে-চিন্তে নেবে। কিন্তু যখন হাত ধুয়ে উঠে গেল তখন ওর মনে হ'ল, দরকারটা জেনে নিই। আবার ভাবল, কি দরকার? দেবু চলে গেলেও সে অনেকক্ষণ দেবুর কথা ভেবে কাটাল। আজ পর্য্যন্ত দেবুকে সে চেনবার চেষ্টা করে নি। দূর থেকে যা আঁচ করেছিল আজ যেন তা মুছে যেতে চাইছে। এমন সময় বিশ্বেশ্বরী এসে হাজির। অমন ভাবে বসে আছিস কেন? দেবু চলে গেছে?

কি জানি! দেখলুম না ত গেছে কি না! যেন দেবুর কোন খোঁজই সে রাখে না। বিশ্বেশ্বরী তাকে প্রয়োজনীয় অপ্রয়োজনীয় কত কথাই বলে গেলেন, কোনটার সঙ্গত জবাব তার কাছ থেকে পাওয়া গেল না।

অনেক দিন থেকে একখানা চিঠি এসে পড়েছিল। তার জবাব দেওয়া হয় নি। চিঠি খানা লিখেছে গাজিয়াবাদের তার এক খৃষ্টান বান্ধবী। ভাবলে এখানে বসেই জবাবটা লিখি।

দেবুর ঘরের শিকল খুলে সে চিঠির জবাব লিখল, হেনরিটা, তোমার আশীর্ব্বাদ করবার ঘটাটা দেখছি কম নয়। সব চেয়ে অবাক হচ্ছি, তুমি মেয়ে হ'য়েও মেয়ের মনের খবর জান না। কে তোমার কানে কানে বলেছে আমি রাজরাণী হ'তে চাই। আমি কি চাই জান? চাই পতি, পুত্র, সংসার, ভারতীয় মেয়েদের এ ছাড়া কোন কামনা নেই। ধন্যবাদ তোমার শুভেচ্ছাকে। তোমার ভাষাতেই বলি শোন। এইটেই নারীর মনের কথা। I don't want to be a queen, I want to be a woman in man's arm! বুঝেছ? আছি ভালই। সম্প্রতি ঝড় উঠেছে আমার মনে, আগুনও ধরেছে, কি দিয়ে যে নিভিয়ে দেব তা জানি নে। জেনে রাখ তোমার চেয়েও আমি অসুখী।

আরও নানান কথা লিখে চিঠি খানা মুড়ে খামে আঁটল।

বিকেল পেরিয়ে গেলে অমলেন্দু এসে তাকে নিয়ে গেল। বিশ্বেশ্বরী বললেন, মাঝে মাঝে এসে আমাকে একটু সাহায্য করে যাস নির্ম্মলা, যতদিন না কোমরের ব্যথাটা সারছে।

—আচ্ছা, বলে নির্ম্মলা চলে গেল।

চিঠিখানা ডাক বাক্সে ছেড়ে দিতে ওর ভুল হ'ল না। অমলেন্দু পথে যেতে যেতে সিগরেট ধরিয়ে বলল, খবরদার বাড়ি গিয়ে মার কাছে যেন গল্প করিস নে। সে হতভাগা লোকটা কোথায় গেছে মামীমা বললেন যে!

নির্ম্মলা কোন জবাব দিল না। অমলেন্দু বলে চলল, একদিন আমার সঙ্গে সে কি তর্ক! বাপস্ রে! কিচ্ছু জানে না, তর্ক করতে আসে। একটা আস্ত ইডিয়ট। কোন ভদ্রতা জানে না। দেখলি তাকে?

তথাপি কোন জবাব না পেয়ে বলল, কি রে, তোকে ভুতে পেল না কি?

নির্ম্মলা ধীরভাবে জবাব দিল, হুঁ। কোন মন্ত্র-তন্ত্র জান।

হঠাৎ যেন কিসের একটা খেই পেয়ে অমলেন্দু বলল, অলকেন্দুর কাণ্ড-কারখানা শুনেছিস?

নির্ম্মলা অবাক হ'য়ে বলল, কৈ, না।

অমল তির্য্যক ভঙ্গিতে বলে উঠল, একটা রাস্কেল! আজ দুপুরে একখানা বিয়ারিং চিঠি এসে হাজির। কি না, আমি এখানকার একটি তেলেগু মেয়েকে বিয়ে করেছি। তার বাবা আমাকে চাকরি করে দেবেন বলেছেন এখন তাঁদেরই ওখানে আছি। আমাকে মার্জ্জনা করবেন আপনারা —মার্জ্জনা করবেন! ন্যাকা কোথাকার!

অমলের গার ভিতর যেন রি-রি করে উঠল।

নির্ম্মলার মুখখানা এক পলকে বিবর্ণ হ'য়ে গেল! বাড়ী এসে সে চুপচাপ বিছানায় শুয়ে পড়ল। টস্ টস্ করে তার চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ল। ঘৃণায় যেন তার অন্তরাত্মা অবধি রি-রি করে উঠল। দেবু আর অলকেন্দুকে পাশাপাশি রেখে কিছুতেই কারু খেই পেল না।

এই ঘটনার দিন কুড়ি পরে একদিন নির্ম্মলা এসে হাজির। বিশ্বেশ্বরীকে সমস্ত সংবাদ জানালেন। বিশ্বেশ্বরী বললেন, আসুক দেবু অফিস থেকে যদি তার মত করাতে পারি।

অমলেন্দু মুখ থেকে চায়ের বাটী নামিয়ে রেখে বলল, তুমি কি ক্ষেপেছ মা? নির্ম্মলার বিয়ে দেবে একটা লোহা-লক্কড়ের দালালের সঙ্গে! এখনও অতখানি অবনতি আমাদের ঘটে নি। আর তা ছাড়া—তুই কি বলিস নির্ম্মলা?

নির্ম্মলা গম্ভীরভাবে উঠে ঘরে চলে গেল। কপাটের আড়ালে এসে বসে পড়ল। দুর-দুর এ ঘাত-প্রতিঘাত কি ভাল লাগে ছাই! তার আবার ইচ্ছে! তার আবার দাম!

অমলেন্দু আর একবার জোরে ঘোষণা করল, দেবব্রত চক্রবর্ত্তীর মত ছেলের হাতে যে দিন আমার বোনকে দেব, সে দিন দড়ি আর কলসী কিনে দেব।

শর্ম্মিলা অবাক হ'য়ে ছেলের পানে চাইলেন। বাইরের কপাটটা একটা করুণ শব্দ করে বন্ধ হ'য়ে গেল।

অতীত

—শ্রীইলা দেবী

বহুদিন আগে নবযৌবনে
দখিণ হাওয়ার সনে,
কত যে ক্ষ্যাপামি জেগেছিল,
তাই ভাবিতেছি মনে মনে

দিনগুলি সব হাস্যলীলায়
কখন ঝরিয়া গেছে,
শুধু সে দিনের সুবাস মাখানো
স্মৃতিটি রয়েছে বেঁচে।

আর জেগে ওঠে মাঝে মাঝে সেই
হারানো দিনের সুর,
সারা অন্তর পুলক আবেশে
হয়ে ওঠে ভরপুর।

উদ্বেগ আশঙ্কা নাই, নাই দৃষ্টি
ভবিষ্যত পানে,
অতীতের লাগি নাই অশ্রুবিন্দু এক
বেদনার টানে।

শুধু তরী বেয়ে যাওয়া বর্ত্তমান
কালস্রোত মাঝে,
আনন্দ উদ্বেল প্রাণে সর্ব্বশঙ্কা
ফিরে যেত লাজে।

পরের নিষেধ আর অপ্রিয়-ভাষণে
না পাতিয়া কান,
কেমনে বাহিয়া গেছি হারানো অতীতে
জীর্ণ তরী খান।

আজি প্রতিপদে শঙ্কা, কাঁদে মন
শুধু অকারণে,
পথ চলি আর বার বার চাহি ভয়ে,
ভয়ে পিছু পানে।

সেই উদ্দাম যৌবন, কোথা ফিরে
আজ পাব বল,
পাছের আকিঁকে অভিমান আর
অক্ষম আঁখি জল।

ঝঞ্ঝা ঠেলিয়া অগ্রে যাইব
বর্ত্তমানেরে বরি,
হায় রে আমার হারানো অতীতে
সেদিন গিয়াছে মরি।

উপন্যাস-সাহিত্যে ভূদেব মুখোপাধ্যায়

—শ্রীকনক বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রবন্ধকার হিসাবে ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সবিশেষ খ্যাতি থাকিলেও বাঙ্গালা উপন্যাস-সাহিত্যের ইতিহাসে তাঁহার দান অবহেলা করিবার নহে। তাঁহার 'শিক্ষা বিধায়ক প্রস্তাব', 'সামাজিক প্রবন্ধ', 'পারিবারিক প্রবন্ধ' প্রভৃতি অপূর্ব্ব গ্রন্থ—সেগুলি বহু চিন্তাশীল তথ্যে পরিপূর্ণ। কিন্তু তাঁহার রচিত 'ঐতিহাসিক উপন্যাস'খানি বাঙ্গালা উপন্যাস-সাহিত্যে একটি নূতন পথের সন্ধান দিয়াছিল। কারণ 'ঐতিহাসিক উপন্যাস' প্রকাশের পূর্ব্বে আর কেহই বাঙ্গালা সাহিত্যে এই শ্রেণীর উপন্যাস রচনা করেন নাই। পর পর যথাক্রমে ইহার সংস্করণগুলি প্রকাশিত হয়। ১৮৫৭ (প্রথম সংস্করণ), ১৮৬২, ১৮৬৫। ইহাই প্রথম বাঙ্গালা ঐতিহাসিক উপন্যাস।

গ্রন্থখানির মধ্যে দুইটি উপাখ্যান আছে, 'সফল স্বপ্ন' ও 'অঙ্গুরীয় বিনিময়'। ঐতিহাসিক কাহিনীর মধ্যেও যে রোমান্সের সন্ধান পাওয়া যাইতে পারে ভূদেববাবুই প্রথমে তাহা দেখাইয়া গিয়াছেন। ইতিহাস-বর্ণিত নর-নারীর বিরহ মিলন তাঁহার 'ঐতিহাসিক উপন্যাসে'র উপজীব্য। বিখ্যাত ইংরেজী গ্রন্থ 'রোমান্স্ অব্ হিষ্ট্রি'র আদর্শে 'ঐতিহাসিক উপন্যাস' রচিত—আখ্যায়িকা দুইটিও উক্ত ইংরেজী গ্রন্থ হইতে গৃহীত কিন্তু অনেক স্থলে লেখক নিজের কল্পনার সাহায্যও গ্রহণ করিয়াছেন, একেবারে আগাগোড়া আদর্শের অনুসরণ করেন নাই।

'সফল স্বপ্নের' উপাখ্যানটি অতি ক্ষুদ্র। ইহার মধ্যে কোনও রূপ অভিনবত্ব নাই এবং এই অখ্যায়িকাটি উপন্যাস পদবাচ্যও নহে। ইহাতে ছোট গল্পের লক্ষণই ফুটিয়া উঠিয়াছে। ইহার আখ্যায়িকাটি এই :—গজ্নী নগরাধিপতি সুবক্তগীন প্রথমে একজন সাধারণ ব্যক্তি ছিলেন। একদা তিনি বনপথ অতিক্রম করিতে করিতে অকস্মাৎ দস্যুহস্তে বন্দী হইলেন। দস্যুগণ তাঁহাকে প্রাণে না মারিয়া একজন দাসক্রেতার নিকটে বিক্রয় করিল। কিন্তু দাসত্ব স্বীকার করিয়াও স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা, বীরত্ব প্রভৃতি সদ্গুণরাশি তাঁহার বিলুপ্ত হয় নাই। কিছুদিনের মধ্যেই সম্রাট্ আলপ্তগীন ঐ দাসকে ক্রয় করিয়া আপন পরিচর্য্যায় নিযুক্ত করিয়াছিলেন। ক্রমশঃ আপন গুণ দেখাইয়া সুবক্তগীন সম্রাট্ আলপ্তগীনের মন্ত্রী হন। পরে সম্রাটের অনূঢ়া কন্যার প্রতি তিনি অনুরক্ত হন এবং সম্রাট্-কন্যাও তাঁহার প্রতি অনুরক্ত হইলেন। ফলে উভয়ের বিবাহ হইল এবং সম্রাটের আর কোনও সন্তানাদি না থাকায় সুবক্তগীনই সম্রাট্ আলপ্তগীনের মৃত্যুর পরে গজ্নী নগরের অধিপতি হইলেন। সুবক্তগীন ও সম্রাট্-কন্যা জেহীরার দৃষ্টি-বিনিময় ও প্রণয়সঞ্চার, এইটুকু মাত্র এই উপাখ্যানের রোমান্স্। এ কাহিনী নিতান্ত মামুলি ধরনের সেজন্য রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয় তাঁহার 'বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব'-এ বলিয়াছেন, "এ উপাখ্যান অতি ক্ষুদ্র, তাহাতে রচনা-চাতুর্য্য বা কৌশল তাদৃশ কিছুই নাই।"

কিন্তু 'ঐতিহাসিক উপন্যাস'এর অন্তর্গত 'অঙ্গুরীয় বিনিময়' নামক আখ্যায়িকাটির বর্ণনার চমৎকারিত্ব, ইতিহাস অনুযায়ী চরিত্র বর্ণনা এবং ঘটনার প্রবাহ পাঠক মাত্রকেই মুগ্ধ করিবে। এই গ্রন্থে ভূদেববাবুর ভাষা অত্যন্ত সংস্কৃত ঘেঁষা, কাজেই মাধুর্য্যহীন। ভাষা সরল ও মাধুর্য্যসম্পন্ন হইলে বিষয়টি যে আরও উপভোগ্য হইত, সে বিষয়ে কোন সংশয় নাই। তথাপি বলিতে হয় যে, এই আখ্যায়িকায় চরিত্রচিত্রণ, ঘটনাবর্ণনা এবং করুণরসাত্মক পরিসমাপ্তি মনোরম হইয়াছে।

'অঙ্গুরীয় বিনিময়' আখ্যায়িকাটি এই :—মহারাষ্ট্রের অধিপতি শিবাজী একদা দিল্লীর বাদশাহ আওরঙ্গজেবের কন্যা রোসিনারাকে পর্ব্বত পথ হইতে অপহরণ করিয়া কিছুদিনের জন্য নিজের দুর্গে অবরুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন। সেখানে দুর্গের বাহিরে যাওয়া ভিন্ন রোসিনারার অন্য সকল বিষয়ে স্বাধীনতা ছিল দুর্গের দাসিগণ রোসিনারার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বিধানের জন্য সর্ব্বদাই প্রস্তুত থাকিত। শিবাজীর সহিত দেখা না হইলেও শিবাজীর সৌজন্যের পরিচয় রোসিনারা প্রতিদিনই পাইত এবং মুগ্ধা হইয়া ক্রমশঃ সে শিবাজীর সহিত

সাক্ষাতের জন্য উৎসুক হইয়া উঠে। শিবাজীর সহিত সাক্ষাৎ হইলে পর উভয়ের প্রণয়-সঞ্চার ও বিবাহের প্রস্তাব পর্য্যন্ত হইয়াছিল। কিন্তু অকস্মাৎ একদিন মোগল সেনাপতি ঐ দুর্গ অধিকার করিয়া রোসিনারাকে উদ্ধার করিয়া আওরঙ্গজেবের নিকট প্রেরণ করিল। প্রণয়বিহ্বলা রোসিনারা তাহার পিতার নিকট ফিরিয়া শিবাজীর যথেষ্ট প্রশংসা করিতে থাকেন। বাদ্‌শাহ তাঁহার কন্যার নিকট হইতে শত্রুর প্রশংসা শুনিয়া অত্যন্ত রুষ্ট হন এবং নিজ পিতা বন্দী সাহ্‌জাহানের সহিত রোসিনারাকে বন্দী করিয়া রাখেন।

ওদিকে শিবাজী পুনরায় নিজ দুর্গ অধিকার করিয়া মোগলদিগের সহিত যুদ্ধ করেন, কিন্তু জয়লাভের সম্ভাবনা নাই দেখিয়া বাদ্‌শাহ আওরঙ্গজেবের হিন্দু সেনাপতি রাজা জয়সিংহের সহিত একাকী সাক্ষাৎ করেন। জয়সিংহ বাদ্‌শাহের সহিত তাঁহার সন্ধি ঘটাইয়া দিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুতি দেন এবং বাদ্‌শাহের অপর এক শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার জন্য শিবাজীকে অনুরোধ করেন। শিবাজী সেই যুদ্ধে লিপ্ত হন। যুদ্ধশেষে শিবাজী দিল্লী গমন করিলে আওরঙ্গজেব তাঁহার সম্মান না করিয়া, বরং কিঞ্চিৎ অপমান করিয়া তাঁহাকে কারারুদ্ধ করেন। শিবাজী কৌশলে তথা হইতে পলায়ন করেন। শিবাজীর আগমন সংবাদ পাইয়া বন্দিনী রোসিনারা অসীম আনন্দে উৎফুল্লা হইয়া উঠিয়াছিল। সে ভাবিয়াছিল যে, এইবার হয় ত তাহার সহিত শিবাজীর মিলন হইলেও হইতে পারে। পরমুহূর্ত্তেই তাহার পিতার প্রকৃতি স্মরণ করিয়া সে অত্যন্ত নিরুৎসাহ হইয়া পড়িয়াছিল —আশা ও নিরাশার মধ্যে তাহার মন ক্রমাগত আন্দোলিত হইতেছিল।

শিবাজী পলায়ন করিবার সময়ে রোসিনারাকে ভুলেন নাই। তিনি তাহাকে সঙ্গে লইয়া যাইবার সমস্ত উপায় ঠিক করিয়া নিজের এক অঙ্গুরীয় দিয়া এক বারবণিতাকে রোসিনারার নিকট পাঠাইয়াছিলেন। কিন্তু শিবাজীর ভার্য্যা হইলে আওরঙ্গজেব শিবাজীর ভীষণ শত্রু হইয়া উঠিবেন এবং শিবাজীও হয় ত তাঁহার স্বজাতীয়দিগের নিকট আর পূর্ব্বের ন্যায় সম্মান ও সমাদর পাইবেন না—একথা চিন্তা করিয়া রোসিনারা বারবণিতার সহিত গমন করিলেন না। শিবাজীর অঙ্গুরীয়ের সহিত নিজের অঙ্গুরীয়ের বিনিময় করিয়া প্রিয়তমের নিকট এক পত্র প্রেরণ করিয়া তাঁহার সহিত মিলনের অনিচ্ছা জ্ঞাপন করিলেন।

ইহাই 'অঙ্গুরীয় বিনিময়'-এর গল্পাংশ। এই উপন্যাসখানি সম্বন্ধে পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয় যাহা বলিয়াছেন তাহা প্রণিধানযোগ্য—"ভূদেববাবু ইংরেজি উপন্যাসের পদ্ধতিতেই যে ইহার উপাখ্যান আরম্ভ করিয়াছেন তাহা বলা বাহুল্য। এস্থলে আর একটি কথার উল্লেখ করা আবশ্যক হইতেছে—যৎকালে এই 'অঙ্গুরীয় বিনিময়' রচিত হয়, তখন 'পদ্মিনী উপাখ্যান' বল, 'দুর্গেশনন্দিনী'ই বল, ঐতিহাসিক-উপন্যাস নামক কোন গ্রন্থ বাঙ্গালায় রচিত হয় নাই। অতএব ঐ বিষয়ে যে বাঙ্গালা গ্রন্থকারদিগের দৃষ্টি পড়িয়াছে ও প্রবৃত্তি জন্মিয়াছে, ভূদেববাবুই তাহার মূল। এক্ষণে ঐরূপ প্রকৃতির গ্রন্থরচয়িতারা যে সকল বিষয়ে ভূদেববাবুর অনুকরণ করিয়াছেন, একথা আমরা বলি না। কিন্তু সকলেই যে ভূদেববাবু হইতেই উহার স্বাদ প্রথম গ্রহণ করিয়াছেন, একথা অবশ্যই বলিব।" বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব উপন্যাসখানি ট্র্যাজেডি—মিলনাত্মক নহে, বিয়োগান্তক। উপন্যাসের ঘটনাধারা বেশ স্বাভাবিক ভাবে বহিয়া আসিয়া ট্র্যাজেডিতে পরিণত হইয়াছে। প্রথমদর্শনের দিন হইতে শিবাজী ও রোসিনারা পরস্পর পরস্পরকে প্রার্থনা করিয়া আসিয়াছিলেন। কিন্তু সেই মিলনাকাঙ্খার পরিসমাপ্তি হইল বিচ্ছেদে। শিবাজীর প্রতি অনুরাগ প্রকাশ পাওয়াতে সে বন্দী হইয়াছিল। বন্দিনী রোসিনারা কতদিন কত সায়ংসন্ধ্যায় তাহার মনোমন্দিরে শিবাজীর ধ্যান করিয়াছে, শিবাজীর চিন্তায় বিভোর হইয়া সে কল্পলোকে বিচরণ করিয়াছে। বৃদ্ধ সাহ্‌জাহান তাহা বুঝিয়া তাহাকে কত সান্ত্বনা দিয়াছেন, কত আশা দিয়াছেন। কিন্তু যখন উভয়ের মিলনের সুযোগ উপস্থিত হইল তখন রোসিনারা শিবাজীর মিলন-প্রার্থনা প্রত্যাখ্যান করিল। আপন প্রেমাস্পদের জন্য, একদিকে দিল্লীশ্বরের ভয়—অপর দিকে মহারাষ্ট্রীয়দিগের ভয়, ইহাই শিবাজীর সহিত রোসিনারার মিলনে বাধা ঘটাইল। এই যে একটা মীমাংসাহীন দ্বন্দ্বের মধ্যে পড়িয়া রোসিনারার নারীজীবনের সমস্ত ঐশ্বর্য্য ও সকল সুখের অপচয় হইয়া গেল, ইহাই এই উপন্যাসের ট্র্যাজেডির উপকরণ।

উপন্যাসখানিতে ঐতিহাসিক চরিত্রগুলি ইতিহাস

অনুরূপই হইয়াছে। শিবাজীর স্বদেশপ্রেম, সাহসিকতা ও ধূর্ত্ততা চমৎকার ফুটিয়াছে। শিবাজী বর্ণজ্ঞানশূন্য ছিলেন বলিয়া যে প্রসিদ্ধি আছে উপন্যাসখানিতে কৌশলে তাহাও রক্ষিত হইয়াছে। তিনি বীরত্বে যেমন অসাধারণ ছিলেন প্রতিহিংসাতেও তাঁহার অসাধারণত্ব প্রকাশ পাইয়াছে। তাঁহার দুর্গে অবস্থানকালে রোসিনারার প্রতি তাঁহার এক সেনা আকৃষ্ট হইলে বীরের মতই তিনি তাহার প্রতিহিংসা লইয়াছিলেন। ইচ্ছা করিলে তিনি মুহূর্ত্তমধ্যে হুকুম দিয়া ঐ সেনাকে বধ করিতে পারিতেন। কিন্তু তাহা না করিয়া তাহাকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করিয়া পরাজিত ও বিতাড়িত করেন। এই যুদ্ধের ফলে শিবাজী তাঁহার দেহের স্থানে স্থানে আঘাত পান এবং সেই সময়ে সেবা করিতে আসিয়া রোসিনারার অঙ্কুরিত প্রণয় পল্লবিত হইয়া উঠিয়াছিল।

'অঙ্গুরীয় বিনিময়ে' আওরঙ্গজেবের শঠতা, চতুরতা ও বিশ্বাসঘাতকতা ইতিহাস অনুরূপ বর্ণিত হইয়াছে। রামদাস স্বামীর মহত্ত্ব, স্বদেশহিতৈষিতা এবং শিষ্যবাৎসল্য অতি সুন্দর ফুটিয়াছে। রাজপুত বীর জয়সিংহের চরিত্র উদারতায় এবং মাহাত্ম্যে উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে।

নারীচরিত্র বর্ণনাতেও লেখক উপন্যাসখানির মধ্যে বেশ কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। রোসিনারার চরিত্র উজ্জ্বল বর্ণে চিত্রিত হইয়াছে। তাহার মধ্য দিয়া নিঃস্বার্থ প্রেমের আদর্শ ফুটিয়া উঠিয়াছে। সে শিবাজীকে ভালবাসিয়াছিল, শিবাজীর সহিত মিলনোন্মুখ হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু মিলনের সুযোগ পাইয়াও সে তাহা প্রত্যাখ্যান করিয়াছে। যে মুহূর্ত্তে সে জানিয়াছে যে শিবাজীর সহিত তাহার মিলন হইলে শিবাজী একাধারে তাঁহার স্বজাতি ও আওরঙ্গজেবের ঘোরতর শত্রু হইবেন সেই মুহূর্ত্তে চির আকাঙ্ক্ষিত আসন্ন মিলনের প্রতি সে বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়াছে। মিলন প্রত্যাখ্যান করিয়া সে দুঃখকে সাদরে বরণ করিয়া লইয়াছে। কিন্তু ঐ দারুণ দুঃখেও তাহার পরম সান্ত্বনা এই যে সে শিবাজীকে অশুভের হাত হইতে রক্ষা করিতে পারিল। রোসিনারার অন্তরে যে প্রণয় জাগিয়াছিল তাহার আকর্ষণ ছিল অত্যন্ত প্রবল, কিন্তু প্রেমাস্পদের শুভাকাঙ্ক্ষায় সেই প্রণয়কে প্রত্যাখ্যান করার শক্তিও তাহার ছিল পর্ব্বতনিঃসৃত নির্ঝরের মত দুর্বার। শিবাজীর প্রার্থনা প্রত্যাখ্যান করিয়া সে শিবাজীকে বাধা দিয়াছে, কিন্তু নিজে অধিকতর ব্যথিতা হইয়াছে। তাহার প্রেমের আদর্শ, তাহার ত্যাগ এবং স্বেচ্ছায় দুঃখবরণ, বৃদ্ধ সাহজাহানকে আশ্চর্য্য করিয়াছিল এমন কি বারবণিতাও তাহার আচরণে বিমুগ্ধা হইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছিল।

অন্তর্জগতের রহস্য বিশ্লেষণ করিয়া চরিত্রচিত্রণ আধুনিক যুগের বিশিষ্টতা। ভূদেববাবু কুশলতার সহিত রোসিনারার অন্তর্জগতের রহস্য বিশ্লেষণ করিয়া অনেক স্থলেই তাহার চরিত্র বর্ণনা করিয়াছেন। শিবাজীর জয় পরাজয়ে রোসিনারার অন্তর্জগতে যে আলোড়ন হইয়াছিল তাহা স্পষ্টভাবে ব্যক্ত হইয়াছে।

প্রেমে, অনুকম্পায় ও সহানুভূতিতে রোসিনারা-চরিত্র অত্যুজ্জ্বল চিত্র। সে সম্রাটকন্যা, সেবা কখনও কাহাকেও করে নাই। কেহ কখনও তাহাকে সেবা করিতে শিক্ষাও দেয় নাই। কিন্তু তাহার অন্তরে প্রেম অঙ্কুরিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সে শিখিয়াছে সেবা কাহাকে বলে। শিবাজী যখন আহত তখন শিবাজীর পার্শ্বে উপবেশন করিয়া সে নীরবে তাঁহার সেবা করিয়া তাঁহাকে সুস্থ করিয়া তুলিয়াছে। বন্দী সাহজাহানের প্রতি তাহার সমবেদনাও চমৎকার ভাবে অঙ্কিত হইয়াছে। কোথাও তাহার কুসুমকোমল অন্তর আত্মপ্রকাশ করিয়াছে, কোথাও তাহার মধ্যে অপরূপ তেজ ও ত্যাগের মহিমা প্রকাশ পাইয়াছে। এই দুইটি বিরোধী গুণের সমন্বয়ে সে অপূর্ব্ব হইয়া উঠিয়াছে।

চরিত্রচিত্রণ ভিন্ন উপন্যাসখানির আর একটী গুণ ইহার ঐতিহাসিক ঘটনাসন্নিবেশনৈপুণ্য। ঐতিহাসিক উপন্যাসে কেবল চরিত্রবর্ণনা বা ঘটনা বর্ণনাই সর্ব্বস্ব নহে। যে পটভূমিকার উপর ঘটনাগুলি ঘটিবে তাহাও ঐতিহাসিক সত্য হওয়া প্রয়োজন। সেইজন্য উপন্যাসকার এই উপন্যাসের ঘটনা বর্ণনা প্রসঙ্গে মহারাষ্ট্রীয়দিগের অস্ত্রশস্ত্র, সেনা, দিল্লীনগর ও সেখানকার সম্রাটপ্রাসাদ, বন্দী শাহজাহানের দুরবস্থা ও তাঁহার নির্ম্মিত ময়ূর সিংহাসন প্রভৃতি অনেক ঐতিহাসিক বিষয়ের বর্ণনা করিয়াছেন। বাদশাহ আওরঙ্গজেবের দরবার, বাদশাহের জন্মতিথির বিবরণ প্রভৃতি বর্ণনা করিতে গিয়া তিনি সম্রাটের ঐশ্বর্য্য বিলাস প্রভৃতির একটা হুবহু চিত্রও অঙ্কিত করিয়াছেন। ইহাতে ঐতিহাসিক উপন্যাসের আদর্শ আদ্যোপান্ত অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। কল্পনাপ্রবণতায় ঐতিহাসিক চরিত্র ও ঘটনা বর্ণনা ক্ষুণ্ণ হয় নাই। এই জন্য মনে হয় যে ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনার আর্ট সম্বন্ধে লেখকের একটি সুস্পষ্ট ধারণা ছিল। প্রথম পথপ্রদর্শক হিসাবে তিনি ঐতিহাসিক উপন্যাসের যে আদর্শ বঙ্গসাহিত্যে দান করিয়া গিয়াছেন তাহা অতুলনীয়। ইহারই সমন্বয়ে পরবর্ত্তীকালে রমেশ দত্ত এবং বঙ্কিমচন্দ্র ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনা করেন

মাঝি

—শ্রীশকুন্তলা দেবী

আজ যাবার দিন শোনপুরের হাটে। নৌকো বোঝাই মাল নিয়ে যেতে হবে, তাই পাল বাবুদের বাড়ী মধুর ডাক পড়েছে।

মধু এই মতিডাঙার সব চেয়ে পুরোনো মাঝি। বয়স তার অনেক, বুড়োদের সমবয়সী। কিন্তু বুড়ো হোলে কি হয়, হাল ধরবার সামর্থ্য তার এখনও আছে। সেই জন্যেই তো মধু যখন-তখন উপুরে হাত দেখিয়ে বলে, সব তাঁরই দয়া। এই রকম পুরোনো ঝানু মাঝিকে পাল বাবুরা যখন-তখন তলব করেন। তাঁদের জানা আছে যে, মধুর হাতে নৌকো কখনও ডুববে না। এ আশা সকলেই কোরত, কেন না মধু ছিল—

যাক সে কথা। সকাল আটটায় রওনা হওয়া চাই। কথা আছে, মধু সকাল বেলা বাবুদের বাড়ীতেই দুমুঠো খেয়ে নেবে। কথা মত মধু হাজির হয়েছে ঠিক সময়ে পাল বংশের ভিটেতে।

কর্ত্তা বাইরে থেকেই খোঁজ নিলেন, ও বউমা, মধুর ভাত দিয়েছ?

ভিতর থেকে উত্তর এল, দিয়েছি।

যা মধু, খেয়ে নিগে যা, সময় তো হয়ে এল।

কর্ত্তার তাড়াতাড়িতে মধুকেও তাড়াতাড়ি কোরতে হোল। ঘর বারান্দায় পাতা করা হয়েছে। মধু গিয়ে বসল তার সুমুখে, তার পর চলে ডান হাতের ব্যাপার।

খাওয়া যখন শেষ হোল, তখন বউমা এসে জিজ্ঞেস করেন, মধু, পেট ভরেছে ত?

তা আর কি ভরে নি দিদিমণি! তবে একটা কথা যদি শো.—

কি বলো না।

একটু মাছের তরকারি যদি দাও দিদিমণি, তো বুড়ীকে দিয়ে আসি।

বুড়ীকে আজ এইখানেই খেতে বলে এস। একলাটির জন্যে আর উনুন ধরাবে কেন?

মধু একগাল হেসে এঁটো পাতাটা পরিষ্কার কোরে নেয়। তার পর কাঁধ থেকে গামছা নিয়ে মুখের জল মুছতে মুছতে এসে দাঁড়ায় সদর ঘরে। কর্ত্তাবাবু তামাক খাচ্ছিলেন। তার পর নলটি নামিয়ে বলেন, কি-রে হোল মধু?

হাঁ, কর্ত্তাবাবু।

তা, বুড়ীর জন্যে কিছু নিয়ে গেলি না?

তারই বউ বুড়ী। সামান্য একটা গরীব মাঝির বউ। তারই জন্যে কর্ত্তাবাবুর এই আগ্রহ। কিন্তু মধুর কাছে এ নতুন নয়। কর্ত্তাবাবুর কাছে সে অনেকবার শুনেছে, টাকা তো আনি অনেক মধু, কিন্তু দশজনকে নিয়ে তা ভোগ না করলে কি আর মা লক্ষ্মী থাকেন! তবু কর্ত্তাবাবুর দয়ায় মধু গলে গেল, সে একগাল হাসির সঙ্গে বলে, দিদিমণি তাকে এইখানেই আসতে বললেন। মানা করলুম, তবু···কিন্তু মধু মানা মোটেই করে নি। আনন্দের বেগে তার মুখ থেকে দু একটা বেশী কথা বেরিয়ে গেল।

না, না। মানা কোরবি কেন? বউমা আমার সাক্ষাৎ মা লক্ষ্মী কি না, তাই তোদের এত যত্ন করে রে! যা, তুই তা হোলে বুড়ীকে খবরটা দিয়ে আয়।

মধু পেটে হাত বুলোতে বুলোতে বুড়ীকে খবর দেয়, ও বুড়ি, আজ কর্ত্তাবাবুদের বাড়ী খাওয়া-দাওয়া করিস, দিদিমণির হুকুম।

বুড়ীর বুড়োটে দেহে একবার একটা শিহরণ বহে গেল। দিদিমণির হুকুম!

ঘাটে নৌকো মালপত্তরে বোঝাই হয়ে গেছে। মধু নৌকোটা খুলে দিতেই, গোটাকতক ষণ্ডামার্কা মাঝি লগি দিয়ে নৌকোটাকে ঠেলে নিয়ে গেল তীর থেকে একটু গভীর জলে। ঘাটে দাঁড়িয়ে রইল কর্ত্তাবাবু, কর্ত্তাবাবুর ছেলে আর মধুর বুড়ী। তার পর দেখতে দেখতে নৌকোটা এগিয়ে গেল। মধু দূর থেকে চোখ পিট্ পিট্ করে দেখে নিলে একবার ঘাটের সব লোকগুলোকে। তার পর হালটা সে বাগিয়ে ধরে। কর্ত্তাবাবুর মুখ থেকে বেরিয়ে আসে, দুর্গা-দুর্গা।

তখন হয়ে এসেছে সন্ধ্যে। গাঁয়ের বুকে অন্ধকার নেমে আসছে। দু একটা গরুর ডাক, পাখিদের কিচির-মিচির আর আলোর বিদায় নেওয়া। পালেদের সদর ঘরের ভেতর চৌকিতে বসে আছেন কর্ত্তাবাবু। হাতদুটো মাথার উপর, আর তামাকের নলটা মাটিতে গড়াগড়ি যাচ্ছে। সামনে আর পাশে মধু আর তাঁর ছেলে। একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস, তার পর সেই নিস্তব্ধ ঘরে একটা কথা শোনা গেল, আর কেঁদে কি হবে মধু, যা হবার তা তো হয়ে গেছে! কিন্তু তুই তো সিয়ানা মাঝি, মধু!

কি কোরব কর্ত্তাবাবু! একেবারে কিনারা ঘেঁসে চলছিলুম। কে জানত যে গাছটা ডুবে আছে!

তবু নৌকোটা সামলাতে পারলি না?

যে এই মাত্র বলে এসেছে, যা হবার তা তো হয়ে গেছে, সেই আবার দুঃখের রেশ বাড়িয়ে চলে! হবে না! কত টাকার মাল একেবারে মাঠে মারা গেল! মধু, তুই তো সর্ব্বনাশ কোরলি কর্ত্তাবাবুর! তুইই আবার বুক ফুলিয়ে বলতিস্ না যে,...

মধু এক মহা অপরাধীর মত দাঁড়িয়ে থাকে।

সামলাবো কি করে হুজুর? পালে তখন হাওয়া লেগেছে। নৌকো তখন হুস্ হুস্ করে চলছিল। তার পর ঐ বেটা ডুবো গাছের ডাল—

যা মধু, তুই যা।

কর্ত্তা মাথা নীচু করে বসে রইলেন। ঘরে অন্ধকার গাঢ় হয়ে উঠেছে। আজ লণ্ঠনটাও কি জানি ঠিক সময়ে জ্বালা হয় নি। তাই সেই অন্ধকারেই কর্ত্তাবাবু বসে রইলেন। তাঁর ছেলেটি ডাক দেয়, বাবা! কর্ত্তাবাবুর মুখ থেকে কোন কথাই বেরুল না। দেয়াল থেকে একটি টিকটিকি ডেকে উঠল। সেই অন্ধকারের মধ্যেই শোনা গেল একটা চাপা দীর্ঘশ্বাসের শব্দ।

মধু আস্তে আস্তে বাইরে এসে দাঁড়াল। তার পর সামনের পথ দিয়ে চলল ঘরের দিকে। পা দুটো তার কাঁপছিল। বুড়ী পালেদের আমগাছটার গোড়ায় দাঁড়িয়েছিল। পরণে তার পাঁচহাতি ময়লা শাড়ী, তিন চার জায়গায় নিজের হাতেই সেলাই দেওয়া। ছোট্ ছোট পাকা চুলগুলো ঝুঁটি করে পেছন দিকে বাঁধা। সমস্ত দেহের চামড়া আলগা হয়ে ঝুলে পড়েছে। চোখ দুটো তার ছোট হয়ে গেছে; আর চোখের জলজলে ভাবও গেছে চুলোয়। সে মধুকে দেখতে পেয়ে কাছে এল, তার পর জিজ্ঞাসা করে, কি হোল গো?

কি আর হবে?

কিছু বললে না বাবু?

বলবে আর কি! দুঃখু করতে লাগল।

তার পর তারা দুজনে চলল সন্ধ্যার অন্ধকারের ভেতর দিয়ে। কারুর মুখে কথা নেই! দুজনেই দুঃখী! তার পর মধু বলে, এ জন্মে আর হাল ধরতে পাব না বুড়ি! আজ থেকে অপয়া হয়ে গেলুম!

কি আর কোরবে বল।

সান্ত্বনা দানের মামুলী চেষ্টা!

দিন কেটে যায়। মধুর কাজ গেছে চুকে। নদীর সঙ্গে তার আর সম্পর্ক নেই। নৌকোতেও সে অনেক দিন কোল বসতে পায় নি। গাঁয়ের লোকদের কাছে তার নাম হয়ে গেছে সর্ব্বনেশে মাঝি! শুধু একটী বারের দুর্ঘটনা! তারই জন্যে এত! অথচ সে সারা জীবনটা সমস্ত বিপদ কাটিয়ে নৌকো বেয়ে এল, তার জন্যে মধু একটু বাহবাও পায় নি! পাবেই বা কেন? সে যে মাঝি! মাঝির হাতে আবার নৌকো ডুববে কি!

মধুকে অনেকে ডেকেছে, দাঁড় টানবি আয়। মধু তার জবাব দিয়েছিল, বাপ-ঠাকুর্দ্দা কখনও দাঁড় ছোঁয় নি, আর আমি যাব দাঁড় ধরতে! হাল ছাড়া আমাদের বংশে কেউ দাঁড় টানে নি, জানিস?

মধুর গর্ব্ব আছে। কথায় কথায় যারা অপয়া হয়ে যায় লোকের কাছে, তাদের আবার গর্ব্ব! কিন্তু তা বললে কি হয়!

মধুর প্রাণ ব্যাকুল হয়ে ওঠে হাল ধরবার জন্যে। কিন্তু কেউ তাকে ডাকে না। মধুর নিজেরও হালওয়ালা নৌকো নেই, তাই তাকে পাল বাবুদের বাড়ীর দিকে চেয়ে থাকতে হয়। তার যখন-তখন মনে হয়, ঐ বুঝি কর্ত্তাবাবু ডাকতে এসেছেন তাকে।

ঘরের ভিতর সে বসে ছিল হুঁকোটা নিয়ে। হঠাৎ সে বাইরে যেন কর্ত্তাবাবুর গলার আওয়াজ শুনতে পেল। তার

মনে হোল, কর্তাবাবু তাকেই বুঝি···। সে চট করে হুঁকোটা নামিয়ে বাইরে এসে দাঁড়ায়। কিন্তু দেখে, কর্তাবাবু ক্ষেতের পাশ দিয়ে চলে যাচ্ছেন নদীর ঘাটের দিকে। তাঁর পাশে পাশে যাচ্ছে যদু—এই গাঁয়েরই একটি মাঝি!

দুপুর বেলা মধু নাক ডাকিয়ে এক চোট ঘুমিয়ে নিচ্ছে। পেট ভরে ভাত খেয়ে তার ভাতের নেশা ধরে গেছে। আর বুড়ী বাইরে রোয়াকে বসে একটা ময়লা গামছা সেলাই করছে। যদিও সে বুড়ী, তবু সেলাই করতে গিয়ে যখন তখন আঙুলে ছুঁচ বসিয়ে দেয় না। হঠাৎ মধু চোখ রগড়াতে রগড়াতে ঘর থেকে বাইরে আসে।

বুড়ি!

বুড়ী মুখ তুলে চায়।

বুড়ি, এক্ষুণি একটা স্বপ্ন দেখলুম! ভারি মজার স্বপ্ন! বুড়োর সেই জরাগ্রস্ত মুখও আনন্দে একটু যেন আলাদা রকমের হয়ে গেল।

কি দেখলুম জানিস?

কি?

কর্তাবাবু আমাকে ডেকে নিয়ে গেল, তার পর আমায় বললে, "মধু, তুইই নৌকোর ভার নে। তুই না হোলে কে আর হাল ধরবে!" এই কথাগুলো বলতে বলতে মধুর মুখে হাসি ফুটে উঠল।

তারপর?

তার পর সব ভেঙে গেল। এস্বপ্ন ঠিক সত্যি হবে, নয় বুড়ি?

তোমার মুণ্ডু! দিনের বেলা আবার স্বপ্ন! পোড়া কপাল তোমার। ভাঙা কপাল আর ফিরছে!

মধু হতাশ হয়ে গেল, যেন সবই মিথ্যে। স্বপ্ন! স্বপ্নটা যদি সে ভোর বেলা দেখতে পেত! মধু মনে মনে আফ্‌শোস করে। তবু সে আশা নিয়ে বলে, না বুড়ি! আমি কর্তাবাবুর কাছে যাই। দেখিস আজ ঠিক কপাল ফিরবে।

মধু পথ ধরলে পালেদের বাড়ীর দিকে। তার পর সে উঠোনে পৌঁছে যায়। তখন কাঠফাটা রোদ্দুর। তাই কেউ আর বাইরে নেই। পালেদের বাড়ীর সবাই ঠিক ঘরের ভেতর আছে—এই ভেবে মধু একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে। সে লুকিয়ে লুকিয়েই নিজের কাজ শেষ করতে চায়। তাই সে সদর ঘরের ধারে এসে দাঁড়াল। সে শুনতে পেল কর্তাবাবুর গলার আওয়াজ—

কত ঘাটতি পড়েছে সরকার মশাই?
এই মাসে পাঁচশো টাকা খোয়া গেছে।

তা আর যাবে না! নৌকো বোঝাই মাল একবারে জলে ফেলে দিয়ে এল! বলুন তো সরকার মশাই, এমনি ভাবে নৌকো চালালে......

এখনও সেই হা-হুতাশ! মধু আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না। আস্তে আস্তে ফিরে চলল নিজের ঘরের দিকে। স্বপ্ন টুকুকে আশ্রয় করেই সে এখানে এসেছিল। যখন ফিরে গেল—তখন তার সেই আশ্রয় গেল ভেঙে; তার মন ব্যথায় টনটনিয়ে উঠল। রঙিন আশার রঙ দেখে সে ভুলে গিয়েছিল স্বপ্ন দেখার দুঃখকে। তার বুভুক্ষু হৃদয় মাকাল ফল দেখে মহানন্দে ভরে উঠেছিল; আর যখন খেতে গেল, তখন......

মধু কতদিন নদীর ধারে গিয়ে বসে। আর চেয়ে চেয়ে দেখে নদীর জল, কতকগুলো বয়ে যাওয়া নৌকো আর মাঝির দল। মাঝিগুলোকে দেখে সে ভাবে—এরা বেশ মজায় আছে! এদের হাতে হয় তো কোনদিন নৌকো ডোবে নি! ভগবানের দয়া!

মধু বসে আছে নদীর পাড়ে। গাছের গুঁড়িতে ঠেসান দিয়ে হুঁকোটা দাঁড়িয়ে রয়েছে।

মধু চেয়ে রয়েছে কর্তাবাবুদের নৌকোর উপর। তার মনটা আনচান করে উঠল; যদি একবার হালের কাছে গিয়ে বসতে পাই!

—এখানে বসে বসে কি হচ্ছে তোমার শুনি?

মধু পেছন ফিরে দেখে তার বুড়ী। হাতে পায়ে তার কাঁদা মাখা। কাপড়ের নীচের ভাগটা তার ভিজে সপ্‌-সপ্ করছে। কোঁচড়ে রয়েছে এককাঁড়ি শাক।

—কি শাক তুলে আনলি?

কলমী।

কলমী শাক মধু খেতে বড় ভালবাসে। তাই বুড়ীর এত......

চল না বাপু ঘরে। ঘরে কি আর কাজ-কর্ম্ম নেই না কি?

সোয়ামীকে ঘরে নিয়ে যাবার জন্যে বুড়ী আজ এত ব্যস্ত। মধুকে এই নদীর তীরে বসে থাকতে সে অনেকদিন দেখেছে। আর বুড়ী এও লক্ষ্য কোরেছে যে—সে নৌকোগুলোই দুচোখ দিয়ে প্রাণভরে দেখে নেয়। এই নৌকো দেখার মধ্যে কোনখানে যে একটা মস্ত বড় কাঁটা আছে—তা বুড়ী বেশ বুঝতে পারে। এই কাঁটার ব্যথায় যাতে মধু আর কষ্ট না পায়, সেই দিকেই বুড়ীর কড়া নজর।

যদু এতক্ষণ মধুকে দেখতে পায় নি। মাল বোঝাইয়ের দিকেই তার সবদৃষ্টিটুকু ছিল। সেই এখন পালেদের মাঝি হয়েছে। আজ সে নিয়ে যাবে নৌকো রাজঘাটে।

—কি গো খুড়ো, কি হচ্ছে? যদু নৌকোর উপর থেকেই জিজ্ঞাসা করে।

—কি আবার হবে রে যদো! তুই তোর কাজ কর না।

—আঃ, চট কেন খুড়ি! ভাল কথাই তো জিজ্ঞেস কোরেছি।

মধু বলে উঠল, যা বুড়ি, তুই কল্কেটা ধরিয়ে নিয়ে আয়।

…আর পারি না বাপু! তবু পারতে হোল, বুড়ী কল্কেটা তুলে নিয়ে চলে গেল। মধু এগিয়ে যায় যদুর দিকে।

কি খুড়ো?

একটা কথা শুনবি যদু?

কি বলো না।

আমায় আজ হালটা ধরতে দে না।

সে কি গো?

কেন রে? আমি আজ একবার……

তা কি হয় খুড়ো! তোমার হাতে একবার ডুবেছে, আবার কি বলে হাল ছোঁবে?

……এবার আর ডুববে না যদু। এবার খুব হুঁসিয়ার হয়ে গেছি।

……তবে চলো খুড়ো। কিন্তু খবরদার, কর্ত্তাবাবু যেন……

পাগল হয়েছিস্! অমনি জানলেই হোল!

কর্ত্তাবাবু ঘাটে এসে গেছেন।

কি রে যদু, সব তৈরী?

হাঁ, কর্ত্তাবাবু।

তবে আর দেরী করিস্ কেন?

হাঁ, খুলি এবার।

মধু বাবুর কাছে এগিয়ে গেল।

সর্ব্বনাশ! যদু ভয়ে বিবর্ণ হয়ে গেল।

কি মধু, খবর কি? কর্ত্তাবাবু জিজ্ঞেস করেন।

বাবু, আমি যদুর সঙ্গে যাব?

তোর মাথা খারাপ হোল না কি?

কেন, কর্ত্তাবাবু?

—অমনি কেন কর্ত্তাবাবু! তুই যেতে চাইছিস, তার পর ডুবুক আর কি সব!

—না বাবু, হাল ছোঁব না। দু-একবার দাঁড় খোরব।

যদু হাঁফ ছেড়ে বাঁচে। ভাগ্যি, মধু সব কথা বলে ফেলে নি!

—কি রে যদু, নিয়ে যাবি না কি?

যদু নোঙর তুলতে তুলতে বলে, যখন বলছে হুজুর, তখন সঙ্গে চলুক।

—দেখিস কিন্তু,…বলে বাবু হালটির দিকে চেয়ে ইসারা করলেন।

মধু আনন্দে কাঁপতে কাঁপতে গিয়ে নৌকোতে বসল। অনেকদিন পর!

নৌকো কিনারা ছেড়ে চলে গেছে নদীর মাঝখানে। তার পর পশ্চিম মুখে বয়ে চলল।

বুড়ী এদিকে জলন্ত কল্কে নিয়ে এসে দেখে মধু নেই। ঘাটে এসে দেখল কর্ত্তাবাবু দাঁড়িয়ে।

—কি গো বুড়ি, বুড়োর জন্যে না কি?

লোকে দেখত এই বুড়ো-বুড়ীর ভেতর বড্ড ভাব। তাই তারা ঠাট্টা করে। তাই কর্ত্তাবাবুও মাঝে মাঝে ঠাট্টা করে ফেলেন।

—কোথায় গেল গা?

—ঐ তো নৌকো করে রাজঘাটে গেল? তোমায় বলে যায় নি বুঝি?

বুড়ীর বুকটা ধরাস ধরাস কোরতে লাগল। সেই পাঁচহাতি ভিজে কাপড়টা টেনেটুনে মাথায় দিয়ে বুড়ী জিজ্ঞেস করে, হাঁ গা, কবে ফিরবে?

—কেন থাকতে পারবে না বুঝি? খুব তো টান দেখছি!

রসিক লোকের কাছে বুড়ী এ রকম অনেক কিছু শোনে। তাই তার ধাতে সয়ে গেছে। সে কোথাগুলো মুখে হেসে হেসে তাই উত্তর দেয়, তা আর কার না হয় গা ?

—তা ঠিক। তবে মধুর ফিরতে চারদিন লাগবে।

তার পর ? তার পর কর্ত্তাবাবু ধানক্ষেতের আলের উপর দিয়ে চলে গেলেন নিজের ঘরের দিকে। আর বুড়ী কল্কেটা নিয়ে দাঁড়িয়ে রইল ঘাটে। নদীর পশ্চিম দিকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে রইল, কারণ সেইদিকেই গেছে মধু নৌকো করে। কল্কের আগুন নিভে এল। খাবার আর লোক নেই! তার পর সেই নদীর ঘাট ছেড়ে বুড়ীকে চলে যেতে হয়।

তখন রাত অনেক। গাঁয়ের সবাই হয় তো ঘুমিয়ে পড়েছে। চারদিকে থম্‌থমে ভাব। গুমট্ গরম। যেন এক্ষুনি বৃষ্টি আসবে। কুঁড়ের দাওয়ায় গামছা পেতে শুয়ে আছে বুড়ী। দোর গোড়ায় একটা পিদিম জ্বলছে রাতে অনেকবার উঠতে হয়, তাই। তবে পিদিমের আলোটা খুব কমিয়ে দেওয়া হয়েছে। ভাতের হাঁড়ি এবেলা আর চড়ে নি। একজনের জন্যে আবার কেন অত ঝঞ্ঝাট! কলমীশাকগুলো দাওয়ায় পড়ে রয়েছে—রাঁধা হয় নি। রাঁধতে হয় তো মন যায় নি, বা অন্য কিছু। বুড়ীর আজ রাত কাটবে মুড়ি খেয়ে। নিজের জন্যে তো আর উনুনে আগুন দেওয়া যায় না!

বুড়ী চোখ বুজে পড়ে আছে। ঘুম তার চোখে নেই। শুধু পড়ে থাকা; শুধু চোখ বুজে পড়ে থাকা। এমনি করে অনেকক্ষণ সে কাটিয়ে দেয়। হঠাৎ যদুর গলা শোনা গেল।

—খুড়ি! ও খুড়ি!

—কে ? যদু ?

……হ্যাঁ গো।

—কি হলো রে ? বুড়ী ভয়ে বলে উঠল।

—সর্ব্বনাশ হয়েছে খুড়ি, সর্ব্বনাশ হয়েছে। বলতে বলতে যদু দাওয়ার কাছে এসে হাজির।

—কি হয়েছে, বল না খোলসা করে।

—নৌকো মাঝদরিয়ায় ডুবে গেছে। কি ভীষণ তুফান!

—এঁ্যা বলিস কি রে ?

—আমি নদীতো সাঁতরে পার হয়ে এলুম! খুড়ি, কেন যে খুড়ো সঙ্গে গেল!

—যদু, তা হোলে· ·বুড়ীর গলার আওয়াজ কেঁপে উঠল।

—না, খুড়ি। যাবে কোথা! ও ঠিক এসে পৌঁছবে রাত্তিরে। বাবুদের কাছে মুখ দেখাব কি করে, খুড়ি ?

এতবড় ঝঞ্ঝাট! তবু বুড়ী দমে গেল না। সে এ রকম অনেক দেখেছে। সে মাঝির বউ, এরকম ভরাডুবির দুর্ঘটনা শুনে শুনে তার চুল পেকে গেছে। তাই সে আজ একটুও বিচলিত হোল না—

—কি আর কোরবি বাছা! যা এখন ঘরে ফিরে, তার পর যা হয় করবে।

যদু জল মুছতে মুছতে চলে গেল।

পিদিমের সল্‌তেটা বাড়িয়ে দিয়ে বুড়ী দরজা ভেজিয়ে দিল। তার পর ঘর ছেড়ে চলল নদীর দিকে ঘরের বাইরে কালো লেজ গুটিয়ে শুইয়েছিল। সে বুড়ীর বড় অনুরাগী। তাই বুড়ীকে একলা যেতে দেখে কালো গা ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়াল। তার পর একটা হাই তুলে বুড়ীর পেছনে পেছনে…

মাথার উপর সমস্ত আকাশটা মেঘে ভরা। চাঁদ বা দু' একটা তারার নাম গন্ধ পর্য্যন্ত নেই। চারিদিকে অন্ধকার, আর একটা অস্বাভাবিক শান্তভাব, যেন এক্ষুণি একটা প্রকাণ্ড ঝড় উঠবে। বুড়ী পিদিমটা নিয়ে এগিয়ে চলেছে নদীর ধার দিয়ে। কোথাও গর্ত্ত, কোথাও কাদামাটি আবার কোথাও বা মাটির শক্ত ঢিবি, কোনখানে বাঁশের টুকরো আবার কোনখানে কিসের হাড়—এমনি ভাবের কত কি জিনিষ বুড়ীর শীর্ণ পায়ের তলায় লাগছে। এই সমস্ত এড়িয়ে চলেছে এক জরাগ্রস্ত বুড়ী, হাতে তার পিদিম আর পেছনে অনুচর কালো। নদীর বুকে একটা কম্পন পর্য্যন্ত নেই। হাওয়া চলাচল বন্ধ হয়ে গেছে। নদীর তীরে বড় বড় গাছগুলো অন্ধকারে দাঁড়িয়ে রয়েছে ভূতের মত।

হঠাৎ বুড়ীর পেছন দিক থেকে কালো ঘেউ ঘেউ করে চেঁচিয়ে উঠল; তারপর সে ছুটে গেল একটা গাছের দিকে।

গাছের পেছন দিক থেকে শোনা গেল, "চুপ! চুপ কর কালো। কে ? বুড়ী এয়েছিস ?"

বুড়ী দেখল, বুড়োর সমস্ত দেহ জলে ভিজা। বুড়ো বলে, পালিয়ে চল বুড়ি, রাত এখনও অনেক আছে।

—এই গাঁ ছেড়ে পালাবো ?

"হাঁ, বুড়ি। ভোর হবার আগেই পালাতে হবে, নইলে কপালে অনেক···

কোন দিকে কিছুর শব্দ নেই। খালি এই দুটো বুড়ো-বুড়ীর কথা বলার ফিস্ ফিস্ আওয়াজ।

দূরে নদীর তীরে একটা আলো জ্বলছে। হয় তো আলেয়া, নয় তো শ্মশানের আগুন! নদীর জল হয়ে গেছে স্থির, কার যেন ইঙ্গিতে। দূর থেকে, বহুদূর থেকে একটা গানের সুর ভেসে আসছে। মাঝি-মাল্লাদের গান নিশ্চয়। কিন্তু তারা কোথায় যে গাইছে, তা ঠিক করা শক্ত। শুধু সেই সুর খুব অস্পষ্ট হয়ে ভেসে আসছে নদীর বুকের উপর দিয়ে। আর এই নিশ্চল নদীর তীরে দাঁড়িয়ে দুই নর-নারী। মাঝি আর তার বউ! বুড়ো আর বুড়ী পাশাপাশি। আর কালো চোখ বুজে দাঁড়িয়ে রয়েছে। এই গভীর কালো রাত! আর এই কালো রাতেরই পথিক দুজন—হাত-ধরাধরি করে পথ চলা যাদের অভ্যাস। হয় তো চরম কালো রাত এদের কাছ থেকে বেশী দূরে নয়; কিন্তু দুনিয়ার বুকের এই বাস্তব কালো রাতের মাঝেই যতক্ষণ আছে, ততক্ষণও বুকে ভয়, পালিয়ে বাঁচবার আকুল প্রাণপণ চেষ্টা। মধু ভয়ে কাঁপছিল। যদি কর্ত্তাবাবু পাগল হয়ে গিয়ে তাকে ধরতে আসে! একটা ঘরছাড়া গরু ঘুরে বেড়াচ্ছিল। গাছের ফাঁক দিয়ে তার সাদা দেহটা দেখা গেল। মধু দেখেই আঁৎকে উঠে, "আলো নিভিয়ে দে!" মধুর হাতে পড়ে প্রদীপের মৃত্যু!

গৃহশ্রী

—শ্রীদীনেশ গঙ্গোপাধ্যায়

গরীবের হারানিধি সংসারে লক্ষ্মী,
দিবানিশি অকাতরে সহে সব ঝক্কি;
লেখাপড়া ঘোটাঘুটি খুটিনাটি নেই কিছু,
চাহিলে মুখের পানে চোখ দুটি করে নিচু।
সুমুখে আসে না বড় পিছু হ'তে টানে সে,
নিজেরে গোপন মাঝে ঢেকে ঢেকে আনে যে;
ভাণ্ডারে কমলা গো, কাণ্ডারী জীবনের
মাটির ধূলায় যেন শুকতারা গগনের।
অনাটন বারোমাস পরিধান ছিন্ন,
স্বার্থের সাথী নয় দুঃখেতে ভিন্ন;
হাসির আড়ালে বহে জীবনের ক্লান্তি,
দৈন্যের নির্ভর অভাবের শান্তি।
সমতায় মমতায় সতত গো তুষ্টা,
বেদনা ও প্রণয়ের স্নেহরসে পুষ্টা;
রিক্তা সে সুখী সদা দ্বন্দ্বের মধ্যে,
ফুল্ল সে শতদল সংসার-পঙ্কে।
ক্ষিপ্রা সে রুক্ষ নয় কল্যাণী নিয়তই,
মরমের বাঞ্ছা যে মালা করে গেঁথে লই;
প্রাণ করে রাখি দেহে ধ্যান করি চিত্তে,
জীবনে মরণে রই ঐ হৃদিতীর্থে।
দূরে ফেলি বিত্ত গো নিত্যই তারে চাই
ঐ নিধি বুকে লয়ে ভিক্ষায়ও সুখ পাই॥

বুডাপেস্ত

—শ্রীমতিলাল দাশ

(ভ্রমণ-বৃত্তান্ত)

হুনদের দেশ হাঙ্গেরী—মহাযুদ্ধের পর স্বতন্ত্র দেশ হয়েছে। এখানে প্রাচ্যের আন্তরিকতা ও জড়তা দুইই দেখতে পেয়েছিলাম। খুব ভাল লেগেছিল স্থানটি, তাই নির্দ্ধারিত সময়ের চেয়ে একদিন বেশী ছিলাম।

ইট, কাঠ, পাথর তাই নিয়ে বাড়ী হয়, কিন্তু মানুষের সহমর্ম্মিতা যখন তাকে মধুর করে না—তখন সেটা হয় পাষাণ-কারাগার, মানুষের প্রীতিই তাকে প্রাসাদ গড়ে তোলে।

বুডাপেস্তে একটি মানুষের সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল, যিনি তাঁর হাসি, রঙ্গ ও উদারতা দিয়ে হৃদয়ে অনশ্বর ছাপ রেখেছেন। তাঁর নাম অধ্যাপক গার্ম্মেনিউস, এখানকার বিশ্বলেখক সংঘের সম্পাদক।

গার্ম্মেনিউসের হাস্যসুন্দর প্রশান্ত মুখ ও স্বভাব-সুন্দর আলাপ অল্পেই আপন করে নেয়।

বাড়ীর একটি চিঠিতে যা লিখেছিলাম এখানে তুলছি, "আজ এই বিদেশে বারে-বারে মনে পড়ছে তোমার আদর ও যত্নের কথা, এই বিভিন্নতার মাঝে হাঁপিয়ে উঠছি—তবু এই আমার প্রয়োজন ছিল—কত মানুষের সাথে আলাপ হ'ল, কত লোকের সঙ্গে বন্ধুত্ব হ'ল এর ফল, ফলবে হয় ত কোনও কালে।

বুডা হ'ল পাহাড়ের উপর পুরাতন সহর—তার তল দিয়ে বয়ে চলেছে ডানিয়ুব নদী—তার নীল জলধারা নিয়ে, আর এপারে পেষ্ট—দুটো সন্ধি ক'রে নাম হয়েছে বুডাপেষ্ট।

এরা একে বলে ডানিয়ুব সুন্দরী, কিন্তু এর সৌন্দর্য্যের সাথে দেখা হয় নি আমার, এদেশের লোকজন তত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন নয়, এদেশের মানুষ অবশ্য ভাল—তাদের বুকে আছে সহজ সুর, তাদের মুখে আছে প্রসন্ন হাসি।

আজ সকালে উঠে গেলাম এখানকার অধ্যাপক গার্ম্মে-নিউসের বাড়ীতে—স্বামী ও স্ত্রীতে ওরা শান্তিনিকেতনে ছিলেন, ওদের ছেলে-মেয়ে নেই—পাথরের একটি মূর্ত্তিকে ওরা বলে ওদের ছেলে। মজার কথা, ছেলে মেয়ে দেয় অনেক দুঃখ কষ্ট, তবু যার ছেলে নেই সেই আটকুড়োর দুঃখ খুব কম মানুষেই বোঝে।

অবশ্য ওর ভাইঝি আছে অনেকগুলি—তারা থাকে দেশে, তাই সহরে আসে সহরের গান বাজনা নৃত্য ও আমোদ শুনতে, এদের দেশে চুমো খাওয়াটা খুব চলে, ওর ভাইঝির সঙ্গে ফিরবার পথে দেখা হ'ল, অমনই প্রোফেসর তার মুখে চুমো খেলেন।

প্রতিদিন যদি আসত কারও না কারও চিঠি, তা হ'লে মন্দ হ'ত না, তা হ'লে ভাল লাগত, প্রতিদিন ঘটুক কিছু অভিনব ঘটনা, এইটাই গতি, কিন্তু জীবনটা ত নভেল নয়, তাই পথে ঘাটে প্রেমিকা জোটে না।

বাইরে যখন চলি, তুষারের টুকরাগুলি তুলোর মত গায়ে এসে পড়ে। ওদেরই মত ধীরে, ওদেরই মত মধুর স্পর্শে, আসুক তোমার ভালবাসা সাত সাগর পাড়ি দিয়ে—"

বুডায় উঠি আটলাণ্টিক হোটেলে—এটা তৃতীয় শ্রেণীর হোটেল। এখানে ঘরভাড়া লাগে রোজ দুটাকা, খাই প্রায়ই বাইরে। একটী চিঠিতে লিখি, "বড় বড় লোকের সঙ্গে মিশতে গেলে চাল দিতে না পারলে অসুবিধা হয়, এখানকার P. E. N ক্লাবের সভাপতির সঙ্গে কথাবার্ত্তা হ'ল—তিনি বল্লেন একটু অনুযোগের সুরে—আটলাণ্টিক থার্ডক্লাস হোটেল—সব দেশেই মানুষ মানুষের বাইরেটা দেখে, তার ভিতর সহসা দেখতে পায় না। তাই বিদেশে চাল দেওয়ার দরকার হয়, কিন্তু ও বিদ্যে এ জীবনে আর শেখা হবে না—"

হোটেলে নেমেই অধ্যাপক জুলিয়াস গার্ম্মেনিউস ভয়েলিকে ফোন করা গেল। অধ্যাপক উত্তর দিলেন, আমার হোটেলের অবস্থানটি সহসা বুঝতে পারলেন না, কারণ এটা বড় নয়। সেটা জেনে নিয়ে বল্লেন অপেক্ষা করতে, বিকালে আমাকে সহর দেখাতে নেবেন।

আলাপে খুব মুগ্ধ করেন। বল্লেন, "কেন বিদেশ ভ্রমণে বেরিয়েছেন?"

উত্তর দিলাম, "যে পৃথিবীতে জন্মেছি—তার বিচিত্র রূপ দেখতে বার হয়েছি, মৃত্তিকা জননীর বিরাট মন্দিরে তীর্থযাত্রী আমি—" হাসলেন মিষ্ট হাসি, বল্লেন, "একজন নিরপেক্ষ দর্শকের ভ্রমণের বই এদেশের লোক খুব পছন্দ করবে।"

অধ্যাপকের অনুরোধ রক্ষা হয় নি, যে আনন্দের প্রাচুর্য্য তখন ছিল, দেশের অবসাদ ও আড়ষ্টতায় হাওয়ায় একদম নিঃশেষ হয়েছে। অধ্যাপক এখানকার International Clubএ নিয়ে গেলেন, নানা লোকের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন। এখানকার বড় একজন সেনাপতির মেয়ের সঙ্গে আলাপ হ'ল, মেয়েটি খুব লম্বা কিন্তু খুব সুন্দরী। ইডা মরলানে বলে একটী বুড়ীর সঙ্গে আলাপ হ'ল।

বুড়ী খুব মজলিসী লোক, গল্প করতে মজবুত। আমায় প্রশ্ন করল, "য়ুরোপে কেমন আমোদ হ'ল ?"

অর্থ যাহা তাহা বুঝিলাম কিন্তু এড়িয়ে বললাম, "য়ুরোপে এসেছিলাম জীবন-চলার বাণী নিতে, তা পেয়েছি মনে হয় না।" বুড়ী হাসলেন, বললেন, "বাণী নয়, মেয়েদের সঙ্গে প্রেম কেমন হ'ল ?" উত্তর দিলাম, "আমি বিবাহিত, বাড়ীতে বে ছেলে মেয়ে আছে—প্রেম করা আমাদের পোষায় না—"

"বল কি ?"

"এটাই ভারতীয় সতীত্বের আদর্শ, সীতাকে বনে পাঠিয়ে রাম কৃচ্ছ্রসাধন করেন, যজ্ঞে সোনার সীতা তৈরি করেন—"

"এগুলি গল্পে মানায়, কাজে খাটে না—"

আমি বললাম, "আমাদের দেশে খাটছে—আমার স্ত্রী আমি এসেছি বলে ভোগনিবৃত্ত থাকবেন, আমাকেও তাই থাকতে হবে।"

বুড়ী বললেন, "আমাদের দেশে এ-সব থাকে না।"

তার পর তিনি একটী মহিলাকে দেখিয়ে বললেন, "ওর স্বামী রোমে কাজ করে—কিন্তু তরুণী এখানে বেশ স্ফূর্ত্তি লুটে নিচ্ছে।"

আমি বললাম, "এটা আমাদের সভ্যতায় মানবে না—"

বুড়ী খুসি হলেন, বললেন, "কাল এষ্টোরিয়া হোটেলে আমার সঙ্গে মধ্যাহ্ন ভোজন করবেন।"

আমি সানন্দ সম্মতি জানালাম।

গুয়েলি সেনাপতির মেয়েকে বললেন, "কাল এঁকে সহর দেখিয়ে আনতে পারবে ?"

তরুণী বলল, "না কাল আমার খুব কাজ আছে।"

অধ্যাপক অপ্রস্তুত হলেন। তরুণী বোধ হয় এই কৃষ্ণকায়কে সঙ্গী করতে নারাজ ছিল।

এখানেই খাওয়া গেল, গুয়েলিই খাওয়ালেন। খেতে খেতে রাজা এডওয়ার্ডের কথা উঠল—অধ্যাপক বললেন, "আমার খুব ভাল লাগে এই মহৎ মনুষ্যত্ব—"

বৃটেনের বাইরে সর্ব্বত্রই রাজা এডওয়ার্ডের সমর্থক দেখেছি।

গুয়েলি খোস-মেজাজী লোক, হাসি-ঠাট্টায় তিনি একেবারে মসগুল ক'রে তোলেন—তার মত হৃদয়বান্ দিল-খোলা মানুষ সংসারে খুবই দুর্ল্লভ।

১০ই ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার। সকালে উঠে ফডরের বাড়ীতে গেলাম। ফডর ইহুদী যুবা, ভিনিসে ওর সঙ্গে আলাপ হয়েছিল—বুডাপেষ্টে ওর বাড়ীতে দেখা করবার জন্ম আমন্ত্রণ জানিয়েছিল। ফডর বাড়ী ছিল না, ওর মায়ের সঙ্গেই আলাপ হ'ল। মা খুব চমৎকার, বুড়ী ইংরেজী জানে না কিন্তু আমার বক্তব্য বুঝবার জন্ম যথাসাধ্য চেষ্টা করল—তার পর সন্ধ্যায় ফডর আসবে ব'লে যেতে বলল।

এখান থেকে এদের আদালত গৃহ Curia-তে গেলাম, চমৎকার বাড়ী। লেনিং বলে বড় একজন ব্যারিষ্টারের সঙ্গে আলাপ হ'ল, তিনি সব দেখিয়ে দিলেন এবং তার পরের দিন বারটায় তার আফিসে যেতে বললেন।

এখান থেকে বেরিয়ে এদের পার্লামেণ্টে গেলাম। সুন্দর গৃহ, রক্ষীরাও খুব ভদ্র। এখানে অনেকক্ষণ কাটিয়ে লিবার্টি স্কোয়ারের মধ্য দিয়ে সেণ্টপলস্ ক্যাথিড্রালে গেলাম। তার পর সেন্ট্রাল পোষ্টাফিসে গিয়ে চিঠি দিলাম।

সেখান থেকে এদের বিশ্ববিদ্যালয়ের ধার দিয়ে ন্যাশানাল মিউজিয়মে গেলাম। অনেক মিউজিয়াম দেখেছি, এখন আর নূতনত্ব চোখে লাগল না।

এখান থেকে এষ্টোরিয়া হোটেলে গেলাম। ইডা মরলানে বা তাঁর ছেলে তখনও আসেন নি—আমি ড্রয়িংরুমে বসে খবরের কাগজ পড়তে লাগলাম।

আমি নিরামিষাশী জেনে বুড়ী আমার আহারের সুব্যবস্থা করলেন। ডাঃ মরলানে ভারতবর্ষে গিয়েছেন—বয়কাউট আন্দোলন সম্পর্কে। ভারতবর্ষ সম্বন্ধে আলাপ হ'ল।

ডাক্তার বললেন, "আপনি বিচারক, কিন্তু আমার মনে হয়, ভারতীয় লোকেরা নিজের পারিবারিক আবেষ্টনকে ভুলতে পারে না, তাই তারা বড় বিচারক হ'তে পারে না।"

এ মন্তব্য সত্য নয়, অপ্রিয়। একজন সদ্য-পরিচিত বিদেশীকে এরূপ বলা শোভনও নয়। কিন্তু হাঙ্গেরীতে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য মিলেছে, তাই আমাদের দোষগুলি পরিপূর্ণতায় এদের মাঝে দেখা যায়। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "ভারতীয়দের কেমন লেগেছে আপনার ?"

উত্তর দিলেন, "আমি যাদের দেখেছি তাদের অনেকের মধ্যে একটা অন্যায় অহমিকা দেখেছি। যোগ্যতা নেই অথচ তারা নিজেদের ইংরেজের সমকক্ষ মনে করে।"

বন্ধু ভারত দেখেছেন ইংরেজদের অতিথি হ'য়ে—ইংরেজদের চোখ দিয়ে, তাই এই মতবাদ বেমানান মনে হ'ল না। অবশ্য ডাঃ মরলানের কথার মধ্যে সত্যও আছে।

যোগ্যতা বিজয় পথের সোপান। সে সোপান অতিক্রম না ক'রেই আমরা রাতারাতি সিদ্ধিকে চাই, তাই জীবনের নানা ক্ষেত্রে আমাদের প্রচেষ্টার মধ্যে যে ফাঁকি আছে, বুদ্ধিমান বিদেশী তাহা সহজে বুঝিয়া নেয়।

ভারতের নিন্দা শুনিয়া মন একটু উষ্ণ হ'ল। চোখা-চোখা কথা শুনাবার জন্য বললাম, "য়ুরোপ যে পথে চলেছে সে কি অকল্যাণের নয় ?" ডাঃ মরলানে অন্ধ স্তাবক নন। জবাব দিলেন, "য়ুরোপে আজ ধর্ম্ম গেছে রসাতলে। ষ্টেটই আজ সর্ব্বেসর্ব্বা—রাষ্ট্রের বিজয়রথ মানুষের মনুষ্যত্বকে সর্ব্বক্ষণে পিষ্ট করছে, মানুষকে যন্ত্র ক'রে তুলেছে।" বললাম, "উপায় কি ?"

"য়ুরোপীয় সভ্যতা মরতে চলেছে, বাঁচতে হ'লে চাই নূতন আলো, নূতন দৃষ্টি-ভঙ্গী।"

কিন্তু কোথায় সে আলো! তাই সে-দিনের যেমন সমস্যা ছিল আজও তেমনই রয়েছে।

সেখান থেকে বুড়ীর নিকট বিদায় নিয়ে বাসায় ফেরা গেল। বুড়ীর আলাপ-আচরণে এমন একটা সহজ দরদ আছে যে ভোলা যায় না। বুড়ী আমার স্কোমের ঠিকানায় পত্র দিয়েছিলেন, সে পত্র বহু পরে এখানে এসে পাই, কিন্তু আলস্য বশতঃ সে প্রীতির ধারা বজায় রাখি নি।

তবু ক্ষণিকের চেনা এই বিদেশিনীর কথা যখনই মনে করি, তখনই বুঝি জগৎ জুড়ে মানুষ ভেদ ও বিরোধের কথা যতই বলুক, সেটা সত্য নয়। সত্য মানুষের সহজ ভালবাসা, সত্য মানুষের দেশোত্তর নৈকট্য। রাষ্ট্র এবং সমাজ মানুষকে মিথ্যা দিয়ে ভুলিয়ে রাখে। অপরিচিতকে তাই বর্ব্বর বলে দূরে রাখি। কিন্তু যতই পরিচয় হয় ততই বুঝি এটা একান্ত বুজরুকি।

ফডরের অপেক্ষায় বাসায় বসে চিঠি লিখলাম। ফডর এল সন্ধ্যা সাতটায়। তার সঙ্গে রাজপথে ঘূর্ণিচক্র দিয়ে আসা গেল। আলাপ চলল ভাঙ্গা ইংরেজীতে।

শনিবার সন্ধ্যায় দেখা করবে ব'লে সে বিদায় নিল। আমি তাড়াতাড়ি সান্ধ্য আহার সেরে নিলাম। এদের কাফেতে ভাত পাওয়া যায়, রাঁধে আমাদেরই মত। ঘি ও ভাত, আলু ও আমলেট দিয়ে দেশের মতই খেয়ে নিলাম। দিতে হ'ল প্রায় পাঁচ সিকা। এ-দেশের তুলনায় বেশী নয়।

ইংরেজী আলোচনার একটা গোষ্ঠী আছে, তার নাম English Circle, অধ্যাপক গার্ম্মেনিউস সেখানে তাঁর আরবের অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে বলবেন। সেখানে গেলাম।

দেখি অধ্যাপক আসেন নি। সময় সম্বন্ধে এদের ধরণে প্রাচ্যভাব।

যাঁর বাড়ীতে বৈঠক হ'ল তাঁর নাম অধ্যাপক ম্যাটশিল। তাঁর মেয়ে ও জামাই আমাকে যথেষ্ট সমাদর করলেন। এখানে একটী মেয়ের সঙ্গে আলাপ হ'ল। সে হিন্দি পড়ছে। ভারতীয়দের প্রতি তার সহজ অনুরাগ, ভারতবর্ষের প্রতি তার অসীম শ্রদ্ধা। ভারতীয় বেশে তোলা তার দু'খানা ছবি ছিল। একটী ছবিতে সে শাড়ী পরে দিলরুপ বাজাচ্ছে, চমৎকার ছবি। তার চোখে-মুখে একটা 'মিষ্টিক' মায়া, হয় ত একটা মোহের ভাবও আছে। এই সব মেয়েদের সঙ্গে ভাব জমানো সহজ, কিন্তু এই আর্টে আমার একটুও দখল নেই।

অধ্যাপক গার্ম্মেনিউস যে বক্তৃতা দিলেন সেটা সাড়ম্বর বাক্যাড়ম্বর নহে। সেটা সহজ কথোপকথন, কিন্তু তার মধ্যে এমন চমৎকার মক্কার বর্ণনা দিলেন যে, সবাই মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে

শুনতে লাগল। অধ্যাপক মক্কায় মুসলমান বেশে দিন কাটাতেন। কাবার সম্মুখে এক ফকিরের সঙ্গে ভাব করে সব খবর জানেন। মক্কা সম্বন্ধে তিনি দুখানি বই লিখেছেন।

অধ্যাপক গার্মেনিউস বোধ হয় খুব ব্যস্ত ছিলেন। আশা করেছিলাম যে, খাওয়ার পথে আমাকে সঙ্গে করে নেবেন। কিন্তু না বলেই বিদায় নিলেন।

International Club হলে সেনাপতির যে দীর্ঘদেহ তরুণীর সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল, তাকে এখানে দেখলাম। একটা নাটক অভিনয়ের রিহার্সেল চলছিল, তাতেই সে মহলা দিতেছিল। তাকে নমস্কার করি, কিন্তু সে যেন কখনও আমায় দেখে নি এইভাব দেখাল।

বোধ হয় তার ভাবি বর সঙ্গে ছিল, তাই কালো আদমীকে সে আমলই দিল না। এখান থেকে ফিরতে একটু অসুবিধাই হ'ল—অন্ধকার নিশীথ রাত্রে, পথ পরিচয় করায় এমন পথিক মেলে না। একজন তরুণ একটী তরুণীকে নিয়ে ট্যাক্সিতে উঠছিলেন, আমার বিপদ বুঝে তিনি সঙ্গে করে নিলেন।

আমায় হোটেলের নিকট নামিয়ে দিলেন। ভাড়া দিতে গেলাম নিলেন না। এমন অযাচিত মহিমার নিদর্শনও দেখেছি।

শুক্রবার ১১ই ডিসেম্বর। ভোরে কুয়াশায় দিগন্ত ভরা। কাফেতে প্রাতরাশ শেষ করলাম। অধিকারী এসে আলাপ জুড়ে দিল। প্রাপ্য কফির বদলে পুনরায় কফি দিল বিনামূল্যে। কোথায় যাব প্রশ্ন করল, কেমন করে যাব তার হদিশ বলে দিল।

বাসে করে ডানিয়ুব পার হ'য়ে বুডার রাজপ্রাসাদে গেলাম।

পেষ্ট সমতল ভূমিখণ্ডে—বুডা পাহাড়ী। বাস থেকে নেমে পাহাড়ের গা বেয়ে যে বৈদ্যুতিক ট্রাম খাড়াই উপরে উঠেছে সেটাতে চড়ে রাজপ্রাসাদে গেলাম। অষ্ট্রোহাঙ্গেরী যখন ছিল তখন সম্রাট বৎসরের প্রায় অর্দ্ধেক সময় এইখানে থাকতেন। কক্ষে কক্ষে এখনও সেই পূর্ব্বতন বিলাস-বৈভবের নিদর্শন মেলে। বিলম্বিত চিত্র সংগ্রহ রাজকীয় রুচির পরিচয় দেয়। য়ুরোপের প্রত্যেক রাজপ্রাসাদেই সুদৃশ্য ছবি পাওয়া যায়। রাজ অনুগ্রহেই চিত্রশিল্প প্রতিষ্ঠা পেয়েছে।

ইহার বৃহত্তম নৃত্যশালার মাঝে দাঁড়িয়ে মানুষের দর্প ও দম্ভের পরিণতির কথা মনে পড়ল।

এখান থেকে করোনেশন পার্কে গেলাম—বিশেষত্ব কিছুই নাই। সেটা দেখে Fisherman's Bastion হ'য়ে এদের রাজকীয় দপ্তরখানায় ঢুকলাম।

একটি মেয়ে যত্ন করে ঘুরে ঘুরে তাদের রাষ্ট্রপ্রশস্তির নানা ঐতিহাসিক দলিল দস্তাবেজ দেখাল। অলিভার ক্রমওয়েল হাঙ্গেরীতে প্রোটেষ্টাণ্ট ধর্ম্মের প্রচার হওয়াতে আনন্দ প্রকাশ করে যে চিঠি লেখেন, মেয়েটি সেটা দেখাল। এই জিনিষটী আমার নিকট বেশ কৌতূহলপ্রদ মনে হ'ল।

এখান থেকে হেঁটে হেঁটে নদীতীরে গিয়ে সেতুপার হ'য়ে পেষ্টে এলাম। পূর্ব্বদিনের পরিচিত ব্যারিষ্টারের আফিসে গেলাম, কাজে ব্যস্ত থাকায় দেখা হ'ল না। এক কাফেতে রুটী, মাখন, মটর দেওয়া আমলেট ও কেক খেলাম। খরচ খুব কম লাগল। বেশ পেট ও ভরল।

সেখান থেকে এক দোকান থেকে দুটী পুতুল ও অন্য কিছু জিনিষ নিলাম। তার পর ডানিয়ুব নদীর উপর অবস্থিত সেণ্ট মার্গারেট দ্বীপে গেলাম। তার জন্য প্রবেশ মূল্য লাগল ত্রিশ ফিলার। এখানকার একটা স্পাতে খনিজ জলে স্নান করলাম, তার জন্যে খরচ হ'ল দুই পেঙ্গো চল্লিশ ফিলার। স্নান করে পরম পরিতৃপ্তিতে অন্তর ভরে উঠল।

সমস্ত দ্বীপ বরফে ছাওয়া। তরুবীথির নির্জ্জন পথে পদব্রজে একা একা ফেরা গেল। এই নির্জ্জন পথে নিঃসঙ্গ মাধুরী খুব ভাল লাগল।

এখান থেকে ফিরে টিভলি নামক একটি সিনেমাতে ছবি দেখলাম। বারে বারে ফিল্ম কাটিতে লাগল, মনে হ'ল যেন বাংলা দেশের সহরেই ছবি দেখছি। খাওয়ার বেশী সময় নেই দেখে ফল কিনে রাত্রির ক্ষুধা নিবারণ করতে হ'ল। তার পর অপেরায় গেলাম। গল্পটী প্রাচ্য, গানগুলি বেশ মধুর। দৃশ্যপটে নদীর ও তরুবীথির চমৎকার অনুকৃতি হয়েছে।

আরম্ভ হওয়ার কিছু বিলম্ব ছিল, তাই গুরুদেবের নিকট উড়ো ডাকে চিঠি দিলাম: "এই চিঠি লিখছি এখানকার রাজকীয় অপেরা হলে বসে। অপেরা য়ুরোপের খুব আদরের জিনিষ। আমাদের যাত্রার সঙ্গে এর মূলতঃ নাড়ীর যোগ আছে। অপেরাতে চলছে গানের পালা,

রাজা, রাণী, চাকর-বাকর, যোদ্ধা, পুরোহিত সবাই গাইছে গান, তবে মাঝে আছে ঐক্যতান বাদন—চমৎকার জিনিষ। বাংলা সাহিত্যে অপেরা নাই, ভাবছি ফিরে একটা অপেরা লিখবার চেষ্টা করব।

য়ুরোপ ভ্রমণ একদিক দিয়ে শেষ। এখন ফিরব পরিচিত দেশের মাঝ দিয়ে, হুনদের দেশ হাঙ্গেরীতে প্রাচ্য-ভাব আছে, ভারতবর্ষের প্রতি এদের নানা মানুষের বেশ দরদ দেখলাম।

এই ভ্রমণ—এ থেকে যে জিনিষটা জানলাম, সেটি প্রাচুর্য্যের মহিমা সংসারে যুদ্ধ কথা আছে, বাদ-বিসংবাদ ছিল ও থাকবে, সংসার থেকে হিংসা ও দ্বেষকে কেউ কোনও দিন হয় ত তাড়াতে পারবে না, কিন্তু তবু এই সমস্ত বিরোধ ও অন্তরায়ের মাঝ দিয়ে ফুটতে হবে, পরিপূর্ণ হ'য়ে ফুটে ওঠার প্রতি আকাঙ্খাই মানুষের সকলের চেয়ে বড় গৌরবের কথা।

এখান থেকে অনুভব করছি আপনাদের সকলের গভীর স্নেহ ও প্রীতি এবং মন সাগর-পাহাড় পেরিয়ে দেশের মাটী ও হাওয়ার জন্য পাগল হ'য়ে উঠেছে, যতই বিচিত্র ও অপরূপের সাথে পরিচয়, ততই দেশের প্রতি শ্রদ্ধা গভীর হ'ল।"

রাত এগারোটায় হোটেলে ফিরলাম।

শনিবার ১২ই ডিসেম্বর। প্রোফেসর গার্ম্মেনিউসের খবর না পেয়ে তাকে টেলিফোন করলাম। সভাপতি রোডার সঙ্গে দেখা করতে। তাঁর বাড়ীতে যেতে বললেন। রোডা লেখক-সঙ্ঘের সভাপতি। বুধেনিক আরিতস, বন্ধুবর ডাঃ কালিদাস নাগ এবং মাদাম সোফিয়ার সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়েছিল, তাঁদের খুব প্রশংসা করলেন।

রোডা নানা ভাষা থেকে হাঙ্গেরীয় ভাষায় কবিতা অনুবাদ করেছেন। তিনি ভ্যানবেরির সঙ্গে আলাপ করতে বললেন। ভ্যামবেরির বাবা প্রাচ্য বিদ্যাপণ্ডিত ছিলেন। ছেলে উকিল এবং এখানকার ফৌজদারী আইনে বিশেষজ্ঞ। তিনি সন্ধ্যায় চায়ে নিমন্ত্রণ করলেন।

ফিরবার পথে ইহুদীদের সিনাগগ্ এবং কলা ভবন দেখে নিলাম। হোটেলে ফিরে আহার শেষে সময় কাটানোর জন্য সিনেমার জন্য বার হলাম। ইহুদীদের বিরামদিন, তাই আজ অভিনয় বন্ধ, নিরাশ হ'য়ে ফিরে এলাম। গার্ম্মেনিউস এসে মোটর করে ভ্যানবেরির ওখানে নিয়ে চললেন। ভ্যানবেরি থাকেন বুডায়। অধ্যাপক ভুল পথ ধরে এক ঘণ্টার উপর দেরী করে দিলেন। ভ্যানবেরি ও তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে নানা বিষয়ে আলাপ হ'ল। পণ্ডিত মানুষ। ভ্যানবেরি গোপালপুরে অবস্থিত কাংড়াভ্যালি টি কোম্পানীর খবর জানতে চাইলেন।

বললাম, "ভারতবর্ষ অত্যন্ত বৃহৎ দেশ, একটা মানুষের পক্ষে সব চেনা সহজ নয়।" ভ্যানবেরির পুরা নাম রোস্তম ভ্যানবেরি, আমার খাতায় লিখলেন, 'ভারত-তত্ত্বজ্ঞ পিতার পুত্র সভ্যতার আদি জন্মভূমিকে প্রণতি জানায়।'

এখান থেকে ফিরে ফডরের গৃহে গেলাম। খেতে দিল লঘু ভোজন। আহারান্তে বাহির হওয়া গেল।

ব্রিটানিয়া হোটেলে অনেকের সঙ্গে আলাপ পরিচয় হ'ল। সেখানে ইহুদীদের বাণিজ্যের একটী আড্ডা আছে—সেই মজলিসের অধিবেশন হ'ল, ভোজ খাওয়া হ'ল, বক্তৃতা চলল। গান হ'ল, নাচ হ'ল- একজন বুড়ী লোকসঙ্গীত গাইল, খুব চমৎকার লাগল। একটা লোক ছবি তুলল, আমায় নিতে অনুরোধ করায় স্মৃতি-প্রতীক হিসাবে এক কপি নিতে রাজি হলাম।

রাত বারটায় বাড়ী ফিরবার পথে ফডরের এক ডাক্তার বন্ধুর সাথে দেখা হ'ল। লোকটি রসিক, বলল, "এর মধ্যেই শুতে যাবেন কেন, চলুন আপনাকে বেদিয়া সঙ্গীত শোনাব। প্যাট্রিয়া কাফেতে গেলাম, লোকে লোকারণ্য—আট দশটি লোক gypsy music বাজাচ্ছিল। সঙ্গীতের অন্তর-রস বুঝি সে কর্ণ আমার নেই, তবে আনাড়ির কাছেও বেশ লাগল।

সাতদিনের পর একদিন এরা উল্লাস আনন্দ করে। তখন তারা নেশায় মাতবার মত হ'য়ে আনন্দকে নিঃশেষে পান করতে চায়। নৈশ জীবনের এই ছবি—ইহার ভাল দিক। এই সব কাফেতে এরা বন্ধুত্ব পাতায়, এখানেই নর ও নারী প্রেমে পড়ে—এখানে আজীবন ভালবাসার বীজ উপ্ত হয়। রাত দুটায় সময় বাসায় ফেরা গেল। ফডর আমার জন্য প্রায় দু তিন টাকা খরচ করল, একটু লজ্জা বোধ হ'ল, কিন্তু ওর আতিথেয়তার অসম্মান করতে সাহস হ'ল না। ওরা দুই বন্ধু আমাকে হোটেলে দিয়ে বাসায় ফিরল।

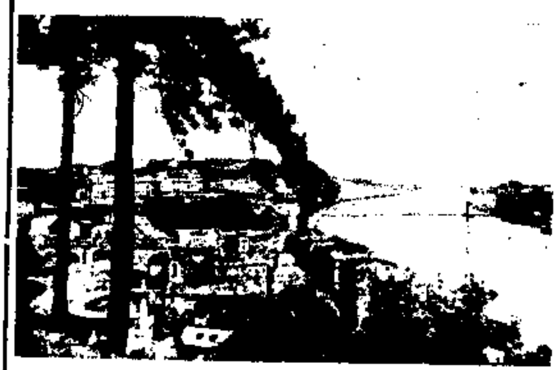
বুডাপে



পার্লামেন্ট



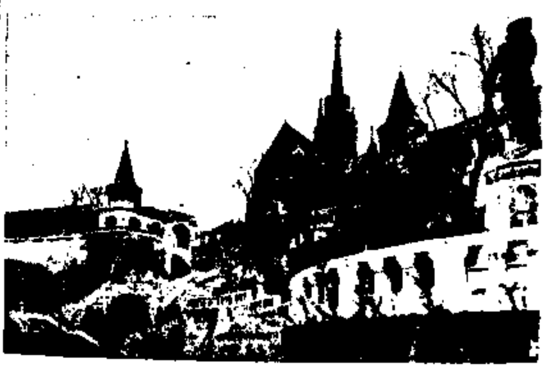
রাজপ্রাসাদ



বুডা ও ডানিয়ুব নদী



পেস্ত সহর ও যুবরাজ ইউজেনের স্মৃতিস্তম্ভ



ফিসারম্যানস্ ব্যাসটিয়ন



লিবার্টি স্কোয়ার

রবিবার। উঠলাম প্রায় সাড়ে আটটায়। গতদিনের নৈশবিহারে শরীর অবসন্ন। আহারাদি করে এগারটার সময় ডাঃ মরলানের কাছে গেলাম। তিনি সঙ্গে করে বয়স্কাউটদের চিঠিপত্রের প্রদর্শনী দেখাতে নিয়ে চল্লেন। ছেলে মেয়েরা বিদেশের ছাত্র ছাত্রীদের লেখনী-বন্ধু পাতিয়ে চিঠিপত্র লেখে—সেই সব চিঠিপত্রের একত্র সম্মেলন।

ছাত্র ছাত্রীদের সংখ্যা বেশী নয়, আয়োজনও যৎসামান্য। কিন্তু দেখলাম পৃথিবীর নানা দেশের ছেলে মেয়েদের সাথে এখানকার ছাত্র ছাত্রীদের প্রীতিপত্র বিনিময় হচ্ছে। ভারতীয় কয়েকখানি চিঠিও ছিল।

এই কল্পনাটি চমৎকার। বিশ্ববোধ বাড়াতে হ'লে চাই সত্যিকার পরিচয়। চিঠিপত্রের মাঝ দিয়ে যখন দেশ-দেশান্তরের কিশোর ও কিশোরীরা বুঝবে যে ভাষা বা দেশের আড়াল কিছু নয়—একই মানব-ধর্ম্ম মানুষকে পরস্পরের নিকট-বন্ধু করে, তখন মানুষের ভবিষ্যৎ সত্যই শান্তিময় হবে।

যুদ্ধের পিছনে আছে ঘৃণা এবং বিদ্বেষ—বিজয়-পিপাসা এবং লালসা—সত্যিকার পরিচয়ে যখন আড়াল ভাঙবে তখন তরুণদের মন থেকে যুদ্ধের প্রতি আন্তরিক টান একদম শেষ হবে।

এখান থেকে বার হ'য়ে এদের চারুশিল্প ভবনে (Fine Arts Museum) দেখতে গেলাম। চিত্র ও ভাস্কর্য্যের আয়োজন অসামান্য—সজ্জাও সুনিপুণ ও সুশৃঙ্খল। অনেকগুলি গ্রীক ভাস্কর্য্যের নিদর্শন মুগ্ধ করল।

তার পর এদের সিটি পার্কে স্কেটিং দেখলাম। বরফ-ছাওয়া একটি মাঠের উপর স্কি পরে তরুণ ও তরুণীরা স্কেটিং করছে—এতে আমোদ আছে যথেষ্ট। তার পর বালির্ণের টায় বসে একটি বায়গায় মধ্যাহ্ন ভোজন শেষ করে নেওয়া গেল।

মেট্রোয় সিনেমা টাকি দেখলাম। মন্দ নয়, ছোট ছেলেদের অভিনয়ে বেশ নূতনত্ব ও চাতুর্য্যের পরিচয় পাওয়া যায়। গল্পটিতে অবশ্য অনেক আজগুবি বাজে জিনিষ জড়ানো হয়েছে, সেটি আমার ভাল লাগল না।

সিনেমার পর অধ্যাপক গার্মেনিউসের বাড়ীতে গেলাম। তিনি আমাকে এদের সাংবাদিকদের আড্ডায় নিয়ে চল্লেন। বিশ্ববিখ্যাত গল্প-লেখকের সঙ্গে আলাপ হ'ল—ইনি ইংরেজী জানেন না। অধ্যাপক গার্মেনিউস অনুবাদকের কাজ করলেন।

তিনি কৃষকদের জীবন নিয়ে তার গল্পের প্লট তৈরী করেন। কথায় কথায় জাতিভেদের কথা উঠল। তিনি বললেন, "য়ুরোপে নামেই জাতিভেদ নেই—কাজে খুব আছে—মানুষে মানুষে রয়েছে আকাশ-পাতাল প্রভেদ।"

তার পর য়ুরোপের অবস্থার কথা উঠল—বল্লেন, "য়ুরোপে মানুষ আশাহীন হ'য়ে উঠছে—এরা জানে না কোথায় মুক্তি ধনিকের দাস হ'য়ে য়ুরোপের মনীষা আজ পথভ্রান্ত—"

বললাম, "ভারতের আধ্যাত্মিকতা হয় ত আপনাদের মুক্তি দিতে পারে।"

উত্তর দিলেন, "না, ভারতবর্ষের আধ্যাত্মিকতা য়ুরোপে চলবে না—য়ুরোপ তার কর্ম্ম-চঞ্চল গতির পথেই ছুটবে, জানে না—কেউই জানে না কোথায় মুক্তি। দুঃসহ কিন্তু ভারতীয় চিন্তাধারার জাড্য য়ুরোপের জন্য নয়—"

চুপ করলাম। গার্মেনিউস অনেকের সঙ্গে আলাপ পরিচয় করালেন।

এই দরদী বন্ধুর নিকট বিদায় নিয়ে সকাল সকাল হোটেলে ফিরলাম। বন্ধু লিখে দিলে, Beauty and goodness is the aim of human life, সুন্দর ও শিবের এই সাধনা বন্ধুর জীবনে সার্থক হয়েছে।

পরদিন সকালে উঠে দেখি—রাস্তাঘাট, তরুলতা সব সাদা বরফে ছাওয়া, অবশ্য লতার দেখা পাই নি। নদীর জল জমে না। পেঁজা তুলার মত বরফ নদীর তীরে তীরে অপূর্ব্ব শোভা রচনা করে। শৈলশিখরে, পথে ঘাটে তুষার-রাশি।

মিউনিক পাড়ি দিতে হবে—গাড়ী সাড়ে আটটায়। সময় বলছে, ওগো বসলে চলবে না—ওঠো, জাগো, ছোটো, ভাবের জল্পনার অবসর নেই। ব্রিটানিয়া হোটেলে যে ফটোগ্রাফার দাম নিয়েছিল আজ ডাকে তার ছবি পেলাম। হোটেল থেকে সুন্দর কারুকার্য্যখচিত কয়েকটি কাঠের ছোট কৌটা নিলাম।

মিউনিক যাব রাত দশটায়। মুসাফির আবার দীর্ঘ পথ পাড়ি দেবে।

কিন্তু বিদায়-বেলায় চোখ সজল হ'য়ে উঠল। বহুদিন পরে এখানে যেন আত্মীয়ের দরদ ও ভালবাসা পেয়েছিলাম। কডর লিখেছিল, "তুমি হাঙ্গেরী ছেড়ে যাওয়ার সময় মনে রাখবে যে হাঙ্গেরীয়রা অতিথিবৎসল, একথা সর্ব্বতোভাবে সত্য।"

গাড়ী চলল। পিছনে রইল শতাব্দীর স্মৃতির তাজমহল বুডা। ডানিয়ুবের উজ্জ্বল জলধারা বয়ে চলছে, সে হয় ত ক্ষণিকের অতিথির কথা স্মরণ করে না, কিন্তু ক্ষণিকের বন্ধু তার স্মৃতিকে বুকের মাণিক করে রেখেছে।

বাঙ্গালার কথা*

—৺নিখিলনাথ রায়

জমীদারগণের দুর্দ্দশা

মুর্শিদকুলীখাঁর সময়ে বাঙ্গালার জমীদারগণের অত্যন্ত দুর্দ্দশা ঘটিয়াছিল। হিন্দু ও পাঠান রাজত্বকালে যে বার ভুঁইয়ার কথা তোমরা শুনিয়াছ, অধিকাংশ স্থলে তাঁহারাই খাজানা রাজস্ব আদায় করিয়া রাজা বা শাসনকর্ত্তাকে কিছু কিছু প্রদান করিতেন। দুই এক স্থলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জমীদারের হস্তেও রাজস্ব আদায়ের ভার ছিল। মোগল রাজত্ব কালে ভুঁইয়া প্রথার অবসান হইলে সর্ব্বত্রই জমীদারী প্রথার প্রচলন হয়। তোদোড়মলের বন্দোবস্ত হইতেই তাহা আরম্ভ হইয়াছিল। জমীদারদের মধ্যে কতক বড় ও কতক ছোট জমীদারও ছিলেন। মুর্শিদ-কুলীখাঁ যে সময়ে দেওয়ান নিযুক্ত হইয়া আসেন, সে সময়ে বাঙ্গালায় রাজস্ব আদায়ের অনেক গোলযোগ ঘটিতেছিল। তাহার কিছু পূর্ব্বে সভাসিংহের বিদ্রোহে জমীদার ও প্রজার অনেক ক্ষতি হইয়াছিল। জমীদারেরা রাজস্ব প্রদানে ত্রুটী করিতেছেন দেখিয়া কুলীখাঁ অনেক জমীদারের হস্ত হইতে জমীদারী লইয়া কতকগুলি আমীনকে তাঁহার রাজস্ব আদায়ের ভার দেন। জমীদারদের ভরণ-পোষণের জন্য কিছু কিছু বৃত্তি নির্দ্দিষ্ট হয়।

কুলীখাঁ নবাব নাজিম হইয়া জমীদারদিগকে আরও পীড়ন করিতে আরম্ভ করেন। যাঁহাদের রাজস্ব বাকী ছিল, তাঁহাদিগকে কারারুদ্ধ করিয়া রাখা হইত। নবাবের কোন কোন কর্ম্মচারী জমীদারদের উপর যারপরনাই অত্যাচার করিত। এইরূপ শুনা যায় যে, একটী আবর্জ্জনা-পূর্ণ গর্ত্তের বৈকুণ্ঠ নাম দিয়া নবাবের কর্ম্মচারীরা জমীদারদিগকে তাহার মধ্যে ফেলিয়া দিত। কুলীখাঁর পর তাঁহার জামাতা, সুজাউদ্দীন মহম্মদ খাঁ নবাব নাজিম হইয়া জমীদারদিগের দুর্দ্দশা মোচন করেন। তাঁহার সময়ে অনেকের কারাবাস ঘুচিয়া যায়। সুজাউদ্দীন জমীদারদের রাজস্বও কতক কমাইয়া দিয়াছিলেন।

মুর্শিদকুলীখাঁ বাঙ্গালার রাজস্বের আবার নূতন বন্দোবস্ত করেন। তিনি সরকারগুলিকে তের ভাগে বিভক্ত করিয়া তাহাদের চাকলা নাম দেন। পরগণার সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া ১৩৫০ হইতে ১৬৬০ করা হয়। তাঁহার সময় ১,৪৫,৪৭,০৮৩৲ টাকা বাঙ্গালার রাজস্ব স্থির হয়। কুলীখাঁর জমা বন্দোবস্তের কাগজকে 'জমা-কামেল-তুমারী' বলে। সুজাউদ্দীন জমীদারীর রাজস্ব কমাইয়া কিন্তু কতকগুলি রাজকর বসাইয়া ১,৬৪,১৮,৫১৩৲ টাকা জমা নির্দ্দেশ করেন। কুলীখাঁ ও সুজাউদ্দীনের সময় ২৪টী বড় জমীদারী ও ২১টী ক্ষুদ্র জমীদারীর পত্তন হইয়াছিল। বড় জমীদারীর মধ্যে বর্দ্ধমান, রাজসাহী, দিনাজপুর ও নদীয়াই প্রধান। রাজা কীর্ত্তিচাঁদের সহিত বর্দ্ধমান, নাটোরের রাজা রামজীবনের সহিত রাজসাহী, রাজা রামনাথের সহিত দিনাজপুর এবং কৃষ্ণনগরের রাজা রঘুরামের সহিত নদীয়া জমীদারীর বন্দোবস্ত হয়। ইহারা পুরুষানুক্রমে ঐ সকল জমীদারী ভোগ করিয়া আসিতেছেন। মুসলমান আমলে কিন্তু এক এক জনের মৃত্যুর পর তাঁহার উত্তরাধিকারীকে জমীদারীর নূতন সনন্দ বা অনুমতি পত্র লইতে হইত। ইংরেজ আমলে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পর আর সেরূপ সনন্দ লইতে হয় না।

সীতারাম রায়

জমীদারদের প্রতি নবাব মুর্শিদকুলীখাঁর কঠোর ব্যবহারে বাঙ্গালার দুইজন জমীদার তাঁহার বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিয়াছিলেন। একজন ভূষণার জমীদার রাজা সীতারাম রায়, আর একজন রাজসাহীর জমীদার রাজা উদয়নারায়ণ রায়। সীতারাম অত্যন্ত পরাক্রান্ত রাজা ছিলেন। প্রতাপাদিত্যের পর তাঁহার ন্যায় বীরপুরুষ বাঙ্গালীর মধ্যে আর কেহ জন্মিয়াছিলেন কি না সন্দেহ। উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থ বংশে সীতারামের জন্ম হয়। তাঁহার পূর্ব্বপুরুষেরা মোগল সরকারে কাজ করিতেন। ক্রমে ক্রমে তাঁহারা কিছু ভূ-সম্পত্তির অধিকারী হন। সীতারামের পিতা উদয়নারায়ণ দাস খাস বিশ্বাস যশোর জেলার

---

* সুকুমারমতি বালকগণের শিক্ষার জন্য সুপ্রসিদ্ধ ইতিহাস-বিদ্ পণ্ডিতপ্রবর স্বর্গীয় নিখিলনাথ রায় মহাশয় একখানি পুস্তক লিখিয়াছিলেন। প্রথম ও দ্বিতীয় বৎসরের "বঙ্গশ্রীতে" ইহার পূর্ব্বার্দ্ধ বাহির হইয়াছিল। অবশিষ্টাংশ আমরা "বঙ্গশ্রীতে" কয়েকটী প্রবন্ধে বাহির করিতে মনস্থ করিয়াছি।

বঙ্গশ্রী-সম্পাদক।

মধুমতী নদীর তীরে হরিহর নগরে বাস করেন। সীতারাম বাল্যকাল হইতেই অশ্বারোহণে, লাঠি খেলায় ও অস্ত্রবিদ্যায় দক্ষ হইয়া উঠেন। তিনি ঐ অঞ্চলের অত্যাচারী পাঠান ও চোর ডাকাতদিগকে দমন করিয়া মোগল সরকার হইতে কোন কোন পরগণার জায়গীর লাভ করিয়াছিলেন। চোর ডাকাত দমন করিয়া তিনি অত্যন্ত খ্যাতি লাভ করেন। সে জন্ত তাঁহার নামে এইরূপ অনেক গ্রাম্য কবিতা রচিত হইয়াছিল।

"ধন্ত রাজা সীতারাম বাঙ্গলা বাহাদুর।
যার বলেতে চুরি ডাকাতি হয়ে গেল দূর॥"
(এখন) বাঘ মানুষে একই ঘাটে সুখে জল খাবে।
রামী শ্যামী পোঁটলা বেঁধে গঙ্গা স্নানে যাবে॥"

সীতারাম ক্রমে ক্রমে অনেক জমীদারী লাভ করেন এবং একটি বিস্তৃত রাজ্যের অধীশ্বর হন। তাঁহার রাজ্য মধ্যে চুরি ডাকাতি ত নিবারিত হইয়াছিল, এমন কি মগ ফিরিঙ্গীর অত্যাচারও ঘটিতে পারিত না। হিন্দু মুসলমান ভাই ভাই-এর মত মিলিয়া মিশিয়া তাঁহার রাজ্যে বাস করিত।

"রাজাদেশে হিন্দু বলে মুসলমান ভাই।
কাজে লড়াই কাটাকাটির নাহিক বালাই॥
হিন্দু বাড়ীর পিঠে কাশন মুসলমান খায়।
মুসলমানের রাম পাটালি হিন্দুর বাড়ী যায়॥
রাজা বলে আল্লা হরি নহে দুই জন।
ভজন পূজন যেমন ইচ্ছা করুক সে তেমন॥
মিলে মিশে থাক সুখে তাতে বাড়ে বল।
ডরেতে পালায় মগ ফিরিঙ্গীরা খল॥
চুলে ধরে নারী লয়ে চড়তে নারে নায়।
সীতারামের নাম শুনিয়ে পলাইয়ে যায়॥"

হরিহর নগরের নিকট সীতারাম তাঁহার রাজধানী স্থাপন করিয়া তাহার মহম্মদপুর নাম দেন। এইরূপ শুনা যায় যে, কোন মুসলমান ফকীরের নামে তিনি রাজধানীর ঐরূপ নাম দিয়াছিলেন। রাজধানীতে দুর্গ নির্ম্মাণ ও তাহাতে এবং তাহার নিকট সীতারাম অনেক দীঘী, পুষ্করিণী খনন ও মন্দিরের প্রতিষ্ঠা করেন। ১৬০০ হস্ত দীর্ঘ ও ৬০০ হস্ত প্রস্থ রামসাগর নামে সুবৃহৎ দীঘী ও লক্ষ্মীনারায়ণ শিলার মন্দির প্রভৃতি আজিও তাঁহার কীর্ত্তি ঘোষণা করিতেছে। সীতারাম যেরূপ বীর ছিলেন সেইরূপ ধর্ম্মপ্রাণও ছিলেন।

"প্রত্যক্ষ সাক্ষী দেখ রাজা সীতারাম।
দেবের সমান হইল শুনি কৃষ্ণ নাম॥
রাজা হক্যা রাজপাট সব দিল ছাড়ি।"

পরাক্রমে, প্রজাপালনে, ধর্ম্মপ্রাণতায় সীতারাম সকলের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছিলেন। লোকে তাঁহাকে দেবরাজ ইন্দ্রের সহিত তুলনা করিত।

"ভাস্করে উদয় ভাস উদয়নারায়ণ দাস
তনয় রাজেন্দ্র সীতারাম।
গুণেন্দ্র দেবেন্দ্র তথি ভূ-অধিপতি
ভুবনে ভূষিত গুণগ্রাম॥"

যিনি এই সকল গুণে ভূষিত তিনি অবশ্য স্বাধীনতার রসও আস্বাদন করিতে ইচ্ছা করেন। তাই সীতারাম ক্রমে ক্রমে স্বাধীনতাকে বরণ করিয়া লইলেন। তাঁহার রাজ্য ভূষণা ফৌজদারীর মধ্যে ছিল। সেই সময়ে আবু তোরাপ নামে বাদশাহের এক আত্মীয় ভূষণার ফৌজদার ছিলেন; ভূষণা মহম্মদপুরের নিকটে নদীর পরপারেই অবস্থিত। ফৌজদার আবু তোরাপের সহিত নবাব মুর্শিদকুলী খাঁর সেরূপ বনিবনাও ছিল না। সীতারাম সেই সুযোগে স্বাধীনতা অবলম্বনের চেষ্টা করেন। মুর্শিদের জমীদারদের প্রতি অত্যাচারও তাঁহাকে স্বাধীনতা অবলম্বন করিতে প্রবৃত্ত করে। আবু তোরাপও অত্যাচারী ছিলেন বলিয়া শুনা যায়। ফৌজদার সীতারামের নিকট রাজস্ব চাহিলে তিনি তাহা আর দিতে স্বীকৃত হইলেন না। আবু তোরাপ সে কথা নবাবকে লিখিয়া পাঠাইলেন। নবাবের উত্তর আসিতে বিলম্ব হওয়ায় ফৌজদার পীর খাঁ নামে একজন সেনাপতিকে সীতারামের বিরুদ্ধে পাঠাইয়া দেন। ফৌজদার নিজেও তাঁহার পিছে পিছে গমন করেন। আবু তোরাপ সীতারামের লোকজনের হস্তে নিহত হন। কেহ কেহ বলেন যে ফৌজদারের শিকার করার সময় তাঁহাকে গুপ্তভাবে হত্যা করা হয়। আবার তিনি যুদ্ধে নিহত হইয়াছিলেন বলিয়া কেহ কেহ বলিয়া থাকেন। সীতারাম ভূষণা অধিকার করিয়া লন।

ফৌজদারের মৃত্যু শুনিয়া নবাব মুর্শিদকুলিখাঁ আপনার আত্মীয় বক্স আলিখাঁকে ফৌজদার নিযুক্ত করিয়া পাঠান।

তাঁহার সহিত সংগ্রাম সিংহ ও দয়ারাম রায় সৈন্যের ভার লইয়া আসেন। দয়ারাম রাজসাহীর দীঘাপতিয়া রাজবংশের আদি পুরুষ। তিনি নাটোর রাজবংশের দেওয়ান ছিলেন। ইঁহাদের সহিত সীতারামের রীতিমত যুদ্ধ বাধিয়া গেল। সীতারামের দুর্গে যে সকল কামান ছিল তাহা গর্জ্জন করিয়া উঠিল। ফৌজদারের সৈন্যেরা সহজে দুর্গ অধিকার করিতে পারিল না। একদিন সীতারামের প্রধান সেনাপতি রামরূপ ঘোষ বা মেনাহাতী প্রাতঃকালে কুয়াশার মধ্যে যখন নগর পরিদর্শন করিতেছিলেন, অমনি দয়ারামের পরামর্শক্রমে তাঁহাকে শূলবিদ্ধ করা হয়। পরে তাঁহার মস্তকচ্ছেদন করিয়া নবাবের নিকট পাঠাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। এইরূপ শুনা যায় যে, নবাব সেই বীরপুরুষের মুণ্ড দেখিয়া বলিয়াছিলেন যে, তাহাকে জীবিত আনিতে পারিলে তিনি সুখী হইতেন। মেনাহাতীর মৃত্যুর পর সীতারামের উৎসাহ ভঙ্গ হয়। বহুসংখ্যক নবাব সৈন্যের নিকট তিনি অবশেষে পরাজিত হন। তাঁহাকে ধৃত করিয়া মুর্শিদাবাদে লইয়া যাওয়া হয়। সেখানে কারাগারে তিনি প্রাণ ত্যাগ করেন।

রাজা উদয়নারায়ণ

এইবার তোমাদিগকে রাজসাহীর রাজা উদয়নারায়ণের কথা বলিতেছি। সে সময়ে সাঁওতাল পরগণা, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ ও পদ্মার অপর পারে বহুদূর লইয়া রাজসাহী জমীদারী বিস্তৃত ছিল। উদয়নারায়ণ তাহার জমীদার ছিলেন। রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ বংশে তাঁহার জন্ম হয়। তাঁহাদের লালা ও রায় এই দুই উপাধি ছিল। মুর্শিদাবাদের বড়নগরে রাজা উদয়নারায়ণের রাজধানী ছিল। সাঁওতাল পরগণার বীরকিটী নামক স্থানেও তিনি আপনার বাসভবন ও তাহার নিকট জগন্নাথপুরে গড় নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। উদয়নারায়ণ প্রথমে মুর্শিদকুলীখাঁর অনুগ্রহ লাভ করিতে পারিয়াছিলেন। তাঁহার হস্তে রাজসাহী জমীদারীর ভার অর্পিত হয়। রাজস্ব আদায়ের জন্য কুলীখাঁ গোলাম মহম্মদ ও কালিয়া জমাদার নামে দুইজনকে উদয়নারায়ণের সাহায্যের জন্যও পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। তাহাদের সাহায্যে রাজা উদয়নারায়ণ তাঁহার বিস্তৃত জমীদারী হইতে রাজস্ব আদায় করিতেন। মুর্শিদকুলীখাঁ যে সময়ে জমীদারদের প্রতি কঠোর ব্যবহার আরম্ভ করেন, উদয়নারায়ণ সে সময়ে তাঁহার হস্ত হইতে নিস্কৃতি লাভের অভিপ্রায়ে স্বাধীনতা অবলম্বন করিতে ইচ্ছুক হন। এদিকে নবাব ও উদয়নারায়ণের দিন দিন ক্ষমতা বৃদ্ধি হইতেছে দেখিয়া তাঁহাকে দমন করিতে অভিপ্রায় করেন।

গোলাম মহম্মদের সৈন্যগণের অনেক দিন হইতে বেতন বাকী ছিল। তাহারা রাজস্ব আদায় করিয়া তাহা হইতে বেতন লওয়ার অভিপ্রায়ে প্রজাদের প্রতি অত্যাচার আরম্ভ করে। রাজা উদয়নারায়ণ তাহার কোনরূপ প্রতিকার করেন নাই। নবাবের নিকট এ-সংবাদ পঁহুছিলে এবং রাজসাহী জমীদারীর রাজস্বও বাকী থাকায় নবাব উদয়নারায়ণ ও গোলাম মহম্মদকে দমন করিবার জন্য মহম্মদ জান ও লহরী মাল নামে দুইজন সেনাপতিকে পাঠাইয়া দেন। তাঁহাদের সহিত কৃষ্ণনগরের রাজার পুত্র রঘুরামও গিয়াছিলেন। উদয়নারায়ণ সে সময়ে বীরকিটীতে ছিলেন। গোলাম মহম্মদ জগন্নাথপুরের গড়ে সসৈন্যে নবাব সৈন্যের অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। গড়ের নিকট মুণ্ডমালা বা মুড়মুড়ের ডাঙ্গা নামক স্থানে দুই পক্ষের মধ্যে যুদ্ধ বাধিয়া যায়। যুদ্ধে গোলাম মহম্মদ নিহত ও উদয়নারায়ণের পুত্র সাহেব রাম পরাজিত হন। অবশেষে উদয়নারায়ণ ও তাঁহার পরিবারবর্গকে বন্দী করিয়া মুর্শিদাবাদে লইয়া আসা হয়। সেখানে তাঁহাদিগকে অনেক দিন বন্দী অবস্থায় থাকিতে হইয়াছিল।

সীতারামের ন্যায় উদয়নারায়ণও একজন প্রজাপালক, পরহিতব্রত ও ধর্ম্মপ্রাণ রাজা ছিলেন। তিনিও অনেক দেবদেবীর প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত মদন গোপালের মূর্ত্তি এখনও মুর্শিদাবাদের বড়নগরে দেখিতে পাওয়া যায়। বীরভূম জেলার কনকপুরের প্রাচীন দেবতা অপরাজিতা দেবীর মন্দিরও তিনি সংস্কার করিয়াছিলেন। উদয়নারায়ণের রাজসাহী জমীদারী মুর্শিদকুলীর প্রিয় পাত্র নায়েব কাননগো রঘুনন্দনের ভ্রাতা নাটোরের রাজা রামজীবনের সহিত বন্দোবস্ত করা হয়। সীতারামের জমীদারীরও অনেক অংশ নাটোরের রাজাদের অধিকারে আসিয়া রাজসাহী জমীদারীকে সুবৃহৎ করিয়া তুলিয়াছিল।

জগৎশেঠ

তোমরা জগৎশেঠদের কথা শুনিয়াছ কি না জানি না। সেকালে জগৎশেঠদের ন্যায় ধনবান্ ভারতবর্ষে কেহ ছিল না বলিয়া শুনা যায়। ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে তাঁহাদের গদী স্থাপিত ছিল। সেই সকল গদীতে কোটি কোটি টাকা মজুত থাকিত। তাঁহাদের হীরা, জহরতেরও সীমা পরিসীমা ছিল না। বাদশাহ, নবাব, রাজা, মহারাজা, বণিক্, মহাজন সেই সকল গদী হইতে প্রয়োজন মত অর্থ ঋণ লইতেন। সে কালে প্রবাদ ছিল যে, শেঠেরা ইচ্ছা করিলে ভাগীরথীর মোহনা টাকা দিয়া বাঁধাইয়া দিতে পারিতেন। মহারাষ্ট্রীয়গণ বা বর্গীরা একবার তাঁহাদের মুর্শিদাবাদের গদী লুণ্ঠন করিয়া কেবল দক্ষিণ দেশের দুই কোটি টাকা লইয়া গিয়াছিল। তাঁহারা দক্ষিণ দেশের লোক। সেই জন্ম দক্ষিণ দেশের টাকাই লইয়া গিয়াছিল। ইহাতে তোমরা বুঝিতে পারিবে যে, অন্যান্য দেশেরও কত টাকা তাহাদের গদীতে মজুত ছিল। তাঁহাদের ধন ঐশ্বর্য্যের কথা প্রবাদ বাক্যের ন্যায় সমস্ত ভারতে ছড়াইয়া পড়িত। বাঙ্গালা দেশের তো কথাই নাই।

> "শেঠের বংশের হায়! ঐশ্বর্য্যের কথা
> সমস্ত ভারতে রাষ্ট্র প্রবাদের মত।
> জগৎশেঠের নামে বঙ্গে যথা তথা
> লক্ষ মুদ্রা সরকক।"

তাঁহাদের ক্ষমতাও অপরিসীম ছিল। নবাব দরবারে তাঁহাদের একাধিপত্য ছিল। বাদশাহের দরবারেও তাঁহাদের ক্ষমতা নিতান্ত কম ছিল না। বাঙ্গালার রাজস্ব, বাণিজ্য, মুদ্রা-অঙ্কন প্রভৃতি সকল বিষয়েরই জগৎশেঠদের সম্বন্ধ ছিল। তাঁহাদের পরামর্শে অনেকে বাংলার নবাব হইয়াছেন এবং কাহারও কাহারও সিংহাসনচ্যুতিও ঘটিয়াছে; সুতরাং তাঁহারা যে কিরূপ ক্ষমতাশালী ছিলেন তাহা অবশ্য তোমরা বুঝিতে পারিতেছ। এক্ষণে আমরা তোমাদিগকে সেই জগৎশেঠের বংশের পরিচয় দিতেছি।

ভাগ্যলক্ষ্মীর কৃপায় শেঠেরা অতি সামান্য অবস্থা হইতে ক্রমে ক্রমে কোটি কোটি টাকার অধীশ্বর হইয়াছিলেন। রাজপুতনার যোধপুরের নাগর প্রদেশে শেঠদিগের পূর্ব্বনিবাস ছিল। তাঁহারা জৈনধর্ম্মাবলম্বী। শেঠদিগের আদিপুরুষ হীরানন্দ ভাগ্য পরীক্ষার জন্য পাটনায় আসেন। সেখানে আসিয়া তিনি কিছুই করিতে পারেন নাই। এরূপ শুনা যায় যে, একদিন বিষণ্ণ মনে নগরের বাহিরে বনের মধ্যে প্রবেশ করিয়া হীরানন্দ একটা আর্ত্তনাদ শুনিতে পান। কিছুদূর গিয়া একটী ভগ্ন অট্টালিকা দেখিতে পাইয়া তাহার মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখেন যে একজন বৃদ্ধ মৃত্যু-যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করিতেছে। হীরানন্দ তাহার সেবা করিতে লাগিলেন কিন্তু বৃদ্ধ বাঁচিল না। তাহার মৃত্যু হইল। মৃত্যুকালে বৃদ্ধ হীরানন্দকে গৃহের একটী কোণে অঙ্গুলী সঙ্কেত করিয়া যায়। হীরানন্দ তাঁহার সেই স্থান হইতে প্রচুর ধনলাভ করেন। তাহা হইতে ক্রমে ক্রমে তিনি বিপুল সম্পত্তির অধীশ্বর হন। হীরানন্দ তাঁহার সাত পুত্রকে সাত স্থানে গদী করিয়া দেন। কনিষ্ঠ পুত্র মাণিক-চাঁদ হইতে মুর্শিদাবাদে জগৎশেঠদের উৎপত্তি। ঢাকায় মাণিকচাঁদের গদী ছিল। সেই গদীর সহিত জমীদার, বণিক, মহাজনদিগের সম্বন্ধ থাকায় দেওয়ান মুর্শিদকুলীখাঁর সহিত তাঁহার পরিচয় হয়। তাহার পর মুর্শিদকুলী মুর্শিদাবাদে আসিলে মাণিকচাঁদও সেখানে আসিয়া মহিমাপুরে গদী স্থাপন করেন; কারণ দেওয়ানের সহিতই তাঁহার বিশেষ সম্বন্ধ ছিল। শেঠদিগের দ্বারাই বাদশাহ দরবারে বাঙ্গালার রাজস্ব পাঠান হইত। মুর্শিদাবাদ টাঁকশালেও তাঁহারা কর্তৃত্ব করিতেন। মুর্শিদকুলীখাঁ বাদশাহের নিকট হইতে শেঠ উপাধি আনাইয়া মাণিকচাঁদকে ভূষিত করেন। মাণিকচাঁদের পর তাঁহার ভাগিনেয় ফতেচাঁদ তাঁহার গদীর ও সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হন। ফতেচাঁদই প্রথমে বাদশাহের নিকট হইতে জগৎশেঠ উপাধি লাভ করেন। মুর্শিদকুলীখাঁর দৌহিত্র ও সুজাউদ্দিনের পুত্র সরফরাজখাঁ মুর্শিদাবাদের নবাব হইয়া জগৎশেঠের সহিত অসদ্ব্যবহার করেন। ফতেচাঁদের পৌত্র মহাতপচাঁদ এগার বৎসরের একটী পরমাসুন্দরী বালিকাকে বিবাহ করায় সরফরাজ তাহার সৌন্দর্য্যের কথা শুনিয়া বালিকাকে দেখিতে চান। সম্মানহানি হইবে বলিয়া ফতেচাঁদ তাহাতে সম্মত না হওয়ায় নবাব জোর করিয়া সেই বালিকাকে আনিয়া দেখিয়াছিলেন বলিয়া ফতেচাঁদ তাহার প্রতি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হন। এদিকে সরফরাজ অত্যন্ত অকর্ম্মণ্য হওয়ায় ফতেচাঁদ অন্যান্য প্রধান

কর্ম্মচারীদের সহিত পরামর্শ করিয়া সরফরাজকে সিংহাসনচ্যুত করিতে চেষ্টা করেন। তাঁহারা বিহারের শাসনকর্ত্তা আলিবর্দ্দীখাঁকে মুর্শিদাবাদের সিংহাসন লইবার জন্য আহ্বান করিয়া পাঠান। আলিবর্দ্দীখাঁ সরফরাজের পিতা সুজাউদ্দিনের অনুগ্রহে বিহারের শাসনকর্ত্তা হইয়াছিলেন। তিনি বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া সরফরাজের বিরুদ্ধে আসিয়া মুর্শিদাবাদ জেলায় গিরিয়া প্রান্তরে সরফরাজখাঁকে যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত করিয়া মুর্শিদাবাদের সিংহাসন অধিকার করেন। ফতেচাঁদ প্রভৃতি তাঁহার উপকার করায় আলিবর্দ্দীখাঁ তাঁহাদেরই পরামর্শক্রমে চলিতেন।

ফতেচাঁদের পর তাঁহার পৌত্র মহাতপচাঁদ গদীয়ান এবং 'জগৎশেঠ' উপাধি লাভ করেন। এই সময়ে শেঠ-দিগেরে উন্নতি চরম সীমায় উপনীত হয়। তাঁহাদের গদীতে প্রতি নিয়ত দশকোটি টাকার কারবার চলিত। হীরা, জহরতে তাঁহাদের কোষাগার পরিপূর্ণ থাকিত। জমীদার, মহাজন, ইংরেজ, ফরাসী প্রভৃতি বণিক্‌গণ তাঁহাদের নিকট হইতে টাকা কর্জ্জ লইতেন। আলিবর্দ্দীখাঁ মহাতপচাঁদেরও পরামর্শ গ্রহণ করিতেন কিন্তু তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার দৌহিত্র নবাব সিরাজউদ্দৌলার সহিত জগৎশেঠের বণিবনাও হয় নাই। অবশ্য সিরাজ অতি অল্প সময়ের জন্য সিংহাসনে বসিতে পাইয়াছিলেন। তাঁহাকে সিংহাসনচ্যুত করিবার জন্য যে ষড়যন্ত্র হইয়াছিল জগৎশেঠও তাহাতে যোগ দিয়াছিলেন। কেহ কেহ বলেন যে, সিরাজ জগৎশেঠকে অপমান করায় তিনি তাঁহার উপর ক্রুদ্ধ হন। আবার কেহ কেহ বলেন যে, সিরাজউদ্দৌলা শেঠদিগের প্রতি সদ্‌ব্যবহারই করিতেন। কিন্তু আলিবর্দ্দীর মৃত্যুর পর সিরাজের সময়ে তাঁহাদের ধনসম্পত্তি নিরাপদে থাকিবে না আশঙ্কা করিয়া জগৎশেঠ সিরাজের সেনাপতি মীরজাফর খাঁ প্রভৃতির সহিত যোগ দিয়াছিলেন। সে যাহা হউক, এই ষড়যন্ত্রের ফলে সিরাজদ্দৌলা ইংরেজদের নিকট পরাজিত হইয়া সিংহাসনচ্যুত ও অবশেষে নিহত হন। সে কথা তোমরা পরে শুনিতে পাইবে। সিরাজউদ্দৌলার পর মীরজাফর খাঁ নবাব হইয়া শেঠদিগের সহিত সদ্‌ব্যবহারই করিতেন। কিন্তু তাঁহার জামাতা মীরকাশীম খাঁ মসনদে বসিয়া ইংরেজদের সহিত বিবাদ আরম্ভ করেন এবং জগৎশেঠ প্রভৃতির ষড়যন্ত্রে ইংরেজেরা সিরাজউদ্দৌলাকে পরাজিত করিয়াছিলেন বলিয়া জগৎশেঠ প্রভৃতির উপর ক্রুদ্ধ হন। মীরকাশীম তাঁহাদিগকে মুঙ্গেরে ধরিয়া লইয়া যান ও গঙ্গায় ডুবাইয়া মারেন।

মহাতপচাঁদের পর তাঁহার পুত্র খোমাবচাঁদ জগৎশেঠ হন। তাঁহার দুই একপুরুষ পরে শেঠদিগের গৌরব ও ঐশ্বর্য্য অস্তমিত হয়। এক্ষণে যাঁহারা তাঁহাদের বংশধর বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন, তাঁহারা সামান্য গৃহস্থ মাত্র। তাঁহাদের বিশেষ কোন ধনসম্পত্তি নাই। ইংরেজ সরকারের নিকট প্রার্থনা করিয়া তাঁহারা প্রথমে সামান্য কিছু বৃত্তি পাইতেন। পরে কিন্তু আর কিছুই পান নাই। জগৎ-শেঠদিগের বিরাট বাসভবন এক্ষণে ভগ্নস্তূপে পরিণত। ভাগীরথীও তাহার অনেক অংশ গ্রাস করিয়াছেন।

বর্গীর হাঙ্গামা

এইবার তোমাদিগকে বাঙ্গলায় এক ভীষণ উৎপাতের কথা বলিতেছি। তোমরা ছেলে ভুলান ছড়ায় শুনিয়াছ—

"ছেলে ঘুমাল পাড়া জুড়াল বর্গী এল দেশে।
বুলবুলিতে ধান খেয়েছে খাজনা দিব কিসে॥"

এই বর্গীই বা কি আর তাহারা কি করিয়াই বা এদেশে আসিল সেই কথাই তোমাদিগকে বলিব। বর্গীরা এ দেশে বেড়াইতে আসে নাই, বাঙ্গালার সর্ব্বনাশ করিতেই আসিয়াছিল। কি করিয়া এ দেশে সর্ব্বনাশ করিয়া গিয়াছিল, তাহাও তোমাদিগকে বলিতেছি। তোমরা দাক্ষিণাত্যের মহারাষ্ট্র দেশের রাজা শিবাজীর কথা শুনিয়া থাকিবে। এই শিবাজীই মোগলদিগের সহিত যুদ্ধ করিয়া মহারাষ্ট্র হইতে তাহাদিগকে তাড়াইয়া দিয়াছিলেন। মহারাষ্ট্রীয় বা মারাঠাগণ শিবাজীর পূর্ব্বে হইতেও ছিল। কিন্তু তাহারা প্রায়ই চাষবাস করিত। কেহ কখনও সৈনিক দলে প্রবিষ্ট হইত। শিবাজী মুসলমানদের বিশেষতঃ মোগলদিগের প্রভুত্ব হ্রাস করিবার জন্য মারাঠাদিগকে এক বীর জাতিতে পরিণত করিয়াছিলেন। ক্রমে তাহারা এরূপ প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল যে, সমস্ত ভারতবর্ষ ব্যাপিয়া তাহারা তাহাদের ক্ষমতা বিস্তার করিতে আরম্ভ করে। শিবাজীর পর মারাঠারা

ভিন্ন ভিন্ন দলে বিভক্ত হইয়া যায়। তাহাদের মধ্যে পুণার পেশোয়ারদের ও নাগপুরের ভোঁসলাদের দলই সে সময়ে প্রধান ছিল। পেশোয়ারা প্রথমে শিবাজী-বংশীয়দের মন্ত্রী ছিলেন। ক্রমে তাঁহারা স্বাধীন হইয়া উঠেন। ভোঁসলারাও সেনাপতি হইতে ঐরূপ প্রবল হইয়া উঠিয়াছিলেন। সে সময়ে দিল্লীর মোগল বাদশাহেরা অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়ায় মহারাষ্ট্রীয়েরা সকল দেশের রাজস্বের চতুর্থ ভাগ আদায় করিয়া লইত। তাহাকে 'চৌথ' বলা হইত। বাঙ্গালায় চৌথ আদায় করিবার জন্য তাহারা এ দেশে প্রবেশ করে। মারাঠারা দলে দলে আসিয়া নানারূপ অত্যাচার করিত। 'বারগীর' বা অশ্বারোহীর দল বলিয়া তাহাদিগকে সংক্ষেপে বর্গী বলা হইত। এক্ষণে সেই বর্গীরা এদেশে কিরূপ হাঙ্গামা করিয়াছিল তাহাই বলিতেছি।

গিরিয়ার প্রান্তরে নবাব সরফরাজখাঁকে যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত করিয়া আলিবর্দ্দীখাঁ মুর্শিদাবাদের সিংহাসন অধিকার করিয়াছিলেন, এ কথা তোমরা শুনিয়াছ।

"সুজা খাঁ নবাব সুত সরফরাজ খাঁ।
দেওয়ান আলম চন্দ্র রায় রায় রাঁয়া॥
ছিল আলিবর্দ্দী খাঁ নবাব পাটনায়।
আসিয়া করিয়া যুদ্ধ বধিলেক তায়॥
তদবধি আলিবর্দ্দী হইল নবাব।
মহবদজঙ্গ দিলা পাতসা খেতাপ॥

সিংহাসনে বসিয়া আলিবর্দ্দী নিজের আত্মীয়-স্বজনকে ভিন্ন ভিন্ন স্থানের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করেন। আলিবর্দ্দীর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা হাজী আহাম্মদের তিন পুত্র নওয়াজেস মহম্মদ, সৈয়দ আহাম্মদ ও জৈমুদ্দীনের সহিত তাঁহার তিন কন্যা ঘসেটি বা মিহির উন্নেসা, মায়মানা ও আমীনার বিবাহ হইয়াছিল। আলিবর্দ্দী নওয়াজেসকে ঢাকার ও জৈমুদ্দীনকে পাটনার শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করিলেন। আর সৈয়দ আহাম্মদকে কটক বা উড়িষ্যার শাসনকর্ত্তার ভার দেওয়ায় তাঁহার অভিপ্রায় হয়। উড়িষ্যা কিন্তু তখন পর্য্যন্তও সরফরাজের ভগিনীপতি দ্বিতীয় মুর্শিদকুলীখাঁ অধিকার করিয়া রাখিয়াছিলেন। আলিবর্দ্দী তাঁহাকে উড়িষ্যা হইতে বিতাড়িত করিবার জন্য সেদিকে গমন করেন। মুর্শিদকুলী ও তাঁহার অনুচরগণ যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া দাক্ষিণাত্যে পলাইয়া যান। নবাব সৈয়দ আহাম্মদের পথ পরিষ্কার করিয়া যখন মুর্শিদাবাদের দিকে আসিতেছিলেন, সেই সময়ে নাগপুরের রঘুজী ভোঁসলার সেনাপতি ভাস্কর পণ্ডিত বাঙ্গালার চৌথ আদায়ের জন্য সদলবলে আসিয়া উপস্থিত হন। আলিবর্দ্দীখাঁ চৌথ দিতে সম্মত ছিলেন না। কাজেই মহারাষ্ট্রীয়দের সহিত যে তাঁহার যুদ্ধ বাধিবে তাহা তিনি বুঝিতে পারিলেন। মহারাষ্ট্রীয়েরাও বুঝিল যে সহজে চৌথ আদায় হইবে না। নবাব যখন বর্দ্ধমানের নিকট আসিয়া পঁহুছিলেন, তখন মারাঠারা তাঁহার সৈন্যদিগকে আক্রমণ করিয়া বসিল।

নবাবের সহিত সামান্য কয়েক সহস্র মাত্র সৈন্য ছিল। কিন্তু ভাস্কর পণ্ডিত অসংখ্য সৈন্য লইয়া আসিয়াছিলেন। তাঁহার সেই বর্গী সৈন্য চারিদিক হইতে নবাব সৈন্যকে ঘিরিয়া ফেলিল। নবাব সৈন্য অসীম বিক্রমে তাহাদের সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে মুর্শিদাবাদের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। যাহাতে নবাব সৈন্যেরা কোন স্থানে খাদ্যদ্রব্য না পায়, সেই জন্য বর্গীরা অশ্বারোহণে আগে গিয়া সেই সকল স্থানের শস্য লুটিয়া লইত। কেবল তাহা নহে, গ্রামের মধ্যে প্রবেশ করিয়া ঘর-বাড়ীতে, গঞ্জ-গোলায় আগুন লাগাইয়া দিত এবং গ্রামবাসীর যথাসর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিত। লোকজনের প্রতি অত্যাচারের সীমা-পরিসীমা ছিল না। এমন কি স্ত্রীলোকের প্রতিও অত্যাচার করিতে ছাড়িত না।

"লুটি বাঙ্গালার লোক করিল কাঙ্গাল।
গঙ্গা পার হইল বান্ধি নৌকার জাঙ্গাল॥
কাটিল বিস্তর লোক গ্রাম গ্রাম জুড়ি
লুটিয়া লইল ধন ঝিউড়ী-বহুড়ী॥"

তাহাদের অত্যাচারে গ্রাম ছাড়িয়া সকল লোকে পলাইতে আরম্ভ করিল।

"তবে মঠে লুটিয়া বরগী গ্রামে সাধাএ।
বড় বড় ঘরে আইসা আগুনি লাগাএ॥
তবে সব বরগী গ্রাম লুটিতে লাগিল।
জত গ্রামের লোক সব পলাইল।"

মগ ফিরিঙ্গীর অত্যাচারে যেমন পূর্ব্ববঙ্গের লোকেরা গ্রাম ছাড়িয়া পলাইয়াছিল, এই বর্গীর হাঙ্গামায় সেইরূপ পশ্চিম বঙ্গের লোকেরাও পলাইয়াছিল।

নবাব সৈন্যেরা অগ্রসর হইতে লাগিল বটে, কিন্তু খাদ্যাভাবে তাহারা যারপরনাই কষ্টে পড়িল। কোন স্থানে কিছু না পাওয়ায় তাহারা কলার আটিয়া তুলিয়া সিদ্ধ করিয়া খাইতে লাগিল।

"কলার আইঠা যত আনিল তুলিয়া।
তাহা আনি সব লোকে খায় সিজাইয়া॥
ছোট বড় লস্করে যত লোক ছিল।
কলার আইঠা সিদ্ধ সব লোকে খাইল॥"

তাহাতেও যখন কুলাইল না তখন গাছের পাতা, ছাল, এমন কি পিপীলিকাদি কীট-পতঙ্গও নবাব সৈন্যেরা খাইতে আরম্ভ করিল। সুতরাং তাহাদের কিরূপ অবস্থা ঘটিয়াছিল, তাহা অবশ্যই তোমরা বুঝিতে পারিতেছ।

এইরূপে অনেকগুলি নবাব সৈন্য বর্গীদের হস্তে প্রাণ দিল। সামান্য যাহারা অবশিষ্ট ছিল, তাহারা কোনরূপে কাটরায় আসিয়া উপস্থিত হয়। ইহারা যে বিশেষরূপ বীরত্ব প্রকাশ করিয়া বর্গীদের হস্ত হইতে আত্মরক্ষা করিয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। কাটরায় মুর্শিদাবাদ হইতে খাদ্যদ্রব্য আসিয়া পঁহুছিলে, নবাব সৈন্যেরা তবে আপনাদের প্রাণ রক্ষা করিতে পারিয়াছিল। নবাব কাটোয়া হইতে মুর্শিদাবাদে গেলে বর্গীরা কাটোয়ায় থাকিয়া রাজমহল ও হুগলী পর্য্যন্ত ভাগীরথীর পশ্চিম পারের সমস্ত স্থান অধিকার করিয়া রাখে। নবাবের মুর্শিদাবাদে উপস্থিতির পূর্ব্বে তাহারা মুর্শিদাবাদে প্রবেশ করিয়া জগৎশেঠদিগের কুঠী হইতে দুই কোটী দক্ষিণ দেশীয় মুদ্রা ও আরও অনেক দ্রব্য লুঠিয়া লইয়া যায়।

বর্গীরা কাটোয়ায় বর্ষাকাল কাটাইবার ইচ্ছা করিল। মধ্যে মধ্যে তাহারা নদী পার হইয়া লুঠপাঠ ও শস্যের ক্ষতি করিতে লাগিল। বর্ষার পরে নবাব আলিবর্দ্দীখাঁ তাহাদিগকে আক্রমণ করিতে ইচ্ছা করিলেন। অনেক সৈন্য সংগ্রহ করিয়া তিনি রাত্রিযোগে গঙ্গায় নৌকার সেতু বাঁধিয়া নদী পার হইলেন ও সহসা মহারাষ্ট্রীয়দিগকে আক্রমণ করিয়া বসিলেন। এইরূপ হঠাৎ আক্রমণে মারাঠারা ব্যতিব্যস্ত হইয়া পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল। নবাব তাহাদের পিছে পিছে যাইতে লাগিলেন। বর্গীরা বিষ্ণুপুরের দিকে গিয়া নগরের মধ্যে প্রবেশের চেষ্টা করিলে, বিষ্ণুপুরের রাজা গোপাল সিংহ জল মাদল কামানের সাহায্যে তাহাদিগকে তাড়াইয়া দেন। সেখান হইতে বর্গীরা মেদিনীপুরের নিকট গেলে নবাব সৈন্য তাহাদিগকে আক্রমণ করিয়া উড়িষ্যা হইতে বিতাড়িত করিয়া দেয়। নবাব মুর্শিদাবাদে ফিরিয়া আসেন। ইহার পর আবার রঘুজী ভোঁসলা নিজেই সসৈন্যে বাঙ্গালায় আসিলেন। আবার পুণার পেশোয়া বালাজী রাও চৌথ আদায়ের জন্য উপস্থিত হইলেন। উভয় দলই লুণ্ঠনাদি করিয়া যারপরনাই অত্যাচার করিতে লাগিল। নবাব বালাজী রাওকে কতক অর্থ দিয়া সন্তুষ্ট করিয়া তাঁহাকে লইয়া রঘুজীর দিকে ধাবিত হইলেন। রঘুজীতে বালাজীতে সদ্ভাব ছিল না। নবাব ও বালাজীর সৈন্য আসিতেছে দেখিয়া রঘুজী পলায়ন করিলেন। তাহার পর তিনি আবার সেনাপতি ভাস্কর পণ্ডিতকে পাঠাইয়া দেন। বর্গীরা আবার আসিয়া লুঠপাঠ ও অত্যাচার করিতে লাগিল। তাহাদের এইরূপ আক্রমণে নবাব অত্যন্ত চিন্তিত হইলেন। তিনি অসুস্থ হইয়াও পড়িয়াছিলেন। এক্ষণে কৌশলে তাহাদিগকে তাড়াইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। আলিবর্দ্দীখাঁ ভাস্করের নিকট সন্ধির ভাণ করিয়া তাঁহাকে তাঁহার শিবিরে আসিতে নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠান। বহরমপুরের নিকট মনকরা নামক স্থানে নবাব শিবিরে ভাস্কর ও তাঁহার অনুচরগণ আসিলে, নবাবের ইঙ্গিতে তাঁহার লোকজন ভাস্কর ও তাঁহার কোন কোন অনুচরকে হত্যা করে। অবশিষ্ট যাহারা ছিল তাহারা পলায়ন করিল। অবশেষে বর্গীরা স্বদেশে চলিয়া যায়।

ভাস্করের হত্যার প্রতিশোধ লইবার জন্য আবার রঘুজী নিজে সসৈন্যে আসিলেন। এবার বর্গীদের অত্যাচার চরম সীমায় উঠিল। গৃহদাহ, লুঠপাঠ ত নিত্যই চলিতে লাগিল, তাহার উপর ধনসম্পত্তি বাহির করিয়া দিবার জন্য লোকের নাসা, কর্ণ ও হস্তপদাদি ছেদন আরম্ভ হইল। স্ত্রীলোকদিগের অঙ্গচ্ছেদ করিতে তাহারা ত্রুটী করে নাই। এবার পশ্চিম-বঙ্গ একেবারে জনশূন্য হইয়া গেল। সমস্ত গ্রাম একেবারে শ্মশানে পরিণত হইল। নবাব কি করিবেন ভাবিয়া স্থির করিতে পারিতেছিলেন না। তিনি রঘুজীর নিকট সন্ধির প্রস্তাব করিয়া পাঠাইলেন। রঘুজী অনেক টাকা হাঁকিয়া

বসিলেন। এদিকে নবাবের সেনাপতি আফগান সর্দ্দার মুস্তাফা খাঁ বিদ্রোহী হওয়ায় নবাব বিষম সমস্যায় পড়িলেন। নবাব সৈন্যের সহিত যুদ্ধে মুস্তাফা খাঁর নিধনের সংবাদ পাইয়া নবাব রঘুজীকে আক্রমণ করিতে অগ্রসর হইলেন। কয়েকটী যুদ্ধের পর রঘুজী স্বদেশে চলিয়া যান। নবাব তাঁহার দেওয়ান দক্ষিণ রাঢ়ীয় কায়স্থ-বংশীয় জানকীরামের পুত্র দুর্ল্লভরামকে উড়িষ্যার শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করিয়াছিলেন। দুর্ল্লভরাম শাসনকার্য্যে সেরূপ দক্ষ ছিলেন না। তিনি সাধু-সন্ন্যাসী লইয়া সময় কাটাইতেন। রঘুজীর লোকেরা সাধু সাজিয়া তাঁহাকে ভুলাইয়া ক্রমে তাঁহার হস্ত হইতে উড়িষ্যা অধিকার করিয়া লয়। নবাব তখন মীরজাফর খাঁ ও আতা-উল্লা খাঁ নামক দুইজন সেনাপতিকে উড়িষ্যা অধিকার করিতে পাঠাইয়া দেন। তাঁহারা রঘুজীর পুত্র জনজীর সৈন্যদিগকে পরাজিত করেন। এই সময়ে নবাবের বিদ্রোহী সেনাপতি মুস্তাফা খাঁর অনুচর কয়েকজন আফগান সর্দ্দার বিদ্রোহী হইয়া নবাবের কনিষ্ঠ জামাতা ও সিরাজউদ্দৌলার পিতা বিহারের শাসনকর্ত্তা জৈনুদ্দীনকে নিহত করায় নবাব পাটনার দিকে যাইতে বাধ্য হন। এদিকে দেশে বর্গীদের উৎপাত চলিতে লাগিল। নবাব মুর্শিদাবাদের অধিবাসীদিগকে বর্গীদের হাত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য পদ্মাপারে যাইতে বলিয়া গেলেন। তাঁহার নিজ সম্পত্তি ও পরিবারবর্গও পদ্মাপারে পাঠাইয়া দেন। বিদ্রোহী আফগানদিগকে পরাস্ত ও নিহত করিয়া সিরাজউদ্দৌলাকে পাটনার শাসনকর্ত্তার পদ ও রাজা জানকী-রামকে তাঁহার সহকারী নিযুক্ত করিয়া নবাব আবার মুর্শিদা-বাদে ফিরিয়া আসিলেন। তাহার পর জনজীর সৈন্যদিগের সহিত তাঁহার ক্রমাগত যুদ্ধ চলিতে লাগিল। নবাব সৈন্যের নিকট তাহারা পরাভূত হইয়াও হয় না। নবাব যখন কিছুতেই তাহাদিগকে পারিয়া উঠিলেন না, তখন অগত্যা তাহাদের সহিত সন্ধি করিয়া উড়িষ্যা প্রদেশ মহারাষ্ট্রীয়দিগকে ছাড়িয়া দিলেন ও বাঙ্গালার চৌথ বাবদ বারলক্ষ টাকা দিতে সম্মত হইলেন। এইরূপে বর্গীর হাঙ্গামার অবসান হইল।

বর্গীর হাঙ্গামার অবসান হইল বটে কিন্তু তাহাতে বাঙ্গালার যে দুর্দ্দশা হইয়াছিল তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। পশ্চিম বঙ্গের লোকেরা সর্ব্বস্বান্ত হইয়া ঘরবাড়ী ছাড়িয়া পলাইয়া গিয়াছিল। সমস্ত গ্রাম জনশূন্য, ক্ষেতমাঠ পতিত, আবাদের নাম গন্ধও নাই, তন্তুবায়কুল পলায়িত, বস্ত্র বয়নের চিহ্নও দেখা যায় না, গৃহসকল ভস্মস্তূপে পরিণত, নাসাকর্ণ হস্তপদ ছিন্ন পুরুষ ও স্ত্রীলোকের হাহাকারে পাষাণ হৃদয় গলিয়া যাইত। জমীদারেরা খাজানা পান নাই। বণিক্ মহাজনদিগের ব্যবসায় বাণিজ্যের ক্ষতির সীমা ছিল না। প্রজার এইরূপ দুর্দ্দশা দেখিয়া নবাব তাহাদের দুঃখ মোচনের জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তাঁহার ব্যবহারে সকলেই সন্তুষ্ট ছিল। এমন কি জমীদারেরা খাজনা না পাইলেও বর্গী-দিগকে তাড়াইবার জন্য নবাবকে যথাসাধ্য অর্থদানে ত্রুটী করেন নাই। নবাবের আদেশে আবার প্রজারা নিজ নিজ গ্রামে আসিয়া চাষবাস ও অন্যান্য কার্য্যে মনোনিবেশ করিল। আবার পশ্চিম বঙ্গ ক্রমে ক্রমে জাগিয়া উঠিতে লাগিল। পূর্ব্ব বঙ্গের লোকে মগ ফিরিঙ্গীর অত্যাচারের কথায় এখনও যেমন আতঙ্কিত হইয়া উঠে, পশ্চিম বঙ্গের লোকেরা বর্গীর হাঙ্গামার কথায় সেইরূপ ভাবই প্রকাশ করে। সে যাহা হউক নবাব আলিবর্দ্দীখাঁর চেষ্টায় আবার লোকে পশ্চিম বঙ্গে বাস করিতে পারিয়াছিল। আলিবর্দ্দীখাঁ বাস্তবিকই একজন প্রজাবৎসল নবাব ছিলেন। তাঁহার সময়ে বাঙ্গালী জাতির অনেক উন্নতি হইয়াছিল। সে সময়ে বাঙ্গালীরা কেবল রাজস্ব ও আয়ব্যয় বিভাগে নিযুক্ত হইতেন না, তাঁহারা সেনা-পতি ও শাসনকর্ত্তারও ভার পাইতেন। রাজা জানকীরাম, দুর্ল্লভরাম প্রভৃতির কথা হইতে তোমরা তাহা জানিতে পারিতেছ। তখনও বাঙ্গালী দুর্ব্বল বা ভীরু ছিল না।

ঘুম

—শ্রীঅমূল্য গুপ্ত

শীতের কুয়াশায় পৃথিবী বিভীষিকার মতো ছম্ ছম্ করে। পৃথিবী নিস্তব্ধ, নিথর, কোথাও সাড়া-শব্দ নাই। পথ-ঘাট অন্ধকার, জনমানব শূন্য। পৃথিবী ঘুমাইতেছে। অদূরে মিলের বিরাট চিমনী ধোঁয়া বিবর্জ্জিত। রবিবারে রাতের ডিউটীতে কেহ আসে নাই। হাহাকার করে কারখানা। সেও ঘুমন্ত। তার পাশে এধারে ওধারে শ্রমিকদের আস্তানা। অনেক লোকের বসতি, কিন্তু জাগিয়া নাই কেহ। কোথাও সামান্য স্পন্দন নাই, আলো নাই। আছে তিক্ত কুয়াশার ছবি ও শীতের আমেজ ভাব।

কুয়াশার জীবনীশক্তি নষ্ট হয় সময়ের ব্যবধানে।

আস্তে আস্তে ঘুমন্ত পৃথিবীর সজীবতা ফিরিয়া আসে। মাঝে মাঝে রিক্সার ঠন্ ঠন্ আওয়াজ, ময়লাবাহী গাড়ীর ভক্ ভক্ শব্দ, ড্রেনে ঝাড়ুদারের ব্রুসের একটানা পচ্ পচ্ শব্দ, মেথরের গাড়ী ঘড়াঙ্ ঘড়াঙ্ করিয়া গলির মধ্যে মিলাইয়া যায়। পথে জল দিতে দিতে কেহ কেহ ফিস্ ফিস্ করিয়া কথা কহে। পৃথিবী জাগৃত, এ তারি সূচনা। এরা যেন বলে: ওগো জাগো।

এ ডাক্ প্রায় সবার কানে পৌছায়, কিন্তু ঘুমের জড়তা কাটে না। এপাশ ওপাশ ফিরিয়া লেপ কাঁথা গায়ে টানিয়া দেয় তারা, উঠিতে মন চায় না। ভাবে আর একটু পরে উঠিবে। ঘুমের জড়তায় আবার ঘুমাইয়া পড়ে অনেকেই। ক্ষতি হয়, কিন্তু ভুল করে সবাই।

সংসার আছে, কাজও কম নয়। একের কী বহর। চা করা, ঘর-দোর মাজা ঘসা, স্বামীর মন রাখা, বিছানা তোলা, স্নান করা, ছেলেপুলেদের খাবার করা, শ্বশুর শাশুড়ীর পরিচর্য্যা করা, আরও কত কী! সৃষ্টিছাড়া পৃথিবীর অপূর্ব্ব কর্ম্মতালিকা। আলস্য করিয়া বড়জোর কিছু সময় আড়মোরা দেওয়া যায়, উঠিতে হয় সবাইকে।

অমিতাও জাগিল। তার ঘুমটা একটু বেশী। ঘুমের জন্য স্বামীর কাছে অনেক বকুনি খাইয়াছে। স্বামী বলে সে কলির কুম্ভকর্ণ! এক যায়গায় দুমিনিট চুপ করিয়া বসিলেই সে ঘুমাইয়া পড়ে। একদিন রাঁধিতে বসিয়া উনানের উপর সে পড়িয়া যায়, চারিদিকে কী হাসাহাসি! সে লজ্জায় কারুর কাছে মুখ দেখাইতে পারে নাই কদিন। এটা তার রোগ। কিন্তু উপায় কি? রুগ্ন স্বামীর শয্যায় প্রত্যহ তাকে রাত জাগিতে হয়। যেদিন ঘুমে চোখ বুজিয়া আসিত, সেদিন আঙ্গুল কামড়াইয়া রক্তারক্তি করিত। তবুও মাঝে মাঝে সে ঢুলিত।

অমিতা আড়মোরা দিয়া বিছানায় উঠিয়া বসিল। স্বামীর গায়ে ছেড়া লেপখানা চারিপাশে গুজিয়া দিল সন্তর্পনে। কী জানি, যা হাল্‌কা ঘুম। একবার ভাঙ্গিলে কথা নাই! কাসি, কী জঘন্য রোগ। আরামে মরিতেও দেয় না। সাড়া রাত খক্ খক্ করিয়াছে শিবনাথ। চোখের পাতা মিনিটের জন্য বুজাইতে পারে নাই সে। অমিতার ঘুম দশবার ভাঙ্গিয়াছে। সেও ঘুমাইতে পারে নাই, শিবনাথ ত—

অমিতা আস্তে আস্তে পা টিপিয়া মুক্ত আকাশের নীচে আসিল। দরজার পাশ হইতে ভাঙ্গা বালতিটা নিয়া সদর দরজা খুলিয়া রাস্তায় আসিয়া চারিদিকে তাকায়। ঘুমের জড়তা ও বাইরের কুয়াশা তার চোখের পর্দ্দায় ঘোলাটে আবর্ত্তের সৃষ্টি করিয়াছে। আঁচল দিয়া সে চোখ মুছিল। রাস্তায় দু'একজন লোক চলাচল করিতেছে। শ্রমিকরা কাজ করিতেছে। সূর্য্যদেব এখনও ওঠেন নাই। দূরে দিগন্তে ক্ষীণ আলোর রশ্মি দেখা দিয়াছে।

'না, বড্ড দেরী হ'য়েছে', অস্ফুটস্বরে অমিতা কহিল। তাড়াতাড়ি সে রায়েদের পড়ো মাঠটার দিকে অগ্রসর অগ্রসর হইল। মাঠটা কুয়াশায় আচ্ছন্ন। অমিতায় শীত করিতেছে, যা ফুর ফুর করিতেছে বাতাস! আঁচলটা বেশ করিয়া গায়ে সে জড়াইয়া দিল। মাঠে আসিয়া সে তৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেলে। নির্জ্জন সে, অমিতা আঁচলটা শক্ত করিয়া শরীরে আঁটিয়া দিল। কতগুলি গরু ঘুমাইতেছে। ওদের কী আরাম! যত সময় ইচ্ছা ঘুমাইতে পারে।

অমিতার হিংসা হয়। তার মত এদের রাতে জাগিয়া থাকিতে হয় না। কিন্তু এ কী! বিস্ময়ে অমিতা চারিদিকে তাকায়। অস্ফুট স্বরে সে কহিল, 'আমার পোড়া কপাল!'

অঘন্ত তার ঘুম। এর জন্ত সে বড্ড দেরী করিয়া উঠিয়াছে। কণামাত্র গোবর অবশিষ্ট নাই। কে যেন চুরি করিয়াছে। সত্যই এ চোরের কাজ। স্বামীর অসুখের সময় হইতে সে মাঠের গোবর কুড়ায়, রায়েরা অনুমতি দিয়াছে। এমন দেরী সে প্রায়ই করে।—কিন্তু আজ? চোখ তার ঝাপসা হয়। অব্যক্ত-ব্যথায় কাকে যেন সে মূক ভাষায় তিরস্কার করে—অভিসম্পাত করে চৌর্য্যবৃত্তির জন্ত। কী হইবে? বিকৃত হয় তার মুখ। ইতস্ততঃ গোবর খোঁজ করে। নিষ্ফল। দিন দিন যার অধোগতি তার সুদিন কী আসে? সুদিন! অমিতা হাসে। অসম্ভব। পূর্ব্বে এ আশা ছিল। বুক বাঁধিয়া সে দারিদ্রতার সাথে লড়াই করিয়াছে, একমাত্র পুত্রশোক ভুলিয়া। কিন্তু যেদিন শিবনাথ মিল হইতে আসিয়াই জ্বরে পড়ে, সেদিন তার আশার শেষ রশ্মিও বিলুপ্ত হয়। শুধু কী জ্বর? কাসি—তার সাথে রক্ত। শিবনাথ আর উঠিতে পারে নাই। ক্রমশঃ বিছানার সাথে মিলাইয়া যাইতেছে।

সুদিন! এ-জীবনে তার আর আশা নাই। নিজেরও কোন আকাঙ্খা নাই। একটা আশা করে: স্বামীর ও তার মরণ একই মুহূর্ত্তে। অতি বড় সজ্জনও তার কথায় হাসিবেন, তিরস্কার করিবেন। কিন্তু অমিতার এর চেয়ে বড় কামনা কী থাকিতে পারে? স্বামী নিঃস্ব, রুগ্ন। সেও সংসারের ঘূর্ণীপাকে জর্জ্জরিত। তার কাছে এটা স্বপ্ন ছাড়া আর কিছু নয়। জীবন ভরিয়া ঘুমাইয়া কাটাইতে যে চায়, তার এটা ভাবা কী অন্যায়। সে নিষ্কৃতি চায়। চিরনিদ্রাই তার সহচর হইবে।

অমিতার তন্দ্রাভাব কাটিয়া যায়। তার চোখে জল। বুক ঠেলিয়া ঘন ঘন দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়ে, পা থর্ থর্ করে। বালতিটার দিকে তাকাইতে পারে না সে, তার শূন্যতা তীব্রভাবে বাজে অমিতার। সেও যে ঐ বালতিটার মতই শূন্য। বালতিটা ভারী লাগে। বালতিটা সহন করা তার পক্ষে শক্ত। অবশ হাতে উহার হাতলটা শক্ত করিয়া ধরে। অসমান পদক্ষেপে সে আগাইয়া যায়, কি ভাবিয়া সে ফিরিয়া আসে। কাল হয় ত গরু একটাও আসে নাই। কি ভুল! ওই তো কটা গরু শুইয়া আছে। সে কি দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া ঘুমের ঘোরে স্বপ্ন দেখিতেছে? কি পাগল সে? গোবর তোলার দাগ পর্য্যন্ত সে দেখিয়াছে। কষ্টে হাসি পায় অমিতার, নিজের এই বিভ্রান্তির জন্ত।

এটা তার বিভ্রান্তি নয়,—দারিদ্র্য। খাওয়া-পরা, অষুধপত্র, মায় সংসারের যাবতীয় জিনিষ জোটায় গোবর। গোবর অমিতার ব্যাঙ্কার। ঘরভাড়া দিতে হয় না। বোসেরা একখানা ঘর এমনিই ছাড়িয়া দিয়াছেন। গোবরের কল্যাণে এখনও তাকে ভিক্ষা করিতে হয় নাই। আশেপাশের বাড়ীর লোকেরা অমিতার কাছ হইতে সস্তায় ঘুঁটে কেনে। অমিতা দরদস্তর জানে না, যা পায় তাতেই সন্তুষ্ট থাকে। গড়পড়তা তিন আনা রোজ পায়। এ কী কম সৌভাগ্যের! কিন্তু পাশের ঘরের বৌ প্রায়ই বলে, দিদি তুমি বড্ড বোকা, ওরা কেমন তোমায় ঠকায় বল ত? আমি হ'লে চার আনা ক'রে শ' বিক্রি করতাম। সস্তায় না দিলেই তো পার।

এর চেয়েও সস্তা দামেও যে তাকে দিতে হইত—না দিলেও যে কী, জানিত অমিতা। কিন্তু আজ প্রথম উপলব্ধি করিল, কী হইবে? স্বামীকে কী অনাহারে মারিবে?

* * *

ভারাক্রান্ত দেহটাকে কোনরূপে বাড়ী টানিয়া আনে অমিতা। ভেজান দুয়ার ঠেলিয়া ভিতরে গিয়া সে বিস্ময়ে বিছানার দিকে চায়। ভয়ে তার মুখ বিকৃত হয়। সম্বিত হারাইয়া ফেলে সে। শিবনাথ মলিন শয্যায় হাটু গাড়িয়া বসিয়া আছে। মুখ দিয়া রক্ত পড়িতেছে। মাঝে মাঝে তার শরীর নড়্ নড়্ করিতেছে দু'হাতে মাথা ধরিয়া নিজেকে সোজা করিয়া রাখিয়াছে। অবসাদে শিবনাথ মুখ থুবরাইয়া পড়িয়া গেল। অমিতার চোখের ঘোর কাটিয়া যায়। আর্ত্তকণ্ঠে সে চিৎকার করিয়া উঠিল। শিবনাথকে কোলের উপর শোয়াইয়া আঁচল দিয়া রক্ত

পরিষ্কার করিতে লাগিল শিবনাথ পলকহীন চোখে অমিতার দিকে তাকায়। কি যেন বলিতে চায় সে। ঠোঁট নড়ে, মুখ দিয়া ঘর্ ঘর্ শব্দ ওঠে। আস্তে আস্তে সে অমিতার কোলে এলাইয়া পড়ে। ঘরের মধ্যে কুয়াশার ঘন আস্তরণ সৃষ্ট হয়। কারুর মুখে কথা নাই। পরস্পরে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে, তারা যেন মূক বধির। পৃথিবীর স্পন্দন অনুভব করার শক্তি হারাইয়া ফেলিয়াছে।

খানিক পরে অমিতা তাকে বিছানার এক পাশে শোয়াইয়া দেয়। কাপড় হাতে বাইরে যাইতে যাইতে বলে,

'তুমি নড়া চড়া ক'র না।'

'অমিতা, আর কেন রক্ত ঘাটা-ঘাটি কর? আমি কী বাঁচব?'

'নেও, আর বাজে ব'ক না। আমি ডাক্তার বাবুকে খবর দিচ্ছি। তিনি এলেই সুস্থ হবে, ভয় কী! স্নান সেরে তোমার বুকে মালিশ করে দেব।'

'অমিতা, শান্তিতে মরতে দেও। ডাক্তার বাবুকে ডেক না, আমি বাঁচ—' শিবনাথের গলার স্বর বন্ধ হয় প্রচণ্ড কাসিতে। মুখ দিয়া ভলকে ভলকে রক্ত আবার ঝরিতে লাগিল। অমিতা ছুটিয়া আসিয়া স্বামীর বুকে হাত বুলাইতে লাগিল। তার পাণ্ডুর মুখের দিকে চাহিতে অমিতার ভয় করে। অন্তর অজানা,—জানা ভয়ে শিহরিয়া উঠে। মৃত্যুর কাল ছায়া শিবনাথের উপর নামিয়াছে। সে আর বেশী দিন বাঁচবে না। বিদায়ের ডাক শুনিতে পাইয়াছে, জানায় তার স্তিমিত চোখ আর রক্তহীন চাহনি।

আর একদিন এমনি ভোরে নন্তু জানাইয়া দিয়াছিল: যক্ষায়—রক্ষা নাই। সেদিনও নন্তু বলিয়াছিল: মা, আমি বাঁচব না।

অমিতা বিচলিতা হয় নাই সে দিন, মার কোলে ছেলে মরিতে পারে না। কিন্তু তার শক্তির বাইরে যে একজন সকলকে চালনা করেন, তার হাতে অমিতার পরাজয় হইয়াছিল। নন্তু একদিন ভোরে চলিয়া যায়, থাকে শুধু পুত্রহারার বুকে একটি দীর্ঘ ক্ষত।

অমিতা নন্তুর কথা ভুলিয়াছিল, ভুলিয়াছিল নিজের অকর্ম্মণ্যতার কথা। ছেলের জন্য শোক করার অধিকারও যে তার নাই। খিদায় দু'মুঠো ভাত, সামান্য আলো-বাতাস যে পায় নাই তাকে এর মধ্যে আকড়াইয়া রাখাও যে পাপ। কারুর কাছে প্রকাশ করিতে পারে না সে; শুধু মনের মধ্যে গুমরাইয়া ওঠে তার।

নন্তু মারা যাওয়ার পর পাঁচটা বছর ভাঙ্গা-জোড়ার মাঝে কাটিয়া গিয়াছে। সংসারের কিছু উন্নতিও হইয়াছিল। বেকার শিবনাথ মিলে একটা কাজ পাইয়াছিল। রোজ পাঁচ আনা। শিক্ষিত শিবনাথ মাঝে মাঝে বিদ্রোহ করিত। কিন্তু তার পঙ্গু আত্মা নিস্তেজ হইত: খাবে কি? কিছুদিন পরে সে কানে বিড়ি গুজিয়া বাটলী চালাইত। মাঝে মাঝে সহকর্ম্মীদের সাথে রসিকতা করিতেও লজ্জা করিত না। মোটের উপর শিবনাথ সভ্যিকারের মজুর হইয়াছিল। অমিতার বেশী ঘুমের জন্য অকথ্য ভাষায় বকাবকি করিত। একদিন ঘুমন্ত স্ত্রীর পীঠে জলন্ত বিড়ি ছেকা দিয়া কী না হাসিয়াছিল! কত বড় নিখুঁত রসিকতা করিয়াছে সে, অমিতাও হাসিয়াছিল, কলহ তারা কখন করে না। এইটাই বিস্ময়ের। পরস্পরের নিকট কৃতজ্ঞ তারা। পাড়ার স্ত্রীলোকেরা বলিত, ঘর তো ঘর অমিতার। নন্তু থাক্‌লে কি না হ'ত। না, ওর একটী পোলাপান হোক্।

অমিতা শুনিত। হাসিয়া বলিত: বেশ আছি দিদি। তারা ভাবিত, অমিতা পাগল। পাগল না হইলে মানুষ এত ঘুমায় কি করিয়া। মশার জ্বালায় কেহ কোথায় মিনিটের জন্য বসিতে পারে না, আর সে কি না অঘোরে ঘুমায়। সময় পাইলেই ঘুম। খাইতে বসিয়া যেদিন কারুর সাথে গল্প করে, সেদিন গল্প শুনিতে শুনিতে ঘুমাইয়া পড়ে। কোনদিন পুত্রকে খাওয়াইতে বসিয়া ভুলে নিজের মুখে তুলিয়া সে দিয়াছে। লজ্জা হইত, যখন নন্তু বলিত, 'ও কি মা, মাছটা নিজের মুখে দিলি যে?'

ঘুমের ঘোরে অমিতা অনেক পাগলামি করে, কিন্তু ছেলে না চাওয়া তার পাগলামি নয়। স্বামীর স্বাস্থ্যের জন্যই সে সন্তান চায় না, কারণ নন্তুর অসুখের সময় শিবনাথের দেহ সে পরীক্ষা করাইয়াছিল। ডাক্তার বলিয়াছিল, সাবধানে থাকিতে। ওঁর শরীরে লক্ষণ আছে পুত্রের ব্যাধির। সে কথা শিবনাথকে গোপন করিয়াছে সে।

পুত্র সে চাহে না, কিন্তু ঘুমের ঘোরে কাঁদিত অমিতা। শিবনাথ ঠাট্টা করিত, 'এ দিকে ছেলে চাও না, কাঁদ কেন? অপরের ছেলেদের আদর কর কেন?' অমিতা বলিতে পারিত না, তোমাকে হারাতে চাই না। বালিশে মুখ গুজিয়া পড়িয়া থাকিত।

ক্ষীণ কণ্ঠে শিবনাথ কহিল, 'অমিতা, ভালবাসা কি মৃত্যুর সাথে সাথেই চলে যায়?'

অমিতার সম্বিত ফিরিয়া আসে, বলে, 'না, আমাদের ভালবাসা মরতে পারে না। মনে আছে সেই রাতের কথা? আমি তোমার—তুমি আমার।'

ফুলশয্যার রাতের কথায় শিবনাথের পাণ্ডুর মুখে হাসি ফুটিয়া ওঠে। সেদিন কত কথাই না সে বলিয়াছিল, কিন্তু একটারও উত্তর পায় নাই। ঘণ্টা খানেক তারা চুপ করিয়া ছিল। কারুর মুখে কথা ছিল না। শিবনাথ লজ্জা কাটাইয়া বলিয়াছিল, আজ থেকে আমি তোমার—তুমি আমার। তার পর সে কিছু সময় নীরব থাকার পর বলিয়াছিল অনেক কিছু, কিন্তু তা অমিতার কানে যায় নাই। সে তখন গভীর নিদ্রায় নিমগ্ন। শিবনাথ উত্তেজিত হইয়াছিল তার নিদ্রালুতার জন্য। কিন্তু দুদিনেই ভুল বুঝিতে পারে, এটা তার রোগ—শৈশবের অবহেলার জন্য।

দুজনেই গত জীবনের কথা ভাবে, কারুর কোন স্পন্দন নাই। পাশের ঘরের ছোট ছেলেরা চিৎকার করিতেছে। কেহ অ, আ, ক, খ তারস্বরে পড়িতেছে। তবুও তাদের চিন্তার বিরাম নাই, বিঘ্ন নাই। গতজীবনের কথা ভাবাও যে সুখ। আর কী সেদিন আসিবে।

'দিদি ডাক্তার বাবুকে খবর দেব?' পাশের ঘরের বৌটি দরজায় দাঁড়াইয়া কহিল।

'হাঁ ভাই তোর ছেলেটাকে পাঠিয়ে দে।'

'তুমি তত সময় মালিশ কর,' বলিয়া বৌটি চলিয়া যায়।

'ওঃ ওঃ আর পারি না।' শিবনাথ যন্ত্রণায় আবার ছট্ ফট্ করিয়া উঠিল।

অমিতার খেয়াল হইল, তাই তো এত সময় মালিশ করিলে হয় ত যন্ত্রণা অনেক কমিয়া যাইত। কিন্তু মালিশের শিশি হাতে তুলিয়া সে শিহরিয়া উঠিল। এক ফোঁটাও মালিশ নাই। এখন কি করিবে। শিবনাথও যে সতৃষ্ণ নয়নে মালিশের শিশির দিকে তাকাইয়া আছে। তৃপ্তির আশা তার ওষ্ঠপ্রান্তে। কাল সে ঘুমের ঘোরে স্বামীর বুকে মালিশ করিয়াছে। খেয়াল হয় নাই যে সব নিঃশেষিত। এখন কোথায় পাইবে? কে আনিয়া দিবে? ডাক্তার বাবু কি বলিবেন? অমিতা লজ্জায় মাথা হেট করিয়া স্বামীর বুকে হাত বুলায়। এটা কার দোষ? দোষ তার কপালের। না, দোষ সে নিজে করিয়াছে। কেন সে অত ঘুমায়। ঘুমই তার মরণ। কি অসভ্য ঘুম! স্বামী যার মৃত্যু শয্যায়, তার কি ঘুম সাজে? এখন পয়সা থাকিলে হয় ত কথা ছিল। কাল বিকালে ঘুমাইয়া পড়ার জন্য কারুর কাছ হইতে পাওনা পয়সা আনিতে পারে নাই। আজ আবার সেই ঘুমের জন্য গোবর পায় নাই। অমিতার রাগ বাড়ে চোখের উপর, কেন তা আপনা আপনি বুজিয়া যায়। সেও ত সজাগ থাকিতে পারে। এ দুটা উপড়াইয়া ফেলিলে আর ঘুম আসিবে না। লজ্জাতুর চোখের ভাষায় স্বামীর নিকট সে মীমাংসা চায়। শিবনাথ বোঝে, কোথায় অমিতার ব্যথা। জানে বলিয়াই সে কষ্টে যন্ত্রণা চাপিয়া রাখে। সান্ত্বনার সুরে ডাকে, 'অমিতা।'

'কি বলবে?'

'আমি নিজের সুখের জন্য তোমার জীবনটাও বিকিয়ে দিলাম। বিয়ে করা কি উচিত হ'য়েছে? যার সামান্য মাথা গোঁজার সংস্থান ছিল না, তার কি বিয়ে সাজে? তোমাকে সংসারের ঘানিতে আষ্টে পিষ্টে বেঁধে দিলাম, কিন্তু দিতে পারি নাই একটুও সান্ত্বনা। নন্তু বেঁচে থাকলে তবুও নীড় বাঁধতে পারতে। চারদিক তোমার অন্ধকার। ও কি কাঁদছ? কি সান্ত্বনা দেব, কাঁদ। কিন্তু আমি বাঁচব না। মালিশ ফুরিয়ে গেছে? আমি সত্যি আরাম বোধ করছি। মালিশে আমার বুকে ব্যথা ধরে গেছে। যেটুকু সময় পৃথিবীতে আছি আর কষ্ট দিও না। বারণ ক'র না, আমায় বলতে দাও। আমার যে অনেক কথা বলবার আছে।'

শিবনাথ হাঁপাইতে লাগিল।

'পরে বলবেন', বলিতে বলিতে ডাক্তার বাবু ঢুকিলেন। শিবনাথ বিকৃত স্বরে কহিল, 'ডাক্তার বাবু কাকে সান্ত্বনা দিচ্ছেন, আমিও জানি অমিতাও জানে। আমায় বারণ করবেন না, দয়া করুন।"

অমিতা স্বামীর মুখ চাপিয়া ধরিল।

'ওগো ডাক্তার বাবুর কথা শোন, তুমি বাঁচবে।' শিবনাথ নিঃসাড়ে পড়িয়া রহিল। স্ত্রীর মুখের দিকে তাকায়। সে ওদের ভুল ভাঙ্গে না। আস্তে আস্তে তার জীবনী শক্তি কমিয়া যাইতেছে। কী ভ্রান্তি! অমিতা এখনও জানে না, তার সিঁথির সিন্দুর মুছিয়া গেল বলিয়া। কপালের সিন্দুর অস্পষ্ট মনে হয় শিবনাথের। ঐ পঞ্চতিলক একদিন সে আঁকিয়া দিয়াছিল। তখন কী জানিত, যে একটি বিন্দুর জন্ম অমিতার সমস্ত আশা, ভরসা, সুখ, সম্পদ একাকার হইয়া যাইবে তার দরিদ্রতার সংস্পর্শে। তাদের মিলন আনিয়াছে শতাব্দীর অভিশাপ। তা না হইলে সে কেন অমিতাকে টানিয়া আনিবে কাঠিন্তের মধ্যে। ছিল না আলো, ছিল না বাতাস। এমন অভিশপ্ত পৃথিবী। শিবনাথ উত্তেজিত হয়। একবার ভাবে বলে, অমিতা বিয়ে আমাদের কোন মতেই হয় নাই, তুমি ফিরে যাও কৌমারিত্বে। নতুন করিয়া আবার গড়। গরীবের জন্ত এ সুখ নয়। না থাকুক: কি হইবে বলিয়া। এটা যে চিরন্তন।

আস্তে আস্তে শিবনাথের স্পন্দন থামিয়া যাইতেছে। ডাক্তার বাবু চেষ্টা করিয়াও পারিলেন না, শিবনাথের স্বাভাবিক স্পন্দন ফিরাইয়া আনিতে। অমিতা ডাক্তার বাবুর পায়ে ধরিয়া বলে, 'ডাক্তার বাবু ওঁকে বাঁচিয়ে দিন আমার যা আছে তার বিনিময়ে।'

কি ভুল! সব নিন। সবের গতি যে কী জানেন তিনি। যার ঘরে হয় ত একটা আধলা মিলিবে না, যার গায়ে এক রতি সোণাদানা নাই, সেও বলে সব কিছু বিলাইয়া দিব। যদিও ডাক্তার বাবু জানেন, মৃত্যুর কাছে জাতি বিচার নাই, তবুও অমিতার কথায় বিকৃত মুখে কহিলেন, 'কি পার? জীবনী শক্তি দিতে পার?'

ডাক্তার বাবু উত্তরের অপেক্ষা করেন না। অন্ত কলের ছুতা করিয়া চলিয়া যান। তার সময়ের দাম আছে। অমিতা মিনতি ভরা চোখে তাকাইয়া কামনা করে, ডাক্তার বাবুর দীর্ঘ জীবন। ডাক্তার বাবুর দোষ কী? তিনি ত চাইলেন জীবনী শক্তি। সে যদি তা দিতে পারিত, স্বামী তার বাঁচিত। কিছু নাই তার। সে যে একেবারে নিঃস্ব। বার বার কাণে ভাসিয়া আসে, পার জীবনী শক্তি দিতে? স্বামীর মৃত দেহ সবলে আকড়াইয়া ধরিয়া ব্যগ্রকণ্ঠে সে কহিল, 'ওগো একবার কথা বল, আমি কি নিয়ে থাকব?'

শিবনাথের স্পন্দন নাই। সে অমিতার রাজ্য হইতে অনেক দূরে। ডাক পৌঁছায় না সেখানে। শুধু অমিতার কথা প্রতিধ্বনিত হয় ঘরের মধ্যে। সে তখন স্থির নেত্রে স্বামীর রক্তহীন মুখের দিকে নিষ্পলক ভাবে তাকায়। অমিতারও কোন স্পন্দন থাকে না। হঠাৎ তার দেহ শিবনাথের বুকে লুটাইয়া পড়িল।

ঘণ্টা খানেক পরে পাশের ঘরের বৌ আসিয়া অমিতার ঘুম ভাঙ্গায়, 'দিদি উনি কেমন আছেন?' অমিতা কহিল, 'নরেন বাড়ী আছে? তাকে ডাক, শ্মশানে যেতে হবে।'

বৌটি অবাক-বিস্ময়ে তাকায় অমিতার মুখের দিকে। ওর কী মাথা খারাপ হইয়াছে? কেহ কী মৃত স্বামীর বুকে ঘুমাইতে পারে। ওর ঘুম না ভাঙ্গিলেই ভাল হইত। থাকিত চিরদিন অমন ভাবে। হয় ত হতভাগী জানিল না, তার ঘুমের ঘোরে কি অঘটনটা না ঘটিল। ঘৃণায় সে বিকৃত মুখে চলিয়া গেল।

* * *

রাত্রি একটা বাজিয়া গিয়াছে। সমস্ত বাড়ীটি নিঝুম নিরালা মনে হয়। একে শীতের রাত্রি, তার উপর বাড়ীর একটি জীবন্ত মানুষ চলিয়া গিয়াছে। তুয়ের জন্ত বাড়ীটির রূপ হইয়াছে অশরীরি আত্মার মত। সবাই ঘুমন্ত। শুধু ঘুম নাই অমিতার। গুমরাইয়া গুমরাইয়া সে কাঁদিতেছে। সে কী আর ঘুমাইবে না? ঘুমাইতে পারিলে অমিতা সান্ত্বনা পাইত, ভাবে পাশের ঘরের বৌ—তারও যে ঘুম ভাঙ্গিয়া গিয়াছে কোলের ছেলের কান্নায়।

'দিদি ঘুমাবার চেষ্টা কর, কেঁদে তাকে ত ফিরিয়ে আনতে পারবে না।'

অমিতা উত্তর করিল, 'ঘুম আর আসবে না। এখন থেকে কান্নাই আমার সহচর।'

বৌটির দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়ে—কামনা করে অমিতা যাতে ঘুমাইতে পারে।

হেমচন্দ্র

—শ্রীকালিদাস রায়

মাইকেলের পর গত শতাব্দীর উল্লেখযোগ্য কবি হেমচন্দ্র। হেমচন্দ্রের সম্বন্ধে সব চেয়ে বড় কথা—তিনি আমাদের জাতীয় কবি, জাতীয়তার বোধনে তিনি মূল গায়ন। হেমচন্দ্র জাতীয় সঙ্গীত রচনা করিয়াছেন বলিয়াই তাঁহাকে জাতীয় কবি বলিতেছি না। প্রধানতঃ দুই শ্রেণীর কবি আমরা দেখিতে পাই। এক শ্রেণীর কবি আবির্ভূত হন—জাতির চিন্তার ধারা, রসবোধের আদর্শ, রুচি, প্রবৃত্তি, আশা-আকাঙ্ক্ষা ইত্যাদির সংস্কারের জন্ম অথবা আমূল পরিবর্তন সাধনের জন্ম। মাইকেল মধুসূদন ও রবীন্দ্রনাথ এই শ্রেণীর কবি। ইঁহাদিগকে যুগ-প্রবর্তক কবি বলা হয়। আর এক শ্রেণীর কবি জাতির মুখপাত্র রূপে জাতির চিন্তা, অনুভূতি, সুখ-দুঃখ ও আশা-আকাঙ্ক্ষাগুলিকেই ছন্দোময় ভাষায় অভিব্যক্তি দান করেন। হেমচন্দ্র এই শ্রেণী কবি। হেমচন্দ্র আমাদের জাতীয় জীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষা ইত্যাদিকে ভাষা দিয়াছেন বলিয়াই তিনি আমাদের জাতীয় কবি রূপে গণ্য হইয়াছেন।

গত শতাব্দীতে আমাদের জাতীয় জীবনের জাগরণ হইয়াছিল বিদেশী শিক্ষা-দীক্ষার অভিঘাতে। জাতির নিদ্রা-ভঙ্গ হইয়াছিল, সে তাহার জাগরণকে দেশের কাজে লাগাইতে চাহিয়াছিল। তাহার সে আকাঙ্ক্ষা যেমন পরিস্ফুট হইয়াছিল বঙ্কিমচন্দ্রের কোন কোন উপন্যাসে এবং গত যুগের কোন কোন নাটকে—তেমনি পরিস্ফুট হইয়াছিল হেমচন্দ্রের কবিতায়। তাই আমরা হেমচন্দ্রকে বলি আমাদের জাতীয় কবি।

হেমচন্দ্রের কবিতা জাতিকে জাগাইয়াছিল,—এ-কথা না বলিয়া আমরা বলি, নবপ্রবুদ্ধ জাতি হেমচন্দ্রের কবিতায় ওজস্বিনী আবেগময়ী ভাষায় আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল।

আমাদের সাহিত্যের চিরন্তন নৈতিক আদর্শকে আঘাত করিয়া মধুসূদন অভিনব নৈতিক আদর্শ প্রবর্তন করিতে চাহিয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথ বিশ্বমানবের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া সাহিত্যে অভিনব নৈতিক আদর্শের প্রতিষ্ঠাই করিয়াছেন। হেমচন্দ্র ভারতীয় সাহিত্যের চিরন্তন নৈতিক আদর্শ ই তাঁহার রচনায় অনুসরণ করিয়াছেন—শুধু অনুসরণ নয়, তাহাকে অতিরিক্ত emphasis দিয়া জ্বলন্ত করিয়া তুলিয়াছেন। 'বৃত্রসংহার' যাঁহারা মন দিয়াপড়িয়াছেন তাঁহাদিগকে এ-সম্বন্ধে অধিক কিছু বলিতে হইবে না। এইভাবে হেমচন্দ্র জাতীয় ভাবধারা অনুসরণ করিয়া আমাদের জাতির চিরন্তন আদর্শ, চিন্তা, অনুভাব ও সংস্কারগুলিকেই রূপদান করিয়াছেন—তাহাদের মধ্যে কোন বিপ্লব ঘটাইবার চেষ্টা করেন নাই।

হেমচন্দ্র আমাদের জাতীয় কবি। তাই বলিয়া এ-দেশের কবিদের প্রভাব তাঁহার রচনার উপর খুব বেশি নাই। সংস্কৃত কাব্য-সাহিত্যের প্রভাব তাঁহার রচনায় নাই বলিলেই হয়। সংস্কৃত পুরাণের প্রভাব অবশ্যই আছে, তাহা তাঁহার বৃত্রসংহারেই সর্বাপেক্ষা অধিক সঞ্চারিত হইয়াছে। বৈষ্ণব কবিদের কোন প্রভাবও তাঁহার রচনায় নাই। ছন্দের দিক হইতে ভারতচন্দ্রের প্রভাব কিছু আছে। দেব-চরিত্র-চিত্রণ বিষয়ে হেমচন্দ্র ভারতচন্দ্রের অনুসরণ করেন নাই। ভারতচন্দ্র দেবতাকে মানুষ বানাইয়াছেন—হেমচন্দ্র মানব হইতে স্বাতন্ত্র্যদান করিয়া দেবতাকে তাহার স্বকীয় মহিমায় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। মাইকেলের প্রভাব হেমচন্দ্রে অবশ্যই আছে। কিন্তু হেমচন্দ্র মাইকেলের অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রকৃত মহিমা ধরিতে পারেন নাই। হেমচন্দ্রের অমিত্রাক্ষর মিলহীন পয়ার মাত্র। হেমচন্দ্র পয়ার ছন্দের চরণের বেড়ি খসাইয়া মিলহীনতার সুবিধাটাই গ্রহণ করিয়াছিলেন। মাইকেলের অমিত্রাক্ষর যে Rhythm (ছন্দোহিল্লোল) সৃষ্টির দ্বারা ছন্দোগৌরবের অভিনব দায়িত্ব স্বীকার করিয়াছিল—হেমচন্দ্র সে দায়িত্ব গ্রহণ করেন নাই। পুরাণ হইতে উপাদান, উপকরণ গ্রহণ করিয়া অভিনব বীর-রসাত্মক খণ্ডকাব্য রচনার পদ্ধতিটি হেমচন্দ্র মাইকেলের কাছ হইতেই পাইয়াছেন।

হেমচন্দ্র সবচেয়ে বেশি প্রভাবান্বিত হইয়াছেন মিল্টন, ড্রাইডেন, গ্রে, বায়রন, লংফেলো ইত্যাদি ইংরাজী ভাষার কবিগণের দ্বারা। মিল্টনের প্যারাডাইজ লষ্টের অনুসরণ বৃত্রসংহারে অনেকস্থলে দৃষ্ট হয়। হেমচন্দ্রের অনেক কবিতা ঠিক লিরিক নয়, ছন্দে বাগ্মিতা মাত্র—Speech

in verse, ইহা তাঁহার গ্রে ও বাইরনের প্রভাবের ফলে। গ্রের Pindaric Ode-এর Awake Aeolian Lyre, awake কিংবা Ruin sieze thee ruthless King, Confusion on thy banner stand ইত্যাদি কবিতার প্রভাব হেমচন্দ্রের কবিতায় দেখা যায়। এইগুলি ছন্দে বাগ্মিতা। হেমচন্দ্রের 'বাজরে শিঙা বাজ এই রবে'—এই শ্রেণীর কবিতা। Wordsworth, Keats, Coleridge, Shelley ইত্যাদি romantic কবিদের প্রভাব হেমচন্দ্রে দেখিতে পাওয়া যায় না। তবু হেমচন্দ্র বুঝিয়াছিলেন একেবারে subjectivity বা ভাবতান্ত্রিকতা না থাকিলে, অন্তরের দরদ না যোগাইলে লিরিক হয় না। হেমচন্দ্রের কাব্যপুরুষের মূল ধাতুতে ভাবতান্ত্রিকতা ছিল না। হেমচন্দ্রের 'কবিতাবলী' ও 'চিত্তবিকাশে'র কবিতাগুলি অন্তরের অবিমিশ্র রসাবেগের অভিব্যক্তি নয়—কিন্তু তিনি অধিকাংশ কবিতায় বিশেষতঃ উপসংহারে অন্তরের সহিত যোগ সাধন করিয়াছেন।

হেমচন্দ্র পৌরুষ-সবলতার পক্ষপাতী। পৌরুষ সবলতা অনেকটা বহিরঙ্গের ধর্ম্ম—মহাকাব্যে ও নাটকে তাহার স্থান প্রশস্ত। গীতি-কবিতায় সৌকুমার্য্যেরই প্রাধান্য। এই সৌকুমার্য্য তাঁহার কোন কোন রচনায় গীতি-মাধুর্য্যের সৃষ্টি করিয়াছে। ইহার সহিত তাঁহার জীবনের একটি ঘটনার সংযোগ আছে। শেষ বয়সে হেমচন্দ্র অন্ধ হইয়াছিলেন। চক্ষুরত্ন হারানোর মধ্যে যে অসহায়তা ও কারুণ্য আছে—তাহা তাঁহার কোন কোন কবিতায় সৌকুমার্য্যের সৃষ্টি করিয়াছে। ফলে লিরিক-মাধুর্য্যেরও সৃষ্টি হইয়াছে।

হেমচন্দ্রের কাব্যের ঐশ্বর্য্য ভাবে নয়, ভাষায় নয়, ভঙ্গীতেও নয়—তাঁহার কাব্যের ঐশ্বর্য্য কল্পনার অবাধ গতিতে। এমন সর্ব্ববাধা-বন্ধনহীন মুক্তপক্ষ কল্পনা-শক্তি অতি অল্প কবিরই আছে। বলা বাহুল্য, কল্পনার এইরূপ অবারিত প্রসার কাব্য-সৃষ্টির পক্ষে অনেক ক্ষেত্রে বাধাও হইয়াছে। কল্পনার অতিমাত্রায় সংযম থাকিলেই ভাল হইত। হেমচন্দ্রের কল্পনা গভীর গহনতায় অবতরণ করে নাই—অতীন্দ্রিয় রহস্যলোকেও উঠে নাই, উহা অবাধ মুক্তি পাইয়া দেশ-দেশান্তরে যুগ-যুগান্তরে পরিভ্রমণ করিয়াছে। সলিল-হিল্লোলে আন্দোলিত একটি পদ্মের মৃণালও তাঁহার কল্পনাকে গ্রীস, রোম, তুরস্ক ঘুরাইয়া আনিয়াছে। তাঁহার কল্পনার পক্ষে ইহা সামান্য কথা। বৃত্রসংহারের কবির কল্পনার লীলা অনন্য-সাধারণ। কি বিশ্বকর্ম্মার কর্ম্মশালা, কি দধীচির তপোবন, কি বৃত্রাসুরের রাজসভা, কি দেবগণের মন্ত্রণা-পরিষদ্—সর্ব্বত্রই হেমচন্দ্রের কল্পনা অপূর্ব্ব রূপচিত্র-সৃষ্টির পরিচয় দিয়াছে। অনেকে মনে করেন, মাইকেলের কল্পনার চেয়েও হেমচন্দ্রের কল্পনার সবলতা, প্রসার ও সৃজনী শক্তি বেশি। হেমচন্দ্রের কল্পনা স্বর্গ-মর্ত্ত্য-রসাতল বহুবার পরিভ্রমণ করিয়াও ক্লান্ত হইয়া পড়ে নাই। কল্পনার লীলায় মাইকেলের মত হেমচন্দ্র অক্ষরে অক্ষরে Greek Convention অনুসরণ করেন নাই—তিনি স্বকীয় কল্পনার মৌলিক দৃষ্টির উপরই অধিকাংশ স্থলে নির্ভর করিয়াছেন।

কবির বৃত্রসংহার মাইকেলের মেঘনাদ বধের মত গ্রীক আদর্শেই গঠিত। ইহাতেও ভার্জিল, হোমার, ট্যাসো, দান্তে, পিণ্ডার ও মিলটনের প্রভাব বিদ্যমান। মেঘনাদ বধের তুলনায় এই কাব্যে মিলটনের প্রভাব অধিকতর স্পষ্ট।

বিদেশী আদর্শে গঠিত হইলেও এই গ্রন্থে বিজাতীয় ভাব সুস্পষ্ট হইয়া উঠে নাই। বিদেশী কবিদের গ্রন্থ হইতে আহৃত উপকরণগুলি কবি দেশীয় ভাবে রূপান্তরিত করিয়াছেন—যাঁহারা বিদেশী সাহিত্য ভাল করিয়া পড়িয়াছেন তাঁহারাই ধরিতে পারিবেন। অন্যের কাছে কিছুই বিজাতীয়, বিসদৃশ বা অস্বাভাবিক বলিয়া মনে হইবে না। ইহার প্রধান কারণ, হেমচন্দ্র কোথাও দেশীয় নৈতিক ও পৌরাণিক আদর্শকে খর্ব্ব করেন নাই। বরং কোন কোন ক্ষেত্রে আরও মহনীয় করিয়া তুলিয়াছেন। হেমচন্দ্র পশুবলের বিরাটতা দেখাইয়াও চিত্তবলের বিরাটতরতা দেখাইতে পারিয়াছেন।

হেমচন্দ্র বৃত্রসংহারে আমাদের কল্পনাকে মানব-মনের গভীর প্রদেশে লইয়া যাইতে পারেন নাই, কিন্তু তাহাকে স্বর্গ-মর্ত্ত্য-রসাতল সমস্ত ঘুরাইতে পারিয়াছেন। কবির ক্ষেত্র অতি বিরাট। কবি সমস্তের মধ্যে একটি সুন্দর সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে পারিয়াছেন। স্বতই কবির রচনায় কোমলতার অভাব আছে, আগাগোড়া কঠোরতায় ভরা। তাঁর কাব্যের এই পাষাণ-শৈলে ইন্দুমতীটি নির্ঝরিণীর মত। হেমচন্দ্রের অঙ্কিত চরিত্রগুলির মধ্যে রমণী চরিত্রগুলিই চমৎকার হইয়াছে। দেবী মানবী সকলেই অন্তরে মানবী।

পুরুষচরিত্রের মধ্যে বৃত্রাসুর দৈহিক শক্তিতে অতিমানব, ত্যাগের আদর্শ দধীচি আধ্যাত্মিক মহিমায় অতিমানব।

মেঘনাদ বধের তুলনায় অপেক্ষাকৃত অল্প হইলেও বৃত্রসংহারে নাটকীয় ভাব যথেষ্টই আছে। ইহার কতকগুলি দৃশ্যপট অতি সুন্দর।

বৃত্রসংহার কাব্যখানির অনেক স্থলই শিথিল, বৈচিত্র্যহীন, গদ্যাত্মক, কিন্তু স্থলে স্থলে কবি অপূর্ব সংযমেরও পরিচয় দিয়াছেন। সেই সংযমের ফলে কোন কোন অংশ গাঢ়বন্ধ ও কোন কোন পংক্তি রসঘন হইয়া উঠিয়াছে।

এইরূপ কাব্যে যে সুরুচি ও সুনীতির মর্য্যাদা থাকা স্বাভাবিক, কবি তাহা রক্ষা করিয়াছেন। প্রেমলীলা দেখাইতে গেলেই আমাদের দেশের কবিরা তরলতা ও চপলতার পরাকাষ্ঠা দেখাইতেন। হেমচন্দ্র এ-বিষয়ে সংযম রক্ষা করিয়া তাঁহার বিরাট কল্পনার মর্য্যাদা রক্ষা করিয়াছেন। হেমচন্দ্রের বৃত্রাসুর উচ্চাভিলাষের সুরায় মত্ত, তাহার অন্যান্য আসুরিক বৃত্তি উহাতেই অবলুপ্ত, সে শচীকে ধরিয়া আনিতেছে—ঐন্দ্রিলার দাসীত্বের জন্য, অন্য কোন হীন প্রবৃত্তি তাহার মনেও আসিতেছে না। বন্দিনী শচীকে দেখিয়া বৃত্র সসম্ভ্রমে সিংহাসন ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইতেছে।

তপস্যাই যে একমাত্র সকল সাফল্য ও সফল বিজয়ের নিদান—কবি তাঁহার এই কঠোর প্রকৃতির কাব্যে তাহাই দেখাইয়াছেন। বৃত্র যে স্বর্গ-সিংহাসন পাইয়াছে তাহা তপো-বলে। তাহা অপেক্ষা কঠোরতর তপ না করিয়া দেবতারাও স্বর্গ-রাজ্য পুনরধিকার করিতে পারিতেছে না। জগতের সকল সিংহাসনই তপোলভ্য, অনায়াসে লাভ করিলেও তপের দ্বারা তাহাকে অটল করিয়া লইতে হয়। স্বর্গ-রাজ্য ফিরিয়া পাইবার জন্য স্বর্গাধিকারীকেও নূতন করিয়া তপ করিতে হইয়াছে। আর কঠোর তপস্বীর আত্মত্যাগেই স্বর্গরাজ্যের পুনরধিকার সম্ভব হইয়াছে। হেমচন্দ্র কোথাও স্পষ্ট ভাবে নৈতিক উপদেশের প্রচার করেন নাই। তাঁহার কাব্যের মেরুদণ্ডই নৈতিক ধর্ম্ম।

এতগুণ থাকা সত্ত্বেও বৃত্রসংহার কেন বর্ত্তমান যুগের পাঠক সমাজের আদরণীয় হইতেছে না?—কবি তাঁহার বিরাট পরিকল্পনাকে রসমূর্ত্ত করিবার উপযুক্ত ভাষা খুঁজিয়া পান নাই। তিনি যে ভাষায় কাব্যখানি রচনা করিয়াছেন তাহা নীরস, গদ্যাত্মক, বৈচিত্র্যহীন ও অনলঙ্কৃত। বর্ত্তমান যুগে রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাবের পর কাব্যের রসাদর্শ পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। সংযত, সংহত, পারিপাট্যময় গঠন-গৌরব ও কলাশ্রী-সৌষ্ঠব না থাকিলে এযুগে কোন কাব্য সমাদৃত হয় না। কলা-কৌশলের চাতুর্য্য ও গঠন-সৌষ্ঠবের অভাবে বৃত্রসংহার বর্ত্তমান যুগে বালুকা প্রান্তরের মধ্যে পিরামিড হইয়া দাঁড়াইয়া আছে—যমুনাতীরের তাজমহল হইয়া উঠিতে পারে নাই। কবি যদি এই কাব্যখানিকে নাট্যাকারে লিখিতেন, এমন কি, গদ্যেও লিখিতেন তাহা হইলে হয় ত ইহার আদর হইত। কাব্যে পাঠক অনেক কিছু চায়, বৃত্রসংহার কাব্য-অভিধা লাভ করিয়া পাঠকের সর্ব্ববিধ আকাঙ্ক্ষা নিবৃত্ত করিতে পারে না। বৃত্রসংহারে বহু সম্পদ প্রচ্ছন্ন আছে—ইহার অনেক কিছু দিবার আছে কিন্তু দানের পাত্রকে আকর্ষণ করিবার শক্তি ইহার নাই।

গত শতাব্দীর কাব্যবিচারকগণ কবিতার মধ্যে রস খুঁজিতেন না, কলা-কৌশলের দিকেও দৃষ্টি রাখিতেন না—তাঁহারা কেবল দেখিতেন হৃদয়ের অনুভূতির যথাযথ প্রকাশ হইয়াছে কি না। আজকালকার কাব্য-বিচারে যে অনুভূতিকে কাব্যের উপকরণস্বরূপ মনে করা হয়—তাহাকেই কাব্যের উদ্দিষ্ট বস্তু মনে করা হইত। সেজন্য হেমচন্দ্র একজন মহাকবি আখ্যা পাইয়াছিলেন। কাব্যের প্রধান উপকরণ যে গভীর অনুভূতি, হেমচন্দ্রের রচনায় তাহা প্রচুরই ছিল। সেই অনুভূতির প্রকাশ সম্বন্ধে হেমচন্দ্র আদৌ সতর্ক ছিলেন না। যে কোন ভাষায়, যে কোন ভাবে, যে কোন ভঙ্গীতে তাহাকে প্রকাশ করিয়াই নিশ্চিন্ত হইতেন। তাহাতে পাঠক-সাধারণের কোন আপত্তি ছিল না, পাঠক-সাধারণ অনুভূতির ছন্দোবদ্ধ প্রকাশ মাত্রকেই কবিতা বলিয়া মনে করিত। একজন্য হেমচন্দ্রের কোন সতর্কতার প্রয়োজনই হয় নাই। তাহা ছাড়া, হেমচন্দ্র গতযুগের জন-সাধারণের প্রতিনিধিই ছিলেন। পাঠক-সাধারণের রুচি, প্রকৃতি ও রসবোধের আদর্শের সংস্কার বা শ্রীবৃদ্ধি সাধনের জন্য আসেন নাই। তাহাদের রুচি, প্রবৃত্তি ইত্যাদির অনুসরণ করিয়াই তিনি কাব্য রচনা করিয়া গিয়াছেন। এইজন্যই তিনি লোককান্ত কবি হইতে পারিয়াছিলেন। দেশের লোক নিজেদের আশা-আকাঙ্ক্ষা, অনুভূতি, ভাব-চিন্তা ইত্যাদি সমস্তকেই তাঁহার কাব্যে

প্রতিবিম্বিত দেখিয়া বড়ই আনন্দ লাভ করিত। তাই একজন সমালোচক বলিয়াছেন –

"হেমচন্দ্রের অনুভূতির অভাব ছিল না, কিন্তু তিনি জানিতেন না—অনুভূতিকে সরস, শোভন, কলা-শৃঙ্খলায় সুগঠন রূপবৈচিত্র্যে, সংযত ভাষায় ও চিত্তাকর্ষক ভঙ্গিতে প্রকাশ দান করিতে না পারিলে রস-সাহিত্য হইয়া উঠে না। অনুভূতির উচ্ছ্বাসকেও তিনি সংযত করিবার চেষ্টা করেন নাই। ছন্দ, মিল, ভাষা-বিন্যাস, অলঙ্কার-প্রয়োগ কোনটার দিকেই সতর্ক হন নাই—কাব্যের বহিরঙ্গের যে সৌষ্ঠব-সম্পাদনের প্রয়োজন আছে, ইহা তিনি নিজেও জানিতেন না, তখনকার বিচারপদ্ধতি হইতেও তিনি পান নাই, তখনকার সমালোচকরাও তাহা বলে নাই।"

আর একটি কথা তাঁহার মনে উদিত হয় নাই। রচনাকে রসঘন করিবারই কথা, রচনার মধ্যেই আপনার স্থূল বক্তব্যের টীকা দিবার কথা নহে। তখনকার সাধারণ পাঠক কবিতার মধ্যেই কবিতার বিশদ্ ব্যাখ্যা পাইয়া খুসী হইত এবং সাধুবাদ দিত। সেই সাধুবাদে উৎসাহিত হইয়া হেমচন্দ্র রচনারীতির পরিবর্ত্তন করেন নাই। হেমচন্দ্র জন-সাধারণের জন্য লিখিয়াছেন, রসজ্ঞ সমাজের জন্য লেখেন নাই। তাই তাঁহার কাব্য গত যুগের জন-সাধারণকে প্রীতিদান করিলেও সম্ভবতঃ নিত্যকালের বস্তু হইয়া থাকিবে না। জন-সাধারণ পরিবর্ত্তনশীল—তাই ভয় হয়, আগামী যুগের জন-সাধারণ হয় ত ঐ কাব্যের কোন আদরই করিবে না।

হেমচন্দ্রের ভাষায় ওজস্বিতা ছিল, দেশানুরাগমূলক কবিতাগুলিতে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। তাঁহার কল্পনার যে উদারতা ও সরলতা ছিল কেবল তাঁহার 'বৃত্রসংহার' নয়, 'দশমহাবিদ্যা'তেও তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়।

হেমচন্দ্রের প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'চিন্তা-তরঙ্গিণী'। ইহার মধ্যে কবিত্বের কোন বালাই নাই। দ্বিতীয় কাব্য 'বীরবাহু কাব্য'। ইহা একজন দেশভক্ত বীরের জীবনকাহিনী। উপাখ্যানটি কাল্পনিক—রাজপুত বীরগাথার অনুকরণে রচিত। এই গ্রন্থে তিনি প্রথম দেশভক্তি প্রচার করেন। ইহার রচনাভঙ্গী মঙ্গলকাব্যকারদের অনুসৃতি।

হেমচন্দ্রের একখানি কাব্যের নাম 'আশাকানন'। ইহা একখানি সাঙ্গরূপক (allegorical) কাব্য। হেমচন্দ্র ভূমিকায় বলিয়াছেন "মানবজাতির প্রকৃতিগত প্রবৃত্তিসকল প্রত্যক্ষীভূত করাই ইহার উদ্দেশ্য।" কবির উদ্দেশ্য সফল হইয়াছে। রসসৃষ্টি কবির উদ্দিষ্ট ছিল না—কাজেই ইহা সৎকাব্যের মর্য্যাদা লাভ করে নাই। ইংরাজিতে এইরূপ সাঙ্গরূপক রচনা ব্যানিয়ানের Pilgrim's Progress। অক্ষয়কুমার দত্ত 'স্বপ্নদর্শন' নামে এই ধরণের গদ্য নিবন্ধ লিখিয়াছিলেন। বাঙ্গলা সাহিত্যে হেমচন্দ্র এই শ্রেণীর কাব্য প্রথম লেখেন। রবীন্দ্রনাথের হাতে এই শ্রেণীর রচনা নাট্যাকারে অপূর্ব্ব রসরূপ ধরিয়াছে।

হেমচন্দ্রের আর একখানি কাব্য 'ছায়াময়ী'। এই কাব্যখানি রোমক কবি দান্তের ডিভাইনা-কমেডিয়া নামক কাব্যের অনুকরণে রচিত। বলা বাহুল্য, ইহা ঐ গ্রন্থের অনুবাদ নয়। দান্তে স্বর্গ, নরক, পরলোক ইত্যাদির বর্ণনা করিয়াছেন, হেমচন্দ্রও তাহাই করিয়াছেন, কিন্তু খ্রীষ্টীয় ভাবে নয়—হিন্দু ভাবে। হেমচন্দ্রের কল্পনা যে অপার্থিব কল্পনাসৃষ্ট লোক লোকান্তরে পরিভ্রমণ করিতে ভালবাসিত, এই কাব্যে তাহার প্রথম পরিচয় পাওয়া যায়।

হেমচন্দ্রের আর একখানি কবিতা পুস্তক 'চিত্ত-বিকাশ'। কবি যখন শেষ জীবনে দৃষ্টিশক্তি হারাইয়া দারুণ দুঃখের মধ্যে জীবন যাপন করিতেছিলেন, সেই সময়ে তিনি এই কবিতগুলি রচনা করেন। এই কবিতাগুলিতে কবির হৃদয়ের তৎকালীন বেদনা রূপ লাভ করিয়াছে। কবিতাগুলি প্রধানতঃ বিদ্যালয়ের ছাত্রগণের জন্য রচিত।

আর একখানি গ্রন্থ 'দশমহাবিদ্যা'। ইহা একটি ক্ষুদ্র কাব্য, কিন্তু এই কাব্যে হেমচন্দ্রের কল্পনার বিশালতা ও আধ্যাত্মিক দৃষ্টির সমন্বয় হইয়াছে। ইহাতে হেমচন্দ্র প্রচলিত ছন্দ ত্যাগ করিয়া হ্রস্বদীর্ঘ মাত্রায় গঠিত প্রাকৃত ছন্দ প্রয়োগ করিয়াছেন। তাহাতে উনবিংশ শতাব্দীর ছন্দোলোকে একটা বৈচিত্র্যের সৃষ্টি হইয়াছে। রসের দিক হইতে ইহার প্রথম দুইটি কবিতা চমৎকার।

কৈলাসে অম্বরময় তারাসূর্য্য অম্বুদর অনকালে নিকিল সকল।
তমস্কর দিগাকাশ, কেবলি করে উল্লাস নীলকণ্ঠের কণ্ঠের গরল।

ইত্যাদি প্রথম শ্রেণীর কবির উপযুক্ত।

ইহা ছাড়া যদি দশমহাবিদ্যার বাক্যার্থ কল্পনা করা যায়, তাহা হইলে এ-কাব্যের মর্য্যাদা ঢের বাড়িয়া যায়।

সতী দেহত্যাগ করিয়াছেন, চরাচর শঙ্করের সঙ্গে কাঁদিয়া আকুল। ইহা অবিদ্যা ছাড়া আর কিছুই নয়, মহাশক্তির কি মৃত্যু আছে? শক্তি রূপ হইতে রূপান্তর গ্রহণ করিতে পারে, কখনও ধ্বংস পায় না, সে শক্তি কখনও রুদ্ররূপে, কখনও শান্তরূপে প্রকাশ পায়। যে শক্তি উচ্ছৃঙ্খল হইয়া ধ্বংস সাধন করে, সেই শক্তিই নিয়ন্ত্রিত হইয়া জীবের মঙ্গল সাধন করে, আবার তাহা নিষ্ক্রিয় হইয়া জড়ের স্থানাবরোধকতা, ঘনতার রূপে সংহত হইয়া রহে। [ইউরোপীয় বিজ্ঞানের Conservation and transformation of energy, 'Kinetic' Potential ইত্যাদি ভেদে Energyর বিভিন্ন রূপ ইত্যাদির কথা স্মর্তব্য]। দশমহাবিদ্যার এক একটি বিদ্যা মহাশক্তির এক একটি রূপেরই রূপক মাত্র। গীতার বিশ্বরূপ দর্শন ও এই দশমহাবিদ্যার প্রকটন একই উদ্দেশ্যে পরিকল্পিত বলা যাইতে পারে। দুই-ই শোক-মোহের মায়া বা অবিদ্যার জাল-ছেদনের জন্য। হেমচন্দ্র সচেতন ভাবে এই সত্যটিকে যদি ফুটাইতেন, তাহা হইলে সোনায় সোহাগা হইত।

হেমচন্দ্রের 'কবিতাবলী'র কবিতাগুলি আজিও সমাদৃত হইয়া থাকে। সর্বাঙ্গসুন্দর না হইলেও এই কবিতাগুলিই (মাইকেলের ২।৪টি কবিতা বাদ দিলে) বঙ্গসাহিত্যে এক নূতন ধারার সূত্রপাত করিয়াছে। এই শ্রেণীর গীতি-কবিতা পূর্ব্বে কেহই লেখেন নাই। ছন্দে বাগ্মিতা প্রকাশ হইলেও 'ভারত ভিক্ষার' ন্যায় কবিতা বঙ্গসাহিত্যে প্রথম। তরুণ রবীন্দ্রনাথের রচনায় হেমচন্দ্রের কবিতাবলীর প্রভাব লক্ষিত হয়। যাহাকে খাঁটি লিরিক বলে, হয় ত এগুলি তাহা নয়, মুক্তা না হইলেও এগুলি মুক্তাজননী শুক্তি বটে।

হেমচন্দ্রের কল্পনার যেরূপ মহিমা ছিল, তাঁহার ভাষা তদুপযোগিনী ছিল না। সম্পূর্ণ ভাবদ্যোতক শব্দের জন্য তিনি পরিশ্রমও করেন নাই। পাঠক-সাধারণের পক্ষ হইতে সে দাবী থাকিলে হয় ত তাহা করিতেন। পাঠক-গোষ্ঠীর পক্ষ হইতে সে দাবীও ছিল না।

বক্তব্যকে কি কৌশলে সাজাইলে, কিরূপ কলাশ্রীমণ্ডিত করিয়া প্রকাশ করিলে, কিরূপ আলঙ্কারিক সৌষ্ঠবের সৃষ্টি করিতে পারিলে, ছন্দোবন্ধের কিরূপ প্রসাধন করিলে বক্তব্য শুধু জোরালো নয়, রসালো হয়, তাহা তিনি জানিতেন না। স্থলে স্থলে ভাবাবেগের সংযমেরও অভাব হইয়াছে। ছন্দঃ-মিলের পারিপাট্যসাধনে তিনি কোন যত্নই করেন নাই।

Shelleyর Skylark কবিতার তিনি একটি অনুবাদ করিয়াছিলেন। এই অনুবাদেই ভাবের সহিত ছন্দের সামঞ্জস্য সাধনে তাঁহার অক্ষমতা প্রমাণিত হইয়াছে। শেলীর কবিতার অপূর্ব্ব প্রকাশভঙ্গীর কৃতিত্ব তিনি যদি উপলব্ধ করিতেন, তাহা হইলে হয় তাহার অনুবাদ করিবার চেষ্টা করিয়া তিনি শেলীর প্রতি অবিচার করিতেন না, নয় ত বঙ্গভাষায় একটি চমৎকার কবিতা আমরা পাইতে পারিতাম। প্রকাশ-ভঙ্গীর অপূর্ব্বতাই যে কাব্যের অধিকাংশ, ভাবের বৈচিত্র্য বা বৈশিষ্ট্য যতই থাকুক, তাহার প্রকাশ যদি কলাশ্রী-সম্মত না হয়, তাহা হইলে তাহাকে যে-কোন ছন্দে ও ভাষায় প্রকাশ দান করিলেই যে কাব্য হয় না, একথা তিনি উপলব্ধি করিতেন না। অনুভূতি যদি গভীর, সত্য ও অকপট হয় তাহা হইলে তাহা স্বতই একটা সরস ভঙ্গীর মধ্য দিয়া আত্মপ্রকাশ করে। অনেক ক্ষেত্রে যে হেমচন্দ্রের রচনা কাব্যাংশে উৎকৃষ্ট হইয়াছে, তাহার কারণ উহাই। ইহা কবির অজ্ঞাতসারেই ঘটিয়া গিয়াছে। কবি যেখানে সম্পূর্ণ সজ্ঞান, সেখানে কাব্য হীনাঙ্গ ও অপকৃষ্ট।

হেমচন্দ্র মিশ্র লঘু ত্রিপদীর ছন্দে অনেক সময় চারটি ছয়টি পর্যন্ত অক্ষরা যোগ করিতেন—সঙ্গীতের দিক হইতে ইহা যে অসঙ্গত তাহা তিনি বুঝিতেন না। দীর্ঘ ত্রিপদী ছন্দ যাহা ভারতচন্দ্র এমন কি রঙ্গলালেও অনবদ্যরূপে পরিস্ফুট হইয়াছে, হেমচন্দ্রের রচনায় তাহা দীর্ঘতর হইয়া মাধুর্য্য হারাইয়াছে। ৮+৮+১০ মাত্রায় দীর্ঘ ত্রিপদীর গঠন। ইহাকে ৮+৮+১৪ তে আনিয়াও তিনি তুষ্ট হন নাই, ৮+৮+১৫ মাত্রাতেও পরিবর্ত্তিত করিয়াছেন। যেমন—

"জীবনেতে পরিণত এইরূপে হয় কত
মর্ত্ত্যবাসী মনোরথ হা দগ্ধ বিধাতারে।"

এখানে 'রে' বাদ দিলেই শ্রুতিমধুর হইত।

লঘুত্রিপদী ছন্দও হেমচন্দ্রের হাতে পদবিন্যাসের দোষে শ্রুতিমধুর হয় নাই, অথচ তাঁহার সমসাময়িক কবি বিহারী-লালের কাব্যে তাহা চমৎকার জমিয়াছে।

অমিত্রাক্ষরে ছন্দের বলিষ্ঠতা ও কৌশল কোথায় তাহা হেমচন্দ্র ধরিতে পারেন নাই। তাঁহার হাতে অমিত্রাক্ষর নিম্নলিখিত রূপ ধরিয়াছে—

"কহিলা, "হে দেবদূত সুসন্দেশ-বহ,
তোমার বারতা নিত্য মঙ্গল দায়িনী,
শীঘ্র যাও দেবগণ এখন যেখানে
কহগে তাদেরে দূত এই সুবারতা।
সুমেরু পর্ব্বতে ইন্দ্র পূজা সাঙ্গ করি,
ধ্যান ত্যজি এতদিনে হইল জাগ্রত,
নিয়তি প্রসন্ন তারে হইল সাক্ষাৎ
কহিলা বিদিত বৃত্র-বিনাশ যেরূপে।"

ইহা মিলনহীন পয়ার ছাড়া কিছুই নয়। মিলহারা হইয়া ইহা পয়ার হইতেও নিকৃষ্টতর। মাইকেলের দুর্ব্বলতা-টুকু হেমচন্দ্র গ্রহণ করিয়াছিলেন—সবলতা এড়াইয়া গিয়াছেন। 'সুসন্দেশ-বহ' 'সুবারতা' ইত্যাদি শব্দ প্রয়োগ দুর্ব্বলতা মাত্র।

মিলের দুর্ব্বলতা ও শিথিলতা হেমচন্দ্রের আর একটি দোষ। ক্রিয়া বিভক্তির মিল মিলই নয়। অথচ হেমচন্দ্র মুহুর্মুহু ক্রিয়াবিভক্তিরই মিল দিতেন। এ যুগের পাঠকদের কর্ণে তাহা বড়ই অশোভন।

হেমচন্দ্র বৃত্রসংহারের শেষ দৃশ্যটি চিত্রিত করিবার সময় মাইকেলের ভাবে আবিষ্ট হইয়া পড়িয়াছিলেন। সেজন্য বোধ হয় এই অংশের ছন্দোগৌরব মাইকেলের মতই অপূর্ব্ব হইয়া উঠিয়াছে।

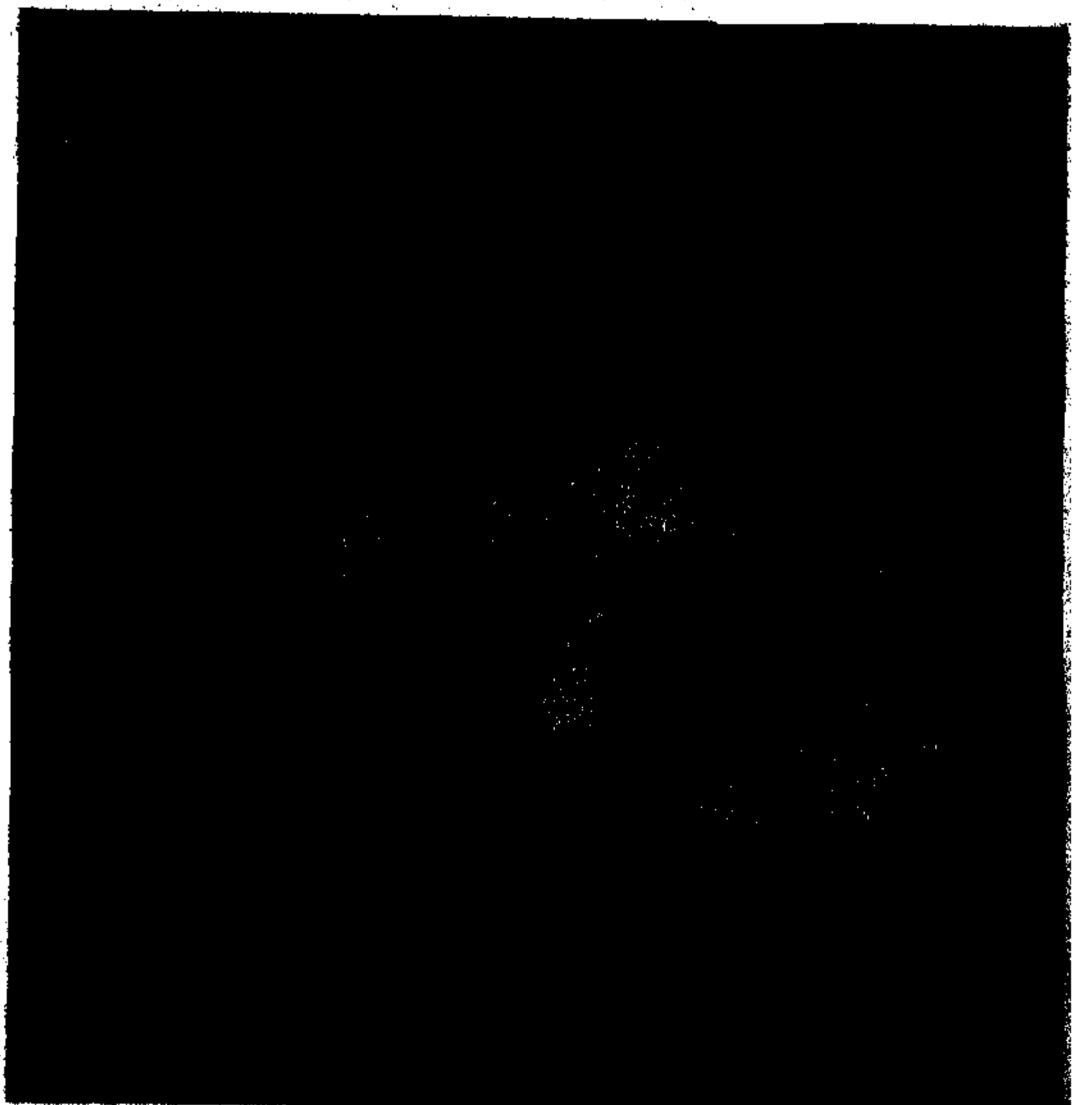
মাছ ধরা

— বন্দে আলী মিয়া

আকাশ ঘুমায়—বাতাস ঝিমায়—ঘুমায় নদীর চর
পদ্মার ঢেউ করে কোলাহল সারা নিশিদিন ভর।
পাড়ের কিনারে বাঁধা আছে হোথা ডিঙি নাও খান কয়
গলুয়ের 'পরে জাল হাতে নিয়ে জেলেরা বসিয়া রয়।
বাঁকের এপাশে দহ পড়িয়াছে—জল খুব এইখানে
বড় বড় মাছ রয়েছে হেথায় জেলেরা সে কথা জানে;
সাঁঝে খেয়ে-দেয়ে জাল নিয়ে তারা এসেছে গাঙের নায়
ছইয়ের মাঝে বিছায়ে মাদুর কেহ কেহ ঘুম যায়।

মাঝ রাত হতে শুরু হয়ে গেছে জেলেদের মাছ ধরা
ক্ষ্যাপলার চেয়ে ঠেলে চলাতেই মাছ ওঠে জাল ভরা,
কোনো বারে ওঠে রুই ও কাৎলা—কোনো বারে ছোটো মাছ
নৌকার খোলে ফাল্ দিয়ে তারা নাচিছে তিড়িং নাচ।
ঝুপ্ ঝাপ্ করি জাল পড়ে জলে গরজে নদীর জল
মাথার ওপরে রাতের বাতাস কুসিতেছে অবিরল।

জেলেদের বউ ছেলেপুলে নিয়ে একা একা থাকে ঘরে
নায়ে গেছে যারা তাহাদের লাগি বুক দুরু দুরু করে;
শুনিয়াছে তারা দহের জলেতে থাকে কোন্ জানোয়ার
মানুষ পাইলে আর কোনো জীব কভু খায় নাকো আর।
'ভূত' 'দেও' 'জিন' কত না বিপদ রয় তাহাদের ঘিরে
বউদের চোখে আসে নাকো ঘুম—ভাবে তাই ফিরে ফিরে;
ভোর রাতে সবে ফিরিবে ঘরেতে পথ-চেয়ে জাগে তাই
কত লোক গিয়ে নাও হতে আর ঘরে ফিরে আসে নাই।
নায়ের লোকেরা ভাবিতেছে ঘর—ঘরের লোকেরা নাও
মনের কথাটি কানাকানি করে হিমেলা পূবেল বাও।



"আমি মুকুল—
তুমি ঝরাফুল—"



—শ্রীপ্রভারাণী দেবী

গুরুজনের প্রতি বধূর কর্ত্তব্য

গুরুজনদের সেবার পর্য্যায়ে প্রথমেই পড়েন শ্বশুর ও শাশুড়ী। শাশুড়ীর আনুগত্য স্বীকার বধূজীবনের অবশ্য-কর্ত্তব্যের অঙ্গীভূত। অবশ্য "বউ কাঁটকী" শাশুড়ীর অভাব আমাদের দেশে নাই, কিন্তু বধূ যদি যথেষ্ট বুদ্ধিমত্তার সহিত শাশুড়ীর মনোভাব বুঝিয়া চলে তবে শাশুড়ী আর "বউ-কাঁটকী" হইতে পারেন না। ইহার জন্য বধূকে সর্ব্বদা শাশুড়ীর মন যোগাইয়া চলিতে হয়, সর্ব্বদা তাঁহার পায়ে পায়ে ঘুরিয়া, তাঁহার সন্তোষবিধান করিয়া কাটাইতে হয়, নতুবা অনাবশ্যক অশান্তিতে গৃহ পূর্ণ হইয়া উঠে। অত্যন্ত অত্যাচারী শাশুড়ীর পাল্লায় পড়িয়া বহু নিরীহ বধূও প্রবলা হইয়া উঠে, এইরূপ দৃষ্টান্তের অভাব এ দেশে নাই; কিন্তু জলে বাস করিয়া কুমীরের সহিত বিবাদ করা বুদ্ধির পরিচায়ক নহে, ইহা বুঝিয়া বধূকে সাবধান হইতে হইবে। শাশুড়ী গৃহের কর্ত্রী, তাঁহার কর্ত্তৃত্ব কোন রকমে ক্ষুণ্ণ হইতে দেখিলেই তিনি রুষ্ট হইবেন। ইহার সাধারণ কারণ, নিজেদের কথা হইলেও সত্যের খাতিরে বলিতে বাধ্য হইতেছি যে, নারীজাতি অত্যন্ত কর্ত্তৃত্ব-প্রবণা। কর্ত্রীগিরি করিবার আকাঙ্ক্ষা তাহাদের মজ্জাগত অভ্যাস। যেখানে যেটুকু সুযোগ পান, নারী তাঁহার কর্ত্তৃত্ব সেখানে ফলাইবেনই। বার্দ্ধক্যে নারীর এই দোষ বর্দ্ধিত হয়। তাই বধূ সংসারের কর্ত্তৃত্ব কাড়িয়া লইতেছে ভাবিয়া অনর্থক বধূর উপর শাশুড়ী রুষ্ট হইয়া উঠেন। বধূ যদি শাশুড়ীর এই স্বভাবটিকে সাবধানে তুষ্ট করিয়া না চলে তবে গৃহে টেঁকা দুঃসাধ্য ব্যাপার হইয়া উঠে।

শাশুড়ীর স্নেহ আদায় করিতে হইলে আপনার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য কতকটা ত্যাগ করিতে হইবে। এমন কি, স্বামীর প্রতি অত্যাধিক ভালবাসা দেখানোর মধ্যেও বিপদ আছে। সাবধানী বধূ এ-সকল বুঝিয়া চলিবেন। অধিক লিখিলে শাশুড়ীজাতি আমার মুণ্ডপাত করিতে ছাড়িবেন না। তবে সুখের বিষয়, আজকাল শিক্ষিতা শাশুড়ীগণ নিজেদের দুর্ব্বলতা এবং বধূর অনিবার্য্য প্রতিপত্তিলাভ সম্বন্ধে কতকটা অবহিত হইতেছেন; তাই তাঁহারা যতদূর সম্ভব আত্মসম্মান বজায় রাখিয়া চলেন।

অন্যদিকে আধুনিক শিক্ষিতা বধূগণ শাশুড়ীর দিকে মোটেই নজর দিতে চাহেন না। ইহাতে শাশুড়ী অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হন। সন্তানের প্রতি স্নেহবশতঃ হয় ত তিনি চুপ করিয়াই থাকেন কিন্তু সুযোগ ও সুবিধা পাইলে একদিন তাঁহার সুপ্ত ক্ষোভ গর্জ্জন করিয়া উঠে। বধূজীবনের পক্ষে এই সব ব্যাপারের সমন্বয়-সাধন দুষ্কর হইলেও একেবারে সাধ্যাতীত নহে।

অনেক ভাগ্যবতী বধূ শাশুড়ীর নিকট মাতৃস্নেহ অপেক্ষা বেশী স্নেহ পাইয়া থাকে। সেক্ষেত্রে শাশুড়ী তাহাকে কন্যা অপেক্ষাও বেশী স্নেহ করেন; কিন্তু এরূপ দৃষ্টান্ত খুব বেশি নহে। তথাপি একথা নিশ্চয় বলা যায় যে-শাশুড়ীর সেবা-যত্ন করিলে, প্রত্যেকটি কার্য্যে তাঁহার কর্ত্তৃত্ব স্বীকার করিয়া লইলে তাঁহার স্নেহলাভ হইবেই।

শাশুড়ীর সহিত বধূর সাংসারিক সংযোগ অত্যন্ত গভীর এবং নিবিড়। প্রত্যেকটি কার্য্যে তাহাকে শাশুড়ীর মতামতের উপর নির্ভর করিতে হয়। রন্ধন কার্য্য, ভাঁড়ার রাখা, হিসাবপত্র রাখার ব্যবস্থা, ঝি চাকরদের খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা, বস্ত্রাদি এবং শয্যাদি পরিষ্কার রাখার কার্য্য, ঘরদ্বার পরিচ্ছন্ন রাখার ব্যবস্থা ইত্যাদি সব কার্য্যেই শাশুড়ীকে বধূ সাহায্য করিবে। ঝি-চাকর অপরাধ করিলে নিজে তাহার শাস্তিবিধান কদাচিৎ করিবে, অন্যথায় শাশুড়ীকে অগ্রাহ্য করা হইবে। গৃহ-

সাম্রাজ্যে শাশুড়ীই যেন 'ডিক্টেটার', এই কথা সর্ব্বদা মনে রাখা উচিত।

বধূর প্রতিপত্তি হয় ত অল্প দিনেই প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে, কিন্তু তাহার সুযোগ গ্রহণ না করাই বধূর পক্ষে বিধেয়।

গৃহে নিত্যপূজাদির ব্যবস্থা থাকিলে বধূকে শাশুড়ীর নিকট হইতে পূজার কার্য্যগুলি সযত্নে শিখিয়া লইতে হইবে। এখানে তাহার নিজের মতামতের কোন স্থান নাই। যে পূজা ঐ বংশের বহুপূর্ব্বপুরুষের দ্বারা যেভাবে পরিচালিত তাহা সেই ভাবেই পরিচালন করা উচিত। শাশুড়ী তাহার সবই জানেন, তাহাই তাঁহার নিকট উহার শিখিয়া লইতে হইবে। নিজের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা কদাচ উহার কার্য্যে লাগাইবে না। তবে যদি সুন্দর ও সুষ্ঠু কোন কিছু—যথা, আরতি বা বরণ-করা, কিম্বা আলিপনা জানা থাকে তবে শাশুড়ীর অনুমতি লইয়া তাহা করা যাইতে পারে। এই সকল প্রসঙ্গ হইতে আত্মপ্রসাদের সঙ্গে স্নেহলাভও মন্দ হইবে না।

শাশুড়ীর খাইবার পূর্ব্বে বধূর খাওয়া কখনো উচিত নয়, এবং শ্বশুর-শাশুড়ী না শয়ন করিলে বধূ শুইতে যাইবে না। প্রত্যেক বধূর এই নিয়ম মানিয়া চলা একান্ত কর্ত্তব্য, নহিলে 'বেহায়া' আখ্যা লাভ অসম্ভব নহে।

শ্বশুরের সহিত বধূর সাক্ষাৎ সম্বন্ধ অল্পই, তবে যতটা সম্ভব সম্বন্ধ রাখিতে পারিলে বধূর পক্ষে উপকার হইবে। কারণ শ্বশুর বধূকে কন্যার চক্ষেই দেখিয়া থাকেন এবং তাঁহার স্নেহ লাভ করিতে বিশেষ বেগ পাইতে হয় না। সাধারণতঃ পুরুষজাতির মধ্যে নারীদের উপর যে মমত্ববোধ থাকে তাহা ত শ্বশুর বধূকে স্নেহ করেন। বধূ একটু বুদ্ধিমতী হইলে অনায়াসেই এই স্নেহকে কন্যাস্নেহে পরিণত করিতে পারে।

এত রকম কার্য্য করিয়াও বধূর সর্ব্বপ্রধান কার্য্য স্বামীসেবা বাকি থাকিয়া গেল। স্বদেহের ও মনের উৎকর্ষ-সাধনের সঙ্গে স্বামীসেবার নৈকট্য খুবই বেশি, কারণ বধূ যাহা কিছু করে সবই ঐ একটি মানুষের মনটুকু ভরাইয়া তুলিবার জন্য। তাই আমরা ঐ বিষয় একসঙ্গেই আলোচনা করিব।

শিশুদের রোগে টোটকা

আমরা এখানে কচি ছেলেমেয়েদের সাধারণ রোগ ও তাহার প্রতিকার সম্বন্ধে আলোচনা করিব। পূর্ব্বে আমাদের পিতামহিগণ নানারূপ টোটকার সাহায্যে শিশুদের অত্যন্ত কঠিন রোগও সারাইতে পারিতেন; আর আজ আমরা আধুনিক সভ্যতার মোহে নানারূপ বিলাতি খাদ্য ব্যবহার করিয়া সেই সব অমূল্য ঔষধাবলীর গুণাগুণ প্রায় ভুলিতে বসিয়াছি। পূর্ব্বে শিশুদের জন্য আলুই খাওয়ানোর ব্যবস্থা ছিল; মধু ও অন্যান্য অনেকগুলি জড়ি একত্র মিশ্রিত করিয়া এই ঔষধটি প্রস্তুত হইত। ইহাতে শিশুদের ঠাণ্ডা লাগা, গলা ফুলা, পেটের পীড়া ইত্যাদি রোগ কদাচিৎ হইত। আধুনিক কালে এই 'আলুই'এর তালিকা প্রকাশ করিলে আমাকে হাস্যাস্পদ হইতে হইবে। আমরা মার 'আলুই'এর সাজে দেখিয়াছি, আস্ত একটি গোসাপের মুণ্ড ছিল; উহাও ঘষিয়া অন্যান্য ঔষধের সহিত মিশ্রিত করা হইত। যাক সে কথা।

আজকালকার যুগে ঠাণ্ডা লাগিবার ভয়ে শিশুকে অনর্থক কতকগুলি জামাকাপড় পরাইয়া রাখা একটা ফ্যাসান দাঁড়াইয়াছে। আমাদের শৈশবেও তেল মাখাইয়া শিশুকে রৌদ্রে ফেলিয়া রাখা হইত; কিন্তু এই প্রথা ক্রমশঃ উঠিয়া যাইতেছে।

অতিরিক্ত জামা কাপড় পরাইয়া রাখা, স্নানের নির্দ্দিষ্ট কোন দিন না থাকা এবং গরম ঔষধ পান করানোর জন্য শিশু স্বভাবতঃই সর্দ্দিপ্রবণ হয় এবং উত্তরজীবনে কোনদিন ঠাণ্ডা-লাগার হাত হইতে নিষ্কৃতি পায় না। পক্ষান্তরে একেবারেই জামাকাপড় না পরাইয়া রাখাও বিপজ্জনক। ইহাতে অকস্মাৎ শীতল বায়ুপ্রবাহ লাগিয়া শিশু নিউমোনিয়া ইত্যাদি কঠিন রোগে আক্রান্ত হইতে পারে।

ময়লা জামা কাপড়, ধুলা, বা আস্তাকুড়ের দুর্গন্ধ শিশুর স্বাস্থ্যের পক্ষে অত্যন্ত হানিকর। ছোট ছেলে প্রায়ই ধুলায় গড়াগড়ি দিতে ভালবাসে। পল্লীগ্রামে উহা ততটা বিপজ্জনক নাও হইতে পারে। কারণ সেখানে রোগ-জীবাণু অনেক কম কিন্তু সহরে উহা শিশুর পক্ষে মারাত্মক। শিশুকে কখনো ধুলার উপর শোয়াইতে বা খেলা করিতে দিতে নাই।

শিশুদের আর একটি বিপজ্জনক অভ্যাস, যাহা কিছু চোখের সামনে পাইবে তাহাই সে মুখে পুরিবে। বহু কদর্য্য বস্তু এইরূপে উহাদের উদরে প্রবেশ করে, অনেক সময় গলায় আটকাইয়া গিয়া সমূহ বিপদ বাধায়। এই সমস্ত বিষয় হইতে গৃহের কন্যাগণ অপেক্ষা বধূগণের অধিক সাবধান হওয়া কর্ত্তব্য। কারণ কন্যাদের ত্রুটি-বিচ্যুতি গুরুজনগণ ক্ষমার চক্ষে দেখিলেও বধূগণের সম্বন্ধে তাঁহারা ততখানি সহনশীল হইতে পারেন না এবং বিপদ যাহা ঘটিবার তাহা তো ঘটেই। যে বধূ গৃহের সকলের স্নেহপাত্রী হইতে চায়, সে এইসব বিষয়ে বিশেষরূপে সাবধান হইবে।

বিড়াল, খরগোস প্রভৃতি গৃহপালিত পশুর দেহ হইতে নানারূপ বিষাক্ত জীবাণু, বিশেষ করিয়া ডিপ্‌থিরিয়া নামক রোগ শিশুদেহে সংক্রামিত হইতে পারে। বধূ ইহা জানিয়া রাখিয়া শিশুগণকে সাবধানে ঐ সব জন্তুর সহিত খেলা করিতে দিবে। খেলা করিবার জন্য শিশুদিগকে এমন খেলনা দিতে হয় যাহা নিতান্ত কম খরচে বাড়ীতেই প্রস্তুত করা যাইতে পারে। নানা রঙিন কাগজের ফুল এই বিষয়ে ব্যবহার করা ভাল।

বাঁশের বাঁখারী কাটিয়া একটী ফ্রেম তৈরী করা বিশেষ কিছু কঠিন কার্য্য নয়। ফ্রেমখানির উপর নানা রঙের কাগজ কাঁচি দিয়া নানাভাবে কাটিয়া আঁটা দিয়া আঁটিয়া দিলে সুন্দর খেলনা তৈরী হয়, অথচ ইহার খরচ দুই এক আনার বেশি নয়।

খড়ের কাঠামো তৈরী করিয়া তাহার উপর কাদার প্রলেপ মাখিয়া রঙিন কাগজ জড়াইলে পাখী, ঘোড়া, গরু প্রভৃতি ছেলেদের মনোরঞ্জনকর খেলনা তৈরী হইতে পারে। মাটির পুতুল তৈরী করিতে এ দেশের প্রায় সব মেয়েই জানে। বধূ ঐগুলি শিখিয়া রাখিলে ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের মনোরঞ্জন করা তার পক্ষে সহজ হইতে পারে এবং অবসর সময়ে ঐগুলি ভালরূপে প্রস্তুত করিলে গৃহসজ্জাও বৃদ্ধি পায়, এমন কি সুযোগ-সুবিধা পাইলে উহা বিক্রয় করিয়া দুই পয়সা উপার্জ্জন করাও চলে। আমাদের জনৈকা বিধবা প্রতি-বেশিনী শোলার পাখী তৈরী করিয়া বিক্রয় করিত, ইহাতে তাঁহার মন্দ আয় হইত না। শিশুদের খেলা একটী বিস্তৃত বিষয়, উহার সম্বন্ধে স্বতন্ত্র অধ্যায়ে আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

ছেলেদিগকে অকস্মাৎ চম্‌কাইয়া দিয়া অনেকে মজা দেখেন। ইহা অত্যন্ত অনিষ্টকর কার্য্য। উহাতে শিশু স্নায়বিক দৌর্ব্বল্যে আক্রান্ত হইতে পারে। শৈশবের এই 'নার্ভাস্‌নেস' জীবনে আর আরোগ্য হইবার সম্ভাবনা থাকে না।

কেহ বা শিশুকে অতিরিক্ত হাসাইয়া বা অনর্থক ধমক দিয়া কাঁদাইয়া আনন্দ পান। আমার মতে উহাদের সকলকে শিশুরক্ষা আইন অনুসারে শাস্তি দেওয়া উচিত। ঐরূপ করিলে শিশু অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া পড়ে এবং 'তড়কা' ইত্যাদি রোগে ভুগিতে থাকে। শিশুদের স্নায়ু অতিশয় অনুভূতিশীল হইলেও উহা শক্ত হইয়া গড়িয়া উঠিতে বহুদিন সময় লাগে। এই জন্য শিশুর পক্ষে শান্তির আবহাওয়া একান্তই প্রয়োজন। সহরে যে সব শিশুর জন্ম হয় তাহাদিগকে জন্মে প্রায়ই 'নার্ভাস্' হইতে দেখা যায়। সহরে নানারূপ যন্ত্রপাতির শব্দ, লোকের কোলাহল এবং প্রতিপালকদের ব্যস্ততা ইত্যাদি ইহার কারণ। যে সব শিশু অতি কচি অবস্থা হইতে দ্রুতগামী যানে যাতায়াত করে তাহাদের স্নায়ু দুর্ব্বল হইয়াই গড়িয়া উঠে।

এই সমস্তগুলির প্রতিকারার্থে নিম্নলিখিত ব্যবস্থা অবলম্বনীয় :—

১। প্রত্যহ কিছুক্ষণ শিশুকে খোলা জায়গায় রৌদ্রে রাখিবে,—প্রভাতের সূর্য্যকিরণ শিশুদেহের পক্ষে উপকারী। ঐ সময় যতদূর সম্ভব কম কাপড়-জামা তাহার গায়ে থাকিবে।

২। আদর করিবার ও খেলা দিবার সময় লক্ষ্য রাখিবে যেন কোনরূপেই শিশুর মনে আঘাত না লাগে। শিশুর মন অত্যন্ত অনুভূতিপ্রবণ এবং উহার গ্রহণশক্তি এত বেশি যে, একবার গ্রহণ করিলে ভুলিয়া যাওয়া প্রায় অসম্ভব। শিশুর মুখের খুব নিকটে মুখ আনিয়া চুম্বনাদি করিবে না, কারণ বয়স্ক লোকের শ্বাসপ্রশ্বাস জীবাণুবর্জ্জিত নহে।

৩। শিশুকে প্রত্যহ সহমত শীতল জলে স্নান করানো অভ্যাস করিবে। এবং তাহার আহারাদি নিয়মিত সময়ে, নির্দ্দিষ্ট পরিমাণে নিয়ন্ত্রিত করিবে।

শান্ত এবং স্বাস্থ্যকর আবহাওয়াই শিশুমন গঠনের ও

শরীর পুষ্টির উপযুক্ত স্থান। শিশুকে সুন্দর ও সুস্বাস্থ্যবান করিয়া তুলিতে হইলে ইহার একান্ত প্রয়োজন। অতএব যতদূর সম্ভব শিশুদের কল্যাণের জন্য বাটীর পারিপার্শ্বিক আবহাওয়া নিয়ন্ত্রিত করিতে হইবে।

শিশুদের জ্বর হইলে স্তন মুখে দিবামাত্র মাতা তাহা জানিতে পারেন। তৎক্ষণাৎ তাপমান যন্ত্র (থার্মোমিটার) দিয়া জ্বর কতখানি, কখন বাড়িতেছে এবং কখন কমিতেছে তাহা লিখিয়া রাখা উচিত। জ্বর হইলে প্রায়শঃ শিশুদের শ্বাসকষ্ট হয়। ইহা লক্ষ্য করিবার জন্য নিম্নলিখিত লক্ষণগুলি জানিয়া রাখা কর্ত্তব্য। শিশু স্বচ্ছন্দে স্তন টানিতে পারে না, তাহার পাঁজরাগুলিতে উপরে, নীচে ও ভিতর দিকে টান পড়ে, পেট ফাঁপিয়া উঠে, নাকের ডগা নীলাভ হইয়া যায়। এই সব লক্ষণ দৃষ্ট হইলে তখনি সুচিকিৎসকের পরামর্শ লওয়া উচিত। সামান্য সর্দ্দি বা "বালসার" ভাবিয়া কদাচ এই লক্ষণগুলি উপেক্ষা করা উচিত নহে।

ডিপ্থিরিয়া নামক দুরারোগ্য মারাত্মক রোগেও উপরের লক্ষণের অনেকগুলি প্রকাশ পায়। এই ব্যাধি অত্যন্ত আকস্মিকভাবে আত্ম-প্রকাশ করে।

'হুপিং কফ্' শিশুদের একটি সাধারণ রোগ। এই রোগের আক্রমণে শিশু টানকাশিতে কষ্ট পায় এবং কাশিতে কাশিতে দম্ আটকাইবার মত অবস্থা হয়; অনেক সময় কাশির বেগে চক্ষুর শিরা ছিঁড়িয়া যায়। এই রোগ সারিতে প্রায় দেড় মাস হইতে দুই মাস সময় লাগে। ইহাও একটি ছোঁয়াচে রোগ। অতএব শিশুকে সকল রকমে এই রোগীর স্পর্শ হইতে দূরে রাখিতে হইবে।

সর্দ্দির প্রাবল্য—বহু শিশুকে দেখা যায় নাক দিয়া অবিশ্রাম সর্দ্দি গড়াইতেছে আর শিশু তাহা চাটিয়া খাইতেছে। বহু ভদ্রঘরের ছেলেমেয়েদের মধ্যেও এই কুৎসিত দৃষ্টান্ত লক্ষ্য করা যায়। তাহাদের পিতামাতাকেও এ সম্বন্ধে উদাসীন দেখা যায়। অথচ শিশুকে একটু রোদ-বাতাস-সহিষ্ণু করিলে এবং যৎসামান্য টাট্‌কা কাঁচা ফলমূল (বিলাতী বেগুন, গাজর, লেবু) খাইতে দিলে ঐরূপ সর্দ্দিকরা অতি সহজেই আরোগ্য হইয়া যায়।

নাক ও গলার সঙ্গে কাণের অতি নিকট সম্বন্ধ থাকায় সর্দ্দিতে আক্রান্ত শিশু কাণের ব্যথা, পুঁজ প্রভৃতি রোগেও কষ্ট পাইতে থাকে এবং অনেক সময় শ্রবণশক্তি ক্ষীণ হইয়া যাইতেও দেখা যায়। শৈশবে কয়েক মাস পশ্চিমের শুষ্ক জলহাওয়াতে রাখিতে পারিলে শিশুর এই সব রোগ সারিয়া যায়। ইহা একাধিক ক্ষেত্রে লক্ষ্য করিয়াছি।

সর্দ্দি-কাশির সংখ্যাতীত ঔষধ বাজারে পাওয়া যায় এবং আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত পিতামাতা গাঁটের কড়ি খরচ করিয়া চিকিৎসকের বিনাপরামর্শে উহা শিশুকে খাওয়ান এবং এইরূপে শিশুকে শৈশব হইতেই ঔষধের দাস করিয়া তুলেন। স্বাভাবিক উপায়ে রোগনিরাময় করিবার প্রথা ক্রমশঃ আমাদের দেশ হইতে উঠিয়া যাইতেছে। পূর্ব্বে দেখিয়াছি শিশুর সর্দ্দি-কাশিতে মধুই যথেষ্ট ঔষধ ছিল, কখনো পিপুলচূর্ণ এবং কোন সময় কণ্টিকারী বা বাকসের পাতা ব্যবহার করা হইত। শিশুদের পক্ষে তুলসী পাতার রস, রসুনের রস, গলায় কাঁচা রসুন বাঁধা, লবঙ্গ পোড়া, ময়ূর পাখা ভস্ম, বচ, যষ্টিমধু প্রভৃতি টোটকা যে কত উপকারী তাহা বলিবার নয়। আয়ুর্ব্বেদের বালাধিকার অধ্যায়ে ঐ সব ঔষধের ব্যবহারবিধি এমন সুনির্দ্দিষ্ট প্রণালীতে লিপিবদ্ধ আছে যে তাহা বুঝিবার জন্য অধিক লেখাপড়ার আবশ্যক করে না।

যতদিন শিশু মাতৃদুগ্ধ পান করে ততদিন মাতার খাদ্যাদির নিয়ন্ত্রণে শিশুর সকল রোগই সারিয়া যায়। সহরে প্রসবের পর ব্রাণ্ডি, ভাইব্রোণা ইত্যাদি খাওয়ানোর ব্যবস্থা করা হয়। ইহার একদিকের কুফলের কথা কেহই বিবেচনা করেন না। যে মাতা যাহা কিছু আহার গ্রহণ করে তাহার কিয়দংশ শিশুও স্তন্যের সহিত গ্রহণ করে। এই অবস্থায় মাতা ব্রাণ্ডি বা পোর্ট খাইলে উহা শিশুর দেহেও প্রবেশ করে। উহাতে যে সুরাসার আছে তাহা আমাদের গ্রীষ্মপ্রধান দেশে শিশুদেহের পক্ষে অনিষ্টকারী।

বধূজীবনের প্রথম অবস্থায় এই সব গুরুতর বিষয়ের প্রয়োজন না হইতে পারে, কিন্তু উহাই বধূর শিখিবার সময় এবং উত্তরজীবনের জন্য প্রস্তুত হইবার সুযোগ। এই জন্য প্রথম হইতে সাধারণ স্বাস্থ্য ও অবশ্য প্রতিপাল্য বিষয়গুলি এত বিস্তৃত ভাবে আলোচনা করিতে বাধ্য হইতেছি। এইগুলি ভালরূপে জানিয়া রাখিলে বহুসময়ে বয়োজ্যেষ্ঠগণও বধূকে শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিবেন এবং তাহার মতামত গ্রহণ করিতে বাধ্য হইবেন। বধূ এইরূপে ধীরে ধীরে অন্তঃপুরের অঙ্গে আপনাকে জুড়িয়া দিতে পারিবে অপরিহার্য্য পরিণতিতে। তাহার স্বস্থান হইতে তাহাকে বিচ্যুত করিবার শক্তি আর পরিবারের কাহারও রহিবে না।

এই সব বিষয়ে যথোচিত শিক্ষা-প্রাপ্ত হইলেও বধূর কর্ত্তব্য শেষ হইল না। ইহার পর গুরুজনদের সেবা, স্বামীর পরিচর্য্যা ও সখীত্ব এবং স্বদেহের ও মনের উৎকর্ষ সাধন তাহার অবশ্য-কর্ত্তব্যের অঙ্গীভূত।

আবর্ত্তন

শ্রীহেমাঙ্গিনী ঘোষ, সরস্বতী

শ্যামাসুন্দরী আহ্নিক শেষ ক'রে সবে জপের মালাটী হাতে করেছেন, পুত্রবধূ কমলা এসে বলে, "মা! খোকা সাবু খেতে চাইছে না।"

মায়ের আর জপ্ করা হয় না, মালাছড়া কপালে ঠেকিয়ে পুনরায় যথাস্থানে রেখে খোকার উদ্দেশে চলেন। খোকা মানে তাঁর আদরের পৌত্র, তাঁর বড় ছেলের প্রথম পুত্র, দশম বর্ষীয় বালক, তার নাম অমূল্যকুমার। কিন্তু ঠাকু'মার আদরের নাতি, মায়ের প্রথম সন্তান, কাজেই তিনি খোকা। খোকার কয়দিন জ্বর হয়েছে। ঠাকু'মা এসে সাধ্য-সাধনা ক'রে, খোকাকে সাবু খাওয়ান। এই অজুহাতে খোকাবাবু ঠাকু'মার কাছ থেকে ঘুড়ী-লাটাইয়ের পয়সা আদায় করে।

খোকাকে সাবু খাইয়ে গৃহিণী পুনরায় জপে বসবেন, ঝি রামার মা এসে আর্জী দাখিল করে, "মা, গয়লা যে দুধ দিয়ে গেছে, সে দুধে গন্ধ, ঠাকুর কি করবে?" এবার গৃহিণী একটু বিরক্ত হ'য়ে বলেন, "যখন দুধ দিয়ে যায়, তখন দেখে নিতে পার নি? যেটী আমি নিজে না দেখব, তাতেই গোল বাধবে; যাও—বৌমাকে যেয়ে বলগে।"

"তাঁকে বলেছিনু, তিনি বল্লেন, তোমাকে জানাতে।" গৃহিণী একটু ভেবে বলেন, "এত বেলায় আর দুধ পাবে কোথায়? ওটা জল দিয়ে রাখতে বল, রামা কোথায়? তাকে বল একখানা দই কিনে আনুক।"

দেশে জলকষ্ট হয়েছে, বড়ছেলে অনাদি এসে মাকে বলে, "মা! একটা পুকুর কাটাতে হবে।" মা বলেন, "বাবা! তোমরা যা ভাল বোঝ কর, আমি তার কি বলব?"

"তোমার মত না নিয়ে ত আমরা কিছু করতে পারি নে মা!"

বধূ কমলা ভাঁড়ার বের ক'রে দেবার জন্যে শাশুড়ীকে ডাকে। শাশুড়ী বলেন, "আমাকে আর জড়াও কেন মা? এখন আমায় অবসর দাও।" কিন্তু তাঁকে যেতেও হয়, ভাঁড়ার বের ক'রে দিতেও হয়। এই রকম সংসারের প্রতি কথায়, প্রতি খুঁটি-নাটি কাজে তাঁর প্রয়োজনীয়তা বেশ বোঝা যায়।

মা ছেলেদের বলেন, "বাবা, আর কেন? দিন ত ফুরিয়ে এল, এখন আমার দিনের উপায় ক'রে দে। আমাকে কাশী পাঠিয়ে দে, বাবা বিশ্বনাথ, মা অন্নপূর্ণার চরণে যেয়ে পড়ে থাকি।"

ছেলেরা বধূরা সকলে হাঁ হাঁ ক'রে উঠে, "বল কি মা? তুমি আমাদের ছেড়ে গেলে আমাদের উপায় কি হবে? আর সংসারই বা দেখবে কে? বাবা নেই, তুমি আছ, তাই আমরা কোন অভাব জানতে পারি নে, পর্ব্বতের আড়ালে আছি ব'লে মনে করি। তুমি চলে যাবে মনে হ'লে—বাপ রে!—ও-সব চিন্তা ছেড়ে দাও।"

মার আর কাশী যাওয়া হয় না।

সন্ধ্যের পরে বিস্তৃত-শয্যায় ছোট ছোট ছেলেদের হট্টগোল বেধে যায়। নাতি-নাৎনীরা সকলেই ঠাকু'মার কোল অধিকার করতে ব্যস্ত। কেউ দাবী ছাড়তে চায় না। তাদের সামলাতে ঠাকু'মাকে অনেক বেগ পেতে হয়। ব্যাঙ্গমা-ব্যাঙ্গমী, রাজপুত্তুর-কোটালপুত্তুর, তার পর ভূত-প্রেত-পিশাচের সহায়তায়—ঠাকু'মাকে নাতি-নাৎনীদের মন রাখতে—মান ভাঙ্গতে হয়। ফলে, ঠাকু'মাকে নইলে কারো এক মুহূর্ত্ত চলবার যো নেই। সংসার বুঝি বা অচল হ'য়ে পড়ে। এই ভাবে দিন যায়।

বছর পাঁচেক পরের কথা। কি জানি—কেমন ক'রে গৃহিণীর মনে কেমন সন্দেহ হয়, যেন সকলে তাঁকে এড়িয়ে চলে। প্রথমে ভাল বুঝতে পারেন না, কিন্তু আগুন বেশীক্ষণ ঢাকা থাকে না। অস্পষ্ট ছায়া ক্রমে সুস্পষ্ট বাস্তবে পরিণত হয়। হঠাৎ একদিন শ্যামাসুন্দরীর বদ্ধ-দৃষ্টি খুলে যায়। তাঁর স্বামীর বেশ বড় একখানি তালুক ছিল। কর্ত্তা বেঁচে থাকতেই সেখানে একটী শিব-মন্দির স্থাপনের উদ্যোগ-আয়োজন চলছিল। ছেলেরা কতদিন মায়ের সঙ্গে এ-বিষয়ে পরামর্শ করেছে। হঠাৎ কর্ত্তার মৃত্যু হওয়ায় সে-প্রসঙ্গ চাপা পড়ে যায়।

অনেক দিন পরে গৃহিণী বড়ছেলে অনাদিকে জিজ্ঞাসা করেন, "সে মন্দির প্রতিষ্ঠার কি করলে?" পুত্র প্রথমে যেন শুনতে পায় নি—এমনি ভাব দেখায়। মা পুনরায় জানতে চাইলে চটকা ভাঙ্গার মত হ'য়ে বলে, "ও: !—সেই মন্দির? হ্যাঁ—তা তো হয়ে গেছে!" মা অবাক হ'য়ে বলেন, "হ'য়ে গেছে কি রকম? আমি কিছু জানতে পেলাম না!"

"সে তো আগেই বলা ছিল, এর পরে আর তেমন ভাল দিন ছিল না কি না? এর পরেই অকাল পড়ে যাবে, তাই ঠাকুর মশায় বল্লেন, তাড়াতাড়ি অমনি—" তাচ্ছিল্য-ভাবে যা-তা ব'লে পুত্র পাশ কাটিয়ে চলে যায়। মা অবাক হ'য়ে চেয়ে থাকেন। কোন উত্তর করেন না, বুঝি তাঁর উত্তর করবার কিছু ছিল না। দিন কয়েক পরে গৃহিণী বধূকে ডেকে বলেন, "বৌমা ভাঁড়ার নিয়ে যাও।"

সে বলে, "আমি বের ক'রে দিয়েছি।" মা বলেন, "চাবি পেলে কোথায়?"

"সে আমি তুলে রেখে দিয়েছি।" ব'লে বধূ চলে যায়। মা নীরবেই থাকেন, মনে করেন, তাঁর বলবার বুঝি আর কিছুই নেই।

নাতি-নাৎনীরা এখন বড় হয়েছে। ঠাকু'মার কোল নিয়ে এখন তারা আর ব্যস্ত নয়। বিস্তৃত-শয্যার দিকে চেয়ে প্রৌঢ়া নারীর অন্তরপ্রদেশ খাঁ-খাঁ ক'রে উঠে, কিন্তু তাতে তাদের কি? তারা এখন বড় হয়েছে, তাদের এখন বাইরে দেখবার শোনবার দরকার। ঠাকু'মার সেই মামুলি সোনার কাঠি-রূপোর কাঠি, সেই শঙ্খ রাজপুত্তুর—সে সবের আর কোন আকর্ষণ নেই। সে সব গল্প এখন তাদের কাছে নিতান্তই আজগুবি-গাঁজাখুরি ব'লে মনে হয়।

ঠাকু'মা ডাকেন, "ওরে অমু, নীরু, ধীরু, শান্তা, হাসি আজ তোদের বেহ্মদত্যির গল্প বলব—শুনবি আয়।"

আগের মত কেউ আর আগ্রহ দেখায় না, উল্‌টে জবাব দেয়, "তুমি এখন মালা জপ কর গে ঠাকু'মা, আর না হয় নিজে নিজে শোন গে। আমাদের বাইরে কাজ আছে,"—ব'লে কেউ বা হেসে কেউ বা টিটকিরি দিয়ে চ'লে যায়। ঠাকু'মা শুক্‌নো মুখে শুধু চেয়ে থাকেন, আর ভাবেন চাকার গতি ফিরে গেছে। এ-সংসারে তাঁর আর কোনই প্রয়োজন নেই। সংসার তাঁর নয়, কেউ তাঁকে চায় না, এখন শুধু প্রতীক্ষা সেই দিনের!!

পল্লীশ্রী

—শ্রীগৌরীপ্রসন্ন মজুমদার

বন্দীযেরা পল্লীমায়ের ছায়াশীতল প্রাণে,
যে সুর বাজে ঐ যে জাগে রাখাল ছেলের গানে।
এক হাতে তার পাঁচনখানি, আরেক হাতে বাঁশী,
পল্লীমায়ের বিষাদ-ঘন ঠোঁটে ফোটায় হাসি।
কোথাও ফোটে আকন্দ যুঁই, কোথাও বেলী চাঁপা,
মন্দ-মৃদুল বাতাসভরে শ্যামল পাতার কাঁপা।
ঐ যে নদী ছোট্ট নদী চলছে এঁকে বেঁকে,
পল্লীমায়ের চরণতলে ঢেউয়ের দোলা রেখে।
পল্লীবধূ ঘোমটা ঢাকে—চাউনী সে চঞ্চল,
চলছে ধীরে কলসী কাঁকে আনতে ঘাটে জল।

গ্রামে সবাই চল রে ফিরে বাঁধবি সেথায় ঘর,
সকাল বেলায় দেখবি সবে প্রথম রবির কর।
মুগ্ধ চিত্তে শুনবি বারেক রাখাল ছেলের বাঁশী,
দেখবি সবে ফুটবে নব পল্লীমায়ের হাসি।
শুনবি সবে আপন মনে প্রভাত পাখীর গান,
হাওয়ার বুকে ভেসে আসা নদীর কলতান।
গান গেয়ে ঐ যায় চলে যায় পানসী নায়ের-মেয়ে,
চৈত্র-আকাশ আঁধার করে মেঘ আসে ঐ ছেয়ে।
প্রণাম করি পল্লী তোমায় তুলনাহীন ভবে,
বন্দীযেরা পল্লীবুকে চল রে ফিরে সবে।

হিষ্টিরিয়া ও তাহার জল-চিকিৎসা

— শ্রীকুলরঞ্জন মুখোপাধ্যায়

১

স্নায়বিক বিশৃঙ্খলার ফলে দেহের ভিতর বিভিন্ন রোগ-লক্ষণ উৎপন্ন হইয়া থাকে। বিভিন্ন জাতীয় স্নায়বিক বিশৃঙ্খলায় বিভিন্ন রোগ-লক্ষণ উৎপন্ন হয়। কোন কোন সময় এমন হয় যে, রোগিণী হঠাৎ কাঁদিয়া ফেলে বা হাসিয়া লুটাইয়া পড়ে, সহজেই অত্যন্ত উত্তেজিত হয়, কোন কাজে মনঃসংযোগ করিতে পারে না বা কখনো মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ে এবং হাত পা ছুড়িতে থাকে। তখন তাহাকে হিষ্টিরিয়া বলা হয়।

এই রোগ সাধারণতঃ স্ত্রীলোকদেরই হইয়া থাকে। কিন্তু পুরুষদের যে না হইতে পারে তাহা নয়। সাধারণতঃ চৌদ্দ হইতে পঁচিশ বৎসর বয়সের মধ্যে এই রোগ হয় এবং বহু ক্ষেত্রেই আপনা-আপনি চলিয়া যায়। কিন্তু রোগিণী যদি দ্রুত আরোগ্য লাভ না করে, তবে ইহা হইতে বিভিন্ন কঠিন রোগ উৎপন্ন হইতে পারে।

এই রোগটিকে সভ্যতার অন্যতম ব্যাধি বলা হইয়া থাকে। পৃথিবীর বিভিন্ন অসভ্যজাতির মেয়েদের ভিতর কখনও এই রোগ দেখা যায় না। মুক্ত আকাশের তলে, মুক্ত বায়ুতে যাহারা থাকে, সর্ব্বদা টাট্‌কা জিনিষ খায়, পুরুষদিগের সহিত সমানভাবে যাহারা পরিশ্রম করে, কোষ্ঠবদ্ধতা বলিয়া কোন অবস্থা যাহারা জানে না এবং ছেলেবেলা হইতে অতিরিক্ত আদরে যাহাদের মাথা নষ্ট হয় নাই, তাহাদের কখনো হিষ্টিরিয়া হয় না। অসভ্য জাতির মেয়েদের ভিতর যে হিষ্টিরিয়া হয় না, ইহার কারণ তাহাই।

মানুষের জীবন গড়িয়া উঠে বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করার পথে। কেবলি কুসুমাস্তীর্ণ পথে চলিলে স্নায়ুগুলি দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। সেই সঙ্গে শ্রম ও স্বাভাবিক খাদ্যের অভাবে দেহের বিষ-মোক্ষণকারী যন্ত্রগুলি দুর্ব্বল হইয়া যায় এবং কোষ্ঠবদ্ধতা আসে। তখন দেহের ভিতর একটা বিষাক্ত পরিস্থিতি উৎপন্ন হয়। যখন ঐ বিষ দুর্ব্বল স্নায়ুকেন্দ্র আক্রমণ করে এবং তাহাদের ভিতর বিশেষ এক শ্রেণীর বিশৃঙ্খলা উৎপন্ন হয়, তখন হিষ্টিরিয়া রোগ প্রকাশ পাইয়া থাকে। এইজন্য যে-সমস্ত মেয়ে অত্যন্ত আদরে থাকে, সকলে যাহাদের মন যোগাইয়া চলে, কোন খেয়ালে যাহারা কখনো বাধা পায় না, যাহাদের কোনরূপ পরিশ্রম করিতে হয় না, ফল ও শাক-সব্জি প্রভৃতি প্রকৃতির দান যাহারা ঘৃণায় স্পর্শ করে না এবং কলে ছাটা পরিষ্কৃত চাউল, সাদা ময়দা ও পরিষ্কৃত চিনি প্রভৃতি কৃত্রিম খাদ্য (denatured food) যাহাদের জীবনের প্রধান অবলম্বন এবং যাহারা এত অলস যে, নিয়মিত সময়ে পায়খানায় যায় না অথচ কোষ্ঠবদ্ধতায় ভোগে, তাহাদের সাধারণতঃ এই রোগ হইয়া থাকে।

কোন কোন অবস্থায় মাতার এই রোগ থাকিলে মেয়ের এই রোগ হয়। কিন্তু কেহই পিতামাতার নিকট হইতে এই রোগ পায় না। মানুষ পিতামাতার নিকট হইতে রোগ-বিস্তারের অনুকূল দেহ মাত্র পায়। অনুকূল দেহ থাকিলে দেহের বিষাক্ত অবস্থায় সহজেই রোগের আক্রমণ হয়। এই জন্যই মাতার এই রোগ থাকিলে মেয়ের এই রোগ হইবার সম্ভাবনা থাকে।

বহু অবস্থায় ভয় ও শোক প্রভৃতি কারণে এই রোগের হঠাৎ আক্রমণ হয়। কিন্তু পূর্ব্ব হইতে স্নায়ু দুর্ব্বল না থাকিলে কখনো এক লহমায় হিষ্টিরিয়া উৎপন্ন হইতে পারে না। যে অনুকূল অবস্থা দেহের ভিতর লোকচক্ষুর অন্তরালে দীর্ঘদিন যাবৎ চলে, হঠাৎ তাহার উপরই চরম বিপর্য্যয় উপস্থিত হয় মাত্র।

প্রকৃতপক্ষে সুস্থ লোকের কখনও হিষ্টিরিয়া হয় না। যখন স্নায়ুগুলি দুর্ব্বল থাকে বা কোন কারণে দুর্ব্বল হইয়া পড়ে এবং দেহ-সঞ্চিত বিভিন্ন বিষের দ্বারা উহারা আক্রান্ত হয়, তখনই এই রোগ হইয়া থাকে।

সুতরাং বিভিন্ন উপায়ে দেহকে দোষমুক্ত করা এবং সঙ্গে সঙ্গে দেহের স্নায়ুগুলিকে সবল করিয়া গড়িয়া তোলাই ইহার প্রকৃত চিকিৎসা।

প্রকৃতি মল, মূত্র ও ঘর্ম্মের পথে সর্ব্বদা দেহের বিষ বাহির করিয়া দিয়া দেহকে দোষমুক্ত রাখে। রোগ হইলেও উহাদের ভিতর দিয়া দেহের বিষ বাহির করিয়া দিয়া দেহকে আমরা সুস্থ করিতে পারি।

এইজন্য প্রথম প্রয়োজন রোগিণীর কোষ্ঠটি স্থায়ীভাবে পরিষ্কার রাখার ব্যবস্থা করা। এই উদ্দেশ্য বিশেষ ভাবে সাধিত হয়, প্রতিদিন দুইবার নিয়মিতভাবে হিপবাথ গ্রহণে। একটা জলপূর্ণ বড় গামলার ভিতর পা বাহিরে রাখিয়া বসিয়া অনবরত তলপেট ঘর্ষণ করিলেই হিপ-বাথ নেওয়া হয়। এই বাথ গ্রহণে কিছুকাল পর অন্ত্র এরূপ সবলতা লাভ করে যে, দুইবেলা আপনা হইতে মল বাহির হইয়া যায়। তাহা ব্যতীত হিপবাথ স্নায়ুগুলিকে উদ্দীপিত করিয়া রোগের মূল কারণই নষ্ট করে। প্রতিদিন দ্বিপ্রহরে স্নানের পূর্ব্বে এবং অপরাহ্নে দশ মিনিট হইতে অর্দ্ধঘণ্টার জন্য এই বাথ গ্রহণ করা আবশ্যক।

ইহার সহিত প্রতিদিন রাত্রিতে আহারের একঘণ্টা পর হইতে সমস্ত রাত্রির জন্য ভিজা কোমর পটি ব্যবহার করিলে কোষ্ঠ পরিষ্কার সম্বন্ধে একরূপ নিশ্চিন্ত হওয়া যাইতে পারে। নাভির চারি অঙ্গুলি উপর হইতে তলপেটের শেষ সীমা পর্য্যন্ত একখানা ভিজা নেকড়া পেট ও পিঠ ঘুরাইয়া জড়াইয়া পরে একখণ্ড ফ্লানেল দ্বারা তিন চার বার আবৃত করিলেই এই পটি (wet girdle) গ্রহণ করা হয়। এই পটির অসংখ্য গুণের মধ্যে অন্যতম গুণ ইহাই যে, ইহা সুনিদ্রা আনয়ণ করে। রোগিণী সুনিদ্রা লাভ করিতে পারিলে স্নায়ুগুলি আপনা হইতেই গড়িয়া উঠিবার অবসর পায়।

রোগিণীর দেহের লোমকূপগুলি খুলিয়া দেওয়া একান্ত ভাবে প্রয়োজন। কারণ প্রকৃতি এই পথে দেহের যথেষ্ট বিষ বাহির করিয়া দেয়। হিষ্টিরিয়া রোগে এই উদ্দেশ্য বিশেষভাবে সাধিত হয় ভিজা চাদরের প্যাক (wet sheet pack) গ্রহণে। রোগিণীকে প্রতি সপ্তাহে এক ঘণ্টার জন্য একটা প্যাক দিয়া তাহার পর শীতল ঘর্ষণ (cold friction) প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। একখানা ভিজা চাদর দ্বারা গলা পর্য্যন্ত রোগিণীর সর্ব্বদেহ আবৃত করিয়া পরে তিন চার খানা লেপ ও কম্বল দ্বারা ভিজা চাদর ঢাকিয়া দিলেই এই প্যাক দেওয়া হয়। প্যাক খুলিয়া ফেলিবার পর বার বার রোগিণীর দেহের বিভিন্ন স্থানে একখানা ভিজা তোয়ালে রাখিয়া এবং ঐ তোয়ালের উপর হস্তদ্বারা ঘর্ষণ করিয়া দেহ হইতে তাপ তুলিয়া লওয়া আবশ্যক। আবশ্যকানুযায়ী এইভাবে দশ হইতে কুড়ি মিনিটের জন্য শীতল ঘর্ষণ প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য।

ইহা ব্যতীত প্রতিদিন প্রচুর জল পান করা চাই। তাহা হইলে দেহের যথেষ্ট বিষ মূত্রের সহিত বাহির হইয়া যাইতে পারে। এইভাবে বিভিন্ন পথে যখন দেহের বিষ বাহির করিয়া দেওয়া যায়, তখন দেহের ভিতর রোগ আরোগ্যের অনুকূল অবস্থা সৃষ্ট হয়। তাহা ব্যতীত এই বাথগুলি দেহকে দোষমুক্ত করিবার সঙ্গে সঙ্গে স্নায়ুগুলির ভিতরও একটা উদ্দীপনা লইয়া আসে।

প্রকৃতপক্ষে স্নায়ুগুলিকে উদ্দীপিত করিয়া তুলিতে বিভিন্নভাবে শীতল জলে বাথ গ্রহণ করার মত আর কিছুই নাই। স্নায়ুগুলিকে উত্তেজিত করিবার জন্য বাজারে বিভিন্ন উত্তেজক ঔষধ বিক্রয় হয়। উহারা ক্ষণকালের জন্য স্নায়ুগুলিকে চঞ্চল করিয়া দেহের ভিতর কৃত্রিম একটা উত্তেজনা সৃষ্টি করে। আমরা তাহাকে শক্তি বলিয়া ভ্রম করি। কিন্তু পরক্ষণেই তাহা অধিকতর অবসাদে নামিয়া আসে। পক্ষান্তরে শীতল জলের স্পর্শে সমস্ত দেহে যে জীবনীশক্তির উদ্দীপনা হয়, তাহার পশ্চাতে অবসাদ আসে না এবং তাহা দীর্ঘ সময় স্থায়ী হয়। এই জন্য রোগিণীর প্রতিদিন দুইবার স্নান করা আবশ্যক এবং শয়নের অব্যবহিত পূর্ব্বে ভিজা তোয়ালে দ্বারা সর্ব্বদেহ মুছিয়া ফেলা কর্ত্তব্য। স্নানের সময় রোগিণীর মেরুদণ্ডে দশ হইতে কুড়ি মিনিটের জন্য শীতল জলের ধারা দেওয়া আবশ্যক। কিন্তু হঠাৎ খুব শীতল জলে বা প্রথমেই দীর্ঘ সময়ের জন্য বাথ নেওয়া বা স্নান গ্রহণ করা উচিত নয়। প্রথম প্রথম অল্প শীতল জলে এবং অল্প সময়ের জন্য বাথ নিয়া বা স্নান করিয়া ক্রমশঃ ধীরে ধীরে স্নানের তীব্রতা বৃদ্ধিকরা কর্ত্তব্য। স্নানের পূর্ব্বে রোগিণীর সর্ব্বদেহ মর্দ্দন করিয়া দিতে পারিলে খুব ভাল হয়।

চিকিৎসার দ্বিতীয় দিন হইতে সাত দিন অন্তর

সাত দিন রোগিণীর মেরুদণ্ডে পাঁচ মিনিট গরম সেকের পর অর্দ্ধ মিনিট শীতল জলপটি দিয়া অর্দ্ধ ঘণ্টার জন্ত গরম-ঠাণ্ডা পটি (alternate compress) দেওয়া আবশুক। ভোর বা সন্ধ্যায় একটা নির্দ্দিষ্ট সময়ে ইহা প্রয়োগ করা যাইতে পারে। এই পটিতে স্নায়বিক-কেন্দ্র বিশেষ ভাবে সবলতা লাভ করে। এই জন্ত এই রোগে মাঝে মাঝে যে কম্প হয় অথবা আক্ষেপ (convulsions) প্রকাশ পায়, কিছুদিন এই পটি গ্রহণ করিলে তাহা অন্তর্হিত হইয়া যায়।

রোগিণীর ঘন ঘন আক্ষেপ প্রকাশ পাইলে তাহার প্রধান প্রতিষেধকই হইল একটা জলপূর্ণ বড় টাবে পনের মিনিট হইতে এক ঘণ্টার জন্ত গলাপর্য্যন্ত জলে ডুবাইয়া রাখা। জলের উত্তাপ সর্ব্বদাই নাতিশীতোষ্ণ (৯২° হইতে ৯৭° ডিগ্রি) হওয়া আবশুক এবং ঐ অবস্থায় মাথায় ভিজা তোয়ালে রাখা কর্ত্তব্য। ঘন ঘন ফিট ও আক্ষেপ বন্ধ করিবার ইহাই প্রধান ব্যবস্থা। কিন্তু যদি বড় টাব সংগ্রহ করা অসম্ভব হয়, তবে ভিজা চাদরের নাতিশীতোষ্ণ প্যাক (neutral wet-sheet pack) প্রয়োগ করিয়াও একই ফল লাভ করা যাইতে পারে। রোগিণীকে একটা ভিজা চাদরের প্যাক দিয়া শরীর গরম হইয়া উঠিবার পর উপর হইতে দুই এক খানা কম্বল সরাইয়া নিয়া ভিতরে একটা নাতিশীতোষ্ণ অবস্থা রক্ষা করিলেই এই প্যাক দেওয়া হয়। যখন ফিট থাকে না তখনই এই সমস্ত করিয়া ফিটের আক্রমণ যাহাতে আর না হইতে পারে, তাহার ব্যবস্থা করা আবশুক।

রোগিণীর ফিট উপস্থিত হইলে তাড়াতাড়ি তাহার মুখে জলের ঝাপটা দিয়া ভিজা গামছা দ্বারা খুব অল্প সময়ের মধ্যে বুক মোছাইয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। যদি তাহাতে জ্ঞান না হয় তবে তাহার ঘাড়ে কিছুক্ষণের জন্ত উত্তাপ প্রয়োগ করা আবশুক। কোন কোন ক্ষেত্রে রোগিণীর ফিট কয়েক ঘণ্টা এমন কি কয়েক দিন পর্য্যন্ত থাকে। ঐ অবস্থায় তাহার মেরুদণ্ডে দশ মিনিটের জন্ত গরম সেক এবং পরে দুই মিনিটের জন্ত খুব শীতল জলের পটি দিয়া ত্রিশ মিনিটের জন্ত গরম-ঠাণ্ডা পটি প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। গরম প্রয়োগ করিয়াই তাহার অব্যবহিত পরে ঠাণ্ডা প্রয়োগ করা আবশুক। প্রয়োজন হইলে এইরূপ দিনে তিনবার করা যাইতে পারে। ফিট উপস্থিত হওয়া মাত্র রোগিণীকে শোয়াইয়া দেওয়া কর্ত্তব্য এবং ঘরের জানালা প্রভৃতি খুলিয়া দিয়া মুক্ত হাওয়ায় রাখা আবশুক।

মূর্চ্ছা ভঙ্গের পরও যথাসম্ভব দীর্ঘ সময় রোগিণীর মুক্ত হাওয়ায় অবস্থান করা কর্ত্তব্য। প্রতিদিন খালি গায়ে মুক্ত হাওয়ায় ভ্রমণ করাও একান্ত ভাবে আবশুক। ঘাসের উপর যে জল পড়িয়া থাকে তাহার উপর হাঁটিতে পারিলে অত্যন্ত উপকার হয়।

রোগিণীর স্বাস্থ্যের যাহাতে উন্নতি হয়, তাহার জন্ত সর্ব্বতোভাবে চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। স্বাস্থ্য গড়িয়া তোলাই এই রোগ হইতে অব্যাহতি লাভের সর্ব্বপ্রধান উপায়।

রোগিণী যাহাতে রোগের চিন্তা না করে, তাহার জন্ত তাহাকে উৎসাহিত করা আবশুক এবং সর্ব্বদা তাহাকে আশা দেওয়া প্রয়োজন যে, রোগ সারিয়া যাইবেই। যাহা কিছু মনকে উত্তেজিত বা অবসন্ন করিতে পারে, তাহা হইতেই তাহাকে দূরে রাখা কর্ত্তব্য। সর্ব্বদা তাহাকে একটা আনন্দের আবহাওয়ার ভিতর রাখা প্রয়োজন।

[৩]

হিষ্টিরিয়া রোগের কোন ঔষধ নাই। কিন্তু পথ্যই ইহার ঔষধ। হিষ্টিরিয়া একটা স্নায়বিক ব্যাধি। সুতরাং এই রোগের পথ্য এরূপ হওয়া উচিত যাহাতে স্নায়ুগুলি গড়িয়া উঠিতে পারে। এই জন্ত রোগিণীর পথ্যে যথেষ্টরূপ সোডিয়াম, ফসফরাস, ভাইটামিন বি, ভাইটামিন সি এবং চর্ব্বিজাতীয় পদার্থ থাকা আবশুক। খাদ্যে এই সকল জিনিষ থাকিলে স্নায়ুগুলি সবল হইয়া গড়িয়া উঠে এবং উহারা তাদের কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করিতে পারে। আর পথ্যে যদি ঐ সকল জিনিষের অভাব হয়, তখন স্নায়বিক বিশৃঙ্খলা, মাংসপেশী পরিচালনে ক্ষমতার অভাব, স্নায়বিক দুর্ব্বলতা এবং পক্ষাঘাত প্রভৃতি রোগ প্রকাশ পাইয়া থাকে। এই জন্ত রোগিণীর উপযুক্ত পরিমাণ কাঁচা ধারোষ্ণ দুগ্ধ,

লাল আটার রুটি, লাল চিড়া, গুজি, ওটমিল, পার্ল বার্লি, পালংশাক, লেটুস, পুঁই, মুলাশাক, বিট, গাজর, লাউ, শালগম, করলা, মোচা, উচ্ছে, পেঁপে, আমড়া, বেগুন, টমেটো, ফুলকপি, কড়াই শুঁটি, শুষ্ক সীমজাতীয় বীজ, কিসমিস, বাদাম, আঙ্গুর, কলা, আপেল, পেয়ারা, নেবু, নারিকেল, মাখন, অলিভ-অয়েল ও কডলিভার অয়েল গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। কিন্তু এক সঙ্গে অত্যধিক আহার করা কখনও উচিত নয়। অধিক আহার করিলেই শরীরের উপকার হয় না। শরীরের উপকার নির্ভর করে আহার করিয়া যথেষ্টরূপ হজম করার উপর। এই জন্য একসঙ্গে অনেকগুলি পদ না খাইয়া অথবা অধিক আহার না করিয়া বিভিন্ন দিনে অল্প অল্প করিয়া ঐ পথ্যগুলি গ্রহণ করা আবশ্যক।

তথাপি ইহা স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে, স্নায়ুর প্রধান উপাদানই চর্ব্বিজাতীয় পদার্থ ও ফসফরাস। এই জন্য সর্ব্বদাই এই রোগে দুগ্ধ, মাখন ও অলিভ-অয়েলের উপর জোর দেওয়া আবশ্যক। কিন্তু চর্ব্বিজাতীয় পদার্থ (fat) সর্ব্বদাই ভাত, রুটি প্রভৃতি শর্করাজাতীয় খাদ্যের (carbohydrate food) সহিত গ্রহণ করা উচিত। অন্যথা তাহা দেহের ভিতর পরিপাক হয় না এবং অম্ল উৎপন্ন হয়।

রোগের উৎকট অবস্থায় কেবল দুগ্ধ, বিভিন্ন ফল ও ফলের রস এবং টমেটো ও শশা প্রভৃতির কাঁচা ব্যঞ্জন (salad) খাইয়া থাকা উচিত। তাহার পর রোগিণী সুস্থ হইবার সঙ্গে সঙ্গে একবেলা রুটি এবং একবেলা দুধ ও কলা প্রভৃতি, পরে একবেলা ভাত ও একবেলা রুটি এবং শেষে দুই বেলাই ভাত গ্রহণ করিতে পারে। তথাপি রোগ আরোগ্যের পরও কিছুকাল পর্য্যন্ত ভাত ও রুটি কম খাইয়া ফল, দুধ ও কাঁচা তরকারী বেশী খাওয়া উচিত। সর্ব্বদাই এরূপ পথ্য গ্রহণ করা আবশ্যক যাহা সহজ-পাচ্য, অনুত্তেজক ও ক্ষারধর্ম্মী এবং যাহা আহারে কোষ্ঠ পরিষ্কার হয়।

রোগিণীর চা, কাফি, তামাকের গুঁড়া, মাংস, ডিম, গরম মসলা, অধিক মসলা, অত্যধিক মিষ্ট দ্রব্য, পরিষ্কৃত চিনি ও সাদা ময়দা সর্ব্বতোভাবে বর্জ্জন করা কর্ত্তব্য। রোগিণীর দিনে দুই বারের বেশী আহার করা উচিত নয়। মাঝে মাঝে উপবাস বিশেষ ফলপ্রদ।

জলচিকিৎসার সহিত এই পথ্যবিধি অনুসরণ করিলে এক কৌটা ঔষধ প্রয়োগ না করিয়াই হিষ্টিরিয়া আরোগ্য করা যাইতে পারে। কারণ জল যেমন দেহের আবর্জ্জনা ধোয়াইয়া লইয়া যায় এবং স্নায়ুকে স্নিগ্ধ করে, তেমনি গঠনমূলক পথ্য স্নায়ুকে নূতন ভাবে গড়িয়া তোলে। যখন দেহ এইভাবে দোষমুক্ত হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে স্নায়ুগুলি সবলতা লাভ করে, তখন হিষ্টিরিয়া থাকাই অসম্ভব হয়।

নব বিধান

জগতে আজ নব বিধানের কথা উঠিয়াছে এবং মনিষীগণ এ বিষয়ে তাঁহাদের মতামত ব্যক্ত করিতেছেন। কিন্তু ইন্দ্রিয় সংযমে সহায়ক শিক্ষার প্রবর্ত্তন না হইলে এবং জমির স্বাভাবিক উর্ব্বরতাশক্তি বৃদ্ধি করিবার উপযোগী প্রতিষ্ঠান সংস্থাপিত না হইলে মানব-সমাজে কোন প্রকৃত নব বিধানের প্রতিষ্ঠা সম্ভব হইবে না।

আফগান সংগ্রাম

—শ্রীমন্মথনাথ সরকার

আমরা একশত বৎসর পূর্ব্বেকার কথা আলোচনা করিতেছি। ইংরাজের আফগানিস্তানে প্রবেশের উদ্দেশ্য এই ছিল যে, তৎকালে রুষ অতি প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল এবং রুষের পক্ষে ভারত আক্রমণ করা অসম্ভব নহে এই বিবেচনায় ইংরাজের আফগানিস্তানের সহিত সখ্য স্থাপন প্রয়োজন হইয়া উঠিয়াছিল। ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দের ২০শে সেপ্টেম্বর তারিখে কাপ্তেন আলেকজাণ্ডার বার্ণেস কাবুলে উপনীত হয়েন। তৎকালে দোস্ত মহম্মদ কাবুলের অধিপতি ছিলেন। এই দেশ তৎকালে বিভিন্ন প্রদেশে বিভক্ত ছিল ও বিভিন্ন অধিপতির শাসনাধীনে ছিল। আফগানিস্তান তৎকালে ভারত-প্রবেশের একমাত্র দ্বার বলিয়া বিবেচিত হইত এবং এইরূপ প্রবাদবাক্য প্রচলিত ছিল যে, ভারতের অধীশ্বর হইতে হইলে তাঁহাকে তৎপূর্ব্বে কাবুল অধিকার করিতে হইবে। আফগানরা ঐ দেশের শাসক হইলেও তদ্দেশে বহুকালাবধি হিন্দু, আরবী, আর্ম্মেনীয়, হাবসী প্রভৃতি বিভিন্ন জাতি ও বিভিন্ন ধর্ম্মের লোক বসবাস করিত।

আফগান সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা আমেদ শা ১৭৭৩ খৃষ্টাব্দে মৃত্যুমুখে পতিত হন। তাঁহার সাম্রাজ্য পশ্চিমে হীরাট হইতে আরম্ভ করিয়া পূর্ব্বে সিরহিন্দ এবং উত্তরে আসাম নদী ও কাশ্মীর হইতে আরম্ভ করিয়া দক্ষিণে আরব সাগর ও সিন্ধু নদের মোহনা পর্য্যন্ত পরিব্যাপ্ত ছিল। আমেদ শার পুত্র তৈমুর শার মৃত্যু হইলে তাঁহার পুত্রগণ সিংহাসন লইয়া বিবাদ করিতে থাকেন। এই বিপদের সুযোগে বারুকজাই নামক বিরুদ্ধ দল প্রবল হইয়া উঠে এবং তাহাদের উদ্যমের ফলে আমেদ শার বংশধরগণ সিংহাসনচ্যুত হন। ১৮৩২ খৃষ্টাব্দে আমেদ শার বংশধরগণের মাত্র হীরাট প্রদেশটি অধিকারে ছিল। আফগানিস্তানের অন্যান্য অংশ দোস্ত মহম্মদ ও তাঁহার ভ্রাতৃগণ কর্ত্তৃক শাসিত হইতেছিল।

দোস্ত মহম্মদ একজন শক্তিমান ও উৎসাহী পুরুষ ছিলেন। তিনি পররাজ্যাপহারক হইলেও দেশের প্রতি তাঁহার বিশেষ অনুরক্তি ছিল। কাপ্তেন বার্ণেস দোস্ত মহম্মদের সহিত সাক্ষাৎ করেন। দোস্ত মহম্মদ ইংরাজের সহিত সখ্যভাবাপন্ন থাকিবেন বলিয়া তৎকালে তাঁহার ঐকান্তিকতা জ্ঞাপন করেন। ঐ সময়ে আমেদ শার শেষ বংশধর হীরাটের অধিপতির সহিত পারস্যের শাহের বিবাদ চলিতেছিল। এই বিবাদে ইংরাজ এই মনে করিয়া ভীত হইলেন যে, পারস্যের শাহ রুষের হাতের ক্রীড়নক মাত্র। রুষ শাহ দ্বারা হীরাট জয় করাইবেন এবং ক্রমান্বয়ে ভারতে আসিয়া অবতীর্ণ হইবেন। বলা বাহুল্য, রুষ ঐ সময়ে দোস্ত মহম্মদের সহিত সৌখ্য স্থাপনের চেষ্টা করিতেছিলেন। দোস্ত মহম্মদকে বার্ণেস্ অকৃত্রিম বন্ধু বলিয়া মনে করিতেন, কিন্তু অন্যান্য ইংরাজগণ দোস্ত মহম্মদকে সন্দেহের চক্ষে দেখিতেন। উঁহাদের এইরূপ প্রতীতি জন্মিয়াছিল যে, দোস্ত মহম্মদ ইংরাজের সহিত বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া পারস্য ও রুষের মধ্যে দূতীয়ালী করিতেছেন।

কাপ্তেন বার্ণেস দোস্ত মহম্মদকে অকপট বন্ধু বলিয়া মনে করিতেন, অথচ তাঁহার কর্ত্তৃপক্ষ দোস্তকে শত্রু বলিয়া মনে করিতে উপদেশ দিয়াছিলেন। দোস্ত মহম্মদও উভয়-সঙ্কটে পড়িয়াছিলেন। ইংরাজের সহিত তাঁহার মিত্রতা করিতেই হইবে, যেহেতু পাঞ্জাব-কেশরী রণজিৎ সিংহের সহিত তাঁহার শত্রুতা ছিল। রণজিৎ সিংহ সমগ্র কাশ্মীর প্রদেশ অধিকার করিয়া লইয়াছিলেন এবং তাহাতে দোস্ত মহম্মদ যে সবিশেষ শঙ্কিত হইয়াছিলেন তাহাতে কোন সন্দেহ ছিল না। এদিকে রণজিৎ সিংহ ইংরাজের বন্ধু। আবার রুষের চক্রান্তপূর্ণ পরামর্শ অবহেলা করিবার মত দৃঢ়তা দোস্ত মহম্মদের ছিল না। দোস্ত মহম্মদ রণজিৎ সিংহের সহিত সন্ধি স্থাপন করিবার আশায় ইংরাজকে অনুরোধ করেন। কাপ্তেন বার্ণেস তাঁহাকে এই বলিয়া আশা দেন যে, ইংরাজ সে বিষয়ে যথাসাধ্য চেষ্টা করিবেন। কিন্তু বার্ণেসের আদর্শ ইংরাজ-কর্ত্তৃপক্ষ মানিলেন না। লর্ড অকল্যাণ্ড তৎকালে ভারতের গভর্ণর জেনারেল ছিলেন। তিনি স্থির করিলেন যে দোস্ত ইংরাজের শত্রু, তাঁহাকে কাবুলের সিংহাসন হইতে অপসারিত

করিতে হইবে। লর্ড অকল্যাণ্ড তদনুসারে রণজিৎ সিংহের ও সুজা-উল-মুলকের সহিত সন্ধি করিলেন। সুজা-উল-মুলক আফগানিস্তানের প্রকৃত উত্তরাধিকারী। তিনি দেশ হইতে নির্ব্বাসিত হইয়াছিলেন। লর্ড অকল্যাণ্ড তাঁহার সহিত এই বলিয়া সন্ধি করিলেন যে, ইংরাজ দোস্ত মহম্মদকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া সুজা-উল-মুলককে কাবুলের সিংহাসনে বসাইবেন।

ইংরাজ যুদ্ধে দোস্ত মহম্মদকে পরাজিত করিলেন। দোস্ত মহম্মদ বীরের ন্যায় সংগ্রাম চালাইয়া পরিশেষে পরাজিত হন। দোস্ত মহম্মদ কতিপয় অশ্বারোহী সৈন্যসহ সিন্ধু পার হইয়া পলায়ন করেন। ইংরাজ শাহ-সুজাকে কাবুলের সিংহাসনে বসাইলেন। কিন্তু কাবুলবাসী আফগানরা ইহাতে সন্তুষ্ট হইল না। সুজার সিংহাসনারোহণ অনেকেই প্রীতির চক্ষে দেখিল না। ইংরাজ কাবুলে মাত্র আট হাজার সৈন্য রাখিয়া অবশিষ্ট সৈন্যদিগকে ভারতে লইয়া আসিলেন। ইংরাজ মনে করিয়াছিলেন, এই মুষ্টিমেয় সৈন্য দ্বারাই শাহ সুজার সিংহাসন সুরক্ষিত হইবে। ইংরাজের এই ভুলের বড় কঠোর প্রায়শ্চিত্ত হইল।

দোস্ত মহম্মদ পুনঃ পুনঃ সিংহাসন অধিকার করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ১৮৪০ খৃষ্টাব্দের ২রা নভেম্বর তারিখে পুরন্দর ক্ষেত্রে দোস্ত মহম্মদের সহিত ইংরাজের তুমুল সংগ্রাম হয়। দোস্ত বীরের ন্যায় ইংরাজের আক্রমণ প্রতিহত করিতে থাকেন। এই যুদ্ধে দোস্ত জয়লাভ করিতে পারিতেন কিন্তু তিনি বিবেচনা করিয়া দেখিলেন যে ইংরাজের সহিত সংগ্রামে তিনি পরিণামে পারিয়া উঠিবেন না। দোস্ত শুধু যে সাহসী সৈনিক ছিলেন তাহা নহে, তিনি একজন কূট-রাজনীতিজ্ঞও ছিলেন। পুরন্দর ক্ষেত্রে বীরের ন্যায় যুদ্ধ করিয়া সন্ধ্যাকালে দোস্ত মহম্মদ অশ্বারোহণে একেবারে ইংরাজের শিবিরে আসিয়া উপনীত হইলেন এবং স্বীয় পরিচয় প্রদানপূর্ব্বক যে তরবারি কিছুক্ষণ পূর্ব্বেও যুদ্ধক্ষেত্রে অমিত শক্তির পরিচয় দিয়াছিল, তিনি সেই তরবারি ইংরাজ দূতের নিকট প্রেরণ করিয়া আত্মসমর্পণ করিলেন। ইংরাজ-দূত স্যার উইলিয়ম ম্যাকনাটেন তাঁহার তরবারি প্রত্যর্পণ করিলেন এবং সসম্মানে তাঁহার অভ্যর্থনা করিলেন। ইহার কিছুদিন পরেই দোস্ত মহম্মদকে ভারতে প্রেরণ করা হইল এবং তাঁহার জন্য বাসভবন ও বৃত্তি নির্দ্দিষ্ট হইল।

দোস্ত মহম্মদ আত্মসমর্পণ করিলেন বটে, কিন্তু কাবুলে শান্তি স্থাপিত হইল না। স্যার ম্যাকনাটেন ইঙ্গিত পাওয়া সত্ত্বেও সতর্ক হইলেন না। ১৮৪১ খৃষ্টাব্দে ২রা নভেম্বর তারিখে কাবুলে দাঙ্গাহাঙ্গামা বাধিল। এই দাঙ্গা একটু চেষ্টা করিলে অচিরে বিনষ্ট হইত, কিন্তু স্যার ম্যাকনাটেনের দূরদর্শিতার অভাবে হাঙ্গামা ক্রমে গুরুতর আকার ধারণ করিল। কাপ্তেন বার্ণেস সহরের মধ্যে বাস করিতেন—ইংরাজের সেনাবাস সহরের বাহিরে কিছু দূরে অবস্থিত ছিল। একদল উত্তেজিত গুণ্ডা যখন কাপ্তেন বার্ণেসের গৃহ আক্রমণ করিল, তখনও তাঁহার মনে সন্দেহ হইল না যে, ব্যাপার গুরুতর আকার ধারণ করিয়াছে। বার্ণেস বাহিরে আসিয়া উত্তেজিত জনতাকে বক্তৃতা দ্বারা বুঝাইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু অচিরে তিনি আফগানের ছুরিকায় প্রাণ হারাইলেন। আফগানরা তাঁহাকে, তাঁহার ভ্রাতাকে ও পরিবারস্থ সকলকে কাটিয়া খণ্ড খণ্ড করিল।

কাপ্তেন বার্ণেসকে হত্যা করিয়া আফগানরা আরও উত্তেজিত হইয়া উঠিল এবং সমগ্র প্রদেশে বিদ্রোহ-বহ্নি পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। আফগানরা ইংরাজের সেনাবাস আক্রমণ করিল। ইংরাজ বাধ্য হইয়া দুর্গ ত্যাগ করিল। এই সময়ে ইংরাজের সেনাপতি ছিলেন জেনারল এলফিন্‌-ষ্টোন। তিনি জরাগ্রস্ত ও বৃদ্ধ ছিলেন, বার্দ্ধক্যহেতু কোনও বিষয়ের গুরুত্ব উপলব্ধি করিবার মত ক্ষিপ্রবুদ্ধি তাঁহার ছিল না। তাঁহার যে সহকারী সেনাপতি ছিলেন, তিনি বিচক্ষণ ছিলেন সত্য, কিন্তু দুঃখের বিষয় উভয়ের মধ্যে মতের মিল ছিল না। তা' ছাড়া, স্যার উইলিয়ম ম্যাকনাটেন চরিত্রবান্ হইলেও সরলবিশ্বাসী ও দুর্ব্বলচেতা ছিলেন।

দোস্ত মহম্মদের প্রিয় পুত্র আকবর খাঁ বিদ্রোহে নেতৃত্ব করিতে লাগিলেন। আকবর খাঁ দুঃসাহসী, চতুর ও হিতাহিতজ্ঞানশূন্য লোক ছিলেন। আকবর বিদ্রোহের নেতা হইয়া শাহ-সুজা ও ইংরাজের বিরুদ্ধে আক্রমণ চালাইতে লাগিলেন। ম্যাকনাটেন বিদ্রোহের অবস্থা গুরুতর দেখিয়া আকবর খাঁর সঙ্গে সন্ধি করিবার জন্য কথাবার্ত্তা চালাইতে লাগিলেন। পরিশেষে এই মর্ম্মে সন্ধি হইল যে, ইংরাজ অবিলম্বে আফগানিস্তান ত্যাগ করিবেন, দোস্ত মহম্মদকে সপরিবারে কাবুলে প্রেরণ করিতে হইবে, শাহ-সুজাকে

সিংহাসন ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতে হইবে এবং প্রতিভূ-স্বরূপ ইংরাজকে কাবুলে কতিপয় সামরিক কর্ম্মচারী রাখিয়া যাইতে হইবে।

ঐ সময়ে শীতকাল—চতুর্দ্দিকে তুষারপাত হইতেছিল, সুতরাং ইংরাজের কাবুল ত্যাগে বিলম্ব হইতে লাগিল। ইতোমধ্যে আকবর খাঁ ম্যাকনাটেনের শিবিরে আসিয়া আরও একটী নূতন প্রস্তাব করিলেন। প্রস্তাবটি এই যে, আকবর খাঁর সহিত ইংরাজের আর একটী গোপন সন্ধি হইবে। সেই সন্ধির মর্ম্ম এইরূপ যে, ইংরাজ আকবর খাঁর সহযোগে আফগানিস্তানের অন্যান্য সর্দ্দারদের সহিত যুদ্ধ করিবেন এবং শাহ-সুজা নামে মাত্র কাবুলের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত থাকিবেন -রাজকার্য্য পরিচালনা করিবেন আকবর খাঁ মন্ত্রীরূপে। ম্যাকনাটেন এই প্রস্তাবে সম্মতি দিলেন। পরে তাঁহার এই ভ্রমের গুরুতর প্রায়শ্চিত্ত হইয়াছিল। ইতঃপূর্ব্বে তিনি অন্যান্য সর্দ্দারদের সহিত সন্ধি করিয়াছিলেন। এক্ষণে তিনি পুনরায় আকবরের সহিত তাহাদেরই বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিবার জন্য উদ্যত হইলেন। আকবর খাঁর কোন প্রস্তাবে কর্ণপাত করা ম্যাকনাটেনের আদৌ উচিত হয় নাই।

আকবরের সহিত এইরূপ কথাবার্ত্তা হইবার পরদিন মধ্যাহ্নকালে ম্যাকনাটেন নিকটবর্ত্তী নদীতীরে যাইয়া আকবরের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। তাঁহার সহিত তিন জন সামরিক কর্ম্মচারী ছিলেন। আকবর খাঁ তৎকালে বহু অনুচর দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া উপবিষ্ট ছিলেন। উভয়ের মধ্যে দু'একটী কথাবার্ত্তা হইবামাত্র আকবর খাঁ একটী সংকেত করিলেন। অমনই তাঁহার অনুচরেরা চক্ষের নিমিষে আসিয়া ম্যাকনাটেন ও তাঁহার সঙ্গীত্রয়কে বাঁধিয়া ফেলিল। আকবর খাঁ স্বয়ং ম্যাকনাটেনকে ধরিয়াছিলেন। আকবর খাঁকে ম্যাকনাটেন বন্ধুত্বের নিদর্শনস্বরূপ ২টি পিস্তল উপহার দিয়াছিলেন। আকবর কটিদেশ হইতে সেই পিস্তল ১টী বাহির করিয়া ম্যাকনাটেনের বক্ষে গুলী করিলেন। ম্যাকনাটেন ধরাশায়ী হইলেন। উন্মত্ত আফগানেরা অমনি ছুটিয়া আসিয়া ম্যাকনাটেনের দেহ টুকরা টুকরা করিয়া কাটিয়া ফেলিল। অপর তিনজন কর্ম্মচারীর মধ্যে একজনকে তখনই হত্যা করা হইল। আর দুইজনকে বন্দী করিয়া ঘোড়ার পিঠে চড়াইয়া কাবুলে প্রেরণ করা হইল।

এই নৃশংসতার কাহিনী ইংরাজের সেনানিবাসে পৌঁছিল পরদিন সকালে। ১৮৪১ খৃষ্টাব্দের ২৪শে ডিসেম্বর তারিখে জনৈক বন্দী-ইংরাজের নিকট হইতে এক পত্র ইংরাজের দূতা-বাসে পৌঁছিল। এই পত্রে সন্ধি করিবার জন্য সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ সন্নিবেশিত ছিল। জেনারল এল্‌ফিনষ্টোন বুঝিলেন যে, তাঁহার পক্ষে কাবুলে থাকা বা আফগানদিগের সহিত সংগ্রাম করা, এই দুইটীই অসম্ভব। পরিশেষে আফগান-দিগের সহিত সন্ধি করাই স্থির হইল। আকবর খাঁর সহিত ইংরাজের সন্ধি হইল। সন্ধির সর্ত্ত এই হইল যে—ইংরাজ আফগানিস্তান ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইবেন, তাঁহারা মাত্র ৬টি বন্দুক সঙ্গে রাখিতে পারিবেন, অবশিষ্ট বন্দুকগুলি আফগানদের হস্তে সমর্পণ করিতে হইবে। দূতাবাসে টাকা-কড়ি যাহা কিছু ছিল সমস্তই রাখিয়া আসিতে হইবে। উপরন্তু পরে আরও কিছু পাঠাইতে হইবে। আফগানরা ইংরাজদের লোকদিগকে নিরাপদে জেলালাবাদ বা পেশোয়ারে পৌঁছাইয়া দিবে। ইংরাজরা দোস্ত মহম্মদকে সপরিবারে কাবুলে পাঠাইয়া দিবেন এবং সন্ধি পালনের প্রতিভূস্বরূপ ৬ জন সামরিক কর্ম্মচারীকে কাবুলে রাখিয়া আসিতে হইবে। সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করা হইল এবং আকবর খাঁ ম্যাকনাটেনের হত্যার দিনে যে দুই জন ইংরাজকে বন্দী করিয়াছিলেন সেই দুইজনকে ছাড়িয়া দিলেন।

ইংরাজগণ কাবুল ত্যাগ করিয়া দারুণ শীতের মধ্যে পথিবাহনে প্রবৃত্ত হইলেন। কুর্দ্দ নামক কাবুলের দুস্তর গিরিসঙ্কটের মধ্যে ইংরাজগণ প্রবেশ করিলেন। এই গিরি-পথ স্থানে স্থানে এমনই সঙ্কীর্ণ যে, মধ্যাহ্নকালেও তথায় সূর্য্যের রশ্মি প্রবেশ করিতে পারে না। এই পথের মধ্যস্থলে আবার একস্থানে একটী খরস্রোত জলপ্রপাত। এই জলপ্রপাতের বেগ এমনই প্রবল যে তুষারস্তূপও ইহার গতিরোধে সমর্থ নহে। জলস্রোতের উভয় পার্শ্বে পথিমধ্যে এবং পর্ব্বতগাত্রে সর্ব্বত্রই তুষাররাশি। পর্ব্বতগুলি এমনই পিচ্ছিল যে, তাহাতে আরোহণ করিয়া পলাইবারও উপায় নাই। এই প্রকার সঙ্কটপূর্ণ পথে ইংরাজগণ পৌঁছিবামাত্র আফগানগণ অতর্কিত ভাবে আসিয়া তাঁহাদিগকে আক্রমণ করিল। শুভ্র তুষাররাশি নররক্তে প্লাবিত হইয়া উঠিল। ইংরাজগণ কাবুল হইতে যাত্রা করিয়া দুই দিন যাবৎ পর্য্যটিবাহন করিয়া অত্যন্ত ক্লান্ত

হইয়া পড়িয়াছিলেন, তাহার উপর আবার এই দুর্গম গিরি-সঙ্কট,—পলাইয়া প্রাণ বাঁচাইবার কোন উপায় নাই। এইরূপ অবস্থায় আফগান-দস্যুর হস্তে ইংরাজদিগের বালক-বালিকা ও নারীদিগের সহিত প্রাণ হারাইতে হইল। ইংরাজের দলে চারি হাজার সৈনিক ছিল, তন্মধ্যে গোরা সৈনিকের সংখ্যা অবশ্য অনেক কম। এতদ্ব্যতীত আরও বার হাজার অনুচর ইংরাজের সঙ্গে আসিতেছিল। দস্যুগণ দীর্ঘ ছুরি ও বন্দুক লইয়া যাত্রীদিগকে আক্রমণ করিতে লাগিল। ইংরাজ সৈনিকগণ পথশ্রমে অত্যন্ত কাতর, তাঁহারা দস্যুদের সহিত যুদ্ধ করিতে সমর্থ হইলেন না। পুরুষ, রমণী, বালক-বালিকা, অশ্ব, অশ্বতর, উষ্ট্র হতাহত হইয়া গিরিসঙ্কটে এক বীভৎস ব্যাপারের সৃষ্টি করিল। এই বিপদের মধ্যে আকবর খাঁ মাঝে মাঝে আসিয়া অবতীর্ণ হইতে লাগিলেন এবং ইংরাজদিগের দলে যাহারা এখনও জীবিত আছে তাহাদিগকে রক্ষা করিবার জন্য ও নিরাপদে জেলালাবাদ বা পেশোয়ারে পঁহুছাইয়া দিবার জন্য ঐকান্তিক আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। এই বিবাদের মধ্যে আকবর খাঁকে দেখিয়া ইংরাজদের দলে আশার সঞ্চার হইল। অবশেষে আকবার খাঁ ইংরাজদের নিকটে আসিয়া আরও একটি প্রস্তাব করিলেন। তিনি বলিলেন, রমণী ও বালক-বালিকাদিগকে তাঁহার হস্তে সমর্পণ করিয়া দেওয়া হউক। তিনি ইহাদিগকে নিরাপদে পেশোয়ারে পৌঁছাইয়া দিবেন। ইংরাজেরা গত্যন্তর না দেখিয়া তাহাই করিলেন। রমণী, বালক-বালিকা ও যে-সকল পুরুষের স্ত্রী বা পুত্র তাহাদের মধ্যে ছিল তাহাদেরও আকবর খাঁর হস্তে সমর্পণ করা হইল। ম্যাকনাটেনের স্ত্রীকেও বাধ্য হইয়া তাঁহার স্বামীর ঘাতকের হস্তে আত্মসমর্পণ করিতে হইল।

অতঃপর ইংরাজের দলের অবশিষ্ট লোকেরা অগ্রসর হইতে লাগিল। অমনই দস্যুদের আক্রমণ চলিতে লাগিল। তুষাররাশি রক্তরাগে রঞ্জিত হইতে লাগিল এবং হতাহতের দেহ পথভূমি আস্তীর্ণ করিয়া ফেলিল। আকবার খাঁ আবার আসিয়া দেখা দিলেন। তিনি আবার এক প্রস্তাব করিয়া বলিলেন যে জেনারল এলফিনষ্টোন, তাঁহার সহকারী ও আর এক জন কর্মচারীকে তাঁহার হস্তে সমর্পণ করা হউক, তাহা হইলে তিনি পার্বত্য দস্যুদিগকে শান্ত করিয়া রাখিতে পারেন এবং ইংরাজদিগকে কিছু খাদ্য দিবারও ব্যবস্থা করিতে পারেন। আকবরের প্রস্তাবে সম্মতি দেওয়া ব্যতীত ইংরাজের আর গত্যন্তর ছিল না। জেনারল এলফিনষ্টোন, ইংরাজ মহিলাগণ ও বালক-বালিকা সকলেই ক্রমান্বয়ে আকবর খাঁর হস্তে বন্দী হইলেন।

ইংরাজের অবশিষ্ট দল আবার পথাতিবাহনে প্রবৃত্ত হইল। বহু কষ্টে ইহারা জগ্‌দুলুক নামক অন্ধকারাচ্ছন্ন গিরিসঙ্কটে প্রবেশ করিল। কিছু দূর অগ্রসর হইয়া ইংরাজেরা দেখিল যে, পথ বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। উভয় পার্শ্বে উত্তুঙ্গ গিরিশ্রেণী, পর্ব্বতারোহণ করিয়া পলায়ন করিবার কোন সম্ভাবনা নাই। পথও যেমন অন্ধকার তেমনই । ইংরাজ-বাহিনী জালে পড়িল। আফগানেরা আসিয়া একেবারে বেপরোয়াভাবে আক্রমণ করিল। ইংরাজের দলের কয়েকজন লোক এই বীভৎস ক্ষেত্র হইতে পলাইয়া জেলালাবাদের পথে উঠিলেন। জেলালাবাদ দুর্গে তৎকালে ইংরাজ-সেনাপতি সালে একটী ক্ষুদ্র বাহিনী লইয়া অবস্থান করিতেছিলেন। যাঁহারা পলাইয়া জেলালাবাদ অভিমুখে যাত্রা করিলেন, আফগানেরা তাঁহাদেরও পশ্চাদনুসরণ করিল। আরও ৬ মাইল পথ অতিক্রম করিতে পারিলে জেলালাবাদে পৌঁছান যায়। সেই সময় পলাতকদিগের মধ্যে মাত্র ৬ জন অবশিষ্ট আছে। এই ৬ জনের মধ্যে ৫ জন নিহত হইলেন, অবশিষ্ট রহিলেন শুধু ডাঃ ব্রাইডন। ডাঃ ব্রাইডন ভগ্ন দূতের ন্যায় অর্দ্ধমৃতাবস্থায় জেলালাবাদ দুর্গে প্রবেশ করিয়া ষোল হাজার ইংরাজ-বাহিনীর মধ্যে তিনি একাকী জীবিত আছেন—এই নিদারুণ সংবাদ সেনাপতি সালেকে শুনাইলেন। ডাঃ ব্রাইডন দুর্গ-প্রাচীরের পাদদেশে পৌঁছিলেন, তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ থর থর করিয়া কাঁপিতেছে এবং তাঁহার অশ্বও মৃতবৎ হইয়া কাঁপিতেছে। তিনি প্রাচীন থার্মপলীর পরাজয় কাহিনী বিবৃত করিবার জন্যই যেন একাকী জেলালাবাদ দুর্গে প্রবেশ করিলেন।

এই হইল উপাখ্যানের শেষ পরিচ্ছেদ। ইহার পর ইংরাজ আফগানিস্তানে আর পরাজয় স্বীকার করে নাই। ডাঃ ব্রাইডন জেলালাবাদে পঁহুছিবার পূর্ব্বে জেনারেল সালে এই মর্ম্মে এক আদেশ পাঠাইয়াছিলেন যে, তিনি যেন কাবুলের সন্ধি অনুসারে জেলালাবাদ ত্যাগ করিয়া ভারতে

চলিয়া যান। জেনারল সালে এই সন্ধি পালন করিলেন না। তিনি বলিলেন যে, শত্রু ইংরাজের গলা কাটিয়া যে সন্ধি করিয়াছে ঐ সন্ধি পালনের অযোগ্য। তিনি স্থির করিলেন, ভারত সরকারের আদেশ ব্যতীত তিনি দুর্গ ত্যাগ করিবেন না। সালের এই সঙ্কল্প কার্য্যকরী হইল। আকবর খাঁ জেলালাবাদ অবরোধ করিলেন। আকবর খাঁ বহু চেষ্টা করিয়াও দুর্গ অধিকার করিতে পারিলেন না। অবশেষে সালে সংবাদ পাইলেন যে, জেনারল পোলক ভারত হইতে সাহায্যার্থ অগ্রসর হইতেছেন এবং তিনি খাইবার গিরিপথ অতিক্রম করিতেছেন। এই সংবাদে আশান্বিত হইয়া জেনারেল সালে সসৈন্যে দুর্গ হইতে বাহির হইলেন এবং আকবর খাঁর বাহিনীকে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া বিতাড়িত করিয়া দিলেন। জেনারল পোলক জেলালাবাদে পৌঁছিবার পূর্ব্বেই শত্রু-সৈন্য পরাজিত ও বিতাড়িত হইল। জেনারল নট তৎকালে কান্দাহারের দুর্গে অবস্থান করিতেছিলেন। জেনারল পোলক, সালে ও নট—সকলেই সরকারের আদেশের প্রতীক্ষায় কাবুল অধিকার করিবার জন্য প্রতীক্ষা করিয়া রহিলেন।

এদিকে ইংরাজ কাবুল ত্যাগ করিবামাত্র আকবর খাঁর আদেশে শাহ সুজাকে হত্যা করা হইল, এবং তাহার দেহ উলঙ্গ করিয়া এক গর্ত্তে নিক্ষেপ করা হইল। ভারতেও লর্ড অকল্যাণ্ডের কার্য্যকাল শেষ হইল। আফগানিস্তান একেবারে ত্যাগ করিয়া চলিয়া আসাই তাঁহার সঙ্কল্প ছিল। অকল্যাণ্ডের পর নূতন গভর্ণর জেনারল হইলেন লর্ড এলেনবরা। অতঃপর ইংরাজ আফগানিস্তানে থাকিবে, কি ভারতে চলিয়া আসিবে এই বিষয় লইয়া কিছুদিন আলোচনা চলিতে লাগিল। পরিশেষে স্থির হইল যে, ইংরাজ প্রতিশোধ লইবার জন্য কাবুল আক্রমণ করিবে। অতঃপর পুনরায় উভয় পক্ষে যুদ্ধ চলিতে লাগিল। পরিশেষে ১৮৪২ খৃষ্টাব্দের ১৫ই সেপ্টেম্বর তারিখে জেনারল পোলক কাবুলে প্রবেশ করিলেন। কাবুলের বাজারে আকবর খাঁর আদেশক্রমে ম্যাকনাটেনের মৃতদেহ লটকাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। জেনারল পোলক কাবুল অধিকার করিবার কয়েকদিন পরেই কাবুলের সেই বিরাট বাজার ধ্বংস করিবার আদেশ দিলেন। আকবর খাঁ কুর্দ্দের গিরিসঙ্কট হইতে যাহাদিগকে অভয় দিয়া বন্দী করিয়া লইয়া আসিয়াছিলেন, তাহাদিগকেও উদ্ধার করা আবশ্যক। অত্যাচার ও পীড়ন সহ্য করিয়াও যে সকল বন্দীর প্রাণ বহির্গত হয় নাই, তাহাদিগকে উদ্ধার করা হইল। বৃদ্ধ এলফিনষ্টোন কারাগারেই মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিলেন। বন্দীদিগের উদ্ধারসাধনেও ইংরাজকে অনেক ফিকির করিতে হইয়াছিল।

অতঃপর ইংরাজ আফগানিস্তান ত্যাগ করার সঙ্কল্প করিলেন। তাঁহারা ভারত-সাম্রাজ্য লইয়াই সন্তুষ্ট রহিলেন। দোস্ত মহম্মদকে ছাড়িয়া দেওয়া হইল এবং তিনি পুনরায় কাবুলের সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। ইংরাজও আফগানিস্তানকে সংগঠিত করিবার প্রয়াস ত্যাগ করিলেন।

দেব ও দেবী পূজা

...মস্তিষ্ক, মুখগহ্বর ও কণ্ঠমধ্যস্থিত কতকগুলি 'কর্ম্মের' নাম "দেব" এবং ঐ কর্ম্মগুলি হইতে যে যে শক্তির উৎপত্তি হয় সেই সেই শক্তির এক একটী 'শক্তি'র নাম "দেবী"। মস্তিষ্ক, মুখগহ্বর ও কণ্ঠমধ্যস্থিত যে যে কর্ম্মগুলিকে এক একটী "দেব" বলিয়া আখ্যাত করা হয় সেই কর্ম্মগুলি যেরূপ মস্তিষ্কে, মুখগহ্বরে এবং কণ্ঠে বিদ্যমান থাকে সেইরূপ আবার বায়ুমণ্ডলেও পরিব্যাপ্ত থাকে। কাজেই দেব এবং দেবীগণ যেরূপ জীবের মস্তিষ্ক, মুখগহ্বর এবং কণ্ঠে বিদ্যমান থাকেন সেইরূপ আবার বায়ুমণ্ডলের সর্ব্বত্র বিরাজিত থাকেন। "দেব" ও "দেবী" এই দুইটী শব্দের অর্থ ভাল করিয়া বুঝিতে পারিলে দেখা যাইবে যে, "দেব-দেবী"র পূজা করার অর্থ বায়ুমণ্ডলে যে-সমস্ত প্রকরণ নিহিত থাকে সেই সমস্ত প্রকরণকে প্রত্যক্ষ করা এবং সেই সমস্ত প্রকরণ জীব-শরীরের উপর কিরূপে কার্য্যকরী হয় তাহা প্রত্যক্ষ করা।...



—শ্রীঅমূল্য চক্রবর্ত্তী

অসভ্যদের হংস শিকার

অষ্ট্রেলিয়ার আর্ণহেম ভূভাগে গ্লাইড নদী সুবিস্তৃত দেশের উপর দিয়া অতিবাহিত। বর্ষার দিনে এই সমস্ত ভূভাগ জলাভূমিতে পরিণত হয়। অষ্ট্রেলিয়ার অনেক কিছুই এখনও মনুষ্য সমাজের গোচরীভূত হয় নাই। এই জলাভূমিতে পার্শ্ববর্ত্তী অধিবাসীদের যে প্রকৃতির পরিচয় পাওয়া গিয়াছে তাহা অদ্ভুত। আবিষ্কার-কর্ত্তা Donald F. Thompson (man. August '39) যে বিবরণ দিয়াছেন তাহাই সংক্ষিপ্তাকারে নিম্নে বর্ণিত হইল।

বর্ষার শেষভাগে হাজার হাজার বিচিত্র বর্ণের হাঁস, রাজহাঁস ডিম প্রসবের জন্য এই জলাভূমিতে আসিয়া বাসা বাঁধে। Arafura Basin এর চতুর্দ্দিকে Dginba, Kanalbingo, Milierbe, Mandalpoi, Nikki ইত্যাদি অসভ্য জাতিরা বাস করে। যখন হাঁসের বাসা বাঁধিবার সময় উপস্থিত হয় তখন এই সকল অধিবাসীরা জলাভূমির দিকে রওনা হয় এবং জলাভূমির তীরবর্ত্তী উচ্চভূমিতে ক্যাম্প প্রস্তুত করিয়া অবস্থান করিতে থাকে। এই স্থান হইতেই ইহারা শিকার-অভিযানে বাহির হয়। জলাভূমির ঘাসপাতার মধ্যে চলিবার উপযোগী বিশেষ এক প্রকার গাছের ছালের ছুঁচলোমুখো নৌকা এই শিকারে ব্যবহৃত হয়। জলাভূমির তীরে শিকারীরা যে ঘর প্রস্তুত করে, মশার আক্রমণ হইতে রক্ষা পাওয়ার জন্যে, তাহা বিশেষভাবে তৈরী করা হয়। এই ঘরের নাম Lia Damalla ঈগলের মাথা। এই ঘরের দরজা থাকে মাটির সাথে মেশান, যেন ঘাস দিয়া বন্ধ করিয়া দিলে মশা প্রবেশ করিতে না পারে। হাঁসের বাসা তৈরী হইবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত স্ত্রীলোকেরা উদ্ভিজ্জ-খাদ্যের অন্বেষণে খুব ব্যস্ত থাকে। আবার পুরুষ ও স্ত্রী উভয়েই মৎস্য শিকারও করিয়া থাকে। এখানেই শিকারীরা নিজের নিজের নৌকা প্রস্তুত করে। এই সকল নৌকা (ngardan) দুই জন আরোহী বহন করিতে পারিলেও সাধারণতঃ একজন করিয়াই তাহারা যাতায়াত করে।



শিকারী ও তাহার সংগৃহীত হাঁসের ডিম

মাঝে মাঝে হাঁসের বাসা প্রস্তুত করা শেষ হইয়াছে কি না দেখিবার জন্য লোক পাঠান হয়। যেই খবর পাওয়া যায় যে,

হাঁস ডিম পাড়িতে আরম্ভ করিয়াছে, অমনি শিকারীরা দলে দলে (এক এক দলে প্রায় ২০ জন করিয়া) জলাভূমির দিকে অগ্রসর হইতে থাকে। সেখানে যাইয়া তাহারা একটা ঘাঁটির মত তৈরী করে এবং এই ঘাঁটি হইতেই তাহারা অভিযান চালায়। শিকারে কেবল পুরুষরাই যায়। স্ত্রী-পুত্রেরা গৃহেই থাকে।

ভোরে ও সন্ধ্যায় মশার প্রাদুর্ভাব খুব বৃদ্ধি পায় বলিয়া শিকারীরা সন্ধ্যার পূর্ব্বেই গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করে। গৃহের প্রবেশ-পথ ঘাস দিয়া বন্ধ করিয়া ভিতরে আগুন জ্বালাইয়া রাখে। ধুঁয়া বাহির করিবার জন্ম গৃহের উপরিভাগে গর্ত্ত থাকে। কোন কারণে যদি তাহাদের এমন যায়গায় চলিয়া যাইতে হয়, যেখানে ঘর বানাইবার সুবিধা নাই, তখন তাহারা বড় বড় ঘাস জমাইয়া তাহার নীচে শুইয়া থাকে। মশার দংশন এড়াইবার জন্যই এরূপ করা হয়।



শিকারীদের ব্যবহৃত বিশেষ ধরণের নৌকা

প্রত্যেক অভিযানে প্রায় দশটি হইতে কুড়িটি নৌকা থাকে। রওনা হয় তাহারা একত্রে কিন্তু শিকারে গিয়া প্রত্যেকে আলাদা ভাবে ছড়াইয়া পড়ে। ইহাতে প্রায় সমস্তটা জলাভূমিতে ছড়াইয়া পড়া তাহাদের সহজসাধ্য হয়। শিকারের স্থানে পৌঁছিয়া তাহারা খাওয়া-শোয়ার সুবিধা হয়—এমন মাচা তৈরী করিবার উপযোগী বড় বড় গাছের অন্বেষণ করে। জল হইতে আঠার কি কুড়ি ফিট উঁচুতে মাচা তৈরী করা হয়। মাচা দুই প্রকারের হয়। (১) রন্ধনের উপযোগী ও (২) শয়নের উপযোগী। মশার উপদ্রবের জন্ম প্রায় প্রত্যেক মাচাতেই আগুন জ্বালাইতে হয়। আগুন করিবার মাচা তৈরী করিতে প্রথমে Takki নামক এক প্রকার ঘাস তক্তার উপর বিছাইয়া দেওয়া হয় পরে তার উপর পুরু মাটির লেপ দেওয়া হয়। মাটি শুকাইয়া গেলে এক প্রকার গাছের ছাল পাতিয়া দেওয়া হয়।

ওস্তাদ শিকারীরা দিনে ছয় সাতটা করিয়া হাঁস মারিতে পারে। নিজের প্রয়োজন মত আহার করিয়া প্রত্যেকে অবশিষ্টগুলি অর্দ্ধেক পোড়াইয়া ক্যাম্পে ফিরাইয়া লইয়া যায় স্ত্রীপুত্রদের জন্ম।

শিকারীরা মশার জন্ম রাতে ভাল ঘুমাইতে পারে না। হয় বসিয়া বসিয়া গল্প করিয়া কাটায়, নয় ত শুইয়া হাঁসের পালক-নির্ম্মিত পাখা দিয়া বাতাস করিতে থাকে।

অধিক পরিশ্রম এবং ঘুমের অল্পতা হেতু, অভিযান প্রতিবারে সাত আট দিনের বেশী চলে না। তবে এই রকম সাপ্তাহিক অভিযান প্রায় দুই মাস অবধি চলিতে থাকে।

ইহাদের খাদ্য আহরণে এক প্রকার বিশেষত্ব লক্ষিত হয়। পুরুষরা যখন হাঁস শিকারে ব্যস্ত থাকে, মেয়েরা তখন গৃহে শাকশব্জী আহরণ করিতে থাকে। পুরুষরা যেমন নিজেদের খাইয়া যাহা বাঁচে তাহা স্ত্রী-পুত্রদের জন্ম লইয়া আসে, মেয়েরাও তেমনি নিজেদের খাইয়া যে শাকশব্জী বাঁচে, তাহা পুরুষদের জন্ম জমা করিয়া রাখে। কারণ, পুরুষরা রোজ রোজ মাংস খাইতে খাইতে বিরক্ত হইয়া পড়ে এবং মুখ বদলাইবার জন্ম উদ্‌গ্রীব হইয়া গৃহে ফেরে। মেয়েরাও উপর্য্যুপরি শাকশব্জী খাইতে খাইতে অরুচি হওয়ায় মাংস খাইবার আশায় শিকারীদের প্রত্যাবর্ত্তনের অপেক্ষায় পথ চাহিয়া থাকে।

ভারতের প্রাচীন শিল্প

—শ্রীমাণিকলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

ভারতের সভ্যতা সুপ্রাচীন। ভারতের প্রাকৃতিক আবেষ্টনী ছিল প্রাচীন সভ্যতা গঠনের অনুকূল। বহু নদনদী-সমাকুল এই ভারতভূমি সু-উচ্চ পর্ব্বতশ্রেণীদ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া সুরক্ষিত ছিল। দেশের বিস্তৃত সমতল ভূমিতে প্রচুর পরিমাণে শস্যাদি উৎপন্ন হইত। ধাতব বস্তুরও দেশে কোন অভাব ছিল না।

ভারতের প্রাচীন সভ্যতা গড়িয়া উঠিয়াছিল গ্রামে। গ্রামবাসীরা তখন একত্রিত হইয়া সুখে বাস করিত এবং নিজ নিজ কার্য্য সুচারুরূপে সম্পাদন করিতে চেষ্টা করিয়া সহজ, সরল এবং অনাড়ম্বর জীবনযাপন করিত। পাশ্চাত্য যন্ত্রসভ্যতার তখন জন্ম হয় নাই, তাহার প্রভাবও প্রকট হইয়া কোথাও দেখা দেয় নাই। দেশের অধিবাসীদের অভাবের তাড়নাও ছিল না। সরল অধিবাসীদের অনাড়ম্বর জীবন-যাত্রার ক্ষেত্রেও অভাব ছিল অতি সামান্য। গৃহের আসবাব বলিতে কয়েকটা মাদুর, রান্নার উপযোগী কিছু আসবাব-পত্র, থালা-বাসন ইত্যাদি, এই ছিল যথেষ্ট। সাধারণ গ্রামবাসী গৃহস্থালীর পক্ষে এর বেশী আসবাব পত্রের অভাব অনুভব করিত না। প্রাতে শয্যাত্যাগের পর গৃহস্থ ক্ষেত্রে কাজ করিতে যাইত এবং অন্যান্য লোকেরাও তাহাদের নিজ নিজ কর্ম্মে নিযুক্ত থাকিত। গৃহে স্ত্রীলোকেরা গৃহকর্ম্মে নিযুক্ত থাকিত, অবসর সময়ে সূতা কাটিত। বালকেরা বাল্যকাল হইতেই পৈতৃক ব্যবসায়ে নিযুক্ত হইয়া কর্ম্ম শিক্ষা করিত এবং পরে পিতৃপিতামহের অবলম্বিত কৃষিকার্য্য বা শিল্পকার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া অন্নসংস্থান করিত। বংশ-পরম্পরায় এইরূপই চলিত। দেশে যখন শান্তি সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল, তখন দেশের রাজা ও ধনী ব্যক্তিরা দেশের শিল্পকে উত্তরোত্তর সমৃদ্ধ করিয়া তুলিবার জন্য যথেষ্ট অর্থ এবং উৎসাহ দিতেন। প্রচুর অর্থ ব্যয় করিয়া দেশের শ্রেষ্ঠ শিল্পীদের এবং অনেক সময় ভিন্নদেশ হইতেও প্রসিদ্ধ শিল্পীদের আনয়ন করিয়া বিবিধ সুরুচি-সঙ্গত শিল্পসৌন্দর্য্যের সৃষ্টির সহায়তা করিয়া নিজেদের আবেষ্টনীকে সমৃদ্ধিশালী এবং সৌন্দর্য্যমণ্ডিত করিয়া তুলিতে সচেষ্ট থাকিতেন। শিল্পী এবং কারিকরগণও রাজা, নবাব ও বাদশাহের পৃষ্ঠপোষকতায় এবং উৎসাহে পুষ্ট হইয়া অপূর্ব্ব শিল্পনৈপুণ্যের পরিচয় দিতেন।

লৌহ এবং ইস্পাতের ব্যবহার আমাদের দেশে প্রাচীন কালেও ছিল। ডামাস্কাসের প্রসিদ্ধ তরবারীর ফলক ভারতীয় ইস্পাতে তৈয়ারী হইত। আমাদের দেশের প্রাচীন শাস্ত্রে স্বর্ণনির্ম্মিত নানাবিধ অস্ত্রশস্ত্র এবং স্বর্ণনির্ম্মিত কারুকার্য্যখচিত রথের উল্লেখ আছে। বস্ত্রশিল্প দেশে চরম উন্নতি লাভ করিয়াছিল। কাষ্ঠনির্ম্মিত নানারকম সুগঠিত কারুকার্য্যমণ্ডিত দ্রব্যাদি, স্বর্ণ এবং লৌহনির্ম্মিত বর্ম্ম প্রভৃতি নানাবিধ শ্রমশিল্পের প্রচলন ছিল। ভারতীয় চিত্রকলা এবং ভাস্কর্য্য বহু প্রাচীনকাল হইতে এদেশে ছিল। মোহেন-জো-দাড়ো ও হারাপ্পাতে যে সমস্ত শিল্পনিদর্শন পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে অনুভূত হয় যে, বহুযুগ পূর্ব্ব হইতেই এদেশে নানাবিধ শিল্পকলা ও ভাস্কর্য্যের প্রচলন ছিল। বৌদ্ধ যুগে ভারতীয় চিত্রশিল্প এবং ভাস্কর্য্য চরম উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল, তাহার নিদর্শন আমরা অজন্তা, বাগ, সিগিরিয়া, ইলোরা প্রভৃতি গুহাগাত্রে দেখিতে পাই। মোঘলযুগেও ভারতীয় চিত্রকলার এক নূতন যুগ প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। ভারতের ঐশ্বর্য্য বহু পরাক্রান্ত নৃপতি এবং দস্যুর দৃষ্টি আকর্ষণ করিত। ফলে মাঝে মাঝে লুণ্ঠনের অত্যাচার সহ্য করিতে হইত। ছোট ছোট রাজ্যের উত্থান ও পতন প্রায়ই ঘটিত। কিন্তু গ্রাম্য সভ্যতার ফলে দেশের শিল্প অক্ষুণ্ণ থাকিত। হিন্দুদের জাতি-বিভাগের ফলে বিভিন্ন শিল্প বিভিন্ন পরিবারের মধ্যে বংশ-পরম্পরাক্রমে রক্ষিত হইত। যুদ্ধক্ষেত্র হইতে ফিরিয়া আসিয়া দেশের অধিবাসীরা আবার স্ব স্ব কার্য্যে মনোনিবেশ করিত এবং নৃপতি ও জনসাধারণের উৎসাহ এবং অর্থসাহায্যে নিজ নিজ কার্য্যে উৎকর্ষ লাভ করিত।

মোঘলযুগের অঙ্কিত যে সমস্ত ছবি পাওয়া গিয়াছে, তাহা দ্বারা তখনকার সময়ের বাদশাহদের রাজত্বের অনেক বিবরণ জানিতে পারা যায়। সুরম্য অট্টালিকায় বহুমূল্য পরিচ্ছদে সুসজ্জিত হইয়া চতুর্দ্দিকে বহু সৈন্যসামন্ত ও সম্ভ্রান্ত ওমরাহগণ কর্তৃক পরিবেষ্টিত হইয়া বাদশাহরা দরবারে

বসিতেন। সম্রাটের অসূর্য্যম্পশ্যা অন্তঃপুরিকাগণ প্রাসাদের নিভৃত কক্ষে বহুমূল্য বসন-ভূষণে সুসজ্জিতা হইয়া ও সহচারিণী পরিবৃতা হইয়া লোকচক্ষুর অন্তরালে থাকিতেন। রাজা বাদশাহদের বহু শিকারের কাহিনী, যুদ্ধের বিবরণ এবং রাজদরবারের নানাবিধ ঘটনার পরিচয় আমরা তখনকার যুগের চিত্রে দেখিতে পাই। মোগলবাদশাহদের রাজত্বকালে রাজদরবারের উৎসাহ এবং পৃষ্ঠপোষকতায় নানারূপ শ্রমশিল্প, স্থাপত্য ও চিত্রকলার উন্নতি সাধিত হইয়াছিল। তখনকার মস্‌লিন, রেশমবস্ত্র, শাল, নানাবিধ কারুকার্য্য-মণ্ডিত বস্ত্রালঙ্কার, স্বর্ণরৌপ্যাদির পাত্র, কাষ্ঠনির্ম্মিত দ্রব্য, হস্তিদন্তনির্ম্মিত নানাবিধ সুন্দর দ্রব্য জগতের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। সম্রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়ার রাজত্বকালে ইউরোপে কাশ্মীরী শালের খুব সমাদর হইয়াছিল। তাঁহার দরবারের সহিত সংশ্লিষ্ট কোন কর্ম্মচারীর বিবাহ উপস্থিত হইলে, তিনি 'কনে'কে কাশ্মীরী শাল উপহার দিতেন। তাঁহার দরবারের এই প্রথা ছিল। কাশ্মীরী শালের ব্যবহার তখনকার দিনে ইউরোপে অভিজাত সম্প্রদায়ের মধ্যে একটা 'ফ্যাসান' ছিল। ঢাকার মস্‌লিন বস্ত্র জগৎবিখ্যাত ছিল। উহা এত সূক্ষ্ম ছিল যে, তাহার সূতার 'বুনট' দৃষ্ট হইত না। ঘাসের উপর বিছাইলে উহা ঘাসের সঙ্গে এমন ভাবে মিশিয়া থাকিত যে সহজে উহা খুঁজিয়া বাহির করা কষ্টকর হইত। এরূপ একটী গল্প প্রচলিত আছে যে, সম্রাট্ আওরঙ্গজেবের কন্যা একদিন মস্‌লিন বস্ত্র পরিধান করিয়া সম্রাট্‌সমক্ষে উপস্থিত হইলে সম্রাট তাঁহাকে পরিধেয় বস্ত্রে শালীনতার অভাব লক্ষ্য করিয়া তিরস্কৃত করেন। কন্যা পিতাকে বলিলেন যে তিনি নয় ভাঁজ করিয়া ঐ বস্ত্র পরিধান করিয়াছেন। বস্তুতঃ তখন দেশে এরূপ সূক্ষ্ম মস্‌লিন বস্ত্র প্রস্তুত হইত যে, তাহা হস্তদ্বারা অনুভব করাও কষ্টকর হইত। মস্‌লিন বস্ত্রের উপর স্বর্ণ এবং রৌপ্যের সূক্ষ্ম কারুকার্য্যও খচিত হইত। বস্ত্রশিল্প মোঘলরাজত্বে উন্নতির চরম শিখরে আরোহণ করিয়াছিল।

মোঘলযুগে দেশীয় শিল্পী এবং কারিকরগণ তাহাদের নানাবিধ কার্য্যধারায় যথেষ্ট বুদ্ধি-কৌশল এবং শিল্পনৈপুণ্যের পরিচয় প্রদান করিত। রেশমী বস্ত্রের উপর তাহারা স্বর্ণরৌপ্যের নানারূপ অলঙ্করণ করিত। সতরঞ্চ বা গালিচার উপরে তাহারা লতাপাতা, জীবজন্তু প্রভৃতি নানারকমের চিত্র অতিসুন্দররূপে অঙ্কিত করিত। গৃহসজ্জার নানাবিধ সাধারণ আস্‌বাব, হস্তিদন্তনির্ম্মিত নানাবস্তু, আবলুস কাঠের তৈয়ারী বিবিধ উপকরণ তাহাদের শিল্পনৈপুণ্যের স্পর্শে অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যমণ্ডিত হইয়া উঠিত। চিত্রকলায় এক নূতন যুগ প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। রাজদরবারের নানারূপ দৃশ্য, শিকারের দৃশ্য, নবাব বাদশাহদের পৃষ্ঠপোষকতায় অঙ্কিত হইত। প্রতিকৃতি অঙ্কন এই সময়ে দেশে খুব প্রচলিত হইয়াছিল এবং খুব উন্নতও হইয়াছিল। বাদশাহরা তাঁহাদের রাজদরবারে অনেক চিত্রকর প্রতিপালিত করিতেন। পারস্যদেশীয় অনেক প্রসিদ্ধ চিত্রকরকেও চিত্রাঙ্কনের জন্য এদেশে নিযুক্ত করিতেন। এই সময়ের চিত্রকলার উপর পারস্যদেশীয় চিত্রাঙ্কন-রীতির প্রভাব খুব পরিলক্ষিত হয়। ইউরোপীয় চিত্রও কিছু কিছু তখন রাজদরবারে আমদানী হইত। এই সমস্ত শিল্পীদের প্রতিভা এবং নানাবিধ শিল্পনৈপুণ্য সেই যুগের শিল্পকে স্মরণীয় করিয়া রাখিয়াছে।

তখনও পাশ্চাত্য যান্ত্রিক সভ্যতার দ্রুতগতি আমাদের দেশে প্রবাহিত হয় নাই। গ্রাম্যসভ্যতার ফলে দেশের শ্রমশিল্প উন্নত হইয়াছিল। হিন্দুদের জাতিবিভাগের সুব্যবস্থার জন্য বিভিন্ন শিল্প বিভিন্ন পরিবারের মধ্যে বংশপরম্পরাক্রমে রক্ষিত হইত। শ্রমশিল্প ও শিল্পকলার জন্য দেশে বড় বড় ঘর কারখানার মত ব্যবহৃত হইত। সেস্থানে কারিকর এবং শিল্পীরা নানাকার্য্যে নিযুক্ত থাকিত; স্বর্ণকার সোনারূপার কাজ করিত, চিত্রকর চিত্রাঙ্কন করিত, রেশমের এবং কিংখাবের বস্ত্রাদি নির্ম্মিত হইত, শিরস্ত্রাণের নিমিত্ত মস্‌লিন বস্ত্রের উপর স্বর্ণরৌপ্যময় কারুকার্য্য খচিত হইত। সারাদিন তাহারা ঐ সমস্ত কারখানার কার্য্যে নিযুক্ত থাকিত, বেলাশেষে গৃহে প্রত্যাবৃত্ত হইত। সরল অনাড়ম্বর জীবনযাপনে অভ্যস্ত শিল্পীদের ইহার চাইতে উন্নত প্রণালীর জীবনযাত্রার দিকে বেশী লক্ষ্য ছিল না—তাহারা নিজ অবস্থাতেই সন্তুষ্ট থাকিত। পাশ্চাত্য নাগরিক সভ্যতার আওতায় যেরূপ উন্নত প্রণালীর জীবনযাত্রার জন্য লোক এত চিন্তাগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছে, তখন সেরূপ চিন্তানল লোকের মনে উদিত হইত না। শিল্পী তাহার নিজের কাজ লইয়াই সন্তুষ্ট থাকিত। চিত্রকরের পুত্র চিত্রাঙ্কন-বিদ্যাই শিক্ষা করিত, স্বর্ণকারের পুত্র স্বর্ণকার হইত, বস্ত্র-ব্যবসায়ীর পুত্র

বস্ত্রব্যবসায়ই করিত; এইরূপ পিতৃপিতামহের অনুসৃত ব্যবসায়ে লিপ্ত থাকিয়াই সকলে অন্নসংস্থানের ব্যবস্থা করিত। বিবাহও প্রধানতঃ নিজ নিজ সম্প্রদায়ের লোকের মধ্যেই হইত। হিন্দু এবং মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যেই এইরূপ প্রথা প্রচলিত ছিল।

দেশীয় শিল্পদ্রব্য প্রস্তুত করা ছাড়াও তাহারা বিদেশীয় শিল্পদ্রব্যাদির অনুকরণে সিদ্ধহস্ত ছিল; ইউরোপীয় ধরণের বন্দুক, অলঙ্কারাদি তাহারা এরূপভাবে অনুকরণ করিতে পারিত যে, আসল বস্তুর সঙ্গে তাহা পৃথক্ করা দুঃসাধ্য ছিল।

মুসলমান রাজত্বে সম্রাট আকবর এবং জাহাঙ্গীরের সময়ে দেশীয় শিল্প উন্নতির শিখরে আরোহণ করিয়াছিল। শাজাহানের রাজত্বকালে স্থাপত্যবিদ্যার খুব উন্নতি সাধিত হইয়াছিল; কিন্তু তাঁহার সময় হইতেই অন্যান্য শিল্পকলার পতন আরম্ভ হয়। সম্রাট আওরঙ্গজেবের সময় দেশীয় নানাবিধ শিল্প দ্রুতগতিতে অধঃপতনের অভিমুখে ধাবিত হয়। বৃটিশ রাজত্বের সময় ইহা প্রায় বিনাশপ্রাপ্ত হয়। ফরাসী দেশীয় পর্য্যটক বার্ণিয়ার ১৬৬০ খৃষ্টাব্দে ভারত পরিভ্রমণ করেন। আওরঙ্গজেবের রাজত্বকালে তিনি এদেশে আগমন করেন। তাঁহার বিবরণ পাঠ করিলে আমরা তখনকার দেশীয় শিল্প এবং শিল্পীদের দুরবস্থার কথা জানিতে পারি। শিল্পী এবং কারিকরদের প্রতিভার অভাব ছিল না। যদি তাহারা রাজদরবার এবং রাজকর্ম্মচারীদের উৎসাহ এবং অনুগ্রহ লাভে সমর্থ হইত, তবে দেশের শিল্প উত্তরোত্তর উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে পারিত। দেশে শিল্পনৈপুণ্য এবং প্রতিভা যথেষ্ট পরিমাণেই ছিল। কিন্তু এই সমস্ত লোকের তখন সমাজে সমাদর ছিল না। তাহাদের প্রতি অন্যায় ব্যবহার করা হইত। তাহাদের পরিশ্রমের উপযুক্ত পুরস্কারও তাহারা সব সময়ে পাইত না। সম্ভ্রান্ত ওমরাহ এবং অন্যান্য রাজকর্ম্মচারিগণ যখন তাঁহাদের প্রয়োজন অনুভব করিতেন, বল প্রয়োগ করিয়া শিল্পীদের কার্য্যে নিযুক্ত করিতেন এবং কার্য্য শেষ হইয়া গেলে সামান্য অর্থ দিয়া বিদায় করিতেন। কোন কোন ক্ষেত্রে অর্থের বদলে চা'বুকও তাহাদের ভাগ্যে জুটিত। এইরূপ আবহাওয়ায় দেশের শিল্প গড়িয়া উঠিতে পারে না। দেশের রাজা ও ধনী ব্যক্তিদের সহায়তা ভিন্ন দেশের শিল্প উন্নতিলাভ করিতে পারে না। কি করিয়া নিজকর্ম্মের উন্নতি সাধিত হইবে, সেই সমস্ত চিন্তা ত্যাগ করিয়া কারিকর এবং শিল্পীরাও কোন প্রকারে কাজ শেষ করিত এবং জীবনধারণোপযোগী সামান্য অর্থ প্রাপ্তির আশায় কোন প্রকারে কাজ করিয়া চলিত। দৈবাৎ যে দু' একজন শিল্পী রাজা বা ওমরাহদের অনুকম্পা লাভে সমর্থ হইত, তাহারাই মাত্র কিঞ্চিৎ সম্মান এবং প্রতিপত্তি লাভে সমর্থ হইত।

মোগলযুগের শিল্পীরা প্রতিকৃতি রচনায় সিদ্ধহস্ত ছিল। এই সমস্ত ছবি জলরঙের 'tempera colour'এ অঙ্কিত হইত। বৌদ্ধযুগের অঙ্কিত যেরূপ বড় বড় ছবি অজন্তা, বাগ প্রভৃতিতে দৃষ্ট হয়, এই ছবিগুলি সেইরূপ বড় নহে। এই সময়কার ছবিগুলিকে সাধারণতঃ 'miniature painting' বলা হয়।

কাশ্মীরের শাল ইউরোপে খুব সমাদৃত হইত। সম্রাট আকবর স্বয়ং এই বস্ত্রশিল্পের উন্নতির নিমিত্ত সহায়তা করিতেন। লাহোরে এই শাল নির্ম্মাণের প্রায় শতাধিক কারখানা ছিল। পাটনা এবং আগ্রাতে কাশ্মীরী শাল প্রস্তুত করার অনেক চেষ্টা হইয়াছিল। কিন্তু কাশ্মীরী শাল যেরূপ শিল্পনৈপুণ্যে উৎকর্ষ অর্জ্জন করিয়াছিল, ঐ সব স্থানে তত্টা সফলকাম হইতে পারে নাই। দিল্লীতে অনেক কারখানায় আকবর নিপুণ শিল্পী নিযুক্ত করিয়াছিলেন। প্রতি সপ্তাহে তিনি বিভিন্ন কারিকরের প্রস্তুত দ্রব্যাদি এবং নানাবিধ চিত্রাদি নিজে পর্য্যবেক্ষণ করিতেন এবং তাহাদিগকে পুরস্কৃত এবং উৎসাহিত করিতেন

এই সমস্ত বিষয় আলোচনা করিলে উপলব্ধি করা যায় যে, দেশের শিল্পবাণিজ্য দেশের জনসাধারণ এবং রাজা-বাদশাহদের অনুকম্পা ব্যতীত উন্নতি লাভ করিতে পারে না। এককালে আমাদের দেশে নানাবিধ শিল্প-বাণিজ্য উন্নতিলাভ করিয়াছিল, রাজশক্তির প্রভাবই তাহার প্রধান কারণ।

এক্ষণে ইহার পতনের কারণ সম্বন্ধে দুই একটী কথা আলোচনা করিয়া এই প্রবন্ধের শেষ করিব। সম্রাট আওরঙ্গজেবের রাজত্বকালেই ভারতীয় শিল্প-বাণিজ্যের পতন সুরু হয়। সম্রাটের শিল্পানুরাগ ছিল না। সেই সময়ে রাজ্যের ধনী ওমরাহ এবং অন্যান্য রাজকর্ম্মচারীদের সহায়তা এবং অনুরাগ হইতে দেশীয় শিল্প বঞ্চিত হইল। যে কাশ্মীরী

শাল এককালে বিভিন্ন দেশে সমাদর লাভ করিয়াছিল, তাহাও ক্রমে নষ্ট হইতেছিল। তখন কাশ্মীরী শাল ব্যবহার একটা 'ফ্যাসান' ছিল। কিন্তু সময়ের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে 'ফ্যাসানের'ও পরিবর্ত্তন হইয়াছে। ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে দেশে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়। সেই সময় যাহারা কাশ্মীরী শাল নির্ম্মাণ করিত তাহারা পাঞ্জাবের অমৃতসরে আশ্রয় লইয়াছিল। লণ্ডন এবং প্যারিস হইতেও চাহিদা কমিয়া আসিল। ফলে কাশ্মীরের শাল ব্যবসায় নষ্ট হইয়া গেল।

বৃটিশ রাজত্বের সঙ্গে সঙ্গে দেশে পাশ্চাত্য সভ্যতারও আমদানী সুরু হইয়াছিল। দেশের রাজা, জমিদার প্রভৃতি ধনীসম্প্রদায় পাশ্চাত্য সভ্যতার অনুকরণ করিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহাদের পোষাকপরিচ্ছদেও ইউরোপীয় অনুকরণ সুরু হইল। যাঁহারা পূর্ব্বে দেশে নির্ম্মিত বহুমূল্য বসন-ভূষণ ব্যবহার করিতেন, তাঁহারা ইউরোপীয় বসনভূষণে সজ্জিত হইতে লাগিলেন। গৃহসজ্জার আসবাবেও বিলাতী অনুকরণ লক্ষিত হইল। এক শ্রেণীর কারিকরও বিলাতী ধরণের চেয়ার, টেবিল ইত্যাদি গৃহসজ্জার উপকরণ নির্ম্মাণ করিতে আরম্ভ করিল। দেশীয় রাজাদের ক্ষমতা এবং ঐশ্বর্য্যের পতনের সঙ্গে সঙ্গে দেশের নানাবিধ শিল্পও লুপ্ত হইল। দেশে যন্ত্রশিল্পের আমদানী হইল। ম্যানচেস্টারের তৈয়ারী বস্ত্রাদি দেশে আমদানি হইতে লাগিল। বোম্বাইয়ে কাপড়ের কল বসিল। ভারতের বস্ত্রশিল্প চরম দুর্দ্দশার সম্মুখীন হইল। ভারতের সর্ব্বত্র হস্তচালিত তাঁতের প্রচলন ছিল এবং দেশের লক্ষ লক্ষ লোক ঐ ব্যবসায় অবলম্বন করিয়া অন্নসংস্থান করিত। বিলাতী বস্ত্রের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় তাহারা পারিয়া উঠিল না। চিত্রকলারও অধঃপতন আরম্ভ হইল। দেশের রাজা, জমিদার, সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ নিকৃষ্ট ধরণের বিলাতী ছবির আমদানী করিয়া তাঁহাদের চিত্রকলার সাধ মিটাইতে সুরু করিলেন। ফলে কতক চিত্রকর পিতৃ-পিতামহের অনুসৃত অঙ্কন-রীতি ছাড়িয়া ইউরোপীয় পদ্ধতির অনুসরণে প্রবৃত্ত হইল; কতকাংশ চিত্রাঙ্কন ছাড়িয়া দিয়া জীবিকার্জ্জনের নিমিত্ত ভিন্ন ব্যবসায় অবলম্বন করিতে বাধ্য হইল। বস্তুতঃ এইরূপে দেশের নানাবিধ শিল্পই বৈশিষ্ট্যহীন হইয়া লুপ্ত হইতে আরম্ভ করিল।

দিও চরণের ধূলি

—শ্রীসত্যনারায়ণ দাশ

চাহি না স্বর্গ, চাহি না দেবতা, মানি না ত ভগবান্
মর্ত্যে জননী সাক্ষাৎ দেবী, নিত্য যে করি ধ্যান।
জননী তোমার বাণী—
অমিত শৌর্য্য বিপুল বীর্য্য বক্ষেতে দেয় আনি ;
বিনা সাধনায় মৌন তপেতে তুষ্ট নিয়ত তুমি,
স্বর্গ হতেও করেছ শ্রেষ্ঠ মাটীর মর্ত্ত্যভূমি।
ইঙ্গীত তব পেলে—
চূর্ণ করিতে পারি হিমাচলে খেয়ালেতে অবহেলে ;
মুঠির তলেতে ধরিবারে পারি সীমাহীন পারাবার
মরু অঞ্চলে তটিনী বহায় হেসে নিতে পারি ভার।

মৃত্যু কাঁদিয়া ওঠে—
মনের গুহায় স্বর্ণ ছড়ায়ে রক্ত-সূর্য্য ফোটে।
তব করুণায় দেবতা-নরের অভিশাপ শত শত
পুড়াবারে পারি বিসুবিয়াসের তপ্ত ধারার মত।
তব চুম্বন তলে —
স্নেহ-ঝরণার কারা যায় টুটে মধু ক্ষরে প্রতি পলে ;
শীতল করাত বুকের পরশ মন্দাকিনীর ধারা
নিমিষে নেভে যে দাবানল-শিখা করে যে আত্মহারা।
মনে জাগে বড় সাধ—
স্বর্ণ-আখরে লিখে দেব তব সুপ্ত আশীর্ব্বাদ ;

তোমার অর্ঘ্য সাজাবারে মাতঃ পুষ্প যে নাহি পাই
পরাহ করিয় রক্ত-পাপড়ি চরণেতে ধরি তাই।
দিও চরণের ধূলি
জয়-অভিযানে বক্ষ বাধার দ্বার যেন যায় খুলি'।

চাষীরা

—শ্রীসুধীরচন্দ্র রাহা

[ভূমিকা]

আমরা এমন ঘুমাইয়া থাকি—সেই ভোরের বেলায়, নূতন ঘুম ভরা দুই চোখে, আবার রঙিন স্বপ্নের মাঝে ঘুম আসে। প্রিয়ার সুকোমল মসৃণ তনুখানি, আমাদের বুকের মাঝে উত্তাপ দেয়—প্রিয়ার সুকোমল বক্ষের সুখ-তপ্ত উত্তাপের মাঝে, তাহার হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন অনুভব করি।

অন্ধকার আর আলোর মাঝে, ভোরের ঠাণ্ডা নরম হাওয়ায় ফুলের গন্ধের সাথে আমরা সুকোমল শয্যায় আলস্যে কাটাইয়া দিই। সেই সুন্দর ক্ষণটীতে কাহারা যে শীর্ণ শুষ্কমুখে নতমস্তকে চলিতেছে, তাহার সন্ধান রাখি না। তাহাদের মৃদু পদধ্বনি আমাদের কাণে পৌঁছায় না।

দূরে গঙ্গার দুই কূলে যন্ত্রদানব দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। ভোর তখনও হয় নাই, আকাশের তারা ঝিক্ মিক্ করিতেছে—বাঁকা চাঁদখানি অস্তমিত হয় নাই। গঙ্গার শীতল নরম সুস্নিগ্ধ জলে আলো-ছায়ার সাথে চাঁদের লুকোচুরি খেলা চলিতেছে। হঠাৎ তীব্র কর্কশ কণ্ঠে যন্ত্রদানবের বাঁশী বাজিয়া উঠে। অদূরবর্ত্তী ছোট ছোট ঘর হইতে, মানুষের মত কাহারা যেন নতমস্তকে শীর্ণ, শুষ্ক, জ্বালাভরা, অনিদ্রাজড়িত চক্ষে নির্জন রাজপথ দিয়া চলিতেছে।

বাঁশী বাজিয়াই যাইতেছে। তখনও রাত আছে, চাঁদ আর অজস্র নক্ষত্রেরা অসীম আকাশের মাঝে লুকাইয়া নাই। তখনও আমরা সুখ-শয্যার ঘুমাইয়া হয় তো স্বপ্ন দেখিতেছি। প্রিয়ার বুকের মাঝে তাহার এলোমেলো চুলের মাঝে মুখ লুকাইয়া ঘুমাইতেছি।

কিন্তু বাঁশী বাজিতেছে। কাহারা যেন নতমস্তকে চলিতেছে। এদিকে নির্জ্জন পল্লীপ্রান্তে, মাঠে, ঘাটে, পথে, বুড়ো বটগাছটীর মাঝে, ফুলের বাগানে, পল্লীবাসীর গৃহে গৃহে জড়াইয়া অন্ধকার রহিয়াছে।

আলো-ছায়া মাখান ভোর রাত। কোমল নরম হাওয়ার সাথে ভোর রাতের খেলা চলিতেছে। আকাশে নক্ষত্র আর চাঁদ। নীচে ছোট ছোট বাড়ীগুলি ঘুমাইতেছে, আমরা ঘুমাইতেছি। কোথাও বিন্দুমাত্র সাড়াশব্দ নাই। এখানে বাঁশী বাজে না। যন্ত্রদানব বুঝি এখনও সন্ধান পায় নাই। কিন্তু এমনি নির্জন ভোর রাতে আমাদের নিস্তব্ধ ঘুমন্ত গৃহের পাশ দিয়া আমাদের ঘরের জানালার তলাদিয়া কাহারা যেন যাইতেছে, তেমনি নতমস্তকে, শীর্ণ-শুষ্ক মুখে, জীর্ণদেহে, জীর্ণ বসনে। উহাদের জানি না, উহাদের চিনি না। চিনিলে উহাদের সন্ধান লইতাম।

এই পৃথিবীর একদিকে নির্জন পল্লীপ্রান্তে অন্ধকার-প্রসুপ্ত গ্রামখানির মধ্যে যখন আমরা ঘুমে অচেতন, যখন আমরা সুখ-শয্যায় প্রিয়ার সুস্নিগ্ধ তনুর সুগন্ধের মাঝে অর্দ্ধ-অচেতন, সেই সময় উহারা চলিতেছে, নতমস্তকে, শীর্ণ-শুষ্ক মুখে। আর একদিকে, এই পৃথিবীর মাঝে, সহস্র জন-মুখরিত শত সহস্র কর্ম্ম-কোলাহলময় নগরীর মাঝে এক নিস্তব্ধ নিদ্রিত বিশ্রাম-অবসর-ক্ষণে আর একদল ধূলিমলিন অন্ধকার গৃহ হইতে, বাহির হইয়া আসিয়া, নতমস্তকে শীর্ণ-জীর্ণদেহে, আশাহীন, ভাষাহীন মুখে নিষ্প্রভ জ্বালাময় নয়নে সম্মুখের দিকে অগ্রসর হইতেছে।

অদূরে গঙ্গার দুই কূলে বাঁশী বাজিতেছে, ওরে আয় আয় আয়।

কোন যে মূর্খ প্রচার করিয়াছে, পৃথিবী একটী। আমি দেখিতেছি দুই পৃথিবী। একদিকে অন্নহীন, নিরক্ষর, সর্ব্ববস্তুর সৃষ্টিকারক সর্ব্বহারার পৃথিবী। সেখানে আলো নাই, আশা নাই, আছে শুধু অন্ধকার। আর একদিকে আর এক পৃথিবী, সেখানে আছে ঐশ্বর্য্য, সুখ, বিভব।

এই ভাবে, দুই পৃথিবী পাশাপাশি গড়িয়া উঠিয়াছে। একদলের উদয়াস্ত কঠোর পরিশ্রমে ধরিত্রী ফলফুলে সুশোভিত হয়, একদলের আপ্রাণ চেষ্টায় পৃথিবীর ধনভাণ্ডার অগণিত অজস্র ঐশ্বর্য্যে পূর্ণ হয়। কিন্তু তাহারা তাহাদের পরিশ্রমের বিন্দুমাত্র ফললাভ করিতে পারে না। ধরিত্রীর বক্ষ অজস্র শস্যে, অজস্র খাদ্যসম্ভারে পরিপূর্ণ হয়। কিন্তু হায়! যাহারা ইহার সৃষ্টি করে, যাহাদের সাগ্রহ প্রতীক্ষায়,

বিনিদ্র রজনীর চেষ্টায়, দিবসের কঠোর পরিশ্রমে, স্বয়ং অন্নপূর্ণা পৃথিবীর বুকে অবতীর্ণা হন, তাহাদের ঘরে অন্নের এক কণাও দেখিতে পাওয়া যায় না।

কোথা হইতে আর একদল ছুটিয়া আসে, তাহাদের হাতে অগণিত অর্থ, পশ্চাতে শক্তি অস্ত্রশস্ত্র। সমস্ত ঐশ্বর্য্য, সমস্ত খাদ্যসম্ভার তাহাদের ধনভাণ্ডারে চলিয়া যায়। রিক্ত উপবাসী সর্বহারার দল চিরকালের মত তেমনি উপবাসী, তেমনি সৃষ্টিকারক, তেমনি বুভুক্ষিত নিঃসহায় অবস্থায় সেই সব ঐশ্বর্য্যের পানে অসহায় সকরুণ দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকে। এমনি ভাবে যুগে যুগে দুই পৃথিবী অনন্তকালের বুকে ফুটিয়া রহিয়াছে। কে বলে পৃথিবী একটী।

একদিকে দুঃখ, বেদনা, নিরাশার অন্ধকার ও বুভুক্ষা-দৈন্য আর অন্যদিকে সুখ, ঐশ্বর্য্য, খাদ্যসম্ভার আর অগণিত শক্তি ও অজস্র অর্থ। এক পৃথিবী আর এক পৃথিবীর সমস্ত কিছু লুণ্ঠন করিয়া তাহাকে নিঃশেষ করিয়া, দিন দিন, প্রতি মুহূর্ত্তে নিজেকে পরিপূর্ণ করিতেছে।

গঙ্গার দুইকূলে যন্ত্রদানবের আহ্বান—তার সতর্ক বংশীধ্বনী, বাজিয়া উঠে—আর নত মস্তকে, জীর্ণ-শীর্ণ বেশে অজস্র নর-নারী আমাদের দৃষ্টির অগোচরে, অন্ধকার তারা-ভরা রাতে সেই দিকে ছুটিতে থাকে। এমনি ভাবে উদ্দেশ্যহীন জীবনে, ক্ষোভে, নিরাশায়, বুভুক্ষায় তাহাদের সমস্ত চেতনা বিলুপ্ত হইয়াছে। তাহারা আজ আর মানুষ নয়, ঐ যন্ত্রদানবের আর এক অংশের মত যন্ত্রময় হইয়া গিয়াছে।

গঙ্গার দুই কূলে বাঁশী বাজিতেছে।

গ্রামের নির্জন ছায়া-সুশীতল পাদপছায়ায় সেই বাঁশীর ধ্বনি প্রতিধ্বনিত হইতেছে। এখানেও তাই নিরন্ন বুভুক্ষিত মানুষের দল ঐ বন পার হইয়া মাঠের মধ্য দিয়া ঐ জলাভূমির অপর পারে দলে দলে চলিতেছে।

আমরা তখন ঘুমাইয়া থাকি।

সুখস্বপ্নে বিভোর হইয়া ঐশ্বর্য্যের মাঝে প্রিয়ার সুকোমল দেহের সুরভির মাঝে রঙিন স্বপ্ন দেখি।

আমাদের বিশ্রামের ব্যাঘাত হয় না, আমাদের খাদ্য তিক্ত হয় না, আমাদের পানীয় বিস্বাদ হয় না। মাঝে মাঝে কাহাদের যেন চাপা কান্নার ধ্বনি আমাদের জানালায় আঘাত করে—ভাবি, বুঝি বাতাসের খেলা।

মাঝে মাঝে কাহাদের পাংশু-পাণ্ডুর মুখচ্ছবি আমাদের চক্ষের সম্মুখে ভাসিয়া উঠে—ভাবি, বুঝি এ দুঃস্বপ্ন।

মাঝে মাঝে প্রেতমূর্ত্তির মত দলে দলে কাহাদের যেন দেখি—ভাবি, অভাগা ভবঘুরের দল। সমাজের শান্তির জন্য রাজদ্বারে আশ্রয় মাগি। আমাদের সুখশান্তি-ঘেরা পৃথিবীর বুকে অন্য এক পৃথিবীর ছায়া মাঝে মাঝে ভাসিয়া উঠে—ভাবি, দৃষ্টির ভ্রম।

গঙ্গার দুই কূলে বাঁশী বাজিতেছে। কাহারা যেন নত মস্তকে পাংশু-পাণ্ডুর মুখে জীর্ণশীর্ণ বেশে, ধীরে ধীরে হাঁটিতেছে।

প্রথম ভাগ

(১)

বাবলারী গ্রামখানি এককালে সমৃদ্ধিসম্পন্ন ছিল। গ্রামে লোকের বাস ছিল অনেক এবং কোন কিছুর বিশেষ অভাবও ছিল না। গ্রামে স্কুল ছিল, অতিথিশালা ছিল। রাস্তাঘাট সব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, কোনদিকে বিন্দুমাত্র অপরিষ্কারের আভাষ ছিল না। মস্ত বড় বারোয়ারীতলা, প্রত্যহ বাজার, অজস্র দোকান, এ সবই ছিল। ক্রেতা বিক্রেতার কোলাহলে, বারোয়ারীতলায় যাত্রাপার্টির অভিনেতাদের চীৎকারে গ্রামখানি প্রাণময় হইয়া থাকিত। কিন্তু আজ আর কিছুই নাই। চারিদিকে এখন ভগ্ন দ্বিতল বাড়ীগুলি পড়িয়া রহিয়াছে। আর জনহীন গ্রাম্য পথঘাটের চতুর্দ্দিক ঘনজঙ্গলে পরিপূর্ণ। বারোয়ারীতলার যাত্রাপার্টি ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, বাজার বসে না, রাস্তায় লোকজন নাই; কদাচিত দু' একজন রুগ্ন, প্লীহাগ্রস্ত, উদরসর্বস্ব মানুষ পাংশু-পাণ্ডুর মুখে জীবনের বোঝা বহিয়া অতি ধীরে হাঁটিতেছে দেখা যায়।

অতিথিশালা ও স্কুল ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। বড় বড় পুষ্করিণীগুলি কচুরী পানায় ও শেওলায় পরিপূর্ণ; পানীয় জল বিষাক্ত ও তিক্ত। শুধু দেখা যায় চারিদিকে ঘন অরণ্য। দ্বিতল বাড়ীগুলি ভগ্ন অবস্থায় কোথাও কোনমতে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে, কিন্তু নানা আগাছা ও বন্যলতায় বাড়ীগুলিকে ঢাকিয়া ফেলিয়াছে। বাবলারী গ্রামের পার্শ্বস্থ অন্যান্য

গ্রামগুলির অবস্থাও ঠিক একই। সঙ্কীর্ণ রাস্তা ধরিয়া হাঁটিয়া যান, দেখিবেন কোথাও জনপ্রাণী নাই। মাঝে মাঝে ভগ্ন বা অর্দ্ধভগ্ন বাড়ীগুলির সামান্ত অংশ দেখা যাইতেছে। কোথাও হয়তো দু'একটী লোক কোনমতে অর্দ্ধাশনে বা অনশনে স্তিমিত দুই চক্ষে মৃত্যুর জন্ম প্রতীক্ষা করিতেছে।

একমাত্র বাবলারী গ্রামখানি আশে পাশের অন্যান্য গ্রামগুলি হইতে আজও যেন কিছু উন্নত। কিন্তু তাহার পূর্ব্ব অবস্থার সহিত তুলনা করিলে, তাহাকে ধ্বংসপ্রাপ্ত গ্রামগুলির সহিতই গণনা করিতে হয়।

উন্নতির মধ্যে শুধু দেখিতে পাওয়া যায়, গ্রামের পাশ দিয়া ই-আই-আর কোম্পানীর রেলপথ চলিয়া গিয়াছে; আর গ্রামের মধ্যে ঠিক বাজারের কাছে রেলষ্টেসন্ হইয়াছে। এই রেলষ্টেসনটীকে ঘিরিয়া খানকয় পান-বিড়ির দোকান, দু' একখানি খাবারের দোকান, আর অদূরে নব-প্রতিষ্ঠিত দেশী মদের দোকান। আশে পাশের গ্রাম হইতে কিছু কিছু যাত্রী এই ষ্টেসনেই উঠা-নামা করে। যাত্রীরা পান-বিড়ি খায়, চা খায়; এবং দু'একজন রসিক ব্যক্তি অদূরবর্ত্তী সরাবের দোকান হইতে এক-আধ গ্লাস পান করিয়া প্রাণ শীতল করিয়া থাকে—মোট কথা খাবার যৎটা বিক্রয় হয়, তাহার অধিক পান-বিড়ি ও চা এবং সরাব বেশী বিক্রয়ই হয়। দৈনিক বাজার আর বসে না। বিক্রেতা থাকিলেও ক্রেতার অভাব দেখা যায়। তাই সপ্তাহে একদিন মাত্র হাট বসিয়া থাকে। এই হাটটী অবশ্য বহুদিন হইতে বসিয়া আসিতেছে।

পূর্ব্বে গ্রামে উৎসবের অভাব ছিল না। বারমাসে তের-পার্ব্বণ কথাটীর প্রত্যক্ষ প্রমাণ এই গ্রামে দেখা যাইত। অবস্থাপন্ন লোকও ছিল যথেষ্ট। এ ছাড়া জমিদারবাড়ীতে কোন পূজাই বাদ যাইত না।

তখন মহা-সমারোহের সহিত প্রত্যেকটী পূজাই হইত। কয়েকদিন ধরিয়া যাত্রা, গান ও কবি-কথকতা হইত। লোকজন খাইতে পাইত। ভিখারীরা শুধুহাতে ফিরিয়া যাইত না। লোকে উদর পুরিয়া ভালমন্দ খাইয়া আমোদ আহ্লাদ করিত।

তারপর ক্রমশঃ সেই সব সমারোহের দিনগুলি সেই সব পূজা-পার্ব্বণ-কথকতা-মুখর ক্ষণগুলি লোকের ভাগ্যবিপর্য্যয়ের মাঝে ম্লান হইয়া আসিতে লাগিল। জমিদার, বড়লোক, বড় বড় ব্যবসায়ীরা সময়ের সহিত সঠিক তাল রাখিতে পারিল না। তাহাদের ধন-সম্পত্তি নষ্ট হইয়া গেল। নানা মামলা-মোকদ্দমায় জড়ীভূত হইয়া, দেনার দায়ে তাহারা সর্ব্বস্বান্ত হইল। কেহ পালাইয়া বিদেশে চলিয়া গেল, কেহ বা মরিয়া গেল। লোকের আর্থিক দুর্দ্দশার সঙ্গে সঙ্গে চারিদিকে ম্যালেরিয়ার তীব্র প্রকোপ দেখা গেল। লোকে সাধ্যমত চিকিৎসা করিতে লাগিল কিন্তু কিছুই হইল না। অবশেষে ব্যাধির তাড়নায়, দেনার দায়ে, অর্থাভাবে মানুষের দুঃখের সীমা রহিল না। সকল উৎসব আয়োজন, নানারূপ সমারোহ, পূজা-পার্ব্বণ বন্ধ হইয়া গেল।

অতিথিশালা স্কুল প্রভৃতি বন্ধ হইল। সংস্কারের অভাবে রাস্তা-ঘাট জঙ্গলে পূর্ণ হইল, বড় বড় পুষ্করিণী মজিয়া ভরাট হইয়া গেল। শেষে যে অবস্থায় আসিয়া গ্রামগুলি দাঁড়াইল, তাহা আমরা স্বচক্ষেই দেখিতেছি।

বাবলারী গ্রামে যা কতক মাত্র লোক দেখিতেছি। কিন্তু কোথাও আনন্দ সমারোহ নাই, লোকের কোন উৎসাহ নাই। অর্থাভাবে, রোগে, দেনায় মানুষ কোনমতে বাঁচিয়া রহিয়াছে। আর পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামগুলিতে নিরন্ন চাষীর দল কোনমতে দু'একবিঘা জমি চাষ করিয়া নিজেদের জীবন বাঁচাইয়া রাখিয়াছে।

অন্নাভাবে, অর্থাভাবে, রোগে, শোকে এবং জমিদার, মহাজন ও প্রবলের অত্যাচারে উহারা প্রতিবাদ করে না। প্রতিবাদ করিবার ভাষা যেন উহারা ভুলিয়া গিয়াছে।

সমস্ত অত্যাচার সহ্য করিয়া শুধুমাত্র অস্ফুটস্বরে এক এক বার ঊর্দ্ধে তাকাইয়া, সমস্ত অভাব-অভিযোগ, সমস্ত ব্যথা-জ্বালা-যন্ত্রণা, এই সবের প্রতীকার-প্রার্থনা জানায় এবং প্রবলের অত্যাচারের বিরুদ্ধে নালিশ করে।

(২)

বহুদিন আগে নিতাই দাস গ্রাম ছাড়িয়া কোথায় যেন গিয়াছিল। প্রথম প্রথম বাড়ীর লোকে নানা জায়গায় সন্ধান করিয়া অবশেষে তাহার আশা ছাড়িয়া দিয়াছিল। নিতাই দাস যখন নিরুদ্দেশ হয়, তখন তাহার বয়স প্রায় কুড়ি বৎসর। তাহার পর মধ্যে আরও অনেক বৎসর

চলিয়া গিয়াছে, কত উত্থান-পতন হইয়াছে; যাহারা ছোট ছিল তাহারা বড় হইয়াছে, সেই সঙ্গে সঙ্গে নিতাই দাসের সংসারেও বহু পরিবর্ত্তন হইয়াছে। নিতাইয়ের বুড়ী মা তাহার নিরুদ্দেশের পর আর বেশী দিন বাঁচে নাই। ছোট ভাইটি চাষ-বাস করিয়া কিছুদিন ঘর-সংসার চালাইল; অবশেষে অর্থাভাবে, দেনার দায়ে জমিটুকু চলিয়া গেল, ঘর-বাড়ী নিলাম হইয়া গেল। একদিন হরিচরণ মাত্র একটী পিতলের ঘটী সম্বল করিয়া তাহার জন্মভূমি, আর বহুদিনকার আবাস, বাপ-মায়ের মধুর স্মৃতি জড়িত, নানা সুখ-দুঃখমাখা ভিটাটুকুর মায়া ছাড়িয়া গ্রাম ত্যাগ করিল। উদ্দেশ্য কোন কিছু জুটাইয়া পেটের ভাত সংস্থান হয় কি না দেখিতে। অবশেষে বহুকষ্টে গরিফার রংকলে চাকরী জুটাইয়া তথায় বসবাস করিতেছে। বিবাহ করে নাই, কিন্তু কোথা হইতে একটী স্ত্রীলোক সংগ্রহ করিতে ভুলে নাই। মনে হয়, তাহারা সুখেই আছে।

একদিন নিতাই ফিরিয়া আসিল। মাথায় বিন্দুমাত্র কেশ নাই—মাথা জোড়া টাক আর নেয়াপাতি একটী ভুঁড়ি। এতদিনে বহু স্থানে ঘুরিয়া-ফিরিয়া নিতাই দাস বহু আয়াসে ভুঁড়ি আর মাথাজোড়া টাক গড়িয়া তুলিয়া একটি পাকা লোক হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

নিতাইপদ গ্রামে আসিয়াই মুদীখানার দোকান খুলিয়া বসিল। সন্ধ্যার পর চা খাইতে খাইতে, তাহার বিদেশ-ভ্রমণের কথা, বিদেশে নিজের পসার-প্রতিপত্তির কথা সবিস্তারে বর্ণনা করিতে লাগিল। আসামের চা বাগান, হাজারিবাগে অন্ধকার রাত্রে বাঘের সঙ্গে লড়াই, বর্ম্মায় চায়ের দোকান, তথায় তাহার বর্ম্মী বউয়ের কথা, সবই নিতাই বলিয়াছে। কিন্তু কত টাকা আনিয়াছে, তাহার বিন্দুমাত্র বলে নাই।

পাঁচু দত্ত ইহার মধ্যেই নিতাইয়ের ভক্ত হইয়া উঠিয়াছে। চা খাইয়া বিড়ি ধরাইতে ধরাইতে পাঁচু জিজ্ঞাসা করিল, দাদা, টাকা তো অনেক জমিয়েছ মনে হয়। এবার একখানা ভাল বাড়ী আর জমিদারী কিনে ফেল, ও-শালার জমিদারের তেলটা ভাঙ্গুক।

নিতাই ফিক্ ফিক্ করিয়া হাসিয়া বলে, দূর পাগল, জমিদারী কিনবার মত কি টাকা আছে। তবে দেখ না, আমি যখন এসেছি তখন জমিদারের সাধ্য কি তোমাদের গায়ে হাত দেয়। সব এক জোট হ বুঝলি—

পাঁচু অবশিষ্ট চা চুমুক দিয়া, আনন্দে গলিয়া গিয়া বলিল, তোমার ভরসাতেই বেঁচে আছি দাদা—

নিতাই দাস শুধু মুদীখানা দোকান করে নাই, তাহার সহিত আরও কিছু খুলিয়াছে। পান, বিড়ি, সিগারেট, এ সব রাখিতেও ভুলে নাই। লোককে বিনি পয়সায় সন্ধ্যা বেলায় একটু চা দেয় বটে, কিন্তু একটী বিড়ি কাহাকেও দেয় না। লোকে চা খাইয়া বাধ্য হইয়া দু'একপয়সার পান-বিড়ি কেনে।

সন্ধ্যার আড্ডাটি জমিয়া উঠিয়াছে মন্দ নয়।

রাখহরি সর্ব্বস্ব গাঁজা খাইয়া ফুঁকিয়া দিয়াছে। থাকিবার মধ্যে বনের মাঝে জীর্ণ চালের একখানি ঘর। তাহাতেই রন্ধন ও শয়ন দু'ই চলিয়া থাকে। জাতব্যবসা হাঁড়ি-কলসী গড়া, তা অনেক দিনই তুলিয়া দিয়াছে। মাঝে মাঝে এখান-ওখান হইতে যা দু' একখানি ঠাকুর গড়ার বায়না পায় তাহাতেই এক বেলা খুদ সেদ্ধ আর গাঁজার খরচ চলিয়া যায়। দিনকতক হইল রাখহরি জেল হইতে ঘুরিয়া আসিয়াছে। পাশের বাড়ীর এক বৈষ্ণবীর ঘর হইতে করগেট-টিন খুলিয়া নিশ্চিন্ত মনে নিজের বলিয়া বিক্রয় করিয়া দিয়াছিল। অবশেষে ধরা পড়িয়া দুই মাস জেল হইল। এরূপ কাজ উহার নূতন নয়। ভিন্ন গ্রামবাসীকে এই ভাবে বহু আম, কাঁঠাল, কাঠ, বাঁশ নিজের বলিয়া বিক্রয় করিত। মাঝে মাঝে ধরাও পড়িত কিন্তু কেহই এতকাল উহাকে জেল পর্য্যন্ত পৌঁছাইয়া দেয় নাই। কিন্তু কেষ্টদাসী বৈষ্ণবী ছাড়িল না। কেষ্টদাসীর বয়স অল্প, পয়সাও আছে। বৈষ্ণব তাহার একটি নয়, অনেকগুলি। বৈষ্ণব বাবাজীদের চেহারা দেখিয়া অহিংস, শান্ত, নিরীহ বলিয়া মনে হয় না। এক সঙ্গে অনেকগুলি কেষ্টদাসীর আঙ্গিনায় খোল-করতালের সহিত প্রায়ই গভীর রাত পর্য্যন্ত উদ্দাম নৃত্য করে। উহাদের হাসি হাসি পান খাওয়া মুখ ও নধর-পুষ্ট দেহগুলি দেখিয়া মনে হয় না যে, ইহারা নিরামিষ খাইয়া থাকে। যাই হোক, রাখহরি এইবার উহাদের চেষ্টায় কয় মাস জব্দ হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছে।

দোকানঘরের এক পাশে অনেকগুলি একসঙ্গে গোল হইয়া বসিয়া গাঁজায় দম দিতেছিল। নিতাই দাসেরও

ঐ অভ্যাসটা আছে দেখা যাইতেছে। কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া নিতাই দাস চায়ের কাপটা হাতে করিয়া কহিল, কই হে সুপতি, দোকানের বাকিটা দিয়ে ফেল—

সুপতি সবেমাত্র মুখের কাছে চীনের চায়ের কাপটি ধরিয়া ঠোঁট দুইখানি সূচাগ্র করিয়া উহার রসাস্বাদনে ব্যস্ত ছিল; কিন্তু চীনের কাপটাতে গরম যেন তীব্র হইয়া উঠিয়াছে। কোনরূপে এক চুমুক গিলিয়া, জিভ দিয়া দুই ঠোঁট চাটিতে চাটিতে সুপতি কহিল, দাদা পাটের বাজার দেখেছেন তো, চার টাকার উপর দাম হচ্ছে না। এদিকে দশমণ পাট তুলতে খরচ যা হ'ল, তা বিক্রী করে আসল চাষ-খরচও উঠছে না।

নিতাই দাস কহিল, কিন্তু আমার চলে কি করে? আর বাপু পাটের দাম উঠবে না—বুঝলে? পরশুদিন কাগজে যা পড়লাম—তাতে দেখলাম, সাহেবেরা খুব রেগে গিয়েছে—বুঝলে না! ঐ যত কংগ্রেসীওয়ালা আর স্বদেশীওয়ালা! ওরাই তো পাটের দাম কমিয়ে দিল। বুঝলে না, লোকে কংগ্রেস করছে, স্বদেশী করছে, ও:তেই সাহেবেরা রেগে যাচ্ছে আর দিচ্ছে পাটের দাম কমিয়ে।

সুপতি কহিল, কিন্তু আমাদের উপায় কি হবে দাস মশায়, সবই যে পাটের উপর ভরসা ছিল।

রাখহরি দাঁত-মুখ খিঁচাইয়া বলিল, থাম রে বাপু, যেখানে যাবি সেখানেই শুধু কাঁদুনী গাইবি। দিনরাত প্যান্ প্যান্ কেন রে বাপু! এলি দুদণ্ড বস, গল্প কর, তামাক খা, বিড়ি খা, তা নয় খালি ঘ্যান্ ঘ্যান্—

সুপতি রোগা মানুষ—শরীর তার দুর্ব্বল। সারা বর্ষায় ম্যালেরিয়ায় ভোগায়, প্লীহা আর লিভার উদর-জুড়িয়া রাজত্ব করিতেছে। ইহার উপর কোনদিন খাইতে পায়, আবার কোনদিন পায়ও না। ছেলে-পিলে লইয়া, খাজনা, ট্যাক্স, দেনার কথা ভাবিয়া ভাবিয়া তাহার শরীরে অবশিষ্ট আর কিছুই নাই। রোগে সুপথ্য বা সুচিকিৎসার কথা ভাবিতেও পারে না। সকালে পান্তাভাত লঙ্কা দিয়া খাইয়া ঐ শরীরেই লাঙ্গল বয়।

রাখহরির লোহিতাভ চক্ষু দেখিয়া সুপতি আর কোন কথা বলিতে সাহস করিল না। শুধু গায়ের ছিন্ন কাপড়টা কোনমতে শরীরে জড়াইয়া বাহিরের অন্ধকারের দিকে তাকাইয়া রহিল।

রাখহরি সবিস্তারে জেলখানার গল্প সুরু করিয়াছে। কি উপায়ে প্রত্যহ গাঁজা খাইত, জেলের মেট-ওয়ার্ডার তাহাকে কিরূপ ভালবাসিত, জেলার সাহেবের বড় মেয়েটা বৈকালে কেমন গান করিত, আর কি খপসুরৎ তাহার চেহারা, এ-সবই সবিস্তারে বর্ণনা করিতে লাগিল। এই গল্প এর আগেও বহুবার করিয়াছে; কিন্তু সন্ধ্যা বেলায় চা আর গাঁজা খাইবার পর রাখহরি প্রত্যহ একবার করিয়া জেলের গল্প বলিত। রামলোচন আর এক কয়েদী। তাহার সহিত রাখহরির খুবই বন্ধুত্ব ছিল। লোকটা নাকি ডাকাতি কেসের আসামী, কিন্তু তাহার চেহারাখানা খাসা! জেলার সাহেবের মেয়েটা নাকি উহাকে দেখিয়া হাসিত। শালার মেয়ে, এই কথা বলিয়া রাখহরি এক অশ্লীল রসিকতা করিয়া হিঃ হিঃ করিয়া হাসিয়া উঠিল। নিতাই দাসও তাহার সহিত যোগ দিল। বাহিরে ঘন অন্ধকার। কার্ত্তিক মাসের শেষ, কিন্তু ইহার মধ্যেই যথেষ্ট শীত পড়িয়াছে। রাত হইয়া উঠিয়াছিল। বাহিরে ঝাপসা কুয়াশা আর শির শির করিয়া বাতাস বহিতেছে। বাজারের অনেক দোকান বন্ধ হইয়াছে। গ্রাম প্রায় নিস্তব্ধ। ছেঁড়া কাপড়খানি কোনমতে গায়ে জড়াইয়া, শীতে কাঁপিতে কাঁপিতে সুপতি কহিল, আবার বুঝি জ্বর আসছে। দাস মশায়, চল্‌লাম এখন।

গলা বাড়াইয়া নিতাই দাস কহিল, বাকী দামটার কথা যেন মনে থাকে।

(৩)

শীত বেশ ঝাপিয়া পড়িয়াছে। কিন্তু সেই যে-বর্ষাকাল হইতে ম্যালেরিয়া সুরু হইয়াছিল, তা আজও বন্ধ হইল না। গ্রাম্য ইউনিয়ন বোর্ড হইতে, দুই চারিটী কুইনাইনের বড়িই একমাত্র সকলের সম্বল। লোকে দু'ঘণ্টা বসিয়া প্রেসিডেণ্ট বাবুর কাছ হইতে, দু' চারিটী বড়ি পায়। কিন্তু উপদেশ শুনিতে হয় বিস্তর—এই বড়ি দিলাম, বুঝলে ঘোষ, আজ তিনটে, কাল দুটো, আর পরশু একটা। ব্যস্ জ্বর নির্ঘাত বন্ধ হবে। এসব সরকারী ওষুধ বুঝলে—যাতা বাজে ওষুধ নয়।

ঘোষ প্রেসিডেন্টবাবুর দিকে তাকাইয়া জরে হিঃ হিঃ করিতে করিতে বসিয়া থাকে

প্রেসিডেন্টবাবু আয়েস করিয়া তামাক টানিতে টানিতে বলেন, ঘোষ, কই বাপু, ক্ষীর ছানা-টানা তো আর দাও না ?

দুই হাত জোর করিয়া ঘোষ বলে, হুজুর এই কমাস থেকে পড়ে রয়েছি, ওসব ব্যবসা একরকম বন্ধই বলতে গেলে। মাত্র দুটো গরু—সের দুই-আড়াই দুধ দেয়, ঐ বিক্রী করে কোন মতে সংসার চলে। হুজুর আশীর্ব্বাদ করুন, সেদিন এলে দেব বই কি ?

গ্রাম হইতে তিন চারি ক্রোশ দূরে সরকারী ডাক্তারখানা। কিন্তু অতদূরে দুর্ব্বল শরীরে জ্বরে কাঁপিতে কাঁপিতে ঔষধ আনা কাহারও হইয়া উঠে না। গ্রামে একজন ডাক্তার আছে বটে কিন্তু আলমারীতে শিশির ভিতর ঔষধের নাম-গন্ধও নাই। ঘরের অবস্থা দেখিয়া, কেহ তাহাকে ডাক্তার-খানা বলিয়া মনে করিবে না। ভাঙ্গা ফুটো ঘরের চালা ভেদ করিয়া বর্ষার জল ঘরে প্লাবন বহিয়া দেয়। চাল ভেদ করিয়া প্রচুর আলো-বাতাস আসিবার কোন বাধা নাই। আলমারীর জায়গায় জায়গায় উই পোকায় খাইয়া ফেলিয়াছে—কদাকার করিয়াছে। সে ভাঙ্গা টেবিলের উপর ঔষধের শিশির সহিত, দা, কাস্তে, কুড়ুল, শাবল সবই শোভা পাইতেছে। ছাগলের নাদীর সহিত ভাঙ্গা গেলাস ও ভাঙ্গা শিশি গড়াগড়ি যাইতেছে। এক অতি অপরিষ্কার গাড়ুর ভিতর কবেকার ধরা পচা জল রহিয়াছে। রোগী যদি কেহ আসে সেই জল খানিকটা শিশিতে ঢালিয়া, বহুদিনকার পচা কুইনাইন আর ম্যাগসলফ্ খানিকটা শিশিতে গুলিয়া, আর সিরাপ দিয়া একটু লালরং করিয়া ডাক্তারবাবু রোগী বিদায় করেন। রোগ সারে কি না তা তাহারাই জানে। তবুও মাঝে মাঝে কেহ কেহ কাঁপিতে কাঁপিতে, সেই ঔষধই লইয়া যায়। নেহাৎ পরমায়ু যাহার থাকে, কোনরূপে বাঁচিয়া যায়। কিন্তু বৎসর বৎসর বন-জঙ্গল-ঘেরা পতিত বাড়ীগুলির সংখ্যা বৃদ্ধি হইতে দেখিয়া আপনাদের মনে হইবে, অচিকিৎসায় আর কুচিকিৎসায় এই সব অধিবাসীরা কোথায় চলিয়া গেল। তাহাদের গন্তব্যপথের সঠিক সন্ধান জানিতে হইলে চৌকিদারের মৃত্যুর হাতচিঠা ও মাতাপুরের শ্মশানঘাটে সন্ধান লইলেই জানিতে পারা যাইবে।

বাবলারী আর তার আশে পাশের গ্রামগুলি জনমানব-শূন্য বলিলেই হয়। যাহারা আছে, তাহাদের মধ্যে অধিকাংশই গরীব নিরীহ চাষী, আর ঘর কয়েক শিক্ষিত ও অর্দ্ধ-শিক্ষিত ব্রাহ্মণ কায়স্থ ভদ্রলোক। হাটের মাঝে আছে ঘর কয়েক কামার, ছুতোর ও কলু। তাহারা নিজের জাতব্যবসা করে আর কেহ বা মুদিখানার দোকানও খুলিয়া বসিয়াছে।

পল্লীবাসীর সামান্য প্রয়োজন গ্রাম্য মুদিখানা হইতেই মিটিয়া যায়। নানাবিধ বিলাস সামগ্রীর সম্বন্ধে যাহাদের বিশেষ সখ আছে, তাহারা নিকটস্থ সহর হইতে কিনিয়া আনে। বাবলারী গ্রামে হরিদাসের ছোট্ট মনোহারী দোকানে সে সব বিলাসিতার বস্তু পাওয়া সম্ভব নয়। সমস্ত দিন লোকে কাজ করে, চাষ-আবাদ করে, দোকানে কেনা-বেচা করে। আর যাহারা কিছু করে না, তাহারা ইহার উহার দোকানে বসিয়া, বিড়ি-তামাক টানিয়া প্রতিবাসীর নিন্দা কুৎসা করিয়া সময় কাটায়। পাঁচু দত্ত সেই শ্রেণীর লোক। তাহার দোকান নাই, চাষবাস নাই, নিজের এক ছটাক জমি নাই, কোথাও চাকুরীও করে না। অথচ বসিয়া বসিয়া ভাল-মন্দ খায়। বাবুর মত পোষাক পরিচ্ছদের বাহার দিয়া, গরীব লোকের ভয়, ভক্তি, সম্ভ্রম আনয়ন করে। কেহ জানে না কোথা হইতে সে পয়সা পায়, অথবা কিসে তাহার চলে। মাঝে মাঝে দেখা যায় কালনা কোর্টে শ্যামের হইয়া, রামের বিরুদ্ধে সাক্ষী দেয়। অথবা কোন উপায়ে কাহারও সহিত ঝগড়া বাধাইয়া দু'চার পয়সার সংস্থান করিবার চেষ্টা করে।

এক ভাবে, একই সুরে, একই নিয়মপদ্ধতিতে ও ধরা-বাঁধায় গ্রামের জীবন চলিতে থাকে। কোন নূতনত্ব নাই, কোন পরিবর্ত্তন নাই। ভগবানের দোহাই দিয়া, অদৃষ্টের উপর দোষারপ করিয়া, কপালের উপর নিজেদের সমস্ত আশা, আকাঙ্ক্ষা, ভবিষ্যৎ সঁপিয়া দিয়া এই পল্লীবাসিগণ দিন কাটাইতে থাকে। নূতন জীবন বা নূতন কোন মতামত সম্বন্ধে ইহাদের কোন আকর্ষণ নাই। প্রশ্ন জিজ্ঞাসা বা কার্য্যকারণ সম্বন্ধে একান্ত উদাসীন। অসুখ হইলে, চিকিৎসার জন্য কোন চিন্তা করে না—পরমায়ু যদি থাকে তবে অবশ্যই বাঁচিবে—এই মহৎ বাক্য অনুসরণ করে। দিন তাহারা খাইতে না পাইয়া, অর্থাভাবে অনাহারে প্রতি

মুহূর্তে ধ্বংসের শেষ সীমায় চলিয়া যাইতেছে ; ইহার যে কি কারণ তাহার জন্ত কেহই কোনদিন কোন প্রশ্ন করেন না। অত্যাচার অনাচারের বিরুদ্ধে, প্রবলের আস্ফালনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের ভাষা খুঁজিয়া পায় না। সমস্ত অদৃষ্টের উপর চাপাইয়া পরম নিশ্চিন্তে চক্ষু মুদিয়া, সর্ব্ব দুঃখ, গ্লানি, অপমান ও অশান্তি সহ্য করিয়া নির্ব্বিবাদে, নীরব, সহিষ্ণু ও শান্ত থাকিতে ইহাদের মত আর কেহ আছে কি না সন্দেহ।

এমনি ভাবে দিন যায়। সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত একটানা সুরে, একই ভাবে প্রত্যহ কাটিয়া যায়। রাত্রি আসে, গ্রামের ভিতর কোন সাড়া পাওয়া যায় না। গ্রাম্য রাস্তা নির্জ্জন হয়। কদাচিৎ দু' একটি কুকুর চীৎকার করিতে করিতে আশ্রয় খোঁজে। শুধু হাটের মাঝে দু' একখানা দোকানে আর নিতাই দাসের দোকানে অনেক রাত পর্য্যন্ত নিকর্ম্মা লোকদের আড্ডা চলিতে থাকে।

অনেকদিন পর হাটের মাঝে একদিন চাঞ্চল্য দেখা গেল। শান্ত লোকগুলির ঠাণ্ডা রক্ত সামান্ত উত্তপ্ত হইল মাত্র।

কানাই মুখুয্যে হাটের মাঝে বিড়ি-সিগারেট বিক্রয় করে আর হাটের দিন চা সরবৎ বিক্রয় করে। পিতৃ-পুরুষের ব্যবসা ছিল গুরুগিরি। আজ পিতার অবর্ত্তমানে, পিতার গুরুগিরি ব্যবসা কানাই চালাইতেছে। কিন্তু শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে আজকাল গুরুদেবের উপর ভক্তি-শ্রদ্ধা যেন কমিয়া গিয়াছে। ইহার জন্ত অবশ্য শিক্ষিত সম্প্রদায়ের দোষ দেওয়া চলে না। যে বিদ্যা ও যে পাণ্ডিত্য গুরুদেবের থাকা প্রয়োজন, তাহার একান্ত অভাবের জন্যই সম্ভবতঃ ভক্তি-শ্রদ্ধার মাত্রা কমিয়া আসিতেছে। কানাই মুখুয্যে পিতার কোন গুণই পায় নাই। কোনরূপে নাম সহি করিতে পারে, আর বানান করিয়া করিয়া কোন মতে বই পড়িতে পারে। লেখা-পড়ার দিক হইতে এই, তবে সঙ্গীত-কলার দিকে কানাইয়ের কিছু কিছু দখল আছে। লোক অভাব হইলে যাত্রার দলে বাঁশী বাজাইয়া, তবলা বাজাইয়া, গান গাহিয়া সে রাত উদ্ধার করিয়া দিতে পারে। ইহা ছাড়া অন্যান্য গুণের বর্ণনা না করাই ভাল। নেশা যে কি করে না, তাহা আমাদের জানা নাই ; কি কি নেশা করে তাহার সবিস্তার বর্ণনা নিষ্প্রয়োজন।

চাষীমহলে কানাই মুখুয্যে দাদাঠাকুর নামেই পরিচিত। চাষীদের কাছ হইতে, কলা, মুলো, ধান, মুগ, কলাই, খেজুর গুড়, আখের গুড় যা বিনা পয়সায় পায়, তাহা কোন ক্রমেই নিন্দনীয় নয়। চাষিগণের সকল কাজে, সকল শুভ ব্যাপারে, সমস্ত পরামর্শে দা-ঠাকুরের মতামতই গ্রাহ্য হয়। কিন্তু সেদিন সকলকে আশ্চর্য্য করিয়া দিয়া হাটের মাঝে ভূপতি চাষী এক কাণ্ড করিয়া বসিল। দোকান হইতে গুরুদেবকে গলায় গামছা দিয়া হিড়্ হিড়্ করিয়া টানিয়া সদর রাস্তায় আনিয়া, গালে-পিঠে অবিরাম কিল-ঘুসি মারিতে লাগিল। লোকে বিস্ফারিত নেত্রে, গুরুদেবের একান্ত অনুগত শিষ্যের কাজ দেখিয়া, সকলে পরম আশ্চর্য্যে অবাক হইয়া চাহিয়া রহিল।

ভূপতির শরীরে অসীম ক্ষমতা, আর সে বুনো ষাঁড়ের মত একগুঁয়ে। সকলের দিকে আরক্ত নয়নে চাহিয়া সবল মুষ্টি শূন্যে তুলিয়া কহিল, দা ঠাকুর বলে এদ্দিন খুব খাতির করে যাচ্ছিলাম ; কিন্তু ভূপতি অনৈরণ সহ্য করতে পারে না। এর পর কোনদিন আবার আমাদের বাড়ীর উঠোনে পা দিলে, ঠ্যাং খোঁড়া করে দেব।

কানাই মুখুয্যের অন্যান্য ভাইয়েরা দাদাকে সাহায্য করিতে দৌড়াইয়া আসিয়াছিল কিন্তু ভূপতির মূর্ত্তি দেখিয়া তাহারা দোকানে ঢুকিয়া পড়িল। লোকে মুখ চাওয়াচায়ি করিয়া এই কার্য্যের কারণ খুঁজিতে লাগিল। কিন্তু বেশীক্ষণ কাহাকেও সেই কারণ খুঁজিবার জন্য কষ্ট করিতে হইল না।

ভূপতির বিধবা দিদি পদ্মরাণী গুরুদেবের দুর্দ্দশা শুনিয়া ভাইকে গাল দিতে দিতে রাস্তায় ছুটিয়া আসিতেছিল। ভূপতি এক লাফে ছুটিয়া যাইয়া পদ্মর হাত ধরিয়া টানিয়া আনিয়া একগাছি লাঠি দিয়া ঘা কতক পিঠে বসাইয়া কহিল, আর এই এক হারামজাদী নষ্টার সাথী।

লোকে সমস্ত কারণ জলের মত বুঝিয়া মুখ টিপিয়া টিপিয়া হাসিতে লাগিল।

গ্রাম্য-জীবনের নাড়ীতে কয়দিন ইহার উত্তেজনা বেশ অনুভব করা গেল।

বাড়ীতে বাড়ীতে, দোকানে দোকানে, পদ্মরাণীর সহিত গুরুদেবের অনেকদিনের অনেক ব্যাপারের গুপ্তত্ত্ব প্রকাশ



বাইরে আলো—ভিতরে আঁধার

হইতে লাগিল, তাহার মুখরোচক নানা আলোচনা চলিতে লাগিল।

বহুদিন পর এবম্বিধ সুমধুর খাদ্য পাইয়া সকলে যেন বাঁচিয়া গেল। সন্ধ্যা বেলায় নিতাই দাসের চায়ের আড্ডায় বসিয়া, এই অতি আধুনিক রসাল ব্যাপার তাহাদের জীবনকে প্রাণময় ও মধুময় করিয়া দিল।

[৪]

কানাই মুখুয্যে হয় তো এই অপমান সহজেই হজম করিয়া যাইত, কিন্তু তাহা হইল না।

দোকানের মধ্যে চুপিসাড়ে পাঁচু দত্ত আসিয়া তাহার অতি কুৎসিত মুখখানাকে যথাসম্ভব করুণ করিয়া কহিল, বলি মুখুয্যে, এ হ'ল কি অ্যাঁ!—বেটা চাষার এত বড় স্পর্দ্ধা যে বামুনের ছেলের গায়ে হাত তোলে।

কানাইয়ের ভাই শম্ভু এতক্ষণ একমনে চা ছেঁকিতেছিল; দাদার দিকে এক কাপ চা ঠেলিয়া দিয়া বলিল, এর বিহিত করবই করব! যদি বিহিত না করি তবে বামুনের ছেলে নই—

সোৎসাহে এক কাপ চা টানিয়া লইয়া পাঁচু দত্ত কহিল, এই তো মরদের মত কথা। এর যদি কোন উপায় না হয়, তবে আমাদের মতন লোকের গাঁয়ে বাস অসম্ভব। এক কাজ করলে কেমন হয়? প্রেসিডেণ্ট বাবুর কাছে, একটা ডাইরী করে এলে কেমন হয়—

এতক্ষণে কানাই কথা কহিল, ও সবের দরকার নেই পাঁচু, কালকের সেই চোলাই মাল ক' বোতল আছে। বলি আছে তো— ব্যস্ আর কিছু দেখতে হবে না। পাঁচু দত্তের কানের কাছে মুখ লইয়া আসিয়া নিম্নস্বরে কানাই কহিল, রাত্রে ওর রান্নাঘরের মেঝে বোতল কটা আর কিছু সাজ-সরঞ্জাম পুঁতে রাখলেই কাজ হাঁসিল হবে। আর সকালে গিয়ে আবগারী দারোগাকে একটা খবর—ব্যস! আর কিছুটী করতে হবে না।

পাঁচু দত্ত তাহার ছাতলা পড়া লাল লাল দাঁতগুলো বাহির করিয়া হিঃ হিঃ করিয়া হাসিতে লাগিল।

অন্যদিনের চেয়ে আজ সন্ধ্যা হইতেই কানাই বাড়ী চলিয়া গেল।

বাড়ীতে তখন সন্ধ্যাদীপ জ্বালা হইয়াছে। তুলসীমূলে প্রদীপশিখাটী বাতাসের অত্যাচারে মৃদু মৃদু কাঁপিতেছে, ধুপ-ধুনার গন্ধে চতুর্দ্দিক সুমধুর হইয়া উঠিয়াছে। দূরে বনের ওধারে গোয়ালপাড়া হইতে শঙ্খের শব্দ ভাসিয়া আসিতেছে।

শীতের সন্ধ্যা। চারিদিকে ঘন কুয়াশা আর অন্ধকার। কানাই রান্নাঘরে উঁকি মারিয়া কহিল, খাবারের কতদূর, একটু তাড়াতাড়ি চাই। মাথার উপর ঘোমটা টানিয়া দিয়া বৌটী মৃদুস্বরে কহিল, এই হল বলে, হাত পা ধোও—

কানাই কোন কথা কহিল না, তাই একটু সাহস পাইয়া বৌটী কহিল, চা করে দেব কি, এই তো সন্ধ্যে? কর্কশ কণ্ঠে কানাই কহিল, এই তো সন্ধ্যে! তাতে তোমার কি? আমার ভাত এখনই চাই, ব্যস্।

প্রচণ্ড ধমকে বধূর মুখ ম্লান হইয়া গেল। বিবাহ হইবার পর হইতে স্বামীর নিকট কোনদিন কোন ভাল কথা শোনে নাই। কোনদিন এতটুকু স্নেহ বা সামান্য আদর-যত্ন পাইয়াছে কি না স্মরণ হয় না। তরুণ জীবনের অসংখ্য আশা-আকাঙ্ক্ষার সামান্যতমও পূর্ণ হয় নাই।

পিতৃগৃহে সকলের সহিত গল্প করিয়া, বই পড়িয়া, নানা খেলা করিয়া আমোদ-আহ্লাদের মাঝে কাটাইয়াছে। কিন্তু এখানে কিছুই নাই। কতদিন সন্ধ্যার পর তাহারা কয় বোনে মিলিয়া কত কবিতা সুর করিয়া একসঙ্গে আবৃত্তি করিয়াছে। স্কুল জীবনে ভাল আবৃত্তি আর গান গাহিতে পারে বলিয়া তাহার সুখ্যাতি ছিল। প্রতিবার সেই জন্য পুরস্কার পাইয়াছে। পিতৃগৃহে তাহার কত বই! রামায়ণ, মহাভারত, চয়নিকা আরও কত সুন্দর সুন্দর বই! কিন্তু এখানে বইয়ের নামগন্ধও নাই। তবুও শ্বশুরবাড়ীতে আসিবার সময় তাহার স্কুল-জীবনের সাফল্যের পুরস্কার, কত সুখস্মৃতি-জড়িত বইগুলিকে ভুলিয়া আসিতে পারে নাই।

কতদিন এই শ্বশুর বাড়ীতে, নিস্তব্ধ রাত্রে, একা একা আলো জ্বালাইয়া চয়নিকার কবিতা পড়িয়াছে। কতদিন তাহার স্বামী বাড়ী আসে নাই—নির্জ্জন ঘরে একা শুইয়া থাকিতে ভয় হইয়াছে। জানালা দিয়া বাহিরের নিস্তব্ধ প্রকৃতিকে বড় গম্ভীর, বড় ভয়াবহ মনে হইয়াছে। ধীরে ধীরে জানালা বন্ধ করিয়া, কোনমতে চোখ বুজিয়া শুইয়া থাকিতে থাকিতে একসময় ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। কতদিন ছোট ছোট ভাই-বোনদের কথা স্মরণ করিয়া, বাপ-মার কথা ভাবিয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিয়াছে। কিন্তু কেহ

দেখে নাই—কেহ তাহার ব্যথা বোঝে নাই। শুধু যখনই সময় পাইত তখনই বাক্স হইতে বইগুলি বাহির করিয়া পাতা উল্‌টাইতে উল্‌টাইতে, সেই পুরাতন জীবনে—সেই সুখময় স্কুল-জীবনের মাঝে ফিরিয়া যাইত।

পাড়া বেড়াইয়া শরৎ ঠাকরুণ উঠানে পা দিয়া বৌকে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া কহিলেন, বলি বাছা, সন্ধ্যেবেলায় আরাম করে দাঁড়িয়ে রয়েছ যে, কাজ নেই না কি? রান্না-টান্না হ'বে না না কি? ওঘরে আলো নিয়ে কে—কানু না কি রে?

ভিতর হইতে কানাই সাড়া দিয়া কহিল, আমি। শরৎ ঠাকরুণ রোয়াকের উপর উঠিয়া বলিলেন, হা রে, তোকে না কি ভূপতি চাষা মেরেছে। বেটার এত বড় সাহস, শূদ্র হয়ে বামনের ছেলের গায়ে হাত তুল্‌লো! তা ছাড়া তার গুরুদেবের গায়ে হাত দিল। এত বড় তার সাহস! শুনে রাখ, আমি যদি বামুনের মেয়ে হই, তবে সেই হাত খসে যাবে।

কানাই বিড়ি টানিতে টানিতে বাহিরে আসিয়া বলিল, বেটার বড়ই তেজ হয়েছে। ও তেজ আমি ভেঙ্গে দেব। তার-তরকারী বিক্রী ক'রে কিছু পয়সা হয়েছে কি না, তাই ধরাকে সরা ভাবছে। সব ঠিক করে দেব। এখন সকাল সকাল দুখানা রুটী করে দাও দেখি।

শরৎ ঠাকরুণ রান্নাঘরের দিকে যাইতে যাইতে কহিলেন, আবার কোথায় বেরুবি?

কানাই বলিল, কাজ আছে।

খাওয়া শেষ হইলে, ঘরের ভিতর হইতে কানাই গর্জ্জন করিয়া বলিল, কই, পান কই? ধুমসী মাগী, খালি খেতে জানে, একটা কাজ যদি হয়।

রান্নাঘর হইতে শরৎ ঠাকরুণ চিৎকার করিয়া বলিলেন, কি হ'ল রে?

—হ'বে আমার মাথা। তোমার যেমন গুণের বউ একটা পান দিতে একযুগ লাগে! দূর করে দাও।

বিনাইয়া বিনাইয়া শরৎ ঠাকরুণ কহিলেন, ওরে বাবা! আমি দূর করে দেবার কে? দাসী বাঁদি বই তো আমি আর রাজরাণী নই। তোমার গুণের নিধি বৌ তুমি বোঝ।

পান লইয়া ঘরের মধ্যে যাইতেই কানাই পাগলা কুকুরের মত দাঁত খিঁচাইয়া কহিল, এঃ, এতক্ষণে মহারাণী এলেন। আহা কান্না হচ্ছে, এক চড়ে কান্না থামিয়ে দেব। হাত ধরিয়া এক হাঁচকা টানে পান ছিনাইয়া লইয়া টর্চ্চ জ্বালাইতে জ্বালাইতে কানাই বাহির হইয়া গেল।

সেই অন্ধকারের মধ্যে দাঁড়াইয়া, বালিকা বধূ শুক্ল, অন্ধকারের দিকে তাকাইয়া রহিল। স্নেহহীন, দয়াহীন, মায়াহীন এক নিষ্করুণ জগৎ, বাহিরের গাঢ় অন্ধকারের মত তাহাকে যেন চারিদিক হইতে ঘিরিয়া ধরিয়াছে।

চারিদিক নিস্তব্ধ নিঃশব্দ। বাহিরে জমাট অন্ধকার, আকাশে অসংখ্য নক্ষত্র দপ্‌ দপ্‌ করিয়া জ্বলিতেছে। আশে-পাশের গাছপালাগুলি অন্ধকারের সহিত মিশিয়া একাকার হইয়া গিয়াছে। নির্ম্মলা ভাবিল—মা বোধ হয় এখন রাঁধছেন, ভাইয়েরা পড়ছে—গল্প করছে। আচ্ছা এই সব নক্ষত্রগুলো এখানেও যেমন দেখা যাচ্ছে আমাদের বাড়ী থেকেও তো তেমন এদের দেখা যাচ্ছে। হয় তো মা এই সময় আমার মতই আকাশের দিকে তাকিয়ে নক্ষত্রগুলোর দিকে চেয়ে আছেন। মা কি আর নিমুর কথা ভাবছেন? নির্ম্মলার দুই চোখ দিয়া দর দর ধারে জল নামিয়া আসিল।

(ক্রমশঃ)

পরমেশ্বর লাভ

একটী সর্ব্বপরিব্যাপ্ত অব্যক্ত তেজ-বীজের নাম পরমেশ্বর। এই তেজ-বীজ চরাচর সমস্ত জীবের মধ্যে সর্ব্বদা বিদ্যমান থাকে। এই তেজ-বীজ সমস্ত জীবের মধ্যে রহিয়াছে বলিয়াই জীবের জীবত্ব, চরের চরত্ব এবং অচরের অচরত্ব। এই তেজ-বীজের উন্মেষ ও বিকাশ সর্ব্বদাই শৃঙ্খলিত ও সর্ব্বপরিব্যাপ্ত একটী নিয়মের অধীন। যে শৃঙ্খলিত ও সর্ব্বপরিব্যাপ্ত নিয়মে উপরোক্ত 'তেজ-বীজের' উন্মেষ ও বিকাশ চরাচর সমস্ত জীবের মধ্যে সাধিত হইতেছে, সেই শৃঙ্খলিত ও সর্ব্বপরিব্যাপ্ত নিয়মকে প্রত্যক্ষ করাকে ঋষিগণ "পরমেশ্বর লাভ করা" বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন।

লোক-নৃত্যে নাট্যকলার প্রকৃতি

—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দাশ

(ঝুমুর নৃত্যের গান)

আধুনিক বাংলা নাট্য-সাহিত্যের ইতিহাসের মূলে পাশ্চাত্য প্রভাবই সর্ব্বাপেক্ষা বেশী, এবং ইহার উৎপত্তিও ঊনবিংশ শতকে। বাংলা নাট্য-সাহিত্যে দীনবন্ধু মিত্র মহাশয়ের "নীলদর্পণ"ই প্রথম নূতন আলোকপাত করে, এবং ইহার পর হইতেই বাংলা নাটকের প্রতি সাহিত্যিকদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। আধুনিক বাংলা নাট্যকলার কথা বাদ দিলে, বাংলার কোনও নিজস্ব নাট্যরীতি আছে কি না সবিশেষ বিবেচনার বিষয়।

বাংলার লোক-নৃত্য ও লোক-সঙ্গীতের ইতিহাসের অনুসন্ধান করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, পল্লীগ্রামের "পাঁচালী" শ্রেণীর লোক-সঙ্গীত খুব প্রাচীন। ত্রয়োদশ বা চতুর্দ্দশ শতাব্দী হইতে রচিত "শূন্যপুরাণ", "রামায়ণ", "মহাভারত", "শ্রীকৃষ্ণবিজয়", "পদ্মাপুরাণ", "চণ্ডীমঙ্গল" প্রভৃতি কাব্যে "পাঁচালী" শব্দের বহুল প্রচলন দৃষ্ট হয়। পাঁচটীর সমাহারে যাহার সৃষ্টি, (পঞ্চ+আলী, পঞ্চালী—পাঁচালী) তাহাই "পাঁচালীর" উৎপত্তি বলিয়া মনে হয়। অনেকের মতে সংস্কৃত নাট্য-সাহিত্যের "পঞ্চালিকা" (অর্থাৎ "পুতুল নাচ") হইতে "পাঁচালীর" উৎপত্তি। সে যাহাই হউক, পাঁচজনে মিলিয়াই পাঁচালী গাহিবার রীতি। পাঁচালী গাহিতে গেলেই ছড়া গাহিতে, সুর টানিতে, তাল দিতে, বাজাইতে ও নৃত্য করিতে, অন্ততঃ পাঁচজনের নাটকীয় রীতিতেই সঙ্গীত পূর্ণাঙ্গ হইয়া থাকে। সুতরাং বাংলার লোক-সঙ্গীতের পাঁচালীর মধ্যে নাট্যকলার আদি ইতিবৃত্ত কতক পরিমাণে অন্তর্নিহিত আছে বলিয়া বোধ হয়।

বাংলার কীর্ত্তন, বাউল, রামায়ণ, জারি, গাজন, গোপীচাঁদ, ঝুমুর প্রভৃতি লোক-সঙ্গীতের প্রধান উপাদান হইতেছে নৃত্য। মূল গায়ক গান করে, সহকারীদের কেহ সুর টানে, কেহ কেহ সখী সাজিয়া নৃত্য করে। উত্তর বঙ্গের গম্ভীরা নৃত্যে সন্ন্যাসী ঠাকুর গাজনের আবৃত্তি করেন, ভক্তদের কেহ শিব সাজিয়া, কেহ বা রূপকালী সাজিয়া ঢাকের তালে তালে নৃত্য করে। গোপীচাঁদের পাঁচালীও নানা সাজে সজ্জিত হইয়া গীত হয়। এই জাতীয় লোক-নৃত্যের ও লোক-সঙ্গীতের নাটকীয় ধারাই বাংলার নিজস্ব নাট্যকলারীতি।

বাংলার বিভিন্ন অঞ্চল হইতে যে সব লোক-নৃত্যের গান সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি, তাহাদের মধ্যে ঝুমুর নৃত্যের গানেই নাট্যকলার রূপ ও প্রকৃতি সর্ব্বাপেক্ষা বেশী সুস্পষ্ট ভাবে প্রকাশ পাইয়াছে। উত্তর বঙ্গের রাজসাহী, দিনাজপুর, মালদহ অঞ্চলে এবং দক্ষিণ বঙ্গের বীরভূম অঞ্চলে ঝুমুর নৃত্য প্রচলিত আছে। ঝুমুর-গান সমাজের তথাকথিত অবনত সম্প্রদায়ের লোকগণ কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত হয়। রাজসাহীর স্থান বিশেষে ঝুমুর গান মুসলমান কবিরাও গাহিয়া থাকে। বিবাহ, অন্নপ্রাশন প্রভৃতি সামাজিক উৎসবগুলিতে সাধারণতঃ ঝুমুর-গান গীত হয়। মূলগায়ক পায়ে নূপুর পরিয়া গায়কদের সম্মুখভাগে নৃত্য করিতে করিতে গান গায় এবং সহকারী গায়কগণ সহজ তালে নৃত্য করিতে থাকে। উত্তর বঙ্গের কোন কোনও ঝুমুর দলের মূল গায়িকা নারী। ঝুমুর-নৃত্যের বাদ্যযন্ত্র হইতেছে ঢোল ও বেহালা।

ঝুমুর গান সাধারণতঃ রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক সঙ্গীত। উত্তর বঙ্গের ঝুমুর গানে শ্রীকৃষ্ণের ব্রজলীলা বর্ণিত হইয়া থাকে। দক্ষিণ বঙ্গের ঝুমুর গানে শ্রীগৌরাঙ্গ লীলার বিষয়ও গীত হয়। ঝুমুর গানের কোনও প্রাচীন পুঁথিপত্র সংগ্রহ করা সম্ভব হয় নাই—উহা বংশপরম্পরায় মুখে মুখে প্রচলিত হইয়া আসিতেছে।

উত্তর বঙ্গের ঝুমুর নৃত্যের আনুষঙ্গিক "শ্রীকৃষ্ণের ব্রজলীলা" লোক-সঙ্গীত সম্পূর্ণ সংগ্রহ করা গিয়াছে। মূল গায়ক বা গায়িকা সম্পূর্ণ পালাটি গান করেন—একাকী সুবলের উক্তি, শ্রীকৃষ্ণের উক্তি, শ্রীরাধিকার উক্তি প্রভৃতি গাহিতে হয়।

আবিষ্কৃত "শ্রীকৃষ্ণের ব্রজলীলা" গীতি-কাব্যের কতক কতক অংশ উদ্ধৃত করিয়া, সম্পূর্ণ পালাটির আখ্যান মোটামুটি আলোচনা করিতে চেষ্টা করিব।

সুবল শ্রীকৃষ্ণের তাপিতাঙ্গ সুশীতল করিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণের গলায় চম্পক ফুলের মালা পরাইয়া দিলেন।

চম্পকের মালা পরিয়া শ্রীকৃষ্ণের বিরহ আরও বাড়িয়া গেল। তাই শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন—

চম্পকের হার পরাইলি কেনে
চম্পকবরণী রাধা উদয় হৈল মনে ॥
মালা গেঁথে অন্য ফুলে   কেন ভাই না দিলি গলে
চাঁপার ফুলে হিয়া জ্বলে যাতনা হয় পরাণে।
ওরে সুবল কি করিলি   বিষম বিপদ ঘটাইলি
বিরহানল জ্বেলে দিলি বাঁচিব কেমনে ॥
বিনে প্রাণাধিকার সঙ্গ   জীবন লীলা হইবে সাঙ্গ
থর থর কাঁপে অঙ্গ অনঙ্গের বাণে।

শ্রীকৃষ্ণের বিরহ অধিকতর বর্দ্ধিত দেখিয়া সুবলের চিত্ত অস্থির হইল। তখন সুবল বলিতেছেন—

ওরে কানাই বনমাঝে রাধা কোথা পাই।
গাছের ফল নয় যে তোরে তুলে দিব ভাই ॥
অসঙ্গত কথা শুনে   বড় দুঃখ হয়রে মনে
কুলবধূ দিনমানে কেমনে মিলাই।
জটিলা কুটিলার কাছে   রাধা আনিবার বাধা আছে
সেখানে গেলে মিছে আসিবে না ত রাই।
চম্পকের মালা পেয়ে   অধৈর্য্য ভাই একেবারে
ত্রিভঙ্গ তোর রঙ্গ হেরে পরাণে ডরাই ॥

ইহাতে কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের সান্ত্বনা হইতেছে না। শ্রীকৃষ্ণের বিরহ যন্ত্রণা কিছুতেই শান্ত হয় না। সুবল শ্রীকৃষ্ণের এতাদৃশ মানসিক দুর্দ্দশা দেখিয়া একটি বাছুর কোলে লইয়া জটিলার দ্বারে উপস্থিত হইলেন। জটিলা পরিশ্রান্ত সুবলকে বিশ্রামের জন্য শ্রীরাধিকার নিকট পাঠাইয়া দিলেন। শ্রীরাধিকা সুবলের নিকট শ্রীকৃষ্ণের কুশলবার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলেন। তখন সুবল বলিতেছেন—

শীঘ্রগতি বিপিনেতে চল গো রাধে।
রেখে এলাম বনে একা গোকুল চাঁদে ॥
তোমার বিরহে কানু   ধূলায় লোটায় কালতনু
দূরে ফেলে মোহন বেণু ধৈর্য্য না বাঁধে।
দশা হেরে প্রাণে ডরাই   পাছে ভাই কানাইকে হারাই
পরিচয় আর কি দিব রাই রাই বলে কাঁদে ॥
পড়ে আছে ধরণীতে   উঠে না গো কোন মতে
তাই তোমাদের নিতে এলাম তরাও বিপদে।

তদুত্তরে শ্রীরাধিকা বলিতেছেন—

কি কথা শুনালি সুবল মোরে।
জীবনকৃষ্ণ কষ্ট পায় এছার দাসীর তরে ॥
শ্যামাকে একা রেখে বনে   এখানে এলি কেমনে
বল দেখি কে সেখানে যতন করিবে তারে।
কি সমাচার দিলি এসে   গৃহেতে মন নাহি বসে
ধৈরয ধরিব কিসে ভাসি দুঃখনীরে ॥
ভেটিবারে রসরাজে   উপায় ত পাই না খুঁজে
জ্বলছে আগুণ বুকের মাঝে মরি গুমরে।
শাশুড়ী ননদী ঘরে কিরূপে যাব বাহিরে ॥

অতঃপর সুবল শ্রীকৃষ্ণের নিকট শ্রীরাধিকাকে পাঠাইবার ব্যবস্থা করেন। রাধিকা সুবলের বেশ ধারণ করিলেন এবং সুবল রাধিকার বেশে গৃহে রহিলেন। কবি বেশ বদলের দৃশ্য বর্ণনায় বলিতেছেন—

হায়রে ভাবের যাইরে বলিহারী।
সুবল বেশে কৃষ্ণ পাশে চলিল কিশোরী ॥
আজড়িয়ে নীল সাটী   কটীতে বাঁধিল কটী
বেণী খুলে উঁচী ঝুঁটী বাঁধে যতন করি।
পীনোন্নত পয়োধর গোপন করিবার তরে
বাহু দিলেক বক্ষোপরে ধরিল বাছুরী ॥
রাই সুবলে একই বর্ণ   অবয়ব নহে ভিন্ন
নয়ান বয়ান সমান চিহ্ন পৃথক বলিতে নারি।
রাধার বেশ করিয়ে ধারণ গৃহে সুবল রহিল এখন।

সুবল বেশে শ্রীরাধিকা শ্রীকৃষ্ণের নিকট উপস্থিত হইলেন। শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধিকাকে চিনিতে পারেন নাই। তাই শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন—

কেন সুবল হেরি তোরে একা।
কৈরে সঙ্গে বৃষভানু রাজার বালিকা ॥
চলিতে কি নাহি পারে   আসিছে কি ধীরে ধীরে
রেখে এলি কত দূরে ওরে জীবন সখা।
বুঝি কমলিনী এনে   লুকায়ে কি রাখিলি বনে
প্রাণ জুড়াই রাই দরশনে দেখা প্রাণাধিকা ॥
সুবলরে তোর করে ধরি   বলরে কোথায় প্রাণেশ্বরী
দে রে একবার হৃদে ধরি হৃদয় বিলাসিকা।

ইহার উত্তরে শ্রীরাধিকা বলিতেছেন—

প্রাণবঁধু ধৈরয ধর প্রাণে।
এস হে নাথ হৃদে ধরি ধূলায় পড়ে কেনে ॥
উঠ উঠ কাল শশী   আমি তোমার পদদাসী
গৃহ ত্যজি বনে আসি তোমার দরশনে।
আমি যে সুবল বেশে   এসেছি হে তব পাশে
সহজ রূপে দিবসে আসিব কেমনে ॥
আমার বেশে সুবলেরে   রাখিয়ে এসেছি ঘরে
এরূপ কৌশল তোমার তরে করেছি যতনে ॥

শ্রীকৃষ্ণের উক্তি।

পরিহাস আর করিস না ভাই মোরে।
একে অঙ্গ জর জর রাই-বিরহ-শরে ॥
এ সময় রহস্য নয়　　দ্বিগুণ আগুন জ্বলে হিয়ায়
আর যাতনা দিস্ না আমায় বিনয় করি তোরে।
তুই বলিস ভাই আমি রাধা,
দুঃখ কি তায় হয় সমাধা,
কথায় যদি হয় রে কাজ কি সুধাকরে ॥
বল দেখি ভাই সুধা পেলে,
পেট ভরে কি মুখের বোলে,
বারি পান না করিলে তৃষ্ণা যায় কি দূরে।
শুনরে সুবল স্বরূপ বচন,
ফুরাইল রাই-দরশন,
রাধা বলি ত্যজিব জীবন রাধাকুণ্ডতীরে ॥

শ্রীরাধিকার উক্তি—

প্রাণ-বঁধু পরিহাস না করি।
সুবল, নই আমি তোমার প্রেমাধিনী পিয়ারী ॥
বলি আমি স্বরূপ কথা　　কেন নাথ ভাব অন্যথা
ছদ্মরূপে এসাছি হেথা শুন বংশীধারী !
চিন্তামণি নাম ধর　　নিজদাসী চিনিতে নার
কি কারণে চিন্তা কর বুঝিতে না পারি ॥
উভয় অঙ্গ পরশনে　　আনন্দ ঘটিবে প্রাণে
হৃদয়-জ্বালা নিবারণে এস হৃদে ধরি।

অতঃপর রাধিকা-কৃষ্ণের আনন্দ-মিলন হইল। রাধিকা-কৃষ্ণের মিলন-দৃশ্য কবি বর্ণনা করিতেছেন—

রাধা গোবিন্দ আনন্দ মনে বিরাজিত একাসনে।
কানুর বামে বৃষভানুসুতা,
তমালে জড়ান কনকলতা,
ক্ষণপ্রভা নবঘনে ॥
আহা মরি মরি　　কি রূপ-মাধুরী
তুলনা নাহি ভুবনে ॥
কিশোরীর মিলন দেখে　　শুক-শারিগণ করিছে সুখে
প্রেমরাগ আলাপনে।
ময়ূর-ময়ূরী উচ্চ পুচ্ছ করি নাচিছে সময় জেনে ॥
কোকিল কুহরে মুকুল হেরে,
গুঞ্জরে ভ্রমর কমলোপরে,
মত্ত হয়ে মধু পানে।
গন্ধ-সমীরণ করিছে বহন বিলাস সুখ কারণে ॥
শ্রীরাধামাধব যুগল পদে
গোপীভাবে সুবিধানে।
রাধাকৃষ্ণ অন্তে হবে দৃষ্ট জিনিবে রবিনন্দনে।

আলোচ্য "শ্রীকৃষ্ণের ব্রজলীলা" গীতিকাব্যটীতে শ্রীকৃষ্ণ, সুবল, জটীলা, শ্রীরাধিকা প্রভৃতি পাত্র-পাত্রী রহিয়াছে। ইহাতে নাট্যকলার রূপ দিলে প্রত্যেক পাত্রের জন্য এক জন করিয়া অভিনেতা আবশ্যক হয়। কিন্তু ঝুমুর-নৃত্যের মূল গায়ক বা গায়িকা একাকী শ্রীকৃষ্ণ, সুবল, শ্রীরাধিকা প্রভৃতির উক্তিগুলি গাহিয়া থাকেন।

বিবাহ, অন্নপ্রাশন প্রভৃতি সামাজিক উৎসবের আনুষঙ্গিকরূপে সাংস্কৃতিক ক্রমধারা হিসাবে ঝুমুর-নৃত্যের গান প্রচলিত হইয়া আসিতেছে। কবিওয়ালাদের পাল্লা গাহিবার রীতি বা কবিওয়ালা সাহিত্যের প্রভাব ইহাতে দৃষ্ট হয় না। সুতরাং ঝুমুর-নৃত্যের গানের প্রাচীনত্ব বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নাই। তবে ইহা কত প্রাচীন সবিশেষ বিবেচ্য। বাংলা সাহিত্যের বৈষ্ণব প্রভাব-প্রসূত রাধাকৃষ্ণ-লীলা বা গৌরাঙ্গ-লীলা বর্ণনা করাই এই গীতিকাব্যের মুখ্য বিষয়। এই জন্য ইহা যে চৈতন্যের পরবর্ত্তী, তাহা নিঃসংশয়ে বলা যায়। ষোড়শ ও সপ্তদশ শতক হইতেছে বাংলা সাহিত্যে বৈষ্ণব পদাবলীর প্রাধান্য-যুগ। সুতরাং ঝুমুর-নৃত্যের গান বৈষ্ণব পদাবলী যুগের প্রভাব-পুষ্ট বলিয়া বোধ হয়।

কুলীন

—শ্রীধরণী ভট্টাচার্য্য

সকাল বেলাতেই শিরোমণি একটা কেলেঙ্কারী বাধাইয়া বসিল। ছোট আটচালার সামনেই হেলিয়া-পড়া কাঁটাল গাছটার গোড়ায় একটা প্রকাণ্ড নিমগাছের গুঁড়ি কোন্ মান্ধাতার আমল হইতে এযাবৎকাল সিংহাসনরূপে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। ওধারেও দুটি আমগাছের তলায় অনুরূপ দুটি বৃক্ষকাণ্ড স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে শাশ্বত হইয়া রহিয়াছে। অবিরত দেহের ঘর্ষণে তাহারা উজ্জ্বল ও মসৃণ হইয়া উঠিয়াছে।

পাড়ার যত বৃদ্ধের দল সকাল হইতে আরম্ভ করিয়া রাত্রি আটটা পর্য্যন্ত নানারকম খোসগল্পে ও মুখরোচক আলোচনায় স্থানটিকে মুখর করিয়া রাখে। তাহাদের বিস্ময়কর উদ্ভাবনী শক্তির পরিচয়ে,—পরচর্চ্চা, পরনিন্দা ও অহেতুক কুৎসা-রটনায় অদ্ভুত পারদর্শিতা দর্শনে গ্রামের সকলেই সর্ব্বদা স্তম্ভিত ও শঙ্কিত হইয়া থাকিত।

আটচালার পাশ দিয়া ডিষ্ট্রিক্টবোর্ডের কাঁচা রাস্তাটা বরাবর সড়ক পর্য্যন্ত চলিয়া গিয়াছে। গ্রামে কোন বাজার বসিত না, মাইল দেড়েক হাঁটিয়া ধর্ম্মদায় যাইয়া বাজার করিতে হইত। কিন্তু শিরোমণি সেই ঘটনার পর হইতে আর বাজারে যাইতে সাহস করিত না।

কাদু মেছুনীরও অবশ্য একটু দোষ ছিল। তিনকাল গিয়া এককালে ঠেকিলেও বয়সের চটক ছিল তাহার দেহে। তা এমনই বা কি বিস্ময় কি? তাহারও তো রক্ত-মাংসের শরীর!

কিছুদিন আগে শিরোমণির নামের সঙ্গে তাহার নামটা জড়াইয়া দিয়া কাহারা নাকি একটা কুৎসিত কথা রটাইয়া দিয়াছিল। যাক গে সে কথা, মন্দলোকে মন্দকথা বলিয়াই থাকে, তাহাতে শিরোমণির কান দিতে গেলে চলে না।

কিন্তু আজ যখন পাঁচজনের সামনে কাদু তাহার হাতখানা জমন করিয়া চাপিয়া ধরিল, তখন শিরোমণি রীতিমত অপমান বোধ করিল। এক ঝটকায় চুপড়ির ভিতর হইতে একমুঠা মাছশুদ্ধ হাতখানা ছাড়াইয়া লইয়া কাদুকে অশ্রাব্য ভাষায় গালি পাড়িতে লাগিল।

হাত ছাড়াইয়া লইতেই কাদু ভাঁড়ের মাছধোয়া জল লইয়া শিরোমণির নামাবলী-জড়ান গায়ের উপর ছিটাইয়া দিল। রাগে ক্ষিপ্ত হইয়া শিরোমণি কাদুর চুবড়িটা ধরিয়া একটা টান দিয়া মাছগুলা ফেলিয়া দিতে চেষ্টা করিল। কাদু রুখিয়া চুবড়িটার একটা ধার চাপিয়া ধরিল। ফলে কাদু বনাম শিরোমণিতে 'কক-ফাইট' লাগিয়া গেল।

এতক্ষণ ওধারের আমগাছটার তলায় বসিয়া তর্কচঞ্চু ও ন্যায়রত্ন দৃশ্যটা উপভোগ করিতেছিল।

"আহা কর কি, কর কি", বলিয়া ন্যায়রত্ন শিরোমণিকে একটা টান দিয়া একধারে সরাইয়া লইল। মুক্তকচ্ছ শিরোমণি পৈতাটা বেশ করিয়া হাতে জড়াইয়া শাপ দিতে দিতে প্রস্থান করিল।

পরদিন সকাল বেলায় পাঁজি হাতে লইয়া শিরোমণি দিন দেখিতেছিল। কুলীন ব্রাহ্মণ শিরোমণি এ পর্য্যন্ত মোট দেড়শত কুলীন কন্যার পাণিপীড়ন করিয়াছিল। তবে চিরা-চরিত প্রথানুযায়ী উক্ত পত্নীগুলী বারমাস তাহাদের পিত্রালয়েই থাকিয়া যাইত। প্রতি শ্বশুরালয়ে বৎসরে একবার করিয়া পদার্পণ করিয়া শিরোমণি তাহাদের কৃতার্থ করিত।

দিন ঠিক হইলে, পাশের মোটা খাতাখানা লইয়া শিরোমণি দেখিতে লাগিল। কবে এবং কোথায় সে বিবাহ করিয়া রাখিয়াছিল, এখানি তাহারই বর্ণ বা স্থানানুক্রমিক সূচিপত্র।

পরদিন ভোরে শিরোমণি আবশ্যকীয় জিনিসপত্র একখানি গামছায় বাঁধিয়া, খাতাখানি বগলে লইয়া শ্বশুরালয় প্রদক্ষিণে বাহির হইল। ভাটপাড়ায় আসিয়া যখন পঁহুছিল তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে।

রাস্তার মধ্যে খাতাখানি খুলিয়া পরবর্ত্তী শ্বশুরালয়ের নামটা দেখিয়া লইয়া, অক্রুর চাটুজ্জের বাড়ী আসিয়া উঠিল। শিরোমণি অক্রুর চাটুজ্জের সর্ব্বকনিষ্ঠা কন্যার পাণি-পীড়ন করিয়াছিল। অক্রুর চাটুজ্জে লোক মন্দ ছিলেন না,—

অনেক দর-কষাকষির পর পা' ধোয়ানো ইত্যাদি বাবদ তিনি শিরোমণিকে নগদ পঁচিশ টাকা ধরিয়া দিতে রাজি হইলেন। শিরোমণি কিন্তু পঁচিশ টাকায় কিছুতেই রাজি হয় না। তিরিশ টাকার এক পয়সা কমে কিছুতেই সে এখানে থাকিতে পারিবে না। চাটুজ্জেও যখন পঁচিশ টাকার এক আধলা বেশী দিতে রাজী হইলেন না, তখন শিরোমণি পোঁটলা-পুঁটলি বগলে লইয়া প্রস্থান করিতে উদ্যত হইল। নিরুপায় হইয়া চট্টোপাধ্যায়-গৃহিণী বাহিরে আসিয়া শিরোমণির একখানি হাত চাপিয়া ধরিলেন। অগত্যা শিরোমণি তখনকার জন্য রহিয়া গেল।

ভাঙা একখানি আরসী লইয়া কাদম্বরী ঝুঁকিয়া পড়িয়া চুল বাঁধিতেছিল, আর গুণ গুণ করিয়া চণ্ডীদাসের একখানি পদ আবৃত্তি করিতেছিল।

শতেক বরষ পরে বঁধুয়া মিলাল ঘরে,
রাধিকার অন্তরে উল্লাস
হারানিধি পাইনু বলি হৃদয়ে লইল তুলি
রাখিতে না সহে অবকাশ॥

আহারাদি চুকিয়া গেলে শিরোমণি চুপি চুপি ঘরে ঢুকিয়া, পোঁটলা ও খাতাখানি বগলে লইয়া, অন্ধকারে রাস্তায় আসিয়া দাঁড়াইল। পঁচিশ টাকায় থাকা চলে না—ধরা পড়িবার ভয়ে শিরোমণি ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিতে লাগিল।

প্রায় মাইল দেড়েক ছুটিয়া শিরোমণি হাঁফ ছাড়িয়া এক জায়গায় আসিয়া দাঁড়াইল। সামনেই একটা বাড়ীতে সানাই বাজিতেছে, বিবাহ আছে নিশ্চয়ই। শিরোমণি পায়ে পায়ে আগাইয়া গেল। বাড়ীর ভিতর ভীষণ গোলমাল চলিতেছিল। শিরোমণি ব্যাপার কি জানিবার জন্য ভিতরে ঢুকিয়া পড়িয়া বরযাত্রীদের মধ্যে মিশিয়া গেল। যাক, গোলমালে রাত্রিটা কাটিয়া যাইবে কোন রকমে।

কিছুক্ষণের মধ্যে ভিতরকার ব্যাপারটা বেশ পরিষ্কার হইয়া গেল। বরকর্ত্তার সঙ্গে কন্যাপক্ষের মাত্র কুড়িটি টাকা লইয়া তুমুল বচসা হইয়া গিয়াছে। বরযাত্রীরা সকলে বর তুলিয়া লইয়া প্রস্থান করিতে উদ্যত। এ দিকে বিবাহের লগ্ন বহিয়া যায়। কুলীনের মেয়ে—কুলীন না হইলে কিছুতেই বিবাহ হইতে পারে না। কিন্তু সারা গ্রাম খুঁজিলে এক ঘরও কুলীন পাওয়া যাইবে কি না সন্দেহ। সময়ও আর বড় বেশী নাই। মেয়ের মা ঘরের ভিতর পড়িয়া কাটা ছাগলের মত চীৎকার করিতেছিল।

শিরোমণির কোটরাগত চক্ষু দুটি কি জানি মুহূর্ত্তে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। কথায় কথায় একজনের কাছে নিজেকে কুলীন বলিয়া পরিচয় দিয়া বসিল। লোকটি আনন্দে চীৎকার করিয়া উঠিয়া হিড় হিড় করিয়া টানিতে টানিতে শিরোমণিকে একেবারে বিবাহ-মণ্ডপের নীচে আনিয়া দিল।

নগদ তিনশ' টাকা, তাহার উপর বরাভরণ ইত্যাদি করিয়া সেও না হক শ'দুই হইবে। লোভে শিরোমণির তখন নাচিতে ইচ্ছা করিতেছে।

হঠাৎ একটা অদ্ভুত কাণ্ড ঘটিয়া গেল। শিরোমণির বংশ-পরিচয় লইতে গিয়া পুরোহিত ভয়ানক চমকাইয়া বলিল, "কি বললেন? কাঞ্জরী বংশ? বিরূপাক্ষ আপনার নাম? খানাকালে বাড়ী তো? এ্যাঁ কি সর্ব্বনাশ"—

মুহূর্ত্তে সকলে মিলিয়া শিরোমণিকে পাঁজাকোলা করিয়া আসন হইতে তুলিয়া দিল। চারিদিকে একটা হৈ হৈ রব পড়িয়া গেল।

প্রায় বছর বিশেক আগে শিরোমণি এই বাড়ীতে একবার বিবাহ করিয়া গিয়াছিল। তারপর মাত্র একবার আসিয়া কি একটা পাওনা লইয়া বিবাদ বাধায় আর কখনও এ বাড়ীর ছায়াও মাড়ায় নাই। শিরোমণি নিজেও বেমালুম ভুলিয়া গিয়াছিল, আর দুর্ভাগ্যক্রমে তাহার খাতাটিতেও এই নামটা বাদ পড়িয়া গিয়াছিল। বিবাহের কনের মা যে এমন নির্ম্মম ভাবে তাহার বিবাহিতা স্ত্রী হইয়া দাঁড়াইবে এ কথা কে কবে ভাবিয়াছিল।

যাহাই হউক মেয়ে যখন তাহারই, আর সম্প্রদান যখন তাহারই করা উচিত, তখন মাত্র কুড়িটি টাকার জন্য বর ফিরিয়া যাইবে ইহা হইতে পারে না। বরযাত্রীরা বর লইয়া তখনও বোধ হয় বেশী দূর যায় নাই। যেমন করিয়াই হউক, হাতে পায়ে ধরিয়া উহাদের ফিরাইতে হইবে।

একটু আগে শিরোমণি যে পথ ধরিয়া ছুটিয়া আসিয়াছিল এখন সেই পথ ধরিয়াই ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিতে লাগিল। চাদরের খুঁটে বাঁধা অক্রূর চাটুজ্জের দেওয়া টাকা কয়টা তখন পিঠের উপর ঢক্ ঢক্ করিয়া দুলিয়া দুলিয়া শিরোমণিকে যেন প্রহার করিতেছিল।

বনে-জঙ্গলে-প্রান্তরে

—শ্রীমেঘেন্দ্রলাল রায়

মানবের প্রকৃতি রহস্যময়—এই রহস্যময় মনোরাজ্যে প্রবেশ করিলে নানারূপ প্রহেলিকাপূর্ণ মনোবৃত্তির পরিচয় পাওয়া যায়। বাস্তব জীবনে এমন অনেক ব্যক্তি দৃষ্ট হয়, যাহারা এই রহস্যময় মনোবৃত্তির অধিকারী। আমাদের পরম বন্ধু বলাই চাঁদকে পূর্ব্বোক্ত রহস্যময় মনোবৃত্তির অধিকারী-দিগের শ্রেণীভুক্ত করা যায়। এই রহস্যময় মনোবৃত্তিকে সাধারণ ভাষায় "বাতিক" বলা হয়। বলাইয়ের সে বাতিক হইতেছে বনে, জঙ্গলে, প্রান্তরে রাত্রি যাপন করিবার অসাধারণ স্পৃহা ও অদম্য উৎসাহ।

বলাই বিশেষ কৃতিত্বের সহিত মেডিকাল কলেজ হইতে এম্-বি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে ও স্বর্ণপদকও লাভ করিয়াছে। এই সহরে এম্-বি-ডিগ্রীধারী চিকিৎসকের প্রাচুর্য্য থাকা সত্ত্বেও অতি অল্প সময়ের মধ্যেই চিকিৎসায় সে বিশেষ খ্যাতিলাভ করিয়াছে; সুতরাং সে যে বুদ্ধিমান্ সে বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকিতে পারে না। শুধু চিকিৎসা-শাস্ত্রে নহে, সাধারণ বিষয়েও যে তাহার বুদ্ধি অন্যের তুলনায় কম তাহাও বলা কঠিন। তাহার তীক্ষ্ণ দৃষ্টির মধ্যে বুদ্ধির দীপ্তি প্রতিভাত। মুখ-মণ্ডলের মধ্যে যেন কারুণ্য সারল্য জল্ জল্ করিতেছে।

বলাইয়ের চিকিৎসা করা ব্যবসা। সে যে বাটীর বাহিরে রাত্রি যাপন করে তাহাও তাহার দৈনন্দিন জীবন হইতে প্রমাণ করা যায় না। এখন প্রশ্ন হইতেছে যে, কোথা হইতে তাহার এই রহস্যময় মনোবৃত্তি আসিয়া উপস্থিত হইল।

পূর্ব্বপুরুষের ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে তাহার বংশে যে কেহ দস্যু বা হত্যাকারী ছিলেন, তাহারও নির্দ্দেশ পাওয়া যায় না, বরং তাহার পূর্ব্বপুরুষেরা বিদ্বান, বুদ্ধিমান ও চরিত্রবান ছিলেন এইরূপই পরিচয় পাওয়া যায়। তবে এ বাতিক বলাই কোথা হইতে অর্জ্জন করিল? সে শুধু ডাক্তার নয়, কবি ও সাহিত্যিক।

বলাই বুদ্ধিমান হইলেও একথা অস্বীকার করা কঠিন যে, তাহার মানসিক বুদ্ধিবৃত্তির মধ্যে কোথায় যেন সামঞ্জস্যের অভাব আছে, উন্মুক্ত বন-জঙ্গল-প্রান্তর সম্বন্ধে তাহার একটা বাতিক দৃষ্ট হয়—যাহাকে ইংরাজীতে বলে 'Mania'। যদি বলাই চুরুট মুখে দিয়া এক কাপ চা লইয়া বসিল ও যদি সেই সঙ্গে বনে, জঙ্গলে, প্রান্তরে রাত্রি যাপন করিবার মাধুর্য্য ও মনোহারিত্ব বর্ণনা করিবার একজন সমজদার বন্ধু পাইল সে আর সে স্থান হইতে নড়িবে না—ভাসিয়া যাউক তাহার প্র্যাকটিস্, ক্ষতি নাই।

বলাইচাঁদের এরূপ বাতিক থাকুক, আমাদের ইহাতে কোন ক্ষতিবৃদ্ধি নাই। কিন্তু ইহার সহিত আর একটী বাতিক ছিল যাহা দস্তুরমত ভীতিপ্রদ।

সেটী হইতেছে বনে, জঙ্গলে, প্রান্তরে রাত্রি যাপনের বিমল আনন্দ বন্ধু-বান্ধব ও স্ত্রী-পুত্রকে উপভোগ করাইবার অদম্য চেষ্টা। স্ত্রী-পুত্র অনেকবার তাহার অনুরোধ রক্ষা করিয়াছেন, বর্ত্তমানে ঘোর অবাধ্য; বন্ধুবান্ধবের মধ্যে উৎসাহী বন্ধুবর্গের অভাব লক্ষ্য করা কঠিন নহে।

বলাইয়ের অন্তরঙ্গ বন্ধুদের মধ্যে আমার ন্যায় অভাজনের সহিত তাহার এই বিষয়ে নানান তর্ক-বিতর্ক হইত। তাহার কারণ আমি তাহার প্রস্তাব লইয়া ঠাট্টা-বিদ্রূপ না করিয়া অন্য উপায় অবলম্বন করিতাম। সে উপায়টী এই যে, বলাই যতই বনে, জঙ্গলে, প্রান্তরে রাত্রি যাপনের কী আনন্দ তাহা সোৎসাহে আমাকে বুঝাইতে চেষ্টা করিত, আমি তাহার উত্তরে কেবল তাহাকে মোটরগাড়ী, ষ্টীমার বা রেল-পথে আরাম দায়ক ভ্রমণের কথা বলিতাম। বলাই অনেক সময়ে বলিত, "নিপুদা, তুমি শিকারী, তোমার মুখে এই কথা?" বলাই বুঝিত না যে শিকার ব্যতীত শিকারীর নিকটে বনে, জঙ্গলে, প্রান্তরে রাত্রি যাপন করার মাধুর্য্য থাকিতে পারে না। বলাইয়ের সাহিত্যিক মন শুদ্ধ নিজে আনন্দ পাইয়া সন্তুষ্ট নহে, বন্ধু বান্ধব ও আত্মীয়-স্বজনও সে আনন্দের অংশ গ্রহণ করে, ইহাই তাহার ইচ্ছা। তাহার আনন্দ অপরকে দান করিবার উদ্ধত আগ্রহ বোধ হয় তাহাকে বাতিকগ্রস্তের শ্রেণীভুক্ত করিয়াছে।

এক সন্ধ্যায় ক্লাবে ব্রিজের টেবিলে বসিয়া বলাই সোৎসাহে বলিতেছে, "আমায় একবার মন্দার-পর্ব্বতে রাত্রি কাটাইতে হবে"। এই সময়ে আমি আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি। আমাকে দেখিয়া বলাই সোৎসাহে বলিয়া উঠিল, "নিপুদা বৌদীতে মান্দার-পর্ব্বতে রাত কাটাতে হবে, কি ব'লো? আমি বলিলাম, "ও বাবা—অনেক সিঁড়ি ভেঙ্গে ওপরে ওঠা সে কী সোজা কথা!" বলাই কিছুমাত্র না

দমিয়া বলিল, "ও কিছু নয়—তিন ঘণ্টায় উঠবো। না হয় বিশ্রাম নেবো মাঝে মাঝে"। ফণী বলিল, "বলাই তোর সব কী উদ্ভট খেয়াল ব'লতো, বৌসী পাহাড়ে রাত কাটাবি!" আমি প্রস্তাব করিলাম, "তার চেয়ে বলাইয়ের মোটর গাড়ীতে সব চ'লো বৌসীতে, সমস্তদিন বেড়িয়ে হৈ চৈ ক'রে রাত্তিরে ডাক্‌বাংলাতে লুচি-মাংস খেয়ে সকালে ফিরে আসা—কি বলো?" সকলে সমস্বরে বলিয়া উঠিল, "Capital—What an idea! নিপুদা না হ'লে কী জমে? আমরা সকলেই রাজী।" বলাই উত্তেজিত হইয়া বলিল, "What an idea! এ তো মহা গন্তময় পরিবেষ্টনীর মধ্যে নিজেকে পিঞ্জরাবদ্ধ করা।" আমি হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "কী কবিত্বময় আবহাওয়ার মধ্যে আমাদের মুক্তি দিতে চাও, সেটা সবিস্তারে বর্ণনা ক'রো।"

বলাই সোৎসাহে বলিল, "মোটরগাড়ীও নয়, রেলগাড়ীও নয়, মোটরবাসও নয়, পদব্রজেও নয়"। ফণী হাসিয়া বলিল, "তবে কি এয়ারোপ্লেন?" বলাই বলিল, "গরুর গাড়ীতে তিন দিনে মন্দার পর্বতে যাব—প্রত্যেক পল্লীতে গিয়ে ঝোপে, ঝাড়ে, জঙ্গলে রাত কাটাবো।" ফণী হাসিয়া বলিল, "তোর মাথা খারাপ হয়েছে—গরুর গাড়ীতে তিন দিনে বৌসীতে যাবি?" বলাই আমার দিকে এমন করুণ ভাবে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল যে, কিছু না বলিলে নেহাৎ অকরুণের ন্যায় ব্যবহার করা হয়। অগত্যা বলিলাম, "Not a bad idea। বলাই, তোমার খাতিরে আমরা না হয় তিন রাত্রি পল্লীতে কাটালাম; কিন্তু একটু অদল বদল করতে হবে ভাই—গরুর গাড়ীর যায়গায় মোটরগাড়ী, আর পল্লীতে জঙ্গল-ঝোপ-ঝাড়ের স্থানে ডাক্ বাংলাতে অবস্থান ও সু-আহার। তুমি গভীর রাত্রি পর্য্যন্ত বনে, জঙ্গলে, প্রান্তরে রাত্রি কাটানোর যে বিমল আনন্দ উপভোগ করেছ, তাই সবিস্তারে তোমার মধুর কবিত্বপূর্ণ ভাষায় আমাদের কাছে বর্ণনা ক'রো, আমরা বিমুগ্ধ বিস্ময়ে সেই বিবৃতি শুন্‌বো—কি ব'লো?" রমেশ বলিল, "বেশ ভাল আইডিয়া এতেও আমরা রাজী।" বলাই দুঃখিত হইয়া বলিল, "what a pity! তোমরা আমার কথা কেউ বুঝ্‌তে পার্‌ছো না, কেউ এর Psychology ধরতে পারছো না।" ফণী বলিল, "Psychologyর কথা আগেই তো বলেছি, তোর মাথা খারাপ হয়েছে।" বলাই চটিয়া বলিল, "সেটা আমি ভাল বুঝি—আমি ডাক্তার।" সকলে নীরব, কেহই এই হৃদয়বান ডাক্তারকে চটাইতে প্রস্তুত ছিলেন না। আমি হাসিয়া ফণীকে বলিলাম, "কেবল মামলার নথী দেখে দেখে সাহিত্যটা কি বর্জ্জন করেছো। মনে নেই Shakspeare কি বলেছেন, "The Lunatic, the lover and poet are in imagenation all compact।" তোমরা সকলেই ভুলে যাচ্ছ যে, বলাই শুধু ডাক্তার নয়, ও মস্ত কবি ও বড় সাহিত্যিক। সেক্‌সপিয়ার অত বড়ো কবি ও নাট্যকার হয়ে যদি কবিদের উন্মাদের দলে শ্রেণীভুক্ত করে থাকেন, তখন বলাই যখন কবি তখন বলাইও উন্মাদ—এতে বলাইয়ের রাগ করা উচিত হবে না।" স্থানীয় কলেজের ন্যায় শাস্ত্রের অধ্যাপক বিপিন বলিলেন, "এই রকম Syllogismটা দাঁড়ায় আর কি। All poets are insane; Balai is poet, Balai is insane।" বলাই বলিল, "হাঁ ভাই আমি insane, কিন্তু তোমরা কি জীবন উপভোগ করবে না? কেউ প্রোফেসরী, কেউ ডেপুটীগিরি, কেউ ওকালতী ক'রে ক্লাবে ব্রিজ্ খেল্‌বে—এই জীবন? ঝোপে, ঝাড়ে, জঙ্গলে, প্রান্তরে রাত কাটাতে না পার্‌লে যে জীবন অর্দ্ধেক উপভোগ করাই হ'ল না, সেটা কেউ বুঝ্‌তে পার্‌লে না। যা হোক নিপুদার আমার সঙ্গে মতের মিল না হ'তে পারে কিন্তু কখনও সে আমাকে বাতিকগ্রস্ত বা পাগল ব'লে না—তা হ'লে তোমরা কেউ যাবে না তো?" ফণী বলিল, "গরুর গাড়ীতে তিন দিনে বৌসী যেতে আমরা কেউ রাজী নই, তা তুই আমাদের যতই অরসিক বল্ না কেন।" বলাই আর কথা না বলিয়া উঠিয়া প্রস্থান করিতেছিল আমি বলাইয়ের হাত ধরিয়া বলিলাম, "আহা চ'টো কেন? এই ঠাণ্ডার দিনে এক কাপ গরম চা খেয়ে যাও—চুরুট আছে, না দেবো?" বলাই বলিল, "Many thanks নিপুদা, চুরুট আছে কিন্তু বাড়ীতে কাজ আছে—এখনই যেতে হবে।"

বলাই শীঘ্রই বাটী ফিরিল, শয়ন ঘরে প্রবেশ করিয়া ষ্টেথস্কোপ সজোরে পকেট হইতে ফেলিয়া শয্যায় আশ্রয় গ্রহণ করিল। স্ত্রী বিভা আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কী গো এখনই শুয়ে পড়লে যে, কী হয়েছে, অসুখ করেছে?" বলাই চটিয়া বলিল, "কিছু হয় নি তুমি এখন যাও।" বিভার

ভাগ্যে এরূপ সাদর সম্ভাষণ অনেকবার ঘটিয়াছে। বিভা বলিলেন, "যাচ্ছি, কিন্তু কি খাবে রাত্তিরে, রুটী, না লুচি, না পরোটা?" বলাই আরও উষ্ণ হইয়া বলিল, "আমি আজ কিছু খাব না—তোমরা আমার শত্রু, জগতে সকলে আমার শত্রু, কেউ আমাকে বুঝ্‌লে না নিপুদা ছাড়া।" স্ত্রী হাসিয়া কাছে আসিয়া শয্যার উপরে উপবেশন করিয়া স্বামীর মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিলেন, "ক্লাবে কেউ বুঝি গরুর গাড়ীতে মন্দারে যেতে রাজী হল না, না?" বলাই বলিল, "একথা তুমি কি রকম করে জানলে? আমি তো তোমার বলিনি।" বিভা বলিলেন, "কাল রাত্তিরে তুমি স্বপ্নে এই সব কথা বলছিলে—আমি ঘুম ভাঙিয়ে দিলাম।" বলাই চিন্তিত হইয়া বলিল, "বলো কি স্বপ্নে কথা বলতে আরম্ভ করেছি? ফণীর কথাটা তো একেবারে মিথ্যা নয় তা হলে।" বিভা বলিলেন, যাক ও কথা ভেবে কি হবে। আমি খোকাকে নিয়ে গরুর গাড়ী করে তোমার সঙ্গে যাব মন্দারে।" বলাই এই কথা শুনিয়া আনন্দে স্ত্রীকে আলিঙ্গন করিয়া বলিল, "যাবে, সত্যি বলছো যাবে?" স্ত্রী হাসিয়া বলিলেন, "হ্যাঁ গো হ্যাঁ, এখন দয়া করে বলো কি খাবে।" বলাই সোৎসাহে বলিল, "লুচি।"

২

কি একটা ছুটী পড়িয়াছে, এক রাত্রে বলাই হঠাৎ আমার বাটীতে উপস্থিত। সে সারল্যের অবতার। আমি তাহার দরদী বন্ধু। সে অকপটে স্ত্রীর কাপট্যের কথা সবিস্তারে বর্ণনা করিল—তাহার স্ত্রীর শরীর বেশ ভাল অথচ মন্দারে গরুর গাড়ীতে যাইবার প্রস্তাব উত্থাপন করিলেই তাঁহার মাথা ঘোরে ও বলাইকে ঘন ঘন ব্লাড্‌ প্রেসার দেখিতে হয়। আমি বলিলাম, "স্ত্রীরা প্রায় সকলেই ঐ রকম বলাই, আমি যখন শিকারে যেতাম আমার গৃহিণী রাগ করে ছ' মাস বাপের বাড়ী বসেছিলেন। আর ব'লো কেন? তিনি বিশ্বাস কর্ত্তেন না যে, আমি শিকারে যাই বা শিকার কর্ত্তে পারি, তিনি অনেক অন্য কিছু ভেবে বসেছিলেন, সাংসারিক অশান্তি থেকে নিস্তার পাবার জন্য বহুকাল শিকার ছেড়ে দিয়েছি।"

বলাই বলিল, "তবে তো মুস্কিল দেখছি। আচ্ছা নিপু দা, চ'লো গঙ্গার ওপারে। তোমার ঘর থেকে দেখতে পাচ্ছো না, ঐযে যেখানে নৌকার আলো দেখা যাচ্ছে, ওরই পাশে চারটে খোড়োঘর আছে। ঐখানেই রাত কাটাবে। বেশী ঝোপজঙ্গল না থাকলেও উন্মুক্ত প্রান্তর অসীম নীরবতা আর এই জ্যোৎস্না রাত কেমন? কাল সকালে খেয়ে-দেয়ে নিয়ে বৈকালে চা ও রাত্তিরে ফার্ষ্ট ক্লাস মাটন্—অবশ্য আমিই রাঁধবো, পোলাও, ঘন দুধ ও খাজা সব ঐ বালুর তটেই খাওয়া যাবে, কি ব'লো?"

বলাই বুদ্ধিমান লোক, সে আমাকে ঠিক স্থানেই আঘাত করিয়াছে। আমি যে দারুণ ভোজন-বিলাসী লোক তাহা সে জানিত। বলাইয়ের ন্যায় এ প্রদেশে এতো ভালো মাটন্ রন্ধন করিতে আর কেহ পারে কি না সন্দেহ। বনে, জঙ্গলে, প্রান্তরে রাত্রি যাপনের বিশেষ আকর্ষণ আমার না থাকিলেও যে এইরূপ মনোরম খাদ্য-দ্রব্যের প্রতি আমার আসক্তি প্রবল ভাবে বিদ্যমান, তাহা সে জানিত। আমি রাজী হইলাম। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "কে কে যাইবেন?" বলাই বলিল, "অমর বাবু কলেক্টারের খুব উৎসাহ, তিনি বন্দুক নিয়ে যাবেন, ভোলানাথ সেও রাইফেল্ নেবে। তুমিও বন্দুক নিয়ে যাবে। ফণী, পরেশ, রমেশ অনেকেই যাবে। তাদেরও রাইফেল্ আছে।" আমি বলিলাম, "শিকারের নাম ক'রলে সব যাবে। এই বার থেকে এই tactics (কৌশল) অবলম্বন করো—" তুমিও তো পাখী-টাখী মারো। বলাই হাসিয়া ব'লল, "আমার aim বড় খারাপ।" আমি বলিলাম, "That does not matter, আচ্ছা আমি নিশ্চয়ই যাব।" বলাই প্রস্থান করিল।

স্ত্রীকে এই সংবাদ জ্ঞাপন করিতেই তিনি কিছুমাত্র সন্তুষ্ট না হইয়া আমার গার্জ্জিয়ান্ রূপে সম্মুখে দাঁড়াইয়া বলিলেন, "বয়সটা বেড়েই যাচ্ছে, কমছে না, সেটা ভেবো। এই ঠাণ্ডায় হিমে গঙ্গার ধারে খোড়োঘরে রাত কাটাবে কি করে?" আমি বলিলাম, "না হৈ, যদি অসুবিধা দেখি রাত্তিরেই ডিঙীতে ফিরে আসবো—ডিঙী তো থাকবেই, মাল্লাকে বলে দেবো।" এই কথাতে প্রিয়ার মুখমণ্ডলে প্রাবৃটের যে ঘনকৃষ্ণ মেঘরাশি আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা যেন অকস্মাৎ শরতের মেঘের ন্যায় বিলীন হইয়া গেল। তিনি সহাস্যে বলিলেন, "অসুবিধা হয় চ'লে এসো।" আমি বলিলাম, "নিশ্চয়ই।"

প্রভাতে আমার বাটীতে ঘোর কলরব। চাকরকে বলিলাম, বন্দুক বাহির করিতে। বন্দুক লইয়া দেখি নলে প্রচুর ময়লা জমিয়াছে, তাহা অতি সাবধানতার সহিত পরিষ্কার করিলাম। তৎপরে দেখিলাম ভরা টোটা একটীও নাই। টোটার কল লইয়া বসিয়া গেলাম—টোটা তৈয়ারী করিতে। বাটীর সম্মুখে একটি ডালে বক ও সন্নিকটস্থ আর একটি ডালে অন্য কি পাখী বসিয়াছিল দেখিলাম। অনেক দিন বন্দুক ছুঁড়ি নাই, হাতের টীপ পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত বকের সন্নিকটস্থ ডালে যে পাখী বসিয়াছিল, তাহার প্রতি অনেকক্ষণ লক্ষ্য করিয়া গুলী ছুঁড়িলাম, কিন্তু দুঃখের বিষয় অন্য ডালে যে বক বসিয়াছিল, তাহা আমার গুলীতে নিহত হইল। বলা বাহুল্য যে, আমার স্ত্রী, পুত্র, কন্যা এই প্রক্রিয়া দেখিতেছিলেন, কারণ এ-রূপ অঘটন আমার বাটীতে ইতিপূর্ব্বে ঘটে নাই। জ্যেষ্ঠ পুত্র বাদল পিতার বন্দুকচালনার অপূর্ব্ব সাফল্যে গৌরব অনুভব করিল। আমি আর কিছু না বলিয়া বকটীকে গঙ্গার জলে ভাসাইয়া দিতে বলিলাম। কন্যা মীনার আনন্দের সীমা নাই। স্বামীর বন্দুক চালনার অদ্ভুত কৃতিত্ব দেখিয়া 'স্বামীর গরবে গরবিণী' স্ত্রীর মুখমণ্ডল হাস্যোজ্জ্বল। এক বককে বন্দুকের গুলিতে আন্দাজী হত্যা করিয়া বাড়ীতে মুহূর্ত্তের মধ্যে এমন উচ্চাসন পাওয়া যায়, তাহা পূর্ব্বে জানিতাম না। মনে মনে বলাইকে ধন্যবাদ দিলাম।

বড় মোটা ওভারকোট, মোটা র‍্যাগ্, প্রকাণ্ড পাশ-বালিশ, মাথার বালিশ, গড়গড়া, প্রাইমাস ষ্টোভ, ভাল চা, বিলাতী কনডেনস্ড্ দিক, একটা পেট্রোমাক্স ল্যাম্প ও এক খানা পুস্তক নৌকাতে পাঠাইবার ব্যবস্থা হইল। বাদল বলিল, "বাবা ক্যাম্প্ চেয়ার নিলেন না?" আমি বলিলাম, "ঠিক বলেছিস ওটা বাসুকে বল নৌকাতে দেবে।" আমার স্ত্রী হাসিয়া বলিলেন, "সাধে কি আমার শ্বশুর ব'লতেন যে তাঁর বড় ছেলে কোথায় যখন যান বা আসেন মনে হয় যেন মতিলাল নেহরু কোথাও যাচ্ছেন বা আসছেন, এতো লটবহর।"

৩

বেলা একটার সময় দুইটী নৌকা আমার বাটীর ঘাট হইতে ও তিনটি নৌকা অমরবাবুর ঘাট হইতে ছাড়িল। গঙ্গাবক্ষে পাল তুলিয়া তরী চলিয়েছে। গঙ্গার তটের মাঝে মাঝে বিস্তর চর পড়িয়াছে, সেই চরের উপরে সরিষার হরিৎ ক্ষেত্রের উপর দিয়া ঢেউ বহিয়া যাইতেছে, দূরে বালুর সমুদ্র অন্তহীন। অমরবাবুর সহিত বলাই, হেম ও নিতাই ছিল। বলাই বলিল, "দেখ্ হেম, ঐ খোড়ো ঘরের একটু দূরে চাষীদের একটা পল্লী আছে, সেই পল্লীর মধ্যে গিয়ে গোটাকতক গাছে hammock খাটিয়ে ফেলবো।" হেম জিজ্ঞাসা করিল, "কটা hammock এনেছিস্।" বলাই বলিল, "চারটে।" জেলার কলেক্টার প্রৌঢ় অমরনাথ বলিলেন, "বলাই, What an idea, Hammock? আমি তাতে ঝুলতে দুলতে প'ড়বো।" নিতাই বলিল, "বলাই দা, আচ্ছা ঐ বালুর তটের কিছু দূরে, যেখানে গঙ্গার জল এসে আটকে রয়েছে, ওরই কাছে মাটিতে গর্ত্ত ক'রে গাছের পাতা দিয়ে ঢেকে তার মধ্যে শুয়োরের জন্য রাত্তিরে বসে থাকলে হয় না?" বলাই বলিল, "Not a bad idea, কিন্তু মাটীতে গর্ত্ত করে তা আবার পাতা দিয়ে ঢেকে—দাঃ বড্ড গদ্যময় prosaic।" এই প্রকার কথোপকথনের মধ্য দিয়া নৌকা সব আসিয়া উপস্থিত হইল কবিত্বময় কুটীরের নিকটে। দিক্‌চক্রবালের সীমান্তে কুয়াশায় আবৃত জামাল-পুরের গিরি-শৃঙ্গের মধ্যে দূরে সূর্য্যদেব অস্তাচলগামী

সকলের জিনিষ-পত্র সব বালুতটে আসিয়া উপস্থিত হইল। এই জনশূন্য নদীতটে আসবাব-পত্র সহ অপ্রত্যাশিত জনসমাগম লক্ষ্য করিয়া অনেকে ভাবিতে পারিতেন যে, মহাত্মার ইচ্ছানুযায়ী এইবারে কংগ্রেসের অধিবেশন এই স্থানে হইবে। বর্ত্তমান জনসমাগম হয়তো সেই জাতীয় অধি-বেশনের অগ্রদূত।

চা'র উপকরণ প্রায় সকলেরই সঙ্গে আছে। বালুর তটে বসিয়া ডিমভাজা পাউরুটী, জিলাপী ও সন্দেশের সহিত চা পানের পর, কে কে বনে জঙ্গলে ঝোপের মধ্যে রাত্রিতে অবস্থান করিবেন তাহা স্থিরীকৃত হইল। কে কে রাত্রে নেহাৎ অ-কবির ন্যায় র‍্যাগ্ দ্বারা দেহকে আবৃত করিয়া কুটীরে অবস্থান করিবেন তাহাও ঠিক হইল—বলা নিষ্প্রয়োজন যে চারিটী খোড়ো ঘর প্রায় ৪টী বাংলোতে পরিণত হইয়াছে অমর বাবু স্থানীয় কলেক্টর সাহেবের শুভাগমনে। প্রত্যেক ঘরেতেই তক্তাপোষ, খাটিয়া ইত্যাদি পাতা হইয়াছে। অবশ্য

বেশীর ভাগ লোক কুটীরেই রাত্রি যাপনের ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। দেখিতে দেখিতে সন্ধ্যার অন্ধকার ক্রমশঃ ঘনায়মান হইয়া রাত্রিতে পরিণত হইল।

রাত্রি সমাগত দেখিয়া বন্ধুবর্গের মধ্যে যাঁহারা আমার সঙ্গীতের অনুরাগী তাঁহারা সকলে আসিয়া জুটিলেন। নিতাই বলিল, "গান না হ'লে কি আসর জমে।" হেম বলিল, 'নিপু দা হারমনিয়ম নিশ্চয়ই আনো নি।" আমি বলিলাম, 'না"। হেম বলিল, "আমি তা আগেই জানতাম তুমি একটি নম্বর ওয়ান্। আমি এনেছি— বাস্তবিকই গান না হ'লে জমে না"—

আমি উত্তরে বলিলাম, "তোমরা যা বল্‌লে সবই ঠিক। কিন্তু তোমাদের কথা শুনে George Eliot এর সেই কথাটা মনে পড়ছে—you are both right and both wrong। হেম জিজ্ঞাসা করিল "Wrong কিসে?" তখনই বলিলাম, "Wrong কিসে তা বোঝানোর দরকার আছে কি? বলাই প্রায় পনেরো সের মাটন্ কড়াইয়ে চড়িয়ে কাঠের উনুনের সাম্‌নে ব্যাত্যাবিক্ষুব্ধ সমুদ্রের মাঝে জীর্ণ-তরী নিয়ে দোদুল্যমান, আর আমরা তাকে দোলায়মান অবস্থায় ছেড়ে দিয়ে সঙ্গীতচর্চ্চা কর্ব্বো, এটা কি ভাল দেখাবে?" হেম বলিল, "নিপু দা এই কথা? এর উত্তর সাহিত্যসম্রাট্ বঙ্কিমচন্দ্র দিয়ে গিয়েছেন"। আমি হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম "কি বলেছেন বঙ্কিম বাবু?" হেম বলিল, "কপালকুণ্ডলায় এত লোক থাকতে নবকুমারই কাঠ কাট্‌তে গেল কেন? যখন এই প্রশ্ন উঠেছে, তখন বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন যে, জগতে কতকগুলো লোক আসে পরের কাঠ কাট্‌তে, আর পরের কাঠ কেটেই তারা চলে যায়—নবকুমার সেই শ্রেণীর লোক। আমাদের বলাই ও সেই দলের লোক, কি বলো?" আমি বলিলাম, "সাহিত্য-সম্রাট্ যা উত্তর দিয়েছেন তার পরে আর আমি কি বল্‌বো—বড় দমিয়ে দিয়েছিস হেম—"

এই সময়ে বলাই হাঁপাইতে হাঁপাইতে আসিয়া বলিল, "নিপু দা বড্ড ভুল হয়ে গিয়েছে, পোলাওয়ের জাফ্রান আর মাটনের মোগলাই কোর্ম্মার কিস্‌মিস্ আনতে ভুল হয়ে গিয়েছে—এখন উপায় কি? মালী বেটাকে খুঁজে পাচ্ছিনে, বেটা কোথায় ব'সে গাঁজা টান্‌ছে তার ঠিক নেই।" আমি বলিলাম, "আমার নৌকার মাঝিটাকে ডাকো তো।" বলাই সোৎসাহে বলিল "তোমার নৌকা আছে এপারে?" আমি বলিলাম, "নৌকা আছে বৈকি, গিন্নির হুকুম, রাত্তিরে ফিরে যাবো।" বলাই মাঝিকে ডাকিয়া আনিল, জাফ্রান ও কিস্‌মিস্ গঙ্গার ধারে, সলিলের দোকান হইতে আনিতে বলিলাম। এমন সময়ে কলেক্টার অমর নাথ ব্যস্ত ভাবে প্রবেশ করিলেন। বলাই জিজ্ঞাসা করিল "কি ব্যাপার অমর দা?" অমর নাথ বলিলেন, "প্রায় দু'মাইল দূরে একটা ছোটখাট জঙ্গল পেয়েছি, ভিতরে খানিকটা পরিষ্কার আছে—আমগাছ ও কাঁঠালগাছও আছে, সেই গাছের নিবিড় পাতার মধ্যে তিনটে hammock খাটিয়ে এসেছি। এখন পেট্রোমাক্সের আলো দরকার—ফণী বলিল, "আমার ছোট পেট্রোমাক্সটা জ্বেলে দিয়েছে নিয়ে যান।" অমর নাথ বলিলেন," এখন কথা হচ্ছে কে কে hammock এ শোবে। স্থির হইল ফণী, অমর বাবু ও বলাই। অমর নাথ বলিলেন, "তাহ'লে আমি চল্‌লাম—Excuse me নিপু দা আমার গান ভাল লাগে না— আঃ চাপরাশী সেটা কোথায় গেল?" চাপরাশী আসিলে অমর নাথ তাহাকে সঙ্গে লইয়া পেট্রোমাক্স, আমার বালিশ, র‍্যাগ ও ভূদেব বাবুর পারিবারিক প্রবন্ধ লইয়া অগ্রসর হইলেন।

কলিকাতা হইতে আগত নামজাদা 'হুক্ ব্রেকার' ঝোপে জঙ্গলে রাত্রিযাপন করিবার বিশেষ উৎসাহী পরেশ বলিল, "গান না হ'লে কি জমে— গভীর জঙ্গলে রাত কাটাতে কাটাতে যখন সাঁওতালদের বাঁশী শুনি কি চমৎকার।" বলাই আনন্দের আতিশয্যে পরেশকে জড়াইয়া বলিল," তুই বলিস্ নে ভাই, ক্ষেপে যাবো—কি সুন্দর, আমার আজও মনে পড়ে, তখন সবে 'প্র্যাক্‌টিস্' আরম্ভ করেছি, তখন (luggage) লাগেজ ছিল না।" নিতাই বলিল, "লাগেজ কি?" বলাই উত্তর দিল, "স্ত্রী—লাগেজ ছাড়া আর স্ত্রীকে কি বলা যাইতে পারে?' সকলে হাসিয়া উঠিল। বলাই বলিয়া যাইতেছে, "দুমকার কাছে গভীর জঙ্গলে একটা ঝোপের কাছে মাচার উপরে ছোট ঘর তৈরী ক'রে শুয়ে আছি, পাশে আর একটা মাচাতে পাঞ্জাবী ইনজিনিয়ার প্রীতম্। রাত্তির অনেক হয়েছে, পূর্ণিমার চাঁদ জ্যোৎস্নায় ধরাতল ভাসিয়ে দিয়েছে—যেমন বন্যার জলে চারিদিক ভেসে গেলে, যে-দিকে তাকাই সেই দিকেই জল থৈ থৈ কর্চ্ছে, তেমনি সেই রাত্তিরে যে-দিকে

তাকাই সেই দিকেই জ্যোৎস্না থৈ-থৈ কর্চ্ছে — সেই জ্যোৎস্নার বন্যায়, পর্ব্বত-প্রান্তর বন-ঝোপ-জঙ্গল সব ডুবে গিয়েছিল — আমি একলা সেই ছোট্ট ঘরের উন্মুক্ত স্থান দিয়ে সেই অপূর্ব্ব জ্যোৎস্না প্লাবন, মৃদু মারুত হিল্লোলে সেই কৌমুদী-তরঙ্গলীলা অবাক হয়ে দেখছিলাম। নিলুদা, এই সময়ে সাঁওতালদের পল্লী থেকে বেজে উঠলো সাঁওতালদের বাঁশী—আমি মুগ্ধ হয়ে শুনলাম। আকাশ কাঁপিয়ে, কানন-পর্ব্বত কাঁপিয়ে, আমাকে কাঁপিয়ে মধুর-তীব্র স্বরে প্রাণ অস্থির করে বাঁশী বাজতে লাগলো — বাঁশী উঁচু সুর থেকে আরো উঁচু সুরে বাজতে লাগলো। সেই বাঁশীর ধ্বনি 'উদ্‌ভ্রান্ত প্রেমের' 'টোরী রাগিনী'র চেয়ে মিষ্ট। মন্দিরাভিমুখী বিমলার সঙ্গীত অপেক্ষাও মিষ্ট, চন্দ্রশেখর গিরিতে ম্যানফ্রেড শ্রুত বংশীধ্বনি অপেক্ষা মধুর, যমুনাতীরে বসন্ত সমীরে শ্রীকৃষ্ণের মুরলী ধ্বনি অপেক্ষাও মধুর লেগেছিল পরেশ—" আমি বলিলাম, "ফণী, বলাই সত্যিই বড় কবি—বলাই, 'হ্যামলেট' নাটকে কবি-গুরু সেক্সপিয়র মানুষকে বাঁশী বলেছেন, মনে আছে যেখানে হ্যামলেটের সঙ্গে বয়স্যদের কথাবার্ত্তা হচ্ছে।" বলাই বলিল, "হ্যাঁ মনে আছে—যা হোক নিপুদাই আমায় যা একটু বোঝে।" তৎপরে হঠাৎ বলাই বলিয়া উঠিল, "By Jove, দেখ মাংস চড়িয়ে কবিত্ব কর্চ্ছি সেকথা ভুলেই গিয়েছি, যাই, যাই," বলাই প্রস্থান করিল।

ফণী বলিল, "দেখ নিলুদা, তোমরা অর্থাৎ তুমি আর বলাই এক জায়গায় জুটলেই—তা ক্লাবেই হোক বা বালুর ওপরেই হোক—স্থানটাকে সাহিত্য পরিষদের প্রবন্ধ আলোচনার সভা ক'রে তোল আমার এতে বিশেষ আপত্তি আছে, যাক, এখন গান গাও।" হেম বলিল, "ভাই একটা ভাল বেহাগ খাম্বাজ গা না।" আমি বলিলাম, "আমি ইমন-কল্যাণ গাইব ভেবেছি—পরে গাইব এখন।" তপকৃষ্ণ বলিল, "ইমন-কল্যাণ কেন বাবা, মীরাবাঈয়ের একটা ভজনই গা না।" বিপিন বলিল, "একটা রামপ্রসাদীই হোক না বাবা।" এই সময়ে বলাই আসিয়া আবার উপস্থিত হইয়াছে। সে বলিল, "কি গাচ্ছ নিলুদা, সেই ভৈরবীটা গাও—পতিতোদ্ধারিণী গঙ্গে—দ্বিজেন্দ্রলালের অমর গান।" নিতাই বলিল, "না রাত্তিরে কি ভৈরবী গায়।" হেম বলিল, "তবে একটা মালকোষই গা।" এই সময়ে স্থানীয় 'বারে'র বড় উকীল, ভোলানাথ প্রায় ৬ ফিট লম্বা, প্রকাণ্ড গোপ ও বড় বড় চোখ লইয়া উত্তেজিতভাবে প্রবেশ করিয়া বলিলেন, "দেখ্ নিপু, যদি তুই রাত্তিরে মালকোষ গাস তো হারমণিয়াম এক্ষুণি আমি গঙ্গার জলে ভাসিয়ে দেবো।" আমি বলিলাম, "ভোলা, তোর রাগের তো আমি কোন কারণ খুঁজে পাচ্ছি না। ভৈরবী বা রামকেলী-ভৈরবী বা মালকোষ রাত্তিরে গাইলে যে মহাভারত অশুদ্ধ হয়, এ-ধারণা আমার নেই—আমি এ গোঁড়ামীর প্রশ্রয় দি না।" ভোলানাথ বলিল, "না না, তা নয়, কাশীতে মস্ত গাইয়ে হীরু রাত্তিরে মালকোষ গাচ্ছিল, অনেক গাইয়ে মানা করলে সে শুনলে না—সে গান শেষ করবার পর চতুর্দ্দিকে ভূত-প্রেত দেখতে আরম্ভ করলে—তার পর অজ্ঞান হয়ে গেল ও মুখ থেকে ফেনা উঠতে লাগলো—সকালে সে মারা গেল, না—না—" আমি বলিলাম, "কৈ আমি তো এ রকম কথা কখনও শুনি নি।" সকলেই শুনিয়া অবাক। বলাই বলিল, "না, না নিপুদা, মালকোষ গেও না—we cannot afford to lose you." নিতাই বলিল, "তুমি ডাক্তার হয়ে এই কথা ব'লছো?" বলাই বলিল, "হ্যাঁ ভারী ডাক্তার আমরা, পেটের বেদনা আমার ক'লকাতার সব ডাক্তার মিলে ভাল করতে পারলে না; এক যোগী মাথায় হাত দিয়ে প্রার্থনা করলে ও পেটে ছাই ঘসে দিলে—সাত বছর হয়ে গেল ভাই, পেটের বেদনা আর হয় না। ডাক্তার, ডাক্তার—যাই দেখি গে পোলাওয়ের আঁকুনীর জল হ'ল কি না।" বলাই পুনরায় প্রস্থান করিল।

গান এর রাগিনীর নানাপ্রকার ফরমাসের পর ঠিক করিলাম চণ্ডীদাসের পদাবলী হইতে দুইটী কীর্ত্তন গাই—যদিও মোগলাই কোর্ম্মা ও পোলাওয়ের গন্ধের মধ্যে কীর্ত্তন ঠিক জমিবে কি না, সে বিষয়ে সন্দেহ ছিল। সকলেই কীর্ত্তন শুনিতে সম্মত হইল। কীর্ত্তন সহজে আবেশ আনে বাঙ্গালীর মনে। বাংলার সরস মাটীর সহিত কীর্ত্তনের নিবিড় সম্বন্ধ বর্ত্তমান— গান খুব জমিল।

৪

গভীর রাত্রে বলাইয়ের রন্ধনকার্য্য সম্পন্ন হইল। বলা বাহুল্য, পোলাও মাংস খুব ভাল হইয়াছিল, ঘন দুগ্ধের সহিত প্রথম শ্রেণীর খাজা তাহাও মনোরম। আহারের কার্য্য

শেষ হইলে প্রত্যেকে তাঁহার স্থিরীকৃত স্থানে শয্যার আশ্রয় গ্রহণ করিল। বলাই অমরনাথের সহিত প্রস্থান করিয়াছে।

কিছুক্ষণ পরেই খেড়ো ঘরের পার্শ্বে শ্মশান-বিহারী কুকুর ও শৃগালের মধ্যে বিরাট দ্বন্দ্ব-যুদ্ধের সূচনা লক্ষ্য করা গেল। যাঁহারা এই সব খেড়ো ঘরে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে ভীতির উদ্রেক হইল। নরেন শেষকালে বিরক্ত হইয়া বলিল, "নিপুদা, বেশ তোফা পাশবালিশ নিয়ে নাক ডাকাচ্ছ, ওদিকে দেখছ না বাইরে দস্তুরমত যুদ্ধ বেধে গিয়েছে, একটা fire কর না।" আমি বলিলাম "বেশ ভাল করে ঘুমোও না, যদি নেহাৎ কাছে আসে তখন দেখা যাবে"।

স্থানীয় দুইজন উকীল রমেশ ও যতীন কবিত্ব করিয়া আমার নৌকার মধ্যে শয়ন করিয়াছিলেন। তখন প্রায় রাত্রি দুইটা হইবে উভয়েই নৌকা ছাড়িয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিয়া একেবারে আমার নিকটে উপস্থিত।

রমেশ হাঁপাইতে হাঁপাইতে আসিয়া বলিল, "নিপু দা, নৌকায় হারিকেন লণ্ঠন উল্টে গিয়েছে, কে নৌকাকে ভয়ানক দোলাচ্ছে—তোমার মাল্লার দেখা নেই—কিছু বুঝ্‌তে পাচ্ছি নে।" আমি গম্ভীরভাবে বলিলাম, "ও কিছু নয় ও ঢিবি ভূত। গঙ্গার ধারে বিশেষতঃ শ্মশানের কাছে ঢিবি ভূতের ওরকম অত্যাচার সহ্য কর্ত্তে হয়। দু' চারবার নৌকা উল্টোতে চেষ্টা করবে কিন্তু পারবে না, ওরা আর কিছু করবে না।" রমেশ ও যতীন উভয়েই আশ্চর্য্য হইয়া বলিল, "ঢিবি ভূত?" আমি বলিলাম, "ঢিবি ভূত কি না দেখ।" তাহারা সত্যই দেখিল যে চড়ার উপর হইতে প্রকাণ্ড ঢিবির ন্যায় চারিটি ঢিবি নড়িয়া গঙ্গার জলে অদৃশ্য হইল। নরেন বিস্মিত হইয়া বলিল, "বাবা! ঢিবি ভূত আছে তাত জানতাম না।" যতীন বলিল, "না নিপু দা, তোমার কাছেই আমরা শোব।" আমি বলিলাম, "ভাগ্যিস বলাইয়ের সঙ্গে মন্দার পর্ব্বতে রাত কাটাতে যাও নি—সময়ে অসময়ে এক আধটা বাঘ বেরিয়ে প'ড়লে কী কর্ত্তে; যাও নৌকাতে গিয়ে শুয়ে পড়ো। কোন ভয় নেই হারিকেন লণ্ঠনটা হুকে ঝুলিয়ে রেখো। একটু না হয় দুল্‌তে দুল্‌তে ঘুমোবে, তাতে ভয় কী?" রমেশ জিজ্ঞাসা করিল, "ঢিবি ভূত কী ভাই?" আমি হাসিয়া বলিলাম, "কচ্ছপ—কচ্ছপ।" নরেন বলিল, "ঐ ঢিবিগুলো কচ্ছপ?" আমি বলিলাম, "হ্যাঁ গো হ্যাঁ, যতীন দেখ যদি ওরা বেশী গোলমাল করে দাঁড় নিয়ে জলে দুই একবার শব্দ কর, পালিয়ে যাবে যাও।" তাহারা নৌকায় ফিরিয়া গেল।

নিদ্রায় পুনর্ব্বার অভিভূত হইয়াছি। তখন রাত্রি প্রায় চারিটা—কুটীরের মধ্যে ঘোর কলরব। ফণী, অমরবাবু ও বলাই হ্যামক্ হইতে অবতরণ করিয়া কুটীরে পদার্পণ করিয়াছেন। অমরনাথ ভাল শিকারী,—ব্যাঘ্র ও ভল্লুকের চর্ম্ম সুশোভিত করিয়া গৃহের ঐশ্বর্য্য বৃদ্ধি করিয়াছে। তিনি আসিয়া শিকারের সব বন্দোবস্ত করিলেন। অমরবাবু নিজে এক দলের নেতা ও ভোলানাথ আর এক দলের নেতা। অমরনাথ অনেক ময়লা কাপড়, জামা ও পাগড়ীর কাপড় বাহির করিতেই ভোলানাথ হাসিয়াছিল। অমরনাথ বলিলেন, "ভোলানাথ বাবু যখন আমার কার্য্য-কলাপ দেখে হেসেছেন তখন কিছু বলা দরকার। আপনারা সকলেই বোধ হয় ইতিপূর্ব্বে শিকার ক'র্‌তে এসেছেন তবুও ভূমিকা হিসাবে কিছু বলা প্রয়োজন,—এই যে ময়লা কাপড়-জামা, পাগ্‌ড়ীর ময়লা কাপড় যা দেখে ভোলানাথ বাবু হেসেছিলেন, এই সব এখন আপনাদের পর্‌তে হবে। ঐ জলার কাছে চড়ায় বসে বা চখাচখী আমাদের পরনে এই সব দেখলে চাষী ভেবে উড়ে পালাবে না।" ফণী চটিয়াছে, সে বলিল, "আমার শিকারে যাবার দরকার নেই, আমি ও সব ময়লা কাপড়-চোপড় পরতে পারব না।" ময়লা কাপড় পরিধানের প্রস্তাবে শিকারীর দলের মধ্যে পাখী শিকারের নিমিত্ত মোট তিন জন (অমরবাবু ব্যতীত) প্রস্তুত হইল—বলাই, পরেশ ও নিতাই। আর নরজন জ্ঞাপন করিল যে, তাহারা কুমারের সন্ধানে যাইবে।

অমরনাথ আমায় জিজ্ঞাসা করিলে আমি জানাইলাম, "এ যাত্রা আমায় ক্ষমা করবেন অমরবাবু, আমি এখন প্রায় বৃদ্ধতে পৌঁছেছি—Superannuated ব'লেও ধ'রতে পারেন।" বলাই বলিল, "সে কী হয় নিপু দা, তুমি যাবে না—" আমি অনেক বুঝাইয়া বলাইকে শান্ত করিলাম।

অমরনাথ এদিকে শিকারের দল যাত্রা করাইবার উদ্যোগ করিতেছেন। সকলেই বেশ চাষী সাজিয়াছেন। অমরনাথ, বলাই, পরেশ ও নিতাইকে দেখিয়া সোৎসাহে বলিলেন "বাঃ বেশ ময়লা কাপড় সব পরা হয়েছে—Beautiful make-

up !" ইহার পরই তিনি নিজে উবু হইয়া বালুর চরে হামাগুড়ি দিতে আরম্ভ করিয়া বলিলেন, "এই রকম করে সকলে উবু হয়ে বালুর চরে হামাগুড়ি দিন। সঙ্গে সঙ্গে বলাই, পরেশ ও নিতাই উবু হইয়া হামাগুড়ি দিতে আরম্ভ করিল। অমরনাথ উঠিয়া বলিলেন, "Go on বলাই—পরেশ বাবুর বেশ হচ্ছে—নিতাইবাবু আর একটু নীচু হন।" অমরনাথ পুনর্ব্বার নীচু হইয়া হামাগুড়ি দিয়া দেখাইলেন; নিতাই আরও নীচু হইয়া চলিয়াছে। অমরনাথ সোল্লাসে বলিলেন, "That's the way !"

আমার এই দৃশ্য দেখিয়া হাসি পাইল। পরেশ একজন বড় ষ্টক্ ব্রোকার, বলাই একজন জাঁদরেল ডাক্তার, অমরনাথ জেলার কলেক্টর ও নিতাই একজন নামজাদা অধ্যাপক। ইহারা সব হামাগুড়ি দিয়া চলিয়াছেন। আর এই অমরনাথেরই তের বৎসরের পুত্র গোপাল তাহার কনিষ্ঠা আড়াই বৎসরের ভগ্নী মিমিকে পিঠে করিয়া বাহিরের ঘরে হামাগুড়ি দিয়াছিল বলিয়া, আমার সম্মুখে, পিতা কর্ত্তৃক কী বিষম প্রহৃত হইয়াছিল! অমরনাথ বলিয়াছিলেন, "ধেড়ে ছেলের বোনকে পীঠে করে হামাগুড়ি দিয়ে বেড়ান মোটেই স্বাভাবিক নয়, তোর একটু লজ্জা করে না?" কিন্তু তাঁহার নিজের আজ কী অবস্থা।

আমি চিন্তা করিলাম যে বলাইকে লোকে দোষ দিয়া থাকে যে সে বাতিকগ্রস্ত, কিন্তু ইঁহাদের কী অবস্থা? ইহাঁদের বাতিক কী কিছু কম?

অমরনাথ পুনর্ব্বার বলিলেন, "এইবারে সব উঠুন—Get up। অমরনাথ পুনর্ব্বার আদেশ দিলেন, "Get ready, এবারে মুখে, হাতে, পায়ে সরষের তেল মাখুন বেশ চপচপে ক'রে; এর কারণ রাত্রি প্রভাত হবার আগেই আমাদের ঝোপের মধ্যে গিয়ে চুপ করে ব'সে থাকতে হবে, তা নইলে হামাগুড়ি দেওয়ার পরিধি আরও বেড়ে যাবে। সেখানে দুর্দ্দান্ত মশা—এই সরষের তেলই আমাদের রক্ষা করবে।"

শিকারীর দল রাত্রি চারিটার সময় বহির্গত হইলেন, আমরা দুই তিনজন পুনর্ব্বার শয্যার ক্রোড়ে আশ্রয় গ্রহণ করিলাম। প্রভাতে কুটীর পরিত্যাগ করিয়া গঙ্গার তটে বায়ু সেবন করিয়া চা পানের উদ্যোগ করিতেছি, দূরে বিভিন্ন দিক্ হইতে বন্দুক চালনার শব্দ পাইলাম। বুঝিলাম শিকার সজোরে চলিয়াছে।

এই রূপে প্রায় দুই ঘণ্টা কাটিয়াছে। আমি বন্ধুবর্গ ও পাচক ব্রাহ্মণের সাহায্যে যাহাতে শিকারীরা ফিরিয়া আসিলে শীঘ্রই আহার করিতে সক্ষম হ'ন তাহার ব্যবস্থা করিতেছিলাম। বিশেষ কিছু নয় খিচুড়ী, আলু ও বাঁধাকপির ডালনা, বেগুন ভাজা, জিলাপী ও ভাল দধি।

মশুরীর ডালের খিচুড়ী কী রকম দাঁড়াইল তাহা দেখিতেছি, বন্ধু তপঃকৃষ্ণ আসিয়া সংবাদ দিলেন যে কুটীরের নিকটে বেঁকের কাছে বড় বড় রাজ হাঁসের ন্যায় আকার দুইটী পাখী—ঠোঁট দুইটী লাল, ওজন প্রত্যেকটির প্রায় পাঁচ সের। আমি উত্তেজিত হইয়া বলিলাম, "বলো কী—লালসর? ওরকম রাজহাঁস তো এদিকে পাওয়া যায় না—ও রকম রাজহাঁস ড্যাল্টনগঞ্জে মুডাট বোটে চড়ে। অনেক দিন আগে মেরেছিলাম—চ'লো তো।" বন্দুক লইয়া চলিলাম। গিয়া দেখি সত্য সত্যই "লালসর।" আমি আর বিশেষ লক্ষ্য না করিয়া দুইটির মাঝামাঝি গুলী ছাড়িলাম। ভগবানের কৃপায় একটি পড়িল ও আর একটির পা এমন ভাবে কাদায় পুঁতিয়া গিয়াছে যে সে আর উঠিতে পারিতেছে না, তখন আরো নিকটে গিয়া তাহাকেও গুলী করিলাম। রাজহাঁস দুইটীকে ডোবা হইতে আনিতে আনন্দের আতিশয্যে তপঃকৃষ্ণ লম্ফ প্রদান করিতেই ডোবার মধ্যে তাহার শরীরের অর্দ্ধেক কর্দ্দমে নিমজ্জিত হইল। তখন চাষীর সাহায্যে তাহাকে অতি কষ্টে এই বিপদ হইতে উদ্ধার করিয়া মাল্লার সাহায্যে হাঁস দুটীকে কুটীরের মধ্যে আনিলাম।

তপকৃষ্ণ মনের আনন্দে পুনর্ব্বার চা করিল। চা তৈয়ারী করিতে তপঃকৃষ্ণ অদ্বিতীয়। এতোই ভাল চা তৈয়ারী করিয়াছিল যে আমি মনের আনন্দে ভৈরবীতে ধরিলাম, "বিভব সম্পদ চাহি না প্রিয়ে, প্রাতে উঠে পাই যেন এক পেয়ালা চা।"—

কিছুক্ষণ পরেই কুম্ভীর শিকারের দলের আবির্ভাব হইল। ভোলানাথ বলিল, "যতো সব ভীরুর দল coward—এদের নিয়ে কুমীর শিকার চলে? কুমীর বুলেট খেয়ে রেগে এসে জোরে নৌকার দাঁড় কামড়ে ধরেছে—তা তো ধর্‌বেই। নৌকা উল্টে যাবে এই ভয়েই সব গেলেন। আমি রাইফেল চালাবো কী? এদের শান্ত কর্‌তে কর্‌তে কুমীর পালিয়ে গেল। Dead shot ছিল 'Coward' সব—"

কিছুক্ষণ পরেই অমরনাথের দল প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। অমরনাথ বলিলেন, "বলাই সব মাটী করে দিয়েছে—এমন বেমক্কা বন্দুক ছুড়লো যে সব চাঁহা উড়ে গেল, তারপর চখা চখী মারতে গেলাম সেখানেও নিতাই বাদ সাধ্‌লে—Hopeless."

সকলেরই মুখে নিরাশার চিহ্ন। আমি হাসিয়া বলিলাম, "ভয় নেই এ বুড়ো দুটো হাঁস মেরেছে—খিচুড়ীর সঙ্গে জমবে ভাল। বলাই লেগে যাও।" অমরনাথ হাঁস দেখিয়া লাফাইয়া উঠিয়াছেন তিনি সোৎসাহে বলিলেন, "লাল সর—লাল সর Very strange, নিপু দা, finishএ মেরে দিলে—Grand!"

আহারাদি সম্পন্ন করিতে প্রায় বেলা একটা বাজিল নিতাই, অমরনাথ, ভোলানাথ সকলেই বলিলেন, "যাহোক একটা রাত কী সুন্দর কাটলো ঝোপে, ঝাড়ে, প্রান্তরে—"

আমার মনে হইল কী করিয়া এই সব পদস্থ সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক শুভ্র মিথ্যাকথা বিনা দ্বিধায় উচ্চারণ করিলেন, "একটা রাত্রি কী সুন্দরভাবে কেটেছে।" শিকারের ব্যর্থতায় প্রত্যেকের মুখে বিরক্তি ও বিষাদের চিহ্ন বিদ্যমান। মশার কামড়, রাত্রি জাগরণের জন্য বদনমণ্ডলে পরিশ্রান্ত হইবার ভাব জল্ জল্ করা সত্ত্বেও তাঁহারা বলিতেছেন যে রাত্রি সুন্দরভাবে কাটিয়াছে।

প্রত্যেক ছুটীতে বিশেষ স্থান পরিদর্শনের জন্য কলিকাতা হইতে অন্যান্য স্থানে, সহরবাসী বায়ু পরিবর্ত্তন হিসাবে গমন করিয়া থাকেন,—তাহা নিতান্ত প্রয়োজন। যান্ত্রিক সভ্যতার কেন্দ্র কলিকাতার বায়ু বিশুদ্ধ থাকিতে পারে না সেই কারণে বায়ু পরিবর্ত্তন বিশেষ প্রয়োজন। কিন্তু ইহা ব্যতীত এই পরিভ্রমণের আর একটী দিক আছে।

আমি এক সময়ে রেল কোম্পানীর বিবৃতি লিখিতাম, সেই অভিজ্ঞতায় আমি উত্তমরূপেই জ্ঞাত আছি যে, কী রূপে তিলকে তাল করিয়া স্থানের মনোহারিত্ব চিত্তাকর্ষক ভাবে মিথ্যার সাহায্যে বর্ণিত হইতে পারে। রেল কোম্পানীর এই রূপ বিবৃতিতে অর্থাগম হয় সুতরাং ব্যবসাদারের পক্ষে এ পন্থা দূষ্য বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না।

কিন্তু ঝোপে, ঝাড়ে, জঙ্গলে, পর্ব্বতে রাত্রি যাপন করিয়া বিশেষ কষ্ট বহন করিবার পরও যখন তাঁহারা বলেন যে কী সুন্দর ভাবে রাত্রি কাটিয়াছে তখন সত্যই বিস্মিত হইতে হয়। যখন তথাকথিত রাত্রি যাপনের পর সহরে আসিয়া অঘোরে নিদ্রা দিয়া পরম সুখ অনুভব করেন, তখন এইরূপ আত্ম-প্রবঞ্চনার কী মূল্য থাকিতে পারে! আমার মনে হয় মানুষের মধ্যে পশুত্ব কখনই লোপ পায় না। তাই বোধ হয় মানুষ মাঝে মাঝে পশুর ন্যায় চতুষ্পদে হাঁটিবার জন্য হামাগুড়ি দেয় ও ঝোপে, ঝাড়, জঙ্গলে গিয়া হাঁক ডাক করিতে ভালবাসে—

তাহাই যদি সত্য হয় তো তাহারা হ্যাট, কোট, টাই খুলিয়া আফিসে টেবিলের নিয়ে বা ঘরে হামাগুড়ি দিয়া সে প্রবৃত্তি চরিতার্থ করে না কেন? তাহা এ ঝোপে বা বালুর চরে হামাগুড়ি দেওয়া অপেক্ষা ভাল।

এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে দেখি অনেকেই বাড়ী ফিরিতে উন্মুখ। তাঁহারা সকলে এতোই সুন্দর ভাবে রাত্রি যাপন করিয়াছেন যে কেহই (বলাই ব্যতীত) আর সে সৌন্দর্য্য উপভোগের নিমিত্ত আর এক রাত্রিও অবস্থান করিতে সম্মত নহেন। বলাই এই সময়ে আসিয়া বলিল, "একি হোল ব'লো দেখি নিপু দা—আজই সকলে ফিরতে চায়। বনে, জঙ্গলে, প্রান্তরে তো কিছুই থাকা হোল না, আচ্ছা নিপু দা—এবারে ডুমকার কাছে গভীর জঙ্গলে আমড়াপাড়ার জলপ্রপাতের কাছে রাত কাটান যাবে, কি ব'লো?" আমি বলিলাম, "সেই ভাল, এখন তাঁবু ভাঙ্গ।"



রণসাজে ইয়াঙ্কি হলিউড

বৰ্দ্ধমান-পরিচিতি

—শ্রীসুধীরচন্দ্র রাহা

আজ পাঠকগণের সহিত বর্দ্ধমান জিলার পরিচয় করাইয়া দিতেছি। আমি বর্দ্ধমানবাসী, সেই হিসাবে নিজ জিলার বিষয় সম্বন্ধে অন্যান্য জিলাবাসীর পরিচয় করাইয়া দেওয়া কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করিতেছি। অনেকেই বর্দ্ধমান জেলার বিষয় কিছু কিছু জানেন। বর্দ্ধমানের কথা মনে হইলেই, এ জিলার সীতাভোগ ও মিহিদানা এই দুই খাবার ও তৎসঙ্গে বর্দ্ধমানের ম্যালেরিয়ার কথা স্মরণ হইয়া যায়। এক বস্তুতে জিহ্বা সরস হইলেও, আর এক বস্তুর নাম স্মরণে হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। আমি যখন রাজবন্দীরূপে বহরমপুর ক্যাম্প হইতে চব্বিশ পরগণা জিলার কোন গ্রামে অন্তরীণ ছিলাম, তখনকার এক কৌতুকপ্রদ ঘটনার কথা মনে আছে। একদিন এক আই, বি অফিসার আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসেন। ভদ্রলোকটি পূর্ব্ববঙ্গের অধিবাসী। সেই সময়ে আমি জ্বরে ভুগিতেছিলাম। তাঁহার সহিত আলাপ-পরিচয় হইবার পর তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনার কি শরীর খারাপ ?"

"হাঁ, ক'দিন হ'তে জ্বরে, মানে, ম্যালেরিয়ায় ভুগছি !"

ভদ্রলোকটি চকিত হইয়া বলিলেন, "ম্যালেরিয়া? সর্ব্বনাশ! তবে পীলেও হয়েছে।"

হাসিয়া বলিলাম, "ম্যালেরিয়া ধরলে পীলে দেখা দেবেই।"

ভদ্রলোকটি হঠাৎ আমার নিকট হইতে চেয়ার সরাইয়া লইয়া, হাত চারেক দূরে সরিয়া বসিলেন। আমি সবিস্ময়ে তাকাইয়া থাকিতে, ভদ্রলোক হাসিয়া বলিলেন, "মশায় ম্যালেরিয়া ভারী সাংঘাতিক, তাই সরে বসলাম। তা ছাড়া, বর্দ্ধমানের ম্যালেরিয়াও নামকরা, আর ভারী খারাপ। ধরলে আর রক্ষা নেই।" মনে মনে বেশ সান্ত্বনা পাইলাম, যা হোক লোকে ম্যালেরিয়ার জন্যও বর্দ্ধমানকে মনে রাখিবে। সীতাভোগ, মিহিদানাকে লোকে ভুলিলেও, ম্যালেরিয়াকে ভোলা কঠিন। একবার কাহারও সহিত ম্যালেরিয়ার প্রেম হইলে, ইহার প্রেমে আত্মা, দেহ, মন একসঙ্গে একসুরে বাজিতে থাকিবে। সেখানে ভুলিবে কে? কিন্তু সত্য কথা বলিতে কি, এক সময়ে বর্দ্ধমান ম্যালেরিয়ার জন্য এত বিখ্যাত ছিল না। ম্যালেরিয়া, সীতাভোগ ও মিহিদানা ছাড়াও, বর্দ্ধমান জিলা সাহিত্য সৃষ্টিতে অমর হইয়া রহিবে। কারণ বহু নবীন ও প্রবীণ বিখ্যাত সাহিত্যিক, এই বর্দ্ধমানে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। এই কারণে বর্দ্ধমানকে বঙ্গ সাহিত্যের জনক বলিলে, কোনরূপেই অত্যুক্তি করা হইবে না। বিগত বহু সাহিত্যিকের পূণ্য পবিত্র পদস্পর্শে বর্দ্ধমান জিলা ধন্য ও গৌরবান্বিত হইয়া রহিয়াছে। এই বর্দ্ধমান জেলায় শূন্য-পুরাণ রচয়িতা শ্রীরমাই পণ্ডিত, ভট্ট ভবদেব, মালাধর বসু, বৃন্দাবন দাস, কৃষ্ণদাস কবিরাজ, লোচন দাস, নরহরি সরকার, কবিকঙ্কন মুকুন্দরাম, গোবিন্দ দাস, কবি জয়ানন্দ, কবি রূপরাম, দ্বিজ রূপারাম, যতীন দাস, কাশিরাম দাস, রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র, রমাই ঠাকুর, পাঁচালী প্রণেতা দাশরথী, প্রভৃতি প্রাচীন কবিগণ ও অধুনা যুগের দুর্গাদাস লাহিড়ী, যাত্রাওয়ালা মতিরায়, সত্যেন্দ্র দত্ত, ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, লালবিহারী দে, ভোলানাথ কাব্যশাস্ত্রী, কবি কুমুদরঞ্জন মল্লিক, প্রভৃতি কবি ও লেখকগণ বর্দ্ধমানে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। এই সম্বন্ধে, আমরা অন্যান্য জিলা হিসাবে বিশেষ গর্ব্ব করিতে পারি। কারণ এরূপ স্বনামধন্য উচ্চ ও পূণ্যবান্ সাহিত্যিকবৃন্দ আর কোন জেলাকে তাঁহাদের পদস্পর্শে ধন্য করেন নাই। পরবর্ত্তী প্রবন্ধে, বর্দ্ধমান জিলার সাহিত্যিকগণের পরিচয় দিবার চেষ্টা করিব।

এই জিলার আয়তন, ২,৭০৫ বর্গ মাইল। সমস্ত বঙ্গদেশের আয়তনের ত্রিশ ভাগের এক ভাগ মাত্র। ১৯৩১ সালের আদম সুমারীর হিসাব মত, বর্দ্ধমানের লোকসংখ্যা, ১৫,৭৫,৬৯৯ জন; ইহার মধ্যে পুরুষের সংখ্যা, ৮,১৪,৮৯১ জন; স্ত্রীলোক সংখ্যা, ৭,৬০,৮০৮ জন; স্ত্রীলোক অপেক্ষা পুরুষের সংখ্যা ৫৪,০৮৩ জন বেশী।

এই জিলার সহর নয়টী; গ্রামের সংখ্যা, ২,৬৩১। সহরের লোকসংখ্যা, ১,২৯,৮৮৫; গ্রামের জনসংখ্যা, ১৪,৪৫,৮১৪ জন। এই হিসাবে, শতকরা ৯ জন লোক,

সহরে বাস করিয়া থাকে ও শতকরা ৯১ জন গ্রামে বাস করে। বর্দ্ধমানের মোট ১৫ লক্ষ ৭৬ হাজারের লোক-সংখ্যার মধ্যে, ১ লক্ষ ১৪ হাজার ভারতীয় অ-বাঙ্গালী। তাহার মধ্যে বিহারী ও উড়িষ্যাবাসী ৯৪০০, মধ্য প্রদেশের লোক ৬০০০, পাঞ্জাবী ১৭০০, যুক্ত প্রদেশের লোক, ১১,০০০, রাজপুতনার লোক ১৪০০, ও আরও ২০০০, অ-ভারতীয় বর্দ্ধমানে বাস করিতেছে।

এই জিলার স্বাস্থ্য কোন ক্রমেই ভাল নহে। কারণ বর্দ্ধমানের জন্মের হার, হাজার করা ২৮ জন ও মৃত্যুর হার, হাজার করা ২১ জন। শিশু মৃত্যুর হার, হাজার করা ১৯২ জন। বিগত ১৮৭২ সাল হইতে ১৯৩১ সাল পর্য্যন্ত, সমগ্র বঙ্গদেশে শতকরা ৪৭ জন লোক সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে। কিন্তু সেই হিসাবে, বর্দ্ধমান জিলায় মাত্র ৬ জন লোক বৃদ্ধি পাইয়াছে। ১৯৩৭ সালের স্বাস্থ্য বিভাগ হইতে প্রদত্ত হিসাবে দেখা যায় যে, অন্যান্য ব্যাধিতে মৃত্যুর হার অপেক্ষা ম্যালেরিয়ায় মৃত্যুর হার অধিক। বর্দ্ধমানের এত ম্যালেরিয়ার অন্যতম কারণ বিগত ১৩১০ সালের দামোদরের প্রবল বন্যা। বিগত প্রবল বন্যার সময় কচুরী পানা বর্দ্ধমানের সকল গ্রামে ছড়াইয়া পড়ে; আজ সেই কচুরী-পানা বর্দ্ধমানের সকল পল্লীতে, আবাদী জমিতে, পুষ্করিণী ও নদীতে বিপুল ভাবে দেখা গিয়াছে। তাহার জন্য আজ পানীয় জল বিষাক্ত হইয়াছে, আবাদী জমি নষ্ট হইয়াছে, ফসল হইতেছে না, বিশুদ্ধ জল-অভাবে লোকে কষ্ট পাইতেছে। সেই সঙ্গে সঙ্গে ম্যালেরিয়ার প্রকোপ তীব্র হইয়া দেখা গিয়াছে। এই জিলায় চিকিৎসার জন্য যা দাতব্য হাঁসপাতাল বা চিকিৎসালয় রহিয়াছে, তাহা সমগ্র জিলার লোক সংখ্যা অনুপাতে খুব কম। মাত্র ৬৫টী দাতব্য চিকিৎসালয় যা রহিয়াছে, তাহাতে হিসাবমত গড়ে ২৪,২৪১ লোকের জন্য ১টী করিয়া হইয়া থাকে। এ বিষয়ে গভর্ণমেণ্ট, ডিষ্ট্রিক্টবোর্ড ও ধনিগণের যত্ন লওয়া উচিত।

এই জিলার মোট জমির পরিমাণ, ১৭,০০,৩৩৪ একর। ইহার ভিতর মোট আবাদী জমির পরিমাণ ৬০৮,২০০ একর। অর্থাৎ মোট জমির অর্দ্ধেক অংশ আবাদ হইয়া থাকে। কিন্তু সর্ব্বসাধারণের চেষ্টার ফলে, বাকী অনাবাদী পতিত জমিগুলির ব্যবস্থা হইলে, বর্দ্ধমানবাসী জনগণের আর্থিক উন্নতি যথেষ্ট হয়। এ বিষয়ে অবশ্য জমিদার ও গভর্ণমেণ্টের সবিশেষ সাহায্য ও সহানুভূতি প্রয়োজন।

মোট অনাবাদী, বা গর-আবাদী জমির পরিমাণ ২,৪২,৪০৮ একর। এই বিস্তীর্ণ ২,৪২,৪০৮ একর জমি আবাদ হইয়া খুব কম খাজনা ধার্য্য হইলেও, জমির মালিক ও প্রজা উভয়েই লাভবান হয়।

একমাত্র ধানই এই জিলার প্রধান ফসল, ৪,৪৩,৬০০ একর জমিতে শুধু মাত্র ধান চাষ হইয়া থাকে। ৭,৫০০ একর জমিতে আখ; ৭,৮০০ একর জমিতে সরিষা; ২,৫০০ একর জমিতে ছোলা; ও ১,৭০০ একর জমিতে তিসি; ও ৮০০ একর জমিতে তিল ও মোট ৩০০ একর জমিতে তামাক উৎপন্ন হইয়া থাকে। এই জিলার উৎপন্ন ধান্যের পরিমাণ ৬১, ৫৮, ১২৬ মণ—এবং সমগ্র জিলার লোক-সংখ্যার অনুপাতে, ৩২, ২৩, ৬৬২ মণ ধান ঘাটতি পরিয়া থাকে। বাকী ঘাটতি ধান্য বাহির হইতে আমদানী হয়। কিন্তু গর-আবাদী জমিগুলি চাষ হইলে বাহির হইতে ধান আমদানী করিতে হয় না। এই বর্দ্ধমান জিলায় চাষ কার্য্য ছাড়াও অন্যান্য শিল্পকার্য্য কিছু কিছু হইয়া থাকে। এই জিলায় নিম্নলিখিত শিল্প-কার্য্যাদি হইয়া থাকে:—

(১) তাঁত-শিল্প (২) গরদ ও তসর-শিল্প (৩) কম্বল (৪) শর্করা (৫) সোনার কাজ (৬) শাঁখা (৭) কাঁসা-পিতলের বাসন (৮) ছুরী কাঁচী (৯) জড়োয়া গহনা (১০) চামড়ার কাজ (১১) মৃৎ শিল্প (১২) ভাস্কর্য্য (১৩) সুতা ও বঁড়শী (১৪) কয়লা (১৫) লোহা (১৬) কাগজ (১৭) তালের গুড় ইত্যাদি।

বর্ত্তমানে হাতে কাটায় সূতার পরিবর্ত্তে কলের সুতায় এই জিলার বহু অঞ্চলে কাপড় তাঁতে তৈয়ারী হয়। কালনা মহকুমার অন্তর্গত পূর্ব্বস্থলী, পাটুলী, মেড়তলা ও কাটোয়া মহকুমার অন্তর্গত নিরোল গ্রামে ও মেমারী থানার অন্তর্গত গন্তীরা, সেলিমাবাদ, শ্রীরামপুর, আমালপুর, রাধাকান্তপুর, প্রভৃতি স্থানে জোলারা কাপড় বুনিয়া থাকে। এইসব কাপড় কলিকাতা বাজারে ফরাসডাঙ্গার কাপড় বলিয়া বিক্রী হইয়া থাকে।

কাটোয়া মহকুমার অন্তর্গত দাঁইহাট, মুস্থলী, মেইগাছি, শ্রীবাটী প্রভৃতি স্থানে, প্রচুর পরিমাণে তসর ও মটকা এবং

কোটের কাপড় তৈয়ারী হয়। মাদ্রাজ ও মাদুরা প্রদেশে উহা বাগটকরা আড়ং-কাপড় বলিয়া সমধিক আদৃত হইয়াছে। ঐসব কাপড় সাহা সম্প্রদায়, জোলা, সদগোপ, প্রভৃতি জাতিরা মহাজনদের নিকট হইতে, দাদন টাকা লইয়া বুনিয়া থাকে।

সদর থানায় পাঁচকুলা, জগদাবাদ গ্রামে ভাল গরদের কাপড় তৈরী হয়। পূর্ব্বে ভাল পশম-শিল্পের মধ্যে উৎকৃষ্ট কম্বল ও গালিচা, বর্দ্ধমানে উৎপন্ন হইত। এখন কালনা মহকুমায় পাটুলী গ্রামে, ও রাণীগঞ্জে কিছু কিছু কম্বল ও গালিচা তৈয়ারী হয়। সতরঞ্চও কিছু কিছু বর্দ্ধমান জিলায় হয়।

শর্করা শিল্প এখন নাই বলিলেই হয়। পূর্ব্বে বর্দ্ধমান জিলার গ্রামে গ্রামে দেশী চিনি বা দোলো প্রস্তুত হইত। সদর থানায় দামোদর নদের তীরে, বড়শুল গ্রামে, প্রচুর পরিমাণে চিনি উৎপন্ন হইত। এখন আর হয় না। পূর্ব্বস্থলী, দাঁইহাট অঞ্চল ও সদর মহকুমার অন্তর্গত কৈতাড়া, বনপাশ গ্রামে কাঁসা ও পিতলের কার্য্যাদি হইয়া থাকে। এই অঞ্চলের পেটা, ঘড়া ও ঘটি বিশেষ নাম করা।

বর্দ্ধমানের কাঞ্চননগরের নাম অনেকেই শুনিয়া থাকিবেন। কাঞ্চনগর ছুরী-কাঁচির জন্য বিখ্যাত।

কয়লার খনি একমাত্র বর্দ্ধমান জিলায় আসানসোলে দেখা যায়। বাংলার আর কোথাও কয়লার খনি নাই। এই বর্দ্ধমান জিলায় আসানসোল, কুলটী, সাঁতরা, ও হীরাপুরে বৃহৎলোহার খনি আছে।

রাণীগঞ্জ বল্লভপুর নামক স্থানে কাগজের কল আছে। বেঙ্গল পেপার মিল দামোদর নদের নিকট অবস্থিত।

মাদুর-শিল্প একমাত্র বর্দ্ধমানের রায়দোগাছিয়াতে দেখিতে পাওয়া যায়। পূর্ব্বে বর্দ্ধমানে কাষ্ঠ্য কার্য্যেও বিশেষ সুনাম ছিল। আজ সেই সুনাম একমাত্র দাঁইহাট নামক স্থানেই সীমাবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। কাঁটোয়া মহকুমায় কিছু কিছু চামড়ার কাজ হইয়া থাকে। কাঁটোয়ার চটিজুতা দামে সস্তা ও সুদৃশ্য। কিন্তু তাহাও ধ্বংস হইতে বসিয়াছে।

রাণীগঞ্জ অঞ্চলে, মেসার্স বার্ণ কোম্পানীর মাটির জার, বোয়েম, প্রভৃতি তৈয়ারী হয়। কৃষ্ণনগরের অনুকরণে নানারূপ মাটীর খেলনা বর্দ্ধমানে প্রস্তুত হয়। রাণীগঞ্জে টালি প্রস্তুত হয়, তাহাও নামকরা। কাল রংয়ের বিশেষ শক্ত হাঁড়ী বর্দ্ধমান জিলায় প্রস্তুত হয়। গঙ্গার তীরবর্ত্তী নানাগ্রামে, মৃৎশিল্প আজও বাঁচিয়া রহিয়াছে। স্থানীয় কুম্ভকারগণ নানারূপ মাটির পুতুল দেবদেবীর মূর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া থাকে। বর্দ্ধমানের বনপাশ গ্রামে জড়োয়া গহনা, কেমিক্যাল সোনার গহনা প্রস্তুত হয়। গিল্‌টী ও নিকেলের যাবতীয় গহনা বর্দ্ধমানে প্রস্তুত হয়; উহা কলিকাতার বাজারে হিন্দুস্থানীরা বিশেষ সমাদরে গ্রহণ করিয়া থাকে। প্রবন্ধ শেষ করিবার পূর্ব্বে আর একটী জিনিষ উল্লেখ করা প্রয়োজন।

বর্দ্ধমান জেলার বেশীর ভাগ লোকই চাষ করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া থাকে। এইরূপ দেখিতে গেলে বর্দ্ধমান চাষ-কার্য্যের দেশ। এইস্থলে আমি চাষীগণের একটি হিসাব দিলাম।

যাহারা কৃষক তাহাদের সংখ্যা, ১,১৭,৪১৫ জন। যাহারা ভাগে চাষ করে, উহাদের সংখ্যা, ২০,৪৩০ জন। যাহারা ক্ষেত-মজুরের কাজ করে তাহাদের সংখ্যা, ২,১৪৭৬৬ জন। যাহারা ধান ভানিয়া খায় তাহাদের সংখ্যা—১৯,৩৫০ জন। যাহারা মাছ ধরিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করে তাহাদের মোট সংখ্যা, ১৩,১১৭ জন। তাঁতের কাজ, লোহার কাজ ও বাঁশের কাজ যাহারা করে তাহারা ১১,৩৪৮ জন। যাহারা ব্যবসা করে, তাহারা ২১,১৯৪ জন।

দিন মজুর খাটে, ৪১,৮৯০ জন, চাকুরী করে, ৯,৯৯৬ জন। এ স্থলে, হিসাব মত দেখা যায়, বেশীর ভাগ লোক চাষকার্য্য ও শিল্পকাজ দ্বারা অন্ন সংস্থান করে। উহাদের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সংখ্যাই কৃষক। ভারতবর্ষ পল্লীপ্রধান দেশ, শতকরা ৯০ জন পল্লীবাসী ও শতকরা ১০ জন মাত্র সহরবাসী। এই পল্লীপ্রধান ভারতবর্ষ চাষীরই দেশ। বর্ত্তমানে চাষীর অবস্থা ও পল্লীর অবস্থা দু-ই সমান। দু-ই আজ হতশ্রী ও শ্মশান সমতুল্য। ভারতবর্ষের সমগ্র জাতীয়তা, তাহার কল্যান, তাহার সাহিত্য, ঐশ্বর্য্য তাহার আলোকিত ভবিষ্যৎ, সকলই পল্লীর উপর নির্ভর করিতেছে। কিন্তু আজ পল্লীগুলি দুরবস্থার শেষ ধাপে উপনীত হইয়াছে। আজ পল্লীগুলি ও চাষীগণকে বাঁচাইবার কাজ দেশবাসীর সমবেত শুভচেষ্টা ও ইচ্ছা ব্যতিরেকে হইবার নয়। এইজন্য দেশবাসী ও দেশের ধনি-গণকে অবশ্যই মনোযোগ দিতে হইবে। সমাজদেহের এক বৃহৎ অংশ রুগ্ন ও ধ্বংস প্রাপ্ত হইলে, অবশিষ্ট ধনিগণের অবশ্যই ধ্বংস অনিবার্য্য। তাই প্রতি জেলায় যে সমস্ত গর-আবাদী জমি পড়িয়া রহিয়াছে, তাহার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। প্রতি কেন্দ্রে আসল বীজ, ভাল সার, উপযুক্ত গরু প্রভৃতি রাখা প্রয়োজন। খুব কম হারের সুদে টাকা ধার দেওয়ার ব্যবস্থা করাও বিশেষ প্রয়োজন।

'India lies in villages and villages lie in their villagers,' এই মহৎ বাক্য আজ ভুলিয়া থাকা মৃত্যুর নামান্তর মাত্র

পৌরাণিক ভূতত্ত্ব*

—শ্রীরমেন্দ্রনাথ সেনশর্ম্মা

দ্বিতীয় অধ্যায়

(পৃথিবীর আকার)

পৃথিবীর আকৃতি বিষয়ে পৌরাণিক ভূগোল ও বর্ত্তমান ভূগোলে মতভেদ দেখা যায়। বর্ত্তমান ভূগোল-বেত্তৃগণ পৃথিবীকে কমলালেবুর ন্যায় গোল এবং উত্তর-দক্ষিণে কিঞ্চিৎ চাপা বলেন। কিন্তু প্রাচীন ভূগোল-বেত্তৃগণের বিবরণে প্রকাশ যে, বর্ত্তমান আবিষ্কৃত পৃথিবী তাঁহাদের জম্বুদ্বীপ, লবণসমুদ্র ও অতলনামা পাতাল ব্যতীত আর কিছুই নহে। তবে এই জম্বুদ্বীপের দক্ষিণদিক কমলালেবুর ন্যায় কতকটা চাপা বটে, কিন্তু উত্তরদিক সেরূপ নহে। উত্তরদিকটা ডিম্বের ন্যায় কতকটা সরু অথচ গোলাকার, ইহার উত্তর অংশে দ্বীপভাগ। দ্বীপ শব্দের অর্থ ভূভাগ। তাহার পরিমাণ লক্ষ যোজন। ইহার দক্ষিণে স্থলভাগের দ্বিগুণ পরিমিত (অর্থাৎ, দুইলক্ষ যোজন) জলভাগ দ্বারা পরিবেষ্টিত। তাহার দক্ষিণে অতলনামা পাতাল। এই পাতালের পরিমাণ দশহাজার যোজন মাত্র।

পৃথিবী অণ্ডাকৃতি হওয়ায়, ব্রহ্মাণ্ড শব্দটি অণ্ড শব্দ হইতে নিষ্পন্ন হইয়াছে। সুতরাং অণ্ডের সহিত তুলনা করিয়াই পৃথিবীর স্বরূপ বর্ণনা করিব।

বর্ত্তমান ভূগোলে পৃথিবীর গোলত্ব বিষয়ে যে চারিটি প্রমাণ দেখা যায়, পৃথিবী অণ্ডাকৃতি হইলেও সেই প্রমাণগুলির কোন ব্যতিক্রম হয় না। যথা,—

(১) সমুদ্রতীরে অথবা বিস্তীর্ণ জলভাগের নিকট দাঁড়াইয়া নৌকা বা জাহাজ দেখিলে প্রথমে উচ্চাংশ দৃষ্ট হয়, ক্রমে নিম্নাংশ দৃষ্ট হইয়া থাকে।

(২) প্রসিদ্ধ নাবিকগণ দিক্ পরিবর্ত্তন না করিয়া পৃথিবী ঘুরিয়া আসিয়াছেন।

(৩) পৃথিবী গোল বলিয়া সূর্য্য সর্ব্বত্র এক সময়ে উদিত হয় না।

পৃথিবী চ্যাপ্টা হইলে এ-সকল প্রমাণের বিরুদ্ধ হয় সত্য, কিন্তু ডিম্বাকৃতিতে কোন দোষ দেখা যায় না। পৃথিবী পূর্ব্ব-পশ্চিমে গোল ত' আছেই, উত্তর-দক্ষিণে ডিম্বাকৃতি হইলেও উক্ত প্রমাণত্রয়ের কোন বাধা থাকে না।

(৪র্থ প্রমাণ) চন্দ্রগ্রহণের সময় পৃথিবীর ছায়া চন্দ্রের উপর পতিত হয়, তাহা গোল দেখায়।

চন্দ্রের উপর পৃথিবীর ছায়া পড়িলে গ্রহণ হয়। সে গ্রহণ কোন সময় দেখা যায়, কোন সময় দেখা যায় না; কোন সময় বঙ্গে দেখা যায় মাদ্রাজে দেখা যায় না; অথবা বোম্বাই হইতেই কেবলমাত্র দৃষ্ট হয়, আর কোথাও দৃষ্ট হয় না। আবার কোন কোন সময় দশ মিনিট, কুড়ি মিনিট বা ত্রিশ মিনিট গ্রহণ দেখা যায়। কোন সময় আংশিক গ্রহণ দেখা যায়, কোন সময় পাঁচ ছয় ঘণ্টা ব্যাপী গ্রহণ হয় তাহাতে দুই তিন ঘণ্টা কাল পূর্ণগ্রাস থাকে। ইহার কারণ, ছায়াটি কতকটা বক্রভাবে চন্দ্রের উপর পড়িয়া থাকে।

বাদামী ছায়া বক্রভাবে পড়িলে কতকটা গোলাকৃতি দেখাইতে পারে। অনেক সময় গোল জিনিষের উপর ছায়া পড়িয়া এরূপ বিকৃত আকৃতিতে দেখা যায়। ইহার দ্বারা গোল প্রমাণিত হইতে পারে না।

সূর্য্যোদয় কালে (প্রভাতে) অথবা সূর্য্যাস্ত কালে (সন্ধ্যার পূর্ব্বে) একটি গোল বল রৌদ্রের মধ্যে ধরিলে, তাহার ছায়া কতকটা লম্বাকৃতি দেখা যায়। এবং দ্বিপ্রহরে একটি রোলারকে খাড়াভাবে ধরিলে তাহার ছায়া গোল দেখায়। সুতরাং ছায়ার দ্বারা গোল প্রমাণিত হইতে পারে না।

চন্দ্রগ্রহণ-কালীন পৃথিবীর যে ছায়া চন্দ্রের উপর পতিত হয়, তাহা সকল সময় এক রকম গোলাকার দেখা যায় না।

পৃথিবী সেকেণ্ডে উনিশ মাইল বেগে গমন করে বলিয়া জ্যোতির্বিদগণ বলিয়া থাকেন। যদি পৃথিবী সেকেণ্ডে উনিশ মাইল বেগে গমন করে, তবে তাহার ছায়া উহা অপেক্ষা অনেক বেশী বেগে গমন করে সন্দেহ নাই। সে ছায়া আবার চন্দ্রকে দুই তিন ঘণ্টা কাল ঢাকিয়া রাখে। সুতরাং ছায়াটি

* ইহার প্রথম অধ্যায় "বঙ্গশ্রী"তে পূর্ব্বে প্রকাশিত হইয়াছিল।

চন্দ্র হইতে অনেক বড়। তাহার চারিদিক আমরা দেখিতে পাই না। এমতাবস্থায় সে ছায়া যে গোলাকার না হইয়া ডিম্বাকার হইতে পারিবে না, এমন প্রমাণ নাই। আংশিক-গ্রহণে একটি অংশ মাত্র দেখা যায়, তাহার দ্বারা ছায়াটি ডিম্বাকার না হইয়া গোলই হইবে এরূপ প্রমাণিত হইতে পারে না।

পূর্ব্বোলিখিত কারণে পৃথিবী যে গোলাকার তাহার বিশিষ্ট কোন প্রমাণ দেখা যায় না। সুতরাং প্রাচীন ভূগোলের উক্তি যে অলীক, ইহাও বলা যায় না। প্রাচীন ভূগোল-বেত্তৃগণ যে সকল স্থানের নাম ও বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন তাহাকে অযৌক্তিক বলিয়া মনে হয় না। সে সকল স্থানের নাম ও বিবরণ ক্রমে আলোচনা করা যাইতেছে।

প্রথম অধ্যায়ে উল্লেখ করা হইয়াছে যে, জম্বু, প্লক্ষ, শাল্মলি, কুশ, ক্রৌঞ্চ শাক ও পুষ্কর নামে সপ্তদ্বীপ এবং লবণ, ইক্ষু, সুরা, সর্পি, দধি, দুগ্ধ ও জল এই সপ্ত সমুদ্র আছে। এতদ্ব্যতীত অতল, বিতল, নিতল, গভস্তিমৎ, মহাতল, সুতল ও পাতাল নামে সপ্ত পাতাল আছে।

কেহ কেহ মনে করেন, সপ্তদ্বীপ শব্দে এশিয়ার মধ্যস্থিত সাতটি দেশ ও সপ্ত সমুদ্র শব্দে কাস্পিয়ান সাগর তুল্য সাতটি হ্রদ, হয় ত' কোন স্থানে ছিল, কিন্তু প্রকৃতির আবর্ত্তনে তাহা পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে।

আবার পাতাল বিষয়েও সেইরূপ ভূমির অধোভাগে অর্থাৎ এশিয়ার বিপরীত—আমেরিকার সাতটি দেশ ছিল, তাহাকে পাতাল বলিয়া উল্লিখিত হইয়া থাকিবে।

বস্তুতঃ তাহা নহে। সপ্তদ্বীপ, সপ্তসমুদ্র ও সপ্তপাতাল বিষয়ে পুরাণস্থিত ভৌগলিক অধ্যায়ে সুবিস্তৃত প্রমাণ পাওয়া যায়

পুরাণে উক্ত আছে :—

জম্বু প্লক্ষাহ্বয়ৌ দ্বীপৌ শাল্মলিশ্চাপরোদ্বিজ।
কুশঃ ক্রৌঞ্চ তথা শাকঃ পুষ্করশ্চৈব সপ্তমঃ ॥৫
এতে দ্বীপাঃ সমুদ্রৈস্তু সপ্ত সপ্তভিরাবৃতাঃ।
লবণেক্ষু সুরা সর্পির্দধিদুগ্ধজলৈঃ সমম্ ॥৬
জম্বুদ্বীপঃ সমস্তানামেতেষাং মধ্য সংস্থিতঃ।
তস্যাপি মেরুর্মৈত্রেয় মধ্যে কনক পর্ব্বতঃ ॥৭

(বিষ্ণু ২য় অ ; ২য় অ ; ২য় অ ৫—৭ শ্লো)

অর্থাৎ,—হে দ্বিজ! জম্বু, প্লক্ষ, শাল্মলি, কুশ, ক্রৌঞ্চ, শাক এবং পুষ্কর এই সপ্ত দ্বীপ যথাক্রমে লবণ, ইক্ষু, সুরা, সর্পি, দধি, দুগ্ধ, এবং জল এই সপ্ত সমুদ্র দ্বারা সর্ব্বত্র সমভাবে পরিবেষ্টিত। হে মৈত্রেয়! জম্বুদ্বীপ এই সকলের মধ্যে অবস্থিত। তাহার মধ্যস্থলে সুবর্ণপর্ব্বত মেরু অবস্থিত। সুতরাং শৈলরাজ সুমেরু এই পৃথিবী-পদ্মের কর্ণিকা বা বীজ কোষ স্বরূপ।

অতলং বিতলঞ্চৈব নিতলঞ্চ গভস্তিমৎ।
মহাখ্যাং সুতলঞ্চাগ্র্যং পাতালঞ্চাপি সপ্তমম্ ॥২
শুক্লাকৃষ্ণারুণা পীতা শর্করা শৈল কাঞ্চনাঃ।
ভূময়ো যত্র মৈত্রেয় বর প্রাসাদ মণ্ডিতাঃ ॥৩
দিবার্করশ্ময়ো যত্র প্রভাং তন্বতি নাতপম্।
শশিনশ্চ ন শীতায় নিশি দ্যোতায় কেবলম্ ॥৮

(বিষ্ণু ২য় অ : ৫ম অ ; ২।৩,৮ শ্লো)

অর্থাৎ,—হে মৈত্রেয়! অতল, বিতল, নিতল, গভস্তিমৎ মহাতল, শ্রেষ্ঠ সুতল ও সপ্তম পাতাল নামে সাতটি পাতালের (ভূবিবরের) শ্রেষ্ঠ প্রাসাদ-শোভিত ভূমি সকল যথাক্রমে শুক্লা, কৃষ্ণা, অরুণা, পীতা, শর্করা শৈলী এবং কাঞ্চনী বলিয়া খ্যাত। দিবাকর রশ্মি তথায় কেবল প্রভা বিস্তার করে, উত্তাপ বিস্তার করে না এবং রাত্রিকালে চন্দ্রের রশ্মি কেবল আলোকের কারণ হয় শীতের কারণ হয় না।

সুমেরুকে পূর্ব্বপশ্চিমে মধ্য ও ধ্রুবকে ঊর্দ্ধ দিক ধরিয়া সর্ব্বোপরি স্থান নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। তন্নিম্নে জম্বুদ্বীপ। এই জম্বুদ্বীপ আবার লবণসমুদ্র দ্বারা পরিবেষ্টিত। তৎপরে প্লক্ষ দ্বীপ তন্নিম্নে ইক্ষুসমুদ্র দ্বারা পরিবেষ্টিত; তৎপরে শাল্মলি দ্বীপ তন্নিম্নে সুরাসমুদ্র দ্বারা পরিবেষ্টিত; তৎপরে কুশদ্বীপ তন্নিম্নে সর্পিসমুদ্র দ্বারা পরিবেষ্টিত; তৎপরে ক্রৌঞ্চদ্বীপ তন্নিম্নে দধিসমুদ্র দ্বারা পরিবেষ্টিত; তৎপরে শাকদ্বীপ তন্নিম্নে দুগ্ধসমুদ্র দ্বারা পরিবেষ্টিত; তৎপরে পুষ্করদ্বীপ তন্নিম্নে জলসমুদ্র দ্বারা পরিবেষ্টিত আছে। এইরূপে সপ্তদ্বীপ ও সপ্ত সমুদ্র অবস্থিত।

এখন বিবেচ্য বিষয় এই যে, সপ্তপাতাল কোথায় এবং কিভাবে অবস্থিত। পাতাল শব্দের অর্থ ভূগহ্বর বা ভূবিবর। সেখানে সূর্য্যরশ্মি ও চন্দ্ররশ্মি প্রবেশ করিতে পারে না অথচ আলো দেয়। এই স্থান স্থল ও জলভাগের অধোভাগে ভূবিবরে অবস্থিত। আবার একটি পাতাল নয়, সপ্তদ্বীপ ও সপ্তসমুদ্রের সঙ্গে সঙ্গে পাতালও সাতটি।

প্রথম অধ্যায়ে বলা হইয়াছে যে, জম্বুদ্বীপ ও লবণ-সমুদ্রের নিম্নে বর্ত্তমান দক্ষিণ মেরুতে একটি স্থান আছে, তাহাই অতলনামা পাতাল।

এইরূপ প্লক্ষদ্বীপ ও ইক্ষুসমুদ্রের নিম্নে বিতল নামা পাতাল; শাল্মলিদ্বীপ ও সুরাসমুদ্রের নিম্নে নিতল নামা পাতাল; কুশদ্বীপ ও সর্পি সমুদ্রের নিম্নে গভস্তিমৎ নামা পাতাল; ক্রৌঞ্চদ্বীপ ও দধিসমুদ্রের নিম্নে মহাতল নামা পাতাল; শাকদ্বীপ ও দুগ্ধসমুদ্রে নিম্নে সুতল নামা পাতাল এবং পুষ্করদ্বীপ ও জলসমুদ্রের নিম্নে পাতাল নামা পাতাল; এই সপ্ত পাতাল অবস্থিত।

এবং দ্বীপাঃ সমুদ্রৈস্তু সপ্ত সপ্তভিরাবৃতাঃ।
দ্বীপশ্চৈব সমুদ্রশ্চ সমানৌ দ্বিগুণৌ পরৌ ॥ ৮৮

(বিষ্ণুঃ ২য় অং ৪র্থ অঃ ৮৮ শ্লো)

অর্থাৎ,—এইরূপে সপ্তদ্বীপ সপ্তসমুদ্র দ্বারা আবৃত। দ্বীপ ও তাহার অব্যবহিত পরবর্ত্তী সমুদ্র পরস্পর সমান এবং পরবর্ত্তী দ্বীপ ও সমুদ্র পূর্ব্ববর্ত্তী দ্বীপ ও সমুদ্রের দ্বিগুণ।

সপ্তদ্বীপের প্রথমে যে জম্বুদ্বীপ আছে, তাহার দ্বিগুণ প্লক্ষদ্বীপ, তাহার দ্বিগুণ শাল্মলিদ্বীপ, তাহার দ্বিগুণ কুশদ্বীপ, তাহার দ্বিগুণ ক্রৌঞ্চদ্বীপ, তাহার দ্বিগুণ শাকদ্বীপ, তাহার দ্বিগুণ পুষ্করদ্বীপ বলিয়া কথিত হইয়াছে। আবার লবণ-সমুদ্র হইতে আরম্ভ করিয়া জলসমুদ্র পর্য্যন্ত প্রত্যেকটি সমুদ্র উত্তরোত্তর দ্বিগুণ বলিয়া কথিত হইয়াছে। এইরূপে ঊর্দ্ধ হইতে অধঃ পর্য্যন্ত বিবেচনা করিলে দেখা যায়, পৃথিবীটি ত্রিকোণ এবং প্রত্যেক দুই দ্বীপের মধ্যস্থলে একটি করিয়া গহ্বর বিদ্যমান রহিয়াছে।

এইরূপে পৃথিবীকে কেহ বা ত্রিকোণ কেহ বা অলাবু (লাউ) সদৃশ কেহ বা ডিম্বাকার বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। পৃথিবীস্থ জলভাগের উপর স্থলভাগ ভাসমানবৎ প্রতীয়মান হওয়ায়, কেহ কেহ পদ্মের সহিত উহার তুলনা করিয়া গিয়াছেন। গ্রীকগণের মতেও পৃথিবী সমুদ্রবক্ষে ভাসিতেছে।

এই সপ্তদ্বীপ, সপ্তসমুদ্র ও সপ্তপাতালের নিম্নে একটি পর্ব্বত আছে, তাহার নাম—লোকালোক পর্ব্বত। ঊর্দ্ধ সুবর্ণ পর্ব্বত হইতে আরম্ভ করিয়া নিম্নে লোকালোক পর্ব্বত পর্য্যন্ত পৃথিবীর মেরুদণ্ড নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। ইহার পর গাঢ় অন্ধকার। যথা—

লোকালোকস্ততঃ শৈলো যোজনাযুতবিস্তৃতঃ।

(বিষ্ণু ২য় অং ৪র্থ অঃ ৯৫ শ্লো)

অর্থাৎ, তাহার পর অযুত যোজন বিস্তৃত লোকালোক পর্ব্বত অবস্থিত।

ততস্তমঃ সমাবৃত্য তৎশৈলং সর্ব্বতঃস্থিতম্
তমশ্চাণ্ড কটাহেন সমন্তাৎ পরিবেষ্টিতম্ ॥৯৬

(বিষ্ণু ২য় অং ৪অং ৯৬ শ্লো)

অর্থাৎ, তদনন্তর গাঢ় অন্ধকার সেই পর্ব্বতকে আবৃত করিয়া রহিয়াছে। সেই অন্ধকারও অণ্ডকটাহ দ্বারা চতুর্দ্দিকে পরিবেষ্টিত।

পঞ্চাশৎ কোটি বিস্তারা সেয় মুর্ব্বী মহামুনে।
সাদ্বৈবাণ্ড কটাহেন সদ্বীপাব্ধি মহীধরা ॥ ৯৭

(বিষ্ণু ২য় অং ৪র্থ অঃ ৯৭ শ্লো)

অর্থাৎ, হে মহামুনে! অণ্ডকটাহ মধ্যবর্ত্তিনী দ্বীপ, সমুদ্র ও পর্ব্বতের সহিত সেই পৃথিবী পঞ্চাশৎ কোটি যোজন বিস্তৃতা।

অণ্ডকটাহ শব্দে অণ্ডাকৃতি পৃথিবীর আবরণ বুঝায়। অণ্ডকটাহ আবার ঘন জলপূর্ণ সাগরে আবৃত আছে বলিয়া স্থানান্তরে কথিত হইয়াছে। ইহাদ্বারা বুঝা যায় অণ্ডকটাহ শব্দে বায়ুমণ্ডল এবং ইহার বাহির জলীয়-বাষ্পদ্বারা আবৃত। বায়ুমণ্ডল যে পৃথিবীর একটা অংশ তাহাতে ভুল নাই, কারণ, বায়ুমণ্ডল সহ পৃথিবী গমন করিতেছে বলিয়া বৈজ্ঞানিকগণ মত প্রকাশ করিয়া থাকেন। ইহাকেই বোধ হয় ক্যালেডিয়ানগণ পৃথিবী অবরুদ্ধ কক্ষ স্বরূপ বলিয়া বর্ণনা করিয়া থাকিবেন।

ভারতের প্রকৃত স্বাস্থ্যনীতি

ভুক্ত খাদ্যের অব্যক্ত উত্তাপ (Potential energy) ব্যক্ত হইয়া দেহের মধ্যে যে তাপের সৃষ্টি করে তাহা পানকরা-জল ও নিশ্বাস বায়ুর সহিত মিলিত হইয়া পরিপক্ক হইলে তাহা হইতে রসধাতুর সৃষ্টি হয়। রসধাতু নিজ অগ্নি বা উত্তাপের দ্বারা পরিপক্ক হইলে তাহা হইতে রক্তের সৃষ্টি হয়। খাদ্যগোলা জল, বায়ু ও উত্তাপ এইরূপে পরিপক্ক ও রূপান্তরিত হইয়া রক্তরূপ ধারণ করিলে তাহা সরাসরি হৃৎপিণ্ডে গিয়া আশ্রয় গ্রহণ করে। হৃৎপিণ্ডাশ্রিত রক্ত তখনই দেহ গঠনে সহায়তা করিবার জন্ত নিয়োজিত হয় না বলিয়া, অনাহত বা অক্ষুণ্ণ অবস্থায় থাকে। বায়ু, পিত্ত ও কফ চিৎশক্তির রূপ বিশেষ। ইহারা একযোগে মিলিত হইলেই তন্মধ্যে চৈতন্যের অধিষ্ঠান হয়। চৈতন্যানুপ্রাণিত রক্ত হৃৎপিণ্ড হইতে বহির্গত হইয়া দেহের সর্ব্বত্র গমন করে। ইহার দ্বারাই দেহযন্ত্রাদি, ইন্দ্রিয়াদি ও সপ্তধাতুর অণু-পরমাণু আর্দ্র বা রসপুষ্ট হইবার সঙ্গে সঙ্গে চেতনাযুক্ত হইয়া থাকে। আয়ুর্ব্বেদ বলেন, চৈতন্যানুপ্রাণিত রক্ত দেহের যে স্থানে গমন করিবে সেই স্থান চেতনাযুক্ত হইবে। কিন্তু যে স্থানে রক্ত অনাহত বা অক্ষুণ্ণ অবস্থায় থাকিবে সেই স্থান বিশেষ চেতনাযুক্ত হইবে। ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতি বায়ু, পিত্ত ও কফ হৃৎপিণ্ডের মধ্যে স্থূল রক্ত রূপে, কিন্তু মস্তিষ্কের মধ্যে সূক্ষ্মরূপে অধিষ্ঠিত হয় বলিয়া, মস্তিষ্কের চেতনাই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক হইয়া থাকে। পাশ্চাত্য শরীর-তত্ত্ববিদ্‌রা মস্তিষ্ককেই কেবল চেতনার স্থান বলেন। হৃৎপিণ্ডের দুর্ব্বলতা বশতঃ মস্তিষ্কের মধ্যে রক্ত-সঞ্চালনের ব্যাঘাৎ ঘটিলে মানুষ অচৈতন্য হইয়া পড়ে। মানুষ ভীত হইলে সর্ব্বাগ্রে তাহার হৃৎপিণ্ডই ধড়ফড় করিয়া উঠে। শোকাবেগ বা যে কোন আবেগ সর্ব্বাগ্রে হৃৎপিণ্ডকেই আঘাত করে। হৃৎপিণ্ডের মধ্যে চৈতন্যের অধিষ্ঠান না হইলে জড়যন্ত্র এইরূপ অনুভূতি-সম্পন্ন হইতে পারে না।

বায়ু, পিত্ত ও কফের স্বভাব, প্রকৃতি বা ধর্ম্ম ভিন্ন। স্বভাব জন্মগত। যাহা স্বাভাবিক বা সহজাত তাহা স্বভাবের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ও ক্রিয়াকর্ম্মের ভিতর দিয়া প্রকটিত হইয়া থাকে। যাহারা প্রকৃতি বা স্বভাবের অনুবর্ত্তন করে, তাহারা ভিন্ন স্থানে বিভিন্ন ক্রিয়া সম্পাদন করিতে পারে না। হৃৎপিণ্ডের সঙ্কোচন ও প্রসারণের প্রতিঘাতে ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতি-বায়ু, পিত্ত ও কফকে বাধ্য হইয়া দিবানিশি নাচিতে হইলে তাহাদের নৃত্যভঙ্গী ও গতি নিজ নিজ স্বভাবানুযায়ী হইবেই হইবে। ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতি-বিশিষ্টা নর্ত্তকীর নৃত্য-ভঙ্গী ও পদক্ষেপের উপর লক্ষ্য করিলেই ইহার সত্যতা নির্দ্ধারণ করা যায়। কফ বা শ্লেষ্মা-প্রকৃতি-বিশিষ্টা নর্ত্তকীর প্রকৃতি বা স্বভাব মধুর ও মতিগতি ধীর ও স্থির হয় বলিয়া নৃত্যকালে উহাদের অঙ্গভঙ্গী ও পদক্ষেপের গতিও ধীর ও স্থির হইয়া থাকে। এই বিশিষ্ট কারণেই নৃত্যকালে উহাদের তাল কাটিতে দেখা যায় না। পিত্ত-প্রকৃতি-বিশিষ্টা নর্ত্তকীর স্বভাব গর্ব্বিত ও মতিগতি চঞ্চল হয় বলিয়া নৃত্যকালে উহাদের অঙ্গভঙ্গী ও পদক্ষেপের গতি দ্রুত হইয়া থাকে। সেই জন্ত উহাদের তাল মাঝে মাঝে কাটিতে দেখা যায়। কিন্তু বাত-প্রকৃতি-বিশিষ্টা নর্ত্তকীর স্বভাব রুক্ষ ও মতিগতি অস্থির হয় বলিয়া নৃত্যকালে উহাদের অঙ্গভঙ্গী ও প্রতিপদক্ষেপের গতিমধ্যে অস্থিরতাই প্রকটিত হয়। এই কারণে উহাদের তাল সর্ব্বাপেক্ষা বেশী কাটে। ইহা প্রত্যক্ষ করিলে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, নৃত্যভঙ্গী ও তাহার গতির সহিত প্রকৃতি বা স্বভাবের অতি ঘনিষ্ট সম্বন্ধ আছে। মনের অতল তলে যে সকল বাসনা-কামনা রূপায়িত হইয়া ভাসিয়া বেড়ায় তাহাদের সকলেরই সহিত প্রকৃতি বা স্বভাব বা ধর্ম্মের অতি নিগূঢ় সম্পর্ক আছে।

বায়ু, পিত্ত ও কফ সুস্থাবস্থায় নাড়ীর (Artery) মধ্যে যে ভাবে বা যে তালে স্পন্দিত হয়, অসুস্থা-বস্থায় বা বৈষম্যাবস্থায় আর সেই তালে যে স্পন্দিত হয় না, চিকিৎসক মাত্রেই তাহা জানেন এবং স্বীকারও করেন। ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতি—বায়ু, পিত্ত ও কফ বিকৃত বা দোষযুক্ত

হইলেই রোগ-প্রকৃতি রূপে অধিষ্ঠিত হয়। রোগ-প্রকৃতি বা ব্যাধি দোষযুক্ত স্বভাবের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় বলিয়া তাহাদের নৃত্য বা স্পন্দনও দোষযুক্ত হইয়া অল্পাধিক পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে। অবস্থাভেদে ইহাদের যে পরিবর্ত্তন ঘটে তাহার প্রত্যেক স্পন্দনাঘাতই নাড়ীর মধ্যে ব্যক্ত হয়। ইহাদেরই যাবতীয় ভঙ্গী ও অনুভবের দ্বারা উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইলে ভিন্ন রোগ-প্রকৃতির স্বরূপ, দেহ যন্ত্রাদি ও ইন্দ্রিয়াদির বৈকল্য এবং সপ্তধাতুর যাবতীয় দোষ সঠিক ভাবেই নির্দ্ধারণ করা যায়। এতদ্ব্যতীত বাম ও দক্ষিণ অঙ্গের মধ্যে কাহার কোন অঙ্গ ঈষৎ দুর্ব্বল, কোন সময়ে বৃদ্ধ রোগীর গঙ্গাযাত্রা করা উচিত, কোন যুবক বা যুবতী জন্মের পর মাতৃশুক্র প্রাপ্ত হয় নাই, গর্ভে সন্তান আছে কি না তাহাও বলা যায়। নাড়ীর স্পন্দনাঘাতই রোগ-প্রকৃতি নির্ণয়ে অদ্বিতীয় বলিয়া আয়ুর্ব্বেদীয় ও ইউনানী চিকিৎসকেরা সর্ব্বাগ্রে নাড়ীই পরীক্ষা করিয়া থাকেন। অনুভব ভিন্ন নাড়ী পরীক্ষা করা যায় না। আর সেই অনুভূতি কেবল অর্জ্জন-সাপেক্ষ নহে, প্রকৃতি বা স্বভাব-সাপেক্ষও বটে। যে কোন প্রকৃতি-বিশিষ্ট মনুষ্য অনুশীলন করিলেই নাড়ী-জ্ঞানী হইতে পারেন না। যে সকল অতি-বুদ্ধিজীবী চিকিৎসকরা আজও নাড়ী পরীক্ষার মর্ম্মোদ্ঘাটন করিতে পারেন নাই, তাঁহাদেরই মধ্যে দুই একজন ভাগ্যবান চিকিৎসক বলিতেছেন যে "নাড়ী পরীক্ষার কোন মূল্য নাই।" পরিপক্ক আঙ্গুরের রসাস্বাদনে অসমর্থ হইয়া ঈসপ্স ফেবেলের (Æsop Fable) শৃগাল যাহা বলিয়া চলিয়া যায় ইহা তাহারই প্রতিধ্বনি মাত্র। নাচিতে না পারিলে লোকে নিজের দোষ স্বীকার না করিয়া উঠানেরই দোষ দেয়। অতি-বুদ্ধিজীবী চিকিৎসকরা "হাসে প্যানি" না পাইয়া উঠানেরই দোষ দিতেছেন।

ব্যাধির এক একটী উপসর্গ এক একটী দোষ। কোন উপসর্গ বা দোষ প্রবলভাবে, কোন দোষ দুর্ব্বলভাবে, আর কোন দোষ মাঝামাঝি ভাবেই প্রকটিত হয়। এই সকল উপসর্গ বা দোষ সমষ্টিই রোগ-প্রকৃতি বা ব্যাধি। রোগ-প্রকৃতিই ব্যাধির কর্ত্তা। উপসর্গ বা দোষগুলি কর্ত্তার অধীন অনুচর মাত্র। ইহারা কর্ত্তার ইঙ্গিতেই পরিচালিত হয়। কর্ত্তা বা রোগ-প্রকৃতিকে অগ্রাহ্য করিয়া দুই একটা অনুচর বা উপসর্গকে জোর করিয়া অর্থাৎ কঠোর ঔষধ প্রয়োগ করিয়া দমন করিলে রোগ-প্রকৃতি দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। প্রকৃতি দুর্ব্বল হইলেই তাহার জোট ভাঙ্গিয়া যায়। জোট ভাঙ্গিলেই দোষ সকল দূরীভূত না হইয়া পুনরায় দেহাবদ্ধই হয়। জ্বরের দোষ এইরূপে দেহাবদ্ধ হইতে থাকিলে পরিণামে জীবনী-শক্তিকে ক্ষুণ্ণ করিয়া তাহার রোগ প্রতিরোধ করিবার ক্ষমতা হ্রাস করে। সর্ব্বসাধারণের ধারণা এই যে, জ্বর সামান্য ব্যাধি। কিন্তু সত্য ইহা ঠিক বিপরীত। কুচিকিৎসায় এই ব্যাধি তাহার যেমন নানা জটিল উপসর্গের সৃষ্টি করিয়া দুশ্চিকিৎস্য হইয়া পড়ে, অন্য কোন ব্যাধি সেইরূপ হইতে পারে না। এই কারণেই আয়ুর্ব্বেদ জ্বর-প্রকৃতির সহিত দ্বন্দ্ব করিতে অর্থাৎ দেহের মধ্যে গোলোযোগ বাধাইয়া চিকিৎসা করিতে পুনঃ পুনঃ নিষেধ করিয়াছেন। যাহা আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে নিষিদ্ধ, উন্নত এলোপ্যাথি চিকিৎসা-বিজ্ঞানে তাহাই করনীয়। এলোপ্যাথি চিকিৎসকগণের জ্বর চিকিৎসার রীতি লক্ষ্য করিলেই ইহার সত্যতা নির্দ্ধারণ করা যায়।

এলোপ্যাথি চিকিৎসা-বিজ্ঞান যাহাকে ম্যালেরিয়া জ্বর বলে, সেই জ্বরে প্রতি বৎসর কোটি কোটি বাঙ্গালী আক্রান্ত হয়। সেই জ্বরেই দেহোত্তাপ অত্যন্ত অধিক হয় বলিয়া গা দিয়া আগুন ছোটে। আর সেই সঙ্গে রস বৃদ্ধি বা চোখ-মুখ ফোলা, দাহ বা জ্বালা, তৃষ্ণা, ঘর্ম্ম, কম্প, অরুচি, গ্লানি, মত্ততা প্রভৃতি আরও কতকগুলি উপসর্গ বা জ্বরের স্বভাবের লক্ষণও প্রকটিত হইয়া থাকে। ইহারা সকলেই ম্যালেরিয়া জ্বরের আনুষঙ্গিক দোষ। ইহারা যাহাতে পরস্পরের সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া ধীরে ধীরে প্রশম হইয়া প্রকৃতিস্থ হইতে পারে, তাহার কোন উপায় বিধান না করিয়া কেবল দেহোত্তাপের উপরই তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিবদ্ধ করা হয়। ইহা প্রত্যক্ষ করিলে সুস্পষ্টভাবে বুঝা যায় যে, এলোপ্যাথি চিকিৎসকগণের কাছে দেহোত্তাপই যেন জ্বরের সর্ব্বস্ব অর্থাৎ উত্তাপই যেন রোগ-প্রকৃতি। দেহোত্তাপ অধিক হইলে মাথায় বরফের থলি (Ice bag) ও তাপ-নাশক ঔষধ প্রয়োগ করিয়া দেহোত্তাপ হ্রাস করিবারই চেষ্টা করা হয়। উত্তাপের মাত্রা হ্রাস হইলেই জ্বরের 'সাম' ও 'নিরাম' অবস্থা বিবেচনা না করিয়াই কঠোর ঔষধ কুইনাইন প্রয়োগ করিয়া একঢিলে দুই পাখী বধ করা হয়। একটী পাখী জ্বরের

প্রত্যক্ষ উপসর্গ উত্তাপ ও আর একটী পাখী আনুমানিক ম্যালেরিয়াল প্যারাসাইট (Malarial parasite)। আনুমানিক বলিবার কারণ এই যে, কোনও এলোপ্যাথিক চিকিৎসক ম্যালেরিয়া জ্বর চিকিৎসা করিবার পূর্ব্বে রক্ত পরীক্ষা করেন না। ইহাদের সকলেরই ধারণা এই যে, বঙ্গদেশবাসীর সাধারণ জ্বর মাত্রই ম্যালেরিয়া জ্বর। সুতরাং রক্ত মধ্যে 'প্যারাসাইট' থাকিতে বাধা। অসময়ে অর্থাৎ জ্বরের 'সাম' অবস্থায় কুইনাইন প্রয়োগ করিয়া জ্বরকে দমন করিলে অন্যান্য আনুষঙ্গিক দোষগুলি বিচ্ছিন্ন হইয়া বা পৃথক হইয়া যে যেখানে আশ্রয় পায় সে সেইখানেই আবদ্ধ হয়। তাহাতে দেহের মধ্যে যে গোলোযোগের সৃষ্টি হয় তাহারই প্রতিক্রিয়ার ফলে সদ্য জ্বরমুক্ত রোগী ক্ষুধামান্দ্য ও গ্লানির হাত এড়াইতে পারে না। সেই জন্য স্বাভাবিক স্বাচ্ছন্দ্যও অনুভব করিতে পারে না। যাহারা দুর্ব্বল, অর্থাৎ যাহাদের অগ্নিবল বা ক্ষুধা স্বভাবতই অল্প, তাহাদেরই ক্ষুধামান্দ্য ও গ্লানি অনেক দিন থাকে। জ্বরের দোষ অসময়ে দেহাবদ্ধ হইলে পুনর্ব্বার জ্বর হইবার প্রবল আশঙ্কা থাকে। কুইনাইন সেবন করিয়া যে জ্বরকে বিতাড়ন করা হয়, সেই জ্বরের বদ্ধদোষ সুযোগ পাইলেই যে ফিরিয়া আক্রমণ করে তাহা বঙ্গদেশবাসী মাত্রেই জানেন। যাহারা জ্বরাক্রান্ত হইলেই কুইনাইন সেবন করিয়া জ্বর মুক্ত হয় তাহারাই বার বার জ্বরে পড়ে আর তাহাদেরই জীবনীশক্তি ক্রমাগত ক্ষুণ্ণ হইতে থাকে। আর তাহারাই পরিণামে জটিল রোগে আক্রান্ত হইয়া অকালেই শ্মশানাভিমুখী হয়। উন্নত এলোপ্যাথি চিকিৎসা-বিজ্ঞানে জ্বরকে "a sympton of a disease" বা ব্যাধির একটী উপসর্গ বলে। জ্বর কোন ব্যাধির উপসর্গ নহে, ইহা স্বয়ং ব্যাধি। আয়ুর্ব্বেদ বলেন, জ্বর সামান্য ব্যাধি নহে সর্ব্বরোগাধিপতি। এলোপ্যাথি চিকিৎসা-বিজ্ঞানের মতবাদের মধ্যে যে একটা বিরাট অসম্পূর্ণতা আছে জ্বর রোগের কারণ উদ্‌ঘাটন করিলেই তাহা জানা যায়। জ্বরের কারণ এলোপ্যাথি চিকিৎসা-বিজ্ঞানে নাই বলিয়া আমাদিগকে আয়ুর্ব্বেদেরই আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে।

আয়ুর্ব্বেদের মতে আহার-বিহারের দোষে আমাশয়ের (Stomach) মধ্যে যে রসরূপী বা তরল দোষ সঞ্চিত হইতে থাকে তাহা পুঞ্জীভূত হইলে মলরূপে পরিণত হয়। সেই মল যখন বিকৃত বা দূষিত হইয়া আমরূপে পরিণত হয়, তখনই প্রথম ধাতু chylo বা রসকে বিকৃত করিয়া যে আমদোষ উৎপন্ন করে তাহাই অগ্ন্যাশয়স্থিত (Deodenum) পিত্তকে (Heat) প্রবল ভাবে উত্তেজিত করিয়া স্বস্থানচ্যুত করে। পিত্ত এইরূপে স্থানভ্রষ্ট হইলেই "স্রোত পথে" ধাবিত হইয়া সর্ব্বদেহে বিক্ষিপ্ত হয়। তাহার ফলেই জ্বর হয়। আধুনিক শরীর-তত্ত্ববিদ্‌রা স্বীকার করেন যে, একটী বিষের (Toxin) ক্রিয়া হইতে শরীরকে রক্ষা করিবার জন্য একটি Anti-toxin বা বিরুদ্ধ বিষ জ্বররূপে দেহ মধ্যে আবির্ভূত হয়। স্রোতের কথা পাশ্চাত্য শারীরতত্ত্ব গ্রন্থে উল্লিখিত না থাকিলেও দেহ মধ্যে অসংখ্য "স্রোত পথ" আছে। আমাদের ত্বক, মাংস, মেদ, অস্থি, মজ্জা, দেহ-যন্ত্রাদি, ইন্দ্রিয়াদি ও নখের মধ্যেও যে অসংখ্য pores বা সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ছিদ্র আছে পাশ্চাত্য শরীরতত্ত্ববিদ্ মাত্রেই তাহা স্বীকার করেন। বিশ্বনিয়ন্তা বিনা উদ্দেশ্যেই ইহাদের সৃজন করেন নাই। দেহের সপ্তধাতু গঠন-কালে রস, বায়ু, পিত্ত ও কফ যে সকল সূক্ষ্ম ছিদ্র পথে চলাচল করে, সেই সকল ছিদ্রপথগুলিকেই আয়ুর্ব্বেদে "স্রোত" নামে অভিহিত হইয়াছে। যে আমরসের দ্বারা জ্বরোৎপত্তি হয় তাহা প্রথমাবস্থায় কাঁচা থাকে। দেহ যত দিন এই অপক্ক বা কাঁচা রসের দ্বারা পরিপূর্ণ থাকে ততদিনই অন্যান্য উপসর্গগুলির সহিত শরীর ভার-ভার বোধ, চোখ-মুখ ফোলা ফোলা, অরুচি ও অগ্নিমান্দ্য প্রবল থাকে। ইহারা যে-কাল পর্য্যন্ত প্রবল থাকে সেই কাল বা সময়কে আয়ুর্ব্বেদে "সাম" অবস্থা বলে। জ্বরের অপক্করস জ্বরোত্তাপে অর্দ্ধপক্ক হইলে "সাম" দোষগুলি একে একে স্তিমিত হয়। তাহার ফলে রোগী যে অবস্থায় উপনীত হয়, আয়ুর্ব্বেদে তাহাকেই 'নিরাম' অবস্থা বলে। ভিন্ন ভিন্ন জ্বর-প্রকৃতির অপক্ক রস পূর্ণমাত্রায় পরিপক্ক হইতে বিভিন্ন সময় গ্রহণ করে। ভাবপ্রকাশ বলেন :—

বাতঃ পচতি সপ্তাহাৎ পিত্তঞ্চ দশভির্দিনৈঃ।
শ্লেষ্মা দ্বাদশভির্ব্বৈদ্যঃ পচ্যতে বদতাং বর॥

বাতিক জ্বরের অপক্কদোষ সাত দিনে, পৈত্তিক জ্বরের অপক্কদোষ দশ দিনে আর শ্লৈষ্মিক বা কফ জ্বরের অপক্কদোষ বার দিনে পরিপক্ক হয়।

ভিন্ন ভিন্ন জ্বর-প্রকৃতির অপক্কদোষ যে জ্বরোত্তাপে এবং

সময়ের মধ্যে পরিপক্ক হয়, তাহা হইতে না দিয়া অর্থাৎ অসময়ে ঔষধ প্রয়োগ করিয়া জ্বরকে দমন করিলেই আর তাহা পরিপক্ক হইতে পারে না, সেই জন্য উহা দেহ হইতে বাহির না হইয়া পুনরায় দেহাবদ্ধই হয়। দেহাবদ্ধ জ্বরের দোষ সামান্য ত্রুটীতেই প্রবল হইয়া আবার দেহ আক্রমণ করে। এই কারণেই আয়ুর্ব্বেদে "সাম" অবস্থায় ঔষধ প্রয়োগ করার নিষেধ আছে। রোগীর যদি অধিক পিপাসা, অত্যন্ত দাহ, অতিরিক্ত ঘর্ম্ম, অতিশয় মাথা ব্যথা ও ঘন ঘন বমন হয়, কিম্বা অধিক অরুচি, মলবদ্ধতা, মূত্ররোধ বা শ্বাস, কাস ও হিক্কা থাকে তাহা হইলেই "সাম" অবস্থায় কেবল উপদ্রব-নিবারক ঔষধ প্রয়োগ করা চলে। জ্বর সামান্য ব্যাধি নহে। ইহার ক্রিয়াও সাধারণ নহে। সেই জন্য ইহার চিকিৎসাও একটু অসাধারণ হইয়া থাকে। জ্বর চিকিৎসার নিয়ম এই যে,—

জ্বরাদৌ লঙ্ঘনং প্রোক্তং জ্বর মধ্যেতু পাচনম্।
জ্বরান্তে ভেষজং দদ্যাদ্ জ্বর মুক্তে বিরেচনম্॥

জ্বরের প্রথমাবস্থায় লঙ্ঘন বা উপবাস, মধ্যমাবস্থায় পাচন, রোগী জ্বরমুক্ত হইলে জ্বরঘ্ন ঔষধ সেবন করাইয়া শেষে একটী জোলাপ দিতে হয়।

নবজ্বর যাহা চারি পাঁচ দিনের মধ্যেই সারিয়া যায়, সেই জ্বরে কোন ঔষধ সেবন করিতে নাই। কাহার নবজ্বর, কাহার দোষজ-জ্বর তাহা গৃহস্থেরা নির্ণয় করিতে পারেন না। সেই জন্য জ্বররোগে দুই একদিন উপবাস ও চারি পাঁচদিন ঔষধ সেবন না করিবার প্রথা পূর্ব্বে প্রচলিত ছিল। বর্ত্তমানে অতি-বুদ্ধিজীবিগণই ইহার ব্যতিক্রম ঘটাইয়াছেন। ঔষধ সেবন না করিয়া নবজ্বরকে যে বিতাড়ন করা যায়, তাহা নিরক্ষর দরিদ্র পল্লীবাসীমাত্রেই ভাল করিয়া জানেন। জ্বর রোগে কোন ঔষধ সেবন ও কুপথ্য না করিলে তাহার অপক্ক দোষগুলি পরিপক্ক হইবার সুযোগ প্রাপ্ত হয় বলিয়া সামান্য কিছু দেহাবদ্ধ ও অধিকাংশই কোষ্ঠে গমন করিয়া শেষে মল ও মূত্রপথে ধীরে ধীরে বাহির হইয়া যায়। কিন্তু যথাসময়ে ঔষধ সেবন ও শেষে একটী জোলাপ লইলে সমস্ত দোষই বাহির হইয়া যায়। এক দোষজ বাতিক জ্বরে প্রথম দুই এক দিন উপবাস করিয়া পরে লঘু পথ্যই আহার করিতে হয়। চতুর্থদিন হইতে লক্ষণোপযোগী পাচন খাইতে হয়। পৈত্তিক জ্বরে পঞ্চমদিন ও শ্লৈষ্মিক জ্বরে ষষ্ঠদিন হইতে পাচন সেবন করিতে হয়; কিন্তু দ্বিদোষজ বা দ্বন্দ্বজ জ্বরে আরও বিলম্বে পাচন সেবন করিতে হয়। বাত পৈত্তিক দ্বন্দ্বজ জ্বরে অষ্টম দিবস, বাত শ্লৈষ্মিক দ্বন্দ্বজ জ্বরে নবম দিবস ও পিত্ত-শ্লৈষ্মিক দ্বন্দ্বজ জ্বরে একাদশ দিবস হইতে পাচন খাইতে হয়। সান্নিপাত জ্বরে পঞ্চদশ দিবস হইতে পাচন দিতে হয়। রোগী যতদিনে জ্বরমুক্ত না হয়, তত দিন পাচনই দিতে হয়। জ্বর অন্তে জ্বরঘ্ন ঔষধ সেবন করাইয়া শেষে একটা আয়ুর্ব্বেদীয় জোলাপ সেবন করাইয়া দেহ শুদ্ধ করিতে হয়। এক দোষজ জ্বরে পাঁচ ছয়দিন, দ্বন্দ্বজ জ্বরে দশ বারদিন ও সান্নিপাত জ্বরে রোগীর অবস্থা বিবেচনা করিয়া কিছুকাল যাবত জ্বরঘ্ন ঔষধ সেবন করাইয়া রোগী একটু সবল হইলে জোলাপ দিতে হয়। ষোল বৎসরের ন্যূন কোন রোগীকেই জোলাপ দিতে নাই। এইরূপ সুচিকিৎসার দ্বারা সর্ব্বরোগাধিপতি জ্বর চিকিৎসিত হইলে সমস্ত দোষ নির্দ্দোষভাবে দূরীভূত হয় বলিয়া বায়ু পরিবর্ত্তনের কোনই প্রয়োজন হয় না। বাঙ্গালী দিন দিন যত শিক্ষিত এবং সুসভ্য হইয়া অতি-বুদ্ধিজীবী হইতেছে, ততই অধৈর্য্য হইয়া পড়িতেছে। সর্ব্বরোগাধিপতি জ্বরকে শীঘ্র শীঘ্র বিতাড়ন করিবার জন্য যেদিন হইতে বাঙ্গালী আয়ুর্ব্বেদের অমূল্য উপদেশকে অগ্রাহ্য করিয়া বিজাতীয় চিকিৎসার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে, সেইদিন হইতেই তাহাদের স্বাস্থ্যহানী ঘটিবার সূত্রপাত হইয়াছে। সুশ্রুত বলেন:—

ভেষজং হ্যাম দোষস্য ভুয়োঃ জ্বলয়তি জ্বরম।
শোধনং শমনীয়ন্তু করোতি বিষম জ্বরম॥

জ্বরের "সাম" অবস্থায় বা প্রথমোবস্থায় ঔষধ প্রয়োগ করিলে পুনর্ব্বার জ্বর হয়। এই অবস্থায় জোলাপ ও জ্বর-নাশক ঔষধ প্রয়োগ করিলে বিষম জ্বরই উৎপাদন করে। চরক বলেন:—

স্তব্ধেষু দোষেষু যস্তথা বিনিবর্ত্ততে।
স্বল্পেনাপ্যপচারেণ তস্য ব্যবর্ত্ততে পুনঃ॥
চিরকালং পরিক্লিষ্টং দুর্ব্বলং দীন চেতসম্।
অচিরে নৈব কালেন সহন্তি পুনরাগতঃ॥
অথবাপি পরিপাকং ধাতুষেব ক্রমাত্মনা।
যান্তি জ্বরম্ কুর্ব্বন্তে তথাপান্তু কুর্ব্বতে।
দীনতাং শরথুগ্লানিং পাণ্ডুতাং নান্নকামতাম্।
কণ্ডাং কোঠ পিড়কাঃ কুর্ব্বন্ত্যগ্নিকতে মৃদুম্।

জ্বরের দোষগুলি অসময়ে এবং অনুচিতরূপে বিতাড়িত

বা স্বস্থানচ্যুত হইলে তাহা সামান্য অনাচারেই আবার ফিরিয়া আক্রমণ করে। এইরূপে যে জ্বর পুনঃ পুনঃ দেহ আক্রমণ করে সেই জ্বর রোগীকে অনেকদিন ভোগাইয়া শেষে নিস্তেজ ও অবসন্ন করিয়া বধ করে। দেহাবদ্ধ দোষ জ্বর উৎপাদন করিতে না পারিলে ক্রমে ক্রমে সপ্ত ধাতু ক্ষয় করিয়া পরিপক্ক হয়। তাহাতে দীনতা (দুর্ব্বলতা), শোথ, গ্লানি, চুলকানি, উৎকোঠ (গায়ে চাকা চাকা দাগ), পিড়িকা (ফোড়া), পাণ্ডুতা, অরুচি ও অগ্নিমান্দ্য উৎপন্ন করে।

বঙ্গদেশবাসীর স্বাস্থ্যহীনতার একটী প্রবল ও প্রধান কারণই যে জ্বর-রোগে কুইনাইন সেবন, আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্র পাঠ করিলেই তাহা বুঝা যায়। বাঙ্গালী যতদিন জ্বর-রোগে কুইনাইন স্পর্শ করে নাই ততদিন তাহাদের স্বাস্থ্য ভালই ছিল। বঙ্গদেশবাসীর স্বাস্থ্য সম্বন্ধে "আইনী অকবরী" গ্রন্থে লেখা আছে, "এই বিশাল দেশ জলবায়ুর সমতায় এবং অধিবাসী-বৃন্দের অঙ্গ-সুষমায় অতুলনীয়"। ইংরাজ-রাজত্বের পূর্ব্বে এবং প্রাক্কালে বাঙ্গালীর স্বাস্থ্য যে অখণ্ড এবং অক্ষুণ্ণ ছিল তাহা বহু নিরপেক্ষ বিদেশী পরিদর্শকের মুখেই আমরা অবগত আছি। ১৮০৭ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গলার তদানীন্তন গভর্ণর (Governor) বাঙালীর স্বাস্থ্য সম্বন্ধে যাহা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন তাহা বাঙ্গালী মাত্রেরই প্রণিধানযোগ্য বলিয়া নিম্নে উদ্ধৃত হইল :—

"আমি বাঙ্গালীর ন্যায় সুশ্রী জাতি কখনও দেখি নাই। মান্দ্রাজিদিগের শরীরের সুখ্যাতি আমি পূর্ব্বে করিয়াছি। কিন্তু বাঙ্গালীর গঠন তাহা অপেক্ষা অনেক শ্রেষ্ঠ। মান্দ্রাজিরা ক্ষীণকায়। বাঙ্গালীর গঠন উন্নত, পেশল ও মল্লোজনোচিত এবং নিখুঁত। বাঙালীর মুখশ্রী অতিশয় সুন্দর এবং তাহা প্রাচীন রোমক ও গ্রীকদিগের মূর্ত্তির অনুরূপ।"

স্বর্গীয় অক্ষয়কুমার দত্ত তাঁহার 'ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়' নামক পুস্তকে লিখিয়াছেন, "পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে বঙ্গদেশে যেরূপ বলবান লোক ছিল এখন তাহার কিছুই নাই।"

ইহার মূলে কুচিকিৎসারই প্রভাব দৃষ্ট হয়। কুচিকিৎসার দ্বারা জ্বর মুক্ত হইলে বহু দোষ দেহাবদ্ধ হইয়া থাকে। দেহাবদ্ধ দোষ জ্বরোৎপাদন করিতে না পারিলে সপ্তধাতুক আক্রমণ করিয়া জীবনীশক্তিকে হ্রাস করে। ইহার হ্রাস হইলেই ব্যাধির প্রাবল্য হয়। ব্যাধির প্রাবল্য হইলেই মানুষ ঘন ঘন রোগাক্রান্ত হয়। রোগ সুচিকিৎসার দ্বারা নির্দ্দোষভাবে নিরাময় না হইলে পরিণামে জটিলাকার ধারণ করিয়া মারাত্মক ব্যাধিই উৎপাদন করে। দেশে জটিল রোগের প্রাদুর্ভাব হইলে অকাল মৃত্যুর সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে থাকে। অদূর ভবিষ্যতে তাহাই জাতিকে শ্মশানাভিমুখী করিয়া ধ্বংস করে। তিনচার পুরুষ ধরিয়া কুইনাইন সেবনের ফলে বাঙ্গালী নানারোগের আকর হইয়া স্বাস্থ্যহীনতার গভীর পঙ্কেই নিমজ্জিত হইয়াছে। ম্যালেরিয়া-জ্বরের সহিত স্বাস্থ্যহীনতার যে ঘনিষ্ট সম্বন্ধ আছে তাহা সকলেই স্বীকার করেন। কিন্তু জ্বর রোগে কুইনাইন সেবনের সহিত স্বাস্থ্যহীনতার সম্বন্ধ আছে কি না সেই বিষয়েই মতভেদ দৃষ্ট হয়। যাঁহারা ব্যাধিগ্রস্থ হইলেই বা দেহের উপর ব্যাধির ছায়াপাত হইলেই চিকিৎসকের পদতলে লুণ্ঠিত হ", তাহারা যাহার উচ্চ-শিক্ষিত ও সুসভ্য হইলেও তাঁহাদের মতামতের মূল্য কানাকড়িও নহে। এলোপ্যাথি চিকিৎসক, যাঁহারা বর্ত্তমানে চিকিৎসা-জগতের শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়া আছেন তাঁহাদের মতামতের মূল্য আছে কি না তাহাই আমাদিগকে বিচার করিয়া দেখিতে হইবে। ইহাঁরাই যত ভিন্ন ভিন্ন জ্বর-প্রকৃতি প্রত্যক্ষ এবং চিকিৎসা করিবার সুযোগ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, বঙ্গ দেশের কোন চিকিৎসক তত রোগ এবং রোগীর মুখ দেখিতে পান না। এলোপ্যাথি চিকিৎসক মাত্রেই জানেন জ্বর রোগে কুইনাইন প্রয়োগ করিলেই পুনর্ব্বার জ্বর হইবার প্রবল আশঙ্কা থাকে। তাহা সত্বেও যখন তাহারা জ্বর রোগে ঐ কুইনাইনেরই ব্যবস্থা প্রদান করিতে কিছুমাত্র ইতস্ততঃ করেন না, তখন এই সন্দেহ মনের মধ্যে উদয় হয় যে, নিশ্চয় ইহার কোন কারণ আছে। কারণের মূল অনুসন্ধান করিলে জানা যায় যে, এলোপ্যাথি চিকিৎসা নিদানে **কুইনাইন ভিন্ন জ্বর দমনকারী দ্বিতীয় ঔষধ আর নাই**। এই "সবে ধন নীলমণি" ব্যতীত যাঁহাদের গত্যন্তর নাই তাঁহাদের মতামতের মূল্য আছে কি না পাঠকবর্গেরাই তাহার মীমাংসা করিবেন। কি কারণে প্রতিবৎসর কোটি কোটি বাঙ্গালী ম্যালেরিয়া জ্বরে আক্রান্ত হয়, একটু গভীর ভাবে অনুসন্ধান করিলেই তাহার স্বরূপ উদ্ঘাটন করা যায়।

ইটালিয়ান (Italian) শব্দ Mala-aria বা দূষিত-বায়ু হইতে ইংরাজি ম্যালেরিয়া (Malaria) শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে। ইংরাজি অভিধানে দেখা যায় যে, আর্দ্র ভূমি হইতে এক প্রকার দূষিত বায়ু উৎপন্ন হইয়া যে কম্পজ্বর উৎপাদন করে তাহাকেই ম্যালেরিয়া (Malaria) বলে। যে ভাষা হইতেই এই শব্দের উৎপত্তি হউক না কেন তাহা যে এখন দূষিত-বায়ু বোধক অর্থে ইংরাজী ভাষায় ব্যবহৃত হইতেছে তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। দূষিত বায়ুর সহিত ম্যালেরিয়া জ্বরের যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে তাহা সপ্রমাণ করা যায়।

বর্দ্ধমান, হুগলী ও হাওড়া জেলার অন্তর্গত আশী মাইল দীর্ঘ "দামোদর বাঁধ", মুর্শিদাবাদ জেলার অন্তর্গত "নালতে কুঁড়ের বাঁধ" ও পূর্ব্ববঙ্গে রেলপথ নির্ম্মাণের ব্যয় লাঘব করিবার জন্ম নদী ও খালগুলিকে অর্দ্ধেক ভরাট করিয়া যে সকল সেতু নির্ম্মিত হইয়াছে, তাহা হইবার পূর্ব্বে বঙ্গদেশের কুত্রাপি ম্যালেরিয়া জ্বরের নামগন্ধও ছিল না। বঙ্গভূমির তুল্য বিশাল বদ্বীপ বা নিম্নভূমি পৃথিবীর কুত্রাপি দৃষ্টিগোচর হয় না। নদী-মাতৃক বিশাল নিম্নভূমির অবাধ জল-প্রবাহ এইরূপে অবরুদ্ধ হইলে দেশের বহু নদী ও বহমান খালগুলি বদ্ধ স্রোত হইয়া প্লাবনের পথ চিরকালের জন্ম রুদ্ধ করে। তাহাতে পশ্চিম বঙ্গে যে পরিস্থিতির উদ্ভব হয় তাহার ফলেই প্রতিবৎসর পলি পড়া বন্ধ, সঞ্চিত আবর্জ্জনাদি ধৌত ও পরিষ্কৃত হইবার পথও রোধ হয়। নিম্নভূমি বা আর্দ্রভূমি প্রতিবৎসর একস্তর পলিমাটীর দ্বারা আবৃত না হইলে তাহার রস শোষণ ও দুর্গন্ধ নাশ বা শোধন করিবার ক্ষমতা বিশেষ ভাবে ক্ষুণ্ণ হয়। দেশের সঞ্চিত আবর্জ্জনাদি বৃষ্টির জলে ভিজিয়া ভিজিয়া অত্যন্ত রসপুষ্ট হইয়া থাকে। বর্ষাকালে আকাশ প্রায় মেঘাচ্ছন্ন ও মাঝে মাঝে প্রবল বৃষ্টিপাত এবং শীতল বায়ু প্রবাহিত হয় বলিয়া যথোচিত উত্তাপের অভাবে তাহা পচিয়া উঠিতে পারে না। শরৎকালের মেঘমুক্ত আকাশ ও খরসূর্য্যোত্তাপে সিক্ত আবর্জ্জনাদি যখন উত্তমরূপে পচিয়া উঠে তখন পলিহীন আর্দ্রভূমি আর ঐ পচাগলা আবর্জ্জনাদির দুর্গন্ধ যুক্ত রস শোষণ করিতে ও শোধন করিতে পারে না। সেই জন্ম সমস্ত পচা রস পরিণামে বাষ্পাকারে ঊর্দ্ধে উঠিয়া বায়ুর সহিত মিশ্রিত হয়। ইহাই Mala aria বা দূষিত বায়ু। ইহার সহিত ম্যালেরিয়া জ্বরের নিগূঢ় সম্বন্ধ আছে।

১৮৫২ খৃষ্টাব্দে "দামোদর বাঁধ" নির্ম্মিত হয়। তাহার ফলেই হুগলী জেলার সদর ও শ্রীরামপুর এই দুইটী মহকুমার সমস্ত খাল ও নদী বদ্ধস্রোত হইয়া পড়ে। বাঁধ-নির্ম্মাণের দুই বৎসর পরেই উপরোক্ত দুইটী মহকুমার বায়ু দূষিত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই ম্যালেরিয়া রাক্ষসী যে বিকট মুখ-ব্যাদন করিয়া উঠে এ পর্য্যন্ত তাহার কোন পরিবর্ত্তন ঘটে নাই অর্থাৎ যেমন ছিল তেমনিই আছে। আধুনিক ম্যালেরিয়া-বিশেষজ্ঞেরা দূষিত বায়ুকে আমলই দিতেছেন না। সকলেই মুক্তকণ্ঠে বলিতেছেন যে ম্যালেরিয়া জ্বরের মূল কারণ "ম্যালেরিয়াল প্যারাসাইট" (Malarial parasites)। বঙ্গদেশে যে বৎসর প্রচুর বৃষ্টিপাত হয় সেই বৎসর ম্যালেরিয়ার প্রাদুর্ভাব হয় না, কিন্তু যে বৎসরে বৃষ্টিপাত অল্প হয় সেই বৎসরে ঘরে ঘরে ম্যালেরিয়ার তাণ্ডব নৃত্য দেখা যায়। বঙ্গদেশের যে সকল অঞ্চল আজ ও নবজল প্রবাহে নিমগ্ন হয় সেই সকল অঞ্চলে এ দুর্দ্দিনেও যখন ম্যালেরিয়ার প্রাদুর্ভাব দেখা যায় না তখন ইহাই প্রমাণিত হয় যে ম্যালেরিয়া জ্বরের সহিত দূষিত বায়ুর সম্বন্ধ আছে।

শরৎকালেই Mala-aria বা দূষিত বায়ু উৎপন্ন হয়—শরৎকালেই ম্যালেরিয়া জ্বরের প্রাদুর্ভাব হয়। শরৎকালেই কেন এই জ্বরের প্রাদুর্ভাব হয়, অন্য ঋতুতে কেন হয়না তাহার কি কোন কারণ নাই? পাশ্চাত্য-দেশীয় উন্নত চিকিৎসা-বিজ্ঞান ও স্বাস্থ্য-বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় কোন গ্রন্থে ইহার কোন উল্লেখ না থাকিলেও আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে তাহা আছে। আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রকারেরা বলেন শরৎকালের বায়ু প্রকৃতির নিয়মে অত্যন্ত রসপুষ্ট ও উষ্ণ হয়। বায়ু পরীক্ষা করিলেই ইহার সত্যতা নির্দ্ধারণ করা যায়। রসপুষ্ট উষ্ণ বায়ু প্রতিমুহূর্ত্তে নিশ্বাস রূপে দেহ মধ্যে প্রবিষ্ট হইলে দেহাশ্রিত Heat বা উত্তাপ বা পিত্ত কুপিত হইয়া উঠে। ইহার সহিত দূষিত বায়ু যুক্ত হইয়া দেহ মধ্যে প্রবিষ্ট হইলে দেহাশ্রিত বায়ুও কুপিত হইয়া উঠে। বায়ু ও পিত্ত একযোগে কুপিত হইলে তাহাদের সামঞ্জস্য রক্ষার জন্ম কফকে ও অধিক উত্তেজিত হইতে হয়। এই কারণেই শরৎকালে আহার বিহারের ক্রটী হইলেই বঙ্গবাসী জ্বরাক্রান্ত হয়। বায়ু ও পিত্ত কুপিত হইয়া

যে দ্বন্দ্বজ জ্বর উপাদন করে এলোপ্যাথি চিকিৎসা বিজ্ঞান তাহার স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করিতে না পারিয়া ম্যালেরিয়া জ্বর নামে অভিহিত করিয়াছে। আর বর্ত্তমানে ইহাকে ম্যালেরিয়াল প্যারাসাইট (Malarial parasite) কৃত ব্যাধি বলিতেছে। প্যারাসাইট (Parasite) মানব দেহে প্রবিষ্ট হইয়া জ্বর উৎপাদন করে। ইহারা স্বয়ং সাক্ষাৎ ভাবে মানব দেহে প্রবিষ্ট হয় না বা হইতে পারে না। দেহ হইতে দেহান্তরে প্রবিষ্ট না করাইলে বা নিক্ষিপ্ত না হইলে উহারা কিছুই করিতে পারে না। এনোফিলিস (Anopheles) জাতীয় মশকেরাই ম্যালেরিয়া রোগীর দেহ হইতে প্যারাসাইট (Parasite) সংগ্রহ করিয়া সুস্থ শরীরে সঞ্চারিত করিয়া রোগ বিস্তারে সহায়তা করে। জলে, স্থলে ও বায়ু মধ্যে ইহাদের খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। একমাত্র মানব দেহেই ইহাদের আশ্রয় স্থান। ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে যে দেশে ম্যালেরিয়ার অস্তিত্বই ছিল না সেই দেশে যে লোকটী সর্ব্বপ্রথম জ্বরে আক্রান্ত হয়, তাহার দেহ মধ্যে যে প্যারাসাইট (parasite) প্রবিষ্ট হয়, সেই জীবাণু কোথা হইতে আবির্ভূত হয়? প্রকৃত কথা এই যে ম্যালেরিয়াল প্যারাসাই (Malarial parasite) বাহির হইতে আসিয়া দেহের মধ্যে প্রবিষ্ট হয় না। ইহারা দেহেরই বস্তু বলিয়া সুযোগ পাইলেই রক্তমধ্যে নাচিয়া বেড়ায়। ইহারা সাক্ষাৎ ভাবে যে রোগোৎপাদন করিতে পারে না তাহা প্রমাণ করা কঠিন নহে।

যাঁহারা Zoology বা প্রাণী-বিজ্ঞান অনুশীলন করিয়াছেন তাঁহারা সকলেই জানেন যে মানুষের Intestine বা অন্ত্র বা নাড়ীভুঁড়ি মধ্যে নানাজাতীয় বহু জীবাণু বাস করে। ইহারা জন্ম হইতে মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত মানব দেহে অবস্থান করে। ইহারা এত ক্ষুদ্র হয় যে একবিন্দু রক্ত মধ্যে বহু জীবাণুর স্থানাভাব হয় না। অনুবীক্ষণ যন্ত্র ব্যতিরেকে ইহাদের দেখাই যায় না। ইহারা অতি ক্ষুদ্র জীব বলিয়া রক্তস্রোতে প্রবাহিত হইয়া দেহের সর্ব্বত্র গমন করিতে পারে। সুশ্রুত গ্রন্থে বহু জীবাণুর উল্লেখ আছে। মহাত্মা হ্যানিম্যান (Hahneman) ইহাদের "সোরা" (sora) নামে অভিহিত করিয়াছেন। আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে ইহারাই "জরমৃত্যুকারী" জীবাণু নামে অভিহিত হইয়াছে। সর্ব্বনিম্ন পর্য্যায়ের এক-কোষক (unicellular) নগণ্য জীব। এক কোষক জীবমাত্রেই দ্বিধা বিভক্ত হইয়া বংশ বৃদ্ধি করে। যাহারা এক হইতে দুইতে দুই, দুই হইতে চারি এইরূপে ক্রমাগত বিভক্ত হইয়া সংখ্যা বৃদ্ধি করে, তাহাদের মরণ হয় না অর্থাৎ অমর হইয়া থাকে। ইহারা অন্ত্রস্থিত রস-মধ্যে বাস ও সেই রস আহার করিয়া জীবনধারণ ও বংশবৃদ্ধি করে। দেহাবদ্ধ সঞ্চিত রস যখন পুঞ্জীভূত হইয়া মলরূপে পরিণত হয় তখনই জীবাণুগুলি আনন্দে মাতোয়ারা হইয়া উঠে। জীব মাত্রেরই চরম লক্ষ্য বংশবৃদ্ধি। জীবাণুর আনন্দ বৃদ্ধি বলিতে বংশবৃদ্ধিকেই বুঝায়। মল-মধ্যে ইহাদের বংশবৃদ্ধি অতি দ্রুত বেগেই হয়। ইহাদের দেহ হইতে এক প্রকার Toxin বা বিষ নিসৃত হয়। আর সেই বিষই জরা-মৃত্যুর কারণ। পারদ বা গন্ধকের দ্বারা ইহাদের দমন করিয়া রাখা যায় বলিয়া আয়ুর্ব্বেদীয় সকল ঔষধেই "হিঙ্গুলোত্থ কজ্জলি" মিশ্রিত করিবার উপদেশ আছে। "মকরধ্বজ" শ্রেষ্ঠ জীবাণু দমনকারী ঔষধ। যাহাদের দেহ হইতে বিষ নিসৃত হয় মলমধ্যে তাহাদের সংখ্যা দ্রুতগতিতে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে থাকিলে বিষের পরিমাণও সঙ্গে সঙ্গে বাড়িয়া উঠে। তাহার ফলেই দেহাবদ্ধ পুঞ্জীভূত মল শীঘ্র শীঘ্র বিকৃত বা দোষযুক্ত হইয়া উঠে। ইহা বিকৃত হইলেই মলাশ্রিত বায়ু, পিত্ত ও কফ ব্যাধিরূপে অধিষ্ঠিত হয়। মল বিকৃত বা দোষযুক্ত হইয়া রোগোৎপাদন করে তখন যে প্রকৃতির মল যে জীবাণুর অনুকূল হয় সেই মলমধ্যে সেই জীবাণুর আহ্লাদ অতিমাত্রায় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় বলিয়া তাহারা আনন্দে উন্মত্ত হইয়া ছুটাছুটি করে। ঠিক সময়েই উহাদের রক্তস্রোতে নাচিয়া বেড়াইতে দেখা যায়। তাহার পূর্ব্বে একটী জীবাণুর চিহ্নও রক্ত-মধ্যে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। নর্দ্দমার কৃমিগুলি যেমন নর্দ্দমার ময়লাই ভালবাসে, বিষ্ঠার কৃমি যেমন বিষ্ঠাই ভালবাসে, সিক্ত রুটির উপর যে ছাতা পড়ে, সেই ছাতার কৃমিগুলি যেমন সিক্ত রুটিই ভালবাসে, সেইরূপ অন্ত্রস্থিত জীবাণু যাহাদের ম্যালেরিয়া-বিশেষজ্ঞেরা "ম্যালেরিয়াল প্যারাসাইট" (Malarial parasite) নামে অভিহিত করিতেছেন, তাহারাই কম্প জ্বরের মল ভালবাসে বলিয়া জ্বর কালিন মলপূর্ণ রক্ত মধ্যে নাচিয়া বেড়ায়। নর্দ্দমার কৃমিগুলি যেমন নর্দ্দমার মল উৎপাদন করিতে পারে না, বিষ্ঠার কৃমিগুলি যেমন বিষ্ঠা উৎপাদন করিতে পারে না, সেইরূপ ম্যালেরিয়াল প্যারাসাইটও (Malarial parasite) কম্প-জ্বর (Malaria) উৎপাদন করিতে পারে না। ব্যাধি মাত্রেই ত্রিগুণাত্মিকা—বায়ুপিত্ত ও কফের দ্বারাই গঠিত হয়। এলোপ্যাথি চিকিৎসা-বিজ্ঞান বিভ্রান্ত হইয়া যাহাকে ম্যালেরিয়া জ্বর বলিতেছে তাহা বাত-পৈত্তিক জ্বর। [ক্রমশঃ]

বঙ্গশ্রীর পুনরাবির্ভাব

ঈশ্বর-কৃপায় আবার 'বঙ্গশ্রী' বাহির হইল। তিনি ইচ্ছা করিলে আবার ইহা চলিবে। 'বঙ্গশ্রী'র উদ্দেশ্য সকলের বোধগম্য না হইলেও, ইহার আদর্শ অনেকের পক্ষেই তিক্ত ও দুর্ব্বোধ্য মনে হইলেও, ইহার আদর্শের তুলনায় এখনও একশ্রেণীর লোক উচ্চতর আদর্শ কিছুই কল্পনা করিতে পারেন না। অন্ততঃ তাঁহাদের ক্ষোভের কারণ অন্তর্হিত হইল।

অনেকের নিকট 'বঙ্গশ্রী'র কষাঘাত দুঃসহ মনে হয়। কিন্তু যাহাতে সুবুদ্ধি ফিরিয়া আসে তাহা কঠোর হইলেও সর্ব্বথা পালনীয়। ব্যাধির উপসম তিক্ত ঔষধেই হইয়া থাকে।

'বঙ্গশ্রী' কোন সাম্প্রদায়িক সংগঠনের পক্ষপাতী নহে। ইহার ধর্ম্ম 'মানব ধর্ম্ম'। ইহা হিন্দুরও নহে, মুসলমানেরও নহে, খ্রীষ্টানেরও নয়, আবার ইহা সকলেরই। যাহা সমগ্র মানবজাতির পক্ষে প্রযোজ্য, তাহার প্রচারকার্য্যই ইহার একমাত্র ব্রত। তাই 'বঙ্গশ্রী' হিন্দুমহাসভা ও মোসলেম লীগ প্রভৃতি সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠানের প্রতি বিরূপ। যে সকল কংগ্রেস নামধেয় ব্যক্তি কংগ্রেসের ধ্বজাও ধরেন, আবার মহাসভার আনাচে কানাচেও ঘোরেন, তাঁহারা 'বঙ্গশ্রী'র প্রতি কটাক্ষ করিতে পারেন, কিন্তু তাঁহারা ইহার হাত এড়াইতে পারিবেন না। আবার যাঁহারা কংগ্রেসের শাসন মানিবেন না, অথচ আপনাদিগকে কংগ্রেস-নেতা বলিয়া পরিচয় দিবেন তাঁহাদেরও 'বঙ্গশ্রী'র হাতে নিস্তার নাই। মোট কথা, ভণ্ড বা মিথ্যা আস্ফালনকারীর নিকটে 'বঙ্গশ্রী' বরাবরই দুঃসহ থাকিবে।

সাম্প্রদায়িক 'লীগের' পক্ষপাতী না হইলেও 'বঙ্গশ্রী' সর্ব্বজাতির প্রতি সমভাবাপন্ন, হিন্দু মুসলমানে সমদর্শী। বহু শতাব্দী ধরিয়া হিন্দু-মুসলমান এই দেশে বাস করিতেছে, এই দেশেরই জল, মাটী, আলো, বায়ু সমভাবে উপভোগ করিতেছে, এই ভূমিতে এক ছাড়িয়া আর একটীর প্রাধান্য সম্ভব নয়। এই হিন্দু মুসলমানের দেশে হিন্দু মুসলমানকে সমভাবে না দেখিয়া যিনি প্রজায় প্রজায় বিভেদ সৃষ্টি করিবেন, তিনি পাপগ্রস্ত হইবেন।

এই সমদর্শিতায় 'বঙ্গশ্রী' মনে করে এ পর্য্যন্ত মুসলমানের অভাব অভিযোগ বা অজ্ঞানতার সুবিধা লইয়া আমরা যে চাকুরীর বাজার প্রায় একচেটিয়া করিয়া রাখিয়াছিলাম, সেদিন অস্তমিত দেখিয়া যিনি দুঃখিত হইবেন তিনি অসমদর্শী। বঙ্গশ্রী সেই অসমদর্শিতার ঘোর বিরোধী। তথাকথিত ব্রাহ্মণ-প্রধান ভারত যে মুসলমান এবং অন্তর্জ্জাতির উপর ঘৃণ্য আচরণ প্রদর্শন করিয়া থাকেন তাহাও 'বঙ্গশ্রী'র তীব্র প্রতিবাদের বিষয়।

'বঙ্গশ্রী' জাতীয় মহাসম্মিলনের বিরোধী নহে। 'বঙ্গশ্রী' মনে করে কংগ্রেসই একমাত্র জাতীয় প্রতিষ্ঠান। ইহার দ্বারা যথেষ্ট কাজ হইতে পারে। কিন্তু 'বঙ্গশ্রী' মনে করে কংগ্রেস ভ্রান্ত পথে চলিতেছে; ইহার কার্য্যকর্ত্তাগণ জনসাধারণকে প্রকৃত পন্থা প্রদর্শনে ও সেই দিকে পরিচালনা করিতে অক্ষম। ইহার কার্য্যপ্রণালীর পরিবর্ত্তন অবশ্য কর্ত্তব্য। আজ কেবল 'স্বাধীনতা' 'স্বাধীনতা' বলিয়া চীৎকার না করিয়া যদি কংগ্রেস অন্ন-সমস্যা ও অভাবকে কেন্দ্র করিয়া কর্ম্মপদ্ধতি নির্ণয় করে, তবে সমগ্র ভারতবাসী এক সূত্রে গ্রথিত হইয়া যে শক্তিসঞ্চয় করিবে, শক্তিসঞ্চয় করিয়া সমস্বরে যে ভীষণ নাদ উত্থিত করিবে, সেই দুর্ব্বার আহ্বান উপেক্ষা করিবার কাহারও সাধ্য নাই। আর স্বাধীনতাও তখন আপনা হইতেই আমাদের করতলগত হইবে।

বেশী দিনের কথা নয়—এই সুজলা, সুফলা, শস্যশ্যামলা দেশেই এমন প্রচুর শস্য উৎপাদিত হইত, তাহাতে গৃহস্থ নিজে খাইয়া যাহা উদ্বৃত্ত রাখিত, তাহার বিনিময়ে সে অন্যান্য জিনিষ পাইয়া অভাব দূর করিত। কৃষক ছয় মাস কৃষিকাজ করিয়া বাকী ছয় মাস অন্যান্য হস্ত-শিল্প-জাত দ্রব্য তৈয়ার করিয়া নিজের ও সমাজের উপকার সাধন করিত। আজ আমাদের কেন কৃষি বিনষ্ট হইল, কেন পূর্ব্বের ন্যায় জমি আর উর্ব্বরতাগুণে শস্য উৎপাদন করিতে পারে না, হস্তশিল্পে

কাহারও কেন আস্থা নাই—আজ অভাব, অভিযোগ, দুর্ভিক্ষ অন্নাভাব ভীষণ বাঘিনীর ন্যায় মুখব্যাদান করিয়া কেন এই কঙ্কালসার জাতিকে গ্রাস করিতে সমুদ্যত হইয়াছে তাহা কেহই ভাবে না। অথচ আমাদের কল্পিত অভাব আমরা বাড়াইয়াই চলিয়াছি। তথাকথিত বিজ্ঞান যে ভীষণভাবে জাতির অপকার সাধন করিতেছে, আমরা যে সুখ, স্বাস্থ্য, আয়ু, বুদ্ধি সবই হারাইতেছি, কুশিক্ষা যে আমাদিগকে কত বিপথগামী করিতেছে, আমরা তাহা দেখিয়াও দেখি না।

বঙ্গশ্রী এই অবস্থাই দেশবাসীর সমক্ষে উপস্থিত করিয়া উহার সমস্যা-নির্ণয়ে আলোবর্তিকার সহায়তায় পথ দেখাইতে চায়। আমরা অভাবের মাত্রা সঙ্কোচ করিয়া যদি সেই পথে চলিয়া আবার পূর্ব্বের দিন ফিরাইয়া আনিতে পারি, তবেই এ জাতি রক্ষা পাইবে, নচেৎ ইহার ধ্বংস অনিবার্য্য। এই ধ্বংস হইতে রক্ষার উপায় নির্দ্ধারণই 'বঙ্গশ্রী'র প্রধান কার্য্য।

বঙ্গশ্রী প্রমাণ করিয়াছে যে এই পথে আমাদের যাত্রা সুনিয়ন্ত্রিত করিলে কেবল ভারতেরই ত্রিশ কোটি নিরন্ন নরনারীর অন্নাভাব ঘুচিবে না, পরন্তু শস্যশ্যামলা ভারতভূমি সমগ্র জগৎকে অন্নদান করিয়া তাহাদের উপরে নিজের প্রাধান্য সংস্থাপিত করিতে পারিবে। তদুপরি ভারতের শিক্ষা, ভারতের সংস্কৃতি, ভারতীয় ধর্ম্মশাস্ত্র সেই প্রভুত্ব একেবারে চিরস্থায়ী ও দুরতিক্রমণীয় করিতে সমর্থ হইবে।

এই সত্যই 'বঙ্গশ্রী' প্রচার করিতে চায়। আপনি মতিভ্রষ্ট হইয়া ইহার প্রতি কর্ণপাত করুন আর নাই করুন, 'বঙ্গশ্রী' তাহার নিজের লক্ষ্য হইতে কখনও চ্যুত হইবে না।

বর্ত্তমান ইউরোপীয় যুদ্ধ

দ্বাদশ দিবস যুদ্ধ করিবার পরে ক্রীটের পতন ঘোষিত হইয়াছে। ১৫,০০০ রাজকীয় বাহিনী ক্রীট হইতে মিশরে চলিয়া যাইতে বাধ্য হইয়াছে। ক্রীট ভূমধ্য সাগরের মিত্রশক্তির একটী গুরুত্বপূর্ণ ঘাঁটি। ইহার রক্ষার জন্য মিত্রপক্ষ হইতে উদ্যোগ আয়োজনের কোন অভাব হয় নাই। স্বয়ং মিঃ চার্চ্চিল বলিয়াছিলেন, "ক্রীট ও তোবরাক রক্ষার জন্য আমরা প্রাণ তুচ্ছ করিয়া যুদ্ধ করিব। এস্থান হইতে অপসারণের কোন কথাই উঠিবে না।" 'মরি কিম্বা মারি' এই সঙ্কল্প করিয়াই মিত্রশক্তি যুদ্ধ করিয়াছিল। কিন্তু অবশেষে অপসারণ করিতেই হইল।

ক্রীট পতনের কারণ শুনিতে পাই বিমানের অভাব। ভূমধ্য সাগরে ইংলণ্ডের প্রচণ্ড ও দুর্ব্বার নৌবাহিনীও বিমানের নিকট তুচ্ছ প্রমাণিত হইল। নৌবাহিনী থাকিয়াও ইংলণ্ড যে সাগরের উপরে আধিপত্য করিতে অক্ষম, ইহাই পরিতাপের বিষয়। আর ক্রীটের পতনে সেই প্রমাণ আরও দৃঢ়তর হইল।

ক্রীটের পতনে পূর্ব্ব ভূমধ্য সাগরে ইংরাজের প্রভুত্ব অনেকটা খর্ব্ব হইবে বলিয়া মনে হয়। ইতিপূর্ব্বে অষ্ট্রিয়া, হাঙ্গারী, চোকোশ্লোভেকিয়া, রুমেনিয়া, বুলগেরিয়া সকলেই একে একে জার্ম্মানীর প্রভুত্ব মানিয়া লইয়াছে। মিঃ চার্চ্চিল কূটনীতিতে এপর্য্যন্ত জার্ম্মানীর চেষ্টা ব্যর্থ করিতে পারেন নাই। এইখানে কূটনীতির পরাজয় স্বীকার করিতেই হইবে।

জুগোশ্লেভিয়াও ত্রিশক্তি চুক্তি স্বাক্ষর করিবার পরে আবার উহা প্রত্যাহার করে। ফলে জার্ম্মানীর সঙ্গে ভীষণ যুদ্ধ হয় এবং পরিণামে জার্ম্মানীই জয়লাভ করে। গ্রীস ও ভীষণ মৃত্যুপণ যুদ্ধ করিয়াছিল। কিন্তু অবশেষে তাহাকেও অবনমিত হইতে হইল। গ্রীস্ অধিকৃত হইল, কিন্তু গভর্ণমেণ্টের পরাজয় হইল না—ক্রীটে উহা স্থানান্তরিত হইল। ক্রীট অধিকারে গ্রীসের আশা আপাততঃ বিলুপ্ত হইল।

এদিকে গ্রীস এবং তুরস্কের মধ্যবর্ত্তী দ্বীপপুঞ্জও একে একে জার্ম্মানীর হস্তগত হইয়াছে। কৃষ্ণসাগর, বসফরাস ও দার্দ্দেনিলিস প্রণালীর মধ্য দিয়া জার্ম্মান জাহাজ অবাধে যাতায়াত করিয়া ইজিয়ান উপসাগরে পঁহুছিতে সমর্থ হইয়াছে। রুশিয়া কোন বাধা দিল না। তুরস্ক অবাধে নিজ জলরাশির অধিকার প্রদানে আপত্তি করিল না। বিনা বাধায় ইতালী অধিকৃত দোদিকেনিসে আসিতে জার্ম্মান জাহাজের কোন বাধাই রহিল না। রুশিয়াতে পূর্ব্বেই ইংরাজকে সহায়তা করে নাই। উত্তর, পশ্চিম ও দক্ষিণে জার্ম্মান বাহিনী বেষ্টিত হইয়া এবার তুরস্ক ও অক্ষশক্তির সহিত মৈত্রী স্থাপন করিল না বটে, কিন্তু জার্ম্মানীর কোন অসুবিধাই রহিল না। দেখিতে দেখিতে পূর্ব্ব ভূমধ্য সাগরে জার্ম্মানী অবাধ গতিতে যাতায়াত করিতে লাগিল। এ সবই কূট-

রাজনীতির যুদ্ধ দেখিতেছি, মিঃ চার্চ্চিল এদিকে জার্ম্মানীকে পরাভূত করিতে পারেন নাই।

আমরা এমন কথা বলি না যে, ইংরাজের পরাজয় হইয়াছে বা ইহাতেই তাহার নৈরাশ্যের কারণ আছে বরং যতদূর দেখা যায়, শেষাশেষি ইংরাজই জয়ী হইবে। হয় তো বা সিরিয়ায়ই তাহার সূত্রপাত হইতে পারে। তবে আমরা বলি যে, সতর্কতা অবলম্বন করিলে এ দিকেও বহু সহস্র লোকের জীবন রক্ষা হইত। কিন্তু প্রথম হইতে তাহা অবলম্বন করা হয় নাই। গত বৎসর ডানকার্ক পতনে এবং মিত্রশক্তির সম্মান-জনক অপসরণে বিমানশক্তিতে উহার সম্পূর্ণ অভাবই অনুভূত হইয়াছিল। এই এক বৎসর মধ্যে বিমান শক্তি-বৃদ্ধির কোন চেষ্টাই বোধ হয় হয় নাই। বস্তুতঃ এই বিমানের জন্য গ্রীসের পরাভবে বিমান পরিচালনায় জার্ম্মানীর এত সুবিধা হইয়াছিল যে, ব্রিটিশগণ ক্রীটে বিমান ঘাঁটি না থাকায় বিমান বাহিনী অপসারণ করিতে বাধ্য হয়। এই সব অবস্থা পূর্ব্বেই বিবেচনা করিয়া, হয়, বিমানশক্তি বৃদ্ধি করিয়া ক্রীট বাধায় দৃঢ়পরিকর হওয়া উচিৎ ছিল, নতুবা লোকক্ষয় না করিয়া অপসারণ পূর্ব্বে করিলেই সবলের প্রাণরক্ষা হইত। আর মিসরের যুদ্ধেও সেই সৈন্য বাহিনীকে কাজে লাগাইতে পারা যাইত এবং পরে সময় হইলে পুনরধিকার চেষ্টা করিলেই হইত। দূরত্ব বলিয়া যে অসুবিধা তাহাও পূর্ব্বে বুঝা উচিৎ ছিল। দূরত্ব বলিয়া রাজকীয় বিমান বাহিনী জার্ম্মানীতে গিয়াও বিপুল ক্ষতি করিয়া আসিতে ত্রুটী করে নাই। এবারে মিসর হইতে প্রেরিত বিমান বাহিনী কি তাহা করিতে পারিত না?

কে কি বলিবে ইহাতে কর্ণপাত করা মিঃ চার্চ্চিলের উচিত ছিল না। কারণ শেষ জয়ই আসল জয়।

মিঃ চার্চ্চিল যে স্পষ্ট সত্য কথা বলিতে ভয় পান না তাহা সকলেই জানে। আর তিনি উদ্দীপনার সঞ্চার করিয়া বিপুল সৈন্যমণ্ডলীকে উৎসাহিত ও আশান্বিত করিতে পারেন সেকথাও সত্য, কিন্তু কূটনীতির অভাবে অথবা আয়োজনের অসম্পূর্ণতায় ডানকার্ক হইতে আরম্ভ করিয়া বলকান, লিবিয়া, ক্রীট প্রভৃতি স্থানের যুদ্ধে তিনি যে ব্যর্থতার পরিচয় দিয়াছেন তাহাতে জাতিকে প্রকৃষ্ট পন্থায় পরিচালিত করিতে অপর নায়কের যে অভাব হইয়াছে তাহা অস্বীকার করিলে সত্যের অপলাপ করা হইবে। অথচ এই সঙ্কটে কে কর্ণধার হইয়া জাতিকে রক্ষা করিবে একমাত্র ভগবানই জানেন। ইংলণ্ড দেশ এ সম্বন্ধে একেবারে নীরব, যেন উদাসীন। এখন জাতিকে সুনিয়ন্ত্রিত করিলে কেবল যুদ্ধ জয় হইবেনা, পরন্তু হিটলার দমিত হইবে, মুসোলিনী শাসিত হইবে, ইংরাজ আবার সমগ্র জগতে একচ্ছত্রতা করিতে পারিবেন। কে সেই পথ দেখাইবে? এমন মনীষী কি ইংলণ্ডে আজ নাই?

আমাদের মতে সেরূপ ব্যক্তি এখনও ইংরাজেরই আছে, আর সে শক্তির বিকাশ হইবে যদি **ভারতের সহায়তা সম্পূর্ণরূপে সে গ্রহণ করে।** আমাদের ধ্রুব বিশ্বাস যে ইংলণ্ড ও ভারত একসঙ্গে মিশিয়া **নব্‌বিধানে** আবার জগতে শান্তি সংস্থাপিত করিতে সমর্থ হইবে। আমরা সেই সময়েরই প্রতীক্ষা করিতেছি।

কর্পোরেশনে দ্বন্দ্ব

সম্প্রতি কর্পোরেশনে ষ্ট্যাণ্ডিং কমিটী গঠন উপলক্ষে কতকগুলি ব্যাপার হইয়াছে। মোস্লিমলীগ সভ্যদের পক্ষ হইতে ভূতপূর্ব মেয়র মিঃ সিদ্দিকী কিছু সময় চাহিয়াছিলেন কিন্তু ভোটে পরাজিত হইয়া দলবলসহ তিনি বাহির হইয়া গিয়াছেন। এই সঙ্গে মিঃ বি, সি চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ও কর্পোরেশনের অল্ডারম্যান পদটী পরিত্যাগ করিয়াছেন।

দেশবন্ধুর সময় হইতে কংগ্রেস কমিটীই কর্পোরেশনে প্রবল ছিল। কর্পোরেশনের সমগ্র করদাতাগণের সুবিধা, অসুবিধা তিনি দেখিতে চাহিয়াছিলেন—অনেকটা সাফল্যও আনিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার মহাপ্রস্থানের পরে সেই উদ্দেশ্য ক্রমে ক্রমে ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হইয়াছে।

যাহা হউক, গতবৎসর কর্পোরেশন নির্ব্বাচন সম্বন্ধে কংগ্রেস নিরপেক্ষ ছিল। লড়াই বাধিয়াছিল বসুদল এবং হিন্দু মনোনীত সভ্যদের মধ্যে। উভয় দলই আংশিকভাবে জয়ী হয়েন। কিন্তু ইতিমধ্যে হিন্দুমহাসভা ও বসু-লীগের চুক্তির কথা হইতেছিল। শুনিয়াছি উহা হইয়া ভাঙ্গিয়া যায়। চুক্তি হয় পরে বসুদল ও মোস্লিম দলের মধ্যে। অভিমানে অথবা আশঙ্কায় হিন্দুমহাসভার দল কর্পোরেশনের ষ্ট্যাণ্ডিং কমিটীর সংস্রবে আসেন নাই।

এক বৎসর মধ্যে সুভাষচন্দ্রের অন্তর্ধানের পরে কার্য্যতঃ এই বসু-লীগ চুক্তি ভাঙ্গিয়া যায়। আজ দেখিতেছি কার্য্যতঃ হিন্দুমহাসভা ও বসুদলের মধ্যে মিলন হইয়াছে। যেমন পূর্ব্বের বসু-লীগ চুক্তি নানা কারণে দোষাবহ ও ভীতিসঙ্কুল ছিল তেমনি এই সম্মিলনেও আশা বা আনন্দের কিছুই নাই। অন্ত যেমন মোস্লিমলীগের সভ্যগণ এই সম্মিলন একটু ভীতির চক্ষে দেখিতেছেন, পূর্ব্বেও সেইরূপ বসু-লীগ চুক্তি ভয়সঙ্কুল হইয়াছিল। আজ যেমন লীগের সভ্যগণ সভাগৃহ হইতে চলিয়া গিয়াছেন, সেবারেও হিন্দুমহাসভার সভ্যগণ কার্য্যতঃ চলিয়াই আসিয়াছিলেন।

এই সম্বন্ধে হিন্দুমহাসভার অন্যতম সভ্য নির্ম্মল চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের উক্তি অত্যন্ত আপত্তিজনক হইয়াছে। পদত্যাগ উক্ত শ্রীবিজয় চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে তিনি সম্বোধন করিয়া বলিয়াছেন "Mr. B. C. Chatterjee decoyed me into the Corporation by promising Hindu Solidarity. Now that Solidarity is being achieved, he has no business to go out." অর্থাৎ আমি হিন্দু সংগঠনের আশায়ই কর্পোরেশনে আসিয়াছি এবং আজ তাহা সফল হইবার উপক্রম হইয়াছে।

মিঃ নির্ম্মল চাটার্জ্জির উপরোক্ত উক্তি খুবই ক্ষতিকর, মুসলমানের পক্ষেও যেমন, হিন্দুর পক্ষেও সেইরূপ। কর্পোরেশনে হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান, ইহুদী সকলেরই বাস, এখানে সকলের সমান অধিকার ও স্বার্থ। বিশিষ্ট নেতা হিন্দু সংগঠন দৃঢ় করিতে চাহিতেছেন, ইহাতে মুসলমান সভ্যদের মনে ভীতিসঞ্চার হওয়া যে স্বাভাবিক তাহাতে সন্দেহ নাই। যাঁহারা এইরূপ মনোভাব লইয়া কর্পোরেশনে প্রবেশ করিয়াছেন, তাঁহারা তাঁহাদের কর্ত্তব্য বুঝিতেছেন বলিয়া আমাদের মনে হয় না। এইরূপ উক্তিতে ভিন্ন সম্প্রদায় হইতে তুল্যরূপ উক্তির পথ পরিষ্কার করিয়া দেওয়া হয় মাত্র। কথায় কথায় হাতাহাতিও এইরূপেই হয়। গত বৎসরেও যেরূপ বসু-লীগ চুক্তিতে হিন্দু জন-সাধারণ আশঙ্কিত হন, মিঃ চাটার্জ্জির এই উক্তিতে সাম্প্রদায়িক দোষশূন্য ব্যক্তিগণও খুবই ব্যথিত হইবেন সন্দেহ নাই।

এই সমস্ত সাম্প্রদায়িকতা দূর করিয়া কর্পোরেশনে শান্তি স্থাপন করিতে পারেন একমাত্র ডেপুটী মেয়র মহোদয়। মেয়রেরই উচিত প্রত্যেক সম্প্রদায় হইতে প্রধান প্রধান ব্যক্তি লইয়া একটী পরামর্শ সভা করিয়া সেই ভাবে কাজ করা। তাহার মধ্যে সব সম্প্রদায়ের লোকই থাকিবে। তাহা হইলে কর্পোরেশনে কোন গোল হইবে না, সাম্প্রদায়িকতা-বিষও বিদূরিত হইবে। কিন্তু বর্ত্তমান মেয়রের সেই সঙ্কল্প কি প্রাণে জাগিয়াছে? আর সেই সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত করিতে যে সাহস ও দৃঢ়তা প্রয়োজন তাহাও তাঁহার আছে কি?

আমরা মিঃ সিদ্দিকি সম্বন্ধে দুই একটি বিষয়ে মন্তব্য না করিয়া পারিলাম না। তিনি অবাঙ্গালী ও সাম্প্রদায়িক-ভাবযুক্ত এইরূপ অপবাদ অনেক লোকে তাঁহাকে দিয়া থাকেন। আমরা কিন্তু তাঁহার মেয়রের কার্য্যকলাপে সেইরূপ দোষনীয় কিছুই পাই নাই। বরং কোন কোন বিষয়ে বাঙ্গালীর প্রতি গভীর শ্রদ্ধাই প্রদর্শিত হইয়াছে। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধা খুবই গভীর। এবারেও তিনি বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলিয়াছেন:—

"The work of the Corporation must go on amicably and in a friendly manner if possible. Dictatorship was not welcomed by any body. If instead of being dictated, they can come to any settlement by mutual understanding, it will be to the welfare of the citizen."

তাহা খুবই সত্য কথা। কোন ডিক্টেটরের আদেশে মত দিলেই কর্পোরেশনের কাজ ভাল হইবে না, কাজ ভাল হইবে—মিলিয়া মিশিয়া কাজ করিতে পারিলে। এরূপ মিলিয়া মিশিয়া কাজ করিবার পক্ষপাতীই আমরা।

তবে সিদ্দিকি সাহেব যে ডিক্টেটরী সম্বন্ধে বলিয়াছেন, বোধ হয় বর্ত্তমান কর্ম্মকর্ত্তাগণের কার্য্যকলাপ দেখিয়াই তিনি এরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে বিশ্বাসী নেতার নির্দ্দেশ মানিলেই কাজ ভাল হয়। কিন্তু সেইরূপ নেতা হইতে হইলে স্বার্থত্যাগ চাই, সমদর্শিতা চাই, চাই দুর্ব্বার সাহস। সেই ত্যাগ ও প্রেম ছিল বলিয়াই দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন সমভাবে হিন্দু-মুসলমানের চিত্তাকর্ষণ করিয়াছিলেন। চাই এইরূপই নেতা, যিনি ক্ষুদ্র স্বার্থের জন্ত পরস্পরের কলহ বিবাদ নিজ ব্যক্তিত্ব-প্রভাবে বিদূরিত করিয়া দেশে প্রকৃত সুখশান্তি সংস্থাপন করিতে পারিবেন এবং যাঁহার উপর সমস্ত ভার দিয়া সকলেই মনে করিবে যে, ইনি যাহা করিবেন তাহাই ঠিক, তাহাই আমার পক্ষে হিতকর।

পরিশেষে শ্রীযুক্ত বি-সি চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে আমাদিগের কিছু অনুযোগ করিবার আছে। তিনি যখন হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে ঐক্যস্থাপনের জন্যই কর্পোরেশনে গিয়াছিলেন, তবে এখন পদত্যাগ করিতেছেন কেন? যে সময়ে তিনি গিয়াছিলেন তখন যদি ঐক্যসাধনের খুবই প্রয়োজনীয়তা ছিল, তবে এখন সে প্রয়োজনীয়তা বরং বৃদ্ধিই পাইয়াছে। তিনি যদি এখন নিরপেক্ষ ভাবে সিদ্দিকের দল, বসুদল, খৃষ্টান দল, হিন্দুমহাসভার দল ও স্বাধীন মতাবলম্বীদিগের মধ্যে ঐক্যস্থাপনের প্রয়াস পান তবে তিনি সকলেরই শ্রদ্ধাকর্ষণ করিবেন। বসুদল কর্তৃক মনোনীত হইয়াছেন, তাহাদিগকে ভোট দিবার জন্যই তাঁহার প্রয়োজন এবং একমত না হইলে পরিত্যাগ করিবেন—এরূপ নিকৃষ্টভাবে তাঁহার সম্বন্ধে আমরা ভাবিতে পারি না। চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের কর্ত্তব্যপরতা সম্বন্ধে আমাদের কোনরূপ সন্দেহ নাই। তাহা দেখাইবার এই তো সুবর্ণ সুযোগ ছিল, হেলায় নিজে তাহা হারাইয়া ভাল করেন নাই।

হিন্দুমহাসভা ও কংগ্রেস

সম্প্রতি উত্তর বঙ্গ হইতে ব্যবস্থাপক পরিষদের সভ্য নির্ব্বাচনে হিন্দু মহাসভার কর্ম্মী শ্রীযুক্ত আশুতোষ লাহিড়ী মহাশয় জয়যুক্ত হইয়াছেন। প্রতিপক্ষে ছিলেন তাহিরপুরের জনৈক কুমার বাহাদুর, ইনি বসুদলের মনোনয়ন লাভে সমর্থ হইয়াছিলেন। কংগ্রেস পক্ষে কেহ প্রার্থী ছিল না।

কংগ্রেস যখন কোন প্রার্থী মনোনীত করেন নাই, তখন ইহার অথবা বিশিষ্ট নেতৃবৃন্দের নীরব থাকাই সমীচীন ছিল। কিন্তু শ্রীযুক্তকিরণশঙ্কর রায় একটি বিবৃতি দিয়াছিলেন। ইনি পরিষদে কংগ্রেস দলের নায়ক, সুতরাং কংগ্রেসের মনোভাব সম্বন্ধে ইহার বিবৃতির যথেষ্ট মূল্য আছে।

কিরণবাবু বলেন, "কংগ্রেস কোন প্রার্থী মনোনীত করেন নাই, তবে ব্যক্তিগত হিসাবে আশুবাবু অনেক গুণে গুণবান্।" প্রথমটুকু তিনি ঠিকই বলিয়াছেন কিন্তু দ্বিতীয়টী দিয়া তিনি ভাল করেন নাই। কারণ ইহাতে আশুবাবুকে সমর্থন করিবার ইঙ্গিত আছে। আমদের মনে হয় কংগ্রেসের পক্ষে আশুবাবুর জয় শুভকর নহে।

আশুবাবু হিন্দুমহাসভার একজন কর্ম্মকর্ত্তা, ইহার আরম্ভ হইতে আশুবাবু মহাসভার সহিত সংশ্লিষ্ট। মহাসভা কংগ্রেসের নীতি ও কার্য্যপ্রণালীর বিপরীতপন্থী। সুতরাং আশুবাবুর জয়ে কংগ্রেসের কোন হিত হইবে বলিয়া মনে হয় না।

সম্প্রতি আশুবাবু মহাসভাকে রাজনৈতিক অনুষ্ঠানে পরিণত করিতে চান। হিন্দুমহাসভার রাজনীতি যে, হিন্দু-ভাবাত্মক হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু কংগ্রেস হিন্দু ও মুসলমান উভয়েরই, নিছক হিন্দু-স্বার্থ রক্ষাই ইহার উদ্দেশ্য নহে। আমাদের মনে হয় যেমন মুসলিম লীগ সাম্প্রদায়িক ও কংগ্রেসের বিরোধী, রাজনীতিতে লিপ্ত হইয়া মহাসভাও যে কংগ্রেসের বিরোধী সংগঠনই সৃষ্টি করিবে তাহাতে সন্দেহ কি? অন্ততঃ স্যার মন্মথনাথ যে কংগ্রেস ছাড়িয়া মহাসভায় যোগ দিতে বলেন, তাহাতেও সেইরূপই বুঝায়। বিরোধী হইলে কংগ্রেসের ক্ষতি অনিবার্য্য। আর যদি বিরোধী না হয়, তবে হয় মহাসভা কংগ্রেসের সহিত মিশিবে, নতুবা কংগ্রেস ও মহাসভা সম্মিলিত ভাবে কার্য্য করিবে। বীর সভারকার-পরিচালিত মহাসভা কখনও কংগ্রেসের সহিত মিশিয়া নিজের অস্তিত্ব বিলুপ্ত করিবে না। কিন্তু মহাসভা ও কংগ্রেস যদি এক হইয়া কাজ করে, তবে কংগ্রেস যে হিন্দু সংগঠন ভিন্ন আর কিছু নয়, প্রকারান্তরে সেই আশঙ্কাই প্রমাণিত হইবে। সুতরাং প্রশ্ন এই, অদূর-ভবিষ্যতে যে মহাসভা কংগ্রেসের বিরুদ্ধে দাঁড়াইবে তাহাকে আরও বলশালী করিতে কিরণ বাবু আশু বাবুর পক্ষে গুণ ব্যাখ্যা করিয়া কেন কংগ্রেসের বিরোধী-কার্য্য করিয়াছেন? তাঁহার নীরব ও নিরপেক্ষ থাকাই সমীচীন ছিল। একে বাঙ্গালার কংগ্রেস ক্ষীণ হইতেছে তদুপরি কংগ্রেস নেতাগণও যেন ক্রমেই মহাসভার দিকেই আকৃষ্ট হইয়া পড়িতেছেন। আশু বাবুর অভিনন্দন সভায় শ্রীযুক্তবিপিনবিহারী গাঙ্গুলী মহাশয়ও খুব আনন্দ প্রকাশ করিয়াছিলেন। অন্যতম নেতা শ্রীশরৎচন্দ্র বসু মহাশয়কেও হিন্দু মহাসভা কর্তৃক আহূত একাধিক সভায় যোগদান করিতে দেখিয়া দুঃখিত হইয়াছি। কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ মহাসভার যতই সমর্থক হইবেন, মুসলমানগণ ততই কংগ্রেসকে আপনার ভাবিতে পারিবেন না, এবং লীগ ততই প্রবল হইবে। নেতৃবৃন্দের ভাবের দৈন্য দেখিয়া আমরা স্তম্ভিত হইয়াছি।

আগামী কল্য ২রা আষাঢ় সর্ব্বত্র দেশবন্ধুর মৃত্যু-বার্ষিকী অনুষ্ঠান সম্পন্ন হইবে। এই উপলক্ষে অদ্য কলিকাতা কর্পোরেশনের ভূতপূর্ব্ব মেয়র শ্রীযুক্ত সিদ্দিকি সাহেব একটী মর্ম্মর মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিতেছেন। আমরা সিদ্দিকে মহাশয়কে এই জন্য অভিনন্দিত করি। হিন্দু-মুসলমান এক, এই ভাবে সর্ব্বস্ব দিয়া এক দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনই বাঙ্গলা দেশ, বাঙ্গালী জাতি ও ভারতীয় আদর্শের জন্য প্রাণপাত করিয়াছিলেন। দেশবন্ধুর আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া সকলে স্বার্থত্যাগ শিখিলেই তাঁহার আত্মা তৃপ্ত হইবেন।

ডিক্টেটারী শাসন

জার্ম্মানীর হিটলার ও ইটালীর মুসোলিনী ডিক্টেটার থাকা বিধায় ইংলণ্ড ও আমেরিকা সেইরূপ শাসন-নীতির বিনাশ সাধন করিয়া জগতে ডিমোক্রেসীর প্রতিষ্ঠায় দৃঢ়ব্রতী হইয়াছেন এবং তাহা করিয়াই জগতে নববিধান প্রতিষ্ঠা করিবেন। সেই উদ্দেশ্যেই আজ এই মহাসমর, এত লোকক্ষয় এবং এত অশান্তি। আমরা কিন্তু দেখিতেছি ফল একই হইবে। ডিমোক্রেসীর জন্যই লড়াই করুন বা কাহাকেও স্বাধীন জাতি বলিয়াই ঘোষণা করুন, মিঃ চার্চ্চিলও কি সেই ডিক্টেটারীভাব হইতে মুক্ত হইতে পারিয়াছেন? তাঁহার উক্তি হইতে তো সেরূপ প্রকাশ পায় না। হিটলার ও মুসোলিনী কাহারও নিকট বাধ্য নহেন, তিনি কেন জবাবদিহি হইয়া সব কথার কৈফিয়ত দিবেন, এইজন্য উষ্মাই প্রকাশ করিয়াছেন। বিসমার্ক যে নিমজ্জিত হইল, হিটলার কি রাইখ ষ্টাগে দাঁড়াইয়া তাহার উত্তর দিয়াছেন? মুসোলিনী কেন আবিসিনিয়া ও সোমালিল্যাণ্ড হারাইয়াছেন তিনি কি সকলকে তাহা বুঝাইয়া দিয়াছেন। মিঃ চার্চ্চিল স্পষ্টই বলিয়াছেন, "The dictator Goverments are not under any similar pressure to explain or excuse any ill success that may befall them."

মুসোলিনী এবং হিটলারের আদর্শে একতন্ত্র শাসন পরিচালনা করিতে না পারার জন্য যদি চার্চ্চিলের এতই ক্ষোভ, তবে কিসের জন্য এত যুদ্ধ? এত—এত প্রাণীনাশ এত অর্থব্যয়। তবে কি ডিমোক্রেসী একটা কথার বুলি মাত্র?

হিন্দু মহাসভার Direct Action

কিছুদিন পূর্ব্বে মথুরায় হিন্দু মহাসভা Direct action এর জন্য তৈয়ার হইতে নির্দ্দেশ দিয়াছিলেন। বঙ্গশ্রী কখনও direct action এর পক্ষপাতী নয়। তাই কংগ্রেসও কোন direct action না করে সেই ভাবেই আমরা মত প্রকাশ করিয়াছি। সম্প্রতি হিন্দু মহাসভার এই direct action এর কথায় আমরা খুবই বিস্মিত হইয়াছিলাম। কারণ, যে সমস্ত সরকারী চাকুরেগণ পেনসন লাভ করিতেছেন, যে সমস্ত জমিদারগণ কংগ্রেসে যোগদান করিতে চান না, নরমপন্থী, যাহারা কংগ্রেসের ভয়ে ভীত, প্রধানতঃ হিন্দু মহাসভায় এই সকল লোকেরই ভীড়। তাই direct action ইহাঁরা করিবে শুনিয়া আমরা পূর্ব্বে বিশ্বাসই করি নাই। এখন দেখিতেছি আমাদের অনুমানই ঠিক। শুনিতে পাইলাম যে, কি একটা অজুহাতে direct action-এর ভাঁওতা ইহারা পরিত্যাগ করিয়াছেন, যাহা হউক শেষকালেও যে সুবুদ্ধি আসিয়াছে ইহাতেই আমার খুসী।

আমাদের মনে হয় direct action, political organisation প্রভৃতি ছেলে-ভুলানো বাক্য ছাড়িয়া দিয়া সমগ্র ভারতবাসীর দারিদ্র্যের কিরূপে সমাধান হয়, তাহা করিয়া যথার্থ কাজ করুন। কাজ তো যথেষ্ট আছে, তাহা করিলেই হয় আর সমগ্র জাতির অভাব দূর করিবার চেষ্টা অপেক্ষা আজ আর কোন কাজই বড় নয়। নতুবা কংগ্রেসের প্রতিযোগিতা করিয়া নিজেরাও কিছু করিবেন না, কংগ্রেসেরও ক্ষতিই করিবেন।

প্রবাসীর রুচি

সহযোগী প্রবাসীর রুচি সম্বন্ধে ধারণায় আমরা কখনও বিস্মিত হই নাই। আজ বিস্মিত হইলাম যে, প্রবাসীতেও সিনেমা অভিনেত্রীর ছবি বাহির হইতেছে। এতদিন গিরিশচন্দ্রের নাটক পড়েন নাই বলিয়া সম্পাদক মহাশয় গৌরব করিতেন, কেন না গিরিশচন্দ্র থিয়েটার অভিনেত্রীদের লইয়া থিয়েটার করিতেন। আর আজ অভিনেত্রীদের ছবি প্রবাসীতে বাহির হওয়ায় সম্পাদক মহাশয়ের বলিবার কি আছে, জানিবার ঔৎসুক্য হইয়াছে। কথা হইতে পারে যে, বিজ্ঞাপনের সঙ্গে ছবি বাহির হইয়াছে। কিন্তু ছবি বাহির করিবার ইহা কি নবপ্রথা নহে? একদিন বিলাতী বস্ত্রাদি ও জুতার বিজ্ঞাপন দেওয়ায় কোন কোন কাগজ বর্জ্জিত হইয়াছিল, আর আজ সত্বাধিকারী-সম্পাদক এই লোভটুকু কি ত্যাগ করিয়া স্বীয় আদর্শ রক্ষা করিতে পারিতেন না?

পুস্তক ও প্রবন্ধ পরিচয়

মেদিনীপুরের ইতিহাস প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ (পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত সংস্করণ), শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র বসু বি, এ, বিদ্যানিধি প্রণীত। পুস্তক বিক্রেতা ও প্রকাশক সেন ব্রাদার্স এণ্ড কোং, ১৫ কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা।

সাতশত পৃষ্ঠাব্যাপী এই স্থূলাকার গ্রন্থ খানিতে গ্রন্থকার মেদিনীপুরের ভৌগোলিক অবস্থা ও ভৌমিক বিবরণ এবং প্রাগৈতিহাসিক যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া হিন্দু রাজত্ব, মুসলমান অধিকার (পাঠান ও মোগল) ও ইংরাজ শাসন কালের যাবতীয় ইতিহাস মূলক ঘটনা বিবৃত করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত মেদিনীপুরের প্রাচীন কীর্ত্তি ও নানা কাহিনী, লোক-তত্ত্ব, ভাষা ও শিক্ষা, জমিদার বংশের পরিচয় এবং সাহিত্য-প্রভাব সম্বন্ধেও গ্রন্থকার যাবতীয় ঘটনা উল্লেখ করিতে কোনরূপ শৈথিল্য বা কার্পণ্য করেন নাই।

ইতিহাস সাধারণতঃ ঘটনা-বহুল বলিয়া নীরস, বিশেষতঃ যদি জিলা বিশেষের বিবরণ উল্লিখিত হয়, তবে সাধারণতঃ সেই জিলার লোকের পক্ষেই উহা তৃপ্তিকর হইবার সম্ভাবনা। অনেকে বলেন এই সমস্ত জিলার ইতিহাস ও বিবরণ ভিত্তি করিয়াই বাংলার প্রকৃত ইতিহাস রচনা সম্ভব। ইহা প্রত্নতাত্ত্বিকের পক্ষে হিতকর হইতে পারে, তবে গুণাগুণ সম্বন্ধে বলিতে হয় যে কোন পুস্তকই—কি ইতিহাস কি সাহিত্য—সার্ব্বজনীন না হইলে তাহা ইতিহাস বা সাহিত্যে যথোপযোগী স্থান লাভ করিতে সমর্থ হয় না। কিন্তু ইহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে, মেদিনীপুর জিলার স্থানীয় ইতিহাস হইলেও গ্রন্থকার গ্রন্থখানিকে এইরূপ হৃদয়গ্রাহী করিয়াছেন যে, চব্বিশ পরগণা, ময়মনসিংহ, ফরিদপুর, শ্রীহট্ট, চট্টগ্রাম প্রভৃতি সমগ্র বাঙ্গালা দেশের জনসাধারণও ইহাতে সমভাবে আনন্দ পাইবেন। ইতিহাস রচনায় এই খানে গ্রন্থকারের যথেষ্ট নৈপুণ্য দেখিয়া আমরা বিশেষভাবে পুলকিত হইয়াছি।

দ্বিতীয়তঃ, সাহিত্য-রসে সঞ্জীবিত ও পুষ্ট না হইলেও কোন গ্রন্থই স্থায়ী হয় না—বিশেষতঃ ইতিহাস। কেবল ঘটনা নির্ণয়ে ইতিহাসের সরসতা থাকে না। ঘটনা-মূলক হইলেই গ্রন্থকারকে সেই দিকে লক্ষ্য করিতে হইবে। আবার লক্ষ্য করিয়া গ্রন্থকার যদি জোর করিয়া তাঁহার রচনায় সাহিত্য সংযোজিত করেন, তাহাতেও গ্রন্থের নীরসতা স্পষ্ট ভাসিয়া উঠে। কিন্তু এই গ্রন্থের রচয়িতা একজন খাঁটি পাকা সাহিত্যরথী। তিনি প্রত্নতাত্ত্বিক, ঘটনা-সংগ্রাহকও বটে, কিন্তু সর্ব্বোপরি তিনি সাহিত্যিক। তাই নীরস ঘটনারাশিও রসে ডগমগ করিয়া গ্রন্থখানিকে গ্রন্থকার এমনি উপাদেয় করিয়াছেন যে, সাহিত্যে এইখানি বঙ্গের উৎকৃষ্ট গ্রন্থরাজি মধ্যে স্থানলাভ করিবে।

এই ইতিহাসের পাতায় পাতায় সাহিত্য। ইতিহাস লিখিতে লিখিতে তিনি ঈশ্বর বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জন্মভূমি বীরসিংহের স্মৃতি স্থাপনার কথা বলিতেছেন, কিরূপে সেই মহামানব করুণাময়ী জননীর উদ্দীপনায় বাল বিধবার বিবাহ শাস্ত্র-সম্মত বলিয়া প্রমাণ করিয়াছিলেন, কিরূপে তাঁহার অমৃতময়ী লেখনী তাঁহাকে বাঙ্গলা সাহিত্যের জন্মদাতারূপে সৃষ্টি করিয়াছিল। ঈশ্বরচন্দ্র-মহিমায় গ্রন্থকারের গ্রন্থ সার্থক হইয়াছে। তবে গ্রন্থকার যে লিখিয়াছেন, "ঈশ্বরচন্দ্রের জীবন লইয়া গৌরব করিবার বিশেষ অধিকার মেদিনীপুরবাসীরই—" ভিন্ন জিলার কোন পাঠকই তাহা স্বীকার করিবেন না। ঈশ্বরচন্দ্রের জীবন লইয়া গৌরব করিবার অধিকার সমগ্র বঙ্গবাসীরই, ইহাতে আর বিশেষ অবিশেষ নাই।

কেবল বিদ্যাসাগর মহাশয়ই নহেন, অন্যান্য সাহিত্যিকগণের কথাও প্রচুর আছে। বঙ্কিমচন্দ্র কিরূপে বাল্যকালে মেদিনীপুরের জিলা স্কুলের ছাত্ররূপে সুখ্যাতি অর্জ্জন করিতেছিলেন। কিরূপে তাঁহার 'কপালকুণ্ডলা' সমুদ্রতীর, রসুলপুরের নদী, অদূরস্থ 'তমালতালী বনরাজি', দৌলতপুর, দরিয়াপুর পুণ্যক্ষেত্ররূপে চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিয়াছে; কিরূপে পরে আবার বঙ্কিমচন্দ্র মেদিনীপুরে আসিয়া ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটের কার্য্য করিয়াছিলেন; কিরূপে কৃষ্ণকান্ত পুষ্করিণী 'কৃষ্ণকান্তের উইল' প্রভাবান্বিত করিয়াছে। আবার কিরূপে রাজনারায়ণ

বসুর ও তাঁহার 'জাতীয় গৌরব সম্পাদনী-সভা' ইংরাজী-বাঙ্গলা না শিখাইয়া কেবল বিশুদ্ধ বাঙ্গলাতে কথা কহিতে শিক্ষা দিতেন ; কিরূপে মেদিনীপুরের কাহিনী তাহার স্বরচিত জীবনীতে বিশেষভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। কখনও আমরা এই গ্রন্থে দেখি শ্যামানন্দ 'অদ্বৈত তত্ত্ব' লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। কখনও দেখি বাসুদেব ঘোষ তমলুকে আসিয়া সতীর দশা ভাবিতেছেন, কখনও বা গোবর্দ্ধন দাস মধুর রসের সার রচনা করিয়া ধন্য হইতেছেন—

মধুর কেলি মধুর মেলি, মধুর মধুর করয়ে কেলি
মধুর যুবতী মাঝে মধুর,
শ্যাম গৌরী কাঁদিয়া।
কি বা সে চুম্বক বদন ইন্দু, তাহে শ্রমজল বিন্দু বিন্দু
আনন্দে মগন দাস গোবর্দ্ধন
হেরিয়া জনম ছাড়িয়া॥

গ্রন্থকার অতি মনোজ্ঞভাবে লিখিয়াছেন কিরূপে কবি কঙ্কণ মুকুন্দরাম দামুন্যা পরিত্যাগ করিয়া আড়রা গ্রামে আসিলে রাজা তাঁহাকে—

"দশ আড়া মাপি দিলা ধান"—

আর অভাব মুক্ত হইয়া এখানেই চণ্ডীকাব্য রচনায় প্রবৃত্ত হইলেন। কিরূপে কাশীরাম দাসও মেদিনীপুরের অন্নজলে পুষ্ট হইয়া মহাভারত রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন—

"মহাভারতের কথা অমৃত সমান
কাশীরাম দাস কহে শোনে পুণ্যবান।"

কিরূপে রামেশ্বর তাঁহার শিবায়নে বাঙ্গালীর ঘরের সুখদুঃখের কথা কহিতে কহিতে বেদিয়ার বেশে মহাযোগী মহেশ্বরকে দিয়া জগন্মাতা গৌরীকে শাঁখা পরাইয়াছিলেন।*

এইরূপ কৃষ্ণচন্দ্রীয় যুগের কথা আছে, মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের কথা আছে, বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমে উহা পরিসমাপ্তি লাভ করিয়াছে।

সর্ব্বোপরি গ্রন্থকারের বঙ্কিম-সাহিত্যে কৃতিত্বের কিছু পরিচয় আবশ্যক। পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্র নাথ দত্ত বলেন গ্রন্থকার বঙ্কিম সাহিত্যে বেশ সুপ্রবিষ্ট। আমরা বলি তিনি বিশেষজ্ঞ। কপালকুণ্ডলার পরিকল্পনা যে কাঁথিতে হয়, সেই কাঁথি, সমুদ্রতীর, বালিয়াড়ী, কাপালিকের উচ্চভূমি, দরিয়াপুর, অধিকারীর বাড়ী, বনজঙ্গলের হুবহু চিত্র ও পরিচয় দিয়া তিনি ঐ অঞ্চলকে কেবল বাঙ্গালীর তীর্থস্থানরূপে পরিণত করেন নাই, পরন্তু এই বিষয়ে অনুসন্ধিৎসু সমগ্র সাহিত্যিক কুলের তিনিই পথপ্রদর্শক।

বঙ্কিমচন্দ্রের তো কথাই নাই "যুগলাঙ্গুরীয়", "কৃষ্ণকান্তের উইল", এবং "সীতারামের" সহিত ও মেদিনীপুরের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। দুর্গেশনন্দিনীর মোগল-পাঠান সংগ্রাম, ওসমান-কতলুখাঁর বিবরণও যে খুলনা যাইবার পূর্ব্বে বঙ্কিমচন্দ্র কাঁথি হইতে সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। হিজলী ঈশাখাঁর বাড়ী রসুলপুরের নদীর খুবই নিকটবর্ত্তী। কেহ কেহ বলেন ওসমান সেই ঈশাখাঁরই পুত্র। আবার সুবর্ণরেখা যে মেদিনীপুরের সীমানারই বাঙ্গালা ও উড়িষ্যার মধ্যে প্রবাহিত, বঙ্কিমচন্দ্র "সীতারামে" তাহার আভাষ দিয়াছেন এবং মেদিনীপুরের রাস্তার কথাও "কপালকুণ্ডলায়" আছে। গ্রন্থকার যেমন মেদিনীপুর জিলার সমস্ত স্থান ও পাত্র সম্বন্ধে সম্যকভাবে অভিজ্ঞাত, সব বিষয়েই বর্ণনাও হইয়াছে অতি সুন্দর।

গ্রন্থের ঐতিহাসিক ঘটনাবলিও অতি মনোজ্ঞভাবে বর্ণিত হইয়াছে। বর্গীর হাঙ্গামা ও ভাস্কর পণ্ডিতের কথা, হিজলীর কথা, মোগল-পাঠান যুদ্ধের কথা পড়িতে পড়িতে উপন্যাস পড়িবার তৃপ্তি পাওয়া যায়। এতদ্ব্যতীত জাতীয় নেতৃগণের কথাও কোথাও বাদ পড়ে নাই। রাজা নরেন্দ্র লাল খাঁ, কে, বি, দত্ত ও বীরেন্দ্র নাথ শাসমলের কার্য্যাবলীরও ঠিক ঠিক পরিচয় দেওয়া হইয়াছে।

একটি বিষয়ের উল্লেখ প্রয়োজন। গ্রন্থকার লিখিয়াছেন বিপত্নীক বঙ্কিম চন্দ্র নেগুঁয়া থাকিতে জুন মাসে (১৮৬০) রাজলক্ষ্মী দেবীকে বিবাহ করেন। শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্র নাথ দত্তও তাহা লিখিয়াছেন। গ্রন্থকার বঙ্কিম-ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীযুক্ত শচীশচন্দ্রের বঙ্কিম জীবনী হইতেও এইরূপই পাইয়াছেন। আমাদের মনে হয় বঙ্কিমচন্দ্র যশোহর হইতে নেগুঁয়া যাইবার পূর্ব্বেই মধ্যম সহোদর সঞ্জীবচন্দ্র ও বন্ধুবর দীনবন্ধু মিত্রের সহায়তায় পাত্রীর সন্ধান পাইয়া বিবাহ করিয়া গিয়াছিলেন। স্বর্গীয় পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ও সেইরূপ ইঙ্গিতই দিয়াছেন। আর সেই সময়ে বঙ্কিমচন্দ্র প্রায় তিন সপ্তাহ বাড়ী ছিলেন। জুনমাসে তিনি কোন ছুটী পান নাই। যাহা হউক এ বিষয়ে

---

*রামেশ্বরের শিবায়ন হইতেই গিরিশচন্দ্র 'হরগৌরীতে' এঁয়োর শাঁখার তত্ত্ব প্রচার করেন।

প্রকৃত তত্ত্ব সম্বন্ধে আরও অনুসন্ধান আবশ্যক অনুসন্ধিৎসু গ্রন্থকারের নিকট আমরা ইহা প্রত্যাশা করিতে পারি।

পুস্তকখানির প্রথম ভাগ গ্রন্থকার তাঁহার স্বর্গীয় পিতৃদেব রায়সাহেব জ্ঞানদাচরণ বসু ও মাতৃদেবীকে এবং দ্বিতীয় ভাগ স্বর্গগতা পত্নী সুরবালা বসুকে উৎসর্গ করিয়া একদিকে পিতৃমাতৃ ভক্তি অপরদিকে সহধর্ম্মিণীর প্রতি প্রবলানুরাগের পরিচয় দিয়াছেন। পুস্তকে ৩৭ খানা ছবি আছে। ছাপা অতি সুন্দর।

এইরূপ একখানি মনোজ্ঞ ও তত্ত্ববহুল গ্রন্থ বহুদিন পড়ি নাই। বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে ইহার প্রচার হইলে আমরা সুখী হইব। কারণ এরূপ সদ্‌গ্রন্থের প্রচার এখন নিতান্তই বিরল।

সরলা—শ্রীযুক্ত শশীভূষণ সেন প্রণীত। মূল্য ॥৹ আনা। গ্রন্থকার অতি প্রাঞ্জল ভাষায় তাঁহার পরলোকগতা সহধর্ম্মিণীর গার্হস্থ্য জীবনের একটী সুন্দর চিত্র দিয়াছেন। গ্রন্থের ভাষাও যেমন সরল, কথাগুলিও অতি পরিষ্কার ভাবে বর্ণিত হইয়াছে। কিরূপে সরলাদেবী নানারূপ শোক ও বিপদ তুচ্ছ করিয়া ধীরচিত্তে স্বামীর ঘরকন্না করিয়া সংসারটীকে সুখের করিয়াছিলেন, পাতায় পাতায় তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। আমরা বর্ত্তমান সময়ে নানারূপ প্রেম-বহুল গল্পের পরিবর্ত্তে যদি এইরূপ উপাদেয় গ্রন্থ পাই, বিশেষ প্রীত হইব। নকারজনক সাহিত্যে বাঙ্গলার আবহাওয়া বিকৃত হইয়াছে। একমাত্র সৎসাহিত্যেই সেই অবস্থার পরিবর্ত্তন সম্ভব। আমরা গ্রন্থখানির বহুল প্রচার কামনা করি।

রবীন্দ্র জন্মদিন—জ্যৈষ্ঠের 'শনিবারের চিঠিতে' শ্রীযুক্ত মোহিত মজুমদার মহাশয়ের 'রবীন্দ্র-জন্মদিন' উপলক্ষে প্রবন্ধটী অত্যুক্তি-দোষে দোষণীয় হইয়াছে। তাঁহার মতে :—

(১) রবীন্দ্রনাথ সাহিত্য জগতে যুগাবতার।

(২) তাঁহার অবদানে তিনি বঙ্কিম-বিবেকানন্দ যুগকেও অতিক্রম করিয়াছেন।

(৩) 'অতুল শান্তি ও বিপুল বিরতি' সম্বন্ধে তিনি জগতের কবিদের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

রবীন্দ্রনাথ যে জগতের শ্রেষ্ঠ কবিদের সহিত সম-আসনে উপবিষ্ট হইবার অধিকারী সকলেই তাহা স্বীকার করেন। এই জাতি হয় ত তাঁহার নাম আবহমানকালই করিবে, কিন্তু উপরোক্ত বিশেষণে কবি বোধ হয় নিজেই লজ্জিত হইবেন যাহা হউক তর্ক ছাড়িয়া, এতবড় প্রতিভাশালী ব্যক্তি এই জাতিকে কি দিয়া উন্নত করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন, তাহাই বিচার্য্য।

মোহিতবাবু বলেন "বাঙ্গালাদেশে আজ আর কোন স্তম্ভ নাই, কোন আলোক নাই; এ যুগে বাঙ্গালীর মত এত আত্মপ্রবঞ্চিত, আত্মঘাতী, বুদ্ধিহত, নির্ব্বীর্য্য জাতি আর নাই। জীবনের কোন ক্ষেত্রে নূতন কিছু অর্জ্জন করিবার তাহার যোগ্যতা নাই, পৈত্রিক যাহা কিছু ছিল এতদিন তাহারই অপচয় করিয়া সেই পিতৃগণকে সে পরিহাস করিয়াছে। যে সর্ব্বনাশকে সে নিজেই ডাকিয়া আনিয়াছে সেই সর্ব্বনাশ আজ যখন করালতম মূর্ত্তিতে একেবারে সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত, তখনও তাহার ধর্ম্মবুদ্ধি বা শুভবুদ্ধি নাই; সৃষ্টির পরিবর্ত্তে অনাসৃষ্টি, জীবনের পরিবর্ত্তে মৃত্যু, ত্যাগের পরিবর্ত্তে অতি নীচ আত্মপ্রতিষ্ঠার প্রবৃত্তি তাহাকে পাইয়া বসিয়াছে।"

ইহা পরিণত বয়স্কদের উপলক্ষে লিখিত, যুবকদিগের সম্বন্ধেও মোহিত বাবুর উক্তি খুবই নৈরাশ্যজনক। তিনি বলিতেছেন—

"আজিকার যাঁহারা তরুণ সম্প্রদায় তাহাদের মনোভাব আমি অনেক চেষ্টা করিয়াও বুঝিতে পারি নাই, তার কারণ আমার শিক্ষা ও সংস্কার, আমার মানস-আদর্শ ও জীবন-দর্শন এতই ভিন্নমুখী যে কোনখানে কোন দিক্‌দিয়া তাহাদের সহিত পরিচয় অসম্ভব।"

মোহিতবাবু দেশের দুর্গতির চরম অবস্থার একটী ভয়াবহ চিত্র দিয়াছেন। কিন্তু আমরা বুঝিতে পারি না যে দুই পুরুষ হইতে যদি আমাদের এইরূপ অবস্থা হয়, তবে আমাদিগকে কবি কিরূপ উন্নত করিয়াছেন? আর তাঁহার বাণী অবিশ্বাসের আত্মঘাত হইতেই বা জাতিকে কিরূপে রক্ষা করিতেছে?

কবি বলিয়াছেন "এত দীর্ঘকাল বাঁচিয়া থাকা একপ্রকার ধৃষ্টতা, তেমন ব্যক্তি সমাজের নিকট যেন অপরাধী।" মোহিতবাবু বলেন কবির এই কথায় তিনি খুবই সন্তুষ্ট হইয়াছেন। তিনি যদি সন্তুষ্টই হইয়া থাকেন, তবে এইরূপ বিভীষিকাময় চিত্র দিয়া কবির সন্তাপ আরও কেন বৃদ্ধি

করিলেন? ইহাতে কি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন হইয়াছে? আর জাতি যদি এতই অপদার্থ ও অধঃপতিত হয়, তবে যে মোহিতবাবু বলিয়েছেন, "কবি যতদিন বাঁচিবেন বাঙ্গালীর সুনাম বজায় থাকিবে। তারপরে কি হইবে বিধাতাই জানেন—"তাহা কি অর্থহীন স্তোকবাক্য নয়?

কিন্তু মোহিতবাবু নিরাশ হইলেও প্রকৃতই জাতি এতটা অপদার্থ হয় নাই—আর তরুণ সম্প্রদায়ের অবস্থাও এত নৈরাশ্যজনক নয়। গত চল্লিশ বৎসর মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন ক্ষেত্রে বাঙ্গালী যুবক যেরূপ মনুষ্যত্বের পরিচয় দিয়াছে, তাহাতে সুনিয়ন্ত্রিত হইলে তাহারা জগতের কোন যুবক সম্প্রদায় হইতে যে ন্যূন নয় তাহা খুবই নিশ্চিত। তবে কে তাহাদিগকে চালাইবে? একদিন বঙ্কিম-বিবেকানন্দের বাণীতে তাহারা উৎসাহ পাইয়া উন্নত হইয়াছিল। দেশবন্ধু বলিতেন, বঙ্কিমের প্রেরণাতেই মাতৃযজ্ঞে গিয়াছিলাম। আর আজ? আজ কদর্য্য সাহিত্য, সিনেমা, টকী, নৃত্যগীত তাহাদিগকে চালাইতেছে। অথচ জগৎ-বরেণ্য কবি এখনও পরিচালকের শক্তিতে বরীয়ান।

একদিন রবীন্দ্রনাথই বাঙ্গালীকে এক করিতে গাহিয়াছিলেন—

বাঙ্গলার মাটী বাঙ্গলার জল
বাঙ্গলার শস্য বাঙ্গলার ফল
সত্য হউক সত্য হউক হে ভগবান্—

তাঁহার ব্যাধি ও প্রতীকার বাঙ্গালীহৃদয় স্পর্শ করিয়াছিল। জাতীয় শিক্ষায় তাঁহার অবদান ও ন্যূন ছিল না। দিন গেল দিন ফুরাইল রবীন্দ্রনাথ বিদেশে গিয়া একদিন 'নোবেল প্রাইজ' পাইলেন। বাঙ্গালীর গৌরব বৃদ্ধি হইল, সমগ্র বাঙ্গালা তাঁহাকে সম্মান করিতে শান্তিনিকেতনে অতিথি হইল। কিন্তু আহত হইয়া ফিরিয়া আসিল। বাঙ্গালা ক্ষুণ্ণ হইল।

কেবল তাহাই নয়। রবীন্দ্রনাথে ইবসেনিজম্ আশ্রয় করিল। তাঁহার লেখনী 'ঘরে বাইরে' প্রসব করিল। 'বোষ্টমী' আসিল, 'মেজদিদি' প্রধান হইলেন। আবার 'পয়লা নম্বরের' নব নব সংস্কার আরম্ভ হইল। এবার রবীন্দ্র-পুষ্ট প্রমথ চালিত 'সবুজপত্র' তরুণদের শিক্ষাভার গ্রহণ করিল। দেশ বঙ্কিম-বিবেকানন্দ ভুলিতে লাগিল, জাতীয়তা ভুলিল, বরিশালের যজ্ঞকুণ্ড ভুলিল, অর্দ্ধোদয়ে যুগের সেবাধর্ম্ম আর তাঁহাকে আকর্ষণ করিল না। সে এখন দস্যু হইল, গল্প লিখিতে লাগিল, আর্টের যুগ চলিল।

এই অবস্থায় রবীন্দ্রনাথও একদিন ভীত হইয়া শাসন করিবার জন্য বেত্রদণ্ড ধারণ করিলেন বটে, কিন্তু 'সতী' রচয়িতা ডাক্তার নরেশ সেনগুপ্তের সমর্থনেই অধিক লোক দাঁড়াইল। ভূত ওঝাকে আক্রমণ করিতে ছাড়িল না।

ইতিপূর্ব্বে সর্ব্বস্ব ছাড়িয়া একবার দেশবন্ধু মাতৃযজ্ঞে গিয়াছিলেন বটে, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ তাঁহাকে দেওয়াল গাঁথিয়া বাহিরের আলো বন্ধ করিতে নিষেধ করিলেন। আবার কিছুদিন পরে দেশবন্ধুর মহাপ্রস্থানে সেই ভাববন্যা যখন ক্ষীণ ভাঁটায় পরিণত, রবীন্দ্রনাথ তখন বিশ্বজয়ে বাহির হইলেন, আর নৃত্য ও 'নটীর পূজা' তাঁহার সহগামী হইল। নৃত্যে প্রাচ্যের গন্ধ আছে আর রবীন্দ্রনাথ উহার উৎসাহ দাতা, ফলে গরীব দেশ নৃত্যবহুল হইয়া উঠিল। আজ নৃত্যগীতে দেশ উৎসন্ন যাইতে বসিয়াছে। কিন্তু আবার পশ্চাৎ ফিরিবার দিন আসিয়াছে। আজ কবি যেন কালোপযোগী বাণীর সহায়ে দেশকে প্রকৃষ্ট পন্থা নির্দ্দেশ দিতে কখনও ত্রুটী করেন না। তাঁহার জন্মদিন উপলক্ষে আমাদের ইহাপেক্ষা আর বেশী কামনা নাই। আমরা তাঁহার শতবৎসরের পরমায়ু কামনা করি।

"সভ্যতা সঙ্কট"—জ্যৈষ্ঠ মাসের 'প্রবাসী'তে রবীন্দ্রনাথের 'সভ্যতার সঙ্কট' অভিভাষণ প্রবন্ধাকারে বাহির হইয়াছে। ৮০ বৎসর পূর্ণ হইলে রবীন্দ্রনাথ তাহার জন্মোৎসব উপলক্ষে যে একটী অভিভাষণ পাঠ করিয়াছিলেন তাহারই নাম 'সভ্যতার সঙ্কট'। ইংরাজ শাসনের ব্যর্থতায় অভিভাষণটী পূর্ণ। যদিচ দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন প্রমুখ বহু দেশনায়ক এ সম্বন্ধে অনেক কথা বলিয়াছেন তথাপি রবীন্দ্রনাথের এই বার্দ্ধক্যেও প্রকৃত কথাগুলি যে ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহাতে দেশবাসী আশ্বস্ত হইবে। ইংরেজ গত ১৮৪ বৎসর হইতে এই দেশ শাসন করিতেছে। ইংরাজ জাতি ডেমোক্রেসীর পক্ষপাতী। কিন্তু এই দীর্ঘকালের মধ্যে ইংরাজ আমাদিগকে কি দিয়াছে, তাহাই প্রবন্ধে আছে। রবীন্দ্রনাথ বলেন যে, মানব-মৈত্রীর বিশুদ্ধ পরিচয় ইংরাজ

চরিত্রে তিনি পাইয়াছেন। এখনও এণ্ড্রুজ প্রভৃতি কয়েক জন ইংরাজের মহত্ত্বে ব্যক্তিগত ভাবে তিনি বিশেষ মুগ্ধ। কিন্তু "এখন সাম্রাজ্যের মদমত্ততায় তাঁহাদের দাক্ষিণ্য কলুষিত।"

দ্বিতীয়তঃ, কবি বলেন, "ভারতবর্ষ ইংরাজের সভ্যশাসনের জগদ্দল-পাথর বুকে করিয়া নিরুপায় ও নিশ্চলতার মধ্যে অতলস্পর্শে তলাইয়া গিয়াছে।"

দৃষ্টান্তস্বরূপ তিনি বলেন যে, ভারতবর্ষ জাপান অপেক্ষা বুদ্ধিসামর্থ্যে কোন অংশে ন্যূন না হইলেও, উহা এত উন্নত ইহার কারণ ভারত ইংরাজ-শাসনের দ্বারা সর্ব্বতোভাবে অধিকৃত ও অভিভূত, আর জাপান স্বাধীন।

তৃতীয়তঃ, যে আইন এবং শৃঙ্খলা সম্বন্ধে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন ১৯২১ হইতে ১৯২৫ পর্য্যন্ত নানাভাবে নানাস্থানে অতৃপ্তি প্রকাশ করিয়াছেন, আজ রবীন্দ্রনাথও বলিতেছেন :—

"এই বিদেশীয় সভ্যতা, যদি এ'কে সভ্যতা বলো, আমাদের কি অপহরণ করেছে তা জানি, সে তার পরিবর্ত্তে দণ্ডহাতে স্থাপন করেছে যাকে নাম দিয়েছে আইন ও শৃঙ্খলা—বিধি এবং ব্যবস্থা, যা সম্পূর্ণ বাইরের জিনিষ বা দরোয়ানি মাত্র। পাশ্চাত্য জাতির সভ্যতাভিমানের প্রতি শ্রদ্ধা রাখা অসাধ্য হয়েছে। সে তার শক্তিরূপ আমাদের দেখিয়েছে, মুক্তিরূপ দেখাতে পারে নি। অর্থাৎ মানুষে মানুষে যে সম্বন্ধ সব চেয়ে মূল্যবান এবং যাকে যথার্থ সভ্যতা বলা যেতে পারে, তার কৃপণতা এই ভারতীয়দের উন্নতির পথ সম্পূর্ণ অবরুদ্ধ ক'রে দিয়েছে।"

কবি আরও বলেন—সোভিয়েট রাশিয়ার শাসনের রূপ এত উদার যে "বৃহৎ সাম্রাজ্যের মূর্খতা ও দৈন্য ও আত্মাবমাননা অপসারিত হয়ে যাচ্ছে"।

দুই একদিন পূর্ব্বেও রবীন্দ্রনাথ এইজন্যই বলিয়াছেন যে, ১৮০ বৎসরের ইংরাজ শাসনে শতকরা দশজন শিক্ষিত; আর ১৩ বৎসরের সোভিয়েট রুশিয়ায় শতকরা ৯০ জন শিক্ষিত।

অতঃপর কবি বলেন—সোভিয়েট রাশিয়ায় মুসলমান ও অমুসলমানে রাষ্ট্র-অধিকারের ভাগবাটোয়ারা লইয়া কোন বিরোধ নাই।

সর্ব্বাপেক্ষা যে বিষয়টী আজ চল্লিশকোটি ভারতীয় নরনারীর একমাত্র ভাবনার বিষয় হইয়াছে সেইটী সম্বন্ধে সর্ব্বশেষে রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন—"সভ্যশাসনের চালনায় ভারতবর্ষের সকলের চেয়ে দুর্গতি আজ মাথা তুলে উঠেছে, সে কেবল অন্ন-বস্ত্র-শিক্ষা এবং আরোগ্যের শোকাবহ অভাব মাত্র নয়, সে হচ্ছে ভারতবাসীর মধ্যে অতি নৃশংস আত্মবিচ্ছেদ। এর কোন তুলনা দেখতে পাইনি ভারতবর্ষের বাইরে মুসলমান স্বায়ত্ত-শাসনচালিত দেশে।"

এই সমস্ত ব্যর্থতা দেখাইয়া রবীন্দ্রনাথ মনে করেন "ভাগ্যচক্রের পরিবর্ত্তনের দ্বারা একদিন না একদিন ইংরেজকে ভারত সাম্রাজ্য ত্যাগ ক'রে যেতে হবে। কিন্তু সে যখন যাবে ভারতবর্ষ আর লক্ষ্মীছাড়া দীনতার আবর্জনা ভিন্ন কিছুই থাকিবেনা।"

রবীন্দ্রনাথের কথা ঠিক এবং এই অবস্থাই ইংরাজ এখন দূর করিতে পারে যদি প্রকৃত মানবহিতৈষী নরশ্রেষ্ঠ ভারতবাসীর সহায়তা পায়। এই সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ কতকটা আশার বাণী দিয়া বলেন—

"আজ আশা ক'রে আছি, পরিত্রাণ-কর্ত্তার জন্মদিন আসছে আমাদের এই দারিদ্র্যলাঞ্ছিত কুটীরের মধ্যে...... মানুষের চরম আশ্বাসের কথা মানুষ এসে শোনাবে এই পূর্ব্ব-দিগন্ত থেকেই—

ঐ মহামানব আসে
দিকে দিকে রোমাঞ্চ লাগে
মর্ত্ত্যধূলির ঘাসে ঘাসে।

আমাদেরও মনে হয় মুক্তি আসিবে পূর্ব্ব-দিগন্ত হইতেই।

গল্প-প্রতিযোগীতা

বঙ্গশ্রীর জন্য একটী গল্প প্রতিযোগীতা আহ্বান করা যাইতেছে। গল্পগুলি বঙ্গশ্রীর আদর্শের সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখিয়া লিখিত হইবে। ইহার মধ্যে যে গল্প দুইটী ভাল বিবেচিত হইবে, ভাদ্রমাসে তাহাদের যথাক্রমে ২৫৲ ও ১৫৲ টাকা প্রথম ও দ্বিতীয় পুরস্কার দেওয়া হইবে। সম্পাদকগোষ্ঠীর মনোনয়নই চূড়ান্ত বলিয়া গৃহীত হইবে। পাঠাইবার শেষ তারিখ ১০ই শ্রাবণ; ইহার পর কোন গল্প গৃহীত হইবে না। গল্প ফেরৎ দেওয়া হইবে না। গল্প পাঠাইবার ঠিকানা—সম্পাদক, বঙ্গশ্রী : ১১, ক্লাইভ রো, কলিকাতা। বঙ্গশ্রীর আদর্শ সম্বন্ধে যাঁহারা উৎসাহী, তাঁহারা এই ঠিকানায় দেখা করিয়া, বা পত্র লিখিয়া উহা জানিতে পারেন। ইতি—

—সর্ব্বাধ্যক্ষ।

"লক্ষ্মীস্ত্বং ধান্যরূপাসি প্রাণিনাং প্রাণদায়িনী"

বঙ্গশ্রী

শ্রাবণ—১৩৪৮

৯ম বর্ষ—১ম খণ্ড, ২য় সংখ্যা শৈলেন্দ্র নাথ কুণ্ডু

সাময়িক প্রসঙ্গ ও আলোচনা

দেশবন্ধু-স্মৃতি-বার্ষিকী

গত ১৬ই জুন (২রা আষাঢ়) তারিখে ভারতের প্রায় সকল প্রদেশেই দেশবন্ধুর ভক্ত ও গুণগ্রাহীগণ অতি শ্রদ্ধার সহিত তাঁহার পুণ্যস্মৃতি-ব্রত উদ্‌যাপন করিয়াছেন।

এই উপলক্ষে কলিকাতা কর্পোরেশনের ভূতপূর্ব্ব মেয়র মিঃ আবদুর রহমান্ সিদ্দিকি সাহেব দেশবন্ধু-স্মৃতি-মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য যে একটি আ-বক্ষ মর্ম্মর মূর্ত্তি প্রদান করিয়াছেন, পূর্ব্ব দিবসে (১৫ই জুন) মুর্শিদাবাদের মাননীয় নবাব বাহাদুরের পৌরহিত্যে উহার আবরণ-উন্মোচন-উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। সেই অনুষ্ঠানে নবাব বাহাদুর বলেন—

"ভারতে যে মহান আদর্শ দেশবন্ধু প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, সেই আদর্শ দেশবাসী কখনই বিস্মৃত হইবে না। ভারতের দুইটি বৃহৎ সম্প্রদায়ের মধ্যে আজ পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষপুষ্ট যে এক বিকৃত মনোভাব উদয় হইয়াছে, ইহার উচ্ছেদ সাধন করিয়া উক্ত সম্প্রদায় দুইটির মধ্যে মধুর ভ্রাতৃ-বন্ধন স্থাপন করিতে হইলে আবার আমাদের সকলকে দেশবন্ধুর আদর্শেই অনুপ্রাণিত হইতে হইবে।"

বর্ত্তমানের সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ-জর্জ্জরিত পরিস্থিতির কথা স্মরণ করিয়া সর্ব্বান্তঃকরণে আজ আমরা নবাব বাহাদুরের উক্তির প্রতিধ্বনি করিতেছি।

'বঙ্গশ্রী'র পাঠক মাত্রেই অবগত আছেন যে, আমরা আধুনিক পাশ্চাত্য-ভাবাপন্ন বিজ্ঞান, কৃষ্টি ও সভ্যতার পক্ষপাতী নহি। অধিকন্তু যাঁহারা এই বিজাতীয় বিজ্ঞান ও সভ্যতার পৃষ্ঠপোষক, তাঁহাদের বর্ত্তমান মতবাদকে সর্ব্বদাই আমরা তীব্র ভাষায় সমালোচনা করিয়া থাকি। এই কারণেই দেশবন্ধুর চিন্তা ও কর্ম্মধারার সহিত সকল সময়ে আমরা একমত হইতে পারি নাই। কিন্তু আজ দেশবন্ধুর অনন্য-সাধারণ দেশভক্তি, অপূর্ব্ব ত্যাগ এবং ইন্দ্রিয়জয়ী আদর্শ মননশক্তির কথা স্মরণ করিয়া তাঁহার উদ্দেশ্যে আমাদের অকুণ্ঠ ও গভীর শ্রদ্ধাজ্ঞাপন ভিন্ন আর কিছুই নাই। আজ তাঁহার স্মৃতি-বাসরে সেই শ্রদ্ধাই আমরা জ্ঞাপন করিতেছি।

পরাধীন ভারতবর্ষের গত পাঁচশত বৎসরের ইতিহাস মসীলিপ্ত। এই ইতিহাসে প্রকৃত দেশপ্রেমিক মহাপুরুষের সংখ্যা নিতান্তই বিরল। চিত্তরঞ্জন সেই অঙ্গুলিমেয় মহাপুরুষদের মধ্যে অগ্রগণ্য ছিলেন। দেশ-হিতব্রতে জনসাধারণের পরিত্রাণের জন্য সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিতেও তিনি কখনও পশ্চাদ্‌পদ হন নাই। ধন-সম্পদ, মান, যশ এমন কি দেহ ও মন পর্য্যন্ত দেশ-মাতৃকার বেদীমূলে তিনি আত্মোৎসর্গ করিয়াছিলেন। সর্ব্বস্ব পণ করিয়া দেশসেবা করিয়াছিলেন বলিয়াই তিনি আমাদের এরূপ-অখণ্ড-শ্রদ্ধার পাত্র।

চিত্তরঞ্জনের প্রথম জীবনের পানাসক্তি ও বিলাস ব্যসনের

কথাও আমরা বিস্মৃত হই নাই। কিন্তু দেশ-মাতৃকার পূজারী হইয়া কিরূপ বিপুল আত্মসংযমে তিনি উহা দমিত করিয়াছিলেন, তাহা ভাবিলেও বিস্ময়াপন্ন হইতে হয়। ইন্দ্রিয় বশ করিবার তাঁহার অসাধারণ শক্তি ছিল, আর তিনি দেশ-ব্রতে ভাল মন্দ সবই ত্যাগ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তাঁহার ন্যায় দেবদুর্লভ বীরের অভাব ভারতবর্ষ চিরকালই অনুভব করিবে। আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে তাঁহার আত্মার সদ্‌গতি কামনা করি, ও দেশবাসীকে তাঁহার আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া জনসেবায় আত্মনিয়োগ করিতে অনুরোধ করি।

প্রকৃতই আজ যদি দেশবাসী প্রকৃষ্ট-পন্থা নির্দ্ধারণ করিতে সমর্থ হয়, তবে দেশবন্ধুর আদর্শে সর্ব্বস্বপণ করিলে ভারত আবার নিশ্চয়ই জগতের শ্রেষ্ঠ আসন লাভ করিতে সমর্থ হইবে। তবেই দেশ বন্ধুর স্মৃতির উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন সার্থক হইবে। কবে আবার আমাদের সেই সুদিন সমাগত হইবে?

কংগ্রেস ও সমরায়োজনে মিঃ মেহ্‌তা

শ্রীযুক্ত যমুনা দাস মেহ্‌তা কলিকাতা নগরীর অক্‌টার-লোনী মনুমেন্টের পাদদেশে আহুত এক জনসভায় কংগ্রেসের নীতির সমালোচনা করিয়া বলিয়াছেন যে, "কংগ্রেসের প্রধান নেতৃবৃন্দের সরব ঢক্কা-নিনাদ আর ওয়ার্কিং কমিটীর প্রস্তাবাদি সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী অ-সার মনোভাব সম্পন্ন হইলেও ইহার কর্ম্মপন্থা কিন্তু পুরাদস্তুর গণতন্ত্র-বিরোধী ও ফ্যাসিষ্ট মনোবৃত্তি সম্পন্ন আর ইহার মূল-নীতি নিতান্তই কল্পনা-প্রসূত ও দর্শন অভিমুখী (metaphysical)। তাঁহার মতে, কংগ্রেসের খদ্দর-আন্দোলন, অস্পৃশ্যতা বর্জ্জন ও সাম্প্রদায়িক ঐক্য আর যাহাই হউক, উহাতে রাজনীতির নামগন্ধও নাই।

ইতিপূর্ব্বে কংগ্রেসের কর্ম্ম ও নীতি সম্বন্ধে আমরা বহুবার আলোচনা করিয়াছি। আমাদের মতে গান্ধীজীর সত্যাগ্রহ আন্দোলনে কোন সুফলের সম্ভাবনা নাই। উহা একান্তই অবাঞ্ছনীয়। প্রত্যুত কংগ্রেসের বর্ত্তমান কর্ম্মপন্থা অনেক ধীরবুদ্ধি ব্যক্তিও বিবেকের সহিত গ্রহণ করিতে পারেন না। কিন্তু বড়ই দুঃখের সহিত বলিতে বাধ্য হইতেছি যে, মিঃ মেহ্‌তার যুক্তি কোন প্রকারেই সমর্থন যোগ্য নয়। কংগ্রেস কর্ম্মপন্থা দর্শন-অভিমুখী (metaphysical)! শ্রীযুক্ত মেহ্‌তা কি এই কথাটির অর্থ বুঝিয়া উহা ব্যবহার করিয়াছেন?

কংগ্রেস-নীতি দার্শনিক ভাবসম্পন্ন হইলে তো উহাতে দেশবাসীর প্রকৃত হিতসাধনই হইত। এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে দর্শনের নীতি, নিয়ম-তান্ত্রিকতার নীতি, উহা সতত প্রাণী-জগতের মঙ্গল-প্রয়াসী, কদাপি অহিত-কামী নয়। সুতরাং দর্শনের প্রতি শ্রীযুক্ত মেহ্‌তার অযথা কটাক্ষ প্রকাশে দর্শন সম্বন্ধে তাঁহার অজ্ঞানতাই প্রতীয়মান হইতেছে।

এতদ্ভিন্ন তিনি যে বর্ত্তমান কালের সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ-দুষ্ট পরিস্থিতিতে সাম্প্রদায়িক ঐক্যের আন্দোলনকে অ-রাজনীতিক বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন, এইরূপ উক্তি অপেক্ষা অধিকতর হাস্যাস্পদ আর কি হইতে পারে! অবশ্য একথা খুবই সত্য যে, এই উদ্দেশ্যে কংগ্রেস যে প্রণালীতে কাজ করিতে চায় তাহা সময়োপযোগী বা সমীচীন নয়। কিন্তু ভারতে সাম্প্রদায়িক ঐক্যের চেষ্টা অপেক্ষা আর প্রকৃষ্টতর রাজনীতি যে কি হইতে পারে তাহা আমরা ধারণাই করিতে পারি না। কংগ্রেসের এই প্রচেষ্টা যে খুবই প্রশংসনীয়, তাহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। তবে, কংগ্রেস নেতাদের নিকট আমাদের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ, তাঁহারা যেন প্রকৃত পন্থা গ্রহণ করিতে পশ্চাদ্‌পদ না হয়েন।

শ্রীযুক্ত মেহ্‌তা আরও বলিয়াছেন যে, কংগ্রেসী-শাসন কালে প্রাদেশিক মন্ত্রিমণ্ডলী চেষ্টা করিলে স্ব স্ব প্রদেশস্থ অধিবাসীবর্গকে আধুনিক যুদ্ধবিদ্যায় বিশেষ পারদর্শী করিয়া তুলিতে পারিতেন। স্বীকার করি পারিতেন, কিন্তু তাহাতে কি ফল লাভ হইত? ইংলণ্ড তো আধুনিক যুদ্ধ-বিদ্যায় খুবই পারদর্শী, কিন্তু এই পারদর্শিতা কি ইংলণ্ডের অসহায় জনমণ্ডলীকে—ইহার নিরীহ শিশু, স্ত্রীলোক ও রুগ্ন ব্যক্তিগণকে শত্রুর আক্রমণ হইতে রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছে?

আধুনিক রণ-নীতি যে মানবের সামান্য হিতসাধন করিতেও সমর্থ নয়, তাহা বুঝিতে ইহজগতে কি আর কাহারও বাকী আছে? বস্তুতঃ এখন আমাদিগকে নব নব পদ্ধতিতে নূতন করিয়া রণ-নীতির নবপ্রথা আবিষ্কার করিতে হইবে। আর এই নবাবিষ্কৃত যুদ্ধবিজ্ঞানের উদ্দেশ্য হইবে পরস্পর হানাহানি হইতে জগতের রক্ষার বিধান, ধ্বংসের ইন্ধন সংগ্রহ নয়। একমাত্র বিধাতাই জানেন, কোন মহাপুরুষ এই নব বিধান আবিষ্কার করিয়া জগতের চিরশান্তি স্থাপন করিতে সমর্থ হইবেন।

হিন্দু মহাসভা কর্তৃক প্রত্যক্ষ সংঘর্ষ-বর্জ্জন

বিগত মাদুরা অধিবেশনে কার্য্যকরী সমিতি কর্তৃক একটী সংঘর্ষমূলক কর্ম্মপন্থা অবলম্বনের প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছিল। সম্প্রতি কলিকাতায় যে সর্ব্ব-ভারতীয় হিন্দু সভাকমিটি আহূত হয়, তাহাতে সদস্যগণ ভবিষ্যতে অনুকূল সুযোগের অপেক্ষায়, উক্ত কর্ম্মপন্থা স্থগিত রাখিয়াছেন।

হিন্দু মহাসভার এই নূতন সিদ্ধান্ত বাস্তবিকই প্রশংসার্হ সন্দেহ নাই। আর প্রত্যক্ষ সংঘর্ষ স্থগিত করিয়া বর্ত্তমান দ্বন্দ্ব-কলহের সময়ে মহাসভা সমীচীন কার্য্যই করিয়াছেন। তবে এ কথা সত্য যে, মহাসভা-অবলম্বিত মূলনীতিই দোষনীয়, তাই আমরা তাহা কখনও সমর্থন করিতে পারি না। কারণ সংঘর্ষের তো কথাই নাই, ইহার দৃষ্টিভঙ্গীই ভারতীয় ঋষিগণ কৃত হিন্দু দর্শনের সম্পূর্ণ পরিপন্থী।

হিন্দুদর্শনের শিক্ষা-দীক্ষা অতীব মহান্, ইহাতে প্রত্যেক নরনারীর প্রতি দ্বন্দ্ব-কলহ ও রাগ-দ্বেষ প্রভৃতি নিকৃষ্ট চিত্তবৃত্তি গুলির দমন করিবার নির্দ্দেশ আছে। পক্ষান্তরে, তথাকথিত হিন্দুর জাতীয় জীবনের উন্নয়ক হিন্দু মহাসভার নীতি প্রকৃতই মুসলমান স্বার্থ-বিরোধী। স্বভাবতঃই ঐ নীতি আন্দোলিত ও অনুসৃত হইয়া মানুষের কু-চিত্তবৃত্তিগুলিকেই প্রশ্রয় দিয়া থাকে। এখন আবার গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে সংঘর্ষমূলক আন্দোলন উপস্থিত করিয়া প্রতিহিংসা সাধন করিতে প্রবৃত্ত হইলে সেই বৃত্তিগুলি আরও প্রশ্রয় লাভ করিবে। পরস্পর বিরোধী আন্দোলন প্রশ্রয় দেওয়ায় হিন্দু-মহাসভা ও মুস্লিম-লীগ উভয় সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠানের কার্য্য কলাপেই দেশ প্রকৃতই জর্জ্জরিত হইয়া উঠিয়াছে। কংগ্রেসও এরূপ কার্য্য প্রশ্রয় দিয়া অবস্থার একটুও উন্নতি করিতে সমর্থ হয় নাই। একেইতো দ্বন্দ্ব-কলহের মাত্রা চরমে উঠিয়াছে, আবার উহাতে ইন্ধন প্রদানের আবশ্যকতা কি? উক্ত তিনটী মহতী প্রতিষ্ঠানের কার্য্য-প্রণালীই যে কত দোষনীয়, এ বিষয়ে সময় থাকিতে সকলকে সচেতন হইতে আমরা অনুরোধ করিতেছি।

তুরস্কের সহিত জার্ম্মানীর নূতন বাণিজ্য-চুক্তি

আষাঢ় সংখ্যার আলোচনায় 'বৃটেনের প্রতি তুরস্কের প্রকৃত মনোভাবের বিশ্লেষণ করিয়া আমরা বলিয়াছিলাম যে, তুরস্ক এক প্রকার নিরুপায় হইয়াই বৃটেনের বন্ধুত্ব স্বীকার করিতেছে। নতুবা সুবিধা পাইলেই সে জার্ম্মানীর সঙ্গে যোগদান করিয়া বসিবে। কিছুদিন পূর্ব্বে জার্ম্মেনীর সহিত তুরস্কের দশ বৎসরের জন্য নূতন যে চুক্তি স্বাক্ষরিত হইয়াছে, তাহাতে আমাদের ধারণা যে নিতান্ত কল্পনাপ্রসূত নহে, তাহা আংশিক ভাবে প্রমাণিত হইয়াছে। আপাতদৃষ্টিতে এই চুক্তি অর্থনীতি সম্বন্ধ যুক্ত বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু প্রকৃত-পক্ষে ইহার গূঢ় উদ্দেশ্য একান্তই রাজনৈতিক। বস্তুত বৃটেনের



মিঃ ইনান্নু

প্রতি তুরস্কের আন্তরিকতার কোন বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ এ পর্য্যন্ত আমরা পাই নাই। কারণ তুরস্ক বৃটেনের প্রকৃত বন্ধু হইলে জার্ম্মানী কখনই সিরিয়ায় এত অনায়াসে বিমান বহরের সমাবেশ ও অপসারণে সমর্থ হইত না। তুরস্ককে আমরা বরাবর সন্দেহের চক্ষে দেখিয়াছি। আশাকরি, আমাদের এই সন্দেহ যেন ভ্রান্ত সন্দেহেই পর্য্যবসিত হয়।

মিঃ চার্চ্চিলের বেতার বক্তৃতা

পূর্ব্বে আমরা বলিয়াছিলাম, গান্ধীজী প্রবর্ত্তিত ধৈর্য্য-নীতির প্রভাব অধুনা মিঃ চার্চ্চিলকে বড় বেশী অভিভূত

করিয়া ফেলিয়াছে। ধৈর্য্য-নীতির প্রতি কটাক্ষ করা অবশ্য আমাদের লক্ষ্য নয়। কিন্তু এই ধৈর্য্য-নীতি যদি গঠনমূলক কার্য্যে নিয়োজিত না হইয়া কেবল ধ্বংসলীলারই পরিপোষণ করিয়া চলে, তবে সেই ধৈর্য্যের কোন অর্থ থাকেনা, আর উহা নিতান্তই নিন্দনীয়। বিপন্ন বিশ্বমানবের উদ্ধার সাধনের যে আদর্শ ইংলণ্ড আজ প্রচার করিতে চায়, সেই আদর্শের



মিঃ চার্চিল

সাফল্যলাভ, সংগঠনমূলক কার্য্য ব্যতীত কেবল ধৈর্য্যের দোহাই দিলেই কদাপি সম্ভব হইবে না। আশাকরি, চার্চিল মহোদয় ইংলণ্ডবাসীকে এই আদর্শেই অনুপ্রাণিত করিয়া প্রকৃত কর্ম্ম-পন্থা নিরূপণে সচেষ্ট হইবেন। নতুবা, তিনি যে ইংলণ্ডকে ধ্বংসপথে চালিত করিয়াছেন, ভবিষ্যতে ইহা ছাড়া আর অন্য কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া আর সম্ভব হইবে না।

কলিকাতায় নিষ্প্রদীপ

প্রায় মাসাধিক কাল হইতে কলিকাতা সহরে নিষ্প্রদীপ সুরু হইয়াছে। আর কিছু না হোক্—এই নিষ্প্রদীপের ফলে কলিকাতাবাসী যে এক নূতন বিপদের আভাষ প্রাপ্ত হইয়াছে, এ কথা অস্বীকার করা যায় না। বিপদের কথা বলিতে আমরা অবশ্য কোনরূপ বহিঃশত্রুর আক্রমণজনিত বিপদের ইঙ্গিত করিতেছি না। কেন না, উহার সম্ভাবনা এখনও সুদূর-পরাহত। কলিকাতার ন্যায় একটি বৃহৎ জনসঙ্কুল সহরে উপযুক্ত আলোকের অভাবে যে সকল দৌরাত্ম্য ও দুর্ঘটনার আবির্ভাব হইতে পারে, সেই বিপদের কথাই বলিতে চাহিতেছি। হুজুক-প্রিয় ও রসিক গুজব-রটনাকারীগণ এ পর্য্যন্ত যে সব লোমহর্ষক চুরি ও ডাকাতির সংবাদ প্রচার করিয়াছে তাহাতে অবশ্য সত্যের অস্তিত্ব অল্প;—আমরা ইহা সমর্থনও করি না। কিন্তু আলোক-নিয়ন্ত্রণের ফলে কলিকাতার জনবহুল পথেঘাটে দুর্ঘটনার সংখ্যা যে ক্রমেই বৃদ্ধি পাইবে এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। এতদ্ব্যতীত চুরি ও ডাকাতি প্রভৃতি না হইলেও অন্ধকারের সুযোগে পথচারীদের উপরে যে-কোনরূপ রাহাজানি ও অন্যান্য দৌরাত্ম্যের আবির্ভাব হওয়া খুবই স্বাভাবিক। নগরীর পুলিশ বিভাগ অবশ্য এই সব অসুবিধার প্রতিকার-কল্পে সাধ্যমত ব্যবস্থা অবলম্বনের চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু সে চেষ্টা এখনও সমধিক ফলবতী হয় নাই। সংবাদপত্রে প্রকাশিত মাড়োয়ারী বণিক্‌সমিতির বিবৃতিতেও এই অভিযোগই প্রকাশ পাইয়াছে।

কিন্তু পথচারীদের চেয়েও নাগরিকজীবনের বৃহত্তর ক্ষতি সাধিত হইতেছে, বোধ হয়, সহরের শিল্প-বাণিজ্যের দিক্ দিয়া। সন্ধ্যার পর বড় বড় দোকানগুলিতে পূর্ব্বের মত আর ক্রেতার ভিড় হয় না। একে বাহিরের অন্ধকার, তায় বর্ষার দাপট—ইহার মাঝে পথে বিপদ বরণ করা অপেক্ষা জানালা দুয়ার বন্ধ করিয়া ঘরে বসিয়া থাকাই শ্রেয়ঃ—অধিকাংশ সহরবাসী আজকাল এই ধারণাই পোষণ করিতেছে।

নিষ্প্রদীপের ব্যবস্থা বিমান-আক্রমণ প্রতিরোধের অন্যতম উপায় বটে, কিন্তু একমাত্র উপায় নহে; তাহা হইলে আমাদের বলিবার কিছু ছিল না। কিন্তু বিমান-আক্রমণে এই নিষ্প্রদীপ যে বিশেষ ফলপ্রদ নহে, ইহাতো শত্রুপক্ষকর্তৃক দিবাভাগের আক্রমণেই প্রমাণিত হইয়াছে। ইংলণ্ড, স্কট-ল্যাণ্ড ও ওয়েলস এবং অন্যান্য ইয়োরোপীয় দেশেও নিষ্প্রদীপ

অবলম্বিত হইয়াছিল ; কিন্তু তাহাতেও কি অসহায় জনসাধারণ জার্মাণীর বর্ব্বরতা হইতে রক্ষা পাইয়াছে ?

এতৎসত্ত্বেও আত্মরক্ষার জন্ত কর্ত্তৃপক্ষ যে বিধান দিয়াছেন, সেই সব বিধান সর্ব্বতোভাবে পালন করিতে আমরা দেশবাসীকে অনুরোধ করি। সঙ্গে সঙ্গে কর্ত্তৃপক্ষকে ইহাও বিবেচনা করিতে প্রার্থনা করি যে, যে ঔষধ পূর্ব্বে বিশেষ ফলপ্রদ হয় নাই, সেই ঔষধেরই পুনঃ পুনঃ প্রয়োগের কী সার্থকতা ?

ইংলণ্ড বনাম ফ্রান্স

গতবারে আমরা মঃ ল্যাভালের বক্তৃতার আলোচনা প্রসঙ্গে বলিতে বাধ্য হইয়াছিলাম যে, ব্রিটেনের কূটরাজনীতির দূরদর্শিতার অভাবেই ফ্রান্স ক্রমে ক্রমে জার্ম্মানীর দিকে আকৃষ্ট হইয়া পড়িতেছিল। বস্তুতঃ এই রাজনীতির শৈথিল্য বশতঃই আজ দেখিতেছি ইংলণ্ড ও ফ্রান্স পরস্পর পরস্পরকে শত্রু বলিয়া গণ্য করিতেছে।

যুদ্ধের প্রারম্ভে ফ্রান্স ও ইংলণ্ড মৈত্রীবন্ধনে দৃঢ়ভূত হইয়া সাধারণ শত্রু জার্ম্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছিল। কালে জার্ম্মানী কর্ত্তৃক ফরাসীদেশ আক্রান্ত হয়, এবং যুদ্ধে ফ্রান্সের পতন অবশ্যম্ভাবী হইয়া উঠে। এই আকস্মিক দুর্ঘটনায়, ইংলণ্ডের মতানুযায়ী না হইলেও ফ্রান্স জার্ম্মানীর সহিত কতকগুলি সর্ত্তে আবদ্ধ হইয়া অনধিকৃত কয়েকটী প্রদেশ লইয়াই সন্তুষ্ট হয়। কিন্তু সেই দুঃসময়েও ব্রিটেনের স্বার্থ-বিরোধী কোন কাজে ফ্রান্স লিপ্ত হয় নাই। কিন্তু আজ আর সে অবস্থা নাই। উহার সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন হইয়াছে। আজ দেখিতেছি, ফ্রান্স ও জার্ম্মানী পরস্পর বন্ধুত্ব সূত্রে আবদ্ধ হইয়া তাহাদের সাধারণ শত্রু ইংলণ্ডের বিরুদ্ধেই যুদ্ধ করিতেছে। সিরিয়ার যুদ্ধে সত্যই এইরূপ বিপর্য্যয় দেখিয়া আমরা স্তম্ভিত হইয়াছি।

কেন আজ জার্ম্মানীর শত্রু ফ্রান্স তাহার বন্ধু হইয়া দাঁড়াইল ? আর ব্রিটেনের মিত্রই বা কেন তাঁহার শত্রুর স্থান অধিকার করিয়াছে ? ইহা কি প্রকৃতই জার্ম্মানীর কূটরাজনীতির জয় ও ব্রিটেনের উহার অভাবের ফল নহে ?

জার্ম্মানী আমাদের শত্রু। উহার যশোগান আমাদের উদ্দেশ্য নয়, কিন্তু একথা বলিলে সত্যের অপলাপ হইবে যে, রাজনৈতিক দূরদৃষ্টির অভাবেই ইউরোপের প্রায় সমস্ত রাজ্যই ক্রমে ক্রমে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষে ব্রিটেনের বিপক্ষভুক্ত হইয়া দাঁড়াইয়াছে ; আর সত্যের অপলাপ করিয়া আমাদের সম্যক অবস্থা অনুধাবন বা বিবৃত না করাও রাজভক্তি নয়, রাজভক্তির অভাব মাত্র ; উহা অলীক স্তুতিবাদ ভিন্ন আর কিছুই নয়। সময় থাকিতে রাজকীয় রাজনীতিবিশারদগণকে আমরা সচেতন হইতে অনুরোধ করিতেছি। আরও দেখিতেছি যেন ভারতের ভাগ্যাকাশেও ধ্বংসকারী মেঘজাল প্রায় ঘনীভূত হইয়া আসিতেছে। এই সম্ভাবিত বিপদ হইতে এই ভারতভূমিকে রক্ষা করিবার কি কেহই নাই ?

ভারতের সম্পদ :

ভারতসচিব মিঃ আমেরির সিদ্ধান্ত এবং স্যার ইব্রাহিম রহিমতুল্লার প্রতিবাদ

ভারতসচিব মিঃ আমেরি সাহেব সম্প্রতি পার্লামেন্টে প্রদত্ত বক্তৃতায় বলিয়াছেন যে :—ভারতবর্ষ সম্পদশালী দেশ। কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক গবর্ণমেন্টের অর্থ-ভাণ্ডারে দেশবাসীর প্রদত্ত করের ক্রমবর্দ্ধিষ্ণু হারই তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। গণতন্ত্রের কাঠামোর নবরচিত এই প্রাদেশিক গভর্ণমেন্টগুলির শাসনকালে দেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা দ্রুত উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে। কেবল তাহাই নহে, বহুকাল হইতেই দেশের সামাজিক জীবনে এই ক্রমোন্নতি পরিলক্ষিত হইতেছে।

অর্থনৈতিক শ্রেণী বিভাগে 'সম্পদের' অর্থ দুই প্রকার :—এক প্রাকৃতিক সম্পদ ; দ্বিতীয়, আর্থিক সম্পদ ; আমেরি সাহেব প্রথমোক্ত সম্পদের উল্লেখ করিলে আমাদের তরফ হইতে বলিবার কিছু ছিল না। কিন্তু সরকারী তহবিলে সঞ্চিত অর্থের উদাহরণ দিয়া স্পষ্টতঃ তিনি ভারতের আর্থিক সম্পদশালীতার কথাই ইঙ্গিত করিয়াছেন।

রাজনীতিক-মহল এবং সংবাদপত্রসমূহ মিঃ আমেরির এইমত-উক্তির সবিশেষ প্রতিবাদ করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে সংবাদপত্রে প্রকাশিত স্যার ইব্রাহিম রহিমতুল্লা সাহেবের বিবৃতি সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য।

স্যার ইব্রাহিম সরকারী রিপোর্ট হইতে সংগৃহীত ভারতীয় সম্পদের সঠিক গাণিতিক হিসাব লিপিবদ্ধ করিয়া প্রমাণ-

করিয়াছেন ভারত সম্পর্কে মিঃ আমেরির উপরোক্ত আশাবাদী ধারণা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। তিনি লিখিয়াছেন—সরকারী তহবিলে রাজস্ব এবং অন্যান্য প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ট্যাক্স দেওয়ার পর বৃটীশশাসিত ভারতের ত্রিশকোটী অধিবাসীর মাথাপিছু আয়ের পরিমাণ মাসিক তিন টাকার কিছু বেশী। এই বিপুল আয়কারীদের তালিকায়, আবার সরকারী-বে-সরকারী, উচ্চপদস্থকর্মচারীদল, জমিদারমণ্ডলী এবং পুঁজিদার ব্যবসাদারগণও অন্তর্ভুক্ত আছেন। ইঁহাদের বাদ দিয়া সাধারণ ভারতবাসীর মাসিক আয় কত, তাহা সহজেই অনুমেয়।...অথচ বৃটীশ শাসনের পূর্ব্বে (অর্থাৎ প্রায় ২৫০—৩০০ বৎসর পূর্ব্বে) ভারতবাসীর আর্থিক বা প্রাকৃতিক কোন সম্পদেরই অভাব ছিল না। সেই স্বর্ণযুগে ভারতবর্ষ জগতের অন্যতম সম্পদশালী দেশরূপে পরিগণিত হইত।

স্যার ইব্রাহিমের ন্যায় আমরা আমাদের দৃষ্টিকে অতদূরেও প্রসারিত করিতে চাহি না। ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বের ইতিহাসই আলোচনা করা যাক্—দেখা যাইবে, সেই সময়েও ভারতের অর্থনৈতিক অবস্থা যাহা ছিল, এখনকার অবস্থা তার চেয়ে অনেক শোচনীয়। ত্রিশকোটী ভারতবাসী আজ নিরন্ন ও নিরক্ষর, উপযুক্ত খাদ্যের অভাবে অকালমৃত্যু বৃদ্ধি পাইয়া জাতীয়-জীবন মৃতপ্রায় করিয়া তুলিয়াছে। ইহার কারণ কী? ভারতবাসীর এই দুরবস্থার উন্নতি সাধনে বৃটিশ প্রজাপালন-নীতির যে অনেক কর্ত্তব্যই অসম্পন্ন রহিয়াছে, ভারতসচিব কি একথা অস্বীকার করিতে পারিবেন?

ভারতে বাষ্পীয়-পোত নির্ম্মাণের কারখানা

গত ২১শে জুন ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদের পৌরহিত্যে সিন্ধিয়া ষ্টিম্ নেভিগেশান্ কোং পরিকল্পিত ভারতে প্রথম জাহাজ-নির্ম্মাণকারখানার ভিত্তিস্থাপন-উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে। জনসাধারণ সম্ভবতঃ এই নব প্রচেষ্টার জন্য সিন্ধিয়াকে মুক্তকণ্ঠে অভিনন্দন জ্ঞাপন করিবে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এই সপ্রশংস ঐক্যতানের সহিত আমরা আমাদের কণ্ঠের স্বর মিলাইতে পারিব না। কারণ, ইতিপূর্ব্বেও আমরা একাধিক প্রসঙ্গে বলিয়াছি যে, যাহার প্রসারের জন্য অর্ণবপোত প্রভৃতি নির্ম্মাণের প্রচেষ্টা, সেই সাগর-বাণিজ্যই বর্ত্তমান মানবজাতির অনন্ত দুঃখরাশির অন্যতম মূল। ইতিহাস প্রমাণ দিবে—এই সাগর-বাণিজ্যের নামেই প্রবলতর জাতিগুলি দুর্ব্বল জাতি সমূহের স্বাধীনতা ও সম্পদ হরণ করিয়াছে। ইতিহাস ইহাও প্রমাণ দিবে যে, অতি প্রাচীনযুগেও ভারতবাসীগণ অতি দ্রুতগামী অর্ণবপোত নির্ম্মাণের কৌশল সম্যক্ অবগত ছিলেন। কিন্তু এবম্বিধ পোত নির্ম্মাণ আর্য্য ঋষিগণের নির্দ্দেশক্রমে নিষিদ্ধ ছিল। সাগর-বাণিজ্যের প্রকৃত উদ্দেশ্য ও পরিণতির কথা তাঁহাদের অজানা ছিল না বলিয়াই ভারতের হিতের জন্য তাঁহারা এবম্বিধ বাণিজ্য নিষেধ করিয়া দেন।

বর্ত্তমানে সবচেয়ে যাহা প্রয়োজন, তা সাগর-বাণিজ্য নহে, অন্তর্বাণিজ্য। ইহার প্রসারের জন্য ভারতবাসীকে সচেষ্ট দেখিলে তবেই আমরা সত্যকার আনন্দ লাভ করিতে পারিব। আজ আমাদের দেশের স্রোতস্বতী নদী, তড়াগগুলি প্রায় সবই শুষ্ক হইয়া গিয়াছে, নৌকা বা জলবাহী বাষ্পপোতের চলাচল বড়ই অল্প। এখন আমাদের সত্যিকার প্রয়োজন সেই নদীগুলির সংস্কার ও ডিঙ্গী ও জলযানের বিপুল প্রসার।

৯। সাম্প্রদায়িক ঐক্য ও সুসঙ্গতি

[কে বি, সি, চ্যাটার্জ্জি এবং মিঃ ফজলুল হক সম্প্রতি দেশবাসীর নিকট সাম্প্রদায়িক ঐক্য স্থাপনের জন্য এক মিলিত আবেদন প্রকাশ করিয়াছেন। উক্ত বিবৃতি পাঠে প্রত্যেকেই আবেদনকারী দ্বয়ের খাঁটি আন্তরিকতার পরিচয় পাইবেন। সময়ান্তরে ও ক্ষেত্রবিশেষে শ্রীযুক্ত চ্যাটার্জ্জি ও মিঃ হকের মনোভাব যাহাই থাকুক না কেন, কিন্তু তাঁহাদের এই অধুনাপ্রকাশিত মিলিত আবেদনে সাম্প্রদায়িক ঐক্য স্থাপনে তাঁহাদের অকপট আকাঙ্ক্ষা ও প্রয়াস যে অতি নিখুঁত ভাবে পরিস্ফুট হইয়াছে, একথা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। আদর্শের এই আন্তরিকতা ও অকপটতায় যথার্থ ফল লাভের সম্ভাবনা থাকিলে, বাঙ্গালার উক্ত বিখ্যাত নেতৃদ্বয় অবশ্যই তাঁহাদের অভিষ্ট কর্ম্মে সফলকাম হইতেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ, একমাত্র আন্তরিকতার জোরেই কোন কর্ম্ম ফলপ্রসূ হয় না। উদ্দিষ্ট কর্ম্মকে সাফল্যমণ্ডিত করিতে হইলে আন্তরিকতা ভিন্ন আরও তিনটি গুণের অধিকারী হওয়া আবশ্যক। তাই কোন সামাজিক অভি-শাপ দূরীকরণের মানসে প্রয়াসী কর্ম্মীকে প্রথমেই জানিতে

হইবে, কি ভাবে এবং কি কারণে এই অভিশাপের উদ্ভব হয় ; দ্বিতীয়তঃ, তাঁহাকে জানিতে হইবে, কি উপায়ে এই অভিশাপ দূরীকরণের উপযুক্ত কর্ম্মপন্থা নিরূপিত হইবে ; এবং তৃতীয়তঃ, এই কর্ম্মপন্থাকে কার্য্যে খাটাইতে হইলে কর্ম্মীকে হইতে হইবে উপযুক্ত আর্থিক ও শারীরিক সামর্থ্যের অধিকারী।—হিন্দু ও মুসলমান, এই দুই পারস্পরিক ভেদজ্ঞানযুক্ত সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হইল কি ভাবে, ইহার আবিষ্কারের চেষ্টা হইলে দেখা যাইবে যে, গুরু ও পুরোহিত নামধারী হিন্দু পণ্ডিতগণই এহেন সাম্প্রদায়িক ভেদের জন্য প্রধানতঃ অন্য সব কিছুর চেয়ে দায়ী।—হিন্দু ও মুসলমানগণ একদা পরস্পরের মিত্ররূপেই বাস করিত,—অথচ এখন পারে না, ইহার কারণানুসন্ধান হইলে স্পষ্টতঃই প্রতীয়মান হইবে যে, দেশের সার্ব্বজনীন অভাব ও দারিদ্র্য এবং দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলির ভ্রান্ত শিক্ষাদান- পদ্ধতিই ইহার মূল কারণ।

সুতরাং আমাদের ধারণানুসারে, সাম্প্রদায়িক সুসঙ্গতি স্থাপনের জন্য সর্ব্বাগ্রে চাই দেশের রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজনীতি প্রভৃতি এবং সর্ব্বক্ষেত্রে এক অভিনব প্রবল আন্দোলন। এই আন্দোলনের দ্বারা দেশের সর্ব্বক্ষেত্রে এমন এক সামাজিক ব্যবস্থার প্রবর্ত্তন করিতে হইবে, যেই ব্যবস্থায় দেশবাসী স্ব স্ব দৈনন্দিন প্রয়োজনসমূহ মিটাইবার পক্ষে ন্যূন উপকরণগুলি হইতে বঞ্চিত হইবে না, এবং তাহাদের প্রত্যেকেরই উপার্জ্জন, বুদ্ধি ও শক্তির তারতম্য অনুসারে বৃদ্ধি পাইবে। পূর্ব্বে আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাদান-পদ্ধতির কথা যে উল্লেখ করিয়াছি, তাহারও পরিপূর্ণ সংস্কার হওয়া প্রয়োজন ; সেইজন্য শিক্ষা ক্ষেত্রেও প্রবল আন্দোলন করিতে হইবে ;—নব পদ্ধতিতে এমন এক শিক্ষাপ্রণালী গঠন করিতে হইবে, যাহাতে প্রত্যেক শিক্ষার্থী অন্তরের সর্ব্বপ্রকার উত্তেজনা ও হৃদয়াবেগকে সংযত করিতে তৎপর হয়। উপরন্তু স্মরণ রাখিতে হইবে যে, মানুষ সর্ব্বদাই মানুষ, এবং সমগ্র মনুষ্যজাতি এক মানব-ধর্ম্মের [illegible]ক। এজন্য কোন অবস্থাতেই একজনকে অপরের পদদলিত বা ধ্বংস করিবার অধিকার নাই।

২। ভারতাভিমুখে জেনারেল্ ওয়াভেল্

সরকারী ভাবে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, ভারতের প্রধান সেনাপতি স্যার অচিনলেকের স্থলে শীঘ্রই মধ্যপ্রাচ্যের সেনাধ্যক্ষ জেনারেল্ ওয়াভেল্ ভারতের প্রধান সেনাপতিরূপে এদেশে পদার্পণ করিতেছেন। কর্ম্মসঙ্কুল বিপুল পরিশ্রম হইতে জেনারেল্ ওয়াভেল্কে কিয়ৎ পরিমাণে বিশ্রাম গ্রহণের অবকাশ দেওয়াই না কি এই পরিবর্ত্তনের মুখ্য উদ্দেশ্য। অন্যান্য সরকারী বিবৃতির ন্যায় ইহার মর্ম্মও আমরা সঠিক বুঝিতে পারি নাই। বর্ত্তমান পরিস্থিতিতে মধ্যপ্রাচ্যের সেনাপতির কার্য্য অপেক্ষা ভারত-সেনাপতির কার্য্য কম দায়িত্বপূর্ণ বা কম বিপদসঙ্কুল হইবে, ইহা আমরা বিশ্বাস করিতে প্রস্তুত নহি। অধুনা রাশিয়ার রণক্ষেত্রে সোভিয়েট ও নাৎসীদের সংগ্রাম চলিতেছে, তাহাতে রাশিয়ারই সর্ব্বতোভাবে জয়ী হইবার সম্ভাবনা—ঈশ্বরের নিকট আমরাও রাশিয়ার জয়লাভই প্রার্থনা করি ;—কিন্তু দুর্ভাগ্য- বশতঃ জার্ম্মাণীর জয় হইলে ককেসাসের দিক্ দিয়া তাহাদের প্রাচ্যাভিমুখী গতিকে কি উপায়ে ভারতের প্রবেশ দ্বারে প্রতিরোধ করা হইবে, তাহা আমরা ভাবিয়া পাইতেছি না। এই কারণেই আমরা আশঙ্কা করিতেছি, জেনারেল্ ওয়াভেলকে সর্ব্বপ্রকারে কঠিন কর্ত্তব্যেরই সম্মুখীন হইতে হইবে। এই কর্ত্তব্য সম্পাদনে তিনি উপযুক্ত হইবেন, ইহাই আমাদেরএকান্ত কামনা।

৩। আমেরিকার স্বাধীনতা-প্রেম

যুক্তরাষ্ট্রের আণ্ডার সেক্রেটারী মিঃ সামনার ওয়েলস্ সম্প্রতি এক স্মারকপত্রে স্বাক্ষর করিয়াছেন। উক্ত পত্রে সমগ্র আমেরিকার নিরাপত্তা রক্ষার জন্য তিনি আমেরিকায় অন্যান্য প্রজাতান্ত্রিক রাজ্যগুলিকে সংগঠনমূলক ও কার্য্যকরী সহযোগিতায় আহ্বান করিয়াছেন। আমেরিকার জাতীয় পূর্ব্বপুরুষগণ বিপুল পরিশ্রমের ফলে আমেরিকার জন্য যে স্বাধীনতা ও অন্যান্য সুখ-সম্পদ অর্জ্জন করিয়াছিলেন, সেই স্বাধীনতা ও সম্পদকে ভবিষ্যৎ বংশধরদের জন্যও সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করা আমেরিকাবাসীর কর্ত্তব্য, এবং ইহার জন্য প্রয়োজন অন্যান্য রিপাব্লিক্গুলির সমবেত চেষ্টা। আণ্ডার সেক্রেটারীর স্বাক্ষরিত উক্ত পত্রে এই প্রয়োজনের কথাই প্রকট হইয়া উঠিয়াছে। প্রসঙ্গক্রমে ঐ পত্রে অধিকন্তু উল্লিখিত হইয়াছে যে, বিভীষিকা এবং হত্যা ও ধ্বংসলীলায়

কাপালাজি সমগ্র ইয়োরোপ সহ অখিল পৃথিবীর বৃহত্তর অংশকে গ্রাস করিতে বসিয়াছে।……

সারা ইয়োরোপের ধ্বংসের বিরাট তাণ্ডবলীলা দর্শনে মিঃ সামনার ওয়েল্‌স্ খুবই সচকিত ও চিন্তিত হইয়াছেন, সন্দেহ নাই ; কিন্তু ধ্বংস-তাণ্ডবের নিবৃত্তি কল্পে আমেরিকা এ পর্য্যন্ত কি ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছে, আণ্ডার সেক্রেটারী মহাশয় আমাদের এই সাধারণ প্রশ্নটার জবাব দিবেন কি? আমরা ইতিপূর্ব্বেও বলিয়াছি যে, কথায় ও কাজে আমেরিকা কোন দিনই তেমন সঙ্গতি প্রদর্শন করে নাই ; আণ্ডার সেক্রেটারীর উপরোক্ত বিবৃতিতেও এই সঙ্গতি পরিলক্ষিত হয় না। সেই



মিঃ গান্ধী

কারণেই এবম্বিধ বড় বড় গালভরা বুলিতে আমরা বিশেষ আশ্বস্ত হইতে পারি না। আশা করি, আমেরিকান রাজনীতি-ধুরন্ধরগণ ভবিষ্যতে সমস্যার প্রকৃত সমাধানের বিষয়টি চিন্তা করিতে তৎপর হইবেন।

৪। হিংসা বনাম অহিংসা
(Violence Vs. Non-Violence)

'সম্ভাবিত মুসলমান আক্রমণের বিরুদ্ধে হিন্দুগণের কি কর্ত্তব্য' ইহার নিরূপণ কল্পে সম্প্রতি কাশীতে এক জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, মাষ্টার তারা সিং, ডাঃ বি, এস, মুঞ্জে প্রভৃতি নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ উক্ত সভায় উপস্থিত ছিলেন। পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য মহাশয় ও এই সম্বন্ধে সারগর্ভ বক্তৃতা দেন। নিম্নে তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত হইল।

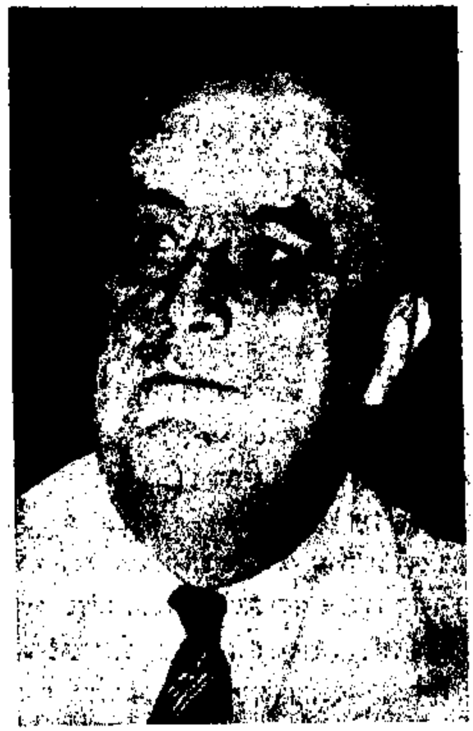
"অহিংসার নীতি প্রচার করিয়া বহুদিন যাবৎ গান্ধীজী দেশবাসীকে এই উপদেশ দিয়া আসিতেছেন যে, ব্যক্তিগত নিরাপত্তা রক্ষার জন্যও হিংসানীতি অবলম্বন করা উচিত নয়। এ বিষয়ে গান্ধীজীর সহিত কোনদিনই আমি একমত হইতে পারি নাই। যুগ যুগ পূর্ব্বে মনু, বেদব্যাসের ন্যায় সমাজ অনুশাসনকারিগণও বিধান করিয়াছিলেন যে, কোন কোন ক্ষেত্রে মানুষ হিংসাত্মক কর্ম্ম অবলম্বন করিতে পারে। ভারতীয় পেনাল কোডেও এইরূপ বিধান আছে যে, আততায়ীর আক্রমণ হইতে নিজেকে বলপ্রয়োগ দ্বারা রক্ষাকরা আইন-বিরুদ্ধ নহে।"

পণ্ডিত মালব্যের উপরোক্ত বিবৃতিতে 'অহিংসা' সম্বন্ধে তাঁহার স্বকীয় মত ও গান্ধীজীর মতের পার্থক্য সুস্পষ্ট-রূপে ব্যক্ত হইয়াছে—গান্ধিজীর ন্যায় পণ্ডিত মালব্য সকল ক্ষেত্রেই অহিংসার পক্ষপাতী নহেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, তাঁহার এই মতের সমর্থনের জন্য মনু ও বেদব্যাস হইতে ভ্রান্ত উদাহরণ উল্লেখ করিয়া তিনি উত্তম বিচারবুদ্ধির পরিচয় দিয়াছেন বলিয়া আমাদের মনে হয় না। মনু ও বেদব্যাস কোন কোন স্থানে উল্লেখ করিয়াছেন বটে যে, মনুষ্যসমাজ কর্ত্তৃক ক্ষেত্র বিশেষে বলের প্রয়োগ হইয়া থাকে কিন্তু এই বলপ্রয়োগকে প্রশ্রয় দিবার নির্দ্দেশ তাঁহারা সমগ্র শাস্ত্রের মধ্যে কুত্রাপি দেন নাই। আমরা নিঃসঙ্কোচে বলিতে পারি যে, আর্য্য ঋষিগণ স্বীকার করিয়াছেন বটে যে, অন্তঃস্থিত পাশব ও দানব শক্তির তাড়ণাবশতঃ মানুষ সময় বিশেষে সম্পূর্ণরূপে হিংসা-বৃত্তি দমন করিতে অক্ষম ; কিন্তু হিংসা-বৃত্তি মানুষের কল্যাণকর অথবা ক্ষেত্রবিশেষে মানুষ বিধিসঙ্গত ভাবে এই হিংসাবৃত্তিকে প্রশ্রয় করিতে পারে এ কথা তাঁহারা কদাপি উল্লেখ করেন নাই। পক্ষান্তরে মানবজাতিকে তাঁহারা উক্ত প্রবৃত্তি দমন করিবার জন্যই বিবিধ নির্দ্দেশ দিয়াছেন। মনুসংহিতা প্রভৃতি শাস্ত্রগ্রন্থের অন্তঃস্থলে যাঁহারা প্রবেশ করিয়াছেন, তাঁহারাই উপলব্ধি করিয়াছেন যে, হিংসা-বৃত্তি দমনের শিক্ষার প্রচারোদ্দেশ্যেই মূলতঃ এই সকল শাস্ত্রগ্রন্থ রচিত হইয়াছিল।

পণ্ডিত মালব্যের সংজ্ঞানুসারেই আমরা উপরোক্ত আলোচনায় 'হিংসা-অহিংসার' উল্লেখ করিলাম ; কিন্তু এ কথা আমাদের সর্ব্বদাই বিশেষরূপে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, একক-ভাবে উক্ত শব্দ-দুইটীর যথার্থ কোন অর্থ সূচিত হয় না। ইহাদের উল্লেখ হইলেই বুঝিতে হইবে, এই উল্লেখের মূলে কোন ফলদর্শী কার্য্যবিধির ইঙ্গিত আছে। সুতরাং যে কার্য্যবিধির সংকল্প হইয়াছে, তাহা হিংসা কি অহিংসার নীতিতে পরিচালিত হইবে, এই প্রশ্নের পূর্ব্বে ঐ কার্য্যবিধির স্বরূপ কি এবং উহাতে সাম্প্রদায়িক কলহ প্রকৃত পক্ষে নিবারিত হইবে কি না, নেতৃবৃন্দের তাহাই ভাবিয়া দেখা একান্ত কর্ত্তব্য।

৫। মার্কিন স্বাধীনতার স্বরূপ (President Roosevelt's Liberty)

আমেরিকার স্বাধীনতাদিবস উপলক্ষে সম্প্রতি রাষ্ট্রপতি রুজভেল্ট মার্কিণ জাতিকে উদ্দেশ করিয়া বেতারে এক বক্তৃতা দিয়াছেন। বক্তৃতার কিয়দংশের ভাবার্থ এইরূপ—"ডিক্টেটার-গণের বর্ব্বরতা ও অত্যাচার হেতু ব্যক্তিস্বাধীনতার অভাবে যে ঊষর পরিস্থিতির উদ্ভব হইতেছে, সেই ঊষর মরুভূমির মাঝে শান্তি, প্রগতি ও স্বাধীনতার মরূদ্যান স্বরূপ আমেরিকার অস্তিত্ব চিরদিনের জন্য কখনই অটুট থাকিতে পারে না।" প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টের বক্তৃতা হইতে যদি আমাদের ইহাই বুঝিতে হয় যে, সারা ইয়োরোপ আজ একনায়কত্বের পদানত হইতে চলিয়াছে, তবে আমরা নিঃসন্দেহে বলিতে পারি, এই সম্ভাবিত পরিস্থিতি প্রকৃতই অত্যন্ত ভয়াবহ। অবশ্য হিটলার ও মুসোলিনীর ন্যায় স্বেচ্ছাতান্ত্রিক ডিক্টেটারগণের প্রতি আমাদের কোন শ্রদ্ধাই নাই। কিন্তু তাই বলিয়া মার্কিনী-স্বাধীনতাকেও শ্রদ্ধা করিবার আমরা যথেষ্ট হেতু খুঁজিয়া পাই না। কারণ, আমেরিকার স্বাধীনতার সত্যকার স্বরূপ, নিতান্তই পরনির্ভরতা ; স্বরাষ্ট্র ও পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে একাধিক বিষয়ে আমেরিকা নিতান্ত পরপ্রত্যাশী। যে শিল্প-বাণিজ্য আমেরিকার শতকরা ৯৯ জন অধিবাসীকে দৈনন্দিন জীবিকার সংস্থান দেয়, সেই শিল্পের অবশ্য-প্রয়োজনীয় কাঁচা মালের জন্যই আবার গোটা দেশটাকে বহির্জগতের নিকট হাত পাতিয়া থাকিতে হয়। এই কারণে এ হেন মার্কিনী সভ্যতার যথার্থ মূল্য সম্বন্ধে আমরা বরাবরই অত্যন্ত সন্দিহান। স্বীকার করি, চার্চ্চিলের মিত্ররূপে মিঃ রুজভেল্টকে অনায়াসেই চিনিতে পারা যায় ; কিন্তু জগতের সর্ব্বাপেক্ষা আলোকপ্রাপ্ত ও উন্নতিশীল জাতির আবাসভূমি আমেরিকা



প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট

যুক্তরাজ্যের রাষ্ট্রপতিরূপে তিনি যখন কোন বিবৃতি দেন বা ব্যাখ্যা করেন, তখনই তিনি অবোধ্য হইয়া উঠেন।

ঢাকা-দাঙ্গার তদন্তে সরকারের অভিমত

ঢাকা-দাঙ্গা তদন্ত কমিটীর সম্মুখে বাঙ্গালা সরকার নিয়োজিত ষ্ট্যাণ্ডিং কৌঁসুলী শ্রীযুক্ত কে, এন্ মজুমদার বর্ত্তমান হাঙ্গামা সম্বন্ধে যে বিবৃতি পেশ করিয়াছেন, তাহার মোটামুটি বক্তব্য এই যে :—মূলতঃ, জনসাধারণের হিতার্থে প্রবর্ত্তিত কতিপয় শাসনব্যবস্থা ভ্রান্তভাবে সাম্প্রদায়িক ও হিন্দুস্বার্থ-বিরোধী বলিয়া চালিত ও অপপ্রযুক্ত হওয়ার ফলেই প্রধানতঃ এই সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার উদ্ভব হইয়াছে। অথচ কংগ্রেস-শাসিত প্রদেশসমূহে এই শ্রেণীর শাসনব্যবস্থাই না কি জনহিতকর বলিয়া প্রশংসিত হইয়াছে।

'জনহিতকর শাসনব্যবস্থার প্রবর্তন' এই উক্তি নিতান্ত যুক্তিশূন্য ও হাস্যোদ্দীপক। কেন না, কি কংগ্রেসী-মন্ত্রিগণ, কি হক্-মন্ত্রিমণ্ডলী, কেহই যে এ পর্য্যন্ত কোনরূপ সত্যকার জনহিতকর শাসনপ্রবর্ত্তনে কৃতকার্য্য হইয়াছেন, তাহা মনে হয় না। হইলে, দেশের সর্ব্বত্রই আজ এই ভাবে এমন সব সঙ্কটপূর্ণ পরিস্থিতির উদ্ভব হইত না। তবে কি আমাদের বুঝিতে হইবে যে, শাসনব্যবস্থা জনহিতার্থেই প্রবর্তিত হইয়াছে, কিন্তু কর্ণধার মন্ত্রিমণ্ডলী স্বীয় দুর্ব্বুদ্ধিবশতঃ সেই সব শাসন-ব্যবস্থা দূষিত করিয়াছেন ?

শ্রীযুক্ত মজুমদার যে সাম্প্রদায়িক অপপ্রয়োগের উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা সমর্থনযোগ্য। তথাপি ইহাকেই দাঙ্গার মূল কারণ বলিলে ভুল বলা হইবে। পূর্ব্বাপর ঘটনাবলী বিশ্লেষণে ইহা সহজেই প্রতীয়মান হয় যে, এই সকল হাঙ্গামার মূলে আছে অন্য কোন গুরুতর কারণ। সেই কারণ প্রকৃত পক্ষে রাজনৈতিক নয়, অর্থনৈতিক ; এবং এই সব সাম্প্রদায়িকতা সেই কারণের কুফল। ভারতের অসংখ্য শ্রমিক জনসাধারণ আজ নিরন্ন। দারিদ্র্য ও অভাবের নিষ্পেষণে যেন মরিয়া হইয়া তাহারা মনে মনে সকলেই বর্ত্তমান সমাজব্যবস্থা ও গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে প্রতিশোধপরায়ণ হইয়া উঠিয়াছে। সুবিধাবাদী ষড়্‌যন্ত্রকারীরা দেশের এই শোচনীয় অবস্থারই সুযোগ গ্রহণ করিয়া নিজেদের স্বার্থসাধন ও হীন-অভিপ্রায় হাসিল করিতে সামান্য কয়েকটী তাম্রমুদ্রার লোভ দেখাইয়া ক্ষুধার্ত্ত জনসাধারণকে এই হীন-ষড়্‌যন্ত্রে লিপ্ত করিয়াছে। অথচ তদন্তকমিটী এই সাধারণ কথাটি বুঝিতে না পারিয়া অনর্থক ইহাতে রাজনীতির রঙ চড়াইতেছেন। আশা করি, কর্ত্তৃপক্ষ নিরর্থক তর্কজাল ছাড়িয়া অনিষ্টের মূল কারণের অনুসন্ধানেই ব্যাপৃত হইবেন।

যুদ্ধভাণ্ডারের জন্য গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক দেশবাসীর নিকট সাহায্য প্রার্থনা

বৃটিশ সাম্রাজ্য আজ বিপন্ন। বর্ব্বর শত্রুর কবল হইতে এই বিপন্ন সাম্রাজ্যকে রক্ষা করিতে হইলে প্রত্যেক বৃটিশ প্রজারই যুদ্ধভাণ্ডারে অকুণ্ঠ সাহায্যদানে তৎপর হওয়া উচিত—বাঙ্গালা সরকার সম্প্রতি সাধারণের প্রতি এই নির্দ্দেশ জারী করিয়াছেন। বৃটিশ সাম্রাজ্য রক্ষার্থে সকলেরই সর্ব্বপ্রকারে সাহায্যদানে অগ্রসর হওয়া কর্ত্তব্য, ইহা আমরাও স্বীকার করি এবং ইহাও স্বীকার করি যে, ইহার চেয়ে বড় কর্ত্তব্য আজ আর কিছু নাই। কারণ, বৃটিশ শাসনই বর্ত্তমান মানবের মৈত্রীবন্ধনের একমাত্র যোগসূত্র, ইহার পতনে পৃথিবীর বুকে এক নারকীয় বিশৃঙ্খলা ও বিপর্য্যয়ের আবির্ভাব অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও বাঙ্গালার দরিদ্র ও বিপন্ন জনসাধারণের নিকট এই সাহায্য চাহিয়া তাহাদের আরও বিপন্ন করিবার যুক্তিযুক্ততা আমাদের বোধগম্য হইল না। দেশবাসীর যাহা উপার্জ্জন, তাহা হইতে দৈনন্দিন প্রয়োজন মিটাইবার পর সাহায্য করা দূরে থাক, ভবিষ্যৎ সঞ্চয়ের জন্যও পর্য্যন্ত কিছুমাত্র উদ্বৃত্ত থাকে না—সরকার-বাহাদুরের ইহা নিশ্চয় অবিদিত নাই। এক্ষেত্রে গোটা ভারতবর্ষ হইতে খুব বেশী হইলে কয়েক লক্ষ টাকার বেশী কিছু সংগৃহীত হওয়া অসম্ভব। বর্ত্তমান যুদ্ধে বৃটেনের দৈনিক ব্যয়ের পরিমাণ প্রায় এক কোটী পাউণ্ড, এই বিপুল ব্যয়ের তুলনায় ভারত হইতে সংগৃহীত অর্থের পরিমাণ খুবই অকিঞ্চিৎকর। সুতরাং এই সামান্য অর্থের জন্য প্রজাবর্গকে বিপন্ন করিয়া কি লাভ ? বৃটিশ সাম্রাজ্যের রক্ষাকার্য্য অতি মহৎ কর্ত্তব্য, কিন্তু এই মহৎ কর্ত্তব্য সম্পাদনে কোনরূপ অ-মহৎ ব্যবস্থা যেন অবলম্বিত না হয়, কর্ত্তৃপক্ষের নিকট ইহাই আমাদের একান্ত প্রার্থনা।

আমেরিকার সিদ্ধান্ত

যুক্তরাষ্ট্রে জার্ম্মানী ও ইটালীর সমুদয় প্রতিনিধিমূলক কার্য্যকলাপ এবং বাণিজ্য-দূতাবাস বন্ধের নির্দ্দেশ

গতমাসে অজ্ঞাত আততায়ীর টর্পেডোর আঘাতে মার্কিন জাহাজ 'রবিনমুর' মধ্য-আটলাণ্টিকের বুকে নিমজ্জিত হইয়াছে। এই অপ্রত্যাশিত ব্যাপারে আমেরিকার জন-সাধারণ ও রাজনীতিক মহল সবিশেষ উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছেন। অজ্ঞাত শত্রুটী কে, তাহা সঠিক আবিষ্কৃত না হইলেও অধিকাংশ আমেরিকাবাসী সন্দেহ করে, জার্ম্মানীই না কি ইহার জন্য মূলতঃ দায়ী। সরকারী বিভাগ এই সন্দেহ সমর্থন করিয়াছেন। ফলে গভর্ণমেণ্ট আমেরিকাস্থ জার্ম্মানীর সমুদয় প্রতিনিধিমূলক প্রতিষ্ঠান ও দূতাবাসগুলি বন্ধ করিয়া দেওয়ার আদেশ জারী করিয়াছেন। 'জার্ম্মানীর

লাঙ্গুলধারী ইটালীর প্রতিষ্ঠানগুলিও পুলিশ বিভাগ কর্ত্তৃক অধিকৃত হইয়াছে। লণ্ডনস্থ সংবাদদাতার প্রেরিত সংবাদে প্রকাশ যে, জার্ম্মান তরফ হইতে আমেরিকার এই কার্য্যের প্রতিবাদ করা হইয়াছে। প্রতিবাদের সংবাদ অবশ্য এখনও পর্য্যন্ত সরকারী ভাবে সমর্থিত হয় নাই। আর, হইলেও কর্ত্তৃপক্ষ যে এই প্রতিবাদে বিশেষ আমল দিবেন, তাহা মনে হয় না। মিঃ সাম্‌নার ওয়েলস্ স্পষ্টই বলিয়াছেন, জার্ম্মানী কর্ত্তৃক এই ধরণের সমস্ত প্রতিবাদই আমেরিকা উপেক্ষা করিবে। মোটের উপর জার্ম্মানী ও ইটালীর সহিত আমেরিকার সকল বাধ্যতামূলক সম্বন্ধ ছিন্ন হইয়াছে।

জার্ম্মানীর ও ইটালীর বিরুদ্ধে আমেরিকা কর্ত্তৃক এইরূপ ব্যবস্থা অবলম্বনে বর্ত্তমান যুদ্ধে তাহার যোগদানের সম্ভাবনা প্রবলতর ভাবে প্রকাশ পাইয়াছে। ইহার পর কোন দিন যুক্তরাষ্ট্র সোজাসুজি ভাবে যুদ্ধে অবতীর্ণ হইলেও বিস্ময়ের কিছু থাকিবে না। আর এইরূপ পরিস্থিতিতে জাপানও যে নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া থাকিবে, তাহাও মনে হয় না। অক্ষ শক্তির পক্ষ লইয়া বোধ করি সেও মালকোঁচা মারিয়া আসরে নামিয়া পড়িবে।—ধ্বংস-দেবতার তাণ্ডবলীলা এই ভাবেই দিনের পর দিন সারা জগতে ছড়াইয়া পড়িতেছে। ভগবান জানেন, কবে এই রণ-তাণ্ডবের অবসান হইবে।

কিন্তু আমাদের জিজ্ঞাস্য, কিসের জন্য এই তাণ্ডব, এই সংহারলীলা? তবে কি সত্যই আধুনিক বিজ্ঞান ও সভ্যতার উচ্ছেদ সাধনই এই ধ্বংস-তাণ্ডবের উদ্দেশ্য? আশা করি, বৈজ্ঞানিক ও শক্তিজাতমহল ব্যাপারটা আরও তলাইয়া দেখিবেন!

রাশিয়ার বিরুদ্ধে জার্ম্মানীর অভিযান

আজিকার দিনে সর্ব্বাপেক্ষা উত্তেজক আলোচনার বিষয়—রাশিয়া ও জার্ম্মানীর যুদ্ধের কথা। এই যুদ্ধ না কি যেমন অপ্রত্যাশিত তেমন হতবুদ্ধিকর। কিন্তু পূর্ব্বাপর বিচারে এই ব্যাপারটিকে সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত মনে করা নিতান্ত অহেতুক বলিয়া মনে হয়। নাৎসীবাদের সুবিধাবাদী ও বিশ্বাসঘাতকতার নীতির কথা যাঁহারা অবগত আছেন, তাঁহারা জানেন যে, পূর্ব্ব বন্ধুত্ব বিস্মৃত হইয়া কোন রাজ্যের সর্ব্বনাশ সাধন করা হিটলারের পক্ষে কিছুমাত্র অপ্রত্যাশিত নয়। এই হীন বিশ্বাসঘাতকতার জোরেই জার্ম্মানী আজ একটী একটী করিয়া ইয়োরোপীয় স্বাধীন রাজ্যগুলিকে গ্রাস করিয়া ফেলিয়াছে। রয়টারের সামরিক ভাষ্যকারগণও বোধ করি এই বিশ্বাস-ঘাতকতার কথা স্মরণ রাখিয়াছেন, তাই রুশীয় সীমান্তে জার্ম্মানী কর্ত্তৃক সৈন্য সমাবেশ ও সমরোপকরণের তোড়-জোড়ের সংবাদ প্রকাশ কালে রাশিয়ার বিরুদ্ধে জার্ম্মান-অভিযানের সম্ভাবনা স্পষ্টতই তাঁহারা ইঙ্গিত করিয়াছিলেন। কিন্তু তখন একশ্রেণীর অতিবুদ্ধি সংবাদপত্র মহল এই সম্ভাবনাকে বিশ্বাস করিতে প্রস্তুত ছিলেন না। আমরা কিন্তু অতটা আশ্বস্ত হইবার সাহসী হই নাই। এই কারণেই সেই সময়ে রাশিয়া হইতে বৃটিশ প্রতিনিধিদের অপসারণের জন্য



মঃ ষ্ট্যালিন শৈলেন্দ্র নাথ কুণ্ড

বৃটিশ পররাষ্ট্রনীতির প্রতি কটাক্ষ করিয়াছিলাম। (সাপ্তাহিক বঙ্গশ্রী ৪র্থ সংখ্যা দ্রষ্টব্য) তা’ছাড়া পরস্পর-বিরোধী নাৎসীবাদ ও কমিউনিজ্‌ম্ চিরকাল গলাগলি করিয়া অবস্থান করিতে পারিবে না, ইহাও সর্ব্বজন বিদিত। এই সমুদয় বিচার করিলে জার্ম্মানী ও রাশিয়ার যুদ্ধ মোটেই অপ্রত্যাশিত বলা চলে না। তথাপি আমরা বলিতে বাধ্য যে, এই যুদ্ধ অপ্রত্যাশিত না হইলেও সম্পূর্ণ আকস্মিক।

রাশিয়ার সামরিক শক্তির সঠিক পরিচয় অদ্যাবধি না পাওয়া গেলেও তাহার বিরুদ্ধে এমন আকস্মিক অভিযান করা নিশ্চয়ই রীতিমত দুঃসাহসিক কার্য্য। এই জন্যই,

হিট্‌লারের এ-হেন দুঃসাহসিক কার্য্যের পিছনে কি উদ্দেশ্য নিহিত রহিয়াছে, তাহা নিতান্তই কৌতূহলের বিষয়। হিট্‌লার স্বয়ং অবশ্য বলিয়াছেন যে, জার্ম্মানীর বিরুদ্ধে প্রচ্ছন্ন শত্রুতাচরণের অপরাধে রাশিয়াকে শাস্তি দিবার জন্যই মূলতঃ জার্ম্মানীর এই অভিযান। অবশ্য রুশ পররাষ্ট্র-সচিব এই অভিযোগের প্রতিবাদ করিয়াছেন। এই বাদ-প্রতিবাদের



হের হিটলার

মধ্যে বিশেষ সত্য বা যুক্তি পরিলক্ষিত হয় না। রয়টারের সামরিক ভাষ্যকার এইযুদ্ধের কারণ নির্দ্দেশ করিয়া বলিয়াছেন যে, ভারতবর্ষ ও প্রাচ্য সাম্রাজ্যের সহিত বৃটেনের সকল যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করিয়া বৃটেনের উপর চূড়ান্ত আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হওয়াই হিট্‌লারের রাশিয়া আক্রমণের প্রধান উদ্দেশ্য। আমরাও এই মতটী বিশেষ প্রণিধানযোগ্য বলিয়া মনে করি। বৃটেন এবং আমেরিকাও বোধ করি এই উদ্দেশ্যই টের পাইয়া রাশিয়াকে সর্ব্বপ্রকারে সাহায্যদানে প্রস্তুত হইয়াছে। রাশিয়াকে সাহায্যদান বৃটেনের পক্ষে কতখানি বিচক্ষণতার পরিচায়ক হইবে, তাহার বিচার হইবে প্রত্যক্ষ কর্ম্মক্ষেত্রে। আমরা কিন্তু এক্ষণে এই প্রচেষ্টা সমর্থন করিতে পারিতেছি না। কারণ, আমাদের দৃঢ় ধারণা—নাৎসীবাদের বর্ব্বরতা যেমন জগতের অনিষ্টকারী, রাশিয়ার নীতিধর্ম্ম জ্ঞানবর্জ্জিত কমিউনিজ্‌মও তদপেক্ষা কম অনিষ্টকারী নহে এবং সপ্তদশ শতাব্দীর তুলনায় বৃটেনের বর্ত্তমান নীতি, আজ যতই স্বার্থপর ও কাপুরুষতাপূর্ণ হউক না কেন, একথা সর্ব্ববাদিসম্মত যে, একমাত্র বৃটেনই একদিন এই কমিউনিজ্‌মকে সর্ব্বাপেক্ষা প্রচণ্ডভাবে দমন করিতে সক্ষম হইবে। কিন্তু ঘটনাচক্রে কমিউনিজ্‌ম যদি ক্রমেই প্রবল ও দুর্ব্বার হইয়া পড়ে, তবে এই নীতিধর্ম্ম বিবর্জ্জিত বল্‌সেভিক নীতি দমন করিতেই ইংলণ্ডেরও কম সময় ও শক্তিক্ষয় হইবে না। সুতরাং অনর্থক শক্তির অপচয় না করিয়া বৃটেনের পক্ষে এ যুদ্ধে নিরপেক্ষতা অবলম্বনই বোধ হয়, সর্ব্বাপেক্ষা বুদ্ধিমানের কার্য্য ছিল।

কিন্তু এইসব সত্ত্বেও সর্ব্বতোভাবে আমরা এখন রাশিয়ার জয়লাভই কামনা করি। রয়টারের ভাষ্যকার, আক্রমণের উদ্দেশ্যের যে ব্যাখ্যা দিয়াছেন, সেই ব্যাখ্যার অন্তরালে জার্ম্মানী কর্ত্তৃক সম্ভাবিত ভারত আক্রমণের ইঙ্গিতও সূক্ষ্মভাবে পরিব্যক্ত হইয়াছে। এইদিক দিয়া বিচার করিলে রাশিয়ার বিপদে আমাদেরই বিপদ। শুধু এই বিপদের কথা স্মরণ করিয়াই আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে রাশিয়ার জয়লাভ প্রার্থনা করিতেছি। রাশিয়ার ব্যাপারে বৃটেনের পক্ষে এরূপ সমস্যাপূর্ণ অবস্থার ইতিপূর্ব্বে আর কখনও উদ্ভব হইয়াছে কিনা আমরা অবগত নহি।

যুদ্ধসম্বন্ধে কয়েকটী জ্ঞাতব্য কথা

—শ্রীসচ্চিদানন্দ ভট্টাচার্য্য

মানুষে মানুষে যখন যুদ্ধ হয়, তখন দেখা যায় যে উভয় পক্ষেই ক্ষতবিক্ষত হইয়া পড়ে। যুযুৎসু দুই পক্ষেরই শরীর যেরূপ ক্ষতবিক্ষত হয়, মনও সেইরূপ বিশৃঙ্খল হয়, বুদ্ধিও মলিন হইয়া যায়।

যুদ্ধ-প্রবৃত্তিযুক্ত দুইটী মানুষ যেরূপ মনুষ্যাবয়বে পশুতুল্য হইয়া পড়ে, সেইরূপ অনুসন্ধান করিয়া দেখিলে দেখা যাইবে যে, দুইটী জাতি কতকাংশে পশুভাবাপন্ন না হইলে যুদ্ধনিরত হইতে পারে না। যে মানুষের একান্ত কর্ত্তব্য মানুষকে রক্ষা করা, মানুষ কি করিয়া বিপন্মুক্ত হইবে তাহার উপায় উদ্ভাবন করা, সেই মানুষ যখন যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয় তখন বিপক্ষকে কি করিয়া বিধ্বস্ত করিবে, কি করিয়া বিপক্ষের প্রাণ নাশ করিবে, তাহার জন্য মাতোয়ারা হইয়া পড়ে।

যুদ্ধে প্রবৃত্ত মানুষ অথবা জাতির উপরোক্ত অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিলে স্বতঃই প্রশ্ন আইসে যে, মঙ্গলময়ের রাজ্যে এতাদৃশ হীন যুদ্ধপ্রবৃত্তি মানুষের প্রাণে জাগ্রত হয় কেন?

কোরাণ যাহাকে "আল্লা" অর্থাৎ করুণানিধান বলিয়াছেন, বাইবেল যাহাকে "গড" অর্থাৎ মঙ্গলশক্তির উৎস বলিয়াছেন, বেদ যাঁহাকে "ব্রহ্ম" অর্থাৎ ভূত ও ভাবাধার বলিয়াছেন, যাঁহাকে সকলেই সর্ব্বাবস্থায় মঙ্গলালয় বলিয়া বুঝাইয়াছেন, তাঁহার রাজ্যে তাঁহারই সৃষ্ট মানুষের মনে এত অমঙ্গলপ্রসূ যুদ্ধপ্রবৃত্তি কোথা হইতে আইসে, তাহা বুঝিতে হইলে সৃষ্টিতত্ত্বের কতকগুলি কথা জানিতে হইবে ও উপলব্ধি করিতে হইবে।

সৃষ্টিতত্ত্বের এই কথাগুলি বেদ, বাইবেল ও কোরাণ, এই তিনখানি গ্রন্থেই লিপিবদ্ধ আছে এবং ঐ তিনেরই এতদ্বিষয়ক কথা সর্ব্বতোভাবে একরূপ। বেদ, বাইবেল ও কোরাণের মূল কোন কথা উদ্ধৃত করিয়া ঐ তিনই যে যুদ্ধ-বিষয়ে সর্ব্বতোভাবে একই কথা বলিয়াছেন তাহা প্রমাণ করিবার চেষ্টা এখানে করিব না, কারণ, তাহা হইলে এই প্রবন্ধ সাধারণ পাঠকের পক্ষে জটিল হইয়া পড়িবে।

যুদ্ধের প্রবৃত্তি কেন মানুষের প্রাণে উদ্ভব হয় তৎসম্বন্ধে বেদ, বাইবেল ও কোরাণে যে একই রকমের কথা লিপিবদ্ধ আছে, তদ্বিষয়ে যাঁহারা সন্দিগ্ধ তাঁহারা আমাদিগের নিকট ব্যক্তিগতভাবে লিখিয়া জানাইলে তাঁহাদের সন্দেহ আমরা দূর করিতে চেষ্টা করিব।

জগৎকারণ অথবা ঈশ্বর মানুষের স্রষ্টা বটে, কিন্তু মানুষের প্রাণে যে যুদ্ধপ্রবৃত্তি দেখা যায়, তাহার স্রষ্টা ঈশ্বর নহেন। পরন্তু যুদ্ধপ্রবৃত্তির স্রষ্টা মানুষ নিজে।

এইখানে মনে রাখিতে হইবে, যাহা সৃষ্টি করা সর্ব্বতোভাবে মানুষের সাধ্যায়ত্ত নহে, পরন্তু যাহা মানুষের প্রযত্ন ও পরিদৃশ্যমান বায়ুমণ্ডলের কার্য্য—এই উভয়ের মিশ্রণে আপনা হইতেই উৎপন্ন হইয়া থাকে, তাহাকে আমরা ঈশ্বরের সৃষ্টি বলিয়াই অভিহিত করিয়া থাকি। আর যাহা সর্ব্বতোভাবে মানুষের চেষ্টায় এবং মানুষের রক্তমাংসের কার্য্যকুশলতায় সৃষ্টি হইয়া থাকে, তাহাকে মানুষের সৃষ্টি বলিয়া অভিহিত করা হয়।

মানুষ কি করিয়া যুদ্ধপ্রবৃত্তি নিজের মধ্যে সৃষ্টি করে, তাহা বুঝা অথবা উপলব্ধি করা অপেক্ষাকৃত দুরূহ হইলেও উহাতে সাফল্য লাভ করিবার চেষ্টা করা একান্ত প্রয়োজনীয়। কারণ, যুদ্ধপ্রবৃত্তির কি করিয়া উদ্ভব হয় তাহা জানা না থাকিলে, যুদ্ধপ্রবৃত্তি সর্ব্বতোভাবে দমন করা সম্ভব হয় না এবং যুদ্ধ অথবা দ্বন্দ্বকলহের প্রবৃত্তি সর্ব্বতোভাবে দমন করিতে সামর্থ্যযুক্ত না হইলে, পরোপকারবৃত্তি যথার্থভাবে চরিতার্থ করিয়া মনুষ্যজীবন সার্থক করা সম্ভব হয় না এবং প্রকৃত মহত্ত্ব লাভ করা ঘটিয়া উঠে না। দ্বন্দ্বকলহের প্রবৃত্তিদ্বারা যে প্রকৃত পরোপকারবৃত্তি চরিতার্থ করা যায় না, তাহার বড় দৃষ্টান্ত আমাদিগের ভারতীয় জাতীয় মহাসভার নেতৃবৃন্দ। ইঁহাদিগের প্রত্যেকেই যে পরোপকারবৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্য আগুয়ান হইয়াছিলেন এবং কেহ কেহ যে উহার জন্য নিজ জীবনকে সর্ব্বতোভাবে উৎসর্গ করিয়াছিলেন তাহা অস্বীকার করা যায় না। অন্যদিকে ইঁহাদিগের কাহারও দ্বারা যে ভারতের কোন প্রকৃত হিত সাধিত হয় নাই, তাহাও যুক্তিসঙ্গতভাবে অস্বীকার করিতে পারা যায় না। ইঁহাদিগের

দ্বারা যদি ভারতের কোন প্রকৃত হিত সাধিত হইত, তাহা হইলে ভারতসন্তানগণের প্রায় প্রতি ঘরে ঘরে অর্থাভাবের জ্বালা, অস্বাস্থ্যের প্রকোপ, অশান্তির চণ্ডলীলা উত্তরোত্তর এত বৃদ্ধি পাইতে পারিত না। এত উৎসর্গ, এত প্রযত্ন কেন এত অসাফল্য লাভ করিয়াছে তাহা বিশ্লেষণ করিয়া বুঝিতে বসিলেই দেখা যাইবে যে, উহার প্রধান কারণ ইংরাজের প্রতি বিদ্বেষ এবং তাহাদিগের সহিত দ্বন্দ্বকলহের প্রবৃত্তি।

মানুষ কি করিয়া যুদ্ধপ্রবৃত্তি নিজের মধ্যে সৃষ্টি করে, তাহা বুঝিতে অথবা উপলব্ধি করিতে হইলে কি করিয়া ভ্রূণের সৃষ্টি হয়, ভ্রূণ হইতে কি করিয়া হস্ত-পদাদি কর্ম্মেন্দ্রিয় এবং চক্ষু কর্ণাদি জ্ঞানেন্দ্রিয়ের উদ্ভব হয় তাহা লক্ষ্য করিতে হইবে। ইহা লক্ষ্য করিতে বসিলে দেখা যাইবে যে, যে মানুষ অবশেষে এত প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড চেহারা পাইয়া থাকে এবং এত প্রচণ্ড প্রচণ্ড যুদ্ধের নেতৃত্ব করিয়া থাকে সেই মানুষ ভ্রূণরূপ পরিগ্রহ করিবার আগে একটি বায়বীয় রূপে বিদ্যমান থাকে। হের হিটলারের মাতা যখন তাঁহাকে গর্ভে ধারণ করিয়াছিলেন, সেই মুহূর্ত্তে কোন ধাত্রী যদি তাঁহার (অর্থাৎ হের হিটলারের মাতার) জরায়ুর মধ্যে কি আছে তাহা পর্য্যবেক্ষণ করিতে চেষ্টা করিতেন, তাহা হইলে জরায়ুর মধ্যে কতখানি বায়ু ছাড়া কোন ভ্রূণ পর্য্যন্ত দেখিতে পাইতেন না। প্রকৃতির নিয়ম বশে আপনা হইতেই ঐ বায়ু হইতে ভ্রূণের উৎপত্তি হয় এবং ঐ ভ্রূণ হইতে হস্ত-পদাদি বিশিষ্ট হের হিটলারের মত মানুষের সৃষ্টি হয়।—মূলতঃ বায়ু হইতে প্রকৃতির নিয়ম অনুসারে মানুষের সৃষ্টি হইয়া থাকে বলিয়া বেদ, বাইবেল ও কোরাণে বায়ুকে জীবের স্রষ্টা বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে।—বস্তুতঃপক্ষে বায়ুর মধ্যে যে তেজ ও রসবীজ বিদ্যমান থাকে, তাহা মানুষের মধ্যে না থাকিলে মানুষ চক্ষু থাকিতেও অন্ধ হইয়া যাইত, কর্ণ থাকিতেও বধির হইয়া যাইত।

মানুষের মধ্যে তেজ ও রসবীজযুক্ত এই বায়ু আছে বলিয়াই মানুষ প্রতিমুহূর্ত্তে মেদ, অস্থি, মজ্জা, বসা, মাংস, রক্ত ও চর্ম্মের অণু-পরমাণু সমূহ সৃষ্টি করিতে সক্ষম হইয়া থাকে। এবং এই সক্ষমতা নিবন্ধনই শিশুর ছোট হাতখানি, ছোট পাখানি, ছোট অবয়বটুকু যুবকের দীর্ঘ হাত, দীর্ঘ পা' ও দীর্ঘ অবয়ব পরিগ্রহ করে।

হাওয়া হইতে কি করিয়া ভ্রূণের উৎপত্তি হইতেছে এবং ভ্রূণ হইতে কি করিয়া হস্ত-পদাদিবিশিষ্ট প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড মানুষের সৃষ্টি হইতেছে তাহা লক্ষ্য করিতে বসিলে আরও দেখা যাইবে যে, প্রথমতঃ বালকের সৃষ্টিকার্য্য সর্ব্বতোভাবে একমাত্র বায়ুর কার্য্যের নিয়মানুসারে চলিতে থাকে। কিন্তু যখন বায়ু হইতে মেদাদির উদ্ভব হয়, তখন আর মনুষ্যাবয়বে কেবল মাত্র বায়ুর কার্য্য বিদ্যমান থাকে না। তখন উপরন্তু রক্ত-মাংস প্রভৃতির কার্য্যও চলিতে আরম্ভ করে। এই রক্তমাংসের কার্য্যে কিছুদিন পর্য্যন্ত বায়ুর কার্য্যের অনুরূপতা সর্ব্বতোভাবে বিদ্যমান থাকে, কিন্তু যখন রক্তমাংসের বুভুক্ষা তীব্রতা লাভ করে, তখন আর বায়ুর কার্য্য এবং রক্তমাংসের কার্য্যের মধ্যে সমতা বিদ্যমান থাকে না। তখন মানুষ প্রধানতঃ দুই শ্রেণীর কার্য্যের দ্বারা পরিচালিত হইতে থাকে। একশ্রেণীর কার্য্য তাহার আভ্যন্তরীণ বায়ুর এবং অপর শ্রেণীর কার্য্য তাহার মেদাদি রক্তমাংসের। রক্তমাংসের বুভুক্ষার তীব্রতায় বিধ্বস্ত না হইলে, উপলব্ধি করা সম্ভব হয় যে, মূলতঃ বায়ুর কার্য্য হইতেই রক্তমাংসের কার্য্যের উৎপত্তি হইতেছে এবং ঐ দুই শ্রেণীর কার্য্যই মূলতঃ সমভাব-সম্পন্ন। রক্ত-মাংসের বুভুক্ষার তীব্রতার দাসানুদাস হইলে মানুষ তাহার বুভুক্ষা মিটাইবার জন্য সর্ব্বদা ব্যাকুল হইয়া পড়ে এবং তখন মূলতঃ বায়ুর কার্য্য হইতেই যে রক্তমাংসের কার্য্যের উৎপত্তি হয় তাহা বিস্মৃত হইয়া যায় এবং ক্রমশঃ মানুষের মধ্যে দুইটী বিভিন্ন শ্রেণীর কার্য্য দেখা দেয়। এক কথায়, বায়ু অথবা স্রষ্টাই যে মানুষের কর্ম্মশক্তির মূল উৎস, তাহা যতক্ষণ পর্য্যন্ত মানুষের স্মৃতিপথে জাগ্রত থাকে এবং উহার সুরের সহিত সুর মিলাইয়া মানুষ যতক্ষণ পর্য্যন্ত কার্য্য করিতে পারে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত মানুষের কোন অস্বাস্থ্য, অথবা অশান্তি, অথবা দ্বন্দ্ব-কলহের প্রবৃত্তির উদ্ভব হয় না। আর যখন ঐ স্রষ্টাকে ভুলিয়া বুভুক্ষার তীব্রতা প্রসাদনার্থ কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, তথমই তাহার মধ্যে বিরুদ্ধভাবাপন্ন কার্য্যের উদ্ভব হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে মানুষ দ্বন্দ্বকলহ-প্রবৃত্তির দাস হইয়া পড়ে। স্রষ্টা অথবা বায়ুমণ্ডলের কার্য্য যাহাতে সর্ব্বদা স্মৃতিপথে জাগ্রত থাকে এবং উপলব্ধিযোগ্য হয় তাহারই জন্য প্রাচীন মনীষিগণ বেদের সন্ধ্যা, তন্ত্রের সন্ধ্যা এবং বাইবেল ও কোরাণের উপাসনার রচনা করিয়াছিলেন। এখনও মানুষ ঐ সন্ধ্যা ও উপাসনা করিয়া থাকে বটে, কিন্তু ঐ সন্ধ্যা ও উপাসনার মূল উদ্দেশ্য যে

কি, তাহা বুঝিবার মত সক্ষমতাযুক্ত মানুষের সংখ্যা অতীব অল্প। ইহারই ফলে সন্ধ্যা ও উপাসনা করিয়াও মানুষ বিদ্বেষ ও দ্বন্দ্বকলহ-প্রবৃত্তির আধার হইয়া থাকে।

মোটের উপরে দেখা যাইবে, যুদ্ধপ্রবৃত্তির মূল কারণ মনুষ্য-তত্ত্ব সম্বন্ধে জ্ঞান ও উপলব্ধির অভাব।

জ্ঞান ও কর্ম্ম-ক্ষমতা সম্বন্ধে যাঁহারা সম্পূর্ণতা লাভ করিতে পারিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের কলম হইতেই বেদ, বাইবেল ও কোরাণের কথা নিঃসৃত হইয়াছে। তাঁহারা কেহই যুদ্ধ-প্রবৃত্তির প্রশংসা করেন নাই এবং গুণ্ডাধর্ম্মকে বীরত্বের প্রশংসা প্রদান করেন নাই। তাঁহাদিগের ভাষা অনুসারে বীর বলা হয় তাঁহাদিগকে, যাঁহারা যুদ্ধপ্রবৃত্তিকে দমিত ও শমিত করিতে সক্ষম হইয়া থাকেন। ঐ দম ও শমের তারতম্যানুসারেই বীরত্বের তারতম্য তাঁহাদিগের ভাষায় নিরূপিত হইয়াছে। অধুনা মনুষ্য-সমাজ মূর্খতায় আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছে; তাই মানুষের বুদ্ধি আজ বৈপরীত্য লাভ করিয়াছে। আজকালকার ভাষায় মানুষ যাহাদিগকে বীর অথবা যোদ্ধা বলিয়া অভিহিত করিয়া থাকে, তাহাদিগের দ্বারা মনুষ্যসমাজের হিত সাধিত হইতেছে অথবা অহিত সাধিত হইতেছে, তাহা মানুষ লক্ষ্য করিয়া দেখুক। উহা লক্ষ্য করিবার সামর্থ্য অর্জ্জন করিলে মানুষ দেখিতে পাইবে যে, রাজপুতবীরগণের কার্য্যকলাপের ফলে তাহার পরবর্ত্তী কালে ভারতবর্ষের অবনতি আরম্ভ হইয়াছে।

ইংরাজগণ সাধারণতঃ মনে করিয়া থাকেন যে, নেল্‌সনের বীরত্বের ফলে ইংরাজজাতির উন্নতি হইয়াছে। নেল্‌সনের বীরত্বের ফলে ইংরাজের সাম্রাজ্য বিস্তার লাভ করিয়াছে বটে, কিন্তু ইংরাজজাতির প্রকৃত উন্নতি সাধিত হইয়াছে কি না তৎসম্বন্ধে সন্দেহ করিবার কারণ রহিয়াছে। ইহার কারণ, অষ্টাদশ শতাব্দী ও তাহার পূর্ব্বে ইংলণ্ড অন্য কোন দেশের উপর নির্ভর না করিয়া তাহার প্রয়োজন মত অধিক পরিমাণে নির্ব্বাহ করিতে পারিত, ঊনবিংশ শতাব্দী অথবা বিংশ শতাব্দীতে এখন আর তাহা পারিতেছে না।

আজকাল যেরূপভাবের যুদ্ধ ঘটিয়া থাকে এবং যোদ্ধাগণ মানুষকে হত্যা করিয়া যেরূপভাবের বীরত্ব দেখাইয়া থাকেন, তাহাতে মনুষ্যসমাজের কোন রকমের হিত সাধিত হয় না বটে, কিন্তু ধর্ম্মযুদ্ধে মানুষের হিত সাধিত হইতে পারে। ধর্ম্মযুদ্ধে কি করিয়া মানুষের হিত সাধিত হইতে পারে তাহা বুঝিতে হইলে, ধর্ম্মযুদ্ধ কাহাকে বলে এবং যুদ্ধ কত রকমের হইতে পারে তাহা জানিবার প্রয়োজন হয়।

যুদ্ধ মূলতঃ তিন শ্রেণীর হইতে পারে।

কোন একটী জাতি মনে করিল যে, অমুক দেশটী লাভ করিতে পারিলে অথবা উহার উপর প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিলে ঐ জাতির অর্থসমস্যার পূরণ হইতে পারে,—অথচ কোন দেশ ছিনাইয়া লইলেই অপর কোন জাতির কোন সমস্যার পূরণ হওয়া সম্ভবপর কি না তাহা মোটেই তলাইয়া চিন্তা করিল না, এতদবস্থায় অন্য কোন দেশ ছিনাইয়া লইবার জন্য আক্রমণকারী যে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়, সেই যুদ্ধের নাম "তামসিক যুদ্ধ" এবং আক্রান্ত জাতি আত্মরক্ষা করিবার জন্য যে যুদ্ধ করিতে বাধ্য হয়, সেই যুদ্ধের নাম "ধর্ম্ম-যুদ্ধ"। আক্রান্ত জাতি যদ্যপি আত্মরক্ষা না করিয়া অথবা সামান্য মাত্র আত্মরক্ষা করিয়া আক্রমণকারী জাতিকে বিধ্বস্ত করিবার জন্য প্রতিহিংসামূলক কোন যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয় তাহা হইলে আক্রান্ত জাতির ঐ যুদ্ধও 'তামসিক যুদ্ধ' বলিয়া পরিগণিত হইবে।

কোন একটী জাতি যখন নিজের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য অন্য কোন জাতিকে আক্রমণ করে, তখন ঐ যুদ্ধ "রাজসিক যুদ্ধে"র অন্তর্ভুক্ত হইয়া থাকে।

যখন দেখা যায় যে, কতকগুলি তামসিক ও রাজসিক জাতির ভ্রান্ত সাম্রাজ্য-পরিচালনার ফলে প্রায় সমগ্র মনুষ্য-জাতির অধিকাংশ মানুষ অর্থাভাবে স্বাস্থ্যাভাবে, শান্তির অভাবে জর্জ্জরিত হইতেছে, তখন যদি কোন মানুষ সমগ্র মনুষ্যজাতির সমস্যাসমূহ সমাধান করিবার উদ্দেশ্যে মনুষ্য-জাতিকে তামসিক ও রাজসিক জাতিসমূহের ভ্রান্ত সাম্রাজ্য-পরিচালনার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান করিতে প্রযত্নশীল হয়, তখন যে যুদ্ধের সৃষ্টি হয় সেই যুদ্ধের নাম আসল 'ধর্ম্ম-যুদ্ধ'। ধর্ম্মযুদ্ধে কোন মারামারি, কাটাকাটির ব্যাপার থাকে না। ইহাতে থাকে মস্তিষ্কের নৈপুণ্যের পরিচয়।

বলা বাহুল্য, আধুনিক মনুষ্যসমাজে এতাদৃশ ধর্ম্ম-যুদ্ধের প্রয়োজন হইয়াছে। কে এই ধর্ম্মযুদ্ধের নেতৃত্ব গ্রহণ করিবেন, তাহা ভগবান্ জানেন।

বিশ্ব-সৃষ্টি

—শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য

মানব-সভ্যতা হ'তে যে-ভদ্রতা বর্ব্বরতা আনে,
যের ব্যথা স্বার্থের সংঘাতে শত দুর্ব্বলের প্রাণে
ব্যাপিয়া সমগ্র বিশ্ব সৃষ্টি করে তীব্র অন্ধকার,
মানব-রুধিরে মন্ত্র'পাঠ করে মৃত্যু বন্দনায়
যন্ত্র-দানবের সনে পৈশাচিক পুষ্প উপচারে
হে মোর শতাব্দী আজি ধ্বংস করো—ধ্বংস করো তারে।

মিথ্যার তাণ্ডবে তার ধরণীতে হয় ধর্ম্ম লোপ,
স্বেচ্ছাচারে জাগে নিত্য মানবের মৃত্যু অশ্রু ক্ষোভ,
বিপ্লবের স্পর্দ্ধা নিয়া ভাগ্যাকাশে রক্ত ঊষা জাগে
নটরাজ করে নৃত্য ; অন্নপূর্ণা দ্বারে ভিক্ষা মাগে,
অভয় মঙ্গলশঙ্খ নাহি বাজে যুগের মন্দিরে
সভ্যতার ধ্বংস হোক্ হে শতাব্দী কালসিন্ধু-নীরে।

শবের সমষ্টি ভিন্ন নহে কিছু নিখিল জীবন,
সে শব কদর্য্য করি' অকল্যাণ আনি' অনুক্ষণ
যে সভ্যতা দিলনা ক' মহত্ত্বের কোন পরিচয়
ক্ষুদ্র আমিত্বের লাগি, যে সভ্যতা পাপের সঞ্চয়
করিতেছে উগ্রতম অসত্যের ক্রুদ্ধ অহঙ্কারে
হে মোর শতাব্দী আজি ধ্বংস করো—ধ্বংস করো তারে।

সত্যের শ্রীক্ষেত্রে হেরি রথযাত্রা চলেছে মিথ্যার,
ভণ্ডের মৃদঙ্গ বাজে, সংকীর্ত্তন করি' নীচতার
আত্ম-প্রচারক-দল চলিতেছে পঙ্গপাল সম,
কু-উদ্দেশ্যে প্রতিচিত্তে অপবিত্র রহে ঘৃণ্যতম।
স্বার্থপর নিয়ে তারা করিতেছে সংসারে চাতুরী,
যাহারা বোঝে না কিছু তাহাদের বক্ষে হানে ছুরি।

দৃষ্টি-বিভ্রমের পথে মুক্ত আছে শতেক যুবতী
তাদের মিটাতে ক্ষুধা, নিত্য যারা সমাজের ক্ষতি
করিতেছে নেতারূপে, ত্যাগ যেন নহেক বর্জ্জিত,
দর্শন-বিজ্ঞান নীতি যারা আজি করেছে বিকৃত,
বিশ্বের কলঙ্ক তারা, তবু হায়! নির্ব্বোধ মানব-
সম্প্রদায় করিতেছে তাহাদের জয় শঙ্খরব।

সাম্যের সঙ্গীত যারা গাহিতেছে এ সভ্য জগতে
তাহারা বপন করে অসমতা জীব-যাত্রা-পথে
দ্বন্দ্বের সৃজন করে সমরের ডাকে হুতাশনে
ঢাকিয়া মারণ-অস্ত্র ভদ্রতার ছদ্ম আবরণে।
শান্তির লাগিয়া যারা সম্মেলন করিতেছে নিতি
তাহাদের কণ্ঠে ওঠে বারবার সংগ্রামের গীতি।

আজিকার মৃত্তিকায় নাহি রস, নাহি গন্ধ ফুলে,
বহেনা ক' সমীরণ শান্তি-স্নিগ্ধ পল্লী-কুঞ্জে দুলে ;
নদীর প্রবাহধারা চিরসুপ্ত শুষ্ক মরুভূমে,
শস্য নাহি, শষ্প নাহি, পৃথ্বী কাঁদে উগ্র চিতাধূমে।
যাহাদের মূর্খতার কূটচক্রে এই চিত্র রাজি
রয়েছে সম্মুখে মম, তাহাদের ধ্বংস করো আজি।

ধ্বংস করো সভ্যতার গর্ব্বোদ্ধত হিমাদ্রি-শিখর,
আগ্নেয়গিরির সম তুমি জাগো বিশ্বের ভিতর,
তোমার গৈরিক-স্রাবে ভস্ম হোক পাপের ফসল,
আত্ম-সমর্পণহীন ধ্বংস হোক, নীরব নিশ্চল
হোক যারা কোন দিন চিত্ত স্থির করেনি ভুলিয়া,
মিথ্যার কালিমা মাখি ঘুরিয়াছে সংহতি গঠিয়া।

সভ্য জগতের চেয়ে বন্যদ্বীপ অসুন্দর নহে,
আদিম মানব সেথা সারল্যের প্রীতিপুণ্যে রহে
শ্যামল-কুটির মাঝে শান্তিময় মুক্তির বাতাসে ;
সভ্য জগতের দূরে শিশুসম আরণ্যক হাসে।
বন্দীর শৃঙ্খল সেথা বাজে নাক লৌহ কারা গেহে,
সবলের নিষ্পেষণে নাহি রক্ত ঝরে নরদেহে।

দানবীয় চরমতা সভ্যতার হেরিয়াছি এবে
আর কেন হে শতাব্দী! ধ্বংসরূপী ওঠ বিশ্বব্যোপে
ধ্বংসের পশ্চাতে রহে সনাতন সৃষ্টির নির্ঝর,
আবার হাসিবে বিশ্ব নন্দনের সম নিরন্তর।
যে সভ্যতা-ভদ্রতায় ক্ষিপ্ত-পৃথ্বী অস্ত্রের ঝঙ্কারে,
হে মোর শতাব্দী আজি ধ্বংস করো—ধ্বংস করো তারে।

বঙ্কিমচন্দ্র ও বাঙ্গালী মুসলমান *

—শ্রীব্রজেন্দ্রসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায়, এম.এ. বি-এল

[লেখক বঙ্কিমচন্দ্রের দৌহিত্র। ইনি বহুদিন হইতে বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে অনেক সুচিন্তিত প্রবন্ধ লিখিতেছেন। ইঁহার পিতা স্বর্গীয় রাখালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ই বঙ্কিমচন্দ্র প্রবর্ত্তিত "প্রচার" পত্রের সম্পাদনা করিতেন ও বঙ্কিমচন্দ্রের চিন্তাধারার সহিত বিশেষভাবে পরিচিত ছিলেন।]

—সম্পাদক।

বাঙ্গালী হিন্দু ও বাঙ্গালী মুসলমানের মধ্যে বিরোধের সৃষ্টিকর্ত্তা ও পোষক ব্যক্তি উভয় সম্প্রদায়েই বিগুমান আছে, মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে ঐ শ্রেণীর লোক যাঁহারা বর্ত্তমান আছেন তাঁহারা তাঁহাদিগের অন্যতম প্রধান অস্ত্রস্বরূপ প্রচার করিয়া থাকেন যে, বঙ্কিমচন্দ্রই এই বিরোধের মূল এবং প্রথম ও প্রধান প্রবর্ত্তক। ইহাতে তাঁহাদের দুইটি উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়। প্রথমতঃ, ইহার দ্বারা তাঁহারা তাঁহাদের নিজ সম্প্রদায়কে বঙ্কিমচন্দ্রের বিশ্ববিমোহী জাতীয়তা বোধ হইতে যতদূর সম্ভব দূরে রাখিয়া থাকেন। কারণ তাঁহারা বিলক্ষণ বুঝেন যে, তাঁহাদের সম্প্রদায় যদি বঙ্কিমচন্দ্রের জাতীয়তাবাদের অতুল্য আস্বাদ একবার গ্রহণ করিয়া ফেলে, তাহা হইলে আর কিছুতেই তাহাদিগকে বাঙ্গালী হিন্দু হইতে পৃথক রাখিতে পারা যাইবে না।

দ্বিতীয়তঃ, বঙ্কিমচন্দ্রকে মুসলমান বিদ্বেষী বলিয়া প্রচার করিয়া তাঁহারা স্বসম্প্রদায়কে বুঝাইতে চাহেন যে, জাতীয়তাবাদী বাঙ্গালী হিন্দুর যে ব্যক্তি উপাস্য দেবতার স্বরূপ, সেই ব্যক্তি স্বয়ংই মুসলমান বিদ্বেষ্টা ও বাঙ্গালী হিন্দু মুসলমান বিরোধের আদি পুরুষ। অতএব বাঙ্গালী মুসলমান যেন বুঝিয়া রাখেন যে, বাঙ্গালী হিন্দু তাহাদিগের কত বড় শত্রু।

এই সর্ব্বৈব মিথ্যা ও হীনজনোচিত প্রচারের ফলে এই সকল মুসলমানেরা তাঁহাদিগের স্বজাতীয়গণের যে কতদূর সর্ব্বনাশ করিতেছেন তাহা ভাষায় ব্যক্ত করা কঠিন। বাঙ্গালী মুসলমানদিগের মাতৃভাষা বাঙ্গলা। দুই একজন উচ্চ শিক্ষিত সখ করিয়া আরবী বা ফারসী শিখিয়া থাকেন ও যত্ন পূর্ব্বক বিশুদ্ধ উর্দ্দুতে কথা কহিবার ক্ষমতা আয়ত্ত করেন বটে, কিন্তু সাধারণ বাঙ্গালী মুসলমানেরা স্ত্রী-পুরুষে ঐ সকলের বিন্দু বিসর্গও জানে না। ইহাদের শিক্ষা ও জ্ঞানলাভের একমাত্র উপায় বঙ্গভাষা। পূর্ব্বোক্ত মুসলমানেরা বাঙ্গালী মুসলমানদিগের মধ্যে বঙ্কিম বিদ্বেষ প্রচার করিয়া, তাহাদিগকে তাহাদিগের মাতৃভাষার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ হইতে বঞ্চিত করেন।

এক্ষণে দেখা যাউক, বঙ্কিমচন্দ্রের রচনাবলী হইতে তাঁহার বাঙ্গালী মুসলমানদিগের প্রতি বিদ্বেষের কিরূপ পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁহার প্রথম গ্রন্থ "দুর্গেশনন্দিনী"। এই গ্রন্থে পশ্চিম দেশীয় হিন্দু জগৎসিংহের হস্তে বাঙ্গালী মুসলমান ওসমান খাঁর পরাজয় বর্ণিত আছে। এই পরাজয়কে মুসলমান প্রচারকেরা বঙ্কিমচন্দ্রের স্বজাতিপ্রীতি ও মুসলমান বিদ্বেষের একটি প্রধান নিদর্শন বলিয়া গণ্য করিয়া থাকেন। বাস্তবিক কিন্তু জগৎসিংহের এই জয়লাভে বঙ্কিমচন্দ্রের স্বজাতীয়গণের অর্থাৎ বাঙ্গালী হিন্দুদিগের বিশেষ কিছুই গৌরবের বিষয় নাই। কারণ জগৎসিংহ বাঙ্গালী নহেন, তিনি বিদেশীয়। ওসমানই বাঙ্গালী। বাঙ্গালী, হিন্দুই হউক আর মুসলমানই হউক, দৈহিক বলে পশ্চিম প্রদেশীয় ভারতবাসী অপেক্ষা কিছু ন্যূন। ওসমানের পরাজয় ইহারই পরিচায়ক মাত্র। ওসমান যখন জগৎসিংহকে বলিলেন, "দেখিয়াছেনত গড় মান্দারণ বিজেতারা নিতান্ত হীনবল নহেন।" তখন জগৎসিংহ ঈষৎ তাচ্ছিল্যের সহিত উত্তর দেন, "হাঁ তাঁহারা কৌশলী বটে।" অন্যান্য ভারতবাসীরা সাধারণতঃ বাঙ্গালীকে হীনবল ধূর্ত্তবিশেষ বলিয়াই বর্ণনা করিয়া থাকেন। জগৎসিংহের উক্তি উহারই সম্পূর্ণ প্রতিধ্বনি। অতএব এই দুইজনের মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্র কাহাকে আপনার স্বজাতীয় ও কাহাকে বিদেশীয় বলিয়া চিত্রিত করিয়াছেন তাহা সহৃদয় পাঠক মাত্রেই অনুধাবন করিতে পারেন। জগৎসিংহের চরিত্র বাঙ্গালী চরিত্র নহে। ওসমানই খাঁটি বাঙ্গালী।

* ইতিপূর্ব্বে 'বঙ্গশ্রী'তে ডাক্তার শ্রীহেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত ডি-লিট মহাশয় এ বিষয়ে কিছু আলোচনা করিয়াছেন। আমাদের এই প্রবন্ধ উহারই কিছু বিস্তারিত বিবরণ।—লেখক।

কিন্তু ওসমানের পরাজয়ে বাঙ্গালী,—হিন্দুই হউক আর মুসলমানই হউক, কাহারও লজ্জিত হইবার প্রয়োজন নাই। কেন না, উহা কাব্যের জন্ত প্রয়োজন। "দুর্গেশনন্দিনী" কাব্যের সর্বস্ব হইতেছে আয়েষা। উহার শোভা বল, সম্পদ বল, উৎকর্ষ বল, যাহা কিছু বল সমস্তই আয়েষার চরিত্র। এই লোকললামভূত নারী চরিত্রের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপাদান তাঁহার আত্মসংযম ও মনের বল। স্ত্রীলোকের সকলই সহ্ন হইতে পারে, কিন্তু প্রণয় প্রতিদ্বন্দ্বিনী অসহনীয়া। কিন্তু আয়েষার উহাও কিছুই নহে। এই পরদুঃখ কাতরা রমণী জগৎসিংহের বিবাহ বাসরে স্বহস্তে তিলোত্তমাকে সাজাইয়া দিয়া আসিয়া, পাছে কোন দুর্ব্বল মুহূর্ত্তে নিজের প্রতি অহিত করিয়া ফেলেন, এই আশঙ্কায় চিরদিনের জন্ত দুর্গ প্রাকারে নিজ হস্তস্থিত বিষাঙ্গুরীয় পরিত্যাগ করিলেন। আমরাও ধন্ত হইলাম। যে কবি এই বুদ্ধিমতী, পরোপকারিনী, দৃঢ়চিত্তা স্নেহশালিনী, সকল সম্পদে অতুলনীয়া মুসলমানী নারী অঙ্কিত করিয়াছেন, তিনি যদি মুসলমান বিদ্বেষী তবে মুসলমান হিতৈষী কে?

এই আয়েষার চরিত্রের বিকাশের জন্ত নিতান্ত প্রয়োজন ছিল যে, আয়েষার প্রণয়পাত্র সকল গুণে গুণবান হইয়া আয়েষার পক্ষে একান্ত দুষ্প্রাপ্য হইবেন। কোন মুসলমানকে ঐরূপ করা সম্ভব নহে। কারণ হিন্দুদিগের স্তায় মুসলমানদিগের মধ্যেও বহু বিবাহ প্রচলিত। অতএব কোন গুণবান মুসলমানের পক্ষে তিনি বিবাহিত হইলেও, আয়েষার স্তায় রমনীরত্নের অযাচিত প্রণয় প্রত্যাখ্যান করা একেবারেই অস্বাভাবিক ও অশোভন হইত। একজন হিন্দু হইলেই সকল দিক ঠিক বজায় থাকে। তাই সূক্ষ্মদৃষ্টিসম্পন্ন বাঙ্গলার মহাকবি আয়েষার প্রণয়ভাজনকে হিন্দু করিয়াছেন ও তাঁহার হস্তে আয়েষার প্রণয়াকাঙ্ক্ষী বীরশ্রেষ্ঠ ওসমানকেও পরাস্ত করাইয়াছেন। এ বিষয়ে ইতিহাস তাঁহাকে বিশেষ সাহায্য করিয়াছে। কুমার জগৎসিংহের হস্তে বাঙ্গলার পাঠানদিগের পরাজয় ঐতিহাসিক ঘটনা।

ইংলণ্ডের ইতিহাসে লর্ড লিষ্টার (Lord Leicester) আদর্শ বীর বলিয়া বর্ণিত নহেন। তথাপি স্তর ওয়াল্টার স্কট (Sir Walter Scot) এমি রবসার্ট (Amy Robsart) এর প্রণয়াকাঙ্খী দুঃসাহসিক বীর ট্রেসিলিয়ন (Tressilian)কে লিষ্টারের হস্তে পরাজিত করাইয়াছেন। কারণ উহা না করাইলে এমি রবসার্টের চরিত্র একেবারে মাটি হইয়া যায় এবং মহাকাব্য কেনিলওয়ার্থ (Kenil Worth)এর সকল সৌন্দর্য্য নষ্ট হয়। সেইরূপ জগৎসিংহের হস্তে যদি ওসমান খাঁ পরাজিত না হইতেন, তাহা হইলে আয়েষা চরিত্রেরও ঠিক ঐ পরিণতি হইত। অতএব আমরা আমাদিগের মুসলমান ভ্রাতৃগণকে জিজ্ঞাসা করিতে চাই যে তাঁহাদিগের নিকট আয়েষা চরিত্রের সমাধি অধিক বাঞ্ছনীয়, না জগৎসিংহের হস্তে ওসমানের পরাজয় অধিক বাঞ্ছনীয়? "দুর্গেশনন্দিনী"তে আর একটি প্রধান ও আর একটি অপ্রধান মুসলমান চরিত্র অঙ্কিত আছে। প্রথমোক্তটি হইতেছে বাঙ্গলার পাঠানদিগের তৎকালিক রাজা কতলু খাঁ। দ্বিতীয় হইতেছে সিপাহি রহিম সেখ। কতলু খাঁর চরিত্রে কিছুই নিন্দনীয় দেখিতে পাওয়া যায় না। বীরেন্দ্র সিংহের বিচারের দৃশ্যে তাঁহার রাজোচিত দৃঢ়তা ও ধৈর্য্যের যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি কতকটা জিতেন্দ্রিয়ও ছিলেন। বিমলাকে করতলগত করিয়াও তিনি উপযুক্ত অবসরের অপেক্ষা করিয়াছিলেন। ইহা সে সময়ে রাজাদিগের পক্ষে বড় ক্ষুদ্র কথা নহে। নির্জ্জিত শত্রু, বিশেষতঃ বাহুবলে বহু কষ্টের পর যাহাকে দমন করিতে পারা গিয়াছে, তাহার স্ত্রী-কন্যার অদৃষ্টে বিমলা ও তিলোত্তমার স্তায় বিধানই তখনকার দিনে হইত। উহা একপ্রকার ন্তায়সঙ্গত প্রথার মধ্যে পরিগণিত ছিল। অতএব বিমলা ও তিলোত্তমাকে বিলাস গৃহে পাঠাইয়া কতলু খাঁ বিশেষ কিছু অন্তায় ব্যবস্থা করেন নাই। বীরেন্দ্র সিংহের প্রতি যদি বা কিছু দয়ার অবশিষ্ট ছিল, তাহা বীরেন্দ্র সিংহ বিচারের সময় তাঁহার ঔদ্ধত্যের দ্বারা সম্পূর্ণই শুকাইয়া দিয়াছিলেন। তথাপি কতলু খাঁ যতদিন না তিনি তাঁহার রাজকার্য্যের মধ্যে কিছু উপযুক্ত অবসর করিতে পারিয়াছিলেন, ততদিন পর্য্যন্ত তাঁহার বিলাস গৃহের নবাগতদিগের কোন সংবাদই লয়েন নাই। কুমার জগৎসিংহকে বন্দী করিয়া তিনি তাঁহার প্রতি যেরূপ সদয় ব্যবহার করিয়াছিলেন তাহাতে তাঁহার ভদ্রতা ও রাজনীতিজ্ঞতার বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। মৃত্যুকালেও তিনি ঐ সকলের যথেষ্ট পরিচয় দিয়া গিয়াছেন।

শৈলেন্দ্র নাথ কুণ্ডু

সে কালের মুসলমানেরা স্বভাবতই কিছু ভোগ-বিলাসী ছিল। অতএব বিমলা যে সহজেই সিপাহী রহিম সেখকে নিজের বশীভূত করিতে পারিয়াছিলেন, ইহাতে আশ্চর্য্য হইবার বা নিন্দার কিছুই নাই। সিপাহী রহিম সেখের চরিত্র বড়ই উজ্জ্বল ও স্বাভাবিক।

ওসমান খাঁর চরিত্র বিশ্লেষণের কোন প্রয়োজন নাই, উঁহার উৎকর্ষ সর্ব্ববাদীসম্মত। বাঙ্গালীজনোচিত বুদ্ধিমত্তা ও সৌজন্যে স্বয়ং জগৎ সিংহও তাঁহার নিকট ম্লান।

বঙ্কিমচন্দ্রের দ্বিতীয় ও তৃতীয় গ্রন্থ "কপালকুণ্ডলা" ও "মৃণালিনী।" "কপালকুণ্ডলায়" বাঙ্গালী মুসলমানদিগের কথা অল্পই আছে, যেটুকু আছে তাহাতে উঁহাদের প্রশংসাই সূচিত হয়। উক্ত হইয়াছে যে, পদ্মাবতীর পিতা রামগোবিন্দ ঘোষাল সপরিবারে পুরুষোত্তম দর্শনে যাত্রা করেন। সেই সময়ে এতদ্দেশীয় পাঠানদিগের সহিত দিল্লীর মোগলদিগের যুদ্ধ বাঁধিয়াছিল। রামগোবিন্দ উড়িষ্যার পথে পাঠানদিগের হস্তে পতিত হয়েন। সপরিবারে মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া তবে অব্যাহতি পান। যুদ্ধের কথা এইখানে উল্লেখ করায় ইহা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, বঙ্কিমচন্দ্রের মতে বাঙ্গলা ও উড়িষ্যার মুসলমানেরা বিশেষ কারণ ব্যতিরেকে তাঁহাদিগের স্বদেশবাসী হিন্দুদিগের ধর্ম্মের উপর কোনরূপ হস্তক্ষেপ করিতেন না। বঙ্কিমচন্দ্র যদি এই মত পোষণ না করিতেন তাহা হইলে তিনি যুদ্ধের কথা উল্লেখ না করিয়াই, অপরাপর অবিবেচকদিগের ন্যায় অমনিই বলিতে পারিতেন পাঠানেরা রামগোবিন্দের ধর্ম্মচ্যুতি ঘটাইল। যুদ্ধের সময় শত্রুদিগের অধিকার হইতে রামগোবিন্দ পাঠানদিগের অধিকারে প্রবেশ করিয়াছিলেন, অতএব তাঁহার গুপ্তচর হওয়ার বিলক্ষণ সম্ভাবনা। সুতরাং ঐ সময়ে তাঁহাকে অবরোধ করিয়া তাঁহার ধর্ম্মলোপ ঘটান কিছুই বিচিত্র নহে।

ইতিহাস ঠিক এই কথাই বলে। বাঙ্গলাদেশের পাঠানেরা সকল রকমেই বাঙ্গালী হিন্দুদিগের সহিত সহৃদয়তা পূর্ণ হইয়া পড়িয়াছিলেন। তাঁহারা নিজেদের বাঙ্গালী মনে করিতেন, বাঙ্গালীর ন্যায় পরিচ্ছদাদি পরিধান করিতেন ও বাঙ্গলা ভাষার অনুশীলন করিতেন। তাঁহাদিগের আনুকূল্যে বঙ্গভাষার উন্নতির আরম্ভ। রামায়ণ ও মহাভারতের প্রথম বঙ্গানুবাদ তাঁহারাই সম্পাদন করান। হোসেনশাহী রামায়ণ ও পরাগল খাঁর মহাভারতের নাম এখনও বাঙ্গালী ভুলে নাই। দিল্লীর মুসলমানেরা কিন্তু এইরূপ করেন নাই। তাঁহারা দেশীয় ভাষাকে ভাষা বলিয়া মনে করিতেন না। কাজেই ঐ সকল অঞ্চলে উর্দ্দু ভাষারই প্রসার হইয়াছিল, দেশীয় ভাষা মোটেই অগ্রসর হইতে পারিল না। বাঙ্গলা ভাষা যে আজ এত সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর ও পরিপুষ্ট, বহু পূর্ব্ব হইতে এই রাজানুগ্রহ লাভ তাহার অন্যতম কারণ। কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয় আজ-কাল সামান্য কিছু রাজনৈতিক অধিকার লাভের আশায় বাঙ্গালী মুসলমানদিগের ভিতর অনেকে তাঁহাদের সমাজে বঙ্গভাষার স্থলে উর্দ্দু চালাইবার চেষ্টা করিতেছেন। তাঁহাদের এই প্রচেষ্টা সফল হইবে কি না সে বিষয়ে বিশেষ সন্দেহ আছে। কারণ, কোন জাতির মাতৃভাষার পরিবর্ত্তন করা একরূপ অসম্ভব কথা।

বিবাহাদি ব্যাপারে ঠিক এইরূপই দেখা যায়। পশ্চিম প্রদেশে বাদশাহদিগের অনুগ্রহ লাভের আশায় কোন কোন রাজ পরিবার তাঁহাদিগের দুই একটি কন্যাকে বাদশাহদের হস্তে অর্পণ করিয়াছিলেন। কিন্তু কোন উচ্চ বংশীয় মুসলমান কন্যা কোন হিন্দুর ঘরে প্রবেশ করিয়াছে এরূপ দৃষ্টান্ত একটিও কোথাও দেখিতে পাওয়া যায় না। কিন্তু বাঙ্গলার ইতিহাসে ঐরূপ দুইটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত বর্ত্তমান আছে। প্রথম রাজা গণেশের পুত্র, দ্বিতীয়, মহাবীর কালাচাঁদ বা কালাপাহাড়। ইতিহাসেই যখন এইভাবে দুইটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত পাইয়া থাকি তখন সাধারণ সমাজে উহা অবিরল ছিল না একথা স্বীকার করিতে আমরা বাধ্য। বাঙ্গালা দেশের সুবিখ্যাত পীর আলি (পিরিলি) বংশের উৎপত্তি সম্বন্ধেও কেহ কেহ এই ভাবের কথা বলিয়া থাকেন। নিম্নস্তরের হিন্দু মুসলমানের ভিতর আদান-প্রদান বাঙ্গালা দেশে একরূপ নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপারে দাঁড়াইয়াছিল এবং এখনও উহা সেইরূপ আছে। সেই জন্যই বাঙ্গালা দেশে হিন্দু মুসলমান চেনা কঠিন।

এইবার আমরা "কপালকুণ্ডলা"র দিল্লীওয়ালা মুসলমানদিগের সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের মতের আলোচনা করিব। "কপালকুণ্ডলা"তেই উঁহাদের সম্বন্ধে বঙ্কিম চন্দ্রের স্পষ্ট

অভিব্যক্তি আমরা প্রথম দেখিতে পাই। দিল্লীওয়ালা মুসলমানদিগকে বঙ্কিমচন্দ্র বিদেশীয় বলিয়া মনে করিতেন, কারণ তাঁহারা বাঙ্গালীদের নিজেদের স্বদেশীয় বলিয়া মনে করিতেন না, অথবা বিশেষ শ্রদ্ধার চক্ষেও দেখিতেন না। বর্ত্তমানে ইংরাজদিগের সহিত ভারতবাসীদের যে সম্বন্ধ, দিল্লীওয়ালা মুসলমানদের সহিত সেকালে বাঙ্গালীদেরও ঠিক সেই সম্বন্ধই ছিল। লুৎফুন্নিসা (মতিবিবি) যখন তাঁহার পরিচারিকা পেষমনকে জানাইলেন যে, তিনি বাঙ্গালা দেশে বাস করিবেন বলিয়া মনস্থ করিয়াছেন, তখন পেষমন আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া তাঁহাকে বলে, "সেই চুয়াড়ের দেশে?" বাস্তবিকই তখনকার দিল্লী অঞ্চলের অধিবাসীরা বাঙ্গলা দেশকে চুয়াড়ের দেশ বলিয়া মনে করিতেন। এই ভাবটা তাঁহাদের মধ্যে এত অধিক প্রচলিত ছিল যে, বঙ্কিমচন্দ্র একজন সামান্য বাঁদীর মুখেই উহা দিয়া দিয়াছেন।

দিল্লীর মুসলমানদিগের উপর বঙ্কিমচন্দ্রের বিদ্বেষের আর একটা কারণ তাঁহারা বাঙ্গলা দেশের শোষক ছিলেন। বাঙ্গলার অর্থরাশি সংগ্রহ করিয়া তাঁহারা দিল্লী-আগ্রার সৌধাদি নির্ম্মাণে ব্যয় করিতেন। সুবাদারগণ বাঙ্গলা দেশের ভিতরে বড় একটা প্রবেশই করিতেন না। তাঁহারা বাঙ্গলার পশ্চিম প্রান্তে অবস্থিত রাজমহল নগরে বসিয়া অর্থ সংগ্রহে ব্যস্ত থাকিতেন। শাসনের দিকে বিশেষ মনোযোগী হইতেন না। যখন পর্ত্তুগীজ, মগ প্রভৃতির অত্যাচারে বাঙ্গালা হইতে অর্থ-সংগ্রহে বড়ই ব্যাঘাত হইতে লাগিল তখনই সুবাদার মীর জুমলা রাজ মহল হইতে ঢাকায় রাজধানি পরিবর্ত্তিত করেন। এই সকল নানা কারণে বঙ্কিমচন্দ্র দিল্লীর মোগলদিগের প্রতি বিদ্বেষ ভাবাপন্ন ছিলেন, কিন্তু তাঁহার ন্যায় মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত ও মহাকবির পক্ষে কাহারও উপর মিথ্যা বা অন্যায় দোষারোপ করা সম্ভব নহে। তিনিও উহা করেন নাই। মোগল বাদশাহদিগকে তাঁহাদিগের ঠিক প্রকৃত বর্ণেই চিত্রিত করিয়া গিয়াছেন। যাহার যে দোষ তাহা যেমন দেখাইয়াছেন তেমনই যাহার যে গুণ তাহাও দেখাইয়াছেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের চিত্রিত আকবর বাদশাহের চরিত্র বিশ্লেষণ করিলেই আমরা ইহা সম্যক উপলব্ধি করিতে পারি। "কপালকুণ্ডলা"য় উল্লিখিত আছে যে, যখন মেহেরউন্নিসার প্রতি কুমার সেলিমের আকর্ষণ বুঝিতে পারিয়া আকবর বাদশাহ মেহেরউন্নিসাকে স্থানান্তরিত করিলেন, তখন সেলিমকে উহা নীরবে সহ্য করিতে হইয়াছিল। কারণ আকবরের রাজত্বকালে তাঁহার পুত্রেরও অপরাধ করিয়া বিনা দণ্ডে অব্যাহতি পাইবার সম্ভাবনা ছিল না। মোগল বিদ্বেষী বঙ্কিমচন্দ্রের নিকট হইতে এতবড় প্রশংসাপত্র পাওয়া আকবর বাদশাহের পক্ষে বড় কম কথা নহে। এই বঙ্কিমচন্দ্রই আকবর শাহের "খোসরোজ" এ লিখিয়াছেন যে চিতোরের রাজকুমারীকে নির্জ্জনে স্বগৃহে বন্দিনী করিয়া আকবর তাঁহার নিকটে গিয়া বলিতেছেন,—

"কত শত নারী রাজার ঝিয়ারী
মম আজ্ঞাকারী চরণ সেবে।
তোমাসম রূপে নহে কোন জন
তব আজ্ঞাকারী আমি হে এবে।"

এই বঙ্কিমচন্দ্রই "রাজসিংহ" গ্রন্থে নির্ম্মলকুমারীর মুখ দিয়া বলাইয়াছেন, "আকবর বাদশাহের নামে রাজপুতনী ঝাড়ু মারে।" এই বঙ্কিমচন্দ্রই আকবরের পূর্ব্বোলিখিত অতবড় প্রশংসা করিতে কিছু মাত্র কুণ্ঠা বোধ করিলেন না। "কপালকুণ্ডলা"য় আমরা আর এক জায়গায় দেখিতে পাই যে, সে সময়ের অন্যতম প্রধান কূট রাজনীতিজ্ঞ খাঁ আজিম মতিবিবিকে লিখিতেছেন "মৃত্যুকালেও আকবর বাদশাহ বুদ্ধি বলে আমাদিগকে পরাজিত করিয়া গিয়াছেন।" ইহাও বড় অল্প কথা নহে।

"কপালকুণ্ডলা"য় জাহাঙ্গীরএর (কুমার সেলীম) চরিত্রও বর্ণিত আছে। ঐ চরিত্র সম্পূর্ণ রূপে ইতিহাসের অনুরূপই বর্ণিত হইয়াছে। একবিন্দু কোথাও অতিরঞ্জিত নহে। ইতিহাসে জাহাঙ্গীর আত্মসুখপরায়ণ, ভোগবিলাসরত, কথঞ্চিৎ নিষ্ঠুর সম্রাট। "কপালকুণ্ডলা"র জাহাঙ্গীরও ঠিক তাহাই।

এইবার আমরা "মৃণালিনী" গ্রন্থে বর্ণিত মুসলমান চরিত্রের আলোচনা করিব। "মৃণালিনী"র মুসলমানেরা বাঙ্গালী মুসলমানদিগের পূর্ব্বপুরুষ। কিন্তু উহা হইলেও তখনও উহারা অবাঙ্গালী। সেকালের দিনে অবাঙ্গালীর বিজেতার পক্ষে বিজিত বাঙ্গালীর প্রতি যেরূপ ব্যবহার করা সম্ভব,

"মৃণালিনী"তে বঙ্কিমচন্দ্র পাঠানদিগের বাঙ্গালীর প্রতি ঠিক সেইরূপ আচরণই দেখাইয়া গিয়াছেন। "মৃণালিনী"র "যবন-বিপ্লব" বা নগর দাহ পরিচ্ছেদ কিছুমাত্র অতিরঞ্জিত নহে। বিংশ শতাব্দীর মধ্য ভাগেও যদি নৈশ বিমান আক্রমনে গৃহে গৃহে অগ্নি সংযোগ করা যাইতে পারে ও সহস্র সহস্র আবাল-বৃদ্ধবণিতার অকাতরে প্রাণ সংহার করা যাইতে পারে তবে ত্রয়োদশ শতাব্দীতে বক্তিয়ারখিলিজি বিজিত শত্রু পুরীতে কেন আগুণ ধরাইয়া দিবেন না, কেনই বা পরাভূত শত্রুকে ভয় দেখাইয়া অধিকতর বশীভূত করিবার জন্য জনকয়েক নিরীহ লোকের প্রাণ বধ করিবেন না? বরং এই প্রসঙ্গে কবি বক্তিয়ারখিলিজির ধৈর্য্যেরও বিবেচনার যথেষ্ট পরিচয় দিয়াছেন। এই বিপ্লব মাত্র এক রাত্রি স্থায়ী হইয়াছিল। তাহার পর দিনই নগর অনেকটা শান্ত ভাব ধারণ করিল। একথা আমরা পশুপতি পুরোহিতের মুখেই শুনিতে পাই। আর উহা না হইলে মনোরমার চিতারোহনের আয়োজনও সম্ভব হইত না, হেমচন্দ্রকে শ্মশানভূমিতে আনয়নও করা যাইতে পারিত না।

পশুপতির সহিত ব্যবহারেও আমরা খিলিজির রাজ-নৈতিক বিবেচনা শক্তি ও ধৈর্য্যের পরিচয় পাই। পশুপতিই তাঁহার প্রধান শত্রু, একথা খিলিজি বিলক্ষণ জানিতেন। এই শত্রু তাঁহার প্রলোভনে পতিত হইয়া তাঁহার হস্তগত হইয়াছিল। কিন্তু পরে নিজের ভ্রম বুঝিতে পারিয়া তিনি খিলিজির বিরুদ্ধ পন্থী হইলেন। এরূপ ক্ষেত্রে পশুপতির জীবন দণ্ডই সাধারণ ব্যবস্থা। কিন্তু খিলিজি তাহা করিলেন না। তিনি ভবিষ্যতের দিকে চাহিয়া পশুপতিকে কারারুদ্ধ করিয়া রাখিলেন।

গৌড়ে খিলিজি যুদ্ধ করেন নাই। কিন্তু তিনি যে একজন অসম সাহসী মহাবীর, একথা গ্রন্থকার স্পষ্টাক্ষরেই আমাদের বুঝাইয়া দিয়াছেন। একজন বিশ্বাসঘাতকের উপর আস্থা স্থাপন করিয়া তিনি মাত্র সপ্তদশ অশ্বারোহীর সঙ্গে নবদ্বীপে প্রবেশ করিয়াছিলেন। ইহাদের সকলের আগে তিনিই ছিলেন। কবি লিখিয়াছেন, "সর্ব্বাগ্রে একজন কুরূপ যবন।" এই কুরূপ যবন কে তাহা সকলেই বুঝিতে পারিতেছেন। "সবে মাত্র সতের জন সঙ্গী লইয়া অতবড় শত্রুপুরীতে প্রবেশ করা যে কতদূর দুঃসাহসের পরিচয় তাহা ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না। যে ব্যক্তি স্বীয় প্রভুর সহিত বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছে সে যে অপরের সহিত বিশ্বাসঘাতকতা করিবে না তাহার স্থিরতা কি? তাই বলিতে হয় যে, বক্তিয়ার খিলিজি এক রকম জানিয়া শুনিয়াই মৃত্যুর মুখে প্রবেশ করিয়াছিলেন। বিনা যুদ্ধে তিনি গৌড় জয় করিবেন। হয় ভালই; না হয় তিনি মরিবেন, পরে তাঁহার অনুচরেরা যথা নিয়মে কার্য্য সমাধা করিবে। গৌড়েশ্বরের প্রাসাদের দ্বারে উপস্থিত হইয়া—খিলিজিই প্রথমে অদম্য উৎসাহে দ্বারপালদিগকে আক্রমণ করিয়া তাহাদিগকে করায়ত্ত করেন। কি অদ্ভুত সাহস ও পরাক্রম। কে জানিত যে এই প্রাসাদে সহস্র সৈনিক লুক্কায়িত নাই।

"মৃণালিনী"তে আমরা আর একজন উল্লেখযোগ্য মুসলমান চরিত্র দেখিতে পাই। উহা মহম্মদআলির। মহম্মদআলী বীর, রাজনীতিজ্ঞ ও আত্মমর্য্যাদা সম্পন্ন। তিনি দুইজন অনুচর সঙ্গে লইয়া সারারাত্রি নবদ্বীপে ঘুরিয়া বেড়াইয়াছিলেন। এমন কি, সে সময়ের প্রসিদ্ধ বীর মগধের যুবরাজের বাসভবন পর্য্যন্ত যাইতে কুণ্ঠিত হন নাই, এবং ক্ষিপ্রকারিতার বলে যুবরাজের অব্যর্থ লক্ষকেও ব্যর্থ করিয়া চলিয়া আসিয়াছিলেন। পশুপতির সহিত কথোপ-কথনে দেখিতে পাই মহম্মদআলী আত্মমর্য্যাদা সম্পন্ন ও রাজনীতিজ্ঞ। পশুপতি যখন তাঁহাকে গৌড় ও মগধ উভয় স্থলেই এক সময়ে যুদ্ধের সম্ভাবনা জানাইয়া ভয় দেখাইলেন, তখন মহম্মদ আলী দৃঢ় কণ্ঠে উত্তর দিয়াছিলেন, "পিঁপড়া ও মশা একসঙ্গে কামড়াইলে হাতী মরে না।" যখন পশুপতি হস্তী কর্ত্তৃক তাঁহার প্রভু বক্তিয়ারখিলিজির আক্রমনের কথা উল্লেখ করিয়া ব্যঙ্গ করেন ও জিজ্ঞাসা করেন যে, পশুযুদ্ধে খিলিজির কিরূপ আনন্দ। ইহার উত্তরে মহম্মদ আলী বলেন, "গৌড় যুদ্ধে আসা পশু যুদ্ধেই আসা"। কিন্তু এই সকল কথাবার্ত্তা বলিয়াও তাঁহার কিছুমাত্র ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটে নাই। এই সকলের পরেও তিনি বেশ ধীর ভাবে পশুপতির সমস্ত কথা শুনেন ও বিশেষ রাজনীতিজ্ঞের ন্যায় ঐ সকল সম্বন্ধে সম্ভব মত নিজের মতামত ব্যক্ত করিয়া চলিয়া আসেন।

বক্তিয়ার খিলিজি পশুপতির প্রস্তাব স্বীকার করিয়া পরে

ছল ক্রমে উহা ভঙ্গ করেন। যুদ্ধনীতির দিক দিয়া ইহাকে অধিক নিন্দা করা যায় না। সে সময়ে বক্তিয়ার খিলিজির চারিদিকে শত্রু। বিশেষতঃ নবজিত মগধে ঘোরতর বিদ্রোহের সম্ভাবনা। এরূপ ক্ষেত্রে যতদূর সম্ভব অল্প সংখ্যক সৈন্য ও যুদ্ধসম্ভার নষ্ট করিয়া কার্য্যোদ্ধার করিতে প্রত্যেক বুদ্ধিমান ব্যক্তিই চেষ্টা করিয়া থাকে। খিলিজিও তাহাই করিয়াছিলেন। সুতরাং পশুপতির সহিত যদি তিনি কিছু কপটতা করিয়া থাকেন তাহা হইলে তাহার জন্য তাঁহাকে বিশেষ দোষী করা যায় না। আমরা পড়িয়াছি ব্যানাকবার্ণ (Bannuckburn) যুদ্ধে স্কটল্যাণ্ডের উদ্ধার কর্ত্তা রাজা রবার্ট ব্রুস (Robert Bruce) মাটিতে গোপনে গর্ত্ত খুঁড়িয়া ইংরাজের অজেয় অশ্বারোহী সৈন্যদলকে প্রলোভিত করিয়া সেইখানে আনয়ন করেন এবং সেই স্থলে তাহাদিগকে জীবন্ত সমাধি দেন। ইহার জন্য কি আমরা রবার্ট ব্রুসকে গালি দিই ? না, উহার পরিবর্ত্তে তাঁহার বুদ্ধিমত্তার জন্য শতমুখে প্রশংসা করি ? সেইরূপ বক্তিয়ার খিলিজিরও নিন্দা না করিয়া প্রশংসা করিলে বোধ হয় যুদ্ধ নীতির বিশেষ অমর্য্যাদা হয় না। কিন্তু মহম্মদআলী এ বিষয়ে বক্তিয়ার খিলিজিকে সমর্থন করেন নাই। তিনি যুদ্ধ ব্যাপারেও কোনরূপ কপটতা করিতে প্রস্তুত ছিলেন না। কবি বলিয়াছেন যে, বক্তিয়ার খিলিজি পশুপতিকে কারারুদ্ধ করিলে মহম্মদআলী বিশেষ দুঃখিত হয়েন এবং খিলিজির অমতে পশুপতির মুক্তির ব্যবস্থা করেন। নীতি ও শৃঙ্খলার দিক দিয়া তাঁহার এই কার্য্যের সম্পূর্ণ অনুমোদন করিতে পারা যায় না বটে, তথাপি মহম্মদআলী যে আদর্শ বীর পুরুষ ও কর্ম্মঠ ব্যক্তি এ কথা অবশ্য স্বীকার্য্য।

দেখা গেল, বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম তিন খানি গ্রন্থে মুসলমানের নিন্দাজনক কিছুই নাই, বরং প্রশংসার অনেক কিছুই আছে। আয়েষার ন্যায় রমণীরত্ন, ওসমান, বক্তিয়ার খিলিজি, মহম্মদআলী প্রভৃতি পুরুষ শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র দেখাইয়াছেন যে, ইস্‌লামের প্রভাবে মনুষ্যত্ব, বুদ্ধিমত্তা, দয়া, বীরত্ব প্রভৃতি সদ্‌গুণ বিন্দু মাত্র ম্লান না হইয়া আরও প্রোজ্জ্বল হইয়া উঠে। বক্তিয়ার খিলিজির বিরাট বাক্য, "যাহাকে সনাতন ধর্ম্ম বলেন উহা ভূতের পূজা মাত্র ; মহম্মদ ভজিয়া ইহকাল ও পরকালের মঙ্গল সাধন করুন।" হিন্দুর কাণে কিছু কটু শুনায় বটে, কিন্তু এই কথা নিরাকার একেশ্বর বাদীগনের ধমনীতে ধমনীতে শোনিত স্রোতঃ নিঃসন্দেহ দ্বিগুণিত করে। "মৃনালিণী"কে বাঙ্গালী মুসলমানদিগের জাতীয় মহাকাব্য বলিলে অত্যুক্তি হয় না।

বাঙ্গলার পাঠান বিজেতাগণকে বঙ্কিমচন্দ্র সিংহের সহিত তুলনা করিয়াছেন, ও বাঙ্গালী হিন্দুদের মনুষ্য বলিয়াছেন, লিখিয়াছেন, "সিংহের হস্তে মনুষ্য পরাজিত। চিত্রফলক সিংহের হস্তে, যদি ঐ ফলক মনুষ্যের হস্তে থাকিত তাহা হইলে হয় ত চিত্র অন্যরূপ হইত।" পাঠান ঐতিহাসিক মীনহাজউদ্দীন লিখিয়া গিয়াছেন যে, মাত্র সতের জন অশ্বারোহী গৌড়দেশ জয় করিয়াছিল। বঙ্কিমচন্দ্র বাঙ্গলার জাতীয় মহাকবি। তাঁহার নিকট বাঙ্গালী মুসলমান ও বাঙ্গালী হিন্দু উভয়ই সমতুল্য। তাই মীনহাজউদ্দীনের ঐ কথার প্রতিবাদ কল্পে তিনি পূর্ব্বোক্ত উক্তির অবতারণা করিয়াছেন। বাঙ্গালী মুসলমান ও হিন্দুর যথাক্রমে সিংহ ও মনুষ্যের সহিত উপমা যথার্থই অতুলনীয়, বোধ হয় এক মাত্র বঙ্কিমচন্দ্রের লেখনীতেই উহা সম্ভব।

ক্রমশঃ



ধর্ম্ম ও প্রেম

—শ্রীমেঘেন্দ্রলাল রায়

"যেথা ধর্ম্ম সেথা প্রেম
যেথা পাপ প্রেম নাহি রহে।"
—দ্বিজেন্দ্রলাল।

মহীপৎ স্থির করিয়াছে পর্ব্বতের উচ্চ চূড়া হইতে অবতরণ করিয়া মন্দিরের সন্নিকটস্থ বিসর্পী পথ দিয়া অবতরণ করিবে। যখন সে মন্দিরের পার্শ্বস্থ গিরিপথ অতিক্রম করিয়া দেব মন্দিরের প্রায় পশ্চাতে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে, হঠাৎ মন্দিরের উদ্যানের দ্বার উন্মুক্ত হইল। সে দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিতেই সে লক্ষ্য করিল এক তরুণী সুন্দরী, যৌবনের সৌন্দর্য্য যেন তাহার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে উছলিয়া পড়িতেছে।

হঠাৎ কোন দেবীকে স্বর্গ হইতে মর্ত্তভূমিতে অবতীর্ণ হইতে দেখিলেও মহীপৎ এত বিস্মিত হইত না। সর্ব্ব প্রথমে তাহার ইচ্ছা হইল যে, সে সুন্দরীর নিকটে গমন করে। কিন্তু সে তাহার প্রবৃত্তিকে দমন করিয়া মন্দিরের নিকটে শিলাখণ্ডের পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইয়া অনিমেষ নয়নে রমণীকে লক্ষ্য করিতেছিল।

রমণী তাহার অলৌকিক সৌন্দর্য্যের দীপ্তিতে পথ আলোকিত করিয়া মন্দিরের সম্মুখে প্রবেশদ্বার অভিমুখে অগ্রসর হইল। মহীপৎ আর স্থির থাকিতে অসমর্থ হইয়া অলক্ষ্যে যন্ত্রবৎ সুন্দরীকে অনুসরণ করিল।

মহীপৎ স্বগত এই উক্তি করিল, "আবার বিমলাকে অনুসরণ ক'রলি? আমি তো তাকে অনুসরণ ক'রবার অধিকারী নই—।" এইরূপ চিন্তায় মগ্ন থাকায় মন্থর গমনে সে মন্দিরাভিমুখী রমণীর সান্নিধ্যে উপস্থিত হইতে সক্ষম হইল না। সে পুনর্ব্বার মনে মনে প্রশ্ন করিল, "অধিকারী না হ'তে পারি, কিন্তু দেখা ক'রতে দোষ কি? আর একবার —এই শেষ বার দেখা ক'রে যাই।" এই মুহূর্ত্তে সুন্দরী মন্দিরের মধ্যে প্রবেশ করিল। মহীপৎ দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "যাক্, শেষ হ'য়ে গিয়েছে, এখন নিজের পথে চলি, দেখি অশ্ব কোথায় গেল?" কিন্তু তাহার উক্তির সহিত কার্য্যের কোন সামঞ্জস্য লক্ষিত হইল না, তাহার হৃদয় এ-স্থান পরিত্যাগ করিতে সম্মত নহে। মন্দির হইতে যে পথ নদী তটে নামিয়া গিয়াছে, সেই পথে এক প্রস্তরখণ্ডে মহীপৎ প্রায় অর্দ্ধঘণ্টা নীরবে বসিয়া রহিল।

তাহার হস্তে অকস্মাৎ এক ফোঁটা জল পড়িল। সে স্বপ্নোত্থিতের ন্যায় আকাশের দিকে নিরীক্ষণ করিয়া লক্ষ্য করিল যেন আকাশ ঘন হরিদ্রাবর্ণ মেঘে আচ্ছন্ন এবং সেই মেঘের ছায়ায় পর্ব্বত প্রান্তর অন্ধকার মিশ্রিত শুভ্রালোকে আবৃত। বাতাস অসম্ভব স্থির, রুদ্ধশ্বাসে সে যেন ঝটিকার অপেক্ষা করিতেছে। মুহূর্ত্তের মধ্যে প্রবল ঝঞ্ঝা আসিয়া তাহাকে আক্রমণ করিল, সঙ্গে সঙ্গে যেন ঘূর্ণায়মান বালুস্তম্ভ আকাশে বাতাসে ব্যাপ্ত হইল, ঘোর মসীময় গহ্বর যেন এই ঘূর্ণী বালুর মধ্যে লক্ষিত হইল। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রস্তরখণ্ড যেন বৃষ্টিধারার ন্যায় বর্ষিত হইতে আরম্ভ করিল। এই ভীষণ ঝড়ের মধ্যে মহীপৎ আশ্রয়ের জন্য ছুটিল। কিন্তু দূরেই একটি পুরাতন পরিত্যক্ত দুর্গ লক্ষ্য করিয়া ত্বরায় সেই দুর্গের জীর্ণ গৃহে প্রবেশ করিল। কিছুক্ষণ পরে ঝড়ের বেগ প্রশমিত হইলেও বৃষ্টিধারা যেন জলপ্লাবনের ন্যায় উপস্থিত হইল। বারি পাতের মধ্যে যে এত ভীষণতা বর্ত্তমান তাহা ইতিপূর্ব্বে মহীপৎ কখনও লক্ষ্য করে নাই। পর্ব্বতের পার্শ্বে যে সুন্দর কবিত্বময় পল্লী অবস্থিত তাহা এই জলপ্লাবনে যেন সত্যই নিশ্চিহ্ন হইয়া যাইবে, এইরূপ আশঙ্কায় মহীপতের হৃদয় উদ্বেলিত হইয়া উঠিল।

মহীপৎ বসিয়া ভাবিতেছে,—"অদৃষ্ট যেন অভিশাপ নিয়ে আমার অনুসরণ ক'রছে। বিমলার অসামান্য রূপে মুগ্ধ হ'য়ে যে দিন প্রথম আসি, সে দিনও এই ঝড় এসেছিল, আজ আবার শেষ সাক্ষাৎ ক'রে যাব ভেবেছিলাম, আজও সেই ঝড়।"

তাহার মনে হইল, "হে পরমেশ্বর, এ জলপ্লাবন তোমার দেশে ছিল, সমুদ্রের অন্তঃস্থলও তোমায় নিরীক্ষণ ক'রেছিল, মেঘ তোমারই আজ্ঞায় বজ্রকে আহ্বান ক'রেছিল, তোমার পথ এ পর্ব্বতেও আছে আমার হৃদয়েও আছে—কিন্তু তোমার পদধ্বনি শুনি না কেন প্রভু? কোথায় তুমি?"

দিবাকর অস্তোন্মুখ, সান্ধ্য-অন্ধকার ক্রমশঃ ঘণীভূত হইয়া আসিতেছে। এই ঘণায়মান অন্ধকারের মধ্যে প্রকৃতির মূর্ত্তি যেন ভীষণ ভয়াবহ দানবীর রূপ লইয়া মহীপতের সম্মুখে উপস্থিত হইল। মন্দিরের পশ্চিম দিকে এক প্রকোষ্ঠ হইতে আলোর রেখা বিচ্ছুরিত হইতে দেখিয়া সে চিন্তা করিল যে, দুই বৃদ্ধ বিমলার স্বর্গীয় সঙ্গীত উপভোগ করিতেছেন—কত সুখী তাঁহারা।

সময় চলিয়া যাইতেছে, যাহা পর্ব্বতের বিসর্পী পথ ছিল সেই পথ এখন ক্ষুদ্র জলপ্রপাতের আকার ধারণ করিয়াছে। বৃষ্টি ধারা যেন সহস্র চাবুক লইয়া নির্ম্মমভাবে দুর্গের প্রাকারকে প্রহার করিতেছে। মহীপৎ ভয়ার্ত্ত হৃদয়ে বিষণ্ণ-চিত্তে ঘোর অন্ধকারের মধ্যে দুর্গের অভ্যন্তরে বসিয়াছিল। প্রায় এক ঘণ্টা পরে বৃষ্টির ক্রোধ প্রশমিত হইল, জল-প্রপাতের শব্দও ক্ষীণ হইয়া আসিল, মেঘরাশি ধীরে ধীরে অদৃশ্য হইল, পর্ব্বতের পার্শ্বদেশ হইতে কৌমুদী হাসিল। মহীপতের মনে হইল প্রকৃতি দেবী মাঝে মাঝে মানবের শক্তিকে লইয়া বিদ্রূপ করেন। কিছুক্ষণ পূর্ব্বে প্রকৃতির কি প্রলয়ঙ্করী মূর্ত্তি দেখিয়া তাহার হৃদয় ভয়ে বিকম্পিত হইয়াছিল; আবার পরক্ষণে প্রকৃতি হাস্যময়ী, চন্দ্রমার স্নিগ্ধ আলোকে যেন তাহার হৃদয়ে আশার সঞ্চার হইল। কিন্তু কি করিয়া সে এ পর্ব্বত হইতে এখন অবতরণ করিবে? সে কি গ্রামের পথ খুঁজিয়া পাইবে? গ্রামের পথ মাঠ সবই হয় তো জলে জলময় হইয়াছে, তাহার নিরুদ্দিষ্ট ঘোটকেরই বা কোথায় সে সন্ধান পাইবে, সাঁকো হয় তো ভগ্ন হইয়াছে।

এই প্রকার নানা চিন্তায় যখন তাহার হৃদয় উদ্বেলিত এই সময়ে মন্দিরের উদ্যানের অভ্যন্তরে সে যেন একটা কলরব শুনিল—অনেক লোক সমবেত হইয়া কি বলিতেছে। মহীপৎ লক্ষ্য করিল, সাত আট জন লোক দ্রুতপদবিক্ষেপে উদ্যানের মধ্যে প্রবেশ করিল, সেও অতি দ্রুতপদে অগ্রসর হইল উদ্যানের দিকে—কিছুদূর অগ্রসর হইতেই সে বিমলার ভয়ার্ত্ত কণ্ঠস্বর শুনিল। মহীপৎ উদ্যানের দ্বার প্রান্তে এক ব্যক্তিকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "ব্যাপার কি?" সেই ব্যক্তি উত্তর দিল, "গোপাল মহারাজ ও কৃষ্ণ বাবাজী মহা-রাজার সঙ্গে দেখা কর্ত্তে রাজধানীতে গিয়েছেন, নদীর সাঁকো জল ও ঝড়ে ভেঙ্গে গিয়েছে, তাই মা বড় ব্যস্ত হ'য়েছেন—যদি মহারাজা গাড়ী ক'রে পাঠিয়ে থাকেন তা হ'লে গাড়ী শুদ্ধই বিপদে প'ড়তে পারেন।"

মহীপৎ উদ্যানের দ্বার উন্মুক্ত দেখিয়া তাহার মধ্যে প্রবেশ করিল, প্রথমেই সে বিমলাকে উন্মত্তের ন্যায় চীৎকার করিতে দেখিল। সে চীৎকার করিয়া বলিতেছে "কি হবে, কি সর্ব্বনাশ হলো, পুল ভেঙ্গে গিয়েছে রাধাকৃষ্ণ বাবাজী আসবেন কি করে?" এই সময়ে বিমলা মহীপৎকে দেখিয়া যেন আর্ত্তনাদ করিয়া বলিল, "তুমি এসেছো আবার, এই ভয়ানক রাত্রিতে আবার এসেছো তুমি, কি চাও," এই কথা বলিয়া বিমলা তাহার প্রকোষ্ঠের দিকে পলায়ন করিল। মহীপৎ ও সঙ্গে সঙ্গে তাহাকে অনুসরণ করিল।

বিমলা ফিরিয়া কহিল, "হে ভগবান, হে রাধাশ্যাম, কি করলে" সে মহীপৎকে বলিল, "জান কি হয়েছে; বৃষ্টি ও ঝড়ে নদীর সাঁকো ভেঙ্গে গিয়েছে, রাধাকৃষ্ণ বাবাজী হয় তো মহারাজার গাড়ীতে বেরিয়েছেন—কি হবে, কি হবে, না, না আমি সেই সাঁকোর অপর পারে যাবো"

মহীপৎ বলিল, "তা হলে একেবারেই অপর পারে যেতে হবে।"

এই সময়ে দুই ব্যক্তি প্রবেশ করিলে বিমলা বলিল, "আমি সাঁকোর অপর পারে যাবো, বাবা, বাবাজীর কি হবে—"

এক ব্যক্তি বলিল, "আপনি সেখানে যেতে পার্ব্বেন না, অসম্ভব।"

আর এক ব্যক্তি বলিল, "ও সাঁকো দিয়ে তো আর পার হওয়া যাবে না, এক গাছ ভেঙ্গে পড়ে যদি সাঁকো তৈরী হয়ে থাকে তা হলেও"—এই প্রকার কথোপকথনের মধ্যে হঠাৎ রব উঠিল "রামদাস ফিরে এসেছে।"

বিমলা চীৎকার করিয়া ডাকিল, "রামদাস, রামদাস।" এক শীর্ণকায় কৃষ্ণবর্ণ যুবক সিক্ত বসনে সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল।

বিমলা জিজ্ঞাসা করিল, "কৈ আমার বাবা, কৃষ্ণ বাবাজী কোথায়, তাঁরা কিছু সংবাদ দিয়েছেন।"

যুবক উত্তর করিল, হাঁ, মা তাঁহারা উভয়েই সাঁকোর কাছে মহারাজার ধর্ম্মশালাতে আছেন, তাঁরা বলেছেন কাল

সকালে নৌকাতে নদী পার হয়ে আসবেন, তোমাকে ভাবতে মানা করে দিয়েছেন।"

বিমলা শান্ত হইয়া বলিল, "আঃ বাঁচলাম; রাধাশ্যাম তোমাকে কোটি কোটি প্রণাম" এই সময়ে আর আর সকলে প্রস্থান করিল।

বিমলা মহীপতের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিল, মহীপৎ বলিল, "তবে বিদায় দাও বিমলা। আমার আর এখানে কোন কাজ নেই।" বিমলা কি যেন বলিতে যাইতেছিল অথচ তাহা বলিতে পারিল না। তাহার মুখমণ্ডলের রক্তিম আভা লক্ষ্য করিলে সহজেই উপলব্ধি করা যায় যে মস্তিষ্কে উষ্ণ রক্ত স্রোত বহিতেছিল। সে নিজেকে যথাসাধ্য সংযত করিয়া বলিল, "বিদায়, আমি ভেবেছিলাম যে তুমি ভারতবর্ষ ছেড়ে সিংহলে চলে গিয়েছো—তবে যাও নি? আবার কি নৌকা ডুবেছে? কি আশ্চর্য্য! যে দিন তুমি আস তোমার সঙ্গে প্রলয়কে সঙ্গে করে আন—তুমি আবার কেন এসেছো মহীপৎ; কি তোমার উদ্দেশ্য?" বিমলার কণ্ঠস্বরে ছিল চিন্তা ও কৌতুহলের রেষ, মুখে ছিল ভালবাসার রক্তিম আভা যাহা এখনও সম্পুর্ন নির্ব্বাপিত হয় নাই।

মহীপৎ হৃদয়ের আবেগে বলিল,—"বিমলা, তুমি আর একবার এক মুহূর্ত্তের জন্যও তোমার করস্পর্শের অধিকার দেবে না?"

বিমলা জিজ্ঞাসা করিল, "কিন্তু আমি জানতে চাই, আজও তুমি এখানে কেন? সিংহলে কেন যাও নি? আমি কখনও স্বপ্নেও কল্পনা করিনি যে তোমাকে আবার দেখতে পাবো, কিন্তু তুমি আবার কেন ফিরে এলে?—কিন্তু কেন—কেন—কেন, আমি এসব কথা জানতে চাচ্ছি—আমার এত সংবাদের কি প্রয়োজন?—না না কিছু জানতে চাইনে আমি।"

মহীপৎ বলিল, "ভগবানের ইচ্ছা যে আজ রাত্রেই তুমি আমাকে দেখবে—দাও তোমার হাত বাড়িয়ে দাও।"

বিমলা হস্ত প্রসারণ করিয়া বলিল, "কিন্তু এবার যেন অঙ্গীকার ভঙ্গ না হয়—এই শেষ বিদায়।"

মহীপৎ বিমলার হস্ত গ্রহণ করিয়া কহিল, "শেষ বিদায়, সত্য।"

বিমলা কহিল, "সত্য?"

মহীপৎ উত্তর দিল, "নিশ্চয়ই।"

বিমলা জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার ঘোড়া কোথায়?"

মহীপৎ বলিল, "ঘোড়া খুঁজে পাচ্ছিলাম না বলেই তো পাহাড়ের ধারে এসেছিলাম ঘোড়া খুঁজতে।"

বিমলা বলিল, "তবে উপায়?"

মহীপৎ ম্লান হাস্যে উত্তর দিল, "হেঁটেই যাবো।"

বিমলা বলিল, "কিন্তু গ্রামে ফিরে যাবে কি করে, সাঁকো যে ভেঙ্গে গিয়েছে।"

মহীপৎ বলিল, "এখানে কোন পান্থশালা নেই?"

বিমলা বলিল, "আছে খুব নিকটেই।"

মহীপৎ বলিল, "তবে সেই স্থানেই যাই।" মহীপৎ বিমলার হস্ত ছাড়িয়া দিল।

মহীপৎ এত কথা বলিতেছে বটে কিন্তু সে এক পদও নড়ে নাই। সে জিজ্ঞাসা করিল,—"তুমি কি সত্যই আমায় ছেড়ে যাচ্ছ?"

বিমলাও নিস্পন্দ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। বিমলা দুঃখিত হইয়া বলিল, "আমি যাচ্ছি—আমায় যেতেই হবে, তোমার সঙ্গে এই হঠাৎ সাক্ষাৎ, একেবারে হঠাৎ—এর মধ্যে কোন অশুভের ইঙ্গিত আছে। যাও মহীপৎ শীঘ্র এ স্থান পরিত্যাগ ক'রো—শীঘ্র যাও বলছি।"

মহীপৎ বলিল, "এই দুর্য্যোগের মধ্যে তুমি আমাকে এই ভাবে তাড়িয়ে দিচ্ছো, কি অভদ্র তুমি? না, আমি যাবো না।" সে গৃহের দিকে অগ্রসর হইল।

বিমলা বলিল, "আমি তোমাকে এ স্থান পরিত্যাগ কর্ত্তে বলছি কারণ এছাড়া আর অন্য কোন পথ নাই, ভগবান এই ত্যাগ স্বীকার করতে আমাকে আজ্ঞা দিয়াছেন।" ভাবের প্রাবল্যে তাহার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিল, সে আর কথা বলিতে অক্ষম। মহীপৎ বলিল, "তুমি আমায় ভালবাস না—কেবল আমায় নিয়ে ঠাট্টা করো, না? এক বিদেশী, সমুদ্র যাকে তীরে নিক্ষেপ করেছে।—সেই সহায়হীন সম্পদহীন যুবক তোমার বিদ্রূপেরই পাত্র বটে। সে ছেড়ে যেতে চায় কিন্তু ঘটনার আবর্ত্তনে, অদৃষ্টের চক্রে তোমারই কাছে তাকে ফিরে আসতে হয়।"

তখন বিমলা অনুনয় করিয়া বলিল, "তুমি বড় অবুঝ হয়েছো মহীপৎ, গতবারে তুমি তো এরকম ছিলে না। যদি

তুমি আমার শ্রদ্ধা ক'রো ও আমার জন্ম যদি তোমার কিছু মাত্র যায় আসে, তোমাকে হাত জোড় ক'রে ব'লছি, এস্থান পরিত্যাগ ক'রো।" তাহার কণ্ঠস্বর কাঁপিতে লাগিল।

মহীপৎ বলিল, "তোমাকে আর কখনও দেখবো না, তা কি করে সম্ভব? যদি আমি দূরে চলে যাই ভগবান আমাকে আবার টেনে আনবেন তোমার কাছে। তোমার কাছে আসবো না এ কখন হতে পারে না। তার চেয়ে এই চোখ দুটো উপড়ে ফেলবো, তোমার আজ্ঞা শোনবার আগে।"

বিমলা বলিল, "তুমি আমাকে অতি সুন্দর ভাবে দেখবে—স্মৃতির মধ্যে, তার কাছে চোখের দেখা তুচ্ছ। তুমিই আমায় একদিন ব'লেছিলে মনে নেই যে এ ভালবাসার জন্ম দু'জনকেই স্বার্থ ত্যাগ ক'রতে হবে—সে কথা আজ কেন বিস্মিত হচ্ছ মহীপৎ—কেন, কেন আজ তুমি আমার নেত্র পথে উদিত হয়ে আমাকে টানছো তোমার কাছে?"

মহীপৎ বলিল, "কারণ ঈশ্বর নিজে টেনে আনছেন আমাকে তোমার কাছে এবং যেন তিনি আদেশ ক'রছেন, "যাও নিয়ে এসো মন্দির দ্বার থেকে, ছিনিয়ে নিয়ে এসো ঐ সুন্দরীকে—সে তোমার, আর কারো নয় এ জগতে।"

বিমলা বলিল, "ঈশ্বর! ঈশ্বর! কে তোমার ঈশ্বর—কে তোমার ঈশ্বর!"

মহীপৎ বলিল, "যিনি তোমার ঈশ্বর তিনি আমারও ঈশ্বর—জগদীশ্বর একজনই আছেন।"

বিমলার হৃদয়ের মধ্যে প্রবল ঝড় বহিতেছিল, ধমনীতে ক্রমশঃই প্রবলতর উষ্ণ রক্তস্রোত বহিতেছিল। সে বলিল, "মহীপৎ তুমি আমার কী বন্ধু নও? তুমি যদি চিরদিন আমার হৃদয়ের পূজা পেতে চাও, এখনই চ'লে যাও। আমি যে রাধাশ্যামের সেবিকা,—মহীপৎ।"

"আমি সে কথা শুনতে চাই না, শুনতে চাই না।" মহীপৎ ঐ কথা এতই উচ্চকণ্ঠে বলিল যে বিমলা ভীত হইয়াছে।

বিমলা প্রায় বিকারের ঘোরে যেন বলিল, "মহীপৎ যদি তুমি আমার ভালবাসার কিছু মূল্য দাও, আমি স্বীকার কচ্ছি অকপটে তোমার কাছে, তোমাকে আমি নিজের প্রাণের চেয়ে ভালবাসি। যাও যাও আমায় শান্তি দাও মহীপৎ। তুমি আমি দূরেই থাকি—দূর থেকেই আমাদের ভালবাসা আরো নিবিড় হবে।"

মহীপৎ বলিল, "মিথ্যা সব মিথ্যা।"

বিমলা অশ্রুসিক্ত নয়নে বলিল. "মিথ্যা সব মিথ্যা? তুমি এত নীচ? না না তোমার প্রবৃত্তি এত নীচ নয়, না. না মহীপৎ তোমার মুখে ঐ কথা শোভা পায় না, আমি যা তোমায় ভেবেছি তা তুমি নও, এ কখন ও হতে পারে?"

মহীপৎ বলিল, আমি যা—আমি তাই, আমি আর কিছু হ'তে পারি না।"

বিমলা বলিল, "তা হ'লে আমি তোমায় ঘৃণা করি।"

মহীপৎ বলিল, "ঘৃণা ক'রো হতে পারে, কিন্তু আমি তোমাকে চাই।"

বিমলা উত্তেজিত কণ্ঠে বলিল, "তা হ'লে এই মুহূর্ত্তে আমাদের সম্পর্ক ছিন্ন হোক্, তুমি আমাকে পরিত্যাগ করে চলে যাও।"

মহীপৎ উত্তর দিল, "আমি তো গিয়েছিলাম। কিন্তু কেন অশ্ব হারালাম, কেন ঝড় এলো, কেন বৃষ্টি হোল, কেন তোমার দেখা পেলাম? ঘটনার বৈগুণ্যে কেন আবার এই মন্দিরে এলাম—এই 'কেন'র কে উত্তর দেবে? ভগবান বা অদৃষ্ট আমায় এখানে টেনে এনেছেন।"

বিমলা বলিল "তোমার সত্যই বিশ্বাস মহীপৎ, যে ভগবান তোমাকে টেনে এনেছেন—।"

মহীপৎ শান্ত কণ্ঠে উত্তর দিল "তা ছাড়া আর কি বলতে পারি বিমলা—অকারণ কোন কিছু ঘটতে পারে একথা আমি বিশ্বাস করি না। ভগবানের নির্দ্দেশ বা অদৃষ্টের ইঙ্গিত ছাড়া এ অঘটন ঘটা সম্ভব নয়—।"

বিমলা দৃঢ় কণ্ঠে বলিল 'কিন্তু আমি প্রেতাত্মায় বিশ্বাস করি—কোন প্রেত তোমাকে অধিকার করেছে—আমাকে যে মহীপৎ ভালবাসতো সে মৃত যে সম্মুখে আমার সঙ্গে কথা কইছে সে মহীপতের প্রেতাত্মা—মহীপৎ নয়

মহীপৎ আর্দ্রকণ্ঠে ডাকিল "বিমলা"—

এই সময়ে বাহিরে তুমুল ঝড় আরম্ভ হইল—প্রবল বায়ু হঠাৎ তাহাদের উপর দিয়া এমন ভাবে বহিয়া গেল যে তাহাদের কথোপকথন বন্ধ হইল। কিছুক্ষণ পরে বায়ুর বেগ প্রশমিত হইলে মহীপৎ বলিল "বিমলা—প্রিয়তমে, আমার

হৃদয়ের আলো, এসো এই নিবিড় অন্ধকারের মধ্যে আমরা দু'জনে পালিয়ে যাই—ভগবানকে সাক্ষী ক'রে ব'লছি, কখনো আমি তোমায় পরিত্যাগ কর্ব্বনা"—মহীপৎ বিমলার হস্ত নিজের হস্তের মধ্যে লইল।

বিমলা স্বপ্নাবিষ্টের ন্যায় বলিল "না না ঐ দেখছো না মহীপৎ! আমার প্রেমের ঠাকুর রাধা শ্যাম আমায় ডাকছে।"

মহীপৎ আবেগ পূর্ণ হৃদয়ে বলিল "বিমলা, তুমি কী ভাগ্যের ইঙ্গিত বুঝতে পারো না? ঈশ্বরের আদেশ শুনছো না—আমি তো শুনতে পাচ্ছি আকাশ বাতাস পৃথিবী সমস্বরে ব'লছে যেন "বিমলা তোমার জন্যই সৃষ্টি হয়েছে নিয়ে পালাও, নিয়ে পালাও বিলম্ব ক'রোনা।"

বিমলা সবলে তাহার হস্ত মুক্ত করিয়া গৃহে প্রবেশ করিয়া দ্বার বন্ধ করিতে গেল, কিন্তু তাহার সে চেষ্টা ব্যর্থ হইল মহীপৎ সবলে দ্বার উন্মুক্ত করিয়া গৃহে প্রবেশ করিয়া দ্বার বন্ধ করিয়া দিল।

২

মন্দিরের বৃদ্ধা সেবিকা মহানিশা ভীতা হইয়া বারান্দার সম্মুখে আসিয়া বলিতেছে "কী ভয়ানক ঝড় বইছে—উঃ মন্দিরের দরজাগুলো হাওয়াতে আছড়ে আছড়ে প'ড়ছে—মন্দিরের সব আলো নিভে গিয়েছে। ওরে বটেশ্বর—।"

বটেশ্বর মন্দিরের দ্বার রক্ষক। বটেশ্বর অর্দ্ধ ঘুম ঘোরে উঠিয়া সম্মুখে আসিতেই বৃদ্ধা বলিল "বলিহারী ঘুম তোর—দেখছিস্ মন্দিরে আজ গোপাল মহারাজ, কৃষ্ণ বাবাজী কেউ নেই, রাণী মা একলা আছেন, আর তুই এই সাঁজ সন্ধ্যে বেলা বেশ নাক ডাকিয়ে ঘুমোচ্ছিস্—? আমি রাণী মা'র দোতালার ঘরের সিঁড়ির কাছে একটা লোকের ছায়া দেখেছি শিগগীর আলো জ্বাল। আমার মনে হোল যেন কে ছুটে ওপরে গেল রাণী মার ঘরে।"

বটেশ্বর হাঁসিয়া বলিল "বুড়ী মা তুমি তো প্রায় ভূত দেখ, লোক দেখ, ডাকাত দেখ আর আজ এই ঝড়ের মধ্যে কিছুই দেখবে না ত ...।"

মহানিশা তাহাকে কথা শেষ না করিতে দিয়াই বলিল "নে নে—আর বেশী কথা ব'লতে হবে না কুড়ের সর্দ্দার—যা শিগগীর মন্দিরের ফটক বন্ধ করে আয়। ঝড় বৃষ্টি আবার এলো জোড়ে—।"

বটেশ্বর বলিল "বাবা এ ঝড়ের মধ্যে আমি এখন ফটক বন্ধ কর্ত্তে পার্ব্বনা—একটু ঝড় কমুক।"

বৃদ্ধা মহানিশা বলিল "কী হ'লো ঠাকুর, মনে হচ্ছে যেন মন্দিরকে শুদ্ধ উড়িয়ে নিয়ে যাবে।" কিয়ৎক্ষণ পরে বটেশ্বর আলো জ্বালিলে মহানিশা জিজ্ঞাসা করিল "বটেশ্বর, রাণীমাকে দেখেছিস্ ওপরে যেতে ?"

বটেশ্বর বলিল "হাঁ। দেখেছি খানিকক্ষণ আগে—।"

মহানিশা বিশেষ বিরক্তির সহিত কহিল "গাধা কি করে দেখলি, তুই কি ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে দেখতে পাস্ বাঁদর, চ'ল্ আলো নিয়ে দেখতে হবে, মন্দির ঘর, সব দেখতে হবে।"

বটেশ্বর বিশৃঙ্খল করিয়া বলিল "আবার খুজতে হবে! রাণী-মা আছেন ওপরে—।"

মহানিশা বলিল "তবে যা আগে ওপরে দেখে আয়—"

বটেশ্বর উপরে গিয়া ঘরে আলো জ্বলিতে দেখিয়া ডাকিল "রাণী মা" গৃহের দ্বার অর্গল বন্ধ, ভিতর হইতে বিমলার কণ্ঠস্বর শোনা গেল "কোন ভয় নেই—আমি আছি—।"

বটেশ্বর আসিয়া গম্ভীর ভাবে জানাইল "রাণী মা ওপরের ঘরে আছেন, বল্লেন কোন ভয় নাই—।"

মহানিশা বলিল "আবার ওদিকে কোথায় যাচ্ছিস্—ভাল করে মন্দিরের সব যায়গা দেখতে হবে, আমি লোক দেখেছি" বটেশ্বর নিতান্ত অনিচ্ছার সহিত মহানিশার অনুসরণ করিল। বৃদ্ধা সহজে অন্বেষণ সমাপ্ত করিতে ইচ্ছুক নহে কিন্তু সমগ্র মন্দির তন্ন তন্ন করিয়া দেখিবার পরও কোন ব্যক্তিকে লক্ষ্য করা সম্ভব হইল না।

বায়ুর বেগ ক্রমশঃ প্রবল হইতে প্রবলতর হইল। পবনদেব যেন মন্দিরের সহিত ঘোর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া তাহাকে সমূলে উৎপাটিত করিয়া চূর্ণ বিচূর্ণ অবস্থায় দূরে নিক্ষেপ করিবেন এইরূপ মনোভাব প্রকাশ করিতেছেন। উদ্যানের বৃক্ষরাজি যেন বায়ুভরে মাটির নিকটে হেলিয়া পড়িয়াছে, বৃক্ষের শাখা-গুলি যেন রমণীর শুষ্ক আলুলায়িত কেশের ন্যায় ইতঃস্ততঃ উৎক্ষিপ্ত বিক্ষিপ্ত হইতেছে—। মন্দিরের বন্ধ বাতায়নের উপর বারি বর্ষণের শব্দ যেন অশ্বের পদধ্বনির ন্যায় শ্রুত হইল, যখন বায়ুর ও মেঘের তাণ্ডব নৃত্য প্রশমিত হইল তখন বায়ুর শব্দ যেন একবার তীব্র একবার ক্ষীন—সে শব্দ

যেন এক বিরাট দুঃখের কাতরোক্তি। গভীর আর্ত্তনাদ ও হতাশ্বাসের অভিব্যক্তি।

কিন্তু পুনর্ব্বার বায়ু ভীষণ আকার ধারণ করিল। বৃক্ষের মধ্যে শাখা প্রশাখা আন্দোলিত ও বিক্ষিপ্ত হইয়া পরস্পরকে আক্রমণ পূর্ব্বক আঘাত করিতে লাগিল। এই বিরাট তাণ্ডব নৃত্যের ঘোর অস্বাভাবিক ভীষণতার মধ্যে সত্যই মনে হইল যে ভগবান যেন মন্দিরকে কোন বিশেষ কারণে ধ্বংস করিতে উদ্যত হইয়াছেন।

প্রকৃতির তাণ্ডব নৃত্যে প্রকম্পিত মন্দিরে দ্বার রুদ্ধ গৃহে বিমলার নিস্পন্দ নির্জ্জীব দেহে যেন প্রাণের স্পন্দন ফিরিয়া আসিল। গৃহের দ্বার বন্ধ করিতে প্রয়াসী হইয়া মহীপৎ কর্ত্তৃক দ্বার উন্মুক্ত হওয়ার প্রবল আঘাতে সে ধরণীর আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল। সে ধীরে ধীরে প্রকৃতিস্থ হইয়া অন্ধকারাবৃত গৃহের ক্ষীণ আলোকে তাহার নিজের অবস্থা সম্যক উপলব্ধি করিয়া শিহরিয়া উঠিল। নারী জীবনে ভগবানের চরণে আত্মসমর্পণের জ্যোতিরালোকিত পথ, মন্দিরের প্রধান সেবিকার পদ মর্য্যাদা, সতীত্ব সমস্তই যেন বিস্মৃতির গর্ভে নিমজ্জিত হইয়াছে—সে ভাবিল জগতে সে বড়ই একা সে নিজেকে মনে করিল জীবন্ত জাগ্রত এক মহা অভিশাপ ভগবান ও মনুষ্য উভয়েরই ঘৃনিত পরিত্যক্ত!

বিমলা এক হস্তে চক্ষু আবৃত করিয়া আর এক হস্ত উত্তোলন করিয়া ভয়ার্ত্ত কণ্ঠে ডাকিল "মহীপৎ, মহীপৎ," তাহার মনে হইল সে গৃহের মধ্যে যেন এক ভীষণ গভীর গহ্বর উন্মুক্ত হইয়াছে—কে যেন তাহাকে সজোরে সেই গহ্বরের মধ্যে নিক্ষেপ করিতেছে—সে পুনরায় ভয়ার্ত্ত কণ্ঠে ডাকিল "মহীপৎ, মহীপৎ—"

মহীপৎ নিকটে আসিয়া তাহাকে ভূমি হইতে উত্তোলন করিয়া বলিল "বিমলা, এই যে আমি তোমার রক্ষা কর্ব্ব—কখনও তোমাকে পরিত্যাগ কর্ব্ব না।"

বিমলা মহীপতের আলিঙ্গন হইতে নিজেকে মুক্ত করিয়া বলিল "কি তুমি উন্মাদের মতন প্রলাপ বকে যাচ্ছ, তোমার আমাকে পরিত্যাগ করা উচিত—কিন্তু—কিন্তু—"

মহীপৎ ব্যস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল "কিন্তু কি?"

বিমলা বলিল—"আমার মনে হচ্ছে—আর আমি বাঁচবো না—আমার মৃত্যু সন্নিকট—তুমি এখন যেও না।"

মহীপৎ দৃঢ় কণ্ঠে বলিল "এখন? কখনও নয়—কেউ তোমাকে আমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিতে পার্ব্বে না—"

বিমলা কহিল—"আমার বৃদ্ধ পিতার কথা মনে হচ্ছে—জানো মহীপৎ আমি শৈশবে মাতৃহীন—তিনি শুধু আমার বাবা নয়, মাও বটে—আর তাঁর কেউ নেই।"

মহীপৎ বলিল—"তোমার পিতার জন্য আমার কিছু যায় আসে না—"

বিমলা বলিল—"আমার ধর্ম্ম?"

মহীপৎ মস্তক অবনত করিয়া বিমলার নিকট হইতে দূরে দাঁড়াইল।

বিমলা বলিল—"মহীপৎ, এ কি তুমি দূরে স'রে যাচ্ছ কেন? কি হয়েছে তোমার?" মহীপৎ তখনও নীরবে দণ্ডায়মান—বিমলা নিকটে গিয়া মহীপতের মুখ হাত দিয়া তুলিয়া ধরিল—এখনও মহীপৎ নীরবে—বিমলা পুনর্ব্বার বলিল "কী হয়েছে তোমার মহীপৎ! কথা ক'চ্ছো না কেন?—"

মহীপৎ বলিল—"বিমলা, তুমি ভয়ানক কথা উচ্চারণ করেছো—আমি ভ-ধর্ম্ম গ্রহণ কর্ত্তে পার্ব্ব না—ধর্ম্মের উচ্চারণে আমার ধমনীতে যেন হিমানী প্রবাহ হ'য়ে গেল, কে যেন আমাকে সজোরে আঘাত কচ্ছে—" মহীপতের উত্তেজনা লক্ষ্য করিয়া বিমলা ভীত কণ্ঠে বলিল "এসো বন্ধু—আর আমাদের মধ্যে ব্যবধান রেখোনা।"

মহীপৎ বিষণ্ণ চিত্তে উত্তর দিল "ব্যবধান কি প্রকারে যেতে পারে?"

বিমলা কহিল—"এসো, তুমি আর আমি আমাদের আদর্শ সব এক করে ভগবানের কাযে আমাদের জীবন আত্মসমর্পণ করি—তোমার ধর্ম্ম আর আমার ধর্ম্ম কি পৃথক?"

মহীপৎ উত্তর দিল "ভগবানের কাছে কোন পার্থক্য নেই সত্য কিন্তু মানুষের কাছে আকাশ পাতাল প্রভেদ।"

বিমলা বলিল—"ভগবানের কাছে যখন কোন পার্থক্য নাই, এসো মহীপৎ আর আমরা পৃথক হ'তে পারি না।"—

বিমলা গৃহের দ্বার উন্মুক্ত করিয়া মহীপতের হাত ধরিয়া মন্দিরের দ্বারের নিকটে উপস্থিত হইল। সে মন্দিরের দ্বার


NEW ORDER
I promise to give you DEATH & STARVATION
REACTION'S HANDS
DARLAN
SAILA

নাৎসী-নববিধান

উন্মুক্ত করিয়া দিল—রাধাশ্যামের মূর্ত্তির সম্মুখে দ্বারের নিকটে উভয়ে দাঁড়াইয়াছিল।

বিমলা বলিল—"ওই যে প্রেমের ঠাকুর দাঁড়িয়ে রয়েছেন—এসো মহীপৎ, এসো আমরা দুজনে গিয়ে জানুপেতে ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করি যেন তাঁরই সেবায় আমাদের জীবন উৎসর্গ করি, এসো।"

মহীপতের মুখে কে যেন বিষাদের কালিমা লেপন করিয়া দিয়াছে। সে তাহার শ্মশ্রুতে হাত দিয়া নত মুখে মন্দিরের নিকটে দাঁড়াইয়া রহিল।

বিমলা বলিল—"এসো মহীপৎ—ওকি তুমি এখনও ভাবছো—ঠাকুরের কাছে এসে প্রার্থনা ক'রো, এসো করজোরে জানুপেতে প্রার্থনা করো—যা চাইবে তাই পাবে—ঠাকুর প্রেমময়।" মহীপৎ কথার কোনও উত্তর দিল না—মূক স্থির—।

বিমলা বলিল—"এ কি—তুমি যে আমার দিকেও একবার চাইছ না—কি হ'লো তোমার ব'লো…বলো।"

মহীপৎ বলিল—"আমি মন্দিরের মধ্যে যেতে পার্ব্ব না, বিমলা—তোমার ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা ক'রতে পার্ব্ব না—আমি হিন্দু নই—"

বিমলা ভয়ার্ত্ত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল "তুমি হিন্দু নও! তবে তুমি কি?"

মহীপৎ বলিল, "আমি হিন্দু নই—আমি খ্রীষ্টান।"

বিমলা বলিল, "হা ভগবান—খ্রীষ্টান, খ্রীষ্টান—"

বিমলাকে যদি কেহ বার বার ছুরিকাঘাতে হত্যা করিত সে সময়ে যদি সে এই কথা উচ্চারণ করিত সেইরূপ মরণোন্মুখ নারীর ন্যায় আর্ত্তকণ্ঠে সে এই বাক্য উচ্চারণ করিয়াছিল।

মহীপৎ দীর্ঘশ্বাসের সহিত অসামান্যা সুন্দরী বিমলার দিকে একবার দৃকপাত করিয়া সূচীভেদ্য অন্ধকারের মধ্যে বিলীন হইয়া গেল।

শৈব্যা

—শ্রীসত্যনারায়ণ দাশ

যাহার সত্য যাহার নিষ্ঠা হেরিয়া বাসব শঙ্কিত
শৌর্য্যে যাহার বীর্য্যে যাহার মেদিনী হইত কম্পিত,
যাহার যশের গাথায় গাথায় বন উপবন ঝঙ্কৃত
কর্ম্ম যাহার ধর্ম্ম যাহার হিরণ লেখায় অঙ্কিত
যে ছিল তাহার রাজলক্ষ্মী, শৈশবে রাজ-নন্দিনী
নিয়তি এঁকেছে পটেতে তাহারে বিপ্র গৃহেতে বন্দিনী।
একদিন যার দাসী অগণন অঙ্গুল হেলনে ছুটিত
ভাণ্ডার যার মুক্ত দেখিয়া অযুত অনাথ জুটিত,
একটী কথায় কোটি প্রজা যার বুকের রুধির দানিত
সারাটি রাজ্য রাণী নয় শুধু দেবী বলে যারে মানিত,
প্রসাদ যাহার থাকিত মুখর উছল উতল হাসিতে
নিয়তি এঁকেছে পটেতে তাহার দাসবৃত্তি কাশীতে।
নিযুত কৃপাণ উঠিত ঝলসি' যাহার শিবির রাখিতে
অভিমানে বুক ভরা ছিল যার, বাদল নামিত আঁখিতে।
সূর্য্যও যার রূপের ছটা দেখে নাই কভু নয়নে
কুসুম পেলব অঙ্গ যাহার লাগিত কুসুম শয়নে,
প্রভাতে জাগাত চারণের দল গাহিয়া যাহার বন্দন
নিয়তি এঁকেছে পটেতে তাহারে মৃত শিশু কোলে ক্রন্দন!
প্রাসাদ সোপানে চরণ চালনে চরণে পেত যে যাতনা
চারি দিকে তার ছিটাইয়া পড়িত মাণিক মুকুতা কত না,
সোহাগে যে জন গলিয়া পড়িত নিজেরে করিয়া রিক্ত
রাজার জননী হব মনে হলে' আঁখি হত যার সিক্ত;
পদতলে যার পরাণ মাগিত কত অপরাধী মশানে
নিয়তি এঁকেছে পটেতে তাহারে মৃত শব বুকে শ্মশানে।
ধূপের গন্ধে হ'তো সুরভিত যাহার শয়ন-কক্ষ
চরণ চিত্র আলতা আঁকিত সে যেন শিল্পী দক্ষ,
সিনানের জলে ভেসে যেত কত অগুরু চন্দনচূর্ণ
ভাণ্ডার যার থাকিত সতত মুক্তা মাণিকে পূর্ণ;
প্রাসাদে যাহার কত দীন হীন পেয়েছে শিক্ষা দীক্ষা
নিয়তি এঁকেছে পটেতে তাহারে তনয়ে যাচিতে ভিক্ষা॥

বাঙ্গালার কথা

-৺নিখিলনাথ রায়

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

সিরাজউদ্দৌল্লা

নবাব সিরাজউদ্দৌল্লার নাম বঙ্গদেশে প্রবাদ বাক্যের ন্যায় প্রচলিত হইয়াছে। তাঁহার সম্বন্ধে যে কত সত্য মিথ্যা কথার রটনা হইয়াছে, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। তোমরা সিরাজউদ্দৌল্লা সম্বন্ধে অনেক কথা শুনিয়া থাকিবে। কোন কোন পুস্তকে কিছু কিছু পড়িয়া থাকিতেও পার কিন্তু সিরাজদ্দৌল্লা সম্বন্ধে যাহা সত্য তোমাদিগকে তাহাই বলিতেছি।

বর্গীর হাঙ্গামার অবসানের পর প্রজাদিগের সুখস্বচ্ছন্দের ব্যবস্থা করিয়া আলিবর্দ্দী খাঁ কিছুকাল শান্তিতে কাটাইতে ইচ্ছা করেন। কিন্তু তিনি কয়েক বৎসর মাত্র জীবিত ছিলেন। নবাব সুজাউদ্দীন খাঁর সময় আলিবর্দ্দী যখন বিহারের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হন সেই সময়ে তাঁহার দৌহিত্র সিরাজউদ্দৌল্লার জন্ম হয়। সিরাজের জন্ম তাঁহার ভাগ্যের শুভলক্ষণ মনে করিয়া আলিবর্দ্দী তাঁহাকে অত্যন্ত ভালবাসিতেন এবং তাঁহার কোন পুত্র না থাকায় সিরাজকে পুত্রের ন্যায়ই পালন করিতেন।

তাঁহার মৃত্যুর পর সিরাজউদ্দৌল্লাকে মুর্শিদাবাদের নবাব মনোনীত করিয়াছিলেন। অবশ্য সে জন্য দিল্লীর বাদশাহের অনুমতি লওয়ারও প্রয়োজন ছিল। সিরাজউদ্দৌল্লা তত ধীর স্থির ছিলেন না। তাঁহার প্রকৃতি অত্যন্ত চঞ্চল ছিল। আলিবর্দ্দী তাঁহাকে সুশিক্ষা দিবার চেষ্টা করিতেন। সিরাজের পিতা জৈনুদ্দীনের মৃত্যুর পর আলিবর্দ্দী খাঁ সিরাজকে বিহারের শাসন কর্ত্তার পদ দিয়া রাজা জানকী রামকে তাঁহার সহকারী নিযুক্ত করিয়াছিলেন। সে কথা তোমাদিগকে বলিয়াছি। সিরাজউদ্দৌল্লা আলিবর্দ্দীর সঙ্গে সঙ্গেই থাকিতেন। সেইজন্য রাজা জানকী রামই প্রকৃত প্রস্তাবে বিহার শাসন করিতেন। সিরাজ কু-লোকের পরামর্শে মনে করিলেন যে, তাঁহাকে নামমাত্র বিহারের শাসনকর্ত্তার পদ দেওয়া হইয়াছে। জানকীরামই প্রকৃত শাসনকর্ত্তা। তখন তিনি জানকীরামের নিকট হইতে বিহার অধিকার করিবার জন্য সসৈন্যে ধাবিত হইলেন। নবাব আলিবর্দ্দী খাঁর আদেশে জানকীরাম সিরাজকে অক্ষত শরীরে ধৃত করিয়া নবাবের নিকট পাঠাইয়া দিলে নবাব তাহাকে ক্ষমা করেন। সিরাজের চঞ্চল প্রকৃতির এইরূপ আরও অনেক পরিচয় পাওয়া যায়। এক সময়ে সিরাজ নবাব আলিবর্দ্দী খাঁকে তাঁহার নবনির্ম্মিত মনসুরগঞ্জ বা হিরাঝিলের প্রাসাদ দেখাইতে লইয়া গিয়া তাঁহাকে একটী ঘরে আবদ্ধ করিয়া রাখেন। পরে নবাবের নিকট হইতে প্রাসাদ রক্ষার অর্থের ব্যবস্থা করিয়া লইয়া তাঁহাকে ছাড়িয়া দেন। নবাব ঐ প্রাসাদ রক্ষার জন্য যে 'একটী আবওয়ার' অতিরিক্ত কর স্থাপন করিয়াছিলেন—তাহাকে নজরানা মনসুরগঞ্জ বলিত।

সে কালের নবাব বাদশাহের ছেলেরা যেরূপ বিলাসী ও চরিত্রহীন হইতেন, সিরাজও সেইরূপ ছিলেন। কিন্তু তাঁহার সম্বন্ধে যে সকল কথা লোকে রটনা করিয়াছে, তাহা যে খুব বাড়াবাড়ি তাহাতে সন্দেহ নাই। তাহার অধিকাংশই রটা কথা। সে কালের নবাব বাদশাহ বা বড়লোকদের ছেলেদের অপেক্ষা সিরাজ এমন কিছু করিয়া যান নাই, যাহার জন্য তাঁহাকে যারপর নাই নিন্দা করা যায়। সিরাজের চরিত্র দোষ সম্বন্ধে অনেকে অনেক কথা বলিয়াছেন। তিনি সম্ভ্রান্ত ঘরের মহিলাদিগকেও লইয়া টানাটানি করিতেন, এরূপ কথাও কেহ কেহ বলিয়া থাকেন। কিন্তু তাহা কতদূর সত্য বলা যায় না। কারণ আলিবর্দ্দী খাঁর সিরাজের প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল। আলিবর্দ্দী নিজে নির্ম্মল চরিত্র ছিলেন। তিনি জীবিত থাকিতে সিরাজের ঐরূপ কাণ্ড করা সম্ভবপর হইতে পারে না। আলিবর্দ্দী সিরাজকে সর্ব্বদাই সঙ্গে সঙ্গে রাখিতেন। কি মহারাষ্ট্রীয় যুদ্ধ, কি আফগান বিদ্রোহ সর্ব্বত্রই সিরাজ মাতামহের সহিত যুদ্ধ ক্ষেত্রে উপস্থিত থাকিতেন। তাহাতে তিনি যুদ্ধবিদ্যায় অভ্যস্ত হইয়াছিলেন। আলিবর্দ্দীর রাজত্বের সময় সিরাজের কোনরূপ কুব্যবহার করার সম্ভাবনা ছিল না। আর সিরাজ নবাব হইয়া ১৫ মাস মাত্র রাজত্ব

করিতে পারিয়াছিলেন। সে সময়ের মধ্যে তাঁহাকে যেরূপ বিব্রত থাকিতে হইয়াছিল তাহাতে তাঁহার নিঃশ্বাস ফেলিবারও অবকাশ ছিল না। বিলাস-বাসনা পূর্ণ করা ত' দূরের কথা। সিরাজ মদ্যপান করিতেন। কিন্তু আলিবর্দ্দী খাঁ তাঁহার মৃত্যু শয্যায় সিরাজকে কোরাণ ছুঁইয়া প্রতিজ্ঞা করাইয়া লইয়া ছিলেন যে, তিনি মদ্যপান পরিত্যাগ করিবেন। সিরাজ তাহার পর হইতে আর মদ্যপান করেন নাই। ইহা হইতে বুঝা যায় যদি সিরাজের চরিত্রে আর কোন গুরুতর দোষ থাকিত তাহা হইলে আলিবর্দ্দী তাহা হইতেও সিরাজকে নিবৃত্ত করিতে চেষ্টা করিতেন।

সম্ভ্রান্ত ঘরের মহিলাদের প্রতি তাঁহার কু-দৃষ্টির বিষয়ে একটী মাত্র গুজব প্রচলিত আছে, কিন্তু সে গুজবে সম্পূর্ণরূপ বিশ্বাস করা যায় না। নাটোরের রাণী ভবানীর সুন্দরী বিধবা কন্যা তারাকে পাইবার জন্য সিরাজ চেষ্টা করিয়াছিলেন বলিয়া এক গুজব প্রচলিত আছে। কিন্তু যে ভাবে সিরাজ তারাকে দেখিয়াছিলেন বলিয়া গুজব প্রচলিত তাহা কিছুতেই বিশ্বাস করা যায় না। রাণী ভবানী সে সময়ে মুর্শিদাবাদের বড়নগরে থাকিতেন। একদিন তারা বড়নগর রাজবাটীর ছাদে স্নানের পর চুল এলাইয়া বেড়াইতেছিলেন, সিরাজউদ্দৌলা গঙ্গা হইতে নৌকায় বসিয়া তারাকে দেখিয়া তাঁহাকে পাইবার ইচ্ছা করেন। রাণী ভবানী সে কথা শুনিয়া একটী মিথ্যা চিতা-কুণ্ড প্রজ্জলিত করিয়া তারা পুড়িয়া মরিয়াছেন বলিয়া রাষ্ট্র করিয়া দেন। আবার এর পর প্রচলিত আছে যে, সিরাজ তারাকে লইয়া যাইবার জন্য লোকজন পাঠাইলে বড়নগরের পরপারে সাধক-বাগের বৈষ্ণব সাধু মস্তরাম বাবাজী তপোবলে লোকজন সৃষ্টি করিয়া সিরাজউদ্দৌলার লোকজনকে তাড়াইয়া দিয়াছিলেন। ইহা যে গল্প মাত্র তাহা অবশ্য তোমরা বুঝিতে পারিতেছ। তখন বড়নগরে সাধকবাগ প্রভৃতি মুর্শিদাবাদ সহরের মধ্যেই ছিল। নাটোর রাজকুমারীর ন্যায় সম্ভ্রান্ত ঘরের মহিলা মুর্শিদাবাদ সহরে দিনের বেলায় চুল খুলিয়া বেড়াইবেন ইহা কতদূর সম্ভব তোমরা বুঝিয়া দেখ। একথা সেকালের কোন পুথিপত্রে নাই। কেবল একথা বলিয়া নহে সিরাজ যে কোন বিশিষ্ট ভদ্র পরিবারের মহিলাকে লইয়া টানাটানি করিয়াছিলেন, তাঁহাদের কোন নাম ধাম সে কালের কোন গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায় না। আর আমরা বলিয়াছি যে, আলিবর্দ্দী জীবিত থাকিতে তাহা কখনও ঘটিবার সম্ভাবনা ছিলনা। এ সকল কথা সিরাজের সম্বন্ধে বাড়াবাড়ি করিয়াই বলা হইয়া থাকে।

সিরাজউদ্দৌলার অত্যাচার সম্বন্ধেও অনেক গুজবের সৃষ্টি হইয়াছে। তিনি গর্ভবতী রমণীর গর্ভ বিদারণ করিতেন, জনপূর্ণ নৌকা জলে ডুবাইয়া দিতেন এইরূপ অনেক অমানুষিক অত্যাচারের কথা তাঁহার সম্বন্ধে রচিত হইয়াছে। কোন কোন ইউরোপীয়ের লিখিত বিবরণে ও কোন কোন বাঙ্গালা পুস্তকে অনেক দোষের কথা বলিয়াছেন, কিন্তু এমন কথার উল্লেখ করেন নাই। তাহা যদি করেও সেকালকার কোন সমসাময়িক মুসলমানের লিখিত পুঁথিপত্রে এসকল কথা দেখিতে পাওয়া যায় না। এই মুসলমান লেখকেরা তাঁহার দুইটী অত্যাচারের কথা লিখিয়াছেন। কিন্তু তাহারও বিশেষ কারণ ছিল। সিরাজ ফৈজী বা ফয়জান নামে এক নর্ত্তকীকে নাকি ঘরে বন্ধ করিয়া অনাহারে রাখায় সে মরিয়া গিয়াছিল। আর একটী, তিনি ঢাকার সহকারী শাসন কর্ত্তা হোসেন কুলীখাঁকে হত্যা করার আদেশ দিয়াছিলেন। ইহা অবশ্য অনেক গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়। সিরাজ আলিবর্দ্দীর বেগমের উপদেশে হোসেন কুলী খাঁকে হত্যা করিতে আদেশ দেন। আলিবর্দ্দীর বেগম বুদ্ধিমতী ও সদবিবেচনা সম্পন্ন ছিলেন। তিনি কেন যে সিরাজকে ঐরূপ উপদেশ দিয়াছিলেন, তাহার অবশ্য গূঢ় কারণ ছিল। আর ফৈজীর ঐরূপ দুর্দ্দশা করারও কারণ ছিল। তোমরা বড় হইয়া সে সকল কথা জানিতে পারিবে। সিরাজ-উদ্দৌলার মুসলমান ধর্ম্মেও বিশ্বাস ছিল। তিনি মুর্শিদাবাদে সুন্দর এমামবারা নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে মসজীদে মহম্মদের সমাধিক্ষেত্র মদিনা হইতে মৃত্তিকা আনাইয়া স্থাপন করা হইয়াছিল। তাহাকেও মদিনা বলে। মুর্শিদাবাদের গঙ্গাতীরে এখনও সেই মদিনা দেখিতে পাওয়া যায়। আশা করি, সিরাজউদ্দৌলা সম্বন্ধে তোমাদের যদি কোন ভুল ধারণা থাকে, এখন হইতে তাহা দূর করিতে চেষ্টা করিবে।

সিরাজ ও ইংরাজ

ইংরেজদিগের সহিত যুদ্ধে সিরাজউদ্দৌলার পতন হইয়াছিল—সে কথা তোমারা শুনিয়া থাকিবে। ইংরেজদের

সহিত কেন তাঁহার বিবাদ বাধিয়াছিল, এক্ষণে সেই কথাই বলিতেছি। শাজাদা আজিম ওশ্বানের নিকট হইতে ইংরেজ কোম্পানী বিনা শুল্কে বাণিজ্য করার অধিকার লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহাতেও তাঁহাদের বাণিজ্যের বা প্রাধান্যের সম্পূর্ণ সুবিধা ঘটে নাই। তাঁহারা আপনাদের সকলপ্রকার সুবিধা করিয়া লওয়ার জন্ত চেষ্টা করিতেছিলেন। নবাব মুর্শিদকুলীখাঁ সে বিষয়ে বিশেষরূপ বাধা দেন। কোম্পানীর এরূপ প্রাধান্য বৃদ্ধি তিনি ভাল মনে করিতেন না। সে যাহা হউক কোম্পানী কিন্তু নাছোড়বান্দা হইয়া আপনাদের কার্য্যোদ্ধারে প্রবৃত্ত হন। বাদশাহ ফরমশেরের একটী ব্রণ চিকিৎসা করিয়া ইংরেজ ডাক্তার হ্যামিলটণ তাঁহাকে সন্তুষ্ট করায় বাদশাহ ইংরেজ কোম্পানীর বাণিজ্যের সকল প্রকার সুবিধার জন্ত আদেশ দেন। ইহাতে তাঁহাদের বাণিজ্যের সুবিধার সহিত দিন দিন ক্ষমতার বৃদ্ধি হইতে থাকে।

কোন কোন সময়ে কোম্পানীর লোকজন অন্যান্য বণিকদের জাহাজের দ্রব্যাদি লুটপাট করিতে আরম্ভ করে। নবাব আলিবর্দ্দী খাঁ তাহা জানিতে পারিয়া প্রথমে কোম্পানীকে সেই বণিকদের ক্ষতিপূরণ করিতে বলেন। কিন্তু ইংরেজেরা অবিলম্বে তাঁহার আদেশ প্রতিপালন না করায়, আলীবর্দ্দী খাঁ কোম্পানীর বাণিজ্য বন্ধ করিয়া দেন। কোম্পানী অবশেষে জগৎশেঠ মহাতপচাঁদকে ধরিয়া বার লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড দিয়া বাণিজ্য করার অধিকার লাভ করেন। ইংরাজেরা ও অন্যান্য ইউরোপীয় বণিকেরা সিরাজউদ্দৌল্লাকে ভাবী নবাব জানিয়া তাঁহাকে নানা প্রকার উপঢৌকন দিয়া সন্তুষ্ট করিতে চেষ্টা করিতেন। কিন্তু সিরাজউদ্দৌল্লা ইংরেজ কোম্পানীর সকল বিষয়ে বাড়াবাড়ি বুঝিতে পারিতেন। তিনি সে কথা নবাব আলিবর্দ্দীখাঁকেও সময়ে সময়ে জানাইতেন। নবাব নিজেও ইংরেজদিগের ক্ষমতা বৃদ্ধি বেশ বুঝিতে পারিয়াছিলেন। সেইজন্ত অন্তিমকালে সিরাজউদ্দৌল্লাকে ইউরোপীয় বণিকদিগকে বিশেষতঃ সর্ব্বাপেক্ষা ইংরেজদিগকে বিশেষভাবে দমনে রাখিতে বলিয়া যান। আলিবর্দ্দী সিরাজকে বলিয়াছিলেন যে, তিনি জীবিত থাকিলে সিরাজের পথ পরিষ্কার করিয়া যাইতেন। এক্ষণে সিরাজকেই তাহা করিয়া লইতে হইবে। তাহা না করিতে পারিলে সিরাজের রাজ্য থাকিবে না। এরূপ একটা কথাও আছে যে, নবাব ইংরেজদিগের সহিত বিবাদ করিতে ইচ্ছা করেন নাই। মহারাষ্ট্রীয়দিগের সহিত যুদ্ধে বিব্রত হইয়া তিনি নাকি কোন সময়ে বলিয়াছিলেন যে, স্থলে যে আগুণ জ্বলিয়াছে তাহাতেই রক্ষা নাই। আবার জলে আগুণ জ্বালিলে না জানি কি হইবে। কিন্তু তিনি ইউরোপীয় বণিকদিগকে বিশেষতঃ ইংরেজদিগকে দমন রাখিবার জন্ত অন্তিম সময়ে সিরাজকে যে উপদেশ দিয়াছিলেন তাহাতে সন্দেহ নাই।

আলিবর্দ্দী খাঁ নিজে সিরাজউদ্দৌল্লাকে মুর্শিদাবাদের নবাব মনোনীত করিলেও তাঁহার পরিবারবর্গের মধ্যে সিংহাসন লইয়া অনেক পরামর্শ ও ষড়যন্ত্র হইতেছিল। সৈয়দ আহম্মদের পুত্র শকৎজঙ্গের সিংহাসন লাভের ইচ্ছা হয়। আলিবর্দ্দী সৈয়দ আহাম্মদকে পূর্ণিয়ার শাসন কর্ত্তা নিযুক্ত করিয়াছিলেন। সৈয়দ আহাম্মদের মৃত্যুর পর শকৎজঙ্গ ও সেই পদ লাভ করেন। কিন্তু তিনি মুর্শিদাবাদের সিংহাসনের প্রতি লোলুপ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছিলেন। নওয়াজেস মহাম্মদখাঁর কোন পুত্র ছিল না। তিনি সিরাজের কনিষ্ঠ ভ্রাতা এক্রামউদ্দৌলাকে পুত্রের ন্যায় পালন করিতেন। নওয়াজেস মহম্মদখাঁর মৃত্যুর পূর্ব্বে এক্রামউদ্দৌল্লার মৃত্যু হয়। তাঁহার একটী শিশু পুত্র ছিল। নওয়াজেসের মৃত্যুর পর তাঁহার পত্নী ঘষেটী বেগম এক্রামের সেই শিশুপুত্রের জন্ত সিংহাসন অধিকারে ইচ্ছুক হন। ঢাকার সহকারী শাসনকর্ত্তা বৈদ্যবংশীয় রাজা রাজবল্লভ ঘষেটীর প্রধান সহায়ক ছিলেন। ইংরেজদের সহিত তাঁহার বিশেষরূপ পরিচয় ছিল। রাজবল্লভ ইংরেজদের সহিত সে বিষয়ে পরামর্শ করিতেছেন সন্দেহ করিয়া সিরাজ নবাবের মৃত্যুশয্যায় তাঁহাকে সে কথা জানাইলে নবাব ইংরেজদিগকে সে বিষয়ে জিজ্ঞাসা করেন। অবশ্য ইংরেজেরা সে কথা অস্বীকার করিয়াছিলেন। এ দিকে রাজা রাজবল্লভ পুত্র কৃষ্ণবল্লভের সহিত আপনার ধনসম্পত্তি ও পরিবারবর্গকে তীর্থযাত্রার ছলে কলিকাতায় ইংরেজদের আশ্রয়ে পাঠাইয়া দেন। সেই সময়ে ইউরোপে ইংরেজ-ফরাসীর মধ্যে যুদ্ধ বাধিবার সম্ভাবনায় এবং এ দেশেও তাহা ঘটিতে পারে বলিয়া ইংরেজেরা নবাবের বিনা অনুমতিতে কলিকাতার দুর্গসংস্কার করিতে আরম্ভ করেন।

সিরাজ পূর্ব্ব হইতে ইংরেজ কোম্পানীকে চিনিয়াছিলেন

দুর্গসংস্কার প্রভৃতি তাঁহাদের ছল মাত্র। প্রকৃত প্রস্তাবে ক্ষমতা বৃদ্ধিই তাঁহাদের উদ্দেশ্য মনে করিয়া তিনি ইংরেজদিগকে ঐ সকল করিতে নিষেধ করেন। তোমরা অবশ্য বুঝিতে পারিতেছ, কাহারও রাজ্যমধ্যে যদি অন্য কাহারও ক্ষমতা প্রবল মনে হয়, তাহা হইলে তাঁহার রাজ্যের আশঙ্কাই হইয়া থাকে। আর ইংরেজেরা ক্রমে ক্রমে যে রাজ্যলাভের অভিপ্রায় করিতেছিলেন, তাহাও বুঝা যাইতেছিল। কাজেই সিরাজকে প্রথম হইতেই সাবধান হইতে হইয়াছিল।

সিরাজউদ্দৌলা সিংহাসনে বসিয়া কাশীমবাজার ইংরেজ-কুঠীর অধ্যক্ষ ওয়াট্‌স্ সাহেবকে তলব করিয়া আনিয়া কলিকাতার দুর্গ সংস্কার করিতে নিষেধ করেন। তাহাতে কোন ফল না হওয়ায় তিনি খোজা বাজিদ নামে একজন সম্ভ্রান্ত আর্মেনীয় সওদাগরকে কলিকাতায় পাঠাইয়া দিলেন। সে সময়ে ড্রেক্ সাহেব কলিকাতার অধ্যক্ষ ছিলেন। কলিকাতার কোম্পানীর লোকেরা খোজা বাজিদের কথা শুনিলেন না। বরঞ্চ তাঁহাকে অপমানিত করিয়া বিদায় করিয়া দিলেন। তাহার পর কৃষ্ণবল্লভকে আনিবার জন্য সিরাজ নারায়ণ সিংহ নামে একজন দূতকে পাঠাইলেন। নারায়ণ সিংহ ছদ্মবেশে কলিকাতায় পঁহুছিয়া নবাবের পত্র ইংরেজ দরবারে পেশ করিলে, তাঁহারা সে পত্র অগ্রাহ্য করিয়া নারায়ণ সিংহকেও তাড়াইয়া দেন। তাঁহারা এইরূপ ভাব প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, নারায়ণ সিংহ ছদ্মবেশে আসায় তাহাকে বিশ্বাস করিতে পারা যায় নাই। সিরাজকে ক্রমে ক্রমে এইরূপ অপমানিত করায়, ইংরেজদের প্রতি তাঁহার ক্রোধাগ্নি জ্বলিয়া উঠিল। তিনি মাতামহের অন্তিম উপদেশ স্মরণ করিয়া ইংরেজ দমনে প্রবৃত্ত হইলেন।

প্রথমে তিনি ঘসেটী বেগমের মতিঝিল আক্রমণ করিয়া তাঁহার ধন-সম্পত্তি অধিকার করেন। ঘসেটী বেগমকে মতিঝিল হইতে আনাইয়া সিরাজ আপনার অন্তঃপুরে রাখারই ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। ঘসেটী বেগম যে একরাম-উদ্দৌলার শিশুপুত্রের জন্য সিংহাসন অধিকারের চেষ্টা করিয়াছিলেন এবং রাজা রাজবল্লভ যে সেজন্য ইঁহাদের সহিত যোগাযোগ করিতেছিলেন ও তাঁহার পুত্র কৃষ্ণবল্লভকে কলিকাতায় পাঠাইয়াছিলেন, সে কথা তোমরা শুনিয়াছ। তাহার পর সিরাজ ইংরেজ-কোম্পানীর কাশীমবাজার অবরোধ করার জন্য আদেশ দিলেন। কুঠী অবরোধ করিয়া অধ্যক্ষ ওয়াট্‌স্ প্রভৃতিকে ধরিয়া লইয়া যাওয়া হইল। ভারতবর্ষের প্রথম গভর্ণর জেনারেল ওয়ারেন হেষ্টিংস সে সময়ে কাশীমবাজার কুঠীতে একজন সামান্য কর্ম্মচারীর কার্য্য করিতেন। হেষ্টিংস কোনরূপে পলায়ন করিয়া প্রথমে কাশীমবাজারে কাশীমবাজার রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা কৃষ্ণকান্ত নন্দী বা কান্ত বাবুর আশ্রয়ে উপস্থিত হন বলিয়া কথা প্রচলিত আছে। কান্তবাবু সে সময়ে কাশীমবাজার ইংরেজ-কুঠীতে রেশমের সরবরাহ করিতেন। সেই সূত্রে হেষ্টিংসের সহিত তাঁহার পরিচয় হয়। কান্তবাবুর অবস্থা তখন অবশ্য সেরূপ ভাল ছিল না। এইরূপ কথিত আছে যে, কান্তবাবু পান্তাভাত ও চিংড়ীমাছ দিয়া হেষ্টিংসের অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন।

"ঘরে ছিল পান্তাভাত আর চিংড়ী মাছ,
কাঁচা লঙ্কা বড়ি পোড়া কাছে কলাগাছ;
সূর্য্যোদয় হ'ল আজ পশ্চিম গগনে,
হেষ্টিংস্ ডিনার খান কান্তের ভবনে।"

কান্তবাবু পরে কাশীমবাজার হইতে হেষ্টিংসকে সরাইয়া দেন। ইহার কৃতজ্ঞতাস্বরূপ হেষ্টিংস পরবর্ত্তী কালে কান্তবাবুকে দেওয়ান করিয়া তাঁহাকে অনেক জমিদারীর অধিকারী করিয়া দিয়াছিলেন। ওয়াট্‌স্ সাহেবকে মুচলেকা লেখাইয়া লওয়া হইল যে, কলিকাতার নূতন নির্ম্মিত দুর্গপ্রাচীর ভাঙ্গিয়া ফেলিতে হইবে, কোম্পানীর কলিকাতার জমিদারীর কর্ত্তা হলওয়েল সাহেবের প্রজাদের প্রতি অত্যাচার নিবারণ করিতে হইবে, আরও কোন কোন সর্ত্ত পালন করার কথাও লিখিত হয়। ইংরেজেরা কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত মুচলেকার সর্ত্ত পালন করিলেন না, বা তাহাতে বিলম্ব করায় সিরাজউদ্দৌলা ইংরেজদিগের উদ্ধত ভাব দমনের জন্য কলিকাতা আক্রমণে অগ্রসর হইলেন।

ইংরেজেরা এই অবকাশে কলিকাতার পরপারে নবাবের থানার ক্ষুদ্র দুর্গ অধিকার করিয়া বসিলেন। হুগলীর ফৌজদার সৈন্য পাঠাইয়া তাহা আবার দখল করিয়া লন। তাহার পর নবাবসৈন্য আসিয়া কলিকাতা আক্রমণ করিল। নবাব রাজবল্লভকে ক্ষমা করায় কৃষ্ণবল্লভ নবাবের পক্ষ অবলম্বন করিতে পারেন বলিয়া ইংরেজেরা তাঁহাকে বন্দী করিয়া রাখিলেন। নবাবের লোকের সহিত যোগ আছে

মনে করিয়া আমীরচাঁদ বা উমিচাঁদ নামে কলিকাতার একজন সম্ভ্রান্ত সওদাগরকেও বন্দী করিয়া রাখা হইল। নবাব হুগলীতে পঁহুছিয়া সেখান হইতে কলিকাতা আক্রমণ করিতে আসিলেন। ইংরেজেরা প্রথমে অর্থ দিয়া নবাবকে সন্তুষ্ট করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহাতে কোন ফল হয় নাই। নবাব-সৈন্যেরা কামান ছাড়িতে আরম্ভ করিলে ইংরেজেরা জাহাজ ও নূতন দুর্গ-প্রাচীর হইতে গোলাবৃষ্টি করিতে লাগিলেন। তাঁহারা কলিকাতা রক্ষার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতে ত্রুটী করেন নাই। বর্গীর হাঙ্গামার সময় কলিকাতার উত্তর ও পূর্ব্বদিকে মহারাষ্ট্রীয় খাত নামে গড়খাই করা হইয়াছিল। দক্ষিণ দিকে তাহা সম্পূর্ণ হয় নাই। সেই খাত ভরাট করিয়া পরে সার্কুলার রোড নামে রাস্তা করা হইয়াছে। মহারাষ্ট্রীয় খাত সহজে পার হওয়ার সম্ভাবনা ছিল না। নগরের মধ্যে স্থানে স্থানে তোপমঞ্চ করিয়া কামান স্থাপন করা ছিল। কিন্তু নবাবসৈন্য কোনরূপে নগরে প্রবেশ করিয়া যখন অগ্রসর হইতে লাগিল, তখন ইংরেজেরা দুর্গমধ্যে আশ্রয় লইলেন। সামান্য সামান্য যুদ্ধে তাঁহাদের লোকজনের কতক হত ও কতক আহত হইয়াছিল। ক্রমে নবাবসৈন্য দুর্গের নিকট উপস্থিত হইয়া দুর্গ অধিকার করিয়া লইল। এই দুর্গ এখনকার দুর্গ নহে। তাহা বর্ত্তমান লালদীঘির নিকটে ছিল।

[ক্রমশঃ

বোধী বেদী মূলে

—শ্রীশচীন্দ্রমোহন সরকার

ভারতের মহাতীর্থে বোধী বেদী মূলে,
সংসারের মায়া-মোহ গিয়েছিলে ভুলে,
কাটিয়া গোপার প্রেম নিবিড় বন্ধন,
তুচ্ছ করি রাহুলের স্নেহের ক্রন্দন,
বাহির হইলে পথে,— সর্ব্বজীব তরে,
কেমনে মিলিবে শান্তি মানব অন্তরে!
ক্রমে এসে হেথা বসি'—নীরবে নির্জ্জনে,
কাহারে করিলে ধ্যান বিজন বিপিনে,
পাইলে অমৃত ভাণ্ড জগতের তরে,
জ্ঞান চক্ষু উন্মিলিত মানস-অন্তরে!
'অহিংসা পরম ধর্ম্ম'—সর্ব্ব ধর্ম্ম সার,
তোমার প্রেমের বাণী—করিলে প্রচার!

কলিঙ্গ বিজয়ী রাজা ব্যথিত অন্তরে,
অনুতপ্ত প্রাণ লয়ে—ছিল তোমা তরে।
সে শুভ মুহূর্ত্তে দেব! শুনাইলে বাণী,
আগ্রহে পূজিল এসে—চরণ দু'খানি!
সঙ্ঘমিত্রা ক্রমে আসি' স্নেহের আড়ালে,
ক্ষুদ্র দ্রুম শিশু লয়ে—চলিল সিংহলে!
তিব্বতে, জাপানে, চীনে, দেশ-দেশান্তরে,
প্রচার হইল বাণী—শিলালিপি' পরে!
জগতের ইতিহাসে সোনার আখরে,
রহিল সে বাণী তব—চির-যুগ তরে!
গর্ব্বোন্নত কত জাতি—সম্ভ্রমে সভয়ে,
নত করি শির আজো দেখিছে বিস্ময়ে!

সেই বোধীদ্রুম মূলে—প্রস্তর আসনে,
দেখিতে পেতেছি তোমা মানস নয়নে!
আজিও রয়েছ বসে—আঁখি ধ্যান-রত,
জগতের সর্ব্বজীবে করিতে উন্নত!

চাষীরা

—শ্রীসুধীরচন্দ্র রাহা

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

(৫)

পাঁচুদত্ত কানাই মুখুয্যের কথা রাখিল। পরের দিন বেলা ন'টা দশটার সময় আবগারী দারোগা, পুলিশ চৌকিদার লইয়া, ভূপতির বাড়ী ঘিরিয়া ফেলিল।

ভূপতি অবাক হইয়া গেল। পাড়ার লোক—দোকানদার—যে যেখানে ছিল, সব আসিয়া, ভীড় করিয়া এ উহাকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল—হ'ল কি ?

শুধু দূরে দাঁড়াইয়া, কানাই তাহার গুণবান্ ভাইগুলির সহিত বিড়ি টানিতে টানিতে, ফিক্ ফিক্ করিয়া হাসিতে লাগিল। ভূপতি দাস সেই দিকে চাহিয়া, নিমেষের মধ্যে বুঝিয়া ফেলিল—এটা দা ঠাকুরের কোন ষড়্যন্ত্রের ফল। কিন্তু এখন কোন উপায় নাই, ভবিষ্যতে কি হয়, তাহাই দেখিবার জন্ত চুপ করিয়া রহিল। আবগারী দারোগা ভূপতিকে ডাকিয়া বলিল—তোমার নাম ভূপতি দাস—

—হাঁ হুজুর।

টুল হইতে উঠিয়া দারোগা কহিল, আমরা তোমার বাড়ী খানাতল্লাস করবো। আমরা খবর পেয়েছি, তোমার বাড়ীতে চোলাই মদ আছে।

ভূপতি যেন আকাশ হইতে পড়িল—চোলাই মদ! না হুজুর কক্ষণো না—

হুজুর একটা সিগারেট ধরাইয়া কহিল, তা দেখছি আমরা। এখন তুমি আমাদের দেখে নিতে পার। আমাদের কাছে, কোন কিছু আছে কিনা ; দেখতে চাও—

ভূপতি হাত যোড় করিয়া কহিল—না, হুজুর আপনাদের আর আমি কি দেখব।

বেশ! ভূপতিকে সঙ্গে লইয়া, দারোগা সদলবলে আগাইয়া চলিল।

পাঁচু দত্ত, পূর্ব্ব হইতেই স্থান নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছিল। ঘরের পাশেই একটা চালা ঘর—সেখানে রান্না হয়। সেই চালা ঘরের মধ্যে আসিয়া দারোগা বলিল,—এই ঘর তোমার।

হাঁ হুজুর।

ঘরের চতুর্দ্দিকে তাকাইয়া, ঘরের মেজের একস্থানে নির্দ্দেশ দিয়া দারোগাবাবু হুকুম দিলেন,—খোঁড় এইখানে।

নির্দ্দেশমত, শাবল লইয়া, একজন চৌকীদার সেই জায়গা খুঁড়িতে খুঁড়িতে মাটীর কলসীতে চোলাই মদ, গুটী তিনেক বোতল ও অন্যান্য সাজ সরঞ্জাম পাইয়া গেল।

ভূপতি সেইদিকে চাহিয়া, চীৎকার করিয়া কহিল, হুজুর, এসব নষ্টামী করে কেউ রেখে গিয়েছে। জিজ্ঞেস করুন সবাইকে ; আমাকে কেউ মদ খেতে দেখেছে কি না—

দারোগাবাবু বলিলেন তুমি মদ খাও না ?

না, হুজুর, পাড়ার লোককে জিজ্ঞাসা করুন।

হুঁ, কিন্তু এসব এলো কি করে—

তা জানিনে হুজুর—

ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া দারোগাবাবু বলিলেন, তা জান না—তোমার ঘরে মদ পাওয়া গেল, তুমি জান না কিরকম ? বোধ হয় লুকিয়ে বিক্রী করতে ?

তার স্বরে বাধা দিয়া ভূপতি কহিল, না হুজুর ও কাজ আমি কক্ষণো করি নে।

দারোগাবাবু কথা বলিলেন না। কলসী দুটীর মুখ ভালভাবে বাঁধিয়া, ভূপতিকে সঙ্গে লইয়া, পুলিশ-দল আগাইয়া চলিল। দারোগাবাবু চলিতেছেন, হঠাৎ কোথা হইতে কে একজন আসিয়া তাঁহার জুতার উপর মাথা রাখিয়া কাঁদিয়া উঠিল—হুজুর বাঁচান আমাদের। মেয়েটী ভূপতির স্ত্রী।

কোনমতে পা ছাড়াইয়া লইয়া দারোগাবাবু বলিলেন,—আমি কি করবো বাছা, এসব সরকারী কাজ। আমার কি হাত।

মেয়েটী কাঁদিতে লাগিল। ভূপতির দুটী ছোট ছোট ছেলে মেয়ে এতগুলি পুলিশ চৌকীদার দেখিয়া, তাহাদের

অদ্ভুত পোষাক-পরিচ্ছদ দেখিয়া ভয়ে ও বিস্মিত নয়নে চুপ করিয়াছিল। কিন্তু উহাদের সহিত ভূপতিকে যাইতে দেখিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল।

ভূপতি করুণ নয়নে, নিজের স্ত্রী-পুত্রদের দিকে তাকাইয়া চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল, ভগবান্ এ অবিচার সইবেন না; আমার সর্ব্বনাশ যে করলো, হে ভগবান্, তার মাথায় বাজ ফেলো।

দারোগাবাবু হয় ত নূতন কাজে ঢুকিয়াছেন—এখনও সরকারী যন্ত্রের চাপে, তাঁহার কোমল মন পাষাণ হইয়া উঠে নাই। এই করুণ দৃশ্যে, তাঁহার মনও চঞ্চল হইয়া উঠিল। নিজের মনে বিচার করিয়া দেখিলেন, হয়তো সত্যই লোকটা দোষী নয়; বোধ হয়, কোন শত্রুর কারসাজী। তবে কি ঐ লোকটার কোন—

লাল বড় বড় দাঁত বাহির করিয়া পাঁচু দত্ত হাসিতে হাসিতে আগাইয়া আসিতে লাগিল। পিছনে অদূরে দাঁড়াইয়া কানাই হাসিতেছে।

দারোগাবাবু তীব্র দৃষ্টিতে, উহাদের দেখিয়া লইলেন। পাঁচুদত্ত, নিকটে আসিয়া চুপি চুপি কহিল, হুজুর আমি কিছু পাব তো।

গম্ভীর কণ্ঠে দারোগাবাবু কহিলেন; "পাবে নিশ্চয়ই। চিরকাল গোয়েন্দারা মোটা টাকাই পেয়ে আসছে—ভাবনা কি? মোটা টাকার লোভে পাঁচু দত্তের দুই চোখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। আরও নিম্নস্বরে কহিল,—"এখানে আরও আছে হুজুর। ঠিক সময়ে জানাবো। বেশ,—দারোগাবাবু সাইকেলে উঠিয়া পড়িলেন। দারোগা চলিয়া যাইতেই কানাই সকলের দিকে তাকাইয়া চীৎকার করিয়া কহিল,—"দেখ হাতে হাতে ফল! বেটা খেমো চাষা, ছোট লোক কাঁহাকা, বামুনের গায়ে হাত তুলে রেহাই পাবি! বলি ধর্ম্ম কি উড়ে গেছে।"

অন্য চাষীরা হাত যোড় করিয়া কহিল, "তা কি হয় দা'ঠাকুর। কলিকালে, একমাত্র গুরুব্রাহ্মণই ভরসা। হুজুর, ভূপতিটা একদম গোঁয়ার।"

পাঁচু দত্ত কানাইকে থামাইয়া কহিল, "বেটার পেটে পেটে এত বুদ্ধি। আমরা জানি, ভূপতি গোঁয়ার পাজী লোক। কিন্তু নেপাটেপার ধার দিয়ে হাঁটে না। আরে বাপু, ধর্ম্মের কল বাতাসে নড়ে! একদিন ধরা পড়তেই হ'বে, এখন জেলটা ঘুরে আসুক একবার। দোকানে উঠিতে উঠিতে কানাই কহিল, "খাঁটি সরষের তেল বের করিয়ে ছেড়ে দেবে! বাছাধন এবার মজাটা টের পাক। পাঁচু দত্ত, ধীরে ধীরে দোকানে উঠিয়া, বেশ ভালভাবে আয়েস করিয়া বসিয়া কহিল, "একটু চায়ের জল চাপাও গো। সকাল থেকে জুৎ করে একটু চা খাওয়া হ'ল না। খালি সব বাজে ঝামেলা। চায়ের প্রত্যাশায় আরও অনেকে আসিয়া বসিল। কানাই হাত-পা নাড়িয়া বলিল, "আমি দেখে নেবো, আরও দু'চার শালাকে দেখে নেবো। শালারা আমার পেছনে লেগেছে—"

চাষীদের হৃৎকম্প উপস্থিত হইল। এত শীঘ্র ভূপতির এই দুর্দ্দশা দেখিয়া, প্রত্যেকেই কল্পনানেত্রে দেখিতে লাগিল, তাহাদের প্রত্যেককে যেন দড়ি বাঁধিয়া টানিয়া লইয়া যাওয়া হইতেছে। রাস্তায় দাঁড়াইয়া ছেলে মেয়েরা কাঁদিতেছে। অবশেষে বিচারে যেন জেল হইয়া গেল। একমাস নয়, দুমাস নয়, প্রত্যেকের ছয় মাস করিয়া। তাহাদের ক্ষেত খামার পাট ধান কলা-বেগুনের বাগান সবই পাঁচজনে লুটিয়া লইতেছে।

ভিতরে ভিতরে শিহরিয়া সকলে একসঙ্গে সমস্বরে বলিয়া উঠিল, "দা'ঠাকুর, আমরা তো আপনার শ্রীচরণে কোন অপরাধ করিনি—"

তাহাদের এই ভয় দেখিয়া কানাই মনে মনে খুসী হইয়া বাহিরে গাম্ভীর্য্য বজায় রাখিয়া কহিল, হুঁ, তা বটে—"

দা'ঠাকুরের এই বাঁকা কথাতে, চাষীদের বিন্দুমাত্র ভয় ভাঙ্গিল না, বরং সমস্ত ভয় এক সঙ্গে দানা বাঁধিয়া মনের অন্তস্তলে বসিয়া গেল। সকলের মুখের দিকে আর একবার চাহিয়া কানাই কহিল, "কি যে নতুন গুড় উঠেছে না—আর কলাই মুগ!"

"হাঁ দা'ঠাকুর, আজই সব শ্রীচরণে পৌঁছে দেব।" কানাই মৃদু হাসিল।

দোকানঘর নির্জ্জন হইয়া গেলে, পাঁচু দত্ত কহিল, মুখুয্যে, সকালে একটা জিনিষ দেখেছ? বিস্মিত হইয়া কানাই কহিল, জিনিষ, কই, কি বল ত? মৃদু হাসিয়া পাঁচু দত্ত কহিল, "বাবা, আমার চোখ সবখানেই থাকে। বেড়ে জাল

কিন্তু—কানাই তাহার হাত ধরিয়া টানিয়া দোকানের পিছনের ঘরে লইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি বল ত?" পাঁচু কহিল, "চোখ দুটো ছিল কোথায়? ভূপতির শালী এসেছে যে; ঐ গোয়াল ঘরের পাশে দাঁড়িয়ে ছিল।" পাঁচুকে সজোরে জাপটাইয়া ধরিয়া কানাই কহিল, "মাইরী, আজ কার মুখ দেখে উঠেছিলাম। জিতা রও বাবা, কিন্তু খুব সাবধান, একটা ব্যবস্থা করতে হয়।" পাঁচু কহিল, "আরে সেই জন্তেই তো, এ আর দেরীটেরী করা নয়। রাত্রে—দিব্যি অন্ধকার—বেটীর মুখ চেপে ধরে, কাঁধে ফেলে ব্যস্—তারপর নৌকো ধরে কে? আর বেটার বাগানে কলা যা হয়েছে—"

হিঃ হিঃ করিয়া হাসিয়া কানাই পাঁচুর থুতনী নাড়িয়া মাথার উপর হাত তুলিয়া আনন্দে ঘুরপাক খাইয়া লইল।

হঠাৎ উহাদের পরামর্শে বাধা পড়িল। বাহিরে নানা লোকের গলার শব্দ শোনা যাইতেছিল, ঐ দেখা যাচ্ছে—ঐ যে —ঐ যে—

কানাই আর পাঁচু বাহিরে আসিয়া দেখিল, পাড়ার ছেলে, মেয়ে বুড়ো সকলেই হাঁ করিয়া আকাশের দিকে তাকাইয়া রহিয়াছে।

একজন বলিতেছে, এই আমার আঙ্গুল সোজা ঐ তাল গাছটার পাশ দিয়ে দেখ্ না,—দেখছিস্?

—কই না—ওখানে তো বাপু শুধু মেঘ একখানা—

—কানা—আরে ঐ যে—উই—দেখছিস্—

পাঁচু দত্ত, চোখের উপর হাত আড়াল করিয়া কহিল,—কিরে বাপু কি দেখ্‌ছিস—

সকলে সমস্বরে কহিল, উড়ো জাহাজ—উঃ কী শব্দ। শব্দ শোনা যাইতেছে। অনেকটা ভোমরার পাখার শব্দের মত গুণ গুণ আওয়াজ কানে আসিতেছে। বহুদূরে নীল আকাশের বুকে, কালো রেখার মত একখানি এরোপ্লেন দেখা গেল। দেখিতে দেখিতে, কয়েক মুহূর্ত্তের মধ্যে তাহা আরও পরিষ্কার ভাবে দেখা যাইতে লাগিল।

সকলে সমস্বরে বলিয়া উঠিল, ঐ যে—ঐ যে—

ভীষণ আওয়াজ করিতে করিতে এরোপ্লেন খানি সকলের মাথার উপর দিয়া উড়িয়া চলিয়া গেল। ক্রমশঃ দূরে বহুদূরে চলিয়া গেল। গাছের আড়ালে—আর তাহাকে দেখা গেল না।

পাঁচু দত্ত বলিল—ইস্ কি কলই ইংরেজ বানিয়েছে; এ বাবা ভাতখেগো বাঙ্গালীর কর্ম্ম নয়।

আশু গড়াই ঘানির বলদের পিঠে এক ঘা বসাইয়া কহিল, আচ্ছা দা' ঠাকুর জাহাজটা গেল কোথায়। কানাই দাঁতে বিড়িটা চাপিয়া ধরিয়া কহিল, এক ঘণ্টায় দু'শ ক্রোশ চলে যাবে, বুঝলি! এ তোর ঘানির বলদ নয়—

পাঁচু দত্ত হিঃ হিঃ করিয়া হাসিয়া উঠিল।

আশু কহিল,—তা যা বলেছেন, দা'ঠাকুর। কিন্তু আমার এই বলদজোড়া, ঘানিগাছের পাশে, তা কম রাস্তা ঘোরে না! আচ্ছা দা'ঠাকুর, অত বড় ভারী জিনিষ, ওটা আকাশে ভাসছে কি করে—

কৃপানাথ কহিল আবার শুনছি, ওতে মানুষ চড়ে। সবিস্ময়ে আশু কহিল, তাই নাকি দা'ঠাকুর! তা তাদের মাথা ঘোরে না—

রাধাচরণ এক ঘটি জল লইয়া কোন এক বিশেষ কাজে বন পানে যাইতেছিল। মুহূর্ত্ত খানেক থামিয়া কহিল, বাবা যদি একবার কল বেগড়ায় তবে হুড়মুড় করে এসে ভুঁয়ে পড়বে, আর সব ছাতু। ওর চেয়ে বেঁচে থাক আমাদের গরুর গাড়ী—এ বাবা ঠিক সমান তালে চলবে। ওসব শয়তানী ব্যাপার—সব শয়তানী ব্যাপার—

বাড়ীর ভিতর কৃপানাথের মা তার মেয়েকে বলিতেছিল—ওলো ও পাচী, ঐ জাহাজখানা তোর শ্বশুরবাড়ীর গাঁয়ের উপর দিয়ে গেলো।

পাঁচী কহিল—হাঁ মা, ওতে মানুষ চড়ে নাকি?

কি জানি মা—ও সব খিরীস্তানী কাণ্ড বাণ্ড—দে উঠোনে একটু গোবর জল দিয়ে দে—বারজেতে মিন্‌ষেরা উঠোনের ওপর দিয়ে জাহাজ চালিয়ে গেল। ওর ছায়াটা ত পড়েছে,—দে গোবর জল ছিটিয়ে দে—

সন্ধ্যাবেলায় নিতায়ের চায়ের দোকানে চায়ের আড্ডা বেশ জমিয়া উঠিয়াছে। চারিদিকের জানালা দরজা বন্ধ করিয়া মাথা মুখ বেশ করিয়া কাপড়ে ঢাকিয়া সকলে জড়াজড়ি ভাবে বসিয়া আছে।

পাশে উনুনে এক হাঁড়ী জল ফুটিতেছে—চা হইবে।

রাখহরি ঘন ঘন হাঁড়ীর মুখের সরা খুলিয়া দেখিতেছে, জল কতদূর গরম হইল। রাখহরি বিড়-বিড় করিয়া বলিয়া উঠিল—শালার জল গরমই হ'তে চায় না। আর একখানি কাঠ উহুনের মধ্যে ঠেলিয়া দিয়া দুই হাত পা উহুনের মুখে রাখিয়া শীতে হিঃ হিঃ করিতে লাগিল।

শীতে কাঁপিতে কাঁপিতে রাখহরি কহিল, বুঝলেন দাস মশায়, জামাই বেটা আজ এসেছিল। দিলেম খেদিয়ে, শালা বলে কিনা,—আমার বউ পাঠিয়ে দাও। আমি, রাখহরি দাস, বললাম, চল দাসমশায়ের কাছে। বিয়ের আগে যে সব কথাবার্ত্তা হয়েছিল—সে সব চুকিয়ে দিয়ে তোমার বউ নিয়ে যাও, আমার কোন আপত্তি নেই। বলুন, ন্যায্য কথা কিনা।

নিতাই দাস চৌকীর উপর কান, মুখ-মাথা ঢাকিয়া বসিয়াছিল; শুধু ছোট ছোট দুটী চোখ পিট্ পিট্ করিতেছিল।

—তা, কি বললে তোমায় বাবাজীবন—।

এদিকে, চায়ের জল টগ্‌ বগ্‌ করিয়া ফুটিতে সুরু করিয়াছে। একমুঠো গুঁড়ো চা জলের মধ্যে ছাড়িয়া দিয়া, মুখে সরা চাপা দিয়া, কিছুক্ষণ বেশ করিয়া ফুটাইয়া, রাখহরি হাঁড়ীটা নামাইল। কাঁসার গেলাস বাটীতে, চা ছাঁকিতে ছাঁকিতে, রাখহরি কহিল—বাবাজীবন আর বলবে, ঢেঁকী—খুব রোক্ রাখ করতে লাগল—। শেষে বুঝলেন অসহ্য হয়ে উঠলো, দিলাম গলায় হাত দিয়ে খেদিয়ে। তা যাক্—মেয়ের নামে ঐ দুশো টাকার সম্পত্তি আর তিন ভরির গহনা দেবে, তবে মেয়ে পাঠাবো।

হাড়গিলের মত গলাটা লম্বা করিয়া বিশু কামার কহিল, ইয়ে, ভারী তো মেয়ে—ঐ দিয়েছে খুব—

চা খাইতে খাইতে, চায়ের নেশায় রাখহরির চোখ দুটী বুঝি বুজিয়া আসিতেছিল—কিন্তু বিশুর কথায় সজাগ হইয়া বোজা চোখ দুটী যথাসাধ্য বড় বড় করিয়া রাখহরি বলিল, কি বললি বিশে—মেয়ে আমার কেলনা নাকি। যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা—পাজী নচ্ছার—হাঁহাকা। বিশু কামার গলা আরও চড়াইয়া কহিল—খবর্দার, মুখ সামলে রেখো।

সেই দুরন্ত শীতে, রাখহরি গায়ের কাপড় কোমরে জড়াইয়া, চীৎকার করিয়া বলিল, মারবি নাকি তুই? চলে আয় বিশে। আমার মেয়েকে তুই যা ইচ্ছে তাই বলবি—বেটা কামার—।

নিতাই দাস গাঁজার কলকেটা রাখহরির দিকে বাড়াইয়া দিয়া কহিল,—আহা থাক না, খুব হয়েছে।

রাখহরির সব ক্রোধ জল হইয়া গেল। নিশ্চিন্তমনে গায়ে বেশ করিয়া কাপড় জড়াইয়া, তোবড়ান গালে দুই চারিবার সজোরে গাঁজায় টান দিয়া, কলিকাটী বিশুর হাতের কাছেই বাড়াইয়া দিল।

আশ্চর্য্য, বিশু কিন্তু কোন আপত্তি করিল না। দেখা গেল, পরম শান্ত মুখে, বড় বড় করিয়া দুই তিন টান দিয়া শিবু ঘোষের হাতে কলিকাটী দিয়া, বিশু অল্প অল্প করিয়া শূন্যে ধোঁয়া ছাড়িতেছে।

বংশলোচন নিতায়ের দোকানে জিনিষপত্র বিক্রী করে।

সকাল বেলা, সবেমাত্র নিতাই দোকান খুলিয়া চায়ের কাপে চুমুক দিয়াছে, এমন সময় বংশ যে কথা শুনাইল, তাহাতে, নিতায়ের হাত হইতে চায়ের কাপ প্রায় খসিয়া যায় আর কি।

সুপতি কৈবর্ত্ত আর বুঝি বাঁচে না।

নিতাই বলিল, "বলিস কি রে। কার কাছে শুনলি অ্যাঁঃ—"

বংশ বলিল, "ওদের বাড়ীর কাছ দিয়েই আসছিলাম কি না—এখন কি হবে বাবা,—ওর কাছে যে অনেক টাকা পাওনা।"

যা-যা শিগ্‌গীর যা। দেখ, দু' চার মণ পাট, শন্ আছে কি না। যদি থাকে, আমায় খবর দিবি—

সুপতির মরিবার বয়স নয়। বয়স বোধ হয় ত্রিশ, কিন্তু আজ এই বয়সেই তাহাকে মরিতে হইতেছে। অর্দ্ধাশন, অনাহার, বিনা চিকিৎসায় কতদিন কাটাইয়া দিয়াছে। রোগে পথ্য পায় নাই, ঔষধ পায় নাই; রুগ্ন শরীরে লাঙ্গল ঠেলিয়াছে, ইহার উহার দুয়ারে কাজ করিয়াছে।

মাথার উপর সংসারের ভার—তাহার উপর মহাজনের দেনা—খাজনা, ট্যাক্স।

সমস্ত বৎসর চাষ আবাদ করিয়াছে, কিন্তু হয় বন্যায়, অথবা অনাবৃষ্টিতে কিছুই ফসল হয় নাই। কিন্তু, খাজনা—

ট্যাক্স, মহাজনের সুদ সবই দিতে হইয়াছে। রাজা ছাড়িবে কেন!

শ্রাবণ ভাদ্র মাসে, মাথার উপর দিয়া বাজ হাঁকিয়া গিয়াছে, অঝোর ধারায় বৃষ্টি পড়িয়াছে। কিন্তু কোনদিকে দৃক্‌পাত করে নাই। উদয়াস্ত পর্য্যন্ত এক কোমর জলে, কাদায় দাঁড়াইয়া প্রাণপাত পরিশ্রম করিয়া, যে সোনার ফসল মাঠে ফলাইয়াছে, তাহা তাহার ঘরে উঠে নাই। তাহাদের ক্ষুধিত দৃষ্টির সম্মুখ হইতে তাহাদের অনন্ত আশার সামগ্রী—তাহাদের স্ত্রী-পুত্র কন্যাদের ক্ষুধার সামগ্রী—নিজের বুকের বিন্দু বিন্দু তপ্ত রক্তের তৈরী ফসল,—সবই মাঠ হইতে মহাজনের ঘরে উঠিয়াছে।

মহাজনের খাতায় সুদ বাড়িতেছে, দেনার অঙ্ক ভারী হইতেছে। পৃথিবীতে এই সব নিরন্ন হতভাগ্যদের মাথা গুঁজিবার জন্য সামান্য একটা চালাঘর নাই, একমুঠো খাদ্য পাইবার জন্য কোথাও এক হাত নিজস্ব জমি নাই। ইহারা নিরন্ন, নিঃস্ব, রিক্ত, সর্ব্বহারা! যেন ইহারা চিরকাল সমগ্র পৃথিবীর ক্ষুধার উপকরণ তৈয়ারী করিবার জন্য জন্ম লইয়াছে! কিন্তু এক মুঠো অন্নে ইহাদের যেন কোন অধিকার নাই।

মানুষ বুঝি সভ্য হইতেছে। মানব-সমাজ মানব-সভ্যতা বুঝি ক্রমশঃ অগ্রসর হইতেছে। ইহাদের নিরন্ন রাখিয়া, নিরক্ষর রাখিয়া, আশ্রয়হীন, অন্নহীন, সহায়হীন, হা-ঘরে করিয়া মানবসভ্যতা কি অগ্রসর হইতে পারিবে! ইহাদের ক্ষুধিত ক্রন্দনে সভ্যতার গতি-চক্র কি থামিবে না!

(৬)

কয়দিন হইতে ভূপতির শালীকে আর পাওয়া যাইতেছে না। ইহার উপর একদিন গভীর রাত্রে ভূপতির ঘর পুড়িয়া গেল। সকলে ভীড় করিয়া আসিল—কিন্তু আগুন নিভিল না। সর্ব্বগ্রাসী হুতাশন ভূপতির সব ক'খানি ঘর ভস্মীভূত করিয়া তবে শান্ত হইল। ভাগ্য ভাল যে, আগুন আর কোথাও ছড়াইয়া পড়িল না।

ভূপতির বৌ ছেলে মেয়ে দুটীর হাত ধরিয়া, সেই দগ্ধ ভিটাতে বসিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতে লাগিল, ভগবান্, তুমি যদি থাক—তবে এর বিচার করবে। লোক আসিল, মুখে সহানুভূতি দেখাইয়া চলিয়া গেল। কিন্তু একটু আড়ালে যাইয়া বলিতে লাগিল—দাদা, ভূপতির সে কাজটা ভাল হয়নি। শুক্ বেরাম্‌হ্মণের গায়ে হাত দে'য়া, সে কি সহজ কথা!

দোকানে বসিয়া কানাই মুখুয্যে আর পাঁচু দত্ত মুচকী মুচকী হাসিতে থাকে।

পদ্মরাণী ফিরিয়া আসিল, একদিন ভূপতি তাহাকে অপমান করিয়াছিল, মারিয়াছিল—একদিন ঐ ভূপতির বৌ তাহাকে কত লাঞ্ছনা গঞ্জনা দিয়া ভূপতিকে তাহার বিরুদ্ধে উৎসাহিত করিয়াছিল, সে সব ভুলিয়া পদ্মরাণী ফিরিয়া আসিল। তাহার আবাল্য পরিচিত বাপ মার স্মৃতি জড়িত ভিটাখানির দিকে চাহিয়া, আঁচলে চোখ মুছিয়া ডাকিল—বৌ—

ভূপতির বৌ সব ভুলিয়া, তাহাকে জড়াইয়া ধরিল। চোখের জলের মাঝে সমস্ত কলহ, মনোবেদনা, অভিমান দূর হইয়া গেল! ভূপতির ছোট মেয়েকে কোলে তুলিয়া পদ্ম কহিল, ভাবনা নেই বৌ। ভূপতিকে আমি জেলে যেতে দেব না—তার ব্যবস্থা করেছি। উকীল বলেছে, এই প্রথমবার জরিমানা হ'বে। যা জরিমানা হয়, তা আমি দিয়ে দেব। আজ ধরামি আসবে, আবার নতুন ঘর হবে। হাঁ রে, কুসুমের কোন খবর পেলি—পাসনি? পদ্ম একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া, কহিল তুই কাঁদিসনে, রান্নার উয্যুগ কর তো দেখি। আমি গরুটা দুয়ে ফেলি—বলদ দুটোকে খড় জল দিই। হাত চালিয়ে সব করেনে—ধরামি এল বলে। ভূপতির বৌ হঠাৎ হেঁট হইয়া পদ্মার পা ধরিয়া কহিল, দিদি, আমায় মাফ করো—

নিমেষের মধ্যে তাহাকে বুকের মধ্যে টানিয়া লইয়া পদ্ম কহিল,—এ আবার কি ঢং লো, নে চোখ মোছ। উনুনে কাঠ দে দুধ দুয়ে দিচ্ছি, ছেলে মেয়ে দুটোকে একটু গরম করে খেতে দে। আচ্ছা বৌ—। উনুন ধরাইতে ধরাইতে ভূপতির বৌ কহিল, কি দিদি! জানিস এ সব কারা করেছে, বুঝেছিস—

ভূপতির বৌ কহিল, বুঝেছি দিদি, ঐ দা'ঠাকুর আর পেঁচো দত্ত। পদ্ম কথা কহিল না।

কিছুক্ষণ নিঃশব্দে কাটিলে, পদ্ম কহিল, বৌ তোর অজানা কিছু নেই। পাপ মুখে বলতেও দোষ। কিন্তু যে কাজ

করেছি, তা বলতে আর দোষ কি! মুখুয্যেকে সত্যি ভালবাসি—অনেক সময় মনে ধিক্কার আসে। এর জন্তে এত লজ্জা এত লাঞ্ছনা—না, আর ওদিকে যাইব না—আর কথা পর্য্যন্ত বলব না। কিন্তু বৌ থাকতে পারিনে—পোড়া বুক টন্ টন্ করে উঠে। জানি ও বদ্‌মায়েস, মাতাল, চোর সব জানি। তবুও ওকে না দেখতে পেলে, আমার দিনরাত আঁধার হয়ে আসে। এ পোড়া মন নিয়ে কোথায় যাব বলতো বৌ?

ভূপতির বৌ আপন মনে দুধ জাল দিতে লাগিল।

মৃদু নিঃশ্বাস ফেলিয়া পদ্ম বলিল—কিন্তু বৌ, এতবড় অত্যাচার, এতবড় পাপ কাজ, আমি হাজার মন্দ হই তবুও সহ্য করতে পারব না—এ তুই দেখে নিস্।

ভূপতির বৌ চোখ তুলিয়া তাকাইয়া দেখিল, পদ্মরাণীর সমস্ত মুখ চোখের চেহারা বদলাইয়া গিয়াছে—এ যেন অন্য মানুষ।

পদ্ম কহিল —কুসীকে ওরাই সরিয়েছে—ঘরে আগুন ওরাই লাগিয়েছে, আর আজ ভূপতিকে মিথ্যে করে, ষড়্‌যন্ত্র করে, থানা পুলিশ ওরাই করিয়েছে। আমিও সহজে ছাড়ব না বৌ। হোক না কেন—আমি ওকে ভালবাসি কিন্তু যাকে ভালবাসি, তার এতদূর মতিচ্ছন্ন আমি সহ্য করতে পারব না। অন্যায় সহ্য করা—এও যে পাপ। যে পাপ কাজ করে তার যেমন শেষে দুঃখের সীমা থাকে না—আর সেই পাপ কাজ যে সহ্য করে, সেও পাপী। তারও দুঃখের সীমা থাকে না বৌ। এর বিহিত আমি করবই।

পাঁচু দত্ত সেই পথ দিয়া যাইতেছিল। পথ হইতে পদ্মকে দেখিয়া হাসিতে হাসিতে কাছে আসিয়া কহিল—বাঃ, এই যে আবার জোটা হয়েছে। বলি পদ্মরাণীর আগমন কখন হ'ল?

ভূপতির বৌ কোন কথা কহিল না, পদ্ম একমুহূর্ত্তে কি ভাবিয়া, গম্ভীর হইয়া হাসিয়া কহিল—এসেছি কিছু আগে—দাঁড়িয়ে কেন, আর বসতেই বা কিসে দেব—

হিঃ হিঃ করিয়া হাসিয়া পাঁচু কহিল—আহা আমার বসার জন্তে এত ব্যস্ত কেন। এই এখানেই বসছি। তারপর, এদিকের সবই শুনেছ তো।

সত্যই এসব কে করলো বল দেখি—কি সব অন্যায় কাজ। এই ঘর পুড়ে গেল—মেয়েটাকেই বা কে নিয়ে গেল! —ওদিকে ভূপতি হাজতে। তোমরা দুটো মেয়ে লোকে কি কর্বে, বলত?—

পাঁচু দত্তর মুখের কথা শেষ হইল না—অকস্মাৎ 'বাপরে' বলিয়া চীৎকার করিয়া মাটিতে পড়িয়া গেল। পদ্ম তখন মোটা একগাছি—লাঠি লইয়া পাঁচু দত্তের শরীরে, যেখানে সেখানে পাগলের মত ঠেঙ্গাইতে সুরু করিয়াছে। মাথা ফাটিয়া দর্ দর্ করিয়া রক্ত ঝরিতেছে—কোনমতে, দুই হাত দিয়া লাঠির আঘাত ঠেকাইবার বৃথা চেষ্টা করিতেছে।

পাগলের মত লাঠি চালাইতে চালাইতে, পদ্ম বলিতে লাগিল বল, কোথায় কুসুমকে রেখেছিস্ বল। নইলে আজ মেরেই ফেলব—বল শীগ্‌গির। আর কখনও ঘরে আগুন দিবি—রাত্রে লুকিয়ে মদের বোতল রাখবি—পাজী ছুঁচো—বদ্‌মায়েস—বল কুসুম কোথায়।

পদ্মর সহিত ভূপতির বৌও যোগ দিয়াছে—মারের চোটে কুসুমের সন্ধান পাঁচু বলিয়া দিল।

হাতের লাঠিগাছটা দূরে ফেলিয়া পদ্ম কহিল—এ যদি মিথ্যে হয়, আবার ঠেঙ্গানি খাবি। ভেবেছিস্ কেউ তোদের কিছু করতে পারবে না। মার খেয়ে শিখে রাখ—পদ্মী চাষানী তোর মত পাজী কুকুরকে জুতো মেরে শায়েস্তা করতে পারে। চারিদিকে তখন লোকে ভীড় করিয়া দাঁড়াইয়াছে।

পাঁচু দত্তের এ হেন দুর্দ্দশায় সকলেই যেন আনন্দিত হইয়াছে। সকলের মুখ দেখিয়া তাহাই মনে হইতে লাগিল।

চারিদিকে একবার তাকাইয়া পাঁচু কহিল—আমি থানায় যাব। অশ্বিনী ছুতোর তাহার মুখের কাছে, হাত নাড়িয়া বলিল, পুলিশেই যাও আর খোদ হাকিমের কাছেই যাও, কোন প্রাণী তোমার হয়ে সাক্ষী দেবে না। তোমাদের অন্যায় অত্যাচার কেন আমরা সহ্য করব।— ও লোকটার ঘরে আগুন দেওয়া, মেয়েটাকে রাত্রে চুরি করে নিয়ে যাওয়া, ভূপতিকে মিথ্যেমিথ্যি হাজতে পোরা, এ সব বুঝি কেউ ধরতে পারে না ভেবেছ। ভেবেছ গাঁয়ে মানুষ নেই—পাজি নচ্ছার কাঁহাকো! চোর, বদমাস! অশ্বিনী মারে আর কি—

অশ্বিনীর বিশাল বুকের ছাতি দেখিয়া পাঁচু চুপ করিয়া রহিল।

—পুলিশের গোয়েন্দা কোথাকার। তোর মুখে থুঃ—শতেকবার থুঃ। সত্যই অশ্বিনী পাঁচু দত্তের মুখের উপর এক থ্যাবড়া থুতু ফেলিয়া দিল।

সকলে হোঃ হোঃ করিয়া হাসিয়া উঠিল। কানাই মুখুয্যে দূর হইতে দেখিয়া আস্তে আস্তে সরিয়া পড়িল।

পাঁচু দত্ত এবং কানাই মুখুয্যের উপর লোকের কিছুমাত্র সহানুভূতি নাই। লোকের গাছের আম—কাঁঠাল বা ঘটীবাটী, এমন কি গহনা কাপড়চোপড় উহারা বহুবার চুরি করিয়াছে। কোনবার ধরা পড়িয়াছে, হাতে পায়ে ধরিয়া মীমাংসা হইয়াছে, অথবা কোন বার ধরা পড়ে নাই। কিন্তু লোকে কোনদিন উহাদের ভাল চোখে দেখে নাই। বদমায়েস গুণ্ডা প্রকৃতি বলিয়া—কেহ উহাদের কোন কিছু বলিতে সাহস করে নাই, কিন্তু আজ পাঁচু দত্তের এই দুর্দ্দশায় প্রত্যেকের সেই অজানা ভয় ভাঙ্গিয়া গিয়াছে।

আজ সকলেই বুঝিল, এতদিন তাহারা মিথ্যা ভয় করিয়া উহাদের নানা অত্যাচার সহ্য করিয়া আসিয়াছে। চাষী-পাড়ার সকলেই বলিয়া উঠিল—আমরা বাপু কেউই সাক্ষী দেব না। আর দেখব—কোন্ ভাই তোমাদের হয়ে সাক্ষী দেয়।

ভূপতির বৌ কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, তোমরাই বিচার কর, বিনি দোষে ওকে হাজতে পাঠিয়েছে, রাত্রে ঘর জ্বালিয়ে কুসীকে চুরী করে নিয়ে গেছে—এর বিহিত তোমরা কর। পাঁচু দত্ত উঠিয়া, মাথার রক্ত মুছিতে মুছিতে চলিয়া গেল। একজন বলিল, বোধ হয় থানায় যাবে।

পদ্ম গর্জ্জিয়া কহিল, যাক্ যে চুলোয়; ওর ভয়ে আমি মরে যাব না। ভগবান যদি থাকে, এখনও যদি দিন রাত ঠিক মত হয়, তবে কলিকালেও সূক্ষ্ম বিচার হ'বে।

অশ্বিনী ছুতোর বলিল, "এ সব হৈ চৈ করার কাজ নয়। যাক না কেন থানাতে, আমাদের এখান থেকে জনপ্রাণী সাক্ষী দেবে না। মোড়ল বাড়ী ফিরে আসুক, তখন আমি, ছিনাথদা, ফকিরদা মিলে সলাপরামর্শ করব। কোন ভাবনা নেই!" ভীড় ক্রমশঃ পাতলা হইয়া গেল।

[ক্রমশঃ

পল্লী-শ্মশানে

-শ্রীনকুলেশ্বর পাল

আবার এসেছি ফিরে;
সাত পুরুষের সোণার ভীটায়
ভাসিয়া অশ্রুনীরে।
পথে ঘাটে লোক চলেনা কো আর
চারি দিকে আজি শুধু হাহাকার
পল্লীমায়ের ভাণ্ডার লুটি
নিঃস্ব করিল কী রে?
পল্লীর সাথে বাংলার ভালে
সন্ধ্যা নামিছে ধীরে।
শুধু আছে হেথা খালি গোলাবাড়ী
নাইকো গোলায় ধান,
পল্লীবাসীরা কঙ্কাল দেহে
কোন মতে ধরে প্রাণ।
ঐ দেখা যায় ভাঙ্গা পাঠশালা,
রথ নাহি আর—আছে রথতলা,
বারোয়ারী মাঠে বসেনা যে মেলা
জঙ্গলে আছে ঘিরে,
সারা গ্রামখানি ধু ধু করে হায়
স্মৃতিটুকু বহি শিরে।

ছিল যে হেথায় খাল বিল ভরা
স্ফটিক-স্বচ্ছ-জল,
আজ সেথা আছে ব্যথামাখা শুধু
পল্লীর আঁখি জল।
খেয়াঘাট আছে—খেয়া নাহি চলে;
এই কি রে ছিল পল্লীর ভালে?
মিটি মিটি জলে ভাঙ্গা নায়ে দীপ
শুষ্ক নদীর তীরে,
শৈশবে কি যে দেখিয়া গিয়াছি—
দেখিতেছি কিবা ফিরে।
গ্রাম্য দেবতা মন্দিরে আর
জলেনা সাঁঝের বাতি
শঙ্খ-ঘণ্টা বাজেনা হেথায়
মুখরিত দিবা রাতি।
সন্ধ্যা-প্রদীপ তুলসী তলায়,
কেহ নাহি দেয় পোড়া বাংলায়,
পল্লীমায়ের এ মহা শ্মশানে
আঁধার ফেলিছে ঘিরে;
সহরের মায়া-মরিচিকা কাটি
আয় দলে দলে ফিরে।

যাত্রা

—শ্রীহেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত

যাত্রা আমাদের দেশের একটী প্রধান আমোদ। এখনও মনে আছে, বাল্যকালে বহু দূরেও যাত্রা শুনিতে যাইতাম। যাত্রার কথোপকথন, যাত্রার গান, ও যাত্রার সঙ সবই আকর্ষণের বস্তু ছিল। কিন্তু তখনও যাহা শুনিতাম, তাহা নূতন যাত্রা। নূতন ও পুরাতন যাত্রায় বিশেষ পার্থক্য ছিল। নূতন যাত্রা হইত কতকটা থিয়েটারের অনুকরণে, পুরাতন যাত্রা হইত কৃষ্ণবিষয়ক। ইহাতে ভক্তির ভাবই বেশী প্রকটিত হইত।

আমাদের দেশে যাত্রা অনেকটা আধুনিক হইলেও, ইহার জন্মকাল কিন্তু প্রায় হাজার বৎসর আগে। তৎপূর্ব্বে নাট্যাভিনয় ভারতীয় কৃষ্টির একটী প্রধান অঙ্গ ছিল। রামায়ণ মহাভারতের যুগ ছাড়িয়া দিলেও মহামনীষী ভাস, কালিদাস, শূদ্রক ও ভবভূতি প্রভৃতি প্রধান প্রধান নাট্যকার কেবল ভারতেরই নয়, জগতের কবি ও নাট্যকারদের মধ্যেও শ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিগণিত। অনেকে পণ্ডিত কালিদাস ও সেক্সপিয়রের মধ্যে কে অধিকতর শ্রেষ্ঠ তাহা প্রমাণ করিতে বিশেষ তথ্যানুসন্ধান করিয়াছেন। এই সমস্ত শ্রেষ্ঠ নাটক ছাড়িয়াও অনেকের রচিত নাটক পল্লীতে পল্লীতে অভিনীত হইত।

কালক্রমে মুসলমানরাজ্য প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গেই থিয়েটারের অস্তিত্ব প্রায় বিলুপ্ত হয়। আবার ইংরাজ রাজত্বের প্রারম্ভে নাটকাভিনয় প্রবর্ত্তিত হয়। আজও বাঙ্গলা নাটক যে অভিনীত হইতেছে, তাহা ইংরেজের থিয়েটারের অনুকরণে। তথাপি বলিতেই হইবে যে, নাটক প্রাচীন ভারতের নিজস্ব সম্পদ্। মুসলমান নৃপতিগণ ধর্ম্মবিগর্হিত বলিয়া নাটকাভিনয় বন্ধ করিয়া দেন। তবে এই ক্ষতির পূরণ হয় অন্যদিকে—কিন্তু তাহা কতকাংশে বটে। সেকথাই এখন বলিব।

১১৯৯ খৃষ্টাব্দে বক্তিয়ার খিলিজি বাঙ্গালা দেশ অধিকার করেন। ইহার দশ বৎসর পূর্ব্বে দিল্লীশ্বর পৃথ্বীরাজ মহম্মদ নিকট পরাভূত হন। ইহার ৫৪৪ বৎসর পরে বাঙ্গালা দেশ ইংরেজদের হাতে আসে, আর তাহার শতাধিক বৎসর পরে বাঙ্গালা নাটক সর্ব্বপ্রথম অভিনীত হইতে আরম্ভ হয়। এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, এই দীর্ঘ সার্দ্ধ ছয়শত বৎসর কাল কি বঙ্গবাসীর কোন আমোদ প্রমোদের বিষয়ই ছিল না?

সত্য বটে, মুসলমান প্রভাবে নাটকের অধোগতি হইয়াছিল, কিন্তু একদিকে রাজসমাদরে যেমন কলাবতী গানের উন্নতি হইতে লাগিল, তেমনি আর একদিকে চৈতন্য দেবের আবির্ভাবে এবং ভক্ত কবিগণের ভক্তির উচ্ছ্বাসে বাঙ্গালায়ও যাত্রা, কবি প্রভৃতির অভ্যুদয় হইতে আরম্ভ করিল। বাহ্যতঃ নাটক ও যাত্রা উভয়ই প্রায় এক প্রকার; তবে যাত্রায় রঙ্গমঞ্চ, দৃশ্যপট ও যবনিকার আবশ্যক নাই, গানের আধিক্য বেশী। সকলে এক আসরে বসিয়া গান বাজনা করে এবং দুই তিন জন দাঁড়াইয়া সঙ্গীত ও উত্তর প্রত্যুত্তর দ্বারা বক্তব্য বিষয় প্রকাশ করে। কিন্তু বাহ্যিক কতকটা সাদৃশ্য থাকিলেও পরস্পরের উদ্দেশ্য বিভিন্ন। যাত্রার উদ্দেশ্য রসপুষ্টি, নাটকের উদ্দেশ্য চরিত্র-সৃষ্টি। সংসার কর্ম্মভূমি, কর্ম্মী নর আপনাকে ভাঙ্গে, গড়ে এবং কর্ম্মের ভিতর দিয়া আত্মবিকাশ করে। ক্রিয়াবান্ নাটক এইজন্যই মানবের অধিকতর হৃদয়গ্রাহী। ক্ষুদ্র রঙ্গালয় মহানাট্যশালার অনুকৃতি মাত্র:—

All the world's a stage
All the men and women are mere players.
—"As you like it".

প্রাচীন ভারতের অভিনয়-গৌরব মুসলমান আধিপত্য কালে বিলুপ্ত হইলেও যাত্রাদির মধ্যেই হিন্দু-নাট্যকলা বাঁচিয়া ছিল। বস্তুতঃ যাত্রাই দেশীয় নাট্যাভিনয়।

যাত্রা বহুদিন হইতেই আমাদের দেশে প্রচলিত। প্রাচীনকালে যাত্রা অর্থে দেবতার সম্মানের জন্য কোনও উৎসবকে বুঝাইত। জগন্নাথ দেবের যাত্রা (স্নানযাত্রা, রথযাত্রা ও পুনর্যাত্রা) হইতে এই উৎসব নামকরণ হওয়া সম্ভব। ভরত-নাট্যশাস্ত্রে যাত্রার উল্লেখ আছে। ভবভূতির মালতীমাধবেও 'যাত্রা' শব্দের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। উৎসব এবং পারিভাষিক উভয়

অর্থেই যাত্রা শব্দ ব্যবহৃত হয়। ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় এবং পৌরাণিক বিষয় লইয়াই যাত্রাভিনয় অনুষ্ঠিত হইত। ধর্ম্ম ও সামাজিক উৎসব উপলক্ষে যাত্রাভিনয় অনুষ্ঠিত হইত। থিয়েটারের ন্যায় যাত্রাও দেবপূজা সংক্রান্ত উৎসবাদি হইতে উৎপন্ন। যে অবস্থায় ইউরোপে 'মিষ্টিরিজ' আরম্ভ হইয়াছিল, বাঙ্গালায় সেই অবস্থাতেই বোধ হয় যাত্রা আরম্ভ হয়। অনেকে মনে করেন "যাত্রা হইতে থিয়েটারের উৎপত্তি। 'ললিত-বিস্তার' বুদ্ধদেবের অভিনয়-প্রীতি সম্বন্ধে যে উল্লেখ আছে, তাহা থিয়েটার সম্বন্ধে নহে, যাত্রা সম্বন্ধে। বৈদিক স্তোত্রাদি ও কথোপকথন ও তাঁহাদের মতে যাত্রারই প্রারম্ভ সূচনা করিতেছে।"১

আমরা কিন্তু এই সকল মনীষীদিগের সহিত একমত হইতে পারিলাম না। বস্তুতঃ যাত্রা এবং থিয়েটারের মূল এক হইলেও আর্য্য-সভ্যতা এবং উহার উচ্চ আদর্শের প্রভাবে শ্রেষ্ঠতম কলাবিদ্যাই নাট্যশাস্ত্র, নাট্যশালা এবং হিন্দুনাটকের অভিনয়ের মধ্যে ফুটিয়া উঠিয়াছে। আর বিরুদ্ধ সভ্যতার আঘাতে তাহা ম্লান হইয়া যাত্রার আকারে অন্তদিকে রূপান্তরিত হইয়া আপনার প্রাধান্যকে জাগ্রত করিয়া তুলিয়াছে। থিয়েটার পূর্ব্বেও ছিল, এখনও আছে। যাত্রা কেবল মধ্যযুগে প্রচলিত ছিল মাত্র। মুসলমান আমলে যখন নাটকাভিনয় নিষিদ্ধ ছিল, তখন ধর্ম্ম বা পুরাণমূলক উপাখ্যান 'যাত্রা'র আকারে অভিনীত হয়। ইহাই যাত্রার উৎপত্তি। ঐ যাত্রার গতি ও আদর্শ ছিল সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। থিয়েটারের আদর্শে এখন যে যাত্রার অভিনয় হইতেছে, তাহার সহিত পূর্ব্বকালের যাত্রার সম্বন্ধ খুব কম। থিয়েটার ও যাত্রা উভয়ের উৎপত্তির মূল এক হইতে পারে কিন্তু যাত্রা থিয়েটারের কারণ নয়। এই অধ্যায়ে আমরা যাত্রার পৃথক্ গতিধারা নিরূপণ করিতে প্রয়াস পাইব

প্রাচীন বাঙ্গালার যাত্রা শক্তিপূজার সহিত বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট ছিল। শুম্ভনিশুম্ভ বধ, বা অন্য কোন অসুর বধের উপাখ্যান লইয়া যাত্রাগানের পালা রচিত হইত। এক হিসাবে "মার্কণ্ডেয় চণ্ডী"কে আমরা যাত্রার মূল নাট্য-সাহিত্য হিসাবেও গণ্য করিতে পারি। চণ্ডীতে মধুকৈটভ, মহিষাসুর এবং শুম্ভ-নিশুম্ভ বধের কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। মধু-কৈটভকে বধ করেন বিষ্ণু এবং মহিষাসুর ও শুম্ভ-নিশুম্ভকে বধ করেন স্বয়ং চণ্ডী। কৃষ্ণযাত্রা আরম্ভ হয় গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম্মের অভ্যুত্থানের পর হইতে। শ্রীচৈতন্যদেবের প্রচেষ্টা ও সাধনায় সরস বৈষ্ণব ধর্ম্ম যখন যুগধর্ম্ম রূপে বাঙ্গালায় সমাদৃত হয়, তখন হইতে কৃষ্ণযাত্রা বাঙ্গালার সর্ব্বত্র প্রসার লাভ করে। জয়দেবের "গীতগোবিন্দ" এবং তদনুকরণে রচিত কবিতা ও রাধাকৃষ্ণের লীলাবিষয়ক গান, চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতির পদাবলী প্রভৃতি যাত্রার ভাব ও বিষয়ের পুষ্টিসাধন করিয়াছে। জয়দেবের গীতগোবিন্দে রাধাকৃষ্ণ ও সখীর কথাবার্ত্তা আছে। কৃষ্ণযাত্রার বিষয়ও প্রায় সেইরূপ। পূর্ব্বরাগ, মিলন ও বিরহ লইয়া যাত্রার পালা রচিত হইত। এই সকল ভাবরসেই যাত্রার আসর জমিত আর দর্শকবৃন্দ রাধাকৃষ্ণের প্রেমরস পান করিয়া ভক্তিস্রোতে ভাসিয়া যাইতেন, তাঁহাদের গণ্ড বহিয়া অশ্রু প্রবাহিত হইত, কখনও বা বাহ্যজ্ঞান লুপ্ত হইত।

প্রথমে শক্তিযাত্রাই যে প্রচলিত ছিল, একথা আমরা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি। কিন্তু "শক্তিযাত্রা" এই নামটি প্রথমে ছিল না, শুধু 'যাত্রা' বলা হইত। কৃষ্ণযাত্রা প্রচলিত হওয়ার পর উহার নাম হইল কালীয়দমন। কৃষ্ণ-যাত্রা মাত্রেই কালীয়দমন। 'দান' হউক, 'মান' হউক, 'মাথুর' হউক কিম্বা যে পালাই হউক, লোকে সকল পালাকেই কালীয়দমন বলিতে লাগিল এখন পর্য্যন্তও অনেকে এই নাম ব্যবহার করিয়া থাকেন। কৃষ্ণযাত্রার নাম কালীয়দমন কেন হইল, তাহার একটা সুন্দর ইতিহাস আছে। এই সময়ে একজন বৈষ্ণব যাত্রা অভিনয়ের জন্য একটি বেশ সুন্দর নূতন পদ্ধতি অবলম্বন করিয়াছিলেন। একটি পুষ্করিণীকে বেশ সুন্দররূপে সজ্জিত করা হইত। ইহার নাম রাখা হইয়াছিল কালীয় হ্রদ। পুষ্করিণীর মধ্যস্থলে একটি প্রকাণ্ড অজগর সর্প নির্ম্মাণ করা হইত। এই অজগর সর্পের নাম কালীয়নাগ।

১ 1 E. P. Harritz :—"Even the Vedic age knew Jatras, a venerable heirloom of Aryan antiquity. The gods of the Rigveda were hymned in choral procession. Some of the Samveda-hymns re-echo the rude mirth of the primitive yatra-dances.'

The Indian Theatre P. 178 Foot note.

Dr. Hertel regards the yatras of Bengal as constituting a distinct age in the evolution of Indian drama.

জলের উপরে কালীয়নাগের বিশাল ফণা বিস্তৃত, আর এই ফণার উপর শ্রীকৃষ্ণ দাঁড়াইয়া বাঁশী বাজাইতেন আর মধ্যে মধ্যে নৃত্য করিতেন। শ্রীকৃষ্ণ-নৃত্য-পীড়নে কালীয় নাগের প্রাণ কণ্ঠাগত। চারিদিকে কালীয়নাগের স্ত্রীগণ জল হইতে অর্দ্ধোত্থিত হইয়া করযোড়ে শ্রীকৃষ্ণকে মিনতি করিতেছে,—কখনও কথায় কখনও বা গীতে। নিকটে এক মাচার উপরে মৃদঙ্গ, করতাল, খরতাল, বাজিতে থাকিত এবং যাত্রাওয়ালারা বসিয়া "দোয়ার্কি" করিত। এই যাত্রা অভিনয় লোকের খুব ভাল লাগিয়াছিল এবং 'কালীয়দমন' নামটাতে সকলে বেশ অভ্যস্থ হইয়া গিয়াছিল। তারপর কালীয়দমন ছাড়িয়া কৃষ্ণযাত্রার অন্যান্য পালা যখন আরম্ভ হইল, তখনও লোকে সেই কালীয়দমন নামই ব্যবহার করিতে লাগিল। কালীয়দমন কৃষ্ণযাত্রা, লোকে বুঝিল কৃষ্ণযাত্রা হইলেই কালীয়দমন।২

অনেক দিন হইল কালীয়দমন যাত্রা একপ্রকার লোপ প্রাপ্ত হইয়াছে। চৈতন্যদেবের পর ইহার জন্ম, রাজা রামমোহন রায়ের পর ইহার মৃত্যু। কালীয়দমন প্রায় চারিশত বৎসর কাল জীবিত ছিল।৩

চৈতন্যদেবের সময় হইতে আরম্ভ করিয়া ১৮৪০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত প্রায় ৩০০।৩৫০ বৎসর কাল কালীয়দমন যাত্রার অভিনয় কাল ধরা যাইতে পারে। ইহার পূর্ব্বে শক্তিযাত্রা, চণ্ডীর গান, মনসার গান প্রভৃতির প্রচলন ছিল। চৈতন্য-দেবের আবির্ভাবের পূর্ব্বেও যাত্রাগান হইত, কিন্তু সে সমস্ত প্রায়ই শক্তি বিষয়ক, কৃষ্ণযাত্রার তখন সূত্রপাতই হয় নাই।৪ পূর্ব্বোক্ত ভাবে সব যাত্রাই কালীয়দমন যাত্রা নাম পরিগ্রহ করিবার পরে আবার শক্তিযাত্রাও মাঝে মাঝে হইতে লাগিল। তখন কৃষ্ণবিষয়ক যাত্রার নাম হইল কৃষ্ণযাত্রা আর শক্তি বিষয়ক যাত্রার নাম হইল শক্তিযাত্রা।

নাটকের প্রথমে যেমন নান্দীমুখ, যাত্রার প্রথমেও তেমনি গৌরচন্দ্রিকা। রূপ গোস্বামী তাঁহার "বিদগ্ধমাধব" ও "ললিতমাধব" নাটকের শুরুবন্দনায় চৈতন্যদেবের স্তুতি করিয়াছেন। তৎকালে গৌরবন্দনা মাঙ্গলিক কার্য্যের একটি আবশ্যকীয় অঙ্গ ছিল—বিশেষতঃ গীতবাদ্য অভি-নয়াদিতে। এই বন্দনাই গৌরের উদ্দেশ্যে নিবেদন বা গৌরচন্দ্রী। সকল যাত্রাতেই এই প্রথা বিদ্যমান ছিল। যাত্রা মহাপ্রভুর সময়েই প্রবর্ত্তিত হউক বা তাঁহার পূর্ব্ব হইতেই প্রচলিত থাকুক, এই মঙ্গলাচারণ বা গৌরচন্দ্রী হইতেই যাত্রা গানে চৈতন্যদেবের প্রভাব বিশেষভাবে উপলব্ধি করিতে পারা যায়।

যাত্রার ধারাবাহিক ইতিহাস সংগ্রহ করা এক দুরূহ ব্যাপার। কেদেলী গ্রাম নিবাসী শিশুরাম অধিকারী নামক এক ব্রাহ্মণ যাত্রার গৌরব সম্পাদন করেন। তাহার বহু পূর্ব্ব হইতে নাটকের জঘন্য অপভ্রংশ স্বরূপ এক প্রকার যাত্রা এতদ্দেশে প্রচলিত ছিল। সঙ্কীর্ত্তন ও কবিগানের প্রচারের ফলে তাহা প্রায় লোপপ্রাপ্ত হইতে বসিয়াছিল। শিশুরাম তাহাকে মার্জ্জিত করিয়া পুনরায় প্রচলিত করেন। শিশুরামের পর শ্রীদাম, সুবল, তৎপর পরমানন্দ প্রভৃতি অনেকে যাত্রার পরিপুষ্টি সাধনে প্রয়াসী হইয়াছিলেন। তাঁহাদের প্রচেষ্টা অনেক পরিমাণে সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছিল।৫

শিশুরামের পূর্ব্বেও অনেক যাত্রাওয়ালা ছিল। কিন্তু তাহাদের সম্বন্ধে কোন উল্লেখযোগ্য বিবরণ আমরা পাই নাই।

গৌরাঙ্গদেব স্বয়ং যে অভিনয় করিয়াছিলেন, তাহাকে যাত্রাও বলিতে পারা যায়, থিয়েটারও বলিতে পারা যায়। কারণ, সঙ্গীতশালা বা 'উঠান' শব্দের উল্লেখ নাট্যশাস্ত্রেও রহিয়াছে। চৈতন্যদেবের নাট্যাভিনয়ে বহু অভিনেতার প্রয়োজন হইত এবং প্রত্যেক অভিনেতাই পৃথক্ সজ্জায় সজ্জিত হইতেন।

উপরোক্ত শ্রীদাম, সুবল, দুই সহোদর। যতদূর জানিতে পারা গিয়াছে, পলাশী যুদ্ধের কিছু পূর্ব্বে এই দুই ভাই কালীয়-দমন (কৃষ্ণযাত্রা) গান করিয়া বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়া-ছিলেন। দেশে তখন ঘোর বিবর্ত্তন, চারিদিকে একটা ধূমধাম পড়িয়া গিয়াছিল। সেই সময় বর্গীরা দেশ ছাড়ে, মুসলমানের রাজ্য যায়, কোম্পানীর ব্যবসা জাঁকিয়া উঠে। বাঙ্গালার রেশম, বাঙ্গালার কার্পাস, বাঙ্গালার শাল, বাঙ্গালার কোরা বিদেশীদের শিরোভূষণ হয়। সেই সময় কবি, কীর্ত্তন, শিল্প, সাহিত্য সকলই জাঁকিয়া উঠিয়াছিল। সেরূপ

২ গ্রন্থকারের "The Indian Stage" ১১০ পৃষ্ঠা।

৩ বঙ্গদর্শন—ফাল্গুন, ১২৮৯।

৪ সোমপ্রকাশ পত্রে স্বর্গীয় দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের প্রবন্ধ।

৫ গ্রন্থকারের "The Indian Stage" ১ম খণ্ড ১১৫ পৃষ্ঠা।

জাঁক তাহার পর আর হয় নাই। তখন ভারতচন্দ্র লেখক, কবিওয়ালা লালু, নন্দলাল, কীর্ত্তনওয়ালা বাঞ্ছারাম বৈরাগী, পুরাণ বক্তা (কথক) গদাধর শিরোমণি আর যাত্রাওয়ালা শ্রীদাম, সুবল।

"ইঁহারা প্রত্যেকেই কবি ছিলেন, এই জন্ত ইঁহারা প্রত্যেকেই বাঙ্গালীর গুরু হইতে পারিয়াছিলেন। ভারত-চন্দ্রের কথা স্বতন্ত্র; অন্ত কয়জনের কবিত্বে স্নেহ প্রণয় বাড়িয়াছিল, সেই স্নেহের তরঙ্গ বাঙ্গালীর অন্তরে অদ্যাপি বহিতেছে। বৈষ্ণবতা সতত স্নেহ প্রণয়ীর সঙ্গী। সুতরাং সেই সঙ্গে বৈষ্ণবতাও বিলক্ষণ পুষ্টি লাভ করিয়াছিল।"৬

শ্রীদাম সুবলের দলে পরমানন্দ দাস নামে (হুগলী জিলার তারা নিবাসী) এক বালক 'সখী' সাজিত। পরে ইনিই ওস্তাদের নাম রক্ষা করেন। তাঁহার বেশ-ভূষায় কোন বাহুল্য ছিল না। বিলক্ষণ স্থূলকায় ছিলেন বলিয়া গৃহস্থের বাড়ী হইতে দুই খানি শাটী চাহিয়া পরিতেন—এক খানায় কুলাইত না। নাসায় একটি বেসর পরিতেন, যে বাড়ীতে যেমন জুটিত চাহিয়া অলঙ্কার পরিতেন। সঙ্গে খোল করতাল ছাড়া কিছু আনিতেন না। তিনি একাই দূতী সাজিয়া গালাগাল করিতেন, কৃষ্ণ, রাধিকা এবং অন্তান্ত সকলে উপলক্ষ থাকিত মাত্র। সকলের কথাই তিনি একা নানাভাবে কহিতেন ও গাহিতেন, আর শ্রোতারা তাঁহার যাত্রা শুনিয়া হাসিত, কাঁদিত, মন্ত্রমুগ্ধের ন্তায় বসিয়া শুনিত।

পরমানন্দের যাত্রা যিনি শুনিয়াছেন তিনি জানেন যে, আসরে আসিয়া প্রেমানন্দ যখন গান করিতেন "নবরে নবরে নিতুই নব, যখনি হেরি তখনি নব" মনে হইত, তিনি যেন দুইটি প্রেমপূর্ণ হৃদয় লইয়া খেলা করিতেছেন, দুইটিকে কখনও পরস্পরের খুব কাছে আনিতেছেন, কখনও বা দূরে রাখিতে-ছেন, আর সৃষ্টি করিয়া তুলিতেছেন তাঁহাদের প্রাণে অপরিসীম চাঞ্চল্য। 'মানের' পালায় তাঁহার এই ক্ষমতা ছিল অসাধারণ। 'মান' বাঙ্গালা ভাষায় একমাত্র নাটক বা drama, বোধ হয় একমাত্র প্রথম নাটক। Drama বলিয়াই বোধ হয় মান লোকের কাছে এত মিষ্ট লাগিত। পরমানন্দের যাত্রায় গীতের ভাগ খুব বেশী ছিল না। কাব্যরস সৃষ্টি করিবার জন্ত পরমানন্দ কথাবার্ত্তাই অধিক বলিতেন। সেই কথা-বার্ত্তার মধ্যে যে যে অংশে গীত ছিল তাহা প্রায়ই পয়ার ছন্দে রচিত এবং সাধারণতঃ পয়ারের সুরে গাওয়া হইত। পয়ারের সুরে গাহিতে গাহিতে গানের শেষ লাইনের অন্তর্নিহিত মাধুর্য্যটুকু শ্রোতার কর্ণে নিঃশেষে ঢালিয়া দিবার জন্ত শেষ পদটি পরমানন্দ কীর্ত্তনের সুরে গাহিতেন। সমস্ত শ্রোতা যেন মাধুর্য্য রসে একেবারে ডুবিয়া যাইতেন। এই প্রণালীকে তখন তুক্কো বলা হইত। আর পরমানন্দই ছিলেন ইহার স্রষ্টা। 'পরমার তুক্কো'র ন্তায় সুশ্রাব্য সঙ্গীত বাঙ্গালায় সৃষ্ট হয় নাই বলিয়াই অনেকের ধারণা। নিম্নে দুই একটি তুক্কো উদ্ধৃত করা গেল :—

(১) "সায়া বন বুলে বুলে
বনফুল আনলাম তুলে
তার বোঁটা গুলি দিলাম ফেলে
কিনা তোমার শ্যামাঙ্গে বাজিবে বলে।"

(২) "বঁধু যেতে যেতে, প্রাণের বঁধু
যেতে যেতে
রথে হতে কি কথাটি বল্‌তেছিল।
বলতে বলতে অমনি বঁধুর
মুখের কথা মুখে রৈল
নয়ন জলে ভেসে গেল।"

পরমানন্দের যাত্রা দর্শকগণকে আদ্যোপান্ত শুনিতে হইত। এই যুগে কাব্যরসের সৃষ্টি করাই ছিল যাত্রাওয়ালাদের উদ্দেশ্য। তাই সম্পূর্ণ পালাটী না শুনিলে শুধু দুই একটি গান শুনিয়া রস গ্রহণ করা সম্ভব হইত না। দর্শকগণের মনে ধরিতেছে না বুঝিলে তাহারা আসরে সং আনয়ন করিত এবং পুনরায় রসসৃষ্টি করিবার জন্ত নূতন করিয়া পরিশ্রম করিত।

পরমানন্দের সমসাময়িক আর একজন যাত্রাওয়ালা ছিলেন, তাঁহার নাম প্রেমচাঁদ। তিনি 'থরকাটা প্রেমা' নামে সকলের নিকট পরিচিত ছিলেন। ইঁহার গানে তুক্কো ছিল না, সমস্ত গানই ছিল চৌপদী। কীর্ত্তনে তিনি যাহা গাহিতেন, তাহা একটু মাজিয়া ঘসিয়া লইতেন। খাঁটি মহাজনী পদ 'পত্তন' দিয়া গাহিলে সাধারণ লোক ভাল করিয়া বুঝিতে পারিত না। এই জন্ত প্রেমচাঁদ মহাজনীপদ হালকা করিয়া সেই পদের পুরাতন ভাবের সঙ্গে প্রচলিত ভাষা মিশাইয়া মাজিয়া ঘসিয়া যাত্রাগান করিতেন। শুনিয়া

৬ বঙ্গ দর্শন ১২৮০।

সাধারণ লোক একেবারে মাতিয়া উঠিত। সেই অবধি স্ত্রীলোকের কীর্ত্তনের ব্যবসা করিবার পথ প্রশস্ত হইয়া যায়। ইহার পূর্ব্বে স্ত্রীলোকের মুখে কীর্ত্তন শোনা নিষিদ্ধ ছিল।৭

প্রেমচাঁদের ছোকরা বদন, যাত্রাওয়ালা হইয়া তাহার গুরুর পদ্ধতি অনুসরণ করিয়া কালীয়দমন যাত্রা করিত। পরমানন্দের ছোকরা গোবিন্দ অধিকারী অল্প কিছুদিন যাত্রা করিয়াই গুরুপ্রদর্শিত তুক্কো পরিত্যাগ করিলেন এবং ইচ্ছামত নানা সুরে গান রচনা করিয়া যাত্রার আসরে গাহিতেন। দাশরথি রায়ের অনুপ্রাসে তখন সকলেই মুগ্ধ হইতেন। গোবিন্দ অধিকারীও তাহার রচিত গানে অনুপ্রাসের বহুল প্রয়োগ দ্বারা শ্রোতার প্রাণে অমৃত ঢালিতে লাগিলেন। পুরাতন তুক্কোর স্থান অনুপ্রাস আসিয়া অধিকার করিল এবং যাত্রার আসর জমকাইয়া বসিল। বদন কিন্তু তুক্কো ছাড়িল না, বরং আরও ঘষিয়া মাজিয়া যাত্রার মধ্যে প্রবর্ত্তিত করিল। বদনের পরেই কালীয়দমন প্রায় লুপ্ত হইয়া গেল। বদনের পুত্র ক্ষেত্র এবং ভ্রাতুষ্পুত্র যদুনাথ ও ব্রজনাথ (ছোকরা বলিয়া পরিচিত) কিছুদিন তুক্কো রক্ষা করিয়াছিল বটে, কিন্তু তাহারাও অধিক দিন যাত্রা করে নাই।

গোবিন্দ অধিকারীর বাড়ী ছিল কৃষ্ণনগরের জাহাঙ্গীর পাড়ায়। অনুমান ১৭৯৮ খৃষ্টাব্দে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। কালীয় দমন যাত্রায় প্রথমে তিনি দূতী সাজিতেন। তাহার দূতীর ভূমিকা অভিনয় দেখিবার জন্য বহু দূর হইতে লোক ছুটিয়া আসিত। গোবিন্দ অধিকারীর রচিত ভাবপূর্ণ ভক্তি-রসাশ্রিত অনুপ্রাসবহুল সঙ্গীত তাঁহারই মুখে গীত হইয়া শ্রোতাকে এমনই মুগ্ধ করিত যে, কোথাও গোবিন্দের যাত্রা হইতেছে শুনিলে বহুদূরবর্ত্তী গ্রাম হইতেও আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা দলবদ্ধ হইয়া আগমন করিত এবং যাত্রা আরম্ভ হইবার বহুপূর্ব্ব হইতেই আসরে যাইয়া বসিয়া থাকিত। এত জন-সমাগম হইত যে, আসরে তিল ধারণের স্থানও থাকিত না। তাঁহার "শুক শারীর পালা" ও "চূড়ানূপুরের দ্বন্দ্ব" এক সময়ে সকলকেই মুগ্ধ করিত। তিনি যখন সুর ধরিতেন—

(১) নূপুর শোনরে শোন, কিনে হুজন, হুজনের বেদনা জানে না,
অবোধ যদি উচ্চ ভাসে, সুবোধ বুঝায় মৃদুভাষে;
ভাবের আভাসে ভাসে, কভু ডুবে না।

(২) বড়র বড় দায়, তাতে কি বড়ত্ব যায়,
পেলে একদিন বড়ই পায়
বড় বড় বড় গাছ বই লাগে না॥

সুরের সেই ঝঙ্কারে প্রাণে মধুবর্ষণ করিত, সকলের চক্ষু অশ্রুজলে পূর্ণ হইয়া যাইত।

গোবিন্দ অধিকারী পুরাতন পদ্ধতির যাত্রা কেন পরিত্যাগ করিলেন, আমরা এখানে তাহাই কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব। কৃষ্ণযাত্রা বেশীদিন রহিল না আভ্যন্তরিক কারণের জন্য, মুসলমান প্রভাবের জন্য নহে। কারণ, যাত্রার আসরে কি গান হইত, সে সম্বন্ধে মুসলমান নৃপতিগণ সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ ছিলেন। ইংরেজ রাজত্বের প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে আবার নব পর্য্যায়ে থিয়েটারের সূত্রপাত হইল বটে, কিন্তু বাঙ্গালার প্রচলিত আমোদ-প্রমোদ লুপ্ত হইতে বসিল। কলিকাতা নগরীর উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে বিস্তর হিন্দুস্থানী এ দেশে আসিয়া সাধারণের সঙ্গে মিশিতে লাগিল। বর্গীর হাঙ্গামার সময় বহু মহারাষ্ট্র যুবতী বাঈজীরূপে বাঙ্গালা দেশে প্রবেশ করিয়াছিল। ধনাকাঙ্ক্ষীরা মাড়োয়ারীদের অনুগত হইল। ধনবানেরা মহারাষ্ট্র বাঈজীদের সেবা করিতে আরম্ভ করিল। এই বাঈজীরাই বাঙ্গালা সঙ্গীতের সর্ব্বনাশের কারণ। ইহাদের আগমনের পূর্ব্বে বাঙ্গালা দেশে গায়িকার প্রচলন বড় ছিল না। কীর্ত্তন গাহিত পুরুষেরা, যাত্রাও পুরুষেরাই করিত। এমন একদিন ছিল, যখন বাঙ্গালার কীর্ত্তনের সুর সুদূর পাঞ্জাব পর্য্যন্ত ধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছিল। কীর্ত্তনের সেই সুর বাঈজীদের আগমনে লোপ প্রাপ্ত হইতে বসিল। খোল করতালের গোলমাল বাবুদের আর ভাল লাগিল না, তব্‌লার টীমটিমি বোল তাঁহাদের কর্ণে মধুবর্ষণ করিতে লাগিল। টপ্পার হাল্কা সুর এবং তব্‌লার সঙ্গীত প্রবর্ত্তনের আয়োজন চলিতে লাগিল, সঙ্গে সঙ্গে দেশীয় সঙ্গীতব্যবসায়ীদের উপার্জ্জনও কমিতে লাগিল। তাই গোবিন্দ অধিকারীকে যাত্রাগানের পুরাতন পদ্ধতির সহিত কালোপযোগী নূতন প্রথা প্রবর্ত্তিত করিতে হইয়াছিল। এইরূপে "সখের যাত্রা" ক্রমে কৃষ্ণযাত্রাদির স্থান অধিকার করিয়া বসিল।

এই সময় বাঙ্গালার উত্তর-পশ্চিম এবং দক্ষিণ প্রদেশ হইতেও অনেক যাত্রার দল আসিয়া এ দেশে আসর জমাইয়া বসিয়াছিল। এই যাত্রা অনেকটা আধুনিক নাটকের অনুরূপ

৭ বঙ্গদর্শন—ফাল্গুন, ১২৮৯।

কথোপকথন-বহুল ছিল। শ্রীকৃষ্ণ ও গোপীগণের প্রেমই এই যাত্রার বর্ণিত বিষয়। কটক জেলা হইতে আগত ব্রাহ্মণকুলজাত বালকগণ কর্ত্তৃক এই যাত্রা অভিনীত হইত। গ্রীক chorus এর সহিত এই যাত্রার অনেক সাদৃশ্য ছিল।৮

গোবিন্দ অধিকারীর অভ্যুদয়ের সময়ে "অক্রূর-সংবাদ" এবং "নিমাই সন্ন্যাস" পালা গাহিয়া লোচন অধিকারী শ্রোতৃবর্গকে বিশেষ ভাবে বিমুগ্ধ করিতেন। শোনা যায়, লোচন অধিকারীর যাত্রায় করুণ রসের আধিক্যে এত অশ্রুতরঙ্গ প্রবাহিত হইত যে, কোনও এক ধনী ব্যক্তি ক্রন্দনের ভয়ে লোচন অধিকারীকে নিজবাটীতে আহ্বান করিতে সাহসী হন নাই।

এই সময় "নল-দময়ন্তী" যাত্রা, ব্রজমোহন অধিকারী এবং রামসুন্দর অধিকারীর যাত্রা বিশেষ রূপে জনপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছিল। নল দময়ন্তীর পর "বিদ্যাসুন্দর" যাত্রা বিশেষ খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিল। এই "বিদ্যাসুন্দর" যাত্রাই সখের যাত্রা নামে পরিচিত হয়।

সখের যাত্রা প্রচলিত হওয়ার পর হইতে যাত্রার ইতিহাসে এক বিশেষ পরিবর্ত্তন সাধিত হয়। ইহার পর হইতে যাত্রায় রাধাকৃষ্ণের স্বর্গীয় প্রেমের স্থান বিদ্যা এবং সুন্দরের মানবীয় প্রেম আসিয়া অধিকার করে। যাত্রার এই পরিবর্ত্তন বাঙ্গালার সমাজজীবনেরও পরিবর্ত্তন সূচনা করিতেছে। সখের যাত্রা প্রবর্ত্তিত হওয়ার পূর্ব্বে যাত্রার আসরে স্ত্রীলোক কখনও নামে নাই। এই পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে কৃষ্ণবিষয়ক সঙ্গীতের আসরে স্ত্রীলোকও গাহিবার অধিকার লাভ করে। এইরূপ একটী যাত্রার দলের সংবাদ নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

"গ্লী ক্লাব" (Glee Club) কর্ত্তৃক নন্দবিদায় নামক একটি নূতন যাত্রা অভিনীত হয়। দর্শকবৃন্দ এই নূতন যাত্রার খুব প্রশংসা করেন। বাবু রামচন্দ্র মুখার্জ্জি জোড়াসাঁকোর একজন বিশেষ ধনশালী ব্যক্তি ছিলেন। জোড়াসাঁকোর একটি হাফ্ আখড়াই দল ছিল। উহাই কলিকাতার আদি সঙ্গীত সমাজ। রামবাবু এই হাফ্ আখড়াই দলকে যাত্রার দলে পরিবর্ত্তিত করেন এবং স্বয়ং উহার সেক্রেটারীর কার্য্যভার গ্রহণ করেন। এই দলের কবিও ছিলেন তিনিই। এক বৎসরের মধ্যে এই দলের জন্য প্রায় চার পাঁচ হাজার টাকা ব্যয় হয়। পুরুষ অভিনেতা ব্যতীত এই দলে দুইটি বালিকাও ছিল। বড়টির বয়স প্রায় ১২ বৎসর ছিল, তাহার নাম ছিল সিদাম। ছয় সাতটি বালকও এই দলে ছিল। রাত্রি নয় টার সময় অভিনয় আরম্ভ হইয়া প্রাতে সাতটায় শেষ হইত।৯

ইহা ১৮৪৯ সালের কথা।

সখের যাত্রা

কোন ধনী ব্যক্তি 'সখ' করিয়া নিজ ব্যয়ে একটি যাত্রার দল গঠন করিয়াছিলেন বলিয়া অতঃপর এবম্বিধ যাত্রা 'সখের যাত্রা' নামে অভিহিত হয়। সেই সময়ে উহাকে রিফরমড্ (reformed) যাত্রাও বলা হইত। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, তখন বাঙ্গালা সঙ্গীতে ঘোর পরিবর্ত্তন আরম্ভ হইয়াছে। খোল ও নূপুর লোপপ্রাপ্ত হয় এবং তবলা ও ঘুমুর তাহাদের স্থান অধিকার করে, মহাজনী পদের স্থান অধিকার করিল নূতন রচিত গীতিকা, আর তাহাতে সংযোজিত হইল নূতন সুর। পশ্চিম দেশীয় টপ্পার সুরও সঙ্গে সঙ্গে উঠিয়া গেল। নূতন বলিয়া এই যাত্রার দিকে লোকের মন বিশেষভাবে আকৃষ্ট হইল। ক্রমে এই যাত্রা পেশাদারী যাত্রায় পরিবর্ত্তিত হইলেও নামটা সখের যাত্রাই রহিয়া গেল। লোকে মনে করিত ঢোলক ও তবলা থাকিলেই সখের যাত্রা, আর খোল করতাল থাকিলে কালীয়দমন। আরও একটী পার্থক্য ছিল। দেবতার প্রসঙ্গ ব্যতীত কৃষ্ণ-যাত্রা বা কালীয়দমন যাত্রা হইতে পারিত না। সখের যাত্রার বিষয় ছিল কখন বিদ্যাসুন্দর, কখনও বা নল-দময়ন্তী। ক্রমে কালীয়দমন একেবারে উঠিয়া গেল। তারপর সখের যাত্রার 'সখের' কথাটা শুধু যাত্রায় পরিণত হইল।

পূর্ব্বে সখের দলের মধ্যে ভবানীপুর, বেলতলার এবং আঁড়িয়াদহের যাত্রাই সমধিক খ্যাতিলাভ করিয়াছিল। বহু অনুসন্ধানের ফলে যাত্রার দলের ইতিহাস যেটুকু সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি, পাঠকবর্গের অবগতির জন্য নিম্নে তাহা উদ্ধৃত হইল।

বৌবাজারে প্রথম সখের যাত্রার উৎপত্তি সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বিবরণ পাওয়া যায় না। শোনা যায়, রাধামোহন

৮ গ্রন্থকারের The Indian stage, ১১২ পৃষ্ঠা।

৯ গ্রন্থকারের The Indian stage ১২৬ পৃষ্ঠা।

সরকার নামক এক ধনী ব্যক্তি বৌবাজারের যাত্রার দল গঠন করেন, কিন্তু ইনিই সখের যাত্রার প্রথম প্রবর্ত্তক কি না, সে সম্বন্ধে নিশ্চয় করিয়া কিছু বলিতে পারা যায় না।

সখের যাত্রাভিনয় সম্পর্কে যতদূর জানিতে পারা যায় তাহাতে আঁড়িয়াদহেই প্রথম সখের যাত্রার উৎপত্তি হইয়াছে বলিয়া অনুমিত হয়। ১৮২২ খৃষ্টাব্দে ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায় নামক এক ব্যক্তি তাঁহার পিতা রামজয়ের নামে এই দল গঠন করেন। ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর তখনও মুদ্রিত হয় নাই—হস্তলিখিত পুঁথি হইতে অভিনয়োপযোগী দৃশ্য বাছিয়া লওয়া হয়। এই কার্য্যে প্রাণকৃষ্ণ তর্কালঙ্কার এবং নিমাই মিত্র বিশেষ সহায়তা করেন। নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ অভিনয় করিয়াছিলেন :—

রাজা—রাধামোহন চট্টোপাধ্যায়

সুন্দর—কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

বিদ্যা—ঈশান (রাধামোহনবাবুর পুত্র)

রাইবাঘিনী – নিমাই গাঙ্গুলি

নান্দীর গান গাহিয়াছিলেন নিমাই মিত্র ও তাঁরাচাঁদ বন্দ্যোপাধ্যায়। অভিনয়ের অল্প কিছুদিন পরে এই দলের প্রবর্ত্তক ও অধিকারী ঠাকুরদাস বাবু এবং আরও কয়েকজন অভিনেতার মৃত্যু হওয়ায় অশুভসূচক বলিয়া দলটি ভাঙ্গিয়া যায়।

অতঃপর দক্ষিণ বরানগরে ও জনাইতে দুইটি উৎকৃষ্ট বিদ্যাসুন্দর দল গড়িয়া উঠে। দক্ষিণ বরানগরে মধু ভট্টাচার্য্য মালিনী, গোপীমোহন চট্টোপাধ্যায় রাজা, রামচন্দ্র ভাদুড়ী বিদ্যা, রূপনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় সুন্দর সাজিতেন। মধু ভট্টাচার্য্য সুবক্তা, কথক এবং সুগায়ক ছিলেন। সংস্কৃত ভাষাতেও তাঁহার বিশেষ ব্যুৎপত্তি জন্মিয়াছিল। বরানগরের বিখ্যাত পালোয়ান কালী চাটুয্যের আত্মীয় এবং দলের অন্যান্য সকলেই খুব সুপুরুষ ছিলেন।

শ্যামবাজারের নবীনকৃষ্ণ বসু মহাশয় বিদ্যাসুন্দরকে ভিত্তি করিয়াই নাট্যশালার প্রবর্ত্তন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। তাহার বিস্তৃত বিবরণ অন্যত্র প্রদান করিব। উক্ত থিয়েটার ২।৪ বৎসরের বেশী স্থায়ী হয় নাই, কিন্তু তাহাতেও খুব ব্যয় হইত। তাই তখনকার দিনে যাত্রাই প্রধান আমোদ বলিয়া পরিগণিত ছিল।

একদিকে পাশ্চাত্ত্য অনুকরণে সখের যাত্রা এবং থিয়েটার, আর একদিকে দেশীয় প্রথায় গোবিন্দ অধিকারীর যাত্রা, দুই-ই তখন প্রচলিত ছিল। যদিও সখের যাত্রা ও থিয়েটারের দিকে লোক অধিক পরিমাণে আকৃষ্ট হইয়াছিল, তথাপি দেখা যাইত, গোবিন্দ অধিকারীর আসরে লোক ধরে না। গোবিন্দকেও অবশ্য যুগোপযোগী করিয়া তাহার যাত্রার কিছু কিছু পরিবর্ত্তন করিতে হইয়াছিল। তাই কালীয়দমনের পুরাতন পদ্ধতি পরিত্যক্ত হইয়াছিল।

সঙ্গতি-সম্পন্ন বাবুদের সখের থিয়েটার অবশ্য বেশীদিন স্থায়ী হয় নাই, কিন্তু পেশাদারী সখের যাত্রা বেশ চলিতে লাগিল। অন্যান্য স্থান হইতে এইরূপ পেশাদারী যাত্রার দল আসিয়া কিছুদিন গীতাভিনয় করিবার পর স্থানান্তরে চলিয়া যাইত। এইরূপ দুই একটী সম্প্রদায়ের উল্লেখ করা এখানে অপ্রাসঙ্গিক নহে।

(১) মণিপুর হইতে একটি যাত্রার দল কলিকাতায় আসিয়াছিল। তাহারা গোপীদিগের সহিত শ্রীকৃষ্ণের প্রেম-লীলা অভিনয় করিত। বাদকগণ সকলেই ছিল পুরুষ কিন্তু গায়িকারা ছিল স্ত্রীলোক। তাহারাই কৃষ্ণ, ললিতা, বিশাখা, চিত্রা, রঙ্গদেবী, সুদেবী, চম্পকলতা, বিদ্যাধরী, ইন্দুলেখা প্রভৃতির ভূমিকা অভিনয় করিত। গোপীদিগের সৌন্দর্য্যের সহিত তাহাদের চেপ্টা নাক মোটেই মানাইত না।

(২) বাবুদের বাড়ীতে হলধরের সম্প্রদায়ও খুব সুখ্যাতির সহিত অভিনয় করিত। তাহারা বিদ্যাসুন্দর, শুম্ভ-নিশুম্ভ বধ এবং অন্যান্য পালা অভিনয় করিত।[১০]

ইহা ১৮২৮এর কথা।

বরানগর তখন সঙ্গীতাদির জন্য বিশেষ প্রসিদ্ধি প্রাপ্ত করিয়াছিল। নবীনবাবুর দলে যিনি সুন্দর সাজিতেন, তিনি ছিলেন এখানকার লোক (ভবানীপুরবাসী)—নাম শ্যামাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। বরানগরের আর একটী সুগায়ক ছিল, নাম প্যারী। বেহালা বাজাইয়া সে ভিক্ষা করিয়া বেড়াইত। প্যারী দেখিতে খুব সুশ্রী ছিল। ভবানীপুরের একটী সঙ্গতি-সম্পন্না বারাঙ্গনা তাহার গানবাদ্যে মোহিত হইয়া তাহার প্রতি আকৃষ্ট হয়। কিছুদিন একসঙ্গে বাস করিয়া উভয়ে একটী যাত্রার দল গঠন করে এবং নলদময়ন্তী পালা গান করিতে

১০ গ্রন্থকারের The Indian stage ১২৮ পৃষ্ঠা।

আরম্ভ করে। দর্শকগণ এই যাত্রা শুনিয়া খুব প্রীতিলাভ করিয়াছিল। ভিক্ষোপজীবী প্যারী অতঃপর প্যারীমোহন নাম গ্রহণ করিয়া একটী প্রকাণ্ড বাড়ী তৈয়ার করিয়াছিল। এই দলই ভবানীপুরের দল বা বেলতলার দল নামে খ্যাতি লাভ করে। অতঃপর স্ত্রীলোকের নেতৃত্বেও একাধিকবার বিদ্যাসুন্দর যাত্রার দল গঠিত হইয়াছিল। "তারাহারার" দল ও "বৌ-মাষ্টারের" দল বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

কলিকাতার ভবানীপুরের রামকুমার কাঁসারী ছিলেন এই যুগের একজন প্রধান ওস্তাদ। নৃত্যগীতে তাঁহার অসাধারণ দক্ষতা ছিল এবং তিনি খুব ভাল বেহালা বাজাইতে পারিতেন। প্যারীমোহনের দলে তিনি সঙ্গীত শিক্ষা দিতেন।

রামধন স্বর্ণকারের দলও এই সময়ে বিশেষ প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিল। প্রতি রাত্রি অভিনয়ের জন্য সে ৫০৲।১৬০৲ টাকা করিয়া পাইত। তাহার দলে ফুরণের বন্দোবস্ত ছিল। উদ্বৃত্ত অর্থ নিজে এক অংশ লইয়া অবশিষ্ট তিন ভাগ দলের সকলকে ভাগ করিয়া দিত। শাল, বনাত প্রভৃতি উপহারের জিনিষপত্র সে নিজেই লইত। লোকে রামধনকে ওস্তাদজী বলিয়া ডাকিত। গঙ্গাসাগর হইতে মুর্শিদাবাদ পর্য্যন্ত সর্ব্বত্রই তাহার খ্যাতি বিস্তৃত ছিল।

সখের যাত্রায় গোপাল উড়েই সমধিক প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিল। তাহার যশ বঙ্গের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত হইয়াছিল। প্রায় সকল জায়গা হইতেই তাহার "বায়না" হইত। গোপাল উড়ের বাড়ী কটক জেলার জাজপুরে। কলিকাতায় আসিয়া সে প্রথমে নানা প্রকার মনোহারী দ্রব্যাদি ফেরি করিত। পরে সে বহুবাজারের ধনী রাধামাধব বাবুর যাত্রার দলে যোগ দেয়। গোপালও ছিল সুকণ্ঠ গায়ক এবং দেখিতেও ছিল খুব সুশ্রী। সে মালিনীর ভূমিকা গ্রহণ করিত। তাহার সুশ্রী চেহারা এবং সুমিষ্ট কণ্ঠের জন্য মালিনীর অভিনয়ে সকলে এত মুগ্ধ হইয়াছিল যে, রাধামাধব বাবু তাহার মাসিক বেতন একেবারে পঞ্চাশ টাকা করিয়া দেন। রাধামাধবের মৃত্যুর পর গোপাল তাহার দলের সমস্ত জিনিষপত্র পাইয়া নিজেই এক দল গঠন করে। ভৈরব হালদার নামক এক ব্যক্তির দ্বারা সে অতি সহজ ভাষায় গান রচনা ও সুর যোজনা করাইয়া আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার চিত্তবিনোদন করিত। গানগুলির রচনা-ভঙ্গী ছিল এমন সুন্দর যে, গানের সঙ্গে সঙ্গে নাচও চলিতে পারিত। ইহার উপর সে দেখিতে ছিল সুশ্রী, স্ত্রীলোক সাজিলে কেহ তাহাকে পুরুষ বলিয়া সহজে ধরিতে পারিত না।

চাপা-ধোপাজাতীয় কাশী নামক এক ব্যক্তি নৃত্যবিদ্যায় বিশেষ পারদর্শী ছিল। অনেক যাত্রার দলে সে নৃত্যশিক্ষা দিত এবং ইহা ব্যতীত অনেক পুরুষ এবং স্ত্রীলোকও তাহার নিকট নৃত্য শিক্ষা করিত। কাশী, গোপাল উড়ের যাত্রায় যোগদান করিয়া মালিনীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হইত। মালিনীর ভূমিকায় কাশীর নৃত্য হইতেই যাত্রায় খেমটা নাচের প্রচলন হয়। গোপাল উড়ের যাত্রায় উমেশ এবং ভোলানাথ দাস যথাক্রমে বিদ্যা ও সুন্দরের পার্ট অভিনয় করিত।

গোপালের রস সৃষ্টি করিবার অসাধারণ ক্ষমতা ছিল। এখানে দুই একটি দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিতেছি।

বিদ্যাসুন্দরের প্রধান চরিত্র হীরা মালিনী। পূর্ব্বে গোপালই মালিনী সাজিত। সুন্দর তাহাকে মাসী বলিয়া সম্বোধন করিলে মালিনীবেশী গোপাল জলদবীণার সুরে বলিত,

যাদু এমন কথা কেন বললি
ভোরের বেলা সুখের স্বপন এমন সময় জাগালি।

মালিনীবেশী গোপাল হীরা মালিনীর রূপের ব্যাখ্যা করিয়া বলিতেছে, যখন বামুনপাড়া ফুল যোগানে গমন করি, তখন পূজাপরায়ণ ব্রাহ্মণগণ এই পক্ককেশী রূপবতীকে দেখিয়া

"রহে কোশাকুশি অমনি ধরে।"

অন্যত্র গোপাল বিদ্যার ভূমিকায় হীরা মালিনীকে লক্ষ্য করিয়া গান ধরিত —

কেড়া চুলে বকুল ফুলে খোঁপা বেঁধেছ
প্রেম কি বাসিয়ে তুলেছ—

সন্ন্যাসী বেশী সুন্দরের সহিত বিদ্যার বিবাহ হইবে ইহা লইয়া হীরা মালিনী ঠাট্টা করিয়া বলিতেছে —

আপ ভোলারী মহৎ আশ্রম
অতিথ আসবে রকম রকম
গাঁজাতে লাগাবি লো দম,
বোম কেদার বলে—

এই সকল গানের সঙ্গে নাচও চলিত। গোপালের যাত্রা এত জনপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছিল যে, বাঙ্গালায় এমন স্থান ছিল না, যেথান হইতে গোপালের বায়না না আসিত।

যাত্রায় যে রস-সৃষ্টি হয় না তাহা নহে। বস্তুতঃ রস-সৃষ্টিই যাত্রার প্রধান উদ্দেশ্য। রসপূর্ণ রচনা আদর পাইলে সমাজেরই রসগ্রাহিতার পরিচয় পাওয়া যায়। কৃষ্ণযাত্রায় রস-সৃষ্টি কম হয় নাই, কিন্তু বিদ্যাসুন্দরে তাহা প্রায় দেখা যাইত না, দেখাইবার স্থানেরও অভাব ছিল। বকুলতলায় সুন্দরের সহিত মালিনীর সাক্ষাৎ, মালিনীর বাড়ীতে তাহার বাস এবং দৌত্যকর্মে মালিনীর প্রবৃত্তি এই কয়েকটি অংশ লইয়াই সচরাচর যাত্রা হইত। ইহাতে বিচ্ছেদ ও করুণ রস নাই, বিষাদ যেটুকু থাকিত, নাচের প্রাবল্যে দর্শক তাহাও ভুলিয়া যাইত। বিদ্যা বিষাদক্লিষ্ট হইয়া গায় ও নাচে, দর্শকগণ বাহবা দেয়—বিদ্যা আরও ঘুরিয়া ঘুরিয়া নাচে, আসরে হাস্য ও অদ্ভুত রসের সৃষ্টি হয়। 'বিদ্যাসুন্দরের' যাত্রায় এই ভাবে করুণ রসের স্থানে অদ্ভুত রসের অবতারণা হইত।

রুচি ও শ্লীলতার দিক দিয়াও বিদ্যাসুন্দর অভিনয়ের অযোগ্য হইয়া উঠিল। বলিতে কি, শিক্ষিত সমাজের পিতা-পুত্র, মাতা-কন্যা এক সঙ্গে বসিয়া এই অভিনয় দেখিতে পারিত না। গানগুলি প্রায়ই জঘন্য রুচির পরিচয় দিত। এইরূপ অভিনয় দর্শনে লোকের আগ্রহ দেখিয়া বঙ্কিমচন্দ্র বঙ্গদর্শনে লিখিয়াছিলেন—

"আধুনিক যাত্রায় বিদ্যা, মালিনী ও সুন্দরের প্রাদুর্ভাব। পল্লীগ্রামের যৌবনোন্মুখী সরলা যুবতীগুলি বিদ্যার মুখে নিম্ন-লিখিত বা তদনুরূপ গীত শুনিলে তাহাদের কিরূপ শিক্ষা হয়—?

এখন উপায় আমি কর তারে আনিতে।
কামানলে জ্বেলে চলে, ভুলে আছে মনেতে।
কবে সে সুদিন হবে, সুধাকর প্রকাশিবে।
বারিবিন্দু বরষিবে, চাতকীরে বাঁচাতে।

পিতা পুত্র-কন্যা লইয়া শুনেন, লজ্জা করে না, সেই পুত্র-কন্যা জ্ঞানবান্ হইলে পিতামাতাকে কিরূপ ভাবিবে?"১১

যাত্রা গানের কদর্য্য রুচি শিক্ষিত লোকের মনে যাত্রার প্রতি বিতৃষ্ণা জন্মাইয়া দিয়াছিল, তারপর শিক্ষার প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে নূতন আমোদ-প্রমোদের প্রতি লোকের মন আকৃষ্ট হইতে লাগিল। এই জন্য থিয়েটার শিক্ষিত, অশিক্ষিত, ধনী, দরিদ্র সকলেরই প্রিয় হইয়া উঠিল। নাট্যকার রামনারায়ণ স্পষ্টই বলিলেন, "সরস সংস্কৃত ও ইংরাজী ভাষা নাটক সমূহের অতুল্য রসমাধুরী অবগত হইয়া প্রচলিত ঘৃণিত যাত্রাদিতে সকলেরই সমুচিত অশ্রদ্ধা হইয়া উঠিয়াছে।"

নাট্যকার মনোমোহন বসুও বলিলেন, "জঘন্য যাত্রার প্রাদুর্ভাবে অশ্লীল রসের উত্তেজনা বৃদ্ধি পাইল।" সঙ্গে সঙ্গে যাত্রায় সেই যে ভাঙ্গন ধরিল, আর তাহাকে রক্ষা করিতে পারা গেল না। কৃষ্ণযাত্রায়ও—'এসে প্রকাশ করিয়া বল দেখি'—বলিয়া যে উপর্য্যুপরি গান হইত, তাহা কাহারও ভাল লাগিত না। অতঃপর যাত্রার এক নূতন পর্য্যায় আরম্ভ হইল—ইহার নাম অপেরা। কেহ কেহ ঠাট্টা করিয়া বলিত "অপ্পেয়েরা।" এখনও অনেক স্থানে এই যাত্রা চলিতেছে। ইহাতে শামলা আছে, প্যান্টলুন আছে, পোষাক আছে, তরবারি আছে, সাধুভাষা আছে, বক্তৃতা আছে, চীৎকার আছে, পতন উত্থান আছে। আগে যাত্রায় ছিল গানের আধিক্য—তাই লোকে ইহাকে বলিত গীতাভিনয়। এখন দেখিবার জিনিষই বেশী, সঙ্গীত ও কাব্য রসের অভাব।

বাবু বিনোদপ্রসাদ ব্যানার্জী প্রণীত শকুন্তলাই প্রথম বাঙ্গালা অপেরা। ইহার ভাষা সরল, রচনাভঙ্গী সরস। শকুন্তলার অভিনয় প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত শ্রোতৃবর্গের মনোযোগ আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইয়াছিল। ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দের ১৪ই নবেম্বর তারিখে বৌবাজারের দত্তদের বাড়ীতে অপেরা অভিনীত হইয়াছিল। এই সময় যে তিনখানা অপেরা জনসাধারণের মধ্যে বিশেষ খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিল, তাহাদের মধ্যে পদ্মাবতীই ছিল সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।১২

থিয়েটারের অনুকরণে যাত্রার অনেক উন্নতি হইয়াছিল বটে, কিন্তু যাত্রার দিকে জন সাধারণের আগ্রহ ক্রমেই হ্রাস পাইয়া আসিতেছিল। শেষে যাত্রা ও থিয়েটারের পার্থক্য ক্রমশঃ লোপপ্রাপ্ত হইতে লাগিল এবং যাত্রা থিয়েটারের সহিত মিশিয়া যাইতে লাগিল।

এই নূতন পর্য্যায়ের যাত্রারও এমন কতকগুলি বিষয় ছিল, যাহা রসসৃষ্টির বিঘ্ন জন্মাইত। জুরীপ্রথা ইহাদের মধ্যে একটী। প্রত্যেক যাত্রার দলেই কয়েকজন—সাধারণতঃ চারি জন লোক, চোগা চাপকান পরিয়া আসরে যাইয়া বসিত।

১১ বঙ্গদর্শন, পৌষ ১২৭৯।

১২ গ্রন্থকারের The Indian Stage p. 134.

ইহারাই জুরী নামে অভিহিত। দশ পনর মিনিট পরে পরেই তাহারা উঠিয়া নানারকম সুরে বিকট চীৎকার করিয়া গান ধরিত, তাহারা যেন কিছুতেই আর থামিতে চাহিত না। তাহারা অবশ্য অনেক প্রকার সুর, তান, মান, লয়ের সৃষ্টি করিত, সঙ্গীত-বিশেষজ্ঞদের নিকট হয়ত উহার একটা বিশেষ মূল্যও ছিল, কিন্তু সাধারণ শ্রোতৃবর্গের ধৈর্য্যের উপর জুরীপ্রথা ছিল এক প্রকার অত্যাচার বিশেষ। জুরীগণ গান করিতে উঠিলে অধিকাংশ শ্রোতাই বিরক্ত হইয়া উঠিত।

অতঃপর, লেখকগণ যাত্রা না লিখিয়া নাটক লিখিতে প্রবৃত্ত হইলেন। পরবর্ত্তী অনেক বাঙ্গালা নাটকে যাত্রার প্রভাব দেখা গেলেও যাত্রার প্রতি লোকের আগ্রহ ক্রমেই কমিয়া আসিতেছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। সময়ের গতিকে রোধ করিবার সাধ্য কাহারও নাই।

যাত্রা গানের রুচি

পণ্ডিত রামনারায়ণ তর্করত্নের ন্যায় তৎকালীন অনেক বিখ্যাত লেখক বঙ্গ-রঙ্গমঞ্চকে পুনরুজ্জীবিত করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন। যাত্রাগানও ভারতের প্রাচীন নাটকের অনুরূপ হউক—ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল প্রভৃতির ইহা আন্তরিক ইচ্ছা ছিল। কবি ঈশ্বর গুপ্ত বলিয়াছিলেন, কালীয়দমন, বিদ্যাসুন্দর এবং নলদময়ন্তীর অভিনয় দর্শনে দর্শকগণ আনন্দ লাভ করিত বটে, কিন্তু এগুলির অভিনয়পদ্ধতি এত হীন রুচির পরিচয় প্রদান করিত যে, কেবল কদর্য্য রুচি-সম্পন্ন লোকেরাই উহাতে তৃপ্ত হইত। ভদ্রসমাজের মার্জ্জিত রুচি তাহাতে তৃপ্তি লাভ করিতে পারিত না।

থিয়েটার প্রচলিত হওয়ার পূর্ব্বে কবি, পাঁচালী, হাফ আখড়াই এবং যাত্রাই জনগণের চিত্তবিনোদন করিত। হাফ আখড়াই, কবি এবং পাঁচালীতে অশ্লীল গালিগালাজ চলিত এবং সাধারণ লোকের ঐ সকল গালিগালাজ ভালও লাগিত। যাত্রাতে কথাবার্ত্তা বড় একটা ছিল না। দু'একটা কথার পর—'তবে প্রকাশ করে বলো দেখি' বলিয়া গান আরম্ভ হইত। এই গানের কতক আদর ছিল, কিন্তু বিশেষ আদর ছিল সঙের। সঙ্ হালকা সুরে গাহিত। অপেক্ষাকৃত ভারী অঙ্গের পালার সুর হইতে সঙের সুরের আদর অনেকের নিকট হইত। সঙ্ গালাগালি দিত; তাহা লোকের বিশেষ প্রিয় হইত। গালাগালির এত আদর হইত যে, সংবাদ-পত্রের সম্পাদকে-সম্পাদকে অতি অব্যক্ত ভাষায় গালি চলিত এবং ঐ সকল সংবাদপত্রেরই গ্রাহক অধিক হইত। যিনি গালাগালি দিতে সুনিপুণ হইতেন, আদর তাঁহার বেশী ছিল। ইংরেজী বিদ্যার যতই কেন দোষ দেন না, ইংরেজী বিদ্যায় কৃত-বিদ্য ব্যক্তিগণ দেখিলেন যে, সমাজের এরূপ রুচি ভাল নয়। সমাজের বড় বড় লোক নাটক অভিনয়ে প্রবৃত্ত হইলেন। সে সময়ে নাটকের বড় চটক হইল।"১২

থিয়েটারের প্রচলনে ক্ষতি লাভ উভয়ই হইয়াছে। যাত্রার কতকগুলা অশ্লীল ভাঁড়ামি ছিল, তাহা গেল, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বদন অধিকারী, গোবিন্দ অধিকারীর মধুর রসের সঙ্গীত-স্রোতও লোপ পাইল। কৃষ্ণলীলার মধুর রসপূর্ণ গান—মহাভাবুকের রচিত সঙ্গীত বিলুপ্ত হইতে চলিল, আমরা মৌলিকত্ব হারাইলাম—অনুকরণে প্রবৃত্ত হইলাম।

সেই যুগের গোবিন্দ অধিকারী, নারায়ণ দাস, নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায়, রসিক চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি যাত্রাওয়ালাগণ মহাভাবুক ব্যক্তি ছিলেন, স্বধর্ম্মে তাঁহাদের বিশ্বাস ছিল, সাজসজ্জা এবং দৃশ্যপটাদি ব্যতীতই তাঁহারা দর্শকগণকে মুগ্ধ করিতে পারিতেন।

পূর্ব্ববঙ্গে যাত্রাভিনয়

কলিকাতা এবং তাহার পার্শ্ববর্ত্তী স্থানসমূহ যখন ভারত-চন্দ্রের আদিরস ঘটিত গান ও ভাবভঙ্গীতে ভরপুর, পূর্ব্ববঙ্গ তখন কৃষ্ণলীলার গানে মুখরিত। ঢাকা বিক্রমপুর নিবাসী কালাচাঁদ পাল কৃষ্ণযাত্রায় বিশেষ যশস্বী হইয়াছিলেন। ঢাকায় যাত্রা ও কবির অভাব ছিল না, কিন্তু প্রেমরসমাধুর্য্য পূর্ণ স্বপ্নবিলাস, রাই-উন্মাদিনী ও বিচিত্রবিলাস এই তিনখানি পুরাণ যাত্রা ঢাকায় যে ভাব-প্রবাহ প্রবাহিত করিয়া দিয়াছিল, আমরা এখানে তাহার কিঞ্চিৎ উল্লেখ করিব। অনুমান ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে "স্বপ্নবিলাস" রচিত হয়। অনেক যাত্রার দলে এই বইখানি অভিনীত হইয়াছিল। এই বইখানির খুব বিক্রয় হইয়াছিল। "বিচিত্রবিলাসের" ভূমিকায় গ্রন্থকার কৃষ্ণকমল "স্বপ্নবিলাস" সম্বন্ধে লিখিয়াছিলেন "সাধারণের কাছে বইখানা নিশ্চয়ই খুবই ভাল লাগিয়াছিল, তাহা না

১২ বর্ত্তমান রঙ্গ ভূমি।

হইলে এত অল্প সময়ের মধ্যে ২০০০০ হাজার বই বিক্রয় হইবে কেন ?" বিক্রমপুরের কৃতী সন্তান ডাক্তার নিশিকান্ত চট্টোপাধ্যায় মহাশয় এই তিনখানি বই সঙ্গে লইয়া বার্লিন, সেণ্ট পিটার্সবার্গ প্রভৃতি স্থানে গিয়াছিলেন এবং এই তিন খানি পুস্তক অবলম্বন করিয়া "The Popular Dramas of Bengal" নামক একখানি উৎকৃষ্ট পুস্তক প্রণয়ন করেন। এই পুস্তকখানি লণ্ডন হইতে প্রকাশিত হইয়াছিল। তিনি তাঁহার পুস্তকে পূর্ব্ববঙ্গের এই নাটক তিনখানি সম্বন্ধেই শুধু লিখিয়াছেন, বাঙ্গালা দেশের অন্য কোন যাত্রার কথা ইহাতে উল্লিখিত হয় নাই।

রাই-উন্মাদিনী, বিচিত্রবিলাস এবং স্বপ্নবিলাসের রচয়িতা কৃষ্ণকমল গোস্বামী নদীয়া জেলার ভজনঘাটের অধিবাসী। কিন্তু ঢাকায় অবস্থানের সময় তিনি সমস্ত পূর্ব্ব-বঙ্গের হৃদয় জয় করিয়াছিলেন। এই তিনখানি বই ব্যতীত "ভরত মিলন" "নন্দ হরণ" এবং "সুবল সংবাদ" নামক আরও তিনখানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। লেখাপড়া শেষ হওয়ার পর কৃষ্ণকমল "নিমাই সন্ন্যাস" রচনা করেন এবং নিমাই সন্ন্যাসের অভিনয়ে নিজেই নিমাই সাজিতেন। তাঁহার নিমাইএর ভূমিকা অভিনয় এমনি প্রাণস্পর্শী হইত যে, অভিনয় দর্শনে সকলেই অশ্রু বিসর্জ্জন করিত। ১৭৮০ খৃষ্টাব্দে তাঁহার জন্ম হয়। ৭৮ বৎসর বয়সে গঙ্গাতীরে তিনি দেহ বিসর্জ্জন করেন। পূর্ব্ববঙ্গের লোকেরা তাঁহাকে বড় গোঁসাই বলিয়া ডাকিত। কৃষ্ণকমলের চিন্তাশক্তি ছিল গভীর, তাঁহার রচনাভঙ্গী ছিল মনোমুগ্ধকর। তাঁহার রচিত সঙ্গীত-সুধা পান করিয়া সকলেই পরম তৃপ্তি অনুভব করিত। তাঁহার রচনামাধুর্য্যের সামান্য পরিচয় নিম্নে দেওয়া গেল।

রাধা, কৃষ্ণ বিরহে পাগলিনী প্রায় হইয়া উঠিয়াছেন—পথ অপথের জ্ঞান নাই—শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিবার জন্য নিকুঞ্জ-কাননাভিমুখে উর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়াছেন। ললিতা সখী বলিতেছেন "রাই ধীরে চল, পথে অনেক কাঁটা রহিয়াছে—

অমন করে যাস্‌নে গো
কত কণ্টক আছে গো বনে
ফুটিবে ছুটি চরণে গো। ইত্যাদি—

শুনিয়া রাধা সখীকে বলিতেছেন,—"বহু তপস্যা করিয়া কৃষ্ণকে লাভ করিয়াছি। রাখালের সঙ্গে প্রেমাবদ্ধ, জানি বনে বনে ফিরিতে হইবে, কত কাঁটা পায়ে বিঁধিবে, তাই, সই,

হইলে আঁধার রাতি, পথ মাঝে কাঁটা পাতি
গড়াগড়ি করিয়ে শিখিতেছি

আকাশে কৃষ্ণমেঘ বায়ুবেগে উড়িয়া যাইতেছে দেখিয়া কৃষ্ণ বিরহে উন্মাদিনী রাই মনে মনে ভাবিলেন "আমার নব জলধরই বুঝি আমাকে দেখিয়া দ্রুতপদে পালাইতেছে" তাই শশব্যস্ত হইয়া সখীগণকে বলিলেন,—

"সখি, ধর বট পীত পট, নিপট কপট শঠ
লম্পট শিরোমণি যায়।
আসিয়ে নিকট, কোথা ঘুচাইবে সঙ্কট
নিকট বিরহ যে ঘটায়।"
"ঠেকে যে শঠের পাটে, ব্রজের অবলা ঠাটে
গোঠে মাঠে ঘাটে বাটে কাঁদিয়ে বেড়াই গো।"

আবার, মেঘ দেখিয়া রাধা কৃষ্ণরূপ বর্ণনা করিতেছেন
"কিবা সজল জলদ শ্যামল সুন্দর"

বস্তুতঃ চৈতন্যদেবের দিব্যোন্মাদ ভাব অতি সুন্দর হইয়া রাই-উন্মাদিনীতে প্রতিবিম্বিত হইয়াছে। চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, কৃষ্ণদাস কবিরাজ, রূপগোস্বামী, রামানন্দ প্রভৃতি বৈষ্ণব কবিগণ এবং গোবিন্দ অধিকারী, রাম বসু, হরু ঠাকুর প্রভৃতি প্রসিদ্ধ যাত্রাওয়ালা ও কবিওয়ালাগণের ভাবে অনুপ্রাণিত কৃষ্ণকমলের কবিতা ও গান এমনি মধুর রস সিঞ্চন করিত যে, সকলেরই মন ভক্তিরসে আপ্লুত হইয়া উঠিত।

পূর্ব্ববঙ্গের লোকও কালমাহাত্ম্যে নূতনের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িল—পুরাতন ধরণের যাত্রাগান আর তাহাদের ভাল লাগিল না, তাহারা থিয়েটারের অনুকরণে যাত্রার পক্ষপাতী হইয়া উঠিল এবং ক্রমে থিয়েটারও পূর্ব্ববঙ্গে নিজ প্রাধান্য বিস্তার করিতে সমর্থ হইয়াছে।

আমরা ইতিপূর্ব্বে যে সকল যাত্রাওয়ালার কথা উল্লেখ করিয়াছি, তাঁহারা ব্যতীত আরও কয়েকজন যাত্রাওয়ালার নাম এখানে উল্লেখ করা আবশ্যক। রামযাত্রায় আনন্দ অধিকারী এবং জয়চাঁদ অধিকারী, চণ্ডীযাত্রায় ফরাস ডাঙ্গার (চন্দননগর) গুরুপ্রসাদ বল্লভ এবং মনসার ভাসানে বর্দ্ধমানের লাউসেন বড়াল বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। গ্রামের প্রত্যেক বিশিষ্ট ব্যক্তির বাড়ীতে চণ্ডীমণ্ডপ থাকিত এবং চণ্ডীপূজা বা অন্যান্য দেবদেবীর পূজা উপলক্ষে সেখানে



নেপথ্যে সেন্সাস্ কুমারী

নাচের ব্যবস্থা হইত। মনসাদেবী, মঙ্গলচণ্ডী এবং স্থানীয় অন্যান্য দেবতাগণের স্তুতি করিয়া যে পালাগান রচিত হইত তাহাই মঙ্গলগান নামে পরিচিত। এই সকল মঙ্গলগানই কালক্রমে মেলোড্রামাতে (melodrama) পরিণত হইয়াছিল। এই সকল গানের সহিত কথাবার্ত্তার সংযোগ হইয়া যাত্রাকে অনেক পরিমাণে নাটকীয় আকার প্রদান করিয়াছে। সাধারণতঃ চণ্ডীমণ্ডপ কিম্বা মন্দির প্রাঙ্গণই এইগুলি অভিনীত হইবার প্রধান স্থান।

উল্লিখিত যাত্রাওয়ালাগণ তাঁহাদের নিজ নিজ দেশে বিশেষ খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিলেন। নীলকান্ত মুখার্জ্জী এবং নারায়ণ দাস তাঁহাদের যাত্রাভিনয় দ্বারা বহু লোককে মুগ্ধ করিয়াছেন। পশ্চিমবঙ্গে নীলকান্ত প্রসিদ্ধ যাত্রাওয়ালা ছিলেন। এই সকল যাত্রা ক্রমে লোপপ্রাপ্ত হইলেও সুপ্রসিদ্ধ মতিরায় নূতন পদ্ধতিতে যাত্রার আসর অনেকদিন পর্য্যন্ত জমকাইয়া রাখিয়াছিলেন।

যাত্রা এবং কথকতা লোকশিক্ষার একটি উৎকৃষ্ট পন্থা। সাধারণ লোক যাত্রা শুনিয়া যে কত শিক্ষা ও আনন্দ লাভ করিত তাহার ইয়ত্তা নাই। সর্ব্বজনীন শিক্ষার (Mass education) এই প্রধান একটি প্রতিষ্ঠানকে যাঁহারা বাঁচাইয়া রাখিয়াছিলেন, তাঁহারা সমগ্র জাতির কৃতজ্ঞতার পাত্র। এই প্রসঙ্গে মতিলাল রায়ের নাম সমধিক উল্লেখযোগ্য।

মতি রায়

মতি রায় ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে বর্দ্ধমান জিলার ভাতশালা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি প্রথমে কিছুদিন কেরাণীগিরি করিয়া পরে শিক্ষকতাও করিয়াছিলেন। ইনি মাঝে মাঝে ঈশ্বরগুপ্ত সম্পাদিত "প্রভাকর" পত্রিকায় কবিতা লিখিতেন। ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে দোগাছিয়া নিবাসী হরিনারায়ণ চৌধুরী তাঁহাকে যাত্রার দলের জন্য একখানি নাটক লিখিতে অনুরোধ করেন। তাঁহারই অনুরোধে মতি রায় রামায়ণের বর্ণিত ঘটনা অবলম্বনে প্রথমে "তরণী সেন বধ" এবং পরে "রাম বনবাস" রচনা করেন। মতি রায় হরিনারায়ণের সহিত একযোগে যাত্রার দল করিয়াছিলেন এবং নূতন পদ্ধতিতে অভিনয়প্রণালী শিক্ষা দিয়া যথেষ্ট অর্থ ও খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিতেন যে, এমন মনোহর অভিনয় তাঁহারা কখনও দর্শন করেন নাই। মতি রায়ের যাত্রার বিষয় ছিল—পুরাতন কিন্তু তাঁহার পদ্ধতি ছিল—নূতন। তিনি অনেক যাত্রাভিনয়ের পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন। কালীয়দমন, ভরত-মিলন, মহালীলা, সীতাহরণ, দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ, বিজয়া-চণ্ডী, পাণ্ডব-নির্ব্বাসন, নিমাই সন্ন্যাস, ভীষ্মের শরশয্যা, রামরাজা, কর্ণবধ, লক্ষ্মণ বর্জ্জন, ব্রজলীলা, রাম বনবাস, রাবণ বধ, গয়াসুরের হরিপাদপদ্ম লাভ প্রভৃতি মতিরায়ের প্রসিদ্ধ যাত্রাভিনয়। মতিলাল যে কেবল গীতাভিনয়ের পদ্ধতিরই পরিবর্ত্তন করিয়াছিলেন তাহা নহে, তিনি নিজেও ছিলেন শাস্ত্রজ্ঞ এবং নানা বিদ্যায় সুপণ্ডিত। "বঙ্গভাষা লেখক" প্রণেতা মতিলাল সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত হইল :—

"১২৮০ সালে (১৮৭৩ খৃঃ) মতিলাল যখন নবদ্বীপে দল-প্রতিষ্ঠা করেন, তখন নবদ্বীপেশ্বরী পোড়ামাতাকে অর্চনা করিয়া তাঁহার মন্দির-অঙ্গনে প্রথম অভিনয় করিয়াছিলেন। অভিনয়ে নবদ্বীপবাসী পণ্ডিতগণ সকলেই বিমোহিত হইয়া তাঁহাকে কবিরত্ন উপাধি ও স্বর্ণপদক প্রদান করেন। কৃষ্ণ-নগরের রাজবাটীতে দোলযাত্রা উপলক্ষে যখন ইহার যাত্রা হয়, তখন নবদ্বীপাধিপ ক্ষিতীশচন্দ্র, মতিলালকে বলিয়াছিলেন "আপনা হইতেই আমাদের পূর্ব্বপুরুষের প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হইল। কারণ, ইতিপূর্ব্বে কোন যাত্রাই রাজবাটীতে হয় নাই। আমার বোধ হয়, তখন যদি এরূপ যাত্রা থাকিত, তাহা হইলে তাঁহাদেরও প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হইত।" কেশবচন্দ্র সেন মহাশয় তাঁহার "কমল-কুটীরে" বিশেষ যত্ন সহকারে রায় মহাশয়ের যাত্রা শুনিতেন। একদা আমরা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছি, কেশববাবুর বাড়ীতে রায় মহাশয়ের যাত্রা হইতেছে, কেশব-বাবুর অঙ্কে স্বর্গীয় মহাত্মা রামকৃষ্ণ পরমহংস উপবিষ্ট, একমনে রায় মহাশয়ের গান শুনিতেছেন। রায় মহাশয় তৎকালে তাঁহার প্রণীত নিমাই সন্ন্যাস গীতাভিনয়ে শ্রীধর রূপে অবতীর্ণ। আবেগময় প্রাণমুগ্ধকর ভক্তিরসের প্রবল স্রোতে পরমহংসদেব সমাধি প্রাপ্ত হইলেন। অনেক পরে আবার প্রকৃতিস্থ হইয়া রামকৃষ্ণ পরমহংস 'মতি মতি' বলিয়া স্বয়ং উত্থান পূর্ব্বক রায় মহাশয়কে আলিঙ্গন করিলেন। প্রসিদ্ধ বাগ্মী সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার শিমুল-

তলার বাটীতে সমাজ ও নীতিশিক্ষা সম্বন্ধে রায় মহাশয়ের বক্তৃতা শুনিয়া শতমুখে প্রশংসা করিয়াছেন।"

মতিরায়ের অনুকরণে পূর্ব্ব ও পশ্চিম বঙ্গে অনেক যাত্রার দল গঠিত হইয়াছিল। তন্মধ্যে সাঁতরা কোম্পানীর দল, উমাকান্ত ঘোষালের দল, ডেঙ্গর ঘোষ, কালীকান্ত নয়, ভূষণদাস, অহিভূষণ ভট্টাচার্য্যের দল বিশেষ উল্লেখযোগ্য। অহিভূষণের "সুরথ উদ্ধার" গীতাভিনয়ের নাম সকলেরই পরিচিত। উমাকান্ত বাবু ব্রাহ্মণ-বংশোদ্ভব, সুশিক্ষিত এবং সুকণ্ঠ ছিলেন। পূর্ব্ববঙ্গে তাঁহার বিশেষ খ্যাতি ছিল। ভূষণদাস ও মথুর সাহার দলও উল্লেখযোগ্য। জাতীয়তার দিক্ হইতে মুকুন্দদাস সর্ব্বজনবিদিত। আমরা যথাস্থানে তাঁহার সম্বন্ধে বিস্তৃত ভাবে আলোচনা করিব।

কবি, হাফ-আখড়াই ও পাচালী যাত্রার ন্যায় নহে। তথাপি আমোদ-প্রমোদ এবং লোকশিক্ষার প্রতিষ্ঠান হিসাবে এইগুলিরও কিঞ্চিৎ পরিচয় এখানে দেওয়া আবশ্যক। কবিগান সাধারণতঃ দুই দলে হইয়া থাকে। শিব, শক্তি, কৃষ্ণ এবং অন্যান্য পৌরাণিক দেবতাদিগকে লইয়া উভয়দলের মধ্যে বেশ বুদ্ধির পরীক্ষা চলিত। এক দলের পর আর এক দলের গান হইত। কবি বলিতে আজকাল যাহা আমরা বুঝি অর্থাৎ poet—পূর্ব্বে তাহা এই সম্প্রদায়ের মধ্যেই নিবদ্ধ ছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে হরু ঠাকুর এবং তাঁহার চেলা ভোলা ময়রা, নীলু ঠাকুর, নিতাই বৈষ্ণব প্রভৃতি প্রসিদ্ধ কবিওয়ালা ছিলেন। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে হরু ঠাকুর, রাম বসু, এণ্টুনি ফিরিঙ্গী, ভোলা ময়রা সাতু রায় প্রভৃতি কবিওয়ালাগণ বিশেষ জনপ্রিয় ছিলেন।

রাজা নবকৃষ্ণ কর্ণেল ক্লাইভের মুন্সীরূপে বিখ্যাত ছিলেন। হরুঠাকুর ছিলেন তাঁহারই বিশেষ প্রিয়পাত্র। পরে তিনি রাজদরবারের সভাসদ্ হইয়াছিলেন এবং অন্যান্য দলের জয় পরাজয় বিচার করিতেন। হরুঠাকুরের প্রসিদ্ধ পদ—

হরিনাম করিতে অলস করো না রসনা
যা হবার তাই হবে।
ভবের তরঙ্গ বেড়েছে বলে কি
কেউ দেখে না ডুবাবে।

হরুঠাকুরের গানগুলি খুব সুন্দর। বিরহের গানেই তিনি সমধিক খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। এণ্টুনী ছিলেন পর্ত্তুগীজ। তিনি প্রথমে ফরাসডাঙ্গায় আসিয়া বাস করিতে আরম্ভ করেন। সেখানে তিনি এক ব্রাহ্মণ-যুবতীর প্রেমে পড়েন। পরে তাহাকে লইয়া তিনি গরিটীর নিকট যাইয়া বাস করিতে আরম্ভ করেন। হিন্দু-যুবতীটি ফিরিঙ্গীর সঙ্গে বাস করিলেও হিন্দু আচার ব্যবহার বজায় রাখিয়াছিল এবং বাড়ীতে দুর্গোৎসব করিত। এণ্টুনী সাহেব তাহার সহিত বাস করিয়া বাঙ্গালা বেশ ভাল বলিতে শিখিয়াছিল। প্রেমে পড়িয়া সাহেব নিজের ব্যবসা পরিত্যাগ করেন এবং সখের দল করিয়া সর্ব্বস্বান্ত হ'ন। পরে পেশাদারী কবির দল করিয়া যথেষ্ট অর্থোপার্জ্জন করিয়াছিলেন।

উল্লিখিত কবিগণ সকলেই ছিলেন দ্রুত কবি। এণ্টুনী সাহেবকে পাইলে পাল্টা আরও জোরে জমিত। এখানে তাহার কিঞ্চিৎ পরিচয় দেওয়া গেল। একবার রামবসু এণ্টুনীকে বলিলেন,—

'কও হে এণ্টুনী!
আমি এইটী শুনতে চাই
এসে এদেশে এ বেশে
তোমার গায় কেন কুর্ত্তি নাই।"

রামবসু তখন ঠাকুর সিংহের দলভুক্ত ছিলেন। এণ্টুনী তাহার প্রশ্নের উত্তরে বলিলেন,—

এই বাঙ্গালায় বাঙ্গালীর বেশে আনন্দে আছি
হয়ে ঠাকুরে সিঙ্গীর বাপের জামাই
কুর্ত্তিটুপী ছেড়েছি।

এণ্টুনী একবার গান বাঁধিল,—

ওমা মাতঙ্গী, মা জানি ভকতি স্তুতি
জেতে আমি ফিরিঙ্গী।

পরক্ষণেই প্রতিদ্বন্দ্বী দলের দলপতি মাতঙ্গীর হইয়া উত্তর দিল—

যীশুখ্রীষ্টে ভজগে যা তুই শ্রীরামপুরের গির্জ্জেতে
জাত ফিরিঙ্গী জাবরজঙ্গী পারব নাক তরাতে।

আর একবার রামবসু এণ্টুনী সাহেবকে বলিলেন,—

সাহেব! মিথ্যে তুই কৃষ্ণপদে মাথা মুড়ালি।
ও তোর পাদ্রী সাহেব শুনতে পেলে
গালে দিবে চুনকালি।

এণ্টনী জবাব দিলেন,—

খৃষ্টে আর কৃষ্ণে কিছু প্রভেদ নাই রে ভাই।
শুধু নামের ফেরে মানুষ ফেরে এ ত কোথা শুনি নাই
আমার খোদা যে, হিন্দুর হরি সে
ঐ দেখ শ্যাম দাঁড়িয়ে রয়েছে
আমার মানব জনম সফল হবে,
যদি রাঙ্গা চরণ পাই।

হরুঠাকুর একবার রাম বসুর দলকে পরাজিত সাব্যস্ত করিলে, রামবসু উত্তরে গাহিলেন,

ঠাকুর! বাঁচবে না আর বিস্তর দিন।
তোমার চক্রে ধরেছে পোকা, ধর্মরেখা অতি ক্ষীণ॥

নিতাই দাসও একজন প্রসিদ্ধ কবিওয়ালা ছিলেন। তাঁহার সম্বন্ধে ঈশ্বরগুপ্ত মহাশয় প্রভাকরে লিখিয়াছিলেন,—

"ধনী লোক মাত্রেই কোন পর্ব্ব উপলক্ষে কবিতা শুনিবার ইচ্ছা হইলে অগ্রে নিতাই দাসকে বায়না দিতেন। ইঁহার সহিত ভবানী বেণের সাক্ষাৎ যুদ্ধ ভাল হইত। যথা প্রচলিত কথা—'নিতে বৈষ্ণবের লড়াই।' এক দিবস ও দুই দিবসের পথ হইতেও লোক সকল নিতে-ভবানের লড়াই শুনিতে আসিত যাঁহার বাটীতে গাহনা হইত তাঁহার গৃহ লোকারণ্য হইত, ভিড়ের মধ্যে ভেদ করিয়া প্রবেশ করিতে হইলে প্রণান্ত হইত। তৎকালে যদিও অজানা দল ছিল; কিন্তু হরুঠাকুর, নিতাই দাস এবং ভবানী বণিক্ এই তিন জনের দল সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান রূপে গণ্য ছিল। এই নিত্যানন্দের গোঁড়া ভক্ত কত ছিল তাহার সংখ্যা করা যায় না। কুমার হট্ট, ভাটপাড়া, ত্রিবেণী, বালী, ফরাসডাঙ্গা, চুঁচুড়া প্রভৃতি নিকটস্থ ও দূরস্থ গ্রামের ভদ্র অভদ্র লোক নিতাইয়ের নামে গদ্‌গদ হইতেন। নিতাই দাস জয় লাভ করিলে ইঁহারা যেন ইন্দ্রত্ব পাইতেন। পরাজয় হইলে পরিতাপের সীমা থাকিত না; যেন হৃতসর্ব্বস্ব হইবেন—এমনি জ্ঞান করিতেন। অনেকে আহার নিদ্রা রহিত হইত। কতস্থানে কতবার গোঁড়ায় গোঁড়ায় লাঠালাঠি কাটাকাটি হইয়া গিয়াছে। অন্যে পরে কা কথা, ভাটপাড়ার ঠাকুর মহাশয়েরা নিত্যানন্দকে নিত্যানন্দ প্রভু বলিয়া সম্বোধন করিতেন। ইঁহারা গাহনার প্রাক্কালে "প্রভু উঠেছেন" বলিয়াই গোড়ায়ই টলটল হইতেনণ নিতায়ের এক প্রধান গুণ ছিল যে, তিনি ভদ্রাভদ্র ভাবলোককেই সমভাবে সন্তুষ্ট করতে পারিতেন।"

জন হলহেড্

এণ্টনী ফিরিঙ্গীর মত আর একজন ইউরোপীয় কবিওয়ালা ছিলেন। তাঁহার নাম মিঃ ন্যাথানিয়েল জন হলহেড্। তিনি বাঙ্গালীর পোষাক পরিয়াই চলাফেরা করিতেন, এমনি অনর্গল বাঙ্গালা বলিতে পারিতেন যে, তিনি যে বাঙ্গালী নহেন, তাহা কেহই ধরিতে পারিত না। তিনি বাঙ্গালা ভাষায় কিরূপ দক্ষতা লাভ করিয়াছিলেন বর্দ্ধমানে একবার তাহার পরিচয় পাওয়া গিয়াছিল। বর্দ্ধমানের রাজাবাহাদুর ইউরোপীয়দিগকে এক ভোজে আমন্ত্রণ করেন। তাহাদিগকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য গানবাজনার ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। জন হলহেড্ এই গানের মজলিসে বাঙ্গালীর বেশে এমন সুন্দর গান করিয়াছিলেন যে, ঐ দলের বাঙ্গালীরা পর্য্যন্ত বুঝিতে পারে না যে তাহাদের সঙ্গে একজন বিদেশী গান করিতেছে। মিঃ হলহেড্ পেশাদার কবিওয়ালা ছিলেন না। তিনি ছিলেন সদর দেওয়ানী আদালতের একজন বিচারপতি। ইংরেজদের মধ্যে তিনিই সর্ব্বপ্রথম গ্রাম্য বাঙ্গালা ভাষায় কথা বলিতে পারিতেন। এ বিষয়ে তাঁহার সমকক্ষ আর কেহ ছিল না।

বলিতে কি, তৎকালীন বঙ্গসমাজের আমোদ-প্রমোদের প্রধান উৎস ছিল কবি, যাত্রা, পাঁচালী ইত্যাদি। রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের ভাষায় বলিতে পারি "কবি, যাত্রা, পাঁচালী প্রভৃতি সে কালের প্রধান আমোদ ছিল, তাহাদের মধ্যে কবি প্রধান। হরু ঠাকুর, নিতে বৈষ্ণব, রাসু, নৃসিং, রামবসু, ভবানীবেণে ইঁহাদের কবিতা সর্ব্বত্র বড় আদরের বস্তু ছিল।[১৩]

কবির দলের মধ্যে যিনি দ্রুত কবি থাকিতেন, লোকে তাঁহাকে বলিত বাঁধনদার। দ্রুত কবিত্ব, প্রত্যুৎপন্নমতি, প্রখর কল্পনা শক্তি, পুরাণে যথেষ্ট দক্ষতা না থাকিলে বাঁধনদারকে পরাজয় মানিতে হইত। তৎকালের কবিওয়ালাগণের যথেষ্ট পাণ্ডিত্য ছিল। কবি ঈশ্বরগুপ্তও কোন এক সময়ে কবির দলের বাঁধনদারের কাজ করিয়াছিলেন।

কি সহর, কি পল্লীগ্রাম সর্ব্বত্রই কবির বিশেষ আদর ছিল। কিন্তু উভয়পক্ষের মধ্যে বুদ্ধির এই লড়াই নিকৃষ্টতার এমন চরম সীমায় পৌছিয়াছিল যে, উভয় পক্ষে কদর্য্য,

---

১৩ সেকাল ও একাল—১৬ পৃষ্ঠা।

জঘন্য, অশ্লীল ব্যঙ্গোক্তি তখন কবিগান নামে পরিচিত হইয়া উঠিয়াছিল, জনসাধারণও নির্বিকারে এই অশ্লীল গালিগালাজ আকণ্ঠ পান করিয়া তৃপ্তি অনুভব করিত। ইংরেজী শিক্ষার প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে এই হীনরুচিসম্পন্ন আমোদ-প্রমোদের প্রতি লোকের বিতৃষ্ণা জন্মিতে লাগিল। ফলে কবিগানের প্রসার বহুল পরিমাণে হ্রাস প্রাপ্ত হইয়া গেল। এখন কবিগান একরূপ উঠিয়া গিয়াছে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

আমরা যে সময়ের কথা আলোচনা করিতেছি, তৎকালে সাধারণের আমোদ-প্রমোদের মধ্যে নাচের কোন স্থান ছিল না। সাধারণতঃ ইউরোপীয়দিগকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য ধনী লোকেরা নাচের মজলিসের আয়োজন করিতেন। এই সকল নাচের মজলিসে পেশাদার বাইজীরাই নাচিত। স্বর্গীয় রাধামোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের দ্বিতীয় পুত্র ভবানী-চরণ তাঁহার প্রথম পুত্রের জন্ম-উৎসব উপলক্ষে শালকিয়া এবং হাওড়ার সমস্ত ইউরোপীয়দিগকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। শালকিয়া এবং হাওড়া তাঁহার এই উভয় স্থানের বাড়ীতে এই উপলক্ষে বাই নাচের আয়োজন হইয়াছিল। এই নাচের আসরে সহরের সেরা বাইজীগণকে বায়না করা হইয়াছিল।

রাজা রাজকৃষ্ণের বাড়ীতে একবার নূতন ধরণের নাচের ব্যবস্থা করা হয়। এই নাচের আসরে কতিপয় মুসলমান পুরুষ নৃত্য প্রদর্শন করিয়াছিল। হিন্দুস্থানী নাচ এবং খেয়াল, টপ্পা ও ধ্রুপদ গানকে ব্যঙ্গ করিয়া এই আসরে নৃত্যগীত হইয়াছিল।

হাফ্ আখড়াই

হাফ্ আখড়াইগুলি অধিকাংশ স্থলেই ছিল সখের দল। বিশিষ্ট ভদ্রপরিবারের যুবকগণ হাফ্ আখড়াই দলে গান করিতেন। ইহাতে বিবিধ প্রকার বাদ্যযন্ত্র ব্যবহৃত হইত। সহরেই ইহার প্রচলন ছিল বেশী। কলিকাতার অনেক অভিজাত বংশের সন্তান—এমন কি, অনেক রাজা মহারাজা পর্য্যন্ত এই আমোদ প্রমোদে যোগদান করিতেন। দুর্গাপূজার সময় অনেক হাফ্ আখড়াই ও পাঁচালীর দল গান বাজনা সহকারে কলিকাতার বিভিন্ন পথে পরিভ্রমণ করিত।

পাঁচালী

পাঁচালী ছিল সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র অনুষ্ঠান। দলের যিনি প্রধান থাকিতেন, তিনি সুর-তান-লয় সহকারে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ, রাধাকৃষ্ণের প্রণয় ব্যাপার কথা ও গানে বর্ণনা করিতেন এবং দলের আর সকলে গানের ধূয়া ধরিত। লক্ষ্মীকান্ত বিশ্বাস, গঙ্গানারায়ণ লস্কর প্রভৃতি পাঁচালীওয়ালাগণের খুব নাম ছিল বটে, কিন্তু দাশরথি রায়ের খ্যাতি সকলকে অতিক্রম করিয়াছিল। ১৮০৪ খৃষ্টাব্দে বর্দ্ধমান জেলার বাদমুড়া গ্রামে দাশরথি রায় জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন। দাশরথি রায় প্রথমে কবির দলের বাঁধনদার ছিলেন। কবিগান করিতে গিয়া দাশরথি প্রায়ই প্রতিপক্ষের নিকট কুৎসিত গালিগালাজ শুনিতেন। ইহাতে তাঁহার পিতা ও মাতুল তাঁহাকে কবির দল পরিত্যাগ করিতে আদেশ করেন। অতঃপর কবি দাশরথি পাঁচালী রচনা করিয়া অক্ষয় কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন। প্রভাস, চণ্ডী, দক্ষযজ্ঞ, মানভঞ্জন, লবকুশের যুদ্ধ, বিধবা-বিবাহ প্রভৃতি তাঁহার রচিত অনেক পাঁচালী ছাপা হইয়াছে। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে তিনি মানবলীলা সংবরণ করেন। ঐ সময়ে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বিধবা বিবাহের আন্দোলনে সমগ্র বঙ্গদেশ আলোড়িত হইয়া উঠিয়াছিল। দাশরথি রায় তাঁহার মৃত্যুর পূর্ব্বে বিদ্যাসাগর মহাশয়কে স্তুতি ছলে নিন্দা এবং গুপ্ত কবিকে নিন্দাছলে প্রশংসা করিয়া গান রচনা করিয়াছিলেন। নিম্নে তাঁহার দুই একটি পদ উদ্ধৃত হইল,

(১) বিধবার দিতে নাথর গুণের সাগর
বিদ্যাসাগর রূপ ধরেছেন গুণনিধি। ইত্যাদি।
(২) নরক দেশের অধ্যাত্মিকে, বিপক্ষ বিধবা দিকে
জুটেছে এই কথায়,
কলিকাতায় আমাদের ঈশ্বরগুপ্ত অক্ষয়ে
নারীর যোগ বোঝে না বৈদ্য হয়ে
যেমন হাতুড়ে বৈদ্য বিষ দিয়ে দেয়
প্রাণে বধি। ইত্যাদি।

তাঁহার একটি প্রসিদ্ধ গানের দুই একটি পদ এখনও লোকের মুখে শোনা যায়—

দোষ কারু নয় গো মা, আমি স্বখাত সলিলে
ডুবে মরি গো শ্যামা
ষড়্‌রিপু হ'ল কোদণ্ড স্বরূপ
পুণ্যক্ষেত্র মাঝে কাটিলাম কূপ। ইত্যাদি।

উপমা ও অনুপ্রাসের প্রয়োগে, উপযুক্ত প্রত্যুত্তর দিতে এবং প্রতিপক্ষকে জব্দ করিতে দাশরথি রায়ের সমকক্ষ

তৎকালে আর কেহ ছিল না। পাঁচালীওয়ালা তৎকালে আরও অনেকে ছিলেন বটে, কিন্তু পাঁচালীর শ্রেষ্ঠস্থান অধিকার করিবার মূলে যে দাশরথির কবি-প্রতিভা, তাহাতে সন্দেহ নাই। দাশরথি রায় বাঙ্গালা সাহিত্যে একটা বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছেন। স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্রও তাঁহার যথেষ্ট প্রশংসা করিয়াছেন।

কালক্রমে পাঁচালীর ভাষা এত অশ্লীলতা দোষে দুষ্ট হইয়া উঠিল এবং উহাতে এত অসঙ্গত অনুপ্রাস এবং উপমার প্রয়োগ হইতে লাগিল যে, ভদ্রসমাজ পাঁচালীর প্রতি অত্যন্ত বীতশ্রদ্ধ হইয়া উঠিয়াছিলেন।

পাঁচালীওয়ালা এবং যাত্রাওয়ালা হিসাবে ব্রজমোহন রায়ের নামও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাঁহার রচিত "রামসীতা" "সাবিত্রী" এবং "অভিমন্যু" অতি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ।

জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষার প্রচারের জন্য 'কথকতা' একটি উৎকৃষ্ট পন্থা। কথকতায় কথক ঠাকুর কোন পৌরাণিক ঘটনা বিবৃত করেন এবং সঙ্গে সঙ্গে সুরসাল ভাষায় সমালোচনা এবং সঙ্গীতাদি দ্বারা বর্ণিত বিষয়কে সরস ও হৃদয়গ্রাহী করিয়া তুলেন। কথক হিসাবে শ্রীধর কথকই বিশেষ খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিলেন। কথকতায় অশ্লীলতা বা হীনরুচির কোন স্থান নাই। এখনও কথকতার প্রচলন আছে বটে, কিন্তু ভাল কথক খুব বিরল।

এই সঙ্গে নিধুবাবুর কথাও উল্লেখ করা আবশ্যক। নিধুবাবু তাঁহার রচিত টপ্পাগানের জন্য বিখ্যাত হইয়া রহিয়াছেন।

কীর্ত্তন

কীর্ত্তন এক শ্রেণীর সঙ্গীতবিশেষ। কীর্ত্তন শুনিয়া বহুলোক তৃপ্তি অনুভব করিয়া থাকেন। বহুদিন হইতে বাঙ্গালা দেশে ইহা প্রচলিত আছে। কীর্ত্তন বলিতে সাধারণতঃ ভক্তিরস পূর্ণ গীতবিশেষকেই বুঝাইয়া থাকে। পূর্ব্বে ভগবৎ-প্রেম, করুণা, জাগতিক বিষয়ের অসারতা, দেহতত্ত্ব প্রভৃতি লইয়া কীর্ত্তন রচিত হইত।

তবলা, বেহালা, সারেঙ্গী প্রভৃতি যে সকল বাদ্য-যন্ত্র মানুষের মনে ইন্দ্রিয়লালসা জাগ্রত করিয়া তুলে, কীর্ত্তনে তাহাদের স্থান নাই। একতারা, সারিন্দা, খোল, খঞ্জনী অথবা গোপীযন্ত্র সহযোগে কীর্ত্তন গীত হইয়া থাকে। প্রথমে মেয়েরাই কীর্ত্তন গান করিত। যে সকল পতিতা পাপব্যবসা পরিত্যাগ করিত, তাহারাই সাধারণতঃ কীর্ত্তন গাহিত। কালক্রমে কীর্ত্তনের বহু পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে। কীর্ত্তন খুব আনন্দ দায়ক এবং উচ্চ অঙ্গের সঙ্গীত বলিয়া অনেক পুরুষ শিল্পী কীর্ত্তনের দিকে আকৃষ্ট হয় এবং কীর্ত্তন গাহিতে আরম্ভ করে। অতঃপর শুধু ভগবদ্ভক্তি ও করুণা প্রভৃতি কীর্ত্তনের মধ্যে আবদ্ধ রহিল না, রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলার বিভিন্ন দিক—যেমন পূর্ব্বরাগ, মিলন, বিরহ প্রভৃতি অবলম্বন করিয়া কীর্ত্তন গান রচিত হইতে লাগিল। বর্ত্তমানে একতারা এবং সারিন্দার স্থান হারমোনিয়ম অধিকার করিয়াছে, কিন্তু পুরাতন খোলকে কেহ স্থানচ্যুত করিতে পারে নাই। এমন কি, থিয়েটারে যখন কীর্ত্তন করা হয়, তখনও তবলার পরিবর্ত্তে খোল বাজান হইয়া থাকে।

উপজই হইল কীর্ত্তনের প্রধান মাধুর্য্য। উপযুক্ত মুহূর্ত্তে যে কীর্ত্তন-গায়ক যত অধিক সংখ্যক উপজ ব্যবহার করিতে পারেন, তিনিই কীর্ত্তনে যথেষ্ট খ্যাতি অর্জ্জন করিতে পারেন। উপজ সম্বন্ধে নিম্নে একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া গেল :—

কীর্ত্তনের একটি পদ আছে "বিফলে পড়ল এসে মালতীর মালা।" এই পদটি গাহিয়া নিম্নলিখিত রূপ উপজ সংযোজনা করা হইয়া থাকে, যথা :—

আমার মালা গাঁথা বিফল হলো, বন্ধুর জন্যে মালা গেঁথেছিলাম, আমার মালা গাঁথা বন্ধুর জন্যে, অনুরাগ মিশাইয়ে মালা গেঁথেছিলাম, আমার মালা গাঁথা ইত্যাদি—

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন কীর্ত্তন শুনিতে ভাল বাসিতেন। জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষা প্রচারের জন্য কীর্ত্তনের প্রয়োজনীয়তা এবং যোগ্যতা তিনি বিশেষরূপে উপলব্ধি করিয়াছিলেন। তবে কীর্ত্তন আরও উন্নত হওয়া আবশ্যক। তাঁহার জীবিতকালে তিনি কীর্ত্তনকে উন্নত এবং কালোপযোগী করিতে বিশেষ প্রয়াস পাইয়াছিলেন। গণেশ কীর্ত্তনীয়া মহাজনী পদ খুব উন্নত ও মার্জ্জিত ভাবে গাহিতেন। এই জন্যই তাঁহার কীর্ত্তন শুনিতে দেশবন্ধু খুব ভালবাসিতেন।

দেশবন্ধুর মৃত্যুর পর তাঁহার কন্যা শ্রীমতী অর্পণা দেবী কীর্ত্তনের উন্নতিকল্পে নিজে একটি কীর্ত্তনের দল গঠন করিয়াছেন। তাঁহার এই কীর্ত্তনের দলের নাম ব্রজ-মাধুরী সঙ্ঘ। একবার তাঁহার কীর্ত্তন গানে নাটোরের বর্ত্তমান মহারাজা স্বয়ং খোল বাজাইয়াছিলেন। অর্পণা দেবীর কীর্ত্তন শুনিয়া হাইকোর্টের বিচারপতি হইতে আরম্ভ করিয়া সাধারণ লোক পর্য্যন্ত সকলেই একবাক্যে প্রশংসা করিয়াছেন। তাঁহার এই ব্রজমাধুরী সঙ্ঘ দীর্ঘজীবন লাভ করিয়া জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষা প্রচারে ব্রতী থাকুক—ইহাই আমাদের আন্তরিক কামনা।

বর্ত্তমানে রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত খগেন্দ্র নাথ মিত্র এম, এ মহোদয় কীর্ত্তনে বিশেষ খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছেন। তিনি অর্পণা দেবীকে কীর্ত্তন-সরস্বতী উপাধি প্রদান করিয়াছেন। তিনি যে, এই উপাধিলাভের সম্পূর্ণ যোগ্য, তাহাতে সন্দেহ নাই। কীর্ত্তনের উন্নতির জন্য দেশবন্ধু যে পন্থা নির্দ্দেশ করিয়াছেন, অর্পণা দেবী তাহাই অনুসরণ করিয়া চলিয়াছেন।

শৈলেন্দ্র নাথ

মরণ-বাসর

—শ্রীহীরেন্দ্রনাথ বসু এম্.-এ

(রস-চিত্র)

হেনা আর হরেনের জীবন গীতি-নাট্যের মতই বেশ মিলনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল, কিন্তু হঠাৎ তাদের মধ্যে ঘটে গেল বিচ্ছেদ—মানুষের মন বোঝা বড় শক্ত, মেয়েদের তো কথাই নেই, বন্ধু-বান্ধবেরা কেউ ভেবেই ঠিক কোরতে পারলেন না ব্যাপারটা ঠিক কি যে হোলো। কেউ দিলেন হরেনকে দোষ, কেউ কোরলেন হেনাকে দোষী। এমন সময় হরেন হোলো নিরুদ্দেশ – চারদিকে খোঁজ খোঁজ রব। বন্ধু-বান্ধবের বাড়ী, আত্মীয়-স্বজনের বাসায় সবাই কোরলে ছুটাছুটি। শেষে থানায় থানায়, হাঁসপাতালে হাঁসপাতালে খবর নিয়েও যখন হরেনের কোন পাত্তাই পাওয়া গেল না, তখন রেডিওতে এস, ও, এস খবর শোনা গেল—

"হরেন্দ্রনাথ বসু বয়স ২১।২২, ছিপছিপে, রং কালো, বাঁ দিকের কপালে ভ্রূর কাছে একটা কাটা দাগ, লম্বাটে ধরণ, কোঁকড়া চুল, গায়ে সিল্কের পাঞ্জাবী, পায়ে হরিণের চামড়ার চটিজুতো, চোখে রিম্-লেস্ চশমা, পঞ্চম বার্ষিক শ্রেণীর ইতিহাসের ছাত্র, হঠাৎ নিখোঁজ হোয়েছেন। ৪৯, নম্বর সদানন্দ রোডে শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ বসু, নিকটস্থ থানায়, অথবা রেডিও আফিসে খবর দেবেন।"

লেকের ধার। রাত এগারোটা বেজে গেছে। এ অঞ্চলটা একটু নির্জ্জন। একখানা খালি মোটর দাঁড়িয়ে আছে। জলের ধারে একখানা বেঞ্চে বোসে একটি লোক কি লিখছিল। পেছনকার গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে একজন বয়স্কলোক তার দিকে নজর রাখছিলেন। হঠাৎ বেঞ্চ থেকে লোকটি উঠে যেতেই বয়স্কলোকটী সেখানে এসে দেখলেন, বেঞ্চের উপর একখানি ছোট ডাইরী পোড়ে। সেখানি হাতে নিয়ে তুলে দেখেন, তাতে লেখা রোয়েছে—"আমার মৃত্যুর জন্তে কেহ দায়ী নহে।"

ভদ্রলোক সামে চেয়ে দেখেন, লোকটি জলের ধারে গিয়ে দাঁড়িয়েছে. গায়ে সিল্কের পাঞ্জাবী, বেঞ্চের তলায় হরিণের চামড়ার চটি।

আকাশে অসংখ্য তারা লেকের কালো জলে এসে যেন ডুব দিয়েছে, ঝক্‌ঝক্ কোরছে—হরেনও ডুব দিতে গেল। ঠিক সেই সময় তার কাণের কাছে কে বোলে উঠলো—"হাঁ হাঁ! করেন কি, করেন কি?"

হরেন চোম্‌কে পেছন ফিরতে না ফিরতেই বয়স্ক ভদ্রলোকটী এসে তার হাতখানি খপ কোরে চেপে ধোরলেন। হরেন হাত ছাড়াতে চেষ্টা কোরে বোল্‌লে—"হাত ছাড়ুন—"

ভদ্রলোক—"অত তাড়া কেন মশাই! বলি, আত্মহত্যা কোরবেন তো?"

হরেন—"আমার খুসী। আপনার ক্ষতি কি?"

ভদ্রলোক—"আমার? কিছু না। একটী ভদ্রলোকের মেয়ে বড় বিপদে পোড়েছেন, তাই আপনার সাহায্য চাইছেন তিনি।"

হরেন—"ভুল লোককে এসে ধোরেছেন আপনি। একটী ভদ্রলোকের মেয়ের জন্তেই আজ আমি লেকের জলে ঝাঁপ দিতে এসেছি—।"

ভদ্রলোক—"ছি:! একটী মেয়ের অপরাধের জন্তে আপনি সব মেয়েকেই দোষী ভাবছেন কেন?—মেয়েটী সুন্দরী···শিক্ষিতা···ভদ্রঘরের। পোনোরো মিনিটের জন্তে যদি আমার সঙ্গে আসেন একটীবার—"

হরেন—"শুনুন, আমি এখানে লেকের জলে ডুবতে এসেছি।"

ভদ্রলোক—"বেশ কোরেছেন, কিন্তু ও কাজটী ভয়ানক পুরণো হয়ে গেছে। জলে ডোবা, আফিম খাওয়া, রেলে কাটা, আগুনে পোড়া, গলায় দড়ি এগুলো শুন্‌লেই মনে হয়, অশিক্ষিত আর পাড়াগেঁয়ে। তাই আমি অনেক চিন্তা কোরে আত্মহত্যা করবার একটা অভিনব উপায় আবিষ্কার কোরেছি—।"

হরেণ—"অভিনব আত্মহত্যা!!"

ভদ্রলোক—"আজ্ঞে হাঁ। যাঁদের জীবনের ওপর ঘেন্না হোয়েছে, যাঁরা আর বাঁচতে চান্‌না, সেই সমস্ত সৎসাহসী

সৌখীন তরুণ-তরুণী—যাঁদের চোখে রামধনু, মুখে গান, বুকে হাজার তারার আলো ; জীবনটা যাঁদের হাসি-গান-নাচে ভরা মধুর একখানি গীতিনাট্য—তার শেষ দৃশ্য লেকের জলে ! পাড়াগাঁয়ের মেয়েদের মত ! আরে ছিঃ ! আপনি তরুণ—প্রগতির অগ্রদূত, আপনাদের কাছে আমরা আশাকরি সব সময়েই একটা অদ্ভুত কিছু ।"

হরেন—"মরে ভূত হোয়ে অদ্ভুত কিছু একটা করবার চেষ্টা কোরবো, এখন ছাড়ুন—।"

ভদ্রলোক—"আপনি ভুল কোরছেন । আমি আপনাকে বাঁচাতে আসিনি ।"

হরেন—"তবে ?"

ভদ্রলোক—"তা হোলে ব্যাপারটাকে একটু খুলেই বোলি আপনাকে । আমার নাম ডাক্তার রসিকলাল চক্রবর্ত্তী । নামটা বোধ হয় আপনার খুব শোনা শোনা ঠেক্ছে, নয় ?"

হরেন—"আজ্ঞে না ।"

ভদ্রলোক—"সে কি কথা ! কোলকাতার সৌখীন সম্প্রদায়ের সকলেই আমাকে রসিকদা' বোলে জানেন । যাক্…আমি যে কথা আপনাকে বোল্‌তে চাই শুনুন—।"

হরেন—চট্ পট্ বোলে ফেলুন—আপনার সঙ্গে দাঁড়িয়ে গল্প করবার আমার সময় নেই ।"

ভদ্রলোক—"দেখুন, মানুষ হোলো সামাজিক জীব । পাঁচ জনকে নিয়েই আমাদের থাকতে হয়—মৃত্যুর চরম দিনটি পর্য্যন্ত মানুষের প্রতি মানুষের একটা কর্ত্তব্য আছে । তাই, আমি বোলছিলুম—এই রকম নিঃসঙ্গ—একাকী মরবার আপনার দরকার কি ?"

হরেন—"একলা মরবো না তো আবার সঙ্গী কোথা পাবো— ।"

ভদ্রলোক—"পাওয়া যায় মশায়, পাওয়া যায়, মরবার সঙ্গী হবার আবার লোকের ভাবনা !"

হরেন—"বেশ তো, তবে আপনিই আমার মরবার সঙ্গী হোন্ না ?"

ভদ্রলোক—"আমি বুড়ো মানুষ । আপনি হোলেন তরুণ, আপনার মরবার একজন সঙ্গিনী চাই ।"

হরেন—"সঙ্গিনী ! মরবার জন্তে !"

ভদ্রলোক—"হাঁা, তবেই তো মরাটা হবে গানের মত মধুর, স্বপ্নের মতই রোমাঞ্চকর ।"

হরেন—"মরবার সঙ্গিনী সত্যি পাওয়া যায় ?"

ভদ্রলোক—"কত চাই । নাচের, গানের, থিয়েটারের সঙ্গিনী পাওয়া যায়, আর এত বড় কোলকাতা সহরে একটি শিক্ষিত ভদ্রসন্তানের সঙ্গে মরবার একজন সঙ্গিনী পাওয়া যাবে না ?"

হরেন—"হোটেলে পাশে বোসে খাবার, মোটরে চোড়ে বেড়াবার, সিনেমা-থিয়েটার দেখবার সঙ্গিনী অনেক পেয়েছি, কিন্তু মরবার— ; আপনি আশ্চর্য্য কোরলেন ! আমার মরণ-সঙ্গিনী যিনি হবেন তিনি কেমন ?"

ভদ্রলোক—"আজ্ঞে বেশ ভালোই । ভদ্রঘরের শিক্ষিতা সুন্দরী তরুণী—।"

হরেন—"আমার সঙ্গে তিনি মরতে চান ?"

ভদ্রলোক—"আজ্ঞে হাঁা । তিনি প্রস্তুত হোয়ে অপেক্ষা কোরছেন আপনার— ।"

হরেন—"কোথায় ?"

ভদ্রলোক—"আসুন তবে আমার মোটরে । এই নিন্ আপনার ডাইরী, চটিটা পোরে ফেলুন ।" ভদ্রলোকটী হরেনের হাত ধোরে মোটরের সামনে এসে দরজা খুলে বললেন, "উঠুন । হাঁা, দেখুন, এই রুমালখানা চোখে বেঁধে ফেলুন, এটা আমাদের নিয়ম । আপনার বিশেষ আপত্তি নেই বোধ হয়— ।"

হরেন গাড়ির ভেতর উঠতে উঠতে বললে—"তা দিন, রুমাল না হয় চোখে বাঁধছি; কিন্তু আমার মনে হচ্ছে আপনি আমায় ধাপ্পা দিচ্ছেন না তো ?"

ভদ্রলোক দরজা বন্ধ কোরে গাড়ীতে ষ্টার্ট দিয়ে বললেন, "যদি দিই, লেকের জল তো আর পোনেরো মিনিটে শুকিয়ে কাঠ হোয়ে যাচ্ছে না, এসে নয় ডুববেন এখন মশায়—।"

হরেন রুমাল চোখে লাগাতেই গাড়ি তীরের মত ছুটতে লাগলো । হরেন জিজ্ঞাসা কোরল, "কোথায় নিয়ে চোললেন আমায় ?"

ভদ্রলোক—"আজ্ঞে যেখানে তিনি আছেন, আমাদের **মরণ-বাসরে** ।"

হরেন—"মরণ-বাসর !"

ভদ্রলোক—"অভিনব আত্মহত্যার একটা আড্ডাখানা বোল্‌লে কেউ কি আর তার কাছে ঘেঁসতো মশাই, কিন্তু

এই মরণ-বাসর নামের মায়ায় মুগ্ধ হোয়ে অনেক সৌখীন তরুণ-তরুণী আমার এখন খোদ্দের হোচ্ছেন।"

হরেন—"খোদ্দের! আপনি মরবার জন্মে লোকের কাছ থেকে ফি,—মানে টাকা আদায় করেন না কি?"

ভদ্রলোক—"যে যা দেয়, কোন জুলুম কোরি না। আমার এই মরণ-বাসর রাত্রের পর রাত সাজিয়ে রাখতে একটা তো খরচ হয় মশাই, সেই খরচটাই কেবল তুলি।"

হরেন—"তা তুলুন, কিন্তু আমি আপনাকে একটি আধলা দোবো না।"

ভদ্রলোক—"আমি তো আপনার কাছে কিছু চাইনি। একটী সুন্দরী তরুণী আমার মরণ-বাসরে অভিনব ভাবে আত্মহত্যা কোরতে এসেছেন, আমি কিছুতেই তাঁর মরবার একজন সঙ্গী খুঁজে পাচ্ছিলুম না। আজ হঠাৎ রেডিওতে—"

হরেন—"ও আপনি রেডিওতে খবর শুনে বুঝি তাই লেকের ধারে ওৎপেতে বোসেছিলেন?"

ভদ্রলোক—"কি করি মশাই, আমার হোলো এই ব্যবসা। আজ যদি আপনাকে আমি খুঁজে বার কোরতে না পারতুম, তা'হোলে সৌখীন সমাজে একথা জানাজানি হোয়ে গেলে আমার সব পসার মাটি হোতো—

হরেন—"আপনি তো দেখছি তা হোলে লোক খুন করবার ব্যবসা করেন—"

ভদ্রলোক—"না, যাঁরা আত্মহত্যা কোরতে চান তাঁদের ছাড়া আমি আর কাকেও ধোরে আনি না তো।"

হরেন—"মেয়েটীকে কি আমার মত এখান থেকেই ধোরে নিয়ে গেছেন?"

ভদ্রলোক—"না, তিনি নিজেই এসেছেন।"

হরেন—"মরবেন বোলে?"

ভদ্রলোক—"হাঁ, অভিনব ভাবে। এ বিষয়ে তাঁকে আপনার সাহায্য কোরতে হবে। তিনি একজন শিক্ষিতা ভদ্র-কুমারী, আপনি একজন শিক্ষিত ভদ্র-সন্তান, আপনার কাছে এটুকু সাহায্য তিনি কি আশা কোরতে পারেন না?"

হরেন—"আমার কি কোরতে হবে—?"

ভদ্রলোক—"সোণার হরিণ শিকার—।"

হরেন—"এ যে রামায়ণের গল্প সুরু কোরলেন—।"

ভদ্রলোক—"সবটাই শুনুন আগে, তারপর নয় মন্তব্য কোরবেন। মরণ-বাসরের ব্যবস্থা মত মরতে চায় যারা—এমন একজন তরুণের সঙ্গে একজন তরুণীকে একটী হলঘরে ছেড়ে দেওয়া হয়—।"

হরেন—"তারপর?"

ভদ্রলোক—"ঘরের ভেতরে থাকে একটা গুলীভরা পিস্তল, আর একটা হরিণের মুখোস। সেখানে তারা দুজনে টাকা ছুড়ে ভাগ্য-পরীক্ষা করে—যে জেতে সে হয় হরিণ, আর যে হারে তাকেই হোতে হয় শিকারী।"

হরেন—"ভাগ্য-পরীক্ষার সঙ্গে সঙ্গে হরিণ বেচারীকে তা হোলে শিকারীর হাতেই মারা পোড়তে হয়?"

ভদ্রলোক—"শিকারীরও মারা পড়বার সম্ভাবনা বড় কম নেই—।"

হরেন—"কেন?"

ভদ্রলোক—"শিকারের সময়, ঘর কোরে দেওয়া হয় একেবারে অন্ধকার—।"

হরেন—"অন্ধকার! সে কি মশাই, অন্ধকারে শিকার চোলবে কেমন কোরে?"

ভদ্রলোক—"ছোট্ট একটী সোণার ঘণ্টা লাগান থাকে হরিণের গলায়, তার আওয়াজ শুনে শিকারীকে লক্ষ্য কোরে অন্ধকারেই গুলী চালাতে হয়—।"

হরেন—"শিকারীর গুলী যদি হরিণের গায় না লাগে?"

ভদ্রলোক—"তখন হরিণের হাতে পিস্তলটী দিয়ে শিকারীকেই হরিণ সাজতে হয়—।"

হরেন—"বুঝেছি। আর কত দূর—?"

ভদ্রলোক—"এই যে এই গলির ভেতর। আর মোটর ঢুকবে না। এইবার একটু হাঁটতে হবে, নামুন—এইবার আপনি রুমালটা খুলে ফেলুন—।"

ভদ্রলোক গাড়ীর দরজা খুলে দিলেন, হরেন নেবে পোড়লো। গলির পথ ধরে হরেন তাঁর পেছু পেছু এগুতে লাগলো। উত্তেজনার ঝোঁকে এতদূর অবধি এসে তার যেন এখন কেমন একটু ভয় ভয় কোরছে, হরেন ডাক্তার রসিকলালকে বোললে—"কোলকাতার ভেতর এমনি নোংরা⋯জঘন্য গলি আছে! কুকুরগুলো কামড়াবে না তো মশাই, যা চীৎকার কোরছে, একটা কি আলোও নেই—?"

ভদ্রলোক—"কেন ? ভয় কোরছে নাকি ?"

হরেন—মরতেই যখন এসেছি, তখন আবার ভয় কি—।"

ভদ্রলোক—"কিছু না। তারপর যে কথা আপনাকে বোলছিলুম—প্রত্যেক সাত বারের বার আমি পিস্তলে একটা কোরে ফাঁকা আওয়াজ পুরি—।"

হরেন—"সাতবারের বার ফাঁকা আওয়াজ পোরেন কেন ?"

ভদ্রলোক—"মরবার রহস্য তাতে আরো বেড়ে যায়—"

হরেন—"ফাঁকা আওয়াজে—?"

ভদ্রলোক—"হ্যাঁ, সে দেখবেন তখন ভারি মজা। কার বরাতে কখন যে ঐ ফাঁকা আওয়াজ-ভরা পিস্তল হাতে এসে পোড়বে, তা দুজনের কেউই জানতে পারে না।"

হরেন—"কেন ?"

ভদ্রলোক—"তবে আর মজাটা কি হোলো। সেটা নির্ভর কোরতে হয় তাদের আমার ওপর। এইখানেই তো হোলো মরবার আসল রহস্য। আমাকে আপনাদের বিশ্বাস কোরতে হবে—কেমন, পারবেন তো ?"

হরেন—"সম্পূর্ণ।"

ভদ্রলোক—"বেশ, তবে আসুন আমার সঙ্গে এই বাড়ীতে।

অন্ধকারে ভালো বোঝা না গেলেও বাড়ীটা হাল্-ফ্যাসানের বেশ বড় বাড়ী বোলেই বোধ হোলো। দরজার কলিংবেল টিপিতেই ওপরে আলো জলে উঠলো। তারপর দরজা খুলে যে মূর্ত্তি এসে দেখা দিলেন, তাঁকে দেখে হরেনের বোরিস্ কারলফের মামীর কথা মনে পোড়ে বুক কেঁপে উঠলো। তবে ইনি পুরুষ নন্, নারী ; যেন হাজার বছর মাটীর গোরের ভেতর থেকে এই মাত্তর উঠে এলেন।

"আসুন" বোলে ডাক্তার রসিকলাল দামী কারপেট পাতা কাঠের সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠতে লাগলেন, হরেন তাঁর পেছু পেছু ওপরে উঠে এলো। সিঁড়ির সামনেই যে ঘরখানি, সেখানির ভেতর নীল আলো যেন স্বপ্নের মায়া আঁকছিল। আকাশের চাঁদের মত একটী সুন্দরী মেয়ে পিয়ানোর ওপর মাথা রেখে ঘরের ভেতর বোধ হয় ঘুমিয়ে পোড়েছে। হরেনও উৎসাহিত হোয়ে ফস্ কোরে জিজ্ঞাসা কোরলে—"উনি—উনিই বুঝি তিনি ?"

ভদ্রলোক—"আজ্ঞে না।"

হরেনের চোখের সামে যেন আলো নিবে গেল।

ভদ্রলোক—"উনি হোলেন মিস্ হেলেন রায়। আমায় এখানে পিয়ানো বাজান। আমার দেরি দেখে ঘুমিয়ে পোড়েছেন। আপনি দাঁড়াবেন না, আসুন এদিককার ঘরে।" হরেনকে প্রায় এক রকম টেনে নিয়ে গিয়ে ডাক্তার রসিকলাল আর একখানি ঘরের সামে এসে বোল্লেন—

"এই ঘরে আপনার মরণ-সঙ্গিনী আপনার অপেক্ষা কোরছেন। এটী হোলো আমাদের মরণ-বাসর। দরজায় টোকা দিন—না, না, দাঁড়ান।

সামে দেওয়ালে একটী হ্যাট-র‍্যাকে অনেকগুলো নানা রকমের মুখোস ঝুলছিল, ডাক্তার রসিকলাল তাই থেকে একটি তুলে নিয়ে হরেনের হাতে দিয়ে বোললেন—

"এই মুখোসটা আপনি আগে পোরে ফেলুন। তিনিও মুখোস পোরে আছেন। এখানকার নিয়ম সব গোপন রাখা হয়—নাম, ধাম, ঠিকানা—কেউ কিছুই জানতে পারে না।"

মুখোসটা পোরতে পোরতে হরেন বোললে—

"ব্যবস্থা সব ভালোই কোরেছেন। দেখুন দেখি, মুখোস পরাটা ঠিক হয়েছে কি না ?"

ভদ্রলোক—"ঠিক হোয়েছে, বাঃ ! এইবার দরজায় টোকা দিন।"

এইবার যেন হরেনের কেমন একটু লজ্জা লজ্জা কোরতে লাগলো, দরজায় টোকা দিতে যেন তার হাত কে ধেরে দিয়েছে। ডাক্তার রসিকলাল হরেনের ইতঃস্ততঃ ভাব লক্ষ্য কোরে হেসে বোললেন—

"লজ্জা কোরছে নাকি আপনার ? আপনি তো আর ওঁর সঙ্গে প্রেম কোরতে যাচ্ছেন না, যাচ্ছেন ওঁকে সাহায্য কোরতে, উনিও আপনাকে নিশ্চয়ই সাহায্য কোরবেন। আপনারা দুজনেই মরতে চান, এখানে মরবার জন্যেই এসেছেন। আমরা আছি কেবল আপনাদের এই মরণটাকে যথাসম্ভব মধুর কোরে তোলবার একটু সাহায্য কোরতে। টোকা দিন এইবার।"

হরেন দরজায় মৃদু আঘাত কোরতেই ভেতর থেকে,

তারের বাজনার মত এক তরুণীর সশব্দ ঝঙ্কারের সঙ্গে সঙ্গে দরজা খুলে গেল।

রেবা—"রসিকদা, এইকি আপনার কথার ঠিক! আমাকে শুধু শুধু এমনি একা বসিয়ে রেখে এ কষ্ট দেবার কি দরকার ছিল—মরবার জন্তে না হোলে, এতক্ষণ ধৈর্য্য ধোরে চুপ কোরে বোসে থাকা আমার কুষ্ঠিতে কোনদিন লেখেনি।"

ভদ্রলোক—"হাজার বার, হাজার বার আপনার কাছে ক্ষমা চাচ্ছি উর্ব্বশীদেবি! ইনি লেকের জলে ঝাঁপ দিতে যাচ্ছিলেন—"

"ও:!" বোলে তরুণীটী একটু যেন সঙ্কুচিত হোয়ে তাদের পথ ছেড়ে দিলে। হরেন দেখলে ইনি যে একেবারে আর্ট ইস্কুলের সরস্বতী, যেন জীবন্ত প্রতিমা। চাঁদের-আলো-সাড়ী যেন চাঁদের আলোর মতই কোমল দেহখানিকে ঘিরে আছে। চোখের ভ্রূর কাছ থেকে নাকের ডগা অবধি কালো মুখোসে ঢাকা। হরেন অনুভব কোরলে মুখোসের ভেতর থেকে সুন্দরীর দৃষ্টি তাকে মলাট আঁটা বইয়ের মতন এক নিশ্বাসে পোড়ে ফেলবার জন্তে ব্যস্ত হয়ে উঠেছে। হরেন একটু অস্বস্তি মনে কোরলে। দু'জনকে দু'জনকেই দেখবার একটু সুযোগ দিয়ে ডাক্তার রসিকলাল বোললেন—

অনেক কষ্টে বুঝিয়ে সুঝিয়ে মাত্তর পোনেরো মিনিটের জন্তে—"

তরুণী বেহালার সুরে বোললেন—"কি?"

ভদ্রলোক—"মানে ওঁকে এখানে আসতে রাজি কোরেছি। আর দেরি কোরবেন না—"

রেবা—বেশ তো, আপনি ব্যবস্থা কোরুন, আমরা প্রস্তুত।

ভদ্রলোক—"আমার ব্যবস্থা সব ঠিকই আছে। এই হরিণের মুখোস, আর এই গুলীভরা পিস্তল, আর এই হরিণের গলার ছোট্ট ঘণ্টা।"

রেবা—"বেশ আপনি তবে আলোটা—"

ভদ্রলোক—"হাঁ, আলোটা আমি নিবিয়েই দেবো। তবে তার আগে আমাদের মরণ-বাসরের নিয়ম মত আপনাদের একটি কাজ করতে হবে।"

রেবা—"আবার কাজ···আমার যে আর দেরি সহ্য হচ্ছে না।"

ভদ্রলোক—"আমি আপনাদের বেশী সময় নষ্ট কোরবো না। পৃথিবী থেকে চিরদিনের জন্তে বিদায় নেবার আগে আপনারা দু'জনে দু'জনের সঙ্গে মনের কথা কোয়ে প্রাণটাকে একটু হাল্কা কোরে নিতে পারেন—কিন্তু সময় মাত্র পাঁচটি মিনিট। আমি চোললুম।"

ডাক্তার রসিকলাল দরজা বন্ধ করে পাশের ঘরে চলে গেলেন। ঘরের মাঝখানে একটা ছোট গোল টেবিল, তার দু'পাশে দু'খানি চেয়ার। দু'জনে গিয়ে চেয়ার দু'খানিতে বোসলো। দেওয়ালে ঘড়িটা টক টক কোরে সময় ছুটে পালাচ্ছে তাই জানিয়ে দিচ্ছে। তরুণী ঘড়ির দিকে চেয়ে বোল্লে—

"পাঁচ মিনিট,···পাঁচ মিনিট, না—আমি অতক্ষণ অপেক্ষা কোরতে পারবো না। আপনারও বোধ হয় তাই ইচ্ছে।"

হরেন বোসে বোসে তার মরণ-সঙ্গিনীর ক্ষালি চাঁদের মত কপাল, গোলাপের মত গাল, রসাল আঙুরের মত দুখানি রাঙা ঠোঁটের কথা ভাবছিল···এ রূপ আসল না নকল—এমন সময় হঠাৎ তরুণী তাকে প্রশ্ন কোরে বোস্তেই হরেনের যেন সব কেমন গুলিয়ে গেল। সে অপ্রস্তুত হয়ে বোল্লে—

হরেন—আমায় কি কিছু আপনি এই মাত্তর জিজ্ঞাসা কোরলেন, আমি অন্যমনস্ক ছিলুম।"

রেবা—"কি ভাবছিলেন?"

এইরে বাবা, ইনি কি মনের কথা টের পান নাকি, হরেন তাড়াতাড়ি বোলে ফেললে, "রসিক ডাক্তার লোকটী বেশ।"

রেবা—"কেন?"

হরেন—"এই আমাকে লেকের জলে ডুবতে না দিয়ে ধোরে আনলেন, বোললেন আপনি আমার জন্তে অপেক্ষা ক'রে বোসে আছেন।"

রেবা—"হাঁ, বলেন কেন, আমিও পটাসিয়াম্ সিয়ানাইড্ জোগাড় কোরেছিলুম, খেতে গিয়ে মনে হোলো মামুলীভাবে মরবো না। এক বন্ধুর কাছে রসিকদার মরণ-বাসরের কথা শুনেছিলুম। সিনেমায় যাচ্ছি বোলে সটান এখানে এসে হাজির হোলুম। এই দু'ঘণ্টা বোসে ঠায় ঐ সোফাখানার ওপর কাত হোয়ে পোড়ে থেকে আমার প্রাণ

একেবারে হাঁপিয়ে উঠেছিল, ভাগ্যিস্ আপনি এলেন—আপনার নাম ?"

হরেন—"ধূমকেতু। আপনার ?"

রেবা—"উল্কা।"

নাম শুনেই হরেন থ্ হয়ে গেল। আর কথা বলে না দেখে তরুণী কাণের ঝুমকো দুটো দুলিয়ে বোললে—

"দেখুন, ধূমকেতুবাবু পাঁচ মিনিট পরেই যখন আমাদের মরতে হবে দুজনকেই, তখন—"

হরেন—"তখন কি বোলুন ?"

রেবা—"এই পাঁচ মিনিটের পরিচয়টুকুকে যত মধুর করা যেতে পারে, তাই আমাদের করা উচিত নয় কি ?"

হরেন—"যা বোলেছেন, সে কথা ঠিক"—

রেবা—"তবে।"

হরেন—"কি ?"

রেবা—"কিছু নয়। আপনি কেবল আমার সঙ্গে একটু কথা কোন, আমি শুনি—"

হরেন—"কি কথা সুরু কোরি বোলুন তো ?"

রেবা—আজে বাজে যা খুসী আপনার। শুধু একটু কথা কোন, এ নিঃসঙ্গতা আর আমার ভাল লাগে না—অসহ্য।

হরেন—"দেখুন উল্কাদেবি ! ঘরে ঢুকেই আমি একেবারে চোম্‌কে উঠেছিলুম সব প্রথম—"

রেবা—"কেন, আমায় দেখে নাকি ?"

হরেন—"হাঁ, তারাকে দূর আকাশেই দেখি। কিন্তু ঘরের ভেতর, সাম্নাসাম্নি, এত কাছে, এই মরণ-বাসরে মরণের জন্যে সেজে গুজে বোস থাকতে যখন দেখছি, তখন আমার মনটা যেন কেমন এক রকম হোয়ে যাচ্ছে। আমার একটী প্রশ্নের জবাব কি আপনি দেবেন দয়া কোরে।"

রেবা—"কি প্রশ্নটা আপনার শুনি।"

"হরেন—"এ তারকার আত্মহত্যা—কার জন্যে ?"

রেবা—"অন্য সময় হোলে এ কথার জবাব আপনাকে আমি দিতুম না, কিন্তু যখন আর সাড়ে তিন মিনিট বাদেই আমি মরবো, তখন সহজভাবে প্রাণ খুলে কথা কওয়াই ভালো। ধূমকেতু বাবু, তারা আজ এখানে কেন, তার উত্তরে আমায় বোলতে হচ্ছে, দেবতার রূপ ধোরে আমাকে ঠকিয়ে গেছেন এক শয়তান।"

হরেন—"ইতিহাসটাকে আর একটু খুলে বল্‌বেন কি আপনি দয়া করে ?"

রেবা—"আগে আপনারটাই শুনি। আপনি এখানে কেন ধূমকেতুবাবু ?"

হরেন—"ঠিক ঐ একই কারণে। আপনাকে ঠকিয়েছেন এক দেবতা, আমায় ঠকিয়েছেন এক দেবী।"

রেবা—"এই কি প্রথম ঠোকলেন জীবনে ?"

হরেন—হাঁ, প্রথম ধাক্কা—বুকটা একেবারে ভেঙে গেছে। আপনি ?"

রেবা—"আমারও এই প্রথম।"

হরেন—"বাঃ, আপনাতে আমাতে বেশ মিলে যাচ্ছে তো"—

রেবা—"হাঁ—তা খুব মিল্‌ছে।"

হরেন—"মিলুক—আমি প্রতিজ্ঞা করেছি—"

রেবা—"প্রতিজ্ঞা আবার আপনি কি কোরেছেন ?"

হরেন—"জীবনে আর দ্বিতীয়বার কখনও কোন মেয়ের কাছে ঠোকবো না— তাই লেকের জলে ডুবতে যাচ্ছিলুম।"

রেবা—"সেই মেয়েটীর জন্যে, যে আপনার বুক ভেঙে দিয়েছে ? কিন্তু একবার একটু ভেবে দেখেছেন কি—যার পায়ে আপনার জীবনটাকে পুষ্পাঞ্জলি দিতে যাচ্ছেন, তার ততটা সম্মান পাওয়া উচিত কি না ?"

হরেন—"আপনি তবে কেন আপনার পলাতক দেবতা, যে স্বচ্ছন্দে আপনাকে ছেঁড়া জুতোর মত ফেলে পালালো, তার জন্যে মরতে যাচ্ছেন,—এ আত্মাহুতিও কি আপনার অপাত্রে দান হোচ্ছে না ?"

রেবা—"না না, আপনি তা ভাববেন না। পুরুষ জাতটা ভয়ানক নেমকহারাম আর স্বার্থপর, আমার পুরুষ জাতটার ওপরই এখন ঘেন্না হোয়ে গেছে।"

হরেন—"ঠিক। মেয়ে জাতটার ওপরও আমার আপনার মতই ভাব হোয়েছে।"

রেবা—"কি ভাব ?"

হরেন—"বিজাতীয় একটা বিতৃষ্ণা। যাক্। দেখুন উল্কাদেবি। আমাদের মরবার আর মাত্র দু'মিনিট দেরি আছে"

রেবা—"সত্যি ?"

হরেন—"হাঁ। তাই বলেছিলুম উল্কাদেবি ! আমাদের

মুখোসের এ প্রবঞ্চনা আর কেন, ওটা খুলে ফেলুন মুখ থেকে।"

রেবা—"কেন বলুন তো ?"

হরেন—"যে কোমল হাতের পিস্তলের গুলীতে আমি স্বর্গে যাব, তাঁর মুখখানি একবার দেখতে পাব না !"

রেবা—"রহস্যের ঘোমটা ঢাকা থাকাই তো ভাল ধূমকেতুবাবু।"

হরেনের যেন অসহ্য বোধ হচ্ছিল। সামনে তার এত কাছে দাঁড়িয়ে ফোটা গোলাপের মত রূপ নিয়ে তরুণী হরেনের চোখে নেশা জাগিয়ে দিয়েছে, তাই সে অনেকটা মাতালের মতই জড়িয়ে বল্লে—

"আমরা রূপের পূজারী। রূপেরই ধ্যান করতে চাই; খুলে ফেলুন্ মুখোস মুখ থেকে।"

রেবা—"এটা সম্পূর্ণ একটা ছেলেমানুষী খেয়াল আপনার। এ রকম চরম মুহূর্ত্তে আপনার ধ্যান আমার মুখখানার চেয়ে আরও একটু উঁচুতে যাওয়াই উচিত ছিল।"

হরেন—"উচিত অনুচিত ভাববার সময় নেই। মুখোসটী একবার···এইটী আমার অনুরোধ।"

রেবা—"আপনার অনুরোধ রক্ষা করলে, আপনি আমার একটা কথা রাখবেন বলুন—"

হরেন—"এখুনি, আপনার কি অনুরোধ বলুন।"

রেবা—"আপনার মুখোসটীও আপনাকে খুলতে হবে তা হলে।"

হরেন—"বেশ, তাতে আমি রাজি। তবে নিন্ একসঙ্গে দু'জনে খুলি···এক···দুই···তিন—"

মুখোস খুলে দু'জনে দু'জনের মুখের পানে থেকে আর চোখ ফেরাতে পারলে না। হরেন যেন ধ্যানস্থ হবার মতন করে বল্লে—"সুন্দর !"

রেবা যেন স্বপ্ন দেখ্‌তে দেখ্‌তে বল্লে—"অপরূপ !"

হরেন—"উল্কাদেবি !"

রেবা—"ধূমকেতুবাবু !"

হরেন—"আপনার এই সুন্দর মুখখানি আপনার নামের সঙ্গে যেন কিছুতেই খাপ্ খাচ্ছে না উল্কাদেবি !"

রেবা—"আপনার নামটীও যেন আমার কেমন কেমন ঠেকছে ধূমকেতুবাবু, আপনার আসল নাম ?"

হরেন—"হরেন। আপনার ?"

রেবা—"রেবা।"

হরেন—"রেবা ! বাঃ ! বেশ নামটী আপনার; আপনারা কি রেবাদেবি !

রেবা—"কেন ? বাঙ্গালী।"

হরেন—"না না, আমি তা বলি নি। আপনাদের পদবী ?"

রেবা—"আমরা মিত্তির···। আপনারা ?"

হরেন—"বোস।"

রেবা—"আপনি কি কাগজে কবিতা লিখেন ?"

হরেন—"আপনি জান্‌লেন কেমন কোরে ! আমার কবিতা আপনি পোড়েছেন নাকি, আঁা ?"

রেবা—"না। আমার পলাতক দেবতাটী আমায় চিঠি দিয়ে জানিয়েছেন,—হরেন বোস বোলে একজন বোকা কবির মানসীর গান তিনি এখন রোজ উপভোগ কোরছেন।" এই কবি হরেন বোস কি আপনি ?

হরেন—"আপনার এই পলাতক দেবতাটীর নাম কি ?"

রেবা—"চঞ্চল চৌধুরী।"

হরেন—"গুলী কোরবো তাকে।"

রেবা—"তা করুন গে, আমার ক্ষতি নেই, আমায় কি এইবার আপনার পলাতকা মানসীটীর নাম জানবেন ?"

হরেন—"কুমারী হেনা সরকার।"

রেবা—"হেনাকে আমি গুলী কোরবো।"

ঠিক সেই সময়ে দরজা খুলে ব্যস্তভাবে ডাক্তার রসিকলাল ঘরে এসে তাদের দুজনকে মুখোস খুলে থাকতে দেখে বোল্‌লেন—"একি ! আপনারা দুজনে মুখোস খুলে ফেলেছেন কেন ! নিয়ম ভঙ্গ কোরবেন না। পাঁচ মিনিট হোয়ে গেছে। মুখোস পোরে ফেলুন আপনারা। আর দেরি নয়। আমার কাছে টাকা আছে, টসে যিনি জিতবেন, তিনিই হরিণ হোতে পাবেন সব প্রথম। নিন্ বোলুন্ 'হেড্' না 'টেল'—টং কোরে ডাক্তার রসিকলাল টাকা ওপর দিকে ছুঁড়লেন, রেবা বোল্‌লে "হেড্।"

রসিকলাল—"টেল পোড়্‌লো। ধূমকেতুবাবু আপনি টসে জিতেছেন। আপনি হরিণ হোন। এই নিন্ হরিণের মুখোস, গলায় এই সোণার ছোট্ট ঘণ্টাটি বেঁধে ফেলুন।

উল্কাদেবি! এই পিস্তল ধোরুন, গুলী ভরা আছে, খুব সাবধান।”

রেবা—“দিন্।”

রসিকলাল—“এই নিন্। আমি আলো নিবিয়ে ঘর থেকে চোলে গেলেই পাশের ঘর থেকে বাজনা বেজে উঠবে। যিনি হরিণ হবেন তাঁর পছন্দ মতই বাজনা বাজবে, এ-ই মরণ-বাসরের নিয়ম। বোলুন ধূমকেতুবাবু, পৃথিবী থেকে চিরবিদায় নেবার আগে আপনি কি সুর শুনতে চান্? “বাজাতে বোলুন”—বলে হরেন গান ধোরলে—

“আজি অন্ধকারে তোমার অভিসার।
অন্তরে মোর রূপের শিখা বাহিরে অন্ধকার।”

তার সঙ্গে সঙ্গে ঘর অন্ধকার হোতেই পাশের ঘর থেকে বাজনা বাজতে লাগ্লো। হরেন গলায় ঘণ্টা বেঁধে হামাগুড়ি দিয়ে ঘরের ভেতর চলে বেড়াতে লাগলো, তারপর দড়াম্ কোরে পিস্তলের আওয়াজ হোলো। তখুনি দরজা খুলে ডাক্তার রসিকলাল এসেই বোল্লেন—“নোড়বেন না, আমি আলো জ্বালছি।”

আলো জ্বলে উঠতেই রসিকলালের চক্ষুস্থির হোয়ে গেল, —উল্কাদেবী সিদে ছাতের দিকে পিস্তলের মুখ কোরে দাঁড়িয়ে আছেন। রসিকদাকে দেখেই তিনি কাঁদ্তে কাঁদতে বোললেন—

“পারবো না, আমি পারবো না রসিকদা, একজন নিরপরাধ লোকের বুকে শুধু শুধু এমন কোরে গুলী কোরতে পারবো না। তার চেয়ে আমি ওঁর হাতে মরতে রাজি আছি।”

হরেন—“বেশ, তবে এই নিন হরিণের মুখোস, আপনি হরিণ হোন, এই ঘণ্টা নিন্, দেখি আপনাকে আমি শিকার কোরতে পারি কি না—দিন পিস্তলটা।”

রসিকলাল—‘দিন পিস্তলে আমি গুলী ভরে দিই।”

রেবা হরিণের মুখোস পোরে ঘণ্টা গলায় বেঁধে প্রস্তুত হোলো। ডাক্তার রসিকলাল হরেনের হাতে পিস্তলটা দিয়ে বোল্লেন—‘আমি আলো নিবিয়ে অন্ধকার কোরে দিচ্ছি। কি গান শুনতে শুনতে আপনি স্বর্গে যেতে চান উল্কাদেবি! বোলুন, তাই বাজবে—’

রেবা গান গেয়ে উঠলো—

‘এলোমেলো যাহোক একটা কিছু।
ছন্নছাড়া জীবনটারে কেউ ডাকে না যেন পিছু।”

আলো নিবে গেল। ডাক্তার রসিকলাল পাশের ঘরে চোলে গেলেন। বাজনা বাজতে লাগলো। অন্ধকার ঘরের ভেতর রেবা হরিণের মুখোস পোরে গলায় ঘণ্টা বেঁধে হামাগুড়ি দিয়ে বেড়াতে লাগলো। সে চোলছে আর গলার ছোট্ট ঘণ্টাটী টুং টুং কোরে বাজছে। হরেন পিস্তল হাতে কোরে স্থির হোয়ে দাঁড়িয়ে আছে। রেবা বোললে—‘গুলী ছুঁড়ুন ধূমকেতু বাবু, শিকার তো সাম্নেই ঘুরছে।’

‘হাঁ, ছুঁড়ি।’ বোলে হরেন পিস্তলের ঘোড়া টিপলে আর সঙ্গে সঙ্গে বিকট শব্দ হোলো। ডাক্তার রসিকলাল সঙ্গে সঙ্গেই দরজা খুলে আলো জ্বাল্লেন। আলো হোতেই দেখা গেল হরেন কারপেটের ওপর উপুড় হোয়ে পোড়ে আছে। রেবা তখুনি মুখোস খুলে ফেলে চীৎকার কোরে কেঁদে উঠলো—‘এ কি সর্বনাশ, হরেনবাবু কি আমায় বাঁচাতে নিজে আত্মহত্যা কোরলেন—হরেনবাবু—হরেনবাবু—এ কি কোরলেন! শেষে সত্যিই আত্মহত্যা—”

রসিকলাল—“আত্মহত্যা! অসম্ভব। আমি তো বোলেছিলুম প্রত্যেক সাতবারের বার মরণ-বাসরের নিয়ম মত আমি ফাঁকা আওয়াজের গুলী দোবো, আজ ৬ নম্বরের আপনি ছুঁড়েছিলেন উল্কাদেবি! আর হরেনবাবুর বরাতে গুলী ছিল ঐ ৭ নম্বরের ফাঁকা আওয়াজ। উনি কিছুতেই মোরতে পারেন না। মোরবেন ভেবে অজ্ঞান হোয়েছেন। ঐ যে নোড়ে উঠেছেন—হাওয়া দিন—হাওয়া দিন একটু—

হরেন—‘আমি কোথায়—এ কি স্বর্গে।’

রসিকলাল—‘সেটা আপনারা দুজনে উঠে বোসে ধীরে সুস্থে ভেবে চিন্তে ঠিক করুন, কে কি কোরবেন—বাঁচবেন, না মোরবেন—। আমার পিস্তলে আবার আমি গুলী ভোরেছি নিন্ উল্কাদেবি! ধোরুন—’

হরেন ও রেবা—‘ধন্যবাদ রসিকদা, আমরা আর মোরতে চাই না, এখন বাঁচতে চাই।’

রসিকলাল—‘দুজনেরই কি ঐ মত আপনাদের?’

হরেন ও রেবা—‘হাঁ—হাঁ—রসিকদা—

মরণ আমরা চাহিনা কো আর আমরা বাঁচিতে চাই।
মরণ-বাসরে মিলনেরি জয়-উৎসব গান গাই॥
আমরা বাঁচিতে চাই, আমরা বাঁচিতে চাই।

লণ্ডন-তীর্থে

—শ্রীমতিলাল দাশ

প্রথম পর্ব্ব

লণ্ডন মহামানবের সাগর তীর্থ। বৃটিশের প্রতাপ বিশ্বব্যাপক, তাই দেশদেশান্তরের নর ও নারী এখানে ভিড় জমায়। লণ্ডন বৃটিশের শক্তি ও সভ্যতার কেন্দ্র। বিষ্ণুশর্ম্মার পঞ্চতন্ত্রে পড়িয়াছি, মানুষ যতদিন প্রফুল্ল চিত্তে দেশ দেশান্তর না করে ততদিন বিদ্যা, বিত্ত, শিল্প সম্যক্ লাভ করিতে পারে না। কিন্তু এই উপদেশ আমাদের মনে বসে না। আমরা একান্ত গৃহগতপ্রাণ। প্রয়োজনহীন নিরুদ্দেশ ভ্রমণ আমাদের প্রিয় নহে।

কবি মেজফিল্ডের কবিতা পড়িতেছি। উধাও যাত্রার প্রতি বৃটিশের স্বাভাবিক আসক্তি কবির ছন্দে ধ্বনিত হইয়াছে।

A wind's in the heart of me, a fire's in my heels
I am tired of brick and stone and rumbling wagon-wheels,
I hunger for the sea's edge, the limits of the land
Where the wild old Atlantic is shouting on the sand,
Oh! I'll be going, leaving the noises of the street
To where a lifting fore sail-fort is yanking at the sheet.
To a windy torring anchorage where yawls and ketches ride
Oh I'll be going, going, until I meet the tide,
And first, I'll hear the sea-wind, the mewing of the gulls
The clucking, sucking of the seal about the rusty hulls
The songs at the capstan in the hooker warping out
And then the heart of me 'll know I am there or there about.
Oh! I am tired of brick and stone, the heart of me is sick,
For windy green, unquiet sea, the realm of Moby Dick;
And I'll be going. going, from the roaring of the wheels
For a wind's in the heart of n e, a fire's in my heels.

জানি না, হয়ত অকারণে আমার হৃদয়ে এই যাযাবর মনের হাওয়া লাগিয়াছিল, বাহিরকে দেখিবার জন্য চরণে ক্রতি জাগিয়াছিল, ফলে লণ্ডনে আসিয়া পড়িলাম।

এশিয়া ছিল অতীত জ্ঞানের ধাত্রী। মানব জাতিকে সে ধর্ম্ম দিয়াছে, সে জ্ঞান দিয়াছে। কিন্তু তাহার গরিমা আজ য়ুরোপের প্রদীপ্ত প্রভায় স্তিমিত—গত পাঁচশত বৎসর ধরিয়া য়ুরোপ জগৎকে চালাইতেছে। বিজ্ঞান তাহার কুহকদণ্ড য়ুরোপের হাতে দিয়াছে। য়ুরোপের সেই জগৎ শোভার মধ্যমণি লণ্ডন।

গোধূলির স্তিমিত আলোকে বেলা ৬টার সময় ভিক্টোরিয়া টার্মিনাস ষ্টেসনে নামিলাম। অন্তরে যে সুপ্ত কৌতূহল অপূর্ব্ব কিছু দেখিবার জন্য উৎসুক ছিল, তাহা ক্ষুণ্ণ হইল। অকম্প বক্ষে চোখ বুলাইয়া লইলাম।

হাওড়া ষ্টেসনের মতই, কেবল প্রাচ্য দেশের বিশৃঙ্খল জন-সমারোহ নাই। এই বিশাল অপরিচিত সহরে আমি নিজেকে একান্ত একাকী বলিয়া অনুভব করিলাম। বন্ধুদের জন্য সঙ্গীরা আসিয়াছে।

হরিহর দাদাকে আসিতে লিখিয়াছিলাম। তিনি আসেন নাই। তরু দত্তের জীবনী লিখিয়া সাহিত্যিক আসরে দাদা খ্যাতি ও প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছেন। ইংরাজীতে তাহার অসামান্য অধিকার। অক্সফোর্ডে বি, লিট পাশ করিয়া ডি, ফিল হইবার জন্য চেষ্টা করিতেছিলেন। তাঁহার প্রবন্ধ মনোনীত হয় নাই। সেই অবধি আজও সাধনা চলিতেছে।

১৭ বৎসরের অধিক বিলাতে আছেন। মনে-প্রাণে, আলাপে-আচরণে একান্তভাবে ইংরেজ ভদ্রলোক হইয়াছেন। সময়মত খবর না পাইলে তাঁহার পক্ষে কিছু করা সম্ভব নয়।

পাণ্ডোর বন্ধুকে আমার ঠিকানা দিয়া, যাইবার উপায় জিজ্ঞাসা করিলাম। ভদ্রলোক আমাকে ভূগর্ভস্থ রেলপথে বেলসাইজ পার্কে যাইবার পরামর্শ দিলেন। আমাকে ষ্টেসন পর্য্যন্ত পৌঁছাইয়া দিয়া টিকিট পর্য্যন্ত করিয়া দিলেন।

টিউব রেলওয়ে লণ্ডনের চলাচলের একটী চমৎকার পন্থা। বৃহৎ লণ্ডনের আয়তনের মাঝে প্রায় ৬০০ রেলষ্টেশন আছে এবং আনুমানিক ৭০০ মাইল রেল আছে। ইহা ছাড়া ভূগর্ভ রেলপথের ২০০ ষ্টেশন আছে। ভূগর্ভ রেলপথের গাড়ী বিদ্যুৎ-প্রবাহে চলে। প্রায় পাঁচ মিনিট অন্তর গাড়ী চলে। ষ্টেশনে গাড়ী আসিলে দরজাগুলি আপনি খুলিয়া যায় এবং ছাড়িবার সময় আপনা অপনি বন্ধ হইয়া যায়। প্রথমে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের দ্বারা নির্ম্মিত হয় বলিয়া এই বিশাল রেলপথের সমাহারকে সামঞ্জস্যহীন বলিয়া মনে হয়। নবাগত বিদেশীর পক্ষে দূরের কথা, অনেক নাগরিকের পক্ষে ইহা দুর্ভেদ্য জাল বলিয়াই মনে হয়। ডিষ্ট্রিক্ট এবং মেট্রোপলিটান রেলওয়ে ভূ-সমতলের অল্প নীচে এবং ইহার ষ্টেসনগুলিতে সিঁড়ি দিয়া নামা যায়। বাকী পাঁচটি টিউব ভূগর্ভের বহু নীচে চলে। এবং সেগুলি লিফ্‌ট (আরোহ) এবং Escalatoes (চলন্ত সোপান) দিয়া ভূভাগের সহিত যুক্ত।

মরডেন ক্রজওয়ার লাইনে বেলসাইজ পার্কে নামিলাম। নিজের সুটকেস বহিয়া উপরে আসিলাম।

সুন্দর বিস্তৃত রাজপথ—জনতাহীন। জিজ্ঞাসা করিয়া আর্য্যভবনে পৌছিলাম। আর্য্যভবনে স্থান না থাকায় গুজরাটি হোটেলওয়ালা পেটেল ৪৮ বেলসাইজ স্কোয়ারে নূতন একটী বাড়ী নিয়াছে। সেখানেই থাকিবার ব্যবস্থা হইল। ডিনার খাইলাম। পেটেলের পরিচারিকা আইরিশ যুবতী তিনটী, এখানে লুচি ও ভাত পাওয়া যায়।

আহার শেষ হইলে ঘোষের টেলিফোন আসিল। খানিক পরে সে আসিল। দুজনে গাওয়ার ষ্ট্রীটে Student Merchant House-এ ভারতীয় ছাত্রদের মজলিস্ দেখে রাত এগারটায় বাসায় ফিরিলাম।

২৭শে জুলাই। সকাল সকাল ঘুম ভাঙিল। কিন্তু কাহারও কোথাও সাড়া নাই। বাহির হইয়া পড়িলাম। প্রভাতে লণ্ডনের নির্জ্জন পল্লীপথের শোভা দেখিয়া লইলাম। কাছেই একটী গির্জ্জা—কয়েকখানি ছবি তুলিলাম। আটটা বাজিল, তবু প্রাতরাশের ব্যবস্থা নাই। অবশেষে আয়োজন হইল। প্রাতরাশ শেষ করিয়া ঘোষের সন্ধানে চলিলাম।

লণ্ডনের শতাব্দীর ইতিহাস মনে পড়ে। আশ্চর্য্য ইহার ইতিবৃত্ত, আশ্চর্য্য ইহার অভ্যুদয়। চিরায়ুষ্মতী নারীর ন্যায় তাহার সজ্জা ও পারিপাট্য যুগে যুগে বাড়িয়াছে। বিরাট বৃটিশ সাম্রাজ্যরূপ খিলানের সন্ধান-প্রস্তর লণ্ডন। যে রাজ্যে সূর্য্য কখনও অস্তমিত হয় না, লণ্ডন তাহারই কেন্দ্র

লণ্ডনের বিশালতা সকলের নিকটই প্রতিভাত হয়। যেন অসংখ্য নগর মিলিয়া একটী অপূর্ব্ব সমন্বয় গড়িয়াছে। টেম্‌স্ নদীর উভয় কূলে বিস্তৃত ডক—সেখানে নানা দেশের জাহাজ সম্মিলিত হয়। রাজপথের দু'ধারে সমৃদ্ধ প্রাসাদোপম হর্ম্ম্যাবলী।

ইহা সত্য, লণ্ডনের চেয়ে প্যারি মনোমোহিনী। তাহার দীর্ঘায়ত বুলেভাঁ, তাহার বিশ্ববিদিত কলা ভবন, তাহার আমোদের সহস্র আয়োজন, তাহার লঘু উজ্জ্বল কেলিলতা লণ্ডনে নাই। বার্লিনের সৌম্য প্রশান্তি, তাহার মসৃণ রাজপথ, তাহার কলা ভবনের ঐশ্বর্য্য লণ্ডনে নাই। নীল দানিয়ুব নদীর তীরে ভিয়েনা নগরী স্বপ্নপুরীর মত সুন্দরী বলিয়া মনে হয়—তাহার ভুবন-বিদিত অপেরা-গৃহে গানের সুরধুনী বহিয়া যায়। নিউইয়র্ক আধুনিকতার অবদানে গৌরবোজ্জ্বল—তাহার আকাশচুম্বী অট্টালিকার বাহার লণ্ডনে নাই।

তথাপি লণ্ডনের ঐতিহ্য, লণ্ডনের ব্যাপকতা, চমকপ্রদ। ইহার পার্লামেণ্ট যেন গণতন্ত্রের জীবন্ত প্রতিমূর্ত্তি, ইহার গির্জ্জা, ইহার দুর্গ শত শতাব্দীর রোমাঞ্চকর আখ্যানে প্রদীপ্ত। রোমান ঐতিহাসিক ট্যাসিটাস ইহার নাম 'লণ্ডিনিয়াম' বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। ইহার মৌলিক অর্থ জলদুর্গ কেল্টিক Leyn বা Lin মানে সরোবর এবং din বা dun মানে দুর্গ। দেরাদুনের দুনের সহিত ইহার কোনও জ্ঞাতিত্ব আছে কি না ভাষাতত্ত্ববিদরাই বলিতে পারেন।

এখন যেখানে সেণ্টপল ক্যাথিড্রাল—সেখানে ফ্লীট নদী ও টেমস নদীর সঙ্গমে লাডগেট শৈল-শিখরে হয়ত এই দুর্গ অবস্থিত ছিল—ইহার তিনদিকে ছিল নদীর পরিখা, অন্তদিকে ছিল সুরক্ষিত প্রাচীর।

অন্তেরা বলেন, বৃটন-রাজ লাডের নামানুসারে নগরের নামকরণ হয়। বৃটিশ সংবাদপত্রের লীলাভূমি ফ্লীট ষ্ট্রীট দিয়া

চলিতে চলিতে মনে হয় যে, এখন যেখানে অসংখ্য মানুষের কলকোলাহল, সেখানে একদিন টেমসের শাখানদী ফ্লীট তরঙ্গ-ভঙ্গে কুলুকুলুনাদ করিয়া বহিত। চারিদিকে সুবিস্তীর্ণ জলাভূমি—তাহার মাঝে একটী দ্বীপভূমি—ইহাই ছিল অতীতের লণ্ডন।

রোমানদের আগমনের সহিত লণ্ডনের প্রতিপত্তি বাড়িয়া গেল। ইহা আন্তর্জ্জাতিক ব্যবসায়ের কেন্দ্র হইল। নানা দিগ্‌দেশ হইতে বণিক ও সাধুরা আসিয়া এখানে সম্মিলিত হইত। রোমক সময়ে লণ্ডনের চারিদিকে প্রাচীর গঠিত হইয়াছিল। তাহার ধ্বংসাবশেষ এখনও দেখানো হয়। চেয়ারিং ক্রশ ষ্টেশনের নিকট রোমান যুগের একটী স্নানাগার আবিষ্কৃত হইয়াছে। বোডেসিয়ার বিদ্রোহের ফলে লণ্ডন বিধ্বস্ত হয়। রোমক যুগে টেমসের উপর সেতু নির্ম্মিত হইয়াছিল।

বর্ত্তমান কাউণ্টিহলের সন্নিকটে সেকালের একখানি নৌকা আবিষ্কৃত হইয়াছে। কেনসিংটন শিল্প-ভবনে ইহা সংরক্ষিত হইয়াছে। রোমানেরা চলিয়া গেলে বৃটনদের অবস্থা অত্যন্ত খারাপ হয়। গলের রাজার নিকট তাহারা লিখিয়াছিল—"বর্ব্বরেরা উদ্যত তরবারি দিয়া আমাদিগকে সমুদ্রের দিকে তাড়ায়, আবার সমুদ্র-তরঙ্গ আমাদিগকে বর্ব্বরদের তরবারির দিকে ফিরায়, কাজেই আমাদের ভাগ্যে হয় নিমজ্জন, নয় শিরশ্ছেদন।"

স্যাক্সন জাতির আগমনে পুনরায় দেশে শান্তি হয়। স্যাক্সনেরা সুরক্ষিত নগরী অপেক্ষা মুক্ত প্রান্তর ও ভূমি ভালবাসিত, তাই তাহাদের সময়ে লণ্ডনের বিশেষ কোনও উন্নতি হয় না।

স্যাক্সনের সময়ে খৃষ্টান ধর্ম্ম পোপ গ্রিগরির প্রচেষ্টায় ইংলণ্ডে প্রচারিত হয়। রাজা সিবার্ট দু'টি সুন্দর গির্জ্জা নির্ম্মাণ করেন; পরবর্ত্তী কালে সেণ্ট পিটারের উদ্দেশে নির্ম্মিত পশ্চিমের ভজনালয়কে রাজা এডগার West Minster নাম দেন এবং সেণ্টপল ক্যাথিড্রালের ভূমিতে অন্য যে গির্জ্জাটি ছিল, তাহার নাম East Minster। রাজা এলফ্রেড লণ্ডনকে ইংলণ্ডের রাজধানী করেন। রোমানদের যুগে ইয়র্ক রাজধানী ছিল, স্যাক্সনেরা উইনচেষ্টারকে রাজধানী করে।

এই সময়ে ডেনদের আবির্ভাব হয়। যুদ্ধপ্রিয় রণতুম্মদ, ইহাদের সময়ে লণ্ডনের বিশেষ উন্নতি হয় নাই। ডেনিস যুগের পরিচয়-চিহ্ন স্বরূপ ষ্ট্রাণ্ড নামক রাজপথে সেণ্ট ক্লিমেণ্ট ডেনস গির্জ্জা আছে। ইহার পাশেই জনপ্রিয় মন্ত্রী গ্লাডষ্টোনের মর্ম্মরমূর্ত্তি।

হ্যারল্ডকে রণে পরাজিত করিয়া উইলিয়াম ১০৬৬ খৃষ্টাব্দে ইয়র্কের বিশপ কর্ত্তৃক ইংলণ্ডের রাজমুকুট লাভ করেন। উইলিয়াম নগরবাসীদিগকে একটী সনন্দ দেন। ইহা আজিও মুরসিডে আছে। নর্ম্মান শাসন হইতেই লণ্ডনের প্রগতি এবং অভ্যুদয় শতাব্দীর পর শতাব্দী নব নব রূপে বাড়িয়াছে।

নর্ম্মান শাসনকালে লোকে জাঁকজমকশালী পোষাক পরিত। লম্বা লম্বা চুল রাখিত। ১১০০ খৃষ্টাব্দে আর্চ্চ বিশপ আনসেল্‌ম আদেশ দেন যে, লোকে চুল কাটিবে। তিনি আরও আদেশ দেন যে, লোকে মাত্র দুইবার ভোজন করিবে—নয়টায়—মধ্যাহ্ন-ভোজন, সন্ধ্যা ছয়টায়—নৈশ-ভোজন করিবে। তৃতীয় হেন্‌রীর রাজত্বকালে সাইমন ডি মণ্টফোর্ট লণ্ডনবাসীদের লইয়া এক বিদ্রোহ করেন। তাহার ফলে পার্লামেণ্টের উদ্ভব হয়।

কিন্তু গ্লোষ্টারের আর্ল রাজপুত্রের সহিত যোগ দিয়া লণ্ডনবাসীদিগকে বিধ্বস্ত করেন। ফলে লণ্ডনের চার্টার কাড়িয়া লওয়া হয়। লোকের নিকট হইতে যথেষ্ট জরিমানা আদায় করা হয়।

নর্ম্মান স্থাপত্যের ছাপ লণ্ডনের যত্র তত্র বিদ্যমান। নর্ম্মান রাজত্বপ্রথা আজিও যৎসামান্য পরিবর্ত্তিত হইয়া ইংলণ্ডে চলে। নর্ম্মানযুগ তাই লণ্ডনের ইতিহাসে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে। ১০৪৯ খৃষ্টাব্দে ব্লাকডেথ নামক একপ্রকার ভীষণ ব্যাধি লণ্ডনকে আক্রমণ করে। ফলে লক্ষ লক্ষ লোক মৃত্যুমুখে পতিত হয়। এই সময়ে যে দুরবস্থা হয় তাহার ফলে লণ্ডনবাসী ১০৮১ খৃষ্টাব্দে ওয়াট টাইলারের বিদ্রোহে যোগ দেয়। ১৪৫০ খৃষ্টাব্দে জ্যাককেড বিদ্রোহ করে। প্লেগ, দুর্ভিক্ষ, মহামারী এবং বিদ্রোহ লণ্ডন জীবনকে মধ্যযুগে ত্রস্ত করিত সত্য, কিন্তু তাহারই সঙ্গে সঙ্গে আনন্দের আয়োজন ছিল। এই সময়ে আমাদের দেশের যাত্রার মত 'মিষ্টরি এবং মিরাকেল' নাটক অভিনীত হইত।

লোকে অত্যন্ত উৎসবে সমারোহ করিত। ১৬৬৬ খৃষ্টাব্দের অগ্নিদাহে লণ্ডনের অনেক প্রাচীন কীর্ত্তি ধ্বংস হইয়া যায়। তথাপি মধ্যযুগের অনেক ঐতিহাসিক চিহ্ন আজিও দেখিতে পাওয়া যায়।

রাণী এলিজাবেথের সময়ে লণ্ডন সমৃদ্ধির সমুচ্চ শিখরে ওঠে। এই বিবর্দ্ধনের পরিচয় এই যুগের সাহিত্যে প্রতিভাত। সেক্‌স্‌পীয়ারের নাট্যকলায় এই নবযৌবনের বিপুল আবেগ পরিলক্ষিত হয়।

কিন্তু এই সময়ে লণ্ডনের রাজপথগুলি অত্যন্ত অপরিসর ছিল। রাস্তা দিয়া ফিরিওয়ালারা চীৎকার করিয়া চলিত। এই সময়ই গথিক স্থাপত্যরীতি লণ্ডনে আসে।

প্রথম চার্লসের সঙ্গে পার্লামেণ্টের যে মতানৈক্য হয়, তাহাতে লণ্ডন পার্লামেণ্ট এবং ক্রমওয়েলের সহায়তা করে। চার্লসকে হোয়াইট হল নামক প্রাসাদে বধ করা হয়। এখানে বর্ত্তমানে একটী মিউজিয়াম আছে। দ্বিতীয় চার্লসের আগমনের পরে লণ্ডনের মতিগতি পরিবর্ত্তিত হইল। প্রায় অর্দ্ধশতাব্দীর উপর লোকে পাপের বন্যাবেগে ভাসিয়া চলিল। দুর্নীতির প্রবাহে লণ্ডন প্লাবিত হইল। ইহার পরিচয় এই যুগের সাহিত্যে দেখা যায়।

অষ্টাদশ শতাব্দী হইতেই লণ্ডনের বিকাশকে আধুনিক বলা যাইতে পারে। মহারাণী ভিক্টোরিয়ার সময় লণ্ডনের সুপরিসর সুন্দর রাজবর্ত্মগুলি নির্ম্মিত হয়। তাহার পর একে একে বিজ্ঞানের নিপুণতা বাড়িয়া চলিয়াছে। মানুষের সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের আয়োজনও শতধা বাড়িয়া চলিয়াছে।

গ্রিণ্ডলে আমার ব্যাঙ্কার। সেখানে চিঠির সন্ধানে চলিলাম। চিঠি পাইলাম না। অন্তর বিরহী যক্ষের মত ব্যথাতুর হইল। যক্ষের দিনে যে দুরবস্থা ছিল আজ তাহা নাই। আজ বিদ্যুৎ মানুষের পরিচয়, বাংলাদেশের নিভৃত কুটীরে যে প্রিয়তমা সজল আকাশ দেখিয়া প্রবাসী দয়িতকে মনে করিতেছে, তাহাকে মুহূর্ত্তেই খবর পাঠানো চলে। কিন্তু তত অর্থব্যয়ের সামর্থ্য নাই, তাই মনের বার্ত্তা পাঠাইয়া ফিরিতে হইল।

টাকাকড়ি গ্রিণ্ডলের ওখানে জমা দিলাম। যে সুটকেস জাহাজ হইতে পূর্ব্বে পাঠাইয়াছিলাম, তাহা পাই নাই। তাহাও পাঠাইতে বলিয়া ঘোষের ওখানে গেলাম। ঘোষ গাওয়ার ষ্ট্রীটে একটা হোটেলে উঠিয়াছিল উহাকে লইয়া বাহির হইয়া একত্র লাঞ্চ খাইলাম।

তারপর উহার মুরুব্বী O'Dowdর সন্ধানে কেনসিংটন পল্লীতে চলিলাম।

বুড়া ও বুড়ী দু'জনে খুব রসিক। ঘোষকে বলিলেন—"তোমাদের বিপদ ছুঁড়ীদের হাতে, ওদের যমের মত এড়িয়ে চলো।"

হাসিলাম। বুড়ী বলিলেন "না না, হাসবার কথা নয়, যুদ্ধের পরে পুরুষের সংখ্যা কমেছে, এরা তাই বিয়ে করতে পায় না, তাই এরা সব সময় ফাঁদ পেতে রয়েছে—"

আমি বলিলাম—"আমার ভয় নেই, আমার বর্ম্ম আছে—"

বুড়া বলিলেন—'না, না, বর্ম্ম এখানে রক্ষা করে না, খুব মনের বল থাকা চাই।

আমি বলিলাম—'সে কথা ঠিক, আমাদের দেশের সামাজিক রীতি-নীতির পরিবর্ত্তে এখানে ছেলেরা পায় অবাধ মেলামেশার সুযোগ, এটা তাদের পথভ্রান্ত করে।'

ওখান হইতে দুইজনে মিউজিয়াম দেখিতে চলিলাম

কেনসিংটন লণ্ডনের পশ্চিমে অবস্থিত—এই পল্লীর দক্ষিণাংশকে মিউজিয়াম পাড়া বলে। এই কলা-ভবনের নাম ভিক্টোরিয়া এবং এলবার্ট মিউজিয়াম। ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে মহারাণী ইহার ভিত্তিস্থাপন করেন। পরে রাজা এডওয়ার্ড ও রাণী আলেকজেণ্ড্রিয়া ইহা রাজকীয় সমারোহে ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে উদ্বোধন করেন। ইহা পুরাতত্ত্বের ভাণ্ডার নহে, এখানে নানা দেশ-দেশান্তরের, এবং নানা যুগের শিল্প ও কলার সুচারু সংগ্রহ আছে। বাড়ীটি স্থপতি ওয়েবের কীর্ত্তি—রেনাশাঁ রীতিতে নির্ম্মিত। ইতালীয়, ফ্লেমিশ, স্পানিশ এবং ফরাসী স্থাপত্য ও ভাস্কর্য্যের বিচিত্র ও বিরাট সংগ্রহ কৌতূহলী দর্শককে মুগ্ধ করে। ইহার চিত্রকলার আহরণও অপূর্ব্ব।

এত বড় চিত্রশালার এবং কলা-ভবনের পুঙ্খানুপুঙ্খ পরিচয় লইবার সময় ছিল না।

বিকালে বাসায় ফিরিলাম।

হরিহর দাদা আসিলেন। শ্রীযুক্ত হরিহর দাশ খুলনার লব্ধপ্রতিষ্ঠ উকিল যাদবচন্দ্র দাশ মহাশয়ের দ্বিতীয় পুত্র।

সম্পর্কে আমার ঠাকুরদাদা হন। দাদা বহুদিন বিলাতে আছেন। তাঁহার তরুদত্তের জীবনী সর্ব্বজনপ্রশংসিত। পুস্তক রচনা করিয়া তিনি যথেষ্ট কীর্ত্তি ও সুনাম অর্জ্জন করিয়াছেন। এনসাইক্লোপিডিয়াতে তাঁহার নাম স্থান পাইয়াছে।

তিনি বলিলেন—"কি উদ্দেশ্যে এসেছ।"

আমি বলিলাম—"এটা তীর্থভ্রমণ, বাহিরের বিরাট বিশ্বের সাথে একবার পরিচয় করে ফিরতে চাই।"

দাদা আমল দিলেন না। তিনি বলিলেন—'একটা কাজের কিছু ধারা দরকার, হয় একটা ডিগ্রি নিয়ে ফেরো, নয় ব্যারিষ্টার হয়ে যাও।' শুভাশীর্ব্বাদ নতমস্তকে গ্রহণ করিলাম।

বাংলাদেশে ও বাঙ্গালী জাতি ডিগ্রির মোহে মোহাচ্ছন্ন। সত্যকার অধিগমের দিকে তাহার দৃষ্টি কম। বিদ্যার যে অনন্ত ধারা, জানি, তাহা অসীম তাহার, প্রতি অনন্য নিষ্ঠায় যে সিদ্ধি, ডিগ্রির সঙ্গে তাহার তুলনা হয় না। কিন্তু সে কথা বন্ধু ও আত্মীয়দের বুঝানো কঠিন।

ডিনার শেষে ঘরে চুপ করিয়া বসিয়া বাড়ীতে চিঠি পাঠাইলাম। ধূসর কল্পসী, বাতায়নে ধূসর স্তিমিত গোধুলির আলো। নির্জ্জন কোষ্ঠ, প্রিয় পরিজনের জন্য চিত্তে জাগে অকারণ ক্রন্দন। তাহারই অস্ফুট বেদনা বহিয়া লিখন চলে নীল সাগরের পারে—দেশের মর্ম্মকোষে।

২৮শে জুলাই। বাকিংহাম প্রাসাদ দেখিবার জন্য যাত্রা করিলাম। টিউব রেলে বেলসাইজ পার্ক ষ্টেশন হইতে লেষ্টার স্কোয়ারে নামিলাম। সেখান হইতে ট্রাফাল্গার স্কোয়ারে আসিলাম। লর্ড নেল্‌সন এবং ট্রাফাল্গারে যুদ্ধের কীর্ত্তি অবিনশ্বর রাখিবার জন্য এই নামকরণ। নেলসনকে ইংরাজেরা জাতির ত্রাণকর্ত্তা বলিয়া পূজা করে।

ইহা অলস শ্রদ্ধার অঞ্জলি নহে। নেপোলিয়ানের যে দুর্দ্দম শক্তি সমস্ত য়ুরোপকে কম্পিত করিয়া তুলিয়াছিল, ট্রাফাল্গারে তাহার গতি খর্ব্ব হয়। এই চতুষ্কোণের মধ্যে নেলসন স্তম্ভ—ইহা ১৭৬ ফুট উচ্চ। প্রতি বৎসর ২১শে অক্টোবর এখানে এই বীরশ্রেষ্ঠের স্মৃতিবার্ষিকী অনুষ্ঠিত হয়। রণদেবতা মার্স-স্মৃতিতে উৎকৃষ্ট স্তম্ভের অনুকরণে ইহা পরিকল্পিত। স্তম্ভের বেদীতে চারিদিকে চারিটি বন্ধুর ব্রোঞ্জ চিত্র। একদিকে কোপেন হাগেনের যুদ্ধ জয়ের পর নেলসন একটি দলিল সহি করিতেছেন। অন্যদিকে স্পেনযুদ্ধ জয় শেষে বীর পরাজিতের তরবারি গ্রহণ করিতেছেন। উত্তর দিকে আবুকির যুদ্ধের ছবি। মহাপ্রাণ আহত হইয়া নীচে আসিয়াছেন, সার্জ্জন তাহাকে দেখিতে আসিলেন। বীর বলিলেন, 'তাড়াতাড়ি করিবার প্রয়োজন নাই, আমি আমার সাহসী বন্ধুদের সহিত আমার পালার জন্য অপেক্ষা করিব।"

চরিত্রের এই মাধুর্য্যই বৃটিশ শক্তির অপ্রতিদ্বন্দ্বী প্রভাবের কারণ। দক্ষিণ দিকে নেলসনের মৃত্যুদৃশ্য। নীচে লেখা—"ইংলণ্ড চায় যে, প্রত্যেকে তাহার কর্ত্তব্য করিবে।"

ইহাকেই নিষ্কাম কর্ম্মযোগ বলে। ভারতবর্ষে শ্রীকৃষ্ণ কর্ম্মযোগ প্রচার করিয়াছিলেন। সেই কঠোর দুঃসহ তপশ্চর্য্যা আমাদের ভাল লাগে না। আমরা আরাম-বিলাসী। বৃটিশ কর্ম্মযোগী, তাই তাহার শৌর্য্য দিগ্‌ দিগন্তরে ছড়াইয়া পড়ে। বেদীর চারিকোণে চারিটি সিংহ বৃটিশ শক্তির প্রতীক। ফরাসীদের নিকট হইতে গৃহীত কামান গলাইয়া এই ব্রোঞ্জ মূর্ত্তিগুলি খোদিত হইয়াছে। ইহাদের স্থপতির নাম এডউইন ল্যাণ্ডসিয়ার। ইহা ছাড়া এখানে বৃটিশ বিজয়ের গৌরব মণ্ডিত অন্যান্য সেনাপতিদের মূর্ত্তি আছে। খারটুমে নিহত জেনারেল গর্ডনের, সিপাহী বিদ্রোহের যুগের হ্যাভলক এবং চার্লাস নেপিয়ার মূর্ত্তি এই চতুষ্কোণে রহিয়াছে।

ওখান হইতে সেণ্ট জেমস পার্কের মধ্য দিয়া বাকিংহাম প্যালেস দেখিতে চলিলাম। এই নগরোদ্যান অনেকের মতে লণ্ডনের মধ্যে সর্ব্বোত্তম। সেণ্ট জেমস ইহাকে মৃগোদ্যানে পরিণত করেন—পূর্ব্বে ইহা আর্দ্র জলাভূমি ছিল। দ্বিতীয় চার্লস মল নামক রাস্তায় Paille Maille নামক ক্রীড়া করিতেন। এই ক্রীড়াটি ফরাসীদের, একটি বল ও একটি কাষ্ঠমুদ্গর লইয়া খেলিতে হয়। আধুনিক কালের ক্রোকেট খেলার অনুরূপ। কবি ওআলার চার্লস সম্বন্ধে এই বিষয়ে একটি চমৎকার কবিতা লেখেন। ক্লাক্‌স্টেন তাঁহার পুস্তকে যে অংশটুকু তুলিয়াছেন তাহা উদ্ধৃত করিতেছি।

"Here a well-polish'd wall gives us the joy,
To see our Prince his matchless force employ;
His manly posture and his graceful mien
Vigour and youth in all his actions seen.

His shape so lovely and his limbs so strong
Confirm our hopes we shall obey him long,
No sooner has he touched the flying ball
But 'tis already more than half the Mall.

And such a turn from his arm hath got,
As from a smoking culverin 'twere shot
May that ill-fate my enemies befall
To stand before his anger as the ball."

ফরাসী উদ্যানপালক Le Notre মৃগোদ্যানকে একটী সুন্দর উদ্যানে পরিবর্ত্তিত করেন। চতুর্থ জর্জ্জ তাঁহার স্থপতি ন্যাশকে দিয়া ইহার রমণীয়তা বৃদ্ধির আয়োজন করেন। মধ্য দিয়া একটী অপ্রশস্ত ঝিল বহিয়া চলিয়াছে—তাহাতে নানাবিধ জলচর পাখী সর্ব্বদা বিচরণ করে। ইহার ঋতু-পুষ্প খচিত ক্ষেত্রগুলি নয়নমনোহর। সেণ্টজেম্‌স পার্কের পশ্চিমাংশের সম্মুখেই বাকিংহাম প্রাসাদ। বিলাতে রেশম-শিল্প প্রচলনের জন্য তুঁতগাছের এক বাগান হয়। তাঁহার রক্ষক ছিলেন বাকিংহামের ডিউক জন সেফিল্ড। তাহার ভবনের নাম ছিল বাকিংহাম প্রাসাদ। ইহা ১৭০৩ খৃষ্টাব্দে নির্ম্মিত হয়। তৃতীয় জর্জ্জ ইহা কিনিয়া নেন। চতুর্থ জর্জ্জ ন্যাশকে দিয়া ইহা সংস্কৃত ও পরিবর্দ্ধিত করেন। কিন্তু মহারাণী ভিক্টোরিয়ার আমল হইতেই ইহার প্রতিপত্তি। সপ্তম এডওয়ার্ডের এই প্রাসাদেই জন্ম ও মৃত্যু হয়। প্রাসাদের সম্মুখেই ভিক্টোরিয়ার মর্ম্মর-মূর্ত্তি। দক্ষিণে ও বামে ন্যায় এবং সত্যের মূর্ত্তিদ্বয়। প্রাসাদের দিকে মুখ করিয়া মূর্ত্তিশ্রেণী রহিয়াছে—তাহারা মাতৃত্বকে প্রকাশ করিতেছে। সকলের উপর ডানা মেলিয়া জয়শ্রী বিরাজ করিতেছেন। জয়শ্রী একটী গোলকের উপর দণ্ডায়মান, তাহাতে সাহস এবং নিষ্ঠার মূর্ত্তি ধরিয়া রাখিয়াছে। প্রসাদের মধ্যে কোনই শিল্পচাতুর্য্য নাই, সাধারণ ত্রিতল বাড়ী দীর্ঘায়ত হইয়া রহিয়া গিয়াছে। বিস্ময়ের বিষয়, যে রাষ্ট্রের প্রতাপ বসুন্ধরার সর্ব্ব-দিকে ও সর্ব্বদেশে, তাহার রাজপ্রাসাদে আড়ম্বর এবং গরিমার কোনই আয়োজন নাই। প্রাসাদ দর্শকদের জন্য উন্মুক্ত নয়, কেবল পূর্ব্ব হইতে ব্যবস্থা করিলে রাজার অশ্বশালা দেখিতে পাওয়া যায়। যখন রাজা এই প্রাসাদে অবস্থান করেন, তখন রক্ষিপরিবর্ত্তন উৎসব সম্পন্ন হয়। দাঁড়াইয়া এই উৎসব-সমারোহ দেখিলাম। বিচিত্র পরিচ্ছদে সজ্জিত রক্ষিগণ যখন বদল হয় তখনকার দৃশ্য ও মিছিল লোকে উপভোগ করে। তারপর লণ্ডন মিউজিয়াম দেখিতে গেলাম। ইতিহাসের পরম্পরায় লণ্ডনের নানা যুগের আচার-ব্যবহার, রীতি-নীতি, সাজসজ্জা প্রভৃতির পরিচয়ের সুন্দর আয়োজন করা হইয়াছে। প্রাচীন লণ্ডনের কতকগুলি মডেল আছে, তাহার মধ্যে জ্বলন্ত লণ্ডনের ছবিটি খুব ভাল। বৈদ্যুতিক আলোকে ইহাকে অবিকল অগ্নিময় দেখান হয়। কারাগারের প্রাচীন কঠোর শাস্তির ব্যবস্থাও খুব স্বাভাবিক ভাবে দেখান আছে।

এখান হইতে ন্যাশানাল আর্ট গ্যালারি দেখিতে চলিলাম। এখানে নানাদেশের নানা যুগের চিত্রকলা সংগৃহীত করা হইয়াছে। ইংলণ্ডের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ চিত্রশিল্পী এবং নিসর্গদৃশ্যের অপ্রতিদ্বন্দ্বী স্রষ্টা টার্নারের সমস্ত ছবি এখানে দেখিতে পাওয়া যায়। ইতালীয় চিত্র-সম্পদের অতুলনীয় সম্ভার দেখিয়া দর্শক বুঝিতে পারেন যে, কেমন করিয়া অপটু হস্ত ধীরে ধীরে রেখা ও রঙের সামঞ্জস্য লাভ করিয়া পরিপ্রেক্ষিতকে বুঝিয়া ভুবনবিজয়ী চিত্রকলার উদ্ভাবন করিয়াছে। মাইকেল এঞ্জেলো, রাফেল, টিসিয়ান প্রভৃতি চিত্রকবিদের সৃষ্টির দক্ষতা বহু যুগের সাধনাকে গ্রহণ করিয়া মহিমময় হইয়া উঠিয়াছে।

চিত্রকলার বোদ্ধা সকলে নহে। তার জন্য রুচি ও শিক্ষা চাই, আমার চিত্রসৌন্দর্য্যজ্ঞানের বড়াই করিতে পারি না। তাড়াতাড়ি ছবিগুলির উপর চোখ বুলাইয়া লইয়া লিফ্‌টে করিয়া উপরে ন্যাশনাল পোর্টেট্রট গ্যালারি দেখিতে চলিলাম। কবি, মনীষী, রাজা, রাণী, মন্ত্রী প্রভৃতি দেশ-নায়কগণের প্রতিমূর্ত্তির সমাবেশে সমৃদ্ধ। ইতিহাসের কালানুযায়ী সজ্জিত এই সব চিত্রপট দেখিয়া ইংরাজবালক তাহার অতীতকে শ্রদ্ধা ও ভক্তি করিতে শেখে। পুরাতন তাহার নিকট কেবল শ্রুতি ও স্মৃতি রহে না, তাহা প্রত্যক্ষ ও অনুভবগম্য হইয়া ওঠে।

সাবির মা

—শ্রীঅমিয় ঠাকুর

সবাই বলে সাবির মা। ষাট্‌-পঁয়ষট্টি বছর বয়স হবে। সমস্ত মুখ রেখায় রেখায় ভর্ত্তি। দেহের চামড়া লোল হয়ে ঝুলে পড়েছে। ছোট করে ছাটা চুলের বেশীর ভাগই সাদা হয়ে এসেছে। বৃদ্ধত্বের সব লক্ষণই প্রকট হয়ে উঠেছে। কিন্তু ওর চোখ দুটো? তা'রা অন্য কথা বলছে।

ছোট—খুবই ছোট—ওর চোখ দুটো। কিন্তু কি উজ্জ্বল। সুদীর্ঘ জীবনের অসংখ্য ঝড়-ঝাপটা তাদের নিষ্প্রভ করতে পারে নি একটুও। বরঞ্চ অধিকতর তীক্ষ্ণ, অধিকতর সতর্ক করে তুলেছে। শিকারী বিড়াল যেমন একদৃষ্টে চেয়ে থাকে তার শিকারের পানে, লক্ষ্য করে তার প্রতিটি অঙ্গ-সঞ্চালন, ওর চোখ দুটোও তেমনি সবরকম বিপদের বিরুদ্ধে সদা সজাগ, রেখাবহুল মুখের মাঝে তা'দের সক্রিয় অস্তিত্ব স্বভাবতই স্মরণ করিয়ে দেয় ছাইয়ে ঢাকা আগুনের কথা। ওর দাঁতগুলিও বয়সকে ফাঁকি দিয়েছে। সুসজ্জিত দাঁতগুলির কোথাও একটু ফাঁক নাই। সবক'টাই অটুট রয়েছে। পান ও দোক্তায় মুখের দু' কষ ঈষৎ রঞ্জিত। ওর মুখের বাঁকা হাসিটি এখনও ওর চোয়ালের শক্তির কথা মনে করিয়ে দেয়। সব মিলে এই বৃদ্ধ বয়সেও ওর ভিতরে ঠিক রুক্ষ না হইলেও একটা তীক্ষ্ণতা সহজেই চোখে পড়ে। ছোটজাতের মেয়ে ও। কিন্তু অমন যে বাঘা জমিদার—শ্যামলাল চাটুয্যে—তিনিও ওর সাথে সতর্ক হয়েই কথা বলেন। বেশ মনে পড়ে, ওর দৃঢ় চলনভঙ্গীর দিকে তাকিয়ে জেঠাইমা একদিন বলেছিলেন,—"বাবা! মেয়ে লোক নয় তো, যেন পুরুষের বাবা।" ওর মেয়ে সাবিত্রীকে আমরা দেখি নি। শুনেছি, তার জন্মের অল্পদিন পরেই নাকি ওর স্বামী মারা যায়। জাতে ওরা নমঃশূদ্র। বিধবা-বিবাহ ওদের সমাজে চলে না, কিন্তু প্রলোভনের কোন অভাবই ছিল না। কিন্তু কোন বিপদ, কোন প্রলোভনই ওকে টলাতে পারে নি। দুর্দ্দমনীয় ওর মনের তেজ, অসম্ভব ওর সাহস। আড়াল থেকে মা ও জেঠাইমাকে বলতে শুনেছি, কোন এক বিশেষ ঘটনার সময় ওর 'সুতীক্ষ্ণ দন্তের চিহ্ন' অঙ্গে ধারণ ক'রে গ্রামের জমীদারনন্দন নাকি হঠাৎই বিখ্যাত হয়ে পড়েছিলেন।

একফোঁটা মেয়ে সাবিত্রীকে সম্বল ক'রে ও সংসারসমুদ্রে পাড়ি দেয়। স্বামীর আমলের বলদ দু'টো হইতে আরম্ভ ক'রে ঘরের বেড়ার বাঁধনগুলি পর্য্যন্ত সবকিছুই সে নিজে তত্ত্বাবধান করত। কখন কোথায় বলদ দুটোকে পাওয়া যাবে আর বেড়ার বাঁধনগুলির কোনটার বয়স কত—এ সবই ছিল তার নখদর্পণে। আবাদের সময় অবশ্য তাকে অপরের সাহায্য নিতে হ'ত। কিন্তু তাও সে নিজে দাঁড়িয়ে থেকে করিয়ে নিত। জমিদারকে দিয়ে যা অবশিষ্ট থাকত, তাতে মা ও মেয়ের বছরের খোরাক সচ্ছন্দেই চলে যেত, তা ছাড়া অবসর সময়ে বাঁশ ও বেতের কাজ ক'রেও বেশ দু'পয়সা ঘরে আসত। বাড়ীতে একটা নারকেলে কুলের গাছ ছিল। গ্রামের দশ মাইলের ভিতরে আর কারও গাছে ও রকম বড় ও মিষ্টি কুল হ'ত না। ছোট বেলায় আমরা এক পয়সায় আটটা করে কিনতাম।

সাবিত্রীর দশ বছর বয়স হতেই ভিন গাঁয়ের একটি স্বাস্থ্যবান্ ছেলেকে বর-জামাই করে এনে নূতন করে ও সংসার পাতাল। এর পর বছর দশেক ওদের বেশ সুখেই কাটলো। সাবির মার সতর্ক দৃষ্টি আর জামায়ের অক্লান্ত পরিশ্রমে কয়েক বছরের ভিতরই ঘরে ছনের পরিবর্ত্তে টিনের চাল উঠল। জমীও নূতন কিছু কেনা হ'ল।

প্রতিবেশীদের চোখ টাটিয়ে উঠল। ভগবান্‌ও বোধ হয় ওদের এতটা উন্নতি বরদাস্ত করতে পারলেন না। হঠাৎই ওদের সংসারে আবার ভাঙ্গন ধরল। কুড়ি বছর বয়সে এক ছেলের জন্ম দিতে গিয়ে সাবিত্রী মারা পড়ল। কিছুদিন পরে তার স্বামীও তাকে অনুসরণ করল। সাবির মার সুখের স্বপ্ন এক নিমেষেই ভেঙ্গে গেল। সুদীর্ঘ কর্ম্মবহুল সময়ের পর যখন কিঞ্চিৎ বিশ্রামের সুযোগ মিলল, তখনই তাকে আবার একা পড়তে হ'ল। শোকে-দুঃখে প্রথমটায় ও ভেঙ্গে পড়েছিল। কিন্তু ক্ষুদ্র নাতিটির মুখ চেয়ে ওকে

বাঁচতে হ'ল। সুস্থ সবল শিশুটির কৌতুকোজ্জ্বল চোখের ভিতর আবার ও দেখতে পেল নূতন আশার নূতন জীবন।

ক্রমে সেই শিশু বড় হয়ে উঠেছে। ওর নাম রাখা হয়েছে রাখাল। স্বভাবতঃই ও সুস্থ শরীরের অধিকারী। পনের ষোল বছর বয়সেই শক্তি ও সামর্থ্যে গাঁয়ের অন্যান্য ছেলে-দেরকে ছাড়িয়ে গেছে। মাথায় ও ছ' ফিটেরও কিছু উপরে হবে। সুদৃঢ় পেশীবহুল দেহ। মুখে কঠোরতা মিশ্রিত একটা গাম্ভীর্য্যের ভাব। দেখলেই মনে হয়, ও কাজের ছেলে, সাবির মা ওর দিকে তাকিয়ে থাকে; ওকে দেখে তার স্বামীর কথা মনে পড়ে। সত্যিই রাখাল খুব কাজের ছেলে। গাঁয়ের অন্যান্য ছেলেদের সাথে আড্ডা দিয়ে সময় কাটান ও পছন্দ করে না। ওর জাত স্বতন্ত্র। বার তের বছর বয়স থেকে ও নিজেই জমীর কাজ-কর্ম্মের ভার নিয়েছে। পরিশ্রম করে ও তৃপ্ত পায়। সমস্ত দিনের কাজের পর ও দিদিমার কাছে শুয়ে শুয়ে পুরাণো দিনের গল্প শোনে। দিদিমাকে ও ভালবাসে। ক্রমে আরও পাঁচ ছ' বছর কেটে যায়। ওদের ভাঙ্গা সংসার আবার জোড়া লাগতে চলেছে। ঠিক এমনি সময় দেখা দিল নূতন বিপদের সূত্রপাত।

কোলকাতা থেকে কোন এক বাবু এসে ওদের গাঁয়ে পাটের কল খুলেছে। বেশ একটা সাড়া পড়ে গেছে গাঁয়ে। সেদিন রাখাল বাজারে গেছে, দেখে, দয়াল সা'র দোকানে অনেক লোক জমেছে। ব্যাপার কি দেখবার জন্য সেও গিয়ে দাঁড়াল। অপরিচিত এক ভদ্রলোকের পাশে বসে গাঁয়ের পুরুতঠাকুরের ছেলে অনিল রায় যেন অনর্গল কি বকে যাচ্ছে। একটু লক্ষ্য করে রাখাল যা বুঝল তার সার মর্ম্ম হচ্ছে এই যে, গাঁয়ে একটা পাটের কল খোলা হয়েছে। গাঁয়ের চাষীদের দুঃখ দূর করবার জন্যই পার্শ্বে উপবিষ্ট ঐ অপরিসীম দয়ালু বাবুটী এই ব্যবস্থা করেছেন। এর পর থেকে তাদের আর পাট বিক্রী করতে দূরদেশে যাবার দরকার হবে না। আর তা ছাড়া, মিলে যারা কাজ করবে তারা যে সুখে থাকবে, তা কেবল স্বর্গেই সম্ভব। যারা মিলে কাজ করতে চায়, তারা যেন এখনই তাদের নাম-ধাম লিখিয়ে দিয়ে যায়। সব শেষে, আজকাল পাট চাষে কি ভয়ানক লাভ, সেই কথা প্রমাণ করে অনিল চুপ করে। একে একে অনেকেই আপন আপন নাম ঠিকানা দিয়ে এল। রাখাল এতক্ষণ কিছু দূরেই দাঁড়িয়েছিল, অনিল রায়কে সে জানে। দু' তিনবার কি এক পরীক্ষার দুয়ারে মাথা খুঁড়ে শেষে বিফল হয়ে গাঁয়ে ফিরে এসেছে। মাঝে কিছুদিন "কৃষক-সমিতির" নাম নিয়ে ওকে গাঁয়ের ভিতরে ঘুরতে দেখা গিয়েছিল। ওর বিরুদ্ধে নির্দ্দিষ্ট কোন অভিযোগ না থাকলেও রাখালের ওকে ভাল লাগে না। রাখালকে দেখেই অনিল খুব উৎসাহ দেখিয়ে বলে উঠে, "এই যে রাখাল, তুমিও এসেছ। বেশ ভালই হলো। তোমার মত লোকই তো আমাদের চাই।" সাধারণ সংস্কারই রাখালকে সাবধান করে দেয়। স্পষ্ট ভাবে ও বলে, "না কর্ত্তা আমি ওর ভিতর নাই। আপনারা তো মেলাই লোক পেয়েছেন।" রাখালকে অমত করতে দেখে অন্যান্য সকলেই চঞ্চল হয়ে উঠে। ওর মতামতের উপর তাদের যথেষ্ট আস্থা। বুদ্ধিমান্ অনিল সপ্রস্তু হয়ে উঠে। তাড়াতাড়ি বলে, "তা তো সত্যিই। তোমার যখন অসুবিধাই আছে, তখন পরে হলেই চলবে।" ঈষৎ হেসে রাখাল আপন কাজে চলে যায়।

শেষ পর্য্যন্ত কিন্তু রাখালকে মত বদলাতেই হলো। অন্যান্য সকলের মত সেও এবার বেশীর ভাগ জমিতেই পাট বুনলো, অতিরিক্ত লাভের আশায়। কিন্তু পাট তারা তৈরী করলেও তার দামের পরে তো আর তাদের কোন হাত নাই। তাই রোদে পুড়ে বৃষ্টিতে ভিজে যখন সেই পাট ঘরে তোলা হলো, তখন দেখা গেল যে, যা আশা করা গিয়েছিল তার অর্দ্ধেকও তার দাম হবে না। অতিরিক্ত উৎপাদনের ফলে যা হয়ে থাকে। চাহিদা গেছে অসম্ভব রকম ক'মে। রাখাল মাথায় হাত দিয়ে বসলো। সাবির মা কিন্তু পূর্ব্বেই তাকে বারণ করেছিল পাট বুনতে। এখন সান্ত্বনা দিয়ে বললো "থাক যা হবার হয়ে গেছে। ও নিয়ে আর মাথা ঘামিয়ে লাভ নাই।" কিন্তু মনে মনে সেও কম ভাবিত হলো না। পাট বিক্রী করে যা পাওয়া গেল তাতে হয়তো কষ্টে সৃষ্টে তাদের মাস চারেক চলতে পারতো। কিন্তু জমিদারের পাওনার কি হবে? সাধারণতঃ নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ ধান অথবা তার বাজার-মূল্য জমিদারকে দিতে হয়। স্বভাবতঃই ধান এবার দুর্মূল্য। কাজেই জমিদারের প্রাপ্য শোধ করতেই অপেক্ষাকৃত অধিক অর্থব্যয় করতে হলো।

অনিলের উদ্দেশ্যই সিদ্ধ হলো। রাখালকে তায় শরণ

নিতে হলো পাটকলে কাজের উমেদারীর জন্ত। এখন কিন্তু কাজ পাওয়াটা আর পূর্ব্বের মত সোজা ছিল না। প্রার্থী অনেক। অনেকেরই রাখালের মত অবস্থা। কিন্তু অনিল লোক চেনে। জানে, কাকে হাতে রাখা দরকার। দু'তিন দিন ঘোরা-ফেরার পর রাখালের কাজ জুটলো। দৈনিক তিন আনা করে মজুরী। সাবির মা ঘোরতর আপত্তি জানালো। রাগ করে কথা বন্ধ করলো। কিন্তু রাখাল টললো না। অগত্যা নিতান্ত অনিচ্ছায়ই তাকে রাখালের মত মেনে নিতে হলো।

রাখাল মিলে যেতে আরম্ভ করেছে। এ যেন এক নূতন জগৎ। সকলেই এক গ্রামের বাসিন্দা। অনেকেই অনেকের !, না-হয় পরিচিত। কিন্তু এখানে কেউ কারো খোঁজ রাখে না। একদণ্ড দাঁড়িয়ে আলাপ করা তো দূরের কথা, কেউ কারও দিকে তাকাবার পর্য্যন্ত ফুরসুত পায় না। সবাই ব্যস্ত। ছুটাছুটি, টানাটানি, হাঁকাহাঁকি, সর্দ্দারদের চীৎকার করে গালাগালি, আর তার সাথে ইঞ্জিনের ফোঁসফোঁসানী। সব মিলে যেন একটা হুলস্থূল ব্যাপার। নিশ্বাস ফেলবার অবকাশ নাই। এক মিনিট থামলে যেন সমস্ত সৃষ্টিই ভেঙ্গে পড়বে। ভোর ছ'টা থেকে সন্ধ্যা ছ'টা পর্য্যন্ত চলে এইভাবে। মাঝে সাড়ে এগারটায় আধঘণ্টা খাবার ছুটী। সন্ধ্যা ছ'টা বাজতেই ইঞ্জিন থেমে আসে। কলের বাঁশী বেজে উঠে—যেন কর্ম্মক্লান্ত দানবের কাতর আক্ষেপ। গেট্ খুলে দিতেই পিল্ পিল্ করে বেরিয়ে আসে অসংখ্য মানুষ। কিন্তু মানুষ ব'লে ওদের চেনা যায় না। আপাদ মস্তক পাটের ধুলায় ঢাকা। সন্ধ্যার অন্ধকারে মনে হয়, ওরা যেন বুভুক্ষু অশরীরীর দল। ক্রমে মাঠের ওপারে তাড়ির দোকানে ভীড় জমে উঠে। মিল খোলার কিছুদিন পরেই এই তীর্থস্থানটির সৃষ্টি হয়েছে। পিতা-পুত্র-নির্ব্বিশেষে এ তীর্থের যাত্রী। বহুরাত্রি পর্য্যন্ত হল্লা চলে। ক্রমে তাদের কণ্ঠস্বর ক্ষীণ হয়ে আসে। নেশায় চুর হয়ে যে যার বাড়ী অথবা রাতের আশ্রয়ে ফিরে যায়। দিনের পর দিন এই ভাবে কাটতে থাকে, ঘটনাহীন, বৈচিত্র্য-হীন কলের জীবন।

সাবির মা চঞ্চল হয়ে উঠেছে। ওর মন বলছে, বিপদ আসছে। রাখাল যেন আজকাল কেমন হয়ে উঠেছে। বড় একটা কাছে ঘেঁসে না। ভোর বেলা উঠে মিলে চলে যায়। দু'পুরে কোন দিন খেতে আসে, কোন দিন বা আসেই না। ভাত নিয়ে সাবির মা বসে থাকে। শেষে ক্লান্ত হয়ে ভাত ঢাকা দিয়ে রাখে। নিজেরও আর খাবার রুচি থাকে না। রাতেও রাখাল অনেক দেরী ক'রে ফিরতে সুরু করেছে। কারণ জিজ্ঞেস করলে স্পষ্টই বিরক্ত হয়। সোজা গিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়ে। খেতে বললে বলে, শরীর ভাল নাই। সাবির মা এই হঠাৎ পরিবর্ত্তনের কারণ খুঁজে কূল পায় না। হঠাৎ ওদের একি হলো! দিব্যি সুখের সংসার ওদের। কোন অভাবই তো ছিল না। তবে আজ এ রকম হ'লো কেন? কাকে যে সে এর জন্ত দায়ী করবে—সাবির মা ভেবে পায় না।

ক্রমেই রাখাল দূরে সরে যাচ্ছে; না আর নয়। সাবির মা ঠিক করেছে, আজ সে স্পষ্টই জিজ্ঞেস করবে রাখালকে। কিন্তু রাখাল আসছে কই। মিলের ঘণ্টায় রাত দশটা বেজে গেল। রাখাল তখনও ফিরল না। ভাত সামনে রেখে সাবির মা ঢুলছে। হঠাৎ কি একটা শব্দ হতেই সাবির মা চমকে ওঠে। টল্‌তে টল্‌তে রাখাল বাড়ী ফিরছে। সাবির-মা এগিয়ে গিয়ে রাখালের একটা হাত ধরতেই সে বিকৃত কণ্ঠে চীৎকার করে ওঠে; "ছেড়ে দে আমায়। দেখিয়ে দিচ্ছি শালাকে। শালা বলে কিনা বামী ওকে ভালবাসে।" বামী ওপাড়ার সনাতন মণ্ডলের বিধবা মেয়ে। সাবির মা সবই বুঝতে পারে। বিরক্তিতে তার সমস্ত শরীর রিরি করে ওঠে। হাত ছেড়ে দিয়ে ও গিয়ে ঘরের দরজায় বসে পড়ে। এদিকে রাখাল আর একবার 'বীর রসে'র অবতারণা করতেই হুম্‌ড়ি খেয়ে পড়ে উঠানের ভিতর। তার পরেই আরম্ভ হয় বমি। সে কি দুর্গন্ধ! সমস্ত বাড়ীটা সে গন্ধে ভরে যায়। কোথায় থাকে সাবির মার রাগ। সে ছুটে গিয়ে রাখালকে তুলে ধরে। বামুনদের পুকুর থেকে পরিষ্কার জল নিয়ে এসে মুখে মাথায় দিতেই রাখাল কথঞ্চিৎ সুস্থ হয়। তাকে বিছানায় শুইয়ে দিয়ে সাবির মা লেগে যায় উঠানের নরক পরিষ্কার করতে। সব শেষ করে যখন ও শুতে যায় তখন ভোরের আর সামান্তই বাকী থাকে। ঘুম কিন্তু ওর কিছুতেই আসে না। নানা দুর্ভাবনায় বিছানায় পড়ে ছটফট্ ক'রতে থাকে। ভোর হতেই অভ্যাসমত রাখাল মিলে চলে যায়।

সেদিন থেকে প্রায়ই এরকম হতে থাকে। সাবির মার

দিনরাত অশান্তিতে কাটে। সেও যেন আজকাল কেমন খিটখিটে হয়ে পড়েছে। রাখাল সম্বন্ধে প্রতিবেশীরা কেউ কিছু বলতে এলে সে হাত-মুখ খিঁচিয়ে ওঠে। বলে, "যা যা, সবাইকেই আমার জানা আছে। পুরুষ মানুষ ওরকম করেই থাকে।" কিন্তু নিজের মনে কোন সান্ত্বনাই সে খুঁজে পায় না।

আরও তিন চার মাস কেটে গেল। না, সাবির মা আর পারে না। সেদিন দুপুর রাতে মাতাল হয়ে ফিরতেই বেশ দু'ঘা বসিয়ে দেয়। রাখাল কেঁদে ওঠে। ওর দিদিমার কাছে এখনও সে শিশু। সাবির মা ওকে টেনে নিয়ে বিছানায় শুইয়ে দেয়। সে রাত দুজনেরই উপোস করে কাটে। ভোর বেলা রাখাল চলে যেতেই অনুতাপে সাবির মার চোখ দিয়ে জল পড়তে থাকে। কাল সে রাখালকে মেরেছে।

ছোট বেলা থেকে কখনও রাখালের গায় তার হাত দিতে হয়নি। এমনি সাধের ছেলে ও। কিন্তু আজ তার এ অধঃপতন হলো কি করে? কারণ খুঁজতে গিয়ে স্বভাবতঃই মন তার মিলবাড়ীর চারদিকে ঘুরে বেড়ায়। পূর্ব্বে সেখানে টিনের ছাউনি ছিল। এখন পাকাবাড়ী উঠেছে। ওখানে যাবার পরই তো রাখাল অমন ধারা হয়েছে। সমস্ত আক্রোশ গিয়ে পড়ে তার ঐ মিলের উপর। কিন্তু কিই বা সে করতে পারে।

আজ রাখালের জন্মদিন। পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বে ঠিক এমনি দিনে রাখাল জন্মেছিল। ভোর থেকেই সাবির মা লেগে গেছে এটা ওটা যোগাড় করতে। মোচার তরকারী রাখাল খুব ভালবাসে। অনেক সাধ্য সাধনা করে মনিব-বাড়ীর পুকুরপাড় থেকে একটা মোচা নিয়ে এসেছে। প্রতিবেশীদের ছোট মেয়ে টেঁপিকে সঙ্গে নিয়ে নিজেই গিয়ে বিল থেকে কিছু ছোট চিংড়ি মাছ ধ'রে নিয়ে এল। আজ সে রাখালকে পরিতোষ করে খাইয়ে কাল রাতের রূঢ় আচরণের প্রায়শ্চিত্ত করবে। বেলা দশটার ভিতরই রান্নাবান্না শেষ করে সে স্নান করে এলো। তারপর আসন পেতে জল দিয়ে ভাত সাজিয়ে সে ব'সে রইলো রাখালের প্রতীক্ষায়।

হঠাৎ তীক্ষ্ণ কর্কশ চীৎকারে আকাশ চিরে দিয়ে বেজে উঠলো মিলের বাঁশী। বিরাট কোলাহলে আকাশ বাতাস মুখর হয়ে উঠলো। শঙ্কায় সাবির মার বুক কেঁপে ওঠে। কি যেন একটা ঘটেছে। সে এগিয়ে গিয়ে রাস্তার পাশে দাঁড়ায়। ওপাড়ার চণ্ডী ছোঁড়াটা ছুটে আসছে। সাবির মা বুঝতে পারে, তার সর্ব্বনাশ হয়েছে। শঙ্কায় তার সমস্ত শরীর থরথর্ করে কাঁপতে থাকে। হাঁপাতে হাঁপাতে চণ্ডী বলে, "রাখালদা' এঞ্জিনে কাটা পড়েছে। তুমি শীগ্গির চলো দিদিমা।" বলবার আর কিছুই ছিল না। হাঁপাতে হাঁপাতে বুড়ী ছুটলো চণ্ডীর পিছনে।

রাখালকে ঘিরে অসংখ্য লোক জমেছে। মাথাটা কেটে দু'ফাঁক হয়ে গেছে। সমস্ত অঙ্গ ক্ষত-বিক্ষত। রক্তে রক্তে নীচের জমি লাল হয়ে গেছে। কষ্টে শ্বাস বইছে। আর কয়েক মিনিট পরেই একেবারে থেমে যাবে। করবার আর কিছুই ছিল না। ভীড় ঠেলে সাবির মা কাছে আসতেই রাখাল শেষ বারের মত চোখ মেলে চাইলো। কথা বলবার শক্তি নাই। চোখ দিয়ে বড় বড় দু'ফোঁটা জল গড়িয়ে প'ড়লো—তার পরই সব শেষ। "ওরে রাখালরে" বলে বুড়ী ঝাঁপিয়ে পড়লো তার রক্তাক্ত দেহটার পরে।

এই ঘটনার পর দু-তিন বছর কেটে গেছে। সাবির মা এখনও বেঁচে। কিন্তু সে শুধুই বেঁচে থাকা। পৃথিবীর কোন কিছুর পরই তার আর আকর্ষণ নাই। সুখের সব স্বপ্নই তার একে একে ভেঙ্গে গেছে। আশাই জীবন। আশার সাথে সাথে জীবনও গেছে চলে। এখন শুধুই শেষের অপেক্ষায় বসে বসে দিন গোণা। ঘর-দোরেরও আর সে পূর্ব্বের শ্রী নাই। সর্ব্বত্রই যেন অন্ধকার ঘনিয়ে আসছে। মৃত্যুর ছায়া পড়েছে চারিদিকে। বেড়াগুলির সবই প্রায় খুলে পড়েছে। উঠানে ধানের গোলাটা মাটিতে প'ড়ে গিয়ে সৃষ্টি হয়েছে একটা আবর্জ্জনার স্তূপ। চারদিকে বন-জঙ্গলে ভর্ত্তি। পরিষ্কার করবার লোক নাই। ঘরের পেছনের ফুল গাছগুলি প্রতিবেশীদের গরুতে মাথা নেড়া করে খেয়ে গেছে। আমাদের আক্রমণ থেকে সেগুলিকে রক্ষা ক'রতে এক সময় সাবির মাকে কি বেগটাই না পেতে হতো। কোণের পুরাণো বকফুল গাছটা মরে গিয়ে কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কাকেরা বাসা বেঁধেছে তার শুকনো ডালে। বেলা প'ড়ে আসতেই কুব্জ ন্যুব্জ দেহটাকে শতছিন্ন তেল-চিটচিটে একটা কাঁথা দিয়ে জড়িয়ে সাবির মা এসে দোরগোড়ায় বসে। ও'র ভাঙ্গা বুকে কাসি বাসা বেঁধেছে। ব'সে ব'সে খক্ খক্ করে কাসে আর তারই ফাঁকে অদূরের মিলটাকে অভিসম্পাত দেয়। ক্রমে দিনের আলো নিভে আসে। সন্ধ্যার ছায়া ছড়িয়ে পড়ে পৃথিবীর বুকে। পুরুতদের নূতন মন্দির থেকে আরতির শব্দ ভেসে আসে। সাবির মা বুঝতে পারে না ও কিসের আরতি ;—দেবতার—না পাটকলের !

ইংলণ্ডের নির্ব্বাচন-প্রার্থীর নমুনা

—শ্রীদুলালচন্দ্র মিত্র

অনেকেই বলেন, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য কভু না মিশিবে। কতকগুলি ব্যাপারে কিন্তু এই দুই জগৎ মিশিয়া গিয়াছে, কিংবা মিশিয়া যাইতেছে, আর নির্ব্বাচনের হুল্লোড় তাহার মধ্যে একটী; সম্প্রতি কলিকাতা মিউনিসিপ্যালটীর সাধারণ নির্ব্বাচন উপলক্ষে উক্ত বিষয়ে আমাদের ঘরের কথা যথেষ্ট আলোচিত হইয়াছে। এক্ষণে ঘরের কথা ছাড়িয়া দিয়া ইংলণ্ডের কথা বলিব।

ইংরেজী সাহিত্যে উইলিয়াম্ কাউপার্ একজন খ্যাতনামা কবি তো বটেই, তাঁহার পত্রাবলীও ইংরেজী সাহিত্যের একটী বিশিষ্ট সম্পদ্। ১৭৮৪ খৃষ্টাব্দের ২৯শে মার্চ্চ তারিখে তিনি রেভারেণ্ড জন্ নিউটনকে একখানি পত্র লিখিয়াছেন, সেই পত্রে তিনি যাহা বলিয়া গেছেন, তাহা এই শতাধিক বর্ষ পরেও প্রণিধানযোগ্য। পত্রটীতে কবি কাউপার লিখিতেছেন "......যখন তুফানের জোর বড্ড বেশী হয়, তখন সমুদ্রের জল বেলাভূমি ছাড়িয়ে গুহা খাঁড়ির ভেতরে প্রবেশ করে। অন্য সময় সমুদ্রের জল ততদূর গিয়ে পৌঁছায় না। আমাদের এখানে (কবি তখন কিছুদিনের জন্য এক পাড়াগাঁয়ে বাস করিতেছিলেন) ঠিক্ সেই মতন, বর্ত্তমানে যে গোলযোগের ঢেউ এসে পৌঁছেছে; তা'না হ'লে, সাধারণতঃ এখানে রাষ্ট্রনীতির বালাই নেই। আর শ্রিম্প ও কক্‌ল্ মাছ ঢেউয়ে এসে বেলা ভূমির গণ্ডীর বাহিরে কোন গর্ত্তে আটকে গিয়ে যে অবস্থায় থাকে, আমাদের অবস্থাও এখানে তাই।

কাল্‌কে আহারের পর দুইটী মহিলা ও আমি বৈঠকখানায় স্বচ্ছন্দে ও নিশ্চিন্ত মনে বসেছিলাম, এমন সময় একটী ভদ্রলোক দেখা দিলেন, আর সঙ্গে-সঙ্গেই আমরা চকিত হয়ে দেখলাম, জানলার বাহিরে একদল লোক দাঁড়িয়ে আছে; দরজায় কড়ানাড়ার জোর শব্দ শোনা গেল, আর তখনই ঝি এসে বললে, মিষ্টার গ্রেন্‌ভিল এসেছেন। পুস্ (এই প্রাণীটী কবির বড়ই আদরের) সে সময় ছাড়ান ছিল, সেই কারণে ভদ্রলোকটীকে ও তাঁহার দলকে সদর দিয়ে না এনে খিড়কি দিয়ে আনা হল। (পাছে পুস্ পদ-দলিত হয়,) নির্ব্বাচন-প্রার্থীদের এমনই প্রকৃতি যে, তাঁরা মান-অপমানের দিক্‌টাতে নজর দেন না; আমার মনে হয়, দরজা বন্ধ ক'রে দিলে জানলার ফাঁক দিয়ে আসতেও এঁরা গররাজী নন্। তাঁর প্রবেশের সঙ্গে-সঙ্গেই ঘরও প্রাঙ্গন লোকে পরিপূর্ণ হয়ে গেল। মিষ্টার গ্রেন্‌ভিল আমার দিকে এগিয়ে এসে অভিবাদন করলেন, যেন কতই আপনার জন—মনটাকে যেন একেবারে জল করে দিলেন। তিনি এবং তাঁর দলের লোকেরা, যাঁরা চেয়ার পেলেন, বসলেন। মিষ্টার গ্রেন্‌ভিল তখন তাঁর আগমন-বার্ত্তা ব'লতে আরম্ভ ক'রলেন। আমি বললাম, ভোটার-লিষ্টিতে আমার নাম নেই; আমার এই কথা শুনে তিনি তৎক্ষণাৎ আমার প্রশংসা করলেন। আমার যে প্রভাব-প্রতিপত্তি নেই—এই কথা আমি তাঁকে বিশ্বাস করতে বললাম; কিন্তু তিনি বোধ হয় সে কথা বিশ্বাস করতে পারলেন না,—কারণ, কাপড়ের দোকানের লোক সেই সময় আমার কাছে এসেছিলেন, তিনি তাঁকে শুনিয়ে দিলেন—আমার প্রভাব-প্রতিপত্তি যথেষ্ট। ভাবলাম, তা হ'লে হয় তো বা আমি সেই মূল্যবান জিনিষের অধিকারী, তাই, মিষ্টার গ্রেন্‌ভিল্‌কে বললাম, সেই জিনিষটা কোথায় আছে আর কেমন ক'রেই বা আমার হ'ল তা তো জানি না। আমাদের কথাবার্ত্তা তখন শেষ হল।" সুতরাং এইবার বিদায়ের পালা—মিষ্টার গ্রেন্‌ভিল কবিকে এবং পাশ্চাত্যের নিজস্ব প্রথায় মহিলা দুইটিকে বিদায়-অভিবাদন জানাইলেন, বাড়ীর দাসীটীকেও তদনুরূপ অভিবাদন জানাইতে ভুলিলেন না। ইহার পরের কথা কবির মুখে শুনুন—"ছেলের দল জয়ধ্বনি করল, কুকুরগুলো ঘেউ-ঘেউ করে উঠল, পুস্ চোঁ-দৌড় দিল, আর যিনি নায়ক, তিনি তাঁহার হীন অনুচরবৃন্দ (obsequious followers) সহ প্রস্থান করলেন।"

মিষ্টার গ্রেন্‌ভিল্‌জাতীয় নির্ব্বাচনপ্রার্থী ব্যতীত ইংলণ্ডের আর একজাতীয় নির্ব্বাচনপ্রার্থীর সন্ধান আমরা পাই। মিষ্টার্ মিল্ তাঁহাদের অন্যতম। ইনি আমাদের আত্মীয়, জ্ঞাতি বলাও চলে, কারণ, যখন ভারতবর্ষ কোম্পানীর রাজত্ব

থেকে মহারাণীর রাজত্বে রূপান্তরিত হইল, ইনি সেই সন্ধিক্ষণে এবং তাহার পূর্ব্বে লণ্ডনের ইণ্ডিয়া অফিসে একজন উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী ছিলেন ; ইনি হইতেছেন ইংলণ্ডের প্রসিদ্ধ সুধী জন্ ষ্টুয়ার্ট মিল্। ইঁহার পিতাও ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর লণ্ডন অফিসে একজন পদস্থ কর্ম্মচারী ছিলেন।

পার্লামেণ্টের একাধিক নির্ব্বাচনে জন্ ষ্টুয়ার্ট মিল্কে নির্ব্বাচনপ্রার্থী হইতে বলা হইয়াছিল, কিন্তু তিনি সম্মত হন নাই। মিল্ তাঁহার আত্মজীবনীতে ইহার কারণ বলিয়া গিয়াছেন—"একটী আধলা পয়সাও খরচ করা নির্ব্বাচনপ্রার্থীর পক্ষে উচিত নয়।……খরচের ধরণটা খুব ভাল ভাবে হইলেও, যিনি নিজের নির্ব্বাচনদ্বন্দ্বের ব্যয় নিজেই করেন, জনসেবা ছাড়া তাঁহার অন্য মতলব আছে, ইহা মনে হওয়া স্বাভাবিক।" নির্ব্বাচনপ্রার্থীর নির্ব্বাচনব্যয়-নির্ব্বাহের জন্য চাঁদা তোলা উচিত—ইহাই মিলের অভিমত। প্রবীণ বয়সে মিল্ নির্ব্বাচনদ্বন্দ্বে অবতীর্ণ হইতে বাধ্য হইয়াছিলেন, কিন্তু তিনি তাঁহার নীতি পরিত্যাগ করেন নাই ; এতৎসম্বন্ধে তিনি তাঁহার আত্মজীবনীতে বলিয়াছেন—"আমি উক্ত নীতি ঠিক ভাবে অনুসরণ করিয়াছিলাম, নিজের পয়সা খরচ করি নাই, নির্ব্বাচনের বন্দোবস্ত নিজে করি নাই, কিংবা ভোটভিক্ষায় বহির্গত হই নাই। নির্ব্বাচনের এক সপ্তাহ পূর্ব্বে, আমার অভিমত জানাইবার জন্য এবং ভোটদাতাদের প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দেবার জন্য, আমি কতকগুলি জনসভায় উপস্থিত হইয়াছিলাম, বক্তৃতা দিবার মতনই আমি সোজাসুজি ভাবে ও খোলাখুলি ভাবে উত্তরগুলি দিয়াছিলাম।" মিল্ তাঁহার 'থট্‌স্ অন্ পার্লামেণ্টারী রিফরম্‌স্' শীর্ষক সন্দর্ভে মজুরদিগকে বেশ স্পষ্ট ভাষাতেই, নির্লজ্জ মিথ্যাবাদী বলিয়াছেন, তাঁহার প্রতিপক্ষ এই সংবাদটুকু প্রচারপত্রে জাহির করিয়া দিয়াছিলেন। মিল্ তাঁহার আত্মজীবনীতে বলিয়াছেন—"মজুরদের এক সভায় আমার হাতে সেই প্রচারপত্র দেওয়া হইয়াছিল এবং আমাকে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল, আমি ওই কথা লিখিয়াছি কিনা। আমি তৎক্ষণাৎ উত্তর দিলাম, হাঁ। লিখেছি। শব্দ দুইটা উচ্চারিত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই সভাটা আমার প্রশংসাধ্বনিতে প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল।" সেই সভাতে মজুরদের পক্ষীয় এক বক্তা শেষকালে বক্তৃতায় বলিয়াছিলেন, মজুররা এই রকম প্রতিনিধি চায়, যিনি মজুরদের বন্ধু হয়ে কাজ করবেন, তাঁদের দোষগুণ দু'টোই দেখবেন, ভোট আদায়ের জন্য শুধু মিষ্টি কথা ব'লবেন না।

নির্ব্বাচনদ্বন্দ্বে প্রেসিডেন্সির জয়-পরাজয়ের কথা আমাদের জানা নাই ; কিন্তু মিল্ এই নির্ব্বাচনে জয়ী হইয়াছিলেন।

চিত্তরঞ্জন দাশ

শ্রীবিপিনবিহারী দাশগুপ্ত

বঙ্গচিত্ত-সিন্ধু মধ্যে অমূল্য রতন।
উজ্জ্বল নির্ম্মল শুভ্র হৃদ্‌-বাসন ॥
দেশবন্ধু দেশপ্রাণ দেশহিতরত।
সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসীবীর নরসেবারত
মহামনা মহাকর্ম্মী সরস অন্তর।
অচল অটল ধীর নায়ক প্রবর ॥
উদার মহান্ যথা উচ্চ হিমাচল।
ভাবের তরঙ্গ যেন জাহ্নবীর জল ॥
গৌরাঙ্গ করুণাসিক্ত করুণ হৃদয়।
উদ্বেলিত মহাচিত্ত ভাবাবলীময় ॥

ত্রিভঙ্গ সুন্দরশ্যাম স্বপন তোমার।
মুরলীর নাদ শোন কাণের ভিতর ॥
ভাবারণ্যে এবে সদা তোমার বসতি।
বিপদ সাগরে ভাসে দেশের সন্ততি ॥
হিংসা দ্বেষ পরিপূর্ণ বিপুল অবনী।
অনিদ্রায় যাপে নিশি ভারত-জননী ॥
আবার দাঁড়াও এ'সে বঙ্গের উপর।
মহাব্রত সিদ্ধ কর ভারত উদ্ধার ॥
বিষাদের দিনে করি প্রীতিঅর্ঘ্য দান।
একবিন্দু অশ্রুজল অমৃত সমান ॥

যেখানে যেভাবে থাক সদানন্দময়।
মোর মর্ম্মবাণী তুমি জানিবে নিশ্চয় ॥

দিগ্‌ভ্রষ্ট

—শ্রীরণজিৎকুমার সেন

প্রশান্তর চোখে সারাটা পৃথিবী অন্ধকারে ভ'রে ওঠে। শ্বাস রোধ হ'য়ে যাওয়া রোগীর মত তার শ্রান্ত তনু যেন মুহূর্ত্তে নির্জ্জীবতার বুকে ঝিমিয়ে পড়ে। প্রশান্ত যেন ভাবতে পারে না তার জীবনের কথা; জগতের বুকে নিজের অস্তিত্বকে সে ক'রতে পারে না বিশ্বাস।···

সামান্ত চল্লিশ টাকার কেরাণী-জীবনও আজ তার নিঃসন্দেহে ঘুচে গেল এক মুহূর্ত্তে। হায় রে! এম্‌নি ক'রেই তো তার সমস্ত সম্বন্ধ ঘুচে যাবে একদিন পৃথিবীর সাথে,···এই লীলা-চপল আলো বাতাস—সবার সাথে। সেই অনিশ্চিত দিনটিকে যদি আজ প্রশান্ত হাতের মুঠির মধ্যে পেতো, তবে তার বুক নিঙড়ে সমস্তটুকু রক্তকে এক নিঃশ্বাসে সে পান ক'রতো, মৃত্যুর যবনিকার অন্তরালে পার্থিব এই জীবনটাকে হাতের আঙুলে সে বাজিয়ে নিতো।—

মানুষের খেলাঘর যেখানে রচনা হয়েছে, তার পেছনে যে কোন দানবিকতার অভিসম্পাত লেগে থাকতে পারে—প্রশান্ত পারে না তা' ভাবতে। সাংসারিক জীব সে, তাই সে চেয়েছিল বাঁচতে, চেয়েছিল সে জীবনের মনুষ্যত্বটাকে ফিরে জেগে উঠ্‌তে,···কিন্তু নিয়তির ক্রূর পরিহাস তাকে তা' ক'রে দিয়েছে ব্যাহত। অনেক ক'রে বড়বাবুদের হাতে পায়ে তেলিয়ে সে জুটিয়েছিল তার এই কাজটা, কিন্তু আজ তা'ও হারাতে হোলো তাকে। প্রশান্ত ভাবলো—এখন সে কোথায় গিয়ে দাঁড়ায়? কে তার একটানা সংসারের ভার নিয়ে তাকে চিরদিনের জন্ত মুক্তি দেয়! মুহূর্ত্তে যেন পর্দ্দার ছবিগুলোর মত জীবনের সমস্তগুলো অধ্যায় প্রশান্তর মানস চোখে এক এক ক'রে জেগে উঠ্‌লো।

শিশুকাল হ'তে দরিদ্র বাপ-মার স্নেহ-ভালবাসায়, আদরে আহ্লাদে প্রশান্তর দিনগুলো বেশ কেটে যাচ্ছিল একে একে। কোথাও তার অস্বাচ্ছন্দ্যের পরিচয় মেলেনি কোন দিনই। তারপর সে লেখাপড়া ক'রে আই-এস্‌সি পাশ ক'রলো। বাবা অমল চৌধুরীর ইচ্ছে হোলো ছেলেকে এখন মেডিক্যাল লাইনে পড়ান; কিন্তু সে শুধু হুজুগে প'ড়ে, অর্থের স্বচ্ছলতার দিক দিয়ে নয়। কিন্তু প্রশান্তর চিরদিনই ভয় ছিল সার্জ্জারী ডিপার্টমেণ্টটাকে। তার বেশ মনে আছে—একবার তার আপন মাসতুতো ভাইকে অপারেশান করা দেখে মূর্চ্ছিত হ'য়ে পড়েছিল সে আতঙ্কে। তাই সে বাবাকে ব'ললে, "ডাক্তারী পড়বার মত ধৈর্য্য বা সৎসাহস আমার নেই বাবা, যে, ছ'ছটা বছর ছুরি ধার দেবার মত ব্রেইন্‌টাকে ঘষ্‌তে ঘষ্‌তে পাশ ক'রে বেরিয়ে এসে চেম্বার খুলে বোস্‌বো। আর আমাদের এই দরিদ্র জীবনে তা' সম্ভবও হবে না। তার চাইতে 'জেনারেল-লাইনে' প'ড়েই দেখি, কিছু করতে পারি কি না।" উত্তরে বাবা সেদিন পিতৃত্বের কঠোর দাবী নিয়ে বাধা দেন নি তার চলাপথে। মায়ের অনুরোধও ডিঙিয়ে এসেছিল সেদিন প্রশান্ত নির্ব্বিবাদে।—এম্‌নি ক'রেই দিন চ'ল্‌তে লাগ্‌লো।···

প্রশান্ত ভেবেছিল বি-এস্‌ সি-তে সে একটা 'ব্রিলিয়েণ্ট রেজাল্ট' ক'রে বেরিয়ে আস্‌বে, কিন্তু অদৃষ্টের দাসত্ব থেকে সে মুক্তি পাবে কেমন ক'রে?—ফাইনালের বছরেই তার হারাতে হোলো মাকে। একমাত্র সন্তান হ'য়ে এ শোক সে সহ্য ক'রতে পারেনি সেদিন। 'ফিস্‌' দাখিল ক'রেও পরীক্ষা তার বন্ধ ক'রতে হোলো সেবারে। বাবা অমল চৌধুরীও যে সেই থেকে বিছানা নিলেন, আর মাথা তুলে দাঁড়াতে পারেন নি। ডাক্তাররা ব'ল্‌লেন, বাঁ-অঙ্গ তাঁর 'প্যারালাইস্‌ড' হ'য়ে গেছে।—সেই থেকে প্রশান্তকে সংসারের দিকে মন দিতে হোলো। তবু তার সাহস ও শক্তি ছিল বুকে,···পরের বছর 'এগ্‌জামিন্‌' দিয়ে পাশ ক'রে এলো সে বেরিয়ে। অঙ্কশাস্ত্র নিয়ে এম্‌-এ প'ড়্‌বার সখ ছিল তার বরাবরই, কিন্তু পূর্ণ হোলো না তার সে আশা।

—বাবা ব'ল্‌লেন, "এম্‌-এ প'ড়তে হ'লে তো আর এখানে থেকে প্রাইভেট্‌ প'ড়লে বিশেষ সুবিধে হবে না, বাধ্য হ'য়ে ক'লকাতায় কিম্বা ঢাকায় যেয়ে প'ড়তে হবে। কিন্তু তুই চ'লে গেলে আমার কি অবস্থা হবে ব'ল্‌তে পারিস?

মুখে একটু জল তুলে দেবার লোকটি পর্য্যন্তও যে থাক্‌বে না!”

বাবা বুড়ো হ’য়েছেন, তাতে ক’রে আবার সংসারে নেই দেখাশোনার লোক দ্বিতীয়টি, তাই বাধ্য হ’য়ে প্রশান্তকে এবার ঘরের আশ্রয়ই নিতে হোলো। কিন্তু এম্‌নি ক’রেই বা আর কতদিন চ’ল্‌বে? জীবনে কিছু ক’রে খেতে তো হ’বে নিশ্চয়ই! প্রশান্ত একদিন ব’ল্‌লে, “কলকাতায় পিসেমশাইর কাছে থেকে কয়েকদিন চাক্‌রীর চেষ্টা ক’রে আসি না কেন বাবা? হাজার হোক্‌, কলকাতা বড় ‘ফীল্ড্‌’ তো বটে।”

বাবা ব’ললেন, “ঘরে আমার পঙ্গুরিদার কা’কে রেখে যাবি বল্‌? হায়! আজ যদি তোর মা বেঁচে থাকতো এতদিনে তবে তোর বিয়ে দিয়ে বউ নিয়ে আসতো ঘরে জানকী বোসের মেয়ের সাথে তো সম্বন্ধ একরকম ঠিকই হ’য়ে গিয়েছিল, কিন্তু ভগবানের ইচ্ছে নয়, তাই সময়মত কাজটা হোলো না।—মেয়েটিকে আমার ভারী পছন্দ হ’য়েছিল বাবা।”—কথার শেষে দু’ফোঁটা জল গড়িয়ে প’ড়লো তাঁর দুগ্ধফেননিভ শয্যার পরে। প্রশান্তও তাই শেষ পর্য্যন্ত বাবার শেষ জীবনের ইচ্ছাকে পূর্ণ ক’রবার জন্যে কাঁইচালের জানকী বোসের মেয়ে ছবিকে বিয়ে ক’রে নিয়ে এলো ঘরে। ···সেদিন সে ভাবতেও পারেনি, যে, জীবনে হয়ত একদিন দারিদ্র্যের কশাঘাতে জর্জ্জরিত হ’তে হ’বে তাকে। ছবিকে ঘরে এনে ঠিক প্রাণের ছবির মতই প্রশান্ত সর্ব্বক্ষণের জন্য সাজিয়ে রেখেছিল তাকে। ব’লেছিল, “তুমি এসেছ আমার জীবনে স্ফটিকজলের স্বচ্ছধারা হ’য়ে। তোমার মধ্যে দেখতে পেয়েছি আমার জীবনের প্রতিটী অণুপরমাণুকে সৌন্দর্য্যের অপার দৃষ্টিতে। তুমি আমার অন্তরের দীপশিখাটী।”

—ছবির সেদিন লজ্জায় আড়ষ্ট হ’য়ে এসেছিল সারাটি অঙ্গ। মৃদু হেসে বলেছিল, “আর তুমি হ’লে আমার জীবনের ধ্রুবতারা। তোমাকে লক্ষ্য ক’রেই সংসার-সমুদ্রে ভেসে চ’ল্‌বে আমার জীর্ণতরী।”

এমনি ক’রেই সুখের দিন তাদের এগিয়ে চ’ল্‌তে লাগলো ধীরে ধীরে।······

ছবিকে কাছে পেয়ে প্রশান্তর প্রয়োজন এবারে যেন বাবা অমল চৌধুরী অনেকখানি কম বোধ ক’রতে লাগলেন মনে। প্রশান্ত খুশী হোলো তাতে কম নয়। তাই একদিন বাবার পায়ের ধূলি নিয়ে, ছবির অশ্রুরোধভরা চোখের জল মুছিয়ে দিয়ে প্রশান্ত ছুটে পড়লে কলকাতায়। ছ’মাস তার এম্‌নি এম্‌নিই কেটে গেল এখানে এসে। তারপর কী একটা বে-সরকারী অফিসে সাধারণ একটা কেরাণীর কাজ জোটালে সে অনেক চেষ্টা ক’রে। এমনি ক’রেই চার চারটে বছর একে একে তার কেটে গেল কলম পিষে।······

—এতদিন গাধার মত খেটেও সে একটি প্রতিবাদ করেনি ক্ষণিকের জন্যও। ‘নাইট-ডিউটি’তে সারারাত জেগে সপ্তাহের পর সপ্তাহ কাটাতে হ’য়েছে,···শরীর ক্ষীণ হ’য়ে গেছে, অসুখে ভুগেছে কতবার। ফল-ফলারি, দুধ-মাখন খাবার মত সামর্থ্য নেই তার, তাই ‘কুইনাইন’ খেয়েই আবার সময়মত হাজিরা দিতে হ’য়েছে তাকে অফিসে। বড়বাবুর তবু তাতে মন ওঠে নি। দু’ দু’বার তিনি বিনা অর্থে তাকে warning দিয়েছেন কাজের ত্রুটি দর্শিয়ে। কিন্তু তাতেও বোধ হয় তাঁর শান্তি ঘটে নি, ঘুম হয় নি রাত্রে। জানি না, প্রশান্তর উপরেই কেবল তাঁর এমন আক্রোশ কেন!··· ···

······এরি মাঝে একদিন ‘নাইট-ডিউটি’তে বসে কাজের ফাঁকে প্রশান্ত বুঝি বা টেব্‌লে উপুড় হ’য়েই একটু তন্দ্রাচ্ছন্ন হ’য়ে প’ড়েছিল, কারণ, কয়েকদিন যাবৎই তার জ্বর চ’ল্‌ছিল গায়ে; কিছুতেই আর কর্ম্মের সংগ্রামে দেহটাকে টেনে নিয়ে দাঁড় করাতে পারছিল না প্রশান্ত, তবু কাজে এসে যোগদিতে হ’য়েছে তাকে রীতিমত! নইলে চাক্‌রী আর ভাগ্যে জুটবে না একটী দিনও।—এমনি সময়ে বড়বাবু হঠাৎ ধূমকেতুর মত আবির্ভূত হ’লেন সেই রুমে, কিন্তু বেশীক্ষণের জন্য নয়; তক্ষুণি প্রশান্তকে নিদ্রিতাবস্থায় দেখে সরে পড়লেন তিনি সে যায়গা থেকে, ভাব্‌লেন—এর সমুচিত ব্যবস্থা যা’ হয় কাল ‘ডে-টাইমে’ করা যাবে বুঝে শুনে। করাও হোলো তাই। এবারে শেষবারের মত তিনি প্রশান্তকে Explanation Call ক’রে রুঢ়কণ্ঠে ব’ল্‌লেন, “দু’ দু’বার warning পেয়েও দিব্বি সহজ পথেই চ’লছো দেখছি। You are a peculiar creature, I see—কাজ করতে করতে ঘুমিয়ে পড়া, সব সময়ই কাজটাকে

এড়িয়ে চলা—এসব বুঝি মজ্জাগত হ'য়ে দাঁড়িয়েছে আজকাল, হ্যাঁ? আর 'ডিউটি' 'টাইমলি না হ'লে যে অফিস 'সাফার' করে—এ জ্ঞানটা আছে কি? অফিস যে আরাম ক'রবার যায়গা নয়, এ সহজ কথাটাও কি ব'লে দিতে হবে?"

শুনে প্রশান্তর যেন আজ এতদিন বাদে সত্যি কতকটা ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটতে চাইল,…শত চেষ্টা ক'রেও আর দমিয়ে রাখতে পারলে না সে নিজেকে। পৌরুষ তার মধ্যে রুদ্র বেশে সাড়া দিয়ে উঠ্‌লো। অতীত আর ভবিষ্যৎ যেন চাপা প'ড়ে রইল তার অন্তর্দৃষ্টির সম্মুখে, বল্‌লে, "চাকুরী ক'রতে এসে আপনাদের কাছে দাসখৎ লিখে জীবন বাঁধা রাখি নি, যে, মিথ্যাকে চিরদিন সত্যের রঙে ছাপিয়ে শাসন ক'রে চ'ল্‌বেন প্রতিমুহূর্ত্তে। ধর্ম্মের দিকে চেয়ে, মনুষ্যত্ব বজায় রেখে একথা কি সত্যি ব'ল্‌তে পারেন যে, আমার inactiveness-এর জন্যে আপনার office বা work কখনো suffer ক'রেছে?…টাকার বিনিময়ে গোলাম হ'য়ে রইলেও এখনও এতটা ন্যায়ের সীমা ছাড়িয়ে যাইনি যে প্রতিমুহূর্ত্তে warning খেয়ে চ'ল্‌তে হ'বে authorityর কাছ থেকে। চাকুরী দিয়েছিলেন ব'লে কি জীবনও কিনে নিয়েছেন নাকি?…Explanation দেবার মত আমার নতুন কোনো যুক্তি নেই এর চাইতে।—যা খুসী হয় করুন।" প্রশান্তর সর্ব্বাঙ্গ যেন থর থর ক'রে কাঁপতে লাগলো। পর মুহূর্ত্তেই ভাবলো—এ সে কি ক'রেছে? বড়বাবু তার এই ঔদ্ধত্য সইবেন কেন? কিন্তু মুখ ফুটে ক্ষমা চাইবার মত কাপুরুষতাকেও সে ঘৃণা না ক'রে থ'াক্‌তে পারে না। বড়বাবু ব'লে কি তাঁর কাছে সে জীবন-মৃত্যু বাঁধা রেখেছে?—স্থির হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইল প্রশান্ত অটল পাথরের মত। কিন্তু সে মুহূর্ত্ত মাত্র।

রাগে বড়বাবুর সারা গা যেন জ্বলে যাচ্ছিল এতক্ষণ! আর দেরী না ক'রে তৎক্ষণাৎ তিনি প্রশান্তকে বরখাস্ত ক'রে দিলেন কাজ থেকে। প্রশান্ত নিঃশব্দে সিঁড়ি দিয়ে নেমে এলো ফুট্‌পাতে। চারিদিকের প্রাকৃতিক দৃশ্যগুলি যেন তার চোখে একটা বীভৎস রূপ ধ'রে ফুটে উঠ্‌লো এতদিনে! ……জীবনের উপর এসে প'ড়লো তার ধিক্কার। ইচ্ছে হয় তার পৃথিবীর এই অন্যায় শাসন-শক্তিকে ভেঙ্গে চুরমার ক'রে দিতে।—প্রত্যক্ষভাবে তার দেখিয়ে দিতে ইচ্ছে হোলো দেশের ধনিকসম্প্রদায়কে, যে, অর্থের বিনিময়ে সমস্ত কিছু ক্রয় করা গেলেও মানবতাকে দাসত্ব স্বীকার করাতে পারে নি কোন বাদ্‌শা-রাজা কোনদিন। কিন্তু হায়! কোথায় তার সে শক্তি? দু'টী পয়সার অভাবে 'সংসারের মানুষ' যার উপোস ক'রে কাটায় দিনের পর দিন, তার [illegible] শক্তি আছে কী ক'রবার? ভিতর থেকে প্রশান্তকে কে যেন চাবুক মারে! মাতালের মত সে টুলে টুলে চ'লতে থাকে পথ। সমস্ত শিরা উপশিরাগুলো যেন তার নিস্তেজ হ'য়ে আসে ধীরে ধীরে! —আজ তাকে সমবেদনা জানায়, এমন লোকটিও নেই যেন পৃথিবীতে! একান্ত নির্জীবের মত এসে দেহটাকে এলিয়ে দেয় প্রশান্ত ভাঙ্গা ছারপোকায় ভরা তক্তপোষে।

ধীরে ধীরে রাত বেড়ে চলে।……

—প্রশান্তের চোখে ঘুম নাই। রাশীকৃত চিন্তা এসে মনটাকে যেন বিক্ষুব্ধ ক'রে দিয়ে যায়। আপন মনে ও চেঁচিয়ে ওঠে—'you scoundrel men of the Earth! enjoy the beauty of life to day, but what would be tomorrow? To morrow you will be devoured by the monster of vice.—হাঃ হাঃ!'—সাথে সাথে কে যেন দেয়ালগুলোর মাঝ থেকে অট্টহাসি হেসে ওঠে!……এম্‌নি ক'রে কতঘণ্টা যে কেটে যায়, প্রশান্তর তা' হুঁস্ নেই। —রাত্রির নিস্তব্ধতা ভেদ ক'রে মাঝে মাঝে নিশাচর পাখীগুলো যেন হাউ-হাউ ক'রে কেঁদে ওঠে।—কতদিন পরে প্রশান্তর আবার মনে প'ড়ে যায় ছবির কথা। ছবিকে ছেড়ে আজ চার চারটে বছর একান্ত নিঃসঙ্গ কেটে গেল তার দিনগুলো। মাঝে মাঝে শুধু চিঠির বিনিময়, চারবছরের কাজের ফাঁকে মাত্র কয়েকবার যেয়ে তার কাছে থেকে আসা—এছাড়া তো আর কিছুই নয়! উঃ! ছবিকে সে কত দুঃখ দিয়েছে আজ পর্য্যন্ত। কই? কোন দিনই তো সে ছবিকে দু'টি ভাল জিনিষ কিনে নিয়ে হাতে তুলে দেয় নি। কতলোক কত কি ক'রে চ'লেছে তাদের স্ত্রীর জন্যে। দামী সোণার গয়না গড়িয়ে দিচ্ছে হাতে, পূজার সময় বেনারসী-শাড়ীতে ভ'রে তুল্‌ছে নববধূর অঙ্গ। কিন্তু হায়! প্রশান্তর তো আজও তেমন দিন হোলো না জীবনে!—দু'হাতের মুঠির মধ্যে মাথাটা চেপে ধরে ও শক্ত করে। সাথে সাথে টপ্‌টপ্ ক'রে গড়িয়ে পড়ে কয়েকফোঁটা তপ্ত অশ্রু ওর চোখ থেকে।

—কত আশা ছিল ওর বুকে, কত স্বপ্ন দিয়েই না তৈরী



পল্লীশোভা

শিল্পী—শ্রীসুনীল সেন

ক'রেছিল ও জীবনটাকে। আজ সব কিছু তার ভেঙে গেল, সব কিছু ডুবে গেল ওর মুহূর্ত্তে। বাবাকে করতে পারলে না ও সুখী, ছবিকে সাজিয়ে রাখতে পারলে না ওর কল্পনা দিয়ে। হায় রে জীবন! হায় রে অর্থ!···ধিক্‌ এই পৃথিবীকে। মানুষ চুষে খায় এখানে মানুষের রক্ত, তাতে সিংহ-শৃগালের প্রয়োজন হয় না। জীবনকে নিয়ে ছিনিমিনি খেলতে মানুষ এখানে অভ্যস্ত। ধনীর প্রাসাদে দরিদ্রের আসন মেলে না। এখানে নেই মনুষ্যত্ব, নেই ধর্ম্ম। একটা বিষাক্ত হাওয়া প্রতিনিয়ত কুণ্ডলি পাকিয়ে উড়ে বেড়াচ্ছে আকাশে আকাশে। প্রশান্তর বিদ্রোহী মন আর একটী মুহূর্ত্তও বাঁচতে চায় না এখানে। ফাঁশফাঁসিয়ে ওঠে ও নিজের মধ্যে।··· এম্‌নি ক'রেই ধীরে ধীরে রাত্রি শেষ হ'য়ে এলো।

প্রশান্ত ভাবলো, আজ এখান থেকে পালিয়ে যাবে সে চিরজীবনের মত। অকস্মাৎ বাড়ীর 'টেলি' এসে হাজির ওর হাতে,—Come sharp, Chhabi seriously ill. —প্রশান্তর মনে হোলো কে যেন একটি নিমেষে তার বুকের পাঁজরা ক'খানাকে সাবল মেরে ভেঙে দিল!—কে যেন ওকে চিরজীবনের মত কাঙাল ক'রে থুয়ে গেল পৃথিবীতে! শ্রান্ত পথভ্রষ্ট পথিকের মত—হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল প্রশান্ত মেঝেরের' পরে। সাথে সাথে মেঘকজ্জল শ্রাবণ—আকাশ থেকে মেঘের শব্দ ভেসে এলো কানে।

লিপি

—শ্রীমুকুন্দলাল সাহা

অজানা কোন্‌ ঠিকানাতে লিখ্‌বো আজি লিপি,
তাইতে নূতন সন্ধানেতে নিত্য চেয়ে থাকি,
ভাব্‌ছি ব'সে এই আষাঢ়ের কালো মেঘের মায়া—
তার পেছনে দেখ্‌তে পাবো তোমার সজল ছায়া,
সত্যি সবই, মিথ্যে শুধু তোমার নাহি আসা—
জানিনে কোন্‌ সুদূর দেশে বাঁধছো আবার বাসা;
যেথায় থাকো, যেথায় থাকো, ভালই তুমি আছো,
তোমার রূপের সুধা দিয়ে মধু-চক্র রচো;
জানোই আমি চিরদিনের মধুপানের লোভী—
কেমন করে ছাড়্‌বো প্রিয়ে, চিরন্তনী দাবী ?
মোদের মিলন-কুঞ্জদ্বারে সেই যে নীপ-বীথি—
বাদল দিনে কতই কুসুম রাখছে শাখে গাঁথি,
কেবল তুমি নেই এখানে একলা আছি পড়ে
মিলনহারা কুঞ্জবনে অশ্রু-বাদল ঝরে'।
তালপুকুরে ডাহুক কাঁদে, ডাহুকী নাই পিছে,
তোমার স্মৃতি সেই ব্যথাতে জড়িয়ে ধরে' আছে;—
তোমার যে সেই ছোট্ট তোলা বনের মৃগ-শিশু—
বাস্‌তে ভালো যারে তুমি, জান্‌তে নাকো পশু,
আজ যে তাহার শিঙ্‌ উঠেছে, দুষ্টোমীও ভারী
তোমায় খুঁজে প্যাগলসম সারা বাড়ী ফিরি',
তোমার-দেয়া দুধের বাটী আস্তাকুঁড়ে লুটে—
মা-হারা আজ তোমার শিশুর ব্যথায় দিবস কাটে,
ক্রোধ যদি বা করেই থাকো আমার ব্যবহারে,—
একবার তুমি ফিরে এস মোদের ভাঙা ঘরে;
তোমার রবির বোল ফুটেছে 'মা, মা' বলে ডাকে,
তুমি ছাড়া কে আছে তার, বাসতে ভালো তাকে;
থাকতে যদি নাই বা পারো অচল হ'য়ে হেথা—
এক লহমা তরে এস যেমন ছায়াসীতা
—তোমার দুখে ফাটলো ধরা, নিয়েছে কোল পেতে',
চিতার অনল জালিয়ে দিয়ে আমার বুকের ভিতে,
তোমার সাথে ছিল কথা এক তরণী পরে
যাত্রা মোরা করবো দোঁহা নিরুদ্দেশের তরে,—
বল্‌লে নাকো কোনই কথা, জানালে না বাণী;
আঁধার-ঘেরা রাত দুপুরে খুল্‌লে তরীখানি;
অশ্রুমতী-নদীর ধারা তেপান্তরের মাঠে,
নও যে তুমি অশ্রুহীনা সেই বারতা রটে';
আজকে শুধু বল ওগো, ডাকবে মোরে কবে,—
তোমায় আমায় আবার দেখা কোন্‌ জনমে হবে ?
এই লিপিকা পাঠানু আজ রক্ত দিয়ে লেখা,—
রোজ নিশীথে স্বপন মাঝে দিও মোরে দেখা।

ভারতীয় ফিল্ম শিল্প

—শ্রীভোলানাথ ঘোষ

ভারতের ফিল্ম ব্যবসায় প্রথম আরম্ভ হয় ১৯১৩ সালে। বোম্বাই প্রদেশে ইহার প্রথম প্রতিষ্ঠা। ডি, জি, পাল্‌খে ইহার প্রথম প্রতিষ্ঠাতা। 'হরিশ্চন্দ্র' ভারতীয় ছায়াছবির প্রথম চিত্রনাট্য। ইহার পরে 'লাইট অব এশিয়া' নামে ভগবান্ বুদ্ধের জীবনী লইয়া লিখিত চিত্রনাট্য বিশেষ সুখ্যাতি লাভ করে। ১৯২৮ সালে ভারতে সবাক ছায়া ছবির জন্ম হয়। বোম্বায়ের "ইম্পিরিয়েল ফিল্ম কোম্পানী" ১৯৩১ সালে প্রথম সবাক ছবি প্রস্তুত করে। তাহাদের প্রস্তুত "আলামারা" ভারতবর্ষের প্রথম সবাক ছায়াছবি। ঐ 'ইম্পিরিয়েল ফিল্ম কোং, ১৯৩৮ সালে 'কিষাণ-কন্যা' নামে ভারতের প্রথম রঙিন ছায়াছবি উৎপন্ন করে। দুর্ভাগ্যক্রমে এই প্রতিষ্ঠানটি আজ বন্ধ হইয়া গিয়াছে।

গত পঁচিশ ছাব্বিশ বৎসরের মধ্যে ভারতের ফিল্ম ব্যবসায় নানা শাখা প্রশাখায় বৃদ্ধি পাইয়া দিকে দিকে বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে। ইহা যখন অঙ্কুর অবস্থায় ছিল তখন ইহাকে ঝড় ঝঞ্ঝা প্রভৃতি বাধা অনেক সহ্য করিতে হইয়াছে। শৈশবে ইহা রাজসরকারের নিকট অনাদৃত ছিল। ইহার পরিপোষণের নিমিত্ত পর্য্যাপ্ত পুঁজিরও অভাব ছিল। জনসাধারণের সহানুভূতি ছিল ইহার একমাত্র মূলধন। এই শিল্পের প্রতিষ্ঠাতাদের ও শিল্পসেবীদের একান্ত প্রচেষ্টার ফলে আজ এই অল্প দিনের মধ্যে ফিল্মশিল্প যে উন্নতি লাভ করিয়াছে তাহার স্থান শুধু শিল্পকলার দিকে নহে, শিল্প ব্যবসায়ের দিক দিয়াও নিতান্ত কম নহে। ইহার কার্য্যকাল পঁচিশ বৎসর পূর্ণ হওয়ায় ইহার সিলভার জুবিলি অনুষ্ঠান বোম্বায়ে সম্পন্ন হইয়াছে।

আজ ভারতীয় ফিল্ম-শিল্পে উৎপাদন, বিতরণ ও প্রদর্শনী ব্যপদেশে মোট ১৭ কোটী টাকা মূলধন রূপে খাটিতেছে। ৪০ হাজার লোক ইহার নানা বিভাগে নিযুক্ত থাকিয়া জীবিকা অর্জ্জন করিতেছে। ছবি উৎপাদন কার্য্যে ৭৫টি কোম্পানী কাজ করিতেছে। ইহারা বৎসরে গড়ে ১২ হাজার হইতে ১৪ হাজার ফুটের দু'শটি প্রদর্শনীয় ফিল্ম উৎপাদন করে ও তাহাতে গড়ে মোট দুই কোটী টাকা খরচ হয়। উৎপাদনের প্রধান প্রধান স্থান হইতেছে বোম্বাই, পুণা, কোলাপুর, কলিকাতা, মাদ্রাজ, দিল্লী, লাহোর, বাঙ্গালোর, করাচি ও ভূসাওয়াল। আজ ভারতের প্রেক্ষাগৃহগুলির মোট সংখ্যা ৯৯৬টি। ইহার মধ্যে ৫৩২টি গৃহে কেবলমাত্র ভারতীয় ছবি দেখান হয় এবং ২৬৬টি গৃহে ভারতীয় ও বিদেশীয় উভয়বিধ ছবিই দেখান হয় এবং ১৯৮টি গৃহে কেবল মাত্র বিদেশীয় ছবি দেখান হয়। এই সিনেমা-গৃহগুলি ছাড়া ৫০০টি ভ্রমণশীল সিনেমা আছে।

এই সিনেমা শিল্পে ফিল্মের উৎপাদনের জন্য যে কাঁচা মাল লাগে, তাহা বিদেশ হইতে আমদানী করিতে হয়। যথোপযুক্ত মূলধন ও রাজ-সরকারের সাহায্যের অভাবে ভারতে এখনও ইহা প্রস্তুত করা সম্ভবপর হয় নাই। একখানি ছবির উৎপাদনের জন্য যে টাকা খরচ হয়, তাহার এক তৃতীয়াংশ কেবলমাত্র ঐ কাঁচা ফিল্মের জন্য খরচ হয়। ঐ কাঁচা মাল-গুলির জন্য যদি আমদানী শুল্ক কম ধার্য্য করা হয়, তাহা হইলে এদেশে অধিক সংখ্যক ছায়া ছবি উৎপন্ন হয় বা উৎপাদনের ব্যয় বৃদ্ধি করিয়া উন্নততর ছবি প্রস্তুত হয়। ইণ্ডিয়ান সিনেমাটোগ্রাফ কমিটী বিনা শুল্কে এই কাঁচা মাল ও ইহার রাসায়নিক দ্রব্যাদি আমদানী করিবার অধিকার দিতে সুপারিশ করিয়াছিলেন। কাঁচা ফিল্ম ও রাসায়নিক দ্রব্যাদির উপর শতকরা ২০৲ টাকা আমদানী শুল্ক দিতে হয়। ইণ্ডিয়ান মোশন পিক্‌চার কংগ্রেস সম্প্রতি কুড়ি টাকা শুল্কই তুলিয়া দিতে দাবী করিয়াছে। এই শুল্ক উঠাইয়া দিলে গভর্ণমেণ্টের যে ১৪ লক্ষ টাকা ক্ষতি হইবে তাহা যথাসময়ে উঠিয়া আসিবে ঐ ব্যবসায়ের উন্নতি হেতু প্রাপ্ত আয়করের উপর দিয়া। প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্টেরও এ বিষয়ে গঠনমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করা কর্ত্তব্য। এই ব্যবসায়ের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে কৌতুক কর (ontertainment tax) গভর্ণমেণ্টের তহবিলে বৃদ্ধিই পাইবে। ইণ্ডিয়ান সিনেমাটোগ্রাফ কমিটী সুপারিশ করিয়াছিলেন যে, এক টাকার কম মূল্যের আসনগুলির উপর যেন এমিউজমেণ্ট কর ধার্য্য করা না হয়। কিন্তু কোন কোন প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্ট চার আনার কম মূল্যের আসন-

গুলির উপরও কর ধার্য্য করিতে পশ্চাৎপদ হন নাই। ভারতবর্ষে ছায়া-ছবির উন্নতির ক্ষেত্র অতি বিস্তৃত। শত শত বাধা পাইয়াও ইহা বাঁচিয়া আছে; তবে ইহা অর্দ্ধমৃত অবস্থায় বাঁচিয়া আছে বা হয় ত' অনেক দিন এই অবস্থায় টিকিয়া থাকিতেও পারে; কিন্তু যদি সমস্ত বাধা দূর করিয়া ইহাকে বাঁচিবার বা বৃদ্ধি পাইবার যথেষ্ট সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হয় তাহা হইলে ইহার ভবিষ্যত খুব উজ্জ্বল এবং ইহা ভারতের একটি প্রধান লাভজনক শিল্পে পরিণত হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই।

আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে ১৩ কোটী লোকের বাস এবং ইহাতে ২০ হাজার প্রেক্ষাগৃহ বর্ত্তমান। সপ্তাহে এক কোটী লোক ছায়াছবি দেখিয়া আনন্দ উপভোগ করে। রাশিয়ায় সিনেমা হাউস আছে ১০ হাজার, জার্ম্মানীতে ৫১ শ', ফ্রান্সে ৪ হাজার, ইটালিতে ৪ হাজার। কিন্তু আমাদের ভারতবর্ষে? ভারতে পল্লীগ্রাম আছে ৭ লক্ষ, ৩৭ কোটী লোকের বাস। সমস্ত পৃথিবীর অধিবাসীর মোট সংখ্যার প্রায় এক পঞ্চমাংশ লোক শুধু এই ভারতবর্ষেই বাস করে। তবু ইহার ছায়াচিত্রের প্রেক্ষাগৃহের সংখ্যা মাত্র ১ হাজারও নহে। ছায়াছবি-জগতের সঙ্গে সমতা রক্ষা হইত, যদি বর্ত্তমানের অন্ততঃ পনের গুণ সিনেমা-গৃহ ভারতবর্ষে বর্ত্তমান থাকিত। সমগ্র পৃথিবীতে মোট ১৮০ কোটি লোকের বাস এবং ৯৬ হাজার প্রেক্ষাগৃহ বর্ত্তমান। পৃথিবীতে সপ্তাহে ২৩ কোটী লোক এই সমস্ত স্থানে চলচ্চিত্র দেখে।

লোক সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গে ছায়াছবির প্রসার অবশ্যম্ভাবী। সাধারণ আনন্দদান, লোকশিক্ষা ও জনমত প্রচারের ইহা এখন শ্রেষ্ঠ পরিবাহক। রাশিয়া প্রভৃতি দেশে ইহার দ্বারা সাধারণ জনগণের মধ্যে এক বিপুল একতা আনা সম্ভবপর হইয়াছে। ছায়াছবির মধ্যদিয়া অতি সহজভাবে জনজাগরণ আনিয়া শিক্ষা, জ্ঞান, ধর্ম্ম, চরিত্র, স্বাস্থ্য, সমাজ—সকলের বিশেষ উন্নতি সাধিত হইতে পারে বলিয়া প্রত্যেক দায়িত্বশীল গভর্ণমেণ্ট অধুনা ইহার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিতেছেন। ভারতবর্ষে বহুভাষা প্রচলিত থাকায় এক এক ভাষার ছায়াছবি মুষ্টিমেয় শ্রোতাগণের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে বলিয়া ছবির ব্যাপক প্রসার ব্যাহত হয়। ভারতে আরও সভার আসন হওয়া উচিত এবং কোনও একটি ভাষাকে মাধ্যমিক ভাষারূপে গ্রহণ করিতে পারিলে ইহার উন্নতি বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি পাইবে। যদি গভর্ণমেণ্ট সহানুভূতি সম্পন্ন হইয়া সিনেমা কোম্পানীগুলিকে অর্থ সাহায্য দিয়া ও ঋণদানের ব্যবস্থা করিয়া দিয়া অধিক ছবি উৎপাদনের ও ছায়াছবির গৃহ-নির্ম্মাণের সহায়তা করেন তাহা হইলে এই অবস্থার নিশ্চয় পরিবর্ত্তন হয়।

ভারতীয় চলচ্চিত্র শিল্পের দুরবস্থা হইলেও ভারতের মধ্যে ইহা এখন অষ্টম বৃহত্তর শিল্প। সর্ব্ব শিল্পকলায় যে দেশ এখন সর্ব্বাপেক্ষা উন্নত, সেই আমেরিকায় ইহার স্থান দ্বিতীয়, সেখানে ইহার কাঁচা-মালগুলিও তৈয়ারী হয়। এই শিল্পকে কেন্দ্র করিয়া সেখানে প্রায় ২৫০ পরগাছা শিল্প মাথা চাড়া দিয়া উঠিয়াছে। তাহাদের এই শিল্প উন্নত, পর্য্যাপ্ত ও স্বয়ং সম্পূর্ণ। আমাদের দেশে কাঁচা ফিল্ম (Raw and exposed Film) ও উহার কাঁচামাল আমদানী করিতে আমদানী শুল্ক লাগিয়াছে ১৪,৮৯,৯৮৩৲ টাকা (১৯৩৭—৩৮)। রেল কোম্পানী ভাড়া বাবদ পাইয়াছে ১৫ লক্ষ টাকা। বৎসরে আমেরিকা, যুক্তরাষ্ট্র ও গ্রেট ব্রিটেনকে এই ব্যপদেশে ভারতবর্ষ মোট ৫৫ লক্ষ টাকা দিয়াছে।

গত তিন বৎসরে গড়ে ৪০০ বিদেশী ছবি ভারতে দেখান হইয়াছে। ২৫৩টী ভারতীয় পরিবেশক কোম্পানী ও ৩৪টি বিদেশীয় কোম্পানী আছে। নামকরা সাপ্তাহিক ও মাসিক সিনেমা পত্রিকা আছে ৬৮। একখানি ভারতীয় নির্ব্বাক ছবি তুলিতে সাধারণতঃ ১০ হাজার টাকা ব্যয়িত হয় ও সবাক ছবি তুলিতে ১৫ হাজার হইতে ৭০।৮০ হাজার টাকা ব্যয়িত হয়। গড়ে ৫০ হাজার টাকা বলা যাইতে পারে। যে ছবিখানি তুলিতে ৬০ হাজার টাকা খরচ হয় তাহাতে উহা মোটামুটি এই ভাবে চারিটি ভাগ হয়—কাঁচা ফিল্ম ও লেবরেটারি খরচ ১৮ হাজার, ষ্টুডিও ভাড়া বা উহার রক্ষণাবেক্ষণ ১৫ হাজার, শিল্পীদের বেতনাদি ১৫ হাজার, গল্প, সিনারি ও পোষাক, গান ৭ হাজার, প্রচার ব্যপদেশে ৫ হাজার—মোট ৬০ হাজার। সাধারণতঃ একখানি পূর্ণ ছবি তুলিতে ১২০০০ ফুট ফিল্ম লাগে। নেগেটীভ্ ফিল্মের মূল্য হাজার করা ১২৫৲ টাকা ও সাউণ্ড ট্র্যাকের জন্য লাগে হাজার করা ৪৫৲ টাকা (মোট ১৭০৲ টাকা)।

বর্ত্তমানে ভারতীয় সিনেমাগুলি যে অবস্থায় রহিয়াছে,

এই অবস্থার মধ্য দিয়া ইহার আরও উন্নতি হইতে পারে। উপযুক্ত পরিচালকের অভাবে ইহা জনপ্রিয়তা অর্জ্জন করিতে পারিতেছে না। ছায়াছবির উপযোগী গল্প নির্ব্বাচন একটী গুরুহ ব্যাপার। লোকের ব্যক্তিগত রুচিমত গল্প নির্ব্বাচন না করিয়া, এই নির্ব্বাচনের জন্য বহু শিক্ষিত সাহিত্যিক, সমালোচক এবং পরিচালক ও গ্রন্থকারকে লইয়া একটী বৃহৎ অবৈতনিক নির্ব্বাচকমণ্ডলী গঠন করা প্রয়োজন। প্রত্যেকের মতামত অনুযায়ী গল্পের সংলাপ ঠিক করিয়া তবে তাহাকে ছায়া-ছবির উপযোগী বলিয়া গ্রহণ করিলে বিভিন্ন রুচির লোকের মুখরোচক হইয়া ছবি জনপ্রিয়তা লাভ করিবে। ছায়াছবির অভিনেতা হিসাবে মঞ্চের নটনটীদের বাদ দিলেই ভাল হয়। নূতন নূতন শিল্পী আবিষ্কার করা ও শিক্ষিত করিয়া লওয়া প্রয়োজন। ইহার জন্য শিক্ষাবিভাগের প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন—সেখানে সিনেমা সংক্রান্ত প্রত্যেক বিভাগীয় শিক্ষার সুবন্দোবস্ত থাকিবে ও বিভিন্ন ষ্টুডিওতে তাহাদিগকে ট্রেনিং-এ পাঠাইতে পারা যাইবে। ছবি তোলা, শব্দ গ্রহণ, আলোকসম্পাত, অভিনয় শিক্ষা, সিনারি ও লেখা, প্রয়োজন ও পরিচালনা শিক্ষা প্রভৃতি সকলই সেখানে শিখানো হইতে পারে। এইরূপ ব্যবস্থা সফল করিতে পারিলে ছবি ব্যাপক ভাবে জনপ্রিয়তা লাভ করিবে। পুঁজিবাদীর দৃষ্টি এই দিকে পড়িলে তবে সিনেমার সুদিন আসিবে। নতুবা অনভিজ্ঞ পরিচালকদের হাতে ইহার উন্নতি সুদূরপরাহত। অর্থের অভাব দূর করিবার জন্য উপযুক্ত ও দায়িত্বশীল ব্যক্তিদের তত্ত্বাবধানে পাব্লিক লিমিটেড্ কোম্পানী করিয়া অর্থ উঠান যাইতে পারে। এই ব্যবসায়ের উপযোগী মূলধনের পরিমাণ যে কম, তাহাতে ভুল নাই, তবু এই সব সামলাইয়া লইবার গুরু দায়িত্ব সুদক্ষ কর্ম্মপটু অধ্যক্ষ ও পরিচালকের উপর। ছবি ভাল হইলে তাহার মূল্য এখনও জনসাধারণে দেয়; কিন্তু বাংলায় ভাল ছবি জন্মাইতেছে না। অবশ্য একথা ঠিক নহে যে, প্রত্যহ "ফোর্থ ক্লাস ফুল" টাঙানো দেখিলে বা অংশ্র সস্তায় হাততালি শুনিলে যে সে ছবিকে ভাল ছবি বলিতে হইবে। যাহা জনসাধারণকে অগ্রগতির পথে চলিবার পক্ষে ইঙ্গিতে সাহায্য করিবে, আমাদের এখন সেই ছবির দরকার। ছায়াছবি সাধারণ দর্শক ও শ্রোতার মনের পশ্চাদনুসরণ করিবে না—দেশে উপযুক্ত চোখ ও কাণ তৈরী করার ভার তাহাদেরই উপর।

মানুষের আর্থিক সচ্ছলতা ও মানসিক স্বাস্থ্য সম্পাদনের উপায় ঃ—

মানুষের আর্থিক সচ্ছলতা ও মানসিক স্বাস্থ্য সম্পাদন করিতে হইলে প্রধানতঃ নিম্নলিখিত চারিটি ব্যবস্থার প্রয়োজন :—

(১) জমীর স্বাভাবিক উর্ব্বরাশক্তি যাহাতে অক্ষুণ্ণ থাকে, তাহার ব্যবস্থা।

(২) জিনিষপত্রের আদানপ্রদানে যাহাতে মূল্যের সমতা থাকে, তাহার ব্যবস্থা।

(৩) যাহাতে জমীজাত দ্রব্যসমূহ (অর্থাৎ কাঁচামাল) অনায়াসে (অর্থাৎ উৎপন্নকারীর স্বাস্থ্য ভগ্ন না করিয়া) মানুষের ব্যবহারের উপযোগী হইতে পারে, তাদৃশ শিল্পের ব্যবস্থা।

(৪) যাহাতে দেশের মধ্যে সর্ব্বত্র সুচিন্তিত সুশিক্ষার প্রবর্ত্তন হয়, তাহার ব্যবস্থা।

অনুসন্ধান করিলে জানা যাইবে যে, স্মরণাতীত কালে এমন একদিন ছিল, যখন ভারতের সর্ব্বত্রই উপরোক্ত চারিটী ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। ঐ চারিটী ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল বলিয়াই একদিন মনুষ্যসমাজের প্রত্যেকেই আর্থিক সচ্ছলতা এবং শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য উপভোগ করিতে পারিতেন। এক্ষণে ঐ চারিটী ব্যবস্থাই মনুষ্যসমাজ হইতে অন্তর্হিত হইয়াছে বলিয়া সর্ব্বত্রই মানুষের মধ্যে হাহাকার উত্থাপিত হইয়াছে

অজিতার মৃত্যু

—শ্রীলীলাময় দে

মায়ের হাতের শেষ কপর্দ্দকটি নিঃশেষ করে' সঞ্জয় সে বার বি, এ পাশ করে বেরিয়ে এল। কত আশা, কত উদ্যম, কত কল্পনা তার মনের মধ্যে ঘুরপাক খেতে লাগল। এবার সে যেমন করে হোক, মায়ের দুঃখ মোচন করবে আর অবিবাহিতা বয়ঃস্থা বোনের বিয়ে দেবে।

অজিতার বয়স একটু বেশী হয়ে পড়েছে—তবু বিয়ে দিয়ে উঠতে পারে নি বলে পাড়ার মেয়েরা একজোট হ'য়ে তার মাকে নানা রকম কথা শুনিয়ে যায়, সেই সব কথা ঘুরতে ঘুরতে যখন সঞ্জয়ের কানে এসে পৌছল, তখন তার সর্ব্ব শরীর রাগে গিসগিস করতে লাগল, কিন্তু কিছু বলবার উপায় নেই, অজিতা যে তারই সহোদরা। অতএব মনের রাগ তার মনেই চেপে যেতে হল। ছোটবোন অজিতার কালো মুখ আর সে সহ্য করতে পারে না।

অজিতা অপূর্ব্ব সুন্দরী না হলেও দেখতে শুনতে মন্দ নয়। এই কিছুদিন তার একটা সম্বন্ধ এসেছিল—এক পঞ্চাশ বছরের বুড়োর সাথে। গ্রামের মাতব্বররা সঞ্জয়কে আর তার মাকে ডেকে বলল—মান-ইজ্জতের ভয় রেখে গ্রামেই যদি বাস করতে হয় তা হ'লে যে সম্বন্ধ এসেছে তাতে তোমারা কোন রকম অমত ক'র না। পুরুষের আবার পঞ্চাশ বছর একটা বয়েস নাকি? মেয়ের আইবুড়োত্ব ঘুচাতে আর ঘরের ইজ্জত বাঁচাতে অনেক সময় ঘাটের মড়া ধরেও মেয়ে উদ্ধার করতে হয়। এ সম্বন্ধ তবুও অনেক দিক দিয়েই ভাল। খাওয়া পরার কোনদিন অভাব হবে না, আর ইচ্ছাময়ের ইচ্ছা থাকলে দশবিশ বছর সুখে স্বচ্ছন্দে ঘর-সংসারও করতে পারবে।

সঞ্জয়ের মা কাঁদিতে কাঁদিতে বলল—দেখুন, আপনারা যা ভাল বোঝেন তাই করুন, আমার আবার মতামত কি। তবে—আমি বলছিলাম কি, আমার ত ঐ একটি মাত্র মেয়ে, আর কয়েকদিন সবুর করে একটু ভাল,—মুখের কথা কেড়ে নিয়ে মুখুজ্জে মশায় বলে উঠলেন—আর ঐ একটু টেকটু নয় অনেক কালই ত অপেক্ষা করে দেখলে, এর চাইতে ভাল পাত্র পাওয়া গেল কৈ! এবার যখন পাওয়া গেছে চোখ কান বুজে মত দিয়ে দাও পরিণামে ভালই হবে, সাধা লক্ষ্মী পায়ে ঠেল না, ঠেললে এমন সুযোগ আর পাবে না।

সঞ্জয়ের মা মত দিতে যাবে এমন সময় সঞ্জয় বাধা দিয়ে বলল—না মা, তা হ'তে পারে না। আমি বেঁচে থাকতে অমন ধারা একটা ঘাটের মড়ার সাথে আমি আমার বোনের বিয়ে দেব না, তাতে যদি আমার বোনের বিয়ে না হয়—নাই হ'ল। তাও ত তার একটা সান্ত্বনা থাকবে যে সে বিধবা নয়, সে চির কুমারী।

গ্রামের খুড়ো দু' পা এগিয়ে এসে বলল,—দেখ সঞ্জয়, তোমার ওসব ক্রেশ্চানী চাল এখানে চলবে না। এটা তোমাদের সহর নয়, এটা পাড়া-গাঁ। তোমার বোনের বিয়ে দাও আর না দাও তাতে আমাদের কিছু আসবে যাবে না কিন্তু এ গ্রামেও তোমাদের থাকা হবে না। গ্রামে থেকে তোমাদের বাড়ীতে যদি একটা কেলেঙ্কারী হয়, তখন আমাদেরও মাথা তোলবার উপায় থাকবে না। তার জন্যেই গায়ে পড়ে আমাদের এ সব বলা, বুঝলে? এখন অজিতা হচ্ছে তোমার বোন, তার ভাল-মন্দর ফল তোমাকেই ভোগ করতে হবে।

উত্তরে সঞ্জয় বলল—তা বুঝতে হয় বুঝব, তবু আপনাদের ইচ্ছামত অজিতাকে ঐ পঞ্চাশ বছরের বুড়োর হাতে তুলে দেব না। আমাদের জন্য আপনাদের একটুও ভাবতে হবে না, আমি কালই আমার মা-বোনকে নিয়ে এ গ্রাম ছেড়ে কলকাতায় চলে যাব।

সঞ্জয়ের কথায় গ্রামের প্রবীণের দল ক্ষুব্ধ হয়ে রাগে গর্‌-গর্‌ করতে করতে চলে গেল।

পরদিন সন্ধ্যায় গ্রাম সম্পর্কীয় এক পিসিমাকে তাদের ঘরদোর দেখতে বলে মা আর বোনকে নিয়ে সঞ্জয় কলকাতায় চলে এল। মনে মনে ঠিক করে রাখল, গ্রামে আর তারা ফিরে যাবে না। সময়মত একবার দেশে গিয়ে ঘর-দোর বেচে দিয়ে আসবে। সঞ্জয়ের হাতে তখন যৎসামান্য কিছু ছিল;

তারই ওপর ভরসা করে শ্যামবাজারের ধারে বস্তির মাঝে একটু ভদ্র-পল্লী দেখে পাঁচটাকায় দু' খানা ঘর ভাড়া নিল। সেখান থেকে প্রত্যহ পায়ে হেঁটে সারা কলকাতা সহর ঘুরে সঞ্জয় চাকরীর খোঁজ করতে লাগল।

এক সপ্তাহ হাঁটাহাঁটি করেও সঞ্জয় একটা চাকরী জোটাতে পারল না, আবার এদিকে যৎসামান্য পুঁজির অঙ্কও প্রায় শেষ হয়ে এল। দিন পনের পরে বহু কষ্টে অনেক হাঁটাহাঁটি করে গঙ্গার ওপারে একটা কারখানায় পঞ্চাশ টাকা মাইনের একটা চাকরী জোগাড় করল। সঞ্জয় কাজ পেয়েছে শুনে অজিতার আর মায়ের মুখে বহুকাল পরে আনন্দের হাসি ফুটে উঠল।

একমাস কাজ করার পর সঞ্জয় পঞ্চাশটি টাকা এনে মায়ের হাতে তুলে দিয়ে, তার মাঝ থেকে পাঁচটী টাকা চেয়ে নিয়ে নিজের পকেটে রাখল। মা বলল,—মাত্র ঐ পাঁচ টাকাতে তোর হাত খরচ চলবে কেন, আরও কিছু নে।

উত্তরে সঞ্জয় হাসি মুখে বলল,—না মা আমার দরকার হবে না। আমার হাত খরচের টাকা আমি অন্যদিক থেকে উঠিয়ে নি। ওটাকা তুমি সংসার খরচের জন্যই রাখ, বলে বাইরে বেরিয়ে গেল।

সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে সঞ্জয় ঘরে ফিরে জিনিষ ভর্ত্তি একটা কাগজের বাক্স এনে অজিতার হাতে দিতেই অজিতা জিজ্ঞেস করল—কি এনেছ দাদা?

সঞ্জয় বলল—খুলেই দেখ না

অজিতা সানন্দে বাক্সটা খুলে দেখে তার মধ্যে সুন্দর একখানা রেন্-বো শাড়ী আর কয়েক টুকরো রঙিন ব্লাউজ পিস্। অজিতা দাদার পানে মুখ তুলে জিজ্ঞেস করল—এগুলো কার জন্যে এনেছ দাদা?

সঞ্জয় বলিল—তোর জন্যে, আর কার জন্যে আনব।

—আমার জন্যে? বলে অজিতা কাপড়গুলো বুকে চেপে ধরে আনন্দে অধীর হয়ে মায়ের কাছে ছুটল। মার কাছে এসে হাসিভরা মুখে মায়ের চোখের সুমুখে কাপড়গুলো মেলে ধরে বলল—দেখ মা, দেখ, দাদা আমার জন্য আজ কেমন সুন্দর একটা শাড়ী এনেছে, আর কি সুন্দর ব্লাউজের কাপড়! আজই আমি এই ছিটগুলো দিয়ে ব্লাউজ তৈরী করব।

অজিতার আনন্দ দেখে তার মা নিজেও অত্যধিক আনন্দিত হ'য়ে হেসে বলল—বেশ ত মা, আজি তুমি কাপড়গুলো দিয়ে ব্লাউজ তৈরী করে ফেল।

অজিতা আর সেখানে অপেক্ষা না করে কাপড়গুলোকে আবার বুকে করে নিজের ঘরে ফিরে এল।

মাস ছয়েক পরের কথা।

সঞ্জয়ের কারখানায় ধর্ম্মঘট সুরু হল। কর্তৃপক্ষদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে শ্রমিকদল ধর্ম্মঘট সুরু করল। তাদের নালিশ হচ্ছে, সারাদিন তারা যে পরিশ্রম করে, তার একআনা পারিশ্রমিকও তারা পায় না। শুধু তাই নয়—আবার রবিবারদিনও তাদের খাটতে হয়, তারা যেন মানুষ নয়, তাদের বিশ্রামের প্রয়োজন হয় না। তারা যেন রক্ত মাংসে গড়া এক একটি মেশিন; মুখ বুজে শুধু কাজ করে যেতে হবে কোন রকম ওজর আপত্তি সুবিধা, অসুবিধা জানাবার অধিকার তাদের নেই!

এমনি করে দিনের পর দিন চুপ করে থাকতে থাকতে একদিন সকল শ্রমিক একত্রিত হয়ে কর্তৃপক্ষের কাছে তারা তাদের দাবী পেশ করল। তারা মানুষ, তারা চায়—সপ্তাহে একদিন সম্পূর্ণ বিশ্রাম, আর পরিশ্রম অনুযায়ী পারিশ্রমিকের হার বৃদ্ধি। কর্তৃপক্ষ তাদের আবেদন অগ্রাহ্য করল, হাতে নয়, তাতে তাদের ওপর অত্যাচার সুরু হল, হপ্তাশেষে শ্রমিকেরা যে যা পেত, তা বন্ধ করে দেওয়া হল। বড়লোকের স্বার্থপরতার তলে যে শ্রমিকেরা চিরদিন পিষে চলেছে—তারাই একদিন তাদের মালিকদের কাছে প্রতিবাদ করে ধর্ম্মঘট সুরু করল। ধর্ম্মঘট সুরু করতে না করতেই একদিনের মধ্যে কারখানার অবস্থা অচল হ'য়ে দাঁড়াল। কর্তৃপক্ষরা তবু তাদের দাবী অগ্রাহ্য করে নতুন লোক এনে কাজ চালাতে লাগল; তাতে কারখানায় দরজাই খোলা রইল কাজ হল না একটুও।

কর্তৃপক্ষরা মনে করেছিল শ্রমিকদল পেটের দায়ে দু-একদিনের মধ্যেই আবার নিজের থেকে এসে কাজে যোগ দেবে; কিন্তু এক সপ্তাহ পেরিয়ে গেল, তবু তারা এসে কাজে যোগ দিল না।

কর্তৃপক্ষীয়েরাও শেষ সিদ্ধান্ত করল—যদি নিজে থেকে এসে কাজে যোগ না দেয় ত তাদের কিছুতেই ডাকা হবে না, তাতে যদি কারখানা বন্ধ হয়ে যায়—যাক। তারা নতুন লোক

আনিয়ে তাদের কাজ শিখিয়ে তাদের দ্বারা কারখানা চালাবে। আর এখন গায়ে পড়ে তাদের ডেকে এনে কাজে লাগালে লেবারপার্টির দর বেড়ে যাবে, আর তাতে কারখানা সওয়ালাদের সম্পূর্ণ ক্ষতি।

কারখানার খরচ কমাবার জন্ম নতুন অফিসারদের ছাড়িয়ে দেওয়া হল। তাদের মধ্যে সঞ্জয়ও একজন। চাকরী যেতেই সঞ্জয় এসে শ্রমিকদের সাথে যোগ দিল। শ্রমিকদল সঞ্জয়কে তাদের মাঝে পেয়ে ধন্য হয়ে গেল, যেন তারা হাতে স্বর্গ পেল।

সঞ্জয়ও শ্রমিকদের নিয়ে দল গঠন করে কারখানার বিরুদ্ধে তাদের দাবী জানিয়ে সহরের বুকের ওপর দিয়ে 'প্রসেশন' করে চলল। ফলে, তার পরদিন সহরের প্রায় সবগুলো পত্রিকায় কারখানার নিন্দাবাদ বেরিয়ে গেল। এবার কর্তৃপক্ষীয়েরা পড়ল মুস্কিলে। কারখানার সুনাম নষ্ট হয়ে যেতে চলেছে দেখে, তারা শ্রমিক নেতাদের ডেকে পাঠাল। তারা আসিলে তাদের কতক দাবী মঞ্জুর করে মিষ্টি কথায় তাদের আবার কারখানায় টেনে আনল। কিন্তু তাদের মূল-নেতা সঞ্জয়কে তারা আর চাকরী দিল না।

তা শুনে শ্রমিকেরা পুনরায় একজোট হয়ে বলল,—সঞ্জয় বাবুকে আবার বাহাল না করলে তারাও কাজে যোগ দেবে না। কর্তৃপক্ষীয়েরা কিন্তু এ সর্ত্তে কিছুতেই রাজি হল না।

সঞ্জয় দেখিল, তার জন্ম গরীবদের দল আবার বুঝি মারা ।। সেদিন সন্ধ্যাবেলা সকলকে ডেকে সে বলল—দেখ আমায় ওরা চাকরী দিক আর না দিক, তা দেখতে যেও না। তোমরা কাল থেকে আবার কাজে লেগে যাও। তোমাদের ছেলে-মেয়ে আছে, ঘর-সংসার আছে। একবেলা তোমরা না খাটলে, তোমাদের সাথে সাথে তারাও যে না খেয়ে মরবে। সে কাজ কর না, বুঝলে?

শ্রমিক-সর্দ্দার জিজ্ঞাসা করল—তবে আপনার চলবে কি করে বাবু? সঞ্জয় বলল—আমার চলবে, আমার জন্ম তোমাদের ভাবতে হবে না। আমি লেখাপড়া জানি, গায়ে খাটবার শক্তি আছে। যেমন করেই হ'ক্ আমি আমার দিন চালাতে পারব। কিন্তু তোমরা ভুল কর না, কালই গিয়ে কাজে যোগ দাও।

সঞ্জয়ের কথানুযায়ী তখন তারা সকলে, তার পরদিন কারখানার কাজে লেগে গেল। আর সঞ্জয়—কর্ম্মচ্যুত বেকার সঞ্জয়—গঙ্গার ধারে এসে একা একা চুপকরে বসে ভাবতে লাগল,—এখন সে কি করবে? ছ'মাস কাজ করে সংসারের সব খরচ চালিয়ে এখন তার কাছে জমা আছে মোট আড়াইশত টাকা, নানা রকমভাবে রোজগারের পথ ভেবে শেষ পর্য্যন্ত সে ঠিক করল, চাকরী আর সে করবে না। তার কাছে যে টাকা আছে তারই অর্দ্ধেক টাকা দিয়ে সে একখানা 'রিক্স' কিনবে। আর সেই 'রিক্স' চালাবে সে নিজে।

তার পরদিনই সে একখানা 'রিক্স' কিনল। কুলির মত বেশভূষা করে 'রিক্স' টানতে সুরু করল। তার যে চাকুরী গেছে বা সে যে এখন 'রিক্স' টানছে, সে কথা সে বাসায় কাউকে জানাল না, বাসায় জানে,—সে এখনও কারখানাতেই কাজ করছে।

সঞ্জয় 'রিক্স' টেনে বেশ দুপয়সা পেতে লাগল, আর তাতে তাদের সংসার খরচ নির্ব্বিঘ্নেই চলতে লাগল। এমনি দিনে অজিতা পড়ল অসুখে। সাধারণ জ্বর—সাতদিনের মধ্যে মারাত্মক জ্বরে পরিণত হল, কে তার দেখাশুনা করে! একা মা। আর সঞ্জয় ত সারাদিন 'রিক্স' নিয়ে বাইরে বাইরেই থাকে। সঞ্জয়ের মা সঞ্জয়কে কিছুদিনের জন্ম ছুটি নিতে বলল। তারপর থেকে সঞ্জয় আর নিজে 'রিক্স' নিয়ে না বেরিয়ে বাড়ীতেই থাকতে লাগল। মাকে বলল, মা আমি ছুটি নিয়েছি। আর এদিকে রিক্সখানাকে ভাড়া দিয়ে দিল। তাতে সে দৈনিক একটা টাকা করে পেতে লাগল।

সঞ্জয়ের কাছে যা দেড়শ টাকা পুঁজি ছিল, তা সমস্তই অজিতার ওষুধপত্রে আর ডাক্তার দেখানোর খরচ হ'য়ে গেল, দিনদিন অজিতার অবস্থা আরও সঙ্কটাপন্ন হ'য়ে উঠল। তাকে বাঁচিয়ে তুলবার শেষ চেষ্টা করতে গিয়ে, শেষ সম্বল রিক্সখানাকেও বিক্রী করে ফেলতে হ'ল।

পনের দিনের দিন অজিতা, তার মা আর দাদাকে তার বিয়ের ভাবনার হাত থেকে রেহাই দিয়ে 'দাদা' 'দাদা' ক'রতে ক'রতে দাদার ডান হাতের ওপর মাথা রেখে চিরদিনের জন্ম চলে গেল।

আর সঞ্জয়! বেচারা সঞ্জয় চোখের জলে প্রিয়তম বোনকে নিমতলার ঘাটে নিঃশেষে শেষ করে নিঃসম্বল অবস্থায় মাকে নিয়ে দেশের বাড়ীতে ফিরে গেল।

অজিতার জন্ম একদিন তাদের বসত্-ভিটা ছাড়তে হ'য়েছিল, আর আজ, অজিতা তাদের ছেড়ে গিয়ে তাদেরকে—তাদের বসত-ভিটায় ফেরত পাঠিয়ে দিল। গ্রামের প্রাবীণরা আজ আর তাদের কি বলবে?

ভারতের শিল্প প্রচেষ্টা

—শ্রীযতীন্দ্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রলয়ের পর প্রভব, ধ্বংসের পর সৃষ্টি, উৎসাদনের পর উৎপাদন। জগতে নির্ব্বিশেষ সৎ কিংবা অসৎ কিছুই নাই। সৎ হইতে অসৎ এবং অসৎ হইতেও সৎ-এর উৎপত্তি সম্ভব।

যুদ্ধ যে এমন হিংসাত্মক এবং ধ্বংসাত্মক ব্যাপার, ইহারও পরিণাম শুভাশুভ-মিশ্র। অসীম অনিষ্ট সংঘটনানন্তর ইহাও প্রভূত ইষ্টের সূচনা করে। যুদ্ধ যেমন ধ্বংসের মূল, তেমনি নব নব সৃষ্টিরও উৎস।

ইউরোপ খণ্ডে এবং এশিয়ার কিয়দংশে যে মহাবিপ্লব ধ্বংসের তাণ্ডবলীলা প্রকট করিয়াছে, নিত্য নূতন অনাচার, অত্যাচার, অবিচার ও অভিচার দ্বারা বিভীষিকার বিতংস বিস্তার করিয়াছে—ইহারও অন্তস্তলে ও অন্তরালে সমূহ সৎ সম্ভাবনার অঙ্কুর নিহিত রহিয়াছে।

যে পরিমাণে এই বহুদেশব্যাপী সমরানল অতীত যুদ্ধাপেক্ষা সমধিক ভীষণ ও ভয়ঙ্কর, অদূর ভবিষ্যতে ইহা তদনুপাতেই অধিকতর সুফল প্রসব করিবে। এই ধ্বংসের ও বিনাশের পশ্চাতে যে প্রবল সৃষ্টির প্রবাহ আসিবে, তাহা হয় ত কালজয়ী কল্যাণে নিখিল মানব-সমাজকে সুখ, শান্তি ও সমৃদ্ধির অনন্ত বৈভব প্রদান করিবে।

ইহা ভবিষ্যদ্বাণী নহে, দূরদৃষ্টি মাত্র। অন্ততঃ এটুকু আশা করা অন্যায় হইবে না যে, বিগত মহাযুদ্ধের অবসানে আমরা যে শিক্ষা ও সম্ভাবনা লাভ করিয়াছিলাম, এবং তাহার যে-পরিমাণ সদ্ব্যবহার করিতে সক্ষম হইয়াছিলাম, বর্ত্তমান মহা-আহবের অবসানে তদপেক্ষা অধিকতর জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করিয়া, কর্ম্মক্ষেত্রে তাহার সম্যক্ অনুশীলন দ্বারা অধিকতর সুফল লাভ করিতে পারগ হইব।

যুদ্ধ রাষ্ট্র-জগতে যতটুকু বিশৃঙ্খলা ঘটায়, শিল্প-জগতে তদপেক্ষা অনেক অধিক বিপ্লবের সৃষ্টি করে। আবার রাষ্ট্র-জগতে যেমন শান্তির সহিত শৃঙ্খলা আনে, শিল্প-জগতেও তেমনি বিপ্লবের অবসানে বিপুল বৈভবোৎপাদনের শুভ সূচনা করে।

যুদ্ধ আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্যের সহজ সরল পন্থা রুদ্ধ করিয়া অন্তর্ব্বাণিজ্য ও বহির্ব্বাণিজ্যের বিশৃঙ্খলা ঘটায়। শত্রুপক্ষীয় দেশের সহিত আদান-প্রদান বন্ধ হয়; এবং নিরপেক্ষ দেশের সহিতও অবাধ বাণিজ্যের বিষম অন্তরায় উপস্থিত হয়। অনেকসময় দূরবর্ত্তী স্বপক্ষীয় অথবা সহানুভূতিশীল দেশের সহিতও ক্রয়-বিক্রয়ের বিশৃঙ্খলা ঘটে। প্রতি দেশকেই শত্রুমিত্র-নির্ব্বিশেষে দুর্দ্দৈব, অথবা আত্মরক্ষার নিমিত্ত প্রস্তুত হইতে হয়। তদুপরি, সমুদ্র-বাণিজ্যের সঙ্কট এবং মাল চালান দিবার উপযুক্ত জাহাজের অভাব, আদান-প্রদানের বিষম বাধা সৃষ্টি করে। সুতরাং শিল্প ও বাণিজ্যের সহজ প্রগতি প্রতিহত হয়।

যুধ্যমান এবং নিরপেক্ষ, উভয় শ্রেণীর দেশের পক্ষেই যুদ্ধ প্রতিকূল। সাময়িক অর্থনৈতিক সঙ্কট সৃষ্টি করিয়াই যুদ্ধ নিবৃত্ত হয় না, ইহার পরিণাম ফলে, ভিন্ন ভিন্ন দেশের উৎপন্ন শক্তির বিপুল তারতম্য ঘটে এবং নিখিল জগতের অর্থনৈতিক পদ্ধতির ঘোর পরিবর্ত্তন সংঘটিত হয়। মাল চলাচলের বাধা-বিপত্তি হেতু আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্য নূতন পথে গতি পরিবর্ত্তিত করে, চল্‌তি বাজার বন্ধ হইয়া যায়, নূতন দেশে নূতন বাজার প্রতিষ্ঠিত হয়, লেন-দেনের সঙ্কট জন্মে, কোন কোন দ্রব্যের চাহিদা অকস্মাৎ অতিরিক্ত পরিমাণে বৃদ্ধি পায় এবং কোন কোন দ্রব্যের কাট্‌তি একেবারে কমিয়া যায়। মূল্য-মানের বিপর্য্যয় হেতু আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্যের মূল শিথিল করিয়া দেয়।

অবশ্য, নিরপেক্ষ জাতির ক্ষতির তুলনায় যুধ্যমান জাতির ক্ষতি অতিমাত্রায় বৃদ্ধি পায়। কোন কোন নিরপেক্ষ দেশ যুদ্ধার্থ ব্যবহৃত দ্রব্যের দ্রুত সরবরাহ দ্বারা লাভবান্ হয় এবং সেই সুযোগের সম্যক্ সদ্ব্যবহার দ্বারা নূতন শিল্পের সৃষ্টি এবং চল্‌তি, পুরাতন, অথবা মুমূর্ষু শিল্পের উন্নতি ও পুনরুদ্ধার দ্বারা স্থায়ী সৌভাগ্য ও সম্পদের ভিত্তি দৃঢ়মূল করে। কিন্তু যুধ্যমান দেশের যে সমূহ ক্ষতি হয়, তাহার ঘাত-প্রতিঘাত এবং পরিণামফলের যথেষ্ট অংশ নিরপেক্ষ ও নির্লিপ্ত দেশ-গুলিকেও লইতে হয়।

যাহা হউক, শিল্পক্ষেত্রে যুদ্ধের পরিণাম ফল যে, বহুল পরিমাণে শুভ হয়, তাহার সাক্ষী ইতিহাস। শতবর্ষব্যাপী

যুদ্ধের ফলে, বিলাতে পশম-শিল্পের প্রতিষ্ঠা হয়। ধর্ম্মযুদ্ধগুলির অর্থনৈতিক ফল অধিকতর কল্যাণজনক হইয়াছিল। বিগত মহাযুদ্ধের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার আশু ও সম্পূর্ণ সদ্ব্যবহার করিয়া, এক ভারতবর্ষ ব্যতীত অন্যান্য সকল যুধ্যমান ও নিরপেক্ষ দেশই স্ব স্ব শিল্প ও বাণিজ্যের বিপুল বিস্তার ও প্রভূত উন্নতি সাধন করিয়াছিল। বিগত মহাযুদ্ধের অবসানের দুই এক বৎসরের মধ্যেই যুক্তরাজ্য অধমর্ণ হইতে উত্তমর্ণ জাতিতে পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল।

ভারতবর্ষ যদি বিগত মহাযুদ্ধের বিপুল সুযোগের আশু ও সম্পূর্ণ সদ্ব্যবহার করিত, তাহা হইলে, আমাদের ভূতপূর্ব্ব অর্থ-সচিব স্যার বেসিল্ ব্লাকেটের কল্পনাকে কার্য্যে পরিণত করিয়া উত্তমর্ণ জাতিতে সমুত্থিত হইতে পারিত। কিন্তু ভারত সে সুযোগ লয় নাই।

বর্ত্তমান মহা-বিপ্লবের আভাষ বহুপূর্ব্বে সূচিত হইয়াছিল। যুধ্যমান জাতিগণ ইঙ্গিতজ্ঞ। তাহারা ইঙ্গিত প্রাপ্তি মাত্রই যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইতেছিল। নিরপেক্ষ জাতিরা যুধ্যমান জাতিদের অধিকৃত ভিন্ন ভিন্ন দেশের বিভিন্ন বাজার আত্মসাৎ করিবার নিমিত্ত বদ্ধপরিকর হইয়াছিল। যুদ্ধোপকরণ প্রস্তুত হেতু ঐ সকল দেশের শিল্প-সম্পদ্ দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছিল এবং ব্যবসা-বাণিজ্যেরও যথেষ্ট উন্নতি ঘটিতেছিল। যখন সকলেই দ্রুতাগত অবশ্যম্ভাবী শস্ত্র-যুদ্ধের বিবিধ সম্ভার সংগ্রহোপলক্ষে শিল্প ও বাণিজ্য-প্রতিযোগিতায় অগ্রসর হইতেছিল, ভারত তখন মসী-যুদ্ধে লিপ্ত ছিল!

ভারতের শিল্প-সমৃদ্ধি বহুল পরিমাণে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের উপর নির্ভর করে। কারণ, ভারত কৃষিপ্রধান দেশ এবং আমাদের রপ্তানী পণ্যের অধিকাংশই কৃষিজাত দ্রব্যসম্ভার। আমাদের অনেকগুলি শিল্পও বিদেশ হইতে আনীত মাল-মসলা, সাজ-সরঞ্জাম, যন্ত্র-পাতি ও কল-কব্জার উপর নির্ভরশীল। বর্ত্তমান বিপ্লবের ফলে, বহু আবশ্যকীয় দ্রব্যাদির অভাবে, আমাদের অনেক সুপ্ত, লুপ্ত, মুমূর্ষু শিল্প বিপদ্‌গ্রস্ত হইয়াছে। সুপ্তের প্রাণ-প্রতিষ্ঠা, লুপ্তের পুনরুদ্ধার, চল্‌তির অগ্রগতি এবং মুমূর্ষুর সঞ্জীবন আমাদের মুখ্য উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্ত আমাদের দৃষ্টি সুদূর-প্রসারিত করিতে হইবে। কেবল মাত্র যুদ্ধ-সম্ভার প্রস্তুত করিয়া সাময়িক প্রয়োজন সাধন করিলেই আমাদের কর্ত্তব্যের অবসান হইবে না। স্থায়ীভাবে পুরাতনের প্রাণ দান এবং নূতনের প্রতিষ্ঠা ভবিষ্যতে কল্যাণদায়ক হইবে।

যে সকল কাঁচা মাল আমাদের দেশে সহজ ও সুলভ এবং প্রচুর পরিমাণে জন্মে সেইগুলিকে যথাসম্ভব পাকা মালে পরিণত করিবার নিমিত্ত যে সকল শিল্প-প্রতিষ্ঠান আছে, তাহাদিগের দিকেই আমাদের প্রধান লক্ষ্য দিতে হইবে। উদ্বৃত্ত কাঁচা মাল বিদেশে রপ্তানীর ব্যবস্থা করিতে হইবে। দ্বিতীয়তঃ, যে সকল কাঁচা মাল আমরা বিদেশ হইতে আমদানী করি, সে সকলের যতগুলি সম্ভব আমাদের দেশে উৎপন্ন করিবার যথাশক্তি চেষ্টা করিতে হইবে। যে সকল মাল-মসলা, সাজ-সরঞ্জাম, যন্ত্র-পাতি ও কল-কব্জা আমরা বিদেশ হইতে আনি, তাহাদের যতগুলি সম্ভব আংশিক অথবা পূর্ণভাবে প্রস্তুত করিবার শক্তি, সাহস, সুযোগ ও সুবিধা অর্জ্জন করিতে হইবে। কেবল মাত্র নিজের দেশের অভাব পূরণ করিয়া সন্তুষ্ট থাকিলে চলিবে না। ভারতের বাহিরে, অন্যান্য দেশে, আমাদের উৎপন্ন শিল্প ও কৃষিজাত দ্রব্যের চাহিদা সৃষ্টি করিয়া, তাহাদের কাটতি বাড়াইতে হইবে।

অনেকের ধারণা, ভারতবর্ষ শিল্পেও পূর্ণস্বরাজ প্রতিষ্ঠা করিতে পারে, অর্থাৎ আমরা আমাদের আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি এরূপ পরিমাণে উৎপন্ন করিতে পারি যে, বিদেশ হইতে আমাদের কিছুই আনিবার প্রয়োজন হইবে না। ইহা অর্থনৈতিক স্বাতন্ত্র্যের চরম কল্পনা! বিনিময় ব্যতীত ব্যবসা কোথায়?

ইহা সত্য যে, আর্থিক জগতের বর্ত্তমান অবস্থায় কিয়দংশে অর্থনৈতিক স্বাতন্ত্র্য প্রয়োজন এবং উপকারীও বটে; কিন্তু, শিল্প-সম্প্রসারণ-সম্ভাবনা সম্বন্ধে আমাদের ধারণা বাস্তবের অনুকূল হওয়া প্রয়োজন। ইহা আদৌ সত্য নহে যে, ভারতবর্ষ স্বল্প, অথবা অল্পতর ব্যয়ে ভারতের অধিবাসীদিগের আবশ্যকীয় সমস্ত দ্রব্য প্রস্তুত করিতে পারে। আমাদের অদূর ভবিষ্যতে শিল্প-সম্প্রসারণের সম্ভাবনাও পরিমিত।

শিল্প-প্রচেষ্টার শৈশবে, আত্ম-প্রাচুর্য্যের অলীক কল্পনা অতি লোভনীয় সন্দেহ নাই; কিন্তু সে কল্পনা কার্য্যকরী হইতে পারে - যদি আমরা কেবল মাত্র আভ্যন্তরীণ চাহিদার প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া রাখি। দূরদৃষ্টির আশ্রয় লইলে আমরা বুঝিতে পারি যে, এরূপ সঙ্কল্প অসম্ভব। জাতীয়

শিল্পের ক্রমোন্নতির সহিত আভ্যন্তরীণ চাহিদা মিটাইয়াও আমাদের কিছু উদ্বৃত্ত থাকিবে ; এবং কোন কোন শিল্পের প্রতিষ্ঠা ও প্রবর্দ্ধন হেতু বিদেশ হইতে কিছু কিছু আমদানী অপরিহার্য্য হইবে। কারণ, আমদানী ব্যতীত কেবল রপ্তানী রক্ষা করা সম্ভব নহে ; বিশেষতঃ, যে সকল শিল্পে আমরা অন্যান্য দেশাপেক্ষা অগ্রবর্ত্তী, সে সকল শিল্পোৎপন্ন দ্রব্যজাতের নিমিত্ত ভারতের বাহিরেও আমাদের বিপণি প্রয়োজন।

আত্ম-প্রাচুর্য্য সুপ্রতিষ্ঠিত হইলেও, বহু প্রয়োজনের নিমিত্ত আমাদিগকে অন্যান্য দেশ হইতে কিছু কিছু মাল আমদানী করিতে হইবে। আদান-প্রদান ব্যতীত আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্য সম্ভব নহে। আমদানী ও রপ্তানীর বিনিময় ব্যতীত বাণিজ্য জমা-খরচ অচল ; তবে বাণিজ্য খতিয়ান জমার, অর্থাৎ প্রাপ্যের অঙ্ক যাহাতে আমাদের অনুকূল হয়, তন্নিমিত্ত আমদানী অপেক্ষা রপ্তানীর পরিমাণ অধিক রাখিতে হইবে। বিগত মহাযুদ্ধের পর, অত্যন্ত চড়া দরে রৌপ্য কিনিয়া, কিরূপ ভাবে আমাদের এই জমার অঙ্কের অপচয় সংসাধিত হইয়াছিল, সে প্রসঙ্গের আলোচনা এখানে অপ্রাসঙ্গিক হইবে।

শিল্প-সম্পদের যথেষ্ট প্রসার ও প্রতিপত্তি সত্ত্বেও কোন কোন বিষয়ে বহুদিন আমাদিগকে পরমুখাপেক্ষী হইয়া থাকিতে হইবে। আন্তর্জ্জাতিক আমদানী-রপ্তানী তালিকার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে আমরা দেখিতে পাই, আমরা কোন্ কোন্ দেশ হইতে কি পরিমাণে কোন্ কোন্ দ্রব্য ঐ সকল দেশে রপ্তানী করি।

আমাদের আমদানী ক্ষেত্রে, জার্ম্মাণীর স্থান তৃতীয়। শীর্ষস্থান ব্রিটেনের, দ্বিতীয় স্থান জাপানের। রপ্তানী-আয়তনে জার্ম্মানীর স্থান চতুর্থ। এক্ষেত্রেও শীর্ষস্থান ব্রিটেনের, দ্বিতীয় স্থান যুক্তরাজ্যের এবং তৃতীয় স্থান জাপানের। বাণিজ্যের অংশ হইতে—বিশেষতঃ আমদানী ক্ষেত্রে—জার্ম্মানীর সহিত আমাদের ব্যবসায়ের গুরুত্ব উপলব্ধ হয় না।

এই গুরুত্ব আমরা উপলব্ধি করিতে পারি, যখন আমরা বিবেচনা করি যে, জার্ম্মানী কি কি দ্রব্য আমাদের দেশে পাঠায় এবং সেই সেই পণ্যের নিমিত্ত আমরা কি পরিমাণে জার্ম্মানীর উপর নির্ভরশীল। আমাদের শিল্প-সম্প্রসারণ এবং কৃষিজীবী সম্প্রদায়ের একটি প্রকৃষ্টাংশের আর্থিক উন্নতির নিমিত্ত আমরা প্রায় নিরুপায় ভাবে জার্ম্মানীর উপর নির্ভরশীল ছিলাম।

রপ্তানী ক্ষেত্রে জার্ম্মানীর সহিত সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইলে, ভারতের বিশেষ ক্ষতি হয় না ; কারণ, আমরা জার্ম্মানীতে যে সকল জিনিষ পাঠাই, তাহার অধিকাংশই কাঁচা মাল। ঐ সকল সামগ্রী বিদেশে না পাঠাইয়া, যদি আমরা স্বদেশে তাহাদের যথোপযুক্ত ব্যবহার করি, তাহা হইলে, ক্ষতি দূরে থাকুক, শিল্পোন্নতি দ্বারা আমরা যথেষ্ট লাভবান্ হইতে পারি। আর, যদি সে সকল দ্রব্যের সম্পূর্ণ অথবা সম্যক্ ব্যবহার নাও করিতে পারি, তাহা হইলে আমাদের মিত্র দেশগণও তাহা লইতে পারে।

কিন্তু জার্ম্মানী হইতে আমরা যে-সকল সামগ্রী ক্রয় করি, তাহার অধিকাংশই লৌহ ও ইস্পাত, কলকব্জা, লোহার জিনিষ, কাগজ, পিচ্ বোর্ড, রঞ্জনদ্রব্য, রাসায়নিক উপকরণ এবং ধাতু। ১০৩৭-৩৮ সালে আমরা প্রায় পনর কোটী ত্রিশ লক্ষ টাকার পণ্য ক্রয় করিয়াছিলাম। তন্মধ্যে রাসায়নিক উপকরণের মূল্য ছিল চল্লিশ লক্ষ, ছুরি কাঁচি প্রভৃতি সতর লক্ষ, ঔষধাদি প্রায় দুই লক্ষ, রঞ্জন ও চর্ম্ম প্রস্তুতোপকরণ দ্রব্যাদি আড়াই লক্ষের কিঞ্চিদূর্দ্ধে, লৌহ-পিত্তলাদি নির্ম্মিত দ্রব্য এক লক্ষের কিঞ্চিদধিক, যন্ত্রপাতি এক লক্ষ, কলকব্জা আড়াই লক্ষ, এবং ধাতু আড়াই লক্ষ। এই সকল দ্রব্যাদির মধ্যে লৌহ, ইস্পাত এবং লৌহ-পিত্তলাদি নির্ম্মিত সামগ্রী আমরা যুক্তরাজ্য ও জাপান হইতে অধিক পরিমাণে পাইতে পারি ; কিন্তু অন্যান্য বস্তুজাতের নিমিত্ত আমাদিগকে বিশেষ অসুবিধা ভোগ করিতে হইতেছে।

বর্ত্তমান মহাবিপ্লবের ফলে, বিদেশ হইতে পণ্য আনয়নের বিশৃঙ্খলা ঘটিয়াছে। শত্রুদেশ হইতে আমদানী বন্ধ ; সমুদ্র-সঙ্কট ও জাহাজের অনটনে মিত্র ও নিরপেক্ষ দেশ হইতেও আমদানী স্থূল পরিমাণে কমিয়া গিয়াছে। এই হেতু যে সকল শিল্পের পরিচালনার জন্য বিদেশী যন্ত্র-পাতি, কল-কব্জা বা তাহাদের খণ্ডাংশ এবং রাসায়নিক উপকরণের উপর নির্ভর করিতে হয়, তাহাদিগের বিশেষ ক্ষতি হইতেছে। এই ক্ষতিই আমাদের উন্নতির মূল। এই ক্ষতিপূরণ প্রচেষ্টা

আমাদিগকে আত্মনির্ভরতার পথে অগ্রসর করিবে। প্রয়োজনই আবিষ্কারের প্রসূতি।

প্রতিষ্ঠিত শিল্পের উন্নতি এবং নিত্য নূতন অভাব পূরণার্থ নব নব শিল্পের প্রতিষ্ঠা দ্বারা আমাদিগকে শিল্প-স্বরাষ্ট্রের বনিয়াদ গাঁথিতে হইবে। সৌভাগ্যক্রমে, বিগত মহাযুদ্ধের পর হইতে কোন কোন শিল্পে আমরা যথেষ্ট উন্নতি করিয়াছি। বস্ত্রবয়ন, সূতা প্রস্তুত করণ, লৌহ ও ইস্পাত, বিলাতি মাটি, শর্করা, দিয়াশলাই, কাচের বাসন প্রভৃতি কয়েকটি শিল্পে আমরা অল্পবিস্তর অগ্রসর হইয়াছি। বর্তমান মহাবিপ্লব যে সকল অসুবিধা এবং সুযোগ সৃষ্টি করিয়াছে, তাহাদিগকে সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত করিয়া আমাদিগকে প্রতিষ্ঠিত এবং অপ্রতিষ্ঠিত সকল শিল্পেই দ্রুত অগ্রসর হইতে হইবে।

বর্তমান শিল্প-বাণিজ্যবিপ্লব আমাদিগকে চারিটি সুমহান্ সুবিধা প্রদান করিয়াছে। প্রথম, পরিণত দ্রব্যের মূল্য-বৃদ্ধি, দ্বিতীয়তঃ, যুধ্যমান দেশ সকলের প্রতিযোগিতানিবৃত্তি, তৃতীয়তঃ, স্বদেশ ও বিদেশ উভয়ত হইতে যুদ্ধোপকরণ এবং অন্যান্য বর্তমানে দুর্লভ দ্রব্যাদির চাহিদা বৃদ্ধি হেতু শিল্প-প্রগতির প্রবর্দ্ধনা এবং চতুর্থতঃ, ষ্টার্লিং হইতে বিযুক্ত দেশ সমূহে টাকার বিনিময়মূল্য হ্রাস হেতু ঐ সকল দেশের প্রতিযোগিতা প্রতিহত হওয়ার ফলে আমাদের দেশের শিল্প যে অতিরিক্ত সুযোগ লাভ করিয়াছে। এই শেষোক্ত প্রক্রিয়ার ফলে ভারতীয় শর্করা ইহার প্রতিদ্বন্দ্বী জাভা শর্করার প্রতিকূলে কিঞ্চিৎ সুবিধা লাভ করিয়াছিল।

বর্তমান মহাবিপ্লব যে বাণিজ্য-বিপর্যয় সৃষ্টি করিয়াছে, তাহার সুযোগ লইয়া আমাদের কোন্ কোন্ শিল্পের প্রতি অবহিত হওয়া কর্তব্য তাহার আলোচনাই আমাদের মুখ্য উদ্দেশ্য।

বিগত মহাযুদ্ধ এবং তাহার পরবর্তী সময়ে আমাদের দেশে অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাসায়নিক শিল্পের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। সকল প্রচেষ্টাই যে সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে, তাহা নহে; তথাপি অধিকাংশ ক্ষুদ্র লঘু রাসায়নিক এবং ভেষজের নিমিত্ত আমরা আর পূর্ব্বের ন্যায় পরমুখাপেক্ষী নহি। ভারতীয় রাসায়নিক দ্রব্য প্রস্তুতকারক সমিতির অভিমত এই যে, ভারতে অক্লেশে সর্ব্বপ্রকার ঔষধাদি প্রস্তুত করা যাইতে পারে। ভারতে এত গাছ-গাছড়া জন্মে যে, ব্রিটিশ ভৈষজ্যতত্ত্বোল্লিখিত ঔষধাদির তিন চতুর্থাংশ আমরা এখনই প্রস্তুত করিতে পারি এবং বাকী এক চতুর্থাংশ গাছগাছড়ার চাষ সহজেই হইতে পারে।

উষ্ণদেশীয় রোগ চিকিৎসা বিদ্যালয়ের (School of Tropical Medicine) অধ্যক্ষ কর্ণেল চোপরার পরিচালনায় সম্প্রতি এই সমিতির এক অধিবেশনে স্থিরীকৃত হইয়াছে যে, যদি আমরা উদ্ভিজ্জজাত ঔষধাদি প্রস্তুত বিষয়ে অবহিত হই, তাহা হইলে, আমরা আমাদের আভ্যন্তরীণ চাহিদা মিটাইয়া ও কিছু কিছু অসংস্কৃত উদ্ভিজ্জ ভেষজ বিদেশে চালান দিতে পারি। সমিতির অভিমত এই যে, ঔষধ প্রস্তুতকরণ-শিল্পে অধিকতর অগ্রসর হইবার নিমিত্ত, আমাদিগকে পাথুরিয়া কয়লাকে অঙ্গারে পরিণত করণ (Coal Carbonisation) এবং দ্রাবক প্রস্তুত করণ (Production of solvents) প্রভৃতি সম্পর্কিত গুরু এবং লঘু উভয়বিধ রাসায়নিক প্রস্তুত করণের দিকে একই যোগে লক্ষ্য দিতে হইবে। সমিতির অভিমত শাসন-কর্তৃপক্ষের গোচরে আনা হইয়াছে। আশা করি সুফল ফলিবে।

নানাবিধ তৈল প্রস্তুত করণ সম্পর্কেও সমিতি আলোচনা করিয়াছেন। যদিও চন্দন, পুদিনা, ল্যাবেণ্ডর, লেবু প্রভৃতি তৈল প্রস্তুত করিবার উপকরণ ভারতবর্ষে সুলভ, তথাপি আমরা প্রচুর পরিমাণে এই সকল তৈল বিদেশ হইতে আমদানী করি। শাসনতন্ত্র অনুকূল হইলে এবং সরকারী ও বে-সরকারী আরোগ্যশালাগুলির সহিত ঔষধ প্রস্তুত-কারকগণের ঘনিষ্ঠ সংযোগ সংস্থাপিত হইলে, এই সকল শিল্পে আমরা দ্রুত উন্নতি সাধন করিতে পারি।

দাহক-ক্ষার (Caustic Soda), ক্ষার ভস্ম (Soda ash), গন্ধক (Sulphur), শুক্লকারক চূর্ণ (Bleaching Powder) প্রভৃতি কয়েকটি গুরু রাসায়নিকের জন্য আমরা অসহায় ভাবে বিদেশী সরবরাহের উপর একান্ত নির্ভরশীল। ইহার ফলে, সাবান, কাচ, মোজা প্রভৃতি শিল্পে আমরা বিলক্ষণ বাধা-বিঘ্ন ভোগ করিতেছি। যদি বর্তমান মহাবিপ্লব দীর্ঘস্থায়ী হয়—এবং তাহার সম্ভাবনাও বিপুল—তাহা হইলে এই সকল শিল্প অচল অবস্থায় উপনীত হইবে। এই যে বিষম সমস্যা—ইহার মূলে আমাদের শাসন-তন্ত্রের বিলক্ষণ ত্রুটি আছে। একটি আন্তর্জাতিক সমবায় প্রতিষ্ঠানের প্রতি

অথবা সহানুভূতির ফলে, স্বদেশী শিল্প গড়িয়া উঠিতে পারে নাই।

গুরু রাসায়নিক শিল্পের অভাব আমাদের দেশের সর্বতোমুখী শিল্পপ্রচেষ্টার একটি গুরুতর অন্তরায়। আমাদের দেশে রঙ্ শিল্পের কোন প্রতিষ্ঠান নাই, সুতরাং বিদেশাগত রঙের আমদানী বন্ধ হওয়াতে আমরা বিশেষ মুস্কিলে পড়িয়াছি। লঘু রাসায়নিকের ন্যায় গুরু-রাসায়নিক শিল্প প্রতিষ্ঠা ভারতবর্ষে অসম্ভব নহে; কিন্তু যুদ্ধাবসানের সঙ্গে সঙ্গে বিদেশী প্রতিযোগিতার আশঙ্কায় কোন ধনিক এই ব্যাপারে লিপ্ত হইতে সাহসী নহেন। বর্ত্তমান মহাবিপ্লবের ক্ষতি পূরণ করিতে দীর্ঘ সময় লাগিবে, সুতরাং, এই বিপ্লব-হেতু রঙের দর যেরূপ বৃদ্ধি পাইয়াছে, তাহাতে এই শিল্প প্রবর্ত্তনের যে সুযোগ আসিয়াছে, তাহা অবহেলা করা অত্যন্ত ভুল হইবে। সুখের বিষয় একজন বাঙ্গালী যুবক রঙ প্রস্তুতের একটি সহজ উপায় আবিষ্কার করিয়াছেন।

কোন কোন দেশী প্রতিষ্ঠানে শুক্রকারক চূর্ণ প্রস্তুত করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। একটু দৃঢ় এবং আন্তরিক চেষ্টা করিলে, ক্ষার-ভস্ম, অমিশ্রতৈল (essential oils), গন্ধক (Sulphuric) এবং অন্যান্য দ্রাবক (acid) প্রভৃতি প্রস্তুত করিবার প্রচেষ্টা সহজ-সাধ্য না হউক, সম্ভব হইতে পারে। যুদ্ধের পরিস্থিতি ফলে, আমাদের বর্ত্তমান শাসনতন্ত্র, সমস্ত রাসায়নিক প্রতিষ্ঠান এবং কোন্ কোন্ দ্রব্য কি পরিমাণে উৎপন্ন হয় এবং প্রত্যেকটি কত অধিক পরিমাণে প্রস্তুত করা যাইতে পারে, তাহার একটি তালিকা লইয়াছেন। এই তালিকা প্রস্তুত ও আলোচনার ফলে, আমরা কোন কোন নূতন রাসায়নিক শিল্পানুষ্ঠানের সাহস ও শক্তি সঞ্চয় করিতে পারিব—এ আশা দুরাশা নয়।

তড়িৎসংক্রান্ত যন্ত্রপাতি এবং উপকরণাদি ব্যাপারে আমরা অত্যন্ত পশ্চাৎপদ। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কয়েকটি উপাদান ও উপকরণ প্রস্তুত করিবার প্রচেষ্টা আরম্ভ হইয়াছে; কিন্তু কোন গুরু দ্রব্যের প্রস্তুত প্রয়াস সুদূরপরাহত। বিগত মহাযুদ্ধের সময় গতি-যন্ত্র (Dynamo), চালক (Motor), রূপ-পরিবর্ত্তক (Transformer) প্রভৃতি যন্ত্রপাতি প্রস্তুতের কোন কল্পনাও আমাদের অন্তরে আশ্রয় লাভ করে নাই; এখনও আমরা এবিষয়ে কিঞ্চিন্মাত্রও অগ্রসর হই নাই। এই অনুষ্ঠানের মূলে অবশ্য কতকগুলি কাঁচা মালের অভাব বিদ্যমান। ছিদ্র পথে তীক্ষ্ণ সংক্রমণ শক্তি সম্পন্ন ঢালা লোহা (cast iron of high permeability), নম্র ইস্পাত (mild steel), চুম্বক ধর্ম্মবিশিষ্ট পাতলা লৌহফলক (thin iron plates with magnetic properties), তামার তার, তামার বাটের স্বতন্ত্র যন্ত্র (copper bars of special section) প্রভৃতির একান্ত অভাব।

তড়িৎ শক্তির নিত্য নূতন ব্যবহারের ফলে, বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি এবং উপাদান উপকরণের চাহিদা দিন দিন বাড়িতেছে। বৈদ্যুতিক শক্তি সরবরাহের ব্যবস্থাও দিন দিন প্রসার লাভ করিতেছে। প্রাদেশিক শাসনতন্ত্রগুলিও স্বেচ্ছা-প্রণোদিত ভাবে কয়েকটি তড়িৎ-শক্তি সরবরাহ পরিকল্পনার সহিত সাক্ষাৎ সম্বন্ধে সংশ্লিষ্ট হইয়াছেন; সুতরাং বিজলী শক্তিকে নানা প্রকারে ব্যবহার করিবার নিমিত্ত যে সকল যন্ত্রপাতি ও উপাদান-উপকরণ প্রয়োজন, তাহার উৎপাদন প্রচেষ্টা আমাদের আশু প্রয়োজন। সরকারী সাহায্য ও সহানুভূতি লাভ করিলে শিল্পোৎসাহী ধনিকের এই শিল্পে আস্থা জন্মিবে। পিত্তল ও তামার সরঞ্জাম আমাদের দেশে প্রস্তুত হইতেছে। বর্ত্তমান পরিস্থিতির সুযোগ লইয়া চীনা-মাটীর (porcelain) নির্ম্মিত অংশগুলি প্রস্তুত করিবার বিশেষ প্রচেষ্টাও প্রয়োজন।

কলকব্জা শিল্পে আমরা বহুল পরিমাণে বিদেশী পণ্যের উপর নির্ভরশীল। বিগত মহাযুদ্ধের পর হইতে কয়েকটি এঞ্জিনিয়ারীং প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র যন্ত্রপাতি এবং সরঞ্জাম প্রস্তুত হইতেছে; কিন্তু এই গুরু শিল্পে আমাদের প্রচেষ্টা অতি অকিঞ্চিৎকর। বিজলী-শক্তি প্রতিষ্ঠানের যন্ত্রপাতির অভাব আমাদের নিদারুণ। রাসায়নিক দ্রব্যাদি উৎপাদনার্থে যন্ত্রাদি, তুলার কলের জন্য সূতা কাটিবার সরঞ্জাম, ছাপাখানায় যন্ত্রপাতি—এ সকলের কোন কিছুই প্রায় আমাদের দেশে উৎপন্ন হয় না। সুতরাং এই সকল দ্রব্যের আমদানী যে বন্ধ হইয়াছে তাহার সুযোগ লইয়া কিছু করিবার সামর্থ্য আমাদের নাই; অধিকন্তু, দারুণ দুর্ম্মূল্য এবং সমুদ্রপথের সঙ্কট হেতু বিদেশ হইতেও কিছু আনিবার উপায় নাই। বৃহৎ যন্ত্রপাতি কিংবা কলকব্জা প্রস্তুত করিবার কোন প্রচেষ্টাই আমরা বিগত মহাযুদ্ধে

পর হইতে করি নাই। শাসনতন্ত্রের সাহায্য ও সহানুভূতি ব্যতীত এরূপ গুরুতর শিল্পের প্রতিষ্ঠাও সম্ভব নহে। টাটা প্রতিষ্ঠানের স্থায় এক্ষেত্রেও বিপুল প্রচেষ্টার প্রয়োজন।

জাপান বিগত মহাযুদ্ধের সুবর্ণ সুযোগ লইয়া বৃহৎ যন্ত্রপাতি ও কলকব্জা শিল্পের প্রভূত উন্নতি করিয়াছে। শাসনতন্ত্রের আর্থিক সাহায্য বলে এবং সুনিয়ন্ত্রিত পরিকল্পনার ফলে স্বদেশোৎপন্ন যন্ত্রপাতি ও কলকব্জার সাহায্যে যথেষ্ট পরিমাণে শিল্প সমুন্নয়ন সম্প্রসারণ সাধন করিয়াছে। শিল্পোন্নতি করিতে হইলে, আমাদিগকেও এবিষয়ে অবিলম্বে অবহিত হইতে হইবে। যন্ত্রশিল্পের প্রতিষ্ঠা ও প্রসারণ ব্যতীত শিল্পসমুন্নয়নের কোন প্রচেষ্টাই অধিক পরিমাণে অগ্রসর হইতে পারে না। যন্ত্রশিল্পের প্রতিষ্ঠা হেতু বহুজনের সমবেত বিপুল প্রয়াস প্রয়োজন। লৌহ ও ইস্পাত শিল্পের স্থায় এই জটিল শিল্পেও সরকারের সক্রিয় অনুকূল আশ্রয় ও প্রশ্রয়ের বিশেষ আবশ্যক।

মহীশূরের ভূতপূর্ব দেওয়ান বিখ্যাত এঞ্জিনিয়ার ও শিল্পোৎসাহী স্যার মৎস্যাগান্ধী বিশ্বেশ্বরীয়া কয়েক বৎসর হইতে মোটরগাড়ী প্রস্তুতার্থ একটি বৃহৎ কারখানা খুলিবার পরিকল্পনা সাধারণে প্রচার করিয়াছেন। কয়েকজন দেশীয় নৃপতি ও সুবিখ্যাত ধনিকের অর্থানুকূল্যের আশ্বাসও তিনি পাইয়াছিলেন; কিন্তু প্রধানতঃ রাজনৈতিক পরিস্থিতির জন্য এই পরিকল্পনা এখনও কার্য্যে পরিণত হয় নাই। বর্ত্তমান মহাবিপ্লবের অভিঘাতে, এই বৃহৎ শিল্পের প্রতি বিশিষ্ট ধনিকগণের মনোযোগ পুনরাকৃষ্ট হইয়াছে। আশা করি, বর্ত্তমানে ভারত-সরকারের সাহায্য-বিমুখতা সত্ত্বেও অচিরে আমরা এই বিষয়ে অগ্রগতির সংবাদ পাইব। বোম্বাইএর জেনারেল মোটর কোম্পানী কোন কোন অংশ প্রস্তুত, এবং যে সকল খণ্ডাংশ প্রস্তুত করা যায় না তাহা বিদেশ হইতে আনিয়া সংযোগ-সঙ্কলন করিতেছে, উক্ত কারখানার স্থায় আরও কয়েকটি কারখানা কার্য্যারম্ভ করিয়াছে। এখানে যথাসম্ভব খণ্ডাংশ প্রস্তুত করিবার বিশেষ উত্তম চলিয়াছে। স্যার এম, বিশ্বেশ্বরীয়ার পরিকল্পনা বিরাট। সমস্ত খণ্ডাংশ এদেশে, স্বদেশী কারিগর ও মূলধন সাহায্যে, প্রস্তুত ও সংযুক্ত করিয়া অখণ্ড গাড়ীর কারবার—এই উত্তম সফল হইলে, কোটী কোটী টাকা, যাহা এখন বিদেশে চলিয়া যাইতেছে—তাহা এই দেশেই থাকিবে এবং নিরন্নের মুখে অন্ন যোগাইবে।

বোম্বাইয়ের সুপ্রসিদ্ধ শিল্পোৎসাহী ধনিক ও ব্যবসায়ী শ্রীযুক্ত বালচাঁদ হীরাচাঁদ ও একটী বিরাট শিল্পের উদ্যোগ-পর্ব্ব সমাধা করিয়াছেন। বাঙ্গালোর সহরে বিমান নির্ম্মাণ করাই তাঁহার মহৎ উদ্দেশ্য। সৌভাগ্যক্রমে, শ্রীযুক্ত হীরাচাঁদ, ভারত সরকার, মহীশূরের ব্রিটিশ রেসিডেন্ট ও মহীশূরের বর্ত্তমান দেওয়ানের সহানুভূতি লাভ করিয়াছেন। বাঙ্গালোরের আবহাওয়া, বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠানের সান্নিধ্য এবং বৈদ্যুতিক শক্তি সরবরাহের সুবিধাই এই স্থানের উপযোগিতা প্রতিপন্ন করিয়াছে। তাঁহার শুভ-প্রচেষ্টা সাফল্যমণ্ডিত হউক।

বিমান নির্ম্মাণের স্থায় অর্ণবপোত নির্ম্মাণ-শিল্পেও আমরা নিতান্ত অসহায় অবস্থায় অবস্থিত। এমন একদিন ছিল, যখন ভারত-নির্ম্মিত জলযান ও অর্ণবযান সমুদ্রবক্ষে নির্ভয়ে বিচরণ করিয়া দেশ-বিদেশে পণ্য বিতরণ করিত। কালের কুটিলগতিতে, অন্যান্য বহু সমৃদ্ধ শিল্পের স্থায় এই বিরাট শিল্পও লুপ্ত হইয়াছে। বর্ত্তমান মহা বিপ্লবের ফলে, ভারত সরকারের সানুরাগ মনোযোগ এই শিল্পে আকৃষ্ট হইয়াছে। ভারতে এই শিল্প প্রতিষ্ঠার সকল অনুকূল অবস্থাই বর্ত্তমান। সিন্ধিয়া ষ্টীম নেভিগেসান কোম্পানী ভিজাগাপট্টমে এই শিল্পের প্রতিষ্ঠা করিতেছেন।

ভারতের অর্থনৈতিক উপদেষ্টা ডাঃ গ্রেগরী এবং বাণিজ্যবার্ত্তা বিভাগের অধ্যক্ষ ডাঃ মীক্ এই সকল শিল্প প্রতিষ্ঠানোপযোগী যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম এবং উভয় দেশের মধ্যে বাণিজ্যের প্রসারবৃদ্ধি সম্ভাবনা সংক্রান্ত সংবাদ সংগ্রহার্থে যুক্তরাজ্যে গমন করিয়াছিলেন। এই সমস্ত বিপুল শিল্পের প্রথম উদ্যমের সকল তথ্যই সম্প্রতি সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছে, সুতরাং ইহার বিস্তৃত আলোচনা নিষ্প্রয়োজন।

পোত-শিল্পের স্থায়, বড় বড় এঞ্জিন এই দেশে প্রস্তুত করিবার নিমিত্ত ভারতবাসী বহুদিন হইতে আন্দোলন চালাইতেছে। বিগত মহাযুদ্ধের সময় এই সকল প্রস্তাবের প্রতি সরকারের মনোযোগ আকৃষ্ট হইয়াছিল; কিন্তু শান্তি প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গেই সকল প্রস্তাব ও প্রচেষ্টা সমাধি লাভ করিয়াছিল। বর্ত্তমান মহাবিপ্লবের ফলে যদি এই সব

প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত হয়, এবং প্রচেষ্টা সফল হয়, তাহা হইলে বর্ত্তমান মহাবিপ্লব আমাদের অপরিসীম উপকার সাধন করিবে। কেন্দ্রীয়-শাসনতন্ত্র এ বিষয়ে উদ্যোগী হইয়াছেন। আজমীরে বড় বড় রেল-এঞ্জিন নির্ম্মাণের আয়োজন চলিয়াছে।

নানাবিধ নল প্রস্তুত করিবার প্রচেষ্টাও বিপুল উদ্যমে চলিয়াছে। টাটা লৌহ ও ইস্পাত কোম্পানী এবং ষ্টুয়ার্ট ও লইড্‌স্ কোম্পানীর সমবায় চেষ্টায় জামসেদপুরে নূতন কারখানা খোলা হইতেছে। ভারতীয় নল কোম্পানীর সালিমারস্থিত কারখানাও শীঘ্র কার্য্যারম্ভ করিবে। শুভ সংবাদ।

একটি বিষয়ে আমাদিগকে অবহিত হইতে হইবে। বিগত মহাযুদ্ধের অবসানের সঙ্গে সঙ্গেই আমাদের সমস্ত উদ্যম যেমন উবিয়া গিয়াছিল, এবার যেন সেরূপ না ঘটে। প্রথম সুযোগের সদ্ব্যবহার আমরা করি নাই। দ্বিতীয় সুযোগ দুর্লভ। ঘটনাচক্রে তাহাও আমরা পাইয়াছি। এই সুবর্ণ সুযোগ হেলায় অতিক্রম করিলে—তৃতীয় সুযোগ আসিবে না। ইহা ধ্রুব সত্য। অদৃষ্টের সহিত যুদ্ধ শ্রেয়ঃ—পরিহাস মারাত্মক।

সরকারী উদ্যম ক্ষণস্থায়ী হইতে পারে; কিন্তু আমাদের শিল্পোৎসাহী ধনিক ও বণিকের উৎসাহ যেন অদম্য হয় এবং আমাদের সকলের সমবায় প্রচেষ্টা যেন কল্পস্থায়ী হয়। সুখের বিষয়, সম্প্রতি বাণিজ্যসচিব আশ্বাস দিয়াছেন যে, যুদ্ধান্তে সুপরিচালিত আদিম বা মৌলিক (key) এবং ভেষজ-শিল্প সংরক্ষণার্থ কেন্দ্রীয়-শাসনতন্ত্র উপযুক্ত সাহায্য প্রদান করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন। ইহা ভরসার কথা সন্দেহ নাই; কিন্তু অন্যান্য শিল্প সম্বন্ধেও প্রয়োজনানুযায়ী এইরূপ আশ্বাস আবশ্যক।

তোমরা ও আমরা

—শ্রীশচীন্দ্রনাথ সেন

গরীব হলেও ধরার মানুষ মোরা,
পরণে না হয় কাপড় মোদের কালো;
প্রতি দিনরাত খেটে-খুটে খায় যা'রা,
তোমাদের চোখে নয় ত তাহারা ভালো।

ধনীর দুলাল-দুলালী তোমরা যত
লেকের পাড়েতে ত্রিতল বাড়ীতে থাক,
মোদের তুচ্ছ নোংরা গলিতে বাস,
রোদে পুড়ে মরি, তোমরা মটর হাঁক'।

প্রেমে পড় আর সিনেমায় ভীড় কর,
তোমাদের ঘরে জল্‌না কত না জানি,
বেলাশেষে হও লেকের পাড়েতে জড়,
তখন আমরা বাবুর রিক্সা টানি।

জগতের যত দেনাপাওনার মাঝে,
মোদেরও ত চাই ছোটখাট অধিকার,
খেটে খেটে মরি সকালে, দুপুরে, সাঁঝে,
তোমরা ত হাস', মোরা করি হাহাকার।

যা'রা বড়লোক বড় বড় কথা বলে,
দুঃখের নামেতে শিহরিয়া যা'রা ওঠে,
মোদের দুঃখে ত প্রাণ কভু নাহি জলে,
কথায় কথায় দিনের মাহিনা কাটে।

তোমাদের দুঃখে আমরাত বলি আহা!
ভুলেওত কই ফিরিয়াও নাহি চাও,
তোমাদের গাড়ী চাপিলে মোদের ঘাড়ে,
আপদ বলিয়া বিদায় করিয়া দাও।

দারুণ গ্রীষ্মে পাখার বাতাসও নাই,
মাঘের শীতেতে বুকে হাঁটু দিয়ে কাঁপি,
নরম গদিতে গরমে গা ঢাকা দাও,
গ্রীষ্মের রাতে ফ্যান্ তোমাদের চাই।

যখন তখন তোমরা চেঞ্জে যাও,
রোগে ভুগিলেও অফিস কামাই নাই—
মোদের রক্ত নিঙাড়ি-নিঙাড়ি লও,
মোরা আছি আজও যন্ত্র বাঁচিয়া তাই।

তোমাদের পুঁজি আমাদের দেয়া শ্রমে
প্রতিদিন বাড়ে, তোমরা ত খেতে পাও।
ফুটপাতে থাকি, মোরা উপবাসে মরি,
আমাদের শ্রমে তোমরা মুনাফা পাও।

মোরা আছি তাই আজিও বাঁচিয়া আছ,
তোমরা পারনা করিতে ত এতটুকু;
মরিতে মরিতে এখন ত আছি বেঁচে,
আমাদের বাঁচা তোমাদের সবটুকু।

অতৃপ্ত সাধ

-শ্রীইলা দেবী

আসিয়াছি দূর বিদেশে। দুঃখ করিয়া লাভ নাই, কাজের খাতিরে থাকিতে হইবে। বাসাটী আমার বড়ই পছন্দ হইয়াছে। সামনের বারান্দায় বসিলেই দেখা যায়, দিগন্ত-বিস্তৃত ধানের ক্ষেত। ধান এখনও পাকে নাই, সেই সবুজ ধানের উপর বাতাসের দোলা লাগে, ঢেউ খেলিয়া যায়, বড় ভাল লাগে। বাসার পিছনেই একটি ছোট নদী। গ্রীষ্মকালে শুখাইয়া যায়, হাঁটু ডোবে কি না ডোবে; আবার বর্ষাকালে তার প্রবল প্রতাপে সর্ব্বদা শঙ্কিত থাকিতে হয়, কখন সব ভাসাইয়া লইবে। ছোট উঠানটি বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন; আশে পাশে দু' চারিটি আম-জামের গাছও উঠানটিকে ছায়া-ঢাকা রহস্যময় করিয়া রাখিয়াছে। বাসার সংলগ্ন একটি ছোট পুকুর— বাঁধানো ঘাট ভাঙিয়া যাইতেছে সেই ঘাটের রাণার দুই পাশে দুইটি রক্ত করবী গাছ ফুলের ভারে সাজিয়া, অতীতের সৌখীন কোন গৃহস্বামীর সৌন্দর্য্য জ্ঞানের সাক্ষ্য দিতেছে। সামনের রাস্তা দিয়া গ্রাম্য লোক ভার লইয়া হাটে যায় ও হাট হইতে দিনান্তে যখন বাড়ী ফেরে, ইজিচেয়ার পাতিয়া বারান্দায় শুইয়া শুইয়া নিত্য দেখি। ক্রমে তাহাদের প্রত্যেকেই যেন মুখ-চেনা হইয়া উঠিয়াছে। ঝড়-বাদল আসিলে তাহারাও অসঙ্কোচে আমার এ আচ্ছাদনটুকুর তলায় আশ্রয় লয় ও দৈনন্দিন জীবনের ক্ষুদ্র সুখ-দুঃখের ব্যাপার লইয়া দিব্য আমার সহিত গল্প জমাইয়া তোলে। নগরের কোলাহল ও কৃত্রিমতার বাহিরে এই শান্ত জায়গাটি আমার সত্যই বড় ভাল লাগিয়া গেল।

গৃহস্থালী আমাদের ছোট। আমি ও একটি চাকর, আর ধরিলে, আমার কুকুর জিম। বলিতে গেলে, এই তিনটি প্রাণী। দিন কয়েকের মধ্যে আমরা এই শান্ত জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত হইয়া উঠিলাম।

সেদিন রাত্রে একটা বড় আশ্চর্য্য ঘটনা ঘটিয়া গেল। কৃষ্ণপক্ষের সপ্তমী হইবে বোধ হয়; পাণ্ডুর একটু জ্যোৎস্না উঠিয়াছে। একখানা বই লইয়া খুব নিবিষ্ট হইয়া গিয়াছিলাম। বইখান শেষ করিয়া ঘড়ির দিকে চাহিলাম, দেখি একটা বাজিয়া গিয়াছে। টেবিলে জল ঢাকা ছিল, খাইয়া শুইতে যাইব, মনে হইল, শিয়রের জানালাটা বন্ধ করিয়া দিই। জানালার পাল্লায় হাত দিয়াছি, বাহিরের দিকে চোখ পড়িতেই অবাক হইয়া গেলাম। সেখান হইতে ঘাটের দিকটা চোখে পড়ে, পরম বিস্ময়ে দেখিলাম সেই রক্ত-করবী গাছটীর তলায় দুইটি ডালে দুইটি বাহু অলসভাবে বিন্যস্ত করিয়া সদ্যঃ-কৈশোরত্তীর্ণা একটি মেয়ে দাঁড়াইয়া আছে। দুই হাতে চোখ রগড়াইলাম। ভাল করিয়া চাহিতেই আর কিছু দেখিতে পাইলাম না। অনেকক্ষণ চাহিয়া রহিলাম, কিন্তু আর কিছুই চোখে পড়িল না। তখন চেয়ারে ফিরিয়া আসিয়া নিজের মনেই হাসিয়া উঠিলাম। অতিরিক্ত বই পড়িয়া বোধহয় মাথা আমার গরম হইয়া উঠিয়াছে।

যাক, ইহার পর ক'দিন বেশ কাটিল। সেদিনের সেই মায়া-কন্যাকে অনেক চেষ্টা করিয়াও আর দেখিতে পাই নাই। সেটিকে আমার কল্পনা-প্রসূত মনে করিয়াই নিশ্চিন্ত ছিলাম। কিন্তু বিশ্বাস আমাকে করিতেই হইল।

সেদিন দিনের বেলাটায় বড় ভয়ানক গরম পড়িয়াছিল, সন্ধ্যার দিকেও গরমটা কমিল না। গাছের পাতাগুলি পর্য্যন্ত এতটুকু নড়িতেছে না। চারিদিকে একটা যেন থমথমে ভাব। চাকরটাকে দিয়া উঠানে ক্যাম্পখাটটা টানিয়া আনিয়া শুইয়া ছিলাম। চাকর রান্নাঘরে ছিল, শুইয়া শুইয়া তাহাকে বেশ স্পষ্ট দেখা যাইতেছিল। খাটের তলায় জিম শুইয়া, রাত হয় ত আটটা সাড়ে আটটা হইবে। এতক্ষণের গুমোট ভাঙিয়া সহসা একটু বাতাস বহিতে লাগিল। তন্দ্রা হয় ত একটু আসিয়াছিল, হঠাৎ আমার মনে হইল, সেদিনের সেই মেয়েটি আস্তে আস্তে আমার পাশে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, সর্ব্বাঙ্গ সিক্ত, আঁচল লুটাইতেছে। মুখে-চোখে একটা আকুল আগ্রহ। ব্যাকুল ভাবে আমার হাত দু'খানি চাপিয়া ধরিয়া বলিল,—বল, বল, আমায় কি তুমি ভুলে যাবে? কখনও কোনও দিনও কি মনে পড়িবে না।

ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিলাম, ক্যাম্পখাটটা মচ মচ করিয়া

উঠিল। সারা গা ঘামে ভিজিয়া গিয়াছে, গলা শুকাইয়া গিয়াছে। তাড়াতাড়ি চাকরটাকে ডাকিলাম। গলার স্বরে হয় ত মনের চঞ্চলতা ধরা পড়িয়াছিল, সে ছুটিয়া আসিল, কি বাবু?

কতক্ষণ ঘুমিয়েছি বল তো?

আধঘণ্টা হবে বাবু, কেন?

বলিলাম,—না কিছু নয়, খাটটা তুই ঘরে তোল। চাহিয়া দেখিলাম, জিম দিব্য ঘুমাইতেছে। তবে কি এ স্বপ্ন? প্রেতযোনিতে আমার কোন দিনই বিশ্বাস নাই। কিন্তু গা'টা আমার ছমছম করিতে লাগিল। অত্যন্ত অস্বস্তিতে দুয়ার-জানালা বন্ধ করিয়া গরমে, ভয়ে, তন্দ্রায়, জাগরণে, বহুকষ্টে রাতটা কাটিল।

আমার একটি পূর্ব্বপরিচিত বন্ধুকে এখানে পাইয়াছিলাম। রোজই তিনি আসিতেন। পরের দিন সকালে তিনি আসিলে, অনেক ইতস্ততঃ করিয়া, অবশেষে, এই দুদিনের অভিজ্ঞতার কথা তাঁহাকে বলিয়া ফেলিলাম। সঙ্কোচ বোধ হইতেছিল খুবই, কেন না, দুদিন পূর্ব্বে এরূপ কাহিনী অপরের মুখে শুনিলে আমিই হয় ত হাসিয়া উড়াইতাম। কিন্তু বন্ধুবরের মুখখানা গম্ভীর হইয়া গেল। বলিলেন, সত্যি? শুধু সত্যি, ভয়ঙ্কর রকম সত্যি। আমি যেন লোক, আমারও গা টা ছমছম্ করছে। এ দেখায় ভুল হতেই পারে না।

না তোমার ভুল নয়! একথা আমি আগেও শুনেছি, কিন্তু বিশ্বাস করিনি। এর একটা কাহিনী আছে—

বছর ছ'সাত পূর্ব্বের কথা। এ বাড়ীর ছেলে প্রসাদ তখন সবেমাত্র আই-এ দিয়াছে। দীর্ঘ অবকাশে, সে গিয়াছিল পিসীমার বাড়ী, অল্প দূরেই একটি গ্রামে, প্রসাদের বাবা মারা গিয়াছেন অনেক দিন, বিধবা মা আছেন, ঐ একটিই সন্তান—উহারই মুখ চাহিয়া। ছেলেও সব বিষয়ে ভাল, মায়ের নিতান্ত বাধ্য ছেলে। কিন্তু বিধাতা বাধ সাধিলেন। প্রসাদ দুদিন বিশ্রাম উপভোগ করিতে গিয়া এক অচিন্ত্যপূর্ব্ব বিপদে পড়িয়া গেল।

পিসীমার এক প্রতিবেশীর বাড়ী বিবাহ। বাড়ীর পাঁচজনের সঙ্গে সেও নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে গিয়াছিল। কিন্তু গিয়া দেখিল, বিবাহমণ্ডপ যুদ্ধক্ষেত্র হইয়া উঠিয়াছে। বরপক্ষ রীতিমত 'যুদ্ধং দেহি' বলিয়া সাজিয়া দাঁড়াইয়াছেন। কন্যাপক্ষ যথারীতি করজোড়ে মার্জ্জনা ভিক্ষা করিতেছেন। তৃতীয়পক্ষের পাণি-অভিলাষী পঞ্চাশবছরের টাকপড়া স্থূলবপু বর হঠাৎ টোপর- ও চাদর ফেলিয়া দিয়া গর্জ্জাইয়া উঠিলেন, কান্না রাখো, শুধু কথায় চিড়ে ভেজে না। টাকা কোথায়, টাকা? টাকার জোগাড় হয় নি ত বিয়ে দেবার সাধ কেন? জোচ্চোর কোথাকার!

কন্যাকর্ত্তা তাঁহার হাত ধরিয়া মিনতি করিলেন, বলছি ত মশাই, আজ জোগাড় হয়ে ওঠেনি, দুদিন পরেই দিয়ে দেব। দু'টো দিন সময় চাইছি বই ত নয়।

বিয়েও তবে সেইদিনই হবে। উঠে আয় সব,—বলিয়া বর প্রচণ্ড হুঙ্কারসহ উঠিয়া দাঁড়াইলেন ও সদলবলে প্রস্থানোদ্যত হইলেন।

কন্যাপক্ষে কান্নাকাটি পড়িয়া গেল। ক'নে পীড়ির উপর বসিয়া কান্নার আবেগে ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতে লাগিল। পাড়ার লোকে মধ্যস্থ করিতে আসিল, কত হাতে-পায়ে ধরিল, কত অনুনয়-বিনয় করিল, কিন্তু পণের টাকা সমস্ত না গুণিয়া পাইলে তাঁহারা কিছুতেই ফিরিবেন না, এমনই কঠোর প্রতিজ্ঞা। গোলমাল ক্রমেই বাড়িতে লাগিল। একটী যুবক হঠাৎ বলিয়া বসিল, টাকাই যদি দেবে, তবে তোমার মত এমন চামারের সঙ্গে বিয়ে দেবে কেন?

কথাটা হয় ত উত্তেজনার মুহূর্ত্তে মুখ ফস্‌কাইয়া বাহির হইয়া গিয়াছিল—কিন্তু সজ্জিত ইন্ধনে আগুন জ্বালো করিয়াই জ্বলিয়া উঠিল। বরপক্ষ টাকা আদায়ের জন্য মুখে যতটা আস্ফালন করিতেছিলেন, অন্তরে হয় ত, ততটা অসত তাহাদের ছিল না, বিশেষতঃ, বর স্বয়ং তৃতীয়পক্ষ লাভের এ-হেন সুযোগ নিতান্ত সহজে ছাড়িতেন না, কিন্তু আর তা হইল না। কন্যাদায় উদ্ধারার্থে শ্মশানযাত্রীকেও যদি আহ্বান করা হয়, তবে তিনিও রাজসম্মান পাইয়া থাকেন ইহাই বিধি, তাহার এতবড় ব্যতিক্রম! বরের এহেন অপমান! কল্পনা করাও কঠিন। বিস্তর গালাগালি করিয়া তাহারা সদর্পে চলিয়া গেল।

সামান্য এতটুকু সময়, ইহারই মধ্যে সমস্ত ওলোট-পালোট হইয়া গেল। এতখানি যে হইবে, তাহা কেহ ভাবে নাই। সকলেই মনে করিয়াছিল যে, যতই হোক ভদ্রলোক ত, যতই ভয় দেখাক্ কাজে কখনও করিতে

পারিবে না। সকলেই কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল—অন্তঃপুরের আনন্দগুঞ্জন বন্ধ হইয়া গেল, কন্যার মাতা মূর্চ্ছা গেলেন। কর্ত্তা কাঁদিয়া উঠিলেন—কি হবে?

এমন সময় এক অভাবনীয় ব্যাপার ঘটিয়া গেল। পাড়ারই জনকয়েক যুবক বিস্মিত প্রসাদকে টানিতে টানিতে আনিয়া বরের পীড়িতে বসাইয়া দিয়া হাসিমুখে বলিল, এই নিন মশাই, বর এনে দিলাম, রূপে, কুলে শীলে এমন আর পাবেন না।

প্রসাদের পিসেমশাই সোৎসাহে বলিলেন, এই ত চাই, এই ত উচিত কাজ। পণপ্রথার বিরুদ্ধে দেশের তরুণ তোমরা, দেশের ভবিষ্যৎ তোমরা, তোমরা যদি না দাঁড়াও তবে আর কে দাঁড়াবে? আমাদের এই সর্ব্বনাশী পণ-প্রথার হাত থেকে সমাজকে বাঁচাবার জন্য তোমাদেরই ত সাহসের সঙ্গে অগ্রসর হ'তে হ'বে। তোমরাই যে আমাদের আশা—। যুবকের দল জয়ধ্বনি তুলিল। বাড়ীর ভিতর হইতে হুলু ও শঙ্খধ্বনি দ্বিগুণ উৎসাহে আবার ধ্বনিয়া উঠিল। কন্যার মাতা ভূশয্যা ছাড়িয়া সানন্দে উঠিয়া বসিলেন—আর ক'নে বেচারী ভিজা চোখ দুইটি ভাল করিয়া মুছিয়া লইয়া অবগুণ্ঠনের ফাঁক দিয়া একবার চুরি করিয়া দেখিয়া লইবার চেষ্টা করিয়া আনন্দে হাসিয়া ফেলিল।

ব্যাপারটা এত তাড়াতাড়ি ঘটিল যে, এই গোলযোগে পড়িয়া প্রসাদ একটু প্রতিবাদ করিতেও অবসর পাইল না। কিন্তু মা যে এই ব্যাপারে কিরূপ ক্রুদ্ধ হইবেন, তাই ভাবিয়া মনে মনে নিতান্ত শঙ্কিত হইয়া উঠিল।

যাক্, যাহা ঘটিবার তাহা ত ঘটিয়া গেল। পরের দিন বর-ক'নে লইয়া পিসেমশাই ও পিসীমা রওনা হইলেন। প্রসাদের মাকে আগেই খবর পাঠানো হইয়াছিল। খবর পাইয়া তিনি অগ্নিমূর্ত্তি হইয়া উঠিলেন। আমার ছেলে আমি জান্‌লাম না, কোন হাবাতে হাঘরে মেয়ে তার ঠিক নেই। কেন, আমি তো এখন ও মরি নি। বলে, মার চেয়ে যার দরদ বেশী তাকেই বলে ডা'ন,—এ হোল তাই। বলে, আমার সই, অতবড় জমিদারের গিন্নী; মেয়ে রেখে বসে সাধছে, অমন লোকটা মুরুব্বী হবে দু'পয়সা দেবে থোবে—তা নয়, কোথা থেকে এ সর্ব্বনাশ ঘটালো! দেখি, কে ও বৌ ঘরে তোলে? ছেলের আমি আবার সেই মেয়ের সঙ্গেই বিয়ে দেব তবে আমার নাম—। জ্ঞাতি যা নিকটেই বসিয়াছিলেন, তিনি বলিলেন, তা কাজটা যখন হয়েই গেছে তখন আর রাগ করে কি করবে বল? দাক্ষায়ণী ঝঙ্কার দিয়া উঠিলেন—না রাগ করবো কেন? আনন্দ [illegible] ছেলের বিয়ে ও, আমার মতে তো কাজ হয় নি, ও বৌও আমি ঘরে তুলব না, যারা সখ করে করেছে তারা বিহিত করুক।

বর-ক'নে আসিল; তিনি উঠিলেনও না ঘরের বাহিরও হইলেন না। জ্ঞাতিরা গিয়াই কোন রকমে করণীয় নিয়ম-কার্য্য সমাধা করিলেন। প্রসাদের পিসীমা বলিলেন, বড় বৌ এল না। হাঁ, সে আসবে, যে আগুন হয়ে আছে। ভয় করছে বাপু, একটা কাণ্ড না করে বসে!

নতুন বৌ লইয়া পিসীমা ভ্রাতৃবধূর সন্ধানে গেলেন। প্রসাদ পলাইয়া বাঁচিল। দাক্ষায়ণী নির্ব্বিকার ভাবে আকাশের দিকে চাহিয়া দুয়ারের নিকট বসিয়া ছিলেন, পিসীমা বধূকে বলিলেন, তোমার শাশুড়ী—মা, প্রণাম কর।

বধূ প্রণাম করিল। দাক্ষায়ণী মুখ ফিরাইয়া থাকিলেন, চাহিয়াও দেখিলেন না।

একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া পিসীমা বলিলেন, পোড়া-কপালীর পোড়া কপালটাই তোমারও আগে চোখে পড়লো বড়বৌ? অঙ্গভরা এত যে রূপ, তা একবার চেয়েও দেখলে না।

দাক্ষায়ণী তেমনি নির্ব্বিকার ভাবে বসিয়া রহিলেন, কথা কহিলেন না।

পিসীমা দুঃখের সহিত বলিলেন, রাগ ক'রছ বড় বৌ, কিন্তু জেন ভাই, এ নিতান্ত ভগবানের কাজ, আমাদের এতে কোন হাতই নেই। আর এ হতভাগীর দুঃখের কথা যদি সব জানতে, তবে আর তোমার এ রাগ থাকতো না। ভেবেছিলাম, হয় ত এ হতভাগী এবার একটু সুখ পাবে—কিন্তু বিধাতা ওর অদৃষ্টে দেখছি তা লেখে নি।

পিসীমা আঁচল দিয়া চক্ষু দুইটি মুছিলেন। এবারে দাক্ষায়ণী কথা কহিলেন। সবিদ্রূপ জ্বালা ভরাস্বর, বলিলেন,—আমরা তো তোমার মত মহৎ লোক নই ভাই, কথায় কথায় পরের দুঃখে দরদ দেখিয়ে ইনিয়ে-বিনিয়ে কাঁদতেও জানিনে; কিন্তু বলি ভাই, তোমার নিজের বাবামরা ভাইপোটিকেই বা কোন বড় লোকটা দেখলে? বড় ঘরে বিয়ের ঠিক করেছিলাম,

অনাথা বিধবা আমি, আখেরে ভাল হবে বলে। তোমরা হিতৈষী সেজে এবার কোন হিতটা করলে শুনি ?

পিসীমা বলিলেন, দোষ দিচ্ছ, দাও। কিন্তু বলেইছি তো ভাই, এতে আমাদের কোন হাতই ছিল না। এ নিতান্তই বিধাতার নির্ব্বন্ধ। রাগ করিতে হয়, আমাদের ওপরই কর, এ অনাথা তোমার পায়ে এসে পড়েছে, একে কেন শাস্তি দিচ্ছ ?

দাক্ষায়ণী নির্লিপ্ত কণ্ঠে বলিলেন, ওর সেটা অদৃষ্ট। আমিও গরীব অনাথা, তোমাদের মত পরের ওপর দয়া দেখিয়ে, নিজের ছেলের সর্ব্বনাশ করতে তো আর পারিনে। ছেলের আমার সেইঘরেই আবার বিয়ে দিতে হবে।

বধূ সব শুনিল—চোখের জল ফেলিয়া কোলের মাটি ভিজাইয়া ফেলিল কিন্তু অধৈর্য্য হইল না। বাপ নাই, মামার বাড়ী সে ও তাহার মা থাকে। মামা লোক মন্দ নন্, ভগ্নীর জন্ত দুঃখ বোধ করেন, কিন্তু প্রতিকার করিবারও সাধ্যও নাই সামর্থ্যও নাই। দ্বিতীয় পক্ষের সংসার, দু চারটি অপোগণ্ড আছে কিন্তু সামর্থ্য নাই। দুঃখ, জ্বালা সহ্য করা তাই আবাল্য অভ্যাস।

ফুলশয্যার রাত্রি। আনন্দ উচ্ছ্বাস নাই, উৎসাহও কাহারও নাই,উৎসব করিবারও কেহ নাই। নিতান্ত নিয়মরক্ষার ব্যাপার। রাত্রি প্রায় দুইটা বাজিয়া গিয়াছে। প্রসাদ এই দু'দিনই পলাইয়া কাটাইয়াছে। কলিকাতাতেই পলাইয়া যাইত, নেহাৎ পিসে-ম'শাইএর জন্ত পারে নাই। আজও পিসে-ম'শাইই খুঁজিয়া আনিয়া তাহাকে ঘরে দিয়া বাহির হইতে শিকল তুলিয়া দিয়া গিয়াছেন। বন্ধ ঘরে পড়িয়া প্রসাদ বড়ই অস্বস্তি বোধ করিতে লাগিল। ছোট ঘর, অদূরেই খাটের উপর একটি অপরিচিতা মেয়ে শুইয়া আছে – যাহার জন্ত তাহার এত অশান্তি, এত নিগ্রহ। কি যে করিবে কিছুই সে ভাবিয়া পাইতেছিল না। চারিদিকে চাহিল, কিন্তু ঘরে এমন কিছুই পাইল না, যাহাতে শুইয়া সে রাতটুকু কাটাইতে পারে। অগত্যা আলোটা নিভাইয়া দিয়া গুটিগুটি হইয়া সে বিছানার এক পাশে শুইয়া পড়িল। শুইল বটে কিন্তু ঘুম আসিল না, তাহার বড় অসুবিধা বোধ হইতে লাগিল। খানিকক্ষণ কাটিয়া গেল হঠাৎ অড়ভড়্প-বৎ শায়িতা মেয়েটি পাশ ফিরিল। মাথার কাপড় তখন তাহার খসিয়া পড়িয়া সুন্দর মুখখানি সম্পূর্ণ দেখা যাইতেছে। করুণ হাসিয়া অসঙ্কোচে বলিল, "আমার জন্ত আপনার বড় কষ্ট হোল, না ?"

প্রসাদ অবাক হইয়া গেল, কথা বলিতে পারিল না। এ বিষয়ে তাহার কোন অভিজ্ঞতা দূরে থাক, সামান্ত ধারণাও নাই। বয়সের চেয়েও সে অনভিজ্ঞ, তবে মেয়েটির সঙ্কোচ-ভয়হীন আচরণ তাহাকে খুবই আশ্চর্য্য করিল। মেয়েটির উপর তাহার এতাবৎ রাগই হইতেছিল। বেশ ছিল সে— নিশ্চিন্ত, নিরুপদ্রব জীবন ; মাঝখানে অকস্মাৎ কোথা হইতে এই দুষ্টগ্রহ উদয় হইল। ইচ্ছা হইতেছিল উত্তর দেয়, 'হয়েছেই তো' কিন্তু কিছুই বলিল না। কিছুক্ষণ চুপচাপ কাটিয়া গেল। মেয়েটিই আবার কথা বলিল। গলার স্বর ভারি, বোধ হয় এতক্ষণ কাঁদিতেছিল, আস্তে আস্তে বলিল, আমার মার বড় কষ্ট, আমায় যদি আপনারা তাড়িয়ে দেন, মা আমার আর বাঁচবে না ; আমি আপনাদের দাসী হয়ে থাকবো—বলিতে বলিতে অশ্রুর আবেগে তাহার কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হইয়া গেল।

প্রসাদের করুণা হইল। নিজের আকস্মিক মর্য্যাদাবৃদ্ধির অনুভূতি এই তাহার প্রথম জাগিল, সে এতকাল সকলের ছোট হইয়াই কাটাইয়াছে। এই যে কিশোরী মেয়েটী আজ তাহারই কাছে একান্ত দীনভাবে একটু আশ্রয় ভিক্ষা করিতেছে, তাহাকে সম্ভ্রম করিয়া কথা বলিতেছে, এ তাহার নেহাত মন্দ লাগিল না। সদয় কণ্ঠে বলিল,—তা, আমি কি করবো বল—মাকে বলে দেখো।

মেয়েটি একটি নিঃশ্বাস ফেলিল। অন্ধকারে সে নিঃশ্বাস প্রসাদের গায়ে লাগিল। এতক্ষণ মেঘ করিয়াছিল। এতক্ষণে মেঘ কাটিয়া যাওয়ায় অনেক বিরহ-মিলনের সাক্ষী চাঁদ শিয়রের জানালা দিয়া এই বিচিত্র বাসর-রজনীর অভিসার-কক্ষে সহাস্যে উঁকি দিয়া চাহিলেন। সেই জ্যোৎস্নাতেই কিংবা সেই রাতটিতেই কি একটু মাদকতা ছিল যে, প্রসাদ সহসা সাহসী হইয়া উঠিল। তাহার শিথিল একখানি হাত নিজের হাতের মধ্যে তুলিয়া লইয়া সস্নেহে বলিল,—তোমার নাম কি ?

জলভরা চোখে হাসি ফুটাইয়া বধূ বলিল,—চাঁপা।

প্রসাদও হাসিমুখেই বলিল, বেশ নাম।

ইহার পর আলাপ আর জমে নাই। সেই হাতটি হাতের মধ্যে লইয়াই প্রসাদ কখন ঘুমাইয়া পড়িল এবং অবশেষে দেখা গেল, সদ্য মাতৃকোলছাড়া ভীরু বালিকাটিও কখন প্রসাদের একান্ত সন্নিকটে সরিয়া আসিয়া তাহার গায়ের উপর একখানি হাত তুলিয়া দিয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছে।

পরের দিন ভোরে, দাক্ষায়ণী আসিয়া সবেমাত্র উঠানে দাঁড়াইয়াছেন, চাঁপা আসিয়া তাঁহার পা চাপিয়া ধরিয়া বলিল, আমায় আপনি তাড়িয়ে দেবেন না মা।

দাক্ষায়ণী তাহার এতখানি স্পর্দ্ধা দেখিয়া অবাক হইয়া গেলেন। এ দু'দিনের মধ্যে তিনি তাহার মুখ পর্য্যন্ত দেখেন নাই। সজোরে পা ছাড়াইয়া লইয়া তিক্তকণ্ঠে বলিলেন, আ-মর আদিখ্যেতা দেখ না। তাড়িয়ে দেব কেন—মাথায় করে নাচব! বাপ তোমার কোঠা-বালাখানা তুলে দিয়েছে কি না, তাই।

বৌ তবু পা ছাড়িল না। পর পর ঐ এক কথাই বলিতে লাগিল।

মরামানুষ যাহাতে কথা বলে এমন অনেক কথাই দাক্ষায়ণী বলিলেন, কিন্তু চাঁপা যেন পাথর, কোন কথাই যেন তাহার কানে প্রবেশ করে না। এক ঘেয়ে সুরে একভাবে সে এক কথাই আওড়াইয়া যাইতে লাগিল। সহসা সেই প্রভাতের নির্ম্মল আলোকে সেই অশ্রুপ্লাবিত সুন্দর মুখখানি দাক্ষায়ণীর মনের কোথায় যেন বাজিল, নিজের একটি নির্য্যাতিতা মৃতা মেয়ের সাদৃশ্য কেমন করিয়া যেন ইহার মধ্যে তিনি খুঁজিয়া পাইলেন। মনটা নরম হইয়া পড়িল। তবু তেমনি কঠোর সুরেই বলিলেন—ভাল আপদ হোল! সে যা হয় হবে'খন, এখন পা ছাড়, আর জ্বালাস্ নে।

প্রসাদ সেই দিনই কলিকাতায় চলিয়া গেল। বৌ রহিয়া গেল। প্রতিবেশীদিগকে দাক্ষায়ণী বলিয়া বেড়াইলেন, থাকতে চায় থাক, পেটে খেয়ে কাজকর্ম্ম করুক কিন্তু ছেলের আমি বিয়ে আবার দিবই।

দুইটি বছর কাটিয়া গিয়াছে। প্রসাদ ইহার মধ্যে খুব কমই বাড়ী আসিয়াছে। মধ্যে মধ্যে দু'চার দিনের জন্য যখন বাড়ী আসিয়াছে, বাহিরে বাহিরেই প্রায় কাটাইয়াছে। রাত্রেও বাহিরের ঘরেই প্রায় শুইয়াছে, বৌকেও দাক্ষায়ণী এমনই চোখে চোখে রাখিয়াছেন যে, চোখের দেখা একটু দেখিবার অবসরও পায় নাই। কেবল একটি দিন কেমন করিয়া একটু সুযোগ ঘটিয়া গিয়াছে। দুপুর বেলাটা খাওয়া-দাওয়া সারিয়া প্রসাদ পাশের বাড়ীতে তাসের আড্ডাতেই পড়িয়া থাকিত; সেই জানিয়া আহারান্তে দাক্ষায়ণী কোন প্রতিবেশীর বাড়ী গিয়াছিলেন। প্রসাদ আসিয়া পড়িল, বলিল, একগ্লাস জল দাও তো মা।

মা বাড়ী নাই। চাঁপা কি করিবে ভাবিয়া পাইল না। অনেক ইতস্ততঃ করিল কিন্তু নিশ্চেষ্ট থাকিতে পারিল না। জলের গ্লাসটা হাতে লইয়া ভীতপদে সঙ্কুচিত মনে প্রসাদের নিকট উপস্থিত হইল।

প্রসাদ অন্যমনস্ক হইয়া দাঁড়াইয়াছিল, সহসা চাঁপাকে দেখিয়া অপ্রতিভ ভাবে বলিল, তুমি? মা কোথায়?

বাড়ী নেই।

ও। আর কোন কথা নাই।

চাঁপা সসঙ্কোচে জিজ্ঞাসা করিল, শরীর ভাল আছে?

হাঁা।

আবার নিস্তব্ধতা। চাঁপা ইতস্ততঃ করিয়া আবার জিজ্ঞাসা করিল, এখন থাকবেন?

না। প্রসাদ মাথা নাড়িয়া উত্তর দিল।

এমন হাঁা ও না'র ভিতর এক তরফা কতক্ষণ কথা বলা চলে, চাঁপার কান্না আসিতে লাগিল। প্রসাদের কি তাহার সহিত এতটুকু মুখের কথা কহিতেও নাই। তাহার সম্বন্ধে প্রসাদের কি এতটুকু কৌতুহল নাই! যাহাকে হাত ধরিয়া এবাড়ীতে লইয়া আসিয়াছে তাহার বিষয়ে এতটুকু দায়িত্বও কি নাই! কি এত অপরাধী সে!

প্রসাদ নির্ব্বিকার মুখে জামা গায়ে দিয়া বাহিরে চলিয়া গেল। আজিকার সেই সুযোগটুকুর সদ্ব্যবহার করার কোন ইচ্ছা যে তাহার ছিল তাহা তাহার গমনভঙ্গী প্রকাশ করিল না বরং মনে হইল, সে যেন পলাইয়া রক্ষা পাইতেছে চাহিতেছে। চাঁপা দুয়ার ধরিয়া দাঁড়াইয়া যতদূর চোখ যায় প্রসাদের পানেই চাহিয়া রহিল। তাহার নির্ব্বিকার মন উথলাইয়া উঠিয়া অজস্র ধারে তার দুই গাল বাহিয়া ঝরিয়া পড়িতে লাগিল।

এই অগ্রহায়ণেই দাক্ষায়ণী প্রসাদের আবার বিবাহ দিবেন স্থির করিয়াছেন। বড়লোকের মেয়েকে বিবাহ

করিয়া প্রচুর ধন-সম্পদ লাভের অপূর্ব্ব সুযোগ ও নিজের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের সুখ-স্বপ্ন গরীবের ছেলে প্রসাদকেও প্রলুব্ধ করিয়াছে। ভাব-বিলাস বাস্তব জগতে চলে না। চাঁপাকে সে বিবাহ করিয়াছে বটে কিন্তু সে বিবাহে তাহার দায়িত্ব কতদূর, এ বিষয়ে প্রসাদ নিজের মনে যথেষ্ট বাদানুবাদ করিয়াছে। স্বেচ্ছায় দায়িত্ব লইব বলিয়া সে কিন্তু যায় নাই এবং সেই সময় কেহ তাহার মতামতও জিজ্ঞাসা করার প্রয়োজন বোধ করে নাই। বিপন্নের দায়—পাঁচজনে জোর করিয়া তাহার ঘাড়ে চাপাইয়াছে এবং সেইটাকেই পরম সত্য বলিয়া ধরিয়া লইলে উন্নতির এই সুলভ সুযোগটুকুকে হারাইতে হয় এবং ইহার ফলে ভবিষ্যতে অন্নবস্ত্রের সংস্থানটুকু যে তাহার পক্ষে কঠিন হইয়া উঠিবে না, তাহাও বলা যায় না। সাত পাঁচ ভাবিয়া দেখিলে, এ সুযোগ পরিত্যাগ করা—নিতান্ত মূর্খতা বলিয়াই তাহার ধারণা হইয়াছে। আর, বাস্তবিক চাঁপার প্রতি এমন আর কি অবিচার সে করিতেছে। পিতামহের বয়সী ঐ বরটীর হাত ধরিয়া যে সংসারে প্রবেশ করিয়া পিতার বয়সী যে সকল পুত্রদের জননী সাজিয়া তাহাকে বাস করিতে হইত, সে সংসার কি তাহার ইহার চেয়ে কোন অংশে শ্রেয়ঃ হইত। তার হাত হইতে উদ্ধার করিয়াছে প্রসাদ, অম্লান মুখে অন্নবস্ত্র দিতে প্রস্তুত আছে; চিরজীবনের জন্য, তবু তাহার অসন্তুষ্ট বা অসুখী হইবার কি কারণ থাকিতে পারে, প্রসাদ তাহা ভাবিয়া পায় না। তা ছাড়া, সর্ব্বোপরি, মাতার এ আদেশ মানিয়া না চলিলে তাহার সংসারে বাস করাই কঠিন হইয়া উঠিবে হয় ত'।

পূজা আসিয়াছে। শরতের আকাশে, বাতাসে, ঝরা শেফালীতে, প্রস্ফুটিত পদ্মে, পাখীর গানে, ঝলমল করা দিনগুলিতে কি যে এক মাদকতা আছে! পথের ভিখারীও তাহাতে পুলকিত হইয়া উঠে। নিখিলভুবন আসন্ন উৎসবের আয়োজনে মত্ত, চারিদিকে বিচিত্র রঙের অপূর্ব্ব সমারোহ, আনন্দ সাগর কোথাও উত্তাল হইয়া উঠিয়াছে এবং তারই ঢেউ প্রত্যেক নরনারীর মনে একটা দোলা দিয়া যাইতেছে। কলেজ বন্ধ। প্রসাদ বাড়ী আসিয়াছে। বাহিরের ঘরে সেদিন রাত্রে সে শুইয়াছিল। ভোর তখন হয় নাই, সবে মাত্র রাতের ঘোরটা কাটিতেছে, চাঁদ তখন পশ্চিম আকাশে চলিয়া পড়িতেছে। প্রসাদের কি যেন একটা শব্দে হঠাৎ ঘুমটা ভাঙিয়া গেল। চোখ মেলিয়াই দেখিল, সামনের জানালাটার গরাদ ধরিয়া চাঁপা দাঁড়াইয়া আছে। সে তাকাইতেই হাতের ইসারা করিয়া চাপা গলায় চাঁপা ডাকিল, একবার বাইরে আসুন—প্রসাদ অতিশয় আশ্চর্য্য হইয়া গেল —এমন ভাবে যে চাঁপা তাহার নিকটে আসিতে পারে, তাহা সে কল্পনাও করিতে পারে নাই। সে ক্ষণকাল বিমূঢ় হইয়া বসিয়া রহিল। দুই বৎসরের মধ্যে একদিনের সামান্য দুইটা মুখের কথা ব্যতীত যাহার সহিত কোন পরিচয় তাহার হয় নাই, বা করিবার ইচ্ছাও তাহার মনে জাগে নাই, আজ উপযাচিকা হইয়া তাহার নিকটে আসিয়াছে এই শেষ রাত্রির নিস্তব্ধ অন্ধকারে,—অন্দর হইতে বাহির-বাড়ীতে। সরম-জড়িতা ভীরু বালিকা কোথা হইতে এত সাহস পাইল?

ক্ষণকাল পরে, সে চোখ তুলিতেই দেখিল, চাঁপা যেন শঙ্কিত অসহিষ্ণু হইয়া উঠিয়াছে। ব্যাকুল মিনতিপূর্ণ কণ্ঠে সে আবার বলিল,—শুনুন না। প্রসাদ সে মিনতি অবহেলা করিতে পারিল না। নিঃশব্দে দুয়ার খুলিয়া চাঁপাকে অনুসরণ করিল। পুকুরের দিকটা নির্জ্জন। সেইখানে—সেই করবী গাছটার নিকটে আসিয়া চাঁপা দাঁড়াইল; প্রসাদকে বলিল বসুন—প্রসাদ, যন্ত্রচালিতের মত, সেই ঘাটের রাণার উপর বসিয়া পড়িল। চাঁপা সেই করবী গাছটার দুইটি ডালে হাত দিয়া গাছটাকে অবলম্বন করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। কতক্ষণ চুপচাপ কাটিয়া গেল, কেহই কথা বলিল না। চাঁপা হয়ত আশা করিয়াছিল, এ মৌনতা প্রসাদই ভঙ্গ করিবে কিন্তু তাহা হইল না দেখিয়া সে-ই প্রথম কথা বলিল, নিতান্ত দ্বিধাজড়িত কণ্ঠস্বর—আপনাকে ডাকলাম বলে রাগ করছেন?

প্রসাদ যেন তৃতীয় ব্যক্তি কৌতূহলভরে একটি রহস্যময় ঘটনার সমাপ্তি দেখিতেছে। সে নীরস কণ্ঠে বলিল,—'না'—

কাল মা আমায় পাঠিয়ে দেবেন, আর হয়ত দেখা হবে না।—বলিয়া একটু চুপ করিল, বোধ হয় কান্না সামলাইতে।—তারপর আস্তে আস্তে বলিল, আমায় নিয়ে আপনার বড় কষ্ট গেল, এবারে নিশ্চয় আপনি সুখী হবেন।

প্রসাদ কোন কথাই বলিল না।

চাঁপা এবার আস্তে আস্তে তাহার সন্নিকটে আসিয়া দাঁড়াইল। তারপর বিস্মিত প্রসাদের দুইটি হাত সজোরে চাপিয়া ধরিয়া উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলিল, "তখন তুমি কি আমায় একেবারে ভুলে যাবে, বল? বল? কখনও কোনদিনই কি একটিবারের জন্যও মনে পড়বে না?"

শেষের দিকে তাহার কথাগুলি কান্নায় একেবারে ডুবিয়া গেল এবং সেইখানে সেই মাটীর উপর বসিয়া পড়িয়া উচ্ছ্বসিতভাবে সে কাঁদিতে লাগিল। প্রসাদ তাহার এ ব্যাকুলতা দেখিয়া চঞ্চল হইয়া উঠিল। এমন ভাবে তাহার পদতলে পড়িয়া একটি নিরুপায় বালিকাকে কাঁদিতে দেখিয়া তাহার মনটাও পরম স্নেহে ভরিয়া উঠিল এবং নিজের সঙ্কল্প ত্যাগ করার মত দুর্ব্বলতাও তাহার মনে উঁকি দিতে আরম্ভ করিল। চাঁপার একটি হাত ধরিয়া তাহাকে উঠাইবার চেষ্টা করিতে করিতে সে কি বলিতে যাইতেছিল, এমন সময় কোথায় যেন দুয়ার খোলার শব্দ হইল। চাঁপা চমকিয়া উঠিয়া বসিল। এত স্বামী-স্ত্রীর নিভৃত আলাপন নয়, এ চাঁপার অনধিকার প্রবেশ! শব্দটা আবার শোনা যাইতেই বাণবিদ্ধা হরিণীর মত চাঁপা পলাইয়া গেল। প্রসাদও আবার গিয়া শুইয়া পড়িল।

বিছানায় পড়িয়া খানিকক্ষণ এই সব কথা ভাবিতে ভাবিতে প্রসাদ আবার ঘুমাইয়া পড়িল এবং ভোরের ঘুম বলিয়া উঠিতে তাহার অনেক বেলা হইল। যখন তাহার ঘুম ভাঙ্গিল, তখন বাড়ীতে ভয়ানক হুলুস্থূল ব্যাপার চলিতেছে। সে চোখ রগ্‌ড়াইতে রগ্‌ড়াইতে বাহিরে আসিয়া শুনিল, চাঁপাকে পাওয়া যাইতেছে না।

কথা ছিল, প্রসাদকে আজ কন্যাপক্ষ হইতে দেখিতে আসিবে, সেইজন্য চাঁপাকে তাহার বাপের বাড়ী পাঠানো হইবে এবং তারপর বিবাহটা সম্পন্ন হইয়া গেলে যদি প্রয়োজন হয়, তবে আবার না হয় আনা হইবে। কিন্তু এই ভাবে চাঁপাকে অন্তর্দ্ধান করিতে দেখিয়া, সকলে আশ্চর্য্য হইয়া গেল, কেন না, এভাবে যে সে কোথাও যাইতে পারে, তাহা কাহারও ধারণায় আসে না। পাঁচজনে পাঁচশ' কথা বলিতে লাগিল। ব্যাপার ক্রমেই জটিল হইয়া উঠিতে লাগিল।

প্রসাদ শুনিয়াই শিহরিয়া উঠিল। তাহার মনে কোথায় যেন প্রচণ্ড ভাবে আঘাত লাগিল। তাহার অবিবেচনায়, হৃদয়হীনতায় যে সে চাঁপাকে এই ভাবে পথে বাহির করিয়াছে, এই ভাবিয়া তাহার নিদারুণ অনুশোচনা জাগিল। ভোর রাত্রের কথাগুলিও ছাঁৎ করিয়া তাহার মনে পড়িয়া গিয়া তাহার মনটা তোলপাড় করিয়া উঠিল। শুষ্কমুখে ইতস্ততঃ অনেকক্ষণ সে খুঁজিয়া বেড়াইল, কিন্তু কোথাও কোন সন্ধান পাইল না।

সকাল হইতে মুখে জল পড়ে নাই। বেলা অনেক হইয়া গিয়াছে দেখিয়া সে ঘাটে মুখ ধুইতে গেল। উদাস মনে, অন্যমনস্ক ভাবে সে সিঁড়ি বাহিয়া নামিতেছিল, হঠাৎ তাহার নজরে পড়িল ঘাটের অদূরেই কাপড়ের মত কি যেন একটা খুঁটার সহিত জড়াইয়া আছে। উদ্বেগ-ব্যাকুল হৃদয়ে প্রসাদ জলে ঝাঁপাইয়া পড়িল এবং অনেকক্ষণ জল তোলপাড় করিয়া যখন সেই হিমশীতল দেহখানি বুকে করিয়া সে পাড়ে উঠিল, তখন সে আশ্রয়ের আর তাহার প্রয়োজন ছিল না। অবহেলিতা উপেক্ষিতা মেয়েটি তখন আপন আশ্রয় খুঁজিয়া লইয়াছে।

কাঁটা সরিয়া গেল, তবু পথ পরিষ্কার হইল না। প্রসাদ আর সেখানে বাস করিতে পারিল না। প্রত্যহ তেমনি সময়—সেই দিবস ও রজনীর অপূর্ব্ব সন্ধিক্ষণে কে যেন তাহাকে বড় ব্যাকুল ভাবে ঐ কথাই জিজ্ঞাসা করে—"আমায় কি তুমি ভুলে যাবে? কখনও কি মনে করবে না? বল? বল? বল?"

অবহেলিতা কিশোরী উপযাচিকা হইয়া প্রিয়তমের মুখের যে কথাটি শুনিতে চাহিয়াছিল, আজ জীবনের পরপারে গিয়াও সে কথা শুনিবার সাধ বুঝি তাহার মেটে নাই।

প্রাচীন বাঙলা কাব্যে ভোজনবিলাস ও রন্ধন-বিজ্ঞান

—শ্রীস্বদেশরঞ্জন চক্রবর্ত্তী

প্রাচীন বাঙলার কাব্যগ্রন্থাবলীর মধ্যে বিশেষভাবে মঙ্গলকাব্যগুলিতে সমসাময়িক যুগের ভোজনবিলাস রন্ধন-বিজ্ঞানের সমধিক পরিচয় পাওয়া যায়। নৃপতিগণের অন্তঃপুর হইতে আরম্ভ করিয়া নিতান্ত দরিদ্রের পর্ণকুটীরেরও দৈনন্দিন আহার্য্যসামগ্রীর সংবাদসমূহ তদানীন্তন কবিগণ স্ব স্ব কাব্য-মধ্যে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। এই সকল কবির সময়ে বাঙলার সমাজে কিরূপ খাদ্যসম্ভারের প্রচলন ছিল, তখনকার জনগণ সাধারণতঃ কিরূপ আহার্য্য-সামগ্রী প্রস্তুত করিত, বা করিতে পারিত, তাহার অতি উৎকৃষ্ট নিদর্শন এই কাব্যগুলিতে বর্ত্তমান প্রবন্ধে এই সকলের পরিচয় প্রদান করিতে তৎপর হইলাম।

প্রাচীন বাঙলার ধনাঢ্য ব্যক্তিগণের ভোজনাদি যথেষ্ট আড়ম্বরপূর্ণ ছিল। অধিকাংশ কাব্যগ্রন্থেই পঞ্চাশ ব্যঞ্জনের উল্লেখ পরিদৃষ্ট হয়।

"ওদন পায়স পিঠা পঞ্চাশ ব্যঞ্জন মিঠা
অবশেষে ক্ষীরখণ্ড কলা।
(কবিকঙ্কণ চণ্ডী)

"স্বামীকে দিলেক অন্ন পঞ্চাশ ব্যঞ্জন।"
"পরিপাটি পাঁচ পিঠা পঞ্চাশ ব্যঞ্জন।"
(ঘনরাম কৃত ধর্ম্মমঙ্গল)

"পঞ্চাশ ব্যঞ্জন অন্ন পাক হইল পরিপূর্ণ
পায়স পিষ্টক নানা জাতি।"
(শিবায়ন)

"পঞ্চাশ ব্যঞ্জন অন্ন ঘৃত মধু দধি।"
(শিবায়ন)

"নিরামিষ আমিষ রান্ধে পঞ্চাশ ব্যঞ্জন।"
(বিজয় গুপ্ত কৃত মনসামঙ্গল)

"সুপক্ক অন্ন সহ পঞ্চাশ ব্যঞ্জন।"
(কৃত্তিবাস)

গোপাল উড়ের গানের মধ্যেও "পঞ্চাশ ব্যঞ্জনের" উল্লেখ বর্ত্তমান।

"পঞ্চাশ ব্যঞ্জনের উপর
দুধের উপর চিনি দিলে।"
"নানাবিধ আয়োজন রেঁধে পঞ্চাশ ব্যঞ্জন
ভোজন করতে কর বারণ
এ কেমন রীতি।"

অবশ্য কোন স্থলেই "পঞ্চাশ ব্যঞ্জনের" পরিপূর্ণ রন্ধন-প্রণালী দৃষ্টি গোচর হয় না। কিন্তু রন্ধন উপকরণের যে তালিকা দেখিতে পাওয়া যায় তাহাই যথেষ্ট। এই প্রসঙ্গে ধনপতি সদাগরের ভোজনতালিকা উল্লেখযোগ্য।—

"সুবর্ণের বাটিতে দুর্ব্বলা দেয় ঘি।
হাসিয়া পরশে রামা রসিকের ঝি॥

*

প্রথমে সুকুতা আনি দিল ঘণ্ট শাক।
প্রশংসা করয়ে সাধু ব্যঞ্জনের পাক॥
ঘৃতে ভাজা খণ্ডে দিল কিছু ফুলবড়ি।
পাখা ধরি বাতাস করয়ে দুর্ব্বা চেড়ি॥
ভাজা, মীন, ঝোল, ঘণ্ট, মাংসের ব্যঞ্জন।
গন্ধে আমোদিত দৈল ভোজন-ভবন॥ (কবিকঙ্কণ)

লহনা ও খুল্লনার ভোজনকালেও দেখিতে পাই,—

"রন্ধন করিতে খুল্লনার হইল ত্বরা।
ঘণ্টে পুরিয়া রাখে কুড়িয়া পাথরা॥
কটু তৈলে রুই মৎস্য ভাজে গণ্ডা দশ।
মুঠে নিচোড়িয়া তাহে দিল আদারস॥
খণ্ডে মুগের সূপ উত্তারে ভারয়ে।
আচ্ছাদন দিল থাল তাহার উপরে।

*

পঞ্চাশ ব্যঞ্জন অন্ন করিয়া রন্ধন।
প্রেমালাপে দু'সতীনে করিলা ভোজন॥" (কবিকঙ্কণ)

মাধবাচার্য্যকৃত চণ্ডীকাব্যেও এইরূপ ভোজনের বর্ণনা আছে।—

"পাচক আলায় রামা মনের হরিষে।
শাক রন্ধন করি ওলাইল বিশেষে॥
উমা বড়ি ভাজি রাখে ঘৃতেতে আগল।
জাতিকলা দিয়া রাখে খুনা নারিকেল॥
জলপাই অম্বল রাখে মহা হৃষ্ট হয়্যা।
সজারি ওলাইল তারে শস্তপোড়া দিয়া॥
নিরামিষ ব্যঞ্জন রামা থুইয়া এক ভিত।
আমিষ রান্ধিতে লহনা দিল চিত॥

মনের হরিষে রান্ধে রোহিতের মাছ।
উরিচা বিশালে রান্ধে চুরিতা আনাচ॥
বড় বড় কই মৎস্য রান্ধয়ে হরিষে।
সুগন্ধি তণ্ডুলে অন্ন রান্ধে অবশেষে॥"

ঘনরাম চক্রবর্ত্তীও পঞ্চাশ ব্যঞ্জন পরিবেশন করিয়াছেন কিন্তু অন্যান্য পূর্ব্ববর্ত্তী কবিদের মত তিনি পঞ্চাশ ব্যঞ্জনের তালিকা দেন নাই।—

শাক সূপ সম্বোল সুকুতা সুধাম।
বেসারে বেষর ঘণ্টে সুরসাল কাল।
পরিপাটি পাঁচভাজা পুরটের থাল॥
আলু ওল পটল পলস পানিফল।
কদলি করলা কচু কুষ্মাণ্ড কমল॥
মজা কলা ভাজা তেলে ঘৃতে টসমস।
ক্ষীরখণ্ড পায়স পিষ্টক পাঁচ রস॥

*

পরিপাটি বাটি বাটি পঞ্চাশ ব্যঞ্জন।

সেকালে বাঙলা দেশে আতিথেয়তা একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল। রামায়ণ, মহাভারতে আতিথেয়তার অন্ত নাই। অনুরূপ একটি আতিথেয়তার কাহিনী ধর্ম্মমঙ্গলে দেখিতে পাওয়া যায়। রাজা হরিশ্চন্দ্র পুত্রের মাংস দ্বারা অতিথিসৎকার করিতেছেন। রাণী মদনা নিজহস্তে আপন পুত্র লুহার মাংস কাটিয়া রন্ধন করিতেছেন।

"সুপক সম্বোল মাংস রূপার ডাবরে।
ঢালিয়া সোনার থাল ঢাকিল উপরে॥
উড়িচুর্ণ মাথার মজ্জার তোলে বড়া।
বুকের কলিজা ভাজে চড়াইয়া কড়া॥
নাড়া চাড়া দিয়ে ভাজে ঘৃতে করকর।
পরিপাটি মাংসের রন্ধন হইল সব॥
অপর উত্তম অন্ন করিল রন্ধন।
পরিপাটি পাঁচপিঠা পঞ্চাশ ব্যঞ্জন॥"

আতিথেয়তার নিমিত্ত নিতান্ত শোকাকুল অবস্থায়ও এই রন্ধন সম্ভব হইয়াছে। ঘনরাম পুত্রের মাংস রন্ধনের বর্ণনা দিয়াই প্রসঙ্গ শেষ করিয়াছেন। কিন্তু মাণিক গাঙ্গুলী আর একটু বেশী করিয়াছেন। তিনি মদনাকে দিয়া শাক, সূপ ইত্যাদিও রন্ধন করাইতে ছাড়েন নাই। মাণিক গাঙ্গুলীর রচনায় দেখা যায়,—

"প্রথমে রান্ধিলা শাক সুক্তা ভারপায়।
সূপে দিয়া তেজপত্র সম্বরে সত্বর॥
ছওয়াকি সহিত ভাজা কটু কটিরক।
সিদ্ধ করে মুদ্গ ভাজিয়া দিল টক॥
কাঠিবল পানিফল অল্প আর কত।
পৃথক পৃথক ভোজ করিল প্রস্তুত॥
রোহিত মৎস্যের মুণ্ড যতনে রান্ধিলা।
রান্ধিল "লুহার" মাংস রোদন করিয়া॥"

মাণিক গাঙ্গুলীর সময়ে শাক-সুক্তা ভোজনের অপরিহার্য্য অঙ্গ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। আর একটি আতিথেয়তার বর্ণনা পাই সুরিক্ষার আলয়ে। সুরিক্ষা বারবনিতা হইলেও চণ্ডীর অনুগ্রহের পাত্রী। লাউসেনের অসম্ভব রন্ধনাবলী চণ্ডীর কৃপাবলে পাক করিয়া দেন।—

"চণ্ডী ভোগ চটপট চড়াইয়া পাক।
সরস করিল সুক্তা সুশনির শাক॥
সম্বরিয়া সূপ ঢালে স্বর্ণ ডাবরে।
বার্ত্তাকু বকল ভাজে বেসারির পরে।
পটল পানিফলে ভাজে আর পলাকড়ি।
দুগ্ধ গুড় দিয়া ভাজে অমৃত বড়ি॥"—মাণিক গাঙ্গুলী

ঘন রামের ধর্ম্মমঙ্গলে সুরিক্ষার রন্ধনের আর একটু দীর্ঘ তালিকা পাই।

"রন্ধনে বসিল মনে ভবানী ভাবনা।
প্রথমে রান্ধিল শাক, সূপ, মুগ চনা॥
জলের শিঙ্গালা আলে আলে দুধ দুধ।
ব্যঞ্জনে রন্ধনে জীরা মরিচ কর্পূর॥
সুরসাল দিয়া ঝাল হেমথালে ঢালে।
তবে রান্ধে বেসার ব্যঞ্জন ঝোলে ঝালে॥
মন্দ মন্দ আলে বালে মনে ভাজে ভাজা।
কলজী পটল ওল ব্যঞ্জনের রাজা।
কুটে রাখে নারিকা লবণ মাখি খালে।
নির্ম্মল করিয়া রাখা তপ্ত ঘৃত ঢালে॥
ঘন সময়ে ঘৃতের শুনি সাড়া।
নীরস করিয়া ভাজে দিয়া নাড়াচাড়া॥
মানকচু কুষ্মাণ্ডী হরিদ্রা সব।
ফল মূল ভাজে কত ঘৃত জবজব॥
ভাজিল বেগুন শীম নিম দিয়া বোঁড়।
মুগ আদা বড়িকা করলা গর্ভথোড়॥
নারিকেল অপক পনস পানিফল।
বিশেষ সতীর কন্যা হরিদ্রা নির্ম্মল।
কদলী অপর অনেক ভেজে ভেজে।
তিক্ত রসে সুক্তা রাখা রান্ধে ঝোলে ঝোলে॥

বার তিন তিক্ত হাঁড়ি ধুয়ে সীমন্তিনী।
আমের অম্বল রান্ধে দিয়া দধি-চিনি॥
সকাল বকাল কত মিছরি মিশাইয়া।
দুগ্ধধারি ক্ষীর করি রাখে জুড়াইয়া॥
উড়ি চেলে গুঁড়ি কুটি সাজাইল পিঠা।
ক্ষীরখণ্ড ছানা ননী পুর দিয়া মিঠা॥
ঘৃতপক্ক লুচি পুরী নাগর উদ্দেশে।
অপূর্ব্ব উড়ির অন্ন রান্ধে অবশেষে।
পরিপাটি পাঁচরস করিয়া রন্ধন।
স্নানকরি সেনে আসি করে নিবেদন॥"

এখানেও আমরা দেখিতে পাই, জীরা, মরিচ ইত্যাদি দিয়া সুরসাল ব্যঞ্জন প্রস্তুত হইয়াছে। কদলী, পটল, ওল ইত্যাদি কাটিয়া লবণ ইত্যাদি মাখাইয়া রাখা হইয়াছে এবং কিয়ৎকাল পরে সেইগুলি নিৰ্জ্জল করিয়া তপ্ত ঘৃতে ভাজা হইয়াছে। তিক্ত রসে শুক্তা রন্ধন করা হইয়াছে, দধি ও চিনি দিয়া আমের অম্বল হইয়াছে। ক্ষীর, চালের গুঁড়ির পিঠা, লুচি, পুরী ইত্যাদি প্রস্তুত করা হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে শুধু ব্যঞ্জনের নাম মাত্র নহে, অন্নবিস্তর প্রণালীও বর্ণিত হইয়াছে দেখিতে পাই, এবং এই সকল প্রণালী এই কয়েক বৎসরেও বিশেষ পরিবর্ত্তিত হয় নাই।—

এই প্রসঙ্গে বিজয় গুপ্ত বর্ণিত বণিক্ বধূগণের রন্ধনেরও কিঞ্চিৎ পরিচয় দিতেছি। এখানে কবি ঠিক রন্ধন-প্রণালী না দিলেও, কোন্ জিনিসের সহিত কোন্ জিনিসের সুন্দর সমন্বয় হয় তাহা বলিয়া দিতেছেন এবং ইহাই হয় ত কবির সময়কার প্রচলিত রন্ধন-প্রণালী।—

"প্রথমে পূজিল অগ্নি দিয়া ঘৃত ধূপ।
নারিকেল কোরা দিয়া রান্ধে মুগের সূপ॥
পাটার ছেঁচিয়া নেয় পোলতার পাতা।
বেগুন দিয়া রান্ধে ধনিয়া পোলতা॥
জ্বর পিত্ত আদি নাশ করার কারণ।
কাঁচাকলা দিয়া রান্ধে মুগের পাঁচন॥
জমানী পুড়িয়া ঘৃতে করিল ঘন পাক।
সাজ ঘৃত দিয়া রান্ধে গিমা তিতা শাক॥
কোমল বাথুয়া শাক করিয়া কেচাকেচা।
নাড়িয়া চাড়িয়া রান্ধে দিয়া আদা ছেঁচা॥
নারিকেল দিয়া রান্ধে কুমড়ার শাক।
সাজ কটুতৈলে রান্ধে কুমারের চাক॥
বেহাগ বেগুন কাটি থুইল বাটি বাটি।
ঝিঙা পোলা কড়ি ভাজে আর কাঁঠাল আঁটি॥
রান্ধিছে রান্ধনী না দেয় গা মোড়া।
সাজকটু তৈল দিয়া রান্ধে বেগুন পোড়া॥
বাটি বাটি ভরিয়া ব্যঞ্জন থুইল ঠাঁই ঠাঁই।
কলার থোড় রান্ধিতে কাটিয়া দিল বাই॥
অত্যন্ত ধবল যেন সাজ দুগ্ধের দৈ।
সরিষা বাটা দিয়ে রান্ধে পানী কচুর বৈ॥
রন্ধন করিতে লাগে বড় পরিপাটি।
মরিচের ঝাল দিয়া রান্ধে বটবটী॥
মুগের বোল রান্ধে আর মাসকলাইর বড়ী।
দুগ্ধ লাউ রান্ধে আর নারিকেল কুমারী॥
শুক্তা পাতা দিয়া রান্ধে কলাইএর ডাইল।
পাকা কলা লেবু রসে রান্ধিল অম্বল॥
রান্ধি নিরামিষ ব্যঞ্জন হল হরষিত।
মৎস্যের ব্যঞ্জন রান্ধে হয়ে সচকিত॥
মৎস্য মাংস কাটিয়া থুইল ভাগ ভাগ।
রোহিত মৎস্য দিয়া রান্ধে কলতার আগ॥
মাগুর মৎস্য দিয়া রান্ধে গিমা গাছ গাছ।
সাজ কটু তৈলে রান্ধে খরসুল মাছ॥
ভিতরে মরিচ গুঁড়া বাহিরে জড়ায় সূতা।
তৈলে পাক করি রান্ধি চিংড়ির মাথা॥
ভাজিল রোহিত আর চিতলের কোল।
কৈ মৎস্য দিয়া রান্ধে মরিচের ঝোল॥
ডুম ডুম করিয়া ছেঁচিয়া দিল চৈ।
ছাল খসাইয়া রান্ধে বাইন মৎস্যের বৈ॥
রন্ধনের কার্য্য থাকুক ভোজনের কথা।
বারমাসি বেগুনেতে শৌল মৎস্যের মাথা॥
দুই তিন আনাজ করিয়া ভাগ ভাগ।
থোড় দিয়া ইহার মুণ্ড মুলা দিয়া শাক॥
জীরামরিচ রান্ধনী বাটিয়া করে মিল।
মসলা বাটিতে হাতে তুলে নিল শীল॥
মাংসেতে দিবার জন্য ভাজে নারিকেল।
ছাল খসাইয়া রান্ধে বুড়া খাসীর তেল॥
ছাগ-মাংস কলার মূলে অতি অনুপম।
ডুম ডুম করি রান্ধে পাড়রের চাম॥
একে একে যত ব্যঞ্জন রান্ধিল সকল।
শৌল মৎস্য দিয়া রান্ধে আমের অম্বল॥
পিঠার অনেক রান্ধে নানাবিধ ফল।
দুই তিন প্রকার পিষ্টক পায়স॥"

এই সকল রন্ধন ভিন্ন আরও কতিপয় স্থলে আড়ম্বরপূর্ণ রন্ধনের পরিচয় পাই। সাধভক্ষণ মেয়েদের বিশেষ ঘটার সহিত সমাধা হয়। খুল্লনা ও রাণী গঙ্গাবতীর সাধভক্ষণ ধনী গৃহের ব্যাপার। সাধ যাহাকে খাওয়ান যায়, রন্ধনও তাহার অভিরুচিমত করা হয়। এখানে রন্ধন-প্রণালী ছাড়াও তৎকালীন সমাজের ও সেই শ্রেণীর রমণীগণ সেই অবস্থায় কি খাইতেন তাহার পরিচয় পাই। খুল্লনার সাধ-ভক্ষণের বর্ণনা হইতে জানিতে পারি,—

"উদরে হইল ব্যথা শুন দিদি মোর কথা
ওদন ব্যঞ্জন যেন বারি।
যদি পাই মাজ ঝোল বগরি শকুল ঝোল
তবে গ্রাস চারি খাত্যে পারি॥
পুড়িয়া রোহিত ঝস দিয়ে তেঁতুলের রস
হিঙ্‌ জিরা বাসে সুবাসিত।
ভাজা চিথোলের কোল মাগুর মৎস্যের ঝোল
মানকচু মরিচ ভূষিত॥
লতা নালিতার শাক কাঁজি দিয়া কর পাক
সাজিনী মাতলিবে জোয়ানি ফোড়ায়া।
সম্বল বেগুন ভথি দিয়া হিঙ জিরা মেথি
বনি বথ্যা যদি থাকে দয়া॥
নিধান করিয়া খই ত'হাতে মথিয়া দই
আমড়া সংযোগে রান্ধ শাক।
যদি পাই কিছু পুপ আমে মুসুরির সূপ
আমসিতে প্রাণ পাই রাখ॥
আমি যেন পাই সোনা শকুল মাছের পোনা
পোড়া কাসুন্দী দিয়া তথি।
চরিয়া রঞ্জিত কাঞ্জী উদর পুরিয়া ভুঞ্জি
বনশাকে বড়ই পীরিতি॥"

এই প্রসঙ্গে কি দিয়া কি দ্রব্য রন্ধন করিতে হইবে তাহাও খুল্লনা লহনাকে বলিয়া দিতেছে। এতদ্ভিন্ন খুল্লনার সাধ বর্ণনাও একটা আছে। তাহাতেও নানারূপ খাদ্যদ্রব্যের সন্ধান পাওয়া যায়।—

"কহি নিজ সাধ শুন লো দাসি,
পান্ত ওদন ব্যঞ্জন বাসি।
বাথুয়া টনটনি তেলেতে পাক,
ডগি ডগি তোল ছোলার শাক।
মীন চড়চড়ি কুমুম বড়ি,
সরল সফরী ভাজা চিঙ্গড়ি।
যদি ভাল পাই মথিয়া দই,
ফেলি চিনি তাহে মিশায়ে খই।
পাকা চাঁপাকলা কড়িয়া গুড়,
খেতে মনে সাধ করেছি বড়।
কনক থালেতে ওদন শালি,
কাঁজির সহিত করিয়া মেলি।
হেন কাঞ্জি ভুঞ্জি মনেতে ভায়,
চাকা চাকা মূলা বাগুন তায়।
আমড়া নোয়াড়ি পাকা চালিতা,
আমসি কাসুন্দি কুল করঞ্জা।
পোর উড়ুম্বর ইচলী মাছে,
পাইলে মুখের অরুচি ঘুচে।"

*

মনে করি সাধ খাইতে মিঠা
ক্ষীর নারিকেল ছাঁচির পিঠা।

•

দুগ্ধে তিলির গুড়ি মিশায়ে লাউ,
দধির সহিত গুড়ের ঝাউ।
চিড়া পাকা কলা দুধের সার,
কহি দুয়া এই আন গো আর।
ঝুনা নারিকেল চিনির গুড়া,
করি আপনার সাধের চূড়া।"

—কবিকঙ্কণ

এই সকল অতি সাধারণ খাদ্য। ইহাতে আদৌ আড়ম্বর নাই। অতঃপর শাকসংগ্রহ ও রন্ধন বর্ণনা পাওয়া যায়। কবিকঙ্কণ শাক সংগ্রহের একটি সুদীর্ঘ তালিকা দিয়াছেন, তৎকালে প্রচলিত সমস্ত শাকের উল্লেখ তাহাতে বর্তমান। অবশ্য লহনার রন্ধন প্রসঙ্গে মাত্র নালিতা ও বেথুয়া শাকের কথা দেখিতে পাই—

"শাক তুলিবারে দুয়া ফিরে বাড়ি বাড়ি।
কোংচট করিয়া পরে থায় হাড় শাড়ি॥
নটা রাঙ্গা তোলে শাক পালঙ্ক নালিতা।
তিক্তপলতার শাক কলতা পলতা॥
সাঁজতা বনতা বনপুঁই ভদ্রপলা।
হিলঞ্চী কলমী শাক জাঙ্গি ওতিপলা॥
নটিয়া বেথুয়া তোলে ফিরে ক্ষেতে ক্ষেতে।
মহুরী শুলফা ধন্যা ক্ষীর পাই যেতে॥
বাড়ী বাড়ী ফিরে দুয়া দিয়া বাহনাড়া।
ডগি ডগি তোলে যত সরিষার যাড়া॥

রন্ধন করিতে লহনার হইল ত্বরা।
ঘণ্টে পুড়িয়া এড়ে মাটির পাথরা ॥
ঘৃতে জবজব কৈল নালিতার শাক।
কটু তৈলে বেথুয়া করিল দৃঢ় পাক ॥
খণ্ডে মুগের সূপ উত্তারে ডাবরে।
আচ্ছাদন পালাখালি তাহার উপরে ॥
কটু তৈলে ভাজে রামা চিতলের কোল।
রোহিতে কুমড়াবড়ি আলু দিয়া ঝোল ॥
বদরী শকুল মীন রসাল মুশরী।
পণ দুই ভাজে রামা সরল সফরী ॥
নতগুলা তুলে রামা চিঙড়ীর বড়া।
কচি কচি গোটা কত ভাজিল কুমড়া ॥
পঞ্চাশ ব্যঞ্জন অন্ন করিল রন্ধন।"

মাধবাচার্য্যের চণ্ডীতেও আমরা নানারূপ শাকের বর্ণনা পাই। মাধবাচার্য্যের সমস্তগুলি শাক কবিকঙ্কণের দীর্ঘ তালিকাতেও লিখিত হয় নাই। সম্ভবতঃ কবিকঙ্কণের সময়ে এই সকল শাক সাধারণতঃ খাওয়া হইত না, অথবা মাধবাচার্য্যের সময়ও কবিকঙ্কণ বর্ণিত শাকগুলি সকলের নিকট বিশেষ আদরণীয় ছিল না। এই নিমিত্ত আমরা এক একজন কবির এক একরূপ বর্ণনা পাই ও এই হিসাবে এইগুলিকে কবির সময়কার প্রচলিত দ্রব্য বলিয়া ধরিয়া লইতে পারি। মাধবাচার্য্য লিখিতেছেন,—

ভ্রমি কত বাড়ি বাড়ি   শাক তুলে দুবা চেরী
ফুল সব ভাগ ভাগ করে।
বাথুয়া তুলে শুচিয়া   স্বর্ণরেখা না উচিয়া
পোলতা মিশায় নানা শাকে।
তেপাতিয়া বাঁশপাতা   অপূর্ব্ব অমৃতলতা
তাই খোলে তুলি নিল কাকে।
ডাম সোম তারার ফুল   কাকলিয়া করার মূল
মিশালেতে তুলিল বাছিয়া।
বনপুই পুনর্ন্নবা   তেলাকুচি তুলে দুবা
হেট বাগুন তুলয়ে দেখিয়া।
আর তুলে কুচানটিয়া   পালং তুলে খুড়িয়া
মলচি তুলিল তার পাছে।
তুলে লাউ কুমড়ের ডোক   বাছিয়া নারয়ে পোক
দিল নিয়া লহনার কাছে।"

মাণিক গাঙ্গুলী কৃত ধর্ম্মমঙ্গলে রাণী রঞ্জাবতীরও সাধ ভক্ষণের অনুরূপ বর্ণনা আছে। মাণিক গাঙ্গুলীর কাব্যে শুধু রন্ধন-উপকরণের তালিকা মাত্রই আমরা পাই না, রাণী রঞ্জাবতী রন্ধন-প্রণালীও বলিয়া দিতেছেন।

"শুসনির শাক আনি সম্বরিবে তৈলে।
শেষে দিবে সর্ষপ বাটনা সিদ্ধ হলে ॥
অল্প জলে অল্প অল্প আসিবে কাটি।
দৃঢ় করি দিয়া কাঠি দিবে তাকে বাঁটি ॥
গুঁড়া করে গোটা দশ দিবে তায় বড়ি।
অল্প অল্প লবণ দিয়া উলাইবে হাঁড়ি ॥
কটু তৈল কিছু দিয়া সম্বরিয়া পুনঃ।
প্রচুর পিটালী দিবে পাক হয় যেন ॥
ঠিক বলি ঠাকুরাণী ইহা যদি পাই।
একসের ঢেঁকের অন্ন একগ্রাসে খাই ॥
আর এক আছে সাধ আনি পুই খাড়া।
যথোচিত জল দিয়া ঝাল দিবে বাড়া ॥
সিদ্ধ হলে শেষে দিবে পোস্তাঞ্জনীফুল।
কিছু কিছু দিবে তায় কচুকলা মূল ॥
ঝোল রাখি ঝাল দিয়া ঘ্রাণ দিও পরে।
সেই ব্যঞ্জনের সার শুনে মুখ সরে ॥
চিংড়িচাদা কুচানি চাপানটে শাকে।
অধিক লবণ দিয়া পাক কর তাকে ॥
তায় দিয়ে গোটা দশ পনসের বীজ।
প্রচুর করিয়া দিবে পিটালী মরিচ ॥
ঝোলে দিয়া কটমাত করি চড়চড়ি।
তৈলেতে ভাজিয়া তায় দিও ফুলবড়ি ॥
নীরস অত্যন্ত হলে তায়ে দিও নীর।
কাটি দিয়া কর দ্রব যেন হয় ক্ষীর ॥
আধারে তুলে সব বাছিবে কণ্টক।
এই ব্যঞ্জনের চূড়া অরুচিনাশক ॥
তায় যদি কিছু হয় লবণ বিহীন।
খেতে পারি ঢের করে বসে সারাদিন ॥
সফরীর পেট চিরি বার করে পোঁটা।
পোড়াবে যতনে যেন থাকে গোটা গোটা ॥
লবণ সর্ষপ তৈল কিছু দিবে তায়।
শুনে মুখে জল সরে খাবার নাই দায় ॥"

বিজয় গুপ্ত সনকার রন্ধনেরও একটি বর্ণনায় অনেকাংশে পূর্ব্ববর্ত্তী কবিদের সাধ-ভক্ষণের অনুরূপ লিখিয়াছেন :—

তেতুল চলার অগ্নি জ্বলে ধপ ধপ।
নারিকেল কোরা দিয়া রান্ধে মুগের সূপ ॥

ধীরে ধীরে জ্বলে অগ্নি একমত জ্বাল।
কড়ীর বেতাগে রান্ধে কলাইয়ের ডাল॥
ঝিঙ্গা পোলাকড়ি রান্ধে কাঁটালের আঁটি।
নারিকেল কোরা দিয়া রান্ধে বটবটি॥
আনিয়া বেথুয়া শাক করিল লেচাকেচা।
নাড়িয়া চাড়িয়া রান্ধে দিয়া আদাচেঁচা॥
কমানী পুড়িয়া ঘৃতের তৈলে পাক।
কটু তৈলে ভাজি তোলে শিষা শাক॥
নানাপ্রকারে রান্ধে অনেক সুরস।
অনেক প্রকারে রান্ধে পিষ্টক পায়স॥
নিরামিষ রান্ধিয়া থুইল এক ভিত।
মৎস্যের ব্যঞ্জনে সোনেকা দিল চিত॥
মৎস্য মাংস কাটিয়া করিল ভাগ ভাগ।
রোহিত মৎস্য দিয়া রান্ধে কোলটের আগ॥
খান খান করিয়া কাটিয়া লইল চই।
সাজ কটু তৈলে রান্ধে রোহিত মৎস্যের থই॥
চেঙ মৎস্য দিয়া রান্ধে মিঠা আমের ঝোল।
কলার মূল দিয়া রান্ধে পিপলিয়া শৌল।
কৈ মৎস্য দিয়া রান্ধে মরীচের ঝোল।
জিরা মরিচে রান্ধে চিথলের কোল॥
উপল মৎস্য আনিয়া তাহার কাঁটা করে দূর।
গোলমরিচে রান্ধে উপলের পুর॥
আনিয়া ইলিশ মৎস্য করিল ফালাফালা।
তাহা দিয়া রান্ধে ব্যঞ্জন দক্ষিণসাগর কলা॥
শৌল মৎস্য আনিয়া কাটি খানে খানে।
তাহা দিয়া রান্ধে ব্যঞ্জন আলু আর মানে॥
মাগুর মৎস্য আনিয়া কাটিয়া করে কুড়ী।
তাহা দিয়া রান্ধে ব্যঞ্জন আদা-মাগুরী॥
রান্ধিতে রান্ধিতে সোনার না পূরিল আশ।
পাকা তেঁতুলে করে খলিসার বংশ নাশ॥

এইগুলি ধনীগৃহের চিত্র। এই সঙ্গে কবি বর্ণিত কাঙাল কালকেতুর মাতা নিদয়ার সাধ-ভক্ষণের বর্ণনাও প্রদত্ত হইল। ইহাতে কোনও আড়ম্বর নাই; সাধারণ খাদ্যসম্ভারের বর্ণনা কবি এই প্রসঙ্গে দিয়াছেন। নিদয়া নিতান্ত দরিদ্ররমণী; কাজেই দরিদ্রগৃহের চিত্র আমরা নিদয়ার সাধভক্ষণে পাই।—

নিধানী করিয়া খই তথি মহিষের দই
কুল করঞ্জা প্রাণসম বাসি।
যদি পাই মিঠা ঝোল পাকা চালিতার ঝোল
প্রাণ পাই পাইলে আমসী॥
আমার সাধের সীমা হিলঞ্চ পলতা দিয়া
বোয়ালি কুটিয়া কর পাক।
খরকাঠে খর জ্বালে সাতুলি কটু তৈলে
কিছু দিবে পলতার শাক॥
পুঁই ডগি থুপি কচু ফুলবড়ি দিবে কিছু
কাঁটালের বিচি গণ্ডাদশ।
রান্ধিবে চিঙ্গুড়ী মীনে সাঁতুলি দিবে
অবশেষে দিবে আদারস॥
আমি যেন দেখি সোনা শকুল মৎস্যের পোনা
তথি গোটা কাসুন্দি মিশায়্যা।
যদি পাই কিছু যূপ আনে মুসরির সূপ
তথি প্রাণ পায় সে নিদয়া॥
পোড়া মৎস্যে লেম্বুরস কই মৎস্যে রান্ধ যস
দিবে তথি মরিচের ঝাল।
হরিদ্রা রঞ্জিত কাঞ্জি উদর ভরিয়া ভুঞ্জি
প্রাণ পাহ পাইলে পাকা তাল॥
সদাই ন্যাকার উঠে দিনে দিনে বল টুটে
সদাই বদনে উঠে জল।
মূলাতে বাগান সীম তথি মিশাইয়া নিম
কিছু দিবে উড়ুম্বর ফল॥
নিদয়ার সাধ হেতু ঘরে ঘরে ধর্ম্মকেতু
খুঁজিয়া আনিলা আয়োজন।

এই সাধ-ভক্ষণ ব্যাপার ছাড়াও খুল্লনার রন্ধনের বর্ণনায় কবি আমাদিগকে তৎকাল-প্রচলিত আরও কতকগুলি ব্যঞ্জনের সহিত পরিচিত করাইয়া দিয়াছেন। কবিকঙ্কণের চণ্ডীকাব্যের মধ্যে এইটি একটি সামাজিক নিমন্ত্রণ উপলক্ষে হইয়াছে। মাধবাচার্য্যে খুল্লনার রন্ধন শুধু ধনপতির উদ্দেশ্যেই হইয়াছে মাত্র। তৎকালে সামাজিক অনুষ্ঠান বেশ আড়ম্বরপূর্ণ ও আহার বিহারে যথেষ্ট সমারোহ ছিল। যেমন,—

বার্ত্তাকু কুমড়া কাঙ্গা কাঁচা কলা দিয়া মাজা
বেসারি পিঠালি ঘন বাটি।
ঘৃতে সম্ভলিলা তথি হিঙ্গু জিরা দিয়া মেথি
সুক্তার রন্ধন পরিপাটি।
ঘৃতে ভাজে পলাকড়ি নটীশাকে ফুলবড়ি
চিঙ্গড়ি কাঁঠাল বীচি দিয়া।
ঘৃতে নালিতার শাক তৈলে বাথ্যা বরশাক
খণ্ডে ফেলে বটিকা ভাজিয়া।

দুগ্ধে লাউ দিয়া খণ্ড জ্বালদিল দুই দণ্ড
সাঁতলিল মহুরীর বাসে।
মুগসূপে ইক্ষুরস কই ভাজে গণ্ডাদশ
মরিচাদি দিয়া আদা রসে॥
মুসরী মিশ্রিত মাস সূপ রান্ধে হিঙ্গবাস
দিয়া ভিয়া বাসসুশোভিত।
ভাজে চিথলের কোল রোহিত মৎস্যের ঝোল
মানকচু মরিচে ভূষিত॥
বোদালি হেলঞ্চা শাক কাটি দিয়া কৈল পাক
ঘনবেসার সম্বোধন তৈলে।
কিছু ভাজে ঝাইখড়া চিঙ্গুড়ের তোলে বড়া
খরশোলা পুঁজি দশ তোলে॥
করিয়া কণ্টকহীন আম্রে শকুল মীন
খরলোন দিয়া ঘন কাটি।
রান্ধিল পাকাল ঝস দিয়া তেঁতুলের রস
ক্ষীর রান্ধে জ্বাল করি ভাটি॥
কলাবড়া মুগসারি ক্ষিরভাজা ক্ষিরপুরী
মাংস রান্ধিল অবশেষে।"

খুল্লনার রন্ধনের বর্ণনা মাধবাচার্য্য নিম্নোক্তরূপ দিয়াছেন,—

"পাবক জ্বালায়ে রামা মনের হরিষে।
শাক রন্ধন করি ওলায় বিশেষে॥
সুক্ত করি রামা রান্ধে ঝুনা নারিকেল।
জলপাই অম্বল রান্ধে ঘৃতেতে আগল॥
মনের হরিষে রান্ধে রোহিতের মাছ।
দুঘিতা মিশায়ে রান্ধে উঁরিচা আনাজ॥
বড় বড় কই মৎস্য রান্ধিল হরিষে।
ঝাল ব্যঞ্জন রান্ধে কত অবশেষে॥
অপূর্ব্ব খরল মাছ হিঙ্গ দিয়া তায়।
সম্মোহন ঘৃত দিয়া সম্ভারি ওলায়॥
কৃষ্ণসার-মাংস রান্ধে তৈল কটা ভরি।
তিক্ত মিষ্ট মিশায় রান্ধয়ে নিমছড়ি॥
ক্ষিরপুলি রান্ধে রামা হরষিত হয়ে।
ডুবাইয়া থুইল তারে ঘনাবর্ত্ত পয়ে॥
সমুদ্রের ফেনা পিঠা অপূর্ব্ব ত গণি।
দধি মধু চন্দ্রপুলি রান্ধে সুবদনি॥
অপূর্ব্ব পিষ্টক রান্ধে লাল বৈলাম।
পুষ্পপাণি পিঠা রান্ধয়ে অনুপম॥
কলাবড়া পিঠা রান্ধে মনের হরিষে।
সুগন্ধি তণ্ডুল অন্ন রান্ধে অবশেষে॥

রায়গুণাকর ভারতচন্দ্রের "মানসিংহ" কাব্যের মধ্যেও তৎকালপ্রচলিত অন্নব্যঞ্জনের বিশদবর্ণনা পাওয়া যায়; তবে ভারতচন্দ্র রন্ধন ব্যাপারে কবিকঙ্কণ প্রভৃতির মত বিশেষ পারদর্শী ছিলেন না। তিনি একপ্রকার ব্যঞ্জনই নানাবিধ মাছ দিয়া রন্ধন করিয়া তাহার তালিকা বাড়াইয়াছেন।—

হাস্যমুখে পদ্মমুখী আরম্ভিলা পাক।
শড়শড়ি ঘণ্ট ভাজা নানামত শাক॥
ডালি রান্ধে ঘনতর ছোলা অড়হরে।
মুগমাস বরবটি বাটুল মটরে॥
বড়াবড়ি কলা মূলা নারিকেল ভাজা।
দুধ থোড় ডালনা শুক্তানি ঘণ্টভাজা॥
কাঁটালের বীজ রান্ধে চিনিরসে গুঁড়া।
তিল পিটালিতে লাউ বার্ত্তাকু কুমড়া॥
নিরামিষ তেইশ রান্ধিল অনায়াসে।
আরম্ভিলা বিবিধ রন্ধনে মৎস্য মাংসে॥
কাতলা ভেকুট কই ঝাল ভাজা কোল।
শিকপোড়া ঝুরা কাঁটালের বীজে ঝোল॥
ঝাল ঝোল ভাজা রান্ধে চিতল ফলই।
কই মাগুরের ঝোল ভিন্ন ভাজে কই॥
মায়া সোনা খড়কার ঝোল ভাজা সার।
চিঙড়ির ঝাল বাগা অমৃতের তার॥
কঠা রান্ধি রান্ধে কই কাতলার মুড়া।
তিতা দিয়া পচা মাছে রান্ধিলেক গুঁড়া॥
আম্র দিয়া শোল মাছে ঝোল চড়চড়ী।
আর রান্ধে আনারসে দিয়া ফুলবড়ি॥
রুই কাতলার তৈলে রান্ধে তৈলশাক।
মাছের ডিমের বড়া ঘৃতে দেয় ডাক॥
বাটার করিলা ঝোল খয়রার ভাজা।
অমৃত অধিক বলে অমৃতের রাজা॥
সুমাছ বাছের মাছ আর মাছ যত।
ঝাল ঝোল চড়চড়ি ভাজা কৈলা কত॥
বড়া কিছু সিদ্ধ কিছু কাছিমের ডিম।
গঙ্গাফল তার নাম অমৃতে বিলীন॥
কচি ছাগ মৃগ মাংসে ঝাল ঝোল রসা।
কালিয়া দোলমা বাগা সেকচ সমসা॥
অন্ন মাংস শিকভাজা কাবাব করিয়া।
রান্ধিলেন মুড়া আগে মসলা পুরিয়া॥
মৎস্য মাংস সাঙ্গ করি অম্বল রান্ধিলা।
মৎস্য মূলা বড়াবড়ী চিনি আদি দিলা॥



বিদায়-পর্ব্ব

আর আমসত্ত্ব আর আমসী আচার।
চালিতা তেঁতুল কুল আমড়া মন্দার॥
অম্বল রান্ধিয়া রামা আরম্ভিলা পিঠা।
সুধা বলে এই মজে আমি হব মিঠা॥
বড়া এলো আসিকা পীযূষী পুরীপুলী।
চুষি রুটি রামরোট মুগের শামুলী॥
কলাবড়া তিলের পাপর ভাজাপুলী।
সুধারুচি মুচমুচি সুচি কতগুলি॥
পিঠা হৈল পরে পরমান্ন আরম্ভিলা।
চালু চিনা ছুধ রাজবর চালু দিলা॥
পরমান্ন পরে খেচরান্ন রান্ধে আর।
বিষ্ণুভোগ রান্ধিলা রান্ধুনী লক্ষ্মী আর॥
অতুলিত অগণিত রান্ধিয়া ব্যঞ্জন।
অন্ন রান্ধে রাশি রাশি অন্নদামোহন॥"

তৎকালে উপকরণাদিও প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যাইত, দৈনন্দিন আহারের জন্য শাক কিনিতে হইত না। কবিকঙ্কণ ও মাধবাচার্য্যের গ্রন্থে দেখি দাসীগণ বাড়ী বাড়ী হইতে শাক তুলিয়া আনিতেছে। কবিকঙ্কণ খুল্লনার রন্ধনের জন্য দুর্ব্বলা দাসীকে ৫০ কাহন কড়ি দিয়া বাজারে পাঠাইয়াছেন।—সে জিনিষ কিনিতেছে—দেখুন,—

"লাউ কিনে কচিকুমড়া শতমূলে পলাকড়া
পাকা আম্র কিনে ঝুড়িমূলে।
বিশাবরে ছেনা কিনি কিনিল নবাত চিনি
পণে পণমূলে পান নিলে॥
মূল দিয়া পণ দশ কিনিল-জীরক শশ
জঠর কমঠ কিনে রুই।
খরসুলা কিনে কই কিনিল মহিষদই
কামরাঙ্গা কিনে কুড়ি দুই॥
বাছি কিনে তাল শাঁস হিঙ্গু জিরা রস বাস
চই মেথি জোয়ানী মহুরী।
মুগমাস বরবটি কিনিল সকল পুঁটি
সের দরে ঘৃত ঘড়া পুরি॥
রন্ধন সন্ধান জানে চিতল বোয়ালি কিনে
খোল পোনা কিনিল চিংড়ি।
চতুর সিধুর দাসী আট কাহনেতে খাসী
তৈল সেরে কর্ণবুড়ি॥
পুরি ফুলে নারিকেল ফুল কদলী পানিফল
কাটাল কিনিল দুইকুড়ি।
কিছু কিনে ফুলপাতা করুণা কমলা টাবা
সেরে জুখি লয় ফুলবড়ি।
তোলা মূলে তেজ পাত ক্ষীর কিনে বিশাসাত
আদা বিশা পড়ে দশ বুড়ি।
মান ওল কিনি সারি দুগ্ধ কিনে ভার চারি
ভার দুই কিনিল কাঁকুড়ী।
কলা কিনে মর্ত্তমান সরল গুবাক পান
কর্পূর কিনিল শঙ্খ চূর্ণ।
শাক বেগুন সায় কচু থাস আলু কিনে কিছু
বিশা দুই তিন কিনে লোন॥
নির্ম্মাণ করিতে পিঠা বিশা সাত কিনে আটা
খণ্ড কিনে বিশে সাত আট।
চতুর সাধুর দাসী আট কাহনে কিনে খাসী
তবে কিছু মাঙ্গ্যা লয় ভাট॥
কিনিয়া রন্ধনসাজ অঞ্চলিতে লয় বাজ
হরিদ্রা চুবড়ি ভরি কিনে।

ভারতচন্দ্রের হীরামালিনীর সুন্দরের নিকট বাজারের হিসাব সর্ব্বজন পরিচিত। এই দুর্ব্বলা দাসীও তদনুরূপ। ধনী গৃহের অন্নব্যঞ্জনের পরিচয় যথেষ্ট হইয়াছে, এখন জনসাধারণের খাদ্যদ্রব্যের কিছু বিবরণ দিব। খুল্লনার ছাগলচারণকালে যাহা খাইতে দেওয়া হইত তাহা অত্যন্ত দুঃখী-গৃহের চিত্র।—

"পুরাণ ক্ষুদের জাউ তথি কিছু লোন।
সকল ব্যঞ্জনে বাটি না দিয়াছে লোন॥
রান্ধ্যাছে পাঞ্জরা দিয়া কলথি কাচড়া।
কলাই ক্ষুদের পড়াতে তুলিছে কিছু বড়া॥
বাগানের খাড়া লাউ কুমড়া বেকলা।
পড়ই মাছের পোটা মুড়া করি তথি মেলা॥
থৈলের যোগার দিয়া জাল দিয়াছে বড়।
তৈল লোন নাহি তথি সম্বলন বড়॥
উড়ুম্বর ফল কিছু রান্ধ্যাছে পিড়িয়া।
কাঠ দিয়া ব্যঞ্জনে পুড়িয়া দেই সরা॥"

খুল্লনার এই সময়কার বর্ণনায় মাধবাচার্য্য লিখিতেছেন,—

"যাবের পাকে লহলো ক্ষুদের অন্ন চালে।
অন্ন অন্ন দিলে তাহে পোড়াই বহুল।
এক পাশে ঢালি দিল পাকা কলার মূল॥
ভাঙ্গা নারিকেল জল দিল সুবদনী।
ভোজন করিতে বৈসে খুল্লনা বাক্ষানী॥"

"ভাঙানারিকেল জল" মাধবাচার্য্যের অত্যন্ত প্রিয়। প্রত্যেক স্থলেই তিনি ইহার উল্লেখ করিয়াছেন—অবশ্য সব স্থলে পানের জন্য নহে—

"ভাঙ্গা নারিকেল জলে আচমন করে—"

এমন কি অন্নসংস্থানহীন ব্যাধ কালকেতুও ভাঙা নারিকেল জলে আচমন করিয়াছে।—

এই সঙ্গে কালকেতুর খাদ্যবর্ণনাও দেওয়া গেল। ইহাতে নিম্নশ্রেণীর লোকদের আহার্য্যের কিঞ্চিৎ পরিচয় পাওয়া যাইবে।—

"পাতিল ফুল্লরা আনি মাটির পাথরী।
খাঞ্জনের তরে দিলা নূতন খাপরী॥
সাজুড়িয়া ছুটা গোফ বাকি লৈয়া খাড়ে।
এক শ্বাসে সাত হাঁড়ী আমানি উজাড়ে॥
সাতহাঁড়ী মেসহাবীর খায় খুদ জাউ।
ছয় হাণ্ডী মুসুরীসূপ মিশ্রা তথি লাউ॥
ঝুড়ি দুই তিন খায় আলু ওল পোড়া।
তার দুই বনপুই কলমী কাচড়া॥
ফুল্লরা রন্ধন করে জাল গোটা বাঁশ।
খোলে রাখি দিলা ছুটা হরিণের মাস॥
মণগণ্ডা খাইলা নকুল করি পোড়া।
শারী কচুখণ্ডে মিশা করঞ্জ আমড়া॥
অন্ন খায় মহাবীর জাইয়াকে জিজ্ঞাসে।
রন্ধন করিছে ভাল আর কিছু আছে॥
আস্থাছে হরিণ দিয়া দধি এক ভারী।
দধি দিয়া অন্ন বীর খায় তিন হাঁড়ী॥"

কৃষ্ণদাস কবিরাজ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে শ্রীচৈতন্যের আহার্য্যপ্রসঙ্গে লিখিয়াছেন,—

"আমকাসুন্দী আদা ঝাল কাসুন্দী নামে।
লেবু আদা আম্রকলি বিবিধ সন্ধানে॥
আমসী আম্রখণ্ড তৈলাম্র আমতা।
যত্ন করি গুণ্ডা করি পুরাণ সুকুতা॥

*

বহিরা মৌরী তণ্ডুল গুণ্ডি করিয়া।
নাড়ু বান্ধিয়াছে চিনি পাকে করিয়া॥
শুণ্ঠী খণ্ড নাড়ু আর আম পিত্ত হর।
পৃথক পৃথক রাখে কুথলি ভিতর॥
কোলি শুণ্ঠী কোলিচূর্ণ কোলি খণ্ড আর।
কত নাম লব যত প্রকার আচার॥
নারিকেল খণ্ড আর নাড়ু গঙ্গাজল।
চিরস্থায়ী খণ্ড বিকার করিল সকল॥
চিরস্থায়ী ক্ষীরসার মণ্ডাদি বিকার।
অমৃত কর্পূর আদি বিবিধ প্রকার॥
শালিকা চুটি ধান্যের আতপ চিড়া করি।
নূতন বস্ত্রের বড় কুথলি সব ভরি॥
আধেক চিড়া হুড়ুম করি ঘৃতেতে ভাজিয়া।
চিনি পাকে নাড়ু কৈল কর্পূরাদি দিয়া॥
শালি তণ্ডুল ভাজা চূর্ণ করিয়া।
ঘৃত সিক্ত চূর্ণ কৈল চিনি পাক দিয়া॥
কর্পূর মরিচ লবঙ্গ এলাচি রসবাস।
চূর্ণ দিয়া নাড়ু কৈল পরম সুবাস॥
শালি ধান্যের খই ঘৃতেতে ভাজিয়া।
চিনি পাকে উখড়া কৈল কর্পূরাদি দিয়া॥
মুটকলাই চূর্ণ করি ঘৃতে ভাজাইল।
চিনি পাকে কর্পূর দিয়া নাড়ু কৈল॥

*

সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য বাণীনাথ দিয়া।
প্রসাদ পাঠাইল রাজা বহুত করিয়া॥
ফলগড়ি প্রসাদ উত্তম অনন্ত।
নিসকড়ি ভোগের প্রসাদ আইল—যার নাই অন্ত।
ছেনা পানা পৈড় আম্র—নারিকেল কাঁঠাল।
নানাবিধ কদলক আর বীজতাল॥
নারঙ্গ ছোলঙ্গ টাবা কমলা বীজপুর।
বাদাম ছোহরা দ্রাক্ষা পিণ্ড খর্জ্জুর॥
মনোহর নাড়ু আদি শতেক প্রকার।
অমৃত গুটিকা আদি ক্ষীরসা অপার॥
অমৃতমণ্ডা ছানার মণ্ডা আর কর্পূর কুলি।
রসামৃত সর ভাজা আর সরপুলি॥
হরিবল্লভ রসবতী কর্পূর মালতী।
ডালিমা মরিচ লাড়ু—নবাত অমৃতি॥
পদ্মচিনি চন্দ্রকান্তি খাজা খণ্ডসার।
বিয়ড়ি কদমা তিলা খাজার প্রকার॥
নারঙ্গ ছোলঙ্গ আম্রবৃক্ষের আকার।
ফলফুল পত্রযুক্ত খণ্ডের বিকার॥
দধিদুগ্ধ দধিতক্র রসালা শিখরিণী।
সলবণ মুদ্গাঙ্কুর আদা খানাখানি॥
লেবু কোলি আদি নানাপ্রকার আচার।
লিখিতে পারি না প্রসাদ কতেক প্রকার॥"

জয়ানন্দকৃত "চৈতন্যমঙ্গলে" লক্ষ্মীঠাকুরাণীর রন্ধন ও বৈষ্ণব-ভোজন প্রসঙ্গে বিবিধ আহার্য্যের পরিচয় পাওয়া যায়।

"রন্ধনশালায় প্রবেশিলা লক্ষ্মীমাতা।
শচী ঠাকুরাণী গেলা দেখিবারে তথা ॥
পঞ্চাশ ব্যঞ্জন অন্ন রান্ধিল কৌতুকে।
পিষ্টক পায়স অন্ন রান্ধে একে একে ॥
তুলসী মঞ্জরী দিয়া কৃষ্ণে নিবেদিলা।
সারি দিয়া সকল বৈষ্ণব বসাইলা ॥
ঘৃতায় সভাকে দিলা শাক মুদ্গ সূপ।
সোনাবড়া লাফরা পটোল বাস্তুক ॥
হিঞ্চ্ বাল মোল ভাজা তালকাঞ্জি বড়া।
বড়াবু শর্করা লাফ মিঠাসুপ বীড়া ॥
ক্ষীর অমৃত গুটিকা খবড়া নবাত।
মনোহর পুলি দুগ্ধপুলি দুগ্ধভাত ॥
আধা নারিকেল পুলি সাকরা কাকরা।
চন্দ্রকান্তি পায়স পরমান্ন শর্করা ॥
গুটিকা জলিসা মধু প্রবানাড়পুলি।
মনোসন্তোষ নন্দন সুখ গঙ্গাজল মিলালি ॥
মর্চা চেনা দুগ্ধপুলি কোয়া মিষ্টসব।
অনুপাম জগন্নাথ ভোগসুখসার ॥"

মহাদেব গৌরীকে যে সমুদায় ভোজনসামগ্রীর কথা বলিতেছেন—তাহা বাস্তবিকই বাংলার গৃহে গৃহে দেখিতে পাওয়া যায়;—

"আজি গণেশের মাতা রান্ধিবে মনোমত।
নিম শিমে বেগুনে রান্ধিবে যে তিক্ত ॥
সুকুতা শীতের কালে বড়ই মধুর।
কুমড়া বার্ত্তাকু কচু দিবেক প্রচুর ॥
রান্ধিবে ছোলার শাক তাতে দিবে খণ্ড।
আলস্য ঘুচায়ে ঝাল দিবে দুই দণ্ড ॥
বেশন-মাখিয়া রান্ধে সরিষার শাক।
কটু তৈলে বাথুয়া করিবে চড়পাক ॥
ঘৃতে ভাজি শর্করায় ফেলিবে ফুলবড়ি।
চোয়া চোয়া করি ভাজ পলতা কাকড়ি ॥
রান্ধিবে মসুরি সূপ দিয়া টাবা জল।
খণ্ড মিশাইয়া তার রান্ধিবে কেবল ॥
নটিয়া কাঁঠাল বীচি সারি গোটা দশ।
ঘৃতে সম্বারিয়া তার দিবে আদারস ॥
খণ্ড মুগের সূপ উত্তরে ডাবরে।
আচ্ছাদন পালাখালি তাহার উপরে ॥
কুষ্মাণ্ডেতে কুরিয়া আনিয়া নারিকেল।
পিটালী মিশায়ে কেহ তাহে দিবে জল ॥
খনকাঠে খরজালে রান্ধিবে ভাল ঘণ্ট।
তবে সে পূরিবে মোর উদর আকণ্ঠ ॥
কুলকাসন্দীতে দিবে কদলীর রস।
এ বেলার মত রান্ধ এই ব্যঞ্জন দশ ॥

দ্বিজ বংশীদাস রচিত পদ্মপুরাণ হইতে কন্যার গৃহে বরের আহার্য্য বিষয়ক কতিপয় পঙ্‌ক্তি উদ্ধৃত করা স্থানোপযোগী।

"সজ্জিতা হইয়া তবে তারকা সুন্দরী।
স্বর্ণের থাল আনি দিল হাতে করি ॥
সুগন্ধি শালির অন্ন দিল কত গুটি।
উপরে দিল ঘৃত সুবর্ণের বাটি ॥
প্রথমে আনিয়া দিল ভাজা অষ্টাদশ।
কিঞ্চিৎ খাইয়া মাত্র করিল পরশ ॥
তার পাছে বেসারী ব্যঞ্জন পাঁচসাত।
কিছু কিছু খায়্যা তারে রাখে করি পাত ॥
দুগ্ধবোগ মনোহর পক্করাজ ডাইল।
আচুল পরশে তার রাখে বরি আইল ॥
অম্বল দু' তিন আনি দিল অবশেষে।
কিছু কিছু মুখে দিয়া রাখে একপাশে ॥
তার পাছে আনি দিল পরমান্ন পিঠা।
গুড় মধু শর্করা সন্দেশ চিনি মিঠা ॥
আমি বড়া চন্দ্রকাটি আর দুগ্ধ রুটি।
ঘৃতে ভাজি ঘৃতবড়া দুগ্ধে ভরি বাটি ॥
কিছু কিছু খায়্যা কইল পূর্ণ ভোজন।
অঞ্জলি করিয়া শেষে কৈল আচমন ॥"

দ্বিজ বংশীদাসের রচনায় অগণিত ভোজ্য উপাদান সমসাময়িক দিনের গার্হস্থ্য চিত্রকে ভাস্বর ও প্রোজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছে, এই প্রসঙ্গে চাঁদ সওদাগরের বাণিজ্যযাত্রার প্রাক্‌কালে সনকার রন্ধন-প্রণালীর অভিনবত্বের কথা উল্লেখযোগ্য।—

"নিরামিষ রান্ধে সব ঘৃতে সম্বারিয়া।
মৎস্যের ব্যঞ্জন রান্ধে তৈল পাক দিয়া ॥
বড় বড় কই মৎস্য ঘন ঘন আঁজি।
জিরা লঙ্গ মাখিয়া তুলিল তেলে ভাজি ॥
কাতলের কোল ভাজে মাগুরের চাকি।
চিতলের কোল ভাজে রসবাস মাখি ॥
ইলিশ তলিত করি বাটা ও খয়রা।
শউলের খণ্ড ভাজে আর শউলপোনা ॥

বড় বড় ইচা মাছ করিয়া ভলিত।
মিঠা পুঠী ভাজিলেক তৈলের সহিত॥
বেত-আগ পালিয়া চুঁচড়া মৎস্য দিয়া।
শুক্ত ব্যঞ্জন রান্ধে আর্দ্রক বাটিয়া॥
পাবতামাছ দিয়া রান্ধে নালিতার ঝোল।
পুরাণ কুমড়া দিয়া রোহিতের কোল॥
কিঞ্চিৎ নালিতাপত্র তার মাঝে আলা।
লাউ দিয়া ঘণ্ট রাঁধে রোহিতের গাদা॥
বাগুন বিগুণ করি তাহে লাউ যোগ।
মাগুর মৎস্য সহ রান্ধে কোঙর ভোগ॥
নবীন কুমড়া দিয়া কই মৎস্য সনে।
পিপুল কাটিয়া ঝোল রান্ধিল সন্ধানে॥
লায়া বেগুন দীর্ঘে করি চারিখণ্ড।
চই কাটিয়া রান্ধে রোহিতের অণ্ড॥
মাসদাল দিয়া রান্ধে রোহিতের মাথ।
হিঙ্গের সন্ধানে তারে দিল তেজপাতা॥
জিরা লঙ্গ বাটি দিল মরিচের রসে।
ভুবন মোহিত কৈল ব্যঞ্জনের বাসে॥
আদাজামীরের রসে কইমাছ ভাল।
অম্লব্যঞ্জন রান্ধে দৈবকল মিশাল॥
শোলামাছ দিয়া রান্ধে করঞ্জ অম্বল।
চিংড়িচালিতায় রান্ধে সুধাক্ত কেবল॥
পাকা তেঁতুলেতে রাঁধে রোহিতের পেটি।
বদরির অম্ল রাঁধে শোলমাছ কাটি॥

পাকা মৌ আলু দিয়া ঘৃতপাক করি।
তাতে কৈল দধিখণ্ড চিনিয়ে সঞ্চারি॥
দারুচিনি বাটি দিল আর তেজপাল।
পিটালি কাটিয়া তাহে মরিচ মিশাল॥
আদাজামীরের রস সৈন্ধব লবণে।
রান্ধিলেক মনোহর নাম ব্যঞ্জনে॥
মৎস্যের ব্যঞ্জন রন্ধন করি অবশেষে।
মাংসের ব্যঞ্জন তবে রান্ধয়ে বিশেষে॥
কাউটায় রাঁধে মাংস তৈল ডিম্ব দিয়া।
ভলিত করিয়া তোলে ঘৃতেতে ছাঁকিয়া॥
কৈতোরের বাচ্চা ভাজে কাউঠার হাতা।
ভাজিছে খাসীর তৈল দিয়া তেজপাতা॥
ধনিয়া সলুপা বাটি দারুচিনি যত।
মৃগমাংস ঘৃত দিয়া ভাজিলেক তত॥
রাঁধিল পাঁঠার মাংস দিয়া খরসাল।
পিটালি বাটিয়া দিল মরিচ মিশালে॥
কত শত ব্যঞ্জন নাহি লেখা জোখা।
পরমান্ন পিষ্টক সে রান্ধিছে সনকা॥"

এইরূপে সমগ্র বাংলাকাব্য হইতে ভোজনবিলাস বর্ণনা করিতে গেলে একখানি স্বতন্ত্র গ্রন্থ হইয়া পড়ে। আপাততঃ এইখানেই আমরা উপসংহার করিলাম।



পদ্মলোচনের ধর্ম্মঘট

—শ্রীকালীপদ চৌধুরী

প্রাতঃকালে পদ্মলোচন মেটে ঘরের দাওয়ায় বসিয়া দশমবর্ষীয়া কন্যাকে ডাক্ দিল—"বারুণী ! ও বারুণী !"

ঘরের দরজার ফাঁক দিয়া দাওয়ার উপর উপবিষ্ট পিতার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বারুণী মৃদুস্বরে কহিল,—"কি ? ডাকছো কেন ?"

পদ্মলোচন পিছন না ফিরিয়াই অভ্যাস বশতঃ কহিল, "একটু তামাক্ সাজ,—" বারুণী পিতার আদেশ পালন করিতে লাগিল। পদ্মলোচন পুনরায় ডাক দিল,—"ভাল কথা ! শুনে যা তো মা !"

বারুণী পুনরায় দরজার ফাঁক দিয়া দৃষ্টিপাত করিয়া কহিল, "কি ?"

পদ্মলোচন পিছন ফিরিয়া কন্যার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কহিল,—"এদিকে আমার কাছে আয়, বলছি।"

বারুণী একটু ইতস্ততঃ করিয়া পরিধানের শতছিন্ন মলিন বস্ত্রাঞ্চলকে সংযত করিয়া সংকোচভরে পিতার নিকটে আসিয়া দাঁড়াইল। পদ্মলোচন কন্যার পরিচ্ছদের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া দীর্ঘশ্বাস ছাড়িয়া চুপ করিয়া রহিল। বারুণী রাস্তার শতচক্ষুর কৌতূহল-দৃষ্টির সম্মুখে অধোবদনে দাঁড়াইয়া রহিল। কিছুক্ষণ পরে পদ্মলোচন মেয়ের বিপন্নতা বুঝিয়া বলিল,—"সে কি কচ্ছে ?"

"শুয়ে আছে" ধীরে ধীরে কথা কয়টী বলিয়া বারুণী ঘরের ভিতরে চলিয়া গেল। পদ্মলোচন মেয়ের চলিবার ভঙ্গী লক্ষ্য করিতে করিতে বলিল—"শুয়ে আছে, রান্না বান্না করবে না।"

পিতার প্রশ্নে বারুণী শুধু পিতা শুনিতে পান এই ভাবে চুপি চুপি কহিল, "ঘরে চাল বাড়ন্ত।"

পদ্মলোচন এইরূপই সন্দেহ করিতেছিল। মেয়ের কথায় সে সন্দেহ সত্যে পরিণত হইল। আজ আবার কার কাছে সে হাত পাতিবে ? কাল তবু গৌর মুদী দয়া করিয়া পাঁচ আনার সওদা দিয়াছিল, তাই চলিয়াছে। কিন্তু আজ ? মুদী তো আজ কিছুই দিতে চাহিবে না। আর, মুদীরই বা দোষ কি ? তার প্রায় চার পাঁচ টাকার উপর পাওনা হইয়াছে। সেই বা আর কাহাতক ধার দিবে ! কি আহাম্মকিই না সে করিয়াছে ধর্ম্মঘট করিয়া। সংসারে অমন অনটন, রোজ না আনিলে রোজের খোরাক হয় না। তার ভিতর ধর্ম্মঘট করিয়া ঘরে বসিয়া থাকা পদ্মলোচনের মোটেই উচিত হয় নাই। আর পদ্মলোচনেরই বা দোষ কি ? কারখানার সকলেই যখন মিঃ দত্তর কথায় ধর্ম্মঘট করিল, তখন সে একা কাজ করিবে কি করিয়া ; কাজেই বাধ্য হইয়া তাহাকে ধর্ম্মঘটে যোগ দিতে হইয়াছে। ধর্ম্মঘটে আপত্তি অনেকেরই ছিল, কিন্তু মিঃ দত্ত যখন সকলকে আশ্বাস ও উৎসাহ দিয়া কহিলেন, "তোমাদের কোন ভয় নেই, চাকরী গেলে, আমি চাকরী দেবো ; অভাব হইলে আমি সাহায্য করিব। তোমরা ধর্ম্মঘট কর, মজুর ভাইগণ ! তোমরা এক হও।" তখন আর কাহারও আপত্তি রহিল না। পদ্মলোচনও সোৎসাহে ধর্ম্মঘটে যোগ দিয়াছে। কিন্তু কৈ ? আজ যে উপবাসী থাকিতে হইবে, মিঃ দত্ত তো দেখিতে আসিবেন না, অর্থ সাহায্য করা তো দূরের কথা।

বারুণী তামাক সাজিয়া কল্কীর আগুনে ফুঁ দিতে দিতে পিতার নিকটে আসিয়া বলিল,—"ধর বাবা।"

পদ্মলোচনের চিন্তায় বাধা পড়িল। জলমগ্ন ব্যক্তি যেমন করিয়া ভাসমান কাষ্ঠখণ্ডকে আঁকড়াইয়া ধরে, পদ্মলোচনও তেমনি হাত বাড়াইয়া মেয়ের হাত হইতে হুকাটা ধরিতে হাত বাড়াইল। 'দে' ! হুকাটায় কয়েকটা টান দিবার পরই আবার থার্ডক্লাসের যাত্রীর মত হুড় হুড় করিয়া চিন্তার পর চিন্তা আসিয়া তাহার মস্তিষ্ককে অবসন্ন করিয়া তুলিল। কতক্ষণ এভাবে বসিয়া ছিল বলা যায় না। চমক ভাঙ্গিল স্ত্রী কাদম্বিনীর ডাকে—"বলি, বসে তামাক খেলেই চলবে ? না, চেষ্টা-চরিত্তির কিছু করবে ?"

পদ্মলোচন চমকিয়া উঠিল। মনে মনে স্ত্রীর প্রতি রাগত হইয়া হুকাটায় আরও কয়েকটা টান দিয়া ব্যগভাবে বলিল—"হুঁ ! কোথায় যাবো ? কোন চুলোয় ?" হুকাটির

আরও জোরে কয়েকটা টান দিতেই বুঝিতে পারিল, তামাক পুড়িয়া গিয়াছে, অগ্নিতে ঘৃতাহুতির মত পদ্মলোচন দপ্‌ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল, সমস্ত রাগটা পড়িল তামাকটার ওপর। "দূর ছাই; নাঃ—যাঃ"—বলিয়া হস্তস্থিত কল্কীখানা সজোরে অদূরে নিক্ষেপ করিল। কল্কীখানা টুক্‌রা টুক্‌রা হইয়া ভাঙিয়া গেল। বন্ধ দরজার ফাঁকে স্ত্রীর অস্পষ্ট মূর্ত্তির প্রতি অগ্নিদৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া পদ্মলোচন মেয়েকে আহ্বান করিল—"বারুণী! ও বারুণী! বলি, নেশার ভেতর তো খাই একটু তামাক! তাও তোদের কপাল পুড়ে, একটু ভাল সাজতে পারিস্ না? একপাল রাক্ষস জন্মে আমাকে...।"

ঘরের ভিতর হইতে বারুণীর বিরক্তিপূর্ণকণ্ঠ শোনা গেল,—"তামাক নেই, তার আমাকে কি করতে বল? একটু পোড়া গুল দিয়ে তামাক সেজেছি। কাল কি তামাক এনেছিলে? খালি বলতেই পার।"

সত্যই তো পদ্মলোচন কাল তামাক আনে নাই। কাল রাতেই তো তামাকের অভাব পড়েছিল—ছাই-মনে কিছুই থাকে না। শুধু শুধু মেয়েটাকে সে গালাগালি দিল। রাগ ও অনুশোচনায় পদ্মলোচন স্ত্রীর উপর বিরক্ত হইয়া উঠিল—চেষ্টা-চরিত্তির! স্ত্রী তাকে বলিয়া দিবে, তবে সে চেষ্টা করিবে? পদ্মলোচনের কি সে বিষয়ে চিন্তা নেই! তবে কেন গিন্নী সকালবেলা ঝুটো ঝাঁঝাল কথা বলিয়া গিন্নী-গিরী ফলাইতে আসিলেন।

হাতের হুঁকাটা দেয়ালের পেরেকে ঝুলাইয়া রাখিবার জন্য পদ্মলোচন ঘরে প্রবেশ করিয়া, হুঁকাটা যথাস্থানে রাখিয়া কাপড়ের আঁচল দিয়া ক্ষুদ্র বামচক্ষুটা মুছিতে লাগিল। পদ্মলোচনের এ চক্ষুটা অন্যটা অপেক্ষা একটু ছোট, অনবরত জল ঝরে—যত বয়স বেশী হইতেছে চক্ষুটাও যেন দিন দিন ক্ষুদ্র হইতে ক্ষুদ্রতর হইতেছে। দেয়ালে ঝুলান তক্তাখানা হইতে হ্যাণ্ডেল-ভাঙ্গা সুতায় বাঁধা চশমাটিকে কানে জড়াইয়া ছেঁড়া সার্টটাকে কাঁধের উপর ফেলিয়া লাঠিখানি হাতে করিয়া পদ্মলোচন রাস্তায় আসিয়া দাঁড়াইল।

হাঁটিতে হাঁটিতে বস্তির দক্ষিণপাশে গৌর মুদীর দোকানের সামনে আসিয়া দাঁড়াইল। মুদী বিরাট ভুঁড়িটার ভারে স্থির হইয়া বসিয়া খরিদ্দার বিদায় করিতেছিল। একবার একটু ইতস্ততঃ করিয়া পদ্মলোচন একটু কাশিয়া, বামহস্তদ্বারা পিঠ চুলকাইতে চুলকাইতে মুদীকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিল—"গৌর, বাপ আমার। বারুণী এলে, আজকের মত খোরাকীটা তাকে দিয়ে দিও—আমি ফিরে এসেই দামটা মিটিয়ে দিব।"

গৌরমুদী কোন কথাই বলিল না। যেন শুনিতেই পায় নাই, এমনি ভাব দেখাইয়া নির্ব্বিকার চিত্তে খরিদ্দার বিদায় করিতে লাগিল।

পদ্মলোচন আর একটু উচ্চ গলায়, একটু ঢোক্ গিলিয়া বলিল—"গৌর! শুনছ!" গৌরমুদী এবার পদ্মলোচনের প্রতি দৃষ্টিপাত করিল। পদ্মলোচন ইতস্ততঃ করিয়া বলিল, "আজকের খোরাকীটা···বারুণীকে···আমি এসেই···"

গৌরমুদী এবার চটিয়া উঠিল—"ও সব চালাকী ছাড়ুন ম'শাই! আমার আগের পাওনা মিটাইয়া না দিলে—আমি আর এক আধলারও জিনিষ দিচ্ছি না—না-না, কক্ষণও না।" সম্মুখে দণ্ডায়মান জগু মিস্তিরের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া মুদী পুনরায় পূর্ব্বের সুর বজায় রাখিয়া কহিল—"ম'শাই, চার পাঁচ মাসের বাবদ ৬।৭ টাকা পাওনা, তারপর আবার এটা ওটা যাচ্ছে···ম'শাই আপনিই বলুন, আমি এখানে ব্যবসা করতে বসেছি, না, দানছত্র খুলেছি?"

জগাই মিস্তিরেরও কিছু বাকী জিনিষ নেবার ইচ্ছা আছে—সে মুদীর কথায় সম্পূর্ণ সায় দিয়া কহিল—"ঠিকই তো।"

পদ্মলোচন যেন ইচ্ছা করিলেই মুদীর কথার একটা উপযুক্ত জবাব দিতে পারিত, এমনি ভাব দেখাইয়া দোকান পেরিয়ে হন্ হন্ করিয়া এগিয়ে গেল। সম্মুখে আরও কিছুদূর অগ্রসর হওয়ার পর, পদ্মলোচন দেখিল—নিস্তারিণী বাড়ীওয়ালী তার ঘোরকৃষ্ণ গজসদৃশ দেহখানি হেলাইয়া দোলাইয়া হাতে একটী জলপূর্ণ গাড়ু লইয়া সম্পূর্ণ বস্তিটার একমাত্র পায়খানাটার উদ্দেশ্যে দ্রুতপদে অগ্রসর হইতেছে। পরিধানে তার একখানি 'চারখানার' গামছা, উহারই একপ্রান্ত দ্বারা নিস্তারিণী বক্ষের ও মস্তকের লজ্জা কোনমতে নিবারণ করিয়াছে। মাথার ওপরে সমস্ত চুলটা একটা গাঁট দিয়া শিব-প্যাটার্ণ তৈরী করিয়াছে।

নিস্তারিণী, পদ্মলোচনকে বিষণ্ণ মুখে আসিতে দেখিয়া

রাস্তার একপাশে সরিয়া দাঁড়াইয়া পথ ছাড়িয়া দিয়া কহিল, "এত সকালে কোথায় বেরোচ্ছ পদ্মদা।"

পদ্মলোচন থমকিয়া দাঁড়াইল। একটা আশার ক্ষীণ আলো তার মনের মধ্যে উঁকিঝুকি মারিয়া মুহূর্ত্তেই মিশাইয়া গেল। তবুও পদ্মলোচন একবার শেষ চেষ্টা না করিয়া ছাড়িল না। নিস্তারিণীর প্রশ্নের কোন জবাব না দিয়া, পদ্মলোচন নিজের কথা পাড়িল। একটু আপ্যায়িত হাসি হাসিয়া পদ্মলোচন কহিল—"নিস্তারিণি, তুমি তো অনেকেরই উপকার কর, আমার একটু উপকার করবে ?"

নিস্তারিণীর চোখ দু'টো স্তিমিত হইয়া আসিল। তার উর্দ্ধতন চৌদ্দ পুরুষের মধ্যে কেহ কোনদিন ভুলক্রমেও পরোপকার করিয়াছে, একথা নিস্তারিণী তার জীবনে কারও মুখ হইতে শুনে নাই। সে মনে মনে প্রমাদ গণিল—নিশ্চয়ই পদ্মলোচন এখন কিছু যাচ্ঞা করিয়া বসিবে। শুধু শুধু সেধে কেন সে কথা বলিতে গেল ?

পদ্মলোচন নিস্তারিণীকে চুপ দেখিয়া গলাটা একটু পরিষ্কার করিয়া বলিল—"বল উপকারটুকু করবে ? বারুণী এলে তাকে চার আনার পয়সা দিবে ?"

নিস্তারিণী ইচ্ছা করিলে আরও কিছুকাল পদ্মলোচনের সহিত কথা কহিতে পারিত, কিন্তু পদ্মলোচনের শেষ কথার সে যেন আর থাকিতে পারিতেছে না, এমনি ভাব দেখাইয়া অস্ফুট স্বরে কি একটা কথা বলিয়া গন্তব্যস্থান অভিমুখে দ্রুতপদে অগ্রসর হইল।

নিস্তারিণী অস্ফুট স্বরে কি বলিয়া গেল, পদ্মলোচন তাহা কিছুই বুঝিতে পারিল না, উত্তরটা ভাল করিয়া শুনিবার জন্য এক পা অগ্রসর হইতে যাইবে, এমনি সময় পিছনে কে যেন অদম্য হাসির বহর রোধ করিতে না পারিয়া "হি-হি-হি" করিয়া হাসিয়া উঠিল।

পদ্মলোচন পিছন ফিরিয়া দেখিল—মাটির দেয়ালের ভিতর লোহার জালে ঘেরা ক্ষুদ্র একটী গবাক্ষে একটী বধূ মুখ বাহির করিয়া হাসিতেছে; পদ্মলোচনের চোখা-চোখি হওয়া মাত্র বধূটী আবার ফিক্ করিয়া হাসিয়া অদৃশ্য হইয়া গেল।

পদ্মলোচনও আবার হাঁটিতে আরম্ভ করিল। বস্তির শেষ প্রান্তে, বড় রাস্তার পার্শ্বে, যশোদা পালের বৈঠকখানার জানালার পাশে আসিয়া অম্বুরী তামাকের গন্ধে থমকিয়া দাঁড়াইল। পদ্মলোচন আর থাকিতে পারিল না—সকালের তামাকটা ভাল খাওয়া হয় নাই—ইচ্ছা হইল, একটা টান দেয়। যশোদা পালের বৈঠকখানার দরজা ঠেলিয়া ভিতরে ঢুকিয়া পড়িল। যশোদা পাল এইমাত্র স্নান করিয়া ফোঁটা কাটিয়া হুঁকাটায় তামাক ভরিয়া চৌকীতে বসিতে যাইবেন, এমন সময় পদ্মলোচনকে ঢুকিতে দেখিয়াই বলিয়া উঠিলেন—"আহা-হা-হা দাঁড়াও, দাঁড়াও, সবে মাত্র স্নান করে এলুম, অমনি, আর ফুরসৎ সইল না ? জ্বালা আপদ! বলি, কি জিনিষ ?"

পদ্মলোচন কিছুকাল কি চিন্তা করিয়া বলিল, "পেতলের ঘড়া"।

বিরক্তিতে যশোদা পালের ঠোঁট দুটো ফুলিয়া উঠিল, "দূর-ছাই! বউনির সময় পিতলের কলসী ? যাও দুপুরে এসো। হরে কৃষ্ণ, হরে কৃষ্ণ···"

পদ্মলোচন নিরুপায় হইয়া চলিয়া যাইতে পা বাড়াইল। আর একবার পিছন ফিরিয়া যশোদা পালের হস্তস্থিত হুকাটার প্রতি লোলুপ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া দরজা অভিমুখে অগ্রসর হইল।—

যশোদা পাল চেঁচাইয়া উঠিল, "বলি, যদি এলে তামাকটা খেয়েই যাও; অত ব্যস্ত কেন ?"

যশোদা পালের আহ্বানে পদ্মলোচন প্রফুল্ল হইল। ঝুপ করিয়া বসিয়া পড়িয়া কলিকাটি পাইবার জন্য হাত বাড়াইল।

যশোদা পালের বৈঠকখানা হইতে বাহিরে আসিয়া পদ্মলোচন গৃহ অভিমুখে রওয়ানা হইল। বারুণী পাতকুয়া হইতে একটী দড়ি-বাঁধা বালতিতে করিয়া জল তুলিতেছিল, তার একপাশে একপাঁজা বাসন ও একটি পিতলের ঘড়া। পদ্মলোচন ভিতরে ঢুকিয়া আস্তে আস্তে মেয়ের কাছে আসিয়া চুপি চুপি কহিল, "দে তো ঘড়াটা একটু সাফ করে শীগগির। বারুণী বিস্মিত মুখে পিতার প্রতি দৃষ্টিপাত করিল। পদ্মলোচন মেয়ের বিস্মিত দৃষ্টির অর্থ বুঝিয়া একটু আশ্বাস দিয়া বলিল, "এই ২।৪ দিনের জন্য মোটে, তোর অসুবিধে হলে আমি তাবৎ একটা মেটে কলসী এনে দেব, তাই নিয়ে তুই

কলে যাস।" কথা ক'টী বলিয়াই পদ্মলোচন একবার পিছন ফিরিয়া চাহিয়া দেখিল—গিন্নী আছে কি না—যদি গিন্নী বুঝিতে পারে, তবে হয় তো, দুটো কড়া কথা শুনাইয়া দিবে।

বারুণী পিতার প্রস্তাবে দুঃখিত হইল, তার এত সাধের ঘড়াটা—এই ঘড়া ভরিয়া রাস্তার কল হইতে জল আনিতে বারুণীর কত সাধ! এই ঘড়াটার উপর তার অসীম স্নেহ। রোজ দু'বেলা তেঁতুল-বালি দিয়া ঘড়াটাকে মাজিয়া পরিষ্কার করিয়া রাখে। এই ঘড়া না হইলে জল আনিতে বারুণীর সুখ হয় না। শেষে কি না এটাও যাবে! কিন্তু পিতার ম্লান নিরুপায় মুখের দিকে তাকাইয়া আর "না" বলিতে পারিল না। পদ্মলোচন ঘড়াটাকে হাতে তুলিয়া ওজন করিবার ছলে কহিল, "পাকা ৫ সের।"

স্ত্রী, পদ্মলোচনের শেষ কথাটা শুনিতে পাইয়া বাহিরে আসিয়া পদ্মলোচনের হাতে ঘড়াটা দেখিয়া ব্যাপারটা বুঝিয়া ফেলিল। পদ্মলোচন স্ত্রীকে দেখিয়া ভীত হইয়া উঠিল—কিন্তু কাদম্বিনী বেশী কিছু বলিল না, শুধু ঠোঁট দুটো উল্টাইয়া বিদ্রূপ করিয়া কহিল, "ধর্ম্মঘট কর গে।"

[২]

মিঃ আর, দত্ত অর্থাৎ রামেশ্বর দত্ত যৌবনে ছিলেন সম্পূর্ণ সাহেব-ভাবাপন্ন। হ্যাট-কোট ছাড়া পরিতেন না। ইংরাজী ছাড়া বলিতেন না। টেবিলে ছাড়া খানা খাইতেন না। ক্রমে প্রৌঢ়ত্বের সীমায় পৌঁছিলে, হাতেও বেশ দু'পয়সা জমা হইল—মনে করিলেন, এবার চাকরী ছাড়িয়া দেশসেবায় মনোনিবেশ করিবেন। যেই কথা সেই কাজ—হ্যাট-কোট ছাড়িয়া ধুতি-পাঞ্জাবী খদ্দরের টুপী পরিলেন। দু'একটা যায়গায় মোটা রকম কিছু দান করিয়া, এখানে ওখানে বক্তৃতা দিয়া, সভাসমিতি করিয়া ২।৩ বৎসরের মধ্যেই True Patriot উপাধিতে ভূষিত হইলেন। ক্রমে, বহু জায়গা হইতে তাঁর ডাক আসিতে লাগিল। কোথাও সভাপতিত্ব গ্রহণ করিবার জন্য, কোথাও হইতে বা ধর্ম্মঘট পরিচালনার জন্য। শেষোক্ত কার্য্যটীতে তিনি বিশেষ পারদর্শী হইয়া উঠিলেন—এবার তিনি সুবর্ণ-সুযোগ লাভ করিলেন। ঝোঁপ বুঝিয়া কোপ মারিয়া যাইতে লাগিলেন। এবং দু'এক জায়গায় মালিকদের নিকট হইতে মোটা রকম একটা টাকার পরিমাণ লইয়া ধর্ম্মঘট নির্ব্বিঘ্নে মিটাইয়া দিয়া দেখিলেন, এ ব্যবসা চাকুরী অপেক্ষা শতগুণে ভাল—অথচ সুনামও আছে।

পদ্মলোচন যে তেলের কলে কাজ করিত, সে-খানকার ধর্ম্মঘটের প্রধান উদ্যোক্তাও ইনি।

এ হেন মিঃ দত্ত বাইরের ঘরে বসিয়া ছিলেন—বাহির হইতে পদ্মলোচন আসিয়া ডাক দিল—"বাবু।"

মিঃ দত্ত একবার ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া জানালার ভিতর দিয়া প্রথমে লোকটীকে দেখিয়া লইলেন। তার পর স্মিত-হাস্যে কহিলেন,—"এস হে, ভিতরে এসো।"

পদ্মলোচন ছেঁড়া ছাতাটী বগলে করিয়া দরজা ঠেলিয়া ভিতরে প্রবেশ করিল। মিঃ দত্ত একটা চেয়ার দেখাইয়া দিয়া পদ্মলোচনকে বলিলেন,—"বস। কি খবর?"

পদ্মলোচন বসিল না। বাবুর সামনে চেয়ারে বসা উচিত নয়—এ-টুকু জ্ঞান তার আছে, আর বাবুর সামনে চেয়ারে বসাটা ভালও দেখায় না।

মিঃ দত্ত পুনরায় প্রশ্ন করিলেন,—"তার পর, কি খবর?"

পদ্মলোচন কাপড়ের খুঁট দিয়া ক্ষুদ্র বাম চক্ষুটা মুছিয়া লইয়া, শঙ্কিতকণ্ঠে বলিল,—"বাবু, বড় অভাব যাচ্ছে।"

মিঃ দত্ত একটু মুচ্‌কি হাসিয়া সহানুভূতিপূর্ণ স্বরে কহিলেন, —"তা তো যাবেই, নূতন কিছু নয়। তোমরা সামান্য আয় কর, তার ওপর কয়দিন বিনা কাজে বসে আছ। তবে আরও কিছু দিন কষ্ট সহ্য কর—একটা সুবিধা আমি করে দিবই।"

পদ্মলোচন পূর্ব্বের সুর বজায় রাখিয়া বলিল,—"বাবু, আর কাঁহাতক উপোস করব? কাল থেকে উপোস করে আছি।"

"শেখ, শেখ, শিক্ষা হোক। সোণা যত পুড়বে তত উজ্জ্বল হবে। তোমরা যদি অভাবের তাড়না সহ্য না কর, তবে তোমাদের ভিতর শক্তি জাগবে কি করে? আজ দলে দলে উপবাসী নিরন্ন শ্রমিকগণ হাতে হাত ধরে বল,—"আমরা এটা চাই, ওটা চাই, দেখবে, ধনকুবের মালিকগণ না দিয়ে পারবে না।" বক্তৃতাচ্ছলে কথাগুলি বলিয়া মিঃ দত্ত নীরব হইলেন।

পদ্মলোচন আবার আব্‌দারের সুরে বলিল,—"বাবু!

ওরা—দিগম্বর বাবু—যদি চাকরী থেকে আমাকে জবাব দিয়ে দেয় ? আর দেবার কথাও আছে। আমার ওপর—দিগম্বর বাবু হাড়ে হাড়ে চটে আছেন, তাঁর ধারণা আমিই দলের পাণ্ডা। যদি চাকরী যায় বাবু, ছেলেপুলে নিয়ে মরে যাব বাবু।" কথা কয়টী বলিয়া পদ্মলোচন পুনরায় আঁচল দিয়া ক্ষুদ্র বাম চক্ষুটা মুছিয়া লইল।

মিঃ দত্ত আশ্বাস দিয়া বলিলেন, "সে ভয় করো না—আমি যখন পেছনে আছি, তখন তোমাদের কোন ভয় নাই। আমি কথা দিচ্ছি—যদি চাকরী যায় তবে অন্ততঃ তোমাকে আমি এর চাইতে ভাল চাকরী দেবই। সে কুলির কাজ নয়—লেখাপড়ার কাজ

পদ্মলোচন মিঃ দত্তের এই শেষ কথাটাই শুনিবার জন্ত সত্য-মিথ্যায় মিশান এই কাঁদুনী গাহিয়াছে। আরও একটু মিঃ দত্তের মন তার প্রতি আকৃষ্ট করিবার জন্ত কহিল,—"বাবু, তা যদি পারেন, তবে বাবু তাই দেখবেন। বুড়ো বয়স, তেলকলের খাটুনী আর খাটতে পারি না।" কথা কয়টী বলিয়া পদ্মলোচন একটু ঢোক গিলিয়া উৎসাহভরে বলিল,—"বাবু, আমার হাতের লেখা বড় ভাল—ছেলেবেলায় ঠাকুর্দা বলতেন,—পদ্মর হাতের লেখা যেন মুক্তার টুকরো।" দেখবেন বাবু ? এই দেখুন—"

পদ্মলোচন একটী পেন্সিল দিয়া টেবিলের উপর একটুকরা কাগজে মুক্তার টুকরার নিদর্শন দিতে যাইতেছিল, মিঃ দত্ত রুক্ষস্বরে কহিলেন, "থাক আর দেখাতে হবে না", তার পর একটু থামিয়া কহিলেন,—"এখন যাও, দেখি আমি তোমার জন্ত কি করতে পারি।" পদ্মলোচন নমস্কার করিয়া বাহির হইয়া গেল।

মিঃ দত্ত নিজের মনে মনে হাসিয়া উঠিলেন, তার পর ড্রাইভারকে ডাকিয়া কহিলেন,—"গাড়ী রেডী কর।"

(৩)

পদ্মলোচন যে তেলকলে কাজ করে, তাহার একমাত্র স্বত্বাধিকারী শ্রীদিগম্বর রায়। অবশ্য, দিগম্বর বাবু এর প্রতিষ্ঠাতা নন, প্রতিষ্ঠাতা দিগম্বর বাবুর পিতা নীলাম্বর রায়। সামান্ত দুইশত টাকা মূলধন লইয়া তিনি ব্যবসাক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন, এবং ক্রমে ক্রমে মৃত্যুর পূর্ব্বে পুত্রের হস্তে ব্যবসায়ের যে হিসাব-নিকাশ দিয়া যান, তাহাতে মূলধন তিন লক্ষেরও অধিক। নীলাম্বর নিজে ছিলেন কঠোর পরিশ্রমী। পুত্র দিগম্বরও পিতার এই গুণটী পাইয়াছেন, কিন্তু দিগম্বর বাবুর একটী বিশেষ দোষ আছে, সেটী হচ্ছে, তাঁর অতিরিক্ত ক্রোধ। সামান্ত কারণে লোকের উপর চটিয়া যাইতেন—লোকে বলিত—টাকার গরম।

স্ত্রী নিরুপমার সঙ্গে তো দিন-রাত ঝগড়া বাধিয়াই আছে, আবার পরক্ষণেই তাহা আপোষ হইয়া যাইতেছে। দিগম্বর বাবুর পাঁচটী পুত্র, কন্তা নাই। দীর্ঘ ত্রিশ বৎসরের বিবাহিত জীবনে পরপর ৩,৪টী ছেলেই হইল, তখন দিগম্বর বাবু নিরুপমাকে একদিন পরিহাস করিয়া বলিয়াছিলেন—"গিন্নী, এ তুমি করছ কি ? খালি ছেলেই দিচ্ছ, মেয়ে কি মোটেই দিবে না ?"

নিরুপমা স্বামীর মুখের ওপর কটাক্ষ হানিয়া কহিয়াছিলেন "কি যে ছাই বল, তার ঠিক নেই।" কিন্তু পরক্ষণেই নিরুপমার মুখ ম্লান হইয়া যাইত। বাস্তবিক! যদি একটী মেয়ে হইত—কোঁকড়া কোঁকড়া চুল, ফুটফুটে মুখ, ঠিক ও বাড়ীর ডলির মেয়ে খুকীর মত! তবে, নিরুপমা তাকে কত সাধে সাজাইতেন!

তারপর, নিজের কন্তারত্ন লাভের আকাঙ্ক্ষাকে সত্যে পরিণত করিতে নিরুপমা স্বামীর অজ্ঞাতে মাদুলী, তাবিজ, গাছগাছড়া ধারণ করিয়াও যখন পর বৎসর পুনরায় একটী পুত্র-রত্ন প্রসব করিলেন, তখন দিগম্বর বাবু মুখ ভারী করিয়া বলিয়াছিলেন—"গিন্নী তো আমাকে ভারী মুস্কিলে ফেললে। জান তো, বাবা বলে গেছেন যে, তাঁর বংশের পুত্র-সন্তানদের নামের শেষে 'অম্বর' সংযোগে নামকরণ করিতে হইবে। কিন্তু এত 'অম্বর'-এর বিশেষণ আমি কোথায় পাব ?"

নিরুপমাও হিসাব করিয়া দেখিলেন—বড় ছেলের নাম, পীতাম্বর, দ্বিতীয়টীর নাম সিতাম্বর, তৃতীয়টীর নাম অসীমাম্বর, চতুর্থটীর নাম অরুণাম্বর, এখন কোলেরটীরই বা কি নাম রাখা যায় ? শ্বশুরের এমন আজগুবি খেয়ালের বশে বাছাদের নামগুলি বিশ্রী হইয়া যাইতেছে, লোকের ছেলে-পিলের কি সুন্দর সব নাম—'অরুণ, সুনীল, কমল, কিরণ'... কিন্তু বাছাদের...।

দিগম্বরবাবু অনেক উপন্তাস ঘাঁটিয়াও যখন 'অম্বর'

সংযোগে কোন নাম পাইলেন না, তখন নিরুপমাকে আসিয়া কহিলেন—"গিন্নী, ঠিক হয়েছে ও নভেম্বর মাসে জন্মেছে, ওর নাম 'নভেম্বর' রাখা হউক—নইলে আর উপায় নেই।"

নিরুপমার অতি দুঃখেও হাসি পাইল—অগত্যা ৫ম পুত্রের নাম 'নভেম্বর' রাখাই স্থির হইল এবং দিগম্বরবাবু নিরুপমাকে সাবধান করিয়া দিলেন যে, ভবিষ্যতে যদি তিনি আরও পুত্র সন্তান প্রসব করেন, তবে যেন 'সেপ্টেম্বর' কি ডিসেম্বর করেন, নতুবা দিগম্বরকে মহামুস্কিলে পড়িতে হইবে।

দিগম্বরবাবু মুখে যাই-ই বলুন না কেন, একটি কন্যালাভের আকাঙ্ক্ষা তাঁরও মনে দিনরাত কাঁটার মত বিঁধিতেছিল। অগত্যা যখন বুঝিলেন, গিন্নীকে দিয়া কন্যালাভ সম্পূর্ণ অসম্ভব, তখন ১৭শবর্ষীয় পুত্র পীতাম্বরকে একটী সুন্দরী পাত্রী দেখিয়া বিবাহ করাইয়া পুত্র-বধূকে ঘরে আনিয়া কন্যার স্থানে প্রতিষ্ঠিত করিয়া কতকটা স্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করিলেন। পীতাম্বরের বয়স অল্প, তাতে আবার সামনে পরীক্ষা, এ জন্য নিরুপমা পুত্রবধূকে ছেলের সহিত বেশী মিশিতে দিতেন না। সর্ব্বদাই চোখে চোখে রাখিতেন। কিন্তু পুত্রবধূ রেণুকা বড় দুষ্টু—সে একটু ফাঁক পাইলেই পীতাম্বরের কাছে ছুটিয়া যাইয়া তার পরীক্ষার পড়ার ব্যাঘাত করে।

দিগম্বর বৈঠকখানায় বসিয়া খবরের কাগজ পড়িতেছিলেন। হঠাৎ একটা জায়গায় নজর পড়িল।—

"নীলাম্বর অয়েল মিলে ধর্ম্মঘট, মিঃ আর, দত্তের অক্লান্ত পরিশ্রম, মালিক দিগম্বর রায়ের অবিবেচনা।" ১৩ই নভেম্বর।

"গত ৯ই নভেম্বর তারিখ হইতে, নীলাম্বর অয়েল মিলের শ্রমিকগণ এই বলিয়া মিঃ আর, দত্তের নেতৃত্বে ধর্ম্মঘট করিয়াছে যে, তাহাদের বৎসরে একমাস বেতনসহ ছুটী দিতে হইবে, জ্বর বা অনুরূপ কোন অসুখ হইলে তজ্জন্য কারখানা অনুপস্থিতির মাহিয়ানা কাটিতে পারিবে না। ডিউটি দশ ঘন্টার স্থানে আট ঘন্টা করিতে হইবে। কোন শ্রমিককে ৩০৲ টাকার নীচে মাহিয়ানা দিতে পারিবে না। মালিক দিগম্বর রায় কারখানা বন্ধ করিয়া দিয়াছেন—ধর্ম্মঘট এখনও মেটে নাই।

আমাদের মতে, আজকাল আর সে ধনতন্ত্রের যুগ নেই—আজকাল মজুরের যুগ—বাস্তবিক দেশের কল্যাণ সাধন করিতে হইলে শ্রমিক আর কৃষক এই দুইশ্রেণীর লোকদের সমকক্ষ করিয়া তুলিতে হইবে। ধনকুবের মালিকগণ নিজেদের হীন অর্থের লালসা চরিতার্থ করিয়া দিন দিন মজুরদের রক্তমাংস শুষিয়া লইতেছে। মালিক দিগম্বর রায় কারখানা বন্ধ করিয়া নির্ব্বুদ্ধিতার কাজ করিয়াছেন—যেহেতু শ্রমিকদের দাবীগুলি মোটেই অসঙ্গত নহে। আমরা মজুরদের সাফল্য কামনা করি এবং মিঃ আর, দত্তকে তাঁহার সৎ উদ্দেশ্যের জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।"

সংবাদটি পড়িয়াই দিগম্বরবাবুর মেজাজ খারাপ হইয়া গেল। কি আহম্মক এই সাংবাদিক! "মজুরদের আপত্তিগুলি মোটেই অসঙ্গত নয়?" অথচ এই সংবাদপত্রের প্রেস কর্ম্মচারীদের কি সুবিধা এ করিয়াছে? তাদের মাহিয়ানা ১০ হইতে ২৫ টাকা মাত্র। দশ ঘন্টা, মাঝে মাঝে তারও বেশী, ডিউটি ইহারা দেয়, একদিন অনুপস্থিত হইলে মাহিয়ানা কাটা তো দূরের কথা—মজুরকে চাকুরী হইতে জবাব দেয়। এই তো এর ভিতরের খবর। অথচ এ কোন সাহসে মজুর আন্দোলন সমর্থন করিয়া পরের উপর দোষারোপ করে? নিজে বাঙ্গালীর মুখপত্র হিসাবে ধাপ্পাবাজী দিয়া ব্যবসা চালাইতেছে। ব্যবসা ছাড়া আর কিই বা বলা যায়—খালি কতকগুলি হুজুগে মাতা বাঙ্গালীর মনগড়া কথা লিখিয়া এ কারবার চালাইতেছে। নিজেদের প্রেসকর্ম্মচারীদের উপর দিনরাত যথেচ্ছ অত্যাচার করিয়া আসিতেছে, অথচ কি দরদই না মজুরদের উপর দেখাইতেছে। এই তো এর ভিত্তি। বাঙ্গালীর এই আবার জাতীয় পত্রিকা!

পরকে দোষ দিলেই বা কি হইবে? নিজের পুত্র পীতাম্বর পর্য্যন্ত এই কাগজের পক্ষপাতী। সব হুজুগে মাতা! তুই আমার ছেলে—লেখাপড়া শিখেছিস্, আমারই মুখের উপর বলিস্—"বাবা, মজুরদের আপত্তি মেটান আপনার উচিত।" গিন্নীরও ঐ মত। সবই যেন কমুনিষ্ট—যত সব ষ্টুপিড! যদি কারবারটি নষ্ট হয়, তবে কতগুলি টাকা লোকসান হবে—সেকথা ভেবে দেখেছিস্? বাবা কত কষ্ট সহ্য করে নিজের হাতে যা গড়ে রেখে গিয়েছেন—আমি নিজের হাতে তা কি করে নষ্ট করি? দিগম্বরবাবু নিজের মনে নিজেই জলিয়া পুড়িয়া মরিতে লাগিলেন, কাউকে যে ব্যাপারটা বুঝাইয়া নিজের দোষ ক্ষালন করিবেন, সে উপায় নেই। কেই বা তাঁর কথা শুনিবে?

"বাবা" সিতাম্বর দরজা ঠেলিয়া ভিতরে ঢুকিয়াই পিতার মুখের প্রতি তাকাইয়া থমকিয়া দাঁড়াইল। সিতাম্বর রোজই এই সময় পিতার নিকটে আসিয়া খবরের কাগজ পড়া শোনে—দিগম্বরবাবু পড়েন, আর সিতাম্বর মেঝের উপর শুইয়া পিতার মুখ হইতে দুনিয়ার খবর শোনে।

দিগম্বর বাবু পুত্রের বিহ্বলতা দেখিয়া কহিলেন "এ দিকে এস।"

সিম্বতার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। দিগম্বর বাবু হাতের কাগজখানা দেখাইয়া বলিলেন—"এর নামটা কি জান, বাবা!"

সিতাম্বর বানান করিয়া পড়িল, "জা-তী-য়-প-ত্রি-কা।"

দিগম্বর বাবু কহিলেন, "হু! বড় হলে নামটা মনে থাকবে?"

সিতাম্বর সজোরে মাথা নাড়িয়া কহিল—"খুব থাকবে।"

দিগম্বর বাবু বলিলেন "আমি বলছি, বড় হয়ে যখন খবরের কাগজ পড়বে, কেবল ঐ জাতীয়-পত্রিকা পড়বে না, বুঝলে?"

"কেন বাবা?"

"এরা জোচ্চোর, নিজেদের গলদ ঢেকে রেখে পরের উপর দোষারোপ ক'রে এরা ভাল মানুষ সাজে! এরা আমাকে গালাগালি দিয়েছে।"

"তোমাকে? শালাদের পেলে—এই এমনি করে ঘুষা মেরে দিতুম, আমাকে একটা বন্দুক এনে দাও, ওদের গুলী করে ফেলব।"

ছেলেকে শান্ত করিবার জন্য দিগম্বর বাবু কিছু বলিবার পূর্ব্বেই অসীমাম্বর, অরুণাম্বর, এমন কি নভেম্বর পর্য্যন্ত আসিয়া ঘরে ঢুকিল।

সিতাম্বর অসীমাম্বরকে কহিল "শুনেছিস জাতীয় পত্রিকা বাবাকে গালাগালি দিয়েছে? আমরা বড় হয়ে আর ও কাগজ পড়ব না, বুঝলি?"

অসীম দিগম্বর বাবুর প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কহিল, "বাবা! তুমিই তো ও কাগজ রাখ।"

দিগম্বর বাবু চটিয়া বলিলেন "আমি কেন রাখতে যাব? রাখে তোর দাদা—।"

অসীম কহিল—"দাদা কেন রাখতে যাবে? তুমিই তো টাকা দিয়ে কাগজ রাখ—তোমার নামেই তো কাগজ আসে।"

দিগম্বর বাবু তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠলেন—"তোদের ও মাথা খেয়েছে? আমার মুখে মুখে কথা! বেরো…বেরো সব এখান থেকে।"

পিতার ক্রোধ দেখিয়া ছেলেরা শিহরিয়া উঠিয়া—ছুটিয়া পালাইল, ছোটছেলে নভেম্বর দৌড়াইতে পারে না, মাত্র হাঁটিতে শিখিয়াছে। সে নিরুপায় হইয়া দরজা পর্য্যন্ত যাইয়া, চৌকাঠ পার হইতে অসমর্থ হইয়া পিতার প্রতি মিনতিপূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল। দিগম্বর বাবু খবরের কাগজখানা টুকরা টুকরা করিয়া কনিষ্ঠ পুত্রের পৃষ্ঠের ওপর সজোরে নিক্ষেপ করিয়া, চীৎকার করিয়া উঠিলেন—"বেরো! যা আমার সমুখ থেকে।"

নিরুপমা, পুত্রবধূকে সংসারের কাজের ভার দিয়া নিজে তার পিছনে চেয়ারে বসিয়াছিলেন—অর্থাৎ বধূকে পাহারা দিচ্ছিলেন, বউটী বড় দুষ্ট, কোন্ ফাঁকে আবার পীতাম্বরের কাছে ছুটিয়া যায় তা বলা যায় না। বৈঠকখানায় কর্ত্তার চীৎকার শুনিয়া তিনি ছুটিয়া আসিলেন। নভেম্বরকে কোলে তুলিয়া স্বামীকে কহিলেন—"কি হয়েছে? অমন করে চেঁচাচ্ছ কেন? আর নভুকে মেরেছ কেন?"

দিগম্বর বাবু সুর আর একমাত্রা চড়াইয়া দিয়া কহিলেন,—"ওকে তো মারা উচিত নয়, মারা উচিত তোমাকে, ছেলে-গুলোকে যা'তাই শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে!"

"কি? কি বললে? মারবে! জান, আমি ব্যারিষ্টারের মেয়ে?—আমি…।"

"বাড়ীতে কে আছেন?" দরজায় কে কড়া নাড়িল। নিরুপমার কণ্ঠ থামিয়া গেল, তিনি ভিতরে ঢুকিয়া স্বামীর উপরের রাগের মাত্রাটা ছেলের পিঠের ওপর প্রলেপ দিলেন, ছেলেটা কাঁদিয়া উঠিল—"বাবা আ-আ—"

দিগম্বর বাবু ছেলের কান্না কানে তুলিলেন না। ধীরে ধীরে দরজা খুলিয়া দেখিলেন—মিঃ দত্ত দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন।

(৪)

মিঃ দত্ত চেয়ারে বসিয়াই বলিলেন—"তার পর? আপনি কি করবেন? নিষ্পত্তি করবেন? না, এমনি থাকবে?"

"তা—সবটা নিষ্পত্তি করা তো সম্ভব নয়, তা হলে যে

কারখানা ফেল পড়বে।" মিঃ দত্ত বক্তৃতার সুরে বললেন—"যান—যান—ওসব ন্যাকামো ছাড়ুন্। আপনারা শিক্ষিত ধনী, দেশের গণ্য মান্য ব্যক্তি। মাস মাস হাজার হাজার টাকা উপার্জ্জন কর্চ্ছেন। কিন্তু একবার মজুরদের প্রতি চাহিয়া দেখুন তো; নিরন্ন, উপবাসী, মলিন শ্রমিক বস্তির স্যাঁতসেঁতে কোণে ছেঁড়া কাঁথায় গা ঢাকাদিয়া কোনমতে দিন গুজরাণ কর্চ্ছে। পরণের কাপড় নেই, বলকারী খাদ্যের অভাবে দিন দিন অস্থিচর্ম্মসার হইয়া যাইতেছে। আর আপনারা, তাদের ওপর নির্ব্বিকারে অত্যাচারের মাত্রা দিন দিন বাড়াইয়া যাইতেছেন? একবার ভেবেও দেখেন না যে, ওরাও মানুষ, ওদের ও সুখ-দুঃখ আছে!" মিঃ দত্তের মানসপটে শ্রমিকদের উলঙ্গমূর্ত্তি জাগিয়া উঠিল, তাঁহার চোখ ছলছল করিয়া উঠিল। তিনি রুমালে চোখ মুছিলেন। দিগম্বর বাবুও লোকটীর হাবভাবে ও কথার ছন্দে একটু অন্যমনস্ক হইয়া পড়িলন, এমন সময় দরজায় একটী যুবকের প্রতি তাঁহার দৃষ্টি পড়িল। যুবকটীর চুল বাবরী করিয়া কাটা, গায়ে একটী হাফসার্ট। দিগম্বর বাবু দেখিয়াই চিনিলেন—৭নং বাড়ীর গিরীনবাবুর ছেলে পরেশ। পরেশ নিরুপমার পিসতুতো ভাই। যুবকটী "নিরুদিদি" বলিয়া ডাক দিয়া ঘরে ঢুকিয়াই মিঃ দত্তকে দেখিয়া থমকিয়া দাঁড়াইল। নিরুপমা ওপাশের দরজার পাশে চুড়ির আওয়াজ করিয়া পরেশকে কাছে যাইতে ইঙ্গিত করিলেন।

পরেশ, নিরুপমার ইঙ্গিত বুঝিয়াও তাহার নিকটে গেল না। একটা চেয়ার টানিয়া লইয়া মিঃ দত্তের পাশে গা ঘেঁষিয়া বসিয়া কহিল, "এখানেও 'দাঁও' মারবার চেষ্টায় আছেন নাকি?"

মিঃ দত্ত কোন জবাব না দিয়া উঠিয়া যাইবার জন্য উস্‌খুস্ করিতে লাগিলেন। যুবকটীকে তিনি চিনিতে পারিয়াছেন। পাটনার "ইণ্ডিয়া ফ্লাওয়ার মিল"এর মালিক গিরীন বাবুর বড় ছেলে। দিগম্বর বাবুর প্রতি চাহিয়া দেখিলেন যে, তিনি হতবাক্ হইয়া তাহাদের উভয়ের প্রতি তাকাইয়া আছেন। মিঃ দত্ত চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া দিগম্বর বাবুকে নমস্কার করিয়া কহিলেন—"আচ্ছা, আসি।"

দিগম্বর বাবু প্রতিনমস্কার করিয়া কিছু বলিতে যাইবার পূর্ব্বেই পরেশ তাঁহাকে ইঙ্গিত করিয়া নিষেধ করিয়া মিঃ দত্তকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিল—"বা রে! এখনই যাবেন কি? আমি যখন এসে পড়েছি তখন আমিই না হয় দিগম্বর বাবুকে আপনার ইচ্ছা পূর্ণ করতে বলে দেব'খন।"

মিঃ দত্ত বসিলেন না। পরেশের প্রতি একটা অগ্নি-দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া তিনি বাহিরে আসিয়া মোটরে ষ্টার্ট দিলেন।

পরেশ হাসিয়া উঠিল—"হোঃ হোঃ হোঃ।"

দিগম্বর বাবু পরেশকে বলিলেন, "কি ব্যাপার পরেশ, তোমাকে দেখেই লোকটা অমন ভাব করে চলে গেল কেন? তুমি পাটনা থেকে কবে এলে? তোমার বাবা ভাল আছেন?"

পরেশ বলিল—"অতগুলো প্রশ্নের জবাব একবারে দেওয়া অসম্ভব। একটা একটা করে বলি,—কাল এসেছি। বাবা ভাল আছেন। আর, লোকটা আমাকে দেখে যে চলে যাবে, সেটা আমি পূর্ব্বেই বুঝেছিলাম।"

"কেন?" নিরুপমা পরেশের পাশে মিঃ দত্তর পরিত্যক্ত চেয়ারটায় বসিয়া প্রশ্ন করিলেন—"তুমি ওকে চেন, পরেশ?"

পরেশ যাহা কহিল, তাহার মর্ম্ম এই যে, পাটনায় তাহাদের ময়দার কলে যে ধর্ম্মঘট হয়, তাতেও এই লোকটাই কুলীদের সর্দ্দার হইয়া তাদের পরিচালনা করিয়াছিল—শেষে পরেশের পিতা গিরীন বাবুর নিকট হইতে প্রায় ১০।১২ হাজার টাকা ঘুস লইয়া, ধর্ম্মঘট মিটাইয়া দেয়। লোকটার ব্যবসাই ঐ। আরও দু'একটা জায়গায় এ রকম দাঁও মারিয়াছে। এখন এখান হইতেও কিছু না লইয়া ছাড়িবে না।

দিগম্বর বাবু আকাশ হইতে পড়িলেন—বল কি! এ লোক ঘুস্ খাবে? দেখলে না—কুলীদের দুঃখে এর চোখে জল এসেছিল—?"

পরেশ মুচ্‌কি হাসিয়া কহিল, "দাদাবাবু, বুড়ো হতে চল্লেন, এখনও লোক চেনেন নি? সামান্য চোখের জল যদি না ফেলতে পারবে, তবে স্বদেশ সেবক-উপাধিটা এমনি কেদে আসবে?"

নিরুপমা বলিল,—"লোক চিনেন ছাই! উনি পারেন খালি আমার সাথে—আজকে বলে কিনা, বুঝলে পরেশ—"

নিরুপমাকে বাধা দিয়া দিগম্বর বাবু পরেশকে কহিলেন, "পারবে ঘুস দিতে? তাহলে যে আমি বেঁচে যাই—না হয় যাবে ৭।৮ হাজার এক সময় বেরিয়ে—।"

পরেশ কহিল—"নিশ্চয়, তবে কি না ওদের প্রশ্রয় দিতে নেই—ওতে ওদের লালসা বেড়ে যাবে। তাছাড়া আর কিই বা করবেন? আচ্ছা, তাই হবে, দেখবেন, কালই ও সব গোলমাল মিটিয়ে দেবে।"

নিরুপমা স্বামীকে বলিল, "তার চেয়ে টাকাটা কুলীদের মধ্যে ভাগ করে দাও না কেন? ওরা কত খুসি হবে দেখবে'খন।"

পরেশ নিরুপমাকে বাধা দিয়া কহিল, "তোমার কথা ঠিক হ'লনা দিদি, তাই যদি দেওয়া হয়, তবে ফি'বছর ওরা টাকার লোভে ধর্ম্মঘট করে বসবে, ওতে ব্যবসা চলে না।"

দিগম্বর বাবু বলিলেন, "ওর তো ওই দোষ, যা বুঝবে না তাতে কথা বলতে আসবে—" তার পর একটু থামিয়া বলিলেন—"আমি ভাবছি এই 'জাতীয় পত্রিকা'র কথা—আমরা অক্লান্তকর্ম্মী শ্রমিকনেতা মিঃ দত্তের শুভেচ্ছাকে ধন্যবাদ দিই—অথচ, মিঃ দত্ত যে কী, তা ওরা জানে না—"

পরেশ বলিল,—"ও কাগজ রাখেন কেন? বাবা তো এই 'জাতীয় পত্রিকা'র নাম শুনিলে জ্বলিয়া উঠেন। ওরা লোককে ভুল পথে চালিত করে, লোককে হুজুগে মাতাইয়া তোলে—কতকগুলি বুলি টিয়াপাখীর মত আউড়ে লোকের নিকট খ্যাতি-লাভ করছে। ও কাগজ না রাখাই ভাল—"

সন্ধ্যার অন্ধকারে দিগম্বর বাবু, পরেশকে সঙ্গে লইয়া মিঃ দত্তের বাড়ীর দরজায় মোটর থামাইলেন—মিঃ দত্তের অভ্যর্থনায় উভয়ে বৈঠকখানায় উপবেশন করিয়া দু'চারটী কথার পর দিগম্বর বাবু কাজের কথা—অর্থাৎ ঘুষ্ দেওয়ার কথা পাড়িলেন—। মিঃ দত্ত এক হাত জিভ বাহির করিয়া বলিলেন,—"ছি! ছি! সে কী কথা! তাও কি হয়?"

দিগম্বর বাবু পরেশের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন। পরেশ ইঙ্গিতে কি বলিল—শেষে দিগম্বর বাবু মিঃ দত্তের হাতে তাঁহার বহু আপত্তি সত্ত্বেও যখন একতাড়া নোট গুঁজিয়া দিলেন, তখন মিঃ দত্ত একগাল হাসিয়া কহিলেন,—"এ বড় অন্যায়! এ-এ আমার ইচ্ছা মোটেই নেই—অথচ শুধু আপনার অনুরোধ রাখবার জন্যই…।"

[৪]

দু'দিন পরের কথা। তেল কলের মজুর দল পার্কে জড় হইয়াছে। অনেকের হাতে লাল নিশান।

মিঃ দত্ত গাড়ী হইতে নামিয়া পার্কে প্রবেশ করিলেন। একজন শ্রমিক চীৎকার করিয়া উঠিল—"বল ভাই—'লাল ঝাণ্ডা' কি—"

কয়েক জন বলিয়া উঠিল—"জয়!" কিন্তু আজ জয়-বাক্য পূর্ব্বের মত জমকাল হইল না।

মিঃ দত্ত চেয়ারে উপবেশন করিলেন,—তাঁর বাম পার্শ্বে খ্যাতনামা কংগ্রেস কর্ম্মী মিঃ সি, বসু অন্য পার্শ্বে দু'একজন রিপোর্টার। একদিকে ২১৪ জন পাগড়ীধারী পুলিশও দেখা গেল—

সভার কার্য্য আরম্ভ হইয়া গেল—। মিঃ সি, বসু অর্থাৎ চন্দ্রনাথ বসু উঠিয়া মজুরদের উদ্দেশ্য করিয়া কহিলেন—"ভাই সব! তোমাদের কথা আমরা সবই শুনিয়াছি—তোমরা যে এত কষ্ট সহ্য করিয়াও ধর্ম্মঘট ত্যাগ কর নাই, এজন্য তোমাদের ধন্যবাদ দিই। আরও কিছুদিন এ ভাবে থাকিতে পারিলে নিশ্চয়ই তোমাদের উদ্দেশ্য সফল হইবে—।" চন্দ্র বাবু বসিয়া পড়িলেন—চারিদিক হইতে করতালিধ্বনি হইল—অতঃপর শ্রমিকদের ভিতর হইতে একজন বলিয়া উঠিল, "বাবু আমরা আর থাকতে পারব না—আমরা ঠিক করেছি কাল থেকে কাজে যোগ দিব।" অমনি চারিদিক হইতে জন-সাধারণ বলিয়া উঠিল, "দাঁড়িয়ে বল, দাঁড়িয়ে বল—হে।"

যুবকটী লজ্জায় আর উঠিল না—মাথা নীচু করিয়া বসিয়া রহিল। তাহার পিছন হইতে কালু সেখ উঠিয়া দাঁড়াইল—মিঃ দত্তকে সম্বোধন করিয়া বলিল—"বাবু লোক! আপ প'নর রোজ আগাড়ি আল্লাকা কসম্ করকে হামকো বোলা থে, হামকো তকলিপ্ মে, আপ্ চাউলডাল সাহায্য করেগা। কোই! বাবু, আপ্ কো তো সাক্ষাৎ নেই মিল্‌তা! হাম্‌কো আজ তক্ দো-রোজ খানা,পিনা কুছ্ভি নেহি মিলা—কাঁহাতক হাম থাকে গা?"

পিছন হইতে আরও দু'একজন বলিয়া উঠিল—"বাবু, আমরা সুবিধে চাই না, আমরা কাল থেকে কাজে যোগ দেব।"

মিঃ দত্ত এবার দণ্ডায়মান হইলেন—অমনি চারিদিকের অস্ফুট গুঞ্জন থামিয়া গেল—তিনি টেবিল চাপড়াইয়া কহিতে লাগিলেন—"ভাইগণ! আমি তোমাদেরই ভাল'র জন্ম চেষ্টা করেছিলাম, আমার নিজের জন্ম নহে। যদি তোমরা বিনা আপত্তিতে কাজে যোগ দিতে চাও, তবে আমার কোন আপত্তি নেই—তোমরা উপবাসী থাকিবে, এ আমার ইচ্ছা নয়, যা তোমরা ভাল বোঝ, তাই কর, এটা জেনো, আমি তোমাদের পেছনে আছি, যখনই দরকার হবে ডাক দিলেই হাজির হ'ব। তবে যদি তোমরা অন্ততঃ আরও ১০।১২ দিন সবুর করতে পারতে তবে খুবই সুবিধে হ'ত, সমস্ত আপত্তিগুলোই মেটান যেত। কিন্তু তোমাদের দুর্ভাগ্য।"

তিনি বসিয়া পড়িলেন—আবার চারিধারে অশান্তির গুঞ্জন আরম্ভ হইল। একটা ডেঁপো ছেলে বলিয়া উঠিল—"দত্তমশাই, উপোষ করে তো দেখেন নি কতখানি কষ্ট! ও শুধু কথায় কি আর চিঁড়ে ভিজে।"

চারিদিক হইতে আবার গোলমাল উত্থিত হইল, চন্দ্রবাবু, মিঃ দত্তের সঙ্গে কি পরামর্শ করিয়া মজুরদের উদ্দেশ্যে কহিলেন, "তবে তাই হোক্, তোমরা কালথেকে কাজে যোগ দাও, কিন্তু একতা ভাঙ্গিও না, দলবদ্ধ থাকিলে তোমাদের উপর অত্যাচার বেশী করিতে পারিবে না।"

আরও কিছুক্ষণ বক্তৃতার পর সভা ভঙ্গ হইল। পদ্মলোচন একপার্শ্বে দাঁড়াইয়া ব্যাপারটা লক্ষ্য করিতেছিল। এবার প্রমাদ গণিল, সে বুঝিতে পারিল, মিঃ দত্ত চটিয়া গিয়াছেন। সে সাহসে ভর করিয়া মিঃ দত্তর সম্মুখে আসিয়া করযোড়ে কহিল, "বাবু, আমি আর ও কারখানায় যাব না—বাবু, আমি আপনার অবাধ্য হব না।"

মিঃ দত্ত তাঁহার পিঠ চাপড়ে কহিলেন—"এই তো চাই" তারপর চন্দ্রবাবুর প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন—"An ideal strong minded labour like him is rare."

পদ্মলোচন বলিল—"বাবু, আমার হাতের লেখা খুব ভাল।"

মিঃ দত্ত তাহাকে আশ্বাস দিয়া কহিলেন,—"জানি। তুমি পরশু আমার সঙ্গে দেখা করো, একটা ভাল কাজ তোমাকে জুটিয়ে দেব।"

শ্রমিকরা যে যাহার বাড়ী চলিয়া গিয়াছে, মিঃ দত্ত চন্দ্রবাবুর সঙ্গে আসিয়া মোটরে উঠিয়া দীর্ঘশ্বাস ফেলিলেন, এত অল্পে ও নির্ঝঞ্ঝাটে যে ইচ্ছা পূর্ণ হইবে তা তিনি স্বপ্নেও ভাবেন নাই। পদ্মলোচন পিছনেই ছিল, গাড়ী ছাড়িবার পূর্ব্বে সে আর একবার মনে করাইয়া দিল যে, তার হাতের লেখা খুব ভাল।

*

মিঃ দত্ত সন্ধ্যায় বাড়ী ফিরিয়া ঘরে প্রবেশ করিতেই বেয়ারা হাতে একখানি পত্র দিল—খুলিয়া দেখিলেন, "বঙ্গীয় বৈষ্ণব সম্মিলনী" বার্ষিক অধিবেশনে তাঁহাকে বিশেষভাবে অনুরোধ করিয়া সভার কার্য্য পরিদর্শন করিতে বলিয়াছে। তিনি আসিয়া ড্রেসিং রুমে প্রবেশ করিলেন—এবং আধঘণ্টা পরে যখন খদ্দরের জামা, কাপড়, টুপী ছাড়িয়া নামাবলী ফোঁটা, কৃত্রিম এক টিকি ধারণ করিয়া বাহিরে আসিলেন, তখন সহজে তাঁহাকে চিনিতে পারা যায় না। দেখিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়, সুদীর্ঘ টিকিটা তিনি কোথা থেকে জোগাড় করিয়াছেন! পোষাকের কি নূতন বাহার!

(৫)

৫।৬ দিন চলিয়া গেল, অন্যান্য শ্রমিকরা কাজে যোগ দিয়াছে। পদ্মলোচন যায় নাই, তার আশা রহিয়াছে—মিঃ দত্তর প্রদত্ত চাকরীই করিবে—আর তেলকলে যাইবে না। দিগম্বর বাবু পদ্মলোচনকে না দেখিয়া গোবিন্দকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, পদ্মলোচন এলো না কেন।

গোবিন্দ বলিল, "বাবু, দত্তমশাই তাকে ভাল চাকরী দেবে, সে আর আপনার এখানে আসবে না।"

দিগম্বর বাবু কোন কথা না বলিয়া, শুধু বলিলেন, "হুঁ", তারপর, কিছুক্ষণ পরে বলিলেন, "তুমি একজন লোক ঠিক করে দিও, আর পদ্মলোচনকে বলে দিও যে, সে-যেন আর এই কারখানার ধারই না ঘেঁসে, সে যেন দত্ত ম'শায়ের চাকরীই করে। মিঃ দত্ত দেবে আবার চাকরী!"

*

কাদম্বিনী, গোবিন্দর মুখে সব শুনিয়া পদ্মলোচনকে আসিয়া বলিল, "বলি মিন্‌সে! এ করেছ কি? শেষে হাতেরটা-পাতেরটা দু'টোই খোয়াবে? বলি, সে দত্ত ফত্ত না কে যেন, তার কাছেও তো যেতে হয়! ঘরে খুঁটী হয়ে

বসে থেকে কি গিলবে? খালি তাস খেলা—আর তাস খেলা! আজ নয় কাল যাব; কাল হ'লে বলবে, এই বৈকেলে যাব, কপাল একদম পুড়েছে!"

পদ্মলোচন কয়েকজন লোকের সঙ্গে তাস খেলিতেছিল। স্ত্রীর কথায় খেলার ব্যাঘাত জন্মিল, সে হাড়ে হাড়ে চটিয়া উঠিল, হস্তস্থিত পাখাখানা শক্ত করিয়া ধরিয়া চট্ করিয়া খাড়া হইয়া স্ত্রীর প্রতি ধাবমান হইয়া বলিল, "খালি ওস্তাদী! আজ তোর একদিন কি আমারি একদিন।"

কাদম্বিনী বলিল, "বাঃ বাঃ! যতটুকু আমার ওপরই পারলে! কত বড় বীর পুরুষ দেখা যাবে।" সে সরিয়া ভিতরে চলিয়া গেল। পদ্মলোচনের আর খেলা হইল না, চিন্তা আসিয়া পড়িল। বাস্তবিক, মিঃ দত্ত এ—করলেন 'ক? ২।৩ দিন যাইয়া পদ্মলোচন ফিরিয়া আসিয়াছে, দেখা পায় নাই। মনে করিয়াছে, বোধ হয় কোনও কাজে আটকা পড়িয়াছে। কিন্তু আজ তেলকলের ২।১ জনের কথায় তার ঘোর সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে, এ যে হাতের পাতের দু'টাই নষ্ট হইল! মিঃ দত্তর একবার দেখা পাইলেই অবশ্য চাকরী বাঁধাই আছে। নানা কথা ভাবিতে ভাবিতে পদ্মলোচন ছাতাটী বগলে করিয়া মিঃ দত্তর বাড়ী অভিমুখে রওনা হইল।

ঐ তো মিঃ দত্তের বাড়ী। ও কে? মিঃ দত্ত! হাঁ তিনিই তো, তিনি প্রাচীরের উপর দিয়া মুখ বাহির করিয়া রাস্তায় দণ্ডায়মান একটি ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা বলিতেছেন। হাঁ, ঠিকই, পদ্মলোচনের ভুল হয় নাই! ওই যে মিঃ দত্ত তাহাকে দেখিয়াছেন, দূর হইতেই পদ্মলোচন মিঃ দত্তের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া একটু আপ্যায়িত হাসি হাসিয়া ফেলিল। ভদ্রলোকটি চলিয়া গেলেন, মিঃ দত্ত, পদ্মলোচনের দিকে আর একবার ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া দৃষ্টিপাত করিয়া অদৃশ্য হইয়া গেলেন।

পদ্মলোচন আসিয়া দরজায় দাঁড়াইল। মনে করিল, বাবু তাহাকে দেখিয়া দরজা খুলিয়া এখনই বাহিরে আসিবেন। কিন্তু প্রায় ১০।১২ মিনিট চলিয়া গেল, বাবু আসিলেন না। পদ্মলোচন ডাক দিল, "বাবু।"

কোন সাড়া নেই।

আবার ডাক দিল, "বাবু বাড়ী আছেন?

এবার দরজা খোলার শব্দ শ্রুত হইল। বেচারা রামার মূর্ত্তি দেখা গেল—"কে?"

"আমি পদ্মলোচন, বাবু আছেন?"

"হাঁ!" "বাবু বললেন যে, তিনি বাসায় নেই।" পদ্মলোচনের পায়ের নীচে পৃথিবী কাঁপিয়া উঠিল। সে মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িল। মনে পড়িল গিন্নীর শ্লেষ-বাণী "ধর্ম্মঘট কর'গে।"

মানুষের মধ্যে অ-মিলনের কারণঃ—

কেহ কেহ মনে করেন যে, মানুষের অ-মিলন স্বভাব-সম্মত এবং ঐ স্বভাবের জন্যই মানুষের মধ্যে সম্পূর্ণ মিলন হওয়া কখনও সম্ভব হয় না। এই কথা যে সত্য নহে, তাহা মানুষের নিজের অবস্থার দিকে ও বিশ্ব-দুনিয়ার দিকে তাকাইয়া দেখিলে সহজেই বুঝিতে পারা যায়।

যে মানুষের অস্তিত্ব কতকগুলি পরমাণুর মিলনে, চক্ষুকর্ণাদি কতকগুলি ইন্দ্রিয়ের মিলনে, হস্তপদাদি কতকগুলি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মিলনে, মিলন সেই মানুষের স্বভাবসম্মত নহে, তাহা যুক্তিসঙ্গতভাবে ভাবিতে পারা যায় কি?

যে মানুষের অভ্যন্তরে বায়ুর অ-মিলন, তেজের অ-মিলন অথবা রসের অ-মিলন ঘটিলেই তাহা অসুস্থ এবং মৃত্যুমুখে পতিত হয়, সেই মানুষের অস্তিত্ব অ-মিলনে সংরক্ষিত হইতে পারে, ইহা ভাবিতে গেলে কি বাতুলতার পরিচয় দেওয়া হয় না?

এইরূপে ভাবিয়া দেখিলে দেখা যাইবে যে, মিলনই মানুষের স্বভাবসম্মত এবং বর্ত্তমানে মানুষের মধ্যে যে এত অ-মিলন অথবা দলাদলির উদ্ভব হইতেছে, তাহার প্রধান কারণ খাদ্যাদি প্রয়োজনীয় বস্তুর অপ্রাচুর্য্য এবং সুশিক্ষার অভাব।

এই দিক্ দিয়া দেখিলে বলিতে হয় যে, যতদিন পর্য্যন্ত দেশের মধ্যে মানুষের প্রয়োজনীয় বস্তুর প্রাচুর্য্য এবং সুশিক্ষার প্রসার সংসাধিত না হয়, ততদিন পর্য্যন্ত মানুষের মধ্যে সম্পূর্ণভাবে প্রকৃত মিলন সংঘটিত করা সম্ভব হইবে না।

কোণারকের পথে

—শ্রীকাশীকান্ত ঠাকুর

আমার ভবঘুরে জীবনে পথচলার ডাক—বহুবার আমায় নতুন দেশের সন্ধান দিয়েছে। ইদানীং কর্ম্মজীবনে স্থিতি-লাভ করায় বছরের মাত্র দশদিন আমি পথচলার ডাকে সাড়া দিতে পাই। এই ক'টা দিনের ছুটীর সময় চারিদিকের ডাক আমায় এমন ভাবিয়ে দেয় যে, স্থান নির্ব্বাচন আমার পক্ষে অসম্ভব হয়ে ওঠে। এবারও প্রথম থেকে কোন জায়গায় আমার গন্তব্যস্থল নির্দ্দিষ্ট হবে, তা ঠিক করে উঠতে পারি নি। জল্পনা-কল্পনা প্রথম থেকেই বিভিন্ন স্থান নিয়েই চল্‌ছিল; পুরী, দিল্লী, আগ্রা, শিলং কোনটাই বাদ যায় নি।

শেষ পর্য্যন্ত ৪ঠা অক্টোবর আমরা চারজন ঠিক করে ফেললাম পুরী যাওয়া হবে।

আমাদের চারজনের সংগঠন হয়েছিল শ্রীদেবীদাস সেনগুপ্ত, শ্রীতপনকান্তি সেনগুপ্ত, শ্রীউদয় সেনগুপ্ত এবং আমাকে নিয়ে।

প্রতিমুহূর্ত্তে ভেবেছি শঙ্কাকুল মন নিয়ে যাওয়া ঠিক্, নির্দ্দিষ্ট স্থলে হবে কি না হবে।

৫ই অক্টোবর, বেলা ২টার সময় যখন চারজনের চারখানা এক্সপ্রেসের টিকিট সিটি বুকিং আফিস থেকে কিনে আনা হল তখন খানিকটা নিশ্চিন্ত হয়েছিলাম এই ভেবে, বোধ হয় আমাদের যাওয়া হলেও হতে পারে। টিকিট কিনে ঠিক হল, উদয়বাবুর বাড়ীতে আমরা চারজনে একত্র হব এবং সেখান হতে ষ্টেসনে যাত্রা কোরবো। নির্দ্দিষ্ট সময়ের কিছু পরে সন্ধ্যা ৭টায় দু'খানা রিক্সায় চড়ে আমরা যাত্রা ক'রলাম। ষ্ট্রাণ্ডরোডে এসে কিছুদূর এগোতেই হাওড়াগামী জনস্রোত আমাদের গতিকে বাধা দিল। কিছুদূর কোনমতে তাল রেখে চলবার পর, আমাদের রাস্তা একেবারে বন্ধ হয়ে গেল। গত্যন্তর নেই দেখে, একটা ঝাঁকামুটের মাথায় আমাদের সুটকেশগুলো চাপিয়ে পদব্রজে ষ্টেসনের দিকে রওনা হ'লাম। রাত্রি আটটায় সময় বিপুল জনস্রোতের মধ্য দিয়ে প্লাটফরমে যখন পৌছলুম তখন গাড়ীতে 'ন স্থানম্ তিল ধারণে'। কোনমতে একখানা গাড়ীর মধ্যে আমরা সবে উঠেছি এমন সময় গাড়ী হুইসিল্ দিয়ে প্লাটফরম্ ছেড়ে মাঠের দিকে এগিয়ে চল্‌ল।

আশ্চর্য্য! এই গাড়ী! ষ্টেসনে যে গাড়ীতে বসবার স্থান ছিলনা, গভীর রাত্রে তারই কুক্ষির মধ্যে এক বিচিত্র ভাবে, নরনারীরা অকাতরে না হলেও নিদ্রায় মগ্ন হয়েছিল।

গাড়ীর মধ্যে আমাদের ঠিক হল, আগে ভুবনেশ্বর হয়ে, পরে পুরী যাওয়া হবে।

পরদিন ৬ই অক্টোবর, বেলা সাড়ে আটটায় আমরা ভুবনেশ্বর ষ্টেসনে নামলুম। উদয়বাবু উদ্যোগী হয়ে ভুবনেশ্বর স্যানাটোরিয়ামের ম্যানেজারের নামে একখানা পরিচয়-পত্র নিয়ে এসেছিলেন। তাই সোজা গরুর গাড়ীতে চ'ড়ে একেবারে স্যানাটোরিয়ামে উপস্থিত হ'লাম।

স্যানাটোরিয়ামে যখন আমরা পৌছিলাম তখন বেলা সাড়ে নটা—রোদ্দুরের তেজ অনেকখানি বেড়ে গিয়েছে। সমস্ত স্থানটা জুড়ে এক বিরাট শান্তি বিরাজ ক'রছিল ব'লে বেলা অনেক বেশী হ'য়েছে ব'লে মনে হচ্ছিল। স্যানাটোরিয়ামের যিনি মালিক, তিনি আমাদের জন্য একখানা ঘর দেখিয়ে দিলেন। আমরা মালপত্র নিয়ে সেই ঘরে উঠলাম। তাড়াতাড়ি সুটকেশ খুলে মুখ ধোবার সরঞ্জাম বের করে মুখ ধুয়ে নিলাম। পোষাক বদলে বাইরে এসে একটা খালি চেয়ার দেখে তাতেই ব'সে পড়লাম।

স্যানাটোরিয়ামের গেট দিয়ে ঢুকে অনেকখানি খালি জায়গা আছে, সেখানে কয়েকটা নিমগাছ আর অন্য গাছ আছে। ম্যানেজার মশায় সেখানে কয়েকটা চেয়ার রেখে দিয়েছেন। এখানে এসে বসতেই আরামের একটী সুদীর্ঘ নিশ্বাস আপনা হতে বেরিয়ে এল। চারিদিকে তাকিয়ে শুধু গাছ, খালি মাঠ আর মাঝে মাঝে মন্দির ছাড়া কিছুই দেখতে পেলাম না।

হঠাৎ আবিষ্কার করলাম যে, এমনি ধারা নিঃসঙ্গ, নিরালা স্থানের জন্য আমার মনে একটা বিশেষ আকাঙ্ক্ষা আছে। কোলকাতার জনমুখর কর্ম্মকোলাহলের জীবন্ত যান্ত্রিক

সহরতা উত্তেজিত ক'রছিল যতটা, অবসাদ এনে দিয়েছে ততখানি, যার বিনোদনের জন্য এই নিঃসঙ্গ, নিরালা, সরল গ্রাম্যতা আমার এত ভাল লাগছে। ব'সে ব'সে যখন এমনি ধারা ভাবছি, এমন সময় একজন বৃদ্ধ ভদ্রলোক এসে সটান প্রশ্ন করলেন, 'তুমি ব্রাহ্মণ না ?' উত্তরে নিজের পরিচয় দিয়ে বললুম, "আজ্ঞে হ্যাঁ।" ধীরে ধীরে তাঁর সঙ্গে আলাপ-পরিচয় হল। জানতে পারলাম কোলকাতার তিনি একজন ব্যবসায়ী, বছরে একবার তিনি বাইরে বেরোন, মাসখানেক কাটিয়ে আবার কর্ম্মস্থলে ফেরেন। এই বৃদ্ধের কথা অনেকদিন আমার মনে থাকবে। এঁর একটা বিশেষত্ব আমার বড় ভাল লেগেছিল, সেটা এঁর উপদেশ দেবার বিশেষ দাবী দেখে। আমার যেন একমাত্র কর্ত্তব্য, এঁর কাছে উপদেশ নেওয়া এবং সেটা দেওয়াই এঁর যেন একমাত্র কাজ। বলার ভঙ্গির মধ্যে অদ্ভুত এক দাবী ফুটে উঠে প্রতিমুহূর্ত্তে সজাগ করে দেয়। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখি সাড়ে দশটা বেজে গিয়েছে এবং আমার দু'জন সঙ্গী স্নান সমাপন ক'রে ফিরছে। তাদের কাছে জিগ্যেস করে জানলাম, একটু এগিয়ে 'কেদার কুণ্ড' হচ্ছে স্নানের জন্য ভাল জায়গা। তাড়াতাড়ি সাবান আর তোয়ালে নিয়ে আমি আর তপনবাবু বেরিয়ে প'ড়লাম। রাস্তার রং লাল। একটু এগোতে একটা নালা দেখতে পেলাম, আর তারই ওপর দিয়ে যেতে যেতে দেখলাম, এক পাশে কতকগুলো উলঙ্গ বালক কতকগুলো গরুকে স্নান করাচ্ছে। এদের দেহ খুব বলিষ্ঠ নয়, গরুগুলোও জীর্ণ। বুঝলাম, হাওয়ায় প্রাণশক্তি থাকলেও খাদ্যে প্রাণশক্তি নেই এবং দুর্ভিক্ষ এদের লেগেই আছে অপর্য্যাপ্ত খাদ্যের জন্য। অন্য পাশে ধানের ক্ষেত। খানিকটা এগোতেই দেখলাম, মাঝে মাঝে সুন্দর সুন্দর বাড়ী এবং বাড়ীর ফটকে মালিকের নাম, দেখে বুঝলাম সবাই বাঙ্গালী। আরও খানিক এগোতে এক বিরাট পুকুর দেখতে পেলাম, চারপাশ বাঁধান পাথর দিয়ে, মাঝে মাঝে সিঁড়ি আছে জলে নামবার। আর ঠিক পুকুরটার মাঝখানে একটা দ্বীপের মত। মনে হল একটি মন্দির আছে। পুকুরের দক্ষিণে একটু দূরে ভুবনেশ্বরের মন্দির। বেলা বেড়ে ওঠায় পায়ের তলার মাটি হ'য়ে উঠল গরম, আমরাও দক্ষিণ-পূর্ব্ব দিক দিয়ে কেদারকুণ্ডের দিকে এগিয়ে চ'ললাম। লাল মাটির রাস্তা, পাশে জমি, মাঝে মাঝে খানিকটা খানিকটা জায়গায় খুসির খেয়ালের মত কতকগুলো গাছ হয়ে রয়েছে, আর তারই ফাঁকে ফাঁকে রয়েছে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত মন্দির। এখানকার সমস্ত মন্দির একধরণের তৈরী। একটা অনামী পূজারীবিহীন মন্দিরের দিকে এগিয়ে গেলাম। মন্দিরটার চারপাশে কতকগুলো গাছ নিজেদের ইচ্ছামত ছায়া ক'রে দাঁড়িয়ে আছে। কাছে গিয়ে মনে হল মন্দির শতাব্দীর মধ্যে মানুষের স্পর্শ পায় নি। সব চাইতে আশ্চর্য্যের ব্যাপার, যাঁর জন্যে মন্দির সেই বিগ্রহই নেই, শুধু বেদী পড়ে আছে! দেখে মনে হ'ল, বিগ্রহ ছিলেন শিবলিঙ্গ। মন্দিরের গায়ের কারুকার্য্য নোনায় ধরে ধীরে ধীরে ক্ষ'য়ে



ভুবনেশ্বরীর মন্দির।

যাচ্ছে। মন্দিরের গায়ের কারুকার্য্য দেখে মনে হ'ল সমস্তই দাক্ষিণাত্যের শিল্প। আর অপেক্ষা না ক'রে, তাড়াতাড়ি কেদারকুণ্ডে গিয়ে উপস্থিত হলাম। পাঁচটা কুণ্ডের জল এসে এই কুণ্ডে পড়েছে একটা মুখ দিয়ে। যেখানে এসে প'ড়েছে সেখানটা বাঁধান কুণ্ড তৈরী করা হ'য়েছে। কুণ্ডের জল বেশ ঠাণ্ডা। কতকগুলো ছোটো মাছ নির্ভাবনায় খেলা করছে। আমরা দু'জনে বেশ কিছু সময় স্নান ক'রে বাড়ী ফিরলাম।

খাবার সময় ঠিক হ'ল, খাওয়ার পর একটু বিশ্রাম ক'রেই আমরা আজ সন্ধ্যার মধ্যে দর্শনীয় সমস্ত দেখে শেষ ক'রে ফেলব এবং কাল ভোর পাঁচটায় আমাদের পুরী যাত্রা করতে হবে। শুনলাম, এর মধ্যে একজন পাণ্ডাও ঠিক হ'য়ে গিয়েছে, সে এখানকার সব আমাদের দেখিয়ে দেবে। পাণ্ডাঠাকুরের

সঙ্গে ঠিক হয়েছে, তিনি তিনটের সময় আসবেন। পরে জানতে পেরেছিলাম এঁর নাম কপিল পাণ্ডা। তিনটে বাজবার কিছু আগেই পাণ্ডাঠাকুরের একজন এ্যাসিস্‌টাণ্ট এসে উপস্থিত হয়ে জানালেন, আপনারা উদয়গিরি আর খণ্ডগিরি যাবেন বলেছেন, এখন রওনা না হ'লে আসতে রাত হবে, আর যখন পায়ে হেঁটে যাবেন বলছেন তখন এখনই রওনা হওয়া ভাল।

আমরা চারজন পোষাক বদলে পনের মিনিটের মধ্যেই তৈরী হ'য়ে নিলাম। প্রথমে ভুবনেশ্বরের মন্দির দেখে আমরা পরে উদয়গিরি ও খণ্ডগিরিতে যাব ঠিক হল। আমরাও তাই সোজা মন্দিরের কাছে উপস্থিত হলাম। সিংহদরজায় যেতেই আমাদের চামড়ার সমস্ত জিনিষ গচ্ছিত রেখে মন্দিরে প্রবেশ ক'রতে হ'ল। ভুবনেশ্বরের মন্দির অনেকখানি জায়গা জুড়ে তৈরী। ঢুকেই একটা স্তম্ভ চোখে পড়ে। সিংহদরজার দু'পাশে মাদশায় ক'রে ভাত ভোগ বিক্রী হচ্ছে। মন্দিরের মধ্যে প্রবেশ করবার আগে মন্দিরের চারদিকে প্রদক্ষিণ করে দেখতে আরম্ভ করলাম। মন্দিরের গঠনভঙ্গী এবং উচ্চতা



উদয়গিরি ও মন্দির।

প্রথমে আমার আকৃষ্ট করে। অতি সূক্ষ্ম কারুকার্য্য করা এক-একটা আস্ত পাথরকে কি ক'রে অত উঁচু জায়গায় লাগান সম্ভবপর হ'ল তা ভাবতে গিয়ে স্তম্ভিত হ'তে হয়। মন্দিরের গায়ে বহু দেবতার মূর্ত্তি ভগ্নাবস্থায় রয়েছে। এ ছাড়া তিন চারটা বিশেষ যুগে মন্দিরের সংস্কার করা হয়েছিল বলে মনে হ'ল। অন্ততঃ তিনবার সংস্কার করা হয়েছে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। আর এই সময়ের মধ্যে যে বিশেষ তফাৎ ছিল, তাতেও সন্দেহ নেই, শুধু তাই নয়—বিশেষ ভিন্নরুচির ছিল এই তিন যুগ।



গুহা (খণ্ডগিরি)।

মন্দিরের দক্ষিণের গণেশমূর্ত্তি এবং উত্তরের অষ্টসখি-পরিবৃত পার্ব্বতীমূর্ত্তি যে কোণারকের মন্দিরের সমকালীন, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। এই মূর্ত্তি কালো পাথরের তৈরী। মূর্ত্তির ওপরের কারুকার্য্য দেখে মনে হয় ভারতবর্ষ সেই যুগে ভাস্কর্য্য-শিল্পকলায় পৃথিবীর ইতিহাসে এক বিশেষ স্থান অধিকার ক'রেছিল। কোণারকের মন্দির খৃষ্টীয় নবম শতাব্দীতে তৈরী ব'লে ঐতিহাসিকেরা অনুমান করেন এবং পুরীর মন্দিরের পূর্ব্বে। এই সময় চোলগঙ্গদের রাজ্য ছিল বলে তাঁরা বলেছেন। ভুবনেশ্বরের মন্দির এরও পূর্ব্বে ব'লে মনে হয়। মন্দিরের বহু সুন্দর সুন্দর মূর্ত্তিকে নষ্ট ক'রে দেওয়া হয়েছে। দেখে মনে হ'ল মুসলমানদের মন্দির ধ্বংসের অত্যাচারের হাত হ'তে এই সুদূর প্রান্তে অবস্থিত মন্দিরটীও অব্যাহতি পায় নি। তবে, এই বিভিন্ন সময়ের শিল্পকলায় দাক্ষিণাত্যের শিল্পের ছাপ সুপরিস্ফুট। মন্দিরের গায়ের জীর্ণ সংস্কারের জন্য এখানকার স্থানীয় শিল্পী চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু অতি সামান্য কাজ করবার পরই নিজের অক্ষমতার কথা জানিয়ে তিনি বিদায় নিয়েছেন। মন্দিরের মধ্যে প্রবেশ করে বিগ্রহের স্থানে যখন উপস্থিত হ'লাম, তখন অন্ধকার ছাড়া

আর কিছুই লক্ষ্যের মধ্যে আসে নি। ঘোর কাটবার পরই অনেকখানি স্থান জুড়ে শিবলিঙ্গ-বিগ্রহ দর্শন করলাম; পাশেই এক প্রদীপ জলছে। শুনলাম, সর্ব্বদাই এই প্রদীপ জ্বালান হয়ে থাকে। গ্রহের পাশে উপগ্রহের মত মন্দিরের বিগ্রহের



গুহা (খণ্ডগিরি)।

পাশে আরও বহু বিগ্রহের অবস্থান দেখতে পেলাম—যা সমস্ত মন্দিরের পাশেই দেখতে পাওয়া যায়।

পাণ্ডাঠাকুরের একজন লোক, এইবার উদয়গিরি আর খণ্ডগিরি দেখাবার জন্য পথ দেখিয়ে নিয়ে চ'ললেন। মিনিট দশেক যাইবার পর আমরা মাঠের মধ্যের রাস্তায় এসে উপস্থিত হ'লাম। এই রাস্তাটী পাকা এবং লালমাটির, একেবারে উদয়গিরি, খণ্ডগিরির পায়ের কাছে মিশেছে। মাঠের দু' পাশে অনুর্ব্বর জমি, কোথাও মাঝে মাঝে বাঁশের ঝোপ, দূরে দু একটা মাঝে মাঝে গাছ, এ ছাড়া আর কিছুই দেখতে পাওয়া যায় না। মন্দির হ'তে যখন আমরা রওনা হ'য়েছিলাম, তখন উদয়গিরির পথ তিন মাইল বলা হয়েছিল, কিন্তু পৌঁছাবার পর বুঝলাম এরা ক্রোশকে মাইল বলে।

আমরা যখন উদয়গিরি খণ্ডগিরির পায়ের কাছে পৌঁছিলাম তখন সূর্য্য অস্ত গেছে। উদয়গিরির চূড়ায় একটা মন্দির আছে, আমরা পাহাড় বেয়ে মন্দিরের কাছে যখন পৌঁছিলাম, দেখলাম পূজারী মন্দিরের দ্বার বন্ধ করে চলে গেছে। সামনে দিক্‌চক্রবালের দিকে তাকাতেই তখনকার দৃশ্য আমায় সত্যিই বিমোহিত করেছিল। উদয়গিরি হ'তে খণ্ডগিরির দিকে চেয়ে দেখলাম কতগুলো গুহা সেখানে রয়েছে।

এককালে উদয়গিরি এবং খণ্ডগিরি একই গিরিশ্রেণী ছিল। অশোকের সময়—অন্য পারে যাবার জন্য একে দ্বিধা-বিভক্ত করা হয়।

খণ্ডগিরির সমস্ত গুহাই মানুষের কীর্ত্তি। বিভিন্ন সময়ের বিভিন্ন যুগের মানুষের বাস হওয়ার জন্য এর মধ্যে বিভিন্নতার সংমিশ্রণ হয়েছে। খুব প্রাচীন সময় হ'তে কিছুদিন আগের কালের পর্য্যন্ত রুচির কিছু কিছু পরিচয় এর দেওয়ালের গায়ে উৎকীর্ণ করা রয়েছে।

স্থানে স্থানে দাক্ষিণাত্যের প্রভাব দেখতে পেলাম। আবার অশোকযুগীয় মগধের শিল্পকলার পরিচয়ও কিছু কিছু রয়েছে।

ফিরবার পথে আমাদের রাত হ'য়ে গেল। আকাশ ছিল খুব পরিষ্কার। শুক্লা ষষ্ঠী তিথি। শরৎকালের এই তিথি ঘরছাড়া বাঙ্গালীকে ঘরমুখো করে। আজ অধিবাস, এই কথা মনে হ'তেই কেমন আনমনা হ'য়ে পড়লাম। চিরপরিচিত দুর্গামণ্ডপের পাশে মনটা ঘুর ঘুর করতে লাগল। বুঝলাম, ভবঘুরেও কেন নীড় বাঁধতে চায়। পথে এখানকার একমাত্র শিল্পী দামোদর মহারাণার শিল্প-ভবনে গেলাম। একখানি



খণ্ডগিরির গুহার আর একটি দিক।

ছোটপাথরের ঘর, তারই চারিদিকে সমাপ্ত, অর্দ্ধসমাপ্ত, সব দেবতার মূর্ত্তি রয়েছে আর তারই মধ্যে বসে শিল্পী একমনে দিনের পর দিন পাথর খোদাই ক'রে করছে সৃষ্টি। এঁর পরিচয় শিল্পের দিক্ দিয়ে দেওয়া নিষ্প্রয়োজন, কারণ, গত

কয়েকবার ইনিই Acadamy of Fine Artsএর Exhibitionএ পুরস্কার পেয়েছেন।

বাড়ীতে যখন পৌঁছিলাম তখন প্রায় আটটা। এসে চা আর জলখাবার খেয়ে, আমরা সেই পুরোণো নিমগাছের তলায় চারজনে এসে বসলাম। কিছু সময় কথাবার্ত্তার পর দেখি, একজন আমাদের দিকে এগিয়ে আসছেন, কাছে আসতে বুঝতে পারলাম ইনিও আমদেরই সমবয়স্ক। স্থানবিশেষে পরিচয় হ'তে দেরী হয় না। অল্পসময়ের মধ্যেই আমাদের পরিচয় আলাপে পরিণত হল। পরিচয়ে জানলাম, এঁর নাম শ্রীনলিনীকান্ত গঙ্গোপাধ্যায়, একজন পোষ্ট-গ্রাজুয়েটের ষষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্র। বিষয় নিয়েছেন Ancient History and Culture. এঁর সঙ্গে এসেছেন একজন অধ্যাপক, নাম অবনীবাবু—আশুতোষ কলেজের ইতিহাসের অধ্যাপক।

ভোর পাঁচটায় ষ্টেসনে যেতে হবে বলে আমরা সাড়ে ন'টার মধ্যে খাওয়া দাওয়া শেষ করে ঘরে গেলাম। সমস্ত জিনিষ গুছিয়ে যখন শুতে গেলাম তখন রাত ১১টা। ঘরের মধ্যে অসহ্য গরম বোধ হ'তে লাগল। বারটা একটা বেজে গেল, ঘুম আসে না, শেষে কখন ঘুমিয়ে পড়েছিলাম মনে নেই। ভোর পাঁচটায় গাড়োয়ান এসে ডাকতেই তাড়াতাড়ি উঠে দরজা খুলে দেখি গাড়োয়ান নেই। স্যানাটোরিয়ামের চাকর বললে, "ওর কাছ থেকে আপনারা কিছু পয়সা রেখে দিয়েছেন ?" বললুম 'না', তখন বললে, "ও অন্য লোক নিয়ে গিয়েছে, আপনারা যদি ওর কাছ থেকে কিছু পয়সা রেখে দিতেন, তবে ও আপনাদের নিয়ে যেত। এই এখানকার নিয়ম।" কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হয়ে কিছু সময় কাটিয়ে প্রাতঃকৃত্য সেরে সুটকেস আর বিছানা ঘাড়ে ফেলে ষ্টেসনে যখন উপস্থিত হ'লাম তখন ৬টা। এখানে এসে সেই বৃদ্ধ লোকটীর সাক্ষাৎ পেয়েছিলাম ঠিক তেমনি ভাবে। ট্রেণ দেরী করেছে—বেলা ৭টায় সময় ট্রেণ আসতে আমরা পুরী অভিমুখে যাত্রা করলাম।

[ক্রমশঃ

মাটির ঠাকুর

—শ্রীশিবরাম দাস

দিবসের শেষে সবিতা যখন ফিরে যায় নিজ ঘরে।
ছোটমেয়ে এক তরুতলে বসি আনমনে খেলা করে॥
খেলার জিনিষ কিছু নাই তার, মাটির পুতুল গড়ি।
অতি সযতনে সাজায় তাহারে সারাদিনমান ভরি॥
ভোর না হইতে সাজি ল'য়ে হাতে ফিরিত গাছের তলে।
সারাটি দুপুর গাঁথিয়া সে মালা পড়িত নিজের গলে॥
একদিন তার জননী আসিয়া শুধালেন, একি খেলা ?
এই খেলা তোর খেলিতে খেলিতে কেটে যায় সারা বেলা ?
কন্যা তাহার কহিল হাসিয়া, এ নহে নিছক খেলা।
মোর দেবতারে পূজা করি, তাই কেটে যায় সারা বেলা॥
কন্যার কথা শুনিয়া জননী মনে মনে বলে, একি ?
এত টুকু মেয়ে এত সব কথা, এ-যে ঘোর কলি দেখি॥
কন্যা কহিল মাতারে, আমার দেবতারে দেখ নাই।
দেবতা আমার না ডাকিতে আসে, আমি তার দেখা পাই॥
মাতা কহিলেন, ওরে বোকা মেয়ে, ঐ বুঝি তোর ধাতা ?
মাটির পুতুল গড়িয়া দেবতা মিছাই ভাবিস যা' তা॥
জলভরা চোখে জননীরে কয়, মাটিতেই তাঁর স্থান।
সে'যে, গো, আমার বিরহী দেবতা আমি যে গো তার প্রাণ॥
হোক সে আমার মাটির ঠাকুর, তবু তারে ভালবাসি।
দেবতা আমার, আমি যে গো তাঁর পূজারিণী দেবদাসী॥

আমি যা' লয়ে যাই

—শ্রীমতী প্রমীলা রায় চৌধুরী

(১)

সুধীশ গুহ ব্যারিষ্টার—কিন্তু 'ব্রিফলেশ' নয়—বরং 'ব্রিফের' চাপে তার নিজেকে খুঁজে পাওয়া মুস্কিল। সকালে চা খাবার পর থেকে গভীর রাত্রি পর্য্যন্ত তার 'ব্রিফ', মক্কেল, আর আইনের বই নিয়েই কাটে। আইনের কূটজালে কতদিন এমনভাবে জড়িয়ে পড়ে যে, রাত্রিশেষও এসে যায়। জাল যতই জটিল হয়, জেদ তার ততই চড়ে।

'কসবা'র যে অঞ্চলে তার বাড়ী, সে অঞ্চলে লোকজনের বসতি এখনো বিশেষ হয় নি—নির্জ্জনতার পক্ষপাতী বলে, সে এই অঞ্চলটাই পছন্দ করে। বাড়ীখানা খুব জমকালো না হলেও শ্রী ও রুচি-সম্পন্ন। চোখে পড়লেই চেয়ে দেখতে ইচ্ছা হয়।

'নিজের' বলতে সংসারে তার পত্নী রেবা আর তিনটি ছেলেমেয়ে ছাড়া আর বড় কিছু নেই—কিন্তু ছিল সবই—সংসারের চাকায় পড়ে কে কোথায় ছিটকে পড়েছে এখন তার ঠিকানা করা মুস্কিল। পয়সার প্রাচুর্য্য মনটাকেও বুঝি অন্য রকম করে দিয়েছে!—

অফিস-রুমের পাশেই ছোট একখানা ঘর—খুবই ছোট—সেখানে কোনো জিনিসেরই বাহুল্য নেই—একটী মাত্র মূর্ত্তি দেওয়ালে খোদাই করা, সে মূর্ত্তি লক্ষ্মীদেবীর। বোধ হয়, এইখানে সে নির্জ্জনে তাঁর আরাধনা করে।

শীতের সকাল, স্লিপিং স্যুটের ওপরেই একটা ওভারকোট চাপিয়ে সুধীশ তাড়াতাড়ি খবরের কাগজটায় চোখ বুলিয়ে নিচ্ছিল। সাতটায় এক ধনী মক্কেলের আসবার কথা; তারও আর বেশী দেরী নেই। কাগজটা দেখতে দেখতে তার মনে হচ্ছিল যে, বহুদিন আগে এই খবরের কাগজই ছিল তার সময় কাটানোর সাথী। পড়ে পড়ে বিজ্ঞাপনগুলিও মুখস্থ হয়ে যেতো, তাতেও সুদীর্ঘ দিনের শেষ হতো না। বেকার দিনগুলি বুঝি এমনি ধারাই হয়। আর এখন! মোটামুটি খবরগুলিতে চোখ বুলানো ছাড়া আর কিছুই হয় না—বিশদ জানতে হয় পত্নী রেবার কাছে—নিশীথ রাতে—বিরামের অবসরে।

এই প্রাচুর্য্যের আগে যা'সব দিন গিয়েছে তার খবর এখন কেউ জানে না। সে ছাড়া আর যে একজন তার সেই বিমুখ দিনগুলির কথা, জানতো হয়তো সে আজ আর এই পৃথিবীতে নেই। যাক, সে যে বিরূপ ভাগ্যলক্ষ্মীকে বাঁধতে পেরেছে এই তার সান্ত্বনা। চোখটা ছিল কাগজের লেখায়, আর মনটা ছিল বিগত দিনের সুদুশ্চর তপস্যার আলোচনায় ডুবে।

সকালের 'ডাক' এসে গেলো। গায়ে অসংখ্য ছাপ মারা একটা পুলিন্দা দেখে সেইটা তুলে নিয়ে দেখলে যে, সঙ্গে তার "প্রাপ্তি স্বীকার" পত্র আঁটা। কার্ডখানায় নিজের সহি দিয়ে সে এবারে কোথা থেকে সেটী এসেছে তার খোঁজে ব্যস্ত হলো। প্রেরকের জায়গায় লেখা "ভাওয়ালী স্বাস্থ্য-নিবাসের কর্ম্মকর্ত্তা।" একটু আশ্চর্য্য হয়ে সে ভাবতে লাগলো ভাওয়ালী থেকে এমন কি জিনিষ 'রেজিষ্টার্ড' হয়ে এসেছে! সেখানে তার কে আছে? মনের অতল থেকে কিছুই আবিষ্কার করতে না পেরে, সে চিন্তিত মনেই পুলিন্দা খুলে ফেললে।

ভেতরে আছে, একখানা টাইপ করা চিঠি—দিন-লিপির আকারে লেখা এক গোছা কাগজ আর একখানি ফটো। ফটোখানি দেখে সুধীশ চমকে উঠলো। এ কে-রে! বিস্মৃতির দুয়ার ভেদ করে এতদিন পরে মনের মাঝে ইন্দ্রাণীর মত এসে দাঁড়ালো! একে কি ভুলে যাওয়াই যায়! জোর করে "ভুলে গেছি" মনে করা।

ফটোখানা তার নিজেরই; ব্যারিষ্টারীর সনদ নেওয়ার পোষাকে তোলা। অনেকদিন আগের ভুলে যাওয়া অনেক কথা মনে জ্বল্-জ্বল্ করে উঠলো। মাথার ভেতরে রক্ত দ্রুত তালে বইতে লাগলো; পড়ে যাওয়ার ভয়ে দেহটা সে সোফার উপরে এলিয়ে দিলে। সমস্ত চিন্তাশক্তি পাক খেয়ে জড়িয়ে যেতে লাগল।

কয়েক মিনিট পরে উঠে সে তার অফিস-রুমের দরজা সব ক'টাই বন্ধ করে দিলে। বেহারাকে ডেকে বলে দিলে, এখন

যেন কেউ তাকে না ডাকাডাকি করে—সে একা থাক্‌তে চায়।

এর পরেই, অত বড় ব্যারিষ্টার সুধীশ গুহ—যার প্রত্যেকটী ঘণ্টা রিজার্ভ করা—ঘণ্টার পরে ঘণ্টা সেই দিনলিপির গোছায় ডুবে গেল। আজ আর অর্থের নেশা হাতছানি দিয়ে তাকে ডেকে কোন সাড়া পেলো না। সজ্ঞানে সময়ের অপব্যবহার তার জীবনে এই প্রথম।

(দুই)

সুধীশ পাতা উল্টিয়ে পড়ে যেতে লাগলো :—

"ভাওয়ালী স্যানাটেরিয়ম। তোমার কাছ থেকে অনেক—অনেক দূরে চলে এলাম সুধীশ! কিন্তু ভুলতে কি পারব? ভাওয়ালীতে নার্স হয়ে এলাম আমি! নার্স হওয়া ছাড়া আর কি উপায় ছিল, বলো, তুমি তো আমার সব কথাই জানো।

তোমার কাছাকাছি থাকলে তুমি উন্নতি করতে পারবে না, তাই, আমার এই আত্ম-নিপীড়ন। কিন্তু দিনশেষে সব ভাবতে গেলে বুকটা জ্বলেই যায়, শান্তি আসে না। আমি অতদূর থেকে—নির্জ্জনে তোমার উন্নতি-কামনা জানাব ভগবানের পায়ে।......একান্ত নির্ভরশীল অসহায়, 'পেসেণ্ট' নিয়ে মনটাকে অন্যমনস্ক রাখার চেষ্টা মাত্র।

মাস খানেক কাজ করা হয়ে গেল আমার। কাজের ভিতরে মনটাকে ডুবিয়ে রাখতে চাচ্ছি—হয় তো সুদূর ভবিষ্যতে কৃতকার্য্যও হবো, কিন্তু 'ডিউটী' যখন ফুরিয়ে যায়—তখন অন্য সব আড়াল করে, তোমার ভাস্বরমূর্ত্তি কেন জেগে উঠে' আমার মনকে আবার মধুর অতীতে নিয়ে যায়? আমি তো প্রাণপণে চেষ্টা করছি, যাতে সেবাব্রত আমার জীবনে প্রধান ও শ্রেষ্ঠ অবলম্বন হয়। তুমি সুস্থ মনে তোমার যাত্রা-পথে আগিয়ে যাও—পিছনে কি পড়ে থাকলো বা না থাকলো তা দেখবার দরকার নাই।

'কি পেয়েছি, কি পাইনি—
তারি হিসাব মেলাতে
মন মোর নহে রাজী।"

*

আজ একটি রুগী মরবার জন্য—হ্যাঁ—তা ছাড়া আর কিই বা বলা যাইতে পারে, কারণ, কোন ডাক্তারই তাকে সামান্য আশ্বাসও দিলেন না—তার বাঁচা সম্বন্ধে। আত্মীয় স্বজনের মাঝে মরবার জন্য, জন্মভূমিকে দেখে মরবার জন্য সে কি গভীর ব্যাকুলতা নিয়েই ছুটে গেল! আমি 'নার্স' মাত্র—এই ব্যাপার নিয়ে বেশী ভাবা আমার উচিত নয়। এমন কত যাবে, কত আসবে, যদি সব ক'টী জীবনই এই কীটদষ্ট অবস্থা কাটিয়ে তাজা হয়ে উঠবে, তবে যে 'অসুখ' কথাটা আর থাকে না! এই লোকটীর বাঁচবার যে কী আগ্রহ তা' জানো? বহুদিন ধরে সে ছিল এখানে, আজ যখন ডাক্তারদের মিলিত মত ওকে শোনানো হলো, তখন কী নিশ্চিন্ততাই নেমে এসেছিল ওর মুখের ওপরে! দু'এক মিনিট চুপ করে থেকে কেমন নির্লিপ্ত সুরে সে বললে, "আমি তা' হ'লে দেশে চলে যাই স্যর!" সে গেল বটে কিন্তু ডাক্তাররা বল্লেন, "ও দেশে পৌঁছাতে পারবে কি না সন্দেহ।" মানুষের মনের সাধ কি আশা কোন্‌টাই বা মেটে?

পাঁচ বৎসর হয়ে গেল আমার এখানে আসা। খবর পেয়েছি, তুমি বিয়ে করেছ, দেখতে তোমাকে ইচ্ছা করছে খুব। কিন্তু তোমার কাছে আমি তো মৃতা। আমি এইবার আমার সম্পূর্ণ মন সেবার কাজে নিয়োজিত করে দিতে পারব। কারণ, এইবার তুমি অভাগিনী ফুল্লরাকে ভুলে যাবে। বিদায়! বিদায়!! আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ ও সুন্দর দিনগুলি।—

এই পর্য্যন্ত পড়েই সুধীশ অস্থির হয়ে উঠে। কাগজের তাড়াটা হাতে নিয়েই সে ঘরের মধ্যে পায়চারী ক'রে বেড়াতে লাগলো। পূর্ব্বস্মৃতি বোধ হয় তাকে পীড়ন করছিল, বুকটা মথিত করে দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে দুটী অক্ষর তার বুকের তটে আছড়ে পড়ছিল—"ফুলু, ফুলু"! চোখের উপরে তিনটী বছরের প্রত্যেকটী দিন অজস্র সুখস্মৃতি নিয়ে আসা যাওয়া করতে লাগলো। একদিন, এই ফুল্লরা তার জীবনে কতখানি জায়গা জুড়ে বসে ছিল—সে তাই ভাবতে লাগলো। ভাবতে লাগলো অর্থোপার্জ্জনের আশায় সে কী সুদুশ্চর তপস্যা! আর এই ফুল্লরাই কেমন মিষ্ট কথায় শিষ্ট ব্যবহারে তার সেই শ্রমভার লাঘব করে দিতো! তবুও তো সে ফুল্লরাকে কোনদিনই নিজের অধিকারে পায় নি! অর্থোপার্জ্জনের তপস্যার মত প্রেমের তপস্যাও কম সুদুশ্চর নয়। দেখা-

সাক্ষাতের স্থান, কাল, ছিল সীমাবদ্ধ—বন্ধুর বোন্!—বন্ধুর বাড়ীতেই আলাপের সূত্রপাত, আলাপের মধ্য দিয়েই প্রকাশ পেতো যে, তার আশার অপেক্ষায় আর একটী সতেজ সবুজ প্রাণও কেমন ভাবে তার প্রতীক্ষায় থাকে।

তারপরে! তারপরে এলো সেই ভয়ানক দিন! সে দিনের কথা মনে হ'য়ে সুধীশের মন প্রায় ১৫ বৎসর আগের বাথিত ও ভারাক্রান্ত হয়ে উঠল। কি ধাক্কা পেয়েই সে ছুটে এসেছিল, লুকিয়ে ফেলেছিল নিজেকে নিরালায়! ফুল্লরাকে বিয়ে করার প্রস্তাব করবে বলে, সে পালকের মত মন নিয়ে তাদের বাড়ীতে গিয়েছিল, মনে দৃঢ় বিশ্বাস, সবই ঠিক আছে, শুধু বন্ধুর সম্মতির অপেক্ষা কিন্তু সম্মতি নেওয়া হলো না। তার আনন্দোচ্ছ্বাস স্বরকে থামিয়ে দিয়ে ফুল্লরা অসম্মতি জানিয়েছিল—জানিয়ে'ছল—সে বিধবা। যদিও সেই বিয়ের কোন স্মৃতিই তার মনে জাগে না, তবুও, তবুও সমাজের চোখে, দেশের চোখে ধর্ম্মের চোখে সে বিধবা! তাকে দিয়ে আর কোন দেবতার পূজা হতে পারে না, পূজা শেষ, বিসর্জ্জনের প্রতিমা সে! প্রাণপ্রতিষ্ঠা না হয়েই তার বিসর্জ্জন হবে। সুধীশ বন্ধুর কাছে প্রতিবাদের আশা ক'রে অসহায়ের মত চেয়ে রইলো। সে কিছুই বললে না, বরং বললে, "আমার সব চেষ্টা, সব অনুরোধ ধুলু ঐ একটী কথায় উড়িয়ে দেয়। তুমি যদি মত করাতে পারো, তো আমার অমত নেই।"

সুধীশ চুপ করে বসে রইলো, রাত্রি কত হয়ে গেল কিছু বোঝা গেল না। হঠাৎ এক সময়ে উঠে পড়ে বললে, "আচ্ছা আমি শেষ একবার চেষ্টা করে দেখব, তারপরে ভেসে পড়ব—কূল মেলে, ভাল, না মেলে—ভেসেই চল্‌ব।"

পুরো দু'টী দিন ধরে সুধীশের সে কি চেষ্টা! কিন্তু অশ্রুপ্লাবিত স্বরে ফুল্লরা সেই একই আপত্তি জানিয়ে তাকে নিবৃত্ত করলে, "আমি বিধবা, তুমি ভালবেসেছ, তাই আমার যথেষ্ট পুরস্কার, আমার জন্ত তোমাকে আমি কারো চোখে হীন করতে পারব না, ভবিষ্যৎ বংশ তোমার কালিমায় ভরে দিতে পারব না। তুমি মাপ করো আমাকে, পালিয়ে যেতে দাও আমাকে তোমার কাছ থেকে। না হলে, আমি হয়তো তোমার এই দুর্নিবার আকর্ষণ এড়াতে পারব না। সময়ে হয়তো এই বেদনা সহ্য হয়ে যাবে। তুমি পুরুষ, সামনে তোমার উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ, কেন কালি লেপে দেবে তার গায়ে?"

অধীর কণ্ঠে সুধীশ বলেছিল, "আমার জীবনের আনন্দ বাদ দিয়ে আমি সুখ চাই না, চাই শান্তি।"

মুখে পরম প্রশান্তি নিয়ে ফুল্লরা বলেছিল, "সে হয় না—আমার প্রথম ও শেষ প্রণাম তুমি নেও। আমার জন্ত তুমি কিছু ভেবো না। আমি আমার পাথেয় যথেষ্ট সঞ্চয় করেছি, তাই নিয়েই আমি বাকী পথ চলতে পারব

একে একে এইগুলি মনে হ'তে সে অস্থির হয়ে উঠলো, ভাবলো—এখন যদি ফুল্লরাকে সামনে পেতাম, বলতাম, "তোমার প্রত্যাখ্যানে আমার ক্ষতি কিছুই হয় নি। দেখো—আমার বাড়ী, ঘর, ধন, জন, মান, সম্ভ্রম কিছুরই অভাব নেই আজ, স্নেহময়ী পত্নী ও আনন্দময় সন্তানেরও আস্বাদ লাভ করেছি, কিন্তু সেই সুধীশ গুহ বুঝি আর নেই, এ সুধীশ—কর্ত্তব্যপরায়ণ—ধনী সুধীশ গুহ।"

পায়চারী ক'রে ক'রে ক্লান্ত হয়ে সুধীশ আবার ডায়েরীটা খুলে বসলো, সবটা আগাগোড়া পড়বার মত মনের স্থৈর্য্য আর ছিল না। শেষের দিকের গোটা কয়েক পাতা উল্টে সে পড়তে বসলো।

"কিছুদিন থেকে শরীরটা খারাপ বোধ হচ্ছে, ডাক্তার সেন আমাকে মেয়ের মত দেখেন, আমার এ চাকরীটাও তাঁরই অনুগ্রহে। তাঁকে দিয়েই নিজেকে পরীক্ষা করালাম, বল্লেন, "এ্যাবসলিউট্ রেষ্ট্ নিতে। এর অর্থ বুঝতে আমার বাকী নেই, ডাক্তার না হলেও যে রোগ নিয়ে কারবার করি তাতে এ কথার পরে আর কি আসবে সেটা অনুমান করতে দেরী হয় নি। আমার কিন্তু ভয় হচ্ছে না একটুও, বরং মনে হচ্ছে, মুক্তির জন্ত দরখাস্ত ছেড়েছি, মঞ্জুর হলে হয়। তোমাকে ছেড়ে এতদূরে থাকার কষ্ট, যা আমি স্বেচ্ছায় বরণ করে নিয়েছি, তার থেকে ছুট মেলে। কিন্তু এখন একবার দেখতে বড় ইচ্ছা হয় যে।

—না, না, এ আমি কি কামনা করছি? তুমি যে অপরের! একটী বিমল প্রাণ, অকুণ্ঠ বিশ্বাস ও নিষ্ঠাভরে যে তোমার পানে চেয়ে আছে। তার জীবন, মরণ, শুভ, অশুভ, সবেরই যে দাবী তুমি! আমার এই মলিন কামনাতেও

হয়তো তুমি লক্ষ্যভ্রষ্ট হবে। না, না, আমি তা চাই না, আমার এতদিনের সকল কষ্ট যে তা হ'লে বিফল হবে!

অনেকদিন কিছু লিখিতে পারি নি। ডাক্তার সেন কড়া হুকুম দিয়েছেন। আমি ঠিকমত 'রেষ্ট' নিচ্ছি না—আমার খবরদারী করবার জন্ম একটী পাহারার ব্যবস্থাও করেছেন। ওষুধ-বিষুদের যেমন ঘটা চল্‌ছে, তা'তে যাবার পথে দেরীই পড়বে—আমি ওষুধগুলি সব খাই না—কিন্তু ইন্‌জেক্‌শান যে নিতেই হয়। ওষুধগুলি নষ্ট করিতে মায়া বোধ হয়। ভাবি, একটা মূল্যবান্ জীবনের হয় তো কিছু উপকার হতো এতে। কিন্তু উনি আমার হাতে কাগজ পেন্সিল দেখলেই চটে যাচ্ছেন আজকাল। হায়! ডাক্তার বোঝেন না যে, বাঁচবার ইচ্ছা আমার সত্যিই নেই। আমার যে 'নার্স' সে বলে যে, ডাক্তারবাবু আজকাল নাকি বড় খিট্‌খিটে হয়ে যাচ্ছেন, কিন্তু কই, আগে তো উনি এমন ছিলেন না—আমি তো প্রায় বছর চোদ্দ ওঁর সঙ্গে কাজ করছি। যাক্ গে, ওঁর মনস্তত্ত্ব নিয়ে আমার কি হবে?"

*

"পেয়েছি আমার কামনার জিনিস আমার হাতের মধ্যে—সে বাসা বেঁধেছে আমার প্রাণের মাঝে। কাল, দৈবক্রমে শুনেছি,—আমার অবস্থা ভালোর দিকে তো নয়ই বরং 'গ্যালপিং'এর দিকে। কি আনন্দই যে হচ্ছে আমার! আশা-নিরাশার দোলা নাই—অনিশ্চিতের পিছু পিছু ছোটা নাই—ভয়, ভাবনা, সমাজ, সংসার সব কিছুকেই জয় করিয়াছি। মরণকে আজ আমার মনে হচ্ছে—

"এসো শ্যাম সুন্দর
এসো শঙ্কাহরণ"

আর বুঝি লেখা হয় না—ডাক্তারের পায়ের শব্দ পাচ্ছি।"

একমাস পরে—

"সেন সাহেবের কাছে মিনতি করে লিখবার অনুমতি পেয়েছি। কিন্তু তিনি ধরা গলায় অনুমতি দিয়ে, চোখে রুমালটা নাড়তে নাড়তে চলে গেলেন, মনে হোল, তবে কি আমার আকাঙ্ক্ষিত মৃত্যু আমার শিয়রে এসে দাঁড়িয়েছে? তাই বুঝি নিষেধের আর দরকার হোল না! ইস্! কি আনন্দই হচ্ছে আমার! এই দুঃখে ভরা, রোগজীর্ণ প্রাণটাকে তার ভাঙা খাঁচা থেকে মুক্তি দিয়ে যাত্রা করব—নূতনের সন্ধানে—এ ভাবতেও যে আনন্দ, শান্তি। আমার নার্সটাকে অনেক জিজ্ঞেসা করেও কিছু জান্‌তে পারি নি। তবুও বুঝতে পারছি, মেয়াদ আমার ফুরিয়ে এসেছে, দু'চার দিনের মধ্যেই যদি ফুরোয়! সকলকে বলে রেখেছি—আমি ম'রলে পরে আমার এই ডায়েরীখানা তারা যেন দয়া করে তোমার কাছে পাঠিয়ে দেয়। ঠিকানা আমি জানি না—তা হলেও তুমি অতবড় ব্যারিষ্টার! শুধু নাম দিলেই বোধ হয় হবে। তা ছাড়া, এই সুদীর্ঘ প'নের বৎসর তোমাকে দেখি নি—আমার মনের সেই ব্যাকুলতাই আমার এই রক্ত দিয়ে লেখা বুকের-বেদনা তোমার কাছে পৌছে দেবেই। এ ভরসা আমার আছে—না হলে, ম'রতে আমি এমন নির্ভয় হ'তাম না।"

"যাবার আগে, বিদায় নেবার আগে, গোটা কয়েক কথা বলে নিই—সময় আর তো হবে না। তোমাকে ছেড়ে পালিয়ে আস্‌তে কষ্ট আমার কম হয়নি, সে কষ্ট আমি স্বেচ্ছায় বরণ করে নিয়েছিলাম, শুধু তোমাকে সর্ব্বজয়ী দেখব বলে—তোমার জীবনটা নষ্ট হ'তে দেব না বলে। কি ভুমি পেতে এই অভাগীকে বিয়ে করলে? সমাজ, সম্মান, যশ, প্রতিপত্তি সবই হয় তো হারাতে হতো। আমি যে মর্ম্মান্তিক যন্ত্রণায় ভুগেছি, মনের সেই যন্ত্রণাই আমাকে তিলে তিলে ক্ষয়ের দিকে নিয়ে এসেছে, সেই যন্ত্রণা এখন আমার বরদাতা, আমার শেষ আশ্রয়। তা'বলে, আমিও কম পাই নি। আরও লোভ যে করি নি, সেই যথেষ্ট। যাবার বেলায় কোন দুঃখ আর আমার নাই—কারণ এতদূরে থাক্‌লেও প্রতিক্ষণে, প্রতি মুহূর্ত্তেই তোমার অদৃশ্য আকর্ষণ অনুভব করছি। মন আমার বহু পূর্ব্বেই তোমার অভিসারে বেরিয়ে পড়েছে—

"আমি যা' লয়ে যাই
তুলনা তারি নাই—"

সুধীশ আর পড়তে পারলো না। ডায়েরীর সঙ্গের টাইপ করা কাগজখানা উল্টে দেখতে লাগলো, ইংরাজীতে যা লেখা আছে তার তর্জ্জমা করলে দাঁড়ায়, "মৃতার কাছে অনুরুদ্ধ থাকায় এই জিনিসগুলি আপনাকে পাঠানো হইল।"

তার চোখ ফেটে বুঝি অশ্রুর বদলে বুকের রক্ত বাহিরে আস্‌তে চাইল। স্বগত সে বলতে লাগল,—"মৃতা—মৃতা!



বন্ধুত্ব।

তুমি আজ আশা, আকাঙ্ক্ষা, সাধ, স্বপ্ন ভরা দেহধারী নও—তুমি মৃতা! মাটির মাঝে, তোমার সব সাধ, সব স্বপ্ন, সব আশা, সব নিরাশা, মিশে গিয়েছে। চোখের সামনে না থাকলেও, তুমি পৃথিবীরই অধিবাসী, এ কথা মনে জান্‌তাম। আজ তুমি আকাশে, বাতাসে, জলে স্থলে কোথাও নাই। আমি তিলে, তিলে, বিত্তসঞ্চয় করে, সংসার পেতে বসে গভীর অনুরাগের প্রতিক্রিয়া স্বরূপ, গভীর উপেক্ষায় দেখাতে চেয়েছিলাম তোমাকে যে, 'পাষাণি! তোমার প্রত্যাখ্যানে ক্ষতি আমার কিছুই হয় নি। আমি জীবনে সাফল্য লাভ করেছি।' আমি যখন সমারোহ সহকারে তোমার প'রে শোধ নেবো ভাবছিলাম—তুমি তখন নিঃশব্দে বিজয়-নিশান উড়িয়ে দিয়ে চলে গেলে বিজয়িনী হয়ে!"

অসহ্য গুমোটের পরে জ্বালা জুড়িয়ে ধারার পরে ধারা নিঃশব্দে ঝরতে লাগ্‌লো। অনেক অশ্রু ফেলে, সুধীশ স্তব্ধ হ'য়ে রইলো—অসহ্য শোক তার তখন সীমার মধ্যে এসেছে। সন্ধ্যার মুখোমুখি দরজা খুলে, বরাবর নিজের শোবার ঘরে গিয়ে রেবাকে ডেকে পাঠালে। রেবা এসেই উদ্বিগ্ন সুরে বল্‌লে, "সারাদিন আজ তোমার কি হয়েছে? কোর্টেও গেলে না—শুন্‌লাম, কারো সঙ্গে দেখা, সাক্ষাতও কর নি—শরীর কি তোমার ভাল নাই?"

রেবা যতক্ষণ কথা বল্‌ছিল সুধীশ স্থির দৃষ্টিতে তার দিকে চেয়েছিলো, সে থামলে একটু আগিয়ে এসে তার মাথাটা বুকের মাঝে চেপে ধরে রইলো—হয়তো যৌবনের রক্তনেশা তাকে একটু দোলা দিচ্ছিল—হয় তো বা সে রেবার কাছে অসহায় মনের অবলম্বন খুঁজছিল।—

একটু পরেই সে বল্‌লে, "সিনেমায় যাবে?—বাংলা?" বহুদিন আগে ভুলে যাওয়া সুরের আমেজ পেয়ে রেবা মনে মনে বালিকার মত চঞ্চলা হয়ে উঠ্‌লো। সিনেমায় তারা দু'জনেই যায়—কিন্তু একসঙ্গে যাওয়া বহুদিন ঘুচে গিয়েছে। নিজেদের মধ্যে এ নিয়ে ওদের কোন অশান্তিই নেই—দু'জনেই দু'জনের ভিতরকার মানুষটীকে সম্ভ্রম করে, শ্রদ্ধা করে। স্বামীর এই আহ্বানে উৎফুল্ল হয়ে, সে আব্‌দারের সুরে বল্‌লে "তুমি নিয়ে গেলেই যাব—"।

সিনেমা ঘর—বাংলা ছবি "জীবন-মরণ" দেখানো চল্‌ছিল। এর আগে সুধীশ বাংলা ছবি এত মন দিয়ে দেখেনি বোধহয়,—বইখানা—তার মনে ছাপ রেখে যাচ্ছিল।

কানে গান ভেসে এলো—

"আমি তোমায় যত শুনিয়েছিলেম গান—
তার বদলে আমি, চাই নি কোন দান।"

•

পাথরের মত কঠিন মনে তার, অশ্রু-সাগর দুলে উঠলো। অশরীরিণ ফুল্লরা তার সকল মাধুর্য্য নিয়ে মনের গহন আলো করে দাঁড়ালো। ছবি শেষ হয়ে গেলে, কোনো মতে সুধীশ গাড়ীতে এসে বস্‌লো—তাকে দেখে তখন সুস্থ'র চেয়ে অসুস্থ বলেই মনে হচ্ছিল।

পথের আলোয় স্বামীর মুখ দেখে রেবা একটুও ভরসা পেলে না—ধীরে তার হাত দুটী বুকের মাঝে ধরে রেখে স্নিগ্ধকণ্ঠে বল্‌লে "তোমার কি হয়েছে বলবে না আমাকে?"

এক মুহূর্ত্তে সুধীশ নিজেকে সামলে নিলে,—ছি! ছি! নিজেকে নিয়ে সে এ কি 'সেন্টিমেন্টের' পরিচয় দিচ্ছে? সে তো "সেন্টিমেন্টাল" নয়—সে, "প্র্যাক্‌টিকাল—আইনজীবী—সুধীশ গুহ। অব্যবসায়ীর মত ভাবপ্রবণতা নিয়ে সে এ কি ছেলেমানুষী করেছে!—চারিদিকে তার কত কাজ! প্রত্যেকটী মুহূর্ত্ত তার যে রিজার্ভ করা।" মৃদু হেসে সে রেবাকে বল্‌লে, "কিছুই তো হয় নি রেবা।"—পরের দিন 'কাওয়ালী স্যানাটোরিয়মের' কর্ম্মকর্ত্তার কাছে একটা মোটা অঙ্কের 'চেক্‌' চলে গেল। সঙ্গের চিঠিটায় প্রেরকের নাম, ধাম প্রকাশ করা সম্বন্ধে নিষেধ ছিল। মরার পরেও যদি দেখা বা শোনা যায়—তা হলে, ফুল্লরা হয়তো সুধীশের অনুরাগের পরিচয় পেয়ে খুশী হয়েই উঠেছিল।—

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের ছোট-গল্প

—অধ্যাপক শ্রীনরেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী এম, এ,

(১৩০৫ বঙ্গাব্দ হইতে ১৩০৬ বঙ্গাব্দ)

যে সময়ের সীমার ভিতর লেখক প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়কে পাওয়া গিয়াছে, সেই অল্পকালের মধ্যে তাঁহার বেশী ছোট গল্প প্রকাশিত হয় নাই। তিনি তখন তরুণ লেখক ছিলেন, কিন্তু তাঁহার সেই অপরিণত বয়সের রচনায় যেরূপ চমৎকারিত্ব দেখা যায়, তাহাতে অনুমান করিতে পারা যায়, তিনি পরিণত বয়সে কিরূপ প্রতিভায় ছোট-গল্প-লেখকগণের শীর্ষস্থানীয় হইবেন।

খৃষ্টীয় ১৯০০ সাল পর্য্যন্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় যে কয়েকটি ছোট-গল্প লিখিয়াছিলেন, তাহাই সীমাবদ্ধ করিয়া এই গ্রন্থে আলোচ্য।

তিনি যে সময়ে ছোট-গল্প লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন অর্থাৎ খৃষ্টীয় ঊনবিংশ শতাব্দীর একেবারে শেষভাগে, তখন হইতেই বাংলা সাহিত্যে ছোট-গল্পের বন্যার প্রবাহ আরম্ভ হয়। যাঁহারা সেই বন্যার তরঙ্গ তুলিয়াছিলেন তিনি তাঁহাদের অন্যতম।

প্রভাতকুমার বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ-শিক্ষাপ্রাপ্ত ছিলেন। ব্যারিষ্টারী পরীক্ষা দিবার জন্য তিনি বিলাতেও গিয়াছিলেন। সুতরাং স্বদেশ-বিদেশের ভাব শিখিয়া তিনি তাঁহার ছোট-গল্পে নূতন ভাব ফুটাইতে যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছিলেন; যে জিনিষটি নিজস্ব নহে, তাহা নিজের করিয়া লওয়া বাস্তবিকই শ্রমসাধ্য। তিনি তাই জানিয়া ছোট-গল্পকে সমৃদ্ধ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিলেন। তাঁহার পূর্ব্বতন ছোট-গল্প লেখকেরা যেরূপ আদর্শ লইয়া যে সমস্ত ছোট-গল্প লিখিতেন, তিনি সেরূপ লিখিতেন না। এ ক্ষেত্রে, তাঁহার গুরু রবীন্দ্রনাথ। দেশী ছবি বিলাতী কাঠামোতে বাঁধানো যেন তাঁহার প্রকৃতিগত উদ্দেশ্য ছিল। তিনি সেই উদ্দেশ্য লইয়াই যেন ছোট-গল্প লিখিতেন।

কিন্তু দুঃখের বিষয়, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের স্বদেশ-বিদেশের অভিজ্ঞতা লইয়া যে সমস্ত ছোট-গল্প লিখিত হইয়াছিল, তাহা এই গ্রন্থের আলোচ্য সময়ের গণ্ডীর ভিতর পড়ে নাই। এখানে তাঁহাকে এদেশীয় অভিজ্ঞতাপূর্ণ লেখকই বলা হইবে।

১৩০৫ বঙ্গাব্দের চৈত্র মাসের 'প্রদীপ' মাসিক পত্রিকায় প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের 'অঙ্গহীনা' নামক ছোট-গল্প প্রকাশিত হয় এবং পরবর্ত্তী বৎসর অর্থাৎ ১৩০৬ বঙ্গাব্দের বৈশাখ মাসে উক্ত মাসিক পত্রিকায় অর্থাৎ 'প্রদীপে' "হিমানী" নামে আর একটী ছোট গল্প দেখিতে পাওয়া যায়।

তিনি 'নব কথা'র দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকায় লিখিয়াছেন—"* * * 'শ্রীবিলাসের দুর্ব্বুদ্ধি' আমার সর্ব্বপ্রথম গল্পরচনা। 'ভূত না চোর', 'কাটা মুণ্ড' এবং 'সাহজাদা ফকিরের প্রণয়কাহিনী' এই তিনটি গল্প ভাষান্তর হইতে গৃহীত, অনুবাদ নহে, স্বেচ্ছামত পরিবর্ত্তিত করিয়া লইয়াছি।"

'শ্রীবিলাসের দুর্ব্বুদ্ধি' যখন ১৩০৫ বঙ্গাব্দের 'প্রদীপ' মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়, তখন উহা লেখিকা রাধামণি দেবীর নামে বাহির হইয়াছিল। প্রভাতকুমারের গ্রন্থাবলীর মধ্যে 'বেনামী চিঠি' নামে একটি ছোট-গল্পও দেখিতে পাওয়া যায়, উহাও ঐ ১৩০৫ বঙ্গাব্দের 'প্রদীপ' মাসিক পত্রিকায় লেখিকা রাধামণি দেবীর নামে প্রকাশিত হইয়াছিল। যদি 'শ্রীবিলাসের দুর্ব্বুদ্ধি' ও 'বেনামী চিঠি' ছোট-গল্প দুইটী প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের রচনা হয়, তবে হয়তো তিনি (তাঁহার আত্মীয়া) রাধামণি দেবীর নামে তাঁহার প্রথম ছোট-গল্প দুইটি প্রকাশিত করিয়াছিলেন। তাহা না হইলে ১৩০৫ বঙ্গাব্দের 'প্রদীপে' লেখিকা রাধামণি দেবীর নামে প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের লেখা বাহির হইবে কেন? ইহা অনুসন্ধানযোগ্য। এই সংশয়ে উক্ত ছোট-গল্প দুইটির আলোচনা স্থগিত রাখা গেল।

'অঙ্গহীনা' ও 'হিমানী' উভয়ই যেন আনন্দের খনি। পড়িলেই মুগ্ধ হইতে হয়। দুইটি স্বতন্ত্র বিষয়বস্তু লইয়া

রচিত হইলেও প্রভাতকুমার হিন্দুসমাজকে কষাঘাত করিবার জন্যই ছোট গল্প দুইটী লিখিয়াছিলেন। সে হিন্দুসমাজ কিন্তু তাঁহার শত্রু নহে, বা দেশান্তরের লোকের সমাজ নহে, উহা তাঁহার আপনার, আপনার মা বাপ-ভাই-বোনের সমাজ। উহা তাঁহার বিশেষ আদরের বস্তু।

অবশ্য এখানে বলিলে অসঙ্গত হইবে না, প্রভাতকুমারের বিলাত ভ্রমণের পরের ছোট-গল্পেও সমাজদ্রোহিতার ছবি নাই। থাকুক, হিন্দুসমাজ মন্দ, সে মন্দকে তিনি ভাল করিবেন, আর যদি সে মন্দ ভাল না-ই হয়, তবু তাঁহার হিন্দুসমাজ তাঁহারই থাকিবে। তিনি চান দোষ-ত্রুটি-বিহীন নিজের জিনিষ।

'অঙ্গহীনা'তে তাই তিনি হিন্দুসমাজের পণপ্রথারূপ অভিশাপকে নিন্দা করেন। পিতামাতা আচারনিষ্ঠ হইয়া সামাজিক বিবাহবন্ধনে পুত্রকন্যাকে আবদ্ধ করুক, ইহাই তাঁহার কামনা। তাহারা যেন পাশ্চাত্য প্রথার নকল করিতে গিয়া বিবাহকে একটা ধর্ম্ম-সংস্কার ভিন্ন অন্য কিছু মনে না করে।

'অঙ্গহীনা'য় প্রভাতকুমার সমাজকে কষাঘাত করিয়াছেন কিন্তু 'হিমানী'তে তিনি প্রণয় জিনিষটিকে বড় দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহা হয় নাই।

ভালবাসা, প্রেম, প্রণয়, প্রীতি যে নামেই এই জিনিষটিকে অভিহিত করা যাক না কেন, সমাজবন্ধন বড়ই দৃঢ় বন্ধন, উহা ছিন্ন করা কষ্টসাধ্য। এখানে তিনি সামাজিক নিয়মকে প্রশংসা করিয়াছেন। উভয় ক্ষেত্রেই সমাজ তাঁহার মহা-আদরের। এই উদ্দেশ্য সফল করিতে গিয়া তিনি গভীর মনস্তত্ত্বের আশ্রয় লইয়াছেন, কারণ তাহার অভাব হইলে ছোট-গল্প রস-বিহীন হয়। এই দুইটি ছোট-গল্প মনস্তত্ত্বমূলক। যদিও ইহা সামাজিক।

'অঙ্গহীনা' ও 'হিমানী'তে ভালবাসার যে চিত্র দেওয়া হইয়াছে, তাহাতে এই দুইটি ছোট-গল্পকে প্রেমমূলক বলিলে দোষ হয় কি না বিবেচ্য। লেখক গল্প দুইটিকে সমাজের পরিচ্ছদে ভূষিত করিয়া মনস্তাত্ত্বিক অলঙ্কারে অলঙ্কৃত করিয়াছেন।

সাহিত্যিকের উদ্দেশ্য, যে কোনও দিক দিয়া শিক্ষা দেওয়া, রস সৃষ্টি করা। তাই প্রভাতকুমার সামাজিক নীতি-শিক্ষা দানের জন্য এবং সমাজসংস্কারের জন্য এই দুইটি ছোট-গল্পের অবতারণা করিয়াছেন। প্রেমের ছবি ফুটানোর উদ্দেশ্য তাঁহার গৌণ, সমাজের দুর্নীতি দূর করা, সমাজের আদর্শ উচ্চতর করার অভিলাষ তাঁহার মুখ্য।

ছেলেকে বিবাহ দিয়া ছেলের বাপের মেয়ের বাপের নিকট টাকার দাবী করার হিড়িকটা বোধ হয় আজকালকার বাংলাদেশে বর্ত্তমান নারী-প্রগতির দিনে কিছু কমিয়াছে। কিন্তু বাংলার হিন্দু সমাজে এমন একটা সময় গিয়াছে, যে সময় পণ-প্রথার আঘাতনে বহু মেয়ের বাপকে পথে বসিতে হইয়াছে। অনেক কন্যাও পিতা-মাতার দৈন্যে দুশ্চিন্তায় অধীর হইয়া আত্মহত্যা করিয়াছে। এজন্য দেশে বহু আন্দোলন হইয়া গিয়াছে। বহু সাহিত্যিকও এই দুর্নীতির ইতিহাস অবলম্বন করিয়া অনেক উপন্যাস, ছোট-গল্প, পদ্য ও ছড়া লিখিয়াছেন। সংবাদপত্রে এই পণ-প্রথার শোচনীয় সংবাদ তখন প্রকাশিত হইত। বর্ত্তমানে 'সর্দা আইন' পাশ হওয়ায় মেয়েদের অধিক বয়সে বিবাহ দিবার সুযোগ পাওয়ায় ও কোন নির্দ্দিষ্ট বয়সের মধ্যে মেয়েকে বিবাহ দিতেই হইবে—এরূপ কড়াকড়ি না থাকায় এবং সর্ব্বোপরি দেশের আর্থিক দুর্দ্দশার জন্য ছেলেরা উপার্জ্জন করিতে সমর্থ না হইয়া বিবাহ করিয়া আর্থিক ভাবে বিপন্ন হইতে স্বীকৃত না হওয়ায়, সেই পণপ্রথা কিছু হ্রাস হইয়াছে। প্রভাতকুমারও হিন্দু-সমাজের এই অভিশাপ-স্বরূপ পণ-প্রথার ভয়াবহ পরিণামে ক্ষুব্ধ হইয়া 'অঙ্গহীনা' ছোট-গল্পে সামাজিক চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন। তাঁহার এই উদ্দেশ্য ছিল, হয়তো তাঁহার 'অঙ্গহীনা'র ছবি বঙ্গীয় হিন্দুসমাজের কোন একটিও অর্থগৃধ্নু পিতার মন পরিবর্ত্তিত করিতে সমর্থ হইবে।

শ্যামাচরণের ন্যায় 'বোম-ভোলানাথ' সওদাগরী আফিসের ষাট টাকা মাহিনার কেরানী, বাংলা দেশে ভূরি ভূরি আছে। তাহারা এই মাসিক নামমাত্র বেতনের উপর নির্ভর করিয়া একটি মাঝারি বা বড় সংসার চালাইতে বাধ্য হয়। ঐ টাকার মধ্যে সংসারের সব রকম খরচ, তিন চারিটি পলগ্রহা কন্যার বিবাহ পর্য্যন্ত সঙ্কুলান করিতে হয়। এই সমস্ত দিক সামলাইতে গিয়া তাহাদের তো জীবন রক্ষা বিড়ম্বনা হইবেই। সংসারে মেয়েটিকে সৎপাত্রে দান করিতে সকলের সাধ। পুত্রকে পিতা আশৈশব কত লালন-পালন করেন,

তাহার শিক্ষার জন্য যোগ্য বয়স পর্যন্ত কত খরচ করেন, মেয়ের জন্য তো বিবাহ দিবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তাঁহারা খরচ করিয়া থাকেন। তাই, শ্যামাচরণ কন্যাকে একটি ভাল পাত্রে দিবার চেষ্টা করিয়াছিল। পাত্রটি সৌভাগ্যবশতঃ ভালও জুটিয়াছিল। সে পাত্র শ্যামাচরণের পুত্র আশুতোষের সহপাঠী মোহিনী। কন্যা শৈলবালাও মোহিনীকে পছন্দ করিয়াছিল। কিন্তু মোহিনীর পিতা জমিদার হরেকৃষ্ণ রায় ইহাদের মিলনে দুর্দ্দৈব হইল। তাহার ধন আছে, কৌলীন্য আছে, পুত্র বি, এ, পাশ, সুশ্রী। যখন পণপ্রথা বর্ত্তমান, তখন হরেকৃষ্ণ রায় পুত্রের বিবাহ বিনা অর্থে দিবে না।

শ্যামাচরণের আশা-আকাঙ্ক্ষা সমস্তই তাই ম্লান হইল। গৃহিণীর সমস্ত গা খালি করিয়াও হরেকৃষ্ণের দেওয়া বিবাহ-ফর্দ্দের ব্যয় সঙ্কুলান হইল না। হিন্দুসমাজের শাসন তো শ্যামাচরণকে ছাড়িবে না। মেয়ে বড় হইয়া উঠিয়াছে। আর তো তাহাকে বিবাহ না দিয়া রাখা যায় না। সমাজের ভয়, পাড়া-প্রতিবেশীর কানাকানি শ্যামাচরণকে অস্থির করিয়া তুলিল। গৃহিণীও অস্থির হইল। সুতরাং অন্য পাত্র খুঁজিতে শ্যামাচরণ বাধ্য হইল। স্থিরও করিল একটি। পাত্রটি উকীল, কিন্তু দোজবরে, একটু ভারি-ভুরি। কাহারও মন উঠিল না, না কর্ত্তার—না গৃহিণীর, শৈলর তো মোটেই না।

তাই বলিয়া প্রভাতকুমার শৈলকে দিয়া উপন্যাসের নায়িকার মত—

"বসিয়া বিজনবনে বসন অঞ্চল পাতি,
পরাইতে তব গলে নিজ মনে মালা গাঁথি।"

বলাইয়া মোহিনীর জন্য জীবন যৌবন সমর্পণ করান নাই, যদিও এই সম্বন্ধ উপস্থিত করিবার পূর্ব্বে মোহিনী বন্ধু আশুতোষের বাড়ীতে আসিয়া শৈল-র দেওয়া জিনিস-পত্র হাতে করিয়া লইয়াছে।

শ্যামাচরণের স্ত্রীও মোহিনীকে প্রীতির চোখে দেখিয়াছিল। ইতিমধ্যে যে একটি ঘটনা ঘটিয়া গেল, তাহা শোচনীয়। শৈল একটি ঘটি আঙুলে লইয়া খেলা করিতে করিতে একটা আঙুল কাটিয়া ফেলিল। ক্ষত বিষাক্ত হইয়া হাতখানি সংক্রামিত করিবে বলিয়া ডাক্তার শৈল-র সেই ঘটি কাটা আঙুলটী একেবারে কাটিয়া ফেলিয়া তাহাকে অঙ্গহীনা করিল। তাহাকে এখন বিয়ে দেওয়া আরও কঠিন হইল।

বিবাহসভায়, শৈল'-র আঙুল একটি নাই সংবাদ, যখন প্রকাশিত হইল, (যদিও এ সংবাদ উকীল-পাত্রপক্ষীয়েরা পূর্ব্বে জানিয়াছিল কিন্তু বিবাহ-আসরে এ কথা প্রকাশিত হইলে, কন্যাপক্ষের নিকট হইতে টাকা আদায় করা সুবিধা হইবে ভাবিয়া, তাহারা পূর্ব্বে নীরব ছিল) তখন উকীল-বরের কর্ত্তৃপক্ষ শ্যামাচরণের নিকট আরও দুইশত টাকা দাবী করিল।

প্রভাতকুমার হিন্দুসমাজের এই ঘৃণ্য ব্যাপার উদ্ঘাটিত করিয়া গল্পাংশ এমন জঁাকালো করিয়াছেন যে, পাঠক-পাঠিকা উহা পড়িবামাত্র হৃদয়ে দারুণ আঘাত পায়, ইহাই ছোট গল্পের মেরুদণ্ড। তারপর, আশুতোষ সেই রাত্রিতেই বন্ধু মোহিনীর শরণাপন্ন হইল।

লেখক, মোহিনীর শৈলকে বিবাহ করিবার ইচ্ছাটা নাটকীয়ভাবে প্রচ্ছন্ন রাখিয়াছেন। মোহিনী যেন আশুতোষের বোনের, বন্ধুর ভগিনীর উপকার সাধনের জন্য সেই রাত্রিতেই শৈলকে বিবাহ করিল। এখানেই লেখকের কৃতিত্ব। তারপর কতদিন গেল। মোহিনী গুপ্তবিবাহ করিয়া কিরূপে রাশভারী জমিদার পিতার নিকট এই অপমানের সংবাদ প্রকাশ করিবে, ইহাই হইল সমস্যা।

প্রভাতকুমার এখানে অকৃতিত্ব দেখান নাই। ছোট-গল্পটির ও এখানে রসভঙ্গ হয় নাই। আশুতোষ যে বন্ধু মোহিনীর মত করাইবার জন্য ছোঁয়া হাতে বিয়ের গভীর রাতে মোহিনীর মেসে ছুটিয়া, হাঁপাইয়া গিয়াছিল এবং মোহিনীও তখন কি করিতে হইবে চিন্তা করিবার অবসর পাইয়াছিল না; তাহার আত্মসম্মান জ্ঞান, পিতা কিংবা পূজনীয়া মাতা বা জ্যেঠা ভগিনী বা বাটীর অন্য কর্ত্তৃপক্ষ এরূপ বিবাহ অনুমোদন করিবে কি না, কারণ, এই আগুর বোনের সহিতই সম্বন্ধ তাঁহারা পূর্ব্বে দেনা-পাওনার জন্য ভাঙিয়া দিয়াছিল, এমতাবস্থায়, প্রভাতকুমার যে এই বিবাহ দিয়া ফেলিলেন, ইহা তাঁহার কোন্ উদ্দেশ্য যাচাই করিবার জন্য, ইহাই জিজ্ঞাস্য।

মোহিনী নয় ঋণ করিয়া বন্ধুর বোনের ভবিষ্যৎ দুর্গম পথের কণ্টক তুলিল, কিন্তু ইহা তাহার যুবকোচিত বীর হৃদয়ের পরিচয়, না—সে কিশোরীর প্রেমে মাতোয়ারা, ইহাই বিবেচ্য। [ক্রমশঃ

পুস্তক—আলোচনা

—শ্রীহেমেন্দ্রনাথ দাশ গুপ্ত

"রাজসিংহের ভূমিকা"—

পাঠক মনে করিবেন না যে, অর্দ্ধশতাব্দী পরে সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের রাজসিংহের পরিচয় দেওয়ার দুর্ব্বুদ্ধি আমাদের হইয়াছে। সম্প্রতি, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ হইতে বঙ্কিমচন্দ্রের সমগ্র পুস্তকাবলীর নূতন সংস্করণ বাহির হইয়াছে। রাজসিংহ ও বাহির হইয়াছে এবং ভূমিকা লিখিয়াছেন পণ্ডিতপ্রবর স্যার যদুনাথ সরকার মহাশয়। আমাদের বক্তব্য বিষয়, প্রধানতঃ, এই ভূমিকা সম্পর্কে। পুস্তকখানি 'শনিরঞ্জন' প্রেসে মুদ্রিত হইয়াছে। সাহিত্য পরিষদ হইতে প্রকাশিত সংস্করণের সম্পাদকদ্বয় লিখিয়াছেন যে, ইতিহাসের দিক্ দিয়া বঙ্কিমচন্দ্র কতখানি সাফল্যলাভ করিয়াছেন তাহার বিচার স্যার শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার তাঁহার লিখিত ভূমিকায় করিয়াছেন। সুতরাং বঙ্কিমে ঐতিহাসিক উপন্যাসের বিচারকের আসন স্যার যদুনাথ গ্রহণ করিয়াছেন, তাহাই মনে করিতে হইবে। সম্পাদকদ্বয় যাহাই বলুন এই বিচার, স্যার যদুনাথ কিরূপভাবে সম্পন্ন করিয়াছেন, তাহাই আমাদের আলোচনার বিষয়।

একে স্যার যদুনাথ ইতিহাস ও ইংরাজি সাহিত্য সম্বন্ধে একজন বিশেষজ্ঞ; তারপরে ১৮৯৯ ও ১৯০০ এই দুই বৎসর পাটনা কলেজের ছাত্ররূপে তাঁহার কাছে অনেক কথা শিখিয়াছি; তাই, এতবড় একজন পণ্ডিতের সম্বন্ধে কোন কথার আলোচনা ধৃষ্টতার নামান্তর হইলেও, কর্ত্তব্যের অনুরোধে সেই অপ্রিয় কার্য্যও আজ করিতে বাধ্য হইতেছি।

স্যার যদুনাথের "ঔরঙ্গজেবের ইতিহাস" ইংরাজীতে পাঁচ খণ্ডে প্রকাশিত। পুস্তকখানি বিশেষ গবেষণাপূর্ণ। তিনি শিবাজীর ইতিহাসও লিখিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত আরও অনেক প্রবন্ধাদি এবং পুস্তকও রচনা করিয়াছেন।

স্যার যদুনাথ যখন পাটনা কলেজের প্রফেসার, লর্ড কার্জ্জন তখন ভারতের গভর্ণর জেনারেল। স্যার যদুনাথ পাটনার খোদাবক্স খাঁন লাইব্রেরীর লিখিত ও মুদ্রিত পুস্তকাদি ও কাগজপত্র পাঠ করিয়া এই পুস্তকের জন্য বহু উপাদান সংগ্রহ করিয়াছেন। ফারসী ভাষায় লিখিত কাগজপত্র বুঝিয়া লইতে তিনি নিজে একাধিক মৌলভী রাখিয়া আরবী ও ফারসী শিখিয়াছিলেন। এই বিষয়ে তিনি যে পরিশ্রম করিয়াছেন, তাহা কেবল পাণ্ডিত্যেরই পরিচায়ক নহে, সেই উদ্যম ও অধ্যবসায় অমানুষী বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।



বঙ্কিমচন্দ্র

লর্ড কার্জ্জন কেল্লার অন্তর্গত রঙমহলে ফারসী ভাষায় পড়িয়াছিলেন—

আগর্ ফিরদৌস্ বরুয়ে জমিনস্ত,
ও হমিনস্ত হমিনস্ত হমিনস্ত।

কিছুদিন পরে তিনি পাটনা আসিয়া এই লাইব্রেরীর মহামূল্য গ্রন্থপ্রাচুর্য্য দেখিয়া ও মুগ্ধ হইয়া সোল্লাসে বলিয়া উঠেন—

আগর্ ফিরদৌস বরুয়ে জমিনস্ত,
ও হমিনস্ত হমিনস্ত হমিনস্ত

অতঃপরে, স্যার যদুনাথ এই লাইব্রেরীর তথা লর্ড কর্জনের প্রশংসা সূচক একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। বোধ হয়, তাহা প্রদীপ কি প্রবাসীতে বাহির হয়। সেই প্রবন্ধ পড়িয়া মনে হইয়াছিল যে, লর্ড কার্জন আর উক্ত লাইব্রেরী—উভয়ের প্রভাবই প্রবীণ অধ্যাপক মহাশয়ের উপরে বিশিষ্টভাবে পড়িয়াছিল। প্রবন্ধটী কাছে নাই, উহার সব কথা মনেও নাই; তবে ঔরঙ্গজেব-চরিত্রের কথা পড়িয়া মনে হয়, তিনি তাঁহার নায়ককে তৎকালীন প্রবল প্রতাপান্বিত রাজপ্রতিনিধির জীবন্ত আদর্শে যে কতকটা গড়িয়াছেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। তাঁহার মতে, ঔরঙ্গজেব পীর ও ফকিরের অনুরূপ সাধু চরিত্র। পিতার অবরোধ, দারার সহিত সংঘর্ষ ও দারার মৃত্যুদণ্ড প্রভৃতি সবই তাঁহার গ্রন্থে রাজনৈতিক কারণে সমর্থিত হইয়াছে। দারার সহিত সংগ্রামে ঔরঙ্গজেবকে তিনি ডিউক অব্ ওয়েলিংটনের সঙ্গে তুলনা করিয়াছেন এবং ঔরঙ্গজেবকে ধর্ম্মস্থান ও ধর্ম্মবিশ্বাসেরই উদ্ধারকর্ত্তারূপে চিত্রিত করিয়াছেন। ঔরঙ্গজেবের উদ্দেশ্য-সিদ্ধি ও উন্নতির পক্ষে তাঁহার সমস্ত কল্পনা ও আশা ষোল বৎসর যাবৎ ব্যর্থ করিয়া দেওয়ায় দারার প্রতি তাঁহার ব্যবহার কি অন্যায় হইয়াছে? স্যার যদুনাথ বলেন,—

"For Dara there could be no pardon. For more than 16 years Dara had been blighting shadow on Aurangzeb's life, has monopolised all the favours of Shajahan, for Dara Aurangzeb was always misunderstood, suspected and unjustly reprimanded from the very beginning of the term of office and the bitterness of feelings thus aroused was one of the reasons why the war on succession was conducted so heartlessly and unscrupulously."

"আলমগীরী নামার" গ্রন্থকার মহম্মদ কাজেমের মত স্যার যদুনাথও মোরাদকে মূর্খ ও অনভিজ্ঞ বলিয়াই অভিহিত করিয়াছেন, যদিচ খাপি খাঁ পর্য্যন্ত এই জন্য কাজেমকে ক্ষমা করেন নাই। স্যার যদুনাথের মতে, Aurangzeb was free from any vice, abstemious like a hermit and his oneness of purpose was a thing of great admiration and if the empire fell, it did only for Aurangzeb's policy and conduct.

অর্থাৎ মহদুদ্দেশ্য প্রণোদিত হইয়াই ঔরঙ্গজেব পিতাকে বন্দী ও ভ্রাতৃগণের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিয়াছিলেন। তিনি একজন "Ideal Moslem King" ছিলেন, তবে যে সাম্রাজ্য রক্ষা করিতে পারেন নাই, তাহা তাঁহার নীতির দোষ, মহৎ চরিত্রের কোন ত্রুটীর জন্য নয়। স্যার যদুনাথ এই ভাবেই ঔরঙ্গজেব চরিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন। উক্ত বঙ্কিমচন্দ্রের রাজসিংহের ভূমিকায় ঔরঙ্গজেবের চরিত্র সমালোচনা করিতে গিয়াও মূলতঃ তিনি তাঁহার পূর্ব্বমত ও ভাব পরিত্যাগ করেন নাই। ইতিহাসে তেমনভাবে না বলিলেও রাজসিংহের ভূমিকায় তিনি নিম্নলিখিত দোষগুলির উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি বলেন, একজন ধর্ম্মান্ধ ওয়ায়াদ খলিফার চরিত্র যেমন Gibbon চিত্রিত করিয়াছেন, ঔরঙ্গজেব সম্বন্ধেও সেইরূপ বলা যায়—

The throne of an active and able prince was degraded by the useless and pernicious virtues of a bigot.

অর্থাৎ স্যার যদুনাথের সব মন্তব্য ধরিয়া বলিতে হয় যে, "আদর্শ মুস্লিম সম্রাট্ ঔরঙ্গজেবের যাহা কিছু দোষ ছিল তাহা কেবল ধর্ম্মান্ধতা। এই গোঁড়ামির জন্যই তিনি হিন্দু ও শিয়াদের বিরুদ্ধে খড়্গহস্ত হইয়াছিলেন।"

যদুনাথের মতে, ঔরঙ্গজেবের ধর্ম্মান্ধতা ভিন্ন তাঁহার আর কোন দোষ ছিল না। যদিচ ধর্ম্মান্ধতা থাকিলেই কোন সম্রাট আদর্শ হইতে পারেন না, তথাপি সম্প্রতি এবিষয়ে আমরা তর্ক করিব না। এদিকে বঙ্কিম দেখিয়াছেন ঔরঙ্গজেবকে ধর্ম্মহীন, ভণ্ড ও অত্যাচারীরূপে। এই বিশাল মোগল সাম্রাজ্য—যে সাম্রাজ্য পরম রাজনীতিজ্ঞ আকবর বাদশাহ প্রতিষ্ঠা করেন, জাহাঙ্গীর ও সাজাহান যাহা রক্ষা করেন,—তাহার ধ্বংস হয় ঔরঙ্গজেবের পাপের ফলে, কোন নীতি বা ধর্ম্মান্ধতার জন্যই নহে। বঙ্কিমের মতে প্রকৃতই "ঔরঙ্গজেব ধর্ম্মশূন্য" ছিলেন। বঙ্কিম বলেন, "অন্যান্য গুণ থাকিলেও যাহার ধর্ম্ম নাই—হিন্দু হৌক, মুসলমান হৌক, সেই নিকৃষ্ট। ঔরঙ্গজেব ধর্ম্মশূন্য, তাই তাঁহার সময় হইতেই মোগল সাম্রাজ্যের অধঃপতন আরম্ভ হইল।"

বাদশাহ ঔরঙ্গজেবকে স্যার যদুনাথ বলেন, ধর্ম্মান্ধ, আর বঙ্কিম অভিহিত করেন, ধর্ম্মশূন্য। এই উভয় কথার মধ্যে অনেক

পার্থক্য। বঙ্কিম বলেন, "স্পেনের দ্বিতীয় ফিলিপের ন্যায় ঔরংজেব নিষ্ঠুর, কপটাচারী, ক্রূর, দাম্ভিক, আত্মমাত্র হিতৈষী এবং প্রজাপীড়ক ছিলেন।"

যে ধর্ম্মান্ধ সে ধর্ম্মকে উপেক্ষা করিতে পারে না, কাজেই কখনও দাম্ভিক, কপটাচারী, ক্রূর, ও আত্মমাত্র হিতৈষী হইতে পারে না, বরং সরল, গোঁয়ার হওয়াই সম্ভব। কপটাচারী, ক্রূর, দাম্ভিক ও আত্মমাত্র হিতৈষী ব্যক্তিই ধর্ম্মহীন, এবং সেই সঙ্গে নিষ্ঠুর হইলে, এই অধর্ম্মের পাপেই রাজ্যের অধঃপতন আরম্ভ হয়। এখানেও পতন হইয়াছিল কেবল ধর্ম্মান্ধতার জন্য নহে, ধর্ম্মহীনতার জন্যই সমধিকভাবে। সুতরাং দেখিতেছি, বঙ্কিমচন্দ্র ও স্যার যদুনাথ, ঔরঙ্গজেব-চরিত্র সম্পূর্ণ বিপরীত দৃষ্টিভঙ্গি লইয়া, একজন উপন্যাসে আর একজন ইতিহাসে, চিত্রিত করিয়াছেন।

কোন ধর্ম্মগ্রন্থই কপটাচারকে সমর্থন করে না। কোরাণের তো কথাই নাই। ঔরঙ্গজেব যদি বর্ণে বর্ণে কোরাণের নির্দ্দেশ মানিয়া চলিতেন, তাহা হইলে কখনও কপটাচারী ও ক্রূর হইতে পারিতেন না। এরূপ স্থলে দুইজনের মূলসূত্রে সম্পূর্ণ স্বাতন্ত্র্য, এমন কি বৈপরীত্য থাকায় স্যার যদুনাথ বঙ্কিমচন্দ্রের একমাত্র ঐতিহাসিক উপন্যাসের ভূমিকা লিখিবার অধিকারী কি না এবং বঙ্কিমচন্দ্রের সাফল্য বিষয়ে বিচার করিতে তাঁহার যোগ্যতা আছে কি না, এ বিষয়ে আমাদের যুক্তি যুক্ত সন্দেহ আছে। মনে হয় যেন, তিনি কাহারও অনুরোধে জোর করিয়া লিখিয়াছেন। আজ যদি বঙ্কিম জীবিত থাকিতেন, তবে এই সমালোচনায় তিনি নিশ্চয়ই তুষ্ট হইতেন না।

দ্বিতীয়তঃ, রাজসিংহ চরিত্র। বঙ্কিমচন্দ্র এই চরিত্র আলোচনা করিয়াছেন একটী বিশেষ তত্ত্ব প্রমাণিত করিবার জন্য। অবশ্য, বঙ্কিমচন্দ্র নিজে "ভারতীয়গণের বাহুবল প্রতিপাদন" উদ্দেশ্য বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। এইটুকু মুখ্যভাবে উল্লেখ করিলেও, রাজসিংহে বঙ্কিমচন্দ্রের "অনুশীলন তত্ত্ব"ই সমধিক ভাবে প্রকটিত হইয়াছে। সম্যক অনুশীলিত ব্যক্তি যেমন শরণাগতকে রক্ষা করিতে সর্ব্বস্ব—রাজ্য, ধন, মান, প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করিতে দ্বিধা করেন না, রূপনগরের রাজকন্যাকে ঔরংজীবের হাত হইতে রক্ষা করিতেও রাজসিংহ সেইরূপ সর্ব্বস্ব পণই করিয়াছিলেন। এবম্বিধ বীরচরিত্র অঙ্কিত করিতে গিয়া বঙ্কিমচন্দ্র নিজেই বলিয়াছেন যে, তিনি ইতিহাস হইতে এই চরিত্রের উপাদান সংগ্রহ করিয়াছেন। অথচ রাজসিংহ-চরিত্র সম্বন্ধে এবং মুঘল-মেবার সংঘর্ষের যুদ্ধাদি বিষয়ে স্যার যদুনাথ বিশেষ কিছুই বলেন নাই।

যে টুকু উল্লেখ করিয়াছেন তাহাতে বঙ্কিমের উদ্দেশ্য প্রমাণিত হয়না। এমন কি, বঙ্কিমচন্দ্র ইতিহাস উদ্ধার করিতে গিয়া (সমগ্র পুস্তক খানিই ইতিহাস-অবলম্বিত) যে প্রমাণ করিয়াছেন—রাজসিংহ ঔরঙ্গজেবকে মুষিকের মত গিরিগহ্বরে আবদ্ধ করিয়াছিলেন, সম্রাটের সঙ্গিনী বেগম উদীপুরীকে হাতে পাইয়াও রাজসিংহ সম্রাটের নিকটে তাহাকে ফেরত পাঠাইয়া দেন, বন্দী সম্রাট ও তাঁহার অবরুদ্ধ সৈন্যবাহিনীর রসদের বন্দোবস্ত করিয়া দেন,—এসব স্যার যদুনাথ বিশ্বাসই করেন নাই।

তিনি বলেন—"ঔরঙ্গজেব মহারাণার সৈন্য কর্ত্তৃক ঘেরাও হইয়া একদিন অনাহারে কাটাইলেন, উদীপুরী বেগম বন্দিনী হইবার পরে রাণা তাঁহাকে মুক্তি দিলেন। ইহা ঐতিহাসিক ভুল।" আবার যে ইতিহাস-প্রসিদ্ধ পত্রখানি রাজসিংহ ঔরঙ্গজেবকে লিখিয়া ছিলেন, যে চিঠিখানি সম্বন্ধে রাজপুতনার ইতিহাস-বেত্তা লিখিয়াছেন—"The Rana remonstrated by letter, in the name of the nation of which he was the head, in a style of such uncompromising dignity, such lofty yet temperate resolve so much of soul-stirring rebuke mingled with a boundless and tolerating benevolence, such elevating excess of the Divinity, with such pure philanthropy, that it may challenge competition with any epistolary production of any age, clime or condition." এবং যে পত্রখানি বাদশাহের ক্রোধানলে ঘৃতাহুতি দিয়াছিল, যে পত্রখানি বঙ্কিমচন্দ্র উল্লেখ করিয়া রাজসিংহের মহত্ত্ব দেখাইয়াছেন, সেই ইতিহাস-প্রসিদ্ধ লিপিখানি সম্বন্ধে স্যার যদুনাথ পূর্ব্বে বলিয়াছিলেন যে, উহা শিবাজী লিখিয়াছিলেন, আর বর্ত্তমান ভূমিকায় ঐ পত্রখানি সম্বন্ধে একেবারে সম্পূর্ণ নীরব রহিয়াছেন; অথচ ঐ চিঠি থাকিলেই রাজসিংহের স্বাধীনচিত্ততা ও নির্ভীক ব্যবহার সম্পূর্ণ প্রকটিত। এই পত্রখানির কোন উল্লেখ না থাকিলে রাজসিংহের চরিত্রের

প্রকৃত পরিচয় পাওয়াই কঠিন হইত। কিন্তু তথাপি ভূমিকাতে এই বিষয়ে কোন উল্লেখ নাই। অতঃপরেও কি বলিতে হইবে যে, স্যার যদুনাথ বঙ্কিমচন্দ্রের যথার্থ আলোচনা করিয়াছেন?

আমরা যথাসময়ে এই লিপিখানির রচয়িতা কে, তাহার আলোচনা করিব।

স্যার যদুনাথ যে বহু গবেষণা করিয়া ইতিহাসখানি লিখিয়াছেন তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। "আলমগীরী নামা" "মাসিরি আলমগিরী" "আদাবী আলমগিরী" খাপি খাঁনের বিবরণ ইত্যাদি মুঘলের প্রসাদপুষ্ট ব্যক্তিগণের রচিত ইতিহাস অবলম্বন করিয়াই তিনি পুস্তক লিখিয়াছেন। বর্ত্তমান ভূমিকায়ও সেই ইতিহাসই প্রতিফলিত হইয়াছে। আর, বঙ্কিমও যে ইতিহাসে বিশেষজ্ঞ ছিলেন তাহা সর্ব্বজন বিদিত। বাল্যকাল হইতে ইতিহাসেই তাঁহার সর্ব্বাপেক্ষা অনুরাগ ছিল। ইতিহাস সম্বন্ধে বহু গ্রন্থ যে তিনি পড়িয়াছেন তাহা তাঁহারে লিখিত পুস্তকাদি ও স্মৃতিকথায় পাওয়া যায়। তাঁহার ইতিহাসের প্রতি প্রবল অনুরাগ সম্বন্ধে পাঠকের নিকট আরও পরিচয় দিব। অবসর গ্রহণ করিবার পর হইতে মৃত্যুর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত বঙ্কিমচন্দ্র মেটকাফ্ হল হইতে যে সমস্ত পুস্তকাদি বাড়ীতে পড়িবার জন্ত আনিতেন, তাহাদের তালিকা দেখিয়া (এই তালিকা আমার কাছে আছে) বুঝা যায় যে, সে বই গুলির অধিকাংশই ইতিহাস-বিষয়ক। তিনি নিজেও ইতিহাস লিখিবেন বলিয়া অভিমত প্রকাশ করিয়াছিলেন। তবে বঙ্কিমচন্দ্র ঔরঙ্গজেব চরিত্র বিবৃত করিবার পূর্ব্বে মন্তব্য করিয়াছেন—"মুসলমান ইতিহাসলেখকেরা অত্যন্ত স্বজাতি-পক্ষপাতী, হিন্দুদ্বেষক। হিন্দুদের গৌরবের কথা প্রায় লুকাইয়া থাকেন, বিশেষতঃ, মুসলমানদের চিরশত্রু, রাজপুতদিগের কথা। রাজপুত ইতিহাসের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করা যায় না—স্বজাতিপক্ষপাত নাই, এমত নহে।"

স্যার যদুনাথ লিখিয়াছেন—

"বঙ্কিম রাজপুত কবিদিগের বিবরণ অগ্রাহ্য করিয়া তাঁহার ন্যায়-বিচার শক্তিরই প্রমাণ দিয়াছেন।"

কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র ন্যায়-বিচারশক্তি দেখাইলেও স্যার যদুনাথ তাহা দেখান নাই। তিনি বলেন,

"ঔরঙ্গজেবের কার্য্য, চরিত্র ও উক্তি সম্বন্ধে যাহা "মাসিরী আলমগীরি"তে বলা হইয়াছে তাহা শত্রুর উক্তি বা বাজার-গুজব বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া যায় না, তাহা স্বীকৃত রাজনীতি ও মত বলিয়া গ্রহণ করিতেই হইবে।"

কেন করিতে হইবে? একে "মাসিরি আলমগীরী"র গ্রন্থকার সকী মুস্তাকা খাঁ ছিলেন বাদশার অধীনস্থ বিশ্বস্ত রাজকর্ম্মচারী, তারপরে বাদশার প্রিয় শিষ্য ও সেক্রেটারী এনায়েৎ উল্লা খাঁর আদেশে তিনি উক্ত গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। বাদশাহ-পরিবারের ও বাদশাহের মনোরঞ্জনার্থ না লিখিয়া কিরূপে স্বাধীনভাবে প্রকৃত বিষয় রচনা করা তাহার পক্ষে সম্ভব ছিল? দৃষ্টান্ত-স্বরূপ বলিতেছি যে, আজকাল রাশিয়া ও জার্ম্মানীর মধ্যে সংঘর্ষ চলিতেছে। তাহাতে জার্ম্মানদের অধিকার-দাবী, যাহা আজ পড়িয়া জানিতে পারি, পরদিনই রাশিয়ার বুলেটিন হইতে জানা যায় যে, শত্রুর দাবী একেবারে মিথ্যা। কাহার সংবাদ মিথ্যা? হয় জার্ম্মানীর, নতুবা রাশিয়ার। এখন এই শিক্ষা ও সভ্যতার দিনেও যদি পক্ষপাতিত্ব-দোষ সত্যকে এতই কলঙ্কিত করিতে পারে, তবে তখনকার দিনে সম্রাটের তুষ্টির জন্ত সম্রাট বা সম্রাট পরিবারের তাঁবেদারদের দ্বারা অতিরঞ্জন কি অসম্ভব হইত? তাই এই সমস্ত বাদশাহ বা বাদশাহজাদা-ভক্ত ঐতিহাসিকগণের উক্তি যেমন বিশ্বাস্য নয়, সেই প্রশস্তি অবলম্বন করিয়া ইতিহাস লিখিলেও সেইরূপ উহা নির্ভরযোগ্য হওয়া সম্ভব নহে।

দৃষ্টান্তস্বরূপ, একখানি পুস্তক সম্বন্ধে নিরপেক্ষ পণ্ডিত-মণ্ডলীর অভিমত বিশেষভাবে উল্লেখ করিতেছি। যে 'আলমগীরী'নামার কথা ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছি—সেখানি মুস্তাফা কর্ত্তৃক লিখিত। ঔরঙ্গজেব নিজে উহা লিখাইয়াছেন। সম্রাট নিজে গ্রন্থকারকে সমস্ত ঘটনা বলিতেন এবং গ্রন্থকার কতকাংশ লিখিয়া তাঁহাকে পড়িয়া শুনাইতেন। ইহাতে পিতা ও ভ্রাতৃবর্গের সহিত বাদশাহের দ্বন্দ্বের উল্লেখ আছে। ইহাতে লেখা হইয়াছে যে, ঔরঙ্গজেব নীতি ও ধর্ম্মের অনুরোধে পিতাকে বন্দী করেন, দারার মৃত্যুদণ্ড দেন, সোরাদের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করেন, এবং বর্ব্বর মোরাদ নিজদোষেই ঔরঙ্গজেবের হাতে প্রাণ হারাইয়াছিল। যদিও স্যার যদুনাথ তাঁহার পুস্তকে প্রথম দশ বৎসরের আখ্যান (১৬৫৮—১৬৬৮) প্রধানতঃ উক্ত গ্রন্থ অবলম্বন করিয়াই লিখিয়াছেন, অন্যান্য নিরপেক্ষ ঐতিহাসিকগণ কিন্তু উহা একদেশদর্শিতার জন্য বর্জ্জন করিয়াছেন। আলমগীরীনামা:

ইতিহাসখানি সমাপ্ত হইয়া গেলেই ঔরঙ্গজেব রাজ্যমধ্যে ঘোষণা করিয়া দেন যে, রাজ্যশাসনের ইতিহাসে নিজ শাসনকর্ত্তার চিত্ত উৎকর্ষ প্রাপ্ত হয় না, গর্ব্বে স্ফীত হইয়া উহার ক্ষতি সাধন করে, সুতরাং অতঃপরে সাম্রাজ্যের ত্রিসীমানায়ও যেন কোন ইতিহাস রচিত না হয়। কিন্তু বিস্ময়ের বিষয় এই যে, উক্ত 'আলমগীরী'নামাখানির প্রকাশ ও প্রচার তিনি বন্ধ করিলেন না। অনেক ঐতিহাসিক কারণ অনুমান করিয়া বলেন যে, ঔরঙ্গজেব মনে মনে জানিতেন অতঃপরে রাজত্বকালে যে যাহা লিখিবে প্রশস্তি বই আর কিছু হইবে না। কিন্তু পূর্ব্ব বর্ণনা (পিতার সহিত যুদ্ধাদি) পরে তাঁহার কলঙ্ক উদ্ঘাটিত করিতে পারে। পাছে পিতা ও ভ্রাতৃগণের প্রতি আচরণ সম্পর্কে প্রকৃত পৈশাচিক সত্য দেশে ও কালে প্রচারিত হইয়া যায়, সেই ভয়েই তিনি এই পুস্তকের প্রচার রহিত করেন নাই। সুতরাং সেইখানি প্রকাশিত হউক, তারপর সবই বন্ধ হউক, এইরূপ ইচ্ছা অসাধু ভিন্ন আর কিছুই নয়। তাই Sir H. M. Elliot ঠিকই লিখিয়াছেন—

"As the royal listener was not likely to criminate himself, we must perpetually bear in mind that such histories are mere one-sided accounts and not to be received with implicit reliance."

প্রফেসর John Dawsonও বলেন—

"The style of Alamgirinama is quite in accord with the courtly panegyrical character of the book. It is strained, verbose and tedious, fulsome in its flattery, abusive in its censure. Laudatory epithets are heaped one upon another in praise of Aurangzeb, while his unfortunate brothers are not only sneered at, and abused, but their very names are perverted. Dara Shakka is repeatedly called 'the undignified' and Suja is called Nasuja, the unvaliant

ঐই আলমগীরী নামাই "মাসিরী আলমগীরী" এবং খাফিখাঁর "মুন্তাখাবুল লুবাব" প্রভৃতি ইতিহাসের প্রামাণ্য গ্রন্থ (authority), আর যদিও প্রফেসার Dawson বলেন, "Alamgirinama seems to have obtained no great reputation in India",

কিন্তু স্যার যদুনাথ ঐ গ্রন্থখানিকেই authority হিসাবে অমর করিয়া রাখিয়াছেন।

পূর্ব্বোক্ত ঐতিহাসিকগণের ন্যায় বঙ্কিমচন্দ্র যেমন মাসিরী আলমগীরী, আলমগীরী নামা, আদাবী আলমগিরি প্রভৃতি গ্রন্থও প্রমাণ-স্বরূপ লয়েন নাই, সেইরূপ হিন্দু প্রশস্তিও লয়েন নাই। স্যার যদুনাথও একথা স্বীকার করিয়াছেন।

তবে রাজসিংহ প্রণয়ণে কি উপাদান হইতে বঙ্কিমচন্দ্র তত্ত্বগ্রহণ করিয়াছেন?—

(১) মানুচী নামে জনৈক ভিনিস্ (ইটালী) বাসী ডাক্তার ভারতবর্ষে আসিয়া অনেক দিন ছিলেন। শাহ্ আলমের বেগমের দুরন্ত কর্ণপীড়া হইতে তাঁহাকে রক্ষা করিয়া বাদশাহ-জাদার স্থায়ী চিকিৎসকরূপে তিনি দাক্ষিণাত্যে তাহার সঙ্গেয়ান। এই মানুচী, রাণার সহিত ঔরঙ্গজেবের যুদ্ধের সময় যুদ্ধক্ষেত্রে শাহ্ আলমের সঙ্গীরূপে উপস্থিত ছিলেন। মাস বা তারিখের এক আধটু গোলমাল হইলেও তাঁহার প্রদত্ত বিবরণ অনেকটা সত্য। তিনি যে হিন্দুদের প্রতি বিশেষ আস্থাবান ছিলেন তাহা নয়, কারণ হিন্দুদের প্রতি তাঁহার কোন পক্ষপাতিত্বই ছিল না। এমতাবস্থায়, তাহার প্রদত্ত বিবরণ যে, প্রমাণ সম্বন্ধে খুবই মূল্যবান, তাহাতে সন্দেহ নাই।

(২) বার্ণিয়ার নামে একজন ফরাসী পর্য্যটক ঔরঙ্গজেবের অধীনে চাকুরী করিতেন। তিনিও রাজপরিবার প্রভৃতি বিষয়ে অনেক খবর লিখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার কথাও প্রামাণ্য স্বরূপ গ্রহণ করা যায়।

(৩) আর একজন পর্য্যটক ছিলেন Tavernier—ইঁহার বিবৃতি হইতেও অনেক সত্যানুসন্ধান করা যায়।

(৪) অতঃপরে, রবার্ট অর্মি বহু সাধনা ও পরিশ্রম করিয়া বহুদিনের চেষ্টায়, বহু কাগজপত্রাদি দেখিবার পরে যে Fragments লেখেন তাহা খুবই প্রামাণ্য গ্রন্থ। অর্মির অমূল্য গ্রন্থে যেরূপ পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ের পরিচয় পাওয়া

যায়, অন্ত কোন ঐতিহাসিক গ্রন্থে সেরূপ পাওয়া যায় কি না সন্দেহ।

এই গ্রন্থ প্রকাশিত হয় ১৭৭৮ খৃঃ অব্দে এবং অর্ম্মি ১৭৫৬ সাল হইতেই তত্ত্বানুসন্ধান করিতে আরম্ভ করেন।

(৫) অতঃপরে কর্ণেল টড্ রাজপুতনার সমস্ত স্থান ঘুরিয়া নানাস্থান হইতে কাহিনী ও ঘটনাবলীর বিবরণ শুনিয়া ও নানাবিধ রচনাদি দেখিয়া তিনি যে ১৮৩২ খৃষ্টাব্দে "Annals of Rajasthan" বাহির করেন তাহাও কিছুতেই উপেক্ষণীয় নয়।

মূলতঃ, এই পাঁচখানি গ্রন্থ অবলম্বন করিয়াই বঙ্কিমচন্দ্রের "রাজসিংহ" উপন্যাস রচিত হইয়াছে এবং আমরা দেখিতে পাই, এই রাজসিংহের ন্যায় খাঁটি ঐতিহাসিক উপন্যাস আজ পর্য্যন্ত কোন ভাষায় রচিত হইয়াছে কি না সন্দেহ। ইতিহাসজ্ঞ পাঠকের বুঝিতে বিলম্ব হইবে না, কোন্ স্থান ইতিহাস আর কোন্ স্থান উপন্যাস। আর বঙ্কিম, রাজসিংহ উপন্যাস সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—

"যে সকল ঘটনা লিখিত হইয়াছে সকলই ঐতিহাসিক নহে। উপন্যাসে সকল কথা ঐতিহাসিক হইবার প্রয়োজন নাই।"

তাই, কয়েকটী ঘটনা সম্বন্ধে রীতিমত মতেল বলিয়া রবীন্দ্রনাথ উপহাস করিলেও, আর স্যার যদুনাথ তাহার উল্লেখ করিলেও উপন্যাসের আখ্যান ছাড়িয়া দিলে যেটুকু থাকে তাহাই ইতিহাস। বঙ্কিম নিজেই বলিয়াছেন,

"রাজসিংহ, ঔরঙ্গজেব, উদিপুরী ঐতিহাসিক চরিত্র। ইহাদের চরিত্র ইতিহাসে যেমন আছে, প্রায় তেমনই রাখিয়াছি।"

বস্তুতঃ, এই কয়েকটী চরিত্রই পুস্তকখানিকে একেবারে ঘিরিয়া রাখিয়াছে। এই কয়টী চরিত্র ঐতিহাসিক হইলে, মূল গ্রন্থখানিই ইতিহাস-তত্ত্ব আলোচনায় বিষয়ীভূত হইয়া পড়ে। এই কয়েকটী চরিত্র সম্বন্ধেই আমরা আগামীবারে বিশদ্ভাবে আলোচনা করিব।

[ক্রমশঃ

আত্মঘাতী হিন্দু—শ্রীযুক্ত শাক্যসিংহ প্রণীত। হিন্দুমিশনের পক্ষ হইতে শ্রীমধিজয়কৃষ্ণ কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য আট আনা মাত্র।

হিন্দুজাতি আত্মবিস্মৃত জাতি। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া পরাধীনতার রজ্জু হিন্দুকে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধিয়া তাহার বুকে বিস্মৃতির এই জগদ্দল পাথর চাপাইয়া দিয়াছে। এই বিস্মৃতির ফলেই হিন্দু আজ আত্মঘাতী।

অধুনা মৃতপ্রায় হিন্দুজাতির পুণর্জাগরণকল্পে যে আন্দোলন শুরু হইয়াছে, গ্রন্থকার সেই আন্দোলনের একজন নীরব-উপাসক। বক্তৃতামঞ্চে বা সংবাদপত্রের স্তম্ভে আত্মপ্রচারের বিন্দুমাত্র চেষ্টা না করিয়া সমস্যার প্রকৃত সমাধানেরই তিনি প্রয়াসী হইয়াছেন। নিরপেক্ষ সমালোচক ও উদ্যমী সংস্কারকের ন্যায় হিন্দুজাতির পতনের কারণগুলি তিনি তীব্র অনুভূতি দ্বারা হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন এবং পাণ্ডিত্যপূর্ণ যুক্তির সাহায্যে উক্ত কারণগুলি বিশ্লেষণ করিয়া সমস্যা সমাধানের উপায়গুলিও একে একে দেখাইয়া দিয়াছেন। বিষয়গুলিও সরলভাষায় সহজ কথোপকথনের ছাঁচে লিপিবদ্ধ হইয়া বিশেষ সহজবোধ্য হইয়াছে।

'আধ্যাত্মিকজীবনের উচ্চাদুচ্চতর অনুভূতিসম্পন্ন' এবং কুসংস্কার লেশহীন ও বৈজ্ঞানিক সত্যে মহিমান্বিত যে ধর্ম্ম, উহাই ভারতীয় ঋষিগণ প্রবর্ত্তিত প্রকৃত সনাতন ধর্ম্ম। এই ধর্ম্মে সংকীর্ণতার লেশমাত্র নাই। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ, বহুশতাব্দী হইতে ভারতে উক্ত ধর্ম্মের অস্তিত্ব অবলুপ্ত হইয়াছে। উহার স্থান অধিকার করিয়াছে তথাকথিত ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম। গ্রন্থকার এই ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মকে 'পুরোহিতরাজ' এবং 'Religious Imperialism' নামে অভিহিত করিয়াছেন। বস্তুতঃ এই প্রভুত্বকামী ও স্বেচ্ছাচারী ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের দ্বারাপথ দিয়াই হিন্দুধর্ম্মে 'মারাত্মকসংকীর্ণতা,' কুসংস্কার, অস্পৃশ্যতা, আত্মম্ভরিতা প্রভৃতি অনাচারের বিষ প্রবেশ করিয়াছিল। আর্য্যঋষিগণ প্রবর্ত্তিত সনাতন ধর্ম্ম ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের প্রভাবে কিভাবে বিকৃত হইয়াছে, তাহার উদাহরণস্বরূপ গ্রন্থকার 'বর্ণাশ্রমের' উল্লেখ করিয়াছেন। প্রাচীন আর্য্যধর্ম্মে বর্ণাশ্রমের প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল 'জীবিকা বিভাগ', কিন্তু পরে ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের প্রকোপে উহা ঘৃণ্য 'অস্পৃশ্যতায়' পরিণত হইয়াছে। গ্রন্থকারের মতে তথাকথিত

'আর্টের' বিলাসীতা ও হিন্দুজাতি তথা হিন্দুসংস্কৃতির অবনতির অন্যতম প্রধান কারণ। তিনি বলিয়াছেন :—'সত্য' ও 'শিব'কে উপেক্ষা করিয়া কেবল 'সুন্দরের' সাধনা মিথ্যার সাধনারই নামান্তর। উক্ত মিথ্যার সাধনায় অভিভূত হইয়াই হিন্দুজাতি বর্ত্তমানে "সংঘাত্মবোধ, সত্যের নিষ্ঠা, স্বদেশ ও স্বধর্ম্মরক্ষার্থে মৃত্যুবরণ" প্রভৃতি মহান্ ভারতীয় আদর্শগুলি সম্পূর্ণরূপে বিস্মৃত হইয়াছে।"

লেখকের কয়েকটী মতের সহিত আমরা একমত হইতে পারি নাই। উদাহরণস্বরূপ ভারতের প্রাচীন ধর্ম্ম ও সংস্কৃতির প্রতি তাঁহার পরোক্ষ অনাস্থা এবং প্রকারান্তরে উক্ত ধর্ম্ম সংস্কৃতির আমূল পরিবর্ত্তনের পক্ষপাতিত্বের কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। একস্থানে তিনি বলিয়াছেন বটে, "হিন্দুর অতি প্রাচীন ধর্ম্ম ও কৃষ্টির জোরে ভারত অচিরে পৃথিবীর দীক্ষাগুরুর আসন দখল করিবে," কিন্তু পরবর্ত্তী অধ্যায় সমূহে ঐ উক্তির প্রাধান্য বিশেষ দৃষ্ট হয় না। লেখক যুগধর্ম্মী নূতন সংস্কৃতিকেই বরণ করিয়া লইয়াছেন। আমরা এই বিজাতীয় নবসংস্কৃতির অনুমোদক নহি। ভারতের ঋষিগণ যে সংস্কৃতির সন্ধান দিয়াছেন তাহাই ভারতের প্রকৃত সংস্কৃতি। উহাকে উপেক্ষা করিয়া হিন্দুর পুনসংগঠন কখনই সম্ভব হইবে না, ইহাই আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস।

লেখক মহাশয় অধঃপতিত হিন্দুজাতির জাতীয় ও ধর্ম্ম-জীবনের অনেকগুলি সমস্যার কথাই উল্লেখ করিয়াছেন বটে, কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টী মোটেই আলোচনা করেন নাই। আমরা হিন্দুর, তথা সমগ্রভারতবাসীর, বর্ত্তমান অন্ন-সমস্যার ইঙ্গিত করিতেছি। প্রকৃতপক্ষে এই অন্ন-সমস্যাই ভারতবর্ষকে হবীরধর্ম্মী করিয়া রাখিয়াছে। এই সমস্যাকে কেন্দ্র না করিলে সমস্ত আন্দোলনই যে অচিরে ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হইবে, এই সহজ সত্যটী কংগ্রেসী ও হিন্দুনেতাগণ আজও কেন বুঝিয়া উঠিতে পারেন নাই, তাহা বিস্ময়ের বিষয়। আশা করি, পরবর্ত্তী সংস্করণে শাক্যসিংহ বাবু এই সমস্যার যথোচিত আলোচনায় প্রবৃত্ত হইবেন।

এবম্বিধ কয়েকটী অসম্পূর্ণতা ব্যতীত 'আত্মঘাতী হিন্দু' বিশেষ কালোপযোগী এবং একটী পড়িবার মত বই হইয়াছে। ছাপা ও বাঁধাই মোটামুটি সুন্দর।

প্রতি বাঙ্গালী হিন্দুর গৃহেই এই চমৎকার পুস্তকখানি সমাদৃত হইবে বলিয়া কামনা করি।

*

বাঙ্গালীর পণ্য—আমরা বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠমাসের কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য ও ধন-বিজ্ঞান বিষয়ক পত্রিকাখানি পাঠ করিয়া বিশেষ প্রীতিলাভ করিলাম।

বৈশাখ মাসের পত্রিকাখানি বেশ সুন্দর হইয়াছে, কিন্তু জ্যৈষ্ঠ মাসের কাগজখানিতে অনেকগুলি অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয় সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। তন্মধ্যে (১) বেকার-সমস্যা ও চাষের কাজ, (২) বাটার জুতা ব্যবহার করা উচিত কি না, (৩) শঙ্খশিল্পের ইতিহাস ও তাহার কারবার, (৪) কাগজ কিভাবে তৈয়ারী হয়, (৫) খদ্দর পরিব কেন, (৬) বাঙ্গালী ব্যবসায় হটিতেছে কেন প্রভৃতি কয়েকটি প্রবন্ধ বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য।

শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায় বাটার জুতা সম্বন্ধে সরলভাবে দেখাইয়াছেন যে, অল্পদিন মধ্যে চেকোস্লোভাকিয়া নামক একটি ক্ষুদ্ররাজ্য আমাদিগকে কিরূপে বিদেশী জুতা দিয়া "বাটার শ্রেষ্ঠ উপহার" প্রদান করিয়াছেন, আর আমরাও পিঠ পাতিয়াই তাহা গ্রহণ করিতেছি। এই প্রবন্ধে নাট্যসম্রাট গিরিশচন্দ্রের একটী কথা মনে পড়িতেছে। তিনি সিরাজ-উদ্দৌলা নাটকে করিমচাচার মুখে আরোপ করিয়াছেন, "হায়! বাঙ্গালী জুতা চিনিল না। এই জুতা বহুদিন তাহাকে বহন করিতে হইবে।"

আমরাও বলি বিদেশীর প্রস্তুত ব্যবহার্য্য বস্তুতে এত দরদ থাকিলে জুতা আমাদিগকে অনেক দিনই স্কন্ধে বহন করিতে হইবে।

বাটার ন্যায় প্রতিষ্ঠান আত্মসম্মানবিশিষ্ট বাঙ্গালীর প্রচেষ্টায় গড়িয়া তোলা কি অসম্ভব?

কুটীর-শিল্প সম্বন্ধেও জ্যৈষ্ঠ মাসের পত্রিকায় খুব ভাল ভাল কথা আছে। খদ্দরে যে ১৬ আনাই তাঁতী, চাষী কাটুনী ও ধোপার থাকে তাহাও বেশ সুন্দর ভাবে বিবৃত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত কালীকুমার ঘোষ কিউরেটার মহাশয় খুব উপযোগী অনেকগুলি কথা লিখিয়াছেন। আমরা এই পত্রিকাখানির বহুল প্রচার কামনা করি।

"ভদ্র-ভিখারী"

শ্রীযুক্ত সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় যে সুন্দর গল্প ও উপন্যাস রচনা করেন, তাহার অনেক পরিচয় আমরা পাইয়াছি। কিন্তু ইদানীং তিনি নব্য-আর্টের স্কুলে দীক্ষিত হইয়াছেন, না, তাঁহার পাথসানের পুঁজি ফুরাইয়া গিয়াছে তাহা ঠিক বুঝিতেছি না। সম্প্রতি আমরা একটী গল্পের উল্লেখ করিব, পাঠক তাহাতেই তাঁহার এই রুচি-রূপান্তরের পরিচয় পাইবেন।

"ভদ্র ভিখারী" নামে জৈষ্ঠের 'ভারতবর্ষে' চণ্ডীদাস সম্বন্ধে নব্যগবেষকদিগের প্রতি কটাক্ষ আছে। সম্প্রতি তাঁহার বিদ্যুৎবরণ (গল্পের নায়িকার স্বামী) বলিতেছে—

"বুঝছো না ভারী interesting…ঐ চণ্ডীদাস, এমন নজীর পেয়েছি, যার জোরে প্রমাণ করে দেবো তিনি শুধু বৈষ্ণব পদাবলী লেখেন নি…একশোখানি শ্যামা-সঙ্গীত লিখে গেছেন। Internal evidence যা পাচ্ছি।"

চণ্ডীদাস শ্যাম-সঙ্গীত রচনা করিয়াছেন বলিয়া কেহ লিখিয়াছে কিনা আমরা তাহার আলোচনা সম্প্রতি ছাড়িয়া গল্পটী সম্বন্ধেই কিছু বলিব।

গল্পের নায়িকা অতসী। সুন্দরী, শিক্ষিতা ও এক বুদ্ধিশালী যুবকের স্ত্রী—এই যুবক বুদ্ধিতে যেমন অর্থোপার্জ্জন করেন, বিদ্যারও তেমনি তিনি চণ্ডীদাসের গবেষণা করেন। চণ্ডীদাসের রাধার প্রসঙ্গ আলোচনা করেন, এবং চণ্ডীদাসের কবিতা আওড়াইয়া বলেন,—

সখি মরম কহিনু তারে
আড় নয়নে ঈষৎ হাসিয়া
বিকল করিল মোরে।

কিন্তু অতসী স্বামীর এই সবকথাই শুনেন, কিন্তু তাহার ভালবাসা না পাইয়া সর্ব্বদাই যেন ব্যথিতা। স্বামী, কথা বলেন বটে কিন্তু প্রেমালাপ করিবার তাহার সময় নাই। তিনি অবসর সময়ে চণ্ডীদাস লইয়াই মসগুল।

অতসীর কোন গতিবিধিতে কি কার্য্যকলাপে স্বামী বিদ্যুৎবরণ কখনও কোন বাধা দেন না। একদিন অতসী সিনেমা-গৃহের দরজার নিকট হইতে একটী ভদ্র-ভিখারী কুড়াইয়া আনেন। দয়াপরবশ হইয়া তাহাকে মালীর কাজ দেন। তাহার জন্য অতসীর কত দরদ! অল্প দিন মধ্যেই এই দরদ ঘনিষ্ঠতায় পরিণতি হইল। ভিখারীর নাম কান্তি।

একদিন অতসী বেশী রাত্রিতে ছাদ হইতে নীচে আসিয়া দেখেন স্বামী গভীর নিদ্রামগ্ন। ভাবিল,—

"বিছানায় অতসী নাই নিশ্চয় দেখিয়াছে, একবার খবর লইল না? হায়রে, কি সুখে অতসী বাঁচিয়া আছে? কিসের আশায়? কিসের লোভে?"

অতসী ছুটিয়া ভদ্র-ভিখারীর কাছে গেল, সেই গভীর রাত্রে কত সুখের দুঃখের কথা বলিল, ভালবাসার কথা বলিল।…প্রভু ভৃত্যের সম্পর্ক ভুলিয়া স্ত্রী-পুরুষের ব্যবধান ভুলিয়া একান্ত বিশ্বস্ত সাথীর মতো কান্তির কাছে অতসী খুলিয়া বলিল—তার এতদিনকার পুঞ্জিত বঞ্চনা ব্যর্থতার কাহিনী।

মাথার উপর চাঁদের আলো নিমেষের জন্য যেন মলিন-ম্লান…একখানা মেঘ আসিয়া চাঁদকে ঢাকিয়া দিল!

অতসীর মনে হইতেছিল, কান্তি যেন শাপভ্রষ্ট কোন রাজপুত্র…যেন কোন মুনির শাপে এখানে ভৃত্যগিরি করিতেছে।

সত্যই তাই?

কান্তির মুখের পানে সে চাহিয়া রহিল…অবিচল দৃষ্টি!

সহসা মাথা কেমন ঝিম্-ঝিম্ করিয়া উঠিল। চাঁদকে সে মেঘখানা যেন বন্দী করিয়াছে। চারিদিকে যেন অন্ধকারের ছায়া নামিতেছে…এ ছায়া ঘন…আরো ঘন…মেঘ যেন তার বিরাট দেহ প্রসারিত করিয়া জ্যোৎস্নার শেষ রশ্মিটুকুকে চাপিয়া মারিয়া ফেলিল…আকাশ-পৃথিবী অন্ধকারে ভরিয়া গেল।

তারপর, আবার যখন আলো ফুটিল, চোখ মেলিয়া অতসী দেখে সে শুইয়া আছে…কান্তির কোলে মাথা! কান্তি তার মাথায় মুখে হাত বুলাইয়া দিতেছে!

একটু পরে কান্তি আসিয়া অতসীর মাথার কাঁটাটী দিয়া গেল। সেটী অতসী রাত্রে ফেলিয়া গিয়াছিল।

গল্পের নমুনা দেখিয়া পাঠক বুঝিবেন, কি ধিক্কারজনক আর্টের পরিণতি! রাত্রির ঘটনায় অতসীর দেহ-মন অশুচি-বিষে যেমন রী-রী করিয়া উঠিয়াছিল, গল্প পড়িয়াও সেইরূপ পাঠকের মন রী-রী করিয়া উঠিবে। নারীজাতির উপর এরূপ অসম্মান প্রদর্শন নিতান্তই অসঙ্গত।

সৌরীন্দ্রমোহন এইরূপ কদর্য্য গল্পে তাঁহার শক্তিক্ষয় না করিয়া সমাজের ও দেশের বর্ত্তমান চিত্রগুলি উপস্থিত করিলে আমরা প্রকৃতই সুখী হইব।

গল্প-প্রতিযোগিতা

"लक्ष्मीस्त्वं धान्यरूपासि प्राणिनां प्राणदायिनी"

ধান্যশ্রী

ভাদ্র—১৩৪৮

৯ম বর্ষ— ১ম খণ্ড, ৩য় সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ ও আলোচনা

প্রফুল্লজয়ন্তী

ভক্তগণ অনুষ্ঠিত স্বীয় একাশীতম জন্মোৎসব উপলক্ষে স্যার পি. সি. রায় নিম্নোক্ত বিবৃতি প্রকাশ করেন—"এ-জীবনে আমি যথাসাধ্য মাতৃভূমির সেবা করিয়াছি। এখনও জন্মভূমির কপালে অবিচার, অত্যাচার, দারিদ্র্য ও অশিক্ষার অভিশাপ লাগিয়াই রহিয়াছে। যে সন্তানগণ দেশমাতৃকার এই অভিশাপ চিরতরে মুছিয়া ফেলিবার জন্য বংশপরম্পরায় সংগ্রাম করিবে, সেই কর্ম্মীদের মধ্যে আমি বরাবর বাঁচিয়া থাকিতে চাই।"

স্যার পি. সি. রায়ের উক্ত বিবৃতি পাঠে এই মর্ম্ম অনুধাবন করা যায় যে, ভারতবর্ষ অবিচার, অত্যাচার, দারিদ্র্য ও অশিক্ষা এই চতুর্ব্বিধ অভিশাপে নিষ্পেষিত, এবং স্যার পি, সি, রায় ভারতের এই অভিশাপ দূরীকরণের জন্য অনেক কিছু করিয়াছেন। আমরা নিঃসন্দেহে স্বীকার করি যে, ভারতবর্ষ —শুধু ভারতবর্ষ কেন, সমস্ত পৃথিবীই এই চতুর্ব্বিধ অভিশাপের পদানত। কিন্তু প্রশ্ন করি,—কে বা কাহারা ইহার জন্য দায়ী? স্যার পি, সি, রায় অবশ্য স্পষ্টাস্পষ্টি ভাবে কাহারও নাম উল্লেখ করেন নাই; কিন্তু তাঁহার বিবৃতিতে প্রচ্ছন্ন ভাবে যে আভাষ ও ইঙ্গিত সূচিত হইয়াছে, তাহাতে মনে হয় যেন, তিনি ইংলণ্ডকেই ভারতের ভালে এই কালিমা লেপনের জন্য দায়ী করিয়াছেন। আমাদের অনুমান সত্য হইলে, আমরা স্যার পি, সি, রায়ের সহিত একমত হইতে পারিব না। কারণ আমাদের দৃঢ় ধারণা যে, ভারতের এই অভিশাপের জন্য অন্য কিছুর চেয়ে আধুনিক যুগের বিজ্ঞান ও সভ্যতা এবং তাঁহার ন্যায় উহার পূজারীদলই অধিক দায়ী। আর তিনি যে বলিয়াছেন, যৌবনে তিনি জন্মভূমির সেবা করিয়াছেন,—তাই ভবিষ্যতের বংশধরদের মধ্যে আবার তিনি ফিরিয়া আসিতে চান, ইহাও অর্থবিহীন বলিয়াই মনে হয়। অবশ্য যদি দেখিতে পাইতাম,—তাঁহার যৌবন-কাল হইতে এপর্য্যন্ত ভারতের অবস্থা অনেকটা উন্নত হইয়াছে, তবে আমরা স্বীকার করিতে বাধ্য হইতাম যে, তিনি ও তৎশ্রেণীর বিজ্ঞানীগণ দেশের জন্য যথার্থে অনেক কিছু করিয়াছেন এবং তাঁহাদের কার্য্যে সমর্থন না করা আমাদের পক্ষে অন্যায়। কিন্তু উন্নতির পরিবর্ত্তে যখন দেখি দেশের সর্ব্বক্ষেত্রে কেবল অবনতিই স্তূপীকৃত হইতেছে, তখন উন্নতি সাধনের কৃতিত্ব দাবীকে অন্যায় ও নিরর্থক ধারণা করা কি দোষনীয়? এই কারণেই আচার্য্য দেবকে তাঁর ঈদৃশ বিবৃতির জন্য প্রশংসা করিতে পারি না।...স্যার পি, সি, রায় একজন সর্ব্বজনমান্য নেতা ও অধ্যাপক, তাঁহারই সম্বন্ধে এবম্বিধ উক্তি প্রকাশের জন্য সত্যই আমরা দুঃখিত। কিন্তু আমরা নাচার,—অকুণ্ঠ সত্যপ্রকাশই আমাদের একমাত্র ব্রত।

প্রার্থনা করি,—আচার্য্য দেব আরও দীর্ঘজীবন লাভ করিয়া এবং সত্য ও অন্তর্দর্শনের অনুভূতি স্বরূপ উপযুক্ত সাহস সঞ্চয় করিয়া জগতের সমক্ষে ঘোষণা করিবেন যে, বর্ত্তমান কালের সভ্যতা এবং বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানীগণ ইষ্টের তুলনায় মানব-জাতির অনিষ্টই বেশী পরিমাণে সৃষ্টি করিয়াছে।



আধুনিক জমি সম্বন্ধে বঙ্গীয় অর্থনৈতিক তদন্ত কমিটির সিদ্ধান্ত

সম্প্রতি বঙ্গীয় অর্থনৈতিক তদন্ত কমিটি বাঙ্গালা প্রদেশের সমুদয় অ-কর্ষিত, পতিত ও জলাভূমিগুলিকে কর্ষণযোগ্য ও উৎপাদনক্ষম করিয়া উহাদের একটি আর্থিক সুরাহা করিয়া ফেলিবার সদিচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন।

সদিচ্ছাটি খুবই প্রশংসনীয়; তবে এবম্বিধ সদিচ্ছাকে কার্য্যে পরিণত করিতে হইলে, কমিটিকে চারিদিক বিচার করিয়া যথোপযুক্ত সতর্কতা অবলম্বন করিতে হইবে। জমি মাত্রকেই কর্ষণযোগ্য করিয়া তুলিলে যে সব সময়েই বাঞ্ছনীয় ফল লাভ হইবে, তাহার কোন নিশ্চয়তা নাই। বঙ্গীয় কৃষককুলের আর্থিক, বিশেষতঃ, শারিরীক সামর্থ্যের পরিমিত গড়পড়তা হিসাব করিলে দেখা যাইবে যে, তাহাদের পরিশ্রম-ক্ষমতা সীমাবদ্ধ। প্রত্যেক কৃষক বৎসরে দশ বিঘার অধিক জমি চাষ করিতে পারে না, এবং এই দশ বিঘার বিঘাপ্রতি অন্ততঃ বার মণ শস্য উৎপাদিত না হইলে কৃষকের পক্ষে পরিবার ভরণপোষণ করা দুঃসাধ্য হইয়া পড়ে। বঙ্গীয় অর্থনৈতিক তদন্ত কমিটী যে সকল অনুর্ব্বর, পতিত ও জলাজমিগুলিকে উৎপাদনক্ষম করিবার চেষ্টা করিবেন, সেই সব জমিতে পূর্ব্বোক্ত পরিমাণেই পরিশ্রম ব্যয়িত হইবে; কিন্তু পরিবর্ত্তে সেই পরিমাণে শস্যোৎপাদন কখনই সম্ভব হইবে না। কাজেই, উক্ত জমিগুলিকে উৎপাদনক্ষম করিতে গিয়া প্রয়োজনীয় শস্য পাওয়া না গেলে, অবস্থার কোনরূপ উন্নতিসাধন তো কখনই সম্ভব হইবে না, অধিকন্তু দরিদ্র কৃষকদের অবস্থা আরও শোচনীয় হইয়া উঠিবে। স্মরণাতীতকাল হইতে ঐ সব জমির উৎপাদিকা শক্তি নষ্ট হইয়াছে, একদানা শস্যও উহাদের বুকে এপর্য্যন্ত উৎপন্ন হয় নাই। এই কারণেই আজও উহারা ব্যবহারবর্জ্জিত।

আশা করি, কাজে নামিবার পূর্ব্বে তদন্ত কমিটি এইসব বিষয় পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে চিন্তা করিয়া দেখিবেন।

রবীন্দ্রনাথের তিরোভাব

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ দেহরক্ষা করিয়াছেন। তাঁহার মৃত্যুতে আমরা গভীর শোক প্রকাশ করিতেছি।

রবীন্দ্রনাথ, নিঃসন্দেহে, একজন মহাকবি ও অনন্যসাধারণ ব্যক্তি ছিলেন। সমসাময়িকদের মধ্যে আর কেহ বোধ হয় তাঁহার ন্যায় এরূপ বিপুল খ্যাতি ও প্রতিপত্তি লাভ করিতে পারেন নাই। তাঁহার বিরাট সর্ব্বমুখী প্রতিভা সর্ব্বজন স্বীকার্য্য। কিন্তু তাঁহার কবিতা ও দৃষ্টিভঙ্গিকে যাঁহারা মানবহিতৈষীরূপে বরণ করিতে চাহেন, তাঁহাদের আমরা সমর্থন করিতে পারিব না। রবীন্দ্রনাথ আজ লোকান্তরে, পৃথিবীর বহু লোকের তিনি পূজ্য;—তাঁহার বিরুদ্ধে আজ আমরা কিছু না বলিতে পারিলেই সুখী হইতাম। কিন্তু প্রতিবাদের ভয়ে সত্যের অপলাপ আমাদের কর্ত্তব্য-বিরুদ্ধ। ফলেই বৃক্ষেই পরিচয়; সুতরাং কবি রবীন্দ্রনাথের 'পরে ভারতে পথপ্রদর্শকরূপে যে মাহাত্ম্য আরোপিত হইয়াছে, তাহা সত্য হইলে, আমরা নিশ্চয় দেখিতে পাইতাম যে, আমাদের জাতীয় জীবনে মানসিক গ্লানি, স্বাস্থ্যহীনতা দারিদ্র প্রভৃতির চাপ কিছুমাত্র লাঘব হইয়াছে। কিন্তু প্রত্যুতপক্ষে ফল হইয়াছে বিপরীত।—বস্তুতঃ, ভারতের ভাগ্য-গগনে প্রকৃত মাহাত্ম্য ও ব্যক্তিত্বসম্পন্ন পুরুষ বহুযুগ হইতেই দুর্লভ এবং রবীন্দ্রনাথের উদাহরণ তার শ্রেষ্ঠতম প্রমাণ।

আমরা আশা করি, জনসাধারণ কোন কিছু হুটকারী মতামত গ্রহণ না করিয়া সমগ্র বিষয়ের ফলাফল উত্তমরূপে চিন্তা করিয়া দেখিবেন; নতুবা তাহাদের প্রাত্যহিক জীবনে দুঃখের বোঝা আরও দুঃসহ হইয়া উঠিবে।

ম্যাঞ্চেষ্টার গার্ডিয়ান ও ভারতের ভবিষ্যৎ গভর্ণমেণ্ট

ভারতের উপর বহিঃশত্রুর আক্রমনের সম্ভাবনা ক্রমশঃ

সন্নিকটতর হইয়া উঠিতেছে। আন্তর্জ্জাতিক দানব জার্ম্মানীই এই সম্ভাবিত আক্রমণের কর্ত্তা হইবে বলিয়া এতদিন আমাদের ধারনা ছিল; কিন্তু কয়েকদিন যাবৎ জাপান ইন্দোচীন লইয়া যেরূপ মাতামাতি সুরু করিয়াছে, তাহাতে সেই দিক হইতেও বিপদের আশঙ্কা খুব কম বলিয়া মনে হইতেছে না। বিলাতের ম্যাঞ্চেষ্টার গার্ডিয়ান'ও এইরূপ আশঙ্কা করিয়াছেন যে, উত্তর পশ্চিম এবং দক্ষিণ-পূর্ব্ব এই দুই সীমান্ত হইতেই ভারতবর্ষ বহিঃশত্রু কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইতে পারে। উক্ত আশঙ্কা করিয়া গার্ডিয়ান, ভারতে ঐ আক্রমণ প্রতিহত হইয়া যাহাতে উপযুক্ত নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে, তজ্জন্য নূতন এক ভারতীয় জাতীয় গভর্ণমেন্টের পরিকল্পনা করিয়াছেন—কেবলমাত্র ভারতীয়গণের সহযোগীতায়ই এই পরিকল্পিত গভর্ণমেন্ট গঠিত হইবে।

ম্যাঞ্চেষ্টার গার্ডিয়ানের এই পরিকল্পনা প্রশংসনীয় সন্দেহ নাই। কিন্তু আমাদের জিজ্ঞাসা এই যে, এই প্রকার জাতীয় গভর্ণমেণ্ট প্রবর্ত্তন করিয়া বৃটীশগণ অথবা ভারতীয়গণ কি সত্যকার কোন সাফল্য লাভে সমর্থ হইবেন? আমরা কিন্তু তাহা মনে করি না। আমরা জানি, ভারতের যাহারা নেতৃ-স্থানীয় তাঁহাদের অধিকাংশই জন্মগত ভারতীয় হইলেও চিন্তা ও সংস্কৃতির দিক দিয়া ইংরেজীভাবাপন্ন, এবং না ইংরেজ, না ভারতীয় এই দুইয়ের এক উদ্ভট সমন্বয়। কাজেই, ইহাদের হাতে ভারতের ভাগ্য-তরীর হাল ছাড়িয়া দিলে অবস্থা যে অধিকতর জটিল ও সঙ্কটপূর্ণ হইয়া উঠিবে, তাতে আর সন্দেহ কি!

অতএব, উক্ত উপায়ে কোন কালেই ভারতীয় শাসন-ব্যবস্থার কোন উন্নতি সাধিত হইবে না। আমাদের মতে,—ভারতের শাসন কার্য্য যদি এমন কয়েকজন উদার বৃটীশ শাসক কর্ত্তৃক পরিচালিত হয়, যাঁহারা নিরন্ন ও রোগজর্জ্জরিত অবস্থা হইতে ভারতীয় জনসাধারণকে উদ্ধার করিতে সমর্থ হইবেন—তবেই সমস্যার যথার্থ সমাধান লাভ ঘটিতে পারে। আর,গভর্ণ-মেণ্টকে যদি ভারতীয় করিয়াই তুলিতে হয়, তবে শাসনকার্য্য এমন ভারতীয়দের হস্তে ন্যস্ত করিতে হইবে, যাঁরা মনে ও প্রাণে সর্ব্বপ্রকারে সত্যকার ভারতীয়। তাঁহাদের চোখে মানুষ চিরকাল মানুষ হিসাবেই পরিগণিত হইবে—'বৃটীশ' বা 'ভারতীয়' এই পার্থক্যযুক্ত হইয়া নহে। তাঁহাদের ধর্ম্ম হইবে একমাত্র মানবধর্ম্ম।

প্রতিশোধ ও প্রবঞ্চনার নীতিতে বর্ত্তমান অবস্থার প্রতিকার কখনও সাধিত হয় না—ভারতের গান্ধীরা এবং সাভারকরেরা অথবা জিন্নারা এবং সিকান্দার হায়াতখানেরা এই সহজ সত্যটী যদি এতদিনেও উপলব্ধি করিতে পারিতেন, তবে নিরীহ ভারতবাসীকে আজ আর এমন হীন দুরবস্থার কবলিত হইতে হইত না!

সাম্প্রদায়িক ঐক্যসম্বন্ধে মিঞা ইফ্‌তিখারুদ্দিনের বিবৃতি

সাম্প্রদায়িক ঐক্য ও সুসঙ্গতি স্থাপনের মহৎ উদ্দেশ্য লইয়া সম্প্রতি পাঞ্জাব প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটীর সভাপতি মিঞা ইফ্‌তিখারুদ্দিন এম্. এল্, এ সাহেব, ডাঃ গোপিচাঁদ ভার্গব ও সর্দ্দার মঙ্গল সিংএর সহিত একযোগে এক মিলিত আবেদন প্রকাশ করিয়াছেন। আবেদনের সহিত তিনি এক ভবিষ্যৎ বাণী করিয়াছেন যে, অনাগত যুগে এমন দিন আসিবে; যখন সাম্রাজ্যবাদ-নিপীড়িত সমগ্র শান্তিপ্রিয় মানবগোষ্ঠি সঙ্কীর্ণ সাম্প্রদায়িকতার বিষ-জাল হইতে বিমুক্ত হইয়া জগতে এক অভিনব নব-বিধান সৃষ্টি করিবে।

সাম্প্রদায়িকতা ভারতের এক পুরাতন জটিল ব্যাধি; কাজেই, এই ব্যাধি দূরীকরণের সর্ব্বপ্রকার প্রচেষ্টাই খুব প্রশংসনীয়;—কিন্তু সত্যের খাতিরে ইহাও আমরা বলিতে বাধ্য যে, আন্তরিকতা ও উপযুক্ত কর্ম্মপন্থার অভাবে নেতৃ-বৃন্দের এই প্রয়াস প্রায়ই কেবল ব্যর্থ বাগাড়ম্বরেই পর্য্যবসিত হয়। কিছুদিন পূর্ব্বে এই সাম্প্রদায়িকতার প্রতীকার কল্পে মিঃ বি, সি, চাটার্জ্জি এবং মৌলবী ফজলুল হক সাহেবও এক যুগ্ম আবেদন প্রকাশ করেন। গত শ্রাবন-সংখ্যায় সেই যুগ্ম আবেদনের আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা বলিয়াছিলাম যে, এই শ্রেণীর সমাজিক মীমাংসা সাধনে সংস্কারকগণকে সর্ব্বাগ্রে সমস্যার মূল কারণগুলি অনুসন্ধান করিতে হইবে। আর নিরপেক্ষ অনুসন্ধান ও অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন হইলে দেখা যাইবে যে, এই সমস্যাগুলির মূলে প্রধানতঃ রহিয়াছে দেশের অর্থনৈতিক দুরবস্থা ও দোষযুক্ত শিক্ষাদান প্রণালী। সুতরাং প্রকৃত সমাধানে হাত দিতে হইলে নেতৃবৃন্দকে এই পথেই

অগ্রসর হইতে হইবে, এবং এমন এক সংগঠনমূলক আন্দোলন করিতে হইবে, যাহাতে উক্ত আর্থিক দুরবস্থার যথাসম্ভব অবসান হয় এবং যাহাতে সংস্কৃত নব-শিক্ষায় অনুপ্রাণীত হইয়া সকল দেশবাসী অন্তঃস্থিত দ্বন্দ্ব, কলহ ও উত্তেজনাপূর্ণ কু-চিত্তবৃত্তিগুলি দমন করিতে শিক্ষা করে। নেতৃবৃন্দ যদি এইরূপ উপযুক্ত কর্ম্মপন্থা অবলম্বন করিতে সক্ষম হন, তবেই প্রার্থিত ফললাভ ঘটিতে পারে; নতুবা তাঁহাদের মুখনিঃসৃত শ্রুতিমধুর অথচ অন্তঃসারশূণ্য বক্তৃতাবলীর দ্বারা দেশবাসীর দুঃখকষ্টের যে কখনই কোন মীমাংসা হইবে না, একথা আমরা দৃঢ়তার সহিত বলিতে পারি। তাই আমরা দেশবাসীকে অনুরোধ করি, তাঁহারা যেন এই অন্তঃসারশূণ্য অবাস্তব কল্পনাবিলাসী বক্তৃতা ও বিবৃতি সম্বন্ধে যথেষ্ট অবহিত হইতে পারেন।

মিঃ ইফ্‌তিখারুদ্দিন যে ভবিষ্যৎবাণী করিয়াছেন যে, সাম্রাজ্যবাদ-পদানত সমগ্র মানবগোষ্টি অনতি ভবিষ্যতে জগতে এক নববিধান প্রতিষ্ঠা করিবে এবিষয়ে তাহার সহিত আমরা একমত। তদুপরি আমরা আরও বলি যে, সাম্রাজ্যবাদের সকল নির্দ্দেশ ও অনুজ্ঞা সম্বন্ধে উক্ত মানবসম্প্রদায়ের সম্যক্ অবহিত হওয়া কর্ত্তব্য। কিন্তু এখানে আমাদের জিজ্ঞাস্য,—সাম্রাজ্যবাদী বলিতে মিঃ সাহেব কাহাদের ইঙ্গিত করিয়াছেন? যে কোন দেশের সরকারী, যে কোন পদস্থ কর্ম্মচারী বা লেজিস্‌লেটারই কি এই তথাকথিত সাম্রাজ্যবাদীদের অন্তর্ভূক্ত নহেন? সেই সংজ্ঞানুসারে মিঃ সাহেবও একজন সাম্রাজ্যবাদী—অথচ আশ্চর্য্যের বিষয় এই, তথাকথিত সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধেই তিনি অভিযোগ করিতেছেন! ইহাকেই বলে প্রকৃতির পরিহাস!

পরিষদে ফ্লাউড্-কমিশন রিপোর্ট

পাঠকগণের নিশ্চয় স্মরণ আছে যে, গত বৎসর গভর্ণমেণ্ট বাঙ্গালা দেশের কৃষি ও কৃষকের উন্নতি সাধন মানসে মিঃ ফ্রান্সিস্ ফ্লাউডের নেতৃত্বাধীনে ভূমিরাজস্ব কমিশন নামে এক কমিশন নিয়োগ করিয়াছিলেন। ১৯৪০ সালের মার্চ্চ মাসেই উক্ত কমিশন সরকারের নিকট তাহাদের রিপোর্ট দাখিল করেন। রাজস্বসচীব স্যার বি, পি, সিংহ রায়ের মতানুসারে রিপোর্টের প্রধান সুপারিশগুলি নিম্নলিখিত চারিভাগে বিভক্ত করা যায়; যথা—

(১) খাজনা প্রদানকারী কৃষকের উপরস্থ সকল স্বত্ব ও জমিদারী গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক সংগ্রহ করা

(২) কৃষি-আয়কর প্রবর্ত্তন

(৩) প্রজাস্বত্ব আইন সংশোধন

(৪) কৃষকের আর্থিক অবস্থার উন্নতিকল্পে উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন

ইতিপুর্ব্বে এই রিপোর্ট লইয়া সাধারণের মধ্যে বহু বাদ-প্রতিবাদ হইয়া গিয়াছে, কিন্তু পরিষদে এতাবৎ কাল পর্য্যন্ত এ সম্বন্ধে কোন আলোচনা হয় নাই—গত ২৭শে জুলাই রাজস্বমন্ত্রীর প্রস্তাবে পরিষদে উক্ত ভূমিরাজস্ব কমিশনের সুপারিশগুলি আলোচনার্থ উপস্থিত হয়। এই প্রসঙ্গে রাজস্বসচীব বলেন যে, সুপারিশ সমূহের আর্থিক, সামাজিক ও শাসন সম্বন্ধীয় প্রভৃতি প্রশ্ন সম্পর্কে পরিষদ-সদস্যদের মতামত প্রকাশের সুযোগ দেওয়াই এই আলোচনার উদ্দেশ্য। গভর্ণমেণ্ট এই ব্যাপারে কোন পাকাপাকি সিদ্ধান্ত গ্রহণের পুর্ব্বে জনসাধারণের প্রতিনিধি স্থানীয় সদস্যদের মতামত চাহেন।

সদস্যদিগকে এই মতামত প্রকাশের সুযোগ দিয়া গভর্ণমেণ্ট প্রকৃত গণতান্ত্রিক মনোভাবেরই পরিচয় দিয়াছেন। বস্তুতঃ, অন্য কোন গণতান্ত্রিক গভর্ণমেণ্ট ইহা অপেক্ষা প্রশস্ততর ব্যবস্থা অবলম্বনে সক্ষম হইতেন কিনা সন্দেহ। এজন্য কর্ত্তৃপক্ষ সত্যই অত্যন্ত ধন্যবাদার্হ। কিন্তু এক্ষণে প্রশ্ন হইল যে, এই গণতান্ত্রিক সরকারের সহিত যাঁহারা বর্ত্তমানে সংশ্লিষ্ট তাঁহাদের অন্ততঃ একজনও বঙ্গীয় কৃষককুলের উন্নতিকল্পে প্রকৃত কর্ম্মপন্থা নিরূপণ করিতে পারিবেন কি? সত্যকথা বলিতে কি,—আমরা তো তেমন যোগ্যব্যক্তি খুঁজিয়া পাইতেছি না। আমরা পুর্ব্বেও যেমন একাধিক প্রসঙ্গে বলিয়াছি, এবং এখনও বলি যে, কোন সমস্যার মীমাংসা করিতে হইলে, সমস্যার মূল অনুসন্ধান করিতে হইবে সকলের আগে; নিমজ্জমান তরীর তল ভাগে যেখানে ছিদ্র, সেইখানেই সর্ব্বপ্রথম হাত লাগাইতে হইবে। সুতরাং বঙ্গীয় কৃষককুলের উন্নতি সাধন করিতে হইলেও অন্য পথ গ্রহণ করিলে চলিবে না। বাঙ্গালার চাষ ও চাষীর সহিত যাহারা কিঞ্চিৎমাত্র পরিচিত তাহারা সকলেই অবগত আছেন যে, জমির ক্রমক্ষয়িষ্ণু উৎপাদিকা শক্তিই বর্ত্তমান কৃষিশিল্পের অবনতির

প্রধানতম কারণ। বিশেষজ্ঞ জানেন যে, এই ক্ষয়িষ্ণু উৎপাদিকা শক্তির উন্নতি নির্ভর করে দেশীয় নদ-নদী, খাল ও তড়াগগুলির গভীরতা বৃদ্ধি করিয়া প্রভৃত সংস্কার সাধনের উপর। কি করিয়া এই সংস্কার সাধন সম্ভব, তাহার আলোচনা অত্যন্ত বিস্তৃত। বর্ত্তমানে আমাদের এই ক্ষুদ্র আলোচনায় তার সঙ্কুলান হওয়া সম্ভব নহে।

বঙ্গীয় কৃষককুলের বর্ত্তমান অর্থনৈতিক দুরবস্থার দ্বিতীয় কারণ অনুসন্ধান করিলে দেখা যাইবে যে, উহার মূলে রহিয়াছে উৎপাদন দ্রব্যের মূল্যের অসম্ভব হ্রাস বৃদ্ধির হার। অথচ জমির এই উৎপাদনই কৃষকের পারিবারিক ভরণপোষণের একমাত্র ভরসা। অতএব কৃষকের আর্থিক উন্নতির জন্য শস্যমূল্যের এই অসম্ভব বাড়তি ও কমতি রহিত করা অবশ্য প্রয়োজনীয়। কিন্তু এই প্রসঙ্গে আলোচনাও অত্যন্ত বিস্তৃত।

তবে, পরিষদের প্রতিনিধিস্থানীয় সদস্যগণ যদি বঙ্গীয় কৃষিশিল্পের অবনতির উপরোক্ত কারণগুলি আন্তরিক ভাবে অনুসন্ধান করিয়া উহাদের প্রতীকার সাধনের জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হন, তাহা হইলে আমরাও তাঁহাদের সহিত উহার বিস্তৃত আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতে পারি। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস যে, আমাদের প্রস্তাবিত উক্ত ব্যবস্থায় কর্ণপাত না করিয়া কেবল জমিদারী প্রথা উচ্ছেদ এবং জমির সর্ববিধ খাজনাভোগী স্বত্ব গ্রহণ অথবা কৃষি-আয়কর প্রবর্ত্তন ও প্রজাস্বত্ব আইন সংশোধন করিলে, গভর্ণমেন্টের সকল প্রচেষ্টাই ব্যর্থ হইবে। উপরন্তু কর্তৃপক্ষ ইহার ফলে বঙ্গীয় কৃষকদের অবস্থা আরও শোচনীয় করিয়া তুলিবেন।

অতএব, কোনরূপ পাকাপাকি ব্যবস্থা গ্রহণের পূর্ব্বে গভর্ণমেন্ট, মন্ত্রীমণ্ডলী এবং জনসাধারণের প্রতিনিধি-সদস্যবৃন্দ এ বিষয়ে যথেষ্ট সচেতন হইবার চেষ্টা করিবেন, ইহাই আমাদের একান্ত অনুরোধ।

বড়লাটের সম্প্রসারিত শাসন-পরিষদ

যুদ্ধের ফলে কাজের চাপ বৃদ্ধি পাওয়ায় শাসন কার্য্য সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য বড়লাটের শাসন-পরিষদকে সম্প্রসারিত করার কথা অনেক দিন হইতে শোনা যাইতেছিল। গত ২১শে জুলাই সিমলা হইতে প্রকাশিত এক ইস্তাহারে শাসন-পরিষদ সম্প্রসারণ এবং জাতীয় দেশরক্ষা-পরিষদ গঠনের সংবাদ সরকারী ভাবে ঘোষণা করা হইয়াছে। এই নূতন পরিষদে সর্ব্বসাকুল্যে তিনজন সরকারী ও আটজন বে সরকারী সদস্য অনুমোদিত হইয়াছেন। পুরাতন পরিষদে তিনজন সরকারী এবং প্রধান সেনাপতি ব্যতীত তিনজন বে-সরকারী সদস্য পদস্থ ছিলেন।

বিবৃত বা ব্যাখ্যার সাহায্যে শাসন পরিষদের এই সম্প্রসারণে সরকারের যে উদ্দেশ্যই সূচিত হোক্ না কেন, প্রকৃত কর্ম্মক্ষেত্রে ইহার দ্বারা বৃটেন বা ভারতবর্ষ সত্যই কোন উপকার লাভ করিবে কিনা, সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ আছে। ইহা সর্ব্বজনবিদিত, বৃটেন যুদ্ধ চালাইতে



লর্ড লিনলিথগো

এখন ভারতবর্ষ হইতে সমরোপকরণ ও সৈন্য সংগ্রহ করিতে চায়; কিন্তু এই সংগ্রহের জন্যই যে শাসন-পরিষদ সম্প্রসারিত হইয়াছে, তাহা বলা চলে না। কেন না, বৃটেনের আকাঙ্খিত সৈন্য ও যুদ্ধোপকরণ সংগ্রহে এখনও পর্য্যন্ত কোনরূপ অপূরণ লক্ষিত হয় নাই। আর, ভারতের হিতসাধনই যে সম্প্রসারিত পরিষদের উদ্দেশ্য, তা'ও আমরা বিশ্বাস করিতে পারিনা. ভারতের হিতসাধন দূরে থাক্, বড়লাট কর্ত্তৃক শাসন পরিষদ গঠনের এই নূতন ব্যবস্থায় চাকুরী প্রয়াসী উচ্চ শ্রেণীর ভারতীয়দের মধ্যে অহেতুক হিংসা ও বিদ্বেষ-দুষ্ট মনোভাবেরই উদয় হইবে।

তবে কি আমাদের বুঝিতে হইবে যে, বৃটেনের রাজনীতি আজ সম্পূর্ণ নিঃস্ব হইয়া পড়িয়াছে?

সগোত্র ও অসবর্ণ বিবাহ এবং ডাঃ দেশমুখের প্রস্তাব

বিশেষ লক্ষ্য করা গিয়াছে যে, গত কয়েক বৎসর হইতে কেন্দ্রীয় পরিষদের সদস্য ডাঃ দেশমুখ পরিষদে যে সমস্ত প্রস্তাব বা আন্দোলন উপস্থিত করিয়াছেন, উহাদের অধিকাংশই হিন্দুর বিবাহ-বিধিতে কেন্দ্রীভূত। পাঠকগণের নিশ্চয়ই স্মরণ আছে, কয়েকদিন পূর্ব্বে তৎপ্রণীত 'হিন্দুনারীর বিবাহ-বিচ্ছেদ বিল' সারা ভারতে বিশেষ উত্তেজনার সৃষ্টি করিয়াছিল। অধুনা, কিছুদিন যাবৎ সগোত্র ও অসবর্ণ বিবাহের বিল নিয়া তিনি আবার সবিশেষ মাতিয়া উঠিয়াছেন। বিবাহ-বিশারদ মহাশয়ের এই শেষোক্ত বিল দুইটী আইনে পরিণত হইবার পক্ষে কতদূর সমর্থনীয়, তাহাই আমাদের বর্ত্তমান আলোচ্য বিষয়।

স্মরণাতীত কাল হইতে সগোত্র ও অসবর্ণ বিবাহের প্রথা হিন্দু সমাজে নিষিদ্ধ হইয়াছে। সকলেই জানেন, প্রাচীন শাস্ত্রকারগণ কর্ত্তৃক এই প্রথা নিছক কোন খামখেয়াল বশতঃ নিষিদ্ধ হয় নাই; মানবজীবনের নৈতিক ও সামাজিক নানাদিক চিন্তা করিয়া অতীব মহদুদ্দেশ্যে তাঁহারা এই নিষেধের বিধান করিয়াছেন। প্রথমতঃ, সগোত্র বিবাহের কথাই বলি—দৃষ্টিকে কিঞ্চিত প্রসারিত করিলেই দেখা যাইবে যে, পৃথিবীর অন্যান্য ধর্ম্মবিধানে সহোদরভ্রাতা ও ভগিনীর মধ্যে বিবাহ যে কারণে নিষিদ্ধ, সগোত্র বিবাহও হিন্দুধর্ম্মে সেই কারণেই পরিত্যক্ত। 'অথর্ব্ববেদে' বিষয়টী চমৎকার ভাবে আলোচিত হইয়াছে। আলোচনা প্রসঙ্গে প্রথমেই প্রশ্ন আসে—বিবাহের মূল সার্থকতা কি?' প্রশ্নের উত্তরে আবার প্রশ্ন হইয়াছে, কেন মানবের জীবনযাত্রায় ভাঙ্গন ধরে? এবারে প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হইয়াছে যে, 'লালসা' ও 'কাম' প্রবৃত্তির ফলে মানুষের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা উচ্ছৃঙ্খল হইয়া থাকে। সুতরাং জীবনধারাকে সর্ব্বপ্রকারে উন্নীত করিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন এই লালসা ও কামপ্রবৃত্তিকে সম্পূর্ণরূপে দমন করা। কিন্তু মনস্তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গি লইয়া বিচার করিলে আবার দেখা যায়, মানুষের জীবনে তা'ও সম্ভব নয়। কাম ও লালসার বীজ মানুষের প্রতি মজ্জায় গ্রথিত। উপরন্তু, অবিচ্ছেদ্য রক্ত সম্বন্ধ জনিত আত্মীয়তার ফলে নর-নারীর স্বাভাবিক সম্পর্ক সহজে ঘনীভূত হইতে পারিয়া উক্ত চিত্তবৃত্তিদ্বয়কে অধিকতর উদ্রিক্ত করে। কাম-লালসার এই অনিবার্য্য গতি সম্বন্ধে শাস্ত্রকার আর্য্য ঋষিগণও সম্যক অবহিত ছিলেন। এইজন্যই, সম্পূর্ণ অবরুদ্ধ না করিয়া নানা বিধি-নিষেধের সাহায্যে এই গতিকে সংযত করিবার নির্দ্দেশ দিয়াছেন। 'বিবাহ'—এই নির্দ্দেশ দানের ফল। অতএব, সহজেই বুঝা যায়, কাম চরিতার্থে নয়, কামকে সংযত করাই বিবাহের মূল উদ্দেশ্য; এবং এই মহদুদ্দেশ্যেই স্বাভাবিক মিলনোন্মুখ ভ্রাতাভগিনীর বিবাহ এবং ফলতঃ সগোত্র বিবাহকে ভারতীয় ঋষিগণ নিষিদ্ধ করিয়াছিলেন।

অসবর্ণ বিবাহ এবং দেশ ও বয়সের বিরাট পার্থক্যযুক্ত নরনারীর বিবাহ প্রভৃতিও এই প্রকার অন্য এক সামাজিক মহৎ কারণ বশতঃ নিরুদ্ধ হয়। বৈদিক ঋষিগণ বুঝিয়াছিলেন যে, বয়স, বর্ণ ও দেশের উক্ত অসমন্বয় ও দূরত্বযুক্ত বিবাহের সন্তান যথেষ্ট ধী ও প্রতিভাসম্পন্ন হইতে পারে না। আবার বর্ণ প্রভৃতি সম্বন্ধ নিকট হইলেও একই কুফল লাভ হয়। এই সকল কারণে বৈদিকমতে সবদিকে মধ্যস্থ পন্থা অবলম্বনই সর্ব্বাপেক্ষা প্রশস্ত বিবেচিত হইয়াছিল।

যুগ যুগ ধরিয়া ভারতে বিবাহের এই বৈদিক বিধি প্রচলিত রহিয়াছে। কিন্তু এই যুগ-প্রচলিত বিধিকে যাঁহারা সহসা আজ সংস্কারের নামে উড়াইয়া দিতে মনস্থ করিয়াছেন, সেই সব সংস্কারগণের নিকট আমাদের একান্ত অনুরোধ যে, কোনরূপ সংস্কারে হাত দিবার পূর্ব্বে তাঁহারা যেন ভারতীয় ঋষিগণ-কৃত উক্ত শাস্ত্র সমূহের সহিত সম্যক পরিচিত হইবার চেষ্টা করেন। বিবাহের এই বৈদিক প্রথাকে উপেক্ষা করিয়া বিরুদ্ধ পন্থা অবলম্বনের চেষ্টা দুই-তিন শতাব্দী হইতে পৃথিবীর বিভিন্ন খণ্ডে অনুষ্ঠিত হইতেছে, কিন্তু এখনো পর্য্যন্ত কোন সন্তোষজনক ফল লাভ হয় নাই। বিবাহ-বিশারদ সংস্কারকগণ এই কথাটিও স্মরণ রাখিবেন, আশা করি।

ব্রহ্মদেশে ভারতীয়দের প্রবেশ নিয়ন্ত্রণ

সম্প্রতি, ব্রহ্মদেশে ভারতীয়দের প্রবেশ নিয়ন্ত্রণ ও হ্রাস করিবার উদ্দেশ্যে উভয় দেশের সরকারের মধ্যে 'ভারত-ব্রহ্ম

ইমিগ্রেশন চুক্তি' নামে এক চুক্তি স্বাক্ষরিত হইয়াছে। চুক্তির বহুবিধ সর্ত্তাবলীর ভাবার্থ এই যে, স্থায়ী বাসিন্দা এবং ন্যূনপক্ষে ১৯৩২ সাল হইতে অন্ততঃ সাত বৎসর যাহারা ব্রহ্মদেশে স্থায়ীভাবে বাস করিয়াছে সেই সব ভারতীয় ভিন্ন অন্য কোন ভারতবাসী উপযুক্ত ছাড়পত্র বা পাসপোর্ট ব্যতীত ব্রহ্মদেশে আর প্রবেশ করিতে পারিবে না। আগামী অক্টোবর মাস হইতে এই চুক্তি কার্য্যকরী হইবে।

এতদ্দেশীয় সংবাদ পত্র সমূহে এই চুক্তির বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিবাদ উত্থিত হইয়াছে; এবং সঙ্গে সঙ্গে একদল ভারতীয় তাঁহাদের ভিটামাটি ছাড়িয়া ব্রহ্মদেশে স্থায়ীভাবে বসবাস করিবার জন্য উন্মুখ হইয়া পড়িয়াছে; কিন্তু আমাদের জিজ্ঞাস্য,—কিসের জন্য এই প্রতিবাদ, স্বদেশপ্রিয় ভারতীয়দের স্বদেশ ত্যাগের এই বিপুল বাসনা? এবং কি কারণেই বা জগতের অন্যতম অতিথিপরায়ণ ব্রহ্মজাতি ভারতীয় বিতাড়নে এতটা ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন? অনুসন্ধান করিলে দেখা যাইবে, উভয় প্রশ্নেরই একটি মাত্র উত্তর। উভয় দেশের শোচনীয় অর্থনৈতিক অবস্থাই এই সমুদয় দূষিত মনোভাবের মূল।

বৃটিশ শাসন প্রণালী যে আজ কতদূর অপকৃষ্ট হইতে চলিয়াছে, উপরোক্ত ঘটনা তা'রই একটি জ্বলন্ত উদাহরণ।

ভারতরক্ষা কমিটি

বহিঃশত্রুর আক্রমণ হইতে ভারতের নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠার জন্য ভারতের নূতন জঙ্গীলাট জেনারেল ওয়েভেল্ নবপদ্ধতিতে এক ভারতক্ষা কমিটি গঠন করিয়াছেন। বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, এই নূতন কমিটিতে ভারতীয় রাষ্ট্রীয় পরিষদ ও কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপরিষদ হইতে মনোনীত দশজন ভারতীয় সদস্যও অন্তর্ভুক্ত হইয়াছেন। স্পষ্টই বুঝা যায়, দেশরক্ষা ব্যবস্থার সহিত দেশবাসীর সম্পর্ক স্থাপনই জেনারেল ওয়েভেলের এই নবোদ্যমের প্রধান উদ্দেশ্য। প্রধান সেনাপতির এই সুবিচারে আমরা তাঁহাকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। কিন্তু আমাদের জিজ্ঞাস্য—ইংলণ্ডের অনুকরণে গঠিত এই দেশরক্ষা কমিটি এবং উহার রণ-নীতি কি প্রকৃতই দেশবাসীকে বহিঃশত্রুর বর্ব্বরতা হইতে বিপন্মুক্ত করিতে সক্ষম হইবে? সম্ভবতঃ নহে। কারণ ইংলণ্ড ও অন্যান্য নাৎসী কবলিত দেশের নিরীহ জনসাধারণ এই সমরনীতির দ্বারা আত্মরক্ষা করিতে পারেন নাই। আমরা জানি, জেনারেল ওয়েভেল্ অতি বিচক্ষণ সমরবিদ্। ভারতকে রক্ষা করিতে নিরীহ দেশবাসীর প্রাণ ও সম্পত্তি বিপদাপন্ন না করিয়া অন্য কোন বিচক্ষণতর সমরনীতি অবলম্বন করা কি তাঁহার পক্ষে



জেনারেল ওয়েভেল্

অসম্ভব? ভারতের নিরাপত্তা স্থাপনই যদি তাঁহার লক্ষ্য, তবে তাহার জন্য ধ্বংসকারীপন্থা অবলম্বনে কি লাভ হইবে?

প্রধান সেনাপতি মহাশয় অথবা তাঁহার নবগঠিত কমিটী ভারতকে উপযুক্ত উপায়ে রক্ষা করিতে অপারগ বিবেচিত হইলে, যাঁহারা দেশের নিরাপত্তার জন্য ভিন্নতর নিরাপদ ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন করিতে পারিবেন, তেমন যোগ্যতর ব্যক্তিগণই দেশরক্ষা ব্যাপারে আহূত হইবেন বলিয়া আমরা আশা করি। আমাদের মতে বর্ত্তমান সঙ্কটপূর্ণ পরিস্থিতে ইহাই বিচক্ষণতম নীতি। জেনারেল ওয়েভেল একবার তাঁহার চিন্তাধারা সেইদিকে প্রধাবিত করিবেন কি?

মাধ্যমিক শিক্ষা বিল এবং মিউনিসিপাল আইনের দ্বিতীয় সংশোধন বিল

উপরিউক্ত বিল দুইটি লইয়া হিন্দু নাগরিকদের মধ্যে এপর্য্যন্ত বহু বাক্-বিতণ্ডা হইয়া গিয়াছে। একদিক দিয়া

অবশ্য বিল দুইটী সত্যই প্রতিবাদযোগ্য। কারণ, উহাদের প্রকৃত স্বরূপ বিশ্লেষণে ইহাই প্রতীয়মান হয় যে, শুধু হিন্দু নহে, সকল সম্প্রদায়ের পক্ষেই এই প্রস্তাবিত সংশোধন স্বার্থ-বিরোধী এবং সকল সম্প্রদায়ের পক্ষে অসমর্থনীয়। সেদিক দিয়া মনে হয়, বিল দুইটী আইনে পরিণত না হওয়াই বাঞ্ছনীয়। তথাপি সত্যের খাতিরে আমরা বলিতে বাধ্য যে, এতাবৎ সংখ্যা-গরিষ্ঠ হিন্দুদের শাসনে এই প্রদেশের শিক্ষাপ্রণালী এবং কর্পোরেশন আইন নামে যাহা প্রচলিত ছিল তাহাও 'ফলেন পরিচীয়তে' এই নীতি অনুসারে খুব সমর্থনযোগ্য নহে এবং আমূল পরিবর্ত্তন না হইলেও অবিলম্বে উহাদের প্রভূত সংস্কার সাধন আবশ্যক। সুতরাং, এবিষয়ে যখন সমুচিত কর্ত্তব্য সম্পাদনে হিন্দুদের অসাফল্যই প্রমাণিত হইয়াছে, তখন মুসলমানদিগকে তাহাদের স্বীয় মতানুসারে উক্ত কর্ত্তব্য সম্পাদনে সুযোগ দিতে বাধা কি? অবশ্য এপর্য্যন্ত যতদূর দেখা গিয়াছে, তাহাতে মুসলমান সংস্কারকগণই যে কিছু সফলকাম হইবেন, তাহা মনে করিবারও কিছু সঙ্গত কারণ নাই। হিন্দুদের মত ইহাদের কর্ম্মনীতিও ভ্রান্ত ও দোষদুষ্ট। আশা করি, কার্য্যক্ষেত্রে নামিয়া তাঁহারা এই ভ্রান্তি উপলব্ধি করিতে পারিবেন। তাঁহাদিগকে এই সুযোগটি দিবার জন্ত আমরা দেশবাসীকেও অনুরোধ করিতেছি।

*

উপরোক্ত আলোচিত বিল দুইটীর বিরুদ্ধে যাঁহারা সরব জেহাদ্ ঘোষণা করিয়াছেন, শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকারের নাম তার মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনি বলেন যে, উক্ত বিল দুইটীর এমন সংশোধন হওয়া উচিত, যাহাতে উহা হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায় কর্ত্তৃক সমর্থিত হইতে পারে। জানি না, গভর্ণমেণ্টের কতিপয় পদস্থ কর্ম্মচারী ব্যতীত, সরকার মহাশয় বা তাঁহার এবম্বিধ উক্তির পরে কেহ কোনরূপ মূল্য বা আস্থা আরোপ করিবেন কি না! কারণ তাঁহার এই উক্তি শ্রুতিমধুর হইলেও নিতান্ত অযৌক্তিক। তৎকৃত উক্ত পরিকল্পনা কিভাবে কার্য্যকরী হইবে, সরকার মহাশয় আমাদের তাহা বুঝাইয়া দিবেন কি?

কেন্দ্রীয় রাজস্বে ঘাট্তি

সম্প্রতি, জাপ-ভারতীয় বাণিজ্য বন্ধ হওয়ায় এবং পেট্রোল-নিয়ন্ত্রণ অনুসৃত হওয়ায় কেন্দ্রীয় রাজস্বে ঘাট্তি হইবার সম্ভাবনা অতি প্রবলভাবে অনুভূত হইতেছে। গুজব রটিয়াছে, শীঘ্রই আবার নূতন ট্যাক্সসমূহ প্রবর্ত্তিত হইবে। কিন্তু সরকারের নিকট আমাদের জিজ্ঞাস্য, কেবল ট্যাক্স প্রবর্ত্তন ব্যতীত ঘাটতি-পূরণের ভিন্নতর উপায় কি কর্ত্তৃপক্ষ খুঁজিয়া পান না? ঘাটতি-পূরণের আরও তো অনেক উপায় আছে। তবে কি বুঝিতে হইবে যে বৃটিশ রাজনীতি আজ একেবারে নিঃস্ব, এবং ইহা তার অন্যতম জলন্ত নিদর্শন? অর্থসচীবেরও এবিষয়ে সম্যক সাবহিত হওয়া উচিত। আর এবম্বিধ ট্যাক্সের পর ট্যাক্সের ভার প্রজাসাধারণের স্কন্ধে চাপানো ব্যতীত অর্থ-সংগ্রহের অন্ত উপায় নির্দ্ধারণে যাঁহারা অজ্ঞ, সেই সব অর্থসচীবদেরও আইন করিয়া পদলাভ করিতে বাধা দেওয়া কর্ত্তৃপক্ষের কর্ত্তব্য।

ডাঃ সত্যপালের কংগ্রেসের সদস্যপদ ত্যাগ

পাঞ্জাবপ্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির ভূতপূর্ব্ব সভাপতি ডাঃ সত্যপাল যুদ্ধক্ষেত্রে আহত ও আর্ত্তদের শুশ্রূষার মানসে বিদেশ যাইবার জন্ত পাঞ্জাব সরকারের নিকট এক আবেদন পেশ করিয়াছেন বলিয়া প্রকাশ। ডাঃ সত্যপালের এই সঙ্কল্প অত্যন্ত প্রশংসনীয়। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এই সাধু সঙ্কল্পের জন্ত তাঁহাকে কংগ্রেসের চারি আনার সভ্যপদটী ইস্তাফা দিতে হইয়াছে। যে প্রকারেই হউক, বৃটীশ সরকারে অধীনস্থ হওয়াই নাকি কংগ্রেসের নীতি-বিরুদ্ধ। ডাঃ সত্যপালের পদত্যাগের যদি ইহাই একমাত্র কারণ হয়, তবে আমরা বলিতে বাধ্য, এই ঘটনা কংগ্রেসের বর্ত্তমান কর্ম্মকর্ত্তাদের পক্ষে নিতান্তই লজ্জার বিষয়। আর্ত্ত ও আহতের সেবা মহৎ কার্য্য;—তাহাতে আত্মনিয়োগ করিলে পদত্যাগের প্রশ্ন উঠে কেন? ইতিপূর্ব্বেও কংগ্রেস হইতে এই রকম আরও একাধিক পদত্যাগ ও পদচ্যুতির সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। এই সব ঘটনাবলী হইতে কি ইহাই সূচিত হয় না যে, কংগ্রেসের বর্ত্তমান কর্ম্ম-নীতি দোষদুষ্ট এবং অনতিবিলম্বে এই কর্ম্ম-নীতির আমূল পরিবর্ত্তন হওয়া বাঞ্ছনীয়? আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, কংগ্রেস একমাত্র সেই দিনই উহার আদর্শ পূরণে সফল হইবে, যেদিন উহা ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত সর্ব্বপ্রকার অসহযোগের বালাই ত্যাগ করিয়া বৃটীশ গভর্ণমেণ্টকেও মিত্ররূপে স্বীকার করিতে সমর্থ হইবে। অপরের বিরুদ্ধে হিংসা, দ্বেষ, অথবা ঘৃণার মনোভাবের দ্বারা যে কখনও কোন মহৎ কর্ত্তব্য সম্পন্ন হইতে পারে না, মানুষের জীবনে এইটাই হইল সর্ব্বপ্রথম দর্শন ও নীতি।

মিঃ ফজলুল্ হক্ ভারত রক্ষা কমিটীতে যোগদানে মুসলীম লীগের আপত্তি

জেনারেল্ ওয়েভেলের নেতৃত্বাধীনে যে ভারত রক্ষা কমিটী গঠিত হইয়াছে মুসলীম লীগ উহার সদস্তদিগকে সেই কমিটীতে সদস্তপদ গ্রহণ করিতে নিষেধ করিয়াছেন। কিন্তু বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয়, মিঃ ফজলুল হক্ প্রভৃতি আরও দুই একজন লীগ পাণ্ডা লীগের এই আদেশ গ্রাহ্য করেন নাই। লীগের অনুমতির অপেক্ষা না করিয়াই তাঁহারা উক্ত ভারত রক্ষা কমিটীতে যোগদান করিয়া বসিয়াছেন। ফলতঃ, মুসলীম লীগ এই বিদ্রোহী সভ্যদের উপরে নিরতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়াছেন। আমরা কিন্তু আমাদের বুদ্ধির স্বল্পতাবশতঃ লীগের এবম্বিধ আচরণের কোন সন্তোষজনক অর্থ খুঁজিয়া পাইলাম না। লীগের নির্দেশমত সভ্যগণ যদি প্রাদেশিক মন্ত্রীত্ব গ্রহণেই সমর্থ হয়, তবে তাঁহাদেরই ভারত রক্ষা কমিটীর সদস্ত হইবার বাধা কি? লীগের কর্ম্মকর্ত্তাগণগুলী এ বিষয়ে খোলাখুলি সব কথা প্রকাশ করিয়া ফেলিলে আমরা আশ্বস্ত হইতে পারিতাম।

ইংলণ্ড ও আমেরিকায় জাপানের সমুদয় প্রতিষ্ঠান বন্ধের নির্দ্দেশ

ইন্দোচীন লইয়া ভিসির সহিত আপোষ হইয়া যাওয়ার পর হইতেই জাপানের ক্রমবর্দ্ধিষ্ণু হম্বি-তম্বি অতিশয় দুর্ব্বীসহ হইয়া উঠিতেছে, বিশেষতঃ, বৃটেন ও আমেরিকার পক্ষে। এই কারণে জাপানকে পূর্ব্বভাগেই সাবধান করিয়া দিবার জন্য উক্ত রাষ্ট্র দুইটি স্ব স্ব রাজ্যের সমুদয় জাপানী সম্পত্তির গতি রুদ্ধ করিয়া দিবার আদেশ দিয়াছেন। অনেকেরই হয়তো ধারণা হইবে যে, বৃটেন ও আমেরিকার এই কার্য্যে জাপান খুব জব্দ হইয়া গেল। প্রকৃত পক্ষে, এই ধারণা ঠিক নহে। কারণ, ইহার ফলে, জাপানের কয়েকটি ব্যক্তি-বিশেষের ব্যক্তিগত সম্পত্তি বিপদগ্রস্ত হইল বটে, কিন্তু স্বয়ং জাপ-সরকারের ইহা দ্বারা কোন বিশেষ ক্ষতি সাধিত হইল না। বরঞ্চ, বৃটেন ও আমেরিকার উক্ত আচরণের প্রত্যুত্তরে জাপ-সরকারও স্বীয় রাজ্য ও অধিকৃত অঞ্চলে বৃটীশ ও মার্কিন সম্পত্তিসমূহ বন্ধ করিয়া দিয়াছে। এবং ফলতঃ, পূর্ব্বোক্ত জাপানীদের ন্যায় বৃটীশ ও আমেরিকান কতিপয় ব্যক্তি বিশেষগণ ও ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছেন। অর্থাৎ রাজায় রাজায় যুদ্ধ বাধিল, কিন্তু সেই যুদ্ধে কেবল কয়েকটী নিরীহ নলখাগড়ারই প্রাণহানি হইল। এই অস্ত্রের বিরুদ্ধে অস্ত্র—ইহাই কি প্রকৃষ্ট রাজনীতির নমুনা? জনসাধারণের হিতকল্পে জনসাধারণেরই প্রতিনিধিত্বে রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে যে শাসকসঙ্ঘ গঠিত হইয়াছে, সেই শাসক-সঙ্ঘই 'অস্ত্রের বিরুদ্ধে অস্ত্র' এই বর্ব্বর নৃশংশ নীতির প্রশ্রয় দিতেছেন। মানব-কল্যাণের পক্ষে এই বর্ব্বর নীতি গ্রহণ সমর্থনীয় কিনা, সমগ্র পৃথিবীর জনসাধারণের কাছে আজ ইহাই হইল প্রধান চিন্তনীয় বিষয়।

ইঙ্গ রুশ চুক্তি

সকলেই জানেন ইংলণ্ড ও রাষিয়ার মধ্যে এক সামরিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হইয়া গিয়াছে। চুক্তির সর্ত্ত এই—(১) নাৎসীবাদের উচ্ছেদ কল্পে বৃটেন ও সোভিয়েট পরস্পর পরস্পরকে রণ-সম্ভারাদি দিয়া যথাসাধ্য সাহায্য ও সহযোগিতা করিবে এবং এক পক্ষের সম্মতি ব্যতীত অপর পক্ষ শত্রু পক্ষের সহিত কোন সন্ধি বা চুক্তিতে আবদ্ধ হইতে পারিবে না। রুষ-জার্ম্মান যুদ্ধ লাগিবার পর হইতেই বৃটেনের তোড়জোড় দেখিয়া এই রকম একটা চুক্তির সম্ভাবনা আমরা বিশেষ ভাবে অনুমান করিয়াছিলাম—তাই ব্যাপারটা খুব অপ্রত্যাশিত বা আকস্মিক বলিয়া মনে হয় না। তথাপি এই নূতন চুক্তির বনিয়াদ ও স্থায়িত্ব সম্বন্ধে আমাদের রীতিমত সন্দেহ ও আশঙ্কা হয়। আমরা এমন কথা বলি না যে, নাৎসীবাদ ধ্বংস কল্পে কোন চুক্তি আপত্তি জনক, কিন্তু প্রশ্ন এই, এরূপ চুক্তি কি বস্তুতঃই সত্যপ্রসূত, না ইহাতে পাটোয়ারী বুদ্ধি নিহিত আছে।

চুক্তির লক্ষ্য কেবল কাগজপত্রে স্বাক্ষর নয়। ইহার উদ্দেশ্য গাঢ়তর—পরস্পরের সত্যিকার মিলন—অর্থাৎ উহার আত্মিক ও দার্শনিক দিকটাই প্রবলতর। এই দিক হইতে বিচার করিলে ইঙ্গ-রুষ মৈত্রীক তেল ও জলের সংমিশ্রণের মত অসম্ভব বলিয়া মনে হওয়াই স্বাভাবিক।

রাষিয়া ও ইংলণ্ডের রাজনীতিক চিন্তা ও কর্ম্মধারা সম্পূর্ণ বিপরীতমুখী। একজন গণতান্ত্রিক—সমাজের নেতৃস্থানীয়দের মঙ্গল সাধনই তার প্রধান উদ্দেশ্য, আর অপরজন, সমাজ-তান্ত্রিক—নেতৃবৃন্দকে অপাঙ্‌ক্তেয় করিয়া শ্রমিক শ্রেণীর কল্যাণ সাধনই তার প্রধান লক্ষ্য।

সুতরাং এবম্বিধ বিভিন্নতা সত্ত্বেও এই চুক্তির সার্থকতা কি? উভয়ের সাধারণ শত্রু জার্ম্মানীর বিরুদ্ধে সম্মিলিত প্রতিহিংসা গ্রহণের ইচ্ছাই কি এই অসম্ভবকে সম্ভব করে নাই? দার্শনিক বিশ্লেষণে তো ইহাই ইঙ্গ-রুষ মৈত্রীর এক মাত্র উদ্দেশ্য বলিয়া মনে হয়। কিন্তু প্রতিহিংসা-নীতি কোন কালেই মানব জাতির কোনরূপ হিতসাধনে সক্ষম নয়;—এই নীতি পশুর নীতি। উপস্থিত, এই চুক্তির ফলে জার্ম্মানীকে পরাভূত করা সম্ভবপর হইলেও শেষ পর্য্যন্ত হয় তো ইহা জগতের অনিবার্য্য ধ্বংসেরই কারণ হইবে। অতএব, ঝাঁপাইয়া পড়িবার পূর্ব্বে বৃটীশ রাজনীতিকমণ্ডলের কি এই সমস্ত পূর্ব্বাপর বিচার করিয়া দেখাই উচিৎ ছিলনা? কিন্তু আজ বোধ হয় সেই সুযোগ আর নাই।

পুনর্গঠিত জাপ-মন্ত্রীসভা

নিত্যভঙ্গুর জাপ-মন্ত্রীসভায় সম্প্রতি আর এক অদল-বদল হইয়া গিয়াছে। বর্ত্তমান পরিস্থিতিতে শাসনপরিষদকে অধিকতর শক্তিশালী ও কার্য্যকরী করিবার মানসে পূর্ব্ব মন্ত্রীসভা ভাঙ্গিয়া প্রধানমন্ত্রী প্রিন্স কনোয়ের নেতৃত্বে নূতন একটী মন্ত্রীসভা গঠিত হইয়াছে। বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয়, পদচ্যুত মন্ত্রীবৃন্দ হইতে আন্তর্জ্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন মিঃ মাৎসুয়োকাও বাদ পড়েন নাই। পাঠকগণ নিশ্চয়ই বিস্মিত হন নাই যে, কিছুদিন পূর্ব্বে এই মাৎসুয়োকাই জাপানের তরফ হইতে রাশিয়ার সহিত এক অনাক্রমণ চুক্তি স্বাক্ষর করিয়াছিলেন। সুতরাং মাৎসুয়োকাকে সরাইয়া জাপান বর্ত্তমানে কোন্ মহৎ উদ্দেশ্যে প্রণোদিত হইয়া উঠিয়াছে, তাহা বুঝা বোধ হয় খুব কঠিন ব্যাপার নহে। সম্ভবতঃ, জার্ম্মানীর বিশ্বাসঘাতকতার অনুসরণেই সে হয়তো জার্ম্মানীর ন্যায় রাশিয়ার সহিত আবদ্ধ উক্ত অনাক্রমণ চুক্তির প্রতি তুল্যরূপ মর্য্যাদা দেখাইতে মনস্থ করিয়াছে। এরূপ হইলে আমরা মোটেই বিস্মিত হইব না, তবে বুঝিতে



প্রিন্স কনোয়ে

হইবে এরূপ বিশ্বাসঘাতকতাই কি আধুনিক সভ্য জাতিগুলির মহত্ত্বের একমাত্র পরিচায়ক? তাই যদি হয়, তবে আমরা প্রার্থনা করি, আমাদের ভারতবর্ষ যেন এইরূপ মহত্ত্ব অর্জ্জন করিতে না পারে।

লর্ড হ্যালিফাক্স এবং বিশ্ব-শান্তি

যুক্তরাষ্ট্রের সান ফ্রান্সিসকোস্থ কমনওয়েলথ ক্লাবে প্রদত্ত এক বক্তৃতায় লর্ড হ্যালিফাক্স, ভবিষ্যতে পৃথিবীতে যাহাতে



লর্ড হ্যালিফাক্স

অবাধে শান্তি স্থাপিত হইতে পারে, তাহার এক পরিকল্পনা করিয়াছেন। বক্তৃতায় তিনি বলেন যে, জাপানের সহিত নূতন এক রাজনৈতিক সম্বন্ধে আবদ্ধ হইয়া বর্ত্তমান যুদ্ধে জার্ম্মানীকে সমূলে ধ্বংশ করিতে পারিলেই ইংলণ্ড ও আমেরিকা এই বাঞ্ছিত শান্তি স্থাপনে সমর্থ হইবে। লর্ড হ্যালিফাক্সকে আমরা একজন প্রকৃত খৃষ্টান বলিয়া জানিতাম, এবং তজ্জন্য তাঁহার প্রতি আমাদের শ্রদ্ধাও ছিল অগাধ। কিন্তু সম্প্রতি তাঁহার মনোভাব উত্তরোত্তর যেরূপ প্রতিহিংসাপরায়ণ ও হিংসাত্মক হইয়া উঠিতেছে, তাহাতে আমাদের পূর্ব্বের সে শ্রদ্ধা আর অটুট রহিতেছে না। সন্দেহ নাই, হিটলার এক জন জঘন্যতম পাপী—বিনা দ্বিধায় বিরাট নরহত্যাই তাঁহার সমুদয় কার্য্যাবলীর স্বরূপ। কিন্তু তাঁহার এই পাপের নিরশনকল্পে যদি তাঁহারই বর্ব্বর কর্ম্মপন্থা অনুসৃত হয়, তবে আর সে পাপের উচ্ছেদ হইল কি প্রকারে? হিংসার বিরুদ্ধে হিংসা খৃষ্টীয় নীতি নহে;—শত্রু-মিত্র নির্ব্বিশেষে মানুষকে ভালবাসাই খ্রীষ্টানের প্রকৃত ধর্ম্ম। তাই আমাদের মনে হয় যে, যতদিন পর্য্যন্ত না বৃটেন, কি শত্রু, কি মিত্র, সকল ক্ষুধিত

মানবকে অন্ন, বস্ত্রহীনকে বস্ত্র, আর রোগার্ত্তকে শুশ্রূষা দানে সক্ষম হইবে, ততদিন পর্য্যন্ত বিশ্বশান্তি স্থাপনে তাঁহার সমস্ত প্রচেষ্টাই কেবল ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হইবে। আর এই মানব কল্যাণেচ্ছা একমাত্র স্বদেশ ও সাম্রাজ্যের হিতসাধনে গণ্ডীভূত হইলেই চলিবে না,—স্বদেশী, বিদেশী, স্বজাতি, বিজাতি নির্বিচারে সমগ্র মানবের মঙ্গলসাধনব্রতে উদ্বুদ্ধ হইতে হইবে। এবং তবেই জগতে চিরন্তন শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিবে।

মিঃ সাম্নার ওয়েলস্ ও বিশ্বশান্তি

নরওয়ের রাজকীয় দূতাবাসের একটি নূতন শাখা গৃহের ভিত্তিস্থাপন উপলক্ষে যুক্তরাষ্ট্রের আণ্ডার সেক্রেটারী মিঃ সাম্নার ওয়েলস্ এক অভিনব জাতিসঙ্ঘের পরিকল্পনা করিয়া একটি বক্তৃতা দেন। বক্তৃতায় তিনি বলেন যে, পৃথিবীতে চিরস্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে জগতের বিভিন্ন জাতি ও রাষ্ট্রের সমন্বয়ে এমন একটি আদর্শ শক্তিমান আন্তর্জাতিক মিলন সঙ্ঘ গঠন করিতে হইবে, যেই সঙ্ঘ সমুদয় জাতি ও রাষ্ট্রকে নিরস্ত্র করিতে এবং সমাজের প্রত্যেক সভ্যকে সমভাবে অর্থনৈতিক সুবিধা বণ্টনের দায়িত্ব গ্রহণে সক্ষম হইবে। আণ্ডার সেক্রেটারীর এবম্বিধ বিবৃতি হইতেই বুঝা যায় যে, আমেরিকার রাজনৈতিক চিন্তাধারা এখনও অতিশয় দুর্ব্বল। অর্থনীতির নৈসর্গিক কার্য্যকারণ-গুলি পাশ্চাত্যদেশের সঠিক জানা থাকিলে উঁহারা নিশ্চয় উপলব্ধি করিতে পারিত যে, সমাজের প্রত্যেক সভ্যকে ন্যূনতম আর্থিক সুবিধা বণ্টন সম্ভবপর হইলেও—জগৎব্যাপী দূরের কথা, এমন কি দুইটি রাষ্ট্রের মধ্যে পর্য্যন্ত অখণ্ড ধন-সাম্য প্রতিষ্ঠা করা অসম্ভব। এইরূপ, জাতিসমূহকে নিরস্ত্র করার পরিকল্পনাও উক্ত ধন-সাম্যের মত নিছক অবাস্তব ও কল্পনাপ্রসূত। কিছুকালের জন্য, হয় তো, একটি জাতি বা জাতিসঙ্ঘ অত্যন্ত শক্তিমান হইয়া অন্যান্য জাতি ও রাষ্ট্রগুলিকে নিরস্ত্র করিতে পারে; কিন্তু এই জুলুম-নিরস্ত্রীকরণ ধোপে টিকিবে না বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস। আমাদের মতে, মানবসমাজকে স্থায়ী ভাবে অস্ত্রত্যাগী করিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে মানবগোষ্ঠীর প্রত্যেকের জন্য ন্যূনতম আর্থিক প্রয়োজন দানের ব্যবস্থাকে সুদৃঢ় করিতে হইবে। দ্বিতীয়তঃ, প্রত্যেকের মাঝে প্রচার করিতে হইবে, হিংসা দ্বেষ প্রভৃতি কু-চিত্তবৃত্তিগুলিকে সংযত করার শিক্ষা। দৈহিক শক্তি ও ঘৃণ্য পাশব শক্তি অপেক্ষা বুদ্ধি ও মনের শক্তিই শ্রেষ্ঠ। দৈহিক শক্তিমান পুরুষ দুর্ব্বলতর ব্যক্তিকে কিছু-কালের জন্য পরাজিত ও পদানত করিয়া রাখিতে পারেন বটে, কিন্তু সেই পরাজিতের অন্তরস্থ প্রতিহিংসার বৃত্তিকে একেবারে নিঃশেষ করিতে পারেন না। এই প্রতিহিংসার বৃত্তিকে নির্মূল করিতে পারে একমাত্র বুদ্ধির শক্তি।

পাশ্চাত্যের রাজনীতিক-দর্শন আজি এমনি দোষদুষ্ট। আশা করি, পাশ্চাত্যদেশ এই ভ্রান্ত রাজনীতি বিষয়ে সম্যক অবহিত হইয়া প্রাচ্যনীতির আদর্শে তার নীতির ভ্রান্তি স্খালনে তৎপর হইবে।

জাপ-ভিসি চুক্তি

ভিসি গভর্ণমেণ্ট ও জাপানের মধ্যে এক চুক্তি হওয়ার ফলে জাপানী সৈন্য বিনা বাধায় ইন্দো-চীনে পদার্পণ করিয়াছে। এই চুক্তিতে ভিসি গভর্ণমেণ্টের সামরিক দৌর্ব্বল্য অত্যন্ত প্রকট ভাবে প্রমাণিত হইয়াছে। তবু মনে হয়, যেরূপ দৌর্ব্বল্যের পরিচয় সে দিয়াছে, প্রত্যুতপক্ষে ভিসি বোধ হয় ততটা দুর্ব্বল নহে। ভিসিকে তাহার এই কৃত অ-কর্ম্মের জন্য নিন্দা করিয়া এখন কিছু লাভ নাই বটে, কিন্তু তথাপি আমরা বলিতে বাধ্য যে, ভারতের উপর বহিঃশত্রুর আক্রমণ ও বর্ব্বরতার আশঙ্কা ভিসির এই আচরণের ফলে প্রবলতর আকার ধারণ করিবে। ঈশ্বর জানেন, কে আমাদের এই সম্ভাবিত বিপদ হইতে রক্ষা করিবে! জঙ্গীলাট, তাহার ভারতরক্ষা কমিটী অথবা বড়লাটের সম্প্রসারিত শাসন পরিষদ—ভারতরক্ষা ব্যাপারে ইহাদের কাহারও উপর আমাদের আন্তরিক আস্থা নাই। আমরা উত্তম জানি, বহিঃশত্রুর বর্ব্বরতা ও নিষ্ঠুরতা হইতে ইহাদের কেহই ভারতবাসীকে উপযুক্ত নিরাপত্তা দানে সমর্থ হইবেন না। একমাত্র, প্রধান মন্ত্রী চার্চ্চিল মহোদয় এবং বড়লাট বাহাদুর যদি সময় থাকিতে সচেতন হইয়া উপযুক্ত কর্ম্মপন্থা অবলম্বনে কৃতসঙ্কল্প হন, তবেই হয় তো আমাদের নিরাপত্তা সংরক্ষিত হইতে পারে।

প্রার্থনা করি, অন্ততঃ এই সঙ্কটপূর্ণ অবস্থাতেও যেন তাহাদের সুবুদ্ধির উদয় হয়।

* * *

ভিসির উপরোক্ত আচরণের দ্বারা বৃটেনের সুদূর প্রাচ্য-সাম্রাজ্যের যে বিপদের আভাষ সূচিত হইয়াছে, সে সম্বন্ধে বৃটীশ পররাষ্ট্র সচিব মিঃ ইডেন এক বিবৃতি দিয়া বলিয়াছেন যে, বৃটেন এই বিপদের জন্য রীতিমত প্রস্তুত হইয়া আছে। মিঃ ইডেনের এই আশ্বাস নির্ভরযোগ্য হইলে ভারতবাসীর সঙ্কিত হইবার কারণ ছিল না। কিন্তু এই দুঃসময়ে ইংলণ্ডের ন্যায় একটি দেশের পররাষ্ট্র সচিবের পক্ষে যে বিচক্ষণতা ও গুণাবলী থাকা প্রয়োজন, দুর্ভাগ্যবশতঃ মিঃ ইডেন সেই বিচক্ষণতা ও গুণাবলীর অধিকারী নহেন। কাজেই তাঁহার আশ্বাসাড়ম্বরে ও আমরা আশ্বস্ত হইতে পারি না। ঈশ্বরের নিকট আবার আমরা প্রার্থনা করি, ভ্রান্ত ইংলণ্ড যেন এই বিচক্ষণতার অধিকারী হইয়া বৃটীশ সাম্রাজ্য ও ভারতকে রক্ষা করিতে কৃতকার্য্য হইতে পারে।

রাজনীতি ও শাসন কার্য্য

শ্রীসচ্চিদানন্দ ভট্টাচার্য্য

রাজনীতি কোন্ সূত্রানুসারে প্রতিষ্ঠিত হইলে এবং শাসনকার্য্য কোন্ পদ্ধতি অনুসারে পরিচালিত হইলে রাজনীতি ও শাসনকার্য্যের উদ্দেশ্য সাফল্য লাভ করিতে পারে, তাহার আলোচনা করা এই প্রবন্ধের প্রধান উদ্দেশ্য।

আধুনিক রাজনীতি-বিশারদগণ রাজনীতি বিষয়ে প্রধানতঃ তিন দলে বিভক্ত। একদল প্রজাতন্ত্র অথবা socialism নীতির পক্ষপাতী। দ্বিতীয়দল সাম্যবাদ অথবা communism নীতির পক্ষপাতী। তৃতীয় দল স্বদেশসেবী, সমাজতন্ত্রবাদ অথবা Fascisim নীতির পক্ষপাতী। "Democracy" নীতি "Socialism" নীতির একটী শাখা মাত্র। Nazism কে Fascisim এর যমজ ভাই বলা যাইতে পারে। বর্ত্তমান ইউরোপের Fascisim অথবা Nazism, Communism এবং Socialism অথবা Democracy নীতির মধ্যে ছোট বড় অনেক রকমের তফাৎ রহিয়াছে। এই তিনটী মতবাদের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ পার্থক্য প্রতিনিধি নির্ব্বাচন-পদ্ধতি ও শাসন কার্য্যের পদ্ধতি লইয়া।

Socialism অথবা Democracy নীতিবাদীরা জনসাধারণের ভোটের দ্বারা প্রতিনিধি নির্ব্বাচনের পদ্ধতিতে আস্থাবিশিষ্ট। ইঁহারা প্রতিনিধিগণের ভোটানুসারে সর্ব্ববিষয়ক শাসনকার্য্য চালাইবার পক্ষপাতী। ইংলণ্ড, ইউনাইটেড্ ষ্টেট্স, ফ্রান্স, পোলাণ্ড, হলাণ্ড, বেলজিয়াম প্রভৃতি দেশগুলি Socialism অথবা Democracy নীতির অন্তর্ভুক্ত।

Fascisim, Nazism, Communism বাদীরা জনসাধারণের ভোটের দ্বারা প্রতিনিধি নির্ব্বাচনের পদ্ধতিকে ভিত্তি করিয়া প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন বটে, কিন্তু ইঁহারা শাসন কার্য্য পরিচালনা বিষয়ে প্রতিনিধিগণের ভোটানুসারে কার্য্য করিতে সম্মত নহেন। ইঁহারা এতদ্বিষয়ে Dictator ship নীতির পক্ষপাতী। ইটালী, জার্ম্মানী ও রুশিয়া, এই Dictator-ship নীতির অন্তর্ভুক্ত। ইঁহারা যে ভাবে চলিতেছেন, তাহাতে হয় ত অদূর ভবিষ্যতে একদিন জনসাধারণের ভোটের দ্বারা প্রতিনিধি নির্ব্বাচনের পদ্ধতিকেও বাতিল করিয়া দিবেন।

ইংলণ্ড সাধারণতঃ নিজেকে Democracy-র অন্তর্ভুক্ত বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করেন বটে, কিন্তু England কে খাঁটিভাবে Democratic বলা চলে কিনা তদ্বিষয়ে সন্দেহ আছে। খাস ইংলণ্ডের আইন করিবার জন্য জনসাধারণের দ্বারা প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হয় বটে, কিন্তু ইংলণ্ডে রাজা আছেন এবং উল্লেখযোগ্য কোন আইন দেশের মধ্যে প্রবর্ত্তিত করিতে হইলে রাজার সম্মতি লইবার প্রয়োজন হয়। কাজেই ইংলণ্ডের গভর্ণমেণ্টকে খাঁটি Democratic না বলিয়া Parliamentary-Democratic আখ্যানে আখ্যাত করিতে হয়। বিশ্লেষণ করিয়া দেখিতে বসিলে England এর গভর্ণমেণ্ট যে কোন ভেজালশূন্য খাঁটি নীতির অনুসরণকারী, তাহা বলা চলে না। পরন্তু উহা যোগরূঢ় অথবা খিচুড়ী-নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত ইহা বলিতে হয়।

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ভারতবর্ষ ও অন্যান্য উপনিবেশগুলি যে রাজনীতি অনুসারে পরিচালিত হয়, তাহা সর্ব্বতোভাবে England-এর রাজনীতির অনুরূপ নহে।

ভারতবর্ষের আইন প্রণয়নের জন্য যেরূপ জনসাধারণের দ্বারা প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হয়, সেইরূপ আবার England এর মন্ত্রীদের দ্বারা রাজ-প্রতিনিধিগণও নিযুক্ত হইয়া থাকেন। উপরোক্ত রাজ-প্রতিনিধিগণের অর্থাৎ Viceroy ও গভর্ণরগণের সম্মতি না হইলে ভারতবর্ষে কোন আইনই প্রবর্ত্তিত হইতে পারে না।

ইংলণ্ডে সাধারণতঃ আইন প্রবর্ত্তিত করিতে হইলে রাজার সম্মতি লইবার প্রয়োজন হয় বটে, কিন্তু যে আইন জনসাধারণের প্রতিনিধিগণের সম্মতি পাইয়া থাকে, ইংলণ্ডের রাজা কার্য্যতঃ সেই আইন বাতিল করেন না। কিন্তু ভারতবর্ষে জনসাধারণের সম্মতিক্রমে গৃহীত একাধিক

আইন রাজ-প্রতিনিধিগণের দ্বারা পরিবর্ত্তিত এবং বাতিল হইয়াছে।

এদিক দিয়া দেখিলে ইংলণ্ডের রাজনীতিকে যেরূপ একভাবে Democratic বলা যাইতে পারে, সেইরূপ আবার Dictator-ship নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত বলিয়াও মনে করা চলে। অবশ্য একথা স্বীকার করিতেই হইবে যে, ইটালী, জার্ম্মানী ও রুশিয়ার যে-শ্রেণীর Dictator-ship বিদ্যমান আছে, England-এর Dictator-ship হুবহু সেই শ্রেণীর নহে। আমরা England-এর রাজনীতিকে Democratic-Dictator-ship নামক নূতন একটী শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত বলিয়া অভিহিত করিব।

এক্ষণে প্রশ্ন—আদর্শ রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে কোন্ রাজনীতি অনুসরণযোগ্য ?—খাঁটি Democracy অথবা Democraric-Dictator-ship অথবা খাঁটি Dictator ship ?

আদর্শ-রাজ্য (Ideal State) প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্ত কোন্ রাজনীতি অনুসরণ করিতে হইবে তাহা স্থির করিতে হইলে, আমাদিগের মতে সর্ব্ব-প্রথমে আদর্শ-রাজ্যের লক্ষ্য কি কি হইবে তাহা নির্দ্ধারণ করিতে হইবে এবং যে রাজনীতিতে ঐ ঐ লক্ষ্যে উপনীত হওয়া যায়, সেই রাজনীতি গ্রহণ করিতে হইবে।

কাজেই দ্বিতীয় প্রশ্ন—আদর্শ-রাজ্যের (Ideal State-এর) লক্ষ্য কি কি হইবে ?

আমাদিগের মতে আদর্শ-রাজ্যের (Ideal State-এর) মুখ্য লক্ষ্য হওয়া উচিত দুইটী, যথা :—

(১) রাজ্যস্থিত প্রত্যেক প্রজার অর্থাভাব, অস্বাস্থ্য, অশান্তি ও অসন্তুষ্টি দূর করা।

(২) রাজ্যস্থিত প্রত্যেক প্রজার আর্থিক প্রাচুর্য্য শারীরিক স্বাস্থ্য, শান্তি ও সন্তুষ্টি বৃদ্ধি করা।

তৃতীয় প্রশ্ন—কোন্ রাজনীতি অনুসরণ করিলে আদর্শ-রাজ্যের প্রত্যেক লক্ষ্যটীতে উপনীত হওয়া সম্ভব হয় ?

এই প্রশ্নের উত্তর দিতে হইলে, যে সমস্ত রাজ্যে খাঁটি Democratic নীতি অথবা Democratic Dictator-ship নীতি অথবা খাঁটি Diotator-ship নীতি অনুসৃত হইতেছে, সেই সব রাজ্যের প্রত্যেক প্রজার অথবা অন্ততঃপক্ষে অধিকাংশ প্রজার অর্থাভাব, অস্বাস্থ্য, অশান্তি ও অসন্তুষ্টি দূরীভূত হইয়া তাহাদিগের আর্থিক প্রাচুর্য্য, শারীরিক স্বাস্থ্য ও সন্তুষ্টির বৃদ্ধি সাধিত হইয়াছে কি না, তাহা চক্ষু মেলিয়া পরীক্ষা করিতে হইবে। যদি দেখা যায় যে, ঐসব রাজ্যের অধিকাংশ প্রজারই অর্থাভাব, স্বাস্থ্যাভাব, অসন্তুষ্টি ও অশান্তি দূরীভূত হইয়াছে এবং অর্থপ্রাচুর্য্য, শারীরিক স্বাস্থ্য, শান্তি ও সন্তুষ্টি প্রসার লাভ করিয়াছে, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে, বর্ত্তমান রাজনীতির যে কোনটী অনুসরণ করিলে আদর্শ-রাজ্য (Ideal State) প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হইতে পারে।

ইউনাইটেড ষ্টেট্‌স্, ফ্রান্স, হলাণ্ড, বেলজিয়াম, ইংলণ্ড, জাপান, ইটালী, জার্ম্মানী এবং রুশিয়া প্রভৃতি যে-কোনটীর আভ্যন্তরীণ অবস্থা বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলে দেখা যাইবে যে, অধিকাংশ প্রজার ত' দূরের কথা, প্রায় প্রত্যেক প্রজারই অর্থাভাব, অস্বাস্থ্য, অসন্তুষ্টি ও অশান্তি প্রায়শঃ দূর হয় নাই, পরন্তু উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে।

কাজেই আর কিছু না দেখিয়া এইস্থানেই সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে যে, বর্ত্তমান খাঁটি Democratic-নীতি অথবা Domocratic-Dictatorship-নীতি অথবা খাঁটি Dictatorship-নীতির কোনটাই আদর্শ-রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিতে সক্ষম নহে। এবং আদর্শ রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিতে হইলে চতুর্থ আর একটী রাজনীতির আবিষ্কার করিতে হইবে।

চতুর্থ রাজনীতিটী কোন্ ধরণের হইলে আদর্শ-রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হইতে পারে, তাহা অনুমান করিতে হইলে বর্ত্তমান রাজ-নীতির কোনটাই সর্ব্বতোভাবে সাফল্য লাভ করিতে পারে নাই কেন, তাহার অনুসন্ধান করিতে হইবে। এবং আরও দেখিতে হইবে যে, কোন্ নীতি অনুসরণ করিলে আদর্শ-রাজ্যের লক্ষ্য দুইটীতে উপনীত হওয়া সম্ভব হয়।

বলা বাহুল্য,রাজ্যস্থিত প্রত্যেক প্রজার অর্থাভাব, অস্বাস্থ্য, অশান্তি ও অসন্তুষ্টি যাহাতে দূর হইয়া যায় এবং আর্থিক-প্রাচুর্য্য, শারীরিক স্বাস্থ্য, শান্তি ও সন্তুষ্টি যাহাতে বৃদ্ধি পায় তাহার ব্যবস্থা করিতে হইলে, অর্থার্জ্জন, স্বাস্থ্যরক্ষা, শান্তি ও সন্তুষ্টি রক্ষা সম্বন্ধে রাজ্যের মধ্যে কোন্ কোন্ বিধি ও নিষেধ প্রবর্ত্তিত হওয়া উচিত তদ্বিষয়ে রাজ্যের আইন-প্রণয়ণকারী-

বিষয়ের বিশেষ বিশেষ জ্ঞান থাকা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। এবং যাঁহারা ঐ ঐ বিষয়ে অজ্ঞ তাঁহারা যাহাতে রাজ্যের কোন ব্যবস্থাপক সভায় প্রবিষ্ট না হইতে পারেন, তাহার ব্যবস্থাও একান্ত প্রয়োজনীয়।

এই হিসাবে, আদর্শ-রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিতে হইলে, রাজ্যের ব্যবস্থাপক সভাসমূহের সভ্যগণের যাহাতে নিম্নলিখিত গুণগুলি থাকে, তাহা দেখা একান্ত প্রয়োজনীয়:—

(১) জিতেন্দ্রিয়তা।

(২) অর্থ বিষয়ে নির্লোভতা অথচ আর্থিক প্রাচুর্য্য এবং অ-ঋণী হওয়া।

(৩) সত্যবাদিতা ও সরলতা।

(৪) স্বাস্থ্যবান্, ঈশ্বরবিশ্বাসী ও ধর্ম্মভীরু হওয়া।

(৫) জমী, হাওয়া ও জলের যে অবস্থা রক্ষিত হইলে কৃষকগণ স্বাধীনভাবে পাঁচমাস পরিশ্রম করিয়া কৃষিকার্য্যের দ্বারা বারমাসের নিজ নিজ সমগ্র পরিবারের যাবতীয় খরচা সংগ্রহ করিতে পারে তদ্বিষয়ক নিখুঁত জ্ঞান।

(৬) শিল্প ও বাণিজ্যের যে ব্যবস্থা রক্ষিত হইলে শিল্পী ও বণিকগণের যুক্তিসঙ্গত লাভ করা সম্ভব হয়, অথচ দ্রব্যমূল্য অত্যধিক পরিমাণে বৃদ্ধি করিয়া ক্রেতা-সাধারণকে লোকসানগ্রস্ত করা অসম্ভব হয়, তদ্বিষয়ক নিখুঁত জ্ঞান।

(৭) যে যে ব্যবস্থা হইলে জনসাধারণ অনায়াসেই স্বাস্থ্যরক্ষা করিতে পারে এবং অস্বাস্থ্যকর কার্য্য হইতে বিরত থাকিতে বাধ্য থাকে, তদ্বিষয়ক নিখুঁত জ্ঞান।

(৮) শিক্ষার যে ব্যবস্থা হইলে রাজ্যের প্রত্যেক অধিবাসী নিজ নিজ পরিবারের প্রয়োজনীয় অর্থোপার্জ্জন করিতে সক্ষম হয়, শরীর, ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধিকে সংযত করিতে পারে, এবং রাগ-দ্বেষ ও দ্বন্দ্ব-কলহের প্রবৃত্তিকে আয়ত্তাধীন করিতে পারে, তদ্বিষয়ক নিখুঁত জ্ঞান।

যাঁহারা নিম্নলিখিত কোন দোষে দুষ্ট হইবেন, তাঁহারা যাহাতে কোন ব্যবস্থাপক সভার সভ্য হইতে না পারেন, তাহার ব্যবস্থা থাকাও একান্ত প্রয়োজনীয়:—

(১) লাম্পট্য—

(২) অর্থ-লোলুপতা, ঋণগ্রস্ততা, অর্থাগমের সাধু উপায়-হীনতা—

(৩) মিথ্যাবাদিতা ও কপটতা—

(৪) অসুস্থতা, ঈশ্বরে বিশ্বাস-হীনতা এবং অধর্ম্ম-প্রবণতা—

(৫) কৃষি-বিজ্ঞানে মূর্খতা, উদাসীনতা ও প্রতারণা—

(৬) শিল্প ও বাণিজ্য-বিজ্ঞানে মূর্খতা, উদাসীনতা ও প্রতারণা—

(৭) স্বাস্থ্যবিজ্ঞানে মূর্খতা, উদাসীনতা ও প্রতারণা—

(৮) শিক্ষা-বিজ্ঞানে মূর্খতা, উদাসীনতা ও প্রতারণা।

প্রচলিত রাজনীতি-গুলি (অর্থাৎ Democracy-নীতি, Democratic Dictatorship নীতি এবং Dictatorship-নীতি) পরীক্ষা করিয়া দেখিলে দেখা যাইবে যে, উপরোক্ত গুণসম্পন্ন না হইয়া যাহাতে রাজ্যের কোন ব্যবস্থাপক সভায় কেহ সভ্য না হইতে পারেন, তাহার কোন ব্যবস্থা কোন প্রচলিত রাজনীতিতে বিদ্যমান নাই। আরও দেখা যাইবে যে, প্রচলিত রাজনীতিগুলির প্রত্যেকটীতে যে নির্ব্বাচন-পদ্ধতি বিদ্যমান আছে তাহাতে লম্পট, অর্থ-লোলুপ, ঋণ-গ্রস্ত, অর্থাগমের সাধু-উপায়হীন, মিথ্যাবাদী, কপট, ঈশ্বরে বিশ্বাস-হীন, অধার্ম্মিক, কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, স্বাস্থ্য ও শিক্ষা-বিজ্ঞানে সম্পূর্ণ মূর্খ, উদাসীন এবং প্রতারক মানুষের পক্ষেও উৎকোচ এবং কু-চক্রের সহায়তায় জনসাধারণের প্রতিনিধিত্ব লাভ করা সম্ভব হইয়া থাকে। কার্য্যতঃও দেখা যাইবে যে, প্রত্যেক দেশের প্রত্যেক রাজ্যের অধিকাংশ ব্যবস্থাপক সভাই অল্পাধিক পরিমাণে অপ-গুণবিশিষ্ট সভ্যগণের দ্বারা পরিপূর্ণ রহিয়াছে। এবং সর্ব্বত্রই যথোপযুক্ত-গুণবিশিষ্ট সভ্যগণের অত্যন্ত অভাব। এমন কি, মন্ত্রী-মণ্ডলের মধ্যেও অপ-গুণ বিশিষ্ট লোকের সংখ্যাই বেশী এবং যথোপযুক্ত গুণবিশিষ্ট লোক একরূপ নাই বলিলেও চলে।

সুতরাং তৃতীয় প্রশ্নের (অর্থাৎ কোন্ রাজনীতি অনুসরণ করিলে আদর্শ-রাজ্যের প্রত্যেক লক্ষ্যটীতে উপনীত হওয়া সম্ভব হয় তাহার) জবাবে আমাদিগকে বলিতে হইবে যে, যে রাজনীতিতে উপরোক্ত কোন অপগুণ-বিশিষ্ট কোন মানুষের পক্ষে রাজ্যের কোন ব্যবস্থার কার্য্যে (অর্থাৎ Legisla-

tionএ), কোন শাসনকার্য্যে (Executive Administration এ) এবং কোন বিচার-কার্য্যে (অর্থাৎ Judicial বিভাগে) প্রবেশলাভ করা নিষিদ্ধ হয় এবং একমাত্র যথোপযুক্ত গুণ-বিশিষ্ট মানুষ সকলই যাহাতে ঐ ঐ কার্য্যভার গ্রহণ করিতে পারেন তাহার নিয়ম প্রচলিত হয়, একমাত্র সেই রাজনীতিকে ভিত্তিকরিয়া রাজ্য পরিচালিত করিতে পারিলে আদর্শ-রাজ্যের প্রত্যেক লক্ষ্যটীতে উপনীত হওয়া সম্ভব হইবে। আমাদিগের প্রস্তাবিত এই রাজনীতিকে "আদর্শ-রাজনীতি" বলিয়া আমরা অভিহিত করিব।

কোন্ উপায়ে আদর্শ-রাজনীতি জগতের মধ্যে প্রসার লাভ করিতে পারে?

কোন্ উপায়ে আদর্শ-রাজনীতি জগতের বর্ত্তমান অবস্থায় প্রসার লাভ করিতে পারে তদ্বিষয়ে আলোচনা করিতে হইলে আমাদিগকে প্রথমেই চিন্তা করিতে হইবে যে, জগতের সর্ব্বত্রই যেরূপ নির্ব্বাচন-পদ্ধতি প্রচলিত আছে তাহা অক্ষুণ্ণ থাকিলে আদর্শ-রাজনীতি প্রবর্ত্তিত করা সম্ভবযোগ্য হয় কি?

উপরোক্ত চিন্তায় প্রবৃত্ত হইলে দেখা যাইবে যে, প্রচলিত নির্ব্বাচন-পদ্ধতি (Election) অক্ষুণ্ণ থাকিলে কোন দেশে "আদর্শ-রাজনীতি" প্রবর্ত্তিত করা সম্ভবযোগ্য হয় না, কারণ, জগতের প্রত্যেক দেশের জনসাধারণ যেরূপ অভাবগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছে এবং প্রত্যেক দেশের শিক্ষিত ও ধনবান্ সম্প্রদায় প্রায়শঃ যেরূপ আত্মবিস্মৃত হইয়া মিথ্যাবাদী, কুটিল, কু চক্রী ও অধার্ম্মিক হইয়া পড়িয়াছেন, তাহাতে এতাদৃশ নির্ব্বাচন-পদ্ধতি প্রবর্ত্তিত থাকিলে মিথ্যাবাদী, কুটিল, কু-চক্রী ও অধার্ম্মিকগণ উৎকোচ ও কুচক্রের সহায়তায় যত সহজে ব্যবস্থার কার্য্যে, শাসন-কার্য্যে ও বিচার-কার্য্যে প্রবেশ লাভ করিতে সক্ষম হইতে পারেন, সত্যবাদী, সরল ও ধর্ম্মভীরুগণের পক্ষে তত সহজে প্রবেশ লাভ করা সম্ভব হয় না।

ইহা ছাড়া আরও দেখা যায় যে, দেশের জনসাধারণের মধ্যে প্রকৃত শিক্ষা (অবশ্য আধুনিক মিথ্যাবাদিতা, কপটতা, অধার্ম্মিকতা ও আত্ম-প্রতারণা বৃদ্ধির সহায়ক শিক্ষা নহে) আরও বিস্তৃতি লাভ না করিলে তাহাদিগের পক্ষে কে অপগুণবিশিষ্ট অথবা কে যথোপযুক্ত গুণবিশিষ্ট, তাহা স্থির করা সম্ভব হয় না।

কাযেই, এদিক দিয়া দেখিলে বলিতে হয় যে, যতদিন পর্য্যন্ত প্রচলিত নির্ব্বাচন-পদ্ধতি বিদ্যমান থাকিবে, ততদিন পর্য্যন্ত আদর্শ রাজনীতি কোন দেশের মধ্যে প্রবর্ত্তিত করা কখনও সম্ভবযোগ্য হইবে না।

অথচ, প্রচলিত নির্ব্বাচন-পদ্ধতি জগতের প্রত্যেক দেশে যেরূপভাবে জনসাধারণের মধ্যে আদর লাভ করিয়াছে, তাহাতে ঐ পদ্ধতি সর্ব্বতোভাবে তিরোহিত করিতে চাহিলে ব্যাপক-ভাবে অসন্তুষ্টির উদয় হওয়া খুবই সম্ভবযোগ্য।

এক্ষণে প্রশ্ন যে, তাহা হইলে উপায় কি?

ইহার উত্তরে আমাদিগকে বলিতে হইবে যে, জগতের প্রত্যেক দেশেই বর্ত্তমান অবস্থায় আদর্শ-রাজনীতি প্রবর্ত্তিত করা সম্ভব-যোগ্য নহে। তাহার কারণ, আদর্শ রাজনীতি প্রবর্ত্তিত করিতে হইতে হইলে যে যে গুণ-বিশিষ্ট আইন-প্রণয়নকারী, শাসক ও বিচারকের প্রয়োজন, সেই সেই গুণ-বিশিষ্ট একটীও মানুষ জগতের অনেক দেশেই নাই। ঐ ঐ দেশে ঐ ঐ গুণ-বিশিষ্ট মানুষ প্রস্তুত করিয়া লইতে হইবে। তাহা সময়-সাপেক্ষ। ইহা ছাড়া, কোন দিন একই নিয়মে সমস্ত দেশে আদর্শ-রাজনীতি প্রবর্ত্তিত করা সম্ভব-যোগ্য হইবে না। অবস্থার বিভিন্নতানুসারে আদর্শ-রাজনীতি প্রবর্ত্তিত করিবার পন্থা বিভিন্ন হইবে।

আমাদিগের আজকার আলোচ্য—

কোন্ উপায়ে আদর্শরাজনীতি ভারতবর্ষে তাহার বর্ত্তমান অবস্থায় প্রবর্ত্তিত হইতে পারে?

কোন্ উপায়ে আদর্শ-রাজনীতি ভারতবর্ষে তাহার বর্ত্তমান অবস্থায় প্রবর্ত্তিত হইতে পারে, তাহার আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলে সর্ব্বাগ্রে মনে রাখিতে হইবে যে, যে উপায় অবলম্বন করিলে কোন বৃহৎ রকমের দ্বন্দ্ব-কলহের উদ্ভব হইতে পারে, সেই উপায় সর্ব্বাগ্রে পরিত্যাগ করিতে হইবে। এই হিসাবে ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট অথবা Viceroy-এর সহিত যাহাতে কোনরূপ ঝগড়ার উদ্ভব না হয়, তদ্বিষয়ে জনসাধারণকে সর্ব্বদা সতর্ক থাকিতে হইবে। আদর্শ-রাজনীতি অনুসারে দেশের আইন-প্রণয়ন, শাসন ও বিচারকার্য্যে যে যে গুণ একান্ত

প্রয়োজনীয়, সেই সব গুণ ভাইসরয়ের না থাকিলেও এবং যে যে দুষ্টতা একান্ত বর্জ্জনীয়, সেই সব দুষ্টতা ভাইসরয়ের থাকিলেও ভারতবর্ষের জনসাধারণকে ভাইসরয়কে সর্ব্বতোভাবে আন্তরিক সম্মানের সহিত মানিয়া লইতে হইবে এবং যে কার্য্যে তিনি বিরক্ত হইতে পারেন সেই কার্য্য যতই প্রয়োজনীয় হউক না কেন, তৎসময়ের জন্য স্থগিত রাখিতে হইবে।

দ্বিতীয়তঃ, ভারতবর্ষের জনসাধারণকে মনে রাখিতে হইবে যে, যে গুণ কয়েকটীর সমাবেশ হইলে আদর্শ-রাজনীতির কর্ণধার পদে প্রতিষ্ঠিত হইবার যোগ্যতা লাভ করা যায়, সেই গুণ কয়েকটীর আধার যেরূপ সর্ব্বদেশে সর্ব্বসময় জন্মলাভ করে না, সেইরূপ আবার যে অপ-গুণগুলিকে বর্জ্জন করা একান্ত প্রয়োজনীয়, সেই অপগুণগুলি যিনি সর্ব্বতোভাবে বর্জ্জন করিতে পারিয়াছেন, সেইরূপ মানুষও অত্যন্ত দুর্লভ। একাধারে ঐ অপগুণগুলি সর্ব্বতোভাবে বর্জ্জন করিবার মত এবং সু-গুণগুলি সর্ব্বতোভাবে অর্জ্জন করিবার মত মানুষ কালের নিয়মানুসারে এক একটা প্রয়োজনীয় যুগে এক একটা প্রয়োজনীয় স্থানে জন্মলাভ করিয়া থাকেন। যাঁহারা কালনির্ণয় শাস্ত্রে এবং কালের নিয়ম সম্বন্ধীয় শাস্ত্রে সুদক্ষ, তাঁহারা কখন কোন্ দেশে উপরোক্ত ধরণের অতি-মানুষের জন্ম হইবে তাহা হিসাব করিয়া বলিতে পারেন। সেই হিসাবে দক্ষতা লাভ করিতে পারিলে দেখা যাইবে যে, এতাদৃশ মানুষ ভারতে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। ভারতের কোথায়, কত বৎসর আগে এই অতি-মানুষের জন্ম হইয়াছে তাহার গণনা অত্যন্ত দুরূহ বটে, কিন্তু জগতের কোন্ দিকে, কোন্ গ্রহের কোন্ সঞ্চারে ঐ অতিমানুষের আবির্ভাব সম্ভব তাহা বলা তত দুরূহ নহে।

এই আদর্শ-রাজনীতির কর্ণধার পদে প্রতিষ্ঠিত হইবার যোগ্যতাসম্পন্ন মানুষের কার্য্য যখন আরম্ভ হয়, তখন ঐ যোগ্যতাসম্পন্ন মানুষের যে আবির্ভাব হইয়াছে তাহা কাহারও বুঝিবার ক্ষমতা থাকে না এবং এমন কি, ঐ যোগ্যতা-সম্পন্ন মানুষ নিজেও তাঁহার যোগ্যতা সম্বন্ধে নিঃসন্দিগ্ধ হইতে পারেন না এবং তিনি সর্ব্বদাই নিজকে লুক্কায়িত রাখিতে ব্যস্ত থাকেন। সমাজের জনসাধারণকে তাঁহার অনুসন্ধান করিতে হয়।

উপরোক্ত কারণে, ভারতের জনসাধারণকে অতি-কতর সজাগ হইতে হইবে এবং কোথায় কে জনসাধারণের ব্যথায় ব্যথিত হইয়া সর্ব্বসাধারণের সর্ব্ববিধ দুঃখ কি করিয়া তিরোহিত হইবে, কি করিয়া মানবসমাজ হইতে দ্বন্দ্ব-কলহের প্রবৃত্তি এবং রাগ-দ্বেষের আতিশয্য দূরীভূত হইবে, তাহার কথা ও কার্য্য লইয়া নিজেকে বিলাইয়া দিতে প্রস্তুত হইয়াছেন, তাঁহার দিকে মনোযোগ দিতে হইবে। ঐ মনোযোগ প্রদান করিলেই, যে মহাত্মা আমাদিগের দুর্দ্দশা মোচন করিবেন, তাঁহার সাক্ষাৎ পাওয়া যাইবে।

এই মানুষটী যাহাতে ভাইসরয়ের সহকারিতা করিতে প্রস্তুত হন এবং ব্রিটিশ-গভর্ণমেণ্ট ও ভাইসরয় যাহাতে এই মানুষটীর সাহায্য লইতে স্বীকৃত হন, তজ্জন্য ভারতবর্ষের জনসাধারণকে চেষ্টা করিতে হইবে।

এক্ষণে, এই বর্ত্তমান যুদ্ধের সময়ে ভারতবর্ষ ও ব্রিটিশ সাম্রাজ্য যে অবস্থায় আসিয়া উপনীত হইয়াছে, তাহাতে ভারতবর্ষের জনসাধারণ যদ্যপি "আদর্শ-রাজনীতির" সংগঠন দাবী করে এবং যথোপযুক্ত গুণবিশিষ্ট মানুষটীকে যদ্যপি ভাইসরয়ের সহকারীরূপে বসাইতে চাহে, তাহা হইলে ব্রিটিশ ক্যাবিনেট অথবা ভাইসরয় ঐ দাবী না-মঞ্জুর করিতে পারিবেন না। অবশ্য যিনি ভারতের ভাইসরয়ের সহকারী পদে প্রতিষ্ঠিত হইবেন, তিনি যে সমগ্র পুণ্যকার্য্যশালী মানবসমাজের অর্থাভাব, অস্বাস্থ্য, অশান্তি ও অসন্তুষ্টি দূর করিয়া মানব সমাজের প্রত্যেকের অর্থপ্রাচুর্য্য, স্বাস্থ্য, শান্তি ও সন্তুষ্টি যাহাতে বৃদ্ধি লাভ করে তাহার ব্যবস্থা করিবেন—তাহা তাঁহাকে তার-স্বরে শুনাইয়া দিতে হইবে।

ভাইসরয়ের কার্য্যবিভাগ প্রধানতঃ নিম্নলিখিত নয়টী বিভাগে বিভক্ত করিতে হইবে :—

(১) বৈদেশিক বিভাগ
(২) আভ্যন্তরীণ শান্তিরক্ষা বিভাগ
(৩) কৃষি-বিভাগ
(৪) শিল্প ও বাণিজ্য বিভাগ
(৫) চাকুরী বিভাগ
(৬) বিচার-বিভাগ
(৭) স্বাস্থ্য-বিভাগ
(৮) শিক্ষা-বিভাগ
(৯) রাজ্য-পরিচালনা বিভাগ
 (ক) হিসাব রক্ষা বিভাগ
 (খ) কোষ রক্ষা বিভাগ

এতদ্বিষয়ক অন্যান্য কথা জনসমাজকে আমরা বারান্তরে শুনাইব।

বন্ধন-মুক্তি

—শ্রীকালীপ্রসন্ন দাশ

(১)

পুকুরঘাটে স্নান ও প্রাতঃসন্ধ্যা করিয়া গঙ্গাস্তোত্র আবৃত্তি করিতে করিতে ভাগীরথী গৃহে ফিরিলেন। একহাতে ভিজা কাপড় ও গামছাখানি, আর একহাতে পূজার জন্য একঘটি জল, গায়ে তসরের উপরে নামাবলীখানি জড়ান। ফাল্গুনের প্রথম ভাগ; তখনও শীত বেশ আছে। কয়েকদিন অবধি কন্‌কনে উত্তরে হাওয়ায় শীতটা বেশ জোরেই আবার আসিয়া পড়িয়াছে। কিন্তু শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা, বার মাস ত্রিশদিন সমানভাবেই প্রত্যুষে ভাগীরথী পুকুরঘাটে গিয়া প্রাতঃস্নান ও প্রাতঃসন্ধ্যা করিয়া পূজার জন্য একঘটি জল লইয়া এমন সময় বাড়ীতে ফিরিতেন। তসরের কাপড়খানির উপরে নামাবলী ব্যতীত শীত নিবারণের জন্য আর কোন বস্ত্রের প্রয়োজন তাঁহার কখনও হইত না; প্রাচীনা গ্রাম্যনারী কাহারও বড় হয় না। নবীনা বধূরাও অনেকে পরণের সাড়ীখানির আঁচল মাত্র দুই ফেরে গায়ে জড়াইয়া ভরা-শীতে গৃহকর্ম্ম করে, উঠানে গোবর ছড়া দেয়, ঘর নিকোয়, পুকুরঘাটে গিয়া বাসন মাজিয়া আনে। বহুবস্ত্রে সুরক্ষিতা আধুনিকা নগরবাসিনী কন্যা ও বধূদের অপেক্ষা দেহের স্বাস্থ্য ইহাদের অনেক ভাল বই হীন বড় কিছু দেখা যায় না।

নিঃসন্তান বিধবা, শ্বশুরকুলে কেহই ছিল না; পিতৃগৃহেই ভাগীরথী বাস করিতেন। কিন্তু সেই পিতৃগৃহেও এখন তিনি একা। একটি মাত্র ভ্রাতুষ্পুত্র আছেন, তিনিও সপরিবারে কর্ম্মস্থল কলিকাতায় বাস করেন, দেশে গাঁয়ে আসেন না।

প্রতিবেশিনী এক বৃদ্ধা—মনার মা—রাত্রিতে আসিয়া ঘরে তাঁহার কাছে শুইয়া থাকে। ভোরে উঠিয়া ঘরখানি নিকাইয়া উঠানে ঝাঁট-পাট ও গোবর-ছড়া দিয়া গৃহে চলিয়া যায়। ভাগীরথী পুকুরঘাট হইতে ফিরিবার পূর্ব্বেই এসব কাজ সারিয়া সে গৃহে ফিরিত। ভাগীরথীও স্নানান্তে ফিরিয়া বাড়ী-ঘরখানির পরিচ্ছন্নতা ও পরিমার্জ্জনা লক্ষ্য করিয়া যারপর নাই প্রীত হইতেন। তাঁহার পুরাতন বস্ত্র, ভোজ্যাবশেষ যাহা থাকিত, লাউ, কুমড়া, শাকপাতা বাড়ীতে যাহা জন্মিত, একাদশীর পারণে নারিকেল, শসা, কলা, পেয়ারা, পেঁপে, আতা, বেল, আম, কাঁঠাল ইত্যাদি যাহা যখন জুটিত, ডাকিয়া তাহাকে দিতেন। বৈকালে এক একদিন রামায়ণ-মহাভারতও পড়িয়া তাহাকে শুনাইতেন। মনার মাসী তাঁহাকে 'দিদি' বলিয়া ডাকিত, বলিত, গেল-জন্মে তিনি তাহার সত্যকার একমায়ের পেটের 'দিদিই' ছিলেন।

দাওয়ায় জলের ঘটিটী রাখিয়া আড় বাঁশের উপরে ভাগীরথী ভিজা কাপড়খানি ছড়াইয়া দিলেন। তারপর দরজা খুলিয়া ঘরে গিয়া উঠিলেন। ঘটিটী যথাস্থানে রাখিয়া ফুলের সাজিটী লইয়া বাহির হইলেন।

"আঃ কপাল! ফুল যে একটিও নেই। গাছভরা এত গাঁদা, জবা, কাঞ্চন—একটি ফুল নেই! সব তুলে নিয়ে গিয়েছে! এখন আমিই বা পূজো ক'রব কি দিয়ে, আর ওদের পাঁচজনকেই বা দেব কি? মর আবাগীরা! নিবি নে। দেবতাকে দিবি, তোরা দিলেও দিবি, আমি দিলেও দেব। তা দুটো ত' আমার তরেও রাখতে হয়। এই ... বিধুও এক্ষুণি আসবে—"

"কি দিদি, কি হ'য়েছে? ওমা, তাই ত! কি সর্ব্বনাশ! একটি ফুলও যে গাছে নেই! কি হবে এখন?"

বলিতে বলিতে ফুলের সাজি হাতে প্রৌঢ়া একটি বিধবা আসিয়া দাঁড়াইলেন।

"এই যে বিধু! এই ত দ্যাখ না ভাই, ফুলগুলো কোন্ আবাগীরা এসে তুলে নিয়ে গিয়েছে। গাছের বকগুলো—তাও ডালপালা ভেঙ্গে আঁকুশি দিয়ে পেড়ে নিয়েছে। মনার মাই বা কতক্ষণ হ'ল আর গেছে, এরি ভেতর সব তুলে পেড়ে নিয়ে গেল! ঐ উঁচু ডালে কেবল ক'টি বক আছে, তাও কি ছাই ঐ আঁকশিতে নাগাল পাব?"

"সব ঐ পাড়ার বজ্জাত ছুঁড়ীদের কাণ্ড! ডানপিটে ছোঁড়াগুলোও কেউ কেউ এসেছিল। নইলে কেবল ছুঁ... এরি ভেতর এত ফুল তুলে পেড়ে নিয়ে যেতে পারত না।"

"তাই হবে। নইলে নেয় ত না এমন ফুল তুলে কেউ কখনও এসে। কেন নেবে? ফুল ত সবাইকেই আমি ভাগ ক'রে দিই। তা যারাই নিক, নিয়েছে ত নিয়েছে। দেবতার পূজোই ত হবে। হাতে ক'রে যারাই দিক্‌, এক দেবতাই ত পাবেন।"

"হাঁ, চুরি করা ফুল—তাও না কি আবার দেবতা পায়ে তুলে নেন?"

ভাগীরথী কহিলেন, "তা বোন্‌, ভক্তি ক'রে দেবতাকে যে যা দেয়, তাই তিনি পায়ে তুলে নেন। না নিয়ে পারেন? আর পূজোর ফুল ত পরের গাছ থেকে না ব'লে ক'য়ে যে পারে সেই তুলে নিয়ে যায়। আর তা যায় পূজো ক'রবে ব'লেই। ভাল ভাল ফুল গাছে দেখলে কেউ বড় লোভ সামলাতেই পারে না। তা এ লোভটায় এমন দোষও দিতে পারিনে বোন। যারটা নেয়, সে যাকে দেবে, যে নেয় সেও ত তাকেই দেবে। পাবার মালিক যিনি, যে ভাবে হ'ক পাওনাটা তাঁর পায়ে গিয়ে পৌছিলেই হ'ল। ঐ পশ্চিমের বাড়ীর এক ঠান্‌দিদি আমাদের ছিলেন—ত্রি-সংসারে কেউ ছিল না—তুই দেখিস নি। তিনি বলতেন, পূজোর ফুল চুরি ক'রে নিলে দোষ নেই। বাইও ছিল—রাত থাকতে উঠতেন, আর যত বাড়ীর যত ফুল চোখে প'ড়ত, সব তুলে নিয়ে যেতেন। কাজও ত আর কিছু ছিল না। রাত না পোয়াতেই উঠে সাজিটি নিয়ে বেরোতেন, আর পাড়ার যত বাড়ীর ফুল তুলে নিয়ে যেতেন।"

"ও মা! কেউ কিছু ব'লত না? গালমন্দ দিত না?"

হাসিয়া ভাগীরথী কহিলেন, "তা দিত না? খুবই দিত। সকালে উঠে যখন দেখত গাছে ফুল নেই, ডাক ছেড়ে যা মুখে আসত তাই ব'লে গাল দিত।"

"ভয় পেত না তাতে? লজ্জা ক'রত না?"

"কিচ্ছু না। গ্রাহ্যিই কিছু ক'রতেন না, মানুষও ছিলেন বড় তেজী, নাম ক'রে কেউ কিছু বলত না। যা বলত আড়ালে।"

বিধুমুখী কহিলেন, "সব ফুল এমনি ক'রে তুলে নিয়ে লুকিয়ে একা ঘরে বসে তাই দিয়ে পূজো ক'রতেন?"

না। সেটেই ত ছিল মজা! ঐ ফুল নিজে কিছু রেখে বাকী সব ভাগ ক'রে বাড়ী বাড়ী গিয়ে দিয়ে আসতেন। ফুল কারও বাড়ীতে থাক না থাক, সবাই কিছু না কিছু পেত। কাজেই খুসীও ছিল আবার অনেকে।"

"মাগো! বাইও ত সত্যি কম নয়।"

"বাই কত রকমই কত লোকের থাকে বোন। তার পর সংসারে কাজও ত আর কিছু ছিল না, ঐ একটা কাজ জুটিয়ে নিয়ে ছিলেন, সারাটা সকাল বেলা এই ক'রেই কাটাতেন। যাই দেখি, সতুদের কি শান্তদের বাড়ীতে যদি দুটো ফুল পাই। নইলে আজ বেলপাতা আর গঙ্গাজলেই পূজোটা সারতে হবে দেখছি। তা ঠাকুরের মর্জ্জি—যে দিন যেমন দেবেন তেম্‌নি পাবেন। তাঁরই দেওয়া জিনিষ বইত আর তৈরী ক'রে আমরা কিছু তাঁকে দিতে পারিনা।"

এই বলিয়া বড় ঘরখানির এক পাশ দিয়া পিছনের পথের দিকে অগ্রসর হইলেন। বিধুমুখীও সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন।

পথে আসিতেই কয়েকটি মেয়ে খিল্‌ খিল্‌ করিয়া হাসিয়া উঠিল। সকলের হাতেই ফুলভরা এক একটি সাজি।

"আ-মর! ছুঁড়ীগুলোর কাণ্ড দেখ না! আমারে ক্ষেপায় যেন। পাগল পেয়েছিস্‌ নাকি?"

"কেমন মজা ঠান্‌দি? হাঃ হাঃ হাঃ!"

"হিঃ হিঃ হিঃ।"

বিধুমুখী কহিলেন, দূর হ পাপগুলো! না ব'লে ক'য়ে এসে ফুল তুলে আনলি কেন লো?"

"নিয়ে ত পালিয়ে যাইনি; দেখলাম, ঠান্‌দি কি করে।"

"তা ঠান্‌দির কাজ এগিয়ে দিয়েছি! দু'দণ্ড ধ'রে একা একটি একটি ক'রে ফুল তুলত, আমরা টপ টপ ক'রে দেখতে দেখতে সব তুলে ফেলেছি।"

"হাঁ, বেশী ক'রে আজ ফুল দিতে হবে ঠান্‌দি, কতখানি কাজ তোমার এগিয়ে দিলাম।"

ভাগীরথী হাসিতেছিলেন; জীর্ণ মুখের কুঞ্চনরেখাগুলি আরও ঘন কুঞ্চনে গায়ে গায়ে মিলাইয়া সমস্ত মুখখানি ভরিয়া বড় মধুর হাসিই ফুটিতে ছিল। কহিলেন, "তা নে, তোদের যত খুসী নে। কেবল আমার সাজিতে আর বিধুর সাজিতে তোদের হাতে যেমন ওঠে দুটো দুটো ফেলে দে।"

"না ঠান্‌দি, তুমিই নেও, নিয়ে ভাগ ক'রে দুটি দুটি আমাদের দেও।"

মাথা নাড়িয়া তেমনই হাসিমুখে ভাগীরথী কহিলেন, "না

লো না, সে আর এখন হয় না লো। তোরা হ'লি কুমারী, হাতে তুলে যা নিয়েছিস্ তা নিয়েছিস্; ফিরিয়ে কি নিতে পারি? এখন ওরই দুটো দুটো যা হয় দে; তাই পেয়েই দেবতা আমার কৃতার্থ হবেন।"

হাসি মুখে মেয়েরা তখন এক এক থাবলা করিয়া ফুল ভাগীরথীর আর বিধুমুখীর সাজিতে তুলিয়া দিল। তারপরে সুর তুলিয়া মাঘ-মণ্ডল ব্রতের একটি গান গাহিতে গাহিতে চলিয়া গেল। বিধুমুখী গৃহে ফিরিয়া গেলেন। ভাগীরথীও গিয়া ঘরে উঠিয়া পূবের দিকের দরজাটি খুলিয়া দিলেন। বেশ রোদ আসিয়া সেখানে পড়িল। রোদে আসনখানি পাড়িয়া মালা লইয়া জপ করিতে বসিলেন।

(২)

"পিসীমা! ও পিসীমা! বলি ঘরে আছ?"

জপ সারিয়া মালাটি গুটাইয়া রাখিয়া কেবল তখন ভাগীরথী উঠিয়া দাঁড়াইয়াছেন। সাড়া পাইয়া তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া আসিলেন।

"কে রে! বাবা মহীন্ এলি! আহা! আয় বাবা আয়! কত কাল যে মুখখানি দেখিনি।"

বলিতে বলিতে ভাগীরথী প্রণত ভাতুষ্পুত্র মহীন্দ্রনাথকে বুকে জড়াইয়া ধরিয়া একেবারে কাঁদিয়া ফেলিলেন।

"ওরে, মা নেই, বাপ নেই; তাদের পুণ্যি ছিল—সব জ্বালা এড়িয়ে কবে স্বর্গে চ'লে গেছে। বুড়ো একটা পিসী কর্ম্মের দোষে পাপ এই পৃথিমীতে প'ড়ে রয়েছি, তা কি এমনি ক'রে ভুলে থাকতে হয় রে বাবা?"

আর্দ্র চক্ষুদু'টি কোঁচার খুটে পুছিয়া হাসিমুখখানি তুলিয়াই মহীন্দ্রনাথ কহিলেন "ভুলে কি আর আছি পিসীমা? চিঠি-পত্তর ত লিখছি।"

"তা ত লিখছিস্—খরচ-পত্তরও যখন যা দরকার পাঠাচ্ছিস্। তা মুখখানি চোখে না দেখলে বুকটা কি জুড়োয় বাবা? এই তো কত বছর গেল, বাড়ীমুখো একটি বার হলি নি। ঘর-দোর তো সব গোল্লায় গেল। এই আমি যে ক'টা দিন আছি, এর পর তোর বাপ-পিতেমোর বাস্তুভিটে শেয়াল-কুকুরের বাসা হবে। বেহ্মজ্ঞানী হ'য়েছিস্, না হয় পাল-পার্ব্বণ কিছু করবি নি। তাই ব'লে বাপপিতেমোর বাস্তুভিটে—তা কি এমনি ধারা আঁধার করে রাখতে হয় রে বাবা?—তা ব'স, ব'স, এই পীঁড়িখানায় ব'স্।" একখানা পীঁড়ি ছিল কাছে ঘরের বেড়ার গায়ে লাগান; তাড়াতাড়ি করিয়া ভাগীরথী সেখানি পাড়িয়া দিলেন।

বসিয়া মহীন্দ্রনাথ কহিলেন, "কি ক'রব পিসীমা? জাতমারা ক'রে রেখেছ তোমরা, গাঁয়ে এসে কি থাকবার যো আছে?"

"কেন থাকবে না? এসে যদি মাঝে মাঝে থাকিস্, ধ'রে কি মারবে তোদের কেউ? তবে বেহ্মজ্ঞানী হয়েছিস্, জাতধর্ম্ম কিছু মানিস্ না, খাওয়া দাওয়া তোদের সঙ্গে কেউ করবে না। তাই ব'লে কি লাঠি মেরে কেউ তাড়িয়ে দেবে? গাঁয়ে তো কত মোছলমানও আছে। আছে, তাদের ধর্ম্ম নিয়ে তারা আছে। কে তাদের কি ব'লতে যায়? তোরা কি তাদের চাইতেও আলাদা হ'য়ে গেছিস্? আর তোদের যে বেহ্ম—তার পুজো কি আমরাই করি না? এই তো গোরোদা (গৃহদাহ) হ'লে সবাই বেহ্মপুজো করে। আবার ঐ যে বারোয়ারী পুজো হয়, আর পাঁচ দেবতার সঙ্গে বেহ্মঠাকুর গড়িয়েও লোকে পুজো করে। আর বেহ্মা বিষ্টু শিব, এই তিন দেবতার নাম ত—"

হাসিয়া মহীন্দ্রনাথ কহিলেন, "ও পিসীমা, আমরা তোমাদের সে বেহ্মার পুজো করিনে, জান্‌লে।"

"ও মা! তবে আবার কোন্ বেহ্মার পুজো করিস্! কয়জন বেহ্মা আবার আছেন রে?"

"আমরা বলি একজন, আর তিনি হলেন ব্রহ্ম। আর তেত্রিশ কোটি দেবতার সঙ্গে তোমরা যার পুজো কর, তিনি হলেন ব্রহ্মা।"

"ও, তাই বল্! ত তফাৎ ত হবেই। শ্যাম হলেন কেষ্ট আর শ্যামা হলেন কালী। ঐ একটা 'আ'তেই কত তফাৎ হয়ে গেল। তা তোদের সে বেহ্ম কেমন রে? কি ধ্যান পড়িস্?"

মহীন্দ্রনাথ কহিলেন, "ও সব ধর্ম্মতত্ত্বের কথা এখন থাক্ পিসীমা। আর আমাদের এই বেহ্মর কথা মাথায়ও ঢুকবে না কিছু তোমার। তা এলাম এদ্দিন পরে, দু'টি

খেতে টেতে দেবে ত ? না, বল, শুধু তোমার পায়ের ধূলো নিয়েই কালীনগরে চ'লে যাই, সেইখানে গিয়েই খাওয়া দাওয়া করিগে।"

"ষাট ! কালীনগরে কেন যাবি খেতে ? বাড়ীতে এলি কত বছর পরে—বুড়ো একটা পিসী রয়েছি—আর ছুটো খেতে যাবি কালীনগরে ? ও মা, বলে কি ! কেন কালী-নগরে আবার কি ?"

হাসিয়া মহীন্দ্রনাথ কহিলেন, "সেইখানেই ত এসে-ছিলাম জরুরী একটা কাজে ঐ কিশোরীদের বাড়ীতে।"

"ও, তাই বল্ ! আমিও ত বলি, বলি হঠাৎ যে মহীন বাড়ীতে এল—কেন ? বুড়োপিসীর এত বড় ভাগ্যি আজ কিসে হ'ল ? তা কালীনগরে এসেছিলি—তাই বুঝি দয়া ক'রে একটু দেখা দিয়ে গেলি ? হায়রে কপাল !"

"তা যেখানথেকেই যেভাবে আসি, দেখা ত পেলে। না এলেই বুঝি ভাল হত ?"

"ষাট্, ষাট্ ! অমন কথা মুখেও আনতে নেই বাবা। এসেছিস, তবু মুখখানি একটিবার চোখে দেখলাম। তা আয়, ঘরের ভেতর আয়। সোস্তি হ'য়ে একটুখানি বস। ঘরে পেপে আছে, শাক আলু আছে, কেটে কুটে দি, আর ঐ সুবলদের বাড়ীতে এতক্ষণে গাই দোয়া হ'ল, কতটুকু দুধ এনে বলক তুলে দি, খা। তারপরে মাছের ঝোল ভাত রেঁধে দিচ্ছি—ও বাড়ীর তারককে পয়সা দেব, সে মাছ, তরকারী, দুধ এনে দেবে। আয়, ঘরে আয় !"

"ঘরে কি নেবে পিসীমা ? আমার যে জাত গেছে।"

"বালাই, জাত কেন যাবে ? একেবারে মোছলমান কিষ্টেন ত হ'সনি—বেহ্মজ্ঞানী। তারা শুনেছি অনেকটা আমাদের মতই থাকে ;—তবে কিনা জাতধর্ম্ম মানিস না, অনাচারটার কিছু হয়। তা বস্ বরং একটুখানি বাইরেই বস্। আমার মালার ভুঙ্গী, পুজোর ফুল, জল, বাসন-কোসনগুলো আর জলের কলসীটা পেছনের চালায় নিয়ে রেখে আসি।"

"আবার অতটা হাঙ্গমা করবে ? তা ঘরের ভেতর নাই গেলাম। এই বারান্দায়ই দিনটা বেশ কাটিয়ে দিতে পারব—একটা মাদুর-টাদুর এনে বরং বিছিয়ে দেও। সন্ধ্যা বেলায় ত আবার কালীনগরেই ফিরে যাব।"

"তা সে যখন যেতে হয় যাবি। তাই বলে ঘরের ছেলে ঘরে এসেছিস্—তোরই বাড়ী-ঘর। সারাটি দিন বাইরের একটা লোকের মত বাইরে বসে থাকবি—তাও কি হয় কখনও ? আমিই বা কোন্ প্রাণে তাই চোখে দেখব ? তাজামা আর কি ? কি জানিস্ বাবা, জাতধর্ম্ম কিছু মানিস্ না, অনাচারটার করিস্, মনটা খুঁৎ খুঁৎ করে।—তা আমরা পাপী মানুষ কিনা, তাই ; নইলে দেবতার কি আর সত্যি ছুঁৎ কিছু লাগে ! দেবতা কোথায় না আছেন ?—তবে কি না, দেবতাকে নাকি আত্মবৎ দেখতে হয়, আত্মবৎ সেবা করতে হয়। অবোধ মন—নিজের যাতে ছুঁৎ লাগে, মনে হয়, দেবতারও লাগে। তা বস্ একটুখানি বাবা।"

বলিয়া ভাগীরথী ঘরের ভিতরে গিয়া উঠিলেন। মালার ভুঙ্গী, জলের কলসী, পূজার ফুল জল, আহার্য্যের দুই চারিটা দ্রব্য যাহাতে ছুঁৎ লাগে, পিছনের চালায় নিয়া রাখিয়া আসিলেন। চারিদিকে একবার চাহিয়া দেখিলেন, আর কোনও দ্রব্য এমন আছে কিনা বি-ধর্ম্মী ও অনাচারী ভ্রাতুষ্পুত্রের গৃহ-প্রবেশে যাহার বিশুদ্ধি ক্ষুণ্ণ হইতে পারে। কিন্তু চোখে কিছু পড়িল না। দূর হ'ক ছাই, এমন থাকেই যদি দুই একটা দ্রব্য কিছু, না হয় ফেলাই যাইবে, না হয় বাইরের লোক কাউকে ডাকিয়া দিয়া দিবেন। তাই বলিয়া মহীন বাহিরের লোকের মত কতক্ষণ বাহিরে কেবল ঐ ছাই একটু পীঁড়িতে বসিয়া থাকিবে ?

"আয়, ঘরে আয় ! হাসছিস্ যে ! ভাবছিস বুড়ীকে ছুঁৎরোগে ধরেছে ?"

ঘরে উঠিতে মহীন্দ্রনাথ কহিলেন, "ছুঁৎরোগ বুড়ী ছুঁড়ী তোমাদের সবারই আছে। তাতেই ত দেশটা গেল।"

ভাগীরথী উত্তর করিলেন, "তা বাবা, জাতধর্ম্ম একটা থাকলে আচার-নিয়মও পাঁচ রকম থাকে, মেনেও তা চ'লতে হয়। দেশটা গেল গেল যে তোরা সবাই বলিস, গেল ত অনাচারে, আচার-নিয়ম কেউ মেনে চলে না, তাই। গেরস্ত লোককে ও সব মেনে চ'লতে হয়। তাতেই ভাল-ভালাইতে সবাই থাকে। যার যা খুসী তাই করলে সব তো ছন্নছাড়া হয়ে পড়ে ; ভাল কারও কিছু তাতে হতে পারে ? তবে যোগী সন্ন্যাসী মহাপুরুষ যাঁরা—তাঁরা শুনেছি আচার-নিয়ম কিছু মেনে চলেন না। তা সে তাঁদের কথা হ'ল আলাদা। গেরস্ত লোক ত তাঁরা নন্, ওসব কিছু মেনে চলতে হয় না।

আবার পুণ্যির জোরও আছে—জ্ঞানী লোকও সবাই—তাঁদের সঙ্গে কি এই সব গেরস্ত লোকদের তুলনা হয় ?”

বলিতে বলিতে ক্ষিপ্রহস্তে ভাগীরথী মাদুরের উপরে একখানি তোষক এবং তাহার উপরে পরিষ্কার একখানি চাদর ও একটি বালিস পাড়িয়া দিলেন। আর কোনও বাদ-বিতণ্ডা না তুলিয়া মহীন্দ্রনাথ শালটি গায়ে জড়াইয়া একটু হেলিয়া পা দুইটি ছড়াইয়া দিয়া তাহার উপরে বসিলেন। সকালে বন্ধুর গৃহ হইতে প্রচুর চা-যোগ করিয়া আসিয়াছিলেন ; পিসীমার প্রদত্ত গ্রাম্য ফলদুগ্ধাদিতে ‘জলযোগে’র স্পৃহা কিছু ছিল না। তবে পিসীমার মন-মান রক্ষার্থে কিঞ্চিৎ ‘মুখস্থ’ ও ‘উদরস্থ’ তাঁহাকে করিতে হইল।

ভ্রাতুষ্পুত্রকে এই জলযোগে কিছু ‘সুস্থ’ করিয়া ভাগীরথী একটি টাকা লইয়া বাহির হইলেন। পাড়ার একটি লোককে দিয়া ত্বরিত বাজার হইতে মাছ, তরকারী, দুধ ইত্যাদি আনাইলেন। দ্বিপ্রহরের মধ্যেই পাঁচ ভাগ রাঁধিয়া সম্মুখে বসিয়া তাঁহাকে খাওয়াইলেন। খাওয়া হইলে উচ্ছিষ্ট বাসন ইত্যাদি মাজিয়া ধুইয়া আনিয়া স্নান করিয়া আসিলেন। চালায় গিয়া গঙ্গাজলস্পর্শে শোধিত হইয়া পূজা আহ্নিক সারিলেন, নিজের হবিষ্য পাক করিয়া আহার করিলেন। এই বৃদ্ধ বয়সেও পিসিমার কর্ম্মকুশলতা ও ক্ষিপ্রকারিতা দেখিয়া মহীন্দ্রনাথ একেবারে বিস্মিত হইয়া গেলেন।

একটু গড়াগড়ি দিয়া ভাগীরথী উঠিলেন ; তখন বেলা পড়িয়াছে। নিদ্রাভঙ্গে চোখেমুখে জল দিয়া মহীন্দ্রনাথও বারান্দায় আসিয়া বসিলেন।

এক বাটী ক্ষীর, কিছু মুড়ী কলা আর মিষ্ট আনিয়া ভাগীরথী সম্মুখে রাখিলেন।

“কি সর্ব্বনাশ! তুমি কি ক্ষেপেছ পিসীমা ? এ গুলো খাবে কে ? এই ত কেবল ভাত খেয়ে উঠলাম। আমি কি এখন আর ছেলে মানুষটি আছি ?”

গালে হাত দিয়া ভাগীরথী কহিলেন, “ওমা, বলে কি! কত বুড়ো হ’য়েছিস রে মহীন্ ? বয়েস ত এই চুয়াল্লিশ সবে হ’ল। তোর বাবা চুয়ান্ন বছরেও অমন দু’তিন বাটী ক্ষীর খেতে পারত, সঙ্গে আরও কত আম খেত, কাঁটাল খেত, কলা খেত—”

হাসিয়া মহীন্দ্রনাথ কহিলেন, “তোমাদের সেই বৃকোদরের দ্বাপর যুগ আর এখন নেই পিসীমা। ঘোর কলি উপস্থিত, মানুষ সব বেজায় ক্ষীণজীবী হ’য়ে প’ড়েছে। চল্লিশ পেরোলেই এখন সব বুড়ো, আর অম্বল, অজীর্ণ সেই জীর্ণ দেহের একবারে অন্তরঙ্গ হ’য়ে দাঁড়ায়।”

“পোড়া কপাল! তাই ব’লে এই ক্ষীরটুকু খেতে পারবিনি ? সবে ত এক সের দুধ মেরে এই ক্ষীর ক’রেছি!”

“ও বাবা! একসের দুধের ক্ষীর। পাতলা এক পো’ দুধ যে পেটে সয় না।”

“অবাক্ করলে! ক’দিন তা’হলে বাঁচবি ? পোড়া যম ত আমাকে চোখে দেখবে না ? কত কাল যে এই পাপের বোঝা আর বইব ? তা, খা—খা—আমি বলছি, কিছু হবে না।”

“তুমি ব’ল্লেই যদি কিছু হ’ত কি হ’তনা পিসীমা, তবে আর ভাবনা ছিল কি ? তুমি ত একশ বছর পরমাই হ’ক, হাজার বার একথা ব’লেছ। তা যে হবে না, একথা লিখে প’ড়ে আমি দিতে পারি।”

“কেন হবে না ? খেলেই পরমাই বাড়ে। এই চুয়াল্লিশ বছরেই এক পো’ দুধ খেতে পারবিনি, পরমাই দাঁড়াবে কিসের জোরে ? খুব খা-দা, দেখিস পরমাই হবে।”

“ঐ ক্ষীর যদি খাই পরমাই আজ এই চুয়াল্লিশেই দাঁড়াবে, এক পাও আর এগোবে না।”

“বালাই! বালাই! অমন কথা মুখেও আনতে আছে ? আমি হাতে ক’রে এনেছি, ও অমেধ্যো! তা সব না খাস, যা পারিস একটু খানি গালে তুলে দে। নইলে প্রাণটা আমার পুড়ে ছাই হ’য়ে যাবে।”

ক্ষীরের বাটী পিসিমা ভ্রাতুষ্পুত্রের কাছে সরাইয়া দিলেন।

“তা হ’লে একটু খানি হাতে তুলে বরং দেও। ছুঁয়ে আর কেন নষ্ট ক’রব ? পাড়ার ছেলেরা খাবে।”

“তা খাবে। তাদের আবার জাতবিচের কিছু আছে কিনা ? আর ও সব আজ কালকার ছেলে। খা না তুই নিজে তুলে যে টুকু পারিস্।”

মহীন্দ্রনাথ একটু খানি ক্ষীর তুলিয়া লইলেন। ভাগীরথী একটি সন্দেশও হাতে গুঁজিয়া দিলেন। অগত্যা তাহাও মুখে দিয়া হাত মুখ ধুইয়া মহীন্দ্রনাথ কহিলেন, “তা হ’লে আজকে উঠি পিসীমা। থাকতে আর পারব না, আজ রাত্তিরেই ওখানে কাজ আছে কিনা—”

"তা কবে যাবি ক'লকাতায় ?"

"কালই যেতে হবে।"

"তা আমাকেও কেন অমনি নিয়ে যা না বাবা ?"

"তুমি ! তুমি যাবে ক'লকাতায় ! বল কি পিসীমা !"

একটি নিশ্বাস ছাড়িয়া ভাগীরথী কহিলেন, "তা যদি নিয়ে যেতিস্ বাবা, গঙ্গাস্নান ক'রে কালীমাকে দর্শন ক'রে আস্‌তাম। কপালে ত ঘটে না। বৌমাকে আর ছেলে মেয়ে কটিকেও কতকাল দেখিনি। সেই উমিকে কোলে নিয়ে কত বচ্ছর আগে এসেছিল—আর বাছাদের কাউকে চোখে দেখিনি।"

মহীন্দ্রনাথ কি ভাবিয়া একটু হাসিলেন; কহিলেন, "তা আমাদের সেই খিষ্টেনী বাড়ীতে কি তোমার পোষাবে পিসীমা ?"

"তা তোরা ত একেবারে খিষ্টেন হ'স্‌নি। তারা খিষ্ট ভজে, গরু শুয়োর খায়—রাম বল ? তা তোরা হ'লি বেহ্মজ্ঞানী অত অনাচার ত করিস্‌নি, না, করিস ?

"না, অতটা করি না। তবে—"

"তবে—আর কি ? আর কিছু বলিস্ নি বাবা, আমি শুনতে চাইনে। তা আমায় নিয়ে যা, আলাদা একটা ঘরে থাকব। একটুখানি গঙ্গাজল আনিয়ে দিস্, পূজো আহ্নিক ক'রব, এক মুঠো হবিষ্যি রেঁধে খাব। তোদের অনাচারে আমার কি এসে যাবে ?"

"বেশ, তা যেতে চাও যাবে। কিন্তু—অসুবিধে তোমার কিছু হবে। সেটা বোঝ।"

"কিছু অসুবিধে হবে না আমার। তীর্থে যাব অসুবিধে একটু হ'লেই বা কি ? দু'দিন না খেলেই বা কি এমন এসে যায় ? তোর বাড়ীতে প'ড়ে আছি, ম'রে গেলেই এদিক্‌কার সব ফুরোল। এই একটি আবদার আমার রাখবি না মহীন ?"

"আচ্ছা, ইচ্ছে যদি এমন হয়, যাবে। তৈরী হ'য়ে থেকো। সন্ধ্যের পরেই কাল আমি এসে নিয়ে যাব তোমাকে।"

প্রণাম করিয়া পিসীমার পদধূলি লইয়া মহীন্দ্রনাথ উঠিলেন। পাড়ার এ বাড়ী ও বাড়ী খুড়ী, জ্যাঠাই, পিসী, ঠানদিদি, বৌঠাকরুণ, দাদা, খুড়া, জ্যাঠা যাঁহারা ছিলেন, ওবেলায় অনেকেই আসিয়া দেখা করিয়া গিয়াছিলেন। যাইবার সময় মহীন্দ্রনাথ সবাইকে ডাকিয়া প্রণাম করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে সকলে পাড়ার বাহিরে বড় রাস্তা পর্য্যন্ত আসিলেন। মধ্যে মধ্যে এক একবার বাড়ী ঘরে আসিতেও বহু অনুরোধ সকলে করিলেন।

(৩)

পিসীমাতা এবং প্রতিবেশী স্বজনগণের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া বেশ একটু চিন্তাকুল চিত্তেই মহীন্দ্রনাথ বন্ধুর গৃহে ফিরিয়া আসিলেন। চিন্তার কারণ ছিল। নিজে তিনি যারপরনাই সদাশয় ও আনন্দময় স্বভাবের লোক ছিলেন। কলিকাতায় যখন কলেজে পড়িতেন, তখন ব্রাহ্ম-সমাজে খুব যাতায়াত করিতেন। কতিপয় ব্রাহ্মযুবকের সঙ্গে বন্ধুত্বও জন্মে। ক্রমে এক ব্রাহ্মপরিবারের আই, এ পাশ কোনও যুবতীর প্রতিও চিত্ত বেশ আকৃষ্ট হইয়া ওঠে। ইহার সঙ্গে দাম্পত্য মিলনের প্রয়োজন যখন অতি তীব্রভাবে অনুভব করিলেন, তখন ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রতিও মনের বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা তিনি জাগাইয়া তুলিলেন। পিতা-মাতা তখন পরলোকে। ইহলোকে এই বিধবা পিসীমা মাত্র ছিলেন। দীক্ষা ও উদ্বাহ পর পর দুইটি অনুষ্ঠান সহজেই সম্পন্ন হইয়া গেল। তারপর পিসীমার আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করিয়া একখানি পত্র লিখিলেন। তখন আর পিসীমা কি করিবেন ? পরলোকগত ভ্রাতা, ভ্রাতৃবধূ, পিতা-মাতা প্রভৃতি প্রিয় স্বজন-গণের জলপিণ্ডাদি লোপ জনিত ভাবী দুর্গতির কথা চিন্তা, যথারীতি বিলাপ-পরিতাপ যতদূর পারিলেন করিলেন, প্রতিবেশিবর্গও সমবেদনা ও সান্ত্বনা যতদূর দেওয়া যায়, কার্পণ্য কেহ কিছু তাহাতে দেখাইলেন না। মনের ভারও কিছু লঘু হইল। অগত্যা তখন ভ্রাতৃবংশ-তিলক মহীন্দ্রনাথকে ও নববধূমাতাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া একখানি পত্র ভাগীরথী লিখিলেন। প্রজাপতির আশীর্ব্বাদে ও মা ষষ্ঠীর কৃপায় বহু সুসন্তান তাহাদের হউক, জলপিণ্ডাদির অভাবে ক্ষুৎপিপাসায় পরলোকগত পিতৃপিতামহগণ যতই ক্লিষ্ট হউন, বংশের অস্তিত্ব পৃথিবীতে বর্ত্তমান থাকিবে, পুন্নাম নরকে তাঁহাদিগকে পতিত হইতে হইবে না, ইহাই অগত্যা এখন কতকটা সান্ত্বনার স্থল তাঁহাদের হইবে। তা অভাগা পিসীমাতাকে মহীন যেন বিস্মৃত হয় না। মধ্যে মধ্যে তাহাদের

চন্দ্রবদনদ্বয় দর্শনে যেন তিনি কিছু আনন্দ লাভ করিতে পারেন ; ইত্যাদি।

প্রথম কয়েক বৎসর পিতৃস্বসাকে এই সুধা বিতরণে মহীন্দ্রনাথ কার্পণ্য বড় করেন নাই। ক্রমে যখন ছোট ছোট আরও দুই একটি চন্দ্রের উদয় আরম্ভ হইল, পৌত্তলিকতায় কোনও কলঙ্ক-পাতে কোমল সেই শিশুচন্দ্রগুলি পাছে কিছু মলিন হয়, এই ভয়ে তাহাদের জননী সুকল্যাণী অতি শঙ্কিত হইয়া উঠিলেন। বর্ষার জলের মতই পৌত্তলিকতা পল্লীগ্রামগুলিকে ছাইয়া ঢাকিয়া আঁধার করিয়া রাখিয়াছে। মাসে মাসে ব্রতপূজার অন্ত নাই ; শঙ্খ কাঁসর ঘণ্টাধ্বনি নিত্য সকালে সন্ধ্যায় গৃহে গৃহে উত্থিত হয় ; শৃগাল রববৎ হুলুধ্বনি ও যখন তখন শোনা যায়! প্রায় প্রতি শনিমঙ্গলবারে দল বাঁধিয়া ফল-ফুল-চাউল-কদলী সহ নারীরা 'তথাকথিত' দেবালয়ে যায়। কে জানে কোন্ অলক্ষ্য সূত্রে এই সব জঞ্জাল—জঞ্জালের কোনও কণ্টকিত গুল্মের বীজ ইহাদের উর্ব্বর হৃদয় ক্ষেত্রে অঙ্কুরিত হইয়া উঠিবে, কোন্ আঁধার ছায়া তাহাদের নির্ম্মল চিত্তফলকে ভুরপনেয় কাল দাগ আনিয়া ফেলিবে, তাই ইহাদের লইয়া কিছুতেই আর তিনি পল্লীগ্রামে আসিতে চাহিলেন না। মহীন্দ্রনাথ একা দুই একবার আসিয়াছেন ; কিন্তু তাহাও শেষে বন্ধ হইয়া গেল। ইচ্ছা একটু আধটু যখন হইয়াছে, সুকল্যাণী নানা অসুবিধার ওজর দেখাইয়াছেন। শেষে এই ইচ্ছা হওয়াটাই তাঁহার দূর হইয়া গেল।

এখন পৌত্তলিকতার প্রতি এতাদৃশী বিদ্বেষিণী সুকল্যাণী যে গৃহের কর্ত্রী, সেই গৃহে পরমপৌত্তলিকা পিসীমাতার উপস্থিতি কত রকম অশান্তির বিক্ষোভ যে সৃষ্টি করিবে, তাহা উপলব্ধি করিয়া মহীন্দ্রনাথ সত্যই বড় উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিলেন। কিন্তু উপায়ান্তর ছিল না। পিসীমা এমন করিয়া নিজের এই আকাঙ্ক্ষা জানাইলেন, এখন কোন্ প্রাণে কোন্ মুখে তিনি বলিতে পারেন, না, তোমাকে কলিকাতায় আমার বাড়ীতে লইয়া যাইতে পারিব না ? যাহাহউক নিতান্তই যদি অসুবিধা কিছু হয়, বাড়ীর কাছেই তাঁহার বন্ধু উপেনবাবুর বাড়ীতে, যে কয়দিন থাকিতে চাহেন পিসীমাকে রাখিয়া দিবেন। এই উপেনবাবু উদারমতাবলম্বী হিন্দু অর্থাৎ হিন্দু-সমাজভুক্ত, বিবাহাদি ক্রিয়া-কর্ম্ম হিন্দু মতেই নির্ব্বাহ করেন ; কিন্তু নিত্যনৈমিত্তিক কোনও কর্ম্মানুষ্ঠান গৃহে কখনও হয় না। সুতরাং ইঁহার সঙ্গে স্বামীর ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্বে সুকল্যাণীর আপত্তি কিছু ছিল না। ছেলে মেয়েরা সদাসর্ব্বদা ইঁহার গৃহে যাইত। ইঁহার গৃহে অবস্থিতি হেতু তাহাদের মুখদর্শনে পিসীমা ব্যথিত ত হইবেনই না, আবার উপেনবাবু ও তাঁহার স্ত্রীও যথোচিত আদর-যত্নে তাঁহাকে গৃহে রাখিবেন।

তবে পিসীমাকে লইয়া একেবারেই গিয়া গৃহে উঠিবেন, অপ্রত্যাশিত এই অতি অপ্রীতিকর ঘটনায় না জানি সুকল্যাণী কি বিশ্রী একটা গোলমালই ঘটাইয়া তোলেন, তাই পূর্ব্বেই একটু সাবধান করিয়া দিবার অভিপ্রায়ে মহীন্দ্রনাথ একটা টেলিগ্রাম করিয়া দিলেন,—পিসীমাকে লইয়া পরদিন প্রাতঃকালে তিনি কলিকাতায় পৌছিবেন।

যথাসময়ে মহীন্দ্রনাথ পিসীমাকে লইয়া বাড়ীতে গিয়া উঠিলেন। পূর্ব্বে যে সংবাদ পাঠাইয়াছিলেন তাহাতে অবশ্য এইটুকু সুবিধা হইল যে, তাঁহার দর্শন মাত্র সুকল্যাণীর হিষ্টিরিয়া হইল না, অথবা সজ্ঞানে এমন কিছু একটা গোলমাল তিনি করিলেন না, যাহাতে মহীন্দ্রনাথ অতি অপ্রতিভ হইয়া পড়িতে পারেন। অতি গম্ভীর-বদনে পিসী-শাশুড়ীকে একটা নমস্কার করিয়া বসিবার জন্ম একখানি চেয়ার দেখাইয়া দিলেন। ছেলেমেয়েরাও তদ্রূপ নমস্কার করিয়া একটু দূরে সরিয়া দাঁড়াইয়া মিটিমিটি হাসিতে লাগিল; মাতৃ-শাসন ভয়ে কাছে ঘেঁসিয়া বেশী কিছু কথা বলিতে ভরসা পাইল না। ভাগীরথীরও মনটা কেমন দমিয়া গেল।—নাতি-নাতনীদের হাসিমুখে আদর করিয়া কাছে ডাকিতে অথবা কাছে গিয়া আদর করিতে পারিলেন না। ভ্রাতুষ্পুত্র-বধূর নির্দ্দিষ্ট চেয়ারখানির দিকে একবার দৃষ্টিপাত করিয়া ভ্রাতুষ্পুত্রের মুখপানে ফ্যাল ফ্যাল করিয়া চাহিয়া রহিলেন। মহীন্দ্রনাথ একটু হাসিয়া কহিলেন, "তোর দিদিমাকে একখানা আসন-টাসন কিছু এনে দে উর্ম্মি।"

তখন উর্ম্মিমালা একখানি আসন আনিয়া গৃহতলে পাতিয়া দিয়া কহিল, "এইখানে বসুন দিদিমা।"

মালার ঢুক্নীটি হাতেই ছিল, পাশে সেটি রাখিয়া নিঃশব্দে ভাগীরথী সেই আসনে বসিলেন।

মহীন্দ্রনাথ কহিলেন, "কোন্ ঘরে উনি থাকবেন ঠিক করেছ ?"

পূর্ব্ববৎ গম্ভীর ভাবেই সুকল্যাণী উত্তর করিলেন, "এদিককার সব ঘরই ত অকুপায়েড্ (জোড়া); ফার্ণিচার (আসবাব-পত্র) সব রিমুভ করে (সরিয়ে) একটা যায়গা করে দেওয়ার সুবিধে হ'ল না। বারান্দার ওদিকে বাথরুমটার পাশে যে ছোট ঘরটা আছে—ময়লা কাপড়গুলো রাখা হ'ত—সেইখানে থাকতে পারেন।"

একটু ভ্রূকুটি মহীন্দ্রনাথের ললাটে দেখা দিল। কহিলেন, "রান্না-বান্না?"

"আমাদের ত বামুনেই রাঁধে, নিরামিষ তরকারীও হয়। তা, ওঁর যদি তেমন প্রেজুডিস্ (কুসংস্কার) থাকে, ঐ ঘরেই একটা তোলা উনুনে রেঁধে খেতে পারেন।"

"হুঁ, আচ্ছা, হ'ক তাই আজকের মত। হাঁ, ঘরটা পরিষ্কার আছে ত?"

ঊর্ম্মি কহিল, "হাঁ, কাল বিকেলেই বেশ ক'রে ধুইয়ে টুইয়ে রেখেছি।"

বলিয়া পিতার কাণের কাছে মুখ আনিয়া চুপি চুপি কহিল, "ঝিকে দিয়ে লুকিয়ে একটু গোবর আনিয়েও জলের বাল্‌তিতে দিয়ে নিয়েছিলাম।"

একটু হাসিয়া মহীন্দ্রনাথ চাকরকে ডাকিলেন, "ওরে, ও বেহারী! ওরে, পিসীমার জিনিষপত্তরগুলো সব ঐ বাথরুমের পাশের ঘরটায় নিয়ে যা ত?"

বেহারী ঘরে ঢুকিতেই পিসীমা তাঁহার মালার ভুল্পীটি সরাইয়া কোলের কাছে আনিলেন। বেহারী অন্যান্য জিনিষপত্র লইয়া গেল। ঊর্ম্মি পিতার আদেশে ভাগীরথীকে লইয়া গিয়া সেই ঘরে পৌঁছিয়া দিল।

সুকল্যাণী তখন কহিলেন, "একি কাণ্ডটা তুমি ক'রলে বল দিকি?"

"কি করব সুকু? উনি অত ক'রে ধ'রে প'লেন।"

"তাই ব'লে একটিবার আমাকে জিজ্ঞাসা করলে না, আমার সুবিধে অসুবিধে কিছু হবে কি না ভাবলে না, একেবারে বাড়ীতে এনে তুল্লে—এটা কি তোমার উচিত হয়েছে?"

"কেন, টেলিগ্রাম তো করেছিলাম কাল।"

"সে ত খবর একটা কেবল দিয়েছিলে, ওঁকে নিয়ে আসছ। আমার মতের অপেক্ষা ত কিছু করনি?"

"সময় পেলাম কই, সুকু? তা কি এমন অসুবিধা তোমার হবে? ঐ ওধারে একটা ঘরে উনি থাকবেন, দুটি রেঁধে খাবেন।"

রুক্ষস্বরে সুকল্যাণী বলিয়া উঠিলেন, "শুধু রেঁধেই যদি দুটি খেতেন অসুবিধে এমন কিছু ছিল না। কিন্তু উনি নাইতে যাবেন গঙ্গায়, পুজো টুজো করবেন।"

"তা ত ক'রবেনই। তাতেই বা আমাদের অসুবিধে কি এমন হবে।"

"না, আমার এ ঘরে ও সব চ'লতেই পারে না! পৌত্তলিকতার কোনও অনুষ্ঠানে গৃহের পবিত্রতা ক্ষুণ্ণ হবে, সেটা আমি কিছুতেই অনুমোদন করতে পারি না। পাপ বলে যা মনে করি, তার কোনও প্রশ্রয় আমি কি করে দেব? ছেলেমেয়েদের সামনে অতি বড় একটা কুদৃষ্টান্ত তাতে দেখান হবে। এর পর যদি তারা কোনও অন্যায় করে, কি ব'লে আমি শাসন ক'রব? আর এও তো জান, এসব পাপের সংস্পর্শ থেকে কত সাবধানে আমি ওদের দূরে রক্ষা করছি!"

"বল কি সুকু! চুরিও না, ডাকাতিও না, নিজের ঘরে বসে উনি পুজো-আহ্নিক করবেন, তাতে কি এমন পাপ আমাদের হবে?"

দৃঢ়স্বরে সুকল্যাণী উত্তর করিলেন, "পৌত্তলিকতার চাইতে বড় পাপ কিছু নেই—হ'তেই পারে না। কারণ ঈশ্বরের অবমাননা এতে হয়। নিষ্ঠাবান্ কোনও ব্রাহ্মগৃহে পৌত্তলিক কোনও অনুষ্ঠান চলতেই পারে না।"

"বড় যে সর্ব্বনেশে কথা বলছ সুকু! গঙ্গাস্নান না ক'রে, পুজো-আহ্নিক না ক'রে, উনি যে জল গ্রহণই করবেন না! বুড়ো পিসীকে বাড়ীতে এনে শেষে না খাইয়ে মারব?"

"আগেই এটা ভাবা উচিত ছিল তোমার! আমাকে যদি জানাতে, আমি বুঝিয়ে দিতে পারতাম, এ বাড়ীতে একটি দিনও ওঁর থাকা চ'লতে পারে না।"

"তাহ'লে এখন কি করি বল? ওঁকে কি বাড়ী থেকে পথে বের ক'রে দেব? সেটা কি দয়ার কাজ হবে, না ভদ্রতাই হবে?"

নীরবে কিয়ৎকাল ভ্রূকুটি করিয়া থাকিয়া সুকল্যাণী কহিলেন, "ক'দিন ওঁকে রাখতে চাও এখানে?"

"ক'দিন আর চাইনে সুকু! যদি বল, কালই উপেনকে

ব'লে তার বাড়ীতে ওঁকে রেখে আসব কিন্তু উনি আমার পিসী—মাতে ওঁতে তফাৎ কখনও দেখিনি। বাড়ীতে নিয়ে এসেছি, এক সন্ধ্যে অন্ততঃ না খাইয়ে ওঁকে বের করতে পারব না। খাওয়াতে হ'লে ওঁকে গঙ্গাস্নান করাতে হ'বে, ওঁর পূজো আহ্নিকের ব্যবস্থাও সব ক'রে দিতে হবে। পাকের জন্ত গঙ্গাজল আনিয়ে দিতে হ'বে। আর ঐ বাথরুমের পাশে ওঁকে জায়গা দিয়েছ, আজ মেথর ওঁর দোরের সামনে দিয়ে সেদিকে যেতে পারবে না।"

সুকল্যাণী শিহরিয়া উঠিলেন।

"সর্ব্বনাশ! সে কি ক'রে হ'তে পারে? মেথর তো এই ন'টায় আসবে। ঘর ধুয়ে ফেনাইল না দিয়ে গেলে দুর্গন্ধ হবে যে! ছেলেপিলেদের হেল্‌থ এ্যাফেক্ট (স্বাস্থ্যহানি) ক'রবে যে!"

মহীন্দ্রনাথ কহিলেন, "হয় অন্ত একটা ঘর ওঁকে দেও, না হয় ও বাথরুম আজ ব্যবহার করো না। আর না হয় ঊর্শ্মি নিজে গিয়ে ঘর ধুয়ে ফেনাইল দিয়ে আসবে। না, ফেনাইল চ'লবে না। ওঁকেও তো যেতে হবে। গোবর দিয়ে বরং—"

"গোবর! ক্ষেপেছ তুমি! গোবর!"

গোবরের নামে বিকট একটা চীৎকার করিয়া সুকল্যাণী প্রায় মূর্চ্ছা যাইবার মত হইলেন।

হাসিয়া মহীন্দ্রনাথ কহিলেন, "ওগো, গোবরটা নেহাৎ খারাপ জিনিষ নয়, খুব ভাল একটা ডিস-ইন্‌ফেক্টাণ্টই (শোধক দ্রব্য) বটে। সাহেব ডাক্তাররাও সেটা আজকাল স্বীকার করে থাকেন। । পৌত্তলিকতাও ওতে কিছু নেই—যদি তারা ওটা সর্ব্বদা ব্যবহার করে থাকে। কেমন পারবি না ঊর্শ্মি?"

"কেন পারব না? ঝি গোবর নিয়ে আসুক, এখুনি আমি গিয়ে ঘর ধুয়ে টুয়ে দেব।"

ভ্রূকুটি-কুটিল অগ্নিদৃষ্টিতে সুকল্যাণী কন্তার দিকে চাহিলেন। কিন্তু দৃষ্টি ব্যর্থ হইল। মাতার নিকট হইতে এরূপ একটা রোষপ্রকাশের সম্ভাবনা বুঝিয়া ঊর্শ্মি সেদিকে আদৌ ফিরে নাই; পিতার মুখের দিকেই চাহিয়া ছিল।

মহীন্দ্রনাথ কহিলেন, "বেশ তো, তুই-ই করবি। এসব কাজ মাঝে মাঝে নিজেদের হাতেও করতে হয়। নইলে কেউ কখনও পারে না। মেথর যদি একদিন না এল, একেবারে অসহায় হয়ে পড়তে হয়। বামুন না এলে তবু হোটেলে গিয়ে কি খাবার-টাবার কিনে এনে দু'টো দিন চালান যায়। কিন্তু মেথর নইলে একদিনও চলে না। মেথর-ধাঙ্গড়রা যদি ধর্ম্মঘট করে, সহরশুদ্ধ লোকের ত্রাহি ত্রাহি ডাক ছাড়তে হয়। তাহ'লে কি বল খুকু? এই বন্দোবস্তই আজ হ'ক। কাল সকালেই ওঁকে উপেনের ওখানে নিয়ে রেখে আসব।"

অগত্যা সুকল্যাণী কহিলেন, "তা—উপায় যদি নাই থাকে, একদিন কাজেই এটা সইতে হবে, যদিও বুঝতে পারছি গৃহের পবিত্রতা এতে নষ্ট হবে।"

একটু হাসিয়া মহীন্দ্রনাথ কহিলেন, "তা না হয় অনুতাপ করে বিশেষ একটা প্রার্থনা সেটা শোধরাতে কাল করা যাবে।"

ভ্রূকুটি করিয়া সুকল্যাণী কহিলেন, "কেন, একটা দিন কি উনি আমাদের ধর্ম্মমতের মর্য্যাদা রাখতে পারেন না।"

"কি, গঙ্গাস্নান পূজো-আহ্নিক সব ছেড়ে? না, তা পারেন না। না খেয়ে বরং দু'টোদিন কাটিয়ে দিতে পারেন, কিন্তু ওটা একদিনও বাদ দিতে পারেন না।"

"তাহ'লে তুমি নিজে যা হয় বন্দোবস্ত করগে, আমি কিন্তু পারব না, আমার ছেলেপিলেরাও পারবে না।"

"তাই হবে" ঘড়ী খুলিয়া দেখিলেন সাড়ে আটটা তখন বাজিয়াছে।

"ও বেহারী! ওরে, যা ত, শীগ্‌গির করে একটা ট্যাক্সী নিয়ে আয় ত, গঙ্গায় যাবে।"

ঊর্শ্মি কহিল, "চা-টা খাবে না বাবা?"

"না না, আর সময় নেই। আফিসে যেতে হবে যে।"

ট্যাক্সী আসিল, তখনই মহীন্দ্রনাথ পিসীমাকে লইয়া গঙ্গায় গেলেন। ভাগীরথী স্নান করিয়া পূজা আহ্নিক সব অমনই ভাগীরথীতীরেই সারিয়া আসিলেন। বেহারী সঙ্গে গিয়াছিল, এক কলসী জল লইয়া আসিল। এদিকে ভ্রূকুটি-কুটিলাননী সুকল্যাণী আদেশ দিলেন, ঊর্শ্মিমালা চাউল, ডাইল, তরকারী, দুধ ইত্যাদি আহার্য্য দ্রব্যাদি গুছাইয়া রাখিয়া আসিল। ঝি দোকান হইতে উনানের জন্ত গৃহতলে আস্ত কিছু মাটির উপরে কয়েকখানা ইট আনিয়া সাজাইয়া

রাখিল। ঘরে তোলা উনান অবশ্য একটা ছিল। কিন্তু তাঁহাদের ব্যবহার করা উনান, মুরগীর ঝোল, ডিমের আমলেট রাঁধা অনেক হইয়াছে। সুতরাং পিসীমার ব্যবহার্য্য তাহা হইতে পারে না। অগ্নি, গোময়, গঙ্গাজলও এত অনাচারের স্পর্শ শোধরাইয়া তুলিতে পারে না। অন্ততঃ নিষ্ঠাবতী কোনও বিধবা থাক্, সধবাও কেউ পারে বলিয়া মনে করেন না। মহীন্দ্রনাথ এ সব জানিতেন, যাইবার সময় এইরূপ আদেশ দিয়াই যান।

গঙ্গার ঘাট হইতে ফিরিতে বেলা প্রায় দশটা হইল। এগারটায় আফিস, ঊর্ম্মি তাড়াতাড়ি এক পেয়ালা চা আর কয়েকখানা বিস্কুট লইয়া আসিল। চোখে-মুখে মাথায় একটু জল দিয়া আসিয়া কাপড়টা ছাড়িয়া কোনও মতে তাহা গলাধঃকরণ করিয়া মহীন্দ্রনাথ আফিসে চলিয়া গেলেন।

সন্ধ্যার পর স্থানান্তরিত হইবার প্রস্তাব শুনিয়াই ভাগীরথী কহিলেন, "তা আমায় বরং আজ রাত্তিরেই দেশে পাঠিয়ে দে মহীন্। পরের বাড়ীতে কোথায় গিয়ে থাকব—"

"না না, সে হয় না পিসীমা। এসেছ—কয়দিন থাক—কালীঘাটে যাবে—আরও কত কি দেখবে শুনবে। শেষে যখন হয় পাঠিয়ে দেব। উপেন আমার আপন ভায়ের মত; কোনও অসুবিধা তোমার সেখানে হবে না।"

"তোদের দেখতে পাব ত বাবা?"

"পাবে পাবে। কেন পাবে না। রোজ যাব—আফিস থেকে ফিরবার পথে তোমার পাতের ভাত খেয়ে আসব। রোজই দু'টি করে পেসাদ রেখে দেবে আমার জন্যে। সেই আমার বিকেলের জল-খাবার হবে। ঊর্ম্মি-টুর্ম্মি ওরাও যখন সময় হয়, তোমার ওখানে যাবে, গল্প সল্প ক'রবে।

ভাগীরথী আর আপত্তি তুলিলেন না।

[ক্রমশঃ

এই বিংশ শতাব্দীতে মানবেরা নূতন ঈশ্বর—

—শ্রীরাসবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায়

পৃথিবী নূতনরূপে জাগিয়াছে আমাদের চোখে,
আমরা প্রকৃতিঘাতী বৈজ্ঞানিক বুদ্ধিশীল প্রাণী,
অমেয় শক্তির দাপে কাহারো না পরাভব মানি—
সৃষ্টিছাড়া আমাদের গতিবিধি ভূলোক দ্যুলোকে!

আমরা দুরন্ত নই—শতাব্দীর জাগ্রত নির্ম্মাতা,
এখানে ঈশ্বর নাই,—অক্ষমের কল্পিত সান্ত্বনা;
নিজস্ব সৃষ্টির খাতে ধরণীতে নূতন দ্যোতনা,
মানুষ ভুলিয়া গেল দৈববাদ, ভাগ্যের বিধাতা!

ভেঙে চুরে পৃথিবীতে গড়া হোক স্বচ্ছন্দ জগৎ;
সন্দেহ অতীত হ'ল, বিশ্বাসের কোথা অবসান?
কল্পনা শুকায়ে গেছে; ফুলদল বিকচ বিধুর:
প্রশস্ত মসৃণ হোক আমাদের জীবনের পথ,—
আকাশে বাতাসে ওঠে ধীরোদাত্ত মাঙ্গলিক গান;
এই বিংশ শতাব্দীতে মানবেরা নূতন ঈশ্বর।

নবীনচন্দ্র

—শ্রীকালিদাস রায়, কবিশেখর, বি, এ

আমাদের প্রাচীন সাহিত্যে দেবতার মহিমা-প্রচারই ছিল প্রধান উপজীব্য। দেবতার মহিমা প্রচার করিতে গিয়া প্রাচীন কবিগণ মনুষ্যত্বের মহিমা খর্ব্ব করিয়াছেন। দৈবমহিমা প্রচার করিতে গিয়া দেবতাদের চরিত্রে কবিরা মানবসুলভ দুর্ব্বলতা আরোপ করিয়াছেন। ফলে তাঁহাদের কাব্যে মনুষ্যত্ব ও দেবত্ব দুই'এর আদর্শই খর্ব্ব হইয়াছে। প্রাচীন সাহিত্যে এক গোরক্ষনাথ ও চাঁদসওদাগরের চরিত্রে মনুষ্যত্বের উচ্চ আদর্শ দেখিতে পাই। গোরক্ষনাথ সিদ্ধপুরুষ, বৌদ্ধতন্ত্রের সাধক। চাঁদসওদাগর হিন্দু মহাপুরুষ। এই চাঁদসওদাগরের পূর্ণ মনুষ্যত্বের মর্য্যাদাও মনসার ভাসানের কবি শেষ পর্য্যন্ত রক্ষা করেন নাই।

আমাদের দেশের সাহিত্যে পাশ্চাত্য প্রভাব সঞ্চারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মনুষ্যত্বের মর্য্যাদাও কাব্যে প্রধান স্থান লাভ করিল। মাইকেলের মেঘনাদবধেই আমরা এই আদর্শ প্রথম লাভ করিলাম। মাইকেলের রাবণ ও ইন্দ্রজিৎ রাক্ষস নয়, মানুষই। মাইকেলের মনুষ্যত্বের আদর্শের সহিত অবশ্য আমাদের ভারতীয় আদর্শের মিল হইবে না—পরবর্ত্তী কবিদের আদর্শেরও মিল হইবে না। মাইকেল পশুবলে পরাক্রান্ত, তেজস্বী, মৃত্যুভয়জিৎ বীর পুরুষকেই আদর্শ মনে করিতেন।

হেমচন্দ্র, মাইকেলের কল্পিত আদর্শকে শ্রেষ্ঠ মনে করেন নাই। তাই তাঁহার বৃত্র দানবই থাকিয়া গিয়াছে—ইন্দ্র দেবতাই থাকিয়া গিয়াছেন। দধীচিকেই তিনি আদর্শ মানুষরূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। আত্মত্যাগী মহাতপস্বী দধীচির কাছে, ইন্দ্র, বৃত্র দুইই ম্লান। ইহা ছাড়া, হেমচন্দ্র বৃত্র-সংহারে আদর্শ নারীত্বের ও প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন।

বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার উপন্যাসগুলির মধ্যে মনুষ্যত্বের উচ্চাদর্শ নানা ভাবে উপন্যস্ত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। ইহা তাঁহার অনুশীলন মাত্র। ঐতিহাসিক জগতে পূর্ণ মনুষ্যত্বের আদর্শ না পাইয়া তিনি মহাভারত অনুসন্ধান করিয়াছেন এবং উপন্যাসের ক্ষেত্র ত্যাগ করিয়া আদর্শ মহাপুরুষের মহিমা কীর্ত্তনের জন্য তিনি প্রবন্ধের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন।

শ্রীকৃষ্ণকেই মনুষ্যত্বের পূর্ণাদর্শরূপে প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন বঙ্কিমচন্দ্র গদ্যে, নবীনচন্দ্র পদ্যে। নবীনচন্দ্রের কাব্যে কেবল আদর্শ প্রতিষ্ঠিত হয় নাই, তাহা জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে। নবীনচন্দ্র শ্রীকৃষ্ণের আদর্শ মনুষ্যত্বকে জীবন-ধর্ম্মের নানা



নবীনচন্দ্র

বৈচিত্র্য, নানা লীলারহস্য ও জ্ঞান-ভক্তি-কর্ম্মের মধ্য দিয়া ক্রমোন্মেষের স্তরে স্তরে বিকশিত করিয়া তুলিয়াছেন। ইহাই নবীনচন্দ্রের সর্ব্বপ্রধান কবিকর্ম্ম। এই অবদানে নবীনচন্দ্র—মাইকেল, হেমচন্দ্র, বঙ্কিমচন্দ্র এই তিনজনকেই অতিক্রম করিয়াছেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের রচনায় শ্রীকৃষ্ণের চরিত্র-প্রতিষ্ঠায় কল্পনার অবসর নাই। আমাদের ধর্ম্মমূলক ইতিহাসে ও পুরাণে শ্রীকৃষ্ণকে যে ভাবে পাইয়াছেন—তিনি সেই ভাবেই

উপস্থাপিত করিয়াছেন। তিনি যুক্তিদ্বয়ের কেবল পরস্পর-বিসংবাদী তথ্যগুলির মধ্যে প্রতিকূল তথ্যগুলিকে পরিহার করিয়াছেন এবং শ্রীকৃষ্ণ-চরিত্রের উচ্চাদর্শের সহিত অসমঞ্জস তথ্যগুলিকে অবিশ্বাস্য বলিয়া তিনি ত্যাগ করিয়াছেন। বঙ্কিমচন্দ্র এখানে কলাকোবিদ স্রষ্টা নহেন—যুক্তি-সমাশ্রয়ী বিচারক ও সমালোচক। নবীনচন্দ্র ভক্তকবি ও রসস্রষ্টা—তিনি তথ্যের উপরই নির্ভর করেন নাই—তিনি কল্পনার প্রচুর সহায়তা গ্রহণ করিয়াছেন এবং আপন মনের মাধুরী মিশাইয়া শ্রীকৃষ্ণ-চরিত্রকে ভাঙ্গিয়া গড়িয়াছেন। নবীনচন্দ্রকে বেশী শাস্ত্র ঘাঁটাঘাঁটি করিতে হয় নাই। নবীনচন্দ্র ভক্তির দৃষ্টিতে শ্রীকৃষ্ণ-চরিত্রকে পূর্ণাঙ্গভাবে দেখিয়াছেন। কুরুক্ষেত্রে তিনি বলিয়াছেন—

জ্ঞান পদে পদে পতঙ্গের মত যেখানে যাইতে চায়,
ভক্তি-বিহঙ্গিনী উধাও সেখানে উচ্ছ্বাসে উড়িয়া যায়।

নবীনচন্দ্রের 'কুরুক্ষেত্র' 'রৈবতক' 'প্রভাস' তিনখানি কাব্য মিলাইয়া একখানি মহাকাব্য। মহাকাব্যের বাঁধা-ধরা নিয়মগুলির সহিত মেঘনাদবধের মিল হয় না—নবীনচন্দ্রের শ্রীকৃষ্ণ-কাব্যেরও মিল হয় না—তবু এই দুইখানিকে আমরা মহাকাব্যই বলিয়া থাকি। নবীনচন্দ্রের শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল কাব্যে মহাকাব্যের একটা লক্ষণ অন্ততঃ অবিসংবাদিতরূপে বিদ্যমান। একটি বিরাট পুরুষের জীবন এই কাব্যের উপজীব্য। কেবল তাহাই নয়—এই কাব্যের সহিত একটি বিরাট দেশের জাতীয় জীবনেরও কিছু কিছু সংযোগ আছে। মেঘনাদবধ কাব্যের ন্যায় এই কাব্যেও গীতিধর্ম্ম (Lyrical element) প্রবল। কিন্তু গীতিধর্ম্মই এই মহাকাব্যের সর্ব্বস্ব নয়—ইহাতে জাতীয় দ্বন্দ্ব-সমস্যার স্থান হইয়াছে—রাজনীতি, সমাজনীতি, গার্হস্থ্য-নীতি এমনকি দাম্পত্য-নীতির অনেক রহস্য ইহার অঙ্গ পুষ্টি করিয়াছে। ইহাতে অসংহত, ভেদবুদ্ধির দ্বারা ক্ষতবিক্ষত, সদা বিবদমান দেশে একটা মহাজাতি-গঠনের পরিকল্পনা আছে। কবি এখানে মহাভারতের বহু তথ্যের বর্ত্তমান যুগোপযোগী Interpretation দিয়াছেন, আবার বর্ত্তমান যুগের বহু সমস্যাকেও তিনি কোন-না-কোন পৌরাণিক ক্ষীণসূত্র অবলম্বন করিয়া মহাভারতীয় যুগের পরিবেষ্টনীতে সমারোপিত করিয়াছেন।

এজন্য তিনি পৌরাণিক চরিত্রগুলি লইয়াই তুষ্ট হ'ন নাই—বর্ত্তমান যুগের মনোভূমিতে রচিত একাধিক নূতন নূতন চরিত্র তাঁহার কাব্যে প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন এবং পৌরাণিক চরিত্রগুলিকে নবভাবে ভাঙ্গিয়া গড়িয়াছেন। যে সকল দ্বন্দ্বের দ্বারা নবীনচন্দ্রের কাব্যের আখ্যান-বস্তু পরিপুষ্টি লাভ করিয়াছে, সে সকল দ্বন্দ্ব নবীনচন্দ্রের মনগড়া নয়। সেগুলি কেবল ভারতীয় নয়—সার্ব্বভৌম। সর্ব্বযুগের আর্য্য অনার্য্যের দ্বন্দ্বই হউক, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রের দ্বন্দ্বই হউক, সামাজিক বা গার্হস্থ্য সংস্কারের সহিত সত্য ও প্রেমের দ্বন্দ্বই হউক, ভক্তির সহিত জ্ঞানের দ্বন্দ্বই হউক, অহিংসাত্মক রসধর্ম্মের সহিত হিংসাত্মক শৌর্য্য ধর্ম্মেরই দ্বন্দ্ব হউক, বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের সহিত সর্ব্বাশ্রম-ধর্ম্মের দ্বন্দ্বই হউক, সুকুমার হৃদয়বৃত্তির সহিত রূঢ় কর্ত্তব্য-বোধের দ্বন্দ্বই হউক—সকল দ্বন্দ্বেরই সার্ব্বজনীনতা আছে। দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষের এই মানস কুরুক্ষেত্রই নবীনচন্দ্রের কাব্যকে মহাকাব্যের পর্য্যায়ে উন্নীত করিয়াছে। শ্রীকৃষ্ণের জীবনে যে সত্যের সহিত স্বপ্নের দ্বন্দ্ব কবি দেখাইয়াছেন, তাহাতে গীতি-কাব্যের বিশ্বজনীন আবেদন দেশকালের সীমা অতিক্রম করিয়া উঠিয়াছে। হৃদয়াবেগের আতিশয্য একদিকে কবির কাব্যে কলাচাতুর্য্যের পক্ষে হানিকর হইয়াছে—কিন্তু অন্যদিকে ইহা বহু দ্বন্দ্ব-সমস্যা ও তত্ত্ব-তথ্যের কঙ্কালপুঞ্জকে রূপ লাবণ্যে আচ্ছন্ন ও শ্রীমণ্ডিত করিয়াছে।

জাতিভেদ, ধর্ম্মভেদ, রাজ্যভেদ, সাম্প্রদায়িক ভেদ ইত্যাদি বহু ভেদে বিচ্ছিন্ন অধঃপতিত জাতির জন্য কবির উদ্বেগের সীমা ছিল না। কবি শুধু এই উদ্বেগের প্রকাশ করিয়া ক্ষান্ত হন নাই। ইহার কারণ-নির্দ্দেশ ও সমাধান সম্পর্কে যে উৎকণ্ঠা তিনি অনুভব করিয়াছেন, তাহা তাঁহার কাব্যে উচ্ছ্বসিত বাগ্মিতার রূপ ধরিয়াছে। কাব্যের দিক হইতে ইহা ঐশ্বর্য্য বাড়ায় নাই—কিন্তু সেই তিনি যে হৃতাশ্বাস জাতিকে আশার বাণী শুনাইয়াছেন, বাগ্মিতায় তাহা কাব্যের দিক হইতেও ব্যর্থ হয় নাই।

রৈবতক হইতে প্রভাসের শেষ পর্য্যন্ত শ্রীকৃষ্ণ-চরিত্রের যে সুসঙ্গত ধারাবাহিকতা আছে—তাহাই তিনখানি কাব্যকে একটি অখণ্ড মহাকাব্যে পরিণত করিয়াছে। মানবজীবনের চিরন্তন ধারার সঙ্গে ইহা অভিন্ন। রৈবতকে লীলার জীবন—কুরুক্ষেত্রে কর্ম্মজীবন—দারুণ জীবন-সংগ্রাম—প্রভাসে বৈরাগ্যের জীবন অলঙ্কার-শাস্ত্রে যাহাকে শান্তরস বলে—



একা আমি র'বো হেথা কর্ত্তব্য সাধিতে

প্রভাসে তাহারই অভিব্যক্তি। প্রভাসের উৎসবেও বৈরাগ্য, ব্যসনেও বৈরাগ্য। শান্তরস সকল রসের শেষ পরিণতি। রৈবতক কুরুক্ষেত্রের নানা রসের লীলা-বৈচিত্র্য প্রভাসের সমুদ্রতীরের মহামহিমময় আবেষ্টনীর মধ্যে বিশ্রাম লাভ করিয়াছে। মহাবৈষ্ণব নবীনচন্দ্র জ্ঞানকর্ম্মের চরম পরিণতি দেখাইয়াছেন—প্রেমে। প্রভাসের শেষ আট পংক্তি—

> পাইয়াছি শোকে শান্তি পাইয়াছি দুঃখে সুখ।
> প্রেমে ঝরিয়াছে নেত্র, প্রেমে ভরিয়াছে বুক ঃ
> ফলিয়াছে বহু আশা, ফলে নাই বহু আর।
> বহিয়াছি এ-জীবন আশার ও নিরাশার।
> গীত শেষ—অপরাহ্ণে সন্ধ্যা আসিতেছে ধীরে,
> বসি ধ্যানমগ্ন এই জীবন প্রভাসতীরে।
> সম্মুখে অজ্ঞাত সিন্ধু, ভাসে কৃষ্ণ পদ-তরী,
> এই তীরে সন্ধ্যা, ঊষা অন্য তীরে মুগ্ধকরী।

মাইকেল ও হেমচন্দ্রের কল্পনা অবাস্তব স্বর্গ, মর্ত্ত্য, রসাতল পরিভ্রমণ করিয়াছে— নবীনচন্দ্রের কল্পনা এই বাস্তব পৃথিবীতেই বিচরণ করিয়াছে। সেজন্য নবীনচন্দ্রের কাব্যে আমরা বিরাট নদ, নদী ও সমুদ্র, পর্ব্বত, অরণ্য, রণক্ষেত্রের চমৎকার বর্ণনা পাই। সমুদ্রের নিঃসীমতা, মহিমা ও নীলিমাকে নবীনচন্দ্র রসদৃষ্টিতে দেখিয়াছেন। রসদৃষ্টিতে দেখিয়া প্রকৃতির মহিমা ও মাধুর্য্য উপলব্ধি-বিষয়ে নবীনচন্দ্র রবীন্দ্রনাথের অগ্রদূত।

শেষ পর্য্যন্ত এই তিনখানি কাব্য পড়িলে মনে হয়—ইহা কাব্য না ধর্ম্মপুস্তক? বলা বাহুল্য, ইহা ধর্ম্মপুস্তক ও কাব্য দুই-ই। মাইকেল, বঙ্গের কাব্য-সাহিত্যকে ধর্ম্মের নাগপাশ হইতে মুক্ত করিয়াছিলেন। তাঁহার ব্রজাঙ্গনার সঙ্গেও ধর্ম্মের কোন সম্বন্ধ নাই। বাঙ্গালীর ধারা হেমচন্দ্র একেবারে ভুলিতে পারেন নাই—দশমহাবিদ্যা লিখিয়া ধারা রক্ষা করিয়াছিলেন। নবীনচন্দ্র প্রথমে ভাবিয়াছিলেন—ধর্ম্মকে এড়াইয়া কাব্য রচনা করিবেন। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত তিনি ধর্ম্মকে আশ্রয় করিয়াই আত্মস্থ হইলেন। বাঙ্গালার নিজস্ব ধারা লুপ্ত হইবার নয়—অহিন্দু মাইকেল তাহাতে বাধা দিলেন, কিন্তু তাহার বিলোপ সাধন করিতে পারিলেন না। নবীনচন্দ্র প্রকারান্তরে মঙ্গলকাব্যের ধারারই কবি। বর্ত্তমান যুগে এই ধারার রূপ বদল হইয়াছে। নবীনচন্দ্রের দেবতা অবাস্তব ভক্ত-বাঞ্ছাপূরণকারী পূজালুব্ধ দেবতা নয়—বাস্তব মানবই মহামানব হইয়া দেবত্ব লাভ করিয়াছে। বর্ত্তমান শিক্ষাদীক্ষা ও সাহিত্যের আদর্শ বঙ্গের চিরন্তন ধারার রূপ পরিবর্ত্তন করিয়াছে।

নবীনচন্দ্রের শ্রীকৃষ্ণ-কাব্যের পরই উল্লেখযোগ্য রচনা, পলাশীর যুদ্ধ। ঐতিহাসিক কাব্য ও ঐতিহাসিক নাট্য-রচনার পদ্ধতি পূর্ব্বেই প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। কিন্তু বাঙ্গালার ইতিহাস লইয়া কাব্য রচনা ইহাই প্রথম ও শেষ। পলাশী যুদ্ধের পর বাঙ্গালার ইতিহাস লইয়া নাট্য রচিত হইয়াছে—কিন্তু কোন কাব্য রচিত হয় নাই। রাজপুতানার ইতিহাসের সহিত আমাদের প্রাণের যোগ নাই—বাঙ্গালার ইতিহাসের সঙ্গে অবশ্য সে যোগ আমাদের আছে। বিশেষতঃ, পলাশীর যুদ্ধের বিষয়-বস্তু বাঙ্গালার ভাগ্যবিপর্য্যয়ের ইতিহাস। ইহার ফলে স্বদেশের প্রতি কবির মনের গভীর প্রীতি এই কাব্যে জ্বলন্ত ও জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে বাঙ্গালী পাঠকের মর্ম্মও ইহা সহজে স্পর্শ করিয়াছে। এক সময়ে নবীনচন্দ্রের কবিখ্যাতি পলাশীর যুদ্ধকেই আশ্রয় করিয়া ছিল, এখন তাহা তাঁহার শ্রীকৃষ্ণ-কাব্যের উপরই নির্ভর করিয়া আছে—পলাশীর যুদ্ধ এখন অনেকটা উপেক্ষিত। অন্ধকার কারাকক্ষে যে দুর্ভাগ্য যুবকের জীবনাবসানের সহিত বাঙ্গালার স্বাধীনতা চিরদিনের জন্য অস্তমিত হইয়াছিল তাহার প্রতি গভীর দরদ কবির অগাধ দেশ-প্রীতির সহিত মিলিত হইয়া পলাশীর যুদ্ধকে উচ্চশ্রেণীর কারুণ্যময় কাব্যে পরিণত করিয়াছে।

অন্যান্য কাব্যের তুলনায় পলাশীর যুদ্ধে নবীনচন্দ্রের ভাবাবেগের কতকটা সংযম দৃষ্ট হয়। এই সংযমের মূলে নবীনচন্দ্রের কর্ম্মজীবন কতটা দায়ী তাহা বলা যায় না। নবীনচন্দ্রের দেশ-প্রেমজাত বেদনা সমগ্র কাব্যখানির মধ্যে ফল্গুধারার মত প্রবাহিত, স্থলে স্থলে তাহা উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছে। কবির বেদনা দুই দিক হইতে গভীর হইয়া উঠিয়াছে। একদিকে তাঁহার স্বজাতির ভীরুতা, নীচতা, স্বার্থপরতা ও বিশ্বাসঘাতকতা—অন্যদিকে অকারণে দেশের স্বাধীনতা লোপ। বাঙ্গালী হিন্দু-মুসলমানের দেশদ্রোহী হীন চরিত্র উদ্‌ঘাটিত করিতে কবি যে গভীর বেদনা অনুভব করিয়াছেন—একমাত্র মোহনলালকে আশ্রয়

করিয়া তাঁহাতে কথঞ্চিৎ সান্ত্বনা পাইয়াছেন। এমনও বলা যাইতে পারে—নবীনচন্দ্রের নিজেরই ব্যথিত অন্তরাত্মা মোহনলালের সান্ত্বনার জন্ম রূপ ধরিয়াছে। সিরাজের শেষ চিত্র কবি অন্তরের বেদনাঘন মসী দিয়া অঙ্কিত করিয়াছেন। সিরাজের অঙ্গের প্রত্যেক আঘাতটি যেন দেশ-প্রাণ কবি নিজের অঙ্গেই গ্রহণ করিয়াছেন।

নবীনচন্দ্রের জন্মভূমি চট্টগ্রাম। বঙ্গদেশের মধ্যে একমাত্র চট্টগ্রামই Meet nurse for a poetic child. গিরি, অরণ্য, সমুদ্র ও নদী রূপ-মালা-ধৃত প্রান্তরের অপূর্ব্ব মহিমায় মণ্ডিত এই ভূখণ্ড। চট্টগ্রামের প্রাকৃতিক প্রভাব কি নবীনচন্দ্রের জীবনে কোন কাজই করে নাই ?

কবির রঙ্গমতী পড়িলে মনে হয়, তাহা ব্যর্থ হয় নাই। এমন চমৎকার দেশকে ভাল না বাসাই অস্বাভাবিক। এমন চমৎকার দেশ যদি পরপদ-লাঞ্ছিত, দৈন্ত-কুসংস্কারে নিপীড়িত হয়—তবে তাহার কল্যাণ-সাধনের জন্ম দেশের সন্তানের আত্মসমর্পণ ছাড়া উপায় কি ? রঙ্গমতীর লীলাস্থল এই চট্টগ্রাম, এবং মনে হয় কবি নিজেই যেন ইহার নায়করূপে দেশের জন্ম আত্মবিসর্জ্জন করিতেছেন। এই কাব্যে আমরা চট্টগ্রামের প্রাকৃতিক ঐশ্বর্য্যকে পরিবেষ্টনীরূপে পাইতেছি। কাব্যহিসাবে রঙ্গমতী বঙ্গসাহিত্যে সমাদর পায় নাই, কিন্তু ইহার সহিত নবীনচন্দ্রের কবি-জীবনের ক্রমোন্মেষের গভীর সম্বন্ধ আছে। জন্মক্ষেত্রে নদী যেমন শীর্ণ ও সংকীর্ণ থাকে, যত মহাসমুদ্রের নিকটবর্ত্তী হয়, ততই তাহার পরিসর বৃদ্ধি পায় এবং সাগর-সঙ্গমের উপযোগী হয়, রঙ্গমতীর খরস্রোতা অথচ সংকীর্ণ দেশপ্রীতির ধারা তেমনি যতই মহাভারতের মহাসাগরের নিকটবর্ত্তী হইয়াছে, ততই তাহা উদার, বিপুল, বিশাল অথচ প্রশান্ত ধীর ও প্রসন্ন হইয়া আসিয়াছে।

নবীনচন্দ্রে পলাশীর যুদ্ধ ছাড়া অন্তান্ত কাব্যে ইংরাজী কবিদের প্রভাব বেশি নাই। অন্তান্ত কাব্যে ইংরাজী শিক্ষা-দীক্ষা, ভাব, চিন্তার আদর্শ ও সংস্কৃতির প্রভাব প্রচুর আছে। নবীনচন্দ্রের পলাশীর যুদ্ধে বাইরণের প্রভাব খুব বেশী ছিল বলিয়া নবীনচন্দ্রকে বাঙ্গালার বাইরণ বলা হইত। পলাশীর যুদ্ধ নবীনচন্দ্রের প্রথম বয়সের রচনা। ক্রমে বয়োবৃদ্ধির সহিত নবীনচন্দ্রের কাব্যে যত ধর্ম্মভাবের সমাবেশ হইতে লাগিল,—বাইরণের প্রভাব ততই বিদূরিত হইতে লাগিল।

নবীনচন্দ্রের কাব্যে ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ, শেলী, কীটস্ ইত্যাদি কবিদের প্রভাব ধরা যায় না। হোমার, দান্তে, মিলটন ইত্যাদি মহাকবিদের প্রভাব হইতেও তিনি মুক্ত ছিলেন।

সংস্কৃত কাব্য-নাট্যের কোন প্রভাব বা বৈষ্ণবকবিদের কোন প্রভাবও নবীনচন্দ্রের কাব্যে নাই। নবীনচন্দ্র মহা-ভারত, ভাগবত, হরিবংশ ও গীতা মনোযোগ দিয়া অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। তিনি কেবল গীতার অনুবাদই করেন নাই —গীতার বাণী তিনি শ্রীকৃষ্ণ-কাব্যেও ওতপ্রোতরূপে অনু-স্যূত করিয়াছেন। সুভদ্রার মুখ দিয়া তিনি গীতার সার তত্ত্বটীর সরস অভিব্যক্তি দান করিয়াছেন।

কেবল মাইকেলের ছন্দ নয়, মাইকেলের কাব্যে যেটুকু দেশীয় ভাবের অভিব্যক্তি, নবীনচন্দ্র সেটুকুকে অনুসরণ করিতে ভুলেন নাই। তবে মাইকেলের চরিত্র-সৃষ্টি ও মনুষ্যত্বের আদর্শকে তিনি অনুকরণীয় মনে করেন নাই। দুর্ব্বাসার উদ্দেশে ও শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশে জরৎকারুর আবেদন দুইটি মাইকেলের বীরাঙ্গনা কাব্যে অনায়াসে স্থান পাইতে পারিত।

বীরবল একবার বলিয়াছিলেন—"কবিরাই ইচ্ছা করিলে সরস ভঙ্গীতে গদ্য লিখিতে পারেন।" নবীনচন্দ্রের 'আমার জীবন' পড়িলে একথা সত্য মনে হয়। নবীনচন্দ্র 'আমার জীবন' রচনার আগে ভানুমতী লিখিয়াছিলেন। জাতি, দেশ ও সমাজের কল্যাণের জন্য কবির উৎকণ্ঠার ফলে ভানুমতীর জন্ম। ইহাকে কথা-সাহিত্যের রূপদান করিলেও ইহা উপন্যাস নয়—ইহা একটি উদ্দেশ্যমূলক রচনা। ইহাতে দেশ ও সমাজের নানা সমস্যা লইয়া কবি আলোচনা করিয়াছেন। উপন্যাসের মর্য্যাদা ইহা লাভ করে নাই, কিন্তু ইহার রচনাভঙ্গী সরস।

কবির জীবনী এমন কিছু বৈচিত্র্যময় নয় যে, কৌতূহল বশতঃ কেহ তাহা পাঠ করিবে। মাইকেলের জীবনীর মত ইহা জীবন-সংগ্রাম-বিক্ষত ঘটনাঘন ট্রাজেডি নয়। 'আমার জীবন' কবির ডেপুটি জীবনের ইতিহাস মাত্র। কিন্তু ইহার রচনাভঙ্গী এমনই সরস যে, ইহা উপন্যাসের মত চিত্তাকর্ষক হইয়া উঠিয়াছে।

নবীনচন্দ্রের দেশপ্রীতির একটা বৈশিষ্ট্য আছে। নবীন-চন্দ্রের দেশপ্রীতি দেশের নিসর্গকে অবলম্বন করে নাই—

অতীতের স্বপ্নকেও আশ্রয় করে নাই। নবীনচন্দ্র, বঙ্কিমচন্দ্রের মত দেশমাতার দেবী-মূর্ত্তি কল্পনা করেন নাই—হেমচন্দ্র রঙ্গলালের মত অতীতের স্বপ্নের মধ্য দিয়া দেশপ্রীতি প্রকাশ করেন নাই—রবীন্দ্রনাথের মত দেশের প্রাকৃতিক ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যের মধ্য দিয়া দেশভক্তি প্রচার করেন নাই। তাঁহার দৃষ্টি ছিল ভবিষ্যতের দিকে। তাঁহার দেশপ্রীতি ফুটিয়া'ছে মানবতার মধ্য দিয়া। পলাশীর যুদ্ধে হতভাগ্য নবাবের প্রতি গভীর সহানুভূতির ও মোহনলালের আত্মত্যাগের প্রতি গভীর শ্রদ্ধার মধ্য দিয়া তাঁহার দেশপ্রীতি দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ-কাব্যে তিনি মহাভারত হইতে উপাদান গ্রহণ করিয়াছেন এবং শ্রীকৃষ্ণকে ঐ কাব্যের প্রধান চরিত্ররূপে গ্রহণ করিয়াছেন সত্য, কিন্তু তাহার মধ্য দিয়া, ফুটিয়াছে অধঃপতিত স্বজাতির জন্য গভীর উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠা। তিনি মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝিয়াছিলেন এই ভ্রষ্টচ্ছন্ন, শতধা-বিভক্ত, ভেদবুদ্ধিতে ছত্রভঙ্গ জাতির মধ্যে যদি এক জাতীয়তা, এক ধর্ম্ম, এক মহান্ আদর্শ প্রতিষ্ঠিত না হয়—এ জাতি যদি এক মহাধর্ম্ম-সাম্রাজ্যের অন্তর্গত ও অধিগত না হয়—তাহা হইলে এ জাতির আর নিস্তার নাই। শ্রীকৃষ্ণের মহামনুষ্যত্ব ও পূর্ণাদর্শ-পরিকল্পনার মূলে এবং ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয় দ্বন্দ্ব, আর্য্য-অনার্য্য দ্বন্দ্ব, কুরু-পাঞ্চাল বৃষ্ণিকুলের দ্বন্দ্ব ইত্যাদির অবতারণার মূলে নবীনচন্দ্রের মহাজাতি গঠনের স্বপ্নই মুখ্যতঃ বিদ্যমান। এই স্বপ্ন,—স্বজাতি ও স্বদেশের জন্য এই উদ্বেগ —কবির কাব্যগুলিতে ফুটিয়াছে। কবি ইহার বেশী কিছু করিতে পারেন নাই। ভবিষ্যতের দিকে আশার দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া তিনি সর্ব্বপ্রকার উৎকণ্ঠার মধ্যে আশ্বস্ত হইয়াছেন। তাঁহার বিশ্বাস—শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় একজন মহাপুরুষের পুনরাবির্ভাব, ছাড়া এই হতভাগ্য জাতির মুক্তি নাই। অমিতাভের ভূমিকায় তিনি বলিয়াছেন—"আবার ধর্ম্মের গ্লানি ও অধর্ম্মের অভ্যুত্থান ঘটিয়াছে। কাল পূর্ণ, এখন সেই মহাপ্রতিজ্ঞা আমাদের একমাত্র আশা—সম্ভবামি যুগে যুগে।"

নবীনচন্দ্রের দেশানুরাগ আর একটি রূপ ধরিয়াছে স্বজাতির সমক্ষে পূর্ণ মনুষ্যত্বের আদর্শ-প্রতিষ্ঠায়। তাঁহার বিশ্বাস ছিল এইরূপ একটা জীবন্ত আদর্শ ছাড়া কোন অধঃপতিত জাতির পরিত্রাণ নাই। নবীনচন্দ্র বুঝিতেন—মানুষের আদর্শ দেবতা নয়, মানুষের আদর্শ মানুষই। এইরূপ কতকগুলি আদর্শ লইয়া তিনি একাধিক কাব্য রচনা করিয়াছেন। এ বিষয়ে তাঁহার সাম্প্রদায়িকতা ছিল না। মহাপুরুষগণ মানব-জাতির পরিত্রাণের জন্য বিপথে চালিত মানব-জাতিকে পথ দেখাইবার জন্য যুগে যুগে দেশে দেশে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহাদের বাণী, আদর্শ ও মন্ত্রপ্রচারকেই তিনি পরম দেশ-সেবা বলিয়া মনে করিতেন। তাই তিনি কেবল শ্রীকৃষ্ণ নয়, খৃষ্ট, বুদ্ধ, ও চৈতন্যের জীবন ব্রত ও বাণী লইয়া কাব্য রচনা করিয়াছিলেন।

নবীনচন্দ্র ইঁহাদের কাহাকেও দেবতা বানাইয়া পূজার উপদেশ দেন নাই—ইঁহাদিগকে আদর্শ মানুষরূপেই চিত্রিত করিয়াছেন এবং ইঁহাদের আদর্শ ও বাণীই মানুষ অনুসরণ করুক, এই অভিপ্রায়ই তাঁহার কাব্য-রচনার মূলে বিদ্যমান আছে। কবি যদি ইঁহাদিগকে দেবতা বানাইতেন—তাহা হইলে তাঁহার অভিপ্রায় একটিতেই পরিচ্ছিন্ন হইত। অমিতাভের ভূমিকায় কবি বলিয়াছেন—"পূর্ব্ববর্ত্তী গ্রন্থকারগণ প্রায় সকলেই বুদ্ধদেবকে অল্পাধিক অতি-মানুষিক ভাবে চিত্রিত করিয়াছেন। আমি যথাসাধ্য তাঁহাকে মানুষিক ভাবাপন্ন করিতে যত্ন করিয়াছি। এই অবতারদিগকে মানুষিক ভাবে দেখিলে যেন আমার হৃদয় অধিক প্রীতি লাভ করে। তাঁহা-দিগকে আমাদের অধিক আপনার বলিয়া বোধ হয়।" ইহা হইতেই কবির অভিপ্রায় সুস্পষ্ট হইবে।

নবীনচন্দ্র ধর্ম্ম-জগতের একটি উচ্চস্তর হইতে বিভিন্ন ধর্ম্মমতবাদের দিকে চাহিয়া লক্ষ্য করিয়াছেন যে, সকল ধর্ম্মের মূলেই একটি পরম সত্য বিদ্যমান আছে। সেজন্য তিনি বুদ্ধ, শ্রীকৃষ্ণ, চৈতন্য ও খৃষ্টের বাণীর মধ্যে কোন বিসংবাদ দেখিতে পান নাই।

মাইকেল-প্রবর্ত্তিত অমিত্রাক্ষর ছন্দের মর্য্যাদা হেমচন্দ্র বুঝেন নাই। তাঁহার হাতে অমিত্রাক্ষর অধিকাংশ ক্ষেত্রে অনেকটা মিলহীন পয়ারে পরিণত হইয়াছে। নবীনচন্দ্র মাইকেলেরই অনুসরণে অনেকটা সাফল্য লাভ করিয়াছেন—

কেন্দ্রস্থলে অভিমন্যু, শরের শয্যায়
সিদ্ধ-কাম মহাশিশু। ক্ষত কলেবর

রক্তজবা সমাবৃত ! সস্মিত বদন
মায়ের পবিত্র অঙ্কে করিয়া স্থাপিত
সন্ধ্যাকাশে যেন স্থির নক্ষত্র উজ্জ্বল
নিদ্রা যাইতেছে সুখে ! বক্ষে সুলোচনা
মূর্চ্ছিতা ! মূর্চ্ছিতা পদে পড়িয়া উত্তরা
সহকার সহ ছিন্না ব্রততীর মত।
নীরব বিস্তৃত ক্ষেত্র ! থাকিয়া থাকিয়া
কেবল কাঁপিয়া ধীরে মায়ের অন্তর
গাহিতেছে কৃষ্ণনাম ! মূর্চ্ছিত অর্জ্জুন
পড়িতে, ধরিলা কৃষ্ণ বাহু প্রসারিয়া।
উচ্ছ্বাসে কহিলা কৃষ্ণ,—"অর্জ্জুন ! অর্জ্জুন !
আমরা বীরের জাতি, বীরধর্ম্ম রণ !
অযোগ্য এ শোক তব ! এই বীরক্ষেত্র
করিও না কলঙ্কিত করিয়া বর্ষণ
এক বিন্দু শোক-অশ্রু ! বীরদত্ত তুমি
বীর শোক-অশ্রু নয়,—অসির ঝঙ্কার।

এই সকল অংশ পড়িলে মাইকেলকে মনে পড়ে।

নবীনচন্দ্রের কাব্যগুলি অনেকাংশ অর্দ্ধনাটকীয়, যুক্তি-গর্ভ বাগ্মিতায় পূর্ণ, দীর্ঘ বক্তৃতার বিনিময়। এইগুলি রবীন্দ্রনাথের গীতিনাট্য—বিশেষতঃ বিদায় অভিশাপ, গান্ধারীর আবেদন, কর্ণ-কুন্তী সংবাদ ইত্যাদি নাট্য-কবিতার পূর্ব্বাভাস সূচনা করে।

নবীনচন্দ্রের গীতি-কবিতাগুলির মধ্যে 'কীর্ত্তিনাশা' বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। এই কবিতার গীতি-ধর্ম্ম রবীন্দ্রনাথের উদয়ের পূর্ব্বে শুকতারার মত সমুজ্জ্বল। হেমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের মধ্যে এই কবিতা একটা যোগসূত্র রচনা করিয়াছে মনে হয়। বাঙ্গালার গীতিকাব্যের ক্রমবিকাশের ইতিহাসে এই কবিতাটির স্থান আছে।

'অবকাশরঞ্জিনী' নবীনচন্দ্রের গীতি-কবিতা-সংগ্রহের পুস্তক। এই কবিতা গুলিতে উচ্ছল ভাবাবেগের আতিশয্য বিশেষভাবে লক্ষণীয়। এই ভাবাবেগে যদি সংযম এবং তদনুগত কলাসৌষ্ঠব থাকিত,তাহা হইলে নবীনচন্দ্র গীতি কবিতা রচয়িতা হিসাবেও বঙ্গসাহিত্যে হেমচন্দ্রের উপরে স্থান পাইতেন। এই কবিতাগুলিতে বিদেশী প্রভাব বর্ত্তমান আছে। নবীনচন্দ্রের কাব্যের প্রধান দোষ, কবি তাঁহার কাব্যে আপনার বক্তব্য নিঃশেষ করিয়া বলিবার জন্যই ব্যগ্র—কাব্যকলার সৌষ্ঠবের দিকে তাঁহার দৃষ্টি ছিল না—বক্তব্য প্রকাশের ভাষা ও ভঙ্গী যে সরস, শোভন, চিত্তাকর্ষক ও সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হওয়ার প্রয়োজন, সেদিকে তাঁহার লক্ষ্য ছিল না। তাহা, ছাড়া পাঠক-সমাজের শক্তি-বুদ্ধির প্রতি তাঁহার যথোচিত শ্রদ্ধা ছিল না—সেজন্য তিনি সকল কথা নিঃশেষ করিয়া, সংহত বাণীগুলির বিশদ ব্যাখ্যা করিয়া বলিতে চাহিতেন। তাহার ফলে, তাঁহার রচনা ব্যঞ্জনার ঐশ্বর্য্য হইতে বঞ্চিত হইয়াছে। কেবল চিন্তাশীলতা নয়, কোথাও কবির ভাবাবেগেরও দৈন্য ছিল না। ভাবাবেগের আতিশয্যে তিনি কাব্যকলাশ্রীর দিকে একেবারেই দৃষ্টি করেন নাই। ভাবাবেগের অবাধিত উচ্ছ্বাস অনেক স্থলে তাঁহার কাব্যকে নাট্য-ধর্ম্মোপেত করিয়াছে। যথাযোগ্য সংযমের অভাবে উচ্ছ্বাসগুলি সংহত রসঘন রূপ ধরিতে পারে নাই। কবি ছায়াকেই কাব্য-তরুর প্রধান সম্পদ বলিয়া মনে করিয়াছেন, পুষ্পকে নয়। সেইজন্য তাঁহার কাব্য-তরু বাক্যের ঘন পল্লবে সমাচ্ছন্ন হইয়াছে—তাহাতে রসের পুষ্প হয় ফুটিতে পায় নাই—নয় ঢাকা পড়িয়া গিয়াছে।

নবীনচন্দ্রের কাব্যের আর একটি দোষ, সামঞ্জস্যবোধের অভাব। ভাবচিত্রের পরিবেষ্টনী-সৃষ্টিতে নবীনচন্দ্রের অদ্ভুত ক্ষমতা ছিল। কিন্তু মহিমময় আবেষ্টনীর মধ্যে কবি অনেক সময় তরলতা ও চটুলতার সমাবেশ করিতেন—গুরুগম্ভীর আখ্যানভাগের মধ্যে হাস্যচপলতার অবতারণা করিতেন—জীবন-মরণের মহাসংগ্রামের পটভূমিকায় লঘুতরল চিত্র প্রকটন করিতেন। ইহাতে রসাভাস ঘটিয়াছে। মূল বিষয়বস্তু যেখানে গুরুত্বপূর্ণ, সেখানে নানা রসের সমাবেশের অবসর থাকে না। এই সামঞ্জস্য-বোধ মাইকেলের ছিল—রবীন্দ্রনাথের ত' আছেই। এই সামঞ্জস্যের অভাবে কুরুক্ষেত্রের ন্যায় কাব্যের মহিমাও অনেকাংশে ক্ষুণ্ণ হইয়াছে।

গভীর

-শ্রীশুদ্ধসত্ত্ব বসু

সন্ধ্যার গাড়ীখানা চলিয়া গেল। নিত্যকার মত ধোঁয়া উড়াইয়া আকাশের খানিকটা কালো করিয়া, অদ্ভুত ও বিচিত্র শব্দ তুলিয়া দূর বনের মধ্য হইতে যেমন সহসা আসিয়াছিল, তেমনি সহসা চলিয়া গেল।

একটু দূরে ষ্টেশন, বড় রকমের একটি জংসন। তিন দিক্ হইতে লাইন আসিয়া মিশিয়াছে। অগণিত রেলের পাথা সেখানে, অসংখ্য লাইন: রাতদিন হাজার হাজার যাত্রীর ভিড়, ফেরিওয়ালাদের চীৎকার, রেল-কর্ম্মচারীদের ব্যস্ততা;—সব কিছু মিলিয়া যেন একটি নূতন পৃথিবী রচিত হইয়াছে।

জ্ঞানদার কিন্তু ওখানে যাইলেই দম বন্ধ হইয়া আসে। স্বামীর সঙ্গে যখন সে প্রথম তাহাদের গ্রামের ষ্টেশন হইতে উঠিয়াছিল, ট্রেনে তখন তাহার বেশ লাগিয়াছিল।

গ্রামের ষ্টেশনটি ছোট, সারা দিনরাত্রি খান চারেক গাড়ী যাতায়াত করে, লোকের অকারণ চেঁচামেচি নাই, অথবা অযথা সোরগোল তুলিবারও বাড়তি লোক নাই। একটা কেমন শান্ত ও স্তিমিত ভাব। খুব দূরে—একটি ঝোপের আড়াল হইতে গাড়ীখানি দেখা দিল একটি ক্ষুদ্র বিন্দুর মত, এবং ক্রমে সেই বিন্দুটি বাড়িতে বাড়িতে আসিয়া হুস্ করিয়া পৌঁছাইল, ষ্টেশনে একেবারে যেন ঘাড়ের উপর। একটুখানি চাঞ্চল্য, কয়েকজন উঠিল, কয়েকজন বা নামিল। জ্ঞানদার তাহা বেশ মনে পড়ে। কিন্তু যখন পরের দিন সকালে সারারাত্রি ট্রেনে কাটাইবার পর এখানে, এই এত বড় জংসন্ ষ্টেশনটিতে নামিতে হইল, কি বিশ্রীই না লাগিয়াছিল। তখন লোকের তাড়াহুড়া, ঘণ্টার শব্দ, ফেরিওয়ালার চীৎকার—আর মাথার উপরে প্লাটফরমের শেড, শেডের নীচে বদ্ধ বায়ু, দম বন্ধ হইয়া আসিয়াছিল জ্ঞানদার। স্বামীকে নীচুগলায় বলিয়াছিল, শীগ্‌গির এখান থেকে চলো, আমার মাথার মধ্যে কেমন ঝিম্ ঝিম্ করছে।

প্রথম দর্শনেই ষ্টেশনটিকে বিশ্রী লাগিয়াছিল জ্ঞানদার, আজও তার ভাল লাগে না। তাহার পর আরও ত কতবার যাইতে হইয়াছে ষ্টেশনে, বাপের বাড়ী যাইবার পথে, সেখান হইতে ফিরিবার সময় তবুও সে এই ষ্টেশনটিকে সহ্য করিতে পারে না; কৌতূহলময় এই বিরাট ষ্টেশনটীর সাথে মিতালি তাহার হয় নাই।

সন্ধ্যার ট্রেনটি এই মাত্র চলিয়া গেল। কত ট্রেনই তো এরূপ রোজ চলিয়া যাইতেছে, গিয়া ওইখানে ওই ষ্টেশনটিতে থামে, জল লইয়া আবার দৌড় সুরু করিয়া দেয় অবিরাম ভাবে, ছুটিয়া ছুটিয়া হাঁফাইয়াও উঠে না এতটুকু। জ্ঞানদা কিন্তু ওদের এই গতিহীন দৌড় দেখিয়াই ভিতরে ভিতরে হাঁফাইয়া উঠিয়াছে।

জ্ঞানদার স্বামী এই ট্রেনের ছোটা দেখিয়া সময় বলিয়া দিতে পারিতেন কেমন; একেবারে ঘণ্টা মিনিট পর্য্যন্ত। অতটা বাজিয়া অত মিনিট; জ্ঞানদা কিন্তু সে সব পারে না। পড়শীরা কেহ কেহ হয় ত বলিত—দশটার গাড়ী গেল; কিন্তু সুশীতল বলিয়া বসিতেন—দশটা চৌদ্দ হয়ে গেল; ভাত বাড় গো, নইলে দেরী হয়ে যাবে; ট্রেন পাবো না।

জ্ঞানদা তৎপর হইয়া উঠিত নিজের কাজকর্ম্মে, অন্যগ্রামে স্কুল-মাষ্টারি করিতে হয় সুশীতলকে, ট্রেনে করিয়া যাইতে হয়। একটি মাত্র ষ্টেসনের ব্যবধান; হাঁটিয়া যাওয়া অসম্ভব না হইলেও জ্ঞানদাই হাঁটিয়া যাইতে নিষেধ করিয়াছিল সই সই করিয়া। পয়সা! পয়সা সঞ্চয় করিয়া তাহাদের কি হইবে? সুশীতল বলিতেন ভবিষ্যৎ ভাবিতে। জ্ঞানদার ঠোঁটের ফাঁকে তির্য্যক্ হাসি ফুটিয়া উঠিত এক ঝলক,—ভবিষ্যৎ আবার সে ভাবে না কি! খোকা-খুকু আসিবে কোলে, স্কুলের সাধারণ শিক্ষক হইতে স্বামী তাহার একদিন প্রধান শিক্ষক হইয়া উঠিবেন। তারপর, আরও অনেক পরে স্বামী কলিকাতায় আরও বড় বড় বিদ্যালয়ের শিক্ষকতা করিবেন, খোকা মানুষ হইবে, জ্ঞানদার দুঃখভাবনা থাকিবে না কিছু! ভবিষ্যৎ জ্ঞানদা ভাবে না আবার!

খোকা আসিয়াছে সত্যই। ছোট একটি ফুট-ফুটে রাঙা খোকা। জ্ঞানদার খুশী ধরে না। ছেলে কোলে করিয়া মাতিয়া গিয়াছে রাতদিন, বলে—গরীব মায়ের ছেলে হলে কি হবে, খোকা আমার রাজপুত্তুর হবে একদিন। কপালের পাশে এই যে ধব চিহ্নটা আছে, এটা থাকলে রাজাই হয় সত্যি, আমাদের দেশে এক জ্যোতিষী বামুন ছিলেন, তিনি তাই বলতেন।

সুশীতল বলিতেন, তোমার খোকার ওপর আমার শুধু হিংসে হচ্ছে, আমার সঙ্গে ও রীতিমতভাবে প্রতিযোগিতা চালিয়েছে, দেখেছো?···তোমাকে সত্যিই ও জয় করতে পেরেছে।

জ্ঞানদা লজ্জায় লাল হইয়া উঠিত, স্বামী খোকার নরম গাল দুটা আদর করিয়া টিপিয়া দিতেন, ছেলেটি হাসিয়া উঠিত অহেতুক, কথা বলবার চেষ্টায় হাত নাচাইয়া বলিয়া উঠিত, মা, তা-বা-আ···

জ্ঞানদার তাই কোনো দুঃখ নাই। দেবতার মত স্বামী পাইয়াছে সে, আর রাজপুত্র ওই খোকা। ভবিষ্যতের স্বপ্ন-জাল বুনিতে বুনিতে উজ্জ্বল হইয়া উঠিত সে, প্রতিবেশিনীদের নিকট বিভোর হইয়া পড়িত কখনও কখনও।

দেখিতে দেখিতে খোকা বড় হইয়া পড়িল। বাবার সহিত বিদ্যালয়ে যাইতে আরম্ভ করিল, সেখানে অল্পদিনেই সুখ্যাতি হইল তাহার; সরু আর চটি চটি বই ছাড়িয়া মোটা মোটা শক্ত বই ধরিল, ইংরাজীতে কত কি লেখা। তারপর, কি পরীক্ষা দিতে হইবে না কি খোকাকে এবার।

এই পরীক্ষায় খোকা স্কলারসিপ্ পাইয়াছে, কলিকাতায় গিয়া এবার তাহাকে পড়াশুনা করিতে হইবে। জ্ঞানদা কান্নাকাটি করিল, সুশীতল বুঝাইলেন, দেশের ও দশের একজন হইতে হইলে কলেজে তাহাকে পড়িতেই হইবে; আর ছাত্র হিসাবে খোকা তাহাদের প্রশংসা ও খ্যাতি পাইয়াছে কত। জ্ঞানদা আর আপত্তি তুলিল না। স্বামী নিজে গিয়া ভর্ত্তি করিয়া দিয়া আসিবেন; থাকিবার, খাইবার মেসের বন্দোবস্ত পর্য্যন্ত ঠিক করিয়া দিবেন। জ্ঞানদার দুর্ভাবনার কিছু নাই।

তবুও সে একবার বলিয়া রাখিল,—খোকার আমার এতটুকুও কষ্টও যেন না হয়।

জ্ঞানদা বড় কোমল; তার মনের দুর্ব্বলতা যেমনই ব্যাপক আর তেমনই সূক্ষ্ম। খোকার এই কলিকাতা চলিয়া যাওয়ার ব্যাপারে সে বড় আঘাত অনুভব করিল, সে একেবারে উদ্বেগে আকুল হইয়া উঠিল। নিজের জন্য দুঃখ মনে করিবার অবসর সে পায় না; স্বামী এবং পুত্রকে কেন্দ্র করিয়া তাহার বেদনা-বোধ, তাহাদের চিন্তায় তরঙ্গ আসিয়া তাহার মনের অতলে আলোড়ন জাগাইয়া তোলে, জ্ঞানদা অধীর না হইয়া পারে না।

বাড়ীর পাশ দিয়া ট্রেন চলিয়া গেল; গাড়ীতে গেল সুশীতল আর খোকা। উদ্বিগ্ন হৃদয়ে জ্ঞানদা যথাসম্ভব দৃষ্টি তীক্ষ্ণ করিয়া রাখিয়াছিল, বলিয়া দিয়াছিল খোকাকে, খোকার বাবাকে,—এই দিকের জানলায় বসো, যাবার সময় তবু আর একবার দেখবো!

কিন্তু দেখা হয় নাই; এত দ্রুত চলিয়া গিয়াছিল দস্যু গাড়ীখানি, বিরাট একটি দৈত্যের মতো, জ্ঞানদা ঠাহরই করিতে পারে নাই। রুমাল উড়াইতে খোকাকে সে নিজে বারণ না করিলে, হয়ত বোঝা যাইত!

সারারাত্রি ঘুম হয় নাই ভালো করিয়া। আপনার কোনো দুঃখে জ্ঞানদা পাথরের মতো নিস্পন্দ হইয়া উঠিতে পারে, কিন্তু স্বামী-পুত্রকে কাছ ছাড়া করিয়া একদণ্ড ও সে স্বস্তি অনুভব করিতে পারে না। ভোরের আলো ফুটিতে না ফুটিতেই জ্ঞানদা বিছানা ছাড়িয়া উঠিয়া পড়িয়াছে—ঈশ্বরের কাছে স্বামী-পুত্রের কল্যাণ কামনা করিয়াছে শতবার; গৃহকার্য্যে তবুও সে মনোযোগ দিতে পারে নাই।

একটি দু'টি করিয়া পাঁচটি দিন কাটিয়া গেল, কোন সংবাদ নাই জ্ঞানদার কাছে। অধীর হইয়া উঠিল সে, একদিন পরেই স্বামীর ফিরিয়া আসিবার কথা;—অন্ততঃ একখানি চিঠিও আসা উচিত ছিল। পাড়ার কাহাকে দিয়া না হয় পড়াইয়া নিলেই চলিত। জ্ঞানদার বুক কাঁপিয়া উঠিল, চোখের জল আর বাঁধ মানিল না।

প্রতিবেশিনীদের কেহ কেহ আসিল সান্ত্বনা দিতে, কিন্তু জ্ঞানদার নরম মন ভাঙিয়া গিয়াছিল খান খান হইয়া, কেমন যেন গভীর অসহায়তা বোধ করিতেছিল; কিছু ঘটুক আর নাই ঘটুক, মন তাহার কু ডাক ডাকিয়াই আছে।

—অবশেষে সংবাদ আসিল। না আসিলেই ভালো ছিল তবু; রেল কলিশনে জ্ঞানদার স্বামী-পুত্র দুজনেই

মারা গিয়াছে বিপাকে। জ্ঞানদা নিস্তব্ধ হইয়া গেল খবর শুনিয়া, চোখের মণি দুইটা হইয়া গেল স্থির, মুখখানি হইল নিষ্প্রাণ, দেহ হইল নিশ্চল। পাথর হইয়া গেল জ্ঞানদা সংবাদ শুনিয়া।

কিন্তু কেন জানি না, জ্ঞানদা তবু বাঁচিয়া রহিল। শোকের প্রথম ধাক্কায় বোধ হইয়াছিল প্রাণবায়ু এইবার ছুটিয়া যাইতে পারে, যেমন নিশ্চল আর নিষ্প্রাণ হইয়া পড়িয়াছিল সে,. কিন্তু তথাপি সে বাঁচিয়া আছে।…একটু একটু করিয়া শোকের গভীরতা কমিয়া গিয়াছে, কিন্তু ক্ষত শুকাইয়া যায় নাই একেবারে, এখনও সেখানে আঘাত লাগিলে তাহাকে ডুকরিয়া কাঁদিয়া উঠিতে হয়; খোকার মুখ মনে পড়িয়া যায় অকস্মাৎ, স্বামীর কথা কাণে বাজিতে থাকে।

নতুন দুঃখ আর জুটিবে না কিছু। স্বামী-পুত্র সম্বন্ধে সকল দুশ্চিন্তার শেষ হইয়া গেছে একেবারে। ছোটখাটো ব্যথা, বেদনা, উদ্বেগ, অহংকার সকল কিছুর পরিসমাপ্তি ঘটিয়াছে। এখন তার পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে কত, সে এখন অন্য জ্ঞানদা।

জীবনের নূতন পরিচ্ছেদ সুরু হইয়াছে। সুশীতলের স্ত্রী হইয়া আজ তাহাকে রায় বাবুদের বাড়ীতে দাসীবৃত্তি করিতে হইতেছে বলিয়া, সে মনে কিছু করে না। কপাল তাহার মন্দ না হইলে রাজা এবং রাজ-পুত্রকে সে খাইবে কেন এমন করিয়া?

রায়েরা তবু লোক ভালো; অন্ততঃ জ্ঞানদার সঙ্গে রূঢ় ব্যবহার করে নাই কোনোদিন।

করিলেও কিছু বলিবার নাই। দু একটা ভুলচুক ত' জ্ঞানদার কাজে লাগিয়াই আছে, তথাপি তাহারা সামলাইয়া লয় সে সব। বুঝিতে পারিলে জ্ঞানদাই বরং রুখিয়া ওঠে—ভুল হয়েছে, বেশ আমাকে শুধরে নেবার হুকুম করবে, তা না তোমরা আমাকে অমনভাবে ক্ষমা করবে কেন, আমাকে দয়া দেখাতে হবে না এভাবে! আমাকে কি ভিখিরী মনে করো, কেবল দয়া, মায়া,—না, আমি তোমাদের বাড়ী আর কাজ করতে পারবো না। চল্লুম বড়দিদি।

রায়-গিন্নী অনুরোধ করিলেন, জ্ঞানদা, যাসনে অমন করে. বলি শোন্ শোন্।

না বড়দি—বলিয়া জ্ঞানদা অকারণে ঝর ঝর করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল রায়গিন্নীর সম্মুখে। কি যেন হইয়াছে তাহার ছোট খাটো কথায়, সামান্য একটু আঘাতেই জ্ঞানদা কাঁদিয়া ফেলিত এমনভাবে।

রাগ করিয়াই সে দিন সে চলিয়া আসিল।

কিন্তু বিকালে তাহাকে আবার চাকরী লইতে হয়। হাসিতে হাসিতে গিয়া বলে তোমাদের ফেলে কোথাও যেতে পারি কি বড়দি। কেমন যেন তোমরা আমার আপন-জন হয়ে গেছ। বলিয়া কাজ আরম্ভ করিয়া দেয়, উত্তরের এবং অনুমতির অপেক্ষা করে না।

গো-শালা পরিষ্কার করিয়া গরুর জাবনা কাটিতে বসে; অবসর নাই একদণ্ড, এখুনি ফুলের বাগানে গিয়া কয়েক কলস জল ঢালিয়া দিতে হইবে চাঁপা মালতীর গোড়ায়, তারপরে তুলসী তলা গোবর দিয়া নিকানো, দরজায় দরজায় জলের ছিটা দেওয়া, সন্ধ্যার প্রদীপ অষ্ট দিকে দেখানো: জ্ঞানদার কাজের অন্ত থাকে না। কোনও দিন বা ইহার উপর আবার রায়-গিন্নীর মেয়ে তারা ধরিয়া বসে, বলে, জ্ঞানদা মাসী, আজ তোমায় ছাড়ছি না, চুল বেঁধে দিতেই হবে। সেই রকম ময়ূরমুকুর খোঁপা করে দাও। কাল বড় পালিয়েছিলে।

এতো কাজ। ছোটখাটো অবসর যা মেলে জ্ঞানদা এদিক ওদিক চাহিয়া কাটাইয়া দেয়, নয় তো পুকুরের পাড়ে গিয়া শুশনী শাক তুলিতে বসে, কিংবা অহেতুক ফুলের বাগানে ঘুরিয়া বেড়ায়।

তারা বড় মিতালি করিয়া ফেলিয়াছে জ্ঞানদার সহিত; চুল বাঁধিয়া দিতে হইবে ময়ূরমুকুর খোঁপা করিয়া, কপালে আঁকিতে হইবে সোনালী টিপ—আর অবসর সময়ে গল্প করিতে হইবে আজেবাজে; কিন্তু জ্ঞানদা হাঁফাইয়া ওঠে মাঝে মাঝে, এত সহ্য হয় না। তাহার রিক্ত-আত্মা ডুকরাইয়া কাঁদিয়া উঠে; বলে,—কবে ত' ঝরিয়া শুকাইয়া গিয়াছিস অকালে, এখনও মনের গভীরে একটী তরুণী বালিকাকে জীবিত করিয়া রাখার কোনো হেতু নাই। উষ্ণ নিঃশ্বাসে ঐ সরল মেয়েটীর ক্ষতি যেন করিস না।

সত্যই ত। জ্ঞানদা মনের দিকে চাহিয়া বড় হতাশ

হইয়া পড়ে, তারার পাশ হইতে সরিয়া আসে; ছোট্ট মেয়ে, সাধ-আহ্লাদ, আশা ও আকাঙ্ক্ষা—সকল কিছুকে কেন্দ্র করিয়া মন তাহার উড়িয়া উড়িয়া বেড়ায় প্রজাপতির মত, নিজের উষ্ণ নিঃশ্বাসের তলে জ্ঞানদা তারার ঐ সুখ নষ্ট করিতে চায় না। সে সরিয়া আসে নিভৃতে।

নীল অপরাজিতার দুটি ফুল তারার খোঁপায় গুঁজিয়া দিয়াছিল তারার এক বান্ধবী। পাকা দেখা হইয়া গেছে; বান্ধবী আসিয়াছিল, হাসি খেলা করিতে করিতে তারাকে রাণী সাজাইয়া এই ফুল দু'টি খোঁপায় দিয়া বলিয়াছে,—রাণী হবি তুই তারা, দেখিস।

জ্ঞানদার চক্ষু এড়ায় নাই। পাকা দেখার দিন কাজ তাহার বেশী পড়ুক, তবু তাহাকে সকলদিকে চোখ রাখিতে হইয়াছে, কোথা দিয়া কখন কি ঘটিয়া যায়—জ্ঞানদার এখন সকল দিকেই দৃষ্টি সজাগ থাকে। তারার মাথার দিকে চাহিয়া সে শিহরিয়া উঠিল—দৌড়াইয়া ফুল দু'টি ছিনাইয়া লইল খোঁপা হইতে,—চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল,—এ ফুল ফেলে দে মুখপুড়ি! রাক্ষুসি, তুইও কি আমার মতো হতে চাস না কি!—কে তোকে এ সব অলুক্ষণে ফুল দিয়েছে বল তো?

রায়-গিন্নির কথাক'টি বিশেষ ভালো লাগিল না; সে জ্ঞানদাকে শাসনের সুরে দু-চারটি কড়া কথা শুনাইয়া দিল। জ্ঞানদা নির্বিবাদে সকল কথা সহ্য করিয়া গেল; তারাকে বলিয়াছিল শুধু: ও ফুল বড় অ-পয়া তারা; ছেলে বয়সে আমি মাথায় দিতুম, আর মনে করতুম রাণী হব। তুই আর কোন দিন ও ফুল ছুঁস্‌নি। জ্ঞানদা চলিয়া আসিল বাহিরে।

সেই যে জ্ঞানদা রায়বাড়ী ছাড়িয়াছে আর যায় নাই। ওখানে যায় না বটে, কিন্তু রায়দের সকল কথাই কানে আসিয়া পৌঁছায় জ্ঞানদার; আজ তারার বিবাহ হইল, কাল শ্বশুরবাড়ী গেল, এমনি খুচরা খবর। হঠাৎ একদিন শুনিল তারা বাপের বাড়ী ফিরিয়াছে, কপালে সিঁদুর নাই, হাতের নোয়া খোয়াইয়া, থান পরিয়া ফিরিতে হইয়াছে তারাকে। জ্ঞানদার চোখে আর একবার বর্ষা নামিল।

রায়-গিন্নি কাঁদিলেন; শোক প্রশমিত হইলে বলিলেন,—আমি এ হ'বেই, যেদিন ওই জ্ঞানদা ডাইনী মেয়েকে অভিশাপ দিলে, সেইদিনই বুঝতে পেরেছি। স্বামী-পুত্র খেয়েও রাক্ষুসীর তৃপ্তি হয় নি।

তারপর হইতেই পাড়ার সকলে বুঝিতে আরম্ভ করিল, জ্ঞানদা ডাইনী। রূপকথার রাজ্যে রাক্ষসীরা যেমন মানুষের দেহ ধরিয়া রক্ততৃষ্ণা মিটাইত, জ্ঞানদা না কি সেইরূপ একটি প্রাণী-বিশেষ। চেহারায় মেয়েমানুষের সাদৃশ্য থাকিলে কি হইবে, আসলে জ্ঞানদা ডাইনী। জ্ঞানদার সম্বন্ধে সকলের মুখেই এ কথাগুলি শুনিতে পাওয়া যায়। কেহ বড় একটা আর তাহার সম্মুখে বাহির হইত না।

জ্ঞানদা শুনিতে পাইল সব; সন্দেহ তাহারও মনে যে না হইয়াছিল তাহা নয়, অবচেতন মনে হয় তো একটা আকাঙ্ক্ষা ছিল, তারা বিধবা হোক, এবং জ্ঞানদা তারাকে বড় বেশী ভালবাসিত বলিয়াই ঐ প্রচ্ছন্ন বাসনাটি মনের কোণে জমিয়াছিল কি না কে জানে? জ্ঞানদা বিহ্বল হইয়া পড়ে, বিশ্লেষণ করিতে পারে না।

সে ডাইনীই হইয়া গেল সকলের চোখে। সারাদিন বাহির হইবার উপায় নাই; গাল-মন্দ চলিবে, দুষ্টু ছেলেরা পাথরের নুড়ি ছুড়িয়া মারিতে ছাড়ে না। আর বাড়ীর মেয়েরা ছোট ছোট ছেলে-মেয়েদের সাবধান করিয়া রাখিবে। হাওয়া বাতাস যেন না লাগে। জ্ঞানদা গুটি গুটি করিয়া অগ্রসর হয়, হাটে-বাজারে, দোকানঘরে,—কোথাও কিছু মিলিবার উপায় নাই; একমুঠা চাল জুটাইতে পারে না সে। ডাইনী বলিয়া ঘৃণা ও অনাদর আসে সকল স্থান হইতে। মুড়ি ভাজিয়া বেচিতে সুরু করিয়া দিল জ্ঞানদা। কিন্তু প্রথম দিনেই যে লোকটি কিনিয়াছিল, সে মারা গেল কলেরায়। ওই মুড়ি খাইয়া যে লোকটি মরে নাই জ্ঞানদা তাহা শপথ করিয়া বলিতে পারে, লোকে কিন্তু সে কথা বিশ্বাসই করিল না। দেশান্তর হইতে ওঝা ডাকানো হইল। একদিন সকালে জ্ঞানদা দেখিতে পাইল—লঙ্কা আর সরিষা ছুড়িয়া মারিতেছে তাহারা, বিড়্ বিড়্ করিয়া মন্ত্রও পড়িতেছে তাহার সঙ্গে। জ্ঞানদা রাগিয়া ফুঁসিয়া উঠিল, ক্রুদ্ধ সর্পিণীর ন্যায় তাড়িয়া আসিল; চোখ দুটা লাল, হিংসার বহ্নিতে মুখখানি পুড়িয়া গিয়া বিবর্ণ ও ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিয়াছে, প্রতি কুঞ্চিত রেখায় রেখায় অগ্নিস্ফুলিঙ্গ—জ্ঞানদা ক্ষেপিয়া

। তাহার সারল্যের সুযোগে লোকেরা এ ভাবে

তাহাকে অপমান করিবে কেন—জ্ঞানদা ডাইনী যদি হয়, হোক।

সেদিন ভয়ে সকলে পলায়ন করিয়া বাঁচিল। জ্ঞানদার পিছনে লাগিয়াছে সকলে। সে দিকে জ্ঞানদা ভ্রূক্ষেপ করে না। সারাদিন ধরিয়া নিজের স্বল্প পরিসর ঘরখানির মধ্যে বসিয়া বসিয়া ঝিমাইতে থাকে। রাত্রে, রাত যখন গভীর এবং নিশুতি হয়, তখন এর ওর পুকুর হইতে কলমী, শুশ্‌নী তুলিয়া আনে, কাহারও গোলা হইতে বা ধান চুরি করিয়া আনে;—এমনি করিয়া চালাইয়া দেয় দিনগুলি। আর, মধ্যে মধ্যে লোহার সর্পিল পথরেখার প্রতি তাকাইয়া থাকে, হিংসায় মন তাহার জ্বলিয়া পুড়িয়া খাক্ হইয়া উঠে। অব্যক্ত বেদনায় ছট্‌ফট্ করিয়া উঠে, বড় কাতর হইয়া যায়।

সুস্থ থাকিলে জ্ঞানদা ভাবিতে বসে—ডাইনী হয় ত সে সত্যই হইয়া গেছে। তারা ত' তাহার কথামতই বিধবা হইয়াছে, তাহারই মত থান পরিয়া—মাথার সিঁদুর মুছিয়া বুকজোড়া হাহাকার লইয়া!—তাহারই ভাজা মুড়ি খাইয়া লোকটি ত' মরিয়া গেল—এ কথা কে না জানে। তা'ছাড়া পাশের বাড়ীর ছোট ছেলেটার দিকে তাকাইয়াছিল বলিয়াই ত' তাহার একশো পাঁচ জ্বর উঠিয়াছিল সেই মুহূর্ত্তে—ভুল বকিতে বকিতে বিভীষিকা দেখিয়া উঠিয়াছিল জ্ঞানদার। নিজের প্রতি জ্ঞানদা আর বিশ্বাস রাখিতে পারে না।

এতদিন জ্ঞানদা দরমার আড়াল দিয়া রাখিয়াছিল রেল-পথের দৃষ্টি হইতে, সংস্কারের অভাবে তাহা এখন ঘুচিয়া যাইতেছে। ওদিকে দৃষ্টি পড়িলেই জ্ঞানদার মনটি এখনো টন টন করিয়া উঠে। তাই আড়াল দিয়া রাখিয়াছিল, কিন্তু তাহা অযত্নে ভাঙিয়া গেল। এখন রোয়াকে বসিয়াই দেখা যায় লোহার বুকের উপর ওই দৈত্যগুলি উদ্দামগতিতে শব্দ করিতে করিতে ছুটিয়া যায় একমনে; কাহারও মনের দিকে চায় না; কাহারও লাভ-লোকসানের প্রতি দৃষ্টি নাই, কোনও অনুভূতির মূল্য নাই, নিষ্প্রাণ এবং নির্দ্দয় দানবগুলির কাছে।...অথচ লোকের সর্ব্বনাশ করিতে তাহারা ছাড়ে না। ক্ষুদ্র একটি জীবনকে ছন্ন ছাড়া করিয়া তুলিতেও ছাড়ে না। মায়া না থাকুক, কিন্তু নির্ম্মমতা পোষণ করিবার দুঃসাহস তাহারা পাইল কোথা হইতে?

সহসা মনে হইল—ওই দূরের বৃহৎ ষ্টেশনটি দায়ী। ঢং ঢং করিয়া ঘণ্টা বাজাইয়া ইহাদের মাতাল করিয়া দেয়, আশ্বাস দিয়া ছুটিবার আদেশ জানায়! জ্ঞানদার চোখের মণি দুইটা জ্বল্ জ্বল্ করিয়া উঠিল।

সন্ধ্যার অন্ধকারে লুকাইয়া সেদিন তারা আসিয়া জানাইয়া গেল—মাসী গো, তুমি এখন ছেড়ে পালিয়ে যাও, তোমাকে বাবা, কাকা পুড়িয়ে মারবে ঠিক করেছে। আমার মাথার দিব্যি, তুমি চলে যেও।

জ্ঞানদা নিষ্পলক দৃষ্টিতে তারাকে দেখিয়াছিল একবার।

গভীর রাত্রে, ফলচুরি করিতে বাহির হইয়াছিল যখন জ্ঞানদা—তিনদিন অনাহারের পর, একাদশীর উপবাস করিতে হইবে আবার কাল, তাই অবসন্ন এবং ক্লান্ত শরীর নিয়া আহার্য্যের সন্ধানে বাহির হইয়াছিল যখন সে—তখন দূর হইতে দেখিতে পাইল, তারার কথা সত্য হইয়াছে,—তাহার ছোট্ট কুঁড়েখানি জ্বলিয়া যাইতেছে। সে সোজা ষ্টেশনের পথে ফিরিয়া গেল।

এইখানে জ্ঞানদাকে আমরা ছাড়িয়া দিতাম। অর্দ্ধোন্মত্ত বেদনাকাতর ও দুঃখক্লিষ্ট একটি নারীর কাহিনীর যবনিকা এইখানেই টানিয়া দিতাম; কিন্তু আরও একটুখানি না বলিলে সবটাই অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে।

সোজা সে ষ্টেশনে চলিয়া আসিল। অতবড় বিরাট ষ্টেশন,—গভীর সেই নিশুতি রাতে কেমন নিস্তব্ধ হইয়া রহিয়াছে যেন। মায়াপুরীর মত, এখানে ওখানে যারা রহিয়াছে—বসিয়া বসিয়া ঝিমাইতেছে কেহ—শুইয়াও পড়িয়াছে অনেকে। কেবল দূরে, ওভার পুলের ওই পাশে একটি কক্ষে টক্ টক্ করিয়া কি শব্দ হইতেছে—একটা লোক তাহার পাশে বসিয়া বসিয়া কি ছাই লিখিয়া মরিতেছে অবিরাম ভাবে—জ্ঞানদা সরিয়া আসিল নির্জ্জনে।

...গাড়ীগুলি সত্যই ত দৈত্য। এই দৈত্যের শক্তি নষ্ট করিয়া দিতে হইবে। যেমন পঙ্গু করিয়া দিয়াছে তাহারা জ্ঞানদাকে; তেমনি করিয়া ওই নির্দ্দয় পাষাণ যন্ত্রগুলার উপর ক্ষতের চিহ্ন আঁকিয়া দিতে হইবে, মানুষের ক্ষতি করিয়া যাহাদের বিচার হয় না, সেই দৈত্যের সর্ব্বনাশ করিতে হইবে। জ্ঞানদার সারা দেহের উপর একটি শিহরণ বহিয়া গেল।... হতভম্বের মত এদিক্ ওদিক্ তাকাইয়া সে ঘণ্টা বাজাইবার ওই লোহার ছোট ডাণ্ডাটি লইয়া ছুটিয়া পালাইল।

—বাহিরে আসিয়া সে দাঁতে কামড়াইয়া, আছাড় মারিয়া সেই লৌহ খণ্ডকে বিচূর্ণ করিবার বহু চেষ্টা করিতে লাগিল। জ্ঞানদার শরীর থর্ থর্ করিয়া কাঁপিতেছিল, এবার সে জ্ঞান হারাইয়া ঘুরিয়া পড়িয়া গেল পথের উপর, মুখ দিয়া এক ঝলক রক্ত বাহির হইয়া আসিয়া সেই স্থানটিকে লাল করিয়া দিল। তথাপি সে ঘণ্টা বাজাইবার সেই লৌহ-খণ্ডটাকে কামড়াইয়া রহিয়াছে শক্ত ভাবে।...

বাঙ্গালার জাতীয় জীবনে শ্রীচৈতন্যদেবের প্রভাব

—শ্রীবীরেন্দ্রমোহন আচার্য্য

ফাল্গুনী পূর্ণিমা তিথিতে এবার গ্রস্তোদয় গ্রহণ হইয়াছিল। নদীয়ার ঘরে ঘরে শঙ্খধ্বনিতে মনে পড়িল বহুদিন পূর্ব্বেকার এক পুণ্যময় দিনের কথা। ৪৫৫ বৎসর পূর্ব্বে সেদিনও ফাল্গুনী পূর্ণিমা তিথিতে গ্রহণ লাগিয়াছিল। নবদ্বীপের ভাগীরথীবক্ষে সেদিন লক্ষ পুণ্যার্থীর কণ্ঠে ধ্বনিত হইতেছিল কলুষহারী ভগবানের নাম। রাজপথ মাল্যপুষ্পে সমাকীর্ণ। হর্ষোৎফুল্ল নরনারীর হুলুধ্বনি দিগ্‌মণ্ডল প্রতি-ধ্বনিত করিয়া তুলিতেছিল। এমনি সময়ে এমনি মুহূর্ত্তে নবদ্বীপে জগন্নাথ মিশ্রের কুটির হইতে শুভশঙ্খনাদে বাঙ্গালার নবযুগোদয় বিঘোষিত হইল। ধর্ম্ম, সমাজ, সাহিত্য প্রভৃতি সর্ব্বদিক দিয়াই বাঙ্গালার জাতীয়-জীবনে যে সময়ে শোচনীয় দুর্দ্দশার কৃষ্ণা রজনী ঘনাইয়া তাহার কৃষ্টি ও সভ্যতাকে রাহু-গ্রস্ত করিয়া তুলিতেছিল, এমনি সময়ে নবদ্বীপচন্দ্র নদীয়ায় আবির্ভূত হইয়া সর্ব্বাঙ্গীনভাবে বাংলাকে অবশ্যম্ভাবী সর্ব্বনাশ হইতে রক্ষা করিলেন।

জগন্নাথ মিশ্রের এই দিব্যকান্তি চপল শিশুটির অপরূপ রূপ-লাবণ্য ও কীর্ত্তিকাহিনীর কথা পরবর্ত্তী কালের কবিবৃন্দ তাঁহাদের সকল কল্পনার উৎস নিঃশেষিত করিয়াও যেন আঁকিয়া তৃপ্ত হ'ন নাই। প্রেম ও করুণার মূর্ত্ত বিগ্রহ বলিয়া যেন সবখানি বলা হয় নাই।

অমিয়া মথিয়া কেবা নবনী তুলিল গো
তাহাতে গড়িল গোরাদেহ।
জগৎ ছানিয়া কেবা রস নিঙাড়িল গো
এক কৈল সুধই সুলেহ।
বিজুরী বাটিয়া কেবা গা'খানি মাজিল গো
চাঁদে মাজিল মুখখানি।
লাবণ্য বাটিয়া কেবা চিত নিরমাণ কৈল
অপরূপ রূপের বলনি।

এ রূপের কথা কি কাহাকেও বলিয়া বুঝান যায়? একবার যাহার হিয়ায় সে পরশ লাগিয়াছে তাহাকে আপন ভোলা করিয়া ঘর ছাড়াইয়াছে। বিংশ শতাব্দীর মরমী কবি লিখিয়াছেন, "বাঙ্গালীর হিয়া-অমিয়া মথিয়া নিমাই ধরেছে কায়া।" সত্যই বাঙ্গালার আশা, আকাঙ্ক্ষা, বাঙ্গালার সভ্যতা, সংস্কৃতি যেন সার্থক ভাবে মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছিল নিমাইরূপে।

বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রেমের ধর্ম্ম, রসের ধর্ম্ম। শস্যশ্যামলা চির-হরিৎ বাঙ্গালার শান্ত-শীতল গৃহকোণবাসী বাঙ্গালীর স্নিগ্ধ জীবন-যাত্রাটিও যেন তেমনি একটি অনবদ্য রসের সঙ্গীত, প্রেমের সঙ্গীত।

বাঙ্গালার বৈষ্ণব কবিরা সত্যকার প্রেমঘন বিগ্রহের সাক্ষাৎ পাইয়া আম্রপল্লবঘন শ্যামল পল্লীশ্রীর সত্যকার রূপটী উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন, মহাপ্রভুর সেই ভুবন ভোলান রূপ অঙ্কন করিয়া বঙ্গীয় সভ্যতার নিগূঢ়মর্ম্ম অনুসন্ধান করিতে পারিয়াছিলেন। বাঙ্গালার নিজস্ব সংস্কৃতিগত বৈশিষ্ট্য ও শ্রীচৈতন্যদেবের অলৌকিক প্রেমধর্ম্ম ওতপ্রোতভাবে বিজড়িত। বাঙ্গালার নিমাইকে না চিনিয়া বাঙ্গালীর হৃদয়ের সন্ধান যে করিতে যাইবে, তাহার সে চেষ্টা পণ্ডশ্রম মাত্র।

মহাপ্রভুর সেই লোকোত্তর জীবনকাহিনীর কথা বর্ত্তমানে আলোচনা করিবার সময় নাই, তবে নদীয়ার এই প্রেমের ঠাকুরের অলোক-সামান্য ব্যক্তিত্ব বাঙ্গালার জাতীয় জীবনে কি যে মোহস্পর্শ দিয়া এমন প্রাণবন্ত করিয়া তুলিয়াছিল তাহার আলোচনা করিতে গেলে সত্যই বিস্মিত হইতে হয়। তাঁহার বিশ্বপ্লাবী প্রেমের বন্যায় বাঙ্গালার আধ্যাত্ম জীবনের সমস্ত কলুষ-কালিমা যেন মুহূর্ত্তে বিধৌত হইয়া গেল। বাঙ্গালী পুরী গেল, কাশী, কাঞ্চি, দ্রবিড়ে বাঙ্গালার অভিনব চিন্তাধারার প্লাবন বহাইল; বৃন্দাবনের লুপ্ততীর্থগুলি উদ্ধার করিয়া গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণের চিন্তা ও দর্শনের অন্যতম প্রধান কেন্দ্র করিয়া তুলিল। ভারতে কোন নূতন ধর্ম্মমতই প্রতিষ্ঠিত হইবে না—যদি তাহা সম্পূর্ণরূপে শ্রুতির উপর প্রতিষ্ঠিত না হয়, অভ্রান্ত দার্শনিক মতবাদে তাহার ভিত্তি সুগঠিত না হয়। মহাপ্রভুর এই প্রেমের ধর্ম্মও শুধু হৃদয়ের

ভাবাবেগের উপরেই প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। পূর্ব্ববর্ত্তী বহু দার্শনিক মতবাদ কূটতর্কে বিচ্ছিন্ন করিয়া নিজস্ব জটিল দর্শন রচনা করিতে হইয়াছে। এই হিসাবে ভারতের দার্শনিক চিন্তাধারায় গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের 'অচিন্ত্য-ভেদাভেদতত্ত্ব' বর্ত্তমানকালের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অবদান। এমনি করিয়া নানাদিকে বাঙ্গালী তাহার সঙ্কীর্ণতার আবরণ ভেদ করিয়া ভারতের বৃহত্তর কর্ম্মক্ষেত্রে বৃহত্তর বঙ্গের সর্ব্বপ্রথম প্রতিষ্ঠা করিল।

বাঙ্গালার সাহিত্য সাধনাতেও এই বৈষ্ণব সাধকগণের অপরিমিত দানের কথা সর্ব্বজনবিদিত। কৃত্তিবাসের পর কিছুকাল ধরিয়া গৌড়ীয় রাজন্যবর্গের পৃষ্ঠপোষকতায় খান কয়েক রামায়ণ, মহাভারতের বঙ্গানুবাদ ও চণ্ডী, শীতলা, মনসার বিবিধ ছড়া-পাঁচালী, ব্রতকথা রচনায় তখন বাঙ্গালার সমগ্র কবিপ্রতিভা নিয়োজিত হইতেছিল। এইভাবে অগ্রসর হইতে থাকিলে বঙ্গ-সাহিত্যের ভবিষ্যৎ এত অল্প সময়ের মধ্যে কখনই এমন গৌরবময় হইয়া উঠিতে পারিত না। কিন্তু সেখানেও এই 'প্রেমিক-পাগলের' পুণ্য-পরশ যে অভূতপূর্ব্ব কাণ্ড ঘটাইয়াছে পৃথিবীর কোন সাহিত্যের ইতিহাসেই বোধ হয় তাহার জোড়া নাই। সাহিত্যের যখন সবেমাত্র জ্রূণাবস্থা, এমনি সময়ে মহাপ্রভুর ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া বৈষ্ণব সাধকগণ মাত্র কয়েক বৎসরের মধ্যে যে বিশাল পদাবলী-সাহিত্য রচনা করিয়া ফেলিলেন গীতিকাব্য হিসাবে তাহা আজিও পৃথিবীর সাহিত্য-সভায় অপ্রতিদ্বন্দ্বী রহিয়াছে। বৈষ্ণব সাধকগণের অনাবিল প্রেম-ধর্ম্ম, সাধনা ও বিশ্বপ্রেমের প্রবল বন্যায় শুধু যে বাঙ্গালার জড়চেতন সমাজ জীবনের নানাবিধ জঞ্জাল, দৈন্য ও কুসংস্কার বিধৌত হইয়া গেল তাহা নহে, পরন্তু অহেতুক-প্রেমভক্তির মাধুর্য্য বর্ণনা করিয়া বাঙ্গালার সাহিত্য-জীবনকেও নিষ্কলুষ ও সংস্কারমুক্ত করিল। এই অপূর্ব্ব সাহিত্যের প্রত্যেক স্তরে স্তরে প্রাণের কি ব্যাকুল আকুতি, কি আত্মহারা ভাব, প্রেমের কি বিচিত্র লীলা! প্রিয়তমের জন্য, দয়িতের জন্য সর্ব্বস্ব, এমন কি, আত্মবিসর্জ্জন করিয়া সুখ, এমনিতর কত চিত্রই যে অঙ্কিত হইয়া আছে, তাহা বলিয়া ফুরাইবার নহে। ভাবের প্রগাঢ়তায়, আবেগের তীব্রতায়, নিষ্কাম প্রেম-সাধনায়, আত্ম-নিবেদনের চরিতার্থতায় বৈষ্ণব কবিগণ আজ পর্য্যন্ত পৃথিবীর মধ্যে অপ্রতিদ্বন্দ্বী বলিলেও বোধ হয় অত্যুক্তি হইবে না।

বৈষ্ণব সাহিত্য, রসের সাহিত্য! এই সাহিত্যে পূর্ব্বরাগ, মান, কলহান্তরিতা, বিরহ, মিলন, প্রভৃতি প্রেমের নানা অবস্থায়, নানা ভাবের চিত্র নিপুণ তুলিকায় কি যে অপূর্ব্বরূপে ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহার ব্যাখ্যা নাই, বিচার চলে না, কেবলমাত্র সহৃদয় পাঠকের তাহা সাত্ত্বিক অনুভূতি-সাপেক্ষ।

মহাপ্রভুর জীবনকাব্য হইতে প্রেরণা লাভ করিতে পারিয়াছিলেন বলিয়াই তাঁহার অনুবর্ত্তী বৈষ্ণব কবিরা তাঁহাদের অন্তরের অনুভূতিকে এমন সার্থক করিয়া আঁকিতে পারিয়াছিলেন। তাঁহাকেই সাক্ষাৎ 'রাধাভাব-দ্যুতি সুবলিতং' ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ জানিয়া ও তাঁহার ভাবোন্মাদ অবস্থার অলৌকিক লীলা-কলাপ প্রত্যক্ষ করিয়া রসের নির্ঝরে আকণ্ঠ নিমগ্ন হইতে পারিয়াছিলেন বলিয়াই তাঁহাদের রচনায় প্রেমের এমন পরিপূর্ণ অভিব্যক্তি সম্ভব হইয়াছিল।

> 'রূপ লাগি আঁখি ঝুরে গুণে মন ভোর
> প্রতি অঙ্গ লাগি কান্দে প্রতি অঙ্গ মোর
> হিয়ার পরশ লাগি হিয়া মোর কান্দে
> পরাণ পিরীতি লাগি থির নাহি বান্ধে।'

ইহাকে শ্রীরাধার ব্যাকুল উক্তি না বলিয়া মহাপ্রভুর পরিচরবৃন্দের প্রাণের আকুতি বলিলেও মিথ্যা হয় না।

> "বঁধু আর কি ছাড়িয়া দিব,"
> এ বুক চিরিয়া যেখানে পরাণ সেখানে তোমারে থোব।
> ও চাঁদ বয়ান সদা নিরখিব, মুখ না চাহিব আর,
> তোমা হেন নিধি মিলাইল বিধি পুরিল মনের সাধ।"

কিংবা,

> শিশুকাল হৈতে বন্ধুর সহিতে পরাণে পরাণ লেহা,
> না জানি কি লাগি, কো বিহি গড়ল ভিনি ভিনি করি দেহা
> আমার অঙ্গের বরণ লাগিয়া পীতবাস পরে শ্যাম।
> প্রাণের অধিক করের মুরলী লইতে আমারি নাম।
> আমার অঙ্গের বরণ সৌরভ যখন যেদিকে পায়।
> বাহু পসারিয়া বাউল হইয়া তখন সেদিকে ধায়।

এই সকল অপরূপ ভাবোল্লাসের চিত্র পরবর্ত্তী বৈষ্ণব কবিরা মহাপ্রভুতে সম্পূর্ণ প্রত্যক্ষ করিতে পারিয়াছিলেন।

রাধা-কৃষ্ণের লীলাবর্ণনায় প্রেমের যে তীব্র আর্ত্তি ও গাঢ় ঐকান্তিকতা তাঁহাদের লেখনীতে এমন অপরূপ ভাবে চিত্রিত হইয়াছে মহাপ্রভুর জীবনে তাহা তেমনি গম্ভীর

ভাবেই ফুটিয়া উঠিয়াছিল। প্রেমের ঐরূপ কল্পনাতীত লীলাবৈচিত্র্য তাঁহারা যেন চোখের সামনে দেখিয়াই লিখিয়া রাখিয়াছেন, কল্পনা করিতে হয় নাই।

পদ রচনায় ইহারা রাধাকৃষ্ণ-লীলা বর্ণনার পূর্ব্বেই গৌর-লীলা বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। এই গৌর-লীলা অর্থে কেবল মাত্র শ্রীচৈতন্যদেবের জীবনী বর্ণনা নহে, শ্রীকৃষ্ণের স্থলে গৌরাঙ্গ প্রভুকে নায়ক করিয়া ব্রজলীলার সমুদয় ঘটনাবলী এবং সমুদয় ভাববৈচিত্র্য তাঁহার উপর আরোপ করা হইত। গোরাচাঁদ কখন কোন ব্রজভাবে মগ্ন হইয়া থাকিতেন তাহাই কল্পনা করিয়া রূপ বর্ণনা, পূর্ব্বরাগ, অভিসার, মান, খণ্ডিতা, রাস, মাথুর, প্রভৃতি সকল লীলা প্রকাশেই অজস্র গৌর সম্বন্ধীয় পদ রচিত হইয়াছে। এই সকল পদগুলিকে 'গৌরচন্দ্রিকা' বলা হয় এবং কীর্ত্তনীয়াগণ কীর্ত্তন গাহিবার কালে মূলপালা গাহিবার পূর্ব্বে ঐ লীলা সম্বন্ধীয় গৌরচন্দ্রের কয়েকটি পদ গাহিয়া পরে পালা আরম্ভ করিয়া থাকে। (এই হিসাবে গৌরচন্দ্রিকা শব্দের অর্থে ঘোর অন্ধকারময় শ্রীকৃষ্ণ লীলার উপরে সাধারণের বুঝিবার জন্য গৌর-লীলা রূপ চন্দ্রিকা পাত বলিয়া মনে করা যাইতে পারে)। ইহা হইতেই গৌরচন্দ্রিকা শব্দের অর্থ মূল আখ্যায়িকার ভূমিকা দাঁড়াইয়া গিয়াছে।

পদাবলী রচনা ছাড়াও বৈষ্ণব কবিরা আরও এক বিষয়ে বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেন। মহাপ্রভু অবতীর্ণ হইবার পূর্ব্বে পৌরাণিক দেব-দেবীর কথা ছাড়িয়া মানুষের কথা যে কোন কাব্যের বিষয়বস্তু হইতে পারে, লৌকিক মানুষের লৌকিক চরিত্র লইয়া যে কোন সাহিত্য রচনা করা যাইতে পারে, তাহা কাহারও ধারণা ছিল না।

বৈষ্ণব কবিগণ এ বিষয়ে বঙ্গ-সাহিত্যে যুগান্তর আনয়ন করিলেন বলা যায়। শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু, নিত্যানন্দ, অদ্বৈতাচার্য্য ও অন্যান্য বহু বৈষ্ণব সাধকগণের জীবনী অবলম্বন করিয়া তাঁহারা বহু জীবনীগ্রন্থ, কড়চা, ইতিহাস প্রভৃতি রচনা করিয়া বঙ্গ-সাহিত্যকে পরিপুষ্ট করেন। এইরূপে বৈষ্ণব যুগেই প্রকৃত পক্ষে বঙ্গ-সাহিত্যের পুষ্টিসাধন ও সাহিত্য বলিয়া গর্ব্ব করিবার মত ইহার দৃঢ় ভিত্তির প্রতিষ্ঠা, শ্রীচৈতন্যদেবের ভক্তেরা তাঁহারই ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া অবজ্ঞাত মাতৃভাষায় তাঁহাদের ধর্ম্মের মর্ম্মকথা জনসাধারণকে বুঝাইতে লাগিলেন। দীনা বঙ্গভাষা 'ন'দের চাঁদের' পুণ্য পরশ লাভ করিয়া বাঙ্গালার ঘরে ঘরে বাঙ্গালীর মর্ম্মকথা হইয়া দাঁড়াইল।

পদাবলী-সাহিত্যের সঙ্গে সঙ্গেই অঙ্গাঙ্গী ভাবে আরও একটি ললিত কলার সৃষ্টি ও পুষ্টি হয়—কীর্ত্তন-সঙ্গীত। ভারতীয় সঙ্গীত-কলার ধারায় ইহাই বাঙ্গালার একমাত্র নিজস্ব ও শ্রেষ্ঠ দান। সঙ্গীতের সুরে মানুষের হৃদয়কে উদ্বেলিত করিয়া দ্রবীভূত করিয়া দিবার পক্ষে কীর্ত্তনের মত সার্থক স্বর-বিন্যাস বোধ হয় আর কিছু হইতে পারে না। সঙ্গীতের ইতিহাসে এই কীর্ত্তন-সঙ্গীতের মূল্য যে কতখানি তাহা সঙ্গীত-বিশেষজ্ঞগণই অনুভব করিবেন।

[ক্রমশঃ



লণ্ডন-তীর্থে

—শ্রীমতিলাল দাশ।

[পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর]

২৯শে জুলাই। সকালে প্রাতরাশ শেষ করিয়া ৪৮নং বাসে উঠিয়া টটেনহামকোর্টে নামিলাম। সেখান হইতে বৃটিশ মিউজিয়ামের আর্ট গ্যালারী দেখিতে চলিলাম। ইহা একটি জাতীয় সম্পদ এবং ইহার নাম বিশ্ববিদিত। ১৭৫৩ খৃষ্টাব্দে শ্লোয়ানির পাঠাগার এবং সংগ্রহ কিনিয়া আরম্ভ হয়। পরে নানা জনের নানাবিধ আহরণ লইয়া ইহা দিনে দিনে সমৃদ্ধ হইয়া উঠিয়াছে। এখানে ঐতিহাসিক এবং প্রাগ্‌-ঐতিহাসিক নানাবিধ বিচিত্র সংগ্রহ আছে। বৃটিশজাতির চিরপ্রিয় Magna Charta একটী দেওয়ালে টানানো আছে। বিখ্যাত এ্যাংলো-স্যাকসন ইতিবৃত্তও কৌতূহলী দর্শককে মুগ্ধ করে। নানা রাজা-মহারাজার হস্তলিপির একটী আকৃতি আছে। এখানকার মিশরীয় সভ্যতার পরিচয়-ভবন অতিশয় সুন্দর। মধ্যযুগের মঠের সন্ন্যাসীদের লেখা চিত্রিত পাণ্ডুলিপিগুলিও খুব ভাল লাগে।

প্রথমে আর্ট-গ্যালারি দেখিলাম। তারপর গাওয়ার ষ্ট্রীটে হরিহর দাদার সহিত লাঞ্চ খাইতে চলিলাম। দাদা বহু বিপথগামী যুবকের ইতিহাস জানেন, তাই তাঁহার মন সন্দিগ্ধ। আমি বিবাহিত, বয়স্ক, তাহাতেও দাদার সন্দেহ ঘোচে না। তিনি আমাকে খুব সাবধানে চলা-ফেরা করিতে উপদেশ দিলেন। মায়াবিনীদের নাগপাশে যাহাতে না পড়ি, তজ্জন্য সতর্ক করিলেন। আমি কি কি দেখিব, না দেখিব, তাহার সম্বন্ধে বিশদ ব্যবস্থা করিয়া দিলেন।

আহার শেষে পুনরায় মিউজিয়ামে আসিলাম। এখানকার রিডিং-রুমে পড়িবার টিকিটের ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। পুনরায় দেখিয়া শুনিয়া তাঁহার নিকট আসিলাম। তিনি আমাকে লইয়া হ্যারাডের দোকানে গেলেন। ৭ গিনি দিয়া একটী স্যুটের অর্ডার দিলাম। দাদার পোষাক পরিচ্ছদে পারিপাট্যের দিকে বিশেষ দৃষ্টি। আমি এ বিষয়ে সাধারণতঃ উদাসীন। মানস-ভূষণ শ্রেষ্ঠ এইরূপ একটী মতবাদ হয় ত আমাকে বিশৃঙ্খল করিয়া তুলিয়াছে। দাদা বলেন,—'এটা ভুল, মানুষ তোমার বাহির দেখেই বিচার করবে, তুমি যদি সুবেশ না হও, তবে তোমায় এরা অ-ভদ্র মনে করবে, তুমি যে সব মনীষী ও মহাপুরুষদের সাক্ষাৎ চাও, তাঁরা তোমার প্রতি সশ্রদ্ধ থাকবেন না।

দাদার কথা মিথ্যা নয়। ভেক না হইলে ভিক্ষা মিলে না, এ প্রবাদ আমাদের দেশেও আছে। হ্যারাডের দোকান হইতে আমি বাসায় ফিরিলাম। দাদা বলিলেন, "ডাক্তার সরকার এসেছেন জান তো?"

বলিলাম—"শুনেছি আসবেন, কিন্তু তাঁর ঠিকানা জানি না।"

তিনি ঠিকানা বলিয়া দিলেন। পরদিন তাঁহার সহিত দেখা করিব সংকল্প করিলাম। ডাঃ সরকার World Fellowships of Faiths নামক বিশ্ব-ধর্ম্ম সম্মিলনে যোগ দিয়া আসিয়াছেন। আমাকে তিনি স্নেহ করেন, তাই এই অমায়িক, নিরহঙ্কার, যোগি-সদৃশ মহাপুরুষের সহিত সাক্ষাতের প্রয়োজন অনুভব করিলাম।

যুদ্ধ, কলহ, বিবাদ আছে তাহা সত্য কিন্তু সকলের উপর মানুষে মানুষে একটী পরম ঐক্য আছে। সে ঐক্য তাহার অন্তরের ঐক্য। বিশ্ব-ধর্ম্ম মহাসম্মিলনের মত অনুষ্ঠানে মানুষের এই আত্মীয়তার পরিচয় সিদ্ধ ও সফল হয়।

মানুষের প্রাত্যহিক জীবনে মানুষে মানুষে আমরা বিরোধ বাধাই। স্বার্থকে, বিষয়বুদ্ধিকে পূজা করিয়া আমরা সর্ব্বভূতাধিবাস সাক্ষী অন্তরতম দেবতাকে ভুলিয়া যাই। মানুষের যে ঐশ্বর্য্য তার অন্তরের প্রাচুর্য্যে শিল্পকলায় ধর্ম্মে বিকশিত হয়, সেই অসীম উদ্বৃত্তকে আমরা অস্বীকার করিতে পারি না। ডাঃ মহেন্দ্রনাথ সরকার ভারতীয় দর্শনকে কেবল অধ্যাপক হিসাবে পাঠ করেন নাই। নিজের জীবনে তাহাকে গ্রহণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। ইহাই তাঁহার বিশেষত্ব।

মানুষের জীবনে যে বৃহৎ অভিব্যক্তির প্রেরণা ভারতীয়

ঋষির কণ্ঠে অতীতে ধ্বনিত হইয়াছিল, সেই ভূমার বাণী বলদৃপ্ত প্রতীথিতে বারংবার প্রচার করিবার দায় আমাদের। এটি আমাদের পিতৃঋণ।

মানুষের হৃদয় যদি প্রসারিত হয়, তবেই সে সমস্ত জীবকে সুখিত হইবার প্রার্থনা করিতে পারে। আপন বিজয়, শ্রী ও ঐশ্বর্য্যের যে ব্যক্তিগত প্রার্থনা, সে কামনা মানুষের মধ্যে যে পশু, তাহার। মানুষের মধ্যে যে দেবতা, তাহার প্রার্থনা, জগৎ সুখী হোক।

ভারতবর্ষের এই আত্মদর্শনের বাণী আমার মনে হয় পশ্চিম গ্রহণ করিতে উৎসুক। যুদ্ধের ভয়ঙ্কর বেদনায় সে আর্ত্ত হইয়া উঠিয়াছে। সে অমৃতের স্পর্শ চায়। সমস্ত প্রলোভনের মধ্য হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়া মানুষ যখন মানবতার পরম ঐক্যকে অনুভব করিবে, তখনই নবযুগের সূচনা হইবে। সেই সাধনায় ভারতের স্থান সর্ব্বাগ্রে, একথা প্রচার করিতে ডাঃ সরকার বিশেষ যোগ্য, তাহাতে সন্দেহ নাই।

৩০শে জুলাই। সকালে উঠিয়া শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ সরকারের ওখানে চলিলাম। ডাঃ সরকার হাইড পার্কের নিকট ল্যাঙ্কাষ্টার গেটে ছিলেন। তিনি বলিলেন,—"ইয়োরোপ কেমন লাগছে আপনার?"

আমি বলিলাম,—"আমি ভাবুক, তাই জীবনে sublime বলে যাকে মাথা নোয়াব এমন কিছু দেখতে পাই নি—যে কল্পনা নিয়ে ইয়োরোপে এসেছিলাম, তাকে প্রত্যক্ষ দেখে বিস্ময়-রস অনুভব করব—এটা হয় নি।"

তিনি বলিলেন,—"এদের কর্ম্মশক্তি সত্যই বিস্ময়কর, চারিদিকে এরা যেন সদাজাগ্রত হয়ে রয়েছে, আমাদের দেশে এই তৎপরতা নেই।"

সে কথা সত্য।

আমাদের অথর্ব্ববেদের ঋষির কণ্ঠে মন্ত্র উঠিয়াছিল—

ঋতং সত্যং তপো রাষ্ট্রং শ্রমো ধর্ম্মশ্চ কর্ম্ম চ।
ভূতং ভবিষ্যদুচ্ছিষ্টে বীর্য্যং লক্ষ্মীবলং বলে॥

মানুষের জীবনে যাহা কিছু সম্পদ, তাহা তার প্রাত্যহিকতায় নয়, তাহা তার প্রাচুর্য্যে, তাহা তার উদ্বৃত্তে। ইয়োরোপের নর ও নারীর প্রত্যেকের জীবনে উদ্বৃত্তের প্রতি যথেষ্ট আসক্তি দেখিতে পাই। উহারা সামান্য জীবনযাত্রার ধাঁধাঁর কেবল ঘুরিয়া মরে না। প্রত্যেকেরই কোনও না কোন hobby আছে—সখের ঘোড়া চালাইবার অতিরিক্ততা প্রত্যেকের কাজেই দেখিতে পাই। জীবনীশক্তির এই আধিক্য উহাদিগকে সর্ব্বত্র জয়ী করিয়াছে। উহারা লক্ষ্মী, বল, রাষ্ট্র সকলই লাভ করিয়াছে।

চা খাওয়ার জন্য ডাকিলেন। তাঁহার সঙ্গে চা খাইতে খাইতে গল্প চলিল। তিনি তাঁহার বক্তৃতার বিষয় বলিলেন। বাসায় ফিরিয়া Wisdom of the East গ্রন্থমালার পরীক্ষক বিল্ডের চিঠি পাইলাম। তাঁহার চিঠিটি অতি সুন্দর। আমি তাহাকে প্রিয় বন্ধু বলিয়া সম্ভাষণ করিয়াছিলাম, তাহাতে তিনি অতিশয় প্রীত হইয়াছিলেন। আমার সঙ্গে বৈষ্ণব গীতিকবিতার একখানি অনুবাদ ছিল, আমি উহা উহাদের গ্রন্থমালায় প্রকাশের জন্য বলিয়াছিলাম। তিনি আগ্রহ প্রকাশ করিয়া চাহিয়া পাঠাইলেন।

বাসে করিয়া দক্ষিণ কেনসিংটনে গেলাম। শ্রীযুক্ত কান্তিচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের সন্ধানে। যে বাড়ীতে তিনি ছিলেন সেখানে তিনি নাই, অন্যত্র গিয়াছেন। ওখান হইতে হাইকোর্ট পরিক্রম করিয়া কিং কলেজের ডিন পটারের সহিত সাক্ষাৎ করিলাম। আমার সহিত হিন্দু-আইনের আধি ও নিক্ষেপ সম্বন্ধে একটী গবেষণামূলক পুস্তক ছিল, তাই দিয়া উহাদের পি-এইচ-ডি ডিগ্রী এক বৎসরে দিতে বলিলাম। পটার বলিলেন, তাহা সম্ভব নহে। দুই বৎসরের কমে কোনও ডিগ্রি দেওয়া যাইবে না। ওখান হইতে হাই কমিশনারের আফিসে গেলাম। এখানে দু'জন বাঙ্গালী আছেন—এক জনের নাম, মিঃ দত্ত, অন্য জনের নাম, মিঃ কর। মিঃ দত্ত অত্যন্ত সজ্জন, অমায়িক ও আলাপী। উভয়েই আমাকে ব্যারিষ্টারি পড়িতে বলিলেন। Kuaster নামক একজন ভদ্রলোক এই সব বিষয় স্থির করেন, তাঁহার সহিত দেখা করিলাম। কুষ্টিয়ায় শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র লাহিড়ীর সহিত হৃদ্যতা হইয়াছিল। তিনি মিঃ টেগার্টের নিকট চিঠি দিয়াছিলেন। তাঁহার সহিত দেখা করিতে গেলাম। তাঁহার নিকট বিশেষ কিছু সাহায্য হইল না। আমার ইচ্ছা ছিল একটী বৃটিশ পরিবারে অতিথি হইয়া থাকিয়া বৃটিশ পারিবারিক ও সামাজিক জীবন পর্য্যবেক্ষণ করিব। এই আশায় Miss Wrench-র নিকট চলিলাম।

স্বর্গীয় গুরুসদয় দত্ত ব্রতচারী আন্দোলন ও লোকনৃত্য লইয়া ইংলণ্ডে যখন প্রচার করেন, তখন Miss Wrench তাহার আন্দোলন অনুরাগী হন। ব্রতচারী, শ্রীযুক্ত দত্ত মহাশয়ের অক্ষয় কীর্ত্তি।

কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় সাধারণ মধ্যবিত্ত বাঙ্গালী সমাজে ইহার প্রতিকূল সমালোচনাই শুনিয়া থাকি। তিনি দেশের লুপ্ত নৃত্যকে বয়স্কাউট আন্দোলনের সঙ্গে মিশাইয়া যে সুন্দর সঙ্ঘ গড়িয়া তুলিতেছেন, তাহতে সকলের শ্রদ্ধা থাকা কর্ত্তব্য। Miss Wrench স্থান দিতে পারিলেন না। আর সেটি বাড়ী নয়, একটী হোটেল। সেখানে থাকিবার প্রবৃত্তি আমার ছিল না।

বাসায় ফিরিয়া জানিলাম আর্য্যভবনে একটী স্থান খালি হইয়াছে। সেখানেই চলিয়া আসিলাম।

৩১শে জুলাই। হ্যামষ্টেড পুলের নীচে দিয়া ট্রাম চলিয়াছে। ট্রামে চড়িয়া Gray's Inn নামক আইন কলেজে চলিলাম। ব্যারিষ্টারি পড়িবার জন্ত চারিটি বিদ্যালয় আছে, তাহাদিগকে Inns of Court বলে। তাহাদের নাম যথাক্রমে, ইনার টেম্পল, মিডল্ টেম্পল, লিনকনস্ ইন এবং গ্রেস্ ইন। পান্থশালায় যেমন ভোজনের আয়োজন ব্যারিষ্টারি পড়িতে পূর্ব্বে সেইরূপ ডিনার খাইলেই চলিত। এখন অবশ্য তাহা নাই, এখন পড়িতে হয় এবং পরীক্ষাও দিতে হয়। ব্যারিষ্টারি পড়িতে সাধারণত তিনবৎসর লাগে। বৎসরে চারিটি করিয়া টার্ম আছে। আমি চেষ্টা করিতেছিলাম, যাহাতে মাত্র দেড় বৎসরে পরীক্ষা শেষ করিতে পারি। ইহাদের আলাপ ভব্য মনে হইল। যিনি কেরানী বাবু, তিনি আমাদের কাছে মুখ বিকৃত করিয়া নিজ পদ-মর্য্যাদা বাড়াইলেন না। উপদেশ দিলেন Secretary of Legal Education মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিতে। কাছেই তাঁহার অফিস-গৃহ, সেখানেই চলিলাম। সারাদিন কেবলই বৃষ্টি পড়িতেছে, ধারাসার নহে, ছিটে-ফোঁটা করিয়া ভাদ্রের পচা বৃষ্টির মত, বিরক্তিকর লাগে। কমলালয় হইতে যে গ্যাবাউন কিনিয়াছিলাম, সেইটা পরিয়া বৃষ্টি নিবারণ করিতে হইতেছিল। যিনি সম্পাদক, তিনি ছিলেন না, ছিলেন সহকারী। তাহার নামটি টুকিয়া রাখি নাই। ছেলে মানুষ, ভদ্রভাবে আলাপ করিলেন। বলিলেন, পূর্ব্বে যে সব সুবিধা দেওয়া হইত, এখন আর দেওয়া হয় না। এখান হইতে মিডল টেম্পল এবং Inner Temple দেখিলাম। ফ্রান্সিস বেকন গ্রেস্ ইনের ব্যারিষ্টার ছিলেন। তাঁহার রোপিত ক্যাটাল্‌পা বৃক্ষ এখনও তাঁহার স্মৃতি বহন করে। এই সম্প্রদায়ের দ্বারাই ১৫৯৪ খৃষ্টাব্দে ইহাদের হলঘরে সেক্সপীয়রের 'ভ্রান্তিবিলাস' অভিনীত হইয়াছিল।

ইনার এবং মিডল টেম্পল দুটি পাশাপাশি। ইহাদের চত্বর এবং চতুষ্কোণের চারিদিকে ইংরাজদের প্রাচীন ইতিহাসের নানাস্মৃতি ওতপ্রোত। বিদেশীর নিকট তাহার সে প্রেরণা নাই। এই সব প্রাচীন গৃহ প্রভৃতি দেখিয়া বিদেশী আনন্দ লাভ করিতে পারে না।

সাউথ কেনসিংটনে পুনরায় শ্রীযুক্ত কান্তিচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের সন্ধানে চলিলাম। শুনিলাম তিনি ওখানে থাকেন না। Fellowship of Faiths Club-এ থাকেন। কাজেই নিরাশ হইয়া গৃহে ফিরিলাম। ধূসর আকাশে ধূসর মেঘের খেলা চলে।

বাড়ী ফিরিয়া দেখি জাহাজের সহযাত্রী বন্ধু অধ্যক্ষ ভাডে, জৈন ও জৈনের বন্ধু মিঃ লাল আসিয়াছেন। তাঁহাদের চা পানে আপ্যায়িত করিলাম। অনেকক্ষণ নানা বিষয়ে খোস গল্প হইল

আমার নোট বইটি ড্রেসিং গাউনের পকেটে রাখিয়াছিলাম, কিন্তু ভুল করিয়া সেটার জন্ত সমস্ত জিনিষ পত্র নাড়িয়া বিরক্ত হইয়া উঠিলাম।

সার অতুল চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের চিঠি পাইলাম। তিনি ৪ঠা আগষ্ট তাঁহার লণ্ডনের বাসায় চা'য়ের নিমন্ত্রণ করিয়াছেন।

সার অতুল কর্ম্মী ও জ্ঞানী, বিদ্যায় ও বুদ্ধিতে তিনি সত্যই অতুল। আই, সি, এস পরীক্ষায় তিনি প্রথম স্থান অধিকার করেন। তিনি ১৯২৫ হইতে ১৯৩১ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত হাই-কমিশনার ছিলেন। তাহার পর সরকারী নানা কাজে ও দৌত্যে তিনি ভারত সরকার কর্ত্তৃক মনোনীত হইয়াছেন।

তাঁহার চিঠিটির আন্তরিকতা হৃদয় স্পর্শ করে। বড় হইলে মানুষ অহঙ্কারী হয়। গগনস্পর্শী স্পর্দ্ধায় পৃথিবীকে দেখিতে ভোলে। স্যার অতুলের চিঠিতে এই দাম্ভিকতার পরিচয় আদৌ নাই।

পরে তাঁহার সহিত আলাপে তাঁহার অপূর্ব্ব সৌজন্যের পরিচয় পাইয়াছিলাম। আচার, বিনয়, বিদ্যা অতুলনীয়। কুষ্টিয়ার উকীল শ্রীযুক্ত কালীপদ মুখোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার আত্মীয়। তিনি পরিচয়-পত্র দিয়াছিলেন। দেখিলাম তিনি দূরতম আত্মীয়দের ভোলেন নাই এবং ক্ষুদ্রকে উপেক্ষা করিয়া আপন মহত্ত্বের পরিচয় দিবার বাঙ্গালী-সুলভ মনস্তত্ত্ব শেখেন নাই।

১লা আগষ্ট, শনিবার। সকালে উঠিয়া ট্রামে চড়িয়া Aldwych গেলাম। বৃষ্টি পড়িতেছে—আবহাওয়া ভাল নয়। এটা বাংলা দেশের বর্ষা নয়, ইহাকে দেখিয়া রবীন্দ্র-নাথের কবিতা বলা চলে না—

ঐ আসে ঐ অতি ভৈরব হরষে
জল-সিঞ্চিত ক্ষিতিসৌরভ রভসে
ঘন গৌরবে নব-যৌবন বরষা
শ্যামগম্ভীর-সরসা।
গুরু গর্জ্জনে নীপমঞ্জরী শিহরে
শিখি-দম্পতী কেকাকল্লোলে বিহরে
দিগ্‌বধূচিত্ত-হরষা
ঘনগৌরবে আসে উন্মদ বরষা।

এখানে মত্ত-মদির বাতাস নাই, সজল মেঘের নীল অঞ্জন নয়নে লাগে না। আকাশ এখানে পাংশু ও উদাসীন। বৃষ্টিধারা ঝর-ঝর করিয়া শব্দ করে না। টিপ্ টিপ্ করিয়া পড়ে যেন একান্ত ভীত বধূ ভয়ে ভয়ে পদ সঞ্চরণ করিতেছে।

বাংলা দেশের শ্যামল ভূমির সন্তান আমরা। বর্ষা আমাদের একান্ত প্রিয় ঋতু। তাহার শত বিচিত্র রূপ দেখিয়া আমরা আনন্দমত্ত হই। কিন্তু এই বিদেশের বৃষ্টিতে না আছে আনন্দরস, না আছে সৌন্দর্য্য। হাই কমিশনার আফিসে Kuaster-র সঙ্গে দেখা করিয়া পূর্ব্বদিনের অভি-যানের কথা বলিলাম। তাহার আলাপে আন্তরিকতার স্পর্শ নাই। সে অবশ্য বলিল, গ্রেস ইনে ভর্ত্তি করাইবার ব্যবস্থা করিবে। বাড়ীতে ফিরিয়া আর্য্যভবনেই মধ্যাহ্ন ভোজন করিলাম।

মধ্যাহ্ন ভোজনের আয়োজন ভাল নয়। সেখান হইতে রিসেন্স স্কোয়ারে হরিহরদার ওখানে আলাপ করিতে চলিলাম। তারপর গাওয়ার ষ্ট্রীট ও Y. M. C. A. Students Union এ গেলাম, কাহারও দেখা মিলিল না। বন্ধুবর মানকুমার ঘোষের সন্ধানে তাহার বোর্ডিং ও কলেজে সন্ধান করিলাম। সন্ধান মিলিল না। ভগ্নমনোরথ হইয়া গৃহে ফিরিলাম।

বর্ষাঋতু নিখিল বিরহিজনের চিত্তে উন্মাদনা জাগায়; বিরহীর মনকে মিলনাতুর করে, কিন্তু এসব কল্পনা যে যুগের, সে সব যুগ গিয়াছে। আমাদের প্রিয়া বিরহে আর্ত্তা হইয়া রোদন করেন না, কাজেই মেঘকে দূত করিবার দুঃখ করিবার প্রয়োজন নাই।

বাড়ী ফিরিয়া ডিনার খাইয়া নিকটস্থ সুইস কটেজ ষ্টেসনের ধারের থিয়েটার এম্বাসীতে অভিনয় দেখিতে চলিলাম। আজ থিয়েটার ছিল না। আজ চারিদিকেই কেবল বিফলতা। ফিরিয়া বিছানায় চুপ করিয়া শুইয়া পড়িলাম।

২রা আগষ্ট, রবিবার। সকালে পণ্ডিত লালনের সঙ্গে কথা হইল। বৃদ্ধ জৈন, গুজরাট অঞ্চল হইতে জাগতিক ধর্ম্মসম্মিলনে আসিয়াছেন। পণ্ডিতজী বলিলেন,—"এই সম্মিলনের আসল উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় নি।"

"কেন?"

"এখানে বিজ্ঞান ও দর্শন নিয়ে আলোচনা হয়েছে, কিন্তু ধর্ম্ম নিয়ে আলোচনা হয় নি, তাই আমি সভাপতিকে চিঠি লিখছি—"

পণ্ডিতজীর সঙ্গে একটী যুবক আত্মীয় ছিল। পণ্ডিতজীর আদেশে সে যে চিঠি লিখিয়াছিল তাহা আমাকে দেখাইল।

চিঠিতে অলঙ্কারের বাহুল্য, ভাষার গুরু গম্ভীর রীতি। বলিলাম, 'সহজ ভাষায় লিখুন, ওরা সরলতাকে পছন্দ করে।' পণ্ডিতজী বুঝিলেন, সংশোধন কিছু করিলেন না কিন্তু রচনাশৈলী স্বভাবের মত, প্রত্যেক মানুষের স্বতন্ত্র ও বিশিষ্ট সহসা তাহাকে ত্যাগ করা চলে না।

আজ বাহির হইলাম না। এখানকার একটী দৈনিক কাগজে আমার লুপার্ক স্মৃতির উপর রং ফলাইয়া একটী ছোট প্রবন্ধ লিখিলাম। এই কাগজে অন্যতম বিজ্ঞাপন ছিল, তোমার চেহারা যদি চার্লি-চ্যাপলিনের মত হয় তবে তোমার ফটো পাঠাইয়া দিও। আমার ফটোটি পাঠাইলাম। একান্ত দুষ্টামি, কিন্তু একটু মজা না হয় করিলাম। সারা জীবন গোপাল অতি সুবোধ বালকের পাঠ কণ্ঠস্থ করিয়া গোপালের

মত আচরণ করিয়াছি। মাঝে মাঝে লঘু হইতে ইচ্ছা হয়। সংসারে চিন্তার জাল বুনিয়া গম্ভীর হইয়া লাভ কি? আমরা চিন্তা করিয়া পৃথিবীর জগদ্দল ভার এতটুকু কমাইতে পারি না। বরং কালোমুখ করিয়া বেদনার সঙ্কটকে বাড়াইয়া তুলি। তাহার চেয়ে লঘু, ভাবনাহীন হাসির টুকরা দিয়া যদি জীবনকে পূর্ণ করি, তাহা হইলে কাহারও ক্ষতি হয় না, অথচ পৃথিবীতে আনন্দের ঝরণার গতিবেগ একটু বাড়াইয়া দেওয়া যায়।

রবিবার দিন বিলাতে দ্বিপ্রহরে ডিনার। সে দিন রাত্রে চাকর-বাকরদের ছুটি। তাহারা সপ্তাহে একটী রাত্রি উপভোগ করিবে। হয় বন্ধুর, নয় বান্ধবীর সঙ্গে তাহারা বাহির হইয়া পড়ে। মুক্ত আকাশের তলে কোনও উদ্যানে কোনও সহর-তলীতে, কিংবা নদীতীরে কিংবা শৈল-শিখরে আনন্দময় কয়েকঘণ্টা কাটাইয়া আসে। যদি তাহা না পারে, তবে সিনেমা, থিয়েটার প্রভৃতির দ্বার ত খোলাই আছে। আহার শেষে নিকটবর্ত্তী odeon picture palace এ একটা ছবি দেখিলাম। ফিরিয়া লালজী ভাই মেহ্‌তার সঙ্গে আলাপ হইল। ইনি করাচী বণিকসমিতির সহঃসভাপতি। সস্ত্রীক পৃথিবীভ্রমণে বাহির হইয়াছেন। তাঁহার সহিত মাদাম তাসাদের ভুবনবিখ্যাত মোমের পুতুলের প্রদর্শনী দেখিতে গেলাম।

১৭৬২ খৃষ্টাব্দে বার্ণ সহর হইতে জন ক্রিষ্টোফার চার্চিস প্যারি আসেন। তিনি মোমের পুতুল নির্ম্মাণ করিতেন। তাঁহার দোকান প্যারির বিখ্যাত নাগরিকদের আড্ডা হইয়া ওঠে। তাঁহার ভাগিনেয়ী মেরী গ্রেসহলজ এই বিদ্যায় অসামান্য দক্ষতা লাভ করেন। তাঁহার নিপুণ হস্তাঙ্গুলি স্পর্শে নির্জ্জীব মোমে যেন সজীবতা ও লাবণ্য ফুটিয়া বাহির হইত। মেরি গ্রেসহলজ বিবাহের পরে মাদাম তাসাদ বলিয়া পরিচিত হন। ষোড়শ লুইয়ের ভগিনীর আমন্ত্রণে মেরী কিছুদিন ভর্সেল সহরে রাজান্তঃপুরিকাদিগকে এই বিদ্যা শিক্ষা দেন। ফরাসী বিদ্রোহের সময় তাঁহারা নানা বিপদে পড়েন। মাদাম ১৮০২ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডে আসেন। ১৮০৬ খৃষ্টাব্দে তিনি বেকার তাঁহার প্রদর্শনী আনেন। এখানে ইহা খুব লোকপ্রিয় হইয়া ওঠে। মাদাম তাসাদ নব্বই বৎসর বাঁচিয়া ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পরও ইহা সযত্নে পরিচালিত হইতেছে। ১৯২৫ খৃষ্টাব্দে অগ্নিদাহে ইহা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়, কিন্তু পুনরায় মূর্ত্তিগুলি নির্ম্মিত হইয়াছে।

দ্বিতলে বড় হলঘরের নাম গ্রাণ্ডহল, এখানে ১৫০টি মূর্ত্তি আছে। বিখ্যাত সৈনিক, রাজনীতিবিদ, কবি রাষ্ট্রনায়ক, ধর্ম্মযাজক, নাবিক, রাজপরিবার প্রভৃতির ছবি আছে এখানে যাহাদের ছবি আছে, তাহারা সকলেই বিশিষ্ট। কাহাকে ছাড়িয়া কাহার নাম করিব তাহা সমস্যার বিষয়। এখানে পঞ্চম জর্জ্জ, অষ্টম এড্‌ওয়ার্ড, কিচেনার, নেলসন, লর্ড-রিডিং, গ্ল্যাড্‌ষ্টোন, মাদাম তাসাদ, নেপোলিয়ান, ক্রমওয়েল, উইলসন, লুথার, বুথ, ডিজরেলী, চেম্বারলেন, সাইমন, ম্যাকডোনাল্ড, মুসোলিনী, ষ্ট্যালিন, হিটলার, বার্ণার্ড শ', কিপলিং, সেকস্‌পিয়ার প্রভৃতি পরিচিত বহু মনীষীর জীবন্ত মূর্ত্তি দর্শককে বিস্মিত করে।

ত্রিতলে অনেকগুলি জীবন্ত দৃশ্য আছে, তন্মধ্যে ম্যাগনাকার্টা প্রদানের ছবি, নেলসনের মৃত্যু প্রভৃতি ঐতিহাসিক ঘটনাকে চোখের সম্মুখে তুলিয়া ধরে। যাহারা রেকর্ড ব্রেকার এবং রেকর্ড মেকার, ক্রীড়া প্রভৃতি নানা ক্ষেত্রে বিজয়ী, সেই সব বীরদের একটা টেবলো আছে। চিরস্মরণীয়দের একটী দৃশ্য আছে। সংবাদ-জগতে যাহারা জগতে নাম পাইয়াছে, তাহাদের মধ্যে মহাত্মা গান্ধী আছেন। সঙ্গীত, অভিনয় ও নৃত্যে যাহারা অপ্রতিদ্বন্দ্বী, ক্রীড়ায় যাহারা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, তাহাদের মূর্ত্তি আছে। ত্রিতল হইতে ভিন্ন সোপানে দ্বিতলে রাজাদের ঘরে আসা যায়। এখানে নানা যুগের নরপতিদের মূর্ত্তি আছে। এই সমস্ত মোমের পুতুল দেখিয়া যুগপৎ শিক্ষা ও আনন্দ লাভ হয়।

এই প্রদর্শনীর বিশেষ আকর্ষণ কিন্তু Chamber of Horrors. মানুষের জিঘাংসার নারকীয় পৈশাচিক প্রকৃতির পরিচয় এখানে পাওয়া যায়। যে সব অপরাধী নরহত্যা প্রভৃতি চমকপ্রদ কার্য্যে খ্যাতি লাভ করিয়াছে, তাহাদের প্রতিমূর্ত্তি স্মরণ করাইয়া দেয় যে, মানুষ ইচ্ছা করিলেই দানব হইয়া পড়ে।

অমৃতের আহ্বান মানুষের জীবনে বারে বারে আসে না কিন্তু পাপ ও বীভৎসতা মানুষকে ডাকে। যাহারা তাহার মায়ায় ভোলে, তাহাদের জীবনে কি নারকীয় পরিবর্ত্তন ঘটে! এই সব অপরাধীদের মুখে ও চোখে ভয়ঙ্কর পাশবিকতা যেন প্রকট হইয়াছে।

আমি প্রদর্শনী দেখিয়া একা একা গৃহে ফিরিলাম।

লালজীভাই তাঁহার বন্ধুদের লইয়া লণ্ডনের নৈশ-জীবনের আনন্দ-উৎসব দেখিতে চলিলেন।

৩রা আগষ্ট, সোমবার। একটী প্রবচন আছে যে গ্লাড্‌ষ্টোন আমেরিকান ভ্রমণকারীদের বাসের মাথায় চড়িয়া লণ্ডন দেখিতে উপদেশ দিয়াছিলেন। আজ ট্রামে করিয়া মনীষীর সেই উপদেশ পালন করিতে চলিলাম। একখানি ট্রামের টিকিট কিনিলাম—এক শিলিং দিয়া, ইহাতে সারাদিন চড়া চলিবে। কিন্তু ফল সুবিধা হইল না। কারণ ট্রাম লণ্ডনের অপরিচিত এবং বিশেষত্বহীন অঞ্চল দিয়া চলিয়াছে।

বাড়ীর পরে বাড়ী, তাহাতে সৌন্দর্য্যের স্পর্শ নাই। বন্ধুহীন যাত্রা ভাল লাগে না। আমার কোষ্ঠীর ফল বন্ধুহীনতা, অথচ সহমর্ম্মী বন্ধুর জন্য আমার কাতরতার অন্ত নাই। অন্তরঙ্গতার এই আকুলতা অস্বাভাবিক নহে। ঘুরিয়া ফিরিয়া গাওয়ার ষ্ট্রীটে মধ্যাহ্ন ভোজন করিলাম। তাহার পর ঘোষের সন্ধান করিলাম। সে ছিল না, তাহার সঙ্গী বরোপের সহিত আলাপ হইল। সে বণিক, লণ্ডনে ব্যবসার সন্ধানে আসিয়াছে।

তারপর, উদ্দেশ্যহীন খানিক ভ্রমণ করিয়া বাসায় ফিরিবার পথে ছবি দেখিতে বসিলাম। The Devil's island, World news and The music goes round, তিনটী ছবি দেখাইল।

শেষের ছবিটির মূল কথাটি চমৎকার। আনন্দ সংক্রামক, মানুষ তাহাকে যত বাড়াইয়া দেয় সে বাড়িয়া চলে। আনন্দের মাঝে পূর্ণতার পরিচয় পাই। তাহাকে ভাগ করিলে সে ক্ষয় হয় না—সে বরং বৃদ্ধি পায়।

বাসায় ফিরিয়া ভাবিয়াছিলাম দেশের চিঠি পাইব, না পাইয়া মন বিষণ্ণ হইল। বসিয়া বসিয়া লণ্ডনের ভারতীয় ছাত্রদের সম্বন্ধে সরকারী বিবরণী পড়িলাম।

৪ঠা আগষ্ট, মঙ্গলবার। হাই কমিশনার আফিসে গিয়া সার ফিরোজ খাঁনুনের সহিত দেখা করিতে চাহিলাম। তিনি কর্ম্মব্যস্ত থাকায় দেখা হইল না, তাঁহার সহিত বৃহস্পতিবার বেলা সাড়ে দশটায় দেখা করিব এই ব্যবস্থা করিয়া বাসায় ফিরিলাম। বিকালে শ্রীযুক্ত শশধর সিংহের Bibliophile নামক পুস্তকের দোকানে গিয়া সাহিত্যিক বন্ধু শ্রীযুক্ত অন্নদাশঙ্কর রায় মহাশয়ের পুস্তক পাঠাইবার ব্যবস্থা করিলাম। লণ্ডনে ব্যবসা ও বাণিজ্যের পথ বিস্তৃত—আমাদের দেশের অনেকে এখন এইদিকে দৃষ্টি দিতেছেন।

সেখান হইতে শুর অতুলের ওখানে চলিলাম। সহরের একটী ফ্লাট। বুড়া ও বুড়ী যখন সহরে আসেন তখন এখানেই থাকেন। চাকর-বাকর, নাই, লেডি চ্যাটার্জ্জি চা আনিলেন—চা, স্যাণ্ডউইচ, ক্রিমকেক এবং প্লেন কেক, বলিলেন, 'এসব বাড়ীর তৈরী।'

আমি সশ্রদ্ধ অভিবাদন জানাইলাম, বলিলাম—'যা পারি তা খাব' শুর অতুল স্নিগ্ধ সৌজন্যে আপ্যায়িত করিলেন। বলিলেন, সর্ব্বপ্রকারে সাহায্য করিবেন।

বাসায় ফিরিয়া অধ্যাপক নগেন্দ্রনাথ সেনের নিমন্ত্রণ-পত্র পাইলাম। পটুয়াখালিতে শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সেন মহাশয়ের সহকর্ম্মী ছিলাম। দাদার সহিত অত্যন্ত অন্তরঙ্গতা হইয়াছিল। তাঁহার পুত্র অমিয় সেন আসিবেন বলিয়া ফোন করিয়াছিলেন।

অমিয় সেন আসিলে তাঁহার সহিত আধঘণ্টা আলাপ হইল। আমি বাসা বদলাইয়া ইংরেজ-পরিবারে থাকিবার চেষ্টা করিতেছি বলিয়া তাঁহাকে বলিলাম। তিনি এ বিষয়ে বিশেষ উৎসাহ প্রকাশ করিলেন না।

৫ই আগষ্ট, বুধবার। অপূর্ব্বর বিস্তৃত মুক্তভূমিকে হিল বলে। হ্যাম্পষ্টেডহিলের উত্তরাংশে গোল্ডার্স গ্রীণ—ইহা লণ্ডনের একটী সহরতলী। এখানে সার জন কাম্বিং সাহেবের সহিত দেখা করিতে চলিলাম। চমৎকার লোক—কর্ম্মজীবনের শেষে পরিণত বয়সে নিভৃত জীবন যাপন করিতেছেন। আমাকে নিজের পাঠ-কক্ষে নিয়া বসাইলেন। চা খাওয়াইলেন।

আলাপ চলিল। বলিলেন, "লণ্ডনকে কেবল দেখেই ইংলণ্ডের ঐতিহ্য বোঝা যায় না।"

"কি করতে বলেন?"

"পয়সায় কুলালে সপ্তাহান্তে আমাদের ইতিহাস-প্রসিদ্ধ স্থান সকল দেখে আসবেন, তা হলেই ইংলণ্ডে আসা সার্থক হবে—"

তিনি যেসব পড়াশুনা করিতেছেন তাহা বলিলেন। আমি লিখি শুনিয়া খুব উৎসাহিত হইলেন। বলিলেন, 'শুধু শুধু ফিরে যাওয়া ঠিক নয়, ব্যারিষ্টারি পড়ুন।'

সার রিচার্ডসন এবং মিঃ ব্রাউনের নিকট চিঠি দিলেন। বলিলেন, যখনই প্রয়োজন হয় তখনই যেন দেখা করি। [ক্রমশঃ

পথে শৈলেন্দ্র নাথ কুণ্ডু

—শ্রীউৎপলাসনা দেবী

বৌদি !

"এই জায়গাটা এত সুন্দর, তুমি এখানকার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য দেখলে নিশ্চয়ই অনেক গল্প, কবিতা লিখে ফেলতে।"

"আচ্ছা বৌদি ! কি করলে তোমার মত লেখিকা হ'তে পারি বলতে পার ? আমি তাই অনেক চেষ্টা ক'রেও আমার মনের কাব্যভাবকে রূপ দিয়ে বাইরে ফোটাতে পারছিনে। তুমি আমায় এই বিস্তার মন্ত্রটা একটু শিখিয়ে দিও, আমার লেখিকা হওয়ার বড্ড সখ !"

"তুমি নাকি রাঁচি গিয়েছিলে ? দাদা লিখেছেন, লোকে মাথার গোলমাল সারাতে রাঁচি যায়, তোমার বৌদি রাঁচি হ'তে মাথা খারাপ ক'রে এসেছেন। তিনি গভীর রাত্রে বিছানায় বসে কাকে যেন খোঁজেন, কিন্তু কোন কিছু জিজ্ঞাসা করতে আমি ভরসা পাইনে, কারণ তিনি একজন কাব্যিক লোক, কোন্ কাব্য-রসে কখন মেতে থাকেন, তা বোঝা আমাদের মত অ-কবিদের পক্ষে ভয়ানক দুর্ব্বোধ্য ব্যাপার !"

"কে রোমান্স ঘটালে বল তো ? তা যাই কেন রোমান্স ঘটাও আমার কিন্তু গল্পটা লিখে পাঠিও। এই পাণ্ডব বর্জ্জিত, অর্থাৎ পরিজন শূন্য পৃথিবীর এই নির্জ্জন প্রান্তে ব'সে মনে একটা আনন্দের খোরাক পাব।"

ইতি—

তোমার "বেণু।"

প্রিয় বেণু !

তোর চিঠি পেলুম।

তুই লেখিকা হ'তে চাস্ ? খবরদার ও পথে যাস্‌নি, ও-পথে যাওয়ার বড় বিপদ্। একে তো ও-রোগে ধরলে আর সহজে ছেড়ে চায় না, তার উপর ঘরে বাইরে লোকে টিকতে দিতে চায় না।"

এই দেখ, কোন্ মান্ধাতার কালে দু'টো কি লিখেছিলাম, তার জের তোরা ভাই-বোনে এখনও টেনে নিয়ে চলেছিস্। শুধু কি তা-ই ? লেখা বার হওয়ার পর পাড়া-প্রতিবেশিনীরা কেউ বল্লেন, এটা তো নিছক তোমার জীবনী লিখেছ ! কেউ বা মুখ ভার ক'রে এসে বল্লেন, এটা তোমার খালি, আমার উনাকে আক্রমণ ক'রে লেখা। তবুও ভাল ছিল ! সে-দিন চারু ঠাকুরপো, কি বলছিলো জানিস্ ? বল্লে, এটা তো তোমার বেমালুম চুরি ক'রে লেখা ! আমি তো অবাক্ ! মনে মনে বল্‌লাম, পাড়া-প্রতিবেশিনী এর চেয়ে ভাল ছিল। যাক্, ইনি যখন আত্মীয়, তখন, দুর্ব্বাক্য বলার, ও দুর্নাম করার অধিকার নিয়েই এসেছেন। বল্লাম, "কি ব'লছ, চুরি !" "হাঁা নিশ্চয় ! নইলে তোমার মত মেয়েমানুষের হাত হ'তে এই রকম দামী লেখা বার হ'তে পারে না। যে মেয়ে মানুষ দিন রাত হাঁড়ি হেঁসেল নিয়ে থাকে, তার সাধ্যি হয়, এই লেখা বার করতে ? হেঁ, হেঁ, অন্যের চোখে ধূলি দিলেও আমার চোখে ধূলি দেওয়ার তোমার ক্ষমতা নেই। জান, তিন তিনটে ফার্ম্মের আমি কর্ত্তা ! সাতঘাটের জল কত লোককে খাইয়ে বিশলাখ্ টাকার উপর কারবার করি, এই হাত দিয়েই সব চলে ; আমার চোখে তোমার সামান্ত চুরি ধরা পড়বে না ? হেঁ, হেঁ, একি যে সে শর্ম্মা ? আমি বল্লাম, "তা আমার চুরিটা ধরিয়ে দিতে পার, কিসের থেকে করেছি ?"

"কোন বই হ'তে নাও করতে পার, তবে এই তোমার মাসী, কি পিসি লিখেছিলেন, তাঁদের খাতাই সরিয়ে নিয়ে টুকে চালাচ্ছ ! হেঁ, হেঁ।"

"চমৎকার ! তোমার অ-দেখা আমার মাসী, পিসি, তাঁরা হলেন সত্য, আর আমি জল-জ্যান্ত মানুষটা দাঁড়িয়ে আছি তোমার সুমুখে, সেই আমিই হ'লাম তো মিথ্যে ! বুদ্ধির ছেড়ি আছে বেশ দেখছি।

সত্যি ! তোকে কি বলবো বেণু! ঠাকুরপোর এই অপমানসূচক কথায় আমার চখে জল এলো ! কিন্তু তোমার দাদা, তাঁর এই কথায় বেশ একটা কৌতুক অনুভব করে, হাঁসির ফোয়ারা ছুটিয়ে দিলেন। দেখছো তো কি বিপন্ন

অবস্থায় সাহিত্যিকদের পড়তে হয়! আচ্ছা এইবার তোমার দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছি। সেটা ঘটেছিল রঁাচি হ'তে আস্‌বার পথে। যেদিন আমরা রঁাচি হ'তে আসি, সে দিনটা ছিল, ষটপূজার পরব। পরব উপলক্ষে কোলদের ছিল নাচ। সেখানকার বন্ধু-বান্ধবরা অনুরোধ করলেন, "আজকের দিনটা ম'শাই থেকে কোল-ড্যান্সটা দেখে যান, একটা দেখবার মত জিনিষ।" মনের মধ্যে আশা রাখলুম, রথ দেখা, কলা বেচা দুই হবে। অর্থাৎ সন্ধ্যা ছয়টায় গাড়ী, আর বেলা তিনটায় হবে নাচ। কাজেই ক'লকাতা অভিমুখে, যাত্রা করার সুখ ও নাচ দেখার আনন্দ দুই উপভোগ করব।

বাড়ীর সম্মুখে যাত্রা-মাঠে নাচ হবে। সকাল হ'তে গাড়ী গাড়ী খাঁথ আমদানী হচ্ছে। একটা সার্কাসওয়ালা, ইঁদুরের খাঁচার প্রায় দ্বিগুণ ওজনের খাঁচাতে বাঘ এনেও হাজির করেছে। সেই মাঠে আমার ছেলে-মেয়ে, ঠাকুর-চাকররা সকলেই অনবরত উৎসুক আনন্দে আনাগোনা ক'রছে। এমন সময় তোমার দাদা এসে নোটিশ দিলেন, বেলা দু'টায় একটা গাড়ী ছাড়ে, সেটা বেলা চারটে নাগাদ মুড়ি পৌঁছায়, আমরা সেইটেতেই যাব।

সকলের মুখ এই সংবাদে নিষ্প্রভ হ'য়ে গেল। ছেলে-মেয়েরা আপত্তি জানালে, ঠাকুর-চাকররা মুখ ভারী করলে। কিন্তু বাড়ীর কর্ত্তা অটল, স্থির! এমন কি, সার্কাসওয়ালাটাও সেলাম ঠুকে এসে দাঁড়িয়ে তার ভাঙ্গা বাঙ্গলায় বল্লে, "বাবু জবর তামাসা হোবে, আপ লোক দেখ্‌কে তব যাও।" আমি তো কোল-ডান্স দেখতে পাব না শুনে খুবই দুঃখিত হ'লাম। আধুনিক যুগে নৃত্যকলা শুধু শিল্প নয়, পাশ্চাত্য সভ্যতার একটি আদর্শ নীতি। আমরা অনবরত নেচে-কুঁদে পাশ্চাত্য সভ্য মানুষদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা স্থাপন করার চেষ্টা করছি। নৃত্য পাশ্চাত্যদেশবাসীদের আদর্শনীতি শুধু নয়, আবার সামাজিক অনুষ্ঠানও। তাই মনে হচ্ছে, আমাদের অপেক্ষা ইয়োরোপীয়ানদের সঙ্গে কোলেদের যে-রকম সামাজিক অনুষ্ঠান স্বাভাবিক ভাবে মিলে যাচ্ছে, দেখে মনে হয় আমাদের চেয়ে কোলেদের পাশ্চাত্য জনসমাজে আত্মীয়-তার দাবী করবার অধিকার অনেক বেশী। আমরা কসরৎ ক'রে যা পাওয়ার চেষ্টা করছি, ওরা তা সহজেই পাবে বলে মনে হয়।

মনে মনে কোলদের উদ্দেশ্য ক'রে বল্লাম, তোমরাই ধন্য! তোমাদের সামাজিক ব্যাপারের সঙ্গে সাহেবদের সামাজিক অনুষ্ঠান যেমন মিলে যাচ্ছে, এতে আমার প্রত্যয় জন্মাচ্ছে, হয় তো পুরাকালে তোমরাই সাহেব ছিলে, কিংবা সাহেবরাই কোল ছিল। আমি যদি পণ্ডিত হ'তাম তাহ'লে অবশ্য এই গবেষণায় নেমে যেতাম। যাক্‌, নাচ দেখা আর আমার হ'লো না। আজকাল প্রেক্ষাগৃহে ভীল-নাচ, সাঁওতালি-নাচ, কোল-নাচের মরশুমী। কত মোটা টাকার টিকিট কিনে সহরের লোকেরা এই নাচ দেখেন। তবু সে সকল নকল নাচ। আর এই জলজ্যান্ত টাট্‌কা সত্যি নাচটা ফেলে কি না আমায় এখুনি যেতে হবে?"

যাক্‌, রওনা হলুম। এই ট্রেনটি বোধ হয় আমাদের পরিবারটিকেই শুধু বহন ক'রে মুড়ি পৌঁছিল। পথে যেতে যেতে দু'ধারের নিবিড় ঘন বনশ্রী, তরুলতা-পরিবেষ্টিত পর্ব্বতের অপূর্ব্ব শোভা আমার মনকে এতই মুগ্ধ করলো, যে, তখন মনে হ'লো নাচ দেখ্‌তে পারিনি ব'লে ঠকিনি। দিনে না আস্‌লে রূপকথা এবং পুরাণে বর্ণিত অরণ্যের এমন প্রত্যক্ষ মূর্ত্তি আর দেখ্‌তে পেতাম না। এক এক স্থানে পাহাড়, জঙ্গল দুই পাশ হ'তে এমন চেপে অন্ধকার ক'রে তুল্‌ছিলো যে, তখন মনে মনে শুধু আমাদেরই ত্রাস হয়নি, বোধ হয় এঞ্জিনটারও ভয় কর্চ্ছিল।

চার্‌টে নাগাদ মুড়ি পৌঁছিলাম। মুড়িতে নেমে মনে হ'লো সহরের বাইরে বেড়াতে আসা এতদিনে সার্থক হ'য়েছে। যে স্থান লক্ষ্য ক'রে বেড়িয়েছিলাম, সেই, মনের অজ্ঞাত বাসনার বাঞ্ছিত প্রিয় স্থানটির দেখা আজ পেলাম।

এখানে এক ষ্টেসনটুকু ছাড়া মানুষের হাতের তৈরী কৃত্রিমতা আর কোথাও নেই। পাহাড়, মাঠ, বন, সবই যেন, তাদের উলঙ্গ পরাণ নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। প্রকৃতি-মায়ের কোলে তারা অবাধে বেড়ে উঠেছে, কোন মানুষ গিয়ে তাদের এই পবিত্র গাত্রে আঘাত ক'রে সভ্য করার চেষ্টা করেনি। এখানে এসে আমাদের সকলেরই মন দুরন্ত শিশুর মতই নেচে উঠলো। একটা কি যেন তৃপ্তিতে অন্তর ভরে উঠ্‌লো।

পাহাড়ের কোলে অস্তগামী সূর্য্যের সিন্দূরাভা থাকে থাকে সাজান। চারিদিক নির্জ্জন। পাখীর মিষ্টি কূজন



বর্ষা　　　　শ্রীমলি　　　　কর্ষক

ছাড়া আর কিছুই বড় শোনা যায় না। ছেলে-মেয়েরা চাকরদের সঙ্গে ওধারে কি একটা পাহাড়ে বেড়াতে গেল, খাওয়ার জন্য ডাক্‌লাম, শুন্‌ল না। আমিও বেড়াতে বেড়িয়ে পড়্‌লুম। তোমার দাদা বারান্দায় ইজি চেয়ারে বসেছিলেন, আমায় বল্লেন, "বেশী দূরে যেও না কিন্তু, এতো রাঁচি নয়! এদেশে না আছে রাস্তা, না আছে কোন আলো!

মনে মনে বল্‌লাম, "রাখ তোমার রাঁচি! রাঁচিতে গিয়ে অবধি একদিনও মনে হয়নি, আমরা ক'লকাতায় নেই। সেখানে রাস্তায় বেড়াতে বেড়াতে ভুল হ'তো, এ বুঝি আমাদের ক'লকাতার বালীগঞ্জ সারকুলার রোড, কিংবা গড়িয়াহাট রোড্, কি ওই রকম যে আরও পাঁচটা রাস্তা আছে, তারই কোন একটার মধ্য দিয়ে হাঁটছি। সেই রকম দুই ধারে গাছের সারির মধ্যে ইলেক্‌ট্রিক লাইট্, পিচ-ঢালা রাস্তা, আর হাঁটতে না পার্‌লেই মোটর। সদাসর্ব্বদা, সভ্যতা এবং শরীরের পঙ্গুতা দু-পাশ হ'তে আমাদের শাসন ক'রে রাখ্‌তো! আজই শুধু মনে হচ্ছে, আমরা স্বেচ্ছায়, কর্ম্ম-জগত হ'তে আমরা মুক্ত। এ যেন প্রদীপ নিভ্‌বার পূর্ব্বে উদ্দীপ্ত দীপশিখা যেন তার উজ্জ্বল জ্যোতির শেষ রশ্মি-রেখায় অন্ধকারের পদ চুমে বিদায় নিল।

সেই দিনের সেই শান্ত সন্ধ্যাটি আমায় কয়েক মুহূর্ত্তটুকুর জন্য বিশ্ব-প্রকৃতির কোলের কাছে নিয়ে গিয়ে যে বিমল আনন্দ উপভোগ করিয়েছিল, সেই সন্ধ্যাটিকে আমি কোন দিন ভুলবো না। চারিদিকের পাহাড়, গাছ, মাঠ, সকলে যেন সস্নেহে আমার মনকে আলিঙ্গন করলো। মনে মনে বল্‌লাম, আজকের সূর্য্য উঠা আমার জীবনে সার্থক হ'য়েছে। আমি সেই মেঠো রাস্তা, গাছ, মাঠ, পাহাড়, অস্তগামী সূর্য্যের দিকে চেয়ে বল্‌লুম, যদি জীবনে কখন সুযোগ ও সৌভাগ্য আসে তো বিশ্ব-প্রকৃতির এমনি স্নেহের কোলে ছোট্ট একটি নীড় বাঁধবো।

রাত্রি হ'য়ে এলো। রাঁচির অপেক্ষা এখানে শীত কম।

ছেলে-মেয়েরা বল্লে, "কাকাবাবু (জনৈক বন্ধু) ব'লেছিলেন, তোমরা মুড়ির সিঙ্গাড়া খাওনি? খেয়ে দেখো, খাসা জিনিষ। তা আমাদের কিনে দাও।"

ছেলে মেয়েদের ছোট কাকা সেখানে দাঁড়িয়েছিলেন। তিনি বল্লেন, "তোমরা কিছু ভেবোনা, আমি সিঙ্গাড়ার অর্ডার দিয়েছি।" ছেলেরা নেচে বল্লে, "কই, আসুন।"

কাকা বল্লেন, "এই তো একরাশ লুচি, তরকারী, ক্ষীর, সন্দেশের সদ্ব্যবহার হ'লো, এখন পেটটাকে একটু বিশ্রাম দাও। গাড়ীতে উঠে পাবে।

মেয়ে শুক্তি বল্লে—"মাগো গাড়ীতে উঠে সেই বায় ভূতের মধ্যে বসে খেতে হবে, তা বাপু আমি পার্‌বো না। গলা দিয়ে আমার নাব্‌বেই না খাবার।"

কাকা বল্লেন, "তা নয় একটু কষ্ট ক'রে গলা দিয়ে নামালেই।"

ছেলে আশীষ বল্লে, তা ছোট কাকা, আপনি ভাববেন না, আমার গলা দিয়ে বেশ নেমে যাবে।" আমি ছোট ঠাকুর-পোকে বল্‌লাম, "ওদের তো আপনি চেনেন না, শেষকালে বাসি সিঙ্গাড়া ক'লকাতা পৌছিবে।" দেবর কিছু আশ্চর্য্যান্বিত হ'য়ে বল্লেন, "আরে বুঝতে পারছ না এ যে মুড়ির সিঙ্গাড়া! সে সকল অবস্থায় এক অবস্থা।"

আমি ত' বোকা হ'লাম। মনে মনে মুড়ির সিঙ্গাড়ার প্রতি শুধু শ্রদ্ধান্বিত হ'য়ে রইলাম না, তার স্বরূপ বিশেষের জন্য কৌতুহলিত হ'য়ে রইলুম।

ওভার ব্রিজ পার হ'য়ে ট্রেনটিকে অভ্যর্থনা করার জন্য প্লাটফরমে এসে দেখি সেখানে ঝাল্‌দার কাঁচি-বঁটি বিক্রী হ'চ্ছে। এই ঝাল্‌দার একখানি কাঁচি নিয়ে গিয়ে ক'লকাতায় আমাদের এক প্রতিবেশিনী কাঁচি-সম্পত্তি পাওয়ায় একজন সৌভাগ্যশালী মহিলা বলে খ্যাতিলাভ ক'রেছিলেন, তাঁর খ্যাতির গর্ব্ব দেখে আমারও তা পাওয়ার জন্য লোভ জন্মায়।

রাঁচিতে গিয়ে অনেক খুঁজে ঝাল্‌দা ষ্টোর বার ক'রে দেখি সেখানে জগতের নগণ্য প্রাণী স্ত্রীলোকদের হাতিয়ার বঁটি, কাঁচি তারা সৃষ্টি করে না। তারা মধ্যযুগের যুদ্ধে ব্যবহৃত, এবং আধুনিক যুগে ডাকাতির অস্ত্র, 'রামদা,' ছোরা, প্রভৃতি বৃহৎ বৃহৎ অস্ত্র তৈরী করে।

আমি তাই ক্ষুণ্ণমনে ফিরি। আজ হঠাৎ এস্থানে আমার সেই আকাঙ্ক্ষিত ধন এমন স্থানে দেখে আর লোভ সম্বরণ কর্‌তে পার্‌লুম না; বঁটিই দর কর্‌তে ব'সে গেলুম।

কিন্তু ফেরিওয়ালা যা দর হাঁক্‌লে, তা শুনে আমি আঁৎকেই উঠলুম।

যাক্, এক জোড়া বঁটি কিনে আমার ব্যাগে হাত দিয়ে দেখি, "আরে সর্ব্বনাশ ! টাকা তো নেই।" ব্যাপার কি জান ? বিদেশে বেরুলে আমার কাছে টাকা রাখতে তোমার দাদা আমায় দেন না। তিনি সাবধানী লোক, সাবধানতা অবলম্বন পূর্ব্বক সেগুলি সর্ব্বদা নিজের কাছে রাখেন। এতে কি যে মুস্কিল হয় তা তোমায় কি বলবো ! প্রত্যেক পাই পয়সাটি খরচ করতে তাঁর কাছে হাত পেতে পয়সা নিতে হয় ; আবার সকল সময় ভিক্ষে মঞ্জুরও হয় না। কাজেই পয়সা চাওয়া মানেই বকুনি খাওয়ার জন্য প্রস্তুত হওয়া। সেজন্য স্থির করেছিলাম, কর্ত্তার অলক্ষ্যে কিছু ব্যাগ হ'তে সরিয়ে রাখবো। তুমি নিশ্চয়ই এখন তোমার চক্ষু দুইটি বিস্ফারিত ক'রে তোমার কল্পিত দেখা, আমার মুখের দিকে চেয়ে মনে মনে বলছো, "ছ ! বৌদি ! তুমি এমনই", তা বোঝাচ্ছি, শোন, না বলিয়া পরের দ্রব্য লইলে চুরি করা হয়। আচ্ছা ! কিন্তু আমি তো পর নই ! স্বয়ং অর্দ্ধাঙ্গিনী।

কাজেই দোষ আইনতঃ, ধর্ম্মতঃ কোন খানেই কিছু দাঁড়াতে পারে না। কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ কাজের ভিড়েও বটে, এবং এই বিদ্যায় অনভ্যস্ত থাকার দরুণও বটে, এই দরকারী কাজটি করা হয়নি।

শুক্তি বুঝতে পেরে বল্লে, "টাকা নেই বুঝি ? তা আমার কাছে আছে নাও।" এমন সময় আশীষ বল্লে, "জান মা, এই টাকা কার ? এ টাকা আমার।

শুক্তি বল্লে, "কেমন ক'রে হলো ? আচ্ছা মা, তুমিই বলো বিচার ক'রে, আমি ভাই-ফোঁটা দিয়ে আশীর্ব্বাদ করেছিলুম, ও আবার সেই টাকা দিয়ে আমায় প্রণাম ক'রে ফিরিয়ে দিল, এখন কার ? আমি গম্ভীর ভাবে বল্লাম ও টাকা এখন বঁটিওয়ালার।" এমন সময় তোমার দাদা আগত প্রায় ট্রেনটিকে দেখে, এই ভিড় ঠেলে গাড়ীতে উঠার যুদ্ধের জন্য আমরা কি রকম প্রস্তুত হ'য়েছি দেখতে এসে, প্রথমেই দৃষ্টি দিলেন বঁটির উপরে।

তাঁর চক্ষু দু'টি তিনি চড়কগাছের মত ক'রে বল্লেন, "আচ্ছা কাণ্ড তোমার ! ওইগুলো কিনে কি হবে বলতো ? যত সব জঞ্জাল ! ফেরৎ দেও, ফেরৎ দাও !"

আমি অমনি চট্ করে বল্লুম, "এতো আমার জন্যে কিনিনি, এ যে কল্পনার জন্যে। সে যে অনেক ক'রে বলে দিয়েছিল কিনা ! নইলে এই একরাশ মালের উপর আবার জঞ্জাল বাড়াই ! রাম !"

জানতো তোমার দাদাকে ! নিজের সন্তানদের নামে তাঁর বেশ একটু দুর্ব্বলতা আছে। তিনি বল্লেন, "তা, আর দু'খানা বেশী কেন নিলে না ?"

"ক্ষেপেছ ? এই কিনতেই ব'লে কত পয়সা বেরিয়ে গেল, নেহাত সেই অভিমানিনী মেয়ের ঠোঁট ফুলবে, তাই। নইলে,"—এদিকে মনে মনে ভাবছি, যাতে একখানাও মেয়ের বাড়ী না যায়, তাদের তো বহু বঁটি আছে। গাড়ীতে ছেলে আশীষ বল্লে, "মা, মুড়ির সিঙ্গাড়া ?"

কাকাবাবু ব্যস্ত হ'য়ে বল্লেন, "তাইতো ! যা !" তোমার দাদা বল্লেন, "ফ্লাস্ক ভর্ত্তি যে দুধ এলো, সেগুলো কেন খাও না ?"

আশীষ নীরব ইসারায় জানাইল, তার দুধ খাওয়ার মোটেই ইচ্ছে নেই।

তার পিতার চোখে তার এই অমত-দৃষ্টি এড়াইল না। ধমকিয়ে বল্লেন "খাও !" ছেলে মুখ ভারী ক'রে দুধের কাপে চুমুক দিল। কিন্তু শুক্তি বল্লে, "আমি খেলে ঠিক বমি করবো।" তাকে ছেড়ে সকলের ছোট মেয়েকে ধরলাম, তিনি মুখ ঘুরিয়ে বললেন, "বাবা ! দুধ খেলে আমার প্রাণ এক্ষুনি বেরিয়ে যাবে।" আমি বল্লাম "তা বাপু দুধ খেলে যদি তোমাদের প্রাণ বেরোয় তা বেরিয়ে যাক, ও আপদ ধরে রেখে কাজ নেই।" দেখলাম, মেয়েরা সব এক ছাঁচেই গড়া হয়।

এইবার সহযাত্রীদের দিকে নজর দিলাম। প্রথমে নজর পড়লো একদল ইয়োরোপীয়ান পরিবারের প্রতি। দৃষ্টি আকর্ষণের কারণ, এমন একটি পরিচিত খাদ্যের গন্ধে সেই স্থানটি আমোদিত ক'রেছিল যে, বাধ্য হ'য়ে সেইদিকে তাকাতে হ'য়েছিল। সুগন্ধ বিশিষ্ট প্রিয় খাদ্য, স্থান-কাল-পাত্র-নির্ব্বিশেষে এমন ঘৃনাই হয়, আজই প্রথম দেখলুম।

সাহেব-পরিবারটি পরম পরিতোষ সহকারে আহার শেষ ক'রছিলেন, তাঁরা বুঝতে পারলেন না, যে, তাঁদের খাওয়ার বহর দেখে সামনেই একদল মানুষের অন্নপ্রাশনের ভাত পর্য্যন্ত উঠে আসছে।

আহার-পর্ব্ব সমাধানের পরে, আরম্ভ করলেন তাঁরা হুড়োহুড়ি। একটি পঁচিশ-ছাব্বিশ বছরের যুবতী, (তাঁরা বললেন এ তো মাত্র বালিকা) এমন কাণ্ড সুরু করলেন যে, আমি লজ্জায় চোখ বুজছিলাম। ফ্রক তো পরেছেন হাঁটুর উপর, তা আবার তাঁর দস্যিবৃত্তির চোটে সেটা সে সীমানা ছাড়িয়ে যাচ্ছিল।

যাক্, বর্ত্তমান জগতে তাঁরাই হ'লেন সভ্যতার আদর্শ।

সঙ্গের পুরুষ-মানুষগুলির সঙ্গে মেয়েটি এমন ব্যবহার ক'রছিলো, আমি তো বুঝে উঠতে পারছিলাম না, কোনটি তাঁর স্বামী, কিংবা তার স্বামীপদে অভিষিক্ত ব্যক্তিটি আদবেই আছেন কি না? মনে মনে বল্লাম, এই সভ্যতার নামে অসভ্যতার কবে মৃত্যু হবে? তোমাদের দেখে আমাদের ভদ্রসমাজ যে আজ মরতে বসেছে!"

এমন সময় দেখি কে একটি ভদ্রলোক ইংরাজিতে বলছেন, "তাই তো মেম সাহেব, আমার জলটা তুমি ফেলে দিলে, তা গেছে, গেছে তোমার জুতো তো ভেজে নি? এই আমি হচ্ছি রুগ্ন লোক।"

মেম সাহেব গরম মেজাজে জবাব দিলেন, "তুমি কেন জলের কুঁজো এনেছ? আমার এই জুতো ভেজার জন্ত তুমি দায়ী রইলে, এখন আর বেশী কথা বলো না।"

লোকটি আবার কি বলিতে যাইতেছিলেন, মেম সাহেব সরোষে বল্লেন, "চুপ।"

ভদ্রলোকটি আমার পার্শ্বের দু'খানা বেঞ্চ ছাড়িয়ে, একটা বেঞ্চিতে বিছানা পেতে লেপ গায়ে দিয়ে শুয়েছিলেন। মেমের কাছে বকুনি খেয়ে তিনি তাঁর ছোকরা চাকরটিকে বকতে সুরু করলেন। সেই বাচ্চা চাকরটার গালে ঠাস ক'রে একটা চড় ক'ষে দিয়ে বল্লেন, "হাঁদারাম, তোমায় না কতবার বললুম, আমার আগে, আমার কুঁজো!" "ব'লেই তিনি কাশতে সুরু করলেন। কাশতে কাশতে বিছানা ছেড়ে উঠে বসলেন, দেখলাম ভদ্রলোক অত্যন্ত রোগা।

তাঁর পাশে দুইজন কোট-প্যাণ্ট পরা ভদ্রলোক তাস খেলছিলেন, তাঁরা বল্লেন, "তা, জলের জন্ত কেন দুঃখু করছেন, জল তো আমাদের সঙ্গে আছে।"

ভদ্রলোকটি বল্লেন, "যে সে জল তো আমার কুঁজোয় ছিল না, এ রাঁচীর প্রসিদ্ধ কুয়োর জল ম'শাই, প্রসিদ্ধ কুয়োর জল। এ আর কোথায় পাব?" বলিয়া তিনি একটা হতাশের শ্বাস ফেলে তাকালেন।

ছোকরা দুইটি বল্লে, "রাঁচীর কোথা হ'তে জল এনেছিলেন?" "কেন? রাঁচির ট্রেজারী।"

আরে ছো! রাঁচি গিয়ে খেলেন কি না শেষে ট্রেজারীর কুয়োর জল! আরে মশাই রাঁচির বিখ্যাত কুয়ো হচ্ছে গোদার। কাঁকে রোডে, আমার মাসীর বাড়ী, তাঁর বাড়ীতেই এই কুয়ো। কত দূর-দূরান্তের লোক এসে এই কুয়োর জল নিয়ে যায়, রীতিমত পয়সা খরচ ক'রে। খাবেন? আমাদের সঙ্গে আছে। ভদ্রলোক অত্যন্ত আগ্রহে তাদের কাছ হ'তে এক গেলাস জল নিয়ে, খেয়ে বল্লেন, "তাই তো মশাই, জলটি বড়ই সুস্বাদু! এতদিন থেকে এলাম, তা এমন কথাটি তো কেউ বললো না, একবারও। আচ্ছা মশাই জল খেলে বমি টমি সব সেরে যায়! তা হ'লে ওখান হ'তে আমি জল আনবার বন্দোবস্ত করবো। মশাই, বল্লে না প্রত্যয় যাবেন, এই জল, জল, ক'রে হেন জায়গা নেই আমি যাইনি! বল্লে অত্যুক্তি হবে না, কোথায় শিমলে, কোথায় দার্জ্জিলিং, কোথায় আলমোড়া! কি বলবো ম'শাই, আর একটু জল দেবেন?"

—"হাঁ৷ নিশ্চয়।" বলে যুবকটি তার কুঁজো হতে প্রায় আধ কুঁজো জল রুগ্ন ভদ্রলোকটির কুঁজোয় ঢেলে দিলেন। ভদ্রলোক জল খেয়ে আবার কাশতে সুরু করলেন। তাঁর কাশি ও লিকলিকে সরু চেহারা দেখে বুঝলাম, এঁর পরমায়ু আর বেশী দিন নেই। তা এই অসুস্থ লোকটির কখনও উচিৎ নয়, সুস্থ লোকদের সঙ্গে এক গাড়ীতে যাওয়া। একে রাঁচি ফেরৎ, তায় কাশি, এর আর কি প্রমাণের অভাব রইল? এ যক্ষ্মা না হ'য়ে তো যায়ই না। তা কেন রেল কোম্পানী রুগ্ন মানুষদের জন্য আলাদা ট্রেণ করে না? সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়লো, কিছুদিন পূর্ব্বে আমার একটা প্রতিজ্ঞা। সদ্য রোগ-মুক্ত তোমার দাদাকে নিয়ে গিয়েছিলাম মধুপুরে। চেঞ্জে যাওয়ার সময় তোমার দাদাকে সকলে পরামর্শ দিলেন, রোগের জন্ত যে রকম টাকার রাজসিক যজ্ঞ করলে, এখন ব্যয়-সংক্ষেপ না করলে ভবিষ্যতে ফেল পড়ে যাবে যে। তুমি

তো আর লাট সাহেব নও,—স্ত্রী-পরিবার থার্ড ক্লাসে পাঠিয়ে, নিজে সেকেণ্ড ক্লাসে যাও।"

তাঁদের পরামর্শ মত থার্ড ক্লাসেই উঠলুম। জীবনে এই প্রথম। গান্ধী-নীতি স্মরণ ক'রে সব অসুবিধাগুলিকে ঝেড়ে ফেলতে চেষ্টা করলুম। গোটা কামরা নিম্নশ্রেণীর লোকে পরিপূর্ণ। সম্মুখের বেঞ্চিতেই একটি মুসলমান রুগ্না রমণী শুয়ে আছে। তার মুখ দিয়ে লাল গড়িয়ে পড়ছে। রমণীটির ময়লা জামা-কাপড় ও চেহারা দেখেই মনে হয়, অত্যন্ত নীচু ক্লাসের মুসলমান। মাঝের বেঞ্চটা রেল কোম্পানী আমাদের জন্ত রিজার্ভ লিখে রেখেছেন। রুগীটিকে দেখে, সত্যি কি বলবো, বড়ই ঘৃণা হ'লো। কিন্তু কি করবো? এই বেঞ্চিতে বসা ছাড়া আর গত্যন্তর নেই। অগত্যা নাক মুখ সিট্‌কিয়ে, রুগীর ছোঁয়াচ বাঁচিয়ে ছেলে-মেয়ে নিয়ে বসলুম। তার প্রতি আমার ঘৃণাকে জোর ক'রে মন থেকে তাড়াতে চেষ্টা করলুম। বেদান্তের বড় বড় বাক্য-গুলিও অনেকবার সৎচিন্তা স্রোতের মধ্যে ভেসে গেল। নীতিবাক্য জপ্‌তে জপ্‌তে চলেছি। মাত্র তো চার ঘণ্টার পথ। এই টুকু সময় কিছু অসুবিধা সহ্য করে থাকতে পারবো না? না পারবো তো মানুষ হ'য়ে জন্মেছি কেন? কিন্তু এক ফুৎকারে আমার মনের সকল বল হারিয়ে ফেললাম।

রুগীটির আত্মীয়, কি জন্ত জানিনা, তাকে একবার দাঁড় করালো, রুগী টল্ মল করে টলতে লাগলো।

আমি মুহূর্ত্তে ছেলে মেয়ের হাত ধরে বিদ্যুৎরেখার মত তড়িৎ-গতিতে ভাড়া করা বেঞ্চি রেখে উপস্থিত হ'লাম পাঞ্জাবী মহলে। পরমুহূর্ত্তেই বুঝতে পারলাম, আমি একটা অমানুষোচিত ভুল ক'রলাম। রোগীটিকে কেন ঘৃণা ক'রলাম। কেন তাকে সহ্য করতে পারলাম না? এত দুর্ব্বল আমি? নিজের মনকে অজস্র প্রশ্ন ক'রে তার বিচার করতে চাইলাম। কিন্তু তবু সেই বেঞ্চিটিতে ফিরে বসতে যেতে পারলুম না।

দুই পার্শ্বের দুই পাহাড় প্রমাণ দেহবিশিষ্ট পাঞ্জাবী ছায়ার মধ্যের রন্ধ্রপথে ছেলে মেয়েকে বসিয়ে কামরার দরজার ধারে দাঁড়িয়ে রইলুম। বাচ্চাগুলি চিঁড়ে-চেপ্‌টা হওয়ার জোগাড় দেখেও আবার স্বস্থানে প্রস্থান করতে পারলুম না।

জান ত' আমায় বাড়ীতে সকলে সেবাময়ী নাম দিয়েছে। আমার এই সুনামের জন্ত যথেষ্ট গর্ব্ব ছিল। কই পারলুম না তো রুগীটির সেবা করতে? কিংবা যে তার সেবা করছে, তার সাহায্য করতে। কেন পারলুম না! ভয়? না, ঘৃণা? নিজের মনের নগ্নতা, ভীরুতা সবই যেন আমি স্পষ্ট দেখতে পেলুম। ষ্টেসনে নেমে, সর্ব্বপ্রথম তোমার দাদাকে প্রশ্ন করেছিলুম, গাড়ীতে বেশী ভিড় হয় নি তো? তিনি একটু ম্লান হাসি হেসে বললেন, আমার মত মানুষের আবার গাড়ীতে জায়গার অভাব? আমি কিছু না বলে তাঁর দিকে সপ্রশ্নে তাকাতে বল্লেন, দুটো সাহেব উঠেছিল, কিন্তু তারা আমার দিকে চেয়ে নেমে গেল।

সেই দিনের বেলা-শেষের ক্ষীণ সূর্য্যালোকের সঙ্গে, তোমার দাদার ক্ষীণ হাসিটুকুর মধ্যে যে ব্যথা ফুটে উঠেছিল, সেই ব্যথার কাঁটা শেলের মত আজও আমার বুকে ফুটে আছে।

সেই থেকে প্রতিজ্ঞা করেছি, রুগ্ন মানুষ দেখলে আর ঘৃণা ক'রবো না। সে জন্ত আজ এই রুগ্নটিকে দেখে আমার অন্তর তাঁর জন্ত সহনাভূতিতে ভরে উঠলো। আহা বেচারা! তাঁর স্ত্রী পুত্রের জন্তও অত্যন্ত করুণা জাগতে লাগলো। হতভাগ্য তারা! গাড়ী টাটায় থামলো। অনেক আরোহী এখানে উঠলেন। রুগীটি বেশ ঘুমিয়েছিলেন। গোলমালে উঠে কাশতে সুরু করলেন। সে কি ভয়ানক কাশি! প্রতি মুহূর্ত্ত যেন আমার ভয় করছিল; কি দুর্ঘটনা ঘটে বসে। সে কাশি আর থামে না! তিনি হাত জোড় করে, তাঁর বেঞ্চি ও তাঁর চারদিকের অন্যান্ত বেঞ্চির সহযাত্রীদের বল্লেন, "আপনারা দয়া করে সরে বসুন, আমি এখুনি বমি করে ফেলবো। এই ফেললাম। সরুন! সরুন! এই ওঃ, মুহূর্ত্তে তাঁর বেঞ্চি, ও তাঁর চার ধারের বেঞ্চির সকল লোক হুড় মুড়িয়ে কতক আমাদের পিঠের কাছে দাঁড়াইলেন, কতক আমাদের সম্মুখের ইয়োরোপীয়ান মহলে গিয়ে উপস্থিত হলেন। কী দুর্ভোগ তাঁদের! কিন্তু রুগ্ন ভদ্রলোক খুবই সাবধানী। কি করবেন বেচারা! না স'রতে ব'লে করেনই বা কি?

আমিও বমির উদ্বেগ শুনে সেদিক হতে মুখ ফিরিয়ে সম্মুখের সাহেব-পরিবারটির দিকে তাকিয়ে দেখি, এত

গোলমাল, নোংরা কাণ্ডের মধ্যেও তাঁদের খাওয়ার বেশ দহরম-মহরম চলেছে। ট্রেন ছাড়লো। এলো আসানসোল। এখানেও ইংরাজ-দলটি আর এক পত্তন আহার-পর্ব্ব সমাধা ক'রলেন। চপ্, কাটলেট ইত্যাদি। এলো বর্দ্ধমান। এখানকার সীতাভোগ, মিহিদানার উপর যথেষ্ট এঁদের শ্রদ্ধা দেখলুম। গো-গ্রাসে গিলতে লাগলেন। আমরা অবাক্ হ'য়ে তাঁদের ভোজনের অধ্যবসায় দেখতে লাগলাম। তাঁদের সঙ্গে একটি বৃদ্ধ মহিলা ছিলেন, তিনি এ পর্য্যন্ত যুবক-যুবতীদের পাল্লা দিচ্ছিলেন, শুধু বর্দ্ধমানে এসে সামান্য কিছু খেয়ে জবাব দিলেন। আহা, বেচারি হেরে গেল!

এতক্ষণ এই ভোজন-পিয়াসী দলের আহারের কৃচ্ছ্র-সাধনায় মুগ্ধ হ'য়ে মন চোখ উভয়কেই এক চেটে ক'রে ন্যস্ত করার দরুণ কামরার অন্যদিকে চাইবার ফুরসৎ পাইনি। এখন আবার রোগীটির পানে চেয়ে দেখলাম তিনি বেশ লম্বা হয়ে শুয়ে লেপমুড়ি দিয়ে ঘুমুচ্ছেন। বুঝতে পারলাম, এতক্ষণ কেন এদিকে নজর পড়েনি অর্থাৎ তিনি ঘুমোনের দরুণ কামরাটি বেশ শান্ত হয়েছে কি না!

এমন সময় তোমার দাদা চুপি চুপি বল্লেন, দেখ, এঁরা সেই টাটা থেকে উঠাবধি সমানে দাঁড়িয়ে আছেন। তুমি যদি ওই বেডিং দুটোর উপর বিছানা পেতে, খোকা-খুকুদের শোয়াও তো এই বেঞ্চি দুটো খালি ক'রে ওঁদের বসতে বলি। আমি ফিরে দেখি, ওই রুগীটির কাছ হ'তে যাঁরা সরে এসেছেন, ইনি তাঁদের কথাই বলছেন। আমি কিছুক্ষণ গুম হ'য়ে থেকে বল্লুম, "এ তো আমাদের রিজার্ভ করা বেঞ্চি!"—"হলোই বা রিজার্ভ করা। রেল-কোম্পানীর সঙ্গে আমি এমন কোন স্বর্ত্ত করিনি, যে রিজার্ভ করা বেঞ্চিতে অন্য কাউকে বসতে দিলে তারা আমায় দ্বীপান্তর বা ফাঁসী দেবে।"

জানতো তোমার দাদাকে। কি অদ্ভুত চরিত্রের লোক তিনি। ব্যাপারীর সঙ্গে দর কষাকষি করা দূরে থাকুক, তাকে দু-পাঁচ টাকা বেশী দেবেন। কিছু প্রতিবাদ করলে বলেন, "আহা বেচারা দেবে কোথা থেকে বলো তো? বিশেষ আজকাল তো যুদ্ধের বাজার।" সেবার কল-তলা হ'তে বাসনের গোছা চুরী গেলে চাকরকে সন্দেহ ক'রে, তাকে নানা রকম জেরা শাসন ক'রতে লাগলুম, তোমার দাদা বল্লেন, "আহা বেচারীকে বকো না, নিয়েছে তো নিয়েছে। লোকটার ভূমিকম্পে বাড়ী-ঘর সব পড়ে গেছে।" তারপর আমায় লুকিয়ে আরও মোটা টাকা তাকে দিলেন ঘর তোলার জন্যে। কাজেই জানি, এই লোকটির সঙ্গে পারবার যো নেই। অগত্যা তাঁর কথামত আমায় সেই ব্যবস্থা করতেই হলো। ভদ্রলোক অতিথি-সৎকার করে গাড়ীর বাঙ্কে গিয়ে শুয়ে পড়লেন। অতিথিরা তাঁকে ধন্যবাদ দিয়ে আসন গ্রহণ ক'রলেন।

ভোরবেলা গাড়ী হাওড়ায় এলো। আমি প্লাটফর্মে দাঁড়িয়ে মাল হিসাব করে নিচ্ছি, এবং তার মধ্যে শুজির আহ্বানে মাঝে মাঝে সেই ভিড়ের মধ্যে কোন্ বৌটির ব্লাউজের প্যাটার্নটি সুন্দর, কার পরণে আজকালকার হাল ফ্যাসানের সাড়ী, কোন্ মেয়েটি বেশী হাইহিল্ড তা-ই কৌতূহলিত হ'য়ে দেখছিলুম। হঠাৎ চমকে উঠলুম।

তোমার দাদা বলছেন, "খাসা অভিনয় করেন মশাই! আমি তো একেবারে মুগ্ধ! যদি কোন থিয়েটারে না ঢুকে থাকেন তো ঢুকে পড়বেন, খুব নাম হবে।"

পাশ ফিরে দেখলাম সেই রুগ্ন ভদ্রলোকটিকে বলছেন। ভদ্রলোকটি তোমার দাদাকে হাতজোড় করে নমস্কার ক'রে হেসে বললেন, "আর দাদা! আজ ছাব্বিশ বছর ট্রেনে ষ্টীমারে যাতায়াত করছি এই একই ভাবে। চিরদিন পাঁচজনার জায়গা একলাই দখল ক'রে ঘুমিয়ে পথ পার হ'য়ে যাই, কেউ বলতে পারবে না, এক চিড় জায়গা কোন দিন কাউকে ছেড়ে দিয়ে, বাঙ্কে গিয়ে শুয়েছি। এমন বদনাম আমার পরম শত্রুতেও করতে পারবে না মশাই—" ভদ্রলোকের কথা আর বলা হ'লো না তাঁর পিছন হ'তে একটি রাসভকণ্ঠ গর্জ্জন ক'রে উঠলো। বোধ হয়, তিনিই ভদ্রলোকের তিনি!

ভদ্রমহিলাটি বললেন, "নাও, আর দাঁত বার ক'রে গল্প ক'রতে হবে না। সারারাত্রি বেশ মজা ক'রে তো ঘুমুলে, এখন আর কোন ঢং না ক'রে এটাকে ধরো দিকি, ব'লে একটা বছর দেড়েকের বাচ্চাকে তাঁর কোলে দিয়ে, ডাইন হাতে মস্ত একটা ক্যাশ-বাক্স ঝুলিয়ে দিয়ে বললেন, "যাও এগোও গে।" কর্ত্তা কিছুদূর গিয়ে পিছন ফিরে আমতা আমতা ক'রে বললেন, "ওগো তুমিও এসোনা গো।"

গিন্নি আবার তাঁর হেঁড়ে গলায় গর্জ্জন ক'রে বল্লেন, "তোমার মতন জোয়ান মানুষের সঙ্গে জোর কদমে হেঁটে যেতে আমি পারি? আমি ব'লে গো হলুম হার্টের রুগী। তা পোড়া, আমার জর্দ্দার কৌটো কোথায় গেল দেখ!"

অদূর হ'তে কর্ত্তা বললেন, "ওগো তোমার জর্দ্দার কৌটো তো আমার কাছে আছে।"

"ওমা, তাই বল! এদিকে আমি ছিষ্টি ত্রিভুবন খুঁজে মরছি! আক্কেল যাই হোক তোমার গা!" বল্‌তে বল্‌তে কর্ত্তা-গিন্নি দুই জনে জোর কদমে, মানে, ঠিক যেন মিলিটারি প্যাটার্ণের পা ফেলে, নানা ভঙ্গীতে হাত-পা নাড়তে নাড়তে দু'জনে দু'গলায় নানা রকম আওয়াজ ক'রতে ক'রতে চলে গেলেন।

আমি অবাক হ'য়ে নিষ্পলক নেত্রে তাঁদের গতির দিকে তাকিয়ে রইলুম। মনে মনে এক নিমেষে, সারা রাত্রির ইতিহাসটুকু ছায়াবাজির মত খেলে গেল।

ভাবলুম সারা পৃথিবীর কথা ছেড়ে দিই। এই সামান্য একটা গাড়ীর কামরার মধ্যে কত বিভিন্ন প্রকৃতির মানুষই না ছিল। কেউ বা নিজের বসবার স্থানটুকু ছেড়ে আনন্দ অনুভব ক'রে, কেউ বা পাঁচজনাকে ঠকিয়ে, বঞ্চিত ক'রে, তাদের জায়গা দখল ক'রে সুখ-গর্ব্ব বোধ করে। তার মধ্যে মনের মধ্যে উলটি পালটি কতগুলি ভাব আসার পর এমন একটি ভাবের মূর্ত্তি আমার মানসচোখে এসে দাঁড়াল, যে তার রূপ যদি বাইরে প্রকাশ করি, তো এ যুগের লোকেরা কেহই তা সহ্য করতে পারবে না। সত্যি বলছি, খুব নিরীক্ষণ ক'রে দেখলুম, সে মূর্ত্তিটি কোন সেমিজ-সাড়ী, আলতা-পরা সলজ্জা বঙ্গরমণীর মূর্ত্তি নয়, কিংবা হাই হিলের জুতো পরা হালফ্যাসানের সাড়ীপরা ভ্যানিটি ব্যাগ হাতে কোন আধুনিক মূর্ত্তিও নয়। স্পষ্ট দেখলুম, সেটি সেই মহিষমর্দ্দিনী রূপ। যে মূর্ত্তি সেই পৃথিবীর যৌবন কালে সত্যযুগে, দেবতাদের বহ্নি-শিখা দিয়ে তৈরী হ'য়েছিল, এ সেই! অর্থাৎ যে মানুষটা একটা গাড়ীর কামরা সমস্ত মানুষকে ঠকিয়ে তাদের বসা-শোয়ার আরামটুকু একলাই দখল ক'রে এলো, সেই মানুষটার প্রতি গাড়ীর সমস্ত লোকের রোষের বহ্নি বোধ হয় আমার উপরে আবির্ভূত হ'য়ে দেবী চামুণ্ডার মূর্ত্তি হুঙ্কার দিয়ে বার হ'তে চেষ্টা করছিলেন।

আমি ত' মূর্ত্তি দেখে, ভয়ে চুপ। লজ্জায় জিব কাটলাম। সর্ব্বনাশ! এই কলিকালে, তার নশ্বর পৃথিবীতে, যেখানে যে ভাবেই হোক একবার পৌঁছিলে, যমের বাড়ী যেতেই হবে। এর কোন প্রতিকার নেই, তিনি দেবীই হোন, আর দানবীই হোন মৃত্যুকে তাঁর বরণ করিতেই হবে। সেই পৃথিবীতে কেউ তার সম্মান করবে না।

প্রথমে ত' স্বামী মহাশয়, মহাদেবের মত দেবীর পদতলে পড়বেন না, ঠিক তার চেয়ে হাওড়ার পুলের উপর দাঁড়িয়ে গঙ্গায় ঝাঁপ দেওয়াকে অনেক বেশী, পুরুষকার মনে করবেন। এবং লজ্জায় তিনি তা-ই করবেন। আর ষ্টেসন ভর্ত্তি লোক দেবীকে নিয়ে যা করবেন, তা বিকেলে টেলিগ্রাম কাগজে সকলেই জানতে পারবেন। হাঁসি, ঠাট্টা, মার, হাতেকড়া, শ্রীঘর পাগলা-গারদ।

যাক্, দেবী ভূতলে আবির্ভাব হ'লেন না। বোধ হয় দেখলেন, এই বীরাঙ্গনা মূর্ত্তি ত্রিভুবনের নিকৃষ্ট জীব "নর" তার মোটেই আদর ক'রলো না। তিনি ভিতরে ঠাণ্ডা হ'য়ে রইলেন।

কিন্তু ভাই একটা মজা হচ্ছে যে, এখনও স্বপন-ঘোরে দেখে থাকি, সেই রাত্রির সেই ট্রেনটির কামরাটিকে। সম্মুখের বেঞ্চিতে নানা জাতের লোকের মধ্যে পিঞ্জরাপুলের যাত্রীর মত ব'সে ইয়োরোপীয়ান পরিবারটির খাওয়া-দাওয়ার অধ্যবসায়ের জোর, আর অদূরে রুগ্ন মানুষটির দু'খানা বেঞ্চিজুড়ে কাশি-বমির ভণ্ডামি। আমার মনে, পূর্ব্ব-পাপের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপে আহা বলে সমবেদনা জাগা। পরেই হাওড়া ষ্টেসনের ব্যাপার মনে হওয়ায়, চারিদিকে তাকিয়ে খুঁজি, আর কিছু নয়, একটা শুধু মজবুত বেতের চাবুক। কিন্তু চাবুক আর খুঁজে পাইনে। তখনি মনে মনে প্রতিজ্ঞা করি, এবার ক'লকাতা গিয়ে, প্রথমেই যাব হগমার্কেটে, কেন না সেখান হ'তে খুব ভাল দেখে একটা চাবুক কিনতে হবে।

ইতি তোমার

বৌদি।

বাঙ্গালার কথা

—৺নিখিলনাথ রায়

[পূর্বানুবৃত্তি]

অন্ধকূপ কারাগারে

তোমরা 'অন্ধকূপ হত্যা' নামে একটী কাণ্ডের কথা বোধ হয় শুনিয়াছ এবং কোন কোন পুস্তকেও তাহা পড়িয়া থাকিবে। কিন্তু তাহার প্রকৃত ব্যাপারটা কি, তাহা তোমাদিগকে বলিতেছি। 'অন্ধকূপ হত্যা' নামে কোন লোমহর্ষণ ঘটনা ঘটে নাই। তবে অন্ধকূপ কারাগারে কয়েকজন ইংরেজ যে বন্দী হইয়াছিলেন, তাহা বলা যাইতে পারে। এই ইংরেজদের মধ্যে কয়েকজন মরিয়া যান ও কয়েকজন বাঁচিয়াও থাকেন। নবাব সৈন্তেরা কলিকাতার দুর্গ অধিকার করিয়া কয়েকজন ইংরেজকে তাহাতে বন্দী করিয়া রাখে। নবাব সিরাজউদ্দৌলা, সেনাপতি মাণিকচাঁদকে যুদ্ধে ধৃত ইংরাজদের ব্যবস্থা করিবার জন্ত আদেশ দিয়া নিজ শিবিরে চলিয়া যান। অন্যান্ত জাতির লোকদিগকে ছাড়িয়া দেওয়া হয়, মাণিকচাঁদই তাঁহাদিগকে অন্ধকূপে নিক্ষেপ করার আদেশ দেন। যুদ্ধের নিয়মানুসারে বন্দীদিগকে যেরূপ কারাগারে রাখিতে হয়, মাণিকচাঁদও সেইরূপ ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। অবশ্য, বন্দী ইংরাজদের মধ্যে অনেকে যুদ্ধে আহতও হইয়াছিলেন। তখন গ্রীষ্মকাল, দারুণ গ্রীষ্মে তাঁহাদের কেহ কেহ যে প্রাণত্যাগ করিবেন, ইহা বিচিত্র নহে। তাই ইংরাজদের মধ্যে কয়েকজন জীবন বিসর্জ্জন দিয়াছিলেন। সুতরাং ইহা যে একটা লোমহর্ষণ ব্যাপার নহে, তাহা অবশ্য তোমরা বুঝিতে পারিতেছ। সকল যুদ্ধের বন্দীদিগেরই ঐরূপ দশা ঘটিয়া থাকে। কাজেই ইহা একটা নূতন কাণ্ডও নহে।

তবে ক্ষুদ্র অন্ধকূপ কারাগারে অধিকসংখ্যক লোক ঠাসাঠাসি করিয়া যদি বন্দী করা হইয়া থাকে, তাহা হইলে তাহাতে অবশ্য নিষ্ঠুরতা প্রকাশ পাইতে পারে। সেই কথা শুনিয়াই ইহাকে 'অন্ধকূপ হত্যা' বলা হয়। কিন্তু বাস্তবিক সেরূপ ঘটনা ঘটিয়াছিল বলিয়া মনে হয় না। সিরাজউদ্দৌলার ইংরাজদেরই উপর রাগ ছিল। অন্যান্ত জাতির লোকদিগকে ছাড়িয়া দেওয়া হয়। সেনাপতি মাণিকচাঁদ ইংরেজদিগকেই অন্ধকূপ-কারাগারে আবদ্ধ করিতে আদেশ দেন। অন্ধকূপ কারাগারে যাহারা বন্দী হইয়াছিল, তাহারা যে ইংরেজ একথা তখনকার ইংরেজরাও বলিয়া গিয়াছেন, কিন্তু তাঁহারা ইংরেজদের সংখ্যা ১৪৬ জন বলেন। আবার তাহার বেশী ও কমের কথাও শুনা যায়। আর অন্ধকূপের পরিমাণ ১৮ ফুট দীর্ঘ ও ১৮ ফুট প্রস্থ বলিয়া শুনা যায়। তাহারও কম বেশীর কথা আছে। যদি ঐরূপ ক্ষুদ্র গৃহে অতগুলি লোককে আবদ্ধ করিয়া রাখা হইয়া থাকে, তাহা হইলে তাহাদিগকে ঠাসাঠাসি করিয়াই পুরিতে হয়। অন্ধকূপের পরিমাণ ঐরূপ থাকিতে পারে, কিন্তু অতগুলি ইংরেজ যে বন্দী হয় নাই, তাহা মনে করিবার যথেষ্ট কারণ আছে।

কলিকাতা আক্রমণের সময় সেখানে সামান্য কয়েকজন ইউরোপীয় ছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে অধ্যক্ষ ড্রেক প্রভৃতি কয়েকজন স্ত্রীলোকদিগকে লইয়া পলায়ন করিয়াছিলেন। দুর্গ অধিকারের সময় ৫০ জনও ইংরেজ ছিলেন কিনা সন্দেহ। ড্রেক সাহেব পলায়ন করিলে, হলওয়েল সাহেব দুর্গ রক্ষার ভার গ্রহণ করেন। তাঁহাকেও অন্ধকূপে থাকিতে হইয়াছিল। তিনি ৫৩ জন মাত্র মৃত ব্যক্তির কথা উল্লেখ করিয়াছিলেন। অথচ এই হলওয়েলই আবার ১৪৬ জন অন্ধকূপে আবদ্ধ এবং তাহাদের মধ্যে ১২৩ জন প্রাণত্যাগ করে ও ২৩ জন মাত্র জীবিত ছিল বলিয়া প্রকাশ করিয়াছিলেন। ইহা কিরূপে বিশ্বাস করা যায়? ইংরেজদিগের সহিত অন্যান্ত জাতির লোক লইয়া ১৪৬ জন ধরা যাইতে পারে বটে, কিন্তু বরাবরই ইংরেজদিগকেই বন্দী করার কথাই বলা হইয়াছে, আর নবাব সিরাজউদ্দৌলার দেশীয়দিগের বা অন্য জাতির লোকের উপর রাগের কোন কারণই ছিল না, কাজেই তাহাদিগকে যে অন্ধকূপে আবদ্ধ করা হয় নাই, ইহাই মনে হয়। তাহাদিগকে ছাড়িয়া দেওয়ার কথাই আছে। এক্ষণে কম বেশী ৫০ জন ইংরেজকে ১৮ফুট ঘরে বন্ধ করিয়া রাখায় তাঁহাদের মধ্যে কয়েকজন আহত যদি দারুণ গ্রীষ্মের জন্য প্রাণত্যাগ করিয়া থাকেন, তাহা হইলে তাহাকে কি 'অন্ধকূপ হত্যা' বলা যায়? অবশ্য কয়েকজন ইংরেজ বাঁচিয়াও ছিলেন। আর এই

ব্যাপারের সহিত সিরাজউদ্দৌলাকে জড়িত করিতে পারা যায় না। তিনি মাণিকচাঁদের উপর বন্দীদের ব্যবস্থা করার ভার দিয়া শিবিরে গিয়াছিলেন। সুতরাং ইহাতে যে তাঁহার কোনই দোষ নাই তাহা অবশ্য তোমরা বুঝিতে পারিতেছ। পরদিন সিরাজ হলওয়েল প্রভৃতির সহিত সদ্ব্যবহারও করিয়াছিলেন। কলিকাতার নাম 'আলি নগর' দিয়া ও মানিক চাঁদের উপর তাহার ভার দিয়া সিরাজ মুর্শিদাবাদে চলিয়া আসেন।

সিরাজের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র

তোমরা শুনিয়াছ যে, আলিবর্দ্দীর পরিবারবর্গের মধ্যে সিরাজের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র হইতেছিল। তাহার মধ্যে সিরাজ প্রথমে ঘসিটীবেগমের উদ্দেশ্য বিফল করিয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু শকৎজঙ্গ আপনার উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য চেষ্টা করিতে ত্রুটী করিতেছিলেন না। তখন নবাবী পাইতে হইলে দিল্লী হইতে বাদশাহের সনন্দ বা অনুমতিপত্র আনাইতে হইত। সিরাজ প্রথম হইতে বিব্রত থাকায় তাহা করিয়া উঠিতে পারেন নাই। আর ইহার জন্য অনেক অর্থেরও প্রয়োজন। জগৎশেঠের উপর সেই অর্থ সংগ্রহ করিয়া সনন্দ আনার ভারও ছিল। জগৎশেঠ মহাতপ চাঁদ তাহা করিয়া উঠিতে পারেন নাই। সিরাজ, জগৎশেঠকে সেজন্য তিরস্কার করিয়া বণিক-মহাজনদিগের নিকট হইতে সনন্দ আনয়নের টাকা তুলিতে বলিলে জগৎশেঠ তাহার প্রতিবাদ করেন। সিরাজ তাহাতে জগৎশেঠকে অপমানিত করিয়া কারারুদ্ধ করিবার জন্য আদেশ দিয়াছিলেন বলিয়া একটা কথাও প্রচলিত আছে। কিন্তু সিরাজ যে শেঠদিগের প্রতি বরাবর সদ্ব্যবহারই করিতেন, এ কথাও জানা যায়। এদিকে শকৎজঙ্গ বাদশাহের নিকট হইতে সনন্দ পাইয়াছিলেন বলিয়া সিরাজকে মুর্শিদাবাদের সিংহাসন ছাড়িয়া দিবার জন্য লিখিয়া পাঠাইলেন। তখন সিরাজউদ্দৌলাকে শকৎজঙ্গের বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করিতে হইল।

মোহনলাল, মীরজাফর প্রভৃতি সেনাপতিগণকে লইয়া সিরাজ যুদ্ধের জন্য অগ্রসর হইলেন। মোহনলাল, সিরাজের একজন বিশ্বাসী সেনাপতি ছিলেন। এরূপ কথা প্রচলিত আছে যে, মোহনলাল সিরাজকে তাঁহার এক সুন্দরী ভগিনী উপহার দিয়া তাঁহার প্রিয়পাত্র হইয়া উঠেন। মোহনলালের ন্যায় ব্যক্তি এরূপ করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয় না। এদিকে শকৎজঙ্গও সসৈন্যে অগ্রসর হইলেন। উভয় পক্ষে যুদ্ধ বাধিয়া গেল। শকৎজঙ্গের সেনাপতি শ্যামসুন্দর অসীম সাহস সহকারে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। এদিকে মোহনলালও সেইরূপ বীরত্ব প্রকাশে প্রবৃত্ত হইলেন। শ্যামসুন্দর ও মোহনলাল দুই জনই বাঙ্গালী কায়স্থ ছিলেন বলিয়া শুনা যায়। তাহা হইলে এই যুদ্ধ প্রধানতঃ যে বাঙ্গালীতে বাঙ্গালীতে হইয়াছিল তাহা অবশ্য তোমরা বুঝিতে পারিতেছ। তখনও পর্য্যন্ত বাঙ্গালীরা যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হইতেন। এই দুই বাঙ্গালী বীরের কামান গর্জ্জনে যুদ্ধস্থল কম্পিত হইয়া উঠিয়াছিল। শকৎজঙ্গ সে সময়ে শিবিরে বসিয়া মদ্যপানে বিভোর হইয়া নর্ত্তকীদিগকে লইয়া আমোদ করিতেছিলেন। সৈন্যেরা ছত্রভঙ্গ হইতেছে বলিয়া তাঁহাকে ধরাধরি করিয়া হস্তিপৃষ্ঠে বসাইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে লইয়া আসা হয়। ইহাতে তোমরা বুঝিতে পারিবে শকৎজঙ্গ কিরূপ চরিত্রের লোক ছিলেন। অথচ অনেকে সিরাজকেই নিন্দা করিবার জন্য শতমুখ হইয়া থাকেন। যুদ্ধে শকৎজঙ্গ নিহত হন ও সিরাজ জয়লাভ করেন। মোহনলালের প্রতি পূর্ণিয়া শাসনের ভার দেওয়া হয়।

পারিবারিক ষড়যন্ত্রের নিবৃত্তি হইল বটে, কিন্তু বাহিরের ষড়যন্ত্র ক্রমে প্রবল হইয়া উঠিতে লাগিল। ইংরেজেরা কলিকাতা হইতে পলায়ন করিয়া ফলতায় অবস্থিতি করিতেছিলেন। মাদ্রাজে তাঁহাদের দুর্দ্দশার সংবাদ পঁহুছিলে, কর্ণেল ক্লাইভ ও এডমিরাল ওয়াট্‌সন কলিকাতা উদ্ধারের জন্য বাঙ্গালায় আসেন। ক্লাইভ দাক্ষিণাত্যে পরাক্রম দেখাইয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। প্রথমে তাঁহারা নবাবের বজবজের দুর্গ আক্রমণ করেন। মাণিকচাঁদ সেখান হইতে পলায়ন করিয়া কলিকাতায় আসিয়া মুর্শিদাবাদের দিকে চলিয়া যান। ইংরেজেরা অনায়াসেই কলিকাতা আবার অধিকার করিয়া লন। ডেক সাহেবই তাহার অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। তাহার পর নবাবের কলিকাতা আক্রমণের প্রতিশোধের জন্য ইংরেজেরা হুগলী বন্দর লুণ্ঠন করিতে অগ্রসর হন। এদিকে নবাবের সহিত মিটমাটের জন্য ও তাঁহার দরবারে, বিশেষতঃ, জগৎশেঠের নিকট পত্রাদি পাঠাইতেও ত্রুটী হইতেছিল না।

নবাব হুগলী লুণ্ঠনের ব্যাপারে ইংরেজদের প্রতি যার পর নাই অসন্তুষ্ট হইয়া সসৈন্যে হুগলীতে আসিয়া উপস্থিত হন। তাহার পর কলিকাতা আসিলে, ইংরেজেরা নবাবের সৈন্যসংখ্যা দেখিয়া সন্ধির প্রস্তাব করিতে থাকেন। এদিকে তলে তলে ক্লাইভ সাহেব রাত্রিযোগে নবাবের শিবির আক্রমণ করিয়া বসেন। এইরূপ হঠাৎ আক্রমণে নবাব অত্যন্ত বিব্রত হইয়া পড়েন, তখন উভয় পক্ষের মধ্যে সন্ধি স্থাপিত হয়। ইহাতে নবাব ইংরেজদের প্রতি কোনরূপ অত্যাচার করিবেন না বলিয়া স্বীকার করেন এবং তাঁহাদের ক্ষতিপূরণ করিতেও সম্মত হন। ইংরেজেরাও বণিকের ন্যায় ব্যবসা চালাইবেন, নবাবের রাজ্যে গোলযোগ ও শান্তিভঙ্গ করিবেন না বলিয়া অঙ্গীকার করেন। সিরাজ অক্ষরে অক্ষরে সন্ধির সর্ত্ত পালন করিয়াছিলেন। কিন্তু ইংরাজেরা যে তাহা করেন নাই সে কথা তোমরা ক্রমে জানিতে পারিবে।

ইংরেজেরা প্রথমে ইউরোপে ফরাসীদিগের সহিত তাঁহাদের যুদ্ধ আরম্ভের ছলে ফরাসীদিগের চন্দননগর অধিকার করিতে ইচ্ছা করিলেন। নবাব ইংরেজদিগকে নিষেধ করিয়া পাঠাইলেন। কিন্তু তাঁহারা সে নিষেধ শুনিলেন না। ইংরেজেরা হুগলীর ফৌজদার নন্দকুমারকে হস্তগত করিলেন। নবাব, নন্দকুমারকে ফরাসীদিগকে রক্ষা করিবার জন্য আদেশ দিলেন ও রাজা দুর্ল্লভরামকে সসৈন্যে হুগলীতে পাঠাইয়া দিলেন। নন্দকুমার, দুর্ল্লভরামকে ফিরিয়া যাইতে বলিলেন। নিজেও ফরাসীদিগের সাহায্য করিলেন না। ইংরেজরা চন্দননগর অধিকার করিয়া লইলেন। নবাব, দুর্ল্লভরামকে পলাশীতে সসৈন্যে থাকিবার জন্য আদেশ দিলে তিনি পলাশীতে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। ইংরেজেরাও তলে তলে নবাবের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

এদিকে নবাব-দরবারেও ভীষণ ষড়যন্ত্র চলিতেছিল। মীরজাফর, জগৎশেঠ, দুর্ল্লভরাম প্রভৃতি ঘোরতর ষড়যন্ত্র করিতেছিলেন। ইংরেজদের সহিত যোগ দিয়া সিরাজ-উদ্দৌলাকে সিংহাসনচ্যুত করাই তাঁহাদের উদ্দেশ্য ছিল। মীরজাফরের অনেকদিন হইতে মুর্শিদাবাদের সিংহাসনের উপর লোভ ছিল। এমন কি আলিবর্দ্দীকে সিংহাসনচ্যুত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। আলিবর্দ্দী অবশ্য তাহাদের সে চেষ্টা ফলবতী হইতে দেন নাই, তিনি মীরজাফরকে ক্ষমাও করিয়াছিলেন। মীরজাফর, আলিবর্দ্দীর বৈমাত্রেয় ভগিনীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। সিরাজ, মীরজাফরকে হাড়ে হাড়ে চিনিতেন, তাঁহার যে মুর্শিদাবাদের সিংহাসনের উপর লোভ, তাহাও জানিতেন। সেইজন্য তিনি সময়ে সময়ে মীরজাফরের প্রতি অসদ্ব্যবহার করিতেন। আবার সময়ে সময়ে তাঁহাকে শান্ত করিয়া প্রধান প্রধান কার্য্যের ভারও দিতেন। কিন্তু মীরজাফর সিংহাসনের আশা কিছুতেই ত্যাগ করিতে পারিতেছিলেন না।

মীরজাফর, জগৎশেঠ মহাতপচাঁদের বন্ধু ছিলেন। সিরাজ, শেঠদিগের সহিত সদ্ব্যবহারই করিতেন। কিন্তু সিরাজের রাজ্য ও তাঁহাদের ধনসম্পত্তি নিরাপদ নহে আশঙ্কা করিয়া জগৎশেঠ বন্ধু মীরজাফরের সহিত যোগদান করেন। কেহ কেহ বলেন যে, সনন্দ আনয়নের জন্য জগৎশেঠকে অপমান করায়, তিনি সিরাজের উপর বিরক্ত হন। সিরাজ যে জগৎ-শেঠের কথা মানিয়া চলিতেন তাহারও অনেক প্রমাণ আছে। সে যাহা হউক, জগৎশেঠ এই ষড়যন্ত্রে যোগ দিয়াছিলেন। মোহনলালের প্রতি সিরাজ অনেক কার্য্যের ভার দেওয়ায়, দুর্ল্লভরামও আপনাকে অপমানিত মনে করিয়া ষড়যন্ত্রে যোগ দেন। ইয়ারলতিফ নামে আর একজন সেনাপতিও মীরজাফরের ন্যায় নবাবীর আশায় ইংরেজদের সহিত যোগ দিতে স্বীকার করেন। রাজবল্লভ, মাণিকচাঁদও ইহার মধ্যে ছিলেন, জমীদারদের মধ্যে কৃষ্ণনগরের রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের এই ষড়যন্ত্রে যোগদানের কথা শুনা যায়। রাণী ভবানী, কৃষ্ণচন্দ্রের এইরূপ কাপুরুষতার জন্য তাঁহাকে স্ত্রীলোকের উপযোগী শাঁখা-সিন্দুর পাঠাইয়া দিয়া উপহাস করিয়াছিলেন বলিয়া কথাও প্রচলিত আছে। জগৎশেঠের বাটীতে ষড়যন্ত্রের বৈঠক বসিত বলিয়া শুনা যায়।

নিনাদে সমররঙ্গে নবাবের ঢোল,
ভীমরবে দিগন্তন
কাঁপাইয়া ঘন ঘন,
উঠিল অম্বরপথে করি ঘোর রোল।"

তাহার পর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। নবাবের ফরাসী সেনাপতি সিনফ্রের অধীনস্থ সৈন্যগণ প্রথম গোলাবৃষ্টি আরম্ভ

করিল। ইংরেজেরাও তাহার উত্তর দিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

"একস্মাৎ একেবারে যতেক কামান
করিল অনলবৃষ্টি
ভীষণ সংহার দৃষ্টি,
কত শ্বেতযোদ্ধা তাহে হল তিরোধান।
ইংরাজের বজ্রনাদী কামান সকল
গম্ভীর গর্জ্জন করি,
নাশিতে সম্মুখ অরি।
মুহূর্ত্তেকে উগরিল কালান্ত অনল।'

যুদ্ধে সুবিধা হইতেছে না দেখিয়া ক্লাইভ সৈন্যদিগকে পিছে হটিয়া আম্রকুঞ্জ মধ্যে প্রবেশ করিতে আদেশ দিলেন। তিনি রাত্রিতে নবাবকে আক্রমণ করিবেন বলিয়া মনে করিয়াছিলেন। ক্লাইভ যুদ্ধস্থল পরিত্যাগ করিয়া নদীতীরে নবাবের একটী শিকার-গৃহে বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। ইংরেজ সৈন্যদিগকে আম্রকুঞ্জ মধ্যে প্রবেশ করিতে দেখিয়া সেনাপতি মীরমদন একদল অশ্বারোহী সৈন্য লইয়া কুঞ্জের দিকে অগ্রসর হইলেন। অধিক দূর যাইতে না যাইতে ইংরাজদিগের একটী গোলা আসিয়া তাঁহার পায়ে লাগিল। মীরমদন ভূতলে পড়িয়া গেলেন। তাঁহার সৈন্যগণ ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িল।

'ছুটিল একটী গোলা রক্তিম বরণ,
বিষম বাজিল পায়ে,
সেই সাংঘাতিক ঘায়ে,
ভূতলে হইল মীরমদন পতন।
হুররে! হুররে! করি গর্জ্জিল ইংরাজ
নবাবের সৈন্যগণ,
ভয়ে ভঙ্গ দিল রণ
পলাতে লাগিল সবে নাহি সহে ব্যাজ।'

মীরমদনের সৈন্যগণকে পলায়ন করিতে দেখিয়া সেনাপতি মোহনলাল অগ্রসর হইয়া তাহাদিগকে উৎসাহিত করিলেন এবং ইংরাজদিগের প্রতি ধাবিত হইলেন তাঁহার আক্রমণে ইংরাজসৈন্যগণ অস্থির হইয়া উঠিল। তাহারা আম্রকুঞ্জ মধ্যে প্রবেশ করিতে লাগিল। এই সময়ে একটী ব্যাপার ঘটিল। মীরমদনের পতনে সিরাজউদ্দৌলা ভীত হইয়া মীরজাফরের পায়ে মাথার পাগড়ী রাখিয়া তাঁহাকে রক্ষা করিতে অনুরোধ করিলেন। মীরজাফর সেইদিন যুদ্ধ বন্ধ করিয়া পরদিন যুদ্ধ করিতে বলিলেন। তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল মোহনলালকে যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত করিতে পারিলে, ইংরাজেরা সুযোগ পাইবেন ও নবাবকে আক্রমণের ব্যবস্থা করিবেন। সে যাহা হউক, সিরাজ মীরজাফরের কথায় সম্মত হইয়া মোহনলালকে যুদ্ধ করিতে নিষেধ করিয়া পাঠাইলেন। মোহনলাল কিন্তু যুদ্ধ ছাড়িলেন না। তিনি নবাবকে বলিয়া পাঠাইলেন যে, এ-সময় যুদ্ধ ছাড়িলে জয়ের আশা থাকিবে না। নবাব সে কথা মীরজাফরকে জানাইলেন। তিনি উত্তর দিলেন যে, তিনি নবাবকে সদুপদেশই দিয়াছেন, এক্ষণে নবাবের যাহা ইচ্ছা হয় করিতে পারেন। দুর্লভরামও সিরাজকে মুর্শিদাবাদে ফিরিয়া যাইতে বলিলেন। নবাব আবার মোহনলালকে যুদ্ধ করিতে নিষেধ করিয়া পাঠাইলেন।

এই ষড়যন্ত্রে আর একজনও বিশেষভাবে যোগ দিয়াছিলেন, তাঁহার নাম আমীরচাঁদ বা উমিচাঁদ। তিনি কলিকাতার একজন পাঞ্জাবী সওদাগর। নবাব দরবারে উমিচাঁদের কিছু কিছু কথাবার্ত্তা চলিত। ইংরেজেরা তাঁহাকেও হাতে রাখিতে ইচ্ছা করেন। উমিচাঁদ কিন্তু অনেক টাকা দাবী করিয়া বসেন। ক্লাইভ সাহেব সেইজন্য দুইখানি অঙ্গীকারপত্র লেখাইয়া একখানিতে উমিচাঁদের টাকার কথা ও আর একখানিতে তাঁহার নামগন্ধও না থাকার ব্যবস্থা করেন। শেষে সেই জালপত্রখানি বাহির করা হয়। উমিচাঁদ তাহাতে টাকার কথা দেখিতে না পাইয়া পাগল হইয়া গিয়াছিলেন। সে যাহা হউক ইংরেজেরা মীরজাফরকেই নবাব করিতে সম্মত হন। কাশীমবাজার কুঠীর অধ্যক্ষ ওয়াটস্ সাহেব স্ত্রীলোকের ব্যবহারোপযোগী আচ্ছাদনে আবৃত শিবিকায় চড়িয়া মুর্শিদাবাদে মীরজাফরের জাফরগঞ্জের বাড়ীতে গিয়া সন্ধি-পত্র স্বাক্ষর করাইয়া আনেন। মীরজাফর কোরাণ ও তাঁহার পুত্র মীরনের মস্তক স্পর্শ করিয়া সন্ধি-পত্রে স্বাক্ষর করেন। সিরাজউদ্দৌলার সর্ব্বনাশ করিবার জন্য তিনি তাঁহাদের পবিত্র ধর্ম্মগ্রন্থ ও নিজপুত্রের মস্তকস্পর্শ করিতেও কুণ্ঠিত হন নাই। সিরাজউদ্দৌলা, মীরজাফর প্রভৃতিকে সন্দেহ করিতেছিলেন, তিনি মীরজাফরকে সন্তুষ্ট করিতেও চেষ্টা করিতেন। মীরজাফর মুখে তাঁহার সাহায্য করিবেন বলিয়া স্বীকার করেন, তাহাতে ইংরেজেরাও মীরজাফরকে সন্দেহের চক্ষে দেখিতে থাকেন। সিরাজ,

ইংরেজদিগের দুরভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়া পলাশীর দিকে সসৈন্যে অগ্রসর হন। ইংরেজেরাও যুদ্ধযাত্রা করিলেন।

পলাশীর যুদ্ধ

পলাশীর বিশাল প্রান্তরে ভাগীরথীতীরে উভয় পক্ষের সৈন্য সমবেত হইল। নবাব মুর্শিদাবাদ হইতে পলাশীতে আসিয়া পঁহুছিলেন, ইংরাজেরা চন্দননগর হইতে কাটোয়ায় আসিয়া গঙ্গা পার হইয়া সেখানে আসিলেন। তাঁহারা একটী আম্রকুঞ্জ মধ্যে আশ্রয় লইলেন। হুগলী হইতে পলাশীতে আসিয়া দুর্লভরাম যেখানে পরিখা কাটিয়া শিবির সন্নিবেশ করিয়াছিলেন, নবাব সেইখানেই অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। নবাবের সহিত মীরজাফর, দুর্লভরাম, ইয়ারলতিফ এবং মীরমদন, মোহনলাল ও সিনফ্রে নামে একজন ফরাসী সেনাপতি ছিলেন। আর ওদিকে কর্ণেল ক্লাইভ, মেজর কিলপ্যাট্রিক, মেজর কুট, কাপ্তেন গ্রাণ্ট প্রভৃতি সেনাপতি ইংরেজসৈন্য লইয়া আসেন। তাঁহাদের মধ্যে ক্লাইভই প্রধান সেনাপতি। নবাবের বিশ্বাসী সেনাপতি মীরমদন, মোহনলাল ও সিনফ্রে মধ্যভাগে, আর বিশ্বাসঘাতক দুর্লভরাম ইয়ারলতিফ ও মীরজাফর পার্শ্বদেশে অর্দ্ধচন্দ্রাকারে অবস্থিতি করিতেছিলেন। এই বিশ্বাসঘাতক সেনাপতিদের অধীনেই বহুসংখ্যক সৈন্য ছিল। যুদ্ধকালে ইহারা সামান্য মাত্রও পদক্ষেপ করে নাই। ইংরাজসেনাপতিরা তাঁহাদের সৈন্যদিগকে আম্রকুঞ্জের বাহিরে শ্রেণীবদ্ধ করিলেন। উভয় পক্ষের সৈন্য যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইল, দুই দিক্ হইতে রণবাদ্য বাজিয়া উঠিল।

"বৃটিশের রণবাদ্য বাজিল অমনি
কাঁপাইয়া রণস্থল,
কাঁপাইয়া গঙ্গাজল,
কাঁপাইয়া আম্রবন উঠিল সে ধ্বনি।
'অকস্মাৎ তুর্য্য-ধ্বনি হইল তখন,
ক্ষান্ত হও যোদ্ধাগণ!
কর অস্ত্র সম্বরণ,
নবাবের অনুমতি কালি হবে রণ।"

নবাবের আদেশে মোহনলাল যুদ্ধ পরিত্যাগ করিলে নবাব সৈন্যেরা ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িল। ইংরেজসৈন্য তখন আম্রকুঞ্জ হইতে বাহির হইয়া অগ্রসর হইতে লাগিল। শিকার-গৃহে ক্লাইভ সাহেব বিশ্রাম করিতে করিতে নিদ্রিত হইয়া পড়িয়াছিলেন। তাঁহার নিকট ইংরেজসৈন্যের অগ্রসর হওয়ার সংবাদ পঁহুছিলে তিনি প্রথমে বিরক্ত হইয়া উঠেন। কারণ তিনি পূর্ব্বে যাহা দেখিয়াছিলেন তাহাতে সহজে জয়লাভ করিতে পারিবেন বলিয়া মনে করিতে পারেন নাই। সেইজন্য রাত্রিকালে আক্রমণের অভিপ্রায় করিয়াছিলেন। এক্ষণে সমস্ত ব্যাপার শুনিয়া তিনি সৈন্যদিগকে অগ্রসর হইতে আদেশ দিলেন। কিন্তু ফরাসী-সেনাপতি সিনফ্রে তাহাদের গতিরোধ করিলেন। তাঁহার অল্পসংখ্যক সৈন্য বহুক্ষণ ধরিয়া যুদ্ধ করিয়া শেষে ইংরেজদিগকে পথ ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইল। ইংরাজেরা অগ্রসর হইয়া নবাব-শিবির অধিকার করিলেন। সিরাজ তাহার পূর্ব্বে উষ্ট্রে চড়িয়া মুর্শিদাবাদে চলিয়া গিয়াছিলেন। ইংরাজেরা বিজয়বাদ্য বাজাইয়া বঙ্গে তাহাদের বিজয় ঘোষণা করিলেন।

ঝম্ ঝম্ ঝম্ করি বৃটিশ বাজনা
কাঁপাইয়া রণস্থল
কাঁপাইয়া গঙ্গাজল,
আনন্দে করিল বঙ্গে বিজয় ঘোষণা।"

এইরূপে পলাশীর যুদ্ধ হইয়াছিল। ইহাতে তোমরা দেখিতে পাইতেছ যে, বিশ্বাসঘাতক সেনাপতিগণের অধীনে যে বহু-সংখ্যক সৈন্য ছিল তাহারা কিছুই করে নাই। সিনফ্রে, মীরমদন ও মোহনলালের যুদ্ধে ইংরেজ সৈন্য অস্থির হইয়া উঠিয়াছিল। মীরজাফরের বিশ্বাসঘাতকতায় সিরাজ মোহনলালকে যুদ্ধ করিতে নিষেধ করায় নবাব সৈন্য যুদ্ধ ছাড়িয়া দিয়াছিল। কেবল সিনফ্রের সৈন্যরাই যুদ্ধ পরিত্যাগ করে নাই। কিন্তু তাহাদের সংখ্যা অল্প থাকায় শেষ পর্য্যন্ত তাহারা ইংরেজদিগকে পথ ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইয়াছিল। সুতরাং পলাশীতে যে রীতিমত যুদ্ধ হয় নাই তাহা অবশ্য তোমরা বুঝিতে পারিতেছ। কেবল বিশ্বাস-ঘাতকতার জন্যই ইংরেজরা পলাশীতে জয়লাভ করিয়া-ছিলেন। পলাশীর যুদ্ধ যাহাই হউক কিন্তু ইহাতে ইংরেজরা জয়লাভ করেন, তাহাতেই তাঁহাদিগকে ভারতবর্ষের রাজা করিয়াছিল। ইংরেজ বণিকের মানদণ্ড শেষে রাজদণ্ডে পরিণত হইয়াছিল।

"সেদিন এ বঙ্গপ্রান্তে পণ্যবিপণীর একধারে
নিঃশব্দ চরণ
আনিল বণিকলক্ষ্মী সুড়ঙ্গপথের অন্ধকারে
রাজসিংহাসন!
বঙ্গ তারে আপনার গঙ্গোদকে অভিষিক্ত করি
নিল চুপে চুপে,
বণিকের মানদণ্ড দেখা দিল পোহালে শর্ব্বরী
রাজদণ্ড রূপে!"

এক রাত্রির দিদি

—শ্রীহেমাঙ্গিনী ঘোষ

দুধারে সবুজ বৃক্ষশ্রেণী, ঘন প্রান্তর। তার মাঝখান দিয়ে হু হু ক'রে ট্রেণখানা ছুটে চলেছে। চলেছে ত চলেছে;—যেন তার বিরাম নেই, বিশ্রাম নেই, বুঝি অনন্ত কাল পর্য্যন্ত এইভাবে চল্‌বে! কত জনপদ, নদী-নালা, প্রান্তর, দীঘি-সরোবর পিছনে ফেলে, উন্মত্ত দানবের মত ট্রেণ ক্রমেই এগিয়ে চলেছে। মাঝে মাঝে এক একটা ষ্টেশনে অতি অল্প সময়ের জন্যে থামে; তখন প্যাসেঞ্জারের ছুটোছুটি হুড়োহুড়ি বেধে যায়। পোঁটলা-পুঁটলী, ট্রাঙ্ক-বেডিং ইত্যাদি নিয়ে একদল নেমে যায়, আবার নতুন লোক এসে তাদের স্থান দখল করে। এই ত জগতের নিয়ম। এক যায়—আর এক আসে। কেউ স্থায়ী হ'য়ে কোথাও থাকে না—থাকতে পারে না।

একটা কামরা রিজার্ভ ক'রে লিলির বাবা রমানাথ বাবু সপরিবারে পুজোর ছুটীতে দেশে যাচ্ছেন। সঙ্গে লট্‌-বহর অনেক। তিন চারটী ছেলে মেয়ের ভিতর, সকলের ছোট লিলি। ছোট্ট লিলি, এই ক্ষুদ্র কারাকক্ষে অবরুদ্ধ হ'য়ে বড়ই ফাঁপরে পড়েছে। বন্য হরিণীর মত দিন রাত তার অবাধ ছুটোছুটীতে বাড়ীর সকলেই সন্ত্রস্ত। এক সময়ের জন্যেও স্থির থাকতে পারে না সে। এই ভাবে তার উদ্দাম চলা ফেরায়, কত সময়, কত বিপদেই যে তার মা-বাবাকে পড়তে হয়েছে, তার সীমা নেই। একদিন উপরের সিঁড়ি দিয়ে ছুটে আস্‌তে—একেবারে গড়গড় ক'রে নীচে এসে পড়ে'—মাথা ফাটিয়ে ফেলে। আর একদিন, রাস্তার ওপর ছুটোছুটী ক'র্‌তে পায়ের তলায় পাথরের কুচি বিঁধে কী হ্যাঙ্গামই না বাধিয়েছিল। তাকে ত কতদিন বিছানায় পড়ে থাকতে হয়;—আর ডাক্তার, ওষুধ, ব্যাণ্ডেজ, সেক্‌-তাপ এই সব ক'র্‌তে ক'র্‌তে, তার মা-বাবার প্রাণ ওষ্ঠাগত আর কি! এই রকম তার নিত্য নূতন উপদ্রবের আশঙ্কায় সকলেই সন্ত্রস্ত থাকেন,—কখন্ না জানি লিলি কি ফ্যাসাদ বাধায়। কিন্তু তবু—ফুটন্ত মল্লিকা-ফুলের মত ফুটফুটে এই মেয়েটী ছিল সকলের অতি প্রিয়। তার অত্যাচারে বিপন্ন হ'য়েও,—তাই তাঁরা কিছুই বল্‌তেন না ওকে। মেয়েটী যেমন সুন্দর, তার কথাগুলো ছিল—তেমনি ভারী মিষ্টি। তার মুখের সেই আধ-আধ কথা যে একবার শুনত, সে তারে কখনও ভুল্‌তে পারত না। এ হেন লিলি কি ট্রেণের ভেতর চুপ ক'রে থাকতে পারে কখনো? ট্রেণ চল্‌তে আরম্ভ করতেই, লিলি ছুটে জানালার ধারে যেয়ে গলা পর্য্যন্ত বাড়িয়ে দিয়েছে। মা ব্যতিব্যস্ত হ'য়ে এক একবার টেনে আনেন, কিন্তু সাধ্য কি তাঁর—তাকে আট্‌কে রাখার? তিনি একটু অন্যমনস্ক হ'তেই, আবার লিলি সেই জানালায়। লিলির বাবা অন্য ঘরে ছিলেন, তিনি এঘরে এসে ব্যাপার দেখে লিলিকে তাঁর কাছে নিয়ে যান। ছুটোছুটি ক'র্‌তে কখন যে লিলির বড় সাধের বঙ্গলক্ষ্মী সাড়ী খানা একটা তারে বেঁধে প্রায় আধ হাত ছিঁড়ে গেছে, তা সে এতক্ষণ জানতেও পারেনি। আস্‌বার সময়, মার বারণ না শুনে'—সবাইকে দেখাবার জন্যে জোর ক'রে, সে তার সখের কাপড়খানি পরে এসেছে। তার ধারণা, সে এখন যথেষ্ট বড় হ'য়েছে; এখন ফ্রক পরা মানায় না তার;—বিশেষ, এই পুজোর সময় অমন সাড়ী-খানা না পরে কি থাকা যায়? বাবার কোলে এসে সাড়ীর ওপর লিলির নজর পড়ে। সখের কাপড়ের অমন দুর্দ্দশা দেখে লিলির চোখের জল বাধা মানে না। বাবার কাঁধের ওপর মাথা রেখে লিলি হু হু ক'রে কেঁদে ফেলে।

অনেক বুঝিয়ে লিলির বাবা শান্ত করেন ওকে। কথা দেন, বাড়ী থেকে এসেই—ঠিক ঐ রকম একখানা সাড়ী কিনে দেবেন। লিলির চোখের জল না শুকাতেই মুখে হাসি দেখা দিল। চুপ ক'রে থাকা তার স্বভাব নয়; তাই—"রেল গাড়ী কেমন ক'রে হলো?" "এত মানুষ কোত্থেকে আসছে বাবা?" ইত্যাদি অদ্ভুত প্রশ্নে অনর্গল ব'কে ওর বাবাকে ব্যতিব্যস্ত ক'রে তোলে।

ক্রমে ট্রেণ-যাত্রার অবসান হয়। অনেক দেশ-দেশান্তর অতিক্রম ক'রে, নির্দ্দিষ্ট স্থানে এসে ট্রেণ থেমে পড়ে। যাত্রীদলের কোলাহলের সঙ্গে—আবার সেই ছুটোছুটি হুড়ো-

হুড়ি। পুরাণকে বিদায় দিয়ে, নূতনকে অঙ্কে তুলে নিয়ে, লৌহ-অশ্ব পুনরায় রুদ্ধ রোষে গর্জ্জন ক'রতে ক'রতে ধাবমান হয়।

রমানাথ বাবু মোট-ঘাট এবং সকলকে নিয়ে এই ষ্টেশনেই নেমেছেন। পুজোর সময়, কাজেই জিনিষ-পত্র সঙ্গে অল্প ত নয়ই—বরং বেশী। সেই সব জিনিস-পত্র এবং ছেলেদের নিয়ে তিনি বিব্রত হ'য়ে পড়েন। সঙ্গে দুটী চাকর আছে। এখান থেকে তাঁদের বাড়ী যেতে ষ্টীমারে উঠতে হয়। অতএব রমানাথ বাবু, জিনিষ-পত্র কুলীর মাথায় চাপিয়ে চাকরদের হেপাজতে ষ্টীমারঘাটে পাঠিয়ে, নিজেরা অর্থাৎ স্বামী-স্ত্রীতে ছেলেদের ভার নেন।

রেলকোম্পানীর ব্যবস্থায়, এই সব ছোট ষ্টেশনে আলোর বন্দোবস্ত অতি সুন্দর। দূরে দূরে এক একটা স্তম্ভের উপর এক একটা কেরোসিন তেলের ল্যাম্প মৃদু আলো আর প্রচুর ধূম বিকীর্ণ ক'রে মিটমিট ক'রে জ্বলে, তাতে যাত্রীদের সুবিধার চেয়ে অসুবিধাই বেশী হয়। রমানাথ বাবুর সঙ্গে দুটী হ্যারিকেন লণ্ঠন ছিল, একটা টর্চ্চও ছিল। লণ্ঠন দুটী চাকরদের হাতে দিয়ে—টর্চ্চটা নিজে নিয়ে ঘাটের দিকে এগিয়ে চলেন। ছেলেরা তাঁদের পিছু পিছু চলেছে। দুরন্ত লিলি চারদিকের ব্যাপার দেখে, কেমন হকচকিয়ে যায়। অবাধ আলোর রাজ্য থেকে একেবারে আঁধারের রাজ্যে এসে পড়ায়, ভারী বিশ্রী লাগে তার। সে দুহাতে বাবার গলা জড়িয়ে ধ'রে, তাঁর বুকের উপর এলিয়ে পড়ে। বাম হাতে তাকে বুকের ওপর চেপে ধ'রে টর্চ্চ দেখিয়ে রমানাথ বাবু এগিয়ে চলেন। বড় মেয়েটী তার পিছনে, আর তার পিছনে তার মা, ছেলে দুটীর হাত ধ'রে চলেছেন। এইভাবে তাঁরা ঘাটে এসে, সিঁড়ি বেয়ে ষ্টীমারে ওঠেন। জিনিষ-পত্রের উপযুক্ত ব্যবস্থা ক'রে ওদের সব কেবিনে রেখে রমানাথ বাবু নিজের কেবিনে এসে বিশ্রামের আশায়, একটী সিগারেট ধরিয়ে, বেঞ্চির উপর শ্রান্ত দেহ-ভার এলিয়ে দেন।

দুষ্টু লিলি বাবার কোলের ভেতর এতক্ষণ যদিও বা শান্ত ভাবেই ছিল, কিন্তু ষ্টীমারের প্রায়ান্ধকার এই ছোট্ট কামরা-টুকুর ভেতর এসে তার প্রাণটা যেন হাঁপিয়ে ওঠে। ট্রেণ যখন গাছ-পালা-মাঠের ভিতর দিয়ে ছুটেছে, তখন খুশীতে ওর প্রাণটা ভরে উঠেছে; যখন কোন ব্রিজের ওপর ট্রেণখানা ওঠে, সে তখন ছোট্ট হাত দুখানিতে তালি দিয়ে কলধ্বনি তুলে জানালার ধারে ছুটে যায়, মা ব্যস্ত হ'য়ে ধরে আনেন। সে সময়টা একরকম মন্দ কাটেনি। কিন্তু এখন? ষ্টীমারের অন্ধকারপূর্ণ ক্ষুদ্র কারাকক্ষে, তার উল্লাস-মুখর শিশু প্রাণটা একেবারে ডুক্‌রে কেঁদে ওঠে। মায়ের কোলের ভিতর মুখ রেখে লিলি ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে।

অনেক ক'রে বুঝিয়েও লিলির মা শান্ত ক'রতে পারেন না ওকে। লিলির বাবাও কাছে নেই,—মহা ফাঁপরে পড়ে তিনি যখন একেবারে হাল ছেড়ে দেন, সেই সময় পাশের বেঞ্চি থেকে খুব মিষ্টি ক'রে কে ডাকে, "খুকুমণি! ছিঃ! কাঁদে কি? এস আমার কাছে।" এতক্ষণ কারো লক্ষ্য হয়নি, আগাগোড়া চাদর মুড়ি দিয়ে, একটী মেয়ে পাশের বেঞ্চিতে শুয়েছিল; চাদর ফেলে সে এখন উঠে ব'সে লিলিকে ডাকে। হঠাৎ অপরিচিত কণ্ঠের ডাক শুনে লিলি কান্না থামিয়ে ওর মুখের দিকে চায়, কিন্তু কাছে যাবার কোন লক্ষণ দেখা যায় না। মেয়েটী তখন উঠে দু'হাত বাড়িয়ে বলে, "এস লক্ষ্মীটি! একটা মজার জিনিষ দেখাব তোমায়।"

মজার জিনিষ দেখ্‌বার প্রলোভনে চঞ্চল শিশু-হৃদয় বাধা মানে না। লিলি আস্তে আস্তে মায়ের কাছ থেকে ওর কাছে যেয়ে দাঁড়ায়। দু'হাতে লিলিকে বুকের ভেতর নিয়ে মেয়েটী বলে, "সোনা মেয়ে! কেঁদ না, মজার জিনিষ দেখ্‌বে? ঐ দেখ—"

তখন ষ্টীমার ছাড়বার পূর্ব্বক্ষণে পাশের কল ঘর থেকে গুরু-গম্ভীর গর্জ্জন শোনা যাচ্ছে। অস্পষ্ট আলোয় ষ্টীমারের দু'ধারে নদীর জল ঈষৎ স্ফীত দেখাচ্ছে। সেই দিকে ওর মনোযোগ আকর্ষণ ক'রে মেয়েটী বলে, "ঐ শোন, ষ্টীমার ডাক্‌ছে, এক্ষুণি সোঁ সোঁ ক'রে ছুটবে। আমার কোলে বসে জলের দিকে চেয়ে থাক, দেখ্‌বে, জল কেমন ফুলে উঠে ষ্টীমারের সঙ্গে সঙ্গে ছুটে চলেছে"।

তার একটু পরেই ষ্টীমার ছেড়ে দেয়। খালাসীদের কোলাহল, ষ্টীমারের গর্জ্জন, জলের কল্লোল, তিনে মিলে বেশ একটা গণ্ডগোলের সৃষ্টি করে। লিলি তাই শুন্‌তে শুন্‌তে একটু বাদে মেয়েটীর বুকের ওপরেই ঘুমিয়ে পড়ে।

ভোরের আলো কেবিনের ভেতর ঢুকতেই লিলি ধড়্‌মড়্‌ ক'রে উঠে বসে। পাশের দিকে চেয়ে দেখে,

তার মা আর ভাই-বোনেরা তখনো ঘুমুচ্ছে। রাত্রিটা কেটেছে,—ভোরের আলো দেখা দিয়েছে, দুষ্টু লিলি আর কি চুপ ক'রে থাকতে পারে? সে ঘুমন্ত ভাই-বোনদের কাছে যেয়ে,—কারো বা চুল ধরে টেনে, কারো বা গায়ে চিম্‌টী কেটে, সবাইকে জাগিয়ে তোলে। এদের ভিতর বড় মেয়েটী,—অর্থাৎ লিলির বড় দিদি লতা, ভোরের ঘুমটীতে এমনভাবে বাধা পেয়ে মহা খাপ্পা হ'য়ে ওকে মারবার জন্যে হাত তুল্‌তেই, পাশের সেই মেয়েটী ওর হাত ধ'রে ফেলে। সে এতক্ষণ লিলির দুষ্টুমি দেখে আপন মনে হাসছে; এখন ওর দিদি ওকে মারতে উদ্যত দেখে, তার হাত ধ'রে হেসে বলে, "ছিঃ! ছোট মানুষ, ওকে মারতে আছে কি?"

লতা মুখ ভার ক'রে বলে, "হ্যাঁ—ছোট বই কি? জানেন না ওকে? বয়সে ছোট হলে কি হয়? পেটে পেটে কেবল বজ্জাতি ওর। দেখুন না, ভোরের এমন মিষ্টি ঘুমটা কেমন মাটি ক'রে দিলে? দুপুর বেলা সবাই যখন ঘুমোয়, ও তখন হৈ চৈ ক'রে বেড়ায়। মাকে যদি একটুও ঘুমোতে দেয়? কাউকে ভয় করে না। কেউ কিছু বলে না কিনা? আমাকে যা একটু ভয় করে। আমি সময় সময় যখন বড় অসহ্য হয়, দু'একটা চড়-চাপড় দিয়ে থাকি,—তাই।"

ততক্ষণে লিলি সেই মেয়েটীর কোলে উঠে বসেছে। লিলির মাও জেগে উঠে লিলির কাণ্ড দেখে মুখ টিপে হাস্‌ছেন। এতক্ষণে সূর্য্যদেব আকাশের অনেকটা উপরে উঠেছেন। চারদিক্ আলোয় ঝলমল কর্চ্ছে। পরিপূর্ণ দিবালোকে, রুদ্ধ কক্ষের মানুষ কয়টী, পরস্পর পরস্পরের দিকে চেয়ে দেখবার অবসর পেলেন। অপরিচিতা মেয়েটী লিলির মায়ের মুখের দিকে চেয়ে বুঝতে পারে, উদারতা এবং মধুরতা এই মহীয়সী নারীর মুখে যেন আঁকা। যৌবন, যাই যাই করেও, এই সুন্দর দেহের মায়া ছেড়ে যেন যেতে পার্চ্ছে না। সেই মুখে বিলাস বা লালসার চিহ্ন মাত্র নেই। মাতৃত্বের পূর্ণ গৌরবে জল্‌-জল্ কর্চ্ছে। ছেলে মেয়ে কয়টীও পরম সুন্দর। বিশেষ ছোট্ট লিলি, সত্যিই যেন একটী আধফুটন্ত গোলাপ ফুল। লিলির মা দেখেন, একটী সতের আঠার বছরের শ্যামবর্ণা সুশ্রী মেয়ে। ওর কমনীয় মুখখানিতে একটী শান্ত করুণ ভাব যেন ফুটে আছে। লিলি অবাক্ হ'য়ে ওর মুখের দিকে চাইতে চাইতে হঠাৎ কি মনে ক'রে বলে, "তোমাকে কি ব'লে ডাক্‌ব?"

লিলিকে বুকে চেপে ধ'রে অপরিচিতা মৃদু হেসে বলে, "আমি যে তোমার দিদি হই, আমাকে দিদি ব'লে ডেকো!"

কথায় কথায় অনেকখানি বেলা হ'য়ে পড়ে। রমানাথ বাবু চাকরের হাতে ছেলেদের জন্যে খাবার পাঠিয়ে দেন। হাত মুখ ধুয়ে, খাবার খেয়ে ওরা সকলে জানালার ধারে বসে, চারদিক্ দেখতে দেখতে, নানা রকম গল্প গুজবে সময় কাটায়। দু'ধারে জল কেটে, সফেন গর্জ্জন তুলে, বাঁশী বাজিয়ে, ষ্টীমার এগিয়ে চলে।

খানিক দূর যেয়ে অপরিচিতা মেয়েটী নিজের সামান্য জিনিষ-পত্র গুছিয়ে প্রস্তুত হ'য়ে বসে। তাই দেখে লিলি বলে, "ও কি দিদি তুমি যে বিছানা বাঁধ্‌ছ?

"আমাকে যে এখন যেতে হবে ভাই?" মৃদু হেসে অপরিচিতা বলে।

জোরে মাথা নেড়ে, রাগ ক'রে লিলি বলে, "বারে! এখুনি যাবে কি? যেতে কে দিচ্ছে তোমায়?"

"আমার যে না গেলে নয় ভাই?"

ঘাড় বেঁকিয়ে অভিমান-স্ফুরিত কণ্ঠে লিলি বলে, "এই আমার সঙ্গে দিদি পাতালে, আবার চলে যেতে চাইছ? তা বেশ, যাও।"

ক্ষুদ্র লিলিকে বুকের ভিতর চেপে ধ'রে, ওর মাখমের মত তুলতুলে নরম গালটীতে চুমু খেয়ে অপরিচিতা বলে, "এত অল্প সময়ের ভেতর এমন ক'রে তুমি মায়ায় বাঁধবে, যদি আগে বুঝতে পারতুম, তা হ'লে কখনো তোমার সঙ্গে ভাব করতুম না। তা এখন আমি যাই লক্ষ্মীটি! তুমি কিছু মনে করো না। আমি শীগগির আবার তোমার সঙ্গে দেখা করব। তোমায় কি ভুলতে পারি?"

লিলি খানিকক্ষণ কথা বলে না। গালের ভিতর একটা আঙুল পুরে, চুপ ক'রে থাকে। ক্রমে সময় নিকট হ'য়ে আসে। বাঁশী বাজে, ষ্টীমারের গতিও মন্থর হ'য়ে আসে। অপরিচিতা ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়িয়ে যাবার জন্যে পা বাড়ায়। তখন লিলি ছোট্ট একটা নিঃশ্বাস ছেড়ে ব'লে ওঠে, "ও ভাই, তুমি শুধু আমার এক রাত্রির দিদি!"

বাঙ্গালার লোক-নৃত্য

—শ্রীসুরেন্দ্র নাথ দাশ

আনন্দের অমৃতধারাই হইতেছে নৃত্য-ছন্দের উৎস। অন্তরের আনন্দের প্রবাহ যখন ছন্দোবদ্ধ ভাবে পরিপুষ্ট হইয়া উঠে, তখন স্বভাবতঃ দেহের রন্ধ্রে রন্ধ্রে আনন্দের স্ফূরণ হয়। ইহা হইতে দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গও আনন্দের শিহরণে রূপায়িত হইয়া নৃত্য-ছন্দের সৃষ্টি করে। সেই আদিম যুগে জীব-জগতে আনন্দের জন্ম হইতে নৃত্য-তালের উৎপত্তি হইয়াছে। সেই আদিম প্রভাত হইতেই পৃথিবীর মানুষ আনন্দের সহিত নৃত্য-কলার অনুশীলন করিতে করিতে আধুনিক নৃত্যের উন্নতি-স্তরে পৌছিয়াছে। পৃথিবীর অপরাপর ভূখণ্ডের ন্যায় ভারতবর্ষও সেই আদিযুগ হইতে নৃত্যের চর্চ্চা সুরু করিয়াছে। তাহার প্রমাণ পাই ইলোরা-অজান্তার পর্ব্বত গুহায়, মহেন্-জাদারো—হরপ্পার প্রাচীন মন্দিরে, যেখানে সহস্র সহস্র নর্ত্তকনর্ত্তকী দেব-দেবীর চিত্র অদ্যাপি বর্ত্তমান। এই সব চিত্রের প্রমাণ নিস্তেজ হইলেও, এগুলি প্রাচীন যুগের নর-নারীদের নৃত্য-চর্চ্চার পরিচায়ক।

ভারতীয় নৃত্যকলার একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হইতেছে, নৃত্যকলার সাহায্যে অন্তরের সুষমা শুদ্ধভাবে রূপায়িত করিয়া এক অতীন্দ্রিয় ব্যক্তির অনুভূতি লাভ করা। নৃত্যের ছন্দে ছন্দে, নৃত্যের তালে, নৃত্যের সুরে-সুরে নর্ত্তক-নর্ত্তকীর মনে হৃদয়-দেবতার রূপ ফুটিয়া উঠুক, ইহাই ছিল ভারতীয় নৃত্যকলার অন্যতম আদর্শ। নটরাজ নৃত্যে, মেনকা-নৃত্যে, ইন্দ্রাণী-নৃত্যে ভারতবর্ষে কত কাব্য, কত সঙ্গীত, কত সুকুমার শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে। নটরাজ-নৃত্য, মেনকা-নৃত্য প্রভৃতি ব্যতিরেকেও ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে বহু লৌকিক নৃত্যের সৃষ্টি হইয়াছে। যেমন সিংহলের কান্ডি-নৃত্য, মালাবারের কথাকালী, আসামের মণিপুরী, সেরাই-কেলার ছাউনাচ প্রভৃতি। কান্ডীয় নৃত্য তাণ্ডব নৃত্যের অন্তর্ভুক্ত—ইহাতে অসাধারণ বীরত্বের ভাব পরিস্ফুট হইয়া থাকে। কথাকালী নৃত্য হইতেছে রসমূলক ও প্রকাশ মূলক। মণিপুরী নৃত্য সম্পূর্ণ সঙ্গীতপূর্ণ। ভারতীয় আদি অধি-বাসীদের মধ্যে যে নৃত্যের প্রচলন রহিয়াছে, তাহা সাধারণতঃ "সাঁওতালী" নৃত্য নামে পরিচিত। সাঁওতাল রমণীরা মাথার কেশ ও বেণী বনফুলে সুসজ্জিত করিয়া সাঁওতাল পুরুষদের সম্মুখে যখন নৃত্য করিতে থাকে, তখন এই স্বভাবমূলভ নৃত্যের ছন্দে ছন্দে অপরিসীম আনন্দের উন্মাদনার সৃষ্টি হয়।

ভারতের অপরাপর প্রদেশের ন্যায় বাঙ্গালা দেশের বিভিন্ন অঞ্চলেও বহু লৌকিক নৃত্যের প্রচলন রহিয়াছে। পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সভ্যতার প্রভাবে আমরা শিক্ষিত সম্প্রদায় স্ব-দেশের লোক-সঙ্গীত, লোক-শিল্প, লোক-নৃত্য প্রভৃতি জাতীয় সংস্কৃতির জীবন্ত ধারাগুলির মূল্য ভুলিয়া গিয়াছি। শিক্ষিত সম্প্রদায়ের অনাদর ও অবহেলায় এই সব মূল্যবান্ জাতীয়-সম্পদ্ বিলয়-প্রাপ্ত হইবার উপক্রম হইয়াছে। পল্লী-বাসীদের আন্তরিক সহানুভূতিতে অদ্যাপি এই সব জাতীয়-সম্পদ্ এখনও অল্প বিস্তর সংরক্ষিত রহিয়াছে। এগুলি আমাদের পরম আদরের বস্তু। জাতীয় লোক-নৃত্যগুলির মধ্যে আমরা পূর্ব্ব-পুরুষদের অসীম শক্তির পরিচয় পাই।

বংলার গ্রাম্য সংস্কৃতি বিষয়ে অনুসন্ধান করিতে করিতে যে সব লোক-নৃত্যের আবিষ্কার করা গিয়াছে, তাহাদের কয়েকটী সম্বন্ধে সংক্ষেপে এখানে আলোচনা করিতে চেষ্টা করিব।

শাঁখবোল

উত্তরবঙ্গের মালদহ ও রাজসাহী অঞ্চলে কৃষক সম্প্রদায়ের মধ্যে শাঁখবোল নৃত্যের জীবন্ত ধারা বর্ত্তমান রহিয়াছে। সারা পৌষমাস সন্ধ্যাবেলায় শঙ্খ, শিঙ্গা, কাঁসর বাজাইতে বাজাইতে রাখাল বালকগণ শাঁখবোলের ছড়া গাহিতে গাহিতে পল্লী অঞ্চল পরিভ্রমণ করে। ছড়া গাহিবার সময়ে নৃত্যের অনুষ্ঠান চলে। শঙ্খের উচ্চধ্বনি সহকারে এই অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয় বলিয়া ইহার নাম "শাঁখবোল" হইয়াছে। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রবল অরাজকতার সময় কবিওয়ালাদের প্রভাব-প্রতিপত্তির যুগ। এই অরাজকতার ফলে দস্যুদলের অত্যাচারে যখন কৃষকদের ধন-ধান্য প্রভৃতি সম্পদ্ রক্ষা করা কঠিন হইয়া পড়িয়াছিল, তখন কৃষকগণ

দল বাঁধিয়া শস্যক্ষেত্র রক্ষাহেতু রাত্রিতে শঙ্খ, শিঙ্গা লইয়া পল্লী-ছড়া বাঁধিয়াছে ও গাহিয়াছে। রাখালদের শাঁখবোল অনুষ্ঠান সেই স্মৃতি আজও বহন করিতেছে। শাঁখবোল অনুষ্ঠান কৃষকদের শৌর্য্য-বীর্য্যের পরিচায়ক।

লাঠিনৃত্য

উত্তর ও পূর্ব্ববঙ্গের জেলাগুলিতে মহরম পর্ব্ব উপলক্ষে লাঠিনৃত্য এখনও প্রচলিত। মহরম দিবসের পক্ষাধিক কাল পূর্ব্ব হইতেই মুসলমানগণ রীতিমত লাঠিখেলা আরম্ভ করে। ঢোলের রণ-বাদ্যের সহিত লাঠিখেলা চলে। ঢোলের বাদ্যের তালে তালে 'লাঠিয়াল' রণনৃত্য সহকারে লাঠি ভাঁজিতে থাকে। কখনও একখানা, কখনও দুইখানা লাঠি লইয়া বৃত্তাকারে লাঠি-নৃত্য চলিতে থাকে। চল্লিশ পঞ্চাশ জন লাঠিয়াল "ওস্তাদ লাঠিয়াল" মহাশয়কে বৃত্তাকারে ছাঁদিয়া ফেলে। ওস্তাদ ও লাঠিয়াল লাঠি-নৃত্য করিতে করিতে অমিত বিক্রমে বৃত্তের বাহিরে চলিয়া আসে। মহরম পর্ব্বের ছোরা খেলা বা তরবারি খেলাও অসীম শক্তির পরিচায়ক। লাঠি খেলা, ছোরা খেলা, ভারোত্তোলন, মাটির ভিতর ঘণ্টাধিক কাল পর্য্যন্ত অবস্থান প্রভৃতি শারীরিক ব্যায়াম-কৌশলের অভিপ্রদর্শনীও সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

ঝুমুর-নৃত্য

উত্তরবঙ্গের রাজসাহী, দিনাজপুর অঞ্চলে এবং দক্ষিণ-বঙ্গের বীরভূম অঞ্চলে ঝুমুর-নৃত্য প্রচলিত আছে। ঝুমুর গান সমাজের তথাকথিত অবনত সম্প্রদায়ের লোকগণ কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত হয়। রাজসাহীর স্থানবিশেষে ঝুমুর গান মুসলমান কবিরাও গাহিয়া থাকে। বিবাহ, অন্নপ্রাশন প্রভৃতি সামাজিক উৎসবগুলিতে সাধারণতঃ ঝুমুর গান হইয়া থাকে। ঝুমুর গান প্রধানতঃ রাধা-কৃষ্ণ বিষয়ক সঙ্গীত। গান গাহিতে গাহিতে গায়কগণ সঙ্গতালে নৃত্য করিতে থাকে।

বাউল-নৃত্য

বাউল-নৃত্য সারা বাঙ্গালায় প্রচলিত এবং বাঙ্গালাদেশের একান্ত নিজস্ব মৌলিক সম্পদ্। বাউল মনের আনন্দে 'একতারার' তানের সঙ্গে সুর মিলাইয়া গান গাহিতে থাকে, সঙ্গে সঙ্গে বাউলের সেবাদাসী রমণীটিও গান গাহিতে থাকে। দেহ-ভাবের গান গাহিতে গাহিতে যখন তাহারা ভাবের আবেশে নিবিষ্ট হইয়া পড়ে, তখন তাহারা আত্মহারা হইয়া নৃত্য আরম্ভ করে। তখন বাউলের আর আনন্দের সীমা থাকে না। আত্মহারা বাউলের জীবন তখনই যেন সার্থক হয়।

বসন্ত ব্রত-নৃত্য

উত্তরবঙ্গের রাজসাহী, বগুড়া, দিনাজপুর, মালদহ প্রভৃতি অঞ্চলে বসন্ত ব্রত-নৃত্যের রীতিমত প্রচলন ছিল। এখনও রাজসাহী জেলায় বসন্ত ব্রত-নৃত্যের জীবন্তধারা বর্ত্তমান। এতদঞ্চলে এই ব্রত সাধারণতঃ "বসন্ত-বুড়ীর গান" নামে অভিহিত হইয়া থাকে। কুমারী মেয়েরা সারা চৈত্র মাস এই ব্রত-নৃত্যের অনুষ্ঠান করে। কোনও পুষ্করিণীর ধারে অথবা উদ্যানে একটি কলাগাছের পূজা প্রত্যহ সন্ধ্যাবেলায় অবিবাহিতা নারীগণ কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত হয়। মেয়েরা বসন্ত ঋতুর যাবতীয় ফুল সংগ্রহ করে এবং ঐগুলি দিয়া কলাগাছের পূজা দেয়। পূজার সময় মেয়েরা বহু ব্রত-গীতি গাহিয়া থাকে। তারপর, সকলে দাঁড়াইয়া কলাগাছের চারিদিকে সনৃত্যে ঘুরিতে ঘুরিতে বহু ছড়ার আবৃত্তি করে। বাঙ্গালার মেয়েরা বসন্ত-ঋতুকে অভ্যর্থনা করিবার জন্যই এই ব্রতের সৃষ্টি করিয়াছেন। কলাগাছকে বসন্ত ঋতুর যাবতীয় ফুল দ্বারা সজ্জিত করিয়া বসন্ত-রাণীর রূপ বন্দনা করা সত্য সত্যই অপূর্ব্ব। মেয়েরা এই ব্রত উপলক্ষ্য করিয়া যে সকল ছড়া রচনা করিয়াছেন, তাহার মূল্য অপরিমেয়। অ-বিবাহিতা মেয়েরা এই ব্রতের ভিতর দিয়া নৃত্য ও গানের চর্চ্চায় অনাবিল আনন্দ লাভ করিয়া থাকে।

রায় বেঁশে

রায় বেঁশে নৃত্যের জীবন্ত ধারা অদ্যাপি বীরভূম জেলার পল্লী অঞ্চলে বর্ত্তমান রহিয়াছে। প্রাচীনকালে রায় বেঁশে বর্দ্ধমান, মুর্শীদাবাদ প্রভৃতি অঞ্চলেও প্রচলিত ছিল। রায় বেঁশে পশ্চিম বাঙ্গালার রণ-নৃত্য। সৈন্যগণ ভল্ল লইয়া যুদ্ধ করিত। ভল্লের বাঁট তৈয়ারী হইত শ্রেষ্ঠ বংশখণ্ড হইতে। রায় বাঁশ ধারী যোদ্ধারাই রায়বেঁশে এবং

রণোন্মত্ত সেই বীরগণের নৃত্যই রায়বেঁশে নৃত্য নামে অভিহিত হইয়াছে। রায়বেঁশেরা ছিল প্রাচীন বাঙ্গালার রাজা ও জমিদারদের আশ্রিত সৈন্য। রাজা মানসিংহের সৈন্যবাহিনীর একটি প্রধান অংশ ছিল এই রায়বেঁশের দল। লর্ড ক্লাইভের বাঙ্গালী বাহিনীর মধ্যেও রায়বেঁশের নির্দিষ্ট স্থান ছিল। ইতিহাসে পাওয়া যায়, আলেকজাণ্ডারের দিগ্বিজয়ী সৈন্যদল 'গঙ্গারাট' বা 'গঙ্গারাঢ়' প্রদেশের অতুল-বীর্য্য সৈন্যদের ভয়ে পূর্ব্বভারতের দিকে অগ্রসর হইতে পারে নাই। এই গঙ্গারাঢ় আধুনিক রাঢ়প্রদেশ এবং তাহার পরাক্রমশালী সৈন্যরাই ছিল রায়বেঁশে। কালক্রমে রায়বেঁশে নৃত্য বাউরী, ডোম প্রভৃতি শ্রেণীর লোকের মধ্যেই প্রচলিত হইয়া আসিয়াছে। এই নৃত্যের সঙ্গে ঢোল ও কাঁসির বাজনা হইয়া থাকে। নর্ত্তকগণ ডান পায়ে নূপুর পরে। এখন রায়বেঁশেরা পল্লী অঞ্চলে বিবাহ ও উৎসবাদিতে নৃত্য এবং কসরৎ দেখায়।

ঢালি-নৃত্য

যশোহর ও খুলনা জেলার ঢালি-নৃত্য প্রাচীন রণনৃত্য বিশেষ। ঢাল ও খাঁড়া লইয়া যুদ্ধ করিবার রীতি ছিল বলিয়া সৈন্যদের নাম ঢালি হইয়াছে। ভারতচন্দ্র বীর প্রতাপাদিত্যের সম্পর্কে তাঁহার প্রধান সম্পদ "বায়ান্ন হাজার ঢালি"র উল্লেখ করিয়াছেন। ধর্ম্মমঙ্গল প্রভৃতি কাব্যেও ঢালির উল্লেখ রহিয়াছে। বার ভূঁইয়াদের যুগে ঈশা খাঁ, রাজা প্রতাপাদিত্য প্রভৃতি যে দৃপ্ত নিঃশঙ্ক বক্ষে দাঁড়াইয়াছিলেন, সে কেবল এই ঢালি সৈন্যদের অমিত শৌর্য্যের বলে। বর্ত্তমানে আসল ঢাল ও তরবারি ব্যবহারের প্রচলন না থাকায় বীর ঢালি সৈন্যদের বংশধরগণ কাষ্ঠনির্ম্মিত তরবারি ও বেতের ঢাল সহযোগে নৃত্য করে; সঙ্গে সঙ্গে ঢোল ও কাঁসির বাজনা চলে। এই নৃত্যে নর্ত্তকগণ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া যুদ্ধের মত অগ্রসর ও পশ্চাদ্গমনে অস্ত্র ভাঁজিয়া থাকে। এখনও যশোহর, খুলনা অঞ্চলের নমঃশূদ্র ও মুসলমান কর্ত্তৃক ঢালিনৃত্য মাঝে মাঝে অনুষ্ঠিত হয়। স্বর্গীয় গুরুসদয় দত্ত রায়বেঁশে ও ঢালিনৃত্যের আবিষ্কারক।

দৈ-কাদো মল্লনৃত্য

উত্তর বঙ্গের রাজসাহী, মালদহ, বগুড়া প্রভৃতি জেলায় জন্মাষ্টমীর পরদিন নন্দোৎসব মহাধুমধামে সম্পন্ন হয়। এতদঞ্চলের নন্দোৎসবের [illegible] একটি গৌরবময় বৈশিষ্ট্য বেশ প্রণিধানযোগ্য। নন্দোৎসবের দিন প্রাতঃকালে গ্রামাধীশ বা মণ্ডলমহাশয়ের বাড়ীতে গ্রামের সমস্ত নরনারী সমবেত হয়। উৎসাহী যুবকগণ বর্ষার কর্দ্দমাক্ত অঙ্গিনায় শারীরিক ক্রীড়া-কৌশল প্রদর্শন করে। সাধারণতঃ শরীরের ওজন পরীক্ষা, কুস্তি, ভারোত্তোলন প্রভৃতি ক্রীড়া-কৌশল প্রদর্শিত হইয়া থাকে। পূর্ব্বে ছোরা, লাঠি, তরবারি প্রভৃতি খেলার অনুষ্ঠানও হইত, এরূপ এখনও শুনিতে পাওয়া যায়; কর্দ্দমাক্ত আঙিনায় শক্তিশালী যুবকগণ খেলা-ধূলা করে বলিয়া আঙ্গিনার কাদা দধির আকার ধারণ করে। এই জন্য এই মল্লক্রীড়া অনুষ্ঠান সাধারণ বাংলা কথায় 'দৈ কাদো' নামে অভিহিত হইয়া থাকে। প্রায় চারি পাঁচ ঘণ্টা কাল এই খেলাধূলা চলে। এই প্রতিযোগিতায় যে সব যুবক জয়ী হয়, তাহারা গ্রামে শক্তিশালী পুরুষ বলিয়া স্বীকৃত হয়।

জারি নৃত্য

পূর্ব্ববঙ্গের ঢাকা, ময়মনসিংহ, বরিশাল, ফরিদপুর প্রভৃতি অঞ্চলে এবং উত্তর বঙ্গের রাজসাহী, মালদহ, পাবনা, রংপুর, দিনাজপুর প্রভৃতি অঞ্চলে জারি নৃত্যের জীবন্ত ধারা অদ্যাপি বিদ্যমান। মহরম পর্ব্ব উপলক্ষে মুসলমানগণ জারিগান গাহিয়া থাকে। কোর্-আন সরিফের ভিন্ন ভিন্ন অংশ হইতে আখ্যান লইয়া জারি গান রচিত হইয়াছে, অথবা হিন্দু-মুসলমানের মধ্য হইতে ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় বিদ্বেষ দূর হইয়া ঐক্য ও সখ্য ভাব স্থাপিত হয় এইরূপ কথা লইয়াও জারিগান রচিত হয়। মূলগায়ক 'বয়াতি' গান সুরু করিলে সহকারী গায়কেরা তাহা সমবেত কণ্ঠে গাহিতে থাকে। গানের সুর এত সুললিত, সতেজ ও করুণ যে, আপনা হইতেই মন ভাবাবিষ্ট হইয়া পড়ে। তখন গায়কগণ বৃত্তাকারে নৃত্য করিতে আরম্ভ করে। গায়কেরা পায়ে নূপুর বা ঘুঙুর পরে এবং ডান হাতে লাল রংএর রুমাল ব্যবহার করে।

ঢোলবরণ নৃত্য

মেয়েরা বিবাহোৎসবে নৃত্য ও সঙ্গীত চর্চ্চা করিতেন। এখনও ঢাকা, ময়মনসিংহ, ফরিদপুর, রাজসাহী প্রভৃতি অঞ্চলের স্থানবিশেষে হিন্দু, মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের

মেয়েরা বিবাহে গান ও নৃত্যের অনুষ্ঠান করিয়া থাকে। বিবাহ বা অন্নপ্রাশন উপলক্ষে ঢোলবরণ জন্য মেয়েরা যেখানে নৃত্য করিতেন, সেখানে পুরুষদের প্রবেশাধিকার ছিল না। কেবলমাত্র বাদ্যকর ঢোল বাজাইবার জন্য প্রবেশাধিকার পাইত। মেয়েরা কুলা হইতে ফুল লইয়া বাদ্যকরের ঢোল স-নৃত্যে পূজা করেন। ঢোল পূজা করিবার সময় মেয়েদের নৃত্য করিবার রীতি আছে বলিয়া এই অনুষ্ঠান 'ঢোলবরণ' নামে অভিহিত। ঢাক, ঢোল, মাদল প্রভৃতি বাদ্যের যন্ত্র। এই সব যন্ত্রকে নৃত্য ও গানের ছন্দের প্রতীক মনে করিয়াই বোধ হয় এগুলির প্রতি উচ্চ সম্মান দেখাইবার জন্য ঢোল-বরণ নৃত্যের সৃষ্টি হইয়াছে।

বাঙ্গালা দেশের বাহিরে যে সব লৌকিক নৃত্য প্রচলিত আছে, তাহাতে নৃত্যকালে কোনও ছড়াগান গাহিবার রীতি দৃষ্ট হয় না। কিন্তু বাঙ্গালা দেশের এই সব লোক-নৃত্যের প্রত্যেকটি অনুশীলনকালে আনুষঙ্গিক ছড়া-গীতি গাহিবার বিধান রহিয়াছে। প্রত্যেকটি নৃত্যের তালে তালে নর্ত্তকগণ এবং সঙ্গিগণ আনুষঙ্গিক ছড়া গাহিয়া থাকে। এই বিষয়টী বিশেষভাবে লক্ষ্য করিবার বিষয়।

শরীরচর্চ্চা আনন্দ-সাধনার আদি উৎস। স্বাস্থ্যের শক্তির উপরই জীবনের সমস্ত মঙ্গল নির্ভর করে। ব্যায়ামেই স্বাস্থ্য সবল হয়। জ্ঞান, আনন্দ ও কর্ম্মধারা একই সঙ্গে যাহাতে নৃত্যকলার ভিতর পরিপুষ্টি লাভ করিতে সক্ষম হয়, সেই দিকে লক্ষ্য রাখিয়া এই নৃত্যগুলির রচনা। সহজ সরল নৃত্য-গীতের ভিতর দিয়া শব্দ ও গতি-ছন্দের এই যে আনন্দময় সাধনা—ইহাই এই নৃত্যগুলির সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বিশেষত্ব। এই সব নৃত্যের চর্চ্চায় দেহ সুদৃঢ় ও নীরোগ হয়, মন আনন্দ-রসে পরিপ্লুত হয় এবং নিষ্পাপ কর্ম্মপরণ জীবন গড়িয়া উঠে।

নৃত্য-কৌশলে যে পরিশ্রম সাধিত হয়, তাহাতে শরীর ক্লান্ত হইয়া যায়। শরীর গঠনের উদ্দেশ্যে নৃত্যচর্চ্চা—মনের এই জাগ্রত চেতনা আনন্দ-রসকে অলক্ষ্যে শুকাইয়া ফেলে; তাহার ফলে শরীরের উপরও বাহ্যতঃ ইহার প্রতিক্রিয়া প্রকাশিত হয় এবং ইহাতে মনের সহজ আনন্দবোধ ক্ষুণ্ণ হইয়া যায়। সুতরাং শারীরিক শ্রান্তি হ্রাসের জন্যই নৃত্যের সহিত আনুষঙ্গিক ছড়া গানের সৃষ্টি। সঙ্গীত চর্চ্চার সহিত নৃত্য-কৌশলের অনুশীলনে মনের উপর আনন্দের প্রভাব অতিশয় স্বাস্থ্যপ্রদ হইয়া থাকে।

সেতু

—শ্রীপরিতোষ রায়

তোমার আমার মাঝে সেতুর রচনা কেন বলো,
মহান্ ভুলের সেতু, অর্থ যার হয়নাক' মোটে ?
বিক্ষুব্ধ আত্মার তলে অনুযোগ, ক্ষোভ কোনো নেই,
অথচ বোঝার ভ্রমে তুমি আমি দূরে গেছি স'রে।

ফুলে ফুলে প্রজাপতি, দখিণের চঞ্চল বাতাস,
সমুদ্রের আধোভাঙা ঢেউগুলি, গোধূলির মেঘ,
গহন রাতের চাঁদ, পৃথিবীর বিলাস সম্পদ ;
তারাও নিষ্প্রভ হলো—আমাদের ভুলের প্রবাহে।

একদিন এই সেতু ভেঙে যাবে সত্যের প্রকাশে,
অনুতাপে ভ'রে যাবে আমাদের সুকোমল মন,
গোপন ব্যথার চাপে অশ্রুবিন্দু জমা হ'বে চোখে,
চলিষ্ণু জীবনতলে আমাদের শক্তি হবে শেষ,
বিরাট ভুলের ক্ষতে ক্ষয়ে যাবে মনের সাহস;
তখন আমরা শুধু দূর হ'তে জানাব গুঞ্জন।

মুমূর্ষু পৃথিবী

—শ্রীসুকৃতি চট্টোপাধ্যায়

বাইরে থেকে অনেক কিছুকেই চক্‌চকে ঠেকে। বিশেষ ক'রে এই সহর-বাজারে। এখানে এক টুকরো লোহাকে গায়ে মর্চে ছাড়িয়ে রাখা হয়—কোন দিন উঁচু দামে যদি বিক্রী হয়, সেই আশায়। এত বড় সহরে কে কেমন আছে জানবার উপায় নেই। সবাই চক্‌চকে, সবারই গায়ে পালিশ, চোখে-মুখে জলুস। একদিন ছিল, যে কালটাকে আজ আমাদের স্বপ্নেরও অতীত বলে মনে হয়। তবু আঁচ করে নিতে পারি, সেই কালে আমাদের আত্মা জীবিত ছিল; খেয়ে-প'রে যেটুকু থাকত, সেই উদ্বৃত্তকে গোলায়, নয় সিন্দুকে তুলে রাখতুম। ভাবী-কালের জন্ম ভাবতে হয় নি। ছেলে পুলে না হ'লে দেবতার কাছে পূজো পর্য্যন্ত দিয়েছি। এই বিংশ শতাব্দীর চোখে সেইটেই আজ বড় অপরাধ। ছেলে-মেয়ে হওয়া পাপ। যান্ত্রিক সভ্যতা মানুষের সহজ গতিকে নষ্ট ক'রে দিয়েছে। প্রতি পদে পদে সংশয়। বৈজ্ঞানিকেরা জন্ম-নিয়ন্ত্রণ ক'রবার জন্ম দিনের পর দিন গবেষণা ক'রছেন। আজ পৃথিবীর নর-নারীদের চরম সভ্যতা বইপড়ার ধাপে নেমে এসে কি অপূর্ব্ব প্রাণহীন কঙ্কাল আবিষ্কার ক'রে তুলেছে—কাছে না এলে জানবার উপায় নেই। আমাদের সুকুমারকে নেমে আসতে হয়েছিল একটু উঁচু থেকে। হঠাৎ ক'রে তিনি আসেন নি। এসেছিলেন গড়িয়ে গড়িয়ে, তাই আঘাতটা তাঁর তত লাগেনি। বিষয়-আশয় সব বেচে দিয়ে যে এসেছিলেন ক'লকাতায়। ছেলে-মেয়ে নিয়ে কালীঘাটের ওদিকে ঘর ভাড়া ক'রে থাকতেন—এইটুকুই শুনেছিলাম। আর শুনেছিলাম, কোথায় একটা ইংরেজি স্কুলে মাষ্টারি করেন। মোটা চল্লিশ টাকা মাসে আসে। এর বেশী কিছু জানতাম না।

বছর দু'য়েক পরে একদিন তাঁর সঙ্গে আমার দেখা। গ্রাম সম্পর্কে আমার তিনি কাকা হ'তেন। ট্রাম থেকেই ডেকে উঠলাম, কাকাবাবু—

সুকুমার থমকে দাঁড়ালেন। ট্রাম থেকে নেমে এসে তাঁর সামনে দাঁড়ালাম। দেখি, সে চেহারা আর নেই। মাথার চুলগুলো যতদূর সম্ভব খাটো করে ছাঁটা। জামা-কাপড়ের ছিরি দেখলে কিছুতেই আঁচ করা যায় না যে, এক কালে সুকুমারের বংশ জীবনের ক্ষেত্রে কোথাও উন্নত হয়েছিল। কাঁধের উপর সেফ্‌টিপিন্ দিয়ে আটকানো। তাঁর আর্থিক অবনতিটা আমার চোখে বেশ কেমন যেন লাগলো। কোথায় দাঁড়িয়ে কথা বলা যায় ভাবছিলাম, সামনে একটা খাবারের দোকান দেখে বললাম, আসুন এখানে ব'সে আলাপ করি।

একটু আপত্তি তুলতে যাচ্ছিলেন, বললাম, আসুন-ই না।

কিছুতেই তিনি খেতে চাইছিলেন না। আমি নিজেই এটা-ওটা আনবার ফরমাস ক'রলাম। সঙ্কুচিত ভাবে বললেন, কেমন আছ—

বললাম, ভালই, আপনারা?

কোন রকমে বেঁচে আছি। তার পর—তুমি এখন ক'রছ কি?

বললাম, এম, এ, পড়ছি।

পিঠটা চাপড়ে দিয়ে ব'ললেন, বেশ, বেশ; পড়, পড়। পাশ করে করবে কি ঠিক করেছ?

বললাম, আমার ঠাকুরদাদার আমল থেকে যা হ'য়ে আসছে তাই ক'রব নিশ্চয়। নূতন কিছু ক'রতে পারব ব'লে মনে হয় না।

সুকুমার একটু চুপ করে থেকে বললেন, চাকরি তোমরা কোন্ দুঃখে করবে? ঘরে পয়সা আছে, খাওয়া-পরার ভাবনা নেই। তোমরা সবাই যদি চাকরি ক'রব বলে প্রতিজ্ঞা ক'র, গরীবের ছেলেগুলো কোথায় যাবে বল দেখি?

জলের গেলাসটা তুলে নিয়ে জবাব দিলাম, পরের জন্মে কখনও ভাবি নি। নিজের বিষয়ে ভেবেছি, তাই নিজের ভবিষ্যৎটা নিতান্ত অস্পষ্ট নয়। কে কি ক'রবে না ক'রবে সে খোঁজে আমার কি দরকার?

কথাটা শুনে তাঁর মুখখানা যেন ম্লান হ'য়ে উঠল।

উঠে দাঁড়িয়ে পকেট থেকে ময়লা রুমালখানা বের ক'রে পয়সা বের ক'রবার জন্ম গিট খুলতে লাগলেন, দেখে আমি বাধা দিলাম। সুকুমার শুনলেন না। পয়সাগুলো দোকানীর হাতে তুলে দিয়ে বললেন, এক দিন খাইয়ে কি এমন অনুগ্রহ করতে চাও বল আমাকে? আর আমিই বা সে অনুগ্রহ নেব কেন?

আমিও জবাব দিলাম, তবে আমিই বা আপনার পয়সায় খাব কেন?

সুকুমার হাতটা ধরে টেনে বাইরে নিয়ে আসতে আসতে বললেন, একথা পৃথিবীর লোককে অত চেঁচিয়ে শুনিও না খোকা ছেলে, তা হ'লে গালে চু'চড় দেবে।

কথাটার মর্ম্মার্থ বুঝতে দেরী হ'ল। বুঝলাম যখন, তখন সুকুমারও চলে গেছেন। তাঁর আর এক তিলও সময় ছিল না দাঁড়াবার। ছেলের সুপারিশের জন্ম তিনি কার কাছে যেন যাচ্ছেন। বললেন, একদিন সময় ক'রে পার তো এস গরীবের ওখানে।

যাবার আমার কোন ইচ্ছে ছিল না। ওদিকে কি একটা কাজে গিয়ে পড়েছিলাম। আসছি, হঠাৎ আকাশে মেঘ উঠে বৃষ্টি নেমে এল। কোথায় কার বাড়ির নীচে দাঁড়াব—দাঁড়াবার এতটুকু যায়গা কি আছে ছাই! নূতন ফ্যাসনের বাড়ী, না আছে বারান্দা, না রোয়াক। জানালা কপাট সব বন্ধ। ছুটতে ছুটতে আসছি, দেখি, একটা উইয়ে ধরা দোরের উপরে একখানা গোল টিনের চাকতি লটকানো। বাড়ীর নম্বরটা দেখে মনে প'ড়ল সুকুমারের বাসা এই ত। এই বৃষ্টিতে না ভিজে ঢুকে পড়ি না কেন! এই মনে ক'রে আর একটু এগিয়ে সেই ইট বার করা বাড়ীর দরজার কড়া খুব সন্তর্পণে নাড়লাম।

খানিকক্ষণ ডাকাডাকির পর ভিতর থেকে শিকল খোলার শব্দ কানে এল। তারপরেই হ্যারিকেনের আলোর শিখা চোখে এসে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে একটি পাতলা গড়নের স্ত্রীলোকের গলা এল,—মেয়েটার অত জ্বর দেখে গেলে সকালে, একটু সকাল সকাল আসতে হয় তো।

কথাটা শুনে থমকে দাঁড়ালাম। তাঁর ভুল ভাঙাবার জন্ম বললাম, সুকুমার বাবু আছেন? ভদ্রমহিলা কপাট ভেজিয়ে দিয়ে কাকে লক্ষ্য করে যেন বললেন, এই স্বাধ তোর বাবাকে কে ডাকছে—

অল্পক্ষণ পরেই একটি বছর সতেরর রোগা লিক্‌-লিকে মেয়ে দোর অবধি এগিয়ে এল। দোরের ফাঁক দিয়েই দেখলাম, শীর্ণ পাংশুবর্ণ মুখখানি। চোখে পিতলের চশমা। রুক্ষ চুল। মিহি গলায় জিজ্ঞেস করলে, কাকে চাই?

বললাম, সুকুমার বাবু আছেন?

বাবা তো এখনও ফেরেন নি।

আকাশের অবস্থা দেখে বললাম, এখুনি ফিরবেন তো?

তা ফিরবেন। আপনি বসবেন এসে?

একটু দরকার ছিল—

মেয়েটি কপাট খুলে দিয়ে ব'লল, আসুন।

একটি ঘরের সামনে দাঁড় করিয়ে রেখে ব'লল, দাঁড়ান, ও-ঘর থেকে মাদুরখানা এনে দিই।

মাদুরখানা পেতে দিয়ে হ্যারিকেনটা চৌকাঠের বাইরে রেখে সে কপাটটা ঈষৎ টেনে দিল। এমন সময় ভিতর থেকে আবার গলা এল, আলোটা নিয়ে আয়রে মিনু। উনুনে ভাত চাপিয়েছি—ও আবার আলো নিয়ে গেল কোথায়!

বুঝলাম, এই একটি হ্যারিকেন ছাড়া এদের আর কোন সম্পত্তি নেই। ভাবলাম, মেয়েটি ঘুরে এলে বলব, নিয়ে যান আলো। সে তক্ষুনি ঘুরে এসে বলল, মনে কিছু ক'রবেন না। এখুনি আলোটা দিয়ে যাচ্ছি—

না-না কিছু না। আপনার মাকে একবার পাঠিয়ে দেবেন তো। বলবেন, সমরেশ এসেছে—ব্রজেন বাবুর ছেলে।

মেয়েটি তখুনি আলো নিয়ে ঘুরে এসে ব'লল, আমার ছোট বোনের খুব অসুখ করেছে কি না, তাই মা তার কাছে বসে কপালে জলপটি দিচ্ছেন। আপনাকে আসতে ব'ললেন।

উঁচুনীচু রোয়াক ডিঙিয়ে কপাটের কাছে এসে দাঁড়াতেই মাথার ঘুঁটিটা একটু তুলে দিয়ে ব'ললেন, আমি চিনতে পারিনি বাবা। কিছু মনে ক'র না। সেদিন উনি এসে গল্প করছিলেন বটে যে, তোমার সঙ্গে দেখা হয়েছে। তা সে! গরিব কাকীমার ঘর দোরের ছিরি দেখছ না কি?



পর বলে বলীয়ান নেহার জাপান

? আর দেখে কি হবে বাবা? বর্ষাকালে জল পড়ে। উঠনের নর্দ্দমা বুজে পুকুর হয়ে ওঠে। নোংরা আর আবর্জ্জনায় হাঁড়ি-কুঁড়ি সব একাকার ক'রে দেয়।

আসনখানা দখল ক'রে নিয়ে বললাম, সেই ভাড়া দিয়েই থাকেন যখন, এত কষ্ট সহ্য করেন কেন?

কি ক'রব বাবা? থাকতে হয়, কোথায় যাব বল! এতগুলি কাচ্চাবাচ্চা নিয়ে। ভাড়াটাও কিছু সুবিধে। তিনখানা ঘরের মাত্র বারো টাকা ভাড়া, তাই সময়ে জুলিয়ে উঠতে পারিনে। ছ' মাসের ভাড়া বাকি পড়ে। উঠবার কি উপায় আছে বাবা! তোমার কাকাবাবুর চল্লিশটে টাকার উপরই তো ভরসা! পেটে খাব, না ভাড়া দেব?

কেন, আপনার বড় ছেলের চাকরি হয়নি এখনও?

কোথায়! কত চেষ্টা করলেন কিছুতেই কিছু হোলো না। আজ চার বছর ঠাই সে বসে আছে। তারপর ঐ একটি সতের আঠার বছরের মেয়ে মাথার উপর। এ দিকে এই মেয়েটি প্রায় মাস খানেকের উপর বিছানায় পড়ে। রোজ ঘুস ঘুসে জ্বর, সর্দ্দি। টোটকা-টাটকি কত করলাম, কিছুতেই কিছু হোলো না। লোকে নানা কথা বলেন, শুনে, বাবা, প্রাণ জল হয়ে যায়। ক'রবই বা কি বল! না আছে তেমন পয়সা যে ভাল ডাক্তার দেখাব! হাঁসপাতাল, সেখানেও তো বাবা গরীবের যায়গা নেই। এমন অদৃষ্ট করেও আমি এসেছিলাম—

তাঁর শীর্ণ মুখখানির কোল বেয়ে এক ফোঁটা জল নেমে এল। আমার কাছে অন্তরের দুঃখ গোপন ক'রবার জন্ত তাড়াতাড়ি আঁচলের খুঁটে চোখ মুছে ব'ললেন, দেখ মিনু, উনি ডাকছেন বোধ হয়।

মিনু হারিকেন তুলে নিয়ে চলে গেল অল্পক্ষণ পরেই সুকুমারের গলা পাওয়া গেল!

—কেমন আছে রানু?

কাকীমা মাথার ঘোমটা আর একটু তুলে দিয়ে বললেন, একটু সকাল ক'রে ফিরতে হয়তো! সুকুমার কাকা আমার দিকে চেয়ে বললেন, শোন কথা! আমি কি ইচ্ছে করে পড়েছিলাম। আর ইচ্ছে ক'রে রাত ন'টা পর্য্যন্ত চাকরি ক'রতে। চল্লিশটে টাকা কি এমনি দেবে তারা? গায়ে যতক্ষণ এক ফোঁটা রক্ত থাকিবে ততক্ষণ তারা ছাড়বে কেন?

তাঁর দীর্ঘ জীবনের দুঃখের পাথেয়র ভূমিকা এইখানে এসে একটু থামল। কাকীমা বিরাট পৃথিবীর খোঁজ রাখতেন না। এখানে কত অন্ন-জল, কত বাদ-আবাদ চলছে তা অজ্ঞাত ছিল। তাঁর নিজের মত সরল ও সহজ মনে ক'রতেন এই পৃথিবীকে। ব'ললেন, ব'লতেও তো পারতে, বাড়ীতে অসুখ।

কাকাবাবুর মুখে ম্লান হাসির রেখা ফুটে উঠল। ব'ললেন, সে কথা শুনে তাদের মন একতিলও টলত না। তারা ব'লত কি জান, ব'লত, তোমাদের মত রাস্কেলগুলো কেন বিয়ে করে, কেন সংসার করে, তা বুঝতে পারি নে। আমরা আবার মানুষ, আমাদের আবার অভিযোগ। ও সব দুঃখের কথা বলবার জন্ত সারা জীবন পড়ে। এখন থাক। সমরকে কিছু জল খেতে দাও, এনে দিচ্ছি, বলে, তিনি উঠে দাঁড়াতেই বাধা দিয়ে ব'ললাম, থাক কাকাবাবু, খাবার আমার আর ইচ্ছে নেই। এই একটু আগেই ছোট মাসীমার বাপের বাড়ী গিয়েছিলাম। এমন খাওয়া খেয়েছি পেটে এক তিল জায়গা নেই আর।

তাঁর সে কথা বিশ্বাস হ'ল না। ব'ললেন জানতাম, তুমি খাবে না—

কেন?

আমরা গরীব। আমরা কিই বা খাওয়াতে পারি।

চুপ ক'রে গেলাম। কোন কথার আর প্রতিবাদ ক'রলাম না। কত জন্মের আগুন জ্বলছে তার ঠিক কি! একটু ঘি পড়লেই লক্ লক্ করে উঠে গ্রাস করতে চাইবে।

ব'ললাম, আপনার বড় মেয়ের বিয়ের কি ক'রলেন?

কি আবার ক'রব? কত ছেলে এল, দেখল, কেউ পাঁচশ' টাকার কম ঘাড় পাততে চায় না। কোথায় পাব অত টাকা! পাঁচটা টাকা জোগাড় করতে যার হিম্‌সিম্ খেতে হয়, পাঁচশ' টাকা কোথায় পাবে সে! এই সব কারণে আর হয়ে ওঠে নি।

মিনু উঠে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

কাকীমা ব'ললেন, একটি ছেলে-টেলে দেখে দিতে পার বাবা, গরীবের মেয়েটিকে কেউ নেয়।

মনে পড়ল অনাদির কথা। ছেলেটা আমাদের সঙ্গে পড়ত। অবস্থা খুব খারাপ নয়। এখন কংগ্রেসের একজন

পাওা, খবরের কাগজে তার প্রবন্ধ প্রায় বেরোয়। আর সে-সবের ভিতর প্রায়ই নারী-সমস্যার কথা থাকে। ভাবলাম, যা থাকে কপালে, কপাল ঠুকে একদিন দেশকর্মীর দ্বারস্থ হ'তে হবে।

সেদিনকার মত বিদায় নিয়ে উঠে পড়লাম। দোর অবধি সুকুমার কাকা এলেন। আকাশ তখন বেশ ফর্সা হয়ে গেছে। আসতে আসতে অন্ধকারের ভিতর পকেট থেকে দশটাকার নোটখানা ঘরের মেঝেয় ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে এলাম। হাতে তুলে দেবার মত সাহস ছিল না। কি জানি যদি তখুনি ফেরৎ দেয়!

মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীটের কাছাকাছি অনাদি একটা মেসে থাকত। ঠিকানা তার জানাই ছিল। খুঁজে বার ক'রতে বিশেষ কষ্ট হোল না।

সিঁড়ি ধরে উঠে এসে দেখি মিষ্টার আমাদের ইজি-চেয়ারে হেলান দিয়ে শুয়ে শুয়ে ধূমপান ক'রছেন। সামনে টি-পয়টার ওপর আনকোরা খানকয়েক সংবাদপত্র ছড়ান। পায়ের সাড়া পেয়ে অনাদি উঠে ব'সল, মাই গুড গড! তারপর হঠাৎ, পথ ভুলে না কি?

একরকম তাই। পথ না ভুললে কেউ কি ত্রাণকর্ত্তার শরণ নেয়?

ত্রাণকর্ত্তা! সে আবার কি!

ন্যাকা! যেন আকাশ থেকে পড়লে। দেশের যারা কাজ করে, মানে পার্কে বক্তৃতা দেয়, কাগজে প্রবন্ধ লেখে; যারা এই দুঃস্থ পঙ্গু জাতিটাকে কষ্টে ঠেলে নিয়ে যাবার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ, তাদের এ ছাড়া আর কি বলব!

অনাদি হো হো করে হেসে উঠল, ব'লল, বস, বস। তোমার কথায় বেশ কবিত্ব আছে; নিতান্ত গদ্যময় নও দেখছি। বেশ, বেশ, তারপর, খুলে বল দেখি কি মনে করে?

ব'ললাম, সভা-সমিতির সভাপতিত্ব ক'রবার জন্য যে নিমন্ত্রণ করতে আসি নি এটা আগেই জানিয়ে রাখছি।

বুঝলাম, তারপর?

চাকরি-বাকরির সুপারিশের জন্যও যে তোমাদের কাছে আসব না, তাও বোধ করি তুমি জান!

নিশ্চয়!

বলার আগে একটু চা খাবার বন্দোবস্ত কর দেখি!

এক্ষুনি। বলেই কোথায় কি টিপে দিল কে জানে, অমনি ঘণ্টা বেজে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে চাকরের আবির্ভাব। চায়ের হুকুম হ'ল। চায়ের বাটিটি করতলগত ক'রে ব'ললাম, ভাল কথা তুমি বিয়ে করেছ?

হঠাৎ এ কথা?

সীরিয়াসলী বলছি। করেছ?

অনাদি ঘাড় নেড়ে ব'লল, ওসব ভাববার সময় কোথায় ক'রলেই হোল। বয়স তো আর পালিয়ে যায় নি।

সব কথা তাকে গুছিয়ে ব'ললাম। শুনে সে ব'লল, সব বাবার হাত। তিনি যা বলেন তাই হবে।

আহা, বেশ ত তুমি একদিন দেখেই এস না কেন? মেয়ে এমন কিছু ডানাকাটা পরী নয়। তবে খুব কুৎসিতও নয়। অযত্নে অবহেলায় মানুষ হ'লে যা হয়। গরীবের মেয়ে। দেশের কত সমস্যা নিয়েই তো নেচে বেড়াচ্ছ। একটির সমাধান করলেই বা। ক্ষতি কি তাতে?

অনাদি খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে ব'লল, তোমাকে আমি এই মাসের ভিতরেই জানাব। কেমন?

জানাব বললে হবে না। এ আমার দাবী মনে ক'র। বন্ধুত্বের দাবীকে যেন ফুৎকার দিয়ে উড়িয়ে দিও না ভাই।

পাগল হয়েছ তুমি। তোমায় কথা দিচ্ছি। ব'লতে ব'লতে সে আমাকে দোর অবধি এগিয়ে দিল।

দিন দু'য়েক পরেই সুকুমার কাকাকে বলে এলাম, আর ভাবনা নেই। মিনতির বিয়ের জন্য আপনার কোন ভাববার কারণ নেই। দিন কুড়ি আর অপেক্ষা করুন!

সুকুমার কাকা কি বলবেন ভেবে পেলেন না। বাইরে এসে বললেন, এমাসে তো হবে না বাবা। শুনেছ বোধ হয় আমার সেই ছোট মেয়েটা পরশু রাত্রেই মারা গেছে।

আমি বিস্ময়ে কাঠ হ'য়ে গেলাম। বিছানাতেই রাহুকে নির্ব্বিকার ভাবে শুয়ে থাকতে দেখেছিলাম। কিন্তু তার সামনে যে বসে ছিল দিগন্ত বিস্তৃত মহানিশা, তা আমার নজরে পড়ে নি।

সুকুমার কাকা বললেন, "মেয়েটাকে ইচ্ছে করেই মেরে ফেললাম। ইচ্ছে করেই কি! না পারলাম একটা ডাক্তার দেখাতে, না পারলাম ওষুধ খাওয়াতে। শুনলে তুমি অবাক

হবে সমস্তেন্, খাটে নিয়ে যাবার খরচটা পর্য্যন্ত হাতে ছিল না। ভগবানই মিলিয়ে দিলেন। দেখি খাটের নীচে একখানা নোট পড়ে। কি ক'রে এল, কোত্থেকে এল, কে জানে ভগবানই জুটিয়ে দিলেন বোধ হয়। মেয়েটাকে তাঁর কি ভারই যে লাগত। অমন লক্ষ্মী মেয়ে তুমি দেখ'নি বাবা; রোজ সন্ধ্যে হ'লে নিজে হাতে প্রদীপ জ্বেলে সামনে শিবের মন্দিরে আলো দিয়ে আসত। কাউকে ব'লে দিতে হ'ত না, কাউকে দেখিয়ে দিতে হ'ত না।

ব'লতে ব'লতে তাঁর চোখ দুটো ভারী হ'য়ে উঠল। খানিকক্ষণ রেলিং ধরে চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইলেন। হয়ত মনে পড়ছিল, সেই সমস্ত দুঃখাতীত নির্জ্জন সন্ধ্যার কথা। অকাল বৈশাখীর উদ্দাম ঝড় নেই, শ্রাবণের বারিধারা নেই, সবাইকে উপেক্ষা ক'রে প্রদীপ হাতে ভাঙ্গা উমানাথের মন্দিরের দিকে যে যেত একটি কুমারী মেয়ে। অঙ্গের বস্ত্র তার মলিন। মাথায় তার তেল জোটে নি সময়ে। পেটভরে সে দু'বেলা খেতে পায় নি। সেই নালিশ পৌঁছিয়ে দিতে সে যায় নি, সে যেত, অন্ধকারের বিগ্রহকে আলো দেখিয়ে শিশু-মনে তৃপ্তি পেতে। আজও সন্ধ্যা হয়, অন্ধকার নেমে আসে পৃথিবীর বুকে, কিন্তু রাণুই শুধু দৃষ্টির বহির্বাসিনী।

খানিকক্ষণ এটা ওটা ব'লে, যাবার জন্য পা বাড়াতেই সুকুমার কাকা ব'ললেন, ছেলেটি যেন হাত ছাড়া না হয় বাবা। একটু দেখ। আমি না হয়, একদিন যাবো তোমার সঙ্গে।

ব'ললাম, তার দরকার হবে না। সে সব আমার উপর ভার রইল।

ব'লে বেরিয়ে পড়লাম। দিন দশেক পরেই তার খবর পেলাম। তার চিঠির জবাবে লিখলাম, পণ ব'লে কিছু দিতে পারব না ভাই। তোমার বাবাকে ব'ল। তুমি যদি বল, তিনি না ক'রতে পারবেন না। বাবার অনেক কথায় তো অমান্য কর, এর বেলাতেও না হয় করলে।

তার দু' চার দিন পরেই অনাদির চিঠি এল। শুধু উনি পারবে না। বরপণ দিতেই হবে। বাবা গররাজি। তাঁর কথা অমান্য করি কি ক'রে বল?

মনে মনে ভাবলাম দেখা হলে খুব খানিকটা শুনিয়ে দেব। কেবল মুখেই দরদ দেখালে চলে না, কাজেও খানিকটা দেখাতে হয়। আবার ভাবলাম, কাজ নেই, ওদের সঙ্গে কথা বলাটাই আমার মূর্খতা।

যেতে ভয়ানক লজ্জা হচ্ছিল। সুকুমার কাকাকে চিঠি দিয়ে জানালাম। সে ছেলে এখন বিয়ে করবে না।

সকাল বেলায় বসে আছি। সুকুমার কাকার ছেলে এসে হাজির। তাকে ব'সতে ব'লে ব'ললাম, কি খবর বলুন তো?

সে ব'লল, বাবা নিশ্চয় বিয়ে ঠিক ক'রেছেন। সোনার-পুরের ঐ দিকে তাদের বাড়ী? ছেলেটি যজমানি করে। বিশেষ কিছু নেই বটে। তৃতীয় পক্ষ। তবে ছেলে-পিলে নেই। বাবা এই চিঠিখানি দিয়েছেন আপনাকে, আর বাবা বলেছেন, গোটা পঞ্চাশ টাকা আপনি যদি যোগাড় ক'রে দিতে পারেন, আপনাকে ধীরে সুস্থে দিয়ে দেবেন।

কি করে টাকাগুলো যোগাড় করা যায় ভাবছিলাম। ভাবলাম, বাবাকে লিখে দিই। এ মাসে হোষ্টেলের খরচ বেশী পড়েছে। এ ছাড়া আর কোন উপায় মাথায় এল না। ব'ললাম, এখনও চার পাঁচ দিন সময় আছে তো? আমি দেখা করব'খন। নয় আপনিই রবিবার দিন বেলা চারটের সময় আমার সঙ্গে য়ুনিভারসিটির গেটে দেখা করবেন, কেমন?

সে ঘাড় নেড়ে একটা ছোট্ট নমস্কার করে কিছুদূর এগিয়ে ফিরে দাঁড়িয়ে ব'লল, আর একটা কথা আপনাকে ব'লব। আপনার তো অনেক বড় বড় চাকুরে আত্মীয়-স্বজন আছেন, আমাকে কোথাও একটা কিছু ক'রে দিতে পারেন।

বললাম, আচ্ছা ব'লে দেখব।

ছেলেটি আর একটা নমস্কার করে নেমে গেল। বাবাকে তার পর দিন ছুটো একটা খরচের লম্বা ফর্দ্দ দেখিয়ে চিঠি লিখলাম; এবং জরুরী খবরটা জানিয়ে দিলাম। টাকাটা টেলিগ্রাফ মনি-অর্ডারে এসে পৌঁছুলে হাঁপ ছেড়ে বাঁচলাম। টাকাটা পাঠিয়ে দেবার কথা ভাবছিলাম, এমন সময় ছেলেটী এসে দেখা ক'রল। ব'লল, কই আপনি তো কাল দেখা ক'রলেন না।

ব'ললাম, একটু কাজে আটকে গিয়েছিলাম। এই নিন্ টাকা ক'টা।

টাকা ক'টা নিয়ে সে লজ্জিত ভাবে ব'লল, আমার কথাটা একটু মনে রাখবেন।

বললাম, কিছু মনে ক'রবেন না। তাঁরা সবাই বলেন, তোমার নিজের জন্যে হয় সে আলাদা কথা। বুঝলাম কিছু ক'রবেন না। দেখুন, হ'য়ে যাবে একদিন।

আপনি বুধবার দিন আসছেন তো?

সম্ভব হবে না। আমার বড় বোনকে দেরাদুন মেলে তুলে দিয়ে কখন ফিরব তার ঠিক নেই। যাক্, দেখা আমি করব'খন।

তারপরে অনেকগুলি দিন কেটে গেছে। মাঝ খানে শুনেছিলাম, সুকুমার কাকার বড় ছেলেটি বাড়ী থেকে পালিয়ে গেছে। আজ অবধি তার কোন খোঁজ পাওয়া যায় নি। এর পর আর কোন খবর রাখি নি।

সেবার জন কয়েক বন্ধু মিলে বারুইপুরের ওদিকে এক দীঘিতে মাছ ধরতে যাচ্ছিলাম। একটা ছোট ষ্টেসনে এসে গাড়ি থামলে একটি যুবতী মুড়ি দিয়ে এসে কিছুটা দূরে ব'সল। তার দিকে চেয়ে কালীঘাটের একটা আধা-চোরা বাড়ির কথা মনে পড়ল। ঠিক চোখে তেমনি চশমা, ঠিক তেমনি নাক, মুখ, চোখ, ঠিক সেদিনকার মতনই একখানি বিবর্ণ শীর্ণ মুখ।

তাকে জানতে কেমন যেন কৌতূহল হ'ল। তাঁর সঙ্গীকে জিজ্ঞেস ক'রলাম, আচ্ছা এঁর বাপের বাড়ী কি ক'লকাতা?

লোকটি ঘাড় নেড়ে বলল, হাঁ কালীঘাটে। সম্প্রতি স্বামী মারা গেছেন কি না, তাই বাপের কাছেই ফিরে যাচ্ছেন।

জিজ্ঞেস ক'রলাম, আপনার কেউ হ'ন বুঝি?

লোকটি বার কয়েক ঘাড় নেড়ে ব'লল, গ্রাম সম্পর্কে আমি মামাশ্বশুর হই।

জিজ্ঞেস ক'রলাম, কেন, ওঁর শ্বশুরবাড়িতে আর কেউ নেই?

তিনি বুড়ো আঙুলটি নেড়ে আমাকে দেখালেন। বললেন, লিখলাম ওঁর বাবাকে যে, এসে আপনার মেয়েকে নিয়ে যান। তাঁর আবার শুনছি অসুখ। তাও আবার যে সে নয়, টাইফয়েড।

এমন সময় গাড়ীখানা ধীরে ধীরে বারুইপুরের ষ্টেসনে এসে ঢুকল। অবিনাশ হুইল সুদ্ধ ছিপগুলো তুলে নিয়ে দোরের দিকে এগিয়ে ডাকল, উঠে আয় রে। গাড়ী এক্ষুনি ছেড়ে দেবে।

রেন্-কোটটা তুলে নিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে একবার মিনতির দিকে চেয়ে, নেমে পড়লাম। মনটা একটু আন্‌মনা হয়ে পড়েছিল। বিজনের গলা পেয়ে ফিরে দেখি, সে অনর্গল ব'কে চলেছে, মোটর আমি নিয়েই এসেছি, তোদের কোন অসুবিধা হবে না। ষ্টোভ নিয়েছি দিব্যি চা ক'রে খাওয়া যাবে কি বল? গ্রামোফোনটা অবধি বৌদিকে ব'লে এনেছি। আমরা তো আর জেলে নই—সখের জেলে, কি বল?

গেটের বাইরে যেতে যেতে চেয়ে দেখি, মিনু তেমনি জানালার পাশে কাঠ হ'য়ে বসে। বছর খানেক আগেকার সেদিনকার মুখখানা যেমন শুকনো বিবর্ণ ছিল, সেদিন বর্ষণ মুখর রজনীতে যা দেখেছিলাম, আর আজ এই বিবর্ণ দিনের আলোতে যা দেখছিলাম, কোথাও এতটুকু প্রভেদ নেই। তেমনি শুকনো চুল, তেমনি ম্লান মুখ। চোখাচোখি হোতেই থানের কাপড়ের খুঁটটা আমায় দেখে মাথার উপর আর একটু টেনে দিয়ে সে স'রে ব'সল। আমি হতবাক্ হ'য়ে পা বাড়ালাম।

সেদিনকার মাছ ধরার উৎসবটা আমার কাছে অত্যন্ত করুণ ঠেক্‌ল। এর আগে কোন মুক্ত জীবকে করতলগত ক'রবার জন্ত কোন দুঃখ বোধ হয় নি। কারণটা জানলে অবশ্যই ব'লতাম। কিন্তু নিজেই সে জানি নে, তাব পরকে বলব কি

বাংলা ও হিন্দী গান

—শ্রীহরিপদ দত্ত

কয়েক বৎসর দেশে সঙ্গীত বিষয়ে জাগরণ লক্ষিত হইতেছে। "গান গাহিলে ছেলে বকাটে হইয়া যাইবে," "বকাটে ছেলেরা এবং নিকর্ম্মা লোকেরা গান-বাজনা করে" কয়েক যুগ পূর্ব্বে সাধারণের এই যে ধারণা ছিল, তাহা এখন দূর হইয়াছে—অন্ততঃ অধিকাংশ সমাজে। কেবল বালক নহে, বালিকাদেরও ওস্তাদ রাখিয়া গান শিখান হইতেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ও সঙ্গীতানুশীলন বিষয়ে উৎসাহ প্রদান করিতেছেন। সম্প্রতি হিন্দী ও বাঙ্গালা গানের প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে সংবাদপত্রেও আলোচনা আরম্ভ হইয়াছে। সেই জন্য শেষোক্ত বিষয় সম্বন্ধে নিম্নের কয়েক পংক্তি লিখিতে সাহস করিলাম।

পশ্চিম ভারতের গায়কগণ স্বভাবতঃই চিরদিন হিন্দী গান গাহিয়া আসিতেছেন। এই সকল গানের ভাষা হিন্দী বলিয়া সাধারণ্যে প্রসিদ্ধি থাকিলেও, ইহাতে দেবনাগর ও উর্দ্দূ উভয়েরই সংমিশ্রণ আছে। ধ্রুপদ গানে দেবনাগরী শব্দের এবং ঠুংরি প্রভৃতিতে উর্দ্দূ শব্দের আধিক্য পরিদৃষ্ট হয়। খেয়াল-গানে উভয় ভাষা প্রায় সমানাংশে ব্যবহৃত হইয়াছে। তবে হিন্দী ভাষা শঙ্কর (hybrid) এবং প্রধানতঃ এই দুই ভাষার সংমিশ্রণে উৎপন্ন হইয়াছে; সুতরাং এই গানগুলিকে অনায়াসে হিন্দী গান বলা যাইতে পারে।

মধ্যভারতে ও বোম্বাই অঞ্চলে মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় রচিত এবং দক্ষিণ ভারতে স্থানীয় ভাষায় রচিত গান কিছু কিছু শুনিতে পাওয়া যায় বটে, তথাপি তত্তৎ প্রদেশে হিন্দী গানেরই প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয়, বিশেষতঃ ওস্তাদের মুখে। যাঁহারা ওস্তাদের নিকট গান শিক্ষা করিয়াছেন, তাঁহারাও হিন্দী গানই গাহিয়া থাকেন।

বঙ্গদেশে সঙ্গীতবিদ্যায় শিক্ষিত বাঙ্গালী গায়কগণ হিন্দী গানই গাহেন, কারণ, তাঁহাদের সঙ্গীত শিক্ষা বর্ত্তমান সময়ে সীমাবদ্ধ ভাবে হইলেও পুরাকালে সম্পূর্ণরূপে হিন্দুস্থানী ওস্তাদের নিকট হইত। ইহা হইতে অনুমান করা যায় যে, যাহাতে সুরের প্রাধান্য-রক্ষা হয় এরূপ গান বাংলা ভাষায় রচনা করিতে বাঙ্গালী কোন কালে চেষ্টা করেন নাই। বাংলায় রচিত গানের অধিকাংশই কবিতার রূপ ধারণ করিয়াছে। শব্দবহুলতা সুরবিস্তারের অন্তরায় এবং যুক্তাক্ষরের সন্নিবেশে সুরবিস্তার অধিকতর দুরূহ হয়। ব্যবহৃত শব্দের মধ্যে তানের স্থান না থাকিলে, সুর হিসাবে গান মনোরম হয় না। সুর-শিল্পিগণ ইহা উপলব্ধি করিয়াই শব্দ-বহুল বাংলা গান গাহিতে চাহেন না। যদিও সোরীমিঞার টপ্পার আদর্শে নিধুবাবু বাঙ্গালা টপ্পা রচনা করিয়াছিলেন, তথাপি সে সকল টপ্পায় কবিত্বের ত বটেই, শব্দেরও প্রাধান্য লক্ষিত হয়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ নিধুবাবুর একটি টপ্পা উদ্ধৃত করিলাম—

(তবে প্রেমে) কি সুখ হ'ত।
আমি যারে ভালবাসি সে যদি ভালবাসিত।
কিংশুক শোভিত ঘ্রাণে কেতকী কণ্টক হীনে
ফুল ফুটিত চন্দনে ইক্ষুতে ফল ফলিত।
প্রেম-সাগরের জল হ'ত যদি সুশীতল
বিচ্ছেদ বাড়বানল তাহে যদি না থাকিত।

এ গানে নিঃসন্দেহ কবিতা আছে, কিন্তু অন্তর্ব্বর্ত্তী তান অল্প। ইহার কারণ শব্দবহুলতা ও যুক্তাক্ষরের সন্নিবেশ। সুরের প্রাধান্য বজায় রাখিতে হইলে এমন ভাবে গানের কথা সাজাইতে হইবে এবং এমন কথার সন্নিবেশ করিতে হইবে, যে কথার, অন্ততঃ অধিকাংশ কথার মধ্যে তান থাকে; ইহাকেই অন্তর্ব্বর্ত্তী তান বলা যায়। উদ্ধৃত গানের প্রথম, দ্বিতীয়, চতুর্থ ও ষষ্ঠ চরণের শেষ কথাতেই তানের স্থান আছে—"হ'ত," "বাসিত," "ফলিত" ও "থাকিত"—তাহাও একেবারে শেষ অক্ষরে। যাঁহারা সুরের সাধনা করেন, ঝিঁঝিট—আদ্ধা কাওয়ালীতে গানটি গাহিলেই ইহা বুঝিতে পারিবেন।

ভজন ও ধ্রুপদ ছাড়িয়া দিলে হিন্দী গানের মধ্যে কবিতা বড় একটা খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। খেয়াল ও ঠুংরি গানে শব্দের অন্তর্ব্বর্ত্তী তানের অভাব ঘটিলে সুরের মাধুর্য্য থাকে না—স্বাধীন তানের কথা ধরিতেছি না, কারণ স্বাধীন তান

সকল গানেই প্রকাশ করা যায়। সেই জন্ম হিন্দী খেয়াল ও ঠুংরি গানগুলিতে সাধারণতঃ শব্দ, তান ও লয় একাঙ্গীভূত বা ওতপ্রোতভাবে জড়িত। ঐ সকল গানে কথা অপেক্ষা সুরের প্রাধান্ত রক্ষা করা এবং যাহাতে লয়ের গতি অপ্রতিবদ্ধ হয় সেই দিকে লক্ষ্য রাখা হইয়াছে। এই সকল হিন্দী গানে যুক্তাক্ষরের সন্নিবেশ নাই বলিলেই চলে। এই কারণেই সুর-শিল্পিগণ হিন্দী গানেরই পক্ষপাতী।

অধুনা বঙ্গদেশে বাঙ্গালী সঙ্গীতাধ্যাপক বা ওস্তাদের অভাব নাই, কিন্তু তাঁহাদের কাছেও হিন্দী গানই শিখিতে হয়। কারণ, প্রথমতঃ ইঁহারা শিক্ষিত বিদ্যাই শিক্ষা দিয়া থাকেন এবং ইঁহাদের শিক্ষক ছিলেন হিন্দুস্থানী ওস্তাদ। দ্বিতীয়তঃ, যাহাকে ওস্তাদী গান বলা যায় তাহা হিন্দী ভিন্ন অন্য ভাষাতে নাই। অন্ততঃ বাঙ্গালায় অন্য ভাষায় রচিত ওস্তাদী গানের প্রাদুর্ভাব দূরের কথা, আবির্ভাবও হয় নাই। যাঁহারা হিন্দী গান রচনা করিয়া গিয়াছেন তাঁহারা, অন্ততঃ তাঁহাদের অধিকাংশ নিজেরাই ওস্তাদ ছিলেন। সেই জন্য তাঁহারা সুরের প্রাধান্য ও তালের গতি বজায় রাখিয়া গান রচনা করিতে পারিয়াছেন। বাঙ্গালী ওস্তাদগণ কখন নিজের ভাষায় গান রচনার চেষ্টাও করেন নাই। যাঁহারা বাংলা গান, বিশেষতঃ আধুনিক বাংলা গান রচনা করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ কিয়ৎপরিমাণে সুরজ্ঞ হইলেও অধিকাংশই "তালকাণা"—লয়ের ধার ধারেন না। কাজেই তাঁহারা গান রচনা করিতে বসিয়া কবিতাই রচনা করিয়াছেন। গান বলিলেই তাহা সুর-তাল-সমন্বিত ইহা সকলেই বুঝেন, কিন্তু আধুনিক রচয়িতার লেখনী হইতে অতি অল্পসংখ্যক বাংলা গান সুর-তাল-সমন্বিত আকার লাভ করিয়া জন্মগ্রহণ করে। অধিকাংশ স্থলে রচয়িতা মূর্তি নির্ম্মাণ করেন এবং কোন সুর-শিল্পী সুর ও তালের সংযোজনে তাহার প্রাণ প্রতিষ্ঠা করেন। কিন্তু প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিলে হইবে কি, মূর্তি যে গঠনের জটিলতা বশতঃ শ্রীহীন! ফলে বিশুদ্ধ সঙ্গীত-শাস্ত্র অনুসারে গানগুলি জীবজগতের কুব্জ, খঞ্জ ও অন্যান্য রূপ অঙ্গহীনের পর্যায়ভুক্ত হয়। অধিকন্তু আধুনিক বাংলা গানের গায়কবৃন্দের কণ্ঠে আরোহণ করিয়া এই সকল গান রাগ-রাগিণীর খিচুড়ীতে পরিণত হয়। ইহার কারণ এই যে, এবংবিধ গায়কগণ "না পড়িয়াই পণ্ডিত" - শাস্ত্রীয় রাগ-রাগিণীর রূপ সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ। রচয়িতার দোষ কি? তিনি ত মানসিক উচ্ছ্বাসকে রূপ প্রদান করিয়াছেন। হয় ত, কবিতা হিসাবে তাঁহার রচনা উৎকৃষ্ট, অথচ সঙ্গীতবিদ্যায় ব্যুৎপত্তির অভাবে গান হিসাবে অপকৃষ্ট হইয়া পড়িয়াছে। যাঁহারা সঙ্গীতবিদ্যায় পারদর্শিতা লাভ করিয়া ওস্তাদ বা গায়ক-শ্রেণীভুক্ত হইয়াছেন, তাঁহারা সকলেই গান রচনায় অক্ষম, ইহা বিশ্বাস করা যায় না। যাঁহাদের ক্ষমতা আছে, তাঁহারা চেষ্টা করেন না কেন?

শ্রোতার দিক হইতে দেখিলে প্রতীয়মান হইবে যে, যাঁহারা রাগ-রাগিণী ও লয় বুঝেন, তাঁহাদের কাছে হিন্দী গান সুশ্রাব্য, কিন্তু যাঁহারা সে বিষয়ে অজ্ঞ, তাঁহাদের কাছে উহা অশ্রাব্য না হইলেও, বিশেষ আনন্দদায়ক নহে। রাগ-রাগিণী ও সুর-লয় বুঝেন এরূপ শ্রোতার সংখ্যা অপেক্ষাকৃত অল্প। অধিকাংশ শ্রোতা রাগ-রাগিণী ও লয় অপেক্ষা যে কোন সুর-সংযুক্ত কবিতার ভাষাতেই অধিকতর আনন্দ লাভ করেন। ইহা স্বাভাবিক, কারণ যে বিষয় যিনি বুঝিতে পারেন না, তাহা তাঁহাকে আনন্দ দান করিতে পারে না। এই জন্য অনেকেই বাংলা গান শুনিতে ভালবাসেন।

লক্ষ্য করিবার আর এক দিক আছে। নিজের দেশে বাঙ্গালীর সন্তান এমন সঙ্গীত শুনিতে পাইবে না, অন্ততঃ যাহার ভাষা সে বুঝিতে পারে। প্রথমতঃ, হিন্দী গানের ভাষা অনেকের বোধগম্য নয়। দ্বিতীয়তঃ, বাঙ্গালী গায়কের হাতে পড়িয়া হিন্দী গানগুলির আসল ভাষা ক্রমশঃ বিকৃত ও অশুদ্ধ হইয়াছে এবং বহুসংখ্যক গান অর্থহীন হইয়া পড়িয়াছে। যাহার সুর-লয়ও বুঝিতে পারি না, ভাষাও বুঝিতে পারি না, এমন গান শুনিয়া কিরূপে আনন্দ পাইব?

যাঁহারা হিন্দীগান শিক্ষা করিয়াছেন, ওস্তাদ না হইলেও তাঁহাদের মধ্যে অধিকাংশ গায়ক বাংলা গান গাহিতে চাহেন না। অনেকে বাংলা গানের নামে নাসিকা কুঞ্চন করেন। ইহার একাধিক কারণ থাকিতে পারে। তাঁহারা যে গান ওস্তাদের নিকট শিখিয়াছেন এবং যেরূপ ভাবে শিখিয়াছেন, সেই গান সেইরূপ ভাবেই তাঁহারা গাহিতে পারেন—বড় জোর তাহাতে সুর ও লয়ের অলঙ্কার কিছু

অধিক পরিমাণে সন্নিবিষ্ট করিতে পারেন। ওস্তাদগণ ত বাঙ্গালা গান শিখান নাই ; যাহা শিখি নাই তাহা গাহিয়া শুনাইব কিরূপে ? "ভজন"-গানে সুরের সূক্ষ্ম কাজ অধিক পরিমাণে না করিলে চলে ; তবে বাঙ্গালা ভজন গাহিতে আপত্তি কেন ? সম্ভবতঃ, মৌলিকতা ও চেষ্টা উভয়েরই অভাব বশতঃ এইরূপ আপত্তি উত্থাপিত হয়। প্রকৃত শিক্ষাপ্রাপ্ত সুর-শিল্পিগণ যদি বাংলাগানে রাগরাগিণী ও তাল সংযোজন করেন এবং কিছু কিছু বাংলাগান গাহিতে থাকেন, তাহা হইলে উহার রচনার সহায়তা করা হয় এবং সুর-লয়ের সমন্বয়ে উহা উন্নতির পথে ধাবিত হইতে পারে।

যে সকল শিক্ষিত গায়ক বাংলা "ভজন"কেও অবজ্ঞার চোখে দেখেন, তাঁহাদিগের অবগতির জন্য বলি যে, যিনি যুগাধিককাল বঙ্গদেশে ওস্তাদগণের শীর্ষস্থানীয় রূপে সম্মানিত হইয়াছিলেন এবং ধামার ও স্বরগ্রাম-তেলেনা বিষয়ে সমগ্র ভারতে অপ্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন, সেই স্বনামখ্যাত স্বর্গীয় বিশ্বনাথ রাও স্থানবিশেষে বাংলা ভজন গাহিতেন। স্বর্গত ওস্তাদ অঘোরনাথ চক্রবর্ত্তীর গীত বাংলা ভজনের মধুর ঝঙ্কার তাঁহার শ্রোতৃবর্গের শ্রবণে যেন অদ্যাপি ধ্বনিত হইতেছে। পরলোকগত লালচাঁদ বড়াল যে বাংলা গান গাহিতেন, গ্রামোফোন রেকর্ড তাহার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। বিশ্বনাথজীর সুযোগ্য শিষ্য এবং বর্ত্তমান ধামারীগণের অগ্রগণ্য শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র দত্ত (দানীবাবু) বাংলা ভজন গাহিতে লজ্জাবোধ বা ইতস্ততঃ করেন না।

গাহিবার উপযুক্ত নয় বলিয়া যাঁহারা বাংলা গানের প্রতি অনাস্থা প্রকাশ করেন, যদি তাঁহাদের সুর লয় যোজনা করিবার প্রবৃত্তি ও ক্ষমতা থাকে, তাঁহাদিগকে আমি নিম্নোদ্ধৃত গান দুইটি গাহিবার জন্য আন্তরিক চেষ্টা করিতে অনুরোধ করি। বলা বাহুল্য, এই দুইটি গানই হিন্দীগানের অনুকরণে রচিত, অর্থাৎ ইহাদের কালবুদ হিন্দীগান, তবে কথার মাপে কথা বসান হয় নাই। বঙ্গীয় নাট্যপরিষদের "কালীকীর্ত্তনে" এ দুইটি নিম্নলিখিত রাগিণী ও তালে গীত হইয়া থাকে।

(১) ইমন-কল্যাণ—চৌতাল

উর শঙ্কর-অঙ্কশোভিনী মুক্তকিঙ্কর-অন্তরে
পূত পরশনে শুষ্ক কানন হাসিবে পুষ্পভারে।
না হ'লে পতিত পাথারে
ডাকি না ত মা তোমারে
চরণতরী খুঁজিয়া মরি
তখন দুখদে অকূল ভবসাগরে ॥
সম্পদ ক্রোড়ে যবে
ভুলেও ভাবি না কভু
জননী তুমি করুণাময়ী
না কর লেশ যতন --
রাখ চরণোপান্তে
চাহ নয়নপ্রান্তে
তপ্ত হৃদয় অমৃতময়
কর মা তব করুণাধারে ॥

(২) ঝিঁঝিট —চৌতাল

শঙ্কর উরস 'পর কে ললনা
মুক্তকেশী দীপ্ত আঁখি লোলরসনা।
কণ্ঠে দোলে কপালমালা
নরকরহার কটিতে মেখলা
সদ্যছিন্ন শিরে করে করে রুধির হের না ॥
পুঞ্জীভূত তেজ অসিত অঙ্গে
খেলিছে অশনি জলদে রঙ্গে
বিশ্ব কুঞ্চিত কুটিল ভ্রূভঙ্গে
হুঙ্কারে ভীত দানবকুল --
চিনেছি না তোরে ভবেশভামিনি
আদ্যাশক্তি বিপদবারিণী
হরিতে ভূ-ভার অসুরনাশিনী শ্যামা বিবসনা।

আসল কথা এই যে, যদি সঙ্গীতের বিশুদ্ধিরক্ষা এবং সাধারণ বাঙ্গালী শ্রোতার আনন্দবর্দ্ধন উভয়ই অভিপ্রেত হয়, তাহা হইলে কবিবৃন্দকে হিন্দী গানের অনুকরণে বাঙ্গলা গান রচনা করিতে হইবে এবং সঙ্গীতকুশল ওস্তাদ ও অন্যান্য গায়কের কর্ত্তব্য হইবে, সেই সকল গান গাহিয়া শ্রোতৃবর্গকে শুনান। যদি লেখকের ন্যায় নগণ্য সঙ্গীতোপাসকের মতামতের কোন মূল্য থাকে, তাহা হইলে বলিতে চাই যে, গান রচনা বিষয়ে প্রথম প্রথম নিম্নলিখিত পদ্ধতি অবলম্বন করা বিধেয় : একটি হিন্দী গানকে "কালবুদ" স্বরূপ গ্রহণ করতঃ তাহাতে সন্নিবিষ্ট কথাগুলির আকারের অনুরূপ অর্থাৎ তাহার মাপে যুক্তাক্ষরবিহীন বাংলা কথার সন্নিবেশ ;

যদি "কালবুদে" যুক্তাক্ষরবিশিষ্ট কথা থাকে, তাহা হইলের চিত বাংলা গানেও তদনুরূপ কথার যথাস্থানে ব্যবহার। নিম্নে দুইটি উদাহরণ দেওয়া গেল :

(১) কেদারা—চৌতাল

বাজই বাজত দেবীদ্বারে সব করত হায় (এ) বিহার নাম
প্রণত সব মস্তালিয়া মন্দমন্দিরমে করত জপ।
পাপ আপ পছ হাত ধর্ম্মধ্বজা পহরাত
মোহ আরি দূর যাত —
ছনমে নির্ম্মল হুই বাঢ়ত পুণ্যপ্রতাপ।
মামুখ তনু সুরসমান অমৃতপান চরণোদক
ধন্য ধন্য জগতমাত দেখত নয়ন সে আপ —
যোগ যজ্ঞ তীরথ ব্রত সংযম আওর নেম ব্রত
যোক সহজ লহত দহত তিন তাপ॥

শ্যামল বরণা এলোকেশী শ্যামা বিহর হর—উরসে কেন
মালিকা কণ্ঠে ছিন্নশির ছিন্নহস্তপাতি মেখলা যেন।
দেব-অরি নাশ তরে খড়্গ-পরবাণ করে
কাঁপে লোক ত্রাস হেরে—
ভীষণ হুঙ্কারে হিয়া বিদরে দীর্ণ শ্রবণ।
দনুজ খনু পাপপুরতি নিধনে ভার-মুক্ত ক্ষিতি
শুদ্ধ সত্য ধরমবায়ু বহে গো জগত জুড়িয়া—
তিন সূর্য্য নয়ন ভালে বহ্নিমান সতত জ্বলে
শুম্ভ দানব তেজে খরহেলে অসি কেন॥

(২) কেদারা কাওয়ালী

যৌবন হঠ যেন করিয়ে—
মেহর বাহু আব হি যা কারি হো ঝুকার।
যো কোউ আবে আপন চিগর্বা
তা সো গরব ন কিজিয়ে
মেহেরবান ওন সো লাগালই ডোরিয়া।

নৈশ গগনে কে বিহরে—
কনক-আভা তনুশোভা পুলক বিতরে।
মণিখচিত সুনীল আসনে
শোভে হাসিভরা আননে
জ্যোছনারাশি ভাসিত স্তু-উরস উপরে॥

"বঙ্গশ্রী"র একাধিক পাঠক সম্পাদক মহাশয়ের নিকট এরূপ অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিলে, সংখ্যান্তরে উল্লিখিত গান-চতুষ্টয়ের স্বরলিপি প্রকাশিত হইতে পারে।

দুর্ব্বাসা

—শ্রীনিবারণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

হে দুর্ব্বাসা রুষ্ট ঋষি অগ্নি তোমার বাণী
অভিশাপের অনল শিখায় রাখছ জগৎ জিনি।
মাতৃপরিত্যক্তা শিশু গহণ বনের ছায়
জনম লভি ধরার বুকে সজন নাহি পায়
বিহঙ্গম এক পক্ষপুটে ক'রল যারে ত্রাণ
কণ্ব ঋষির তপাশ্রমে বাঁচল যাহার প্রাণ
রাজাধিরাজ করল যারে হৃদয় সমর্পণ
তাহার প্রতি নিদয় তুমি রুষ্ট তোমার মন!

কণ্ব ঋষির আশ্রমেতে সাধ্বী শকুন্তলা
প্রিয়তমের চিন্তারতা একান্তে একেলা
এমনি সময় তোমার মুনি তথায় পদার্পণ।
পতি চিন্তায় মগ্না তোমায় পায়নি দরশন।
বিরহিনী নারীর প্রতি দারুণ অভিশাপ
সাধ্বী সতীর পতি ধ্যানে হয় কি কভু পাপ?
তোমার শাপে ভাগ্যহীনা সাধ্বী সরল বালা
জীবনব্যাপী লাভ করিল অশেষ দুঃখ জ্বালা।

প্রিয়তমার সকল স্মৃতি পতির হৃদয় হ'তে
তোমার শাপে মুছে নিল এমনি আচম্বিতে।
পতিব্রতার পতি প্রেমের দারুণ পুরস্কার
তুমিই দিলে জগৎ মাঝে তুলনা নাই তার।
নিজ বনিতা কন্দলীকে অভিশাপানলে
ভস্মীভূত ক'রলে তুমি আপন যোগবলে।
কারো দুঃখেই হৃদয় তোমার হয় নি বিগলিত
অভিশাপই ছিল তোমার জীবনভরা ব্রত।

অম্বরীষের গৃহে করি আতিথ্য গ্রহণ
রুষ্ট হয়ে তার নিধনের ক'রলে আয়োজন,
তাহার ফলে ত্রিভুবনে মিলল নাকো স্থান
অম্বরীষের ক্ষমা লভি পাইলে পরিত্রাণ।
শ্রীরামচন্দ্র ত্যাগ ক'রলেন প্রাণের সহোদর
মূলে তাহার তুমিই ছিলে রুষ্ট মুনিবর।
তোমার কোপে শ্রীভ্রষ্ট হলেন দেবরাজ,
অভিশাপই ছিল তোমার জীবন ভরা কাজ!

বার ঘণ্টা

—শ্রীবিপিনবিহারী রায়

সমীর তাড়াতাড়ি বেরিয়ে যাবার যোগাড় ক'রছিল, তখন সকাল ৯টা। চাকর এসে ডাকের চিঠি দিয়ে গেল। ও প্রবোধের চিঠি; সিমলে পাহাড়ে বেড়াতে গেছে, সেখানকার খবর। খাম থেকে চিঠিখানা বার করতেই একটি লাল রং-এর ফুল মাটিতে পড়ে গেল। সমীর চিঠিখানা তাড়াতাড়ি শেষ করলে, সেখানে পাহাড়ে রাস্তায় বেড়াতে গিয়ে পথের ধারে দেখতে পেয়ে প্রবোধ এই ফুলটি তুলে পাঠিয়েছে। চিরকালই "সেন্টিমেন্টাল" সে। ফুলটি কুড়িয়ে নিয়ে সমীর একবার শুঁকলে, বাঃ এখনো বেশ একটু মিষ্টি গন্ধ আছে, রুমালের মধ্যে সেটাকে রেখে রুমালখানা পকেটে গুঁজে সে বেরিয়ে পড়লো···অনেক জায়গায় ঘুরে অবশেষে সে যখন ডাক্তার বর্দ্ধনের বাড়ীর সামনে এলো তখন এগারোটা বেজে গেছে। তার বাবা ব'লে দিয়েছিলেন, ওদিকে যদি যায় ত একবার ডাক্তার বর্দ্ধনের সঙ্গে দেখা করে আসে, বাবার পুরাণো বন্ধু। ডাক্তার বর্দ্ধন বাইরের ঘরে এসে তাকে বসতে ব'ললেন। জিজ্ঞেস ক'রলেন, চা খাবে?

সমীর বললে, থাক্, অনেক বেলা হ'য়ে গেছে।

ডাক্তার বর্দ্ধন হেসে ব'ললেন, ওহে, আমি না হয় বিষ নিয়েই থাকি, বিষ ঘেঁটেই আমার জীবন কাটলো, তাই বলে আমার চা'য় পেঁয়ালাতে ত' আর বিষ মাখানো নেই—

সমীর হেসে ব'ললে, আজ্ঞে না, সেজন্যে নয়। ক'দিন শুনচি আপনার শরীরটা খারাপ যাচ্ছে, বাবা তাই একবার খবর নিতে পাঠালেন—

ডাক্তার বললেন, হাঁা বড্ড খাটুনি গেছে ক'দিন, তাই শরীরটা—কত রকম বিষ আসে আমার কাছে, সব অ্যানালাইজ করা—

সমীর ব'ললে, একদিন সময় পান তো যাবেন না বাবার সঙ্গে দেখা ক'রতে—ব'লে, তার রুমালটা বের ক'রলে মুখ মুছতে।

ডাক্তার বলে উঠলেন, ওটা কি? কি পড়লো?

সমীর বললে, ও একটা ফুল, আমার বন্ধু প্রবোধ সিমলে থেকে চিঠি লিখেচে, সেইখান থেকে পাঠিয়েচে—

দেখি, দেখি ফুলটা, ভ্রূ কুঞ্চিত করে ডাক্তার বললেন। হাতে নিয়েই বললেন, হুঁ, এ তো দেখচি—

মুখখানা অস্বাভাবিক রকম গম্ভীর ক'রে তারপর বললেন, তোমার বন্ধু প্রবোধের সঙ্গে ঝগড়াটা কি নিয়ে?

ঝগড়া? সমীর বিস্মিত হয়ে বললে, ঝগড়া কেন হবে? তার আমার বন্ধুত্ব নিয়েই বরং আমাদের অন্য বন্ধুরা ঠাট্টা করে।

না, না, তুমি জানো না এমন কোন ব্যাপার নিয়ে তোমার ওপরে তার ভীষণ আক্রোশ হয়েচে। ইস্—তুমি ফুলটা পেয়ে শুঁকেচো নাকি?

সমীর বললে হাঁা, শুঁকেচি তো, বেশ একটু মিষ্টি গন্ধ—

ডাক্তার একবারে চীৎকার করে উঠলেন, আঃ, কেন শুঁকতে গেলে? কেন তুমি শুঁকতে গেলে? কি সর্ব্বনাশ করেচো···পুয়োর বয়···আমি তোমার বাপ-মা'র কথা ভাবচি···

সমীর হতভম্ব হয়ে বললে, আপনি কি ব'লচেন, আমি ত কিছুই বুঝতে পারচি না···

ডাক্তার বর্দ্ধন তখন ফুলটিকে সযত্নে একটা চিমটে দিয়ে তুলে ধ'রে বললেন, rare জিনিস···হিমালয়ের জঙ্গলে পাওয়া যায়, pyromensia decifolia-ই বটে, চিরকাল এই সব নিয়ে রিসার্চ্চ করচি, এ তো ভুল হবার যো নেই—

সমীর ব্যগ্রভাবে জিজ্ঞেস করলে, শুঁকেচি তো কি হয়েচে, কি হয় ওটা শুঁকলে?

হাত ছুঁড়ে ডাক্তার বললেন, কী হয়, হতভাগা ছেলে! কী হয়—এর যে আজ পর্য্যন্ত কোন ওষুধ কেউ বের করতে পারে নি! ন'টায় শুঁকেচো? বারো ঘণ্টা! বারো ঘণ্টা পরে···তোমার মৃত্যু অনিবার্য্য।

সমীর ফ্যাল্‌ফ্যাল্ ক'রে চেয়ে ব'লে উঠলো, বারো ঘণ্টা পরে···মরে যাবো?···চীৎকার করে বললে, না না, এ হতেই

পারে না। আমার এমন শরীর, কোন রোগ নেই···কোন কষ্ট হচ্চে না তো···

ডাক্তার একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, কিছুই জানতে পারবে না, বারো ঘণ্টা পরে···বুকটা একবার কন্‌কন্ করে উঠবে, তার পরেই···সব শেষ! কিন্তু যাও, যাও, তুমি বাড়ী যাও! বাড়ী যাও। আমি একবার যাই ল্যাবরেটরীতে, শেষ চেষ্টা, একটা চান্স···উঃ, কিন্তু, pyromensis decifolia এর অ্যান্টিডোট ?···

সমীর ফ্যাকাসে মুখে তাঁর দিকে চেয়ে আছে, আর কোন কথা বলতে পারচে না···ডাক্তার ফুলটি নিয়ে তাঁর ল্যাবরেটরীর দিকে যেতে যেতে আবার চেঁচিয়ে ব'ললেন, যাও, বাড়ী যাও, কিন্তু রাত ৯টার আগে এসো ফের একবার আমার কাছে, শেষ চেষ্টা···লাষ্ট চান্স···পুওর বয়···

সমীর ধীরে ধীরে বেরিয়ে গেল।

(২)

তারপর কতক্ষণ কাটলো তার স্বপ্নাবিষ্টের মত তার ঠিক নেই। অনির্দ্দিষ্ট ভাবে ঘুরতে ঘুরতে এসে একটা পার্কের বেঞ্চে বসে মাথায় হাত দিয়ে ভাববার চেষ্টা করতে লাগলো, কি করা যায়, কোথায় যাবো, কত কাজ পড়ে রয়েছে···একটা খোঁড়া ভিখিরি এসে পয়সা চাইলে, দিতে গেলো একটা পয়সা, হঠাৎ মনে হলো, দুত্তোর! আর আয়ু যার মাত্র কয়েক ঘণ্টা আছে তার আর টাকা পয়সার কি দরকার? পকেটে যা ছিল সব ঢেলে দিলে ভিখিরিটার হাতে—সে অবাক হয়ে, এদিক ওদিক চেয়ে মুঠোর মধ্যে টাকা পয়সাগুলো চেপে নিয়ে ছুট্ দিলে···কিন্তু খানিক পরে ক্ষিদের তাড়নায় সমীরকে উঠতে হলো। রাস্তায় খানিক গিয়ে একটা রেস্তোঁরা দেখে ঢুকলো। সেখানে পেট ভরে খেয়ে নিলে, কর্ম্মচারী একটাকা পাঁচ আনার বিল নিয়ে এলো। পকেটে হাত দিয়ে দেখে পকেট খালি! পঞ্চাশ টাকা দামের হাত-ঘড়িটা খুলে হোটেলের মালিককে দিতে গেল। সে বললে, ও কি মশায়, ও হবে না—

সমীর মিনতি করে ব'ললে, বড় বিপদ আমার, নিন্ ওটা। হোটেলওয়ালা একবার তার মুখের দিকে চায়, একবার ঘড়িটা হাতে নিয়ে নেড়ে চেড়ে দেখে, যেন একটা কি বিষম ঠক্ বাজিতেই পড়েছে। শেষে নিলে···ইতিমধ্যে সমীর মনে মনে একটা বড় কাজ ঠিক করে নিয়েছে, এ কাজ তাকে মরবার আগে ঠিক শেষ করে যেতেই হবে। আর ক' ঘণ্টাই বা সময় আছে? বাড়ীমুখো চললো। সেখানে গিয়ে দেখে তার দুই বন্ধু দীনেশ আর রতন তার জন্তে বৈঠকখানায় অপেক্ষা করছে। তা'রা একবারে হৈ হৈ ক'রে উঠলো, কিরে, আজ আর সীট পাবি কখন, আজকের অত বড় ম্যাচটা ভুলে গেচিস?

সমীর ব'ললে, ম্যাচ দেখা আজ আর হবে না ভাই, আমার সময় নেই, অনেক কাজ—

রতন ব'ললে, বাঃ, ম্যাচটা তা'হলে মাঠেই মারা যাবে?

সমীর ব'ললে, এখুনি আমাকে প্রফেসার সেনের বাড়ী যেতে হবে, বিশেষ জরুরী কাজ···তোরা দাঁড়া, চট করে একবার ওপর থেকে আসচি।

ওপরে গিয়ে তা'র বৌদি'কে ব'ললে, আজ আর খাবো না, এক বন্ধু খাইয়ে দিয়েচে, আর একটু কাজে যাচ্চি, বাড়ী আসতে একটু দেরী হবে···বৌ'দির উত্তরের অপেক্ষা না করেই চলে এলো। তিন বন্ধুতে বেরিয়ে পড়লো।

(৩)

পথে যেতে যেতে সংক্ষেপে দুই বন্ধুকে লাল ফুলের ব্যাপারটি বললে, ডাক্তার বর্দ্ধন যা বলেছেন, তার আয়ু আর মাত্র কয়েক ঘণ্টা আছে। রতন কিছুতেই বিশ্বাস করে না, বলে, এ কি গাঁজাখুরী? এ কক্খনো হ'তে পারে না···

কিন্তু সমীরের মুখের ভাব দেখে শেষে তারা চুপ হ'য়ে যায়।

তারপর সমীর ব'ললে, তোমরা জানো আমি প্রফেসার সেনের মেয়ে কল্যাণীকে অনেক দিন থেকেই ভালবাসি? কিন্তু আজ পর্য্যন্ত মুখ ফুটে বলি নি, বল্‌বোও না।

রতন বললে, সে ত' জানি, কিন্তু বলবে না ত' সেখানে ছুটোছুটি কচ্চো কেন?

সমীর ব'ললে, আর ব'লে লাভ কি? কিন্তু তার চেয়েও বড় কাজ আছে, শুনেছ কি না জানি না, কল্যাণীর সঙ্গে অজয়ের বিয়ের ঠিক করেচেন ওর বাবা, সে বিয়ে আমাকে ভাঙতেই হবে। অজয়কে চেনো ত?

রতন বললে, আরেঃ, সেই হতভাগাটা ? ত'হু'বার বি, এ ফেল্ করে ব'সে আছে, খালি যত রাজ্যের মেয়ের সঙ্গে ঘুরে বেড়ায়—

দীনেশ বললে, কল্যাণীর মত অমন শান্ত, accomplished মেয়ের সঙ্গে অজয়ের মত ছেলের—অনেক টাকা আর বাপের একমাত্র ছেলে বলেই—

রতন চেঁচিয়ে উঠলো, হ'লোই বা অনেক টাকা, ছেলেটাকে দেখতে হবে না ? বুড়োর মতিচ্ছন্ন হয়েচে বোধ হয়—

সকলে প্রফেসার সেনের বাড়ীর সুমুখে এসে পড়লো।

সমীর ব'ললে, তোমরা এখন যাও···

রতন ব'ললে, থেকে যাই না হয়, যদি দরকার হয়তো অজয়টাকে ডাকিয়ে আচ্ছা করে ঠোকন্ দেওয়া যাবে।

সমীর ব'ললে, যা ক'রবার সব ব্যবস্থা আমি ক'রেচি। প্রফেসার সেনের নাম করে অজয়কে টেলিফোন করেচি, সে এক্ষুণি এসে পড়বে···

দুই বন্ধু আস্তে আস্তে চ'লে গেল। রতন ব'লে গেল, আমরা আবার ঘুরে আস্‌চি, আজ আর ছাড়ছি না তোকে· শেষ পর্য্যন্ত কি হয়···এখন যাই একবার সেই ডাক্তারের ওখানে·

(৪)

প্রফেসার সেন সমীরকে দেখেই বললেন, বসো বাবা কল্যাণীকে ডাকি ? তার আবার মাসতুতো বোন লতিকা এসেছে ক'দিন হলো পাটনা থেকে, এখন কিছুদিন থাকবে—

সমীর বারণ করে ব'ললে, না, থাক্। আজ আপনার সঙ্গেই একটু দরকারি কথা আছে। কল্যাণীর বিয়ে কি একবারে ঠিক হ'য়ে গেছে ?

প্রফেসার সেন ব'ললেন, হঁ্যা, তা সে একরকম ঠিকই। সমীর ব'ললে, সে হবে না, আপনি ভেঙ্গে দিন, এ বিয়ে হ'তে পারে না।

বিস্মিত প্রফেসার সেন ব'ললেন, হ'তে পারে না, কেন, কেন ? সমীর উত্তর দিলে, অজয়ের মত ছেলে আপনার মেয়ের যোগ্য পাত্রই নয়। আপনি ওর বাবাকে জানেন, কিন্তু, বোধ হয়, ছেলের সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই জানেন না— প্রফেসার সেন জিজ্ঞেস ক'রলেন, কেন, কি হয়েছে, ছেলে—

সমীর অধীর ভাবে ব'ললে, সে অনেক কথা, আমি খুব ভাল-রকম জানি, ওকে সৎপাত্র বলা একেবারেই চলে না—

প্রফেসার সেন ব'ললেন, এ সব তুমি কি বলচো, আজ থাক, এ সব কথা পরে বিবেচনা ক'রে—সমীর বলে উঠলো, "পরে" "বিবেচনা" এ সব আমি ভাবতেই পারি না, ও বিয়ে হ'তেই পারে না—প্রফেসার সেন একটু সোজা হ'য়ে বললেন, "হতেই পারে না ?" বিয়ে কি তুমি দিচ্ছ, না আমি দিচ্ছি, কি বিপদ—

সমীর নম্রভাবে বললে, মাপ ক'রবেন, হয় ত' আমাকে খুব উদ্ধত মনে করবেন।

প্রফেসার তখন নরম হ'য়ে ব'ললেন, আহা, তা নয়, তুমি অমন ক'রে বলছো—অবশ্য কারণ আছে, কিন্তু—

সমীর বললে, আর "কিন্তু" নয়, শুনুন, যদি অজয় নিজে বলে যে, সে বিয়ে করতে রাজি নয় ?

প্রফেসার সেন মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন, তাই বা সে বলতে যাবে কেন ? এ আমি ত কিছুই বুঝতে পারছি না !

এমন সময়ে চাকর এসে তাঁকে ডাকলে, ওপরে তাঁর খাবার দেওয়া হয়েছে। সমীর তাঁকে আশ্বাস দিলে যে, অজয় নিজেই স্বীকার ক'রবে, এ বিয়েতে সে রাজী নয়। যা ভাল হয় করো, আমি ত কিছু বুঝতে পারছি না, ব'লতে ব'লতে প্রফেসার সেন ওপরে চলে গেলেন।

এর পরেই অজয় এলো। সমীরকে সে বিশেষ চিনতো না, হয় ত দু'একবার দেখেছে। তাকে ভাল ক'রে বসিয়ে সমীর আরম্ভ করলে, যে জন্যে ডাকা হয়েছে শোন, কল্যাণীদেবীর সঙ্গে বিয়ের সম্বন্ধ তোমাকে ত্যাগ করতে হবে। বিস্মিত অজয়ের উত্তরের অপেক্ষা না রেখেই সে একেবারে রূঢ় প্রশ্নের ওপর প্রশ্নের আঘাতে তাকে জর্জ্জরিত ক'রে তুললো। সেদিন তুমি যে মেয়েটিকে নিয়ে রাত ৯টার সময় ইলিসিয়ম হোটেল থেকে বেরোচ্ছিলে, সে নীপেন বোসের বোন রেবা নয় ? এ মাসে তুমি সুরমাকে নিয়ে ক'দিন সিনেমায় গিয়েছে ?······অজয় প্রথমে স্তম্ভিত, তার পরে খুব আস্ফালন ক'রে উঠলো, আমাকে ডেকে এনে অপমান ? এ সব কথার মানে কি ? আমি চললুম—

সমীর লাফিয়ে উঠে বললে, খবর্দ্দার ! বসো চুপ করে, যা বলি শোন, না হলে টুঁটি টিপে এখুনি— । অজয় সভয়ে

বললে, ওরে বাবা! মারবেন না কি? সমীর বললে, হ্যাঁ, দরকার হলে তাও......তারপর বললে, তোমাদের কলেজে অণিমা বলে যে মেয়েটি নূতন ভর্ত্তি হয়েছে, তাকে বেনামী চিঠি লিখে প্রেম নিবেদন করেছিলে? কিডন্যাপ করবে বলে ভয় দেখিয়েছিলে? সে চিঠি আমার হাতে এসেছে। সে ট্রামে, বাসে যেখানে যায় তোমার গ্রীণ মোটর তাকে follow করে, এটা প্রমাণ করতে সাক্ষীর অভাব হবে না—অজয় বাধা দিয়ে বললে, আঃ, কি চান্? কি করতে চান? এ সব কথা—সমীর ব'লে যেতে লাগলো, অণিমার বড় ভাই সম্প্রতি কলকাতায় এসেছে, সে বেনামী চিঠির লেখক ও গ্রীণ মোটরের মালিককে খুঁজছে। যদি heroics করতে চাও, বলো, সামনেই টেলিফোন রয়েছে, তাকে তোমার নাম, ঠিকানাটা জানিয়ে দিই—অজয় কাকুতির স্বরে বললে, আচ্ছা, কেন বলুন তো এ সব বলছেন, কি চান আপনি?

সমীর বললে, প্রথমেই ত বলেছি, আমি যা বলি সেই মত প্রফেসার সেনকে এখুনি একখানি চিঠি লেখো......আর যদি বীর-রস করতে চাও, চিঠি লিখতে না রাজি থাকো, টেলিফোনে অণিমার দাদাকে—

অজয় টেবিলে উঠে গিয়ে সমীরের কথামত প্রফেসার সেনকে চিঠি লিখলে যে, কোন বিশেষ কারণে সে কল্যাণী-দেবীকে বিবাহ করতে অনিচ্ছুক ও অপারগ। সে আশা করে যে, তার চেয়ে যোগ্যতর পাত্রে তিনি কল্যাণীকে সম্প্রদান করবেন এবং তাকে মার্জ্জনা করবেন।

চিঠিখানি নিয়ে সমীর তাকে যেতে দিলে। যাবার সময় একটু দেঁতো হাসি হেসে সে বললে, হেঁ হেঁ, দেখুন সত্যি বলতে কি, কল্যাণীর মতো অমন ফিকে colourless টাইপের মেয়ে আমার পছন্দই নয়—

সমীর বললে, কি টাইপের মেয়ে তোমার পছন্দ, তা জানবার আমার আগ্রহ নেই, যাও। সে চলে গেল।

(৫)

প্রফেসার সেন যখন খাওয়া সেরে নেমে এলেন, সঙ্গে এলো কল্যাণী ও লতিকা। কিসের এত গোলমাল, বকাবকি হচ্ছিল সমীর বাবু? কে এসেছিল, আবার চ'লে গেল? কল্যাণী জিজ্ঞেস করলে। বলছি, ব'লে সমীর প্রফেসর সেনের হাতে অজয়ের লেখা চিঠিখানি দিলে। চিঠিখানি পড়ে তিনি কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে বললেন, যাক্, বেশ হয়েছে। মা কল্যাণী, ও রকম হতভাগার হাত থেকে তুমি পরিত্রাণ পেয়েছো। আঁা, ভদ্রতা একেবারে নেই, একি ছেলেখেলা নাকি?

লতিকা একান্তে কল্যাণীর কানে ব'ললে, দিদি, খুব বেঁচে গেলে—

সমীর ব'ললে, প্রফেসার সেন, আপনি আর ও রকম ক'রে কল্যাণী দেবীর অমতে তার বিয়ের ঠিক ক'রবেন না। যা ক'রবেন ওর মতামত জেনে—এইটুকু ব'ললেই আমি নিশ্চিন্ত—

প্রফেসার সেন একটা দীর্ঘশ্বাস টেনে করুণ স্বরে ব'ললেন, তাই ত দেখছি, আমি না বুঝে বড়ই অন্যায় ক'রতে যাচ্ছিলুম, তা মা কল্যাণী, তোমার মা বেঁচে থাকলে যা ব'লতেন, আমিও বলছি, তোমার মতামত না জেনে আমি আর কখনো—

লতিকা বাধা দিয়ে ব'ললে, আর মন খারাপ ক'রবেন না মেসোমশায়, আপনি ওপরে যান্।

হ্যাঁ তাই যাই, ব'লে প্রফেসার আস্তে আস্তে চলে গেলেন।

লতিকা আবার একান্তে ব'ললে, দিদি, এইবারে তোমার পথ খোলা, মেসোমশাইয়েরও হুকুম পেয়ে গেছো, এইবারে মনের কথা বলে ফ্যালো।

তুই থাম্ লতি, বেজায় ফাজিল হ'য়েছিস, কল্যাণী ব'ললে।

লতিকা ব'ললে, আমি ত' বুঝি, সোজা কথার চেয়ে আর কিছু নেই, যখন তোমার মনের কথা আমাকে ব'লেই ফেলেছো, তখন আর মিছে লজ্জা ক'রে ভবিষ্যৎ মাটি ক'রছো কেন?

কল্যাণী ব'ললে, ওরকম বাজে বক্‌বি ত তুই থাক্, আমি ওপরে চললুম—

সমীর এগিয়ে এসে ব'ললে, শোনো, যেয়ো না, আমার কিছু ব'লবার আছে—

লতিকা ব'ললে, মস্ত একটা ভূমিকা ক'রে সময় নষ্ট ক'রবেন তো? তার চেয়ে আমার মুখ থেকে শুনে নিন্, আপনার বক্তব্যে দিদির উত্তর হচ্ছে—Yes!

কল্যাণী তার মুখে হাত চাপা দিয়ে ব'ললে, চুপ কর!

সমীর ব'ললে, কল্যাণী দেবি, এ কথা যদি সত্যি হয় ত' আমার পরম সৌভাগ্য, কিন্তু সেই সঙ্গেই জানাচ্ছি আমার আমার মত দুর্ভাগ্যও কখনো কারো হয়নি।

লতিকা ব'ললে, দুর্ভাগ্য! এ কি রকম কথা সমীর বাবু?

সমীর ব'ললে, সব কথা বলছি শোন—

লতিকা বাধা দিয়ে ব'ললে, আবার সব কথা কি শুনবো? কাজের কথা হচ্ছে আপনি দিদিকে বলবেন will you? দিদি বলবে, yes! এর ভেতর আবার সব কথাটা কি?

সমীর ম্রিয়মাণ স্বরে ব'ললে, আছে, লতিকা! বড় ভয়ানক কথা, শুনলে—

ঠিক এই সময়ে সদর দরজায় বিষম জোরে ধাক্কা পড়লো, সশব্দে দরজাটা খুলে গেলো এবং প্রায় হুমড়ি খেয়ে প'ড়তে প'ড়তে বেগে দীনেশ ও রতন প্রবেশ করল।

সমীর, সমীর আছিস ভাই? আরে শোন্ শোন্ Shake hands, সুখবর—

এরা একসঙ্গেই ব'লে উঠলো, কি, ব্যাপার কি? তখন দীনেশ ব'ললে যে, সে আর রতন, সমীরকে প্রফেসার সেনের বাড়ীতে ছেড়ে দিয়ে সোজা চলে যায় ডাক্তার বর্দ্ধনের বাড়ী। সেখানে গিয়ে দেখে যে, ডাক্তার বর্দ্ধন নেই, যারা আছে তাদের কাছে যা শুনলে তার তাৎপর্য্য এই যে, কিছুদিন থেকে ডাক্তারের বিলক্ষণ মাথা খারাপ হ'য়েছিল। যে কেউ আসতো তাকেই বেবাক বুঝিয়ে দিতেন যে, কোন একটা ভয়ানক ও মারাত্মক বিষের ক্রিয়া তার শরীরে হয়েছে ও তার মৃত্যু নিশ্চিত। বোধহয়, চিরজীবন বিষ ঘেঁটে রিসার্চ্চ ক'রেই এ রকম মস্তিষ্কবিকৃতি ঘটেছিল, তাঁকে রাঁচীর পাগলা গারদে পাঠাবার ব্যবস্থা হচ্ছে—

সমীর চেঁচিয়ে উঠলো, তা হলে লালফুলের কথা সব মিথ্যা, সব বাজে?

রতন ব'ললে, আরে বাজে নয় ত কি? তখনই বলিনি, ...উঃ, কি বলবো, দুঃখু যে ব্যাটাকে পেলুম না, না হ'লে একটি চড়ে তার মুণ্ডু ঘুরিয়ে দিতুম।

লতিকা ব্যগ্রভাবে সমীরকে ব'ললে, লালফুল ডাক্তার বর্দ্ধন—মাথা খারাপ—মুণ্ডু ঘুরিয়ে, এসব কী সমীর বাবু? আমাদেরও মাথা খারাপ হয়ে উঠলো যে, আমরা কি সবাই রাঁচীর পাগলা গারদের মেম্বার নাকি?

সমীর ব'ললে, সব শুনবে লতিকা এখুনি। যাক্, দীনেশ, রতন, ভাই, ওঃ! তোমরা আমাকে প্রাণ দিলে, বাঁচালে—

রতন হেসে ব'ললে, আরে প্রাণ ত তোর ঠিকই ছিল, আমরা আর কি বাঁচালুম? বাবা, আমি গোড়া থেকেই ব'লছি—

সমীর ধপ ক'রে একখানা চেয়ারে বসে পড়লো, বললে, উঃ আমার মাথাটা ভোঁ ভোঁ ক'রছে।

লতিকা ব'ললে, চলুন ওপরে একটু ব'সবেন, ব্যাপারটা কি ভাল করে বুঝিয়ে দেবেন—

রতন ও দীনেশ বিদায় গ্রহণ ক'রলে, সমীরকে নিয়ে ওপরে যেতে যেতে লতিকা ব'ললে, বাবাঃ! কী সব কাণ্ড বাধিয়েছেন, দিদি ওঁর হাতটা ধর, আবার মাথা মুণ্ডু ঘুরে পড়ে না যান্। লালফুল—ছোট পাতা—নীলজল—কী সব বিভ্রাট ঘটিয়েছিলেন, সব শুনিগে বসে বসে—

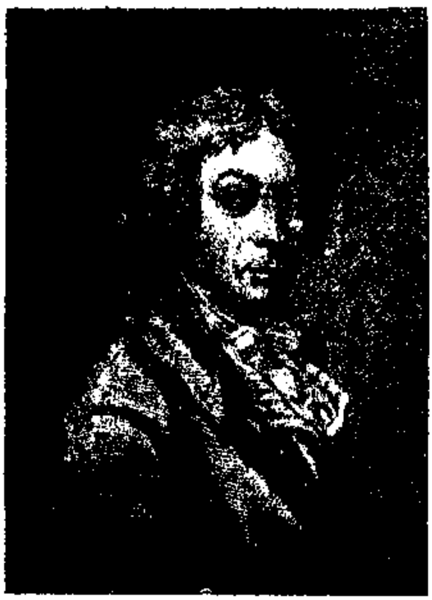
সমীর ঘড়ির দিকে চেয়ে বললে, বাপ্রে ঘণ্টা! সকাল ৯টা থেকে, উঃ, এক যুগ কেটে গেছে আমার!



বিলাতী চিত্র-শিল্পের একটী পর্য্যায়

-শ্রীজিতেন্দ্র নাগ চৌধুরী

চারু কলার মধ্যে চিত্র-কর্ম্ম সর্ব্বাপেক্ষা অধিক রস পরিবেশন ক'রে থাকে এবং মানবসমাজে বহু মনীষীর প্রভাব বিকাশে সহায়তা ক'রে থাকে, তার পরিচয় আমরা যুগে যুগে সুসভ্য উন্নতমস্তিষ্ক মনুষ্যগোষ্ঠীর মধ্যে পেয়ে থাকি। ছবি আঁকা মানুষের একটা instinct প্রাগ্ঐতিহাসিক যুগেও মানুষ অনুন্নত অবস্থাতেও ছবি আঁকত, তা কাকের ছা, বকের ছা, হলেও, ক্রমবিকাশের প্রথম যুগ। সে যুগের যা অবশিষ্ট



টমাস গেনসবরো

আমরা পেয়েছি সেই প্রাগ্মানবের গুহাজীবনে তার সঙ্গে লক্ষ্য করেছি গুহা বা প্রস্তরগাত্রে তাহার খোদাই চিত্রগুলি।

এই instinct কালে ভিন্ন ভিন্ন জাতির মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন ধারায় বা পদ্ধতিতে চিত্রবিদ্যার সৃষ্টি হয় এবং তারই ফলে জাতীয় সংস্কৃতির মধ্যে অন্যান্য রসকলার মধ্যে চিত্রকর্ম্ম বিশিষ্ট আসন ক'রে নিয়েছে এবং চিত্রকরগণ সুধীসমাজে আদর লাভ ক'রে যশস্বী হয়েছেন। আমার এই প্রবন্ধে আর্ট বলতে আমি পেণ্টিং আর্ট বা চিত্রকলা সম্বন্ধে বল্‌ব বলেই উপরোক্ত কথাগুলির অবতারণা করলাম। আর বিলাতী ব'লতে আমি সমস্ত য়ুরোপের কথা বলছি না, বলছি ইংরেজদের চিত্রকলার প্রথম যুগ সম্বন্ধে।

প্রথমেই বলে রাখি, যখন ভেনিসে, ফ্লোরেন্সে, রোমে, প্যারিতে, স্পেনে বা বেলজিয়াম ও জার্ম্মানীতে চিত্রকলার রীতিমত উন্নতি এবং প্রসার ঘটেছে তখন ইংলণ্ডে ইংরেজদের মধ্যে ভাল ছবি আঁকতে কেউ পারত না। অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইংলণ্ডের নৃপতিবৃন্দের স্বজাতির এই defeciency (অভাব) চোখে পড়েছিল, তাই হ্যান্সহলবিন, ফ্লেমিশ চিত্রকলাবিদ্ রুবেন্স, ভ্যান্ডাইক, ডাচ বা ওলন্দাজ চিত্রকর পিটার লিলি, এঁদের সাদরে আহ্বান করিতেন এবং সম্মানে ভূষিত করে দেশে কিছুদিন রাখবার চেষ্টা করতেন। ফ্লেমিশ চিত্রকলা তখন খুব উন্নতি করেছিল, অবশ্য মৌলিক স্কুলের কেউ প্রতিষ্ঠা করেন নি। সেই ভিসি, এঞ্জেলো র‍্যাফেল মাঁজিওর ধারা অনুবর্ত্তন ক'রে ইতালীয় বাস্তব পদ্ধতিতে চিত্রাঙ্কণ করে যেতেন। সকলেই চিত্রকলার তীর্থভূমি রোমের ভ্যাটিকানে, ফ্লোরেন্সের আর্টগ্যালারীতে বা ভেনিসে ঘুরে আসতেন এবং শিক্ষা ক'রে আসতেন। এক ডাচ্ চিত্র-শিল্পী রেম্বাণ্টই বা মৌলিক এবং শক্তিমান্ পোর্ট্রেট পেণ্টার ছিলেন। লণ্ডনের রাজা চার্লস্ ছিলেন কলা-রসিক এবং চিত্রশিল্পপ্রিয়। রুবেন্স্ ভ্যান্ডাইক তাঁরই উৎসাহে লণ্ডন সহরে এসে বাস করেন এবং সাধারণের মধ্যে ভাল ছবির সমাদর সেই সময় থেকেই হয়ে থাকে, এঁরাই প্রকৃত পক্ষে ইংলণ্ডে প্রথম উচ্চশ্রেণীর চিত্রাঙ্কনবিদ্যার প্রবর্ত্তন করেন। এরই ফলে অষ্টাদশ শতাব্দীতে বৃটিশ চিত্র-শিল্প উন্নতি লাভ ক'রে, কারণ, এই সময়েই হোগার্থ, উইল্সন্, রেনল্ডস্ গেন্সবরো, রোমনে প্রভৃতি কতকগুলি প্রথম শ্রেণীর চিত্রকরের আবির্ভাব হয় এবং জাতীয় চিত্র-কলাবিদ্গণ রাজার আনুকূল্যে 'রয়েল সোসাইটী অব আর্টস্' প্রতিষ্ঠা করেন।

বৃটিশ চিত্রকলায় উইলিয়াম হোগার্থ-এর মত শিল্পী বোধ করি কমই জন্মেছিল। বাহিরের প্রভাব চতুর্দ্দিক থেকে খুব প্রবল, সাধারণে তেমন ছবি ভালবাসে না—

অল্পবয়সে সুন্দরী মেয়ে বিয়ে করেছিলেন, তার উপর সামান্য গৃহস্থের ছেলে, কাজে কাজেই পয়সা রোজগারের জন্য তৈলচিত্রে পোর্ট্রেট আঁকা তাকে শিখতে হয়েছিল এবং শেষ পর্যান্ত লণ্ডন সহরের কাছে এক বাথ-এ গিয়ে বাস করতে হয়েছিল। তখন কার দিনে ফটোগ্রাফের বদলে আঁকা ছবিই চলত এবং বেশ দামে কাটত। টমাস ল্যাণ্ডস্কেপ ছেড়ে পোর্ট্রেট চিত্রাঙ্কণে মন দিলেন এবং অচিরেই এত ভাল ভাল ছবি এঁকে দিলেন যাহাতে যে-সুধীসমাজে রেনল্ডসের ভয়ানক পসারপ্রতিপত্তি ছিল, সেখানে যশুয়ার সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা উপস্থিত হল। [illegible] সার যশুয়া ঈর্ষায় গেন্সবরোর নিন্দা ক'রে বেড়াতেন বটে, কিন্তু প্রতিদ্বন্দ্বিতায় হেরেযেতেন। একখানি ছবি আমরা ধরছি—ডাচেস্ অব ডেভনস্যায়ার



ইতালীর প্রাকৃতিক দৃশ্য : শিল্পী—রিচার্ড উইলসন্



পারেন ... (ন্যাশনাল গ্যালারি) শিল্পী—হোগার্থ

এলিজাবেথের ছবি। ডাচেস-এর ছবি এঁকেছিলেন রেনল্ডস, রোমনে, গেন্সবরো, রেবার্ণ—কিন্তু এলিজাবেথের চক্ষু ঝলসান রূপ, চঞ্চল ভাবপূর্ণ দেহবল্লরীকে টমাস যেরূপ ফুটিয়ে তুলতে পেরেছিলেন, সেরূপ কেহই পারেন নাই। সেই ছবিটী এখানে দেওয়া গেল—ডাচেসের ছেলেমানুষীর মধ্যেও কেমন পারসন্যালিটী ফুটিয়েছেন শিল্পী—তা ছাড়া Grace এবং পোজ দুই কেমন সামঞ্জস্য (balance) সহিত মিলে দর্শকদের আনন্দ দেয়। এলিজাবেথের মুখখানিতে পর্য্যন্ত আনন্দের ভাব, অথচ বুদ্ধির জেল্লার ছাপ কেমন প্রতিমূর্ত্ত হয়েছে। ছবিটী গেন্সবরোর প্রবীণ বয়সে আঁকা। ১৮৭৬ সালে এটী প্রথম লণ্ডন আর্ট-গ্যালারীতে (London Art Gallery) দেখান হয়—সেই প্রথম প্রদর্শনীতেই ছবিটী দশ হাজার গিনিতে বিক্রয় হয় কিন্তু ছবিখানি আমাদের মত বা তার চেয়েও বেশী একজনের এমন ভাল লাগে যে, তিনি প্রলোভন সামলাতে না পেরে ওই প্রদর্শনীতেই অদ্ভুত ভাবে ফ্রেমচ্যুত করে ছবিটা অপহরণ করেন। চোর মহাশয়টী কে জানা যায় নি, তবে যিনি ছবি কিনেছিলেন তিনি গোয়েন্দা

লাগিয়ে ছবিখানি উদ্ধার করেছিলেন অনেক পরে আমেরিকা থেকে। এই ছবিটীতে গেনসবরো পৃথিবীর কাছে একজন যশস্বী চিত্র-শিল্পী রূপে পরিচিত হন—রাজদরবারে আপ্যায়িত হন এবং কলা-রসিক সমাজের বা লণ্ডনের উচ্চতম সমাজে সম্মানের আসন লাভ করেন। ব্লুবয় ছবিটী মাষ্টার বুটালের—নীল রং কি ভাবে ল্যাণ্ডস্কেপ ছেড়ে পোর্ট্রেট অঙ্কনে ব্যবহার করা যায় এবং বিশেষ ক'রে রেনল্ডসকে দেখিয়ে এই বিশ্বপরিচিত চিত্রটী আঁকেন। এটীও এখানে দেওয়া গেল।

চলি দূর্ পথে দু'পহর বেলায়

বন্দেআলা মিয়া

চলি দূর পথে হিমেতপুরের গাঁয়
ময়নামতীর বটগাছ ছাড়ি পীরতলা রাখি বাঁয়;
চলি একা একা—ঝাঁ ঝাঁ করে রোদ—ছায়া নাই একেবারে
বাব্লার গাছ দূরে দাঁড়াইয়া হেথা হোথা চারিধারে।
'আলের দু'পাশে নাইকো ফসল—সারা মাঠ শুধু ফাঁকা
এ ক্ষেতে ও ক্ষেতে কলাই মটর জড়ো করে আছে রাখা।
কৃষাণেরা আসে বিহান বেলায় গামছা বাঁধিয়া মাথে—
হুঁকা ও কল্কি তামাকের ডিবা—পাটখড়ি আনে সাথে।
কলাই মটর সরিষা ও যব যেথায় যেমন রয়
কৃষাণেরা আসি ছড়াইয়া দেয় ক্ষেতের আঙিনাময়।
তারপরে তারা গরু ঘুরাইয়া মলিবারে শুরু করে
গাছ হতে যত ফসলের দানা ঝরিয়া মাটিতে পড়ে।
রাখাল ছেলেরা তামাক সাজিয়া বড়দের কাছে দিয়া
মলনেতে যায়—তাড়ায় গরুরে লাঠি তার হাতে নিয়া।

দু'পহর বেলা—পুড়ে যায় মাথা—ঝাঁ ঝাঁ করে চারিধার
কৃষাণের বৌ ভাত রেঁধে রেখে পথ চায় বার বার।
এতবেলা তবু স্বোয়ামী ও পুত ফিরিল না তারা বাড়া
ঘরের কানাচে আসিয়া দাঁড়ায় দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছাড়ি'—
সাজিনার শাখে বসি দাঁড়কাক কেন যে কেবল ডাকে
কঞ্চি লইয়া কৃষাণ-যুবতী তাড়াইয়া দেয় তাকে।
উঠানের পরে মুরগীর পাল খুদকুঁড়া কিছু নিয়া
শিশুদের দেয়—ধাড়িদের দেয়—দেয় দূরে ছড়াইয়া।
কোলাহল করি খায় সবে মিলে—কাক এসে ভাগ লয়
মাঠপানে চাহি ঘরের কানাচে বউ দাঁড়াইয়া রয়।—

মলনের শেষে খামারের' পরে দানাগুলি পড়ে থাকে
সাপটিয়া সব ছালাতে ভরিয়া সাজাইয়া তায় রাখে।
কৃষাণের যত সাধ আর আশা ইহারে জড়ায়ে রয়
শীত আর রোদ ইহার লাগি সে করে নাই কভু ভয়
দূর পথে যেতে দেখি চেয়ে চেয়ে সারা মাঠখানি হায়
সন্তান হারা জননী সে যেন কাঁদিতেছে বেদনায়।

জাতীয় মহাসমিতির ইতিহাস

—শ্রীহেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত

(৭)

বোম্বাই, কলিকাতা ও মান্দ্রাজে যে কংগ্রেসের পর পর তিনবৎসর অধিবেশন হয় তাহাতে গভর্ণমেণ্ট বিশেষ সহানুভূতি প্রকাশ করেন। কিন্তু চতুর্থ অধিবেশন হইতেই উহার সুর হঠাৎ বিপরীত ভাব ধারণ করিল। কংগ্রেসের প্রারম্ভ হইতেই ভারতে য্যাংলো-ইণ্ডিয়ানদের মুখপত্র 'ইংলিসম্যান' ও 'পাইওনিয়ার' নামক দৈনিক সংবাদ-পত্রদ্বয় সম্পাদকীয় স্তম্ভে বিষ উদ্গারণ করিতে থাকে। তাহারা কংগ্রেসের 'ন্যাসন' জাতি কথাটায় উপহাস করিতে থাকে। ভারতের সিভিল-সার্ভিসের শ্বেতকায় চাকুরিয়াবর্গও বরাবর কংগ্রেসের বিরুদ্ধেই ছিল এবং এপর্য্যন্ত বোম্বাই ও মান্দ্রাজের গভর্ণর এবং ভারতের গভর্ণর জেনারেল (তিনজনই পার্লামেণ্ট কর্ত্তৃক মনোনীত) ইহার সিদ্ধি কামনা করিলেও এবার এলাহাবাদের সিভিলিয়ান লেফ্‌টানাণ্ট গভর্ণর স্যার অকলাণ্ড কল্‌ভিন্ ইহার প্রতিকূলাচরণ করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলেন। এলাহাবাদের অধিবেশনের কথা শুনিয়া তিনি তাঁহার পূর্ব্ব দরবারে অধিবেশনেই উহার প্রতি বক্র কটাক্ষ করিয়া বলেন -

"You should fix your attetnion on matters falling within the legitimate scope of your action and not waste it in the discussion of more ambitious schemes the carrying out of which requires that collective action and that practical handling of affairs which is the result of a long and laborious training in the conduct of public business such as you have scarcely even commenced to impose on yourselves."

কেবল কল্‌ভিন্ সাহেবই যে এই মত পোষণ করিতেন, তাহা নহে। পরন্তু কংগ্রেসের পূর্ব্বে তিনি এক ইস্তাহার প্রকাশ করিয়া রাজকর্ম্মচারীদিগকে রাজনৈতিক সভায় যোগদান করিতে নিষেধাজ্ঞা প্রচার করেন। ইতিপূর্ব্বে তিনবারেই কংগ্রেসের প্রতি সহানুভূতি দেখাইবার জন্য শাসনকর্ত্তারা যেন উদ্গ্রীব হইয়া থাকিতেন। এবার কিন্তু অধিবেশনের সময় কল্‌ভিন্ সাহেব এলাহাবাদ পরিত্যাগ করিয়া মফঃস্বল পরিভ্রমণে বহির্গত হইয়া যান।

কেবল তাহাই নহে, কংগ্রেস অধিবেশনের স্থান সংগ্রহেও অভ্যর্থনা-সমিতিকে কম অসুবিধা ভোগ করিতে হয় নাই। প্রথমতঃ, বিখ্যাত উকীল পণ্ডিত অযোধ্যানাথ ও তাঁহার সহকর্ম্মীরা এলাহাবাদের খস্‌রুবাগে সম্মিলন বসাইবার উদ্যোগ করিয়াছিলেন; কিন্তু রাজপুরুষগণ তাহাতে আপত্তি করায় কেল্লার (fort) নিকটে কয়েকখানা গৃহ ও কতকটা জমি লইয়া তথায় সভা করিবার উদ্যোগ করা হয়। কিন্তু রাজপুরুষগণ যাত্রী ও নিকটস্থ অধিবাসীদের স্বাস্থ্যহানির অজুহাতে তাহার প্রতিবাদ করেন ও পূর্ব্বে যে ভাড়া বাবদ টাকা দেওয়া হইয়াছিল তাহা প্রত্যর্পণ করেন। উদ্যোক্তারা ইহাতেও নিরুৎসাহ না হইয়া ক্যাণ্টনমেণ্টের মধ্যে "পায়োনিয়ার" ("নববিভাকর" পাইওনিয়ারকে বলেন— "প্রয়াগধামের মনসাদেবী") আফিসের নিকটে সেনানিবাসের কাছে তাঁবু স্থাপনের চেষ্টা করেন কিন্তু এখানেও স্বাস্থ্যহানির ছুতায় আপত্তি হয়। অতঃপর অযোধ্যানাথ এক কৌশল অবলম্বন করিলেন—('নববিভাকর' বলেন—চোরা চাল চালেন)।

লাক্ষ্ণৌ নিবাসী জনৈক নবাবের একখানা প্রকাণ্ড বাড়ী ছিল। উহার নাম লৌথার ক্যাসেল (Lowther Castle) অযোধ্যানাথ পূর্ব্বেই উহা ভাড়া নিয়া অগ্রিম টাকা দেন এবং কংগ্রেসের অধিবেশনের বহুপূর্ব্ব হইতেই উহা একেবারে দখলই করিয়া ফেলেন। এই বাড়ীখানি সম্বন্ধেও একটু গোলমাল হইয়াছিল, কিন্তু কার্য্যকরী হয় নাই। বাড়ীটী ভাল দেখিয়া দ্বারভাঙ্গার মহারাজা স্যার লক্ষ্মীশ্বর সিংহ উহার দুই তিন বৎসর পরে ক্রয় করিয়া ফেলেন ও কংগ্রেসের ব্যবহারের জন্য রাখিয়া দেন। মহারাজা বাহাদুরের মহত্বগুণে ও দেশবাৎসল্যে অতঃপর কংগ্রেসের স্থান সম্বন্ধে আর কখনও গোলযোগ হয় নাই। কেন না কর্ত্তৃপক্ষের কোন আপত্তিই আর টিঁকে নাই। স্থানটীও Albert Park এর

নিকটবর্ত্তী এবং পার্শ্ববর্ত্তী বাড়ীগুলি সবই দূরবর্ত্তী স্থানে অবস্থিত ছিল বলিয়া কাহারও আপত্তি হইবার কারণ হয় নাই।

এবার প্রতিনিধি সংখ্যাও হইল দ্বিগুণ ১২৪৮ (১৮৮৭তে হইয়াছিল ৬০৭) এবং ইহাদের মধ্যে মুসলমান ২২১,* খ্রীষ্টান ২২০, শিখ ৬, জৈন ১১, পার্শী ৭ ও অবশিষ্ট সকলেই ছিলেন হিন্দু। কংগ্রেস অধিবেশন উপলক্ষে কর্ত্তৃপক্ষের চেষ্টা যতই প্রবল হইয়াছিল, সাধারণের উৎসাহও ততই দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছিল। এই উৎসাহই এবার কংগ্রেস-সাফল্যের অন্যতম কারণ।



পণ্ডিত অযোধ্যানাথ

ইতিপূর্ব্বে যে গভর্ণর জেনারেল ডাফরিণের সঙ্গে পরামর্শ করিয়াই কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হয়, এবারে সেই লর্ড ডাফরিনও যেন ভিন্ন সুর ধরিলেন। তাঁহার বিদায়ের প্রাক্কালে কলিকাতার শ্বেতাঙ্গগণ ৩০শে নভেম্বর ১৮৮৮ তারিখে সেন্ট এণ্ড্রুজ ডিনার উপলক্ষে টাউনহলে সম্মিলিত হইলে, Sir Alexender Wilson নামে একজন ব্রিটিশ বণিক্ বিদায় সম্বর্দ্ধনা কালে বলেন—

"যাহাদের উপর বিশ্বাস স্থাপন করা যায় এরূপ দায়িত্ব বোধ সম্পন্ন ব্যক্তি আরও উপযুক্ততা দেখাইতে পারিলে হয় তো ভবিষ্যতে অধিকতর রাজনৈতিক অধিকার প্রদান অসম্ভব হইবে না। কিন্তু বর্ত্তমানে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন ব্যাপারে (মিউনিসিপ্যালিটি ও ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড) কিছু তৎপরতা দেখা গেলেও, সাফল্য বলিতে যাহা বুঝা যায়, সেই অবস্থায় আসিতে এখনও অনেক দেরী আছে।

"বর্ত্তমান সংস্কার ও উন্নতির দিনেও কোন বিষয়েই দ্রুত পাদবিক্ষেপ সঙ্গত নয় এবং আজ আমাদের বিশিষ্ট অভ্যাগত গভর্ণর জেনারেল বাহাদুরের নিয়ন্ত্রণের ফলেই সেরূপ কিছু হইতে পারে নাই।"

"The day may come when further political privileges may be granted to those who, holding a stake in the country, have shown themselves fit to exercise them; but though much has been done to bring the theory of local Self-Government within a workable adaptation of means to ends, there is much more to be achieved before it can be pronounced a success in this country. (cheers)

Even in this age of progress there is such a thing as going too fast and the country owes much to our noble guest here to-night for having moderated the pace (renewed cheers),"

সভায় আরও অনেক জটিল সমস্যা উত্থাপিত হয়, এবং লর্ড ডাফ্রিনের মতামতের জন্য সকলে ব্যগ্র হইয়া উঠেন। লর্ড ডাফ্রিণও একটী সুদীর্ঘ বক্তৃতা করিয়া কথা প্রসঙ্গে বলেন—

Now gentlemen, some intelligent, loyal, patriotic and well-meaning men are desirous of taking, I will not say a further step in advance, but a very big jump into the unknown by the application to India of democratic methods of government and the adoption of a parliamentary system which England herself has only reached by slow degrees and through the discipline of many centuries of preparations.

--Vide Englishman Dec. 1, 1888

*"We were straining every nerve to secure the co-operation of our Mohammaden fellow countrymen in this great national work. We sometimes paid the fares of Mohammedan delegates and offered them other facilities."

—Surendra nath's Nation in Making P 108.

"কয়েকজন বুদ্ধিমান্ রাজভক্ত, দেশপ্রাণ এবং সরল ব্যক্তি যেন অন্ধকারে লম্ফপ্রদান করিতে উন্মুখ হইয়াছেন বলিয়া মনে হয়। তাঁহারা বলেন, বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের অনুরূপ গভর্ণমেণ্টই এদেশে প্রবর্ত্তিত হওয়া সঙ্গত। আচ্ছা বলুন তো, ইংলণ্ডে যে প্রকার গভর্ণমেণ্ট প্রচলিত তাহা তো একদিনে হয় নাই। বহু শতাব্দীব্যাপী আয়োজন, চেষ্টা ও শৃঙ্খলার সহায়তায়ই তো আস্তে আস্তে সেই শাসনপ্রথা লব্ধ হইয়াছে। ইঁহারা চাহেন যে, শাসনপ্রথা প্রতিনিধিমূলক হউক, আমলাতন্ত্র তাঁহাদের আজ্ঞাবহ থাকুক, ধনভাণ্ডারের উপর তাঁহাদের আধিপত্য থাকুক এবং ক্রমে ব্রিটিশ কর্ত্তৃপক্ষ তাঁহাদের আজ্ঞাবহ হইয়া পড়ুক। তাঁহাদের পরবর্ত্তী কার্য্য—যেন ভারতীয় সৈন্যই দেশরক্ষায় নিয়োজিত হয় এবং যেন ব্রিটিশ সৈন্য অর্দ্ধাংশে পরিণত হয়।

"ইংলণ্ডবাসী কি এ প্রস্তাবে সম্মতি প্রদান করিবে? এরূপ প্রণালীই অবৈধ (unconstitutional) আর ভারতের ২০ কোটি লোকের মধ্যে শতকরা ৫ জন লিখিতে পড়িতে পারে, আর ইংরাজী পড়িতে পারে একজনেরও কম। বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয় ১৮৫৭ সালে, কিন্তু এই ৩১ বৎসরে ১০০০ জন ও নয়, এ উপাধিপ্রাপ্ত হয় নাই, আর শিক্ষালোকই পায় নাই অসংখ্য ব্যক্তি। এমতাবস্থায় ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট এত নগণ্য ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্রসংখ্যক শিক্ষালোকপ্রাপ্ত ব্যক্তির উপরে এত বড় বিস্তীর্ণ রাজ্যের শাসনভার দিয়া কিরূপে নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন? এই সব লোক কি নিজের প্রতিনিধিত্ব নিজেই জাহির করিতেছেন, না, তাঁহারা নিজেদের গঠনকর্ত্তা কি নিজেরাই নয়? এমতাবস্থায় কিরূপে নির্ব্বাচন-প্রথা সম্ভব?"

'I would ask them how could any reasonable man imagine that the British Government would be content to allow 'this microscopic minority' to control their administration of that majestic and multiform empire for whose safety and welfare they are responsible in the eyes of God and before the eyes of civilization. It has been stated that this minority represents a large and growing class and I feel very sure that as time goes on it is not only the class that will grow but the information and experience of its members. At present, however, it appears to me a groundless contention that it represents the people of India. If they had been the real representatives of the people of India, that is to say, of the voiceless millions instead of seeking to circumscribe the incidence of the income tax as they desired to do, they would have received a mandate to decuple it (laughter). Indeed is it not evident that large sections of the community are already becoming alarmed at the thought of 'such self-constituted bodies' interposing between themselves and the august impartiality of English rule. These persons ought to know that in the present condition of India, there can be no effective representation of the people with their enormous numbers, their multifarious interests and their tasselated nationalities."



লর্ড ডাফ্‌রিণ

পাঠক তিনটী শব্দ বিশেষ মনে রাখিবেন,—'Leap in the dark', 'Microscopic minority' এবং 'Self constituted bodies'. এই তিনটী কথা লইয়া চারিদিকে বিশেষ আন্দোলন উপস্থিত হয়।

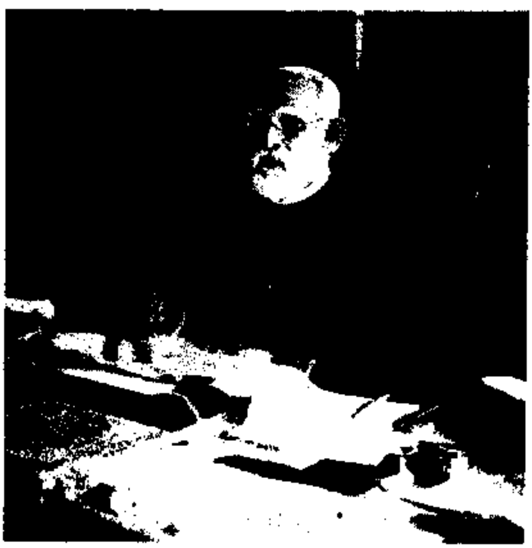
এই বক্তৃতা সম্বন্ধে "ইংলিসম্যান বলেন", merciless logic এবং লর্ড সাল্প, ডাফ্‌রিণকে সমর্থন করেন। অবশ্য হিউম সাহেবও তাঁহার সম্বন্ধে ২।১টী কথা থাকায় প্রত্যুত্তর দেন।

ইংলিসম্যান, হিউম সাহেবকে Guy Fawkes, Seditious প্রভৃতি বলিয়া উপহাস করিতে ত্রুটী করেন নাই। ব

যে, আশ্চর্য্যের বিষয় হিউম সাহেব এখনও গভর্ণমেণ্টের পেন্‌সন্ লাভ করিয়া গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধেই কিরূপে এইরূপ বিদ্বেষ-বিষ প্রচার করিতে সাহস করেন !

"Mr. Hume's occupation is to foment race-animosity and to use the ignorant, credulous and aspiring native as a weapon with which to harrass the Government whose pay he still continues to draw."

ব্রাড্‌ল সাহেব, লর্ড ডাফ্‌রিণের এই অভিভাষণ বিলাতের Times পত্রে পাঠ করিয়া এতই ক্ষুব্ধ হন যে, New Castle এর একটী সভায় এ সম্বন্ধে তিনি প্রত্যুত্তর দিতে শৈথিল্য করেন নাই। লর্ড ডাফ্‌রিণ বিলাতে তাহা পড়িয়া খুবই লজ্জিত হয়েন এবং তাঁহাকে লেখেন—



স্যর সুরেন্দ্রনাথ

That he had not misrepresented the Congress that he neither directly nor by implication suggested that the Congress was seditious, that he always spoke of the Congress in terms of sympathy and respect and treated its members with great personal civility, that he was always in favour of Civil Service reform so that Indians might obtain more appointments in it, as proved by his appointment of the Civil Service Commission and that he himself was in favour of such a reform of the Provincial Councils in India as he (Mr. Bradlaugh) appeared to advocate."

চার্লস্ ব্রাড্‌ল সাহেবের ভারত হিতৈষণা চিরপ্রসিদ্ধ। ইলবার্ট বিল সম্বন্ধে তাঁহার ওজস্বিনী অভিভাষণের কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আর ১৮৮৮ সালে তিনি পার্লেমেণ্টে প্রস্তাব করেন—

"Suggested that a commission including natives be appointed to enquire into the administration of India with power to take evidence both in India and England."

অর্থাৎ কমিশন নিযুক্ত হইয়া ভারত শাসন প্রণালী সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিবেন, এই কমিশনের সভ্য কেবল ভারতবাসীই হইবেন এবং ভারত ও ইংলণ্ড উভয় স্থানের প্রধান লোকদেরই সাক্ষ্য গ্রহণ করা হইবে।

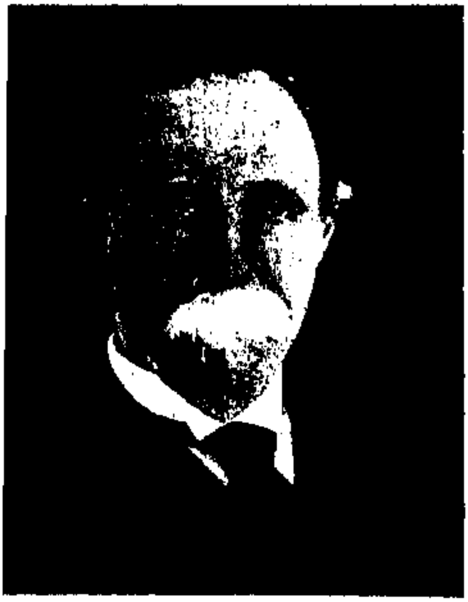
লর্ড ডাফ্‌রিণ, ব্রাড্‌ল সাহেবকে আর একখানি পত্রেও লেখেন,—

"I think our efforts should be applied rather to the decentralisation of our Indian administration than its greater unification and I made considerable efforts in India to promote and expand this principle. In any event I am sure the discussion which you will have provoked will prove very useful and I am very glad that the conduct of it should be in the hands of a prudent, wise and responsible person like yourself, instead of having been laid hold of by some advanturous franc tireier whose only object might possibly have been to let off a few fire-works for his own glorification,"

কিন্তু কার্য্যকালে ইহা হয় নাই। বেশী প্রতিবন্ধক হইয়াছিলেন পার্লেমেণ্টের অন্যতম সভ্য J. M. Maclean. তিনি এই প্রথায় ভারতবর্ষকে রাজনৈতিক আন্দোলনের ঘূর্ণিপাকে নিক্ষেপ করা হইবে বলিয়া আপত্তি করেন, Deprecated the appointment on the ground that it would tend to plunge India into prolonged and incessant agitation.

এই ম্যাক্লিন সাহেবকে তাহার অন্যায়োক্তির প্রতিবাদ করিয়া চিত্তরঞ্জন কিরূপে ১৮৯১ সালের নির্ব্বাচনে উঁহার নির্ব্বাচন ব্যর্থ করেন আমরা "দেশবন্ধু স্মৃতি"তে তাহা বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করিয়াছি। যাহাহউক, লর্ড

ডাফ্‌রিণের "Microscopic minority, 'Leap in the dark,' 'Unconstituted bodies' প্রভৃতি অনুদার



মিঃ হিউম

উক্তিতে শিক্ষিত মণ্ডলে বড়ই চাঞ্চল্য উপস্থিত হইল এবং কংগ্রেসের প্রতি তাহাদের পক্ষপাতিত্বও বৃদ্ধি পায়।

উত্তর পশ্চিম প্রদেশে দুইজন খ্যাতনামা লোক বিপক্ষাচরণ করায়ও সেখানে ক্ষতি হইয়াছিল। একজন আলিগড় কলেজের প্রতিষ্ঠাতা স্যার সৈয়দ আহম্মদ আর একজন কাশীর জমিদার রাজা শিবপ্রসাদ।

স্যর অক্‌ল্যাণ্ড কল্‌ভিনের সঙ্গে মিঃ হিউমের অনেক দিন পর্য্যন্ত চিঠিপত্রে বাদ-বিসম্বাদ চলিয়াছিল। স্যর অক্‌ল্যাণ্ড কংগ্রেসকে আক্রমণ করেন আর হিউম সাহেব উহার সমর্থন করেন। কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা আক্ষেপের বিষয় এই যে, একদিন লর্ড ডাফ্‌রিণই মিঃ হিউমকে কংগ্রেস যেন সামাজিক অনুষ্ঠান হইতে রাজনৈতিক অনুষ্ঠানে পরিণত হয় এই উপদেশ দিয়া ঐরূপ করিতে প্ররোচিত করেন। আশ্চর্য্যের বিষয় তিনিই আবার কংগ্রেস রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হওয়ায় কিরূপে আজ এরূপ গালিগালাজ করিতে পারেন?

এই চতুর্থ অধিবেশনে বেঙ্গল চেম্বার অব কমার্সের প্রেসিডেণ্ট মিঃ জর্জ ইউল (G. Yule) সভাপতির আসন গ্রহণ করেন এবং ব্যবস্থাপক সভার সংস্কার সম্বন্ধে বিশেষ ওজস্বিনী ভাবে বক্তৃতা করেন। নিম্নলিখিত প্রস্তাবাদি উত্থাপিত হয়। বিলাতের পার্লামেণ্টের উদারনীতিক সভ্যগণও কংগ্রেসকে খুব উদার ও সহানুভূতিসূচক দৃষ্টিতেই দেখিতেন। জন্ ব্রাইট তখন অসুস্থ ছিলেন। তাঁহার পুত্র, জর্জ্জ ইউলকে টেলিগ্রাফ করিয়া জানান—

"Father better, thanks Congress warmly".

ইতিপূর্ব্বে লর্ড সেলিসবারীও যে কংগ্রেসের প্রাক্তন সভাপতির প্রতি একটি সভায় অশিষ্টোচিত উক্তি প্রয়োগ করিয়াছিলেন তিনিও তাহার কতিপয় বন্ধুর নিকট এইজন্ত বিশেষ দুঃখ প্রকাশ করিয়া ত্রুটী জানান যে, উত্তেজনা বশতঃই তিনি এইরূপ কথা বলিয়াছিলেন।

ঘটনাটী এইরূপ হয়। নৌরজি সাহেব পদপ্রার্থী হন Holborn Division of Finisbury পক্ষ হইতে, প্রধান মন্ত্রী Lord Salisburyর মুখ হইতে Blackman of India কথা বাহির হওয়ায় গ্লাডষ্টোন সাহেবও তাঁহাকে খুব তিরস্কার করেন। কিন্তু প্রথমে Lord Salisbury অস্বীকার করেন। Prime Minister denied that the use of the term



স্যর সৈয়দ আহম্মদ

'blackman' was a contemptuous denunciation of the people of India—যাহা হউক, পরে তিনি দুঃখ প্রকাশ করিয়া বলেন, It fell from him in the excitement of the moment

এই অধিবেশনে নিম্নলিখিত প্রস্তাবাদি গৃহীত হয় :—

(১) Reform of Legislative Councils.

(২) পাব্লিক্ সার্ভিস কমিশনের রিপোর্ট আলোচনা,

(৩) Separation of judicial and executive functions,

(৪) জুরীপ্রথার ও ক্ষমতার আলোচনা,

(৫) পুলিশ সংস্কারের জন্ম কমিশন নিয়োগ প্রার্থনা,

(৬) আব্গারী বিধির সংস্কার,

(৭) হাজার টাকা আয় হইলে ট্যাক্স প্রদান প্রার্থনা,

(৮) শিক্ষার ব্যয়বৃদ্ধির প্রার্থনা,

(৯) Industrial Surveyর জন্ম কমিশন প্রার্থনা,

(১০) লবণের ট্যাক্স হ্রাস করার প্রস্তাব,

লর্ড ডাফ্রিণের চেষ্টায় ১৮৮৭ সালে একটী রয়েল কমিশন নিয়োগ হয়। সাক্ষ্য প্রমাণ গ্রহণে চাকুরী প্রথার কিরূপে উন্নতি সাধন করা যায়, তাহা নির্দ্ধারণ করাই কমিশনের উদ্দেশ্য ছিল। স্যার চার্লস টার্ণার ছিলেন কমিশনের চেয়ারম্যান। প্রায় একবৎসর পর কমিশনের কার্য্য শেষ হয়। এবং একটী রিপোর্ট প্রদান করা হয়।



জর্জ ইউল

এই কমিশনে সিভিল সার্ভিস পরীক্ষার বয়স যেন ১৯ হইতে ২৩এ বৃদ্ধি করা হয়, কিন্তু ইংলণ্ড ও ভারত উভয় স্থানেই পরীক্ষা প্রবর্ত্তনের স্বপক্ষে কিছুই যেন না করা হয়, এই ভাবে রিপোর্ট দেওয়া হইয়াছিল।

এখন কংগ্রেস হইতে প্রস্তাব হয় যে, উভয় স্থানেই যেন পরীক্ষা গ্রহণের বন্দোবস্ত করা হয়। মাদ্রাজের মিঃ জন আডাম সংশোধন প্রস্তাব করিতে চাহেন যে, এ দেশে পরীক্ষা হইলেও বিলাতে কিছুদিন শিক্ষালাভ করিতেই হইবে। বাঙ্গালার বিখ্যাত মতিলাল ঘোষ ইহাতে খুব ক্ষুব্ধ হন এবং যাহাতে এইরূপ প্রস্তাব না হয় তজ্জন্ম বিশেষ চেষ্টা করেন। তাঁহার ভয় হয় যে, এরূপ প্রস্তাব গৃহীত হইলে গোঁড়া হিন্দুগণ কংগ্রেস হইতে সরিয়া পড়িবেন। নিম্নলিখিত ভাবে প্রস্তাব গৃহীত হয় :—

"Congress appreciated the concessions proposed by the Public Services Commission but stated that full justice would never be done to the people of the country until open competitions for the Indian Civil Service were held simultaneoously in England and India,

অর্থাৎ কমিশন যতটুকু সুবিধার জন্ম সুপারিশ করিয়াছেন, ততটুকুর জন্ম সভাগণের যত্ন খুবই প্রশংসনীয়, কিন্তু ভারত ও ইংলণ্ড উভয় স্থানে সমভাবে পরীক্ষা প্রথা প্রবর্ত্তিত না হইলে ভারতবাসীর প্রতি সুবিচার করা হইবে না।

অধিবেশনে লর্ড ডফ্রিণের অভিভাষণের তীব্র প্রতিবাদ করা হয়। সুরেন্দ্রনাথ বলেন যে মহাত্মা গ্লাডষ্টোন কংগ্রেসের সমর্থন করেন, আর লর্ড ডাফরিণের প্রতিকূলতা করার কারণ কি ? গ্লাডষ্টোন সাহেব জনৈক মুসলমানের প্রশ্নের উত্তরে বলিয়াছেন—

"It will not do for us to treat with contempt or even indifference the rising aspirations of this great people."

সভায় রাজা শিবপ্রসাদ ডেলিগেট হইয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন। তাহাতে অনেকে আপত্তি করেন কারণ তাঁহার জাতীয়তাবিরোধী মতামত কাহারও অপরিজ্ঞাত ছিল না। তবে তাহাকে ডেলিগেটদের নিকট হইতে কতক দূরে প্রেসিডেন্টের নিকটবর্ত্তী স্থানে বসান হয়। কাউন্সিল-সংস্কার প্রস্তাবের সময় লর্ড ডাফ্রিণের উক্তির আলোচনার মধ্যে রাজা শিবপ্রসাদ একটী অদ্ভুত প্রস্তাব করিয়া ফেলেন। প্রস্তাবটী পরে প্রমাণিত হয় যে Seditious speeches (রাজদ্রোহকর বক্তৃতা) বন্ধ করিবার জন্ম গভর্ণমেণ্টকে আবেদন মাত্র। সমগ্র প্রতিনিধি ও দর্শকবর্গ অতিশয় ক্ষুব্ধ ও বিচলিত হন এবং এতই উত্তেজিত হইয়া পড়েন যে, বহু কষ্টে রাজাকে কোন রকমে নিরাপদে বাড়ীতে পৌঁছাইয়া দেওয়ার বন্দোবস্ত করা হয়।

কংগ্রেসের পরবর্ত্তী অধিবেশন হয়, ১৮৮৯ সালে বোম্বাই নগরীতে এবং উহার প্রধান আকর্ষণ ভারত-বন্ধু ব্রাড্লো সাহেবের উহাতে যোগদান। ইলবার্ট সম্বন্ধে ব্রাড্লো

...হেবের লণ্ডনে বক্তৃতার কথা আপনাদিগকে পূর্ব্বেই ...লিয়াছি। স্যর উইলিয়াম ওয়েডারবার্ণ সভাপতির আসন গ্রহণ করেন এবং স্যর ফেরোজশা মেটা অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি হন।

এই উপলক্ষে ব্রাড্‌লো সাহেবকে কংগ্রেস হইতে অভিনন্দন দেওয়া হয়। সভাপতি স্যর উইলিয়ামই সেই অভিনন্দন-পত্র পাঠ করেন। প্রত্যুত্তরে ব্রাড্‌লো সাহেব যে কয়টী কথা বলেন তাহাও সকলের কর্ণে ঝঙ্কৃত হয়। যাহা হউক, সে প্রসঙ্গ আমরা আগামীবারে করিব।

এই প্রসঙ্গে একটী কথা বলিতে ভুলিয়া গিয়াছি, এলাহাবাদে যখন জাতীয় মহাসমিতির অধিবেশন হয়, আলিগড়ের স্যর সৈয়দ আহম্মদের প্রচেষ্টায় সেই সময় লাহোরে একটী মুসলমান কংগ্রেসের অধিবেশন হয়। গুজরাটের ডিষ্ট্রিক্ট জজ Sirdar Mahomad Hatkhan C. S. I. সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়া স্যর সৈয়দ আহম্মদকে Messiah র সঙ্গে তুলনা করেন এবং লাহোরের ছাত্রগণ স্যর সৈয়দ আহম্মদকে "Father, Leader and Guide" বলিয়া অভিনন্দন দেন।

স্ত্রীশিক্ষা এবং মুসলমান ছাত্রগণের বিদ্যালয়ের বেতন যেন হ্রাস পায় এই সব সম্বন্ধে আলোচনা হয়।

একদিন এই স্যর সৈয়দ আহম্মদই সিভিল সার্ভিস সম্বন্ধে আন্দোলন চালাইবার জন্য সুরেন্দ্রনাথকে দৃঢ়ভাবে আলিঙ্গন করিয়াছিলেন। আজ তাঁহার এরূপ পরিবর্ত্তনে সকলেই মর্ম্মান্তিক দুঃখিত হইয়াছিলেন। [ক্রমশঃ

পদ্মা-বুকে

—শ্রীনকুলেশ্বর পাল

উত্তাল পদ্মার নীরে ;
বেলা শেষে সন্ধ্যা নামে ধীরে।
সুনীল আকাশ ঘিরে
ঢেলে দিল আঁধারের কালি ;
ঈশানের মেঘপুঞ্জ
সাজাইল মরণের ডালি।
ওপারেতে ধূ ধূ করে শূণ্য বালুচর ;
সেথা কারা বাঁধিয়াছে ঘর ?
আলো-আঁধারের কোলে
নিত্য করে প্রণয়ের খেলা ;
উদ্বেলিত তরঙ্গের বুকে
ভাসাইয়া জীবনের ভেলা।
সুদূরের যাত্রী যারা ;
কাজল তিমির কোলে হ'য়ে পথহারা,
খুঁজিছে পথের আলো,—
আঁখি দুটী করে ছল ছল ;
মরণের কোলে দোলে
উর্ম্মিমালা নিঠুর চঞ্চল।

এরি বুকে কত মাঝি তরণী ভাসায়ে
মহানন্দে চলে সারি গেয়ে।
আনন্দে উচ্ছল গীতি
কলহাস্য মাখা ;
ফেনিল পদ্মার বুকে
সকৌতুকে আঁকা,
ঝপ্ ঝপ্ পড়ে দাঁড় ;
ভাষাহীন মৌন কণ্ঠে কত কথা ফুটিছে পদ্মার।
এ যেন মর্ম্মের বাণী ;
ঊর্দ্ধে তুলি উর্ম্মিমালা ডাকিছে দিয়া হাতছানি।
তরঙ্গের মালা ;
ঊষার কনক হারে সাজাইয়া থালা,
বিছাইয়া গোধূলির ফাগমাখা রক্তিম অঞ্চল ;
সর্ব্বহারা পথিকেরে ডাকে চল্ চল্।
ওপারের যাত্রী যারা ;
ছুটে চল্—ওরে পথহারা,
সন্ধ্যা যে ঘনায়ে এল, স্তব্ধ নীলিমায় ;
পথ-ভোলা আয় ফিরে আয়।

শেষ রক্ষা

—শ্রীসুধীরচন্দ্র ধর

প্রথম পরিচ্ছেদ

অণিমার মা আমাকে খুবই ভালবাসে। কেন?—সে খোঁজ আমি কোন দিনই করি নাই। করার যে একটা প্রয়োজন আছে, তাও কোন দিন মনে হয় নাই। কেন না, শুধু অণিমার মা কেন, নীলিমার পিসি, রেবার দিদিমা, বাসন্তীর বড়দি সবাই আমায় এমনি ভালবাসে। কাজেই অণিমার মা'র ভালবাসার উদ্দেশ্য কথার ছলে বাহির করিবার চেষ্টা কোন দিন করি নাই বলিয়া আমাকে দোষ দিলে অন্যায় করা হবে। আমার বরাত ভাল। যুবকদের অনেকেরই আমার বরাত দেখিয়া হিংসা করার কথা। আদর আমার সর্ব্বত্র। রেবার দিদিমা বলেন, "দাদার আমার মুখে যেন মধুঢালা।" বড়দি অর্থাৎ বাসন্তীর বড়দি বলেন, "অশোক, শরীরের উপর অত্যাচার করা মোটেই উচিত না; সারাদিন রোদে রোদে ঘুরে বেড়ান বাসন্তী মোটেই পছন্দ করে না।" একথা এখানে বলিয়া রাখা দরকার যে, অণিমার মা একদিন আমার মা না থাকার অজুহাতে মাতৃত্বের দাবী করিয়া বসিয়াছেন। কাজেই ইচ্ছায় হউক, অনিচ্ছায় হউক তাঁ'কে সন্তুষ্ট করিবার জন্য 'মা' বলিয়াই ডাকিতে হয়। রেবার দিদিমাকে 'দিদিমা', নীলিমার পিসিমাকেও 'পিসিমা' বলিয়াই ডাকি। নাম আমার অশোক। আমার এ নাম কে রেখেছিল জানি না। শুধু শুনেছি মা'র ইচ্ছায়ই আমার এ নাম রাখা হয়েছে। আমার জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই মা'র মৃত্যু, কাজেই মা'র কোনও স্মৃতিই আমার থাকা উচিত না। মা'র মৃতদেহ না কি হাসপাতাল থেকেই কেওড়াতলায় নিয়ে যাওয়া হয়। বিধবা পিসিমার বুকে চড়িয়া হাসপাতাল হইতেই বালীগঞ্জের "শান্তিধামে" ফিরিয়া আসি। কথা বলিতে শেখার পর হইতে পিসিমাকেই মা বলিয়া ডাকি। শোকের মধ্যেই যার জন্ম তা'র নাম অশোক। কথাটা শুনিয়া আমার আজও একটু একটু হাসি পায়। এই নাম রাখার মধ্যে সত্যই আমার মা'র যেন অসীম স্নেহ জড়ান ছিল। গুণ আমার বিশেষ কিছু আছে কি না জানি না। তবে মনে হয়, এই নামের জন্মকথাকে সার্থক করিবার জন্যই বুঝি সবাই আমাকে ভালবাসে। মা না কি এও বলিতেন, মেয়ে হ'লে তা'র নাম রাখা হবে "নির্ম্মাল্য"। যা' হোক মেয়ে হ'য়ে জন্ম না হওয়ায় 'নির্ম্মাল্য' হ'বার সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত হয়েছি। কিন্তু আমি তবু ভাগ্যবান্;—আমি না বুঝিলেও সবাই বলে তাই। নইলে বাইশের কোটায় পা না দিয়াই এম, এ পাশ করিতে না করিতেই দিগম্বর বাবু তাঁ'র একমাত্র মেয়ে হাসিরাশির জন্য জামাই করিতে চাহিলেন কেন? লোকে বলে মিত্তির ম'শায়ের যেমন নাম-ধাম, তেমন পয়সা। তারপর এতগুলি মেয়ের প্রেম লাভ করা সত্যই কম সৌভাগ্যের কথা নয়। বয়স হইয়াছে, কিন্তু বেকারত্বের অপরাধে আজও কোন মেয়ে, মালা দূরের কথা, একটা ফুল পর্য্যন্ত যাকে দেয় নাই—তা'র চোখে আমি স্বয়ং কামদেব। যুবকহৃদয়ের সর্ব্বাপেক্ষা বড় আকাঙ্ক্ষার খোরাক—প্রেম। সেই প্রেমের রাজ্যেই যা'র বাস, তা'কে 'অশোক' বলিবে না কেন?—

একদিন মানুষকে যেটা ভাবিতে হয় না, আর একদিন যে সেটাই তার সব চেয়ে বড় ভাবনার বস্তু হয়ে ওঠে, তাতে আশ্চর্য্যের কিছু নাই। একদিন যা ভাবি নাই, আজও যে তাহা ভাবিব না, তাহা মিথ্যা; কেন না, ভাবনা করিতে ব্রিটিশ গভর্ণমেন্ট এখনও নিষেধাজ্ঞা জারী করেন নাই। সে দিন ভাবি নাই, ভাবনা করার প্রয়োজন ছিল না। বাবার ছিল মোটা 'ব্যাঙ্ক-ব্যালান্স' আর ছিল বিরাট সম্পত্তি—বগুড়ায় বিশাল জমিদারী—আয় প্রায় বিশ হাজার টাকা। বছরে বিশ হাজার টাকা সে দেশের জমিদারের পক্ষে কম কথা নয়—যে দেশের নাম দেওয়া হয়েছে "ল্যাণ্ড অব্ ক্লার্কস্।" বড় বড় জমিদার হয় তো শুনিয়া হাসিবেন—বিশ হাজার টাকা আয়ের জমিদারী আবার জমিদারী! যাক্ সে কথা। এক কথায় অভাব আমাদের কিছু ছিল না।

বিমল বলে, "অশোক, সেদিন ভাব নাই, তার একটা Justification ছিল। কিন্তু আজ আর নিশ্চিন্ত থেকো

না। ক'লকাতার এ বাড়ীখানাও তা' হ'লে রাখতে পারবে না।"

বিমল আমার বন্ধু, অণিমার ভাই। বি, এল, মধ্যবিত্ত পরিবারের ছেলে। সাংসারিক বুদ্ধি তার যতটা আছে, তার শতাংশের এক অংশও আমার নাই। আমার পিসিমা অন্ততঃ তাই বলেন। উত্তর একটা দিতে হয়, তাই দি—

"বিমল, আমার আজ আর সম্পত্তির প্রয়োজন কি বলিতে পার? যা আছে, এই ভোগ করিবার লোক নাই।"

বিমল যেন আমার উত্তরের কোনই অর্থ খুঁজিয়া পায় না। "প্রয়োজন ততদিনই থাকে, যতদিন মৃত্যু না হয়" বলিয়াই উত্তরের আশায় আমার মুখের দিকে তাকায়। স্বল্পভাষী সে, কথা খুব প্রয়োজন না হ'লে বড় একটা বলে না। এই জন্য আমি তাকে একটু ভয় করি, সম্মানও করি।—

"মৃত্যু মনুষ্যের শুধু জীবনবিয়োগ ঘটিলেই হয় না। তার ambition-এর যে দিন মৃত্যু হয় সে দিনই তার সত্যকার মৃত্যু ঘটে।"

বিমল এ কথা শুনিতে চায় না। সে না কি আমার মধ্যে কি বিরাটত্বের চিহ্ন দেখেছে। আমাকে মানুষ না কি হ'তেই হবে। সে বলে, "অশোক, একটা কথা তুমি মানিবে কি না জানি না; কিন্তু কথাটা অতি সত্য। মানুষের মধ্যে যতদিন সুখ-দুঃখের অনুভূতি থাকে ততদিনই তার মানুষ হ'বার আশা থাকে। তবে দৈহিক বিকারগ্রস্তের কথা স্বতন্ত্র।"

আশা থাকাটাই যে মানুষ হ'বার যাদুকাঠি, একথা এক দিন হয় তো মানিতাম যে দিন 'অশোক' নামের সার্থকতা নিজের জীবনে পরিস্ফুট হ'য়ে উঠেছিল। কিন্তু আজ আর মানি না। আরম্ভের বিরাটত্ব দেখিয়া অবসানের মহিমায় যারা পঞ্চমুখ তাদের কথা তাদের জন্য, আমার জন্য নয়। যার জীবনের কোন অঙ্কেরই শেষ রক্ষা হয় নাই সে Shakespear-এর সুরে সুর মিলাইয়া বলিতে পারে, "Life is a tale told by an idiot." আশা যেখানে সম্বলহীন ও নিঃস্ব হইয়াছে, উদ্দীপনার মৃত্যু হইয়াছে সেখানে। হৃদয় কাঙ্গাল হইয়াছে সেদিন।

বিমল এ যুক্তির প্রতিবাদ করে তীব্র ভাবে; —"এ ধারণা তোমার ভুল অশোক! দুঃখের দিনে ওরূপ দার্শনিকবাদে পরিপূর্ণ ও কবিত্বপূর্ণ কথার সৃষ্টি হয়। নিষ্ঠুর বাস্তবের চোখে ইহা অতি অকিঞ্চিৎকর। যাক্ শোন,—এখন কাজের কথা কিছু বলা যাক্। আমি প্রাণতোষ বাবুর সঙ্গে পরামর্শ ক'রে জেনেছি, তুমি অর্দ্ধেকটা দিতে পারলে আর সব ছাড়িয়া দিয়া mortgage হইতে নিস্কৃতি দিতে রাজি আছেন।"

"হুঁ"। অশোক চুপ করিয়া থাকে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

পাঠক-পাঠিকাকে কেবল এতক্ষণ আগের ও পরের কথাই বলিয়াছি। মাঝের কথা কিছুই বলা হয় নাই। এবার মাঝের কথা বলি।

শাসন যেখানে শিথিল, গতি যেখানে বন্ধনহীন—উচ্ছৃঙ্খলতা বাড়িয়া চলে তার চারি ধারে, অযত্নরচিত আগাছার মত। আবার মুক্তির মাঝে বিকাশ পায় সারল্য, বাড়িয়া চলে মনের প্রসার। যেখানে ছিল না নিয়মের বন্ধন, সেখানে নূতন আইনের প্রচলন বিদ্রোহ আনে। অণিমা আজ বিদ্রোহী। এ বিদ্রোহ আর কাহারও উপর নয়, নিজের উপর। শিক্ষিত নারীহৃদয় মার্জ্জিত রুচির অজুহাতে নিজের মধ্যে নিজেই জ্বলিয়া পুড়িয়া মরিতে পারে। অভিযোগ আনিতে ঘৃণা হয়। মেয়ের গতিবিধির অস্বাভাবিক পরিবর্ত্তনে রঞ্জিত বাবু একদিন শঙ্কিত হইয়াছেন, কিন্তু প্রকাশের উপায় নাই। নিজের অপরাধের গুরুত্ব যখন নিজের চোখে ধরা পড়ে—মানুষ নিজের মাঝে নিজেই সঙ্কুচিত হইয়া পড়ে। স্বামী স্ত্রী ও মেয়ের মধ্যে এ কয়দিন ধরিয়াই একটা থমথমে ভাব চলিতেছে। যেন ভূমিকম্পের পূর্ব্ব লক্ষণ, কেহ কাহারও সহিত বিশেষ একটা কথা বলে না। পূর্ব্ব-পরিচিত যে কোনও লোক গরচা রোডের এই ভাড়াটে বাড়ীখানির মধ্যে প্রবেশ করিলেই বেশ বুঝিতে পারিবে, কোথায় যেন একটা কি ঘটিয়া গিয়াছে।

প্রতি সন্ধ্যাবেলায় রঞ্জিতবাবুর বৈঠকখানায় পাড়ার অবঘুরে লোকদের আড্ডা বসে। আর সেখানে চলিতে থাকে বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের যত নূতন কথা। হিটলার, মুসোলিনী হইতে আরম্ভ করিয়া পাশের বাড়ীর ভাড়াটে খৃষ্টান মেয়েটীর আয়-ব্যয়ের হিসাব পর্য্যন্ত, সমস্ত কিছুই এ আড্ডায় আলোচিত হয়। সঙ্গে সঙ্গে চা ও সিগারেটের সৎকার চলিতে থাকে।

রাত্রি প্রায় সাড়ে দশটা এগারটায় হঠাৎ পরদিন অফিসের কথা মনে পড়ায় সভা ভঙ্গ হয়।—কিন্তু আজ ক'দিন হলো সবই বন্ধ। এ জন্য রঞ্জিতবাবুর বন্ধু মহলে ক'দিন ধরেই একটা বেশ কানা-ঘুষা চলিতেছে। রঞ্জিতবাবু যেন "ফায়ার-প্রুফ", "ওয়াটারপ্রুফ" কিংবা বুনো কচুপাতা—কোন কথাই গায়ে মাখিবার প্রকৃতির লোক তিনি নন। কিন্তু আজ গিন্নি চপলার কথায় হঠাৎ আগ্নেয়গিরির মত গর্জ্জিয়া উঠিলেন—

"এখানে থাকা অস্বস্তি বোধ কর, মেয়েকে নিয়ে ডিহিরি চলে যাও।"

চপলা ও যেন আজ নামের মর্য্যাদা রাখিয়া মুখে মুখেই জবাব দিল, "ডিহিরি যাওয়ার প্রয়োজন হ'লে যাবো বইকি,—তোমার কাছে পরামর্শ নেবার প্রয়োজন হ'বে না।"

"বেশ, দাদাকে লিখে দাও। বড় মানুষ তা'রা, পয়সার অভাব তো আর তা'দের নাই। না হয় সামনের সপ্তাহেই এসে নিয়ে যাবে।"

চপলাও তেলে-বেগুনে জ্বলিয়া উঠিল—

"একদিন ঐ দাদার দৌলতেই চাকুরী পেয়েছিলে, সে কথা ভুলে যাও কেন? আইন পাশ করে তো ফ্যা ফ্যা করে বেড়াচ্ছিলে, লজ্জা করে না তা'দের নিন্দে করতে? বেশ, কালই আমি অশোককে নিয়ে চলে যাচ্ছি, চিঠি লিখবার দরকার হ'বে না।"

চপলাকে এই মুর্ত্তিতে রঞ্জিতবাবু পূর্ব্বে আর কখনও দেখেন নাই; তারপর চাকুরী লইয়া স্ত্রীর মুখে এইরূপ খোঁটা শোনাও প্রথম। লজ্জা ও ঘৃণায় স্ত্রীর সহিত কথা বলিতেও রঞ্জিতবাবুর ঘৃণা বোধ হইল। কিছু বাদ-প্রতিবাদ না করিয়াই ঘর ছাঁড়িয়া বাহির হইয়া পড়িল। চপলা রাগে ও ঘৃণায় বিছানায় পড়িয়া চোখের জল ছাড়িয়া দিল।

স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কোথায় যে কি হইয়াছে, বাহির হইতে কিছুই বুঝিবার উপায় নাই।

অণিমা যেন আজ হঠাৎ অন্ধকারে আলোক খুঁজিয়া পাইয়াছে। প্রায় মাসখানেক পূর্ব্বে খবরের কাগজ দেখিয়া রংপুরে একটা মেয়ে-স্কুলের মাষ্টারীর জন্য আবেদন করে। আজ তা'রই উত্তর আসিয়াছে—আগামী মাসের ৭ তারিখের মধ্যে কার্য্যে যোগদান করিতে হইবে। মাহিনা মাসিক ৪৫৲।

—"মা, ওমা—মা কোথায় রে রঘু?"

রঘু চাকর মায়ের ঘর দেখাইয়া দিল।

অণিমা চিঠিখানা হাতে লইয়া উপরে মায়ের শোবার ঘরে আসিয়াই থম্‌কিয়া দাঁড়াইল—"অসুখ করেছে বুঝি? কই, আমায় কিছু বলনি তো?"

চপলা নিজেকে অনেক কষ্টে সামলাইয়া লইল।—"না, অসুখ এমন কিছু নয়, মনটা ভাল নয় তাই। খুকি, চল ক'দিন ডিহিরি থেকে ঘুরে আসি। যাবি?—"

—"আমার তো যাওয়া হবে না, মা।"

—"কেন? ক'দিন বই তো নয়। আর এম্-এ ক্লাস তো তোমার ক'দিন বাদেই ছুটী হয়ে যাচ্ছে।"

—"কলেজ বোধ হয় আমার আর করা চলবে না। এম্-এ, টা বোধ হয় আমার প্রাইভেটই দিতে হবে।"

—"সে কি? এম্-এ, প্রাইভেট দেবার কি হলো? অশোক তো বলছিল, তুই এম্-এতে ফার্ষ্ট ক্লাস পাবি।"

"হুঁ! তা' হয় তো পাব।" অণিমা একটা ছোট্ট দীর্ঘ শ্বাস ছাড়িয়া আবার বলিল—"হাঁ, আজ মাসের ২৫ তারিখ, সামনের শনিবারই বোধ হয় আমাকে রংপুর চলে যেতে হবে। এই দেখ এ্যাপয়েণ্টমেণ্ট লেটার।" অণিমা চিঠিখানা মায়ের হাতে দিল। মা চিঠিখানা ভাল করিয়া পড়িলেন।—

—"মোটে ৪৫৲টা টাকার জন্য আমাদের ছেড়ে তুমি রংপুর পড়ে থাকতে যাবে কেন?—আর অশোকের ইচ্ছে নয়, তুমি চাকরী কর।"—

অণিমার মুখখানা ক্ষণেকের জন্য ফ্যাকাশে হইয়া উঠিল।

—"তাঁ'র ইচ্ছা অনিচ্ছায় আমার কি আসে যায়? আর তিনিই তো আমার অভিভাবক নন। তোমাদের মত পেলে আর কা'রও মতের অপেক্ষা আমি করতে চাইনে।"

—"আমরাই বা তোমাকে চাকুরী করতে কি ক'রে মত দি খুকি? এ তোমার অন্যায় আবদার।"

—"বেশ, চাকুরী না হয় নাই ক'রলাম; আমাকে কি করতে হ'বে শুনি?"

—"কেন! অশোকের এ্যাটর্নী হ'বার আর ক'দিনই বা বাকী আছে। একটা বৎসর বইতো নয়। তোমারও এম-এ-র এক বছর বাকী আছে।"

অণিমার পিঠে কে যেন বারবারই বেত্রাঘাত করিতে লাগিল। অশোকের মনের যে পরিচয় সেদিন সে পাইয়াছে, তারপর অশোককে কোনও মতেই তা'র বিয়ে করা চলে না। —"মনে মনে তোমরা স্বর্গ রচনা করতে পার, কিন্তু ওসব কথা আমায় বলো না। অশোক বাবুকে বিয়ে আমি করবো না। তুমি বাবার মত নিয়ে রেখো, সামনের শনিবারই আমি রংপুর যেতে চাই।"—

অণিমা বেগে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। মা ক্ষণকাল স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন। তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়িয়া হয় তো মনে মনে ভাবিলেন—"একবার সংযমের বাঁধন ছাড়িয়া দিয়া তাহাকে পুনরায় ধরিতে যাওয়ার চেষ্টাই মিথ্যা।"

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

"বড় অসময়ে যে? ব্যাপার কি অশোক বাবু?" রেবা ড্রয়ারটা টানিয়া একটা চিঠি লেখার pad বাহির করিল—। "বসুন, দাঁড়িয়ে রইলেন কেন? কথাটা শুনেছি বলেই শাস্তি দেবো না।" রেবা একটু মুচকি হাসিল। স্বাভাবিক মনের ভাব চাপা দিয়া কথান্তরের অবতারণা করিতে রেবা খুবই অভ্যস্ত।—

অশোক বসিল—।

"উঁহু, ওখানে বসা চলবে না। এই সামনের কৌচটায় বসুন।"

—"হাঁ, আজ আমি ভারী obedient, যা বলবে তাই শুনবো।"

"Just like a henpacked husband. Isn't it?"

রেবা হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল।

"Oh no! never to be a husband of polished girl." অশোক সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়িল।

—"মেয়েদের সামনে সিগারেট খাওয়াটা অসভ্যতা, তা' জানেন?"

"তোমার সামনেও?"

"নিশ্চয়। দিদিমা অন্ততঃ তাই বলেন।"

"Old lady of the eighteenth century তা' ডাক না বুড়িকে একবার। অনেক দিন দেখা হয়নি।"

"তা' না হয় তা'কে ডাকলাম কিন্তু মিষ্টারের এমন কি জরুরী প্রয়োজন হ'ল যে ভোর না হ'তেই রেবা রায়-এর বাড়ীতে পায়ের ধূলা পড়লো?"—কে রে? দাসী?—

দাসী ঝি, উত্তর দিল—"হাঁ দিদিমণি,—দিদিমাকে ডাকলেন?" রেবা ডাকিতে আদেশ করিল।—

"প্রয়োজন একটা কিছু আছে। তা' তোমার সঙ্গে দেখা করাটাও তো একটা প্রয়োজন।"

"My lord! it is a truth indeed" রেবা চক্ষু উপরের দিকে তুলিল।—"To play ducks and drakes with the fashionable girls—এটাও একটা কম প্রয়োজন নয়—তা' আমাকে স্বীকার করতেই হবে।" রেবার এই তীব্র উক্তি অশোকের বুকে একখানা উত্তপ্ত লৌহ-শলাকার মতই গিয়া বিদ্ধ হইল। রেবার মুখে ঐরূপ কটু উক্তি সম্পূর্ণই অপ্রত্যাশিত।—অশোক প্রথমতঃ ইহার কোনও প্রতিবাদই করিতে পারিল না। তারপর সংযত হইয়া ডাকিল, "রেবা!"

রেবা একটু মুচ্‌কি হাসিয়া বলিল—"Pardon Sir! অপ্রস্তুত অবস্থায় কাউকে আক্রমণ করা বীরত্বের লক্ষণ নয়! আর যে দোষটা তোমরা আজকাল পুরুষের ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হও তা'র জন্য দায়ী তোমরা! পাশ্চাত্যের অনুকরণে শিক্ষিতা হ'য়েও মনটাকে এখনও পঙ্গু করে রেখে দিয়েছ—"

রেবা বাধা দিল।

"ভুল করছেন অশোক বাবু! যা' চিরসত্য তা'র বিরুদ্ধে অভিযোগ করা বাতুলতা মাত্র। পাশ্চাত্যদেশীয়া হ'লেই তা'র মনটা নাৎসীসভ্যতার ছাঁচে গড়া হ'বে, এ ধারণা আপনার ভুল। যেখানে মানুষের মন নিয়ে খেলা চলে, সেখানে মতের দোহাই দিয়ে হয় তো আইনের হাত থেকে বাঁচা যায়, মনটাকে আঁচড়হীন রাখা যায় না। Arguments for argument sake—রাগ করবেন না যেন।"

—"রাগ আর রাগ ও দু'টোর একটাও আমার ধাতে সয় না।" তা' এখন উঠি……"

"তা' উঠবে বই কি নাতি!" দিদিমা পরদা ঠেলিয়া ঘরে প্রবেশ করিল—"ডুমুরের ফুল হয়ে উঠেছো; তা' উঠবে বই কি? বড়লোকের জামাই হচ্ছো; তা' বেশ, বেঁচে থাকে

হচ্ছে? আমি কাশী যাবার আগেই করো। নিমন্ত্রণটা খেয়েই যাবো।—কি রে রেবা, এক কাপ চা ও বুঝি দিতে নেই?" বুড়ি রেবার দিকে ফিরিয়া ঝঙ্কার তুলিল। রেবা অপরাধীর মত উঠিয়া গেল।

"না দিদিমা, চা আমি খেয়ে এসেছি।"—

—"তা' দিগম্বর মিত্তিরের বাড়ীর চায়ের মত দামী চা না হ'লেও খাওয়া বোধ হয় চলতে পারে, বসো দাদা বসো। যাবেই তো', শ্বশুর-বাড়ী না হ'তেই এত তাড়া, হ'লে তো আর দেখাই পাবো না।"

দশচক্রে ভগবান ভূত বনিয়া যায়, আর মানুষ তো কোন্ ছার। অশোক নির্ব্বাক্। বুড়ি কিন্তু নাছোড়।

"তা' দেনা-পাওনা কি হ'ল? ক'ভরি সোনা? ফারনিচার? নগদ?"

অশোক যেন হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিল। এতক্ষণে উত্তর দেওয়ার মত একটা পাইয়াছে।

"দেনা-পাওনা?—তা' আপনার কল্পনাতীত;—এই ধরুন, একখানা এয়ার প্লেন, দুখানা মোটর, তিনখানা খাট, ত্রিশ ভরি নিখাদ সোনা;—তা' দেবে না কেন দিদিমা? মিত্তির ম'শায়ের টাকা তো আর কম নয়।"

দিদিমা এ বিদ্রূপটুকু বুঝিলেন, কিন্তু যেন কিছুই বোঝেন নি—এই ভাবেই উত্তর দিলেন—তা' দেবে বই কি দাদা, ছেলেও তো তুমি কম নও।"

চা আসিল কিন্তু রেবা আসিল না, অশোক শুনিতে পাইল, উপরের গোল-বারেন্দা হইতে রেবা ডাকিতেছে—"আস্তামান, গাড়ী বের করো।"

"নাও দাদা, চা-টা খেয়ে ফেলো তো, জুড়িয়ে যে জল হ'য়ে যাবে।" দিদিমা কাপের দিকে হাত বাড়াইয়া দিলেন।

এ যেন সত্যিকারের অপমান করা। শিক্ষিত ও সভ্য সমাজে এর কোন প্রতিকার নাই। 'কিল খাইয়া কিল চুরি করা' যেন আধুনিক সভ্যতার একটা অঙ্গ। অশোকের অন্তরের আলোড়নকে চাপা দিয়া মুখে হাসিরেখা টানিয়া চা পান করিতে হইল।—মেয়েদের সঙ্গে অশোক খুবই মেশে, কিন্তু নারীর এই বাক্যবাণের বিরুদ্ধে অস্ত্র প্রয়োগ করিতে কোন দিনই শেখে নাই। অশোক ভাবিতে লাগিল, মানুষ যদি নিজের মনে ভুল করিয়া জ্বলিয়া পুড়িয়া মরে, তাহাতে তাহার কি অপরাধ? আধুনিক সভ্যসমাজ কি একটা স্বার্থকে পশ্চাতে রাখিয়াই প্রগতির দোহাই দেয়?—

দু' এক চুমুক দিয়াই 'টেপয়রের' উপর কাপটি নামাইয়া রাখিল। মুখে একরাশ ভাড়া-করা হাসি আনিয়া বলিল, "তা এখন উঠি দিদিমা, আর একদিন আসবো।"

"তা কাজ থাকলে উঠবে বই কি দাদা। বসো, রেবাকে ডেকে দি, দেখা ক'রে যাও।"

অশোকের ইচ্ছা হইল বুড়িকে নিষেধ করে, কিন্তু পূর্ব্ব ব্যবহারের কথা মনে হইতেই কথাটা যেন অসামঞ্জস্যপূর্ণ মনে হইল। কোন উত্তর না দিয়াই চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল দিদিমা চলিয়া গেল।—

রেবা পরিপাটিরূপে সজ্জিত হইয়া অশোকের ঠিক সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল—"অশোক বাবু, চলুন আমার গাড়ীতেই, আমি অর্চ্চন বাবুর ওখানে যাবো একবার, কাল ফোনে ডেকে পাঠিয়েছেন; একটু ঘুরে আপনাকে নাবিয়ে দিয়ে যাবো'খন।"

—"না তুমি একাই যাও। আমাকে একবার প্রাণতোষ বাবুর সঙ্গে দেখা ক'রতে যেতে হ'বে।"

—"এটর্ণী P. C. Banerjee, যাঁর আর্টিকেল ক্লার্ক ছিলেন আপনি?"

"হাঁ।"

"আচ্ছা তবে আসি, নমস্কার।"

"নমস্কার।"

অশোক একটু দ্রুত পদেই লন পার হইয়া কটকের কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। রেবা পিছন হইতে ডাকিল, "অশোকবাবু?"

অশোক ফিরিয়া দাঁড়াইল।

—"আপনার একখানা চিঠি আছে। দাদা দিয়েছেন। ভুল হ'য়ে গিয়েছিল দিতে,—দাঁড়ান একটু, ছুটে নিয়ে আসছি।"

রেবা সিঁড়ি বাহিয়া উপরে উঠিল। অশোক ম্লানমুখে গেটে দাঁড়াইয়া আছে, এমন সময় একখানা 'বেবি অষ্টিন' আসিয়া দরজায় দাঁড়াইল।

"Hallo! Why so pale my darling! মিহির নামিয়া আসিয়া অশোকের হাত ধরিল। "চল ভিতরে যাই, দরজায় দাঁড়িয়ে কেন? রেবা নাই বুঝি?"

—"হাঁ, এখনি আসছে।"

মিহির রেবার মাসির ছেলে; অশোকের সহপাঠী।

—"কোথায় অভিযান হচ্ছে, শুনি?"

"Nowhere !"

"মানে?"

—"কোথাও না।"

রেবা আসিল।

"কি মিহিরদা যে, গুড্ মর্ণিং।"

"গুড মর্ণিং। কোথায় যাওয়া হচ্ছে?"

"স্বর্গে।"

"মানে, প্যারাডাইজ লজে?"

"রে, গুড্ বাই, দিদিমা আছেন তো?

"হাঁ আছে, যাও।"

মিহির অগ্রসর হইল।

"এই নিন্ অশোকবাবু! আপনার চিঠি," অশোক হাত বাড়াইয়া চিঠি নিল।

"আর একদিন আসবেন? কয়েকটা কথা আছে।"

—"ফোন করো।"

[ক্রমশঃ

নীরবের গান নীরবে বসিয়া নীরবে গাহিয়া যাই—

—শ্রীঅমিয়ভূষণ কর

নীরব দিয়েছে দেবতার ভাষা,
নীরব দিতেছে মানবের আশা,
নীরবেই আসে বিবেকের দিশা
নীরবতা মাঝে জয়;

নীরবের ব্যথা কত ব্যথাতুর,
নীরবের গান কত সুমধুর,
নীরবের গতি কত দ্রুততর
নীরবী বুঝেছে তায়;

৩

নীরব বোঝায় দেবতার দান,
নীরবই গাহিছে দেবতার গান,
নীরব মিলায় ভক্তের তান
নীরবেই ছলনায়;

নীরব না হলে আসে না যে মন,
নীরবী না হলে ফোটে না যে জ্ঞান,
নীরবে না গে'লে দেবতার গান
দেবতা ফিরে না চায়;—
তাই, নীরবের গান নীরবে বসিয়া—
নীরবে গাহিয়া যাই।

যুদ্ধের পরে

—শ্রীশশিভূষণ মুখোপাধ্যায়

মনুষ্যসমাজের পক্ষে যুদ্ধ উন্নতিসাধক কি শান্তি উন্নতিসাধক, এই প্রশ্ন লইয়া আজকাল সুধীজন মধ্যে বিশেষ আলোচনা চলিতেছে। এ বিষয়ে প্রবল মতভেদ দেখা দিয়াছে। কেহ কেহ বলিতেছেন, শান্তিই মানবজাতির উন্নতি সাধনের বিশেষ অনুকূল, আবার কেহ কেহ বলিতেছেন যে, যুদ্ধ-বিগ্রহই মানুষকে উন্নতির পথে বিশেষভাবে অগ্রসর করিয়া দেয়। ইতিহাস কিন্তু বিগ্রহবাদীদিগের অনুকূলে রায় দেয়। ইতিহাসে দেখিতে পাই যে, যে রোমকরা প্রাচীন রোমক জাতির পত্তন করিয়াছিলেন, তাঁহারা এতদূর শত্রুবেষ্টিত ছিলেন যে, তাঁহারা রোমনগরী হইতে শান্তিতে পাঁচ মাইল পথ অতিক্রম করিতে পারিতেন না। পাঁচ মাইল অতিক্রম করিতে হইলেই পথে তাঁহাদের শত্রুর সহিত সাক্ষাৎ হইত এবং অবিলম্বে অস্ত্রের ঝনঝনায় সেই স্থানের কানন-প্রান্তর এবং কেদার-কান্তার মুখরিত হইয়া উঠিত। এই অবস্থাতেই প্রথমে প্রাচীন রোমক জাতির বীর্য্য বিকশিত হইয়া উঠিয়াছিল। তাঁহারা পরে যে বিস্তীর্ণ রোমক সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন,—তাহাতে জগতে শান্তি স্থাপিত হইয়াছিল, সেই শান্তির ফলেই রোমকরা মরিয়াছিল—বিগ্রহের ফলে মরে নাই। প্রাচীন গ্রীকদিগের এক একটা রাজ্য লোকসংখ্যায় বর্ত্তমানকালের কলিকাতা মহানগরীর লোকসংখ্যা অপেক্ষা অনেক অল্প ছিল। বিস্তারেও উহা আমাদের দেশের একটা মহকুমা অপেক্ষা বড় ছিল না। তাহাদের পরস্পরের মধ্যে নিত্যই বিবাদ ছিল। কিন্তু সেই বিবাদের মধ্যেও তাহারা স্বীয় প্রতিভা-প্রভাবে বর্ত্তমান যুগের কলাবিদ্যার, সাহিত্যের এবং কোন কোন বিজ্ঞানের বীজ বপন করিয়া গিয়াছিল। কিন্তু যে সময় শক্তিশালী আলেকজাণ্ডার তাঁহার বিশাল সাম্রাজ্য স্থাপন করিয়া সেই বিবাদের কোলাহল নিবৃত্ত করিয়াছিলেন, সেই সময়েই গ্রীক জাতির গৌরব-ভাস্কর অস্তমিত হইয়া গিয়াছিল।

ইদানীন্তন যুগের ইতিহাসে দেখা যায়, এক একটা যুদ্ধের পরে এক একটা জাতি শিল্প-বাণিজ্যে বড় হইয়া উঠিয়াছে। নেপোলিয়নের সমরনীতিই গ্রেট বৃটেনের শিল্প-বাণিজ্যকে অনেকটা প্রগতির পথে চালিত করিয়াছিল। গৃহযুদ্ধের পরই মার্কিণ শিল্প-বাণিজ্যের পথে অগ্রসর হইয়াছিল। ফ্রাঙ্কো-প্রাসিয়ান যুদ্ধের পরেই শিল্পপ্রধান জার্ম্মানীর অভ্যুদয় ঘটিয়াছিল। ইহাতে মনে হয় যে, একটা বড় রকম ধ্বংসিনী শক্তির খেলা হইয়া গেলে আবার মানব-সমাজে কোথাও না কোথাও সংগঠনী শক্তির সন্ধুক্ষণ হইয়া উঠে। ইহা প্রকৃতির লীলা। বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমি যুদ্ধের লৌকিক বা গূঢ় কারণ সম্বন্ধে কোন কথাই বলিব না। যুদ্ধ মানুষের সংগঠনী শক্তিকে উস্কাইয়া দেয়, ইহা সত্য। সেই জন্য মানুষের এই সুযোগ পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য নহে। শ্রম-শিল্পের উন্নতিকামী ব্যক্তিদিগের সেই সুযোগ পরিত্যাগ করা সঙ্গত নহে। বিগত ইয়োরোপীয় মহাযুদ্ধের পরে ভারতে শিল্প-বাণিজ্যের—বিশেষতঃ শ্রম-শিল্পের—যে সামান্য কিছু উন্নতি ঘটিয়াছিল, তাহা বলাই বাহুল্য। কিন্তু ভারত সরকারের ঔদাসীন্যে ভারতবাসী ঐ পথে অধিক দূর অগ্রসর হইতে পারে নাই। সকল সভ্য দেশের সরকারই নিজ নিজ দেশের শিল্প-বাণিজ্যের ব্যাপারে দেশবাসীকে প্রগতির পথে অগ্রসর করিয়া দিবার চেষ্টা করে, কিন্তু ভারত-সরকার তাহা করেন নাই। মানুষ মাত্রেরই একটা আদর্শ থাকা চাই এবং সমাজস্থ বা দেশস্থ সকলের সেই আদর্শ সম্বন্ধে একটা জাগ্রত অনুভূতি থাকা বিশেষ আবশ্যক। যে মানবসমাজে সকল লোকের বা অধিকাংশ লোকের মনে সেই অনুভূতি জাগিয়া উঠে, সে দেশের জাতীয় সরকার তাহা উপেক্ষা করিতে পারেন না। তাঁহারা সেই অনুভূতি জনিত আদর্শ অনুযায়ী জাতীয় জীবনধারা নিয়ন্ত্রিত করিতে যত্ন করেন। জাতীয় সরকারের তাহা সফল করিবার চেষ্টা স্বতঃই প্রকাশ পায়।

ভারতবর্ষের অধিবাসীদিগের যে এখন শিল্প-সেবা করা একান্তই কর্ত্তব্য হইয়া পড়িয়াছে, তাহা অধিকাংশ ভারতবাসীই এখন অল্প-বিস্তর বুঝিতে পারিতেছেন। যাঁহারা রাজনীতি

আলোচনা করিয়াই কাল কাটাইতেন, তাঁহারাও এক্ষণে বুঝিয়াছেন নিছক রাজনীতিক আন্দোলনে কোন ফল ফলিবে না,—শিল্প-সেবাই বিশেষভাবে করিতে হইবে। যে সুরেন্দ্রনাথ রাজনীতিক আন্দোলন করিয়াই জীবন কাটাইয়াছিলেন, সেই সুরেন্দ্রনাথই মরিবার কয়েক দিন মাত্র পূর্ব্বে বলিয়াছিলেন যে, রাজনীতিক পরবশ্যতা অপেক্ষা আর্থিক পরবশ্যতা অনেক অধিক ভয়ঙ্কর। সুতরাং ভারতবাসীর সর্ব্বাগ্রে আর্থিক ব্যাপারে স্বাবলম্বী হইবার চেষ্টা করা উচিত। আর্থিক ব্যাপারে স্বাবলম্বী হইতে হইলে শিল্প এবং বাণিজ্যের সেবা করা আবশ্যক। বর্ত্তমান যুদ্ধের সময় ভারতবাসী যদিও যুদ্ধে লিপ্ত হইয়াছে, তথাপি তাহাদের পক্ষে শিল্প-সেবা করিবার বিশেষ সুবিধা হইতেছে না। যুদ্ধ এখনও চলিতেছে। কতদিনে যে ইহার অবসান হইবে তাহা এখনও বুঝা যাইতেছে না। এখন এই যুদ্ধের পর আমরা কিছু সুবিধা করিতে পারিব কি না তাহা লইয়াও নানা দিকে নানা জল্পনা-কল্পনা চলিতেছে। এরূপ জটিল বিষয়ে নানা জনে নানা মত প্রকাশ করিতেছে; তাহাতে বিস্ময়ের বিষয় কি আছে? সম্প্রতি কানপুরে যুক্ত প্রদেশের বণিক-সভায় রজত জুবিলি উপলক্ষে উহার সভাপতি স্যার শ্রীযুক্ত জ্বালা প্রসাদ শ্রীবাস্তব যে বক্তৃতা করিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি বলিয়াছিলেন—"যুদ্ধের পর ভারতের শিল্প-বাণিজ্য কি ভাবে নিয়ন্ত্রিত করা হইবে তাহা যে সরকারের এবং দেশের লোকের বিশেষ ভাবে চিন্তনীয়, তাহা আমি অতি দৃঢ়ভাবেই বলিতেছি। সরকারের তোপ এবং সামরিক সামগ্রী প্রস্তুতের কাজ এখন খুব বিস্তৃতি লাভ করিতেছে; তাহাতে সহস্র সহস্র লোক কর্ম্ম করিতেছে। বে-সরকারী কারখানাগুলিও সামরিকদিগের প্রয়োজনীয় দ্রব্য প্রস্তুত করিবার জন্য বহু লোককে পালাক্রমে বিভক্ত করিয়া তাহাদের দ্বারা কাজ করাইতেছে। শান্তি উপস্থিত হইলেই সরকারী কারখানার অধিকাংশই বন্ধ হইয়া যাইবে এবং বে-সরকারী কারখানা গুলিরও আচম্বিতে কাজ অনেক কমাইতে হইবে। সুতরাং পূর্ব্ব হইতে এইরূপ পরিকল্পনা করিতে হইবে যে, এইরূপ অবস্থায় লোকের কষ্ট না হয় এবং সংগ্রামের অবস্থা হইতে শান্তির অবস্থায় ফিরিয়া যাওয়া যাহাতে অতি সহজ হয়, তাহার জন্য যথাসম্ভব চেষ্টা করিতে হইবে।"

কথা সত্য! কিন্তু সে পরিকল্পনা করা হইতেছে না। অধিকাংশ লোকই 'গদ্যাং গচ্ছ' করিয়া কাল কাটাইতেছেন। আবার কেহ কেহ মনে করিতেছেন যে, বর্ত্তমান যুদ্ধে অত্যন্ত বিস্তীর্ণ ক্ষেত্রে ধ্বংসের লীলা চলিয়াছে,—যুদ্ধের পর শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইলে আবার সেইরূপ গঠনের পালাই পড়িবে। ধ্বংস যত অল্প সময়ে হয়, গঠন করিতে তাহার অনেক অধিক সময় লাগে। সেইজন্য শান্তির সময় কাজ অধিক পাওয়া যাইবে, কাজের অভাব ঘটিবে না। ইয়োরোপের যে-সমস্ত দেশ বিধ্বস্ত হইয়া গিয়াছে, সে সকল দেশ হইতে ভারতে গঠনের জন্য আবশ্যক উপকরণ দ্রব্যের এবং খাদ্য বস্তুর চাহিদা আসিবে। সুতরাং যুদ্ধের পরই ভারতবাসীর কর্ম্মাভাব হইবে না। অথচ ঐ সকল বিধ্বস্ত দেশের লোকদিগকে সেই সেই দেশের সরকারকে কর্ম্ম দিতে হইবে। সুতরাং যে সকল দেশে যাহা উৎপন্ন করা যাইবে তাহার বায়না ভারতবাসীরা সহজে পাইবে না। কিন্তু তাহা হইলে পণ্যের উপকরণ এবং খাদ্যশস্যের টান ভারতে পড়িবে। তাহাতে ভারতবাসীর বিশেষ লাভ হইবে না। কারণ, ভারতে যে পরিমাণ খাদ্য-শস্য উৎপন্ন হয় তাহা ভারতেরই কুলায় না—সুতরাং তাহা অন্য দেশে চালান দিতে হইলে লোকের লাভ না হইয়া ক্ষতিই অধিক হইবে। দেশের বহুলোক না খাইয়া মরিবে। কিছু কাল ধরিয়া রেঙ্গুণের চাউল আমদানি হওয়াতে বাঙ্গালার লোক অনাহারে মরিতেছে না। এবার রেঙ্গুণ বা পূর্ব্ব উপদ্বীপ হইতে চাউল কম আমদানী হইতেছে। রেঙ্গুণ চাউলের দর চড়া। কাজেই লোকের কষ্ট অধিক হইতেছে। অথচ কৃষির উন্নতি করিতে পারিলে শস্যের ফলন বাড়ে। শস্যের ফলন বাড়িলে ভারতের পক্ষে খাদ্য-শস্য বিদেশে রপ্তানী করা সম্ভবে—সে কাজ কিছু লাভজনক হয়। কিন্ত শ্রম-শিল্পের উন্নতির ব্যবস্থা না করিলে কৃষির উন্নতি সাধন কিছুতেই সম্ভব হইবে না। আমাদের এই বাঙ্গালা দেশে অত্যন্ত অধিক লোক কৃষিকার্য্য করে—এবং ভূমি হইতে উৎপন্ন পণ্যের আয় হইতে সম্পূর্ণ এবং আংশিক ভাবে সংসার চালায়। ইহাতে ঘোর অন্নকষ্ট হইলেও একটা সামান্য আয় আছে। উহাতে তাহাদের যোতের জমি অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ ভাবে নানাভাগে বিভক্ত হইয়াছে। ইহাও কৃষির উন্নতির পক্ষে একটা বিষম বাধা। কিন্ত অন্য বৃত্তি অবলম্বনের উপায় না

করিলে জমিবিভাগ রহিত করা যাইবে না। যাহারা এখন জমি ধরিয়া পড়িয়া আছে,—জমি ছাড়িয়া দিলে তাহারা কি করিবে? অথচ চাষের জমি অত্যন্ত ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত হইলে—উহাতে বৈজ্ঞানিক বিধি মতে চাষ প্রবর্ত্তন করা সম্ভবে না। শ্রমশিল্প প্রবর্ত্তিত হইলে কতক লোক যদি শ্রম-শিল্পের দিকে ঝুঁকিয়া পড়ে, তাহা হইলে কৃষকদিগের যোতের জমিও বৃদ্ধি পায়, কৃষির উন্নতি সাধন সম্ভব হয়। তাই বলিতেছি যে, শ্রম-শিল্পের উন্নতি না করিতে পারিলে এই হতভাগ্য দেশের উন্নতি সাধনের কোন উপায়ই নাই।

কিন্তু যুদ্ধের পর শ্রম-শিল্প গড়িয়া তুলিবার একটা সুবিধা আসিবেই আসিবে। তখন ভারতবাসীর পক্ষে সরকারী আনুকূল্য এবং সাহায্য পাওয়া যাইবে কি না, তাহাও বলা যায় না। কারণ, এই যুদ্ধের সময়েও ভারত-সরকারের সরবরাহ বিভাগের কর্ম্মচারীরা যেভাবে জিনিষপত্র খরিদের ব্যবস্থা করিতেছেন, তাহাতে তাঁহারা ভারতবাসী শ্রম-শিল্পের সেবকদিগকে পূর্ব্ব হইতে একটা পরিকল্পনা করিয়া কোন উন্নতি সাধনের পথ প্রস্তুত করিয়া দিতেছেন না। সরবরাহ বিভাগ কতকগুলি দ্রব্যের বায়না ভারতীয় কারখানায় দিতেছেন সত্য, কিন্তু পূর্ব্ব হইতে তাহার ব্যবস্থা করা হইতেছে না—সেই রকমের জিনিষ যে সরকার নিজ প্রয়োজন মত তাহাদিগের নিকট হইতে চাহিবেন, তাহা জানা না থাকায়, হঠাৎ মাঝে মাঝে তাহা সরবরাহ করিবার জন্য বায়না দিলে দেশীয় কারবারীরা তাহা সরবরাহ করিতে পারেন না। কারণ, হঠাৎ বায়না পাইলে তাঁহারা উহা প্রস্তুত করিবার জন্য আবশ্যক যন্ত্রপাতির এবং কাঁচা মালের অভাবে সেই বায়না পাইয়া আবশ্যক দ্রব্য ঠিক মত প্রস্তুত করিতে পারেন না। অনেক জিনিষ যুদ্ধের সময় প্রয়োজনীয় হইয়া উঠে, কিন্তু শান্তির সময় আর তাহার তত প্রয়োজন থাকে না। এখন সরবরাহ বিভাগ পূর্ব্ব হইতেই কতকগুলি দ্রব্যের বায়না দিতেছেন সত্য, কিন্তু তাহা হইলেও এবিষয়ে সরবরাহ বিভাগের আরও একটু অবহিত হওয়া আবশ্যক। এই দরিদ্র দেশের লোকের অর্থনাশের ভয় স্বাভাবিক। কাজেই তাহারা মনে করে যে, যুদ্ধের পর যখন শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইবে, তখন আবার প্রচুর পণ্য প্রস্তুত হইবে। তখন ভারতবাসীর পক্ষে প্রতিযোগিতা করিয়া মালপত্র বিক্রয় করাই কঠিন হইয়া দাঁড়াইবে। এরূপ ক্ষেত্রে ভবিষ্যতের জন্য একটা পরিকল্পনা স্থির করিয়া কার্য্য করাই বিধেয়। যুদ্ধের পর ঠিক কি অবস্থা ঘটিবে তাহা এখন বুঝা যাইতেছে না। এবার বহু দেশ বিধ্বস্ত হইয়া গিয়াছে। ঐ সকল দেশের কল-কারখানা এবং শিল্পের অবস্থা কিরূপ আছে এবং যুদ্ধের পর কিরূপ থাকিবে, তাহা বুঝা যাইতেছে না। সুতরাং যুদ্ধের পর শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইলে কিরূপ দ্রব্যের টান ধরিবে তাহা বুঝা যাইতেছে না। বিগত ইয়োরোপীয় মহাযুদ্ধে শান্তি স্থাপিত হইলেই বাজারে মন্দা আসিয়া পড়ে নাই। মন্দা আসিয়াছিল কিছুদিন পরে। তবে গতবার মন্দা লাগিতে অধিক দিন বিলম্ব ঘটে নাই। এবার তাহা অপেক্ষা অনেক অধিক দেশ বিধ্বস্ত হইয়াছে। ফ্রান্সের কিয়দংশ এবং আইবিরিয়ান উপদ্বীপ ব্যতীত আর ইয়োরোপের সকল দেশই বিধ্বস্ত। এখনও রণরঙ্গের অবসান হয় নাই—কবে কি ভাবে উহার শেষ হইবে তাহা মানুষ বলিতে পারে না। রুশিয়া এই রণরঙ্গে যোগ দিয়াছে। স্পেনে, পর্টুগালে এবং ফ্রান্সের অনধিকৃত অঞ্চলে যুদ্ধের কালানল জ্বলিয়া উঠিবার সম্ভাবনাই অধিক। কাজেই এবারকার যুদ্ধের ফল কিরূপ দাঁড়াইবে তাহা বুঝা যাইতেছে না। তাহা হইলে ইহা বুঝা যাইতেছে, পূর্ব্বকার যুদ্ধ অপেক্ষা এবারকার যুদ্ধে সংগঠন-কার্য্য করিতে অধিক সময় লাগিবে। সেই জন্য অনুমান হয় যে, এবারকার এই যুদ্ধের পর মন্দা আসিতে অপেক্ষাকৃত অধিক বিলম্ব ঘটিবে। যদি তাহা হয়, তাহা হইলে এবার ভারতবাসীর পক্ষে হয় ত' শ্রম শিল্প গঠনের কিছু অধিক সুবিধা হইতে পারে। কিন্তু তাহা হইলেও এই বিষয়ে পূর্ব্ব হইতে পরিকল্পনা করিয়া কার্য্য করা আবশ্যক। কোন কাজ করিয়া ভাবা অপেক্ষা ভাবিয়া করা ভাল, ইহা আমাদের দেশের প্রাচীন নীতিবাক্য। এই বাক্য বহুকালের অভিজ্ঞতার উপর প্রতিষ্ঠিত। সেই জন্য শ্রম-শিল্প বিষয়ে অগ্রসর হইতে হইলে আমাদের প্রথমে কোন্ কোন্ শিল্পের সেবা করা উচিত, তাহা বিশেষ ভাবে ভাবিয়া চিন্তিয়া দেখা কর্ত্তব্য। প্রথম আমাদের দেশে যে সকল আবশ্যক পণ্য প্রস্তুতের উপকরণ বা কাঁচামাল প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়, সেই সকল পণ্য আমাদের সর্ব্বাগ্রে প্রস্তুত করা বিধেয়। ইহার মধ্যে একটা জিনিষের আমাদের একচেটিয়া অধিকার

ছিল—সেটি পাট। কিন্তু পাটের কারবার এখন বিদেশীরাই হস্তগত করিয়াছে, তাহাতে আমাদের স্থান নাই। পাটের কারবার স্কটল্যাণ্ডের অধিবাসীরা আসিয়া দখল করিয়া বসিয়াছে। আমরা কেবল প্রতীক্ষমাণ কুক্কুরের মত মনিবের টেবিল হইতে নিক্ষিপ্ত উচ্ছিষ্ট দ্রব্যের অনুরূপ যৎকিঞ্চিৎ কুলিগিরি পাইবার আশায় বসিয়া আছি। ইহাতে তাঁহাদেরই জয় জয়কার! কারণ আমরা কেবল মাত্র রাজনীতি লইয়া যখন মসগুল ছিলাম, সেই সময়ে স্কটল্যাণ্ডের সদা-সজাগ কর্ম্মীরা এই কাজটা দখল করিয়া লইয়াছে, আমরা কিছুই করিতে পারি নাই। সে দোষ আমাদের। যাহা হউক, এইরূপ বহুবিধ পণ্য প্রস্তুত করিবার উপকরণ এখনও আমাদের দেশে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যাইতে পারে। এখন কথা হইতেছে যে, যুদ্ধের পরবর্ত্তী কালে বিভিন্ন রাষ্ট্রপতি ও রাষ্ট্রপরিচালকগণ কিভাবে দেশের আর্থিক অবস্থার ব্যবস্থা করেন,—তাহাও জানা আবশ্যক। সকল দেশের লোকই বিগত ১৯১৪–১৮ খৃষ্টাব্দের ইয়োরোপীয় যুদ্ধের পর নিজ নিজ দেশের ধনরক্ষার জন্য কতকটা নূতন পরিকল্পনাও করিয়াছিলেন। এবারও তাঁহারা নিশ্চয়ই কিছু নূতন পরিকল্পনা করিবেন কিনা তাহা ঠিক বুঝা যাইতেছে না। তাহা না জানিলে কোন পাকা পরিকল্পনা করাই সম্ভব হইতেছে না। তাহা হইলেও আমাদের দেশের হাটে আমাদেরই প্রয়োজনীয় পণ্যের উৎপাদনে আমাদেরই শিল্পীদিগের প্রাধান্য যাহাতে প্রতিষ্ঠিত হয় তাহা করা কর্ত্তব্য। দেশের লোকেরও ইহা মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝা উচিত যে, blood is thicker than water আত্মীয়তার দাবীই সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতম দাবী, সে দাবী রক্ষা করা মানুষ মাত্রেরই কর্ত্তব্য।

বর্ত্তমান যুদ্ধে একটা বৈশিষ্ট্য দেখা যাইতেছে যে, ইয়োরোপীয় প্রায় সমস্ত দেশই জার্ম্মানীর পদানত হইয়া পড়িয়াছে। ঐ সকল দেশ হইতে এখন আর বিদেশে পণ্য রপ্তানী হইতেছে না। বৃটিশ জাতির শ্রম-শিল্পের কারখানাগুলিতে এখন সামরিক অস্ত্রই প্রস্তুত হইতেছে। আর বৃটিশ নৌবহর এখন সামরিক দ্রব্য বহনেই নিযুক্ত রহিয়াছে। অতএব বৈদেশিক প্রতিযোগিতা অনেকটা কমিয়া গিয়াছে। মার্কিন ডলারের মূল্য স্থির রাখিবার জন্য বৃটিশ সাম্রাজ্যগুলিকে অল্প মাল সরবরাহ করিতেছেন। তদ্ভিন্ন তাঁহাদের কলকারখানাগুলিও সমরোপকরণ প্রস্তুতে নিযুক্ত রহিয়াছে। যুদ্ধের সময়ে দ্রব্যাদি খরিদ-বিক্রয়ের জন্য ডলারের মূল্য স্থির রাখিতে হইতেছে। কাজেই এখন বৈদেশিক প্রতিযোগিতা অনেকটা শুষ্ক হইয়া গিয়াছে। ভারত হইতে এতদিন কেবল কাঁচামালই বিদেশে চালান যাইতেছে। এবার সুযোগ বুঝিয়া সুপরিকল্পনা পূর্ব্বক যদি ভারতবাসী কাঁচামাল হইতে ব্যবহারোপযোগী পণ্য প্রস্তুত করিয়া বিদেশে—বিশেষতঃ বৃটিশ সাম্রাজ্যের মধ্যে চালান দিতে পারে, তাহা হইলে বড়ই সুবিধা হয়। কিন্তু এ বিষয়ে সরকারী সাহায্য বা আনুকূল্য পাইলেই ভাল হইত। এই যুদ্ধের পূর্ব্বে বাজারে বিদেশী কাগজের মূল্য কমিয়া যায়। নিখিল ভারতে ২০টি কাগজের কলের পরিচালকগণ তাঁহাদের অংশীদারদিগকে অধিক লাভ দিতে পারেন নাই। কেবল টিটাগড় এবং বেঙ্গল পেপার মিলস্ অংশীদারদিগকে মোটা লাভ দিয়াছিলেন। আর দুইটি কলের পরিচালকগণ অতি সামান্য লাভই দিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। কিন্তু যুদ্ধ উপস্থিত হইবার পর হইতেই বাজারের ভাব পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে। কতকগুলি কাগজের কল বন্ধ হইয়া গিয়াছিল, তাহারা আবার কার্য্যারম্ভ করিয়াছে ও করিতেছে। তবে এখনও কেহ অংশীদারদিগকে লাভ দিতে পারেন নাই। যে দেশের অধিবাসী সংখ্যা প্রায় ৩৮ কোটি, সে দেশে ১৩টি কিম্বা ১৫টি মাত্র কাগজের কল দেশের জন্যই কাগজ যোগাইবার পক্ষে পর্য্যাপ্ত নহে। সেই জন্য ভারত-সরকার বিশেষ অনুসন্ধানের পর কাগজের কলগুলিকে লাইসেন্স লইয়া বিদেশে একটা নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ কাগজ রপ্তানী করিবার আদেশ দিয়াছেন। এখন এই ব্যবস্থা ভালই হইয়াছে, কিন্তু চিরদিন এ ব্যবস্থা ভাল থাকিবে না। তখন ভারতীয় শিল্পজ পণ্য যাহাতে বিদেশে ভূরি পরিমাণে বিকায় তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। "পড়িলে ঢাক বাজাইলেই সিদ্ধি" কাজ করিতে করিতেই বুদ্ধি খুলিয়া যায়। গত যুদ্ধের সময় মিষ্টার স্যামুয়েল টার্ণার বলিয়াছিলেন, "আমরা যুদ্ধ করিতে করিতেই কিরূপে যুদ্ধ চালাইতে হইবে তাহা শিক্ষা করিয়াছি। আমরা তেমনই যখন শান্তির কার্য্য আরম্ভ করিব, সেই সময়ে কি পদ্ধতিতে ইহার কার্য্য চালাইতে হইবে তখন আমরা তাহার পরিকল্পনা করিয়া লইব। পূর্ব্বে হইবে না।"

কারণ, অবস্থা বুঝিয়া ব্যবস্থা করিতে হইবে। আমাদিগকে শ্রম-শিল্পের বিকাশ সাধনে বুদ্ধিপূর্ব্বক আত্মনিয়োগ করিতেই হইবে। তবে পূর্ব্ব হইতে কিছু ভাবিয়া রাখা এবং আত্মরক্ষার জন্য শিল্পোন্নতি করাও আবশ্যক।

বর্ত্তমান যুদ্ধের পরে আমাদের সম্মুখে কতকগুলি সমস্যা বিশেষভাবে উপস্থিত হইবে। প্রথম, পণ্যমূল্যের বিপর্য্যয় ঘটিবে। পণ্যমূল্য অকস্মাৎ পড়িয়া যাইবে কি না, তাহা ঠিক বুঝা যাইতেছে না। বাণিজ্যক্ষেত্রে যেমন ভারতের কতকগুলি খরিদ্দার জাতি কিছু দিনের জন্য হয় ত হাত গুটাইয়া থাকিতে বাধ্য হইবে, তেমনই আবার কোন কোন দেশের অধিবাসীরা বাণিজ্য-ক্ষেত্রে ভারতের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া দাঁড়াইবে। সেইজন্য ভারতীয় পণ্যের মূল্য কিরূপ দাঁড়াইবে তাহা বুঝা কঠিন। তাহার পর টাকার বিনিময়-মূল্যের সহিত পণ্যমূল্যের সম্বন্ধ অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। সেই সম্বন্ধ বিশেষ পাকা বনিয়াদের উপর প্রতিষ্ঠিত না করিলেই ভারতের স্বার্থহানি হইবার বিশেষ সম্ভাবনা। টাকার মূল্য ১৬ পেন্সই হউক আর ১৮ পেন্সই হউক তাহাতে বিশেষ আইসে যায় না, কারণ, মুদ্রামূল্যের সহিত পণ্য মূল্যের একটা সামঞ্জস্য সাধন হইয়াই যায়। বিলাতী সোভারিণের সহিত উহার বিনিময়হার ঠিক রাখিতে হইবে। কারণ, আমাদিগকে বিলাতকে অনেক টাকা সোভারিণের হিসাবে দিতে হয়। তাহার পর সরকারের প্রচলিত মুদ্রা-নীতি এবং বাজার পশার-নীতি (credit policy) রক্ষা করিবার পদ্ধতির পরিবর্ত্তন সাধন আবশ্যক হইবে কি না, তাহাও চিন্তনীয়। এই যুদ্ধে আমাদের অনেক খরিদদার-জাতির ভাগ্যবিপর্য্যয় হইয়া গিয়াছে। এরূপ অবস্থায় আমাদের বিদেশে রপ্তানী-বাণিজ্য রক্ষা করিবার কি উপায় করা কর্ত্তব্য, তাহাও পূর্ব্ব হইতে ভাবিয়া ঠিক করিয়া রাখিতে হইবে। আমাদের দেশ হইতে প্রধানতঃ কাঁচামালই বিদেশে চালান যায়। তাহা রক্ষা করা কতদূর সম্ভব হইবে, তাহাও বিচার্য্য বিষয়। তাহার পর আমাদের দেশের শ্রম-শিল্পের প্রসারবৃদ্ধির কিরূপ ব্যবস্থা করিতে হইবে, এ সম্বন্ধে সরকারী শুল্কনীতি কিরূপ হইবে এবং আমাদিগকেই বা কি করিতে হইবে, তাহাও পূর্ব্ব হইতে অবধারণ করা আবশ্যক। নতুবা শেষ কালে তাহা করিতে গেলে সুবিধা হইবে না।

এ সকল বিষয়ে আমরা সরকারের নিকট অনেকটা সাহায্য প্রাপ্তির আশা করি; কিন্তু সরকার এ বিষয়ে বিশেষ অবহিত বলিয়া আমাদের মনে হয় না। ভারতে শ্রম-শিল্পের উন্নতি সাধন না করিতে পারিলে আমাদের আর নিস্তার নাই। অনেকে হয় ত বলিতে পারেন যে, অগ্রে যুদ্ধই শেষ হউক, তাহার পর এই সকল কথা চিন্তা করা যাইবে। যুদ্ধ কত দিনে শেষ হইবে তাহার স্থিরতা নাই। এ কথা প্রকৃত বিবেচকের মত কথা নহে। যুদ্ধে লিপ্ত গ্রেটবৃটেনও ইহার মধ্যেই একজন মন্ত্রীকে নিয়োগ করিয়া যুদ্ধের পরে বাণিজ্য রক্ষার্থ কিরূপ ভাবে সংগঠন কার্য্য চালাইতে হইবে, তাহার পরিকল্পনা করিবার ভার অর্পণ করিয়াছেন। গ্রেটবৃটেনের পক্ষে এরূপ কার্য্য করা যদি একান্তই প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে ভারতের ন্যায় শ্রম-শিল্পে পশ্চাৎপদ দেশের পক্ষে তাহা যে বিশেষ কর্ত্তব্য তাহা অস্বীকার করা যায় না। ভারত-সরকারও একটি পুনর্গঠন-কমিটী নিযুক্ত করিয়াছেন। ইহার দ্বারা তাঁহারা কার্য্যতঃ এইরূপ পুনর্গঠন কার্য্যের পরিকল্পনা করিবার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করিয়াছেন সত্য, কিন্তু কমিটীর বিচার্য্য বিষয় আরও বর্দ্ধিত করিয়া দিলেই লোক তাঁহাদের কার্য্যে বিশেষ সন্তুষ্ট হইতে পারিত। আমাদের বিশ্বাস, এখনও সময় আছে। অতএব ভারত-সরকার যদি সমস্ত শ্রম-শিল্প সংগঠনের পরিকল্পনা ও ব্যবস্থার বিষয় এই সমিতির হস্তে সমর্পণ করিয়া দেন, তাহা হইলে ভাল হয়। বিগত ইয়োরোপীয় মহাযুদ্ধের সময় আমরা পূর্ব্ব হইতে কোন পরিকল্পনা করিয়া রাখি নাই। সেই জন্য বিগত যুদ্ধের পর অর্থাৎ ১৯১৮ খৃষ্টাব্দের পর প্রায় পাঁচ ছয় বৎসর পর্য্যন্ত আমাদের চেষ্টা এবং শিল্পোন্নতির বাসনা অন্য জাতির কার্য্যদ্বারা অত্যধিক বিড়ম্বিত হইয়াছিল। এবার তদপেক্ষা অধিক বিস্তীর্ণ ভূভাগ এই যুদ্ধে বিধ্বস্ত হইয়া গিয়াছে এবং যাইতেছে। এরূপ অবস্থায় আমাদের পূর্ব্ব হইতে অধিকতর সাবধান হওয়া আবশ্যক। সেই জন্য এবার আমাদিগের এই চেষ্টায় অধিক মনোযোগী হওয়া উচিত। কোন দেশের লোক যদি সম্মিলিত হইয়া নিজ জাতীয় ও রাষ্ট্রীয় স্বার্থ রক্ষা করিতে অবহিত না হয়, তাহা হইলে এই প্রবল জীবনসংগ্রামের দিনে তাহাদিগের পক্ষে স্বীয় অস্তিত্ব রক্ষা করিয়া থাকাই

অসম্ভব ইহার, অথবা তাহাদিগকে অতি হীন বৃত্তি অবলম্বন করিয়া নিখিল-মানবজাতির নিম্নস্তরে অতি শোচনীয় অবস্থায় থাকিতে হইবে। বর্ত্তমান যুগে পৃথিবীর সকল দেশেই মানবজাতি স্বকীয় স্বার্থবুদ্ধির দ্বারা চালিত হইয়া থাকে, নৈতিক ধর্ম্মবুদ্ধির দ্বারা কোন জাতিই চালিত হইতেছে না। সেই জন্যই আপনাদের প্রগতির পথ মুক্ত রাখিবার চেষ্টাই ভারতবাসীমাত্রেরই বিশেষ ভাবে কর্ত্তব্য হইবে। সরকারী কমিটী যুদ্ধের পর সমরসম্ভার প্রস্তুত বিষয়ে কি উপায় করা হইবে, তাহা বিবেচনা করিবেন; কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে প্রতিযোগিতার অভাবজনিত সুবিধা পাইয়া যে সকল শিল্প বৃদ্ধি পাইয়াছে, তাহা কি উপায়ে রক্ষা করা যাইবে, তাহাই আমাদের দেশের সর্ব্বসাধারণের চিন্তার বিষয় হওয়া উচিত। সেই সম্বন্ধে পরিকল্পনা করা একান্তই আবশ্যক।

বর্ত্তমান সময়ে আমাদের রপ্তানী বাণিজ্য অতিশয় বিপর্য্যস্ত হইয়া গিয়াছে। অনেক দেশ বিধ্বস্ত হইয়া যাওয়াতে তাহারা আর আমাদিগের দেশ হইতে পণ্য লইতে পারিতেছেন না। কিন্তু কোন কোন দেশে আমাদের দেশজাত পণ্য কিছু অধিক যাইতেছে এবং কোন কোন দেশ আমাদিগের নূতন খরিদ্দার শ্রেণীভুক্ত হইয়াছে। পূর্ব্বে ইয়োরোপে কেবল আমাদের দেশ হইতে কাঁচা মাল অধিক চালান যাইত, এখন কোন কোন নূতন দেশে আমাদের দেশে প্রস্তুত শ্রম-শিল্পজ পণ্যও চালান যাইতেছে। উহা পরিমাণে অধিক না হইলেও যাহাতে শ্রম-শিল্পজ পণ্য বিদেশে অধিক কাটে, তাহার জন্য চেষ্টা করা আবশ্যক। কোন দেশ যদি বিদেশে কেবল কাঁচা মাল রপ্তানী করে এবং বিদেশ হইতে তাহাদের আবশ্যক শ্রম-শিল্পজ ব্যবহার্য্য পণ্য আমদানী করিতে বাধ্য হয়, তাহা হইলে সে জাতি নিতান্ত পঙ্গু অবস্থায় দারিদ্র্য পঙ্কে নিমগ্ন হইয়া থাকে,—তাহারা আর কস্মিনকালেও সমৃদ্ধির মুখ দেখিতে পায় না। প্রবল দারিদ্র্যে মানুষের প্রতিভা নষ্ট হইয়া যায়, মনীষা আত্মপ্রকাশ করিতে পারে না। বিদেশে বে-পরোয়া হইয়া কাঁচা মালের রপ্তানী করিলে দেশের মঙ্গল হয় না। উহা অবস্থাবিশেষে দারিদ্র্য বৃদ্ধি করে, কখনই সমৃদ্ধি বৃদ্ধি করে না। ভারতের দারিদ্র্য যে কিরূপ প্রবল, তাহা সম্প্রতি সার ইব্রাহিম রহিমতুল্লা অতি সুন্দর ভাবে দেখাইয়াছেন। বৎসরে ৪৫টি টাকা যে দেশের প্রত্যেক ব্যক্তির গড় আয়, সে দেশে জনকয়েক ধনী ব্যক্তি ভিন্ন আর সর্ব্বসাধারণের আয় কত তাহা ভাবিয়া দেখা আবশ্যক। ধনীদিগকে বাদ দিলে ভারতের অধিকাংশ লোকের আয় গড়ে মাসিক তিন টাকারও কম পড়ে। দিন ৫টি কিম্বা ৬টি পয়সা যে দেশের প্রত্যেক লোকের আয়, সে দেশের লোক কত দরিদ্র, তাহা চিন্তা করিয়া দেখা আবশ্যক। এখন শিল্পের উন্নতি সাধনই এই দুরন্ত দারিদ্র্য-সমস্যা সমাধানের একমাত্র উপায়। সেই জন্য আমি আমার দেশবাসীকে এই সময়ে এই বিষয়ে অবহিত হইবার জন্য বিশেষ ভাবে অনুরোধ করিতেছি।



প্রভাতকুমারের ছোট গল্প

—অধ্যাপক নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী এম, এ.

গত সংখ্যায় শৈলর বিবাহ 'অঙ্গহীনা' গল্প আলোচনা প্রসঙ্গে নাটকীয়ভাবে দেখান হইয়াছে। বাস্তবিক, ঐ রাত্রিতে যদি শৈলর বিবাহ না হইত, তবে জীবনে তাহার আর বিবাহ করা হইত না। হিন্দু সমাজের পেষণে সে তো চূর্ণ হইয়া যাইত। সে তো পতিতা হইয়া আ-জীবন লাঞ্ছিতার জীবন যাপন করিত। তাই শৈল'-র প্রেমে আবদ্ধ হইয়া মোহিনী বিবাহ করে নাই। প্রভাতকুমারের মোহিনীর চরিত্রাঙ্কণে সাফল্য, এই খানে। মোহিনীর সেই রাত্রিতে পিতা হরেকৃষ্ণ রায়ের বাড়ীর অপমানের কথা চিন্তা করিবার অবসর খোঁজার সময় সে রাত্রিতে নহে। সেই রাত্রিতে শৈলকে বিবাহ করা তাহার সঙ্গত হইয়াছিল।

কিন্তু শেষে মোহিনী চিন্তিত হইল।

প্রভাতকুমার, মোহিনীর এই উভয় বিপদে দুই দিক যাহাতে রক্ষা হয় তাহাই করিলেন। তাহাকে তিনি তখন দেশে পাঠাইলেন না এবং কাহাকেও জানিতে দিলেন না যে, সে বিবাহ করিয়াছে। গ্রীষ্মাবকাশে সেবার সে কলেজের ছুটীতে বাড়ী গেল। শৈল তখন চিঠিপত্র তাহাকে লিখিত। কিন্তু তাহার একখানা চিঠি শত সাবধানতা সত্ত্বেও ধরা পড়িল। কেহ কিছু না বুঝিয়া মনে করিল, ছেলে বিগড়াইয়া গিয়াছে। শেষে, সকলের অনুরোধে সেই গ্রামের কোন মেয়ের সঙ্গে জমিদার হরেকৃষ্ণ রায় পুত্রের বিবাহের বন্দোবস্ত করিল। কিন্তু মোহিনী সেই মেয়েকে বিবাহ করিতে স্বীকৃত হইল, এই সর্ত্তে যে, তাহার বিবাহের সময় শ্যামাচরণ বাবুদের সপরিবারে তাহাদের বাড়ী আনিতে হইবে।

অগত্যা, পিতাকে রাজী হইতে হইল। প্রভাতকুমার, এই সূত্রে শ্যামাচরণ দ্বারাই গল্পের উপসংহার করাইলেন। মোহিনীর বিবাহের আনুপূর্ব্বিক সমস্ত ঘটনা প্রকাশিত হইল। হরেকৃষ্ণ রায় সাদরে শৈলকে বধূবরণ করিলেন। সকলের উল্লাস হইল।

ওদিকে, মোহিনীর জন্য যে মেয়েটি শেষে স্থির করা হইয়াছিল, তাহার সহিত আতার বিবাহ হইল। এইরূপ সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দররূপে লেখক "অঙ্গহীনা" ছোট গল্পটি শেষ করিয়াছেন। সে বিয়ের-ফর্দ্দ শৈল'-র বিবাহের পথে অন্তরায় হইয়াছিল সেই ফর্দ্দ মত হরেকৃষ্ণ রায় নিজেই শেষে সমস্ত অলঙ্কার পুত্রবধূকে দিলেন। প্রভাতকুমার পণের দাবী শেষ করিলেন।

হিমানীতে প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়কে আরও বড় ভাবে পাওয়া যায়। তাহাতে যে কি উচ্চ আদর্শ তিনি প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, তাহা অনুভূতিসাপেক্ষ।

তিনি এখানে স্থূল ও সূক্ষ্ম ভালবাসার বিভেদ, পাঠক-পাঠিকার সম্মুখে তুলিয়া ধরিতে চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহার লেখায় এই সংযমটা আরও বেশী করিয়া উঠিয়াছে তখন, যখন তিনি সামাজিক বিবাহ বন্ধন সর্ব্বকার্য্যদ্বারা পবিত্র ও অচ্ছেদ্য রাখিতে চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি প্রমাণ দিয়াছেন, "তাহাকেই বলি ভালবাসা যাহা উহার বিনিময়ে আত্মবিসর্জ্জন দিতে কুণ্ঠিত হয় না।" তিনি বলিয়াছেন, "হিন্দুদের বিবাহ-বন্ধন ধর্ম্মসংস্কার ভিন্ন অন্য কিছু নহে। বিলাতী চোখের নেশা, প্রথম প্রেম দুদিনে আসে আবার দুদিনে চলিয়া যায়।"

চুম্বক যেমন লৌহ আকর্ষণ করে, দুইটি যুবক যুবতীর অবাধ মেলামেশা তেমন একের অন্যের প্রতি আকৃষ্ট হওয়ায় বিপদ টানিয়া আনে। তাই হিন্দু শাস্ত্রকারেরা এরূপ সঙ্গের বিরুদ্ধে তীব্র অনুশাসন রাখিয়া গিয়াছেন। শুধু এই বিষয়টির ভয়াবহ পরিণামের জন্য কত সহস্র সংস্কৃত শ্লোক তাঁহারা রচিত করিয়াছেন। এ দোষ, সে দোষ, পাপ, মহাপাপ, নরকবাস ইত্যাদির ভয় তাঁহারা দেখাইয়াছেন। প্রভাতকুমারের তাই বোধ হয় মনে দুঃখ হইয়াছিল এবং সেইজন্য হিমানীর আদর্শ হিন্দুসমাজে দেখাইতে বড়ই উৎসুক হইয়াছিলেন। পাছে হিন্দুসমাজ নরকের পথে যায়, তাই তিনি ভীত ত্রস্ত হইয়া সমাজকে বন্ধনের ভিতর রাখিয়া ইহাকে উচ্চতরভাবে দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন।

বিদায়ের দৃশ্যই হিমানীর আরম্ভ, শেষেও বিদায়ের যবনিকা। মাঝখানে তো কান্নাকাটি, চোখের জল আছেই।

লেখকের উদ্দেশ্য ইহা যে, এই চোখের জলের ভিতর যে ছবি তিনি দেখাইবেন তাহা পাঠক পাঠিকার বুকে দাগের মত কাটিয়া পড়িবে।

এই গ্রন্থের উপক্রমণিকায় বলা হইয়াছে, 'ভাল ছোট গল্প হইবে সেগুলি, যাহাতে করুণ গাঁথা দিগন্ত বিস্তৃত একটা মর্ম্মন্তুদ দৃশ্যের পানে প্রাণকে টানিয়া লইয়া যায়। প্রভাত কুমারের হিমানী সেই জাতীয় ছোট গল্প। ইহা পড়িতে পড়িতে শেষের দিকে যেন রোদন সংবরণ করা যায় না।

হিমানী মেয়েটির জন্য পাঠক পাঠিকার দুঃখ হইবেই। দুঃখের জন্যই যেন তাহার জন্ম, চোখের জল ফেলিতে ফেলিতেই তাহার প্রাণ গেল। কিন্তু নির্দ্দয় বিধাতা নির্ম্মমভাবে যে তাহাকে শাস্তি দিবেনই। তাহার কৃতকর্ম্মের জন্য তাহাকে যে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবেই। আর হিমানীর বিধাতা এখানে শরীরী মানুষ। তাঁহার যে আক্রোশ যুবতী হিমানীর উপর। কারণ, সে কৈশোরে ও যৌবনে না জানিয়া বিবাহিতযুবক মণিভূষণকে প্রাণ মন ঢালিয়া পাপ করিয়াছিল। হিন্দু সমাজের বন্ধন রক্ষাকারী প্রভাতকুমার মণিভূষণকে হিমানীর পানে ছাড়িয়া দিতে পারেন না। সে বিবাহিত হিন্দু, আর হিমানী অনূঢ়া খৃষ্টান তনয়া, রূপে গুণে আদর্শস্থানীয়া। তাহার পিতা কালাদাস মিত্র, কলিকাতার কোনও এক মিশনারী বড় কলেজের অধ্যাপক। অধ্যাপক মহাশয়ও যেমন মেয়েকে প্রথমতঃ মণিভূষণের সঙ্গে অবাধ মেলা-মেশা করিতে সুযোগ দিয়াছিল সেরূপ শেষে পস্তাইলও বটে।

বিধাতার বেশে প্রভাতকুমার মণিভূষণকে আর হিমানীর নিকট রাখিলেন না, যখন তিনি বুঝিলেন একে অন্যকে সর্ব্বদাই লিপ্সা করিতেছে।

মণিভূষণ চেষ্টা করিল সে নির্জ্জনে, লোকালয়ের বাহিরে থাকিবে, কোনও নারীর মুখ দেখিবে না। তাহাতে আরও মজা হইল। নির্জ্জনতার সুযোগে হিমানীর ছায়া যেন কায়ারূপ ধারণ করিয়া তাহার পিছু পিছু জড়াইয়া ধরিতে অবকাশ পাইল। ক্রমে তাহাকে "মনোম্যানিয়া" ব্যাধিতে আক্রমণ করিল।

উহা ডাক্তারের চিকিৎসার বাহিরে। তাহার মানস-পটে যে হিমানীর মূর্ত্তি আঁকা আছে তাহা হইতে সে তাহার ছবি কাগজ পটে আঁকিতে চেষ্টা করিল। তাহা সহজসাধ্য নহে। কিন্তু হিমানীর ভালবাসার যে গভীর দাগ মণির বুকে পড়িয়াছিল, প্রাণান্ত পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ের গুণে তাহাও সম্ভবপর হইল। তাহাকে সে কাগজের উপর বসাইল। এ ঠিক সেই কিশোরী হিমানী, ক্রমে ক্রমে যুবতী হইয়াছে। মণিভূষণ যেন ক্ষেপিয়া গিয়া বড় কবি হইল।

স্ত্রী নবদুর্গাকে মণিভূষণ পূর্ব্বে হিমানীর সমস্ত আখ্যান বলিয়াছিল, তাহাতে পত্নী ক্রুদ্ধ হইয়া স্বামীকে দুশ্চরিত্র ভাবিয়া বলিয়াছিল, "তুমি চরিত্রহীন, তুমি আমায় স্পর্শ করিও না।" মণিভূষণের তাই আর বাধা ছিল না। প্রভাতকুমার এখানেও তাঁহার আদর্শ ঠিক রাখিয়াছেন। সতীত্ব কি শুধু নারীজাতির? পুরুষ কেন হিন্দু হইয়া খৃষ্টানের মেয়ের প্রেমে পড়িবে? তাই তিনি, নবদুর্গাকে মণিভূষণ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া, দুর্নীতির প্রশ্রয় দিলেন না।

ওদিকে, হিমানী খৃষ্টানের মেয়ে হইলেও লেখকের তাহার প্রতি একটা কর্ত্তব্য আছে। চরিত্রহীনতা কোনও ধর্ম্মেই প্রশংসা করে না, হিমানী যে মণিভূষণকে ভালবাসিয়া তাহার কাছে আত্মসমর্পণ করিয়াছিল আর সে চাহিল না তাহার মণিভূষণকে দেওয়া প্রাণ, আবার তাহার নিকট হইতে আনিয়া, আর কাহাকে দেয়, কারণ সে খৃষ্টান হইলেও বাঙ্গালী। এদেশের অস্থিমজ্জাগত সংস্কারকে সে আঁকড়াইয়া ধরিল। নৈলে খৃষ্টধর্ম্মে তো Divorce প্রথা বর্ত্তমান আছে। আর সে তো আইনতঃ বিবাহিতাও নহে; সে অবাধে অন্যত্র বিবাহ করিতে পারিত। কিন্তু হিমানী এই মাটির আদর্শই অবলম্বন করিল।

ত্যাগে সুখ, ভোগে সুখ নাই। হিমানী তাহার পিতার মৃত্যুর পর শোকে সান্ত্বনা পাইবার জন্য মায়ের সঙ্গে কৃষ্ণনগরের "জেনানা মিশনে" চিকিৎসা ব্যবসায়ের কার্য্যে নিযুক্তা হইল।

প্রভাত কুমার, হিমানীর জন্য সুচিন্তিত ব্যবস্থা করিলেন। এখানে তাঁহাকে পক্ষপাতিত্ব দোষে দুষ্ট করা যায় না। তিনি মণি ভূষণকেই বেশী পাপী মনে করিয়াছেন, কেন সে বিবাহিত হিন্দু-যুবক হইয়া এরূপ নিয়মবিরুদ্ধ কার্য্যে লিপ্ত হইয়াছিল। তাই মণি ভূষণের ভাগ্যে "মনোম্যানিয়া।"

মণিভূষণ হিমানীকে বহুদিন পরে পুনরায় পাইয়া অত্যন্ত

আনন্দিত হইল, যখন সে পীড়িতা নবদুর্গার সংবাদ দিবার জন্য আসিয়াছিল যে, নবদুর্গা শেষ মুহূর্ত্তে একবার স্বামীর দর্শন-ভিক্ষা চায়।

হিমানীই নবদুর্গার চিকিৎসার ও শুশ্রূষার ভার লইয়াছে। মণিভূষণ এ সংবাদে বিস্মিত হইয়া ভাবিল, হিমানী মানবী নহে। সে নবদুর্গাকে বাঁচাইয়া তুলিয়া তাহাকে তাহার সাধের মণির গলার হীরার কণ্ঠি করাইবে, তাহাতেই তাহার জীবনের খাটি সার্থকতা হইবে, সে সুখে মরিতে পারিবে, হইলও তাই। হিমানী মণিভূষণকে লইয়া নবদুর্গার কাছে গেল। সে তখন মৃতপ্রায়। ডাক্তার বলিয়াছে রোগীণীর অসম্ভব রূপে নীরক্তাবস্থা হইয়াছে। তাহার দেহ এখন অন্য সমজাতীয়ার রক্ত না পুরিয়া দিলে সে কিছুতেই বাঁচিবে না। মণিভূষণের অনেক নিষেধ সত্ত্বেও হিমানী কৃতসঙ্কল্প হইল যে, সে নিজেই নবদুর্গার শিরায় নিজের ধমনীর রক্ত দিয়া তাহাকে নীরক্তাবস্থা হইতে রক্ষা করিবে।

প্রভাতকুমার এই যে ত্যাগের ছবি অঙ্কিত করিয়াছেন, ইহাই তাঁহার অসীম কৃতিত্ব।

হিমানী, নবদুর্গাকে রক্ত দিয়া নিজে মুসড়াইয়া পড়িল, ক্রমে নিস্তেজ হইল। এ পর্য্যন্ত কখন ইহা অনুমান করা যায় না—হিমানী আত্মবিসর্জ্জনের জন্য এই কাণ্ড করিয়াছে। সে গভীর রাত্রিতে স্বেচ্ছায় সেই শিরার বন্ধন খুলিয়া ফেলিয়াছিল। অবিরাম রক্ত বাহির হইতে লাগিল। ডাক্তার ও লোক-জন ছুটিয়া আসিল। কিন্তু তখন ডাক্তার বলিল, এ রোগিনীর আত্মহত্যা। সকল প্রকার চেষ্টা ও ঔষধ-পত্রে হিমানীকে আর রক্ষা করা গেল না।

"নব-দুর্গা সুখিনী হউক"—এই তাহার বিদায়বাণী।

হিমানীকে বধ করিয়া পাঠক-পাঠিকাকে চোখের জলে ভাসাইয়া প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের তৃপ্তি হইল।

"হিমানী, নবদুর্গাকে শাস্তি দিবার জন্য মরে নাই"—যদি একথা কেহ বলেন তবে তাঁহাকে আদর্শতন্ত্রবাদী Idealistic বলা হইবে। পাঠকপাঠিকার, হিমানীর প্রতি এরূপ উচ্চ ধারণা হওয়া স্বাভাবিক, কারণ এরূপ আনন্দ-কলির মুকুলে বিনাশ পরম দুঃখের বটে এবং ইহা দেখিয়া সকলেরই প্রাণে সহানুভূতি জাগে বটে কিন্তু কঠিন প্রতিহিংসা-পরায়ণ মনের হিমানীর মৃত্যুতে এই ধারণা হয়,—হিমানী, মণিভূষণের কাছে গিয়াছিল একটা কঠোর সত্য পালনের ব্রত লইয়া অর্থাৎ "নবদুর্গাকে বাঁচাইয়া তুলিবে বলিয়া," কিন্তু মণিভূষণের সঙ্গে দেখা হইবার পর হিমানীর উদ্বেলিত প্রণয় সিন্ধু যেন আর বাগ মানিতে পারিল না। সে উত্তালতরঙ্গ পুনরায় প্রণয়িনীর মনে জাগিয়া যেন তাহাকে জলের নীচে ডুবাইয়া দম আটকাইয়া মারিল। সে ভাবিল, যখন মণিভূষণকে পাওয়া হিন্দু-সমাজপুরাণী গর্হিত তখন আর বাঁচিয়া লাভ নাই। সে সময় বোধ হয় প্রভাতকুমারের মনে হইয়াছিল "আয়েষার প্রণয়ী দুই জন থাকিতে পারে না" তাই হিমানী রক্তের শিরার বাঁধ স্বেচ্ছায় ছুটাইয়া রক্তপাতে আত্মহত্যা করিল। হিমানী যদি বাঁচিয়া উঠিয়া, নবদুর্গার প্রাণদান করাইয়া, মণিভূষণের সঙ্গে তাহার পুনর্ম্মিলনের সুরাহা করিয়া নিজে ব্রহ্মচারিণী থাকিয়া সেই সেবাব্রত অবলম্বন করিতে পারিত তবেই তাহার জীবন আদর্শময় হইত। কিন্তু প্রভাতকুমার সে আদর্শ দেখাইতে পারেন না কারণ তাহা হইলে তিনি যে ছোট-গল্পকে করুণতার মর্য্যাদা দিয়া যে শ্রেষ্ঠ ছোট-গল্প করিতে চাহেন তাহা যে হয় না। পাঠক-পাঠিকা কাঁদুক তিনি যে তাহাই চান। তাঁহার যে তাহাতেই স্বার্থসিদ্ধি।

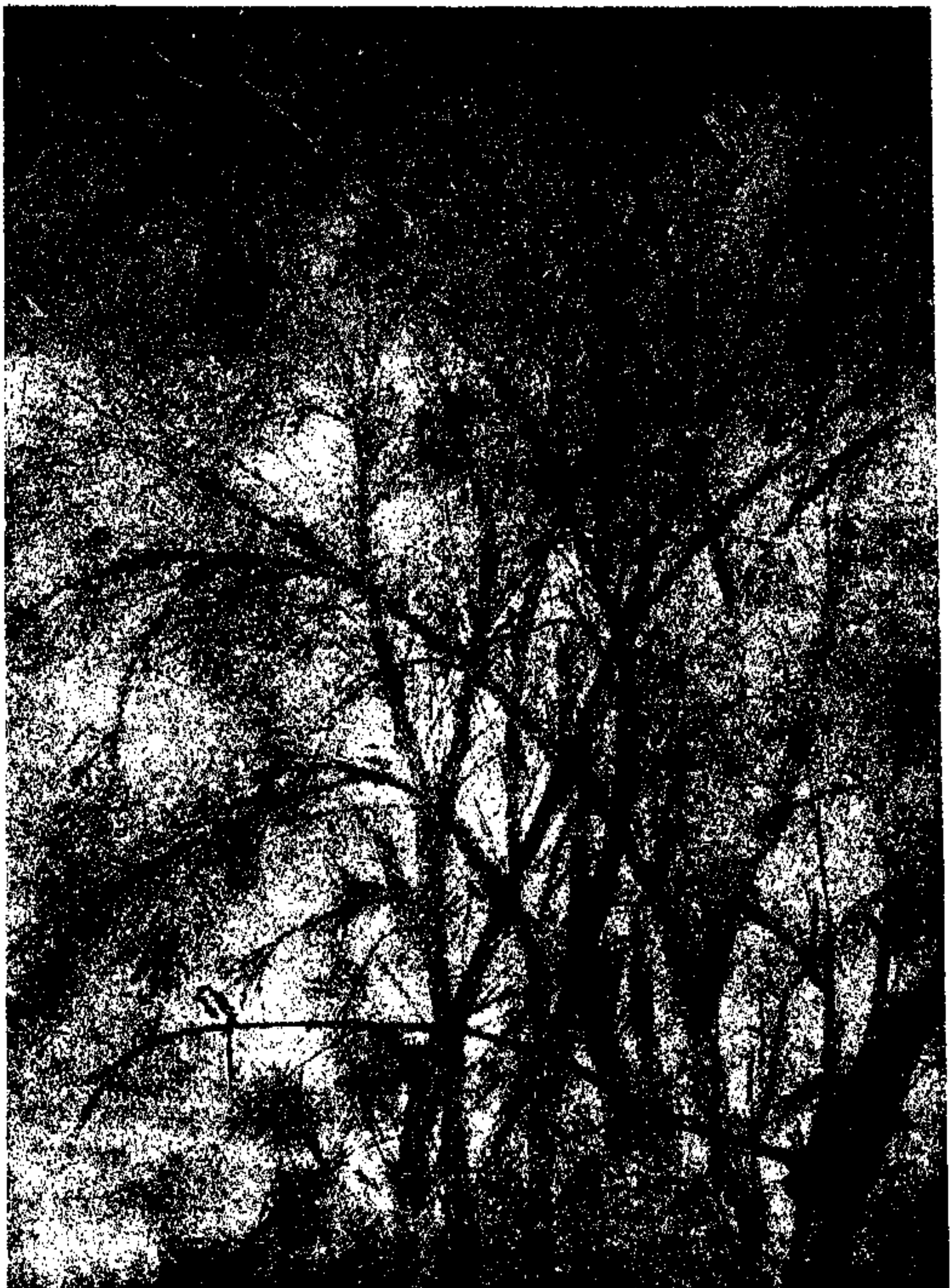
হিমানী যে কারণেই আত্মদান করিয়াছিল তাহা পাঠক-পাঠিকার আর আলোচনা করিতে প্রাণে বাজে। তাহাদের সবচেয়ে বেশী দুঃখ হয় তাঁহার এই কথাগুলিতে :

"হিমানী আবার দুগ্ধ পান করিল, আরও একটু সুস্থ হইয়া বলিল, 'কতগুলি কি স্বপ্ন দেখিতে ছিলাম, কিন্তু বড় চমৎকার স্বপ্ন। দেখ মণি! আমি যেন নবদুর্গা হইয়া জন্মিয়াছিলাম আর তোমার সঙ্গে আমার বিবাহ হইতেছিল। আমি যদি নবদুর্গা হইয়া জন্মাই তবে তুমি কি আমায় এমনি ভালবাসিবে!'

মণিভূষণ বাষ্পাকুলস্বরে বলিল, "হাঁ হিমা, এমনই ভাল-বাসিব।"

হিমানী বলিল, "তবে কাল প্রাতে আমার আত্মা নব-দুর্গার সঙ্গে পরিবর্ত্তন করিব। আমার ভারি ঘুম পাইতেছে।"

প্রভাতকুমার আর এখানে ধৈর্য্য ধরিতে পারিলেন না। খৃষ্টান ধর্ম্মাবলম্বী বালিকার মুখ দিয়া জন্মান্তর, হিন্দুধর্ম্মে



নিভৃত বনানী — শিল্পী—শ্রীরবীন্দ্র দত্ত

নারীর পরজন্মে পতিকামনা প্রভৃতি না বলাইয়া পারিলেন না। হিমানী মনে-প্রাণে মণিভূষণকে প্রাণ দিয়াছিল, সে বুঝিয়াছিল, "খৃষ্টীয় মিশনের সেবাব্রত-চ্ছলে ডাক্তারীই করি বা ধাত্রীগিরিই করি, মণি বিহনে আমার বাঁচিয়া থাকা সম্ভব হইবে না কিন্তু সর্ব্বতঃ মণিভূষণকেও পাওয়া যাইবে না। অতএব এ যাত্রায় যাই, ফিরিয়া যদি মণিকে পাই।"

প্রভাতকুমার, মণিভূষণকে যে শাস্তি দিয়াছেন তাহা বাস্তবিকই নিদারুণ।

"মণিভূষণের পাগলামি ব্যাধি আরও বৃদ্ধি পাইয়াছে কিন্তু সেই ব্যাধিতেও একটা সুলক্ষণ দেখা যায়। স্ত্রীর প্রতি তাহার মন আশ্চর্য্যরকম ফিরিয়া গিয়াছে। এখন সে স্ত্রীকে 'হিমানী' বলিয়া ডাকে।"

লেখকের এই দুইটি ছোট-গল্পের মাধুর্য্য আরও বাড়িয়াছে ইহাদের ভাষার প্রাঞ্জলতার জন্য। কোনরূপ কঠিনতা বা দুরূহতা ইহাতে নাই।

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের ছোট-গল্পের ভাবধারা লইয়া এ যাবৎ আলোচনা করা হইয়াছে কিন্তু ভাবার দিক দিয়া বলিতে গেলে, তিনি তাঁহার এই সময়ের রচনায় তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তীদিগের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন, "রমেশচন্দ্রের প্রতিভার সহিত আমার প্রথম পরিচয় যখন আমি একাদশ বৎসরের বালক। তৎপূর্ব্বে আমি একখানি-মাত্র উপন্যাস পাঠ করিয়াছি—তাহা "আনন্দমঠ।" কোথা হইতে জানি না, বাড়ীতে একখানি ছেঁড়া জীবন সন্ধ্যা আসিয়া পড়িয়াছিল। তাহার সম্মুখ ভাগের খান কতক পৃষ্ঠা ছিল না, শেষের দিকটারও সেই অবস্থা। যে অংশ টুকু অবশিষ্ট ছিল তাহাই আগ্রহের সহিত পাঠ করিয়াছিলাম। দ্বিপ্রহর রজনীর গভীর অন্ধকারে কেবল তারকালোকে নিস্তব্ধ কানন ও তমসাচ্ছন্ন পর্ব্বত পথ দিয়া তেজসিংহ নাহারামগরো গহ্বরে চারণী দেবীর নিকট আপনার ললাট লিখন জানিতে গমন করিতেছেন। সর্ব্বাপেক্ষা এই দৃশ্যটিই আমার তরুণ হৃদয়কে মথিত ও কম্পিত করিত। কি ভয়ঙ্কর সেই গহ্বর—!"

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় ব্যারিষ্টারি পড়িতে গিয়া রমেশচন্দ্রের সহিত যে ঘনিষ্ঠতা করিয়াছিলেন এবং তিনি যে তাঁহাকে বড় চোখেই দেখিতেন এবং তাঁহার অনুসরণ করিতেন তাহা তাঁহার "বিলাত ভ্রমণে" পাওয়া যায়।

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের নব কথা ছোট-গল্পের পুস্তকে নিম্নলিখিত ছোট-গল্প সমূহ দেখিতে পাওয়া যায় ইহার অধিকাংশই এই গ্রন্থের আলোচ্য সময়ের পরে। তবুও ঐ সমস্ত পাঠক-পাঠিকার অবগতির জন্য দেওয়া হইল

১। অঙ্গহীনা। ২। হিমানী। ৩। ভূত না চোর। ৪। বেনামী চিঠি। ৫। কুড়ানো মেয়ে। ৬। কাজির বিচার। ৭। একটি রৌপ্য মুদ্রার জীবন চরিত। ৮। কাটা মুণ্ড। ৯। পত্নী মায়া। ১০ ভুলভাঙ্গা। ১১। দেবী। ১২। শ্রীবিলাসের দুর্বুদ্ধি ১৩। ভিখারী সাহেব। ১৪। বিষবৃক্ষের ফল ১৫। শাহজাদা ও ফকির কন্যার প্রণয় কাহিনী। ১৬ বঙ্কিম বাবুর কাজির বিচার। ১৭। দ্বিতীয় বিদ্যাসাগর ১৮। বউ চুরি। ১৯। প্রিয়তম। ২০। ছদ্মনাম ২১। কলির মেয়ে। ২২। বলবান জামাতা। ২৩ গহনার বাক্স। ২৪। অদৃষ্ট পরীক্ষা।

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের "ষোড়শী" নামক ছোট-গল্পের পুস্তকে নিম্নলিখিত ছোট-গল্পগুলি আছে। এ সমস্ত এই গ্রন্থের আলোচনার বহির্ভূত :

১। সারদার কীর্ত্তি। ২। বক্স শিশু। ৩। কাশীবাসিনী। ৪। ধর্ম্মের ফল। ৫। প্রণয়-পরিণাম। ৬। বাস্তুসাপ। ৭। ভুল শিক্ষার বিপদ। ৮। অযোধ্যার উপহার। ৯। খুড়া মহাশয়। ১০। গুরুজনের কথা। ১১। আত্মত্ব। ১২। ডাগর মেয়ে। ১৩। মাষ্টার মহাশয়। ১৪। নয়নমণি। ১৫। বাজীকর।

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের "গল্প-বীথিতে" নিম্নলিখিত ছোট-গল্পসমূহ দেখা যায়। ঐ সমস্ত ছোট-গল্প এই গ্রন্থের আলোচনার ভিতর পড়ে না :

১। খোকার কাণ্ড। ২। বায়ু পরিবর্ত্তন ৩। সম্পাদকের আত্ম কাহিনী। ৪। নীলু দা। ৫ যুগল সাহিত্যিক। ৬। কুমুদের বন্ধু। ৭। বাল্য বন্ধু ৮। বিলাত ফেরতের বিপদ। ৯। মাদুলী। ১০ রসময়ীর রসিকতা। ১১; মাতৃহীন। ১২। আদরিনী ১৩। অলকা। ১৪। কুঙ্কুম কুমারীর গুপ্ত কথা। ১৫ হতাস প্রেমিকার ডায়েরী। ১৬। প্রত্যাবর্ত্তন। ১৭ বজ্রভঙ্গ। ১৮। লেডি ডাক্তার।

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের "দেশী ও বিলাতী" ছোট-গল্পের পুস্তকে নিম্নলিখিত ছোট-গল্পসমূহ দৃষ্ট হয়। এই সমস্তও এই গ্রন্থের আলোচ্য সময়ের ছোট-গল্প সমূহের বহির্ভূত :

১। আমার উপন্যাস। ২। আধুনিক সন্ন্যাসী। ৩। এক দাগ ঔষধ। ৪। স্বর্ণ সিংহ। ৫। প্রতিজ্ঞা পূরণ। ৬। উকীলের বুদ্ধি। ৭। হাতে হাতে ফল। ৮। খালাস। ৯। মুক্তি। ১০। ফুলের মূল্য। ১১। পুনর্মূষিক। ১২। প্রবাসিনী।

শোভাময়ীর মূর্চ্ছা

গুপ্ত

পিতা প্রফুল্লচন্দ্র বিলাতী বইয়ের দোকানে বইবিক্রীর দালালি করে, ইহাতে কন্যা শোভাময়ীর যেন আর লজ্জার অবধি নাই!

শোভাময়ী বালীগঞ্জ বালিকা-বিদ্যালয়ে ক্লাস নাইন-এ পড়ে। তাহার সহপাঠিনীদের পিতারা কেহ উকীল, কেহ মুন্সেফ, কেহ সাবজজ, কেহ ম্যাজিষ্ট্রেট, কেহ অধ্যাপক, কেহ শিক্ষক, কেহ বা সরকারী অথবা বে-সরকারী কর্ম্মচারী, কিন্তু বইবিক্রীর ক্যানভ্যাসার কেহ নাই। অতএব শোভাময়ী মরমে মরিয়া আছে!

বালীগঞ্জ বালিকা-বিদ্যালয়ে শোভাময়ী পড়িতেছে আজ চার বৎসর। তাহার পিতা কি কাজ করেন সেকথা জিজ্ঞাসা করিলে শোভা এই চার বৎসর ধরিয়া বলিয়া আসিতেছে, ইউরোপীয়ান ফার্ম্মে চাকুরি করেন,—প্রাণ ধরিয়া সে ক্যানভ্যাসারীর কথা বলিতে পারে নাই। শোভা তাহার মাতাকে বলে, "ম্যাট্রিক্‌টা কোন রকমে পাস্ কর্‌তে পার্‌লে কলেজে আর পড়ব না মা, যদি পড়তে হয় ত প্রাইভেট্ পড়ব। বাবার বইয়ের দালালির কথা আর 'ইতি গজ' করে' বন্ধুদের কাছে বল্‌তে পারিনে—"

শোভাময়ীর বয়স এখন সতেরো। বছর ন-দশ পূর্ব্বে শিশু শোভার নিকট প্রফুল্ল তাহার ক্যানভ্যাসারী-কৃতিত্বের গল্প করিত। পিতার উপজীবিকা সম্বন্ধে শোভাময়ীর মনোভাব তখনও সুস্পষ্ট আকার ধারণ করে নাই। সেরূপ স্পষ্টতার পক্ষে তাহার বয়সও তখন যথেষ্ট নয়, কাজেই শ্রদ্ধার সহিত শোভা সে সকল কাহিনী শুনিত।—

"তুমি প্রথমে রেলগাড়ীতে বই বিক্রী কর্‌তে বাবা?"

গর্ব্বের ভঙ্গীতে খোঁচা খোঁচা দাড়িওয়ালা মুখ নাড়িয়া প্রফুল্ল বলিত "হুঁ-উঁ,—শুধু কি বই? তেলের সঙ্গে বই। 'কেশবর্দ্ধিনী' তেল—দাম এক টাকা। এক শিশি তেল কিন্‌লে একটা বই ফ্রি।"

শিশু শোভা প্রশ্ন করিত, "কি বই বাবা? ভূতের গল্প আছে? রাজার গল্প আছে? সেদিন যে পান্তাবুড়ীর গল্পটা বল্‌লে সেটা বুঝি সেই বই থেকে?"

"হাঁ, হাঁ, ভূতের গল্প, রাজার গল্প, পান্তাবুড়ীর গল্প আছে বৈকি! আর সব বড়দের গল্পও আছে সে সমস্ত বইয়ের মধ্যে,—"পুরসুন্দরী", "সরোজিনীবল্লভ", "সতীকুলগরবিণী লক্ষ্মীরাণী বা প্রণয়-প্রতিমা", "পাষণ্ডদলন", এমনিতর আরও কত বই! ডিটেকটিভ উপন্যাসও থাক্‌ত অনেক তার ভেতরে। সব চেনা হ'য়ে গিয়েছিল টিকিট-চেকার বাবুদের সঙ্গে, টিকিট লাগত না। মাঝে মাঝে এক-আধ শিশি তেল তাদের দিতুম, কখন-সখন দু-একখানা বই তাদের দিতুম পড়তে।—রেল-গাড়ী চড়বি শোভা?"

উল্লসিত আগ্রহে শোভা বলিত, "হাঁ বাবা চড়্‌ব, কবে নিয়ে যাবে বাবা?"

"আচ্ছা নিয়ে যাব শীগ্‌গিরই একদিন, নিদেনপক্ষে না হয় তোকে লিলুয়া, শ্রীরামপুর অবধিই ঘুরিয়ে নিয়ে আস্‌ব। আগেকার দিন হ'লে পয়সাই লাগ্‌ত না—"

উৎসাহের সঙ্গে শোভা বলিত, "আমাকে রেলগাড়ীতে নিয়ে যেয়ো বাবা, আমিও তোমার বই বেচে দেব। অনেক পয়সা হ'বে তা'হলে। চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে ডাক্‌ব, চাই তেল, চাই বই। লোকদের সব জিজ্ঞেস কর্‌ব, তেল নেবেন? বই নেবেন? এক শিশি তেল কিন্‌লে একটা বই—। একটা বই কি বাবা?"

"একটা বই ফ্রি।"

"হাঁ, হাঁ, একটা বই ফিরি। অনেক তেল বিক্রী হ'বে তাহলে—"

কন্যার রকম দেখিয়া প্রফুল্ল হাসিয়া উঠিয়া বলিত, "দূর বোকা মেয়ে, আজকাল কি আর আমি গাড়ীতে গাড়ীতে তেল বিক্রী করি! ও ত অনেকদিন আগেকার কথা! এখন আমি কাজ করি, বুঝলি? সাহেবদের দোকানে। প্রকাণ্ড দোকান, অনেক সাহেব আছে সেখানে। আমি কাজ করি সেই সাহেবদের দোকানে, বুঝলি? এখন সব বড় বড় বই বিক্রী করি বড় বড় লোকদের কাছে। একশ' টাকা, দু'শ' টাকা, তিনশ' টাকা সে সব বইয়ের দাম। দেখিস্‌নে মাঝে মাঝে সাহেব সেজে বেরুই? যেদিন খুব বড় কোন

খদ্দেরের কাছে যেতে হয় সেদিনই বেয়োই সাহেব সেজে। এখন আর এক টাকার 'কেশবর্দ্ধিনী' তেল বিক্রী করিনে—"

শুনিয়া শোভাময়ীর মন খারাপ হইয়া গেল। আজকাল আর প্রফুল্লকে রেলগাড়ীর যাত্রীদের কাছে তেল এবং বই বিক্রী করিতে হয় না শুনিয়া সে মোটেই খুশী হইল না। তাহার মনশ্চক্ষে ভাসিতে লাগিল কত গ্রাম, জনপদ, নদী, প্রান্তর পিছনে ফেলিয়া মাঠের মাঝখান দিয়া রেলগাড়ী ছুটিয়া চলিয়াছে। টেলিগ্রাফের পোষ্টগুলা উল্টা দিকে দৌড় মারিয়াছে, রেলগাড়ীর চাকায় চাকায় "কটকটাকট, পটপটাপট" শব্দ, আর পাদানির উপর পা ফেলিয়া প্রফুল্ল সেই চলন্ত ট্রেনের এক কাম্‌রা হইতে অন্য কাম্‌রায় অবলীলা-ক্রমে যাতায়াত করিতেছে! শোভাময়ী যেন চোখের উপর তাহার পিতার গৌরবোজ্জ্বল ক্যানভ্যাসার-মূর্ত্তি দেখিতে লাগিল, গাড়ীর ভিতরে দাঁড়াইয়া প্রফুল্ল যাত্রীদের বলিতেছে, তেল নেবেন বাবু আপনারা? এক শিশি তেল কিন্‌লে একখানা বই ফিরি!"

ক্ষুব্ধকণ্ঠে শোভাময়ী প্রশ্ন করিল, "তুমি আজকাল আর রেলগাড়ী চড় না বাবা?"

"উঁহুঃ, বল্‌লুম যে এখন সাহেবদের ওখানে কাজ করি। মস্ত বড় বইয়ের দোকান, অনেক সাহেব আছে সে দোকানে—"

ছাই সাহেব! ছাই বড় দোকান! রেলগাড়ীই ঢের ভালো! দুঃখে ও অভিমানে শোভা মুখ কালো করিয়া রহিল।

কিন্তু শোভাময়ীর এ কাহিনী হইল নয় দশ বৎসর পূর্ব্বেকার কাহিনী। পিতার জীবিকার্জ্জনের উপায় সম্বন্ধে শোভার ধারণা বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে ক্রমশঃ পরিষ্কার হইতে লাগিল, এবং সহসা একদিন কেমন করিয়া যেন এ বিষয়ে তাহার লজ্জা দেখা দিল। চতুষ্পার্শ্বের স্বজন-পরিজনদের সকলের জীবনধারণের বৃত্তির বিষয়ে মনে মনে ধারণা করিয়া লইয়া এবং নিকট-আত্মীয়দের মুখে শুনিয়া শুনিয়া তাহার শিশু-বুদ্ধিতে সে যেটুকু বুঝিল, তাহাতে তাহার মনে হইল, পিতার উপজীবিকার কথা তুলিয়া বন্ধুদের কাছে তাহার কিছুমাত্র গর্ব্ব করা চলিবে না।

চার বৎসর পূর্ব্বে শোভাময়ী যেদিন প্রথম বালীগঞ্জ বালিকা-বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি হয়, সেদিন স্কুল হইতে বাড়ী ফিরিয়া প্রফুল্লর নিকট আবদার করিয়া সে কহিল, "বাবা, তোমাকে একটা কথা বলুব, রাগ করবে না?"

মৃদু হাসিয়া প্রফুল্ল বলিল, "না—"

"তুমি ত সব স্কুলেই বই বিক্রী কর্‌তে যাও?"

বিস্মিত হইয়া প্রফুল্ল কহিল, "হাঁ যাই, কিন্তু তাতে কি হ'য়েছে?"

অনুনয়ের মধুর কণ্ঠে শোভাময়ী বলিল, "তুমি আমাদের স্কুলে কোনদিন বই বিক্রী করতে যেয়ো না বাবা—"

শুনিয়া প্রফুল্ল স্তম্ভিত হইয়া গেল। কিছুক্ষণ হতবুদ্ধির ন্যায় চুপ করিয়া থাকিয়া সে কহিল, "কিন্তু তোদের ইস্কুল যে বেশ বড় ইস্কুল শোভা, ওরা যে মাঝে মাঝে অনেক বই-টই কেনে। আমি ত সেই আশাতেই আজ বিশেষ চেষ্টায় তোদের হেড মিষ্ট্রেসের সঙ্গে আলাপ করে' এলুম—"

ভয় পাইয়া শোভাময়ী কহিল, "বই কেনার কথা কি বলেছ নাকি সুরমাদিকে!"

"না, না, আজ বলিনি। আজ শুধু পরিচয়টা করে' এলুম। বইয়ের কথা কি আর প্রথম দিনেই বলা চলে!"

ক্রন্দনোন্মুখ শোভাময়ী কহিল, "তোমার দুটি পায়ে পড়ি বাবা, তুমি আমাদের স্কুলে বইয়ের কথা বোলো না। আমার বাবা লোকের বাড়ী বাড়ী বই বিক্রীর খদ্দের খুঁজে বেড়ায়,—না বাবা, সুরমাদির কাছে সে কথা বল্‌লে আমার ভারী লজ্জা কর্‌বে।

শুনিয়া প্রফুল্লর কালো মুখ যেন আরও কালো হইয়া গেল। মুহূর্ত্ত পরে কি ভাবিয়া সে হাসিয়া উঠিল, "আচ্ছা, আচ্ছা শোভা, তোর প্রেষ্টিজের খাতিরে এ রকম একটা ভালো খদ্দেরও না হয় হাতছাড়া কর্‌ব, বই ক্যানভাস কর্‌তে না হয় যাব না তোর সুরমাদির কাছে। কিন্তু তুই তোর ইস্কুলের সবাইকে কি বল্‌বি শোভা? তোর বাবা হাইকোর্টের জজ?"

শোভাময়ী বড় হইতে লাগিল। পিতার ক্যানভাসারীর বিষয়ে সে যে লজ্জা বোধ করে, আজকাল একথা মনে করিতেই তাহার লজ্জা হয়। পিতাকে তাহাদের স্কুলে বই বিক্রীর চেষ্টা করিতে সে যে নিষেধ করিয়াছে, তাহা

স্মরণ করিয়া বর্ত্তমানে শোভা মর্ম্মপীড়া অনুভব করে, কিন্তু তবু শত চেষ্টা করিয়াও সে কিছুতেই প্রফুল্লর বইয়ের দালালি সম্বন্ধে নিজের সঙ্কোচ ত্যাগ করিতে পারে না। আপন দুর্ব্বলতায় সে বিরক্ত বোধ করে, কিন্তু এ দুর্ব্বলতা পরিহার করা তাহার সাধ্যায়ত্ত বলিয়াও শোভাময়ী বোধ করে না। প্রফুল্লর উপর তাহার অত্যন্ত ক্রোধ হইতে থাকে, পৃথিবীতে সে যেন আর কাজ খুঁজিয়া পাইল না! একটা কেরাণীগিরিও যদি কোথাও করিত!

পিতাকে বেদনা দিয়াছে মনে করিয়া শোভাময়ী পীড়িত হয়, কিন্তু যুগপৎ একথাও সে মনে করে যে, এমন করিয়া এ বেদনা তাহার পিতার লাভ করাই উচিত ছিল!

প্রফুল্লর যখন বই বিক্রী কম হইতে থাকে, নূতন খরিদ্দার যে মাসে সে আর বাগাইতে পারে না, তখনই বিশেষ করিয়া বালীগঞ্জ বালিকা-বিদ্যালয়ের কথা তাহার মনে হয়। বিরক্ত হইয়া সে ভাবে, কমসে-কম পাঁচশ' টাকার বই ওখানে গছান যাইত,—হতভাগা মেয়েটার খেয়ালে পড়িয়া এই দুর্দ্দিনের বাজারে অমন একটা খরিদ্দার শুধু শুধু হাতছাড়া করিতে হইল! একথা স্মরণ হইলেই শোভাময়ীর চালিয়াতীর জন্য তাহার কান মলিয়া দুই গালে দুই চড় কসাইয়া দেওয়ার ইচ্ছাটা প্রফুল্লর মনে প্রবল হইয়া উঠে! এক একবার প্রফুল্লর লোভ হয়, শোভার অজ্ঞাতসারে তাহাদের স্কুলে যাইয়া বই বিক্রীর চেষ্টা করিয়া আসে,—কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই মনে হয়, মেয়েটা যা আব্দেরে, একবার টের পাইলে কাঁদিয়া-কাটিয়া অনর্থ করিয়া কি যে অঘটন ঘটাইবে, কে জানে! কাজ নাই বাবা ও সকল হাঙ্গামায়! সুখের চেয়ে স্বস্তি ঢের ভালো!

বালীগঞ্জ বালিকা-বিদ্যালয়ে পুরস্কার-বিতরণী উৎসব হইবে; শোভাময়ীর অভিভাবক বলিয়া প্রফুল্লরও নিমন্ত্রণ হইয়াছে। শোভা দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়া নবম শ্রেণী হইতে দশম শ্রেণীতে উঠিয়াছে, সেজন্য সে পুরস্কার পাইবে, এবং তা ছাড়া সে একটা ইংরাজী কবিতাও আবৃত্তি করিবে, অতএব মেয়ের এমনতর গুণপনায় পুলকিত হইয়া প্রফুল্ল খুব আগ্রহের সহিতই পুরস্কার-বিতরণী সভায় উপস্থিত হইল।

পত্র-পুষ্পশোভিত বিদ্যালয়-প্রাঙ্গণে চন্দ্রাতপতলে সভা বসিয়াছে। উচ্চ বেদীর পরে সভাপতির আসন। সভাপতির আসনের দক্ষিণে পুরস্কারপ্রাপ্তা বালিকাদের স্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। তাহাদের পিছনে ছাত্রীদের সঙ্গীত, আবৃত্তি ও মূক-অভিনয়ের জন্য ছোটখাট একটি নাটামঞ্চ সজ্জিত করা হইয়াছে।

প্রথম পংক্তির প্রায় মাঝখানে প্রফুল্ল আসন গ্রহণ করিল। প্রথম পংক্তির সহিত সমকোণ করিয়া কয়েকখানা চেয়ার পাতা হইয়াছিল। তাহাতে বিদ্যালয়ের কার্য্যনির্ব্বাহক সভার সভ্যরা বসিয়াছিলেন। সেক্রেটারী মহাশয় প্রফুল্লর সম্মুখেই বসিয়াছিলেন, প্রফুল্ল মাঝে মাঝে তাঁহার সহিত দু'একটা কথা কহিতেছিল।

উদ্বোধনসঙ্গীত, সভাপতি বরণ ইত্যাদি সম্পন্ন হওয়ার পরে সেক্রেটারী উঠিয়া দাঁড়াইয়া বিদ্যালয়ের বার্ষিক কার্য্যবিবরণী পাঠ করিলেন,—তাহার পরে উপস্থিত ভদ্রমহোদয় ও মহিলাদের উদ্দেশ করিয়া বলিলেন, "আমি আসন গ্রহণ করবার পূর্ব্বে গভীর আনন্দের সঙ্গে আপনাদের আর একটি সংবাদ জানাতে চাই। শ্রীযুক্ত অরবিন্দ বসু মহাশয়ের কন্যা শ্রীমতী সুলতা আমাদের দশম শ্রেণীর ছাত্রী। অরবিন্দবাবু আমাদের এই বিদ্যায়তনের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন। তিনি আমাদের বিদ্যালয়-গ্রন্থাগারের জন্য আজ কিছুক্ষণ পূর্ব্বে দু'শ টাকা দানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, এবং আমরা সানন্দে কৃতজ্ঞ-চিত্তে সে দান গ্রহণ করেছি। ভগবান দাতাকে দীর্ঘজীবী করুন।"

চতুর্দ্দিকে উচ্চ করতালি পড়িয়া গেল। সভাপতির আসনের দক্ষিণ দিকে পুরস্কারপ্রাপ্তা বালিকাদের মধ্যে শোভাময়ী বসিয়া ছিল, সহসা প্রফুল্লর দিকে চাহিতেই সে দেখিল, প্রফুল্লর চোখ লোভে চক্চক্ করিতেছে। পিতার ওই মূর্ত্তি দেখিয়া শোভা যেন ভয়ে পাথর হইয়া গেল।

আবৃত্তির জন্য শোভাময়ীর ডাক পড়িল, প্রথম আবৃত্তি তাহার। দ্বিধাজড়িত শঙ্কিত পদে শোভা

নাট্যমঞ্চের 'পরে আসিয়া দাঁড়াইল, গুরুতর আশঙ্কায় তাহার সমস্ত শরীর তখন ক্ষণে ক্ষণে শিহরিয়া উঠিতেছে, তাহার গলা শুকাইয়া মরুভূমি হইয়া গেছে! আজিকার উৎসবের সকল মাধুর্য্য তাহার অন্তর হইতে সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হইয়াছে!

নীরস অবিচিত্র কণ্ঠে দম-দেওয়া কলের ন্যায় শোভা বলিতে আরম্ভ করিল,

It's good to see the school we knew,
The land of youth and dream,
To greet again the rule we knew
Before we took the stream :
Though long we've missed the sight of her,
Our hearts may not forget ;
We've lost the old delight of her,
We keep her honour yet.

আবৃত্তিতে শোভাময়ীর সুখ্যাতি ছিল, কিন্তু আজ এই উৎসবে এতগুলি অতিথি-অভ্যাগতের সম্মুখে শোভার মাধুর্য্যহীন বিবর্ণ কণ্ঠের আবৃত্তি শুনিয়া শিক্ষয়িত্রীরা ও বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ বিস্মিত ও লজ্জিত হইলেন।

প্রফুল্ল ততক্ষণে পকেটে হাত দিয়া অনুভব করিয়া লইয়াছে তাহার বই বিক্রীর নমুনা-পত্রগুলি ঠিক আছে কি না! সেসব কাগজ কখন্ কোথায় কাজে লাগিয়া যায়, এই সম্ভাবনায় তাহার নিত্যসঙ্গী, অতএব ঠিকই ছিল। উত্তেজনায় প্রফুল্ল তখন উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া উঠিয়াছে,—কন্যার কবিতা আবৃত্তির এক বর্ণও তাহার কর্ণে প্রবেশলাভ করিতেছিল না, তাহার চতুষ্পার্শ্বের জনতা সম্বন্ধেও সে তখন সম্পূর্ণ অচেতন!

অপলক নেত্রে পিতার দিকে তাকাইয়া অভিভূতের ন্যায় শোভাময়ী তখন বলিতেছে,

We'll honour yet the school we knew,
The best school of all :
We'll honour yet the rule we knew,
Till the last bell call
For, working days or holidays,
And glad or melancholy days,
They were great days and jolly days
At the best school of all.

—প্রফুল্ল তাহার কাগজপত্র হাতে করিয়া সেক্রেটারীর কাঁধের উপর ঝুঁকিয়া দ্রুতকণ্ঠে তাঁহাকে কি যেন বুঝাইতে চেষ্টা করিতে লাগিল। শোভাময়ী মোহাচ্ছন্নভাবে প্রফুল্লর দিকে চাহিয়া কবিতার তৃতীয় কলি বিস্মৃত হইয়া পুনরায় প্রথম হইতে বলিতে আরম্ভ করিল,

It's good to see the school we knew—

শুনিয়া হেড্‌মিস্ট্রেস সুরমা মিত্র ধমক দিয়া উঠিলেন, "কি হচ্ছে শোভা? সমস্ত ভুল বল্‌ছ কেন?"

শোভা তখন কবিতা আবৃত্তি বন্ধ করিয়া সম্মোহিত দৃষ্টিতে প্রফুল্লর দিকে চাহিয়া আছে। প্রফুল্ল একটা অর্ডার-ফর্ম্ম বাহির করিয়া নিজের ফাউন্টেনপেনটা সেক্রেটারীর হাতে গুঁজিয়া দিয়া তাঁহার নিকট হইতে একটা বইয়ের অর্ডার লওয়ার চেষ্টা করিতেছিল।

সহসা চতুর্দ্দিকে তীক্ষ্ণ কোলাহল উত্থিত হইল। শোভাময়ী মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া গেছে!

১৬ই শ্রাবণ ১৩৩৮



গীতি-নৃত্য

—শ্রীকমলাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

(আলেক্জান্দ্রে কুপ্রীন্ হইতে)

রিয়াজান গভর্ণমেণ্টের অধীন বড় বাবদার জায়গা টুমাতে যখন আমরা থাকতাম। টুমা, রেল লাইন থেকে অনেক দূরে। স্থানীয় অধিবাসীদের প্রবাদ ছিল ;—টুমা লোহার আর টুমার বাসিন্দা সব পাথরের তৈরী। এক প্রাচীন মস্ত বাড়ীতে আমরা থাক্তাম ; ১৮১২ সালে ফরাসী বন্দীদের রাখবার জন্তে এই বিরাট কাঠের বাড়ী তৈয়ার করা হ'য়েছিল। আর্মেই-এর বন্দীদের কথা মনে করিয়ে দিতেই যেন বাড়ীটার মধ্যে অনেক থাম ছিল। আর চারিদিকে অনেক গাছ লাগিয়ে পার্কের মত করা হ'য়েছিল।

"আমাদের হাস্তাস্পদ অবস্থাটা একবার ভেবে দেখুন। তেইশখানি ঘর আমাদের হাতে আছে, কিন্তু তার মধ্যে একখানি ঘরে আগুন জ্বালানোর ব্যবস্থা আছে, যেন ঘর গরম থাকে শীতের দিনে। তবু সে ঘরখানিও এত বেশী ঠাণ্ডা হয় যে, সকাল হ'তে না হ'তেই জল জমে যায় এবং দরজার ফাঁকে তুষার জমে। সপ্তাহে একদিন, কখনও বা দু'মাস পরে একদিন ডাক বিলি হয় ; গ্রাম্য কোনও কৃষককে ধ'রে ডাকের চিঠিপত্র পৌঁছিয়ে দেওয়া হয়। প্রায় কোনও বৃদ্ধের ভাগ্যেই এই ভার পড়ে, সে তার ছেঁড়া বরফ-জমা কোটের উপর ডাকের ব্যাগ ফেলে আনে ; ফলে চিঠি সব ভিজে যায়, খামের পিছন দিক্ খুলে কোনও অনুসন্ধিৎসু পোষ্টমাষ্টার পুনরায় বন্ধ ক'রে দিলেও কিছু হয় না। আমাদের চারিদিকে এক পাইনের প্রাচীন অরণ্য, যেখান থেকে ভালুকের ডাক শোনা যায় এবং প্রকাশ্য দিবালোকে ক্ষুধার্ত নেকড়ে বাঘের দল গ্রামপথের উপর থেকেই সন্ত্রস্ত-আগ্রত কুকুরগুলিকে ধ'রে নিয়ে যায়। গ্রামের লোক যে ভাষায় কথা বলে, আমরা তা আদৌ জানি না ; তাদের কথায় কখনও শুনি ঘুম-পাড়ানি গানের সুর, কখনও মনে হয় তারা কাশছে, কিম্বা শব্দ ক'রে কিছু তাড়াচ্ছে। অবিরাম তারা আমাদের দিকে অপলক দৃষ্টিতে চায়। তাদের দৃঢ় বিশ্বাস যে, এই অরণ্যের মালিক ঈশ্বর আর গ্রামবাসীরা এবং সেখানকার অলস জার্মান অরণ্য রক্ষক কেবল গ্রামবাসীদের কে কত কাঠ চুরি ক'রে নিয়ে যাচ্ছে তারই হিসাব রাখে। আমাদের অধীনে এক চমৎকার অষ্টাদশ-শতকের পুস্তকাগার ছিল, যদিও বইগুলির মলাট সব ইঁদুরে কেটে খেয়েছিল। এমন কি এক প্রাচীন চিত্রশালাও ছিল, যার প্রত্যেক ছবির ক্যানভাস্ অস্পষ্ট ; স্যাঁতসেঁতে আবহাওয়া ও ধূমের জন্ম নষ্ট হ'য়ে গিয়েছিল।

কাছের গ্রাম বরফে চাপা প'ড়ে গিয়েছে। গ্রামে সেরোঝা নামে যে লোকটা থাকে, সে এত শীতেও আদুল গায়ে পথে পথে ঘুরে বেড়ায়। গ্রামের পুরোহিত এক বোকা-বদমাইস্, ফন্দীবাজ ভিখারী, কথা বলেন পিটার্স বর্গের টানে, উপবাস করেন না বরং ধর্ম্মশাস্ত্রের বিরুদ্ধে কলম চালান। এই সব দেখলে বুঝতে পারতেন যে, কি বিরক্তিতে আমাদের দিন কাটে। ভালুক মেরে কিম্বা কুকুর দিয়ে খরগোস শীকার ক'রে আমাদের বিরক্তি ধ'রে গিয়েছে। তিনখান ঘরের মধ্য দিয়ে পঁচিশ গজ দূরে পিস্তল ছুঁড়ে লক্ষ্যভেদই বা আর কতদিন চলে? সন্ধ্যাবেলায় রসের কবিতা লেখাও ভাল লাগে না। তবে হাঁ্যা, নিজেদের মধ্যে ঝগড়া করা অবশ্য আমরা ছাড়ি নি, বাঁচতে হবে তো?

যদি প্রত্যেককে প্রশ্ন করেন, এখানে এসেছ কেন? আমার মনে হয়, একজনও তার উত্তর দিবে না। তখন হয়ত আমি ব'সে ছবি আঁকছি ; ভালেরিয়ান্ আলেক্জান্দ্রোভিচ কবিতার মিল খুঁজছে এবং ভাস্কা পুরাতন ভাঙা পিয়ানোটার হল্দে রীডের উপর হাত চালিয়ে ওয়াগ্নারের ট্রিষ্টান্-আইসোল্ডে বাজাচ্ছে। এমনি ক'রে দিন কাটায়।

খ্রীষ্ট্মাস এলে পর সমস্ত গ্রামে সাড়া প'ড়ে যায়, সকলে ঘরে ঘরে বিয়ার বানাতে সুরু করে ; এমন খর বিয়ার যে, হাতে দাগ লেগে যায়, খেতে গেলে মুখে লেবুর খোসার মত লেগে থাকে। কৃষকদের মধ্যে উৎসবের আগেই এমন মাতলামি হ'তে থাকে যে, ভ্যাজিলেভা গ্রামে মাতাল হয়ে কোনও কৃষকের মাথা কাটিয়ে দিয়েছে তার ছেলে এবং শুনলাম জ্লগলিটসিতে এক বুড়ো বিয়ার খেয়ে খেয়ে ম'রেই

গিয়েছে। কিন্তু আমাদের কাছে সেবার খ্রীষ্টমাস একটু নূতনত্ব আনলো। পরিচিত গ্রামবাসী এবং অফিসারদের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ ক'রলাম, অভিনন্দন জানালাম। প্রথমে পুরোহিতের বাড়ী গেলাম, তারপর গীর্জার গায়কের কাছে, গীর্জার রক্ষকের বাড়ী হ'য়ে গ্রামের স্কুলের শিক্ষয়িত্রী দু'জনের সঙ্গে দেখা করা গেল। টুমার ডাক্তারকে নমস্কার জানিয়ে দলবেঁধে আমরা জেলার কর্ত্তার ওখানে গেলাম, সেখানে আমাদের এক ভোজ হ'লো, সত্যিকারের ভোজনোৎসব। তারপর পুলিসের আড্ডায়, ঘোড়া ওষুধওয়ালার কাছ হ'য়ে গেলাম গ্রামের এক অত্যাচারী গৃহস্থের বাড়ী, এই লোকটা বড়লোক হ'য়েছে অন্যের পয়সা লুটে নিয়ে এবং গ্রামের সমস্ত চাষীকে নিজের মুঠোয় পুরে তাদের সব শস্য নিজের গোলায় জমা ক'রে রেখেছে। আমরা সেদিন কেবল ঘুরেই বেড়ালাম, এখানে ওখানে অবিশ্রান্ত ঘুরলাম।

কখন কখন আমাদের মুস্কিলে প'ড়তেও হ'য়েছিল, তা অস্বীকার করার উপায় নাই। এখানকার জীবন-ধারণের গতির সঙ্গে আমরা তাল সামলে চ'লতে পারিনি। সত্যি ক'রে ব'লতে গেলে আমরা তার বাহিরেই ছিলাম। তাদের জীবন অগুণতি বৎসর ধ'রে এমনি একভাবে কাটছে। আমাদের মধুর ব্যবহার এবং তাদের খুসী করার আপ্রাণ চেষ্টা থাকলেও, আমরা যেন তাদের কাছে অন্য কোন গ্রহের বাসিন্দা। তা ছাড়া, আমাদের পরস্পরের মধ্যে এমন একটা ব্যবধান আছে, যার ফলে আমরা পরস্পরকে ভালো-ভাবে বুঝতেই পারি না। আমরা তাদের দিকে খুঁটিয়ে দেখতে চাই—অণুবীক্ষণ যন্ত্রের মধ্য দিয়ে, আর তারা দূর থেকে আমাদের দেখে যেন দূরবীক্ষণের সাহায্যে। অবিশ্যি আমরা তাদের সঙ্গে নিজেদের মিলিয়ে মিশিয়ে নিতে চেষ্টা ক'রেছিলাম।

আমরা চক্রাকারে বসি একদিন। দলে আমরা সেদিন পুরু ছিলাম; চারজন ছাত্র ছুটিতে বেড়াতে এসেছিল—তারা, গীর্জার গায়ক, কাছের এক জমিদারের এক চাকর, স্কুলের শিক্ষয়িত্রী দু'জন, ইউনিফর্ম-পরা পুলিশ একজন, পাদ্রীর সহকারী, গ্রামের ঘোড়ার ডাক্তার, আর আমরা তিনজন। খুব নাচা গেল, গান হ'লো, চীৎকার করা গেল। আমাদের দলের কর্ত্তা ছিল ডকফিতেমুফি নামে এক ছাত্র, মাঝে দাঁড়িয়ে আমাদের সে নাচালে। সে নিজেও মাথার হাত তুলে, তালি দিয়ে দিয়ে নাচলে। গান চললো :

"রাণী ছিল নগরীতে, নগরীর প্রাসাদে
রাজার কুমার এলো পালিয়ে ;
সে পেয়েছে খুঁজে তার প্রিয়তমা বঁধুরে,
অপরূপ সুন্দরী রূপবতী প্রিয়া তার
সোনার আংটি দিলো হাতে তার পরিয়ে।"

একটু পরেই নাচের শেষ হয়, মাথা ঘুরে যায় নাচের পাকে। গম্ভীর গলায় তখন পরস্পরকে গান শুনাই :

"খুলে গেল প্রাসাদের দ্বার,
রাজা করে প্রণতি রাণীরে,
রাণী করে সম্মান রাজার
শির নুয়ে পড়ে ধীরে ধীরে।"

তখন ঘোড়ার ডাক্তার আর গীর্জার গায়কের মধ্যে নেশার ঝোঁকে প্রতিযোগিতা আরম্ভ হয়, কে মাথা বেশী নোয়াতে পারে!

আমাদের আসা-যাওয়া চ'লতে থাকে। একদিন টুমার স্কুলে যাই। কারণ পিটার্সবর্গের মাননীয় অতিথিদের অর্থাৎ আমাদের সম্মানের জন্যে স্কুল থেকে এক আনন্দোৎসব হবে, আজ আমাদের তাই নিমন্ত্রণ হয়েছে। আমরা ভিতরে যাই। সামনে খ্রীষ্টমাস-ট্রীতে অনেক আলো জ্বলছে; আর উৎসবে কি হবে তা আমার আগে থেকেই জানা আছে। পল্লী-গীতি গেয়ে পল্লী-জীবনের কাহিনী শোনানো হবে। এমন কিছু শোন্‌বার মত নয় এ সব; তবুও বছর ছয়েকের ছেলে একজন মস্ত বড় এক চামড়ার টুপী মাথায় দিয়ে, তার বাবার ছেঁড়া দস্তানা হাতে দিয়ে খুব মোটা গলায় বেশ একখানি মিষ্টি গান গাইলে। ছেলেটী যেন গানের গলা জন্ম থেকেই পেয়েছে!

আর সমস্তই বিরক্তিকর। যত সব মিথ্যা অথচ জনপ্রিয় কায়দাতে উৎসবের তালিকা শেষ করা হ'য়েছে।

এই ধরণের আনন্দোৎসবের সঙ্গে আমার বহুকালের পরিচয় আছে। অসম্ভব রকমের শ্রুতিকটু লাগে—সেই সব লিটল রাশিয়ান্ গাথাগুলি, বিশেষ ক'রে কদর্য্য উচ্চারণের ভুলের জন্যে। কবিতা আর নানা রকমের ছেলে ভুলানো ছবি! একটা খ্রীষ্টমাস-ট্রী কোথাও আঁকা। পেঁচোচকা, ঘোড়া বা রিম-ইঞ্জিনের ছবি তারা এঁকে রেখেছে। ছোট

শিক্ষক মশায়—হাঁপানি রোগও আছে তাঁর, এক ফ্রক কোট ও শক্ত কলারের সার্ট প'রে উৎসবে এসেছেন। হাতের বেহালাখানি হঠাৎ টেনে বাজাতে সুরু ক'রছেন, কিম্বা ছড় দিয়ে আঘাত ক'রে তাল দিচ্ছেন। থেকে থেকে কোনও ছেলের মাথায় ছড় দিয়ে টোকা মারছেন।

স্কুলের অবৈতনিক অভিভাবক,—অমুক সহরের এক বিশিষ্ট ব্যক্তি, বসে বসে চিউয়িং গাম্ চিবাচ্ছেন। আনন্দের আতিশয্যে তোতা পাখীর মত জিভ দিয়ে শব্দ ক'রছেন—যেন আজ এই উৎসব তাঁরই সম্বর্দ্ধনার্থে হ'চ্ছে।

অবশেষে তালিকার সব চেয়ে বড় ঘটনাটা এলো। তখন পর্য্যন্ত আমরা শুধু হেসেছি। কে জানতো এখন আমাদের কাঁদবার পালা আসবে? বার কি তের বছরের একটী বালিকা আসে। এখানকার পাহারাওয়ালার মেয়ে সে, পাশ থেকে তার মুখ দেখতে ঘোড়ার মত লম্বা লাগলেও সামনে থেকে দেখতে ঠিক তেমন মনে হয় না। সে এই স্কুলের শ্রেষ্ঠা বালিকা, এসেই সে তার ছোট্ট গান আরম্ভ করে:

"গ্রীষ্ম কালের সারা দিনরাত ফড়িং গেয়েছে শুধুই গান,
কেমনে কাটিবে শীতকাল তার সেই ভাবনায় কাঁদেনি প্রাণ!"

একটা সাত বছরের ছেলে, তার বাবার বুট প'রে তার অংশ বলতে এসে দাঁড়ায়। পাহারাওয়ালার মেয়েকে ডেকে সুর ক'রে বলে:

"হায় অভিবেশী, এ কি অদ্ভুত! গরমের দিনে করো নি কাজ?"

মেয়েটি বলে:

"কাজ করিবার ছিল কি সময়? ঘাস কত ছিল মাঠের মাঝ!"

এই কি আমাদের অতি-বিখ্যাত অতিথি-পরায়ণতা?

প্রশ্ন হয়: "গ্রীষ্মকালে কি করেছ তুমি?"

ফড়িং উত্তর দেয়: "সারাক্ষণ শুধু গান করেছি!"

এই উত্তর দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাদের শিক্ষক—ক্যাপিটোনিচ্, তাঁর বেহালা ও ছড়খানি একত্রে দুলিয়ে ইসারা করেন, আর তৎক্ষণাৎ অদ্ভুত এক মৃদু সুরে সমবেত ছেলে-মেয়েগুলি গেয়ে উঠে, বোধ করি তাদের সেই সন্ধ্যা-বেলায় এই গান শিখান হয়েছিল:

"গান তুমি গেয়েছ তুমি ভালো ভাবেই গেয়েছ,
সারা গ্রীষ্মকাল গেয়েছ এখন সময় শীতের সময় নেচে কাটাও;
তুমি তোমার গান গেয়েছ, শীতকাল ধ'রে নেচে চলো,
শীতকাল ধ'রে নাচো, কেবল নেচে যাও;
গান তুমি গেয়েছ যখন, তখন নাচটাও নেচে দাও।"

আমি স্বীকার ক'রছি, গান শুনে আমার চুল খাড়া হ'য়ে উঠেছিল, যেন চুলগুলির প্রত্যেকটী কাচের তৈরী! আমার মনে হলো, সমবেত চাষীদের আর ওই ছেলে-মেয়েদের প্রত্যেকে আমার দিকে এক দৃষ্টে চেয়ে আছে, এবং তারা যেন সকলেই ব'লছে সমস্বরে:

"গান তুমি গেয়েছ, তুমি ভালো ভাবেই গেয়েছ;
গান যখন গেয়েছ, তখন নাচটাও নেচে দাও।"

এই অদ্ভুত গানের গুঞ্জন কতক্ষণ আমার কানে বাজছিল, কে জানে? পরিষ্কার ভাবে মাত্র আমার মনে পড়ে যে, এই মুহূর্ত্তে যে চিন্তা আমার মগজে জেগে উঠেছিল। আমি ভেবেছিলাম, "এই যে আমরা, বিজ্ঞের একটী ছোট্ট দল এখানে এসেছি, অগণিত কৃষকদের সামনে দাঁড়িয়ে আছি, পৃথিবীতে যারা সবচেয়ে মহৎ এবং সবচেয়ে অজ্ঞান ব'লে দুর্ব্বোধ্য, তাদের সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ কিসের? কিছুই নয়! ভাষা নয়, ধর্ম্ম নয়, পরিশ্রম নয়, আর্ট নয়, কিছুরই নয় এই যোগাযোগ! আমাদের কবিতা তাদের কাছে উপহাসের জিনিষ, যার কোনও অর্থ হয় না, কোনও মূল্য হয় না! আমাদের উন্নত চিত্রকলা তাদের সমক্ষে অজ্ঞানের ব্যর্থ প্রচেষ্টা মাত্র। ভগবান্ সম্বন্ধে যা আমরা ভাবি, বা দেবতার সৃষ্টি ব'লে যা আমরা গ'ড়ে থাকি, তাদের কাছে তা বোকামির চরম নিদর্শন। আমাদের সঙ্গীত তাদের কাণে বিরক্তিকর এক গোলমাল ছাড়া আর কিছুই নয়। আমাদের বিজ্ঞানে তারা সন্তুষ্ট হ'তে পারে না। আমাদের মনোবিশ্লেষণ-বিদ্যা শুনে তারা হয় হাস্‌বে, নয় আমাদের ধৃষ্টতা দেখে ক্ষমা ক'রবে। তারা হ'চ্ছে মাটীর সন্তান। জমির জন্যে তারা আপ্রাণ পরিশ্রম ক'রতে পারে, কখন অধৈর্য্য হয় না। হাঁ, যেদিন এই শিশু, এই বয়স্ক, জ্ঞানী মানুষ কিম্বা অজ্ঞ জেগে উঠবে, সেই ভয়ঙ্কর জাগরণের দিনে আমরা তাদের কি উত্তর দিব? এই সহস্র-শীর্ষ দৈত্যকে কি ব'লে বুঝাবো?"

আমরা হয়ত দুঃখের সঙ্গে তাদের বল্‌বো, "আমরা সারাক্ষণ গান গেয়েছি। আমরা আমাদের গান গেয়েছি।

আর সেই দৈত্য উত্তর দিবে, "তা'হলে যাও, নাচটাও নেচে নাও।" মুখে তার ফুটে উঠবে—কৃষকের অদ্ভুত প্রাণ-খোলা হাসি।

আমি জানি, আমার সঙ্গী দু'জন ত আমার মত ভেবেছিল। উৎসব-সভা থেকে আমরা নিঃশব্দে বাহিরে আসি। কেউ কোনও মতামতও বলি নি।

তিন দিন পরে আমরা বিদায় নিই। তারপর থেকে আমাদের মধ্যে যেন আর প্রাণ ছিল না। আমাদের বিবেক হঠাৎ যেন চুপ করে গিয়েছে আর লজ্জায় ভারে আমাদের মাথা আপনা আপনিই নীচু হয়ে গিয়েছে। সেদিন সেই দুরন্ত ছেলে মেয়েদের দল যেন আমাদের মৃত্যুদণ্ড দিয়েছে। আমরা সেখান থেকে ফিরে আসি, কিন্তু ফেরার পথে সারাক্ষণ সেই গানের প্রতিধ্বনি আমার কানে বাজে। সেই অদ্ভুত উপহাস:—"তা হ'লে নাচটাও নেচে নাও।"

ভগবান্ জানেন, রুশ জাতির ভাগ্যে কি আছে।…কিন্তু তবুও, যদি দরকার হয়, আমরা নাচটাও নেচে নিতে পিছিয়ে থাকবো না।

সারারাত্রি ধ'রে হেঁটে রেল-ষ্টেশনে আসি।

তুষারাচ্ছন্ন নিষ্পত্র বার্চ গাছের শাখার ফাঁকে যেন তারাগুলি চুপচাপ ব'সে আছে। ভগবান্ নিজের হাতে যেন গাছগুলি সাজিয়েছেন। আমি ভাবি, "হাঁ সুন্দর বটে!" কিন্তু মন থেকে সেই উপহাসাত্মক চিন্তা যায় না: "তা হ'লে নাচটাও নেচে নাও।"

ভিখারিণী

—শ্রীতৃপ্তিরাণী বাক্‌চী

পথ পাশে ব'সে কাঁদিছে যে ভিখারিণী
হারিয়ে গিয়েছে কিবা তার।
বুকে ল'য়ে যারে ছিল গরবিণী
কেন' ফেলে গেছে বলা ভার॥

ছিন্ন মলিন আবরণখানি টুটে।
শীর্ণ-দেহের পঞ্জর কয়খানি।
জাগিয়া উঠেছে গোপনে কখন ফুটে
শেষ ক'রে দিয়ে হৃদয়ের জানাজানি॥

ধূসর ধূলায় রুক্ষ চিকুররাশী
উড়ে উড়ে ফেরে অনিবার।
ঢাকিছে কভুবা পাংশু মলিন হাসি
কভু মুছে যায় আঁখিধার॥

নিষ্ঠুর ওরে দীনতার কষাঘাত
বেদনব্যথায় পূর্ণতা' হ'লো আজ।
তপ্ত রুধির ঝরায়ে দিবস-রাত
রুগ্ন হয়েছে মরুর বক্ষ মাঝ॥

ছড়ায়ে দুহাতে তপ্ত পথের ধূলি
লুটায় কখনো দেহভার।
সেথা হ'তে তারে কেবা লবে তুলি
মোছাবে যতনে আঁখিধার॥

ক্লান্ত নয়ন নিবানিশি খুঁজে যারে
হারিয়ে ফেলেছে দৃষ্টির রেখাটিরে।
না বলি মিলিল ডেকে ডেকে তারে
শকতি কোথায় তুলিবার ধীরে ধীরে॥

যেই স্মৃতি ছিল ওরি সাথে সাথে
বাঁধা এক ডোরে বহুদিন।
ভেঙে ফেলে তায় নির্মম দুটী হাতে—
কেন' ক'রে গেছে দীনহীন॥

বিংশ শতাব্দীর পাশ্চাত্ত্য চিত্রকলা

—শ্রীহেমেন্দ্রনাথ দাস

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ পর্য্যন্ত, পাশ্চাত্য চিত্রকলার দেখা যায় এক গঠন-মূলক এক-মুখী ধারা; কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হ'তে প্রাতীচ্যের শিল্পকলায় সুরু হয় এক ভাঙন, যার ফলে অসংখ্য নব নব ধারার হয় উদ্ভব। ত্রয়োদশ শতাব্দী হ'তে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত ইউরোপীয় শিল্পীরা এক একটী নির্দ্দিষ্ট ধারা অনুসরণ ক'রে এগিয়ে চলেন। 'বারোক' যুগে 'ডেকরেটিভ আর্টের' বিশেষ আদর ছিল, কাজেই শিল্পীরা 'ডেকরেটিভ' ধারা অবলম্বন করে শিল্প রচনা করেন। 'ক্লাসিকাল' যুগে, শিল্পীরা এক ক্লাসিক ধরণেই চিত্র অঙ্কন ক'রে যান। এমনি এক এক কালে এক একটী বিশেষ ধারা চলে আসে। কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দীর পর হ'তে, পাশ্চাত্যে এক কালে বহু ধারার উদ্ভব হয়, যার ফলে একই স্থানের একই কালের শিল্পীরা বিভিন্ন ধারার শিল্প রচনা করতে থাকেন। গতানুগতিক রীতির শিল্প কলার বিপক্ষে যে শিল্পীরা বিদ্রোহ ঘোষণা করেন, তাঁদের মধ্যে 'Impressionist' শিল্পীদের নাম বিশেষ উল্লেখ যোগ্য।



প্রাকৃতিক দৃশ্য : শিল্পী—ভিন্সেণ্ট, ভ্যানগগ

—Neo-Impressionism-Schoolএর উদাহরণ

অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে 'ইম্‌প্রেস্তানিষ্ট' শিল্পীদের উদয় হয়। নামে এরা 'ইম্‌প্রেস্তানিষ্ট' হলেও, ভাবের সঙ্গে এঁদের কোন পরিচয়ই নেই। বাহ্যিক রূপ নিয়েই এঁদের চিত্র অঙ্কিত হয়। 'ইম্‌প্রেস্তানিষ্ট'রা বর্ণ রাজ্যে আনেন যুগান্তর। তাঁরা সহসা একদিন ঘোষণা করে বসেন, "তাঁদের পূর্ব্ববর্ত্তীদের বর্ণ-প্রয়োগ প্রথা হ'লো ভ্রান্ত, অবৈজ্ঞানিক ও মন-গড়া ধরণের।" Pre-Raphelite, Raphelite, Academician প্রভৃতিরা Studioর বদ্ধ আলোকে ছবি এঁকে গেছেন। কিন্তু স্বাভাবিক চিত্র আঁক্‌তে হ'লে প্রয়োজন উন্মুক্ত প্রকৃতির স্বভাবিক উন্মুক্ত আলোক। ইমপ্রেস্তানিষ্টরা তাঁদের পূর্ব্ববর্ত্তীদের মত ইচ্ছানুযায়ী বর্ণ-প্রয়োগ করা পরিত্যাগ করেন। আধুনিক বৈজ্ঞানিকদের বর্ণ ও আলোকের 'theory' অবলম্বন ক'রে তাঁরা উন্মুক্ত প্রকৃতির চিত্র অঙ্কন ক'রতে বাহির হন। 'ইম্‌প্রেস্তানিষ্ট'রা স্বাভাবিক আলোকে যে বস্তুকে যেমনটী দেখতেন, চিত্র-পটে ঠিক তেমনি আঁকতেন। এমন কি আলোকের অসমান অবস্থায় (unequal intensity

of light) জন্য বিষয়-বস্তুর কোন অংশ বিকৃত দেখা'লে তাঁরা সে বিকৃতিটুকুও চিত্রপটে এঁকে নিতেন। 'ইম্প্রেশানিষ্ট'রা হ'লেন চরম বস্তুতান্ত্রিক।

'ইম্প্রেশানিষ্ট'দের প্রভাব জার্মানীতে শীঘ্রই পৌঁছাল। 'ইম্প্রেশানিষ্ট' শিল্পীদের বর্ণ প্রয়োগ-প্রথা জার্মান শিল্পীরা বিশেষ আদরের সঙ্গে গ্রহণ করিলেন। জার্মানরা জাত-বৈজ্ঞানিক, কাজেই ধরা বাঁধা বৈজ্ঞানিক নিয়ম কানুন অনুসরণ ক'রে তাঁরা তাঁদের শিল্পে, বর্ণ প্রয়োগ প্রথার বিশেষ উন্নতি সাধন করিলেন। কিন্তু, বর্ণ-পাতে অতিরিক্ত কলা কৌশল দেখাতে গিয়ে, আকার ও গঠনের প্রতি তাঁদের তুলি গেল একেবারে শিথিল হয়ে, ফলে তাঁরা যত কিম্ভুতকিমাকার চিত্র সৃষ্টি করতে আরম্ভ করলেন. লোকে তাঁদের চিত্র দেখে তুললে তীব্র প্রতিবাদের রোল। কিন্তু জার্মানরা আদৌ হতাশ হ'বার জাত নন। তাঁরা উঁচু গলায় জনসাধারণকে বুঝিয়ে দিলেন "আমরা বস্তু-তান্ত্রিক কলাশিল্পী নই। আমরা



বিদায় : শিল্পী—হিভারিপ্তী ম্যাস   —Luminism School

হুবহু অনুকরণ করবার প্রয়োজন বোধ করিনা। আমাদের নিজের মনের ভাবকে প্রকাশ ক'রে' রূপ দেওয়াই হলো আমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য।" এই হ'তেই তাঁদের নাম হয়ে গেল "Expressionist."



মঞ্চে নর্তকী   শিল্পী—এদগার দেগা

'Expressionist'দের উদ্ভবের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই এক সঙ্গে বহু ছোট বড় ধারার উদ্ভব হয়,—যেমন 'Futurism', Fauvism, 'Cubism', 'Intimism', 'Plasticism', 'Synthecism' প্রভৃতি। এ প্রবন্ধে স্থানাভাবে সমস্ত ধারাগুলির পরিচয় দেওয়া অসম্ভব, তবে দু'একটী বিশিষ্ট ধারার বিবরণ দিচ্ছি সংক্ষেপে।

Roger Fry যা'কে বলেছেন, "The 'treeness' of the tree and 'wall-ness' of the wall," তা অতি আধুনিক পাশ্চাত্য চিত্রকলায় একেবারেই বর্জ্জিত হয়েছে। প্রথম যুগে 'Expressionist' শিল্পীদের লোকে পাগল বলতো। বিনা-মূল্যে দিলেও তাদের চিত্র কেহ নিতে চাহিত না, কিন্তু এখন তাদের এক একখানি চিত্র হাজার হাজার পাউণ্ডে বিক্রয় হ'চ্ছে। এখন সেগুলি হ'য়েছে আধুনিক শিল্পীদের আদর্শ ও সৌখিন লোকদের 'কিউরিও'। জীবিতকালে 'পল্ সেঁজ্যা' চল্লিশ বছরের মধ্যে একখানিও চিত্র বিক্রয় ক'রতে পারেন নি,

কিন্তু এখন তাঁর এক একখানি চিত্রের মূল্য হ'য়েছে হাজার হাজার পাউণ্ড।

প্রথম যুগে সেঁজা 'Post-impressionist দের দলে পড়ে' খামখেয়ালী ধরণের অনেক চিত্র আঁকেন, তারপর তাঁর মত যায় একেবারে বদলে। হঠাৎ তিনি একদিন বলে বসলেন, চিত্রে থাকবে "দৃঢ় গঠন" "ঘনত্ব"। এর পর হতে তিনি 'পিকাসো' প্রবর্তিত 'Picassoism' অনুসরণ ক'রে চিত্র অঙ্কন ক'রতে সুরু ক'রলেন, কিন্তু তাঁর এ ধারার নাম হ'য়ে গেল Cubism।

এর পর ইটালীতে, কবি—F. T. Marinetti-'র কাব্য অনুসরণ ক'রে এক বিচিত্র শিল্পধারার উদ্ভব হয়। এই শিল্পী-দলের নাম হয় 'Intimist' এঁরা ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমানের চিন্তাধারা এক সঙ্গে মিশিত করে চিত্র আঁকতে আরম্ভ করেন। ধরুন, 'Intimist' চিত্রকর দেখলেন সাম্‌নের বারেণ্ডায় কোন ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে আছেন। তিনি তাঁর চিত্রে আঁকলেন,



দোলা শিল্পী—এদুয়ার মানে

লোকটী বারেণ্ডায় দাঁড়িয়ে আছেন, কিন্তু তাঁর চোখে মুখে যে ভাব ফুটিয়ে তুললেন তা'তে বর্তমানের কিছুই রাখলেন না। গত রাত্রের পান-ভোজনের পর তাঁর মুখে যে ভাব ফুটে উঠেছিল তারই একটী ছাপ ফুটে উঠলো তাঁর চিত্রের



উপবিষ্টা মহিলা শিল্পী—পাব্লো পিকাসো

মুখমণ্ডলে। তারপর, চিত্রকর দণ্ডায়মান লোকটীর সাম্‌নে একটী তরুণীর মূর্ত্তি এঁকে দিলেন। হয়ত লোকটী অবিবাহিত, কিন্তু ভবিষ্যতে কোন মেয়েকে তাঁর ভালবাসার সম্ভাবনা আছে—চিত্রকর এখানে সেই ভবিষ্যতের পূর্ব্বাভাষ দিয়ে রাখিলেন। এ ধারাটীতে বিকৃতির প্রভাব তত্টা দেখা যায় না যতটা দেখা যায় 'খামখেয়ালীপনার'। ফ্রান্সে এ ধারাটী বিশেষ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করে।

এর পর Lyricist শিল্পীদল, কাব্যের ছন্দ, শিল্পকলার মধ্য দিয়ে প্রকট করে তুলতে প্রয়াস পান। কতকগুলি গীতবাদ্য বিশেষজ্ঞ ও কতকগুলি চিত্র-শিল্পীর একত্র সমাবেশেই এই নব ধারার উদ্ভব হয়। এঁদের চিত্রগুলি অতি বিচিত্র। এঁদের অঙ্কিত মনুষ্য মূর্ত্তির আঁকা বাঁকা লতানে হাত-পা গুলির মধ্যে এক অদ্ভুত ছন্দের ব্যঞ্জনা দেখা যায়।

Symbolism, Synthecism, 'Electicism', Orphism প্রভৃতি ধারাগুলি ভেঙেচুরে বিংশ শতাব্দীতে অতি

আধুনিক এক শিল্পধারার উদ্ভব হয়েছে; ধারাটীর নাম হ'লো 'Surrealism' 'সুরিয়ালিজ্‌ম্' শিল্পজগতে এনেছে সম্পূর্ণ মুক্তি। তা'তে ধরা-বাঁধা আইন-কানুন কিছুই নেই। স্রষ্টার যা অভিরুচি, তাই আঁকেন। 'সুরিয়ালিজমে' অস্থি ও পেশীসংস্থান (Anatomy), পারিপ্রেক্ষিক (Perspective), আলো-ছায়া (Shade and Light), বর্ণবিজ্ঞান, কিছুরই বালাই নেই। যেমন খুসী তেমনি আঁকা যায়। এই নব্য ধারাটী প্রবর্ত্তিত হওয়ার আজ সকলেরই শিল্পী হবার সুবিধা হ'য়েছে। যা'র তুলিতে একটা সরল রেখা টানবারও শ'ক্ত ছিল না আজ তিনি শিল্পী হয়ে পড়েছেন।

গত ১৯৩৬ সালে ইংলণ্ডে একটী 'সুরিয়ালিষ্ট' চিত্র-কলার প্রদর্শনী হয়। তা'তে বিশ হাজারেরও অধিক চিত্র ছিল। পৃথিবীর চৌদ্দটী বিভিন্ন দেশের লোক ঐ প্রদর্শনীতে চিত্র প্রদর্শন করেন। তা'তে আসল চিত্রকর, কবি, সাহিত্যিক, কামার, কুমোর, ছুতোর, ধোপা, নাপিত প্রভৃতি প্রত্যেকেরই আঁকা চিত্র ছিল। ইহাতে দেখা যায়, "আ-চণ্ডালে কোল দেওয়া"র মত এ ধারাটী সকলকেই শিল্পী হ'বার সমান অধিকার দিয়েছে। এ সম্বন্ধে কয়েকখানি চিত্র



মালি : শিল্পী পল ক্যাজানি　　　　—Cubism School

দেওয়া গেল, তা' থেকে আপনারা 'সুরিয়ালিষ্ট' চিত্রশিল্পীদের অঙ্কন শক্তির যথেষ্ট পরিচয় পাবেন।

এখানে আমি "Arp" অঙ্কিত একখানি 'সুরিয়ালিষ্ট' চিত্রের বিবরণ দিচ্ছি: চিত্রে একটী মৎস্যের মত জীব আঁকা হয়েছে। জীবটীর গলদেশ হতে একগাছি দড়ি একটী



বন : শিল্পী—হেনরী মাতিস　　　　—Fauvism School

খোঁটায় বাঁধা। মৎস্য-দেহী প্রাণীটীর গলার উপর বাবরী-কাটা চুল বিশিষ্ট একটী মনুষ্য-মুণ্ড। গলার ঠিক নীচে ও লাঙ্গুলের কিছু উপরে জুতা, মোজা পরা দু' জোড়া মানুষের পা ঝুলছে। জীবটীর পৃষ্ঠদেশ হ'তে একটী বড় গোলাপ ফুল ফুটেছে, আর তার উপর কয়েকটী মধুকর উড়ছে। ফুলটীরও আবার বিশেষত্ব আছে। ফুলের পাঁপড়ীর উপর হ'তে দু'টী গাছ বাহির হ'য়েছে। এ চিত্রের অর্থ যে কি তা বুঝে উঠা অতি কঠিন। সিংহদেহে মনুষ্যমুণ্ড যুক্ত মিশরের 'স্ফিংসে'র মত একটী কিছু হবে হয়ত। রূপ ত' নেই-ই; বর্ণের উদ্ভটত্বের কথা ছেড়েই দেওয়া যাক্, ভাবই হলো এই বিচিত্রসৃষ্টির যা কিছু উপাদান। কল্পনা হবে যত উদ্ভট শিল্পের মূল্য (বিংশ শতাব্দীর মান (Standard) অনুযায়ী) বোধ হয় হবে তত বেশী।

দুঃখের বিষয়, পাশ্চাত্যের চিত্রকলায় তাদের আজ এত আদর, তবুও বুঝতে পারি না, আমাদের দেশের উচ্চ-শিক্ষিত পাশ্চাত্য ঘেঁসা ভদ্রলোকেরা অনেকেই রবিবাবুর অবনত উদ্ভট চিত্রকলার নামে কেন হাঁসেন! প্রাচীচ্যের ভৌগলিক সীমারেখা পার হ'য়ে যেদিন আমাদের দেশে 'Orphism' এসে প্রবেশ ক'রবে—সেদিন রবিবাবুর এক একখানি ছবির মূল্য হ'বে লক্ষ লক্ষ টাকা।

থার্ডক্লাশে

—শ্রীশৈলেন্দ্রমোহন রায়

[নক্সা]

বিছানা সুটকেস লইয়া হাওড়া ষ্টেশনে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। পশ্চিমে চলিয়াছি হাওয়া বদলাইতে। কারণ, পেটের অবস্থা নিতান্তই শোচনীয়; যদিও আমার আর্থিক অবস্থা ক্রমশঃই স্বচ্ছল হইয়া আসিতেছে। খাওয়া খরচের অঙ্ক দিন দিন কমিয়া আসিয়া এমন একটা অবস্থায় আসিয়া পড়িল—যখন ডাক্তার বলিলেন, কয়েক দিন পর নাকি খাওয়া খরচ আর লাগিবেই না। বলে কি! খাওয়া খরচ না লাগিলে তো···.

আর ভাবিতে পারি না, খাওয়া খরচ বাড়াইতে যাতায়াতের খরচের হিসাব কষিয়া বাহির হইয়া পড়ি দেওঘরের উদ্দেশ্যে।

টিকিট কাটিয়াছি থার্ডক্লাশের। প্রথমে ভাবিয়াছিলাম ইন্টারক্লাশের কাটিব; টিকিট কাটিবার ঘরে গিয়া দেখিলাম, এক ভদ্রলোক বারোখানা থার্ডক্লাস টিকিট গুনিয়া গুনিয়া পকেটে ভরিতেছেন। আর চুপ থাকিতে পারিলাম না, বিনীতভাবে জিজ্ঞাসা করিলাম, "আজ্ঞে, আপনি কি স্কুল-টিচার?"

ভদ্রলোকও ভ্রূ কুঁচকাইয়া পাল্টা প্রশ্ন করিলেন, "কেন?"

"এতগুলি টিকিট কাটলেন কিনা, তাই ভাবলাম স্কুলের ছাত্রদের নিয়ে বুঝি বেড়াতে যাচ্ছেন।"

ভদ্রলোক বিরক্তস্বরে জবাব দিলেন, "টিচার হতে যাব কোন দুঃখে, ক্লার্ক, মশাই ক্লার্ক। সপরিবারে হাওয়া খেতে যাচ্ছি। আর কিছু জিজ্ঞাসা করবার আছে?" জিজ্ঞাসা করিবার আর কি-ই বা থাকিতে পারে। বুঝিলাম দুই জনেই এক গোয়ালের গরু! ভদ্রলোকের খাওয়া খরচ আমার থেকেও কম, নইলে এত খিটখিটে মেজাজও মানুষের হয়।

ইন্টারক্লাশের টিকিট কাটিবার জন্য টাকা আনিয়াছিলাম। কিন্তু ভাবিলাম ভদ্রলোক সপরিবারে যখন থার্ডক্লাশে যাইতে পারেন, আমি আর এমন কি লাটসাহেব হইয়াছি যে থার্ডক্লাশে যাইতে পারিব না। একটা প্রাণী, কোন রকমে নাক মুখ বুঁজিয়া পড়িয়া থাকিলেই চলিবে ···প্লাটফর্মে ঢুকিলাম। গার্ডসাহেবের গাড়ী এবং ইঞ্জিন বার দুই তিন পর্যবেক্ষণ করিলাম। কুলিটা সেই যে চীৎকার জুড়িয়া দিয়াছে তখন হইতে; বলিতেছে তাহাকে কি মারিয়া ফেলা হইবে না কি! বলিলাম, বাপু জায়গাটা কোথায়? সে হাত ঘুরাইয়া জিব এবং তালুর সাহায্যে একটা অদ্ভুত শব্দ উচ্চারণ করিয়া বলিল, "তব ছেকেন কেলাসমে যাইয়ে না!" ভাবিলাম, এ জীবনে সেটা স্বপ্নেই থাক, আগামী জীবনে যদি হয়।

শেষে হাল ছাড়িয়া কুলিকে বলিলাম যে-কোন একটা থার্ডক্লাশ কামরায় জিনিষপত্র ঢুকাইয়া দিতে। কুলি কাজে লাগিয়া গেল। বিছানা এবং বাক্সটা জানালা দিয়া কোন রকমে ভিতরে ঢুকাইয়া দিল। আমাকে বলিল, "উঠিয়ে।" উঠিব কি করিয়া? জানালা দিয়া তিন চার জোড়া হাত সবলে বাহিরের দিকে আমার মাথাটা ঠেলিয়া রাখিল। প্রথমে কাকুতি-মিনতি করিলাম, ফল হইল না; ভয় দেখাইলাম, কিন্তু ভয় পাইল না। শেষে নিরুপায় হইয়া কুলিটাকে বলিলাম—"পিছনসে জোরসে ঠেলা মারো;" সে বেঁকিয়া বসিল, "জাস্তি পয়সা লাগে গা।"

বলে কি ছাতুখোর ব্যাটা! একটু ঠেলিয়া দিবে তাহাতেও আবার পয়সা! বাজারে জিনিষ কিনিলে ফাউয়ের ব্যবস্থা আছে, আর এখানে কি একটা ফাউ ঠেলাও জুটিবে না! তাহাকে বলিলাম, রাস্তায় ঘাটে যখন সে ভীড়ের মধ্যে ইহাকে উহাকে ঠেলা মারিয়া বেড়ায় তখন কি পয়সা চাহিয়া বেড়ায় নাকি! ধরিয়া লউক না এটাও একটা রাস্তা। কিন্তু এত বোকা নয় সে, শেষে দরাদরি করিয়া এক আনায় ঠেলা দিতে রাজি হইল।

তারপর যা ব্যাপার হইল তাহার বর্ণনা আমাদ্বারা সম্ভবপর নয়, কারণ, কিছুকাল আমার বুদ্ধিলোপ পাইয়াছিল। বুদ্ধি ফিরিয়া পাইলে দেখিলাম আমি গাড়ীর ভিতর দাঁড়াইয়া আছি এবং চারিদিক হইতে যে পরিমাণ চাপ পড়িতেছে সন্দেহ

হইল বুঝি প্রাণটা ধড় ছাড়িয়া চলিয়া যায়! কথাটা ভাবিতেই গা শিহরিয়া উঠিল। লোকেই বা বলিবে কি তাহা হইলে! অমুক বাবু কিনা গাড়ী চড়তে প্রাণ দিলে! নাঃ, অত সহজে মরিলে চলিবে না। "গেল, গেল ঠ্যাংটা গেল যে!" হঠাৎ চমক ভাঙিয়া গেল। দেখিলাম, কোণের দিকে দুইটা বেঞ্চি অধিকার করিয়া পূর্ব্বকথিত ক্লার্কবাবুটি সপরিবারে বসিয়া আছেন। কিন্তু বসিয়াও নিস্তার নাই; বাবুর বড় ছেলেটির ঠ্যাং কে মাড়াইয়া দিয়াছে। ক্লার্কবাবুটি একবার ভীড়ের দিকে তাকাইলেন, বুঝিলেন আপত্তি নিষ্ফল।

ছেলেকে ভেঙ্গাইয়া বলিলেন' "গেল, গেল ঠ্যাং গেল। কিসের ঠ্যাং রে, মাখনের নাকি? অত সহজে ঠ্যাং গেলে জীবনে কিসসু করতে হবে না। কই ছোট বয়স থেকে তো এই বুড়ো বয়স অবধি এই মোদ্দা থার্ড ক্লাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে, অঙ্গের তো হানি হোল না আজ পর্য্যন্ত।" ছেলেটা ততক্ষণে ঠ্যাংটাকে টানিয়া একটা নিরাপদ স্থানে আনিয়া ফেলিয়াছে। গাড়ী ছাড়িয়া দিয়াছে এবং ভক্তবৃন্দের আকুল কণ্ঠস্বরে কাণে তালা লাগিবার জোগাড় হইল, "কালী মাইকী" সঙ্গে সঙ্গে "জয়"ধ্বনি

দেখিলাম আমাদের গাড়ীর সঙ্গে সঙ্গে একটি হিন্দুস্থানী যুবক দৌড়াইতেছে এবং হাউ হাউ করিয়া কাঁদিতেছে। প্রথমে কারণটা বুঝিলাম না, কিন্তু দেখিলাম আমার পাশেই একটা বুড়া হিন্দুস্থানী ফ্যাচ্ ফ্যাচ্ করিয়া নাক ঝাড়িতেছে এবং অনুনাসিক সুরে যুবকটির প্রতি উপদেশ প্রয়োগ করিতেছে। কিছু কিছু বুঝিলাম, লোকটি বলিতেছে, যুবকটি যেন অতিরিক্ত টাকা ব্যয় না করে, খাওয়া খরচ বাদে যাহা বাঁচিবে তাহাই যেন তাহাকে পাঠাইয়া দেয় ইত্যাদি, ইত্যাদি।

গাড়ী ছাড়িবার সঙ্গে সঙ্গেই কয়েকটা লোক লাফাইয়া নামিয়া গেল। প্রথমে ব্যাপার কিছুই বুঝিলাম না; পরে শুনিলাম, উহারা নাকি জায়গা দখল করিয়া রাখে 'ভাইয়া'র জন্য, তারপর নামিয়া যায়; ভাইয়াও পা টান করিয়া শুইয়া পড়ে। ফাঁক বুঝিয়া জানালা ঘেঁসিয়া এক কোণে বসিয়া পড়িলাম। হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিলাম। ধীরে ধীরে বাক্স-বিছানাও নিজের কাছে চলিয়া আসিল।

বর্দ্ধমান পর্য্যন্ত বেশ নিরাপদেই কাটিল। বর্দ্ধমান ষ্টেশনে গাড়ী থামিতেই কয়েকজন হিন্দুস্থানী কুলিশ্রেণীর লোক গাড়ী চড়াও করিল। দুইটি দরজার গোড়ায়ও দুইটী ছোট ছেলেকে শোয়াইয়া রাখা হইয়াছিল। বুদ্ধিটা আবিষ্কার করিয়াছিল একজন হিন্দুস্থানী স্ত্রীলোক। বিহারী নারী বুদ্ধিতে কোন অংশেই পুরুষ অপেক্ষা খাটো নয়।

প্রত্যেক ষ্টেশনেই লোক উঠিবার চেষ্টা করে, গাড়ীর ভিতর হইতেও সমস্বরে চীৎকার হইতে থাকে, বাচ্চা মর্ যায় গা রে!" লোকগুলি শিশুহত্যার নয়, সুতরাং সরিয়া পড়ে। কিন্তু বর্দ্ধমানে শিখণ্ডী দাঁড় করাইয়া আর কাজ চলিল না। প্রথমে দরজা খুলিতে গেলে 'বাচ্চার' ভবিষ্যৎ মৃত্যু সম্বন্ধে সমস্বরে চীৎকার উঠিল। কিন্তু বাইরের লোকগুলি এত সহজে দমিবার পাত্র নয়। বাচ্চা না মারিয়াও কি করিয়া গাড়ীতে উঠিতে হয় তাহারা তাহা জানে।

তাহারা জানালা দিয়া গলিয়া ভিতরে ঢুকিবার চেষ্টা করিতে লাগিল; আমরাও ভিতর হইতে বাধা দিতে লাগিলাম। থার্ডক্লাশের ইহাই নিয়ম, তুমি উঠিবার সময় বাধা পাইবে এবং উঠিলে বাধা প্রদান করিবে। সকলেই এই নিয়ম মানিয়া চলে।

আমার দিকের জানালাটা দিয়া একটা হিন্দুস্থানী গলিয়া ভিতরে ঢুকিবার চেষ্টা করিতেছিল। বাধা দিলাম। দুই হাতে তাহার মাথাটা ধরিয়া পিছন দিকে ঘুরাইবার চেষ্টা করিলাম, কিন্তু ঐ জোয়ান হিন্দুস্থানীর মাথা হটাইবার মত শক্তি ডিস্পেপটিক্ বাঙ্গালীর বাহুতে আজ আর নাই। সে একটা দম লইল তারপর 'রামজী'কে স্মরণ করিয়া আমার উপর দিয়া অদ্ভুত ক্ষিপ্রতার সহিত ভিতরে প্রবেশ করিল।

ভিতরে প্রবেশ করিয়াই সে তাহার মূর্ত্তি বদলাইয়া, হুঙ্কার ছাড়িয়া জিজ্ঞাসা করিল, তাহাকে ঠেলিয়াছিলাম কোন আইনে, সে কি টিকিট কাটে নাই? না, তাহার পয়সার কোন দাম নাই? বলিলাম, সকলেই তো সকলকে ঠেলিয়াছে, কই, তাহারা তো আপত্তি করে নাই। হাওড়া ষ্টেশনে আমাকে কম ঠেলা খাইতে হইয়াছে না কি। মাথাটা এখনও দপ্ দপ্ করিতেছে যে! কিন্তু ইহাতে তাহার রাগ একটুও কমিল না, তাহার হিন্দুস্থানী ভাই সকল ধাক্কা মারিতে পারে, এমন কি ঠেলিয়া গাড়ী হইতে ফেলিয়াও

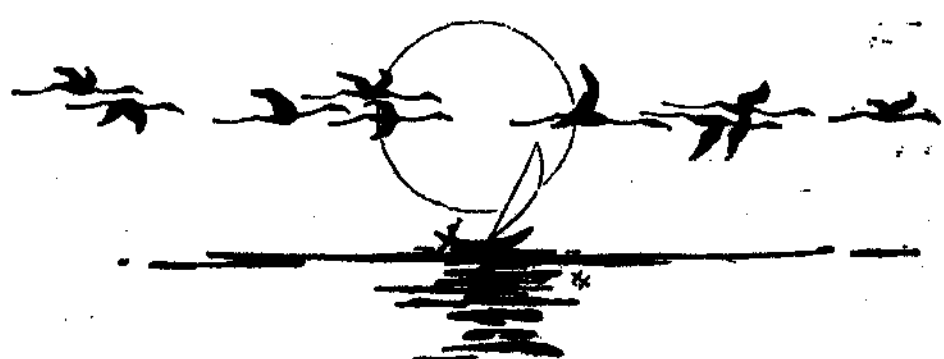
দিতে পারে—তাহাতে তাহার আপত্তি নাই, কিন্তু 'বাঙ্গাল' তাহাকে ঠেলিবে কেন? সঙ্গে সঙ্গে আরও কয়েকটা হিন্দুস্থানী ছুটিয়া গেল। শৈনী টিপিতে টিপিতে সকলেই সমস্বরে বলিল—"এ তো ঠিক বাৎ হায়!" সর্ব্বনাশ! এই সব লোকগুলিই তো আমাকে বলিয়াছিল ঐ লোকটাকে ঠেলিয়া ফেলিতে! কোন উচ্চবাচ্য করিলাম না। সমস্ত পথ তাহারা জীভের সদ্ব্যবহার করিতে করিতে চলিল, কিন্তু শরীরে হস্তক্ষেপ করিল না। বুঝিলাম, বিহার এখনও রক্ত দেখিতে অভ্যস্ত হয় নাই।

সব জিনিষেরই শেষ আছে। তাহাদের গালি-গালাজেরও শেষ হইল। জায়গায় বসিয়া ঢুলিতে লাগিলাম। হঠাৎ পিঠে কিসের ধাক্কা অনুভব করিয়া ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল, দেখিলাম একজন হিন্দুস্থানী স্ত্রী-লোক আমার পিঠে মাথা রাখিয়া মহাসুখে নিদ্রা যাইতেছে। সমস্ত রাত্রিই প্রায় সজাগ অবস্থায় কাটিয়াছে, মেজাজটাও বিগ্‌ড়াইয়া গিয়াছিল, দিগ্‌বিদিক্‌ জ্ঞান-শূন্য হইয়া তাহাকে পিঠের সাহায্যে মারিলাম এক ঠেলা, সেও গিয়া পড়িল তাহার পাশের যাত্রীটির উপর—সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত বেঞ্চিটা জুড়িয়া একটা ঠেলায় তরঙ্গ বহিয়া গেল। সকলে মার, মার, করিয়া উঠিল—"জেনানাকো ঠেলা মারা কাহে?" বুঝিলাম বিপদ আবার আসন্ন; হাল ছাড়িয়া মুখ কাঁচুমাচু করিয়া বলিলাম—"ঘুম্‌কা ভিতর একটু স্বপ্ন দেখকো, ঠেলা মারা। হামরা কেয়া দোষ হুয়া?" সকলেই গম্ভীর মুখে রায় দিল, না, ইহা এমন কিছু দোষের হয় নাই, ঐ রকম তাহাদের কত হয়।

মধুপুর আসিয়া ট্রেণ থামিতেই প্ল্যাটফর্ম্মের জনতার দিকে তাকাইয়া মাথা ঘুরিয়া গেল। উহারাও তো সকলে এই গাড়ীতেই যাইবে, কিন্তু জায়গা কোথায়? সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়িয়া গেল, বিহারী লোকদের জায়গার অভাব হয় না কোনদিন। কথাটা মনে হইতেই তড়াক্‌ করিয়া লাফাইয়া উঠিলাম; বিছানা পত্তর জানালা দিয়া গলাইয়া বাহিরে ফেলিয়া দিয়া নিজেও লাফাইয়া পড়িবার ব্যবস্থা করিতেছি, এমন সময় কাণে গেল ক্লার্কবাবুটি বলিতেছেন—"কি মশাই, মধুপুরেই নামছেন যে? টিকিট তো কাটলেন দেখলাম দেওঘরের।"

—"আজ্ঞে হাঁ, তবে এখানে মানুষ থাকতে পারে না, সেকেণ্ড ক্লাশে যাচ্ছি।"

ভদ্রলোক মৃদু হাসিয়া বলিলেন,—এতটুকু কষ্ট সইতে না পারলে—তাঁহার কথা শেষ পর্য্যন্ত শুনিবার প্রবৃত্তি রহিল না, লাফাইয়া বাহিরে পড়িলাম।



েন্দ্র নাথ কুণ্ডু



—শ্রীকিরণবালা দেবী

দেখিতে দেখিতে সমাজের অবস্থা ক্রমেই ঘোর আবর্ত্তনের মধ্যে যাইতেছে। চল্লিশ পঞ্চাশ বৎসরের অবস্থাও যেন সেদিনের কাহিনী বলিয়া মনে হইতেছে। হিন্দু নারীর ভিতরকার জিনিষটা যে একেবারে বদলাইয়া গিয়াছে, তাহা নয়। তথাপি বর্ত্তমান ভাব যদি আরও প্রগতির দিকে যায়, তবে যে অবস্থা কি হইবে কিছুই বলা যায় না। আমাদের সময়ে, বিবাহের পূর্ব্বে মেয়ে দেখিতে আসিলে রন্ধন সম্বন্ধে বিশেষ কথাই উঠিত না। কারণ, তখন রন্ধনকার্য্য একটা অবশ্য কর্ত্তব্য নিত্যকর্ম্মের মধ্যে পরিগণিত হইত। সুক্তানি, চচ্চড়ী, ডাল, মাছের ঝোল রন্ধনই আমরা প্রথমে শিখিতাম। কিন্তু এসব শিখিবার মধ্যে কি নূতনত্ব আছে তাহাও আমরা আয়ত্ত করিয়া নিতাম। রন্ধনকার্য্য তখনকার দিনের একটী প্রধান কার্য্য বলিয়া পরিগণিত হইত। আর আজকাল মেয়ে দেখিতে গেলে, কোন কোন সেকেলে ধরণের কর্ত্তা, রন্ধন সম্বন্ধে দুই একটী প্রশ্ন করিয়া থাকেন বটে, কিন্তু অধিকাংশ স্থলে সেটা হাস্যাস্পদ বলিয়া পরিগণিত হয়। অনেক অভিভাবকই মনে করেন—"দেখ আক্কেল টা! আমার মেয়েকে আমি এত কষ্ট করে লেখা-পড়া শেখালাম, গান-বাজনা শেখালাম, নৃত্য-কলা শেখালাম, আর আমার মেয়ে যাবে ওঁর বাড়ী হাঁড়ি ঠেলতে, দেব না ওখানে বিয়ে।"

কোন কোন অভিভাবক বলেন—"ম'শায়, আমার মেয়ে রান্না জানে, কিন্তু পাছে হাত-টাত পুড়িয়ে ফেলে, তাই আমি রান্না করতে দিই না।" কিন্তু তাঁহারা জানেন না, রন্ধনশীলা মহিলারা জাতিগঠনে কত সহায়তা করেন। আজ সেই কথা জানিয়াই হের হিটলার জার্ম্মান মেয়েদিগকে রন্ধনকার্য্যে নিয়োজিত করিয়াছেন। হিটলারের এই খেয়াল কি পাগলামি, না গভীর বিচক্ষণতার ফল? জার্ম্মানী ও রুষিয়ায় যুদ্ধ হইতেছে, একদিকে রুষিয়ান নারী যুদ্ধকার্য্যে ব্যাপৃতা, আর একদিকে নারী-বাহিনী নারীরা সব রন্ধনশালায় (কিচেনে), কি অদ্ভুত তারতম্য।

ভগ্নীরা কি দেশনায়কগণ যদি ভাবিয়া দেখেন, তবে দেখিবেন, আমাদের কার্য্য কত গরীয়সী। পাচকেরা রান্না



রন্ধনে

করে, বেতন পায়, পরিষ্কার না ছাই রান্না করে, তাহাতে তাহাদের কি যায় আসে। অথচ এই আহারেই আমাদের স্বামী পুত্রের স্বাস্থ্যবর্দ্ধনে এমন সহায়তা করিতে পারে, যেন তাঁহারা সুস্থ ও দীর্ঘায়ু হইয়া সমাজ, দেশ, জাতি গঠনের কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিতে পারেন। আর অত বড় কাজ না করিলেও তাঁহারা সুস্থ থাকিলেই তো সংসার চলিবে,

পরিবারের শ্রীবৃদ্ধি হইবে, ছেলেরা মানুষ হইবে। এমতাবস্থায় তাঁহাদের আকাঙ্ক্ষা থাকুক, ইহাই আমাদের সর্ব্বাপেক্ষা কাম্য আকাঙ্ক্ষা। এই সকল কার্য্যে আমরা যদি সহায় না হই, তবে আমাদের অস্তিত্বের কি দরকার? তবে আমাদের অর্দ্ধাঙ্গিনী নামের সার্থকতাই বা কি? আমি অনেক মহিলাকে দেখিয়াছি, তিনি স্নাতপূত হইয়া সাত্ত্বিক ভাব লইয়া স্বামীর জন্য নিজহাতে যে অন্ন-ব্যঞ্জনাদি রন্ধন করেন, তাহা খাইয়াই নাকি তাঁহার স্বামী পুত্রগণ এত সুস্থ, বলিষ্ঠ ও কর্ম্মক্ষম রহিয়াছেন। আমি আমার মহিলাজাতিকে আবার রন্ধনকার্য্যে আত্মনিয়োগ করিতে অনুরোধ করি। সুখের বিষয়, আজকাল কোন কোন মেয়ে উচ্চশিক্ষা লাভ করিয়াও নাকি রন্ধনকার্য্য প্রকৃতই ভালবাসেন, কিন্তু তাঁহাদের সংখ্যা কত অল্প! আমাদের কার্য্য আমরা করিব না তো কে করিবে?

এখন প্রায়ই দেখিতে পাই, মেয়েরা সকালে উঠেন না। অবশ্য, যাঁহারা সকালে কলেজে পড়িতে যান তাঁহাদের কথা



[illegible]

বলিতেছি না। উঠিয়াই পায়খানায় যাওয়া নাই, হাত-মুখ ধোয়া নাই, কাপড় ছাড়া নাই, সকালেই দেখি, চা'র বাটী লইয়া বসেন। ইহাতে স্বাস্থ্য কিছুতেই ভাল থাকিতে পারে না, ভাল ভাল অভ্যাসও কিছুতেই শিক্ষা হয় না। আমাদের সময়, আমরা খুব প্রত্যুষে উঠিতাম; মা, খুড়ী,



পূজারতা

পিতামহী, শাশুড়ীকে সকালে উঠিয়াই গোবর ছড়া দিতে দেখিতাম। তাহাতে তাঁহাদের কি স্ফূর্ত্তি দেখিতাম! বড় হইয়া আমরাও গোবর ছড়া দিতাম। গোবরের গন্ধে বাড়ীর দুর্গন্ধ দূর হইত, বাড়ীখানি ঝকঝকে পরিষ্কার হইত। আজকাল বোধ হয় ফিনাইলেও সে পরিচ্ছন্নতা কিছুতেই পাওয়া যায় না। মনে পড়িতেছে, কে একজন ইংরাজ না আমেরিকান মহিলা গোবরের কথা নিয়া আমাদের ঠাট্টা করিয়াছিলেন। জানিনা, দেশবাসীরা কি উত্তর দিয়াছিলেন। কিন্তু এই গোবর ছড়া, গোময়ে উঠান লেপা, গোবর দ্বারা সকড়ি পরিষ্কার করা আমাদের নিত্যকার্য্যের মধ্যে ছিল, আর ইহাতেই আমরা গৌরবানুভব করিতাম।

আর তখন সকালে উঠিব না কেন, সকালে উঠিবার জন্য আড়াআড়ি চলিত। মাঘ মাসের বাঘের শীতেও লেপ হইতে উঠিয়া সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে ঘাটে গিয়া ব্রত করিতাম। প্রতি সকালে সকলে কণ্ঠে কণ্ঠ মিলাইয়া ছড়া গাহিতাম—

ওঠ ওঠ সূর্য্যদেব
ঝিকি মিকি দিয়া
না উঠিতে পারি আমি
ইঝলের লিগ্যা ।
ইঝলের পাকনাটি শিয়রে থুইয়া
সূর্য্য উঠবেন কোন খান দিয়া ?
ব্রাহ্মণ বাড়ীর ঘাটা দিয়া
বামনের মেয়েরা বড় সেনা
পৈতা জোগায় বিহান বিহান,
পৈতার সোনা জল পুষ্করিণীতে ভাসে
তা দেইখা মাইলানি খট্-খটাইয়া হাসে ।
হাসিস না লো মাইলানি তুই তো আমার সই
মাঘমণ্ডলের ব্রত কর্ত্তে ঘাট পাবু কই ?
আছে আছে গো ঘাট বৈদ্য-বাড়ীর ঘাট
বৈদ্যগো মেয়েরা বড় সিয়ান
পূজা করে বিহান বিহান্ ।

আরও কত সুন্দর সুন্দর কথা কণ্ঠস্থ রহিয়াছে । যেমন—

মাঘমণ্ডলে দিয়া লাড়ু—
শাঁখার আগে সোনার খাড়ু
মাঘমণ্ডলে চাইলা মধু—
বড় মানুষের পুত্রবধূ ।

এইরূপে আমাদের শীতের প্রভাত কাটিত । আর আজকাল !

তাই বলি, মেয়েরা এখন আলস্য পরিত্যাগ করিয়া সংসার-কার্য্য নির্ব্বাহ করিলেই সমাজের অনেক মঙ্গল হয় । যে দিন পড়িয়াছে, এত বেকার সমস্যা, এত অনাহার, এত দুর্ভিক্ষ, এত হাহাকার, এখন আমরা যদি আবার বাবুয়ানী চালে চলি তবে, সংসার একেবারে নষ্ট হইয়া যাইবে । যাইতে বসিয়াছে ও । কিন্তু এই বঙ্গ-সংসার রাখিতে আমরাই পারি । আর তাহাতেই সমাজ-সংস্কার হয় ।

তখনও যে লেখাপড়ার প্রচলন না ছিল, তাহা নয় । আমরা বাড়ীতেই পড়াশুনা করিয়াছি । কখনও কখনও বিক্রমপুর-সম্মিলনীর পরীক্ষাও দিতাম । মনে পড়ে, আমার শ্বশুর যখন আমাকে প্রথম দেখিতে যান, আমাকে সরস্বতী সম্বন্ধে একটী স্তব লিখিতে দিয়াছিলেন । তিনি পড়িলেন, আমি লিখিলাম । সে লেখা আর আমার কাছে নাই । তবে প্রায়ই শুনিতে পাই, এখনকার অনেক পাশকরা মেয়েরাও নাকি ঐরূপ স্পষ্ট লিখিতে পারে না । যাক্, সেটা অহঙ্কারের কথা । আমরা কোন গর্ব্বের কথা বলিতে চাই না । কিন্তু আমার কথা এই, যে যাহা পড়ে পড়ুক, শিখে শিখুক, কিন্তু আমাদের ঠাকুর দেবতার নাম স্মরণে যেন কোন ভক্তির ন্যূনতা না হয় । আর একটা প্রধান কথা এই যে, সেই কৃত্তিবাসী রামায়ণ ও কাশীদাসী মহাভারত যেন আমরা না বিস্মৃত হই । এ বিষয়ে ত্রুটীটা আমাদের সকলই প্রথমে আরম্ভ হয় । কিন্তু শাশুড়ী ঠাকুরাণী, মা ও পিসীমা-দের দেখিয়াছি, তাঁহারা যখন সুর করিয়া রামায়ণ ও মহাভারত পড়িতেন, যেন সীতা ও সাবিত্রীর কথা পড়িতে পড়িতে অশ্রুসিক্ত হইতেন, কাঁদিয়া উঠিতেন । তখনই বুঝিতাম, সমগ্র মহিলাকুলের উপর সীতা ও সাবিত্রীর কত প্রভাব ।

মন ও বুদ্ধি কাহাকে বলে…

রক্ত এবং রক্তস্রোত হইতে মেদের উৎপত্তি হইবার পর মানুষের যে ক্রিয়া-শক্তির প্রথম উন্মেষ হয়, মেদ হইতে ক্রমশঃ অস্থি, মজ্জা, বসা, মাংস এবং রক্তের উৎপত্তির সঙ্গে সঙ্গে যে-শক্তির পরিণতি ঘটিয়া থাকে এবং যে-ক্রিয়াশক্তির অভিব্যক্তি হইয়া থাকে মানুষের স্পর্শ, রূপ, রস এবং গন্ধশক্তিতে, সেই ক্রিয়াশক্তির নাম মানুষের "মন" ।

মানুষের মধ্যে যে সর্ব্বদা অজড়, অর্থাৎ রক্ত ও রক্তস্রোত হইতে জড় অবস্থার উৎপত্তি হইতেছে, তাহা মানুষের যে ক্রিয়াশক্তির দ্বারা অনুভব করিতে পারে এবং যে ক্রিয়াশক্তির পরিণতির ফলে মানুষের চিৎ, চিত্ত ও চৈতন্যের উদ্ভব হয়, তাহার নাম মানুষের বুদ্ধি।

পৌরাণিক ভূতত্ত্ব

—শ্রীরমেন্দ্রনাথ সেনশর্ম্মা

তৃতীয় অধ্যায়।

(জম্বুদ্বীপের বর্ষসমূহের সীমানা)

প্রথম অধ্যায়ে বলা হইয়াছে যে, বর্ত্তমান পৃথিবী পৌরাণিক জম্বুদ্বীপ নামে প্রসিদ্ধ। এই ভূখণ্ডকে বর্ত্তমানে এসিয়া, ইউরোপ, আফ্রিকা, উত্তর আমেরিকা ও দক্ষিণ আমেরিকা এই পাঁচটি দেশে বিভক্ত করা হইয়াছে।

পৌরাণিক ভূতত্ত্বেও জম্বুদ্বীপকে নয়ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। তাহারা বর্ষনামে প্রসিদ্ধ। যথা, ইলাবৃতবর্ষ, ভারতবর্ষ, কিম্পুরুষবর্ষ, হরিবর্ষ, ভদ্রাশ্ববর্ষ, কেতুমালবর্ষ, রম্যকবর্ষ, হিরণ্ময়বর্ষ ও উত্তরকুরুবর্ষ।

> ভূপদ্মস্যাস্য শৈলেশঃ কর্ণিকাকারসংস্থিতঃ।৯
> হিমবান্ হেমকূটশ্চ নিষধশ্চাস্য দক্ষিণে।
> নীলঃ শ্বেতশ্চ শৃঙ্গী চ উত্তরে বর্ষপর্ব্বতাঃ। ১০
>
> (বিষ্ণু ২য় অং ২য় অঃ ৯।১০ শ্লোক)

অর্থাৎ,—শৈলরাজ (সুমেরু) এই পৃথিবীপদ্মের কর্ণিকা (বীজকোষ) স্বরূপ বিদ্যমান। ইহার দক্ষিণে হিমবান্, হেমকূট, নিষধ এবং উত্তরে নীল, শ্বেত ও শৃঙ্গী এই সকল বর্ষপর্ব্বত রহিয়াছে।

এখানে বর্ষপর্ব্বত শব্দে বর্ষ সকলের সীমানা নিরূপক পর্ব্বতকে বুঝায়।

> ভারতং প্রথমং বর্ষং ততঃ কিম্পুরুষং স্মৃতম্।
> হরিবর্ষং তথৈবান্যন্মেরোর্দক্ষিণতো দ্বিজ।১২
> রম্যকঞ্চোত্তরে বর্ষং তস্যৈবানু হিরণ্ময়ম্।
> উত্তরাঃ কুরবশ্চৈব যথা বৈ ভারতং তথা।১৩
>
> (বিষ্ণু ২য় অং ২য় অঃ ১২।১৩ শ্লোক)

অর্থাৎ—প্রথমে ভারতবর্ষ, তৎপরে কিম্পুরুষবর্ষ, এবং তদনন্তর হরিবর্ষ বলিয়া কথিত হয়। মেরুর উত্তরদিকে রম্যক, তৎপরে হিরণ্ময় তৎপরে ভারতের ন্যায় ধনুকাকার উত্তরকুরুবর্ষ অবস্থিত।

> নবসাহস্রমেকৈকমেতেষাং দ্বিজসত্তম।
> ইলাবৃতঞ্চ তন্মধ্যে সৌবর্ণো মেরুরুচ্ছ্রিতঃ।১৪
>
> (বিষ্ণু ২য় অং ২য় অঃ ১৪ শ্লোক)

অর্থাৎ,—হে দ্বিজসত্তম! ইহাদের এক একটি বর্ষ নব সহস্র যোজন বিস্তৃত। ইলাবৃতও নবসহস্র যোজন। তাহার মধ্যে সুবর্ণপর্ব্বত 'মেরু' অবস্থিত।

ইহাদ্বারা বুঝা যায় যে, দক্ষিণে ভারতবর্ষ, তাহার উত্তর সীমানা হিমালয় পর্ব্বত বা হিমবান্ পর্ব্বত। এই হিমালয় পর্ব্বত পারস্যের এলবুর্জ পর্ব্বত হইতে আরম্ভ করিয়া হিন্দুকোশ সহ বর্ত্তমান হিমালয় পর্ব্বত পূর্ব্ব দিকের সাগর পর্য্যন্ত বিস্তৃত আছে। অর্থাৎ ব্রহ্মদেশ, শ্যামরাজ্য অতিক্রম করত ইন্দোচীনের উত্তরদিক দিয়া যাইয়া সাগরে প্রবেশ করিয়াছে। সুতরাং ইহার দক্ষিণে পারস্য হইতে আরম্ভ করিয়া ব্রহ্মদেশ, শ্যামরাজ্য ও ইন্দোচীন পর্য্যন্ত এই দেশ বিস্তৃত।

যথা,—

> তস্যৈব দক্ষিণে পার্শ্বে হিমবত্যচলোত্তমে।
> নিকুঞ্জনির্ঝর গুহা নৈব সানুদরীতটে।২৭
> অর্ণবাদর্ণবং যাবৎ পূর্ব্বপশ্চায়তেঽচলে ২৮
>
> (ব্রহ্মাণ্ড ৪৩ অঃ ২৭।২৮ শ্লোক)

অর্থাৎ, কৈলাসশৈলের দক্ষিণ পার্শ্বে হিমালয় শৈল, ইহা বহুবিধ নির্ঝর, গুহা ও উপত্যকায় শোভিত। ইহার আয়তন পূর্ব্বসাগর হইতে পশ্চিম সাগর পর্য্যন্ত পরিব্যাপ্ত।

> পূর্ব্বে কিরাতা যস্য স্যুঃ পশ্চিমে যবনাঃ স্থিতাঃ।
> ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়া বৈশ্যা মধ্যে শূদ্রাশ্চ ভাগশঃ॥
>
> (বিষ্ণু ২য় অং ২য় অঃ ৮ শ্লোক)

অর্থাৎ,—পূর্ব্বে (শ্যাম ও ব্রহ্মদেশে) কিরাতগণ, পশ্চিমে (পারস্য দেশে) যবনগণ ও মধ্যে (বর্ত্তমান ভারতে) ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রগণ বাস করেন।

ইহার উত্তরে কিম্পুরুষবর্ষ। এই কিম্পুরুষবর্ষকে বর্ত্তমানে তিব্বত ও চীন দেশ বলে। এই দেশ উত্তরে হেমকূট পর্ব্বত হইতে আরম্ভ করিয়া দক্ষিণে হিমবান্ বা হিমালয় পর্ব্বত পর্য্যন্ত বিস্তৃত। হেমকূট পর্ব্বতশ্রেণীকে বর্ত্তমানে টিয়েনসান সাম্যো ও খিনগান পর্ব্বত বলে।

ইহার উত্তরে হরিবর্ষ বলিয়া কথিত হইয়াছে। উত্তরে নিষধ পর্ব্বত হইতে আরম্ভ করিয়া দক্ষিণে হেমকূট পর্ব্বত পর্য্যন্ত বিস্তৃত। বর্ত্তমান আলতাইএস্লুনই পর্ব্বতমালা নিষধ-

পর্ব্বত বলিয়া কথিত হইয়াছে। আলতাই পর্ব্বত হইতে উরল পর্ব্বত পর্য্যন্ত একটি সরল রেখা টানিলে তাহার দক্ষিণের ভূভাগও হরিবর্ষের অন্তর্গত।

ইহার উত্তরে ইলাবৃতবর্ষ; ইলাবৃতবর্ষের চতুর্দ্দিক বরফে আচ্ছাদিত। ইহার দক্ষিণ সীমানা নিষধপর্ব্বত। ইহাকে বর্ত্তমানে আলতাই ও এন্নুনই পর্ব্বত বলে। উত্তরে নীল পর্ব্বত বর্ত্তমান গ্রীণল্যাণ্ড হইতে আরম্ভ করিয়া পশ্চিমে রকি-পর্ব্বতের উত্তর অংশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। ইহার পূর্ব্বদিকে মাল্যবান্ পর্ব্বত বর্ত্তমান এন্নুনই পর্ব্বতের পার্শ্ব হইতে আরম্ভ করিয়া লেনা নদীর তীর দিয়া ক্রমশঃ অগ্রসর হইয়া উত্তর আমেরিকার রকি পর্ব্বতের উত্তর অংশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। পশ্চিমে গন্ধমাদন পর্ব্বত। এই পর্ব্বত উরল পর্ব্বত হইতে আরম্ভ করিয়া গ্রীণল্যাণ্ড পর্য্যন্ত বিস্তৃত। এইরূপে ইলাবৃতবর্ষকে চতুষ্কোণ ও চারিসহস্র যোজন দীর্ঘ বলা হইয়াছে।

এই গ্রীণল্যাণ্ডটি পার্ব্বত্যভূমি ও বহু পর্ব্বতসমাবৃত বলিয়া বর্ত্তমান ভৌগোলিকগণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ইহার পার্শ্বে অনেক স্থানে মালভূমি দৃষ্ট হয়। ইহা দ্বারা এখানে যে একটি পর্ব্বত ছিল তাহার বিশিষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। তাহা ছাড়া



দ্বীপগুলি পর্ব্বতশৃঙ্গেই সৃষ্টি হইতে দেখা যায়। এই স্থানটি দ্বীপসমূহে পরিপূর্ণ।

দীর্ঘাণি তত্র চত্বারি মধ্যমং তদিলাবৃতম্।

(ব্রহ্মাণ্ড ৩৫ অঃ ৩৪ শ্লোক)

অর্থাৎ, সেই সকল বর্ষের মধ্যস্থলে ইলাবৃতবর্ষ চারি সহস্র যোজন দীর্ঘ।

দক্ষিণেন তু নীলস্য নিষধস্যোত্তরেণ তু। ৩৬

উদগায়তো মহাশৈলো মাল্যবান্নাম পর্ব্বতঃ॥ ৩৭

(ব্রহ্মাণ্ড ৩৫ অঃ ৩৬।৩৭ শ্লোক)

অর্থাৎ, নীল পর্ব্বতের দক্ষিণে ও নিষধ পর্ব্বতের উত্তরে মাল্যবান্ পর্ব্বত অবস্থিত।

এইরূপে ইলাবৃতবর্ষ, দক্ষিণে নিষধ, উত্তরে নীল, পূর্ব্বে মাল্যবান্ ও পশ্চিমে গন্ধমাদন পর্ব্বত দ্বারা সীমাবদ্ধ এবং চতুষ্কোণ বলিয়া কথিত হইয়াছে।

ইলাবৃতবর্ষের উত্তরে নীল পর্ব্বত, তাহার উত্তরে রম্যকবর্ষ, বর্ত্তমানে ইহাকে কেনাডা বলে। রম্যকবর্ষের উত্তরে শ্বেত পর্ব্বত। এই পর্ব্বত বর্ত্তমানে ওয়াটশিস্ পর্ব্বত (Watshish mountain) নামে প্রসিদ্ধ। ইহা হড্‌সন্ উপসাগরের পূর্ব্বদিকে লেবিরাডর উপদ্বীপ (Labiador Peninsula) হইতে আরম্ভ করিয়া সুপিরিয়র হ্রদ প্রভৃতি দ্বাদশটি হ্রদের মধ্য দিয়া পশ্চিমদিকে অগ্রসর হইয়াছে। ইহা দ্বারাই রম্যকবর্ষ ও হিরণ্ময়বর্ষ বিভক্ত হইয়াছে।

ইহার পর হিরণ্ময়বর্ষ। এই বর্ষের পরে ধনুকাকার উত্তরকুরুবর্ষ। হিরণ্ময় বর্ষ ও উত্তর কুরুবর্ষের মধ্যে শৃঙ্গবান্ পর্ব্বত অবস্থিত। বর্ত্তমানে হিরণ্ময়বর্ষকে যুক্তরাজ্য (United States) এবং উত্তরকুরুবর্ষকে দক্ষিণ আমেরিকা (South America) বলা হয়।

ভদ্রাশ্বং পূর্ব্বতো মেরোঃ কেতুমালঞ্চ পশ্চিমে।

বর্ষে দ্বে তু মুনিশ্রেষ্ঠ তয়োর্মধ্যে ইলাবৃতম্॥ ২৩

(বিষ্ণু ২য় অং ২য় অঃ ২৩ শ্লোক)

অর্থাৎ, মেরুর পূর্ব্বদিকে ভদ্রাশ্ববর্ষ ও পশ্চিমে কেতুমাল বর্ষ, তাহাদের মধ্যে ইলাবৃতবর্ষ অবস্থিত।

ইহাদ্বারা বুঝা যায়, ইলাবৃতবর্ষের পূর্ব্ব সীমানা মাল্যবান্ পর্ব্বত। তাহার পূর্ব্বদিকে যে ভূভাগ আছে, তাহাই ভদ্রাশ্ব বর্ষ বলিয়া কথিত হইয়াছে। এশিয়া মহাদেশের উত্তরাংশে সাইবিরিয়ায় লেনা নামে একটি নদী আছে। ঐ নদীর পার্শ্ব দিয়া যে পর্ব্বতমালা অবস্থিত, তাহাই মাল্যবান্ পর্ব্বত বলিয়া কথিত হইয়াছে। বর্ত্তমানে কামস্কাট্‌কা ও আমেরিকার অন্তর্গত আলস্কা এই ভদ্রাশ্ববর্ষের অন্তর্গত।

ভদ্রাশ্বে ভগবান্ বিষ্ণুরাস্তে হয়শিরা দ্বিজ। ৫০

(বিষ্ণু ২য় অং ২য় অঃ ৫০ শ্লোক)

অর্থাৎ ভদ্রাশ্ববর্ষে ভগবান্ বিষ্ণু হয়-শিরা রূপে (ঘোড়ার মাথার মত আকৃতি বিশিষ্ট) অবস্থিত আছেন।

মেরুর পশ্চিম সীমানা গন্ধমাদন পর্ব্বত। এই গন্ধমাদন পর্ব্বতকে বর্ত্তমানে উরল পর্ব্বত বলে। তুরস্কের মালভূমিও এই পর্ব্বতের অন্তর্গত। এই পর্ব্বতের পশ্চিম দিক্‌স্থ সমস্ত ভূভাগ কেতুমালবর্ষের অন্তর্গত, অর্থাৎ ইউরোপ, এশিয়া-মাইনর, আরব ও আফ্রিকা এ দেশের অন্তর্গত।

চতুর্থ অধ্যায়

(ইলাবৃত বর্ষ)

হরিবর্ষাৎ পরশ্চৈব মেরোশ্চ তদিলাবৃতম্। ৩১

ইলাবৃত পরং নীলং রম্যকং নাম বিশ্রুতম্॥ ৩২

(ব্রহ্মাণ্ড ৩৫ অঃ ৩১।৩২ শ্লোক)

অর্থাৎ, হরিবর্ষের পরে মেরুসংযুক্ত বর্ষ ইলাবৃতবর্ষ নামে প্রসিদ্ধ। ইলাবৃতের পর নীল পর্ব্বত, পরে রম্যকবর্ষ বলিয়া জানিবে।

দক্ষিণেন তু নীলস্য নিষধস্যোত্তরেণ তু।

উদগায়তো মহাশৈলো মাল্যবান্নাম পর্ব্বতঃ॥

(ব্রহ্মাণ্ড ৩৫ অঃ ৩৬ শ্লোক)

অর্থাৎ, নীল-পর্ব্বতের দক্ষিণে ও নিষধ-পর্ব্বতের উত্তরে মাল্যবান্ পর্ব্বত অবস্থিত।

তস্য প্রতীচ্যাং বিজ্ঞেয়ঃ পর্ব্বতো গন্ধমাদনঃ।

(ব্রহ্মাণ্ড ৩৫ অঃ ৩৮ শ্লো)

অর্থাৎ, তাহার পশ্চিমে গন্ধমাদন পর্ব্বত বলিয়া জানিবে।

পরিমণ্ডলয়োর্মধ্যে মেরোঃ কনকপর্ব্বতঃ।

(ব্রহ্মাণ্ড ৩৫ অঃ ৪৯ শ্লোক)

অর্থাৎ, এই পরিমণ্ডলের মধ্যস্থলে কনকপর্ব্বত মেরু বলিয়া জানিবে।

গ্রীণল্যাণ্ড হইতে আরম্ভ করিয়া আলস্কার রকি পর্ব্বতের উত্তর প্রান্ত পর্য্যন্ত যে পর্ব্বতমালা ছিল, তাহাকে নীলপর্ব্বত বলা হইয়াছে। এখানে কতকগুলি দ্বীপ দেখা যায়,

তাহাদের মধ্যে কতকগুলি পার্ব্বত্য প্রদেশ দৃষ্ট হয়। এই মালভূমি প্রাচীন নীল-পর্ব্বতের অস্তিত্বের সাক্ষ্যদান করিতেছে।

সাইবিরিয়ায় লেনা নদীর পার্শ্ব দিয়া যে পর্ব্বতমালা উত্তর-দক্ষিণ আয়ত দেখা যায়, তাহাই মাল্যবান্ পর্ব্বত বলিয়া কথিত হইয়াছে।

ইহা দ্বারা বুঝা যায়, দক্ষিণে নিষধ পর্ব্বত (আলতাই, সায়ান ও এব্লনই পর্ব্বত), পশ্চিমে গন্ধমাদন পর্ব্বত (উরল পর্ব্বত), উত্তরে নীল পর্ব্বত ও পূর্ব্বে মাল্যবান্ পর্ব্বত অবস্থিত।

এই সীমাবদ্ধ চতুষ্কোণ ভূভাগ ইলাবৃতবর্ষ বলিয়া কথিত হইয়াছে।

দীর্ঘাণি তত্র চত্বারি মধ্যমং তদিলাবৃতম্

(ব্রহ্মাণ্ড ৩৪ অঃ ৩৪ শ্লো)

অর্থাৎ,—উল্লিখিত বর্ষ সকলের মধ্যস্থলে ইলাবৃতবর্ষ। ইহা চারি সহস্র যোজন দীর্ঘ।

এই ইলাবৃতবর্ষের মধ্যস্থলে সুবর্ণপর্ব্বত বা সুমেরু পর্ব্বত অবস্থিত। যথা :—

আনীলনিষধায়ামৌ মাল্যবদ্‌গন্ধমাদনৌ।
তয়োর্মধ্যগতো মেরুঃ কর্ণিকাকারসংস্থিতঃ ॥৩৭

(বিষ্ণু পুঃ ২ অং ২ অঃ ৩৭ শ্লো)

অর্থাৎ—মাল্যবান্ ও গন্ধমাদন পর্ব্বত, নীল ও নিষধ-পর্ব্বত পর্য্যন্ত দীর্ঘ আছে, ইহার মধ্যে 'মেরু' কর্ণিকাকারে অবস্থিত।

চতুর্ব্বর্ণঃ সৌবর্ণশ্চতুরস্র সমুচ্ছ্রিতঃ।
অব্যক্তধাতবঃ সর্ব্বে সমুৎপন্না জলাদয়ঃ ॥৪১

(ব্রহ্মাণ্ড ৩৫ অঃ ৪১ শ্লোক)

এই মেরু চতুষ্কোণ ও চতুর্ব্বর্ণাত্মক, স্বর্ণময় ও অত্যুচ্চ এবং ইহা হইতেই সমুদয় অব্যক্ত ধাতুসকল ও জলাদির উৎপত্তি হইয়াছে।

এই মেরু পর্ব্বতের বিষয় আলোচনা করিব। ইহা চতুষ্কোণ বলিয়া কথিত হইয়াছে। ইহা মণি ও সুবর্ণময় অর্থাৎ ইহা সুবর্ণ ও নানা প্রকার হীরক দ্বারা গঠিত। ইহার পূর্ব্বদিকে শ্বেতশৃঙ্গ, দক্ষিণে রক্তশৃঙ্গ, পশ্চিমে কৃষ্ণশৃঙ্গ ও উত্তরে পীতশৃঙ্গ বিরাজমান অর্থাৎ ইহার চারিদিকে চারি প্রকার হীরক দ্বারা গঠিত।

মণিরত্নময়ং চিত্রং নানাবর্ণপ্রভাযুতং।
অনেকবর্ণনিচয়ং সৌবর্ণমরুণপ্রভম্ ॥৬৯
কান্তং সহস্রপর্ব্বাণং সহস্রোদ্ধৃতকন্দরম্।
সহস্রশতপত্রং তং বিদ্ধি মেরুং নগোত্তমম্ ॥৭০

(ব্রহ্মাণ্ড ৩৫ অঃ ৬৯,৭০ শ্লোক)

অর্থাৎ,—এই পর্ব্বতোত্তম মেরু নানা মণি-রত্ন ও সুবর্ণাদি বিবিধ বর্ণে ভূষিত হইয়া সাতিশয় মনোহর কান্তি ধারণ করিয়াছে। ইহাতে সহস্র সহস্র গ্রন্থি, সহস্রগুণ জলময়-গুহা ও সহস্র সহস্র পত্র বিদ্যমান।

মণিরত্নার্পিতস্তম্ভৈর্মণিচিত্রিতবেদিকৈঃ।
সুবর্ণমণিচিত্রাঢ্যৈস্তথা বিদ্রুমতোরণৈঃ ॥৭১
বিমানযানৈঃ শ্রীমদ্ভিঃ শত সংখ্যোদিবৌকসাম্।
প্রভাদীপিতপর্য্যন্তং মেরুং পর্ব্বণি পর্ব্বণি ॥৭২

(ব্রহ্মাণ্ড পুঃ ৩৫ অঃ ৭১।৭২ শ্লোক)

অর্থাৎ,—এই পর্ব্বতে পর্ব্বে পর্ব্বে মণি-রত্নমণ্ডিত স্তম্ভ, মণি-চিত্রিত বেদিকা, সুবর্ণনির্ম্মিত মণি-রত্নময় তোরণ এবং সুরগণের বহু বিমান-যান শোভমান।

তস্য পর্ব্বসহস্রেষু স্মিন নানাশ্রয়বিভূষিতে।
সর্ব্বদেবনিকায়ানি সন্নিবিষ্টানানেকশঃ ॥৭৩
তমাবসচ্চোর্দ্ধতলে দেবদেবশ্চতুর্ম্মুখঃ।
ব্রহ্মা ব্রহ্মবিদাং শ্রেষ্ঠো বরিষ্ঠস্ত্রিদিবৌকসাম্ ॥৭৪
মহাভবনসম্পূর্ণৈঃ সর্ব্বৈঃ কামফলপ্রদৈঃ।
মহাস্থরসহস্রৈস্তং বিদ্ধ্যনেকসমাকুলম্ ॥৭৫
তত্র ব্রহ্মসভা রম্যা ব্রহ্মর্ষিগণসেবিতা।
নাম্না মনোবতী নাম ত্রিষু লোকেষু বিশ্রুতা ॥৭৬

(ব্রহ্মাণ্ড পুঃ ৩৫ অঃ ৭৩।৭৬ শ্লোক)

অর্থাৎ,—এই মেরুর নানাবর্ণময় পর্ব্ব সমূহে দেবগণের বহু নিবাসস্থান বিরাজমান। সেই বিস্তৃত পর্ব্বতোপরি সর্ব্বকাম-ফলপ্রদ চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা দেবগণের সহিত অবস্থিত রহিয়াছেন। ঐ সকল দেবতাদের আবাসস্থান সুবৃহৎ ও সাতিশয় মনোহর। এই মেরুশৃঙ্গে ত্রিলোকবিখ্যাত ব্রহ্মর্ষিগণ কর্ত্তৃক পূজিত রমণীয় মনোবতী নাম্নী ব্রহ্মসভা বিরাজিতা আছে।

ততশ্চ কৃত্তে রুচিরে তরুণাদিত্যবর্চ্চসি।
মহাগিরিতটে হৈমোত্তুঙ্গকুটৈর্বিচিত্রিতে ॥৮৩
নৈকরত্নপ্রভাব্যাপ্তে মণিতোরণকন্দরে।
মেরৌ সর্ব্বেষু পার্শ্বেষু সমন্তাৎ পরিমণ্ডলে ॥৮৩
ত্রিংশদ্‌যোজনসাহস্রে চক্রবাটে সমোত্তমে।
দশযোজনসাহস্রা চক্রবাটাবতিষ্ঠতা। ॥৮

নাপূর্ব্ব তটসামান্তা নাপি ভূমৌ প্রতিষ্ঠিতা ।
দিগ্‌ ব্যোম সদৃশাকারা স্থিতা সা অমরাবতী ॥৮৫
তিরস্কৃতৈঃ প্রভাভিস্তু সূর্য্যাদ্যৈর্জ্যোতিষাং গণৈঃ ।
উদয়াস্তমনং যান্তি তেষাম্‌পাচলোত্তমাঃ ॥৮৭

(ব্রহ্মাণ্ড পুঃ ৩৫ অঃ ৮৩-৮৭ শ্লোক)

অর্থাৎ,—অনন্তর তাহার চারিপার্শ্বে মণ্ডলরূপে ব্যাপ্ত কৃষ্ণবর্ণ মনোহর অত্যুচ্চ মহাগিরি-তটে বিচিত্র তরুণ-তপন-তুল্য প্রভাসম্পন্ন মনোহর মণি তোরণময় কন্দরশালী বহু রত্ন সমূহের প্রভা দ্বারা সমুজ্জ্বল মেরু-পর্ব্বতের পার্শ্বে ত্রিংশৎ সহস্র যোজন দীর্ঘ দশ সহস্র যোজন আয়ত চক্রবাট-গিরি বিদ্যমান। ঐ তটের অতি উচ্চেও নয় এবং অতি ভূমি সমীপেও নয়, এরূপ দিগাকাশ সদৃশ দর্শনীয় অমরাবতী নগরী প্রতিষ্ঠিত। উহার প্রভাপটলে তিরস্কৃত হইয়া সূর্য্যাদি জ্যোতিষ্কগণ উদয় ও অস্তাচলে গমন করিয়া থাকেন।

এই মেরুপর্ব্বতের চতুর্দ্দিকে নাতিউচ্চ দশসহস্র যোজন প্রশস্ত একটি উপত্যকা আছে। তাহার নাম চক্রবাটগিরি। এই চক্রবাটগিরির উপরে আটজন দিক্‌পালের আটটি নিবাস স্থান বিদ্যমান। উহা পুরী বা সভা নামে প্রসিদ্ধ। মেরুপর্ব্বতের জ্যোতিতে এই চক্রবাটগিরি সর্ব্বদাই আলোকিত থাকে।

এই চক্রবাটগিরির পূর্ব্বদিকে ইন্দ্রের অমরাবতী ও সুধর্ম্মাপুরী অবস্থিত। দক্ষিণ পূর্ব্বদিকে হুতাশনের তেজবতী নাম্নী পুরী; দক্ষিণদিকে বৈবস্বতের সুসংযমা নাম্নী পুরী; দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে বিরূপাক্ষের কৃষ্ণাঙ্গনা নাম্নী পুরী; পশ্চিম দিকে বরুণের শুদ্ধবতী নাম্নী পুরী; বায়ুকোণে বায়ুদেবের গন্ধবতী নাম্নী পুরী; উত্তর দিকে চন্দ্রের মহোদয়া নাম্নী পুরী এবং ঈশানকোণে মহাদেবের যশোবতী নাম্নী পুরী অবস্থিত আছে। (এখানে পুরী শব্দে নগরী বুঝাইতেছে।) তাহার বিস্তৃত বিবরণ অতঃপর আলোচনা করা যাইতেছে।

চক্রবাটগিরি

ততঃ সর্ব্বামরৈঃ পূর্ণং চক্রবাটং প্রভাপরৈঃ ।
দুর্দ্ধর্ষং বলদৃপ্তানাং দৈত্যদানবরক্ষসাম্‌ ॥১
দিব্যৈর্মনোহরৈর্দ্বারৈঃ প্রতোলীশতমণ্ডিতম্‌ ।
তপ্তজাম্বুনদময়ং প্রাংশুপ্রাকারতোরণম্‌ ॥২
নানারত্নবিচিত্রাভির্বিচিত্রৈঃ খচিতং রত্নবান্‌ ।
মহাভবনকোটিভিরনেকাভির্বিভূষিতাম্‌ ॥৩

(ব্রহ্মাণ্ড পুঃ ৩৬ অঃ ১—৩ শ্লোক)

অর্থাৎ, অনন্তর অমরগণ পরিপূরিত চক্রবাটগিরি বলোদ্দীপ্ত দৈত্য, দানব ও রাক্ষসগণেরও দুর্দ্ধর্ষ। উহা দেবগণের মনোহর শত শত দ্বার ও বলভী (ঘরের পাইড) ও প্রতোলী (পথ) দ্বারা মণ্ডিত, প্রতপ্ত জাম্বুনদ কাঞ্চনময় এবং অত্যুচ্চ প্রাচীর ও তোরণে সমন্বিত এবং নানা রত্ন খচিত কোটি কোটি প্রকাণ্ড ভবনে ভূষিত।

তস্যৈবোত্তরপূর্ব্বেঽস্মিন্‌ দিগ্‌দেশে সমবর্ত্তিনি ।
চক্রবাটপরিক্ষিপ্তে নানারত্ন বিভূষিতে ॥
অমরগণাকীর্ণে বিপদক্রমমণ্ডিতে ॥৪
মহাভবনসংকীর্ণা বিমানশত সঙ্কুলা ।
মহাবাপীশতাকীর্ণা দিব্যাদিব্যৈর্বিভূষিতা ॥৫
ত্রিদশানাং মহাযানৈ রূপস্থানগতৈঃ সদা ।
শোভিতা পুষ্করগণৈঃ পতাকাধ্বজমালিনী ॥৬
মহাযক্ষৈর্মহানাগৈর্মহাগন্ধর্ব্বসাধুভিঃ ।
মহাপ্সরোগণৈশ্চৈব মহামুনিগণৈঃ সদা ॥৭
তপঃস্থানাগতৈঃ সিদ্ধৈরাকীর্ণা বিবিধাশ্রমা ।
পুরন্দরপুরী রম্যা সমৃদ্ধাপ্যমরাবতী ॥৮

(ব্রহ্মাণ্ড পুঃ ৩৬ অঃ ৪—৮ শ্লোক)

অর্থাৎ, উহার পূর্ব্বদিকে উত্তরাংশে বিবিধ রত্নে রঞ্জিত, মনোজ্ঞ দর্শন অমরগণে পূরিত ও মনোহর তরুনিচয়ে আকীর্ণ, তথায় চক্রবাটের সমীপে মনোহর অমরাবতী নাম্নী পুরন্দর-পুরী অবস্থিত। ঐ পুরী নানা-রত্ন-নির্ম্মিত সুবৃহৎ ভবন গণে পরিব্যাপ্ত, শত শত সুবৃহৎ বাপীসমূহ দ্বারা পরিশোভিত এবং ভবন পর্য্যন্ত ভূমিস্থিত দেবযান সমূহ দ্বারা সুশোভিত, মনোহর পদ্মসমূহে শোভান্বিত, বিবিধ ধ্বজ-পতাকায় উচ্ছ্রিত এবং যক্ষ, নাগ, গন্ধর্ব্ব, অপ্সরাগণ, সাধু-মুনি ও তপস্যা স্থান হইতে আগত সিদ্ধগণ দ্বারা আকীর্ণ, বহু আশ্রমে পরিপূর্ণ, সমৃদ্ধিশালিনী পুরন্দরের রমণীয় অমরাবতী নাম্নী পুরী অবস্থিত।

মধ্যে তস্য মহাপুর্য্যাঃ পরমা ক্ষয়বেদিকা ।
সুধাবগাহা দেবানাং কর্ত্তার্থাক মহাত্মনাম্‌ ॥৯
প্রাগুক্তোঽর্ণনির্য্যাহা হেমজালপরিষ্কৃতা ।
বৈকন্তকসহস্রৈস্তু সর্ব্বরত্নৈর্বিভূষিতা ॥১০
সন্তচিত্রমহাকোষা চিত্রতোরণবেদিকা ।
মহর্দ্ধিযুক্তগোপেতৈঃ পুরিষ্ঠৈর্মানবৈঃ ॥১১
ঘণ্টাপতিতসংস্থিতা বিচিত্রকটকোজ্জ্বলা ।
মনোজ্ঞস্রগ্‌দামলা বায়ুনা কিঙ্কিণীরিতা ॥১২
কনকোজ্জ্বলকপাটিভির্ভাস্বরালোকিতোজ্জ্বলা ।
পারিজাতকপুষ্পাণাময়গন্ধৈর্বিভূষিতা ॥১৩



শক্তিমান্ প্রতিবেশী মাঝে থাইল্যাণ্ড

রুদ্রৈর্মরুদ্ভির্বসুভিরাদিত্যপক্ষগণবৈঃ ।
পিতৃভির্দেবগন্ধর্বৈরপ্সরোভির্মহোরগৈঃ ॥১৪
সাধ্যৈশ্চ ঋষিসংঘৈশ্চ নিত্যৈর্নিত্যনিষেবিতা ।
ভূত্যা পরময়া যুক্তা দ্যুতিমদ্ভিঃ সমাবৃতা ॥১৫
মহেন্দ্রস্য সভা রম্যা সুধর্মালোকবিশ্রুতা ।
তত্র সর্বগণা দেবাশ্চতুর্দিক্ষু চ তে তথা ।
সমস্তাৎ তেজসাং রাশির্দেবানাং তত্র কীর্ত্যতে ॥১৬
তত্রাস্তে শ্রীপতিঃ শ্রীমান্ সহস্রাক্ষঃ পুরন্দরঃ ।
উপাস্যমানস্ত্রিদশৈর্মহাযোগৈঃ সুরর্ষিভিঃ ॥১৭
তত্র লোকপতেঃস্থান মার্চিতসমবর্চসঃ ।
মহেন্দ্রস্য মহারাজঃ সর্বসিদ্ধৈর্নমস্কৃতম্ ॥১৮
ঐন্দ্রলোকং লোকস্য খ্যাত্যা পরময়া যুতম্ ।
দীপ্যতে অমরশ্রেষ্ঠৈস্ত্রিদশৈর্নিত্যসেবিতম্ ॥১৯

(ব্রহ্মাণ্ড পুঃ ৩৯ অঃ ৯—১৯ শ্লোক)

অর্থাৎ, ঐ মহাপুরীর (অমরাবতীর) মধ্যস্থলে মহেন্দ্রের সুধর্ম্মা নাম্নী সভা প্রতিষ্ঠিত। ঐ সভায় দেবগণ ও মহাত্মা ঋষিগণ সুখে উপবেশন করিয়া থাকেন। উহার প্রান্তভাগে তোরণ ও দ্বার সকল শোভমান। বহু রত্নময় সহস্র সহস্র স্তম্ভ ঐ সভার ছাদ সকল ধারণ করিয়া আছে। সভার তলভাগ বিবিধ রত্নে চিত্রিত, তাহার উপর মনোহর তোরণ-বেদিকা বিরাজিত। তাহার উপরিভাগ মহামূল্য রত্নখচিত স্বর্ণ আস্তরণে ও আসনে পরিবৃত। উহা বিচিত্র গুণবন্ধ রত্নসমূহ ও বিচিত্র রত্নবলয়ে সমুজ্জ্বল। ঐ সভা বহুতর মনোহর পুষ্পমাল্য পরিশোভিত। ঐ মাল্য সকল বায়ুদ্বারা ঈষৎ আন্দোলিত হইতেছে। পারিজাত সমূহে বিরচিত লম্বমান মালা সকল উহার সুষমা বিস্তার করিতেছে। ঐ সভায় দ্যুতিমান্ রুদ্র, মরুৎ, বসু, আদিত্য, পক্ষীন্দ্র, পিতৃ, দেবতা, গন্ধর্ব্ব, অপ্সরা, মহোরগ, সাধ্য ও ঋষিগণ এবং ব্রহ্মা নিয়ত অবস্থান করিয়া থাকেন। সর্ব্ব দেবতার অধিষ্ঠান বলিয়াই এখানে দেবতেজের সমষ্টি আছে, এইরূপ কীর্ত্তিত হইয়া থাকে। উক্ত সভায় শ্রীমান্ শ্রীপতি পুরন্দর দেব, দেবর্ষি ও দেবগণ দ্বারা উপাসিত হইয়া অবস্থান করেন। লোকপতি ইন্দ্রের এই আদিত্যসম প্রভাযুক্ত স্থান সিদ্ধগণ কর্ত্তৃক পূজিত হইয়া থাকেন। দেবরাজের এই নিবাসস্থান বহুবিধ ঐশ্বর্য্য ও দেবশ্রেষ্ঠগণ দ্বারা সতত্তই সাতিশয় সুশোভিত।

হুতাশনের তেজোবতী সভা

দ্বিতীয়েঽপ্যন্তরতটে দেশো বৈ পূর্বদক্ষিণে ।
নানাধাতুশতৈশ্চিত্রৈঃ সুরম্যমতিতেজসম্ ॥২০
নৈকরত্নাঞ্চিততলমনেকস্তম্ভসংযুতম্ ।
জাম্বূনদকৃতোদ্যানং নানারত্নসুবেদিকম্ ॥২১
কূটাগারৈর্বিনিক্ষিপ্তমনেকৈর্ভবনোত্তমঃ ।
মহাবিমানঃ (প্রথিতঃ) ভাস্করং জাতবেদসম্ ॥২২
সা হি তেজোবতী নাম হুতাশস্য মহাসভা ।
সাক্ষাত্তত্র সুরশ্রেষ্ঠঃ সর্বদেবমুখোঽনলঃ ॥২৩
শিখাশতসহস্রাঢ্যো জ্বালামালী বিভাবসুঃ ॥২৪

(ব্রহ্মাণ্ড ৩৯অঃ ২০-২৪ শ্লোক)

অর্থাৎ, পূর্ব্বোল্লিখিত ব্রহ্ম সভার পূর্ব্ব-দক্ষিণাংশে উচ্চতর দ্বিতীয় তটে নানা রত্নময় একটি উদ্যান বিদ্যমান আছে। এই উদ্যান বিবিধ ধাতু চিত্রিত দীপ্তিমান্ মনোহর অনেক স্তম্ভ বিশিষ্ট, জাম্বুনদ স্বর্ণে নির্ম্মিত। ইহার নিম্নভাগ বহুবিধ রত্ন নির্ম্মিত বেদীদ্বারা পরিশোভিত। ঐ উদ্যানে এক অত্যুৎকৃষ্ট মহামণ্ডপ আছে, ইহা সূর্য্যের ন্যায় দীপ্তি সম্পন্ন। এখানে প্রভাশালী অনলদেব অবস্থান করেন। এই মণ্ডপেই হুতাশনের তেজবতী নাম্নী মহাসভা প্রতিষ্ঠিতা। এই সভাতে সর্ব্বদেবময় জ্বালামালী, শত শত শিখাধর দেবশ্রেষ্ঠ হুতাশন দেব সর্ব্বদা বিরাজমান। (ইহা একটি আগ্নেয়গিরি)

তৃতীয়েঽপ্যন্তরতটে এবমেব মহাসভা ।
বৈবস্বতস্য বিজ্ঞেয়া লোকে খ্যাতা সুসংযমা ॥২৮
তথা চতুর্থদিগ্দেশে নৈঋতাধিপতেঃ সভা ।
নাম্না কৃষ্ণাঙ্গনা নাম বিরূপাক্ষস্য ধীমতঃ ॥২৯
পঞ্চমেঽপ্যন্তরতটে এবমেব মহাসভা ।
বৈবস্বতস্য বিজ্ঞেয়া নাম্না শুদ্ধবতী সতী ॥৩০
উদকাধিপতেঃ খ্যাতা বরুণস্য মহাত্মনঃ ।
পরোত্তরে তথা দেশে ষষ্ঠেঽন্তরতটে শিবে ॥৩১
বায়োর্গন্ধবতী নাম সভা সর্বগুণোত্তমা ।
সপ্তমেঽপ্যন্তরতটে নক্ষত্রাধিপতেঃ সভা ॥৩২
নাম্না মহোদয়া নাম শুদ্ধবৈদূর্যবেদিকা ।
তথাষ্টমেঽন্তরতটে ঈশানস্য মহাত্মনঃ ॥৩৩
যশোবতী নাম সভা তপ্তকাঞ্চনসুপ্রভা ।
মহাবিমানান্যেতানি দিক্ষ্বষ্টাসু শুভানি হি ॥৩৪

(ব্রহ্মাণ্ড ৩৯ অঃ ২৮-৩৪ শ্লোক)

অর্থাৎ, ইহার দক্ষিণাংশে তৃতীয় তটে বৈবস্বতের (যমের) সুসংযমা নাম্নী এরূপ এক সভা আছে। এই সভা সর্ব্বজ

সুপরিচিত। চতুর্থতটে ইহার দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে ধীমান্ বিরূপাক্ষের কৃষ্ণাঙ্গনা নাম্নী সভা বিদ্যমান। পশ্চিমদিকের তটে মহাত্মা জলাধিপতি বরুণের শুভবতী নাম্নী সভা বিদ্যমান। তৎপর ষষ্ঠ তটে বায়ুকোণে বায়ুদেবের সর্ব্বগুণমণ্ডিতা গন্ধবতী নাম্নী সভা বিরাজমান। সপ্তম তটে উত্তর দিকে নক্ষত্রাধিপতির বৈদূর্য্যমণিমণ্ডিত বেদিকাময় মহোদয়া নাম্নী সভা ও অষ্টম তটে ঈশান কোণে মহাদেবের তপ্তকাঞ্চন প্রভা যশোবতী নাম্নী সভা প্রতিষ্ঠিত। আট দিকে ইন্দ্রাদি দেবের এই আটটি বিমান বিরাজমান।

> অষ্টানাং দেবমুখ্যানামিন্দ্রাদীনাং মহাত্মনাং।
> ঋষিভির্দেবগন্ধর্বৈরপ্সরোভির্মহোরগৈঃ ॥৩৫
>
> সেবিতানি মহাভাগৈরুপস্থানগতৈঃ সদা।
> নাকপৃষ্ঠং দিবং স্বর্গমিতি বৈ পরিপঠ্যতে।
> বেদবেদাঙ্গবিদ্ভির্হি শব্দৈঃ পর্য্যায়বাচকৈঃ ॥৩৬
>
> তদেতৎ সর্ব্বদেবানামধিবাসে কৃতাত্মনাম্।
> দেবলোকে গিরৌ তস্মিন্ সর্ব্বশ্রুতিষু গীয়তে ॥৩৭
>
> নিয়মৈর্বিবিধৈর্যজ্ঞৈর্বহুভির্নিয়তাত্মভিঃ।
> পুণ্যৈঃ কৰ্ম্মভিশ্চ বিবিধৈর্জন্মান্তিশতার্জিতৈঃ।
> প্রাপ্নোতি দেবলোকং তং স স্বর্গ ইতি চোচ্যতে ॥৩৮

(ব্রহ্মাণ্ড পুঃ ৩৬ অঃ ৩৫-৩৮ শ্লোক)

অর্থাৎ, এই সকল ইন্দ্রাদি অষ্ট দেবের পুরী অতি মনোহর। বেদবেদাঙ্গবিৎ ঋষি, গন্ধর্ব্ব, দেব, অপ্সরাঃ ও মহোরগগণ এই সভায় আসিয়া, ইহাকেই স্বর্গ বলিয়া বর্ণনা করিয়া থাকেন। এই কারণ এই দেবলোকপ্রতিম গিরি সকল শ্রুতিতেই বর্ণিত হয়। তাঁহারা স্তুতি বাক্যে বলিয়া থাকেন যে, উক্ত আটটি সভাস্থানই স্বর্গ পদবাচ্য। যাহারা বিবিধ নিয়ম ও জন্মান্তরসঞ্চিত পুণ্য প্রভাবে যজ্ঞাদি এবং অন্যান্য বহুতর পুণ্য কার্য্যে বিশুদ্ধচিত্ত হইয়াছে, তাহারাই এই সর্ব্ব-দেবাধিষ্ঠান পুণ্যময় স্বর্গ লাভ করিয়া থাকে। এই নিমিত্ত এই মেরু স্বর্গ বলিয়া বর্ণিত হইয়া থাকে।

এক্ষণে চক্রবাটগিরির পূর্ব্বদিকে দেবকূট ও জঠর পর্ব্বতের বিষয় আলোচনা করা যাইতেছে।

> জঠরো দেবকূটশ্চ পূর্ব্বস্যাং দিশি পর্ব্বতৌ ॥৮

(ব্রহ্মাণ্ড ৩৭ অঃ ৮ শ্লোক)

অর্থাৎ, জঠর ও দেবকূট পর্ব্বত(যে রুর) পূর্ব্বদিকে অবস্থিত।

মেরুর পূর্ব্বদিকে (অর্থাৎ চক্রবাটগিরির পূর্ব্বদিকে) এই পর্ব্বতদ্বয় অবস্থিত। তন্মধ্যে দক্ষিণে দেবকূট পর্ব্বত ও তাহার উত্তরে জঠর পর্ব্বত অবস্থিত। এই দেবকূটের সাতটি শৃঙ্গ আছে।

> তত্রৈব চাস্য পূর্ব্বস্য কূটেষু চ মহৎসু।
> দক্ষিণেষু বিচিত্রেষু সপ্তস্বপি তু শোভিনঃ ॥৫
> সন্ধ্যাপ্রভাঃ সমুদিতা রুক্মপ্রাকারতোরণাঃ।
> মহাভবনমালাভিঃ শোভিতা দেবনির্ম্মিতাঃ ॥৬
> ত্রিংশদ্‌যোজনবিস্তীর্ণাশ্চত্বারিংশত্তমায়তাঃ।
> সপ্ত গন্ধর্ব্বনগরী নরনারী সমাকুলাঃ ॥৭
> আগ্নেয়া নাম গন্ধর্ব্বা মহাবলপরাক্রমাঃ।
> কুবেরানুচরা দীপ্তাস্তেষাং তে ভবনোত্তমাঃ ॥৮

(ব্রহ্মাণ্ড ৪২ অঃ ৫-৮ শ্লোক)

অর্থাৎ, এই দেবকূটের শীর্ষস্থানীয় দক্ষিণদিক্‌স্থিত উচ্চতম সপ্ত মহাশৃঙ্গে ত্রিশ যোজন বিস্তৃত চল্লিশ যোজন দীর্ঘ সাতটি গন্ধর্ব্বনগরী বিদ্যমান। এই সকল নগরী স্বর্ণময় প্রাচীর ও তোরণে পরিবৃত। এই জন্য ইহাকে দেখিলে সন্ধ্যাকালীন গগনের ন্যায় মনে হয়। এই সকল পুরীই দেবনির্ম্মিত। তাহাতে অনেক পুরুষ ও স্ত্রী বাস করে। উল্লিখিত পুরীতে যে সকল মহাবল-পরাক্রান্ত গন্ধর্ব্ব বাস করে, তাহারা আগ্নেয় নামে প্রসিদ্ধ এবং সকলেই যক্ষরাজ কুবেরের অনুগত।

> তস্য চোত্তরকূটেষু জঠরস্য মহাগিরেঃ।
> হর্ম্ম্যপ্রাসাদবদ্ধঞ্চ উদ্যানবনশোভিতম্ ॥৯
> পুরমাশীবিষৈঃ পূর্ণং মহাপ্রাকারতোরণম্।
> বাদিত্রশতনির্ঘোষৈর্নাদিতং ভবনান্তরম্ ॥১০
> দুষ্প্রসহ্যমমিত্রাণাং ত্রিংশদ্‌যোজনমণ্ডলম্।
> নগরং সৈংহিকেয়ানামুদীর্ণং দেববিদ্বিষাম্ ॥১১

(ব্রহ্মাণ্ড ৪২ অঃ ৯-১১ শ্লোক)

অর্থাৎ, এই সপ্ত পুরীর উত্তর দিকে জঠর নামে গিরি বিরাজমান। তাহাতে বিবিধ প্রাসাদ ও উদ্যান-শোভিত উচ্চতর প্রাচীরাদি পরিবৃত বিষম বিষধরময় ত্রিশ যোজন পরিধি বিশিষ্ট এক নগর বিদ্যমান। এখানে ভবনসমূহ শত বাদিত্র শব্দে প্রতিধ্বনিত হইয়া থাকে। এখানে দেবগণের রিপু সিংহিকাতনয়গণ বাস করে।

দেবকূট পর্ব্বতের পার্শ্বে সুনাগ নামে দ্বিতীয় মর্য্যাদা-পর্ব্বত অবস্থিত। যথা—

> দ্বিতীয়ে দ্বিজশার্দ্দূলা মর্য্যাদাপর্ব্বতে শুভে।
> মহাভবনমালাভির্নানাবর্ণাভিরাবৃতম্ ॥১২
> সুবর্ণমণিচিত্রাভিরনেকাভিরলঙ্কৃতম্।
> বিশালরথ্যং দুর্দ্ধর্ষং দিব্যং প্রমুদিতং শিবম্ ॥১৩
> নরনারীগণাকীর্ণং প্রাংশুপ্রাকারতোরণম্।
> ষষ্টিযোজনবিস্তীর্ণং শতযোজনমায়তম্ ॥১৪
> নগরং কালকেয়ানামসুরাণাং দুরাসদম্।
> দেবকূটতটে রম্যে সন্নিবিষ্টং সুদুর্জ্জয়ম্।
> মহাভ্রচয়সঙ্কাশং সুনাগনামবিশ্রুতম্ ॥১৫

(ব্রহ্মাণ্ড ৪২ অঃ ১২-১৫ শ্লোক)

অর্থাৎ, হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ! দ্বিতীয় মর্য্যাদা-পর্ব্বতে দুরাত্মা কালকেয় অসুরগণের এক পুরী আছে। ঐ পুরী সুবর্ণ ও মণি দ্বারা বিবিধ বর্ণে চিত্রিত, উচ্চতর প্রাচীরাদি-সমাবৃত, বিস্তৃত পথ বিশিষ্ট, বহু নরনারী পরিপূর্ণ, ষষ্টি যোজন বিস্তৃত ও শত যোজন দীর্ঘ; এই পুরী অতি মনোহর, অজেয় এবং দেবকূটের সন্নিহিত। ইহা মেঘের ন্যায় সুনীলবর্ণ ও 'সুনাগ' নামে পরিচিত।

[ক্রমশঃ

রাজসিংহের ভূমিকা

—শ্রীহেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত

(২)

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার একমাত্র ঐতিহাসিক উপন্যাস 'রাজসিংহ' প্রণয়ণে স্বজাতি পক্ষপাতী হিন্দু কি মুসলমান লিখিত বিবরণ নির্ভর করিয়া কিছু রচনা করেন নাই। মাণুচী, বার্ণিয়ার, টেভারণিয়ার, টড্ ও অর্ম্মি লিখিত বিবরণ মূল করিয়াই উপন্যাসখানি রচনা করিয়াছেন। বঙ্কিমচন্দ্র নিজেই লিখিয়াছেন যে, উপন্যাসের রাজসিংহ ও ঔরঙ্গজেব উভয়ই ঐতিহাসিক চরিত্র। আর এতদুভয়ের চরিত্র আলোচনা করিতে সর্ব্বপ্রথমেই রূপনগরের রাজকুমারীর কথার উল্লেখ করিতে হয়।

বঙ্কিম লিখিয়াছেন—রূপনগরীর রাজকুমারীকে অঙ্কলক্ষ্মী করিবার জন্য ঔরংজেব তাহাকে আনিতে দুই সহস্র মোগল সৈন্য পাঠাইয়া দেন। রাজকুমারী এই আহ্বান উপেক্ষা করিয়া চিতোরের রাণা বীরবর রাজসিংহকে একখানি পত্র লিখিয়া পাঠান। এই পত্রে লিখিত হয়—

"যিনি এই পত্র লইয়া যাইতেছেন তিনি আমার গুরুদেব। তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলে জানিতে পারিবেন—আমি রাজপুত কন্যা। রূপনগর অতি ক্ষুদ্র রাজ্য—তথাপি বিক্রমসিংহ সোলাঙ্কি রাজপুত। রাজকন্যা বলিয়া আমি মধ্যদেশ বাসীর কাছে গণ্য, না হই—রাজপুত কন্যা বলিয়া দয়ার পাত্র। কেননা আপনি রাজপুত - রাজপুতজাতির কুলতিলক।

"অনুগ্রহ করিয়া আমার বিপদ শ্রবণ করুন। আমার দুরদৃষ্টক্রমে দিল্লীর বাদশাহ আমার পাণি গ্রহণ করিতে মানস করিয়াছেন। অনতিবিলম্বে তাঁহার সৈন্য, আমাকে দিল্লী লইয়া যাইবার জন্য আসিবে। আমি রাজপুত কন্যা, ক্ষত্রিয় কুলোদ্ভবা - কি প্রকারে তাহাদের দাসী হইব? রাজহংসী হইয়া কেমন করিয়া বক সহচরী হইব? হিমালয় নন্দিনী হইয়া কি প্রকারে পঙ্কিল তড়াগে মিশাইব? রাজকুমারী হইয়া কি প্রকারে তুরকী বর্ব্বরের আজ্ঞাকারিণী হইব? আমি স্থির করিয়াছি এ বিবাহের অগ্রে বিষভোজনে প্রাণত্যাগ করিব।

"প্রয়োজন হইলে প্রাণ বিসর্জ্জন করিব প্রতিজ্ঞা করিয়াছি; কিন্তু তথাপি এই অষ্টাদশ বৎসর বয়সে এ অভিনব জীবন রাখিতে বাসনা হয়। কিন্তু কে এ বিপদে এ জীবন রক্ষা করিবে? আমার পিতার তো কথাই নাই, তাহার এমন কি সাধ্য যে আলমগীরের সঙ্গে বিবাদ করেন? আর যত রাজপুত রাজা—ছোট হউন, বড় হউন, সকলেই বাদশাহের ভৃত্য, সকলেই বাদশাহের ভয়ে কম্পিত-কলেবর।

কেবল আপনি - রাজপুত কুলের একা প্রদীপ—কেবল আপনিই স্বাধীন—কেবল উদয়পুরেশ্বরই বাদশাহের সমকক্ষ। হিন্দুকুলে আর কেহ নাই যে এই বিপন্না বালিকারে রক্ষা করে—আমি আপনার শরণ লইলাম—আপনি কি আমাকে রক্ষা করিবেন না?


জাহাঙ্গীর

"আপনি বলিতে পারেন, 'আমার বাহুতে বল আছে—কিন্তু থাকিলেও আমি তোমার জন্য কেন এত কষ্ট করিব? আমি কেন অপরিচিতা মুখরা কামিনীর জন্য প্রাণি হত্যা করিব? ভীষণ সমরে অবতীর্ণ হইব?'—মহারাজ! সর্ব্বস্ব পণ করিয়া শরণাগতকে রক্ষা করা কি রাজধর্ম্ম নহে? সর্ব্বস্ব পণ করিয়া কুলকামিনীর রক্ষা কি রাজপুতের ধর্ম্ম নহে?"

আর একটু ছিল, সেটী অন্য হাতের লেখা। সেটী এই ভাবের ছিল—

"আর আমি এই বিপদে পড়িয়া পণ করিয়াছি যে, যে বীর আমাকে মোগল হস্ত হইতে রক্ষা করিবেন, তিনি যদি রাজপুত হয়েন, আর যদি আমাকে যথাশাস্ত্র গ্রহণ করেন, তবে আমি তাঁহার দাসী হইব। হে বীরশ্রেষ্ঠ! যুদ্ধে স্ত্রী লাভ বীরের ধর্ম্ম ;............আপনি কি বীরধর্ম্মে পরাঙ্মুখ হইবেন?"

পত্র পাইয়াই তৎক্ষণাৎ রাজসিংহ শরণাগতকে রক্ষা

করিতেই কৃতসংকল্প হইলেন। মুষ্টিমেয় সৈন্য লইয়া দুই সহস্র মোগল সৈন্যের সম্মুখীন হইতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হইলেন। জাতিবর্গকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন।

"বেলা হইয়াছে, সকলেরই ক্ষুধা-তৃষ্ণা পাইয়াছে। কিন্তু আজ উদয়পুরে গিয়া ক্ষুধা-তৃষ্ণা নিবারণ করা আমাদের অদৃষ্টে নাই। এই পার্ব্বত্য পথে আবার আমাদিগকে ফিরিয়া যাইতে হইবে। একটা ক্ষুদ্র লড়াই জুটিয়াছে—লড়াইয়ে যাহার সাধ থাকে, আমার সঙ্গে আইস—আমি এই পর্ব্বত পুনরারোহণ করিব। যাহার সাধ না থাকে, উদয়পুরে ফিরিয়া যাও।"

এখন প্রশ্ন এই যে—এই পত্র ও উপরোক্ত যুদ্ধের কথা কি প্রকৃত,—না বঙ্কিমের স্বকপোল-কল্পিত?

এই চিঠি সম্বন্ধে অথবা রূপনগরের রাজকুমারীর ব্যাপারে স্যার যদুনাথ তাঁহার "History of Aurangzeb" এ কিছুই উল্লেখ করেন নাই। অবশ্য বঙ্কিমচন্দ্র চঞ্চলকুমারীর চিঠিখানি ও রূপনগরের রাজকুমারীর কথা টডের Annals of Rajasthan হইতেই সংগ্রহ করিয়াছেন।

স্যার যদুনাথ টডের ত্রুটী দেখাইয়া উক্ত ইতিহাসে এ ··· কোন আলোচনাও করেন নাই। মহামতি টড লিখিয়াছেন যে,—"

"The Mogul demanded the hand of the Princess of *Rupnagore*, a *junior branch of* the Marwar House, and sent with the demand (a compliance with which was contemplated as certain) a cortege of two thousand horse to escort the fair to court. But the haughty Rajpootni either indignant at such precipitation or charmed with the gallantry of Rana who had evinced his devotion to the fair by measuring his sword with the head of her house rejected with disdain the proferred alliance and justified by brilliant precedents in the romantic history of the nation she entrusted her cause to the arm of the Chief of the Rajput race offering herself as the reward of protection. The family priest (her preceptor) deemed his office honoured by being the messenger of her wishes and the billet he conveyed is incorporated in the memorial of his reign. "Is the swan to be the mate of the stork, a Rajpootni pure in blood to be the wife to the monkey-faced barbarian? Concluding with a threat of self-destruction, if not saved from dishonour. This appeal with other powerful notices was seized on with the avidity by the Rana as a pretext to throw away the scabbard in order to illustrate the opening of a warfare in which he determined to put all to the hazard in defence of his country and his faith. The issue as an omen of success to his war like and superstitious vassalage. With a chosen land he rapidly passed the foot of the Aravali and appeared before Roopnagore, cut up the Imperial guard and bore off the prize to his capital. The daring act was applauded by all who bore the name of the Rajput and his chiefs with joy gathered their relations around the "red standard to protect the queen so gallantly achieved.

টড্ যাহা লিখিয়াছেন, বঙ্কিমও এই বিষয়ে তাহারই অনুবর্ত্তী হইয়াছেন। যে-সমস্ত মোগল সৈন্য চঞ্চলকুমারীকে লইতে আসিয়াছিল, মবারক ছিলেন তাহাদের সেনাপতি। আর রাজসিংহ ডাকাত মাণিক লালকে এক বিশ্বস্ত অনুচরে পরিবর্ত্তিত করিয়া লইলেন। উভয় পক্ষে খুব যুদ্ধ আরম্ভ হইল। রাজসিংহ পর্ব্বত শিখর হইতে সব দেখিতে লাগিলেন। যতক্ষণ মোগলেরা ক্ষুদ্রপথে একে একে প্রবেশ করিতেছিল, ততক্ষণ কাহাকেও কিছু বলিলেন না। পরে তাহারা রন্ধ্রপথ মধ্যে নিবদ্ধ হইলে পঞ্চাশত অশ্বারোহী রাজপুত লইয়া, বজ্রের ন্যায় ঊর্দ্ধ হইতে তাহাদের উপর পড়িয়া তাহাদের নিহত করিতে লাগিলেন। সহসা উপর হইতে আক্রান্ত হইয়া মোগলেরা বিশৃঙ্খল হইয়া গেল। তাহাদের মধ্যে অধিকাংশ এই ভয়ঙ্কর রণে প্রাণত্যাগ করিল। উপর হইতে ছুটিয়া আসিয়া অশ্ব সহিত মোগল সওয়ারগণের উপর পড়িল—নীচে যাহারা ছিল, তাহারা চাপেই মরিল। পাঁচশত সওয়ার মাত্র এড়াইল। মবারক তাহাদের লইয়া ফিরিলেন।

আবার যুদ্ধ হইল। সেখানেও রাজপুতেরা জলপ্রবাহবৎ মোগল সেনার উপর পড়ে, মোগলেরাও 'আল্লা-হো-আকবর' শব্দ করিয়া তাহাদের প্রতিরোধ করিতে উদ্যত হয়। ভয়ানক যুদ্ধ হইল, রাজসিংহ প্রাণতুচ্ছ করিয়া যুদ্ধ করিলেন

এবং পরে মোগল সেনা পরাভূত করিয়া চঞ্চলকুমারীকে লইয়া মেবারে উপস্থিত হইলেন।

অতএব দেখিতেছি যে, রূপনগরের রাজকুমারীর তেজস্বিতা, রাজসিংহের নিকট তাঁহার পত্র লিখিয়া সাহায্য প্রার্থনা প্রভৃতি বিষয় ইতিহাস কথিত হইলেও স্যার যদুনাথ তাহার 'হিষ্টিতে' কিছু লিখেন নাই। কিন্তু বহুদিন পরে রাজসিংহের ভূমিকায় 'বীরবিনোদ' হইতে উদ্ধৃত করিয়া তিনি স্বীকার করিয়াছেন যে, বঙ্কিম প্রদত্ত এই আখ্যান সত্য। বীরবিনোদে আছে যে, ঔরঙ্গজেব রূপনগরের কর্ত্তা চারুমতীকে বিবাহ করিবার দাবী করিয়া তাঁহাকে আনিবার জন্য সৈন্য পাঠাইলে, চারুমতীর নির্দ্দেশানুসারে রাজসিংহ সদলবলে রূপনগরে উপস্থিত হইয়া তাহাকে বিবাহ করেন। ঔরঙ্গজেব এই ঔদ্ধত্যের কৈফিয়ৎ দাবী করিলে রাজসিংহ তাঁহাকে লিখিয়া পাঠান—

"আমি যে বাদশাহের অনুমতি না লইয়া বিবাহের জন্য কিশনগড়ে গিয়াছিলাম, তাহাতে বাদশাহের প্রতি ঔদ্ধত্য দেখান হইয়াছে এরূপ আপনি লিখিয়াছেন। কিন্তু রাজপুতের সঙ্গে রাজপুতের সম্বন্ধ বহুদিন হইতে চলিয়া আসিতেছে, ইহাতে যে কোন নিষেধাজ্ঞা হইবে এরূপ আমি কল্পনা করি নাই। তাই বাদশাহের কোন অনুমতি লওয়া নিষ্প্রয়োজনীয় মনে করিয়াছি, আর বরানুগমনের সময় রাজপুতগণ কর্ত্তৃক বাদশাহী রাজ্যে তো কোন উপদ্রব হয় নাই।"

এই চারুমতীই বঙ্কিমচন্দ্রের চঞ্চলকুমারী। সুতরাং নাম ঠিক না হইলেও চঞ্চলকুমারীর ব্যাপার যে ইতিহাস-অনুমোদিত, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। তবে সেনাপতির নাম যে মবারক ছিল, তাহা ইতিহাসে নাই।

এই ঘটনায় ঔরঙ্গজেব যে খুবই ক্রুদ্ধ হইয়া রাণার এই উদ্ধত কার্য্যের জন্য নিজ অপমানের প্রতিশোধ লইতে একটুও ত্রুটি করিবেন না, তাহা সহজেই অনুমেয়। রাণার সহিত যুদ্ধেরও ইহাই মুখ্য কারণ। কিন্তু রাজদরবারের বেতনভোগী ইতিহাস বিশারদগণ এই ব্যাপারের উল্লেখও করেন নাই। কিরূপে করিবেন? ইহাতে যে তাহাদের প্রভু শাহান শা বাদশাহের অপমানের কথা সূচিত হয়। কিন্তু টড্ ইহা প্রকাশ না করিলে ঐ 'বীরবিনোদকে'ও হয় তো বা আমরা উড়াইয়াই দিতাম। যুদ্ধের ইহাই মুখ্য কারণ; এতৎসম্বন্ধে নিরপেক্ষ টড্ সাহেবও প্রকৃত বিবরণই দিয়াছেন।

আসিরী আলমগীরী ও 'হিষ্টি অব ঔরঙ্গজেব' পড়িলে এই গল্পটি উড়াইয়াই দিতে হয়। যাহা হউক, স্যার যদুনাথ বহুদিন পরে স্বীকার করিয়া ভালই করিয়াছেন। ভরসা করি, ঐ হিষ্টির নূতন সংস্করণেও ইহার উল্লেখ করিবেন। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় টড্ সাহেব সর্ব্বপ্রথমে এই কথা লিখিলেও স্যার যদুনাথের কলম হইতে তাঁহার গবেষণা সম্বন্ধে একটা কথাও তো বাহির হইল না। টড্কে উড়াইয়া



ঔরঙ্গজেব

দেওয়ার প্রচেষ্টা একেবারে প্রশংসনীয় নয়। যাহা হউক, বঙ্কিমচন্দ্র অতঃপরের ঘটনা এই ভাবে দিয়াছেন—

"বাদশাহ সৈন্যের পরাজয় ও চঞ্চলা-হরণ সংবাদ দিল্লীতে আসিয়া পৌঁছিল। দিল্লীতে অত্যন্ত কোলাহল পড়িয়া গেল। বাদশাহ রাগে স্বসৈন্যের নেতৃগণের মধ্যে কাহাকেও পদচ্যুত, কাহাকেও বা আবদ্ধ, কাহাকে বা নিহত করিলেন। কিন্তু রাজসিংহকে দণ্ডিত করা বড় দুঃসাধ্য। কেন না, যদিও মেবার ক্ষুদ্র রাজ্য, তথাপি বড় কঠিন ঠাঁই।...দুনিয়ার বাদশাহকে কিল খাইয়া কিছুদিনের জন্য কিল চুরি করিতে হইল।

"কিন্তু ঔরঙ্গজেব কাহারও উপর রাগ সহ্য করিবার লোক নহেন। হিন্দুর অনিষ্ট করিতে তাহার জন্ম। হিন্দুর

অপরাধ বিশেষ অসহ্য। একে হিন্দু মারহাট্টা পুনঃ পুনঃ অপমান করিয়াছে, আবার রাজপুত অপমান করিল। মারহাট্টার বড় কিছু করিতে পারেন নাই, রাজপুতের বিরুদ্ধে হঠাৎ কিছু করিতে পারিতেছেন না। অথচ বিষ উদ্গিরণ করিতে হইবে। অতএব রাজসিংহের অপরাধে সমস্ত হিন্দু জাতির পীড়নই অভিপ্রেত করিলেন।

"আমরা এখন ইন্‌কাম ট্যাক্সকে অসহ্য মনে করি, তাহার অধিক অসহ্য একটা ট্যাক্স মুসলমানী আমলে ছিল। তাহার অধিক অসহ্য—কেন না, এই টেক্স মুসলমানকে দিতে হইত না, কেবল হিন্দুকেই দিতে হইত। ইহার নাম জেজিয়া। পরম রাজনীতিজ্ঞ আকবর বাদশাহ ইহার অনিষ্টকারিতা বুঝিয়া, ইহা উঠাইয়া দিয়াছিলেন। সেই অবধি ইহা বন্ধ ছিল। একণে হিন্দুদ্বেষী ঔরঙ্গজেব তাহা পুনর্ব্বার স্থাপন করিয়া হিন্দুর যন্ত্রণা বাড়াইতে প্রবৃত্ত হইলেন।

"ইতিপূর্ব্বে বাদশাহ, জেজিয়ার পুনরাবির্ভাবের আজ্ঞা প্রচারিত করিয়াছেন। কিন্তু একণে বড় বাড়াবাড়ি আরম্ভ হইল। হিন্দুরা ভীত, অত্যাচারগ্রস্ত, সর্ব্বপীড়িত হইল যুক্তকরে সহস্র সহস্র হিন্দু বাদশাহের নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করিল; কিন্তু ঔরঙ্গজেবের নিকট ক্ষমা ছিলনা। শুক্রবারে যখন বাদশাহ মসজিদে ঈশ্বরাধনায় যাইতেন, তখন লক্ষ লক্ষ হিন্দু সমবেত হইয়া তাঁহার নিকট রোদন করিতে লাগিল। দুনিয়ার বাদশাহ দ্বিতীয় হিরণ্যকশিপুর মত আজ্ঞা দিলেন, হস্তীগুলা পদতলে ইহাদিগকে দলিত করুক। সেই বিষম জনমর্দ্দ হস্তীপদতলে দলিত হইয়া নিবারিত হইল।"

"ঔরঙ্গজেবের অধীনে ভারতবর্ষ জেজিয়া দিল। ব্রহ্মপুত্র হইতে সিন্ধু তীর পর্য্যন্ত হিন্দুর দেবপ্রতিমা চূর্ণীকৃত, বহুকালের গগনস্পর্শী দেবমন্দির সকল ভগ্ন ও বিলুপ্ত হইতে লাগিল, তাহার স্থানে মুসলমানের মসজিদ প্রস্তুত হইতে লাগিল। কাশীতে বিশেশ্বরের মন্দির গেল; মথুরার কেশবের মন্দির গেল; বাঙ্গালায় বাঙ্গালীর যাহা কিছু স্থাপত্য-কীর্ত্তি ছিল, চিরকালের জন্য তাহা অন্তর্হিত হইল।

"ঔরঙ্গজেব একণে আজ্ঞা দিলেন যে, রাজপুতনার রাজপুতেরাও জেজিয়া দিবে। রাজপুতনার প্রজা তাঁহার প্রজা নহে, তথাপি হিন্দু বলিয়া তাহাদের উপর এ দণ্ডাজ্ঞা প্রচারিত হইল। রাজপুতেরা প্রথমে কর দিতে অস্বীকৃত হইল। কিন্তু উদয়পুর ভিন্ন সমগ্র রাজপুতেরা কর্ণধারবিহীন নৌকার ন্যায় অচল। জয়পুরের জয়সিংহ—যাঁহার বাহুবল মোগল সাম্রাজ্যের একটী প্রধান অবলম্বন ছিল, তিনি একণে গতায়ু; বিশ্বাসঘাতক বন্ধুহন্তা ঔরঙ্গজেবের কৌশলে বিষপ্রয়োগ দ্বারা তাঁহার মৃত্যু সাধিত হইয়াছিল। তাঁহার বয়ঃপ্রাপ্ত পুত্র দিল্লীতে আবদ্ধ। সুতরাং জয়পুর জেজিয়া দিল। যোধপুরের বিধবা রাণী জেজিয়া দিলেন না বটে, কিন্তু তৎপরিবর্ত্তে রাজ্যের কিয়দংশ ছাড়িয়া দিলেন।

"রাজসিংহ জেজিয়া দিলেন না। সর্ব্বস্ব পণ করিলেন—কিছুতেই কর দিবেন না; জেজিয়া সম্বন্ধে ঔরঙ্গজেবকে একখানি পত্র লিখিলেন। পত্রখানি বাদশাহের ক্রোধানলে ঘৃতাহুতি দিল।"

এই পত্রখানি সম্বন্ধে বঙ্কিমের মতামত গত মাসের 'বঙ্গশ্রী'তে আমরা উদ্ধৃত করিয়াছি। সমগ্র পত্রখানি আগামী বারে উদ্ধৃত করিবার ইচ্ছা রহিল। স্বাধীনতা স্পৃহা, নির্ভীকতা, অপূর্ব্ব তেজস্বিতা পত্রখানির প্রতি ছত্রে ছত্রে প্রতিভাত। এবং তদুপরি ধীরতা এবং প্রকৃত ধর্ম্মবিশ্বাস ইহাতে সম্পূর্ণ দেদীপ্যমান! মূল পত্রখানির ইংরাজী অনুবাদ টড্ সাহেব তাঁহার Annals of Rajputna-তে সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন। তবে টড্ সাহেব,স্যার, উইলিয়াম বাউটন রোজের অনুবাদ গ্রহণ করিয়াছেন। আর সেই অনুবাদ প্রথমে অর্ম্মিতে বাহির হয়—১৭৭৮ খৃষ্টাব্দে, স্যার যদুনাথও আবার অপর পুস্তকে পত্রখানি উদ্ধৃত করিয়াছেন – কিন্তু দুইজন দুইদিক হইতে। টড্ সাহেব রাজপুত বীরের সাহস ও মাহাত্ম্য প্রকটিত করিয়াছেন, আর স্যার যদুনাথ মারহাট্টাবীর শিবাজীর প্রতি চিঠিখানি আরোপ করিয়া তৈলাক্ত মস্তিষ্ক আরও তৈলসিক্ত করিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন।

এই তেজস্বিতা, এই সাহস ও এই ধীরতায়ই রাজসিংহের প্রকৃত চরিত্র দেদীপ্যমান হয়। নতুবা যুদ্ধ তো কত লোকই করে। বাহুবলও অনেকেরই আছে, কিন্তু মনুষ্যত্ব আছে কয় জনের? সেই মনুষ্যত্বই রাজসিংহের ব্যবহারে প্রতিভাত হয়। এমন একদিন ছিল, যখন সমস্ত রাজপুতনা যবন সৈন্য-ভয়ে ভীত, তুর্কীর সঙ্গে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হইতে একান্ত লালায়িত, একা প্রতাপসিংহ আকবরের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়া মনুষ্যত্বের পরিচয় দিয়াছিলেন, সকলে আকবরও সন্ধির

প্রার্থনা করিয়াছিলেন। রাজসিংহও একা ঔরঙ্গজেবের বিপুল বাহিনীর বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া নিজ মনুষ্যত্বের পরিচয় দিলেন। কিন্তু ঐতিহাসিকের অভাবে কয়জন বীর রাজসিংহের বীরত্বের কথা অবগত আছেন?

পত্রখানি পাইয়া বাদশাহ রাজসিংহের উপর আজ্ঞা প্রচার করিলেন জেজিয়া তো দিতে হইবেই, তাহা ছাড়া রাজ্যে গোহত্যা করিতে দিতে হইবে এবং দেবালয় সকল ভাঙ্গিতে হইবে। উপায়ান্তর না দেখিয়া রাজসিংহ যুদ্ধের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। ঔরঙ্গজেবও যুদ্ধের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। এরূপ ভয়ানক যুদ্ধের আয়োজন করিলেন যে, তিনি পূর্ব্বে কখনও এমন আয়োজন করেন নাই।

অতঃপরে যে যুদ্ধ হয় তাহার পরিচয় পরে দিব, কিন্তু জিজ্ঞাস্য এই যে, কেবল হিন্দুর উপরে এই জেজিয়া কর-প্রবর্ত্তন, রাজসিংহ কর্ত্তৃক উহা প্রদান করিতে অস্বীকৃতি এবং ঔরঙ্গজেবের প্রতি রাণার নির্ভীকোক্তি, সম্বন্ধে স্যার যদুনাথ তাঁহার ভূমিকায় একেবারে নীরব রহিয়াছেন কেন? অথচ প্রতাপসিংহের অনুরূপ, বরং ততোধিক বীরত্ব কি ইহাতেই প্রমাণিত হয় না? বিদেশীয় ইতিহাসবেত্তা যেরূপ প্রয়াস ও অধ্যবসায়ে রাজসিংহের চরিত্রের মহত্ত্ব প্রকটিত করিয়াছেন; দেশীয় ইতিহাসজ্ঞ পণ্ডিতপ্রবর নীরবতায়, ঔদাসীন্যে এবং ঘটনা বিকৃতিতে সেই চরিত্রকে সাধারণ মানব-চরিত্রেই পরিণত করিয়া ইতিহাসের উদ্ধারের নামে কেবল রাজসিংহের প্রকৃত বীরত্ব দেখাইতেই শৈথিল্য করেন নাই, পরন্তু বঙ্কিমের প্রতিভাও ম্লান করিয়াছেন! ফলে আজি সত্য-সন্ধ ঐতিহাসিক যীর সত্য ইতিহাস বিবৃত করিয়া একশ্রেণীর দেশবাসীর নিকট অবজ্ঞাত ও তিরস্কৃত হইতেছেন; তাই আজ আবার সত্যপ্রকাশের প্রয়োজন হইয়াছে। কেননা সত্যপ্রকাশই প্রকৃত সমাজ-হিতৈষণা।

উপরোক্ত ঘটনার প্রত্যেকটী ইতিহাস কথিত। আমরা নিঃসন্দেহে প্রমাণ করিব যে, উহা বিন্দুমাত্রও অতিরঞ্জিত বা অত্যুক্তি দোষে দুষ্ট নয়। ডাক্তার মান্থচি বা মাণুচী বলেন—(Vol II p. 234)

"Aurangzeb imposed on the Hindus a poll tax which every one was forced to pay, some more some less. Aurangzeb did this as his treasures had begun to shrink owing to expenditure on his campaigns, secondly to force the Hindus to become Mohamedans. Many who were unable to pay, turned Mohamedans to obtain relief from the insults of the collectors."

অর্থাৎ জেজিয়া কর প্রবর্ত্তনে ঔরঙ্গজেবের দুইটি উদ্দেশ্য ছিল—এক ধনভাণ্ডার পূর্ণ করা, আর দ্বিতীয় অপারগ হিন্দুগণ যেন অত্যাচারে অসহ্য হইয়া মুসলমান ধর্ম্মগ্রহণে বাধ্য হয়।

মাণুচীর বিবরণে ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করিতে বাধ্য করার উদ্দেশ্য স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। দিল্লীর জুম্মামসজিদে নমাজ পড়িতে যাওয়ার সময় সমবেত জনমণ্ডলী বাদশার প্রতি কাতরোক্তি করিয়া জেজিয়ার রেহাই চাহিয়াছিল বটে, কিন্তু তিনি তাহাদিগকে হস্তী-পদতলে মর্দ্দিত করিতে আদেশ দেন। এই হস্তীপদ-মর্দ্দন সম্বন্ধে খাপিখানের অনুদিত কথাই এখানে উদ্ধৃত করিতেছি—Elliot's History of India Vol VII p. 296



শিবাজী

"With the object of curbing the infidels and of distinguishing the land of the faithful from an infidel land the jizya or poll tax was imposed upon the Hindus throughout all the province. Upon the publication of this order the Hindus all round Delhi assembled in vast numbers under the Jharokha of the emperor on the river front of the palace to represent their inability to pay and to pray for the recall of the edict. But the emperor would not listen to their complaints. One day when he went to public prayer in the great mosque on the Sabbath, a vast multitude of Hindus thronged the road from the palace to the mosque with the object of seeking relief. Money-changers and drapers, all kinds of shop-keepers from the mechanics and workmen of all kinds left

off work and business and pressed into the way. Not withstanding orders were given to force the way through as it was impossible for the emperor to reach the mosque. Every moment the crowd increased and the emperor's equipage was brought to a standstill. At length an order was given to bring out the elephants and direct them against the mob. Many fell trodden to death under the feet of the elephants and horses. For some days the Hindus continued to assemble in great numbers for complaints but at last the many submitted to pay the Jizia.

সুতরাং দেখিতেছি, জেজিয়া ব্যাপারে বঙ্কিমচন্দ্র হস্তীর পদমর্দ্দন সম্বন্ধে মোসলমান ইতিহাস রচয়িতা কর্ত্তৃকই সমর্থিত হইয়াছেন। যাহা হউক, উপরোক্ত জেজিয়ার বিরোধী চিঠিখানিই আমাদের প্রধান বক্তব্য বিষয়। এইবার উহা আলোচনা করিব।

লিপির সময় নির্দ্ধারণ

এলফিনষ্টোন বলেন, ১৬৭৭ খৃষ্টাব্দে চিঠিখানি লিখিত হয়। খাপি খাঁ ইহার ঠিক সময় দিতে পারেন নাই। তাঁহার মতে ১৬৭১ হইতে ১৬৮১ সালের মধ্যে উহা লিখিত হয়। চিঠিখানির তারিখ ১৬৭৯ সালের ১২ এপ্রিল। মাসুচি গ্রন্থ সম্পাদক উইলিয়াম আর্ভিনও সেই তারিখই গ্রহণ করিয়াছেন।

মাসুচীর সম্পাদকও বলেন—(II 237)

On the 22nd year (1910 11) a letter came from the Rana (Raj Singha), and his son Kunwar Jaysingh was presented in audience at Ajmere on the 29th Safar (April 11, 1679). The Jizia (Poll tax) was imposed at this time on the 18th Rabi. The Rana's son left for his home. In the 23rd year (1090) H. Zu 1. Hijjut Jan 1980 Hassan Ali Khan was sent against the Rana (Maisiri Alamgiri 174, 175, 187.)

প্রধান আলোচ্য বিষয়, উপরোক্ত চিঠিখানি লিখিয়াছিলেন কে?

বিখ্যাত ইতিহাসবেত্তা কর্ণেল টড্ স্পষ্টাক্ষরে বলেন যে, উদয়পুর হইতে আসল পত্রখানি তাঁহার মুন্সী নকল করিয়াছেন এবং উদয়পুরের সকলেই উহা রাজসিংহের পত্র বলিয়াই বিশ্বাস করেন।* (টড্ ৩০০ পৃষ্ঠা) টড্ নিঃসন্দেহে প্রমাণ করিয়াছেন যে, ঐ পত্রখানি রাণাই লিখিয়াছিলেন।

মানুচীর সম্পাদক Sir William Irvine বলেন, এ পত্র রাণা কর্ত্তৃক লিখিত। মানুচী অবশ্য এই পত্রখানির সম্বন্ধে কিছু বলেন নাই, তবে এই জাতীয় একখানি পত্রের সম্বন্ধে তাঁহার ইঙ্গিত আছে। মানুচী বলেন যে, ঔরঙ্গজেব রাণার নিকট নিম্নলিখিত দাবী করিয়া পাঠান :—

(১) রাণার কন্যা ঔরঙ্গজেবকে দিতে হইবে। The first demand was for his daughter in marriage to one of Aurangzeb's sons.

রাণার কোন কন্যা ছিল না, রূপনগরের যে রাজকুমারীকে রাণা নিয়া আসিয়াছিলেন, মানুচী বোধ হয় তাহার সম্বন্ধেই বুঝিয়া থাকিবেন।

(২) রাণা নিজ নামে মুদ্রা প্রচলন করিতে পারিবেন না।

(৩) তাঁহাকে মেবার রাজ্যে গোবধে সম্মতি দিতে হইবে,

(৪) ও মন্দির ধ্বংস করিয়া তাহার স্থানে মসজিদ তৈয়ার করিতে হইবে।

যদি রাণা এই সমস্ত আদেশ পালন না করেন, তবে তিনি যেন রাজ্য ছাড়িয়া চলিয়া যান।

উত্তরে রাণা বলেন,—

"উল্লিখিত কন্যা আমি কিছুতেই প্রত্যর্পণ করিব না, আর আমার পিতৃ সম্পত্তি আমি উত্তরাধিকার সূত্রে পাইয়াছি, সুতরাং ছাড়িবার কোন কারণ দেখিতে পাই না। আবশ্যক হইলে যুদ্ধক্ষেত্রে উপযুক্ত সৈন্য প্রেরণ করা যাইবে।"

এই সমস্ত কথা চিঠিতেই সম্ভব হইয়াছিল; তাই মানুচীর কথায় চিঠির আভাষ আছে।

কিন্তু খাপি খাঁ ও বলেন—জেজিয়া সম্বন্ধে রাণাকে বাদশাহের ফার্ম্মাণ প্রেরণ করা হইলে রাণা চিঠিতে উত্তর করেন। এই চিঠিখানির বিষয়ই যে 'জেজিয়া' তাহাতে সন্দেহ নাই

*মানুচী সম্পাদক উইলিয়াম আর্ভিন বলেন, টড্ এবং অর্মি উভয়েই প্রামাণ্য। আমরাও তাহা মনে করি, তবে এতদুভয়ের মধ্যে যাহার উক্তি অন্যান্য প্রমাণে সমর্থিত হইয়াছে তাহাই নির্ভুল প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছি।

চিঠিখানি সম্বন্ধে আরও বিস্তারিত আলোচনা করিবার পূর্ব্বে পাঠকের অবগতির জন্য কয়েকটী তারিখ বিশেষ প্রয়োজনীয় হইয়াছে। তারিখগুলি অধিকাংশই শিবাজী সম্বন্ধে উল্লিখিত আছে। এইরূপ হওয়ার কি তাৎপর্য্য তাহা পরে বলিব—

১৬৬৬—শিবাজী ও শম্ভাজী সম্রাট সকাশে দিল্লীতে আসেন।

ডিসেম্বর—দিল্লী হইতে রাজগড়ে পলায়ন।

১৬৬৭—জয়পুরের রাজা জয়সিংহের মৃত্যু।

১৬৬৯—শিবাজী সামরিক শাসন প্রবর্ত্তন করিয়া বিজাপুর ও গোলকোণ্ডা রাজ্যকে কর প্রদানে বাধ্য করে।

১৬৭০—শিবাজী ১৫০০০ সৈন্যসহ সুরাট লুণ্ঠন করেন। কর ধার্য্য করিয়া শিবাজী দাক্ষিণাত্যে চলিয়া আসে। লুণ্ঠন দ্রব্য লইয়া মোগল-সৈন্যমধ্য দিয়া চলিয়া আসে।

১৬৭২—মোগল সেনাপতি দিলীর খাঁ শিবাজী কর্ত্তৃক পরাস্ত হন।

১৬৭৬—কর্ণাটক জয়ে অভিযান করেন এবং মোগলের বিরুদ্ধে হায়দ্রাবাদের কুতব সাহের সহিত সন্ধি করেন।

১৬৭৭—শিবাজী কৃষ্ণানদী পার হইয়া কর্ণাটে আসেন এবং জিঞ্জি দুর্গ দখল করেন। শিবাজী পিতার জায়গীর দখল করেন এবং চৌথ ও সর্দ্দেশমুখী আদায় করেন।

মোগল ইহাতে চকিত হন।

১৬৭৮ নভেম্বর—রূপনগরের রাজকুমারীর উদ্ধার।

১০ই ডিসেম্বর, যোধপুরে যশোবন্ত সিংহের মৃত্যু।

১৬৭৯—জানুয়ারী হইতে মার্চ্চ মাড়োয়ারে কিছু কিছু লুঠ তরাজ হয়।

১৬৭৯—২রা এপ্রিল মোগল ও শিবাজীর মধ্যে যুদ্ধ, দিল্লীর বিজাপুর অবরোধ করেন। শিবাজী মোগল রাজকুমারের বিষয় সম্পত্তি লুট করেন।

১৬৭৯, ১১ই এপ্রিল—জেজিয়ার প্রবর্ত্তন ও সম্রাটের সহিত রাণার পুত্র জয়সিংহের সাক্ষাৎ ও প্রত্যাবর্ত্তন।

১৬৭৯, সেপ্টেম্বর—শিবাজীর সহিত ভয়ানক যুদ্ধ, শিবাজী রায়গড়ে যান। শম্ভাজী মোগল দরবারে পালাইয়া গিয়া পিতার প্রাণে গুরুতর ব্যথা দেন।

নভেম্বর ও ডিসেম্বরে বেরার ও ঔরঙ্গাবাদে শিবাজী আবার আক্রমণ ও লুণ্ঠন করেন।

নভেম্বর—ঔরঙ্গজেব আজমীর আসিয়া রাণার বিরুদ্ধে যুদ্ধের তত্ত্বাবধান করেন। সম্রাট-পুত্র মজম দাক্ষিণাত্য হইতে আসেন আর আজম আসেন বাঙ্গালা হইতে। আকবরও আসেন গুজরাট হইতে।

১৬৮০, ফেব্রুয়ারী—যুদ্ধক্ষেত্রে ঔরঙ্গজেব ও বেগমের মেবার-পর্ব্বতের গহ্বরে আবদ্ধ হওয়া, মার্চ্চ পর্য্যন্ত চারি মাস সে যুদ্ধ হয়, তাহাতে ঔরঙ্গজেব বাধ্য হইয়া মেবার হইতে আজমীরে চলিয়া আসেন

৫ই এপ্রিল—রায়গড়ে শিবাজীর মৃত্যু।

১৬৮০—এপ্রিল হইতে মোগলের সঙ্গে রাণা রাজসিংহের দ্বিতীয় বারের যুদ্ধ।


শাহ্জাহান

১৬৮০-৮১—আকবরের বিদ্রোহ, ঔরঙ্গজেবের কৌশল শম্ভুজীর কাছে পলায়ন, রাণার জয় ঘোষণা, সন্ধি, ঔরঙ্গজেবের দাক্ষিণাত্যে গমন ইত্যাদি।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি রাণা রাজসিংহের পূর্ব্বোক্ত চিঠিখানি ১৭৭৮ খৃষ্টাব্দে সর্ব্বপ্রথমে রবার্ট অর্ম্মি তাঁহার Annals এ বাহির করেন। আর এই পত্রখানি Sir William Boughton Rouse কর্ত্তৃক অনূদিত। কিন্তু অর্ম্মি একটী ভুল করিয়াছেন তিনি বলেন, পত্রখানি রাজা যশোবন্ত কর্ত্তৃক লিখিত। রাজা যশোবন্ত সিংহকে খাইবারপাসের গভর্ণর করিয়া পাঠান হয় এবং সেইখানে ১৬৭৮ সালের ১০ই ডিসেম্বর তারিখে জামরুদে তিনি প্রাণত্যাগ করেন। আর জেজিয়া পুনঃপ্রবর্ত্তিত হয় রাজার মৃত্যুর পরে ১৬৭৯ সালের ১২ই এপ্রিল। সুতরাং রাজা যশোবন্ত সিংহ কর্ত্তৃক এই চিঠি রচিত হওয়ার কোন উক্তি সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য বলিয়া মনে করিতে হইবে।

স্যার যদুনাথ ও বলেন, পত্রখানি যশোবন্তের নয়।

অর্ম্মি বলেন, ঔরঙ্গজেব জেজিয়া কর চাহিয়া দূত প্রেরণ

করেন। উত্তরে রাজসিংহ সব দাবী অগ্রাহ্য করিলেন। অর্মি বলেন—

"The Rana remonstrated to gain time which Aurangzeb likewise wanted until his preparations were ready."

রাণাই যে ঐ চিঠিখানিতে remonstrance করিয়াছেন অর্মি তাহা উল্লেখ না করিয়া ভ্রমক্রমে রাজা যশোবন্তের উপরে চিঠিখানি আরোপ করিয়াছেন।

কিন্তু স্যার যদুনাথ পূর্ব্বোক্ত প্রমাণ বিশ্বাস করেন না, তিনি বলেন, ঐ চিঠিপত্র রাজসিংহ কর্ত্তৃক লিখিতই হয় নাই। শিবাজী কর্ত্তৃক লিখিত হইয়াছিল। [History of Aurangzeb III 325-39, Sivaji and his Times 327-333] স্যার যদুনাথ বলেন, শিবাজী এই পত্রখানি লিখিয়াছিলেন ১৬৭৯ খৃষ্টাব্দের শেষ দিকে। আচ্ছা ধরা যাউক, ঐ তারিখই ঠিক। কিন্তু একটা কথা জিজ্ঞাস্য এই যে, মহারাষ্ট্রে জেজিয়া প্রবর্ত্তিত হয় শিবাজীর মৃত্যুর চারি বৎসর পরে।

জেজিয়া যে একই সময়ে সমগ্র ভারতে প্রবর্ত্তিত হয় নাই, তাহাও ঠিক। জেজিয়া মেবারে প্রবর্ত্তিত হয় ১৬৭৯ সালের এপ্রিল মাসে। এক বৎসর পরে সায়েস্তা খাঁন বঙ্গদেশে উহার প্রচলন করেন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, মহারাষ্ট্রে প্রবর্ত্তিত হয় ১৬৮৩ খৃষ্টাব্দে

'জেজিয়া' আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে শিবাজীর এই চিঠি লিখিবার কোন প্রয়োজনই ছিল না, আর যুদ্ধরত শিবাজীর তাহাতে মাথা ঘামাইবার কি দরকার ছিল! তিনি তখন স্বদেশের ব্যাপার লইয়াই ব্যস্ত, রাজপুতনার রাজাদের সম্বন্ধে ভাবিবার তাঁহার দরকার কি? আর শিবাজী ও ঔরঙ্গজেবের সঙ্গে এমন সদ্ভাব ছিলনা যে, এই পত্রখানি লিখিবার কোন কারণ হইতে পারে। যে তালিকাটী আমি পূর্ব্বে দিয়াছি তাহাতে দেখা যাইবে যে, ১৬৭৭ হইতে আরম্ভ করিয়া মৃত্যুর শেষ দিন পর্য্যন্ত শিবাজী ঔরঙ্গজেবের সহিত অবিশ্রান্ত প্রচণ্ড সংগ্রামে লিপ্ত ছিলেন। প্রবল শত্রুর সহিত লিপ্ত হইয়া কে কবে তাহাকে মিঠা-কড়া ঐরূপ পত্র লেখে? বরং ধীরচিত্ত মানুষ কাহারও সহিত যুদ্ধ আরম্ভ হইবার উপক্রম হইলে যুদ্ধ যাহাতে না বাধে নানাভাবে তজ্জন্যই নিজের আত্মসম্মান রাখিয়া মিলনের চেষ্টা করিয়া থাকেন। আর এই সময় রাজসিংহের সঙ্গেই যুদ্ধ লাগিবার উপক্রম হইয়াছিল; কারণ স্যার যদুনাথ নিজেই বলেন, ১৬৭৯ সালের নভেম্বর মাসে রাণার সহিত যুদ্ধ বাধে।

বস্তুতঃ ১৬৬৬ সালে শিবাজী দিল্লী হইতে পলাইয়া আসিবার পরেই মোগলের সহিত যুদ্ধ বাধে, আর সেই যুদ্ধ ১৬৭৯ সালের ২রা এপ্রিল তারিখে ভীষণ আকার ধারণ করে এবং শিবাজীর মৃত্যু পর্য্যন্ত (১৬৮০, ৫ই এপ্রিল), সেই যুদ্ধ কিছুতেই নিবৃত্ত হয় না। অর্থাৎ সমগ্র ১৬৭৯ সাল মোগলের সহিত যুদ্ধ হয় এবং বলিতে কি পুত্র শম্ভাজীর বিদ্রোহ, আর পিতার বিরুদ্ধে পুত্রের মোগলের সহিত যোগদান শিবাজীর প্রাণে এত ব্যথা দেয় যে, তাহাতেই বোধ হয় মোগল বিজয়ী বীরপুরুষের অন্তিম দশা এত শীঘ্র ঘনাইয়া আসে।

শিবাজীর সহিত মোগলের দীর্ঘকালব্যাপী যুদ্ধ এবং বিশেষভাবে সম্বন্ধে আমাদের সিদ্ধান্ত যে ভ্রমসঙ্কুল নয়, তাহার প্রমাণ Grant Duff-র ঐতিহাসিক বিবরণ। তিনি শিবাজী সম্বন্ধে বহু গবেষণা করিয়াছেন কিন্তু জেজিয়া সম্বন্ধে শিবাজী ঔরঙ্গজেবকে কখনও কোনও পত্র লিখিয়াছেন বলিয়া তাক্ কখনও বলেন নাই। শিবাজী ভেঙ্কাজিকে দিয়া মৃত্যুর পূর্ব্বে কয়েকখানি চিঠি লিখাইয়াছিলেন বটে, কিন্তু Grant Duff উহার কোন চিঠিই যে ঔরঙ্গজেবের নিকট লিখিত তাহা কখনও বলেন নাই

কথা হইতে পারে যে, এইরূপ চিঠিখানির সম্বন্ধে Grant Duff বোধ হয় কিছুই জানেন না। কিন্তু একথা ঠিক নয়। Grant Duff একস্থানে বলিতেছেন—

"Raja Jaswant Sing's well-known letter to Auranzeb concerning Jezia or Poll tax on all persons not professing Mohamedanism is preserved by the Raja of Kolapoor.

Grant Duff বলেন—

"কোলাপুর* হয় তো মনেকরিতে পারে যে পত্রখানি শিবাজী লিখিত, বাস্তবিক উহা শিবাজীর নয়, রাজা যশোবন্তের।"

* কোলাপুরের রাজা শিবাজীর বংশধর।

বস্তুতঃ, যদি উহা শিবাজী কর্ত্তৃক লিখিত বলিয়া Grant Duff সন্দেহ করিতেন বা কোন প্রমাণ পাইতেন, তবে নিশ্চয়ই তিনি স্পষ্টভাবে বলিতেন।

Grant Duff-এর পুস্তক বাহির হয় অর্ম্মির পুস্তকের পরে। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, অর্ম্মি, রাজা যশোবন্ত সম্বন্ধে ভুল করিয়াছেন। Grant Duffও সেই ভুলই করিয়াছেন। কিন্তু এখানে যশোবন্ত সিংহের কথা নয়, বস্তুতঃ, এখানে কথা হইতেছে শিবাজী সম্বন্ধে। Grant Duff এর নায়ক (hero) এই পত্র লিখিলে তিনি উহা প্রকাশ করিতে কখনও বিরত হইতেন না, বরং প্রকাশ করিতে গৌরব বোধ করিতেন।

ডাক্তার সুরেন্দ্রনাথ সেনও এই চিঠিখানি বিষয়ে কিছু লেখেন নাই বা কোন প্রমাণ পান নাই।

আর ইহাও ভাবিতে হইবে যে, শিবাজী ছিলেন একজন অসমসাহসিক যোদ্ধা। ১৬৬৬ খৃষ্টাব্দে রাজধানী দিল্লী হইতে ছদ্মবেশে পলাইয়া যাইবার ২।৩ বৎসর মধ্যেই তিনি সামরিক শাসন প্রবর্ত্তিত করেন। তাহারই এক বৎসর মধ্যে ১৬৭০ সালে ১৫০০০ সৈন্য লইয়া সুরাট লুণ্ঠন করেন এবং ঔরঙ্গজেবের বিরুদ্ধে অভিযান করেন। এমন কি নিজেকে তিনি ছত্রপতি বলিয়া অভিহিত করেন; যথাসময়ে প্রজাগণ কর্ত্তৃকও অভিষিক্ত হয়েন। এমন কি তিনি নিজের জননী জিজাবাঈ, গুরু রামদাস স্বামী ও দেবী ভবানী ভিন্ন সংসারে কাহাকেও ভয় করিতেন না। ১৬৭৯ সালের শেষ দিকে যখন উক্ত পত্রখানি ঔরঙ্গজেবকে লেখা হয়, সেই সময়কার—শিবাজী ও মোগলের মধ্যে—ঘোর যুদ্ধের কথা Grant Duff নিম্নলিখিত ভাবে দিয়াছেন—

"Sivaji agreed to attack Dilirkhan (the Mogal general) and advanced slowly within 24miles of the camp and attacked Mogal possessions literally with fire and sword. Dilir did not relinquish the seige and Sivaji continued his depredations from the Bheema to the Godabury. He crossed the latter river, attacked Joulna and although Sultan Muzam was at Aurangabad, plundered the town leisurely for three days, pointing out as was his custom on such occasions particular houses and spots where money and valuables were secreted. Nothing escaped him and no place was a sanctuary; the residence of the peers or Mahomedan saints which Sivaji had hitherto held sacred were on this occasion pillaged. The laden booty was a certain signal that Sivaji would take some route towards Raigarh and a body of 10000 horses having been collected by the prince's order under Runmust Khan, pursued, overtook and attacked Sivaji near Sungumnere on his route to Pulla. A part of the troops were thrown into confusion owing, principally, to the impetuosity of Suntagel Ghore puray; Seedgee Nimbalkar, an officer of distinction, was killed but Sivaji led a desperate charge and by great personal exertion retrieved the day. The Mogul troops were broken and he continued his route but he had not proceeded far when he was again attacked by the Moguls who had been joined by a large reinforcement under Kissen Singh one of the grandsons of Mirza Raja Joy Singh. Shambhuji joined Moguls and caused great pain and disappointment in Sivaji. The son was released but Sivaji again put him to prison. Janardan Paut defeated Dilir Khan and compelled him to retire." [Duff's 1st Volume 289.

Such were the feelings of Sivaji.

এক সময়ে স্যার যদুনাথ বলিয়াছেন যে, চিঠিখানি লিখিত হয় ১৬৭৯ সালের একেবারে শেষ দিকে (Modern Review, 1908 p. 23. line 34) আর হিষ্ট্রি অব ঔরংজেবে তিনিও Grant Duffকে সমর্থন করিয়া স্পষ্টাকরে বলেন যে (p. 225—227) ১৬৭৯ সালের ১৮ আগষ্ট দিলীর যখন ভীমা নদী অতিক্রম করেন, আর বিজাপুর শিবাজীর সহায়তা প্রার্থনা করেন, সেই সময় হইতে সম্পূর্ণ ১৬৭৯ সাল

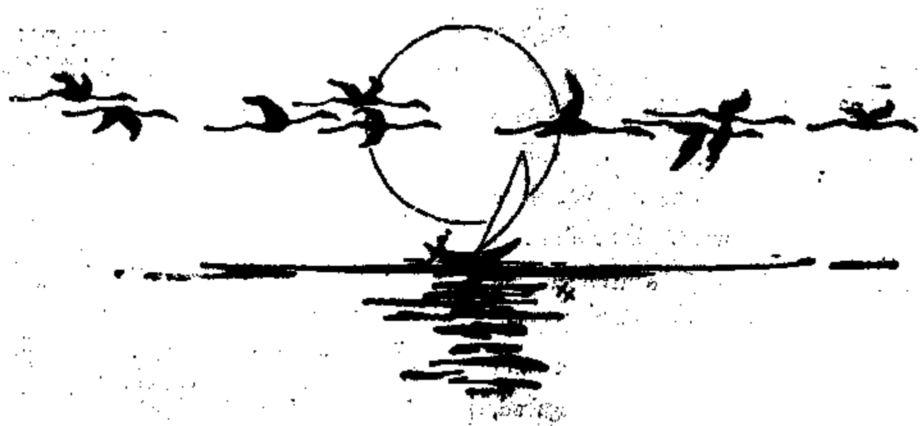
এমন কি মৃত্যুর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত মোগলের সঙ্গে শিবাজীর তুমুল যুদ্ধ হয়। এখন পাঠকই মনে করুন যে, এই সময়ে শিবাজীর দ্বারা ঐরূপ চিঠি রচিত হওয়া সম্পূর্ণ অসম্ভব কিনা। বেগতিক দেখিয়া স্যার যদুনাথ ১৯০৮ সালের (close of the year) "বর্ষ শেষ', হইতে ১৯১৯ সালে তিনি "প্রায় মধ্যভাগে" (about the middle of year) এ সরাইয়া আনিয়াছিলেন। H. A. Vol III p. 224.

এত বড় অধ্যাপক ইচ্ছানুরূপ ঘটনার তারিখ পরিবর্ত্তিত করিবেন, তাহা সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত। মনে হয় যেন এখনও তিনি চিঠিখানির তারিখ সম্বন্ধেই নিশ্চিত হইতে পারেন নাই।

বস্তুতঃ, মোগলের প্রতি এইরূপ মনোভাব ও বিদ্বেষ লইয়াই ছত্রপতি শিবাজী ১৬৮০ খৃষ্টাব্দের ৫ই এপ্রিল তারিখে চিরনিদ্রায় অভিভূত হন। অতএব ১৬৭৯ সালে শিবাজীর এইরূপ চিঠি লিখিবার কোন কারণই হইতে পারে না। রাজসিংহই যুদ্ধ নিবৃত্তির জন্য অনেক চেষ্টা করিয়াছিলেন কি শিবাজী বাদশাহ্‌র ভ্রূকুটি, ক্রোধ, বিদ্বেষ প্রভৃতি কোন ভাবের তোয়াক্কা রাখিতেন না। আর তিনি ইহাও নিশ্চয় জানিতে যে, এইরূপ চিঠি লিখিলেও তাঁহার পূর্ব্বাপর আচরণ বাদশাহ্‌র মনে কিছুতেই বিশ্বাস জন্মাইতে পারিবে না।

এমতাবস্থায় ১৬৭৯ সালে শিবাজী কর্তৃক ঐ অবস্থায় ও সময়ে এরূপ চিঠি লেখা অসম্ভব হওয়ায়—উহা শিবাজীর প্রতি কিছুতেই আরোপিত হইতে পারে না। আমরা বিনীতভাবে বলিতে বাধ্য যে, স্যার যদুনাথ অকারণে চিঠিখানি তাঁহার hero শিবাজীর প্রতি আরোপ করিয়া অনৈতিহাসিক কার্য্য করিয়াছেন।

আগামী বারে আমরা চিঠিখানি উদ্ধৃত করিয়া তাহা হইতে দেখাইব যে, চিঠিখানি রাজসিংহ ভিন্ন অপর কাহারও দ্বারা লিখিত হওয়া একেবারেই অসম্ভব।



"লক্ষ্মীস্ত্বং ধান্যরূপাসি প্রাণিনাং প্রাণদায়িনী"

বঙ্গশ্রী

আশ্বিন—১৩৪৮

৯ম বর্ষ—১ম খণ্ড, ৪র্থ সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ ও আলোচনা

বিচক্ষণ রাজনীতির নমুনা

কিছুদিন অতীত হইল ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী মিঃ চার্চ্চিল ও যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি মিঃ রুজভেল্টের সহিত যে সাক্ষাৎ আলাপ-সম্ভাষণ ও আলোচনা হইয়াছে, তাহার ফলে জগতের ভাবী নববিধানের সুখ-স্বপ্ন আবার যেন প্রতিভাত হইয়া উঠিয়াছে। উভয়ের আলোচনার ফলে সমগ্র জগতে যাহাতে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে, তদভিপ্রায়ে তাঁহাদের অনুষ্ঠিত কয়েকটি রাজনীতি-তত্ত্ব স্থিরীকৃত হইয়াছে। সেগুলি এই :—

(১) কোন রাজ্যই সাম্রাজ্য-সম্প্রসারণ-নীতির অনুবর্ত্তী হইতে পারিবে না।

(২) কোন দেশ বা রাজ্যের ভৌগোলিক পরিবর্ত্তন করা হইবে না।

(৩) জনসাধারণের রুচি ও অভিপ্রায়ানুযায়ী শাসনতন্ত্র গঠন করিতে হইবে।

(৪) সর্ব্বপ্রকার বাণিজ্য ও কাঁচামাল লাভে প্রত্যেক রাজ্যেরই সমান অধিকার ও সুবিধা থাকিবে।

(৫) সমগ্র জাতির মধ্যে এরূপ সহযোগিতা বিদ্যমান থাকিবে, যেন সর্ব্বত্র শ্রমিকসমস্যা বিদূরিত হয় ও প্রত্যেক জাতির অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থার উন্নতি হয়।

(৬) সর্ব্বাঙ্গীণ ও স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠায় সহায়তা করিতে হইবে।

(৭) বিনা বাধায় যাবতীয় মানব মণ্ডলীকে সমুদ্রে গমনাগমনের সুবিধা প্রদান করিতে হইবে।

(৮) সর্ব্বপ্রকারে ক্ষাত্র শক্তি (যুদ্ধবিগ্রহাদির) প্রয়োগ রহিত করিতে হইবে।

কিন্তু দুঃখ এই যে, যাহার উদ্দেশ্যে এত ঘনঘটা, এই সঙ্কল্প, বহু বিজ্ঞাপিত পূর্ব্বোক্ত শান্তি-আমন্ত্রণ, সেই জার্ম্মানী কিন্তু এই নববিধানের পরিকল্পনা একেবারে ভুয়া বলিয়া উপেক্ষণীয়ই মনে করিয়াছে। এমন কি, বার্লিনের রাজনৈতিক মহল উক্ত ঘোষণাপত্রের সমগ্র দফাগুলিরই প্রতিবাদ করিতেছে।

প্রথম ও দ্বিতীয় দফার প্রতিবাদে জার্ম্মানীর অধিবাসীবৃন্দ জিজ্ঞাসু হইয়াছেন যে, ইংলণ্ড ও আমেরিকা যদি এতই শান্তিবাদী ও নীতিপরায়ণ, তবে কোন্ নীতির বলে তাঁহারা গ্রীণল্যাণ্ড ও আইসল্যাণ্ড করায়ত্ত করিয়াছেন, আর সিরিয়া ও ইরাকেই বা আধিপত্য প্রসারের কারণ কি ?

তৃতীয় দফার উত্তরে তাঁহারা বলেন, আচ্ছা, যদি গণতন্ত্র শাসনই তোমাদের একমাত্র অবলম্বনীয় রীতি, আর একতন্ত্র শাসন বিনাশকল্পে যদি প্রকৃতই তোমরা দৃঢ়সঙ্কল্প, তবে

রাশিয়ার বোলশেভিক্ নীতির সহায়তা করিয়া তোমরা রাশিয়ার সহিত সম্মিলিত হইলে কেন, আর সেই একতন্ত্র শাসননীতি গ্রহণে অন্য দেশেরই বা বাধা কি ?

চতুর্থ, পঞ্চম, ষষ্ঠ ও সপ্তম দফার উত্তরে বার্লিন যুক্ত-রাজ্যের নিম্নলিখিত কার্য্যানুষ্ঠানের উল্লেখ করিয়া বলেন—

বাপু হে, 'তোমরা যদি এতই ন্যায়-পরায়ণ ও সমদর্শী,তবে কেন শত্রুর খাদ্যাভাব সৃষ্টি করিতে তোমাদের এত আয়োজন,



মিঃ চার্চ্চিল

কেন এত অক্ষম ঋণগ্রস্তের তালিকা, কেন আমেরিকার এত সমরায়োজন, কেন উহার বিরাট নৌবাহিনী আটলান্টিক ও প্রশান্ত মহাসাগর অধিকার করিয়া রহিয়াছে, আর কেনই বা নৌ-ঘাটি স্থাপনে উহার এত প্রচেষ্টা ?

জার্ম্মানরা আরও বলেন, এই সব কার্য্যাবলীর সহিত ইঙ্গ-মার্কিন আদর্শমালার সঙ্গতি কোথায় ? উহা কেবল উহাদের অর্থহীন প্রলাপ মাত্র।

এতদ্ব্যতীত জার্ম্মানদের অন্যতম অভিযোগ এই যে, এ্যাংলো স্যাক্সন শক্তিদ্বয় যখন অপরাপর জাতির ও কাহার স্বাধীনতা লাভ হইবে আর কাহার তাহা হইবে না, সেই সিদ্ধান্ত করিবার অধিকার ও কাঁচামাল বণ্টনের ক্ষমতা নিজের হাতে রাখিতে চায়, তখন অষ্টম দফায় যে তাহারা আক্রমশক্তির বিলোপ সাধনে প্রয়াসী, সেই দফাটীর তাৎপর্য্য কি সম্পূর্ণই নিরর্থক নয় ? ইহা তো বস্তুতঃ 'নিজের কোলে ঝোল টানা' নীতি ভিন্ন আর কিছুই নয়। সুতরাং জার্ম্মানী এই নীতিতে মাথা ঘামাইতে সম্পূর্ণই নারাজ। নাৎসী রাজনীতির অপর একটী শাখা তো ইহাকে 'জেনেভা মার্কা ভার্সাই শান্তির নব-কলেবর' বলিয়া শ্লেষই করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন "এই শান্তি সংস্থাপনই তো জগতের চিরন্তন অশান্তির প্রধান বীজ, কোথায় ইহার মূলোৎপাটন হইবে, না আবার ইহারই বর্দ্ধিতায়তন নবসংস্করণ, বেশ ব্যবস্থা !"

কিন্তু চার্চ্চিল-রুজভেল্টের ঘোষণাকে জার্ম্মানগণ যে ভাবেই উপেক্ষা ও শ্লেষের চক্ষে দেখুক না কেন, উহা যে মুখ্যতঃ মহদুদ্দেশ্য প্রণোদিত, ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। যুদ্ধবিরতিকল্পে তাঁহাদের এই উদ্যম বস্তুতঃই আন্তরিকতাপূর্ণ। কিন্তু 'চোরা না শোনে ধর্ম্মের কাহিনী' তাই জার্ম্মানগণ ব্রিটিশ রাজনৈতিকগণের যুদ্ধবিরতি সঙ্কল্প কেবল অসার বলিয়াই ধারণা করে নাই, পরন্তু কোন এক পক্ষের 'এস্পার ওস্পার' না হওয়া পর্য্যন্ত কোনরূপে যুদ্ধোদ্যমে বিরত হইবে না বলিয়া দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াছে।

বর্ব্বর নাৎসীগণের এইরূপ মনোবৃত্তি নিতান্তই জঘন্য ও নিন্দার্হ। আমরা তীব্রভাবে ইহার বিরুদ্ধে সর্ব্বদা লেখনী পরিচালিত করিব।

পক্ষান্তরে চার্চ্চিল-রুজভেল্টের রচিত এই শান্তি-স্বপ্নেও আমরা সুখানুভব করিবার মত কিছুই খুঁজিয়া পাই না। বস্তুতঃ উহা বালুর বাঁধ ভিন্ন আর কিছুই নহে। আমাদের মনে হয়, উক্ত রাজনীতিবিশারদ-যুগল যখন উক্ত নীতিমালার খসড়া রচনা করেন, বর্ত্তমান জগতের জটিল সমস্যাগুলি সম্বন্ধে বিস্মৃতি আসিয়া বোধহয় সম্পূর্ণরূপে তাঁহাদিগের চিত্ত অধিকার করিয়া ফেলিয়াছিল। ফলে ঐ আদর্শ লিপিকার কার্য্যকারিতা যে নিরর্থকতাতেই পর্য্যবসিত হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। হায়, তাঁহারা জানেন না যে, আজিকার দিনে সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর সমস্যাই

অন্নসমস্যা। এই ভীষণ অন্নাভাব যে পর্য্যন্ত দূরীভূত না হয়, যে পর্য্যন্ত ইংলণ্ড ও আমেরিকা জীবনধারণের জন্ত যে শস্তের প্রয়োজন তাহা জন্মাইতে সক্ষম হইবে, ততদিন রাজ্য সম্প্রসারণ ও দেশজয় ব্যতীত যে তাহারা জীবনধারণ করিতে একেবারেই অক্ষম হইবে, ইহা কি তাহারা বুঝে না? সুতরাং দেশ জয় ও সম্প্রসারণের বন্ধ হওয়ার কথা না তোলাই ভাল। উহা নিরর্থক পুঁথির বুলি মাত্র।

এইরূপ সাম্রাজ্য বৃদ্ধি ও হ্রাস করিয়া যে ভৌগোলিক পরিবর্ত্তন সর্ব্বদাই সংঘটিত হইতেছে, তাহার নিবারণও কি কথার কথা মাত্র নয়? নিজের দেশে অন্নপ্রাচুর্য্য না থাকিলেই, খাদ্যাভাব অবশ্যম্ভাবী হইলেই, অন্যদেশের প্রতি লোভ করিতে হয়। এই লোভ ও সাম্রাজ্যবৃদ্ধির পাশবিক কল্পনা বিদূরিত করিতেও প্রচুর খাদ্যসংস্থান চাই, প্রচুর শস্তোৎপাদন আবশ্যক। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, ইংলণ্ড ও আমেরিকা কি এ পর্য্যন্ত সেই খাদ্যের সংস্থান করিতে সমর্থ হইয়াছে? যদি না পারিয়া থাকে, কি অদূর ভবিষ্যতে সেইরূপ পারিবার কোন বুদ্ধি খুঁজিয়া না পায়, তবে ঐরূপ নিরর্থক বুলিতে কি সত্যিকার রাজনীতি-বিচক্ষণতার কোনরূপ পরিচয় পাওয়া সম্ভব?

আর বস্তুতঃই কি তাহারা হিংসা-দ্বেষ ও দ্বন্দ্ব-কলহ নিবৃত্ত করিতে সমর্থ হইয়াছে। যে পর্য্যন্ত তাহা না হয়, ঐরূপ যুদ্ধ-বিগ্রহ ও সম্প্রসারণ বৃদ্ধি অবাধে চলিতে থাকিবে। কেহ নিবারণ করিতে পারিবে না।

বস্তুতঃ আমরা দেখিতে পাই, দেশে খাদ্যাভাব বশতই মানুষ বিদেশবাসী হইয়া থাকে। স্বদেশে পেটভরা আহার না পাইলেই তাহার লোলুপ দৃষ্টি গিয়া পড়েবাহিরে। সে মনে করে দেশান্তরে গেলেই বুঝি আহার্য্য মিলিবে। ব্যক্তিগত ব্যাপারে যাহা ঘটে, ব্যক্তির সমষ্টি রাষ্ট্রেরও সেই দশাই উপস্থিত হয়। স্বরাষ্ট্রে খাদ্যলাভে সমর্থ না হইয়া পররাজ্যে তাহার লোলুপ দৃষ্টি অবশ্যম্ভাবী হইয়া পড়ে। ইহাতেই আবশ্যক হয় রাজ্য সম্প্রসারণ, আর তাহারই নামান্তর পররাজ্য হরণ। বস্তুতঃ কি ব্যক্তিবিশেষে, কি রাজ্য সম্বন্ধে, সর্ব্বত্রই এক সমস্যা —সেই ভীষণ অভিশপ্ত অন্ন-সমস্যা।

বাণিজ্য প্রভৃতিতে সর্ব্বরাষ্ট্রের সমানাধিকার দাবীও একটি সমস্যাপ্রসূত। অতএব সমস্যার প্রকৃত সমাধান করিতে হইলে ইহার মূল কি, তাহা বুঝিতে হইবে; আর সেই মূলের উৎপাটন করিয়া না ফেলিলে শত প্রচেষ্টা,—সব আয়োজনই ব্যর্থ হইবে। তাই চার্চ্চিল রুজভেল্টের ঢাকাঢুকি উপায়ে প্রতীকার চেষ্টা আমাদের দৃষ্টিতে নিতান্তই অর্থহীন বলিয়া মনে হয়।

জনসাধারণের অভিপ্রায়ানুযায়ী পূর্ব্বোক্ত কারণে সমুদ্র-পথে অবাধ অধিকার প্রদানও নিরর্থক প্রলাপ বাক্য, আর



প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট

গভর্ণমেন্ট প্রতিকার সঙ্কল্পও হাস্যাস্পদ ভিন্ন আর কিছুই নয়। অন্যদেশ হইতে কিছু গ্রহণ না করিয়া নিজেদের যাহা আছে তাহার সহায়তাই মিতব্যয়িতার সহিত কার্য্য নির্ব্বাহ করিবার শিক্ষালাভ যে পর্য্যন্ত না হইবে, ততদিন পর্য্যন্ত অন্য জাতির গভর্ণমেন্টের কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিবার লোভ কিছুতেই সম্বরণ করা সম্ভব হইবে না।

ব্যবসা-বাণিজ্যে সমানাধিকার? ইহাও বর্ত্তমান অবস্থার কথার কথা মাত্র। যে পর্য্যন্ত সমস্ত জগৎ উহার সমগ্র অধিবাসীর অভাব-অভিযোগ দূর করিতে না সমর্থ হয়, তদবধি

ঐরূপ আশাও মরীচিকায়ই পর্য্যবসিত হইবে। পৃথিবীতে সর্ব্বসমেত ২০২ কোটি লোকের বাস, অথচ পৃথিবীতে উৎপাদিত খাদ্যে এই বিপুল সংখ্যক অধিবাসীদের শতকরা মাত্র ৬০ জনের ভরণপোষণ সম্ভব হইয়া থাকে। স্বভাবতঃই মনে হইতে পারে, খাদ্যাভাবের কারণ ও উর্ব্বরতা শক্তির অভাব বুঝি কোন নৈসর্গিক ত্রুটি-বিচ্যুতির জন্যই হইয়া থাকে, কিন্তু বস্তুতঃ তাহা নহে। এই অভিশাপের জন্য দায়ী আধুনিক বিজ্ঞান ও সভ্যতা। সুতরাং এই অভিশাপের কারণ অপনীত না হওয়া পর্য্যন্ত জাগতিক কোন সমস্যার সমাধানই সম্ভব নহে। আর সর্ব্বাঙ্গীণ শান্তিও কথার কথা মাত্র। পূর্ব্বেই বলিয়াছি রাগ-দ্বেষ, দ্বন্দ্ব-কলহ দূর করিতে না পারিলে আত্মশক্তির উদ্বোধনে কেহ বাধা জন্মাইতে পারিবে না। আর যে পর্য্যন্ত অভাব-অভিযোগ এইভাবে চলিতে থাকিবে, বুভুক্ষিত, অভাবগ্রস্ত মানুষের সংখ্যা বাড়িয়াই চলিবে সেই পর্য্যন্ত দ্বন্দ্বকলহ কেহ বন্ধ করিতে পারিবে না। তাই বলি, অন্নাভাব ও সর্ব্ববিধ সমস্যার অভাব বিমোচন না হইলে রাগ-দ্বেষ, দ্বন্দ্ব-কলহ থাকিয়াই যাইবে। এবং সঙ্গে সঙ্গে যুদ্ধবিগ্রহাদিও অবশ্যম্ভাবী হইবে। সুতরাং আত্মশক্তির বিলোপ কার্য্যে পরিণত করিতে হইলে অন্নাভাব ও সর্ব্ববিধ অভাব দূর করিতে দৃঢ়সঙ্কল্প হওয়া উচিত। নতুবা কেবল লিপিকা রচনায় ও বড় কথার আবৃত্তিতে লাভ কি? ইহা রাজনৈতিক অনভিজ্ঞতা ভিন্ন আর কিছুই নয়।

ঘোষণায় ৫ম দফায় চার্চ্চিল এবং রুজভেল্ট যে শ্রমিক সমস্যা এবং বর্ত্তমানের অর্থ-নৈতিক ও সামাজিক ব্যবস্থা উন্নয়নের প্রস্তাব করিয়াছেন, এক্ষণে আমরা উহার উত্তর দিব। ইতিপূর্ব্বে বহুবার বলিয়াছি, বৃটেন ও আমেরিকার আধুনিক শাসননীতি ত্রুটী-কলঙ্কিত। শাসননীতির আমূল সংশোধন ব্যতীত শাসন বিষয়ক কোন সমস্যারই প্রতিকার হইতে পারে না। এজন্য শাসন প্রতিষ্ঠানে দৈত্যপন্থী, স্বার্থপর, কপট ও মিথ্যাচারী ব্যক্তিদের প্রবেশ নিষিদ্ধ করিতে হইবে। অবশ্য আমরা বলিতে চাই না যে, শাসনভারপ্রাপ্ত বৃটিশ ও আমেরিকান মাত্রেই এবম্বিধ হীন ব্যক্তি। তবে বৃটিশ ও মার্কিন শাসনব্যবস্থা যে ভাবের কাঠামোতে গঠিত, তাহাতে এইরূপ জঘন্য ব্যক্তিদের প্রবেশলাভ যে একেবারেই অসম্ভব নহে, ইহাই আমাদের বক্তব্যের প্রকৃত অর্থ।

৬ষ্ঠ, ৭ম, ও ৮ম দফার আদর্শগুলি যে সকল সমস্যার প্রতিবিধানোদ্দেশ্যে প্রস্তাবিত হইয়াছে, এইবার উহাদের আলোচনা করা যাক। আপাতদৃষ্টিতে মানুষের সহজাত পাশব হৃদয়াবেগকেই ইহাদের অগৌণ মূল কারণ মনে হওয়া স্বাভাবিক, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইহাদের উৎসও মুখ্যতঃ সেই অন্নসমস্যা। পর্য্যাপ্ত খাদ্যের অভাব ঘটিলেই অপরকে বঞ্চিত করিয়া 'ব্যক্তি' ও 'রাষ্ট্র' উহা লাভের জন্য লোলুপ হইয়া উঠে। আর এই লোলুপতার জন্যই অন্তরের অজেয় পাশব-বৃত্তির তাড়নায় মানুষ মানুষকে আঘাত করে; অপরের অবাধ সমুদ্র বিচরণে যথাসাধ্য বাধাপ্রদান করে। কাজেই, এই অন্নসমস্যার পূর্ণ সমাধানের প্রয়োজন সকলের আগে। সঙ্গে সঙ্গে জনসাধারণের অস্বাস্থ্য ও মানসিক অসন্তুষ্টিও দূর করিতে হইবে। নতুবা সর্ব্বাঙ্গীণ কেন, কোন শান্তিপ্রতিষ্ঠার চেষ্টাই সফল হইবে না।

মিঃ চার্চ্চিল ও মিঃ রুজভেল্ট জাগতিক শান্তিপ্রতিষ্ঠার জন্য অনেক কথাই বলিয়াছেন; অথচ সব হইতে সার কথাটির উল্লেখ ভ্রমেও একবার করেন নাই। এই কারণেই আমরা বলিয়া থাকি, বৃটিশ ও মার্কিন রাষ্ট্রনীতি আজ একেবারে নিঃস্ব। সর্ব্বাপেক্ষা দুঃখের কথা 'ভারতের' দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তা হইয়াও তাঁহারা শান্তি প্রতিষ্ঠার প্রকৃত পথ খুঁজিয়া পান নাই, যেরূপে জার্ম্মানীর সমগ্র প্রচেষ্টা, বিষম শত্রুতা, সার্ব্বান্তিক বৈরীতে ব্যর্থ হইবে তাহার কোন উপায়ই তাহাদের দৃষ্টিগোচর হয় নাই। আমাদের বিশ্বাস, এ বিষয়ে প্রকৃত 'ভারতীয়' রাষ্ট্রনীতিকের সাহায্য লইলেই তাঁহারা যথার্থ সুফল ও ফল লাভ করিতে সমর্থ হইবেন। তথাকথিত রাজনীতিকের বক্তৃতায় ভুলিয়া যেন তাঁহারা বিভ্রান্ত না হন।

কিন্তু, কর্ত্তৃপক্ষ এ বিষয়ে সচেতন হইবেন কি? প্রকৃত পন্থা তাঁহারা গ্রহণ করিবেন কি? প্রকৃত রাজনীতিকের সহযোগিতা গ্রহণ করিতে তাঁহারা কুণ্ঠিত হইবেন না তো?

আমরা সেই শুভ সংযোগের প্রতীক্ষাই বসিয়া আছি।

বর্ত্তমান পরিস্থিতিতে বৃটিশ সাম্রাজ্যের ভিত্তি কি উপায়ে সুদৃঢ় হইবে

বিশ্বগ্রাসী যুদ্ধের ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির মধ্যে বৃটিশ সাম্রাজ্য আজ অতি বিপন্ন। অবশ্য ইহার অর্থ এই নয় যে, বৃটিশ সাম্রাজ্যের পতনই অনিবার্য্য। তবে ভ্রান্তনীতি বশতঃ সাম্রাজ্যের যে অপরিহার্য্য বিপদের সম্ভাবনা রহিয়াছে, আমরা তাহারই ইঙ্গিত করিতে চাহিতেছি। বস্তুতঃ বৃটেনের বর্ত্তমান রাষ্ট্রনীতি যে বহু দোষে দুষ্ট, একথা আজ অস্বীকার করিবার আর উপায় নাই। একমাত্র রাষ্ট্রনীতির এই ত্রুটির জন্যই বৃটেনকে গত পঁচিশ বৎসরের মধ্যে পর পর দুইটি বৃহত্তম ও ভীষণতম যুদ্ধে লিপ্ত হইতে হইয়াছে। ইহারই জন্য বৃটেনকে আজ চারিদিক হইতে আঘাতের পর আঘাত সহ্য করিতে হইতেছে, কিন্তু জিজ্ঞাস্য, বৃটিশ সাম্রাজ্যকে এই আঘাত হইতে মুক্ত করিবার উপায় কি? বৃটেনের রাষ্ট্রনীতি-ধুরন্ধরগণ কি নির্দ্ধারণ করিবেন জানি না, তবে আমাদের মতে ধুরন্ধরদের প্রধান ও প্রথম কর্ত্তব্য এই সমুদয় আঘাতের কারণ ও স্বরূপ নির্ণয় করা।

একটু তলাইয়া দেখিলেই বুঝা যাইবে, বৃটেনের উপর প্রতি আঘাতই দুইদিকের—এক ভিতরের, দ্বিতীয় বাহিরের। ভিতরের আঘাত লাগিতেছে কেন্দ্রীয় শক্তির শৈথিল্যে; বাহির হইতে আঘাত হানিতেছে জার্ম্মানী। কিন্তু এই উভয় আঘাতের মূল কারণ একটি—অর্থনৈতিক অভাব। বিশেষজ্ঞগণ জানেন যে, নাৎসী অভিযানের যতই সামরিক বহির্চ্ছটা থাক, বিশ্বের বাণিজ্যকেন্দ্র হইতে বৃটেনকে সরাইয়া দেওয়াই জার্ম্মানীর গূঢ়তম উদ্দেশ্য। আর শুধু জার্ম্মানীই বা কেন, অভাবগ্রস্ত ও ক্ষুধার্ত্ত সমগ্র জগতই তো আজ বৃটিশ সাম্রাজ্যের বৃহৎ আয়তনের মোহে উহার উপর লোলুপ হইয়া আছে। তাহারা মনে করে, বুঝি এই বৃহৎ সাম্রাজ্য শতবিচ্ছিন্ন হইলেই সকলের ক্ষুধা নিবৃত্ত হইবে।

জগদ্ব্যাপী এই করুণ ক্ষুধার্ত্ত-রবকে শান্ত করিতে পারে একমাত্র বৃটেন; এবং সাম্রাজ্যকে সুদৃঢ় ও চিরস্থায়ী করিতে হইলে ইহাই হইবে তাহার সর্ব্বপ্রথম কর্ত্তব্য। কিন্তু দুর্ভাগ্য-বশতঃ বৃটিশ শাসকগণ পৃথিবীর অভাব মোচন করা দূরে থাক, এখনও পর্য্যন্ত স্বদেশের আভ্যন্তরিক শোচনীয় অবস্থারই বিশেষ কোন প্রতিকার নির্ণয় করিতে পারিতেছেন না। বৃটেনের রাজনৈতিক মহল এবং কতিপয় অজ্ঞ জনসাধারণ অবশ্য স্বদেশের এই অভাবের কথা অস্বীকারই করিবেন। এমন কি, পৃথিবীর অন্যান্য দেশের চোখেও বৃটেন বিশেষ সম্পদশালী দেশরূপেই পরিগণিত। কিন্তু ইহার উত্তরে আমাদের শুধু জিজ্ঞাস্য, শতকরা ৭৯ জন বেতনভুক্ জীবিকানির্ব্বাহী বৃটিশ প্রজা, বা শতকরা ৮০ ভাগ কাঁচামালের জন্য পরমুখাপেক্ষিতায় কি ইহাই সম্পদশালীতার নিদর্শন?

আমাদের পক্ষ হইতে এই প্রশ্নের উত্তর খুব সংক্ষিপ্ত। কি কারণে জানি না, বৃটিশ অর্থনীতিকবৃন্দ অর্থনীতির ক্ষেত্রে ভারতের প্রাধান্য এতাবৎ উপেক্ষা করিয়া আসিয়াছেন। কিন্তু ভারতীয় ঋষিগণকৃত 'কৃষিবিজ্ঞান'সম্মত উপায়ে যদি ভারতের স্বাভাবিক উৎপাদিকা শক্তি পুনর্জ্জীবিত করা যায়, তবে আমরা নিঃসংশয়ে বলিতে পারি, কোনরূপ প্রতিদানের অপেক্ষা না রাখিয়াই ভারত অনতিকাল মধ্যেই সমগ্র জগতের খাদ্যাভাব মোচনে সক্ষম হইবে। এই ক্ষুদ্র আলোচনায় উহার বিস্তৃত বিবরণ লিপিবদ্ধ করা অবশ্য সম্ভব নহে, তবে মোটের উপর এইটুকু বলা যায় যে, আধুনিক বিজ্ঞানের চাপে অবরুদ্ধ দেশীয় নদ-নদী গুলির মুক্তিদানই হইবে উক্ত কার্য্য-বিধির প্রথম ও সর্ব্বপ্রধান সোপান। সর্ব্বাপেক্ষা আশার কথা, এই কাজের জন্য ব্যয়ভারও বৃটিশ সরকারের পক্ষে বিশেষ সাধ্যাতীত হইবে না।

এক্ষণে প্রশ্ন হইতে পারে, যুদ্ধরত বৃটেন কি করিয়া এ সময়ে অন্য একটি গুরুতর কাজে লিপ্ত থাকিতে পারে? যুদ্ধোপকরণ নির্ম্মাণের বিরুদ্ধে আমরা কার্য্যতঃ কিছু বলিতে অক্ষম; তবু সত্যের খাতিরে বলিতেই হইবে, বিপদোন্মুখ সাম্রাজ্যকে রক্ষা করিতে হইলে বৃটেনের আরও দুইটি কর্ম্মবিধি অনুসরণ না করিলেই নহে। যথা:—

প্রথমতঃ, বৃটেনকে জগতের সমক্ষে ঘোষণা করিতে হইবে যে, বৃটেন শত্রুমিত্র-নির্ব্বিচারে সকল মানবেরই অন্নাভাব, অস্বাস্থ্য ও মানসিক অসন্তুষ্টির প্রতিবিধানে ব্রতী;

দ্বিতীয়তঃ, শুধু ঘোষণা করিলেই চলিবে না; ঘোষণাকে অবিলম্বে কার্য্যে পরিণত করিতেও প্রবৃত্ত করিতে হইবে।

—এই প্রসঙ্গও বৃহৎ আলোচনাসাপেক্ষ, আমরাও সে আলোচনা এখন করিব না। তবে কর্ত্তৃপক্ষের আন্তরিক

আগ্রহের পরিচয় পাইলে সে কাজে নামিতে আমরা সর্ব্বদা প্রস্তুত আছি। বর্ত্তমানের শাসন ও বিচার প্রভৃতি রাজকীয় ব্যাপারে দৈতপন্থী, কপট ও লোভী ব্যক্তির প্রবেশ দ্বারা যে অনাচার ঘটিবার সম্ভাবনা, আমাদের কর্ম্মবিধি প্রধানতঃ সেই অনাচার রহিত করিবার চেষ্টা করিবে। অবশ্য, আমরা বলিতে চাহি না—দেশীয় রাজকীয় প্রতিষ্ঠানগুলি মাত্রেই ঐরূপ অযথা ব্যক্তিতে পরিপূর্ণ; তা বলাও মহাঅপরাধ। কিন্তু, সমগ্র মানবসমাজের সমস্যা সমাধানের যে গুরু দায়িত্ব ইংলণ্ডের স্কন্ধে রহিয়াছে, সেই পবিত্র দায়িত্ব উক্ত ঘৃণিত ব্যক্তিগণের সংস্পর্শে যেন দূষিত হইতে না পারে, কর্ত্তৃপক্ষকে সেই সম্বন্ধে সতর্ক করিয়া দেওয়াই আমাদের উদ্দেশ্য।

লোকে কথায় বলে 'রোগীর নাভিশ্বাস, ঔষধ ছয় মাসের পথ'। তাই বলি সময় থাকিতে কর্ত্তৃপক্ষ এ বিষয়ে কি সচেতন হইবেন?

সশস্ত্র অভিযান কি মানব সমস্যা সমাধানে সক্ষম?

আধুনিক জগতের বিশ্বাস যে, পৃথিবীর গতি আজ বিপথাভিমুখী এবং এই গতি রোধ করিতে হইলে আক্রমণকারী শত্রুর বিরুদ্ধে অভিযান ভিন্ন আর অন্য উপায় নাই। আরও আশ্চর্য্য ও মজার বিষয় এই যে, প্রত্যেক জাতিই মনে করে, সে নিজে প্রকৃতই নির্দ্দোষ, ন্যায়পরায়ণ ও সাধু, আর শত্রুই কেবল শোষণনীতি-পন্থী, আত্মম্ভরি, সুবিধা-পরায়ণ ভিন্ন আর কিছুই নয়। এইরূপে রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে পরস্পরে বিদ্বেষভাব পোষণ করে। বস্তুতঃ প্রতি রাষ্ট্রেরই বিশ্বাস যে, সুবিধা পাইলেই শত্রুগণ তাহার প্রতি কি ধর্ম্মে, কি রাষ্ট্রে, কি সমাজে, কি অর্থনীতিতে যে কোন ক্ষেত্রেই সুবিধা গ্রহণ করিতে ত্রুটী করিবে না। এই প্রকারেই যাবতীয় রাষ্ট্রগুলি আত্মরক্ষার ব্যপদেশে অস্ত্র-সম্ভার বৃদ্ধি করিতে তৎপর হইয়াছে। এই ভাবেই প্রত্যেক দেশের অপর দেশ হইতে শোষণাকাঙ্ক্ষা বৃদ্ধি পাইতেছে এবং সকলেই ক্রমে সমর-পরায়ণ হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু আজিকার দিনে এই প্রশ্নই সর্ব্বাপেক্ষা বড় হইয়া দাঁড়াইতেছে যে, এই যে মানবের সশস্ত্র অভিযান ও সাম্রাজ্যলিপ্সা—সত্যই তাহা মানবসমাজের সমস্ত সমস্যার প্রতিবিধানে কি সম্ভবপর হইবে? আমাদেরও একমাত্র উত্তর না,—না, না,—ইহা কোন মতেই সম্ভবপর ও যুক্তিযুক্ত হইতে পারে না। প্রশ্ন হইতে পারে, কেন নয়? ইহার উত্তরে আমাদের বক্তব্য এই যে, সশস্ত্র অভিযানে মানুষের পাশব-বৃত্তিই উদ্বুদ্ধ হয় মাত্র, ইহাতে কেবল হিংসাবৃত্তি চরিতার্থ হয়। আর যাহা এইরূপ হীন বিদ্বেষ-ভাব প্রসূত, তাহাতে মানব-কল্যাণকর কোন সংস্কারই সাধিত হইতে পারে না।

আবার প্রশ্ন আসে—সশস্ত্র অভিযানে যদি প্রকৃত পক্ষেই মানবসমস্যার সমাধান সত্যই না হয়,তাহা হইলে সে সমাধান নিরূপণে কোন্ পন্থা গ্রহণ করিতে হইবে? এ প্রশ্নের কি ভাবে সমাধান হইতে পারে, সে উত্তর তো আমরা বহুবার বহু প্রকারে জনসাধারণের সমক্ষে উপস্থিত করিয়াছি। কিন্তু শ্রোতা কে? সকলেই তো আজ বিভ্রান্ত, বিপথগামী, সাপ বলিয়া দড়ি ধরে, হিত কি তাহা বুঝে না, প্রকৃত তথ্য যে বলে তাহার কথা শুনিবার তাহার সহিষ্ণুতা নাই। কিন্তু আমরা বুঝিয়াছি যে, দেশের গতি ফিরাইতেই হইবে, এই ধ্বংসাভিমুখী গতিকে বিপরীতমুখী করিতেই হইবে, ঔষধ তিক্ত বলিয়া চিকিৎসক যেমন উহা রোগীকে গলাধঃকরণ করাইতে কখনও বিমুখ হয় না, আমরাও সেইরূপ সেই অমৃতবাণী আবার সকলকে শুনাইব, আমরা উহার পুনরাবৃত্তি করিতে কুণ্ঠিত হইব না। কারণ, আমরা জানি এবং আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস যে, ইহাতেই মানবের মঙ্গল, ভারতের হিত, জগতের কল্যাণ সংসাধিত হইবে।

পাঠকগণ জানেন, বিচক্ষণ সমাধান-তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিকে প্রথমতঃ সমস্যার কারণ ও স্বরূপ নির্ণয় করিতে হয়। আর আমরা দেখিতে পাই, জগতের সর্ব্বত্রই প্রায় একই সমস্যা। বস্তুতঃ বিভিন্ন দেশের সমস্যার বহিরাবরণের দিক্ বা উহার সংজ্ঞা বিভিন্ন হইলেও মুখ্যতঃ সেইগুলি প্রায় একই রূপ। আমরা নিম্নে সেইগুলি প্রদান করিতেছি—

(১) খাদ্যাভাব,

(২) স্বাস্থ্যহীনতা,

(৩) মানসিক অশান্তি,

(৪) অকালবার্দ্ধক্য,

(৫) অকালমৃত্যু,

এই যে পঞ্চবিধ সামাজিক অভিশাপ, তাহার উদ্ভব

হইয়াছে আধুনিক সভ্যতা ও বিজ্ঞান-দূষিত সমাজে, উপযুক্ত শিক্ষা ও উন্নত ধরণের কৃষি, আর শিল্প-বাণিজ্যের প্রসারের অভাবে। উপযুক্ত উপায়ে উৎকৃষ্ট কৃষিকার্য্য সর্ব্বক্ষেত্রেই কৃষিজীবীদের পক্ষে যে লাভজনক তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু ইহার জন্য চাই ভূমির স্বাভাবিক উৎপাদিকা শক্তি। ভূমির স্বাভাবিক উর্ব্বরতা অব্যাহত থাকিলে কৃত্রিম সার ও সেচের ব্যবস্থা ব্যতিরেকেও যে শস্য উৎপাদিত হয়, তাহাই কৃষক ও জনসাধারণের প্রয়োজন মিটাইবার পক্ষে পর্য্যাপ্ত। কারণ, সৃষ্টির উদ্দেশ্য হইল প্রকৃতির জল ও তাপে প্রকৃতিকে উর্ব্বর করা। কিন্তু আধুনিক বিজ্ঞানের অনাবশ্যক অত্যাচারে ভূমির প্রাণ-শক্তি,কৃষির প্রধান অবলম্বন দেশীয় নদ-নদীগুলির স্বাভাবিক গতি ও ধারা অবরুদ্ধ হওয়ায় জমির সেই স্বাভাবিক উৎপাদিকা শক্তি নষ্ট হইতে বসিয়াছে। এই লুপ্ত উৎপাদিকা শক্তি পুনর্জ্জীবিত হইলেই কৃষি-জীবিদের আর্থিক অভাব বলিতে আর কিছু থাকিবে না, তাহাদের অবস্থা ক্রমেই উন্নত হইয়া যাইবে।

পক্ষান্তরে শিল্পবাণিজ্যের সুব্যবস্থা হইলেই ইহার উৎকর্ষ-সাধন অবশ্যম্ভাবী। আর যে ব্যবস্থায় শিল্পজীবিগণ ন্যায়-সঙ্গত লাভে একটুকুও বঞ্চিত হইবে না, অথচ অধিক মুনাফাও গ্রহণ করিতে না পারে, আর খুব ক্ষতিগ্রস্ত না হয় সেই ব্যবস্থাই সুব্যবস্থা। কিন্তু এ-কথা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, উপযুক্ত কৃষির উন্নতি ব্যতীত শিল্প-বাণিজ্যে উৎকর্ষ সাধন কোন মতেই সম্ভবপর নয়। অর্থের যথেচ্ছা প্রচলন ও ব্যবহার রহিত করিয়া কৃষি উৎপাদনের এবং বিভিন্ন শ্রেণীর শ্রমিকদের নির্দ্ধারিত বেতনের পরিমাণ অনুসারে অর্থের যথেচ্ছা ব্যবহার ও প্রচলন সংযত করিলেই ব্যাপকভাবে বাণিজ্যের সংস্কারাদি হইবে, এতদ্ব্যতীত শিল্প-বাণিজ্যের প্রধান প্রতিবন্ধক ঘোড়দৌড়াদি সর্ব্বপ্রকার জুয়াখেলার প্রচলন বন্ধ না রাখিলেও শিল্পবাণিজ্যের উন্নতি কিছুতেই সম্ভব নয়।

শিক্ষার সমস্যাই সর্ব্বপ্রধান সমস্যা। আধুনিক যুগের শিক্ষা উপযুক্ত শিক্ষা নহে। উপযুক্ত শিক্ষার উদ্দেশ্য শিক্ষার্থীকে এমনভাবে শিক্ষা দিতে হইবে, যাহাতে তাহার হৃদয়াবেগ ও কামক্রোধাদি ইন্দ্রিয়বেগ প্রশমিত হয়। বস্তুতঃ সংযম শিক্ষাই আসল শিক্ষা। তদুপরি প্রত্যেক বিষয়ের কার্য্যকারণের নির্ণয়বুদ্ধিও উৎকৃষ্ট শিল্প-বাণিজ্য সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞানও শিক্ষার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। সহজেই বুঝা যাইতেছে যে, উপযুক্ত কৃষি-বাণিজ্যের এবং শিক্ষার অভাবে যে সকল সমস্যার উদ্ভব হইয়াছে, উহাই আধুনিক জটিলতম সমস্যা। ইহার সমাধান হইলেই মানব-জাতির আর্থিক অভাব, অস্বাস্থ্য ও মানসিক অশান্তি প্রভৃতি সকল সমস্যার প্রতিকার হইবে। কিন্তু হায়! আজ প্রকৃত পন্থা অনুসৃত হইতেছে না। আজ পৃথিবীতে অস্ত্রশাসনই প্রবল। কিন্তু রণসম্ভারে যে জগতের প্রকৃত শান্তি বা স্বাচ্ছন্দ্য আসিতে পারে না,—শান্তি আসিতে পারে, হাঁ নিশ্চয়ই আসিতে পারে। ভারতীয় অতীত স্বর্ণযুগের অনুকরণে কৃষি, শিল্প-বাণিজ্য ও শিক্ষা ব্যবস্থার পুনর্গঠনে—তাহা কেন যে যুযুধান জাতিগুলি বুঝিতেছে না, ইহাই নিতান্ত ক্ষোভ ও পরিতাপের বিষয়।

অনেকে হয়তো মনে করিতে পারেন, অতীত অতীতই। উহাকে আর ফিরিয়া পাওয়া যায় না। কিন্তু আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস উপযুক্তরূপে চেষ্টা করিলে, দুই বৎসরের মধ্যেই ভারতবর্ষ কৃষি-বাণিজ্য সম্বন্ধে সেই স্বর্ণযুগ ফিরিয়া পাইতে পারিবে। তবে আজ শক্তিশালী বৃটেনকেও আরও দৃঢ়চিত্ত হইতে হইবে। বৃটেনকে আজ গভর্ণমেণ্ট হইতে ভ্রান্ত, মূঢ় ও বিভ্রান্ত ব্যক্তিদের অপসারিত করিয়া যথোপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে এবং জগতের প্রকৃত শান্তি-বিধান করিতে ভারতীয় ঋষিগণপ্রদর্শিত পথ অবলম্বন করিতে হইবে। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস আজ এই উদ্ধত, উন্মত্ত ও শোষক জার্ম্মাণীকে পরাজিত করিবার ইহাই সর্ব্বোত্তম মহৌষধ।

প্রার্থনা করি, জগদীশ্বর যেন বৃটিশ রাজনৈতিকগণকে এ বিষয়ে সুমতি প্রদান করেন।

বর্ত্তমান পরিস্থিতিতে ভারতবাসীর অভাব মোচনের উপায়

ভারতে আজ এই ধারণাই সার্ব্বজনীন যে, বর্ত্তমান পরিস্থিতির দুঃসহ নিষ্পেষণে ভারতবাসী অসহায় এবং শোচনীয় অভাব ও দুর্ভাগ্যের কবলিত। ধারণাটি মিথ্যা নয়,—বাস্তব। তাই স্বতঃই প্রশ্ন হয়, এই অভাব মোচন কি সম্ভব? আমরা বলি, হাঁ, সম্ভব। চেষ্টা করিলে স্বাচ্ছন্দ্যের স্বাদ ভারতবাসীও

পাইতে পারে। কিন্তু পাইবার উপায় জানা চাই। তাই সকলকে ছাপাইয়া আজ এই প্রশ্নটাই বড় হইয়া উঠে—সেই উপায়টা-কী?

কিন্তু বড় হইলেও প্রশ্নটা একক নহে। ইহার সঙ্গে অবিচ্ছিন্ন ভাবে এই প্রশ্নগুলিও সংশ্লিষ্ট—

(১) ভারতীয় জনসাধারণের অর্থ কি,

(২) সাধারণ স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য ভারতবাসী কি চায়,

(৩) বর্ত্তমান পরিস্থিতিতে ভারতবাসীর **কি আছে এবং কি নাই,**

(৪) বর্ত্তমান পরিস্থিতিতে ভারতীয়দের অভাব কি এবং

(৫) এই অভাব মোচন করিবে কে?

একে একে এই প্রশ্নগুলির উত্তর মিলিলে তবেই আমরা 'বর্ত্তমান পরিস্থিতিতে ভারতীয়দের অভাব মোচনের উপায়' অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইতে পারিব।

প্রথম প্রশ্ন,—**ভারতীয় জনসাধারণের অর্থ কি** অর্থাৎ ভারতীয় জনসাধারণ বলিতে কাহাদের বুঝায়? এই প্রশ্ন সম্যক্ উপলব্ধি করিতে হইলে প্রথমতঃ আমাদের জনসাধারণের 'শ্রেণী-বিভাগ' সম্বন্ধে প্রকৃষ্ট জ্ঞান লাভ করিতে হইবে। সাধারণতঃ সকল দেশেরই অধিবাসীগণের শ্রেণী-বিভাগ মোটামুটি অর্থনৈতিক ভিত্তিতে (ধনী, দরিদ্র) অথবা রাজনৈতিক ভিত্তিতে (শাসক ও শাসিত), কিংবা প্রাকৃতিক নিয়মের মানদণ্ডে (বুদ্ধিজীবী ও শ্রমজীবী) নির্ণীত হইয়া থাকে। ইহাদের মধ্যে প্রকৃতির নিয়মানুসারে যে বিশ্লেষণ, উহাই বিশেষ ব্যাপক ও স্থিতিশীল এবং সর্ব্বাধিক আলোচনা-সাপেক্ষ। অবস্থার বিপর্য্যয়ে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক শ্রেণীবিভাগের বিপর্য্যয় অসম্ভব নয়। বৈগুণ্য ঘটিলেই আজিকার ধনী কাল দরিদ্র, আজিকার শাসক কাল শাসিত ব্যক্তিতে পরিণত হইতে পারে।

ভারতে শ্রমজীবির সংখ্যা গরিষ্ঠতম। বস্তুতঃ উহারাই ভারতের যথার্থ জনসাধারণ বা 'গণসাধারণ'। উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারী, নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবৃন্দ এবং গণ্যমান্য সাংবাদিক, বৈজ্ঞানিক ও সাহিত্যিক প্রভৃতি কতিপয় মুষ্টিমেয় লোক ব্যতীত কৃষক, শ্রমিক, কেরাণী এবং অন্যান্য সমুদয় অবহেলিত প্রতিষ্ঠানভুক্ত ব্যক্তিমাত্রেই ভারতের এই বিরাট গণগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত।

দ্বিতীয় প্রশ্ন,—**সাধারণ স্বাচ্ছন্দ্যের নিমিত্ত ভারতবাসী কি চায়?** জিজ্ঞাসাটি জটিল নয়, উত্তর তাই সহজলভ্য। সকলেই জানেন, ভারতবাসী চায়, প্রয়োজন মিটাইবার ন্যূনতম উপকরণ; চায় দু'বেলা পেটভরা আহার, নিরুদ্বেগ স্বাস্থ্য ও মানসিক সন্তুষ্টি। বিলাসের সহায়তা ভারতীয় জনসাধারণের নাই। তবু বর্ত্তমান পরিস্থিতিতে এই প্রয়োজনের অধিক ভারতবাসী আরও কিছু চায়। সে কথা আমরা ক্রমশঃ বলিতেছি।

তৃতীয় প্রশ্নে জিজ্ঞাস্য,—**বর্ত্তমান পরিস্থিতিতে ভারতবাসীর কি আছে এবং কি নাই।** বলা বাহুল্য, প্রয়োজনের উপযোগী ভারতবাসীর কিছুই নাই, কিন্তু বোঝা স্বরূপ যাহা আছে তাহা আরও দুঃসহ। অবৈধ অ-সম বণ্টন, ট্যাক্সের বোঝা এবং চটকদার শিক্ষার মোহ গণসাধারণের জীবনযাত্রাকে আরও জটিল করিয়া তুলিয়াছে। শ্রমজীবীদের স্কন্ধে এই বোঝা চাপাইয়াছে তাদেরই প্রভূত পরিচালক বুদ্ধিজীবীরাই। ভারতের পণ্য ও উৎপাদনে আজ যে বিপুল অভাব তারও জন্য দায়ী এই বুদ্ধিজীবিদেরই প্রবর্ত্তিত ভ্রান্ত বিজ্ঞান। অথচ ভারতের বণ্টন-প্রথা এমনই মজার যে, এই দারিদ্র্যের ভোগও পোহাইতে হয় সেই বঞ্চিত ও সর্ব্বহারা শ্রমজীবির দলকেই। শ্রমজীবিদের অভাব মিটুক কি না মিটুক, বুদ্ধিজীবিদের লাভের অঙ্কে যেন কোন ক্রমেই ঘাটতি না ঘটে। অবশ্য যদি জনসাধারণ তাহাদের প্রয়োজনীয় স্বাচ্ছন্দ্য উপকরণ লাভে ব্যর্থকাম না হইত, তা' হইলে পরিচালকগোষ্ঠি বুদ্ধিজীবীদের মোটা মুনাফায় সমাজের কটাক্ষ করিবার কিছু থাকিত না। কিন্তু দুর্দ্দশার ইহাই তো শেষ নয়। সমাজের অবৈধ অ-সম বণ্টনের ফলে এবং স্বার্থপর লোভী ব্যক্তিবিশেষদের উদরপূর্ত্তির জন্য নিরন্ন অসহায় জন-সাধারণকে অধিকন্তু অসহনীয় ট্যাক্সের বোঝাও বহন করিতে হয়।

বুদ্ধিজীবিদের অন্ধানুকরণে শিক্ষালাভের মোহ। শিক্ষা-প্রচারকদের প্রচারের ফলে অজ্ঞ জনসাধারণ ভুল বুঝে যে, আধুনিক শিক্ষাই সামাজিক উৎকর্ষের প্রধান অবলম্বন। কিন্তু কার্য্যতঃ এই শিক্ষা কোনরূপেই কল্যাণকর হয় না। ক্লেশার্জ্জিত অর্থের বিনিময়ে যে শিক্ষা লাভ হয়, কার্য্যক্ষেত্রে তার পরিণতি বেতনভুক্ চাকুরি। আর পথপ্রদর্শক

বুদ্ধিজীবিরা এই শিক্ষার ফলে যাহা লাভ করে তাহা আর যাই হোক—সততা, সত্যপরায়ণতা বা কর্ত্তব্যজ্ঞান নহে।

অসহায় জনসাধারণকে এভাবে সর্ব্বপ্রকারে বঞ্চিত করা গুরুতর পাপ। কিন্তু পাপের শাস্তি অনিবার্য্য। বুদ্ধিজীবিদের পক্ষে এই শাস্তি আরোপিত হয় তাহাদের পারিবারিক অশান্তিতে।

পরবর্ত্তী প্রশ্ন, বর্ত্তমান পরিস্থিতিতে ভারত-বাসীর প্রয়োজন কি কি?

পূর্ব্ববর্ত্তী প্রশ্নেই আমরা ইহার আংশিক আলোচনা করিয়াছি। যাহার অভাব তাহার পূরণ, যাহা বোঝা তাহার প্রতিবিধান—বর্ত্তমানে জনসাধারণের ইহাই একমাত্র কাম্য। এক কথায় বলা যায়, বর্ত্তমান পরিস্থিতিতে স্বাচ্ছন্দ্যের জন্ম ভারতবাসী চাহে—

(১) অবৈধ অ-সম বণ্টনপ্রথার বিলোপ,

(২) শোচনীয় ট্যাক্সেসনের উচ্ছেদ,

(৩) অপদার্থ শিক্ষার পরিবর্ত্তে কল্যাণকর শিক্ষার প্রবর্ত্তন,

(৪) গণসাধারণের ন্যূনতম প্রয়োজন মিটাইবার জন্য কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যের আমূল সংস্কারসাধন,

(৫) যোগ্যতানুসারে পারিশ্রমিক অর্জ্জনের ব্যবস্থা,

(৬) অস্বাস্থ্য ও মানসিক অশান্তি দূর করিবার উপায়,

(৭) বর্ত্তমান পরিস্থিতিতে ভারতের স্থান আজ কোথায় এই জ্ঞানও ভারতবাসীকে আহরণ করিতে হইবে।

এইবার সর্ব্বশেষ প্রশ্ন, **ভারতীয় সমস্যার সমাধান করিবে কে এবং কি উপায়ে?**

বিস্তৃত ভূমিকা না করিয়া সংক্ষেপেই বলা যায় যে, একমাত্র বৃটিশ গভর্ণমেণ্টই এই সমস্যার প্রতিবিধান করিতে পারেন। কিন্তু সে গভর্ণমেণ্ট বর্ত্তমানের ভ্রান্তনীতিপরায়ণ গভর্ণমেণ্ট নহেন। শাসন প্রতিষ্ঠান হইতে অকর্ম্মণ্য ও অপদার্থ ব্যক্তিদের অপসারণ করিয়া ভারতীয় সমস্যার সম্যক্ জ্ঞানসম্পন্ন যোগ্যতম ব্যক্তিগণ দ্বারা যদি একটি সংশোধিত (reformed) গভর্ণমেণ্ট গঠিত হয়, তবেই সেই গভর্ণমেণ্টই ভারতের সমুদয় অভাব মোচন করিতে পারিবে।

অধিকন্তু সমাধানপ্রয়াসীদের এই পথ গ্রহণ করিতে হইবে:—

প্রথমতঃ—রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক নেতৃবৃন্দ এবং সাহিত্যিক, বৈজ্ঞানিক প্রভৃতি তথাকথিত গণ্য-মান্যদের উপর সাধারণ ভারতবাসীর যে অহেতুক অটল বিশ্বাস আছে, উক্ত দিক্‌পালগণ সেই বিশ্বাসের যোগ্য না হইলে, এই মূঢ় বিশ্বাস ত্যাগ করিতে হইবে। সমস্যার প্রতি-বিধানার্থে উপযুক্ত নেতা এবং উপদেষ্টা নির্ব্বাচন করিতে হইবে।

দ্বিতীয়তঃ—ব্যক্তিগত এবং সাম্প্রদায়িক সর্ব্বপ্রকার দ্বন্দ্ব ও কলহের প্রবৃত্তিকে সর্ব্বথা জয় করিতে হইবে. এবং এবম্বিধ কলহের পোষক তথাকথিত নেতৃবৃন্দকেও প্রশ্রয় দেওয়া চলিবে না। ফলতঃ বৃটিশদের তাড়াইয়া স্বাধীনতা লাভের মনোভাবও ত্যাগ করিতে হইবে।

তৃতীয়তঃ—সমস্যার ভিত্তি জাগতিক না হইলে কোন সমাধানই সর্ব্বাঙ্গীণ কল্যাণকর নহে। সুতরাং অখণ্ড মানব-জাতির কল্যাণ সাধনে ব্রতী হইতে হইবে।

চতুর্থতঃ—এজন্য সমগ্র জগৎবাসীকে, এমন কি শোষণকারী নামে যারা পরিচিত, তাহাদেরও বিশ্বাস করাইতে হইবে যে, ভারতবর্ষ এই মহান্ ব্রতে ব্রতী। ইহার ফলেই ভারতবাসী সর্ব্বজগতের সমর্থন ও সহানুভূতিলাভে সক্ষম হইবে।

পঞ্চমতঃ—ভারতীয় কংগ্রেসের প্রকৃত সংস্কারসাধন করিতে হইবে।

আমাদের মতে সমাধানের ইহাই প্রকৃষ্ট পন্থা—এবং বর্ত্তমান কালেই এই পন্থা অবলম্বনের প্রকৃষ্ট সময়। কোন সংস্কারক সম্প্রদায় ভারতের তথা সর্ব্বজগতের সমস্যার সমাধানার্থে যদি এই পথে অগ্রসর হন, তবে আমরা নিঃসন্দেহে বলিতে পারি, তাঁহার চেষ্টা নিশ্চয়ই ফলপ্রসূ হইবে এবং সমস্ত জগতও মুগ্ধনেত্রে চাহিয়া দেখিবে এই নিরন্ন পদদলিত 'দাস ভারতবর্ষ'ও অসাধ্যসাধন করিতে সক্ষম।

সময় থাকিতে আমরা দেশবাসীকে এবিষয়ে সচেতন হইতে অনুরোধ করিতেছি।

প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট ও খাদ্য সংরক্ষণ

সম্প্রতি রাষ্ট্রপতি রুজভেল্ট আমেরিকার খাদ্য সংরক্ষণ সম্বন্ধে একটী ফতোয়া জারী করিয়াছেন। তিনি বলেন যে, সমরোপকরণের ন্যায় খাদ্যসংরক্ষণও হিটলারবাদের বিরুদ্ধে

অন্যতম অস্ত্র। এমন কি, ভবিষ্যতের শান্তিপূর্ণ ও উন্নততর জগৎ প্রতিষ্ঠায় উহা যে ব্রহ্মাস্ত্রের ন্যায় কার্য্যকরী হইবে, তাহা বলিতেও তিনি শৈথিল্য করেন নাই।

রাষ্ট্রপতির উক্ত ফতোয়া কার্য্যকরী হইতেও বিলম্ব হয় নাই। ওয়াশিংটন হইতে প্রেরিত সংবাদে প্রকাশ যে, কৃষি-বিভাগ নাকি সত্য সত্যই এই ফতোয়া অনুযায়ী খাদ্যসংগ্রহ ও সংরক্ষণে উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়া গিয়াছে। অদূর ভবিষ্যতে নাকি এই সংরক্ষিত খাদ্যভাণ্ডার ইংলণ্ড, চীন প্রভৃতি উপদ্রুত অঞ্চলে প্রেরিত হইবে। প্রেসিডেন্ট মহোদয়ের এই উদ্যম আপাতদৃষ্টিতে বিশেষ বিবেচনাপূর্ণ মনে হওয়া স্বাভাবিক; কিন্তু আমাদের জিজ্ঞাস্য, কি উপায়ে এই খাদ্য সংরক্ষণ সম্ভব হইবে? বিশেষজ্ঞগণ বলেন যে, একমাত্র ব্রহ্মদেশ ব্যতীত পৃথিবীর অন্যান্য সকল দেশের উৎপাদিত খাদ্য প্রজাসাধারণের শতকরা ষাট জনের চাহিদা মিটাইবার পক্ষেও যথেষ্ট নহে। আমেরিকাকেও ইহার ব্যতিক্রম মনে করিবার কোন কারণ খুঁজিয়া পাওয়া যাইতেছে না। তবে কি প্রজাবৃন্দকে উপবাস করাইয়াই যুক্তরাজ্যের এই বিঘোষিত খাদ্যসংরক্ষণ নীতি সংসাধিত হইবে? আশা করি রাষ্ট্রপতি রুজভেল্ট মহোদয় অগ্রপশ্চাত বিবেচনা করিয়া এই আত্মঘাতী পন্থা ত্যাগ করিবেন এবং অচিরেই অধিকতর বিচক্ষণ উপায় অবলম্বন করিতে প্রয়াসী হইবেন।

শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকার ও যন্ত্র-শিল্প

কিছু দিন হইল শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকার মহাশয় আধুনিক বিজ্ঞান ও যন্ত্র-শিল্পের এক প্রশস্তি গাহিয়াছেন। তিনি বলেন, "বর্ত্তমান যুগ যন্ত্রের যুগ, যন্ত্রের সহায়তা না লইলে আমাদিগকে পিছাইয়া থাকিতে হইবে। সুতরাং ভারতের উক্ত বিজ্ঞান ও যন্ত্র-শিল্পের প্রবর্ত্তন সাধন অবশ্য কর্ত্তব্য।"

অপরিণতবয়স্ক তরলমতি বালক যদি আগুনে ঝাঁপাইয়া পড়িতে চায়, তবে সকলেরই কর্ত্তব্য উহাকে বাধা দিয়া অগ্নির দাহিকাশক্তির পরিণতি ও ভীষণতা বুঝাইয়া দেওয়া। শ্রীযুক্ত সরকার বয়সে অবশ্য অপরিণত নহেন, কিন্তু নূতন রাজপদ তাঁহাকে যেন নবীনের উৎসাহ প্রদান করিয়াছে! বস্তুতঃ ভারতের জন্য আধুনিক বিজ্ঞান ও যন্ত্র-শিল্পের ওকালতি করিয়া নিতান্তই তিনি বালকোচিত অবিমৃষ্যকারিতার পরিচয় দিয়াছেন। অন্য কোন বালকসুলভ অনুকরণপ্রয়াসী ব্যক্তি এবংবিধ উক্তি করিলে আমরা নিশ্চয়ই হাসিয়া উড়াইয়া দিতাম, কিন্তু সম্প্রতি নূতন পদলাভে তাঁহার স্কন্ধে যে বিপুল দায়িত্ব ভার পড়িয়াছে, তাহার গুরুত্ব বিবেচনা করিয়া আমরা তাঁহার উক্ত বিবৃতি অমার্জ্জনীয় মনে করিতেছি এবং তাই বাধ্য হইয়া তাহার প্রতিবাদ করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

যন্ত্রনিষ্পেষিত আধুনিক বিজ্ঞান ও সভ্যতার অনিষ্ট-কারিতা সম্বন্ধে আমরা ইতিপূর্ব্বে বহু প্রসঙ্গে আলোচনা করিয়াছি। এই স্থলে সেইরূপ বিস্তৃতালোচনা সম্ভব নহে; তবে শ্রীযুক্ত সরকারের উক্তির বিরুদ্ধে এইটুক বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, আধুনিক বিজ্ঞানের শত উন্নতি সত্ত্বেও পৃথিবীর বর্ত্তমান খাদ্য উৎপাদনের হার অধিবাসিগণের প্রয়োজনের দুই তৃতীয়াংশেরও কম। এই জন্যই আজ পাশ্চাত্য-ভূমিতে সামান্য খাদ্য-খণ্ডের জন্য এত যুদ্ধ,এত হানাহানি, এত বিদ্বেষ-দ্বন্দ্ব-কলহ। অথচ ইতিহাসের অতীত অধ্যায়ের পাতা উল্টাইলে দেখা যাইবে যে, তৎকালে জনসাধারণের চাহিদা অনুযায়ী খাদ্য পর্য্যাপ্তভাবে মিটাইয়াও উৎপাদিত শস্য অনেক পরিমাণে উদ্বৃত্ত হইত। অতএব যন্ত্র-সভ্যতার ফলে পাশ্চাত্য দেশসমূহে যে শোচনীয় অবস্থার উদ্ভব হইয়াছে, সেই সভ্যতাই গ্রহণ করিয়া—ভারতের দুরবস্থারও কি পুনরাবৃত্তি ঘটিবে না —ভারতের অভাবের মাত্রা কি শতগুণে বর্দ্ধিত হইবে না?

কিন্তু ঊর্দ্ধদৃষ্টি সরকার মহাশয়কে সে কথাটি আজ কে বুঝাইবে?

বর্ত্তমান যুদ্ধ ও আমেরিকা

ওয়াশিংটন হইতে প্রেরিত সংবাদে প্রকাশ যে, শ্রমিক ধর্ম্মঘটের জন্য আমেরিকার যুদ্ধোপকরণ প্রস্তুতি নির্ম্মাণে বিশেষ বিঘ্ন ঘটিতেছে। প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট প্রথমে শ্রমিকদের সহিত একটা রফা করিবার বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহাতে কোন সন্তোষজনক ফল লাভ না হওয়ায় অগত্যা তিনি ক্যালিফোর্নীয়া বিমান-কারখানা এবং কেনেরি অঞ্চল প্রভৃতি সৈন্যবিভাগের তত্ত্বাবধানে ছাড়িয়া দিয়াছেন।

উক্ত ওয়াশিংটন হইতে প্রেরিত দ্বিতীয় সংবাদে প্রকাশ হয় যে, প্রেসিডেন্ট মহোদয় কর্ত্তৃক উত্থাপিত সৈন্য-

বিভাগ সম্প্রসারণের কালবৃদ্ধির যে প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে উহা প্রতিনিধিবর্গের পূর্ণ সমর্থন লাভ করিতে পারে নাই। রুজভেল্টের দল মাত্র এক ভোটে জয়ী হইয়াছেন।

উপরোক্ত সংবাদ দুইটি হইতে ইহা স্বতঃই প্রমাণিত হয় যে, বৃটেনকে সাহায্যদানের সদিচ্ছা রুজভেল্ট মহোদয়ের যথেষ্ট পরিমাণ থাকিলেও তাহাতে দেশের জনসাধারণের প্রতিনিধি এবং শ্রমিক সম্প্রদায়ের সমর্থন সেই পরিমাণে খুবই অকিঞ্চিৎকর। অধিকন্তু উক্ত অসমর্থকদের সহিত তাঁহার দলের বিরোধ লাগিয়াই আছে। এই বিরোধের অবসান কবে হইবে জানি না। তবে এই ঘটনা হইতে আমরা এইটুকু বলতে পারি যে, প্রতিশ্রুত মার্কিণ সাহায্য ততটা নির্ভরযোগ্য নহে। বৃটিশ রাজনীতিমহলকে আমরা অবিলম্বে এ বিষয়ে সাবহিত হইতে অনুরোধ করিতেছি।

মুসলীম লীগে বিরোধ

মুসলীম লীগের কয়েকজন সভ্য নবগঠিত ভারতরক্ষা কাউন্সিলের সদস্যপদ গ্রহণ করায় লীগের সহিত উক্ত সভ্যদের মনোমালিন্যের কথা আমরা ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছিলাম। আমরা আরও বলিয়াছিলাম, ভারতরক্ষা কাউন্সিলে যোগদান করিয়া উক্ত সভ্যগণ তেমন কিছু গুরুতর বা শৃঙ্খলা-বিগর্হিত অপরাধ করেন নাই। মিঃ ফজলুল হক সাহেবও এই সূত্রেই লীগের অভিযোগের প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। কিন্তু মিঃ জিন্না এই প্রতিবাদ যুক্তিযুক্ত মনে করেন না— উপরন্তু তিনি মিঃ হক প্রভৃতির প্রতি শাসনমূলক ব্যবস্থা প্রয়োগে উদ্যোগী হইয়াছেন। ফলে স্বভাবতঃই লীগের কর্ম্মকর্ত্তাদের মধ্যে এক বিরোধের সূত্রপাত হইয়াছে। আমরা এই অহেতুক বিরোধের সমর্থন করি না। আশাকরি, বিপদ-বিচ্ছিন্ন হিন্দুদের দৃষ্টান্ত স্মরণ করিয়াও অন্ততঃ মুসলমানগণ এই অহেতুক বিরোধের নিরসনে সযত্ন হইবে না।

মঃ দারলাঁর শক্তিবৃদ্ধি

সম্প্রতি ভিসি গভর্ণমেন্ট কর্ত্তৃক মঃ দারলাঁ 'জাতীয় রক্ষা-সচিব' এই নামীয় পদে নিয়োজিত হইয়াছেন। পদটি কার্য্যতঃ সহ-ডিক্টেটারের পদ। আশা করা যায়, মঃ দারলাঁকে এই নূতন পদপ্রদানে ফ্রান্সের রাজকীয় ব্যাপারে বিশেষ উন্নতি হইবে। অধুনা ফ্রান্সে দুইটি বিবাদমান দল বিদ্যমান—একটি ভিসির অধীনে আদি ও অকৃত্রিম ফরাসী মনোভাবাপন্ন দল, অন্যটি প্যারীর অধীনে নাৎসীপন্থীদল। নবনিয়োজিত সহ ডিক্টেটারের সাতিশয় দায়িত্ব-জ্ঞান এবং কয়েকটি বিষয়ে বিশিষ্ট জ্ঞান একান্ত প্রয়োজন। কারণ, তাঁহাকে ভ্রান্ত শাসনকার্য্য শোধন করিয়া ডিক্টেটারের একমাত্র দেশের কল্যাণকর কার্য্যসমূহে প্রবৃত্ত করিতে হইবে।

আমাদের ভারতের শাসনকার্য্যও কি এইভাবে প্রধান ভাইসরয়ের অধীনে একজন প্রকৃত ভারতীয় সহকারী-ভাইসরয়ের দ্বারা উন্নীত হইতে পারে না?

ভ্লাডিভষ্টক অভিমুখে মার্কিন জাহাজ

স্বদেশবাসীকে উপবাসে রাখিয়া পরের জন্য খাদ্য সংগ্রহের নির্দ্দেশ দিয়া প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট, যে অদূরদর্শিতার পরিচয় দিয়াছেন, সে কথা আমরা কিছু আগে আলোচনা করিয়াছি। কিছুদিন হইতে পেট্রোল-নিয়ন্ত্রণ ব্যাপারেও তাঁহার নীতিতে এই মূঢ়তাই পরিলক্ষিত হইয়াছে। যুক্ত-রাষ্ট্রের ডেপুটি পেট্রোল-কো-অর্ডিনেটার মিঃ র‍্যালফ ডেভিস্ সেদিন বলিয়াছেন, পূর্ব্বাঞ্চলগুলিতে মাত্র দশ দিনের তেল মজুত আছে; পক্ষান্তরে শোনা গেল, ইতিমধ্যেই নাকি এগারটি পেট্রোলবাহী মার্কিন জাহাজ ভ্লাডিভষ্টকের অভিমুখে রওনা হইয়াছে। জিজ্ঞাসা করি, কিসের জন্য প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টের এই আত্মঘাতী প্রয়াস? ইহা কি শুধু নামকা ওয়াস্তে? একথা আমরা নিঃসংশয়ে স্বীকার করি, স্বনামকে চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিবার ইচ্ছা দৈবদুর্লভ প্রেসিডেন্ট মহোদয়ের আছে। কিন্তু সেই চিরস্মরণীয়তা লাভ এভাবে ঘটিবে না। জগতের সার সমস্যাগুলির সত্যকার প্রতিকারপ্রয়াসী হইয়া তিনি যদি ক্ষুধার্ত্তকে অন্ন, স্বাস্থ্যহীনকে স্বাস্থ্য দিতে এবং জগতকে বিবাদ বিনাশী শিক্ষাদান করিতে সক্ষম হন তবেই তাঁহার পবিত্র নাম মানবহৃদয়ে অমর হইয়া থাকিবে।

কিন্তু আমাদের অনুরোধ শুনিবার মত ধৈর্য্য তাঁহার আছে কি?

ভিসিও জার্ম্মানীর মধ্যে নূতন শান্তিচুক্তি

ভিসি ও বার্লিনের মধ্যে এক নূতন চুক্তিতে স্থির হইয়াছে যে, এখন হইতে ফ্রান্সকে আর পুরাপুরি 'অধিকৃত রাজ্য' বলা চলিবে না। পরস্পরের মধ্যে সামরিক বন্ধুত্ব বশতঃ ইটালীর ন্যায় ভিসিও জার্ম্মানীর 'মিত্ররাজ্য' রূপে পরিগণিত হইবে। স্পষ্টতঃই বুঝা যায় যে, জার্ম্মানী, ইটালী ও ফ্রান্স, ইয়োরোপীয় শক্তির এই নব ত্রিভুজ, নরহত্যা-কলঙ্কিত যুদ্ধের



হের হিটলার

অবসান হইলে অধিকৃত রাজ্যের সম্পদাদি ভাগাভাগি করিয়া লইতে মনস্থ করিয়াছে। কিন্তু আসল কথা হইল, যুদ্ধের পর এই সব রিক্ত-সর্ব্বস্ব রাজ্যগুলিতে ভাগ বসাইবার মত কোন কিছু অবশিষ্ট থাকিবে কি? থাকিলে অবশ্য তাহাদের পক্ষে মঙ্গলেরই কথা। কিন্তু আমরা জানি, সাধারণ অবস্থাতেই পৃথিবী অভাব-তাড়িত; ইহার উপর যুদ্ধের অতিরিক্ত খাদ্য ও অর্থের অপব্যয়ের জন্য, কি বিজয়ী, কি বিজিত সকলেরই অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হইয়া পড়িবে। এক্ষেত্রে, আমাদের মনে হয়, অন্য রাজ্যের ঝুঁকি নিতে গেলে অবস্থা দাঁড়াইবে 'গোদের উপর বিষফোড়ার' মত।

অষ্ট্রেলিয়ার শাসনপরিষদে গোলযোগ

বৃটিশ সমরপরিষদে কাহাকে প্রতিনিধিরূপে প্রেরণ করা যায়, এই নিয়া সম্প্রতি অষ্ট্রেলিয়ার ব্যবস্থাপরিষদের মধ্যে বিসংবাদ উপস্থিত হইয়াছে। গভর্ণমেণ্ট পার্টি প্রস্তাব করিয়াছেন, প্রধান মন্ত্রী মিঃ মেন্‌জিস নিজেই এই প্রতিনিধিত্ব গ্রহণ করুন। পক্ষান্তরে লেবার পার্টি উক্ত প্রস্তাবের আপত্তি করিয়া বলিয়াছেন যে, বর্ত্তমানের জটিল পরিস্থিতিতে মিঃ মেন্‌জিসের ন্যায় যোগ্য ব্যক্তিকে হাতছাড়া করিলে অষ্ট্রেলিয়ার ভাগ্যে সমূহ বিপদের সম্ভাবনা। ওদিকে ইংলণ্ড আবার জেদ ধরিয়া বসিয়াছে, স্বয়ং প্রধান মন্ত্রীকেই সমরপরিষদের প্রতিনিধিরূপে প্রেরণ করিতে হইবে। মিঃ মেনজিসের গমনের উদ্দেশ্য আমাদের কিন্তু বিশেষ বোধগম্য হইতেছে না। অবশ্য গলদপূর্ণ বৃটিশ নীতির তিনি যদি কোনরূপ ফলপ্রদ পরিবর্ত্তন সাধন করিতে পারিতেন, তবে তাঁহার বৃটেন গমন খুবই কার্য্যকরী হইত। কিন্তু সমরপরিষদ তাঁহার সমর্থন ব্যতীত কোন প্রতিবাদ তো বরদাস্ত করিবে না। সুতরাং একজন সাক্ষীগোপাল সাজিয়া লাভ কি? আর জিজ্ঞাসা করি, বৃটেনই বা কি কারণে মিঃ মেনজিসেরই বৃটেন গমনে জেদ ধরিয়াছে? বৃটিশ রাজনীতিজ্ঞগণ চান অষ্ট্রেলিয়ার প্রতিনিধিত্ব; সেজন্য রামা-শ্যামা একজনকে তো নির্ব্বাচন করিলেই হইল। নতুবা এই জাতীয় সঙ্কিক্ষণে শক্তিশালী একটি বিপক্ষদলের মত অগ্রাহ্য করিয়া তাঁহাদের বিরাগভাজন হওয়ার সার্থকতা কি? ইহাও কি বৃটিশ নীতির বর্ত্তমান নিঃস্বতার অন্যতম কারণ?

৺দুর্গা-পূজা

শ্রীসচ্চিদানন্দ ভট্টাচার্য্য

আমাদের বাৎসরিক ৺দুর্গাপূজার দিন আসিয়াছে। মাসিক-পত্রিকা সমূহের পূজার সংখ্যায় ৺দুর্গাপূজা সম্বন্ধে অনেকেই অনেক কথা লিখিবেন। অধিকাংশ পত্রিকাতেই অনেক রকমের ভাবের উচ্ছ্বাস অঙ্কিত হইবে। ঐ উচ্ছ্বাস-সমূহের মূলে ৺দুর্গা অথবা তাঁহার পূজা সম্বন্ধে ভারতীয় ঋষিগণ যে সমস্ত কথা লিখিয়া গিয়াছেন, তৎসম্বন্ধীয় কোন ধারণা অথবা জ্ঞানের পরিচয় আছে কি না তাহা ভাবিতে বসিলে প্রায়শঃ হতাশ্বাস হইতে হয়।

কুব্জিকাতন্ত্রে একটী "দুর্গা-কবচ" আছে। তাহাতে লেখা আছে—

"অজ্ঞাত্বা কবচং দেবি দুর্গামন্ত্রং যো জপেৎ।
স নাপ্নোতি ফলং তস্য পরে চ নরকং ব্রজেৎ॥"

এই আর্য্যাটীর অর্থ—"যিনি দুর্গার কবচ অর্থাৎ ৺দুর্গার প্রাকৃতিক তত্ত্ব কি তাহা না বুঝিয়া দুর্গা-মন্ত্র জপ করেন অর্থাৎ ৺দুর্গার পূজা করেন, তিনি ৺দুর্গা-পূজার যে ফল তাহা লাভ করিতে পারেন না এবং এতাদৃশ অন্যায় পূজার ফলে তাঁহাকে নরকে যাইতে হয়, অর্থাৎ নানারকম ইচ্ছার দ্বারা বিতাড়িত ও বিক্ষুব্ধ হইয়া দিক্-বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হইয়া নাবিকহীন নৌকার মত ঘোরা-ফেরা করিতে হয়।"

উপরোক্ত "দুর্গা-কবচ"টীর অপর এক স্থানে লেখা আছে—

"যো জপেৎ কবচং দেহে তস্য বিঘ্নং ন কুত্রচিৎ।
ভূতপ্রেতপিশাচেভ্যো ভয়ং তস্য ন বিদ্যতে॥
রণে রাজকুলে বাপি সর্ব্বত্র বিজয়ী ভবেৎ।
সর্ব্বত্র পূজামাপ্নোতি দেবীপুত্র ইব ক্ষিতৌ॥"

এই আর্য্যা দুইটীর অর্থ—

যিনি দুর্গার কবচকে দেহের মধ্যে ন্যস্ত করেন অর্থাৎ ৺দুর্গার প্রাকৃতিক কার্য্যের ফলে জীবের বিবিধ ইচ্ছার উৎপত্তি হইতেছে কি করিয়া তাহা স্বকীয় দেহের মধ্যে উপলব্ধি করিবার চেষ্টা করেন, তাঁহার কখনও কোনও বিঘ্নের সম্মুখীন হইতে হয় না। ভূত অর্থাৎ চর ও অচর অথবা হিংস্র ও অহিংস্র জীব, প্রেত অর্থাৎ অসদিচ্ছা, পিশাচ অর্থাৎ অসদিচ্ছা তাড়িত কুকার্য্য—এই তিনটীর জন্য তাঁহার কোন ভয় উপস্থিত হয় না। রণে-ই হউক অথবা রাজকুলেই হউক অর্থাৎ বাহিরের কার্য্যেই হউক, কোন কিছু বুঝিবার কার্য্যেই হউক, সর্ব্বকার্য্যেই তিনি সাফল্য লাভ করিয়া থাকেন। দেবী-পুত্রের ন্যায় অর্থাৎ কোন্ প্রাকৃতিক কার্য্যের ফলে জীবের আপনা হইতেই কোন্ ইচ্ছার উৎপত্তি হইতেছে, তাহা উপলব্ধি করিবার সামর্থ্যের জন্য তিনি পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বত্রই সমাদর লাভ করিয়া থাকেন।

কুব্জিকাতন্ত্রোক্ত দুর্গা-কবচটী হইতে আর কিছু বুঝা সম্ভবযোগ্য না হইলেও এইটুকু বুঝা যাইবে যে, ঠিক ঠিক ভাবে দুর্গা-পূজা করিতে জানিলে এবং করিলে মানুষ অনেক কিছুর সামর্থ্য লাভ করিতে পারে। অন্যদিকে দুর্গা-পূজা কি, তাহা সঠিক ভাবে না জানিয়া অন্যায় ভাবে পূজা করিলে মানুষের অনেক রকমের কষ্ট পাইতে হয়।

ইহার পর, যখন দেখা যায় যে, বাংলার মধ্যবিত্তগণের অনেকের বাড়ীতেই ৺দুর্গা-পূজাও হইতেছে, আর সঙ্গে সঙ্গে অনেক বাড়ীতেই নানারকমের কষ্টই বৃদ্ধি পাইতেছে, তখন ইহা না ভাবিয়া পারা যায় না যে, বর্ত্তমানকালে আমাদের ৺দুর্গা-পূজায় কোন না কোন রকমের দুষ্টতা অথবা আবর্জ্জনা আসিয়া প্রবেশ লাভ করিয়াছে। যদি এই সিদ্ধান্ত অস্বীকার করা যায়, তাহা হইলে ধরিয়া লইতে হয় যে, ভারতীয় ঋষিগণ তাঁহাদিগের ৺দুর্গাপূজায় কোন তত্ত্বকথা বলেন নাই। তাঁহারা কেবল মানুষের উৎসবের সুবিধার জন্য এতাদৃশ পূজার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। ঋষিদিগের যে-কোন গ্রন্থ অধ্যয়ন করিলে দেখা যাইবে যে, মানুষ যাহাতে রাগ-দ্বেষের সংযম অভ্যাস করে তাহার ব্যবস্থা করা তাঁহাদিগের সর্ব্বপ্রথম কার্য্য। যাঁহারা রাগ-দ্বেষের সংযমের এত অনুরাগী তাঁহারা যে উৎসবের আয়োজনের জন্য পূজা-প্রথা প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন ইহা বলা চলে না, কারণ, রাগ দ্বেষের সংযম ও উৎসব

এই দুইটি ব্যাপার পরস্পর বিরুদ্ধ। কাজেই ৺দুর্গাপূজা যে কোন উৎসব অথবা উচ্ছ্বাসের জন্ম নহে, তাহা অনুমানের দ্বারাও মনে করা যাইতে পারে।

আমরা সর্ব্ব-প্রথমে, ভারতীয় ঋষির মতানুসারে ৺দুর্গা-পূজার ব্যাপারটী কি তাহার আলোচনা করিব। ৺দুর্গা-পূজার আসল ব্যাপারটী কি তাহা জানিতে হইলে, ইহা বলা বাহুল্য যে, "দুর্গা" বলিতে কি বুঝায় এবং "পূজা" বলিতে কি বুঝায়, তাহা না জানা থাকিলে "দুর্গা-পূজা" বলিতে কি বুঝায় তাহা ঠিক করা সম্ভব নহে। কাজেই, দুর্গা-পূজার আসল ব্যাপারটী কি তাহার আলোচনা করিতে হইলে সর্ব্ব-প্রথম আমাদিগকে "দুর্গা" ও "পূজা" এই দুইটী শব্দের অর্থ কি তাহা স্থির করিতে হইবে।

"দুর্গা" শব্দের অর্থ সম্বন্ধে ঋষিগণ কি বলিয়াছেন তাহার অনুসন্ধান করিলে দেখা যাইবে যে, তাঁহাদিগের মতে—

দুর্গেতি দৈত্যবচনোঽপ্যাকারো নাশবাচকঃ।
দুর্গং নাশয়তি যা নিত্যং সা দুর্গা পরিকীর্ত্তিতা॥

এই আর্য্যাটীর অর্থ—

"দুর্গ" এই শব্দটী "দৈত্য-বচন" অর্থাৎ যাহার মধ্যে দৈত্যের কার্য্য হইয়া থাকে এবং যাহা স্থূল চক্ষে দেখা যায়। আর 'আ' শব্দটী নাশবাচক। দুর্গের দুর্গত্ব নাশকরা যাঁহার নিত্য-কার্য্য তাঁহাকে দুর্গা বলা হয়।

পূজা-শব্দটীর অর্থ—"উপলব্ধি অথবা যোগের সহায়তায় নিখুঁত জ্ঞানলাভ করিবার কার্য্য।"

এতদনুসারে "দুর্গা-পূজা" শব্দটীর অর্থ হয় "দুর্গের দুর্গত্ব নাশকরা যাঁহার নিত্য-কার্য্য তাঁহার সম্বন্ধে উপলব্ধি অথবা যোগের সহায়তায় নিখুঁত জ্ঞানলাভ করিবার কার্য্য।"

উপরোক্ত অর্থ অনুধাবন করিতে বসিলে দেখা যাইবে যে, "দুর্গ" কাহাকে বলে এবং দুর্গকে নাশ করা কাহার নিত্য কার্য্য তাহা না বুঝিতে পারিলে "দুর্গা-পূজার" আসল ব্যাপারটী কি তাহা বুঝিয়া উঠা সম্ভব হয় না।

আগেই দেখান হইয়াছে যে, দুর্গ-শব্দটীর অর্থ "দৈত্য-বচন" অর্থাৎ যাহার মধ্যে দৈত্যের কার্য্য হইয়া থাকে। কাজেই দুর্গ-শব্দটী ভাল করিয়া বুঝিতে হইলে—দৈত্য-শব্দটীর অর্থ বুঝিতে হইবে।

দৈত্য-শব্দটীর অর্থ কি তাহার অনুসন্ধান করিতে বসিলে দেখা যাইবে যে, ঋষিগণ দৈত্য এবং অসুর এই দুইটী শব্দই একার্থে ব্যবহার করিয়াছেন এবং উহার বিপরীত অর্থ-বাচক শব্দ—"দেব।"

যে যে গ্রন্থে সৃষ্টিতত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে, তাহার প্রত্যেক গ্রন্থেই যে "দেব" ও "দৈত্য" অথবা "অসুর" এই শব্দ দুইটীর ব্যবহার আছে, তাহা একটু লক্ষ্য করিলেই দেখা যাইবে। অথচ আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় যে, এই দুইটী শব্দের অর্থ যে কি তাহা ঋষিগণ কোন স্থানেই পরিষ্কার করিয়া বলেন নাই। বস্তুতঃ শব্দের অর্থ কি উপায়ে গ্রহণ করিতে হয় তৎসম্বন্ধে ঋষিগণ বেদাঙ্গে এত কথা বলিয়াছেন যে, সেই সমস্ত কথা পড়িলে আর কোন কথার অর্থ পরিস্ফুট হইতে বাকী থাকে না। কাজেই আপাতদৃষ্টিতে যাহাই মনে হউক না কেন, "দেব" ও "দৈত্য" এই দুইটী শব্দের অর্থ বেদাঙ্গোক্ত উপায়ে অনায়াসেই উদ্ধার করা যাইতে পারে।

সৃষ্টি-তত্ত্ব সম্বন্ধীয় মূল কথাগুলি অসিদ্ধ মানুষ-গুলির বোধগম্য করিবার উপযোগী ভাবায় লেখা আছে—"সূর্য্য-সিদ্ধান্তে।" ঐ গ্রন্থের ভূগোলাধ্যায়ে প্রশ্ন করা হইয়াছে—

"দেবাসুরাণাং অন্যোন্যং অহোরাত্রং বিপর্য্যয়াৎ।
কিমর্থং তৎ কথং বা স্যাৎ ভানোর্ভগণপূরণাৎ॥"

এই শ্লোকটীর অর্থ—

"দেবাসুরগণের পরস্পরের বিপর্য্যয়ে অহোরাত্রের উদ্ভব হয় কি করিয়া? সূর্য্যের ভগণ-পূরণ পর্য্যন্তই বা উহারা কোন্ পদ্ধতিতে সম্বন্ধবিশিষ্ট হইয়া থাকে।"

এই প্রশ্নের জবাব দিবার জন্য যে যে কথার উত্থাপন করা হইয়াছে, সেই কথাগুলি বুঝিতে পারিলে "দেব" ও "অসুর" এই দুইটী শব্দের অর্থ পরিষ্কার হইয়া যায়।

ঐ সমস্ত কথা এইখানে বলা সম্ভবযোগ্য নহে। যাঁহারা বিশদ ভাবে বুঝিতে চাহেন, তাঁহাদিগকে মূলগ্রন্থ যথাযথ অর্থে অধ্যয়ন করিতে হইবে। আমাদিগের বক্তব্য বুঝাইবার জন্য যে কথাকয়টী না বলিলে নয়, আমরা কেবলমাত্র সেই কথা-কয়টী বলিব।

সূর্য্যসিদ্ধান্তে দেখান হইয়াছে যে, এই অণ্ডাকারের ভূ-মণ্ডল (অর্থাৎ বর্ত্তমানকালের পাঁচটী মহাদেশ ও পাঁচটী মহাসমুদ্রমণ্ডিত স্থান) একটী মনুষ্যাকারের আবেষ্টনীর দ্বারা আবদ্ধ। ঐ আবেষ্টনীর মূর্দ্ধাংশ নীলাকাশরূপে আমা-

দিগের স্থূল-চক্ষুর সম্মুখে বিদ্যমান রহিয়াছে। জ্যোতিষযোগ-নিয়মের সাহায্যে উহার অভ্যন্তরাংশও সাধকগণের পক্ষে দেখা সম্ভব হয়। মানুষের পেটের মধ্যে যেরূপ পাকস্থলী, নাড়ী-ভুঁড়ি ও শূন্যাংশ বিদ্যমান থাকে, সেইরূপ ঐ মনুষ্যাকারের আবেষ্টনীর মধ্যে এই ভূ-মণ্ডল বিদ্যমান আছে। মনুষ্যের অবয়বে যেরূপ শূন্যাংশ, বায়ু, তেজঃ, রস, মেদ, অস্থি, মজ্জা, বসা, মাংস, রক্ত, চর্ম্ম বিদ্যমান থাকে, সেইরূপ ঐ আবেষ্টনীর উপাদানেও বহুবিধ পদার্থ বিদ্যমান আছে। মানুষের অবয়বে যেরূপ কতকগুলি কার্য্য বহির্ভাগ হইতে উত্থিত হইয়া অন্তর্ভাগাভিমুখে চলিতেছে, সেইরূপ ঐ আবেষ্টনীর অবয়বেও কতকগুলি কার্য্য বহির্ভাগ হইতে উত্থিত হইয়া অন্তর্ভাগাভিমুখে চলিতেছে। মানুষের অবয়বে যেরূপ কতকগুলি কার্য্য অন্তর্ভাগ হইতে উত্থিত হইয়া বহির্ভাগাভিমুখে চলিতেছে, সেইরূপ ঐ আবেষ্টনীর অবয়বেও কতকগুলি কার্য্য অন্তর্ভাগ হইতে উত্থিত হইয়া বহির্ভাগাভিমুখে চলিতেছে। মনুষ্যের অবয়ব ও উপরোক্ত আবেষ্টনীর অবয়ব—এই দুইটীর মধ্যে তফাৎ এইটুকু যে—মনুষ্যাবয়বের বহিরাংশ সাধারণ চক্ষুর দ্বারাও দেখিতে পাওয়া যায়, আর আবেষ্টনীর অবয়বের বহিরাংশ সাধারণ চক্ষুর দ্বারা দেখিতে পাওয়া যায় না। উহা দেখিতে হইলে সাধনার দ্বারা চক্ষুকে দিব্য-চক্ষু করিয়া তুলিতে হয়। আর একটী তফাৎ এই যে, মনুষ্যাবয়বের অন্তর হইতে উত্থিত হইয়া যে কার্য্যগুলি বহির্ভাগাভিমুখে চলিতে থাকে, তাহা যেরূপ মনুষ্যাবয়বের বহিরাংশের প্রত্যেক স্থলে উপনীত হইতে পারে, উপরোক্ত আবেষ্টনীর অবয়বের অন্তর হইতে উত্থিত হইয়া যে কার্য্যগুলি বহির্ভাগাভিমুখে চলিতে থাকে তাহা সেইরূপ আবেষ্টনীর অবয়বের বহিরাংশের প্রত্যেক স্থলে উপনীত হইতে পারে না।

সূর্য্যসিদ্ধান্তে আরও দেখান হইয়াছে যে, মনুষ্যাবয়বের বহির্ভাগ হইতে উত্থিত হইয়া অন্তর্ভাগাভিমুখে যে কার্য্যগুলি চলিতেছে সেই কার্য্যগুলির জন্যই মানুষের রক্ষা ও বৃদ্ধি সাধিত হইয়া থাকে। আর, অন্তর্ভাগ হইতে উত্থিত হইয়া বহির্ভাগাভিমুখে যে কার্য্যগুলি চলিতেছে, সেই কার্য্যগুলির জন্যই মানুষের ক্ষয় ও পরিবর্ত্তন সাধিত হয়। এইজন্যই ঋষিগণ মানুষকে অন্তর্মুখীন হইবার উপদেশ দিয়াছেন। ঋষিগণ আরও দেখাইয়াছেন যে, মানুষ যতই অন্তর্মুখীন হইবার চেষ্টা করুক না কেন, তাহার বহির্মুখীনতা কিছু না কিছু পরিমাণে থাকিবেই এবং সেইজন্য মানুষ কখনও ক্ষয় ও পরিবর্ত্তনের হাত হইতে নিজেকে সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করিতে পারে না। অন্তর্মুখীন হইবার চেষ্টা করিলে লাভ হয় এইটুকু যে, তাহার রক্ষা ও বৃদ্ধি দীর্ঘস্থায়ী হইয়া থাকে এবং সে দীর্ঘ-যৌবন ও দীর্ঘ-জীবন সম্পন্ন হইয়া সুস্থ শরীরে ও সুস্থ মনে কালাতিপাত করিতে পারে। আর উহার চেষ্টা না করিলে অকাল বার্দ্ধক্যে, অসুস্থতায় ও অশান্ত মনে জর্জ্জরিত হইয়া অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

মানুষের এই অন্তর্মুখীনতা ও বহির্মুখীনতার কারণ উপরোক্ত আবেষ্টনীর অন্তর্মুখীনতা ও বহির্মুখীনতা।

মানুষের বহির্মুখীনতা যেরূপ বহিরাংশের সর্ব্বস্থল-পরিব্যাপী, আবেষ্টনীর বহির্মুখীনতা সেইরূপ তাহার বহিরাংশের সর্ব্বস্থলপরিব্যাপী হয় না। ইহার ফলে মানুষের সর্ব্বাঙ্গ যেরূপ ক্ষয় ও পরিবর্ত্তনশীল হয়, আবেষ্টনীর সর্ব্বাংশ সেইরূপ ক্ষয় ও পরিবর্ত্তনশীল হয় না তাহার কতকাংশ অক্ষয় ও অপরিবর্ত্তনশীল থাকিয়া যায়।

প্রকৃতিজাত প্রত্যেক বস্তুর সর্ব্বাংশে যেরূপ দ্বিবিধ কার্য্য বিদ্যমান থাকে, মনুষ্যের দ্বারা প্রস্তুত কোন কৃত্রিম বস্তুর সর্ব্বাংশে সেইরূপ দ্বিবিধ কার্য্য বিদ্যমান থাকে না।

এই বিশ্বের আবেষ্টনীর ও সর্ব্ববিধ প্রকৃতিজাত বস্তুর মধ্যে যে অন্তর্মুখীন ও বহির্মুখীন এই দ্বিবিধ কার্য্য চলিতেছে, তাহা অনুধাবন করিতে পারিলে দেব ও দৈত্য কাহাকে বলে এবং কোন্‌টীর ধর্ম্ম কি, তাহা বুঝা সহজসাধ্য হয়। এই বিশ্বের আবেষ্টনীর ও সর্ব্ববিধ প্রকৃতিজাত বস্তুর মধ্যে যে কার্য্যগুলি বহিরাংশ হইতে উত্থিত হইয়া অন্তরাভিমুখে চলিতেছে এবং বৃদ্ধি ও রক্ষাকার্য্য সাধিত করিতেছে সেই কার্য্যগুলিকে ঋষিগণ "দেব" এই নাম প্রদান করিয়াছেন। *

উপরোক্ত "দেব" ও "দৈত্য" নামক কার্য্যগুলি যথাযথ ভাবে অনুধাবন করিতে পারিলে দেখা যাইবে যে, "দেব" ও

* প্রকৃত্যন্তর্গতো দেবো বহিরন্তশ্চ সর্ব্বগঃ।
সূর্য্য-সিদ্ধান্ত, ভূঃ অঃ ১৩ শ্লোক।

যে কার্য্যগুলি অন্তরাংশ হইতে উত্থিত হইয়া বহিরাংশাভিমুখে চলিতেছে এবং ক্ষয় ও পরিবর্ত্তন সাধন করিতেছে সেই কার্য্যগুলিকে ঋষিগণ "অসুর" অথবা "দৈত্য" এই নাম প্রদান করিয়াছেন।

"দৈত্য" অসংখ্য হইয়া থাকে এবং তাহারা আকাশমণ্ডল ও জীবমণ্ডল উভয়েই বিদ্যমান থাকে।

এক্ষণে আবার দুর্গ-শব্দটীর অর্থ অনুধাবন করা যাউক। স্মরণ করা যাউক যে, যাহার মধ্যে দৈত্যের কার্য্য হইয়া থাকে এবং যাহা স্থূল চক্ষে দেখা যায়, তাহার নাম "দুর্গ"। ইহা হইতে বুঝিতে হইবে যে, যে-সমস্ত বস্তুর অবয়বের বহিরাংশ দেখিতে পাওয়া যায় এবং যাহার মধ্যে অন্তরাংশ হইতে বহিরাংশাভিমুখে কার্য্য হইয়া থাকে, তাহাকে "দুর্গ" নাম দেওয়া যাইতে পারে। কাযেই আকাশমণ্ডলের কোন অংশকে দুর্গ বলা চলে না, কারণ, তাহার অবয়ব সীমাবদ্ধ নহে এবং সেইজন্য তাহার বহিরাংশ স্থূল চক্ষে দেখিতে পাওয়া যায় না। শরীর-বিশিষ্ট যে কোন প্রকৃতিজাত বস্তুকেই "দুর্গ" বলা যায়। মানুষের দ্বারা প্রস্তুত কোন কৃত্রিম বস্তুকে "দুর্গ" বলা চলে না; কারণ, তাহার কোনটীর অন্তর হইতে বহির্ভাগের সর্ব্বাংশাভিমুখী কোন কার্য্য প্রতিনিয়ত বিদ্যমান থাকে না।

ইহার পর "দুর্গা" শব্দটী বুঝিতে হইলে কি লইয়া দুর্গের দুর্গত্ব অর্থাৎ কোন্ হেতু জীবের বহির্মুখীন কার্য্যসমূহের উৎপত্তি হয়, তাহা বুঝিতে হইবে; কারণ, দুর্গের দুর্গত্ব নাশ করা যাঁহার নিত্যকার্য্য তাঁহাকে "দুর্গা" বলা হয়।

আগেই বলা হইয়াছে যে, এই বিশ্বের আবেষ্টনীর মধ্যে বহির্মুখীন কার্য্যসমূহ আছে বলিয়াই জীবের মধ্যেও বহির্মুখীন কার্য্যসমূহ বিদ্যমান থাকে। কাযেই বলা যাইতে পারে যে, এই বিশ্বের আবেষ্টনীর বহির্মুখীনতা দুর্গের দুর্গত্ব উদ্ভব করে।

এই বিশ্বের আবেষ্টনীর বহির্মুখীনতাই যে দুর্গের দুর্গত্ব উদ্ভব করে তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই কিন্তু এই বিষয়ক তত্ত্ব সর্ব্বতোভাবে পরিজ্ঞাত হইতে পারিলে দেখা যাইবে যে, দুর্গের দুর্গত্ব তাহার ইচ্ছার তামসিকতার উপর প্রতিষ্ঠিত। দুর্গের ইচ্ছার তামসিকতা তাহার দুর্গত্বের মুখ্য কারণ এবং ঐ দুর্গত্বের গৌণ কারণ এই বিশ্বের আবেষ্টনীর বহির্মুখীনতা।

কাযেই বুঝিতে হইবে যে, "দুর্গা" বলিতে বুঝায় সেই দেবীকে অথবা এই বিশ্বাবেষ্টনীর ও জীবসমূহের অন্তর্মুখীন সেই কার্য্যসমূহকে, যে কার্য্যসমূহ প্রকৃতিজাত বস্তুগুলির তামসিক ইচ্ছাসমূহের নাশ করিয়া থাকে। দুর্গার প্রধান কার্য্য বহির্মুখীন কার্য্যসমূহকে অর্থাৎ অসুর অথবা দৈত্যকে পরাভূত করা। তিনি প্রতিষ্ঠিত থাকেন সিংহ অর্থাৎ পশু-রাজের (অথবা যাহার জন্য জীবের পশুত্ব বিকশিত হইয়া থাকে তাহাকে সংযত করেন যিনি তাহার) উপর। যাহার জন্য জীবের পশুত্ব বিকশিত হইয়া থাকে তাহাকে কে সংযত করে তাহার অনুসন্ধান করিলে দেখা যাইবে, যাহার জন্য জীবের ইচ্ছার উৎপত্তি হয় তৎসম্বন্ধীয় জ্ঞান (অথবা ইচ্ছার সদ্ভাব) জাগ্রত থাকিলে সর্ব্বদাই সদিচ্ছাসমূহের কার্য্যপ্রবৃত্তি উদ্ভূত হয় এবং তখন তামসিক ইচ্ছা বিলুপ্ত হইয়া যায়। তখন দশটী ইন্দ্রিয় মা-এর দশটী হস্তরূপে ভ্রূযুগল মধ্যে অবস্থিত মনের দ্বারা সৎভাবে পরিচালিত হইতে থাকে। সদিচ্ছা-সমূহের কার্য্যপ্রবৃত্তি উদ্ভব হইলে মানুষ অন্তর্বিজ্ঞান ও বহির্বিজ্ঞানের অধিকারী হইতে পারে এবং তখন তাহার পক্ষে একদিকে যেরূপ দেব-সেনাপতি হওয়া সম্ভব হয়, সেইরূপ আবার গণপতি হওয়াও সাধ্যায়ত্ত হয়।

দুর্গাপ্রতিমার দিকে চাহিয়া দেখিলেও দেখা যাইবে যে, একস্তরে দুর্গার একদিকে রহিয়াছেন সরস্বতী অথবা অন্তর্বিজ্ঞানের প্রতীক এবং অন্যদিকে রহিয়াছেন লক্ষ্মী অথবা বহির্বিজ্ঞানের প্রতীক।

অন্যস্তরে দুর্গার একদিকে রহিয়াছেন কার্ত্তিকেয় অর্থাৎ দেবসেনাপতি এবং অন্যদিকে রহিয়াছেন গণেশ অর্থাৎ গণপতি।

এককথায় দুর্গাপূজাকে "ইচ্ছাবিজ্ঞানের উপলব্ধি" বলা যাইতে পারে। কেন মানুষের ইচ্ছার উৎপত্তি হইতেছে, কেনই বা মানুষ অসদিচ্ছাপ্রণোদিত হয় এবং কি করিলে অসদিচ্ছাকে সংযত করিয়া মানুষ সদিচ্ছাপ্রণোদিত কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে পারে, তাহা দেখান দুর্গাপূজার প্রধান উদ্দেশ্য।

পূজাঙ্গে যথাযথ অর্থে প্রবিষ্ট হইতে পারিলে দেখা যাইবে যে, উহাতে আছেও তাহাই। এই বিজ্ঞান যে কত প্রয়োজনীয় তাহা কি পাঠকগণকে বলিয়া দিতে হইবে? এই বিজ্ঞান একমাত্র ভারতীয় ঋষির গ্রন্থেই লিপিবদ্ধ আছে। পাশ্চাত্যগণ এখনও এই বিজ্ঞানে প্রবিষ্ট হইতে পারেন নাই।

কে এই বিজ্ঞান নষ্ট করিল? ভারতীয় ব্রাহ্মণ, পণ্ডিত ও পুরোহিতগণ কি ইহার জন্য সর্ব্বাধিক দায়ী নহেন?

পাঠকগণ, এখনও মাকে চিনিতে শিখুন। তাঁহাকে চিনিতে পারিলে দেখিতে পাইবেন যে, আপনাদিগকে রক্ষা করিবার জন্য তাঁহার অভয় হস্ত সর্ব্বদাই প্রসারিত।

আমার পাগলামী ও দুর্গা-পূজা

—জনৈক পাগল

প্রথম অধ্যায়

আমি আমার পাগলামী ও দুর্গা-পূজার কথা লিখিতে বসিয়াছি।

আমি মানুষটা কি রকমের তাহা না বলিয়া দিলে আমার গল্পটী কিছুতেই জমিতে পারে না। কাজেই সর্ব্বপ্রথমে আমার কথা বলিতে হইবে।

আমার এই উপাখ্যানের প্রথম অধ্যায়ের সময়ে আমি একটী পঞ্চাশ বছরের মানুষ। বাহির হইতে দেখিতে বৃদ্ধের মতনই দেখায়। বৃদ্ধের পাওনা, ভক্তি ও শ্রদ্ধা, বালক ও যুবকগণ আমাকে সময় সময় দিয়া থাকে। যখন তাহাদের মন যোগান কথা আমার কলম অথবা মুখ হইতে বাহির হয়, তখন তাহাদের এই ভক্তি ও শ্রদ্ধা, আমার ভাগ্যে জোটে। কিন্তু আমি যখন তাহাদের মনের মতন কথা কইতে পারি না, খাপছাড়া সুর যখন আমার ভিতর হইতে বাহিরে আসিতে আরম্ভ করে, তখন আর আমি তাহাদের শ্রদ্ধার পাত্র থাকি না। তখন তাহারা আমাকে তাচ্ছিল্য দেখায়। আমিও যে একটা মানুষ, মানুষের কথা শুনিবার দায়িত্ব থাকিলে আমার কথাও যে শুনিবার দায়িত্ব তাহাদের আছে, তাহা তাহারা ভুলিয়া যায়। তাহাদের হাব-ভাব দেখিলে আমার মনে নানা রকমের প্রশ্ন আসে। নিজেকে জিজ্ঞাসা করি—আমি কি তবে সত্যই পাগল?

আমাকে বৃদ্ধের মত দেখাইলেও, আমার সম-বয়স্কগণও আমাকে "বুড়ো" বলিতে চান না। তাঁহাদের আপত্তি, আমাকে "বুড়ো" বলিলে তাঁহারাও বুড়ো হইবেন। বুড়ো হইতে যেন সকলেরই আপত্তি।

আমাকে কে কি বলেন তাহা শুনিয়া আমি মানুষটা যে কি রকমের তাহা ঠিক করিবার অনেক চেষ্টা অনেক দিন ধরিয়া করিয়াছি। কিন্তু তাহাতে কিছুই ঠিক করিতে পারি না। গোলোক-ধাঁধার ভিতর থাকিয়া যাই।

নিজের কাছে ফিরিয়া দাঁড়াই। নিজেকে জিজ্ঞাসা করি। কিন্তু সঠিক জবাব পাই না।

পঞ্চাশ বছরের দীর্ঘজীবনে স্বকীয় বিলাসের পান-ভোজন, বসন-ভূষণ প্রভৃতি বিলাসের পরিধান, নিদ্রার উপাসনা, কাম ও কামিনীর উপভোগ, প্রকৃতির ডাক, বাহ্য-শৌচ ছাড়া মানুষের কোন্ কাযে আসিলাম, মানুষের কোন্ কাযে আসিবার আশাই বা আছে, তাহা ভাবিতে ভাবিতে হতাশা যখন ঘিরিয়া ফেলে, তখন নিজেকে বৃদ্ধই মনে করি। সঙ্গে সঙ্গে মরণই একমাত্র আরাধ্য হইয়া দাঁড়ায়।

কিন্তু কষ্ট, তাহাতেও এক-নিষ্ঠ থাকিতে পারি না!

পরক্ষণেই যে আবার মনে হয়, আমার জ্ঞানও আছে, কর্ম্ম-শক্তিও আছে। আশা-কুহকিনী তখন আমাকে অনেক কিছুর পশ্চাতে ছুটাইয়া দেয়। তখন আর আমার বার্দ্ধক্য থাকে না। আত্ম-পরীক্ষার প্রবৃত্তি তখন যে কোথায় চলিয়া যায় তাহার নাগাল পাই না! তখন আমি পূর্ণ যৌবন সম্পন্ন একটী মানুষ হইয়া দাঁড়াই। নিজেকে যুবক বলিয়া ভাবিতে আরম্ভ করি। পঞ্চাশ বছরে আবার কাম ও কামিনী মূর্ত্তিমতী আরাধনার সামগ্রী হইয়া দাঁড়ায়। কল্পনার পৌষে ঘুরিতে ফিরিতে আরম্ভ করি। বিরাম নাই, কেবল ঘোরা-ফেরা। এই শুধু মনের ঘোরা-ফেরা। কারণ, কায়িক অসামর্থ্য আসিয়াছে। মনের ঘোরা-ফেরাতেও ক্লান্তি আছে। ক্লান্তি আসিয়া কাণে কাণে বলিয়া দেয়—এ কি প্রহেলিকা! পূর্ব্বক্ষণে যে আমি নিজেকে বৃদ্ধ বলিয়া মনে করিয়াছি, মরণের আরাধনা করিয়াছি—সেই আমি পরক্ষণেই নিজেকে যুবক বলিয়া মনে করিতেছি, কাম ও কামিনীর যাচ্ঞা আরম্ভ করিয়াছি। নিজের উপর ঘৃণা হয়, নিজেকে ছেলেমানুষ বলিয়া মনে করিতে আরম্ভ করি। সে ঘৃণাও বেশীক্ষণ স্থায়ী হয় না। মরণের দুয়ারের দিকে যে ধেই-ধেই করিয়া ছুটিতেছি তাহা আবার মনে আসে।

ছাই-পাঁশ কত যে কি ভাবি, তাহা কিছুই ঠিক করিতে পারি না। কখনও ব্যাসের মত বিজ্ঞ হইবার আশা হৃদয়ে জাগিয়া উঠে। আবার কখনও তাঁহার শিষ্যের উপযোগী হইবার

সামর্থ্য নাই বলিয়া হতাশায় ঝঞ্ঝাবাত নাড়া-চাড়া দিয়া চলিয়া যায়।

নিজের কাছে ফিরিয়া দাঁড়াইয়াও আমি যে কি রকমের মানুষ তাহা সঠিকভাবে ঠিক করিতে পারি না।

সময় সময় সিদ্ধান্ত হয়—আমি সত্যই একটা পাগল। যাঁহারা আমাকে পাগল বলেন তাঁহারাই ঠিক সত্য-জ্ঞ এবং সত্যবাদী।

আমি নিজেকে পাগল ভাবিয়াও সুস্থির থাকিতে পারি না। প্রশ্ন উপস্থিত হয়—আমার এ পাগলামী—একই বয়সে কখনও নিজেকে ছেলে মানুষ ভাবা, কখনও যুবক বলিয়া মনে করা, আবার কখনও বৃদ্ধত্বে হতাশ হইয়া উঠা—একই বয়সে একই সময় পরস্পর বিরুদ্ধভাব কোথা হইতে আইসে?

তন্ন-তন্ন করিয়া খুঁজিতে আরম্ভ করি। এখনও পরিষ্কার জবাব পাই নাই। বই পড়া বিদ্যার সঙ্গে সর্ব্ব-ব্যাপী প্রকৃতির ঘটনা মিলাইতে আরম্ভ করিলে একটা আবছা-আবছা জবাব মনের মধ্যে আইসে। সেই জবাব ঠিক কিনা তাহা এখনও বলিতে পারি না। মন বলে—আরও সাধনা চাই। প্রথমতঃ, শাম্ভবী বিদ্যার সাধনা—সে বড় রহস্যময় গোপনীয় সাধনা। তাহাতে বিশ্বের মূর্দ্ধার সহিত নিজের মূর্দ্ধা মিলাইতে হয়, বিশ্বের মেরুদণ্ডের সহিত নিজের মেরুদণ্ড, বিশ্বের পূর্ব্বের সহিত নিজের পূর্ব্ব, বিশ্বের পশ্চিমের সহিত নিজের পশ্চাৎ, বিশ্বের উত্তরের সহিত নিজের উত্তর, বিশ্বের দক্ষিণের সহিত নিজের দক্ষিণ মিলাইতে পারিলে শাম্ভবী বিদ্যায় প্রবিষ্ট হওয়া যায়। শাম্ভবী বিদ্যায় ঐ প্রবেশের দ্বারেই কত রহস্য দেখা যায়। বিশ্বের মেরুদণ্ডের সহিত নিজের মেরুদণ্ড মিলন! কাহার নাম নিজের মেরুদণ্ড, আর কাহারই বা নাম বিশ্বের মেরুদণ্ড? এই দুই মেরুদণ্ড চিনিতেও যে অনেক সাধনা লাগে! তাহার পর, বিশ্বের চারি দিক! গোলোকের চারি দিক স্থির করা অত্যন্ত দুরূহ, তাহাতেও অনেক সাধনার প্রয়োজন হয়। কেহ কেহ বলেন, শাম্ভবী বিদ্যা প্রকাশ করা সঙ্গত নহে। আমি তাঁহাদের কথা বুঝি না এবং মান্য করি না। যাহা সকলে মিলিয়া উপভোগ করা যায় না, তাহা যতই আদরের ও আকাঙ্ক্ষার হউক না কেন, তাহা আমি চাই না। আমার প্রাণ চায়, শাম্ভবী বিদ্যা আমার ভাইদিগকে বুঝাইতে। কিন্তু কই, আমার সাধের সাথী, আমার ব্যথার ব্যথী ভাইও আমি চোখের সামনে দেখি না। আমি যাহাকে ভাই বলিতে চাই, সেও আমাকে ভাই বলে না। মুখে মুখে কু-অভ্যাস বশতঃ ইহার জন্য অপরের ঘাড়ে দোষ চাপাই কি না তাহা আমার স্মরণ নাই। এই অপরাধের দায়িত্ব যে আমার ছাড়া আর কাহারও নহে তাহা আমার স্মৃতিপথে আছে। ভাইএর মত ভাই হইয়া ভাইকে ডাকিতে পারিলে ভাইএরা যে আমার দিকে পিছন ফিরাইতে পারিবে না সে বিশ্বাস আমার পাগলামীর মধ্যেও বিদ্যমান আছে।

শাম্ভবী বিদ্যার যতটুকু আমার পাগলামীর মধ্যে অর্জ্জন করা সম্ভব হইয়াছে তাহা যথাযথভাবে প্রকাশ করিবার ভাষা আমি এখনও লাভ করিতে পারি নাই। উহা প্রকাশ করিবার ভাষা আমার কাছে পৌঁছাইলে আপনা হইতেই উহা প্রকাশিত হইবে।

আপনা হইতেই মানুষের নিজের প্রাণে বিবিধ কার্য্য ও বিবিধ কারণ সম্বন্ধে কতকগুলি প্রশ্নের উদ্ভব হয় এবং মানুষ নিজেই ঐ সমস্ত প্রশ্নের জবাব নিজেকে দিয়া থাকে।

বিবিধ-প্রশ্নের যে সমস্ত জবাব মানুষ নিজেই নিজেকে দিয়া থাকে, সেই সমস্ত জবাবের মধ্যে সামঞ্জস্য আছে কি না তাহা পরীক্ষা করিতে আরম্ভ করিলে দেখা যায় যে, প্রায়শঃ ঐ জবাবগুলির মধ্যে কোন সামঞ্জস্য থাকে না। কি হইলে ঐ জবাবগুলির সামঞ্জস্য হইতে পারে তদ্বিষয়ে চিন্তার উদ্ভব হইলে শাম্ভবী বিদ্যার উদ্ভব হয়। শাম্ভবী বিদ্যায় প্রতিষ্ঠিত না হইতে পারিলে ঋষি-প্রণীত চতুর্দ্দশ বিদ্যায় (অর্থাৎ ছয়টী বেদাঙ্গ, চারিটী বেদ, মীমাংসা, ন্যায়-বিস্তার, ধর্ম্ম-শাস্ত্র ও পুরাণ) প্রবেশ লাভ করা যায় না এবং চতুর্দ্দশ বিদ্যায় প্রবেশ লাভ করিতে না পারিলে ব্রহ্ম-জ্ঞান লাভ করা সম্ভব হয় না। ব্রহ্ম-জ্ঞান লাভ করিতে না পারিলে মানুষ কোন তথ্যই নিখুঁত ভাবে নির্দ্ধারণ করিতে পারে না এবং তাহার কর্ত্তব্য কি তাহা যথাযথভাবে স্থির হয় না।

আমার পাগলামী বুদ্ধিতে যতদূর বুঝা সম্ভব হইয়াছে তাহাতে বলিতে হয়, তন্ত্রের মন্ত্রের সহায়তায় প্রথমতঃ, গায়ত্রীর ছন্দকে নিজের মধ্যে জাগাইয়া তুলিতে হয়, তাহার পর অপর ছয়টী ছন্দকে চিনিবার চেষ্টা করিতে হয়, দ্বিতীয়তঃ, ঐ সাতটী ছন্দ দেহের বহিঃস্থিত আকাশে আছে কি না তাহার পরীক্ষা

করিতে হয়। ঐ পরীক্ষার কার্য্য আরম্ভ হইলে দেখা যায় যে, দেহের মধ্যে যেরূপ সাতটী ছন্দের কার্য্য আছে সেইরূপ বহিরাকাশেও তাহার প্রত্যেকটী বিদ্যমান আছে। এই ছন্দের সাধনা শাম্ভবী বিদ্যার প্রথম অধ্যায়। শাম্ভবী বিদ্যার প্রথম অধ্যায়ে সিদ্ধি লাভ করিতে পারিলে বেদাঙ্গে প্রবিষ্ট হইতে পারা যায়। বেদাঙ্গের প্রথম অঙ্গ ব্যাকরণ এবং তাহার প্রথম সূত্র—প্রত্যাহার-সূত্র।

শাম্ভবী বিদ্যার প্রথম অধ্যায়ে সিদ্ধি লাভ করিতে পারিলেই ব্যাকরণের প্রত্যাহার-সূত্রগুলি বুঝিয়া উঠা সম্ভব-যোগ্য হয়। তাহার পর ব্যাকরণের দ্বিতীয় অঙ্গ 'শিক্ষা' পড়িবার চেষ্টা করিতে হয়। ব্যাকরণের প্রত্যাহার-সূত্রগুলি উপলব্ধি করিতে না পারিলে "শিক্ষায়" অভ্যস্ত হওয়া সম্ভব হয় না এবং "শিক্ষায়" অভ্যস্ত না হইতে পারিলে ব্যাকরণের দ্বিতীয় সূত্রে উপনীত হওয়া যায় না। শিক্ষায় অভ্যস্ত হইতে হইলে শাম্ভবী বিদ্যার দ্বিতীয় অধ্যায় জানিবার প্রয়োজন হয়। এই অধ্যায়ে অনেক কথা আছে। তাহা প্রকাশ করিবার সামর্থ্য আমার হয় নাই।

এইখানে আমার আখ্যায়িকার প্রথম অধ্যায় শেষ হইয়াছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

প্রথম অধ্যায়ে যে-ভাবগুলির কথা বলা হইয়াছে তাহার এক বৎসর পরে অর্থাৎ যখন আমি ৫১ বৎসরে উপনীত হইয়াছি, তখন আমার অবস্থা কি ছিল, তাহার কথা লইয়া আমার আখ্যায়িকার দ্বিতীয় অধ্যায়।

পাগলামী ভাব ঠিকই আছে। সেই নিজেকে কখনও ছেলেমানুষ ভাবা, কখনও যুবক বলিয়া মনে করা, আবার কখনও বৃদ্ধত্বে হতাশ হইয়া উঠা—তাহা সমান ভাবে চলিতেছে। পাগলামীর অস্থিরতা—তাহাও একটুও কমে নাই। সেই প্রশ্ন—কেন এই পাগলামী? কোথা হইতে যুগপৎ বালক, যুবক ও বৃদ্ধের পরস্পরবিরুদ্ধ ভাব একই মনকে ঘিরিয়া বসে?

বিশ্ব-দুনিয়া দিনের পর দিন ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। বাহির হইতে দেখিলে মনে হয়, যাঁহারা আমার চারিদিকে ঘিরিয়া রহিয়াছেন, তাঁহাদিগের কাহারও মনে ঐ উদ্বেগ নাই। অস্থিরতা সকলেরই আছে, কিন্তু কেহই কোন উদ্বেগ প্রকাশ করেন না। কাহারও মনে আমার মত পাগলামীর প্রশ্ন তোলপাড় করিতেছে বলিয়া সন্দেহ করিবার কোন চিহ্ন পাওয়া যায় না।

বাহিরের সঙ্গে নিজেকে তুলনা করিবার প্রবৃত্তি প্রায়ই জাগে না। আমি যে পাগল, কাজেই সৃষ্টিছাড়া, তাহা ভুলিতে পারি না। কিন্তু অস্থিরতা ত' তাঁহাদেরও আছে। থাকিলই বা, তাহাতে কি আইসে যায়? মরণ সকলেরই আছে। তাঁহারাও একদিন মরিবে। আমিও মরিব। দুইদিন আগু পাছু, উহাতে কি ক্ষতি-বৃদ্ধি আছে? যশের বৃদ্ধিও কম কি! বয়স বেশী পাইলে যশ বাড়ান যায়, কম বয়সে মরিলে যশস্বী হওয়ার সম্ভাবনা কমিয়া যায়। মানুষের দেওয়া যশের দাম কি আছে? পাগল হইলেও আমি ভিখারী হইতে চাই না। উপবাস করিয়া মরিলেও সর্ব্বমঙ্গলা যেন আমাকে ভিক্ষার আকাঙ্ক্ষায় ছুটাছুটি করান না। পরের দেওয়া যশের মায়া যেন আমার প্রাণে জাগে না। আমি যে ভগবানের অনাসৃষ্টি পাগল তাহা যেন আমি ভুলি না।

মরিতে ভয় নাই, যশের কামনা নাই, তবুও আমার অস্থিরতা দূর করিবার এত প্রয়াস কেন? তবে কি আমি আত্মপ্রতারক? প্রকৃতপক্ষে আমার মরিবার ভয়ও আছে, যশের কামনাও আছে এবং তাহার জন্যই আমার অস্থিরতা দূর করিবার এত প্রয়াস।

কেবল গোলোকধাঁধা! কেবল গোলোকধাঁধা! এতাদৃশ গোলোকধাঁধায় অনেকদিন কাটাইয়াছি। অবশেষে ঠিক হইয়াছে যে, মনুষ্যনামের যোগ্য হইতে হইলে মানুষের দুঃখ কি করিলে দূর হয়, কি করিলে মানুষের সুখ-স্বপ্ন বৃদ্ধি পাইবে তাহা জানা এবং তদনুযায়ী কার্য্য করা একান্ত প্রয়োজনীয়। অবশেষে দৃঢ় প্রতীতি হইয়াছে যে, মানুষের দুঃখ কি করিয়া দূর হয়, কি করিলে মানুষের সুখ-স্বপ্ন বৃদ্ধি পাইতে পারে তাহা স্থির করিতে হইলে মানুষের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদি, ইন্দ্রিয়াদি, মন, বুদ্ধি, তাহার বিবিধ ভাব এবং তাহার বিবিধ ইচ্ছা এবং তাহার বিবিধ অভিমান কোথা হইতে আইসে, কি করিলে উহার প্রত্যেকটী সংযত করা সম্ভব হয়, তাহা জানা একান্ত প্রয়োজনীয়। এই পাগলামীর বুদ্ধিতে আরও বুঝিয়াছি যে, উহা জানিতে হইলে ঋষির চতুর্দশ বিদ্যা ও জগৎকারণের

একনিষ্ঠ অনুসন্ধান একান্ত প্রয়োজনীয়। অস্থিরতা থাকিলে তাহা চলিবে না। কাযেই অস্থিরতা আমাকে দূর করিতেই হইবে। ছুটাছুটির মধ্যেও স্থিরতা রক্ষা করিবার সামর্থ্য অর্জ্জন করিতে হইবে।

আমি পাগল তাহা সত্য, কিন্তু ঐ দৃঢ় প্রতীতি যখনই এই পাগলের হৃদয়ে জাগ্রত থাকে তখনই শ্রমের ক্লান্তি দূর হইয়া যায়। তাই ভাইদিগকে বলিতে ইচ্ছা হয় যে, ভাইগণ, মানুষের দুঃখ কি করিয়া দূর করা যায়, মানুষের সুখ কি করিয়া বাড়ান যায়, তাহার চিন্তা প্রাণে জাগ্রত করিবার চেষ্টা করুন। তাহাতে দেখিতে পাইবেন যে, দুঃখময় জীবনের ঐ চিন্তায় অনির্ব্বচনীয় সুখ আছে। স্বকীয় কাম ও কামনার চরিতার্থ করিয়া সে সুখ পাওয়া যায় না। স্বকীয় কাম ও কামনার চরিতার্থে উদ্যোগী সাগরপারের ঐ ক্রোড়াধিপগণও সে সুখের স্বাদ পাইতে পারেন না। পরের জন্য অকৃত্রিম ভাবে ভাবায় যে সুখ, তাহার প্রতিক্রিয়া নাই, তাহার শ্রমে ক্লান্তি নাই। পাগলকে আপনারা বিশ্বাস করুন, দেখিবেন তাহাতে আছে কেবলই সুখ। আর ক্রোড়াধিপের কাম ও কামনার চরিতার্থে তখনকার মত যতই সুখ পাওয়া যাউক না কেন, তাহার প্রতিক্রিয়া অবশ্যম্ভাবী এবং নানা দুঃখ আসিবেই। এই চরিতার্থতায় কোন প্রকারভেদেই মজগুল থাকা যায় না। আলেয়ার আলোর মত একটা হইতে আর একটাতে ছুটাছুটি করায় অবশেষে অবসন্ন হইতে হয়।

কি করিয়া পরের দুঃখ দূর করা যায়, কোন্ উপায়ে পরের সুখ বাড়ান সম্ভব হয়, তাহা বলিবার জন্য অস্থিরতা দূর করার প্রয়োজন আছে, ইহা যখনই মনে জাগিল, তখনই বুঝিলাম যে, অস্থিরতা দূর করিতে হইলে আমার অস্থিরতা আসে কেন তাহা খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে।

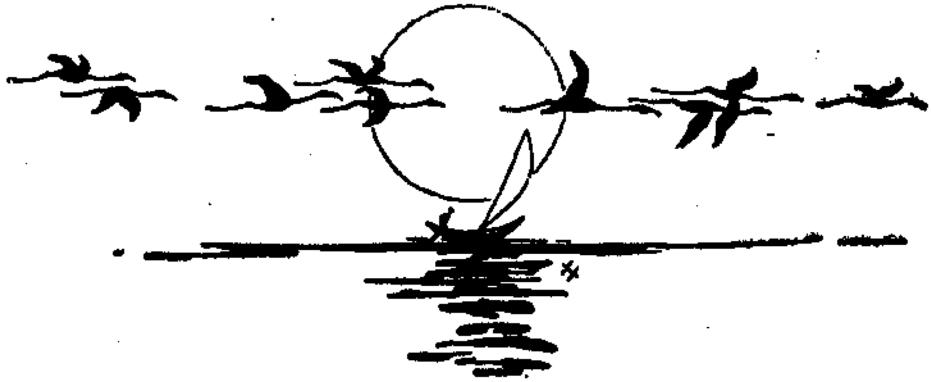
আমার অস্থিরতা আসে কেন তাহা যখন খুঁজিতে আরম্ভ করি, তখন দেখিতে পাই যে, আমি যখন বৃদ্ধ ও মরণের জন্য প্রস্তুত হইতে চাই, তখনই আমার অস্থিরতা সর্ব্বাপেক্ষা কমিয়া যায় আর বাকী সব সময়েই অস্থিরতায় আকুল হইয়া পড়ি। বার্দ্ধক্যের জন্য যখন হতাশ্বাস অথবা মরণের ডাক উপস্থিত হয়, তখনও আমার অস্থিরতা পূর্ণভাবে বিদ্যমান থাকে। এক কথায় যখন দুর্ব্বুদ্ধি ও দুষ্ট ইচ্ছা আমাকে ডুবাইয়া দেয়, তখনই আমার অস্থিরতা জাগে। যখন আমার প্রাণের মধ্যে বুদ্ধির ও ইচ্ছার উৎস কোথায় তাহার সন্ধান-প্রবৃত্তি জাগে, তখন আর আমার অস্থিরতা থাকে না।

আমি সব সময়েই এই ভাবে মজগুল থাকিতে চাই, কিন্তু তাহা পারি না। কেন পারি না তাহার ভাবনা লইয়া অনেক দিনের অনেক সময় কাটাইয়াছি। পরিশেষে বুঝিয়াছি, বুদ্ধি ও ইচ্ছার উৎস যথাক্রমে শিব ও দুর্গা। শুনিয়াছি, তাঁরা যেমন আমার অবয়বের মধ্যে আছেন, সেইরূপ উন্মুক্ত আকাশের সর্ব্বত্রই বিদ্যমান আছেন।

"দেহস্থাঃ সর্ব্ববিদ্যাশ্চ দেহস্থাঃ সর্ব্বদেবতাঃ।
দেহস্থাঃ সর্ব্বতীর্থানি গুরুবাক্যেন লভ্যতে॥"

জ্ঞানসঙ্কলিনীতন্ত্র।

এইরূপে আমার দ্বিতীয় অধ্যায় কাটিয়া গিয়াছে। সর্ব্বমঙ্গলার ইচ্ছা হইলে আবার তৃতীয় অধ্যায় প্রকাশিত হইবে।



জাতীয় মহাসমিতির ইতিহাস

—ডাঃ হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত

(৮)

কংগ্রেসের পঞ্চম অধিবেশন হয় ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে বোম্বাই নগরীতে, আর স্যার উইলিয়াম উয়েডারবার্ণ সভাপতির পদে বৃত হন। এবার কংগ্রেসের প্রধানতম আকর্ষণ—পার্লেমেন্টের সভ্য চার্লস ব্রাড্‌ল' সাহেবের ভারত আগমন ও কংগ্রেসে যোগদান। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি হন স্যার ফেরোজশা মেটা।

চার্লস ব্রাড্‌ল' অজ্ঞেয়বাদী হইলেও জনহিতব্যাপারে তিনি আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। হেনরী ফসেট ও ব্রাইটের মত ভারত শাসনের যাহাতে সংস্কার সাধন হয়, এ বিষয়ে তিনি বিশেষ তৎপর ছিলেন। ভারতবর্ষকে তিনি এত ভাল-বাসিতেন ও পার্লেমেন্টে ভারতবর্ষের স্বপক্ষে যুক্তিপ্রদানে করিতে এতই ব্যাগ্রতা দেখাইতেন, যে সাধারণের মধ্যে তিনি ভারতবর্ষের সভ্য (Member for India) বলিয়া অভিহিত হইতেন।

মিসেস এনি বেশান্ত তাঁহার সহকর্মী ছিলেন এবং অনেক সময়ে একসঙ্গে অনেক জনহিতকর কার্য্য করিয়াছেন। উভয়ে একত্র হইয়া ম্যালথেস বাদ প্রচার করেন—যেন জনসংখ্যা বৃদ্ধি না হয়। ইহা ধর্ম্মবিহিত বলিয়া খ্রীষ্টান দেশে তাঁহারা বাধা পান, কিন্তু আদালতে তাহাদেরই জয় হয়। ব্রাড্‌ল'র মৃত্যুর পরে বেশান্তও ভারতের হিতের জন্য অনেক চেষ্টা করেন।

ব্রাড্‌ল' নিরীশ্বরবাদী ছিলেন বলিয়া ঈশ্বরের শপথ পর্য্যন্ত গ্রহণ করিতে অস্বীকৃত হন্‌। এইজন্য প্রথমে পার্লেমেন্ট হইতে বহিস্কৃত হইলেও পরে তাঁহার মতানুসারেই কাজ হয়।

এই সময়ে চার্লস ব্রাড্‌ল' ভারতবর্ষের হিতার্থে পার্লেমেন্টে শাসন সংস্কার বিল উপস্থিত করিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন, কিন্তু তাহার পূর্ব্বে স্বয়ং ভারতবর্ষে আসিয়া জননায়কগণের মুখে তাহাদের মনোগত ভাব ও বক্তব্য জানিয়া ও বুঝিয়া যাইবার জন্য এই কংগ্রেসের অধিবেশনে উপস্থিত হন। ১৮৮৯, ১৪ই নবেম্বর তিনি রওনা হইতেন, কিন্তু অসুখের জন্য দুই সপ্তাহ পরে রওনা হন। অসুস্থতার মধ্যেও তাঁহার এইরূপ ভারতানুরাগ খুবই শ্লাঘনীয়। বোম্বাইতে আসিয়া তিনি কেবল যে কংগ্রেসের অধিবেশনেই উপস্থিত ছিলেন তাহা নয়, পরন্তু প্রত্যেক প্রদেশস্থ প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণের সহিত আলোচনা করিয়া তাহাদের মতামত বুঝিয়া গিয়াছিলেন। এই অধিবেশনে এতই উদ্দীপনার সঞ্চার হইয়াছিল যে অধিবেশনের নামই হয় "Bradlough Session"।



এনি বেশান্ত

তিনি বিলাত গিয়াই পার্লেমেন্টে ইণ্ডিয়া কাউন্‌সিলস্‌ বিল উপস্থিত করেন।

এইবারের অধিবেশনে প্রতিনিধির সংখ্যা অত্যধিকভাবে বাড়িয়া যায় :—

বাঙ্গলা হইতে আসেন (বিহার, উড়িষ্যা ও আসামসহ)	১৬৫
মাদ্রাজ —	৩৩৬
বোম্বাই ও সিন্ধু—	৮২১
পঞ্চনদ—	৬২
উত্তরপশ্চিম প্রদেশ ও অযোধ্যা—	২৬১
মধ্যপ্রদেশ ও বেরার—	২১৪
মোট—	১৮৮৯

প্রথম বৎসরে বোম্বাই হইতে ৩৮ জন প্রতিনিধি উপস্থিত হন, আর এবার ৮২১। প্রথমবারে মোটে দুইজন মুসলমান প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন, আর এবার ২৫৮। কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা যে দিন দিন ক্রমেই বর্দ্ধিত হইতেছিল এই ঘটনাতেই বেশ বুঝা যায়। কলভিনের ন্যায় বোম্বাইর গভর্ণর কংগ্রেসের উপরে এত খড়্গহস্ত ছিলেন না। ফলে কংগ্রেসের অধিবেশনে অনেক সরকারী কর্ম্মচারীও ব্রাড্‌ল'কে দেখিবার ও তাঁহার কথা শুনিবার জন্য ছদ্মবেশে বা গুপ্তভাবে অধিবেশনে উপস্থিত ছিলেন। বস্তুতঃ ব্রাড্‌লোর শুভাগমনে এতই আশা, উদ্দীপনা ও উৎসাহের সঞ্চার হইয়াছিল।



ওয়েডারবার্ণ

সভাপতি স্যার উইলিয়াম্ ওয়েডারবার্ণ ইংরাজ শাসনের একটী উপাদের ইতিহাস প্রদান করেন। তিনি বলেন,—

"কোম্পানীর শাসনে যে সমস্ত রক্ষাকবচ (Safe-guards) ছিল, তাহার বিনাশে ভারতবাসীর দুর্গতি বরং বাড়িয়াই গিয়াছে। যে দিন হইতে শাসনের ভার কোম্পানীর হস্ত হইতে, Crown এর (গভর্ণমেণ্টের) হাতে আসিয়াছে (১৮৫৮) সেই দিন হইতেই ভারতের দুর্ভাগ্যের অবধি নাই। পূর্ব্বে কোম্পানীর ভয় ছিল পার্লেমেণ্টকে ; কিন্তু গভর্ণমেণ্ট কাহার তোয়াক্কা রাখেন? দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলিতেছি, লর্ড রীপন কৃষিব্যাঙ্ক স্থাপনের একটী নিয়ম (স্কীম) গঠন করিলেন, ইণ্ডিয়া আফিস উহা নাকচ করিয়া দিলেন। জিজ্ঞাসা করি, কৃষি-ব্যাঙ্ক ব্যতীত এই অগণিত কৃষককুল উত্তমর্ণের হাতে পড়িয়া কোন উন্নতি করিতে পারে? ইহা না থাকিলে কৃষককুলের শস্য ঘরে আনিবার কোন সম্ভাবনাই তো থাকে না। আজ দেখুন জার্ম্মানীর অবস্থা—এক সেই দেশে ২০০০ কৃষিব্যাঙ্ক কাজ করিতেছে।"

তারপরে কংগ্রেসের কার্য্যের প্রশংসা করিয়া এবং কংগ্রেসের স্বপক্ষে যে উইলিয়ম্ ডিগ্‌বী প্রভৃতি ভারতবন্ধু আপ্রাণ চেষ্টা করিতেছিলেন তাঁহাদিগকে কৃতজ্ঞতা জানাইয়া অচিরে যাহাতে সমগ্র ইংলণ্ডবাসীর সহানুভূতি কংগ্রেস লাভ করিতে পারে, সেই আশা তিনি বিশেষভাবে হৃদয়ে পোষণ করিয়া অভিভাষণে সকলকে উদ্দীপিত করেন।

এবার দুইটী নূতন মারহাট্টাবাসী কংগ্রেসে যোগদান করেন। একজন মিঃ গোপালকৃষ্ণ গোখেল, আর একজন বালগঙ্গাধর তিলক। মিঃ গোখেল কংগ্রেসের একজন বিশিষ্ট নেতা ছিলেন এবং তর্কালোচনায়—কি ভারতীয় কি প্রাদেশিক কাউন্‌সিলে—তাঁহার তুলনা ছিল না। আর তিলক মহারাজ ত এক সময়ে দেশের মধ্যে অবিসম্বাদী জননায়করূপেই প্রতিষ্ঠার্জ্জন করিয়াছিলেন।

এবার কংগ্রেসের প্রধান প্রস্তাব হয় কাউন্‌সিলের প্রসার ও সংস্কার। এই প্রস্তাবটীর সময় বিশেষ উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। মাঝে মাঝে রাজনৈতিক গগনে একটু মেঘও জমিয়াছিল। কিন্তু বৃষ্টি হয় নাই, মেঘও শীঘ্রই কাটিয়া যায়।

নর্টন সাহেবই প্রস্তাবটী উত্থাপিত করেন। কি কি সর্ত্তে লোক ভোট দেওয়ার অধিকারী হইতে পারে তিনি বিবৃত করেন। পণ্ডিত অযোধ্যানাথ তাঁহাকে সমর্থন করেন। হিউম সাহেব 'মাইনরিটি clause' (সংখ্যা লঘিষ্ঠ) কথা তুলিয়া দেওয়ার পক্ষে ছিলেন। তিনি বল্লেন ভারতবাসী ভারতবাসীই। ইহার আবার মেজরিটি মাইনরিটী কি? কিন্তু অনেকেই তাহাকে সমর্থন করেন নাই। কিন্তু যবে মেবসঙ্কার হয়, যখন অযোধ্যার মুন্সী হিদায়েত রসুল সংশোধন প্রস্তাব করিয়া বলেন যে, হিন্দু-জনসংখ্যা অধিক হইলেও, কাউন্সিলে হিন্দু ও মুসলমান সদস্যের সংখ্যা সমান হওয়া উচিত।

লক্ষ্নৌ সহরের প্রসিদ্ধ ব্যারিষ্টার হামিদালি খাঁ এই সংশোধন প্রস্তাবের আপত্তি করিয়া বলেন যে, হিন্দু মুসলমান বলিয়া কোন কথা উঠাই সঙ্গত নয়।

সৈয়দ ওয়াহেদ আলী বিওয়াজী একটু উষ্ণভাবে বলেন "কাউন্সিলে মুসলমান সভ্য-সংখ্যা হিন্দু সভ্যের তিনগুণ হওয়া উচিৎ।"

সৈয়দ সিরুদ্দিন আহমেদ বাল্‌থি এই কয়টী সংশোধন প্রস্তাবে আপত্তি করিয়া একটী বড় সুন্দর বক্তৃতা দেন। তিনি বলেন যে এই পবিত্র অনুষ্ঠানে আমরা হিন্দুও নহি, মুসলমানও নহি, কিন্তু আমরা ভারতবাসী। 'ভারতবাসী'—এই আমাদের জাতি ধর্ম্ম ও বর্ণ, আমাদের অন্য বর্ণ, জাতি বা ধর্ম্ম নাই।

"We have assembled here for one common object. On such an occasion the Mohamedans cannot call themselves Mohamedans; nor Hindus Hindus; but rather forgetting all differences of creed, caste and colour, we should call ourselves Indians."

মুসলমান প্রতিনিধিগণের মধ্যে হিদায়েত রসুলের সংশোধন প্রস্তাব উঠিলে, তাহারাই উহার বিরুদ্ধে মত প্রদান করেন। পরে নর্টন সাহেবের প্রস্তাবটীই সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। অর্দ্ধশতাব্দী পূর্ব্বে সাম্প্রদায়িকতার যে একটু কালো মেঘের সঞ্চার হইয়া শীঘ্রই উহা প্রশমিত হইয়া যায়; কিন্তু আজ কোথা হইতে পুঞ্জীকৃত জলদজালে রাজনৈতিক গগন যে সম্পূর্ণরূপে ব্যাপ্ত হইয়াছে, তাহা শীঘ্র অপসারিত হইবার তো কোন সম্ভাবনাই দেখিতেছি না। কিন্তু সময় সময় উহাতে বিদ্যুৎ ঝলকে, বজ্রনাদে গগণ যেন বিদীর্ণ হয়, তবে বর্ষার বারিবর্ষণে সেই মালিন্য একেবারে বিদূরীত হইবে কিনা কে জানে?

এই সংখ্যা লঘিষ্ট সম্বন্ধে যখন কথাবার্ত্তা হয় বাঙ্গলার প্রতিনিধি স্বর্গীয় দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় একটী সংশোধন প্রস্তাব আনেন যে স্ত্রীলোকদিগকেও যেন ভোটাধিকার দেওয়া হয়। তিনি অবলা-বান্ধব পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন এবং স্ত্রী-জাতির উন্নতির জন্য বিশেষ চেষ্টা করেন। তাঁহার গান—

"না জাগিলে সব ভারত ললনা
এ ভারত আর জাগেনা জাগেনা।"

তখন অনেকের মুখেই শুনা যাইত।

মিঃ গাঙ্গুলী ছিলেন ডাক্তার কাদম্বিনী গাঙ্গুলীর স্বামী। ইনি এবং চন্দ্রমুখী বসু মহিলাদের মধ্যে প্রথম বি-এ, পাশ করিয়াছিলেন।

প্রস্তাবটী প্রত্যাহৃত হয়। এই অ সেই প্রথম কয়েকজন মহিলা প্রতিনিধি উপস্থিত হইয়াছিলেন। তন্মধ্যে মিসেস্ (ডাক্তার) গাঙ্গুলীও ছিলেন।

তৃতীয় দিনে পাঁচটার সময় কংগ্রেসের কার্য্য সেই বৎসরের জন্য শেষ করা হয়। পাঁচটার সময় ব্রাড্‌ল' সাহেবকে অভিনন্দিত করা হয়। বহু প্রতিষ্ঠান ও অনেকে ব্যক্তিগত ভাবে অভিনন্দনপত্র তৈয়ার করিয়া আনিয়াছিলেন; অবশেষে স্থির হয় যে কংগ্রেস হইতেই একটী অভিনন্দন দেওয়া হইবে, আর বাকী গুলি পঠিত বলিয়া ধরিয়া লইলেই চলিবে।

ব্রাড্‌ল' সাহেব খুব গদগদভাবে উত্তর দেন যে—



কাদম্বিনী গাঙ্গুলী

"আপনারা এমন স্নেহ ও সম্মান প্রদর্শন করিয়াছেন যে তাহাতে ঠিক মনে হয় যেন আমি আপনজনদের সহিত নিজের জন্ম-ভূমিতেই রহিয়াছি। আপনাদের প্রভায় আমি বুঝিতে পারিয়াছি যে কখনও 'বাড়ী' কেবল নিজের গৃহ বা দেশটুকুতেই সীমাবদ্ধ নয়। আমার ক্ষুদ্র দেশ সাগর পারে রহিয়াছে বটে, কিন্তু আমার বৃহত্তর দেশ আপনাদের ভালবাসায় ও প্রেমে সংস্থিত; আর এই ভালবাসার জোরেই ভবিষ্যতে আপনাদের জন্য কাজ করিতে আমি আরও উৎসাহ পাইব—

"You have made me feel since I have been in Bombay that the word 'home' has a wider significance than I had given it. I have learned that if I have only a little house I have a larger one in your sympathies and in your affection and I trust to deserve my future work in your love."

ব্রাড্‌ল' যে জনসাধারণের জন্যই এতাবৎ প্রাণপাত করিয়াছেন, অভিনন্দনে সে কথাও ছিল। উত্তরে তিনি বলেন—

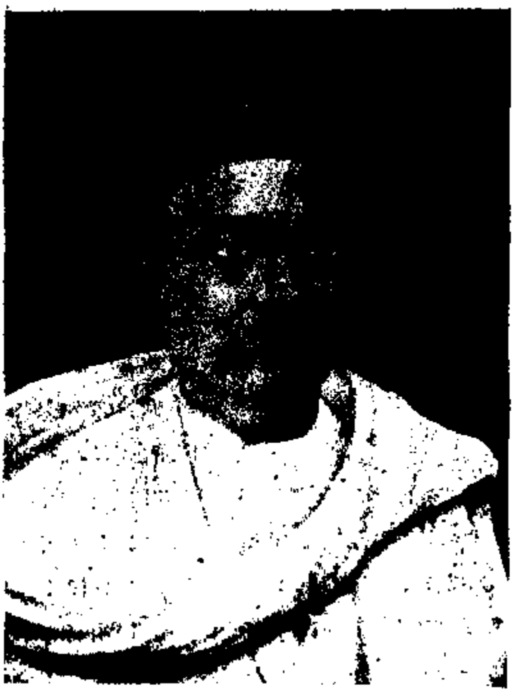
"For whom should I work if not for the people? Born of the people, trusted by the people, I will die for the people."

"যদি জনমণ্ডলীর সেবায় দেহ নিয়োগ না করি, তবে কাহার জন্য করিব। জনসাধারণের মধ্যে আমার অভ্যুদয়

তাহাদের স্নেহ ও বিশ্বাস বরাবর আমি পাইয়াছি, এবং আমি তাহাদের জন্যই দেহপাত করিব।"

বস্তুতঃ দেহপাতও তাঁহার হইয়াছিল, আর তাহা ভারতের হিত করিবার মুখেই। তিনি আরও বলেন যেন [খুব বেশী] আশা করা না হয়। এ বিষয়েও তিনি উপদেশ দিয়া বলেন যে—

"In England great reforms have always been slowly won. Those who first enterprised them were called seditious and sometimes sent to jail



টিলক

as criminals, but the speech and thought live on. No imprisonment can crush a truth, it may hinder it for the moment, it may delay it for an hour, but it gets an electric elasticity inside the dungeon walls and it grows, and moves the whole world when it comes out."

"সংস্কার ইংলণ্ড দেশেও সহজে অর্জ্জিত হয় নাই। প্রথমে যাহারা ইহার জন্য আত্মনিয়োগ করিয়াছেন, তাহাদিগকে রাজদ্রোহী বলিয়া দণ্ডিত করা হইয়াছে, সাধারণ অপরাধীর ন্যায় জেলের দুঃখভোগও ইহারা কম করেন নাই, কিন্তু তাঁহাদের কথা এবং কার্য্যের ফলই পরে সকলে উপভোগ করিয়া থাকে।

"এই সমস্ত মহাত্মাগণ প্রথমেই হউন, 'কারাবরণ'ই করুন, দুঃখভোগই তাহাদের অদৃষ্টে থাকুক, কিন্তু সত্যপথ হইতে তাহাদিগকে কেহই বিচলিত করিতে পারে নাই, আর ঐ কারাভোগের অন্তরালে এমন বিদ্যুৎ-শক্তি সঞ্চারিত হয়, একদিন ক্রমে তাহাই পুঞ্জীকৃত হইয়া সমগ্র জগৎকেও আলোড়িত ও বিকম্পিত করিয়া ফেলে।"

কংগ্রেস এ পর্য্যন্ত কিরূপ কার্য্য করিয়াছে এ সম্বন্ধেও বলেন—"আপনাদের এই সম্মিলনীতে আপনাদের এইরূপ সংযত ও সুচিন্তিত তর্কালোচনায় আমার দৃঢ় প্রতীতি জন্মিয়াছে যে আপনারা সত্যই সর্ব্বসাধারণের হিতার্থে দায়িত্বপূর্ণ কার্য্য সাধনে সম্পূর্ণ উপযুক্ত এবং আইনের আলোচনা ও প্রণয়ন ব্যাপারেও আপনাদের সম্পূর্ণ অধিকার আছে।

"You have shown that you can meet and discuss differences as you have done and that you are worthy of public trust and the right of electing and being elected to help to make the laws which you so discuss."

তিনি বলেন যে পার্লেমেণ্টের কাছে হাজার হাজার, লক্ষ লক্ষ আবেদন জানাইলেই কাজ হইবে।

"Send petitions to Parliament signed by thousands by hundreds of thousands, by millions if possible.

"I am here because I believe you are loyal to the law which I am bound to support. I am here because I believe you much as we in England have done to win within the limits of the constitution, the most perfect equality and right for all."

"এই কংগ্রেসের কার্য্য সাধনে তৎপর ও একান্ত আগ্রহশীল আপনাদের মধ্যে আমি যেন এক বিরাট ফলবন্ত মহীরুহের অঙ্কুরটীর সম্পূর্ণ পরিচয় পাইয়া পরম তৃপ্তি ও আশায় বুক বাঁধিয়া দেশে প্রত্যাবৃত্ত হইতেছি—

"I beliave that in this congress I see the germ of that which may be as fruitful, as the most hopeful tree that grows under your sun."

"আর আপনাদের মধ্যে সেই মহাশক্তির পরিচয় যদি না পাইতাম তবে কি আপনাদের মধ্যে আসিয়া আপনাদের সেবায় আত্মনিয়োগ করিতে এরূপ উদ্বুদ্ধ হইতাম?

"Even if I do not always plead with the voice that you would speak with, you will believe that I have done my best and that I meant my best to be, greater happiness for India's people, greater peace for Britain's rule and greater comfort for the whole of Britain's subjects."

বাঙ্গালা হইতে সুরেন্দ্রনাথ, মতিলাল ঘোষ প্রমুখ

প্রতিনিধিবর্গের সঙ্গে তিনি বাঙ্গলার অবস্থা সম্বন্ধে বিস্তারিত-ভাবে আলোচনা করেন।

স্যার উইলিয়াম উয়েডারবার্ণের ধীরতায় সম্মেলনীর কার্য্য যে খুবই সাফল্য মণ্ডিত হয় এ বিষয়ে কাহারও দ্বিধা করিবার কারণ হয় নাই। আনন্দ চার্লু ও এ বিষয়ে একটী প্রস্তাবে সেই আনন্দ জ্ঞাপন করেন।

বিলাতে এই আন্দোলনের ফলে 'ইণ্ডিয়া' কাগজ কংগ্রেসের মুখপত্ররূপে প্রচারিত হয় এবং মিঃ ডিগবীর উপরই এই কার্য্যভার প্রদান করা হয়।*

অস্ত্র-আইন সম্বন্ধে প্রস্তাবটী আনেন কে, থ্যাডাম। সকলকেই যাহাতে বন্দুকের পাশ (লাইসেন্স) দেওয়া হয় এবং প্রতি বৎসর উহা আবার ফিরিয়া করিতে না হয়, সেই বিষয়ে প্রস্তাব হয়। প্রস্তাবটী গৃহীত হয়।

এই প্রস্তাবের সময় পূর্ব্বদিবসের অধিবেশনে যে কয়জন মুসলমান প্রতিনিধি অসঙ্গত ভাবে কথাবার্ত্তা বলিয়াছিলেন, তাহারা ত্রুটী স্বীকার করেন এবং অধিকাংশ প্রতিনিধির মতানুযায়ী চলিতে প্রতিশ্রুতি দেন। মেঘ কাটিয়া যায়।

আগামী বৎসরের জন্য মিঃ হিউমই জেনারেল সেক্রেটারী নিযুক্ত হন এবং পণ্ডিত অযোধ্যানাথ হন জয়েণ্ট সেক্রেটারী। প্রতিনিধি সংখ্যা যাহাতে এক হাজারের বেশী না হয়, তজ্জন্য একটী প্রস্তাব গৃহীত হয়।

ভারত হইতে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ যাহাতে বিলাতে গিয়া দেশের অবস্থা বুঝাইয়া দেন ও পার্লামেণ্টের অন্যান্য সভাগণকে সেই ভাবে প্রস্তুত করা হয়, তজ্জন্য ১৫০০০৲ টাকার বরাদ্দ ও মঞ্জুর করা হয়। এই টাকার জন্য সেই সম্মেলনীতে আবেদন করা হয়। সর্ব্বপ্রথমেই আম্বালার লালা মুরলীধর ৫৫৫৲ টাকা নগদ টেবিলের উপর রাখিয়া শুভ উদ্বোধন করেন। তার পরেই উত্তেজনার সৃষ্টি হয় এবং সেই উত্তেজনায় সুরেন্দ্রনাথ এমন ভাবে জোগান দেন যে সেই বিরাট সভা মধ্যেই টাকা, পয়সা, আধুলী, দুয়ানী চতুর্দ্দিক হইতে যেন প্রবল বর্ষণের ন্যায় নিক্ষিপ্ত হইতে থাকে। সুরেন্দ্রনাথের এই বক্তৃতা ব্রাড্‌ল'র মনে গভীর ভাবের সৃষ্টি করে এবং তিনি খুব হৃষ্টচিত্তে স্বদেশে প্রত্যাগত হন। সভায় ৪৬০০০৲ টাকার প্রতিশ্রুতি পাওয়া যায় এবং ৯১৭২৸/৭ পাই সভায় সংগৃহীত হয়। উমেশচন্দ্র বন্দ্যো-পাধ্যায়, আর, এন, মুধলকার, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, আর্ডলী নর্টন ও মিঃ হিউম্ সেই ডেপুটেশনের সভ্য মনোনীত হন।

চার্লস ব্রাডল' ইংলণ্ডে পদার্পণ করিয়াই হাউস অব কমন্সে একটী বিল উপস্থিত করেন। অনতিবিলম্বেই অর্দ্ধেক সভ্য সংখ্যা যাহাতে নির্ব্বাচিত হয়, এবং প্রাদেশিক ও ভারতীয় Imperial Council এই সভ্যসংখ্যা যাহাতে বৃদ্ধি



আনন্দ চার্লু

পায় ইহা বিলের প্রধানতম উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু ব্যাধি ও কাল ইহার বিরোধী হইল। ব্রাড্‌ল' অল্পদিন মধ্যেই অন্তিম ব্যাধিতে শয্যাশায়ী হইয়া পড়েন এবং ১৮৯১ সালের ৩০শে জানুয়ারী ইহলোক ত্যাগ করিয়া চলিয়া যান। অসুস্থাবস্থায় বিলের প্রথম Reading হইয়া যায় ২৬শে জানুয়ারী, বিপক্ষীয় দলের Sir John Gorst এর তাড়ায়ই শীঘ্র হয়। তাঁহার মৃত্যুর পরে এই বিলের অপসারণ অবশ্যম্ভাবী হইয়া পড়ে। বিশেষতঃ ১৮৯০ সালের গোড়াতেই ভারত সচিব লর্ড ক্রস হাউস অব লর্ডস্-এ একটী বিল উপস্থিত করিয়াছিলেন এবং ইতিপূর্ব্বে তাহার দুইটী Readingও হইয়া যায়। বিলের

* Indian Parliamentary Committee বিলাতে দাদাভাই নরোজী ও W. C. Bonerjee প্রভৃতির চেষ্টায় হয়। বিলাতে তাঁহারা কংগ্রেসের পক্ষ হইয়া জনসাধারণ এবং পার্লামেণ্টের সভ্যদের মধ্যে কাজ করেন।

অঙ্ক এবং ইংলণ্ডের নির্ব্বাচন-সমর সম্পর্কীয় নানা প্রশ্নে ১৮৯০, ১৮৯১ ও ১৮৯২ সালে ভারতীয় ব্যাপার লইয়া ইংলণ্ডে তুমুল আন্দোলন চলিতে থাকে।

আমরা ১৮৮৯ সালের বোম্বাই কংগ্রেসে একটু ডেপুটেশন গঠনের কথা বলিয়াছি, এই ডেপুটেশনই ইংলণ্ডে প্রথমে নৌরজী সাহেবের Finsbury কেন্দ্রে কাজ করিতে আরম্ভ করে। প্রায় ৪।৫ মাস কাজ করিবার পরে তাহারা জুন মাসে বিলাত পরিত্যাগ করেন। অনেকে ৬ই জুলাই (১৮৯০) পুনরায় বোম্বাই পৌছেন। নির্ব্বাচন প্রথা এবং নির্ব্বাচন-প্রথাজাত অনুষ্ঠান (Representative Institutions) সম্বন্ধেই সাধারণতঃ বক্তৃতা হয়।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, ঘটনা স্রোতে ১৮৯০ হইতে ১৮৯২ সাল পর্য্যন্ত ইংলণ্ডে ভারতের ব্যাপার সম্বন্ধে খুব আন্দোলন হয়। ১৮৯২ সালের গোড়াতেই হাউস অব কমন্সে Third Reading-এর পরে উহা আইনে পরিণত হয়।


দাদাভাই নৌরজী

এই ১৮৯২ সালের আইনে (India Council Act of 1892) মূলতঃ নির্ব্বাচন প্রথার বিশেষ কিছুই উন্নতি হয় না—

No scope was given for election of legislature by local bodies and other legislatures. Governor General may make regulations subject to the sanction of the Secretary of State for India, as to the conditions under which such nomination by G. G. or Lieutenant Governor or Governors will be conducted.

এই ইণ্ডিয়া এ্যাক্টে (১৮৯২) নিয়ম হয় :—

(১) মিউনিসিপ্যালিটী ও ডিষ্ট্রিক্টবোর্ড প্রাদেশিক কাউন্সিলে কয়েকজন সভ্য পাঠাইতে পারিবে কিন্তু এই সব সভ্যকে গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক অনুমোদিত হইতে হইবে এবং কেবল তাহারা পরামর্শ দিবে, সেই পরামর্শ গ্রহণ করা না করা গভর্ণমেণ্টের অভিপ্রায়।

(২) গভর্ণমেণ্ট মনোনীত ব্যক্তিদের মধ্যে কাহাকেও ভারতীয় Imperial সংসদে পাঠাইতে পারিত কেবলমাত্র প্রাদেশিক কাউন্সিল। আর এই মনোনীত বে-সরকারী সভ্যগণ কর্ত্তৃক প্রতি প্রদেশ হইতে একজন সভ্য ভারতীয় সংসদে যাইত। মোট সংখ্যা ১২ হইতে ১৬ জনে বৃদ্ধি করা হয়।

(৩) প্রশ্নাদি জিজ্ঞাসা করিতে অধিকার ছিল।

(৪) সভ্যগণ বাজেট আলোচনা করিতে পারিতেন।

এই এ্যাক্টই পরে লর্ড মিণ্টো ও মর্লি কর্ত্তৃক ১৯০৯এর Actএ সংশোধিত হয় এবং পরে যথাক্রমে ১৯১৯ ও ১৯৩৫-এর গভর্ণমেণ্ট অব ইণ্ডিয়া এ্যাক্টে আরও সংশোধিত হইয়াছে। ইহাই মাত্র ভারতবর্ষের রাজনৈতিক সংস্কার।

লর্ড সভায় লর্ড নর্থব্রুক বলেন,—

"I regret very much that Government has not been enabled to introduce into this bill any system whatever by which a portion of the non-official members of legislatures could be chosen by some system of election or selection and not left entirely to a system of pure nomination.

Lord Ripon—"there should not only be introduced the system of election or selection in local legislatures but in Viceroy's Council also."

Lord Ripon, Earl of Kimberlay ও Lord Stanley এবং Commons সভায় Mr. Schwann এবং Mr. Gladstone বিলটি যাহাতে নির্ব্বাচন প্রথার উপর স্থাপিত হয় তজ্জন্য বিশেষ বক্তৃতা করেন। বিপক্ষে থাকেন লর্ড সভার লর্ড ক্রস ও লর্ড সেলিসবারী (তাঁহারা বলেন— you must not drift to an elective Government of India.) এবং কমন্স সভায় বিরোধীতা করেন মিঃ কার্জ্জন (পরে লর্ড কার্জ্জন ও ভারতের গবর্ণর জেনারেল) ও মিঃ ম্যাকলিন। ইহার ফলে যে পরিণতি হয়, তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি।

ফলতঃ ১৮৯২ খৃষ্টাব্দের কাউন্সিল এ্যাক্টে বিশেষ কিছুই হয় না। তবে আলোচনার সময় মিঃ ব্রাড্‌ল' ছিলেন না। অতিরিক্ত পরিশ্রমে ইতিপূর্ব্বেই তিনি ইহলোক পরিত্যাগ করেন। সংস্কার সম্বন্ধে তাঁহার চেষ্টা সাফল্য লাভ না করিলেও, কাউন্সিলের যৎকিঞ্চিৎ যে সংস্কার হয়, তাহাই ১৮৯২ খৃষ্টাব্দের সংস্কার আইন। আর তাহার মূলেই ছিলেন ব্রাড্‌ল'।

এই সময়কার লণ্ডনস্থ দ্বিতীয় আন্দোলন হয় নৌরজী সাহেবের নির্ব্বাচন ব্যাপার লইয়া। গত মাসের 'বঙ্গশ্রী'তে' আমরা বলিয়াছি যে, ১৮৮৬ সালে নৌরজী সাহেব Finsbury প্রদেশের Holborn হইতে নির্ব্বাচন প্রার্থী হইয়াছিলেন কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। এবার ১৮৮৮ সালেই তিনি আগামী ১৮৯২ সালের নির্ব্বাচনে প্রতিযোগিতাক্ষেত্রে Central Finsbury হইতে দাঁড়াইবার জন্য প্রার্থী হইবেন বলিয়া সঙ্কল্প করেন এবং ইহাতে প্রধান মন্ত্রী লর্ড সেলিসবারী তাঁহাকে 'কালা আদমী' বলিয়া উপেক্ষা করেন। তিনি বলেন যে, গতবারে যে কর্ণেল ডানহাম একজন "কালা আদমীকে" হারাইয়া দিয়াছেন তাহাতে আর বিচিত্র কি? আমার মনে হয় আগামী নির্ব্বাচনেও ইহার ব্যতিক্রম হইবে না।

তিনি বলেন—

"It was undoubtedly a smaller majority than Colonel Dunham obtained, but then Colonel Dunham was opposed by a blackman; and however much the progress of mankind has been and however far we have advanced in overcoming prejudices, I doubt if we have yet got to that point of view where a British Constituency elect a blackman."

প্রধান মন্ত্রীর এই কথায় গ্লাডষ্টোনের দলের (Gladstonians) ভারী সুবিধা হইয়াছিল। গ্লাডষ্টোন সাহেব ইহাতে যে তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছিলেন, তাহাও পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি।

আরও সুবিধা হয় J. Maclean এর অশিষ্ট কতকগুলি উক্তিতে, ইনি নির্বাচন প্রার্থী হইয়াছিলেন Oldham কেন্দ্র হইতে এবং তখন ইণ্ডিয়ান Councils বিল উপস্থাপিত হইয়াছিল বলিয়া নির্ব্বাচন সংগ্রামে গ্লাডষ্টোন ও সেলিসবারীর পক্ষ মধ্যে ভারতীয় প্রশ্ন কেন্দ্র করিয়া সংগ্রাম চলিতেছিল। ইনি তাঁহার এক বক্তৃতায় (ওল্‌ড্‌হ্যামে) ভারতবাসীদের সংস্কার লাভ সম্বন্ধে বক্তৃতা করিয়া বলেন—

ভারতের লোকের আবার সংস্কার লাভে যোগ্যতা কোথায়, ইহারা তো গোলামের জাতি ভিন্ন আর কিছুই নয়।

"Hindus are slaves and Mohomedans are none but indentured slaves; we have conquered India by the Sword and we shall keep it so by the Sword."

"তরবারির সহায়তায় আমরা ভারত অধিকার করিয়াছি এবং তরবারির সহায়তায়ই যে উহা রক্ষা করিতে হইবে তাহাও আমি জানি।"

চারিদিক হইতে ম্যাক্লিনের বক্তৃতার তীব্র প্রতিবাদ হয় এবং অতঃপরে ইনি আবার Lees Conservative Clubএ বক্তৃতায় বলেন যে, বক্তৃতার সময় ইনি লর্ড মেকলেরই অনুসরণ করিয়াছেন। কিন্তু প্রশ্ন এই যে সময় ভারতের ব্যবস্থাপক সভার সম্বন্ধে কাউন্সিল বিল উপস্থিত করা হয়, আর মেকলে বলেন কেবল বাঙ্গলা সম্বন্ধে। আর মেকলে আবার তুল্যভাবে সাহেবদের কার্য্যেরও তীব্র নিন্দা করিয়াছিলেন।

ইহার উত্তরে দাদাভাই নৌরজী National Liberal Club হইতে (১৬ মে ১৮৯২) প্রতিবাদ করিয়া লেখেন—



লর্ড রিপণ

"Persons like Mr, Maclean misrepresent prayer of the Indians to have a fair proportion of elected members in the different Councils. I am sorry I must repeat that persons like Mr. Maclean by inciting race-antipathies, hatred and recriminations will be the most instrumental in weakening or destroying British power in India."

নৌরজী সাহেব সময়াভাবে ইহার বেশী উত্তর দিতে পারেন নাই। কিন্তু ভারতীয় ছাত্রগণ এরূপ জাতীয় অপমান নির্ব্বিকার ভাবে সহ্য করিলেন না। তাহারা অচিরে Oldhamএ একটা সভা করিয়া ম্যাকলিনের অভদ্রজনোচিত ব্যবহারের তীব্র প্রতিবাদ করেন। এই সময়ে বাঙ্গালার চিত্তরঞ্জন দাশ সিভিলসার্ভিস পরীক্ষা দিতেছিলেন। ইনিই তাঁহাদের প্রতিনিধিরূপে বক্তৃতা দিতে লাগিলেন।

প্রথমতঃ তিনি লণ্ডনস্থ ভারতীয়গণ ও ভারতহিতৈষী

ব্রিটিশগণকে Exeterএ একত্র করিয়া ওজস্বিনী ভাষায় বলিতে লাগিলেন –

"Gentlemen, I am sorry to find it given expression to in parliamentary speechers on more than one occasion that England conquered India by the sword, and by the sword must she keep it! (shame). England, gentlemen, did no such thing, it was not her sword and bayonet that won for her this vast and glorious empire, it was not her military valour that achieved this triumph, it was in the main a moral victory or a moral triumph (cheers) England might well be proud of. But to attribute all this to the sword and then to argue that the policy of the sword is the only policy that ought to be pursued in India, is to my mind abselutely base and quite unworthy of an Englishman." (cheers)



চিত্তরঞ্জন দাশ (যৌবনে)

"ভারত তরবারি বা বন্দুকের সহায়তায় অধিকৃত হয় নাই, নৈতিক বলেই হইয়াছে। ভারতে তরবারি-নীতিই অনুসৃত হওয়া উচিত—এবম্বিধ উক্তি অত্যন্ত হেয় এবং ইংরাজের পক্ষে সম্পূর্ণ অযোগ্য।"

অতঃপরে নানাদিক হইতে ইণ্ডিয়া কাউন্সিল বিল ও তদানীন্তন নির্ব্বাচন সম্বন্ধে বক্তৃতা দেওয়ার জন্য চিত্তরঞ্জনের আহ্বান হইল। Oldhamও হইতে লাগিল। এই Oldhamএর সভায় চিত্তরঞ্জন সংস্কার (Reform) সম্বন্ধে খুব একটি সারগর্ভ বক্তৃতা দিয়াছিলেন।

Oldham এর বক্তৃতায় ম্যাকলিনের "An insect like him is not worth powder and short" এবং "A Darwin might easily take him for the missing link" বলিয়া তীব্র তিরস্কার করেন। ম্যাকলিনের অশিষ্টোক্তির প্রতিবাদে লিবারেলরা (উদারনৈতিক দল) এতই খুসী হন যে, অনবরত শ্রুত হয়—"Horse-whip him, make a mince-meat of him."

আমাদের ব্যবস্থাপক সভা যে প্রহসন মাত্র সে সম্বন্ধেও চিত্তরঞ্জন বলেন—

"Our legislature Councils are only guilded shams, splendid lies, magnificent do nothings (cheers). We have men in those councils who have no business to be there and others are studiously excluded without whom no legislature in any country can be perfect....We want Indians of the right sort, but His Excellency the Viceroy takes precious good care to nominate only men of a certain stamp, men either weak in intellect or. persons in inclination—men entirely out of touch with the teeming millions of my countrymen and men whom you gentlemen in this country call aristocratic models."

যখন তিনি বলেন "what we want is the real voice of the people to be heard in the legislature" সভায় বিশেষ উত্তেজনার সৃষ্টি হয়।

যৌবনকালের মনোভাবেই ভবিষ্যৎকালের রাজনীতিক্ষেত্রের ভারতের নায়ক চিত্তরঞ্জনকে প্রকৃষ্ট রকমে বুঝিতে পারা যায়।

এই সমস্ত বক্তৃতা ও আন্দোলনের ফলে লর্ড স্যালিসবারির দলের অনেকেই পরাজিত হন। Oldham এর ম্যাক্লিন হারিয়া যান এবং দাদাভাই নৌরজী ও Central Finisbury হইতে তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বীকে মাত্র তিন ভোটে পরাজিত করিয়া (২৯৫৯ : ২৯৫৬) নির্ব্বাচন সংগ্রামে জয়লাভ করেন। দাদাভাইর একটু সুবিধা হইয়াছিল যে আর একজন প্রতিদ্বন্দ্বী লিবারেল Ford নির্ব্বাচন কেন্দ্র হইতে সরিয়া পড়েন। ইনি ছিলেন গ্লাডষ্টোনের দলের। বাকী ছিলেন একজন মাত্র প্রতিদ্বন্দ্বী নাম Captain Pinton. এই পিণ্টন ছিলেন সেলিসবারীর দলের।

নৌরজী সাহেব এই প্রথম পার্লামেন্টের সভ্য হবেন। ইতিপূর্ব্বে ভারতীয় কেহই সভ্য হইতে পারেন নাই। লালমোহন ঘোষের চেষ্টাও যে ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হয়, তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। একজন ভারতবাসী পার্লেমেন্টে

বসিয়া ইংলণ্ডের এমন কি সমগ্র শাসন সংক্রান্ত বিষয়ে ও আইন-কানুনে যোগদান করিবেন এবং সেই শাসনে তাহার হাত থাকিবে, ইহারা ভারতবাসীর পক্ষে শুভ ও আশাপ্রদ হইলেও, ইংরেজের গাঁয়ে কাঁটা দিল। আবার Lord Reay (বোম্বাইয়ের ভূতপূর্ব্ব গভর্ণর (১৮৮৫), লর্ড রিপনের মত মহানুভব ব্যক্তি, মিঃ গ্লাডষ্টোনের ন্যায় সদাশয় নেতা ও এতই অনন্বিত হন যে কৃতকার্য্যতার জন্য তাঁহাকে অভিনন্দিত করিতে সর্ব্বাগ্রগণ্য হইলেন।

১৮৯২ সালে কংগ্রেসের অধিবেশন হয় এলাহাবাদে। নৌরজী সাহেবকেই সভাপতি করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা হয়। কিন্তু তাঁহার এসময়ে ইংলণ্ড ত্যাগ একরকম অসম্ভবই হয়। কারণ Captain Pinton ভোটের কাগজ আবার গুণিয়া সিদ্ধান্ত স্থির করিবার জন্য আবেদন করেন।


স্তর রমেশ মিত্র

সেই ফলাফলের অপেক্ষায় বাধ্য হইয়া নৌরজী সাহেবকে ৮৯২ সালের ডিসেম্বর মাসে ইংলণ্ডেই থাকিতে হয়। তবে ১৮৯৩ সালে লাহোর অধিবেশনে তিনি আসিয়া আবার সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

অতএব, পাঠক, ১৮৮৯ সালের বোম্বাই কংগ্রেসের পরে কলিকাতায় ১৮৯০, নাগপুরে ১৮৯১ ও এলাহাবাদে ১৮৯২ সালে যে কংগ্রেসের অধিবেশন হয়, তাহার কার্য্যাবলী একসঙ্গে পড়িতে পারেন। বিশেষতঃ এই সমস্ত জায়গায় নূতন করিয়া প্রস্তাবাদি গৃহীত হয় না। সকলে সতৃষ্ণভাবে India Councils Bill বিলের ও নৌরজী সাহেবের প্রতিযোগিতার ফলাফল নিরীক্ষণ করিতেছিলেন।

কলিকাতায় কংগ্রেস হয় টীভলী উদ্যানে (ল্যান্স ডাউন রোড, ও সার্কুলার রোড)। স্তার রমেশচন্দ্র মিত্র মহাশয় তখন হাইকোর্ট হইতে জজিয়তির পদ হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহাকেই অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি পদে নির্ব্বাচিত করিবার কথা হয়। কিন্তু তিনি অসুস্থতা নিবন্ধন অক্ষমতা জ্ঞাপন করেন। সেবারে ব্যারিষ্টার মনোমোহন ঘোষ মহাশয় অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি পদে বৃত হন। এই মনোমোহন ঘোষ মহাশয় অপরাজেয় ফৌজদারীর কৌঁসুলি ছিলেন। তিনি আসামীর পক্ষই সমর্থন করিতেন, এবং তাঁহার হাতে আসামী পড়িলে নিশ্চিন্ত মনে তাঁহার উপরে সব ভার দিয়াই বসিয়া থাকিত। মুক্তি লাভই হইত অধিকাংশ ক্ষেত্রে। আর অবস্থা খারাপ হইলেও তিনি তাহার সেবাকার্য্য হইতে আসামীর অভিভাবককে কখনও বঞ্চিত করিতেন না।

মহাসমিতির সভাপতির আসন গ্রহণ করেন স্তার ফিরোজশা মেটা। কিন্তু সেবারে অসুস্থতা নিবন্ধন অনেক নেতাই উপস্থিত হইতে পারেন নাই। রাজেন্দ্রলাল ও উমেশচন্দ্র অসুস্থ ছিলেন। সুরেন্দ্রনাথ ও বিলাত হইতে আসিয়া অসুস্থ হইয়া পড়েন, কিন্তু পরে আসিয়া সংস্কার-বিষয়ক প্রস্তাবটী উপস্থিত করেন।


মনমোহন ঘোষ

টীভলী গার্ডেনের অধিবেশনে বাঙ্গালার বাহিরের প্রতিনিধিগণকে মিঃ টি, পালিত মহাশয়ের বালিগঞ্জ ২২নং, সারকুলার রোডের বাড়ী, স্তার রমেশচন্দ্র মিত্রের ১৭নং বাড়ী, টি. পালিতের ৩৬ নম্বর Old Ballygung Circular Road, জানকীনাথ রায় মহাশয়ের (পরে রাজা) ২০ নম্বর লাউডন ষ্ট্রীটের বাড়ী, জগন্নাথ ঘোষের ৩ নম্বর ল্যান্সডাউন রোডের বাড়ী, কীর্ত্তি মিত্র মহাশয়ের মোহনবাগান হাউস প্রভৃতি ডেলিগেটদিগের থাকিবার জন্য দেওয়া হয়। প্রথমোক্ত দুইটী বাড়ীতে মুসলমান প্রতিনিধি বর্গকে রাখা হয়। প্যাণ্ডেলে প্রায় ৬০০০ ডেলিগেট ও দর্শকের সমাবেশ করিবার বন্দোবস্ত হয়, আর বাঙ্গালী ডেলিগেটকে তাহাদের আত্মীয়-স্বজনের বাড়ীতে থাকা ও খাওয়ার বন্দোবস্ত করিতে অনুরোধ করা হয়।

এবার ডেলিগেটের সংখ্যা সাত শতের কিছু বেশী হয়। ইহার কারণ—পূর্ব্ব বৎসরের নিয়ম, যে হাজারের বেশী ডেলিগেট নির্ব্বাচিত হইতে পারিবে না। এবার হাজারই

নির্ব্বাচিত হইয়াছিল। কিন্তু সকলে আসিতে পারেন নাই। তবে দর্শক সংখ্যা এত বেশী হইয়াছিল যে ইহাতেই উৎসাহের সম্যক পরিচয় উপলব্ধি হয়।

১৮৯০ সালে কলিকাতায় কংগ্রেস বসিবার কয়েকদিন পূর্ব্বে ইংলিশম্যান, পাইওনিয়ার প্রভৃতি সংবাদপত্রে একখানি বিজ্ঞাপন বাহির হয় যে, কোন সরকারী কর্ম্মচারী যেন দর্শক হিসাবেও কংগ্রেসে উপস্থিত না হন।* এমনকি, লেফটেন্যাণ্ট গভর্ণর, স্যার চার্লস ইলিয়ট এবং তাঁহার পার্শ্বচরবর্গকে অভ্যর্থনা সমিতি হইতে



ফেরোজশা মেহ্‌তা

কয়েকখানি Visitors টিকেট পাঠাইয়া নিমন্ত্রণ করিলে প্রত্যার্পিত টিকেট সহ নিম্নলিখিত উত্তর আসে—

Belvedere. 26th Dec. 1890.

Dear Sir,

In returning herewith the seven cards of admission to the visitors' enclosure of the Congress pavilion which were kindly sent by you to my address yesterday afternoon, I am directed to say that the Lieutenant Governor and the members of his Household could not possibly avail themselves of these tickets, since the orders of the Government of India definitely prohibit the presence of Government officials at such meetings.

Yours truely,

P. C. Lyon

তখনকার ছোট লাট বাহাদুরের প্রাইভেট সেক্রেটারী এই পি, সি লায়ন মহাশয়কে ১৯০৫ সালের সার্কুলারি ব্যাপারে আমরা আরও দেখিতে পাইব।

যাহা হউক, এই সার্কুলার ও পত্রের ব্যাপারে কংগ্রেসের অধিবেশনের সময় তুমুল আলোচনা হয়। জর্জ্জ ইউল "Some Dogberry clothed in a little brief authority", "piece of gross insolence" প্রভৃতি ভাষায় খুবই রাগত ভাবে বলেন, "আমরা কি অস্পৃশ্য না রাজভক্তিতে কাহারও অপেক্ষা ন্যূন!"

"Any instructions, therefore, which carry on their face as these instructions do in my judgment an insinuation that we are unworthy to be visited by Government officers, I resent as an insult and I retort that in all the qualities of manhood we are as good as they."

এই সম্বন্ধে গভর্ণর জেনারেল লর্ড ল্যান্সডাউনকেও চিঠি লেখা হয়। উত্তরে তিনি বলেন যে, "ছোটলাট ঠিক মর্ম্ম বুঝিতে পারেন নাই। কংগ্রেস আন্দোলন খুবই বৈধ--"

'The Congress movement was perfectly legitimate in itself, that the Government of India recognise that the Congress movement is regarded as representing in India what in Europe would be called the more advanced Liberal Party as distinguished from the great body of conservative opinion which exists side by side with it.

বড় লাটের প্রাইভেট সেক্রেটারী বলেন যে, Participationই (যোগদান) কেবল গভর্ণমেণ্ট চাকুরিয়ারা করিবেন না, কিন্তু যাহারা পেনসন পান তাঁহারা এই পর্য্যায় পড়েন না—

"In reference to the specific question which you addressed to His Excellency I am to say that the orders apply only to those who are actually, at the time being, are Government servants but not apply to pensioners and others who have quitted the service of the Government for good."

*The Bengal Government, having learnt that tickets of admission to the visitors' enclosure in the Congress Pavilion have been sent to various Government officers residing in Calcutta, havs issued a circular to all secretaries and heads of department subordinate to it pointing out, that under orders of the Government of India the presence of Government officials even as visitors of such meetings is not advisable and that their taking part in the proceedings of any such meetings is absolutely prohibited.

একদিন কলিকাতা হইতেই বড়লাট লর্ড ডাফ্রিণ "microspic minority" কথা উচ্চারণ করিয়াছিলেন (১৮৮৭, নবেম্বর), আর আজ সভাপতি মহাশয় তাহার উত্তর দিয়া বলেন—

"We have survived the charge of using a microscopic minority, we have even managed to survive the grievous charge of being all Babus in disguise we have survived rudicule, abuse, misrepresentaion, we have survived the charge of sedition and disloyalty"

কলিকাতায় যখন কংগ্রেস হয়, তখন ইণ্ডিয়ান কাউন্সিলস বিলের দুই রিডিং হইয়া গিয়াছে। তাই বিলটা যে ভাবে উপস্থিত করা হয় এবং এ সম্বন্ধে যেরূপ আলোচনা হইয়াছে তাহা সকলেই অবগত ছিলেন। সুতরাং Bradlough যে ভাবে বিল উপস্থাপিত করিতে চাহিয়াছিলেন তাহার সমর্থন করিয়া একটী প্রস্তাব আনা হয়।

In 1890 the Congress supported the bill to commend the India Council Act of 1891 introduced by Charles Bradlough as calculated to secure substantial instalment of Reforms in the administration of India।

উহার প্রস্তাবক হন লালমোহন ঘোষ, সমর্থক পণ্ডিত আনন্দ চার্লু ও অনুমোদক মদনমোহন মালবীয়। পাটনার সারফুদ্দিন প্রভৃতি সকলেই পার্লেমেণ্টে লর্ড সেলিসবারী ও লর্ড ক্রসের যে যুক্তি দেন, তাহার তীব্র প্রতিবাদ করেন। সৈয়দ সরফুদ্দিন একটী সুন্দর বক্তৃতায় বলেন—

"মুসলমানদের সংখ্যা অল্প, সংস্কার প্রবর্ত্তনে তাহাদের ক্ষতি হইবে,—এরূপ যুক্তির কোন মূল্যই নাই। এইত পাটনা সহরে মিউনিসিপ্যালিটিতে ২০টী স্থান (seats) আছে, কিন্তু হিন্দুর সংখ্যাধিক্য সত্ত্বেও সেখানে ত তাহারা মুসলমানকেই বেশী নির্ব্বাচিত করিয়া থাকেন। ২০ জনের মধ্যে ১৩ জনই মুসলমান কমিশনার। বোম্বাই সহরে হিন্দুর সংখ্যাও এত বেশী, তথাপি সেখানে ৫ জন পার্শী, তিনজন ইউরোপীয়, ২ জন হিন্দু ও দুই জন মুসলমান সভ্য। আমাদের দেশে সংখ্যাধিক্য বশতঃ কোন অসুবিধা হয় নাই, সংখ্যাধিক্যের কোন কথাই ওঠা উচিৎ নয়।"

বস্তুতঃ দেখিতেছি প্রথম হইতেই রাজপুরুষগণ কেবল সংখ্যাধিক্য ও সংখ্যার অজুহাত প্রদর্শন করিতেছেন। কিন্তু বিচক্ষণ ও দেশভক্ত মুসলমানগণ কখনও সেই সমস্ত কথায় প্রলোভিত হইতেন না। কিন্তু আজকাল অবস্থা সম্পূর্ণ বদলাইয়া গিয়াছে। এখন তাহারাও বলেন, আমরাও শুনি, তাই কংগ্রেসের সমবেত শক্তি আমরা ক্ষীণ করিয়া ফেলিতেছি, তাই আজ সাম্প্রদায়িক সংগঠনের প্রাধান্য প্রবল হইয়া উঠিয়াছে।

রেভারেণ্ড কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ও মিঃ খাপর্ডে অন্যান্য মামুলি প্রস্তাব আনেন। একটী প্রস্তাবে স্থিরিকৃত হয়



লর্ড কার্জন

যে, ১৮৯২ সালে ইংলণ্ডে কংগ্রেস-অধিবেশন হইবে। মিঃ কেইন্ লণ্ডনে পরবর্ত্তী কংগ্রেসের অধিবেশন আহ্বান করেন। তিনি বড় প্রাণস্পর্শী ভাষায় বলেন—

"It will be a great object lesson to the English people if we can gather together in the Exeter Hall or the Crystal Palace the Indian National Congress that men may hear for themselves and have reported verbatim in every newspaper in the land the reasonable, sensible, statesmanlike and truly patriotic speeches which are delivered here.

In the name of all your friends in England and and I will go further and say in the name of the

great English people I promise you that when you come you will receive such a wel-come as will make your hearts rejoice."

সভাপতিকে ধন্যবাদ প্রদানের সময় মিসেস কাদম্বিনী গাঙ্গুলী বি, এ, একটী বক্তৃতা দেন। কংগ্রেসে এই প্রথম মহিলা প্রতিনিধি বক্তৃতা প্রদান করেন।

কলিকাতায় এই দ্বিতীয় বার কংগ্রেস হয়। কিন্তু এখন পর্য্যন্ত দেশবাসী কংগ্রেসের সার্থকতা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে নাই। 'বঙ্গবাসী' তো কংগ্রেকে 'কঙ্গরস'ই আখ্যা দিত।



গোখলে

দেশের অধিকাংশ লোকের উপরে তখন বঙ্গবাসীর খুবই প্রভাব আর কংগ্রেসকে লোক যে অশ্রদ্ধার চক্ষেই দেখিতে আরম্ভ করিল, ইহার অনেক কারণও ছিল; কারণ অনেক নেতা তখন কেবল বক্তৃতাপ্রিয়, দেশবাসীকে ঠিক স্নেহের চক্ষে দেখিতে পারেন নাই, জন্মভূমিকে শ্রদ্ধার চক্ষে ধারণাও করিতে পারে নাই। অনেকে আবার আত্মপ্রতিষ্ঠার জন্যই কংগ্রেসে যোগদান করিতেন। ইত্যাদি কারণে বাঙ্গলা দেশে মুষ্টিমেয় শিক্ষিত লোকের নিকট হইলেও, সাধারণের উপর কংগ্রেস কোনরূপই রেখাপাত করিতে পারে নাই।

এবারেও মুসলমানদের শিক্ষা সম্মেলন হয় এলাহাবাদে। আর সর্দ্দার মহম্মদ হায়েৎখাঁনই সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। সৈয়দ আহম্মেদ সাহেবও মুসলমানদের শিক্ষা বৃদ্ধির জন্য বক্তৃতা দেন।

কিন্তু কলিকাতা কংগ্রেসের সময় জনজাগরণে বাঙ্গলার নাট্যশালা বড় সহায়তা করে। আমরা অনেক সময়ে রঙ্গমঞ্চের দ্বারা অনুষ্ঠিত মহৎ কার্য্যের কথা ভুলিয়া যাই। ১৮৮৪ সালে 'চৈতন্য লীলা' অভিনয়ে সেই পথবিভ্রমের দিনেও অবিশ্বাসী ব্যাক্তির প্রাণেও গভীর ভাব সঞ্চার হইত। বস্তুতঃ সেই সময়ে ধর্ম্মান্দোলনের যুগে 'চৈতন্য লীলা' যে হিন্দুর ধর্ম্ম-বিশ্বাস দৃঢ় করিবার পক্ষে খুবই সহায়তা করিয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই, ছয় বৎসর পরে আবার রাজনৈতিক আন্দোলনেও রঙ্গমঞ্চ সেইরূপ সহায়তা করিতে লাগিল। আর তাহার প্রবর্ত্তক হইলেন নটগুরু ভক্তপ্রবর, দেশপ্রাণ গিরিশচন্দ্র ঘোষ।

গিরিশ বাবু এই সময়ে ষ্টার থিয়েটারের ম্যানেজার। ষ্টার তখন হাতীবাগানে অমৃত মিত্র, অমৃত বসু প্রভৃতি নাট্যরথীগণের দ্বারা পরিচালিত হইত। গিরিশের "চণ্ড" নাটকেই প্রথম যে কয়েকটী কথা পাই, নায়কের পক্ষে তাহা খুবই প্রযোজ্য।

"অন্তরের গূঢ় স্থল
কর অন্বেষণ মন
পশি অভ্যন্তরে গুহ্যতম পুরে
হের কোথা স্বার্থ লুক্কায়িত।
উচ্চ আশ উন্নতি প্রয়াস
আছে কি গোপনে ধরি
স্বদেশ বৎসলভাব?
আধিপত্য লিপ্সা কিম্বা ভারতের হিত
চালিত অন্তর।
সত্যতত্ত্ব কর নিরূপণ
দেখ মন স্বার্থ শূন্য বহে কি অন্তর তব?

এবার (১৮৯০) কংগ্রেসের সময় "মহাপূজা" নাটিকা অভিনীত হয়। ইহাতে গিরিশের গভীর দেশ-ভক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। ভারত-সন্তানগণ যখন সমস্বরে গাহিতেন—

"শিখ হৃদি উচ্চশিক্ষা, মাতৃমন্ত্রে লহ দীক্ষা।
ত্যজ স্বার্থ মাগি ভিক্ষা, রহ জননী-সেবায়।"

তখন রঙ্গমঞ্চে বিদ্যুৎ সঞ্চার হইত। কংগ্রেসে এবার কোন সঙ্গীত হয় না. কিন্তু সে অভাব পূর্ণ করে বঙ্গীয় নাট্যশালা।

এক স্থানে ভারত-সন্তান বলিতেছেন—

"এ উৎসবের নিতান্ত প্রয়োজন। ইহার প্রথম উদ্দেশ্য— ভারতের ভ্রাতৃভাব; এ বিস্তীর্ণ ভারতভূমির নানা প্রদেশে

ভিন্ন ভিন্ন জাতি ও বর্ণের পরস্পর আলিঙ্গন ; আমরা জাতিতে ভিন্ন, পরস্পর ধর্ম্মে ভিন্ন, কর্ম্মে ভিন্ন, ভাষায় ভিন্ন—কিন্তু এক দেশবাসী ও এক রাজ্যেশ্বরীর প্রজা। রাজনৈতিক বিষয়ে আমরা এক জাতি, ভারতের স্বার্থের সহিত আমাদের স্বার্থ একীভূত—ভারতের ধনাগমে আমরা ধনী—ভারতের সম্মানে আমরা মানী, ভারতের উন্নতিতে আমরা উন্নত ; একত্রে রাজনৈতিক আন্দোলনে আমরা রাজনৈতিক উন্নতি লাভ করিব—

"পাঞ্জাব, প্রয়াগ, অযোধ্যা, কনোজ, মহারাষ্ট্র, মাড়োয়ার।
মান্দ্রাজ, বোম্বাই, আসাম, নাগপুর, উৎকল, বঙ্গ, বিহার।
হিন্দু বা খৃষ্টান পার্শি মুসলমান একপ্রাণ আজি সবে
একতাবিহীন ভারত-সন্তান কেহ আর নাহি রবে।

উদ্দেশ্য সম্বন্ধেও গিরিশচন্দ্র বলেন—

"এ সভার উদ্দেশ্য স্বার্থ-সাধন নয়—স্বার্থ বিসর্জ্জন।"

ভারত-সন্তান বলিতেছেন—

"ভারত-মাতার কার্য্যে কিঞ্চিৎ স্বার্থ বিসর্জ্জন করিতে দিন ; শুনিয়াছি, মাতৃভূমির নিমিত্ত মহাপুরুষেরা সলিলের ন্যায় শোণিত দান করিয়াছেন। জন্মভূমি কি আমার এই ক্ষুদ্র দান গ্রহণ করিবেন না ?"

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, এবার কংগ্রেসে অনেকেই নিজ নিজ বাড়ী বা বাগান-বাড়ী ডেলিগেটদের ব্যবহারের জন্য ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। তাই গিরিশচন্দ্র একজনের মুখে আরোপ করিতেছেন—

"যদি এ দীনের বাগিচার স্থান সঙ্কীর্ণ না হয়, আমার অন্যান্য বন্ধুগণ তাঁহাদের নিজ নিজ অট্টালিকা মহাকার্য্যে দিতে প্রস্তুত। আপনারা গ্রহণ করিলে তাঁহারাও কৃতার্থ হন।"

তৃতীয়তঃ, গিরিশ দেখাইয়াছেন—মাতৃপূজার মূলমন্ত্র মাতৃভক্তি ; কেবল বিশুদ্ধ হৃদয়ই মাতৃ-মন্ত্রে দীক্ষিত হইতে পারে —যাঁর মাতৃস্নেহ হৃদয়ে বলবান্, যিনি ভ্রাতৃপ্রেমে আবদ্ধ, ভারত-উন্নতি যাঁর জীবনে একমাত্র উদ্দেশ্য, যিনি মাতৃকার্য্যে জীবন উৎসর্গ করিতে প্রস্তুত, তিনিই মাতৃপূজার অধিকারী —

"নয়নজলে গেঁথে মালা, পরাব দুখিনী মায়
ভক্তি-কমল বলি দিব, মায়ের রাঙা পায়।
শিখ যদি উচ্চশিক্ষা, মাতৃমন্ত্রে লহ দীক্ষা
ত্যজ স্বার্থ মাগি ভিক্ষা, রহ জননী-সেবায়
যে মায়ে দুরিত হরে, রাখ বক্ষে হৃদে ধরে
অবনী তারে আদরে, জননী প্রসন্ন যায়।"

এই মহাপূজায় গিরিশচন্দ্র আরও কয়েকটী নূতন জিনিষ শিক্ষা দিয়াছেন। বৃটানিয়া, লক্ষ্মী ও সরস্বতী সমাসীনা ; বৃটানিয়া লক্ষ্মীকে বলিতেছেন—

"দুখিনী সন্তানগণে　　অন্নকষ্টে অযতনে,
মলিন আবাস হীন আছিল সকলে।
অন্নপূর্ণ গৃহ কি গো তব কৃপাবলে ?
...
এবে ভাগ্য কি প্রসন্ন ? ভাগ্যপ্রদায়িনী তুমি।"



লালমোহন ঘোষ

লক্ষ্মী—

মম কৃপা পাবে ব'লে　　সাগর লঙ্ঘিয়া চলে,
অর্থকরী নানা বিদ্যা করে উপার্জ্জন ;
অজর অমর জ্ঞান করিয়ে আপন।
দুর্গম অরণ্যে পশে,　　ব্যোমযান হ'তে খসে,
ভারত-সন্তান সবে, সময়ে সহায়
ক্ষুদ্র বঙ্গবাসী দেখ সৈন্যকার্য্য চায়।
কিন্তু এই দুঃখ মনে,　　ভারত-সন্তানগণে
কোনমতে শিখিল না আপন-নির্ভর,
শিল্পকার্য্যে নিয়োজিত করিল না কর।
এ দুঃখ কহিব কারে ?　　তব যন্ত্রপুত্র-দ্বারে
পড়িয়ের বস্ত্র তরে অধীন সকলে
যন্ত্রপুত্র-শিল্পবলে গৃহে দীপ জ্বলে !
লবণের প্রয়োজন　　নিত্য আসে জলে জলে
তব পুত্র হ'তে তারা ক্রয় করি আনে,
শিল্পী নাহি হয় কেহ, শিল্প নীচ জানে।

হুটোনিয়া (সরস্বতীর প্রতি) —

বল সতী, কি কারণে, ভারত সন্তানগণে
এতদিন শিল্প-বিদ্যা কর নি প্রদান,
চিরদিন শিল্প জান উন্নতি-সোপান।

সরস্বতী—

অনুমতি মম প্রতি কর নাই ভাগ্যবতী
রাজোৎসাহ একমাত্র শিল্পের সহায়,
সে সাহায্য বিনা শিল্প সদা নিরুপায়।
ছিল শিল্প নানা মত, যেত-শিল্প-জেতে হত,
নিরুৎসাহে শিল্পকার্য্য না করে গ্রহণ,
ভারত-সন্তানে দেহ আশ্বাস-বচন।



নন্দিপদ সিংহ

১৮৯০ সালের বড়দিনের সময় বিদেশাগত অসংখ্য লোক এবং চারিদিকের বাঙ্গালী মহাপূজার অভিনয়ে এত জাতীয়তার শিক্ষালাভ করিয়া গেলেন যে অতঃপরে কংগ্রেস আর অস্পৃশ্য না হেয় বলিয়া কেহ ভাবিতে পারিলেন না। এখানকার সমস্ত সংবাদপত্রে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা বাহির হইয়াছিল। সকলেই বলেন, গিরিশের প্রচেষ্টায় বাঙ্গালার রঙ্গমঞ্চ এখন শিক্ষামন্দিরে পরিণত হইয়াছে। হিন্দুপেট্রিয়টও লিখিলেন—

"The Star Theatre is nightly drawing patriotic throngs to witness the grand national work entitled Mahapuja brought out specially in honour of the Congress, many delegates of which paid it a visit with ample satisfaction for their reward. Jan. 12. 1891.

কলিকাতা কংগ্রেসের পরে হিউম সাহেব বিলাতে চলিয়া যান। ১৮৯১ জানুয়ারী তিনি বিলাত গিয়াও কংগ্রেসের অধিবেশন যাহাতে বিলাতে হয়, সেইজন্য বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু নানাকারণে লণ্ডনে কোন অধিবেশন হইতে পারে নাই। তাহার প্রধান কারণ লণ্ডনে ডিসেম্বর মাসে নির্ব্বাচন জনিত চাঞ্চল্য অতিমাত্রায় ছিল। তথাপি হিউম সাহেব তাহার ভারতীয় বন্ধুগণকে বিলাতে আসিতে বিশেষরূপে অনুরোধ করেন। কিন্তু তাঁহারা কিছুতেই আসিতে রাজী হন না। তাই হিউম সাহেব পদত্যাগ পত্র পাঠাইয়া লিখেন, 'যদি বিলাতে অধিবেশন না হয়, তবে উহা যেন মঞ্জুর হয়', এখন ভারতে কিছুদিন অধিবেশন বন্ধ থাকাই অভিপ্রেত।

কিন্তু কিছুতেই কিছু যখন হইল না তখন ভারতেই অধিবেশন স্থির হইবার কথা হয়। কিন্তু কে আহ্বান করিবে? অবশেষে নাগপুরই সেই সম্মান লাভ করিল।

নাগপুরের কাহারও বড় ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু একজন যুবক ব্যারিষ্টার C. V. Niadu এই বিষয়ে বিশেষ অগ্রণী হইয়া উঠেন। তাঁহার পিতা নারায়ণ স্বামী নাগপুরের একজন প্রসিদ্ধ উকীল। পুত্রের আগ্রহে পিতা রাজী হইয়া উঠেন এবং অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির পদ গ্রহণ করিতে রাজী হন। ভাগীরথ নামে একজন ভদ্রলোক সম্পাদক হন। সকলে চেষ্টা করিয়া নাগপুরের অধিবেশন খুবই সরস ও সফলতার সম্পন্ন করিতে কৃতকার্য্য হন। হিউম সাহেবও ২০শে নভেম্বর ১৮৯১ আসিয়া নাগপুরে পৌছেন। তাঁহার উপস্থিতিও আপ্রাণ চেষ্টা এবং নাইডু ও অন্যান্য স্থানীয় ব্যক্তির উৎসাহে কংগ্রেসের অধিবেশন খুবই জাঁকজমকের সহিত সম্পন্ন হয়। হিউম সাহেব কার্য্যকালে আসিয়া উপস্থিত হইয়া যে উহার সফলতা সম্পাদনে পশ্চাদপদ হন নাই ইহাতেই বুঝা যায় যে তিনি কংগ্রেসকে কত ভালবাসিতেন আর তাঁহার "father of the congress" নামের সার্থকতা কখনও লুপ্ত হয় নাই।

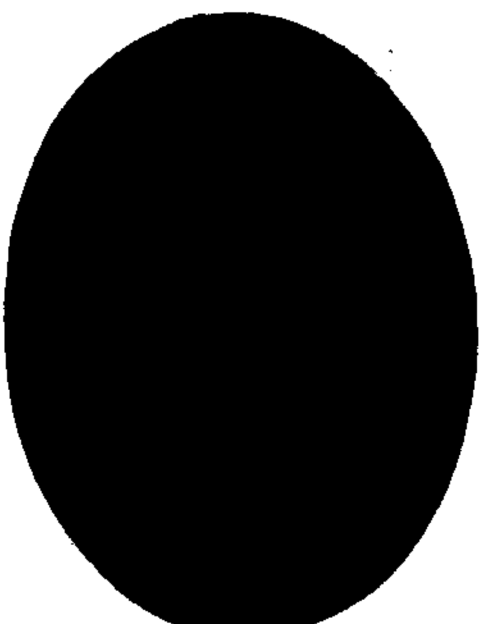
অধিবেশন হয় লালবাগে, ষ্টেশনের নিকটবর্ত্তী স্থানে। পোষ্টাফিস ও টেলিগ্রাফ আফিসও খুব কাছে ছিল। ডেলিগেটদিগকে থাকিবার স্থান দেওয়া হয়, কিন্তু ভোজন-সম্বন্ধে সকলেই পৃথকভাবে মূল্য দিয়া খাইতেন। অভ্যর্থনা সমিতি আহার্য্য দ্রব্যাদি সবই তৈয়ারের বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন।

নাগপুরে নূতন কোন প্রস্তাব হয় না, পুরাতন প্রস্তাবাদিই বিশেষ উৎসাহে বিবেচিত হয়। তবে সকলেই "ব্রাড-ল' সাহেব, রাজেন্দ্রলাল মিত্র এবং টি মাধব রাওয়ের মৃত্যুতে অশ্রুসিক্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন।

শত্রুপক্ষ মনে করিয়াছিলেন "Mr. Hume journeyed from England to India to assist at its uneral obsequies". কিন্তু তাঁহার উৎসাহ ও অনুরাগ দেখিয়া ব্যথিত মনে চলিয়া যান।

হিউম সাহেব আসিয়াই এক সার্কুলার চিঠি পাঠাইয়া দেন—

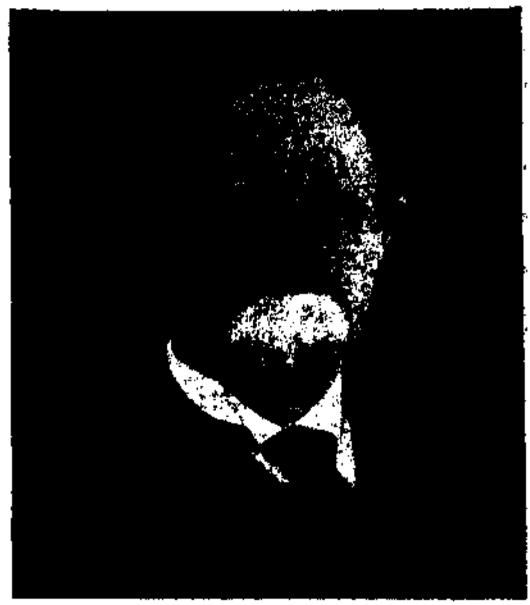
The present seventh session of the Congress is needed not to discuss new subjects but to



ভূধরলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

put the seal on all that its predecessors have demonstated and to comple the cycle."

অষ্টম অধিবেশন হয় এলাহাবাদে (১৮৯২ সালে)। বহু আশা করিয়া পণ্ডিত অযোধ্যানাথ এখানে কংগ্রেস আহ্বান করেন। কিন্তু অধিবেশনের পূর্ব্বেই তিনি স্বর্গারোহণ



মিঃ হিউম

করিয়াছিলেন। বিশ্বম্ভর নাথ অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি হন। আর অধিবেশনের সভাপতি হন বাঙ্গালার মিঃ ডবলিউ, সি, বানার্জ্জি।

স্থান প্রাপ্তি সম্বন্ধে এবার আর কোন অসুবিধাই হয় না। ইতিপূর্ব্বেই Lowther Castle দ্বারভাঙ্গার মহারাজা স্যার লক্ষ্মীশ্বর সিংহ বাহাদুর কিনিয়া লইয়াছিলেন। তিনি কংগ্রেসকে উহা ব্যবহার করিতে দেন (Lent but not lensed)। মহারাজা বাহাদুরের এইরূপ বদান্যতা ও দেশভক্তি বস্তুতঃই আদর্শস্থানীয়।

বাঙ্গলার ছোটলাট স্যার চার্লস ইলিয়াট ১৮৯১ সালে Age of Consent Bill, সহবাস সম্মতি আইন এবং ১৮৯২ সালে Jury Administration নামে দুইটী বিল উপস্থিত করেন। এই দুইটী বিলেই বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িষ্যার একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত তুমুল আন্দোলন উত্থিত হয়। ৩০ বৎসর চালাইবার পরে জুরী প্রথা উঠাইবার কোন কারণ থাকিতে পারে না, তাই দেশের লোক ইহার প্রতিবাদে

বদ্ধপরিকর হইয়া উঠেন। এবং ম্যাজিষ্ট্রেট ও যাহাতে জুরীর সাহায্যে বিচার করেন তজ্জন্য চেষ্টা করেন।

এই সম্বন্ধে পাটনার শ্রেষ্ঠ উকীল গরীবের বন্ধু স্বনামখ্যাত অনারেবেল গুরুপ্রসাদ সেন মহাশয় আপ্রাণ চেষ্টা করিয়াছিলেন। জুরী প্রথা আমাদের প্রাচীন সভ্যতার অঙ্গীভূত, এইভাবে তিনি বিশেষ যুক্তি দেখাইয়া ওজস্বিভাবে বক্তৃতা করিয়াছিলেন। তাঁহাকে সমর্থন করেন বহরমপুরের বৈকুণ্ঠ নাথ সেন মহাশয়। একটী কমিশন গঠিত হয়, এবং ফলে জুরীর বিচার সম্বন্ধে পূর্ব্ব অধিকার প্রায় বজায় থাকে।

কলিকাতার স্বর্গীয় কৃষ্ণলাল বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ও কংগ্রেসের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে যোগদান করেন। ইতিপূর্ব্বে ইনি দেওয়ানী আদালতের জজ ছিলেন ও প্রশংসার সহিত অবসর গ্রহণ করেন। অতঃপরে তিনি সামাজিক ও রাজনৈতিক বিষয়ে আত্মনিয়োগ করেন। তিনিই কলিকাতার প্রথম কংগ্রেসে ১৮৮৬ সালে Expansion Legislative Councils সম্বন্ধে



রাজেন্দ্রলাল মিত্র

প্রস্তাব উত্থাপিত করিয়াছিলেন তাঁহার সম্বন্ধে পরে আরও বলিব।

নেমে আয় মাগো পল্লীর ছায়াতলে

শ্রীসত্যনারায়ণ দাশ

ভেসে যায় দেশ সর্ব্বহারার রোদন আঁখির জলে
দুর্য্যোগক্ষণে নেমে আয় মাগো পল্লীর ছায়াতলে।

সানাই বাজিছে কাঁদিছে কে যেন কোটে করুণার গান
উৎসব এল, নরনারীদের আতঙ্কিত প্রাণ।

বন্যার ত্রাসে তোমার ছেলেরা, গৃহহারা নরনারী
আলো ঝলমল শারদ প্রভাত আনে কি হর্ষবারি।

রোগজীর্ণ, অন্নহীন, কেহ হায় শোকাতুর
পায়না বস্ত্র তোমার মেয়েরা লজ্জা করিতে দূর।

লাঙ্গল বেচিয়া বাঁচায়েছে চাষী রুগ্ন শিশুরে তার
মহাজনে আজ তুষিবে কেমনে, করে তাই হাহাকার।

সড়কে সড়কে ঘুরে ফেরে নিতি আর্ত্ত আতুর দীন
খেটে খেটে হায় তোমার ছেলেরা নিস্তেজ প্রাণহীন।

ফসল ফলেনা, অজন্মা দেশ, তুমি যে অনুর্ব্বর
দরিদ্রতায় প্রপীড়নে বিষশ্বাসে জ্বলে নর।

ভেঙেছে তোমার পূজার দেউল, ফাটলে ফাটলে তার
অশথ বটের ছোট ছোট শিস উঁকি দেয় বায়ে হায়।

ওগো দশভুজা কে করিবে পূজা ভক্তিপূত চিতে
যুক্তকরে কে আসিবে আজি অঞ্জলি দিতে?

ক্লেশ ক্লিষ্ট নীচতা দুষ্ট আজি মানুষের মন
দুঃখের মতন গলিত শবেরে, করে সে অন্বেষণ।

ধনধান্যের আশীষ ধারায় বর্ষি শান্তিজল
কর মা আজিকে শুষ্ক-দগ্ধ পল্লীরে সুশীতল।

রিক্ত প্রাণের তিক্ত বেদনা আঁখি বেয়ে হায় ঝরে
হেথায় আজিকে নেমে আয় মাগো দুর্গতদের তরে।

বন্ধন-মুক্তি

—শ্রীকালীপ্রসন্ন দাশ

[উপন্যাস]

[ভাগীরথী পূজা সন্ধ্যায় নিরতা থাকিতেন। সংসারে তাঁহার থাকিবার মধ্যে ছিল একমাত্র ভ্রাতুষ্পুত্র মহীন্দ্রনাথ। মহীন্দ্রেরই বাড়ী তিনি রক্ষণাবেক্ষণ করিতেছেন। মহীন্দ্রনাথ ব্রাহ্মসমাজভুক্ত। কলিকাতায় স্ত্রী-পুত্র লইয়া থাকেন, দেশের বাড়ীতে বড় আসেন না। তবে একদিন কার্য্যসূত্রে নিকটের এক গ্রামে আসিয়াছিলেন বলিয়া পিসিমাকে দেখিতে বাড়ী আসিলেন। পিসিমার আদরযত্নে তিনি একেবারে অভিভূত হইয়া গেলেন।

ভাগীরথীর বড় ইচ্ছা যে কলিকাতায় গিয়া গঙ্গাস্নান ও কালীঘাটের মাকে প্রণাম করিয়া জন্ম সার্থক করেন। পীড়াপিড়িতে মহীন্দ্রনাথ পিসিমাকে সঙ্গে লইয়া কলিকাতা আসেন। কিন্তু স্ত্রী সুকল্যাণী ইহাতে অত্যন্ত রুষ্টা হইলেন ও বাথ্‌রুমের পাশে একটা ছোট ঘরে তাঁহাকে থাকিতে দিলেন। কিন্তু যখনই শুনিলেন যে, তাঁহার নৈষ্ঠিক পরিবারে হিন্দুর পূজা, ব্রত প্রভৃতি পৌত্তলিক কাণ্ড তাঁহার সন্তানাদির সম্মুখে অনুষ্ঠিত হইবে, তিনি তাঁহার স্বামীকে তাঁহার পিসিমার জন্য অন্যত্র বন্দোবস্ত করিবার জন্য বলিলেন। মহীন্দ্রনাথ তাঁহার বন্ধু উপেনের বাড়ীতে পিসিমার থাকিবার ব্যবস্থা করিলেন। পিসিমা সেই রাত্রেই বাড়ী চলিয়া যাইতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু ভ্রাতুষ্পুত্রের পীড়াপিড়িতে উপেনের বাড়ী আসিতে আপত্তি করিলেন না।]

(৪)

ভাগীরথী রহিলেন; রহিয়াই গেলেন। দেশে ফিরিবার নামও আর মুখে আনিতেন না। উপেন বাবুর স্ত্রী মনোরমা নিজের শাশুড়ীর মতই আদর-যত্ন তাঁহাকে করিতেন; পুত্র অরুণ প্রায়ই তাঁহাকে গঙ্গাস্নান করাইয়া আনিত, মধ্যে মধ্যে কালীঘাটেও লইয়া যাইত। উপেন বাবু ছিলেন হাইকোর্টের একজন এডভোকেট, পসার মন্দ ছিল না। অরুণ সবে ওকালতী আরম্ভ করিয়াছে। নূতন উকিল, সুতরাং সময় যথেষ্ট ছিল। সময়ের অনেকখানিই নূতন এই দিদিমাটির জন্য ব্যয় করিতে কার্পণ্য সে কখনও করিত না। কাছে বসিয়া হাসি-গল্পও অনেক করিত, বেশ ভালই তাহার লাগিত।

শিবরাত্রি আসিল; দুপুরের পর অনেকগুলি শিব গড়িয়া ভাগীরথী একখানি পীঁড়ির উপরে সাজাইয়া রাখিতেছিলেন। উর্ম্মি আসিয়া তখন সম্মুখে দাঁড়াইল। সকালে সন্ধ্যায় নয়, কারণ তখন পৌত্তলিক অনুষ্ঠানের সময়। মাত্র বেলা দুইটা হইতে পাঁচটা পর্য্যন্ত ছেলেমেয়েরা যখন ইচ্ছা উপেনবাবুর বাড়ীতে গিয়া দিদিমার সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করিতে পারে—এইটুকু অনুমোদন মাতার নিকটে পাইয়াছিল। শান্তিপ্রিয় মহীন্দ্রনাথও এই আপোষে রাজি হইয়াছিলেন।

"ও কি দিদিমা! অতগুলো মাটির ঢিপি গড়ছ কেন? কি হবে ও-দিয়ে?"

"মাটির ঢিপি! ওমা, মেয়ে বলে কি? অবাক ক'রলে! মাটির ঢিপি কি লো?"

"তবে কি ও-গুলো?"

"ও তো শিব। আজ শিবরাত্রির যে।"

"শিব! ও, ওই তোমাদের মহাদেব ত? সে ত ছবি টবি দেখছি। তা ও-রকম মাটির ঢিপি ত তা নয়।"

ভাগীরথী কহিলেন, "ঐ ছবিতে যে মহাদেব দেখেছিস, এই শিবও তিনি। এও তাঁর এক মূর্ত্তি।"

হি হি করিয়া উর্ম্মি হাসিয়া উঠিল। কহিল, "মূর্ত্তি! এও নাকি আবার মূর্ত্তি! এ ত মাটির পুঁতুল—তাও ভাল ক'রে গড়া পুজো কর – তাও হয় নি। হাত নেই, পা নেই, নাক-মুখ-চোখ-কাণ, কিছুই নেই—কেবল এক একটা মাথার মত কি বের করে দিয়েছ।"

হাসিয়া ভাগীরথী কহিলেন, "পাগলীর কথা শোন! শিব ত এই রকমই।"

"ঐ গুলো পুজো করবে না কি?"

"ছি দিদি, গুলো গুলো বল্‌তে নেই। এঁরা হলেন দেব্‌তা।"

"হাঁ, দেব্‌তা ত ভারী? এই ঢিপিগুলো আমিই এখুনি ভেঙে একটা দলা ক'রে ফেলতে পারি।"

বলিতে বলিতে উর্ম্মি সম্মুখে বসিল। ভাগীরথী পিঁড়িখানি পিছনের দিকে একটু সরাইয়া রাখিলেন। কে জানে, চপলা বালিকা, সত্যই যদি এমন একটা বিসদৃশ কাণ্ড করিয়া ফেলে? দেবতার কোপে অমঙ্গল যাহা হইবার তাহা ত হইবেই, আবার এতগুলি শিব কেন তাঁহাকে

বলিতে হইবে। হাসিয়া কহিলেন, তা পারবি না কেন? আমিও পারি। কাঁচা মাটির হাতে-গড়া জিনিষ, কে না গড়তে পারে?”

“হাতে গ’ড়ে যা চাওয়া যায়, সে আবার কেমন দেবতা তোমাদের?”

“কি করব দিদি? ভক্তি তেমন নেই, দেবতা নিজে ত মূর্ত্তি ধরে দেখা দেবেন না কাজেই হাতে গ’ড়ে নিতে হয়।”

“হাতে গ’ড়ে নিলে সে ত হয় পুতুল

“পুতুল! ওমা, পুতুল কেন হবে? পুতুল নিয়ে ত খেলা করে। তা কি পূজো করে কেউ? এই যে শিব গ’ড়েছি, পূজো যখন করব, এরি ভেতর আমার দেবতা আসবেন। মনে মনে এতেই তখন আমার দেবতাকে দেখতে পাব।”

ঊর্ম্মি কহিল, “দেবতা ত তোমার সেই মহাদেব যার ছবি দেখেছি? তা সে মহাদেব কে জান?”

“তাই যদি জানব দিদি, তাহ’লে আর এই পাপের বোঝা নিয়ে এখনও এই পিথিবীতে প’ড়ে রয়েছি, কবে যে ত’রে যেতাম।”

“তা এই সব ভুল থেকে কি ত’রে যেতে চাও দিদিমা? জান, বড় একজন পণ্ডিত অনেক গবেষণা ক’রে এর তত্ত্ব বের করেছেন?”

“তা পণ্ডিত যোগী ঋষিরাই ত এর তত্ত্ব জানেন। মুখ্যু মেয়েমানুষ আমরা কি জানব?”

“এ দিদিমা, ইনি তোমাদের সেকেলে সেই যোগী ঋষি পণ্ডিত কেউ নন। তারা ত এসব তত্ত্ব খুবই বুঝত! ইনি হলেন একালের বড় একজন প্রত্নতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত।”

“পেত্নীতত্ত্বের পণ্ডিত? ও, তাই বল্! মহাদেব হ’লেন ভূতনাথ—ভূত যেখানে, সেই সেখেই পেত্নী আছে, ছাড়াছাড়ি হয়ে ত আর থাকতে পারে না। কাজেই পেত্নীতত্ত্ব যে জানবে ভূতের তত্ত্বও সে অবিশ্যি জানবে। আর তা হ’লে ভূতনাথ মহাদেবের তত্ত্ব—”

হি হি করিয়া ঊর্ম্মি হাসিয়া উঠিল। বিস্মিতা ভাগীরথী কহিলেন, “হাসলি যে বড়? ওলো, এসব হাসির কথা নয়। তোরা মেমজানী কি না—কিছু মানিস্ নে। তাই দেবতার কথায় এত হাস্‌ছিস। তা হাসতে নেই দিদি, হাস্‌তে নেই। ওতে অকল্যাণ হয়।”

ঊর্ম্মি কহিল, “হাস্‌ছি তোমার কথা শুনে। আমি কি ব’লছিলাম দিদিমা—ভূতপেত্নীর কথা নয়। পেত্নীতত্ত্ব নয়—হি হি হি! প্রত্নতত্ত্ব—প্রত্নতত্ত্ব।”

“আমিও ত তাই বলছি। তোরা না হয় ভূতকে প্রেত বলিস্—যেমন প্রেত আর পেত্নী, আমরা বলি ভূত আর পেত্নী। একই তো কথা হ’ল।”

“নাঃ! তোমার সঙ্গে আর পারবার যো নেই দিদিমা আচ্ছা, প্রেতপেত্নীর কথা এখন থাক। বড় একজন পণ্ডিত অনেক গবেষণা ক’রে যা বলেছেন, যদি শোন তো বলি।”

“তা বল্ না শুনি। নতুন তত্ত্ব যদি কিছু পাই, সে ত ভাগ্যির কথা!”

“আচ্ছা, তাহ’লে শোন। ঐ যে মহাদেবের পূজো তোমরা কর, ও দেবতা টেবতা কিছু নয়। দেবতা ত কিছু নাই-ই, সব তোমাদের হাতে গড়া পুতুল। ঐ মহাদেব আবার সে পুতুলও নয়। সেকেলে একজন বিলেতের লোক—খুব তেজী আর জোয়ান ছিল—ঘুরতে ঘুরতে এদেশে আসে।”

“ও মা, বলে কি মেয়ে!”

“শোনই, আগে—সে অনেক কালের কথা—কত হাজার হাজার বছর আগেকার—সে দেশের লোক সব তখন বুনো ছিল, বনের জন্তু সব মেরে কাঁচা তাই খেত, তার চামড়া পরত, আর হাড়টাড়গুলোও গেঁথে মালাটালা ক’রে তাই দিয়ে সাজত। নাইত না, মাথায় চিরুণী দিত না, চুলগুলোও জটা বেঁধে থাকত।”

“তা থাকত। তাই ব’লে মহাদেব কেন বুনো সাহেব হ’তে যাবেন?”

“তা ছাড়া আর কে হবেন? গায়ের রঙ একেবারে সাদা, ঠিক সাহেবদের মত। এদেশের লোক ত সব কালো। বড়জোর কেউ কেউ হ’লেও সাহেবদের কাছে ত কালো।”

“তা মহাদেব ত আর এদেশের লোক নন, দেবতা; তাঁর গায়ের রঙ সাদা হ’তে বাধা কি?”

“দেবতা হ’লেন ত? শোনই আগে কথাটা। তা

সে লোকটা—এদেশে এল। দেশ-বিদেশে যাবার ঝোঁক তখনও সাহেবদের বেশ ছিল। এদেশে তখন অনার্য্য জাতির বাস ছিল যেশাই। তাদের সব রঙ ছিল কালো, আর চেহারাও ছিল বড় বিকট। কেউ গাছের লতাপাতা জড়িয়ে পরত, কেউ একেবারে ন্যাংটাও থাকত। তা সাদা সেই জঙ্গলী সাহেবটি না এদেশে এসে এক দল লোক জুটিয়ে নিয়ে, হিমালয় অঞ্চলে একটা দেশ দখল ক'রে নিতে চাইল। তখন সেখানকার দুর্দ্দান্ত একটা অনার্য্য জাতির সঙ্গে গেল তার যুদ্ধ বেধে। অনার্য্য এক রাণী কি রাজকন্তে যেই হউক, খাঁড়া হাতে ক'রে যুদ্ধ করতে এল। সে ছিল ন্যাংটা; আরও কত কালো কালো ন্যাংটা মেয়ে খাঁড়া তুলে নাচতে নাচতে তার সঙ্গে এল। এক যোগ হয়ে হাঁকডাক ছেড়ে ভয়ঙ্কর যুদ্ধ তারা বাধিয়ে দিল। তাই সেই মেয়ে-গুলোর নাম শেষে হ'ল হাকিনী, ডাকিনী, যোগিনী আর খুব কালো ব'লে তাদের সেই সর্দ্দার মেয়েটার নাম হ'ল কালী। খুব যুদ্ধ হ'ল—কাটাকাটি রক্তারক্তি—সে এক ভয়ঙ্কর কাণ্ড! লাফাতে লাফাতে কালী শেষে গিয়ে সেই সাহেবটাকে চিৎ ক'রে ফেলে তার বুকে পা চেপে দাঁড়াল। হার মেনে সাহেব শেষে বল্লে, 'দোহাই কালো আদমীর মেয়ে, আমায় মেরো না। আমিও রাজার ছেলে, যদি বল তোমাকে বিয়ে করব।' কালী তখন লজ্জা পেয়ে জিভে কামড় দিয়ে একটু হাস্‌ল। তারপর তাদের বিয়ে হ'ল, রাজা আর রাণী হ'য়ে দুইজনে শেষে সেই দেশটা শাসন কর্‌তে লাগল। এমন একটা আশ্চর্য্য ঘটনা হ'ল—অমন রাজা আর অমন যোদ্ধা রাণী—ম'রে গেলে সেই জঙ্গলী দেশের লোকেরা দেবতা ব'লে তাদের মূর্ত্তি গড়ে' পূজো কর্‌তে সুরু কর্‌লে। এই হিন্দুদের পূর্ব্বপুরুষ আর্য্যেরা শেষে পাহাড়ী সেই অনার্য্যদের কাছ থেকে এই দু'টি মানুষ-দেবতার পূজো শিখে নিয়েছে। তাদের কাছে খুব বড় দেবতা ব'লে তারা মহাদেব এই নাম তাকে দেয়। বিলেতের সেই জঙ্গলী রাজপুত্রের নাম ছিল সিওয়ান্ড, বা সিবান্ড। তাই থেকে এ দেশে তার নাম হ'য়েছে শিব। এখন বুঝলে দিদিমা, তোমরা যে শিবের পূজো কর, সে কেমন দেবতা, আর কালীই বা কেমন দেবী?"

হাসিয়া কালীময়ী কহিলেন, "বুঝলাম। তোদের এই সেন্সীভক্তের পণ্ডিতের মাকে কোনও বিলেতী মেয়ে এসে তত করেছিল। নইলে দেবতার লীলা—তাই নিয়ে এমন কথাও কেউ বলে?"

ঊর্ম্মি কহিল, "না না, বাজে কথা নয়, দিদিমা। সত্যি খুব বড় একজন পণ্ডিত তিনি। অনেক গবেষণা ক'রে এই তত্ত্ব তিনি খাড়া ক'রেছেন। শুধু এই নয়, তোমাদের যে ঐ সরস্বতী ঠাকুর—"

"সেও বুঝি ঐ জঙ্গলী সাহেব শিবের মেয়ে?"

"হাঁ, তাই তিনি বলেন। এই দেখ না, তোমাদের সব দেবতা হ'লচে, কালো, লাল, নীল, এই সব রঙের। কেবল মহাদেব সাদা আর সরস্বতী সাদা।"

"কেন গঙ্গাও ত সাদা।"

"বটে! তাই নাকি? এই ঠিক হয়েছে, তাঁকে লিখে পাঠাতে হবে। নতুন গবেষণার একটা সূত্র পাবেন। তিনি বলেন, সেই শিব আগে তাদের দেশে একটা বিয়ে করেছিল। একটি মেয়েও হয়। রাজা হ'য়ে সেই মেয়েটিকে এদেশে নিয়ে আসে। খুব ভালবাসত, লেখাপড়াও শেখায়, গানবাজনাও শেখায়। সেই মেয়েই হ'ল তোমাদের, সরস্বতী। তবে সেই মেয়ের মা যে কে, শেষে কি ক'রল, কি হ'ল তার, এসব তিনি ঠিক বুঝতে পারেন নি। তাই অনুমান ক'রে বলেছেন, সে স্ত্রী তখন ম'রে গিয়েছিল। গঙ্গা, দুর্গা, চণ্ডী, এইসব স্ত্রীকে এদেশেই পরে তিনি বিয়ে করেন। বদ নিয়ম এদেশে বরাবরই আছে। তা গঙ্গা যখন সাদা ব'লছ, আর থাকেনও জলে, মকরে চ'ড়ে বেড়ান, নিশ্চয়ই তিনি শিবের সেই আগেকার বিলিতী বউ, সরস্বতীর মা। আর আসেন এদেশে সাগর পার হ'য়ে মকরের মত গড়নের একটা জাহাজে কি ভেলায়-টেলায় চ'ড়ে, আর ঢোকেনও দেশে বোধ হয় গঙ্গার মোহনা দিয়ে, উজোন বেয়ে শেষে হিমালয়ে শিবের সেই রাজ্যে গিয়ে পৌঁছেন। নদীর নামও তাই শেষে বোধ হয় হ'য়েছে গঙ্গা। সেই বিবির নাম বোধ হয় ছিল, গ্যাঞ্জেসিয়া (Gangesia), তাই নদীকে ইংরেজিতে বলে 'গ্যাঞ্জেস' (Ganges)। হাঁ, ঠিক হয়েছে। ওঁকে লিখে পাঠাতে হবে। এই সূত্র পেলে তিনি হয়ত আরও কত তত্ত্ব বের ক'রতে পারবেন।"

"এ সব কোথায় প'ড়লে ঊর্ম্মি?"

সুদর্শন একটি যুবক পাশেই একটা ঘরের দরজায় দাঁড়াইয়া উর্ম্মির এই কথা শুনিতেছিল। এখন অগ্রসর হইয়া এই কথা জিজ্ঞাসা করিল।

"এই যে অরু! হাঁ, শুন্‌লি ত দাদা, উনি কি ব'লছে! তা তোদের ইংরিজি শেখা পণ্ডিতরা কি এইসব পেত্নীতত্ত্ব বইতে লেখে?"

অরুণ একটু হাসিয়া উত্তর করিল, "হাঁ, তা হরেক রকম পেত্নীতত্ত্ব লেখে বই কি? তবে এতবড় একটা পেত্নীতত্ত্ব—সেই হাজার হাজার বছর আগে বিলিতী ভূতপেত্নীদের সঙ্গে এদেশী ভূতপেত্নীদের এমন আশ্চর্য্য একটা যোগাযোগের তত্ত্ব, কই—দেখিনি ত আর কাউকে লিখতে এখনও। লোকটার পাগলা কল্পনায় লাফটা খুব লম্বা বটে। একেবারে লঙ্কা ডিঙ্গিয়ে কোথায় গিয়ে পড়েছে। কে এ উর্ম্মি? কোন্ কাগজওয়ালা এই মৌলিক প্রবন্ধ বের করেছে?"

উর্ম্মি কহিল, "কেন আপনি পড়েন নি? নবযুগ পত্রিকায় গেল মাসে ভঞ্জবাবুর এই প্রবন্ধ বেরিয়েছে। মৌলিক গবেষণায় তাঁর খুব নাম আছে শুনেছি।"

"কই, শুনিনি ত। কে ব'লেছে?"

"দাদা বলেছেন। তিনিই প্রবন্ধটা আমাকে পড়তে দিলেন।"

"ও! তা কথাগুলো যা ব'লেছেন—মৌলিক বন্দুর হ'তে হয়। হাঁ, আর একটা কথাও তাঁকে লিখে দিতে পার। পুরাণে বলে গঙ্গা স্বর্গ থেকে নেমে এসেছেন। তা হ'লে সে যে নিশ্চিত সেই জঙ্গলী সাহেবের বিবি বউ, এতে আর সন্দেহ কিছু নেই। তবে তুমি আবার ব'লছ সাগর থেকে এসে লম্বা চড়াই উজান বেয়ে হিমালয়ে সেই শিবের দেশে পৌঁছেছেন। তা গোড়াতে সাগরে নেমে এসেছিলেন ত সেই স্বর্গ থেকে!"

"আপনি ঠাট্টা করছেন—যান্!"

"তা যাই করি, তুমি লিখে দিও না? দেখো, আগামী মাসে আর একটা প্রবন্ধ বেরোবে এই তত্ত্ব নিয়ে। আর তোমার কাছে এই রত্নের খেই পেয়েছেন, তাও স্বীকার ক'রে কৃতজ্ঞতা জানাবেন। তোমারও বড় একটা নাম বেরিয়ে যাবে।"

যেন লজ্জায় মরিয়া গেল। কহিল, "যান্, কি যে ব'লছেন। আমি লিখব না কিছু। তা আপনি কি বলেন? শিব, কালী, গঙ্গা, এরা কারা? এদের সব কথা একেবারে মনগড়া মিছে গল্প ব'লে উড়িয়ে দিতে চান?"

"আমরা চাইলেই বা উড়ে এঁরা যান কোথায়? হাজার হাজার বছর দেশের এত সব লোকের ভক্তিপূজোর ভারে সারাটি দেশের মনপ্রাণ ভ'রে বেশ শক্ত হ'য়েই যে এঁরা চেপে ব'সে রয়েছেন।"

"আপনি কি এদের দেবতা বলে মানেন?"

"আমি! আমি মান্‌তেও শিখিনি, না মানতেও শিখিনি। আর আমার মানা না মানায় এঁদের এসে যায়ই বা কি? আমি ত অতি নগণ্য একটা লোক মাত্র।"

"কেন, আমরাও ত মানি না।"

"তোমরাই বা কটি লোক দেশের? কটি হাজার মাত্র লোক তোমরা না না ক'রছ, আর কোটি কোটি লোক উচ্চকণ্ঠে হাঁ হাঁ ক'রে এঁদের জয়জয়কার তুল্‌ছে। তোমাদের এই 'না'র মূলে শক্ত কি ভিত্তি আছে জানি না। কিন্তু এদের এই 'হাঁ'র মূলে অতি গভীর বিরাট যে ভক্তিবিশ্বাসের ভিত রয়েছে, তার তল পাওয়া যায় না, সীমাও পাওয়া যায় না, হাজার হাজার বছরের অনেক ধাক্কা-গুঁতোতেও তা টলেনি। ছুটো ফাঁকা গল্প রচনা ক'রে, কি দুটো টিটকারী দিয়ে, তুমি আমি পারব আজ তাই টলাতে? এই ত দিদিমা রয়েছেন, একেবারে সেকেলে বুড়ী, লেখাপড়াও কিছু শেখেন নি। তা এই যে এতবড় পণ্ডিতী গল্পটা বল্‌লে, উনি হাসছেন। কোনও যুক্তি দিয়ে তোমার গল্প উনি কাটাতে পারবেন না। কিন্তু ওঁর ভক্তিবিশ্বাস কি এতটুকুও এতে ট'লেছে?"

উর্ম্মি কহিল, "হাঁ দিদিমা, এই যে কথাটা শুন্‌লে, সত্যি ব'লে মনে হয় না? না হয়, ধর সত্যি হ'তেও ত পারে।"

হাসিয়া ভাগীরথী কহিলেন, "কি, তোর ঐ পেত্নীর কথা! আ পোড়াকপাল! তা তুই কি ভাবছিস, ঐ কথাটা শুনলাম, আর অমনি এই শিবগুলি যা গড়েছি, পূজা' না ক'রে রাস্তায় ফেলে দেব? ছি ছি ছি!"

"পূজোই বা কেন করবে?"

"কেন করব? ওরা দেবতা, তাঁর পূজো করব না?

তোরাও ত দেবতা একটা মানিস—না হয় বেন্ধাই তাঁকে বলিস। তাঁর পুজো করিস নি ?"

"তা করি বই কি ? উপাসনা করি, তা সেও একরকম পুজোই বটে। তবে তিনি হ'লেন এক সত্য দেবতা।"

"আর আমাদের শিব দুর্গা কালী এঁরা হ'লেন বুঝি সব মিথ্যে দেবতা ? কেন, কে বলেছে ?"

হাসিয়া অরুণ কহিল "হাঁ, এইবার ঠকেছ উর্মি! কি উত্তর দেবে ? তোমরা যে মিথ্যে বল, তার প্রমাণ কি ?"

"প্রমাণ কি ! কেন, এর আবার প্রমাণ কিছু লাগে না কি ? পৃথিবীর সব সভ্য উন্নত দেশের লোক জানে, শিক্ষিত আলোকপ্রাপ্ত মানুষ সবাই একবাক্যে বলে, ঈশ্বর এক, তিনি ছাড়া আর কোনও দেবতা নেই। আমাদের বিবেকও বলে তিনি এক অদ্বিতীয়।"

অরুণ কহিল, "এইখানে বড় জটিল দুটি ভুল বল্লে উর্মি। এটাকে যদি প্রমাণ ধ'রে থাক, তবে প্রমাণ হবে না।"

"কেন, কিসে ভুল বল্লাম ?"

অরুণ উত্তর করিল, "প্রথম, সভ্য আর উন্নত দেশ কোন্‌গুলো ? কিসে তারা সভ্য আর উন্নত ? ব'লবে ইয়োরোপ। তা পার্থিব দশটা বিষয়ে ইয়োরোপ আজ যতই উন্নত অথবা শক্তিশালী হ'ক, ধর্ম্মেও অতি উন্নত—একথা সকলে স্বীকার করেন না। হ'লেও, সবাই তারা এক অদ্বিতীয় ঈশ্বরকেই মানে না। তারা খৃষ্ট মানে, আরও কত জ্যোতির্ম্ময় দেবপুরুষ মানে, যাঁদের তারা এঞ্জেল বলে, আর যাঁরা স্বর্গে মহা-জ্যোতির্ম্ময় ঈশ্বরকে ঘিরে দাঁড়িয়ে তাঁর স্তুতি গান করছেন।"

"হুঁ—"

অরুণ বলিতে লাগিল, "তোমরা ঈশ্বরকে যে ভাবে মান, তার সঙ্গে এর কতটুকু মিল আছে, ভেবে দেখ দিকি ? বৌদ্ধরাও অনেক দেবতা মানে। তারপর আজকাল যতই তোমরা অবজ্ঞা কর, প্রাচীন হিন্দুরা সভ্যতায় বিশেষ উন্নত ছিলেন ব'লে পাশ্চাত্য বড় বড় পণ্ডিতরাও স্বীকার ক'রে থাকেন। তোমাদের উপাস্য ব্রহ্ম নাম তাঁদের, ব্রহ্মের ধারণাও তাঁদের। ব্রহ্ম উপরের কর্ত্তা, আর তার নীচে অনেক দেবতা তাঁরা মানতেন। শিক্ষিত আর আলোকপ্রাপ্ত বই অশিক্ষিত আলোকবর্জ্জিত কেউ তাঁদের কখনও বলে না, বঙ্কিমও পারে না। এই সব দেবতার কথা তাঁরাই দেশকে ব'লে গেছেন, পুজো তাঁরাই দেশকে শিখিয়ে গেছেন।"

"কিন্তু আজকাল—নতুন এই যুগ—"

"হাঁ, আজকাল—নতুন এই যুগে, শিক্ষিত আর আলোকপ্রাপ্ত তোমরা যাঁদের বল, তাঁদের কয়জনকে তোমরা জান ? তাঁরা কি বলেন না বলেন, কি করেন না করেন, খবরই বা কতটুকু রাখ ? অনেকে আছেন, সেকেলে বামুনপণ্ডিত, গুরুদের কাছে দীক্ষা নিয়ে এইসব দেবতার পুজো করেন, মন্ত্র জপ করেন। এঁদের লীলার কথাও ভক্তিতে পাঠ করেন, ব্যাখ্যা শোনেন, তীর্থে যান, মন্দিরে মন্দিরে পূজা অর্চ্চনা করেন, তীর্থ নদীতে তীর্থকুণ্ডে স্নান-তর্পণ করেন, ক'রে কৃতার্থ হ'য়ে আসেন। তা হ'লে দেখ, পৃথিবীর কত লোক—শিক্ষিত আর আলোকপ্রাপ্তও কত লোক—এক ঈশ্বর ছাড়া আরও কত দেবতা মানে। সেই এক ঈশ্বর আর এই দেবতাতে তফাৎই এঁরা কিছু দেখেন না ; মনে করেন, তিনিই এই সব দেবতা হ'য়ে ভক্তবাঞ্ছা পূর্ণ করেন।"

"হুঁ—এসব কথা ত শুনিনি কখনও।"

হাসিয়া অরুণ কহিল, "শুনতে চাওনি, শোনান হয়নি, তাই শোননি। তারপর ঐ বিবেকের কথা। বিবেক বলতে ঠিক কি বোঝ জানি না। কাকে যে বিবেক বলে, সেটা ঠিক বুঝে নেওয়াও অমন সহজ নয়।"

"কেন, আমরা ত বলি বিবেক মানুষের অন্তরে ভগবানের বাণী"

অরুণ কহিল, জানি। তা সে বিবেক তোমাদের যেমন আছে, দিদিমারও আছে, সবারই আছে। তোমার বিবেক হয়ত বলে এক ঈশ্বর ছাড়া আর দেবতা নেই। কিন্তু দিদিমার বিবেক ত সে কথা কখনও বলে না ; নিষ্ঠুর হ'য়ে সে বরং বলছে, শিব, দুর্গা, কালী, গঙ্গা এঁরাও আছেন, এঁরাই নিকটে আছেন, মানুষের ভক্তির পূজা নেন, ভক্তকে দয়া করেন। তোমাদের আচার্য্যরাও একটা বচন—উপনিষদেরই একটা বচন আবৃত্তি করে থাকেন—

'তমীশ্বরাণাং পরমং মহেশ্বরং।
তং দেবতানাং পরমঞ্চ দৈবতম্॥'

তাহ'লে এঁরাও ত সেই এক মহেশ্বরের সঙ্গে সঙ্গে আরও

অনেক ঈশ্বরের—যাদেরই দেবতা বলা হয়—তাঁদের সত্তাকেও স্বীকার করেছেন।"

ধীরে ধীরে ঊর্ম্মি কহিল, "তা বটে—তা বটে! কথাগুলো যা বল্‌ছেন, ভাববার কথাই বটে। তবে ভাবিনে কখনও, মনেও ওঠেনি। উঠবার সুযোগও কখনও ঘটেনি। নতুন আজ শুনছি—সব কেমন নতুন নতুন লাগছে, জানা-শুনো সত্যির মত মনে ধ'রে নিতেও পারছিনি। তা—আপনিও কি দিদিমার মত সেদাই এই সব দেবতা মানেন?"

"আমি? আমি ত বলেছি, এ সব মানতেও শিখিনি, না মানতেও শিখিনি। মনও কোনও দিকে বাঁধা পড়েনি, খোলাই আছে। তবে এ সব কথা কিছু কিছু আলোচনা ক'রেছি। আর তাতে এই বুঝেছি, পাঁচরকম দেবতা যারা মানে, তারা এমন একটা পাপ কিছু করে না।"

"তা হবে। কিন্তু আপনি যে বল্লেন, মনটা কোনও দিকে বাঁধা পড়েনি, খোলা আছে, তা কি থাকে কারও? একদিকে না একদিকে টানবেই একটু। তা কোন দিকে আপনার মন টানে?"

অরুণ একটু ভাবিয়া কহিল, "এদিন ত কোনও দিকেই ঠিক টানে নি। মানুষের জীবনে এ সবের তেমন গুরুত্ব কিছু একটা আছে, তাই-ই মনে হয়নি। তবে এই কদিন ধ'রে দিদিমার পূজো-টুজো দেখছি। ওঁর ভক্তি-নিষ্ঠা, আর তার প্রেরণায় হাসিমুখে যে কঠোরতা উনি করেন তা যখন দেখি, এক একবার ইচ্ছে হয়, ওঁর মত এই রকম পূজো আমিও করি। যে বিশ্বাস আর যে ভক্তির পূজো মানুষের মনকে এমন তন্ময় করতে পারে, আরাম-বিরাম দুখ, সব ভুলিয়ে রাখতে পারে, তার ভিত্তি মিথ্যা, এমন কথা আমি বলতে পারি না, মনেও ভাবতে পারি না।"

ধীরে ধীরে ঊর্ম্মি কহিল, "আমার ইচ্ছে হয়, দিদিমার পূজো একদিন দেখি। কখনও ত দেখিনি এসব।"

অরুণ কহিল, "তা বেশ ত, আজ শিবরাত্রি সারাদিন উপোস করে আছেন, সারারাত ব'সে শিবপূজো করবেন। তা থাক না? যতক্ষণ পার দেখবে, তারপর যাবে।"

"সর্ব্বনাশ! তা হ'লে কি মা আর আস্ত রাখবেন? কড়া হুকুম তাঁর, সন্ধ্যে হ'লে আর এখানে না থাকি। অকালেও কখনও আসতে দেন না।"

"কেন? পাছে দিদিমার পূজো-আহ্নিক কিছু চোখে পড়ে, তাই?"

ঊর্ম্মি একটু হাসিল, কিছু বলিল না।

অরুণ কহিল, "তা মাকে ব'লব, তিনি ব'লে পাঠাবেন, খাওয়া-দাওয়া ক'রে যাবে।"

"না, ছিঃ, মাকে ফাঁকি দেব?"

অরুণ একটু লজ্জা পাইয়া কহিল, "সেটা অবিশ্যি ঠিক হয় না। তবে তোমাদের মাও যে, বড় একটি ফাঁকি তোমাদের দিয়ে রাখছেন। একটা গণ্ডীর ভেতর বেঁধে রেখেছেন, নিষেধের শক্ত একটা প্রাচীর তুলে। তার বাইরে যে ধর্ম্মের কত বড় একটা বিস্তৃত বিচিত্র ক্ষেত্র র'য়েছে, একেবারেই তা তোমাদের দেখতে দিচ্ছেন না।"

ঊর্ম্মি কহিল, "সেটা বোধ হয় ঠিক। কিন্তু তা হ'লেও তাঁকে ফাঁকি দিয়ে সেটা দেখবার চেষ্টা করা বোধ হয় ঠিক হবে না। কি বল দিদিমা? তোমার ভক্তির পূজো দেখতে থাকব? মা কিন্তু বারণ ক'রেছেন।"

ভাগীরথী কহিলেন, "বারণ ক'রেছে, থাকবি কি ক'রে লো? তুই মেয়ে সন্তান, এখনও বিয়ে হয় নি, বাপ মার অবাধ্য হ'তে আছে? আর এ পূজোয় দেখবি কি? কোনও ঘটা ত আর হবে না। ঘরে চুপচাপ একলাটি আমি পূজো ক'রব। তাতে আর দেখবার কি আছে?"

"কখনও দেখিনি যে। কেমন ভক্তি ক'রে পূজো ক'র, তাই একটিবার দেখতাম।"

"পাগলের কথা শোন! ভক্তি কি চোখে দেখবার জিনিষ? আর সেই ভক্তিই বা কি ছাই আমার হয়? আবার তোরা যদি সামনে বসিস, ভক্তি— দেখবি ব'লে, হি হি হি! তা হ'লে কি হবে জানিস? ঠাকুরের দিকে ত মন যাবে না, কেবল এই ভাবব, ভক্তি হ'ক না হ'ক, তোদের কি ক'রে দেখাব খুব ভক্তি ক'রে পূজো ক'রছি! হি-হি-হি! —পূজোই আমার হবে না। না দিদি, তুই ঘরেই যা। আমি আর কি ভক্তি দেখাব? ঠাকুর যদি দয়া করেন, ভক্তি তখন আপনিই হবে। জোর ক'রে রাশ বরং বেঁধে রেখে রাখুক, বাঁধন ছিঁড়ে তিনিই কেন ক'রে নেবেন।"

সন্ধ্যার পূর্ব্বেই ঊর্ম্মি ঘরে ফিরিয়া গেল। বড় তীব্র এই অন্তর্মুখীন বেদনা তার ভিতরে সে আজ বহিয়া লইয়া

গেল, স্বাধীনতা ও মুক্তির বহু বাগাড়ম্বরের মধ্যে কত ছোট একটা গণ্ডীর ভিতরে কত বড় শক্ত একটা বাঁধনে সে বাঁধা রহিয়াছে।

নূতন বার্ত্তার নূতন যে সাড়া আজ সে পাইল, এই বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া তাহার দিকে মুখ ফিরাইয়া বাহিরে কোনও সন্ধান লইবে, কোনও সম্ভাবনাও কিছু তাহার সে দেখিতে পাইতেছিল না। বন্ধনটা তাই আজ বড় কঠোর, বড় তিক্ত, বড় ক্লেশকর বলিয়াই মনে হইতেছিল।

"বাবা !"

আজ রবিবার। বেলা তখন দুইটা হইবে। মহীন্দ্রনাথ তাঁহার বসিবার ঘরে আরাম কেদারাখানির উপরে গা ছাড়িয়া দিয়া কি একটা বই দেখিতেছিলেন। সুকল্যাণী উপরে নিদ্রিতা, বড় ছেলেরা কোথায় বেড়াইতে গিয়াছে। ছোট ছেলেমেয়ে দুটি আজ ছুটী পাইয়া দিদিমার কাছে গিয়া গল্প শুনিতেছে। উর্ম্মি ধীরে ধীরে পিতার কাছে গিয়া ডাকিল, "বাবা!"

অলস ভাবে চক্ষু ফিরাইয়া মহীন্দ্রনাথ কহিলেন, "কি রে উর্ম্মি, কি ? আজ রবিবার, দিদিমার ওখানে যাসনি যে ?"

"যাব—এই খানিকটে বাদে যদি সঙ্গে যেতে না হয়। ওরা গেছে। তা—তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা ক'রব বাবা।"

"কথা! কেন, কি কথা রে আবার ? আবার কোনও নতুন তত্ত্ব কোনও কাগজে প'ড়েছিস নাকি ?"

একটু হাসিয়া উর্ম্মি কহিল, "না না, তা কিছু নয়।—তবে—মনে একটা কথা কদিন থেকে ভাবছি, তাই—"

"কি কথা রে ? সিনেমা দেখতে যাবি নাকি ? না বন্ধুদের একটা পার্টি দিবি, না দল বেঁধে কোথাও বেড়াতে যাবার মতলব ঠাউরেছিস ? না সভা ক'রে রচনা প'ড়বি, আবৃত্তির লড়াই ক'রবি ?"

"এই দেখ! বাবা যেন কি আমরা বুঝি কেবল তাই-ই ভাবি ?"

"তা কই, আর ত কিছু বড় ভাবতে দেখি না।"

গভীর ভাবে উর্ম্মি একটি নিশ্বাস ছাড়িল। সত্যই ত ? এ সবের উপরে আর কোনও চিন্তা কি কর্ম, জীবনে তাহাদের কি আছে ? সপ্তাহে এক দিন সমাজ-মন্দিরে—তাও প্রত্যেক রবিবারে যাওয়া ঘটিয়া ওঠে না। সেখানেই বা কি—ঐ একটানা সুরে এক কথাই ত বাল্যাবধি শুনিতেছে! কই, তেমন কোনও গভীর ভাবের স্পন্দন কি চিন্তার উন্মেষ ত প্রাণে কখনও জাগিয়া বড় ওঠে না! গৃহে পিতা হাসি-গল্প করেন, সস্নেহ আদরে তাহাদের কত আব্দার পালন করেন। আর মাতার ধর্ম্মশিক্ষা—সে ত কেবলই নিষেধের কড়া শাসন; কোনও কর্ম্মের দিকে, সাধনার দিকে, চিত্তের আনন্দময়



ভাল কিছু আছে কিনা তোমরা তা দেখতেই চাওনা, বাবা!

অভিনিবেশ হয়, কই, এমন ত কোনও প্রেরণা তাহারা কখনও পায় নাই উর্ম্মি আবার বড় গভীর একটি নিশ্বাস ছাড়িল।

মহীন্দ্রনাথ কহিলেন, "কি রে, কি ভাবছিস ? আর একটা বড় কাজ ত আছে ভালবাসা আর বিয়ে, হুঁ—ভাবটা যা দেখছি—তারই বুঝি বড় তাগিদ একটা কিছু এসেছে ? নতুন বিলেত থেকে এবার কে কে এসেছে না ? তোদের মেয়ে-মহলে খুব একটা সাড়া প'ড়ে গেছে বুঝি ?"

"যাও! কি যে ব'লছ বাবা! ছি! তাই বুঝি আমি ব'লতে এসেছি।"

"কি তবে ব'লতে এসেছিস ? ব'লেই ফেল্ না শুনি ?"

একখানি চৌকি টানিয়া ঊর্ম্মি পিতার কাছে ঘেঁসিয়া বসিল। একটুকাল নতমুখে থাকিয়া পিতার মুখ পানে চাহিয়া সলজ্জ বড় মধুর একটু হাসিল। ধীরে ধীরে শেষে কহিল, "কদিন থেকে একটি কথা কেবলই ভাবছি বাবা —"

"কি ?"

"এই—এ দেশে হিন্দুদের যে পৌত্তলিক ধর্ম্ম—তা কি একেবারেই খারাপ সব ?"

বেশ একটু বিস্মিত দৃষ্টিতেই মহীন্দ্রনাথ কন্যার মুখের পানে চাহিলেন। একটু হাসিয়া তারপর কহিলেন, "আমরা ত তাই বলি।"

"কেন ?"

"কেন ?" তেমনই হাসিয়া মহীন্দ্রনাথ কহিলেন, "তা যে বলতেই হবে। নইলে—আলাদা হ'য়ে আলাদা একটা ধর্ম্ম গ'ড়ে নেবার সার্থকতা কি থাকতে পারে ?"

"এও কি একটা কথা হ'ল বাবা ? তোমরা আলাদা হ'য়েছ,—ধর, যদি ভুল বুঝেই হ'য়ে থাক, তাই ব'লে ভুলটা স্বীকার না ক'রে কেবল জোর ক'রেই বলবে ওদের ওটা মন্দ—ওটা মন্দ—ওটা মন্দ, আর বাইরে এইটেই আমাদের কেবল ভাল ?"

"তা—ঘর ছেড়ে বাইরে এসে দাঁড়ালে ঘরটা মন্দই কেবল ভাবতে হয়, তার মন্দটাই কেবল দেখতে হয়। নইলে সেই বাইরে কেউ দাঁড়াতেই পারে না।"

"সত্যিই যদি মন্দ না হয় ? উপর উপর একটু মন্দ যাই দেখা যাক, ভেতরে বাস্তবিকই যদি অনেক ভাল থাকে, যা হয়ত আগে দেখতে পাওনি—এখন খোলা চোখে তলিয়ে দেখলেই দেখতে পাবে—এখন যদি হয়, তবে—?

"তবে—না, এখন আর তা আমাদের না দেখাই ভাল ঊর্ম্মি। ঘরে যে ফিরে যাবার যো নেই।"

বলিতে বলিতে মহীন্দ্রনাথ সত্যই একটু গম্ভীর হইয়া উঠিলেন। ধীরে ধীরে একটু দীর্ঘনিশ্বাসও ত্যাগ করিলেন।

ঊর্ম্মি কহিল, "তাই ব'লে সত্য যা, তা দেখবে না ? সত্যকে স্বীকার ক'রবে না ? না হয়, ও ঘরে—তারা যদি ফিরিয়ে না নেয়, নাই গেলে। কিন্তু বাইরে কি ঐসব ভাল নিয়ে অমনি আর নতুন একটা বাঁধা যায় না ?"

মহীন্দ্রনাথ উত্তর করিলেন, "সবাই যদি দেখে—ভাল যদি থাকে আর তা দেখে—সবাই যদি তা স্বীকার ক'রে নেয়—সেটা হ'তেও বা পারে।"

"ভাল কিছু আছে কি না, তোমরা যে দেখতেই চাও না বাবা ?"

"না, তাই বা চাই কই। তবে আজ কাল জোর ক'রেই দুই একটা সত্য যেন ধাক্কা দিয়ে চোখে এসে পড়ছে। তা আমরাও আবার তেমনি উল্টো ধাক্কা দিয়ে ঠেলে সেগুলোকে দূরে সরিয়ে দেবারই চেষ্টা করছি।"

ঊর্ম্মি কহিল, "আমার বড় জানতে ইচ্ছে হয়, ভাল ক'রে খুঁজে সব দেখতে ইচ্ছে হয়। মন্দ যা তোমরা বল, কোন মন্দ, খুঁৎখুতি সব মিটিয়ে তল অবধি সব দেখে, তবে মন্দ তাকে ব'লতে চাই। আর সবই যে মন্দ, তা কখনও হ'তেই পারে না। ভাল যা আছে, তারও ভালটা বুঝে, ভাল ব'লে আদর ক'রে মাথায় তুলে নিতে চাই। তুমি কি ওর ভাল মন্দ সব পরীক্ষা ক'রে দেখেছ বাবা ?"

"না মা, সেটা বলতে পারি না।"

"তবে ছেড়ে এলে কেন ?"

"ছেড়ে যেখানে এসেছি, সেটা হয় ত বেশী ভাল।"

"তাও কি তুলনা ক'রে দেখেছ ? ওর সব কথা আর এরও সব কথা ওজন করে তুলনা ক'রে দেখেছ কোনটা বেশী ভাল ?"

"তাই ত ! এ সব কথা তোর মাথায় কোত্থেকে এল রে পাগলী ?" একটু হাসিয়া বিস্মিত দৃষ্টিতে মহীন্দ্রনাথ কন্যার দিকে চাহিলেন।

ঊর্ম্মি কেমন একটু সঙ্কুচিত ভাবে কহিল, "তা—আসতে কি নেই বাবা !"

"থাকবে না কেন ? তা—তোদের মা, বৌ শক্ত প্রাচীর তুলে রেখেছেন, কোন্ ফাঁকে এ বুদ্ধিটা মাথায় এল ? হুঁ—বুঝেছি, পিসীমা তোকে ভজাচ্ছেন। সর্ব্বনাশ ক'রেছে ! তোর মা যদি ঘুণাক্ষরেও একটু বুঝতে পারেন, একটা অনর্থ ঘটবে দেখছি। একেবারে হাত পা বেঁধে কুলুপ দিয়ে ঘরে পুরে তোদের রেখে দেবেন। ওমুখো আর কেউ হ'তে পারবি নি !"

ঊর্ম্মি বড় ভয় পাইল। কহিল, "না বাবা, মাকে যেন বলো না কিছু—দোহাই তোমার! না, সত্যি বলছি দিদিমা কিছু বলেন নি। তবে দিদিমা বড় ভাল। যে ধর্ম্ম তিনি মানেন, খুব বড় একটা ভক্তিবিশ্বাস তাতে তাঁর আছে, আর মনটাও তাতে বেশ ভাল আছে। ভুল কি মন্দ একটা ধর্ম্মে তা কি কখনও কারও হয়? এই ত সেদিন গেলাম, শিবরাত্তির ছিল, মেজাই মাটির শিব গড়ছিলেন।"

"হুঁ! তারপর কি হল?"

ঊর্ম্মি সেদিনকার সকল কথা—সে যাহা বলিয়াছিল, অরুণ যাহা কিছু বলিয়াছিল, পিসীমা যাহা বলিয়াছিলেন, সরলভাবে সব পিতার নিকটে খুলিয়া বলিল। কথাগুলি সব তার মনে একেবারে গাঁথা ছিল।

কিছুকাল নীরবে কি ভাবিয়া মহীন্দ্রনাথ কহিলেন, "হুঁ! তাহ'লে দেখছি, আমাদের এই গণ্ডীর বাঁধন ছাড়িয়ে যেতেই মনটা তোর একদম উন্মুখ হ'য়ে উঠেছে ঊর্ম্মি।"

"তোমাদেরও গণ্ডী বাবা? তোমাদেরও বাঁধন? বাঁধন ত তোমরা মান না। মুক্তির কথা—স্বাধীনতার কথাই ত বল।"

"ওই ত মজা ঊর্ম্মি! বাঁধনের নিন্দে করি, হিন্দুদের বাঁধন দেখিয়ে। মুক্তির কথা বড় গলায় বলি, তাদের দোষ ধরে। কিন্তু আমরা যে তাদের চাইতেও শক্ত বাঁধনে আমাদের বেঁধে রেখেছি, তাদের চাইতেও অনেক সঙ্কীর্ণ একটা গণ্ডী টেনে তার ভেতরেই হাঁকুপাঁকু করছি, সেটা আদৌ ভাবি না। হিন্দুরা মূর্ত্তি গড়েও পূজো করে, সূর্য্য বায়ু আকাশ অগ্নি—দেবতা বলে ব্যক্তি ক'রে এদেরও আরাধনা করে, আবার কেউ বা যোগে ধ্যানে এক পরব্রহ্মেরও চিন্তা করে। যার যেমন মন, যার যেমন শক্তি, যার যেমন ভক্তি, সেই ভাবেই সে তার দেবতাকে ধারণা ক'রে নেয়, তাঁর পূজো করে। ব্যবস্থাও অশেষ রকম আছে। দেখতে গেলে বাঁধন কি গণ্ডী এই ক্ষেত্রে তাদের আদবেই নেই; কোনও একটা মতের কড়া নিয়মে সবাইকে ধ'রে রাখতে কখনও তারা চায় নি। অনুদার সঙ্কীর্ণ তাদের বলি। কিন্তু ধর্ম্ম বলতে তাদের মত উদার বিশ্বপ্রসারী ধর্ম্ম কোথাও বোধ হয় নাই। মাঝে মাঝে এখন—তা সত্যি বলতে কি ঊর্ম্মি—এই বাইরেটার দিকেও চেয়ে একটু দেখি। দেখি সব রকম মতই হিন্দু তার ধর্ম্মের ভেতরে স্থান দিয়েছে, সঙ্গে বেশ মানিয়ে চ'লতেও পারে। অনেকে বাড়ীতে দেবপূজা করেন, আবার ব্রাহ্মমন্দিরে এসে আমাদের উপাসনায়ও যোগদান করেন। আর আমাদের কোনও দেবতার মূর্ত্তি কি দেবতার পূজো দেখে হাজার ভক্তি হ'লেও প্রণামটি করবার কি অঞ্জলিটি দেবার যো নেই, নামটিও মুখে আনতে পারি না। কড়া নিষেধ তাতে। ভাল লাগুক কি না লাগুক, ওই এক বাঁধা নিয়মে, বাঁধা সুরে, বাছা বাছা বাঁধা কয়টি কথা ব'লেই উপাসনা ক'রতে হবে।"

গভীর একটা নিশ্বাস ঊর্ম্মি ছাড়িল। ধীরে ধীরে কহিল, "এই গণ্ডী ছেড়ে বাইরে যেতে যদি মন আমার কখনও চায়, তা কি যেতে পাব না বাবা? গণ্ডীর ভেতরেই বেঁধে আমায় রাখবে?"

—"তা বাইরে কি যেতেই চাস ঊর্ম্মি?"

"বুঝতেই কিছু পারছি নি বাবা। ঠিক যে যেতেই চাই, এমন কথাও বলতে পারি না। তবে বাইরেটাকে দেখতে বড় ইচ্ছে হয়। সেথায় কি আছে খুঁজে দেখতে মনটা বড় আকুল হ'য়েই উঠেছে। তোমার মেয়ে বাবা, আচার-নিয়ম তোমার ঘরেরই পালব। কিন্তু তাই ব'লে একেবারে আড়াল ক'রেই বা কেন রাখবে বাবা? ওদের ভেতর কি আছে, ওরা কি বলে, সত্যটা কি কেবল এই গণ্ডীর ভেতরই বাঁধা রয়েছে, না বাইরেও অনেক দূর ছড়িয়ে গেছে—এসব দেখতে কি দোষ আছে বাবা?"

"দোষ—আমি কিছুই দেখি নে। তবে তোমার মা সেটা পছন্দ ক'রবেন না।"

"সেটা—না করা কি ঠিক বাবা? আমি দেখতে চাই, শিখতে চাই, জানতে চাই! তুমি যদি বল বাবা, ওদের বই টই আমি প'ড়ব। যারা জানে, এমন কাউকে পেলেও তার কাছে শিখব। মা যদি তাড়না করেন, কিছু বলব না, ঝগড়াঝাটি কিছু করব না, চুপ চাপ সব স'য়ে থাকব। কিন্তু তবু এসব একটু দেখতে শুনতে আর শিখতে চাই বাবা। মানুষের জানকে কি একটা বাঁধা গণ্ডীর ভেতর জোর ক'রে কারও ধ'রে রাখা উচিত?"

"না, একেবারেই না।—কিন্তু দেখে শুনে প'ড়ে মন যদি তোর এই গণ্ডীর বাইরেই একদম টানে, তখন কি হবে ঊর্ম্মি? কি ক'রবি?"

"জানি না বাবা। সে সমস্যার সিদ্ধান্ত তখনই হবে। তবে দিদিমা সেদিন বলছিলেন, ঠাকুর যদি দয়া করেন, ভক্তির পুজো চান, মন টেনে তিনিই নেবেন। ধরে কেউ রাখতে পারবে না।"

বলিতে বলিতে গভীর একটা নিশ্বাস ছাড়িল। মহীন্দ্র নাথ কহিলেন, "ঠাকুর কি কেবল বাইরেই আছেন উর্ম্মি? গণ্ডীর ভেতরে তাঁকে পাওয়া যাবে না?"

হাসিয়া উর্ম্মি কহিল, "কেন যাবে না? তোমরা গণ্ডী টেনেছ, তাই ব'লে কি কোনও ঠাঁই ছেড়ে তিনি চ'লে যেতে পারেন? গণ্ডীর এই ভেতরটাও তাঁরই জগতের ভেতর বটে। তবে—বাইরের কি ভেতরের—যদি টানেন—কোন্ ভাবের টানে আমাকে টান্‌বেন—কে তা আজ বলতে পারে বাবা?"

"ও ঝি! ও উর্ম্মি!"

উপরে সিঁড়ির কাছে সুকল্যাণীর কণ্ঠস্বর উঠিল।

"ঐ মা উঠেছেন, এখুনি হয় ত, নীচে নেমে আসবেন। আমি এখন উঠি বাবা। যাই, তোমাদের চা খাবার টাবার তৈরী ক'রে আনিগে বাবা। দেখো, সর্ব্বনাশ। মাকে কিছু বলো না যেন।"

ত্রস্ত উর্ম্মি বাহির হইয়া গেল।

[৬]

"এই যে এস সুকু!—বেশ একটু লম্বা ঘুমই আজ দিয়েছ দেখ্‌ছি।"

"হাঁ, আজ র'ববার, খাওয়া-দাওয়া সারতেও একটু দেরী হ'য়ে গেল। যতই চেষ্টা করি, র'ববারে কি ছুটীর দিনে উইক্-ডে প্রোগ্রামটা (week-day programme) ঠিক রেখে আমরা চল্‌তেই পারি না। আর ওদের প্রত্যেকটি দিনের প্রোগ্রাম একেবারে ঘড়ীর কাঁটায় কাঁটায় বাঁধা।—সাধে বলি এখনও ওদের কাছে অনেক শিখ্‌বার আমাদের আছে।"

"শিখবার অনেক কিছু সব জাতের কাছেই সব জাতের আছে। তবে কি না আমরা কেবল পরেরটাই বড় দেখি, আর নকল ক'রেই বড় হ'তে চাই।"

"কেবল নকল ক'রেই কেউ কখনও বড় হ'তে পারে না। তবে ভাল যেখানে যা' আছে, শিখ্‌বার চেষ্টা সবাইকে করতে হবে।"

"ঠিক কথা। তবে ভাল দেশেও যা' আছে, ঘুরে চাপা দিয়ে যা' থেকে আমরা স'রে আস্‌ছি, সেগুলোও অবিশ্যি শিখ্‌তে হবে। কিন্তু সেদিকে চোখ ফিরিয়েও চাইতে আমরা নারাজ।"

"ভাল কিছু থাক্‌লে দেখ্‌তেই হবে, শিখ্‌তেও হবে। কিন্তু ভাল যে কোথায় কি আছে, দেখ্‌তেই যে পাওয়া যায় না।"

"দেখব না ব'লে চোখ ফিরিয়ে থাক্‌লে কেউ কিছু দেখ্‌তে পায় না।"

"উদার দৃষ্টি যাদের, সত্য তারা সর্ব্বদাই দেখ্‌তে চায়। তা' থেকে চোখ ফিরিয়ে কখনও থাকে না।"

"কিন্তু সে উদার দৃষ্টি ক'জনের আমাদের আছে?"

"আমাদেরই আছে। নেই অন্ধ কুসংস্কারাচ্ছন্ন এ দেশের সব সাধারণ লোকের।—থাক্ ওসব কথা এখন। তা কি হ'য়েছে বল ত? উর্ম্মি যেন কেমন ত্রস্ত-ব্যস্তভাবে ছুটে ওদিকে গেল—মনে হ'ল যেন আমায় দেখে ভয় পেয়ে পালাল।—কেন, কি হ'য়েছে? কি কথা তোমাদের হচ্ছিল?"

"কথা?—এই ছুটীর দিনে রোজ যেমন এসে বসে—এ-কথা ওকথা—কত কথাই বলে—আজও তাই বল্‌ছিল।—তা' হঠাৎ তোমার সাড়া পেয়ে বল্‌লে, 'মা উঠেছেন,—যাই, চা খাবার টাবার তৈরী ক'রে আনি গে।' এই ব'লে ও' বেরিয়ে গেল।"

"হুঁ!—কিন্তু কেমন একটা ভাব দেখ্‌লাম যেন আমায় দেখে ভয় পেয়ে পালাল।"

"তা' দেরী হ'য়ে গেছে, পাছে তুমি রাগ কর তাই বোধ হয় একটু ত্রস্তব্যস্ত হ'য়ে ছুটে গেল। নইলে ভয় কেন তোমায় দেখে পাবে?—তা' ব'স ব'স।—এই এক্ষুণি আস্‌বে, চা' খাবার টাবার নিয়ে।"

সুকল্যাণী গিয়া স্বামীর নিকটেই আর একখানি চৌকিতে বসিলেন।

"চা খাবার সময় কি হ'য়েছে?" বলিয়া ঘড়ীর দিকে সুকল্যাণী চাহিলেন।—

"না, ঠিক রোজকার সময় এখনও হয় নি। তবে এক-বারের অনিয়ম—যেমন ভাত খাওয়ায়, তেমন চা খাওয়ায়ও হ'তে পারে। আর চা—সে আর বল্‌ব কি, যখনই উপস্থিত হয় কি হ'তে পারে; তখন তা' গ্রহণের সময় আজ কাল।"

"হুঁ—চা-টা আজকাল যখন-তখনই ছেলেমেয়েরা খাচ্ছে। তবে আমি সেটা এলাউ (allow) বড় করি না।"

"তার অপেক্ষাও ওরা করে না।—রান্নাঘরে যায়, জল গরম করায়, নিজেরা তৈরী ক'রে খায়। ঊর্ম্মি দেখেছি ধমক-চমক গিয়ে করে। কিন্তু ঠেকিয়ে রাখ্‌তে পারে না।"

"হুঁ, টের পাই। তবে সদাসর্ব্বদা গিয়ে গোলমাল আর কর্‌তে পারি না।—"

"দরকারই বা এমন কি?—ওটা আমাদের ব্রাহ্ম নীতির বিরুদ্ধ ত কিছু নয়। আপত্তি আমাদের পান-তামাকে বরং আছে। পানটা কিছু চল্‌লেও—তামাকটা—"

সুকল্যাণী একটি নিশ্বাস ছাড়িয়া কহিলেন, "তাই বা আজকাল ঠেকিয়ে রাখা যাচ্ছে কই? ছেলেরা কেবল, কেবল কেন, ব্রাহ্ম সমাজে কঠোর সুনীতির আদর্শে মানুষ হ'য়ে উঠেছেন—বয়স্ক এমন লোকেরাও সিগারেট অনেকে খান।"

"তবু এ দেশের বর্ব্বর হুঁকোটা ধরেন নি।"

"ব্রাহ্মসমাজের সেই যে টেম্পারেন্স মুভমেণ্ট (Temperance movement), পিউরিটি মুভমেণ্ট (Purity movement), কোথায় গেল, এ নামও আর কারও মুখে শোনা যায় না!" বলিয়া একটি নিশ্বাস ছাড়িতে ছাড়িতে ঘড়ীর দিকে চাহিলেন।

হাসিয়া মহীন্দ্রনাথ কহিলেন, "ঘড়ীর দিকে চাইছ—তাহলে তুমিও দেখছি অসময়েও চায়ের তরে নিজে 'ইনটেম্পারেট, (intemperate)—এই—এই—অধীর হয়ে উঠেছ। ওরে ও ঊর্ম্মি!"

"এই যাচ্ছি বাবা! হয়ে গেছে।"

সুকল্যাণী একটু হাসিয়া স্বামীর এই শেষ উত্তরে কহিলেন, "সময়ও প্রায় হ'য়ে এল। তা আজ অসময়ে খেয়ে আর লম্বা ঘুমিয়ে সারাটা গা যেন কেমন ম্যাজ ম্যাজ করছে।"

মহীন্দ্রনাথ কহিলেন "এদেশের আচার্য্যদের একটা উপদেশ আছে, ছেলেবেলায় পড়েছি—

অশুচিঃ দিবা-নিদ্রা রাত্রিজাগরণং তথা।
এতে দোষা ক্রমং জ্ঞেয়া বুদ্ধিপ্রাণবিনাশনাঃ ॥"

ঊর্ম্মি তখন কিছু কিছু রুটিটোষ্ট ও সন্দেশ সহ চা আনিয়া ছোট একটি টেবিলে রাখিল। পিতা কহিলেন "তুই খাবি না বুড়ী?"

"খাব আমরা ও ঘরে সবাই মিলে বসে,—ওরা এসে বসেছে, আমিও এই যাচ্ছি। ঐ একটু দুধ আর চিনি



......জামাইটি মনের মত হয়, এটা সবাই চায়

রইল। লাগবে না আর, তবু যদি লাগে মিশিয়ে নিও।" বলিয়া ঊর্ম্মি বাহির হইয়া গেল।

কেমন একটা গম্ভীর আনমনা ভাব সুকল্যাণীর মুখে দেখা দিল; নিঃশব্দে বসিয়া ধীরে ধীরে চা পান করিতে লাগিলেন। ব্যাপার কি? হঠাৎ মনে কি উঠিল? চাহিয়া দেখিয়া মুখ টিপিয়া টিপিয়া মহীন্দ্রনাথ হাসিতেছিলেন। হঠাৎ সুকল্যাণীর দৃষ্টি স্বামীর মুখপানে পড়িল।

"কি, হাসছ যে?" মুখে একটু হাসিও ফুটিল।

মহীন্দ্রনাথ কহিলেন "হাসছি—হাঁ, তা তুমি কি ভাবছ বল দেখি? হঠাৎ অমন গম্ভীর হয়ে উঠলে—চা খাওয়া সেদিকেও যেন মনটা তেমন নেই—"

সুকল্যাণী আবার একটু হাসিলেন। ঘনঘন এরূপ হাসি তাঁহার মুখে সচরাচর দেখা যায় না। কহিলেন, "ভাবছি—তা কত কথাই এক এক সময়ে মনে হয়—যা হয়, তা হওয়া ঠিক উচিত নয় হয় ত ?"

"বটে ! যা উচিত নয় এমন কথা কখনও তোমার মনে হয় ?"

"তা হয় বই কি, হয় বই কি ! মানুষের স্বাভাবিক দোষ দুর্ব্বলতা মানুষ মাত্রের আছে।" বলিতে বলিতে আবার বেশ একটু গম্ভীর হইয়া উঠিলেন।

"তা আছে। যা উচিত নয়, এমন কথাও মানুষ ভাবে, কাজও এমন অনেক করে। কিন্তু তুমি—সে যা'হক, কখনও এমন কিছু ভাব, কি কর, সেটা এমন খোলাখুলি ভাবে স্বীকার ক'রতে কখনও বড় শুনি না।"

গভীর একটি নিশ্বাস ছাড়িয়া সুকল্যাণী কহিলেন, "মনে মনে স্বীকার করি বই কি। তবে নিজের দোষ দুর্ব্বলতার কথা কেবলই মানুষের কাছে বলে বেড়ান—সেটায় আর এমন লাভ কি ? অন্তরের যে বেদনা—যা কিছু পরিতাপ—জানাতে হয় সর্ব্বান্তর্য্যামী পরাৎপর সেই পরম-কারুণিক পরব্রহ্মের চরণে—শক্তি সঞ্চার করে একমাত্র যিনিই মানুষের চিত্তকে এইসব দোষদুর্ব্বলতা থেকে মুক্তিদান ক'রতে পারেন।"

"অন্যের দোষ দুর্ব্বলতার কথা গুলোও তবে—" বলিতে যতীন্দ্রনাথ চটুল চক্ষে একটু হাসিয়া চাহিলেন।

ঠাণ্ডা হইয়া আসিতে ছিল, শেষ দুই তিনটি দ্রুত চুমুকে চায়ের পেয়ালাটি নিঃশেষ করিয়া সুকল্যাণী কহিলেন, "কেবলই বলা হয়ত উচিত নয়। তবে কর্ত্তব্যের অনুরোধে মাঝে মাঝে ব'লতে হয়—বিশেষ যাদের মঙ্গলামঙ্গলের দায়িত্ব সেই মঙ্গলময়ের ইচ্ছায় মাথায় এসে অনেকটা প'ড়েছে।"

হুঁ ! তা হ'লে ভাবছিলেও বোধ হয়—সেই দায়িত্বটা স্মরণ ক'রে তাদের মঙ্গলামঙ্গলের কিছু একটা কথা !"

"হাঁ, তাই-ই ভাবছিলাম বটে।" বেশ একটু হাসিও আবার মুখে ফুটিল।

"তা সে কথটা কি ? খুলেই ব'লে ফেল না ? বেশ শুভঙ্করের একটা রহস্যই কথাটায় আছে বলে মনে হচ্ছে।"

হাসিটা তখন সারাটি চোখ মুখ ভরিয়াই স্ফুরিত হইয়া

"হাঁ, সেটা ঠিক অনুমানই ক'রেছ। ব'লেই তবে ফেলি। তা ভাবছিলাম কি জান, উর্ম্মির যদি এখন বিয়ে হ'ত—বেশ মনের মত একটি ছেলের সঙ্গে—"

"হাঁ, তাই বল। তা হলে মন্দ কি ? সময়ও হ'য়েছে ; ছেলেও—হাঁ, মনের মত হওয়া চাই বই কি, কিন্তু কার মনের মত ? তোমার না উর্ম্মির ?"

সুকল্যাণী কহিলেন, "তা মনের মত অবিশ্যি আগে হওয়া চাই উর্ম্মিরই। তবে কিনা জামাইটি মনের মত হয়, এটা সবাই চায়। তুমি কি চাও না ?"

"চাই বই কি, খুবই চাই। তবে তোমার মনের মত যে হবে, সে হয় ত আমার মনের মত হবে না। আবার তোমার কি আমার মনের মত কেউ হয়ত উর্ম্মির মনের মত হবেনা।"

"তা না হ'লে বিবাহই হ'তে পারে না। তবে সে এখনও বালিকা মাত্র, মনের মত ব'লে বুঝে হয়তো কাউকে হয়ত ধরে নিতে পারবে না। তাই আমরা যদি মনের মত কোনও ছেলে দেখতে পাই, তবে তার সঙ্গে মাঝে মাঝে ওর দেখা শুনো হয় এমন একটা সুযোগ ক'রে দেওয়া বোধহয় অনুচিত কিছু হবে না।"

"না, তা হবে এমন কথা ব'লতে পারি না। সেটা ক'রেও থাকেন অনেকে।"

সুকল্যাণী কহিলেন, "মুখে যতই যা আমরা বলি, কাজে এতদূর অগ্রসর এখনও হ'তে পারিনি যে মেয়েরা স্বাধীন ভাবে চলা ফেরা ক'রে বেড়াতে পারে, ছেলেদের সঙ্গে অবাধে মেলামেশা করবার সুযোগ পায়, যাতে ক'রে নাকি সহজেই মনের মত কাউকে বেছে নিতে পারে।"

"সেই বেছে নেওয়াটা যত সোজা ভাবছ, বাস্তবিক তত সোজা সর্ব্বদা হয় না, যতই স্বাধীনতা ছেলে মেয়েরা পাক। ভুলও অনেক হ'তে পারে, হ'য়েও থাকে। এ বয়সে বাইরের চাকচিক্য, ছেঁদো কথায় আর হালকা হাব ভাবে ভুলে অতি অপাত্রেও তখনকার মত অতি আকৃষ্ট ছেলেমেয়েরা হ'তে পারে।—"

"তা পারে। তবে ভুল ক'রবার অবসরও মানুষের

দিতে হবে। ভুল ক'রে ক'রেই ঠিক পথ মানুষ শেখে ধ'রতে পারে। আর সেই পথই তখন তার পক্ষে খাটে, ঠিক পথ হয়, একেবারে শক্ত হয়ে যাতে সে দাঁড়াতে পারে, দ্বিধাবিহীন হ'য়ে অটল শক্ত পায়ে বরাবর চলতে পারে।"

"কিন্তু ভুল না ক'রেও ত ঠিক পথটা ধরবার বহু উপায় মানুষের আছে। বহু যুগের বহু জ্ঞানীর বহু অভিজ্ঞতাই এই সব উপায় মানুষকে দেখিয়েছে। সেদিকে একটিবার না চেয়ে কেবল ভুল ক'রে ক'রেই যে মানুষকে শিখতে হবে, ঠিক পথটি শেখে বের ক'রে নিতে হবে, এমন কোনও কথা হ'তে পারে না।"

"কিন্তু এঁরা ত বলেন—"

"জানি, বলেন, আজকাল বড়লোক কেউ কেউ ভুল ক'রে ক'রেই মানুষকে শিখতে হবে। কিন্তু কি হিসেবে বলেন, সেটা বুঝতে পারি না। পুরুষপরম্পরাগত প্রাচীন এই অভিজ্ঞতার কি কোনও মূল্য নাই? মানুষের এই একটা জীবন—কতটুকু সময় আর? কাজের অন্ত নাই। ক'টা কাজে ক'টা ভুল ক'রে মানুষ সামলাতে পারে? এমন অনেক ব্যাপারও আছে, যাতে এক একটা ভুলে জীবনের মত তার সর্ব্বনাশ হ'য়ে যেতে পারে। এই যে বিয়ের ব্যাপারটা নিয়ে কথা উঠল, সেটা ঠিক তেমনি একটা ব্যাপার বটে। বিয়ে একবার হ'য়ে গেলে—যদি দেখা যায় বেছে নিতে ভুল হ'য়ে গেছে—তখন তা আর সামলে নেওয়া সহজে কোথাও সম্ভব হয় না। ডিভোর্স যেখানে সুলভ, সেখানেও একটা মিলন ভেঙে মনোমত আর একটা মিলন ঘটিয়ে তোলা ইচ্ছা ক'রলেই অমনি হয় না। সে মিলন তেমনি আবার একটা ভুলের মিলনও হতে পারে। তার পর আবার ছেলেপুলে হলে সমস্যাটা কত জটিল হ'য়ে ওঠে সে আর ব'লব কি?"

"তা বটে, তা বটে! তবে কি না—"

একটু হাসিয়া মহীন্দ্রনাথ কহিলেন, "ও সব তবে কিনা টিনা কিছু আর এতে নেই সুকু। নিজে ভুল না ক'রে ঠিক পথ ধ'রেই ছেলেমেয়েরা যাতে চ'লতে পারে সেইটে দেখাই প্রত্যেকটি অভিভাবকের অতি বড় একটা কর্ত্তব্য। তার অভিভাবকত্বের সার্থকতাই এইখানে।"

"হুঁ"—বলিয়া সুকল্যাণী কি ভাবিতে লাগিলেন। মহীন্দ্রনাথ কহিলেন, "এই যে ভুল ক'রবার অবসরের কথাটা ব'ললে, সব বিষয়েই কি এই অবসর কি অধিকার ছেলে মেয়েদের তুমি দিতে চাও? এই ধর না, তুমি মনে কর, এদেশে হিন্দুর ধর্ম্ম-বিশ্বাস কি তাদের সব অনুষ্ঠান বড় কতকগুলো ভুল—"

ভুল! কেবল ভুল? মহাপাপ এগুলো!"

"ভুল থেকেই পাপের উৎপত্তি। পাপ করে মানুষ ভুলের পথেই। তা এই সব ভুলের পথে কোনও স্বাধীনতায় অধিকার উর্ম্মিকে দিতে তুমি প্রস্তুত আজ?"

"না! একেবারেই না।"

"তবে প্রেমের পাত্র নির্ব্বাচনেই বা এ স্বাধীনতা দিবে কেন? অবাধ মেলামেশায় হয় ত অতি অপাত্রেও সে আকৃষ্ট হ'তে পারে, যার ফলে আমরণ তাকে বহু দুঃখ পেতে হবে। হয় ত বা সে কোনও পৌত্তলিক যুবককেও নির্ব্বাচিত করতে পারে। কারণ, এই অবাধ মেলামেশাটা যে কেবল ব্রাহ্মসমাজের গণ্ডীর ভেতরেই ধ'রে রাখা যাবে, সেটা কিছু আর সম্ভব নয়।"

একটু মাথা নাড়িয়া সুকল্যাণী কহিলেন, "তা বটে, তা বটে। আমাদের এ দেশে অবাধ মেলামেশাটা বাস্তবিক সম্ভবই নয়। বহু সঙ্কটের সৃষ্টি তা থেকে হ'তে পারে।"

"সর্ব্বত্রই হতে পারে, হ'য়েও থাকে। খৃষ্টান ইয়োরোপেও ক্যাথলিক প্রোটেষ্টাণ্ট একটা সম্প্রদায় ভেদ আছে ত? সেখানেও এগিয়ে এই রকম একটা সঙ্কটের সৃষ্টি হ'য়ে থাকে। আবার ঠিক জাতিভেদ না থাক, বংশ-মর্য্যাদার আর আর্থিক অবস্থার তারতম্যে শ্রেণীভেদ একটা খুব মেনে ওয়া চলে। সে ক্ষেত্রেও—"

"থাক ওসব কথা এখন। কথায় কথায় একটা অবান্তর কথা উঠেছিল বই ত নয়। সত্যিই কিছু আর ভুল করবার অধিকারে ওদের ছেড়ে দেওয়া হচ্ছে না। সে প্রশ্নও কিছু ওঠে নি। এ নিয়ে এত আলোচনা এখন একেবারেই নিষ্প্রয়োজন। তবে আমি বলছিলাম, বড় সড় হয়ে উঠেছে বিবাহ যদি এখন হয় মন্দ কি। অবাধে বাইরে সবার সঙ্গে মেলামেশা না করুক, যোগ্য কোনও পাত্রের সঙ্গে মেলামেশার সুযোগ—অবিশ্যি আমাদের সতর্ক দৃষ্টির

ভিতরেই, আড়ালে নয়—তার একটা ব্যবস্থা বোধহয় আমরা এখন করতে পারি। কি বল ?"

"কি উপায়ে সেটা করবে ভেবেছ কিছু ?"

"এই ধর, মধ্যে মধ্যে বাড়ীতে যদি আমরা প্রার্থনা সভা আর চায়ের পার্টি টার্টি কিছু করি—"

"হাঁ, তা প্রার্থনাসভায় না হ'ক, চায়ের পার্টিতে ছোকরারা এসে জুটতে পারে বটে।"

"ছোকরা ! ছিঃ, ও সব হালকা কথা তোমার মুখে শোভা পায় না মহীন। আরও উর্শ্মির পিতা তুমি।"

"হুঁ। কথাটা হালকা হতে পারে। তা হালকা এই রকম ছোকরা ছোকরা ভাব না থাকলে টপ করে অমনি তোমরা এই টোপ ওরা কেউ এসে গিলবে—"

"মিষ্টার মোকার্জ্জি !" আরক্ত চক্ষু মুখ তুলিয়া সুকল্যাণী চাহিলেন।

একটু হাসি চাপিয়া 'মিষ্টার মোকার্জ্জি' উত্তর করিলেন, "মাফ কর সুকু। তা যে ভাষায়ই কথটা বল, তুমি ত চাইছ, তোমার এই সব চায়ের মজলিসে—"

"মজলিস ! ঠিক এই সব ভাল্গারিটী (vulgarity)—"

"তা না হয় হ'ল, পার্টি ই হ'ল—যদিও মানেটা একই। তা তুমিত চাইছ তোমার এই সব চায়ের পার্টিতে—"

"কেবল চায়ের পার্টি নয়, সঙ্গে প্রার্থনাসভাও আছে।"

"তা থাক্। কিন্তু প্রধান আকর্ষণটা হ'চ্ছে, প্রার্থনা-সভা নয়, চায়ের মজলিস্—থুড়ী, পার্টি ই বটে। আর এই সব পার্টিতে তুমি পছন্দসই যুবকদের এনে জোটাতে চাও, যা থেকে নাকি ক্রমে কেউ কেউ উর্শ্মির সঙ্গে আলাপ-সালাপ ক'রে, তার গানটান শুনে, তার প্রতি আকৃষ্ট হ'তে পারে।"

তখন একটু নরম হইয়াই কি ভাবিতে ভাবিতে সুকল্যাণী কহিলেন, "তা—অবাধ মেলমেশা যখন সম্ভব নয়, আর ব'লছ কল্যাণকর নাও হ'তে পারে, তখন আর বা কি আছে ? কেবল আমরাই ত আর একটি ছেলে বেছে এনে উর্শ্মির ঘাড়ে চাপিয়ে দিতে পারি না, যেমন এদেশের হিন্দুসমাজে সাধারণতঃ হ'য়ে থাকে। উর্শ্মিকেও একটু দেখেশুনে বেছে নিতে হবে, আর যাকে সে বেছে নেবে, সেও উর্শ্মিকে বেছে নিতে পারে তারও অবসর তাকে দিতে হবে। এ অবসর এইসব পার্টিতেই দু'পক্ষের হতে পারে।"

"ঠিক কথা। তা বেশ, পার্টি-টার্টি তবে সুরু করেই দেও। তা হঠাৎ এ নিয়ে এত তাড়া তোমার কিসে হ'ল ?" চটুল চোখে একটু হাসিয়া মহীন্দ্রনাথ স্ত্রীর দিকে চাহিলেন সুকল্যাণীর মুখেও প্রায় তেমনই একটু হাসি ফুটিল।

মহীন্দ্রনাথ কহিলেন, "হু। অমনি, ছেলে একটি বেছেই তুমি রেখেছ, আর তাকেই পাকড়াতে চাও।"

"যাও। আবার ওসব ছাই কি বলছ ?"

"আপত্তি কর, ব'লব না। তবে কথাটা সত্যি বটে। তা সে যাই হ'ক, যাকে বেছেচ—"

"বেছেচি ! আমি বাছবার কে ? তবে—হাঁ। কাউকে হয়ত যোগ্য ব'লে আমার মনে হ'তে পারে।"

"হুঁ—। ঐ যে কে, মল্লিকের ছেলে কমল মল্লিক—"

একটু যেন লজ্জা পাইয়াই সুকল্যাণী কহিলেন, "তা কেবল ঐ কমলকেই যে যোগ্য বলে ধরে নিয়েছি এটাই বা তুমি মনে করছ কিসে ?"

"এই ক'দিন ধ'রে তার খুব সুখ্যাতির কথা তোমার মুখে শুনছি কি না, আর তার মাও নাকি কবে তোমার বন্ধু ছিলেন। আবার সেদিন কোন পার্টিতে উর্শ্মির সঙ্গে তার আলাপও নাকি হয়েছিল, গানটান শুনেও খুব খুসী হয়েছে সে কথাটাও অনেক বলেছ—"

"তা বলেছি। কিন্তু তাই বলে কেবল তাকেই যে আমি যোগ্য মনে করি এটাই বা ভাবছ কেন ? আর পার্টি হলে কেবল তাকেই ত নিমন্ত্রণ করা হবে না, আরও অনেক ছেলে-মেয়েকে, বন্ধুবান্ধবী আরও অনেককে নিমন্ত্রণ করা হবে।"

"তা হবে। তবে কিনা পার্টিগুলোর আয়োজন হবে প্রধানতঃ তারই প্রীতিকামনায়। নামে না হক, কার্য্যতঃ তাকেই করা হবে chief guest of the evening."

মুখখানি সুকল্যাণীর লাল হইয়া উঠিল। লক্ষ্য করিয়া মহীন্দ্রনাথ কহিলেন, "যাক ও সব কথা। তা এই কমলকেও ত বেশ যোগ্য বলে মনে কর বটে। কিসে কর ?"

"বল কি ? অতবড় বাপের ছেলে, বিলেত থেকে এসেছে, এসেই ভাল চাকরী পেয়েছে—"

"কিন্তু কেবল তাতেই কি কোনও ছেলে কন্যার বিবাহের

পক্ষে অতি যোগ্য পাত্র হয়। তার স্বভাবচরিত্র মতিগতি ইত্যাদি—"

"ব্রাহ্মপরিবারের ছেলে ত বটে।

"অতি ধনী কোনও কোনও ব্রাহ্মপরিবারের ঘরে cellarএ (সেলারে) দামীদামী বিলিতী মদও মজুত করা থাকে ঢের। তা সে যাই হ'ক, ব্রাহ্মপরিবারের ছেলে আর বিলেত ফেরত এই দুটো মার্কাই কেবল দেখা যাচ্ছে। তা ছাড়া অন্ততঃ প্রত্যাশা করা যায় না কি, যে সে ছেলে উন্নতরুচি আর চরিত্রবান্ হবে!"

"না, এদের সম্বন্ধে তোমাদের চাইতে আমাদের অভিজ্ঞতা অনেক বেশী। বিলেত ফেরত আর ইঙ্গকায়দার অতি ধনী ব্রাহ্মপরিবারের ছেলে নাম লিখিয়ে ব্রাহ্ম হয়নি এমন হিন্দু পরিবারের ছেলেও—তুমি যাকে চরিত্রবান্ ব'লতে পার, তেমন অতি কমই পাওয়া যাবে। তবে অত্যধিক ইঙ্গকায়দাকে যদি উন্নতরুচি বল, তবে রুচিতে উন্নত এদের সবাইকে বোধ হয় বলা যায়।"

"অন্ততঃ ধর্ম্মমতে—"

"ধর্ম্মমত ব'লেই এদের কিছু আছে কিনা, সেটাও নিশ্চিত করে বলা শক্ত। সাধারণ গৃহস্থ ব্রাহ্মপরিবারের ছেলে মেয়েরাও ধর্ম্মটর্ম্মের ধার আজকাল বড় ধারে না।"

কথাটা সত্য। সুকল্যাণী তাহা বেশ জানিতেন। ইহাও জানিতেন, ব্রাহ্ম আদর্শের প্রতি তাঁহার অত্যধিক নিষ্ঠাকে বিদ্রূপও ইহারা যখন তখন করে। তবে পাপকে ক্ষমা না করিলেও পাপীকে সর্ব্বদাই ক্ষমা করিতে হয়, এই নীতি মানিয়া উপেক্ষা করিয়াই তিনি চলেন—কাণে আসিলেও কাণে তুলিয়া কখনও কিছু নেন না। ধীরে ধীরে শেষে কহিলেন, "তা পরীক্ষা ক'রে দেখলেই বা দোষ কি?"

"হাঁ, সেটা দেখতে পার। তবে কি জান, উর্ম্মির যদি আগেই একটা লোভ কি আকর্ষণ জন্মে যায়—"

সুকল্যাণী একটু ভ্রূকুটি করিলেন। কিছু রুক্ষ স্বরেই কহিলেন, "তাহ'লে এই সুযোগটা উর্ম্মিকে দিতেও তোমার আপত্তি আছে?

"সুযোগ—যদি ঠিক সুযোগ ব'লেই বুঝতাম—আপত্তির কোনও কারণই ছিল না।"

"কিন্তু আমি দিতে চাই।"

"বেশ, দাও। আপত্তি আমার এমন জোর কিছু নেই। আসল মানুষটি এরা কি ধাতুর সেটা ধরাও পড়ে সহজে। এ ভরসা আমার আছে, অপাত্রই যদি হয়, উর্ম্মিকে আকৃষ্ট করতে সে পারবে না, লোভেও সে পড়বে না।"

একটু কি ভাবিয়া শেষে সুকল্যাণী কহিলেন, "দেখি যদি আগামী হপ্তায় প্রার্থনাসভা আর পার্টি টার আয়োজন ক'রতে পারি। বেলা গেল, এখন মন্দিরে যেতে হবে। তুমি যাবে না?"

"আমি—না, হ'য়ে উঠবে না। একটু বেড়াতে যেতোব ভাবছি।"

"কি যে তোমার হয়েছে—মন্দিরে যাওয়া এক রকম ছেড়েই ত দিলে। হপ্তার সবে একটি দিন—"

"তাই ত অভ্যেসটা জমে উঠছে না। রোজকার একটা ব্যাপার যদি হত, তাহ'লে বোধ হয় এতটা অনিচ্ছে এমন হ'ত না। তা আজ থাক্ না? যাওয়া যাবে আর একদিন। শরীরটাও তেমন ভাল লাগছে না। সন্ধ্যের হাওয়ায় পার্কে গিয়ে একটু বেড়াতে পারলেই ভাল হ'ত।" বলিয়া লম্বা একটা হাই তুলিলেন।

"তাই যাও তবে। কি আর ক'রব? ছেলেমেয়েদের নিয়ে আমি যাই।"

"হাঁ, তাই যাও। ওদেরই দরকার। আমরা এখন বুড়ো হ'য়ে উঠেছি। প্রার্থনাও অনেক শুনিছি, ওতে যা হবার সে হয়েই গেছে।"

বলিয়া মহীন্দ্রনাথ উঠিলেন। লম্বা আর একটা হাই তুলিয়া গা মোড়া দিয়া বাহির হইয়া গেলেন।

[ক্রমশঃ

দুর্গাপূজা

শ্রীযতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

জগতের সর্বত্র, সর্বকালে, সকল দেশ ও জাতির মধ্যে ঈশ্বরোপাসনা-প্রথা প্রচলিত আছে। দেশ, জাতি ও ধর্মের ভেদে, উপাসনার প্রভেদ পরিলক্ষিত হয়। কোথাও একক, কোথাও সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া, কোথাও নীরবে মনপ্রাণ দ্বারা, কোথাও সরবে মন্ত্রোচ্চারণ অথবা সঙ্গীত-কীর্তন দ্বারা, কোথাও গুরু, কিংবা যাজকের উপদেশ অথবা বক্তা কিংবা কথকের বিশ্লেষণ শ্রবণ করিয়া উপাসনা করিবার বিভিন্ন রীতি প্রচলিত দেখিতে পাওয়া যায়। উপাসনা উপকারী ;—সত্বফলপ্রসূ না হইলেও, পরিণামে শুভপ্রদ ; কখন ব্যর্থ হয় না। কলিকাতা যুব-খ্রীষ্টান সমিতির (Young men's Christan Association) কলেজ শাখার (College Branch) দ্বিতলের সভাগৃহের দেওয়ালে বড় বড় অক্ষরে লেখা ছিল,—প্রার্থনার প্রভাবে ক্রীত (Bought by the power of Prayer)। প্রার্থনাই উপাসনা,—পূজাও উপাসনা। প্রাচীন কালে পূজার নাম ছিল যজ্ঞ।

জগতে সুখ ও দুঃখ চক্রবৎ পরিবর্তিত হইতেছে। সুখ অপেক্ষা দুঃখই অধিকতর প্রতীত হয় ; কারণ, ক্লেশের অভাব হেতু, সুখের সময় সহজে অনায়াসে কাটিয়া যায় ; কিন্তু দুঃখের সময়, ক্লেশের পীড়নে অতিদীর্ঘ—অতি পীড়াদায়ক মনে হয়। এই দুঃখের নাশের নিমিত্ত,—এই দুঃখ হইতে মুক্তি পাইবার নিমিত্ত, আমরা ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করি এবং তাঁহার প্রসাদ লাভ করিবার নিমিত্ত তাঁহার শরণ লই ; তাঁহার নিকট কাতর প্রার্থনা জানাই, তাঁহার ভজন গান করি, তাঁহার নানাবিধ স্তব-স্তোত্র পাঠ করি। তাঁহার উপাসনা করি, মন্ত্র-চৈতন্য দ্বারা তাঁহার ষোড়শোপচারে পূজা করি।

কেহ তাঁহাকে নিরাকার চৈতন্য স্বরূপ বিবেচনা করিয়া তাঁহার ধ্যান ধারণা করে ; কেহ তাঁহাকে ভিন্ন ভিন্ন রূপে কল্পনা করিয়া বিভিন্ন প্রথায় পূজা অথবা উপাসনা করে। দুঃখের নিবৃত্তিই আমাদের মুখ্য উদ্দেশ্য। এই নিমিত্ত, আমরা বাঙ্গালার হিন্দুরা, দুর্গতিনাশিনী দুর্গারূপে তাঁহার সমধিক অর্চনা করি।

প্রপদ্যামি মহামায়াং দুর্গাং দুর্গতিনাশিনীম্।

মার্কণ্ডেয়চণ্ডীতে দেবী বলিতেছেন,—"আমি দুর্গ নামক মহাসুরকে বিনাশ করিব, তাই দুর্গাদেবী বলিয়া আমার নাম বিখ্যাত হইবে।" কাশীখণ্ডের মতেও, দুর্গ-দৈত্য বিনাশ হেতু দেবী দুর্গা নামে খ্যাত হইয়াছেন। দেবীপুরাণে উক্ত হইয়াছে যে, স্মরণমাত্র ইন্দ্রাদি দেবগণকে দুর্গম শত্রুসঙ্কট হইতে উদ্ধারের নিমিত্তই দেবীর নাম দুর্গা। ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ বলেন,—দুর্গ নামক দৈত্য, মহাবিঘ্ন, ভববন্ধন, কর্ম্মপাশ, শোক, দুঃখ, নরক, জন্ম ও মৃত্যুর আবর্তন, মহাভয় এবং অতিরোগাদি নাশ হেতু দেবী দুর্গা নামে অভিহিতা।

শরণ্যে সর্বদে দেবী দুর্গে দুর্গবিনাশিনি।

বিবিধ পুরাণে দেবীর আবির্ভাবের বিবিধ উপাখ্যান বিবৃত আছে। মার্কণ্ডেয়-পুরাণের মতে স্বারোচিষ মন্বন্তরে রাজা সুরথ ও বৈশ্য সমাধি দেবীকে পূজা করিয়াছিলেন :—

মহামায়ানুভাবেন যোঽষ্টমঃ সূর্যসম্ভবঃ।
চৈত্রান্বয়াধিপো রাজা স নাম্না সুরথঃ সুধীঃ॥
পূর্বং স্বারোচিষে ত্বাস্তঃ সকলেঽবনিমণ্ডলে।
জিতঃ কালে নৃপৈরন্যৈঃ সোঽভূৎ কোলাখ্যকৈর্নৃপঃ।
তথামাত্যৈরেব স দৈর্বল্যং যাতো নৃপাগ্রণীঃ।—
বিবেকেনৈব হয়াগ্রে বর্ণ্যো যেধা মহামুনিঃ॥

এইখানে বৈশ্য সমাধির সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়।

তত্রাস্থিতং কিয়ৎকালং বিচরন্ স আশ্রমে।
দৃষ্টবান্ বনমেকস্থ বৈশ্যং বিরহিণং বনে॥
স্বপুত্রমহারাজঃ কস্মাৎ ত্রাসো ভবাংস্তত্র।
রাজা পৃষ্টঃ স উবাচ দুঃখিতোঽহং ভবান্ যথা॥

তাঁহারা উভয়ে মহামুনি মেধসের নিকট গমন করিয়া নিজেদের দুঃখ নিবেদন করিলেন,—যাহারা নিগ্রহ করিয়াছে,

তাহাদের উপর এখনও মমতা, এ কি রহস্য! মুনি বলিলেন,—

মেধসোক্তং বলবতী মহামায়া শরীরভৃতঃ।
তয়া সংমোহ্যতে বিশ্বং সৃজত্যবতি হন্তি চ॥
চেতাংসি জ্ঞানিনাং দেবী নিত্যা ভগবতী হি সা।
বরদা মুক্তয়ে লোকে যোগনিদ্রাভিধীয়তে॥
বিদ্যাখ্যা জগন্মূর্ত্তির্নিত্যারেরেশ্বরী চ সা।
উৎপন্না পয়সোৎপন্না বিষ্ণুনিদ্রা সুখার্দ্দিনী॥
নন্দজা বিন্ধ্যসংস্থানা হৈমী হরিহরপ্রিয়া।
স্তুতিঃ প্রীতিঃ সুরপ্রীতা কৃতিঃ প্রীতিপুরাবহা॥

মুনির সেই উপদেশ অনুযায়ী তাঁহারা চৈত্রমাসে দেবীর পূজা করেন—

মুনেস্তস্যোপদেশেন মৃন্ময়ীং মধুমাসতঃ।
মূর্ত্তিং নির্ম্মায় তৌ পূজাঞ্চক্রতুর্বৎসরত্রয়ম্॥
তত আগত্য সা দেবী তাভ্যামিষ্টং বরং দদৌ।
দুর্গাবরং সমালম্ব্য সুরথো বৈশ্যসমুদ্ভবঃ॥
মন্বন্তরাধিপঃ শ্রীমান্ সুরথঃ সম্ভবিষ্যতি।
সমাধির্জ্ঞানমাসাদ্য মুক্তোহভূৎ তৎপ্রসাদতঃ॥

সুরথ হৃত রাজ্য পুনঃপ্রাপ্ত হইলেন এবং বৈশ্য সমাধি দিব্যজ্ঞান লাভ করিয়া মুক্ত হইলেন। দেবী সর্ব্বাভীষ্টপ্রদা—

বহুলা বহুদা নিত্যা অজ্ঞানজ্ঞানদায়িনী।

জগদ্গুরু বিষ্ণু যখন যোগনিদ্রামগ্ন, তখন হরিকর্ণ-মলোদ্ভূত ব্রহ্মাকে হনন করিবার নিমিত্ত, মধুকৈটভ নামক দুষ্ট দৈত্য উদ্ভূত হয়। ব্রহ্মা তখন ভীত হইয়া বিষ্ণুর যোগনিদ্রার স্তব করেন। দেবীর সেই প্রথম আবির্ভাব।

যোগনিদ্রাসমাপন্নো যদা বিষ্ণুর্জগদ্গুরুঃ।
তদা দ্বাবসুরৌ ঘোরৌ মধুকৈটভসংজ্ঞকৌ॥
হরিকর্ণমলোদ্ভূতৌ ব্রহ্মাণং হন্তুমুদ্যতৌ।
ভীতো ব্রহ্মা ভক্তিযুতঃ তামসীং শরণং গতঃ॥

ব্রহ্মার স্তবে তিনি কখনও স্থির থাকিতে পারেন না।

ইত্থং স্তুতা ভক্তবতী ষড়ঙ্গং মধুবৈরিণঃ।
স চোত্তস্থৌ জগদ্বন্ধুর্যুযুধে বাহুযুদ্ধতঃ।
বর্ষপঞ্চসহস্রাণি ততস্তৌ দানবৌ মৃতৌ॥

দেবীর দ্বিতীয় আবির্ভাব, মহিষাসুর বধ করিবার নিমিত্ত।

হতো দেবাসুরং যুদ্ধং শতবর্ষমভূৎ পুরা।
পরাজিতোহভূদ্ দেবেন্দ্র ইন্দ্রোহভূন্মহিষাসুরঃ॥
ততঃ সা তামসী দেবী দেবতেজঃসমুদ্ভবা।
জঘান সপ্ত সেনান্তশ্চিক্ষুরাদ্যামুখাংস্তথা॥
উগ্রবীর্য্যাবিকালাক্ষ সেনান্ত চতুরাদিকাঃ।
ধূম্রকেশাদিযোধস্তং শালিনং মহিষং রণে।
মাহিষং সৈংহিকং রূপং পৌরুষং হাস্তিকং তথা।
দৈত্যরূপঞ্চ বধা কৃত্বা জঘান বরবর্ণিনী॥

দেববলে বলী মহিষাসুর, দেবগণকে বিতাড়িত করিয়া স্বর্গ অধিকার করিয়াছিল। ব্রহ্মা প্রমুখ দেবগণের দুঃখ-দুর্দশার বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া রুদ্র ও বিষ্ণু বিচলিত হইলেন এবং সকল দেবতার তেজ হইতে সমুদ্ভূত, এবং সর্ব্ব দেবতার অস্ত্রে শস্ত্রে সুসজ্জিত হইয়া দেবী মহিষাসুরকে বধ করেন।

দেবীর তৃতীয় আবির্ভাব শুম্ভ-নিশুম্ভ বধ হেতু।

হিমালয়ে স্থিতৈর্দেবৈঃ স্তুতা দৈত্যনিপীড়িতৈঃ।
কালিকা শিবদূতী চামুণ্ডামূর্ত্তিধারিণী॥
সুগ্রীবস্য বচঃ শ্রুত্বা ধূম্রনেত্রং নিপাত্য চ।
চণ্ডং মুণ্ডং রক্তবীজং রক্তবিন্দুসমুদ্ভবম্॥
কম্বঞ্চ কোটিবীর্য্যং কালকেয়ঞ্চ কালকম্।
দৌহ্রং মৌর্য্যং দৌহৃদঞ্চ ষড়শীতিসহস্রকম্॥
কালকেয়াদিদৈত্যাঞ্চ সর্ব্বাং নারকভূষিতম্।
পুনঃ শুম্ভং নিশুম্ভঞ্চ দৈত্যরাজং জঘান সা॥

এই দেবীর রূপ কিরূপ? তিনি "অনেকরূপারূপা চ বহুরূপা বহুপ্রদা"—

কাত্যায়নী মাতৃকাখ্যা অপাং রূপা বিলোকিনী।
বৈষ্ণবী নারসিংহী চ বারাহী চ মহেশ্বরী॥
কৌমারী চ তথৈন্দ্রাণী ব্রহ্মাণী চারিরূপিণী।
মহাকালী মহালক্ষ্মীর্মহাকলা সরস্বতী॥
একবীরা ভ্রামরী চ তথৈবাষ্টভুজা শিবা।
দশহস্তা সংগ্রভুজা সর্ব্বশক্তিস্বরূপিণী॥

দেবী নিত্যা। নিখিল ভুবন তাঁহার দ্বারা পরিব্যাপ্ত। এই জগতই তাঁহার রূপ। তথাপি তাঁহার উৎপত্তির নানা কাহিনী, দেবগণের কার্য্য সাধনের জন্য। তিনিই সকল প্রাণীর অন্তরে চেতনা। তাঁহার প্রভাবেই, মায়া ও মোহ-জড়িত হইয়া মানুষ সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছে। যখনই তিনি কোন বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনার্থ আবির্ভূতা হয়েন, তখনই তাঁহাকে উৎপন্ন বা উপপন্ন বলা হয়। নতুবা, তিনি কোথায় নাই—কখন নাই?

আমরা মহিষাসুরমর্দ্দিনী রূপে মায়ের অর্চনা করি। কালিকাপুরাণের মতে স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে এই পূজা অনুষ্ঠিত

হইয়াছিল। দেবী আশ্বিন মাসের কৃষ্ণাচতুর্দ্দশী তিথিতে আবির্ভূতা হইয়া দেবগণের তেজে আশ্বিনের শুক্লাসপ্তমীতে, দশভুজা মূর্ত্তি ধারণ করেন। অষ্টমীর দিনে দেবগণ তাঁহাকে নানা আভরণে ভূষিতা করেন। নবমীর দিনে দেবগণের বিবিধ উপচারে পূজিত হইয়া তিনি মহিষাসুর বধ করেন এবং দশমীর দিনে অন্তর্হিতা হয়েন। কিন্তু, আশ্বিনে অম্বিকা পূজা যে শ্রীরামচন্দ্র কর্ত্তৃক প্রথম প্রবর্ত্তিত হয়, এই মতবাদই বঙ্গদেশে সুপ্রতিষ্ঠিত। ভারতের বিভিন্ন স্থানে এই পূজা 'নবরাত্রিক' অথবা শ্রীরামচন্দ্রের বিজয়োৎসব নামে প্রখ্যাত।

> মাহাত্ম্য-বাচিনী বাল্য সুরথ রাজ্য সাধিকা।
> পুনশ্চাসৌ শারদীয়ে শারদীয়া দিনে রণে।
> অরণ্যে রঘুনাথোঽপি মহাপূজাং করিষ্যতি॥

সুরথ রাজা সত্যযুগে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। ত্রেতাযুগে শ্রীরামচন্দ্র ব্রহ্মার বরে দেব, দানব, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, রাক্ষস, সর্প, কিন্নর ও ভূতগণ হইতে মৃত্যুভয়শূন্য সীতাপহারক রাবণের বধের নিমিত্ত, ব্রহ্মার উপদেশানুযায়ী, নিদ্রাভিভূতা দেবীকে বোধনদ্বারা প্রবুদ্ধ করিয়া অর্চ্চনা করিয়াছিলেন এবং তাঁহার প্রসাদে, দুর্দ্দান্ত দানবকে নিহত করিয়া সীতা উদ্ধার করিয়াছিলেন। রাবণও কাতর হইয়া "যে তব শরণ লয় না থাকে আপদ" বলিয়া স্তব করিয়াছিলেন। দেবী স্তবে তুষ্ট হইয়া, "বসিলেন রথে কোলে করিয়া রাবণ।" "জলদ বরণী কোলে রাজা দশানন" কে দেখিয়া, শ্রীরামচন্দ্রও তাঁহার শরণ লইয়া ডাকিলেন,—

> "দুর্গে দুর্গহরা তারা দুর্গতি নাশিনী।
> দুর্গমে শরণী বিন্ধ্যগিরি-নিবাসিনী॥"

স্তবে তুষ্টা দেবী, অধর্ম্মপক্ষ ত্যাগ করিয়া ধর্ম্মপক্ষ গ্রহণ পূর্ব্বক বলিলেন,—"রাবণে ছাড়িনু আমি, বিনাশ করহ তুমি।"

দ্বাপর যুগে দ্বাদশবর্ষ বনবাস শেষ করিয়া, ধর্ম্মপুত্র ত্রয়োদশবর্ষ অজ্ঞাত বাস অতিবাহন হেতু বিরাট নগরে প্রবিষ্ট হইয়া, ত্রিভুবনেশ্বরী ভারতী দুর্গার স্তব করিয়াছিলেন,—"হে দুর্গে! আপনি দুর্গ হইতে উদ্ধার করেন বলিয়া লোকে আপনাকে দুর্গা বলিয়া থাকে। কান্তারে অবসন্ন, জলধিজল নিমজ্জিত ও দস্যুহস্তে নিপতিত জনের আপনিই একমাত্র গতি। আমি রাজ্যভ্রষ্ট হইয়াছি, এক্ষণে আপনার শরণাপন্ন, আপনি আমাকে রক্ষা করুন।" কুরুক্ষেত্রের রণাঙ্গনে দুর্য্যোধনের সৈন্যগণকে সমরোদ্যত নিরীক্ষণ করিয়া, ভগবান্ বাসুদেবের উপদেশে, অর্জ্জুন প্রার্থনা করিয়াছিলেন,—"তুমি ভক্তগণের রক্ষার নিমিত্ত, দুর্গম পথে, ভয়ে, দুর্গম স্থানে ও পাতালে নিত্য বাস কর এবং দানবগনকে যুদ্ধে পরাজয় করিয়া থাক। তোমার প্রসাদে রণক্ষেত্রে যেন জয়লাভে সামর্থ হই।" জয়শ্রী তাঁহাকেই বরণ করিয়াছিল। প্রজাপতি ব্রহ্মা হইতে আরম্ভ করিয়া দেব, দানব, যক্ষ, রক্ষ, নর, যুগে যুগে তাঁহার শরণ লইয়া জয় ও অভয় লাভ করিয়াছে ও করিতেছে। তিনি দুর্গা। দুর্গতিনাশিনী দেবী, দুর্গা দুঃখবিনাশিনী।

দেবী-ভাগবতের মতে রাজা সুরথ এই পূজা প্রথমে ভারতে প্রচারিত করেন। যেরূপেই হউক, দুঃখ-দুর্দ্দশা এবং দৈন্য-দারিদ্র্য হইতেই মুক্তি পাইবার নিমিত্ত এই পূজা বা উপাসনার সৃষ্টি। যজ্ঞীয় বিধানে, দ্রব্যযজ্ঞ ও জপযজ্ঞের সমন্বয়ে এই পূজা অনুষ্ঠিত হয়। এই নিমিত্ত শাক্ত, শৈব, সৌর, বৈষ্ণব কাহারও এই যজ্ঞানুষ্ঠানে বাধা নাই।

এত বড় জাতীয় উৎসব বাঙ্গালায় আর দ্বিতীয় নাই। কোন্ সুদূর কালে বাঙ্গালায় এই প্রতীক, অথবা প্রতিমা-পূজার অনুষ্ঠান হইয়াছিল, তাহার কোন ইতিহাস নাই। বাঙ্গালার নানাস্থানে বহু অষ্টভুজা, দশভুজা, ষোড়শভুজা এবং অষ্টাদশভুজা প্রস্তর-মূর্ত্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে। বহু পল্লীতে এবং পীঠস্থানে এই সকল মূর্ত্তি পূজিত হইতেন এবং এখনও পূজাপ্রাপ্ত হইতেছেন। এই দুর্গোৎসবের সহিত বাঙ্গালীর বহু সুদিন ও দুর্দ্দিনের স্মৃতি বিজড়িত। শুনিয়াছি, যখন বাঙ্গালী রাজ্যশাসন করিত—যুদ্ধ করিতে জানিত, তখন, বিজয়া-দশমীর দিন, রাজারা মৃগয়ায় বাহির হইতেন। সে সকল শৌর্য্য-বীর্য্যের দিন কালের তিমিরগর্ভে সমাধি লাভ করিয়াছে। এই পূজাকে কেন্দ্র করিয়াই বাঙ্গালায় শৌর্য্য-বীর্য্য, শিল্প-কলা, সাহিত্য-সঙ্গীত, জ্ঞান-বিজ্ঞান চরম সার্থকতা লাভ করিয়াছিল। শরৎকালের মেঘলেশশূন্য আকাশে শুক্লপক্ষের শশধর রজত-কিরণ বর্ষণ করে; প্রভাতে নবদূর্ব্বাদল-শীর্ষে শিশিরবিন্দু সকল নবারুণ-কিরণে মুক্তাখচিত মখমলের ন্যায় ঝলমল করে; কুহেলিকাবৃত কুসুমাকীর্ণ বনানী সুগন্ধে পরিপূরিত হয়; নদ-নদীর নীর নির্ম্মল হয়; বাপী-তড়াগ

কুমুদ-কহ্লারে অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করে ; পল্লী-প্রান্তর শুভ্র কাশ-কুসুমে সুশোভিত হয় ; প্রাঙ্গণে প্রাঙ্গণে শেফালি ঝরিয়া পড়ে ; কাননে কাননে ভ্রমর গুঞ্জনমুখরিত হইয়া উঠে ; মাঠে মাঠে সবুজ ধানের শীষ্ মৃদু মন্দ পবনে দুলিতে থাকে। শরতে বাঙ্গালা দেশের শোভার তুলনা নাই। শরৎ ঋতুই আমাদের শ্রেষ্ঠ উৎসবের সময়—এই ঋতুতেই আমরা জগদম্ব, জগদ্ধাত্রী, জগদানন্দকারিণী, জগজ্জীবন হৈমবতীর অর্চ্চনা করি। সেই নানা ঋতুময়ী দেবী, নানা ঋতুবিনির্ম্মিতা। বসন্তের কিশোরী, নিদাঘে যুবতী,—তপশ্চারিণী উমা। প্রাবৃটে তিনি গর্ভভার-মন্থরা। শরতে তাঁহার মাতৃমূর্ত্তি বিকশিত। তিনি যেমন সম্পত্ত্যধিষ্ঠাত্রী, তেমনি শস্যাধিষ্ঠাত্রী। তিনি মহাবীজা বীজ-করী সর্ব্ববীজস্বরূপিণী। শরতে পত্র, পুষ্প ও ওষধির আত্ম-দানে দিকে দিকে তাঁহার মাতৃত্বের নিদর্শন। তিনি সর্ব্বলক্ষ্মী-সমন্বিতা—

লক্ষ্মীরূপা চ কমলা হরা পদ্মাবতী শুভা।

তিনিই—

শ্রীদুর্গাং ধনধান্যপূর্ণাং পদ্মাং সুরেশ্বরীম্।

তাঁহাকে কোটি কোটি নমস্কার—তাঁহার চরণ পদ্মে সংখ্যাতীত প্রণিপাত।

দুর্গা চ দুর্গরূপা চ দুর্গে দেবি নমোঽস্তু তে।

মহাপ্রয়াণে*

শ্রীসুনির্ম্মল পুরকায়স্থ

বিশ্বকবি!

যে বাণী অমৃতময়ী সুধাকণ্ঠে করিলে প্রচার
বিশ্বের ভাবনাক্ষেত্রে,—অক্ষয় হইয়া আছে তাহা
ধরা আজি মহত্তর তোমার সে কল্পনার দানে।
পৃথিবীর পূর্ব্বপ্রান্তে, পশ্চিমের মহাসিন্ধু-তীরে,
ধ্বনিছে তোমার নাম ; লভিয়াছ অমর প্রার্থিত
অভ্রভেদী যশোরাশি ; কোন কালে, কোন কবি যাহা
পায় নাই,—সে তোমার পদপ্রান্তে স্বেচ্ছাবশে লীন।
হে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ কবি! লভিয়াছ 'বিশ্বকবি' নাম।

শুধু কি কবীন্দ্র তুমি?—নহ নহ হে রবীন্দ্রনাথ!
কাব্য ভারতীর বীণা তব হস্ত বহে নাই শুধু।
সাহিত্যে, সঙ্গীতে, শিল্পে, যা দিয়েছ,—অমূল্য সে সব
জানি তাহা ; তবু এত সত্য হ'তে সত্যান্তর জানি,
তোমার এ কীর্ত্তি হতে বহুগুণ তুমি যে মহৎ।
তোমার এ কবিচিত্ত মাঝে ছিল মহান হৃদয়,
ব্যথায় কাঁদিত সে যে রিক্ত তব মাতৃভূমি লাগি ;
কাঁদিত সে শিক্ষাহীন সত্যভ্রষ্ট ভাগ্যহীন তরে।
সে-তীব্র ব্যথায়-বিগলিত কবি কল্পনা-বিলাসী
লভিলে যে নবজন্ম অভিনব কর্ম্মীরূপে তুমি।
তাইত কবিরে হেরি অজ্ঞানের তমিস্রার মাঝে
জ্ঞানের বর্ত্তিকা হাতে—প্রত্যূষের নবারুণ সম।

ওগো শিল্পি, ওগো কবি, হে প্রেমিক, ওগো কর্ম্মবীর!
জানি মোর এই অশ্রু, দীনহীন এই অর্ঘ্যরাশি,
পৌঁছিবেনা যেথা তুমি বিরাজিছ অমর্ত্তলোকেতে।
তবু এই পরিম্লান বেদনার্ত্ত বিধুর হৃদয়
অশ্রুস্নানে পূতঃ হোক, লভুক সে দৃষ্টি অভিনব—
যেন গো বুঝিতে পারি বাণী তব সুকল্যাণময়ী।

*(করাচী-প্রবাসী বাঙ্গালী কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত রবীন্দ্র শোকসভার উপলক্ষে লিখিত)

পলিটিক্স

—শ্রীরবিদাস সাহা রায়

পাশাপাশি গ্রাম হেমন্তপুর ও পলাশডাঙ্গার যতদূর দূরত্বের ব্যবধান—এই দুই গ্রামের অধিবাসীদের মধ্যে কিন্তু ততদূর আন্তরিক ব্যবধান নাই। কোনদিন ছিলও না। হেমন্তপুর মুসলমানপ্রধান আর পলাশডাঙ্গা হিন্দুপ্রধান। তাহা হইলেও দুই গ্রামের উচ্চনীচ সর্ব্বশ্রেণীর অধিবাসীরা মিলিয়া বেশ সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যেই জীবন অতিবাহিত করিতেছিল।

পলাশডাঙ্গায় হিন্দুদের বারোয়ারী দুর্গাপূজা উপলক্ষ্যে মেলা বসিত। দুই গ্রামের মুসলমানরা দলে দলে তাহাতে যোগদান করিত। হেমন্তপুরে হইত মহরমের মেলা। হিন্দুরাও স্ত্রীপুত্র নিয়া তাহাতে যোগদান করিতে কুণ্ঠা বোধ করিত না। পলাশডাঙ্গার কাহাকেও ভূতে পাইলে হেমন্তপুরের আবদুল ওঝা দৌড়াইয়া আসিত, ঝাড়িয়া, মন্ত্র ফুঁকিয়া রোগীকে সুস্থ করিত। হেমন্তপুরের কাহারও কলেরা হইলে পলাশডাঙ্গার নিবারণ কবিরাজ তাড়াতাড়ি যাইয়া ঔষধের ব্যবস্থা করিতে কসুর করিত না।

এই হইল দুই গ্রামের অধিবাসীদের সংক্ষিপ্ত জীবনযাত্রার ইতিহাস। সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য, সৌহৃদ্য, আন্তরিকতা—সবই তাহাদের ছিল। কিন্তু অভাব ছিল শুধু শিক্ষার। শিক্ষা-প্রসারের জন্য কোন সঙ্ঘবদ্ধ চেষ্টা কোন গ্রামেই চলে নাই। তবে পলাশডাঙ্গার তিনটি ছেলে সহরে থাকিয়া পড়াশুনা করিতেছিল, সেই দেখাদেখি হেমন্তপুরের করিম মোল্লাও তাহার ছেলেকে মাইনর পাশ করিবার পরই সহরে পাঠাইয়া দিয়াছিল। এই মুষ্টিমেয় কয়টি জীব ছাড়া আর সকলেই প্রায় নিরক্ষর।

সাম্প্রদায়িক বলিয়া কোন জিনিষ তাহারা জানিত না। আধুনিক উৎকট সভ্যতার দুর্গন্ধ হাওয়া তাহাদিগকে স্পর্শ করিতে পারে নাই।

দশ বৎসর পরে যখন পলাশডাঙ্গার রামধন সরকারের ছেলে শ্যামাকান্ত বি, এ, পাশ করিয়া এবং করিম মোল্লার ছেলে ফজল হোসেন কায়ক্লেশে ম্যাট্রিক পাশ করিয়া গ্রামে ফিরিলে তখন উভয় গ্রামের অধিবাসীদের মধ্যে একটু আশা ও উদ্দীপনার সঞ্চার হইল। পলাশডাঙ্গার দেমাক হইল বেশী—কারণ তাহাদের গ্রামের ছেলে বি, এ, পাশ। কিন্তু হেমন্তপুরের লোকেরাই ছাড়িবে কেন? শ্যামাকান্তের চাইতে ফজল হোসেনের ইংরাজি বলিবার ক্ষমতা এবং বুদ্ধি বেশী—হেমন্তপুরের লোকেরা পলাশডাঙ্গার লোকদের কাছে এই বলিয়া গর্ব্ব করিয়া বেড়াইতে লাগিল।

একদিন এই নিয়া দুই গ্রামের কয়েকজন লোকের মধ্যে বেশ একটু বচসাও হইয়া গেল।

নিষ্ঠুর বিধাতা হয় তো অলক্ষ্যে হাসিলেন। পলাশডাঙ্গা ও হেমন্তপুরে কোন্ নূতন যুগের পত্তন হইতে চলিল কে জানে?

শ্যামাকান্ত আসিয়া গ্রামের কিছু পরিবর্ত্তন সাধন করিল। গ্রামে কোন পোষ্ট-অফিস ছিল না—সেটা ছিল দুই ক্রোশ দূরে। এ জন্য পলাশডাঙ্গা এবং আশে-পাশের গ্রামবাসীদের অনেক অসুবিধা ভোগ করিতে হইত। শ্যামাকান্ত কলিকাতার পি, এম, জি অফিসে দরখাস্ত করিয়া একটি ডাক-বাক্স গ্রামে বসাইল। সারাদেশ শ্যামাকান্তের প্রশংসায় মুখর হইয়া উঠিল।

ফজল হোসেন এদিকে পড়িল মুস্কিলে। সে যদি একটা কিছু না করে তবে তাহার প্রাধান্য ক্ষুন্ন হইবে। অনেক মাথা ঘামাইয়াও যখন কিছু বাহির করিতে পারিল না, তখন গ্রামে মাঝে মাঝে সভা বসাইয়া চাষীদের দুঃখ-দুর্দ্দশা বর্ণনা করিতে লাগিল এবং যাহাতে এই দুঃখ-দুর্দ্দশার লাঘব হয়—সেই জন্য চাষীদিগকে সঙ্ঘবদ্ধ হইবার জন্য আহ্বান করিল। দেশের চাষী মহলে একটা সাড়া পড়িয়া গেল।

কিন্তু এই সামান্য অভিজ্ঞতা, এই সামান্য জ্ঞান—চাষীদের দুঃখ-দুর্দ্দশা মোচন করিবার পক্ষে কতটুকু? ফজল হোসেনের চেষ্টা নিষ্ফল হইল। সভা-সমিতির হিড়িকও ক্রমে ক্রমে মন্দীভূত হইয়া আসিতে লাগিল।

ইহার পরও প্রায় দুই বৎসর অতীত হইয়া গেল। এখন আর কোন গ্রামেই শ্যামাকান্ত কিম্বা ফজল হোসেনকে নিয়া কোন আলোচনা বা প্রশংসাবাদ ওঠে না।

নূতন করিয়া বাহাদুরী জাহির করিবার কাহারও কিছু রহিল না। তখন দুই জনেই পড়িল মুস্কিলে। তাহাদের এই কষ্টার্জ্জিত শিক্ষা, এই গর্ব্ব—সবই কি বিফলে যাইবে? যদি দেশের ভিতর একটা কীর্ত্তি করিয়া না যাইতে পারিল তবে এত কষ্ট করিয়া লেখাপড়া শিখিয়াছে কেন? যদি গ্রামের লোকের উপর মোড়লী করিতে না পারিল, যদি লোকের লক্ষ্যস্থল তাহারা না হইতে পারিল—তবে ধিক্ তাহাদের শিক্ষা!

ফজল হোসেন একটা নূতন বুদ্ধি বাহির করিল। তাহার গ্রামের কয়েকজন মুসলমান লইয়া একটি দল গঠন করিল। দলের প্রধান উদ্দেশ্য হইল মুসলমান জাতির উন্নতি সাধন করা। ইসলামের জাতীয়তা, ইসলামের ধর্ম্ম, ইসলামের ঐক্য—পৃথিবীর আদর্শস্থানীয়—দরদ মাখানো কণ্ঠে তাহা বিবৃত করিয়া ফজল হোসেন তাহার গাঁয়ের মুসলমানদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিল।

শ্যামাকান্তের কানে তাহা পৌছিতে দেরী হইল না। সেও তাহার গাঁয়ের হিন্দুগণকে একত্রিত করিয়া একটি সভা করিল। সভাতে স্থির হইল পলাশডাঙ্গার প্রত্যেক হিন্দুর বিপদে আপদে প্রত্যেক হিন্দু সাহায্য করিবে। প্রত্যেক হিন্দু ভাই ভাই—কেহ অভিন্ন নয়। অচিরেই শ্যামাকান্ত পলাশডাঙ্গার লক্ষ্যনীয় ব্যক্তি হইয়া উঠিল।

কিন্তু ইহাই কি যথেষ্ট? মানুষের উপর নেতৃত্ব করিবার যশ ও খ্যাতি অর্জ্জন করিবার স্পৃহা যখন কাহারও মনে উগ্র হইয়া দাঁড়ায়—তখন সে হইয়া পড়ে দিশেহারা, হিতাহিত জ্ঞান তাহার থাকে না। কাজের চাইতে ভড়ংই হয় তাহার বেশী। কি ভাবে দেশের ভিতর একটা আন্দোলন সৃষ্টি করিয়া নিজে বাহাদুরী দেখাইবার সুযোগ পাইবে—সেই জন্য সে ব্যস্ত হইয়া পড়ে। ফজল হোসেন ও শ্যামাকান্তের অবস্থাও বুঝি তাহাই হইল।

দুর্গাপূজা আসিল। পলাশডাঙ্গার হিন্দু অধিবাসীদের মধ্যে একটা সাড়া পড়িয়া গেল। বারোয়ারী পূজাটা এবার অন্যান্যবার হইতে বেশী জাঁকজমক সহকারে হইবে।

শ্যামাকান্তের বাবা রাঘব সরকার এবার পঞ্চাশ টাকা চাঁদা দিয়াছেন। মেলাও এবার খুব বিরাট হইবে।

ফজল হোসেন তাহার গ্রামের মুসলমানদিগকে ডাকিয়া বলিয়া দিল, কোন মুসলমান পলাশডাঙ্গার পূজায় বা মেলায় যোগদান করিতে পারিবে না। হিন্দুদের অনুষ্ঠানে যোগদান করা ইসলামধর্ম্মের বিরোধী, ইসলামধর্ম্ম অনুসারে উহা পাপ।

সরল-প্রাণ অশিক্ষিত মুসলমানরা তাহাই বিশ্বাস করিল। সকলে একমত হইয়া স্থির করিল—এবার পলাশডাঙ্গার পূজায় বা মেলায় কেহই যাইবে না।



সাম্প্রদায়িক বলিয়া কোন জিনিষ তাহারা জানিত না……

পলাশডাঙ্গার পূজা নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হইয়া গেল। হেমন্তপুর হইতে কোন মুসলমানই এবার আসিল না—সে জন্য মেলাটা খুব ভাল করিয়া জমিল না।

বিজয়ার দিন একধারে যেমন বিষাদ অন্যধারে বিসর্জ্জনের ঘটায় লোকের মনে তেমনি উৎসাহ। বহুরকম বাদ্য এবং রং-তামাসার আয়োজন করা হইল।

নদীতে দুর্গাপ্রতিমা বিসর্জ্জন করিতে যাইবার পথ হেমন্তপুরের মধ্য দিয়া। রাস্তার পার্শ্বেই হেমন্তপুরের মসজিদ। ফজল হোসেন তাহার গ্রামের মুসলমানদিগকে ডাকিয়া বলিলেন—

আমাদের গাঁয়ের উপর দিয়া বাদ্য বাজাইয়া পলাশডাঙ্গার দুর্গাপ্রতিমা যাইতে দেওয়া হইবে না। মসজিদের সম্মুখে বাদ্য বাজিলে ইসলামধর্ম্মের হানি হইবে, পবিত্র ইসলামধর্ম্মে এই হানি কিছুতেই সহ্য করা হইবে না।

হেমন্তপুরের মুসলমানদের অন্তর আনন্দে বিগলিত হইল। ফজল হোসেনের মত এমন দরদী মানুষ আর তাহাদের কে আছে?

এই ব্যাপারটা কয়েক জনের অবশ্য মনঃপূত হইল না। পলাশডাঙ্গার সঙ্গে এতদিনের সৌহার্দ্দ্য ভাঙ্গিয়া যাইবে—ইহা দেখিতেও যেন কিরূপ লাগে। তাঁতের সর্দ্দার বলিল, "কামডা কি বাল আইল মোল্লার পো? এগার লাইগা খোচাখুচি করণের আর কি কাম আছে?"

জাফর আলী ধমক দিয়া বলিল, "তুমি চুপ কর সর্দ্দারের পো, তুমি আর কি বোঝ? আমাগো মোল্লার পো কেতাবে কত কিছু পইড়া আইছে। ধর্ম্মের কথা তার মতন তোমরা কি জানবা?"

তাঁতের সর্দ্দার চুপ করিল। আরও অনেকে সঙ্গে সঙ্গে চুপ করিল।

এই সংবাদ কানে যাইতেই পলাশডাঙ্গার লোকেরা হতবুদ্ধি হইয়া গেল। তখন তাহারা শ্যামাকান্তের কাছে গেল একটা উপায় স্থির করিবার জন্য। শ্যামাকান্ত মনে মনে গর্ব্ব অনুভব করিল। লোকে তবে তাহাকে গ্রামের নেতা বলিয়া মানিয়া লইয়াছে।

সে পলাশডাঙ্গার সমস্ত অধিবাসীকে একত্র করিল। তেজোদৃপ্ত কণ্ঠে সকলের সম্মুখে বলিল, হেমন্তপুরের লোকদের ভয়ে আমরা পশ্চাৎপদ হইব না। হেমন্তপুরের রাস্তা দিয়া বাদ্য বাজাইয়া প্রতিমা আমরা বিসর্জ্জন করিবই। বুকের একবিন্দু রক্ত থাকিতে আমরা আমাদের ধর্ম্মানুষ্ঠানের অঙ্গহানি হইতে দিব না।

গর্ব্বে ও উত্তেজনায় হিন্দুদের বুক ফুলিয়া উঠিল।

তখন সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসিয়াছে। সূর্য্যাস্তের রক্তিম আভা আকাশের বুক হইতে তখনও মিলায় নাই। পলাশডাঙ্গার লোকেরা প্রতিমা নিয়া হেমন্তপুরের পথ দিয়া রওনা হইল।

প্রথমে ঝগড়া—তারপর রক্তারক্তি।

হেমন্তপুরের বুকে একটা অভাবনীয় ব্যাপার ঘটিয়া গেল।

বিধাতা অলক্ষ্যে হাসিলেন।

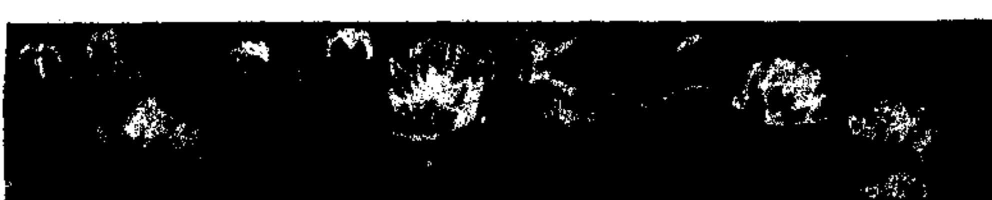
সাম্প্রদায়িকতা বলিয়া কোন কিছু যাহারা জানিত না—তাহাদের ভিতরও এই বিষ বিস্তার লাভ করিল। ইহার জের চলিল অনেকদিন। তারপর হেমন্তপুরের মহরমের মেলার সময় সেটা উগ্ররূপ ধারণ করিল। হেমন্তপুর ও পলাশডাঙ্গা গ্রাম ধ্বংস হইয়া গেল—পড়িয়া রহিল শুধু কঙ্কাল।

অনেকদিন অতীত হইয়া গেল।

হেমন্তপুর ও পলাশডাঙ্গার ধ্বংসস্তূপে কোন্ নূতন জীবন জন্মগ্রহণ করিল কে জানে? দুই গ্রামের লোকদের মনে একদিন আত্মচেতনা জাগিল। বেশ তো সুখে ছিল তাহারা, ফজল হোসেন আর শ্যামাকান্তের নেতৃত্বই তো দেশে এই বিপর্য্যয় বহিয়া আনিল। আত্মীয়-স্বজনহারা গৃহহারা তাহারা হইল কাহার দোষে?

সমস্ত লোক বিদ্রোহী হইয়া উঠিল শ্যামাকান্ত আর ফজল হোসেনের উপর। এই সর্ব্বনাশী দুই নেতাকে তাহারা খুন করিবে। এই দুইজনের রক্তে প্রতিশোধ লইবে—তাহাদের হারানো গ্রামবাসীদের।

কিন্তু কোথায় তাহাদের একান্ত দরদী, হিতাকাঙ্ক্ষী নেতৃদ্বয়? রাতের অন্ধকারে দুই জনেই একযোগে গ্রাম ত্যাগ করিয়াছে। আর কখনও ফিরিবে কি না কে জানে?



আদর্শবাদী দ্বিজেন্দ্রলাল

—শ্রীমেঘেন্দ্রলাল রায়

"শত্রু হয় না হোক না
যদি সেথায় পাস্ মহৎ প্রাণ
তাহারে ভালবাসিতে শেখ
তাহারে কর হৃদয় দান—
তোদের মধ্যে ভণ্ড যে
তাহারে দূর করিয়া দে'
সবার বাড়া শত্রু সে
আবার তোরা মানুষ হ।"

—দ্বিজেন্দ্রলাল

অমর কবি ও নাট্যকার ৺দ্বিজেন্দ্রলাল রায় ১২৭০ সালে আষাঢ় মাসে কৃষ্ণনগরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি কৃষ্ণনগরের দেওয়ান ৺কার্ত্তিকেয়চন্দ্র রায়ের সপ্তম ও কনিষ্ঠ পুত্র।

দ্বিজেন্দ্রলালের পিতা ৺বঙ্কিমচন্দ্রের সমসাময়িক ও তিনি বঙ্কিমচন্দ্র ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের বিশেষ অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন। দেওয়ানজী একাধারে বিশেষ সুসাহিত্যিক ও বিখ্যাত খেয়াল গায়করূপে সে যুগে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। প্রাতঃস্মরণীয় বিদ্যাসাগর, সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র, মহাকবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত, রামতনু লাহিড়ী, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, স্তর সুরেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় প্রভৃতি দেশপূজ্য বঙ্গবাসী দেওয়ানজীর বাটীতে আতিথ্য গ্রহণ করিতেন। কার্ত্তিকেয় চন্দ্র ক্ষীতীশবংশাবলী চরিত প্রকাশ করেন—তাহা প্রাচীন বাঙ্গলার ও নদীয়ার বহু ঐতিহাসিক তথ্যে পূর্ণ, এই পুস্তক বহু পূর্ব্বে জার্ম্মান ভাষায় অনুদিত হয়। তিনি "গীতমঞ্জরী" নাম দিয়া অ-বাংলা গীত রচনা করিয়া প্রকাশ করেন।

দেওয়ানজীর আত্ম-জীবন চরিত ধারাবাহিক ভাবে সাহিত্য মাসিক পত্রিকাতে প্রকাশিত হয়—তাহার লেখনভঙ্গী চিত্তাকর্ষক ও মধুর ছিল। দেওয়ানজীর মৃত্যুর পর তাঁহার ষষ্ঠ পুত্র বঙ্কিমযুগের বিখ্যাত সমালোচক ও পতাকা, নবপ্রভা, টেলিগ্রাম, বিহারনিউস্ প্রভৃতি পত্রিকার বিখ্যাত সম্পাদক ৺হরেন্দ্রলাল রায়, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিকট আত্ম-জীবনচরিতের পাণ্ডুলিপি লইয়া যান ও বিদ্যাসাগর মহাশয় তাহা পাঠ করিয়া নিজব্যয়ে মুদ্রিত করিবেন, এইরূপ ইচ্ছা প্রকাশ করেন, কিন্তু তৎপরে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মৃত্যু হওয়ায় ৺হরেন্দ্রলাল, দেওয়ানজীর আত্ম-জীবনচরিত প্রকাশ করেন।



ডি, এল, রায়

জ্ঞানেন্দ্রলাল দ্বিজেন্দ্রলালের অগ্রজ, বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের সম্পাদিত বঙ্গদর্শনে নব্যভারতে বহু মূল্যবান্ প্রবন্ধ লেখেন, তাঁহার প্রবন্ধ পুস্তকাকারে "প্রবন্ধ-লহরী"

নামে প্রকাশিত হয়। তিনি "মায়া" নামক উপন্যাস লিখেন, তাঁহার সহযোগিতায় ৺হরেন্দ্রলাল নবপ্রভা ও পতাকার সম্পাদকতা করেন। ৺জ্ঞানেন্দ্রলাল একজন শ্রেষ্ঠ প্রতিভাশালী লেখক ছিলেন। ৺হরেন্দ্রলাল রায় ব্যবহারাজীব ও আইনের অধ্যাপক হইয়া ভাগলপুরে বাস করেন—তিনি ভাগলপুরের সাহিত্য-পরিষদ প্রতিষ্ঠা করেন ও তাঁহারই বিশেষ চেষ্টায় বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের দ্বিতীয় বিরাট অধিবেশন ভাগলপুরে উদ্‌যাপিত হয়, অনেকের মতে এইরূপ বিরাট সাহিত্য সম্মিলন অতি অল্পই হইয়াছে। হরেন্দ্রলালের গঙ্গাতীরস্থ ভাগলপুরের বাটী "জাহ্নবী-নিবাস" দ্বিজেন্দ্রলালের বিশেষ প্রিয় ছিল, তিনি কর্ম্মজীবনের প্রারম্ভে বিহারে সুকামুটা, ভাগলপুর, মুঙ্গের প্রভৃতি স্থানে কার্য্যে নিযুক্ত থাকায় হরেন্দ্রলালের বাটীতে বহু সময়ে কখনও বা একাকী কখনও বা সস্ত্রীক থাকেন, এই "জাহ্নবী-নিবাসে" দ্বিজেন্দ্রলালের "রাণা প্রতাপ" ও "সীতা"র অধিকাংশ লিখিত হয়।

হরেন্দ্রলাল, ৺আশুতোষ চৌধুরী, যোগেশচন্দ্র চৌধুরী, স্যর সুরেন্দ্রনাথ, ৺মতিলাল ঘোষ, ৺দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ, স্যর আশুতোষ, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, বিজয়চন্দ্র মজুমদার প্রভৃতি দেশবিখ্যাত বঙ্গবাসীর সহিত ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্বের সূত্রে আবদ্ধ ছিলেন।

হরেন্দ্রলালের প্রবন্ধ "বিদ্যাবত্তা বনাম ধনবত্তা" ভারতবর্ষে প্রকাশিত ও বহু প্রবন্ধ নবপ্রভা ও পতাকাতে প্রকাশিত, হইয়া তদানীন্তন সাহিত্যসমাজে বিশেষ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করে ও উচ্ছ্বসিত প্রশংসা অর্জ্জন করে। তাঁহার ভাষা অতি মধুর ও কবিত্বপূর্ণ, প্রবন্ধের মধ্যে মৌলিকতা ও গভীর পাণ্ডিত্য দৃষ্ট হয়।

হরেন্দ্রলাল ভাগলপুরবাসী বাঙ্গালীর ও বিহারী সম্প্রদায়ের বিশেষ প্রিয় ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পূর্ব্বে ভাগলপুরবাসী "হরেন্দ্রজয়ন্তী" সম্পাদন করিয়া প্রবীণ সাহিত্যিককে রৌপ্য লেখনী, মানপত্র ইত্যাদি দিয়া নিজেদের শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন।

দ্বিজেন্দ্রলালের পিতৃ ও ভ্রাতৃ পরিচয় হইতে ইহা সহজেই লক্ষিত হয় যে, সাহিত্য ও সঙ্গীতের প্রতি বিশেষ অনুরাগ দ্বিজেন্দ্রলাল উত্তরাধিকার সূত্রে অর্জ্জন করেন। বাল্যকাল হইতেই তিনি অতি মধুর কণ্ঠের অধিকারী ছিলেন, তাঁহার দাদা হরেন্দ্রলালও সুকণ্ঠের অধিকারী ছিলেন, উভয়েই পিতার সহিত বাল্যবয়সে কৃষ্ণনগরে অনেক বাড়ীতে গান করিয়া সকলকে মুগ্ধ করেন, এ কথা শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী দ্বিজেন্দ্রলালের স্মৃতিসভাতে বিবৃত করেন।

দ্বিজেন্দ্রলাল বাল্যকাল হইতে একটু অদ্ভুত ধরণের বালক ছিলেন, নিজের বেশ-ভূষার প্রতি কোনরূপ লক্ষ্য ছিল না—তাঁহার গায়ের রং সাহেবদের ন্যায় ছিল ও মুখের গঠন অতি সুন্দর ছিল। পাঠ্য-পুস্তক প্রায়ই তিনি হারাইয়া ফেলিতেন ও স্কুল বসিবার কিছু পূর্ব্বে গিয়া পাঠ মুখস্থ করিয়া প্রথম স্থান অধিকার করিতেন।

তিনি গল্প করিয়াছেন যে, তাঁহার ও তাঁহার অগ্রজ হরেন্দ্রলালের এক সঙ্গে উপনয়ন হইয়াছিল, সে সময়ে তাঁহাদের বার দিন গৃহে বদ্ধ থাকিতে হইত, সেই সময়ে তাঁহারা সমগ্র কৃত্তিবাসের রামায়ণ মুখস্থ করিয়াছিলেন।

বাল্যকাল হইতেই দ্বিজেন্দ্রলাল স্বভাব-কবি ছিলেন। নয় বৎসর বয়সে তাঁহার অগ্রজ ৺জ্ঞানেন্দ্রলাল বাটীর দোতালায় পূর্ণিমার জ্যোৎস্না-প্লাবিত আকাশে চন্দ্রকে দেখাইয়া বলিলেন, "দ্বিজু, ঐ চাঁদ দেখে একটা গান তৈরী ক'রো তো—" তখন দ্বিজেন্দ্রলালের বয়স নয় বৎসর মাত্র, তিনি প্রকৃতির শোভায় আত্মহারা হইয়া হাতে তালি দিয়া নাচিয়া নাচিয়া এই গীত রচনা করিয়া গাহিলেন—

"গগন-ভূষণ তুমি জনগণ-মনোহারী
কোথা যাও হে নিশানাথ, হে নীল-নভোবিহারী।
হেসে হেসে, ভেসে ভেসে
চলি যাও হে কোন দেশে
চারি ধারে তারা হারে,
রহে ঘেরি সারি সারি।
হেলে হেলে, চলে চলে
পড়িছ গগন-তলে
কি মধুর মনোহর শশধর, বলিহারী।"

দ্বিজেন্দ্রলালের অগ্রজেরা এই সব গীত লিখিয়া রাখিতেন, বস্তুতঃ কবির আর্য্য-গাথার প্রথম ভাগের সঙ্গীতাবলীর অধিকাংশ দ্বিজেন্দ্রলালের নয় বৎসর হইতে বার বৎসর বয়সের মধ্যে লিখিত; তাহা যে আজও বাংলার এক শ্রেষ্ঠ গীতাবলী, তাহা রবীন্দ্রনাথ পর্য্যন্ত সমালোচনায় লিখিয়াছেন।

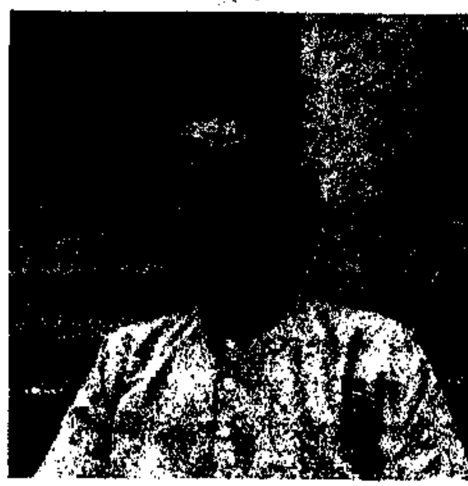
তিনি বাল্যকাল হইতেই বিশেষ ওজস্বিনী ভাষায় বক্তৃতা করিতে ভাল বাসিতেন—কিন্তু বালকের বক্তৃতা শুনিয়া তাঁহার অগ্রজেরা প্রহার করিবেন এই ভয়ে বাড়ীর প্রাচীরের উপর উঠিয়া ভৃত্যমণ্ডলীকে শ্রোতৃবর্গরূপে লইয়া তিনি বক্তৃতা করিতেন।

একদিন যখন এইরূপ বক্তৃতা করিতেছিলেন, সে সময়ে প্রাতঃস্মরণীয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় কৃষ্ণনগরে দেওয়ানজীর বাটীতে প্রবেশ করিতে এই অদ্ভুত দৃশ্য দেখিয়া আর অগ্রসর না হইয়া চুপ করিয়া দ্বিজেন্দ্রলালের বক্তৃতা শ্রবণ করেন ও দেওয়ানজীকে বলেন যে, দ্বিজেন্দ্রলাল বাঁচিয়া থাকিলে দেশ-প্রসিদ্ধ ব্যক্তি হইবেন। বিদ্যাসাগরের ভবিষ্যদ্বাণী সফল হইয়াছিল।

দ্বিজেন্দ্রলাল অল্প বয়স হইতেই ম্যালেরিয়া রোগে বড়ই ভুগিয়াছিলেন—কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি অধ্যয়নে বিশেষ মনোযোগী ছিলেন, তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে বৃত্তির অধিকারী হইয়াছিলেন। তিনি এফ-এ পরীক্ষায় সংস্কৃত'তে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম স্থান অধিকার করেন ও ছাত্রাবস্থায় সংস্কৃততেও সুন্দর বক্তৃতা করিতে পারিতেন। তিনি বি, এ পরীক্ষায় ইংরাজী, বোটানী ও কেমিষ্ট্রিতে প্রথম স্থান অধিকার করেন ও ইংরাজীতে এম, এ পরীক্ষার সময় ঘোরতর ম্যালেরিয়ায় জীবন সঙ্কটাপন্ন হওয়াতে প্রথম স্থান গ্রহণ করিতে সক্ষম না হইয়া দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন। গভর্ণমেণ্ট তাঁহাকে মাসিক ২৫০৲ টাকা বৃত্তি দিয়া কৃষিকার্য্য শিক্ষা করিতে বিলাতে Cirencester কলেজে প্রেরণ করেন, ইংলণ্ডে তিনি এম, আর, এ, এস ; এম, আর, এ, এস, ই ও এম, আর, এ, এস পরীক্ষায় বিশেষ কৃতিত্ব দেখান ও পারিতোষিক প্রাপ্ত হন।

তিনি আমায় বলিয়াছিলেন যে, বিলাতে অবস্থান কালে দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া তাঁহার গভর্ণমেণ্টের চাকুরী করিতে ইচ্ছা ছিল না। সেই কারণে তিনি ব্যারিষ্টারী পড়িতে ইচ্ছুক হইয়া ভ্রাতাদের নিকটে অর্থসাহায্য চাহেন। কিন্তু ভ্রাতাদের নিজেদের অবস্থা খারাপ থাকায় কেহ অর্থ সাহায্য করিতে পারেন নাই।

তিনি যখন দেশে ফিরিয়া আসিবেন, তখন তাঁহার বিশেষ অর্থ কষ্ট ছিল, তদুপরি বিলাতে চারি বৎসর থাকিয়া ইউরোপ না ভ্রমণ করিয়া দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হইবে অর্থাভাবে, এই দুঃখে কয়েক বন্ধুর পরামর্শে তিনি বিলাতে Aryan Melodiest Lyrics of Ind কবিতার পুস্তক প্রকাশ করেন—Edwin Arnold প্রমুখাৎ বিখ্যাত কবি, Scotsman, Temis প্রভৃতি পত্রিকায় কবিতার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা প্রকাশিত হইল, ইংরাজ-জাতি সে কবিতার আদর করিলেও এমন অর্থ হইল না যে, সব পুস্তক বিক্রীত হইয়াও তাহাতে তিনি ইউরোপে ভ্রমণ করিতে পারেন। তিনি দুঃখের সহিত বলিয়াছিলেন যে, এক সন্ধ্যায় যখন নিতান্ত



হরেন্দ্রলাল রায়

চিন্তাক্লিষ্ট হৃদয়ে লণ্ডনের রাজপথ দিয়া যাইতেছিলেন, London Music Hall-এর সম্মুখে জনতা দেখিয়া সেখানে উপস্থিত হইলেন—তিনি দেখিলেন, একটী বিজ্ঞাপন—সঙ্গীত-প্রতিযোগিতার, তিনি ইংরাজী গীত উত্তমরূপেই শিক্ষা করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহা হইলেও ইংরাজদের সহিত ইংরাজী গীতে প্রতিযোগিতা করা কতদূর সমীচীন,তাহা চিন্তা করিলেন, কিন্তু প্রথম পুরস্কার আড়াই শ' পাউণ্ড। যদি সাফল্য লাভ করেন অর্থকষ্ট ঘুচিবে, ইউরোপ ভ্রমণ ভাল করিয়া হইবে। তিনিও প্রতিযোগিতায় নাম দিলেন, তাঁহার নাম তাচ্ছিল্য করিয়াই সর্ব্বশেষে দেওয়া হইল। তিনি প্রথম গান গাহিতেই বিরাট চাঞ্চল্য উপস্থিত হইল, পরীক্ষক-সভ্য আরও একটী গীত শুনাইতে অনুরোধ করিলেন। সেই

দিনের পরীক্ষায় দ্বিজেন্দ্রলাল প্রথম স্থান অধিকার করিলেন। অর্থাভাব ঘুচিল, তিনি প্রথমেই প্রায় দেড়শ' টাকা দিয়া তাঁহার অগ্রজ ৺হরেন্দ্রলালের নববিবাহিতা স্ত্রী (মদীয় মাতৃদেবী) মোহিনী দেবীর (বিখ্যাত উপন্যাস "মধুমিমা"র লেখিকা, ৪০ বৎসর আগে নবপ্রভায় প্রকাশিত) জন্য লণ্ডনে একটী সোনার ঘড়ী ক্রয় করিলেন, ভ্রাতৃবধূকে উপহার দিবার নিমিত্ত। এই প্রকারে অর্থ সংগ্রহ করিয়া দ্বিজেন্দ্রলাল ইউরোপ ভ্রমণ করেন।

পূর্ব্বেই বিবৃত হইয়াছে যে, তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে বৃত্তির অধিকারী হইয়াছিলেন। সেই বৃত্তি হইতে তিনি মাসিক দশ টাকা মাতৃদেবীকে দিতেন ও বৃদ্ধ বয়স পর্য্যন্ত বিশ্বাস করিতেন যে, ভগবান্ এই কারণে তাঁহার মঙ্গল করিবেন।

তিনি অতি স্নেহশীল পুত্র, পিতা, ভ্রাতা, খুল্লতাত ও আদর্শ স্বামী ছিলেন। ইংলণ্ডে অবস্থান কালে পিতা, মাতা উভয়েই মৃত্যুমুখে পতিত হন, তিনি দুঃখ করিয়া আমাকে বলিয়াছিলেন যে, প্রায় ৬ মাস অশান্ত চিত্তে বিলাতে তিনি প্রত্যহ নির্জ্জনে কবর স্থানে গিয়া স্বর্গগত পিতামাতার জন্য অশ্রু বিসর্জ্জন করিয়াছেন। তিনি বলিতেন যে, "কি দুঃখ আমার, যখন বাবা মা'র মৃত্যু হয়, তখন আমি বিলাতে—যখন তোমার খুড়িমা মারা যান তখন আমি ঢাকাতে (হায়! যখন তিনি হঠাৎ সিংহল-বিজয় নাটক লিখিতে লিখিতে সংজ্ঞা হারাইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হন, তখনও তাঁহার প্রাণ স্নেহের মণ্টু,—একমাত্র পুত্র মোহনবাগান খেলার মাঠে)

তিনি তাঁহার পিতৃদেবের স্মৃতিকে শ্রদ্ধাঞ্জলি দেন বিখ্যাত নাটক "দুর্গাদাস" উপহার দিয়া। মার প্রতি ভক্তি তাঁর অসীম ছিল—সেই ভক্তি "চন্দ্রগুপ্ত বা ভীষ্ম নাটকে বিশেষ দৃষ্ট হয়। দেশকে, জাতিকে তিনি প্রাণ দিয়া ভালবাসিতেন, ভ্রাতা, ভগ্নী, মাতা, পিতা, পুত্র, কন্যা ও স্ত্রীকে প্রাণ দিয়া ভালবাসিতেন। সেই কারণে পিতা, ভ্রাতা, মাতা, ভগ্নী, স্ত্রী, পুত্র, কন্যার প্রতি প্রেম একদিকে—অপরদিকে স্বদেশ প্রেম, জাতির প্রতি প্রেম তাঁহার বিরাট সাহিত্যসৃষ্টির মধ্যে জ্বল জ্বল করিতেছে।

তাঁহার স্বভাব ছিল শিশুর ন্যায় সরল—ভোলানাথ-প্রকৃতি। চারি বৎসর বিলাতে থাকিয়াও তিনি নগ্ন গাত্রে থানধুতি পরিধান করিয়া ও মোটা ধবধবে যজ্ঞোপবীতে শোভিত হইয়া নগ্নপদে বাটীতে থাকিতেন। তিনি যে বিলাতে কখনও গিয়াছেন বা চারি বৎসর কাটাইয়াছেন, তাহা তাঁহার উপরওয়ালা সাহেব বা বিলেত ফেরৎ সম্প্রদায় বিশ্বাস করিতে ইচ্ছুক ছিলেন না—বিলেত ফেরৎ সম্প্রদায়ের এই ইঙ্গ-বঙ্গ ভাবকে কশাঘাত করিয়া তিনি "বিলেত-ফের্ত্তা ক'ভাই" বিখ্যাত হাসির গান লেখেন। তাঁহার নিকটে ভারতের আদর্শ যে শ্রেষ্ঠ, এ সম্বন্ধে তিনি কোন সন্দেহ পোষণ করিতেন না। তাঁহার প্রহসনগুলি 'বহুৎআচ্ছা' বা 'প্রায়শ্চিত্ত' ইত্যাদিতে সাহেবী ভাবাপন্ন ও যে সব বাঙ্গালী মেম বিবাহ করেন তাঁহাদের জীবনের যে কি দুঃখময় পরিণতি, তাহা রস-সৃষ্টির সাহায্যে মূর্ত্ত জাগ্রত করিয়াছেন। তিনি নিজে বড় আদর্শবাদী ছিলেন বলিয়া কি নাটক কি কবিতা কি গানে আদর্শবাদকে জাগ্রত করিয়াছেন।

দ্বিজেন্দ্রলালের বিশেষ স্নেহের অধিকারী হওয়ায় ও কিছু কাল তাঁহার সহিত বাস করিবার সুযোগ পাওয়ায় তাঁহার জীবনের দুই একটী ঘটনা, যাহা তিনি আমায় বলিয়াছিলেন, তাহা বিবৃত করিলে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

তিনি প্রায়ই দুঃখ করিয়া বলিতেন, "দেখো, আমরা যে-রকম মাকে ভালবাসিতাম, তোমরা মাকে সেরকম ভালবাস না—রাঙ্গাদা (মদীয় পিতৃদেব) ও আমি পিঠোপিঠী ভাই ছিলাম—দুই জনে যখন এম-এ পড়ি, তখন রাঙ্গাদা মার কোলে মাথা রেখে শুয়ে আছেন দেখে আমি টেনে তাঁকে সরিয়ে মার কোলে মাথা রেখে শুতাম—মাকে নিয়ে আমাদের মধ্যে কতই ঝগড়া হোত—আর সে দৃশ্য তো দেখ না আজ তোমাদের মধ্যে—মা—মা—শুধু মা—আর কিছু নয়।"—কত বড় আদর্শবাদী দ্বিজেন্দ্রলাল!

যখন মেদিনীপুরের কাজলা গড়ে সেই দেশের সাহিত্যিক ও দেশবাসী "দ্বিজেন্দ্রলাল" স্মৃতিস্তম্ভ স্থাপন করিলেন ও আমাকে নিমন্ত্রণ করিলেন- তখন তাঁহারা লিখিলেন, দ্বিজেন্দ্রলালের স্মৃতিস্তম্ভোপোরি "সারা সকালটী ব'সে ব'সে সাধের মালাটী গেঁথেছি।" এই গানটী প্রস্তরের উপর লিখিত হইয়াছে—আমি তখন বিরক্ত হইয়া তাঁহাদের জ্ঞাপন করিলাম যে, দ্বিজেন্দ্রলালের 'আমার দেশ' 'আমার জন্মভূমি' 'জননী ভারতবর্ষ' ইত্যাদি গীত থাকিতে "সারা সকালটী

ব'সে ব'সে" এই গীতটী নির্ব্বাচিত হইল কি কারণে ? তাহাতে সম্পাদক উত্তরে জানান যে, এই স্মৃতিস্তম্ভ সেই বাংলো ও সেই বকুল গাছের নিকটে স্থাপিত হইয়াছে, যেখানে দ্বিজেন্দ্রলাল কিছুকাল সেটেলমেণ্ট অফিসার হিসাবে সস্ত্রীক ছিলেন—সেই সময় এই বকুল গাছের ফুল লইয়া প্রত্যেক সন্ধ্যায় দ্বিজেন্দ্রলালের সহধর্ম্মিণী ফুলের মালা গাঁথিয়া রাখিতেন, সেই সময়ে দ্বিজেন্দ্রলাল এই গীতটী রচনা করিয়া স্ত্রীকে উপহার দিয়াছিলেন—সেই কারণে এই গীতটী নির্ব্বাচিত হইয়াছে। পরে অবশ্য এই গীত সাজাহান নাটকে পিয়ারার মুখে গীত হয়।

দ্বিজেন্দ্রলালের পত্নীপ্রেম অমর হইয়া দেখা দিয়াছে বিখ্যাত নাটক সাজাহানে, পত্নীবিরহে বিরহী কবি সম্রাট সাজাহানের করুণ চিত্রাঙ্কনে।

তিনি সাহিত্যে আদর্শবাদী ছিলেন বলিয়া সাহিত্যে নীতির প্রাধান্য রক্ষা করিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন ও সাহিত্যে দুর্নীতি যে সংক্রামক হইয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহা লক্ষ্য করিয়া দুর্নীতিকে সাহিত্য হইতে দূরীভূত করিতে রবীন্দ্রনাথেরও বিরুদ্ধে সাহিত্য যুদ্ধ ঘোষণা করেন।

তিনি বঙ্কিমচন্দ্রকে বিশেষ শ্রদ্ধা করিতেন। সাহিত্য সম্রাটের আনন্দ মঠ, দেবী চৌধুরাণীকে সাহিত্যের আসরে অতি উচ্চে স্থান নির্দ্দেশ করিতেন। "বন্দে মাতরম্" গীত আমি যখন তাঁহার অনুরোধে গাহিতাম, তিনি আমার পার্শ্বে ভক্ত সাধকের ন্যায় করজোড়ে জানু পাতিয়া অশ্রুপূর্ণ নেত্রে সেই গীত শ্রবণ করিতেন।

তিনি কবি হেমচন্দ্রের বা মধুসূদনের কথা বলিতে বলিতে আনন্দে আত্মহারা হইতেন।

তিনি এই আদর্শবাদ প্রচারের কারণে বিরাট মাসিক পত্রিকা "ভারতবর্ষ" প্রতিষ্ঠা করেন। প্রথম সংখ্যাতে উপন্যাস-সম্রাট শরৎচন্দ্র যখন "চরিত্রহীনের" পাণ্ডুলিপি প্রেরণ করেন তখন দ্বিজেন্দ্রলাল আমায় বলিয়াছিলেন, লেখকের ক্ষমতা অসাধারণ হ'লেও আমার সম্পাদিত কাগজে মেসের ঝিকে heroine ক'রে উপন্যাস প্রকাশ করা হ'বে না।" তিনি শরৎচন্দ্রের নিকটে চরিত্রহীনের পাণ্ডুলিপি প্রত্যর্পণ করেন।

হায়! আজ তাঁহারই প্রতিষ্ঠিত ও তাঁহারই প্রতিকৃতি-সংযুক্ত মাসিক পত্রিকায় গল্প বা উপন্যাসে এমনই কুনীতি প্রচারিত হইতেছে, যাহাতে শ্রাবণের সংখ্যায় "বঙ্গশ্রী" বাধ্য হইয়া কঠোর সমালোচনা করিয়াছেন।

বঙ্গশ্রীর প্রতিষ্ঠাতার সহিত ভারতবর্ষের প্রতিষ্ঠাতার মাসিক পত্র পরিচালনায় যে নীতি অবলম্বন করা উচিত সে বিষয়ে বিস্ময়কর সাদৃশ্য লক্ষিত হয়।

দ্বিজেন্দ্রলাল আদর্শবাদী। তিনি classical নীতিতে ও সংস্কৃত অলঙ্কার-শাস্ত্র অবলম্বন করিয়া বিরাট সাহিত্য সৃষ্টি করিয়া ছিলেন—সেই কারণেই বোধ হয় তাঁহার সমালোচনার বিখ্যাত পুস্তক কালিদাস ভবভূতিতে অলঙ্কার শাস্ত্রের প্রশংসায় মুখর হইয়া তাহার মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়াছেন। দ্বিজেন্দ্রলাল আমাদের অকালে পরিত্যাগ করেন—জ্বলন্ত আদর্শবাদ, যাহা একদিন সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র বাঙ্গালীর হৃদয়ে প্রজ্বলিত করিয়াছিলেন, তাহা দ্বিজেন্দ্রলালের অমর লেখনী প্রভাবে শতগুণ বর্দ্ধিত হইয়া সাহিত্যের আসরকে সমৃদ্ধ করিত, যদি তিনি আরো কিছুকাল জীবিত থাকিতেন—সাহিত্যে আজ পৌরুষের অভাবে যে আগাছার সৃষ্টি হইয়াছে তাহা দূরীভূত হইত।



দেওয়ান ক...

দ্বিজেন্দ্রলালের প্রতিভা সর্ব্বতোমুখী। তিনি একাধারে একজন শ্রেষ্ঠ কবি, হাসির গানের অমর কবি, বাঙ্গলার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ Satirist, অদ্বিতীয় নাট্যকার, চিন্তাশীল সমালোচক, স্বদেশ প্রেমের অমর গাথাবলীর রচয়িতা ও Composer—সুতরাং এ প্রতিভার বিশ্লেষণ এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে সম্ভব নহে—মানুষ হিসাবে দ্বিজেন্দ্রলাল আদর্শবাদী ছিলেন ও সেই আদর্শই সাহিত্যে পরিবেশন করিয়াছিলেন, ইহাই প্রবন্ধের মূল কথা।

স্বপ্ন

—শ্রীপ্রমীলা রায় চৌধুরী

পুরীর সমুদ্রতটও নয়, কিংবা দার্জ্জিলিং, কালিম্পং বা শিলং-এর শৈলশিখরও নয়—সাঁওতাল পরগণার এক অতি অখ্যাত দেশ।

বিশ্বেন্দু তার নব-পরিণীতা অমিয়াকে নিয়ে কয়লা কুঠির কুলীদের ডাক্তার হয়ে এইখানে এসেছে।

একে একে সকলে এসে নতুন ডাক্তারবাবুর সাথে পরিচয় করে গেল। কুঠির ম্যানেজার বাঙ্গালী, বয়সেও প্রবীণ—সদালাপী—সকলে চলে গেলেও তিনি অনেকক্ষণ বসে গল্প করতে লাগলেন। সন্ধ্যা হয়ে আস্‌ছিলো; হাস্‌তে হাস্‌তে ম্যানেজারবাবু বল্লেন, "সন্ধ্যা হলে আপনার স্ত্রীকে একলা রেখে কোথাও বেরুবেন না। জানেন না বোধ হয়, এসব দেশে অপমৃত্যুর ফলে, অপদেবতার আবির্ভাব এত সহজে যেখানে সেখানে হয় যে বলবার কথা নয়। আপনার ডাক্তারী শাস্ত্রে হয় তো 'ভূত' কথাটা নেই—কিন্তু আমাদের মেয়েলী শাস্ত্রে এর 'বিজ্ঞাপন' খুব।"

হেসে বিশ্বেন্দু বল্লে, "সমস্ত দিন ডাক্তারী করার পরে, সন্ধ্যায় 'রিক্রিয়েশান্‌' না হলে বাঁচাই তো মুস্কিল, তা ছাড়া আমার স্ত্রী তথাকথিত ভীরুদের দলে নয় বরং সাহসী। আচ্ছা, যা বলছেন তা আমার মনে থাকবে—সন্ধ্যার পরে বের হলে তাঁকে সঙ্গে নিয়েই বের হব।"

"হাঁ—একটু সাবধানে থাকবেন এই আর কি! পান তো একটা রাত-দিনের ঝি-এর ব্যবস্থা করে নেবেন। আচ্ছা আটটা বাজলো, রাত হলো আজকের মত উঠি। আপনিও যেন কোনদিন বাইরে বেরিয়ে এর বেশী রাত করবেন না। নমস্কার বলে ম্যানেজার বাবু উঠে দাঁড়ালেন।

বিশ্বেন্দু চিন্তিত মুখে প্রতি নমস্কার করে উঠে দাঁড়ালো, ভাবতে লাগলো, এ বলে কি! সন্ধ্যা আটটাকে রাত হলো বলছেন—২।৪ দিন না গেলে বোঝা যাচ্ছে না তো কেমন দেশ, কেমন লোকজন!"

পাশাপাশি কয়েকটা কোয়ার্টার, ডাক্তার বলে বিশ্বেন্দুর কোয়ার্টারটা একটু দূরে। তা হলেও খুব দূর নয়, অন্য বাড়ীগুলির সব কথাবার্ত্তার শব্দ পাওয়া যায়। কোয়ার্টার দেখে অমিয়া খুব খুশী মনে সেটিকে নিজের মনোমত করে গুছিয়ে নিতে বসেছে—একটা এমন বাড়ী সে পেয়েছে, যেটা একেবারে নিজস্বই তার—রাণী, অধিরাণী, একচ্ছত্র অধিকার তার এখানে।

গুন্‌ গুন্‌ করে গানের একটা কলি ভাঁজতে ভাঁজতে সে সেই দুখানি ঘরের মধ্যেই প্রজাপতির মত চঞ্চল পায়ে ঘুরে ঘুরে বেড়াতে লাগলো। তক্তাপোষের ওপরে বিছানা পেতে সে একটা বড় ট্রাঙ্ক খুলে বসলো।

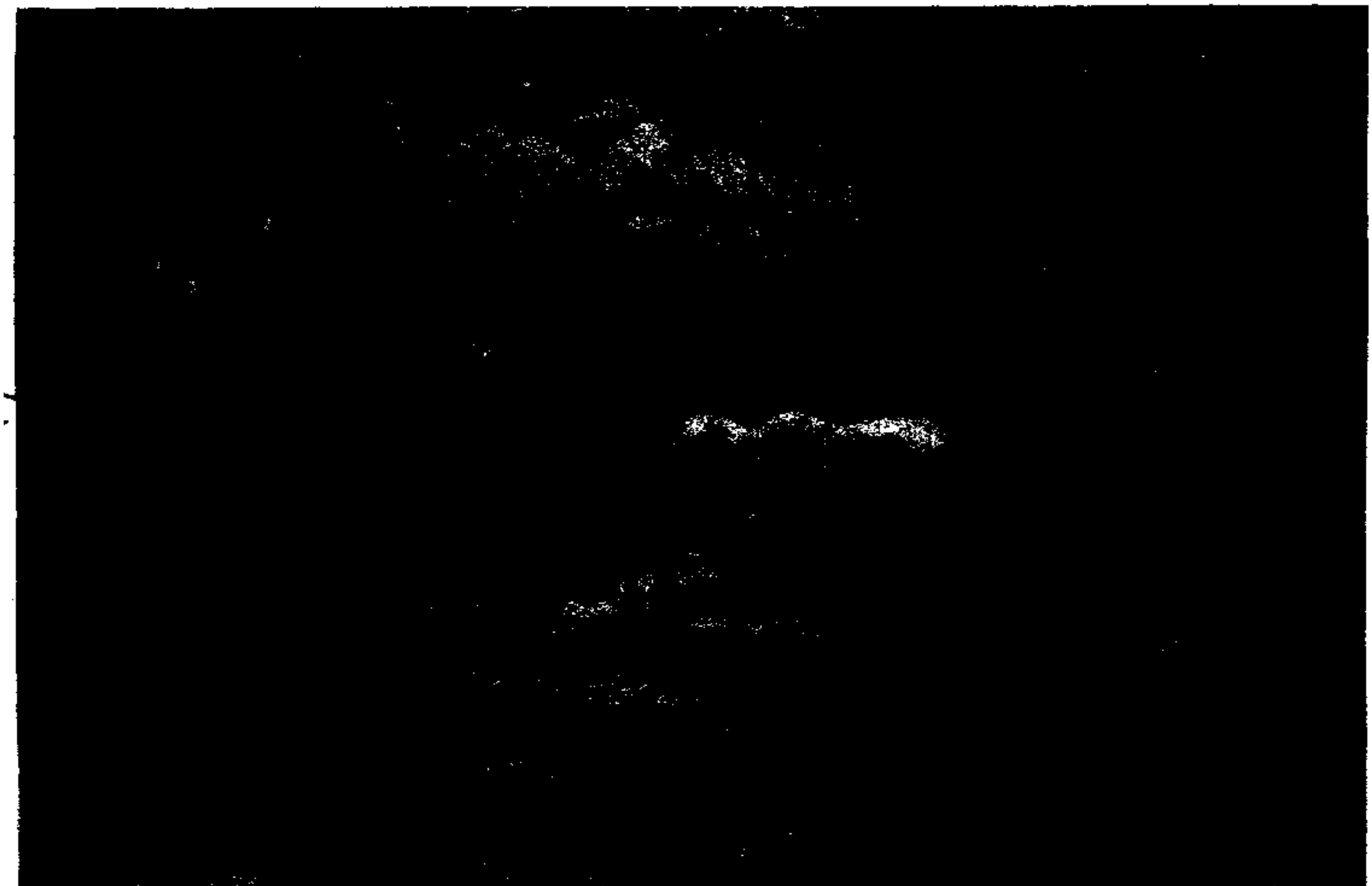
বিশ্বেন্দু এসে ঘরে ঢুকলো—ঘরের চারিদিকে চোখ বুলিয়ে তৃপ্তির সঙ্গে হেসে সে বললে, "বাঃ, সব যে এর মধ্যেই সাজিয়ে নিয়েছ দেখছি, একেবারে করিতকর্ম্মা।"

অমিয়া মুখে কিছু না বলে স্নিগ্ধচোখে একটু হাসলো। বড় ট্রাঙ্কটা থেকে ইংরাজী ও বাংলা খানকয়েক গল্পের বই-এর একটা প্যাকেট বাক্সের ওপর গুছিয়ে রেখে অমিয়া বল্লে, "জায়গাটা সম্বন্ধে তুমি যা আঁচ দিয়ে রেখেছিলে তার চেয়ে ঢের ভাল।"

বিশ্বেন্দু ঘরের মধ্যে পায়চারী করতে লাগলো। হঠাৎ সে বল্লে, "পাড়ার কারু সঙ্গে তোমার আলাপ হয়েছে? কোয়ার্টার তো অনেকগুলিই দেখছি—একটা রাত-দিনের ঝি জুটে গেলে তোমার একা থাকার কষ্টটা কিছু কমবে।"

হেসে অমিয়া বললে, "এদেশের রাত্ত-দিনের ঝি? যে ভাষায় কথা বল্‌বে বুঝেই উঠতে পারব না। এর মধ্যে আবার মাঝে মাঝে নাচও আছে—যে মেয়েটা ও-বেলা কাজ করে গেল সে তো কতবার যে মাথায় ফুল গুঁজে নাচ আরম্ভ করলে—আড়াল থেকে দেখে আর হেসে বাঁচিনে। স্বয়ং উদয়শঙ্করও এদের কাছে নাচের 'লেসন' নিতে পারবেন।"

বিশ্বেন্দু বল্লে, "না, না, হাসি নয়—ওরা খুব ভাল নাচতে পারে, তুমি ওদের নাচ দেখনি তাই বল্‌ছ। দুঃখ যেন থেকে না ওদের কাছে—স্ত্রী-পুরুষে খাটে আর কি অসুরের মত শক্তি। কয়লা কাটার মাঝে ফাঁক পেলেই বাঁশী



খামার বাড়ী | শিল্পী—শ্রীসুনীল সেন

বাজাচ্ছে, গান করছে, নাচছেও। খাদের কুলি-কামিনদের দেখছি তো কাজ সেরে, পিঠে ছেলে বেঁধে দল বেঁধে গান করতে করতে নিজেদের ধাওড়ায় ফেরে। ওদের এই জীবন-যাপন দেখে মাঝে মাঝে মনে হয়, মিছেই আমরা মুখোস পরে ঘুরে বেড়াই. আমরা অমন করে কি হাসতে পারি ?"

মাসখানেক পরে। অমিয়ার সাথে পাড়ার অনেকেরই আলাপ হয়েছে, আর তাকে একা থাকতে হয় না। তার বাড়ীটা শুধু দুজনেরই বাড়ী বলে সেখানে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা আর নিশ্চিন্তে অবসর কাটাবার উপায় ছিল বলে সকলে তার বাড়ী এসেই আড্ডাটা জমাতে ভালবাসত। সভ্য সংখ্যা যেদিন বেশী হ'ত সেদিন বিশ্বেন্দুকে বাধ্য হয়ে ডিস্‌পেন্‌সারী-ঘরের টেবিলের ওপরেই দুপুরটা কাটাতে হত। সকলে চলে গেলে নিজের বাড়ীতেই সন্তর্পণে ঢুকে সে বলত, "ওগো, তোমার সখীদের অভ্যর্থনা করতে তুমি এতই ব্যস্ত এই মানুষটার কথা যে তোমার মনেই পড়ে না দেখি। গৃহছাড়া ত করেইছ, মন ছাড়া করতেও চাও না কি ?

কৃত্রিম কোপে অমিয়া বলে "নিশ্চয়ই, out of sight out of mind"

"ইস, আমি তা হতে দিলে তো আমার যা প্রাপ্য গণ্ডা তা আমি সুদে আসলে পুষিয়ে নেব।"

মোটের ওপর এদেশটা এখন অমিয়ার খারাপ না লেগে, অনেক সময়ে মনে হয়, সহরের ইট কাঠের পরে এই অর্দ্ধবন্য দেশ বেশ ভালই।

সেদিন দুপুরে সকলে বসে বসে আড্ডাটা বেশ পুরোপুরি জমিয়ে তুলেছিল, গল্প চলছিল 'ভূত' নিয়ে। 'ভূত' বলে সত্যিই কোন জিনিস আছে কি না, থাকলে তারা কোথায় থাকে—কেনই বা তারা শুধু রাত্রে দেখা দিয়ে দুর্ব্বল-স্নায়ু লোকদের ভয় পাওয়ায়, কেনই বা তারা দিনে বা সবল মনের লোকের ওপর কোন উৎপাত ঘটাতে পারে না, এই ছিল তাদের গল্পের বিষয় ও বস্তু।

অমিয়া হাসিমুখে সকলের কথা শুনে যাচ্ছিল, শেষে সে বললে, "আপনারা যতক্ষণ আমাকে ভূত দেখাতে না পারছেন, আমি ততক্ষণ কিছুতেই ওদের অস্তিত্ব স্বীকার করব না। তা আপনাদের এদের সম্বন্ধে যত অভিজ্ঞতাই থাকুক না কেন ?"

উত্তর পাওয়ার আগেই দূরে মাদলের শব্দ ও মিহি গলায় একটা গানের সুরের আমেজ পাওয়া গেল। কথার মোড়টাকে ঘুরিয়ে দেওয়ার জন্য অমিয়া উৎসাহিতা হয়ে বললে, "চলুন ওদের ডেকে ওদের নাচ দেখিগে। ওদের নাচ আমার খুব ভাল লাগে দেখতে।"

তার কথায় সকলেই ঘর ছেড়ে বেরিয়ে বারান্দায় এসে দাঁড়াল। হাতছানি দিয়ে অমিয়া তাদের ডাকল। এই টুকুতেই তারা হেসে পরস্পরের গায়ে গড়িয়ে পড়ল। পরে সার বেঁধে এসে দাঁড়িয়ে বললে, "কি বল্‌ছিস তুরা ?"

অমিয়া কোন মতে তাদের বুঝিয়ে দিল যে, তারা ওদের নাচ দেখতে চায়। হি হি করে খানিকটা হেসে নিয়ে ওরা নাচের জন্য তৈরী হয়ে দাঁড়ল। সঙ্গের সাঁওতাল পুরুষটী মাদলে ঘা দিয়ে দিয়ে নাচের সঙ্গত তুলে দিলে। মেয়ে ক'টী এক সুরে গান আরম্ভ করে দিলে–

"চাঁদ করে ঝিকর মিকর হৃদয় করে আলা
কোন্ দেশে গেলে বঁধু' কার নিলে বা মালা ?"

এর সঙ্গে নাচও চল্‌লো। কিছুক্ষণ নাচ দেখানোর পরে পয়সা নিয়ে তারা চলে গেল। বিকেল হয়ে আস্‌ছে দেখে সকলে সেদিনের মত বিদায় নিলে। কেবল যাওয়ার পথে ম্যানেজার-গিন্নি অমিয়াকে নিভৃতে ডেকে বল্‌লেন, "এ কথা নিয়ে আর কোন দিন আলোচনা করবেন না—বিশেষতঃ আপনার এই অবস্থায়। জানেন না বোধ হয়, ওরা কি রকম প্রতিশোধ পরায়ণ! ভাল কিছু করতে শুনলাম না কোনদিন —কিন্তু মন্দ করতে ওরা একটুও পিছপা হয় না। তাই ওদের অস্তিত্বে সব সময়ে বিশ্বাস রাখতে হয়। আমার কথা-গুলো মনে রাখবেন।

মাথা নেড়ে সম্মতি জানিয়ে, বাড়ীর দিকে ফিরে আসতে আসতে অমিয়া ভাবতে লাগলো "আচ্ছা তো! এই যুগে এখনো 'ভূত' বিশ্বাস করতে হবে ? কলেজে পড়ার সময় "লেডী ম্যাক্‌বেথে"র পার্ট ভাল করে আয়ত্ত করার জন্য কতদিন একা একা ছাদের ওপারে অন্ধকারে 'প্র্যাক্‌টিস্' করেছি—কই, কিছু মনে হয় নি তো!" আবার মনে হলো, ম্যানেজার-গিন্নি বলেছেন, "বিশেষতঃ আপনার এই অবস্থায়; তা' অবস্থান্তর না ঘটা পর্য্যন্ত না হয় এসব কথা নিয়ে আর কিছু আলোচনা করব না।" বলা বাহুল্য অমিয়া অন্তঃসত্ত্বা ছিল।

বিদেশে আসার পরে আজ সর্ব্বপ্রথম তার মনে হলো আর একটী কথা বলার লোক থাকলে ভাল হতো—অন্ততঃ পক্ষে রাত-দিনের একটী ঝি। সন্ধ্যার তরল অন্ধকারে বাড়ীর ভেতরে ঢুকতে তার অন্যদিনের মত সাহস হলো না—তবুও সে দৃঢ়পদে ভিতরে ঢুকেই বারান্দার 'পেট্রোম্যাক্স'টা খুব উজ্জ্বল করে দিলো।

*

সন্ধ্যার একটু পরে। অমিয়ার মনে ঠিক ভয় না হলেও একটা অস্বস্তির ভাব এসেছিল। অন্যমনস্ক হওয়ার জন্য সে "বলাকা" নিয়ে মৃদুস্বরে পড়তে আরম্ভ করে দিলে। পড়তে পড়তে কখন যে তার মধ্যে ডুবে গিয়েছে! এর মধ্যেই বিশ্বেন্দু বেড়িয়ে ফিরলো। ঘরে ঢুকে জামা খুলতে, সেই সামান্য শব্দটুকুতেই অমিয়া চমকে উঠে তাকে দেখে একটু হাসল। তাই দেখে বিশ্বেন্দু বল্লে, "চম্‌কে উঠলে যে আমাকে দেখে ভয় পেলে না কি?"

হাতের বইটা দিয়ে তার গায়ে মৃদু আঘাত করে অমিয়া তার উত্তর দিলে। মেঝেয় পাতা মাদুরের ওপর লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ে বিশ্বেন্দু বল্‌লে "তোমার শরীর ঠিক আছে তো? দেখো—একটু বেগতিক কিছু বুঝলেই আমাকে বলো।"

বইটা বন্ধ করে রেখে অমিয়া সরে এসে স্বামীর পরিপাটী-করা আঁচড়ানো চুলের মধ্যে আঙুল চালাতে চালাতে বললে, "ভালই তো আছি। তুমি অত ভয় পেও না

স্নিগ্ধ চোখে চেয়ে বিশ্বেন্দু বললে, "ভয় নয় ঠিক—একটা উদ্বেগ হয়েছে—তুমি চলে গেলেই পারতে তোমার মা'র কাছে।"

ঠোঁটটা উল্‌টিয়ে অমিয়া বললে, "আহা! তাতেই যেন ভাল হতো খুব! আমি তোমাকে না দেখে একটুও থাকতে পারতাম না—মন খারাপ হতো! সে বুঝি খুব ভাল হতো!"

বিশ্বেন্দু একটু হেসে বললে, "আর তোমাকে ছেড়ে আমিই বুঝি খুব আরামে থাকি? এই বুঝি বুদ্ধি তোমার? তা নয়—কষ্ট আমার যতই হোক, তোমার কল্যাণের জন্য তোমাকে ছাড়তেই হবে।"

"আমার আবার কল্যাণ কি? তোমার কল্যাণেই আমার কল্যাণ।"

"হ্যাঁ, তা বটে। কিন্তু এ ক্ষেত্রে তা নয়। তোমার মাঝে আমার যে স্বপ্ন, যে আশা অঙ্কুরিত হয়ে আছে, তার জন্য আমার মনে মনে কি ভয়, কি সতর্কতা জাগে, তুমি তা কি বুঝবে বলো? আমি কি স্বপ্ন দেখি জানো? রামকৃষ্ণ, চিত্তরঞ্জন, বিবেকানন্দ, নিউটন, গ্যারিবল্ডী প্রমুখ যে সব মহামানব জন্মিয়ে পৃথিবীকে তাঁদের অজস্র দানে সমৃদ্ধ করে গিয়েছেন, ধর্ম্মে, জ্ঞানে, আদর্শে, সমপ্রাণতায় যাঁদের তুলনা হয় না, সেই রকম কোন শিশু মহামানব হয় তো আমারও আশা পূর্ণ করতে, আমার সোনার স্বপ্নে রূপ দিতে অপেক্ষা করছে! কে বলতে পারে যে আমার এই স্বপ্ন কালে সত্যি হয়ে উঠবে না?" বিশ্বেন্দুর চোখ দুটী অন্ধকারে জ্বলে উঠে আবার স্নিগ্ধ হয়ে এলো। ব্যাপারটা লঘু করে দেওয়ার ইচ্ছায় অমিয়া বললে, "বাব্বা! সময়ে সময়ে তুমি এমন 'সিরিয়স্' হয়ে ওঠো যে তখন আমার সত্যিই ভয় করে তোমাকে।"

হাত বাড়িয়ে তাকে কাছে টেনে নিয়ে বিশ্বেন্দু বললে, "ভয় করে? কিন্তু আশা যে কুহকিনী।"

ধীর স্বরে অমিয়া বললে, "কিন্তু তুমি যে বড় বেশী আশা করছ! আশা ভঙ্গের ব্যথাও যে দারুণ!"

"বেশী আশা করছি? তা' হবে! কিন্তু আর নয়—কথায় কথায় রাত বাড়ছে, চলো খেতে দেবে।"

রাতের আঁধারে। স্বামীর সন্ধ্যাবেলাকার কথাগুলি হেসে উড়িয়ে দিলেও, অনাগত সন্তান নিয়ে তারও স্বপ্ন দেখায় শেষ ছিল না। কল্পনায়, সে তার শিশুটীকে নিয়ে কত স্বপ্নের জাল বুনতো। আশা ও আশঙ্কা দিয়েই ভগবান্ মায়ের মন গড়ে দেন—অমিয়ার মনেও এর অভাব ছিল না। রাত্রে তার প্রায়ই ঘুম হয় না, বিছানায় শুয়ে যখন আর ভাল লাগে না, তখন সে লঘুপায়ে এসে খোলা জানালার সামনে দাঁড়ালো। জানালার মধ্য দিয়ে যে এক টুকরা তারাভরা আকাশ দেখা যাচ্ছিল, তারই পানে চেয়ে চেয়ে হাত দুটী জোড় করে সে অদৃশ্য কুল-দেবতার কাছে গর্ভস্থ সন্তানের মঙ্গল কামনা করলে। আলো-ছায়ায় ভরা ঘরখানা তার কাছে মায়াপুরী বলে মনে হলো। ফিরে এসে তরল অন্ধকারের

মধ্যে স্বামীর প্রিয় মুখখানা ভাল করে দেখে সে আবার জানালার ধারে গিয়ে দাঁড়ালো। বিশ্বেন্দু ঘুমের ঘোরে কি যেন বলে উঠলো।

অমিয়ার তখন সে দিকে খেয়াল ছিল না—বাইরের জ্যোৎস্না ঘরের ভিতরে এসে লুটিয়ে পড়েছে—সে সেই দিকে অন্যমনে চেয়ে ছিল। ধীরে একখানা কালো মেঘ হিংস্র জন্তুর মত ঝাঁপিয়ে পড়ে চাঁদটাকে গ্রাস করলো। আবছা অন্ধকারে দাঁড়িয়ে চেয়ে থাকতে থাকতে অমিয়ার মনে হলো আকাশের কালো মেঘটা মানুষের মূর্ত্তি ধরে এসে তাঁর একেবারে সামনে দাঁড়িয়েছে। কি বিরাট, কি বিশাল সে মূর্ত্তি! মাথা যে কোথায় তা দেখতে গিয়ে তার মাথাটা ঘুরে উঠলো—পলকের জন্য চোখ মেলে চেয়ে সে দেখলো মূর্ত্তিটা তার সুদীর্ঘ হাত দুখানা তার দিকে কেবলই বাড়িয়ে দিচ্ছে। প্রাণপণ চীৎকারে সে স্বামীকে ডাকতে গেল—কিন্তু গলা দিয়ে একটু অস্ফুট শব্দ ছাড়া আর কিছুই বের হলো না, পর মুহূর্ত্তেই সে জ্ঞান হারিয়ে মাটীতে পড়ে গেল। সমস্ত শরীর তার তখন ঘামে ভিজে গিয়েছে।

পড়ে যাওয়ার শব্দে বিশ্বেন্দুর সতর্ক ঘুম ভেঙে গেল। বিছানায় অমিয়াকে না পেয়ে টর্চটা জেলে সে বিছানা ছেড়ে বাইরে এলো। দেখলে মেজের ওপরে অমিয়া মরার মত পড়ে আছে।

যথা কর্ত্তব্য করতে দেরী না হলেও, তার হাত পা অভ্যাস বশে কাজ করে যাচ্ছিল। ইনজেক্‌সান ও শুশ্রূষার গুণে সকাল বেলায় অমিয়া চোখ মেললো। তার কাছে সব শুনে বিশ্বেন্দু বললে, "ঠিক্—তোমাকে একেবারে একলা রাখা আমার ভুল, অন্যায় হয়েছে। সে অন্যায়ের শাস্তি আমাকে মাথা পেতে নিতেই হবে। ম্যানেজার বাবু তো আমাকে প্রথম দিনেই বলেছিলেন যে, এ রকম হতে পারে!"

বিবর্ণ পাংশুমুখে অমিয়া বললে, "আমাকেও যে ম্যানেজার-গিন্নি সাবধানে চলা-ফেরা করতে বলেছিলেন—কিন্তু ভয় তো আমি পাই নি—জানালা ছেড়ে আসতে গিয়ে—"

তার মাথায় ধীরে ধীরে হাত বুলোতে বুলোতে বিশ্বেন্দু বললে, "আর কথা বলো না—তোমার কষ্ট হবে - একটু ঘুমোও।"

"কি জানি কি হলো! আমার মাথার ভেতর সব গোলমাল হয়ে যাচ্ছে, বড় যন্ত্রণা হচ্ছে ঘুমিয়ে পড়ি?"

"হ্যাঁ পড়ো। ঘুমোলে অনেকটা আরাম পাবে।" দরজার কাছে ম্যানেজার-গিন্নিকে দেখা গেল। বিশ্বেন্দুকে উদ্দেশ করে তিনি বললেন, "ডাক্তার বাবু, আমার ঠাকুর আপনার ভাত দিয়ে যাবে। আপনি এইবেলা আপনার "ডিউটী" সেরে আসুন। আমি ততক্ষণ আছি।" বহু সন্তানের জননী তিনি, অমিয়াকে দেখে বুঝতে পেরেছিলেন যে, পড়ে গিয়ে আঘাত লাগার ফলে অসময়ে তার সন্তান নষ্ট হয়ে যাবেই। সমবেদনায় তাঁর মন ভরে উঠলো।

৩৪ দিন সমানে কষ্টভোগ করে অমিয়া তার শারীরিক যন্ত্রণা থেকে মুক্তি লাভ করলে বটে, কিন্তু মানসিক বিক্ষোভের ফলে সে নির্জ্জীব হয়ে রইলো।

মেয়েদের মনে নীড় বাঁধার প্রবৃত্তি সহজাত; এই নীড় বাঁধার আনন্দে তারা নিজের বলতে যা কিছু সবই উৎসর্গ করে দেয়।

*

ক'দিন অবিশ্রান্ত বৃষ্টি হবার পরে আকাশ ভেঙে আলোর বন্যা নেমেছে। দুপুরে করার মত কোনো কাজ না পেয়ে অমিয়া সন্তর্পণে, চোরের মত একটা ট্রাঙ্ক খুলে বসলো। ট্রাঙ্কের ভিতরে অনাগত সন্তানের জন্য সে তিলে তিলে কি কিছু না সঞ্চয় করে রেখেছে! কাঁথা, জামা, ঝাড়ন, তোয়ালে, সাবান, পাউডার, মাথার ব্রাস, এমন কি একখানা কাজল-লতা পর্য্যন্ত! থাকে থাকে সেগুলি সাজানো—সবগুলি নেড়ে চেড়ে অমিয়া আবার সেগুলি গুছিয়ে রাখলো। অন্যমনা হয়ে সে ভাবতে লাগলো যে শিশু-দেবতার অভ্যর্থনার জন্য সে প্রস্তুত হয়েই ছিলো, কেন তার আবির্ভাব তার জীবনে ঘটলো না? কি অপরাধ হলো? তার স্বপ্ন কেন এমন অসময়ে ভেঙে গেল? অমিয়া ভাবে—থেই পায় না। অজ্ঞাতে চোখের কোল জলে ভরে উঠলো।

পা টিপে টিপে বিশ্বেন্দু ঘরে ঢুকলো—এখন সে এম্‌নি করেই আসে। অমিয়ার এই নিস্তব্ধ ধ্যানমগ্না মূর্ত্তি দেখে তার যেন বড়ই মায়া হলো—ধীরে সে এসে তার দুই কাঁধে হাত দিয়ে বল্‌লে, "কি ভাবছ এত? আমার দিকে চাও তো!" মাথাটা ঘুরিয়ে অমিয়া তার দিকেই চাইলো—অবাধ্য অশ্রু ফোঁটায় ফোঁটায় ঝরে পড়লো।

সযত্নে সেগুলি মুছিয়ে দিয়ে তার ভিজে চোখের ওপরে একে একে চুমু দিয়ে কাণে কাণে বল্‌লে "শোনো, ও রকম মন খারাপ করে থাকে না, আমি তোমাকেই চাই—তোমাকে যে ফিরে পেয়েছি সেই ঢের—আমার অন্য ভাবনা নাই, বুঝলে? বলো, অমন মন খারাপ করে থাক্‌বে না?"

বিষাদভরা সুরে অমিয়া বল্‌লে "শুধু আমাকে নিয়ে তুমি কি করবে? আমি তো তোমার স্বপ্ন পূর্ণ করতে পার্‌লাম না! ভেঙে গেল যে।" "স্বপ্ন কি আমি একাই দেখেছি? তোমার ও তো ভেঙে গেল!" ব্যাস্ কথা ফুরিয়ে গেল। কে কাকে বুঝাবে! দুজনের মনে একই ব্যথার যে তন্ত্রী কেঁপে কেঁপে উঠছে, তা প্রকাশের ভাষা নাই।

বাইরের চোখ-ঝল্‌সানো রোদের দিকে চেয়ে দু'জনেই অন্যমনা হয়ে গেল।

বাঙ্গলার জাতীয় জীবনে শ্রীচৈতন্যদেবের প্রভাব

[পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর]

—শ্রীবীরেন্দ্রমোহন আচার্য্য

মহাপ্রভুর অলৌকিক প্রেমধর্ম্ম-সাধনা বাঙ্গলার সাহিত্য ও সংস্কৃতিকে যে কতখানি সার্থক করিয়া তুলিয়াছিল, পূর্ব্ব প্রবন্ধে তাহার কিছু কিছু আভাষ দিবার চেষ্টা করিয়াছি। বাঙ্গালীর বৃহত্তর কর্ম্মক্ষেত্রে বৃহত্তর বঙ্গের প্রতিষ্ঠায় বা ধর্ম্ম, জ্ঞান, বিজ্ঞান ও ললিতকলার দিক দিয়া এই গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের দানের কথা ছাড়িয়া দিলেও তাৎকালিক কঠোর সমাজবন্ধন-প্রপীড়িত জনগণের উপরে এই নবধর্ম্ম যে কতকগুলি শক্তিপ্রলেপ প্রদান করিয়াছিল আজ তাহা নূতন করিয়া চিন্তা করিবার সময় আসিয়াছে। সমাজ রক্ষার জন্যই সামাজিক অনুশাসন। কোন অতীত যুগে বৌদ্ধ বা মুসলমান-সংস্কৃতির বিপ্লব হইতে সমাজকে রক্ষা করিবার জন্যই হয় ত হিন্দুসমাজের চারিদিকে এমনি করিয়া কঠোর অনুশাসনের প্রাচীর দেওয়া হইয়াছিল। কিন্তু প্রয়োজন ফুরাইলেও তাহার দারুণ বন্ধন শিথিল হইল না। বৃহৎ সমাজ সম্প্রদায়গত ও শ্রেণীগত ভাবে বহুতর ক্ষুদ্রখণ্ডে বিভক্ত হইয়া আপনাকে পঙ্গু করিয়া তুলিল। সামাজিক উচ্চ-নীচ ভেদবুদ্ধি শুধু মানুষে মানুষে বিভেদ সৃষ্টি করিল তাহা নহে, জাতীয় জীবনীশক্তির ধারাকেও ক্রমশঃ শীর্ণ করিয়া তুলিতে লাগিল। অহেতুক কঠোর অনুশাসন ও অর্থহীন বিচারের নিষ্করুণ বিধান হিন্দুসমাজকে তখন যে কি ভয়ানক আত্মঘাতী করিয়া তুলিয়াছিল, তাহা পঞ্চদশ শতকের বঙ্গীয় সামাজিক ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলেই জানা যায়।

এমনি করিয়া এই প্রচণ্ড আত্মহত্যার সাধনায় উন্মত্তের মত মাতিয়া থাকিলে এতদিনে হয়ত 'বাঙ্গলার হিন্দু' কথাটা অতীত ইতিহাসের কাহিনীতে পর্য্যবসিত হইয়া যাইত। কিন্তু যথাসময়ে মহাপ্রভুর প্রেমধর্ম্ম-প্রবাহ বাঙ্গলার সমাজ জীবনের এই মরা গাঙ্গে বাণ ডাকাইল। কঠোর জাতিভেদের শতধা বিভক্ত গণ্ডী শিথিল করিয়া তাঁহার এই প্রেমের ধর্ম্ম ভালবাসার ধর্ম্ম অধঃপতিত বিশৃঙ্খল হিন্দুসমাজকে আসন্ন মৃত্যুমুখ হইতে রক্ষা করিল। হিন্দুসমাজের অবহেলিত ঘৃণিত পতিত জনগণ বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রসারিত আলিঙ্গনের মধ্যে আসিয়া ধন্য হইল।

বৈষ্ণবাচার্য্যগণ ব্রাহ্মণ্যশাসনের চিরাচরিত বিধি শিথিল করিয়া সমাজের উচ্চ-নীচ, ব্রাহ্মণ-শূদ্র, সকলকেই সমভাবে আহ্বান করিয়া সমাজে সম্মানজনক স্থান দিলেন। "হরিনামে যার চক্ষে বহে অশ্রুধারা, সেইজন হয় মোর নয়নের তারা" এই প্রচণ্ড নামশক্তি-বিশ্বাসী বৈষ্ণবগণ তৎকালিক সমাজে যে কি প্রচণ্ড বিপ্লব আনয়ন করিয়াছিলেন, আজ তাহা অনুমান করা সহজ হইবে না। পূজা-অর্চ্চনা, ব্রত-উপবাস প্রভৃতি ধর্ম্মের একমাত্র অনুষ্ঠান হইয়া পড়ায় হিন্দুধর্ম্ম ক্রমশই যেন আন্তরিকতাহীনা বাহ্যিক আচার-অনুষ্ঠান সম্বলিত বাহিরের জিনিষ হইয়া পড়িতেছিল। এমনি সময়ে শুভ মুহূর্ত্তে বৈষ্ণবের প্রেমধর্ম্ম আবির্ভূত হওয়ায় বাহ্যিক অনুষ্ঠান অপেক্ষা আন্তরিক অনুভূতির শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন হইয়া ধর্ম্ম আবার অন্তরের ধন হইয়া উঠিল।

> ম্লেচ্ছ পাষণ্ড আদি প্রেমের বন্যায়
> ডুবিয়া সকল লোক হাসে নাচে গায়।
> পশু পক্ষী ব্যাঘ্র মৃগ জলচর গণে,
> হাসে কাঁদে নাচে গায় করয়ে ক্রন্দনে।
> স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল ডুবিল গোরা-প্রেমে,
> বঞ্চিত হইল একা দাস বলরামে।

এই বিপুল প্রেমের বন্যায় সমাজের যা কিছু কৃত্রিমতা, যা কিছু আন্তরিকতাহীন বাহ্যিক অনুষ্ঠানের কঠিন নিগড় সমস্তই ভাসিয়া গেল, শত অশ্বমেধ অপেক্ষা এক ফোঁটা প্রেমাশ্রুর মূল্য যে কত বেশী, মানুষ আবার তাহা নূতন করিয়া ভাবিয়া দেখিবার অবকাশ পাইল।

সমাজে যাহারা পতিত, ঘৃণিত, অস্পৃশ্য, পতিতপাবন মহাপ্রভু এমনি করিয়া তাহাদের অন্তরের সুপ্ত চেতনাকে উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলিলেন। ভগবানের মধুর বংশীরব জাতির

বাধা, সমাজের বাধা, মানের বাধা, অর্থের বাধা সকল তুচ্ছ করিয়া সাড়া দেয় অন্তরে। সেই অমোঘ আহ্বান যে একবার অন্তর দিয়া গ্রহণ করিতে পারিয়াছে, কোন লৌকিক গণ্ডীই তাহাকে আর বাঁধিয়া ছোট করিয়া রাখিতে পারে না।

দারুণ মুরলী-স্বর না মানে আপন পর
মরম ভেদিয়া যার থাকে।
দ্বিজ চণ্ডীদাসে কয় তনু মন তার নয়—
যোগিনী হইবে সেই পাকে।

অবসাদগ্রস্ত পঙ্গু ও নির্য্যাতিত অস্পৃশ্যগণের সুপ্ত অন্তরে মহাপ্রভুর এই প্রেমের বাঁশরী বড় গভীর ভাবেই বাজিল। বঞ্চিত জন যেন নবজীবনের আস্বাদ পাইয়া কাঁদিয়া কহিল—

যদি গৌরাঙ্গ না হত কি মনে হইত
কেমনে ধরিতাম দে'
এমন মহিমা প্রেমরস সীমা
জগতে জানত কে?
গাও পুনঃ পুনঃ গৌরাঙ্গের গুণ
সরল হইলা মন,
এ' ভবসাগরে এমন দয়াল
না দেখিয়ে একজন।
গৌরাঙ্গ বলিয়া না গেল গলিয়া
কেমনে ধরিনু দে'
পাষুর হিয়া পাষাণ দিয়া
কেমনে গড়িয়াছে।

এমিতর ব্যাকুল হইয়াই অবহেলিত পতিত জন গৌরাঙ্গের প্রেম-ধর্মকে ভালবাসিয়াছিল। ব্রাহ্মণগণই এতাবৎকাল ধর্ম্ম ও সমাজজীবনে একচ্ছত্র প্রভুত্ব করিতেছিলেন, নবধর্ম্মের অভ্যুদয়ে প্রচারিত হইল, যে ভক্ত সেই পূজ্য। ভগবান্ প্রেমের ভিখারী। আমাদের অন্তরের সত্যকার প্রেম ও অনুভূতির লোভে যুগে যুগে তিনিও অবিশ্বাসের আঁধার ও লোকাচার-কণ্টকিত পথ তুচ্ছ করিয়া অভিসারে বাহির হন। শিখাসূত্রের সৌষ্ঠব বা সামাজিক প্রাধান্য সেই অন্তর্যামী শ্রীভগবানের দুয়ারে পৌঁছিয়া দিবার সহায়ক হইবে না, যদি না, প্রেমের রসে চিত্ত মজিয়া থাকে। যমুনায় যাহার উজান বহিল, ব্রজেন্দ্রনন্দনের বাঁশরী সেই শুনিয়াছে, হোক সে ব্রাহ্মণ, হোক সে চণ্ডাল, স্পৃশ্য বা অস্পৃশ্য।

"চণ্ডীদাসে কয় কানুর পীরিতি জাতি-কুলশীল ছাড়া—" তাই বৈষ্ণবাচার্য্যগণ নূতন সঞ্জীবনী মন্ত্র রচনা করিয়া কহিলেন—'চণ্ডালোঽপি দ্বিজশ্রেষ্ঠঃ হরিভক্তিপরায়ণঃ'। ভক্ত যদি চণ্ডালও হয় তথাপি ভক্তিহীন ব্রাহ্মণ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ। ইহার পর আবার যখন ব্রাহ্মণেতর জাতি দীক্ষাগুরুর আসনে বসিয়া উচ্চবর্ণকেও মন্ত্র দিতে আরম্ভ করিলেন, তখন দেশের মধ্যে চিরাচরিত শুষ্ক লোকাচারের মূলে কুঠারাঘাত হইল। ভুঁইমালী ঝড়ু ঠাকুর বৈষ্ণব হইয়া সকলের পূজ্য হইয়া উঠিলেন। নরোত্তমঠাকুর কায়স্থ, তাঁহার নিকটে অদ্বিতীয় পণ্ডিত গঙ্গানারায়ণ চক্রবর্ত্তী, বলরাম মিশ্র প্রভৃতি দেশপূজ্য পণ্ডিতগণ দীক্ষা গ্রহণ করিলেন। রুইদাস মুচি, মুরারী ব্রাহ্মণ চামার, হরিদাস যবন বৈষ্ণবাচার্য্য বলিয়া সমাজে সম্মানিত হইলেন। ব্রাহ্মণেতর বৈষ্ণব সাধকগণ আচার্য্য, গোস্বামী, ঠাকুর প্রভৃতি উপাধিতে এবং ভক্তগোষ্ঠী বিনয়বশতঃ ব্রাহ্মণ-শূদ্র নির্ব্বিশেষে দাস পদবীতে পরিচিত হইতে লাগিলেন। এমনি ভাবে সেই যুগে জাতিভেদের কঠোর বন্ধন ছিন্ন করিয়া 'হরিজন-সমস্যার' সার্থক সমাধান হইয়াছিল।

জাতিভেদের সমস্যা হিন্দুসমাজে আজ বড় কঠিন হইয়াই দেখা দিয়াছে। রাজনৈতিক ধুরন্ধরেরা রাষ্ট্রসভায় আইন করিয়া ভোটসংখ্যার অনুপাত লইয়া বর্ত্তমানে দেশময় যে তাণ্ডব নৃত্য করিয়া বেড়াইতেছেন, জানি না, সত্যকার হরিজন সমস্যার সমাধান ইহাতে কতটা হইবে। জোর করিয়া রাষ্ট্রীয় অধিকার সংগ্রহের উৎসাহে সমাজের মধ্যে শ্রেণীগত স্বার্থ লইয়া আজ পরস্পরের ঈর্ষ্যা-কোলাহলের অন্ত নাই। কিন্তু এই জিনিষটাই সাড়ে চার শত বৎসর পূর্ব্বে আপনা হইতেই কত সুন্দর ভাবে সুসম্পন্ন হইয়াছিল, সমাজ-সংস্কারকদের আজ তাহা নূতন করিয়া ভাবিয়া দেখিবার সময় আসিয়াছে।

গজেন্দ্র-গমনে নিতাই চলয়ে মন্থরে।
যারে দেখে তারে ভাসায় প্রেমের পাথারে।
পতিত দুর্গত পাপীর ঘরে ঘরে গিয়া।
ব্রহ্মার দুর্লভ প্রেম দিছেন যাচিয়া।
যে না লয় তারে কয় দন্তে তৃণ ধরি।
আমারে কিনিয়া লও বোল গৌর হরি।
শুনিয়া কান্দয়ে পাপী চরণে ধরিয়া।
পুলকে পুরল অঙ্গ গরগর হিয়া।
তারে কোলে করি নিতাই যায় আনধায়।
হেন মতে প্রেমে ভাসাইল পুরগ্রাম।

ঐতিহাসিকগণ জানেন, বাঙ্গলাদেশ এককালে বৌদ্ধধর্ম্মে প্লাবিত হইয়া গিয়াছিল। বৈদিক হিন্দুধর্ম্মের বিধি-নিষেধ, আচার-ব্যবহার তখন যথাযথ ভাবে রক্ষিত হইবার উপায় ছিল না। ভারতের বৈদিকধর্ম্মীরাও এই সময়টায় বাঙ্গলাকে বড় সুনজরে দেখেন নাই। শুধু তীর্থদর্শন ছাড়া বৌদ্ধ-প্লাবিত অঙ্গ, বঙ্গ প্রভৃতি দেশে গমনাগমন প্রতিরোধ-কল্পে তাঁহাদের শাস্ত্রবাক্যে নিষেধ রচনা করিতে হইয়াছিল।

"অঙ্গ-বঙ্গ-কলিঙ্গেষু সৌরাষ্ট্রমগধে তথা।
তীর্থযাত্রাং বিনা গত্বা পুনঃ সংস্কারমাচরেৎ।

তারপর রাষ্ট্র-বিপর্য্যয়ের ফলে এই দেশ হইতে বৌদ্ধধর্ম্ম ক্রমশঃ অপসারিত হইয়া যাইবার পর হিন্দু-রাজন্যবর্গের পৃষ্ঠ-পোষকতায় দেশময় হিন্দুধর্ম্ম পুনরভ্যুদয়ের প্রবল প্রতিক্রিয়া সুরু হয়। এই সময়েই বৌদ্ধ ও হিন্দুধর্ম্মের মিলিত প্রভাবে পড়িয়া দেখিতে দেখিতে দেশ বিকৃত বৌদ্ধ-তান্ত্রিকতায় পূর্ণ হইয়া উঠিল। এতকালকার অভ্যস্ত বৌদ্ধ রীতি-নীতি ও ভজন-সাধনের প্রথা অনেক ক্ষেত্রে হিন্দুতান্ত্রিকতার আবরণ পরিয়া উপস্থিত হইল। কোথাও বা কেহ কেহ পূর্ব্বাচরিত পথে চলিয়া সমাজ-বহিষ্কৃত হইয়া রহিল। চৈতন্য-ভাগবতে বৃন্দাবন দাস প্রাক্-চৈতন্যযুগের হিন্দুসমাজের চিত্র আঁকিতে গিয়া লিখিয়াছেন—

কৃষ্ণ নাম ভক্তিশূন্য সকল সংসার।
প্রথম কলিতে হইল ভবিষ্য আচার॥
ধর্ম্ম-কর্ম্ম লোক সব এইমাত্র জানে।
মঙ্গলচণ্ডীর গীত করে জাগরণে॥
দম্ভ করি বিষহরি পূজে কোনজন।
পুত্তলি করয়ে কেহ দিয়া বহু ধন॥
বাসলি পূজয়ে কেহ নানা উপহারে।
মদ্যমাংস দিয়া কেহ যক্ষ পূজা করে॥

এমনি করিয়া ধর্ম্মহীনতা ও যথেচ্ছাচারিতা সমাজের একটা বৃহত্তর অংশকে বিষাক্ত করিয়া তুলিল। পুনরভ্যুদয়ের প্রবল উৎসাহে হিন্দুর সমাজ-সংস্কারকেরা এই সময়ে সমাজের বিশুদ্ধি রক্ষায় বদ্ধপরিকর হইয়া দেশব্যাপী এই অসংখ্য আচারভ্রষ্ট জনসাধারণকে দূরে সরাইয়া দিলেন। সমাজে কোন সম্মানজনক স্থান ত তাহারা পাইলই না, পরন্তু, তাহাদের উপর প্রচুর অত্যাচার ও লাঞ্ছনা বর্ষিত হইতে লাগিল। আচারভ্রষ্ট ধর্ম্মভ্রষ্ট শত-সহস্র মুণ্ডিত-শীর্ষ বৌদ্ধ ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীর তখন সমাজে নিরালম্ব নিরাশ্রয় অবস্থা। নবগঠিত সমাজবিধির মধ্যে কোন সম্মানজনক স্থান না পাওয়ায় ইস্লামধর্ম্মের অভ্যুদয়ে তাহারা দলে দলে রাজধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল। হিন্দুদের উপর কোন প্রকার অত্যাচার হইলে, তখন এই দুর্ব্বল উৎপীড়িত জনসাধারণ দূর হইতে কেমন আনন্দে তাহা উপভোগ করিত, প্রাচীন সাহিত্যের স্থানে স্থানে তাহার নিদর্শন রহিয়া গিয়াছে। এই সময়ে একটু সহানুভূতিসম্পন্ন সস্নেহ আলিঙ্গন প্রসারিত করিয়া দিলে যে সমস্যার সহজেই মীমাংসা হইয়া যাইত, তাহাই আজ বাঙ্গলার অগ্রগতির পথ এমন কণ্টকাকীর্ণ করিয়া তুলিয়াছে। মহাপ্রভু-প্রবর্ত্তিত বৈষ্ণবধর্ম্মে এই সমস্যার অনেকখানি সমাধান হয়। উচ্চ-নীচ, স্পৃশ্য-অস্পৃশ্য নির্ব্বিশেষে তিনি তাঁহার প্রেমালিঙ্গন প্রসারিত করিয়া দিয়াছেন, সামাজিক প্রতিষ্ঠা দিয়াছেন এবং সর্ব্বাপেক্ষা বড় কথা যে, তিনি এই অবহেলিত, পরিত্যক্ত, নিজ্জীব জাতির মধ্যে আত্মসম্মানবোধ ও আত্মোপলব্ধি আনিয়া দিয়াছেন। গঙ্গার পীযুষধারায় অভিষিক্ত হইয়া ষষ্টি সহস্র সগর সন্তান যেমন মন্ত্রবলে সঞ্জীবিত হইয়া উঠিয়াছিল, তেমনি মহাপ্রভুর এই প্রেম-বন্যাধারা ভারতের যেখানে যেখানে প্রবাহিত হইয়া গিয়াছে, সেইখানেই শতসহস্র পতিত দুর্গত মুক্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিয়াছে।

পতিতের গলায় ধরিয়া।
কান্দে পঁহু সকরুণ হৈয়া॥
গদগদ কহে পতিতেরে।
শুনি যাহা পাষাণ বিদরে॥
তো' সভার ধারি বহু ধার।
ধর ধর প্রেমের পসার॥
তো' সভার দুর্গতি নাশিব।
ব্যাজের সহিত প্রেম দিব॥
তারা প্রেমে চাহে মুখচাঁদে।
গলায় ধরিয়া তার কাঁদে।
লহেন করুণা সোঙরিয়া।
বাহু ঘোষ মরয়ে ঝুরিয়া॥

অবাক হইয়া তাঁহারা প্রেমবিগ্রহ মূর্ত্তির পানে চাহিয়া কাঁদিল। বুকে ধরিয়া এমন কথা ত কেহ তাহাদের বলে নাই। তাহারা অস্পৃশ্য, তাহারা হীন, পতিত জাতি, কিন্তু

তাহারাও যে শ্রীভগবানের অখণ্ড প্রেমলীলার সমান অংশীদার —এত বড় আশার বাণী ত কেহ তাহাদের শুনায় নাই। এই আশা-উদ্দীপনার প্রবল উৎসাহে সমাজদেহের পঙ্গু অর্দ্ধাংশের মধ্যে নবজীবনের প্রেরণা আসিয়া গেল।

কথিত আছে, নিত্যানন্দের পুত্র বীরচন্দ্রপ্রমুখ জনকয়েক বৈষ্ণবাচার্য্য বহুসংখ্যক মুণ্ডিত-শীর্ষ বৌদ্ধ-'নাড়া' ও 'নাড়ী'কে বৈষ্ণব ধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়া হিন্দু-সমাজ-গণ্ডীর অন্তর্ভুক্ত করিয়া ল'ন। নব-দীক্ষিতবর্গ হিন্দুর সমাজ-গণ্ডীর মধ্যে আসিল বটে, তবে তাহাদের পূর্ব্বেকার রীতি-নীতি বা চাল-চলনের বিশেষ পরিবর্ত্তন হওয়া সম্ভব হইল না। পূর্ব্বাচরিত বিকৃত বৌদ্ধ-তান্ত্রিক আচরণের সঙ্গে মহাপ্রভুর বৈষ্ণবধর্ম্মের দোহাই দিয়া হিন্দু-সমাজের ভিতরে একটা নূতন স্তরের সৃষ্টি করিয়া ফেলিল। ইহারাই বৈষ্ণব-সমাজের সংযোগী বৈষ্ণব বা 'নেড়া-নেড়ী'। এই 'নেড়া-নেড়ী'র সৃষ্টি বৈষ্ণব-সমাজের বিশুদ্ধতা ও পবিত্রতার মূলে কুঠারাঘাত করিয়াছে বলিয়া অভিযোগ শুনা যায়, কিন্তু বঙ্গীয় হিন্দুর সামাজিক সমস্যা পূরণে ইহা যে কতখানি সাহায্য করিয়াছিল, তাহা বিস্মৃত হইলে চলিবে না।

যাহা হউক, নদীয়ার এই প্রেমিক পাগলটিকে কেন্দ্র করিয়া এমনি ভাবেই বাঙ্গলার জাতীয় জীবনে তীব্র আলোড়ন ঘটিল। মূক বাচাল হইল, পঙ্গু নবজীবন লাভ করিয়া গিরি-লঙ্ঘনের প্রচেষ্টায় ধাবিত হইল। পদব্রজে তিনি যখন সমগ্র উত্তর-ভারত ও দাক্ষিণাত্যের প্রধান তীর্থস্থানগুলিতে পরিভ্রমণ করিয়া তাঁহার অলৌকিক প্রেমধর্ম্ম প্রচার করিয়া বেড়াইয়াছিলেন, তখন যে তাঁহাকে দেখিয়াছে সেই পাগল হইয়াছে। শত শাস্ত্র-ব্যাখ্যায় প্রাণের যে পরম প্রশ্নের উত্তর মিলে নাই, মহাপ্রভুর প্রেমাশ্রুসিক্ত মুখারবিন্দ দেখিয়াই তাহার সমাধান হইয়াছে। সমগ্র দেশ সে সময়ে বৌদ্ধ নিরীশ্বরবাদ ও শঙ্করের অদ্বৈত-ব্রহ্মবাদের জ্ঞানমার্গী শাস্ত্রচর্চ্চায় মুখর। সুতরাং অহৈতুকী পরাভক্তির মত প্রচার ও প্রতিষ্ঠা করিতে গিয়া ভাবাবেগেই যে সর্ব্বত্র কার্য্যসিদ্ধি হয় নাই, তাহা বলাই বাহুল্য। ভারতের দিগ্বিজয়ী বৈদান্তিকগণকে কূট-শাস্ত্র-বিচারে পরাস্ত করিতে হইয়াছে। প্রতিপক্ষের কঠিন যুক্তিজাল অতি অবহেলে ছিন্নভিন্ন করিয়া ভক্তিগদগদ কণ্ঠে প্রেমময়ের নাম করিতে করিতে যখন তিনি আত্মহারা হইয়া পড়িতেন, শুষ্ক জ্ঞানমার্গীর বিতর্কসভা তখন প্রেমধর্ম্মের পুণ্যধারায় উদ্বেলিত হইয়া উঠিত, কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই শাস্ত্র-যুক্তি প্রদর্শনের প্রয়োজন হয় নাই। প্রেমাবিষ্ট দেবমূর্ত্তির দিকে একবার চাহিয়াই তাহারা তাঁহার চরণে বিকাইয়াছে। ভোগী তপস্বী হইয়াছে, দস্যু সাধু হইয়াছে।

পাষাণ সমান হৃদয় কঠিন
সে হেন শুনি গলি' যায়।
পশু পাখী ঝুরে গলয়ে পাথরে
এ দাস লোচন গায়॥

এইরূপে সমগ্র দাক্ষিণাত্য জয় করিয়া, কাশীতে ভক্তি-স্রোত বহাইয়া লুপ্ত বৃন্দাবন উদ্ধার করিয়া, উড়িষ্যায় বাঙ্গলার প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করিয়া সমগ্র ভারতের কৃষ্টির দিক দিয়া কি অপরিসীম কাণ্ড তিনি ঘটাইয়াছিলেন—ভাবিলে সত্যই বিস্মিত হইবার কথা। মহাপ্রভুর এই প্রেমধর্ম্ম জ্ঞাতসারে ও অজ্ঞাতসারে বাঙ্গালীর মর্ম্মস্থানে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া তাহার সংস্কার এবং সভ্যতার রূপদানে কতটা কাজ করিয়াছে, তাহা আজও আলোচিত হয় নাই।

গোরা-গুণ গাও গাও শুনি—
অনেক পুণ্যের ফলে সো পহু মিলাওল
প্রেম-পরশ-রস মণি॥

অখিল জীবের এ শোক সাগর
শোষয়ে নয়ান-নিমিষে।
ও প্রেম-লবলেশ পরশ না পাইলে
পরাণ জুড়াইবে কিসে॥

অরুণ নয়ান বরুণ আলয়
করুণাময় নিরখণে।
মধুর আলাপনে আখরে আখরে—
পাঁজর পাতিয়া লিখনে॥

প্রেমে ঢল ঢল পুলকে পূরল
আপাদ মস্তক তনু—
বাসুদেব কহে সহস্র ধারা বহে
সুমেরু-সিঞ্চিত তনু॥

[ক্রমশঃ

দুলালের স্বপ্ন

—শ্রীরেবতীমোহন সেন

প্রথম পর্ব্ব

"মনু, এখানে আর তোর থাকা হ'তে পারে না, বুঝতেই পার্চ্ছিস্। আমি বলি কি, তোর এই গরীব দাদার তো সংসারে কেউ নেই, তার কুঁড়ে ঘরে বাস করতে যদি বিশেষ কষ্ট হবে ব'লে মনে না করিস্, তাহ'লে চ'লে আয় হরিরাম-পুরে ছেলেমেয়ে নিয়ে—আমি সকল ভার নেবো। পাড়া-গাঁয়ের লোক যে ভাবে মানুষ হয়ে থাকে, ভরসা করি, গরীব হ'লেও আমি সেভাবে তোদের মানুষ করতে পারবো।"

কথাগুলো বল্‌লেন বৃদ্ধ সনাতন রায়—মনোরমার মাস্‌তুতো দাদা। এই ভদ্রলোকের সাংসারিক অবস্থা যেমনই হো'ক, তিনি যে গরীব ছিলেন না এবং খুব হিসেব ক'রে চ'লে বেশ দু'পয়সা জমিয়েছেন, এই রকমের একটা জনরব ছিল। আবার এই কৃপণতার অপবাদ সত্ত্বেও তাঁর খ্যাতি ছিল খাঁটি সজ্জন ব'লে। তিনি ছিলেন বিপত্নীক ও নিঃসন্তান। সামান্য জমা-জমির আয়ের উপর নির্ভর ক'রেই তিনি তাঁর দীন-কুটীরে আজীবন পল্লী-গ্রামে বাস ক'রে আস্‌ছেন। চাষ-আবাদের কাজ দেখে ও অবসরকালে গীতা, রামায়ণ ও পুরাণ, মহাভারতাদি পাঠ ক'রে তাঁর দিন কাটতো। যৌবনের প্রারম্ভে পত্নী-বিয়োগ হ'লেও তিনি দ্বিতীয়বার দার-পরিগ্রহের কল্পনা মনে স্থান দিতে পারেন নি, যদিও এ বিষয়ে উৎসাহ দেবার লোকের কখনো অভাব হয় নি। তিনি বল্‌তেন, বিয়ে একবারই হ'য়ে থাকে, ভগবান যদি তাতে বাদ সাধবেন, সেটা মেনে নিয়েই আজীবন চল্‌তে হবে। কথা ও কাজে তাঁর অমিল প্রায়ই হ'তো না, সুতরাং বিপত্নীক ভাবেই তিনি সারাটা জীবন কাটিয়ে দিলেন। তাঁর একার সংসারের খরচ বাদে যা-কিছু বাঁচতো, সেটা তিনি ভবিষ্যতে কোনও সৎকার্য্যে ব্যয় করবেন, এই রকমের একটা কথা গ্রামবাসীদের মধ্যে প্রচার হ'য়েছিল, কিন্তু সেই সৎকার্য্যটা ভবিষ্যতে কি আকার ধারণ করবে সে সম্বন্ধে—মতভেদ ছিল। আবার কেউ কেউ মনে করতো, সনাতনের টাকা বুঝি বা যক্ষের জন্যই থেকে যাবে।

মনোরমার বিয়ে হ'য়েছিল বেশ ভালো ঘরে, ভালো বরে। স্বামী রামদয়াল ছিলেন কল্‌কাতার একজন সম্ভ্রান্ত ব্যবসায়ীর একমাত্র ছেলে। বিয়ের তিন বছর পর রামদয়াল পিতৃহীন হ'য়ে নিজের হাতে ব্যবসায়ের সমস্ত ভার নিলেন। তাঁর পরিচালনায় ব্যবসায়ে আশাতীত উন্নতি হ'তে লাগলো। পাঁচ বছরের ভিতরে তিনি দু'খানা নতুন বাড়ী তৈরী করতে পারলেন এবং অবশেষে মাণিকতলার পুরাণো বাড়ী ছেড়ে তারই একখানায় বাস করতে লাগলেন।

এই সময়ে হরবিলাস নামে রামদয়ালের এক বাল্যবন্ধু এসে তাঁর সঙ্গে জুটলো এবং কল্‌কাতায় জমি কেনা-বেচার ও ব্যবসায়ের অনেক নূতন নূতন ফন্দীর পরামর্শ দিয়ে তাঁকে হাত করে ফেললো। ফলে, দুই বন্ধুতে মিলে বিস্তর টাকা মূলধন নিয়ে দু'জনে সমান অংশীদার রূপে নতুন ভাবে ব্যবসা আরম্ভ করলো। রামদয়ালের সততা ও ব্যবসা-বুদ্ধি বলে প্রথম বৎসরেই বেশ লাভ দাঁড়ালো। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে এই সময়ে তিনি হঠাৎ খুব পীড়িত হ'য়ে পড়লেন, তখন সমস্ত কাজের ভার পড়লো হরবিলাসের উপর।

রামদয়াল অবশাঙ্গ হ'য়ে শয্যায় প'ড়ে রইলেন কোনো চিকিৎসায়ই কোনো ফল হ'ল না। তিনি যে পুনরায় সুস্থ হ'য়ে ব্যবসায়ের ভার নিতে পারবেন কিংবা তার দেখা-শুনা করতে পারবেন এরূপ সম্ভাবনা রইলো না। দীর্ঘ তিন বৎসর ব্যাপী অসুখের সুযোগে হরবিলাস বিশ্বাসঘাতকতা ক'রে রামদয়ালের সর্ব্বস্ব আত্মসাৎ করবার ব্যবস্থা করলো। ব্যবসায়ে প্রকৃত-প্রস্তাবে লোকসান না হ'লেও কৃত্রিম হিসাব-পত্র প্রস্তুত ক'রে তাতে লোকসানের অঙ্ক বেশ বড় ক'রে দেখাতে—হরবিলাসের বিবেকে মোটেই আঘাত লাগলো না। এই লোকসানের জের মিটাতে গিয়ে রামদয়ালের যথাসর্ব্বস্ব হরবিলাসের হস্তগত হ'ল। রামদয়াল এই দারুণ আঘাত সইতে পারলেন না—এক দিন হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হ'য়ে হঠাৎ তাঁর প্রাণ-বিয়োগ হ'ল। তাঁর স্ত্রী মনোরমা সাত বৎসরবয়স্ক পুত্র দুলাল ও তিনবৎসর বয়স্কা কন্যা

মন্দিরাকে নিয়ে একেবারে পথের কাঙালিনী হ'লেন। এরূপ আকস্মিক অবস্থা-বিপর্য্যয়ে মনোরমা একেবারে মুসড়িয়ে পড়লেন। নিজের ও সন্তান দু'টির গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা দূরের কথা, তাঁদের মাথা রাখবার স্থানটুকু পর্য্যন্ত আর নেই! হরবিলাস অবশ্যি তাঁকে তখনও বাড়ী ছেড়ে যেতে বলে নি, বাড়ী যে ভাড়া দেওয়া হবে এবং সেজন্য শীগ্‌গিরই তার সংস্কার কার্য্য আরম্ভ করা হবে, এরূপ ইঙ্গিত দিতে ত্রুটী করে নি। মনোরমার শ্বশুরকুলে কিংবা পিত্রালয়ে এমন কেউ ছিলেন না যাঁর আশ্রয়ে ও সাহায্যে অদৃষ্ট-লাঞ্ছিত এই দুঃস্থ পরিবার এখন বাস করতে পারে।

কিছু গহনা বিক্রী ক'রে মনোরমা তাঁর স্বামীর শ্রাদ্ধানুষ্ঠান কোনরূপে সম্পন্ন করলেন। হরবিলাস এই কার্য্যে সাহায্যার্থ মনোরমাকে পাঁচশো টাকা দিতে এসেছিল কিন্তু মনোরমা এই দান কিছুতেই গ্রহণ করলেন না।

মনোরমার বিপদের সংবাদ হরিরামপুরেও পৌঁছেছিল। বৃদ্ধ সনাতন রায় লোকমুখে এই সংবাদ শুনতে পেয়েই কল্‌কাতায় এসে মনোরমার সঙ্গে দেখা করলেন। সাত বছর আগে দুলালের জন্মের পর তাকে আশীর্ব্বাদ করবার জন্য সেই যে একবার এসেছিলেন, তার পর বড়লোক-গৃহিণী এই মাসতুতো বোনের আর কোনো সংবাদ তিনি নেন নি। বস্তুতঃ নিকট সম্পর্কিত হ'লেও বড় লোকের কাছে ঘেঁসতে সনাতনের মন চাইতো না, বিশেষতঃ কল্‌কাতার ন্যায় বিরাট নগরের অতিরিক্ত কর্ম্ম-ব্যস্ততার আবহাওয়ায় তিনি যেন হাঁফিয়ে পড়তেন। তাঁর কাছে পল্লী-গ্রামের আড়ম্বরহীন সাদাসিদে জীবন ও প্রকৃতির শান্ত-স্নিগ্ধ শ্যামল মূর্ত্তিই বেশী ভালো লাগতো। তবুও মনোরমার বিপদের কথা জানতে পেয়ে—মনোরমা নিজে তাঁকে কিছু না জানা'লেও—তিনি ঘরে স্থির থাকতে পারলেন না। তিনি এসে তাঁকে নিজের কাছে নিয়ে যাবার জন্য নিজে থেকেই প্রস্তাব করলেন। তাঁর এই প্রস্তাব শুনে মনোরমার চোখ জলে পরিপূর্ণ হ'ল। তিনি উত্তর করলেন :—

"সনাতন দা, তোমার প্রাণটা যে অতো বড় তা জানতাম না। তিনি কতো লোকের উপকার ক'রেছেন, কতো লোককে কতো ভাবে সাহায্য ক'রেছেন, কিন্তু কৈ, আজ তো তাদের কেউ এসে একটিবার খোঁজ পর্য্যন্ত করলে না, একটা সান্ত্বনার কথা বললে না,—এলে কিনা তুমি, যে কোনোদিন এখান থেকে কিছু পায়নি কিংবা পাবার প্রত্যাশাও করেনি! হাঁ দাদা, তোমার বাড়ীতেই যাবো, কিন্তু সনাতন দা, তোমার খুব অসুবিধে হবে না তো?"

"বলিস্ কিরে, আমার আবার অসুবিধে কিসের? তোদেরই হবে কষ্ট পাড়াগাঁয়ে থাকতে। তবে কি জানিস্, খাঁটি দুধ-ঘি যা তোরা কল্‌কাতায় খুঁজে পাস্ না,—তা পাবি পাড়াগাঁয়ে প্রচুর পরিমাণে। সামনের হপ্তায় একটা ভালো দিন দেখে তোদের নিয়ে যাবো'খন—তৈরি থাকিস্।"

সনাতনের প্রস্তাব মতেই কাজ হ'ল। শিশু পুত্র-কন্যা নিয়ে মনোরমা তাঁর গৃহে এসে আশ্রয় নিলেন। সনাতনের সুব্যবস্থায় মনোরমার কোনো অসুবিধেই রইলো না। গৃহস্থালীর কাজে অনভ্যস্তা হ'লেও মনোরমা অকুণ্ঠিতচিত্তে সে সমস্ত ক'রে যেতে লাগলেন। ছেলে দুলালকে গ্রাম্য পাঠশালায় পড়তে দেওয়া হ'ল এবং মন্দিরা সনাতনের কোলে বড় হ'তে লাগলো। অল্প দিনের মধ্যেই সনাতনের কৃপণ অপবাদটা ঘুচে গেল

প্রথম অবস্থায় গ্রামের মহিলাগণ মনোরমাকে বিশেষ প্রীতির চক্ষে দেখে নাই। তাদের বরাবর বদ্ধমূল ধারণা ছিল, কল্‌কাতার বউ-ঝিরা শুধু বিবিয়ানা জানে, কিছু করবার শক্তি বা ইচ্ছে ওদের আদৌ নেই। কিন্তু কিছু দিন পর যখন তারা বুঝতে পারলো, মনোরমার প্রকৃতি সম্পূর্ণ অন্য রকমের,—তাঁর কথাবার্ত্তায় ও আচরণে বিবিয়ানার চিহ্নটুকু পর্য্যন্ত নেই, তখন তাদের সকল প্রকার বিরুদ্ধ ভাব দূর হ'য়ে গেল।

দু'বছর পরে মামার আগ্রহে ভাগে দুলাল নিকটবর্ত্তী হাই স্কুলে ভর্ত্তি হ'ল। সনাতনের ইচ্ছা দুলালকে বর্ত্তমান যুগের অনুরূপ উচ্চ শিক্ষা দিয়ে একটা হাকিম বা সেরূপ কিছু গ'ড়ে তুলবেন। বস্তুতঃ এই বালক অল্প সময় মধ্যেই এই বৃদ্ধের হৃদয় সম্পূর্ণ অধিকার ক'রে ফেল্‌লো তার মধুর ব্যবহার দিয়ে। সে সত্য সত্যই এই স্নেহময় মামাকে অন্তরের সহিত ভালোবাসতে ও শ্রদ্ধা করতে শিখেছিল। বড় হ'য়ে দুলাল অনেক সময় আশ্চর্য্য হ'য়ে যেতো, আধুনিক শিক্ষা না পেয়েও এই পল্লীগ্রামবাসী বৃদ্ধ কেমন পবিত্র, উন্নত-চরিত্র এবং গ্রামবাসী সকলের শ্রদ্ধাভাজন হ'তে পেরেছিলেন।

মন্দিরা প্রথমতঃ মামার কাছেই লেখা-পড়া শিখতে আরম্ভ করে। পরে দুলাল যখন হাই স্কুলে উঁচু ক্লাসে উঠলো, তখন সেই তাকে ইংরেজীসাহিত্য, গণিত ও অন্যান্য বিষয় পড়াবার ভার নিলো।

যথা সময়ে কৃতিত্বের সহিত মেট্রিকুলেশন পরীক্ষা পাশ ক'রে দুলাল আই, এস, সি পড়বার জন্য শহরের কলেজে ভর্ত্তি হ'ল। বলা নিষ্প্রয়োজন, সনাতন আহ্লাদের সহিত তাঁর বহুকালের সঞ্চিত অর্থ ভাগিনেয়ের শিক্ষার জন্য অকাতরে ব্যয় করতে লাগলেন। তিনি এই ব্যয় সম্পূর্ণ সার্থক মনে করলেন, যখন দু'বছর পরে এই পরীক্ষায়ও দুলাল অনেক উচ্চ স্থান অধিকার করলো। এর পর দুলাল ভর্ত্তি হ'ল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে। নিয়মিত ভাবে ব্যায়াম করার অভ্যাস ছিল ব'লে তার দেহ সুগঠিত ও স্বাস্থ্য খুব ভালো ছিল। ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে অল্প সময় মধ্যেই তখনকার ছাত্রগণ মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বলিষ্ঠ যুবক ব'লে তার খ্যাতি প্রতিষ্ঠিত হ'তে বেশী দিন লাগলো না। এই খ্যাতিটা বিশেষ ভাবে ছড়িয়ে পড়লো যেদিন সে নিজের জীবন বিপন্ন ক'রে গভীর জলে নিমজ্জিত এক যুবককে নদীগর্ভ থেকে তুলে তার প্রাণ বাঁচিয়েছিল।

এই কলেজের তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে পড়বার সময় এক দিন সংবাদ এলো, তার মামা সনাতন রায় হঠাৎ খুব অসুস্থ হ'য়ে প'ড়েছেন এবং দুলালকে দেখবার জন্য ব্যাকুল হ'য়ে আছেন। সে অবিলম্বে বাড়ী পৌঁছে দেখলো মামার বাস্তবিকই মুমূর্ষু কাল উপস্থিত—তাঁর কণ্ঠস্বর বন্ধ হ'য়ে গেছে। দুলালকে দেখে যেন তিনি তৃপ্তি বোধ করলেন কিন্তু কিছু বলতে পারলেন না। কয়েক ঘণ্টা পরই তাঁর পবিত্র আত্মা দেহ-মুক্ত হ'ল।

দুলাল ও মন্দিরাকে নিয়ে মনোরমা আজই প্রকৃত বন্ধু-হারা ও অভিভাবক শূন্য হ'লেন। এদের প্রত্যেকে এই বৃদ্ধকে ভালোবাসতে ও শ্রদ্ধা করতে শিখেছিল সুতরাং মৃত্যুতে তারা যে বিশেষ শোকাভিভূত হ'য়েছিল তাতে বিস্মিত হবার কিছু নেই। মৃত্যুর কয়েক দিন পরে দেখা গেল, সনাতন একটা উইল ক'রে তাঁর যথাসর্ব্বস্ব দুলালকে দিয়ে গেছেন, শুধু একটা সর্ত্তে যে, তাকে স্বধর্ম্মে থাকতে হবে। নগদ ৬০০৲ টাকা পাওয়া গেল। মাতুলের শ্রাদ্ধে দুলাল এই টাকাগুলি সবই খরচ ক'রে ফেললো। তাঁর আর কোনো টাকা অন্য কোথাও ছিল কি না দুলাল তা জানতে পারেনি। দুলালের কলেজের খরচ তিনি কি ভাবে চালাতেন তারও সন্ধান পাওয়া গেল না। কাজেই অবস্থা এই দাঁড়ালো যে, দুলালের ইঞ্জিনিয়ারিং পড়া এই খানেই খতম করতে হ'ল। অপর দিকে খামারের অবস্থাও এবার খুব খারাপ ছিল ব'লে সংসার খরচের জন্য কিছু আয়ের ব্যবস্থা করা একান্ত প্রয়োজন হ'য়ে পড়লো। দুলাল অগত্যা দূরবর্ত্তী এক টাউনের স্কুলে ব্যায়াম-শিক্ষকের পদ গ্রহণ করতে বাধ্য হ'ল।

দুলাল কাজে চ'লে গেল। বাড়ীতে রইলেন মনোরমা ও মন্দিরা, আর রইলো নিতাই বাগ্দী ও তার মা। নিতাই সনাতনের কয়েক বিঘা খামার জমি চাষ করতো। বাড়ীতে কোনো পুরুষ লোক না থাকায় মনোরমার অনুরোধে নিতাই তার মাকে নিয়ে এসে বাইরের একখানা ঘরে বাস করতে লাগলো।

দ্বিতীয় পর্ব্ব

শিবরাত্রি উপলক্ষে শহরের প্রান্তস্থিত শিব-মন্দিরের সম্মুখে বেশ বড় মেলা ব'সেছে। দূরবর্ত্তী গ্রাম-সমূহের লোকের তো কথাই নেই, শহর থেকেও বিস্তর লোক দল বেঁধে ঐ মেলায় যাচ্ছিল—তাদের ভিতরে স্ত্রী, পুরুষ, বালক, বৃদ্ধ, সকল শ্রেণীর লোকই ছিল এবং বেশির ভাগ লোকই যাচ্ছিল পায়ে হেঁটে। শহরবাসীদের অনেকে মোটর গাড়ী এবং ঘোড়া-গাড়ীও ব্যবহার কচ্ছিলেন। একটা পর্ব্ব বা ধর্ম্মকার্য্য উপলক্ষ্য ক'রে বাঙ্গলায় প্রায় সর্ব্বত্র এই রকম মেলা বসবার ব্যবস্থা আছে, গৃহস্থের নিত্য প্রয়োজনীয় নানাবিধ পণ্যদ্রব্যের বেচা-কেনার সুবিধার জন্য।

অপরাহ্নের ব্যায়াম শেষ ক'রে দুলাল মেলার পথ ধ'রে সেই দিকেই যাচ্ছিল। তখন পথের ভিড় অনেক ক'মে গিয়েছিল। দু'মাসের উপর হ'ল নতুন চাকরি নিয়ে দুলাল এই টাউনে এসেছে। মেলার দিকে যেতে যেতে বাড়ীর কথা ও নিজের ছোট সময়ের কথা স্বতঃই তার মনে হ'ল—বেশি ক'রে মনে হ'ল পরলোকগত মামার কথা, যিনি নিজের সন্তানের মতো ক'রে তাকে মানুষ ক'রেছিলেন ও

মেলামি উপলক্ষে তার সকল রকমের আবদার রক্ষা করতে কখনো ত্রুটী করেন নি। আজ তিনি কোথায়? মাথা নীচু ক'রে ঐ সব কথা ভাবতে ভাবতে একটু অন্যমনস্ক ভাবে দুলাল চল্‌ছিল, এমন সময় পিছন থেকে হঠাৎ একটা মোটর গাড়ী এসে তার গায়ে একটা ধাক্কা দিয়ে সোঁ ক'রে চ'লে গেল। ধাক্কা সামলাতে না পেরে দুলাল পাকা রাস্তার উপর ছিটকে পড়লো—উঠতে চেষ্টা ক'রে দেখলো, বেশ কষ্ট বোধ হচ্ছে, হাঁটুর নানা স্থান কেটে গেছে, কোমরে ব্যথা হ'য়েছে ও মাথা ঝিম্ ঝিম্ করছে। ঠিক এমনি সময় আর একখানা মোটর খুব বেগে চ'লে আসছিল কিন্তু এখানে এসেই হঠাৎ থেমে গেল এবং তখনই মোটর থেকে একজন যুবতী মহিলা বেরিয়ে এসে তার কাছে দাঁড়ালেন। দুলাল বুঝতেই পারেনি তার মাথায় জখম হ'য়েছে এবং সেই ক্ষতস্থান থেকে তখন রক্ত গড়িয়ে পড়ছে। মহিলাটি কোনো কথা না ব'লেই অবিলম্বে গাড়ী থেকে একটা জলপূর্ণ টিন নিয়ে এলেন এবং রুমালের সাহায্যে ক্ষতস্থান ধুয়ে দিতে লাগলেন। দুলাল প্রথমতঃ একটি কথাও ব'লতে পারলো না, শুধু করুণার প্রতিমূর্ত্তি ঐ মহিলার অনবদ্য মুখের দিকে একটিবার তাকিয়ে চক্ষু মুদ্রিত ক'রে চুপ ক'রে রইলো। ক্ষত ধোওয়া হ'লে পর শুশ্রূষাকারিণী ব'ললেন, "এখন একবার উঠতে চেষ্টা করুন দেখি।"

এই কথা ব'লেই তিনি দুলালের মাথার নীচে এক হাত রেখে অপর হাতে তার ডান বাহু ধ'রে তাকে তুলতে চেষ্টা ক'রলেন। দুলাল কোনোরকমে উঠে বসলো এবং তারপর কষ্টের সহিত দাঁড়ালো। মহিলা তাকে গাড়ীতে উঠবার জন্য পা বাড়াতে বললেন। তখন দুলাল ব'ললো, "আপনি আমার জন্য যথেষ্ট ক'রেছেন,—মনে হয় খুব বেশি লাগেনি আমার, একটু পরে নিজেই চ'লে যেতে পারবো।"

মহিলা বললেন, "খুব সম্ভব বেশি লাগেনি, তবুও আপনার এখুনি হাঁসপাতালে যাওয়া দরকার। আপনাকে সেখানে পৌঁছে না দিয়ে আমি কিছুতেই যাবো না।"

দুলাল আর আপত্তি করতে পারলোনা—খুব আস্তে আস্তে পা বাড়িয়ে গাড়ীতে গিয়ে উঠলো ও কুশানে ঠেস্ দিয়ে বসলো। মহিলাটি একখানা কম্বল বের ক'রে দুলালের কোমর থেকে পা-পর্য্যন্ত ঢেকে দিলেন এবং তারপর নিজেই মোটর চালিয়ে হাঁসপাতালের দিকে রওনা হ'য়ে গেলেন। সেখানে পৌঁছে তিনি হাঁসপাতালের ডাক্তারের সহিত কথাবার্ত্তা ঠিক ক'রে দুলালের জন্য একখানা ভালো bed-এর বন্দোবস্ত করলেন। ডাক্তার তাকে পরীক্ষা ক'রে বললেন, খুব শক্তিশালী লোক ব'লে আঘাতটা সাংঘাতিক হ'তে পারেনি, তাহ'লেও রোগীকে কয়েক দিন বিছানায় থাকতে হবে। মহিলা আশ্বস্ত হ'য়ে দুলালের গৃহে সংবাদ দিবার উদ্দেশ্যে তার নাম ও ঠিকানা জানতে চাইলেন।

দুলাল বললো, "আপনি সেজন্য ব্যস্ত হবেন না, এখানে আমার এমন কেউ নেই যে আমার জন্য ভাববে। আমি একটা মেসে থাকি, সেখানে সহজেই সংবাদ পাঠাতে পারবো। আমার……" দুলাল আরো কিছু বলতে গিয়ে হঠাৎ থেমে গেল। তার সেই সলজ্জ সঙ্কোচ ভাব মহিলার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি এড়াতে পারেনি। তিনি বললেন :—

"আপনি হয়তো ভাবছেন, আপনার মতো জোয়ান লোকের পক্ষে এ রকম মোটর-চাপা পড়াটা একটা লজ্জাকর ব্যাপার হ'য়েছে,—লোকে আপনাকে হয়তো মাতাল বা সেরূপ কিছু ঠাওরাবে, কিন্তু আপনি যে মাতাল নন, তা আমি প্রথমেই বুঝতে পেরেছিলাম, আর আমার বিশ্বাস বন্ধুমহলে নিশ্চয়ই আপনার ওরূপ অখ্যাতি নেই। এ একটা দৈবদুর্ঘটনা মাত্র। আঘাত যে আরো গুরুতর হয়নি সেটাই পরম সৌভাগ্য বলতে হবে। যাই হোক, যদি কোনো কিছুর প্রয়োজন হয়, ডাক্তার বাবুর কাছে আমার কার্ড রইলো, তিনি আমায় জানাবেন এবং অবিলম্বে সকল ব্যবস্থা হ'য়ে যাবে। ভরসা করি শীগ্‌গিরই আপনি সম্পূর্ণ সুস্থ হ'য়ে ঘরে যেতে পারবেন নমস্কার।"

দুলালকে তার কৃতজ্ঞতা জানাবার সুযোগ না দিয়েই মহিলা বেরিয়ে গেলেন। দুলালের কানে তাঁর কথাগুলি পুনঃ পুনঃ প্রতিধ্বনিত হ'তে লাগলো—আর চোখের উপর ভাসতে লাগলো তাঁর অনুপম মুখশ্রী। দেহের সমস্ত গ্লানি ভুলে গিয়ে দুলাল সেই চিত্রের ধ্যানে ডুবে রইলো। রাত্রিতে তার ভালো ঘুম হ'ল না।

পর দিন সকালবেলা দুলালের মেসের দু'টি ভদ্রলোক তার খোঁজ করতে এলেন। তখন দুলাল তাঁদের বিশেষ

তাকে সতর্ক ক'রে দিলেন যেন এই আঘাতের সংবাদটা তার বাড়ীতে কেউ লিখে না পাঠায়।

তারপর ডাক্তার বাবুর কাছ থেকে মহিলার কার্ড খানা আনিয়ে দুলাল পড়লো :—

Miss Lila Ray, B. A.

Tourist, Theosophical Society of India.

কার্ডের নীচে স্থানীয় ডাক বাংলোর ঠিকানা ভিন্ন অপর কোনো ঠিকানা ছিল না। সুতরাং এই ঠিকানা থেকে দুলাল বুঝতে পারলো না মিস রায়ের স্থায়ী বাসস্থান কোথায়। পরে ডাক্তার বাবুর নিকট দুলাল যখন জানতে পারলো, মিস রায় তার হাঁসপাতালে থাকার যাবতীয় ব্যয় অগ্রিম জমা দিয়ে গিয়েছেন এবং সকাল বেলা ফোনের সাহায্যে তার অবস্থা ভালো আছে জানতে পেরে আধ ঘণ্টা পরের ট্রেনেই তিনি চ'লে গেছেন এবং শীগ্‌গির আর এদিকে ফিরবেন না, তখন দুলাল তার মনের ভিতর বেশ একটু তীব্র বেদনা অনুভব করলো। একজন অপরিচিতা মহিলার কাছ থেকে এরূপ অযাচিত দান-গ্রহণে বাধ্য হওয়াতে তার আত্ম-মর্য্যাদায় তো ঘা লেগেছেই, উপরন্তু সেবা দ্বারা ও অন্য প্রকারে তিনি যে উপকার ক'রে গেছেন, দুলাল সে সবের জন্য তার অন্তরের গভীর কৃতজ্ঞতাটুকু তাঁকে জানাবার সুযোগ পর্য্যন্ত পেলো না! সর্ব্বোপরি দুঃখ হ'ল, বিনিদ্রচক্ষে বিছানায় প'ড়ে যাঁর মূর্ত্তির ধ্যানে তার সারারাত কেটেছে, তিনি এমন ভাবে হঠাৎ চ'লে যাবেন দুলাল তা মুহূর্ত্তের জন্যও কল্পনায় আনতে পারে নি। পুনরায় যে তাঁকে দেখবার সৌভাগ্য ঘটবে তারই বা সম্ভাবনা কি?

দু'দিন পরে সুস্থ হ'য়ে দুলাল মেসে ফিরে গেল। দিনগুলি আগের মতোই কাটতে লাগলো, তবে এইটুকু পরিবর্ত্তন ঘটলো যে, এই ঘটনার পূর্ব্বে দুলালের যে সময়টা বন্ধুবর্গের সঙ্গে হাসি-তামাসায় কাটতো, সেই সময়টা দুলাল এখন নিজ ঘরে ব'সে ভালো ভালো ইংরেজী ও বাংলা বই প'ড়ে তার জ্ঞান-ভাণ্ডার বাড়াতে লাগলো।

শরৎ সে চিরদিন যাত্রী

—গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার

সুন্দর ধরাতল সৃষ্টির বক্ষে দৃষ্টিতে লাগে নব স্পর্শ,
নিশির শিশিরে ভেজা শ্যামল তৃণদল মধুর মিলন ঘনরাত্রি।
হৃদয়ের দ্বারে দ্বারে আজি কেন বারে বারে জেগে ওঠে অভিনব হর্ষ,
নিবিড় মমতা তবু অনন্তকাল পথে শরৎ সে চিরদিন যাত্রী।
বলাকার অন্তরে নিবিড় চেতনা জাগে, উড়ে যায় পাখা নেড়ে গগনে;
সন্ধ্যার তারা যত নিদ্‌হারা আঁখি নিয়ে জাগিছে রাতের পর রাত্রি।
বনের কুসুম যত ঘুমের বাঁধন ছিঁড়ি গন্ধ ছড়ায় শুধু সঘনে—
নিবিড় মমতা তবু অনন্তকাল পথে শরৎ সে চিরদিন যাত্রী।
নিথর গহিন রাতে সমীরণ আঁখি পাতে নিয়ে আসে সুখময়ী তন্দ্রা,
বাউলের সঙ্গীতে মঙ্গল ধ্বনি ঐ রাগিনী কাঁপিয়ে তোলে রাত্রি।
গৌরব-ভরা ঐ সৌরভ সুন্দর কুঞ্জে এলায় নিশি সন্ধ্যা;
নিবিড় মমতা তবু অনন্তকাল পথে শরৎ সে চিরদিন যাত্রী।
কুঞ্জে কুঞ্জে ঐ অলিকুল গুঞ্জে, তার সাথে বিহগের সঙ্গীত,
জ্যো'স্না মুখরিত সুখভরা নির্জ্জন আজি এ রূপালী ঘন রাত্রি,
চারি ধারে নব সাড়া ধরণী পাগ'ল-পারা জেগে ওঠে পুলকের ইঙ্গিত;
নিবিড় মমতা তবু অনন্তকাল পথে শরৎ সে চিরদিন যাত্রী।



—শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

রহস্যময়ী মাইক্রোনেশিয়া

জাপানের দক্ষিণ-পূর্ব্বে প্রশান্ত মহাসাগরের বুকে মাইক্রোনেশিয়া দ্বীপপুঞ্জ আজও আদিম মানুষের নিকেতনরূপে বিরাজ করছে। অনেকদিন আগে একবার মাইক্রোনেশিয়ায় গেছিলাম। একটা অসভ্য অতিথি আমাদের হোটেলওয়ালাকে ব'লল, "আমি এখন যাচ্ছি না। আমি এখানে থেকে ওদের দেখতে চাই। ওদের মত জীব আমি জীবনে আর দেখি নি।"

ওরা অর্থাৎ আমরা এই শ্বেতমানুষেরা।

আমি ব'ললাম, "বেশ, ওদের থাকতে দাও। ওদের মত মানুষ আমরাও কখনও দেখি নি।"

লোকটি অবাক হয়ে গেল। ভেবে পেল না, ওদের দেখে আমরা আশ্চর্য্যান্বিত হচ্ছি কেন। মাথায় একহাত লম্বা খোঁপা, দাঁতগুলি কয়লার মত কাল, পানের রসে ঠোঁট দু'খানি সিঁদুরের মত লাল, নগ্নদেহ, সর্ব্বাঙ্গে উল্কির ছাপ, কোমরে খানিকটা আচ্ছাদন। সে হেসে ব'লল, "কেন, সকলকেই তো আমাদের মত দেখতে!"

দক্ষিণ সাগরের "রুমাজ" দ্বীপের আদিম অধিবাসীরা যদি আমাদেরকে তাদের মধ্যে দেখে আশ্চর্য্যান্বিত হয়, আমরাও নিজেদেরকে তাদের মধ্যে দেখে কম আশ্চর্য্যান্বিত হই না। প্রথমে বোধ হয়েছিল, হয় তো সেখানে যাবার অনুমতি জাপানের কাছে পাওয়া যাবে না।

প্রশান্ত মহাসাগরে এমন অনেক রত্নদ্বীপ আছে, যেখানে পর্য্যটকেরা হামেশাই গিয়ে থাকে। যেমন দেখা যায় তাহিতি বা সামোয়া দ্বীপগুলি দিন দিন পরিভ্রমী পর্য্যটকের কাছে কাযাই দ্বীপের মত পরিচিত হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু জাপানের এই রহস্যময়ী মাইক্রোনেশিয়া চির অজ্ঞাত হয়ে রয়েছে। জাপানীরা সেখানে যেতে কাউকে বাধা দেয় না সত্যি; কিন্তু তাদের উৎসাহ দেয় না আদৌ। উপরন্তু তাদের বলে দেওয়া হয় যে, ভ্রমণ করবার সুবিধা নাকি সেখানে নেই এতটুকু। হোটেল তো নেই বললেই হয়। জাপানীরা বলেও দিতে


এই পালাউ সর্দারনী শঙ্খধ্বনি ক'রে পরামর্শ সভা আহ্বান করছে

পারে না, কোথায় গেলে পাওয়া যাবে একটু খাবার বা সামান্য আশ্রয়। যদি কোন পর্য্যটক বলে যে, সে আদিম অধিবাসীদের সঙ্গে থেকে বা আম গাছের তলায় তাঁবু খাটিয়ে দিন কাটিয়ে দিতে চায়, তা'হলে জাপানীরা তো তার কথা হেসেই উড়িয়ে দেব। বরং তাকে বলা হয়, সে যেন জাহাজ

যতক্ষণ বন্দরে থাকে ততক্ষণে দ্বীপগুলি একটু এদিক ওদিক দেখে নেয়।

মাইক্রোনেশিয়া কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপের সমন্বয়ে গঠিত। কিন্তু তারা যে জায়গাটা জুড়ে আছে সেটা সামান্য নয়। বিন্দুর ন্যায় এই ছোট ছোট দ্বীপগুলি প্রশান্ত মহাসাগরের বুকে কয়েক হাজার বর্গ মাইল ধরে বিস্তৃত। প্রায় যুক্তরাষ্ট্রের দু'ভাগের এক ভাগ। প্রধান দ্বীপপুঞ্জগুলির নাম হচ্ছে মেরিয়ানাস, কেরোলাইনস আর মার্শালস। অপেক্ষাকৃত বড় বড় দ্বীপগুলির সংখ্যা প্রায় ১,৪০০।

স্পেনের যখন সুদিন ছিল তখন এই দ্বীপগুলিও ছিল স্পেনের অধীনে। তারপর যুক্তরাষ্ট্র যখন তাদের কাছ থেকে ফিলিপাইনকে কেড়ে নিল, তখন স্পেনকে প্রশান্ত মহাসাগরের সাম্রাজ্য হারাতে হ'ল। স্পেন ও আমেরিকার যুদ্ধে ঋণ শোধ করতে গিয়ে ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে স্পেনকে এই মাইক্রোনেশিয়া দ্বীপপুঞ্জ অনেক টাকায় জার্ম্মানের নিকট বিক্রি করতে হয়। আবার গত মহাযুদ্ধের প্রথম অনলোদ্গিরণ হবার সঙ্গে সঙ্গেই জাপান দ্বীপগুলি দখল করে নেয়। তারপর জাতীয় সঙ্ঘ এদের কর্তৃত্ব জাপানের হাতে ছেড়ে দেয়। সুতরাং এই দ্বীপগুলি বার্সিলোনার হাত থেকে হামবুর্গের হাতে তারপর ইয়োকোহামার হাতে গিয়ে পড়ে।

পৃথিবীর এক কিনারায় গেলে আমাদের যে রকম আনন্দ হয়, মাইক্রোনেশিয়ায় গেলেও আমাদের মনে সেই আনন্দ জাগে। পৃথিবীর এক বিপজ্জনক, সমুদ্রপথে আমরা দক্ষিণ দিকে যাত্রা করলাম। সে পথটা বিপজ্জনক, কেননা, সেখানে আছে প্রবালের খাড়াই পাহাড় আর ঝড় তো অনবরতই হচ্ছে। আমরা "অসীমা" দ্বীপের কোল ঘেঁষে গেলাম। এখানকার আগ্নেয়গিরিতে কত যুবক যে ব্যর্থ প্রেমের কষ্টে আত্মহত্যা করেছে তার ইয়ত্তা নেই। তারপর দেখা গেল 'লটস্ ওয়াইফ' এবং 'নীলচক্ষুবনিন' (ওগাসাওয়ারা সটো)। এখানে আমেরিকান আর ইংরেজদের বংশধরেরা তাদের দক্ষিণ সাগরের স্ত্রী নিয়ে ঘরকন্না করে। আমাদের যাবার পথে ইতস্ততঃ আগ্নেয়গিরিশোভিত দ্বীপমালা বিক্ষিপ্ত ছিল। ডিসেম্বরের ঠাণ্ডা তখনও যায় নি।



পালাউ অধিবাসীগণ মৃত সর্দ্দারের উদ্দেশ্যে শোক-সঙ্গীত গাইছে।

রহস্যময়ী মাইক্রোনেশিয়ায় প্রবেশ ক'রলাম প্রকৃতি নির্ম্মিত দরজা দিয়ে। দরজার দু'পাশে অগ্ন্যুদ্গিরণকারী দুটি আগ্নেয়গিরি। জলন্ত ইউরেকাস দ্বীপটি সিসিলির উত্তরে অবস্থিত ষ্ট্রম্বোলির সমগোত্রীয়। এ অনলোদ্গিরণ করে মাঝে মাঝে, কিন্তু যখন করে তখন ভীষণ ভাবেই করে। এর গলিত লাভার খেত আস্তরণ রাত্রির অন্ধকারকে উজ্জ্বল করে রেখেছিল। তার আলোড়ন চলন্ত জাহাজটাকে কাঁপিয়ে দিয়েছিল, আর তার ছাই সারা ডেকে ছড়িয়ে পড়েছিল।

কাপ্তেন বললেন, "রাত্রির দুটোয় সময়ে জাহাজ একে পেরিয়ে যাবে। আপনাকে কি জাগিয়ে দেব?"

আমি ব'ললাম, "যদি সে নিঃশ্বাস ফেলতে থাকে?"

যা'হোক, যাবার সময়ে আর সে রাক্ষসীকে দেখা হয় নি। ফেরবার সময়ে কিন্তু তাকে দেখবার সৌভাগ্য হয়েছিল। তাকে দেখতে সূক্ষ্মাগ্র মোচার মত। উচ্চতা প্রায় ১০৪৭ ফুট। সারা শরীরটা কয়লার মত কাল। তার মাথার ওপর খানিকটা সাদা পালক মুকুটের মত শোভা পাচ্ছিল। ভুল করে সেটা তুষার জল ভাবলে এমন কিছু অন্যায় হয় না। তার গহ্বরের মধ্য দিয়ে হলদে ধোঁয়ার স্তূপ নির্গত হচ্ছিল। এই দুরন্ত দ্বীপের বুকে এতটুকু সবুজ ঘাস জন্মাবার উপায় ছিল না।

মেরিনা দ্বীপগুলি ঠিক কণ্ঠহারের মত। আমরা তার পাশ দিয়ে যেতে লাগলাম। তারপর চোখে পড়ল আমেরিকার অধিকৃত খানিকটা জমি। তার নাম গুয়ারকামান। ওয়াশিংটনের সন্ধি অনুযায়ী এর অধীনতা পাশ ছিন্ন হয়েছে। এখন সে প্রশান্ত মহাসাগরের বুকে নিঃশব্দে নিদ্রা যাচ্ছে। ৯০ দিন অন্তর অন্তর একখানা ষ্টীমার সেখানে উপস্থিত হয়।

একদা আমরা চিত্রিত সমুদ্রে একটি চিত্রিত জাহাজ দেখলাম। বোধ হ'ল, জাহাজখানা যেন এক জায়গায় স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। কেননা "সিজুয়োকা মারু" প্রবাল প্রাচীরে অবদ্ধ হয়েছিল। ইয়াপের আদিম অধিবাসীরা সেই পরিত্যক্ত জাহাজের জিনিষ-পত্র এনে তাদের গৃহসজ্জা রচনা করেছিল।

ন'দিন পর আমরা মাইক্রোনেশিয়ায় গিয়ে পৌঁছালাম।

কেহ যদি এই দক্ষিণ সাগরের দ্বীপগুলিকে এক'শ বছর আগেকার মূর্ত্তিটিতে দেখতে চায়, যখন তাদের তীরভূমি আধুনিকতার ঢেউতে ধৌত হয় নি, তা হলে তার 'ইয়াপ' দ্বীপপুঞ্জটি দেখা দরকার। কালের গতি যেন, এখানে থেমে গেছে। বোধ হয় যেন এ আরও পশ্চাতে পড়ে আছে। জ্ঞান তাদের একটুকু বাড়ে নি। বাহির জগতের বিষয়ে জ্ঞান তাদের আজও সংক্ষিপ্ত রয়ে গেছে। ইয়াপ শব্দটির অর্থ হচ্ছে ভূমি। ইয়াপ দেশের অধিবাসীদের কাছে ইয়াপই হচ্ছে পৃথিবীর পরিপূর্ণ অংশ। সভ্যতার ভাঁড়ামি তারা সচরাচর পছন্দ করে না। তবে ব্যতিক্রম যে নেই তা' নয়। যুবকদের মধ্যে কাউকে মাঝে মাঝে বাইসাইকেল চালাতে বা টেনিশ বল খেলতে দেখা যায়। আজ সেখানে একটা স্কুল খোলা হয়েছে। সেখানে জামাকাপড় না পরে যাবার আইন নেই। কিন্তু মজা হচ্ছে এই যে, ছেলেরা স্কুলথেকে বাইরে এসেই গায়ের জামাকাপড় গুছিয়ে বগলে নিয়ে উলঙ্গ অবস্থায় বাড়ী ফিরে যায়। আমি অনেক ছোট ছোট মেয়েদের স্কুলে ছুটি হবার আগেই কাপড় জামা ডেস্কের ভিতর গুঁজে সূর্য্যের আলোয় বার হয়ে আসতে দেখেছি। গ্রামের বুড়োরা যুবকদের জামাকাপড় পরতে দেখলে রীতিমত ভর্ৎসনা করে। তাদের মতে এসব না কি অসভ্যতার লক্ষণ। তারা বলে এমন করে অনুকরণ করলে দেবতা নাকি রুষ্ট হন।

সেখানকার লোকদের একটা দৃঢ় বিশ্বাস আছে যে, কোন রকম জামাকাপড় পরে দেবতাদের রাগিয়ে দিলে তাঁরা না কি পারীর কাছে রোগ আর মৃত্যু পাঠিয়ে দেন। সম্ভবতঃ এটা বহুদিনের একটা সংস্কারের অংশবিশেষ। সেকালে এটা দরকার হয়েছিল। কেন না মাঝিমাল্লারা নাকি দূরদেশথেকে ভীষণ রকমের রোগ বয়ে আনত।



ইয়াপ মুদ্রা নিয়ে বাজার কর্ত্তে চলেছে। মাথার ভূষণ লক্ষণীয়।

যা'হোক ইয়াপ দেশের লোকদের সঙ্গে পৃথিবীর কোন সম্পর্ক নেই।

এক'শ বছর আগেকার আকৃতিতে তৈরি একটি "ক্যানো" করে আমরা 'রুমাঙ্গ'এর কাছের উপহ্রদটায় পালে গেলাম। আমাদের সঙ্গে ছিল একটা কানাকা দেশীয় লোক। তার সঙ্গে আলাপ হয় জাহাজে। সে তো আমাদের এই অসীম সাহসিকতা দেখে খুসী হয়ে আমাদের সাহায্য করবার জন্য উন্মুখ হয়ে উঠল। তার নামটি হচ্ছে "টল"। সে ছিল যেন আমুদে ছোকরা। মাঝে মাঝে দিলখুলে হেসে উঠত। তার দাঁতগুলি যদি শাদা হত! সে ছিল ক্যাশান দুরস্ত ছেলে। সুতরাং তার দাঁতগুলি ছিল উজ্জল আবলুস

কাঠের মত। কেবল যে পান খেয়েই দাঁত কালো হয়েছিল তা নয়। পাঁচদিন অন্তর একরকম শিকড়ের রস দাঁতে মাখতে হত।

টল ব'লল, "জিনিষটা খুবই খারাপ। শুধু তাই নয়, শরীরও খারাপ করে। কিন্তু রংটি ভারী সুন্দর ঘোর কালো রং।"

কথা শেষে সে হেসে উঠল, দাঁতগুলি তার আকর্ণ বিস্তৃত হয়ে পড়ল।

সে কিছুদিন 'গুয়াম'এ ছিল। তাই কিছু কিছু ইংরাজি বলতে পারত। এ ছাড়া সে সভ্যতার আর কোন ছোঁয়াচ লাগতে দেয় নি নিজের গায়ে।



পালাউ গ্রামে কংক্রীটে তৈরী নূতন বিজ্ঞায়তন

সে মাঝে মাঝে দার্শনিকের মত ব'লত, "আপনাদের জিনিষ আপনাদের কাছে ভাল, আর আমাদের জিনিষ আমাদের কাছে ভাল; কিন্তু দুটোকে মিশিয়ে দিলে আর কেউ ভাল থাকবে না।"

সত্যই কানাকার লোকদের সঙ্গে পশ্চিমের সাদা মানুষের এত তফাৎ যে, তাদের আর এক ধরণের বলা যেতে পারে। গায়ের রং লাল ও বাদামী, চুলগুলি কালো, চোখ দুটো বসা বসা, নাকটা চওড়া, মুখটা বড়, এই হচ্ছে কানাকার লোকদের আকৃতি। অভিধান অনুযায়ী কানাকা শব্দটির অর্থ হচ্ছে "দক্ষিণ-সমুদ্রের দ্বীপবাসী।" কিন্তু প্রশান্ত মহাসাগরের নানা অংশে এই শব্দটির নানা অর্থ। মাইক্রোনেশিয়ায় একথাটার অর্থ সম্পূর্ণ বিপরীত। সেখানে এই শব্দটার দ্বারা এমন একটা জাতি বুঝায়, যাদের শরীরে পলিনেশিয়া, মেলিনেশিয়া আর পাপুয়ার রক্ত বইছে। প্রধানতঃ মালয় জাতির বংশে তাহাদের জন্ম, কিন্তু তাদের পিতৃপুরুষ হচ্ছে দ্রাবিড় জাতি। যদিও কানাকা জাতি মানে কাল, বাদামী, লাল, হলদে, আর শাদার সংমিশ্রণ, তা হলে হলদের দাবীটাই তাদের মধ্যে বেশী, আর হলদে জাতির দোষগুণও তারা পেয়েছে। সেই কারণে জলদস্যু হিসাবে, দুঃসাহসী নাবিক ও জেলে হিসাবে তাদের বেশ সুনাম আছে। তারা কিন্তু জমিতে চাষ আবাদ করে না, বা ব্যবসা-বাণিজ্যও করে না। স্কুলে তাদের কাছে অঙ্ক-শাস্ত্রটাই সবচেয়ে কঠিন বলে বোধ হয়। মাছ ধরতে তারা খুব ভালবাসে। টল নৌকায় থাকতে এত আরাম পেত যে, তাকে নৌকারই একটা অংশবিশেষ বললে অত্যুক্তি হয় না।

"রুমাঙ্গ" ও "ম্যাপ" আর কতকগুলি ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত দ্বীপকণা নিয়ে "ইয়াপ" গঠিত। ন'মাইল লম্বা আর সাড়েসাত মাইল চওড়া একটা উপহ্রদের মধ্যে তাহাদের রত্নের মত দেখায়। তাদের চারপাশে মালার মত প্রবালের প্রাচীর। রুমাঙ্গে যেতে হলে 'ম্যাপ' পার হয়ে যেতে হয়। ম্যাপের আকর্ষণ এত প্রবল ছিল যে, আমরা সেখানে না নেমে থাকতে পারি নি। তা ছাড়া, আমাদের সঙ্গে তখন ছিল টল।

সেখানকার নারিকেল আমাদের দেশের মত। তবে গাছগুলি বেশ মোটা। ফলে তার ওপর ওঠা কষ্টকর। কিন্তু আমার স্ত্রী হতাশ হবার লোক নয়। সে একটা গাছে উঠল, আর আমিও একটা গাছে উঠলাম। তবে দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে, শেষ পর্য্যন্ত পৌঁছে প্রায় আমার নেমে আসতে হল এক অতিকায় বাদুড়ের দৌরাত্ম্যে। সেখানকার বাদুর বড় সাধারণ নয়। লম্বায় তারা তিনফুট। তাদের মনে হয় রক্তশোষক প্রাণীর দল যেন। এই বাদুড়ের শত্রু হচ্ছে দু'টি, যথা, কাঁকড়া আর ইঁদুর। কাঁকড়ার দাঁত এমনি ধারাল যে, তারা অনায়াসে নারিকেলের মধ্যে গর্ত করে প্রবেশ করে

শাঁসটুকু খেয়ে ফেলতে পারে। মানুষের মাথার খুলিও সে সহজে গর্ত্ত করে দিতে পারে। একবার একটা কাঁকড়া ধ'রে এক ইঞ্চি পুরু কাঠের বাক্সে পুরে রাখা হয়েছিল, কিন্তু তারপর দেখা গেল যে কাঁকড়া পালিয়ে গেছে।

দ্বিতীয় বিপদটি হচ্ছে ইঁদুর। আকৃতি তাদের বিড়ালের মত। অনেক দ্বীপ এই পেটুকে ইঁদুরে একেবারে ভরে গেছে। তারা নারিকেল গাছের চারার বেশ ক্ষতি করে। অঙ্কুর বা ফুল অবস্থায় থাকতে থাকতেই চারাগুলি এই ইঁদুরেরা খেয়ে ফেলে। ওলেয়াই দ্বীপে একবার একটি লোক কতকগুলি বিড়াল এনে ছেড়ে দিয়েছিল, কিন্তু পরে দেখা গিয়াছিল যে বিড়ালগুলিকে ইঁদুরেরা নিঃশেষ করে খেয়ে ফেলেছে।

"ইয়াপে"র দাসবৃত্তিটা বেশ রহস্যজনক আর ঠিক আমাদের দেশের মত দাম নয়। তাদের কেনাও যায় না, বা বিক্রী করাও যায় না। তারা কোন ব্যক্তিবিশেষের গোলাম নয়। তারা সমস্ত স্বাধীন মানুষের দাস। কিন্তু রাজা ছাড়া কেউ তাদের কোন কাজ করবার আদেশ করতে পারে না।

দাসেরা বাস করে তাদের নিজ গ্রামে। রাজা আদেশ করলে তারা যে কোন স্বাধীন লোকের কাজ করে দিতে বাধ্য। রাজাকে ধূমপানের সরঞ্জাম দিলেই অনুমতি পাওয়া যায়। দাস-ব্যক্তিরা পরাজিত জাতির বংশধর। ইয়াপে তাদের বন্দী করে রাখা হয়েছে। ঝোপ ও জঙ্গলেপূর্ণ গ্রামে তারা বাস করে। পাছে 'ক্যানো' নিয়ে পালিয়ে যায়, এই ভয়ে তাদের তীরভূমিতে থাকতে দেওয়া হয় না।

দাসদের স্বাধীন মানুষের খাদ্য খাবার অধিকার নেই। মাথায় তাদের চিরুণীও দেবার অনুমতি দেওয়া হয় না। এ চিরুণীই তাদের স্বাধীন মানুষ থেকে তফাৎ করে রেখেছে। যে যত বড় কাজ করে, তার চিরুণীও তত বড়। এইগুলি কাঠের তৈরী, চওড়ায় প্রায় তিন ইঞ্চি আর লম্বায় প্রায় ছ' ইঞ্চি থেকে দু' ফুট পর্য্যন্ত। তার দুদিকেই ধার।

সেখানে মদ্যপান করলে দিন কয়েক জেল খাটতে হয়। জেল খাটতে এমন কিছু কষ্ট হয় না। কারণ, জেলের অবস্থা নেহাৎ মন্দ নয়। তবে জেল থেকে বার হয়ে আসবার সময়ে তাদের আবার চুল কেটে দেওয়া হয়, ফলে মাস কয়েক তাদের বড় ঘৃণিত জীবন যাপন করতে হয়। আগেই বলা হয়েছে যে, 'ইয়াপ' জাপানের অধীন। তবে জাপান এসে সোজাসুজি শাসন করে না। এখানে চা'রটি রাজা আছে। বংশানুক্রমে তারা রাজদণ্ড পেয়ে আসছে। তবে তাদের ক্ষমতা ভয়ানক বেশি। স্বৈরাচার তারা সহজেই গ্রহণ করে নিয়েছে। প্রজারাও এরূপ শাসন-পদ্ধতিতে অভ্যস্ত।

তার পর আমরা টলের বাসায় গিয়ে পৌঁছালাম। তার মা বড় ভাল লোক। আমাদের খুব আদর-যত্ন করল।



সমুদ্র বক্ষে ক্যেনো (অভিনব নৌকা)

আমি যে একজন আমেরিকান, সেকথা আমার বুঝতেই দিল না। তার কান খানিকটা কাটা ছিল, বৈধব্যের চিহ্নস্বরূপ। তার স্বামী সাত দিন হল মারা গেছে কিন্তু ইতিমধ্যেই সে বিয়ে করে ফেলেছিল। কারণ, ইয়াপের লোকেরা এ ব্যাপারে কোন অন্যায় দেখে না। তার পর এল টলের ভগিনী। তার পোষা শুয়োর ছানাটা নিয়ে সে তো আমাদের সামনে এসে দাঁড়াল। তার গলায় একটা দড়ি বাঁধা ছিল। কারণ, তার নাকি বিবাহের বয়স হয়েছে।

আমাদের বেশ ক্ষুধা লেগেছিল। টলের বাড়ির চারিধারে অনেক ফলও পড়ে থাকতে দেখা গেল, কিন্তু তা খাবার উপায় ছিল না। কেন না কোন গৃহে যদি কেহ মারা যায় তবে সেখানকার ফল-মূল নাকি একবছর থেকে

নেই। সে দেশের লোকের বিশ্বাস, ঐ ফল খেলে নাকি যে খায় তার মৃত্যু হয়।

ইয়াপে পাথরের টাকা ব্যবহার করা হয়। পাথর থেকে টাকা তৈরী করা সহজ ব্যাপার নয়। সুতরাং জাল হবার সম্ভাবনা খুব কম।

আর একটি ঘটনায় আমরা খুব আশ্চর্য্যান্বিত হয়েছিলাম। পাঁচটি উনান জ্বেলে পাঁচটি পাত্রে আমাদের খাবার তৈরী হল। আমি টলকে ব'ললাম, "পাঁচটা উনান কেন অনর্থক জ্বালা হয়েছে? আর পাঁচটা পাত্রেই বা রান্না হচ্ছে কেন? একটা উনান জ্বেলে এক পাত্রে তো রান্না করলে কাজ চুকে যায়।"

টল অবাক হয়ে গেল আমাদের কথা শুনে, ব'লল, "প্রত্যেক পুরুষের জন্যে একটি আলাদা পাত্রে রান্না করতে হবে। মেয়েদের তা দরকার নেই। তারা তাদের যার পাত্রের রান্না খেতে পারে। যে পাত্রে রান্না করে মেয়েরা খায়, পুরুষরা কিন্তু সে পাত্রে খেতে পারবে না।"

আমি ব'ললাম, "যদি খায়?"

"তা'হলে তাকে কখনও বাড়ির কর্ত্তা হতে দেওয়া হবে না। সে মেয়েদের গোলাম হয়ে যায়।"

ফলে মেয়েদের গৃহস্থালী কাজ বেশ বেড়ে গেছে। আমি একটি মেয়েকে সাতটি উনান জ্বেলে রান্না করতে দেখেছি।

সে রাত্রে এই পরিশ্রমের ফলে বেশ আরামের ঘুম হয়েছিল।

পরের দিন টলের বাপের কবর স্থান দেখতে গেলাম। এক টাহিটিয়ান কবির একটি কবিতার সামান্য অংশ মনে পড়ল। "বালির উপর গাছের পাতা ঝরে পড়ে, সমুদ্র প্রবালদ্বীপের তটরেখা ভাসিয়ে দেয়, আমাদের আপনার লোকেরা মর্ত্তাভূমি ত্যাগ করে চলে যায়।"

সভ্যতার আলোক আজও এদেশে তেমন উজ্জ্বল ভাবে প্রবেশ করে নি। তবে মিশনারীদের চেষ্টায় তারা তাদের প্রাচীন সংস্কৃতি থেকে বঞ্চিত হচ্ছে দিন দিন।

শারদীয়া

—শ্রীসুধীররঞ্জন চট্টোপাধ্যায় এম, এ

অন্নহীন বস্ত্রহীন ক্ষুধায় পীড়িত দ্বারে দ্বারে
তোমার মঙ্গল শঙ্খ বাজিবে কি কঠিন ফুৎকারে
উঠিবে কি জয়ধ্বনি আনন্দের উচ্ছ্বসিত রবে
মাতিবে কি আর্ত্তজনগন, আলোকিত মহোৎসবে
আজো তারা নাচিবে কি অন্তরে উচ্ছ্বাসে উল্লাসে
আজো কি গাহিবে গান স্বপ্নপুষ্ট আনন্দ বিলাসে।
কে রচিবে আলিম্পনা, অকলঙ্ক পাদপদ্ম তব
কোথায় রাখিবে তুমি বল, কি মহান ছন্দে নব
তোমার অর্চনা হবে, কি কি দ্রব্য কি কি উপচার
তোমার পূজায় দেবে, অর্ঘ্যথালে নৈবেদ্য তোমার
কি দিয়ে সাজাতে হবে, কি দিয়ে তুষিবে আজ তারা
লাঞ্ছিত পীড়িত দুঃখী, বঞ্চিত, লুণ্ঠিত হ'ল যারা
যারা ভীরু, যারা ক্লীব, অপহৃত যার গৃহবধূ
নির্বাধা নিষ্ক্রিয় যারা দয়ার কাঙ্গাল যারা শুধু
কেমনে পূজিবে তোরে বল মাগো অসুরদলনী
লাঞ্ছিতা পীড়িতা নিত্য যে দেশের মেয়ে ও জননী
যাদের নয়নে ঝরে অশ্রু নয় রুধিরের ধারা
যারা শুধু কেঁদে গেল অসহায়; তবু যে ক্লীবরা
ভয়ের প্রাচীর ভেঙ্গে একবার চেয়ে দেখিল না
দিল নাক' ধমনীর উত্তপ্ত রুধির এক কনা,
ক্ষয়িষ্ণু, সহিষ্ণু, কাপুরুষ, ভীত যারা ত্রস্ত যারা
বল মাগো বীরপ্রসবিণী, কি দিয়ে অর্চি'বে তারা
কোন দ্রব্যে কোন উপচারে? ভীরুতা, ক্লীবতা,
বশ্যতা দীনতা আর ক্ষুদ্রতার সর্ব্ব সংকীর্ণতা,
সঞ্চিত যত অবসাদ, গ্লানি, নিষ্ক্রিয় হাহাকার
সে কি হবে উপাচার, অর্ঘ্যথালে নৈবেদ্য তোমার?

ডিমন্স্‌ট্রেশন্‌

—শ্রীগোকুল সান্যাল

গত জন্মের কর্মফলে, এ জন্মের কর্মপন্থা বাঙ্গালীর প্রায় নির্দ্দিষ্ট অর্থাৎ কলম পিষিতে হইবে। কিন্তু আমার অদৃষ্টের বরাতে সে ফলও ফলিল না, অবশেষে বীমার দালাল হইয়াছি। দেশের ও দশের স্নেহের বন্ধন ছিন্ন করিয়া, সকলের করুণতম স্মৃতি বক্ষে বহিয়া দিনগত পাপক্ষয় করিতেছি মেসের সঙ্কীর্ণ পরিসর কামরায়। আজ বাড়ীর চিঠি আসিয়াছে এবং আমি দার্শনিক হইয়া উঠিয়াছি। এক হইতে পাঁচ নম্বরের পুত্রটী পল্লীর একান্ত নিজস্ব ম্যালেরিয়ার স্নেহ ও সুখ স্পর্শ পাইয়া আসিতেছে। কুইনাইনের প্রয়োজন। এবারের অতিরিক্ত বর্ষায় খোড়ো-চাল খসিয়া খসিয়া পড়িতেছে—না ছাওয়াইলে চলিবে না। জমিদারের লোক কড়া কড়া কথা বার বার শুনাইয়া যাইতেছে অর্থাৎ যেন তেন প্রকারেণ কিছু টাকা চাই। এদিকে উপার্জ্জনের সন্ধানে পায়ের বাঁধন ছিড়িয়া যাইতেছে, তত্রাচ কেস যোগাড় করিয়া উঠিতে পারিতেছি না। বাজার এমনি হইয়া উঠিয়াছে যে, ইন্সিওরেন্স এজেন্টদের জবরদস্তির নাগপাশ হইতে জনসাধারণের পরিত্রাণের জন্য একটি ইন্সিওরেন্স্ কোম্পানী গঠনের অত্যন্ত প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে।

শনিবারের সন্ধ্যা। আকাশ মেঘমেদুর। গোপালদার ঘরে তাস জমিয়া উঠিয়াছে। জানালার একপার্শ্বে বসিয়া আমিও রীতিমত জমিয়া গিয়াছি, নিতান্ত নিজস্ব চিন্তায়। চিন্তাসূত্র হঠাৎ ছিড়িয়া গেল, বন্ধুবর নিশিকান্তের কর্কশ কলকণ্ঠে। বন্ধুবর বলিতেছিল, হাঁ, হাঁ বান্ মশাই—একশো বার বলবো।

মিহি অথচ ক্রুদ্ধ কণ্ঠের প্রতিবাদের শেষ কথাগুলো শোনা গেল, "এমনি করেই ছবির হাঁস একদিন হার গিলেছিল, ম'শাই।"

ঘটনা অতিতুচ্ছ। তাস খেলিতে বসিলে প্রায় ঘটিয়া থাকে। নবাগত সুপ্রকাশবাবুর হরতনের বিবির উপর নিশিকান্ত সাহেব চালিয়া বলিয়াছে, "ঠেঙাও বিবিকে"। ইহাতেই সুপ্রকাশবাবু অগ্নিশর্ম্মা। সহ্য করিতে তিনি সবই পারেন, পারেন না শুধু নারীর অমর্য্যাদা। কথার ফাঁকে ফাঁকে নারীর প্রতি অবিচলিত শ্রদ্ধা, অসাধারণ ভব্যতার কথা তিনি প্রায়ই শুনাইয়া থাকেন।

মেসে নূতন মানুষ আসিলে যাচিয়া আলাপ করিতে হয়। পুরাতনের নিকট দাবী আছে কিন্তু কিছুর প্রত্যাশা নাই। একদা সুপ্রকাশবাবুর সাথে আলাপ হইয়া গেল। সে এক স্মরণীয় দিন,—পরিচয়ে বিপর্য্যয় ঘটিবার উপক্রম। তাহার ইতঃস্তত বিক্ষিপ্ত, ঋজু, নাতিদীর্ঘ শ্মশ্রু, পাণ্ডুর মুখমণ্ডলে অপ্রতিভের হাসি লাগিয়া আছে এবং তাহারই অন্তরালে করুণ রসাত্মক ক্ষুদ্র ইতিহাস যেন উঁকি মারিতে থাকে। প্রথম দিনেই তিনি কহিলেন, 'তুমি'। শিহরিয়া উঠিলাম। গোড়া পত্তনের মুখে এতো আত্মীয়তা!

তাঁহার করুণ রসাত্মক ইতিহাস উপাখ্যান নহে, উলঙ্গ সত্য। নিশিকান্ত বলে, লোকটা অবিবাহিত। তাহার ধারণা, যাহাদের বিবাহিত জীবনের একটী 'ডিকেড' কাটিয়া গেছে, তাহাদের নারীর প্রতি সম্মান জ্ঞান শ্লাঘ্য প্রাপ্যের গণ্ডী ছাড়ায় না। নিশিকান্তের কথাই ঠিক। সুপ্রকাশ বাবুর বয়স চেহারার অনুপাতে অপ্রত্যাশিত হইলেও আজও অবিবাহিত।

বিলাপ শুনিতে শুনিতেই তাহার সহিত আলাপ, সেই কথাই বলিব। দুপুরে এককাপ চা পেটে পুরিয়া টালা হইতে টালিগঞ্জ হাটিতে হয়। তাই সন্ধ্যায় পার্কে বসিয়া বিশ্রাম লইতে চেষ্টা করি। দৈহিক বিশ্রাম মিলে, মানসিক বিশ্রাম নাই। অস্থি-চর্ম্মসার শিশুগুলি মানসপটে মূর্ত্ত হইতে থাকে। মনে আসে, কতকগুলি প্রাণীকে মৃত্যুমুখে টানিয়া লইয়া যাইতেছি।

"শিবরাম যে, তোমরা আছো বেশ!"

সুপ্রকাশবাবু আমার পার্শ্বের স্থানটি দখল করিয়া বসিলেন। এদিক-ওদিক তাকাইয়া তিনি কহিলেন, "আমার দুঃখটা কেউ বুঝলে না, ভাই।"

বোধ করি, অশ্রু এতক্ষণ আত্মগোপন করিয়াছিল। বুঝিবা, এখনি উপচাইয়া পড়ে? দুঃখ কাহার নাই? তিরিশ হইতে তিন হাজার মাসিক মূল্যের মানুষের দুঃখের অবধি

নাই। সকলেরই অবস্থা পাকা ফোঁড়ার মত। একটু টিপিলেই গল্ গল্ করিয়া পুঁজ নির্গত হইবে। তত্রাচ আগ্রহ-সহকারে তাহার দুঃখের ইতিহাস শুনিতে হয়। কারণ সম্প্রতি একটা কেস্ দিবার প্রতিশ্রুতি তিনি দিয়াছেন; মরনাপন্ন শিশুগুলি, বিশেষ বৃদ্ধা স্ত্রী আমার অগোচরেই ক্ষুদ্র গৃহকোণে ফিরিয়া যায়।

গলা সাফ করিয়া তিনি সুরু করিলেন, যখন বাড়ীর থেকে তাড়িয়ে দিলে সে কি দুর্য্যোগের রাত। মানুষ, কুকুর-বেড়াল তাড়ায় না। ধীর-স্থির তীব্র কণ্ঠে বললে, যান, বেড়িয়ে যান্।

তাহার আদ্রকণ্ঠ উপস্থিত ক্ষেত্রে বিচলিত করিল না, তত্রাচ ব্যথিতের ভাব দেখাইয়া কহিলাম, মানুষ এমনিই নিষ্ঠুর হয়, সুপ্রকাশবাবু!

"মানুষ নয়,—মেয়ে মানুষ! যাদের মন, প্রাণ কোমল, নরম যাদের সেন্টিমেন্ট।"

উত্তেজনার আবেগে দাঁড়াইয়া উঠিয়া, পুনরায় তিনি বসিয়া পড়িলেন। বুঝিলাম, ইনিও ব্যর্থ প্রেমিক। তাহাকে থামাইবার চেষ্টায় কহিলাম, তা' আর বলতে! এই ধরুন না, আমার গৃহিনী, শান্ত-শিষ্ট-নিরীহ পল্লীবালা, কিন্তু যখন ফোঁস্ করে উঠেন, বিষ নামাবার মন্ত্র পড়লেও রাগ নামে না। মেয়ে জাতটাই এমনি—

"ছিঃ! ছিঃ! অমন কথা বলো না 'ইন্‌ডিভিযুয়েলের' জন্য 'মাস্'কে য়্যাটাক ক'রো না।"

আমি থামিয়া গেলাম। ইতিমধ্যে তাহার দৃষ্টি আকাশের এক প্রান্তে চলিয়া গেছে। বোধ করি, তাহার অন্তর্দাহ কিঞ্চিৎ প্রশমিত হইয়াছে এবং অতীত সুখ-স্মৃতি মনে ভাসিয়া বেড়াইতেছে।

ইতিমধ্যে বহু পথচারীর দৃষ্টি বিদ্ধ হইয়াছি। স্থির করিলাম তাল মাফিক উঠিয়া পড়িব, কিন্তু সে সুযোগ মিলিল না। তিনি কহিলেন, প্রথম যেদিন সাহস করে তার সাথে কথা কয়েছিলাম—কি মৃদু, কি মিষ্টি তার কথা! সে-সুর এখনো কানে লেগে রয়েছে। তারপর মাসখানেক একটা সুখ-স্বপ্নের মাঝে গেল কেটে। সেদিন অন্তরের তাগিদে মনের বাসনাগুলোকে ব্যক্ত করলাম, তখনি শুনলাম, যান্, বেড়িয়ে যান্।

এমন রুদ্র ও করুণ রসের একত্র সমাবেশ দেখি নাই, কহিলাম, বাজবে না? মাস-জোর আকাশ কুসুম গড়ে শুনতে হোলো, যান্-বেড়িয়ে যান্।

করুণ রাগিনীতে আরো একটি নরম পর্দা চাপান হইল। অশ্রু-বিকৃত কণ্ঠে তিনি বলিলেন, তুমিই বলতো ভাই,—সুমহান প্রেমের সৌধ গড়ে করেছি বাস……

তাহার চক্ষের কোন দুইটি চক্ চক্ করিয়া উঠিল। আমি সমব্যথী হইয়াছি। বিবাহ করিয়াছি কিন্তু প্রেমে পড়ি নাই। তত্রাচ কেমন মনে হইল তাহার প্রেমের ভিত্তি আদৌ পাকা নহে। কিন্তু বলিলাম, কাগজে কাগজে লেখা উচিত। এর প্রতিবাদ করা দরকার—

প্রতিবাদের সুরেই তিনি জবাব দিলেন, প্রতিবাদের যুগ চলে গেছে, ভায়া, প্রতিরোধের দরকার হয়ে পড়েছে।

পুলিশ আসিয়া সুপ্রকাশবাবুর উচ্ছ্বাসের প্রতিবন্ধক হইল। তাহার ভাষায় জানাইল, আর বসা চলিবে না। আমি হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিলাম। ভগবান পুলিশরূপে আসিয়া আমায় উদ্ধার করিলেন, মনে মনে তাহাকে বার বার প্রণতি জানাইয়া মেসাভিমুখে পা চালাইলাম।

*

কয়েকদিন স্নান আহার ত্যাগ করিয়া একটি কেস্ যোগাড় হইব হইব হইয়াছে। সকালে ঘুম হইতে উঠিয়া তাহার কাছে চলিয়াছি। সুপ্রকাশবাবু হঠাৎ কোথা হইতে ঝড়ের মত আসিয়া, খপ্ করিয়া আমার একটি হাত চাপিয়া ধরিয়া অনুনয়ের সুরে কহিলেন, এক মিনিট, ভাই!

"মাপ করবেন। বড় ব্যস্ত—এসে শুনবো।"

তত্রাচ অতি করুণ কণ্ঠে কহিলেন, এক মিনিট, ভাই। তা'র সঙ্গে দেখা হয়েছিল। কিন্তু কথা কয়নি। তাচ্ছিল্যের, উপেক্ষার ভাব দেখালে। আমার তখনকার মনের অবস্থা বুঝতে পারছো তো—সবে নেকা ভিসুবিয়াস্ এ সেই বিক্ষুব্ধ মানর বাধা চেপে চেপে ব্লাডপ্রেসার গেল বেড়ে। তুমিই বলতো ভাই,—এই পরিণত বয়সে প্রেম, যেটা গভীর ভাবে দাগ কেটে যায়, যেটা স্মৃতির চিতা হয়ে ধক্ ধক্ করে জ্বলতে থাকে, যেটা…

বেচারী ব্যর্থ প্রেমিক! আয়ু হইতে প্রায় চল্লিশটা বৎসর বেমালুম খসিয়া গেছে, কিন্তু প্রেমের সাদা পাকা সাথাই

রহিয়া গেল। তাহার দুঃখে কাঁদিবার অবসর উপস্থিত আমার নাই। ঘড়ি দেখাইয়া কহিলাম, আটটা বাজে ভদ্রলোক হয়তো বেড়িয়ে পড়বেন। কাজ সেরে এসে আপনার ঘরে নিশ্চয় যাবো।

"তবে যাও, ভাই।"

সুপ্রকাশবাবু দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিলেন। আমিও দম বন্ধ করিয়া পা চালাইলাম।

*

উপর্য্যুপরি তিনটী কেস পাইয়া, গৃহিণীর অন্তরের বাসনা পূর্ণ করিতে মেস ত্যাগ করিয়া স্বল্প ভাড়ায় বাসা লইয়াছি। গৃহিণীও রীতিমত সংসার পাতিয়া ফেলিয়াছেন। কাজের চাপে ও সাংসারিক চিন্তার টানা-পড়েনে বাহিরের জগৎ সম্পূর্ণ অপরিচিত ও অজ্ঞাত। কাজের শেষে বাসায় ফিরিয়া, কোন রকমে কিছু গলাধঃকরণ করিয়া বিছানা লই। সাড় থাকে না। গৃহিণীর অভিমান ও অনুযোগ পুঞ্জিকৃত হইলেও, ইহাই দৈনন্দিন।

একদিন রাত্রে শুইতে যাইব, এমন সময় নারী কণ্ঠ নিঃসৃত ক্রন্দনসুর কানে আসিয়া মরমে পশিয়া আমায় বিচলিত করিল। বিছানায় উঠিয়া বসিয়া কান পাতিয়া শুনিতে লাগিলাম। গৃহিণী পান সাজিতেছিলেন, আমায় বসিতে দেখিয়া কহিলেন, ঘুম হচ্ছে না বুঝি? কিন্তু ছারপোকা আর একটীও নেই। সারা দুপুর বিছানা রদ্দুরে ছিল।

"কাঁদছে কে বলতো?"

"ঐ পাশের বাসার বৌটা। পান থেকে চুণ খস্‌লে আর রক্ষে নেই। মিন্সে একবারে গোঁয়ার-গোবিন্দ!"

গৃহিণী পান সাজিতে মন দিলেন। বুঝিলাম, তাঁহার ইহা সহিয়া গিয়াছে। কিন্তু আমার প্রশ্নে, তিনি আদ্যোপান্ত ইতিহাস ব্যক্ত করিলেন। কিছু দিন পূর্ব্বে এক ভদ্রলোক আমার পাশের বাসায় বাসা বাঁধিয়াছেন। সংসার বলিতে আপনি ও স্ত্রী। বউটীর রূপ ও গুণ দুইই আছে কিন্তু সামান্য ত্রুটি-বিচ্যুতিতে স্বামীটী প্রহার করিয়া থাকেন যাহা হউক, গৃহিণীর কথিত মিন্সেকে আবিষ্কারের দুর্ভাবনায় রহিলাম।

সকালে ঘুম হইতে উঠিয়াই পাশের বাসার দরজায় ধাক্কা দিলাম।

জানালার ভিতর হইতে গৃহিণী কহিলেন, কি দরকার বাপু!

আমার মেজাজের টেম্পারেচর তখন ব্যারোমিটার ছাড়িয়ে গেছে, সজোরে কড়া নাড়িলাম। দরজা খুলিয়া গেল—ভিতরে দাঁড়িয়ে সুপ্রকাশবাবু। আমার কাছে এতদিন অপ্রকাশিত ছিলেন, সবিস্ময়ে বলিয়া উঠিলাম, আপনি?

সহর্ষে তিনি কহিলেন, আরে, শিবরাম যে—এস এস, ভেতরে এস—তারপর থাকা হচ্ছে কোথায়? কাজ-কর্ম্ম চলছে কেমন?

"একই রকম।"

সুপ্রকাশবাবু আমায় টানিয়া তাহার শয়নকক্ষে লইয়া গেলেন; গলা ছাড়িয়া তিনি কহিলেন, শুনছো ভাল করে দু'পেয়ালা চা বানাও দিকি। আঃ শিবরাম, আড়ষ্ট হয়ে রয়েছ কেন?

তাহাকে দেখিয়া রাগ জল হইয়া ঘামরূপে দেখা দিয়াছে। আবার সেই ব্যর্থ প্রেমের করুণ কাহিনী শুনিতে হইবে নাকি? না, সুপ্রকাশবাবু সে দিক্ দিয়া গেলেন না।

বিছানার উপর শরৎবাবুর "নারীর মূল্য" পড়িয়া ছিল। বইটী হাতে তুলিয়া তিনি কহিলেন, পড়ছিলাম শরৎবাবুর নারীর মূল্য। মেয়েদের বুঝেছেন এই একটী মাত্র লোক উঁর অন্নদাদিদি বাঙলার ঘরে ঘরে আচ্ছা, আমাদের মেয়েরা দুঃখ কষ্ট সহ্য করবার এত শক্তি পেলেন কোত্থেকে আর পুরুষেরা এত নিষ্ঠুর হোলো কেমন ক'রে?

উত্তরে কহিলাম, জন্মান্তরের সংস্কার।

আমাদের আলোচনার মোড় ফিরিয়া রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে আসিল। অবশেষে, সুভাসবাবু ও চিত্রার 'পরিচয়ে' আসিয়া থামিল। ও-দিকে চুড়ির ঠুং ঠাং শব্দে বোঝা গেল, চা প্রস্তুত হইয়াছে। সুপ্রকাশবাবু কহিলেন, ভেতরে এস না, লজ্জা কিসের?—পাড়া-পড়শী বিপদে-আপদে দেখা-শোনা করবে।

হাতখানেক ঘোমটা টানিয়া সুপ্রকাশবাবুর স্ত্রী ঘরে প্রবেশ করিয়া চা পরিবেশন করিয়া চলিয়া গেলেন। সুপ্রকাশবাবু মৃদু হাসিয়া কহিলেন, একেবারে প্রাচীন মতের। কোথাও, কারোর কাছে বেরুবে না। যত বলি,

যাও, যাও পাশের বাসার মেয়েদের সঙ্গে আলাপ করে এস—

কহিলাম, এক রকম ভাল।

চায়ের পর্ব্বের শেষে বিশেষ কাজের অজুহাতে উঠিয়া পড়িলাম। মনে মনে কহিলাম, গৃহিণীর ভুল, অপর কোন বাসার স্ত্রী-নির্য্যাতন হয়। সুপ্রকাশবাবুর মত মার্জ্জিত ভদ্রলোক বন্য মতের পরিচয় দিতে পারেন কখন?

কিন্তু দরজা পার হইয়া রাস্তায় নামিতেই শুনিলাম, ওর দিকে অমন করে চাইছিলে কেন? গিলে খাবি নাকি?

তারপর দুপ্-দাপ্ শব্দ ও রুদ্ধ কণ্ঠের ক্রন্দন শুনা গেল। আমি বিচলিত ও উত্তেজিত হইলাম। ভাবিলাম, দরজা ভাঙ্গিয়া গিয়া সুপ্রকাশবাবুকে উচিত মত শিক্ষা দিয়া আসি।

গৃহিণী তখনো জানালায় দাঁড়াইয়া, কহিলেন, কি দরকার বাপু!

গৃহিণীর সুরে আমার মনের সুর মিশিয়া গেল। সত্যই, পরের ব্যাপারে মাথা গলান যুক্তি সঙ্গত নহে। তা'ছাড়া, তাঁহার অতীতের সুমহান প্রেমের অপমাননা করিতে আমার মন সরিল না।

রঙ্গমঞ্চে আপনি অবতীর্ণ না হইয়া পাড়ার ছেলেদের, যাহাদের, নারীর অমর্য্যাদার কথা শুনিলে রক্ত গরম হইয়া যায় এবং সুযোগ পাইলে মর্য্যাদা-হানি করিতে ছাড়ে না, তাহাদের উত্তেজিত করিয়া বাসায় চলিয়া আসিলাম।

কিন্তু চা খাইতে খাইতে তাঁহার কয়েকটা কথা বার বার মনে পড়িতে লাগিল, প্রতিবাদের দিন চলে গেছে, ভাই, প্রতিরোধের প্রয়োজন হয়ে পড়েছে।

বোধ করি, তাহারই ডিমনস্ট্রেশন্ চলিয়াছে।

বোধন*

—শ্রীনকুলেশ্বর পাল বি, এল্

বাংলাতে আর আসিস্ না মা—শক্তিহীন আজ শৈলরাজ
রাজার রাণী, ভিখারিণী মা মেনকার মলিন সাজ।

এত সাধের আসবে উমা, মায়ের পরাণ কেমন করে,
কি তুলে তোর ধরবে মুখে—নাইকো কিছুই আজ যে ঘরে।

ছিল যে মা দধি দুধের ঢেউ খেলান ভাণ্ড হেথা;
দুধের ছেলের মুখে দিতেও এক ফোঁটা নাই দুগ্ধ সেথা।

এত দিনেও পাষাণী তুই, কেমন ক'রে আছিস্ ভুলে,
ভিখারী তোর ছেলের দলে—নিস্‌নি আজো কোলে তুলে।

অন্নহীনের, বস্ত্রহীনের, শক্তিহীনের জীর্ণ ঘরে
নয়ন জলের বোধন ধারা বুকের পরে অঝোর ঝরে।

উমার বেশে আস্‌তে না চাস, পর্-মা গলে মুণ্ডমালা
শ্মশান বুকে আয় পাষাণী—মুক্তকেশী জগত আলা।

ক্ষ্যাপারে তুই আনিস্ সাথে—কণ্ঠে নিয়ে অযুত ফণা,
বিষ ঢেলে দিক্ বাংলা-বুকে,—চাইনা মা তোর স্নেহের কণা।

পরের ঘরে পর হ'য়েছে বুঝ্‌তে পেলাম এত দিনে,
পাষাণ কুলে জন্ম উমার, প্রাণ হ'বে কি পাষাণ বিনে?

কৈলাসে তুই আছিস্ সুখে—ভুলে যা মা মায়ের কথা,
মা মেনকার সজল আঁখি—জাগায় বুঝি কাঁটার ব্যথা।

বোধনে আজ সানাই বাজে, কাঁদন সুরে বিদায় গানে,
উমা এসেই চাইছে বিদায়—মায়ের ব্যথা সে কি জানে?

বাংলা মায়ের শ্মশান বুকে আমরা আছি জ্যান্তে মরা,
এম্‌নি ক'রে দুঃখ দিতে আসিস্ না আর দুঃখহরা।

বঙ্কিমচন্দ্র ও গিরিশচন্দ্র

—শ্রীকুমুদবন্ধু সেনগুপ্ত
গিরিশচন্দ্র ঘোষ অধ্যাপক (১৯৩০)

বর্ত্তমান প্রবন্ধটী বঙ্কিমচন্দ্র ও গিরিশচন্দ্রের তুলনামূলক নহে। একজন বাঙ্গলার সাহিত্যগুরু, সাহিত্যসম্রাট্, মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষির আসনে আসীন, অপরে বাঙ্গলার নাট্যগুরু, নাট্যসম্রাট, শ্রেষ্ঠ অভিনেতা ও তত্ত্বদর্শী ভক্ত—ইঁহাদের তুলনামূলক সমালোচনা চলিতে পারে না বলিয়া আমার বিশ্বাস, সে ধৃষ্টতা আমার নাই। তবে দুইজনের মধ্যে কর্ম্মক্ষেত্রে একটা আদর্শের ঐক্য আছে, তাহারই আলোচনা করিতে আমি প্রয়াস করিব।

দুইজনের ইউরোপীয় সাহিত্যের দৃষ্টিভঙ্গী ছিল—ইউ-রোপীয় সাহিত্যের আলোকে এবং ছাঁচে ইঁহারা উভয়ে বিষয়বস্তুকে সাজাইতেন। কিন্তু উভয়েই ভারতীয় ধর্ম্মের আদর্শকে পুরোভাগে রাখিতেন। গিরিশচন্দ্রের প্রধানতঃ অবলম্বন ছিল—মহাভারত, রামায়ণ ও পুরাণাদি এবং বঙ্কিমচন্দ্রের ছিল মহাভারতোক্ত গীতা ও যোগদর্শন। বঙ্কিমের প্রায় প্রত্যেক উপন্যাসেই অলৌকিক যোগ-বিভূতিসম্পন্ন সন্ন্যাসী ও দার্শনিক, ডাকাত বা বিদ্রোহী দেখা যায়। দেবী চৌধুরাণী গ্রন্থে তিনি গীতার তত্ত্ব, নিষ্কাম কর্ম্মযোগ বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন, জ্ঞান বিচারের দ্বারা তিনি হিন্দুধর্ম্মকে বুঝাইবার প্রয়াস পাইয়াছেন, পুরাণাদি ও মহাভারত হইতে শ্রীকৃষ্ণ চরিত্রে নবালোকসম্পাত করিয়াছেন এবং আধুনিক প্রতীচ্যের যুক্তিতর্ক ও অনুসন্ধিৎসার প্রণালীতে শ্রীকৃষ্ণ-চরিত্রকে পরিস্ফুট ভাবে অঙ্কিত করিয়া মহামহিম গৌরবোজ্জ্বল আদর্শরূপে সাধারণের সম্মুখে ধরিয়াছেন। গিরিশচন্দ্র পুরাণ, মহাভারত ও রামায়ণ এবং ভক্তমালা হইতে যে উপাদান সমূহ লইয়াছেন—তাহাতে পাশ্চাত্ত্য নাটকীয় ছাঁচে প্রাচীন আদর্শকে উজ্জ্বলভাবে দেখাইতে যত্ন করিয়াছেন। নাট্যকার তাহাতে কোন নূতন তত্ত্ব বা কোন অনুসন্ধিৎসার রেখাপাত করেন নাই বা করিবার চেষ্টা করেন নাই। তিনি প্রাচীন ভাবটী পরিস্ফুট করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। তাই জনসাধারণ গিরিশচন্দ্রের চরিত্রগুলির সহিত সহানুভূতি প্রদর্শন করিত। বঙ্কিমচন্দ্রের অনুশীলনতত্ত্ব বা শ্রীকৃষ্ণ-চরিত্র শিক্ষিত সম্প্রদায়ের আদরের এবং আলোচ্যবস্তু। জনসাধারণ এবং প্রাচীনপন্থীরা উহা সমগ্রভাবে গ্রহণ করিতে সক্ষম হইত না। যাঁহারা ভক্ত এবং ভাবের উপাসক, তাহারা আজ পর্য্যন্ত বঙ্কিমের শ্রীকৃষ্ণ-চরিত্রকে তাহাদের উপাস্যের সহিত মিলাইতে পারে নাই। তবু উভয়ের লক্ষ্য ছিল, অতীত হিন্দু আদর্শকে বর্ত্তমান যুগের চিন্তাধারার প্রণালীতে



বঙ্কিমচন্দ্র

প্রচার করিতে। এই আদর্শ এবং লক্ষ্য সম্বন্ধে উভয়ের মধ্যে একটা সাদৃশ্য ছিল—তবে একজন ছিলেন জ্ঞানী ও সূক্ষ্ম বিচার সম্পন্ন এবং অন্যজন ছিলেন ভক্ত ও ভাবুক। সাহিত্যসৃষ্টির দৃষ্টিভঙ্গী ও প্রেরণা উভয়ে পাইয়াছিলেন—ইংরাজী সাহিত্যের আলোচনায়। স্যার ওয়াল্টার স্কট, লর্ড

লিটন, ডিকেন্স প্রভৃতি ঔপন্যাসিকদের প্রণালী বঙ্কিমকে উপন্যাস রচনায় প্রেরণা দান করিয়াছিল এবং সেক্সপীয়ার প্রমুখ শ্রেষ্ঠ নাট্যকারগণের রচিত নাটকাবলীর রচনাভঙ্গী গিরিশচন্দ্রকে মুগ্ধ করিয়া প্রেরণা দিয়াছিল তাঁহার নাটক রচনায়। উভয়ের রচনাতেই এতদ্দেশীয় চরিত্রসৃষ্টি ও কথোপকথনে বিলাতী পাশ্চাত্ত্যের ছায়া আসিয়া পড়িয়াছে। কিন্তু এই ছায়া তাঁহাদের অগৌরব নহে। ইহা কাহারও ধার করা ভাব বা অনুকরণ নহে। পাশ্চাত্য সাহিত্যরসে পুষ্ট মনের ইহা স্বাভাবিক আত্মপ্রকাশ। বঙ্কিম, শান্তিকে ঘোড়া চড়াইতে বা একাকিনী শত্রু শিবিরে পাঠাইতে দ্বিধা বোধ করেন নাই এবং দেবীচৌধুরাণী বা প্রফুল্লকে ভবানী পাঠক ব্যায়াম করাইতে বাধ্য করিয়াছিলেন। ইহা দোষের নহে, অতীতে যদিও বাঙলাদেশে ইহা স্ত্রীজাতির পক্ষে নিন্দনীয় ছিল, তবু কবিরা ভবিষ্যৎদ্রষ্টা, আজ ইহা অসম্ভব নয়। বঙ্কিম স্বদেশপ্রেমের যে ভাবী উজ্জ্বল ছবি দেখিয়াছিলেন— তাহাই আঁকিয়াছেন। গিরিশচন্দ্র তাঁহার নাটকে এইরূপ অসম সাহসিক স্ত্রী চরিত্র আঁকিতে দ্বিধা করেন নাই। ইঁহাদের উভয়ের মধ্যেই ছিল একটা স্বদেশপ্রেমের গাঢ় অনুভূতি। সিরাজদ্দৌল্লা, মীরকাশিম ও ছত্রপতি শিবাজী গিরিশের স্বদেশপ্রেমের আগ্নেয়গিরির উচ্ছ্বাস। দুঃখের বিষয়, এই পুস্তকগুলি সরকার হইতে বাজেয়াপ্ত হইয়াছে। এই সম্বন্ধে গিরিশ-ভক্তেরা এবং জনসাধারণ নীরব। শরচ্চন্দ্রের "পথের দাবী" সাহিত্যে বাজেয়াপ্তির কবল হইতে তাহার দাবী লইয়া পুনরায় প্রকাশ পাইয়াছে। গিরিশচন্দ্রের সম্বন্ধে সকলেই নীরব। অথচ স্বদেশীযুগে এই পুস্তকগুলি দেশবাসীদিগকে স্বদেশপ্রেমে উদ্বোধিত করিয়াছে। বঙ্কিমের "আনন্দমঠে"র তুলনা নাই—ইহা স্বদেশপ্রেমের গোমুখী নির্ঝর—হিমালয়ের ভাগীরথীপ্রবাহ। জাতীয় জীবনের হৃদয়-সমুদ্রে মিশিয়া "বন্দেমাতরম্" ধ্বনিতে নিরবচ্ছিন্ন ভাব-তরঙ্গে গম্ভীর ধ্বনিতে ভারতের বেলাভূমিতে আছড়াইয়া পড়িতেছে। রাজসিংহ উপন্যাসে বঙ্কিম যেমন রাজপুতনার ইতিহাসে টড্ প্রভৃতি ইংরাজ ঐতিহাসিকদের নিরপেক্ষ তথ্য গ্রহণ করিয়াছেন, গিরিশচন্দ্র তাঁহার ঐতিহাসিক নাটক "চণ্ড" রাজপুতানার টড্ হইতে তেমনই উপাদান সংগ্রহ করিয়াছেন। জাতীয় ভাবোদ্দীপক ঐতিহাসিক নাটক সিরাজদ্দৌল্লা, মীরকাশিম প্রভৃতিতে সেই পথ অনুসরণ করিয়াছিল।

বঙ্কিম ও গিরিশ রঙ্গমঞ্চেই সমসূত্রে জনসাধারণের সমক্ষে দাঁড়াইয়াছেন। বঙ্কিমের উপন্যাসগুলি গিরিশ নাটকাকারে সাজাইয়া সর্ব্বপ্রথমে জনসাধারণকে নিজ অভিনয়-নৈপুণ্য এবং শিক্ষার কৌশলে এই নূতন রসামৃত পান করাইয়াছেন। উপন্যাস—উপন্যাস—নাটকীয় গুণ থাকিলেও ইহা নাটক নহে। গিরিশ তাঁহার অপূর্ব্ব নাট্যকলা-কৌশলে বঙ্কিমের উপন্যাসগুলির জীবন্ত আলেখ্য তুলিয়া ধরিয়াছেন। বঙ্কিমের উপন্যাস বাঙ্গলার শিক্ষিত সম্প্রদায়ের অত্যন্ত আদরের বস্তু ছিল। বাঙ্গলার শিক্ষিত নরনারী ব্যগ্রভাবে প্রতীক্ষা করিতেন বঙ্কিম সম্পাদিত "বঙ্গদর্শনের" পরবর্ত্তী সংখ্যা কবে বাহির হইবে। কিন্তু ইহার রসাস্বাদন করিতেন মুষ্টিমেয় নর-নারী। আধুনিক যুগের তুলনায় ইহা নগণ্য। যদি পাশ্চাত্ত্য প্রদেশ হইত, তবে সংস্করণের পর সংস্করণ বঙ্কিমের লক্ষ লক্ষ গ্রন্থ বিক্রয় হইত। সস্তা মূল্যে গ্রন্থাবলীর আকারে বিক্রয় করিবার জন্য এত বিজ্ঞাপন দিবার আবশ্যক হইত না। শিক্ষিত বাঙ্গালী আজও অর্থব্যয় করিয়া সদ্‌গ্রন্থ কিনিয়া পড়িতে কুণ্ঠিত। কিন্তু গিরিশ, বঙ্কিমচন্দ্রের গ্রন্থাবলীকে নাটকাকারে অভিনয় করিয়া বাঙ্গলার সর্ব্বত্র প্রচার করিয়াছেন। নাট্যালয়ের পাদপীঠে বঙ্কিম ও গিরিশ প্রতিভা সম্মিলিত ভাবে * যে সাহিত্যরস পরিবেশন করিয়াছে তাহা অপূর্ব্ব। বাস্তবিকই কি প্রাচ্যে কি প্রতীচ্যে কোথাও এইরূপ দুই বিরাট প্রতিভার সম্মেলনে সাহিত্যসৃষ্টি হয় নাই। বঙ্কিমের সাহিত্য-প্রতিভার মধ্যাহ্নযুগে, নটশ্রেষ্ঠ গিরিশের অভিনয়-খ্যাতির দীপ্তিকালে, নাট্যকার গিরীশচন্দ্রের নাট্য-প্রতিভার উন্মেষ সময়ে এই রসরচনার সৃষ্টি। বঙ্কিম স্বয়ং কতদিন তাঁহার রচিত চরিত্রগুলির নাটকীয় রূপ রঙ্গমঞ্চে দেখিতে গিয়াছেন এবং আনন্দে গিরিশকে মৌখিক প্রশংসা

---

* বঙ্কিমচন্দ্র এবিষয়ে গিরিশচন্দ্রকে যে একখানি পত্র লিখিয়াছিলেন এখানে তাহার উল্লেখ প্রয়োজন। বঙ্কিম লিখিয়াছিলেন "আপনি সুলেখক ও উৎকৃষ্ট বোদ্ধা, আপনার যত্নে আমার রচনা আশাতীত সফলতা লাভ করিবে ইহা আমি খুব ভরসা করি—ইতি, শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

পাঠক, পত্রখানি "নববিভাকর ও সাধারণী" পত্রিকার ১২৯৪ সালের ২৪ই কার্ত্তিকের সংখ্যায় পাইবেন। ইতি—বঙ্গশ্রী সম্পাদক।

করিয়াছেন। গিরিশ ও বঙ্কিম উভয়েই উভয়কে খুব ঘনিষ্ঠ ভাবেই চিনিতেন। অবশ্য জামাতার চরিত্রহীনতায় ও পাপ-বাসনায় বঙ্কিম রঙ্গমঞ্চের উপর বিতৃষ্ণ হইয়াছিলেন। তাঁহার কন্যার শোচনীয় মৃত্যুর নিদারুণ শোকে বঙ্কিম মুহ্যমান হইয়া পড়েন। থিয়েটারের সংস্রবে আসিয়া তাঁহার জামাতার চরিত্র স্খলন এবং হৃদয়হীন পশুপদবীতে পরিণতি হইয়াছিল বলিয়া বঙ্কিমের দৃঢ় ধারণা হইয়াছিল। ইহার পর বঙ্কিম কদাচিৎ রঙ্গালয়ের অভিনয় দর্শন করিতে আসিতেন। এইজন্য অনেকের ধারণা এবং সেরূপ মতামত প্রকাশ করিতেও কোন কোন সাহিত্যিক দ্বিধা করেন নাই যে, বঙ্কিম গিরিশের প্রতি বিতৃষ্ণ ছিলেন এবং তাঁহার রচিত নাটকগুলি সম্বন্ধে তাঁহার অত্যন্ত হীন ধারণা ছিল। কিন্তু ইহা সম্পূর্ণ ভুল। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বঙ্কিম ও গিরীশ পরস্পর ঘনিষ্ঠ ভাবেই পরিচিত ছিলেন এবং এইরূপ পরস্পরের সম্বন্ধে ঘনিষ্ঠতা ছিল বলিয়াই বঙ্কিম গিরিশের নাটক সম্বন্ধে কোন মতামত প্রকাশ করেন নাই। দীনবন্ধুর জীবিত কালেও বঙ্কিম তেমন ভাবে তাঁহার নাটকাবলীর প্রশংসা করেন নাই। বাঙ্গলাদেশে গিরিশের আবির্ভাবের পূর্ব্বে এবং সমসময়ে অসংখ্য নাটক প্রকাশিত হইত। পুলিশের মোকদ্দমা, তারকেশ্বরের মহন্তের হত্যা প্রভৃতি বিষয় বস্তু লইয়া ছাপাখানায় ছারপোকার মত নাটক প্রকাশিত হইত। এই ধরণের পুস্তকাদি সম্বন্ধে বঙ্গদর্শনে বাহির হইয়াছিল,—বাংলার নাটক "না টক্ না মিষ্টি।" তাহাও বঙ্কিমচন্দ্রের সম্পাদিত বঙ্গদর্শনের সংখ্যায় প্রকাশিত হয় নাই। যাহা হউক, সাহিত্যক্ষেত্রে বঙ্কিম ও গিরিশের যোগসূত্র রঙ্গমঞ্চে সর্ব্বসমক্ষে পরিদৃষ্ট হইয়াছে। যদি গিরিশকে নাট্যকার হিসাবে বঙ্কিম অযোগ্য মনে করিতেন, তবে তাঁহার গ্রন্থগুলি অযোগ্য হস্তে নাটকাকারে পরিণত করিতে দিতেন না, ইহা নিশ্চয়। বঙ্কিম সাহিত্যক্ষেত্রে এই বিষয় দৃঢ়সংকল্প পুরুষ ছিলেন। আবার যদি হীনতা স্বীকারে এবং তোষামোদের দ্বারা বঙ্কিমের গ্রন্থগুলি নাটকাকারে রূপান্তরিত করিতে বঙ্কিমের অনুমতি লাভের জন্য গিরিশকে প্রয়াস পাইতে হইত, তবে অটল, নির্ভীক, তেজস্বী গিরিশচন্দ্র কখনও সেই পথ অবলম্বন করিয়া বঙ্কিমের উপন্যাসগুলি নাটকাকারে গ্রথিত করিতেন না। যাঁহারা গিরিশের সংস্পর্শে আসিয়াছেন তাঁহারা জানেন, গিরিশের এই বিষয়ে কেমন বিতৃষ্ণা ছিল।

শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবকে বঙ্কিম আহিরীটোলায় স্বর্গীয় অধর সেনের বাড়ীতে দর্শন করিয়াছিলেন এবং তাঁহার সহিত অনেক কথাবার্ত্তা এবং আলাপ আলোচনা হইয়াছিল। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত প্রণেতা (স্বর্গীয় মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয়) শ্রীম পরিশিষ্টে লিখিয়াছেন যে, শ্রীরামকৃষ্ণের আদেশে তিনি ও গিরিশ বঙ্কিমের নিকট গিয়াছিলেন। ইহা পড়িয়া আমি শ্রীম'র নিকট গিয়া তাঁহার নিকট আনুপূর্ব্বিক বৃত্তান্ত শুনিতে আগ্রহ প্রকাশ করি। তিনি বলিলেন যে,



গিরিশচন্দ্র

"গিরিশ বাবুর সহিত বঙ্কিমের ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল বলিয়া ঠাকুর আমাকে তাঁহার সঙ্গে বঙ্কিমের নিকটে যাইতে বলিলেন। বঙ্কিম অধর বাবুর বাড়ীতে ঠাকুরকে বলিয়াছিলেন যে, তিনি দক্ষিণেশ্বরে তাঁহাকে দর্শন করিতে যাইবেন। তিনি কবে তথায় যাইবেন, ইহা জানিবার জন্য আমাদিগকে বঙ্কিম বাবুর নিকট পাঠাইয়াছিলেন। আমরা তাঁর কলিকাতার বাড়ীতে গেলাম। সংবাদ পাইয়া তিনি আসিয়া গিরিশ বাবুকে সমাদর করিয়া বসাইলেন এবং তাঁহারা দুইজনে পরস্পরের বই সম্বন্ধে

কথাবার্ত্তা বলিতে লাগিলেন। আমি একপাশে দাঁড়াইয়া ছিলাম। আমি শ্রীম'কে এইখানে জিজ্ঞাসা করিলাম যে, আপনাকে বঙ্কিম বাবু বসিবার জন্য সমাদর করিলেন না। তিনি বলিলেন যে, গিরিশ বাবু ও বঙ্কিম দুইজনের মধ্যে প্রায় ৮।১০ বৎসরের ব্যবধান। দুইজনে Literary men (সাহিত্যিক) দুইজনে তাহা লইয়া কথাবার্ত্তায় মাতিয়াছিলেন। আমি এঁদের চেয়ে অনেক ছোট। আমার বয়স তখন ২৯।৩০ হইবে, এঁদের কাছে নেহাৎ ছোকরা। আমিও একমনে দুইজনের কথাবার্ত্তা শুনতে লাগিলাম। তাঁদের দু'জনের আলাপ শেষ হ'লে আমি ঠাকুরের কথা উত্থাপন করিলাম। গিরিশ বাবু তখন বলিলেন, আপনি একদিন দক্ষিণেশ্বরে যেতে চেয়েছিলেন। তিনি আমাদের আপনার কাছে জানিতে পাঠালেন যে, আপনার সেখানে যাবার কবে সুবিধা হবে। বঙ্কিম বাবু উত্তর করিলেন, "আমার যাবার খুব ইচ্ছা আছে, সেদিন অধর বাবুর বাড়ীতে দেখে অত্যন্ত আনন্দ হয়েছিল। তাঁকে শুধু দক্ষিণেশ্বরে গিয়ে দেখবার ইচ্ছে আছে তা নয়—এখানে একবার আনবার মনে মনে আমার আগ্রহ আছে। তবে বড় কাজ-কর্ম্মের ভিড়, কবে সময় করে যেতে পারব, তা ঠিক আপনাদের আজ জানাতে পারছি না। সুবিধা হলেই আমি (গিরিশ বাবুকে লক্ষ্য করিয়া) আপনাকে জানাব।" কিন্তু দুঃখের বিষয় বঙ্কিমচন্দ্রের ইহার কোনটাই কার্য্যে পরিণত হয় নাই। তাঁহারা বঙ্কিম-বাবুর নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন। শ্রী'ম কথিত উপরোক্ত ঘটনায় বোঝা যায়, ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত উভয়ের মধ্যে খুব সদ্ভাব ও প্রীতিই ছিল।

যাহা হউক, বাঙ্গলাদেশে বঙ্কিম ও গিরিশপ্রতিভার মিলন-ক্ষেত্র হইয়াছিল বাঙ্গলার রঙ্গমঞ্চ। বঙ্কিমের সম্মুখেই গিরিশ তাঁহার নাটকীয় অভিনয় করিয়া দেখাইয়াছেন। সাহিত্যগুরু ঔপন্যাসিক বঙ্কিমের নিকট নটগুরু নাট্যকার গিরিশচন্দ্র স্বীয় নাট্যপ্রতিভার পরিচয় দিয়াছিলেন উপন্যাসগুলির নাটকীয় রূপান্তরে—উভয় জীবনের ইহাই সাহিত্যিক যোগসূত্র। উভয়ের জীবন হইতে এই অধ্যায়টী বাদ দিলে তাঁহাদের জীবনেতিহাস অসম্পূর্ণ রহিয়া যাইবে। বাঙ্গলায় গিরীশ ছিলেন বঙ্কিম-সাহিত্যের প্রচারক ও রস-পরিবেশক, ইহা ভুলিলে চলিবে না।

কেমনে সহিছ প্রভু এই অত্যাচার

—শ্রীগীষ্পতি ভট্টাচার্য্য

কেমনে সহিছ প্রভু এই অত্যাচার ?
তোমার আসনপ্রান্তে তপ্ত রক্তধার—
ধরণীর প্রান্ত হতে আজও কি বহেনি ?
হন্যমান মানবের আর্ত্ত হাহাকার—
আজও কি ধরার বার্ত্তা তোমারে কহেনি ?

শ্বাপদ জন্তুর বল দংষ্ট্রা ও নখর,
গুহাচারী মানবের যষ্টি ও প্রস্তর,
সে' সবারে ছাপায়েছে সুসভ্য মানব।
সভ্যতার গরবেতে ঘূর্ণিত অন্তর
হত্যার উৎসবে মাতে—এরা কি দানব ?

বিস্মিত অন্তর ভাবে কোথায় প্রভেদ !
জিঘাংসা চাপিয়া মারে সর্ব্ব দুঃখ খেদ !
করুণার কোমলতা হিংসার আক্রোশে
ডুবে মরে, মমতার করে' মর্ম্মচ্ছেদ—
মানুষ মানুষে হানে পৈশাচিক রোষে।

মানুষ দেবতা নাকি !—এইকি দেবতা ?
পুরাণে লুকায়ে থাক পুরাণের কথা।
ন্যায়ের মুখোস পরি' সত্যের প্রলাপে,
বলে যবে অতি উচ্চ তত্ত্বের বারতা,
পরস্ব লোলুপ নর এ উহারে চাপে।

মানুষ মানুষে হানে মৃত্যু ভয়ঙ্কর ;
ফুঁসিছে জাগিয়া উঠি লোভ অজগর ;
দেশপ্রেম নামে করে দেশের সংহার ;—
তবু তব দেখা নাই শূলী মহেশ্বর !
কেমনে সহিছ প্রভু, এই অত্যাচার ?

ধামালী ও শ্রীকৃষ্ণকীর্তন

—শ্রীরামেন্দ্র দেশমুখ্য

ধামালী যে কি—তাহা লইয়া পণ্ডিত সমাজে একটি সমস্যা রহিয়াছে। আমি নৃত্যজ্ঞ কিংবা রাগ-রসিক কোনটিই নই। তবু সেই সমস্যার উপর যৎকিঞ্চিৎ আলোকপাত করিবার চেষ্টা করিতেছি।

ডক্টর মুহম্মদ্ এনামুল হক এবং আবদুল করিম সাহিত্য-বিশারদ কর্তৃক লিখিত "আরকান-রাজসভায় বাঙ্গালা সাহিত্য" পুস্তকে ধামালী গানকে অশ্লীল গান বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। তাঁহারা দোনাগাজী চৌধুরীর 'সয়ফুল্ মুলুক ও বদিউজ্জমাল' কাব্যের :

'কেহ পান গুয়া খাএ, আনন্দে ধামালী গাএ
কন্দুকে করএ নানা কেলি।'

এই অংশের 'ধামালী' শব্দের টীকা করিয়াছেন 'অশ্লীল গান' (পৃঃ ৯৪)। ধামালী গান যে কি বস্তু এবং সেই সম্বন্ধে তিনি তখন কতোখানি অভিজ্ঞ ছিলেন—তাহা বিচার সাপেক্ষ। যাহা হউক, বর্তমান প্রবন্ধে এই লইয়া খানিকটা আলোচনা করিবার চেষ্টা করিতেছি।

নগেন্দ্রনাথ বসু সম্পাদিত 'সঙ্গীতরাগ কল্পদ্রুম' গ্রন্থে 'ধামার', 'ধমার', 'ধমাল', 'ধামাল' এই চারিটি শব্দের উল্লেখ আছে। এই সবগুলি শব্দই একার্থে ব্যবহৃত। অন্ততঃ এই পুস্তকখানিতে (অবশ্য যদি ছাপার ভুল না হয়) একই অর্থে ব্যবহার করা হইয়াছে। রাগসাগর মহাশয় হিন্দুস্থানী লোক ছিলেন, সুতরাং 'ধমার'ই বলিবেন। আর ইহা ছাড়া সংস্কৃতে তো "বলয়োরভেদঃ" সূত্রই রহিয়াছে।

রাগ-রাগিনীর দিক হইতে, এই বইখানিতে 'ধামাল' শব্দের দুই প্রকার ব্যবহার আমরা পাইতেছি। প্রথমতঃ, মূল সুর যখন ভৈরবী, তখন একতালা বা ঠুংরি বা কাওয়ালীর মত ধমার সেই মূল রাগিনীকে একটি বিশিষ্ট পর্যায়ে আনিতে সাহায্য করিতেছে। দ্বিতীয়তঃ, ধমার নিজেই একটি মূল রাগ এবং চৌতালায় গীত হইতেছে। অর্থাৎ, তাল হিসাবে এবং মূল রাগ হিসাবে (ধমার-চৌতাল)—দুই প্রকারেই ব্যবহৃত হইয়াছে।

এখন প্রশ্ন তোলা যাইতে পারে যে, এই ধামালের সঙ্গে আমাদের ধামালীর সম্পর্ক কোথায়? মুস্কিল হইল, কল্পদ্রুমখানির মূল সংগ্রাহক রাগসাগর কৃষ্ণানন্দ ব্যাসদেব রাগরাগিনী সম্বন্ধে কোন দিগ্‌দর্শনী রাখিয়া যান নাই। অন্ততঃ রাখিয়া গিয়াছেন বলিয়া আমার জানা নাই। এই কথা বলিতেছি এই জন্য যে, তিন খণ্ডে সম্পূর্ণ কল্পদ্রুমখানির মাত্র এক খণ্ড কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারে রক্ষিত আছে এবং আমি তাহাই দেখিবার সুযোগ মাত্র পাইয়াছি। একটা জিনিষ আমার অনুমান হইতেছে যে, বোধ হয়, ধামাল ও ধামালীর মধ্যে সুরের অনেকটা সামঞ্জস্য আছে। কেন না ঐ সকল গানের কথা ও ছন্দ আমাদের ধামালী গানেরই অনুরূপ।

শ্রীযুক্ত সুকুমার সেন 'বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে' লিখিয়াছেন "ধামালী জাতীয় খাসাঘাত প্রধান ছন্দে ভারতচন্দ্র পূর্ব্ববর্ত্তী এবং পরবর্ত্তী বহু কবিকে ছাড়াইয়া গিয়াছেন।" তাহা হইলে তাহার মতে, খাসাঘাত ছন্দকে ধামালীর একটি বৈশিষ্ট্য হিসাবে আমরা পাই।

'আমার উমা মেয়ের চুড়া, তাজড় পাগল ঐ না বুড়া,
ভারত কহে, পাগল নহে, ওই ভুবনেশ্বর জো॥"
—ভারতচন্দ্র

আমি যে ধামালী গানের কথা বলিব তাহার সঙ্গে খাসাঘাতের নিকট সম্বন্ধ আছে। এই জাতীয় গানের সময় খাসাঘাত ছন্দের ব্যবহার অনেকটা স্বাভাবিক বটে।

ধামালী শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ কি? অধ্যাপক ডক্টর শ্রীসুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন: ধর্ম্মধ > ধম্ম + আল্ প্রত্যয় = ধম্মাল > ধামাল + ঈ, অর্থাৎ ধর্ম্মবিষয়ক কোন উৎসব বা নৃত্য বা গান বা অনুরূপ কিছু। এই অর্থ ধরিলে আমরা আমাদের ধামালী শব্দের অর্থের নাগাল পাই। আসলে আমরাও ধামালীকে প্রায় এই অর্থেই ব্যবহার করিব। ধামাল রাগ এবং ধামালীর মধ্যে ইহার পরেও কতোখানি সম্বন্ধের নৈকট্য থাকে বা না থাকে, তাহা রাগ-রসিকের বুঝার দায়িত্ব।

আসাম প্রদেশের কাছাড় জেলায় ধামালীকে মণিপুরীরা বলে 'খুবাক-ইসাই' অর্থাৎ হস্ত-সঙ্গীত। ঐ অঞ্চলের অনুন্নত সম্প্রদায়ের বহু লোকেরা ইহাকে বলে 'থাপড়া', অর্থাৎ তালি দিয়া যে গান গাওয়া হয়। এই দুইটি শব্দই ধামালীকে একটি বিশেষ অর্থ দান করিয়াছে। গানের বিশেষ অভিজ্ঞতা হইতে এই দুইটি শব্দের জন্ম ও প্রচলন। ব্যুৎপত্তিগত অর্থের সহিত বোধ হয় তেমন কোন সম্বন্ধ রাখা হয় নাই।

'ধামালী' শব্দটিকে আমরা প্রাচীন সাহিত্যে কোথায় কোথায় পাই তাহা অনুসন্ধান করিবার বিষয়। 'আরকান রাজসভায় বাঙ্গালা সাহিত্য' পুস্তকে ধামালী গান সপ্তদশ শতাব্দীর মুসলমান সমাজে প্রচলিত ছিল বলিয়া লিখিত আছে। 'সয়ফুল মুলুক ও বদিউজ্জমাল' কাব্যখানি সপ্তদশ শতাব্দীর। সুতরাং ধামালী গান সপ্তদশ শতাব্দীতে তো ছিলই এবং আরোও আগে ছিল। তবে কৃষ্ণলীলা কিংবা অন্য কিছু তাহাদের ধামালী গানের বিষয় বস্তু ছিল—তাহা সঠিক জানি নাই।

আর আমরা ধামালী শব্দের উল্লেখ পাইতেছি, বড়ু চণ্ডীদাসের কৃষ্ণকীর্ত্তনে। যত সমস্যা দেখা দিয়াছে এই স্থান হইতেই। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় সাহিত্য পরিষদ্-পত্রিকার দিকে আমাকে দৃষ্টি দিতে বলিয়াছেন এবং অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মণীন্দ্র মোহন বসু আমাকে সাহিত্য পরিষদ পত্রিকাখানার বর্ষ ও সংখ্যা নির্দ্দেশ করিয়া বহু পরিশ্রম কমাইয়া দিয়াছেন। বঙ্গাব্দ ১৩৩৯-এর দ্বিতীয় সংখ্যা পত্রে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত প্রিয়রঞ্জন সেন "শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন ও জাগের গান" সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। সমগ্র শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে তিনি ১৩ বার ধামালী শব্দের উল্লেখ আছে বলিয়া—দেখাইয়াছেন। আর ধামালী শব্দের একটি বিশেষ অর্থ নিরূপণ করিয়াছেন—সম্পর্কবিরুদ্ধ রতিসংকেত বা তদ্বিষয়ক হাস্য-পরিহাস। একটি উদাহরণ:

> 'সব গোপী ছাড়ি বনমালী
> মোরে কেহে বোল এ ধামালী।'
>
> —দান খণ্ড ৩২ পৃঃ

এখন আমি যে ধামালী সম্বন্ধ লিখিতেছি তাহার স্পষ্টার্থ অন্য বস্তু। আপাতত, আমি এই আলোচনা বাদ দিয়া প্রবন্ধের মুখ্য বক্তব্য সম্বন্ধে যাহা বলিবার বলিতেছি। উপসংহারে উপর্য্যুক্ত সমস্যার কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব।

একটা কথা পরিষ্কার স্বীকার করিতেছি, ধামাল রাগ সম্বন্ধে কোন ধারণাই বড় নাই—তবে ধামালী গানে যে রাগ বা রাগিণীর ব্যবহার হয়—সে সম্বন্ধে কিছু ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা জন্মিয়াছে। গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া নিজেই সমস্ত তথ্য সংগ্রহ করিয়াছি। অতএব রাগ-রাগিণীর দিক হইতে কেহ যদি ধামাল ও ধামালীর মাধ্যমিক সূক্ষ্ম সম্বন্ধ বিচার করিতে বলেন—তবে মুস্কিলে পড়িয়া যাইব। রাগ-রসিকেরা এই কাজের দায়িত্ব লইলে বরঞ্চ সুফল ফলিবার আশা করা যাইতে পারে।

ধামালী গান সুরমা উপত্যকায়, বিশেষ করিয়া কাছাড় জেলায়, কিরূপভাবে প্রচলিত আছে তাহা বলিতেছি। মূলত, শ্রীহট্ট ও কাছাড় ভাষা ও কৃষ্টিগত ভেদাভেদ বড় অল্প সুতরাং কাছাড় বলিলে যাহা বুঝায় শ্রীহট্ট বলিলে তাহাই প্রায় বুঝাইবে। আমি ধামালী গানের কথা প্রসঙ্গেই এই কথা বলিলাম।

কাছাড় জেলায় অসমীয়া, মণিপুরী এবং বর্ম্মণ বহু বাস করিতেছেন। এই তিনটি অবাঙ্গালী জাতিই কাছাড়ের বাসিন্দা হিসাবে প্রতিবেশী বাঙ্গালীর ভাষা ও সভ্যতা দ্বারা প্রভাবান্বিত। ইহাদের বিদ্যাভ্যাস বাঙ্গালীদের সহিত একই বিদ্যা মন্দিরে একত্রে হয়। সুতরাং, বহুকাল হইল, বাঙ্গালীর সহিত পাশাপাশি বাস করিয়া ইহারা আচার ব্যবহারে ও অনেকটা বাঙ্গালীর মত হইয়াছেন।

কাছাড় অঞ্চলের মণিপুরীরা ধামালী গান জানেন। কোন পর্ব্বোপলক্ষে তাহারা ধামালী গান করেন। রথের সময় মণ্ডপে সাধারণত, পুরুষেরা জয়দেবের সংস্কৃত গীত-গোবিন্দ ধামালী গান করেন। দোলের সময়ও কীর্ত্তন তাহারা বসন্তোৎসব ধামালীতে সম্পন্ন করেন। লেইসাবি, (লেই = ফুল) ফুলের মত সুন্দরী অনূঢ়া যুবতী মেয়েরা গ্রামান্তর হইতে কোনও নির্দ্দিষ্ট স্থানে আসিয়া মিলিত হন এবং ধামালী গান করেন। মেয়েরা তাল রাখিবার জন্য কখনও মন্দিরা ব্যবহার করেন, কখনও শুধুমাত্র হাতই সম্বল থাকে। কার্ত্তিক মাসে রামায়ণ গানের সময়ও এই ধামালী গানকে ব্যবহার করা হয়। জনৈক অভিজ্ঞ মণিপুরীর নিকট শুনিয়াছি, গান

মণিপুরে ধামালীর প্রচলন অতি বিরল। সেই স্থানে রাস-নৃত্য অথবা বালক-নৃত্য প্রভৃতিরই প্রাধান্য। সেই স্থানে রাস-নৃত্য ভঙ্গীই মুখ্য। ধামালীতে হাতের তালিই মুখ্য।

কাছাড়ের আদিম অধিবাসী হিসাবে বর্ম্মণরাই দলে ভারী। ইহাদের চোখ ছোট, নাক মোটা। ইহাদের নিজেদের ভাষাও বাঙলা হরফে কাগজে কলমে উঠিয়াছে। নিজেদের ভাষা ছাড়া ইহারা প্রায় সকলেই বাঙলা জানে। যাহারা সহরে থাকে—তাহারা ইংরাজী শিক্ষিত হয়। আর গ্রামে কিংবা পাহাড়তলীতে যাহারা থাকে তাহারা ভালো বেশ বাঙলা বলিতে পারে। অবশ্য উচ্চারণ ঠিক আমাদের মত হয় না।

বর্ম্মণদেব এককালে পরাক্রান্ত রাজা ছিলেন। তিনি বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ পণ্ডিত আনিয়া রাজধানীতে স্থাপন করিয়াছিলেন। বাঙ্গালী ঐতিহ্যকে বহুকাল ধরিয়া বর্ম্মণেরা মনে প্রাণে গ্রহণ করিবার চেষ্টা করিয়াছে। প্রায় একশ' বছরের মত হইল, ইহাদের রাজা নিহত হইয়াছেন। তৎপর আর ইহারা রাজা নির্ব্বাচন করিবার সুযোগ পায় নাই।

বর্ম্মন রাজারা প্রায় দুই শ' বছর আগেও সংস্কৃতে এবং বাংলায় বহু গান রচনা করিয়া গিয়াছেন।

এই বর্ম্মণ জাতির ধামালী একটি চমৎকার জিনিষ। সাধারণতঃ, কোন পর্ব্বোপলক্ষেই ইহারা এই বিশেষ প্রকার গান করেন। ইহাদের গানের পদও বাংলাভাষায় লিখিত। তবে একটা বিশেষত্ব আছে যে ইহারা নিজেরাই যখন বাংলা গান তৈরী করিয়া লইতেছিল তখন নিজেদের ঐতিহ্য কিংবা বিশেষ প্রাচীন কাহিনী অথবা কিংবদন্তী সঙ্গে সঙ্গে মিশাইয়া লইতেছিল। দুঃখের বিষয় তাড়াতাড়ির মধ্যে সেই সব গান শুধু শুনিয়াছিই—জানা হয় নাই। বাঙ্গালীর লিখা গান ও তাহাদের সমাজে নির্ব্বিরোধে চলিয়া গিয়াছে।

জন কয়েক বর্ম্মণ তরুণী মিলিয়া উঠোনে ইহারা চক্রাকারে নৃত্য করিতে করিতে ধামালী দেন। রাত্রেই এবং বিশেষত জ্যোৎস্না রাত্রেই ইহারা ধামালী দেন। জ্যোৎস্নারাত্রে নৃত্যরতা ইহাদের কণ্ঠে চিকন স্বরে অপূর্ব্ব সঙ্গীত বাজিয়া উঠে। ইহাদের লজ্জা অত্যন্ত প্রবল, এবং ফটো তুলিলে দেশান্তরে প্রচার হইবে ভাবিয়া ফটো তুলিতে দিতে ইহারা রাজী হয় না।

কাছাড় জেলায় সাঁওতালীদের বাস আছে। মণ্ডলীকৃত নর্ত্তন হিসাবে পর্য্যায় সৃষ্টি করিতে গেলে রাস, ঝুমুর, ধামালী এক শ্রেণীতে পড়িতে পারে। অবশ্য অন্যান্য দিক হইতে প্রত্যেকটাই বিভিন্ন।

এইবার ধামালীর স্বরূপ বিবৃত করিতেছি। কাছাড় অঞ্চলের গ্রামে গ্রামেই ধামালী সুপরিচিত জিনিষ। বিশেষ করিয়া অনুন্নত সম্প্রদায়ের মধ্যেই ধামালী বহুল প্রচারিত। গ্রামের উন্নত সম্প্রদায়ের মধ্যেও এককালে ইহা প্রচলিত ছিল; এখন ইহার আদর কমিয়া গিয়াছে। যাইবার কারণঃ সহরীর সভ্যতার প্রসার, বিশুদ্ধ ও মার্জ্জিত প্রকারের গান ও নৃত্যের প্রচুর প্রচলন। উন্নত সম্প্রদায় যত তাড়াতাড়ি সংস্কৃত হয় ও রুচি বদলায়, ততো বোধ হয় অনুন্নত সমাজ পারেনা। এই ধামালীকে সেখানে বলা হয় 'ধামাইল!' শব্দটি 'ধামালী' হইতেই 'অপিনিহিতি' (epenthesis) যোগে প্রসারিত হইয়াছে বলিয়া মনে করিতেছি। উন্নত সম্প্রদায়ের কেহ কেহ সোজাসুজি 'ধামালী'ই বলিয়া থাকেন। 'অপিনিহিতি' সুরমা উপত্যকার ভাষার একটা বিশেষত্ব।

ধামালীকে নিঃসন্দেহে লোক-নৃত্যের পর্য্যায়ভুক্ত করা যাইতে পারে। কিন্তু ধামালী তো শুধু নৃত্যই নয়। ইহা কেবল নৃত্য ও নয়—কেবল গান ও নয়—কেবল তালরক্ষা ও নয়। ইহা তিনের সমবায়ে একটি বিশেষ কিছু, যাহারই নামকরণ হইয়াছে ধামালী।

ধামালী শব্দটী স্ত্রীলিঙ্গবাচক। আমি শব্দরূপ দেখিয়া বিচার করিতেছি। আর ইহা ছাড়া এই কথাও সত্য যে, মুখ্যত এবং সাধারণতঃ স্ত্রীলোকেরাই ধামালী দিয়া থাকে। আমি পুরুষদের ধামালী দিতে কদাচই শুনি নাই—তবে অনুমান করিতেছি দিতে পারেনি বলিয়া, কেননা আনন্দসাধন কিংবা সখ-নিষ্পত্তি ব্যাপারে কোথাও স্পষ্ট সীমারেখা এ ক্ষেত্রে টানা যাইতে পারে না। সুতরাং আসলে ইহা স্ত্রী-অনুষ্ঠানেরই অন্তর্গত। পুরুষদের কথা তুলিয়াছি যখন, তখন শেষও করিতেছি। আমি মাত্র আভাস পাইয়াছিলাম যে, অনুন্নত সম্প্রদায়ের কয়েকজন পুরুষ ধামালী দিবে। এই পর্য্যন্তই।

পর্ব্বোপলক্ষে মেয়েরা ধামালী দেন। অবশ্য ধামালী দেওয়ার ব্যাপারে ধর্ম্মগত কোন বাধ্যবাধকতা নাই। সেই

কারণেই শাক্ত ও বৈষ্ণবের সাম্প্রদায়িকতার প্রশ্ন উঠে না। আনন্দ প্রকাশই ইহার উপলক্ষ্য।

দশ, পনর বা এইরূপ (নির্দ্দিষ্ট কোন সংখ্যা নাই) মেয়েরা চক্রাকারে মিলিত হন। ইহাদের গান ও নৃত্যের সঙ্গে তাল রাখিবার জন্ম ঢোল কিংবা কাড়াও অন্ত লোককে বাজাইতে হয়। কাড়া, ঢোল না থাকিলে যে চলে না, এমনও নয়। মেয়েরা চক্রাকারে নৃত্য করিবেন। চক্রটি সচল—ঘুরিয়া ঘুরিয়া চলিবে। কোন মেয়েই একস্থানে স্থির থাকিতে পারিবেন না। ইহারা গান করিবেন এবং গানের সঙ্গে সঙ্গে তালি দিয়া তালরক্ষা করিবেন। এই তাল আবার পায়ের সঙ্গেও রাখিতে হইবে। সুতরাং, নৃত্য-গীত এবং তালরক্ষা সব কিছুই একসঙ্গে হইয়া যাইতেছে। চক্রটির ব্যাসগত পরিধি সকল সময় সমান থাকিবে না। তালের সঙ্গে সঙ্গে এক একবার করিয়া নৃত্যরতা মেয়েরা সামনের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িলেই চক্রটি ছোট হইয়া আসিবে। সকল সময় তালরক্ষা করিতে হইবে। দুইটি পা চালাইবার নিয়মও সোজা। চরণ বিক্ষেপের মধ্যে একটা ছন্দ ও যতি আছে। অগ্র-পশ্চাৎ চরণ-নিক্ষেপ করিতে হইবে—অথচ চক্রটীকে সচল করিবার জন্ম পা একটু কোণাকোণি করিয়া ফেলিতে হইবে।

ধামালীতে মেয়েরা একতাল বা দুই তাল বা তিন তাল, এমনকি চৌতাল ও দিয়া থাকেন। তালের এই ক্রমবৃদ্ধি মূলতঃ দ্রুতগতির উপর নির্ভর করে। এইখানেই সাঁওতাল ঘুমুরের সহিত খানিকটা সাদৃশ্য আছে। গান—তাল—চরণ, সব কিছুই দ্রুত চলিবে। ছন্দ পতন বড় হয় না, কেন না, শ্বাসের সঙ্গেও একটা কাছাকাছি সম্পর্ক আছে। এ ছাড়া নিয়মের নিগড়ও আছে। অর্থাৎ ধামালীতে ব্যষ্টির অপেক্ষা সমষ্টিই আসল। সকলে এক নিয়মে আনন্দ প্রকাশ করিবেন। সেই কারণেই সূক্ষ্ম কলা-কৌশল কম ইঙ্গিত কম।

এই ধামালী গানে ভাটিয়ালী রাগের প্রচলন আছে। তবে ভাটিয়ালী সুর তাহার স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখিতে পারে নাই। ভাটির মুখে নৌকা ছাড়িয়া একান্ত আপনার ভাবে যে ভাটিয়ালী গান—গানের সুর—তাহা ধামালীতে সম্ভব নয়। ইহারা ভাটিয়ালী গান করেন বটে, কিন্তু আসলে ভাটিয়ালী সুরকে ধামালীর বিশেষ সুরের ছাঁচে ঢালিয়া লওয়া হয় মাত্র। প্রকৃতপক্ষে ধামালী একটি বিশেষ রাগিণী। ঢেউ তুলিয়া ছন্দে ছন্দে এ গান গাওয়া হয়।

ধামালী গান উৎসব মাত্রেই গীত হইতে পারে। তবে কাছাড় জেলার পাটনী-নমঃশূদ্র সম্প্রদায়ের মেয়েরা কয়েকটি বিশেষ পর্ব্বোপলক্ষে এই গান করেন। সূর্য্যের ব্রত বলিয়া একটি বিশেষ পর্ব্ব আছে। সেই উৎসবে সারাদিন ধামালী দেওয়া হয়। সূর্য্যের ব্রত আসলে কৃষ্ণকে কেন্দ্র করিয়া ব্রতার্চ্চনা মাত্র। সমস্ত গানই রাধা-কৃষ্ণ-লীলা বিষয়ক। ইহা ছাড়া বিয়ের আগে অধিবাসের রাত্রেও ধামালী দেওয়া হয়। সারারাত গান গাহিয়া শেষ রাত্রে জল ভরিতে যাইতে এবং জল ভরিয়া আনিয়া উঠানে ধামালী দেওয়া হয়। একটি এই প্রকারের "জলধামালী" গান লিপিবদ্ধ করিতেছি।

কি কব কালিয়া রূপের কথা (' গো সজনী)
কালার রূপ হেরিয়ে খাইলাম কুলের মাথা।
গিয়াছিলাম যমুনাতে কলসীতে জল আনিতে
আমি না জানি সে কালা ছিল সেথা।
আমার নিকটে আসি কহে কালায় হাসি হাসি
তুমি দেওগো প্যারি দুগলি চরণ লতা।
বন্ধু বলে কমলিনি মিছা তুমি ভাব কেন
ওগো কালা তোমায় হৃদয়েতে গাঁথা।

সমস্ত গীত সমাপ্ত করিয়াও মেয়েরা ধামালী দেন। ইহা ছাড়া রাধিকার বিরহ, আক্ষেপ, অলি-সংবাদ প্রভৃতি রসের কয়েকটি পর্য্যায়েও ধামালী দেওয়া হয়। একটি খেদের গান লিখিতেছি।

সখি কইগো গুণমণি।
প্রভাত হইল দেখ সুখের যামিনী।
প্রাণ বন্ধুরে আনিয়া একবার দেখাও সজনী।
আমার আশায় বসিয়া রইলাম যেন চাতকিনী।
একে নারী অভাগিনী বন্ধুরে আমো পরাধিনী।
সহিতে না পারি দারুণ বিচ্ছেদের অগুনি (আগুন)
ভাবিতে চিন্তিতে আমার গত হয় রজনী।
গোঁসাই কোটি চাঁদ কয় পরিণামে কি হবে না জানি।

গান লেখক হিসাবে বহুলোকের নাম আমি পাইয়াছি। আর অনেক গানের লেখকের নাম আমি পাই-ও নাই। ইহাদের মধ্যে বহু নারী লেখিকা ও আছেন। গানগুলির

বানানের রূপ যথাযথ আমি রাখিতে পারি নাই। কেননা এই সব গান ধামালী শুনিতে শুনিতে লেখিতে হইয়াছে।

ভোর বেলায়, রাত্রি শেষে রাধা-কৃষ্ণের মিলনের পর একটি ভাটিয়াল রাগের গান লিপিবদ্ধ করিতেছি—

নিবেদন শুন বন্ধুরে, বন্ধু নিদয় নিঠুর।
কার কুঞ্জেতে প্রাণনাথ, নিশি খেলায় ভোররে।
ওরে আমি যে কলঙ্কী বন্ধু তোমার লাগিয়া।
তুমি আমার জির্ণ (জির) বাস কি দোষ জানিয়া। ইত্যাদি।

গান তো অজস্র রহিয়াছে। আমি শুধু নমুনার জন্য এই গুলিকে অগ্রসর করিয়া দিতেছি। যতগুলি গান আমি সংগ্রহ করিয়াছি, তাহার মধ্যে সব কয়টিই রাধা-কৃষ্ণ বিষয়ক। "কানু ছাড়া গীত নাই" এই কথার একটা মূল্য অনস্বীকার্য্য। তবে শাক্ত গান ও দুই একটি যে না গাওয়া হয়—এমন নহে। কিন্তু সুর ঐ একটিই মাত্র অর্থাৎ ধামালীর যা' বিশেষ সুর। সর্ব্বশেষে 'কোকিল-সংবাদের' একটি গান লিখিয়া ধামালী সম্বন্ধে মূল বক্তব্য শেষ করিতেছি। গানটি অতি সুন্দর এবং জনৈকা মহিলা ইহার রচয়িত্রী।

আইল বসন্তের বাও।
কাল পাখা ডালে থাকি মধুর করে রাও।
শুন শুন আরে কোকিল ডাকিওনা আর।
কানু ছাড়া কামিনীর প্রাণ বাঁচা ভার।
কাল পাখী ডালে থাকি আর জ্বালাইও না।
কানুহারা কামিনীর দুঃখ বুঝ না।
কাতরে বিভা বলে শুনরে কোকিলা।
কানুহারা কামিনীর শরীর জ্বালিলা।

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত প্রিয় রঞ্জন সেন ধামালীর একটি বিশেষ অর্থ দিয়াছেন, তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। স্বীকার করিতেছি যে, এই অর্থ ধরিয়া লইলে চণ্ডীদাস লিখিত শ্লোক-ব্যাখ্যার বিশেষ সুবিধাই হয়। কিন্তু আমরা তো এই প্রকারে কোন অর্থ পাইতেছিনা। আমাদের ধামালীতে লঘু ও চপল আনন্দ প্রকাশ যেমন আছে, যথা, অধিবাসের রাত্রে, তেমনি পূজা-পার্ব্বণে নৈষ্টিক আনন্দ প্রকাশ ও আছে।

ধামালীতে পালাবদ্ধ করিয়া কিছু বড় গাওয়া হয় না। তবে এক একটা বিশেষ সময়ে বিশেষ বিশেষ গানগুলি (যথা, শেষরাত্রে, ভাটিয়াল) গাওয়া হয় এবং অন্যান্য গান গাহিতে স্থান-কালের সঙ্গে সঙ্গতি রাখা হয়। ইহা ছাড়া সূর্য্যের ব্রতে উপবাসী মেয়েরা সারাদিন বিশ্রাম না করিয়া, উদয়াস্ত কিংবা আরও বেশী সময়ের মেয়াদে ধামালী দেন। এই উদয়াস্ত গানে রাধা-কৃষ্ণ লীলা ধারাবাহিক ভাবে বর্ণিত হয়। সেই হিসাবে ইহা পালাবদ্ধ বটে। আজকাল এই ব্রতের উপযোগী ধামালী গানের বই ছাপাও হইয়াছে।

ধামালী কতকাল ধরিয়া এই সব অঞ্চলে প্রচলিত—এই প্রশ্ন একটি প্রায় শতবর্ষীয় বৃদ্ধকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। সে বলিয়াছিল যে, শিশুকালেও সে তাহার মা ঠাকুরমাকে ধামালী দিতে দেখিয়াছে। এই কথায় অবিশ্বাস করিবার কিছু নাই। যে ধামালী অবাঙ্গালীর মধ্যে এমন কি পাহাড়-তলীর বর্ম্মণ মেয়েদের মধ্যেও আশ্রয় লইয়াছে তাহার প্রসারকাল দীর্ঘ-সময় সাপেক্ষ। এখন একটি বর্ম্মণ মেয়েকে জিজ্ঞাসা করিলে সে বলিবে ধামালী তাহাদের জাতীয় সম্পদ, কৃষ্টিগত উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত। এই সব কারণে ধামালীর প্রাচীনত্ব অস্বীকার করা যায় না। একটি কথা মনে উঠিতেছে তবে প্রমাণটিকে নির্ভর যোগ্য বলিয়া দাবী করিতেছি না। সুরমা উপত্যকার বাঙ্গালী সভ্যতা বঙ্গদেশের তুলনায় অপেক্ষাকৃত আধুনিক। বঙ্গদেশ হইতেই এই কৃষ্টি ও সভ্যতা বাঙ্গালীরা শ্রীহট্ট ও কাছাড়ে বহন করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন। সুরমা উপত্যকায় ধামালী গান যদি দেড়শ' বা দুইশ' বছর আগে সর্ব্বত্র বিস্তৃত রহিয়াছে বলিয়া জানিতে পারি তবে বঙ্গদেশে (অন্ত যে কোন নমুনার হউক) আরো আগেই প্রচলিত থাকিবার কথা। কেননা, ভৌগলিক-সংস্থান অনুসারে কৃষ্টি ও সভ্যতা ছড়াইয়া পড়িতে দীর্ঘ সময় লাগে। সেই হিসাবে বড়ু চণ্ডীদাস বেশ প্রাচীন বলিয়া দাবী করিতে পারেন। অবশ্য এই প্রমাণকে নির্ভরযোগ্য বলিয়া দাবী করিবার আগে দেখিতে হইবে, আমাদের ধামালী ও কৃষ্ণ-কীর্ত্তনের ধামালীর অর্থগত সম্বন্ধের নৈকট্য কোথায়।

শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত প্রিয় রঞ্জন সেনের প্রবন্ধ সমালোচনা প্রসঙ্গে ঝুমুরের সহিত ধামালীর সম্বন্ধ নিরূপণ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। 'সঙ্গীত-দামোদর' গ্রন্থের মতে যাহাই থাকুক, ব্যক্তিগত ভাবে আমি কাছাড় জেলার সাঁওতালীদের ঝুমুর নৃত্য দেখিয়াছি। ধামালীতে যখন নৃত্যের গতি অত্যন্ত বর্দ্ধিত হয় এবং মেয়েরা মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে চক্র ও ছোট করিয়া সামনের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িয়া সব কয়টি মথা অত্যন্ত কাছাকাছি লইয়া আসেন এবং পরমুহূর্ত্তেই সরিয়া যান, অর্থাৎ মেয়েদের শরীর ও মাথা ঘড়ির পেণ্ডুলামের মত অগ্র পশ্চাৎ দুলিতে থাকে তখন অনেকটা ঝুমুর নৃত্যের মতই মনে হয়। ধামালীর এই সময়টাকে সেই অঞ্চল বলিয়া বাঙ্গালীর অনেকেই ঝুমুর বলিয়া থাকেন। ইহা ছাড়া সাধারণ সংকীর্ত্তনের তাল ও গান যখন অত্যধিক দ্রুত হইয়াছে তখনও ইহাকে ঝুমুর বলা হয়। কীর্ত্তনে ঝুমুর লাগিয়াছে, এই ভাবে শব্দটির ব্যবহার হয়। ঝুমুর শব্দটির তখন বিশেষার্থে প্রয়োগ। কীর্ত্তন বা ধামালী জমিয়া উঠিয়াছে, এই বুঝাইতেই বিশেষ শব্দটির প্রয়োগ হয়।

মঘকুমার

—শ্রীযতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত বি, ই, কবিশেখর

(জাতক কথানুসরণে)

অতি প্রাচীন কালের কথা বলিতেছি ; বোধিসত্ত্ব তখনও গৌতম বুদ্ধ রূপে ধরণীতে আবির্ভূত হন নাই।

মগধ রাজ্যের রাজধানী, রাজগৃহের অনতিদূরে মচল গ্রাম। ক্ষুদ্র গ্রাম ; লোক-সংখ্যাও অল্প—মাত্র ত্রিশ ঘর লোকের বাস। কিন্তু চৌর্য্য, দস্যুতা ও নানাবিধ অসৎ কার্য্যে মচল গ্রামের অখ্যাতি রটিয়া গিয়াছে। মগধরাজ গ্রামের মণ্ডলকে অনুজ্ঞা পাঠাইয়াছেন, অচিরে ইহার প্রতিকার করিতে হইবে। মণ্ডল ভাবিল, রাজাজ্ঞা প্রতিপালন করিতে হইলে প্রথমেই সুরাপান নিবারণ করিতে হয়। কারণ, সুরাই হইতেছে সকল পাপের জননী। সুরাপান নিবারিত হইলে সুরা-শুল্কও উঠিয়া যাইবে। তখন গ্রাম-মণ্ডলের স্বকীয় ও রাজকীয় ব্যয় সঙ্কুলান হইবে কি উপায়ে? একান্ত দুর্ভাবনা লইয়াই মণ্ডল ত্রিশ ঘর লোকের অধিবাসিবৃন্দের এক সভা আহ্বান করিয়াছে, রাজার আদেশ জানাইয়া দেওয়া হইবে।

নিতান্ত অপরিচ্ছন্ন কণ্টকাকীর্ণ এক শুষ্কভূমে মচল গ্রামের সভা বসিয়াছে। যে পল্লীর অধিকাংশ অধিবাসী কদাচারী ও অলস প্রকৃতি, সে পল্লীতে পরিচ্ছন্ন সুপ্রসন্ন স্থানের অভাব হইবে, ইহাই স্বাভাবিক। রাজভৃত্যগণ অবশ্য মণ্ডলের জন্য সামান্য মাত্র ভূমি পরিষ্কৃত করিয়াছে ; কিন্তু গ্রামবাসীদের জন্য নির্দিষ্ট স্থান অপরিষ্কৃতই পড়িয়া আছে। কেবল সদ্‌ব্রাহ্মণকুলোদ্ভব যুবক মঘকুমার স্বহস্তে নিজের বসিবার স্থানটুকু পরিষ্কৃত করিয়া লইয়াছেন।

মঘকুমার স্বস্থানে বসিয়া সভারম্ভের অপেক্ষা করিতেছেন। এমন সময় তাঁহার এক প্রতিবেশী পার্শ্বের কণ্টকময় স্থানে বসিবার চেষ্টা করিয়া ব্যথা পাইল। মঘকুমার তখনই তাহাকে নিজের পরিষ্কৃত স্থানটুকু ছাড়িয়া দিয়া নিজের জন্য পার্শ্বস্থ কণ্টকময় ভূমি ক্ষিপ্রহস্তে পরিষ্কৃত করিয়া লইলেন। লোকটি বিস্মিত হইয়া মঘকুমারকে অভিবাদন জানাইল ও তৎপ্রদত্ত স্থানে উপবেশন করিল।

পরক্ষণে অপর এক ব্যক্তি আসিয়া কণ্টকসমাচ্ছন্ন ভূমিতে বসিবার চেষ্টা করিবামাত্র আঘাত পাইল। মঘকুমার দ্বিতীয় ব্যক্তির সুবিধার কথা চিন্তা করিয়া পুনরায় স্বস্থান পরিত্যাগ করিলেন ও নিকটস্থ ভূমি পরিষ্কার করিয়া লইলেন। এই ভাবে মঘকুমার একাকী বহুলোকের উপবেশন স্থান পরিষ্কৃত করিয়া দিলেন।

সেদিন সভার কার্য্য কতদূর অগ্রসর হইয়াছিল, জানা যায় না। মণ্ডল কি বলিয়াছিলেন, তাহাও সকলে শ্রবণ করে নাই। বিস্মিত মচলবাসী মঘকুমারের কার্য্য চিন্তা করিতে করিতে গৃহে ফিরিয়া গেল।

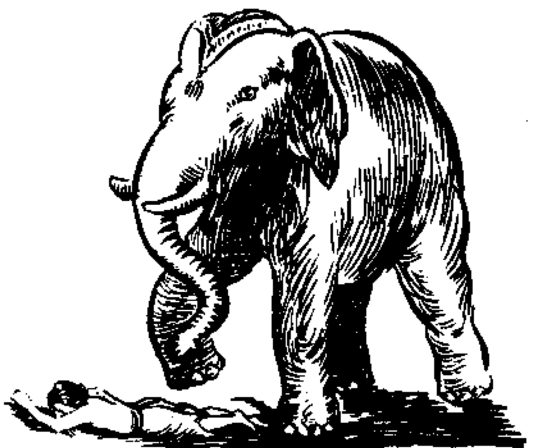
এখন হইতে মঘকুমারের অনুপ্রেরণা ও আদর্শে গ্রামবাসী সকলেই তাঁহার ন্যায় জনসেবা-পরায়ণ হইয়া উঠিল। তাহারা প্রত্যুষে শয্যাত্যাগ করিয়া কুঠার, মুদ্গর প্রভৃতি হস্তে লইয়া বাহির হইত। পথে যে সকল আবর্জ্জনা দেখিতে পাইত, তাহা সমবেত চেষ্টায় দূরে সরাইয়া দিত। তাহারা অসমান স্থান সমান করিত, বৃক্ষাদি কাটিয়া পথের বাধা দূর করিত। ক্রমে গ্রামবাসীদের মিলিত চেষ্টায় পুষ্করিণী খনিত হইল, সেতু নির্ম্মিত হইল, ধর্ম্মশালা প্রস্তুত হইল। সকলে পরোপকারব্রত গ্রহণ করিয়া মঘকুমারের উপদেশানুযায়ী পঞ্চশীল সম্পন্ন হইল।

সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া মণ্ডল প্রমাদ গণিল। গ্রামবাসীরা স্বেচ্ছায় সুরাপান ত্যাগ করায় প্রাপ্যশুল্ক অর্দ্ধেকের উপর হ্রাস পাইয়াছে। কূটবুদ্ধি মণ্ডল রাজসমীপে-সংবাদ প্রেরণ করিল, একদল দস্যুর উপদ্রবে গ্রামবাসী উত্ত্যক্ত। রাজার আদেশ আসিল—যে প্রকারে হউক দস্যুদলকে ধৃত করিয়া রাজধানীতে পাঠাইয়া দাও। মণ্ডল তখন মঘকুমার ও তাহার বাছা বাছা অনুচরগণকে বাঁধিয়া রাজসমীপে প্রেরণ করিল।

মচলগ্রামের অখ্যাতির বিষয় স্মরণ করিয়া রাজা কোন প্রকার অনুসন্ধান করাও প্রয়োজন বোধ করিলেন না। সংক্ষেপে আদেশ দিলেন, দস্যুগণকে হস্তীপদতলে বিমর্দ্দিত কর।

সানুচর মঘকুমার হস্তপদবদ্ধ অবস্থায় প্রাসাদ-প্রাঙ্গণে পড়িয়া আছেন। তাঁহাদিগকে মর্দ্দিত করিবার অভিপ্রায়ে হস্তী আনীত হইয়াছে। চারিদিকে পৌর-জনতা। বন্দী মঘকুমার অনুচরগণকে সম্বোধন করিয়া ধীরে ধীরে বলিতেছেন,—ভ্রাতৃগণ, শীলব্রতের কথা বিস্মৃত হইও না। মনে রাখিও, কি মণ্ডল, কি রাজা, কি হস্তী সকলেই আমাদের আত্মবৎ প্রীতির পাত্র।

মাহুতের পুনঃ পুনঃ চেষ্টা সত্ত্বেও হস্তী বন্দীদের নিকটবর্ত্তী হইল না, আর্ত্তধ্বনি করিতে করিতে দূরে পলাইয়া গেল। রাজাদেশে নূতন নূতন হস্তী আনীত হইল, কিন্তু বন্দীদের নিকটস্থ হইবামাত্র তাহারা পলায়ন করিতে লাগিল বিস্মিত রাজা ভাবিলেন, দস্যুদলপতি নিশ্চয় কোন



পুনঃ পুনঃ চেষ্টা সত্ত্বেও হস্তী বন্দীগণের নিকটবর্ত্তী হইল না,……

মন্ত্র জানে। জিজ্ঞাসিত হইয়া মঘকুমার বলিলেন, মহারাজ, আমাদের মন্ত্র—আমরা প্রাণিহত্যা করি না, চুরি করি না, কুপথে চলি না, মিথ্যা কথা বলি না, সুরা পান করি না, আর সর্ব্বভূতে দয়া ও মৈত্রী প্রদর্শন করি।

এমন কথা ত' দস্যুদলপতির মুখে শোনা যায় না। তখনই সবিশেষ অনুসন্ধান আরম্ভ হইল। সমস্ত কথা জানিতে পারিয়া অনুতপ্ত মগধরাজ মণ্ডলকে যথোচিত শাস্তি দিলেন এবং মচলগ্রামের ভার মঘকুমার ও তাঁহার অনুচরবর্গের উপর ন্যস্ত হইল।

গ্রামাধিপ মঘকুমারের সুব্যবস্থায় মচলগ্রামের প্রভূত উন্নতি সাধিত হইয়াছে। অধুনা অভিজ্ঞ সূত্রধরের নির্দ্দেশমত এক বৃহৎ ধর্ম্মশালা নির্ম্মিত হইতেছে। গ্রামস্থ সমস্ত পুরুষ স্বেচ্ছায় সেই পুণ্যকর্ম্মে যোগ দিয়াছে। স্ত্রীলোকের এ প্রকার পুণ্যকর্ম্মে অধিকার নাই, তাহাদের আর ডাক পড়িল না। কিন্তু ব্রাহ্মণকন্যা সুধর্ম্মা ইহাতে যোগ দিবার জন্য অধীর হইয়া উঠিয়াছেন। সমস্ত গ্রাম-প্রধানের নিকট তাঁহার অনুনয় প্রত্যাখ্যাত হইবার পর সুধর্ম্মা সেখানে সূত্রধরের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। তাঁহার কাতরতা দেখিয়া সূত্রধর প্রতিশ্রুতি দিল, আপনি যাহাতে এই ধর্ম্মশালা নির্ম্মাণে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পুণ্যভাগিনী হইতে পারেন, আমি তাহার ব্যবস্থা করিব।

মনের উদারতায় সূত্রধর ত প্রতিশ্রুতি দিল। কিন্তু গ্রামস্থ সকলের তীব্র আপত্তির মধ্যে পুরুষের চিরন্তন অধিকার ক্ষুণ্ণ করিয়া একজন নারীকে পুণ্যভাগিনী করা ত সহজ কথা নহে। অনেক চিন্তার পর সূত্রধর কৌশল অবলম্বন করিল। সে ভাবী মন্দিরের চূড়াটি নিজের ঘরে বসিয়া পৃথক্ভাবে খোদাই করিতে আরম্ভ করিয়াছে। দিনে ধর্ম্মশালায় অশ্রান্ত কার্য্য হয়, আর রাত্রিতে সূত্রধর তাহার সমস্ত মন প্রাণ ঢালিয়া সেই ধর্ম্মমন্দিরের চূড়া রচে। চূড়া রচনা শেষ হইলে সেটি সে গোপনে সুধর্ম্মাকে দান করিয়া আসিল।

ফাল্গুনের শুক্লা ত্রয়োদশী। আগামী বসন্ত পূর্ণিমায় মগধরাজ মচলগ্রামের নূতন ধর্ম্মশালার দ্বারোদ্ঘাটন করিবেন। অনতিদূরস্থ আম্রবনচ্ছায়ে রাজার স্কন্ধাবার স্থাপিত হইয়াছে। সদ্যস্ফুট আম্রমুকুলের গন্ধে বাতাস পূর্ণ। আকাশে অশ্রান্ত কুহুধ্বনি, আর তাহারই মধ্যে মন্দির সমাপন কার্য্যে গ্রামবাসীদের অক্লান্ত কর্ম্মব্যস্ততা। এমন সময় সূত্রধর বলিল, বড়ই ভুল হইয়াছে, মন্দিরের চূড়া গড়া হয় নাই!

সকলে বলিল, চূড়া গড়িয়া ফেল।

সূত্রধর বলিল, আমার সাধ্য কি, এই অল্প সময়ের মধ্যে ওই মন্দিরের চূড়া গড়িয়া দিই?

তবে উপায়? তখন সূত্রধর বলিল, সন্ধান করিয়া দেখিতে হইবে, যদি কোথাও উপযুক্ত চূড়া কিনিতে পাওয়া যায়।

কাল মন্দিরের দ্বারোদ্ঘাটন; কিন্তু চূড়ার অভাবে সে মন্দির এখনও অঙ্গহীন। গ্রামবাসীরা অনলসভাবে সন্ধান করিতেছে, যদি কোথাও চূড়া কিনিতে পাওয়া যায়। দেশ

বিদেশে অনেক সন্ধানের পর একটি সুন্দর চূড়া পাওয়া গেল সুধর্ম্মার গৃহে। চূড়া দেখিয়া সকলে মুগ্ধ হইয়া গেল; সূত্রধর বলিল,



ব্রহ্মাণ্ডে এমন কোন্ স্থান আছে যেখানে স্ত্রীলোকের অংশ নাই ?…

ইহাই এ মন্দিরের উপযোগী চূড়া, মূল্যদানে কিনিয়া লও।

সুধর্ম্মা কোন মূল্যেই চূড়া বিক্রয় করিতে চাহে না।

সে বলে, "যদি তোমরা আমায় তোমাদের পুণ্যের অংশ গ্রহণে অধিকার দাও, তবে বিনা মূল্যে আমি চূড়া দিব। অপর কোন মূল্যে আমি চূড়া বিক্রয় করিব না ?

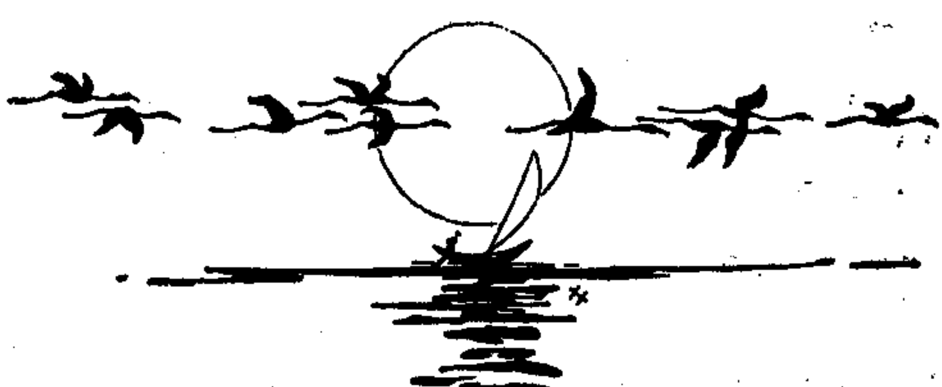
নিশীথকালে গ্রামবাসীদিগের সভা বসিয়াছে। দীর্ঘ আলোচনার পর স্থির হইল, সুধর্ম্মাকে এই মহৎ পুণ্যের অংশ কোনক্রমেই দেওয়া চলে না, কারণ সে স্ত্রীলোক। তখন মঘকুমার বলিলেন,

ব্রহ্মাণ্ডে এমন কোন্ স্থান আছে, যেখানে স্ত্রীলোকের অংশ নাই।

এই চূড়া গ্রহণ না করিলে আমাদের ধর্ম্মশালা অসম্পূর্ণ থাকিবে, মগধরাজের অসম্মান করা হইবে, আর আমরা সকলে ধর্ম্মে পতিত হইব।

তখন অনন্যোপায় হইয়া গ্রামবাসী বিনা মূল্যে সেই চূড়া গ্রহণ করিয়া প্রভাতের পূর্ব্বেই মন্দির সমাপনের ব্যবস্থায় সম্মতি দিল। নারী হইয়াও সুধর্ম্মা সেই ধর্ম্মকার্য্যের পুণ্য-ভাগিনী হইলেন।

ভগবান্ গৌতম বুদ্ধ বলিয়াছেন, বহুজন্ম পূর্ব্বে তিনিই মচল গ্রামে মঘকুমাররূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।



নব জাতীয়তার উপাদান

—স্বামী চন্দ্রেশ্বরানন্দ

আমরা একটা জাতীয় অভ্যুত্থানের যুগে বাস করিতেছি। এ যুগ প্রায় একশত বৎসর পূর্ব্ব হইতে আরম্ভ হইয়াছে, এখনও তার বিরাম নাই, অবিশ্রাম গতিতে জাতিকে নানা দিকে নানাভাবে নানা অনুকূল ও প্রতিকূল অবস্থার মধ্য দিয়া লইয়া চলিয়াছে। সহস্র বৎসরাধিক পরাধীন ও আত্মবিস্মৃত, নিদ্রিত জাতিকে জাগাইবার পক্ষে একশত বৎসর খুব বেশী নহে, আরও কত বৎসর লাগিবে—কে বলিতে পারে। একটা দেশকে জাগাইতে হইলে শক্তির আবশ্যক; সে শক্তি ঐশ্বরিক শক্তি বা জাতির অন্তর্নিহিত যথাকালে প্রকাশিত আত্মশক্তি বা সমষ্টিশক্তি—যাহাই তাহাকে বলা যাক্ না কেন, কিন্তু তাহা প্রকাশিত হয় সেই দেশের কতকগুলি শক্তিমান্ আধারের মধ্য দিয়া—যাহারা সেই প্রচণ্ড শক্তির বেগ ধারণ করিতে পারে। যে সব আধারে সেই শক্তির আবির্ভাব হয় তাহাদের নিজেদের বিশেষ কিছুই করিতে হয় না, সেই শক্তিই ইচ্ছামত আবশ্যক মত তাহাদের লইয়া যাহা করিবার তাহাদের দ্বারা করাইয়া লয়; স্ফটিক আধারে প্রতিবিম্বিত সূর্য্যরশ্মির মত সেই শক্তিতে বিভাসিত সেই সকল আধার তাহারই দ্যুতিতে মহিমোজ্জ্বল হইয়া প্রকাশ পায়। তখন তাহারা যাহা বলে ও করে, জাতির অন্যান্য সকলে অনন্যগতি হইয়া তাহার অনুসরণ করে। পৃথিবীতে যখন যে জাতি দীর্ঘ অবসাদের পর জাগিয়াছে, তাহারা এইরূপ ইতিহাসই রাখিয়া গিয়াছে। যাহা অন্যান্য দেশে ঘটিয়াছে আমাদের দেশেও শতবর্ষ ধরিয়া ধীরে ধীরে তাহা ঘটিয়া চলিয়াছে। এই শতবর্ষের মধ্যে কত নরনারী যে সেই শক্তির আবর্ত্তে পড়িল তাহার সংখ্যা নাই; যাহাদের আধার ক্ষুদ্র, নির্দ্দিষ্ট ও স্বল্প-পরিসরবিশিষ্ট, কাজ হইয়া যাইবার পর তাহারা ধীরে ধীরে বিস্মৃতির সাগরে তলাইয়া গেল, আর যে সকল আধার বিরাট, সমগ্র জাতির অন্তরে চিরকালের জন্য তাহারা আসন পাইল এবং তাহারা চলিয়া গেলেও তাহাদের কথা ও কার্য্য শ্রদ্ধার সহিত সকলে মানিয়া চলিল। এই সকল বিরাট আধার বা অসাধারণ শক্তিসম্পন্ন পুরুষ ও নারী গত শতবর্ষ ধরিয়া ভারতের বিভিন্ন ক্ষেত্রে দৃষ্ট হইয়াছে; ধর্ম্ম, দর্শন, রাজনীতি, ব্যবসা, বাণিজ্য, সাহিত্য, নাট্যকলা, শিল্প ও সমাজ—এক বা একাধিক দিকে যেন এক একজন দিক্‌পালের আবির্ভাব হইয়াছে। তাঁহারা চলিয়া গেলে আবার অন্য কেহ আসিয়া তাঁহাদের স্থান পূর্ণ করিয়াছে, যেন পূর্ব্ববর্ত্তীদের অসমাপ্ত কার্য্য সম্পূর্ণ করিবার জন্যই তাঁহাদের আসিতে হইয়াছে। এই ভাবে সমগ্র ভারত ব্যাপিয়া এক শতাব্দী ধরিয়া জাতির পুনর্গঠন চলিতেছে। এই নির্দ্দিষ্ট



স্বামী বিবেকানন্দ

কালের মধ্যেই স্বামী বিবেকানন্দ আসিয়াছিলেন। তিনি যাহা কিছু কাজ করিয়া ও উপদেশ দিয়া গিয়াছেন, নিঃসন্দেহরূপে তাহা ভারতের অভ্যুত্থানের জন্যই করিয়াছেন। তাঁহার সমগ্র জীবন, সমস্ত সাধনা, জীবনব্যাপী কঠোর সংগ্রাম, তাঁহার চিন্তা, সত্যানুসন্ধান ও তলব্ধ ফল—সকলই তাঁহার জন্মভূমির ও জাতীয় কল্যাণের জন্যই তৎকর্ত্তৃক নিয়োজিত হইয়াছে। এই কল্যাণসাধনের সুস্পষ্ট পন্থাও তিনি পরবর্ত্তীদের জন্য রাখিয়া গিয়াছেন। তাহা আলোচনা করিবার পূর্ব্বে ইহার বিপরীত দিকটাও সংক্ষেপে আলোচনা করা আবশ্যক। ভারতবর্ষ আজ জড়প্রায়, নিজ কল্যাণবোধশূন্য ও জাতীয় ঐক্যবিহীন। কিন্তু এই অবস্থা তাহার একদিনে

একযুগে বা এক শতাব্দীতে আসে নাই। ইহা হইতে সময় লাগিয়াছে, বহু শতাব্দী ধরিয়া দিনে দিনে পলে পলে ইহার জাতীয় শক্তি ও ঐক্যবুদ্ধি নিঃশেষিত হইতে হইতে যখন ইহাকে প্রায় শেষ করিয়া আনিয়াছে তখন ইহার শরীরে বাহির হইতে সামান্য আঘাতেই সে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। খৃষ্টপূর্ব্ব ও পরবর্ত্তী যুগের দুই একটী প্রধান ধর্ম্মান্দোলনের প্রতিক্রিয়া ইহার জন্য অনেকটা দায়ী। প্রথম যুগে ব্যক্তিগত জীবনে ইহা কাহারও মঙ্গল সাধন করিলেও পরবর্ত্তী কালে কোটী কোটী নর-নারীকে ইহা কাপুরুষ করিয়া রাখিতে সহায়তা করিয়াছে। ইহার উল্লেখ করিয়া স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছেন, "আমাদের সমাজে যে সকল বিশেষ দোষ রহিয়াছে তাহা বৌদ্ধধর্ম্মকৃত। বৌদ্ধধর্ম্ম আসিয়া আমাদিগকে উত্তরাধিকারস্বরূপ এই অবনতির ভাগী করিয়াছে।"

এই সকল দোষ সামাজিক জীবন হইতে রাজনৈতিক জীবনে সংক্রামিত হইয়া আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণকে ও আমাদিগকে জীবনের উন্নতি সাধনে এবং দেশের স্বাধীনতা রক্ষণ ও অর্জ্জনে উদাসীন ও অক্ষম করিয়াছে। জগৎ মিথ্যা, জীবন ক্ষণভঙ্গুর—ভিক্ষু, সাধু সন্ন্যাসী, বাউল ও উদাসিগণের মুখে গ্রন্থে ও গানে শত শত বৎসর ধরিয়া ইহা শুনিয়া শুনিয়া ভারতের উচ্চ, নীচ, পণ্ডিত ও মূর্খ প্রায় সকলেই জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে ইহা দ্বারা প্রভাবান্বিত হইয়াছে, ফলে সমগ্র জাতি সংগ্রামশীল জীবনীশক্তি হারাইয়া ফেলিয়াছে. ব্যক্তিগত সুখ শান্তি লাভের তীব্র ইচ্ছা-রূপ স্বার্থপরতায় তাহার সংহতিশক্তি নষ্ট হইয়া গিয়াছে এবং এই দুর্ব্বলতার সুযোগ লইয়া যে কোন শক্তিমান ঐক্যবদ্ধ জাতি যখনই ভারতবর্ষ আক্রমণ করিয়াছে—বিনা আয়াসে বা অল্পায়াসে সে-ই ইহাকে পদানত করিতে সক্ষম হইয়াছে।

আরও গভীর ভাবে অনুসন্ধান করিলে আমরা দেখিতে পাইব—জগৎ ও জীবনের প্রতি ভারতীয় মনের যে অবজ্ঞা ও উদাসীনতা তাহার মূলে রহিয়াছে বৌদ্ধ 'ক্ষণিকবাদ' ও শঙ্করের 'মায়াবাদ'। মতবাদ হিসাবে উভয়ের মধ্যে সূক্ষ্ম পার্থক্য থাকিলেও ভাবের দিক দিয়া উভয়েই এক, অর্থাৎ আপামর-সাধারণের মনে উহারা একই ক্রিয়া করিয়াছে,—জীবন সম্বন্ধে আশাহীন ও জীবনের উন্নতি সম্বন্ধে উদ্যমহীন করিয়া ভারতীয় নর-নারীকে মৃতবৎ করিয়া ফেলিয়াছে। যেটুকু জীবনীশক্তি এখনও তাহাদের মধ্যে অবশিষ্ট আছে, জৈন ও বৈষ্ণব মতবাদ সেটুকুও নিঃশেষ করিয়া দিতেছে। এই সর্ব্বনাশকর ভাবের মূলোৎপাটন করিতে না পারিলে ভারতবাসীর রক্ষা ও মানবজাতির কল্যাণ নাই বুঝিয়া স্বামী বিবেকানন্দ ইহার গোড়া ধরিয়া টান দিয়াছেন, বলিয়াছেন, "আদর্শ রাখিলে চলিবে না। অতিমাত্রায় উচ্চ আদর্শে জাতিকে দুর্ব্বল হীন করিয়া ফেলে। বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম্ম-সংস্কারের পর এইটি ঘটিয়াছিল।" অর্থাৎ ঐ মতবাদসমূহ অতি উচ্চ আদর্শে প্রতিষ্ঠিত হইলেও আপামর সাধারণ্যে তাহা প্রচারিত হইয়া বিষময় ফল উৎপাদন করিয়াছিল। তারপর ঐ সকল মতবাদ কর্ত্তৃক বহুল প্রচারিত ব্যক্তিগত মুক্তি সাধনা ও তৎপ্রসূত ক্ষুদ্র স্বার্থপরতাই জাতীয় মনের ঐক্যবুদ্ধি বিশ্লিষ্টতার মূল কারণ বুঝিয়া তাহা দূরীকরণের জন্য স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছেন, "আমাদের দেশের প্রাচীন ভাব এই—কোন গুহায় বসিয়া ধ্যান করিতে করিতে মরিয়া যাওয়া। কিন্তু এখন এই বিষয়টি ভাল করিয়া বুঝিতে হইবে যে, আমি অমুকের চেয়ে শীঘ্র শীঘ্র মুক্তিলাভ করিব—এ ভাবটিও ভুল। মানুষ শীঘ্র বা বিলম্বে বুঝিতে পারে। যদি সে নিজ ভাইয়ের মুক্তির চেষ্টা না করে' তবে সে কখনই মুক্ত হইতে পারে না।"

এই কয়টি মূল্যবান কথা তিনি বেলুড় মঠের সন্ন্যাসিগণকে নিজ গুরুভ্রাতা ও শিষ্যগণকে বলিয়াছিলেন। ঠিক এই ধরণের কথাই স্বামিজী লাহোরে বেদান্ত সম্বন্ধে বক্তৃতাতেও বলিয়াছিলেন, "অদ্বৈতবাদ আমাদিগকে শিক্ষা দেয়, সমষ্টি জ্ঞানেই মানুষের প্রকৃত ব্যক্তিত্ব, ব্যষ্টিজ্ঞানে নহে। যখন তুমি আপনাকে সমগ্র জগৎস্বরূপ জ্ঞান করিতে পারিবে, তখনই তোমার প্রকৃত অমৃতত্ব লাভ হইবে।" এইরূপ মুক্তি চেষ্টাকে তিনি যেমন ব্যক্তিগত জীবন হইতে স্বজাতি ও মানব জাতির মধ্যে টানিয়া আনিয়াছেন, তেমনি অদ্বৈতবাদকেও তাহার রহস্যময় ভাবরাজ্য হইতে বাস্তব জগতে—নরনারীর প্রাত্যহিক জীবনের কর্ম্মকোলাহলের মধ্যে আনিয়া ফেলিয়াছেন ; বলিয়াছেন, "এখন অদ্বৈতবাদকে কার্য্যে পরিণত করিবার সময় আসিয়াছে। উহাকে এখন স্বর্গ হইতে মর্ত্তে লইয়া আসিতে হইবে—ইহাই এখন বিধির বিধান।" অন্যত্র বলিয়াছেন "এখন আর উহাকে রহস্য রাখিলে

চলিবে না, এখন আর হিমালয়ের গুহায় বনে-জঙ্গলে সাধু-সন্ন্যাসীদের নিকট উহা আবদ্ধ থাকিবে না, লোকের প্রাত্যহিক জীবনে কার্য্যে পরিণত করিতে হইবে। রাজার প্রাসাদে, সাধু-সন্ন্যাসীর গুহায়, দরিদ্রের কুটীরে সর্ব্বত্র—এমন কি রাস্তার ভিখারীদ্বারাও ইহা কার্য্যে পরিণত হইতে পারে।"

অন্যান্য শঙ্করপন্থী সন্ন্যাসীদের মত স্বামী বিবেকানন্দও যদি জীবনকে মিথ্যা ও ছায়ামাত্র বলিয়া জানিতেন, স্বদেশ, স্বজাতি ও জগৎকে যদি অবাস্তব ভ্রম মাত্র বিবেচনা করিতেন, এই সকলের অস্তিত্বকে যদি শুধু 'ব্যবহারিক সত্তা' বলিয়া মনে করিতেন বা 'অধ্যাস' বলিয়া উড়াইয়া দিতেন, তবে নিশ্চয় তাঁহার দরিদ্র, মূর্খ ও পদদলিত স্বদেশবাসীর জন্য এত মর্ম্ম-ছেঁড়া বেদনা অনুভব করিতেন না, বেদান্তের উপদেশ দিতে গিয়া নিশ্চিত তিনি বলিতেন না, "আমাদের প্রয়োজন ধর্ম্ম তত টা নহে,···প্রথমে অন্নের ব্যবস্থা করিতে হইবে, তারপর ধর্ম্ম। গরীব বেচারারা অনশনে মরিতেছে, আর আমরা তাহাদিগকে অতিরিক্ত ধর্ম্মোপদেশ দিতেছি।" এবং তিনি একথাও বলিতেন না, "বেদান্ত প্রকৃত পক্ষে জগৎকে উড়াইয়া দিতে পারে না। বেদান্তে যেমন চূড়ান্ত বৈরাগ্যের উপদেশ আছে, আর কোথায়ও তদ্রূপ নাই; কিন্তু এই বৈরাগ্যের অর্থ আত্মহত্যা নহে, নিজেকে শুকাইয়া ফেলা নহে।" কিন্তু বৈরাগ্যের বিপরীত অর্থটাই জনসাধারণের মন ও বুদ্ধিকে এতকাল আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে এবং নিজেদের জাগতিক উন্নতি ও দেশের স্বাধীনতা অর্জ্জনে তাহাদিগকে একেবারে উদাসীন অথবা অর্দ্ধ আগ্রহশীল মাত্র করিয়াছে। তাহাদের মর্ম্মকোষে বৈরাগ্য সম্বন্ধে ভ্রমাত্মক ধারণারূপ কীট প্রবেশ করিয়া বহু শতাব্দী ধরিয়া তাহা কুরিয়া কুরিয়া খাইয়া জাতির জীবনীশক্তিকে প্রায় নিঃশেষ করিয়া ফেলিয়াছে। বেদান্তই একমাত্র এই ভ্রম দূর করিতে পারে। কেবলমাত্র বেদান্তের অদ্বৈত উপলব্ধিই মানব মনে এই জ্ঞান আনিয়া দিতে পারে যে, জগৎ, জাতি ও দেশ মিথ্যা নহে, জীবন ক্ষণভঙ্গুরও নহে, উহা সত্য ও নিত্য। বর্ত্তমানে যতটুকু সত্য বোধ হইতেছে, ব্রহ্মসত্তায় সত্তাবান বলিয়া ইহা তদপেক্ষা অধিকতর সত্য ও নিত্য। এই বোধ যদি জাতি একবার ফিরিয়া পায়, তবে ইহার সহিত দুর্ব্বার ঐশীশক্তিও সে পাইবে এবং তাহারই পূর্ণ স্ফুরণে সে এতদিনের দুর্ব্বলতা একদিনে জয় করিতে পারিবে। এই উদ্দেশ্যেই অর্থাৎ ভারতবাসীর মনোভাবকে প্রাচীন পন্থা হইতে ফিরাইয়া নব ভাবে ও নব খাতে প্রবাহিত করিবার জন্যই স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছেন, "আগামী পঞ্চাশৎ বর্ষ ধরিয়া সেই পরম মাতৃভূমি যেন তোমাদের আরাধ্য দেবী হন, অন্যান্য অকেজো দেবতাগণকে এই কয়েক বর্ষ ভুলিলে কোন



শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস

ক্ষতি নাই। অন্যান্য দেবতারা ঘুমাইতেছেন—এই দেবতাই একমাত্র জাগ্রত—তোমার স্বজাতি—সর্ব্বত্রই তাঁহার হস্ত, সর্ব্বত্র তাঁহার কর্ণ, তিনি সকল ব্যাপিয়া আছেন। তোমরা কোন্ নিষ্ফলা দেবতার অন্বেষণে ধাবিত হইতেছ, আর তোমার সম্মুখে, তোমার চতুর্দ্দিকে যে দেবতাকে দেখিতেছ, সেই বিরাটের উপাসনা করিতে পারিতেছ না।···প্রথম পূজা বিরাটের পূজা, তোমার সম্মুখে, তোমার চারিদিকে যাহারা রহিয়াছে, তাহাদের পূজা—ইহাদের পূজা করিতে হইবে। এই সব মানুষ, এই সব পশু—ইহারাই তোমার ঈশ্বর, আর তোমার স্বদেশবাসিগণই তোমার প্রথম উপাস্য।

তোমাদিগকে পরস্পরের প্রতি দ্বেষ-হিংসা পরিত্যাগ করিয়া ও পরস্পরে বিবাদ না করিয়া প্রথমে এই স্বদেশিগণের পূজা করিতে হইবে।"

পৃথিবীর কোন দেশের কোন দার্শনিক বা কোন স্বদেশ-প্রেমিকই তাঁহার তত্ত্বকে এইরূপ বাস্তব রূপ দিতে অথবা দেশপ্রেমকে এইরূপ বিশ্বজনীন উচ্চভূমিতে তুলিয়া ধরিতে সক্ষম হন নাই। স্বামী বিবেকানন্দের অদ্বৈত উপলব্ধি স্বদেশের মৃত্তিকাতে নামিয়া আসিয়াছে এবং তাঁহার তীব্র স্বদেশ-প্রেম ব্রহ্মসাক্ষাৎকারজনিত অসীম ঈশ্বর-প্রেমের সহিত অনন্ত ঊর্দ্ধে মিশিয়া গিয়াছে। ইহা অপূর্ব্ব, জগতে ইহা অভিনব। এই অপূর্ব্ব ও অভিনব দান—নব্য ভারতের নব জাতীয়তা গঠনের এই উপাদান সমসাময়িক ও পরবর্ত্তী স্বদেশবাসিগণের জন্য স্বামী বিবেকানন্দ রাখিয়া গিয়াছেন। এই উপাদানেই তাহাদিগকে নবীন-ভারত গড়িয়া তুলিতে হইবে।

এই উপাদানে নব্য ভারতের নব জাতীয়তা গঠন করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন ভগিনী নিবেদিতা। তিনি আইরিশ দুহিতা, কিন্তু বিবেকানন্দের মানস-কন্যা। তিনি ছিলেন পাবকের মত পবিত্র, অগ্নিশিখার মতই তেজস্বিনী। তিনি ভারতবর্ষকে মাতৃরূপে ও ভারতবাসীকে সহোদর-সহোদরা তুল্য ভালবাসিয়াছিলেন। আয়ারল্যাণ্ডে আইরিশ পিতা-মাতার গৃহে জন্মগ্রহণ করিলেও ভারতবর্ষই ছিল তাঁহার স্বদেশ, এই স্বদেশের প্রতি গভীর প্রেম গুরু বিবেকানন্দই তাঁহার মানসী কন্যার অন্তরে সঞ্চারিত করিয়াছিলেন। সেই প্রেম পরবর্ত্তী জীবনে গভীর হইতে গভীরতর, বিস্তৃত হইতে বিস্তৃততর হইয়া, তাঁহার অন্তর হইতে শতধারে উছলিয়া পড়িয়া সংস্রদিকে ছুটিয়া গিয়াছিল। শিক্ষা ও শিল্পকে জাতীয়ভাবে পুনরুজ্জীবিত করিতে তিনি সাক্ষাৎভাবে কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, আর রাজনীতিকে জাতীয় রূপ দিতে নানা কারণে তিনি পরোক্ষে কাজ করিয়াছিলেন। বিংশশতাব্দীর প্রথম যুগে রাজনৈতিক আন্দোলনের যাঁহারা ছিলেন প্রধানতম নেতা, তাঁহাদের কয় জনের মধ্যে তিনি এই নব জাতীয়তার প্রতিষ্ঠা করিতে চাহিয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে ছিলেন রবীন্দ্রনাথ, অরবিন্দ ও বিপিনচন্দ্র। চিত্তরঞ্জনও তাঁহার নিকট এই জাতীয়তার স্বাদ পাইয়াছিলেন। তাই দেখিতে পাওয়া যায়—পাশ্চাত্য রাজনীতি গ্রহণ করিলেও ইঁহারা কেহই খাঁটি পাশ্চাত্য রাজনীতিজ্ঞ হন নাই, তাঁহাদের অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে অন্তঃশীলারূপে যে ধারা প্রবাহিত হইত তাহা সম্পূর্ণরূপে ভারতীয়; ভারতের সাধনা, ভারতের কৃষ্টি, ভারতের মানবতা ও আধ্যাত্মিকতার অন্তরে থাকিয়া তীব্রতম রাজনৈতিক আন্দোলনের মধ্যেও তাঁহাদিগকে নূতন রূপে প্রকাশ করিত, অন্যান্য রাজনৈতিক নেতাদিগের মনোভাব হইতে তাঁহাদের চিন্তা-ধারাকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র করিয়া রাখিত। সেই স্বাতন্ত্র্য স্বাভাবিক ভাবেই তাঁহাদের অন্তরে পূর্ব্ব হইতেই ছিল এবং সেইজন্যই তাঁহারা ভগিনী নিবেদিতার সংস্পর্শে আসিয়াছিলেন, তিনিও সমজাতীয় আধার পাইয়া নিজ অফুরন্ত প্রাণধারা তাঁহাদের অন্তরে ঢালিয়া দিয়াছিলেন। সেই প্রাণধারা তাঁহাদের ছাপাইয়া উঠিল, সে ধারা পান করিয়া শত সহস্র কর্ম্মী নব বলে বলীয়ান্ হইল, নূতন আদর্শ দেখিতে পাইল এবং সেই আদর্শে নিজেদের ব্যক্তিগত জীবন গড়িয়া তুলিয়া নব জাতীয়তার বেদীতে অর্ঘ্যরূপে তাহা নিবেদন করিল। তাহাদের স্থলে পরবর্ত্তীকালে যাহারা আসিল, তাহারা কিন্তু সে আদর্শ ধরিতে পারিল না। পুনরায় পাশ্চাত্য রাজনীতি ও জাতীয়তা বিলাতী সুরার ন্যায় বর্ণে ও ঘ্রাণে তাহাদের চিত্ত বিমোহিত করিল, তীব্র আকর্ষণে তাহা আকণ্ঠ পান করিয়া তাহারা প্রমত্ত হইল, ইহার অনিবার্য্য ফলস্বরূপ কর্দ্দম ও কোলাহলে ভারতের রাজনীতি ও জাতীয় সংগ্রাম পঙ্কিল ও পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। এইরূপ হইবার সম্পূর্ণ আশঙ্কা আছে জানিয়া ভগিনী নিবেদিতা রাজনৈতিক কর্ম্মিগণকে সাবধান করিয়া পথের নির্দ্দেশ দিয়া বলিয়াছিলেন,—

"Our leaders and our followers both require a deeper sadhana, a more direct communion with the Divine Guru and Captain of our movement, an inward uplifting, grander and more impetous force behind thought and deed. It has been driven home to us by experience that not in the strength of a raw unmoralised European enthusiasm shall we conquer. Indians, it is the spirituality of India, the

sadhana of India, tapasya, jnaham, shakti that must make us free and great···It is the Yogin who must stand behind the politcal leader or manifest within him ; Ramadas must be born in one body with Shivaji, Mazzani mingle with Cavour. The divorce of intellect and spirit, strength and purity may help a European revolution, but by a European strength we shall not conquer."

'আমাদের নেতা ও কর্ম্মিগণের চাই গভীরতর সাধনা, চাই ভগবানের সহিত অধিকতর অপরোক্ষ আত্মিক যোগ—যিনি আমাদের আন্দোলনের গুরু ও পরিচালক ; চাই অন্তর হতে আভ্যন্তরিক আত্মোন্নতি—যাহা চিন্তা ও কর্ম্মের পশ্চাতে প্রবলতর প্রেরণা-শক্তির দ্যোতক। অভিজ্ঞতার পর অভিজ্ঞতা হইতে আমরা ইহা উপলব্ধি করিয়াছি। অপবিশুদ্ধ, অবনৈতিক ইউরোপীয় উদ্দীপনা দ্বারা আমরা জয় লাভ করিব না। ভারতের আধ্যাত্মিকতা, ভারতের সাধনা, তপস্যা, জ্ঞান ও শক্তিই কেবল মাত্র আমাদিগকে স্বাধীন ও মহান্ করিতে পারে।······যে যোগী সেই একমাত্র রাজনৈতিক নেতার পশ্চাতে দাঁড়াইবে, অথবা তাহার মধ্যে আপনাকে প্রকাশ করিবে ; রামদাসকে শিবজীর একই শরীরে জন্ম গ্রহণ করিতে হইবে, ম্যাজিনীকে কাভোরের সহিত মিশিয়া যাইতে হইবে। বুদ্ধি ও ধর্ম্ম, শক্তি ও পবিত্রতা হইতে বিচ্যুতি হয় ত ইউরোপীয় বিপ্লব সম্ভব করিতে পারে, কিন্তু ইউরোপীয় শক্তিদ্বারা আমরা জয় লাভ করিতে পারিব না।'

ভারতীয় রাজনৈতিক আন্দোলনের প্রথম উন্মাদনার মুখে ভগিনী নিবেদিতা এইরূপ চিন্তাধারায় তাহাকে এক অভিনব অথচ চিরশাশ্বত পথে প্রবাহিত করিতে সচেষ্ট হইয়াছিলেন, যে পথে ঐতিহাসিক ভারতের স্বাধীনতার উপাসকগণ দলে দলে একদিন জয়যাত্রা করিয়াছিলেন, এ পথে তখনও ভারতের মুক্তির ইঙ্গিত, সমগ্র মানবের স্বাধীনতার স্বপ্ন। এ পথে যদি আসিতে চাও সে সর্ব্বস্ব ত্যাগ কর। মানের আকাঙ্ক্ষা, যশের আকাঙ্ক্ষা, দলপতি হইবার আকাঙ্ক্ষা বিশ্ববরেণ্য হইবার আকাঙ্ক্ষা, সকল আকাঙ্ক্ষায় জলাঞ্জলি দিয়া ভগবানের যন্ত্রস্বরূপ হইয়া যাও। নিজের মন ও বুদ্ধি শুদ্ধ করিয়া মন ও বুদ্ধির নিয়ামকের হাতে তাহাদের ছাড়িয়া দাও। কেবল একটি মাত্র আকাঙ্ক্ষা তীব্র হইতে তীব্রতর কর, তাহা ভারতের মুক্তি, ভারতের কল্যাণ, ভারতের ও সমগ্র মানবের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি। এই মুক্তির সাধনা নীরবে



ভগিনী নিবেদিতা

চলিয়াছে, কখন্ কোথায় তাহা প্রকট হইবে কেহই জানে না। নিবেদিতা সত্যই বলিয়াছেন,—

"The work that has begun at Dakshineswar, is far from finished, it is not even understood. That which Vivekananda received and strove to develop, has not yet materialised.···A less discreet revelation prepares, a more concrete force manifests, but where it comes, when it comes, none knoweth."

সপরিবারে

—শ্রীরাধিকারঞ্জন গঙ্গোপাধ্যায়

নিশিকান্ত নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে চলিয়াছে—সপরিবারে। খুব সাধারণ নিমন্ত্রণ ইহা নয়। বছর দুই ধরিয়া নিশিকান্তের ছোট বোন্ মানদা ও তাহার স্বামী শিবরাম মাসের পর মাস নিয়মিত ডাকঘরের মারফৎ চিঠি পাঠাইয়া নানাভাবে নিমন্ত্রণ জানাইয়া আসিয়াছে এবং লোক মারফৎও বহুবার নিমন্ত্রণ জানানো হইয়াছে। এতদিনে নিশিকান্ত সুযোগ-সুবিধা করিয়া উঠিতে পারিয়া সপরিবারে পুরুলিয়া যাইতে প্রস্তুত হইয়াছে। নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে অবশ্য খুবই দীর্ঘ সময় লাগিয়া গেল সন্দেহ নাই, কিন্তু নিশিকান্তের অবস্থা আর সকলের হইলে, নিমন্ত্রণ রক্ষা করা তাহাদের দ্বারা কোন কালেই সম্ভব হইত কি না কে জানে। নিশিকান্তের সপরিবারে বলিতে বৃহৎ ব্যাপার বুঝায়। স্বামী, স্ত্রী ও পুত্র-কন্যায় মিলিয়া তাহারা তেরো জন। পুরাতন চাকর সাধনকে সপরিবারের গণ্ডীতে আইনত না ফেলিতে পারিলেও তাহাকে বাদ দেওয়া চলিবে না। কারণ, এতগুলিকে একসঙ্গে সাম্‌লাইতে পারা নিশিকান্ত ও তাহার স্ত্রী রাধারাণীর সমবেত প্রচেষ্টায়ও সম্ভব নয়। অবশ্য সাধনের প্রচেষ্টা সেই সঙ্গে যোগ হইলেই আর অসাধ্য সাধন সম্ভব নয়—তবু মনকে প্রবোধ দিবার মত তাহা।

নিশিকান্ত সপরিবারে আসিয়া ট্রেনে উঠিল।

ট্রেন ছাড়িবার সামান্য পূর্ব্বেই নিশিকান্তের ভাল কথা মনে পড়িয়া গেল। মাল-পত্র এক-দুই-তিন করিয়া সে গুণিয়া হিসাব করিয়া লইল। গুনতিতে মাল মিলিয়া যাওয়ায় নিশিকান্ত অনেকটা শান্তি পাইল। তার পরেই নাম ধরিয়া হিসাব সুরু হইল।—আচ্ছা, ঝণ্টু, মণ্টু,......ঠিক আছে; লিলি কোথায় রে?...

—এই যে বাবা, আমি ঠিক তোমার পেছনে।

—বেশ, বেশ, নন্টু আছিস্, ঘেণ্টুকে দেখছি না যে?

—এই যে বাবা আমি।

রাধারাণী এইবার কথা কহিল, বলিল, আবার তোমার সেই ভুল, নন্টু বুঝি ঘেণ্টুর চেয়ে বড়? আগে ঘেণ্ট, তারপরে নন্টু।

নিশিকান্ত বলিল, আমিতো আর গর্ভে ধরিনি, আমার ছাই তাই মনেও থাকে না। আচ্ছা, যেতে দাও, হিসেবে মিললেই হ'লো। আবার সব গুলিয়ে দিলে ঘোড়ার ডিম। ঘেণ্টু-নন্টু পর্য্যন্ত হয়েছে। তারপরে পান্টু, মিমি, কাসি...?

তিনজনে একসঙ্গেই প্রায় বলিয়া উঠিল, এই যে বাবা—আমি।

—আচ্ছা, আচ্ছা, আচ্ছা। শন্টু, পিন্টু আর ভাল তো তোমার কোল জুড়েই রয়েচে। আঃ, বাঁচা গেল! সাধন এখন পাখা একটা কিনে নিয়ে এলেই যে হয়।

বলিতে বলিতেই প্রায় সাধন পাখা হাতে আসিয়া হাজির হইল। সাধনের হাত হইতে পাখাটা হাত বাড়াইয়া লইয়া নিশিকান্ত বলিল, কত দাম নিলে বেটারা শুনি?

সাধন বলিল, চার পয়সা।

নিশিকান্ত বলিল, ডাকাত বেটারা।

তারপরে মুহূর্ত্তে চক্ষু মুদ্রিত করিয়া ঘন ঘন পাখার বাতাসে নিজেকে ডুবাইয়া রাখিয়া নিশিকান্ত স্বস্তি অনুভব করিতে চেষ্টা পাইল। কিন্তু রাধারাণীর কেন জানি তাহা সহ্য হইল না। বলিল, ভাল আক্কেল তোমার যা'হোক্। পাখা কি আনতে দেওয়া হ'লো তোমার জন্যে, না এইগুলোর জন্যে?

বলিয়া রাধারাণী তিন পাশের তিনটিকে একসঙ্গে দেখাইয়া দিয়া নিশিকান্তের চৈতন্য হওয়ার পূর্ব্বেই ঝপ করিয়া তাহার হাত হইতে চলমান পাখাটি কাড়িয়া লইয়া কোলে-কাঁকের শিশুগুলিকে নিজের সঙ্গে বাতাস করিতে লাগিল।

নিশিকান্তের মুখের চেহারা ইহাতে খুব খারাপ হইল ধারণা করিবার কোন কারণ নাই। ইদানীং সে একটু স্বার্থপর হইয়া পড়িয়াছে সত্য। আর তাহা না হইয়াও তাহার উপায় নাই। বাঁচার সদ্‌বুদ্ধিই তাহাকে স্বার্থপর করিয়া তুলিয়াছে। এতগুলি নির্ব্বোধ সন্তানের পিতা হইলে বাঁচিতে হইলে তাহাকে একটু স্বার্থপর হইতেই হইবে।

পাখাটি হাতছাড়া হইয়া যাওয়ায় নিশিকান্ত আড়ষ্ট হইয়া বসিয়া রহিল।

ট্রেন চলিতে সুরু করিল।

সঙ্গে সঙ্গে সমবেত শিশুকণ্ঠে হর্ষ-ধ্বনি জাগিয়া উঠিল। তাহাতেও নিশিকান্ত নিশ্চল ছিল। কিন্তু যেই তাহাদের মধ্যে স্থান পরিবর্ত্তনের একটা প্রচেষ্টা দেখা দিল অমনি নিশিকান্ত চঞ্চল হইয়া উঠিল। সকলেই একসঙ্গে জানালার কাছে বসিবার জন্য রীতিমত মারামারি সুরু করিয়া দিল। দুটি মাত্র জানালা তাহাদের ভাগে পড়িয়াছে—কিন্তু সেখানে এতগুলির স্থান হয় কেমন করিয়া। মহাসমস্যা! ঘেন্টুই গোলমাল সুরু করিল সর্ব্বাপেক্ষা বেশী। সে একাই একটা জানালা দখল করিয়া বসিতে চায়। কাজেই লিলির চুলের মুঠি ধরিয়া একটানে তাহাকে সে নীচে নামাইয়া দিল।

লিলির কান্না সুরু হওয়ার আগেই ঝণ্টু ঘেন্টুর একটা কান শক্ত করিয়া চাপিয়া ধরিল। ঘেন্টু অপমানে একেবারে ফাটিয়া পড়িল,—ষ্টুপিড্ কোথাকার! কান ধরিলি যে বড়! এখুনি দেব দুই ঘুষি লাগিয়ে।

মনে হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই লাফাইয়া পড়িয়া ঝণ্টুর নাকে এক ঘুষি। ঝণ্টুও ঘুষি তুলিল। কিন্তু নিশিকান্ত ও রাধারাণী প্রায় একসঙ্গেই দুইজনকে পরস্পরের ঘুষির সীমানার বাইরে ঠেলিয়া সরাইয়া রাখিল।

রাধারাণী ঝণ্টুকে টানিয়া নিজের কাছে বসাইয়া রাখিয়া বলিল, ঐ হারামজাদা ঘেন্টুটাকে সঙ্গে নিয়ে না আসাই উচিত ছিল—দস্যি কোথাকার!

মিলি হঠাৎ বলিয়া উঠিল, মা, ঘেন্টুদা' আমাকে মুখ ভেংচালে দেখো না। আর তোমার কথা শুনে মুখ টিপে হাসচে আবার।

রাধারাণী জ্বলিয়া পুড়িয়া উঠিয়া বলিল, ধ'রে রয়েচো কেন, দাও না দু'ঘা বসিয়ে উত্তম মধ্যম, নইলে ও হারামজাদকে কি কেউ শায়েস্তা করতে পারবে নাকি!

নিশিকান্ত ঘেন্টুকে নিজের পাশে জায়গা করিয়া চাপিয়া বসাইয়া বলিল, ঘোড়ার ডিম, মা'র ধ'র করতে করতে যেতে হবে নাকি? ভাল জ্বালাতন!

মনে মনে ভাবিল, কোথাও যাইতে হইলে কামরা রিজার্ভ করিয়া যাওয়াই তাহার উচিত। কিন্তু—

ট্রেন পুরুলিয়া আসিয়া পৌঁছিল।

পথে বৃহৎ এবং উল্লেখযোগ্য ঘটনার মধ্যে মিলির কপাল কাটিয়াছে। সে জন্য দায়ী অবশ্য ঘেন্টু। কি যেন ব্যবস্থা তাহার মনোমত না হওয়ায় সে মিলিকে ধাক্কা মারিয়া ফেলিয়া দেয় এবং মিলি ধাক্কার বেগ সাম্‌লাইতে না পারিয়া একটা ট্রাঙ্কের উপর গিয়া পড়ে। ইহার পরে ঘেন্টুও ঘা কতক খাইয়া শান্ত হইয়াছিল।

পুরুলিয়া ট্রেন আসিয়া পৌঁছিতেই নিশিকান্তের প্রথম কথাই মনে হইল, নামিতে হইবে।

না নামিতে হইলেই যেন সে বাঁচিয়া যাইত।

শিবরাম ষ্টেশনে আসিয়াছিল। সঙ্গে তাহার চাকর নিতাইও ছিল।

শিবরাম খুব ধীর স্থির লোক। সহজে বিচলিত হইতে সে জানে না। কাজেই নিশিকান্তকে অস্থির হইয়া উঠিতে দেখিয়া সে তাহাকে মালগুলির কাছে দাঁড়াইতে বলিয়া নিজেই এক একটি করিয়া ছেলে ও মেয়েদের হাত ধরিয়া ট্রেন হইতে নামাইল এবং সর্ব্বশেষে নামিল রাধারাণী কোলে সর্ব্বকনিষ্ঠ ডলিকে লইয়া।

নিশিকান্ত মনে মনে মাল-পত্রের হিসাব নিকাশ করিয়া ফেলিয়া ছেলে-মেয়েদের গণনা কাজে লাগিয়া গেল। সত্যি, হিসাবে যে একজন কম পড়িয়া যাইতেছে। নিশিকান্ত বিশেষ ব্যাকুল হইয়া বলিয়া উঠিল, সন্টু কোথায়?

রাধারাণী বলিল, কেন, ঐতো ঝণ্টুর কোলে।

নিশিকান্ত বলিল, ওটাতো পিন্টু—সন্টু কোথায়?

রাধারাণী মৃদু একটু হাসিয়া বলিল, অদ্ভুত যত কথা শোন' বলি, পিন্টু তো রয়েছে তোমার কোলে।

নিশিকান্ত লজ্জিত হইয়া বলিল, ও আমারই ভুল হয়েচে বটে! সন্টু নয়, আমি পিন্টুকেই খুঁজছিলাম। তাইতো আমার কাছেই তো রয়েচে। মাথার কি আর ঠিক থাকে ছাই এই এতগুলোর জ্বালায়!

শিবরাম, নিতাই ও সাধনকে দিয়া মাল-পত্র সব ষ্টেশনের বাহিরে নিয়া গিয়া ঘোড়ার গাড়ীর মাথায় চাপাইয়া দিল এবং পরে সাধনকে লইয়া ফিরিয়া আসিয়া আবার সপরিবারে নিশিকান্তকে লইয়া চলিল।

দুইখানি ঘোড়ার গাড়ী ভাড়া করিতে হইয়াছিল, কারণ একখানিতে কুলানো সম্ভব নয়।

ঘোড়ার গাড়ী ছাড়িলে পর নিশিকান্ত কতকটা নিশ্চিন্ত হইতে পারিল তবু'।

মানদা একপ্রকার ছুটিয়া আসিয়া দাদা ও বৌদিদির পায়ের ধুলা লইয়া কি যে খুশী হইয়া উঠিল, তাহা আর ভাষায় প্রকাশ করা চলে না।

মুখে বলিল, এতদিনে আমার আশা পূর্ণ হ'লো তবু।

নিশিকান্ত বলিল, তোর আশা পূর্ণ করা যে কি অসাধ্য সাধন আমার পক্ষে, তা যদি তুই বুঝতিস্ তা'হ'লে আর আমাকে দোষ দিতিস্ কি মানি। ভগবান্ জানেন কি ভাবে এ-যাত্রা এসে পৌঁচেছি। ছেলে তো নয় সব গুণের সাগর। ঘোড়ার ডিম—মানুষের যে আবার কেন ছেলে-পুলের সাধ হয়, তা কে জানে।

রাধারাণী নিশিকান্তের এ-উচ্ছ্বাস কেন জানি সহ্য করিতে পারিল না। তাই বলিল, ছেলে-পুলেদের আর দোষ দিও না। নিজেই তুমি পথ-ঘাটে চলার পক্ষে অযোগ্য একেবারে। নইলে ওরা আমার এমন কি অন্যায় কাজটা পথে করেচে শুনি?

মানদা তাড়াতাড়ি বলিল, যাকৃগে বৌদি, সে সব কথা পরে হ'তে পারবে, এখন ছেলে-পুলেদের একটু সামূলে নিয়ে পথের কাপড়-চোপড় ছেড়ে মুখে তোমরা কিছু দিয়ে নাও আগে।

ঝণ্টু আসিয়া মানদাকে প্রণাম করিল। মানদা ঝণ্টুকে বুকের কাছে টানিয়া নিয়া মাথায় হাত রাখিয়া বলিল, বেঁচে থাকো বাবা! এবার কোন্ ক্লাশ হ'লো শুনি?

ঝণ্টু বলিল, ফোর্থ ক্লাশ।

ঝণ্টুর দেখাদেখি মণ্টু, লিলি, ঘেণ্টু, নণ্টু, পাণ্টু ও মিলি যে যেমনি পারিল চট্ করিয়া মানদার পায়ে প্রণাম সারিয়া নিল।

মানদা মিলির কপালের দিকে তাকাইয়া বলিল, ও বৌদি, এটার কপালে আবার কি হ'লো? কি না নাম ওর?

নিশিকান্ত বলিল, কার কথা তুই বলছিস্ মানি, হাসির কথা? হাসির কপাল ফাটবে না তো ফাটবে কার শুনি?

হাসি অমনি বলিয়া উঠিল, না বাবা, আমার কপাল তো ফাটেনি, ফেটেছে মিলির।

রাধারাণী বলিল, সব তা'তে তোমার আগ বাড়িয়ে কথা বলতে যাওয়া কেন বাপু? একটা ছেলে-মেয়েরও নাম তো বাপু তোমার মনে থাকে না।

নিশিকান্ত কিছুমাত্র অপ্রতিভ না হইয়া বলিল, তা'তো থাকেই না, আর থাকা সম্ভবও নয়, আমি তো আর গর্ভে ধরিনি।

মানদা দাদার কথায় হাসিয়া উঠিল।

রাধারাণী রীতিমত চটিয়া গিয়া বলিল, শুনলে কথা ঠাকুরঝি, যেন গর্ভের থেকেই সব নাম নিয়ে পড়েচে।

নিশিকান্ত বলিল, তা না পড়ুক, ঘোড়ার ডিম—আমার মনে থাকে না। বেশ, আমি না হয় আর নাই বললাম তোমার মনে থাকে, তুমিই বলো।

বাদানুবাদ থামিলে মানদা ছেলে-মেয়েদের লইয়া অন্যত্র চলিয়া গেল এবং রাধারাণীও সেই সঙ্গে গেল। নিশিকান্ত নিতাইকে সঙ্গে লইয়া স্নানের জন্ম চলিয়া গেল।

শিবরামের বাড়ীটি নিতান্ত ছোট নয়। একতালা হইলেও বাড়ীর ভিতরে একটি সুপ্রশস্ত উঠান আছে এবং চার পাঁচটি শয়নকক্ষও আছে। শিবরামের রুচি-জ্ঞান ভালই বলিতে হয়, বাড়ীটি নিখুঁত পরিপাটিরূপে সাজানো। একপাশে ছোট একটি বাগানও আছে। বহু মূল্যবান আসবাবপত্রে প্রত্যেকটি কক্ষ যতদূর সম্ভব সাজানো এবং সব কিছুই বেশ পরিষ্কার ঝক্‌ঝকে করিয়া মাজিয়া ঘষিয়া রাখা। বাড়ীতে লোকজন বিশেষ নাই বলিয়াই হয় তো এতখানি পরিষ্কার ও সাজানো রাখা সম্ভব হইয়াছে।

নিশিকান্ত, শিবরামের বাড়ীর চতুর্দ্দিকে ঘুরিয়া ফিরিয়া দেখিয়া মনে মনে বলিয়া উঠিল, লোক নেই, জন নেই, থাকবে না ঝক্‌ঝকে তক্‌তকে, হ'তো আমার অবস্থা তো বুঝতাম কেমন ক'রে রাখে বাড়ীর এ হাল।

সেই সঙ্গে নিশিকান্ত একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল।

প্রথম দিন একপ্রকার নিরুপদ্রবেই কাটিল। যেহেতু

নিশিকান্তের সন্তানদল নূতন স্থানে ও নূতন লোকের মাঝে আসিয়া পড়িয়া কেমন একটু যেন শান্ত হইয়া আছে।

পরদিন সকালে উঠিয়া ঘেণ্টু বাড়ীটার চারিদিকে একবার ঘুরিয়া আসিল এবং ফিরিয়া আসিল একটা মস্ত ব্যাঙ দড়িতে বাঁধিয়া। তারপর একবার সে মণ্টুর গায়ে দিতে যায় সেই ব্যাঙ্‌টা, আর একবার লিলির গায়ে। আর সে কি তাহাদের চীৎকার! বাড়ীময় রীতিমত একটা কোলাহল পড়িয়া গেল।

রাধারাণী হেই হেই করিয়া ছুটিয়া আসিল ঘেণ্টুকে তাহার দুষ্কার্য্য হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিবার জন্ম। কিন্তু ঘেণ্টু বেপরোয়া। ব্যাঙ্‌টা সে তাহার মায়ের গায়েও লাগাইবার জন্ম ভীতিপ্রদ একটা ভঙ্গী করিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড় দিল। সাধন ও নিতাই বহু চেষ্টা করিয়াও ঘেণ্টুকে খুঁজিয়া বাহির করিতে পারিল না। সে যে কোথায় পালাইয়াছে কে জানে। এখানে রাস্তা-ঘাটও তাহার পরিচিত নয়, কাজেই যত সময় যাইতে লাগিল ততই সবার ভাবনা বাড়িতে লাগিল।

বেলা দশটা বাজিয়া গেল, তবু ঘেণ্টুর সন্ধান মিলিল না। সাড়ে দশটার সময় দেখা গেল, শিবরামের একটা হাত ধরিয়া ঘেণ্টু ফিরিতেছে। বাড়ীর কাছাকাছি আসিয়া শিবরাম বলিয়া উঠিল, ওতো কিছুতেই আসবে না। বলে মা আমাকে পেলে মেরে ফেলবে আজ। তারপরে অনেক অভয় দিয়ে ধরে নিয়ে এসেছি। তুমি কিন্তু কিছু বলতে পারবে না ওকে বৌদি।

রাধারাণী রীতিমত ক্রিদ্ধকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, না, তা কি আর বলবো, আমার হাড়-মাস ওরা ক'টিতে একেবারে জ্বালিয়ে দিলে। ওদের জ্বালায় আমার আর বাঁচতে সাধ নেই এক দণ্ডও। এই ঘেণ্টুটা আবার সব চেয়ে হারামজাদা।

শিবরাম বলিল, তা'হোক, আজ ওকে কিছুতেই তা ব'লে মারতে পাবে না বৌদি, আমি ওকে অভয় দিয়ে এনেছি।

রাধারাণী ফিরিয়া হাসিকেই ঘা দুই লাগাইয়া দিয়া সেখান হইতে চলিয়া গেল। কারণ কিছুক্ষণ ধরিয়া হাসি মায়ের কাপড়ের আঁচল ধরিয়া কাঁদিয়া ফিরিতেছিল, কি একটা জিনিষের জন্ম।

হাসি মাটিতে বসিয়া পড়িয়া সরব সঘন কান্না জুড়িয়া দিল।

শিবরাম ও নিশিকান্ত নিম্‌কি ও হালুয়া সহযোগে চা পান করিতেছে। রাধারাণী সেখানে পিণ্টু ও ডলিকে লইয়া বসিয়া আছে এবং থাকিয়া থাকিয়া তাহাদের তত্ত্বাবধান কার্য্য করিতেছে। মানদা তাহাদের পরিবেশন করিতেছে। মানদার দুই দিকে নজর রাখিতে হইতেছে, যেহেতু ছেলেমেয়েরা তাহার রান্নাঘরের সামনের বারান্দায় খাবার লইয়া রীতিমত হুড়াহুড়ি সুরু করিয়া দিয়াছে। মণ্টু খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে একটু বিশেষ লোভী। সে নিজের ভাগ সবার আগে শেষ করিয়া অপরের ভাগ হইতে ভাগ বসাইবার জন্ম নানাপ্রকার ফিকির-ফন্দী সুরু করিয়া দিয়াছে এবং অন্যায় অত্যাচার করিতেও কুণ্ঠা বোধ করিতেছে না। মিলির প্লেটে তিনখানি নিম্‌কি ছিল, সে কণিকের জন্ম উঠিয়া একবার কুয়াতলার কাছে গিয়াছিল, অমনি একখানি নিম্‌কি তাহার খোয়া গিয়াছে। সকলেই দেখিয়াছে, মণ্টু তাহা উদরস্থ করিয়াছে। মিলি রাগে নিজের প্লেটখানি তুলিয়া ধরিয়া সজোরে তাহা শানের মেঝের উপর আছড়াইয়া ভাঙিল। মানদা অন্যত্র গিয়াছিল, আওয়াজ শুনিয়া ছুটিয়া আসিল। মানদাকে ছুটিয়া আসিতে দেখিয়া মিলি সজ্ঞানে ফিরিয়া আসিল এবং সে যে মস্ত অন্যায় করিয়াছে তাহা বুঝিতে পারিয়া দেয়ালের গায়ে গিয়া ঠেস দিয়া কাঁদ কাঁদ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

মণ্টু বলিল, উল্লুক মেয়ে কোথাকার, প্লেট ভাঙ্‌লি যে? বাবাকে আমি ব'লে দিয়ে তোকে কেমন না মার খাওয়াই দেখিস্।

বলিয়া মণ্টু যে ঘরে তাহার বাবা ও পিসেমশাই চা পান করিতেছিল সেই ঘরের উদ্দেশ্যেই চলিয়া গেল।

পথে ঘেণ্টুর সঙ্গে তাহার দেখা হইয়া যাইতে ঘেণ্টু বলিল, ফুটবলটা এখন পাম্প ক'রে নিতে পারলেই হয়, মাঠ তৈরী হ'য়ে গেছে।

মণ্টু জিজ্ঞাসা করিল, মাঠ কোথায় তৈরী করলি শুনি?

ঘেণ্টু বলিল, পিসেমশায়ের বাগানের গাছপালা উপড়িয়ে সাফ্‌ ক'রে দিয়েছি, বেশ মাঠ হ'য়েছে এখন। ছোট হ'লো বটে, তা'হোক্‌ ওতেই চ'লে যাবে। দেখে যাবি আয়না।

বলিয়া ঘেণ্টু মণ্টুর হাত ধরিয়া টানিল। মণ্টু মাঠ দেখিতে চলিল।

নিতাই বাগানের এ-হেন অবস্থা দেখিয়া ছুটিয়া গিয়া বাবুর কাছে জানাইল। শিবরাম ও নিশিকান্ত উভয়েই শুনিয়া স্তম্ভিত হইয়া গেল। নিশিকান্ত মনে মনে ভাবিল, ভগবান, এদের হাত থেকে আমাকে নিষ্কৃতি দাও। ছেলেদের জ্বালায় আর কোথাও গিয়ে শান্তি পাব না।

শিবরাম চা পান শেষ করিয়া বলিল, বলিস্ কি নিতাই, বাগানের একটা গাছও নেই? কে করলে এ কাণ্ড শুনি?

নিতাই বলিল, ঝণ্টু দাদাবাবু আর ঘেণ্টু দাদাবাবুকে তো সেখানে আমি দেখে এলুম। আর কেউ সঙ্গে ছিল কিনা তা বলতে পারি না।

কোন রকমে চা পান শেষ করিয়া শিবরাম ও নিশিকান্ত বাগান দেখিতে চলিল। তাহাদের পিছু পিছু রাধারাণীও চলিল এবং সঙ্গে নিতাইও ছিল। বাগানের অবস্থা দেখিয়া সকলেরই মুখের চেহারা পাল্টাইয়া গেল। নিশিকান্ত বলিল, সর্ব্বনাশ! বাগানে ত একটা গাছও রাখেনি দস্যিরা!

রাধারাণী বলিল, কে করেছে এ কাণ্ড শুনি নিতাই?

নিতাই দাদাবাবু বলিল, কে করেছে তাতো আমি স্বচক্ষে দেখিনি, তবে ঘেণ্টু আর ঝণ্টু দাদাবাবুকে এর আশে পাশে আমি দেখেছি।

রাধারাণী বলিল, এ তবে হারামজাদা ঘেণ্টুর কাজ।

বলিতে বলিতে ঘেণ্টু ও মণ্টু তিন নম্বরের একটা বল ও সিরিঞ্জ সঙ্গে লইয়া সেখানে আসিয়া উপস্থিত। ঘেণ্টুর হাতে সিরিঞ্জ, আর মণ্টুর হাতে ছিল বল। ঘেণ্টু ও মণ্টু উপস্থিত সকলকে দেখিয়া বুঝিয়াছিল যে একটা ব্যাপার কিছু ইতিপূর্ব্বে এখানে ঘটিয়া গেছে, কিন্তু সঠিক কিছু ধারণা করিয়া উঠিতে পারে নাই। ঘেণ্টু তবু কতকটা অনুমান করিতে পারিয়াছিল, কিন্তু ভয় পাওয়ার মত বলিয়া তাহার মনে হয় নাই।

রাধারাণী সহসা একেবারে ঘেণ্টুর ওপর ঝাঁপাইয়া পড়িয়া তাহার হাত হইতে সিরিঞ্জটা কাড়িয়া লইয়া তাহা দিয়া ঘটাং ঘটাং করিয়া কয়েকটা ঘেণ্টুর পিঠে বসাইয়া দিল। ঘেণ্টু অতর্কিত আক্রমণ ও আঘাতে একেবারে মাটিতে লুটাইয়া পড়িয়া হাঁপাইতে সুরু করিল।

শিবরাম এ-ব্যাপারে বিশেষ লজ্জিত হইয়া ছুটিয়া আসিয়া ঘণ্টুকে তুলিয়া ধরিয়া বলিল, আঃ বৌদি, যেতে দাও, যা হবার তা হ'য়ে গেছে। ওদের ধ'রে মারলে কি বাগানের শোভা আবার ফিরে আসবে নাকি? যা করেচে, তা না বুঝিয়া করেছে; কি আর করা যাবে এখন।

নিশিকান্ত এতক্ষণ বহুকষ্টে চুপ করিয়া ছিল, এইবার বলিল, তখনই আমি বলেছিলাম যে, এসব সোনারচাঁদ ছেলে নিয়ে কোথাও যেয়ে কাজ নেই।

শিবরাম বলিল, তা'তে হয়েছে কি! বাগান আমি আবার সাজাতে পারবো। এজন্যে ওদের কিছু ব'লে আর কাজ নেই।

মানদাও খবর পাইয়া সেখানে আসিয়া হাজির হইল এবং তাহার সঙ্গে লিলি, মিলি, নন্টু, পান্টুও আসিয়া জুটিল!

ঘটনা বেশ জমিয়া উঠিল রাধারাণী আর একবার ঘেণ্টুকে তাহার কৃতকর্ম্মের জন্য শাসনে প্রবৃত্ত হইল, কিন্তু মানদা বাধা জন্মাইল।

—আঃ রাগের বশে কিছু ক'রোনা বৌদি। বলিয়া মণ্টুকে সেখান হইতে সরাইয়া লইয়া গেল।

নিশিকান্ত শিবরামের সঙ্গে সেখান হইতে ফিরিয়া আসিয়া ঘরে ঢুকিয়া দেখিল পিন্টু তাহাদের পরিত্যক্ত চা ও নিম্‌কির অবশিষ্টাংশ সর্ব্বাঙ্গে মাখিয়া মহাখুসী হইয়া মেঝেয় গড়াগড়ি দিতেছে। পিংটুর সে মূর্ত্তি দেখিয়া নিশিকান্তের আপাদমস্তক জ্বলিয়া উঠিল। একটা চিৎকার করিয়া সে রাধারাণীকে ডাকিয়া মেঝের ওপরে হাত-পা ছাড়িয়া দিয়া বসিয়া পড়িল। দুঃখে ও ক্ষোভে তাহার সর্ব্বশরীর রী রী করিয়া উঠিল!

নন্টু আসিয়া খবর দিল, বাবা দেখবে এসো, বড়দা এক হাই শট্ মেরে বারান্দার বড় ঘড়িটা ভেঙ্গে চুরমার ক'রে ফেলেচে।

নিশিকান্ত শুনিয়া স্তম্ভিত হইয়া গেল, তারপরে বলিল, এঁ্যা, বলিস্ কি!

নন্টু বলিল, হ্যাঁ বাবা, দেখবেই চলো না। আর বড়দা ঘড়ি ভেঙ্গে সেই যে পেছনের দরজা দিয়ে দৌড়ে কোথায় পালিয়ে গেচে তার খোঁজ নেই।

নিশিকান্ত নিতান্ত অনিচ্ছায় বাড়ীর ভিতরে প্রবেশ করিল। শিবরাম বাড়ী ছিল না। নিজের কাযের জন্য কোথায় যেন গিয়াছে। নিশিকান্ত রাস্তায় একা একাই পায়চারি করিতেছিল, এমন সময় নন্টু আসিয়া এই শুভ-সংবাদ দিল।

বাড়ীর ভিতরে প্রবেশ করিয়াই সে বুঝিল যে, একটা বিশেষ ঘটনা কিছু ঘটিয়া গিয়াছে নিশ্চয়। বারান্দায় আসিয়া প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গেই রাধারাণী একেবারে কাঁদিয়া পড়িয়া বলিল, আর আমি একদণ্ডও এখানে এই সব ধনুর্দ্ধর ছেলে-পুলে নিয়ে থাকতে চাইনি, তুমি আমাকে নিয়ে চলো কল্‌কাতা। বিশ্রাম আমার খুব হয়েচে, আর স্বাস্থ্যও আমার ফিরে গেছে। গর্ভে যত শত্তুর ধরেছিলাম!

নিশিকান্ত মহাবিব্রত হইয়া মানদার দিকে ফিরিয়া বলিল, ঘড়িটা অত উঁচু থেকে পড়লো কেমন ক'রে?

মানদা বলিল, পই পই ক'রে ওদের বারণ করলাম যে, এখানে ফুটবল নিয়ে খেলিস না বাবা, বাইরের বাগানে গিয়ে খেল সব, তা কি শুনলে কেউ। ঝণ্টু এমন বল মারলে যে, ঘড়িতে লেগে ঘড়ি ঠিক্‌রে এসে পড়লো মেজেতে, তারপরেই চৌচির একেবারে।

নিশিকান্ত অত্যন্ত গম্ভীরকণ্ঠে বলিল, কে কে ছিল শুনি?

মানদা বলিল, ঝণ্টু, মণ্টু, আর পণ্টুই বোধ হয় ছিল তখন বারান্দায়।

নিশিকান্ত চতুর্দ্দিকে একবার তাকাইল। ঝণ্টু ও মণ্টু সেখানে কোথাও নাই। বলিল, ঘেণ্টু ছিল না।

মানদা বলিল, না, তাকে ত সকাল থেকেই দেখচি না, খাবার পর্য্যন্ত না খেয়ে কোথায় যেন বেরিয়ে গেচে।

নিশিকান্ত বলিল, গেচে—আপদ গেচে।

তারপরে উন্মাদ-আক্রোশে পণ্টুটার কান ধরিয়া হিড় হিড় করিয়া তাহাকে কাছে টানিয়া আনিয়া সজোরে তাহার দুই গালে ঝড়ের বেগে দুইটি চড় বসাইয়া দিয়া বলিল, ঘোড়ার ডিম একেবারে, আমার মাথা খারাপ ক'রে দেবে এই হারামজাদা নন্টুটাই। আগে ভাল ছিল, দিন দিন ওরও যেন পাখা গজাচ্ছে।

মানদা বাধা দিতে গিয়া বলিল, আহা হা, একি করলে দাদা? পণ্টুটা কোন দোষই করেনি, ওতো আমার কাছে চুপ ক'রে বসেছিল।

নন্টু নিশিকান্তের ঠিক পিছনেই ছিল। বাবার কাণ্ড দেখিয়া হাসিয়া ফেলিয়া উর্দ্ধশ্বাসে ছুট দিল।

পন্টু মেঝেয় লুটাইয়া পড়িয়া কাঁদিতে লাগিল।

নিশিকান্ত হতাশ হইয়া বলিল, ঘোড়ার ডিম, মাথা আমার ওরা রীতিমত বিগড়ে দিয়েচে। পাগল হ'তে যা শুধু বাকী।



সপরিবারে নিশিকান্ত

রাত বারটা প্রায় বাজে। এতক্ষণে বাড়ী ঠাণ্ডা হইয়াছে। নিশিকান্ত সপরিবারে নিদ্রা যাইতেছে।

মানদা বলিল, বাবা! দাদা-বৌদির কি হালই না ক'রে ছেড়েছে এই ছেলেপুলের দল। এমন জানলে কি আবার চিঠির পর চিঠি লিখে ওদের আসতে বলি। দু'দিনে বাড়ী-ঘরের যা হাল হয়েছে—আমার তো কান্না পায়।

শিবরাম মনে মনে খুসী হইয়া বলিল, কেন, বড় না ছেলে-পুলে নেই ব'লে দুঃখু করতে! দেখলে তো তোমার দাদা-বৌদির হালখানা! এ রকম হ'লে পাগল হ'তে ক'দিন লাগতো শুনি?

মানদা বলিল, আর সাতদিন ওরা থাকলে এখানে, সত্যি, পাগল ক'রে ছেড়ে দেবে

শিবরাম বলিল, আমিতো ভাবছি, ঘেণ্টুটাকে রেখে দেব' এখানে কিছু দিনের জন্যে। দুরন্ত ছেলে আমার বেশ লাগে কিন্তু।

মানদা বলিল, রক্ষে করো! ওসব দুর্ব্বুদ্ধিতে আর কাজ নেই। এখন ভালয় ভালয় ওদের ট্রেণে তুলে দিতে পারলে আমি বাঁচি। আমার মাথা খারাপ হ'য়ে যাবার যোগাড় হয়েছে ওদের দৌরাত্মিতে। ছেলে তো নয় সব রত্ন একেবারে!

শিবরাম বলিল, ছেলে-পুলে যেখানে, সেখানে হুটো-পাটি হল্লা তো থাকবেই হবে।

মানদা বলিল, তা'বলে এত হুটো-পাটি, আমার তো মাথা ঘুরতে থাকে।

পাশের ঘরে হঠাৎ একটা চীৎকার, হৈ চৈ হল্লা। দাদা-বৌদি ও ছেলেপুলেরা একসঙ্গে একটা লঙ্কাকাণ্ড যেন বাধাইয়া তুলিয়াছে। শিবরাম ও মানদা নীরবে হল্লা শুনিয়া ব্যাপারটা প্রথম অনুধাবন করিতে চেষ্টা পাইল, কিন্তু সুবিধা করিয়া উঠিতে পারিল না।

মানদা শেষে বলিল, একটু উঠেই দেখো না কি আবার হ'লো।

শিবরাম উঠিয়া পাশের ঘরের দরজায় গিয়া ধাক্কা দিয়া প্রশ্ন করিল, কি হ'লো আবার বৌদি?

নিশিকান্ত দরজা খুলিয়া বাহির হইয়া আসিয়া বলিল, হবে আবার কি, ঘোড়ার ডিম! রাত্রে যে একটু নিশ্চিন্ত হ'য়ে ঘুমুবো তারও কোন উপায় নেই। ছেলেতো নয় সব এক একটা—ঘোড়ার ডিম!

শিবরাম বুঝিল, নিশিকান্ত রীতিমত চটিয়াছে, কাজেই বার বার মুখ দিয়া তাহার 'ঘোড়ার ডিম' কথাটা বাহির হইয়া আসিতেছে। কিন্তু আসলে কি যে ব্যাপার ঘটিয়াছে তাহা সে তখনও বুঝিয়া উঠিতে পারে নাই।

নিশিকান্ত বহুকষ্টে নিজেকে সামলাইয়া উঠিয়া বলিল, ঘেণ্টুটা নীচে শুয়েছিল, কখন আবার উঠে খাটে শুয়েছে ঠেলাঠেলি ক'রে। ধাকাধাক্কিতে পাণ্টুটা একেবারে মশারি-বালিশ সব শুদ্ধ নিয়ে হুড়মুড় ক'রে পড়েছে নীচে।

আলো জ্বালা হইল। দেখা গেল, পাণ্টু সর্ব্বাঙ্গে মশারি জড়াইয়া পাশবদ্ধ পাখীর মত ছট্‌ফট্ করিতেছে পাণ্টুকে মশারির জাল হইতে মুক্ত করিয়া দেখা গেল, মশারি ছিঁড়িয়া গিয়াছে অনেকখানি।

রাধারাণীর অতি দুঃখে হাসি পাইল, বলিল, দোষ দেব' কার, দোষ আমার অদৃষ্টের!

শিবরাম বিদায় লইয়া চলিয়া গেলে রাধারাণী আবার মশারি খাটাইতে লাগিয়া গেল।

পাশের বাড়ী অর্থাৎ নরনাথ উকিলের স্ত্রী পঙ্কজিনী ছুটিয়া আসিল। পঙ্কজিনীকে পাড়ার সকলেই রীতিমত ভয় করিয়া চলিত। একে দেহের আকারটা তাহার প্রকাণ্ড, তাহাতে আবার গলাখানিতে যেন কাঁসর-কাঁসি বাঁধা। এ যাবৎ সম্মুখ-সমরে সে বহু পাড়া-প্রতিবেশিনীকে আহ্বান করিয়াছে এবং বিনাযুদ্ধেই গায়েল করিয়া দিয়া আসিয়াছে, কারণ, তাহার সম্মুখ-সমরে আহ্বান শুনিয়াই কেহ আর কোনদিন সম্মুখীন হয় নাই। বিনা অপরাধে অপরাধ স্বীকার করিয়া লইয়া বাঁচিয়াছে। কিন্তু মানদার উপর কোনদিনই পঙ্কজিনীর ভঙ্গি প্রকাশের কোন প্রকার কারণ ঘটে নাই। মানদার বাড়ীতে কোন ছেলে-পুলে নাই এবং মানদা নিজেও অত্যন্ত নিরীহ স্বভাবের, কাজেই পঙ্কজিনীর রোষদীপ্ত চোখ-রাঙানি কোনদিনই তাহাকে দেখিতে হয় নাই। পঙ্কজিনীর এভাবে ছুটিয়া আসা এই প্রথম এবং মানদা উহাতে রীতিমত ঘাবড়াইয়া গেল। দাদার যা সব ধনুর্দ্ধর ছেলে-পুলে, কি যে কাণ্ড কোথায় করিয়া আসে তাহার তো ঠিক-ঠিকানা কিছু নাই। কি যে করিয়াছে, কে জানে। মানদা আতঙ্কে প্রায় বিবর্ণ হইয়া উঠিল।

পঙ্কজিনী বলিল, বলি, চোখের কি মাথা খেয়েছিস নাকি? কানেও কি তুলো গুঁজেছিস্ নাকি? নইলে সেই থেকে যে চীৎকার ক'রে মরচি সে কি কানে যায় না? আমার গলা যে শুনতে পায় না, সে তো কানের মাথা নিশ্চয়ই খেয়ে বসেছে। তাই ছুটে এলাম কানে ওষুধ দেলে দিতে।

মানদা বলিল, কি হয়েচে দিদি, তাই বলো না?

কি হয়েচে?—বলিয়া পঙ্কজিনী অদ্ভুত একপ্রকার ভঙ্গী করিয়া গালে হাত দিল বিস্ময় প্রকাশের জন্য এবং পরমুহূর্তেই একেবারে ফাটিয়া পড়িয়া বলিল, হয়েচে আমার মাথা আর মুণ্ডু! বলি এই বাঁদরগুলোকে ক'লকাতা থেকে চালান না

আনলেই চলতো না ? ওরা যে আমার বাড়ী ছন্ন-লন্ন ক'রে দিলে। এই দুপুর বেলা যে একটু ঘুমোবো তারই কি জো আছে ? তিনটে বাঁদরে গিয়ে উঠেচে আমার বাগানের পেয়ারা গাছে। কাঁচা-কচি পেয়ারা—তাই সই—মুখপোড়া বাঁদরের দল। গাছটাকে একেবারে মুড়িয়ে রেখে এলো—যা নয় তাই। ধরতে পারলে ওর এক একটাকে আমি ওখানেই পুঁতে রাখতাম। যাও বা একটাকে ধরলাম কোন রকমে সেটা আবার কাপড় ধ'রে এমন টানাটানি শুরু করলে যে প্রায় আমাকে ন্যাংটোই ক'রে ছাড়লে, এমন আস্পর্দ্ধা ! বাপ্‌রে, কি সব ডাংপিটে ছেলে। আবার দূর থেকে এক হারামজাদা এমন ঢিল ছুঁড়লে যে একটুর জন্যে কপালটা আমার ফাটেনি—এই দেখো ফুলেচে কতখানি।

সত্যই পঙ্কজিনীর কপালের একপাশ সুপারির মত ফুলিয়া উঠিয়াছিল।

মানদা সভয়-সন্ত্রাসে বলিল, কি করবো দিদি ওরা সব এসেচে দু'দিনের জন্যে এখানে। আমিই কি কম সহ্য করচি ! এবারটি মাপ করো দিদি।

পঙ্কজিনী সমান আক্রোশে বলিল, মাপ-ফাপ আমি বুঝিনে অত। হ'লোই বা তারা তোমার অতিথি, তা বলে ভদ্রলোকের ছেলে সব এমন ইতর হবে কেন ? আমার এমন ছেলে হ'লে যে আমি গলা টিপে শেষ ক'রে ফেলতাম। বাপ-মায়ের এ কোন্ দিশী শিক্ষা শুনি ? ছেলে-পুলে নিজে না শাসনে রাখতে পারো বোর্ডিং-এ দাও। তা'হ'লে এভাবে পরের অনিষ্ট ক'রে বেড়াবে। এবার আমার বাগানে ঢুকলে পরে ওদের ঠ্যাং যদি না আমি সন্ন্যাসীকে দিয়ে ভেঙে দি' তো আমি তোমাদের অমুক বাবুর বিয়ে করা পরিবারই নই।

মানদা বলিল, আর ওসব কথা কেন, এবারটি মাপ করো।

পঙ্কজিনী রুঢ়কণ্ঠে বলিল, ওসব কথা মানে ? বাড়ীতে লোকজন এসেচে তাই আমার মুখের গীতা এখনও শোনাই নি। আর যদি তোমার নিজের ছেলে-পুলে হ'তো তো আজ ও মু'য়ে আগুন জ্বেলে দিতাম। বলি শুধু জন্ম' দিলেই হয় না, ছেলে শাসন করতে হয়।

মানদা লজ্জায় মরিয়া গেল। ঘরের ভিতর হইতে রাধারাণী সমস্তই শুনিতেছে নিশ্চয়।

তাড়াতাড়ি বলিল, হাতযোড় ক'রে ক্ষমা চাইছি পঙ্কজ দিদি। ওরা দু'দিন বাদেই সব চ'লে যাবে তারপর যা তোমার শোনাতে হয় এসে শুনিয়ে যেও আমাকে।

পঙ্কজিনী উল্টা বুঝিয়া সঙ্গে সঙ্গে চীৎকার করিয়া উঠিল, আমি বুঝি লোককে শুধু শুনিয়েই বেড়াই, ওই বুঝি আমার পেশা। পঙ্কজিনী উচিত কথা বলে কিনা, তাই কারও সহ্যি হয় না।

এমন সময় নণ্টু কোথা হইতে ... টিয়া আসিয়া বাড়ীর মধ্যে ঢুকিল এবং সম্মুখে পঙ্কজিনীকে দেখিয়া আঁৎকাইয়া দুই পা পিছাইয়া গিয়া বলিল, এই মরেচে, বকাসুর বুড়ী যে এখানেও এসেচে।

বলিয়াই নণ্টু একছুটে আবার বাড়ীর বাহির হইয়া গেল

পঙ্কজিনী নণ্টুকে প্রবেশ করিতেও দেখিল এবং বাহির হইয়া যাইতেও দেখিল। মানদা মনে মনে প্রমাদ গণিল। ইহার পরে আর তাহার তো কিছু বলিবার থাকিতেই পারে না।

পঙ্কজিনী একটা ঢোক গিলিয়া লইয়া সুরু করিল, শুনলে ছেলের কথা ! আমি নাকি বকাসুর বুড়ী !……

মানদার গভীর দুঃখেও হাসি পাইল পঙ্কজিনীর নূতন নামকরণে। দাদার ছেলেগুলি এক একটি ধুরন্ধর একেবারে ! মানদা বিপদের গুরুত্ব দেখিয়া নিষ্প্রভ ম্লান হইয়া গেল।

পুরুলিয়া আর একদিনও রাধারাণীর ভাল লাগিতেছিল না। পঙ্কজিনী একেবারে সুধা ঢালিয়া দিয়া বিদায় লইয়াছে। রাধারাণীর জীবনের উপর কেমন জানি ঘৃণা জন্মিয়া গিয়াছে। এইসব ছেলে-পুলে লইয়া আর কখনও কোথাও তার যাওয়ার বাসনা নাই। এখন একবার কলিকাতা ফিরিয়া যাইতে পারিলে সে বাঁচে।

নিশিকান্ত প্রথম ঠিক রাজি হইতেছিল না। পরে সেও দেখিল, এখন বিদায় লওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ। সাতদিনের জন্য আসিয়া সাতদিনই যে থাকিতে হইবে এমন কোন' নিয়ম নাই। বরং দুইদিন আগে যাওয়াই ভাল। কারণ,

এইসব দুরন্ত ছেলেপুলেদের লইয়া একদণ্ডও বিদেশে আর ভরসা করিয়া থাকা চলে না। যে কোন মুহূর্ত্তে ইহারা এমন কাণ্ড করিয়া বসিতে পারে যে, পরে অনুতাপের আর অন্ত থাকিবে না। নিশিকান্ত তাই রাজি হইল।

কিন্তু রাত্রে হাসিই এ প্রস্তাবে প্রতিবাদ জানাইল কান্নাকাটি জুড়িয়া এবং হাসির এ অস্থিরতার কারণ অনুসন্ধান করিতে গিয়া দেখা গেল, তাহার সর্ব্বাঙ্গ জ্বরের তাড়সে পুড়িয়া যাইতেছে। রাত্রি বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে হাসির জ্বরও বাড়িতে লাগিল। ১০৩ ডিগ্রী পর্য্যন্ত জ্বর উঠিল।

পরদিনও হাসির জ্বর সারাদিনে আর ছাড়িল না, কিন্তু সন্ধ্যার দিকে জ্বরটা একটু যেন ছাড়িয়া গেল। আবার শেষ রাত্রের দিকে জ্বর সেই ১০৩ ডিগ্রীতেই দাঁড়াইল।

শিবরাম হাসির জ্বর হওয়ায় রীতিমত বিব্রত হইয়া উঠিল। বিজ্ঞ ডাক্তার ললিতবাবুকে ডাকিয়া আনিয়া দেখাইল। তিনি দেখিয়া বলিয়া গেলেন, এমন কিছু নয়, কাল-পরশুই জ্বর থেমে যাবে ব'লে আশা করচি। আচম্‌কা ভয়-টয় পেয়ে জ্বর হয়েচে ব'লে যেন মনে লাগচে।

পরে খোঁজ লইয়া জানা গেল যে, ঘেণ্টু সন্ধ্যার সময় শিবরামের হ্যাট্ পরিয়া মাথায় একটা ছাতি দিয়া হাসিকে ভয় দেখাইবার জন্য উঠানে গিয়া দাঁড়াইয়াছিল এবং হাসি তাহা দেখিয়া একটা ভীষণ চীৎকার দিয়া ঘরের মধ্যে গিয়া মেঝের উপর লুটাইয়া পড়িয়া কাঁদিয়া উঠিয়াছিল। ব্যাপারটা খুব সামান্য কয়েকজনেই জানিতে পারিয়াছিল এবং যাহারা জানিয়াছিল তাহারা অপরের নিকট আর প্রকাশ করে নাই। রাধারাণী এ-ব্যাপারের কিছুই জানিত না, যেহেতু সে আর মানদা সে সময় পাড়ার মনোহর চাটুয্যের বাড়ীতে বেড়াইতে গিয়াছিল। ছেলে-মেয়েরা সকলেই ব্যাপারটা চাপিয়া গিয়াছিল মার খাওয়ার ভয়ে। এখানে আসিয়া রাধারাণী অধুনা বড় মারমুখী হইয়া উঠিয়াছে। ছেলে মেয়েরা তাই রীতিমত তাহাকে ভয় করিয়া চলিতেছে। তবু অশান্তির আর শেষ নাই।

হাসির জ্বর ছাড়িয়াছে। আগামী কাল তাহারা আবার কলিকাতার দিকে রওনা হইবে। বন্দোবস্ত সমস্তই প্রায় জিনিষপত্র একে একে যতদূর সম্ভব গুছাইয়া রাখা হইতে লাগিল। অনেক কিছু টুক্‌রা-টাক্‌রা জিনিষপত্র খুঁজিয়া পাওয়া যাইতেছিল না, কে যে কোথায় টান মারিয়া ফেলিয়া দিয়াছে তাহার ঠিক নাই। রাধারাণী খুঁজিয়া খুঁজিয়া হায়রাণ। মেজাজটা রাধারাণীর নানা কারণেই বিগড়াইয়া ছিল। কাজেই হাতের কাছে যে জিনিষ থাকিবার কথা তাহা হাতের কাছে না পাইয়া হাতের কাছে যে গুণধরকেই পাওয়া গেল তাহাকেই কয়েক ঘা বসাইয়া দিয়া আত্মতৃপ্তি খুঁজিতে লাগিল।

নিশিকান্ত একটা চেয়ারে বসিয়া ছিল, আর রাধারাণী ঘরের মেঝেয় বসিয়া ট্রাঙ্কে কাপড় চোপড় গুছাইয়া তুলিতেছিল। হঠাৎ সাধন আসিয়া ঘরে ঢুকিল এবং আতঙ্ক-বিজড়িত কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, মা, শীগ্‌গির একবার ছুটে আসুন, ওঘরে অগ্নিকাণ্ড সুরু হয়েচে।

নিশিকান্ত চম্‌কাইয়া উঠিয়া বলিল, অগ্নিকাণ্ড কি রে সাধন?

রাধারাণী বলিল, কি হয়েচে খুলেই বল্ না সাধন?

সাধন বলিল, মণ্টু দাদাবাবু আর ঘেণ্টু দাদাবাবু এ ওর গায়ে দেশলাই জেলে দিতে গিয়ে ও ঘরের খাটের ওপরের গদিতে আগুন ধরিয়ে দিয়েচে।

আগুন! বলিস্ কি!—বলিয়া রাধারাণী এক দৌড়ে একেবারে পাশের ঘরে গিয়া হাজির। নিশিকান্তও তাহার পিছনে পিছনে আসিয়া উপস্থিত।

অগ্নি তখন নির্ব্বাপিত হইয়াছে। মানদা ও তাহার চাকর নিতাই যথা সময়ে আসিয়া পড়িয়া জল ঢালিয়া আগুন নিবাইয়াছে সত্য, কিন্তু খাটের গদিটার একাংশ বেশ ভাল ভাবেই পুড়িয়া গিয়াছে।

নিশিকান্ত ও রাধারাণী কিছুক্ষণের জন্য নিস্তব্ধ নির্ব্বাক হইয়া রহিল পুত্রদ্বয়ের অপরাধের গুরুত্বে। তারপরে রাধারাণী সাধনকে ডাকিয়া বলিল, যেখান থেকে পারিস্ ওদের ধরে নিয়ে আয়। আজ ওদের খুন না করে আমার আর নিস্তার নেই। আমার হাড়-মাংস ওরা একেবারে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দিলে, একদিনের জন্যেও জীবনে শান্তি পেলাম না—এমন সব দুষমণ এসেছিল আমার পেটে। মরেও না হারামজাদারা!

মানদা বলিল, থাক বৌদি, এই ভর সন্ধ্যেবেলা আর ছেলে-পুলেদের শাপ-শাপান্ত করো না। যা হবার তা হয়ে গেছে।

নিশিকান্ত রীতিমত ক্ষেপিয়া গিয়াছিল, কাজেই মুখ দিয়া তাহার আর কথা বাহির হইতেছিল না। মানদার কথায় সে প্রথম কথা কহিল, এবং রাগে কথা তাহার জড়াইয়া বাহির হইল— ঘোড়া-র ডিম, আর জীবনে কখনও যদি আমি এদের নিয়ে কোথাও যাই!

তারপরেই নিজে সাধনের পিছনে পিছনে মণ্টু ও ঘেণ্টুর সন্ধানে বাহির হইয়া গেল।

ঘেণ্টু ধরা পড়িল, কিন্তু মণ্টুর সন্ধান মিলিল না।

ঘেণ্টুও অবশ্য ধরা পড়িত না, কিন্তু সে দৌড়াইয়া পলাইতে গিয়া অন্ধকারে একটা পাথরের মধ্যে গুঁতা খাইয়া সামনের একটা গর্ত্তের মধ্যে পড়িয়া গেল। বাঁ পাটা তাহার কেমন বে-কায়দায় পড়িয়া জানি মচ্‌কাইয়া গেল এবং চোট লাগিল সে নিদারুণ। ঘেণ্টু বলিয়া তাই জ্ঞান হারাইল না, কিন্তু অন্য কেহ হইলে মহা বিপদের কথা হইয়া উঠিত।

ঘেণ্টু ধরা পড়িল সত্য, কিন্তু তাহাকে ধরাধরি করিয়া তুলিয়া আনিতে হইল। ঘরে আনিয়া তাহাকে শোয়াইয়া দিয়া ডাক্তার ডাকিয়া আনা হইল। সারারাত ঘেণ্টুকে লইয়া সকলেই উদ্ব্যস্ত একেবারে। মণ্টু ইহারই এক ফাঁকে আসিয়া বাড়ীতে ঢুকিয়া সকলের সঙ্গে মিশিয়া গেল, কেহ আর তাহার কোন খোঁজ খবর লইল না।

পরদিন সকলের নিষেধ অগ্রাহ্য করিয়াই নিশিকান্ত রাত্রের ট্রেনে সপরিবারে কলিকাতা যাত্রা করিল। ঘেণ্টুকে পা-বাঁধা অবস্থায় সাধনের কাঁধে চাপিয়াই একরকম যাইতে হইল। মানদা কিন্তু এ অবস্থায় ঘেণ্টুকে ছাড়িয়া দিতে রাজি হয় নাই।

ভোরে উঠিয়া শিবরাম বাগান দেখিতে গিয়া দেখিল, বাঁশের গোলপোষ্ট দুইটি যথাস্থানে পোতাই রহিয়াছে এবং মাঠের প্রায় মাঝখানটিতে ঠিক ঘেণ্টুর তিন নম্বরের বলটি পড়িয়া আছে। শিবরাম হঠাৎ কেমন যেন একটু চম্‌কাইয়া উঠিল—এই প্রথম।



বিদ্যাপতি

শ্রীকালিদাস রায় বি, এ, কবিশেখর

বিদ্যাপতি বাঙ্গালী বৈষ্ণব-কবিদের গুরু-স্থানীয়। গোবিন্দ দাস, জ্ঞান দাস ইত্যাদি বহু বাঙ্গালী কবি বিদ্যাপতির ভাব ও ভাষা গ্রহণ করিয়া পদ রচনা করিয়াছেন। ইঁহারা অনুকরণ ও অনুসরণের দ্বারা গুরুর মর্য্যাদা বাড়াইয়াছিলেন। ইঁহাদের রচনা যে হিসাবে বাঙ্গলা কবিতা বলিয়া আদৃত হইয়াছিল, বিদ্যাপতির পদও সেই হিসাবে বাঙ্গালীর সম্পত্তি বলিয়া গণ্য। ভাষার জন্য বিদ্যাপতিকে বাদ দিলে এইরূপ অনেক শ্রেষ্ঠ কবিকেই বাদ দিতে হয়। তাহা ছাড়া—খাঁটি বাঙ্গালার কৃষ্ণকীর্ত্তন, ময়নামতীর গান ও শূন্যপুরাণের ভাষার তুলনায় বিদ্যাপতির বঙ্গদেশে প্রচলিত পদাবলীর ভাষা আমাদের কাছে ঢের বেশী পরিচিত ও অন্তরঙ্গ। সে যুগের অন্যান্য কবির ভাষার মত বিদ্যাপতির ভাষাও বাঙ্গালা ভাষারই একপ্রকার প্রাচীন রূপ। বাঙ্গালা দেশের সীমা তখন পশ্চিমে অনেক দূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। সেকালের বাঙ্গালার পশ্চিম অঞ্চলের কোন কোন স্থানের ভাষা ও তথাকথিত মৈথিলীতে বিশেষ কোন প্রভেদ ছিল না। প্রভেদ সামান্য ছিল বলিয়াই বাঙ্গালী কবিরা এত সহজে বিদ্যাপতির ভাষা আয়ত্ত করিয়া সেই ভাষায় বিদ্যাপতির মতই পদ রচনা করিতে পারিয়াছিলেন।

শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পূর্ব্বেই বিদ্যাপতির পদাবলী বঙ্গদেশে সমাদৃত হইয়াছিল। স্বয়ং শ্রীচৈতন্যদেব স্বরূপ দামোদরের মুখে বিদ্যাপতির পদের আবৃত্তি শুনিয়া আনন্দ উপভোগ করিতেন। ইহাতে মিথিলার কবি বঙ্গদেশে অভিনব মর্য্যাদা ও অধিকতর সমাদর লাভ করিয়াছিলেন।

বিদ্যাপতির পদাবলী বঙ্গদেশে শ্রীচৈতন্য-প্রবর্ত্তিত আবেষ্টনীর মধ্যে যে সমাদর ও রসব্যঞ্জনা লাভ করিয়াছে, তাহাতে বঙ্গদেশে যেন তাহাদের পুনর্জ্জন্ম হইয়াছে। এই জন্মান্তরে হয়ত কিছু রূপান্তরও ঘটিয়াছে, মিথিলায় উহাদের মূল্য এক, বাঙ্গালায় মূল্য আর। বাঙ্গালা দেশ ঐগুলিকে যে-ভাবে প্রাণের বস্তু বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে, মিথিলা তাহা পারে নাই। এমন কি, বাঙ্গালা দেশে বিশিষ্ট সমাদরের ফলে মিথিলায় বিদ্যাপতির সমাদর বাড়িয়া গিয়াছে—বাঙ্গালার রসবোধ এ বিষয়ে মিথিলার রসবোধকে প্রভাবান্বিত করিয়াছে। কীর্ত্তন-সঙ্গীতের মধ্যেই ঐ পদগুলি অভিনব লোকোত্তর জীবন লাভ করিয়াছে। শ্রীচৈতন্য-প্রবর্ত্তিত রসাদর্শ ঐগুলিতে আধ্যাত্মিক অর্থ-গৌরব (Spiritual Interpretation) দান করিয়াছে। সঙ্কলয়িতারা ও রসজ্ঞগণ বিদ্যাপতির পদগুলিকে শ্রীচৈতন্য প্রবর্ত্তিত রসাবেষ্টনীর মধ্যে চণ্ডীদাস, লোচন দাস, গোবিন্দ দাস ইত্যাদি সাধক কবিগণের পদের সঙ্গে গুম্ফিত করিয়া এবং কীর্ত্তনীয়ারা পদে নূতন নূতন ভক্তি-রসানুগ আঁখর সংযোগ করিয়া এক দিকে যেমন সেগুলিকে লোকোত্তর বা মিস্টিক ঐশ্বর্য্যে মণ্ডিত করিয়াছেন, অন্যদিকে সেগুলিকে তেমনি বাঙ্গালীর নিজস্ব সম্পদ্ করিয়া লইয়াছেন।

বিদ্যাপতি যে ভাষায় পদগুলি রচনা করিয়াছেন, সে ভাষার মত রাগ-মাধুর্য্য বর্ণনার উপযোগী ললিত, মধুর, স্বচ্ছ, সরল ভাষা আর্য্যাবর্ত্তে আর নাই। বিদ্যাপতির পদাবলীর সম্পাদক ৺নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয় বলেন,—"বিদ্যাপতি খাঁটি মৈথিলীতেই পদগুলি রচনা করিয়াছিলেন। বাঙ্গালা দেশে এগুলি বিকৃত রূপ ধারণ করিয়া বাঙ্গালা ভাষার কাছাকাছি আসিয়া পড়িয়াছে। এই বিকৃত রূপই বাঙ্গালা দেশে ব্রজবুলি নামে পদ রচনার ভাষা রূপে চলিয়াছে।"

কিন্তু আমরা মনে করি, কেবল গীতি-রচনার জন্যই এই ভাষা কবির নিজেরই বা মিথিলার কবি-সম্প্রদায়ের সৃষ্টি। সুললিত মৈথিল ও সংস্কৃত শব্দের মিশ্রণে যতদূর সম্ভব যুক্তাক্ষর বর্জ্জন করিয়া মাগধী প্রাকৃত কবিতার ভাষাকে কবি এই অভিনব রূপ দান করিয়াছিলেন এবং ইহার তিনি নাম দিয়াছিলেন অবহঠ্‌টা। (দেসিল বঅনা সবজন মিঠ্‌টা তেঁ তইসন জম্পও অবহঠ্‌টা)। বঙ্গদেশে বাঙ্গালা শব্দের প্রভূত মিশ্রণে ইহাই ব্রজবুলি নামে চলিয়াছে। বাঙ্গালার জ্ঞান দাস, গোবিন্দ দাস ইত্যাদি কবিগণ প্রচলিত বাঙ্গালা ভাষা ত্যাগ করিয়া কেন যে এই ব্রজবুলিতে পদ রচনা করিয়াছিলেন, সে কথার পরে আলোচনা করা যাইবে।

পিঙ্গল-সঙ্কলিত বাছা বাছা প্রাকৃত ছন্দগুলিই কবি

পদ রচনায় গ্রহণ করিয়াছিলেন। যাঁহাদের প্রাকৃত পিঙ্গলের দৃষ্টান্তগুলির সহিত পরিচয় আছে, তাঁহারা সহজেই বিদ্যাপতির ভাষা ও ছন্দের জন্মকোষ্ঠী ধরিতে পারিবেন।

বিদ্যাপতি মিথিলার রাজা শিবসিংহের সভাপতি ও সভাপণ্ডিত ছিলেন। ইনি ১৫শ শতাব্দীর লোক।

বেকতেও চোরি গুপুত কর কতিখন বিদ্যাপতি কবি ভাণ। মহলম যুগপতি চিরে জীব জীবথু গ্যাসদেব সুলতান। গ্যাসদেব—গিয়াসুদ্দিন সুলতান। ইনি মিথিলারও সুলতান ছিলেন। বিদ্যাপতি সম্ভবতঃ বাঙ্গালার সুলতান গিয়াসুদ্দিনের সময়ের লোক।

ইনি সংস্কৃতে শাস্ত্রগ্রন্থ এবং ব্রজবুলিতে পদাবলী রচনা করেন। প্রাকৃত ভাষার বৃত্তনরেন্দ্র, ভরট্ট, দোহা ইত্যাদি ছন্দেও জয়দেবপ্রবর্ত্তিত ছন্দে ইঁহার পদাবলী রচিত। ইনি বৈষ্ণব ছিলেন না—ইনি ছিলেন শৈব অথবা পঞ্চোপাসক।

বিশেষজ্ঞগণ বলেন,—নরনারীর চিরন্তন প্রেমলীলার নানা বৈচিত্র্য লইয়া প্রাকৃত রসরচনাই ছিল কবির অভিপ্রেত। অনেক পদে রাধাকৃষ্ণের নামগন্ধও নাই। বাঙ্গালার বৈষ্ণবগণ বিদ্যাপতির পদাবলীর প্রাকৃত প্রেম-মাধুর্য্যকে শ্রীচৈতন্য-প্রবর্ত্তিত রস-সাধনার অঙ্গীভূত এবং কীর্ত্তনের পালার মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট করিয়া লইয়াছে।

বৃন্দাবনের রস-সৌন্দর্য্যের পরিবেষ্টনীর মধ্যে রাধা-কৃষ্ণের প্রেমলীলা অবলম্বনে রতি-রসাত্মক কবিতা রচনা করিলে তাহা আধ্যাত্মিক ও মিস্টিক অভিব্যঞ্জনা লাভ করিবে, এই ধারণাও সম্ভবতঃ তাঁহার মনে ছিল।

বিদ্যাপতির কবিশেখর, কবিরঞ্জন ইত্যাদি অনেক উপাধি ছিল। বিদ্যাপতির প্রবর্ত্তিত ভাষায় অর্থাৎ ব্রজবুলিতে কবিরঞ্জন, কবিশেখর, কবিবল্লভ, চম্পতি, ভূপতি ইত্যাদি ভণিতা দিয়া বাঙ্গালী কবিরাও বহু পদ লিখিয়াছেন। এজন্য অনেক বাঙ্গালী কবির পদকে বিদ্যাপতির পদ বলিয়া মনে করা হয়।

নগেনবাবু কবিরঞ্জন, কবিবল্লভ, কবিশেখর, চম্পতি ও ইঁহাদের পদগুলিকেও বিদ্যাপতির পদ বলিয়া ধরিয়াছেন। পদকল্পতরুর সম্পাদক সতীশবাবু এই বিষয়ে যুক্তি সাহায্যে নগেনবাবুর ভ্রম দেখাইয়া দিয়াছেন। তাঁহার দুই একটি যুক্তির এখানে উল্লেখ করা যাইতেছে।

কবিবল্লভের "সহি হে কি পুছসি অনুভব মোয়। সোই পীরিতি অনুরাগ বখানিতে তিলে তিলে নূতন হোয়।" এই কবিতাটি বিদ্যাপতির হইতে পারে না। রূপ গোস্বামী অনুরাগ শব্দটির যে ব্যাখ্যা দিয়াছেন—তাহা তাঁহার নিজস্ব। সেই অর্থে এখানে অনুরাগ ব্যবহৃত হইয়াছে। বিদ্যাপতি তাহা কোথায় পাইবেন? গোবিন্দ দাসের "আধক আধ আধ দিঠি অঞ্চলে" পদটির ভাব ও কবিবল্লভের কবিতার ভাব একই। এই পদে গোবিন্দদাস করিয়াছেন—"গোবিন্দ দাস ভণে শ্রীবল্লভ জানে রসবতি রসমরিয়াদ।" এই শ্রীবল্লভ বা কবিবল্লভ বাঙ্গালী কবি।

কবিশেখর বিদ্যাপতির উপাধি হইলেও কবিশেখর ভণিতার পদমাত্রই বিদ্যাপতির নয়। বাঙ্গলায় চন্দ্রশেখর, শশিশেখর ইত্যাদি পদকর্ত্তা ছিলেন। রায়-শেখর ভণিতা ও শুধু শেখর-ভণিতার পদও বিদ্যাপতির হইতে পারে না। কবিশেখর-ভণিতা-যুক্ত বহু পদের ভাষায় মৈথিলী শব্দের বদলে সংস্কৃত শব্দ এবং শ্রীচৈতন্য ও গোস্বামিগণের দ্বারা প্রবর্ত্তিত নবভাবের আভাষ-ইঙ্গিত দৃষ্ট হয়। পদকর্ত্তার সখী-স্থানীয়তা সূচক ভণিতাও দেখা যায় এবং বিশাখা-ললিতা, কুটিলা, জটিলার উল্লেখ দেখা যায়। এ-সমস্ত বিদ্যাপতির অজ্ঞাত ছিল। অতএব কবিশেখর ভণিতা থাকিলেই বিদ্যাপতির পদ হইতে পারে না।

'কাজর রুচিহর রয়নি বিশালা' ও 'ই ভরা বাদর মাহ ভাদর শূন্য মন্দির মোর'—বিশেষজ্ঞদের মতে এই দুইটি পদও কবিশেখরের, বিদ্যাপতির নয়।

বিদ্যাপতির ভণিতায় কতকগুলি বাঙ্গলা পদও পাওয়া যায়। হরেকৃষ্ণবাবুর মতে এইগুলি শ্রীখণ্ডবাসী কবিরঞ্জন বিদ্যাপতির রচনা। ইঁহাকে ছোট বিদ্যাপতি বলা হইত। কেবল বাঙ্গলা পদ নয়, ইঁহার অনেক ব্রজবুলির পদে কবিরঞ্জন ও বিদ্যাপতি ভণিতা আছে। সেগুলিকে মিথিলার বিদ্যাপতির পদ বলিয়া ভুল করা হয়। কেহ কেহ মনে করেন—এই ছোট বিদ্যাপতির সহিতই গঙ্গাতীরে দীন চণ্ডীদাসের মিলন ও সহজিয়া-তত্ত্ব-বিচার হইয়াছিল।

বিদ্যাপতির অনেক উৎকৃষ্ট পদ নগেনবাবু মিথিলায় পান নাই,—পাইয়াছেন বাঙ্গলায়। এই পদগুলি যদি বাঙ্গালী বিদ্যাপতির হয়, তাহা হইলে মিথিলার বিদ্যাপতি বাঙ্গালী

বিদ্যাপতির কাছে নিষ্প্রভ হইয়া যান। আর যদি সেগুলি মৈথিল বিদ্যাপতির হয়, তাহা হইলে বলিতে হয় বিদ্যাপতির যে মর্য্যাদা মিথিলা বুঝে নাই—সে মর্যাদা বুঝিয়াছিল বাঙ্গলা-দেশ; মিথিলার লোকে সেগুলিকে রক্ষা করে নাই, বাঙ্গালীরাই ঐ পদগুলিকে বুকে করিয়া রক্ষা না করিলে সেগুলি লুপ্ত হইয়া যাইত। মিথিলায় জন্মগ্রহণ করিলেও বিদ্যাপতি বাঙ্গলার-ই প্রাণের কবি।

বিদ্যাপতির পদাবলী সংস্কৃত কবিদের দ্বারা প্রভাবিত। হালা সপ্তশতী, আর্য্যাসপ্তশতী, অমরুশতক, ঋতুসংহার, শৃঙ্গারতিলক, শৃঙ্গারশতক, শৃঙ্গারাষ্টক ইত্যাদি আদিরসের সংস্কৃত ও প্রাকৃত কাব্য হইতে বিদ্যাপতি বহু ভাব সংগ্রহ করিয়াছেন। সংস্কৃত অলঙ্কারশাস্ত্রের পদ্ধতি অনুসরণ করিয়া সংস্কৃত কবি-প্রৌঢ়োক্তি, সংস্কৃত অলঙ্কার ইত্যাদি তিনি ভূরি ভূরি গ্রহণ করিয়াছেন। নায়িকা-বৈচিত্র্য-বিন্যাসেও কবি সংস্কৃত আলঙ্কারিকদেরই অনুসরণ করিয়াছেন। বহু সংস্কৃত শ্লোকের ভাব তাঁহার রচনায় রূপান্তরিত হইয়াছে। সংস্কৃত কবিদের অনুসরণে তিনি ঋতুবর্ণনায় স্বভাবোক্তি অলঙ্কারেরও প্রয়োগ করিয়াছেন। তবে সংস্কৃত কবির ভাবে ও রসোপাদানে তিনি নিজের মনের মাধুরী যথেষ্টই যোগ করিয়াছেন।

জয়দেবের মত বিদ্যাপতি সম্ভোগাখ্য শৃঙ্গার-রসের কবি—সৌন্দর্য্য-পিপাসার কবি, সম্ভোগের কোন লীলা-বিলাস কবির কাব্যে বাদ যায় নাই। মনে হয়, কবি বাৎস্যায়নের কামসূত্র এবং জয়দেবের গীতগোবিন্দ অনুসরণ করিয়াই যেন সম্ভোগলীলার বর্ণনা করিয়াছেন।

রাধার রূপবর্ণনায় প্রত্যেক অঙ্গটি কবি সংস্কৃত কাব্য হইতে গ্রহণ করিয়াছেন। বিদ্যাপতির কৃতিত্ব,—ঐ গুলিকে তিনি বিবিধ অলঙ্কারে সাজাইয়াছেন। ইহা সম্পূর্ণ মণ্ডন-শিল্পের অন্তর্গত। কবি তাঁহার রচিত উপমাদ্ভুত রূপোচ্চয়কে অনেক স্থলে জীবন্ত করিতে পারেন নাই—তাঁহার তিলোত্তমা জড়-প্রতিমাই থাকিয়া গিয়াছে। এই প্রাণহীন মণ্ডন-শিল্পকেও (Decorative art) সেকালে উচ্চাঙ্গের কবিত্বই মনে করা হইত।

কলা নৈপুণ্যে, গঠন-সৌষ্ঠবে, ছন্দঃশ্রী-সম্পাদনে, পদ-বিন্যাসে বিদ্যাপতি অদ্বিতীয়। রচনার বহিরঙ্গের এইরূপ সর্ব্বাঙ্গীণ সৌষ্ঠব এক গোবিন্দদাস ছাড়া আর কাহারও রচনায় দেখা যায় না।

প্রার্থনার পদ ছাড়া বিদ্যাপতির কবিতায় শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য্যের কথা কোথাও নাই, কোন প্রকার মিস্‌টিক ইঙ্গিত-ব্যঞ্জনাও কোথাও নাই। নাই বলিয়াই বোধ হয় শ্রীচৈতন্যদেব ঐগুলিকে উপভোগ করিতে পারিয়াছিলেন এবং শ্রীচৈতন্য-প্রবর্ত্তিত রসসাধক-সম্প্রদায় ঐগুলির এত সমাদর করিয়াছিলেন। কোন প্রকার ঐশ্বর্য্যের বা আধ্যাত্মিকতার ব্যঞ্জনা থাকিলে শ্রীচৈতন্য-প্রবর্ত্তিত রসাদর্শের মতে রসাভাসের সৃষ্টি হইত। "ঐশ্বর্য্য-শিথিল প্রেমে নাহি মোর প্রীতি" (শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত)।

রাধাকৃষ্ণের লীলাপ্রসঙ্গে প্রেমের গূঢ়তা, গাঢ়তা, আত্ম বিস্মরণের ব্যঞ্জনাই পদাবলীকে বৈষ্ণব সমাজে পরমাস্বাদ্য ধন করিয়া তুলিয়াছে। বৃন্দাবনের অপ্রাকৃত পরিবেষ্টনীর মধ্যে রাধা-কৃষ্ণের প্রাকৃত লীলা-মাধুর্য্য ছাড়া অন্য কিছুই বৈষ্ণব রসিক চাহে না। বিদ্যাপতি তাহা দিতে পারিয়াছেন বলিয়াই তিনি বাঙ্গলার বৈষ্ণবকবিদের গুরুস্থানীয়।

কবির রূপবর্ণনা-মণ্ডন শিল্পের অন্তর্গত, প্রকৃতি-বর্ণনা অনেক ক্ষেত্রে গতানুগতিক (Conventional)। উহা রাগলীলা-বৈচিত্র্যের পটভূমিকা ও আবেষ্টনী মাত্র। সম্ভোগের বর্ণনায় কবি সুরুচির পরিচয় দেন নাই—বয়ঃসন্ধি, পূর্ব্বরাগ ইত্যাদির বর্ণনায় আলঙ্কারিকতার কৃতিত্বই দেখাইয়াছেন—অভিসার, মান, মানভঞ্জন ইত্যাদিতে মাধুর্য্য অপেক্ষা চাতুর্য্যেরই পরিচয় দিয়াছেন, এসকল কথা সত্য, কিন্তু যেখানে কবি মিলনোচ্ছ্বাসের কথা বলিয়াছেন, সেখানে তাঁহার লেখনী রসমহোৎসবে প্রমত্ত হইয়া উঠিয়াছে। উল্লাস-রসের এমন উন্মাদনা প্রাচীন কবিদের মধ্যে এক গোবিন্দদাস ছাড়া আর কোন কবির রচনায় পাওয়া যায় না। আবার কবি যখন বিরহের কথা লিখিয়াছেন—তখন মনে হয় না যে—এই বিদ্যাপতিই অলঙ্কারিকতার বৈচিত্র্য ও চাতুর্য্য সৃষ্টি করিয়া একদিন তুষ্ট ছিলেন—অথবা সম্ভোগ-বর্ণনায় আত্মবিস্মৃত হইতে পারিয়াছিলেন।

যেখানে তিনি প্রেমার্ত্ত হৃদয়ের গভীর ও গূঢ় বার্ত্তা শুনাইয়াছেন—সেখানে তাঁহার আবেদনের সুর চিরন্তন

প্রেমলোক স্পর্শ করিয়াছে এবং দেশ-কাল-পাত্রের সীমা লঙ্ঘন করিয়া তাহা অতীন্দ্রিয় ভাবলোকে উঠিয়াছে।

কবির কৃষ্ণগতপ্রাণা রাধার অন্য সমস্ত বিষয়ে অনাসক্তি ও ঔদাসীন্য, সুখে দুঃখে, সম্ভোগে, নৈরাশ্যে, মিলনে, বিরহে, রাগালসতায়, উৎকণ্ঠায়—সব সময়ই রাধার বাহ্য বস্তুতে বৈরাগ্য, তাঁহার কাব্যে যে রসের সৃষ্টি করিয়াছে, তাহা চিত্তকে উদাস করিয়া তোলে। তখন জগৎ-সংসারকে অসার ও এই জীবনকে মায়ার খেলা বলিয়া মনে হয়, চিরন্তন ধনের জন্য একটা অপূর্ব্ব তৃষ্ণায় প্রাণ যেন ব্যাকুল হইয়া উঠে। ইহা Mystic appeal না হইতে পারে, কিন্তু ইহার Transcendental ও Universal appeal কে উপেক্ষা করা যায় না। কবি যে সকল রচনায় মাধুর্য্য অপেক্ষা চাতুর্য্যকে প্রাধান্য দিয়াছেন, সেগুলিতে কোন অনির্ব্বচনীয় রসের সৃষ্টি না হউক, সৌন্দর্য্য-সৃষ্টি হইয়াছে। Sensuousness বলিয়া ইহাকে বিদায় করা যায় না। ইহাও এক প্রকারের আর্ট। ভাষার স্বচ্ছলতা, ভঙ্গীর পরিচ্ছন্নতা, ছন্দের বৈচিত্র্য ও অনবদ্যতা, পদবিন্যাসের পারিপাট্য, সমস্ত মিলিয়া চিত্তে এমন একটা তৃপ্তিসুখের সৃষ্টি করে—তাহা রসানন্দ না হউক, রূপানন্দ আখ্যা পাইতে পারে। কবি কোথাও কোন অঙ্গহানি বা অক্ষমতার দ্বারা তৃপ্তি-সুখপ্রদ চিত্তের প্রশান্তি নষ্ট হইতে দেন নাই। যে অপূর্ব্ব লাবণ্যে চিরসুন্দর শ্রীকৃষ্ণ আত্মবিস্মৃত, সেই লাবণ্যের পরিচয় দিতে গিয়া কবি দিশেহারা হইয়া গিয়াছেন, অলঙ্কারের ভাণ্ডার একেবারে নিঃশেষ করিয়া ফেলিয়াছেন। তিনি বিশ্বের প্রত্যেক মনোহর বস্তুর কথা উপমাচ্ছলে স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন। বিশ্ব-প্রকৃতির সকল সৌন্দর্য্য সকল মাধুর্য্যের মধ্যেই যেন তিনি রাধাকে দেখিয়াছেন। বিদ্যাপতির রাধা বিশ্বসৌন্দর্য্যময়ী, একটি লাবণ্যময়ী নারী মাত্র নয়।

বিদ্যাপতির রাধা অনবদ্য বনকুসুমের মত ফুটিয়া উঠিয়াছে। অঙ্গ-লাবণ্য ও বর্ণচ্ছটায় গৌরবই ইহার প্রধান সম্বল নয়—মাধুর্য্য ও সৌরভই ইহার প্রধান সম্পদ্। এই মাধুর্য্য ও সৌরভ ফুটিয়াছে—রাধার হাস্যে, লাস্যে, ভাষায়, ভূষায়, চাহনিতে, গতিভঙ্গীতে, ছলনায়, কৌতূহলে, আশায়, নৈরাশ্যে, লজ্জায়, ভয়ে, উদ্বেগে, আকুলতায়, আত্মগোপনে, আত্মপ্রকাশে, বিলাসে, উল্লাসে, হাব-ভাবে এবং রসচঞ্চল কৈশোর-জীবনের নব নব ভাব-রঙ্গের উচ্ছল তরঙ্গ-লীলায়।

রবীন্দ্রনাথ বিদ্যাপতির রাধা সম্বন্ধে বলিয়াছেন—

রাধা অল্পে অল্পে মুকুলিত বিকশিত হইয়া উঠিতেছে। সৌন্দর্য্য ঢল ঢল করিতেছে। শ্যামের সহিত দেখা হয় এবং চারিদেকে একটা যৌবনের কম্পন হিল্লোলিত হইয়া উঠে। খানিকটা হাসি, খানিকটা ছলনা, খানিকটা আড় চোখে দৃষ্টি। একটু ব্যাকুলতা, একটু আশা-নৈরাশ্যের আন্দোলনও আছে, কিন্তু তাহা তেমন মর্ম্মঘাতী নহে।—বিদ্যাপতির রাধা নবীনা নবস্ফুট। আপনাকে এবং পরকে ভাল করিয়া জানে না। দূরে সহাস্যে সতৃষ্ণ লীলাময়ী, নিকটে কম্পিত শঙ্কিত বিহ্বল। কেবল একবার কৌতূহলে চম্পক অঙ্গুলির অগ্রভাগ দিয়া অতি সাবধানে অপরিচিত প্রেমকে একটুমাত্র স্পর্শ করিয়া অমনি পলায়নপর হইতেছে। যৌবন, সেও সবে আরম্ভ হইতেছে, তখন সকলি রহস্যে পরিপূর্ণ। সদ্যোবিকচ হৃদয় সহসা আপনার সৌরভ আপনি অনুভব করিতেছে। আপনার সম্বন্ধে আপনি সবে মাত্র সচেতন হইয়া উঠিতেছে। তাই লজ্জায়, ভয়ে, আনন্দে, সংশয়ে আপনাকে গোপন করিবে, কি প্রকাশ করিবে, ভাবিয়া পাইতেছে না।

"কবহু বান্ধয়ে কচ কবহু বিথরি।
কবহু ঝাঁপয়ে অঙ্গ কবহু উঘারি॥"

হৃদয়ের নবীন বাসনা সকল পাখা মেলিয়া উড়িতে চায়। কিন্তু এখনো পথ জানে নাই। কৌতূহলে এবং অনভিজ্ঞতায় সে একবার ঈষৎ অগ্রসর হয়, আবার জড়োসড়ো অঞ্চলটির অন্তরালে আপনার নিভৃত কোমল কুলায়ের মধ্যে ফিরিয়া আশ্রয় গ্রহণ করে। এখন প্রেমে বেদনা অপেক্ষা বিলাস বেশী। ইহাতে গভীরতার অটল স্থৈর্য্য নাই, কেবল নবানুরাগের উদ্‌ভ্রান্ত লীলা-চাঞ্চল্য।

বিদ্যাপতির এই পদগুলি পড়িতে পড়িতে একটি সমীর-চঞ্চল সমুদ্রের উপরিভাগ চক্ষে পড়ে। ঢেউ খেলিতেছে, যেন উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতেছে, মেঘের ছায়া পড়িতেছে, সূর্য্যের আলোক শত শত অংশে প্রতিস্ফুরিত হইয়া চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত হইয়াছে। তরঙ্গে তরঙ্গে স্পর্শ এবং পলায়ন, কলরব, কলহাস্য, করতালি, কেবলি নৃত্য এবং গীত, আভাস এবং

আন্দোলন, আলোক এবং বর্ণ-বৈচিত্র্য। এই নবীন চঞ্চল প্রেম-হিল্লোলের উপর সৌন্দর্য্য যে কত ছন্দে, কত ভঙ্গীতে বিচ্ছুরিত হইয়া উঠে বিদ্যাপতির গানে তাহাই প্রকাশ পাইয়াছে। কিন্তু সমুদ্রের অন্তর্দেশে যে গভীরতা, নিস্তব্ধতা যে আত্মবিস্মৃত ধ্যানশীলতা আছে, তাহা বিদ্যাপতির গীতি-তরঙ্গের মধ্যে পাওয়া যায় না।

বিদ্যাপতির পদাবলী মধুচক্রের মত, ইহার কুহরে কুহরে মাধুর্য্য। কবি ভাষার ভাণ্ডারে, ভাবলোকে, বিশ্ব-প্রকৃতিতে, ধ্বনি-জগতে, যেখানে যত মাধুর্য্য পাইয়াছেন সমস্তই তাঁহার রচনার চাতুর্য্যের বন্ধনীতে একত্র করিয়াছেন। সর্ব্বত্রই উৎকৃষ্ট কবিতা হইয়াছে তাহা নয়, কিন্তু সর্ব্বত্রই কিছু না কিছু মাধুরীর উপচয় হইয়াছে। অধিকাংশ পদে দেহ ছাড়িয়া কবির কল্পনা অতীন্দ্রিয় লোকে পৌছায় নাই—মর্ম্মের গভীর কূপেও প্রবেশ করে নাই। হৃদয়-সমুদ্র মন্থনের যে অমৃত রসিকজনের অঞ্জলিতে মহাকবিরা পরিবেশন করেন—বিদ্যাপতি তাহাও করিতে পারেন নাই। তবু বিদ্যাপতির তুলনা নাই।

বিদ্যাপতির বর্ণিত বর্ষাপ্রকৃতি ও বসন্তশ্রী রতিরসের উদ্দীপন-বিভাবের কার্য্য করিয়াই ক্ষান্ত হয় নাই। মানব-প্রকৃতির সহিত বিশ্ব-প্রকৃতির যে একটা গূঢ় গভীর চিরন্তন সংযোগ আছে, তাহারও আভাস দিয়াছে। কবি বিরহের দিনে বসন্তকে উপেক্ষা করিয়াছেন—কিন্তু বর্ষাপ্রকৃতির দুর্দ্দম প্রভাবকে উপেক্ষা করিতে পারেন নাই।

খেদব মোঞে পিক অলিকুল বারব কর-কঙ্কণ ঝনকাই।
অখনে জলদে ধবলা গিরি বরিসব তথমুক কওন উপাই।

মানুষ যে উদাস ভাব জন্মিলে মানবাত্মা দেশে দেশে যুগে যুগে বলে—'পরম কাম্য ধনের সাক্ষাৎ বিনা কি করিয়া জীবন ধারণ করিব?' বিদ্যাপতির বর্ষাপ্রকৃতি-চিত্রণ সে ভাব কি জাগায় না? বিদ্যাপতির রাধা-হৃদয়ের হাহাকার গগণের হাহাকারের মধ্য দিয়া কি বিশ্বময় ছড়াইয়া পড়ে না?

বিদ্যাপতি প্রধানতঃ চাতুর্য্যের কবি। সাধারণতঃ অলঙ্কার প্রয়োগ ও ব্যঞ্জনা-ধ্বনির সাহায্যে তিনি এই চাতুর্য্যের সৃষ্টি করিয়াছেন। নিম্নলিখিত পদগুলি তাহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ—

আঁচরে বদন ঝাঁপহ গোরি।
রাজা শুনইছু চান্দকি চোরি॥
ঘরে ঘরে পহরী ছোড়ি গেল যোর।
অবহি দেখব ধনি নাগরী তোর॥
হাসি সুধামুখি নাকর বিভোরি।
বাণীক ধনি ধনি যোগবি যোরি॥
অধর সমীপ দশন কর জোতি।
সিন্দুর সমীপ রসায়ল মোতি॥
শুন শুন সুন্দরি হিত উপদেশ।
স্বপনে তোয় জনি বিপদক লেশ॥
চম্পক আছয়ে ভেদ-কলঙ্ক।
ওয়ে কলঙ্কী—তুহু নিষ্কলঙ্ক॥
রাজা শিবসিংহ লছিমা দেবী সঙ্গ।
ভণয়ে বিদ্যাপতি মনহ নিশঙ্ক॥

তোমার মুখ চাঁদ চুরি করিয়াছে। রাজা এ চুরির কথা শুনিয়া ঘরে ঘরে প্রহরী বসাইয়াছে। কাজেই বদন আঁচলে ঢাকিয়া রাখ, হাসিও না—কথা না বলিলেও ভাল হয়। হাস্তে ও বচনে সুধা বিগলিত হইলেই মুস্কিল। তবে তোমারও একটা বলিবার কথা আছে। চাঁদ কলঙ্কী—তোমার বদন নিষ্কলঙ্ক—কাজেই রেহাই পাইতেও পার। আর একটি পদ—

এ ধনি মানিনি করহ সঙ্গাত।
তুয়া কুচ হেমঘট হার ভুজঙ্গিনী
তাক উপরে ধরি হাত।
তোঁহে ছাড়ি হাম যদি পরশ করি কোয়
তুয়া হার নাগিনী কাটব মোয়॥
হামারে বচনে যদি নহ পরতীত।
বুঝিয়া করহ শাস্তি যে হয় উচিত॥
ভুজপাশে বাঁধি জঘন পর তাড়ি।
পয়োধর পাথর হিয়ে দেহ ভারি
উরুকারাগারে বাঁধি রাখ দিন রাতি।
বিদ্যাপতি কহ উচিত ইহ শাস্তি।

কবি এই চাতুর্য্যটুকু জয়দেব হইতেই পাইয়াছেন। কেবল জয়দেব বলিতেছি কেন? ইহা সংস্কৃতসাহিত্যেও একটা convention হইয়া পড়িয়াছিল। কবির বয়ঃসন্ধি বর্ণনার পদ দুইটি খুবই প্রসিদ্ধ। এই দুইটি পদও চাতুর্য্যের চমৎকার

১। দিনে দিনে পয়োধর ভৈগেল পীন
বাঢ়ল নিতম্ব মাঝ ভেল খীন॥
অবহি মদন বাঢ়াওল দীঠ।
শৈশব সকলি চমকি দিল পীঠ॥

পহিল বদরী কুচ পুন নবরঙ্গ।
দিনে দিনে বাঢ়য়ে পীড়য়ে অনঙ্গ॥
সে পুন ভৈগেল বীজকপোর।
অব কুচ বাঢ়ল শ্রীফল জোর।
উরহি বিলোলিত চাঁচর কেশ।
চামরে ঝাঁপল কনক মহেশ। ইত্যাদি

২। আওল যৌবন শৈশব গেল।
চরণক চপলতা লোচন নেল।
করু দুহু লোচন দূতক কাজ।
হাস গোপত ভেল উপজল লাজ।
অব অনুখন দেই আঁচরে হাত।
সখগয় বচন কহ নত করি মাথ।
কটিক গৌরব পাওল নিতম্ব।
চলইতে সহচরি কর অবলম্ব। ইত্যাদি

চৌরি পিরিতি লইয়া বিদ্যাপতি চাতুর্য্যের সহিত কত রঙ্গই না করিয়াছেন! শাম ঘুমায়ত কোরে আগোরি। তহি রতি চীট পীঠ রহ' চোরি—পদটি লক্ষ্য করিতে বলি। জয়-দেবের ভাবানুসরণে রচিত নিম্নলিখিত পদটিও অপূর্ব্ব চাতুর্য্যের দৃষ্টান্ত—

কতয়ে মদন তনু দহসি হামারি।
হাম নহ শঙ্কর হঙ বর নারি।
নাহি জটা ইহ বেণি বিভঙ্গ।
মালতি মাল শিরে নহ গঙ্গ॥
মোতিম বন্ধ মৌলি নহ ইন্দু।
ভালে নয়ন নহ সিন্দুর বিন্দু॥
কণ্ঠে গরল নহ মৃগমদসার।
নহ ফণিরাজ উরে মণিহার॥
নীল পটাম্বর নহ বাঘছাল।
কেলি কমল ইহ না হয়ে কপাল।
বিদ্যাপতি কহে এহেন সুছন্দ।
অঙ্গে ভসম নহে মলয়জ পঙ্ক॥

চাতুর্য্যের সহিত মাধুর্য্যের অপূর্ব্ব সংযোগের দৃষ্টান্তস্বরূপ একটি পদ এখানে উদ্ধৃত করি—

এ সখি রজিণি কি কহব তোয়।
আজ এক কৌতুক কহনে না হোয়।
একলি আছলুঁ ঘরে হীন পরিধান।
অলখিতে আওল কমল নয়ান।
এদিকে ঝাঁপিতে তনু ওদিকে উদাস।
ধরণী পশিয়ে যদি পাউ পরকাশ।
করে কুচ ঝাঁপিতে ঝাঁপল না যায়।
মলয় শিখর জনু হিমে না লুকায়।
ধিক্ যাউক জীবন যৌবন লাজ।
আজ মোর অঙ্গ দেখল ব্রজরাজ।
ভণয়ে বিদ্যাপতি রসবতী রাই।
চতুরক আগে কিয়ে চতুরাই।

সম্পূর্ণ মাধুর্য্য সৃষ্টির দৃষ্টান্তস্বরূপ পদেরও বিদ্যাপতিতে অভাব নাই। দুই একটির উদাহরণ দিই। আক্ষেপানুরাগের পদ—

অগোর চন্দন তনু অনুলেপন
কো কহে শীতল চন্দা।
পিয়া বিনে সো পুন অনল বরিখয়ে
বিপদে চিনিয়ে ভালো মন্দা।
সজনি, কানুকে কহবি বুঝায়।
রোপিয়া প্রেমবীজ অঙ্কুরে মোড়লি
বাঢ়ব কওন উপায়।
তৈলবিন্দু যৈছে পানি পসারল
তৈছন তুয়া অনুরাগে।
সিকতা জল যৈছে খণহি শুখায়ল
ঐছন তোহারি সোহাগে।
কুলকামিনি ছিলুঁ কুলটা ভৈ গেলুঁ
তাকর বচন লোভাই।
আপন করে হাম মুড় মুড়ায়লুঁ
কানুসে প্রেম বাড়াই।
চোর রমণি জনু মনে মনে রোয়ই
অম্বরে বদন ছাপাই।
দীপক লোভে শলভ জনু ধায়ল
সো ফল ভুঁজইতে চাই।
এখন তখন করি দিবস গোঙায়লুঁ
দিবস দিবস করি মাস।
মাস মাস করি বরিখ গোঙায়লুঁ
ছোড়লুঁ জীবনক আশ।
বরিখ বরিখ করি জনম গোঙায়লুঁ
জয়া জায়ত তনুপাশে।
হিম গরল জনু হিমগিরি বরিখয়ে
কি করব মাধবি মাসে।
ভণয়ে বিদ্যাপতি ইহ কলিযুগ রীতি
চিন্তা না কর কোই।
আপন করম দোষ আপহি ভুঞ্জই
যো জন পরবশ হোই।

যিনি লিখিয়াছেন—

তিন বাণে মদন জিতল তিন ভুবনে
অবধি রহল দুই বাণে।
বিধি বড় দারুণ বধিতে রসিক জন
সোঁপল তোহারি নয়ানে॥

তিনিই আবার লিখিয়াছেন—

নারীর দীঘনিশাস, পড়ুক তাহার পাশ
মোর পিয়া যার কাছে থৈসে'।
পাখী জাতি যদি হউ', পিয়া কাছে উড়ি যাউ'
সব দুখ কহোঁ তার পাশে॥

প্রথম অংশ পড়িয়া বিদ্যাপতিকে সংস্কৃত কবিদের অনুকারক মাত্র মনে হয়, দ্বিতীয় অংশেই তিনি প্রকৃত কবি। [ক্রমশঃ

দেশবন্ধুর স্মৃতি

— শ্রীসুখময় সেন

প্রায় ষোল বৎসর পূর্ব্বে অর্থাৎ জীবনের শেষ বৎসর দেশবন্ধু পাবনা সৎসঙ্গের প্রতিষ্ঠাতা শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের সংস্পর্শ লাভ করিয়াছিলেন এবং সেই বৎসরই ফরিদপুর কন্‌ফারেন্সের পর দার্জিলিং যাইবার পথে পাবনা আশ্রমে কয়েকদিন বিশ্রাম গ্রহণ করেন। দেশবন্ধুর সহিত যখন প্রথম সাক্ষাৎ হয় তখন শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র কলিকাতায় মাণিকতলা ষ্ট্রীটের এক বাটীতে অবস্থান করিতেছিলেন। আমি তখন শ্রীশ্রীঠাকুরের নিকট প্রায়ই যাতায়াত করি। একদিন বহুভক্ত পরিবেষ্টিত হইয়া শ্রীশ্রীঠাকুর বসিয়া আছেন, দেশের অর্থনৈতিক ও বেকার-সমস্যা বিষয়ে আলোচনা চলিতেছে। আমিও তখন বেকার। সমাধান শুনিবার আগ্রহ আমারও অত্যন্ত প্রবল। আমি আগ্রহে প্রশ্ন করিলাম, এই সমস্যার আশু সমাধানের উপায় কি? তিনি বলিলেন, আমাদের wind power dynamo তৈয়ারী হইয়াই আছে, উহার এক্সপেরিমেণ্টও শেষ। এখন একটু চেষ্টা করিলেই উহাকে বাজারে বাহির করা যাইতে পারে এবং উহাদ্বারা আমার শত শত ভাইদের বেকার সমস্যা এখনই সমাধান হইতে পারে ১। কি রকমে চেষ্টা করা যায় জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন, এমন কাহাকেও ধর, যিনি জিনিষটা বোঝেন এবং ইহার ভার গ্রহণ করেন। আমার আগ্রহ বাড়িয়া গেল। একে একে কয়েকজনের নাম করিলাম, অবশেষে দেশবন্ধুর নাম করিতে তিনিও আগ্রহাতিশয্য প্রকাশ করিলেন। এখনই যান বলিয়া তিনি আমাকে বিদায় দিলেন। আমি দেশবন্ধুর সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলাম। দেশবন্ধু তখন তারকেশ্বর সত্যাগ্রহ ব্যাপারে ব্যস্ত। কাজেই অনেক চেষ্টা করিয়াও উদ্দেশ্য সিদ্ধির কোন উপায় না দেখিয়া শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তের সহিত দেখা করিয়া তাঁহাকে শ্রীশ্রীঠাকুরের নিকট লইয়া গেলাম। শ্রীশ্রীঠাকুরের অনুরোধে শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রবাবু সৎসঙ্গের কর্ত্তৃপক্ষ কয়েকজনের সহিত দেশবন্ধুর সাক্ষাতের ব্যবস্থা করিয়া দিবার প্রতিশ্রুতি দিয়া আসিলেন। ইহার কিছুকাল পরে একদিন দিন স্থির করিয়া দেশবন্ধুর বাড়ীতে সাক্ষাতের ব্যবস্থা হইল। তাহারই কিছুদিন পর দেশবন্ধু মাণিকতলার বাড়ীতে শ্রীশ্রীঠাকুরের সহিত একদিন দেখা করিতে আসিলেন। ইহার পর দার্জ্জিলিং এর পথে আশ্রমে কয়েকদিন ছাড়া শ্রীশ্রীঠাকুরের সহিত দেশবন্ধুর আর কোন সাক্ষাৎ ঘটে নাই।

দেশবন্ধু যে কয়দিন আশ্রমে ছিলেন, পাবনা সহরের বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি প্রতিদিন তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিতেন। এ ভিন্ন সাধারণের ভীড় থাকিতই। আশ্রমের কর্ত্তৃপক্ষ তাঁহার বিশ্রামের ব্যাঘাত না ঘটে, তদ্বিষয়ে আন্তরিক চেষ্টার ত্রুটি করেন নাই। যে ঘরটি তাঁহার বাসের জন্য নির্দ্দিষ্ট ছিল তাহা ঠিক পদ্মার তীরে অবস্থিত। বর্ষাকাল, জল কানায় কানায়, সুদূর প্রসারী পদ্মা সোজা ঐ দিকে কুষ্টিয়া মোহিনী মিলের চিমনী, নদীবক্ষে অগণিত নৌকা পক্ষ বিস্তার করিয়া ভাসমান, মাঝে মাঝে দুই একখানি ষ্টীমারও দৃষ্টিগোচরে আসে —মোট কথা স্থানটি মনোরম, বিশ্রামের সম্পূর্ণ উপযোগী। দেশবন্ধু অত্যন্ত গান ও কীর্ত্তনপ্রিয় ছিলেন। প্রতিদিন নদীর তীরে বেদীর উপর বসিয়া আমরা তাঁহাকে গান শুনাইতাম। তিনি একখানা আরাম কেদারায় বসিয়া আমাদের গান শুনিতেন।

আমাদের একজন সহকর্মীকে একদিন শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁহার সহিত পরিচয় করাইয়া দিবার ছলে বলিলেন, দাদা' এই আমার এক পাগল। তিনি তৎক্ষণাৎ উত্তরে বলিলেন,

"আমরা সবাই পাগল, কেউ কম আর বেশী।"

আমি বুঝিলাম উহা শুধু কথা নয় ভাই বলে বক্ষে জড়িয়ে ধরা। হাতে জড়িয়ে ধরলে পাছে প্রাণ স্পর্শ না করে তাই প্রাণ দিয়ে জড়িয়ে ধরলেন প্রাণকে। আমি দেখিয়াছি, আমাদের সেই সহকর্মী সেই কয়দিন মাতালের মত দেশবন্ধুর সেবায় নিজেকে নিঃশেষে উৎসর্গ করে তৃপ্তিলাভ করি॰।

১। যতদূর জানিতে পারিয়াছি তাহাদ্বারা বেকার সমস্যার সমাধান হয় নাই।

—বঙ্গশ্রী সম্পাদক

দেশবন্ধুর নিকট কেহই উপেক্ষণীয় ছিল না। যে যাহাই বলিত অপূর্ব্ব ধৈর্য্যসহকারে কান পাতিয়া তাহা শুনিতেন। শুনিবার আগ্রহ দর্শনে মনে হইত ক্ষুদ্র কীট হইতেও মানুষের শিখিবার অনেক আছে—ইহা তিনি উপলব্ধি করিতেন। পরম সহিষ্ণুতা দেশবন্ধুর চরিত্রের চমৎকার বৈশিষ্ট্য। উহা তাঁহার স্বভাবগত। মতের অনৈক্য তাঁহাকে কাহারও প্রতি ভালবাসায় বা শ্রদ্ধায় বঞ্চিত করিত না।

কর্ম্মক্ষেত্রে মানুষের মতান্তর স্বাভাবিক। যারা দুর্ব্বলচিত্ত, তাদের মতান্তর মনান্তরে পরিণত হয়। কিন্তু সবলচিত্তের মতান্তরে মনান্তর ঘটে না। মহাত্মাজীর সহিত দেশবন্ধুর মতভেদ সর্ব্বজনবিদিত। কিন্তু তাঁহার সহিত মনান্তর কখনও হয় নাই। দেশবন্ধু সর্ব্বদা বিনয় ও শ্রদ্ধার সহিত তাঁহার স্বাধীন মত ব্যক্ত করিতেন। আলোচনা প্রসঙ্গে অনেক সময় মহাত্মাজীর কথা উঠিত। কিন্তু দেখিতাম, তিনি সব সময় অতি শ্রদ্ধাপূর্ণ ভাষায় তাঁহার সম্বন্ধে উক্তি করিতেন ও নিজ মতামত ব্যক্ত করিতেন।



দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন

আমি দেশবন্ধুর মুখে সাধারণের সমক্ষে স্পষ্ট ভাষায় বলিতে শুনিয়াছি—

"অনেকের ধারণা জন্মিয়াছে মহাত্মাজীর সহিত আমার Friction ঘটিয়াছে। আমি মুক্তকণ্ঠে জানাইতেছি যে, আমার সহিত মহাত্মাজীর কোন Friction নাই। মোহন দাস করমচাঁদ গান্ধীই দেশের উপযুক্ত নেতা—আমি নেতা নহি।"

দার্জ্জিলিং যাত্রার পূর্ব্বেই আশ্রমে সংবাদ আসিল, মহাত্মাজী কলিকাতায় আসিতেছেন। কলিকাতা আসিলে মহাত্মাজী দেশবন্ধুর গৃহেই আতিথ্য গ্রহণ করিতেন। এবারও তিনি দেশবন্ধুর অতিথি হইবেন কিন্তু দেশবন্ধু অনুপস্থিত। দেশবন্ধুর আশঙ্কা হইল তাঁহার অনুপস্থিতিতে হয়তো মহাত্মাজীর প্রতি যত্নের ত্রুটী হইবে। তিনি উদ্বিগ্ন হইলেন। কলিকাতায় লোকের অভাব নাই, বিশেষ মহাত্মাজীর যত্নের ত্রুটীর কোন কারণই থাকিতে পারে না। তবুও তাঁর সন্দেহ ঘুচিল না। মহাত্মাজীর মত লোকের অভ্যর্থনা ও যত্নের ভার লইতে পারেন, এমন একজনের খোঁজ পড়িল। গুরুভ্রাতা শ্রীযুক্ত মনোহর দা'কে তিনি মনোনীত করিলেন। মনোহরদা'ও অনুমতি পাইয়া কলিকাতা চলিয়া আসিলেন।

শ্রীমাতাঠাকুরাণীর প্রতি তিনি ছিলেন সব চেয়ে অনুরক্ত। মনে হইত অনেকদিনের মাতৃহারা শিশু মাকে ফিরিয়া পাইয়াছে। দেখিতাম শ্রীমায়ের অদর্শনে যেন শিশুর মত চঞ্চল হইয়া উঠিতেন। শিশু যেমন মাকে দেখিলে হাতের খেলা অনায়াসে বিসর্জ্জন দিয়া মাকে পাইয়াই তৃপ্ত, তদ্রূপ শ্রীমাকে কাছে পাইলে তিনিও ধর্ম্ম, দর্শন, রাজনীতি, সমাজনীতি সব ভুলিয়া গিয়া তাঁহাকে পাইয়াই আনন্দিত হইতেন। মনে পড়ে সেই দিনের কথা, যেদিন দেশবন্ধুর শোকে একান্ত ম্রিয়মাণা, শ্রীমা আমার পানে চাহিয়া কাঁদিতে লাগিলেন, আর অভিমান-মিশ্রিত কাতর অশ্রুভারাক্রান্ত জড়িত কণ্ঠে কহিতে লাগিলেন—

"হায়, হায়, যদি থাকবেই না জানতে কেন এলে আমার শুধু জ্বালাতে কয়দিনের জন্য? তোমায় চিনতাম না জানতাম না বেশ ছিলাম। আমি কি করেছি তোমার যে তুমি আমার সঙ্গে এত বড় শত্রুতা করলে। একি তোমার উচিত?"

পাঠক, কাকে প্রণাম করব? পুত্রহারা মাকে, না মাতৃহারা পুত্রকে? শ্রীমা আমায় প্রায়ই বলিতেন, "জান্, ছেলে সব সাত জন্মের পরম শত্রু, শত্রুতা সাধনের জন্য ছেলে হয়ে জন্মায় রে।"

দেশবন্ধু জানিতেন যে, দেবতা যে ফুলে তুষ্ট তিনি সেই ফুলেই পূজনীয়। চরকা ও খাদিতে দেশের বস্ত্র ও অর্থ-সমস্যা দূর হইবার নহে, ইহা তিনি বিলক্ষণ অবগত ছিলেন। কিন্তু তিনি বুঝিয়াছিলেন ইহাতে দেশের ক্ষতি নাই। কৃতকার্য্য হয় ভাল, না হয় ভুল ভাঙ্গিবে। সুতরাং বাধা দিতেন না। দেশবন্ধুর অনুরোধেই মহাত্মাজী আশ্রমে গিয়াছিলেন। আশ্রমে কোন দিনই চরকা বা খাদির ব্যবস্থা ছিল না। মহাত্মাজীর মনস্তুষ্টির জন্য দেশবন্ধুর অনুরোধে তথায় চরকা ও খাদির ব্যবস্থা হইয়াছিল। কেহ কেহ ভাবিতে পারেন, ইহা একপ্রকার তোষামোদ। তোষামোদের পশ্চাতে থাকে স্বার্থ, ব্যক্তিগত বাসনা, যেখানে তাহা নাই, বুঝিতে হইবে, তাহা শ্রদ্ধার অঞ্জলি বা অর্ঘ্য। দেশবন্ধুর এই অনুরোধের পশ্চাতে কোন ব্যক্তিগত স্বার্থ নিহিত ছিল, এমন কল্পনা বাতুলতার প্রশ্রয়।

প্রথম সাক্ষাতের দিন সর্ব্বপ্রথমেই দেশবন্ধু শ্রীশ্রীঠাকুরকে প্রশ্ন করিলেন—"স্বরাজ হবে তো?"

শিশুর মত সহজ সরল প্রশ্ন! ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ কিছুই তাঁর মনে উদয় হইল না। অনন্ত স্বর্গ বা নরক তাঁর কাছে অকিঞ্চিৎকর। স্বরাজের বিনিময়ে ব্রহ্মাণ্ড তাঁর কাছে গোষ্পদতুল্য। তাই, যিনি স্বরাজ লাভের ক্ষীণতম ভরসাও দিতে পারিতেন। দেশবন্ধুর সকল অহংকার সেখানে অন্তর্হিত হইত। সে যেই হউক, ব্রাহ্মণ, শূদ্র, ধনী, নির্ধন, মুচি, মেথর, দেশবন্ধু তার অনুগত তার ভাই। তাঁহার সকল কঠোরতার অবসান হইত। তিনি তথায় কুসুমাদপি কোমল। স্বরাজ লাভের এতটুকু উৎসাহ যার মধ্যে দেখিতেন, তাহাকেই তিনি সর্ব্বতোভাবে উৎসাহিত করিতেন। বলা বাহুল্য, দেশবন্ধুর এই মনোভাবকে দুর্ব্বলতা মনে করিয়া অনেকে তাঁহাকে প্রবঞ্চনা করিয়াছে। কিন্তু কোন প্রবঞ্চনাই তাঁহার অজ্ঞাত ছিল না। তবে 'ঠগ বাছতে গাঁ উজাড়' তাই কিছু বলিতেন না। বৈষ্ণব কবির ভাষা প্রতিধ্বনি করিয়া বলিতে ইচ্ছা হয় না কি?

ভজ স্বরাজ কহ স্বরাজ লহ স্বরাজ নাম।
যে জন স্বরাজ ভজে সেই মোর-প্রাণ॥

যেখানে দেশ-প্রেম, যেখানে স্বজাতিপ্রীতি, যেখানে গণ-সেবা ও মুক্তি, সেখানে দেশবন্ধু 'তৃণাদপি সুনীচ তরুরিব সহিষ্ণু' আবার যেখানে অন্যায়, অবিচার, স্বার্থান্ধতা, দাসত্ব, অপ্রাকৃত বৈষম্য, সেখানে তিনি বজ্রাদপি কঠোর দৃপ্ত সিংহ, অসহিষ্ণুর অবতার!

একদিন আশ্রম পরিদর্শন কালে তপোবন বিদ্যালয়ে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আমি তখন তপোবনের একজন শিক্ষক। আমার একজন সহশিক্ষক তপোবনের বাগানে উৎপন্ন নানাপ্রকার সবজি ও রোপিত নানা গাছ-গাছড়া দেখাইতেছেন। তিনি উৎসাহের সহিত সব দেখিলেন, তারপর শিক্ষক মহাশয়ের মুখের দিকে কিছুক্ষণ চাহিয়া আমাদের একজনকে জিজ্ঞাসা করিলেন—

ছেলেটি কে? উহার নাম কি?

ঐ একটি মাত্র কথা। বাকী সব অনুমান করিতে আমাদের কাহারও বিলম্ব হইল না। শিক্ষক মহাশয়ও বিলক্ষণ বুঝিলেন। বুঝিয়া গৌরবমিশ্রিত লজ্জায় অধোবদন হইলেন, তাঁহার নাম, বঙ্কিমচন্দ্র রায়। তিনি অক্লান্ত কর্ম্মী। আমরা সকলেই তাহাকে বিশেষরূপে জানিতাম। আমরা শুধু বিস্মিত হইলাম এই জন্যে যে, মুহূর্ত্তে আঁখির পলকে দেশবন্ধু তাঁহাকে চিনিয়া লইলেন এবং পরিচয় চাহিলেন। তাঁহার চিনিবার এই অদ্ভুত ক্ষমতা আমাদিগকে বিস্মিত করিল। মনে পড়ে, কয়েকমাস বাদে দেশবন্ধুর তিরোধানের সংবাদে বঙ্কিমদা কতদূর মর্ম্মাহত হইয়াছিলেন। দার্জ্জিলিং হইতে স্পেশাল ট্রেনে দেশবন্ধুর নশ্বর দেহ যখন কলিকাতায় আনা হয়, (১৮ই জুন, ১৯২৫) এবং শিয়ালদহ ষ্টেশন হইতে বিরাট শোকযাত্রা যখন কেওড়াতলা শ্মশান ঘাটের অভিমুখে শবানুগমন করিতে থাকে তখন আমাদের এই বঙ্কিম স্বর্গীয় মহাপুরুষের প্রতি তাঁহার শেষ শ্রদ্ধা নিবেদন করিতে যাইয়া যে প্রাণান্তিক পরিশ্রম ও অধ্যবসায় প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তাহা প্রকৃতই দেশবন্ধুর প্রতি তাঁহার অন্তরের অকৃত্রিম শ্রদ্ধার পরিচয় প্রদান করিয়াছিল।

দেশবন্ধু অতি অভিনিবেশ সহকারে তপোবন পরিদর্শন করিলেন। তপোবনে ছেলেদের বিজ্ঞান শিক্ষার জন্য একটি গবেষণা-কুটীর নির্ম্মিত হইয়াছিল। দেশবন্ধু তাহা দেখিয়া যারপরনাই প্রীত হইলেন। বিদ্যালয়ে সকল রকম শিক্ষাই দেওয়ার ব্যবস্থা আছে, কিন্তু সবই ধর্ম্মের ভিত্তিতে, ইহা তাঁহার নিকট অত্যন্ত আনন্দের।

দেখিতে দেখিতে তাঁহার মুখমণ্ডল উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। তিনি আবেগ ভরে বলিয়া উঠিলেন।"……বাবু" হয়তো এই সব দেখিয়া বলিবেন, সব superstition. বুঝিলাম, যাঁহার নাম তিনি করিলেন তিনি বাঙ্গলার একজন অতি বিশিষ্ট ব্যক্তি হইলেও ধর্ম্মের প্রতি আস্থাহীন। কিন্তু তৎসঙ্গে ইহাও অনুভব করিলাম, ধর্ম্মের প্রতি দেশবন্ধুর প্রবল আস্থা ও অনুরাগ।

দেশবন্ধু একজন শ্রেষ্ঠ রাজনীতিবিদ্ ইহাই অধিকাংশের ধারণা। কিন্তু তাঁহার রাজনীতি পাশ্চাত্যের অনুকরণ নহে। রাজনীতি তাঁহার নিকট ধর্ম্মের অঙ্গবিশেষ। পূর্ণাঙ্গ-ধর্ম্ম কিছুকে বাদ দেয় না। তাঁহার অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান এবং তাঁহার বক্তৃতাবলীতে আন্দোলনের দার্শনিক ব্যাখ্যা অনুধাবন করিলে স্পষ্টই বোঝা যায় যে, তাঁহার সব কিছুর পশ্চাতে ছিল প্রগাঢ় ধর্ম্মের অনুপ্রেরণা। ধর্ম্মের ছাঁচে ফেলিয়া তিনি তাঁহার রাজনীতিকে রূপ দান করিয়াছিলেন।

তারপর তপোবন হইতে ফিরিবার পথে দুই ধারে জঙ্গল আঁকা-বাঁকা পথে হতশ্রী পল্লীগুলির প্রতি ঐকান্তিক সহানুভূতি ভরে নজর করিতে করিতে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। একবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "এত জঙ্গল কেন?" একজন উত্তর করিল, এ জায়গা আমাদের নহে। তিনি বলিলেন "পড়ে আছে আপনাদের দেয় না কেন?" আমরা বলিলাম, "পড়ে থাকবে তবু আমাদের দিবে না।" তিনি শুধু দীর্ঘ-নিশ্বাস ছাড়িয়া বলিলেন, "হুঁ, সঙ্গে নিয়ে যাবে।"

মুখের দিকে চাহিয়া দেখিলাম, যুগপৎ দুঃখ ও হাসির রেখা।

ইহার একদিন পরেই দেশবন্ধু দার্জ্জিলিং যাত্রা করেন। তিন বারের তিনটি কথা—মনের উপর যে রেখাপাত করিয়াছে তাহা জীবনে সঞ্চিত অক্ষুণ্ণ ভাণ্ডাররূপে বিরাজ করিতেছে। কয়েকটি কথার পশ্চাতে ভাবের অনন্ত সমুদ্র। এই ভাব-সমুদ্র মন্থন করিলে অগণিত কথার পাহাড় সৃষ্টি হইতে পারে। আজও যখন একান্তে সেই মূর্ত্তিখানি ভাবি, মূর্ত্তির সহিত কয়েকটি কথা আমার সমস্ত হৃদয়খানি আন্দোলিত করিয়া সংসারের সীমা ছেড়ে আমাকে নিয়ে যায় বহু দূরে। একি আমার দুর্ব্বলতা!

আশ্রমে অবস্থান কালে দেশবন্ধু একদিন আমায় ডাকিয়া বলিলেন, "একখানা চিঠি নলিনী বাবুর (সরকার) কাছে পাঠাইতে হইবে, একজন বিশ্বস্ত লোক চাই। ডাকে দিলে গভর্ণমেণ্ট খোলে, তাই লোকের সঙ্গে দেওয়া ভাল। যদি আমার দ্বারা হয় তবে সে ভার আমিই নিতে প্রস্তুত। আমার কথা শুনিয়া খুসী হইয়া তাহা আমাকেই অর্পণ করিলেন। আমিও ধন্য মনে করিয়া সানন্দে চিঠি লইয়া কলিকাতা প্রস্থান করিলাম।

যে দিন দার্জ্জিলিং হইতে সংবাদ আসিল দেশবন্ধু গুরুতর রূপে পীড়িত, তখন দেশবন্ধুর পুত্র স্বর্গীয় চিররঞ্জনও তাহার পরিবার আশ্রমে। পীড়ার সংবাদ পাইয়া চিররঞ্জন তৎক্ষণাৎ দার্জ্জিলিং যাত্রা করিল। তার ঘণ্টা চারি পরেই তার আসিল, দেশবন্ধু আর ইহজগতে নাই। দেশবন্ধুর নশ্বরদেহ কলিকাতায় নীত হইতেছে। পরদিন শ্রীমাতাঠাকুরাণী চিররঞ্জনের পত্নী ও শিশুদের লইয়া ষ্টিমারে কুষ্টিয়া পার হইয়া তথা হইতে পোড়াদহ ষ্টেশন অভিমুখে স্পেশাল ট্রেন ধরিবার জন্য রওনা হইলেন, তৎসঙ্গে আমিও চলিলাম। পথে যাহা দেখিলাম, ভুলিবার নহে। ষ্টীমারের সারেং খালাসী হইতে আরম্ভ করিয়া যাত্রীগণ সকলে যেন স্তব্ধ, বজ্রাহত। দেশবন্ধুর পুত্রবধূ যাইতেছে জানিয়া তাহাদের রুদ্ধ কান্না বন্যার স্রোতের মত বহিতে লাগিল, সকলের চক্ষে জল। প্রত্যেকেই যেন বোধ করিতেছে, আজ কে যেন তাদের নাই। অতি প্রিয়, অতি আপনার জন আপন পরিবারের কাহাকেও হারাইয়া সকলে শোকে মুহ্যমান। বাঙ্গালী অনেকেই তাঁহাকে একবার হয়তো চোখের দেখাও দেখে নাই, কেবল লোকমুখে শুনিয়াছে মাত্র। কিন্তু কবে কখন কেমন করিয়া অতর্কিতে হৃদয়ের সিংহাসনে দেশবন্ধুকে সে প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল, বাঙ্গালী তাহা নিজেই জানে নাই। সে দিন জানিল, দেশবন্ধু ছিল কত আপনার! বাঙ্গালী বিরহ-বেদনায় কাঁদিয়া আকুল হইল।

সিগ্ন্যাল

শ্রীমেঘনাদ বসু

(গারসীন্)

[বিশ্ব-সাহিত্যে রাশিয়ার দান অপরিসীম। গোগল, পুশকিন্ থেকে আরম্ভ করে মাইকেল সলোখার, বুনিন্, কুপ্রিন্ পর্য্যন্ত সকল লেখকের লেখাই বিশ্বের দরবারে আদৃত হয়েছে। সাহিত্যে গণসাহিত্যের আন্দোলন যে সুরু হয়েছে—তার মূলে আছে রাশিয়া। এ বিষয়ে সকল দেশের সাহিত্যই, সংক্ষেপে বলতে গেলে, রাশিয়ার কাছে ঋণী।

রাশিয়ার সাহিত্য ঊনবিংশ শতাব্দীতে সবচেয়ে সমৃদ্ধ এবং উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল—আজো সে জ্যোতি ম্লান হয় নি। ছোটগল্পে রাশিয়া অনন্ত; গোর্কী, কুপ্রিন, আন্দ্রে,—প্রভৃতি সব ঔপন্যাসিকের ছোট গল্পগুলি প্রাণবন্ত এবং সর্ব্বাঙ্গসুন্দর, শেখভের নীতিকে মেনেই এরা রচিত।

এবার এদেশের নাম করা লেখক গারসীনের একটি গল্প এখানে দেওয়া গেল। গারসীন্ খুব বেশী লিখে যেতে পারেন নি—মাত্র দশটা কি পনেরটা গল্প লিখে গেছেন। এত কম লিখে রাশিয়ায়, শুধু রাশিয়ায় কেন, সারা জগতে এত বেশী খ্যাতি আর কেউ পান নি। তাঁর রচনার প্রত্যেক লাইনের প্রতিটি অক্ষর যেন তাঁর অভিজ্ঞতা থেকে বেরিয়ে এসেছে। এঁর শেষ জীবন বড় দুঃখের। এবং তখন তাঁর মন সর্ব্বদাই একটা বিষণ্ণতার ভাবে আচ্ছন্ন হয়ে থাকত এবং সেটা কিছুদিন পরে উন্মত্ততায় রূপান্তরিত হয়। তখন তিনি স্বপ্ন দেখতেন- জগতের সমস্ত দুঃখ, সমস্ত মন্দকে তিনি ধ্বংস করতে পেরেছেন। মাত্র ৩৩ বৎসর বয়সে ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে, দুর্ব্বল স্বাস্থ্যে যখন রোগ ভোগ করছিলেন, মনে মনে যখন অসহ্য কষ্ট পাচ্ছিলেন নিজের রুগ্ন, বিকল অবস্থার কথা ভেবে, তখন তিনি আত্মহত্যা করেন। তাঁর লেখাগুলি সবই দুঃখবাদপূর্ণ, কিন্তু রুগ্ন নয়।]

সীমেন ইভানভ্ রেলের পয়েন্টস্‌ম্যানের কাজ পেয়ে বেঁচে গেল। যুদ্ধক্ষেত্র হ'তে ফিরে এসে কাজ না পাওয়া পর্য্যন্ত নিরবিচ্ছিন্ন অলসতার মধ্যে তাকে কাটাতে হয়েছে—সেটা তার পক্ষে যেমন অসহ্য, তেমনি হয়েছিল কষ্টকর। এখন কাজটা জুটেছে মন্দ না। সারা দিনরাতে যে ক'খানা ট্রেন যাতায়াত করে, সেগুলো পাশ করিয়ে দেওয়া, সবুজ ফ্লাগ দেখিয়ে গাড়ীগুলিকে পথের নিরাপত্তা জানানো : এই কাজ।

তার কেবিনটা ছিল দু'টো ষ্টেশনের ঠিক মাঝামাঝি। এধারে অন্ততঃ দশ মাইল এবং ওধারেও পুরো বারো মাইল গেলে তবে ষ্টেশন দেখতে পাওয়া যাবে। সীমেনের এই কেবিনটা একেবারে নির্জ্জন জায়গায়। লোকজনের সঙ্গে মিলেমিশে, সামাজিকতার মধ্যে দেশের আচার-বিধি মেনে স্বচ্ছন্দভাবে দিন কাটার উপায় নেই। চারিদিকে উঁচুনীচু ফাঁকা মাঠ, মাঠের দক্ষিণ-পশ্চিম ধারে পাতলা একখানি বন, আর বনের শেষ সীমা হ'তে ছোটখাটো অসংখ্য পাহাড়! এখানে ইচ্ছা করে কেউ বাসা বাঁধে না। নিতান্ত চাকরী বজায় রাখবার জন্যেই না, সীমেন সস্ত্রীক এসে হাজির হয়েছে এখানে।

প্রথম জীবনে সীমেন গিয়েছিল যুদ্ধে, সৈনিক সেজে নয়, সৈনিকদের পরিচর্য্যার দায়িত্ব ঘাড়ে করে। তাতেই তার কাজের অন্ত ছিল না। সৈন্যের কাজের একটা সীমা নির্দ্দেশ করা যায়—কিন্তু বহু চেষ্টা করে সীমেনের সীমা স্থির করা যেত না; সব রকমের কাজ—রান্না থেকে সুরু করে ক্যাম্প খাটানো, আহত সৈনিককে হাসপাতালে গিয়ে সেবা করা পর্য্যন্ত : সব রকমের কাজই করতে হ'য়েছিল তাকে। প্রচণ্ড রৌদ্রে বা হিম-শীতল তুষারের মধ্যে যেতে হয়েছিল পঞ্চাশ মাইল, কিংবা ঘাড়ে করে মোট বইতে হ'ত দিনের পর দিন, রাতের পর রাত। কিন্তু ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, সীমেন কখনও গুরুতর আহত হয় নি, শুধু বাঁ হাত আর বাঁ পা'টা একটু জখম হয়েছিল।

বড় বড় অফিসার তার কাজের খুব সুখ্যাতি করেছিল। রণক্ষেত্রে হাড়ভাঙা খাটুনির পর গরম চায়ের কাপ সীমেন তাদের হাতে তুলে দিত, যাবতীয় টুকরো কাজ করে তাঁদের সুবিধা করে দিয়ে প্রচুর সান্ত্বনা দান করতো।

ফিরে এসে সীমেন দেখলে তার পিতা আর জীবিত নেই, নিজের ছেলেটিও মৃত্যুশয্যায়। পত্নী ছাড়া জগতে আর কেউ রইল না সীমেনের। আর ভাগ্য যখন মন্দ হয়—বিপদ সব দিক দিয়েই দেখা দেয়; এতদিন তার জমিটা নিষ্ফলা আর অকেজো হয়ে পড়ে থাকায় তার উর্ব্বরাশক্তি গেছে নষ্ট হয়ে। সীমেনের মন হাহাকার করে উঠলো।

কি হবে এখানে থেকে? জীবন যখন অবাধিত নয় এখানে, প্রাণধারণ স্পষ্ট আর স্বচ্ছন্দ নয় যখন এখানে? স্বামী স্ত্রী তারা চলে যাক দূরে—খুব দূরে, যেখানে অন্ততঃ তারা তাদের সৌভাগ্যকে খুঁজে বের করবে, নিজেদের প্রাণধারণের স্পৃহাকে, তার শক্তিকে আঁকড়ে ধরতে পারবে অন্ততঃ মৃত্যুর হাতে নিজেদেরকে সমর্পণ করবে। কিন্তু তা আর করতে হল না—সীমেনের পত্নী ওয়েটিং মেডের কাজ পেয়ে গেল এক ব্যারণের বাড়ী, কিছু দূরেই অবশ্য। আর সীমেন? সে বেরিয়ে এল জগতের সামনে, বিক্ষিপ্ত জনতার মধ্যে সামান্য একটি জলবুদ্বুদের মত, বিশাল জনসমুদ্রের একটি চঞ্চল অথচ ছোট্ট বুদ্বুদের মত।

ঘুরতে ঘুরতে এল একটী ষ্টেশনে। ষ্টেশন মাষ্টার সীমেনকে দেখে কাছে ডাকলেন, পরিচয় জিজ্ঞাসা করে বল্লেন—আমার সন্দেহ তা হলে মিথ্যা নয়? তারপর যাচ্ছ কোথায়?

তা বলতে পারি না স্যার। সীমেন নির্বিকার কণ্ঠে জানালো।

বলতে পারো না—সে কি হে? ষ্টেশন মাষ্টার আশ্চর্য্য হলেন।

সীমেন যুদ্ধক্ষেত্র থেকে ফিরে আসার পর থেকে তার জীবনকাহিনী সুরু করে গেল। যুদ্ধের সময় এই ষ্টেশন-মাষ্টারটি তাদের বড় অফিসার ছিলেন। তিনি সীমেনের অবস্থায় সহানুভূতি জানিয়ে এই কেবিনে থাকার চাকরীটি জুটিয়ে দেন। সীমেন সস্ত্রীক কেবিনে এসে বাসা বাঁধল। নিঃসীম শূন্যে উন্মুক্ত পাখী ডানা ঝাপ্টাতে ঝাপ্টাতে হয়ে পড়েছিল ক্লান্ত, ঠিক সেই সময় সে নীড় পেয়ে গেল, সুখের হব না হক, স্বচ্ছন্দময়; তাই একবারও সোয়াস্তির কূজন তুলবে না কেন?

কাজ কিছু নয়, গরমের দিনে একেবারে কিছুই নয়। গাড়ী দুখানি যায়, দুখানি আসে। সবুজ ফ্ল্যাগ হাতে নিয়ে সেগুলোকে পাস্ করিয়ে দেওয়া, প্রয়োজন হ'লে লাইনের লাটবন্ট্রু গুলো পরীক্ষা করা—তারপর অখণ্ড অবসর। বন্ধু নেই, আত্মীয় পরিজন—কেউ নেই আশেপাশে, যার সঙ্গে বাচাল সীমেন কথা বলে বাঁচবে সীমেন এবং তার পত্নীর অসহ্য হয়ে উঠল। এই নির্জ্জনতাও একরকমের নির্বাসন বৈ কি!

কিছুদূর এগিয়ে গিয়ে—প্রায় মাইল চারেক আরো এদিকে সরে এসে, রেলের এই মস্তবড় বাঁকটা ঘুরে শেষ হয়ে গেছে যেখানে, সেখানকার কেবিনম্যানের সঙ্গে সীমেন আলাপ জমাতে এল একদিন। লোকটার মাথা বেয়ে বার্দ্ধক্যের ছায়া পড়চে, কিন্তু বলিষ্ঠ দেহে শক্তির প্রাচুর্য্য এখনও উপলব্ধি করা যায়, চোখে মুখে, অঙ্গে প্রত্যঙ্গে যৌবনের ভাঁটা এখনো পড়ে নি। সে সীমেনের প্রথম সম্ভাষণে আশ্চার্য্য বা সচকিত না হ'য়েই বল্লে—ভাল আছি আমি, তুমি কেমন আছ?

সীমেন বিস্মিত হ'ল। সে কে, এবং নির্জ্জনস্থানে কেমন করেই বা এল সে, সে কথা লোকটি উত্থাপন করলো না এবং সীমেনের এই বিস্ময়ের ভাব দেখে লোকটি নিজের কাজে চলে গেল—একটা মিনিটও আর অপেক্ষা করতে পারল না।

এরিনা—সীমেনের স্ত্রী, প্রৌঢ় লোকটিকে একদিন দেখতে পেয়ে অভ্যর্থনা জানালে। লোকটি বাচাল নয়, অল্প কথায় সামাজিকতা সেরে নিজের কাজে চলে গেল। সীমেনের আশ্চর্য্য ঠেকল বড়। লোক পায়:না বলে সে আর তার স্ত্রী উঠেছে হাঁফিয়ে, কিন্তু এ লোকটা সঙ্গী পেয়েও তাদের অবহেলা সুরু করে দেয়। আশ্চর্য্য!

কিন্তু দিন যাবার সঙ্গে সঙ্গেই তাদের আলাপ জমলো গাঢ়ভাবে। লোকটির নাম ভাসিলি। বয়েসে অনেক বড় হ'লেও সে সীমেনের বন্ধু হয়ে গেল। উভয়ের অবকাশ সময়ে সমান দূরে এসে উভয়ে বিড়ি ধরিয়ে অতীত কাহিনী সুরু করত। সীমেন অবশেষে বলতো, বড় ভাগ্যের জোরে আজ আমি এই কাজ পেয়েছি, দুবেলা দুমুঠো খেয়ে বাঁচছি। কোম্পানীকে অসংখ্য ধন্যবাদ ভাই।

ভাসিলি দৃঢ়ভাবে জানালে—তুমি ভুল বকছ বন্ধু। ভাগ্যটাগ্য কিছু নয়—ওটা অক্ষম দুর্ব্বল যারা তাদের কথা। তুমি খাটছ, অক্লান্ত পরিশ্রম করছ—তার বিনিময়ে কিছু পয়সা পাচ্ছ। জানো মানুষের সবচেয়ে বড় শত্রু কে? মানুষ! প্রত্যেকেই ওৎপেতে আছে তোমার বুকের রক্ত পান করবার জন্যে।

সীমেন প্রসঙ্গটা পাল্টাবার মানসেই বল্লে—জানি না

বন্ধু, হয়ত হবে। আর যদি তাই হয়—বুঝতে হবে ঈশ্বরের ইচ্ছা তাই।

ঈশ্বর? চোখের ওপর যে অত্যাচার, যে পীড়ন দেখছি, তা তুমি ঈশ্বরের ওপর দোহাই দিয়ে চালাবে! সত্যকার মনুষ্যত্ব তোমার মধ্যে নেই, সীমেন। তুমি দয়ার পাত্র। ভাসিলি উত্তপ্ত হয়ে উঠল।

সীমেন শক্তভাবে জানালে—ঈশ্বরকেই বিশ্বাস কর না যদি, তা হলে তুমি যে এই রেলের কেবিনে চাকরী করছ, এ কার দয়া?

ভাসিলি হো হো করে হেসে উঠল— এই জন্যেই আমি বেশী করে ঈশ্বরকে অবিশ্বাস করি সীমেন। মানুষের ষড়যন্ত্রে আমরা এই নীচ কাজ করছি।

সীমেন আশ্চর্য্য হয়ে বল্ল—নীচ কাজ?

নয়? এত অস্বচ্ছন্দ যে তার তুলনা দেওয়া চলে না। তুমি খাটছ কত—কিন্তু পাচ্ছ কি? গরীবদের জীবনে অবশ্য বেশী কাম্য কিছু নেই!···কত ক'রে মাইনে পাও তুমি?

অবশ্য খুব বেশী নয়—বারো টাকা।

আমি পাই সাড়ে তের টাকা। কিন্তু রেলওয়ের নিয়মে যদি ধরো, প্রত্যেক কেবিনদারের কত পাওয়া উচিত জানো? পনেরো টাকার এক আধলা কম নয়। কতবার আমি এর প্রতিবাদ করেছিলাম, কিন্তু কোন ফল হয় না, তাই ভাবছি, আমি একাজ ছেড়ে চলে যাব—যে দিকে দু'চোখ যায়।

সীমেন আগ্রহভরে বলে উঠল—না, না, ভাসিলি তা করো না। এখানে তুমি চাকরী পেয়েছ, বাড়ী পেয়েছ, ফাঁকা মাঠের হাওয়া, আর পাড়াগাঁয়ের ভেতর কিছু জমি—তা ছাড়া তুমি ও তোমার বউ যখন কাজের লোক—

জমি? তুমি হাসালে সীমেন। এক ফোঁটা জমিও আমার নয়। গতবার ওখানে আমি কয়েকটি কপির চাষ করেছিলাম। ইন্‌স্পেক্টর এল,—বল্লে 'এ সব কি হয়েছে? আমাদের অনুমতি না নিয়ে এসব করেছ কেন? খুঁড়ে ফেল, উঠিয়ে ফেল।'···আমার জরিমানা হয়ে গেল তিন টাকা।

ভাসিলি নীরবে ধূমপান করতে লাগল। তার মুখে চোখে একটা কঠোরতা ফুটে উঠেছিল—সীমেনের চোখে তা এড়াল না। ভাসিলি আবার বলতে সুরু করলে—এখানেই শেষ নয় সীমেন। ইন্‌স্পেক্টর আমাদের সর্ব্বনাশ করবে বলেছে—আর দেখে নিয়ো, আমি সহজে ছাড়ছি না। আমিও চীফের কাছে নালিশ জানাবো।

এবং সে সত্যিই নালিশ জানালে।

একদিন চীফ অফিসার রেলের লাইন তদারক করতে এলেন। লাইনের চার পাশের জঙ্গল কেটে পরিষ্কার করা হল—কেবিনগুলোকে মানুষের মত করে খাড়া করা হল; পোষ্টে পোষ্টে লাগানো হল সাদা কালো রঙ্। সব কিছুর সংস্কার সাধন করা হল। কেবিনের আশে পাশে রেলওয়ে ক্রসিং এর মাথায় মাথায় বালি ছড়িয়ে দিতে হবে—আদেশ এল। সীমেন লেগে গেল কাজে, বালি ছড়ালে, রেলিংএ লাগালে রঙ, পরিষ্কার করে রাখল নিজের কেবিনটাকে। ভাসিলিও প্রাণান্ত পরিশ্রম করে কর্ত্তৃপক্ষের আদেশ পালন করল। তারপর একদিন মহাসমারোহে এলেন চীফ অফিসার। সঙ্গে সঙ্গোপাঙ্গ মেলাই, ভাসিলিকে ফাইন করেছিল যে ইন্‌স্পেক্টর, সেও আছে।

চীফ অফিসার সীমেনকে জিজ্ঞাসা করলেন—কতদিন এখানে আছ?

সীমেন বিনীত কণ্ঠে উত্তর দিলে—আজ্ঞে, মে মাস থেকে আমার কাজ হয়েছে এখানে।

অফিসার বল্লেন—বেশ। ১৬৪নং কেবিনে কে থাকে তুমি জানো?

সীমেনের বন্ধু ভাসিলির তত্ত্বাবধানে ঐ কেবিনটি। কর্ত্তৃপক্ষের সামনে দাঁড়িয়ে সীমেন মিথ্যা কথা বলতে পারে না। সে তাই বললে—ভাসিলি স্পিরিডভ্।

অফিসার নামটা শুনেই ইন্‌স্পেক্টরকে বল্লেন—ভাসিলি স্পিরিডভ্, ওই যার বিরুদ্ধে তুমি জানিয়েছিলে আমাকে?

আজ্ঞে হ্যাঁ—বলে ইন্‌স্পেক্টর চুপ করল।

সীমেনের বুকটা উঠল কেঁপে। এঁদের সঙ্গে ভাসিলির ব্যবহার যেমন হোক, এঁদের সম্বন্ধে তার ধারণার কথা সীমেনের অজানা নেই। এই নিয়ে কিছু না ঘটলেই ভালো হয়।

বড় বড় অফিসারেরা চলে যাবার দু' ঘণ্টা পরে সীমেন নিজের কাজের জন্যে লাইনের ধারে বের হল। দূরে পথের বাঁকের কাছে একটা লোককে আসতে দেখে সীমেন নীরবে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল। লোকটির মাথা সাদা কাপড়ে

ঢাকা রয়েছে, হাতে একটা ছড়ি, কাঁধে পোটলা ; কাছে আসতে দেখা গেল সে ভাসিলি। তার গালে রুমাল জড়ানো, রুমালটায় এলোমেলো রক্তের ছোপ লেগে রয়েছে।

কোথায় চলেছ হে ? সীমেন জিজ্ঞাসা করলে।

ভাসিলিকে অত্যন্ত মলিন আর বেদনার্ত্ত দেখাচ্ছিল, তার চোখ দুটোয় কেমন একটা রুক্ষভাব ফুটে রয়েছে—মুখে একটা অসহায়তা। সে ফুঁপিয়ে উঠে বললে—সহরে যাচ্ছি, মস্কোতে হেড্ অফিসে।

সীমেন আশ্চর্য্য হল—হেড অফিসে ? হেড অফিসে কেন ? নালিশ জানাবে ? ভাসিলি, তুমি ওসব ভুলে যাও, ওদের কথা ছেড়ে দাও।

কঠোর ভাবে ভাসিলি তাকালো সীমেনের দিকে—ভুলে যাবো ? না, তা হতে পারে না সীমেন, দেখছ মেরেছে আমাকে—মুখে রক্তের ফোয়ারা ছুটিয়েছে, আমি এর বিচার চাই। জীবনে আমি এই আঘাত কোনদিনই ভুলতে পারবো না।

সীমেন ভাসিলির হাত দু'খানা ধরে নিষেধ জানালে, অনুনয় করলে, কিন্তু কোন ফল হল না। ভাসিলি বললে সে কোন অপরাধ করেনি। শুধু তার অবস্থা সে বর্ণনা করেছিল। সে কথা থাক ; সত্যের জন্য, ন্যায় বিচারের জন্য সে ছুটেছে সহরে, অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়বার শক্তি তার চিরদিন আছে। অফিসার তার প্রতি রূঢ় হবে—আগেই সে তা বুঝতে পেরেছিল, এবং তাই সে নিজের সমস্ত কাজগুলি করে রেখেছিল পরিপাটী ভাবে, কোথাও একটুকু অযত্ন বা একবিন্দু অবহেলা রাখেনি ; কিন্তু কঠোর আর রূঢ়ভাবে তার সঙ্গে অফিসার বাক্যালাপ করছেন দেখে ভাসিলি দুটো একটা কথার জবাব তাই কঠোর ভাবেই দিয়েছিল। তার ফল হয়েছে এই, প্রহৃত হয়েছে সে : অক্ষমের মত দাঁড়িয়ে সে এ অন্যায় সহ্য করতে পারবে না। তাই ভাসিলি বললে—তুমি ঠিক পথই বেছে নিয়েছ বন্ধু। অন্যায় অবিচারের সব অভিযোগ ভগবানকে জানিয়ে তোমরা শান্ত হতে পার, কিন্তু আমি তা পারি না। আমি আমার শেষ চেষ্টা করবো।

সীমেন ভাসিলির পত্নী এবং কেবিনের কথা জিজ্ঞাসা করল—

ভাসিলি বললে—আমার বউ রইল ওখানে, একটু দেখো। আর সেই এ কদিন কাজকর্ম্ম একরকম চালিয়ে দেবে।…আচ্ছা চলি, সুবিচার পাই কি না কে জানে ?

সীমেন জিজ্ঞাসা করলে—হেঁটেই চল্লে নাকি ?

না, দেখি, ষ্টেশন থেকে মালগাড়ীতে করে যাবার চেষ্টা করবো। তাহলে কাল পৌছতে পারবো মস্কোয় চলি !

ভাসিলি চলতে সুরু করলে। শেষ তীর্থযাত্রীর মত ভাসিলি হাঁটতে সুরু করলে, সীমেন এখানে দাঁড়িয়ে ব্যথিত দৃষ্টি মেলে ধরলে তার দিকে, তার তির্য্যক্ গমন পথের দিকে। লাঠি ঠোকবার আওয়াজ হল অস্পষ্ট, বাঁক ঘুরে নিমিলিয়মান বিন্দুর মত ভাসিলি হয়ে গেল অদৃশ্য।

দিন রাত পরিশ্রম করে ভাসিলির পত্নী স্বামীর কাজ চালিয়ে দিচ্ছিল, কিন্তু মনে মনে সে হয়ে উঠল উদ্বিগ্ন। স্বামী ৬'দিনের জায়গায় এতদিন কেন দেরী করছে ? ইতিমধ্যে অফিসার এল পুনরায়, গোপনে তদন্ত করা হল, কিন্তু ভাসিলির কোন খোঁজ নেই। তার বউ অতিরিক্ত মাত্রায় হয়ে গেল অধীর।

শৈশবে সীমেন উইলো ডাঁটার বাঁশী তৈরী করতে শিখেছিল। আজও সে তা ভুলে যায়নি। তাই অবকাশ পেলেই উইলো ডাঁটা কাটতে ছোটে ঝোপে—এরিণা আর সে বসে বসে তৈরী করে বাঁশী, মালগাড়ীর ব্রেকম্যানের দ্বারা সেগুলো চালান করা হয় বাজারে, যাহোক দুচার আনা পাওয়া যায় তাতে।

আজও সে পত্নীকে সন্ধ্যা ছটার গাড়ী তত্ত্বাবধান করতে বলে সে ঝোপে গেল উইলো ডাঁটা কাটতে। চীফ অফিসারের হাঙ্গামায় এতদিন বাঁশী তৈরী করা হয়নি। দূরের ওই বাঁকটার পাশেই জলা—ওই জলায় প্রচুর উইলো গাছ। সীমেন সেখানে ছুরি দিয়ে উইলো ডাঁটা কাটবার সময় নাড়িদুয়ে নাটবল্টু খোলবার শব্দ শুনতে পেলে। মনটা তার ভীত হয়ে উঠল—এমন নির্জ্জন জংলা জায়গায় লাইনের ওপর থেকে এত তীব্র আওয়াজ আসতে পারে কোথা থেকে ? সে লাইনের ধারে উঠে এল। দূরে একটি লোক লাইন খুলছে, গোটা একটা লাইন সরিয়েও ফেলেছে একধারে। সর্ব্বনাশ ! সীমেনকে দেখে লোকটা উঠে দাঁড়াল,

হাতে তার ম্যাটবল্টু খোলার রেঞ্জ। এইবার সোজা হয়ে দাঁড়াতেই সীমেন লোকটাকে চিনতে পারলে। ভাসিলি! সীমেন উচ্চকণ্ঠে চীৎকার করে উঠল—ভাসিলি! কোথায় ছিলে এতদিন? একি করছ তুমি? এস, লাইনটা ঠিক করে ফেলবার চেষ্টা করি, ভাসিলি, ভাসিলি!

ভাসিলি কোন কথা বলল না, বনের আড়ালে অন্তর্হিত হল।

সীমেন দাঁড়িয়ে রইলো সেখানে, সামে পড়ে রয়েছে খোলা রেলের পাটি। উইলো ডাঁটার বাণ্ডিল সে ফেলে দিলে, ইতিমধ্যেই কোন ব্যবস্থা করতে হবে। ছটার গাড়ী আসবে এবার, আর এ গাড়ীটা মালগাড়ী নয়, প্যাসেঞ্জার ট্রেণ। কিন্তু গাড়ীখানা থামাবার কোন সরঞ্জামই তার কাছে নেই। একটা ফ্ল্যাগ পর্য্যন্ত নয়। একা লাইনখানা টেনে এনে সংযুক্ত করা তার পক্ষে একেবারেই অসম্ভব। এখন দৌড়ে গিয়ে কেবিন থেকে ফ্ল্যাগ আনা ভিন্ন অন্য উপায় নেই। সে উর্দ্ধশ্বাসে দৌড়াতে লাগল।

কিন্তু দূরে মিলের সিটি বাজলো ছটার, শ্রমিকদের ছুটী হল। মাত্র ছটি মিনিট আর বাকী। সাত নম্বর ডাউন গাড়ীখানা এবার আসবে। অথচ এখনো তার কেবিন বেশ দূরে—তিনশো গজের ওপরে হবে, দৌড়ে গিয়ে ফ্ল্যাগ এনে দু'মিনিটের মধ্যে এখানে এসে পৌঁছতে পারবে না। সীমেন হতবুদ্ধি হয়ে পড়ল। সে দিব্যদৃষ্টিতে দেখতে পেলে ট্রেণখানি যেন পড়ে গেল, সহস্র সহস্র নিরপরাধ লোকেরা মৃত্যুর দেশে গিয়ে হাহাকার তুলছে—সীমেনের চোখ দিয়ে দু'ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ল। সে ঈশ্বরকে ডাকতে লাগল। হে ভগবান, এই বিপদে সীমেনকে বুদ্ধি দাও, নিরীহ সহস্র সহস্র লোকের প্রাণ বাঁচাবার উপায় বলে দাও প্রভু। শক্তি দাও সীমেনের মনে।

এবার আরো জোরে দৌড়ে সীমেন সেখানে ফিরে এল কেবিনে গিয়ে ফ্ল্যাগ আনা যখন অসম্ভব, তখন এখান থেকেই কোন ব্যবস্থা করতে হবে। দূরে—খুব দূরে ধিকি-ধিকি শব্দ শোনা গেল ট্রেণের। বাঁশী পর্য্যন্ত শোনা গেল অবশেষে আরও কিছু ওদিকে এগিয়ে সে ঠিক করলে বাঁচাতেই হবে গাড়ীখানি। মালগাড়ী নয়, প্যাসেঞ্জার ট্রেণ! সে হাতের ছুরিখানার দিকে তাকালে, আর একটু দূরে পড়ে রয়েছে উইলো গাছের ডাঁটা, আর নিজের পকেটে আছে রুমাল। ঈশ্বর সীমেনের দুর্ব্বল মনে শক্তি দাও।

বাঁ হাতের কনুইয়ের ভেতর ছুরিখানা চালিয়ে রুমালখানা রক্তে রাঙা করে নিলে, উইলো ডাঁটায় জড়িয়ে লাল নিশান করে সে লাইনের ওপর দাঁড়াল। দূরে দেখা গেল ট্রেণের আলো, বিদ্যুৎগতিতে লৌহযান এগিয়ে আসছে।

সীমেনের সমস্ত দেহ অসাড় হয়ে আসতে লাগল। ফ্ল্যাগ দেখাবার সামর্থ্য পর্য্যন্ত শেষ হয়ে যেতে লাগল। ক্ষতস্থানের রক্তে তার সমস্ত শরীর সিক্ত হয়ে উঠেছে, হাত-পা কাঁপছে, মাথা ঝিম্ ঝিম্ করছে—সমস্ত জগৎ হয়ে এল অন্ধকার। সীমেন শেষবার ঈশ্বরকে প্রার্থনা জানালে—ঈশ্বর, ড্রাইভার যেন নিশানটা দেখতে পায়! আমায় আর একটা মিনিট বাঁচাও···

সে দৌড়তে লাগল, লাইনের ওপর দিয়ে—যে দিক দিয়ে আসছিল ট্রেণটা, সেই দিকে। কিন্তু অন্ধকার ঝাপসা দৃষ্টিতে সে কিছু দেখতে পেলে না ইঞ্জিনের অতবড় উজ্জ্বল আলোও না। শুনতেও পেলে না কিছু। চোখের সামনে ঘোলা হয়ে উঠল সবকিছু, কাণ হলো বধির, সমস্ত জগৎ অন্ধকার আর মূক হয়ে উঠল। সেইখানেই সে পড়ে গেল অচৈতন্য হয়ে। কিন্তু আশ্চর্য্য, হাতের সেই রক্ত-রাঙা পতাকাটি পড়ে গেল না। সীমেনের হাতের আগ্রহ নিয়েই কে যেন ইঞ্জিনের সামনে নাড়তে লাগল সেই পতাকাটা, বিপদের সঙ্কেত জানিয়ে। ঈশ্বর শুনেছেন সীমেনের শেষ প্রার্থনা!

অবশেষে ট্রেণ এল। সিগন্যাল্ দেখতে পেয়েছিল ড্রাইভার, গাড়ী থামিয়ে ফেললে। অগণিত লোক নেমে পড়ল, তদন্ত করে জানলে ব্যাপারটা কি। রক্তাক্ত কলেবরে সীমেন নিষ্প্রাণ জড়ের মত পড়ে রয়েছে হতচৈতন্য হয়ে, ঠিক ইঞ্জিনের সামে—তারই কিছু দূরে রেলের পাটি সরানো। উইলো ডাঁটা, অবকাশ সময়ে সীমেন সুখদুঃখের গান গাইত যার সাহচর্য্যে, সেই ডাঁটায় জড়ানো রক্তের নিশান। ভাসিলি নিস্তব্ধ ভাবে তা ধরে দাঁড়িয়ে রয়েছে। লোকেরা বিহ্বল হল!

ভাসিলি চারিদিকে পরিষ্কার ভাবে তাকালে। মাথা উঁচু করে সে বললে—আমিই অপরাধী। আমি রেলের লাইন সরিয়েছি, আমাকে বন্দী করো!



জগন্নাথদেবের মন্দির [শিল্পী – কুমারী আই, খান

মণিপুরের ধর্ম্ম ও সংস্কৃতি

—শ্রীজিতেন্দ্রকুমার নাগ চৌধুরী

মণিপুর প্রাচীন দেশ এবং তারী সুন্দর রমণীয় প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের মাঝে বৃদ্ধি লাভ করিয়া চিরদিনই এদিককার লোককে আকর্ষণ করিয়া আসিতেছে। চতুর্দ্দিকে পর্ব্বতমালায় বেষ্টিত সুদৃশ্য বনভূমি এবং স্রোতস্বিনী নদী হ্রদ প্রভৃতি সমভিব্যাহারে তরঙ্গায়িত ভূমিতে পূর্ব্বভারতে কাশ্মিরের সামিল আমাদের মত লামামানের দৃষ্টিকে মুগ্ধ করিয়াছে। এই অপূর্ব্ব দেশ শুধু স্বভাব-সৌন্দর্য্যের লীলাভূমি নহে—সুন্দর নর-নারীরও আবাসভূমি। মণিপুর রাজ্যের স্ত্রীলোকেরা বিশেষতঃ চিরদিনই সুগঠন ও সৌন্দর্য্যের অধিকারিণী। 'বাংলাদেশে যত প্রকার পার্ব্বত্য জাতি আছে, মণিপুরীগণ তন্মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা সুশ্রী—প্রায় সকলেই গৌরবর্ণ। মণিপুরীয় মহিলাগণ যখন পুষ্পাভরণে সজ্জিত হন তখন আমাদের ঋষিবর্ণিত গন্ধর্ব্বকুমারী বলিয়া ভ্রম জন্মে'।*

এ হেন মণিপুরে, যেখানে এখনও বহুবিবাহ প্রচলিত রহিয়াছে, সেখানে পাণ্ডব অর্জ্জুন চিত্রাঙ্গদাকে দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলেন এবং বিবাহ করিয়াছিলেন তাহা আর বিচিত্র কি! তাঁহার একটী পুত্রও হইয়াছিল, বভ্রুবাহন তাহার নাম। প্রাকৃতিক শোভা দেখিতে অর্জ্জুনের পরেও অনেক ক্ষত্রিয় আসিয়াছিলেন এবং অশ্বমেধ যজ্ঞের অশ্ব লইয়া বহু চন্দ্রবংশোদ্ভূত ক্ষত্রিয়কে এদেশে আসিতে হইয়াছিল। তাঁহারাও বোধ করি মণিপুরী ললনাদের দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলেন এবং কেহ কেহ বিবাহ করিয়া থাকিবেন। এই জন্যই মণিপুরীরা বিশ্বাস করেন, তাঁহারা ক্ষত্রিয় এবং চন্দ্রবংশোদ্ভূত। সেই প্রাচীন পৌরাণিক যুগের দিন থেকে নাগা কুকি বেষ্টিত মণিপুরীয়দের মধ্যে হিন্দুধর্ম্মের প্রবাহ চলিতে থাকে। বীর্য্যে-বীরত্বে সত্যই ইঁহারা ক্ষাত্র রক্ত দেহে ধারণ করিয়া আছেন এবং ক্ষত্রিয় ধর্ম্ম-পালনে অভ্যস্ত। মনিপুরের ইতিহাসে তাহার পরিচয় যথেষ্ট পাওয়া যায়। অথচ পূর্ব্বভারতে কোথাও ক্ষত্রিয় বর্ণের অস্তিত্ব নাই বলিলেও চলে। সম্ভবতঃ মণিপুরে উপরোক্ত পৌরাণিক কিম্বদন্তীতে বিশ্বাস করিয়া ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ বর্ণের সৃষ্টি হইয়াছে।

মণিপুরীগণ নিজেদের মিতাই বলিয়া থাকেন। তাঁহাদের মিতাই ভাষা আসামের ভাষা হইতে বিভিন্ন, যদিও অসমীয়া বর্ণমালার মত মিতাই বর্ণমালাতেও বঙ্গের অক্ষর লওয়া হইয়াছে আজকাল। ধর্ম্ম ইহাদের হিন্দু, কিন্তু মনে প্রাণে বড়ই বৈষ্ণব—মাছ-মাংস সাধারণ ভাবে কেহই খায় না



পর্ব্বতমালায় বেষ্টিত মণিপুর

বলিলেই চলে। হিন্দু দেব-দেবীদের মধ্যে রাধা-কৃষ্ণই পূজিত হইয়া থাকে। অথচ ৪।৫ শত বৎসর পূর্ব্বে মণিপুরে তান্ত্রিকদের (অ) ধর্ম্মে বাঙ্গলাদেশের মত মিতাই সমাজে বহু অনিষ্ট সাধিত হয়, কিন্তু ঈশ্বরের কৃপায় ষোড়শ শতাব্দীতে শ্রীশ্রীচৈতন্যদেবের প্রেম-ধর্ম্মের স্রোত এই সুদূর পর্ব্বতবেষ্টিত মণিপুর রাজ্যেও বহিতে থাকে, যাহার ফলে, মিতাইগণ তন্ত্র উপাসনার বিষময় ফল হইতে রক্ষা পান। এখানে তান্ত্রিক ধর্ম্মের মন্দদিকটার কথাই বলিতেছি, আমি নিজে শাক্ত—শক্তির পূজারী, বিশেষ করিয়া বর্ত্তমান অবস্থায়, কিন্তু তান্ত্রিক

* কৈলাসচন্দ্র সিংহ—বঙ্গদর্শন।

কাপালিকদের কথা মনে করিলে এই ধর্ম্মত্যাগের ফল বিষময় বলিয়াছি।

আনুমানিক ১৫৭১ সালে মহাতান্ত্রিক শাক্তক্রম এবং ১৫৭৭ সালে শ্রীতত্ত্বচিন্তামণি প্রভৃতির লেখক পূর্ণানন্দ মণিপুরে তন্ত্র-উপাসনা প্রচলিত করেন। পূর্ণানন্দ কামাখ্যা-পীঠের পুনরুদ্ধার করেন। কিন্তু আজও পর্য্যন্ত দেখা গিয়াছে, মণিপুরের অধিপতি হইতে সাধারণ ধর্ম্মপ্রবণ মিতাই-গণ পর্য্যন্ত বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রভাবে তাঁহাদের দেশের নিকট কামরূপের কামাখ্যাপাহাড়ে না উঠিয়া বঙ্গে আসিয়া শ্রীধাম নবদ্বীপে আসিয়াই পুণ্যার্জ্জন করিয়া যান। ষোড়শ শতাব্দীতে



স্বভাব-সৌন্দর্য্যের লীলাভূমি

শ্রীহট্ট চৈতন্যদেবের শিষ্যগণ বা গোস্বামীগণ মণিপুরে আসিয়া শ্রীগৌরাঙ্গের বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচার করেন। রাজ্যের অধীশ্বর (মহারাজ ভাগ্যচন্দ্রের সময় বা ২।১ পুরুষ আগে সম্ভবতঃ রাজা চিং তোমাখোম্বার) পরম আনন্দের সহিত গোঁসাইদের নিকট হইতে সাদরে বৈষ্ণব ধর্ম্ম গ্রহণ করেন এবং ক্রমে ক্রমে প্রজারাও তন্ত্র-মন্ত্র ছাড়িয়া দিয়া এই ধর্ম্ম গ্রহণ করে। শুনা যায়, অদ্বৈত শাখার লোকনাথ গোস্বামীর শিষ্য নরোত্তম অধিকারী এই মিশনের অন্যতম পাণ্ডা ছিলেন, তিনি সদলে রাজা চিং তোমাথোম্বার পৃষ্ঠপোষকতায় এবং সাহায্যে মিতাইগণকে বৈষ্ণব মন্ত্রে দীক্ষা দেন।

বাঙ্গলা দেশে তন্ত্রের প্রভাবে হিন্দুধর্ম্মে যেমন অনাচার ঢুকিয়াছিল, মণিপুরে ভাগ্যক্রমে ততটা হইতে পারে নাই। তাহার পূর্ব্বেই বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রচার কার্য্য আরম্ভ হইয়াছিল। আর একটা লক্ষণীয়, এক সময় আমাদের মধ্যে যেমন শাক্ত বৈষ্ণবের লড়াই চলিত, মিতাই সমাজে পুরামাত্রায় সকলে বৈষ্ণব হওয়াতে সেরূপ ধর্ম্মযুদ্ধের সুবিধা হয় নাই।

মহারাজ ভাগ্যচন্দ্রের সময় হইতে রাজ্যে রাসলীলা প্রধান উৎসবে পরিণত হইয়াছে এবং প্রতিবৎসর কি রাজবাড়ী কি গৃহস্থের ভদ্রাসনে অতি জাঁকজমকের সহিত নৃত্য-গীতানুষ্ঠানের প্রাচুর্য্যে সমাপ্ত হয়। সমস্ত রাজ্যের গ্রামে, গ্রামে, দেবালয়ে দেবালয়ে এবং ইম্ফাল রাজধানীর রাজপুরীর অন্তর্ভুক্ত শ্রীগোবিন্দজীর মন্দিরে কার্ত্তিক মাসে ২৮ দিন ধরিয়া রাস-পূর্ণিমার শ্রীকৃষ্ণলীলাকে প্রতিমূর্ত্ত করিয়া কীর্ত্তন গানে এবং নৃত্য-সঙ্গীতে অনুষ্ঠিত হয়।

(২)

মণিপুরের সংস্কৃতি বা যাকে কালচার বলি তাহার মুখপত্রে মণিপুরের নৃত্য সম্বন্ধে কিছু না বলিয়া অন্যান্য কৃষ্টির কথা তোলাই যায় না। মণিপুরী মেয়েদের চিত্ত নৃত্যরসে যেন উচ্ছল হইয়া থাকিতে থাকে রাসলীলা উৎসবের সময়। মিতাইগণ যে নাচ নাচেন তাহা যেমন মধুর তেমনি মৌলিক ও লীলায়িত ছন্দ পূর্ণ। ভারতের উচ্চ শ্রেণীর নৃত্যগণের মধ্যে হয়ত খুব higher না হইতে পারে কথাকলি বা মুদ্রাসংযুক্ত নৃত্যগুলি যেমন, কিন্তু উহাদের-নাচ দেখিয়া আমার আনন্দ হইয়া থাকে এই জন্য যে পাশ্চাত্য কোন প্রভাব নৃত্যের বা সঙ্গীতের কোন মৌলিকত্ব নষ্ট করে নাই। আর একটা লক্ষণীয় বস্তু দেখিয়াছি নবদ্বীপের মত মণিপুরের নৃত্যের পোষাকী বেশ-ভূষা এমন রমনীয় পরিচ্ছদে মিতাই নারীগণ রাধাকৃষ্ণের নাচ করেন যে ভারতের খুব অল্প স্থানেই তাহার জুড়ি পাওয়া যায়। এই নাচের পোষাক আমরা সংগ্রহ করি, দাম পড়িয়াছিল বোধ হয় ২৫।৩০ টাকা এখন এই পোষাক সকলেই আনাইতেছেন কলিকাতার ষ্টেজে বা পর্দ্দায় প্রায়ই বাঙ্গালী নর্ত্তকীদিগকে এই পোষাকে মণিপুরী

নাচ নাচিতে দেখি। ইহার সঙ্গে একটী ছবি দেওয়া গেল, এই নৃত্যের পোষাক পরিহিতা একটী মণিপুরী মহিলার।

মিতাই ললনাগণ নৃত্যে চিরদিন অভ্যস্ত। নৃত্য ও সঙ্গীত সকল উৎসবেই হয় দেখি। এ বিষয়ে স্থানীয় সমাজ বরাবর উৎসাহ দেন। সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম নৃত্য হয় রাসযাত্রার সময় রাজবাড়ীর শ্রীগোবিন্দজীর নাট-মন্দিরে। প্রায় সারারাত ধরিয়া এবং সারামাস নৃত্য চলে। এই রাস এক অপূর্ব্ব দৃশ্য. মিতাইগণ শ্রীকৃষ্ণের রাস-লীলা অভিনয় করেন। ক্ষুদ্র পশু-আবৃত্তির মাঝে গীত, নৃত্য এবং সঙ্গীত থাকে। বৃত্তাকারে একদল সুন্দরী নৃত্য-রসপটু বালিকা প্রাঙ্গণ ঘেরিয়া দাঁড়ায়; তাহার মাঝে দু'টী মেয়েকে রাধাকৃষ্ণ সাজাইয়া দাঁড় করান হয়। কখনও কখনও কৃষ্ণের দুই পাশে দু'টী রাধিকাও দেখা যায়। ইহারা সকলে মিলিয়া রাসলীলা-পালাগানের অভিনয় করে। বৃত্তের বাহিরে সঙ্গীতজ্ঞ সঙ্গতকারী পুরুষদল এক পাশে আসন লইয়া বসিয়া থাকেন। তাঁহারা খোল-করতাল সহকারে রাসলীলা কীর্ত্তন করেন, আর বালিকারা হাতে হাত দিয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া কখনও কখনও পর্সী বা বংগীপ কবোজ নাচের ধরণে হাঁটু নীচু করিয়া অতি মৃদু-মধুর নৃত্যকলা সহকারে রাসোৎসব অভিনয় করে। [৺বিপিন] পাল বলিয়াছিলেন, দেশে-বিদেশে অনেক নাচ দেখেছি, কিন্তু এই মণিপুরী নাচের মতন এমন সুন্দর, এমন নির্ম্মল, এমন [নিপুণ] নৃত্যকলা কোথাও দেখিনি। আমরাও এই কথার সমর্থন করি।



নাচের বেশে মণিপুরী মহিলা

মণিপুরের কালচারের মধ্যে পুরুষদের পোলো খেলা

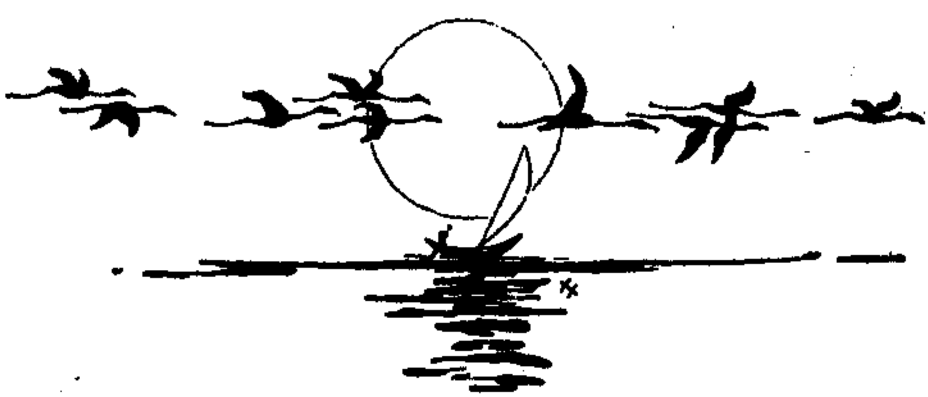
উল্লেখযোগ্য। মিতাই পুরুষেরা বেশ ভাল ঘোড়া চড়িতে পারে। ওখানে ছোট ছোট ভারী সুন্দর পনি (Pony) পাওয়া যায়। সেই অশ্বে চড়িয়া মণিপুরীয়গণ অতি দ্রুত-গতিতে পোলো ক্রীড়া করিয়া থাকে। ইহা তাহাদের জাতীয় ক্রীড়া। যদিও ৩।৪ শত বৎসর পূর্ব্বে মাত্র এই খেলা মণিপুর



রাসমঞ্চ—তমালতলী

রাজ্যে প্রবেশ করিয়াছে। কেহ কেহ বলেন, উত্তর-পূর্ব্ব দিকে তিব্বত-চীন হইতে, কেহ কেহ বলেন উত্তর পশ্চিমে কাশ্মীর, গিলগিট ও চিত্রাল হইতে এই খেলা মণিপুরে প্রবেশ করিয়াছে। যাহাই হউক, ইঁহারা খুব ভাল পোলো খেলেন, আমি ইম্ফালের মাঠে দেখিয়াছি, আর পোলো সম্বন্ধে যে সমস্ত authority আছে তাঁহারাও তাই বলেন। শুনা যায়, ১৮৬৩ সালে মহারাজা চন্দ্রকীর্ত্তি কলিকাতায় বড়লাটের সঙ্গে সাক্ষাতে আসেন, সেই সময় তাঁহার সৈন্য-সামন্তরা গড়ের মাঠে পোলো খেলেন এবং গোরা সৈনিকরা তাহা তাহাদের কাছেই শিক্ষালাভ করিয়া বিলাতে লইয়া যায়।

গারো-হিল্‌স্ জেলার মত নয় বটে, তবে মণিপুরেও যথেষ্ট তুলা উৎপন্ন হয়। আমরা ২।৪ পয়সা করে সের দরে বিক্রীত হইতে দেখিয়াছিলাম, তুলার দ্রব্য অতি সস্তা বলিয়া কিনিয়া আনি। মিতাই মেয়েদের দেখিয়াছি, ইম্ফাল সহরে, কি গ্রামে গ্রামে, একপ্রকার কাঠের যন্ত্রে তুলা পিজিয়া চরকাতে সূতা কাটিয়া ঘরের তাঁতে সুন্দর সুন্দর কাপড় বুনিয়া সেই বস্ত্রকে আবার পাতার রঙে ডুবাইয়া রঙীন করে। সেই কাপড় ‘মায়ের দেওয়া মোটা কাপড়’ হিসাবে মণিপুরের মেয়েরা বুকের উপর আঁটিয়া হাঁটু পর্য্যন্ত আবক্ষ আবৃত রাখে স্কার্টের মত। কখনও কখনও একখানি চাদর লইয়া গায়ে ঢাকা দিয়া থাকে।



রাজা ও রাণী

—অধ্যাপক, শ্রীকৃষ্ণবিহারী গুপ্ত এম-এ

অনেক দিন আগে রবীন্দ্রনাথ রহস্যচ্ছলে লিখিয়াছিলেন, 'আমায় হয়ত করতে হবে আমার লেখার সমালোচনা তবে সে এ জন্মে নয়, পরজন্মে।' কিন্তু তাঁহাকে পরজন্ম পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে হইল না। এ জন্মেই তিনি তাঁহার কোন কোন কাব্য নাটক সম্বন্ধে 'দ্বিতীয় এক ভস্মলোচন' হইয়া উঠিয়াছেন। আর আমার ন্যায় রবি-ভক্তগণ তাহার প্রতিবাদ না করিয়া থাকিতে পারিতেছে না। তাঁহার প্রথম যৌবনে লেখা 'রাজা ও রাণী' একখানি সর্ব্বজন পরিচিত সুন্দর নাটক। এখানি তিনি সমালোচনার আগুনে ভস্ম করিয়া ফেলিয়াছেন এবং আবার তাকে পুনর্জ্জীবিত করিয়া 'তপতী' নামে নব কলেবর দান করিয়াছেন। ইহার কৈফিয়ৎস্বরূপ তিনি 'তপতী'র ভূমিকায় লিখেছেন যে, 'রাজা ও রাণী'র যেটি মূল কথা—রাজা ও রাণীর মধ্যে মিলনের অন্তরায় কোথায় এবং কিরূপে সেই অন্তরায় দৃঢ় হইয়া 'সুমিত্রার সত্য উপলব্ধি বিক্রমের পক্ষে সত্য হ'ল', তাহা তাঁহার রচনার দোষে পরিস্ফুট হয় নাই। ইহার জন্য তিনি দায়ী করিয়াছেন, কুমার ও ইলার প্রেম-কাহিনীমূলক under plot-টিকে। ইহার ফলে তাঁহার মতে 'নাটকের শেষ অংশে কুমার যে অসঙ্গত প্রাধান্য লাভ করেচে তাতে নাট্যের বিষয়টি হয়েচে ভারগ্রস্ত ও দ্বিধা বিভক্ত। এই নাটকের অন্তিমে কুমারের মৃত্যু দ্বারা চমৎকার উৎপাদনের চেষ্টা প্রকাশ পেয়েচে—এই মৃত্যু আখ্যান-ধারার অনিবার্য্য পরিণাম নয়।

এখন, 'রাজা ও রাণী' নাটকখানি একদিন উপভোগ করিয়াছিলাম ইহার অপূর্ব্ব কাব্য সৌন্দর্য্যের জন্য; আর যে উদগ্র প্রেম কখনও বা কর্ত্তব্যকে অবহেলা করিয়া আপনাকে ব্যর্থ করে, অবার কখনও বা কর্ত্তব্যের আহ্বানে ত্যাগের মহিমায় উজ্জ্বল হইয়া উঠে তাহাই বিক্রম ও কুমারের স্বতন্ত্র প্রেম-কাহিনীতে পাশাপাশি ব্যক্ত হইয়াছে, এইরূপ একটা ভাব নাটকখানির মধ্যে অন্তর্নিহিত আছে বলিয়া মনে করিয়াছিলাম। এইরূপ ব্যাখ্যায় কুমার ও ইলার প্রেমলীলা অনাবশ্যক নয়, পরন্তু একটা contrast বা বৈষম্যমূলক আলোক ও ছায়াপাতের দ্বারা ইহা চিত্রটিকে সুপরিস্ফুট করিয়া তুলিয়াছে বলিলে অসঙ্গত হয় না।

রবীন্দ্রনাথ নিজেও যে কয়েক বৎসর পূর্ব্বে পর্য্যন্ত এই নাটকখানিকে এত বেশী দোষদুষ্ট বলিয়া মনে করিতেন না, তাহার প্রমাণ পাই আমরা তাঁহার কৃত ইহার ইংরাজী অনুবাদে। ম্যাকমিলান প্রকাশিত The King and the Queen (ইহা Sacrifice and other plays নামক গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত) নাটকখানিতে যে শুধু নামটিই অবিকৃত রাখা হইয়াছে তাহা নয়, ইহার আখ্যান ভাগেরও কোন পরিবর্ত্তন লক্ষিত হয় না। কবি কেবল নাটকখানিকে ছাটিয়া খুব ছোট করিয়া দিয়াছেন। বাঙ্গালায় যাহা ছিল পঞ্চাঙ্ক নাটক ইংরাজীতে তাহাকে সংক্ষিপ্ত করিয়া দুইটিমাত্র অঙ্কে শেষ করা হইয়াছে, যাহা ছিল বিক্ষিপ্ত, তাহাকে সংহত আকার দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু বস্তু-বিন্যাস বাঙ্গলা ও ইংরাজীতে কোন পার্থক্য নাই। কুমারের মৃত্যু এই আখ্যানধারার অনিবার্য্য পরিণাম কি না সে সম্বন্ধে কবির মনে উত্তর কালে সংশয় উপস্থিত হইলেও ইংরাজীর অনুবাদের সময় এরূপ সংশয় তাঁহার মনে স্থান পায় নাই। কারণ, ইংরাজী অনুবাদেও দেখি সুমিত্রা কর্ত্তৃক কুমারের ছিন্নমুণ্ড বিক্রমদেবকে উপহার দানের সঙ্গে সঙ্গে সুমিত্রার মৃত্যুতে নাটকের পরিসমাপ্তি।

১৯১৭ সালে এই ইংরাজী অনুবাদ প্রকাশিত হয়। কবির তখন পরিণত বয়স। তিনি নিজেই যখন এতদিন পরে তাঁহার প্রথম যৌবনের এই রচনাটি জগতের সম্মুখে ধরিয়া দিতে পারিয়াছেন, তখন তিনি নিশ্চয়ই সে সময়ে ইহাতে বিশেষ আপত্তিকর কিছুই দেখেন নাই।

একথা সত্য হইতে পারে যে, 'রাজা ও রাণীর' মধ্যে নাটকীয় গুণ অপেক্ষা কাব্যসৌন্দর্য্যই অধিক; কিন্তু তাহা হইলেও সুসাহিত্য হিসাবে ইহা যে একখানি অপকৃষ্ট রচনা তাহা আমরা স্বীকার করিব না। যৌবনের উচ্ছ্বসিত প্রেমাবেগ দুইটি উদ্দাম ধারায় ইহার মধ্যে প্রবাহিত হইয়াছে। শেষ বয়সে রচিত 'তপতী'তে এই প্রেম সন্ধ্যার গাম্ভীর্য্যে মণ্ডিত। কবিচিত্তের বার্দ্ধক্য নাই, একথা সম্পূর্ণ সত্য নয়; কারণ, সৌন্দর্য্যোপলব্ধি সম্বন্ধে কবির মন চির-

নবীন হইলেও বয়সের সঙ্গে যে গাম্ভীর্য্য ও চিন্তাশীলতা আসে, তাহা সকল কবির শেষ বয়সের সৃষ্টির মধ্যে একটা স্বাতন্ত্র্য আনিয়া দেয়। 'তপতী' নাটকখানিতেও আমরা সেই স্বাতন্ত্র্য লক্ষ্য করিয়া থাকি। হাস্যরস ইহাতে সম্পূর্ণ বর্জ্জিত এবং একটা নূতন ভাব অনুপ্রবিষ্ট দেখিতে পাই। ইলাকে এই নাটক হইতে সম্পূর্ণ সরাইয়া দেওয়া হইয়াছে। কুমারকে মারিতে হইল না। সুমিত্রা স্বামী ত্যাগ করিয়া দেব মন্দিরের উপাসিকা হইলেন। তখন তার নাম হইল তপতী। (এই নূতন নামের অন্তরালেও পৌরাণিক আখ্যানমূলক একটা ভাব সূচিত হইতেছে।) বিক্রম দেব যখন সেইখানেও পত্নীর অনুসরণ করিলেন, তখন তপতী চিতায় আরোহণ করিয়া উভয়ের মধ্যে প্রেমের বিরোধ মিটাইয়া দিলেন।

নরেশ ও বিপাশাকে লইয়া যে একটা নূতন প্রেম-কাহিনীর সৃষ্টি করা হইয়াছে, তাহাও বেশ একটু অসাধারণ। নর-নারীর প্রেমলীলার চিরন্তন ধারাকে উপেক্ষা করিয়া ইহারাও একটা ভাব বা আদর্শের পিছনে ছুটিয়াছে, এবং অবশেষে তপতীর চিতার আগুন হইতে এই প্রেমিক যুগল জীবনযাত্রার পাথেয় সংগ্রহ করিয়াছে।

পরিশেষে আমাদের বক্তব্য এই যে, জগতের কোন শ্রেষ্ঠ কবিরই অপরিণত বয়সের রচনা সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হয় নাই। কিন্তু তাহা হইলেও তাহাতে স্ফুটনোন্মুখ কবিপ্রতিভার যে সুনিশ্চিত নিদর্শন পাওয়া যায়, তাহারই জন্য এইসব লেখার একটা বিশেষ মূল্য আছে। 'রাজা ও রাণীর' মূল্য তাহার চেয়েও বেশী। ইহা তরুণ রবীন্দ্রনাথের অসীম সৌন্দর্য্যানুভূতির এক প্রকৃষ্ট উদাহরণ ; ভাবে, ভাষায়, ছন্দে, মূর্চ্ছনায় ইহা একটি অপূর্ব্ব গীতিকাব্য।

ধরম্ ও ধর্ম্ম ঃ—

সাধারণ পাঠকগণ যদি তাঁহাদের সাধারণ বুদ্ধির (common sense) দ্বারা ধরম্ ও ধর্ম্ম বলিতে কি বুঝায়, তৎসম্বন্ধে ধারণা করিবার চেষ্টা করেন, তাহা হইলে, দেখিতে পাইবেন যে, মানুষ তাহার শরীরবিধানের কার্য্য, স্ব স্ব খেয়াল এবং সংস্কার বশতঃ যাহা যাহা করিয়া থাকে (what a man does), তাহাই তাহার ধরম্। আর কি করিলে মানুষের সর্ব্ববিধ দুঃখ সম্পূর্ণ ভাবে দূর হইয়া অবিমিশ্র সুখ সম্ভোগ করা সম্ভব হইতে পারে, তাহা বিচারবুদ্ধির দ্বারা পরিজ্ঞাত হইবার উদ্দেশ্যে অথবা উহা পরিজ্ঞাত হইয়া, অর্থাৎ কর্ত্তব্য কি তাহার সন্ধান করিবার জন্য (to find out what a man should do), অথবা তাহার সন্ধান পাইবার পর কর্ত্তব্যজ্ঞান-প্রণোদিত হইয়া মানুষ যাহা করে, তাহার নাম ধর্ম্ম।

ধর্ম্মের এই সংজ্ঞাটি আরও তলাইয়া দেখিলে দেখা যাইবে যে, ধর্ম্মজ্ঞান লাভ করিতে পারিলে মানুষের পক্ষে কোন্ কার্য্যটি কর্ত্তব্য, আর কোন কার্য্যটি অ-কর্ত্তব্য, কোন্টি ভ্রমহীন (right) , আর কোন্টি ভ্রমপূর্ণ (wrong), তাহা সম্পূর্ণ সঠিকভাবে পরিজ্ঞাত হওয়া সম্ভব হয়।

আমাদের মনে হয়, ধর্ম্মজ্ঞান লাভ করিতে পারিলে, এতাদৃশ প্রয়োজনীয় তথ্যগুলি জানা সম্ভবযোগ্য হয় বলিয়া একদিন সারা জগতের সকল মানুষ ধর্ম্মজ্ঞান লাভ করিবার জন্য উদ্গ্রীব হইত। কিন্তু এখন আর কেহ ধর্ম্ম অথবা ধর্ম্মজ্ঞান বলিতে কি বুঝায়, তাহা যথাযথ ভাবে বুঝিতে পারেন না এবং উহা বুঝিতে পারেন না বলিয়াই ধর্ম্ম ও ধর্ম্মজ্ঞান সম্বন্ধে অধিকাংশ মানুষ প্রায়শঃ উদাসীন থাকিয়া যান।

পাড়াগাঁ

—বন্দেআলী মিয়া

ঝুনু আর টুটু দুইভাই ওরা—শহরে ওদের বাড়ী
পাড়াগাঁ কখনো দেখে নাই তারা যায় নাই গৃহ ছাড়ি,
ওদের বন্ধু হারু থাকে দূর্ রূপনাথপুর গাঁয়
হারু লিখিয়াছে পূজার ছুটিতে ওরা যেন সেথা যায়।
দুইজনে তাই আজ বিহানেই চলে বন্ধুর দেশে
ভাটি সোঁতে ওরা নৌকা ছাড়িল—চলে তায় ভেসে ভেসে।
মাঝি মাল্লারা কেহ নাই সাথে—শুধু ওরা দুইজনে
কেহ দাঁড় বয়—কেহ হাল ধ'রে বসে রয় একমনে।
পাড়ির নীচেতে নামিয়া গিয়াছে বরষার ঘোলা জল
ছোটো ঢেউগুলা কূলে কূলে পড়ি করিতেছে কোলাহল।
পাশদিয়ে তার ঘন কাশবন বহুদূরে গেছে চলি'
পূবালী বাতাসে সাদা ফুল তার উঠিতেছে চঞ্চলি।
মনে হয় যেন রাতের জোস্না জমা হয়ে হোথা আছে
পদ্মার জলে মুখ দেখে আর হাতে তালি দিয়ে নাচে।
পাশে মাঠভরা পাকা ধানক্ষেতে—কোথাও বা কাঁচা পাট
তার কিছুদূর আগাইয়া গেলে বাঁ' পাশে চানের ঘাট।
বৌ-ঝিরা কেহ মাজিছে কলস—কেহ ডুব দেয় জলে
ছোট ছেলেপুলে 'টগে' 'টগে' খেলি দূরে সাঁতারিয়া চলে।
বাড়ীর গৃহিনী ক্ষারের কাপড় এনেছে ধামায় নিয়া
কাঠে আছাড়িয়া শুকাইতে দেয় জল তার নিঙারিয়া—
সুখের দুখের কথা কয় তারা—কাজ করে কথা বলে
চান শেষ করি কলসী ভরিয়া ঘরপানে ফিরে চলে।
ঘাট ছাড়াইয়া রশি দুই দূরে গ্রামের শ্মশান ঘাট
পড়ে আছে সেথা মাটির কলসী—আধপোড়া বাঁশ-কাঠ।
পিছনে তাহার পাকুড় গাছটি দৈত্যের মতো রয়
চেয়ে সেইদিকে দিনের বেলাও মনে জাগে বড় ভয়।

নৌকা চলিছে—ঝুনু দাঁড় টানে—টুটু রয় হালধরি,
মাথার ওপরে ইল্সে গুড়িসে পড়িতেছে ঝরি ঝরি।
শানিকদহের চরের কিনারে জেলেরা পেতেছে জাল
সেই ফাঁদে পড়ি লেজ আছাড়িয়া মাছগুলা দেয় ফাল্।
গাঙ্চিলগুলা এইখানে খালি উড়িতেছে দলে দলে
ছায়া এসে লাগে—পর্ খসে পড়ে পদ্মার ঘোলাজলে

চরের ওপরে নানান্ পাখীর বসিয়াছে মেলা যেন
রঙ-বেরঙের এত পাখী ওরা দেখে নাই কভু হেন।
বাঁকের এধারে জল খুব কম—হয় সবে পারাপার
রাখাল ছেলেরা মোষ চড়াইতে আসে হোথা বারবার।
এপারেতে চর ওপারেতে মাঠ—চারিদিকে ধূ-ধূ করে
রাখালের বাঁশী ভেসে ভেসে আসে—সুরে যেন মধু ঝরে।
মেঘের আঁচল সরাইয়া রোদ ক্ষণে ক্ষণে বাহিরায়
মাথাপুড়ে ওঠে—বেলা বেড়ে চলে—ক্ষুধাও যেন গো পায়।
সুলু আর টুটু বলাবলি করে, সঙ্গে খাবার নাই
এত শীগ্‌গির ক্ষিধে পাবে হায় আগে কে জানিত তাই।
ওরা ভাবে মনে দোকান হইতে কিনেলবে চিঁড়ে মুড়ি
পাড়ির কিনারে নৌকা বাঁধিল ছিলো অশথের গুড়ি।
তারপরে সেই গ্রামের মাঝারে চলে তারা দুইজনে
কোথায় দোকান তার খোঁজে তারা চলে আপনার মনে।
পথের ধারেতে দেখা যায় বাড়ী তাহার মালিকে ডাকি
শুধাইল সুলু: খাবার মিলিবে দোকান কি আছে নাকি?
কথা শুনি তার গৃহস্বামী কয়: মন যদি তব চায়—
গরীবের ঘরে তৈরী অন্ন গ্রহণ করগো তায়।
এতেক বলিয়া সমাদর করি দু'জনারে বসাইয়া
ভাত আর জল সুমুখে আনিয়া বায়ুকরে পাখাদিয়া।

সুলু আর টুটু খেতে বসি ভাবে, ইহারা গ্রামের লোক
শহুরে লোকের মতে গো ইহারা যত অসভ্য হোক—
মুখের অন্ন অপরের পাতে ধরে দিতে পারে যারা
দুঃখী গরীব তবু নররূপে দেবতা যেন গো তারা
ইহারা সরল পল্লীর চাষী—ইহাদের আছে প্রাণ
পাশাপাশি সব করিতেছে বাস হিন্দু মুসলমান।
ধর্ম্মের লাগি মানুষে মানুষে বিবাদ হেথায় নাই
একের দুঃখে অপরে কাঁদে গো যেন এরা ভাই-ভাই।

খেয়ে দেয়ে ওরা খুশী হয়ে খুব ফিরে যায় নৌকায়
দীঘির মাঝেতে ফুটেছে সাপলা তুলে নিলো কিছু তায়,
ছায়া ঢাকা আর পাখী ডাকা পথ—সেই পথে তারা চলে
পাড়াগাঁর এই মধুর দিনের কথা দুইজনে বলে।

শশাঙ্কের বংশধর

—শ্রীসরোজকুমার রায়চৌধুরী

এম-এ পাশ করে সুশোভন প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণায় আত্মনিয়োগ করলে। এ বিষয়ে তার আন্তরিক আগ্রহ আছে এবং সেই আগ্রহকে পরিপোষণ করবার জন্যে পিছনে বাপের অর্থও আছে।

সুশোভন ছেলে ভাল। ভাল ক'রেই এম-এ পাশ করেছে। সুপারিশের জোরও ছিল। সুতরাং ইচ্ছা করলেই এ বাজারে একটা লোভনীয় চাকুরী সংগ্রহ করা তার পক্ষে কঠিন ছিল না। কিন্তু সে দিক দিয়েও সে গেল না। তার সহপাঠীদের কেউ হাকিমী নিয়ে, মুন্সেফী নিয়ে, কেউ বা প্রোফেসারী নিয়ে চলে গেল। কিন্তু সে পড়ে রইল প্রত্নতত্ত্ব নিয়ে। হিতৈষীর দল তার এই অর্থহীন পন্থাবলম্বনে ক্ষুণ্ণই হ'লেন। অমন ভাল ক'রে পাশ ক'রে যদি দু'টাকা সে রোজগারই না করতে পারলে, তবে আর লেখাপড়া শেখার সার্থকতা কোথায়?

বন্ধুরা বললে, বেশ করেছ ভাই! দু'মুঠো অন্নের জন্যে কত জায়গার যে জল খেয়ে বেড়াতে হবে তাই ভাবছি। তুমি বেশ ক'রেছ!

শুধু তার বাবাই ভাল-মন্দ কোন কথা বললেন না। তার প্রয়োজনও ছিল না। তিনি জানেন, পিতৃপুরুষের সঞ্চিত অর্থের সঙ্গে যে পরিমাণ অর্থ যোগ ক'রে তিনি রেখে যাবেন, তারপরে ওর আর কিছু না করলেও চলে।

অতএব নিশ্চিন্ত মনে সুশোভন গবেষণায় মত্ত হ'ল। সে যে প্রথমেই তার গবেষণার বিষয়বস্তু সুনির্দ্দিষ্ট করতে পারলে, তা নয়। কিন্তু এই পর্য্যন্ত স্থির করলে যে, বাঙলার প্রাচীন রাজবংশের লুপ্ত ইতিহাস তাকে পুনরুদ্ধার করতে হবে। বাঙলার যে একটা সুসজ্জিত প্রামাণ্য ইতিহাস নেই, এইটে তাকে ব্যথিত করে। সেই চেষ্টাকেই সে দেশসেবার অঙ্গরূপে জীবনের ব্রত ক'রে নিলে।

তার অধ্যাপকেরা এ কথা শুনে যথেষ্ট আনন্দ প্রকাশ করলেন এবং তার এই মহৎ ব্রতে তাকে যথাসাধ্য সাহায্য করবার আশ্বাসও দিলেন।

কিন্তু বাঙলার ইতিহাস কোথায় পাওয়া যাবে? পাওয়া যাবে প্রাচীন পুঁথি-পত্রে, অসংখ্য মন্দির-গাত্রে, অফুরন্ত জনশ্রুতি, প্রস্তরফলক ও তাম্রশাসনে, আর পাওয়া যাবে মাটির নীচে। সুশোভন সেই দুস্তর কাজে পুথির সমুদ্রে ডুব দিলে। যেখানেই কোন নতুন মন্দিরের কথা শোনে সেইখানে ছুটে যায়। দেশে-দেশে জনশ্রুতি, প্রস্তরফলক ও তাম্রশাসন কুড়িয়ে বেড়ায়। মাটির নীচে কোথাও কিছু পাওয়া যাবে শুনলেই খন্তা-কোদাল নিয়ে সেখানে উপস্থিত হয়।

এমনি ক'রে সে বাঙলার ইতিহাস যেখানে যা পায় টুকরো-টুকরো ক'রে সংগ্রহ করতে লাগল। সেই টুকরো-টুকরো বিক্ষিপ্ত কাজের মধ্যে সান্ত্বনা আছে কিন্তু শৃঙ্খলা নেই।

এমনি করে ছড়িয়ে-ছড়িয়ে টুকরো-টুকরো করে সুশোভনের কাজ অগ্রসর হচ্ছিল। এমন সময় খবর পেল রাজা শশাঙ্কের রাজধানী আবিষ্কৃত হয়েছে। বহরমপুর থেকে ৬ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে রাঙামাটি নামে একটি প্রাচীন স্থানের ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গেছে। রাঙামাটির আর একটি নাম কানসোনা। কানসোনার পক্ষে শশাঙ্কের রাজধানী কর্ণসুবর্ণের অপভ্রংশ হওয়া সম্পূর্ণ স্বাভাবিক।

সুশোভনের কল্পনা অমনি আকাশে পাখা মেলে উড়ে চ'লল। চার মাইল বিস্তৃত সমৃদ্ধ রাজধানী কর্ণসুবর্ণ। তার জলবায়ু স্বাস্থ্যকর। সর্ব্বত্র আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য বিদ্যমান। নিত্য সন্ধ্যায় তার অসংখ্য মন্দির থেকে শঙ্খ-ঘণ্টাধ্বনি উঠে আকাশ মুখরিত করে। বৌদ্ধ বিহারে আসে দেশ-বিদেশ থেকে কত জ্ঞানী ও গুণী, কত ছাত্র। গম্ভীর মন্ত্রে তাদের কণ্ঠে ধ্বনিত হয়, বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি। স্ফীতকায়া ভাগীরথীর কূল ভিড় করে থাকে বড় বড় বাণিজ্য পোত। ভগবান তথাগত স্বয়ং আসেন ধর্ম্ম প্রচারের জন্যে।

তার চোখের সামনে জাগে একটা গৌরবময় দূর অতীত কাল, তার আচার-ব্যবহার, বেশ-ভূষা। জাগে একটা

দীর্ঘায়ত তেজোদৃপ্ত উন্নত জাতি, যার জীবনযাত্রায় জটিলতা নেই ঐশ্বর্য্যে কোলাহল নেই, এবং আনন্দে উন্মত্ততা নেই।

পুঁথির পথে তার কল্পনা এগিয়ে চলে দূরতর অতীত কালে, এই কর্ণসুবর্ণ যখন দাতা কর্ণের রাজধানী ছিল তখন কুমার বৃষকেতুর অন্নপ্রাশন উপলক্ষে স্বয়ং লঙ্কাধিপতি বিভীষণ এসে নবকুমারের কল্যাণ কামনায় স্বর্ণবৃষ্টি করে গিয়েছিলেন। কে জানে, এখানকার মাটির রং সেই জন্মেই রাঙা কি না।

এর পরে সুশোভনের পক্ষে প্রলোভন সম্বরণ করা অসম্ভব হয়ে উঠল। জায়গাটির সম্বন্ধে আবশ্যকীয় সংবাদ সংগ্রহ করেই সে রওনা হয়ে পড়ল।

উন্মুক্ত প্রান্তরের উপর দিয়ে যখন সুশোভনের ট্রেণ ছুটে চলেছে তখনও তার কল্পনায় সেই ষষ্ঠ-সপ্তম শতকের কর্ণ-সুবর্ণ ই ভাসছে। তার মনে হচ্ছে, ট্রেণ থেকে নেমেই সে বুঝি একটা আশ্চর্য্য যাদুমন্ত্রবলে দেড় হাজার বৎসর আগেকার সেই প্রাচীন কালের একেবারে মর্ম্মস্থলে গিয়ে পৌঁছিবে। গিয়ে দেখবে, সেই সুবিখ্যাত 'রক্তমৃত্তি' বিহার, যেখানে দিগ্‌দেশ থেকে কত ভিক্ষু, কত শ্রমন এসে সমবেত হত, যার পাশেই দাঁড়িয়ে আছে বিনম্র গৌরবে অশোকস্তূপ। গিয়ে দেখবে কত সঙ্ঘারাম, কত চৈত্য, কত মন্দির। আর দেখবে সেই সমস্ত নিয়ে স্ফটিক প্রাকারের দ্বারা বর্ত্তমান কাল থেকে বিচ্ছিন্ন একটা বলিষ্ঠ, সহৃদয় জাতি সেই সুপ্রাচীন গৌরবের মধ্যে অবরুদ্ধ হয়ে আছে।

কে জানে কি ভাষায় তারা কথা বলবে।

কাটোয়া জংশন পার হয়ে গেল। সালার...মালিহাটী হল্‌ট...। সন্ধ্যার আবছায়া ধীরে ধীরে ঘন হয়ে আসে। ষ্টেশনে-ষ্টেশনে সেই অন্ধকারে ঘোরা ফেরা করে কতকগুলি অস্পষ্ট মূর্ত্তি। কারও হাতে আলো আছে কারও নেই। কল্পনার স্বপ্ন-ঘোরে তার মনে হয়, সে বুঝি ষষ্ঠ শতকের কাছাকাছি এসে পৌঁছে গেছে। ব্যস্তভাবে ইতস্ততঃ ভ্রাম্যমান ষ্টেশনের লোকগুলির বিশৃঙ্খল কলরব সে কান পেতে শোনবার চেষ্টা করে। তার কেমন মনে হয়, এদের কথা সে যেন বুঝতে পারছে না। এ যেন অন্য ভাষা, তার সম্পূর্ণ পরিচিত নয়।

কৃষ্ণা পঞ্চমী। সুশোভন যখন চিরোটি ষ্টেশনে নামল তখন অন্ধকার। একখানা গরুর গাড়ী করে গ্রামের মধ্যে গেল।

বাঙলা দেশে আতিথেয়তা আজও নষ্ট হয় নি। তার রাত্রিবাসের কোনো অসুবিধা হল না। কিন্তু গ্রামের লোকেরা যখন শুনলে, মহারাজা শশাঙ্কের রাজধানী দেখবার জন্যে কলকাতা থেকে একজন বাবু এসেছেন, তাদের আর বিস্ময়ের সীমা রইল না।

রাজা শশাঙ্কের রাজধানী! সে কোথায়?

তারা নানা জনে নানা রকম প্রশ্ন করে:

—রাজা শশাঙ্ক? এটা তো তাঁর জমিদারী নয়।

—রাজা শশাঙ্কের নাম শুনেছি বলে মনে হচ্ছে না তো! এখানে শুধু লালগোলা আর কাশিমবাজার আর···

—তুই তো সবই জানিস! তাঁরা তো মহারাজা। রাজা বলতে গেলে এক নসীপুরের···

হ্যাঁ, নসীপুরের। তাঁর নাম যদি শশাঙ্ক হয় তো অবিশ্যি···

—কিন্তু সেখানে ম'শায়ের কি দরকার জানতে পারি? চাকরী-বাকরি কিছু?

ষষ্ঠ শতাব্দীর রহস্যলোক থেকে সুশোভন একেবারে বিংশ শতাব্দীর পাঁকের মধ্যে পড়ল!

কে রাজা শশাঙ্ক! সুশোভন সমবেত গ্রামবাসীর মুখের দিকে ফ্যাল ফ্যাল ক'রে চায়, আর ভাবে কি ক'রে এদের বোঝাবে কে রাজা শশাঙ্ক!

অনেকক্ষণ পরে একজন গম্ভীরভাবে বললে, আমার মনে হয়, ম'শায়ের ভুল হয়েছে। সে আমাদের এ চিরোটি নয়।

খুবই সম্ভব! সুশোভনের মনে হ'ল, খুবই সম্ভব। সে আমাদের এ চিরোটি নয়, বোধ করি আমাদের এ বাঙলাও নয় যেখানে মহারাজা শশাঙ্ক একদা রাজত্ব ক'রে গেছেন।

সুশোভন হতাশ হয়ে গেল। তার এত আশা, এত পরিশ্রম, সবই শেষে বৃথা হ'ল!

অবশেষে একটি অতি বৃদ্ধ ভদ্রলোক জরাজীর্ণ

দেহে লাঠির উপর ভর দিয়ে টলতে টলতে এসে উপস্থিত হলেন।

সুশোভনকে নমস্কার করে বললেন, রাজা শশাঙ্কের কথা এরা কেউ জানে না। কিন্তু আমি জানি।

—আপনি জানেন!

সুশোভন সোজা হয়ে উঠে বসল। এই অজ্ঞতার অন্ধকারের মধ্যে বৃদ্ধকে তার একটি অতি কৃশ, কম্পিত আলোক রেখার মতো মনে হ'ল।

বৃদ্ধ ঘাড় নেড়ে বললে, জানি। এ অঞ্চলে শুধু আমিই জানি। আর কেউ জানে না।

সুশোভন অবাক হয়ে তার দিকে চেয়ে রইল। বাবলা গাছের আড়ালে তখন এক ফালি চাঁদ উঠেছে। তার পাণ্ডুর আলো কাছের ঝোপে-ঝাড়ে, বাবলা বনে, দূরে রাঙ্গা মাঠে এবং আরও দূরের তেলকর বিলের উপর এসে পড়েছে।

ভদ্রলোক বলতে লাগলেন:

—আসল যেটা রাঙ্গামাটি তার অধিকাংশই আজ গঙ্গা-গর্ভে। এখন বাকি আছে শুধু রাজবাড়ীর ডাঙ্গা, ঠাকুর বাড়ীর ডাঙ্গা, সন্ন্যাসী ডাঙ্গা আর রাক্ষসীর ডাঙ্গা। যেখানটা রাজবাড়ীর ডাঙ্গা সেইখানে রাজা শশাঙ্কের প্রাসাদ ছিল।

—তার চিহ্ন কিছু আছে?

—কিছুমাত্র না। শুধু একটা উঁচু ঢিবি। এরই দক্ষিণ পূর্ব কোণাকুণি হচ্ছে সন্ন্যাসী ডাঙ্গা। শুনেছি ওইখানে বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের একটা মঠ ছিল। এর মধ্যে সবচেয়ে উঁচু ডাঙ্গা হচ্ছে রাক্ষসী ডাঙ্গা। ইটে আর পাথরে পাহাড়ের মতো হয়ে আছে। বলে, ওখানে নাকি এক রাক্ষসী থাকত। ভগবান জানেন কি ব্যাপার।

বৃদ্ধ ভদ্রলোক দম নেবার জন্যে একটু থামলেন।

তারপর আবার বলতে লাগলেন:

আর শোনা যায়, ঠাকুরবাড়ীর ডাঙ্গায় নাকি একটা শিব-মন্দির ছিল। বৎসর কয়েক আগে ওর খানিকটা যখন মা-গঙ্গা গিলে নেন, তখন একটি সোনার লক্ষ্মীপ্রতিমা নাকি পাওয়া যায়।

আগ্রহে সুশোভন সোজা হয়ে বসল।

বললে, আছে সেটা?

হাতের তালু উল্টে বৃদ্ধ বললেন, ভগবান জানেন, আছে কি না। কিন্তু যে পেলে সে তো আর স্বীকার করলে না। থাকবার মধ্যে আছে কেবল অষ্টভূজা মহিষমর্দ্দিনী মূর্ত্তি। যমুনা পুষ্করিণী থেকে সেটা পাওয়া গিয়েছিল। সোনার তো নয়, পাথরের। তাই কেউ আর নেয়নি। রেশম-কুঠির বটগাছ তলায় রেখে দিয়েছে।

যাক, তাহ'লে সুশোভনের অভিযান একেবারে ব্যর্থ নাও হ'তে পারে। রাজবাড়ী ডাঙ্গা, রাক্ষসী ডাঙ্গা, ঠাকুর-বাড়ী ডাঙ্গা আছে,—কতকগুলি পুরাতন পুষ্করিণীও আছে। চেষ্টা করলে কিছু উপকরণ পাওয়া যেতেও পারে।

সুশোভন বৃদ্ধকে বললে, আপনাকে কষ্ট দিতে আমার সঙ্কোচ হয়। কিন্তু উপযুক্ত লোক যদি একজন দেন, তাহ'লে কাল সকালে জায়গাগুলো নিজের চোখে ঘুরে ঘুরে একবার দেখে আসতে পারি।

—নিশ্চয় নিশ্চয়। আপনি কত কষ্ট করে কত দূরে থেকে আসছেন। আর আমরা এইখানকার লোক, আপনাকে এই সামান্য সাহায্যটুকু করতে পারব না?

বৃদ্ধ পুনরপি বললেন, আমার কাছে কয়েকটা পুরানো মুদ্রা আছে। সেও আমি আপনাকে দেখাব। তা ছাড়া আরও একটা খবর দিতে পারি। এখান থেকে ক্রোশ আষ্টেক দূরে মহিমপুর বলে একটা গ্রাম আছে। সেখানে কয়েক ঘর লোক আছেন, যাঁদের রাজ-পুরোহিত বলে। প্রবাদ এই যে, তাঁরা নাকি রাজা শশাঙ্কের পুরোহিত ছিলেন। তাঁদের বাড়ীতে খোঁজ করলে হয়তো কিছু পেতে পারেন।

এ কথা শুনে সুশোভনের আনন্দের সীমা রইল না। সে পরের দিন সকালে এখানকার দ্রষ্টব্য দেখে দুপুর বেলাতেই একখানা গরুর গাড়ী ক'রে মহিমপুর যাত্রা করলে।

বৃদ্ধ ভদ্রলোক মিথ্যা বলেননি। কেবল রাজ-পুরোহিত নয়, রাজগুরু। এ অঞ্চলের সর্ব্বত্রই এঁরা রাজগুরু-ভট্টাচার্য্য বংশ বলে প্রসিদ্ধ।

অবস্থা অধিকাংশেরই অসচ্ছল। পরিবারটি বহু শাখায় শাখান্বিত। বড় বড় অট্টালিকা ধ্বংসোন্মুখ। কেউ বা তারই একটা অপেক্ষাকৃত শক্ত দেওয়ালে চালা তুলে, কেউ

যা পাশে মাটির ঘর তুলে বাস করছে। দারিদ্র্য ও অশিক্ষার সেই অন্ধকারে গুরু-গৌরবের চিহ্নমাত্র খুঁজে পাওয়া যায় না।

একটি লোক হাঁটুর উপর কাপড় তুলে হন হন করে তার গাড়ীর পাশ দিয়ে যাচ্ছিল। সুশোভন তাকে জিজ্ঞাসা করলে, রাজগুরু ভট্টাচার্য্যের বাড়ীটা কত দূর বলতে পারেন?

—ম'শায়ের কোত্থেকে আসা হচ্ছে?

—ক'লকাতা থেকে। আপাততঃ আসছি রাঙ্গামাটি থেকে?

—আমরাই রাজগুরু ভটচায। কি দরকার?

—সে অনেক কথা। চলুন আপনার বাড়ী গিয়েই বলব।

সুশোভন সেইখানেই গো-যান থেকে নেমে লোকটির সঙ্গে হাঁটতে হাঁটতে চলল।

—আপনারাই কি রাজা শশাঙ্কের গুরুবংশ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—এ সম্বন্ধে কোনো প্রমাণ আপনাদের হাতে আছে?

—থাকতে পারে। আগে আপনাদের কি দরকার শুনি।

সুশোভন তার দরকারের কথা বুঝিয়ে দিতেই লোকটি গম্ভীর হয়ে গেল।

সুশোভন বললে, কি বলছেন?

লোকটি বললে, সবই তো বুঝলাম। কিন্তু তাতে আমাদের স্বার্থটা কি বুঝিয়ে দিতে পারেন?

—স্বার্থ? রাজা শশাঙ্কের সম্বন্ধে লোকে আরও বেশী কথা জানতে পারবে, এই তো স্বার্থ।

ঘাড় নেড়ে লোকটি এবার পরিষ্কার ক'রে বললে, ও সব বুঝিনা মশাই। দু'পয়সা তার জন্যে পাব বলতে পারেন?

সুশোভন অবাক হয়ে গেল। লোকটি যে অশিক্ষিত তা সে প্রথম আলাপেই টের পেয়ে গেছে। কিন্তু যতখানি মূর্খ মনে করেছিল, ততখানি মূর্খ নয়। অর্থের সম্বন্ধে কান অত্যন্ত টনটনে।

ছেসে বললে, তাও পাবেন।

সঙ্গে সঙ্গে লোকটির উৎসাহ প্রবল হয়ে উঠল। সসম্ভ্রমে জিজ্ঞাসা করলে, তামাক ইচ্ছে করেন?

—তামাক আমি খাইনা।

লোকটি সেইখান থেকেই ডাকতে আরম্ভ করলে, বাবাঠাকুর! বাবাঠাকুর!

অনেক দূর থেকে মোটা ভাঙা গলায় উত্তর এল, কে?

—একবার শুনুন এই দিকে?

কিন্তু বাবাঠাকুর কথাটা শুনতে আসার পূর্ব্বে লোকটি নিজেই ছুটে ভিতরের দিকে গেল, বোধ করি টাকার ব্যাপারটা জানিয়ে দেওয়ার জন্যে।

একটু পরেই ভদ্রলোক এলেন।

বয়স হয়েছে। কিন্তু সে তুলনায় শরীর এখনও শক্ত আছে। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে লক্ষ্য করলে আভিজাত্যের অতি ক্ষীণ অবশেষ এখনও তাঁর প্রশস্ত ললাটে এবং চোখে খুঁজে পাওয়া যায়

বৃদ্ধ বললেন, তুমি রাজা শশাঙ্কের বৃত্তান্তের জন্য এসেছ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—আমরাই তাঁদের কুলগুরু ছিলাম। হয়তো অনেক কিছুই আমাদের কাছে ছিল। কিন্তু কালক্রমে বংশ বড় হয়ে গেল। কত শাখা স্থানান্তরে চলে গেল, কত শাখা লুপ্ত হয়ে গেল। প্রমাণ-পত্রও হাত বদল হতে-হতে কত লুপ্ত হয়ে গেছে। আমার প্রপিতামহ মাধবচন্দ্র শিরোমণি মহাশয় একটা কুলকারিকা করেছিলেন। পিতামহ নারায়ণচন্দ্র তর্কবাগীশের কাছ থেকে সেগুলি আমি পেয়েছিলাম এবং সযত্নে রেখেছি। আমি যখন আমার পিতার কাছে ন্যায় অধ্যয়ন করছিলাম, সেই সময় আমাদের প্রাচীন বাড়ীর ভিত খুঁড়তে খুঁড়তে একটা তাম্র শাসন পাওয়া যায়, সেটাও আছে। তবে সেই কুলকারিকাই তোমার বেশী কাজে লাগবে। কারণ, আমার প্রপিতামহের আমলেও রাজা শশাঙ্কের বংশধর বিদ্যমান ছিল। আমার বিশ্বাস, সে বংশ এখনও বেঁচে আছে।

—বলেন কি?

—আমার বিশ্বাস সেই রকম। তুমি বাবা, একটু খোঁজ ক'রে দেখতে পার। কথাটা কি জান, কুলকারিকায় পাওয়া যাচ্ছে, রাজা শশাঙ্ক নিহত হবার পর তাঁর একজন রাণী যশোমতী পলায়ন করেন। তিনি সে সময় সন্তানসম্ভবা ছিলেন। তিনি যে কোথায় গেছেন, একমাত্র রাজগুরু ছাড়া আর কেউ জানতেন না। যথাকালে তিনি একটি পুত্রসন্তান

প্রসব করে অগ্নিতে আত্মবিসর্জন করেন। সেই সন্তান গুরু গৃহেই লালিত হন। পরে তিনি বাহুবলে বীরভূম অঞ্চলে আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করেন। কুলকারিকায় যা পাওয়া যায়, সেই বংশের একটি ক্ষীণ স্রোত সিপাহী বিদ্রোহের সময় পর্য্যন্ত প্রবাহিত ছিল। ততদিন পর্য্যন্ত তাঁদের সঙ্গে আমাদের সম্পর্কও ছিল। তাই বংশের রমাই নামে একটি নাবালক শিশু তখনও পর্য্যন্ত জীবিত ছিল। তার পরের রেখা আর খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।

সুশোভন অনুমান করলে, পরবর্ত্তী রাজনৈতিক বিপর্য্যয়ের মুখেই বোধ করি তা হারিয়ে গেছে।

তবু ১৮৫৭ সাল খুব দূরবর্ত্তী অতীত কাল নয়। বীরভূমের সেই অখ্যাতনামা গ্রামটিও এই রেলপথের যুগে খুব দূরবর্ত্তী স্থান নয়। যে প্রাণশক্তি ষষ্ঠ শতক হইতে ঊনবিংশ শতকের মধ্যভাগ পর্য্যন্ত আপনাকে টেনে গিয়েছিল, বিগত শত বৎসরে তা নিঃশেষ হয়ে যাবে এমন মনে হয় না।

সুশোভন শশাঙ্কের বংশধরের সন্ধানে তখনই বীরভূমের সেই অখ্যাতনাম গ্রামের উদ্দেশে যাত্রা করলে।

অবশেষে রমাই-এর সন্ধান পাওয়া গেল।

কিন্তু তার বংশধর আর বীরভূমের সেই অখ্যাতনামা গ্রামে থাকে না। রমাই-এর পুত্র ইছাই শ্বশুরের সম্পত্তি পেয়ে বর্দ্ধমানের এক গ্রামে উঠে গেছে।

সুশোভন তার সম্বন্ধে এর বেশী আর কোনো সংবাদ সংগ্রহ করতে না পেরে শেষ পর্য্যন্ত বর্দ্ধমানের সেই গ্রামের উদ্দেশেই যাত্রা করা স্থির করলে। সেখানে ইছাই-এর সন্ধান পাওয়া কষ্টকর হ'ল না।

ইছাই আর জীবিত নেই।

তার পুত্র মহেশ ক্ষেত-খামার, জোত-জমি নিয়ে ব্যস্ত। যখন সুশোভন সেখানে পৌঁছিল, মহেশ তখন হুঁকো হাতে ক'রে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ধান বিক্রী তদারক করছে।

দুঃখ ক'রে ব'ললে, ধানের আর দর নেই ম'শায়। এক গোলা ধান বিক্রী করলে তিরিশটে টাকাও হয় না। কি করি বলুন? ভদ্রলোকের সংসারে পেট ছাড়াও আর পাঁচটা খরচ আছে তো? না কি বলেন?

বললে, বাড়ীশুদ্ধ লোক ম্যালেরিয়ায় ধুঁকছে। কে কার মুখে জল দেয় তার ঠিক নেই। জলের দরে মা-লক্ষ্মীকে বিলিয়ে দিতে হচ্ছে কি সাধে? রোগ যখন হয়েছে, তখন চিকিচ্ছে তো করতে হবে। না কি বলেন?

লোকটি বড় সরল।

সুশোভন কে, কোথা থেকে এসেছে, কি প্রয়োজন, এ কথা তার মনেই হচ্ছে না। পরমাত্মীয়ের ন্যায় এই অপরিচিত লোকটির কাছে সে নিজের দুঃখের কথাই গেয়ে চলেছে। দুঃখেরও শেষ নেই, কথারও শেষ নেই।

গৃহিণী বাতে ভুগছেন। বড় নাতিটার বুঝি বা কালা-জ্বরই হয়েছে। মাঠে বৃষ্টি নেই, গোলার ধানও ফুরিয়ে এল। বড় নাতনীটার গেল বার বিয়ে দিয়েছি। আর কারও না হোক তাদের তত্ত্ব তো করতে হবে। পুজোর আর ক'টা দিনই বা আছে? বলুন। তিন সনের খাজনা বাকী পড়েছে, কিছু দেনাও হয়েছে। এর ওপর এই চিন্তা! বুঝুন, কি আরামেই আছি!

ভদ্রলোক একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন।

ধান বিক্রী শেষ হ'ল। টাকা ক'টি বাজাতে বাজাতে বোধ করি মহেশের মন একটু ভালো হ'ল, দুশ্চিন্তা-স্রোতে ভাটা পড়ল,—তার সম্বিৎ ফিরে এল।

সুশোভনের দিকে চেয়ে অপ্রস্তুতভাবে বললে, তারপরে? ম'শাই কি জন্যে এসেছেন সেটা এখনও জিজ্ঞেসই করা হয়নি। বিলক্ষণ! বসুন, বসুন। তামাক ইচ্ছে করুন।

সুশোভন তামাকের প্রয়োজন নেই জানিয়ে বললে, আমি এসেছি শশাঙ্কের সম্বন্ধে অনুসন্ধান করতে।

—থানা থেকে আসছেন?

—না, না,······

বাধা দিয়ে মহেশ বললে, থাকগে, সে না হয় নাই বললেন। শশাঙ্ক আমার নিজের মাসতুতো ভাই। তবু সত্যি কথাই বলব। লোক সে ভালো নয় সত্যি, চরিত্র দোষও আছে। কিন্তু আপনি যে সন্ধানে এসেছেন সে-কাজ সে করেনি, এ আমি তামা-তুলসী হাতে নিয়ে বলতে পারি।

সুশোভন বললে, আমি সে শশাঙ্কের কথা বলছি না।

—তবে।

—রাজা শশাঙ্কের কথা।

—তিনি কে?

—তিনি আপনাদেরই পূর্ব্বপুরুষ। বাঙ্গলা দেশের একজন মস্ত বড় রাজা ছিলেন।

সন্দিগ্ধ ভাবে সুশোভনের আপাদমস্তক বার বার নিরীক্ষণ ক'রে মহেশ বললে, তা হবে। তা হ'তে পারে। কিন্তু আমি ঠিক বলতে পারব না। আমার ছেলে বলতে পারে হয় তো।

মহেশের ছেলে বিনোদ হাটখোলার একটা আড়তে খাতা লিখে। এ পরিবারে সেই সব চেয়ে বিদ্বান,—ম্যাট্রিকুলেশন ফেল। কিন্তু সে চাকরীও আর আছে কি না সন্দেহ। মাস তিনেক পূর্ব্বে পীড়িতা জননীকে দেখতে এসে নিজে এমন ম্যালেরিয়ায় পড়েছে যে, এখনও পর্য্যন্ত কলকাতায় ফিরতেই পারলে না।

ক'দিন জ্বর ভোগের পর বিনোদের জ্বরটা আজ ছেড়েছে। ইচ্ছা ছিল, মাছের ঝোল দিয়ে দুটি ভাত খায়। কিন্তু নিষেধ করায় তার মন বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের উপর চটে গেছে।

সুশোভনের প্রসঙ্গ শুনামাত্র সে একেবারে তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠল।

বললে, ইয়ার্কি করবার আর জায়গা পাননি। যাবার কাছে এসেছেন সেই কালো। আমার কাছে সুবিধা হবে না। পুলিসের স্পাই আমি অনেক দেখেছি! হুঃ!

সুশোভন ফিরে চলল।

বৃষ্টি নেই। ধু ধু করছে মাঠ। এখানে-সেখানে গরুর পাল এক গুচ্ছ তৃণের জন্তে বৃথা খুঁজে বেড়াচ্ছে। তাম্রবর্ণ আকাশের নীচে সমস্ত পৃথিবী যেন ফুটছে।

নেই, নেই, নেই। সামনে, পিছনে, ডাইনে, বাঁয়ে কোথাও কিছু নেই। ভবিষ্যতের মাঠে আশার নবাঙ্কুরের চিহ্নমাত্রও নেই। অজ্ঞতার অন্ধকারে অতীত গেছে মুছে।

ধুকছে পৃথিবী, ধুকছে আকাশ।

আর, শশাঙ্কের বংশধর হাটখোলার আড়তে খাতা লিখছে।



রচনা-সাহিত্য ও বঙ্কিমচন্দ্র

—অধ্যাপক, ডাঃ শ্রীশশিভূষণ দাশ গুপ্ত, এম, এ,
পি, আর, এস ; পি-এচ্, ডি

সাহিত্যের ক্ষেত্রে প্রায় সকল জাতীয় সাহিত্যেরই একটা আত্ম-পরিচয় আছে, কিন্তু রচনা-সাহিত্য যেন একেবারে জাতি-গোত্রহীন। বিতর্কাত্মক হইলেও কাব্য, কবিতা, নাটক, গল্প, উপন্যাস প্রভৃতির আমরা একটা লাক্ষণিক পরিচয় ঠিক করিয়া লইয়াছি, কিন্তু রচনা-সাহিত্য বলিতে সাহিত্যের 'চণ্ডীপাঠ ইস্তক জুতা সেলাই' কিছুই বাদ পড়ে না। গুরু গম্ভীর দার্শনিক তত্ত্বালোচনা, দুর্দান্ত ঐতিহাসিক গবেষণা, রাজনৈতিক মসী-যুদ্ধ আর সমাজনৈতিক ঘোঁট, সাহিত্যিক বিতর্ক এবং সমালোচনা বা সাহিত্যিক অন্যান্য রচনা—ইহাদের সকলকেই আমরা 'প্রবন্ধ-সাহিত্যে'র স্বক্ষেত্রে আনিয়া একেবারে এক করিয়া দিয়াছি। মোটের উপরে গল্প, উপন্যাস এবং নাটক ব্যতীত গদ্যরীতিতে আর যাহা কিছুই লিখিত হয় তাহাই প্রবন্ধ-সাহিত্য নামে খ্যাত।

কিন্তু আমরা জানি, যাহা কিছু লেখা হয় তাহাই সাহিত্য নহে, সাহিত্য একপ্রকারের 'বিশেষ লেখা'; সুতরাং যে সকল লেখার গুরু-গাম্ভীর্য্য এবং ভারিত্ব দেখিয়া আমরা সাগ্রহে এবং সসম্মানে তাহাদিগকে সাহিত্যের আসরে ডাকিয়া বসাইয়া আভিজাত্যের উচ্চ আসন দেই, তাহারা গুরু-গম্ভীর বা ভারী হইতে পারে বটে, কিন্তু সাহিত্যের আসরে তাহাদের উচ্চাসন অনেকখানিই অবিচার-লব্ধ। এখানে স্বতঃই প্রশ্ন হয়, এই সাহিত্যিক বৈশিষ্ট্যটি তাহা হইলে কি? এই প্রশ্নের জবাব দিতে হইলে সাহিত্যের মূলধর্ম্ম সম্বন্ধেই আলোচনার প্রয়োজন। এখানেই এক গহনারণ্যে পথ হারাইয়া তর্ক-বিতর্ক জালে আটকাইয়া যাইবার সম্ভাবনা,—কিন্তু তাহাতে আসল কথাটিই বাদ পড়িতে পারে তাই কোন দুর্গম জটিলতায় আমরা প্রবেশ করিব না। সাহিত্যের * মূল লক্ষণ সম্বন্ধে আমাদের প্রাচীন অলঙ্কারিকেরা যে সব আলোচনা করিয়া গিয়াছেন তাহার ভিতর হইতে অসাধারণ ভাবে সাহিত্যের কি কি লক্ষণ আমরা অপরিহার্য্য বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি তাহাই দেখা যাক। প্রথমতঃ সাহিত্য একটি সৃষ্টিকার্য্য। অন্তর্জগৎ এবং বহির্জগৎ সম্বন্ধে সে শুধু সংবাদ বা তথ্য বহন করিয়া আনে না; অন্তর্জগৎ বা বহির্জগৎ হইতে লব্ধ সকল উপাদানকে অন্তঃকরণের দ্বারা একান্ত আপনার করিয়া লইয়া তাহাদ্বারা সে এক রসঘন নূতন সৃষ্টি করিয়া লয়। আলঙ্কারিকেরা এই জন্য বলিয়াছেন যে 'কবিরেব প্রজাপতিঃ'। ব্রহ্মা যেমন করিয়া এই বিশ্ব-সৃষ্টির কাব্য রচনা করিয়াছিলেন, কবি ও ঠিক তেমন করিয়াই তাঁহার কাব্য-জগৎকে গড়িয়া তোলেন তাঁহার সকল রসসত্তা দিয়া। কোন কিছুকে সাহিত্য হইতে হইলে মূলতঃ তাহাকে একটি সৃষ্টি ব্যাপার হইতে হইবে। এইখানেই সাহিত্যের সহিত অ-সাহিত্যের মৌলিক পার্থক্য। রচনা-সাহিত্যকেও সত্যকারের সাহিত্য-পদবাচ্য হইতে হইলে মূলতঃ একটি সৃষ্টি-ব্যাপার হইতে হইবে, ঐ 'রচনা' কথাটির ভিতরেই রহিয়াছে এই সৃষ্টি কার্য্যের সুস্পষ্ট ইঙ্গিত এবং এই জন্যই ইংরাজীতে যাহাকে Essay-Literature বলে তাহার জন্য আমি 'রচনা-সাহিত্য' নামটি বিশেষভাবে গ্রহণ করিয়াছি। রচনা-সাহিত্যের ভিতরে আমরা যে সংবাদ, যে তথ্য, যে পাণ্ডিত্য এবং চিন্তাশীলতা লাভ করি উহাকে আমরা মূল্যবান্ উপরি পাওনা বলিব। এই সকল জিনিষ আপনাতে আপনারা যতই মূল্যবান্ হোক, নিছক সাহিত্যের

* যে অর্থে আজকাল আমরা সাহিত্য কথাটির ব্যবহার করি সেই অর্থে এই শব্দটির ব্যবহার অপেক্ষাকৃত আধুনিক। প্রাচীন আলঙ্কারিকেরা এই অর্থে 'কাব্য' শব্দটিরই ব্যবহার করিতেন। ছন্দোবদ্ধে রচিত সাহিত্যের সীমাবদ্ধক্ষেত্রে 'কাব্য' কথাটির ব্যবহারও আধুনিক। প্রাচীনেরা 'সাহিত্য' শব্দটি শব্দ ও অর্থের সাহিত্য বা সুসঙ্গতি বা মিলন অর্থেই ব্যবহার করিতেন। রবীন্দ্রনাথ এই সুসঙ্গতি বা মিলনের অর্থটিকে আরও ব্যাপক অর্থে গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি বলেন,—"সে যে কেবল ভাবে ভাবে ভাষায় ভাষায় গ্রন্থে গ্রন্থে মিলন তাহা নহে,—মানুষের সহিত মানুষের, অতীতের সহিত বর্ত্তমানের, দূরের সহিত নিকটের অত্যন্ত অন্তরঙ্গ যোগসাধন সাহিত্য ব্যতীত আর কিছুর দ্বারাই সম্ভবপর নহে" (সাহিত্য, ১০৩ পৃঃ)। হিতের সহিত বর্তমান যাহা তাহাই সাহিত্য—এ ব্যাখ্যা শুধু আধুনিক নহে,—সাম্প্রদায়িক।

দিক হইতে বিচার করিলে তাহারা যে রচনা-সাহিত্যের পক্ষে একান্তই অপরিহার্য্য এমন কথা বলা যায় না। বরঞ্চ এ অভিযোগও অনেক সময়ে আনা যাইতে পারে যে, রচনা সাহিত্যে এই সকলের আবির্ভাব সব সময় রসের পরিপূরক না হইয়া অনেক সময় রসভঙ্গই ঘটাইয়া থাকে। সমৃদ্ধ ইংরাজী সাহিত্যের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রচনাকার ছিলেন ল্যাম্ব এবং তাঁহার রচনা হইল Essays of Elia; ল্যাম্বের এই রচনাগুলির অন্য যে কোন গুণই থাক না কেন, ইহারা যে গভীর পাণ্ডিত্যের দ্বারা ভারী হইয়া উঠিয়াছে বলিয়াই ভাল রচনা হইয়াছে এমন কথা কেহই বলিবেন না; বরঞ্চ পাণ্ডিত্যবিহীন যে সহজ কবি চিত্তের স্পর্শ তাহাই ইহাদের প্রাণবস্তু।

দ্বিতীয়তঃ, সাহিত্যের যে সৃষ্টি উহা রসসৃষ্টি। শ্রুতিতে দেখিতে পাই, আদি শিল্পী বিশ্বস্রষ্টার সৃষ্টির মূল অনুপ্রেরণা ছিল আনন্দে, আনন্দেই তাঁহার সৃষ্টি বিধৃত, আবার আনন্দেই তাহার পরিণতি; সাহিত্যের সৃষ্টি বা সাধারণভাবে সকল শিল্প-সৃষ্টির মূলেও রহিয়াছে সেই একই কথা, রসেই শিল্প-সৃষ্টির আদি প্রেরণা, রসেই শিল্প-সৃষ্টি বিধৃত, রসই ইহার ফলশ্রুতি। সাহিত্যের ক্ষেত্রে এই রস-পরিবেশন যে শুধু কাব্য কবিতা বা নাটক উপন্যাসেরই কর্ত্তব্য তাহা নহে, রচনা-সৃষ্টিরও ইহাই মূল ধর্ম্ম। রচনাকারও মূলতঃ কবি; সমগ্র জীবনের ভিতর দিয়া অন্তরে সঞ্চিত হইয়া উঠিতেছে যে স্নেহ প্রেম, সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, আশা-নিরাশার গভীর অনুভূতি স্পন্দনে স্পন্দনে তাহারা কাঁপাইয়া দিয়াছে চিত্তের শতদল, চিত্ত-শতদলের সেই প্রস্ফুরণে জাগিয়াছে বর্ণ, গন্ধ, মধু— তাহারই ভারে ভারাক্রান্ত হইয়া ওঠে কবির সকল সত্তা, তাই সে চায় প্রকাশ, এই প্রকাশের পদ্যময় রূপ যেমন কবিতা, ইহার গদ্যময় রূপ তেমনই রচনা-সাহিত্য। সাহিত্যের কাব্যধর্ম্ম এবং রচনাধর্ম্মের ভিতরে মূলতঃ তাই কোনও পার্থক্য নাই, পার্থক্য শুধু প্রকাশভঙ্গীতে, সত্যকারের একটি রচনা একটি গদ্য-কবিতা।

অন্তরের এই রস-প্রেরণা গদ্যে হোক বা পদ্যে হোক ভাষার ভিতর দিয়া যখন আপনার সুন্দরতম মধুরতম প্রকাশ লাভ করে তখন সে ঘটাইয়া তোলে কবিহৃদয়ের সহিত সমবাসনা-বাসিত সহৃদয় পাঠকের হৃদয়ের নিবিড় যোগ, লেখক এবং পাঠকের ভিতরে রস-সৃষ্টির ভিতর দিয়া এই যে অন্তরের গভীর যোগ ইহাই যথার্থ সাহিত্যের ধর্ম্ম, সাহিত্য তাই 'সহৃদয়-হৃদয়-সংবাদী।' সংবাদ, তথ্য, তত্ত্ব ও পাণ্ডিত্যের ভিতর দিয়া আমাদের বুদ্ধির যোগ ঘটিতে পারে, কিন্তু অন্তরের যোগ ঘটে না, তাই তাহারা সাহিত্যের উপাদান নয়, রস-সংযোগের ভিতর দিয়াই ঘটে হৃদয়-সংযোগ, হৃদয়-সংযোগে জাগে দুইটি হৃদয়ের রস-সংবাদ, তাহাই যথার্থ সাহিত্য।

সমালোচক লিণ্ড একস্থানে বলিয়াছেন যে, সাধারণতঃ আমাদের রচনা-সাহিত্য সম্পর্কে ধারণা এই যে, উহা এক প্রকারের সাধারণ বক্তৃতামঞ্চের বক্তৃতা। পাঠকগণ যেন হাজার হাজার শ্রোতার ন্যায় দল বাঁধিয়া ঠেলাঠেলি করিয়া ভিড় করিয়া আছে,—লেখক যেন গুরুগম্ভীর স্বরে সকলের উপযোগী করিয়া মূল্যবান্ বাক্য বর্ষণ করিতেছেন। কিন্তু সত্যকারের যে রচনাসাহিত্য তাহা এইরূপ বারোয়ারী জিনিস নহে—তাহা একান্ত নিভৃতে লেখক এবং পাঠকের চিত্ত-বিনিময়। পাঠক যেন রচনা পড়িতে পড়িতে একথা কখনও মনে না করে যে, ইহা শুধু তাহার জন্য লেখা হয় নাই,—যে অগণিত ভিড়ের দিকে তাকাইয়া এগুলি লেখা হইয়াছে সে তাহার ভিতরে নগণ্য একজন মাত্র; পরন্তু সে যেন সর্ব্বদার জন্য এই কথাটিই অনুভব করে যে, লেখক যাহা কিছু বলিতেছেন শুধু তাহারই মুখ তাকাইয়া তাহারই জন্য বলিতেছেন। অন্তরঙ্গ বন্ধু যেমন করিয়া একটি পরম মুহূর্ত্তে নিভৃত নির্জ্জনে অপর বন্ধুর নিকট নিজের অন্তরের সঞ্চিত সুখ-দুঃখ, আশা-নিরাশার কথাগুলি অকপটে ব্যক্ত করিয়া দেয়, যেমন করিয়া হৃদয়ের নিভৃততম কক্ষটির দুয়ারও উদ্ঘাটিত করিয়া দেয়, রচনা-লেখকও তেমন করিয়া পাঠকের নিকটে আপনার হৃদয়কে উন্মুক্ত করিয়া দেয়। রচনার ভিতর দিয়া লেখক এবং পাঠকের ভিতরকার এই যে পরম অন্তরঙ্গযোগ ইহা ব্যতীত রচনা সত্যকারের সাহিত্য হইয়া উঠিতে পারে না;—সে 'সহৃদয়-হৃদয়-সংবাদী' হইয়া উঠিতে পারে না। রচনার প্রধান উপাদানই এই হৃদয়ের সংবাদ। তথ্য, তত্ত্ব ও পাণ্ডিত্যের চাপে এই হৃদয়ের সংবাদটি ব্যাহত হইবার সম্ভাবনা, এই জন্যই পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, এই সকল জিনিস রচনার রসের পরিপূরক না হইয়া বরঞ্চ অনেক সময়ে রস ভঙ্গেরই কারণ হইয়া থাকে।

বস্তুতঃ ভাল রচনা-সাহিত্য অনেকখানি লিরিক্ ধর্ম্মী। এখানে আমরা সর্ব্বকালের সর্ব্বদেশের কতগুলি সার্ব্বজনীন কথা শুনিতে আসি না ;—এখানে আসি একটি বিশেষ মুহূর্ত্তে একটি বিশেষ ব্যক্তিসত্তার স্পন্দন লাভ করিতে। লেখক কয়েকটি একান্ত আপনার কথা একান্ত আপনার করিয়া একান্ত অকপটে হৃদয়ের সবটুকু দরদ মিশাইয়া আমাদিগকে উপহার দিবে, তাহার প্রতিটি কথার ভিতর দিয়া লাভ করিব তাহারই হৃদয়ের স্পর্শ, তাহারই হৃদয়ের সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম রসানুভূতিগুলি একটু একটু করিয়া সংক্রামিত হইবে আমাদের হৃদয়ে—ইহাই রচনা-সাহিত্যের লক্ষণ। রচনাকে ভাল সাহিত্য হইতে হইলে একেবারে নৈর্ব্যক্তিক হইলে চলিবে না। এই জন্যই পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, লিরিক্ কবিতা এবং রচনা-সাহিত্যের যে পার্থক্য তাহা অনেকখানিই দৈহিক-ধর্ম্মে, স্বরূপ-ধর্ম্মে নহে।

আসল কথা এই,—রচনার উপাদান সুখ-দুঃখ, আশা-নিরাশায় ভরা জীবনের বহু বিচিত্র রহস্যময় স্মৃতি। কোনও এক ভাবঘন প্রশান্ত মুহূর্ত্তে আমরা ডুবিয়া যাই আমাদের জীবনের সেই স্মৃতির দেশে,—সেখান হইতে আহরণ করি সপ্ত রঙের মণি-মাণিক্য ; বাহিরে আনিয়া তাহাদিগকে যত ভাঙিতে চাই, ততই সুকুমার বর্ণ বৈচিত্র্য ঠিক্‌রাইয়া পড়ে, তাহা লইয়াই অপরূপ এবং অমূল্য হইয়া ওঠে আমাদের রচনা। অন্তরের গভীর দেশে মাঝে মাঝে এই গভীর আত্মনিমজ্জন এবং সেখান হইতে জীবনের সকল পুঁজি হইতে বাছিয়া বাছিয়া কয়েকটি মণিমাণিক্য আনিয়া একান্ত আপনার জনকে নিভৃতে উপহার দান—ইহাই সত্যকারের রচনা।

রচনা-সাহিত্যের স্বরূপ সম্বন্ধে এই যে-সকল আলোচনা করিলাম সেই দিক হইতে বিচার করিলে দেখিতে পাইব যে, সমগ্র বাঙ্গলা সাহিত্যে সত্যকারের রচনা-সাহিত্যের সন্ধান মেলে সর্ব্বপ্রথমে বঙ্কিমচন্দ্রের 'কমলাকান্তের দপ্তরে' এবং পরে তাহা আরও উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে রবীন্দ্রনাথের 'কেকাধ্বনি,' 'নববর্ষা,' 'পাগল,' 'শরৎ,' 'মেঘদূত,' 'শ্রাবণ-সন্ধ্যা,' প্রভৃতি রচনায়। শুধু বাঙ্গলা-সাহিত্যে কেন, ভাল রচনা-সাহিত্য সমগ্র জগতের সাহিত্যেই বিরল। সমালোচক লিও সত্যই বলিয়াছেন যে, ইহা একটা আশ্চর্যের বিষয় যে, সাহিত্যের ক্ষেত্রে যে জিনিষটিকে আমরা মনে করি সর্ব্বাপেক্ষা সহজ সেই জিনিষটিই সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন, এবং জগতের সাহিত্যে সত্যই সে জিনিষটি দুর্লভ। বাঙ্গলা-সাহিত্যের প্রথম রচনা-সাহিত্য হিসাবে আমরা এখানে বঙ্কিমচন্দ্রের রচনা সম্বন্ধেই বিশেষভাবে আলোচনা করিব।

বঙ্কিমচন্দ্র ধর্ম্ম, দর্শন, বিজ্ঞান, সাহিত্য, ইতিহাস, রাজনীতি প্রভৃতি বহুবিষয়ে বহু প্রবন্ধ রচনা করিয়াছিলেন। সে সকল প্রবন্ধে তিনি যে চিন্তাশীলতা, মনস্বিতা এবং পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিয়াছেন তাহা সত্যই শ্রদ্ধার্হ ; কিন্তু রচনা-সাহিত্যে তাঁহার সাহিত্যিক প্রতিভার বিকাশ 'কমলাকান্তের দপ্তরে'। এদিক হইতে কমলাকান্তের দপ্তর বাঙ্গলা-সাহিত্যের ইতিহাসে একটা স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের দাবী করিতে পারে। 'কমলাকান্তের দপ্তরে' বঙ্কিমের মনস্বিতা, চিন্তাশীলতা বা পাণ্ডিত্যের পরিচয় যে খুব অকিঞ্চিৎকর তাহা নহে; কিন্তু পূর্ব্বেই বলিয়াছি, উহা অনেকখানিই আমাদের উপরি পাওনা, আসল পাওনা সাহিত্য-সৃষ্টির ভিতর দিয়া সাহিত্য-স্রষ্টার গভীর স্পর্শ। গদ্য-রচনা ও যে একটা সাহিত্যিক সৃষ্টির কোঠায় আসিয়া পৌঁছিতে পারে 'কমলাকান্তের দপ্তরে' এই কথাটাই আমাদিগকে প্রথম সচকিত করিয়া দিয়াছে। ধরা যাক্ প্রথম সংখ্যা দপ্তরের কথা, 'একা কে গায় ওই.' ইহা কোন সংবাদ বহন করে না, তথ্য যাহা আছে তাহা তর্কাতীত বা সংশয়াতীত নহে, পাণ্ডিত্যের ভারেও সে তেমন ভারী নহে ; তথাপি সে সুন্দর সাহিত্য হইয়া উঠিয়াছে, কারণ সে সাহিত্যিক সৃষ্টি ; সে বহন করে আশা-নিরাশায় ভরা জীবনের সঞ্চিত রসানুভূতি, আর তাহার ভিতর দিয়া প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিয়াছে বঙ্কিমচন্দ্রের দরদী-কবি-চিত্তের মধুর স্পর্শ। আফিংখোর কমলাকান্ত চক্রবর্ত্তীর ব-কলমে সকল কথা বলিলেও কোন পাঠকের বুঝিতে কষ্ট হয় না, ইহা বঙ্কিমের অন্তরের গভীরতম প্রদেশ হইতে কিরূপে স্বতঃ-নিঃসারিত হইতেছে, এ বঙ্কিম শুধু মনস্বী নহেন, শুধু চিন্তাশীল পণ্ডিত নহেন, পাঠক চিত্তে তাঁহার স্পর্শ রসমূর্ত্তি পরমাত্মীয় রূপে।

আরম্ভেই দেখিতে পাই,—"বহুকাল বিস্মৃত সুখস্বপ্নের স্মৃতির ন্যায় ঐ মধুর গীতি কর্ণরন্ধ্রে প্রবেশ করিল। এত মধুর লাগিল কেন ?... কেন কে বলিবে ? রাত্রি জ্যোৎস্নাময়ী—নদী সৈকতে কৌমুদী হাসিতেছে। অর্দ্ধাবৃতা সুন্দরীর নীল বসনের ন্যায় শীর্ণ-শরীরা নীল সলিলা তরঙ্গিণী সৈকত বেষ্টিত

করিয়া চলিয়াছেন ; রাজপথে কেবল আনন্দ—বালক, বালিকা যুবক, যুবতী, প্রৌঢ়া, বৃদ্ধা, বিমল চন্দ্রকিরণে স্নাত হইয়া আনন্দ করিতেছে। আমিই কেবল নিরানন্দ—তাই ঐ সঙ্গীতে আমার হৃদয়-যন্ত্র বাজিয়া উঠিল।" ইহা যে কোন গুরুগম্ভীর তথ্য বা তত্ত্ব নহে সে কথা কাহাকেও বলিয়া দিতে হইবে না ; ইহা একান্তই একটী বিশেষ ব্যক্তি-সত্তার স্পন্দন, তাঁহার সুখ-দুঃখ ভাল-লাগা মন্দ-লাগার কথা ;—মনের তারে বাহিরের কোমল আঘাতে বাজিয়া উঠিয়াছে একটি করুণ মধুর সুর, লেখক নিভৃতে সহৃদয় আপনজনের কাছে যেন জাগাইয়া তুলিতে চাহিতেছেন তাহার প্রতিরণন—ইহা একান্তই লিরিক্-ধর্ম্মী।

"কিন্তু বারেক মাত্র শ্রুত ঐ সঙ্গীত আমার কেন এত মধুর লাগিল, তাহা বলি নাই। অনেক দিন আনন্দোত্থিত সঙ্গীত শুনি নাই,—অনেক দিন আনন্দ অনুভব করি নাই। যৌবনে যখন পৃথিবী সুন্দরী ছিল, যখন প্রতি পুষ্পে পুষ্পে সুগন্ধ পাইতাম, প্রতি পত্র মর্ম্মরে মধুর শব্দ শুনিতাম, প্রতি নক্ষত্রে চিত্রা-রোহিণীর শোভা দেখিতাম, প্রতি মনুষ্যমুখে সরলতা দেখিতাম, তখন আনন্দ ছিল। পৃথিবী এখনও তাই আছে, মনুষ্য চরিত্র এখনও তাই আছে, কিন্তু এ হৃদয় আর তাই নাই। তখন সঙ্গীত শুনিয়া আনন্দ হইত, আজি এই সঙ্গীত শুনিয়া সেই আনন্দ মনে পড়িল। যে অবস্থায়, যে সুখে সেই আনন্দ অনুভব করিতাম, সেই অবস্থা, সেই সুখ মনে পড়িল। মুহূর্ত্ত জন্য আবার যৌবন ফিরিয়া পাইলাম। আবার তেমনি করিয়া, মনে মনে সমবেত বন্ধুমণ্ডলীর মধ্যে বসিলাম, আবার সেই অকারণ সঞ্জাত উচ্চ হাসি হাসিলাম, যে কথা নিষ্প্রয়োজন বলিয়া এখন বলি না, নিষ্প্রয়োজনেও চিত্তের চাঞ্চল্য হেতু তখন বলিতাম, আবার সেই সকল বলিতে লাগিলাম, আবার অকৃত্রিম হৃদয়ে পরের প্রণয় অকৃত্রিম বলিয়া মনে মনে গ্রহণ করিলাম। ক্ষণিক ভ্রান্তি জন্মিল তাই এ সঙ্গীত এত মধুর লাগিল। শুধু তাই নয়। তখন সঙ্গীত ভাল লাগিত,—এখন ভাল লাগে না—চিত্তের যে প্রফুল্লতার জন্য ভাল লাগিত, সে প্রফুল্লতা নাই বলিয়া ভাল লাগে না। আমি মনের ভিতর মন লুকাইয়া সেই গত যৌবন সুখ চিন্তা করিতেছিলাম—সেই সময়ে এই পূর্ব্বস্মৃতি-সূচক সঙ্গীত কর্ণে প্রবেশ করিল, তাই এত মধুর বোধ হইল"। সেই অতীত জীবনের অফুরন্ত সঞ্চয়ের ভিতরে গভীর আত্ম-নিমজ্জন,—সেখান হইতে মণি-মাণিক্য সঞ্চয়, এবং বাহিরের জগতে আনিয়া তাহাকে যত টুকরা টুকরা করিয়া ভাঙিয়া দেখাইবার চেষ্টা ততই তাহাতে অপূর্ব্ব বর্ণ-বৈচিত্র্য এবং রস-মাধুর্য্যের সমাবেশ। এ জগৎ সেই মধুর স্মৃতির জগৎ—সেই

"তচ্চেতসা স্মরতি নূনমবোধপূর্বং
ভাবস্থিরাণি জননান্তরসৌহৃদানি।"

মনের অজ্ঞাতে বাসনায় স্থিরবদ্ধ বহুদিবসের ভাবস্মৃতি মন ভরিয়া ওঠে ব্যাকুল আনন্দের স্পন্দনে, সেই স্পন্দনের প্রকাশই সত্যকারের রচনা। আমাদের বাস্তব জীবনের ভিতরেও এই স্মৃতির জগৎ যে কতখানি মধুর কতখানি সত্য হইয়া ওঠে বঙ্কিমচন্দ্র তাহার আভাস দিয়াছেন 'ফুলের বিবাহ' শীর্ষক নবম সংখ্যা দপ্তরে।"......চমক হইলে দেখিলাম, কিছুই নাই। সেই পুষ্পবাসর কোথায় মিলিল? মনে করিলাম, সংসার অনিত্যই বটে—এই আছে, এই নাই। সে রম্য বাসর কোথায় গেল—সেই হাস্যমুখী শুভ্রস্মিত সুধাময়ী পুষ্প-সুন্দরীসকল কোথায় গেল? যেখানে সব যাইবে, সেইখানে —স্মৃতির দর্পণতলে, ভূতসাগরগর্ভে। যেখানে রাজা, প্রজা, পর্ব্বত, সমুদ্র, গ্রহ নক্ষত্রাদি গিয়াছে বা যাইবে, সেইখানে—ধ্বংসপুরে। এই বিবাহের ন্যায় সব শূন্যে মিলাইবে, সব বাতাসে গলিয়া যাইবে—কেবল থাকিবে কি? ভোগ? না, ভোগ্য না থাকিলে ভোগ থাকিতে পারে না। তবে কি? স্মৃতি?" ফুলের বিবাহের ন্যায় সত্যকারের বিবাহও নিমেষে শূন্যে মিলাইয়া যায়,—কিন্তু মানুষের চিত্তে জাগিয়া থাকে গত জীবনের সকল সুখ-দুঃখের স্মৃতি একটা গভীর রহস্যময়রূপে,—কোন্ নিভৃত নিরালা মুহূর্ত্তে তাহারা জাগিয়া ওঠে মানসপটে অস্ফুট সোনার রেখার মত—'emotion recollected in tranquility'—তাহাকে লইয়া গড়িয়া ওঠে সুকুমার সাহিত্য।

বঙ্কিমচন্দ্রের ভিতরে একটি লিরিক-ধর্ম্মী কবি-চিত্ত ছিল ; তাহার পরিচয় যেমন ছড়াইয়া রহিয়াছে তাঁহার উপন্যাসগুলির আঁটা বাঁধুনির খাঁচে খাঁচে, তেমনি রহিয়াছে 'কমলাকান্তের দপ্তর'গুলির ভিতরে। যে 'বসন্তের কোকিল'কে লইয়া তিনি বারুণীর ঘাটে বকুলতলায় একদিন গভজাবায় অপূর্ব্ব কবিতা

লিখিয়াছিলেন, সেই 'বসন্তের কোকিল'কে উপলক্ষ্য করিয়া সপ্তম সংখ্যার দপ্তরে বলিতেছেন,—"তুই এ-সংসারে পঞ্চমস্বর ভালবাসিস—আমিও তাই; তুই পঞ্চস্বরে কারে ডাকিস্? আমিই বা কারে? বল্ দেখি পাখি, কারে?

"যে সুন্দর, তাকেই ডাকি, যে ভাল তাকেই ডাকি। যে আমার ডাকশুনে, তাকেই ডাকি। এই আশ্চর্য্য ব্রহ্মাণ্ড দেখিয়া, কিছুই বুঝিতে না পারিয়া, বিস্মিত হইয়া আছি, ইহাকেই ডাকি। এই অনন্ত, সুন্দর জগৎ-শরীরে যিনি আত্মা, তাঁহাকে ডাকি। জানিয়া ডাকি, না জানিয়া ডাকি, সমান কথা; তুইও কিছু জানিস্ না, আমিও কিছু জানি না; তোরও ডাক পৌঁছিবে, আমারও ডাক পৌঁছিবে।……কণ্ঠ নাই বলিয়া আমার মনের কথা কখনও বলিতে পারিলাম না। যদি তোর এ ভুবন-ভুলান স্বর পাইতাম ত বলিতাম।…কি কথাটি, বলিব বলিব বলিয়া মনে করি, বলিতে জানি না,… কমলাকান্তের মনের কথা এজন্মে বলা হইল না,—যদি কোকিলের কণ্ঠ পাই—অমানুষী ভাষা পাই, আর নক্ষত্রদিগকে শ্রোতা পাই, তবে মনের কথা বলি।" সেই চিরন্তনের আকূতি—

''না পারে বুঝাতে আপনি না বুঝে
মানুষ ফিরিছে কথা খুঁজে খুঁজে,
কোকিল যেমন পঞ্চমে কূজে
জাগিছে তেমনি সুর,—"

দ্বাদশ সংখ্যা দপ্তরে কমলাকান্ত প্রসন্নগোয়ালিনীর সঙ্গে স্থূল রসিকতা করিয়া যখন—"এস এস বঁধু এস, আধ আঁচরে বস, নয়ন ভরিয়ে তোমায় দেখি" এই গানটির ব্যাখ্যা করিতে আরম্ভ করিলেন, তখন পরিহাসপ্রিয় বঙ্কিমচন্দ্রের চটুলতায়েই আকৃষ্ট হইয়াছিলাম; কিন্তু তাহার ভিতর প্রবাহিত হইতেছিল যে কবিপ্রাণ ফল্গুস্রোতের মত তাহার স্পর্শ অলক্ষণের ভিতরেই আমাদিগকে আরও গভীরে টানিয়া লইল। প্রথমে 'এস এস বঁধু এস'। সর্ব্বত্র এই রব—"এস এস বঁধু এস।" সর্ব্ব কর্ম্মের এই মন্ত্র,—"এসো এসো বঁধু এসো"। জড়জগতের নিয়ম আকর্ষণ। বৃহৎ গ্রহ উপগ্রহকে ডাকিতেছে,—এস এস বঁধু এস। সৌরপিণ্ড বৃহৎ গ্রহকে ডাকিতেছে,—এস এস বঁধু এস। জগৎ জগদ্গুরুকে ডাকিতেছে,—এস এস বঁধু এস। জড়পিণ্ড সকল, গ্রহ, উপগ্রহ, ধূমকেতু—সকলেই এই মোহক্ষেত্রে বাঁধা পড়িয়া ঘুরিতেছে। প্রকৃতি পুরুষকে ডাকিতেছে, এস এস, বঁধু এস। জগতের এই গম্ভীর অবিশ্রান্তধ্বনি,—"এস এস বঁধু এস।" ইহার পরে 'আধ আঁচরে বস।' কমলাকান্ত বলিতেছে "এই তৃণ শস্ত-সমাচ্ছন্ন কণ্টকাদিতে কর্কশ সংসারারণ্যে, হে বাঞ্ছিত, আমার এই হৃদয়াবরণের অর্দ্ধেকে উপবেশন কর। কুশ কণ্টকাদি হইতে তোমার আচ্ছাদন জন্ত আমি এই আপন অঙ্গ অনাবৃত করিতেছি—আমার আঁচরে বস! যাহাতে আমার লজ্জা রক্ষা, মান রক্ষা, যাহাতে আমার শোভা, হে মিলিত! তুমিও তাহার অর্দ্ধেক গ্রহণ কর—আধ আঁচরে বসো। হে পরের হৃদয়, হে মনোরঞ্জন, হে সুখদ! কাছে এসো, আমাকে স্পর্শ কর, আমি তোমাতে সংলগ্ন হইব, দূরে আসন গ্রহণ করিও না—এই আমার শরীর-সংলগ্ন অর্দ্ধাঞ্চলে বস।" তাহার পরে 'নয়ন ভরিয়া তোমায় দেখি'। কমলাকান্ত বলিতেছে,—"কে কখন দেখিয়াছে?……রূপতৃষ্ণায় তুমি ইহজীবন অতিবাহিত করিলে—যেখানে ফুলটি ফুটে, ফলটি দোলে, যেখানে পাখীটি উড়ে, যেখানে মেঘ ছুটে, গিরিশৃঙ্গ উঠে, নদী বহে, জল ঝরে, তুমি সেইখানেই রূপের অনুসন্ধানে ফিরিয়াছ,—যেখানে বালক প্রফুল্ল মুখমণ্ডল আন্দোলিত করিয়া হাসে, যেখানে যুবতী ব্রীড়া ভারে আধা আধা হইয়া শঙ্কিত গমনে যায়, যেখানে প্রৌঢ়া নিতান্ত স্ফুটিতা মধ্যাহ্ন পদ্মিনীবৎ অকাতরে রূপের বিকাশ করে, তুমি সেইখানেই রূপের সন্ধানে ফিরিয়াছ, কখন নয়ন ভরিয়া রূপ দেখিয়াছ? দেখ নাই কিসে কুসুম দেখিতে দেখিতে শুকায়, ফল দেখিতে দেখিতে পাকে, পড়ে, পচে, গলে, পাখী উড়িয়া যায়—মেঘ চলিয়া যায়, গিরি ধূমে লুকায়, নদী শুকায়, চাঁদ ডুবে, নক্ষত্র মিলিয়া যায়? শিশুর হাসি রোগে হরণ করে, যুবতীর ব্রীড়া কিসে না যায়? প্রৌঢ়া বয়সে শুকাইয়া যায়। ইহা সংসারের দুরদৃষ্ট—কেহ কিছু নয়ন ভরিয়া দেখিতে পায়না। অথবা এই সংসারের শুভাদৃষ্ট—কেহ কিছু নয়ন ভরিয়া দেখিতে পায় না। গতিই সংসারের সুখ—চাঞ্চল্যই সংসারের সৌন্দর্য্য।" ইহাই সাহিত্যের রচনা,—পাণ্ডিত্যহীন, সংবাদ *তথ্য-হীন, নিভৃত হৃদয়ের রসালোড়ন,—রুদ্ধ হৃদয়ের দ্বারে* খুলিয়া সহৃদয় পাঠককে অন্তরঙ্গ ভাবে আকর্ষণ। কাব্য-কবিতার সহিত ইহার পার্থক্যের সীমারেখা কোথায় তাহা খুঁজিয়া বাহির করা সকল সময়ে সম্ভব বলিয়া মনে হয় না।

'কমলাকান্তের দপ্তরে'র ভিতর দিয়া বঙ্কিমচন্দ্রের সমগ্র ব্যক্তিপুরুষটি যেমন করিয়া আমাদের কাছে প্রত্যক্ষ হইয়া উঠে তেমন আর কোথাও নহে। লেখার ভিতর দিয়া লেখকের সহিত এমনতর গভীর পরিচয় বাঙ্গলা সাহিত্যে বিরল। শুধু গদ্য সাহিত্যে কেন, ইহার পূর্ব্বে যত কাব্য-কবিতা হইয়াছে তাহার ভিতর দিয়াও কবিপুরুষের স্পর্শ আমরা এমন প্রত্যক্ষ এবং গভীর করিয়া পাই নাই। বঙ্কিম চন্দ্রের ভিতরে একটি কবি-প্রাণ ছিল, একটি চিন্তাশীল দার্শনিক ছিল, একটি অকপট স্বদেশভক্ত ছিল, আর ছিল একটি শুভ্রোজ্জ্বল হাস্যরসিক—একটি অপরাধ-অসহিষ্ণু বীর্য্যশালী শাসক। এই সকল সত্তা একত্রিত হইয়া জাগিয়া উঠিয়াছিল যে একটি অখণ্ড সত্তা তাহারই পরিচয় পাই কমলাকান্তের দপ্তরে। সপ্তমী পূজার দিন আফিং চড়াইয়া কমলাকান্ত বাঙ্গলা মায়ের যে পরিপূর্ণ দুর্গামূর্ত্তি ধ্যাননেত্রে দর্শন করিয়াছিলেন, তাহার ভিতরে স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে একাধারে বঙ্কিমের কবিত্ব এবং স্বদেশিকতা। তিনি যখন অমোঘ স্বরে আহ্বান জানাইলেন,—"এস ভাই সকল! আমরা এই অন্ধকার কালস্রোতে ঝাপ দেই। এস, আমরা দ্বাদশ কোটি ভুজে ঐ প্রতিমা তুলিয়া ছয় কোটি মাথায় বহিয়া ঘরে আনি।"—তখন আমরা যে শুধু সাহিত্য পাঠে নিমগ্ন থাকি তাহা নহে, বাণীমন্ত্ররূপে স্বদেশপূজারী বঙ্কিমচন্দ্র আমাদের নিকট একান্ত জীবন্ত হইয়া ওঠেন। দ্বাদশ সংখ্যা দপ্তরে কমলাকান্ত চক্রবর্ত্তীরূপে বঙ্কিমচন্দ্র বলিতেছেন, "এই সংসার সমুদ্রে আমি ভাসমান তৃণ, সংসার-বাত্যায় আমি ঘূর্ণ্যমান ধূলিকণা, সংসারারণ্যে আমি নিষ্ফল বৃক্ষ, সংসারাকাশে আমি বারিশূন্য মেঘ, আমি কেন দিবস গণিব?"

"গণিব। আমার এক দুঃখ, এক সন্তাপ, এক ভরসা আছে। ১২০৩ সাল হইতে দিবস গণি। যে-দিন বঙ্গে হিন্দুনাম লোপ পাইয়াছে সেই দিন হইতে দিন গণি। যে-দিন সপ্তদশ অশ্বারোহী বঙ্গ জয় করিয়াছিল সেই দিন হইতে দিন গণি। হায়! কত গণিব! দিন গণিতে গণিতে মাস হয়, মাস গণিতে গণিতে বৎসর হয়, বৎসর গণিতে গণিতে শতাব্দী হয়, শতাব্দীও ফিরিয়া ফিরিয়া কতবার গণি। কৈ অনেক দিবসে মনের মানসে বিধি মিলাইল কৈ?" বঙ্কিমচন্দ্রের এই 'মনের মানস' কি? উহা বাঙ্গলার স্বাধীনতা; শুধু রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা নহে শৌর্য্যে, বীর্য্যে, জ্ঞানে, বিজ্ঞানে, সাহিত্যে, শিল্পে চরিত্রের সর্ব্বাঙ্গীন মহিমায় বাঙ্গালী আবার মানুষ হইয়া উঠিবে জগতের ভিতরে আদর্শ স্থানীয় হইয়া উঠিবে তাহার গৌরবোজ্জ্বল মূর্ত্তি—ইহাই বঙ্কিমের জাগরণ ও নিদ্রার স্বপ্ন। প্রতি মুহূর্ত্তের এই স্বপ্ন, প্রাণের এই ঊর্দ্ধ-বাসনা বঙ্কিমচন্দ্রের রচনায় প্রত্যেকটি অক্ষরের ভিতর দিয়া যেন মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া উঠিয়াছে। এই রচনার আবেদন শুধু আমাদের বুদ্ধিবৃত্তির কাছে নহে আমাদের সকল অন্তর সত্তার কাছে। ইহাকে আমরা গ্রহণ করি, আমাদের মন ভরা স্বপ্ন লইয়া, বুকভরা আশা আকাঙ্খা লইয়া, ধমনীতে প্রবাহিত চঞ্চল শোণিত ধারার দোলায় দোলায়। বঙ্কিমচন্দ্র বলিতেছেন, "আর বঙ্গভূমি! তুমিই বা কেন মণিমাণিক্য হইলে না, তোমায় কেন আমি হার করিয়া কণ্ঠে পরিতে পারিলাম না? তোমায় সুবর্ণের আসনে বসাইয়া হৃদয়ে দোলাইয়া দেশে দেশে দেখাইতাম। ইউরোপে, আমেরিকায়, মিশরে, চীনে দেখিত, তুমি আমার কি উজ্জ্বল মণি!" এতখানি সত্যকারের হৃদয়াবেগ, মাতৃভূমির প্রতি এমন অকৃত্রিম উন্মাদ ভালবাসা—বাঙ্গলা জাতির জন্য এতখানি দরদ বোধ—ইহা বঙ্গসাহিত্যে দুর্লভ। বৈষ্ণব-কবি গাহিয়াছিলেন,—

"তোমায় যখন পড়ে মনে, আমি চাহি বৃন্দাবন পানে,
আউলাইলে কেশ নাহি বাঁধি।"

বৈষ্ণব কবির এই বিরহের গান বঙ্কিমের হৃদয় বিক্ষুব্ধ করিয়া তুলিয়াছিল, বাঙ্গলার পূর্ব্বগৌরব বাঙ্গলার দেশলক্ষ্মীকে স্মরণ করাইয়া তিনি বলিতেছেন "সুখ গিয়াছে, সুখচিহ্ন গিয়াছে, বঁধু গিয়াছে, বৃন্দাবনও গিয়াছে—চাহিব কোন দিকে?

চাহিবার এক শ্মশান-ভূমি আছে—নবদ্বীপ। সেইখানে সপ্তদশ যবনে বাঙ্গালা জয় করিয়াছিল। বঙ্গমাতাকে মনে পড়িলে, আমি সেই শ্মশানভূমির প্রতি চাই। যখন দেখি সেই ক্ষুদ্র পল্লীগ্রাম বেড়িয়া অদ্যাপি সেই কলধৌতবাহিনী গঙ্গা তর তর রব করিতেছেন, তখন গঙ্গাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করি—তুমি আছ, সেই রাজলক্ষ্মী কোথায়? তুমি যাহাকে বেড়িয়া বেড়িয়া নাচিতে, সে আনন্দ-রূপিনী কোথায়? তুমি যাহার জন্য সিংহল, বালী, আরব, সুমাত্রা হইতে বুকে করিয়া ধন বহন করিয়া আনিতে সেই ধনেশ্বরী কোথায়?

মনে মনে আমি সেই দিন কল্পনা করিয়া কাঁদি। মনে মনে দেখিতে পাই, কাল পূর্ণ দেখিয়া নবদ্বীপ হইতে বাঙ্গালার লক্ষ্মী অন্তর্হিত হইতেছেন। সহসা আকাশ অন্ধকারে ব্যাপিল, রাজপ্রাসাদের চূড়া ভাঙ্গিয়া পড়িতে লাগিল। পথিক ভীত হইয়া পথ ছাড়িল ; নগরীর অলঙ্কার খসিয়া পড়িল ; কুঞ্জবনে পক্ষীগণ নীরব হইল ; গৃহ-ময়ূরকণ্ঠে অর্দ্ধব্যক্ত কেকার অপরার্দ্ধ আর ফুটিল না। দিবসে নিশীথ উপস্থিত হইল, পণ্যবিপিকার দীপমালা নিবিয়া গেল, পূজাগৃহে বাজিবার সময় শঙ্খ বাজিল না ; গাঢ়তর, গাঢ়তর গাঢ়তর অন্ধকারে দিক্ ব্যাপিল। আকাশ, অট্টালিকা, রাজধানী, রাজবর্ত্ম, দেবমন্দির, পণ্যবীথিকা সেই অন্ধকারে ঢাকিল—কুঞ্জতীর, ভূমি, নদীসৈকত, নদীতরঙ্গ সেই অন্ধকারে—আঁধার, আঁধার, আঁধার হইয়া লুকাইল। আমি চক্ষে সব দেখিতেছি, আকাশ মেঘে ঢাকিতেছে, ঐ সোপানাবলী অবতরণ করিয়া রাজলক্ষ্মী জলে নামিতেছেন। অন্ধকারে নির্ব্বাণোন্মুখ আলোকবিন্দুবৎ জলে ক্রমে ক্রমে সেই তেজোরাশি বিলীন হইতেছে।" ভাঙা-হৃদয়ে সজল নয়নে নিরুদ্ধশ্বাসে বঙ্কিমচন্দ্র কেমন করিয়া বাঙলার গৌরব-লক্ষ্মীর সেই অন্তর্ধান মানস-পটে দর্শন করিতেছিলেন, তাহার জীবন্ত চিত্র ইহা হইতে আর কিরূপে বেশী প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিতে পারে ? ইহা নিছক স্বাদেশিকতার উচ্ছ্বাস নহে, ইহার ঐতিহাসিক মূল্যও সর্ব্বজন-স্বীকৃত নাও হইতে পারে, কিন্তু ইহা সাহিত্য, এখানে জাগিয়াছে লেখকের সহিত পাঠকের নিবিড়তম হৃদয়ের সংবাদ। বঙ্কিমের ভিতরে যে উন্মাদ স্বদেশপ্রেমিকটি ছিল সে যখন নিছক কতগুলি গালভরা রাজনৈতিক সমস্যার চর্চ্চা না করিয়া নিজেকে রস-স্পন্দনের ভিতরে একেবারে বিলাইয়া দিতে পারিয়াছে সেইখানেই জাতীয়তাবাদ ও সাহিত্যের রূপ গ্রহণ করিয়াছে।

[ক্রমশঃ

কন্যা কুমারিকা

—শ্রীদীনেশ গঙ্গোপাধ্যায়

সুচির কৌমার্য্যময়ী, হে অনূঢ়া কন্যা কুমারিকা
তোমার স্তিমিত ভালে অস্তমান সবিতার শিখা
রক্তিম সিন্দুর টীপ ;
জ্বলিছে তারকা দীপ
ঘনায়িত সন্ধ্যার আকাশে একটি দুইটি করি ;
সে মৃদু আলোর ছায়া
নিস্তরঙ্গ সাগরের বুকে রচিয়াছে কী আকুল মায়া !

সম্মুখে অকূল জল মৃদু লীলায়িত
অর্দ্ধস্ফুট কুলু কুলু ধ্বনি
জাগিছে অনন্ত জুড়ি দিগন্তের হৃদয় ভরিয়া।
সুদূর তটের রেখা ঘন নীল অতীব শ্যামল
অমল আকাশপটে সুনীল বনানী
ঘিরে আছে তাল আর তমালের বন
আজিও তেমনি করে,
যেমন আছিল তারা রামায়ণী দিনে।

*   *   *

রাঘবের পুষ্পরথে সুচিহ্নিতা সীতা,
প্রগল্‌ভ আনন্দে রাম দেখায় প্রিয়ারে
মহাশূন্য হতে অঙ্গুলী সঙ্কেতে
এই কন্যা কুমারিকা ;
এই তালীবন, নিস্তরঙ্গ ধূ-ধূ জলরাশি
সমুদ্র ত্রিবেণী তীর্থ
দেববর্ষ ভারতের চরণ মন্দির।

সম্মুখে ছুটিছে রথ দূরে পঞ্চবটি
অযুত যোজন জুড়ি সীমাহীন দণ্ডক বনানী
অতি দীর্ঘ সুবিশাল দুর্গম বিজন
অনন্ত দিগন্ত ব্যাপী তরঙ্গিত কোটি বৃক্ষচূড়া,
—জনহীন গোদাবরী তীর
বৃক্ষতলে সেই কুঞ্জনীড়
ফুল লতিকার সারি,
কুসুমের তরু
আলবালে যেথা জল দিতেন জানকী,
বনবালা সম প্রতিদিন বনমালা গলায় পরিয়া,
—রঘুনাথ রহিতেন চাহি
নিষ্কলুষ আতপ্ত কাঞ্চন বর্ণা ইক্ষ্বাকুর রাজবধূ পানে,
সোনার হরিণ খেলিত তাহার সনে
বনে বনে প্রভাতে সন্ধ্যায়
নিরালায় বসি রঘুনাথ হেরিতেন সেই চটুল খেলা
কাটিত কতনা বেলা,
হারাণো হরিণ তারে খুঁজে দিতে হায় ;
—ঐ সে অশোক তরু
যাহার মুকুলে
সীতার স্তনাগ্র শোভা ফুটেছিল শত ফুলে ফুলে
বিরহকাতর রাম স্মৃতি-হারে গাঁথিয়া সীতারে—
ওরই ঐ ফুলের মুকুল আপনার শূন্য বক্ষে রাখি,
সীতার বুকেরস্পর্শ চেয়েছিল পেতে।

—রথে বসে নির্ব্বাক জানকী
চেয়ে আছে এক মনে দুরান্তের পানে
ফিরিছে স্বদেশ লক্ষ্মী স্বদেশের ঘরে ;
সলজ্জ গৌরবে মুখ আনত উজ্জ্বল
প্রশান্ত পবিত্র রূপ, ধ্যাননেত্র আয়ত বিস্তৃত
পার্শ্বে বসি শুনিছেন রাঘবের কথা
কত কাল—কত দীর্ঘকাল পরে।

*   *   *

তুমি হেরিয়াছ সেই অপূর্ব্ব সুন্দর ছবি
সোণার পুষ্পকরথে ভারতলক্ষ্মীর ;
তোমারে প্রণাম করি
স্বদেশের যাত্রা তার হয়েছিল সুরু—
দুখানি পেলব হস্ত ফুলদল সম
ছোঁয়ায়ে আপন ভালে সে তোমারে করিল প্রণাম,
নিল তব নাম
মনে মনে হে কন্যা কুমারি !

তোমার এই ক্রমশ বিলীন
আনম্র আকাশ তলে
প্রদোষ সন্ধ্যায়
কবিও রাখিয়া যায়
নতি তার অতি অলখিতে
অলস অনন্ত ছোঁয়া
তোমার চরণ ধোয়া গোধূলীর সমুদ্রসঙ্গীতে।

উচ্ছৃঙ্খল

—শ্রীনীহাররঞ্জন হালদার

কলিকাতায় এক বৃহৎ বাড়ী ভাড়া করিয়া, বিমল অণিমাকে শ্রীরামপুর হইতে লইয়া আসিল, মনে কত আশা—স্বামীস্ত্রীতে সুন্দরভাবে জীবন যাপন করিবে ; কিন্তু হইলে কি হইবে, সংসারযাত্রা সুন্দরভাবে নির্ব্বাহ করিতে হইলে ভগবানের নিকট হইতে যেটুকু আশীর্ব্বাদ পাওয়া দরকার, তাহা বোধহয় বিমলের ভাগ্যে ছিল না। বিমল কলিকাতায় কোন অফিসে বেশ মোটা মাহিনার চাকুরী করে, কিন্তু অণিমার মত স্ত্রী যদি তাহার ভাগ্যে না জুটিত তবে বোধ হয় সে কলিকাতায় আসিয়া পাচশো টাকার পরিবর্ত্তে পঞ্চাশ টাকা উপায় করিতে পারিত কি না সন্দেহ, এই হইল তাহার ধরণ, সব কাজই উচ্ছৃঙ্খলতায় পূর্ণ। অণিমা প্রত্যেক কাজেই বিমলকে হুস্ করিয়া দেয় এবং ইহার যদি কোনদিন ব্যতিক্রম হইল, তবে বিমলও সেদিন সে কাজ করিতে পারিল না। অণিমা যা বলে বিমল ঠিক কলের মতন তাই করিয়া যায়, নিজের বুদ্ধি-বিবেচনার ধার দিয়া সে কোনদিন গমন করে না। অণিমা স্বামীর এই বেহুঁস্ চলার জন্ম যে দুঃখিত নয়—তাহা নহে, কিন্তু বাহিরে সে কোনদিন কিছুই প্রকাশ করে না। স্বামীর প্রত্যেক ভুলই সে ধরিয়া দেয়, বিমলের মাষ্টার হিসাবে নয়, সহকারী হিসাবে। বিমলকে সর্ব্বদাই অণিমা চলাফেরা বিষয়ে ভাল করিতে চায় কিন্তু কোন সময় সে বিমলকে বলে না, "তুমি কিছুই বোঝ না, তোমার বুদ্ধি নেই, ইত্যাদি।"

বিমল সকাল বেলায় চেয়ারে বসিয়া একটা ম্যাগাজিন পড়িতেছিল, ওদিকে যে টেবিলের পরে চা আসিয়া কখন জুড়াইয়া গিয়াছিল, সে দিকে তাহার লক্ষ্যই ছিল না। অণিমা কিছুক্ষণ পরে আসিয়া টেবিলের পাশে দাঁড়াইল।

অণিমা বলিল, "ওকি পড়ছো, ওদিকে যে চা ঘণ্টা দুই আগে এসে ঠাণ্ডা হয়ে গেল।"

বিমল ম্যাগাজিনটার উপর হইতে দৃষ্টিটা সরাইয়া অণিমার পানে চাহিয়া বলিল, "ঠিক ছিল না অণি, গল্পটা পড়তে পড়তে তন্ময় হয়ে গিয়েছিলাম, আচ্ছা আমি খেয়ে নিচ্ছি," এই বলিয়া বিমল হাত দিয়া চায়ের কাপটা টানিল।

অণিমা বলিল, "থাক্, তোমাকে আর ঠাণ্ডা চা খেতে হবে না, আমি আবার গরম চা এনে দিচ্ছি," পরে অণিমা চায়ের কাপটা লইয়া ভিতরে চলিয়া গেল, বিমলও আবার ম্যাগাজিনে মনোযোগ দিল।

অণিমা কিছুক্ষণ পরে চা ও বিস্কুট আনিয়া, টেবিলের উপরে রাখিয়া বলিল, "আর পারি না বাবা, এমনি করে কি রোজ রোজ খাওয়ার জন্যে বলে দিতে হবে।"

বিমল একটু হাসিয়া বলিল, "যতদিন পারো।"

অণিমা গম্ভীর ভাবে বলিল, "তোমার ওহাসি আর আমার ভাল লাগে না, আমার আর বুঝি অন্য কোন কাজ নেই ?"

বিমল চা খাইয়া অণিমার হাত হইতে পানটি লইয়া বলিল, "তোমার আবার কি কাজ, চাকর বাকর ত রয়েছে।"

অণিমা বলিল, "চাকর থাকলে বুঝি তাদের কাজকর্ম্ম কিছুই দেখতে হয় না ; অন্য সবাই পারে, আমি তা পারি না।"

বিমল বলিল, "পারো ত ভালই", এই বলিয়া সে আর একখানা বই লইয়া তাহাতে মনোযোগ দিল।

অণিমা দেওয়ালে ঘড়ির দিকে চাহিয়া দেখিল দশটা প্রায় বাজে, এইবার সে একটু রাগিয়া বলিল "বই ত আর একখানা ওঠালে, ওদিকে যে দশটা বাজতে চললো, আজ বুঝি আর আফিসে যাবে না। হাতের মধ্যে ত দেখছি একটা দামী ঘড়ি বাঁধা রয়েছে।"

এইবার বিমল বই রাখিয়া স্নান করিতে গেল। খাওয়া দাওয়ার পর বিমল যখন আফিসে যাওয়ার জন্য নীচের তলায় নামিতে যাইবে অমনি পশ্চাৎ হইতে ডাক পড়িল, "দাঁড়াও।"

বিমল মুখ ফিরাইয়া বলিল, "কি।"

অণিমা বলিল, "পানটা যে না খেয়েই যাচ্ছিলে।"

বিমল অণিমার কাছে আসিয়া পানটি লইয়া মুখে পুরিল। অণিমা এইবার ভাল ভাবে বিমলকে দেখিয়া বলিল, "ও কি, নেকটাইটা যে বাঁধা হয় নি, এটাও কি আমাকে বলে দিতে

হবে, আমি যদি না ডাকতাম তবে দেখতে পারতে আফিসে গেলে সকলেই কেমন উপহাস করতো।"

বিমল এইবার মনে মনে পরাজয় স্বীকার করিল, তারপর সব ঠিকঠাক করিয়া আফিসে চলিয়া গেল।

বিমল সন্ধ্যার সময় বাসায় আসিয়া অণিমার সম্মুখে টেবিলের উপরে একটি মোড়ক রাখিয়া বলিল, "ঐ নাও তোমার জিনিষ।"

অণিমা আগ্রহ সহকারে জিজ্ঞাসা করিল, "কি জিনিষ?"

"তোমার হার।"

অণিমা মোড়কটি খুলিয়া হারগাছা বাহির করিয়া হাতে করিয়া বলিল, "কত দাম লেগেছে?"

"দেড়শো।"

"বাবার টাকা পাঠিয়েছো ত?"

এ সময়ে যে এ প্রশ্ন উত্থাপিত হইতে পারে, তাহা বিমল কিছুতেই ভাবিতে পারে নাই, কিছুক্ষণ অণিমার পানে চাহিয়া বলিল, "না এ মাসে আর পাঠানো গেল না।"

অণিমা একটু আশ্চর্য্য হইয়া বলিল, "কেন আর টাকা গেল কোথায়?"

"আর সবটাকা—এই, একশো টাকার রেসের টিকিট কিনেছি, আর টাকার মধ্যে লাইফ-ইনসিওর আছে।

"তোমায় রেসের টিকিট কিনতে কে আবার মত দিলো?"

বিমল গায়ের কোটটা আলনার উপরে রাখিয়া বলিল, "একটু ইচ্ছে হল তাই কিনলাম।"

অণিমা বলিল, "গ্রামের পল্লীমঙ্গলের টাকা পাঠিয়েছো?"

"না ওটা ওমাসে পাঠালে চলবে, এমাসে আর কুলোনো যাবে না।"

অণিমা এইবার রাগিয়া গেল, বলিল, "যেটা দরকার সেটা না করে, তুমি কিনা রেসের টিকিট, সোণার গয়না করছো, ওদিকে যে তোমার বাবা বার বার করে টাকার কথা চিঠিতে লিখেছেন, সুধীরও পল্লীমঙ্গলের ওষুধের জন্ত চিঠি লিখেছে। কেন, গয়না ওমাসে কেনা যেতো না, রেসের টিকিটও বা কিনলে কি জন্তে?"

বিমল বোকা চাহনি চাহিয়া বলিল, "অফিসের সকলেই কিনলো, আমাকেও কিনতে হল, আর গয়না ত তুমি নিজেই আনতে বলেছিলে।"

অণিমা বলিল, "আমি ত বলেছিলাম অনেক দিন আগে, কিন্তু চিঠি ত গতকাল পাওয়া গেছে।"

এই বলিয়া অণিমা চুপ করিল; কিছুক্ষণ পরে আস্তে আস্তে বিমলকে বলিল,—

"আচ্ছা দিন দিন তোমার এ কি মতিগতি হচ্ছে, রেসের টিকিট কেনা আরম্ভ করেছো, আর যা আগে করা দরকার, সেটা না করে অন্ত জিনিষে পয়সা ব্যয় করে ফেলছো?"

বিমল কিছুই বলিল না, নিজের ভুল সে এবার বুঝিতে পারিল। পরে অণিমা বলিল,

"আজকাল দেখছি তোমার কোন কাজেই মন লাগে না, আমার সঙ্গে একটু ভাল ভাবে কথা বলো না, নিজের ইচ্ছে মত যা ইচ্ছে তাই করো কিন্তু তাতে ত তোমার কিছু ভাল হচ্ছে না, তবুও না হয় কিছু মনে করতাম না।"

বিমল কিছু না বলিয়া চেয়ারের উপরে আসিয়া বসিল, কোন কথার উত্তর দিল না। অণিমা আরো বলিতে লাগিল, "বিয়ের আগে শুনেছিলাম, তুমি বুদ্ধিমান্, গ্রামের সেরা ছেলে, গ্রামের জন্তে খুব কাজ করো কিন্তু এখন দেখছি যে সব বিপরীত। যারা বলেছে তাদের আজ যদি সম্মুখে পেতাম, তবে দেখিয়ে দিতাম তারা কি মিথ্যাবাদী।

আজ মনের আবেগে নিজেকে আর সংযত করিতে না পারিয়া অণিমা রাগের সহিত বিমলকে অনেক কটু কথাই শুনাইয়া দিল, কিন্তু পরে যখন সে নিজে কি করিয়া ফেলিল তাহা বুঝিতে পারিল তখন মুখ নীচু করিয়া ভিতরে চলিয়া গেল। বিমল বসিয়া বসিয়া অনেক কিছুই চিন্তা করিল, পরে আবার অণিমাকে ডাক দিল। অণিমা আসিয়া বিমলের পাশে দাঁড়াইয়া বলিল, "কি।"

বিমল চাহিয়া দেখিল, অণিমা কাঁদিতেছে, দুই চক্ষু জলে পূর্ণ হইয়া গিয়াছে, আর সেই অশ্রুকণার উপরে গবাক্ষপথ-দিয়া আগত সূর্য্যের কিরণ পতিত হইয়া উজ্জ্বল রূপ ধারণ করিয়াছে।

বিমল আর্দ্রস্বরে বলিল,

"ছি কাঁদছো কেন অণিমা, ও রকম কাঁদতে নেই" এই বলিয়া রুমাল দিয়া অণিমার চোখের জল মুছিয়া দিল।



বাউল [শ্রীরামপ্রসাদ

অণিমা বলিল, "মানুষ কি ইচ্ছে করে কাঁদে, কান্না আসে বলেই কাঁদে।"

বিমল অণিমাকে কোলের কাছে টানিয়া বলিল, "আমি তোমাকে ত কিছু বলিনি, তবে কেন কাঁদছো।"

"বলোনি সত্যি, কিন্তু তোমার ওরকম—" এই বলিতে বলিতে অণিমার কণ্ঠস্বর আবার রুদ্ধ হইয়া আসিল।

অণিমাকে বুকের মধ্যে টানিয়া বিমল বলিল, "ছেলেমানুষী করো না অণিমা," তারপর টেবিল হইতে চুড়ী বাহির করিয়া বলিল, "এই নাও, চুড়ী পরো, জান তো আমি তোমাকে কত ভালবাসি।"

অণিমা বাধা দিয়া বলিল, "থাক্ ও কথা আর তোমাকে বলতে হবে না, যে বাপ-মাকে ভালবাসতে পারে না, গ্রামকে ভালবেসে যে কথা রাখতে পারে না, তার স্ত্রীকে ভালবাসার কোন মানে হয় না। আমি ও চুড়ী পরবো না।"

বিমল বলিল, "এইবার পরো, আমি কথা দিচ্ছি, আসছে মাসে সব পাঠিয়ে দেবো।"

তারপর নিজহাতে বিমল অণিমাকে চুড়ী পরাইয়া দিল। পরে অণিমা গলার উপরে বস্ত্রের অঞ্চল রাখিয়া বিমলকে প্রণাম করিল।

সেদিন বোধ হয় রবিবার। বিমল বাসায় ছিল। দুপুরে সে বোধ হয় ঘুমাইতেছিল। অণিমা তার ঘরে বসিয়া কতকগুলি বস্ত্র ঠিকঠাক করিতেছিল। কতকগুলি বস্ত্র খুলিতে খুলিতে অণিমা একটি অনেকদিনের পুরাণো বাক্স খুলিল, ভিতরে তেমন কোন দামী জিনিষ ছিল না। তবে অণিমা একজন স্ত্রীলোকের ফটো পাইল। মেয়েটির বয়স খুব অল্প, অণিমা অনিমেষ নয়নে ফটোর পানে চাহিয়া রহিল, দৃষ্টি আর ফেরে না, কি সুন্দর মুখ, কি সুন্দর দুটী চক্ষু, দুইটি আঁখির চাহনিতে যেন কত সুখ-দুঃখ মাখান রহিয়াছে। উন্নত নাসিকার নিম্নে দুইটি রঙীন ওষ্ঠ বেশ সুন্দরই দেখাইতেছিল, মস্তকের কৃষ্ণবর্ণ কেশগুচ্ছ গলায় দুই পাশদিয়া বক্ষের উপরে আসিয়া পড়িয়াছে। সুন্দর মুখখানি কালোদীঘির জলে প্রস্ফুটিত লাল পদ্মের ন্যায় প্রতীয়মান হইল। অণিমা মনস্থ করিল সে নিশ্চয়ই এমন সুন্দর ফটোখানা বাঁধাইয়া রাখিবে।

বিকালবেলা বিমল যখন বারান্দায় চেয়ারের উপরে বসিয়াছিল, তখন ফটোখানা লইয়া অণিমা স্বামীর কাছে উপস্থিত হইল।

"অণিমা বিমলকে ফটোখানা দেখাইয়া বলিল, দেখ ত এ ফটোখানা কার? আমি কিন্তু ওটা বাঁধিয়ে রাখবো।"

বিমল, "দেখি" বলিয়া ফটোখানা লইল, সঙ্গে সঙ্গে তাহার মুখের ভাব পরিবর্তিত হইয়া গেল।

অণিমা ইহা লক্ষ্য করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, এ "ফটোখানা কার?"

বিমল উত্তরে বলিল, "এ ত আমাদের গ্রামের বোসেদের বাড়ীর পারুলের ফটো।"

"তার ফটো তোমার কাছে এলো কি করে।"

"এমনিই সে আমাকে দিয়েছিলো!"

অণিমা একটু মৃদু হাসিয়া বলিল, "এমনি কি কেউ কাউকে কোন জিনিষ দেয়? আমার কাছে গোপন করে কি লাভ? বল্লেই ত পারতে তোমাকে আদর করে কিংবা ভালবেসে উপহার দিয়েছিলো, আমি কি তাতে তোমাকে খেয়ে ফেলতাম?"

"আমি যদি সত্যিকথা বলতাম, তবে ত তুমি অনেক কথাই ধারণা করে নিতে।"

"আচ্ছা একটা সামান্য কথাতেই কি মানুষের সম্বন্ধে ধারণা করা যায়, যদিও পারুল তোমাকে ভালবেসে থাকে, তুমি কিন্তু তাকে একটু ভালবাসনি, নৈলে তার ফটোখানা কি অনাদৃত ভাবে রাখতে পারো।"

এই কথাটাই বিমলের অন্তরে ঘা দিল, বিমল রাগের চোটে ফটোখানা ছিঁড়িয়া ফেলিল। অণিমা আর কিছু না বলিয়া সে স্থান ত্যাগ করিল। যাহাকে কোনদিনই দেখে নাই, যাহার সঙ্গে কোনদিন আলাপ-পরিচয় হয় নাই, সেই পারুলের প্রাণহীন ফটোখানার উপরে অণিমার যেন কিরকম মায়া জন্মিয়া গিয়াছিল, ভিতরে আসিয়া সে কাঁদিয়া ফেলিল। রাত্রিবেলা অণিমা আস্তে আস্তে বিমলকে বলিল, "আচ্ছা ফটোখানাকে কেন তুমি নষ্ট করে ফেল্লে, সে তোমার কি ক্ষতি করেছিলো; আমি মনে কত আশা করেছিলাম, ফটোখানা বাঁধিয়ে রাখবো, তুমি আর সেটা হ'তে দিলে না।"

বিমল এইবার অত্যন্ত রাগিয়া বলিল, "আমি যা করেছি

তার কৈফিয়ৎ আমি তোমাকে দেবো না; তোমার জন্য দেখছি আমি আর শান্তিতে থাকতে পারলাম না", এই বলিয়া বিমল মুখ ফিরাইয়া রহিল

অণিমা বিছানার উপরে উঠিয়া বসিয়া বলিল, আমি গেলে তুমি সুখী হবে?"

বিমল কিছু না ভেবেই বলিয়া ফেলিল, "হব।"

"বেশ তা হলে আমি কালকেই চলে যাব বাবার ওখানে?"

বিমল বলিল, "বেশ তাই যেও।"

অণিমা সত্য সত্যই চলিয়া যাইবার জন্য মনস্থ করিল। বিমলও কোন বাধা দিল না। পরদিন যাওয়ার সময় অণিমা বিমলের পদধূলি গ্রহণ করিয়া বলিল, "আমার একটা কথা রাখবে?"

বিমল বলিল, "রাখবো বলো।"

"শরীরের প্রতি যত্ন রেখো, আর কোন অসুখ বিসুখ হলে আমাকে খবর দেবে ত?"

"আচ্ছা দেবো।"

অণিমা কিছুদূর অগ্রসর হইয়া আবার বিমলের কাছে আসিয়া বলিল, "যাবার সময় আর একটা কথা জিজ্ঞাসা করবো, তার ঠিক উত্তর দেবে ত?"

"দেবো, বলো না।"

"পারুলের কি বিয়ে হয়ে গেছে?"

"না, কেন?"

অণিমা বলিল, তোমাকে তাকে বিয়ে করতেই হবে, যদিও সে কায়েত, তবু আমি সমাজের সমস্ত নিয়ম অমান্য করে তোমার সেবাতেই তাকে আমি নিযুক্ত করবো, বামুনের ছেলের সঙ্গে কায়েতের মেয়ের ঠিক বিয়ে হতে পারে," এই বলিয়া অণিমা অশ্রুপূর্ণ নয়নে মোটরে গিয়া

বিমল তন্দ্রাচ্ছন্নের ন্যায় সেখানে দাঁড়াইয়া রহিল, ইচ্ছা হইতেছিল এখনই অণিমাকে নামাইয়া লইয়া আসে, কিন্তু কিছুই যে করিতে পারিল না; অণিমা বিমলের পানে একবার করুণাপূর্ণ দৃষ্টিতে চাহিল, সঙ্গে সঙ্গে মোটরও ছাড়িয়া দিল। জানি না কিসের জন্যে বিমলের চোখ দিয়া আজ দুইফোটা অশ্রু গড়াইয়া পড়িল। সেদিন আর বিমল ভ্রমণে বাহির হইল না, সারাদিন বাসাতেই একাকী কাটাইয়া দিল।

অণিমাও চলিয়া গেল, সঙ্গে সঙ্গে বিমলের সংসারের গৃহলক্ষ্মীও বিদায় লইলেন। বিমল তাহার নূতন মোটর বিক্রী করিয়া আগেকার ভাল বাড়ী ত্যাগ করিয়া একটা বাজে বাড়ী ভাড়া করিল। সব চাকরগণকে বিদায় দিয়া, সে মাত্র একটি চাকর রাখিয়া আসবাবপত্র সব বিক্রী করিয়া ফেলিল। এই পৃথিবীতে সবই পরিবর্ত্তনশীল, কোন জিনিষের স্থায়িত্বের কথা কেউ কোনদিন জোর করিয়া বলিতে পারে না। বন্যপশুর আবাসস্থল, মানুষের অগম্য দুর্গম বনও বিশাল সৌন্দর্য্যপূর্ণ নগরে পরিণত হইতে পারে, আবার সুন্দর নগরও কালের কপালে ধ্বংসস্তূপে পরিণত হইতে পারে। আজ যাহাকে ভাল মনে করিয়া আদর করিল, কাল হয়ত তাহাকেই কেহই দেখিবে না, ঘৃণা বলিয়া নিজের গৃহ হইতে বিতাড়িত করিয়া দিবে।

যে বিমল গ্রামের মধ্যে বিদ্যায়, বুদ্ধিতে, দক্ষতায় শ্রেষ্ঠ ছিল, সেই বিমল আজ অধঃপতনের শেষ সীমায়। যে বিমল কোনদিন বিঁড়ি, সিগারেট স্পর্শ করিত না, তাহারই সম্মুখে আজ মদের বোতল, আশ্চর্য্য, নয় কি? গৃহের চাকর সাধু দূরে দাঁড়াইয়া প্রভুর পানে তাকাইয়া সব দেখিতেছিল, ভাবিতেছিল প্রভুর কেন এরূপ দশা হইল? এর সমাধান কি? তাহা সে কিছুতেই বুঝিতে পারিল না। সাধু ভাবিল, "অণিমা চলিয়া যাওয়ার পর হইতেই ত প্রভুর এই দুর্দ্দশা, নিশ্চয়ই ভিতরে কোন মনোমালিন্য হইয়াছে, কিন্তু অণিমা কেন এরূপ ব্যবহার করিবে? ইহা সে কিছুতেই ধারণা করিতে পারিল না, চাকর হিসাবে ত সে কোনদিন তার কাছ হইতে অসদ্ব্যবহার পায় নাই। বিমল আবার মদের বোতল খুলিল, গৃহের বাতাস গন্ধে ভরপুর হইয়া উঠিল, গ্লাসে মদ পূর্ণ হইল, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই বাধা, সম্মুখে উপস্থিত হইল বাড়ীওয়ালা। বাড়ীওয়ালা সম্মুখে আসিয়া বলিল, "দেখুন টাকা দিয়া থাকেন বলে আমার বাড়ীতে যা ইচ্ছে তাই করবেন, তা পারবেন না।"

বিমল দুই চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া বলিল, "কেন পারবো না মশাই, আমি ত কারু কোন ক্ষতি করছি না," এই বলিয়া গ্লাস ধরিয়া চুমুক দিল।

বাড়ীওয়ালা কাণ্ড দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়া বলিল, "দেখুন আপনার ভালর জন্যই বলছি, মদ খাবেন না, দেখুন পাশে ভাড়াটেরা থাকে, তাদেরও মেয়েছেলে আছে। যদি নেশার আতিশয্যে আপনি কিছু করে বসেন, তখন কি হবে বলুন ত ?"

বিমল হাসিয়া বলিল, "এই কথা আপনি বলছেন, কোন ভয় নেই, আমি মাতাল নই, তবে মদ খাচ্ছি বাধ্য হয়ে, আর উপায় নেই ; তাদের বলে দেবেন, যদিও আমি নিজের অস্তিত্ব সম্বন্ধে দিশেহারা হয়েছি, তবু এখনও স্ত্রীলোকের সতীত্বের মর্য্যাদা সম্বন্ধে কাণ্ডজ্ঞানরহিত হই নি। যদি কোনদিন কিছু করে বসি, তবে সেদিন আমাকে এ বাড়ী ত্যাগ করতে বলবেন, আমি অম্লান বদনে এখান থেকে চলে যাব।"

বাড়ীওয়ালা ইহা শুনিয়া চলিয়া গেল। পরে বিমল অদূরে সাধুর পানে চাহিয়া বলিল, দেখছিস, সব ভোলবার জন্য একটু মদ খাব, তাও বেটারা খেতে দেবে না।

অণিমা গিয়াছে তার পিতার কাছে। সেখানে গিয়া অণিমা বিমলের কাছে মাত্র একখানা পত্র লিখিয়াছে, পত্রের সারমর্ম্ম এইরূপ, আমি তোমার কাছে অশান্তির কারণ হইয়া থাকিতে চাহি না, যদি তুমি আমার উপস্থিতি সুখজনক মনে করো, সেই দিন আমি তোমার কাছে আসিব। আমার একান্ত অনুরোধ, শরীরের প্রতি যত্ন রাখিও। তোমার সুখের ভোগী হইয়া আমি সইতে চাহি না, কিন্তু তোমার অসুবিধার সময় যেন তোমার কাছে গিয়া সাহায্য করিতে পারি, নিজের অসুখের সময় যেন চাকরের দ্বারাও লিখিত পত্র পাই, ইত্যাদি। ইহা অণিমার অভিমানী ছন্দ নহে, ইহা একেবারে অন্তরের কথা, পত্র পাইয়া বিমল অনেকক্ষণ চিন্তা করিল, ভাবিল, অণিমাকে লইয়া আসিয়া তাহার কাছে দোষ স্বীকার করিয়া ক্ষমা চাহিবে। স্ত্রীর কাছে ক্ষমা, বিমল শিহরিয়া উঠিল, কেন সে ত কোন দোষ করে নাই ! ভালবাসা কি দোষ, পারুলকে ভালবাসিয়া সে কি দোষ করিয়াছিল, তবে কার দোষ, কার ভুল ? যার জন্যে এত-গুলি জীবন আজ মরণের মুখে ; সে আজ নির্দ্দোষ হইয়া দূরে দাঁড়াইয়া হাসিতেছে।

পারুলের সহিত বিমলের পরিণয় সম্বন্ধে কিছু বলিতে হইতেছে। তাদের বাড়ী বিমলদের বাড়ীর কাছাকাছি অবস্থিত। ছোট বেলা হইতে পরস্পরের ভিতর যাতায়াতে ইহাদের ভালবাসা হয়, এবং ইহা গ্রামের সকলে জানিত। বিমল চিরদিন পারুলকে বলিয়া আসিয়াছিল, "আমি তোমাকে বিয়ে করবই।" কিন্তু একদিন পারুল নিজের বুকখানা শক্ত করিয়া বিমলকে বলিল,—

"তুমি আর আমার কাছে এসো না, বড় লোক ব্রাহ্মণের ছেলের সঙ্গে গরীব কায়েতের মেয়ের বিয়ে এ গ্রামে কিছুতেই হবে না। শুধু শুধু আমাদের ভবিষ্যত জীবনটা তিক্ত হবে মাত্র।"

বিমল উত্তরে বলিয়াছিল, পারুল, তুমি ও রকম কথা বলো না, "আমাদের ভালবাসার কি কোন মূল্য নেই, বেশ আমি আর আসবো না, কিন্তু যেদিন আসবো সেদিন তোমাকে নিজের করে নেবার শক্তি নিয়েই আসবো।" ইহার পরে বিমল আর পারুলের সঙ্গে একদিনও দেখা করে নাই। তারপর একদিন বিমলের পিতা বিমলের সঙ্গে কোন এক জমিদারকন্যার বিবাহ ঠিক করিয়া বিমলকে সব বলিলেন। বিমল একবারে অমত দিল, তারপর হইল পিতা-পুত্রের মধ্যে বিরোধ। দারুণ দুঃখে বিমল বিনা সম্বলেই গৃহ ত্যাগ করিয়া কলিকাতায় চলিয়া আসিল ; কলিকাতায় আসিয়াও বিপদ, পয়সা কড়ির অভাব, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত আশ্রয় পাইল অণিমার পিতার কাছে এবং চাকরীও পাইল। চাকুরীর মূল্য হিসাবে অণিমার পিতা অণিমার বিবাহ প্রস্তাব উত্থাপিত করিলেন ; কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় বিমল গ্রাম্য বালিকা পারুলের কথা ভুলিয়া চাকুরীর কথা চিন্তা করিল এবং আশ্রয়-দাতার প্রত্যুপকার হিসাবে বিবাহের প্রস্তাবে সম্মতি দিল, সঙ্গে সঙ্গে তিনজন মানুষের জীবনের ধারা পরিবর্ত্তিত হইল। অণিমার পিতা আজকাল চাকুরী ছাড়িয়া শ্রীরামপুরে আসিয়াছেন, সেখানেই তাঁহার আসল বাড়ী।

এখানে আসিয়া অণিমা বিমলের কথা কিছুই জানিতে পারিল না, এখানে আসিয়া অণিমা দিন দিন শীর্ণকায়া হইয়া যাইতে লাগিল, মুখে সে সৌন্দর্য্য নেই, চোখে সে জ্যোতিঃ নেই, পায়ে সে গতি নেই, আছে শুধু বিষাদভরা দেহখানা। সকাল-সন্ধ্যায় ঠাকুর ঘরে গিয়া যখন সে ভগবানের কাছে স্বামীর উদ্দেশ্যে মঙ্গল প্রার্থনা করিয়া নীরবে অশ্রুবিসর্জ্জন করিয়া থাকে, তখন কে যেন তাহার কাণে বলিয়া দেয় ; কার জন্যে এত করছো

সে যে তোমাকে একদিনের তরেও ভালবাসেনি। অণিমা আপন মনে নিজের কাজ করিয়া যায়, কিছুই পায় না। এখানে আসিয়াই অণিমা তার শ্বশুরালয়ে একজন চতুর লোক পাঠাইল। শ্রীশ রাধুপুরে যাইয়া অণিমার কথামতই রটনা করিল, সে কুলটা, বিমলের সঙ্গে রাগারাগি করিয়া পিত্রালয়ে চলিয়া আসিয়াছে। শ্রীশ বিমলের পিতার সহিত দেখা করিয়া আগেকার সব কথা বলিয়া, বিমলের সঙ্গে পারুলের বিবাহ প্রস্তাব করিল। বিমলের পিতা প্রথমে মত দিলেন, কিন্তু পরে বলিলেন, "আমার কথায় ত হবে না, সমাজের মত নিতে হবে, না, তা হবে না শ্রীশ।"

শ্রীশ বিমলের পিতার দুই রকম কথা শুনিয়া বলিল, "কেন?"

"না বাপু, ছেলের জন্তে আমরা একঘরে হতে পারবো না।"

শ্রীশ ইহার পরে পারুলের সঙ্গে দেখা করিল, পারুল একবার শ্রীশের সম্মুখে আসিয়া সব কথা শুনিয়া কিছু না বলিয়াই চলিয়া গেল, কোন কথা বলিল না। শ্রীশ অলক্ষ্যে দেখিতে পাইল, পারুলের কাতর আঁখি জলে পরিপূর্ণ হইয়া দরদর করিতেছে। ইহার পরে শ্রীশ ভগ্নোমনোরথ হইয়া শ্রীরামপুরে চলিয়া গেল। ইহার কিছুদিন পরে কলিকাতায় কাজ করে এমন একজন চল্লিশ বৎসরবয়স্ক বৃদ্ধের সহিত পারুলের বিবাহ হইয়া গেল; পারুলের অগাধ রূপ-যৌবন কেন যে আশে-পাশের গ্রামের যুবকদের মন আকর্ষণ করিতে পারিল না, তাহা ঠিক বলিতে পারিলাম না। পারুলের স্বামীর নাম রাধাচরণ, কলিকাতার কোন ব্যবসায়ীর দোকানে কাজ করেন, এবং চল্লিশ বৎসরের মধ্যে যে বেশ টাকাকড়ি জমাইয়া ফেলিয়াছেন, তাহা তাঁহার সন্ত টাক দেখিয়া বেশ অনুমান করিতে পারা যায়। বিবাহে এক হাজার টাকা যৌতুকও মিলিয়াছে, তাহাও নাকি অণিমার পিতা সব দেন নাই, গ্রামের জমিদার নাকি কিছু সাহায্য করিয়াছেন। এই বিবাহের সময় পারুল যখন গ্রামের জমিদার, সম্বন্ধে জ্যাঠা-মশাইকে প্রণাম করিতে গিয়াছিল তখন তিনি এই বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়াছিলেন, "স্বামীর ঘর আলো করবে মা।" পারুল মনে মনে বলিয়াছিল, "চেষ্টা করবো," এ যেন মানুষকে বিষদান করিয়া, পরে ভাল ডাক্তারের চেষ্টা করা, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত সবই বিফলে চলিয়া যায়। এ বিবাহে যে পারুল সুখী হয় নাই, তাহা বোধ হয় পাঠকগণ বুঝিতে পারিয়াছেন, কিন্তু তাই বলিয়া পারুল কোনদিন অদৃষ্টকে ধিক্কার দেয় নাই, জানে এ জীবনে বিমলকে না মিলিলেও পরজীবনে নিশ্চয়ই মিলিবে।

সেদিন বৈকালবেলা পারুল তাহার বাসার বারান্দার উপরে দাঁড়াইয়াছিল এবং বাহিরের কত জিনিষ দেখিতেছিল, ইচ্ছা হইতেছিল একটু বাহিরে বেড়াইতে যায় কিন্তু কে লইয়া যাইবে, স্বামী ত সব সময়ই কাজে ব্যস্ত, এ পর্য্যন্ত একদিনও কলিকাতায় আসিয়া পারুল ঘর হইতে বাহির হয় নাই। রাস্তা দিয়া কতলোক যাইতেছিল, কতলোক আসিতেছিল। হঠাৎ ফুটপাতে একজনের উপর পারুলের দৃষ্টি পড়িল, পারুল জন্মেও ধারণা করে নাই, তাহাকে এই রকম ভাবে, নিজের গৃহদ্বারে পাইবে। পারুলের মুখে একটু হাসি ফুটিয়া উঠিল, ঐ ত সেই যাকে একদিন সে প্রাণমন দিয়া ভালবাসিয়াছিল, এই ত সেই বিমল, পারুল তাড়াতাড়ি তাহার চাকরকে বিমলকে ডাকিয়া আনিতে পাঠাইল। চাকরটি বিমলের কাছে গিয়া ডাকার কথা বলিলে, বিমল বলিল, "কে আমাকে ডাকছে?"

"চাকরটি বলিল, আমার মা আপনাকে ডাকছেন।"

"মা কে তোমার? নাম বলতে পার না?" বিমল সত্য সত্যই বিরক্তি বোধ করিল। নেশায় সে টলিতেছিল, কিছুতেই তাহার ভাল লাগিতেছিল না। পরে পারুলের নাম শুনিয়াই বিমল তাড়াতাড়ি সিঁড়ি বাহিয়া উপরে উঠিল। পারুল বিমলকে দেখিয়া একেবারে হতভম্ব হইয়া গেল, বিমলের সে চেহারা নেই, শরীরের আমূল পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে, গায়ের রং কালো হইয়া গিয়াছে, মাথা ভরা একরাশ লম্বা চুল, তাহাতে তেলের লেশ মাত্রও নাই, চোখ দুটো কোটরগত, কাপড় চোপড় অপরিস্কার, দাঁতগুলিতে ময়লা হইয়া গিয়াছে। দেখিয়া মনে হয়, কতদিন অনাহারে অনিদ্রায় কাটাইয়াছে। পারুল বিমলকে দেখিয়া প্রথমে কোন কথা বলিতে পারিল না, অপলক নয়নে বিমলের পানে চাহিয়া রহিল। পারুলের কপালের সিঁদুর দেখিয়া বিমল বলিল, কবে বিয়ে হল পারুল?

পারুল বলিল, "এই ত চার মাস।"

বিমল রেলিং ধরিয়া বলিল, "তোর স্বামী কোথায়?"

"আফিসে গিয়েছেন, রাত দশটায় আসবেন।" কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া পারুল বলিল, আচ্ছা বিমলদা, শরীরটাকে এমন করে কেন নষ্ট করে ফেললে ?"

"কি করবো, আর যে কোন উপায় নেই।"

"কেন তোমার কি হয়েছে, অণিমা কি এখানে নেই ?

"না, তাকে তাড়িয়ে দিয়েছি পারুল।"

"কেন তাড়িয়ে দিলে, সে কি তোমায় ভালবাসতো না ?"

"হাঁ, ভালবাসতো, কিন্তু আমি যে তাকে চিরদিনই অবহেলা করেছি।" তারপর থামিয়া বিমল বলিল, "আমি যাই পারুল রাত হয়ে গেল, আর থাকতে পারছি না, আমার জ্বর আসছে।"

সত্যি সত্যিই বিমলের জ্বর আসিয়া সমস্ত অঙ্গ কাঁপাইয়া দিল।

পারুল বলিল, "না, আমাদের এখানে থাকো, তোমাকে আমি যেতে দেবো না।"

বিমল একটু ক্ষীণ হাসি হাসিয়া বলিল, "তা কি হয় পারুল, তোর স্বামী এসেই যে তোকে গাল দেবে'খন, কোথাকার কোন মাতাল বাড়ীতে আশ্রয় নিয়েছে বলে।"

পারুল বলিল, "তুমি মাতাল হও, যাই হও, তোমাকে আমি কিছুতেই যেতে দেবো না, তাতে আমার ভাগ্যে যা হয় তাই হবে।" তারপর মনে মনে বলিল, "তুমি যে আমার কাছে কত বড় জিনিষ তা কি তুমি জান না ?"

বিমল বলিল, "না পারুল, আমি চলে যাই।"

এই বলিয়া সে গমনে উদ্যত হইল।

পারুল তাড়াতাড়ি বিমলের হাত ধরিয়া বলিল, "না তুমি যেতে পারবে না, তোমার দুটি পায়ে পড়ি।" এই বলিয়া তাকে টানিয়া আনিয়া বিছানায় শোয়াইল।

এইবার বিমলের কম্প দিয়া জ্বর আসিল, পারুল যে কি করিবে, তাহা সে কিছুই ঠিক করিতে পারিল না, বাধ্য হইয়া রাধাচরণকে খবর দিল। রাধাচরণ বাসায় আসিয়া সব ব্যাপার দেখিয়া ত অবাক, জিজ্ঞাসা করিল, "এ আবার কে।" পারুল কোনরকমে বিমলের পরিচয় দিয়া বলিল, "ডাক্তার নিয়ে এসো, যাও।" রাধাচরণ প্রথমে ইতস্ততঃ করিতে লাগিল। পরে পারুলের তাড়নায় ডাক্তার আনাইল। ডাক্তার আসিয়া দেখিয়া শুনিয়া কিছু ঔষধ দিয়া বলিল, "তেমন বিশেষ কিছু হয় নি, তবে লিভারটা মদ খাওয়ার দরুণ খারাপ হয়ে গেছে।"

পারুল বিমলের মাথায় বাতাস করিতে করিতে বলিল, "সেরে যাবে ত' ডাক্তারবাবু ? সত্যি কথা বলুন ?"

ডাক্তার আশ্বাস দিয়া চলিয়া গেল। রাধাচরণ রাত দশটা পর্য্যন্ত দেখিয়া শুনিয়া শুইয়া পড়িল। পারুল বিমলের শিয়রে বসিয়া আছে, আর কাঁদিতেছে। কাঁদিয়াও কূল পাইতেছে না।

বিমল পারুলকে কাঁদিতে দেখিয়া বলিল, "ছিঃ পারুল, কেঁদো না, দেখো আমি আবার ভাল হয়ে যাব।"

পারুল বলিল, "দেখা দেবে ত ভাল হয়ে, কেন দেখা দিলে না, আমাকে কষ্ট দিতেই কি তুমি আসলে, কত আশা ছিল, বিমলদা।"

এই বলিতে বলিতে পারুল আর নিজেকে রক্ষা করিতে পারিল না, বিমলের মাথার শিয়রে মাথা গুজিয়া কাঁদিতে লাগিল।

পরে বিমল বিছানার উপরে উঠিয়া বসিয়া মাতালের ন্যায় বলিতে লাগিল, "চল পারুল, আমরা পালিয়ে যাই, আমার ওখানে তোমাকে খুব সুখে রাখবো।"

পারুল বলিল, 'বিমল তুমি সেরে উঠ।" এই বলিয়া বিমলকে জোর করিয়া বিছানায় শোয়াইল।

বিমল আবার মদ মদ বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল।

পারুল মিছরির জল গ্লাসে করিয়া দিতে লাগিল, বিমল তাহাই মদ ধারণা করিয়া পান করিতে লাগিল। এদিকে একটা কথা লিখিতে ভুলিয়া গিয়াছি। রাত্রি আটটার ট্রেনেই অণিমাকে শ্রীরামপুর হইতে আনিবার জন্য পারুল চাকরকে পাঠাইয়া দিয়াছিল।

রাত্রি যতই অধিক হইতে লাগিল, ততই বিমলের অবস্থা খারাপ হইতে লাগিল। অত্যধিক মদ্যপানের ফলে আজ সে সত্যই কাণ্ডজ্ঞানরহিত হইয়া গেল। একবার সে বিছানার উপরে উঠিয়া প্রলাপ বকিতে বকিতে পারুলকে ধরিয়া ফেলিল, পারুল নিজেকে মুক্ত করিয়া বলিল, "ছিঃ, ওরকম করো না বিমলদা, আমার যে স্বামী আছে।" এইবার বিমল বিছানার উপরে শুইয়া পড়িয়া গড়াইতে লাগিল, পারুল আর কি করিবে, ভগবানের নাম স্মরণ করিতে লাগিল।

পাঁচটার ট্রেনে অণিমা তাহার ছোট ভাইকে লইয়া চলিয়া আসিল। অণিমাকে দেখিবার জন্যই বোধ হয় বিমলের আত্মা এতক্ষণ দেহেতে ছিল, অণিমা যখন আসিয়া বিমলের শিয়রে বসিল, তখন সে বাক্‌শক্তি রহিত। বিমল অণিমার পানে মাত্র একবার চাহিল, তারপরে উদ্ধের দিকে চাহিয়া দুই চক্ষু মুদিল, সঙ্গে সঙ্গে দুইজন নারীর তপ্ত অশ্রুজল বিমলের বক্ষ ভাসাইয়া দিল। যখন বিমলের আত্মা এই পৃথিবী ছাড়িয়া অনন্তধামে চলিয়া গেল তখন বাহিরে সবেমাত্র নূতন ঊষার আলোকপাত হইয়াছে।



—শ্রীকিরণবালা দেবী

ছোট বেলায় কিরূপ ব্রত নিয়মের মধ্য দিয়া আমাদের শিক্ষা হইত গত ভাদ্র সংখ্যায় তাহা বলিয়াছি। প্রথম হইতেই আমরা যে ঔষধ-পত্রাদি শিখিতাম তাহা বলি নাই। বাড়ীতে শিশুদের অসুখ-বিসুখ হইলে সর্ব্বদা ডাক্তার, কবিরাজ ডাকা কঠিন হইত। আর ডাক্তার কবিরাজ সর্ব্বদা পল্লীগ্রামে পাওয়াও যায় না, বিশেষতঃ পূর্ব্বে পল্লীগ্রামে পাশ করা ডাক্তার কবিরাজ পাওয়াও যাইত না, এমতাবস্থায়



রোগের পরিচর্য্যা

সকল বাড়ীতে প্রবীণা মহিলারা যে সমস্ত টোট্কা টাট্কি ঔষধ দিতেন তাহাতেই অনেক কাজ হইত। আমার শ্বশুর বাড়ীতে এক মহিলা ছিলেন, তাঁহাকে আমরা ধন-দিদিমা বলিয়া ডাকিতাম। গাছ-পাতার এমন সুন্দর ব্যবহার তিনি জানিতেন যে সার্জ্জারির ডাক্তাররাও তাঁহার কাছে হার মানিত। যাহারই যত বড় ফোঁড়া বা ঘা হইত না কেন, তিনি গাছ-পাতা দিয়া তাহা ভাল করিতেন, এমন কি কর্ব্বাঙ্কল পর্য্যন্ত সারিয়া যাইত। যত গভীরই কেন কোন ফোঁড়ার মুখ হউক না, তিনি পাতা একটু পেতো করিয়া দিলে ঘা ক্রমে সমান হইয়া যাইত, কোন ফোঁড়ার যদি অনেকগুলি মুখ হইত ক্রমে তাহা ভাল হইয়া যাইত। ঘা যত পুরাতন বা পচা হউক না কেন, তিনি পাতা দিয়া বাঁধিয়া দিতেন, ক্রমে উহা তাজা হইয়া উঠিত। ইহাতে তিনি কোন পয়সা নিতেন না। তবে তিনি কখনও কাহাকেও শিখাইতেন না, কাহার জানি মানা ছিল। এই ধন-দিদিমাকে ছেলে বুড়ো সকলেই ভয় করিত। ছেলের ছেলের ঝগড়া হইলে তিনি আসিয়া দাঁড়াইতেই সব ঠাণ্ডা হইয়া যাইত।

এই তো বলিলাম ঘা, ফোঁড়া বিস্ফোটকের কথা। ছেলেদের অসুখ বিসুখ হইলে বাড়ীর মহিলারা টোট্কা ঔষধ দিতেন। কোন ছোট ছেলের পেটের-অসুখ হইলে চুণের জল খাওয়াইয়া সারাইতেন। ছেলেপিলেদের গায়ে ফোঁড়া পাঁচড়া হইলে সোহাগার খই ফুটাইয়া মধু দিয়া মাড়িয়া দিতেন। প্রতি বাড়ীতেই শিউলী গাছ থাকিত। ইহাকে পাড়াগাঁয়ে শেফালিকা গাছ বলে। এই গাছের পাতার রস একটু সৈন্ধব লবণ দিয়া খাওয়াইয়া কত ছেলে (ছোট বা বয়স্ক) ভাল করা হইত। আদার রসে সর্দ্দিকাশি সারিত। সকাল বেলা আগে ছেলে বুড়ো অনেকেই আদার কুচি লবণ দিয়া খাইত, তাহাতে ব্যারাম-পীড়া খুব কম হইত। কোষ্ঠ বদ্ধ হইলে পুরাতন গুড় ও হরিতকী একসঙ্গে খাইলে প্রায় সারিয়া যাইত। পল্লীগ্রামে শুধু হরিতকীর খুব প্রচলন ছিল। এখন আর ঐসব শুনি না। কার্ত্তিক মাসে জর-জারি

সর্ব্বত্রই খুব বেশী হয়, কিন্তু তখন চিরতা ভিজান জল খাওয়ার একটা প্রথা ছিল। ঐ সময়টা পিত্তের সময়, চিরতা ভিজান জল, পলতার রস, প্রভৃতিতে জ্বর নিবারণ হইত। পাঁচড়া হইলেও দেখিতাম সরিষার তেলের সঙ্গে নিমপাতা ভাঁজিয়া দেওয়া হইত। এইসব টোটকা ঔষধে কত উপকার হইত। এখন সে সকলের কেউ তোয়াক্কাও রাখেন না। কুটজ গাছ, অশোক গাছ কোন বাড়ী থাকিলে, সেই বাক্‌লা কত স্থান হইতে নিতে আসিত তাহার ইয়ত্তা নাই।

একটু শরীর খারাপ হইলেই ছেলেপিলেকে একাদশী বা পুর্ণিমা, অমাবস্যায় ভাত খাইতে দেওয়া হইত না। আর একটা খুব ভাল নিয়ম ছিল, বাড়ীর বর্ষীয়সী মহিলারা, ছেলেদের কি বউদের পায়খানা হইতে আসিলে সকলকেই কাপড় ছাড়াইয়া আনিতেন। এই নিয়মটী স্বাস্থ্যের পক্ষে খুবই ভাল নিয়ম, কিন্তু আজকাল দেখিতেছি বড় প্রতিপালিত হয় না। তখনকার দিনে ছেলেপিলের জুতা বাহিরে রাখিয়া আসিয়া খাইতে বসিত। জুতা পরিয়া নানা স্থানে যাইতে হয়। সে সমস্ত স্থান অস্বাস্থ্যকর হইলে উহার বীজাণু খাওয়ার স্থানে যাহাতে না আসে তাহাই করা ভাল। এ সমস্ত বিষয় অন্তঃপুর মহিলাদের খুবই দেখা কর্ত্তব্য। কিন্তু আজকাল ইংরাজী শিক্ষা ও সভ্যতার দিন। এসব কথা পড়িলে নব্যেরা আমাদিগকে সেকেলে বলিয়াই উড়াইয়া দিবেন! কিন্তু এসমস্ত বিষয়ে বিশেষ সতর্কতা আবশ্যক।

অনেক ঔষধের কথা বলিয়াছি কিন্তু দুই একটী মিষ্টি জিনিষের কথা বলি নাই। জ্যৈষ্ঠমাসে আমের রসে আমসত্ত্ব দেওয়ার প্রচলন ছিল। প্রতি বাড়ীতেই প্রায় আমসত্ত্ব দেওয়া হইত। তখন প্রতি বাড়ীতেই মহিলারা বাড়ীতে সংখ্যায় বেশী থাকিতেন। কর্ত্তারা বিদেশে চাকুরী করিতেন বটে, কিন্তু পরিবার লইয়া যাইবার এত ধুম ছিল না। মহিলারা পূজার ছুটিতে স্বামী-পুত্রদের আমসত্ত্ব খাওয়াইয়া আম খাওয়ানের সখ মিটাইতেন। আমসত্ত্ব হইত নানা রকমের। আমের ছাকা অংশ দিয়া হইত একটু মোটা ধরণের। মিহি গোলা দিয়া হইত বেশ ভাল। আম যদি টক্ হইত, তবে আমসত্ত্বও টক্ মনে হইত। গোলাতে চিনি দিলে বেশ মিষ্ট হইত। কখনও কখনও উহার সঙ্গে ক্ষীর ও চিনি মিশ্রিত করিয়া শুকাইলে অপূর্ব্ব আমসত্ত্ব হইত। ইহা অতি উপাদেয় সামগ্রী এবং পূজায় গৃহাগত বাবুর দল বেশ আনন্দ করিয়া উহা উপভোগ করিতেন।

পুরাতন আমসত্ত্ব পেটের ব্যারামের একটী মহৌষধ। আর শরৎকালে বা গরমের সময় আমসত্ত্ব ভিজান জলে পিত্তের প্রকোপ কমিয়া যায়, পিপাসা দূর হয় ও ক্ষুধা বৃদ্ধি পায়। কাঁচা আমের আমশীও খুব উপকারী জিনিষ। ক্রমে ক্রমে সব জিনিষই লোপ পাইয়াছে।



……আমসত্ত্ব দেওয়ার প্রচলন ছিল

পূজার কথা বলিতে বলিতে ৺দুর্গা পূজার কথা মনে হইল। সম্প্রতি ব্রতপক্ষ শেষ হইয়া তর্পণপক্ষে চলিতেছে, সম্মুখেই দেবীপক্ষ আসিতেছে। সম্মুখেই পূজা, মা আসিবেন। বর্ষার সময় ঘরের বাহির হওয়া মুস্কিল হইত, সর্ব্বত্রই জল। শরতে জল কমিয়া যায় আকাশ নবরূপ ধারণ করে। নদী, খাল, বিল স্বচ্ছসলিলা হয়। প্রকৃতিও সুন্দর হয়। মনও প্রফুল্ল হইয়া উঠে। মনে আশা হইত এই শূন্যদেশ আবার লোকে ভরিয়া যাইবে, আবার আপন জন দেখিতে পাইব, আবার বালক বালিকাগণের কলকোলাহলে পল্লীগ্রাম মুখরিত হইয়া উঠিবে। হায়, সেই সব এখন কোথায় গেল —আজকাল সেই আনন্দ নাই, সেই উৎসাহ নাই, সেই আশার ভাব নাই। আজ পল্লীগৃহ শূন্য, দেশবাসী বুভুক্ষিত, ক্রীড়াভূমি নীরব।

ওঃ, পূজার সময় কি আনন্দই না হইত! নৌকায় করিয়া একগ্রাম হইতে আর একগ্রামে আত্মীয় স্বজনের সঙ্গে দেখা করিতে যাওয়া আসা হইত। এইবার পূজা হইবে আশ্বিনের প্রথম দিকে। এখনও মাঠে জল আছে। মাঠের উপর দিয়া নৌকা বাহিয়া যাইত আর ছেলেরা স্বচ্ছ বিলের জলে মাছের শোভা দেখিত। নৌকা যাইত পালের বাতাসে—শোঁ শোঁ শব্দ হইত, মনে হইত যেন ষ্টীমারের মত চলিতেছে। স্রোত বিপরীত-মুখী না হইলে নদী বা খাল দিয়া আসা



……নৌকায় বেড়াইতে কি আনন্দ!

হইত। মাঝি বৈঠা দিয়া নৌকা বাহিত। সন্ধ্যা হইলেই মাঝি গান ধরিত—

"মন মাঝি তোর বৈঠা নেরে"

আহা, সেই টানা টানা গান কত সুন্দর লাগিত। জল কমিয়া গেলে খাল নদী দিয়া যাইতে হইত আর উজান নৌকায় গুণ চলিত।

বর্ষা গিয়াছে, মাছের অভাব গিয়াছে, বেড়জালে কত মাছ পড়িতেছে। কর্ত্তারা মাছ পাইয়া বেশী করিয়া ভাত খাইতেন।

এই পূজার সময়েই আমাদের ডাক পড়িত। নিমন্ত্রণ বাড়ীতে পাড়ায় যে সমস্ত গিন্নী বা বৌ ভাল রাঁধে, তাহাদের কত আদর হইত। সকলে মিলিয়া আনন্দ করিয়া রাঁধিতাম, সকলে মিলিত হইতাম, হাসি গল্পে সময় কাটাইতাম।

মা আসিতেন দশদিক আলো করিয়া, পাড়ায় পাড়ায় বাড়ীতে বাড়ীতে কত আমোদ হইত, আনন্দের উৎস বহিত। আবার মা ফিরিয়া যাইতেন বিজয়া দশমীর দিনে। সেদিন আমরা মাকে প্রাণ ভরিয়া বরণ করিতাম। মাও কাঁদিতেন, আমরাও কাঁদিতাম। এসো মা আনন্দময়ী তোমার সন্তানগণকে আশির্ব্বাদ কর, আবার তাদের ধন, জন বৃদ্ধি হউক, আবার বসুন্ধরা ফল, ফুল, শস্য, ধান্যে পরিপূর্ণ হউক।

বিজয়া দশমীতে ছেলে বুড়ো সকলে যাইত উৎসাহে ভাসান দেখিতে কিন্তু আসিত বিষাদভরা বুক লইয়া। মাতৃহারা বাড়ী যেন খালি খালি মনে হইত। কিন্তু ইহার পর তিন চারি দিন আমাদের কাজের আর সীমা থাকিত না। প্রতি বাড়ীতেই নারিকেলের জিনিষ তৈয়ার আরম্ভ হইত, লাড়ু, পাটালি, গঙ্গাজলি, রসকরা, চিকণ চিড়া ও মোটা চিড়া। আর মুড়ির মোয়া, চিড়ার মোয়া, কাউনের চালের মোয়া ও তিলের লাড়ু। এই সব দিয়া অতি উপাদেয় জলখাবার তৈয়ার হইত। লক্ষ্মীপূজার রাত্রি হইতেই জলখাবার ধুম পড়িয়া যাইত। পশ্চিমবঙ্গের অনেকে এই সমস্ত জলখাবার খাইয়া বড়ই প্রশংসা করিতেন। মেয়েদের হাতের তৈরী এই যে নানাপ্রকার খাদ্যের প্রাচুর্য্য ছিল, সে সবের স্থান এখন বাজারের জলখাওয়া অধিকার করিয়াছে। বাজারের খাইয়া আর স্বাস্থ্যও টিকিতেছে না। আগে প্রত্যেক বাড়ীতে দুগ্ধ হইত প্রচুর। ক্ষীর ও ছানার কত জিনিষ হইত, দুগ্ধের মাখম হইত, ঘন দধি হইত। কিন্তু সবই এখন কোথায় গেল! লক্ষ্মীপূজার পরে আসিত অ-রন্ধন ব্রত। ১৯০৫ সালে যে বঙ্গভঙ্গ হইয়া বাঙ্গালীর প্রাণে যে ব্যথা লাগে, তারপরে আমরা প্রতি বৎসর অ-রন্ধন ব্রত করিতাম। আর সঙ্গে সঙ্গে আশ্বিনের সংক্রান্তিতে চিরন্তন গাড়ুর ব্রত করিয়া বর মাগিতাম।

"আশ্বিনের পান্তা কার্ত্তিকে খায়
যে বর মাগে সেই বর পায়।"

পূজা গেল—ইলিসমাছ আর বাড়ী আসিত না। আমরা অপেক্ষা করিতাম বসন্ত পঞ্চমীর জন্য। সেই দিন সরস্বতী পূজায় জোর-মাছ আসিত; আবার গৃহে উলুধ্বনি হইত এবং ছেলে-মেয়ে সমস্বরে বাড়ী, পাড়া, পল্লী মুখরিত করিয়া গাহিত—

সরস্বতী মহাভাগে বিদ্যে কমল লোচনে…

সরস্বতী পূজার সময় হইত খৈ-র মোয়া। এই মোয়াতেই ছেলে বুড়ো সকলে মুগ্ধ হইত।

এসো ভগিনীগণ, তবে আজ মায়ের আগমনের প্রতীক্ষা করিয়া আমরা সকলে মায়ের আবাহন করিবার জন্য প্রস্তুত হই।

রাজসিংহের ভূমিকা

ডাঃ শ্রীহেমেন্দ্রনাথ দাশ গুপ্ত

(৩)

জিজিয়া সম্বন্ধে রাজসিংহ যে চিঠিখানি লিখিয়াছেন, সেই ইতিহাস প্রসিদ্ধ চিঠিখানি সম্বন্ধে পাঠকের সব কথা জ্ঞাত হওয়া কর্ত্তব্য। আমরা চিঠিখানি ইংরাজী ও বাঙ্গলা উভয় ভাষাতেই দিতে ইচ্ছা করি। চিঠিখানির বাঙ্গলা অনুবাদ এইরূপ—

"মহামান্ত দিল্লীশ্বর শাহানশা সম্রাট আলমগীর বাহাদুর।

—"বান্দা সর্ব্বশক্তিমান জগদীশ্বরের মহিমা কীর্ত্তন করিতেছে, মহিমান্বিত সম্রাটের কীর্ত্তিরশ্মি যেন উজ্জল রবিরশ্মির ন্যায় সর্ব্বদা অক্ষুন্ন থাকে। অধীনের বিনীত নিবেদন এই যে, যদিও সম্রাটের সান্নিধ্য লাভ আমার পক্ষে অসম্ভব, তথাপি অধীন চিরকালই আপনার শুভানুধ্যায়ী, রাজভক্তি প্রদর্শনে সদাই ব্যগ্র, সম্রাটের প্রতি কর্ত্তব্য পালনে নিয়তই উৎসুক। আ-সমুদ্র হিমাচল এই হিন্দুস্থানের বিভিন্ন প্রদেশের রাজা, মির্জ্জা, ওমরাও, পারিষদ আর পরিব্রাজক মণ্ডলীর সুখসম্পদ্ বৃদ্ধি করিতে আমি যে কখনও পশ্চাৎপদ হই নাই, সে বিষয়ে সম্রাটের নিশ্চয়ই বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। অধীনের অতীতের সেবা-সম্পদ্—যাহাতে সম্রাট সর্ব্বদাই তাহাকে করুণার চক্ষে দেখিয়া আসিয়াছেন,—তাহারই বলে সে আজ সম্রাটের গোচরে রাজ্যের কথঞ্চিত অবস্থা জ্ঞাপন করিতেছে, ভরসা করি সম্রাটের দৃষ্টি, বিবেচনা ও অনুকম্পা হইতে সে কদাপি বঞ্চিত হইবে না।

"—লোক পরম্পরায় অবগত হইলাম, অধীনের বিরুদ্ধে সম্রাট যে বিপুল সমরায়োজন করিয়াছেন, তাহাতে রাজকোষের প্রভূত অর্থ নিঃশেষিত হইয়াছে, আর সেই ভাণ্ডার পুনরায় পূরণ করিবার জন্ত সম্রাট জিজিয়াকর প্রবর্ত্তনের আদেশ প্রদান করিয়াছেন।

"—অধীন সম্রাটের নিকট নিবেদন করিতেছে যে, স্বর্গগত পরম রাজনীতিজ্ঞ আপনার প্রপিতামহ বাদশাহ মহম্মদ জালালুদ্দিন আকবর বাদশাহ যিনি এই হিন্দুস্থানে অর্দ্ধ শতাব্দীর অধিক কাল রাজ্য শাসন করিয়াছেন, সেই আদর্শ রাজ্য-শাসনকালে কি হিন্দু, কি মুসলমান, কি ইহুদী কি খ্রীষ্টান, কি ব্রাহ্মণ, কি চণ্ডাল যাবতীয় প্রজাকে তিনি সমচক্ষে দেখিতেন এবং তাহারাও তদনুরূপ সমভাবে সুখ ও শান্তিতে দিন অতিবাহিত করিয়াছেন। বস্তুতঃ সেই কারণে সম্রাট সর্ব্বদিক হইতে সকলের শ্রদ্ধা, স্তুতি ও কৃতজ্ঞতা এরূপ সমভাবে অর্জ্জন করিয়াছিলেন যে, সকলে তাঁহাকে জগদ্‌গুরু—দিল্লীশ্বরো বা জগদীশ্বরো বা—আখ্যায় বিভূষিত করিয়া আনন্দে আত্মহারা হইত। সম্রাটের পিতামহ বাদশাহ মহম্মদ নুরুদ্দিন জাহাঙ্গীর বাদশাহ ও দ্বাবিংশতি বৎসরের রাজত্ব কালে সমভাবে আবালবৃদ্ধ বনিতার শ্রদ্ধার্জ্জন করিয়া গিয়াছেন—প্রজাবর্গকে সমভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করাই তাঁহার একমাত্র কর্ত্তব্য ছিল। সম্রাটের পিতা শাজাহান বাদশাহও দ্বাত্রিংশবৎসরের রাজত্ব কালে সকলের প্রতি দয়া ও ন্যায় পরায়ণতায় অবিনশ্বর কীর্ত্তি অর্জ্জন করিয়া গিয়াছেন। দয়া-ধর্ম্ম-দাক্ষিণ্যে তাঁহাদের প্রবৃত্তি এতই অনুকম্পা-পরায়ণ ছিল যখনই যে মহৎ কার্য্যানুষ্ঠানে অথবা যেরূপ অভিযানেই তাঁহারা হস্তক্ষেপ করিতেন না কেন, বিজয়-লক্ষ্মী সর্ব্বদা তাঁহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ অনুসরণ করিত, তাঁহাদের কার্য্যে প্রজাবর্গ সমভাবে আনন্দে বিগলিত হইত আর বিজিত দেশ ও উহার অধিবাসীবৃন্দও সানন্দে তাঁহাদের বশ্যতা স্বীকার করিত। আর আজ সেই সমস্ত পুণ্যশ্লোক মহাত্মাগণের স্থলাভিষিক্ত আপনার শাসন কালে কত লোক আপনাকে ছাড়িয়া যাইতে বাধ্য হইয়াছে, কত রাজ্য জনপদ আপনার হস্তচ্যুত হইয়াছে, অচিরে আরও কত হইবে, তাহার ইয়ত্তা নাই। এই সবই কেবল আপনার অদূরদর্শিতা ও অবাধ অনাচারের অবশ্যম্ভাবী পরিণাম। আজ আপনার প্রজাবর্গ পদদলিত, প্রতি প্রদেশ ও জনপদ অভাবের তাড়নায় জর্জ্জরিত, আজ সর্ব্বত্র লোকক্ষয়, দুর্ভিক্ষ ও বিষাদ। আজ সম্রাট ও সম্রাট-পুত্রগণই যখন অভাবের তাড়না তীব্র ভাবে অনুভব করিতেছেন তখন আর সামন্তবর্গের দুঃখের অবধি কোথায়, আর সাধারণ প্রজাই বা কিরূপে সুখের আস্বাদ পাইবে? আজ সম্রাট-বাহিনীতে শৃঙ্খলা নাই—রাজ্যের বাণিজ্যে সম্পদ্ নাই, প্রজার হৃদয়ে শান্তি নাই।

হিন্দু আজ নিরন্ন, মুসলমান অসন্তোষচিত্ত, আর সাম্রাজ্যের অসংখ্য নরনারীর একবেলায়ও একমুষ্টি আহার জুটিতেছে না। অভাবে নৈরাশ্যে রোষে নিজের কপালে করাঘাত ভিন্ন আজ তাহারা অন্য কোন উপায়ই খুঁজিয়া পাইতেছে না।

এই অভাবক্লিষ্ট বুভুক্ষিত, নিরাশাগ্রস্ত প্রজাবর্গের একবিন্দু দুঃখ দূর করা দূরে থাকুক, তাহাদের স্কন্ধে উপরন্তু যে, নিষ্ঠুর সম্রাট্ আরও ঘৃণা করভার চাপাইবার জন্য নিজ শক্তির অপব্যয় করে, তাহার প্রতি কোন প্রজার শ্রদ্ধা বা রাজভক্তি কি সম্ভব? কি আশ্চর্য্য! প্রাচ্য হইতে প্রতীচী, কাবুল হইতে ব্রহ্মপুত্র পর্য্যন্ত এই সঙ্কট সময়ে আপনি হিন্দুর প্রতি বিদ্বেষ বশতঃ প্রচার করিয়াছেন যে, ব্রাহ্মণ হউক কি যোগী হউক সন্ন্যাসী বা বৈরাগী সকলকেই জিজিয়া কর দিতেই হইবে। আপনি আজ যে করাদায়ে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হইয়াছেন, আপনার এই সঙ্কল্পে কি তৈমুরবংশের গৌরব অক্ষুণ্ণ থাকিতে পারে? আপনার এই আদেশ কি নীতিধর্ম্ম বিগর্হিত নয়? আপনি কি জানেন না সব ধর্ম্মশাস্ত্রের একই বাণী—যে ভগবান সকলেরই ভগবান্, যেমন হিন্দুর তেমন মুসলমানের—তাঁহার বিচারে সকল ধর্ম্মই সমান; মূর্ত্তি উপাসকই হউক বা মসজিদে প্রার্থনা নিরত মুসলমানই হউক তাহার নিকটে সকলেই সমান প্রিয়। আপনার জানা উচিত যে কোন ধর্ম্ম বা লোকাচার অবনমিত করিতে প্রয়াস পাইলে, সৃষ্টি কর্ত্তার প্রাণে সমান বেদনা উপস্থিত হয়।



শিবাজী

বস্তুতঃ আজ যদি কেহ কোন চিত্রীর চিত্র অকারণে নষ্ট করিয়া ফেলে, তাহাতে যেমন চিত্রকরের প্রাণে বিষম বেদনা দেওয়া হয়, সেরূপ কোন ধর্ম্মের অবমাননায়ও সকল ধর্ম্মের রাজাধিরাজ ভগবানের হৃদয়ও সমভাবেই পীড়াদায়ক হইয়া যাইবে।

আপনি আজ যে জিজিয়া কর চাহিয়া পাঠাইতেছেন সে দাবী নিতান্তই ন্যায় বিরুদ্ধ। নীতির দিক দিয়াও ইহার পোষকতা অসম্ভব, যেহেতু ইহাতে প্রজাপীড়ন অবশ্যম্ভাবী। আর ইহা হিন্দুস্থানের বিধি-বিগর্হিত। আর যদি একান্তই আপনি এই করাদায়ে দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ হইয়া থাকেন তবে ন্যায়ানুবোধে প্রথমে আপনাকে জয়পুরাধিপতি রাজা রামসিংহের নিকটই দাবী চাহিয়া পাঠানো সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য। তারপরে আপনি আমার কাছে চাহিবেন, তখন আমার নিকট পাইতেও আপনার বাধা হইবে না। কিন্তু মহানুভবের পক্ষে পিপীলিকা পতঙ্গের উৎপীড়নে প্রথমেই হস্ত মসীকৃত করা কদাপি শোভনীয় হয় না। কিন্তু বড়ই আশ্চর্য্য ও পরিতাপের বিষয় যে সম্রাটের মন্ত্রীবর্গ এতই কর্ত্তব্য-জ্ঞান-হীন হইয়া পড়িয়াছেন যে, তাঁহারা ন্যায় ও ধর্ম্মানুযায়ী কার্য্য করিতে আপনাকে উপদেশ দিতেও পরাঙ্মুখ হইয়া তাঁহাদের কর্ত্তব্য অবহেলা করিতেছেন।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি এই ইতিহাস প্রসিদ্ধ লিপি খানির পরিচয় ইংরাজীতে প্রথমে অর্ম্মিই—১৭৭৮ সালে দেন। পত্রখানির ইংরাজী অনুবাদ করেন Mr. C. W. Boughton Rouse (অর্ম্মি ২৫২-২৫৫)। পত্র খানির অনুবাদ এত সুন্দর যে ৫০ বৎসর পরে টড্‌ও সেই অনুবাদই গ্রহণ করিয়াছেন। আর্ভিন প্রভৃতি পণ্ডিতেরা অর্ম্মি এবং টড্ উভয়কেই খুব অধ্যবসায়-সম্পন্ন অনুসন্ধিৎসু গবেষক বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। আমরা Boughton Rouse এর ইংরাজী অনুবাদ এখানে প্রদান করিলাম:—

All due praise be rendered to the glory of the Almighty, and the munificance of your majesty, which is conspicuous as the sun and the moon. Although I, your well-wisher, have seperated myself from your sublime presence, I am never the less zealous in the performance of any noble act of obedience and loyalty. My ardent wishes and streneous services are employed to promote the prosperity of the Kings, Nobles, Mirzas, Rajahs and Roys, of the provinces of Hindustan, and the chief of Aeraun, Turaun, Room, Shawne, and the inhabitants of seven climates and all persons travelling by land and by water. This my inclination is notorious, nor can your royal wisdom entertain a doubt thereof. Reflecting, therefore, on my former services and your Majesty's condescention, I presume to solicit the royal attention to some circumstances

in which the public as well a private welfare is greatly interested.

I have been informed that enormous sums have been dissipated in the prosecution of the designs formed against me, your well-wisher ; and that you have ordered a tribute to be levied to satisfy the exigencies of your exhausted treasury.

May it please your Majesty your royal ancestor Mohomed Jelaul-ul-deen Akbar whose throne is now in heaven, conducted the offices of this empire in equity and firm security for the space of fifty-two years, preserving every tribe of men in ease and happiness whether they were followers of Jesus, or of Mosss or David or or Mohommed ; were they Brahmins, were they of the sect of Dharains which devine the eternity of matter, or of that which ascribes the existence of the world to chance, they all eqally enjoyed his countenance and favour ; in so much that his people, in gratitude for the indiscriminate protection he afforded them, distinguished him by the appellation of Juggut Grow (Guardian of Mankind).

His Majesty Mahomed Noor-ul-deen Jahangheer, likewise, whose dwelling is now in paradise, extended for a period of twenty-two years, the shadow of his protection over the heads of his people, successful by a constant fidelity to his allies and a vigorous exertion of his arm in business,

Nor less did the Millnstrise Shah Jahan by a propitious reign of thirty-two years acqiure to himself immortal reputation, the glorious reward of clemency and virtue.

Such were the benevolent inclinations of your ancestors. Whilst they pursued these great and generous principles, whatsoever they directed their steps, conquest and prosperity went before them ; and then they reduced many countries and fortresses to their obedience. During your Majestiy's reign many have been alienated from the empire and further loss of territory must necessarily follow since devastation and rapine now university prevail without restraint. Your subjects are trampled under foot and every province of your empire is impoverished ; depopulation spreads and difficulties accumulate, when indigence has reached the habitation of the sovereign and his princes what can be the condition of the nobles ? As to the soldiery, they are in murmers ; the merchants complaining, the Mohomedans discontented the Hindus destitute and multitudes of people wretched even to the want of their mighty meal, are beating their heads throughout the day in rage and desperation.

How can the dignity of the sovereign be preserved who employs his power in exacting heavy tributes from a people thus miserably reduced ? At this juncture it is told from east to west that the emperor of Histustan, jealous of the poor Hindoo devotee, will exact a tribute from Brahmins, Sanyasis Jogies, Beirawghies, that regardless of the illustrious honour of his Timurean race he condescends to exercise his power over the solitary, inoffensive anchoret. If your majesty places any faith in those books, by distinction called divine, you will there be instructed, that God is the God of all mankind, not the God of Mohomedans alone. The Pagan and Mussulman are equally in his presence. Distinctions of colour are of his ordination. It is he who gives existence. In your temples to his name the voice is raised in prayer, in a house of images, where the bell is shaken, still he is the object of adoration. To vilify to religion or customs of other men is to let at nought the pleasure of the Almighty. When we deface a picture, we naturally incur the resentment of the painter : and justly has the poet said, Presume not to arraign or scrutinize the various works of power divine.

In fine the tribute you demand from the Hindoos is repugnant to justice ; it is equally foreign from good policy as it must impoverish the country : moreover it is an innovation and an infringement of the laws of Hindoostan. But if zeal for your own religion has induced you to determine upon this measure, the demand ought, by the rules of equity, to have been made first upon

Ramsing who is esteemed the principal amongst the Hindoos. Then let your well-wisher be called upon with whom you will have less difficulty to encounter; but to torment ants and flies is unworthy of a heroic generous mind. It is wonderful that the Ministers of your Government should have neglected to instruct your Majesty in the rules of rectitude and honour.

পূর্ব্বেই বলিয়াছি এই চিঠিখানি ভিন্ন ভিন্ন লোকে ভিন্ন ভিন্ন লোকের লিখিত বলিয়া বলেন—

১৭৭৮—অর্ম্মি ইউরোপ হইতে চিঠিখানি উদ্ধার করেন এবং বলেন—রাজা যশোবন্ত কর্ত্তৃক লিখিত।

১৮৩২—টড বলেন—চিঠিখানা বড় সুন্দর উহা যশোবন্ত কর্ত্তৃক লিখিত হইতে পারে না। কারণ যশোবন্ত ১৬৭৮ সালের ডিসেম্বরে মৃত হন, আর চিঠিখানা ১৬৭৯ সালে জিজিয়া প্রবর্ত্তিত হইবার পরে লিখিত হয়।

টডের যুক্তি খুবই ঠিক, কারণ জিজিয়া প্রবর্ত্তিত হইবার পূর্ব্বেই যশোবন্ত যে পরলোক গমন করেন স্যর যদুনাথও তাহা বলেন।

এখন টড্ বলেন, "আমি মুন্সীর সহায়তায় উদয়পুর হইতে মূল চিঠিখানির কপি সংগ্রহ করিয়াছি এবং ইহাতে লেখা আছে—

Letter from Rana Rajsingh to Aurungzeb.

এমতাবস্থায় টডের কথা মিথ্যা হইবার কারণ নাই। বঙ্কিমচন্দ্র টডকেই বিশ্বাস করিয়াছিলেন এবং তাঁহার মতে চিঠিখানি রাণা কর্ত্তৃক লিখিত। তিনি লিখিয়াছেন—

"রাজসিংহ জিজিয়া দিলেন না এবং কিছুতেই দিবেন না বলিয়া সর্ব্বস্ব পণ করিলেন। জিজিয়া সম্বন্ধে একখানি পত্র লিখিলেন, সেই পত্রের ছত্রে ছত্রে রাজসিংহের তেজস্বীতা, বীর্য্য, সর্ব্বধর্ম্মে অনুরাগ এবং ধর্ম্মপরায়ণতা দেদীপ্যমান হয়।"

কিন্তু কিছুদিন হইল টডের প্রায় সত্তর বৎসর পরে এবং অর্ম্মির ১৩০ বৎসর পরে স্যর যদুনাথ Modern Review-তে লিখেন যে, চিঠিখানা শিবাজী লিখিত। (1908. p. 22.)

এই সম্বন্ধে দুই স্থানে দুইখানি হস্তলিখিত পত্র (Manuscripts) আছে, একখানি কলিকাতার এসিয়াটিক সোসাইটীতে Manuscript No. 56 আর একখানি লণ্ডনের রয়েল এশিয়াটিক সোসাইটিতে Manuscript No. 71। স্যর যদুনাথ বলেন, লণ্ডনের পত্র খানি শিবাজী কর্ত্তৃক লিখিত বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। আর উক্তপত্রে 'রাজসিংহ' নামটি লেখক উল্লেখ করিয়াছেন বলিয়া রাজসিংহ কর্ত্তৃক উক্ত পত্র লিখিত হইতে পারে না, সুতরাং উহা শিবাজী কর্ত্তৃকই লিখিত।

শিবাজী নিরক্ষর ছিলেন, তাঁহার নিজ সহি কোন পত্রেই নাই। অন্য কোন ব্যক্তি পরে উক্তপত্রে তাঁহার নাম লিখিয়া রাখিতে পারেন। কোলাপুরের রাজা তো এখনও উহাকে শিবাজীর চিঠি বলিয়াই মনে করেন, যদিচ শিবাজীর জীবন চরিতকার Grant Duff তাহা মনে করেন না এবং এইরূপ দাবী হাসিয়াই উড়াইয়া দিয়াছেন। শিবাজীর শেষ বয়সের পত্র বেদ্যাজি কতৃকই লিখিত হইত, কিন্তু এই পত্রখানি নীলপ্রভু মুন্সীর হাতের লেখা বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। এই মুন্সীর কথা Grant Duff কিছু বলেন নাই। যাহা হউক, যদিই বা কেহ থাকিয়া থাকেন তাহাতেও চিঠিখানি শিবাজী কর্ত্তৃক লিখিত হইয়াছে, তাহা প্রমাণ হয় না।

কলিকাতা ও লণ্ডনের চিঠির মধ্যে পত্রীয় বিষয়ে বিশেষ কোন পার্থক্য না থাকিলেও উহাদের মধ্যে দুইটী বিষয়ে বিশেষ পার্থক্য আছে। প্রথম কলিকাতার চিঠির লেখকের নাম শম্ভাজী বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে, শিবাজী বলিয়া নহে। আর কলিকাতার চিঠিখানির ভিতরে রাজসিংহের সম্বন্ধে কোন কথা উল্লিখিত হয় নাই, রামসিংহের সম্বন্ধেই হইয়াছে। শম্ভাজী সম্বন্ধে স্যর যদুনাথ যখন নিজেই বলেন যে, শম্ভাজী চিঠির লেখক হইতে পারেন না আর কলিকাতার চিঠির ভিতরে যখন রামসিংহের উল্লেখ আছে, রাজসিংহের নহে, তখন আমাদিগের বিবেচনায় রাজসিংহকেই ইহার লেখক স্বরূপ মানিয়া লইতে কি অযৌক্তিকতা হইতে পারে ?

বিশেষতঃ একটি বিষয়ে স্যর যদুনাথ তাঁহার স্বপক্ষে প্রমাণ দৃঢ় করিবার জন্য সমস্ত কথাটি দেন নাই। লণ্ডনের চিঠিখানির ভিতরে উল্লিখিত আছে "রাজা রাজসিংহ"— কলিকাতার চিঠিতে "রাজা রামসিংহ।"

দুই স্থানের পত্রেই 'রাজা' কথা উল্লিখিত আছে। কিন্তু যে কোন ভারতবর্ষীয় ব্যক্তি বিশেষতঃ তৎকালীন হিন্দু যাহারা

রাজসিংহের সম্বন্ধে বিন্দুমাত্রও জানিতেন, তাঁহারা রাজসিংহ সম্বন্ধে উল্লেখ করিতে তাঁহাকে কিছুতেই 'রাজা' বলিয়া বিশেষণ ভুক্ত করিতেন না। মহারাণা কি রাণা না লিখিয়া তাহারা কিছুতেই রাজা লিখিতে পারিতেন না।—যেমন বর্ত্তমানকালের রাজা বাহাদুরকে 'বাবু' বলিয়া সম্বোধন করিলে দোষ হয়, তৎকালীন উদয়পুরের মহারাণাদিগকে রাজা বলিয়া সম্বোধন করিলেও সেই দোষ হইত। রাণা অথবা মহারাণা না থাকারই অর্থ এই যে, উহাতে রাজসিংহের সম্বন্ধে কিছু বলা হয় নাই। আর খুব সম্ভব রামসিংহের 'ম' অর্থাৎ Mim কথাটী এমন ভাবে লিখিত হইয়াছে যে তাহাতে jim জ ভাবে পড়া



ঔরঙ্গজেব

যায় আর চিঠিতে Jim এর ফুকৃতা (.) প্রায় দেওয়া হয় না। এইরূপ হওয়াই সম্ভব। আর অর্থ করিবার সময় যাহার যেরূপ অভিজ্ঞতা তিনি সেইভাবে অর্থ করিয়া থাকেন। হিন্দুস্থানী পত্রাদিতে এরূপ বর্ণভেদ অনেক সময়েই হইয়া থাকে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলিতে পারি—ডুমরাওয়ের একটী প্রসিদ্ধ মোকদ্দমায় কথাটি এনজানি (I sanction) কি ইমানত দান করিলাম এই কথার উপর দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন জিলাকোর্টে জয়লাভ করিয়াছিলেন (১৯২০) কিন্তু আপীলে বাদী হারিয়া যান।

অতএব manuscript হস্তলিখিত উর্দ্দু কথায় রামসিংহকে রাজসিংহ বলিয়া পড়িলেও বিশেষ লাভ হইবে না।

এই প্রসঙ্গে বলিয়া রাখা আবশ্যক যে, টড্ তো রচিত রাজসিংহই পড়িয়াছেন আর অনুবাদকারক Boughton Rouse ও রামসিংহই করিয়াছেন। সুতরাং টড্ এবং বাউটন রোজ যখন কলিকাতার হস্তলিখিত পত্রের রামসিংহ কথায় সমর্থিত হইয়াছেন, তখন নিঃসন্দেহে উহাতে রামসিংহই উল্লিখিত হইয়াছিল।

কিন্তু একটী কথা জিজ্ঞাস্য এই যে, স্যর যদুনাথ লণ্ডনের লিখিত কাগজ (manuscript)টী বিশ্বাস করিয়াই তিনি ১৯০৮ সনে নিজেই নামটীর সম্বন্ধে পূর্ব্বের কথা "রাজা" লিখিয়া পরে পুস্তকাদিতে রাজাকে 'রাণা'তে পরিবর্ত্তিত করিলেন কিরূপে? ইহা কি ঐতিহাসিক রূপান্তর নয়? 'রা' বা 'রাজা' যে রাণাতে কিরূপে পরিবর্ত্তিত হইল তাহা আমরা কিছুতেই বুঝিতে পারি না। কথাটীকে ১৯০৮ সালের রাজা হইতে রাণাতে পরিবর্ত্তিত করিয়া পাঠকবর্গকে যে তিনি বিভ্রান্ত করিয়াছেন তাহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। আর কলিকাতার manuscript এ রাজা রামসিংহ কথা কেন আছে, ইহারও তিনি কোন সদুত্তর দেন নাই। এমতাবস্থায় একটী ফুকতার (.) উপর নির্ভর করিয়া হিন্দুর গৌরবমণি রাজসিংহকে উড়াইয়া দিয়া চিঠিখানি স্যর যদুনাথের অঙ্কিত শিবাজীর উপর আরোপ করিয়া তিনি প্রকৃত তত্ত্বের সন্ধান দিয়াছেন তাহা কিছুতেই মনে করিতে পারি না।

এখন দেখিতে হইবে যে, চিঠিখানি হইতে এমন কিছু পাওয়া যায় কি না যাহাতে মনে করিতে হইবে যে, চিঠিখানি শিবাজী লিখিত। অর্থাৎ স্যার যদুনাথকে সমর্থন করিবার জন্য কোন আভ্যন্তরীক (internal credence) প্রমাণ পাওয়া যায় কিনা।

Sir William Boughton Rouse অনুবাদ করিয়াছেন—"যদিও আমি আপনার সান্নিধ্য হইতে দূরে রহিয়াছি I, your wellwisher, have seperated from your sublime presence."

রাজপুতনা ও অন্যান্য স্থানের রাজন্যগণ যেমন চাটুবাদ ও মনস্তুষ্টি সাধনে বাদশাহের মনোরঞ্জন করিয়া থাকেন, রাণা রাজসিংহ তদনুরূপ করিতে আসেন না বলিয়াই তিনি সিংহাসন হইতে দূরে অবস্থান করিয়া থাকেন। সন্ধির

সর্ত্তানুসারে দরবারে যাওয়ার দায় হইতে রেহাই পাইয়াছিলেন। এই কথাতে রাজসিংহকেই বুঝায়। কিন্তু স্তর যদুনাথ অনুবাদ করিয়াছেন,

Although this well-wisher (Shivaji) after rendering thanks for the favours...although this well-wisher was led by fate to come away from your august presence without taking leave, yet he is ready to perform, as far as is proper and possible, all that service and gratitude demand of him.

১৬৬৬ সালে শিবাজী দিল্লী হইতে গোপনে পলাইয়া যান এবং তাহার পর হইতেই মোগল ও মহারাষ্ট্রে ভয়ানক যুদ্ধ বাধে।

এতদিন পরে, ১৬৭৯ খৃষ্টাব্দের শেষ ভাগে; শিবাজীই বা নিজেকে শুভানুধ্যায়ী বর্ণিত করিয়া পত্র লিখিবেন কেন, আর সম্রাটই বা তাহা বিশ্বাস করিবেন কেন?

আর সেই পলায়ন যে অদৃষ্ট প্রসূত তাহাই বা ঔরংজেবের স্থায় বুদ্ধিমান ব্যক্তিকে তিনি কিরূপে বুঝাইতে সমর্থ হইবেন? এই পর্যান্ত লিখিয়া স্তর যদুনাথ তাহার শিবাজীকে দিয়া বলাইতেছেন, "এই অধীন সর্ব্বদাই সেবা করিতে প্রস্তুত।" শিবাজী মোগলের বিরুদ্ধে যুদ্ধই করিতেন। তাঁহার পুত্র শম্ভাজী শত্রুর শিবিরে পলায়ন করিয়া পিতার প্রাণে বিষম ব্যথা দিয়াছে। এই অবস্থায় শিবাজী করিবেন সেবা? আর মনে করিতে হইবে যে সেই সেবা দেখাইবার জন্যই তিনি চিঠি লিখিতেছেন?

যদুনাথের অনুবাদে আছে—My excellent services and devotion to the good of the state are well-known to the Princes, Khans, Amirs, Rajas and the Rais of India to the rulers of Persia, Central Asia, Turkey and Syria &c.

শিবাজী ঔরংজেবের কোন হিতকার্য্য করিয়াছিলেন বলিয়া ভারতবর্ষের কেহই জানিতেন না; ঐ সব রাজ্যের তো দূরের কথা শিবাজীর স্থায় এতবড় তীক্ষ্ণবুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তি নিশ্চয়ই জানিতেন যে, অযথা প্রশংসা বা স্তুতিবাদ অন্য কাহারও হউক না হউক তাঁহার ঘোর শত্রু ঔরংজেবের দৃষ্টি কিছুতেই এড়াইতে সমর্থ হইবে না।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি শিবাজী ছিলেন স্বাধীন রাজা। তিনি নিজেকে ছত্রপতি বলিয়া অভিষিক্ত করেন, এতাবস্থায় স্বাধীন হইবার পরে বাদশাহ এরূপ পত্র লিখিবার কোন অজুহাতই থাকিতে পারে না।

Sir William Bonghton Rouse-এর অনুবাদে আছে—আমি অবগত হইলাম আমার বিরুদ্ধে যুদ্ধায়োজনেই বহু টাকার প্রয়োজন হওয়ায় আপনি নাকি আপনার নিঃশেষিত অর্থকোষ পুনরায় পূরণের জন্য একটি 'কর' প্রবর্ত্তন করিয়াছেন।" পূর্ব্বেই বলিয়াছি ১৬৭৮ রূপনগরের রাজকুমারীকে লইয়া আসা হয়। ১৬৭৯ সালের এপ্রিলে জিজিয়া কর ধার্য্য হয়। ইহার কিছুদিন পরেই এই পত্রখানি লিখিত হয়।

কিন্তু স্তর যদুনাথ অনুবাদ করিয়াছেন—It has recently come to my ears that on the ground of the war with me having exhausted your wants and emptied the Imperial Treasury, your Majesty has ordered that money under the name of Jezia should be collected from the Hindus and the imperial needs supplied with it.

স্তর যদুনাথের যুক্তি এই যে, যুদ্ধে যখন অর্থকোষ নিঃশেষিত, তখন জিজিয়া প্রবর্ত্তিত হয়। সুতরাং শিবাজীর সহিত যুদ্ধে যে অর্থের অর্থব্যয় হইয়াছে তাহারই সম্বন্ধে উল্লেখ হইয়াছে। আর রাজসিংহের সঙ্গে যুদ্ধের পূর্ব্বে যখন জিজিয়া প্রবর্ত্তিত হয় তখন রাজসিংহের কথা হইতে পারে না। কিন্তু Sir William Bonghton Rouse এর অনুবাদ নির্ভুল বলিয়াই মনে হয়, আর কর্ণেল টড্ও সেই অনুবাদই সমর্থন করিয়াছেন। তাহাতে স্পষ্টই মনে হয় যে, রূপনগরের রাজকুমারীর অপহরণের পর রাণার বিরুদ্ধে বিপুল সৈন্যাবেশে যুদ্ধায়োজনে বহু অর্থের প্রয়োজন হইয়াছিল। মেবারের গিরিবর্ত্মে রাণার কৌশলী সৈন্য-বাহিনী পরাভূত করিতে যে বিপুল আয়োজন হইয়াছিল পত্রখানিতে তাহার কথাই হইতেছে আর এই আয়োজন করিতে যে সময় লাগিয়াছিল, তাহা খাপিখাঁন পর্য্যন্ত স্বীকার করিয়াছেন।

পত্রখানিতে উল্লেখ আছে, "আপনি ধর্ম্ম বিশ্বাস বশতঃ যদি এইরূপ কর প্রবর্ত্তনে প্রয়াসী হইয়া থাকেন, তবে ন্যায়তঃ

প্রথমে আপনার রামসিংহের নিকটেই উক্ত করের প্রথম দাবী হওয়া উচিৎ—কেননা হিন্দুরা রামসিংহকেই প্রধান বলিয়া গণ্য করেন।"

স্যর যদুনাথ বলেন, হিন্দুদের মধ্যে প্রধান ছিলেন রাজসিংহ—রামসিংহ নহেন, তাই 'প্রধানের' সম্বন্ধে রাজসিংহ নিজে কোন উল্লেখ করিতে পারেন না। সুতরাং পত্রের লেখক রাজসিংহ কিছুতেই হইতে পারেন না, অতএব পত্র-লেখক শিবাজীই হইবেন। আমাদের জিজ্ঞাস্য, এই পত্র লেখক রাণা রাজসিংহের পক্ষে রামসিংহকে প্রধান বলিয়া উল্লেখিত করিতে বাধা কি? সমগ্র রাজপুতনা দুই ভাগে বিভক্ত—একদিকে একা মেবার, অপরদিকে জয়পুর, যোধপুর, বিকানীর, রূপনগর প্রভৃতি দলবদ্ধ বাকী রাজ্যসমূহ। সমগ্র রাজপুতনা মোগলকে কন্যাদান করিয়া কৃতার্থ হইয়াছে, এক মাত্র মেবারই সেইরূপ হীনতা স্বীকার করিয়া আত্মসম্মান ক্ষুন্ন করে নাই, মাথা উঁচু করিয়া দাঁড়াইয়া ছিল। এখানে ক্ষুদ্ররাজ্য মেবারের কথা আসিতেই পারে না। সুতরাং সেই বিশাল রাজপুতনার প্রধান জয়পুরের মহারাজা ভিন্ন আর কে হইবেন? সমগ্র রাজপুতনার কাছে রাণা তখন একরূপ অপাংক্তেই ছিলেন। রাজপুতনার কেহই রাণার কথায় কর্ণপাত করে নাই, বরং রাণাও তাহাদের দলভুক্ত না হওয়ায় রাণার প্রতি তাহারা বিদ্বেষ ভাবই পোষণ করিয়াছে। রাজপুতনার হিন্দুরা যদি রাণাকে প্রধান বলিয়া মানিত তবেতো তাঁহার কথা শুনিয়া তুর্কীকে কন্যাদানেই বিরত হইত; হিন্দুস্থান আবার স্বাধীন হইতে পারিত। বস্তুতঃ জগতের নিকট রাণার কার্য্যই শ্লাঘানীয় হইলেও বিজয়ী রাজসিংহ নিজেকে অন্ততঃ পত্র লিখিবার সময় প্রধান বলিয়া নিশ্চয়ই পরোক্ষে বা প্রত্যক্ষে পরিচিত করিবেন না। তিনি রাম-সিংহের কথাই এখানে বলিতেছেন। আর রামসিংহের 'প্রধান' হইবার অবস্থাও ছিল। রাজসিংহ যে প্রধান নন্, স্বয়ং স্যার যদুনাথই লিখিয়াছেন—

"কৌলিন্য সত্বেও উদয়পুরের মহারাণা ছিলেন নগণ্য— The Kingdom of Marwar was the foremost Hindu State of Northern India at this time. The Maharana of Udaipur, inspite of his pre-eminent descent, was a negligible factor of the Hindu population of the Moghul world, as he hid himself among his mountain fastness and never appeared in the Moghul Court or Camp." History of Aurongzeb, P. 367 Part III.

তারপরে রামসিংহ ব্যতীত রাজপুতনায় আর কে প্রধান হইতে পারেন। সর্ব্বাগ্রগণ্য রাজা যশোবন্ত সিংহ তখন মৃত, তাঁহার পুত্র তখন শিশু মাত্র। দুর্গাদাস একজন সামন্ত মাত্র। বিক্রম সোলাঙ্কি, বিকানীর প্রভৃতি শক্তিহীন। রামসিংহ সম্রাটের অধীনে কাজ করিলেও তিনিও স্বাধীনচিত্ত ছিলেন। রামসিংহ শিবাজীর একজন বিশেষ বন্ধু ছিলেন, রামসিংহের সহায়তা ভিন্ন শিবাজী দিল্লী হইতে পলায়ন করিতে কৃতকার্য্য হইতেন না, সম্রাটের মনস্তুষ্টির জন্য এখানে তিনি নিজের বিবেক বিসর্জ্জন দেন নাই। সম্রাটও যে রামসিংহকে একটু ভয়ের চক্ষেই দেখিতেন তাহাতে সন্দেহ ছিল না। সম্রাটের চক্রান্তে বিষপ্রয়োগে রামসিংহের পিতা জয়সিংহ শমন ভবনে প্রেরিত হয়েন। আবার ১৬৭৫ সালে এই রাজা রামসিংহকে সম্রাট আসাম প্রদেশে যাইতে আদেশ করিলে তিনি সেখানে যাইতে সম্পূর্ণ অস্বীকৃত হন। তাঁহার পিতা জয়সিংহ সমস্ত রাজপুতনায় একজন প্রধান ব্যক্তি ছিলেন। ১৬৬৭ খৃষ্টাব্দে বিষপ্রয়োগে তাঁহাকে হত্যা করা হয় এবং তাঁহার মৃত্যুতে এক ঔরঙ্গজেব ব্যতীত সমগ্র হিন্দুস্থানই শোকবিহ্বল হইয়া পড়িয়াছিলেন। এই সব কারণে রাজ-সিংহের মনে হওয়া খুবই স্বাভাবিক যে, প্রসাদপুষ্ট হইলেও জয়পুর রাজ্য সহজে কখনো জিজিয়া দিতে স্বীকৃত হইবে না। কারণ স্বাধীনচেতা রামসিংহ বাদশার মনে সর্ব্বদাই যেন ভীতি সঞ্চার করিতেন।

পরন্তু, শিবাজীর ন্যায় মহানুভব ও স্বাধীনতাপ্রিয় ব্যক্তি কোন প্রকারে—কি পত্রে, কি সংবাদে—কখনও হিন্দুস্থানের প্রধানতম স্বাধীনচেতা রাণা রাজসিংহকে প্রবল প্রতাপান্বিত ক্রোধ-পরায়ণ ঔরঙ্গজেব বাদশার নিকটে ধরাইয়া দিবেন তাহা কিছুতেই সম্ভবপর হইতে পারে না। পক্ষান্তরে, রাজসিংহের পক্ষে রামসিংহকে ধরাইয়া দেওয়া হয় না, ঔরঙ্গ-জেবের পক্ষপাতিত্বের জন্যেই তাহার তাঁবেদার সম্বন্ধে বাদশাহের ত্রুটী ও পক্ষপাতিত্বের উল্লেখ করা হয়।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি মহারাষ্ট্রে জিজিয়া প্রবর্ত্তিত হয় শিবাজীর

মৃত্যুর পরে। হিন্দুদের পক্ষ হইয়া এই পত্রখানি লিখিতে প্রবৃত্ত হইলেও, স্বাধীনচেতা রাজসিংহের উপরে জিজিয়া করের প্রয়োগ হউক, শিবাজীর ন্যায় ব্যক্তি তাহা কিছুতেই করিতে পারেন না। স্যর যদুনাথ শিবাজীর প্রতি এই অপকার্য্য আরোপ করিয়া অন্যায় ভাবে শিবাজীর চরিত্র ক্ষুণ্ণ করিয়াছেন।

এদিকে আবার ছত্রপতি শিবাজী ছিলেন সম্পূর্ণ স্বাধীন নরপতি। আর রাজসিংহ স্বাধীন হইলেও, মোগলের নিকট বিশিষ্ট সর্ত্তে আবদ্ধ ছিলেন। সম্রাট শাহজাহানের সঙ্গে রাণার যে সন্ধি হয়, তাহাতে তিনি আর দুর্গ সংস্কার (strengthen fortification) করিতে পারিবেন না, ১০০০ অশ্বারোহী সৈন্যের ব্যয়ভার দিবেন এবং নিজে না আসিলেও তাঁহার পুত্রকে দরবারে আসিতে হইবে, এই তিনটী সর্ত্তে আবদ্ধ হইয়াছিলেন। সুতরাং কার্যতঃ তিনি বাদশাহের অধীন বলিয়া গণ্য হইতেন তাই এইরূপ বিনীত ভাবে পত্র লেখা রাণার পক্ষেই স্বাভাবিক কিন্তু সম্পূর্ণ স্বাধীন রাজা শিবাজীর পক্ষে অসম্ভব। বিশেষতঃ, রাণা চেষ্টা করিতেছিলেন যাহাতে নরম কথায় কার্য্য সম্পন্ন হয়, যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রুর সম্মুখীন হইয়া সৈন্য, শক্তি ও অর্থব্যয়ে আরও দুর্ব্বল হইবেন কেন? নাচার হইয়াই অবশেষে রাণাকে যুদ্ধক্ষেত্রে অবতরণ ও আত্মরক্ষা করিতে হইয়াছিল।

স্যর যদুনাথ বলেন—

"The internal evidence is very strong in favour of a dreaded revager of Moghul territory and a ruler of universal toleration such as Shivaji undoubtedly was".

Vide Modern Review 1908, page 23

আমাদের মনে হয় পত্রলেখকের সমদর্শিতা খুবই প্রশংসনীয়। স্যর যদুনাথ London Manuscript হইতে ইহার সমর্থনে একটি স্থান উদ্ধৃত করিয়াছেন। উহাতে লিখিত আছে—

"Where there is a mosque they sound the call in his remembrance: where there is a temple, the bell is rung in love of him.

কিন্তু সত্যই কি শিবাজী মস্‌জিদ ও মন্দিরকে সমজ্ঞান করিতেন? স্ত্রীলোকমাত্রকেই, হিন্দুই হউক, মুসলমানই হউক, তিনি মাতৃবৎ জ্ঞান করিতেন বটে, কিন্তু হিন্দুর মন্দিরের ন্যায় মসজিদেরও সম্মান করিতেন, এরূপ প্রমাণ প্রথমে থাকিলেও পরে নাই। Grant Duff লিখিয়াছেন, যদিচ প্রথমে তিনি মুসলমান ফকির ও মস্‌জিদের উপর খুবই শ্রদ্ধা করিতেন, মৃত্যুর দুই এক বৎসর পূর্ব্বে তাহা করেন নাই। আমরা পূর্ব্বেই Grant Duff এর বিবরণ উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছি—

"Nothing escaped him and no place was a sanctuary, a residence of the peers or Mohamedan saints which Sivaji had hitherto held sacred were on this occasion pillaged."

শিবাজী মস্‌জিদ ও পীরের প্রতি কোন কোন সময় সম্মান দেখান নাই বলিয়াই, ১৬৮০ সালে তাহার মৃত্যুর কথা খাপি খাঁ আনন্দ সহকারে লেখেন—Kafir ba Jahannam ruf—the infidel went to hell. Stephen VII. p. 305.

রাজসিংহ লিখিয়াছেন, "যদি রামসিংহের নিকট হইতে আপনি কর আদায় করিতে পারেন, তবে আমার নিকট আদায়ে কোন অসুবিধা হইবে না। আমি সর্ব্বদাই আপনার আজ্ঞাধীন। কিন্তু পিপীলিকা ও মক্ষিকার প্রতি পীড়ন বীরত্ব বা সাহসের পরিচায়ক নহে।"

এই পোনর বৎসর শিবাজী কখনও বাদশাহের আজ্ঞাধীন ছিলেন না আর তিনি বাদশাহের নিকট হইতে অনেক দূরে থাকায় নিজেকে অত হীন বা দুর্ব্বলও মনে করিতেন না। উপহাস করিয়া লিখিলে বলিবেন "আমার নিকট, মুখিকের নিকট, হইতে দাবী করা উচিত নয়।"

আর অতো বড় সকল ধর্ম্মের প্রতি উদারভাবাপন্ন পত্র রাজসিংহ ভিন্ন আর কাহার নিকট হইতে আসিতে পারে? এখানে রাজপুত ও মারহাট্টা চরিত্রেরই আলোচনা দরকার। উভয় জাতীরই বীর, নির্ভীক, স্বাধীন-চিত্ত। কিন্তু মারহাট্টার কাছে কার্য্য সাধনের জন্য যে সকল উপায় হীন বলিয়া প্রতীয়মান হয় না, রাজপুত রাণা স্বাধীনতা খোয়াইও সেই সমস্ত কার্য্যে অগ্রসর হইতেন না। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলিতে পারি, রাণার পুত্র ভীম সিংহ যখন শিশুদীয়গণকে পরিচালিত করিতেছিলেন, তিনি অনেক শত্রু সৈন্য নিহত করিয়াছিলেন। শত্রুগণ রাজসিংহের কাছে বেদনা জানায়। কিন্তু রাজসিংহ হিন্দুরাজ্য সংস্থাপনে বাধা জন্মাইয়াও ঐ বিপন্ন ব্যক্তিগণকে বাঁচাইলেন।

বস্তুতঃ রাণার চরিত্রই ছিল অতি মহৎ আমরা কর্ণেল টডের নিম্নলিখিত কথায়ই রাণার চরিত্র সমালোচনা করিব—

Once more we claim the readers admiration on behalf of a patriot prince of Mewar, and ask him to contrast the indigenous Rajput with the emperor of the Moguls. Aurangzeb accumulated on his head more crimes than any prince who ever sat on an Asiatic throne. With all the disregard of life which marks his nation, he was never betrayed, even in the fever of success, into a single generous action; and contrary to the prevailing principle of our natures, the moment of his foe's submission was that chosen for the completion of his malignant revenge. How opposite to the benevolence of the Rajput prince who, when the most effectual means of self defence lay in the destruction of the resources of his enemy, out of pity for a suffering population recalled his son in the midst of victory! As a skilful general and gallant soldier Rajsingh is above praise. The manner in which, in spite of all consequences, he espoused the cause of the Marwar princes placed him in the highest rank of chivalry: while his dignified letter of remonstrance to Aurangzeb on the promulgation of the Jezia affords a striking proof of his moral and intellectual greatness. His taste for the arts is evidenced by the formation of the inland lake, the Raysamand the account and motises for construction of which equally strike high admiration for the great patriot

শিবাজীর পত্র হইলে নিকটবর্ত্তী বিজাপুর, গোলকুণ্ডা প্রভৃতি রাজ্যের সামান্য উল্লেখও থাকিত। আর তিনি পূর্ব্ব-পশ্চিম দিগন্ত রাজ্যের সম্বন্ধে কিছু বলিতেন না। মহারাষ্ট্র রাজ্যের পূর্ব্বদিগন্ত মান্দ্রাজ তখন কেহ গণণার মধ্যেই ধরিত না, পক্ষান্তরে কাবুল হইতে বাঙ্গলা ও আসাম ধরিতে হইলে পূর্ব্ব-পশ্চিমের কথাই আসে এই দুই স্থানের মধ্যবর্ত্তী কোন স্থান সম্বন্ধেই উল্লেখ করা হইয়াছে।

পত্রখানি পড়িয়াই মনে হয় ইহা সহনশীল ন্যায়যোদ্ধা কোন রাজপুত হস্ত লিখিত, কৌশলী, ক্ষিপ্রগতি, শত্রুদমনকারী মহারাষ্ট্রের নহে।

সমস্ত অবস্থা পর্য্যালোচালনা করিলে মনে হয়, পত্রখানি রাজসিংহ ভিন্ন অপর কাহারও হস্ত লিখিত নয়।

বীর বিনোদে আছে চারুমতীকে লইয়া আসিয়া রাজসিংহ তাহার পাণি গ্রহণ করিলেন। এইখানে কেন তিনি অবস্থার একটু পরিবর্ত্তন করিলেন তাহা বলা দরকার। উপন্যাসে আছে চঞ্চল কুমারীকে রাজপ্রাসাদের এক প্রকোষ্ঠে রাখিয়া দিলেন। আসিয়াই বিবাহ করিলেন না। পাঠকের মনে এই প্রশ্ন উদয় হওয়া খুবই স্বাভাবিক যে চঞ্চলকুমারীকে রূপনগর হইতে আনিবার পরে কি হইল?

মাহুচী, অর্ম্মি ও টড্ পড়িয়া যদিও মনে হয় যে, রাণা রাজসিংহ প্রকৃতই আদর্শ বীর, বঙ্কিমচন্দ্র কিন্তু ঘটনার সামঞ্জস্যে সেই বীরচরিত্রে অনুশীলন তত্ত্বই প্রকটিত করিয়াছেন। অনুশীলন লিখিবার পূর্ব্বে বঙ্কিমচন্দ্র 'দেবী চৌধুরাণী' উপন্যাসখানি লিখিয়াছিলেন। প্রফুল্ল সম্যক অনুশীলিত চরিত্র, নিষ্কাম কর্ম্ম তাহার লক্ষ্য, সুখ দুঃখে সে সমসহনশীলা। পুস্তক রচিত হইবার পূর্ব্বেই উদাহরণ খাড়া হইল, তাহাতে মনে হয় বঙ্কিমচন্দ্র এই অনুশীলনতত্ত্ব অনেক পূর্ব্ব হইতেই ভাবিয়াছিলেন।

'অনুশীলনতত্ত্ব' অতঃপরে প্রতিফলিত হইয়াছে 'শ্রীকৃষ্ণ চরিত্রে'। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র শ্রীকৃষ্ণে আদর্শতত্ত্ব প্রকট করিলেও, আমাদের নিকট শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ংই ভগবান্। ভগবদ্-চরিত্র সমালোচনার বহির্ভূত। তাই আমরা খুঁজিতেছিলাম কোন্ নরদেহে এই তত্ত্ব বঙ্কিমচন্দ্র প্রকাশিত করিয়াছেন? খুঁজিয়া পাই নাই, কিন্তু মহাপ্রস্থানের কয়েক মাস পূর্ব্বেই বাহির হইল রাজসিংহ, আর তাহাতে দেখিলাম 'রাজসিংহে'ই বঙ্কিমের সেই তত্ত্ব সম্পূর্ণ প্রকট হইয়াছে। দেখিয়া আনন্দে আত্মহারা হইলাম। বুঝিলাম, হাঁ, রাজসিংহ একটা মানুষের মতন মানুষই; এমন মানুষ বঙ্কিম কেন অন্য কোন গ্রন্থকার আজ পর্য্যন্ত চিত্রিত করেন নাই। যেমন বীর, তেমনি ক্ষমাশীল। বীরত্বপ্রভাবে ঔরঙ্গজেবকে পরাস্ত করিয়া হিন্দুরাজত্ব স্থাপন করিতেছিলেন। পুত্র ভীমসিংহ পশ্চিমে বড় একটি রাজ্যখণ্ড জয় করিতেছিল, কিন্তু সেই উৎপীড়িত প্রজাগণ রাণার কাছে আসিয়া নিজেদের দুঃখবার্ত্তা জ্ঞাপন করিল। রাণা তৎক্ষণাই পুত্রকে নিবৃত্ত করিলেন। হিন্দুরাজ্য স্থাপিত হইল না, কিন্তু প্রজাবর্গের দুঃখ দূর হইল, বীরহৃদয় তাহাতেই তৃপ্ত হইলেন। ঔরঙ্গজেবকে কৌশলে মূষিকের ন্যায় পিঞ্জরাবদ্ধ করিয়াছেন, তাহার সৈন্যবর্গ রসদের অভাবে মৃতপ্রায়, বেগম রাণার বন্দী, দয়ার্দ্র হৃদয় রাণা বাদশাহকে মুক্ত করিলেন, বেগমকে সম্রাটের নিকট প্রত্যর্পণ করিলেন,

সৈন্যদের রসদ জোগাইলেন। ঔরঙ্গজেবকে খুবই শিক্ষা দিতে পারিতেন, কিন্তু হাতে পাইয়াও দিলেন না—মহানুভবতার জন্য। এই সবই বৃত্তিনিচয়ের সম্যক্ অনুশাসনের ফলে। শরণাগত রূপকুমারীকে বিপন্মুক্ত করিলেন, আশ্রিতা মাড়বার মহিষীকে আশ্রয় দিলেন, আবার দস্যু মাণিকলালের সহায়তা গ্রহণ করিতেও পাপ মনে করিলেন না। এরূপ চরিত্র ইতিহাসে বিরল—কি বীরবর প্রতাপসিংহ কি স্বাধীন শিবাজী কি রণজিত কি বাজীরাও কোন চরিত্রই রাজসিংহের সমকক্ষ নয়।

কিন্তু রাজসিংহের চিত্তবৃত্তি দমনের প্রধান নিদর্শন পাই চঞ্চলকুমারীর সহিত আচরণে। আহুত হইয়া চঞ্চলকুমারীকে আনিতে গিয়াছিলেন, দুর্জ্জয় মোগল বাহিনীর সহিত যুদ্ধ করিয়া তাহার উদ্ধার করিলেন, গৃহাগতা রাজকুমারী তাঁহাকে বরমাল্য দিতে উদ্‌গ্রীবভাবে প্রতীক্ষা করিতেছেন। তিনি কিন্তু পত্রখানি লইয়া রাজকুমারীর নিকট বুঝিতে গেলেন যে, তাঁহার এই বয়সেও রাজকুমারী তাঁহার প্রতি কি প্রকৃতই অনুরাগিনী, না—বিপদে পড়িয়া তাঁহাকে বরণ করিতে চাহিয়াছেন, এই যে চিত্ত সংযম তাহা কেবল স্থিতধী সংসার যোগীর পক্ষেই সম্ভব। চঞ্চলকুমারীকে এইটুকু পরীক্ষা না করিলে রাজ-সিংহের আদর্শত্ব উদ্ভাসিত হইত না। বঙ্কিমচন্দ্র দেখাইয়াছেন।

রাজসিংহ চঞ্চলাকুমারীর মহলে আসিয়া যখন পরীক্ষার জন্য নানারূপ প্রশ্ন করিতেছিলেন। একস্থানে বলিলেন।—বাদশাহের কবল হইতে উদ্ধার করিয়া আমি তোমাকে কিছুতেই দিল্লী যাইতে দিতে পারিব না, তুমি সে ভয় করিও না। তুমি এইখানেই থাক।

চঞ্চল—অতিথিস্বরূপ থাকিব, না দাসী হইয়া? রূপনগরের রাজকন্যা এখানে মহিষী ভিন্ন আর কিছু হইতে পারে না।

রাজসিংহ—তোমার মতন লোকমনোমোহিনী সুন্দরী যে রাজার মহিষী, সকলেই তাঁহাকে ভাগ্যবান বলিবে। তুমি এমন অদ্বিতীয়া রূপবতী বলিয়াই তোমাকে মহিষী করিতে আমি সঙ্কুচিত হইতেছি। শাস্ত্রে আছে, রূপবতী ভার্য্যা শত্রুস্বরূপ।

চঞ্চলকুমারী একটু হাসিয়া বলিল, "বালিকার চপলতা মার্জ্জনা করিবেন, উদয়পুরের রাজমহিষীগণ সকলেই কি কুরূপা?...তারপরে মহারাজ! রূপবতী ভার্য্যা শত্রু কিরূপে, তাহা আমি বুঝিতে পারি নাই।"

রাজসিংহ—তাহা সহজেই বুঝান যায়। ভার্য্যা রূপবতী হইলে তাহার জন্য বিবাদ বিসংবাদ উপস্থিত হয়। এই দেখ, তুমি এখনও আমার ভার্য্যা হও নাই, তথাপি তোমার জন্য ঔরঙ্গজেবের সঙ্গে আমার বিবাদ বাঁধিয়াছে। আমাদের বংশের মহারাণী পদ্মিনীর কথা শুনিয়াছ ত?

চঞ্চল—ঋষিবাক্যে আমার বড় শ্রদ্ধা হইল না। সুন্দরী মহিষী না থাকিলে রাজারা কি বিবাদ হইতে মুক্তি পান? আর এ পামরীর জন্য মহারাজ কেন একথা তুলেন? আমি সুরূপা হই, কুরূপা হই, আমার জন্য যে বিবাদ বাধিবার, তাহা ত বাধিয়াছে।

রাজসিংহ—আরও কথা আছে। রূপবতী ভার্য্যাতে পুরুষ অত্যন্ত আসক্ত হয়। ইহা রাজার পক্ষে অত্যন্ত নিন্দনীয়। কেন না, তাহাতে রাজকার্য্যের ব্যাঘাত ঘটে।

চঞ্চল—রাজারা বহুশত মহিষী কর্ত্তৃক পরিবৃত থাকিয়াও রাজকার্য্যে অমনোযোগী হয়েন না। আমার ন্যায় বালিকার প্রণয়ে মহারাণা রাজসিংহের রাজকার্য্যে বিরাগ জন্মিবে, ইহা অতি অশ্রদ্ধার কথা।

রাজসিংহ—কথা এত অশ্রদ্ধেয় নহে। শাস্ত্রে বলে, "বৃদ্ধস্য তরুণী বিষম্।"

চঞ্চল—মহারাজ কি বৃদ্ধ?

রাজ—যুবা নহি।

চঞ্চল—যাহার বাহুতে বল আছে, রাজপুত কন্যার কাছে সেই যুবা। দুর্ব্বলযুবাকে রাজপুত কন্যাগণ বৃদ্ধের মধ্যে গণ্য করেন।

"আমি সুরূপ নহি—"

চঞ্চল—কীর্ত্তিই রাজাদিগের রূপ।

রাজসিংহ—রূপবান, বলবান ও যুবা রাজপুত্রের অভাব নাই।

চঞ্চল—আমি আপনাকে আত্মসমর্পণ করিয়াছি। অন্যের পত্নী হইলে দ্বিচারিণী হইব। আমি অত্যন্ত নির্লজ্জের মত কথা বলিতেছি। কিন্তু মনে করিয়া দেখিবেন, দুষ্মন্ত কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইলে, শকুন্তলা লজ্জা ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, আমারও আজ সেই দশা। আপনি আমায় পরিত্যাগ করিলে আমি রাজ-সমুদ্রে ডুবিয়া মরিব।

পরীক্ষায় রাজসিংহ পরাভব মানিলেন। চঞ্চলকুমারীকে ধর্ম্মপত্নীরূপে গ্রহণ করিতে প্রস্তুত হইলেন। কিন্তু তাঁহার পিতার অনুমতি ব্যতীত বিবাহ করিতে স্বীকৃত হইলেন না। তাহার কারণ, রাজসিংহ কেবল বীরপুরুষই নহে, বিচক্ষণ কৌশলীও। সব দিক না দেখিয়া স্থিতধী ব্যক্তি কোন কার্য্যে অগ্রসর হয়েন না। তাই বলিলেন,—

"তোমার পিতার অমতে আমি বিবাহ করিতে চাহি না। তাহার কারণ, যদিও তোমার পিতার ক্ষুদ্র রাজ্য এবং তাঁহার সৈন্য অল্প, কিন্তু বিক্রম সোলাঙ্কি একজন বীরপুরুষ এবং উপযুক্ত সেনানায়ক। মোগলের সঙ্গে আমার যুদ্ধ বাধিলেই বাধিবে, বাধিলে তাঁহার সাহায্য আমার পক্ষে বিশেষ মঙ্গলজনক হইবে। তাঁহার অনুমতি লইয়া বিবাহ না করিলে তিনি কখনও আমার সহায় হইবেন না। বরং তাঁহার অমতে বিবাহ করিলে তিনি মোগলের সহায় এবং আমার শত্রু হইতে পারেন। তাহা বাঞ্ছনীয় নহে, অতএব আমার ইচ্ছা তাঁহাকে পত্র লিখিয়া, তাঁহার সম্মতি আনাইয়া তোমাকে বিবাহ করি।"

সকলেই জানেন পিতার সম্মতি আসিতে অনেক বিলম্ব হয়। এবং ততদিন রাজসিংহ সংযমী ঋষির ন্যায় অপেক্ষা করেন। এই যে বিচক্ষণতা, ধৈর্য্য, সহিষ্ণুতা ও উদারভাব এইখানে রাজসিংহের চরিত্রে আরোপিত হইয়াছে, তাহা কেবল গল্প সৌন্দর্য্যের জন্যই নহে, রাজসিংহের দমনশক্তি প্রদর্শনের জন্য।

রাজসিংহ বিপুল বাহিনীর বিপক্ষে নিজ মুষ্টিমেয় সেনাকে যেমন উদ্দীপিত করিতে পারেন, রণকৌশলে তিনি যেমন অভ্যস্ত, উদারতা তাঁহার যেমন গরীয়সী—আবার যথাযথ উত্তর দিতেও কখনও সঙ্কুচিত হন না। তাই রাজসিংহের নির্ম্মুক্ত অসি-হস্তে চঞ্চলকুমারীকে রাজসিংহের সম্মুখে দেখিয়া মোগল যখন রাজসিংহের মুখ পানে চাহিয়া বলিল, "উদয়পুরের বীরেরা কতদিন হইতে স্ত্রীলোকের বাহুবলে রক্ষিত?"

রাজসিংহের দীপ্ত চক্ষু হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হইল। তিনি বলিলেন—

"যতদিন হইতে মোগল বাদশাহ অবলাদিগের উপর অত্যাচার আরম্ভ করিয়াছেন, ততদিন হইতে রাজপুত কন্যাদিগের বাহুতে বল হইয়াছে।"

তারপর রাজসিংহ সিংহের ন্যায় গ্রীবাভঙ্গির সহিত, স্বজন বর্গের দিকে ফিরিয়া বলিলেন,

"রাজপুতেরা বাগ্‌ যুদ্ধে অপটু। ক্ষুদ্র সৈনিকদিগের সঙ্গে বাগ্‌ যুদ্ধের আমার সময়ও নাই। বৃথা কাল হরণে প্রয়োজন নাই পিপীলিকার মত এই মোগলদিগকে মারিয়া ফেল।"

মোগল পর্য্যুদস্ত হইল।

এই বীরত্ব, শৌর্য্য, সহিষ্ণুতা, ক্ষমা, উদারতা, সংযম লইয়াই উদার রাজসিংহ চরিত্র। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহাকে খাঁটি আদর্শবীর করিয়াই চিত্রিত করিয়াছেন, আর সেই চরিত্র পরিকল্পনা সম্পূর্ণ ইতিহাস-অনুমোদিত।

দার্শনিক বঙ্কিমচন্দ্র—শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম, এ বি, এল, বেদান্ত রত্ন প্রণীত, প্রকাশক শ্রীকনকেন্দ্র নাথ দত্ত, ১৩৯ বি, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, মূল্য ১॥০।

গ্রন্থকার বাঙ্গলা ভাষার একজন শ্রেষ্ঠ লেখক। ব্যবহারজীবি হইয়াও বিদ্যানুশীলনে তাঁহার ন্যায় এরূপ তৎপরতা বিরল। চিন্তায়, ভাষায় ও ভাবে তাঁহার গাম্ভীর্য্য বাঙ্গলা ভাষার সম্পদ যে বৃদ্ধি করিয়াছে তাহা সর্ব্ববাদী সম্মত। আজকাল যাঁহারা ষষ্ঠিতমবর্ষ অতিক্রম করিয়াছেন তাঁহারাও যৌবনে তাঁহার "গীতার ঈশ্বরবাদ" পড়িয়া গীতার কর্ম্মকাণ্ডের ভিতরে প্রবেশ করিতে সক্ষম হইত। আজ যে তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের রচনার দার্শনিক দিক্‌টা বিচার করিয়াছেন, তাহার ফলাফল বঙ্গীয় পাঠক সমাজ যে খুবই সানন্দে গ্রহণ করিবে তাহাতে সন্দেহ নাই।

গ্রন্থকার সাহিত্যক্ষেত্রে একজন প্রধান সমালোচক। বক্তৃতা-মঞ্চে নবীনচন্দ্র, গিরিশচন্দ্র, বঙ্কিমচন্দ্রের রচনার সমালোচনা যখনই তিনি করিয়াছেন, চরিত্র বিশ্লেষণে তাঁহার দক্ষতায় শ্রোতৃবৃন্দ মুগ্ধ হইয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্যের এরূপ পাণ্ডিত্যপূর্ণ সমালোচনা কেহ করিয়াছেন বলিয়াও আমরা জ্ঞাত নহি। সুতরাং তাঁহার দার্শনিক তত্ত্ব বিশ্লেষণ যে ভবিষ্য চরিতাখ্যায়কগণের ও বঙ্কিম-সাহিত্য অনুসন্ধিৎসু পাঠকের নিকট খুবই অবলম্বনীয় হইবে, তাহা বলাই বাহুল্য। মোটকথা বঙ্কিম সাহিত্য সম্বন্ধে এরূপ যোগ্য অধিকারী খুবই কম।

পুস্তকখানার উপক্রমে বঙ্কিম সম্বন্ধে যে মূলকথা দিয়াছেন

তাহাতেই প্রায় ৩২ পৃষ্ঠা হইয়াছে। ইহাতে বঙ্কিমের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। প্রথমখণ্ডে কোঁতের দৃষ্টবাদ, বেন্থামের হিতবাদ ও বঙ্কিমচন্দ্রের ধর্ম্মতত্ত্ব, দ্বিতীয় খণ্ডে বঙ্কিমচন্দ্র প্রদত্ত গীতার ধর্ম্ম আর তৃতীয়খণ্ডে শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে বঙ্কিমের পরিকল্পনা সম্যকভাবে আলোচিত হইয়াছে। পরিশিষ্টে গ্রন্থকার বঙ্কিমচন্দ্রের স্বদেশ-প্রীতি সম্বন্ধে ও বন্দে-মাতরমের মূলতত্ত্ব ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এবারে আমরা এই স্বল্প পরিসরে বঙ্কিমচন্দ্রের স্বদেশ-প্রীতি সম্বন্ধে গ্রন্থকারের মতাভিমত আলোচনা করিব। পরবর্ত্তী সংখ্যায় গীতা ও অন্যান্য দর্শনাদি সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য উপস্থিত করিব।

পাইকপাড়া রাজবাটীতে বঙ্কিমচন্দ্রের স্মৃতি উৎসবে পঠিত সভাপতির অভিভাষণে গ্রন্থকার বঙ্কিমচন্দ্রের স্বদেশপ্রীতি সম্বন্ধে একটি সুন্দর চিত্র দিয়াছেন। মৃণালিনীর দেশদ্রোহী পশুপতির মর্ম্মভেদী আত্মগ্লানির উল্লেখে বঙ্কিমের মনোগত ভাবের পরিচয় দিতে তিনি সক্ষম হইয়াছেন। "আমার দুর্গোৎসব" হইতে "এসো মা গৃহে এসো—ছয় কোটি সন্তানে একত্রে এককালে দ্বাদশ কোটি কর যোড় করিয়া তোমার পাদপদ্ম পূজা করিব" উদ্ধৃত করিয়া বঙ্কিমের গভীর দেশ-প্রীতির পরিচয় দিয়াছেন, আর সীতারামের বর্ণিত উড়িষ্যার প্রস্তর শিল্পের কথা বলিয়া বঙ্কিমের স্বাজাত্য বোধের পরিচয় দিয়াছেন। ইহাপেক্ষাও আরও অনেক কথার উল্লেখ করিয়া বঙ্কিমের গভীর স্বদেশপ্রাণতার সহিত পাঠককে পরিচিত করিয়াছেন।

বঙ্কিমের স্বদেশ-প্রীতির আরও গভীর পরিচয় পাই গ্রন্থকারের ঢাকায় অভিভাষণ হইতে। ইহাতে তিনি কয়েকটী সূক্ষ্মতত্ত্বের পরিচয় দেন। অনেক মুসলমান এবং সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের অনুকরণে অনেক হিন্দুও বঙ্কিমচন্দ্রকে মুসলমান-বিদ্বেষী বলেন। এই প্রকার ভাব জন্মাইতে যে কতিপয় গ্রন্থকারও ইন্ধন প্রদান করিয়াছেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। গ্রন্থকার দৃঢ়ভাবে বলিয়াছেন,

"এ অভিযোগ একেবারে ভিত্তিহীন—বঙ্কিম সাহিত্যে অনভিজ্ঞেরাই এই ধূয়া তুলিয়াছেন।"

গ্রন্থকার দেখাইয়াছেন যে, বঙ্কিমের স্বদেশ-প্রীতি "ইউরোপীয় পেট্রিয়টিজম নয়—ইহা যথার্থ সমদর্শন।"

এই সমদর্শনেই বঙ্কিম স্পষ্ট ভাবে লিখিয়াছেন,

"তুমি যদি হিন্দু-মুসলমান সমান না দেখ তবে এই হিন্দু মুসলমানের দেশে তুমি রাজ্যরক্ষা করিতে পারিবে না। তোমার রাজ্যও ধর্ম্মরাজ্য না হইয়া পাপের রাজ্য হইবে।"*

এইরূপ হিন্দু-মুসলমান সমদর্শিতা বঙ্কিমের ন্যায় আর কেহ দেখাইয়াছেন বলিয়া আমরা জানিনা। আর বঙ্কিম ভারতীয় জাতীয় মহাসমিতির উদ্বোধনের পূর্ব্বেই এই সমস্ত তত্ত্ব প্রকাশ করিয়াছেন।

তবে যে বঙ্কিম তাঁহার একমাত্র ঐতিহাসিক উপন্যাস "রাজসিংহে" ঔরঙ্গজেবকে নিষ্ঠুর, কপটাচারী, ক্রূর, দাম্ভিক ও আত্মমাত্র হিতৈষী বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন—সে সম্বন্ধেও গ্রন্থকার সত্য ও স্পষ্ট ভাবে লিখিয়াছেন—

"বিশেষতঃ রাজসিংহ উপন্যাসে কোন কোন মুসলমান রাজা ও রাজপুরুষদিগকে তিনি আখ্যানবস্তুর সাপেক্ষ ও ঐতিহাসিক সত্যের অনুরোধে কৃষ্ণবর্ণে চিত্রিত করিয়াছেন বটে, কিন্তু সে চিত্রণ আদৌ বিদ্বেষ মূলক নহে।"

বস্তুতঃ আমরা গ্রন্থকারের সহিত একমত যে বঙ্কিমচন্দ্রই স্বাজাত্যবোধের The real father "of Indian Nationalism."

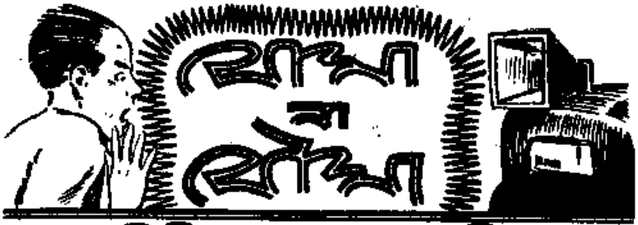
গ্রন্থখানি যেমন বহুতত্ত্ববহুল তেমনি ইহার ভাষাও অতি প্রাঞ্জল। আমরা এই পুস্তকখানির বহুল প্রচার কামনা করি।

*গ্রন্থকার এখানে 'বঙ্গশ্রী' হইতে "বঙ্কিম ও মুসলমান" প্রবন্ধের কতকাংশ উদ্ধৃত করিয়া উদারতার পরিচয় দিয়াছেন।

ভ্রম সংশোধন

"বিংশ শতাব্দীর পাশ্চাত্য চিত্র-কলা" শীর্ষক প্রবন্ধে ভাদ্র সংখ্যায় প্রকাশিত নিম্নলিখিত মুদ্রণের ত্রুটী রহিয়াছে।

"মঞ্চে নর্ত্তকী" চিত্রখানি "Post-impressionism Schoolয়ের উদাহরণ। শিল্পী—"এদ্‌গার দোঁগা"র স্থানে এদ্‌গার দোঁগা" হবে। "মালি" চিত্রের শিল্পী—"পল্ ক্যাজানি"র স্থানে "পল্ সেজ্যাঁ" হবে।



বোমা না বৌমা

শ্রীবিভাসকুমার দত্ত রচিত

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ বল [illegible]চিত

"কলকাতায় বোমা পড়বে নিশ্চয়ই।" এ ধারণা শুধু আমার একার নয়, অনেকেরই মনের ঈশান কোণে আজকাল কাল মেঘের মত এই ধারণা জমাট বেঁধে উঠেছে। ধারণাটা বদ্ধমূল হ'ল সেদিন মাণিকতলার মোড়ে সরকারের সহৃদয় প্রচার বিভাগের সময়োচিত সতর্কীকরণে। "ভাঙ্গা-গড়ায় বিপুল ধরায়" এক নিমেষে কি যেন সব ভেঙে চুরমার হ'য়ে যায়—এই রকমের একটা গানে প্রাণটা পূর্ব্বেই ভাঙ্গনের ভয়ে ভারী হ'য়ে উঠেছিল, তারপরে যখন লাউডস্পিকার সহযোগে বক্তা সুরু করলেন—"……যুদ্ধ আপনার বাড়ীর কাছে এগিয়ে এসেছে, আর নিশ্চেষ্ট হ'য়ে ব'সে থাকলে নাৎসী বর্ব্বরতার কালিমায় শুধু যে ইউরোপের নিষ্কলুষ সভ্যতাই কলঙ্কিত হবে তা' নয়, ভারতের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎও চিরতরে ম্লান হ'য়ে যাবে……" প্রভৃতি, তখন অপ্রিয় হ'লেও কথাগুলির সত্যতা অস্বীকার করার যো রইল না। যাই হোক, মান ত' অনেক দিন গেছে, বিমান আক্রমণ হ'লে কি ক'রে অন্ততঃ পৈতৃক প্রাণটুকু রক্ষা করা যায় সেই সম্বন্ধে সরকারী উপদেশগুলি মনোযোগ-সহকারে শুনে ভারাক্রান্ত-হৃদয়ে বাড়ী ফিরে এলাম।



রাত্রি ঠিক কত হয়েছিল বলতে পারি না, কারণ আমি তখন ছিলাম গভীর ঘুমে অচেতন। হঠাৎ ঘুম ভাঙ্গল প্রচণ্ড এক শব্দে। দাদু খাটের উপর কাৎ হ'য়ে চীৎ-

নেভাও, ব্ল্যাক-আউট, ব্ল্যাক-আউট।" বাতি নিভলো না জ্বলল বুঝতে পারলুম না, কারণ আমার চোখে তখন অন্ধকার। শুনলাম শুধু বাড়ীসুদ্ধ লোকের ছুটাছুটি, চীৎকার ও মোটা-সরু কণ্ঠের মিশ্রিত আর্ত্তনাদ। দাদু আরও জোরে চীৎকার ক'রে উঠলেন—"লুট হচ্ছে, লুট হচ্ছে, এ. আর. পি.—এ. আর. পি., ওয়ার্ডেন, ওয়ার্ডেন……" আমার যেন হঠাৎ শ্বাসরুদ্ধ হ'য়ে এল, প্রাণপণ চেষ্টায় রুদ্ধকণ্ঠে চীৎকার ক'রে উঠলাম—"গ্যাস ছাড়ছে, গ্যাস ছাড়ছে, গ্যাসমাস্ক, গ্যাসমাস্ক……" মুখোসের পরিবর্ত্তে মুখ খ'সে পড়ার যোগাড় হ'ল বিয়াল্লী শিক্কা ওজনের এক চড়ে। চেয়ে দেখি আলো জ্বলছে, আমার বিছানারই এক পাশে বড়মামী প'ড়ে গোঙাচ্ছে। বোধ হয় ছোটমামাই তাঁকে কোলপাঁজা ক'রে এ ঘরে এনেছিলেন। ছোটমামা ডাক্তার, অল্পক্ষণের মধ্যেই তাঁর চেষ্টায় শুধু যে বড়মামীর জ্ঞান সঞ্চার হ'ল তা' নয়, তাঁর শক্তিমান্ ব্যক্তিত্বের সান্নিধ্যে



আমরাও কিঞ্চিৎ আশ্বস্ত হ'লাম, যদিও তখনও আমার বুকটা ধড়াস্ ধড়াস্ ক'রে কাঁপছিল। তখন বোঝা গেল বিবাহের ছয় বৎসরের মধ্যে একাদিক্রমে মা-ষষ্ঠীর কৃপায় ষষ্ঠ সন্তানের মাতা হ'য়ে, বড়মামীর পতন ঘটেছিল নিদারুণ দুর্ব্বলতার জন্য। অবশ্য, প'ড়ে গিয়ে প্রথমতঃ তাঁর উত্থানশক্তি লোপ পেয়েছিল, আর জ্ঞান লোপ পেয়েছিল আমাদের চীৎকারে। তাই ছোটমামা উচ্চকণ্ঠে বলছিলেন—"কতবার বলেছি বাবা, সন্তান প্রসবের পর বৌদিকে "ল্যাণ্ডকো ভাইন" খাওয়াতে, তা' ত' আপনারা শুনবেন না!" দাদু [redacted] "আমরা গরীব গেরস্ত লোক, টনিক খাওয়াবার পয়সা ……"

—শ্রীনিশানাথ মজুমদার

ত' সেই জন্যই "বলীয়ান" ব'লে আর একটা দামী টনিক বাজারে দিয়েছে। তেজস্কর দেশী গাছগাছড়া থেকে উৎকৃষ্ট সুরাসারযোগে তৈরী ব'লে "বলীয়ানের" দামও কম, অথচ তার উপকারীতা কোন অংশেই কম নয়।"

এমন সময় পাশের বাড়ীর সার্ব্বজনীন খুড়ো চেঁচিয়ে উঠলেন—"কি ভায়া, কত বড় বোমা পড়ল, পূব দিক্‌টা দেখছি একেবারে পুকুর হ'য়ে গেছে।" ছোটমামা চীৎকার ক'রে বল্লেন—"খুড়ো, পুকুর ক'রেছে চাঁদের আলো আর তোমার আফিংএর নেশার মিলে। বোমা পড়ে নি, পড়েছেন তোমাদের বৌমা। ভয় নেই, ঘুমোওগে যাও খুড়ো। যে দেশে যুব শক্তির একটী নিদর্শন হচ্ছে আমার এই মাথের ভাগ্নেটী, সে দেশে বোমা ফেলার অপব্যয় কোন বুদ্ধিমান্ জাতই করবে না।"...না, সে অপমান সহ্য করতে পারি নি। সেইদিন থেকেই প্রত্যহ নিয়মিত "বলীয়ান" খাচ্ছি। ফলে বোমা যদি আজ সত্যই পড়ে, তবে বোমার আঘাতে মরতে পারি, কিন্তু বোমার ভয়ে মরব না।

"মধ্যে ৬৩১..

এদ্গার পোঁগা" হবে। "ম।



বেদমাতা

শিল্পী—শ্রীনিশানাথ মজুমদার

"লক্ষ্মীস্ত্বং ধান্যরূপাসি প্রাণিনাং প্রাণদায়িনী"

বঙ্গশ্রী

কার্ত্তিক—১৩৪৮

৯ম বর্ষ—১ম খণ্ড, ৫ম সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ ও আলোচনা

পণ্য মূল্য-নিয়ন্ত্রণ

আমরা অবগত হইলাম, যে ভারত গভর্ণমেণ্ট নাকি অধীনস্থ বাণিজ্য বিভাগের সহায়তায় শীঘ্রই খাদ্য-শস্য, বস্ত্র নির্ম্মাণের সূতা এবং অপরাপর পরিধেয় দ্রব্যাদির মূল্য ধার্য্য করিয়া দিবার জন্য একটী সঙ্কল্প করিয়াছেন। আজকাল প্রায় প্রতি জিনিষের মূল্যই দিন দিন যেরূপ বাড়িয়া চলিয়াছে তাহাতে আমাদের নিত্যাবশ্যকীয় দ্রব্যাদির যথোপযুক্ত মূল্য নির্দ্ধারণ যে গভর্ণমেণ্টের অবশ্য কর্ত্তব্য তাহাতে সন্দেহ নাই এবং এই কর্ত্তব্য বস্তুতঃই যদি নিরপেক্ষতা ও সুবিবেচনার সহিত সম্পন্ন হয়, তবে গভর্ণমেণ্ট যথার্থই দেশবাসীর ধন্যবাদ ও প্রশংসা অর্জ্জন করিতে সক্ষম হইবেন। কিন্তু সুবিবেচনারূপ মূল্য নির্দ্ধারণ বড় সহজ নহে, উহা বিশেষ অভিজ্ঞতা ও সতর্কতা সাপেক্ষ। উহাতে কোনরূপ খামখেয়ালীভাব থাকিলে সমস্ত প্রচেষ্টাই পণ্ড হইবে। এইজন্য আমরা অনুরোধ করিতেছি যে, মূল্য নির্দ্দেশ-বিধির সহিত অর্থনীতির যে নিকট সম্বন্ধ, কর্ত্তৃপক্ষ তাহা যেন বিস্মৃত না হয়েন এবং এই ক্ষেত্রে বিশেষভাবে সেই অর্থনীতির অনুশাসন মানিয়া চলেন।

এমন ভাবে পণ্যের মূল্য নিয়ন্ত্রণ করিলেই বোধহয় সুব্যবস্থা হইবে যে, বিক্রেতাগণ যেন অতিরিক্ত বা অন্যায্য মুনাফা করিতে না পারেন, আবার তাঁহারাও যেন অকারণে ক্ষতিগ্রস্থও না হয়েন। দ্বিতীয়তঃ,মূল্য নিয়ন্ত্রণ এমন ভাবে হওয়া বাঞ্ছনীয় যেন সাধারণ লোক তাঁহাদের নিত্য ব্যবহার্য্য জিনিষ ক্রয় করিতে কখনও অপারগ না হয়। অর্থাৎ পণ্যের মূল্য যেন এই সব সাধারণ লোকের দৈনন্দিন আয়ের অধিক না হয়। মনে করুন একজন শ্রমজীবির দৈনিক আয় মাত্র পাঁচআনা, এখন তাহার জীবনধারণের জন্য নিতান্ত আবশ্যকীয় জিনিষের মূল্য যদি এই আয়ের অধিক হইয়া পড়ে, তবে তাহার অভাব ক্রমেই বাড়িয়া যাইবে। আর একটী বিষয় বিশেষভাবে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, পণ্যের মূল্য যেন সর্ব্বথা উহার উৎপাদন মূল্যের অনুপাতে ধার্য্য করা হয়। যেমন কতিপয় শ্রমজীবির পরিশ্রমে ও তাহাদের উপরওয়ালার তত্ত্বাবধানে উৎপাদিত এক সের জিনিষের মূল্য যদি একটাকা ধার্য্য হয়, তবে আর এক সের ভিন্ন জিনিষ তৈয়ার করিতে সেই পরিমাণ পরিশ্রম ও তত্ত্বাবধানেরই আবশ্যক হইলে শেষোক্ত বস্তুটিরও এক টাকা মূল্যই ধার্য্য করা উচিত; এই ক্ষেত্রে কদাচ অধিক বা অল্প মূল্য ধার্য্য করা কিছুতেই সঙ্গত নয়।

সংক্ষেপে বলিতে হয় যে, প্রয়োজনীয় অভাব দূর করিতে সাধারণ লোকের যে সমস্ত জিনিষের দরকার হয়, তাহার মূল্য নিরূপণ করিতে কর্ত্তৃপক্ষ যেন নিম্নলিখিত নির্দ্দেশ মানিয়া চলেন—

১। বিক্রেতা যেন অন্যায়রূপে লাভ করিতে না পারে,

২। তাহারা যেন অকারণে অধিক ক্ষতিগ্রস্থও না হয়,

৩। প্রয়োজনীয় জিনিষের মূল্যের যেন সাধারণ লোকের আয়ের সহিত সামঞ্জস্য থাকে।

৬। পণ্যের মূল্যের যেন উৎপাদন মূল্যের সহিত অনুপাত নির্দ্ধারিত হয়।

পণ্যাদির মূল্য নিয়ন্ত্রণ করিবার সময় কর্ত্তৃপক্ষ যদি উপরোক্ত অনুশাসনগুলির প্রতি উপযুক্তভাবে মনঃসংযোগ না করেন, তাহা হইলে তাঁহাদের সকল চেষ্টা তো বিফল হইবেই, উপরন্তু তাঁহাদের এবম্বিধ কার্য্যের জন্ত তাঁহারা অত্যাচারী ও খামখেয়ালী বলিয়া জনসমাজে নিন্দিত হইবেন। হইতে পারে যে, এরূপ অত্যাচার ও অবিচার সত্ত্বেও গভর্ণমেণ্ট নির্ব্বিবাদে কিছুকালের জন্ত তাঁহাদের শাসনযন্ত্র চালিত করিতে পারিবেন, কিন্তু উহার পরিচালকবর্গকে একথা স্মরণ রাখিতে অনুরোধ করি যে, এই শাসন দণ্ডেরও কিন্তু প্রকৃতির বিধান অতিক্রম করিবার শক্তি নাই; ন্যায় অন্যায়ের জন্ত উহারও বিচার প্রকৃতির দরবারেই হইবে। আর তাহার অলঙ্ঘনীয় বিধানে যত বড় দুর্দ্ধার শক্তিশালী বা দৃঢ়সঙ্কল্পই হউক না কেন, অত্যাচারী হইলে সেই শাসকেরও পতন অবশ্যম্ভাবী। পক্ষান্তরে ভারতীয় শাসনকর্ত্তাগণ যদি মূল্য নিয়ন্ত্রণের সময়ে উপরোক্ত অনুশাসন গুলি মানিয়া চলেন, তবে অচিরেই সদুদ্দেশ্য বিশিষ্ট ও সুবিবেচক গভর্ণমেণ্টরূপে তাঁহারা দেশের আপামর সাধারণের সশ্রদ্ধ পূজালাভে সমর্থ হইবেন এবং একথা দৃঢ়ভাবে বলা যাইতে পারে যে পৃথিবীতে তখন এমন শক্তি থাকিবে না, যে শক্তি সেই শাসনবিধির মূলোচ্ছেদ করিতে কখনও সমর্থ হইবে।

গভর্ণমেণ্ট পরিচালনা করিবার গুরুতর দায়িত্ব-ভার যাহাদের স্কন্ধে আসিয়া নিপতিত হয়, সর্ব্বাগ্রে তাঁহাদের কর্ত্তব্য, তাঁহারা যেন পর পর ঘটনার একটীর সহিত আরেকটীর নিকট সম্বন্ধ অবহিত হইয়া কার্য্যে অগ্রসর হয়েন। এইরূপ চলমান ঘটনার ক্রমিক ধারাবলীকে পর্য্যাবেক্ষণ করিবার ক্ষমতা অর্জ্জন করিয়া এবং সেই দিকে লক্ষ্য রাখিয়া কার্য্যে অগ্রসর হওয়াই তাঁহাদের প্রধান কার্য্য। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ, বর্ত্তমান কালের গভর্ণমেণ্টগুলির কর্ণধারগণের মধ্যে সেই অভিজ্ঞতা নিতান্তই বিরল। যদি তাঁহারা পর পর ঘটনাবলীর পরস্পর সম্বন্ধ বিষয়ে প্রকৃতই অবহিত হইতেন, তবে নগণ্য জার্ম্মাণ শক্তি আজ বিরাট ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বিরোধী হইবার দুঃসাহস করিতে পারিত না এবং পাশবিক জীঘাংসাবৃত্তি চরিতার্থ করিতে লক্ষ লক্ষ লোকের প্রাণ নাশেরও কারণ হইত না। অতীতে যাহা হইয়াছে, তাহার জন্ত আমাদের অনুশোচনা নাই, ভারত সরকারকে আমরা শুধু বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ সম্বন্ধেই সতর্ক ও সাবহিত হইতে প্রার্থনা করি। আজ যে সরকার বাহাদুর ভারতীয় পণ্যাদির মূল্য নিয়ন্ত্রিত করিবার সদিচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন, আমাদের বিশ্বাস সেই সদিচ্ছায় যেন প্রকৃতিরই ইঙ্গিত রহিয়াছে। গভর্ণমেণ্টের এই সঙ্কটে আমরা যেন তাহাতে ধ্বংসের হাত হইতে এই বিশ্ব সাম্রাজ্যকে রক্ষা করিবার জন্ত প্রকৃতির মঙ্গলময় হস্তই প্রত্যক্ষ করিতেছি। বস্তুতঃ অসম ও অন্যায্য মূল্য নিয়ন্ত্রণ করিয়া প্রজাসগুলীর রক্ষা বিধান করা প্রত্যেক শুভানুধ্যায়ী ও সুবিবেচক গভর্ণমেণ্টেরই প্রধান কর্ত্তব্য। যদি এই কর্ত্তব্য ভারত সরকার আরও পূর্ব্বে সম্পন্ন করিতেন, তবে বোধ হয় মানব সমাজকে আজ এত বড় একটা প্রলয়ের সম্মুখীন হইতে হইত না।

উপরোক্ত এই সত্যটী কেন যে আমরা আজ প্রকাশ করিলাম, বর্ত্তমান নিবন্ধে সে আলোচনা করিতে চাই না। তবে প্রয়োজন হইলে এই উক্তির যাথার্থ্যের উপযুক্ত প্রমাণ দিতে সর্ব্বদাই আমরা প্রস্তুত থাকিব। আজ আমরা আনন্দের সহিত এই কথাই বলিব যে, অনবধানাবশতঃ যে ত্রুটি একদিন গভর্ণমেণ্ট করিয়াছিলেন, বিলম্ব হইলেও সে ত্রুটী সংশোধনের সময় এখনও অতিবাহিত হয় নাই। সময় থাকিতে এখনও যদি গভর্ণমেণ্ট সচেতন হইয়া পূর্ব্বোক্ত চতুর্ব্বিধ অনুশাসনের বিধানানুসারে ভারতীয় পণ্যের মূল্য নিয়ন্ত্রণে সযত্ন হন, তাহা হইলে অদূরভবিষ্যতে তাঁহারা শুধু দেশবাসীরই যে ভক্তিভাজন হইবেন তাহা নয়, পরন্তু এই নবপরিকল্পিত ব্যবস্থার যুদ্ধির সংগ্রামে তাঁহারা ক্রমশঃ হিটলারবাদকেও দমন করিতে সফলকাম হইবেন।

মূল্য-নিয়ন্ত্রণের যে চতুর্ব্বিধ অর্থনৈতিক অনুশাসনের কথা আমরা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি বিশদভাবে তাহা অনুধাবন করিতে হইলে গভর্ণমেণ্ট নিম্নলিখিত ব্যবস্থাগুলি অবলম্বন করিতে যেন অন্যথা না করেন :—

(১) শ্রমিক, কেরাণী, উচ্চপদস্থ এবং তাহাদের অধীনস্থ কর্ম্মচারীগণের কর্ম্মক্ষমতাকে তাহাদের গুণানুরূপ বিধিনির্দ্দিষ্ট করিয়া দিতে হইবে। বিবিধ শ্রেণীর লোকের কর্ম্মক্ষমতা তাহাদের গুণানুযায়ী বিধিনির্দ্দিষ্ট করিবার রহস্ত

কালের অর্থনীতি বিশারদ ও মনস্তত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতগণের নিকটে অপরিজ্ঞাত থাকিতে পারে, কিন্তু উহার বহুবিধ কার্য্যকরী ও প্রকৃষ্ট বিধান ভারতীয় দর্শনশাস্ত্রে নিহিত আছে। অর্থাৎ একজন মজুর সারাদিন খাটিয়া কাজ করিলেও তাহার সম্বন্ধে যেরূপ বিধান হইবে, অন্য এক বুদ্ধিজীবি পদস্থ কর্ম্মচারী যিনি বুদ্ধির সহায়তায় সমগ্র প্রতিষ্ঠানটী বেশ সফলতার সহিত পরিচালনা করিতেছেন তাহার সম্বন্ধে অন্যতর বিধানই হওয়া স্বাভাবিক। আর কাহার যোগ্যতায় কিরূপ কাজ হওয়া সম্ভব এতদ্বিষয়ে সম্যক জ্ঞান ভারতীয় দর্শনশাস্ত্রে যেরূপ লিপিবদ্ধ আছে অন্য কোথাও সেরূপ নাই।

(২) শ্রমিক, কেরাণী এবং উচ্চ ও নিম্নপদস্থ কর্ম্মচারী-গণের বেতনও উক্ত বিধানানুসারে নির্দ্ধারিত করিতে হইবে।

(৩) যদি দেখা যায় যে, কৃষি উৎপাদন কোন কোন দিক দিয়া মানুষের স্বাস্থ্যের পক্ষে প্রতিকূল, তবে উহার সুবিবেচিত নিয়ন্ত্রণ একান্ত আবশ্যক।

(৪) এমন ভাবে ভূমির স্বাভাবিক উর্ব্বরতা শক্তির উন্নতিসাধন করিতে হইবে যেন কৃষিজীবিগণ পাঁচ মাসের পরিশ্রমে পরিবারের সারাবৎসরের ভরণ-পোষণের উপযুক্ত শস্যের তিনগুণ শস্য উৎপাদন করিতে সক্ষম হয়।

(৫) ভূমির স্বাভাবিক উর্ব্বরতা সাধনের উপায়গুলি যে পর্য্যন্ত না কার্য্যকরী হয়, সেপর্য্যন্ত কৃষিজীবিগণের জীবন ধারণের জন্য ন্যূনতম যাহা প্রয়োজন তাহা মিটাইবার জন্য গভর্ণমেন্ট তাহাদিগকে সেই বিষয়ে আশ্বাস দিবেন এবং যথাসাধ্য অর্থ-সাহায্য দানের ব্যবস্থা করিবেন।

(৬) সাধারণ লোকের নিত্য ব্যবহার্য্য জিনিষ-পত্রের একটী সুনির্দ্দিষ্ট তালিকা প্রস্তুত করিয়া "কৃষিজাত" ও "শিল্পজাত" এই দুইভাগে উহা শ্রেণী-বিভক্ত করিতে হইবে।

(৭) শ্রমিক, কেরাণী ও উচ্চ বা নিম্ন পদস্থ কর্ম্মচারীর বুদ্ধি ও পরিশ্রমের অনুপাতে উৎপাদিত শিল্প ও কৃষিজাত পণ্যের মূল্য নির্দ্ধারিত করিতে হইবে।

আমাদের ধ্রুব বিশ্বাস যে, পূর্ব্বোক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করিলেই মূল্য নিয়ন্ত্রণের প্রচেষ্টা সফল হইবে, অন্যথায় হইবে না। পরন্তু উহা অন্যায় ও অধর্ম্মের কার্য্য বলিয়া পরিগণিত হইবে। এই জন্যই আমরা বড়লাট বাহাদুরকে বিষয়টীর গুরুত্ব উপলব্ধি করিতে এবং সময় থাকিতে তাহার উপায় বিধান করিতে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করি।

এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে গভর্ণমেণ্টকে সৎ পরামর্শ দেওয়া প্রতি-নিধিমূলক প্রতিষ্ঠান সমূহের একান্ত কর্ত্তব্য। কিন্তু তথাকথিত প্রতিনিধি সম্প্রদায় এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টী অনুধাবন করিতে পারিবে কি না এই বিষয়ে আমাদের গুরুতর সন্দেহ আছে। প্রত্যুতপক্ষে এই কার্য্য সত্যিকার চিন্তাশীল ব্যক্তির কার্য্য। অথচ আজ প্রতিনিধিমূলক প্রতিষ্ঠানগুলি কুচক্রী ও কপট লোকের হাতেই আসিয়া পড়িয়াছে এবং প্রকৃত চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ ইহাদের সংস্রবে যাইতে একেবারেই নারাজ।

নানাদিক ভাবিয়া আমরা সাম্রাজ্যের অবস্থা সম্বন্ধে বড়ই চিন্তাকুলচিত্ত ও আশঙ্কান্বিত হইয়া পড়িয়াছি। ভগবান আজ একটী মহান ও পবিত্র নব সাম্রাজ্য-গঠনে সহায় হউন।

ভারতের সাম্প্রদায়িক মনোবৃত্তি

বৃষ্টল বিশ্ববিদ্যালয়ের Imperial History-র অধ্যাপক মিঃ সি, এম, ম্যাক্ ইনার এম-এ, মহাশয় "বৃটীশ সাম্রাজ্য ও যুদ্ধ" শীর্ষক এক বিবৃতি পত্রে বলিয়াছেন, "ভারতকে পূর্ণ স্বাধীনতা দানের সর্ব্বোত্তম উদ্দেশ্য থাকিলেও বৃটেন তাহার দায়িত্ব সম্বন্ধে উদাসীন হইতে পারে না। সাম্প্রদায়িক বৈষম্য হেতু, দুর্ভাগ্যবশতঃ, ভারতের যে বিভেদের সৃষ্টি হইয়াছে বৃটেন, কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের ন্যায় সে সম্বন্ধে মাথা ঘামাইতে রাজী না হইলেও, সেই বৈষম্য উপেক্ষা করিতে অক্ষম।"

সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ও বহির্ভুক্ত বৃটেনের শত্রুগণের নানাবিধ হীন আক্রমণের প্রতিবাদের উদ্দেশ্যেই নাকি ম্যাক্ইনার সাহেব এই বিবৃতি পত্র রচনা করিয়াছেন। তিনি বলেন যে, জগতে এমন কোন হীনতম অপরাধ নাই, যাহা উক্ত শত্রুগণ বৃটেনের উপর আরোপ না করিয়াছে।

কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, প্রতিবাদ মাত্রই কি সর্ব্বদা বৈরীজনোচিত? বন্ধুর দোষ ত্রুটী প্রদর্শন এবং সেই দোষ স্খালনের দায়িত্ব অপ্রিয় হইলেও প্রকৃত বন্ধুই তো সেই দায়িত্বের অধিকারী! বৃটীশ সাম্রাজ্য মানবজাতির পক্ষে ঈশ্বরের অনুগ্রহ স্বরূপ; ইহার বিপদে সমগ্র জগতের বিপদ। নানাকারণ বশতঃ এই সাম্রাজ্য আজ বিপন্ন। কিন্তু কি

সেই কারণ ? এ প্রশ্নের জবাব আমরা বহুবার দিয়াছি। শতকরা ৯০ জন জনসাধারণ নহে, কিন্তু বৃটেনের পরিচালকগোষ্ঠী—যাহারা বৃটিশ শাসন, বৃটিশের বিচার বিভাগ, বৃটিশ আইন, শিক্ষা, বিজ্ঞান, সংবাদপত্র, কূটনীতি প্রভৃতির যাঁহারা কর্ণধার তাঁহারাই আজ বৃটিশ সাম্রাজ্যের বর্ত্তমান দুর্ভাগ্যের কারণ। বৃটেনের এই ভাগ্য-বিধাতাগণ পূর্ব্বগামীদের কার্য্যক্ষমতা হারাইয়া আজ এক অসার কুচক্রী রাজনৈতিক গোষ্ঠিতে পরিণত হইয়াছে ; নতুবা প্রবল বৃটিশ সাম্রাজ্যের বিরোধী হইতে মুষ্টিমেয় জার্ম্মাণগণ আজ কখনই সাহসী হইত না।

অধ্যাপক ম্যাক্‌ইনার সাহেবও উক্ত অসার, অকর্ম্মণ্য কুচক্রীদের অন্যতম। গত প্রায় এক শতাব্দী হইতে যে সব ভাগ্যবিধাতাদের হস্তে ভারতের শাসন ও গঠনকার্য্য নির্ব্বাহিত হইয়াছে, অন্ততঃ বৃটেনের সেই অকর্ম্মণ্য পরিচালকগোষ্ঠী যে ভারতবাসীর দোষত্রুটি বিচার করিবার যোগ্য অধিকারী নহেন, একথা অধ্যাপক মহাশয়ের স্মরণ রাখা অবশ্যই উচিত ছিল। উক্ত অযোগ্য কর্ম্মকর্ত্তাগণই যে ভারতের বিষময় সাম্প্রদায়িক বৈষম্যের জন্য মূলতঃ দায়ী তাহা অস্বীকার করিবার কারণ নাই। কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ ম্যাক্‌ইনার সাহেব স্বদেশবাসীর এবম্বিধ অসারতার বিন্দুমাত্র উল্লেখ না করিয়া, উপরন্তু ভারতবাসীদের চরিত্রেই কালিমা লেপন করিয়াছেন। ইহা নিতান্তই হীনতার পরিচায়ক। আজ যে ভারতবর্ষ স্বাধীনতা লাভের জন্য বিপুল আন্দোলন সুরু করিয়াছে, ইহা কিসের জন্য ? অধ্যাপক মহাশয়ের প্রকৃত অধ্যাপকোচিত দৃষ্টিশক্তি থাকিলে তিনি অবশ্যই অনুধাবন করিতে পারিতেন যে, ইহার মূলেও রহিয়াছে সেই অকর্ম্মণ্য বৃটিশ কর্তৃপক্ষের ত্রুটিদুষ্ট শাসন। রাজনীতির প্রাথমিক সামান্য জ্ঞানটুকুও যদি ম্যাক্‌ইনার সাহেবের থাকিত, তবে তিনি নিশ্চিত বুঝিতে পারিতেন যে, প্রত্যেক দেশের জনসাধারণই সাধারণ অবস্থায় নিজেদের আর্থিক দুর্গতি, অস্বাস্থ্য এবং মানসিক অশান্তি যাহাতে দূর হয় তজ্জন্য স্বদেশের শাসনকর্তৃপক্ষের নিকটই প্রার্থনা করিয়া থাকে। ভারতের শাসনকর্তৃপক্ষের নিকট ভারতবাসীও আজ প্রকৃতপক্ষে শুধু এইটুকুই প্রার্থনা করিতেছে ; এই প্রার্থনাটুকু যদি সন্তোষজনক ভাবে পূর্ণ হইত, তাহা হইলে ভারতবাসী কখনই আজ মনে প্রাণে এতটা ইংরেজ বিদ্বেষী হইয়া উঠিত না।

প্রকৃত যুক্তি সহকারে কুটচক্রী কর্তৃপক্ষ যেভাবেই নিজেদের ঢাক বাজাইবার চেষ্টা করুন না কেন, ঐতিহাসিক সত্য আমাদের প্রমাণ দেয়—বৃটিশ শাসনে সাম্প্রদায়িকতা যে ভয়াবহ আকৃতি ধারণ করিয়াছে, মুসলমান শাসনকালে সেই বিদ্বেষ অর্দ্ধমাত্রায়ও বিদ্যমান ছিল না। এমন কি চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বেও ভারতের প্রায় প্রত্যেক গ্রামেই হিন্দু ও মুসলমানগণ পরস্পর গলাগলি ধরিয়া ভাই ও বন্ধুরূপে বাস করিত। অথচ এখন পারে না। কিন্তু কেন ? বৃটিশ শাসনের ভ্রান্তিবশতঃই যে এই বৈষম্যের সৃষ্টি হইয়াছে, উপরোক্ত অবস্থাই কি তাহার যথেষ্ট প্রমাণ নয় ? ১৯০৯ সাল হইতে বাঙ্গালার প্রাদেশিক শাসন-পরিষদে মুসলমানদের জন্য ভিন্ন আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা করিয়াই কর্তৃপক্ষ এই বৈষম্যের বীজ প্রথম বপন করেন। এবং তখন হইতেই যে তাঁহারা শাসন বিষয়ক নানাবিধ সংশোধন করিয়া উক্ত উপ্তবীজের পুষ্টিসাধন করিয়া আসিতেছেন, ইহাও ঐতিহাসিক সত্য। কোনদিন ভারতের বিরোধীশক্তি যাহাতে প্রবল না হইতে পারে, সম্ভবতঃ এই সদিচ্ছারই বৃটিশ রাজনীতিকগণ ভারতবাসীর মধ্যে সেই বিবাদ ঘটাইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহাদের স্মরণ রাখা উচিত ছিল যে ইহা কুচক্রীর কূটনীতি মাত্র এবং ইহার পরিণতি কখনই কল্যাণকর হইবে না। এই কুচক্রীগণ কূটনীতিক না হইয়া যদি বিন্দুমাত্র প্রকৃত রাজনীতির অধিকারী হইতেন, তবে তাঁহারা নিশ্চয়ই উপলব্ধি করিতে পারিতেন সারা পৃথিবীর বুকে, আজ যে হিটলারবাদের আতঙ্ক উপস্থিত হইয়াছে ইহার মূল কারণ এই জগৎব্যাপী খাদ্যাভাব ;—এই খাদ্যাভাবের অবসান হইলে পৃথিবীতে কখনও হিটলারবাদ মাথা তুলিতে পারিত না। কিন্তু এই ক্ষুধার নিবৃত্তি করিবে কে ? ইহার জবাব আমরা বহুবার দিয়াছি। উদারনৈতিক বৃটিশ কর্তৃপক্ষের পরিচালনায় ভারতবর্ষ একাই এই জগৎব্যাপী ক্ষুধা দূর করিবার উপযোগী খাদ্য উৎপাদন করিতে পারে। কিন্তু পূর্ব্ব হইতেই ভারতের সন্তানগণ যদি পরস্পর একতাবদ্ধ ও শান্তির মধ্যে বাস করিতে না পারেন তবে ভারতে এবম্বিধ উৎপাদন কি করিয়া সম্ভব হইবে ? বড়লাট বাহাদুর হয় তো আমাদের এই উক্তিতে কর্ণপাত

করিবেন না, এবং ভারতের সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ দূরীকরণের জন্ত তিনি অনেক কিছু ব্যবস্থাই অবলম্বন করিয়াছেন, বলিয়া হয়তো বা ঢাক বাজাইবারও চেষ্টা করিবেন। কিন্তু আমরা জানি, তাঁহার প্রস্তাবিত ব্যবস্থার স্বরূপ আর যাই হোক, উহা বিশেষ কার্য্যকরী নহে। স্মরণ রাখিতে হইবে যে, **তরীর যে ছিদ্র দিয়া জল ঢুকিতেছে, সেই ছিদ্রে হাত না লাগাইলে নৌকাডুবি কখনই নিবারণ করা সম্ভব হইবে না।**

সুতরাং উপযুক্ত ফলের আশায় এই সাম্প্রদায়িক সমস্যার মীমাংসা করিতে হইলে বড়লাটের প্রধান কর্ত্তব্য এই যে, ভারতের শাসন, ব্যবস্থা ও বিচার পরিষদে যাহাতে দ্বৈতপন্থী অসৎ ও কুচক্রী এবং ভারতের উৎপাদিকা শক্তি সম্বন্ধে অজ্ঞ ব্যক্তিগণ প্রবেশাধিকার লাভ করিতে না পারে, সর্ব্বাগ্রে তাহার ব্যবস্থা করা। অবশ্য ইহার অর্থ ইহাই নয় যে, পরিষদ প্রভৃতি ভারতের শাসন ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি মাত্রই এইরূপ অসৎ, তবে ভারতের শাসন-বিধি যেরূপ শিথিল, তাহাতে রাজসরকারের এরূপ ব্যক্তিগণের প্রবেশ লাভ যে বিশেষ দুঃসাধ্য নহে, কর্ত্তৃপক্ষকে ইহা স্মরণ করাইয়া দেওয়াই আমাদের প্রকৃত উদ্দেশ্য। কিন্তু ভারতের শাসন ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণের অধিকাংশই যে ভারত-ভূমির প্রকৃত উর্ব্বরাশক্তি সম্বন্ধে অজ্ঞ, সত্যের খাতিরে এ বিষয়ে মোটেই আর সন্দেহ করা চলে না। তাই প্রায়ই তাহারা প্রশ্ন করিয়া থাকেন যে, পৃথিবীর বিপুল খাদ্যাভাব দূর করিতে ভারতের উৎপাদিকা শক্তি সত্যই সক্ষম কি না। কিন্তু এ প্রশ্ন অধিকতর অজ্ঞতার পরিচায়ক। এই সব সন্দিগ্ধ ব্যক্তিগণের যদি ভারতীয় ঋষিগণ কৃত জ্যোতিষ-ভূ-তত্ত্বে বিন্দুমাত্র জ্ঞান থাকিত, তবেই তাহারা আমাদের উক্ত উক্তির সত্যতা সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হইতে পারিতেন এবং নিজেদের অজ্ঞতাও উপলব্ধি করিতে পারিতেন।

ইহার পর আবার প্রশ্ন হইতে পারে, শাসন পরিষদ প্রভৃতি অসৎ ব্যক্তিদের সংস্পর্শ মুক্ত হইলেই কি উপায়ে ভারতের সাম্প্রদায়িক বৈষম্য দূরীভূত হইবে? এই প্রশ্নের উত্তর সংক্ষিপ্ত। পৃথিবীর সবচেয়ে বড় সমস্যা খাদ্যের; ভারতেরও তাই। এই অন্ন সমস্যার মীমাংসা হইলেই অন্যান্য কোন সমস্যাই আর সমস্যা বলিয়া মনে হইবে না। সুতরাং অসৎ, অজ্ঞ ও কুচক্রী ব্যক্তিগণকে অপসারিত করিয়া বিচক্ষণ, সৎ ও অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তিগণ দ্বারা গঠিত ভারতীয় গভর্ণমেণ্ট যদি জনসাধারণের অন্নাভাব, অস্বাস্থ্য, মানসিক অশান্তি প্রভৃতি সামাজিক ব্যাধি দূরীকরণে সচেষ্ট হন, তবেই দেশের সর্ব্বাঙ্গীন কল্যাণ, নতুবা আর কিছুতেই নহে। ভরসা করি ম্যাক ইনার সাহেব এবার নিজের ত্রুটীটা বুঝিতে সক্ষম হইবেন।

নির্ব্বাচন স্থগিত রাখার অর্থ কি?

শোনা যাইতেছে ভারতে ও ব্রহ্মে আগামী সদস্য নির্ব্বাচন কার্য্য অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্ত বন্ধ রহিবে, এই নির্দ্দেশে একটী বিল পাশ হইবে। সহজেই বুঝা যায়, যুদ্ধ হাঙ্গামার জন্তই এই বিলের উদ্ভব; কারণ যুদ্ধ না লাগিলে এই বিলের প্রশ্ন সম্ভবতঃ উত্থাপিত হইত না। কিন্তু, কৌতুহলী আমরা জিজ্ঞাসা করি,—বর্ত্তমানের জটিল পরিস্থিতিতে এই বিল কি বিশেষ কার্য্যকরী বা ন্যায়সঙ্গত হইবে?

এই প্রশ্ন এবং ইহার উত্তর বিশেষ সরল নয়। কেন না, বর্ত্তমান পরিস্থিতির জটিলতা ভারতে কি কি বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিয়াছে, এই প্রশ্নের জবাব দিতে হইলে, সে সম্বন্ধে বিশেষ নিরপেক্ষ অভিজ্ঞতা থাকা প্রয়োজন। অনুসন্ধান করিলেই দেখা যাইবে, বর্ত্তমান যুদ্ধ ভারতের পক্ষে প্রধানতঃ নিম্নোক্ত অবস্থা ও ঘটনা তিনটীর সূচনা করিয়াছে,—

(১) বর্ব্বর হিটলারবাদ মানবজাতির মধ্যে যে নৃশংস যুদ্ধের অবতারণা করিয়াছে, সে যুদ্ধ জয় করিতে হইলে ইহার বিরুদ্ধে চাই এমন সমর প্রচেষ্টা, যাহাতে মানুষের ধন ও প্রাণের কোন ক্ষতি সাধিত হইতে না পারে।

(২) ভারতীয় জনসাধারণ পূর্ব্ব হইতেই পরোক্ষ, প্রত্যক্ষ প্রভৃতি নানাবিধ করভারে জর্জ্জরিত। কর্ত্তৃপক্ষের এখনও যদি উপযুক্ত সদিচ্ছা প্রণোদিত না হয়, তবে ভবিষ্যতে আরও নব নব দুঃসহ ট্যাক্সের বোঝা দুর্দ্দশাকবলিত ভারতীয় জীবন-ধারাকে হয় তো অধিকতর দুঃসহ করিয়া তুলিবে। সুতরাং বৃটেনের এখন সর্ব্বপ্রধান প্রয়োজন, উক্ত নূতন কর প্রবর্ত্তনের সম্ভাবনা রহিত করা এবং সম্ভব হইলে পুরাতন করভার লাঘব করা।

(৩) জনসাধারণ পূর্ব্ব হইতেই, আর্থিক সংকট, অস্বাস্থ্য মানসিক বিশৃঙ্খলা প্রভৃতি দুরবস্থার তাড়নায় উত্যক্ত।

ইহার উপর বিদেশের সৈন্য-বাহিনীর জন্য প্রেরিত হইয়া এ দেশের আহার্য্য ও ব্যবহার্য্য দ্রব্যাদি পরিপূর্ণ সমুদ্রগামী পোতসমূহ বর্ব্বর জার্ম্মান আক্রমণে বিনষ্ট ও নিমজ্জিত হওয়ায় দেশবাসীর দুরবস্থা আরও ভারাক্রান্ত হইয়াছে। অতএব কার্য্যকরী সমর প্রচেষ্টা সাধন করিতে হইলে, সর্ব্বপ্রথম এই ব্যবস্থাই করিতে হইবে, যে ব্যবস্থার ফলে দেশবাসীর ভাগ্যে এবম্বিধ অসহনীয় প্রতিকূলচারিতা সংঘটিত হইতে না পারে।

কর্ত্তৃপক্ষ অবশ্য সরবে ঘোষণা করিতেছেন যে, যথাসাধ্য তাঁহারা ভারতবাসীদের উক্ত সমস্যা সমূহের প্রতিকার চেষ্টা করিয়াছেন; কাজে কাজেই কোন কথা না বলিয়া আমাদের নির্ব্বাক থাকাই বাঞ্ছনীয়। কিন্তু আমরা নিশ্চিৎ জানি, যতটুকু করা যায় ঠিক ততটুকু কার্য্য কোন দিনই সম্পন্ন হয় নাই। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, অনর্থক মানুষের ধন ও প্রাণ বিপন্ন না করিয়াও যুদ্ধ চালান সম্ভব। নিরীহ জনসাধারণের উপর ট্যাক্সের পর ট্যাক্সের বোঝা না চাপাইয়া, এমন কি পূর্ব্বতন করভার লাঘব করিয়াও বর্ত্তমান সমরযাত্রা অব্যাহত রাখা যায়। কেবল তাই নয়, সমরযাত্রা অপ্রতিহত রাখিয়াও দেশবাসীর অন্নকষ্ট, অস্বাস্থ্য, মানসিক অশান্তি প্রভৃতি দুরবস্থার নিরসন করা যায়। কিন্তু কর্ত্তৃপক্ষ কাজের চেয়ে সরব কথারই বেশী পক্ষপাতী বলিয়া হয় তো, এই সম্ভাবনা অবহেলা করিতেছেন। একমাত্র ভগবান জানেন, তাঁহাদের ঈদৃশ অবহেলার সত্যকার হেতু কি?

জনসাধারণের সেবাই হইল শাসনভারপ্রাপ্ত কর্ম্মকর্ত্তাদের প্রাথমিক কর্ত্তব্য। কিন্তু, বর্ত্তমান যুদ্ধের জটিলতায় ভারত-বাসীর পক্ষে যে বিশেষ দুরবস্থা সূচিত হইয়াছে এবং কর্ত্তৃপক্ষ উহার প্রতি পূর্ব্বোক্তভাবে যেরূপ অবহেলা প্রদর্শন করিতেছেন, তাহাতে স্পষ্টই বুঝা যায়, ভারতের শাসনভারপ্রাপ্ত কর্ম্মকর্ত্তাগণ তাঁহাদের প্রাথমিক কর্ত্তব্য সম্বন্ধে পর্য্যন্ত বিশেষ অবহিত নহেন। কাজেই, বর্ত্তমান পরিস্থিতির ভয়াবহ জটিলতাকে সরল করিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে এই সকল দায়িত্ব জ্ঞানহীন কর্ম্মচারীদিগকে অপসারিত করিতে হইবে। কিন্তু এই অপসারণ কার্য্য পরিষদের নূতন সদস্যনির্ব্বাচন ব্যতিরেকে কিরূপে সম্ভব?

বিশেষ আশ্চর্য্যের বিষয়, পার্লামেন্টের অধিকাংশ সদস্যই নূতন নির্ব্বাচন রহিতের নির্দ্দেশের প্রস্তাবকেই সমর্থন করিয়াছেন। ইহা হইতে আমরা যদি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হই যে, ব্রিটিশ পার্লামেন্ট দুর্ভাগ্যবশতঃ কতিপয় অযোগ্য ও দায়িত্বজ্ঞানশূন্য ব্যক্তিগণ দ্বারা কণ্টকাকীর্ণ, তবে আমাদের পক্ষে তাহা কি বিশেষ অন্যায়? আমাদের বড়লাট বাহাদুরই বা কিসের জন্য নিশ্চল হইয়া আছেন? তবে কি তিনিও নিজেকে অযোগ্য মনে করেন? তাই যদি না মনে করেন তা'হইলে কেন আজ ভারতের দ্বারে যুদ্ধের নৃশংসতা ক্রমশঃই আগাইয়া আসিতেছে?

ব্রিটিশের সদিচ্ছায় অবিশ্বাস

বিলাতের 'দি টাইম্‌স' নামক সংবাদপত্রখানি সম্প্রতি একটী সম্পাদকীয় স্তম্ভে লিখিয়াছেন,—

"ব্রিটেনের সদিচ্ছার প্রতি ভারতীয় রাজনীতিকগণের অকারণ অবিশ্বাস বশতঃই এখনও পর্য্যন্ত ভারতীয় শাসন সমস্যার বিশেষ কোন সুনিয়ন্ত্রিত সমাধান সম্ভবপর হইতেছে না। সম্প্রই কোন কিছু অনুমোদন করার অসুবিধার পক্ষে ন্যায়সঙ্গত কোন যুক্তিপ্রদর্শন করিলেও, আমাদের সেই যুক্তি ক্ষমতালোভীর ক্ষমতা আঁকড়াইয়া ধরিয়া রাখিবার ওজর ভিন্ন উহা আর কিছুই নয়, এই বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া হয়। ব্রিটেনের অনেকেই ভারতবর্ষকে স্বপ্রতিষ্ঠ ও স্বশাসিত রাষ্ট্ররূপে দেখিতে চান, কিন্তু যাহাতে এই স্বশাসন ও স্বরাজপ্রতিষ্ঠা সাম্য, নিরপেক্ষতা ও সুবিচারের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়, সঙ্গে সঙ্গে সেই বিষয়েও বৃটেনের দেখা তো একান্তই কর্ত্তব্য, আর এই বিষয়ে-কিছু দেওয়ার পূর্ব্বেই তাহাকে এই বিষয়ে নিঃসন্দেহ হইতে হইবে। বস্তুত নূতন স্বপ্রতিষ্ঠ ভারতের সহিত সকল সম্বন্ধ ছিন্ন করিতে ব্রিটিশ পার্লামেন্ট যে অনিচ্ছা প্রকাশ করিতেছে তাহা হীন স্বার্থ-সিদ্ধির উদ্দেশ্যে নহে, পরন্তু ব্রিটেনের সহিত সম্বন্ধ যুক্ত করিয়া ভারতকে বর্ত্তমান জগতে গৌরবময় আসন প্রদান করিবার সদিচ্ছাই বৃটেনের পূর্ব্বোক্ত অনিচ্ছার প্রকৃত কারণ ও উদ্দেশ্য।"

সত্যের খাতিরে আমরা স্বীকার করিতে বাধ্য যে, ব্রিটিশ রাজনৈতিকগণ যখনই ভারতে পূর্ণ স্বাধীনতা দানের এইরূপ

নিঃস্বার্থ সঙ্কল্পের কথা তোলেন, তখন ভারতের কোন নিরপেক্ষ ও চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেই সে সম্বন্ধে বিশেষ আস্থা স্থাপন করিতে পারেন না। কেন পারেন না? স্বভাবতঃই এই বিষয়ে দুইটী প্রশ্ন উত্থাপিত হয়।

(১) ভারতীয় রাজনীতিকগণ যে ব্রিটিশ রাজনৈতিকগণের এই নিঃস্বার্থ (?) মনোভাবের উপর বিশেষ আস্থাবান নহেন, ইহা কি অন্যায় না ন্যায়সঙ্গত?

(২) ব্রিটিশ রাজনৈতিকগণ কি সত্যই সম্পূর্ণ বিশ্বাসযোগ্য নহেন?

পাঠকগণকে উক্ত প্রশ্নদ্বয়ের উত্তরের জন্য বেশীদূর অগ্রসর হইতে হইবে না। 'দি টাইমস্' একটি পঙক্তিতে সে কথা বলিয়াছেন "বৃটেনের সকলেই অবশ্য ভারতবর্ষকে স্বপ্রতিষ্ঠ ও স্বশাসিত রাষ্ট্ররূপে দেখিতে চায়, কিন্তু যাহাতে এই স্বপ্রতিষ্ঠা ও স্বশাসন পরিপূর্ণরূপে সাম্য ও সুবিচারের উপর প্রতিষ্ঠিত হয় সঙ্গে সঙ্গে সেই বিষয়েও বৃটেনকে নিশ্চিন্ত হইতে হইবে।"—এই পঙক্তিতেই আমাদের প্রশ্ন দুইটির সদুত্তর মিলিবে। এই পঙক্তিতেই ভারতসম্বন্ধে বৃটীশ রাজনীতিকদের মনোভাব সুস্পষ্টরূপে প্রতিভাত হইয়াছে। বস্তুতঃ ইহাতে ব্যক্ত হইয়াছে যে, ভারতকে অনিয়ন্ত্রিত স্বাধীনতা দেওয়া সম্ভব নহে, যেহেতু ভারতীয়গণ বৃটীশ রাজনীতিকদের চোখে সম্পূর্ণ বিশ্বাসের অযোগ্য; কাজেই সাম্যে ও সুবিচারে প্রতিষ্ঠিত হইল কিনা, এই অজুহাতে ভারতকে তত্ত্বাবধানধীন রাখা ভিন্ন আর উপায় কি? কিন্তু আবার স্বাধীনতা যতই ভারতীয় আদর্শ সমন্বিত হোক না কেন, বৃটেনের হস্তক্ষেপস্পৃষ্ট সেই স্বাধীনতাকে কখনই প্রকৃত ভারতের স্বাধীনতারূপে অভিহিত করা চলে না। এমতাবস্থায়, "বৃটেনের সকলেই ভারতবর্ষকে স্বপ্রতিষ্ঠিত ও স্বশাসিত রাষ্ট্ররূপে দেখিতে চায়"—এই উক্তি নিতান্তই অসঙ্গত আর ইহাতে সত্যের অপলাপ স্পষ্টই প্রতীয়মান। এই অসঙ্গত উক্তির জন্য বৃটীশ রাজনীতিকগণকে যদি ভারতীয় রাজনীতিকগণ বস্তুতঃই অবিশ্বাস করেন, তা হইলে অভিযোগ করিবার কিছু নাই।

স্বীকার করি, বৃটেন কর্ত্তৃক ভারতীয়দের পরিচালনার প্রস্তাব বিশেষ যুক্তিসঙ্গত এবং একথাও স্বীকার করি যে, স্বপ্রতিষ্ঠা ও স্বশাসন অব্যাহত রাখিবার যোগ্যতা ভারতীয় রাজনীতিকবর্গ এখনও আয়ত্ত করিতে পারেন নাই; তথাপি কোন ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তিই ব্রিটিশ রাজনীতিকদের এই ধাপ্পাবাজী মূলক মনোবৃত্তি সমর্থন করিতে পারিবেন না। তাহাদের ঈদৃশ মনোবৃত্তি অন্যায়, অসঙ্গত এবং সম্পূর্ণ ব্রিটিশবিরোধী। রাজনীতির এই অবনতির জন্যই ব্রিটিশ কর্ত্তৃপক্ষ আর পূর্ব্বের ন্যায় সকলের বিশ্বাস ভাজন হইতে পারিতেছেন না; এই নৈতিক অবনতির জন্যই ব্রিটিশ সাম্রাজ্য আজ ধ্বংসোন্মুখ। এই ধ্বংস হইতে আত্মরক্ষার কার্য্যে ব্রিটিশ জনসাধারণ যে অসামান্য চরিত্রবলের পরিচয় দিতেছে তাহাতে সন্দেহ নাই; কিন্তু আমরা জানি রোগের মূলীভূত কারণ দূর না করিলে কোন চেষ্টাই সফল হইবে না।

ভারতের সহিত সংশ্লিষ্ট হইয়াই বৃটেন একদিন তার বিরাট সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিতে সমর্থ হইয়াছিল, কিন্তু আজ ভারতের ব্রিটিশ কর্ত্তৃপক্ষ হস্তস্থিত ক্ষমতার অপব্যবহার করিয়াই সেই সাম্রাজ্যকে বিপন্ন করিয়াছেন।

প্রার্থনা করি, বৃটেন যেন সময়মত এই ত্রুটি সংশোধনে সক্ষম হয়।

ভারত কি আত্মনির্ভরশীল নহে?

"একাকী ভারতবর্ষ স্বপ্রতিষ্ঠ হইতে পারিবে কি?" শীর্ষক একটি সম্পাদকীয় প্রবন্ধে 'টাইমস্' অন্যত্র বলিয়াছেন—

"অনেক দিন হইতেই সাধারণতঃ এই ধারণাই বলবতী আছে যে, ভারতবর্ষ একাকী টিকিয়া থাকিতে কখনই সক্ষম হইবে না। তদুপরি বর্ত্তমান যুদ্ধ আমাদের এই শিক্ষাই দিয়াছে যে, ভারতবর্ষ কেন, আন্তর্জ্জাতিক-ক্ষেত্রে কোন জাতিরই একাকী অবস্থান করিবার সামর্থ্য নাই।"

জানিনা, সাধারণতঃ লোকে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে উপরোক্ত ধারণাই পোষণ করে কিনা; কিন্তু আমরা স্থির জানি, অতীত ও বর্ত্তমান বিশ্লেষণ করিয়া ভবিষ্যৎ রচনা করিবার যোগ্যতা যাঁহাদের আছে,—তাঁহারা কখনই একথা স্বীকার করিতে পারিবেন না যে, ভারতবর্ষ একাকী আত্মপ্রতিষ্ঠ হইতে অক্ষম। ইতিহাস বলে কালচক্রের একাংশে এমন একদিন ছিল, যখন ভারত বাহিরের কোনরূপ সহায়তা ব্যতীরেকেই নিজের ভাগ্য নিজেই বিশেষ নৈপুণ্য সহকারে পরিচালনা করিতে পারিত। খৃষ্ট

জন্মের বহু পূর্ব্বে ভগবান বুদ্ধের জন্মকালে ভারতে যে স্বর্ণযুগ বিদ্যমান ছিল, কালচক্রের ইতিহাসের অভিজ্ঞতা বলে সেই স্বর্ণযুগের ভারতবর্ষকে যদি কল্পনা করা যায়, তবে উপলব্ধি করা যাইবে, বর্ত্তমান জগতের সমৃদ্ধি অপেক্ষা তখনকার ভারতের সমৃদ্ধি কতগুণ অধিক ছিল। অথচ ভারতবর্ষ সেই সমৃদ্ধি সমসাময়িক কোন জাতির সাহায্য দান হইতে লাভ করে নাই। এই 'স্বর্ণ' অতীত, যাহা ভারতে একদিন 'বর্ত্তমান' ছিল, তাহা যে, পুনরায় 'বর্ত্তমান' হইতে পারিবে না এই সিদ্ধান্ত নিতান্তই অমূলক ও যুক্তিহীন। প্রাচীন ঋষিগণ কৃত 'সূর্য্যসিদ্ধান্ত' নামক 'জ্যোতিষ-ভূ-তত্ত্বে' লিপিবদ্ধ আছে যে, আমাদের ভারতবর্ষ চন্দ্র ও সূর্য্য হইতে বিশেষ দূরত্বে অবস্থিত বলিয়া চন্দ্র ও সূর্য্যের সহিত বিশিষ্ট এক নৈসর্গিক সম্বন্ধ স্থাপন করিয়াছে। ঈদৃশ বিশিষ্ট নৈসর্গিক সম্বন্ধের জন্যই ভারতের জলবায়ুও অন্যান্য দেশ হইতে স্বতন্ত্র এবং উহার উৎপাদিকা শক্তিও অন্যান্য দেশের তুলনায় অসামান্য ও সবিশেষ বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। ভারতের সন্তানগণ যদি দেশমাতৃকার এই বিপুল উৎপাদিকা শক্তিকে প্রকৃত ভারতীয় উপায়ে ব্যবহারোপযোগী করিতে সচেষ্ট হয়, তা হইলে নিশ্চয়ই ভারতের কৃষি অচিরেই পৃথিবীর সর্ব্বাপেক্ষা সমৃদ্ধি-শালী কৃষি-শিল্পীরূপে পরিগণিত হইবে। কিন্তু সর্ব্বদা মনে রাখিতে হইবে,—যে উপায়ে ভারতের পূর্ব্বোক্ত উর্ব্বরতাকে পুনর্জীবিত করা সম্ভব হইবে, সে উপায় বিদেশের আত্মঘাতী আধুনিক কৃষি বিজ্ঞানের অনুকরণ নহে, সে উপায় ভারতীয় ঋষিগণকৃত 'ভারতীয় কৃষি-বিজ্ঞানের' নির্দ্ধারিত উপায়। প্রকৃতপক্ষে, ভারতের প্রকৃত কৃষি-বিজ্ঞান অনুসৃত হইলে ভারতের উৎপন্ন খাদ্যে কেবলমাত্র দেশবাসীরই ন্যূনতম প্রয়োজন মিটিবে না, বহির্জগতের খাদ্যাভাব দূর করিতেও ভারতবর্ষ পশ্চাৎপদ হইবে না। কিন্তু এই দানের জন্য ভারতবর্ষ কখনও বহির্জগতের নিকট প্রতিদান প্রত্যাশী হইবে না। সম্পন্ন ধনী ব্যক্তি যেমন তাঁহার দরিদ্র প্রতিবেশীর উন্নতিবিধানার্থে মুক্তহস্তে দান করেন, ভারতবর্ষ তেমনি কোনরূপ প্রতিদান গ্রহণ না করিয়াই ক্ষুধার্ত্ত বহির্জগতের খাদ্যাভাব দূর করিবার জন্য অকুণ্ঠচিত্তে সাহায্যদান করিবে। কুণ্ঠিতের প্রতি ধুরন্ধর রাজনীতিকগণ নিজেদের অতিরিক্ত আত্মম্ভরিতাবোধ ত্যাগ করিয়া এ বিষয়ে আমাদের সহিত আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলে আমরাও আমাদের উপরোক্ত উক্তি ও সিদ্ধান্তের যথেষ্ট প্রমাণ দানে প্রস্তুত আছি।

অতএব, দেখা যাইতেছে যে, অপরের সাহায্য ব্যতীত ভারত-বর্ষকে একান্ত অসহায় মনে করা নিতান্ত অবিবেচকের কার্য্য। অবশ্য একথাও সত্য যে, বর্ত্তমানের আন্তর্জ্জাতিক যুদ্ধ-বিবাদে প্রবৃত্ত হওয়া ভারতের পক্ষে কোনক্রমে উচিত নহে এবং শুধু এই কারণেই বলা চলে, একাকী আত্মপ্রতিষ্ঠ হইবার সামর্থ্য যথেষ্ট থাকিলেও বর্ত্তমান পরিস্থিতিতে ভারতের একাকী দাঁড়াইবার চেষ্টা অসঙ্গত। কারণ প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে যে দেশ স্বতঃসমৃদ্ধ; ধর্ম্মাধর্ম্মের অনুশাসনে, সেই দেশের পক্ষে জীবন সংগ্রামে রত অন্যান্য অভাবগ্রস্ত দেশকে মুক্তহস্তে সাহায্যদানই সভ্যতার ধর্ম্ম। এক্ষেত্রে ভারতের হৃত উৎপাদিকাশক্তি যদি প্রকৃষ্ট ভারতীয় উপায়ে পুনর্জীবিত হইবার সুযোগ প্রাপ্ত হয়, তা হইলে সমৃদ্ধিশালী ভারতেরও অবশ্য কর্ত্তব্য ইউরোপীয় জাতিসমূহের আর্থিক সংকট দূরীকরণে সহায় হওয়া। এই প্রসঙ্গে এই কথা বোধ করি বিশেষ অবান্তর হইবে না যে, আধুনিক যুগের ভ্রান্ত ও কলুষিত বিজ্ঞান ও সভ্যতার জন্যই ভারতের এই রিক্ততা,—এই বিপথগামী বিজ্ঞানও সভ্যতার নাগপাশে পড়িয়াই পৃথিবীর বহু প্রতিভাবান সন্তান স্বকীয় প্রতিভা হারাইয়া নিছক ভুঁইফোড়ে পরিণত। আধুনিক বিজ্ঞান ও সভ্যতার এইরূপ সর্ব্বনাশা ভ্রান্তি যদি ঠিকভাবে সংশোধন করা যায়, তা হইলে, বর্ত্তমানে কোন জাতিই একাকী সুপ্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না—এই ধারণা একান্ত ভিত্তিহীন প্রতীয়মান হইবে। জাতি-সমূহ অপরের সাহায্য ব্যতীরেকে স্বপ্রতিষ্ঠই যদি না হইতে পারিল তবে তো স্বাধীনতার আদর্শও নিতান্ত মিথ্যা হইয়া গেল।

প্রকৃতি কি সত্যই পৃথিবীর জাতিসমূহকে এইরূপ সহায়-হীন করিয়া ফেলিয়াছেন? আমরা কিন্তু তাহা মনে করিতে পারি না। মোহমুক্ত দৃষ্টি উন্মীলন করিলেই দেখা যাইবে, প্রকৃতি সর্ব্বকালে এবং সর্ব্বদেশেই অকুণ্ঠহস্ত; জাতিসমূহকে পর্য্যাপ্ত-রূপে আর্থিক স্বাধীনতা দানই তাঁহার একমাত্র লক্ষ্য। তবে এই জাতিসমূহের পক্ষে বর্ত্তমান পরিস্থিতিতে সেই স্বাধীনতা লইয়া আলোচনা করা সঙ্গত কিনা, সে বিষয় এই প্রসঙ্গের বহির্ভূত। এবং এক্ষণে আমরা উহার আলোচনাও করিব না।

যাহাহউক, টাইমস্ শ্রেণীর পত্রিকাদির সম্পাদকগণের প্রতি আমাদের একান্ত অনুরোধ, তাঁহারা যেন বিজ্ঞ পরিচালকের ভূমিকা গ্রহণে বিরত থাকেন। কারণ, এই পদ গ্রহণ করিতে হইলে তাঁহাদের অনেক কিছু জানিয়া শুনিয়া লইতে হইবে।

ভারত যদি আক্রান্ত হয়

কয়েক সপ্তাহ পূর্ব্বে সংবাদপত্র মারফৎ যে সংবাদ এদেশে আসিয়া পৌছিয়াছে, তাহা পাঠে স্পষ্টতই বুঝা যায় যে, বৃটিশ সৈন্তাধ্যক্ষদের ক্রটীহীন বাধাদান সত্ত্বেও হিটলারবাহিনী রাশিয়াকে কবলিত করার পথে বিশেষ অগ্রসর হইয়া পড়িয়াছে এবং তাহাদের গতি ক্রমশই ভারতাভিমুখী। উক্ত ঘটনা হইতে স্বতই প্রশ্ন উঠে যে, জার্ম্মাণগণ কর্ত্তৃক সত্য সত্যই আক্রান্ত হইলে ভারতের দশা কি হইবে?

শত্রু আক্রান্ত ভারতের সাধারণ অবস্থা কল্পনা করা বিশেষ কষ্টসাধ্য নয়। সামান্ত লোক মাত্রেই অনায়াসে বুঝিতে পারে যে, নাৎসীবাহিনী ভারতভূমি আক্রমণ করিলে তাহাদের নৃশংসতায় ভারতের অভিজাত অট্টালিকা শ্রেণী, প্রশস্ত রাজপথসমূহ এবং মূল্যবান কৃষিভূমিগুলি ধূলিবিধ্বস্ত হইবে এবং দেশের সঞ্চিত খাদ্য ও অর্থের বিনাশ ঘটিবে। ফলে, অধিকাংশ ভারতীয় জনসাধারণের ভাগ্যেই আহার পর্য্যন্ত জুটিবে না। গর্ব্বিত অভিজাতমণ্ডলের মিথ্যা আভিজাত্যের অহঙ্কারেরও শেষ হইবে।

কিন্তু, দুর্ভাগ্যের ইহাই কি শেষ? উত্তরে বলি,—না, ইহাই শেষ নয়। সত্যকার অর্থনীতির ক্ষেত্রে ভারতের ভাগ্যে আরও অনেক বড় দুর্য্যোগ সংঘটিত হইবার প্রবল সম্ভাবনা রহিয়াছে। জ্যোতিষভূ-তত্ত্বের যাঁহারা একনিষ্ঠ ছাত্র তাঁহারা জানেন যে, বিস্ফোরক ও বারুদের রাসায়নিক স্পর্শে জলবায়ু কলুষিত হইয়া ভূমির নৈসর্গিক উৎপাদিকা শক্তি বিনষ্ট হয়। জার্ম্মাণ সৈন্যগণের হাতে লাঞ্ছিত হইলে ভারতের ক্ষেত্রেও ইহার অন্যথা হইবে না। আধুনিক কালের ভ্রান্ত বিজ্ঞান হয়তো এই ভূ-তত্ত্ব বুঝিতে পারিবে না, কিন্তু প্রামাণ্য জ্যোতিষ-ভূ-তত্ত্ব সঠিক জানে, বিষাক্ত রাসায়নিক দ্রব্যের সংঘর্ষে ভূমি চিরকালের জন্য স্বীয় স্বাভাবিক উৎপাদন ক্ষমতা হারাইয়া ফেলে এবং ভূমির উৎপাদন ক্ষমতা যদি এইভাবে একেবারে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, তবে সেই হৃতশক্তি আধুনিক কৃত্রিম কৃষি বিজ্ঞানের শত অনুশীলন সত্ত্বেও আর পুনর্জ্জীবিত করা সম্ভবপর হইবে না।

সুতরাং বুঝা যাইতেছে, এইভাবে ভারতের স্বাভাবিক উর্ব্বরতা বিলুপ্ত হইলেই অর্থ-নৈতিক ক্ষেত্রে ভারতের কঠিনতম ভাগ্যবিপর্য্যয় ঘটিবে। কারণ, পূর্ব্ববর্ত্তী নিবন্ধেই আমরা বলিয়াছি যে, বিশিষ্ট ভৌগলিক অবস্থান হেতু ভারতের স্বাভাবিক উৎপাদিকা শক্তি অসামান্ত। ভারতীয় ঋষিগণ নির্দ্ধারিত প্রকৃত কৃষি-তত্ত্ব অনুসারে এই উৎপাদিকা শক্তি কৃষি-উপযোগী করিলে যে বিপুল পরিমাণ খাদ্য উৎপন্ন হইবে, সেই খাদ্য সাত বৎসরের মধ্যেই সমগ্র পৃথিবীর অন্নাভাব মোচন করিতে পারিবে,—অবশ্য যদি ভারতের গভর্ণমেণ্ট সময় থাকিতে সচেতন হইতে সক্ষম হন।

জ্যোতিষ ভূ-তত্ত্ব পাঠে আমরা আরও জানিতে পারি যে, বলকান্ রাজ্যের ভূমি ভারতের পরেই পৃথিবীর সর্ব্বোত্তম উর্ব্বর ভূমি। তবুও ভারতের উর্ব্বরতা বলকান রাজ্যের তুলনায় দশগুণ শক্তিশালী, অর্থাৎ যে খাদ্য ভারতে সাত বৎসরে উৎপন্ন হইতে পারে, বলকানে সেই খাদ্য ৭০ বৎসরেও উৎপন্ন হইবে না। কিন্তু ভারতবর্ষের এই স্বর্ণভূমিই যদি আজ জার্ম্মানদের সম্ভাবিত নৃশংস আক্রমণে ধ্বংস-প্রাপ্ত হয়, তবে ইহার অধিক সর্ব্বনাশ আর কি ঘটিতে পারে?

আমরা কর্ত্তৃপক্ষকে এখনও আমাদের বক্তব্যে কর্ণপাত করিতে অনুরোধ করিতেছি, কারণ আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, জগৎকে ভবিষ্যৎ বিপদ হইতে রক্ষা করিবার ক্ষমতা একমাত্র বৃটিশ সরকারেরই আছে।

ভারতীয় বেদ, উপনিষদ ও দর্শন

শ্রীসচ্চিদানন্দ ভট্টাচার্য্য

প্রবেশিকা

গত ভাদ্র ও আশ্বিন মাসের মাসিক বসুমতীতে "অদ্বৈত-বাদের মূল সন্ধানে" শীর্ষক একটী প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। প্রবন্ধটীর লেখক "অধ্যাপক ডাঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য্য শাস্ত্রী এম. এ, পি. এইচ. ডি, পি. আর এস. কাব্যব্যাকরণসাংখ্য-বেদান্ততীর্থ। এই প্রবন্ধটীতে ভারতীয় ঋষির বেদ, উপনিষদ্ ও দর্শন সম্বন্ধে কয়েকটী কথা আছে। এই কথাগুলি বেদ, উপনিষদ ও দর্শনের বিবিধ ভাষ্যে যে সমস্ত কথা আছে, তাহা বদ হজমের পরিচায়ক। আমাদিগের মতে লেখক ঋষিপ্রণীত কোন বেদের কোন মূল মন্ত্রে, উপনিষদের কোন মূল সূত্রে ও কারিকায় এবং দর্শনের কোন মূল সূত্রে আদৌ প্রবিষ্ট নহেন এবং বেদ অথবা উপনিষদ অথবা দর্শনের মুখ্য বক্তব্য যে কি, তৎসম্বন্ধে আদৌ পরিজ্ঞাত নহেন। যাঁহারা ঋষিপ্রণীত বেদ, উপনিষদ এবং দর্শনের মুখ্য বক্তব্যের সহিত পরিচিত, তাঁহারা সহজেই বুঝিতে পারিবেন, ঋক্-বেদ্ সম্বন্ধে তথাকথিত জ্ঞান উঁহার সায়ণ-ভাষ্যে, এবং বেদান্ত সম্বন্ধে তাঁহার তথাকথিত জ্ঞান উঁহার শঙ্করভাষ্যে সীমাবদ্ধ। লেখকের উপনিষদের জ্ঞান যে কোথা হইতে আসিয়াছে তাহা তাঁহার উপরোক্ত প্রবন্ধ পড়িয়া ভাল করিয়া বুঝা যায় না।

বেদের মূল মন্ত্রের অথবা উপনিষদের মূল সূত্রের ও কারিকার অথবা দর্শন ও মীমাংসার মূল সূত্রের ভাষার বেদাঙ্গ-নির্দ্ধারিত যে পদ্ধতিতে প্রবিষ্ট হইতে হয়, সেই পদ্ধতির সহিত লেখক বিন্দুমাত্রও পরিচিত নহেন। ইহা তাঁহার প্রবন্ধের লেখা হইতে অনায়াসেই প্রমাণিত হইতে পারে। ঋক্ বেদের সায়ণ ভাষ্য এবং বেদান্তের শঙ্কর ভাষ্য লেখক স্থানে স্থানে পাঠ করিয়াছেন ইহা ধরা যায় বটে, কিন্তু সায়ণ-ভাষ্য ও শঙ্করভাষ্য সর্ব্বতোভাবে বুঝিতে হইলে সংস্কৃত ব্যাকরণের সম্বন্ধে যে জ্ঞান থাকা নিতান্ত প্রয়োজনীয়, তৎসম্বন্ধে লেখকের যে অভাব আছে তাহা তাঁহার লেখায় পরিস্ফুট হইয়াছে।

এক কথায় লেখক ভারতীয় ঋষির বেদ, উপনিষদ ও দর্শনের বক্তব্য সম্বন্ধে অনেক কথা লিখিয়াছেন বটে, কিন্তু তিনি যে উহার কোনটীর মূল ভাগে আংশিক ভাবেও প্রবিষ্ট হইতে পারিয়াছেন তাহার কোন পরিচয় তাঁহার প্রবন্ধে পাওয়া যায় না এবং এমন কি, উহার কোন সম্পূর্ণ ভাষ্য যে তিনি যথাযথভাবে অধ্যয়ন করিয়াছেন তাহারও কোন চিহ্ন পাওয়া যায় না। উপরোক্ত প্রবন্ধ সম্বন্ধে সর্ব্বাপেক্ষা আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, প্রবন্ধটীর নাম দেওয়া হইয়াছে "অদ্বৈতবাদের মূল সন্ধানে।" অথচ "অদ্বৈত-বাদ" যে কাহাকে বলে এবং তাহার "মূল" যে কোন্ শ্রেণীর "ভূত" অথবা "ভাব" অথবা "বিষয়" তাহা তিনি তাঁহার প্রবন্ধের কুত্রাপিও বিশ্লেষণ করেন নাই। "অদ্বৈতবাদ" অথবা "অদ্বৈতবাদের মূল" বলিতে যে "শব্দ" ও "ধ্বনি"র উদ্ভব হয় তাহাতে স্বভাবতঃ কি বুঝিতে পারা যায় তাহা যাঁহারা সম্যক্-ভাবে ধারণা করিতে সক্ষম হইয়াছেন তাঁহারা লেখকের প্রবন্ধ পাঠ করিলে বুঝিতে পারিবেন যে, লেখক "অদ্বৈতবাদের মূল" কাহাকে বলে তাহার কোন ধারণাও করিতে পারেন নাই এবং এমন কি "অদ্বৈতবাদ" বলিতে যে কি বুঝায় তাহা পর্য্যন্ত ধরিতে পারেন নাই।

আমরা লেখকের লেখার বিরুদ্ধ সমালোচনায় কেন এইরূপ হস্তক্ষেপ করিয়াছি এবং আমাদিগের এই বিরুদ্ধ-সমালোচনা যে যুক্তি-সঙ্গত ও যথার্থ, তাহা এক্ষণে সর্ব্ব-সমক্ষে বুঝাইবার চেষ্টা করিব।

ভারতীয় ঋষির বেদ, উপনিষদ ও দর্শন সম্বন্ধীয় কোন কথা যাঁহারা আজকাল আলোচনা করিয়া থাকেন তাঁহারা প্রায়শঃ আমাদিগের আলোচ্য লেখকের মতনই কতকগুলি অর্থহীন কথার আরোপ করিয়া থাকেন এবং তাঁহাদিগের

আলোচনা হইতে সাধারণ মানুষের ব্যবহার্য্য কোন বাস্তব-কথা প্রায়শঃ পাওয়া যায় না। এই হিসাবে আমাদিগের আলোচ্য লেখকের প্রতি কোন দোষারোপ করা যুক্তি-সঙ্গত নহে এবং তিনি সর্ব্ব-সাধারণের ক্ষমার পাত্র।

যাঁহাদিগের সহিত আমরা কোনরূপ নিকট ও দূর সম্পর্কে সম্পর্কিত, তাঁহাদিগের ব্যথায় ব্যথিত হইয়া প্রথমতঃ তাঁহাদিগের ব্যথা কত শ্রেণীর, দ্বিতীয়তঃ ঐ সমস্ত ব্যথার উদ্ভব হয় কেন, তৃতীয়তঃ আমাদিগের আপনার জনের ব্যথা দূর করা যায় কি করিয়া—ইত্যাদি প্রশ্নের উত্তরের সন্ধানে একনিষ্ঠভাবে দৃঢ় চিত্তের সহিত প্রবৃত্ত হইলে দেখা যাইবে যে, ঐ সমস্ত প্রশ্নের কোন প্রাণ-স্পর্শী উত্তর অ-ভারতীয় কোন দর্শন অথবা বিজ্ঞানে অথবা কাব্য অথবা নাটক অথবা সাহিত্য অথবা সমাজ-গঠন মূলক গ্রন্থে পাওয়া যায় না। এইখানে মনে রাখিতে হইবে যে, মূল বাইবেল ও মূল কোরাণকে আমরা ভারতীয় ঋষি-প্রণীত ভারতীয় গ্রন্থের মধ্যে গণনা করিয়া থাকি। শুধু যে অ-ভারতীয় কোন পণ্ডিতের লেখায় ঐ সমস্ত প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যায় না তাহা নহে, কোন তথাকথিত ভারতীয় পণ্ডিতের লেখাতেও ঐ জাতীয় কোন প্রশ্নের প্রাণস্পর্শী বাস্তব-ব্যবহারোপযোগী কোন জবাব দেখিতে পাওয়া যায় না। ঐ সমস্ত প্রশ্নের সর্ব্বতোভাবে অভ্রান্ত জবাব পাওয়া যায় একমাত্র ভারতীয় ঋষির মূল বেদ, মূল উপনিষদ, মূল দর্শন ও মূল সংহিতায়। ভারতীয় ঋষির মূল বেদ, মূল উপনিষদ, ও মূল দর্শন অধ্যয়ন করিতে হইলে তাঁহাদিগের মূল বেদাঙ্গ, মূল তন্ত্র ও মূল পুরাণ পাঠ ও অভ্যাস করিতে হয়।

ভারতীয় ঋষির লেখাগুলি আধুনিক কালে সাধারণতঃ যে যে অর্থে গৃহীত হইয়া থাকে অথবা গত আড়াই হাজার বৎসর হইতে যে যে অর্থে গৃহীত হইয়া আসিতেছে, আড়াই হাজার বৎসরের আগে ঐ জাতীয় অর্থে গৃহীত হইত না। আড়াই হাজার বৎসরের আগে প্রায় দেড় হাজার বৎসর কাল ভারতীয় ঋষি-প্রণীত গ্রন্থের আলোচনা সর্ব্বতোভাবে মনুষ্য-সমাজ হইতে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছিল। এই বিলুপ্তির প্রায় দেড় হাজার বৎসর আগে ভারতীয় ঋষি-প্রণীত গ্রন্থগুলি সর্ব্বতোভাবে অভ্রান্ত অর্থে গৃহীত হইত। আমাদিগের এই কথাগুলির কোনটী কাল্পনিক নহে। উহার প্রত্যেকটী প্রামাণ্য গ্রন্থ হইতে গৃহীত।

বর্ত্তমান কাল হইতে প্রায় সাড়ে পাঁচ হাজার বৎসর আগে ভারতীয়-ঋষির মূল গ্রন্থগুলি যে যে অর্থে গৃহীত হইত সেই সেই অর্থ হইতে প্রথমতঃ মানুষের দুঃখ কত শ্রেণীর, দ্বিতীয়তঃ মানুষের দুঃখ উদ্ভব হয় কত রকমে এবং কেন, তৃতীয়তঃ মানুষের সর্ব্বশ্রেণীর সর্ব্বরকমের দুঃখ দূর করা যায় কোন্ উপায়ে—ইত্যাদি বিষয়ক অবশ্য প্রয়োজনীয় জ্ঞান আহরণ করা সম্ভব হইত।

এই সাড়ে পাঁচ হাজার বৎসর আগেকার কালে মনুষ্য-সমাজের অবস্থা কিরূপ ছিল, তাহার চিত্র অঙ্কিত করিতে পারিলে দেখা যাইবে যে, ঐ সময়ে মনুষ্য-সমাজ সর্ব্বশ্রেণীর, সর্ব্বরকমের দুঃখ হইতে মুক্ত হইতে পারিয়াছিল এবং তখন সমগ্র জগতের সমগ্র মনুষ্য-সমাজ প্রায়শঃ ভারতীয় ঋষি-প্রণীত প্রত্যেক গ্রন্থের প্রত্যেক অনুশাসনও শ্রদ্ধার সহিত পালন করিত।

আমাদিগের মতে ভারতীয় ঋষির লেখাগুলি উপরোক্ত সাড়ে পাঁচ হাজার বৎসরের আগে যে যে অর্থে গৃহীত হইত, সেই সেই অর্থে পুনরায় প্রচারিত হইতে আরম্ভ হইলে এবং ভারতীয় ঋষির মূল অনুশাসনগুলি যাহাতে সমগ্র মনুষ্য-সমাজের প্রত্যেক স্থলে প্রচারিত হয় তাহার ব্যবস্থা হইলে, পুনরায় মনুষ্য-সমাজের প্রত্যেকে উহা শ্রদ্ধার সহিত পালন করিবে এবং সর্ব্ববিধ দুঃখের হাত হইতে এড়াইতে পারিবে। ইহা যে হইতেছে না, তাহার বড় কারণ আমাদিগের আলোচ্য লেখকের মত পণ্ডিতশ্রেণীর দুর্ব্যাখ্যা। যাঁহারা পাণ্ডিত্যের উপাধিতে অথবা খ্যাতিতে ভূষিত হইবার সৌভাগ্য লাভ করিতে পারিয়াছেন তাঁহাদিগের ব্যাখ্যা যতই অবোধ্য হউক না কেন, সাধারণ মনুষ্য-সমাজ ঐ ব্যাখ্যা বুঝিতে না পারিলেও উহাকে ঋষির মূলকথার ব্যাখ্যা বলিয়া ধরিয়া লইয়া থাকেন। ফলে ভারতীয় ঋষির প্রকৃত কথার পুনরুদ্ধার সম্ভবযোগ্য হইতেছে না। আমরা পিপীলিকার মত নগণ্য হইলেও, আমাদিগের কথা কাহারও শ্রদ্ধার যোগ্য না হইলেও, ভারতীয় ঋষির কথাগুলির যাহাতে পুনরুদ্ধার হয় তাহার সাধ্যমত সাহায্য করা আমাদিগের অন্যতম কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করি। এই কার্য্যে যদি আমাদিগের অনধিকারচর্চ্চা করা হয়, তাহা হইলে আমরা ঐ দোষে দুষ্ট ইহা আমাদিগকে স্বীকার করিতেই

হইবে। যাঁহারা কোন-ঋষির কোন কথা অসঙ্গত ভাবে ব্যাখ্যা করিবেন—তাঁহারা আমাদিগের যতই আপনার হউন না কেন, অথবা তাঁহারা পণ্ডিতগণের যতই মান্য হউন না কেন, তাঁহাদিগের ব্যাখ্যা যে অসঙ্গত তাহা সর্ব্বসাধারণকে দেখাইয়া দিবার চেষ্টা করা আমাদিগের সাময়িক ব্রত। বড় বড় পণ্ডিতগণের কথার বিরুদ্ধ সমালোচনা কেন আমরা করিয়া থাকি, তাহা পাঠকগণ এক্ষণে বুঝিতে পারিবেন।

আলোচ্য লেখক তাঁহার প্রবন্ধে ভারতীয় ঋষির বেদ, উপনিষদ ও দর্শন সম্বন্ধে যে যে কথা লিখিয়াছেন সেই সেই কথা যে ঐ ঐ বিষয়ে তাঁহার অজ্ঞতার পরিচায়ক, তাহা দেখাইতে হইলে ভারতীয় ঋষির বেদ, উপনিষদ ও দর্শনের মুখ্য বক্তব্য কি তাহা সর্ব্বপ্রথমে আমাদিগকে আলোচনা করিতে হইবে। ঋষি-প্রণীত কোন্ গ্রন্থের অথবা কোন্ পুস্তার কি বক্তব্য, তাহার নির্দ্ধারণপদ্ধতি ঋষি তাঁহার "সারদাতিলক তন্ত্রে" বিবৃত করিয়াছেন। ঐ পদ্ধতি "যোগোক্ত" "প্রত্যাহার" ও "ধারণা" অভ্যাসের উপর প্রতিষ্ঠিত। উহা সর্ব্বসাধারণকে বুঝান সম্ভব নহে। ঐ পদ্ধতিকে ভিত্তি করিয়া "বেদ", "উপনিষদ" ও "দর্শনের" মুখ্য বক্তব্য সম্বন্ধে যে যে কথা পাওয়া যায়, তাহা যতদূর সম্ভব সাধারণের বোধগম্য করিবার চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইব। কোন ঋষির কোন কথা বিশেষতঃ বেদের কোন কথা ভ্রান্তভাবে প্রচারিত হইলে প্রচারকর্ত্তা হয় নির্ব্বংশ নতুবা শ্রীহীন হইয়া থাকেন। আমরা সিদ্ধপুরুষ নহি। পরন্তু নিন্দনীয় স্বভাবের মানুষ। বেদ, উপনিষদ ও দর্শনের কোন কথা ভ্রম-প্রমাদহীন ভাবে প্রকাশ করিবার সামর্থ্য আমাদিগের আছে কি না তদ্বিষয়ে আমরা নিজেরাই সন্দিগ্ধ। ইহারই জন্য ঋষি-প্রণীত কোন গ্রন্থের আমূল ব্যাখ্যা করিবার ঐকান্তিক সাহস আমাদিগের হয় না। ঐ সাহস কখনও উদ্দীপ্ত হয়, আবার কখনও নিভিয়া যায়। কোন তথাকথিত পণ্ডিতের লেখনী হইতে ঋষির কোন কথার কু-ব্যাখ্যা বাহির হইলে যতক্ষণ পর্য্যন্ত তাহার প্রতিবাদ না হয় ততক্ষণ পর্য্যন্ত নানাবিধ কার্য্যের মধ্যে বিবিধ প্রযত্ন সত্ত্বেও স্থিরতা রক্ষা করা সম্ভব হয় না। বিধাতাগণের এ যে কি প্রহেলিকা তাহা বুঝিতে পারি না। যিনি এই উভয়ের প্রযোজক, তিনি লেখনীকে সঠিকভাবে নিয়ন্ত্রিত করিয়া নির্ব্বংশ ও শ্রীহীন হইবার বিপত্তি হইতে রক্ষা করুন ইহা তাঁহার নিকট প্রার্থনা করি। কেহ যেন বিচার না করিয়া আমাদিগের কোন কথা গ্রহণ না করেন।

ঋষি-প্রণীত মূল বেদ, মূল উপনিষদ ও মূল দর্শনের মুখ্য বক্তব্য কি কি ?

ঋষি-প্রণীত মূল-বেদ, মূল-উপনিষদ ও মূল দর্শনের মুখ্য বক্তব্য কি কি তাহা সাধারণ বুদ্ধির দ্বারা বুঝিতে হইলে মনে রাখিতে হইবে যে, ইহা সাধারণ বুদ্ধির দ্বারা সম্যক ভাবে বুঝা যায় না। সম্যক্‌ভাবে বুঝিতে হইলে বুদ্ধিকে পরিমার্জ্জিত করিবার প্রয়োজন হয় এবং ইহার একমাত্র উপায় যাজ্ঞবল্ক্য এবং পাতঞ্জলোক্ত যোগাভ্যাস করা। সাধারণ বুদ্ধির দ্বারা কেবল মোটামুটী ভাবে মূল-বেদ, মূল-উপনিষদ ও মূল-দর্শনের বক্তব্য ধরিতে পারা যায়। বেদ, উপনিষদ ও মূল-দর্শন সমূহের মুখ্য বক্তব্য কি, তাহা সম্যক্‌ভাবে ধরিতে হইলে ঐ তিনটী পদের মৌলিক অর্থ কি কি তাহা জানিতে হইবে এবং তাহাদের ধারণা করিতে হইবে।

"বেদ" এই পদটীর অর্থ কি, তৎসম্বন্ধে অনেকেই অনেক কথা বলিয়াছেন এবং বলেন।

কেহ বলেন, "বিদন্তি অনেন ধর্ম্মং" অর্থাৎ ইহার দ্বারা ধর্ম্ম উপলব্ধি করা সম্ভব হয় বলিয়া ইহার নাম বেদ। কেহ বলেন, 'বিদজ্ঞানে' অর্থাৎ ব্রহ্মরূপ হইতে চৈতন্যের উদয় হয় কি করিয়া তাহা ইহার সহায়তায় উপলব্ধি করা যায় বলিয়া ইহার নাম বেদ। আবার কেহ বলেন, 'ইন্দ্রিয়াদি দেবতা প্রকাশকে, মীন-শরীরাবচ্ছেদেন ভগবৎবাক্যমিতি ভায়শাস্ত্রং' অর্থাৎ শরীরস্থ ব্রহ্মাকাশের বিবিধ কার্য্যের সহিত ইন্দ্রিয়, মন, ও বুদ্ধির কি সম্বন্ধ তাহা উপলব্ধি করিতে পারিলে শরীরের বহির্ম্মুখী ও অন্তর্ম্মুখী কার্য্যের সহায়তায় ব্যক্ত ও অব্যক্ত বিষয়মূলক বাক্য সম্বন্ধে যে জ্ঞানের উদ্ভব হয়, সেই জ্ঞান-বিধিকে বেদ-সংজ্ঞা দেওয়া হইয়া থাকে।

কাহারও কাহারও মতে, "ক্রমোপগৃহীতবর্ণাত্মনি অপৌরুষেয়বাক্যে, বেদয়তি বোধয়তি আত্মানং" অর্থাৎ

একটীর পর একটী করিয়া বিভিন্ন অক্ষরের উৎপত্তি হয় কি করিয়া তাহা জানিতে পারিলে ব্রহ্মরূপ, পুরুষ অর্থাৎ মুক্তাকাশস্থিত চৈতন্যের বীজ ও বাক্যের মধ্যে কি সম্বন্ধ আছে তাহা উপলব্ধি করা যায় এবং তখন শব্দ, পঞ্চ মহাভূত এবং পঞ্চ তন্মাত্রার পরিণতি কি তাহা বোধগম্য হয়। এই সমস্ত কার্য্যের সহায়তা যাহার দ্বারা হয় তাহার নাম বেদ।

শাস্ত্রে পারদর্শী হইতে পারিলে দেখা যাইবে যে, প্রাচীন গ্রন্থসমূহে বেদের সংজ্ঞা সম্বন্ধে যে সমস্ত বাক্য লিপিবদ্ধ আছে, তাহা প্রায়শঃই নিন্দনীয় নহে কিন্তু তাহার কোনটী হইতে বেদের বিষয়বস্তু যে কি তাহা সম্পূর্ণ অথবা পরিষ্কার ভাবে ধরা আজকালকার পণ্ডিতগণের পক্ষে সম্ভব হয় না। ইহা ছাড়া সংস্কৃত পদ ও বাক্যের অর্থোদ্ধার করিবার যে পদ্ধতি বেদাঙ্গে বর্ণনা করা হইয়াছে তাহাতে সম্যক্ ভাবে পারদর্শী না হইতে পারিলে ঐ সমস্ত প্রাচীন সংজ্ঞা-বিধায়ক বাক্যও যথাযথভাবে আধুনিক পণ্ডিতগণের পক্ষে বুঝিয়া উঠা সম্ভব হয় না।

সেইরূপ আবার, "উপনিষৎ" এই পদের সংজ্ঞা করিবার জন্য প্রাচীন পণ্ডিতগণ যে সমস্ত বাক্য রচনা করিয়াছেন, তাহা অনুসন্ধান করিলেও প্রায়শঃ একই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হইবে। সংস্কৃত বাক্যের অর্থোদ্ধার করিবার জন্য বেদাঙ্গে যে সমস্ত বিধি লিপিবদ্ধ আছে, তাহা অনুসরণ করিয়া ঐ সমস্ত প্রাচীন সংজ্ঞা-বাক্য বুঝিয়া লইতে পারিলে দেখা যাইবে যে, উহা প্রায়শঃই নির্ভুল। কিন্তু ঐ সমস্ত বাক্য আধুনিক পণ্ডিতগণের পক্ষে একদিকে যেরূপ বুঝিয়া উঠা সম্ভব হয় না, সেইরূপ আবার তাঁহাদিগের পক্ষে ঐ সমস্ত বাক্য হইতে উপনিষদের বিষয়বস্তু যে কি তাহাও ধরিয়া উঠা সহজসাধ্য হয় না।

উদাহরণ স্বরূপ উপনিষদের সংজ্ঞা সম্বন্ধীয় নিম্নলিখিত কতকগুলি বাক্য উদ্ধৃত করিব—

(১) ব্রহ্মবিদ্যায়াং ব্রহ্মাত্মৈক্যসাক্ষাৎকারে

(২) অত্র চোপনিষচ্ছব্দো ব্রহ্মবিদ্যৈকগোচরঃ।
তচ্ছব্দাবয়বার্থস্য বিদ্যায়ামেব সম্ভবাৎ॥

(৩) উপোপসর্গঃ সামীপ্যে তৎ প্রতীচি সমাপ্যতে।
সামীপ্যে তারতম্যস্য বিশ্রান্তেঃ স্বাত্মনীক্ষণাৎ॥

(৪) ত্রিবিধস্য সদর্থস্য নিশব্দোপি বিশেষণম্।
উপনীয় তমাত্মানং ব্রহ্মাপাস্তদ্বয়ং যতঃ॥

(৫) নিহন্ত্যবিদ্যাং তজ্জঞ্চ তস্মাদুপনিষদ্ভবেৎ।
নিহত্য সর্বমূলং যা বিদ্যাং প্রত্যক্স্বরূপিণম্॥

(৬) গময়তি অস্তসত্ত্বেদং অদ্বৈতোপনিষদ্ভবেৎ।

(৭) প্রবৃত্তিহেতুনিঃশেষাৎ তন্মূলোচ্ছেদকত্বতঃ।
যতঃ অবসাদয়েৎ বিদ্যা তস্মাৎ উপনিষৎ ভবেৎ॥

উপরোক্ত সাতটী বাক্যের যে কোনটী যথাযথভাবে বুঝিতে পারিলে "উপনিষৎ" বলিতে যে কি বুঝায় তাহা নির্ভুলভাবে বুঝা যাইবে। কিন্তু আধুনিক পণ্ডিতগণের পক্ষে উহার কোনটীই বাস্তবার্থে বুঝিয়া উঠা সম্ভব নহে। ইহার কারণ সংস্কৃত ভাষা বুঝিবার জন্য বেদাঙ্গে যে পদ্ধতি দেওয়া আছে, তাহা এই পণ্ডিতগণ প্রায়শঃ জানেন না।

"দৃশ্যতে অনেন অস্মিন্ বা"—এই বাক্যটী যথাযথভাবে ধারণা করিতে পারিলে ছয়টী দর্শনের উদ্দেশ্য যে কি তাহা ভাল করিয়া বুঝাই সম্ভব হয়। কিন্তু পরিতাপের বিষয় এই যে, আধুনিক পণ্ডিতগণ উপরোক্ত বাক্যটীও যে সম্যক্‌ভাবে বুঝিতে পারেন, তাহার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না।

বেদ, উপনিষৎ ও দর্শনের মুখ্য বক্তব্য কি কি তাহা সম্যক্‌ভাবে জানিতে হইলে প্রথমতঃ সংস্কৃত ভাষার বৈশিষ্ট্য এবং দ্বিতীয়তঃ শব্দস্ফোট উপলব্ধি করিবার পদ্ধতি পরিজ্ঞাত হইতে হয়।

সংস্কৃত ভাষার বৈশিষ্ট্য কি, তাহা জানিতে হইলে মনে রাখিতে হয় যে, সংস্কৃত ভাষা চৌদ্দটী প্রত্যাহারসূত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং "প্রত্যাহার" অষ্টাঙ্গ যোগের একটী অঙ্গ। প্রাণায়ামে সম্যক্‌ভাবে পারদর্শী হইতে পারিলে প্রত্যাহারে প্রবিষ্ট হওয়া সম্ভব হয়। প্রত্যাহারে অভ্যস্ত না হইতে পারিলে "প্রাকৃত" ও লৌকিক ভাষার সহিত সংস্কৃত ভাষার যে কি পার্থক্য তাহা ধরা যায় না এবং সংস্কৃত ভাষার বৈশিষ্ট্য যে কি তাহা অপরের মুখে শুনিয়া সম্যক্‌ভাবে বুঝা যায় না। আজকালকার পণ্ডিতগণ প্রায়শঃ প্রত্যাহারে অভ্যস্ত নহেন এবং ফলে একটী বিকৃত-কিমাকারের লৌকিক ভাষাকে লোক-সমক্ষে "সংস্কৃত ভাষা" বলিয়া প্রচার করিয়া যাইতেছেন। "প্রত্যাহারে" অভ্যস্ত হইতে না পারিলে শব্দ-স্ফোট উপলব্ধি করাও সম্ভব হয় না।

যোগদর্শনের "শব্দার্থপ্রত্যয়ানাং ইতরেতর অধ্যাসাৎ সঙ্করঃ; তৎ প্রবিভাগসংযমাৎ সর্বভূতরুতজ্ঞানং।" এই সূত্রটী এবং মীমাংসা-দর্শনের "ঔৎপত্তিকস্তু শব্দস্য অর্থেন সম্বন্ধঃ তস্য জ্ঞানং উপদেশোঽব্যতিরেকশ্চ। অর্থেঽনুপলব্ধে তৎ প্রমাণং। বাদরায়ণস্য অন্-অপেক্ষত্বাৎ।" এই সূত্রটী যাঁহারা ধারণা করিতে সক্ষম হইয়াছেন তাঁহারা সংস্কৃত ভাষার বিরাটত্ব কতখানি এবং উহাতে প্রবিষ্ট হইবার প্রাথমিক সূত্র কি তাহা ধরিতে পারিবেন।

এক একটী বাক্যের এক একটী কিম্ভূত-কিমাকার অর্থ করিয়া অনেক পণ্ডিত মনে করেন যে, তাঁহারা সংস্কৃত ভাষা জানেন। বাক্য কিরূপ ভাবে গৃহীত হইলে তাহার সঠিক অর্থোদ্ধার করা হইয়াছে মনে করা যাইতে পারে, তাহা জানিতে হইলে ভর্তৃহরির

"বিষয়ত্বমনাপন্নৈঃ শব্দৈঃ নার্থঃ প্রতীয়তে।
ন সত্তৈব তে অর্থানাং অগৃহীতাঃ প্রকাশকাঃ।"

এই কারিকাটী স্মরণ রাখিতে হইবে। এই কারিকাটী স্মরণ রাখিলে দেখা যাইবে যে বেদ, উপনিষদ, দর্শন, সংহিতা, পুরাণ, তন্ত্র প্রভৃতি ঋষি-প্রণীত গ্রন্থের যে সমস্ত [ইংরা]জী ও বাঙ্গালা অনুবাদ বাজারে চলিত আছে, তাহার কোনটীতে মূল গ্রন্থের কোন মূল বিষয় যথাযথভাবে প্রকাশিত হয় নাই। এবং আধুনিক পণ্ডিতগণের দ্বারা প্রায়শঃ উহা প্রকাশিত হওয়া সম্ভব নহে। বেদ, পুরাণ ও তন্ত্রের মন্ত্র বহুদিন হইতে ব্রাহ্মণগণ বুঝিতে না পারিয়াও বুঝিবার ভান করেন বলিয়াই বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার "লোক-রহস্যের" ব্যাঘ্রাচার্য্য বৃহল্লাঙ্গুল নামক নিবন্ধে একদিন লিখিয়াছিলেন "অভিধানে দেখে, পুরোহিত চালকলাভোজী বঞ্চনা-ব্যবসায়ী মনুষ্য বিশেষ। ……বারাণসী নামক নগরে অনেকগুলি ষাঁড় আছে—তাহারা চাল কলা খাইয়া থাকে। তাহারা পুরোহিত নহে, তাহার কারণ, তাহারা বঞ্চক নহে। বঞ্চকে যদি চাল কলা খায়, তাহা হইলে পুরোহিত হয়"।

সংস্কৃত ভাষা বুঝিবার মত লোক দুর্লভ হইয়াছে বলিয়াও বেদ, উপনিষৎ এবং দর্শনের মুখ্য বক্তব্য যে কি তাহা আজকালকার অনেকের সর্ব্বতোভাবে জানা প্রায়শঃ সম্ভব নহে। সম্যক্ ভাবে উহা জানিতে হইলে কতকগুলি মানুষকে প্রথমতঃ "যম" (অর্থাৎ অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য্য, দয়া, আর্জ্জব, ক্ষমা, ধৃতি, মিতাহার ও শৌচ,) এবং দ্বিতীয়তঃ "নিয়ম" (অর্থাৎ তপঃ, সন্তোষ, আস্তিক্য, দান, ঈশ্বর-পূজা, সিদ্ধান্ত-শ্রবণ, হ্রী, মতি, জপ ও ব্রত) তাঁহাদিগের দৈনন্দিন জীবনের প্রত্যেক কার্য্যে অভ্যাস করিতে হইবে। এবং যাঁহারা অনাচারী, খামখেয়ালী, চরিত্রহীন, মিথ্যাবাদী এবং কপট-বৃত্তিসম্পন্ন মনিবের অধীনে কোনরূপ চাকুরী করিয়া জীবিকার্জ্জন করিতে বাধ্য হন অথবা যাঁহারা প্রধানতঃ ধনবৃদ্ধির জন্য বণিক-বৃত্তি অবলম্বন করেন, তাঁহাদিগের পক্ষে "যম" ও "নিয়ম" অভ্যাস করা কোন ক্রমেই সম্ভব হয় না। "যম" ও "নিয়ম" অভ্যাস করিতে না পারিলে যোগোক্ত আসনের উদ্দেশ্য বুঝা যায় না এবং উহা যথাযথ ভাবে অভ্যাস করাও সম্ভব হয় না। "আসন" অভ্যাস করিতে না পারিলে "প্রাণায়াম" অভ্যাস করা সম্ভব হয় না এবং "প্রাণায়ামে" সুদক্ষ হইতে না পারিলে "প্রত্যাহার" অভ্যাস করা সম্ভব হয় না। "প্রত্যাহারে" সুদক্ষ হইতে না পারিলে যে ঋষি-প্রণীত সংস্কৃত ভাষায় যথাযথ ভাবে প্রবিষ্ট হওয়া সম্ভব নহে, তাহা আগেই বলিয়াছি।

আজকালকার লোকালয়ে অথবা জঙ্গলে যে সমস্ত যোগী "আসন" ও "প্রাণায়ামে" সুদক্ষ বলিয়া নিজদিগকে জাহির করিয়া থাকেন তাঁহারা প্রায়শঃ বিশ্বাসযোগ্য নহেন। যাঁহারা "যাজ্ঞবল্ক্য" ও "পাতঞ্জলোক্ত" যোগে প্রবিষ্ট, তাঁহারা উহাদিগের "আসন" ও প্রাণায়ামের বিকৃতি সহজেই ধরিতে পারিবেন। যে স্বামিজীগণ বিবিধ সম্প্রদায়ের পৌরোহিত্য করিতেছেন, তাঁহারা প্রায়শঃ আসনের ও প্রাণায়ামের প্রকৃত রূপ ধরিতে পারেন না। "প্রাণায়ামের" প্রকৃত প্রকরণে সুদক্ষ হইতে পারিলে চুপ করিয়া বসিয়া থাকিবার অথবা নাক টিপিবার অথবা সজোরে শ্বাস-গ্রহণ ও প্রশ্বাস-পরিত্যাগের প্রয়োজন হয় না, তখন হাঁটিতে হাঁটিতে এবং কথা কহিতে কহিতেও প্রাণায়াম করা সম্ভব হয়।

যাঁহারা যম ও নিয়ম অভ্যাসপ্রয়াসী, তাঁহাদিগের অধীনে যাঁহারা চাকুরী করিয়া জীবিকার্জ্জনের সুযোগ লাভ করিবার সৌভাগ্যে ভাগ্যবান্, কেবল তাঁহাদিগের পক্ষেই চাকুরীর জীবনেও যম এবং নিয়ম অভ্যাস করা সম্ভব হইয়া থাকে।

কতকগুলি মানুষ যখন তাঁহাদিগের দৈনন্দিন জীবনের প্রত্যেক কার্য্যে "যম" ও "নিয়ম" অভ্যাস করিয়া যোগের

প্রত্যহ্যহার পর্য্যন্ত অভ্যাস করিতেন, তখন কেবলমাত্র তাঁহাদিগের পক্ষে প্রকৃত সংস্কৃত ভাষায় প্রবিষ্ট হওয়া সম্ভব হইবে এবং কেবলমাত্র তখনই বেদ, উপনিষদ্ ও দর্শনের মুখ্য বক্তব্য সম্পূর্ণ ভাবে উপলব্ধি করা যাইবে।

আজকালকার দিনে বেদ, উপনিষৎ ও দর্শনের বক্তব্য বুঝিবার একমাত্র উপকরণ সাধারণ-বুদ্ধি (common-sense)। উহার সহায়তায় কেবল মাত্র কয়েকটী মোটা কথা জানা সম্ভব হয়।

সাধারণ-বুদ্ধি দ্বারা বেদ, উপনিষৎ ও দর্শনের মুখ্য বক্তব্য সম্বন্ধে যতখানি বুঝা যায় ততখানি বুঝিতে হইলে মানুষের অবশ্য জ্ঞেয় কি কি তাহা প্রথমতঃ জানিয়া লইতে হইবে। তাহার পর যাহা যাহা মানুষের অবশ্য জ্ঞেয় তাহা সাধারণতঃ সাধারণ বুদ্ধির দ্বারা কি করিয়া জানা যাইতে পারে, তাহা চিন্তা করিয়া বাহির করিতে হইবে।

মানুষের অবশ্য জ্ঞেয় কি কি তৎসম্বন্ধে ন্যায়দর্শনে সম্পূর্ণভাবে আলোচনা করা হইয়াছে। ন্যায়দর্শনের ঐ সম্বন্ধীয় মূল সূত্র—"আত্ম-শরীর-ইন্দ্রিয়-অর্থঃ-বুদ্ধি-মনঃ-প্রবৃত্তি-দোষ-প্রেত্যভাব-ফল-দুঃখ-অপবর্গাঃ তু প্রমেয়ম্।" ন্যায়দর্শনের উপরোক্ত সূত্রের তাৎপর্য্য সঠিকভাবে ধরিতে পারিলে দেখা যাইবে যে, প্রত্যেক মানুষের জ্ঞেয় বিষয় বারটী, যথা :—

(১) আত্ম—অর্থাৎ জীবের ইচ্ছা, দ্বেষ, প্রযত্ন, সুখ, দুঃখ, জ্ঞান, প্রভৃতি ভাবের কারণ।

(২) শরীর—অর্থাৎ জীবের মেদ, অস্থি, মজ্জা, বসা, মাংস, রক্ত প্রভৃতি অঙ্গের কারণ।

(৩) ইন্দ্রিয়—অর্থাৎ জীবের চক্ষুঃ, কর্ণ, নাসিকা জিহ্বা, ত্বক্, প্রভৃতি জ্ঞানাহরিণী ও জ্ঞানপ্রদায়িনী উপকরণের এবং বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ প্রভৃতি কর্ম্মশক্তি-আহরিণী ও কর্ম্মশক্তিবিকাশিনী উপকরণের কারণ।

(৪) অর্থ—অর্থাৎ শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ প্রভৃতি ভাবের প্রতি আকৃষ্টতার কারণ।

(৫) বুদ্ধি—অর্থাৎ উপলব্ধিশক্তির কারণ।

(৬) মন—অর্থাৎ যুগপৎ জ্ঞানবৃত্তি ও উপভোগবৃত্তির কারণ।

(৭) প্রবৃত্তি—অর্থাৎ আত্মবিকাশ জ্ঞান উপনীত হইলেই তাহার ঐশ্বর্য্য করিবার জন্য অভিমানপ্রসূত যে প্রযত্নের উদ্রেক হয়, তাহার কারণ।

(৮) দোষ—অর্থাৎ স্বাভাবিক তামসিকতার কারণ।

(৯) প্রেত্যভাব—অর্থাৎ নানারকমে ঠকিয়াও পুনঃপুনঃ অভিমানোৎপত্তির কারণ।

(১০) ফল—অর্থাৎ তামসিকতা হইতে রক্ষা পাইবার জন্য অভিমানপ্রসূত প্রযত্নে যে অবস্থার উৎপত্তি হয় তাহার কারণ।

(১১) দুঃখ—অর্থাৎ যথেচ্ছাচরণের ফলে যে অবস্থার উৎপত্তি হয় তাহার কারণ।

(১২) অপবর্গ—অর্থাৎ দুঃখ, জন্ম, প্রবৃত্তি, দোষ, মিথ্যাজ্ঞান হেতু যে যে অবস্থার উৎপত্তি হয় তাহার কারণ।

উপরে যে বারটী জ্ঞেয় বিষয়ের কথা বলা হইল তাহা বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলে দেখা যাইবে যে, উহাদিগের মধ্যে এক শরীর ও ইন্দ্রিয় ছাড়া আর কোন বিষয়টীর অস্থূলবস্তু অস্তিত্ব নাই। অন্য সমস্ত জ্ঞেয় বিষয়ই কোন না কোন বস্তু বিষয়ক।

কাজেই, মানুষের যে বারটী জ্ঞেয় বিষয়ের কথা বলা হইল তাহার কোন্‌টী কোন্ বস্তু সম্বন্ধে তাহা জানা না থাকিলে, জ্ঞেয় বিষয়ের কথা সম্পূর্ণভাবে জানা হয় না। বারটী জ্ঞেয় বিষয়ের কোন্‌টী কোন্ বস্তু সম্বন্ধে হওয়া উচিত তাহা চিন্তা করিতে বসিলে দেখা যাইবে যে, বিশ্ব-দুনিয়ায় যাহা কিছু মানুষের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য, তাহার প্রত্যেকটীর সম্বন্ধে উপরোক্ত বারটী জ্ঞেয়-বিষয়। বিশ্ব-দুনিয়ায় অথবা ব্রহ্মাণ্ডে কি কি আছে তাহা লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে যে, বিশ্ব-দুনিয়ায় যাহা কিছু আছে তাহা প্রধানতঃ নিম্নলিখিত চারিটী স্তরে বিভক্ত :—

প্রথমতঃ—কতকগুলি চর ও অচর জীব এবং জল ও স্থল ব্যতীত জায়গা।

দ্বিতীয়তঃ—একটী মণ্ডল, যাহার বিভাগ দেখা যায় না।

তৃতীয়তঃ—ভূমণ্ডলের সর্ব্বদিক ঘেরা একটী অখণ্ড মুক্তাকাশ, যাহার মধ্য দিয়া মানুষের নজর চলে এবং যাহার মধ্যে সূর্য্য, চন্দ্র ও তারকা ও ঝড়, বৃষ্টি, উল্কাপাত প্রভৃতি বিবিধ নৈসর্গিক ব্যাপার প্রতিভাত হয়।

চতুর্থতঃ—একটী নীলাকাশ, যাহা মুক্তাকাশকে ঘিরিয়া রহিয়াছে এবং যাহার মধ্য দিয়া সাধারণতঃ মানুষের নজর চলে না।

নীলাকাশের মধ্য দিয়া সাধারণতঃ মানুষের নজর চলে না বটে, কিন্তু যোগোক্ত উপায়ে চক্ষুকে পরিমার্জ্জিত করিতে পারিলে দেখা যাইবে যে, নীলাকাশের বাহিরেও তাহার একটী আবেষ্টনী আছে এবং ঐ আবেষ্টনীর বাহিরেও আর একটী আবেষ্টনী। এইরূপ করিয়া নীলাকাশের বাহিরে সর্ব্বসমেত চারিটী আবেষ্টনী ঘিরিয়া রহিয়াছে। এই চতুর্থ আবেষ্টনীর বাহিরে আর কোন আবেষ্টনী নাই। মানুষের চক্ষুকে যতদূর পরিমার্জ্জিত করা সম্ভব হইয়াছে, তাহাতে চতুর্থ আবেষ্টনীর বাহিরে আর কোন আবেষ্টনী দেখা সম্ভব হয় না।

এই যে চারি স্তরের এবং তাহার বাহিরের অপর চারি স্তরের আবেষ্টনীর কথা বলা হইল—ইহাদিগের মধ্যে প্রথম তিনটী স্তরে যাহা কিছু দেখা যায় তাহার প্রত্যেকটী বাহ্যতঃ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অথবা মানুষেরই ইন্দ্রিয়ের নিকট ব্যক্ত। কিন্তু কোনটীরই অন্তর সর্ব্বতোভাবে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অথবা ব্যক্ত নহে, পরন্তু "অব্যক্ত"। এই তিনটী স্তরের মধ্যে প্রথম দুইটী স্তরে যাহা কিছু দেখা যায় তাহার প্রত্যেকটী খণ্ডিত অর্থাৎ গণনার যোগ্য। কিন্তু মুক্তাকাশ খণ্ডিত নহে, পরন্তু অখণ্ডিত এবং গণনার অযোগ্য।

চতুর্থ স্তর অর্থাৎ নীলাকাশ লক্ষ্য করিয়া দেখিলে দেখা যাইবে যে, মুক্তাকাশ হইতে বিভিন্ন একটী নীলাকাশ যে মুক্তাকাশকে ঘিরিয়া রহিয়াছে তাহা সাধারণতঃ মানুষের নয়নগোচর হয় বটে কিন্তু নীলাকাশ যে কতখানি পুরু তাহা নয়নগোচর হয় না। পরন্তু সম্পূর্ণভাবে ইন্দ্রিয়ের নিকট অব্যক্ত।

নীলাকাশের বাহিরে যে চারিটী আবেষ্টনী আছে, তাহার কোনটীই সাধারণ নয়নগোচর নহে। পরন্তু পরিমার্জ্জিত ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অথবা কোন জ্ঞানবিশেষের সহায়তায় সিদ্ধ।

। বিশ্বদুনিয়ায় যাহা কিছু আছে তাহা যেরূপ আধার ও আধেয় এই হিসাবে দেখিলে সর্ব্বসমেত আটটী স্তরে বিভক্ত, সেইরূপ আধার কতখানি প্রকাশিত ও কতখানি অপ্রকাশিত তাহার দিক দিয়া দেখিলে উহা তিন শ্রেণীতে বিভক্ত, যথা, (১) ব্যক্ত, (২) অব্যক্ত এবং (৩) "জ্ঞ"—(নীলাকাশের বাহিরের আবেষ্টনীগুলি এবং চর ও অচর জীবের অন্তরতম অংশগুলি ইহার উদাহরণ)।

বিশ্বদুনিয়ায় যাহা কিছু আছে তাহার আর এক রকমের শ্রেণী-বিভাগ আছে। এই শ্রেণী-বিভাগটী বিশ্ব কারণের কোন্ প্রকাশ ও অ-প্রকাশ তাঁহার কোন্ অবস্থাসূচক তাহা লইয়া। এই শ্রেণী-বিভাগ অনুসারে বিশ্বদুনিয়ায় যাহা কিছু আছে তাহা তিন অবস্থায় বিভক্ত। একটী ব্রহ্মাবস্থা, দ্বিতীয়টী ব্রহ্মরূপ অবস্থা, তৃতীয়টী জগৎরূপ-অবস্থা।

ব্রহ্মাবস্থা—"জ্ঞ", ব্রহ্মরূপাবস্থা—"অব্যক্ত" এবং জগৎ-রূপাবস্থা, "ব্যক্ত"।

বিশ্বদুনিয়ায় অথবা ব্রহ্মাণ্ডে যাহা কিছু আছে তাহার বিভিন্ন শ্রেণীবিভাগ উপলব্ধি করিতে পারিলে দেখা যাইবে যে, যাহা কিছু পূর্ণভাবে ব্যক্ত তাহার প্রত্যেকটীর সম্বন্ধে জ্ঞেয়-বিষয় বারটী। কিন্তু যাহা যাহা ব্যক্ত নহে, তাহার কোনটীর মধ্যে সাধারণ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য শরীর ও ইন্দ্রিয় নাই। পরন্তু প্রত্যেকটীর মধ্যে শরীর ও ইন্দ্রিয়ের বীজ বিদ্যমান আছে।

বিশ্বদুনিয়ায় যাহা কিছু ব্যক্ত তৎসম্বন্ধে মানুষের জ্ঞেয় বিষয় যে বারটী তন্মধ্যে একটী রহস্য আছে।

কোন বস্তু সম্বন্ধে এই বারটী জ্ঞেয়-বিষয়ের কোন একটী লইয়া সাধনা আরম্ভ করিলে দেখা যাইবে যে, বারটী জ্ঞেয়-বিষয়ের প্রত্যেক বিষয়টীতে জ্ঞান সম্পূর্ণ না হইলে কোন একটী বিষয়ের জ্ঞান সম্পূর্ণ হয় না।

উদাহরণ স্বরূপ মানুষের অপবর্গের কথা ধরা যাউক। মানুষের জন্ম ও মরণ তাহার অপবর্গান্তর্গত। মানুষের জন্ম ও মরণ কেন হয় ইহার সমাধানের নাম মনুষ্য-সম্বন্ধীয় জ্ঞেয় অপবর্গের সমাধান অথবা "সমাধি"। মানুষের জন্ম ও মরণ কেন হয় তাহার আলোচনা করিতে বসিলে দেখা যাইবে যে, মানুষের আত্মা, শরীর, ইন্দ্রিয়, অর্থ, বুদ্ধি, মন, প্রবৃত্তি, দোষ, প্রেত্যভাব, ফল, দুঃখ—এই এগারটী

কিরূপভাবে অস্থি-মজ্জা হইতে কিরূপে উদ্ভব হয় এবং তাহার কি পরিণতি তাহা সম্যক্‌ভাবে না জানিতে পারিলে মানুষের জরা ও মরণ কেন হয় তাহা সম্যক্‌ভাবে জানা যায় না। সেইরূপ আবার মানুষের দুঃখ কেন হয়, তাহার সন্ধান করিতে বসিলেও দেখা যাইবে যে, অপর একাদশটী জ্ঞান-বিষয় কোথা হইতে কিরূপে উদ্ভব হয় এবং তাহার কি পরিণতি তাহা সম্যক্‌ভাবে না জানিতে পারিলে মানুষের দুঃখ কেন হয় তাহা সম্যক্‌ভাবে জানা যায় না।

বিশ্বদুনিয়ায় যাহা কিছু পূর্ণভাবে ব্যক্ত তাহার প্রত্যেকটীর সম্বন্ধে বারটী জ্ঞেয়-বিষয়ের আলোচনা করিতে বসিলে বিশ্বকারণের যেরূপ তিনটী অবস্থা (অর্থাৎ ব্রহ্মাবস্থা, ব্রহ্মরূপাবস্থা ও জগৎরূপাবস্থা) প্রতীয়মান হয়, সেইরূপ আবার প্রত্যেক জীব সম্বন্ধেও তিন শ্রেণীর প্রকাশ দেখিতে পাওয়া যায়। জীবের প্রথম প্রকাশ তাহার অবয়বের বিভিন্ন অঙ্গে অথবা ভূত-তত্ত্বে (ইংরাজীতে যাহাকে anatomic বলা হয়)। দ্বিতীয় প্রকাশ তাহার আভ্যন্তরীণ বিভিন্ন কার্য্যে অথবা ভাব-তত্ত্বে (ইংরাজীতে যাহাকে physiologic and Psychologic) বলা হয়। তৃতীয় প্রকাশ তাহার নিজের অথবা অপরের সহিত সম্বন্ধযুক্ত কার্য্যে অর্থাৎ 'ন'-তত্ত্বে (ইংরাজীতে এই আলোচনার নামই নাই)। বিশ্বদুনিয়ায় ইন্দ্রিয়গোচর এমন একটী বস্তু নাই, যাহার মধ্যে যুগপৎ ভূত-তত্ত্ব, ভাব-তত্ত্ব ও ন-তত্ত্বের কার্য্য হয় না। মানুষের যে বারটী জ্ঞেয় বিষয় আছে, তাহার যে কোনটী যে কোন বস্তু সম্বন্ধে আলোচনা করিতে বসিলে দেখা যাইবে যে, তাহার প্রত্যেকটীর মধ্যে ভূত-তত্ত্ব, ভাব-তত্ত্ব ও ন-তত্ত্বের সংমিশ্রণ রহিয়াছে।

ভূত-তত্ত্ব, ভাব-তত্ত্ব ও ন-তত্ত্বের সংমিশ্রণে মানুষের সম্বন্ধে মানুষের যেরূপ বারটী জ্ঞেয়-বিষয়ের উৎপত্তি হইয়া থাকে, সেইরূপ আবার পঁচিশটী জ্ঞান-কারণ অথবা পঞ্চ-বিংশতি-গণের উৎপত্তি হয়।

মানুষের পঁচিশটী জ্ঞান-কারণের নাম :—

(১) মূল প্রকৃতি, (২) চৈতন্য ও ইচ্ছার বীজ অথবা মহান্, (৩) অহঙ্কারের বীজ, (৪) শব্দবিষয়ক শক্তির বীজ, (৫) স্পর্শবিষয়ক শক্তির বীজ, (৬) রূপবিষয়ক শক্তির বীজ, (৭) রসবিষয়ক শক্তির বীজ, (৮) গন্ধবিষয়ক শক্তির বীজ, (৯)* বিচারণশক্তি, (১০) স্মৃতিশক্তি, (১১) ধারণাশক্তি, (১২) শব্দগ্রহণশক্তি, (১৩) আস্বাদনশক্তি, (১৪) স্পর্শগ্রহণশক্তি, (১৫) বায়ু, (১৬) পাণি, (১৭) পাদ, (১৮) পায়ু, (১৯) উপস্থ, (২০) অগ্নি, (২১) অস্থি, (২২) মজ্জা, (২৩) মাংস, (২৪) রক্ত, (২৫) চৈতন্য ও ইচ্ছা-শক্তি অথবা পুরুষ।

মানুষের দুঃখ দূর করিতে হইলে সংসার ও সমাজ যে-সংগঠনে সংগঠিত করিতে হয়—তাহা স্থির করিবার প্রয়োজন হয়। এই সংগঠনের মূল সূত্র কি হওয়া উচিত তাহা স্থির করিতে হইলে মানুষের পঁচিশটী জ্ঞান-কারণের সহিত তাহার বারটী জ্ঞেয়-বিষয় কিরূপ সম্বন্ধবিশিষ্ট তাহা সর্ব্বতোভাবে উপলব্ধি করিবার প্রয়োজন হয়। ইহার কারণ মানুষের পঁচিশটী জ্ঞান-কারণ সুনিয়ন্ত্রিত হইলে উহার প্রত্যেকটী মানুষকে যেরূপ সুখের আধার করিয়া তুলিতে পারে, সেইরূপ আবার উহা সুনিয়ন্ত্রিত না হইলে মানুষকে দুঃখের আধার হইয়া পড়িতে হয়।

মানুষের পঁচিশটী জ্ঞান-কারণের সহিত তাহার বারটী জ্ঞেয়-বিষয়ের কি সম্বন্ধ তাহা সর্ব্বতোভাবে উপলব্ধি করিতে হইলে মানুষের ভূত-তত্ত্ব, ভাব-তত্ত্ব ও ন-তত্ত্ব জানিবার প্রয়োজন হয়। কারণ, এই ত্রিবিধ তত্ত্বের সংমিশ্রণেই একদিকে যেরূপ মানুষের পঁচিশটী জ্ঞান-কারণের উদ্ভব হয়, সেইরূপ আবার অন্যদিকে বারটী জ্ঞেয়-বিষয়ের উৎপত্তি হইয়া থাকে। শিব স্বরোদয়ের

"তত্ত্বাৎ ব্রহ্মাণ্ড উৎপন্নং তত্ত্বেন পরিবর্ত্ততে,
তত্ত্বে বিলীয়তে দেবস্তত্ত্বাৎ ব্রহ্মাণ্ডনির্ণয়ঃ।"

এই শ্লোকটী জানা থাকিলে ত্রিবিধ-তত্ত্বের সম্বন্ধে জ্ঞানের আবশ্যকতা যে কতখানি তাহা বুঝা যাইবে।

ঋষিগণ তাঁহাদিগের তন্ত্র, দর্শন, উপনিষৎ ও বেদের সহায়তায় দেখাইয়াছেন যে, ব্রহ্মাবস্থায় এই ত্রিবিধ তত্ত্বের বিজড়িত আছে, ব্রহ্মরূপ অবস্থায় উহাদের বীজ উদ্ভব প্রাপ্ত হয় এবং জগৎরূপ অবস্থায় ঐ ত্রিবিধ-তত্ত্ব বিকাশ প্রাপ্ত হয়।

---

* বিন্দু অর্থাৎ হ্রস্ব ইকার যুক্ত ব এবং দ, আর বীজ অর্থাৎ দীর্ঘ ঈকার যুক্ত বী এবং জ এই দুই শব্দের অর্থে পার্থক্য কি তাহা জানা দরকার। বিন্দু ... [illegible] ... হয় এবং ... [illegible] হয়। ... [illegible] ... সুবুদ্ধি।

ইহা ছাড়া ঋষিগণ আরও দেখাইয়াছেন যে নীলাকাশের বাহিরের দিকে যে চারিটী আবেষ্টনী আছে তাহার মধ্যে ব্রহ্মাবস্থা নিহিত আছে, অথচ নীলাকাশ ও মুক্তাকাশের আবেষ্টনীর মধ্যে ব্রহ্মরূপাবস্থা বিদ্যমান আছে, আর ভূমণ্ডলে জগৎরূপাবস্থা বিদ্যমান আছে। যাঁহারা সূর্য্য-সিদ্ধান্তের জ্যোতিষোপনিষদধ্যায়ের সহায়তায় যজুর্ব্বেদ অভ্যাস করিয়াছেন তাঁহারা আমাদিগের উপরি উক্ত কথাগুলি সর্ব্বতোভাবে বুঝিতে পারিবেন। যাঁহারা "সূর্য্য-সিদ্ধান্ত" যথাযথ অর্থে অধ্যয়ন অথবা যজুর্ব্বেদের অভ্যাস করেন নাই, তাঁহাদিগের পক্ষে এই কথাগুলি বুঝা কষ্টসাধ্য। এই কথাগুলি বুঝিতে পারিলে দেখা যাইবে যে, যাহাতে মানুষ সর্ব্বতোভাবে দুঃখের হাত হইতে এড়াইতে পারে সেইরূপ ভাবে সংসার ও সমাজের সংগঠন করিতে হইলে একদিকে যেরূপ জ্ঞান-কারণ ও জ্ঞেয় বিষয়ের সম্বন্ধ জানিবার প্রয়োজন হয় এবং তাহা জানিবার জন্য যেরূপ মানুষের ভূত-তত্ত্ব, ভাব-তত্ত্ব ও ন-তত্ত্বের উদ্ভব ও বিকাশ হয় কি করিয়া তাহা উপলব্ধি করিবার প্রয়োজন হয়, অন্যদিকে আবার সেইরূপ ব্রহ্মাণ্ডের ব্রহ্মাবস্থায়, ব্রহ্মরূপ অবস্থায় এবং জগৎরূপ অবস্থায় কি কি ব্যাপার সংঘটিত হইতেছে তাহাও উপলব্ধি করিবার প্রয়োজন হয়। এবং তজ্জন্য ভূমণ্ডলে, চরাচর জীবের মধ্যে, মুক্তাকাশে, নীলাকাশে এবং নীলাকাশের বহিরাবেষ্টনীতে ভূত-তত্ত্ব, ভাব-তত্ত্ব ও ন-তত্ত্ব সম্বন্ধায় কি কি ব্যাপার হইতেছে তাহা দেখিবার ও বুঝিবার মত শক্তি সঞ্চয় করিতে হয়। এই শক্তি সঞ্চয় করিয়া ভূত-তত্ত্ব, ভাব-তত্ত্ব ও ন-তত্ত্বের উদ্ভব, বিকাশ ও বিকৃতি কিরূপে হইতেছে তাহা সর্ব্বতোভাবে উপলব্ধি করিতে পারিলে জ্ঞান-বিজ্ঞানের পরাকাষ্ঠা লাভ করা যায়।

ভূত-তত্ত্ব ভাব-তত্ত্ব ও ন-তত্ত্ব বলিতে কি বুঝিতে হয়, তাহা ধরিতে পারিলে সাধারণ বুদ্ধির দ্বারাও দেখা যাইবে যে আমাদিগের উপরোক্ত কথা হুবহু সত্য। জীবের ভূত-তত্ত্ব ভাব-তত্ত্ব, ও ন-তত্ত্বের উদ্ভব, বিকাশ ও বিকার কিরূপে হইতেছে তাহা ভারতীয় ঋষিগণ সর্ব্বতোভাবে উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন বলিয়াই এক'দিন যাহারা জগতের সমগ্র মনুষ্য সমাজকে সর্ব্বতোভাবে সর্ব্ববিধ দুঃখের (অর্থাৎ অর্থাভাব, স্বাস্থ্যাভাব এবং শান্তির অভাব) হাত হইতে কি করিয়া রক্ষা পাওয়া যায় তাহার সঙ্কেত জানাইয়া দিতে পারিয়াছিলেন, ঐ সঙ্কেতগুলি লেখা রহিয়াছে ভারতীয় ঋষি-প্রণীত সংহিতায়। ভারতীয় ঋষির সংহিতা-প্রোক্ত সঙ্কেতগুলি যথাযথভাবে মানিয়া চলিলে এবং তদনুসারে সংসার ও সমাজ গঠিত হইলে এখনও মানুষ সর্ব্ববিধ দুঃখের হাত হইতে এড়াইতে পারে। আজকালকার পণ্ডিতগণ ভারতীয় ঋষির সংস্কৃতভাষা যথাযথভাবে বুঝিতে পারেন না বলিয়া ভারতীয় ঋষির মূল সংহিতার প্রকৃত বক্তব্য উদ্ধার করিতে পারেন না। বিকৃত জ্ঞানের জন্য তাঁহারা সংহিতাগুলির যে ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন তাহা প্রায়শঃ ঋষিগণের মূল সংহিতার বক্তব্য নহে। ইহারই জন্য আধুনিক পণ্ডিতগণের প্রদর্শিত পথে মানুষের সর্ব্ববিধ দুঃখ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় এবং বিন্দুমাত্রও হ্রাসপ্রাপ্ত হয় না।

মানুষের ভূত-তত্ত্ব, ভাব-তত্ত্ব ও ন-তত্ত্ব উদ্ভব, বিকাশ ও বিকারপ্রাপ্ত হয় কি করিয়া তাহা সর্ব্বতোভাবে উপলব্ধি না করিয়া মানুষের দুঃখ দূর করিবার জন্য কাল্পনিক সঙ্কেত আবিষ্কৃত করিলে ও তদনুসারে সংসার ও সমাজ রচনা করিলে সময় সময় মানুষের কোন কোন দুঃখ কিঞ্চিৎ পরিমাণে লঘু করিয়া দেওয়া সম্ভবযোগ্য হইলেও হইতে পারে বটে কিন্তু মানুষের সর্ব্ববিধ দুঃখ ত' দূরের কথা কোন দুঃখই সর্ব্বতোভাবে দূর করা সম্ভব হয় না। ইহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিকের এবং তদনুসারে জার্ম্মাণ, ব্রিটিশ, আমেরিকান, জাপান, ফ্রান্স, ইটালী প্রভৃতি গভর্ণমেণ্টের কার্য্য।

বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিক নানারকমের তথাকথিত বিজ্ঞানের আবিষ্কার করিয়াছেন বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন ইহা সত্য, কিন্তু তাঁহাদিগের কোন বিজ্ঞানই জীবের ভূত-তত্ত্ব, ভাব-তত্ত্ব ও ন-তত্ত্ব কিরূপে উদ্ভব, বিকাশ ও বিকারপ্রাপ্ত হয়, তাহা উপলব্ধি করিয়া আবিষ্কৃত হয় নাই। বর্ত্তমান গভর্ণমেণ্টগুলি যে সমস্ত সঙ্কেতকে মানুষের দুঃখ দূর করিবার সঙ্কেত বলিয়া মনে করেন, তাহাতে কোন মানুষের কোন দুঃখ এমন কি আংশিক দুঃখ পর্য্যন্ত সর্ব্বতোভাবে দূরীভূত হয় না। ভারতসম্রাটেরও অর্থাভাব হয়, স্বাস্থ্যাভাব হয় এবং শান্তির অভাব উপস্থিত হয়।

গভীর ভাবে চিন্তা করিয়া দেখিলে দেখা যাইবে যে, তথাকথিত বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিক কোন প্রাকৃত জীবের কোন বিজ্ঞানই উল্লেখযোগ্য ভাবে উপলব্ধি করিতে পারেন নাই।

তাঁহাদিগের তথাকথিত বিজ্ঞান কেবলমাত্র মনুষ্যের দ্বারা প্রস্তুত কৃত্রিম বস্তুতে সীমাবদ্ধ। তাঁহাদিগের উপরোক্ত মন্তব্যের যুক্তি এই যে, ভাব অর্থাৎ চৈতন্ত ও ইচ্ছা বিহীন কোন প্রকৃতিজাত বস্তু দেখা যায় না। কেবলমাত্র কৃত্রিম অর্থাৎ মনুষ্যের দ্বারা প্রস্তুত বস্তু চৈতন্ত ও ইচ্ছাবিহীন হইয়া থাকে। কাজেই, কি করিয়া চৈতন্ত ও ইচ্ছার উন্মেষ, বিকাশ ও বিকৃতি হয় তাহা বিশ্বাসযোগ্য ভাবে নির্ণয় করিতে না পারিলে প্রকৃতিজাত বস্তু সম্বন্ধীয় কোন বিজ্ঞান আবিষ্কৃত হইয়াছে ইহা বলা চলে না। বর্ত্তমান বিজ্ঞান তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করিলে দেখা যাইবে যে, ইহার কুত্রাপিও চৈতন্ত ও ইচ্ছার উন্মেষ, বিকাশ ও বিকৃতি হয় কি করিয়া তাহার বিশ্বাসযোগ্য কোন সিদ্ধান্তের পরিচয় আদৌ বিদ্যমান নাই। এই জন্তই আমরা মনে করি যে, বর্ত্তমান বিজ্ঞান বাস্তবতঃ বিজ্ঞান নহে। পরন্তু উহা কু-জ্ঞান।

আগেই দেখান হইয়াছে যে, ভূ-মণ্ডলে ও তন্নিহিত চরাচর জীবের মধ্যে, মুক্তাকাশে,নীলাকাশে এবং নীলাকাশের বহিরাবেষ্টনীতে ভূত-তত্ত্ব, ভাব-তত্ত্ব ও ন-তত্ত্ব সম্বন্ধীয় কি কি ব্যাপার হইতেছে তাহা দেখিবার ও বুঝিবার মত শক্তি সঞ্চয় করিয়া ভূত-তত্ত্ব, ভাব-তত্ত্ব ও ন-তত্ত্বের উন্মেষ, বিকাশ ও বিকৃতি কিরূপে হইতেছে তাহা সর্ব্বতোভাবে উপলব্ধি করিতে পারিলে জ্ঞান-বিজ্ঞানের পরাকাষ্ঠা লাভ করা যায়। সাধারণ বুদ্ধির দ্বারা বিচার করিয়া দেখিলে দেখা যাইবে যে, এই বিদ্যায় একদিকে যেরূপ স্বভাবজাত কোন্ বস্তু মানুষের হিতকারী এবং কোন্ বস্তু অহিতকারী তাহা নির্ণয় করা সম্ভব হয়,—অন্যদিকে আবার কোন্ বস্তু কিরূপ ভাবে প্রস্তুত করিলে মানুষের হিতকারী হইতে পারে এবং কিরূপ ভাবে প্রস্তুত করিলে মানুষের অহিতকারী হইয়া যায় তাহাও সঠিকভাবে নির্ণয় করা সম্ভব হয়। বর্ত্তমান তথাকথিত বৈজ্ঞানিকের এবম্বিধ বিজ্ঞান জানা নাই বলিয়াই, তাঁহাদিগের দ্বারা যে সকল বস্তু প্রস্তুত হইতেছে, সেই সকল বস্তু বাস্তবতঃ মানুষের উপকার অপেক্ষা অধিকতর অপকারই সাধন করিতেছে।

কি করিয়া জ্ঞান-বিজ্ঞানের পরাকাষ্ঠা লাভ করা যায়, তাহা উপরোক্ত ভাবে বুঝিতে পারিলে উপনিষৎ ও বেদের মুখ্য বক্তব্য কি তাহা বুঝা অপেক্ষাকৃত সহজসাধ্য হয়।

প্রথমতঃ ও তন্নিহিত চরাচর জীবের মধ্যে যে বদ্ধাকাশ আছে—সেই বদ্ধাকাশে, মুক্তাকাশে ও নীলাকাশে ভূত-তত্ত্ব, ভাব-তত্ত্ব ও ন-তত্ত্ব সম্বন্ধীয় যে সমস্ত বীজাকারের বিকাশ সংঘটিত হইতেছে তাহা দেখিবার ও বুঝিবার মত শক্তি সঞ্চয় করিতে হয় কোন্ উপায়ে এবং দ্বিতীয়তঃ ঐ শক্তি সঞ্চয় করিতে পারিলে মায়া-মোহমুগ্ধ মানুষের পক্ষেও বদ্ধাকাশের ও মুক্তাকাশের যাবতীয় ব্যাপার সর্ব্বতোভাবে দেখা ও বুঝা সম্ভব হয় কি করিয়া তাহা দেখান উপনিষদ্ সমূহের মুখ্য বক্তব্য।

উপনিষদের ভাষা বুঝিতে হইলে একদিকে শব্দের জাতিত্ব দ্রব্যত্ব কাহাকে বলে তাহা যেমন উপলব্ধি করিবার প্রয়োজন হয় সেইরূপ আবার দ্রব্যত্ববাচক শব্দের "আত্মত্ব", বস্তুত্ব, স্বভাবত্ব, শরীরত্ব ও তত্ত্বত্ব কাহাকে বলে তাহাও জানিবার প্রয়োজন হয়। "শব্দ" ও "ধ্বনির" শক্তি, অর্থ ও প্রত্যয়জ্ঞাপক উপরোক্ত বিষয়গুলি জানা না থাকিলে উপনিষৎ-বাক্যের অর্থোদ্ধার করা আদৌ সম্ভবপর হয় না। শঙ্করাচার্য্য-প্রভৃতি কৃত যে সমস্ত উপনিষদের ভাষ্য প্রচলিত আছে তাহা পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যাইবে যে, উহার কোনটীতে শব্দ ও ধ্বনির শক্তি, অর্থ ও প্রত্যয়জ্ঞাপক উপরোক্ত বিষয়গুলির সম্যক্ জ্ঞানের কোন পরিচয় আদৌ পাওয়া যায় না। ইহারই জন্য উপরোক্ত ভাষ্যকারদিগের ব্যাখ্যায় উপনিষদের মুখ্য বক্তব্য কি তাহা বুঝিয়া উঠা সম্ভবযোগ্য হয় না।

অন্যদিকে শব্দ ও ধ্বনির শক্তি, অর্থ ও প্রত্যয় কি করিয়া ধরিতে হয় তাহা পরিজ্ঞাত হইয়া উপনিষদ্বাক্যসমূহের মর্ম্মোদ্ধার করিবার চেষ্টা করিলে দেখা যাইবে যে, উপনিষৎসমূহ একদিকে যেরূপ অধ্যয়ন করিবার জন্য, সেইরূপ আবার অভ্যাস করিবার জন্যও। উপনিষদে যে সমস্ত অভ্যাস করিবার ব্যাপার আছে তাহাতে সুনিপুণ হইতে পারিলে মানুষের ইন্দ্রিয়গুলি অলৌকিক শক্তি অর্জ্জন করিতে পারে

[illegible] যে বদ্ধাকাশ ও মুক্তাকাশের ব্যাপার সাধারণতঃ দেখা ও বুঝা সম্ভব হয় না—তাহা দেখা ও বুঝা অপেক্ষাকৃত অনেক সহজসাধ্য হয়। এবং তখন বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিকের অনুবীক্ষণ ও দূরবীক্ষণ-যন্ত্র যে কতদূর ভ্রম-প্রমাদযুক্ত ও অবিশ্বাসযোগ্য তাহা বুঝিয়া উঠা সাধ্যায়ত্ত হয়।

উপনিষদের মুখ্য বক্তব্য যেরূপ দুইটী, বেদের মুখ্য বক্তব্যও সেইরূপ দুইটী।

প্রথমতঃ নীলাকাশের বাহিরে যে চারিটি আবেষ্টনী আছে, সেই চারিটি আবেষ্টনীতে ভূত-তত্ত্ব, ভাব-তত্ত্ব ও ন-তত্ত্ব সম্বন্ধীয় যে সমস্ত বিজ্ঞাকারে বিকাশ ও উন্মেষ সংঘটিত হইতেছে তাহা বুঝিবার মত শক্তি সঞ্চয় করিতে হয় কোন্ উপায়ে এবং দ্বিতীয়তঃ ঐ শক্তি সঞ্চয় করিতে পারিলে ঐ চারিটি আবেষ্টনীর মধ্যে যে সমস্ত ব্যাপার সংঘটিত হইতেছে তাহা বুঝা সম্ভব হয় কি করিয়া তাহা দেখান চারিটি বেদের মুখ্য বক্তব্য।

বেদের ভাষা বুঝিবার পদ্ধতি প্রায়শঃ উপনিষদের ভাষা বুঝিবার পদ্ধতির অনুরূপ।

ভাষা বুঝিবার অসামর্থ্যের জন্ত যেরূপ উপনিষদের ভাষ্যকারদিগের প্রচলিত ভাষ্যে উহাদিগের মুখ্য বক্তব্য অপ্রকাশিত রহিয়াছে, সেইরূপ একই কারণে বেদের মুখ্য বক্তব্যও অপ্রকাশিত রহিয়াছে।

"[illegible]।
অতোহস্ত-সকলং সাধ্যমিদং [illegible] যুক্তিতঃ।"

সূর্য্যসিদ্ধান্তের উপরোক্ত আর্য্যাটী যথাযথভাবে বুঝিতে পারিলে, আমরা যাহা বেদের মুখ্য বক্তব্য বলিয়া বর্ণনা করিলাম, তাহাই যে বেদের মুখ্য বক্তব্য ইহা বুঝা যাইবে।

বেদের মুখ্য বক্তব্য কি তাহা বুঝিতে পারিলে দেখা যাইবে যে, বেদোক্ত অভ্যাসে সুনিপুণ হইতে পারিলে, সূর্য্য, চন্দ্র প্রভৃতি গ্রহগণের, মেষাদি রাশির এবং অশ্বিন্যাদি নক্ষত্রের উদ্ভব হয় কি করিয়া, তাহাদিগের বিভিন্ন গতি কোন্ কোন্ গাণিতিক নিয়মে নিয়ন্ত্রিত হয়: দিবা, রাত্রি, ঋতু-পরিবর্ত্তন, বর্ষ-পরিবর্ত্তন, যুগ-পরিবর্ত্তন কেন হয়:—ঐসমস্ত অবস্থার গাণিতিক নিয়ম কি কি: ব্যোম, বায়ু, তেজ, রস ও জীবের আকার-ধারণ শক্তি লইয়া যে ভূত-তত্ত্ব, ভাব-তত্ত্ব ও ন-তত্ত্ব, তাহার উন্মেষ, বিকাশ ও বিকার হয় কি করিয়া: মুক্তাকাশ ও বদ্ধাকাশের উদ্ভব, কার্য্য ও পরিণতিসমূহ কোন্ কোন্ নিয়মে আবদ্ধ: ভূ-মণ্ডলের সৃষ্টি হয় কি করিয়া এবং উহার কার্য্য ও পরিণতি কোন্ কোন্ নিয়মে আবদ্ধ: জল ও স্থলের সৃষ্টি হয় কি করিয়া এবং উহার কার্য্য ও পরিণতি কোন্ কোন্ নিয়মে আবদ্ধ: চরাচর জীবের সৃষ্টি হয় কি করিয়া এবং উহার কার্য্য ও পরিণতি কোন্ কোন্ নিয়মে আবদ্ধ: এবংবিধ তথ্যগুলি পরিষ্কার ভাবে বুঝিয়া উঠা সম্ভব হয়। তখন আর জানিবার ও বুঝিবার কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। এক কথায় বেদের অভ্যাসে সুনিপুণ হইতে পারিলে জ্ঞানের সম্পূর্ণতা সিদ্ধ হয়।

বারান্তরে দর্শন ও তন্ত্রের মুখ্য বক্তব্য সম্বন্ধে আলোচনা করিবার ইচ্ছা থাকিল।



জাতীয় মহাসমিতির ইতিহাস

— ডাঃ শ্রীহেমেন্দ্র নাথ দাশগুপ্ত

[৯]

১৮৯০ সালে কলিকাতায় কংগ্রেসের যে অধিবেশন হয়, আমরা তাহার পরে কংগ্রেসের কার্যাকারিতা সম্বন্ধে বড় বিশেষ কিছু শুনি নাই। ১৮৯১ সালে নাগপুরে এবং ১৮৯২ সালে এলাহাবাদের অধিবেশনের কথাও পূর্ব্বেই বলিয়াছি।

১৮৯৩ সালে কংগ্রেসের অধিবেশন হয় লাহোরে। সেখানে সর্দ্দার দয়াল সিংহ অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি হন। ইনি পাবলিক লাইব্রেরী, কলেজ, ট্রিবিউন প্রভৃতি বহু অনুষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। কংগ্রেসের প্রতি তাঁহার উৎসাহও খুব বেশী ছিল। ১৮৯২ সালে দাদাভাই নৌরজী লণ্ডন ছাড়িয়া আসিতে না পারায় দরুণ দেশবাসী তাঁহাকে সভাপতিরূপে পাইবার গৌরব হইতে বঞ্চিত হইয়াছিল। কিন্তু ১৮৯৩ সালে তিনিই সভাপতির পদ অলঙ্কৃত করেন। ছাত্রগণ তাঁহাকে যথাসাধ্য সম্মান প্রদর্শন করেন। ঘোড়া খুলিয়া দিয়া সভাপতির গাড়ী তাঁহারাই টানিয়া নিয়া গিয়াছিলেন। কংগ্রেসের ইতিহাসে এইরূপ ঘোড়া খুলিয়া দিয়া গাড়ী টানার দৃষ্টান্ত ইহাই প্রথম।

১৮৯৪ সালে কংগ্রেসের সম্মিলন হয় মাদ্রাজে। আর এখানে পার্লামেণ্টের জনৈক আইরিস সভ্য মিঃ আলফ্রেড্ ওয়েব সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। মিঃ ডব্লিউ, সি, বোনার্জ্জীর মত, ছিল না যে বিশেষ কারণ ব্যতীত কোন অ-ভারতীয়কে সভাপতির পদে নির্ব্বাচিত করাহয়। যাহাহউক, মিঃ ওয়েব ভাল বক্তৃতা দিয়াছিলেন।

১৮৯৫ সালে সভাপতির সম্মান লাভ করেন সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়, আর অধিবেশন হয় পুণায়। কংগ্রেসের জন্মই একরকম পুণায় বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। পুণায় কলেরার প্রকোপ বলিয়াই প্রথম বৎসরে যে বোম্বাই নগরীতে অধিবেশন হয় তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। পুণার সর্ব্বজাতি ও সম্প্রদায়ের মধ্যেই বিশেষ উৎসাহ পরিলক্ষিত হয়, কিন্তু দুঃখের বিষয় এই, সেখানে মুসলমান প্রতিনিধিগণ যোগদান করেন নাই, তবে ভলাণ্টিয়ারগণ সুরেন্দ্রনাথের গাড়ীও নিজেরাই টানিয়া আনিয়াছিলেন। কংগ্রেসের সাফল্যের জন্য এখানে মহামতি তিলক বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন। ১৮৯৬ সালে কংগ্রেস হয় কলিকাতায় বিডন উদ্যানে। সভাপতি হন বোম্বাইর জনৈক উকীল রহিমতুল্লা সিয়ানী। তাঁহার বক্তৃতা খুব দীর্ঘ হইয়াছিল কিন্তু মুসলমানদের কংগ্রেসে কেন যোগদান করা উচিত তাহার সতেরটী সারগর্ভ কারণ দেখাইয়াছিলেন। দীর্ঘ হইলেও তাঁহার বক্তৃতা খুব সরস ও যুক্তিপূর্ণ হইয়াছিল।

এই অধিবেশনে প্রথম "বন্দেমাতরম" সঙ্গীতটী গীত



স্যর সুরেন্দ্রনাথ

হয়, আর রবীন্দ্রনাথ শুভ্র বস্ত্র পরিধান করিয়া নিজে একা উহা গান করেন। একে বন্দেমাতরম্ সঙ্গীত, তারপরে উহার গায়ক সুধাকণ্ঠ রবীন্দ্রনাথ—সভায় বিদ্যুৎ সঞ্চার হয়। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ সঙ্গীতের সঙ্গে সঙ্গে অর্গান বাজান।

"অয়ি ভুবনমোহিনী" সঙ্গীতটীও এইখানেই গীত হয়।

স্যার রমেশচন্দ্র মিত্র অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি হন। কিন্তু অসুস্থ-নিবন্ধন অপারগ হওয়ায় তাঁহার অভিভাষণ পাঠ করেন ডাক্তার রাসবিহারী ঘোষ।

১৮৯৭ সালে কংগ্রেস হয় অমরাবতীতে (মধ্যপ্রদেশ)

এবং সভাপতি হন স্যার শঙ্কর নায়ার। তিনি তখন উকীল ছিলেন, কিন্তু পরে মাদ্রাজ হাইকোর্টের জজ্ হইয়াছিলেন।

কংগ্রেসের আর বিশেষ কিছু কর্ম্মক্ষমতা পরিলক্ষিত হয় না বটে, কিন্তু এই সাত বৎসরে দুইটী রাজনৈতিক মোকদ্দমায় দেশের মধ্যে যেরূপ উত্তেজনার সৃষ্টি হয়, তজ্জন্য কতকটা দায়ী রাজপুরুষগণই। প্রথমটীতে বাঙ্গলা দেশের অন্তঃস্থল এবং দ্বিতীয়টীতে ভারতের একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত সমগ্রদেশ বিকম্পিত হইয়া উঠে।

প্রথমটী 'বঙ্গবাসীর মোকদ্দমা' দ্বিতীয়টি 'তিলকের মোকদ্দমা'। দুইটীই রাজনৈতিক মোকদ্দমা এবং উহার মীমাংসা দণ্ডবিধির আইন পর্য্যন্ত সংশোধিত করিয়া দেয়, কিন্তু প্রথমটীর স্বত্বাধিকারী যোগেন্দ্র বসু মহাশয়, সমাজ সংস্কারক বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতেন, আর প্রবন্ধটীতে তিনি সামাজিক বিষয় লইয়া আন্দোলন করিয়াছিলেন। সামাজিক বিষয় আলোচনা কংগ্রেসের মতবিরুদ্ধ ছিল। বিশেষতঃ যোগেন্দ্রবাবু ছিলেন কংগ্রেস বিরোধী।

দ্বিতীয়টীর নায়ক ছিলেন তিলক স্বয়ং। তিনি কংগ্রেসের পক্ষপাতী ছিলেন এবং কংগ্রেসও তাঁহার আন্দোলনে বিশেষ মতামত প্রকাশ করিয়াছিলেন।

১৮৯০ সালের কলিকাতা কংগ্রেসের পরে ব্যবস্থাপক সভায় Age of consent Bill উপস্থিত হয়। এখানে একটু আইনের কথা আছে। দণ্ডবিধি আইনে 'বলাৎকার' (Rape) নামে একটী অপরাধ আছে। উহা ৩৭৫ ধারার অন্তর্গত। উহার দণ্ড ১২ বৎসর কারাভোগ। এই অপরাধ হইয়া থাকে, অন্য স্ত্রীলোকের অনিচ্ছায় তাহার উপর জোরপূর্ব্বক অত্যাচার করায়। কিন্তু একটী নিয়ম আছে যে, নিজ স্ত্রীর সহিত সহবাসেও এই অপরাধ হয়, যদি সেই স্ত্রীর বয়স দশ বৎসরের কম হয়। এবং স্ত্রীর সম্মতি থাকিলেও এইরূপ ক্ষেত্রে অপরাধ বলিয়া গণ্য হইবে। ইহার সাজা দুই বৎসর (Act xiv of 1860)। এই 'দশ বৎসরের' সম্মতি প্রধান বিচারপতি স্যার বার্ণস পিককের মতানুসারে হয়। হিন্দুরা ইহাতে আপত্তি করেন নাই, কারণ দশ বৎসরের পূর্ব্বে কচিৎ গর্ভাধান সংস্কার হইত। এখন হরি মাইতি নামক একটি বালিকা-বধূ সহবাস-জনিত অতিরিক্ত রক্তস্রাবে মারা যায়। ইহাতে দেশের কোন কোন উন্নত ভাবাপন্ন ব্যক্তি কলরব করিয়া উঠেন এবং ইণ্ডিয়া গভর্ণমেণ্টের ল' মেম্বর A. Scobble সাহেব Age of Consent Bill (সহবাস সম্মতি আইন) উপস্থিত করেন। বড়লাট লর্ড ল্যান্সডাউন উঠিয়া পড়িয়া লাগেন, 'ইণ্ডিয়ান মীরার' পত্রিকা এবং কতিপয় ব্রাহ্ম ভদ্রলোক এই বিল সমর্থন করেন।

এই বিল উত্থাপিত হওয়ামাত্র হিন্দু সমাজ কিন্তু ভয়ানক আলোড়িত হইয়া পড়ে। নগরে নগরে, গ্রামে গ্রামে, পল্লীতে পল্লীতে, আন্দোলন ও সভা চলিতে লাগিল, সাবিত্রী সভার উদ্যোগে তালতলা যোগেন্দ্র ঘোষের বাড়ীতে ২০শে জানুয়ারী মঙ্গলবার প্যারীমোহন দাসের সভাপতিত্বে একটী সভা, আর ২১শে এলবার্ট হলে গ্রাজুয়েটদের এক সভা হয়। এখানে রাজা প্যারীমোহন সভাপতি হন ও রাসবিহারি ঘোষ, সারদা মিত্র প্রভৃতি উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু সভায় ব্রাহ্মছাত্ররা গোলমাল করে। College Square-এ দুই শত লোকের উপস্থিতিতে একটী সভা হয়। রাজা শশিশেখরেশ্বর রায় সভাপতি হয়েন। সেদিনই নন্দলাল বসুর বাড়ী বাগবাজারে, (২২শে) ও রাজেন্দ্র দেবের বাড়ী শোভাবাজারে তিন শত লোক সমবেত হন। নবদ্বীপ, ভাটপাড়া ও বিক্রমপুরের পণ্ডিত সমাজ একবাক্যে বিরুদ্ধে মত দিতে লাগিল এবং সকলে বলিতে লাগিল—

"দোহাই মহারাণী, আমাদের ধর্ম্ম রক্ষা করুন।"

নেতৃবৃন্দের মধ্যেও W. C. Bonerjee, যতীন্দ্র মোহন ঠাকুর রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র, স্যার রমেশচন্দ্র মিত্র প্রভৃতি বিলের বিরুদ্ধে দাঁড়াইলেন। ২৫শে ফেব্রুয়ারী, বুধবার কলিকাতা ঘোড়দৌড়ের মাঠে একটী বিরাট সভায় (যেহেতু Ochterlony মনুমেণ্টের পাদদেশে সভা করিবার অনুমতি পাওয়া যায় না) প্রায় দুই লক্ষাধিক লোক একত্রিত হইলেন এবং ১২টী বিভিন্ন স্থানে ১২টী বিভিন্ন সভা হইতে লাগিল। রেলগাড়ীতে ও বিভিন্ন স্থান হইতে অনেক লোক আসিয়াছিলেন এবং এত অগণিত জনস্রোত দেখিয়া লোকে স্তম্ভিত হয়। কুমার শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন সেন উহার একটী সভায় ২৫ হাজার লোককে তাঁহার যুক্তিতে একেবারে মন্ত্রমুগ্ধ করিয়া

রাখেন * এবং অন্নদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় (ভূতপূর্ব্ব সিনিয়র গভর্ণমেন্ট উকীল) ও খুব প্রাণস্পর্শী ভাষায় বলেন। সেই সভার উত্তেজনা সমস্ত বঙ্গদেশ বিকম্পিত করিয়াছিল। কিন্তু কোন ফল হয় নাই। স্বাস্থ্যবিধির অজুহাতে আইন পাশ হইয়া গেল। অতঃপরে ১২ বৎসরের কম বয়স হইলে নিজ স্ত্রীর সম্মতি থাকিলেও তাহার সহিত সহবাস অপরাধ বলিয়া গণ্য হইতে লাগিল। এই সময়ই অমৃতবাজার কাগজ সাপ্তাহিক হইতে দৈনিকে পরিণত হয় (১৯শে ফেব্রুয়ারী, ১৮৯১)।

এই সময় "বঙ্গবাসী" পত্রিকায় মন্তব্য বাহির হয় যে, (২৮শে মার্চ্চ, ১৬ই মে ও ৬ই জুন)

"ম্লেচ্ছ রাজা আমাদের সর্ব্বনাশ করিতে বসিয়াছে, আমাদের জাতি ধর্ম্ম যাইতে বসিয়াছে। আমাদের দেশ ছাড়িয়া অন্যত্র যাওয়াই বিধেয়। সম্প্রতি মণিপুরের মামলায়ই দেশে অশান্তি বৃদ্ধি পাইয়াছে। এখন আর সভা করিয়া কি হইবে? দেশত্যাগই একমাত্র পথ। ইত্যাদি।"

এই সমস্ত লেখার দরুণ বঙ্গবাসীর স্বত্বাধিকারী যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু, সম্পাদক কৃষ্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ম্যনেজার ব্রজরাজ বন্দ্যোপাধ্যায় ও মুদ্রাকর অরুণোদয় দে রাজদ্বারে অভিযুক্ত হন। ১৮৯১, সালের ১১ই আগষ্ট তারিখে তাঁহারা দায়রায় সোপর্দ্দ হন এবং সপ্তাহের মধ্যে বিচার আরম্ভ হয়।

হাইকোর্টের দায়রায় মোকর্দ্দমা হয় প্রধান বিচারপতি Sir Comer Pethram-এর আদালতে। যদিচ বিষয়টী সামাজিক কিন্তু ইহার অপরাধ রাজনৈতিক। ইহার ধারা ১২৪ক। শ্রেষ্ঠ ব্যারিষ্টার মিঃ জ্যাকসন ও হিল তাঁহাদিগকে সমর্থন করেন।

এই ধারা প্রথমে ১৮৬০ সালের Act xlv of 1860-তে ছিল না, পরে ১৮৭০ সালে (by Act 27 of 1870) প্রবর্ত্তিত হয়। এই ধারাই দণ্ডবিধি ধারার ১২৪ক ধারা অর্থাৎ (রাজদ্রোহ)। এই ধারায় ছিল—

Whoever by words either spoken or intending to be read...excites or attempts to excite feelings of disaffection to the government...shall be punihsed...

Such a disapprobation of the measures of Government as is compatible with a disposition to obedience to lawful authority is not disaffection. Comments showing disapprobation do not come within the law.



ডব্লু., সি, বোনার্জ্জী

অর্থাৎ কথায় কি লেখায় যে রাজদ্রোহের কার্য্য করিবে তাহার দণ্ড তিন বৎসর পর্য্যন্ত হইতে পারিবে কিন্তু গভর্ণমেণ্টের কার্য্যপ্রণালীর সমালোচনায় উহার অনুমোদন সমর্থন করা যায় না। তবে সমালোচনায় কোন অশান্তির ভাব যেন উদ্রেক না করা হয়।

১৮৭০ সালে Sir James Stephen বিলটী কাউন্সিলে উপস্থিত করিবার সময় স্পষ্টই বলেন* যে, কথায় বা রচনায় কোন বিদ্রোহ উত্তেজিত হইতে পারে এই সব অবস্থায়ই এই ধারা প্রযোজ্য হইবে, নতুবা নয়। সাধারণ উত্তেজনাপূর্ণ কথায় শাস্তি হইবে না।

So long as a writer or speaker neither directly nor indirectly suggested or intended to produce the use of force, he did not fall within the section and most bitter criticism might be perfectly compatible with the absence of any intention to advise resistence to lawful authority.

* March 2, 1891, Hindu Patriot. The age-limit was raised from ten to twelve years by the Indian Criminal Law Amendment Act X of 1891 for the following reasons:—The limit at which the age of consent is now fixed (*i e.* ten years) favours the premature consummation by adult husbands of marriages with children who have not reached the age of puberty, and is thus in the unanimous opinion of medical authorities, productive of grievous suffering and permanent injury to children and of physical deterioration in the community to which they belong.

* সিমলায় ২২ আগষ্ট, ১৮৭০।

বর্ত্তমান অভিযোগেও জ্যাকসন সাহেব সেই ভাবেই বুঝাইয়া দেন। তিনি বলেন, Pilgrim Father গণ ধর্ম্ম-রক্ষার জন্যই Pensylvenia-য় চলিয়া গিয়াছিলেন। লেখকও তাহাই বলেন। রাজভক্তির কোন অভাব নাই তবে ধর্ম্মমূলক কোন কার্য্যে বা সংস্কারে গভর্ণমেণ্ট হাত দেয় তাহা তাঁহার ইচ্ছা নয়। এক সময়ে এই হাইকোর্টেরই প্রধান বিচারপতির আসনে যে স্যার রমেশচন্দ্র মিত্র মহাশয় আরোহণ করিয়াছিলেন তিনিও এই বিল সম্বন্ধে কাউন্সিলে বলিতেছেন—

"The Bill was an infringement of Hindu rights and privileges."

"সুতরাং লেখকের ইহাতে অপরাধ কি হইতে পারে। আর আইন যে ভাবে আছে তাহাতে কোন অপরাধ হয় নাই। সমালোচনা খুব কঠোর হইতে পারে বটে, কিন্তু বিদ্রোহ উদ্রেক করিতে পারে এরূপ কোন ভাষা ব্যবহৃত হয় নাই।"

কিন্তু Sir Comer Pethram, Charge-এ বলেন—disaffection অর্থ হইতেছে contrary to affection অর্থাৎ তাহাতে শ্রদ্ধা বা ভালবাসা উদ্রেক করে না। এরূপ হওয়ার অর্থই ঘৃণা, বিরক্তি বা তদনুরূপভাব পোষণ করা—feelings of dislike or hatred or something অর্থাৎ গভর্ণমেণ্টের প্রতি সকলকেই শ্রদ্ধাবান বা ভালবাসায় পূর্ণ থাকিতে হইবে, অন্যথা তিনি দণ্ডনীয় হইবেন।

৯ জন স্পেশাল জুরীর মধ্যে ৭জন ছিলেন ইউরোপীয়ান, একজন আর্ম্মাণী ও একজন বাঙ্গালী। জুরীদের মধ্যে অনৈক্য হওয়ায় চীফ জষ্টিস জুরী 'ডিসচার্জ্জ' করিয়া আসামীদিগকে আবার পুনর্ব্বিচারের জন্য আদেশ দিলেন।

ইহার পরে আর মোকর্দ্দমা হয় নাই। গভর্ণমেণ্ট মোকর্দ্দমা উঠাইয়া লয়েন এবং বঙ্গবাসীর সত্বাধিকারী প্রভৃতি রাজদ্রোহকর বলিয়া স্বীকার না করিলেও তাঁহাদের ভাষা intemperate, distasteful and unjustifiable‡ বলিয়া স্বীকার ও দুঃখপ্রকাশ করেন। এই সম্বন্ধে স্যার চার্লস ইলিয়াট এবং চীফ্ সেক্রেটারী স্যার জন এড্গার ও খুব চেষ্টা করিয়াছিলেন। লর্ড ল্যান্সডাউন বলেন যে, "আইন ঠিকই আছে, এরূপ দণ্ডবিধানে উহা যথেষ্ট এবং এ সম্বন্ধে প্রধান বিচারপতিরও অভিমত পাওয়া গিয়াছে। তবে আসামীদের বিরুদ্ধে আর দ্বিতীয় বার মোকর্দ্দমা চালাইবার প্রয়োজন নাই।"

এইরূপ আইনের বিধানে বহুলোক দণ্ডার্হ হইয়া পড়িতে পারেন, আইনের চক্ষে কোন ভাষাই বিপদশূন্য নয় তাই দেশে একটা বিষাদ কালিমার ছায়া পড়িয়া গেল। লোকে ক্ষুব্ধ হইল, নিরাপদত্ব লোপ দেখিয়া বিষণ্ণ হইয়া পড়িল। "বঙ্গবাসী মোকদ্দমা"র § যবনিকাপাত হইলেও ইহা এবং ১৮৯১ সালের সহবাস সম্মতি আইন বঙ্গবাসীর পক্ষে স্মরণীয় বৎসর। সকলেই বিষাদ-নিমগ্ন হইল, অপাংক্তেয় সংস্কারকের জয় হইল এবং নাটকে ও রহস্য গীতে ছড়া বাঁধা হইল—

ওগো দেব না সম্মতি আমি দেব না সম্মতি
দেখ্‌বো কেমন আসে পাশে এগারোর পতি।

বোম্বাই-এর সংস্কারকগণ আইনটী সমর্থন করেন। তাই উক্ত 'সম্মতি সঙ্কট' প্রহসনে রচিত হয়—

কাঙালী বাঙ্গালী যদি না করে উপায়,
বোম্বাইয়ে যাইব আমি ভাসিয়ে ভেলায়।
ইষ্টদেবী যার নারী, আছেন সে মালাবারী।
আইন করেছে জারী, সরকার পদে ধরি।
পতির করিতে ক্ষতি যদি আগুয়ান,
অবলার বল দিতে বীর আগুয়ান।

মালাবারি বিল সমর্থন করিয়াছিলেন কিনা আমরা অবগত নহি, তবে তেলাঙ এবং ভাণ্ডারকর স্বপক্ষে ছিলেন কিন্তু বিলের বিরুদ্ধে তিলক খুব দৃঢ় ভাবে বলেন—

"Without fear of contradiction I may state from the earliest time of Sutras down to the present day a period extending over not less than 2500 years this has been our Sastra and practice."

কংগ্রেসের মধ্যেও মতদ্বৈধ ছিল। মিঃ হিউম, সুরেন্দ্রনাথ ও নরেন্দ্রনাথ সেন প্রভৃতি ছিলেন বিলের পক্ষে, আর উমেশচন্দ্র, রমেশচন্দ্র, যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, প্যারীমোহন

‡ এই সময় একটী Journalists Association পরস্পর পরস্পরকে রাজভক্তির বিরোধী কিছু না লেখে, তাহাতে সাহায্য করিবে বলিয়া গঠিত হয়।

§ Vide Empire Vs. Jogendra Chandra Bose, 19 Calcutta 35 at page 44.

১৮৯১, ১১ই মার্চ্চ ষ্টার থিয়েটারে সম্মতি সঙ্কট প্রহসন অভিনীত হয়।

মুখার্জ্জি, মতিলাল ঘোষ প্রভৃতি বিলের বিপক্ষে ছিলেন। তবে কংগ্রেস সমাজ-সংস্কাররূপ কোন বিষয়ে হস্তক্ষেপ করেন নাই। ১৮৯২ সালের এলাহাবাদের কংগ্রেসে সভাপতির আসন হইতে উমেশচন্দ্রও একথা স্পষ্টভাবে ঘোষণা করিয়া দিয়াছিলেন।

মণিপুর মোকদ্দমার কথা যে 'বঙ্গবাসীতে' উল্লিখিত আছে, তাহাও এ বৎসরের অন্যতম স্মরণীয় ঘটনা, তবে তাহাতে কংগ্রেসের সম্বন্ধ নাই বলিয়া উহা বর্ণনা করিতে বিরত হইলাম। তখন মুখে মুখে টিকেন্দ্রজিতের কাহিনী শুনিতাম, আমাদের বয়স তখন বারো বৎসর।

অন্যতম স্মরণীয় ১৮৯৭ সালটীও আবার আরও দুর্ব্বৎসর। একদিকে মহারাণীর হীরক জুবিলী উপলক্ষে যেমন ভারতের সর্ব্বত্র আনন্দ, অন্যদিকে বিষাদ ও বিপদ চতুর্দ্দিকে তাহাকে ঘিরিয়া ফেলিল। সমগ্র ভারতে তখন অন্নাভাব ও দুর্ভিক্ষ করাল কালের ন্যায় মুখব্যাদন করিয়া নিরন্ন কঙ্কালসার নরনারীর প্রাণে ভীতি সঞ্চার করিতেছিল। তাহার উপরে বোম্বাই ও পুনাতে প্লেগের ভয়ানক প্রকোপ হইল। এই প্লেগ উপলক্ষে কর্ত্তৃপক্ষ প্লেগ ক্যাম্পে ও segregation ক্যাম্প করিলেন এবং সন্দেহ


স্যর রমেশচন্দ্র

হইলেই অন্যান্য ব্যক্তিগণকে রোগ মুক্তির জন্য এই সমস্ত ক্যাম্পে আনাইতে লাগিলেন। Mr. W. C. Rand তখন পুনার প্লেগ কমিশনার এবং মিঃ Lewis তাঁহার সহকারী। পিউনিটিভ্ পুলিশও অধিবাসীদিগকে ত্রস্ত করিয়া তুলিল।

মিঃ তিলক তখন পুনার অন্যতম নেতা। তিনি একদিকে অগাধ পণ্ডিত, অন্যদিকে রাজনৈতিক ও জনহিতকর কার্য্যের অগ্রণী। এতদ্ব্যতীত ইংরাজী 'মারহাট্টা' ও মারহাট্টা ভাষায় লিখিত 'কেশরী' সংবাদ পত্র তিনি সম্পাদনা করিতেন। কেশরীর প্রভাব মারহাট্টাবাসীর প্রতি ছিল তখন অসামান্য।

মিঃ তিলকও প্লেগ হস্‌পিটাল করিয়া গভর্ণমেণ্টের কার্য্যে সহায়তা করেন। কিন্তু প্লেগ কমিশনারের কর্ত্তব্য এত কঠোরতার সহিত সম্পাদিত হইত যে,পুনার জনমণ্ডলী অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া উঠে। জনসাধারণের সেই অসন্তোষের ভাব কেশরী ও মারহাট্টায় আত্ম প্রকাশ করিত।

Times of India, Times of London, Pioneer, Englishman প্রভৃতি সংবাদপত্রে তিলকের নিন্দাবাদ বাহির হইতে লাগিল। তিলক উত্তর করেন, গভর্ণমেণ্ট প্লেগ নিবারণের জন্য যে উদ্যম করিতেছেন তাহা প্রশংসনীয় কিন্তু কঠোরতা সর্ব্বথা বর্জ্জনীয়। পুনায় যে অত্যাচার হইতেছে তাহাতে বোম্বাই গভর্ণমেণ্টও ভীত হইয়াছেন, আর বোম্বাইতেও প্লেগ-দমন-নীতি এরূপ নির্দ্দয়ভাবে অনুষ্ঠিত হয় নাই * এইরূপ কথার কাটাকাটি চলিল।

সমগ্র ভারতে মহারাণী ভিক্টোরিয়ার হীরক জুবিলির অনুষ্ঠান হয় ২২শে জুন। বোম্বাইতে সে রাত্রিতে এক বীভৎস কার্য্য অনুষ্ঠিত হইল। গভীর রাত্রে যখন গভর্ণরের বাড়ী হইতে উক্ত র‍্যাণ্ড, লুইস ও সপত্নী লেফ্‌টেনাণ্ট আয়ারষ্ট প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছিল, মিঃ র‍্যাণ্ডকে কে পেছন হইতে গুলী করে এবং লুইস ও আয়ারষ্টকেও গুলী করা হয়। র‍্যাণ্ড তৎক্ষণাতই পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হন এবং আয়ারষ্টও হাসপাতালে অল্পক্ষণ মধ্যেই প্রাণত্যাগ করেন। এই জঘন্য হত্যাকাণ্ডে সমস্ত পুণা আতঙ্কে শিহরিয়া উঠে। মিঃ ল্যাম্ব তখন পুনার কালেক্টর ছিলেন।

মিঃ গোখলে তখন বিলাতে ছিলেন। বোম্বাইয়ের অবস্থা সম্বন্ধে রাণাডে সাহেব ও অন্যান্য বন্ধুদের পত্রে সংবাদ অবগত হইয়া তিনি লণ্ডনে প্রচার করেন যে "পুণাতে ভয়ঙ্কর অত্যাচার অনুষ্ঠিত হইতেছে। স্ত্রীলোকের উপরও পীড়ন হইতেছে।"

* The press accepted the principle but complained about the unnecessary harshness in its execution. Bombay Government itself anticipated dissatisfaction, Scavengers' strikes, riots. Plague measures were stringently carried out. Unnecessary stringency of plague measures, not the writings in the native press, are responsible for the feelings of dissatisfaction. He wanted the authorities at Poona to manage the regulations in the same way as they were being enforced in Bombay by General Gataire.

A. B. Patrika, 6th July, 1897.

পার্লামেন্টে ভারতসচিব ইহার উত্তরে বলেন এইরূপ অভিযোগ সম্পূর্ণ মিথ্যা।*

গোখেল ভারতে আসিলে তাহার উপর মোকদ্দমা চালাইবার কথা হয় কিন্তু তিনি উহা প্রমাণ করিতে হইলে জষ্টিস্ রাণাডেকে সাক্ষী মানিয়া তাঁহাকে expose করিতে হয়। তিনি তাহা করিতে চাহিলেন না, তাই প্রমাণ যাচাই না করিয়া এরূপ অভিযোগ প্রকাশ করায় দুঃখ প্রকাশ করিলেন। 4th. Aug. 1897।

এদিকে তিলককে ধরা হইল ২১শে জুলাই। 'প্রতোদ' সম্পাদক ধৃত হইলেন, 'বৈভব' সম্পাদক বিশ্বনাথ কেলকার ধৃত হইলেন এবং আর গ্রেপ্তার হইলেন দুইভ্রাতা বলবন্ত রাও নাটু (বালা সাহেব), হরিপন্থ রামচন্দ্র রাও নাটু (তাতা সাহেব)—ইহারা দুইভাই Natu Brothers নামে অভিহিত হইতেন। ইঁহারা পুণার বিশিষ্ট প্রতিষ্ঠাবান ব্যক্তি এবং ১৮৯৯ পর্য্যন্ত অন্তরীণে আবদ্ধ (deported) ছিলেন—ইঁহারা শেষে ছিলেন বেলগাঁওতে।

ধৃত হইয়া তিলক স্থানান্তরিত হইলেন বোম্বাইতে। জষ্টিস্ পিয়ারসন ও রাণাডে তাঁহার জামিন প্রদান অগ্রাহ্য করিলেন। পরে জষ্টিস বদরুদ্দিন তায়েবজী ৩০ হাজার টাকার জামিন দেন।

এখন তিলক কেন ধৃত হইলেন এই বিষয়ে পাঠক জিজ্ঞাসু হইতে পারেন। পুনাতে প্রতিবৎসর শিবাজী ও গণপতি উৎসব অনুষ্ঠিত হইত। ঐ বৎসরেও ওরা মে ঐ উৎসব হইবার কথা ছিল। কিন্তু পরে ১৫ইজুন অনুষ্ঠিত হয়। ঐ ১৫ই জুনের সভায় তিলক শিবাজীর উদ্দেশে শ্রদ্ধাঞ্জলি দিতে উঠিয়া "আফজল খাঁর হত্যা সম্বন্ধে বলেন, ঐ হত্যা—দুষ্কৃত বিনাশের জন্য হত্যা—সুতরাং গীতানুমোদিত। স্বরাজ্য ও স্বাতন্ত্র আমাদিগকে পাইতেই হইবে।"

কর্তৃপক্ষ বোধ হয় মনে করেন যে, তিলকের এই কথায় কোন দুর্বৃত্ত ব্যক্তি উত্তেজিত হইয়া র‍্যাণ্ড ও আয়ার্ষ্টকে হত্যা করিয়াছেন। সুতরাং তিলক দণ্ডার্হ। মোকদ্দমার শুনানীর পূর্ব্বেই Daily Mail প্রভৃতি সংবাদপত্র তিলককে scoundrel বলিয়া কটূক্তি করিতে লাগিলেন।

বোম্বাই দায়রা আদালতে তিলকের বিচার হয়। জুরীদের মধ্যে ৫ জন হ'ন ইউরোপীয়, ৩ জন দেশীয় ও একজন ইহুদী। তিলকের পক্ষ সমর্থন করেন কলিকাতার বিখ্যাত কৌঁসুলি মিঃ পিউ ও মিঃ ডাভার (পরে হাইকোর্টের জজ)।

পিউ বলেন, অন্যান্য বৎসরও শিবাজী উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে। আর এরূপ অনুষ্ঠান Scotland-এর Wallace Movements-এর অনুরূপ। বর্ত্তমান আইনটী এত সামান্য অপরাধ সম্বন্ধে বিচারের জন্য রচিত হয় নাই। ইহাতে কোন বিদ্রোহ সৃষ্টি করা হয় নাই। ম্লেচ্ছ, বলিতে তিনি শিবাজীর সময়ের মুসলমানকেই লক্ষ্য করিয়াছিলেন।

বিচারপতি ছিলেন মিঃ জষ্টিস্ ষ্ট্রেচী—তিনি আইন বুঝাইতে গিয়া বঙ্গবাসী মামলার বিচারপতি স্যার Comer Pethram-এরও উপরেও চলিয়া যান। তিনি বলেন—disaffection অর্থ—want of affection, ভালবাসার অভাবই দণ্ডনীয় এবং ইহাতেই বিদ্বেষ (dislike or hatred) আসে আর তাহাতেই hostility or ill-will of any sort small, intense or mild আসে। অর্থাৎ ভালবাসার অভাবেই বিদ্বেষ, বিদ্বেষই শত্রুতা (তাহা সামান্যই হউক বিষমই হউক) আর তাহাই রাজদ্রোহ। আর ঐরূপ মনোভাব (feeling) থাকিলেই অপরাধের পক্ষে যথেষ্ট, কোন কার্য্য অনুষ্ঠানের আবশ্যক নাই।*

Sir Comer Pethram-এর মন্তব্য অবলম্বন করিয়াই জষ্টিস্ Strachy আইনের ব্যাখ্যা আরও প্রসারিত করিয়াছেন। তবে Sir Comer বঙ্গবাসী মোকদ্দমায় কথাগুলি অধিকতর অসংযত থাকা সত্ত্বেও সকল জুরী একমত না হওয়ায় আসামীকে দোষী বলিয়া সাব্যস্ত করেন নাই, এমন কি যাহাতে মোকদ্দমার অবসান হয় সেরূপ ইঙ্গিতও দিয়াছিলেন কিন্তু

* Lord George Hamilton read a telegram that allegations that women had been stripped in the streets of Poona to detect plague symptoms were a malevotent fabrication.

* The Bombay High Court held (22 B 112, 133)—Disaffection means hatred, enmity, dislike, hostility, contempt and every form of ill-will to the Government. Disloyalty is perhaps the best general term comprehending every possible form of bad feeling to the Government.

Mr. Justice Strachy ৬ জন জুরি মারহাট্টা ভাষা সম্বন্ধে অজ্ঞ থাকা সত্ত্বেও তাহা করেন নাই।

ঐ দুইটি মন্তব্যের উপর ভিত্তি করিয়া ১২৪ক ধারায় পূর্ব্বে যাহা ছিল নিম্নলিখিত কথা বাড়াইয়া দেওয়া হইল।

Whoever brings or attempts to bring into hatred or contempt His Majesty or the Government is guilty.

Disaffection includes disloyalty and all fealings of enemity—Vide Act 4 ot 1898



গোখলে

এই ভাবে আইন এখন সংশোধিত ও পরিবর্ত্তিত হইয়াছে এবং এখন sedition case হইলে অব্যাহতি পাওয়া দুষ্কর। আগে আইন ছিল স্বল্পায়তনে,—কিন্তু মোকদ্দমা হইত না। বঙ্গবাসীর মোকদ্দমাই প্রথম। এখন আইন বর্দ্ধিত হইয়াছে এমন ভাবে যে, মোকদ্দমা হইলে অ্যাড্‌ভোকেটকে বড় কসরৎ করিতে হয় না। এই সম্বন্ধে কংগ্রেস ইতিহাস লেখক পাট্টাভাই সীতারামাইয়া যে একটী ভুল কথা লিখিয়াছেন এই-খানে পাঠকের গোচর করা কর্ত্তব্য। তিনি লিখিয়াছেন—

"It was while Tilak was in jail that sections 124A, 153A were added to the Penal Code so as to amplify the scope of "the offences."

১৫৩ ক-এর সহিত তিলকের সম্বন্ধই ছিল না। ১২৪ ক ও পূর্ব্ব হইতেই ছিল (১৮৭০ হইতে) তবে দুইজন বিচারপতির ভাষ্য অবলম্বনে তাহা সংশোধিত করা হইল মাত্র। ভরসা করি ভবিষ্যতে উক্ত গ্রন্থকার নিজের ভুলটী সংশোধন করিয়া লইবেন।

ছয়জন বিদেশী জুরীই তিলককে দোষী বলেন এবং তিনজন বলেন নির্দ্দোষী। তাঁহাকে দেড় বৎসর দণ্ড দেওয়া হয় এবং জেলে তাঁহার প্রতি সাধারণ কয়েদীর ন্যায় ব্যবহার করা হয়।

এই মোকদ্দমায় তিলকের জেল হইল বটে, কিন্তু তাঁহার আসন মারহাট্টাবাসী কেন সমগ্র ভারতবাসীর হৃদয়ে স্থাপিত হইল। ঘটনাচক্রে গোখেল যাহা করিলেন, তিলক তাহা না করিয়া নির্য্যাতন ভোগ করিয়াও সকলের শ্রদ্ধাকর্ষণ করিলেন। এইভাবে জাতীয়তাবাদীগণ তাহাদের লক্ষ্য জয়যুক্ত মনে করিয়া অগ্রসর হইলেন। তিলকের মোকদ্দমা জাতীয়তার ইতিহাসে একটা প্রধান স্মরণীয় ঘটনা।

বাঙ্গালা দেশও তিলকের বন্ধনদশায় গভীর বিষাদসাগরে নিমগ্ন হইল। বাঙ্গালী তিলকের মোকদ্দমায় সহায়তা করিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন। তাহারা অনেক টাকা উঠাইয়া পাঠাইয়াছিলেন। এই সহায়তায় অমৃতবাজার সম্পাদক মতিলাল ঘোষ, ভূপেন্দ্র নাথ বসু ও শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্র নাথ দত্ত যোগদান করিয়াছিলেন এবং ব্যারিষ্টার ঠিক করিয়া দিয়াছিলেন। আপিলের জন্যও ১২০০ টাকা সংগৃহীত হয় এবং তাহাতে মিঃ টি, পালিত, সুরেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, গুরুপ্রসাদ সেন, মতিলাল ঘোষ, হীরেন্দ্র নাথ দত্ত প্রভৃতি ফাণ্ডের সভ্য ছিলেন। তিলকের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন এবং আইনের নূতন সংশোধন বাতিলকরণ উভয়ই তাহাদের উদ্দেশ্য ছিল।

কলিকাতার টাউনহলে সভা হইয়াছিল এবং প্রিভি কাউন্সিলে Lord Chancellor, Lord Hobhouse ও Sir Richard Couch প্রভৃতির কাছে তিলকের পক্ষ সমর্থন করেন Mr. Asquith ও Mr. W. C. Bonerjee, অপর দিকে দাঁড়ান Mr. Brown। লর্ড Chancellor আদেশ করিলেন যে প্রিভিকাউন্সিলে আপিল করিবার জন্য special leave মঞ্জুর হইতে পারে না। সুতরাং ফলে মিঃ জষ্টিস ষ্ট্রেচীর ব্যাখ্যাই বলবৎ রহিয়া গেল। (১৮৯৭ ডিসেম্বর)।

এদিকে প্রতোদ সম্পাদকের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরের আদেশ হয় কিন্তু আপিলের শুনানী হইলে, চীফ জাষ্টিস

Mr. J. Pearson ও ব্র্যাণ্ডেড যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর হইতে দণ্ড কমাইয়া মোটে একবৎসরে সাজা দেন। Mr. Pearson আইনের ব্যাখ্যা করিয়া বলেন, Disaffection এর অর্থ contrary affection or love অর্থাৎ dislike or hatred নয়, ইহার অর্থ disloyalty অথবা disposition in mind to subvert the existing Government. এই মন্তব্যে Sir Henry Stephen এর উদ্দেশ্য কতকটা সমর্থিত হয় কিন্তু অচিরেই এই বিরোধীয় মন্তব্য আইনের দ্বারা কিরূপে মীমাংসিত হইয়া যায় (Act of 1898) পাঠক দেখিতে পাইবেন।

গভর্ণমেণ্ট Sir Comer Pethram ও মিঃ জষ্টিস ষ্ট্রেচীর উক্তিতে নিশ্চিন্ত হইতে পারিলেন না। যদিচ প্রিভিকাউন্সিল আপিল করিবার অনুমতি দেন নাই, কিন্তু প্রত্যেক মোকদ্দমার আবার ভিন্ন ব্যাখ্যা হইল। যাহা হউক ১৮৯৮ সালের গোড়ারই ভাইসরয় লর্ড এলগিন কাউন্সিল এর সহায়তায় আইনটী সংশোধন করাইয়া লইলেন।

বাঙ্গলা দেশে তুমুল আন্দোলন হইল বটে, গভর্ণর জেনারেলের কাছে আবেদন ও পাঠানো হইল সত্য কিন্তু কোন ফল লাভ হইল না। ১২৪ক ধারা নবরূপ ধারণ করিল মূলতঃ উক্ত বিচারপতি দ্বয়ের ভাষ্য বিশেষতঃ মিঃ জষ্টিস ষ্ট্রেচীর অর্থই নূতন সংশোধিত আইনে সন্নিবিষ্ট হইল।

এই সময় বঙ্গভূমির বক্ষ দিয়া আর একটি অনল প্রবাহ প্রবাহিত হয়। ১২ই জুন, শনিবার, ১৮৯৭ বঙ্গদেশ ভূমিকম্পে বিধ্বস্ত হইয়া যায়। বহুলোকের সর্ব্বনাশ হয়, অনেকে ফকির হয়।

এই সময় নাটোরে প্রাদেশিক সম্মিলন হইতেছিল। পূর্ব্বে কলিকাতায়ই এই সম্মিলন হইত কিন্তু ১৮৯৫ হইতে মফঃস্বলে এইরূপ সম্মিলন হইতে আরম্ভ হয়। প্রথমটী হয় বহরমপুরে, সভাপতি হন আনন্দ মোহন বসু, দ্বিতীয়টী হয় কৃষ্ণনগরে স্বর্গীয় গুরুপ্রসাদ সেন মহাশয়ের সভাপতিত্বে আর তৃতীয়টী এবার হইতেছিল নাটোরে সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সভাপতিত্বে। আর তাঁহার অভিভাষণ বাঙ্গলায় বুঝাইয়া দিয়াছিলেন রবীন্দ্রনাথ। ১০ই হইতে কনফারেন্স আরম্ভ হয়। তৃতীয় দিন অধিবেশনের সময় প্রায় ৬।৭ মিনিট কম্পন চলে এবং নাটোর রাজাদের বিস্তর ক্ষতি হয়। তার উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সকল প্রতিনিধিগণকে স্থিরভাবে বসিয়া থাকিতে বলেন এবং অবস্থা দেখিয়া সকলে স্তম্ভিত হইয়া যান।

যাহা হউক, এই সমস্ত হৃদয়বিদারক ঘটনার মধ্য দিয়া অতিবাহিত করিয়া ভারতীয়গণ এবার অমরাবতীতে কংগ্রেসে আসিয়া সম্মিলিত হইলেন। নেতৃবৃন্দ পুণার ঘটনায় এত বিচলিত হইয়াছিলেন যে, তাঁহাদের অভিভাষণ অনুধাবন করিলেই ঘটনার গুরুত্ব যথেষ্ট উপলব্ধি হইবে। সভাপতি শঙ্কর নায়ার অতি প্রাঞ্জল ভাষায় পুণার দুরবস্থার কথা বলেন—

"The measures the Government had to take for the suppression of Plague in Poona are said to have interfered with the domestic habits of Hindus and Mohamedans. Soldiers were employed to enforce those Government measures who were rightly or wrongly, generally believed to have insulted women and defiled places of worship. The result was prostration of the people. A feeling of helplessness came over them. In Western countries the result would have been lawlessness. In Poona many contented themselves abandoing their homes. Some resigned themselves to sullen apathy and despair. There were a few who protested their unnessary harshness. Amongst those who protested was Mr. Natu a leading Poona Sirdar. His formal written compaints recently published in England disclose, if any reliance can be placed on them, a state of affairs which certainly demanded attention. Let me give you a brief summary of his complaints.

"The inspection of houses by soldiers seems to have been carried out without notice by forcing open very often unnecessary when there were other means of entrance the locks of the shops and houses when the owners were absent and absolutely no attempt was made to protect the properties of the houses. No notice was taken on complants concerning them. A Hindu lady was assualted by a soldier and Mr. Natu reported the matter to the authorities producing witnesses. No notice was vouchsafed, the soldiers were refractory

and any complaint against them was obstruction. When a man fell ill many neighbouring family were taken to the segregation camp and left there without any covering to protect their body or any furniture then peoperty at home including horses cows and sheep being left unprotected. A man was unnecessarily taken to hospital and sent back as not being affected by plague to find his furniture destroyed and his poor wife and relatives forcibly removed and detained in segregation camp. Temples were defiled by soldiers and his own temple was entered by them on account, Natu behaves, of his impertilence in making a complaint. An old man who succeeded in satisfying the search party that he was not suffering from Plague was detained in jail some hours for having obstructed these search party, the obstruction apperently consisting in the delay caused by him. Insult was the reward for the services of volunteers and their suggestions were treated with contumacy. You all know how sensitive our Mohomedan fellow subjects are about the privacy of their women. And when Mr. Natu suggested that the services of Mohomedan volunteers should be availed of to search the Mohomedan quarter he was told that the conduct was improper and his services voluntarily rendered were dispensed with.

Natu brought all these to the notice of authorities. The Marhatta complained, "Plague is more merceful to us than its human prototypes now reigning in the city......the tyrany of the Plague Committee and its chosen instruments is yet too rude to allow respectable people to breathe at ease.

দেশের দুরবস্থার অন্ত ছিল না। এ দেশের লোকের স্বাভাবিক অবস্থাই দারিদ্র্য, উহা আজ চরম সীমায় উঠিয়া দুর্ভিক্ষে পরিণতি লাভ করিয়াছে। তাহার পর বোম্বাই-এ মহামারীর আবির্ভাব। প্লেগ দমনের জন্য সরকার যে উপায় অবলম্বন করেন তাহা লোকের পারিবারিক অবস্থার বিরোধী বলিয়া লোকের ভয় হওয়া স্বাভাবিক। সত্য হউক আর নাই হউক, লোকের মনে বিশ্বাস জন্মে যে, যেসব সৈনিক প্লেগ দমন কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছিল তাহারা মহিলাদিগকে অপমানিত ও দেবস্থান কলুষিত করিয়াছিল; তাই লোক নিরাশ হইয়া পড়ে। প্রতীচীতে এ অবস্থায় আইন ভঙ্গ ও দাঙ্গা হাঙ্গামা হইত। যাহারা এই সব ব্যবস্থার প্রতিবাদ করেন সর্দ্দার নাটু তাঁহাদের অন্যতম। বিলাতে তাহার যে অভিযোগ প্রকাশিত হইয়াছে তাহা সত্য হইলে ব্যাপার ভীষণই হইয়াছিল সৈনিকেরা নাকি গৃহস্থের অনুপস্থিতিতে অকারণে দ্বার ভাঙ্গিয়া গৃহে প্রবেশ করিত। ধনসম্পত্তি নিরাপদ ছিল না। অভিযোগ করিলে ফল হইত না। একজন সৈনিক নাকি একজন হিন্দুমহিলাকে প্রহার করে। নাটু সাক্ষী হইয়া সে কথা কর্তৃপক্ষের গোচর করিলেও কেহ সে কথায় কর্ণপাত করে নাই। বরং কেহ অভিযোগ উপস্থিত করিলে মনে করা হইত তিনি কার্য্যে বাধাপ্রদান করিতেছেন। নাটু অভিযোগ উপস্থিত করাইতে বোধ হয় তাহার মন্দির কলুষিত করা হয়। নাটু সে সব কথা রাজকর্ম্মচারীদিগকে জানান।



তিলক

ডেইলী সংবাদপত্রে এই সব কথা আলোচনা করা হয় এবং মারহাট্টা লিখেন, "যাহারা সহরে প্রভুত্ব করিতেছে তাহাদের তুলনায় প্লেগ ভাল।"

ইতিমধ্যে দামোদর চাপেকার নামক একব্যক্তি বোম্বাইতে মহারাণীর মর্ম্মরমূর্ত্তি বিকৃত করিবার সময় পুলিশ কর্তৃক ধৃত হয় এবং একটী স্বীকারোক্তি করিয়া র‍্যাণ্ড ও আয়ার্ষ্টের হত্যার দায়িত্ব গ্রহণ করে। বিচারে তাহার ও তাহার ভ্রাতার ফাঁসি হয়। তবে সে তিলক বা নাটু ভ্রাতৃদ্বয়কে কোনও বিষয়েই সংশ্লিষ্ট করে না।

সুরেন্দ্রনাথও বক্তৃতায় বলেন "A nation is in tears. My feelings go forth to him in his prison-house.

আত্মহত্যা

—শ্রীমোহিনী চৌধুরী

নিস্তব্ধ রাতে হঠাৎ জোনাকীর ঘুম ভাঙিয়া যায়। বালিশের উপর হইতে মাথাটা উঠাইয়া কানের পাশ হইতে আলগা চুলগুলি সরাইয়া দেয়, কিছুক্ষণ চুপ করিয়া কান পাতিয়া কি যেন শোনে—মনে মনে ভাবে : ডাকিব নাকি কর্তাকে ? বাজপাখীগুলা রাত দুপ'রে হঠাৎ এমন মরণকান্না জুড়িয়াছে কেন ?

আওয়াজটা কিন্তু ঠিক বাজপাখীর মত নয়—কর্কশ এবং তীক্ষ্ণ একটানা আওয়াজ—যেন দানোয়-পাওয়া মরদ ষোয়ানেরা একসঙ্গে গোঙাইতে সুরু করিয়াছে। সারাটা দিন খালে বিলে বৈঠা টানিয়া রাত্রি এক পহরের সময় তুফান ঘরে ফিরিয়াছে। কোন গতিকে এক-গেরাস লবণ-ভাত গলায় ফেলিয়া সেই যে সে মাদুরের উপর পাশ ফিরিয়া শুইয়াছে, দারুণ মশার কামড়েও তাহার হাত-পা নাড়িবার সামর্থ্য নাই। পরম নিশ্চিন্তিতে সে নাক ডাকাইতেছে। তাহাকে এমন অসময়ে ঠেলিয়া জাগাইতে জোনাকীর মন চাহিতেছিল না। রোজ বিহান হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত জোনাকী আর পরাণের মুখ চাহিয়া তুফান কী খাটুনিটাই না খাটে—আহা বেচারী এখন একটু হাত-পা ছাড়িয়া ঘুমাক !

কিন্তু ওকি ? অবুঝ ছেলেটা যে হঠাৎ ট্যাঁ-ট্যাঁ করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। পরাণের কান্না শুনিলে কি আর তুফানের চক্ষে ঘুম থাকিবে ? জোনাকী তাড়াতাড়ি ছেলেকে কোলে টানিয়া, তাহার মুখে মাই দিয়া তাহাকে ঠাণ্ডা করিতে গেল। কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। তুফান হঠাৎ ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিয়া ব্যস্তভাবে শুধাইল, "কী হইল গো ? পরাণ অত কাঁদে কেন ?"

জোনাকী ততক্ষণে কাঁদুনী ছেলেটাকে সামলাইয়া লইয়াছে। ধীরে ধীরে সে জবাব দিল, "ব্যস্ত হওয়ার কিছু হয় নাই গো। গলাটা ওর শুকাইয়া গিয়াছিল, এক ফোঁটা দুধ পাইয়া দেখি চুপ করিয়াছে। তুমি একটু কানে তুলা দিয়া ঘুমাও না কেন ?

তুফানের দুইচক্ষে ঘুম জড়াইয়াই ছিল। সে আর কথা না বলিয়া মাদুরের উপর উপুড় হইয়া শুইয়া পড়িল। জোনাকীও পরাণকে বুকে লইয়া একটু মাথা কাৎ করিল। সেই একটানা আওয়াজের কথা আর সেই রাত্তিরে তুফানের কাছে শুধানো হইল না।…

তুফানও এতসব ব্যাপারের কিছুই জানিত না। পরের দিন যখন জোনাকীর সঙ্গে বাতাসী, আহ্লাদী, পুতুল, ঘেঁটু সকলেই আসিয়া বলিল যে, তাহারা কাল রাত্তিরে ভূতের কাঁদন শুনিয়াছে, তখন কথাটা সে ঠিক বুঝিয়া উঠিতে পারে নাই। তাহাদের গেরামে অমন বিরাট ভূতই বা আসিল কোথা হইতে, আর আসিলই যদি তবে অত কাঁদিলই বা কেন ? বেলা দুপুরের সময় ক্ষ্যাপাখুড়ার কাছে কথাটা পাড়িতেই অবশ্য সব পরিষ্কার হইয়া গেল। ক্ষ্যাপা-খুড়া সব কিছুরই খবর রাখে। গাঙের ওপারে যে নতুন চট্‌কল বসিয়াছে আর তারই জন-মজুরদের জানান্ দিবার জন্যই যে সকাল-বিকালে কলের ভেঁপু বাজে—একথা ক্ষ্যাপা-খুড়া ছাড়া আর কেই বা জানিত ?

যাহাই হউক, কয়েক দণ্ডের মধ্যেই তুফানের মুখে কথাটা জানিতে আর কাহারও বাকী রহিল না। সকলেই শুনিল যে, পাট-কোষ্ঠা হইতে থলি-চট তৈয়ার করিবার জন্য গাঙের পারে সাহেবের কল বসিয়াছে।

*

প্রকাণ্ড একখানা দালান বাড়ী—তারই প্রকাণ্ড ফটকে বড়ো বড়ো অক্ষরে কী যেন লেখা আছে। নিরক্ষর চাষা-ভূষারা তাহা পড়িতে পারে না। দরোয়ানকে শুধাইলে সে বলে : 'আরে, ওহি তো কারখানাকা নাম হ্যায়—বজোরাণী জুহট্ ফেক্টোরী।'

কলকারখানার কাণ্ডকারখানাই যেন আলাদা। এমন আশ্চর্য্য জিনিষ গ্রামের লোকেরা কখনো চোখে দেখে নাই। তালগাছের মতো দুইটা কালো চোঙ্ আকাশ ছুঁইয়া দাঁড়াইয়া আছে। গাঙের ধারে লোহার মাচানের উপর একটা মাল উঠানোর কল বসিয়াছে। ঘড়্ ঘড়্ করিয়া

আওয়াজ হয় আর সেই কলটা বড় বড় পাটের গাঁইটগুলাকে বঁড়শীতে গাঁথিয়া নৌকা হইতে টানিয়া উঠাইয়া কারখানার মধ্যে আনিয়া ফেলে। বাহির হইতে সকলে উঁকি মারিয়া দেখে, কী দারুণ কাজকর্মের হুড়াহুড়িই না ভিতরে লাগিয়াছে, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড চুলায় আগুন গণ্‌গণ্‌ করিতেছে, পেল্লায় পেল্লায় চাকা ঘুরিতেছে, বিরাট বিরাট তাঁতকল চলিতেছে, বড়ো বড়ো কলের মানুষ এদিক্‌-ওদিক্‌ ছুটাছুটি করিতেছে। অবাক্‌ হইয়া গ্রামের লোকেরা ভাবে: মিস্তিরী-মজুরেরা এখানে কাজ করে কেমন করিয়া? মাথা ঘোরে না তাহাদের? কল-কব্জার ঝক্‌ঝকানিতে কান ঝালাপালা হইয়া যায় না। খোট্টাগুলার দেশে বুঝি খাওয়া-পরা জোটে না, তাই সাত মুল্লুক পার হইয়া হতভাগারা এখানে মরিতে আসিয়াছে!

বাস্তবিকই অমানুষিক খাটুনি খাটিতে হয় এই চটকলের কুলীমজুরদের। সকাল বেলায় কলের ভেঁপু বাজিয়া উঠিলেই সকলে ঠেলাঠেলি করিয়া ঐ খোঁয়াড়ের মধ্যে গিয়া ঢোকে—'নাস্তা' করিবার ফুরসৎও তাহাদের জোটে না। তারপর বেলা আড়াই পহরের সময় একটু খাওয়ার ছুটী যখন মেলে, তখন ছুটিয়া আস্তানায় গিয়া পিতলের থালায় একপোয়া ছাতু, কাঁচালঙ্কা, লবণ আর জল দিয়া মাখিয়া কোনরকমে গিলিতে গিলিতেই আবার কারখানায় হাজিরা দিবার সময় হইয়া যায়। খাওয়ার মধ্যে দু'বেলা পেট ভরিয়া উহারা শুধু গালাগালিই খাইতে পায়। বারো ঘণ্টা হাড়ভাঙা খাটুনি খাটিয়া আর খানদু'য়েক আধপোড়া চাপাটী খাইয়াও যে উহারা বাঁচিয়া থাকে সে কেবল উহাদের পোড়া-কপালের জোরেই।

•

তুফান বলে: 'না রে জোনাকী, আমরাই বেশি সুখে আছি। রোদ্দুরে পুড়ি আর বর্ষাতেই ভিজি, আমাদের কাজ তো আমাদেরই হাতে। কারো চোখ রাঙানীর তোয়াক্কা রাখি না আমরা। জমিতে লাঙল দেই, ফসল বুনি, আর ভগবানের দয়ায় জল খরা ঠিক মতন হইলে দুই বেলা পেটটা ভরিয়া খাই আর নাক ডাকাইয়া ঘুমাই।'

জোনাকী শুধায়: 'ওরাই বা কী আর এমন কষ্টে আছে বলো? মুখ বুজিয়া যেমন কাজ করিতে হয় ওদের, তেমন আবার রোজগারটাও যে সপ্তাহে সপ্তাহে বাঁধা। তোমাদের মতো ক্ষেত-খামারের দিকে হাঁ করিয়া চাহিয়া থাকিতে হো ওদের হয় না। গায়ে-গতরে খাটিয়া ওরা বেশ কাঁচা টাকার মুখ দেখতে পায়।'

কথাটা সত্য। চাকুরীর একটা মস্ত মোহ এই যে, শক্তি-সামর্থ্যের দরাদরি লইয়া ভাগ্য সেখানে ফাট্‌কা বাজার বসায় না। কেনা গোলাম হইয়া থাকিতে পারিলে বাঁধা মা'হিয়ানাটাও ঠিক জুটিবে।

বঙ্গরাণী জুট ফ্যাক্টরীর ম্যানেজিং ডিরেক্টর বিদ্যুৎবরণের বয়েস চল্লিশ বছর পার না হইলেও তাঁর মতো সুদক্ষ ব্যবসায়ী সাধারণতঃ দেখা যায় না। দালাল, ফড়িয়া, বেপারী, মহাজন প্রভৃতির হাত এড়াইবার জন্ম তিনি সহর ছাড়িয়া মফঃস্বলের গ্রামে আসিয়া কারখানা বসাইয়াছেন। গ্রামের চাষা-ভুষাদের টাকা দাদন দিয়া তিনি ক্ষেতে ক্ষেতে পাট বুনাইবেন, কাঁচা মাল একেবারে সরাসরি গুদামে উঠাইবেন, তারপর পাট শুকাইয়া, ঝাড়িয়া, রঙ্‌ করিয়া, থলি, চট, আসন, সতরঞ্চি প্রভৃতি তৈয়ার করিয়া সময় বুঝিয়া বাজারে ছাড়িবেন—ইহাই তাঁহার সুচিন্তিত পরিকল্পনা। সহরে বা জাহাজঘাটায় মাল চালান দিতেও তাঁহার মোটেই অসুবিধা হইবে না। অনেকগুলি গাধাবোট তাঁহার হেপাজতে আছে, আর তা'ছাড়া পলাশডাঙা হইতে মিএগ্রারহাট পর্য্যন্ত একটা ষ্টীমার লাইন খুলিবার চেষ্টাও তিনি করিতেছেন। এখন একবার এই চটকলটাকে ভালোভাবে চালু করিতে পারিলে হয়।

বছরে যদি কারখানায় পঁচিশ লাখ টাকার কাব হয়, তাহা হইলে অংশীদারেরা কিছু মুনাফা পাউক বা নাই পাউক ম্যানেজিং ডিরেক্টরের ফুলিয়া লাল হইতে বেশীদিন লাগে না। বাজারের যে রকম অবস্থা তাহাতে কারখানা ঠিকমতো চালাইতে পারিলে পাঁচ সাত বছরের মধ্যে পাঁচ সাতশো বিঘা তালুকের মালিক হওয়া বিদ্যুৎবরণের পক্ষে একটা অসম্ভব কিছু ব্যাপার নয়। বিদ্যুৎবরণ মনে মনে ঠিক করিয়া রাখিয়াছেন যে, তখন এই পলাশডাঙাকে তিনি পুরাপুরি সহর না করিয়া ছাড়িবেন না। পাকা রাস্তাঘাট, কোঠাবাড়ী, গাড়ী-ঘোড়া, ইস্কুল-অফিস্‌, বিজলীবাতি, কলের জল, সব কিছু

দিয়া তিনি ওখন এক বিরাট কলোনীর পত্তন করিবেন—নাম দিবেন 'বিদ্যুৎ-নগর।'

*

একথা বোধ হয় ক্ষ্যাপাখুড়া আগেই বুঝিয়াছিল। তাই ছিদাম যখন আসিয়া খপর দিল যে, প্রতাপ সাহার কাছে আর তাহাদের হাত পাতিতে হইবে না, চটকলের সাহেব পাট বোনার জন্ম বিনাস্বদে আগম টাকা দিতেছে, তখন সে তাহাকে ধমক দিয়া বলিয়াছিল—'খবর্দ্দার! সাহেবের টাকা তোরা ছুঁবি না। প্রতাপ সাহা টাকা আদায় করে পিঠের ছাল খসাইয়া, আর ওরা টাকা উশুল করে বুকের রক্ত চুষিয়া।'

ক্ষ্যাপাখুড়ার কোন কথা অমান্ত করার সাহস তুফানের ছিল না। তাই ক্ষ্যাপাখুড়া যখন তুফানকে শাসাইয়া বলিল: 'খেয়াল রাখিস্ তুফান, যদি তোর জমিতে একটা পাটের চারা দেখি তবে আমি তোর ক্ষেতকে ক্ষেত আগুন জ্বালাইয়া দিব,' তুফান তখন সাহেবের কাছারীতে না গিয়া, গোপী সরকারের কাছেই জোনাকীর গলার হাঁসুলী বাঁধা রাখিয়া সের দশেক ধান লইয়া ঘরে ফিরিয়া আসিল।

জোনাকী কিন্তু সমস্ত দেখিয়া একটু মনভারী না করিয়া পারিল না। কী আক্কেল তুফানের! দেশশুদ্ধ লোক সাহেবের টাকা নিয়া হাল বলদ কিনিয়া আদাড়-বাদাড় সব চষিতে আরম্ভ করিয়াছে, আর তাহার স্বামী কি না ক্ষ্যাপা-খুড়ার মানা শুনিয়া চক্ষু বুজিয়া, হাত পা গুটাইয়া বসিয়া আছে। এমন বেবুঝ হইলে কখনো সংসার চালানো যায়?

জোনাকীর অনুযোগ শুনিয়া তুফান ধীরে ধীরে বলে: 'ক্ষিধা পাইলে কি শেষে পাটের পাতা খাইব নাকি বল? ধান বুনিলে তবু একমুঠা খুদকুঁড়া পেটে জুটিবে।'

ক্যানা ভাতের হাঁড়িটা আখার উপর হইতে সশব্দে নামাইয়া রাখিয়া জোনাকী উত্তর দেয়: 'তাতো বটেই! জমিদারের পেয়াদা যখন মরাই হইতে ধানের আঁটিগুলা টান মারিয়া লইয়া যাইবে, প্রতাপসাহা যখন পাওনার জন্ত আদালতে নালিশ ঠুকিবে, ধান বুনিবার স্বখটা তখন বেশ ভালো করিয়াই টের পাওয়া যাইবে।'

ঝগড়া বাধিবার উপক্রম দেখিয়া তুফান চুপ করিয়া যায়। পরাণকে কোল হইতে নামাইয়া রাখিয়া 'হুকা'র কল্কিটার দু'খানা জলন্ত আঙার তুলিয়া লয়। তারপর তামাক টানিতে টানিতে ঘরের হাতার বাঁশের খুঁটীতে ঠেস্ দিয়া নিতান্ত ভালো মানুষের মতো বসিয়া থাকে।

সময় কিন্তু মানুষের মুখ চাহিয়া কখনো বসিয়া থাকে না। সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্নার মধ্য দিয়া উনিশটা বছর কাটিয়া যায়। সময়ের সাথে সাথে দুনিয়াটাও যেন রঙ্ পাল্টায়। পলাশ-ডাঙাকে এখন আর পলাশডাঙা বলিয়া চিনিবার উপায় নাই। 'আঠারোবেঁকী' নদীর উপর ইট গাঁথিয়া প্রকাণ্ড পুল্ তৈয়ার হইয়াছে। গাঙের ওপারটা তো প্রায় সহর বনিয়া গিয়াছে। থানা, ডাকঘর, মিশনারী ইস্কুল, হাঁসপাতাল, হোটেল—সবই সেখানে আছে। এমন কি একটা চুলছাঁটার দোকান, আর গোটাদুয়েক কাপড়কাচার দোকান পর্য্যন্ত বাজারের সামনে বসিয়াছে। রাস্তাঘাটে ঘাসও নাই, কাদামাটীও নাই—খালি লাল লাল ইটের গুঁড়া। বাড়ীগুলাতেও আর কাঁচা-মাটীর ঘর নাই, সবই প্রায় পোড়ামাটীর ঘর। নয়নদাসের ভিটা এখন ইটখোলা হইয়াছে। সেখানে মাটী কাটিয়া ছাঁচে ঢালিয়া, খড়ের গাদায় পুড়াইয়া ইট তৈয়ার হইতেছে। বন-জঙ্গল সব পরিষ্কার হইয়া গিয়াছে। একগাছা বেত্ বা একটা বাঁশ দরকার হইলে এখন সাহাগঞ্জের হাটে দৌড়াইতে হয়।

গাঙের এপারেও অদল-বদল হইয়াছে অনেক। ছিদাম তো তাহার জমিজমা বেচিয়া সহরেই চলিয়া গিয়াছে। নিবারণ, গদাই, বলাইদাস—সবাই প্রায় চাষ-বাসের মায়া ভুলিয়াছে। যাহাদের কয়েক কাঠা ধানজমি এখনও আছে, তাহারা সেখানে পাট বুনাইতেছে। কেবল তুফানের ক্ষেতেই এখনো কিছু ধানের ছড়া দেখা যায়। অবশ্য জোনাকী জোরজুলুম করিয়া সেখানেও পাটের আবাদ যে না করাইয়াছে এমন নয়। জোনাকার জিদটা যেন আজকাল বড়ো বাড়িয়া গিয়াছে। পরাণও হইয়া উঠিয়াছে তাহার মায়ের মতোই বিচার-বাগীশ। কুড়ি বছরের ছেলে—কখনই মুখ বুজিয়া গুরুজনের কথা শুনিতে চায় না। বলে, 'ক্ষ্যাপাখুড়ার পাগলামী তুমি বোঝ না, বাবা। আগে আমরা ঠাকুরদেবতার দুয়ারে মাথা খুঁড়িয়া মরিতাম বলিয়া কি এখনও তাই করিতে হইবে নাকি? পায়ের ধুলা আর

চরণামৃত চাটিবার দিন আর এখন নাই। নিজের মাথা আর নিজের কব্জির জোরেই এখন নিজের সুখসুবিধা আদায় করিয়া লইতে হইবে।'

মিশনারী ইস্কুলে দু'পাতা ইংরিজী পড়িয়া ছেলেটার মাথা একেবারে বিগ্‌ড়াইয়া গিয়াছে। এমনটী যে হইবে ক্ষ্যাপাখুড়া তো তাহা আগেই বলিয়াছিল। কিন্তু জোনাকী সেকথা শুনিল কই? কবে ঐ মিশনারী ইস্কুলের এক ছেলেধরা মেম-সাহেব আসিয়া জোনাকীর সুমুখে চাটাই পাতিয়া বসিয়াছিল। সেই যে জোনাকীর কাণে কী মন্তর্ দিয়া গেল, জোনাকী লুকাইয়া তাহার হাতের বাজু বেচিয়া সেলেট্‌-পেন্সিল কিনিয়া পরাণকে স্কুলে ভর্ত্তি করাইয়া দিল।

ক্ষ্যাপাখুড়া একথা শুনিয়া তাহার রূপাবাঁধানো ল্যাঠিগাছা মাটীতে ঠুকিয়া বলিয়াছিল, 'বটে! দেখি তোর পরাণ কোন্ পথে গাঙের ওপারে যায়। পুলের উপর যদি সে একবার পা বাড়ায়, তবে ঠ্যাঙাইয়া আমি তার ঠ্যাঙ্‌ ভাঙিয়া দিব।'

কিন্তু ইস্কুলের নেপালীদরোয়ান সুখন সিংহের সঙ্গে পারিয়া ওঠা ক্ষ্যাপাখুড়ার মতো বুড়ামানুষের কর্ম্ম নয়। কাযেই শেষ পর্য্যন্ত তাহাকে সে চেষ্টায় ক্ষান্ত দিতে হইয়াছিল। দশ-দশটা বছর তো পরাণ বই খাতার মধ্যে মাথা গুঁজিয়াই কাটাইয়া দিল। না শিখিল ক্ষেত্‌খামারের কায, না করিল ঘর-সংসারের কোন একটা কায। ক্ষেত-নিড়ানীর সময়ে সে বাপের সাথে কাস্তে না ধরিয়া কোথায় কোন্ ভদ্র-বৈঠকের আখ্‌ড়ায় গিয়া আড্ডা মারে। মাঠের ফসল যখন বর্ষার জলের সাথে পাল্লা দিয়া বাড়িতে থাকে, ভুকান তখন নাও লইয়া 'ক্যারেয়া'র খোঁজে বাহির হয়, কিন্তু পরাণ তখন সখের থিয়েটারে মেয়ের পাঠের মহলা দিতেই ব্যস্ত। পাকা ফসল গোলায় উঠিলে ভুকান যখন কখনো ঘরামীর কায করিয়া, কখনো 'চলা' ফাড়িয়া, কখনো বা খালে-বিলে মাছ ধরিয়া দু'টা পয়সা রোজগারের চেষ্টা করে, পরাণ হয় তো তখন তাস খেলিয়া, বিড়ি টানিয়া আর মেলার মহোৎসবে চৌকিদারী করিয়া সময় নষ্ট করে। জোনাকীর ভয়ে ভুকান তার লায়েক পোলাকে একটা কড়া কথা বলিতেও সাহস পায় না। লাই দিয়া দিয়া জোনাকীই পরাণের মাথাটা খাইয়াছে।

জোনাকী নিজেও দিনকে দিন কেমন যেন মুলা হইয়া পড়িতেছে। আসন-কাঁথা বোনা, ডালা-কুলা বানানো, পিঠা-পায়েস রাঁধা কিছুতেই সে আর তেমন দিশা পায় না। মাঝখানে তো ক্রীশ্চান হইবে বলিয়া খুব নাচিয়া উঠিয়াছিল। শেষকালে ক্রীশ্চানেরা গরুর মাংস খায় শুনিয়া হুজুগটা একটু কমিয়াছে। আচ্ছা পাগলই বটে! মুখের একটা কথায় চৌদ্দপুরুষের ধর্ম্মটা ছাড়িলেই হইল কি না! ধর্ম্মটা যে আমাদের অস্থিমজ্জায় জড়াইয়া আছে, মেয়ে মানুষের কি আর সে খেয়াল আছে? আরে আহাম্মক, ধর্ম্ম তো আর সাপের খোলস নয়, যে যখন খুসী ইচ্ছামতো বদ্‌লানো যাইবে।

বৈশাখ মাস। কাঠফাটা রোদ্দুরে খাল-বিলের জল শুকাইয়া গিয়াছে। নদীটা তো পুল আর বাঁধের চাপেই মরিতে বসিয়াছে। যেটুকু জল আছে তাহাও পাট পচিয়া দুর্গন্ধ ও ময়লা হইয়াছে। ওপারে তবু নলকূপের জল খাইয়া লোকগুলা কোনরকমে টিঁকিয়া আছে। এপারে গাঙের জল ফুটাইয়া খাইয়াও জ্বর-জাড়ি লাগিয়াই আছে। কানাইয়ের সাতবছরের পোলাটা তো সেদিন ওলাউঠাতেই মারা গেল।

ভুকানের ঘরে জোনাকীরও হইয়াছে বেহুঁস জ্বর। ভুকান কী করিবে ভাবিয়া পাইতেছে না। পরাণের তো বাড়ীতে টিকিটিও দেখা যায় না আজকাল। সাগু-মিছ্‌রি আনা হইতে শুরু করিয়া গরুকে জাব্‌না দেওয়া পর্য্যন্ত সমস্ত কিছু এখন ভুকানকেই একা করিতে হয়। পয়সা-কড়িরও বড়ো টানাটানি। চৈতী ফসল এবার মোটেই হয় নাই। লোকের বাড়ী জন-খাটিয়া যে খোরাকীটা জুটাইবে জোনাকী জ্বরে পড়িয়া তাহাতেও ফ্যাসাদ বাধাইয়াছে। পরাণ ঘরে থাকিলে খানিকটা সাম্‌লানো যাইত। কিন্তু সে তো আজকাল 'স্বদেশী' হইয়াছে। কোথাকার এক মণিমালা দেবী আসিয়া দেশশুদ্ধ লোককে ক্ষেপাইয়া বেড়াইতেছেন। জমিদারেরা নাকি জমির মালিক নয়, জমির মালিক তারা যারা জমিতে লাঙল দেয় আর ফসল বোনে; কলকারখানার মালিকেরা নাকি মিস্ত্রী-মজুরদের ন্যায্য পাওনা দেয় না; আমাদের দুঃখদুর্দ্দশার জন্য নাকি ইংরাজরাই দায়ী—এমন কত সব নতুন নতুন কথা তিনি

গরম গরম বক্তৃতা করিয়া হাটে-মাঠে রটাইয়া বেড়াইতেছেন। পরাণও তাহারই দলে ভিড়িয়াছে। নাওয়া নাই, খাওয়া নাই—অষ্টপ্রহর সে ওপারে চটকলের কুলিদের বস্তিতে বস্তিতে ঘুরিয়া বেড়ায়। তাহাদের সকলকে একজোটে কাম বন্ধ করিয়া কলের মালিককে বিপদে ফেলাইয়া অতিরিক্ত সুবিধা আদায় করিতে শিখায়—ধর্ম্মঘটের নামে সর্ব্বদাই কেবল অধর্ম্ম ঘটাইতে চেষ্টা করে।

এদিকে ক্যাপাখুড়াও আজকাল একেবারে মনমরা হইয়া গিয়াছে। গেরামের লোকের সঙ্গে আর প্রাণ খুলিয়া কথা বলে না। সব সময়ে নিজের বাড়ীতে পূজা-আর্চ্চা, শান্তি-স্বস্ত্যয়ণ লইয়াই ব্যস্ত থাকে। সেই জন্তেই তুফান পড়িয়াছে সব চাইতে মুস্কিলে। ক্যাপাখুড়ার ভরসাতেই সে এতকাল পুরাণো চাল-চুলা বজায় রাখিয়া আসিয়াছে। নয় তো, অভাবের ঠেলায় কবে তাহাকে চটকলের দরজায় গিয়া চার আনা দিন-মজুরীর প্রত্যাশায় দাঁড়াইতে হইত।

তুফান দেখিল জোনাকী পড়িয়াছে বিষম জ্বরে, পরাণ হইয়াছে ঘরছাড়া, আর ক্যাপাখুড়া হইয়াছে সন্ন্যাসী, ডোলে একমুঠা চাউল নাই, মাচায় একটা লাউকুমড়ার ডাঁটা নাই, জোনাকীর গায়ে একখানা রূপার গয়না নাই। কী করিবে সে? উপাস করিয়া যদি ঘুমাইয়া থাকা যাইত, তবে আর কোন ভাবনা ছিল না। কিন্তু পেট চোঁ চোঁ করিলে চোখের পাতা দুইটাও বন্ধ হইতে চায় না। জোনাকী তবু জ্বরের ঘোরে একেবারে ঝিমাইয়া পড়িয়াছে। বাঁচিয়াছে সে। কিন্তু তুফান? দাঁত দিয়া নিজের ঠোঁটটাকে গায়ের জোরে চাপিয়া ধরিয়া সে আর কতক্ষণ বসিয়া থাকিবে?

ঘরের দুয়ারে ঝাঁপখানা টানিয়া দিয়া তুফান বাহির হইয়া পড়িল।...চিরদিনের অভ্যাসমত ক্যাপাখুড়ার বাড়ীর দিকেই তাহার পা দুইটা চলিতেছিল। কিন্তু চৌমাথার মোড়ে আসিয়া হঠাৎ সে কী ভাবিয়া জোর করিয়া পা দুইটাকে অন্যদিকে ঘুরাইয়া নিল।

চটকলের কুলীর কাজের জন্ত শেষপর্য্যন্ত যে হিন্দুস্থানী জমাদারের হাতে-পায়ে ধরিতে হইবে একথা তুফান কখনো স্বপ্নেও ভাবে নাই। নিস্তেজ মনে বেচারী তুফান আজ সে লাঞ্ছনাও সহ্য করিল। বঙ্গবাণী জুট ফ্যাক্টরীর জমাদার তাহাকে জানাইয়া দিল, আজ যদি সে ঠিকমতো কাজ দেখাইতে পারে, তবে কাল হইতে তাহাকে পাঁচ আনা রোজে বহাল করা হইবে। তুফান সেই পাঁচগণ্ডা পয়সার আশাতেই বড়ো বড়ো পাটের গাইট কাঁধে উঠাইয়া জমাদারের বেগার খাটিতে লাগিয়া গেল।

*

পরের দিন চটকলের যে বাঁশি বাজিল, তাহার আওয়াজটা যেন অত্যন্ত বেশি কর্কশ এবং নির্ম্মম। তুফান ধড়মড় করিয়া ঘুম হইতে উঠিয়া পড়িল। জোনাকীর জন্ত সাগু-মিছরির যোগার রাখিয়া তাড়াতাড়ি ছুটিল কারখানার দিকে। পাটগুদামেই তাহার কাজ পড়িয়াছে। সারাদিন ধরিয়া সে কেবল পাটের গাঁইট উঠানো-নামানোই করিতে লাগিল।...

বেলা তখন পড়িয়া আসিয়াছে। হঠাৎ কারখানার সাম্নের সদর রাস্তায় একজোটে চীৎকার উঠিল, 'লালঝাণ্ডা কি জয়!' গুদামঘরের ঘুলঘুলির ফাঁক দিয়া তুফান দেখিল, একপাল খোট্টা মজুর লাল নিশান উড়াইয়া হৈ-হৈ করিতে করিতে কারখানার দিকে আগাইয়া আসিতেছে। সেই দলের আগে আগে আসিতেছে পরাণ আর তাহারই পাশে একটি কালা-কুৎসিৎ মেয়েলোক—বোধ হয় সেই মণিমালা দেবী।

অফিসঘর হইতে মিছিল আসিতে দেখিয়া ম্যানেজিং ডিরেক্টর বিদ্যুৎবরণ চাবুক হাতে কারখানার সদর দরজার কাছে ছুটিয়া আসিলেন। বজ্রকণ্ঠে দরোয়ানকে হুকুম দিলেন—"জল্‌দি ফটক বন্ধ করো। শালে ডাকুলোককো অন্দরমে মৎ ঘুষনে ছোড়ো।"

কিন্তু বিদ্যুৎবরণকে ধাক্কা মারিয়া ফেলিয়া, দরজা ঠেলিয়া ভিতরে ঢুকিতে উন্মত্ত জনতার বেশীক্ষণ সময় লাগিল না। "ভাই হো, বন্ধু হো" বলিয়া তাহারা কাযে ব্যস্ত সমস্ত মজুরকে টানিয়া কারখানার বাহিরে লইয়া গেল। কেবল পাট-গুদামের এক কোণায় নয়া মজুর তুফান কাহারও নজরে পড়িল না। গুদামঘর হইতে তুফান অবাক্ হইয়া দেখিতে লাগিল—কারখানার সুমুখের খোলা মাঠে মিস্ত্রী-মজুরেরা সকলে গিয়া ভীড় করিয়া জমায়েৎ হইল। একটা হাতভাঙা চেয়ারের উপর দাঁড়াইয়া পরাণ, মণিমালা, আরও অনেকে একে একে কী যেন খানিক চেঁচামেচি করিল। মধ্যে মধ্যে

কান ফাটানো চীৎকার আর চটাপট্‌ হাততালির ধুম পড়িয়া গেল। তুফান এ রকম পাগলামির কোন সহজ অর্থ খুঁজিয়া পাইল না। এইটুকু শুধু সে বুঝিল যে, চটকলের বিরুদ্ধে লোকগুলার বিষম একটা আক্রোশ আছে। কিন্তু পেটের জ্বালায় গোলামী করিতে আসিয়া সে কথা তাহারা জোর গলায় বলিতে পারিতেছে না। পরাণ লেখাপড়া শিখিয়াছে। তাই সে পরের দুঃখ ঘুচাইবার জন্য জীবন পণ করিয়াছে।

তুফান চাহিয়া দেখিল তাহার আশেপাশে কেহ কোথাও নাই। ওদিকে বয়লারের আগুন গণ গণ করিতেছে। পেটেও জাগিয়াছে তাহার সর্ব্বগ্রাসী ক্ষুধা। একগোছা পাট লইয়া সে তাড়াতাড়ি একটা মশাল তৈয়ার করিয়া ফেলিল। তারপর চুলার আগুনে সেটা ধরাইয়া লইয়া আসিয়া গুদামঘরের দুয়ারে খিল লাগাইয়া দিল। মশালের আলো আর ধুমায় পাটের গুদামটাকে যেন একটা বীভৎস পিশাচের মতো দেখাইতে লাগিল। চক্ষু বুজিয়া তুফান সেই পিশাচের বুকে জ্বলন্ত মশালটাকে প্রাণপণে চাপিয়া ধরিল।

দাউ দাউ করিয়া পাটগুদামে যখন আগুন জ্বলিয়া উঠিল তখনও মাঠের সভা শেষ হয় নাই। হঠাৎ আলোয় সকলের চোখ ঝলসাইয়া গেল। চারিদিকে সাড়া পড়িয়া গেল, "আগুন! আগুন!!" বিদ্যুৎবরণ ছুটিয়া বাহিরে আসিলেন—আর্ত্তনাদ করিয়া বলিলেন, "সর্ব্বনাশ হলো রে! বাঁচা, বাঁচা—তোদের সর্ব্বস্ব আগে বাঁচা।"

মণিমালা দৃঢ়কণ্ঠে বলিলেন, "না, কেউ আগুন নেভাতে যাসনে। ওসব ওদের চালাকী—আগুন লাগার ফিকির ক'রে তোদের মন ভুলাবার চেষ্টা।"

মজুরেরা কিছুক্ষণ হতভম্ব হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তারপর যখন খেয়াল করিয়া দেখিল যে চটকলের সাথে সাথে তাহাদের আশাভরসা সমস্ত পুড়িয়া ছাই হইয়া যাইতেছে, তখন যে যেমন করিয়া পারিল, সেই প্রলয় চিতা নিভাইতে চেষ্টা করিল। কিন্তু নদীর জলের সাথে সাথে চোখের জল নিঃশেষ করিয়াও তাহারা তাহাদের জীবন-মরণের সংস্থান চটকলটাকে বাঁচাইতে পারিল না—বাঁচাইল শুধু তাহাদের চিরন্তন দুর্ভাগ্যকে।

বিদ্যুৎবরণের কথামতো পুলিশ আসিয়া প্রথমেই পাকড়াও করিল পরাণকে। অগ্নিকাণ্ডে সে-ই নিশ্চয় মজুরদের প্ররোচনা দিয়াছে। গুদামঘরের ভস্মস্তূপের মধ্যে মশাল হাতে যে পোড়া মৃতদেহটা পাওয়া গিয়াছে, যদিও তাহা এখনও সনাক্ত হয় নাই, তবু তাহা যে কোন একটা দুর্ভাগা কুলীর তাহাতে সন্দেহ নাই। পলাশ-ডাঙা ও বিদ্যুৎনগরের সকলেই আসিয়া মড়াটা একবার দেখিয়া যাইতেছে। ক্ষ্যাপাখুড়াও শেষ পর্য্যন্ত না আসিয়া পারিল না। সে আসিয়া একটু নজর করিয়া দেখিয়াই ভারী গলায় বলিয়া উঠিল, "আরে, একী! এ যে আমাদের তুফান দেখিতেছি!"

পরাণ বিস্ময়ে-দুঃখে আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল, "বা-বা! সেকি?…বাবা এখানে কেমন করিয়া মরিতে আসিল?"

ক্ষ্যাপাখুড়া ধমক দিয়া কহিল, "চুপকর্‌ লক্ষ্মীছাড়া। আগে তুই বাড়ী যা—বাপটাকে তো শেষ করিয়াছিস্‌, মা-টাকে যেন আর খাইস্‌ না। সে-অভাগী যে জ্বরের জ্বালায় মর-মর হইয়া পড়িয়া আছে।"

নিজে জামিন দাঁড়াইয়া ক্ষ্যাপাখুড়া পরাণকে হাজত হইতে খালাস করিয়া দিল।

ওপার হইতে সরকারী ডাক্তার লইয়া পরাণ যখন সন্ধ্যায় ঘরে ফিরিল, তখন জোনাকী একেবারে জ্বরে অজ্ঞান। ডাক্তার আসিয়া নাড়ী পরীক্ষা করিলেন, ষ্টেথিস্কোপ লাগাইলেন, তারপর হাতবাক্স খুলিয়া ইঞ্জেকসনের যোগাড় করিতে লাগিলেন। এমন সময়ে হাঁপাইতে হাঁপাইতে ক্ষ্যাপাখুড়া আসিয়া হাজির। আসিয়াই সে পরাণের হাতে কয়েকটা তুলসী পাতা দিয়া এক নিঃশ্বাসে বলিল, "এই তুলসী পাতা-গুলার একটু রস কর্‌তো পরাণ। মধু আর তুলসীর রস দিয়া এই ওষুধের বড়িটা এখনই খাওয়াইয়া দিতে হইবে।" তারপর ডাক্তারের দিকে চাহিয়া বলিল, "আপনারে মিছা মিছি কষ্ট দিলাম আমরা। হিন্দুর ঘরের রুগী তো বিলাতী ওষুধ ছুঁইবে না। আপনি এই দুইটা টাকা দর্শনী লইয়া দয়া করিয়া ঘরে ফিরিয়া যান।"

ডাক্তার ক্ষ্যাপাখুড়ার কাছ হইতে টাকা দুইটা লইয়া ধীরে ধীরে চলিয়া গেলেন। পরাণ তুলসী পাতার রস করিয়া

আনিল। কোনরকমে কবিরাজী ওষুধটা রুগীকে খাওয়াইয়া ক্ষ্যাপা-খুড়া পরাণকে ডাকিয়া ঘরের বাহিরে লইয়া আসিল।

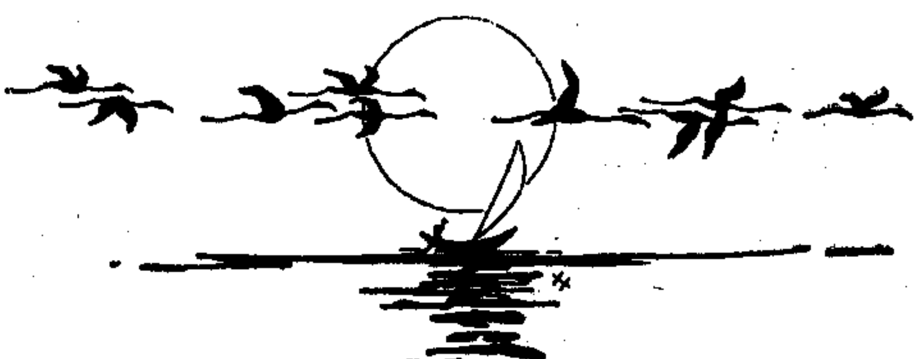
...বাহিরে তখন ঘন-অন্ধকার। একটা গাছের তলায় দাঁড়াইয়া চুপে চুপে পরাণের কাণের কাছে মুখ নিয়া ক্ষ্যাপা-খুড়া বলিল, "বাপ তোর অপঘাতে মরিয়াছে রে পরাণ, তোকে একটা প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে। খবরদার! না করিস্ না কিন্তু। আমার এই একটা কথা রাখ, লক্ষীটি। আত্মহত্যার প্রায়শ্চিত্ত কি জানিস্? আত্মহত্যার প্রায়শ্চিত্ত হইতেছে আত্মরক্ষা।—শুধু তোর বাপই একা অপঘাতে মরে নাই রে—আমাদের নদী মরিয়াছে, আমাদের ধান-ক্ষেত মরিয়াছে, আমাদের সুখ-সোয়াস্তি সব মরিয়াছে। আমাদের দেশের আকাশে বাতাসে এখন কেবল রোগের আর শোকের বীজাণু ছড়াইয়া পড়িয়াছে।...যদি বাঁচিতে চাস্ তবে এই মাটিকে বাঁচাইতে হইবে। আর মাটীকে বাঁচাইতে হইলে চাই তেজ, চাই বায়ু, চাই জল। মায়ের বুকের রক্ত যাহারা শুষিয়া খায়, মায়ের স্তনের সুধা তাহারা কোথায় পাইবে? অতি লোভীরা পৃথিবীর বুক চিরিয়া সব সোনা যদি বাহির করিয়া লয়, তবে মাঠে মাঠে আর সোনার ফসল ফলিবে কেমন করিয়া? ··

ইংরাজেরা কি আমাদের স্বাধীনতা চুরি করিয়া লইয়া গিয়াছে রে বোকা? আমাদের স্বাধীনতা ঘুমাইয়া আছে মাটীর তলায়। লাঙলের খোঁচা মারিয়া তাহাকে জাগাইয়া তুলিতে হইবে। পশ্চিমা বাতাসের ভরসা করিস্ না রে, পরাণ,—পশ্চিমা বাতাসের ভরসা করিস্ না।"—এই বলিয়া পরাণের হাত দুইটা ক্ষ্যাপা-খুড়া চাপিয়া ধরিল। তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া আপনমনেই যেন বলিতে লাগিল, "তুফান দুর্ব্বল। তুফান কাপুরুষ। তুফান আত্মহত্যা করিয়াছে। কিন্তু নিজে মরিবার আগে সে একটা ভয়ঙ্কর রাক্ষসকে পুড়াইয়া মারিয়াছে। জীবনে সে শান্তি পায় নাই—মরিয়া সে নিশ্চয়ই শান্তি পাইবে।"

হঠাৎ ক্ষ্যাপা-খুড়া ঝরঝর করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল। কাঁদিতে কাঁদিতেই আবার পাগলের মতো হাতে তালি দিয়া বলিয়া উঠিল, "বাঃ রে বাঃ! কি মজা! চটকলটা পুড়িয়া একেবারে ছাই হইয়া গিয়াছে!—আমি বাড়ি চল্লামরে পরাণ, আজ আমাব বাড়ীতে হরিরলুট হইবে, তুই তোর মাকে পথ্য করাইয়া একবার প্রসাদ আনিতে যাইস্ কিন্তু।"

ক্ষ্যাপা-খুড়া আর দাঁড়াইল না। তাড়াতাড়ি পা চালাইয়া অন্ধকারের মধ্যে মিলাইয়া গেল।

পরাণ ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া সেইদিকে চাহিয়া ভাবিতে লাগিল, ক্ষ্যাপাখুড়া কি সত্যই পাগল?



বিদ্যাপতি

কবিশেখর শ্রীকালিদাস রায় বি, এ,

কবি বিদ্যাপতি বৃন্দাবনের ক্ষণিক বিরহে ও মানজনিত বিরহে প্রচলিত রীতি কাঁটায় কাঁটায় অনুসরণ করেন নাই। এই বিরহেই বিদ্যাপতির প্রকৃত কবিত্ব বিকশিত হইয়াছে। এখন আর,—

সজল নলিনীদল শেজ বিছাই অ
পরশে যা অসিলা এ।
চন্দনে নহি হিত   চান্দ বিপরীত
করব কওন উনাএ।

কিংবা—

মধুর মধুর পিক   বরতরু তরুসব
করু করু লতিকা সঙ্গ।
ঐ সব সোহাওন   সুরতি সময় বন
পুনমতী রচ রতি রঙ্গ।
দখিণ পবন বহ   শীতল সঘন তহ
মলয়জ রজলয় আব।
কত ন যুবতী মন   মনসিজ নহি হন
সবে কয় রস পরথাব।

এই সকল উক্তির দ্বারা বিরহগীতি মামুলী আক্ষেপেই পর্যবসিত হয় নাই। এ বিরহ সকল convention ছাড়াইয়া উঠিয়াছে। যাহার সঙ্গে অন্তর ঘটিবে বলিয়া 'চুয়া-চন্দন হার'ও বর্জিত হইয়াছিল, পুলক সঞ্চারও যাহার অঙ্গের সঙ্গে অঙ্গের দূরত্ব ঘটাইবে বলিয়া ভয় হইত, সে আজ "নদী গিরি অন্তরে" চলিয়া গিয়াছে। আজ পিয়া বিনা পাঁজর ঝাঁঝর ভেলা। কঙ্কণ বলয়া গলিত দুহুঁ হাত। বসন্ত সমাগমে তাধার বুক চিরিয়া হাহাকার উঠিয়াছে—

অনিমেখ নয়নে   নাহ মুখ নিরখিতে
তিরপিত ন ভেল নয়ান রে।
ঐ সুখ সময়ে   সহয় এত সঙ্কট
অবলা কঠিন পরাণ রে।
দিনে দিনে ক্ষীণ তনু   হিম-কমলিনী জনু
না জানি কি জীব পরিবন্ধ রে।
বিদ্যাপতি কহ   ধিক্ ধিক্ জীবন
মাধব নিকরুণ অন্তরে।

এখন তখন করি   দিবস গমাওল
দিবস দিবস করি মাসা।
মাস মাস করি   বরিখ গমাওল
ছোড়ল জীবনক আশা।
বরস বরস করি   সময় গমাওল
খোয়ল তনুক আশে।
হিমকর কিরণে   নলিনী যদি জারব
কি করব মাধবী মাসে।

*

সরসিজে বিনু সর   সর বিনু সরসিজ
কী সরসিজ বিনু সূরে।
যৌবন বিনু তন   তনু বিনু যৌবন
কী যৌবন পিয় দূরে।
চৌদিশ ভমর ভম   কুসুমে কুসুমে রম
নীরসি মাজরি পীবই।
মন্দ পবন বহ   পিক কুহু কুহু কহ
বিরহিণী কৈসে জীবই।
শঙ্খ কর চুর   বসন কর দূর
তোড়হ গজমতি হার রে।
পিয়া যদি তেজল   কি কাজ শিঙারে
যামুন সলিলে সব ডার রে।

*

প্রেমক অঙ্কুর জাত   আত ভেল
না ভেল যুগল পলাশা।
প্রতিপদ চাঁদ   উদয় যৈছে যামিনী
সুখলব ভৈ গেল নিরাশা।

*

সুরসরি তীরে   শরীর তেজব
সাধব মনক সিধি।
তুলহ পহু মোর   সুলহ হোয়ব
অনুকূল হোয়ব বিধি।

সখীরা বলেন, দেহত্যাগ করিবে কেন? সে সঙ্গ ত্যাগ করিয়াছে, দর্শনের সাধ ত রহিয়াছে "সময় বশে মধু না মিলয়

সজনি সৌরভ কে করে বাধ ?" ঐ স্মৃতির সৌরভটুকু সম্বল করিয়া 'তন্বক দোসর দেহে' শ্রীমতী বাঁচিয়া রহিলেন—প্রতীক্ষায় প্রতীক্ষায়—

"অঙ্গুলক অঙ্গুটী সে ভেল বাহুটি হার ভেল অভিজ্ঞায়।"

"কালিক অবধি করিয়া পিয়া গেল।
লিখইতে কালি ভীত ভরি গেল।"

সখীরা শ্রীমতীর দশা দেখিয়া বলিতেছে—

ধরণী ধরিয়া ধনী সতনহি বৈঠত
পুনহি উঠয় না পারা।
সহজই বিরহিণী জগমাহা তাপিনী
বৈরী মদন শরধারা।
অরুণ নয়ন লোরে তিতল কলেবর
বিলুলিত দীঘল কেশা।
মন্দির বাহর করইতে সংশয়
সহচরী গণতহী শেষা।

শ্রীমতী সখীদের বলিতেছেন—

পাঁচ সাঁচ পহু দেখি গেল সজনি
তনু মন ভেল কুহ ভান।
দিন দিন ফল তরু নিত ভেল সজনি
অহখন না কর গেয়ান।
কহও পিশুন শত অবগুণ সজনি
তনি সম মোহি নহি আন।
কতেক যতন সোঁ মেটিয় সজনি
মেটয় ন রেখ পষাণ।
যে দুরজন কটু ভাষয় সজনি
মোর মন না হোয় বিরাম।
অনুভব রাহু পরাভব সজনি
হরিণ ন তেজ হিম-ধাম।
যইও তরণী জল শোষয় সজনি
কমল না তেজয় পাঁক।
যে জনি রতল যাহি সো সজনি
কি করত বিধি ভই বাঁক।
প্রথম দশা হম কি কহব সজনি
তনি বিনু সহব কলেশ।

আবার বর্ষা আসিল—

আওন অবধি অতীত ভেল সজনি
জলধর সুরাল দিবেশ।
শিশির বসন্ত উতম ভেল সজনি
পাউস ভেল পরবেশ।

*

বরিখয় লাগল গরজি পয়োধর
ধরণী রভসি ভেলি।
নবী নাগরী রত পরদেশ বল্লভ
আওত আশা দূর গেলি।

"ফিরি ফিরি উতরোল ডাকে ডাহুকিনী—"

বিরহিণী কি করিয়া বাঁচিবে ? 'যৌবন ভেল বন বিরহ হুতাশন।' রাধা বলেন, কোকিলকে না হয় কর-কঙ্কণের ঝঙ্কারে তাড়াইতে পারি, ধবলগিরি হইতে তাহার বর্ণ গায়ে মাখিয়া মেঘ আসিতেছে—তাহাকে কি করিয়া নিবারণ করিব ? বেয়াজ কইয়ে পিয়া পরদেশ গেল—সত্বর ফিরিবে বলিয়া—আমি "নখর খোয়ায়লুঁ দিবস লিখি লিখি। নয়ন আন্ধায়লুঁ পিয়া পথ পেখি।"

আবই সখ মধুমাস। তন্নহ বিরহ হুতাশ,
হুতাশ সদৃশ চাঁদ চন্দন মন্দ পবন সন্তাপই
মাধবী মধুমত্ত মধুকর মধুর মঙ্গল গাবই
নব—মঞ্জু মঞ্জুল পুঞ্জ রঞ্জিত চুত কানন সোহই
রস—লোল কোকিল কোকিলা কুল কাকলী মন মোহই
মোহই মাধবি মাস। চৌদিকে কুসুম বিকাশ
বি—কাশ হাস বিলাস সুললিত কমলিনী রস ভূষিতা
মধু—পান চঞ্চল চঞ্চরিকুল পঙ্কজিনী মুখচুম্বিতা।
নব—মুকুল পুলকিত বল্লী তরু অরু চারু চৌদিশে সঙ্কিতা
হম সে পাপিনী বিরহতাপিনী সকল সুখ পরিবঞ্চিতা।
বঞ্চিত রহনিশি বাস। ভৈগেল জৈঠহি মাস।

মাস ইহ রহ যাক পর পহু
সোই সুলখিনী কামিনী।
কত যে সুখ সম ভোগ বঞ্চয়
চাঁদ উজোড় যামিনী।

দহই দারুণি দিনহি বঞ্চয়
কেলি করয় সরোবরে।
পেম পেসলি পুরুষ পেয়সি
পেখি অর্পিত অন্তরে।

অন্তরে আওয়ে আষাঢ়। বিরহিণী বেদন বাঢ়।
বাঢ় ঘুম্মিত বজ্জি তরুবর
চারু চৌদিশে সকরে।

তাপে তাপিত ধরণি মঞ্জরি
নিরখি নব নব জলধরে।

পপীহা পাখির পাখাসে পিড়িত
সঘনে পিউ পিউ ধাগ্নিয়া।
পিক—নাদ শুনি চিত চমকি উঠয়
পিয়া সে পেখি না পাপীয়া।*

কবি বলিয়াছেন—এই ভাবে শ্যামনাম জপ করিতে করিতে রাধার শ্যামের সহিত অভেদ-জ্ঞান জন্মিল—

অনুখন মাধব মাধব সোঙরিতে
সুন্দরী ভেল মাধাই।
ও নিজ ভাব, সো— ভাব বিসরল
অপন গুণ অনুধাই।
আপন বিরহে আ— পন তনু জরজর
জীবইতে ভেলি সন্দেহা।

শ্রীমতীর এমনই উদ্‌গত ভাব জন্মিল যে, নিজকেই মাধব মনে করিতে লাগিলেন। নগেন বাবু বলিয়াছেন, "ইহা সমাধির অবস্থা, দ্বৈতভাবের পরিবর্ত্তে অদ্বৈতভাব, ভেদাভেদজ্ঞানের তিরোভাব।" তাহা হইলে ইহাই শ্রীমতীর সান্ত্বনা হইতে পারিত, কিন্তু কবি বলিতেছেন, দশ দিন দারু দহনে দগ্ধই আকুল কীট পরাণ। বিদ্যাপতি যাহা রাধার সম্বন্ধে বলিয়াছেন তাহা শ্রীচৈতন্যের জীবনে সম্পূর্ণ সার্থকতা লাভ করিয়াছিল।

বিদ্যাপতির পদাবলীর ব্যাখ্যা দেশ, কাল, বিশেষতঃ, পাত্রের উপরই নির্ভর করিতেছে। সমস্ত পদকেই নর-নারীর প্রকৃত প্রেমের বাণীরূপ মনে করিলেও কেহ দোষ দিতে পারে না। কবিতার মধ্যে প্রচ্ছন্ন কোন আধ্যাত্মিক ইঙ্গিত নাই। বিরহের কবিতাগুলিকে যে কোন অনুরাগিণী প্রোষিত-ভর্ত্তৃকার হৃদয়াবেগের অভিব্যক্তি বলা যাইতে পারে। আবার ভক্তের কাছে এই পদাবলীর অর্থ স্বতন্ত্র। শ্রীচৈতন্য দেব সেজন্য এই পদগুলি শুনিতে শুনিতে ভাবে তন্ময় হইতেন। রাধা শ্যামের ভাগবত স্বরূপই সাধারণ পাঠকেরও মনে আধ্যাত্মিক স্বতই আধ্যাত্মিক অর্থ প্রবুদ্ধ করে। শ্রীচৈতন্য নিজের জীবনলীলার দ্বারা এই গুলিতে যে অর্থ আরোপ করিয়াছেন তাহাই আমরা ভুলি কি করিয়া? আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যায় বাধা হয় অনঙ্গলীলার আতিশয্য। এমন কি বিরহের রসঘন পদগুলিতেও কাম ভুজঙ্গের উল্লেখ বার বারই আছে। এ বাধা বৈষ্ণব সাহিত্যের রসজ্ঞ ভক্তের পক্ষে উত্তরণ করা কিছুমাত্র কঠিন নয়। সে যুগে প্রেম ও কামকে পৃথক করিয়া দেখা হইত না—কামলীলাকে প্রেমলীলার অঙ্গ স্বরূপই মনে করা হইত। প্রেমকে abstraction হইতে রক্ষার জন্য কামলীলায় তাহাকে প্রকৃত রূপ দেওয়া হইত। ইহাকে কবিপদ্ধতি বলিয়াও মনে করিয়া লওয়া যাইতে পারে। যে লীলাই হউক, বিরহ যখন সমস্তটাকেই গ্রাস করিতেছে, তখন সমস্তটাই বেদনা এবং তজ্জনিত বৈরাগ্যের গেরুয়া রঙ্গে অতিরঞ্জিত হইয়া যাইতেছে। বিশেষতঃ বিদ্যাপতির 'তাতল সৈকতে বারি বিন্দুসম' ও "মাধব বহুত মিনতি করি তোয়" এই পদ দুটি অন্য পদগুলিরও লোকাতীত ব্যঞ্জনারই ইঙ্গিত করে। কবির ভাবসম্মিলনের পদগুলি মিলনানন্দের পদ। কিন্তু প্রাকৃত মিলনের পদগুলির সহিত ইহার ঢের প্রভেদ, একটা অতীন্দ্রিয় মিলনের দিব্যানন্দ লাভের ব্যঞ্জনা যেন এই গুলিতে বিদ্যমান। শ্রীমতী যেন দীর্ঘ বিরহের তপস্যায় তাঁহার প্রেমাস্পদকে চিরদিনের জন্য অন্তর্লোকে লাভ করিয়াছেন—আর তাঁহার উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা, লোকভয়, বিরহের ভয় ও সর্ব্ববিধ লজ্জা দ্বিধা জয় করিবার চেষ্টা বা মানসিক দ্বন্দ্ব যেন কিছুই নাই। তিনি যেন শান্ত সমাহিত চিরানন্দময় অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছেন। এখন মদনের পাঁচ বাণ লাখ বাণই হউক, আর লক্ষ কোকিলই ডাকুক, তাহাতে তাঁহার কিছু আসে যায় না।

প্রেমের ঠাকুর পরম তৃষ্ণা জাগাইবার জন্য অহৈতুকী করুণা করেন একবার, তারপর অন্তর্হিত হন—তারপর ঐ তৃষ্ণা সাধনায় প্রণোদিত করে, তপস্যায় মগ্ন করায়। এই সাধনা ও তপস্যার দ্বারাই তাঁহাকে চির দিনের জন্য পাওয়া যায়। বিনা সাধনায় ঐহিক বা দৈহিক গুণাতিশয্যে যাহা পাওয়া যায়, তাহাকে হারাইতে হয়, তাহা চিরদিনের ধন হইয়া থাকে না। শ্রীমদ্ভাগবতে এই কথাই আছে। শ্রীমতীর নিদারুণ বিরহকে তপস্যা মনে করিয়া ভাবসম্মিলনের যদি এই ব্যাখ্যা দেওয়া হয়, তাহা হইলে বোধ হয় অসঙ্গত হয় না। তপস্যার অনলে দৈহিকতা ধ্বংস পাইলে বিদেহ প্রেম ভাবসাম্মলনের দিব্যানন্দে আত্মপ্রকাশ করিবে তাহাতে সন্দেহ কি?

* ইহা বিদ্যাপতি রচিত বার মাসের চারি মাসের বর্ণনা। পদ-কল্পতরুতে যে বার মাসের বর্ণনা আছে তাহার বাকি মাসগুলির বর্ণনা দুই গোবিন্দ দাসের—গোবিন্দ কবিরাজের ও গোবিন্দ চক্রবর্ত্তীর। নগেনবাবু বলেন, সবটাই বিদ্যাপতির।

সাধারণ কাব্যবিচারের দিক হইতে ইহা স্বপ্ন, সুখ ও উন্মত্ত স্মরণ,—মনের দ্বারা কল্পনার মিলনানন্দ উপভোগ। মনস্তত্ত্বের সহিত এই ভাবেরও যোগ আছে। প্রাকৃত জীবনে এই ভাবাকুলতা সাময়িক, কাব্যে তাহাকে চিরন্তন বলিয়া ধরা হইয়াছে রসসৃষ্টির জন্য।

লালসার পঙ্কে জন্ম যে মৃণালের, সেই মৃণালেই ফুটিয়া উঠে কামনাময় প্রেমের পঙ্কজ। তাহার স্বর্গীয় সৌরভটুকু পঙ্কজ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া কিছুক্ষণের জন্যও ভাবের মলয়ানিলকে আশ্রয় করে। কবি এই বিদেহ ভাব-সৌরভকে কবিতায় চিরন্তন করিয়া রাখিয়াছেন।

বিদ্যাপতি শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলার পদ রচনা করেন নাই। বাল্যলীলায় কবিত্বের অবসর অল্প। যশোদার মধুর বাৎসল্যের ভাবটি বাঙ্গলার নিজস্ব সম্পদ। বিদ্যাপতি মুগ্ধা নায়িকার বর্ণনায় সংস্কৃত কবিদেরই অনুসরণ করিয়াছেন। নবোঢ়া বালাবধূর কিলকিঞ্চিত ভাবও সংস্কৃত আলঙ্কারিকদের অনুসরণে ফুটাইয়াছেন। এ বিষয়ে মৌলিকতা তাঁহার নাই। এ বিষয়ে মৌলিকতা দেখাইয়াছেন আমাদের চণ্ডীদাস। পূর্ব্বরাগের মাধুর্য্যও বিদ্যাপতির পদাবলী অপেক্ষা বঙ্গীয় কবির পদে অধিকতর ফুটিয়াছে। বিদ্যাপতির বয়ঃসন্ধি বর্ণনার চাতুর্য্য ও মাধুর্য্য দুই-ই অতুলনীয়।

বিদ্যাপতির পূর্ব্বরাগে বংশীধ্বনির মাদকতা নাই—শুধু রূপেরই মোহনতা।

"সুরপতি পায়ে লোচন মাগওঁ পাখি। নন্দেরি নন্দন সঙ্গে দেখি আবওঁ মন মনোরথ রাখি।" "দাহিন নয়ন পিশুনগণ বারণ পরিজন বামহি আধ। আধ নয়ন কোণে যব হরি পেখল তাহি ভেল এত পরমাদ।"

এ সকল চরণ তাহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। রূপানুরাগের ক্রমবিকাশও আছে—

একদিন হেরি হেরি হাসি হাসি যায়।
অরু দিন নাম ধরু মুরলী বাজায়।
আজু অতি নিয়ড়ে করল পরিহাস।
না জানিয় গোকুল মকর বিলাস।
পরিচয় নহি দেখি আন কাজ।
না করয় সম্ভ্রম না করয় লাজ।

শ্রীকৃষ্ণের পূর্ব্বরাগ বর্ণনায় বিদ্যাপতি অজস্র উৎপ্রেক্ষা অলঙ্কারের সমুচ্চয় করিয়াছেন, কিন্তু দুইটি পংক্তিতে রাধিকার রাগের দুর্নিবার প্রভাব যেমন ফুটিয়াছে তেমন আর কিছুতেই নয়।

১। মেঘমালা সঙ্গে তড়িৎলতা জনু
হৃদয়ে শেল দেই গেল।
২। নব জলধর বিজুরি রেহা
দন্দ (দ্বন্দ্ব) পসারিয়া গেলি।

শ্রীমতীর মানাক্ত-রূপ ফুটাইয়া বিদ্যাপতি রাগসাহিত্যে ও চিত্রশিল্পে একটি নূতন সম্পদ দান করিয়াছেন "তনু সুখ বসন তনু হিয় লাগি। যো পুরুখ দেখত তারক ভাগি॥" বিদ্যাপতি যে রসের কবিতা রচনা করিয়াছেন, সে রসের পক্ষে এই চিত্র অপূর্ব্ব। যে পদে ইহা রসের পরাকাষ্ঠা লাভ করিয়াছে, সে পদ লোচনেরই হউক আর চণ্ডীদাসেরই হউক,—বাঙ্গালী কবিরই কৃতিত্ব।

শ্রীকৃষ্ণের পূর্ব্বরাগে অতিরিক্ত অলঙ্কারের ঘটায় শ্রীকৃষ্ণের প্রেমার্ত্তি তেমন পরিস্ফুট হয় নাই। অবশ্য কামার্ত্তি ফুটাইতে কবি ত্রুটি করেন নাই। কামার্ত্তির আভিজাত্য সম্পাদনের জন্যই এত বেশী আভরণ-অলঙ্কারের সাহায্য লইতে হইয়াছিল—নিরাভরণ হইলে গ্রাম্যতা দোষ ঘটিত।

প্রথম সম্ভোগের বর্ণনায়—বালা মুগ্ধা নায়িকা শ্রীরাধিকার প্রথম রস মিলনে কবি অলঙ্কার দিয়াও গ্রাম্যতা আচ্ছন্ন করিতে পারেন নাই—বোধ হয় আচ্ছন্ন করিবার ইচ্ছাও কবির ছিল না। কবি হয়ত ভাবিয়াছেন—পঙ্কজের ক্রমবিকাশ দেখাইতে গিয়া পঙ্কপ্রোথিত মৃণালের পরিচয়টা অপরিহার্য্য।

খণ্ডিতা নায়িকার রোষ, মান, মানভঙ্গ ইত্যাদি প্রকরণে যে পদ্ধতি পূর্ব্ব হইতে প্রচলিত ছিল কবি তাহাই কাঁটায় কাঁটায় অনুসরণ করিয়াছেন। এই পর্য্যায়ের পদগুলির মধ্যে সখীর উক্তিগুলিতে বিদ্যাপতির মৌলিকতা পরিস্ফুট। মানিনী রাধার আক্ষেপোক্তির পদগুলিতে কবি অনেক সাংসারিক অভিজ্ঞতার কথা, মানবজীবনের বহু ভুলভ্রান্তির কথা প্রকাশ করিয়াছেন। সেই সঙ্গে প্রকৃত সজ্জনের লক্ষণ কি, প্রকৃত বিদগ্ধজনের ধর্ম্ম কি, রাধার আক্ষেপ ছলে কবি তাহা বিবৃত করিয়াছেন। এই পদগুলির মধ্যে বৈরাগ্যের উদ্দীপক শান্ত-রসের ধারা প্রবাহিত।

এই সঙ্গে রাধার অনুতাপের পদও কয়েকটি আছে।

এইগুলি শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের বিরহের পদগুলিকে স্মরণ করায়। বিদ্যাপতির মানভঞ্জনের পদাবলীর মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের পক্ষ হইতে আবেদন অলঙ্কারের ঝঙ্কারে নিমগ্ন। রাধার পক্ষের আবেদনই মর্ম্মস্পর্শী। বিদ্যাপতি পুরুষবেশে শ্রীরাধিকাকে অভিসারিকা করিয়াছেন—আবার শ্যামকে মানভঞ্জনের জন্ত গোপীবেশ পরাইয়াছেন। বিদ্যাপতির "যামিনী ঘোর আঁধিয়ার। মনমথ হিয় উজিয়ার" অপেক্ষা শেখরের 'অন্তরে শ্যামচন্দ্র পরকাশ' এক ধাপ উচ্চস্তরের কথা।

অভিসার প্রকরণ সংস্কৃত সাহিত্য হইতে বিদ্যাপতি পাইয়াছেন। নারীর পক্ষে পুরপথ দিয়া বনপ্রান্তর পার হইয়া নায়কের সঙ্কেত স্থানে গমন স্বাভাবিক নয়। তবু কবিরা মাধুর্য্য সৃষ্টির জন্ত ও প্রেমের আহ্বানের দুর্নিবারতা দেখাইবার জন্ত নারীকে অভিসারিকা করিয়াছেন। বোধহয়—নদীধারার দুর্গম পথে উদ্দামবেগে মহাসিন্ধুর পানে অভিযাত্রা এই কল্পনায় সাহায্য করিয়া থাকিবে। বিদ্যাপতি প্রচলিত প্রথাই অনুসরণ করিয়াছেন।

রজনী কাজর বম, ভীমভুজঙ্গম পড়য় দুরবার॥
গরজ তরজ মন, রোষে বরিষ ঘন, সংশয় পড় অভিসার।

বর্ষার ঘন অন্ধকারের মধ্যে এই অভিসার,—এমন কি জ্যোৎস্নালোকে অভিসারের কথা সংস্কৃত সাহিত্যে আছে। ইহাতে নারীর পক্ষে যথেষ্ট প্রগল্‌ভতা প্রকাশ পায়। বিদ্যাপতি পুরুষবেশে অভিসার করাইয়া নায়িকাকে প্রগল্‌ভতর৷ করাইয়াছেন।

এই অভিসার বাঙ্গলা বৈষ্ণব-সাহিত্যে অন্ত সার্থকতা (Interpretation) লাভ করিয়াছে। ইহা পরম ইষ্টধনের আকর্ষণে ভক্তের অভিযান, এইরূপ আধ্যাত্মিক অর্থ লাভ করিয়াছে। তাহার ফলে অভিসারপথকে অত্যন্ত বিঘ্নসঙ্কুল করিয়া তোলা হইয়াছে এবং অভিসারের বৈচিত্র্যও ইহাতে বাড়িয়া গিয়াছে। গভীর শীতের অভিসার, দারুণ গ্রীষ্মের মধ্যাহ্নকালের অভিসার (তপনক তাপে তপত ভেল মহিতল তাতল বালুকা দহন সমান ইত্যাদি) ইত্যাদিও বাণীরূপ লাভ করিয়াছে। শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনির আহ্বানকে দুর্নিবার বলিয়া বুঝাইবার জন্তই কবিগণ শ্রীমতীর অভিসারপথকে দুর্গম করিয়া তুলিয়াছেন। এই অভিসার—বংশীধ্বনি শুনিয়া কুলশীল, সমাজ-সংস্কার ও সংসার বন্ধনের পিঞ্জরে আবদ্ধ হরিণীর লোকালয় হইতে অতি দুর্গম পথে গভীর অরণ্যের দিকে অভিযান।

বিদ্যাপতির ভাষা, ছন্দ, ভঙ্গি, বৃন্দাবন-লীলার পর্য্যায়-বিভাগ—সমস্তই বৈষ্ণব কবিগণ অনুকরণ করিয়াছেন। বিদ্যাপতি সেইজন্ত কবি-গুরু। বাঙ্গালী কবিরা গীতগোবিন্দ হইতে অনেক বাগ্‌ভঙ্গি পাইয়াছেন। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের ছদ্মবেশ ধারণের রসবস্তুর প্রবর্ত্তক বোধ হয় বিদ্যাপতি। বিদ্যাপতির ব্যবহৃত বহু অলঙ্কারও বৈষ্ণব কবিগণ গ্রহণ করিয়াছেন। বড়ু চণ্ডীদাসের রাধা-কৃষ্ণের রস-কলহ বিদ্যাপতির রস-কলহের (গোধে চরাবএ গোকুল মাঝ। গোবক সঙ্গম কর পরিহাস ইত্যাদি) পদকে স্মরণ করায়।

পদের মধ্যকার অনেক বাক্যও বাঙ্গালী কবিরা গ্রহণ করিয়াছেন। যেমন—বিদ্যাপতির—"আঁচরে কাঞ্চন ঝলকে দেখ। প্রেম কলেবর দিয়াছে সাথী।" এই পংক্তিরই রূপান্তর—আঁচরে কাঞ্চন ঝলকে মুখে। মরমে পিরিতি বেকত অঙ্গে—জ্ঞানদাস। "গাঁঠিক হেম বদন মাহা ঝলকই এতদিনে পেখলুঁ আঁখি—গোবিন্দদাস। বিদ্যাপতির "অঙ্গুরি বলয়া পুন ফেরি"—বাক্যের রূপান্তর—অঙ্গুল অঙ্গুরি বলয়া ভেল—(জ্ঞানদাস)। বিদ্যাপতির "সুন্দর বদনে সিন্দুর বিন্দু······আঁধিয়ারে"র ভাব চণ্ডীদাসের "কপালে ললিত চাঁদ যে শোভিত" ইত্যাদি বাক্যে দৃষ্ট হয়। বিদ্যাপতির "চোর রমনী জনু মনে মনে রোয়ই অম্বরে বদন ছপাই"—চণ্ডীদাসের পদে "চোরের মাযে যেন পোয়ের লাগিয়া ফুকারি কাঁদিতে নারে"—এই রূপ লাভ করিয়াছে। বিদ্যাপতির—"সাগরে তেজব পরাণ। আন জনমে হোয়ব কান॥ কানু হোয়ব যব রাধা। তব জানব বিরহক বাধা"—এই অংশ চণ্ডীদাসের একটি চমৎকার পদে পরিণত হইয়াছে।

বিদ্যাপতি লিখিলেন, "রোগী করয়ে জনু ঔষধপান; ভারতচন্দ্র লিখিলেন—"রোগী যেন নিম খায় মুদিয়া নয়ন।' বিদ্যাপতি লিখিলেন "মন্ত্র না শুনয়ে জনু বালভুজঙ্গ"। নিধুবাবু বলিলেন "ভুজঙ্গশিশু যেমন মন্ত্রৌষধি মানে না।" বিদ্যাপতি লিখিলেন "কত রে মদন তনু দহসি হামারি।" রামবসু লিখিলেন—"হর নই হে আমি যুবতী। কেন জ্বালাতে এলে রতিপতি"—ইত্যাদি।

সেতু

—শ্রীমতী প্রতিমা গঙ্গোপাধ্যায়

মানবের মন বিচিত্র। বর্ষার দিনের মত ক্ষণে উজ্জ্বল ক্ষণে ম্লান হইয়া যায়। কোনও একটি দিন প্রভাতে আঁখি মেলিতে মেলিতে অকারণ পুলকে আনন্দরসে চিত্ত ঝলমল করিয়া ওঠে, যাহার মাধুর্যে প্রাত্যহিক কর্মের ধারা, যাহাতে কোনও বৈচিত্র্য নাই, তাহাতেও মন নূতন রসের আস্বাদ অনুভব করে। হৃদয় ভরিয়া আনন্দসুর বাজিতে থাকে, সবার সব ত্রুটি সেই উদার মুহূর্তে মার্জ্জনীয় বোধ হয়।

সকল কর্ম্ম ঘেরিয়া প্রাণ অনুভব করে—

আজিকে প্রভাতে রবির কর
কেমনে পশিল প্রাণের পর।

যাহাতে আজিকার সকল ক্ষণটিই পবিত্র।

আবার এমন প্রভাতও আসে, যাহা বহন করিয়া আনে বিষাদ ও গ্লানি। অথচ ভাবিলে বোধ হয়, কেন এ বিষাদ।

সেই প্রভাতের প্রতি মুহূর্তে যেন অন্তরের অন্তঃস্থলে একটা শূন্যতার বেদনা জাগিয়া সম্মুখস্থ সকল বস্তুই যেন গ্লানিকর বেদনালিপ্ত বোধ হয়। দীর্ঘশ্বাসে হৃদয় ভারাক্রান্ত হইয়া ওঠে।

মণিকা উঠিয়াছিল এমনি একটা বিশ্রী দিনে।

নয়ন মেলিতেই তাহার চোখে যেন কঠোরভাবে আঘাত করিল সূর্য্যকরোজ্জ্বল প্রভাত।

বর্ষার ঘনমেঘের আবরণ সরাইয়া ফেলিয়া সূর্য্যদেব তাঁহার সম্পূর্ণ রশ্মিটুকু বিকীর্ণ করিয়া আলোকধারায় ধরণীকে স্নাত করাইয়াছেন।

ধূলিলেশহীন বৃক্ষের সবুজ পত্রগুলি আলোর ছোঁয়ায় স্বর্ণমণ্ডিত নয়নমনোহর হইয়া উঠিয়াছে।

অতি সুন্দর একটি বর্ষাদিনের প্রভাত। কয়েকদিন অবিশ্রাম বর্ষণের পর আলোয় উজ্জ্বল। ভালই লাগিবার কথা।

তবু ঘুম ভাঙিতেই মণিকার প্রথম মনে হইল, আজ উঠিতেই অনেক দেরী হইল। নিয়মানুযায়ী কর্মের প্রত্যেকটির আজ অনিবার্য্যভাবে বিলম্ব ঘটিবে। বিরক্ত মণিকা উঠিতেই চোখে পড়িল তাহার জ্যেষ্ঠপুত্রের শয়নগৃহ। তাহার ঘরের পাশেই ঘরখানি, মধ্যে দরজা।

পুত্র অজয় তখন পর্য্যন্তও গাঢ়নিদ্রায় মগ্ন। পাশে একটী ছোট টেবলে রিডিংল্যাম্প জ্বলিতেছে। সিলিং ফ্যানটি পূর্ণতেজে ঘুরিতেছে।

সারারাত্রি ঘুরিয়াছে হয়ত! "কাণ্ড দেখ" বলিয়া বিরক্ত মণিকা তাহার গৃহে যাইয়া আলো নিভাইয়া, ফ্যান বন্ধ করিয়া বাহিরে আসিল।

হইতে পারে, কাল রাত্রে গরম ছিল বেশী এবং পরীক্ষার জন্ম রাত জাগিয়া পড়িয়াছে, তাই বলিয়া খরচের কথাটাও অতবড় ছেলে ভাবিবে না, এমনি করিয়া ফ্যান ঘুরাইয়া, আলো জ্বালিয়া বেলা ৮টা পর্য্যন্ত ঘুমাইবে?

স্নান সারিয়া পূজা করিয়া মণিকা যখন ডাইনিংরুমে প্রবেশ করিল তখনও পর্য্যন্ত তাহার স্বামী চা পান করেন নাই, তাহার জন্ম অপেক্ষা করিয়া আছেন।

লজ্জিতা মণিকা বসিল।

মিঃ রায় কাগজ পড়িতেছিলেন, কাগজ হইতে চোখ না সরাইয়াই প্রশ্ন করিলেন, ব্যাপার কি? এত দেরী যে?

কথাটার মধ্যে গুরুত্ব কিছুই নাই, তবু মণিকার মনে হইল ইহা বিদ্রূপ এবং সেই কথাটি মনে হইতেই মণিকার চিত্ত জ্বলিয়া উঠিল।

বিরক্ত চিত্তের বিরক্তি আত্মপ্রকাশ করিতে চাহিলে সামান্ত সূত্রই যথেষ্ট মনে হয়।

মণিকা উত্তর দিল, এমন কিছু কথা নেইতো যে ঘড়ির কাঁটা ধরে ভোর ৬টাতেই উঠতে হবে, একদিন যদি দেরী হয়-ই।

বেয়ারা চায়ের সরঞ্জাম ও টোষ্ট ডিমসিদ্ধ আনিয়া সম্মুখে রাখিল।

মিঃ রায় বিস্মিতনেত্রে মণিকার পানে তাকাইলেন কিন্তু উত্তর না দিয়া আপনার চায়ের পাত্র সম্মুখে টানিয়া লইলেন এবং আর মণিকার পানে না তাকাইয়া তাহাতে মনঃসংযোগ করিলেন।

মণিকা ইহাতে আরো চটিয়া গেল, বলিল, আমি না হয় দেরী করে উঠেছি, তুমি তো সকাল বেলা উঠেছিলে, অজয়ের ঘরে ল্যাম্প জলছিল, ফ্যান ঘুরছিল সেগুলো বন্ধ করে আসতে পারতে তো ?

মিঃ রায় গম্ভীরস্বরে উত্তর দিলেন, ওগুলো ঠিক আমার কর্ত্তব্য নয়।

মণিকা তীব্রকণ্ঠে বলিল, তবে বুঝি ও কর্ত্তব্যগুলো আমার ? দাসী রেখেছ বুঝি আমাকে ও কর্ত্তব্যগুলো করবার জন্য ?

মিঃ রায় বিস্মিতনেত্রে তাহার পানে চাহিয়া বলিলেন, কি কথা থেকে কি উত্তর দিচ্ছ মণি, তোমার কি মাথা খারাপ হয়েছে ?

মণিকার ক্রোধ ততক্ষণে সীমা অতিক্রম করিয়াছে।

সে অতি কটুকণ্ঠে কহিল, স্পষ্ট না বলে ইঙ্গিতে ওই কথাটাই বললে না কি ? কিন্তু যদি সংসারের সকল ব্যয় আর নিজের অমিতব্যয় সম্পূর্ণরূপে বহন করতে পারতে, তার জন্ম রাশি রাশি ধার না করতে, এইরকম ভড়ং করে অদ্ভুত জাঁকজমক করে ঠাট সাজিয়ে না বসে থাকতে তবে আমাকে ফ্যান বন্ধ করবার কথা বলতে হ'ত না, একদিনের অপব্যয় গায়ে লাগতো না। কিন্তু যখনি ভাবি সামান্য সামান্য অপব্যয়ের ফলে মাসের শেষে খরচের অঙ্ক কতখানি বেশী হবে এবং সেই টাকা জোগাবার কোনও উপায় নাই, তখনই আমার চিন্তা বাড়ে।

তবে এও জেনে রেখো যে, আমি এই সংসারের দাসী হয়ে আসি নি যে কোথায় কোন্ কাজ অসম্পূর্ণ রয়ে গেছে সেটা আমার একার কর্ত্তব্য বলে আমাকে করতে হবে।

অহেতুক বাক্যবাণে বোধ করি মিঃ রায়ের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিল, তিনি বলিলেন, মণি তুমি অকারণ কতগুলো অবান্তর কথা বললে, আমি দাসী তোমায় বলি নি।

কিন্তু দাসী নও বলে যে আমাকে শাসন করবার অধিকার তুমি নিজে থেকে নিয়েছ, এটাও তোমার অন্যায়।

আর স্মরণ রেখো যে, যেমন করেই হ'ক সংসারের সকল ব্যবস্থার বহন করছি আমি, সেজন্য তোমাকে কোনরূপ পরিশ্রম করে অর্থ আনতে হয় না। কাজেই আমার উপার্জ্জনের চিন্তার উপর তোমার এই অহেতুক রাগ আর কটুকথা আমার সহ্য হয় না। বলিয়া মিঃ রায় উঠিয়া আপন চেম্বারে চলিয়া গেলেন।

অভুক্ত খাদ্য অসমাপ্ত চাটুকু পড়িয়া রহিল। কেহই খাইল না।

মণিকা স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল।

কি প্রসঙ্গ হইতে কি প্রসঙ্গ আসিয়া সমস্ত দিনটা যেন ম্লান হইয়া গেল।

মিঃ রায় বেশী কথা বলেন না, কিন্তু তাঁহার নীরবতা তিরস্কার হইতেও বেশী আঘাত করে।

(২)

মিঃ রায় পুত্র-কন্যা পত্নীসহ রবিবার দিনটী একত্র বসিয়া আহার করেন ও গল্প করেন, এইজন্য রবিবার দিনটি মিঃ রায়ের বিশেষ প্রিয় দিন।

অন্য দিন মিঃ রায়ের কোর্ট থাকে, অজয় কলেজ যায়, সুমু ও সুমিত্রা, মিঃ রায়ের কন্যাদ্বয়, একজন স্কুলে যায় একজন কনভেণ্টে যায়, কাজেই একত্র বসিয়া আহার সম্ভব হয় না।

সন্ধ্যাবেলা পূবের বারান্দায় একটা ক্যাম্পখাটে শুইয়া মণিকা এই সকল কথাই ভাবিতেছিল।

আজকার দিনটির আনন্দ অন্তর্হিত হইয়াছে তাহারই জন্য।

মিঃ রায় কর্ম্মের অজুহাতে চেম্বারে ভাত চাহিয়া লইয়া খাইয়াছেন। অজয় বেলা নয়টায় উঠিয়া বাড়ীর আবহাওয়ায় শুষ্ক গাম্ভীর্য্য অনুভব করিয়া কখন যে চা খাইয়াছে, আর কখন যে ভাত খাইয়াছে, তাহা মণিকা জানে না।

সুমিত্রা ও সুমু তাহাদেরও আজ সাড়া পাওয়া যাইতেছে না, পড়ার ঘরে দুইজনে আছে বোধ হয়। খাইয়াছে হয় ত অজয়ের সঙ্গে কিম্বা একা একাই খাইয়াছে কে জানে ?

মণিকাকে কেহ ডাকে নাই সাহস করিয়া।

ডাইনিংরুম হইতে উঠিয়া আসিয়া সে শুইয়াছিল শয়নগৃহে। পাচককে বলিয়া দিয়াছিল, শরীর অসুস্থ, খাইবে না।

তাহাকে খাইতে যাইতে না দেখিয়া অজয় প্রশ্নের পর প্রশ্ন করিয়াছিল তাহার নিকটে আসিয়া, "কেন খাবে না মা, কি হয়েছে, অসুখ করেছে ?" তাহাকে ধমক দিয়া বিদায় দিয়াছিল।

খানিকটা ঘুমাইয়া তাহার মনের অন্ধকার অনেকটা পাতলা হইয়াছে। ঝির ঝিরে পূবে হাওয়ায় দেহ-মন স্নিগ্ধ হইয়া যাইতেছে।

দূর আকাশে শুক্লা একাদশীর চন্দ্রের আলোকে চতুর্দ্দিকের অন্ধকার কতক কাটিয়াছে, আলো-ছায়ায় যেন লুকোচুরি চলিতেছে। হাসনাহানা ও বেলার গন্ধে হাওয়াটা ভারি হইয়া উঠিয়াছে। ইহারই মাঝে প্রকৃতির নির্জ্জনতায় পারিপার্শ্বিক স্নিগ্ধতার মধ্যে মণিকার মন অনেকটা লঘু বোধ হয়।

আজকের দিনটি তাহারই কারণে ব্যর্থ হইয়াছে। সামান্য কারণে তাহার মন এত উদ্বেল হইয়া ওঠে কেন?

কেন সে অনর্থক ব্যয়ের সূচনা দেখিলে রাগে ভয়ে দিশাহারা হইয়া যায়। সে কি তাহার অপরাধ?

ঋণ-রাক্ষসীর করাল ব্যাদান তাহাকে এক মুহূর্ত্তের জন্য শান্তি দেয় না যে! তাহারই জন্য তাহার মন অহরহঃ পীড়িত হইয়া থাকে এবং সুযোগ পাইলেই তাহার গ্লানি তাহার সংসারে ছড়াইয়া যায়।

এই দিনগুলি তাহাদের আভিজাত্যের মোহের উপহাসকারী দিন। ব্যারিষ্টার স্বামীর ব্যয় যত অপরিমিত, আয় তত অজস্র নহে এবং যে ষ্টাইল বজায় রাখিয়া চলিতে হয় তাহার তুলনায় নিতান্ত সামান্য। প্রথম জীবনে শ্বশুর মহাশয়ের সঞ্চিত অর্থ লইয়া ব্যারিষ্টারী জীবন-যাত্রা সুরু হইয়াছিল।

ব্যাঙ্কের সুদে ও সামান্য আয়ে চলিত একরকম। ব্যয় নিতান্ত বেশী ছিল না। শ্বশুর যে পরিমাণ অর্থ রাখিয়া গিয়াছিলেন, তাহাতে সাধারণভাবে খাওয়া পরা একরকম চলিয়া যাইত হয়ত। কিন্তু সর্ব্বনাশের প্রথম সূচনা শ্বশুর করিয়াছিলেন পুত্রকে বিলাতে পাঠাইয়া ব্যারিষ্টার করিবার জন্য। পুত্রকে ব্যারিষ্টার দেখিবার পূর্ব্বেই কতকটা অসময়ে তিনি চলিয়া গিয়াছেন কিছু অর্থ সঞ্চিত রাখিয়া।

তাহার পর ধীরে ধীরে আয় বাড়িতে লাগিল কিন্তু কখন যে অজ্ঞাতসারে ইঙ্গ-বাঙ্গালীতে পরিণত হইল তাহারা, তাহা তাহার অপরিজ্ঞাত রহিল। প্রথম জীবনে মন্দ লাগে নাই। বড় বাড়ী, গৃহসজ্জা, মোটরকার এইসব না থাকিলে প্র্যাকটিশ চলে না, সবই হইল। ক্রমে ভৃত্যাদি বাড়িতে লাগিল। ড্রাইভার না থাকিলে ভাল দেখায় না, তাহাও রহিল। পার্টি, টি-পার্টি, উপহার আদান-প্রদান, জন্মদিন, বিবাহদিন ইত্যাদি নানারূপ সামাজিক ক্রিয়া বাড়িয়া চলিতে চলিতে ব্যাঙ্কের অর্থে হাত পড়িল। কিন্তু পুরাইয়া রাখিব বলিয়া যাহা বাহির করা হইল, তাহা রাখা গেল না। ক্রমে ক্রমে ষ্টাইল বজায় রাখাটাই মুখ্য চেষ্টা হইয়া দাঁড়াইল।

ফলে এই ভ্রান্ত সম্মানের পিছনে ছুটিয়া আজ প্রাণান্ত হইতেছে। সুদ বাবদ কত টাকা যে বাহির হইয়া যায়, কত চিন্তা যে সর্ব্বদা ঘনাইয়া থাকে, তাহার হিসাব-নিকাশ নাই। অথচ যখন আধুনিকতম সাড়ী ও গহনায় সাজিয়া হাইহিল-জুতা পায়ে দিয়া, হাণ্ডব্যাগ হাতে লইয়া আপনার car-এ বাহির হয় তখন বাহিরের লোক সম্ভ্রমে তাকাইয়া থাকে—ইহারা এ্যারিষ্টোক্র্যাট সোসাইটির বিশিষ্ট ব্যক্তিবিশেষ।

আপনার সন্তানগুলি পর্য্যন্ত জানে না কোন্ অতল গহ্বরের পাশে তাহাদের আশ্রয়, কোনও একটা হঠাৎ ঝটিকাবর্ত্তের আশঙ্কায় আশঙ্কিত হইয়া তাহাদের ভুয়া আভিজাত্যের তাসের প্রাসাদ দণ্ডায়মান আছে। কিন্তু আশ্চর্য্য ইহাই যে, ইহাকে পরিত্যাগ করিয়া অন্য জীবনে ফিরিয়া যাওয়া আজ অসম্ভব।

অথচ এই আড়ম্বর ক্ষণে ক্ষণে শ্বাসরুদ্ধ করিবার উপক্রম করিতেছে। এই ইঙ্গ-বাঙ্গালী সম্প্রদায় কোন্ মোহে অন্ধ হইয়া আপনাকে ধীরে ধীরে ধ্বংসের পথে অগ্রসর করিয়া দিতেছে, তাহা তাহাদের নিকট অজানা। অদ্ভুত জাঁকজমক বজায় রাখিতে গিয়া অধিকাংশ ব্যক্তি আকণ্ঠ ঋণে নিমজ্জিত, তবু তাহারা ইহা হইতে মুক্তি পাইবার চেষ্টা করে না, আলোকমুগ্ধ পতঙ্গের মত জানিয়া শুনিয়া ইহারা ভুয়া সম্মানের আকাঙ্ক্ষায় চিন্তার সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে সাহেব হইবার চেষ্টা করে। এই অদ্ভুত সামাজিক জীবন রাখিতে গিয়া ইহাদের জীবন হইতে অনেকস্থলে ন্যায়পরায়ণতা, সততা, গম্ভীরতা বিদায় লইয়াছে, বাহ্যাড়ম্বর ইহাদের লক্ষ্য। ইহাদের অধিকাংশ দেশ চেনে না, সাহিত্য জানে না, ধর্ম্মের বিশিষ্টতা নাই, প্রকৃত আর্ট ইহাদের অপরিজ্ঞাত। ইংরাজের চাকচিক্য ইহাদের নয়ন ও মন ভুলাইল, ইহারা তাহাদের চারিত্রিক গুণাবলী গ্রহণ করিল না, করিল ইহাদের চাকচিক্য।

এই অক্ষম অনুকরণের ফলে দেশ ভুলিল, সংস্কৃতি ভুলিল,

সমস্ত বিসর্জ্জন দিয়া ত্রিশঙ্কুর অবস্থায় শূন্যাবলম্বী হইয়া পালিশ করা বাহিরখানি বজায় রাখিতেই ইহারা ব্যস্ত। ইহাদের ঘর নাই আবার বাহিরও নাই।

মণিকা ভাবিতেছিল আমাদের ঘর বলিয়াই বা আছে কি? ম্যালেরিয়া জর্জ্জরিত দুঃখ-দুর্দ্দশার আকণ্ঠ নিমজ্জিত বাংলাদেশের পল্লী হইতে সুস্থ সহজ জীবনযাত্রা বহুদিন বিদায় লইয়াছে, সেখানেও না আছে সংস্কৃতি, না আছে জীবনযাত্রার কোনও সহজ ধারা; সেখানে থাকা যেন মরিয়া বাঁচিয়া থাকা। মনে পড়িয়া যায় মণিকার বাল্যে গ্রাম্য জীবনযাত্রা-প্রণালী।

প্রভাতে মায়েদের সাংসারিক জীবনযাত্রা সুরু হইত ধোয়া-ধুয়ি, আচার-বিচার রন্ধন ও কলহ লইয়া। তাঁহাদের দ্বিপ্রাহরিক অবসরে আলোচ্য বিষয় থাকিত পরচর্চ্চা ও পরনিন্দা। আপনাকে আপনি বড় করিয়া আপনার জিনিষটি বহুমূল্য বলিয়া তাঁহারা আনন্দলাভ করিতেন।

ইহা ব্যতীত তাঁহারা ভাবিতেন কি? তাঁহাদের বড় করিয়া কিছু দেখিবার শিক্ষা কেহ কোনদিন দিয়াছেন কি?

নিজেদের শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা অনুযায়ী গৃহকর্ম্মের ফাঁকে ফাঁকে তিরস্কারের মধ্যদিয়া কন্যাদিগকে তাঁহারা শিক্ষা দেন যে, সকল বিষয়ে সুপটু না হইলে শ্বশুরগৃহে তাহাদের কি অশেষ দুর্গতি অদৃষ্টে আছে। আর কন্যারা শিক্ষাপ্রাপ্ত হয় কি না সকাল হইতে ছোটভাই ভগিনীগুলির তত্ত্বাবধান করা। সময়ে অসময়ে আহার্য্য বস্তুর সদ্‌ব্যবহার করা। অবসর পাইলে খেলা না হয় ঘুম। না আছে শিক্ষা, না আছে স্কুল, না আছে বহির্জ্জগতের সহিত পরিচয়। এইটুকু সঙ্কীর্ণ জীবনের পরিধি।

সকলেই কিছু বুদ্ধিমান্ ও বুদ্ধিমতী হয় না, কিন্তু যাহারা হয়, তাহাদের জীবনও সুযোগের অভাবে ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হয়।

হঠাৎ মণিকার মনে হয়, ক্ষেণী-পিসির কথা। ক্ষেণী-পিসি, নাম বোধ হয় ক্ষণপ্রভা অথবা এমনিই একটা কিছু ছিল, কিন্তু মুখে মুখে বিকৃত হইয়া অবশেষে অবশিষ্ট ছিল ক্ষেণী। মণিকা অপেক্ষা বয়োজ্যেষ্ঠা ছিল সেই ক্ষেণী-পিসি।

মণিকার পিতার জ্ঞাতিকন্যা। তাঁহাদের অবস্থা মণিকার পিতার অবস্থা অপেক্ষা কিছু হীন ছিল।

একই গ্রামে একত্র খেলিয়া গল্প করিয়া একই আব-হাওয়ায় দু'জনে বড় হইয়াছিল।

এখনকার চোখ দিয়া দেখিয়া গ্রামের রূপমণ্ডকের স্মরণ করিয়া দুঃখ বোধ হইলেও শৈশবের জীবন ছিল সদা আনন্দময়। শৈশবে তুচ্ছতম বস্তু হইতেও প্রচুর আনন্দ আহরণ করা যায় এবং সে তৃপ্তি ও আনন্দের পরিমাপ হয় না।

শিশু তুচ্ছ খেলনায় যে আনন্দ অনুভব করে, পরিণত বয়সে মানব সর্ব্বসুখের অধিকারী হইলেও মনে করে আরও পাইবার ছিল, কিছু বাকী রহিয়া গেল।

তাই ওই ছায়াঘেরা আম্রবৃক্ষের তলে আম কুড়াইয়া ঝিনুক ঘসিয়া ফুটা করিয়া আম কাটিয়া পুকুরের পাড়ে পাতা-ভক্তাপানায় বসিয়া খাইতে খাইতে গল্প করিয়া যে আনন্দ মণিকা পাইয়াছে, পরবর্ত্তী জীবনে অতি সুসজ্জিত ড্রইংরুমে সুশিক্ষিত নর-নারীর সহিত অতিমার্জ্জিত আলাপে ঠিক ততখানি আনন্দ আসিয়াছে কিনা মনে সন্দেহ হয়।

মণিকার চাইতে ক্ষেণী বয়সে বড় ছিল, কথাবার্ত্তায় চতুর বুদ্ধিমতী ছিল। তাহার সহিত কথা কহিয়া মণিকার মনে হইত ক্ষেণী-পিসি সকল বিষয়ে শ্রেষ্ঠ তাহার চাইতে। কত তাহার বুদ্ধি, কত তাহার জ্ঞান, তাহার সহিত অন্তরঙ্গ হইয়া মিশিয়া মণিকা গর্ব্ব অনুভব করিত যে, সকল সঙ্গিনী অপেক্ষা তাহার প্রতি ক্ষেণী-পিসির স্নেহ অধিক।

তাহার বিবাহের ৪।৫ বৎসর আগে ক্ষেণী-পিসির বিবাহ হইল। সে সব কথা আজও মনিকার স্পষ্ট মনে আছে।

সম্বন্ধ আসিল, তাহাদের গ্রাম হইতে দূরে ক্ষুদ্র এক পল্লীগ্রামে তাহাদের বাড়ী। ক্ষেত-খামার-চাস-বাস আছে, বাড়ীও আছে একখানি। পাত্রের স্বাস্থ্য ভাল, পল্লীগ্রামের অল্পশিক্ষিত স্বাস্থ্যবান ২০।২২ বৎসরের যুবক।

বিবাহের দিন আলোক, নিমন্ত্রিত অতিথি, সবুজ চেলী পরিহিতা ক্ষেণী-পিসি ও তাহার নবীন যুবক-স্বামীকে দেখিয়া মণিকা ভাবিয়াছিল, তাহার কবে এমনি করিয়া বিবাহ হইবে।

আজ মনে হয়, সে উৎসবের সজ্জা ছিল কি? কয়েকটি পরিচিত গৃহের নর ও নারী। স্থানে স্থানে এসিটিলিন

গ্যাসের আলো। দু' চারিটি ছেলেমেয়ে মিলিয়া আনন্দ-কোলাহল। বর আসিয়াছিল ভাড়াটে ঘোড়ার গাড়ীতে চড়িয়া। ক'নেকে সাজানো হইয়াছিল একখানি সবুজ রংএর চেলীতে, সবুজ ফিতায় খোঁপা বাঁধা হইয়াছিল। হাতে ছিল দু'গাছি বালা, পায়ে মল, কানে মাকড়ী, গলায় হাঁসুলী।

তাহাতেই অবশ্য তন্বী গৌরী কিশোরী স্বর্ণপ্রভাকে মন্দ দেখাইতেছিল না। সবচেয়ে মানাইয়াছিল তাহার মুখের সলজ্জ হাসিটুকু।

বিবাহ হইয়া গেল। প্রায়ই ফেণী-পিসি পিত্রালয়ে আসিতে লাগিল। কত সে গল্প, কত আনন্দ, কত পরিতৃপ্তি। তাহার হাসিমুখের নূতন নূতন গল্প শুনিতে মণিকার ভারি ভাল লাগিত। ক্রমে ফেণীর সন্তানাদি হইতে লাগিল এবং আসা যাওয়াও বিরল হইয়া আসিল।

সেই সময়ে মণিকার বিবাহসম্বন্ধ আসিতে আসিতে হঠাৎ বিবাহ স্থির হইয়া গেল, মিঃ রায় বা রজতকান্তি রায় এম, এ-ষ্টুডেণ্টের সহিত। মস্ত ধনীর গৃহ। পাত্রের পিতা কয়লার ব্যবসায়ে প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছেন। কিন্তু তবু অভিজাত সমাজে তাঁহার আসন তেমন কায়েমী হয় নাই, আড়ালে লোকে তাঁহাকে দেখাইয়া বলে কয়লাবাবু।

সেই দুঃখ ভিতরে তাঁহাকে পীড়া দেয়, তাই একমাত্র পুত্রকে বিলাতে পাঠাইয়া ব্যারিষ্টার করিয়া সুন্দরী পুত্রবধূ ঘরে আনিয়া সকল রকমে অভিজাত হইবার তাঁহার ইচ্ছা ছিল।

হয়ত বড়ঘরে বিবাহ দিবার ইচ্ছাও তাঁহার ছিল, কিন্তু মণিকার অপরূপ রূপ দেখিয়া শ্বশুর তাহাকেই পুত্রবধূ করিতে মনঃস্থ করিলেন। নচেৎ মণিকার পিতামাতা ঠিক এই রকম পাত্রে কন্যা দিবার আশা করেন নাই।

তাহার বিবাহ-উৎসবের স্মৃতি এখনও মণিকার মনকে দীপ্ত করে। বহুমূল্য মোটরকারগুলি ফুলসাজে সজ্জিত হইয়া একখানির পর একখানি করিয়া নিঃশব্দে আসিয়া দাঁড়াইতেছে সারি বাঁধিয়া। বরের গাড়ীখানি শুভ্রপুষ্প ও আলোকসজ্জায় একখানি বৃহৎ রাজহংসরূপে আসিল। তাহার মধ্য হইতে বর নামিল—স্বর্ণকান্তি সুদর্শন যুবক।

ছোট পিসিমা মাকে জড়াইয়া ধরিয়া উচ্ছ্বসিত হইয়া বলিয়াছিলেন, ভাগ্যি করে এমন সোনারচাঁদ জামাই পেলি বৌ।

আর মা! তাঁহার সেই আনন্দাশ্রু-উদ্বেলিত আনন আজও মনে হয়। সে যেন একটা আনন্দভরা স্বপ্ন। ভাবিতে মন বিবশ হইয়া আসে সুখস্মৃতিতে।

৩

তারপর সেই পরিপূর্ণ সুখের জীবন একটানা অবিচ্ছিন্নভাবে কাটিয়াছে বহুদিন। নূতন জীবনে চোখ মেলিয়াছিল মণিকা। কত সজ্জা, কত বিলাসিতা, কত নূতনত্ব সে জীবনে।

শ্বশুর শিক্ষক রাখিয়াছিলেন বাংলা ও সংস্কৃত শিখিবে। ইংরাজী শিক্ষয়িত্রী রহিল, ইংরাজী শিখিবে ও কথোপকথন শিখিবে বলিয়া।

প্রত্যেকটি দিন আসিত বৈচিত্র্য লইয়া। নিত্য নূতন নিমন্ত্রণ ও আলাপনে, সিনেমা ও থিয়েটারে সময় কাটিত রঙীন স্বপ্নের মধ্যে, যাহা গৃহস্থঘরের কন্যা মণিকা কোন দিন কল্পনা করিতে পারে নাই।

মধ্যে ফেণী-পিসির সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছিল। ফেণী-পিসি তখন পিত্রালয়ে ছিল। দার্জ্জিলিং হইতে ফিরিবার পথে মণিকাও তাহার মায়ের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিল। মণিকা আসিয়াছে শুনিয়া ফেণী-পিসি সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিল। বড় দুঃখের সহিত মণিকার মনে হয় সেই বুদ্ধিদীপ্তা সুন্দরী ফেণী-পিসিকে তাহার অদ্ভুতরকম অমার্জ্জিত অশিক্ষিত বোধ হইয়াছিল। ময়লা লেসওয়ালা সেমিজের উপর ফরসা একটা সাড়ী পরা, মুখে একমুখ পান, কোলে একটি দু' আড়াই বৎসরের উলঙ্গ শিশুকন্যাকে লইয়া ফেণী-পিসি আসিয়া দাঁড়াইল।

তারপর তাহার কি সব অশ্লীল কথাবার্ত্তা, ক্ষণে ক্ষণে অকারণ ইঙ্গিতপূর্ণ হাসি মণিকাকে অতিষ্ঠ করিয়া তুলিয়াছিল। একি সেই ফেণী-পিসি! মণিকার মা আসিয়া বসিলে মণিকা বাঁচিল।

কিন্তু মায়ের সহিত কথা কহিতে গিয়া ফেণী-পিসি যেন বদলাইয়া গেল। কত কি তাহার জীবনের দুঃখের কাহিনী। শ্বশুরবাড়ীর ঝোঁকেয়া অজ-পাড়াগেঁয়ে। বড় ছেলে

ও বড় মেয়েটা ম্যালেরিয়ায় ভুগিতেছে, তাহাদের না মেলে ঔষধ না মেলে ভাল পথ্য। জ্বর ছাড়িলে ভাত খাইতে দেয়, নইলে খাবেই বা কি? তাহারা ভাল জিনিষের নামই জানে না। রোগে রোগে ছেলেগুলো জর্জ্জরিত। অথচ চিকিৎসার জন্য এখানে আসিতে চাহিলে উহারা তাহাকে আপনাদের স্বার্থের খাতিরে আসিতে দেয় না, কারণ সে আসিলে খাটিবে কে?—ইত্যাদি। কি বিয়েই আমার হল! ক্ষুব্ধ অভিমানে ক্ষেণী-পিসির গলা কাঁপে। পরিশেষে মণিকার দিকে চাহিয়া হাসিয়া বলিয়াছিল, "তুই বেশ পড়েছিস্ মণি, ভগবান করুন স্বামী-পুত্তুর নিয়ে সুখে থাক।" আর আমার—দুঃখের হাসি হাসিয়া বলিয়াছিল—হাঁসা অব্যেস তাই হাসি, না হলে যেমন জায়গায় পড়েছি সেখানে কাঁদাই উচিত। অজ-পাড়াগাঁয়ে না আছে মানুষ-জন, না সুখ, না স্বাচ্ছন্দ্য। খালি কোন রকমে পেট ভরাবার চেষ্টা কর। সন্ধ্যা না হতে উঠোনে শেয়াল দাঁড়াবে। কাঁথা মুড়ি দিয়ে ঘরে কাঁপ। ভাল একটা আলোও ওদেশে জোটে না। চারিদিকে খালি আঁধার। ওষুধ নেই, পথ্যি নেই, রোগে ভুগে বাঁচতে পার বাঁচ, না হয় পরমায়ু নেই, মর। ডাক্তার বদ্যির বালাই নেই। আর ডাক্তার আছেই বা কই? মাঝে মাঝে মনে হয়, এ অশান্তির জীবন কবে শেষ হবে।"

হঠাৎ মণিকার মনে হইয়াছিল এ তাহার সেই পূর্ব্বের ক্ষেণী-পিসি, এইমাত্র এই দুঃখের অভিব্যক্তিতে তাহার পূর্ব্ব মূর্ত্তি বিদ্যুতের ন্যায় ক্ষণিক আভাষ জানাইয়া দিল। অ-শিক্ষা কু-শিক্ষা বহু স্থূলতম আবরণ তাহার এই চেতনাকে শীঘ্রই অবলুপ্ত করিয়া দিবে হয় ত। তাহার পর বহুদিন দেখা হয় নাই।

কয়েক বৎসর পূর্ব্বে মায়ের নিকট শুনিয়াছিল, সেই ছেলে ও মেয়ের চিকিৎসা করিবার জন্য, তখন তাহাদের প্রায় শেষ অবস্থা, শ্বশুর বাড়ী হইতে পলাইয়া এখানে আসে, স্বামী অনিচ্ছাসত্ত্বেও সঙ্গে আসিয়াছিল। কিন্তু কয়েকদিন চিকিৎসার পর, পর পর দুইদিনে দুটি ছেলে ও মেয়ে মারা গেল, রক্ষা হইল না। ক্ষেণীর সে কি কান্না।

ক্ষেণী-পিসির স্বামী ইহাতে আগুন হইয়া যায়, বলে, দেখলে তো? ওখানে তবু প্রাণে ছিল, এখানে এসে চিকিচ্ছে করে মেরে ফেললে। ইহার পর অনেক অশ্রাব্য গালিগালাজ করিয়া সেইদিনই ক্ষেণী-পিসিকে লইয়া চলিয়া যায়। শোকাতুরা মায়ের হৃদয়ের পানে তাকাইবার মত অনুভূতিও তাহার ছিল না। এমনি অশিক্ষিত গোঁয়ার স্বামী তাহার।

ইহার দু' এক বৎসর পরে ক্ষেণী-পিসি মারা যায় ওই ম্যালেরিয়াতেই, আর বিনা চিকিৎসায়—ওই শ্বশুরবাড়ীতে।

মণিকার মনে হয়—তাহাদের সমাজ, দেশের কথা তো বুঝিতেই পারে না। আর যাঁহারা দেশ-সেবক বলিয়া নিজেদের পরিচিত করেন, তাঁহারা নেতৃত্ব লইয়া মারামারি করেন সহরে বসিয়া, দেশ যে উজাড় হইয়া গেল সে খোঁজ কে রাখে।

কেমন যেন আজ মণিকার মনে হয় দুঃখ উভয়েরই সমান। সেই অতৃপ্তির দাহে দুজনেই জ্বলিতেছে। উভয়েরই জীবনযাত্রা অস্বাভাবিক। একজন অশিক্ষিত, দুঃস্থ; এক সামাজিক পারিস্থিতির মধ্যে পড়িয়া রোগে ঔষধ-পথ্য পায় নাই। খাদ্য-হীন, শিক্ষাহীন অবস্থায় অস্বস্তির দহনজ্বালায় প্রতিকারবিহীন অবস্থায় জীবনলীলা শেষ করিয়াছে। আর একজন এক অদ্ভুত অস্বাভাবিক সমাজের জীবনযাত্রার মধ্যে ঔষধ-পথ্য, শিক্ষা, খাদ্য, অর্থ, সব পাইয়াও ঋণের নাগপাশে বদ্ধ হইয়া অশান্তিতে জ্বলিতেছে। ছাড়াইবার উপায় জানে না।

সরল, সহজ, স্বাভাবিক অবস্থা জীবনে কেমন করিয়া আসিবে?—অর্থ আছে, সংযত জীবনযাত্রা আছে শিক্ষা আছে আবার শান্তিও আছে।

এই দুই অস্বাভাবিক জীবনযাত্রার মাঝখানে একটা স্বাভাবিক জীবনধারার সেতু বাঁধিয়া দেওয়া যায় না কি?



বঙ্কিমচন্দ্র

রচনা-সাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্র

অধ্যাপক ডাঃ শ্রীশশীভূষণ দাশগুপ্ত এম এ,
পি, আর, এস ; পি, এইচ-ডি

ভাল রচনার গঠনরীতি কিরূপ হওয়া উচিত এবিষয়ে উপদেশের অন্ত নাই। তথ্য এবং যুক্তিতর্ক পরম্পরাকে কি ভাবে সাজাইয়া গুছাইয়া মূল সিদ্ধান্তে আসিয়া পৌঁছিতে হইবে এ বিষয়ে পাঠশালার গুরুম'শায় হইতে আরম্ভ করিয়া কেহই কিছু কম ওয়াকিবহাল নহেন। কিন্তু আমরা পূর্ব্বেই দেখিয়াছি, সত্যকারের রচনা-সাহিত্য কোন নৈয়ায়িক পন্থায় কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হয় না, সুতরাং রচনার গঠনরীতি সম্পর্কে যে উপদেশ বাহুল্য দ্বারা আমাদের মস্তিষ্ক ভারাক্রান্ত তাহার খুব অল্প অংশই রচনা-সাহিত্যের ক্ষেত্রে প্রযুজ্য। আমরা দেখিয়াছি, রচনা-সাহিত্যের কাজ নিকটতম বন্ধুর মত হৃদয়ের কোমল গভীর নিভৃত কোণ্‌টি পাঠকের নিকটে একান্ত অসঙ্কোচে উন্মুক্ত করিয়া ধরা; আর সাহিত্যের বাহিরের রূপটি যখন তাহার ভাব-ধর্ম্মেরই বাহন, তখন রচনা-সাহিত্যের গঠনরীতি খোলা মনে কথা বলিবার রীতি। এই খোলা মনে কথা বলিবার ভিতরে বাহিরের খুব শক্ত বাঁধন নাই, মন হাস্যে পরিহাসে, বেদনার অশ্রুতে, আত্ম-নিমজ্জনের গভীরতায় নিজেকে যেমন করিয়া একান্ত সহজ ভাবে প্রকাশ করে ভাল রচনা-সাহিত্যের প্রকাশ-ধর্ম্মও তাহাই; কিন্তু এত এলোমেলো আলাপ-প্রলাপ, হাসি-উচ্ছ্বাস, নৈরাশ্য-বেদনা, চপলতা-গাম্ভীর্য্য—ইহারা একেবারেই ছন্নছাড়া—খাপছাড়া নহে, ইহাদের সকলের পশ্চাতে থাকে একটা বিশেষ মানসিক অবস্থান একটা বিশেষ ভাবদৃষ্টি যে সকল আপাত-বিচ্ছিন্ন উপাদানগুলিকে নিয়ন্ত্রিত করিয়া তোলে একটা ঐক্যের বন্ধনে।

বঙ্কিমচন্দ্রের 'কমলাকান্তের দপ্তর' গুলির ভিতরেও দেখিতে পাই এই প্রাণ খুলিয়া কথা বলিবার রীতি। ধরা যাক্ প্রথম সংখ্যা দপ্তরের কথা। প্রথমে লেখক বলিলেন, "—বহুতন্ত্রীবিশিষ্ট বাদ্যের তন্ত্রীতে অঙ্গুলি স্পর্শের ন্যায় ঐ

গীতধ্বনি আমার হৃদয়কে আলোড়িত করে কেন ?" আমরা ভাবিলাম লেখক সেই কথাটিই বুঝি সর্ব্বপ্রথমে খুলিয়া বলিবেন ; কিন্তু কথা প্রসঙ্গে মনের তারে লাগিতেছে কত সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম আঘাত, বাজিয়া উঠিতেছে কত স্ফুট অস্ফুট ধ্বনি,—মন যেন এক ঘাট হইতে ভাসিয়া যায় কত দূরে। তাই বলিতে বলিতে লেখক বলিতেছেন,—"···কেবল ইহাই জানি যে, আমি একা। কেহ একা থাকিও না। যদি অন্য কেহ তোমার প্রণয়ভাগী না হইল, তবে তোমার মনুষ্য-জন্ম বৃথা। পুষ্প সুগন্ধি, কিন্তু যদি ঘ্রাণ গ্রহণ কর্ত্তা না থাকিত, তবে পুষ্প সুগন্ধী হইত না—ঘ্রাণেন্দ্রিয়বিশিষ্ট না থাকিলে গন্ধ নাই। পুষ্প আপনার জন্য ফুটে না। পরের জন্য তোমার হৃদয়-কুসুমকে প্রস্ফুটিত করিও।" বলিতে বলিতে আবার তিনি থামিয়া পূর্ব্বপ্রসঙ্গে ফিরিয়া আসিলেন,—"কিন্তু বারেক মাত্র শ্রুত ঐ সঙ্গীত আমার কেন এত মধুর লাগিল তাহা বলি নাই।" কিন্তু আবারও তাহা বলা হইল না, বলিতে বলিতে মনের পটভূমিতে ভিড় করিয়া দাঁড়ায় গত জীবনের কত দুঃখ-সুখের স্মৃতি,—কত আশা-নিরাশার কথা—আবার লেখক খেই হারাইয়া যেন কোথায় চলিয়া যান ; কিন্তু সহসা আবার থামিয়া, যান,—"কিন্তু কি বলিতেছিলাম, ভুলিয়া গেলাম। সেই গীতধ্বনি !"

প্রায় সবগুলি দপ্তরের ভিতরেই দেখিতে পাই এই সহজ ভাবে কথোপকথনের রীতি। লেখক কি বলিবেন, কেমন করিয়া বলিবেন আগে যেন কিছুই ভাবিয়া রাখেন নাই ; একটি রসের আবেদনে সমগ্র প্রাণ-মন ব্যাকুল হইয়া উঠিতেছে, তিনি তাহাকেই ভাষা দিতে বসিয়াছেন,—ভাষা ও গঠনরীতি আপনা-আপনি গড়িয়া উঠিতেছে। আমাদের বন্ধু-বান্ধবের সহিত আলাপ-আলোচনা আমরা সাধারণতঃ চপল হাস্য-পরিহাসের ভিতর দিয়াই জমাইয়া তুলি, একটু একটু করিয়া হাস্য-পরিহাসের পাতলা যবনিকা টানিয়া ফেলিয়া আমরা মনের অজ্ঞাতেই যেন হৃদয়ের গভীরে চলিয়া যাই, আমরা নিজেরাই বুঝিতে পারি না, একটু একটু করিয়া কখন যে আমরা গম্ভীর হইয়া উঠি। "কমলাকান্তের দপ্তর" গুলি বিশ্লেষ করিলেও আমরা ঠিক এই রীতিটাই আবিষ্কার করিতে পারিব। "কমলাকান্তের দপ্তর"গুলি হাস্য-পরিহাসে ভরা, এবং রবীন্দ্রনাথ সত্যই বলিয়াছেন যে, বাঙলা-সাহিত্যে নির্ম্মল শুভ্র হাস্য-রস আমরা বঙ্কিমচন্দ্রের ভিতরেই পাইয়াছিলাম। সেই হাস্য-পরিহাস এই দপ্তরগুলিকে দান করিয়াছে একটা অকপট সারল্য।

বঙ্কিমচন্দ্রের 'কমলাকান্তের দপ্তরে'র ভাব ও রীতির উপরে ইংরেজী সাহিত্যের প্রভাব সুস্পষ্ট। এখানে সেখানে বঙ্কিম যে সকল মিল রহিয়াছে* তাহার কথা বাদ দিলেও মৌলিক আকৃতি প্রকৃতির সাদৃশ্য উপেক্ষনীয় নহে। বঙ্কিমচন্দ্রের পরিহাস এবং বিদ্রূপের ভিতর দিয়া সমালোচনাত্মক প্রবন্ধগুলি অষ্টাদশ শতাব্দীর ইংরেজী রচনা-সাহিত্যের, বিশেষ করিয়া এডিসন্ এবং ষ্টীলের রচনার সধর্ম্মী। এডিসন্, ষ্টীল প্রভৃতির লেখা যে সকল সাময়িক পত্রে বাহির হইত তাহার ভিতরে প্রধান পত্র 'স্পেক্টেটর' (Spectator) ; ইহার সহিত বঙ্কিমচন্দ্রের 'বঙ্গ-দর্শন' পত্রিকার নাম-সাদৃশ্যও লক্ষণীয়। এডিসন্ এবং ষ্টীল একজাতীয় হাস্য-রসাত্মক রচনার প্রচলন করিয়াছিলেন, যাহার ভিতর দিয়া তাহারা পরিহাসচ্ছলে তৎকালীন সাহিত্য, সমাজ, ধর্ম্ম, সভ্যতা ও সংস্কৃতিতে যে সকল গলদ দেখা দিয়াছিল তাহাকে তাঁহারা তীব্রভাবে সমালোচনা করিয়াছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের দপ্তরগুলির ভিতরে অনেকগুলি দপ্তর এই আদর্শে অনুপ্রাণিত। ঊনবিংশ শতাব্দীতে আমাদের সাহিত্য কোন সুদৃঢ় বনিয়াদের উপরে আপন স্বাতন্ত্র্যে দাঁড়াইয়া উঠিতে পারে নাই, সস্তায় জন-প্রিয়তা লাভ করিয়া রাতারাতি একটা বড় সাহিত্যিক হইবার দুর্নিবার আকাঙ্ক্ষা অনেকেরই মাথায় ঝাঁকিয়া বসিয়াছিল। আত্ম-প্রত্যয়ের অভাবে, ইংরাজী সাহিত্যের অন্ধ অনুকরণের ফলে আমাদের যে সাহিত্য গড়িয়া উঠিতেছিল তাহাকে

---

* যেমন কমলাকান্ত চক্রবর্ত্তী ইংরেজী লেখক এডিসনের প্রায় ভদ্রলোক রোজার ডি কভর্লি (Roger de Coverley) তুলনীয় ; 'কমলাকান্তের দপ্তরে'র গ্রন্থ সম্পাদক ও টীকাকার ভীষ্মদেব খোসনবীসের সহিত স্কটের টেল্‌স্ অব্ মাই ল্যাণ্ড লর্ড' (Tales of my Landlord) উপন্যাসের 'জেডেডিয়া-ক্লেইশবোথাম্' (Gedediah Cleishbotham) চরিত্রের অনুরূপ। কমলাকান্তের আফিংএর নেশায় দিবা-স্বপ্ন দেখা হয়ত ডি কুইন্সি কৃত দি কন্‌ফেশন্স অব্ এ্যান্ ইংলিশ অপিয়াম্-ইটার' (The Confessions of an English opium-eater) গ্রন্থ খানি হইতে গ্রহণ করা হইয়াছে। এ প্রসঙ্গে শ্রীযুক্ত প্রিয়রঞ্জন সেনের (Western Influence on Bengali Literature)' গ্রন্থখানি দ্রষ্টব্য।

বঙ্কিমচন্দ্র 'অপক্ক কদলী' আখ্যা দিয়াছিলেন। এ সম্বন্ধে 'বঙ্গবাজার' শীর্ষক দশমসংখ্যা দপ্তরে দেখিতে পাই,—

"সাহিত্যের বাজার দেখিলাম। দেখিলাম, বাল্মীকি প্রভৃতি ঋষিগণ অমৃত ফল বেচিতেছেন; বুঝিলাম, ইহা সংস্কৃত সাহিত্য। দেখিলাম, আর কতগুলি মনুষ্য লীচু, পীচ, পেয়ারা, আনারস, আঙ্গুর প্রভৃতি সুস্বাদু ফল বিক্রয় করিতেছে—বুঝিলাম, এ পাশ্চাত্য সাহিত্য। আরও একখানি দোকান দেখিলাম—অসংখ্য শিশুগণ এবং অবলাগণ তাহাতে ক্রয়-বিক্রয় করিতেছে—ভীড়ের জন্য তন্মধ্যে প্রবেশ করিতে পারিলাম না—জিজ্ঞাসা করিলাম, "এ কিসের দোকান?"

বালকেরা বলিল, "বাঙ্গলা-সাহিত্য।"

"বেচিতেছে কে?"

"আমরাই বেচি। দুই একজন বড় মহাজনও আছেন। তদ্ভিন্ন বাকে দোকানদারের পরিচয় পত্রাবলী নামক গ্রন্থে পাইবেন।"

"কিনিতেছেন কে?"

"আমরাই।"

বিক্রেয় পদার্থ দেখিবার বাসনা হইল। দেখিলাম—খবরের কাগজে জড়ান কতগুলি অপক্ক কদলী।

'মনুষ্য-ফল' শীর্ষক দ্বিতীয়-সংখ্যা দপ্তরে দেখিতে পাই,—"আমাদের দেশের লেখকদিগকে আমি তেঁতুল বলিয়া গণি। নিজের সম্পত্তি খোলা আর সিটে, কিন্তু দুগ্ধকেও স্পর্শ করিলে দধি করিয়া তোলে।"

অষ্টাদশ শতাব্দীর ইংরাজী সাহিত্যে স্থানে-অস্থানে কোটেশন প্রয়োগের বাহুল্য একটা বাতিকের মতন বহু লেখককে পাইয়া বসিয়াছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে এই রোগটি বাঙ্গলাদেশের সাহিত্যিকগণের ভিতরেও সংক্রামিত হইয়া পড়ে। অকারণ কোটেশনের দ্বারা পাণ্ডিত্যভারে রচনাকে দুর্ব্বহরূপে ভারী করিয়া দিবার চেষ্টা অনেক লেখককেই যেন একেবারে পাইয়া বসিয়াছিল। এই এই জাতীয় লেখকদিগকে লক্ষ্য করিয়াই কমলাকান্ত বঙ্গদর্শন পত্রিকার সম্পাদক মহাশয়ের নিকট পত্র লিখিয়াছিলেন,—"আপনি কোটেশন ভালবাসেন, না ফুটনোটে আপনার অনুরাগ? যদি কোটেশন বা ফুটনোটের প্রয়োজন হয় তবে কোন ভাষা হইতে দিব তাহাও লিখিবেন। ইউরোপ ও আসিয়ার সকল ভাষা হইতেই আমার কোটেশন সংগ্রহ করা হইয়াছে। আফ্রিকা ও আমেরিকার কতকগুলি ভাষার সন্ধান পাই নাই। কিন্তু সেই সকল ভাষার কোটেশন আমি অচিরাৎ প্রস্তুত করিব, আপনি চিন্তিত হইবেন না।" ঊনবিংশ শতাব্দীর উচ্চ ইংরাজী শিক্ষায় শিক্ষিত বাঙ্গালীদের হাস্যকর পল্লবগ্রাহিতাকে লক্ষ্য করিয়া তিনি লিখিয়াছেন, "গুরুর মধ্যে গুরু যে পাটীগণিত ও জ্যামিতি, তাহাতেও সাহস শূন্য নহেন। জ্যামিতি এবং ত্রিকোণমিতি চুলোয় যাক, চতুষ্কোণ-মিতিতেও তাহার অধিকার—দৈব বিদ্যাবলে তিনি আপনার পৈত্রিক চতুষ্কোণ পুকুরটিও মাপিয়া ফেলিয়াছিলেন। বলা বাহুল্য যে, শুনিয়া লোকে ধন্য ধন্য করিয়াছিল। তাঁহার ঐতিহাসিক কীর্ত্তির কথা কি বলিব? তিনি চিতোরের রাজা আলক্ষেন্ড দি গ্রেটের একখানি জীবন চরিত দশ পনের পৃষ্ঠা লিখয়া রাখিয়াছেন এবং বাঙ্গালা সাহিত্য সমালোচন বিষয়ক একখানি গ্রন্থ মহাভারত হইতে সঙ্কলিত করিয়া রাখিয়াছেন। তাহাতে কোম্‌ত হর্বট স্পেন্সরের মত খণ্ডন আছে এবং ডারউইন যে বলেন মাধ্যাকর্ষণ বলে পৃথিবী স্থির আছে তাহারও প্রতিবাদ করিয়াছেন। ঐ গ্রন্থে মালতী-মাধব হইতে চারি পাঁচটা শ্লোক উদ্ধৃত করা হইয়াছে। ভরসা করি, সমালোচনা কালে আপনারা বলিবেন, বাঙ্গালা ভাষায় ইহা অদ্বিতীয়।"

তৎকালীন নাট্য সাহিত্যেও যে স্থূল রসিকতার ঢং প্রচলিত ছিল এবং বীরত্ব ও শোক প্রকাশের যে হাস্যকর রীতি প্রচলিত ছিল তাহা সমালোচক বঙ্কিমচন্দ্রের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি এড়াইতে পারে নাই। নাট্যকারের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল অমার্জ্জিত রুচি দর্শক এবং শ্রোতাগণকে সস্তায় হাসাইয়া কাঁদাইয়া বাহবা গ্রহণ। এই সকল নাট্য-সাহিত্যের সমালোচনায় বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছেন, "খোসনবীশপুত্র একখানি নাটকের সরঞ্জাম প্রস্তুত রাখিয়াছেন বটে, নায়িকার নাম চন্দ্রকলা কি শশিরেখা রাখিবেন স্থির করিয়াছেন,—তাঁহার পিতা বিজয়-পুরের রাজা ভীমসিংহ, আর নায়ক আর একটা কিছু সিংহ এবং শেষ অঙ্কে শশিরেখা নায়কের বুকে ছুরি মারিয়া আপনি 'হা হতোঽস্মি' করিয়া পুড়িয়া মরিবেন; এই সকল স্থির করিয়াছেন। কিন্তু নাটকের আদ্য ও মধ্যভাগ কিপ্রকার

হইবে এবং অন্যান্য 'নাটকোল্লিখিত' ব্যক্তিগণ কিরূপ করিবেন, তাহা কিছুই স্থির করিতে পারেন নাই। শেষে অঙ্কের ছুরি মারার সিনের কিছু লিখিয়া রাখিয়াছেন এবং আমি শপথ পূর্ব্বক আপনার নিকট বলিতে পারি যে, যে টুকুড়িছত্র লিখিয়া রাখিয়াছেন, তাহাতে আটটা 'হা সখি!' এবং তেরটা 'কি হ'ল, কি হ'ল!' সমাবেশ করিয়াছেন। শেষে একটি গীতও দিয়াছেন—নায়িকা ছুরি হস্তে করিয়া গাহিতেছে, কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, নাটকের অন্যান্য অংশ কিছুই লেখা হয় নাই।" বঙ্কিমচন্দ্রের এই বিদ্রূপাত্মক রচনা আমাদিগকে এডিসনের 'দি লায়ন্ ইন্ দি অপেরা' (The Lion in the Opera) রচনাটির কথাই স্মরণ করাইয়া দেয়। সেখানেও লেখক পরিহাসচ্ছলে তৎকালীন নাট্য-রসিকগণের অমার্জ্জিত রুচির উপরে তীব্র কটাক্ষপাত করিয়াছেন।

বঙ্কিমচন্দ্র যে শুধু ঊনবিংশ শতাব্দীর নব শিক্ষিত পল্লবগ্রাহীদিগকে এবং সাহিত্যের আসরের অরসিকদিগকেই বিদ্রূপবাণে আহত করিয়াছেন তাহা নহে, প্রাচীণ যে শিক্ষা এবং সংস্কৃতি গোঁড়া ব্রাহ্মণ পণ্ডিত সম্প্রদায়ের হাতে পড়িয়া নীরস এবং অকেজো হইয়া উঠিতেছিল তাহার সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের হুলও কিছু কম নহে। 'মনুষ্য-ফলে'র ভিতরে অধ্যাপক ব্রাহ্মণগণকে তিনি ধুতুরা ফল আখ্যা দিয়াছেন। "বড় বড় লম্বা লম্বা সমাসে, বড় বড় বচনে, তাঁহাদের সুদীর্ঘ কুসুমসকল প্রস্ফুটিত হয়, ফলের বেলা কণ্টকময় ধুতুরা।" বিশ্বসংসারের বড় বাজারে ঢুকিয়া কমলাকান্ত ব্রাহ্মণ পণ্ডিত-গণকে ঝুণা নারিকেল বিক্রয় করিতে দেখিলেন। "ব্রাহ্মণ-দিগের সেই প্রখর তপন-তপ্ত ঘর্ম্মাক্ত ললাট এবং বাগবিতণ্ডা জনিত অধর-সুধাবৃষ্টি দেখিয়া দয়া হইল—জিজ্ঞাসা করিলাম, "হাঁ ভট্টাচার্য্য মহাশয়! ঝুণা নারিকেল কিনিতে আপত্তি নাই, কিন্তু দোকানে দা আছে? ছুলিব কি প্রকারে?"

"না বাপু, দা রাখি না।"

"তবে নারিকেল ছোল কিসে?"

"আমরা ছুলি না, আমরা কামড়াইয়া ছোবড়া খাই।"

ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণের এই অবস্থার সুযোগ লইয়াই পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতগণ একেবারে ঝাঁকিয়া উঠিয়াছেন। "আমি এই সকল দেখিতে শুনিতেছিলাম, এমত সময়ে সহসা দেখিলাম যে, ইংরেজ দোকানদারেরা লাঠি হাতে, দ্রুতবেগে ব্রাহ্মণ-দিগের ঝুণা নারিকেলের গাদার উপর গিয়া পড়িলেন। দেখিয়া ব্রাহ্মণেরা নারিকেল ছাড়িয়া দিয়া নামাবলি ফেলিয়া মুক্তকচ্ছ হইয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিতে লাগিলেন। তখন সাহেবেরা সেই সকল পরিত্যক্ত নারিকেল দোকান উঠাইয়া লইয়া আসিয়া বিলাতী অস্ত্রে ছেদন করিয়া, সুখে আহার করিতে লাগিলেন।" আমি জিজ্ঞাসা করিলাম যে, "এ কি হইল?" সাহেবেরা ইহাকে বলে 'Asiatic Researches'।

তৎকালীন লম্বা লম্বা বক্তৃতাকারী বাক্‌সর্ব্বস্ব দেশহিতৈষী-গণকে বঙ্কিমচন্দ্র 'শিমুল ফুল' আখ্যা দিয়াছিলেন। "যখন ফুল ফুটে, তখন দেখিতে শুনিতে বড় শোভা—বড় বড় রাঙ্গা রাঙ্গা, গাছ আলো করিয়া থাকে। কিন্তু আমার চক্ষে নেড়া গাছে অত রাঙ্গা ভাল দেখায় না।······যদি ফুল ঘুচিয়া ফল ধরিল, তখন মনে করিলাম, এইবার কিছু লাভ হইবে। কিন্তু তাহা বড় ঘটে না। কালক্রমে চৈত্রমাস আসিলে রৌদ্রের তাপে অন্তঃশূন্য ফল ফট করিয়া ফাটিয়া উঠে; তাহার ভিতর হইতে খানিক তুলা বাহির হইয়া বঙ্গদেশময় ছড়িয়া পড়ে

তৎকালীন বঙ্গদেশীয় পলিটিক্যাল এজিটেসনের রূপটি প্রকাশ করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র বলিতেছেন,—"শিবু কলুর পুত্র দশম বর্ষীয় বালক, এক কাঁসি ভাত আনিয়া উঠানে বসিয়া খাইতে আরম্ভ করিল। দূর হইতে একটি শ্বেত-কৃষ্ণ কুক্কুর তাহা দেখিল। দেখিয়া একবার দাঁড়াইয়া চাহিয়া ক্ষুধনে জিহ্বা নিঃসৃত করিল। অমল ধবল অন্নরাশি কাংস্যপাত্রে কুসুমদামবৎ বিরাজ করিতেছে—কুক্কুরের পেটটা দেখিলাম, নিতান্ত পড়িয়া আছে। কুক্কুর চাহিয়া চাহিয়া, দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া, একবার আড়ামোড়া ভাঙ্গিয়া হাই তুলিল। তারপর ভাবিয়া চিন্তিয়া ধীরে ধীরে এক একপদ অগ্রসর হইল, এক একবার কলু পুত্রের অন্ন-পরিপূরিত বদন-প্রতি আড়-নয়নে কটাক্ষ করে, এক এক পা এগোয়। অকস্মাৎ অহিফেন প্রসাদে দিব্য চক্ষু লাভ করিলাম—দেখিলাম, এই ত পলিটিকস্—এই কুক্কুর ত পলিটিসান! তখন মনোভিনিবেশ পূর্ব্বক দেখিতে লাগিলাম যে, কুক্কুর পাকা পলিটিক্যাল চাল চালিতে আরম্ভ করিল। কুক্কুর দেখিল—কলু পুত্র কিছু বলে না—বড় সদাশয় বালক,—কুক্কুর কাছে গিয়া থাবা পাতিয়া বসিল। ধীরে ধীরে লাঙ্গুল নাড়ে, আর কলুর

পো'র মুখপানে চাহিয়া হা হা করিয়া হাঁপায়। তাহার ক্ষীণ কলেবর, পাতলা পেট, কাতর দৃষ্টি এবং ঘন ঘন নিঃশ্বাস দেখিয়া কমলাকান্তের দয়া হইল;—তাহার পলিটিক্যাল এজিটেশন্ সফল হইল—কমলাকান্ত একখানা মাছের কাঁটা উত্তম করিয়া চুষিয়া কুকুরের দিকে ঠেলিয়া দিল। কুকুর আগ্রহ সহকারে আনন্দে উন্মত্ত হইয়া তাহা চর্ব্বণ, লেহন, গেলন এবং হজম করণে প্রবৃত্ত হইল। আনন্দে তাহার চক্ষু বুজিয়া আসিল।" কিন্তু আরেক রকমের বুষ-পলিটিক্স্ আছে, যেখানে গায়ের জোরে শৃঙ্গের ভয় দেখাইয়া বৃষ কলুর খোল-বিচালি-পরিপূর্ণ নাদায় মুখ দিয়া সকল খাইয়া মনের সুখে নির্ব্বিঘ্নে চলিয়া যায়,—সে পলিটিক্স আমাদের অজানা।

বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার রচনার ভিতর দিয়া তৎকালীন সাহিত্য, সভ্যতা, সংস্কৃতি, রাজনীতি প্রভৃতিকে কি ভাবে পরিহাসের মধু মিশাইয়া সমালোচনা করিয়াছেন তাহা আমরা দেখিলাম। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বঙ্কিমচন্দ্রের ভিতরে যেমন ছিল একটি পরিহাসপটু গভীর রসিক, অন্যদিকে ছিল একটি কঠোর শাসক—একটি সংস্কর্তা। এখানে প্রশ্ন হইতে পারে, এই সমালোচনা এই সংস্কারের বুদ্ধি—ইহা সাহিত্যিক রূপ লাভ করিয়াছিল কি প্রকারে? ইহার উত্তরে বলা যাইতে পারে যে, বঙ্কিমচন্দ্রের এই জাতীয় রচনাগুলি আলোচনা করিলে দেখিব, এখানে সংস্কার বুদ্ধি বা প্রচারবুদ্ধিই প্রধান হইয়া উঠে নাই, প্রধান হইয়া উঠিয়াছে তাহাদের সকলের ভিতর দিয়া বঙ্কিমের রস-সত্তার প্রকাশ। রচনাগুলির অন্তর্নিহিত যে প্রেরণা তাহা মুখ্যতঃ সাহিত্য সমাজ, ধর্ম্ম বা রাজনীতির সংস্কার নহে, তাহা মুখ্যতঃ কাব্য, এই জন্যই এগুলি সাহিত্য। সেই 'কান্তাসম্মিততয়া উপদেশ যুজে' সাহিত্যের প্রাণ-বস্তুকে প্রাধান্য দিয়াই সংস্কার এবং প্রচার, সাহিত্যের দিক্ হইতে এখানে তাই আমরা বেশী কিছু আপত্তি তুলিতে পারি না।

অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রধান রচনাকার এডিসন্ প্রভৃতির প্রভাবই বঙ্কিমচন্দ্রের উপরে অতি স্পষ্ট হইলেও মনে হয় তিনি রচনা-বিষয়ে অষ্টাদশ এবং ঊনবিংশ শতাব্দীর ইংরেজী রচনা-সাহিত্য দ্বারাই প্রভাবান্বিত। অষ্টাদশ শতাব্দীর এবং ঊনবিংশ শতাব্দীতে ইংরেজী রচনা-সাহিত্যে একটা বিশেষ ঢং প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল, এই জাতীয় রচনাকে বলা হয় Familiar Essays। এই ধরণের রচনার বৈশিষ্ট্য এই, ইহার বিষয়বস্তু যে কি হইতে পারে এবং কি না হইতে পারে সে সম্বন্ধে কোনই বিধি-নিষেধ নাই। অতি তুচ্ছ, অতি ক্ষুদ্র—একান্ত অকিঞ্চিৎকর কোনও একটি বিষয় বা প্রসঙ্গ ধরিয়া লেখক কথা বলিতে আরম্ভ করেন, তারপরে একটু একটু করিয়া তাহার ভিতরে আসিয়া পড়ে বহু সত্য ও তথ্য বহু গভীর আলোচনা; কথা বলিতে বলিতে তিনি যেন কোন গভীরে চলিয়া যান। পূর্ব্বেই আমরা দেখিয়াছি যে, ভাল রচনা সহৃদয় দুইটি বন্ধুর মন খুলিয়া আলাপ আলোচনার মত; সে আলোচনা ব্যবহারিক ক্ষেত্রে সর্ব্বদাই যে কোন গুরু বিষয় লইয়াই আরম্ভ হয় এমন কথা বলা যায় না, অতি সাধারণ বিষয় লইয়া তাহার সূত্রপাত ক্রমে হৃদয়ের দ্বার দ্বার খুলিয়া। আসল কথা, আমরা দেখিয়াছি যে, রচনা-সাহিত্যের যাহা প্রাণবস্তু তাহা প্রধানতঃ লেখকের ব্যক্তিত্বের স্পন্দন ও তাহার ভিতর দিয়া আমাদের সহিত তাহার নিকটতম পরিচয়। সুতরাং স্বভাবতঃই রচনা-সাহিত্যের প্রাণ অনেকখানি বিষয়-নিরপেক্ষ। এই জন্যই ভাল রচনা-মাত্রেই বিষয়-নিরপেক্ষ; ভাল রচনা লিখিতে হইলে যে ভাল বিষয়কেই গ্রহণ করিতে হইবে তাহা বলা যায় না,—অধিকাংশই নির্ভর করে লেখকের মনোধর্ম্মের উপরে। কোন্ মুহূর্ত্তে বিশ্বসৃষ্টির কোন্ একান্ত সাধারণ জিনিষ ও তাহার মনের পরে আঘাত করিয়া যে কোন্ সূক্ষ্ম রাগিণীর ঝঙ্কার তুলিবে এ বিষয়ে পূর্ব্বাহ্নেই কোন কথা বলিয়া রাখা সকল বস্তুবিদ্ এবং মনস্তত্ত্ববিদের ক্ষমতাতীত। এই জন্যই দেখিতে পাই এই Familiar Essay-এর লেখকগণ যে কি বিষয়বস্তু অবলম্বন করিয়া কি কথা বলিবেন তাহা কিছুই ঠিক নাই। তাঁহাদের বিষয়-বস্তু ও যেমন অতি সাধারণ, রচনা-ভঙ্গীও অনুরূপ সাধারণ। একটি সহজভাব, একটি অকপট সারল্যই তাঁহাদের রচনা-ভঙ্গীকে সাহিত্যের মর্য্যাদা দান করে। ধরা যাক্ বঙ্কিমের "এ ব্লেড অব্ গ্রাস্" (A Blade of Grass) রচনাটির কথা। একটি ঘাসের শীষকে অবলম্বন করিয়া বঙ্কিমের কবিচিত্ত নিজেকে যেন একেবারে ঢালিয়া দিয়াছে এই ছোট রচনাটির ভিতরে—ঠিক যেন 'a lyric in prose—একটি গদ্য লিরিক্। একটী ঘাসের শীষের ভিতরে লেখক নিজের মনের সবটুকু মাধুরী মিশাইয়া দিয়া ইহার ভিতরে কত নিগূঢ় সত্য, সৌন্দর্য্য, মাধুর্য্য এবং অপূর্ব্ব মাহাত্ম্যের সৃষ্টি করিয়া তাহাকে যেন নূতন করিয়া গড়িয়া লইয়াছেন।

রিচার্ড জেফেরিজের 'ব্রিটিশ মিউজিয়ামে পারাবত' (The Pigeons at the British Museum) রচনাটিতে দেখিতে পাই, ব্রিটিশ মিউজিয়ামের সম্মুখে স্বচ্ছ সূর্য্যকিরণে যে পারাবতগুলি বসিয়া রহিয়াছে তাহাদেরই কথা প্রসঙ্গে লেখক একটু একটু করিয়া এই উপসংহারে পৌঁছিলেন,—"In the sunshine, by the shady verge of woods, by the sweet waters where the wild dove sips, there alone will thought be found."—"ছায়া-সমাকীর্ণ বনপ্রান্তে স্বচ্ছমধুর জলের কাছে সূর্য্যকিরণে বসিয়া বন্য পারাবতগুলি যেখানে চঞ্চুদ্বারা জলপান করে, শুধু সেই খানেই ভাবনা খুঁজিয়া পাওয়া যায়।"

বঙ্কিমচন্দ্রের 'কমলাকান্তের দপ্তরে'র অনেকগুলি রচনাই ইংরেজী সাহিত্যের এই 'Familiar Essay'র ঢঙে রচিত। 'পতঙ্গ' শীর্ষক চতুর্থসংখ্যা দপ্তরে দেখিতে পাই, "ঝিমাইতে ঝিমাইতে দেখিলাম যে, একটা পতঙ্গ আসিয়া ফানুষের চারি পাশে শব্দ করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। 'চোঁ-ও-ও-ও' বোঁ-ও-ও করিয়া শব্দ করিতেছে। আফিমের ঝোঁকে মনে করিলাম, পতঙ্গের ভাষা কি বুঝিতে পারিনা?" ইহার পর চলিল নানা প্রসঙ্গ,—উপসংহারে আসিয়া দেখিলাম,—"এখন হইতে আমার বোধ হইতে লাগিল যে, মনুষ্য মাত্রই পতঙ্গ, সকলের এক একটি বহ্নি আছে। সকলে সেই বহ্নিতে পুড়িয়া মরিতে চাহে। সকলেই মনে করে, সেই বহ্নিতে পুড়িয়া মরিতে তাহার অধিকার আছে—কেহ মরে, কেহ বাঁচে বাঁচিয়া ফিরিয়া আসে। জ্ঞানবহ্নি, ধনবহ্নি, মানবহ্নি, রূপবহ্নি, ধর্ম্মবহ্নি, ইন্দ্রিয়বহ্নি—সংসার বহ্নিময়।… বহ্নি কি, আমরা জানি না। রূপ, তেজ, তাপ, ক্রিয়া, গতি, এসকল কথার অর্থ নাই। এখানে দর্শন হার মানে; বিজ্ঞান হার মানে, ধর্ম্মপুস্তক হার মানে, কাব্যগ্রন্থ হার মানে। ঈশ্বর কি, ধর্ম্ম কি, স্নেহ কি? তাহা কি, কিছু জানি না; তবু সেই অলৌকিক অপরিজ্ঞাত পদার্থ বেড়িয়া বেড়িয়া ফিরি। আমরা পতঙ্গ না ত কি?"

'বসন্তের কোকিল' (সপ্তম সংখ্যা), 'ফুলের বিবাহ' (নবম সংখ্যা) 'বড়-বাজার' (দশম সংখ্যা), 'ঢেঁকি' (চতুর্দ্দশ সংখ্যা), প্রভৃতি রচনাগুলির ভিতরেও সেই একই আকৃতি-প্রকৃতি দেখিতে পাই। পঞ্চম সংখ্যা দপ্তরে (আমার মন) দেখিতে পাই কমলাকান্ত চক্রবর্ত্তী হঠাৎ একদিন তাহার মনকে আর কোথাও খুঁজিয়া পাইল না। ইহা লইয়া খানিকক্ষণ স্থূল সূক্ষ্ম অনেক রসিকতা চলিল;—কিন্তু খানিকটা দূর আসিয়াই আমরা সহসা থমকিয়া গেলাম,—কমলাকান্ত বলিল, "বুঝিয়াছি, লঘুচেতাদিগের মনের বন্ধন চাই, নহিলে মন উড়িয়া যায়। আমি কখন কিছুতে মন বাঁধি নাই, এই জন্য কিছুতেই মন নাই। এ সংসারে আমরা কি করিতে আসি, তাহা ঠিক বলিতে পারি না—কিন্তু বোধহয় কেবল মন বাঁধা দিতেই আসি। আমি চিরকাল আপনার রহিলাম—পরের রহিলাম, এই জন্যই পৃথিবীতে আমার সুখ নাই।" কমলাকান্তের এই সকল এবং দপ্তরগুলির ভিতরে ইতস্ততঃ ছড়ান এই জাতীয় অনেকগুলি উক্তির ভিতরে হয়ত আমরা কোম্‌তের 'নিশ্চয়-বাদ' (Positivism) এবং মিলের হিতবাদের গন্ধ পাইতে পারি; কিন্তু একটু লক্ষ্য করিলেই দেখিতে পাইব এই দপ্তরগুলির ভিতরে এ সকল উক্তি নিছক উপদেশও হইয়া উঠে নাই, দর্শনও হইয়া উঠে নাই,—ইহারা লাভ করিয়াছে রসমূর্ত্তি,—এই খানেই ইহাদের সাহিত্যিক স্বরূপ।

'বিড়াল' শীর্ষক (ত্রয়োদশ সংখ্যা) দপ্তরে দেখিতে পাই,—"আমি শয়নগৃহে চারপায়ীর উপর বসিয়া হুঁকা হাতে ঝিমাইতেছিলাম। একটু মিট্ মিট্ করিয়া ক্ষুদ্র আলো জ্বলিতেছে—দেয়ালের উপর চঞ্চল ছায়া প্রেতবৎ নাচিতেছে। আহার প্রস্তুত হয় নাই—এজন্য হুঁকা হাতে নিমীলিতলোচনে আমি ভাবিতেছিলাম যে, আমি যদি নেপোলিয়ান্ হইতাম, তবে ওয়াটার্লু জিতিতে পারিতাম কি না? এমত সময়ে একটি ক্ষুদ্র শব্দ হইল, 'মেও'।" কমলাকান্তের প্রথম মনে হইল, ওয়েলিংটন হঠাৎ বিড়ালত্ব প্রাপ্ত হইয়া তাহার নিকটে আফিঙ ভিক্ষা করিতে আসিয়াছে। কিন্তু ভাল করিয়া চক্ষু মেলিয়া দেখিল, একটি মার্জার আসিয়া প্রসন্ন-গোয়ালিনী-প্রদত্ত দুগ্ধটুকু নিঃশেষে উদরসাৎ করিয়া বসিয়া আছে। কমলাকান্তের ক্রুদ্ধ মূর্ত্তি দেখিয়া মার্জার বলিল,—"আর আমাদিগের দশা দেখ—আহারাভাবে উদর কৃশ, অস্থি পরিদৃশ্যমান, লাঙ্গুল বিনত, দাঁত বাহির হইয়াছে, জিহ্বা ঝুলিয়া পড়িয়াছে, অবিরত আহারাভাবে ডাকিতেছি, মেও! মেও! খাইতে পাই না।

আমাদের কাল চামড়া দেখিয়া ঘৃণা করিও না! এ পৃথিবীর মৎস্য মাংসে আমাদের কিছু অধিকার আছে। খাইতে দাও—নহিলে চুরি করিব।……চোরের দণ্ড আছে, নির্দ্দয়তার কি দণ্ড নাই? দরিদ্রের আহার সংগ্রহের দণ্ড আছে, ধনীর কার্পণ্যের দণ্ড নাই!" ইহার পশ্চাতে যে ব্যঞ্জনা রহিয়াছে তাহা ক্ষুরধার তীক্ষ্ণ—অথচ করুণ। এই সংখ্যা দপ্তর আমাদিগকে লি হান্টের (Leigh Hunt) 'দি ক্যাট বাই দি ফায়ার' (The Cat by the Fire) রচনাটির কথাই মনে করাইয়া দিবে। শুধু ভঙ্গীতে ও বক্তব্যে উভয়ের ভিতরে সাদৃশ্য অতি স্পষ্ট।

বঙ্কিমচন্দ্র শুধু ঔপন্যাসিক ছিলেন না—তাঁহার আজীবন সাধনা ছিল বাঙলা-সাহিত্যকে সকল দিক হইতে দৃঢ় বনিয়াদের উপরে গড়িয়া তোলা, তাহাকে সুখ-দুঃখে, হাস্য-পরিহাসে—মানুষের জীবনের যাহা কিছু সুন্দর এবং মধুর এবং মঙ্গলের তাহা দ্বারাই ভরিয়া তুলিতে। তাই তাঁহার প্রতিভা-দীপ্তি একদা কেন্দ্রীভূত হইয়াছিল রচনা-সাহিত্যেরও দিকে; পরবর্ত্তীকালে রবীন্দ্রনাথের হাতে এই রচনা-সাহিত্য আরও অনেক সূক্ষ্ম মধুর বিকাশ লাভ করিয়াছে বটে, কিন্তু প্রথম গড়িয়া তুলিবার ভার ছিল বঙ্কিমচন্দ্রের হাতে। শুধু প্রথম স্রষ্টা হিসাবেই নহে, সত্যকারের রচনাকার হিসাবেও বঙ্কিমের স্থান বাঙালা-সাহিত্যে গৌরবোজ্জ্বল থাকিবে।

শেষের অর্ঘ্য

শ্রীজগদানন্দ বিশ্বাস

চল্লিশ পার হইনু এবার
কখন আসিবে ডাক,
'শেষের অর্ঘ্য' যাই দিয়া যাই—
আর সব পড়ে থাক।
ভারতীর বেদী পেতেছিনু আমি
পল্লী-কুঞ্জ মাঝে,
ফেলে যেতে হ'বে মোর কবিতায়
আজি তাই বুকে বাজে।
কীটে জরজর করিবে খাতাটী
বুকের বেদনা ঢালা,
কেহ আর পড়ি' বুঝিতে নারিবে
আমার হিয়ার জ্বালা।
তোমাদের সবে মিনতি করিয়া
আজিকে বলিয়া যাই,
আমার চিতায় মোর কবিতায়
দিও পুড়ে হবে ছাই।
আমার বিয়োগে কিবা আসে যায়
দুঃখও তা'তে নাই,
আসি, আসি, আসি, ফিরে যেন আসি
পল্লীতে লভি ঠাঁই।

শোক-সভা মোর না করুক কেহ
এই কুঞ্জের পাখী,
আমার আবাসে আসিয়া নিতুই
ফিরে যাবে মোরে ডাকি।
যে সকল আমি তরু ও লতাকে
রোপণ করেছি হাতে,
তাদেরি কুসুম গন্ধ বিলাবে
মোর গৃহে নিতি প্রাতে।
অলিদলে মোর বুকের বেদনা
গাহিবে গুঞ্জরণে,
আমার ভাষায় অমর করিবে
কুঞ্জের পাখীগণে।
সন্ধ্যা-তারাটী জ্বালিয়া দেউটী
দিবে নিতি মোর ঘরে,
আরতির গান করিবে পাপিয়া
সুমধুর সুর ধরে।
বিদায় লইয়া রাখিনু জননি
আজিকে তোমার পাশে,
যাবার বেলায় বলি মোর, হায়,
কণ্ঠ রোধিয়া আসে।

পরাজয়

ডাঃ শ্রীশচীন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত

কন্যার বিবাহ দিতে, সস্ত্রীক নৃপেন বাড়ী চলিয়াছে। নৃপেন ঢাকায় বাস করে। পাটের অফিসের কেরানী। গৌরী তাহাদের একমাত্র সন্তান। পুত্র হয় নাই, সেজন্য গৌরীকে তাহারা পুত্রের মতন করিয়া শিক্ষিতা করিয়া তুলিল। গৌরীও বিদ্যায়, বুদ্ধিতে, গানে, বাজনায় চৌখস্ মেয়ে হইয়া উঠিল।

আত্মীয়েরা ঠাট্টা করিয়া নৃপেনকে বলিত, "মেয়েকে ত রাজরাণী করে গড়েছ। কিন্তু বিয়ে দেবে কি করে শুনি?"

নৃপেন হাসিত, বলিত, "সে ভাবনা আমার, গৌরীকে আমি রাজার ঘরেই বিয়ে দেব।"

আত্মীয়েরা বিদ্রূপের হাসি হাসিত, কারণ সকলেই নৃপেনের অবস্থার কথা জানে।

সেই গরীব নৃপেন যখন কাশীপুরের জমিদার অবনী রায় চৌধুরীর ছেলের সঙ্গে বিবাহের প্রস্তাব ঠিক করিয়া ফেলিল, তখন তাহারা আশ্চর্য্য হইয়া পড়িল। তাহার পর তাহারা যখন আরো শুনিল, অবনী বাবু পন বাবদ নগদ পাঁচ হাজার টাকা চাহিয়াছেন; এবং নৃপেনও যখন সেই টাকা দিতে সম্মত হইয়াছে, তখন তাহারা নৃপেনের দুঃসাহসিকতা দেখিয়া সত্য সত্যই মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িল। নৃপেন একি করিল। যাহার হাতে নগদ হাজার টাকার উপরে নাই সে কোন সাহসে এত বড় দায়িত্বের ভার ঘাড় পাতিয়া লইল। তাহারা থাকিতে না পারিয়া একদিন নৃপেনকে প্রশ্ন করিয়া বসিল।

নৃপেন হাসিয়া বলিত, "কি করব দাদা। কত লোকই ত ধরেছি। কিন্তু কেউ ত এর নীচে রাজি হোল না। সবাই দশ পনর হাজার টাকা চায়। কি করি বল।"

আত্মীয়েরা বলিত, "এত টাকা তুমি কোত্থেকে দেবে।"

নৃপেন শুষ্ককণ্ঠে উত্তর করিত, "সে ত জানিনে। দেখা যাক্ ভগবান কি করেন?"

জবাব শুনিয়া কেহই সুখী হইতে পারিল না।

গোয়ালন্দ ষ্টীমার। বড্ডভীড়। নৃপেন অতিকষ্টে স্ত্রী কন্যাসহ উপরের ডেকে উঠিয়া আসিল, এবং কোন প্রকারে ইণ্টার ক্লাসের কামড়ার নিকটে একটু জায়গা করিয়া বসিয়া পড়িল।

ষ্টীমার ছাড়িল। গৌরী ষ্টীমারের রেলিং ধরিয়া দাঁড়াইয়া আছে। বাতাসে তাহার গায়ের কাপড় পত্ পত্ করিয়া উড়িতেছে। গৌড়ী একমনে নদীর শোভা দেখিতে লাগিল। কত ষ্টেশন, কত গ্রাম পার হইয়া ষ্টীমার ছুটিয়া চলিতেছে। প্রকাণ্ড পদ্মা নদী। এপার আর ওপার দেখা যায় না। ওপারের গাছপালা সব অস্পষ্ট। যেদিকে তাকান যায় কেবল জল আর জল। কত প্রকারের নৌকা পাল তুলিয়া যাইতেছে। গৌরী কোন দিন ঢাকার বাহিরে যায় নাই। তাহার নিকট এই দৃশ্য বড় ভাল লাগিল।

ক্রমে ক্রমে সূর্য্য রশ্মি ম্লান হইয়া আসিল। ষ্টীমার আসিয়া তারপাসায় ভিড়িল। চারিধারে গোলমাল। ষ্টীমারের দুই ধারের সিঁড়ী নামাইয়া দেওয়া হইল। ষ্টেশনের কুলীরা মাল ওঠা নামা করিতে লাগিল।

যাত্রীদের আজ বেজায় ভীড়, তাহারা ঠেলা-ঠেলি ধাক্কা-ধাক্কি করিয়া কেহ নামিতেছে, কেহ বা উঠিতেছে। নৃপেন একজন কুলীর সাহায্যে মালপত্র লইয়া ষ্টেশনে আসিয়া দাড়াইল।

সম্মুখে পদ্মা তর তর শব্দে বহিয়া যাইতেছে। ষ্টেশনের চারিধারে নৌকা ঠাসা। মাঝিরা যাত্রী ধরিবার জন্য ডাকা-ডাকি হাকা-হাকি করিতেছে। নৌকা বোঝাই যাত্রী যার যার গন্তব্য স্থানে যাইতেছে। মাঝিদের চীৎকার ক্রমশঃ মন্দিভূত হইয়া আসিল। ষ্টেশনের সম্মুখে বিস্তীর্ণ ধানক্ষেত, তাহার শিষগুলি বায়ু ভরে মৃদু মৃদু দুলিতেছে। ভারি চমৎকার দৃশ্য। এত বিশাল ধানক্ষেত, গৌরী এক সঙ্গে কোনদিন দেখে নাই। সহরের গাড়ী, ঘোড়া, দালান ইত্যাদি হইতে পল্লীর শোভা তাহাকে মুগ্ধ করিয়া তুলিল। গৌরী বিস্ময় ভরা চোখ তুলিয়া চারিধারের শোভা দেখিতে লাগিল।

এমন সময় নৃপেন আসিয়া ডাকিল, "ওঠ মা। আর দেরি করিস্ নি। বাপ কি ভীড়। আজ যে নৌকা পেয়েছি, সেই যথেষ্ট।"

সন্ধ্যা নিকটবর্ত্তী। পশ্চিমের সূর্য্য ডুবিয়াছে কিন্তু

তার লাল আভা যায় নাই। গৌরী আসিয়া নৌকায় উঠিল। ঢেউয়ের অবিরত আঘাতে নৌকা দুলিতেছিল। গৌরী কোন দিন নৌকায় ওঠে নাই। তাহার মাথা ঘুরিতে লাগিল, গা বমি বমি করিয়া উঠিল। এতক্ষণ যে দৃশ্য দেখিয়া আনন্দ পাইতেছিল তাহা এক নিমিষে অদৃশ্য হইয়া গেল। গৌরী আর বসিয়া থাকিতে পারিল না। সে মাথায় হাত রাখিয়া শুইয়া পড়িল।

গৌরী বাড়ী আসিয়া হাঁপাইয়া উঠিল। পল্লীর আব-হাওয়া তাহার ভাল লাগিতেছিল না। এখানকার লোক গুলাও যেন কেমন কেমন। সকলেই কেন যে তাহারদিকে হাঁ করিয়া চাহিয়া থাকে, তাহা সে বুঝিয়া উঠিতে পারিত না। মেয়েরাও তাহার বিষয় লইয়া আলোচনা করে। কেউ বলে বাজী মেয়ে, কেউ বা বিবি বলে। গৌরী জুতা পরে; ব্লাউজ গায় দেয়, সে যেন তাহাদের সহ্য হয় না। বাঙ্গালীর মেয়ের অত বিবি কেন? এই সব শুনিয়া শুনিয়া গৌরী বিরক্ত হইয়া যায়। সে কাহার সঙ্গে বড় মিশে না। একা একা থাকে, নিজের মনে বই পড়ে। তাহাতেও সে নিন্দার হাত হইতে রক্ষা পায় না। অনেকেই হাত মুখ বেকাইয়া বলে, "দেমাক দেখে বাঁচিনে। বিদ্যে আছে ত বাপু তোর আছে। অত লোক দেখান কেন? সহুরে মেয়েদের ঢং-ই ঐ রকম।" গৌরীর কাণে সব কথাই যায়। কিন্তু এই রোগের সে কি প্রতিকার করিবে।

সময় কাহারও জন্য বসিয়া থাকে না। সে আপন মনে চলিয়া যায়। গৌরীর বিবাহের দিন উপস্থিত হইল। আজ বিবাহ। সারা দিন অবিশ্রান্ত বৃষ্টি হইতেছে। প্রথম রাত্রেই লগ্ন। সকলেই মহা ব্যস্ত, বসিয়া থাকিবার উপায় নাই। চারিদিকে হৈ-চৈ ছুটা-ছুটি।

বৃষ্টি থামিয়াছে। কিন্তু মেঘ কাটে নাই। প্রতিমুহূর্ত্তে বৃষ্টির আশঙ্কা করা যাইতেছে। বিবাহের জন্য সকলেই তাড়া-হুড়া করিতেছে। এমন সময় শাঁখ বাজিল, উলুধ্বনি হইল, বধূ বেশে গৌরী আসিয়া ছাদনা তলায় আসিয়া দাঁড়াইল। তাহার পরণে লাল টকটকে শাড়ী। মুখে চন্দন চর্চ্চিত কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম।

বর কর্ত্তা হইয়া অবনীবাবুর বড় ভাই অবিনাশবাবু আসিয়াছেন। বৃদ্ধ ভদ্রলোক অমায়িক লোক। এতবড় জমিদার বলিয়া অহঙ্কার নাই, চাল-চলোন নাই। ফুর্ত্তিবাজ লোক; সকলের সঙ্গে হাসি তামাসা করিতেছেন। গৌরী আসিয়া দাড়াইতেই তাহার দৃষ্টি সেই দিকে পড়িল।

সহসা অবিনাশ বাবুর ভাবের পরিবর্ত্তন হইল। তিনি মুগ্ধ নয়নে গৌরীর পানে চাহিয়া রহিলেন। কতগুলি দুষ্ট মেয়ে গৌরীর নিকট দাড়াইয়াছিল। তাহাদের মধ্যে একজনের দৃষ্টি অবিনাশ বাবুর উপর পড়িল। সে সকলের দৃষ্টি সেই দিকে আকর্ষণ করিল। তাহারা সকলেই অবিনাশ বাবুর পানে চাহিয়া মুখে কাপড় গুজিয়া হাসিয়া ফেলিল।

গৌরী দাড়াইয়া আছে। কন্যাপক্ষের একজন লোক বিবাহের অনুমতি চাহিলেন। সকলেই চঞ্চল হইয়া উঠিল। কিন্তু অবিনাশ বাবুর কোন প্রকার চঞ্চলতা প্রকাশ পাইল না। সে অনিমেষ নয়নে গৌরীর পাণে তাকাইয়া রহিলেন।

বিবাহের সময় বরপণ দিবার কথা। অবনী বাবু তাহা এখন পায় নাই। তিনি মনে মনে বিরক্ত হইতেছিলেন। তিনি অবিনাশ বাবুকে বলিলেন, "দাদা এখনও পণের টাকাটা দিলে না। অথচ ক'নে এনে হাজির করেছে।"

অবিনাশ বাবু অন্যমনস্ক ছিলেন। চমকিয়া উঠিয়া বলিলেন, "নৃপেনকে ডেকে দাও, আমি বলে দিচ্ছি।" তাহার পর পুনরায় বলিলেন, "মেয়েটী বড় চমৎকার, কি বলিস্ অবনী। ঠিক যেন আমার সুচিত্রার মতন। আহা ও যদি বেঁচে থাকতো তা হ'লে ঠিক গৌরীর মতন হত।" অবিনাশ বাবুর বুক ভেদ করিয়া একটা দীর্ঘনিশ্বাস বাহির হইয়া গেল।

অবনী বাবু সে কথার উত্তর দিলেন না। কিন্তু অন্যকথা পাড়িলেন, বলিলেন, "নৃপেনকে ত এসে অবধি দেখছি নে। আচ্ছা জোচ্চোরের পাল্লায় পড়া গেল।"

পুরোহিত পুনরায় উঠিয়া বিবাহের অনুমতি চাহিলেন। অবনীবাবু উঠিয়া দাড়াইলেন, বলিলেন, "শুভকাজে দেরী করা উচিত নয়, আমাদের ও সে ইচ্ছা নেই। কিন্তু পণের টাকা ত নৃপেন এখনও দিলে না। তাকেই বা দেখছি নে কেন?"

গৌরীর দূর সম্পর্কের এক ভাই অবনীবাবুর নিকট আসিয়া বলিল, "কাকাবাবু পণের টাকা আনতে গেছেন। তিনি এসেই টাকাটা আপনাকে দিয়ে দিবেন।"

অবনীবাবু পাকা লোক, মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "তাহ'লে একটু অপেক্ষা করা যাক। কি বলুন দাদা?" শেষের কথা কয়েকটি অবিনাশবাবুর দিকে ফিরিয়া বলিলেন।

অবিনাশবাবু তন্ময়। অবনীবাবুর কথা তাঁহার কাণে প্রবেশ করিল না। কিন্তু তাঁহার রেশ গিয়াছে। তিনি সোজা হইয়া বসিয়া বলিলেন, "কি বল্লে, অবনী—দেখত অবনী—গৌরীর হাত, পা গুলোও ঠিক আমার সু-মার মতন, না, রে।" তিনি জিজ্ঞাসু নয়নে অবনীবাবুর পানে চাহিলেন।

অবনীবাবু এই কথায় মনে মনে বিরক্ত হইলেন। কোথায় তিনি পুত্রের বিবাহ দিয়া নগদ পাঁচ হাজার টাকা গুণিয়া লইবেন, না—একি বিশ্রী ব্যাপার আরম্ভ হইল। তিনি অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া অবিনাশবাবুর কথার উত্তরে শুধু বলিলেন, "হু!"

নয়টা হইতে বারটার মধ্যে লগ্ন শেষ। এর পর আর লগ্ন নাই। একটু একটু করিয়া দশটা এগারটা বাজিয়া গেল। নৃপেনের আর পাত্তা নাই। চারিধারে লোক ছুটিল। কিন্তু কাকস্য পরিবেদনা। নৃপেনকে কোথাও খুঁজিয়া পাওয়া গেল না।

অবনীবাবু ধৈর্য্য হারাইলেন। ধৈর্য্য হারাইবার কথাও। কারণ নৃপেনের এক আত্মীয় চুপি চুপি আসিয়া অবনীবাবুর কাণে কাণে বলিলেন, "নৃপেন টাকা যোগাড় করিতে পারে নেই; সেজন্য সে পালাইয়া আছে।" অবনীবাবু এবার গর্জ্জিয়া উঠিলেন, বলিলেন, "ম'শায়! জুচ্চুরির আর জায়গা পান নেই। ফাঁকি দিয়ে মেয়ে বিয়ে দিতে চান।" পুরোহিত ভাল লোক প্রতি উত্তরে কি যেন বলিতে যাইতেছিলেন। অবনীবাবু বাধা দিয়া বলিলেন, "না! না! ম'শায়! আমি এখানে কোনমতেই ছেলের বিবাহ দেব না।"

মহাবিপদ! কন্যাপক্ষের মাতব্বর ছুটিয়া আসিল। অবনীবাবুকে কত বুঝাইলেন। ভদ্রলোকের জাত যায়, মান যায় বলিয়া কান্নাকাটি করিল। অবশেষে পায় ধরিয়া ক্ষমা চাহিল। কিন্তু অবনীবাবুর এক কথা। "ছোট লোকের মেয়ের সঙ্গে ছেলের বিবাহ হ'তে পারে না।"

অবনীবাবু তাঁহার দল বল সহ উঠিয়া পড়িলেন। তখন কন্যার মহলে, কান্নাকাটি পড়িয়া গিয়াছে।

গৌরী সেখানে বসিয়া বসিয়া নিজের কাণে সব কথাই শুনিল। সে শিক্ষিতা মেয়ে, নিজের ভাল মন্দ বুঝিবার যথেষ্ট জ্ঞান হইয়াছে। ঘটনা দেখিয়া শুনিয়া তাহার মুখ ফ্যাকাশে হইয়া গেল। গলা শুষ্ক হইল। মাথা বোঁ বোঁ করিয়া ঘুড়িয়া উঠিল।

বর কর্ত্তারা সকলে উঠিয়া পড়িয়াছে। অবিনাশবাবুও অনিচ্ছার সহিত উঠিলেন। কিন্তু তাঁহার দৃষ্টি বরাবর গৌরীর উপর ছিল। তাহার অবস্থা দেখিয়া তাঁহার পিতৃ হৃদয় কাঁদিয়া উঠিল। তাঁহার বুকের মধ্যে হু হু করিয়া ঝড় বহিয়া যাইতে লাগিল। তিনি ভুলিয়া গেলেন, তিনি বরকর্ত্তা ভুলিয়া গেলেন তার ভাইপোয়ের বিবাহে তিনি নিমন্ত্রিত ব্যক্তি, ভুলিয়া গেলেন তার মান সম্মান। তাঁহার মনে হইল এ গৌরী নয়; এ তাঁহারই একমাত্র কন্যা সুচিত্রা। তাঁহারই সম্মুখে তাঁহারই কন্যার এই বিপদ। তিনি বরিশালের শ্রেষ্ঠ জমিদার হইয়া তাঁহার কন্যাকে রক্ষা করিতে পারিতেছেন না। এ যেন তাঁহারই অপমান। অবিনাশবাবু অস্থির হইয়া উঠিলেন। তাঁহার মনে হইল গৌরী যেন তার পানে কাতর নয়নে চাহিয়া তাঁহার করুনা ভিক্ষা চাহিতেছে।

অবিনাশবাবু আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। তিনি ধীরে ধীরে গৌরীর নিকট আসিয়া দাঁড়াইলেন, এবং ধরাগলায় বলিলেন, কাঁদিস নে মা! আমি এসেছি।"

গৌরী এতক্ষণ ভয়ের সমুদ্রে হাবুডুবু খাইতেছিল। লোকে জলে পড়িলে যে ভাবে তৃণখণ্ড দেখিয়া আঁকড়াইয়া ধরে; গৌরী অবিনাশবাবুর কথা শুনিয়া সেই ভাবে তাঁহার পা দুইখানি চাপিয়া ধরিল। তাহার অশ্রুজলে বৃদ্ধের পা ধৌত হইতে লাগিল।

অবিনাশবাবুকে ওভাবে উঠিয়া যাইতে দেখিয়া সকলেই বিস্মিত হইল। বিবাহের আসর নিস্তব্ধ। এত বড় বিবাহের সভা, তাহাতে সাড়া নাই, শব্দ নাই; সকলের বুক ভয়ে দুর দুর করিতে লাগিল। কন্যাপক্ষের মনে কিসের যেন ক্ষীণ আলোর রেখা ধিক্ ধিক্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। সভাস্থল শুব্ধ। একটা সূচ পরিলেও তাহার শব্দ শ্রুত হয়।

এই নিস্তব্ধতা ভাঙ্গিলেন অবিনাশবাবু। তিনি ধীর গম্ভীর স্বরে সভার দিকে চাহিয়া পৌরুষ কণ্ঠে বলিলেন, "অবনী, তোরা বাস্‌নে,—গৌরীর বিবাহটা তোরা দেখে যা।" সভাসদ সকলেই এক সঙ্গে চমকিয়া উঠিল। এ আদেশ ত

অবহেলা করিবার নয়। এ ত সেই লোকের কণ্ঠস্বর যার নামে এখনও বাঘে-গরুতে এক ঘাটে জল খায়। বর-যাত্রীরা ভয়ে কেহ আর কথা বলিল না। তাহারা যে যার স্থানে চুপ করিয়া বসিয়া পড়িল। কন্যাপক্ষেরা বিস্ময়ে অবিনাশবাবুর মুখের পানে চাহিয়া রহিল। অবিনাশবাবু তাহার ভাইপোকে ডাকিলেন,—"শ্যামল।"

শ্যামল আসিয়া দাঁড়াইল। অবিনাশবাবু গৌরীর ক্রন্দন রত সুন্দর মুখখানি তুলিয়া ধরিয়া সভার দিকে চাহিয়া বলিলেন, "আমার গৌরীমার বিবাহের পণ বাবদ আমার জমিদারীটা শ্যামলকে যৌতুক দিলাম।" সকলেই আনন্দে জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল।

মেঘ কাটিয়া গিয়াছে। ছিন্ন মেঘের ফাঁকে ফাঁকে চাঁদ লুকোচুরি খেলা খেলিতেছে। বাঁশ ঝাড়ের পাতায় ঝির্ ঝির্ শব্দ শ্রুত হইতেছে। বহুদূর হইতে শৃগালেরা হুক্কা হুয়া রবে ডাকিয়া উঠিল। বাড়ীতে আবার হুলুহুলু পড়িয়া গেল। ঘরের মধ্যে শাঁক বাজিল, বাজনদারেরা এতক্ষণ নির্জ্জীবের মতন পড়িয়া ঝিমাইতেছিল, এখন হুকুম পাইয়া ভীষণ ভাবে বাজনা বাজাইতে লাগিল। বিবাহ যথা সময় আরম্ভ হইল। এই ব্যাপারে সকলের মন আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিল। কেবল অবনীবাবু সভার মধ্যে মাথা নত করিয়া বসিয়া রহিলেন।

বিপ্রলব্ধা

শ্রীসত্যনারায়ণ দাশ

আকাশে উঠিছে চাঁদ, কলকল ছলছল তটিনীবহে—
জোছনা ঝরিয়া জলে পাপিয়ার তানে তানে কতকি কহে,
আঁকিছে বনার মুখে চলোর্মি চুম্বন খেলার ছলে
এখনো এলনা কেন আবছায়া প্রদোষেতে আসিব বলে!

পাখীরা উড়িয়া যায় ঝাঁকে ঝাঁকে নীলিমায় স্বপন সুখে
আশা ও ভীতির বীচি আনা গোনা করে শুধু রিক্ত বুকে,
ছাড়িল খেয়ার তরী, ফিরে এল পুনরায় নদীর কূলে
হর্ষ হাসির খণে অনুরাগে রাঙাবাণী গেল কি ভুলে?

সরণী ফুরাতে তার, চাহেনাক বুঝি আর মধুর কালে
সান্ধ্য সবুজ ছবি পরাণের কোষে কোষে গরল ঢালে,
তারারা উঠিছে নভে মধুক্ষণ বয়ে যায় এলনা হায়
জমাট বিষাদময়ী জোৎস্না দীপালোকে পরাণ ছায়।

যতনে বাঁধিনু বেণী, কুঙ্কুম সৌরভ অঙ্গ ভরে'—
আসিব বলিয়া হেথা জানিনাক' এলনাক কিসের তরে?
নীবির বাঁধন খসে, কবরীর ফুল ডোর পড়িছে ভূমে
এলনা এলনা হায়, সারা তনু ঢুলে পড়ে অলস ঘুমে।

হয়ত চলার পথে তন্বীর ছায়া কোন পড়েছে আসি
চরণ থিচল তাই বোঝেনাক হেথাকার বেদনা রাশি;
তাহারি কথার গানে বিস্মৃতি আনিয়াছে উদাস মনে
এলনা এলনা তাই আলপনা অঙ্কিত মধুর খণে।

কোণারকের পথে

—শ্রীকাশীকান্ত ঠাকুর

আমরা যখন পুরী ষ্টেশনে এসে পৌঁছলুম তখন বেলা ন'টা কি সাড়ে ন'টা হবে। ছোট্ট একটী ষ্টেশন। ষ্টেশনে নামবার আগে আমরা ঠিক করেছিলুম যে, পুরীতে একখানা ঘর ভাড়া ক'রে সমুদ্রের ধারে থাকব। সেই জন্যে তপনবাবুর নির্দ্দেশ মত আমরা একটা রিক্সায় মালপত্র চাপিয়ে ধীরে ধীরে সমুদ্রের দিকে এগোতে আরম্ভ ক'রলাম। তপনবাবুর এক দূর-সম্পর্কীয়া দিদিমা বহু দিন হ'তে এইখানে বাস ক'রছেন। আমরা ঠিক করলাম দিদিমার ঘরে সুটকেশগুলো রেখে ঘর খুঁজতে বেরুব। দিদিমা যে ঠিকানায় ছিলেন—সেই ঠিকানায় গিয়ে দেখলাম, তিনি অন্য ঠিকানায় স্থানান্তরিত হ'য়েছেন। প্রাপ্ত ঠিকানায় গিয়ে যখন পৌঁছলুম, তখন বেলা সাড়ে দশটা বেজে গিয়েছে। বালুর রাস্তা—উঠেছে গরম হয়ে। দিদিমার ঘরে সুটকেসগুলো রেখে তাড়াতাড়ি সমুদ্রে স্নান করবার জন্য বেরিয়ে পড়লাম। আমি তখন সমুদ্র দেখবার জন্য অতিষ্ঠ হ'য়ে উঠেছি। আজীবন যে সমুদ্রের কথা লোকের মুখে বইয়ের পাতায় কত আপনার রঙে রাঙিয়ে রেখেছি, তারই একান্ত কাছে এসেও না দেখতে পাওয়ার জন্য অধীরতা হবে, সে আর বেশী কি! একটু এগিয়ে মোড় ফিরতেই দেখি—সমুদ্র—

এই সেই সমুদ্র—আঃ—আনন্দের পূর্ণতায় মন ভরে উঠল। কিছু সময় বাদেই পঠিত বিদ্যার তুলনামূলক পংক্তি মনে আসতে লাগল। মনের আনন্দে আপন মনে আবৃত্তি করে উঠলাম। শঙ্খের ধ্বনি সমুদ্রের ধ্বনি দুই মিলে অপূর্ব্ব আনন্দ দিল মনে…সমুদ্রের বুকে ঝাঁপিয়ে পড়লাম। নুলিয়া নিয়ে আমার বন্ধুরা এগিয়ে গেলেন আমি পাড়ের কাছে যেখানে ঢেউ এসে আছড়িয়ে পড়ে ভেঙে যাচ্ছে, তার থেকে একটু এগিয়ে স্নান করতে লাগলাম। একজন স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে বললেন, 'নুলিয়া নেবার কি দরকার, এই দেখুন ঢেউ এলে হয় ডুব দেবেন নয় ঢেউয়েরই সঙ্গে লাফিয়ে উঠবেন। আবার তলা দিয়ে যখন সমুদ্রের দিকে টানবে তখন পা দুটো শক্ত করে বালুতে চেপে ধরবেন'।

কিছু সময় বাদে নিজেকে বেশ ক্ষুধার্ত্ত এবং তৃষ্ণার্ত্ত বলে মনে হল। আমারই চতুর্দ্দিকে জল—কিন্তু মুখে দিলে বিবমিষায় সমস্ত শরীর গুলিয়ে ওঠে। Coleridge এর একটী লাইন মনে পড়ল, 'Water water everywhere, nor any drop to drink.'

স্নান ক'রে দিদিমার কাছে ফিরবার পথে পূর্ব্বসঙ্কল্প ত্যাগ ক'রে ঠিক হ'ল আমরা হোটেলেই উঠব। এখন উপস্থিত হোটেলেই আহারের ব্যবস্থা করতে হবে। বাড়ী ফিরতেই দিদিমা আমাদের চিড়ে-মুড়কী নাড়ু দিলেন



সমুদ্রবেলায় নুলিয়ারা জাল শুকোচ্ছে

জল খেতে। দিদিমার দেওয়া খাবার আমার কাছে অমৃতের মত বোধ হয়েছিল।

পোষাক পরিবর্ত্তন করে আমরা হোটেলের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়লাম। 'শান্তিনিবাসে' এসে ম্যানেজার ম'শায়ের সঙ্গে আলাপে বুঝলাম বৃদ্ধ লোকটী বড়ই ভদ্র। তাড়াতাড়ি সেইখানে খেয়ে আমাদের ঘর দেখে জিনিষপত্র এনে গুছিয়ে ফেললাম। এই 'শান্তিনিবাস' স্বর্গদ্বারে, সামনেই সমুদ্র, আর পাশে শ্মশান। আমি খাওয়ার পরই সমুদ্রের ধারে এসে বসলাম। সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গের তালের ধ্বনি শুনতে শুনতে কখন ঘুমিয়ে পড়ি। বিকেলবেলা চা, লুচি

খেয়ে আমরা সমুদ্রের ধারে বেড়াতে বেরুলাম। ফিরে এসে দেখি—রাত ন'টা বেজে গিয়েছে। আমরা খেয়েই আবার সমুদ্রের বালুর ওপর এসে শুয়ে পড়লাম। দশটা বাজতেই চারিদিকের নিস্তব্ধতা বাড়তে লাগল, আর এদিকে সমুদ্রের গর্জ্জন তত স্পষ্ট হ'তে স্পষ্টতর হ'তে লাগল। মাথার ওপর শুক্লা সপ্তমীর চাঁদ হেলে পড়েছে, অদূরে শ্মশানে একটা চিতা জ্বলতে জ্বলতে নিভে এসেছে, পায়ের কাছের সমুদ্র গর্জ্জন করে রাগে ফুলতে ফুলতে কি যেন এক কথা বলতে গিয়ে বলতে পারছে না—সব মিলে এক ভয়মিশ্রিত আনন্দ সেদিন আমার হয়েছিল। পরদিন খুব ভোরে উঠতে হবে, কারণ, তা না হলে সূর্য্যোদয় দেখতে পাব না। আগেই ম্যানেজার মশায়ের কাছে খবর নিয়ে জেনেছি, এখন শুধু সূর্য্যোদয়ই সমুদ্রের ভেতর হ'তে হয়—সূর্য্যাস্ত হয় না। তাই আমরা আর দেরী না করে শুতে গেলাম।

পরদিন খুব ভোরে উঠে সমুদ্রের ধারে বেরিয়ে পড়লাম; কিন্তু যেখান থেকে সূর্য্যোদয় হবে ঠিক সেইখানেই মেঘ জমে থাকায় বিফল মনে ফিরতে হল।

বাড়ী ফিরে মনে করলাম কালকের সঙ্গে আজকের সকালের সমুদ্র দেখার অনুভূতি কবিতায় লিখব। কিন্তু কবিতা লিখতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথের 'সমুদ্রের প্রতি'র প্রতিটি লাইন আমার কবিতা লেখায় বাধা হয়ে মনে আসতে লাগল। ভেবে দেখলাম, ওই কবিতার কথা ছাড়া আর কোন কিছু দিয়ে আমি সমুদ্র দেখি নি—আর যেটুকু দেখিই তার মধ্যে Byron-এর 'Ocean' এসে মিশে রয়েছে। এই প্রথম দুঃখ পেলাম নিজের অধীতবিদ্যার জন্য। মনে হল আজ যদি আমি মূর্খ হতাম তবে হয় ত নিজের মনের ভাষা বুঝতে পারতাম। আজ প্রথম বুঝলাম নিষ্ঠুর স্পষ্ট করে—যে, আমার চিন্তা আমারই চারিদিকের চিন্তার অনুকৃতি মাত্র।

বেলা দশটায় আবার সমুদ্র-স্নানের জন্য বেরিয়ে পড়লাম। ঢেউয়ের পর ঢেউ তার পর ঢেউ শেষ গিয়ে মিশেছে দূরে, তারপর গম্ভীর প্রশান্ত সাগর। স্নান করে যখন ফিরলাম তখন বেলা অনেকখানি বেড়ে গিয়েছে। খাওয়া শেষ করে উঠতেই বন্ধুরা তাস নিয়ে বসে পড়লেন। আমিও দর্শনীয়ের সন্ধানে বেরিয়ে পড়লাম। আমাদের নিবাসের অল্প একটু দূরেই শঙ্করমঠ, শুনতে পেয়ে আমি তারই উদ্দেশ্যে প্রথমে যাত্রা করলাম।

'শঙ্করমঠ'

এই মঠের মধ্যে যখন আমি গেছলাম তখন বেলা দেড়টা হবে। এখানকার অধিবাসীরা তখন প্রসাদ গ্রহণে ব্যস্ত ছিলেন বলে আমাকে একটু অপেক্ষা করতে হল। অল্প সময় পরে একজন মঠাধিবাসী যুবক আমায় মন্দিরের দরজা খুলে দিলেন। মন্দিরে প্রবেশ করে প্রথমেই একটা পাথরের বেদীর ওপর দু-জোড়া খড়ম্ দেখতে পেলাম। একজোড়া রুপো বাঁধান, অপরটা সাধারণ কাঠের। মঠাধিবাসীরা এই খড়ম্ শঙ্করের ব্যবহৃত বলে প্রচার করে থাকেন। পাশেই একটী তান্ত্রিক মতানুযায়ী "যন্ত্র" দেখতে পেলাম। ওপরে দেবনাগরী অক্ষরে লেখা 'চিদম্বর মহা-যন্ত্রম্'। উত্তরদিকে সামনে জগন্নাথের মূর্ত্তি, আর দুপাশে দুর্গামূর্ত্তি রয়েছে। পাশে কাঠের ঘেরা একটী স্থানে শঙ্করের মর্ম্মরমূর্ত্তি স্থাপিত দেখতে পেলাম। মঠের মন্দিরের মধ্যে এবং বাইরে শুধু ছবি আঁকা দেওয়ালে এবং সমস্তই দেবতাদের, এক জায়গায় শুধু বেদান্তের চারটী মহাবাক্য লেখা রয়েছে। শঙ্কর যখন বৌদ্ধধর্ম্মকে শাস্ত্রমতে পরাস্ত করে সনাতন হিন্দুধর্ম্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন, তারই নিদর্শন স্বরূপ ভারতের চারটি দিকে চারটি মঠ স্থাপনা করেছিলেন। দ্বারকায় 'সারদামঠ', বদরীক্ষেত্রে 'জ্যোতির্ম্মঠ,' শ্রীক্ষেত্রে 'গোবর্দ্ধনমঠ' এবং মহীশূরের কাছে ঋষ্যশৃঙ্গাশ্রমে 'শৃঙ্গেরীমঠ' আমি যখন মন্দিরের মধ্যে দেখছিলাম, তখন এখানকার ম্যানেজার শ্রীজনার্দ্দন রথ আমার দেখায় যথেষ্ট সাহায্য করেন। তিনি আমায় এখানকার লাইব্রেরী দেখবার সুযোগ দেন। এই লাইব্রেরীতে তিনটী বন্ধ আলমারী এবং তিনটী খোলা র‍্যাক আছে। বন্ধ আলমারীর সমস্ত বই-ই দেবনাগরী অক্ষরে সংস্কৃত ভাষায় লেখা। একটী আলমারীতে শুধু পুঁথি আছে। র‍্যাক্ তিনটীর একটিতে তালপাতার পুঁথি (উড়িয়া ভাষায় খোন্তার সাহায্যে লেখা), বাকি দুটিতে বিবিধ ভাষায় কাগজে লেখা পুঁথি। এই খোন্তা এক বিচিত্র জিনিষ, লোহার তৈরী।

এই স্থান দিয়ে তালপাতার ওপর কেটে কেটে লেখা হয়, পরে তালপাতার ওপর কালী দেওয়া হয়। অক্ষরে কালী বসে গেলে পরে মুছে ফেলা হয়

এই সমস্ত পুঁথির মধ্যে উড়িয়া ভাষায় লিখিত তালপাতার পুঁথি সর্ব্বপ্রাচীন; কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত অযত্ন ও অব্যবহারে উইপোকার খাদ্য বস্তুতে পরিণত হয়েছে। শুনলাম, এর কিছু এসিয়াটিক সোসাইটিতে স্থান পেয়েছে। মনে ভাবলুম, সবগুলোই স্থান পেলে ভাল হত। মঠের অধিবাসী একজন স্থানীয় লোককে একটি তালপাতার পুঁথি দিয়ে বললাম পাঠ করতে, অপারগ হয়ে সে আমায় ফেরত দিল। এই মঠের একটী ছেলেকে 'হরিদাসের সমাধি-ক্ষেত্রে'র কথা জিগ্যেস্ করতে সে আমায় সেইখানে নিয়ে যাবার জন্য বেরিয়ে এল। এই মঠের পেছন দিকে সমাধিক্ষেত্র। ডানদিকে বর্দ্ধমান মহারাজার সমাধির প্রতীক রয়েছে। একটু এগোতেই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর ভজন-কুটীর দেখতে পেলাম। কিন্তু কুটীর আর নেই, ভগ্নাবশেষ রয়েছে। আরও কিছুদূরে যেতেই হরিদাসের সমাধি-মন্দিরে উপস্থিত হলাম।

'যবন হরিদাসের সমাধি-মন্দির'—এই মন্দিরে ঢুকেই বাঁদিকে হরিদাসের সমাধি-ক্ষেত্র। সামনে মহাপ্রভুর মূর্ত্তি। এই মন্দিরের সঙ্গে ছোট্ট একটী লাইব্রেরীও আছে। এইখান হতে বেরিয়ে সোজা আমাদের নিবাসে যখন চলে আসি, তখন বেলা সাড়ে পাঁচটা। তাড়াতাড়ি জলখাবার আর চা খেয়ে সমুদ্রের ধারে বেরিয়ে পড়লাম।

মন্দিরের পথে—পরদিন ঠিক হল মন্দিরে যাবার পথে সিদ্ধ বকুল আর রাধাগম্ভীরা দেখে যাব। আমাদের নিবাসে পার্থবাবুর সঙ্গে আলাপ হয়, তিনিও আমাদের সঙ্গ নিলেন। সিদ্ধ বকুলের বিশেষত্ব, তার মূল নেই। গাছের ছাল খানিকটা মাটির মধ্যে আছে, তারই সাহায্যে সমস্ত গাছটা আছে বেঁচে।

রাধাগম্ভীরায় শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কন্থা, কমণ্ডলু আছে। শুনলাম, এখানে তিনি সংকীর্ত্তন, পাঠ ইত্যাদি করতেন।

মন্দিরের বাজারের কাছে যখন পৌঁছলাম তখন বেলা ৯টা হবে। মন্দিরের চূড়া বহুদূর হতে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছিল, এইবার সম্পূর্ণ মন্দিরই আমাদের দৃষ্টিপথে এল। মন্দির প্রবেশের মুখে একটী স্তম্ভ আছে, এই স্তম্ভটীর নাম 'অরুণস্তম্ভ'। শুনলাম, কোণারকের সূর্য্যমন্দিরের সামনে এই স্তম্ভটি ছিল।

মন্দিরের গায়ে উৎকীর্ণ দেব-দেবীর মূর্ত্তির সঙ্গে রয়েছে অদ্ভুত বিকটাকার দানবীয় মূর্ত্তি, আর সমস্ত মন্দিরের স্থানে



মুক্তেশ্বরের মন্দির

স্থানে রয়েছে মানুষের দৈহিক বিলাসের প্রতিমূর্ত্তি। এই মন্দিরের প্রতিষ্ঠা হয়েছে খৃঃ ১০ম শতাব্দীতে। চোল গঙ্গদের তখন ছিল রাজত্ব। এই সময় স্থাপত্যশিল্পে দাক্ষিণাত্য, ভারতীয় শিল্পের এক বিশেষ স্থান অধিকার করেছিল। কিন্তু ক্রমবর্দ্ধমান সাত্ত্বিক পরবর্ত্তী যুগীয় লোকেরা এই শিল্পকে গ্রহণ করল না। যে নিষ্ঠুর সত্যকে প্রচ্ছন্ন রেখে নিজেকে নূতন করে প্রকাশের ভঙ্গী সে জেনেছে, তাকেই পরিহাস করতে কোথায় যেন তার বাধল, তাই তার নগ্নতাকে লোকের চোখের সামনে Art for Art's sake এর জন্যও রাখতে বেধেছিল।*

মন্দিরের মধ্যে প্রবেশ করে প্রথমেই জগন্নাথ দেবের মূর্ত্তি চোখে পড়ল। মন্দির বড় অন্ধকার। মাটীর প্রদীপের আলোয় প্রথমে জগন্নাথদেবের মূর্ত্তি দেখেছিলুম। ঘোর কাটলে ধীরে বলরামদেব ও সুভদ্রাদেবীর মূর্ত্তি দেখতে পেলাম।

পথে বেরিয়ে ঠিক হল, ফিরবার পথে এখন একখানা ঘোড়ার গাড়ী করে আমরা আর বাকী সব দর্শনীয় যা তা দেখে ফিরব।

* পরে জেনেছি, মন্দিরের আসল পাথরের দেওয়াল সম্পূর্ণ চোল-গঙ্গদের তৎকালীন শিল্পে পরিপূর্ণ। তাই তাকে প্রায় নয় ইঞ্চি পরিমাণ সিমেন্টের প্ল্যাষ্টার দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয়েছে। এটা বেশী দিন হয় নি।

প্রথমে আমরা আঠারনালা১ পার হলাম, তারপর চন্দনপুকুর,২ তারপর বিজয় গোস্বামীর মঠ, পাশের কুলদারঞ্জন ব্রহ্মচারীর মঠ হয়ে গাড়ী মোড় ফিরল। এদিকে প্রথমে ইন্দ্র সরোবর,৩ তারপর মাসীর বাড়ী৪ হয়ে আমরা যখন ফিরলাম তখন বেলা বারটা।

বিকেল বেলা যখন বেড়াতে বেরুলাম তখন বেলা পাঁচটা। সমুদ্রের কোল ঘেঁসে বেলাভূমির উপর দিয়ে যাচ্ছি, মাঝে মাঝে ঢেউয়ের মৃদু আঘাত এসে লাগছে, পায়ে খানিকটা ফেনার হচ্ছে সৃষ্টি, আবার যাচ্ছে মিলিয়ে বালুতে। নানা রঙের ঝিনুক মাঝে মাঝে দিচ্ছে দেখা—কুড়িয়ে নিজের পকেট প্রায় ভর্ত্তি করে ফেলেছি।

এক জায়গায় কতকগুলো ছেলে মেয়ে জড় হয়ে বালুর বাড়ী তৈরী করেছে। বেশ বড়, তাতে দিয়েছে রাস্তা, গড়েছে মন্দির, ঘর; ছোট্ট একটী মেয়ে লাল ফ্রক্ পরে সেই বাড়ীর চার পাশে ঘুরে ঘুরে হাততালি দিয়ে নৃত্য করছে। হঠাৎ একটা বড় ঢেউ এসে সমস্ত বাড়ীটাকে ভেঙ্গে দিয়ে চলে গেল। মেয়েটীর নৃত্য গেল থেমে, বোবার মত সমুদ্রের দিকে চেয়ে রইল। তারই অল্প বড় ভাইটী, যে ওই বাড়ীগঠনের ছিল একজন প্রধান শিল্পী, হঠাৎ খল্‌খলিয়ে হেসে উঠল। এগিয়ে চলেছি। নর-নারীর মেলা, বিচিত্র বর্ণচ্ছটার মধ্যে বিচিত্র বর্ণের সমাবেশ। দূরে কখন সূর্য্য অস্ত গেছে, তারই শেষ রশ্মি আকাশে করেছে বর্ণ-বৈচিত্র্য। সমুদ্রের জলেও চলেছে রঙের খেলা। আমার মনে কি যেন এক আনন্দের সুড়সুড়ি অনুভব করলাম। মনে পড়ে গেল, ছেলে বেলায় গঙ্গার ধারে বিকেল বেলায় যখন এমনি সারা আকাশে রং দেখেছি, তখন ছুটে যেতে ইচ্ছে করত গেরুয়া রঙের ওই আকাশের ছোট ছোট রঙীন মেঘের পাহাড়ের গায়ে লুকিয়ে লুকোচুরি খেলতে।

আমার ছেলেবেলা শহরের বদ্ধ পাশের মধ্যে দিয়ে কেটেছে। পরিপূর্ণ আলো বাতাস কখনও পাইনি। চোখের সামনে আকাশকে কখন মিলিয়ে যেতে দেখিনি। তাই আকাশের দিকে চেয়ে আমার হত হিংসে, অতবড় স্থান নিয়ে যারা বাস করে তাদের ওপর। ঠাকুরমার কাছে জিগ্যেস করে জেনেছিলাম, দেবতাদের শিশু ওইখানে খেলা করে। আজ যখন আকাশ, জল এবং বেলাভূমিতে একই রংয়ের সমাবেশের মধ্যে নিজেকে দেখলাম তখন বহুদিনের আকাঙ্ক্ষিত পাওয়ার আনন্দে মন উঠল উৎফুল্ল হয়ে। মন আমার ভরে উঠেছে, কিন্তু সুখ পাচ্ছে না পরিপূর্ণ করে; কেন না, কারুর কাছে সে প্রকাশিত হতে পাচ্ছে না বলে।

এক জায়গায় এসে বসে পড়লাম। আর এগোতে ভাল লাগছিল না। বসে বসে সমুদ্রের দিকে চেয়ে আছি। সমুদ্র বিপুল জলরাশির বাধা। প্রকৃতি মানুষের অগ্রগতির বাধা। যেন পিঠোপিঠি ভাই বোন, তাদের মধ্যে কোন বিষয় নিয়ে হয়েছে ঝগড়া; একজন দিচ্ছে বাধা, অপরজন করছে অতিক্রম। অথচ একই অমৃতে দু'জনে পুষ্ট। এই সমুদ্র মানুষকে মানুষের কাছ থেকে রেখেছিল দূরে বিচ্ছিন্ন করে। মানুষ জলযান সৃষ্টি করে তাকে করেছে অতিক্রম। বিজ্ঞান সৃষ্টি সমগ্র মানবের হিতসাধনের জন্য—মনে পড়ে গেল যুদ্ধের কথা; তবে কেন তা ধ্বংসের দিকে নিয়ে যাচ্ছে?

হঠাৎ পিছনদিকে পিঠের ওপর চাপ অনুভব করতেই ফিরে দেখি হিমাংশু, আমার কলেজের বন্ধু। হিমাংশুর এখানে Boarding আছে। আমি এসে অন্য হোটেলে উঠেছি শুনে বেশ একটু কথা শুনতে হলো। আমিও নিজেকে বাঁচাবার জন্যে প্রথমে বললুম, তুমি যে এখন এখানে থাকবে সে কথা ছিল না। রাঁচির প্রোগ্রাম এখন তোমার, আর দ্বিতীয় আমরা চারজন, একা নই। যুক্তি খুব যুক্তিহীন না হওয়ায় মুক্তি পেলুম প্রতিশ্রুতিতে। অর্থাৎ কাল তার ওখানে উঠে বাকি দিনের গুজরান্ করব বলে। হাত ধরে টেনে বসিয়ে বললাম, "বস্—কত বেড়াবি আর, সন্ধ্যে হয়েছে, একটু পরেই বেশ বড় চাঁদ উঠবে, আকাশ বেশ পরিষ্কার। তুই না থাকলে ভাল লাগবে না।" হিমাংশু হেসে বলল, "বসতে রাজি, কিন্তু এক সর্ত্তে, ন'টার পর তোমাকে আমার সঙ্গে এখানকার Bengali Club-এ যেতে হবে। সেখানে আমার গান গাইবার কথা, দুর্গাপূজা আছে। আজ নবমী।

১। কোন এক রাজা তার আঠারটী পুত্র-সন্তানকে এইখানে বলি দিয়েছিলেন।

২। এই পুষ্করিণীতে জগন্নাথদেবকে রথের সময় স্নান করান হয়।

৩। একটী সরোবর—পাশে ইন্দ্র ও শচীদেবীর মূর্ত্তি স্থাপিত রয়েছে।

৪। রথের সময় জগন্নাথদেবের বিগ্রহ এই বাড়ীতে থাকে। বাড়ীটী বড়বড় এবং সেই সময় যে বিরাট ভোজ হয়, তারই রান্নাঘর প্রভৃতি আছে।

দু'জনে বসে আছি সমুদ্রের উপকূলে, সামনে সমুদ্র—এত সময়ের এতকথা আর কিন্তু বলতে ইচ্ছে করল না।

সামনের অস্পষ্ট চাঁদ লালরঙের বড় একখানা তামা থালার মত সমুদ্রের ওপর দিয়ে ধীরে ধীরে আকাশের গায়ে বেয়ে উঠতে লাগল। এদিকে যতই অন্ধকার গাঢ়তর হতে লাগল, চাঁদের উজ্জ্বলতা ততই স্পষ্টতর হয়ে উঠল।

সাতটা আটটা বেজে ঘড়ির কাঁটা ন'টার দিকে এগিয়ে চলেছে। চারপাশের লোকজন অনেক কমে এসেছে।



জগন্নাথদেবের মন্দির

মাঝে মাঝে এক একটা জায়গা জুড়ে কতগুলো ক'রে লোকের অস্পষ্ট কালো কালো মূর্ত্তি দেখা যাচ্ছে। লোকদের চলাফেরা প্রায় বন্ধ হয়ে এসেছে। সমুদ্রের ফেনার ওপর চাঁদের জ্যোৎস্না পড়ে মনে হচ্ছে, মুঠো মুঠো মুক্তো কে যেন ছড়িয়ে দিচ্ছে ঐ সমুদ্রের বুকে।

পরদিন সকালে আমরা Boarding-এ উঠে এলুম। ভূ-পর্য্যটক শ্রীযুক্ত রমানাথ বিশ্বাসের সঙ্গে এখানে দেখা হল। অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি আমাদের একজন হয়ে গেলেন, তাঁর বাস্তবজীবনের পর্য্যটনের গল্পের মধ্য দিয়ে কখন যে দশটা বেজে গেল, তা আমরা টেরই পাইনি। মুলিয়া এসে দাঁড়াতে ঘড়ির দিকে চেয়ে দেখি—দশটা বেজে গিয়েছে।

ভুবনেশ্বরের নলিনী বাবুকে তাঁর অধ্যাপকের সঙ্গে এখানে দেখতে পেলাম। নলিনীবাবুর সঙ্গে কথায় কথায় জানতে পারলাম, তাঁর কোণারক যাবার বড়ই ইচ্ছে, কিন্তু সঙ্গীর অভাবে যাওয়া হয়ে উঠছে না। তাঁকে জানালাম, আমারও যাবার সম্পূর্ণ ইচ্ছা আছে, অবিশ্যি যদি সঙ্গী পাই। নলিনীবাবু বললেন, তবে আর একজন হলেই যাওয়া যাবে, কারণ Victoria Club-এ ডাঃ সুশীল রায় আছেন, তিনিও পারছেন না ওই একই কারণে, আমি বললাম 'একজনের অভাব হবে না, 'নিবাসে' মিঃ মুন্সি—আমায় একদিন কথা প্রসঙ্গে কোণারক যাবেন বলেছিলেন। অতএব 'শুভস্য শীঘ্রম্'। দেখুন, বাধা অনেক, সুযোগ কম। চাই কি আজই যোগাড় করে যদি সুবিধে হয় ত আমরা আজই রওনা হয়ে যাই। গরুর গাড়ীতে যেতে হবে, সময় লাগবে অনেকখানি। ট্যাক্সি যেতে পারে না, মাঝখানে জল আছে। দূরত্বও কম নয়—ছাব্বিশ মাইল।' নলিনীবাবু ডাঃ সুশীলরায়ের খোঁজে আর আমি মিঃ মুন্সির খোঁজে বেরিয়ে পড়লাম—বেলা তিনটের সময়। মিঃ মুন্সি আমার কথা শুনেই রাজী হয়ে গেলেন, বললেন, 'কিন্তু দেখুন, আজতো আর হয় না। প্রথম গাড়ী ঠিক করতে হবে, গরুর গাড়ী এখানে পাবেন না, মন্দিরের কাছে থাকে, সেখানে গিয়ে আনতে হবে। আর আমি নিজেও ঠিক প্রস্তুত নই। কাল সন্ধ্যের সময় রওনা হওয়া যাবে।'

আমি ফিরে এসে চায়ের টেবিলে দেখি নলিনীবাবু আমার জন্ত অপেক্ষা করছেন। গিয়ে বসতেই নলিনীবাবু বললেন, 'সুশীল বাবু কালকের কথা বললেন তাঁর একটু কাজ আছে। আর দেখুন, অবনীবাবু আজ চলে যাচ্ছেন আমার থাকা উচিত, কি বলুন?' আমি হেসে বললাম, 'এতে কিন্তু করবার কিছু নেই। কালই যাওয়া হবে।' পরে মুন্সির সঙ্গে যা কথা হয়েছে, তা আনুপূর্ব্বিক সব বললাম। 'বরং ঠাকুরের মারফত গাড়ীর ব্যবস্থা করে ফেলা যাক্। আপনি তো দু'দিন আছেন, আপনাকে চেনেও, আপনি কথা বলে ঠিক করে রাখুন।' আমি এই বলে বেরিয়ে পড়লাম সমুদ্রের ধারে।

অফুরন্ত জলরাশি—ঢেউয়ের পর ঢেউ হামাগুড়ি দিয়ে আসতে আসতে বেলাভূমির তীরে অট্টহাস্যে যেন ফেটে পড়ছে।

কোণারক—সূর্য্যমন্দির—বহুদিনের আকাঙ্ক্ষিত দৃশ্যবস্তু,

বোধ হয় দেখতে পাব। সন্দেহশঙ্কিত মন সম্পূর্ণ বিশ্বাস করতে যেন পারছে না, যদি না হয়।

ভোর বেলায় উঠেই সোজা সমুদ্রের তীরে চলে এলাম কিন্তু অন্যদিনের মত আজও মুক্ত সূর্য্যকে সমুদ্রের ভেতর দিয়ে উদয় হ'তে দেখতে পেলাম না। শুধু সূর্য্যের উদয়ের কাছ দিয়ে খানিকটা মেঘ জমে রয়েছে। ইচ্ছে হল, একটা ছুরী দিয়ে ওই মেঘটাকে ছিঁড়ে দিই।

Boarding-এ যখন ফিরিলাম তখন বেলা আটটা। আমাদের চাকরটা দু'কাপ চা নিয়ে ফিরে গিয়েছে। সামনে হিমাংশুর সঙ্গে দেখা। পিঠের উপর ছোট্ট একটা ঘুষি মেরে পাশের একটা ঘরে নিয়ে গেল।

ইতিমধ্যে চাকর এসে চা আর জলখাবার দিয়ে গেল। হিমাংশু বললে, 'নে চা খেয়ে নে। আমার তো দুবার হয়ে গেল। তোর কি ক্ষিদে তেষ্টা নেই?' উত্তরে বললাম, 'ক্ষিদে কি আজ পেয়েছে—সেইজন্যেই তো এখানে এসেছি ক্ষিদে মেটাবার জন্যে—ইচ্ছে করছে উটের মত কিছু সঞ্চয় করে নিয়ে যাই কিন্তু থাকবে কিনা কে জানে। আরে হিমাংশু বলতে পারিস্ সমুদ্র দেখে কখন তোর ক্লান্তি এসেছে? আমার কি মনে হয় জানিস্; সমুদ্র দেখায় ক্লান্তি আসে তখনই যখন ক্লান্তি নেবে আসে দেহে এবং মনে।'

এবারকার ঘুষিটা একটু জোরে এসে পড়ল। হিমাংশু Practical বলে নিজেকে প্রচার করে। হেসে বলে উঠল 'ওসব বুঝি না, ভাললাগে তাই আসি। তবে বেশীদিন থাকি না, কারণ, ভাল লাগে না। মানুষ ছাড়া কোন যায়গায় কোন সৌন্দর্যের রূপ আছে কি না সে বিষয়ে আমার সন্দেহ আছে। ভাল কথা, প্রথমতঃ তোর কেমন লাগছে বল? তোর অসুবিধে হলেই বলিস কিন্তু। আর তোকে নলিনী বাবু ডাকছিলেন। তুই নাকি কোণারক যাবি? যা দেখে আয়, আনন্দ পাবি। আমার কয়েকবার হয়ে গিয়েছে।' আমি তাড়াতাড়ি উঠে বললাম, 'ভাল করেছিস্ আমার মনে করিয়ে দিয়ে আমি নলিনীবাবুর সঙ্গেই এখন একটু দেখা করতে চাই।'

বাইরে এসে দেখি নলিনীবাবু খবরের কাগজ পড়ছেন। আমায় দেখেই বললেন, 'দেখুন, গাড়ী ঠিক হয়ে গিয়েছে। দুখানা ঠিক করলাম আট-টাকা করে নেবে। ঠিক্ সন্ধ্যের সময় আমরা খেয়ে তৈরী হব। গাড়ীও ৭টার মধ্যে আসবে। আপনি বরং খাওয়ার পর দু'পুরে মিঃ মুখার্জিকে খবর দেবেন, আমিও সুশীলবাবুকে বলে আসব যে, তাঁদের ৭টার সময় নিয়ে যাব।

[ক্রমশঃ



গুরু নানকসাহেব

শ্রীবিপিনবিহারী দাশগুপ্ত এম, এ

জন্ম ও বাল্যাবস্থা

লাহোরের পশ্চিমে এবং রাবীনদীর তীরে নন কানা সাহেব নামে একটী গ্রাম আছে। ননকানা সাহেব পূর্ব্বে একটী ছোট গ্রাম ছিল এবং তলবন্তী নামে প্রসিদ্ধ ছিল। প্রায় সাড়ে চারশত বৎসর পূর্ব্বে এই গ্রামে কালু রায় নামে একজন পটওয়ারী ছিল। ঐ সময়ে তলবন্তী গ্রামে রায়-বুলার নামে এক মুসলমান রাজপুত হাকিম ছিল। ইনি খুব সচ্চরিত্র লোক ছিলেন এবং লোকজনের প্রতি সদ্ব্যবহার করিতেন।

সংবৎ ১৫২৬ কার্ত্তিক মাসে পূর্ণিমা তিথিতে কালু রায়ের একটী পুত্র জন্মিল। ইহার পূর্ব্বে কালু রায়ের আর কোন সন্তান হয় নাই। এইজন্য কালু রায় খুব আনন্দিত হইয়া অনেক প্রকার দান করিলেন।

পরদিন কালু রায় আপনার পুরোহিত হরদয়াল মিশ্রকে পুত্রের জন্ম-পত্রিকা প্রস্তুত করিতে কহিলেন। হরদয়াল লগ্ন ঠিক করিয়া কহিলেন যে, এই বালক খুব ঐশ্বর্য্যশালী, তপঃ এবং তেজঃসম্পন্ন হইবে। সংসারের বড় বড় রাজা, মহারাজা এবং বাদশাহ ইঁহার নিকট মস্তক নত করিবে। ঋদ্ধি সিদ্ধি হাত যোড় করিয়া ইঁহার নিকট দণ্ডায়মান থাকিবে এবং ইঁহার নাম সংসারে চিরস্থায়ী হইবে। পঞ্চম দিনে পুরোহিত হরদয়াল বালকের নাম "নানক নিরংকারী" রাখিল।

কালু রায় পুরোহিতকে বলিলেন, এ কি প্রকার নাম। এমন নাম রাখুন, যাহা কেবল হিন্দুর নাম হয়। পুরোহিত উত্তর দিলেন যে, এই বালকের নাম এই ঠিক হইয়াছে। কেন না, কেবল হিন্দু ইহাকে মানিবে তাহা নহে, মুসলমানও ইহাকে মানিবে।

যখন নানকের বয়স সাত বৎসর, তখন কালু রায় গোপাল নামক এক পণ্ডিতের নিকট পুত্রকে শিক্ষার্থ প্রেরণ করিল। পণ্ডিত মহাশয় হিন্দী অক্ষর এবং অঙ্ক লিখিয়া দিয়া ছাত্রকে অভ্যাস করিতে আজ্ঞা দিলেন। নানক পণ্ডিত মহাশয়কে বলিলেন, "পণ্ডিত মহাশয়! এই বিদ্যা কোন কাজের নয়। মনুষ্যের এইরূপ বিদ্যা শিখিতে হইবে যাহাতে মুক্তি পাইতে পারে।" পণ্ডিত মহাশয় উত্তর দিলেন, "বাবা তুমি এখনই ইহা শিখতে চাও। যখন তুমি বড় হবে তখন তুমি ইহাও শিখবে।" নানক নিরংকারীর বুদ্ধি খুব তীক্ষ্ন ছিল। এই জন্য দুই বৎসরের মধ্যে হিন্দী লেখা পড়া উত্তম রূপে শিখিলেন। পরে কালু রায় পুত্রকে পণ্ডিত ব্রজনাথের নিকট সংস্কৃত পড়িবার জন্য পাঠাইলেন।

প্রথম দিন পণ্ডিত মহাশয় নানককে বলিলেন "বারবার "ওঁ" বল।"

নানক জিজ্ঞাসা করিলেন "পণ্ডিত মহাশয় এই অক্ষরের অর্থ কি?"

পণ্ডিত মহাশয় উত্তর করিলেন "ছোট বালককে অর্থ বলিবার কোন আবশ্যকতা নাই। তুমি কেবল এই অক্ষর মুখস্থ কর।"

নানক বলিলেন, ইহার অর্থ আমি আপনাকে বলিতেছি, "সর্ব্বোত্তম শক্তির নাম "ওঁ"। এই শক্তি সমস্ত সংসার শাসন করিতেছে। সমস্ত জগতের স্রষ্টা। সমস্ত জগতের ব্যাপক। সমস্ত জগৎ হইতে অধিক বলবান্ এবং সকল জীব-জন্তুর পালন কর্ত্তা।"

পণ্ডিত মহাশয় এই অর্থ শুনিয়া হতবুদ্ধি হইলেন এবং নানককে খুব সুশীল এবং বুদ্ধিমান্ বালক মনে করিতে লাগিলেন।

যখন নানক সংস্কৃত ভাষায় ব্যুৎপন্ন হইলেন, তখন কালু রায় তাঁহাকে কাজী কুতুবুদ্দীনের মাদ্রাসায় ফারসী শিখিতে পাঠাইলেন। প্রথম দিন যখন কাজী সাহেব ইঁহাকে বর্ণমালা শিখাইতেছিলেন, তখন ইনি কাজী সাহেবকে বর্ণমালার অর্থ জিজ্ঞাসা করিলেন। কাজী সাহেব উত্তর দিলেন, "ইহার অর্থ পরে ব্যাখ্যা করিব তুমি এখন বর্ণমালা অভ্যাস কর।" ইহা শুনিয়া নানক বর্ণমালার অর্থ এমন সুন্দর ভাবে বর্ণনা করিলেন যে, কাজী সাহেব শুনিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন।

গুরু নানক সাহেব প্রায়ই ভগবৎপ্রেমে মগ্ন হইয়া থাকিতেন। সাংসারিক বিষয়ে তাঁহার মন প্রবেশ করিত

না। খাওয়া দাওয়ায় প্রভিও মন ছিল না। কোন কোন দিন অনাহারী থাকিতেন। কোন কোন সময় গভীর বনের ভিতর প্রবেশ করিয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে থাকিতেন।

নানকের পিতা ও অন্যান্য লোকের সন্দেহ হইল যে, নানকের উন্মাদ রোগ জন্মিয়াছে। এই সন্দেহ দূর করিবার জন্য কালু রায় হাকিম হরিদাসকে ডাকিলেন। যখন হাকিম নানকের নাড়ী দেখিতে লাগিলেন, তখন তিনি হাত ছাড়াইয়া নিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কে?" হাকিম উত্তর করিলেন, "আমি হাকিম। তোমার চিকিৎসা করিতে আসিয়াছি।

নানক বলিলেন, "কি? আমার ব্যারাম হইয়াছে। আর আপনি আমার চিকিৎসা করিতে আসিয়াছেন? হাকিম উত্তর করিলেন, "হাঁ! তোমার পিতা বলেন যে, তোমার উন্মাদ রোগ হইয়াছে।"

নানক বলিলেন—"হাকিমজী! আমার উন্মাদ রোগ হয় নাই। আমি ভগবানের প্রেমে পাগল হইয়াছি। আপনি আমার রোগ সারাইতে পারিবেন না। হাকিম কালু রায়কে বলিলেন, "আপনার পুত্রের কোন রোগ হয় নাই। বরং ইনি সংসারী লোকদের রোগ এবং কষ্ট দূর করিবার জন্য—একজন আধ্যাত্মিক বৈদ্য।"

কালু রায় যখন দেখিলেন যে, এই বালকের রুচি কিছুতেই সাংসারিক কার্য্যে প্রবেশ করে না, তখন তিনি তাহাকে বলিলেন, "তুমি যদি কোন কাজ করিতে না চাও তো জঙ্গলের মধ্যে গিয়া পশু চরাও।"

তখন গুরু নানক প্রতিদিন বনে প্রবেশ করিয়া মহিষ চরাইতে লাগিলেন। একদিন গুরু নানক গোষ্ঠে গিয়া এক বৃক্ষতলে বসিয়া পরমাত্মার ধ্যানে এমন মগ্ন হইয়াছিলেন যে, পশুগুলির কথা একদম ভুলিয়া গেলেন। পশুগুলি চরিতে চরিতে এক ক্ষেতে গিয়া উপস্থিত হইল এবং সমস্ত ক্ষেতের শস্য খাইয়া ফেলিল। ক্ষেতের মালিক ক্ষেতের এই দশা দেখিয়া ক্রোধান্বিত হইল এবং ধ্যান-মগ্ন নানককে ধরিয়া নিয়া রায় বুলারের নিকট ইহার নামে নালিশ করিল। রায় বুলার তদন্ত করিবার জন্য তাহার কোন কর্মচারীকে মাঠে প্রেরণ করিল।

তদন্তকারী রায় বুলারকে জানাইলেন যে, ক্ষেত শস্যে পরিপূর্ণ। ক্ষেতের কোনই লোকসান হয় নাই। এই সংবাদ শুনিয়া রায় বুলার ক্ষেত্রপতিকে খুব তিরস্কার করিলেন।

একদিন গুরু নানক পশু চরাইতে চরাইতে অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া এক বৃক্ষের ছায়ায় ঘুমাইয়া পড়িলেন। যখন ছায়া সরিয়া গেল, গুরু নানকের শরীর সূর্য্যের তাপে ঘর্ম্মাক্ত হইল। এই সময় এক ফণিধর সর্প আসিয়া গুরু নানকের মস্তকোপরি ফণা উত্তোলন করিয়া গুরু নানককে ছায়া দান করিতে লাগিল। এই সময় রায় বুলার অশ্বারোহণে আসিয়া সেই স্থলে উপস্থিত হইলেন। দূর হইতে ফণিধর সর্প দেখিয়া মনে করিতে লাগিলেন যে, ঐ বৃক্ষের নীচে আল্লাকে ভেট দিবার জন্য বোধ হয় অনেক টাকা আছে। নিকটে আসিয়া গুরু নানককে ফণির নিচে শায়িত দেখিয়া অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন এবং অশ্বপৃষ্ঠ হইতে অবতরণ করিয়া সর্পকে তাড়াইয়া দিলেন এবং অবশেষে গুরু নানকের চরণে পড়িলেন। গুরু নানকের নিদ্রাভঙ্গ হইলে রায় বুলার তাঁহাকে অশ্বপৃষ্ঠে চড়াইয়া গ্রামে নিয়া গেলেন। রায় বুলার কালু রায়কে ডাকাইয়া বলিলেন, "তোমার পুত্র খোদার প্রিয়। ইহাকে আদর-যত্ন করিবে।"

ঐ সময় হইতে রায় বুলার গুরু নানকের ভক্ত হইলেন।

গুরু নানক দিন দিন দুর্ব্বল হইতে লাগিলেন। তাঁহার মুখ শুকাইয়া গেল। ইহা দেখিয়া কালু রায়ের খুব চিন্তা হইল। একদিন তিনি পুত্রকে বলিলেন, "সদাসর্ব্বদা আমি তোমার জন্য চিন্তিত। কিন্তু তুমি আমার কথা মান না। তোমার ফুলের শরীর শুকাইয়া কাঁটা হইয়া গেছে। তোমাকে যখন দেখি যে তুমি নির্জ্জনে কাল কাটাও তখন তোমার দশা দেখিয়া আমার দুঃখের সীমা থাকে না। তোমার অবশ্য কোন একটা কাজ করা উচিত।"

গুরু নানক উত্তর দিলেন "পিতাজী! আপনি যে আজ্ঞা করিবেন তাহাই আমি করিতে প্রস্তুত আছি।"

কালু রায় কহিলেন, "বাছা! প্রত্যেক মানুষের জীবিকা নির্ব্বাহার্থ কোন না কোন কাজ অবশ্য করা উচিত।"

গুরু নানক উত্তর দিলেন, "পিতাজী! আপনি যে আজ্ঞা করিবেন আমি তাহাই করিব।"

কালু রায় কহিলেন, "তুমি যদি আর কোন কাজ না করিতে চাও, তবে ব্যবসা কর।"

গুরু নানক এই বাক্যে সম্মত হইলেন। কালু রায় অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া বিশটী টাকা দিয়া বলিলেন, "লাহোর হইতে কোন লাভকর পদার্থ খরিদ করিয়া আনিয়া ব্যবসা আরম্ভ কর। যদি কিছু লাভ হয় তবে আরও টাকা দিব।"

কালু রায় মনে করিল যে, নানক ব্যবসায়ের কিছুই জানে না। এইজন্য নিজের ভৃত্য বালাকে গুরু নানকের সঙ্গে দিলেন এবং তাহাকে উপদেশ দিলেন যে, এমন ভাল জিনিষ খরিদ করিবে যাহাতে অধিক লাভ হয়।" ('এয়েসা সচ্চা সৌদা করনা জিসমে লাভ বাস্তি হো।"

গুরু নানক এবং বালা দুইজনে লাহোরের দিকে চলিতে লাগিলেন। যখন তাঁহারা চূহড়কাণের নিকট এক জঙ্গলে উপস্থিত হইলেন তখন নির্জ্জনে একটি সাধুর সহিত দেখা হইল। গুরুনানক তাঁহার সহিত কথাবার্ত্তা বলিতে লাগিলেন। কথা বলিতে বলিতে তাঁহার ধারণা হইল যে, সাধু তিন দিন যাবৎ অনাহারী আছেন। তখন তিনি বালাকে কহিলেন, "ভাই বালা! পিতাজী আমাকে যে বিশ টাকা "সচ্চা সৌদা" করিবার জন্য দিয়াছেন (অর্থাৎ ভাল জিনিষ খরিদ করিবার জন্য দিয়াছেন) তাহা আমি এই সাধুকে দিতে চাই। কারণ, ইহা হইতে অধিক "সচ্চা সৌদা" আর কি আছে?"

বালা উত্তর করিলেন, "আপনার পিতা অসন্তুষ্ট হইবেন।"

গুরু নানক বলিলেন, "তিনি নিজেই আমাকে "সচ্চা সৌদা" করতে আজ্ঞা দিয়াছেন। সাংসারিক পদার্থ খরিদ বিক্রী এবং রক্ষা করিতে আমার খুব কষ্ট হয়। আবার ইহাতে কোন লাভ হয় কি না জানা নাই। কিন্তু এই সৌদা তো এইরূপ, যাহাতে লাভ হইবেই হইবে।"

ইহা বলিয়া গুরুনানক সাধুর নিকট টাকা কয়টি রাখিয়া দিলেন। সাধু বলিলেন, "এই টাকা দিয়া আমি কি করিব? যদি ইচ্ছা হয় তবে কিছু খাবার আনিয়া দাও।"

গুরুনানক বালাকে সঙ্গে করিয়া এক গ্রাম হইতে বিশ টাকার আটা, ডাল, ঘি প্রভৃতি খাদ্যদ্রব্য নিয়া আসিয়া সাধুর নিকট রাখিলেন। এখন গুরুনানক লাহোর আর কি জন্য যাইবেন। এই স্থান হইতে বাড়ীর দিকে ফিরিলেন। যখন নিজগ্রামের নিকট আসিলেন তখন এক বৃক্ষছায়ায় বসিয়া পড়িলেন এবং বালাকে ঘোড়া দিয়া গ্রামে পাঠাইয়া দিলেন। বালা নিজের ঘরে চলিয়া গেল। এবং ঘোড়া কালু রায়ের নিকট পাঠাইয়া দিল। কালু রায় ক্রোধে লাল হইলেন এবং বালাকে অনেক তিরস্কার করিয়া নানকের নিকট গেলেন এবং তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "টাকা কোথায়?"

গুরুনানক উত্তর দিলেন, "টাকা দ্বারা খাদ্যদ্রব্য খরিদ করিয়া অনাহারী সাধুকে দিয়া আসিয়াছি। আমি আপনার আজ্ঞানুসারে এমন "সচ্চা সৌদা" করিয়াছি যাহাতে অনেক লাভ আছে, এবং সর্ব্বদা হইতে থাকিবে। সাংসারিক পদার্থে লাভ অল্প দিনের জন্য হইয়া থাকে।"

কালুরায় এই কথা শুনিয়া ক্রোধে অগ্নিশর্ম্মা হইয়া নানককে অনেক মারপিট করিলেন। রায় বুলার এই সংবাদ পাইলেন, তখন তিনি কালুরায়কে ডাকিয়া বুঝাইলেন এবং গুরু-নানককে ভর্ৎসনা বা মারপিট করিতে নিষেধ করিলেন। তিনি বলিলেন, ঐ টাকা তিনি দিবেন। এই বলিয়া ঐ সময়ই কালুরায়কে বিশ টাকা দিয়া দিলেন।

দ্বিতীয় প্রকরণ

মুদীখানা

জলন্ধর জিলার অন্তর্গত সুলতানপুর গ্রামে জয়রাম নামক একজন লোক ছিলেন। তিনি নবাব দৌলত খাঁর কর্ম্মচারী ছিলেন। তিনি জমি জরিপ করিয়া প্রজাদের নিকট পত্তন করিতেন এবং খাজানা উসুল করিতেন। তলবন্তী গ্রামও জয়রামের অধীন ভুক্ত ছিল। একদিন জরিপ করিবার জন্য জয়রাম তলবন্তী গ্রামে আসিয়া রায়বুলারকে বলিলেন, "আপনি যদি কোন ক্ষত্রী-কন্যার সহিত আমার বিবাহ করাইয়া দিতে পারেন, তবে আমি আপনার নিকট অত্যন্ত কৃতজ্ঞ থাকিব।"

রায়বুলার কালুরায়কে ডাকিয়া তাহার কন্যা নানকীর বিবাহ জয়রামের সঙ্গে দিবার জন্য উপদেশ দিলেন। কালুরায় এই প্রস্তাব স্বীকার করিলেন এবং কিছুদিনের মধ্যে জয়রামের সহিত নানকীর বিবাহ দিলেন।

একদিন গুরুনানক জঙ্গলের মধ্যে প্রবেশ করিতেছিলেন। তখন এক সাধু তাঁহাকে বলিলেন, "ভগবানের নামে আমাকে কিছু দাও, আমি খুব গরীব।"

গুরুনানকের নিকট তখন একটী সোণার অঙ্গুরী আর একটী পিত্তলের বর্ত্তন ছিল। তিনি এই দুইটাই সাধুকে দিয়া দিলেন। যখন কালুরায় এই সংবাদ পাইলেন তখন তিনি গুরুনানককে অনেক ভৎর্সনা করিলেন এবং ঘর হইতে বাহির হইয়া যাইতে আজ্ঞা দিলেন। রায় বুলার এই সংবাদ শুনা মাত্র কালুরায়কে ডাকিয়া বলিলেন, "আমি আপনাকে বারংবার বলিয়াছি যে, নানককে কিছু বলিবেন না। কিন্তু আপনি আমার কথা গ্রাহ্য না করিয়া তাঁহার উপর অনেক অত্যাচার করিতেছেন। আপনি বরং নানককে সুলতানপুরে জয়রামের নিকট পাঠাইয়া দিন। জয়রাম তাহাকে কোন কাজে নিযুক্ত করিয়া দিবে।

কালুরায় রায় বুলারের কথা স্বীকার করিলেন। রায় বুলার জয়রামের নিকট এক চিঠি দিলেন। এই চিঠি নিয়া গুরুনানক সুলতানপুরে জয়রামের নিকট চলিয়া গেলেন।

যখন গুরুনানক সুলতানপুর পৌছিলেন তখন জয়রাম তাঁহাকে অতি আদরের সহিত গ্রহণ করিলেন এবং তাঁহাকে বলিলেন, "আপনি যদি কোন কাজ করিতে চান তো আমি আপনাকে কাজ যোগাড় করিয়া দিতে পারি। নতুবা আপনি আপনার জীবন ভগবানের উপাসনায় অথবা যে রকম ইচ্ছা কাটাইতে পারেন।"

গুরুনানক উত্তর দিলেন, "আমি বেকার থাকিতে ইচ্ছা করি না। প্রত্যেক মনুষ্যের উচিত যে নিজের হাতে উপার্জ্জন করিয়া খায়। আপনি যে কোন কাজে আমাকে লাগাইয়া দিন।"

জয়রাম কহিলেন, "যদি আপনি বলেন তো আমি আপনাকে নবাব দৌলতখাঁর মুদীখানার কাজে নিযুক্ত করিয়া দিতে পারি।"

গুরুনানক উত্তর দিলেন, "যদি আপনি মুদীখানার চাকরী দেওয়াইতে পারেন তো আমি চাকরী করিতে প্রস্তুত আছি।"

পরদিন জয়রাম গুরুনানককে নবাব দৌলতখাঁর দরবারে নিয়া গেলেন এবং নবাবকে বলিলেন, "এই বালকটী খুব বুদ্ধিমান এবং বিশ্বাসী। আপনি মুদীখানার কাজে ইহাকে নিযুক্ত করুন। এ খুব সতর্কতার সহিত কাজ করিবে।"

নবাব দৌলত খাঁ জয়রামের প্রার্থনা স্বীকার করিলেন এবং গুরুনানককে মুদীখানার কাজ চালাইবার জন্য অগ্রিম এক হাজার টাকা দিয়া দিলেন।

গুরুনানক মুদীখানার কাজ করিতে লাগিলেন। সেখানে তিনি প্রাণ খুলিয়া কাজ করিতে লাগিলেন। তাঁহার নিকট সদাসর্ব্বদা সাধু ফকির যাতায়াত করিতে লাগিলেন। অল্প দিনের মধ্যে তাঁহার যশ চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া পড়িল।

একদিন কোন ব্যক্তি জয়রামকে গিয়া বলিল যে, গুরুনানক মুদীখানা লুট করিতেছেন। যদি আর কিছুদিন এইরূপ ভাবে চলে তো মুদীখানা শূন্য হইবে এবং সেজন্য আপনাকে কৈফিয়ত দিতে হবে। জয়রামের খুব চিন্তা হইল। কিন্তু তিনি নিজে গুরুনানককে কিছু না বলিয়া নিজের স্ত্রী নানকীকে সমস্ত অবস্থা জানাইলেন।

নানকী গুরুনানককে ডাকিয়া পাঠাইলেন। গুরুনানক আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "আমাকে ডাকিয়াছ কেন?"

নানকী উত্তর দিলেন "আপনি অনেক দিন যাবত এখানে এসেছেন। দেখা সাক্ষাৎ নাই। দেখতে খুব ইচ্ছা হইয়াছিল, এই জন্য ডাকাইয়াছি।"

গুরুনানক বলিলেন, "আসল কথা আরও কিছু আছে। কেন গোপন কর্চ্ছ? আমার মনে হয়, মুদীখানা সম্বন্ধে কেহ চুগলী করিয়া থাকিবে।"

বিবি নানকী বলিলেন, "একথা সত্য।"

গুরুনানক বলিলেন, "কোন চিন্তা নাই। মুদীখানার হিসাব ঠিক আছে। জয়রাম নবাবকে বলিয়া হিসাব পরীক্ষা করিয়া দেখুন।"

জয়রাম নবাবকে গিয়া বলিলেন, "মুদীখানার হিসাব করান উচিত।" নবাব দেওয়ান জাদোরায়কে হিসাব পড়তাল করিতে আজ্ঞা দিলেন, দেওয়ান হিসাব পড়তাল করিয়া দেখিলেন যে নবাবের মূলধন ১২৫৲ টাকা বৃদ্ধি হইয়াছে।

হিসাব পরীক্ষা শেষ হইলে নানক জয়রামকে বলিলেন, "আমি মুদীখানার কাজ করিতে চাহি না। কারণ, মূলধন ঘাটতি হইলে আপনার মাথায় বৃথা দোষ পড়িবে।"

জয়রাম উত্তর করিলেন, "আপনার উপর আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস আছে। আপনি চাকরী ছাড়িবেন না। আনন্দের সহিত কাজ করিতে থাকুন।"

গুরুনানক জয়রামের কথানুসারে মুদীখানায় চাকরী করিতে লাগিলেন। এখন তিনি পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক দান করিতে লাগিলেন। কোন সাধু ফকির খালী হাতে যাইত না। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে মুদীখানায় ভাণ্ডার সর্ব্বদা ভরপুর থাকিত।

শত্রুগণ নবাব দৌলতখাঁর নিকট গিয়া বলিল যে, মুদীখানা লুট হইতেছে। নবাব দুইবার হিসাব পড়তাল করাইলেন। কোনরকম ঘাটতি ত হইলই না, পরন্তু ৩০০৲ টাকা নবাবের নিকট নানকের পাওনা হইল। নবাব খুব সন্তুষ্ট হইলেন এবং গুরু-নানককে খুব সম্মান করিতে লাগিলেন।

গুরু-নানকের বয়স যখন আঠার বৎসর তখন জয়রাম গুরুদাসপুর জিলার অন্তর্গত পক্খোকী গ্রামবাসী মুনারাম নামক কোন ব্যক্তির কন্যার সহিত নানকের বিবাহের সম্বন্ধ ঠিক করিলেন। এই সংবাদ শুনিয়া কালুরায় খুব সন্তুষ্ট হইলেন। যুগপৎ চিন্তার কারণও উপস্থিত হইল। তিনি ভাবিলেন যে, ছেলে যাহা উপার্জ্জন করে তাহাতো সাধুদিগকে বিলাইয়া দেয়, আর নিজের নিকট এক কৌড়ীও রাখে না। যখন বিবাহ হইয়া যাইবে তখন স্ত্রীকে কি খাওয়াইবে?

যখন এক বৎসর পরে বিবাহের সময় উপস্থিত হইল, তখন কালুরায় আত্মীয়-স্বজনের সহিত জামাতা জয়রামের নিকট সুলতানপুরে উপস্থিত হইলেন এবং খুব ধুমধামের সহিত বরযাত্রিকের দল জমাট করিলেন। বরযাত্রিকগণ পক্খোকী গ্রামে পৌঁছিলে পণ্ডিতগণ বেদমন্ত্র পাঠ করিয়া বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন করাইলেন।

বিবাহ সম্পাদিত হইবার পর গুরুনানক স্ত্রীর সহিত সুলতানপুর আসিয়া জয়রামের সহিত বাস করিতে লাগিলেন। নিজেদের ভরণপোষণের জন্য যে কোন জিনিষের দরকার হইত, গুরুনানক তাহা আনিয়া দিতেন। কিন্তু সাংসারিক বিষয়ে তাঁহার মোটেই রুচি ছিল না। তিনি প্রায়ই ভক্তি-উপাসনায় মগ্ন থাকিতেন।

বিবাহের পর তাঁহার খরচা দ্বিগুণ হইল। এই জন্য তাঁহার দান সঙ্কোচ করা উচিত ছিল। কিন্তু তিনি পূর্ব্ববৎ দুই হাত খুলিয়া দান করিতে লাগিলেন।

যখন তাঁহার বয়স পঁচিশ বৎসর তখন তাঁহার একটী পুত্র জন্মিল। গুরুনানক তাহার নাম রাখিলেন শ্রীচন্দ। তিন বৎসর পরে তাঁহার আর একটী পুত্র জন্মিল। তাহার নাম রাখিলেন লখমীচন্দ।

তৃতীয় প্রকরণ

গৃহত্যাগ

একদিন গুরুনানক রাত্রিকালে গ্রামের নিকট নদীতে স্নান করিতেছিলেন। সেই সময় তিনি ভগবৎপ্রেমে এইরূপ মগ্ন হইয়াছিলেন যে, তাঁহার বাহ্যজ্ঞান রহিত হইল এবং উলঙ্গ অবস্থায় দৌড়াইতে দৌড়াইতে অনেক দূর আসিয়া ভগবানের উপাসনায় মগ্ন হইয়া গেলেন।

কিছু সময় পরে তাঁহার নিকট আকাশবাণী হইল, "হে আমার প্রিয় নানক! তুমি যে কাজের জন্য প্রেরিত হইয়াছ, তাহা কবে করিবে। সংসার ছাড়িয়া দাও, আর লোকদিগকে সরল পথ দেখাও।"

এদিকে গুরুনানককে মুদীখানায় অনুপস্থিত দেখিয়া লোকজন হৈ-চৈ আরম্ভ করিল। তাঁহাকে তালাস করতে করতে নদীতীরে তাহারা উপস্থিত হইল। সেখানে তাহারা তাঁহার কাপড় দেখিতে পাইল। কিন্তু তাঁহার কোন খোঁজ পাইল না। লোকদের সন্দেহ হইল যে, গুরুনানক নদীতে ডুবিয়া গিয়াছেন।

যখন নবাব এই সংবাদ পাইলেন, তখন তিনি স্বয়ং নদী-তীরে আসিলেন এবং জালিয়া ডাকাইয়া নদীতে জাল ফেলাইলেন। গুরুনানককে পাওয়া গেল না। সকলে নিরাশ হইয়া ফিরিয়া আসিল।

তৃতীয় দিন গুরুনানক জয়রামের ঘরে গিয়া উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন জয়রাম তাঁহার জন্য রোদন করিতেছেন। ঐ দিন গুরুনানক সাধুর বেশ পরিধান করিয়াছিলেন এবং লোকদিগকে বলিতে লাগিলেন যে, মুদীখানায় মাল যত লুট করতে পার লুট কর। ইহা বলিয়া তিনি নগরের বাহিরে এক কবর স্থানে চলিয়া গেলেন এবং তপস্যা করিতে লাগিলেন।

যখন নবাব শুনিলেন যে, গুরুনানক লোকদিগকে মুদী-খানার মাল লুট করিতে আজ্ঞা দিয়াছেন, তখন তিনি অতি

সত্বর সুলতানপুর পৌঁছিলেন এবং লোকদিগকে মুদীখানা লুট করতে নিষেধ করিলেন।

ঐদিন নবাব জয়রাম এবং গুরুনানককে হিসাব দিবার জন্ম ডাকিলেন। গুরুনানক নবাবের বাক্য গ্রাহ্য করিলেন না। কিন্তু জয়রাম নবাবের নিকট চলিয়া আসিলেন। যখন হিসাব পড়তাল হইয়া গেল, তখন দেখা গেল গুরুনানকের নিকট কিছু পাওনা নাই বরং তিনি নবাবের নিকট ৭০৭৲ টাকা পাইবেন। নবাব গুরুনানককে ঐ টাকা লইয়া যাইতে বলিলেন।

গুরুনানক বলিলেন, "আমার এই টাকার কোন প্রয়োজন নাই। গরীব লোকদিগকে ঐ টাকা বিতরণ করা হউক।"

যখন গুরুনানকের শ্বশুর মুলামল এই সংবাদ পাইলেন, তখন তিনি অবিলম্বে সুলতানপুর পৌঁছিলেন। জামাতার সাধুবেশ দেখিয়া তাহার হৃদয় ব্যথিত হইল। জামাতাকে অনেক প্রকারে বুঝাইতে লাগিলেন যে, তাঁহার গৃহত্যাগ করা উচিত নয়। কিন্তু গুরুনানক সে কথায় কর্ণপাত করিলেন না। তখন মুলামল নবাবের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে বলিলেন, "আপনার নিকট গুরুনানকের যে টাকা পাওনা আছে তাহা আমার কন্যা ও দৌহিত্রের পাওয়া উচিত।"

নবাব উত্তর দিলেন, "নানক ঐ টাকা গরীব লোকদিগকে দান করিবার জন্ম আমার নিকট রাখিয়াছেন। সুতরাং আপনার কন্যা ও দৌহিত্রগণ ঐ টাকা পাইতে পারে না।"

মুলামল বলিলেন, "নানক তো পাগল হইয়া গিয়াছে। তাহার কথা আপনার শোনা উচিত নয়।"

নবাব বলিলেন, "আমি পুনরায় একবার তাহাকে জিজ্ঞাসা করিব যে টাকা কাহাকে দিব।"

যখন নবাব গুরুনানককে দুইবার জিজ্ঞাসা করিলেন যে, টাকা কাহাকে দেওয়া যাইবে, তখন গুরুনানক উত্তর করিলেন যে, "আমার যাহা বলার আছে তাহাতো পূর্ব্বেই বলা হইয়া গিয়াছে।" অবশেষে অনেক বিবেচনার পর অর্দ্ধেক টাকা গরীব লোকদিগকে বিতরণ করিলেন, আর অর্দ্ধেক টাকা গুরু নানকের স্ত্রীকে দিয়া দিলেন।

একদিন নবাব এক সিপাহী পাঠাইয়া গুরুনানককে ডাকিলেন। সিপাহী গুরুনানকের নিকট গিয়া বলিল যে, নবাব সাহেব আপনাকে ডাকিয়াছেন। গুরুনানক উত্তর করিলেন, "আমাদের নবাবের কি কাজ আছে। আমি যাইতে পারিব না।"

সিপাহী নিরাশ হইয়া চলিয়া গেল এবং নবাবকে গিয়া বলিল যে, গুরুনানক আসিলেন না।

নবাব সিপাহীকে আজ্ঞা দিলেন যে, গুরুনানককে ধরিয়া আন। গুরুনানক যখন দেখিলেন যে নবাব ক্রুদ্ধ হইয়াছেন, তখন তিনি নিজেই নবাবের নিকট আসিলেন। কিন্তু নবাবকে সেলাম করিলেন না। নবাব অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হইয়া গুরুনানককে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমাকে আমি ডাকাতে তুমি আসিলে না কেন?"

গুরুনানক উত্তর দিলেন, "যখন আমি আপনার চাকরী করিতাম, তখন আপনার নিকট যাতায়াত করিতাম। আর আপনার আজ্ঞা পালন করা কর্ত্তব্য মনে করিতাম। কিন্তু আমি এখন আপনার চাকরী ছাড়িয়া দিয়াছি, ভগবানের চাকরী করিতেছি। সর্ব্বদা তাঁহার ধ্যানে নিযুক্ত থাকি এবং মুহূর্ত্ত মাত্রও অবকাশ পাই না।"

নবাব ভাবিতে লাগিলেন যে, ইহার মন সংসার হইতে একদম চলিয়া গিয়াছে, আর ইনি একজন ঈশ্বরভক্ত লোক হইয়াছেন। হয় তো একদিন মুসলমান হইয়া যাইবেন।

ইহা ভাবিয়া নবাব গুরুনানককে বলিলেন, "তুমি খোদার একজন অত্যন্ত প্রিয় ব্যক্তি। আমার সহিত মস্‌জিদে চলো এবং নমাজ পড়ো। আজ জুম্মা বার আছে।"

গুরুনানক উত্তর দিলেন, "খুব আনন্দের সহিত চলা যাক, ইহা হইতে ভাল কাজ আর কি হইতে পারে।"

এই বলিয়া গুরুজী নবাবের সহিত মস্‌জিদে চলিয়া গেলেন।

যখন লোকেরা এই সংবাদ পাইল, তাহারা মনে করিল যে, গুরুনানক মুসলমান হইতেছেন। হিন্দুগণ এই সংবাদ শুনিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন।

এদিকে গুরুনানক নবাব এবং কাজীর সঙ্গে নমাজ পড়িবার জন্ম দণ্ডায়মান হইলেন। কিন্তু নবাব এবং কাজী যখন সজদা করতে লাগিলেন তখন গুরুনানক সজদা না করিয়া চুপ চাপ দাঁড়াইয়া রহিলেন। নবাব নমাজ শেষ করিয়া গুরুজীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি নমাজ পড়িলেন না কেন এবং সজদা করিলেন না কেন?"

গুরুজী উত্তর করিলেন, "নমাজ আমি কার সহিত

পড়িব? আপনি তো কান্দাহারে ঘোড়া খরিদ করতে-ছিলেন। আর কাজী সাহেব মনে মনে এই ভাবিতেছিলেন যে, তাহার গ্রামের বাছুরটী খুলিয়া রাখিয়া আসিয়াছেন। হয়তো ঘুরিতে ঘুরিতে কোন গর্ত্তের ভিতর পড়িয়া যাইতে পারে। ইহাতো খোদার নামাজ নহে। ইহা ঘোড়া আর বাছুরের নমাজ।

ইহা শুনিয়া নবাব এবং কাজী দুইজনেই খুব লজ্জিত হইলেন এবং স্বীকার করিলেন, "যথার্থই ঐ সময় মন খোদার দিকে ছিল না।"

গুরু নানক সাধু হইয়াছেন এই সংবাদ যখন কালুরায়ের নিকট পৌঁছিল, তখন তিনি নিজ ভৃত্য মর্দ্দানাকে সঠিক সমাচার আনিবার জন্য বিবি নানকীর ঘরে পাঠাইলেন। তিনি তখন কবরস্থানে থাকিতেন। মর্দ্দানা লোকদের নিকট পথ জিজ্ঞাসা করিতে করিতে কবরস্থানে পৌঁছিয়া গুরুজীর দেখা পাইলেন।

গুরুজী মর্দ্দানাকে বলিলেন, "আমি তো তোমার পথপানে চাহিয়াছিলাম। আমার সঙ্গে ভ্রমণযাত্রায় বাহির হও।"

মর্দ্দানা জিজ্ঞাসা করিলেন "কোনদিকে যাইতে চাহেন?"

গুরুজী উত্তর দিলেন "যেদিকে ভগবান্ লইয়া যান্।"

মর্দ্দানা কহিলেন "আমি তো আপনার সম্বন্ধে সঠিক সমাচার জানিবার জন্য এখানে আসিয়াছি। আপনার পিতা-মাতা আমার পথপানে চাহিয়া আছেন। কিন্তু আমি এখন আপনার সঙ্গ ছাড়িতে চাহি না।"

গুরুজী বলিলেন "যদি পথযাত্রার কষ্ট সহ্য করিতে পার তো আমার সঙ্গে চলো, নচেৎ ঘরে ফিরিয়া যাও।"

মর্দ্দানা বলিলেন, "আমি আপনার বিরহ সহ্য করিতে পারিব না। এইজন্য পথযাত্রার সব কষ্ট সহ্য করিয়া নিব।"

ঐ দিন হইতে মর্দ্দানা গুরুজীর সহিত কবরস্থানে থাকিতে লাগিলেন এবং ক্ষণমাত্রও গুরুজীর সঙ্গ ত্যাগ করিলেন না।

গুরুজী ভক্তির সহিত ভগবানের ভজন করিতে ভাল বাসিতেন। একদিন তিনি মর্দ্দানাকে বলিলেন, "বিবি নানকীর নিকট হইতে টাকা আনিয়া একটা সেতার কিনিয়া আন এবং আমাকে সেতারের সহিত ভগবদ্ভক্তির সঙ্গীত শুনাও।"

মর্দ্দানা বিবি নানকীর নিকট গিয়া তাঁহার নিকট সেতার খরিদ করবার জন্য টাকা চাহিলেন। নানকী মর্দ্দানাকে সেতারা খরিদ করতে সাত টাকা দিলেন। মর্দ্দানা একটা ভাল সেতার নিয়া গুরুজীর নিকট উপস্থিত হইলেন। মর্দ্দানা প্রতিদিন ভগবৎসঙ্গীত গাইতেন এবং গুরুজী প্রেমে বিভোর হইয়া সঙ্গীত শুনিতেন। একদিন মর্দ্দানা সেতার বাজাইতে ছিলেন। সেই সময় সেতার হইতে এই স্বর বাহির হইতে লাগিল—

'তু হী নিরংকার, তু হী নিরংকার, তুহী নিরংকার'
'নানক তেরা বন্দা'।

এই শব্দ শুনিয়া গুরুজী এইরূপ ভাবে বিভোর হইলেন যে, তিনদিন সমাধিস্থ রহিলেন। এই সময় মর্দ্দানা ক্ষুধা ও তৃষ্ণায় কাতর গুরুজীর নিকট বসিয়া রহিলেন। গুরুজীর বিনা অনুমতিতে ঐ স্থান হইতে উঠা উচিত নয় বিবেচনা করিয়া মর্দ্দানা ক্ষুধাতৃষ্ণা সহ্য করিতে লাগিলেন। তৃতীয় দিবস যখন গুরুজীর ধ্যানভঙ্গ হইল তখন তিনি মর্দ্দানাকে বলিলেন, "মর্দ্দানা! তুমি এত উদাস হইয়াছ কেন?"

মর্দ্দানা উত্তর করিলেন, "মহারাজ! আপনি তো খাওয়া দাওয়া একদম গ্রাহ্য করেন না। কিন্তু আমি ক্ষুধা-তৃষ্ণায় মরিয়া যাইতেছি। আমার খাওয়া দাওয়ার একটা ব্যবস্থা করিয়া দিন। নচেৎ আপনার সঙ্গে থাকিতে পারি না। আমাকে ঘরে যাইবার আজ্ঞা দিন।"

গুরুজী উত্তর করিলেন, "খাওয়া দাওয়া ভগবানের উপর নির্ভর করে। যদি ধৈর্য্য এবং সন্তোষের সহিত ক্ষুধা সহ্য করিতে না পার তবে এখান হইতে চলিয়া যাও।"

মর্দ্দানা বলিলেন, "মহারাজ! আমি আপনার ন্যায় ক্ষুধা সহ্য করতে পারি না। এইজন্য আমি যাইতেছি।"

গুরুজী বলিলেন "সেতারটী বিবি নানকীর নিকট দিয়া যাইও। সেতার দিয়া আমি এখন আর কি করিব।"

মর্দ্দানা সেতার নিয়া বিবি নানকীর নিকট পৌঁছিলেন। বিবি নানকী মর্দ্দানার নিকট গুরু নানকের কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন। মর্দ্দানা কহিলেন, "তিনি সর্ব্বদাই ভগবদ্ভক্তিতে মগ্ন থাকেন। কোন কোন দিন মোটেই পানাহার করেন না। আমি ক্ষুধা-তৃষ্ণার কষ্টে চলিয়া আসিয়াছি। সেতারটা আপনি রাখুন। আমি নিজের ঘরে যাইতেছি।"

নানকী বলিলেন, "তুমি খাওয়া দাওয়ার কোনই চিন্তা করিও না। ভগবান্ সকল ব্যবস্থাই করিয়া দেন। গুরু নানক যতদিন এখানে আছেন তুমি দুইবেলা আমার এখানে আহার করিবে। এবং যখন কোথাও যাইতে হইবে আমি তোমাকে পথ খরচ দিয়া দিব।"

মর্দ্দানা এই কথা শুনিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন এবং ফিরিয়া গুরুজীর নিকট উপস্থিত হইলেন। গুরুজীর সঙ্গ মর্দ্দানার এত ভাল লাগিত যে, তাঁহাকে ছাড়িয়া যাইতে তাহার মোটেই ইচ্ছা ছিল না।

রবি

শ্রীপ্রমথনাথ রায়চৌধুরী।

কবির দুয়ারে দাঁড়ায়ে ছবির মত
স্তব্ধ জনতা মন্ত্রে তন্দ্রাহত,
রুধি নিশ্বাস আকাশে পাতিয়া কাণ
শুনিতেছে কার মৃত্যু-পারের গান,
ঝরিছে নয়ন, ভাঙিয়া পড়েছে মন,
আগুলিয়া আছে আঁকড়ি বিদায়-ক্ষণ।
জিজ্ঞাসা-উত্তর কোথায় পড়েছে স'রে,
কি-যে হয়ে গেল নিমেষে আবেশ-ঘোরে—
জন-স্রোত ক্ষণ-স্তম্ভিত তাড়িৎ লেগে,
ভাঙিয়া দুয়ার বাড়িল ঝড়ের বেগে।
কবির তীর্থে শেষ-দেখা যদি পাই।
রবি নাই, ওরে রবি নাই!

আকাশ ভাঙিয়া পড়ে বাংলার মাথে,
বাণী-মন্দির টলিল বজ্রাঘাতে,
কবির বিরহ ভীষণ অসহ, যায় না ভোলা,
লঙ্ঘি' বোমারু-বিমান কামান-গোলা
সাগর-পারেও শোকের সাড়াটা প'ল,
এক অদ্ভুত শান্তির দূত বিদায় হ'ল।
ভারতীয় সংস্কৃতির উদারতায়
রক্ত-শতাব্দী ভাঙি' সে গড়িল তায়।
শনিগ্রস্ত অর্দ্ধ-পৃথিবী শাসন-বলে,
যুগের তূর্য্য প্রাচীর সূর্য্য অস্তাচলে!
পূর্ণমাত্রায় শুক্ল-যাত্রায় উদিবে, তাই
রবি নাই, ওরে রবি নাই!

রবি নাই, দেশ-বিদেশ তবু যে আলো?
কবি নাই, কাব্য লাগে যে তেমনি ভালো?
বিশ্বকালীন চিন্তার মুক্তধারা
অচলায়তনে ভাঙেই বাধার কারা!

অবুঝ সবুজ কাঁচায় রহিয়া কাঁচা,
না মানে জরা, জানে যৌবনে বাঁচা!
পাঠক, সে কোন্ সুদূর উত্তরকালে
সদ্য-ফোটা গোলাপগুচ্ছ রসের লালে
পড়িছ রবির কবিতা আদর্শ জেনে
শতাব্দীর পর শতাব্দী নেবে যা মেনে!
মহাকাল তারে পথ দিয়ে চলিয়াছে,
রবি আছে, ওরে রবি আছে!

প্রতিভা-হিমালয়ের মাথাটা উঁচা,
মনীষা-অতল দুকূল অপারে মুছা,
পরশ-পাথর খোঁজালো ক্ষ্যাপারে দিয়ে,
নিজেই যা করি ফিরিত মুঠায় নিয়ে।
যাতে দিত হাত, তাই যে হইত সোণা,
অদ্ভুত কর্ম্ম, অপূর্ব্ব কল্পনা-বোনা।
এ-যুগে জগতে উচ্চ, অধিক, নানা
ভাবের দান আর কার? নাই ত জানা!
যতদিন আছে বাংলা, বাঙালী-জাতি
আছে মানবতা, প্রেমের বিমল ভাতি,
যতকাল ধ'রে কৃষ্টির সৃষ্টি বাঁচে—
রবি আছে, ওরে রবি আছে!

জীবন ভরি' খেলিল হোরি মৃত্যু-সাথে,
"তুঁহু মম শ্যাম বলি সে-কালোতে মাতে!
কত নামেই যে ডেকেছে আদরে তারে,
গানে-গানে গেছে অজানে অচিন-পারে।
মরণ জীবনে দেয় ত দুঃখ শোকে
জাগায়ে অনন্ত নেয় আনন্দ-লোকে।
বিভীষিকা-ভয় রসময় করি গীতে
সান্ত্বনা-অভয় দিয়েছে মৃত্যু-ভীতে।

মৃত্যুরে দিয়ে বাঙাল সঁপিয়া বাঁশী,
নিল সঙ্গ তার করিয়া রঙ্গ-হাসি !
নূতন 'পুনশ্চ' পুরাণ গৃহের পাছে,
রবি আছে, ওরে রবি আছে !

মরম-গহনে কবির গভীর ধ্যানে
গোপন বলেছে আপন কথাটি কাণে।
অরূপ নিয়েছে রূপটী ভাঙিয়া ধাঁধাঁ,
চিনায়েছে হাসি, বুঝায়েছে তার কাঁদা !
মেঘে-মেঘে লুকোচুরিটী দিয়েছে ধরা,
রঙে-রঙে চলে যে-খেলা আকাশ-ভরা,
যে-মানা রয়েছে সকল জানার পিছে,
সুরে-সুরে তারে খেলায়ে এনেছে নীচে।
রূপসী মায়ার ঘোমটা খুলিয়া দিয়া
করেছে তাহারে নিখিল-পরাণ-প্রিয়া !
ধরিবে ছায়ারে বুঝেছে যাহারে আঁচে—
রবি আছে, ওরে রবি আছে !

পরেছে সুন্দরী সন্ধ্যা, তরুণী ঊষা
গানের গোলাপে রাঙানো কবির ভূষা।
বর্ষা-প্রভাত, বসন্ত-শরৎ-রাত
অমর হয়েছে রজনীগন্ধার সাথ।
ছয় ঋতু খাটে যে নবরসের পালা
ছবিতে-ছবিতে কবিরে পরা'ল মালা।
মোহিনী প্রকৃতি নিজেরে দেখিয়া ভুলে
ক্ষ্যাপারে ক্ষ্যাপালো রূপের উৎস খুলে'।
দাও দাও, আরও দাও, পাইনি কিছু,
আগল ভাঙিয়া পাগল ছুটেছে পিছু !
ফুল ঝরে নাই, ভাটা পড়ে নাই নদীর নাচে—
রবি আছে, ওরে রবি আছে !

কত ভাবেই যে নারীরে দেখেছে কবি,
মহামানবীর স্নেহার এঁকেছে ছবি,
শিশু সে বক্ষে আদি-জননীর রূপে,
কন্যা বধূজায়া চুমায় ঘুমায় চুপে।
গৃহ-লক্ষ্মীর আসনে বসেছে নারী—
পুরুষে যোগায় সেবায় ভুলায় বারি।
যে নারী ভুলায় দয়িতে মিলন-রাতে,
দুরূহ-ব্রতে অংশ চায় বিদায়-প্রাতে।
প্রেয়সী নারীতে মধু আর একটু মেখে
ছুটী নিল কবি-নারীর পথটী এঁকে।
কবির স্বপন নারী-জাগরণ বর্ণে বর্ণে ফলিয়াছে,
রবি আছে, ওরে রবি আছে !

জনজাগরণ জানি সে-স্বদেশী-দিনে—
বজ্র-ঝঙ্কার কবির অগ্নি-বীণে।
উল্কার বেগে ছুটিছে আবেগে গান,
সাড়া দেয় শব, জাগে কঙ্কালে প্রাণ।
জয়-রথে নব-পথের সারথী কবি,
উঠে মহাজাতি আত্ম-বোধে সংজ্ঞা লভি।
মৈত্রী-প্রেরণা ভাতিল কবির ধ্যানে
ডাক দিয়ে যায় জীবন-দেবতা প্রাণে।
বিশ্ব-ভারতী মিলন-আরতি করে
জাতিতে জাতিতে একটী প্রণতি বরে।
কবি-অবদান মহাপ্রতিষ্ঠান জ্ঞান-দীপ জ্বালিয়াছে
রবি আছে, ওরে রবি আছে !

যুগ-যুগ যারে মা বলে—পড়িত ঝাঁপি
ধরা-থার ক্রোড়ে কবি ! মাতা বক্ষে চাপি
চুম দিতা ভালে, কালের সে রাজটীকা
পেয়ে কবি পেল জগৎ-আলোর শিখা।
মানবের মাঝে তাই সে বাঁচিতে চেত,
সুন্দর ভুবনে মরিতে চায়নি সে ত,
মুক্তি চায়-নি এড়ায়ে মানব-মেলা,
দিবে যোগ বিশ্ব-রঙ্গে—হোক্ তা খেলা।
এই তপোবন প্রদীপ্ত তেজের পর
দেবতা আসিয়া অলক্ষ্যে করিতা ভর।
মানুষের গেহ সে যে মাতৃস্নেহ কবিরে ঘিরিয়াছে
রবি আছে, ওরে রবি আছে !

পাবনার পরিচয়

শ্রীনকুলেশ্বর পাল বি. এল.

শস্য-শ্যামলা বঙ্গ-জননীর মাতৃমূর্ত্তি পাবনার প্রতি অণুপরমাণুতে পরিস্ফুট রহিয়াছে। ইহার প্রতি ধূলি-কণায় কত শক্তিশালী স্বাধীন নৃপতির শৌর্য্য-বীর্য্য ও পুরাকীর্ত্তি লুক্কায়িত রহিয়াছে, কে তাহার সন্ধান রাখে? প্রাচীন মন্দির, মসজিদ, দীর্ঘিকা, রাজবর্ত্ম এবং জাঙ্গালের ধ্বংসাবশেষ—যাহা আজিও বর্ত্তমান আছে, তাহাই এই জেলার লুপ্ত কীর্ত্তির সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। অনেকের মতে পাবনা জেলা অতি আধুনিক, সেই জন্য ইহার কোন পুরাকীর্ত্তি নাই। কিন্তু এই জেলা যে আধুনিক নহে এবং ইহারও যে প্রাচীন কীর্ত্তি ছিল, তাহাই প্রমাণ করিতে প্রয়াস পাইব। জানি না, আমার এই চেষ্টা কতদূর ফলবতী হইবে।

পৌণ্ড্রবর্দ্ধন-ভুক্তি হইতেই পাবনা নামের উৎপত্তি। কাহারও কাহারও মতে পুণ্যতোয়া জাহ্নবীর ত্রিধারার মধ্য হইতে পাবনী ধারা এই জনপদ বিধৌত করিয়া চলিয়াছে, সেই জন্যই এই জনপদের নাম পাবনা বলিয়া খ্যাত হইয়াছে।

মহাভারতের সভাপর্ব্বে ৩০শ অধ্যায়ে ভীমসেন কর্ত্তৃক পুণ্ড্রাধিপতির পরাজয়ের আখ্যান লিপিবদ্ধ আছে। মিঃ কানিংহামের মতে "The greater part of the Province of Pundra Bardhan was to the north of the Ganges including Pabna." মহাভারতীয় প্রাচীন যুগ হইতেও বঙ্গদেশকে অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, পুণ্ড্র ও সুহ্ম এই পাঁচ ভাগে বিভক্ত দেখা যায়। তৎপর মুসলমান-রাজত্বকালেও এই জেলার বর্ত্তমান সোনাগঞ্জ পরগণার উল্লেখ দেখা যায়। আইন-ই-আকবরির মতে পাবনা জেলা টোডরমল্লের সময়ে বাজুহার পরগণে ভুক্ত ছিল।

কাহারও মতে পাবনাজেলা দৈত্যরাজ শম্বাসুরের রাজধানী ছিল। প্রায় একশত বৎসর পূর্ব্বে পদ্মানদীর ভাঙ্গনে কাথারজানী গ্রাম নদীগর্ভে লুপ্ত হইয়া গেলে তথায় ভয়ানক ঘূর্ণাবর্ত্তের উদ্ভব হয় এবং নদীগর্ভ হইতে কয়েকখানি প্রস্তরফলক ও স্তম্ভ আবিষ্কৃত হয়, তাহা অদ্যাপি বাংলা সাহেবের দরগায় বিদ্যমান আছে। ঐ স্থানের পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামসমূহ দেবালয়, তারাবাড়িয়া (শক্তিস্থান), ভাঁড়ারা (ভাণ্ডার), করিয়াদহ (হস্তিশালা) ও ঘোড়াদহ (অশ্বশালা) নামে অদ্যাপি খ্যাত আছে। ইহাতে মনে হয়, উক্ত স্থানে প্রাচীনকালে কোন পরাক্রমশালী নৃপতির বাসস্থান ছিল। পুরাণে শম্বাসুরের রাজধানী পদ্মানদীর তীরে উল্লেখ আছে। তাহাতেই ঐ স্থান শম্বাসুরের রাজধানী ছিল বলিয়া অনুমান হয়। গঙ্গাভক্তি তরঙ্গিনীতেও এই শম্বাসুরের উল্লেখ আছে। ইহা পাবনা জেলার প্রাচীন ইতিহাসের কম নিদর্শন নহে।

স্বর্গীয় দুর্গাদাস লাহিড়ী মহাশয় প্রণীত পৃথিবীর ইতিহাসের মানচিত্রে পাবনা জেলা পদ্মানদীর তীরে বলিয়া বর্ণিত আছে। ১৬৪০ খৃঃ ঢাকুরী-কুলজ-গ্রন্থে পাবনার উল্লেখ আছে।

১৮৫০ অব্দের সার্ভে নক্সায় Pudeh Pabna (পোদে-পাবনা) বলিয়া মৌজার উল্লেখ দেখা যায়। অধুনা পাবনা শালগাড়ীয়া—যাহা পূর্ব্বে শালগ্রামপুর নামে অভিহিত ছিল, তাহা পরগণে পঞ্জুরাম নাজিরপুরের পোদে-পাবনার অন্তর্গত।

পাবনা জেলা নদীমাতৃক, এই জন্য এই জেলা বিভিন্ন শিল্প-বাণিজ্যের কেন্দ্রস্থল ছিল। পদ্মা ও যমুনা, এই দুইটী বিশালকায়া নদী ব্যতীত আরও বহু নদী ও শাখানদীর পীযূষধারায় সিক্ত হইয়া এই জেলার মৃত্তিকা উর্ব্বর হইয়াছে এবং ধন-ধান্যে একদিন এই জেলাকে সমৃদ্ধিশালী করিয়াছিল। প্রাচীন করতোয়া নদীতটে নিমগাছী, মরিচপুরাণ, নবগ্রাম ও হাণ্ডিয়াল—প্রাচীন প্রসিদ্ধ নগরসমূহ একদিন আকর্ষণের বিষয় ছিল। আত্রেয়ী নদীর তীরে ছাতকবরাট ও সিন্দুরীতে স্বাধীন নৃপতি রাজা

দেবীদাসের রাজত্বকালে মোগলসম্রাটকে পর্য্যন্ত এই জেলায় যুদ্ধে লিপ্ত হইতে হইয়াছিল। বরল নদীর তীরে গুলাই-গাছা, শালিখা, সিদ্ধিনগর ও চাটমোহর একদিন বাঙ্গালার শ্রেষ্ঠ পণ্ডিতগণের বাসস্থান ছিল। আজ সে স্থানের গৌরব নাই, এবং যাঁহাদের গৌরবে ঐ স্থানসমূহ বঙ্গের মুকুটমণি স্বরূপে গৌরবান্বিত হইয়াছিল, আজ তাঁহারা বা তাঁহাদের যোগ্য কোন বংশধর নাই। তাই বাঙ্গালার তথা পাবনার এই দুর্দ্দশা।

পাবনা সহরের দক্ষিণ ও পশ্চিমভাগ দিয়া এই সেদিনও ইচ্ছামতী নদী দু'কূল প্লাবিত করিয়া কুলু-কুলু বেগে নাচিয়া চলিয়াছে, ইহারই বুকে বিশ্বকবির কত স্বপ্নের ছবি তুলির মুখে আঁকিয়া তুলিয়াছে, ইহারই কূলে কূলে রবীন্দ্রনাথের কত সোনার স্বপন ফুটিয়া উঠিয়াছে। আজ ইচ্ছামতী জলহারা। আজ কে বিশ্বাস করিবে, রবীন্দ্রনাথের কত কবিতা, যাহা বিশ্ব মানবকে মুগ্ধ করিয়াছে, তাহা এই ইচ্ছামতীর বুকে রচিত হইয়াছিল।

১৩৩৮ অব্দে (1338A. D.) Ibn Betuta লিখিত গ্রন্থ হইতে যমুনার উল্লেখ দেখা যায়। ব্রহ্মপুত্র কামরূপ হইতে উদ্ভূত হইয়া বাঙ্গালা ও লক্ষণাবতীর দিকে যায়। কিন্তু ১৭৮১ খৃঃ মেজর রেনলের ম্যাপে যমুনা একটী ক্ষুদ্র শাখা বলিয়া বিবৃত আছে। কিন্তু ১৮০৯ খৃঃ তিব্বত-দেশীয় সাম্পু নামক নদী ব্রহ্মপুত্রের সহিত মিলিয়া জিনাই-যমুনা নামে প্রধান নদীতে পরিণত হয়।

একদিন করোতোয়া অত্যন্ত বেগবতী ছিল। এবং এই করোতোয়া কামরূপ রাজ্যের সীমা ছিল। এই নদীর অনুসরণ করিয়া বক্তিয়ার খিলিজী তিব্বত অভিযান প্রেরণ করেন। মিঃ হাণ্টারের মতে "The Karatoya was once a river of 1st class size. The present condition of districts of Bogra, Pabna and Rangpur shows that a great river once flew in or near the present bed of Karatoya."

হুলাই, হাণ্ডক, কাশীনাথপুর, সিন্দূরী প্রভৃতি প্রাচীন সম্পন্ন স্থান আত্রেয়ী নদীর কূলে অবস্থিত ছিল। অদ্যাপি তথায় ক্ষীণ স্রোতস্বতীর চিহ্ন পূর্ব্ব-কীর্ত্তির সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে।

The Atrai is one of the chanels of



উড্‌হেড ব্রিজ

Trisrota. It flows through Bit Chalan under the name of Gumani and passes through Pabna district.

সুরাসাগর পাবনা জেলার একটী বিশালকায়া নদী। এই অঞ্চলে একদা সাগর ছিল, তাহা ইহার নাম হইতেই অনুমান হয় এবং রেলওয়ে জরিপেও ঐ বিষয় উল্লেখ আছে।

ঢাকা জেলার মেঘনা, পদ্মা হইতে আসাম শৈলমালা পর্য্যন্ত একদিন সমুদ্র বিস্তৃত ছিল। এই জেলায় বহু নদ, নদী ও খাল, বিল বিদ্যমান আছে; তাহার আলোচনা করিয়া এই প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধি করিতে ইচ্ছা করি না। কারণ তাহাতে পাঠকগণের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিবার সম্ভাবনা আছে। একেই ইতিহাস বড় কঠিন বিষয়, ইহাতে রস পরিবেশন সম্ভব নহে। ইতিহাস অনুসন্ধিৎসু মানবমনের খোরাক জোগায় মাত্র।

সিরাজগঞ্জের সীমা হইতে সেরপুর বগুড়া অভিমুখে ধুবড়ী পর্য্যন্ত বিস্তৃত ভীমেরজাঙ্গাল নামে উচ্চ মৃত্তিকা-

স্তূপের ধ্বংসাবশেষ দৃষ্ট হয়। উহা পাল রাজত্বকালে মহারাজা ভীমপাল কর্তৃক ১০৫৫।৫৬ খৃঃ প্রস্তুত হইয়াছিল। ১৬৬০ খৃঃ ভ্যান ডেন ব্রুক রচিত মানচিত্রেও পাবনা জেলার সাহাজাদপুর, হাণ্ডিয়াল ও তারাসের মধ্যদিয়া বিলচলনের পূর্ব্বপার পর্য্যন্ত সাহীপথ অঙ্কিত আছে। তদ্দ্বারা মুসলমান রাজত্বকালে সৈন্য চালনা হইত। তারাস ও হাণ্ডিয়ালের মধ্যবর্ত্তী স্থলে ঐ পথ আজিও লুপ্ত হয় নাই, ইহাও পাবনা জেলার পুরাকীর্ত্তির পরিচায়ক। মহারাজ প্রতাপাদিত্যের সমসাময়িক রাজা বসন্তরায়ের নির্ম্মিত বসন্তজাঙ্গাল অদ্যাপি বাওইখোলা গ্রামের নিকট দৃষ্ট হয়। মহারাজা মানসিংহ সৈন্যসহ পাবনা সহরের নিকটবর্ত্তী বাজিতপুর ও হিমাইতপুর অঞ্চলে সৈন্য সমাবেশ করিয়া ছাউনি করিয়াছিলেন। মালিগাছা অঞ্চলে মানসিংহের জাঙ্গাল নামে উচ্চ মৃত্তিকাস্তূপ আজিও দৃষ্ট হয়। এই জেলায় অনেক স্থানে মরিচ পুরাণ, পণ্ডিতের ভীটা, খাড়ির ভিটা, জয় সাগর, ভাতুসিংহের দীঘি, মরদানদীঘি প্রভৃতি বহু পুরাকীর্ত্তি বিদ্যমান আছে। নবরত্নের মন্দির, জোড়া বাঙ্গলা, মকদমসাহেবের দরগা, মাকুমখাঁর মসজিদ, শিবের মন্দির, জগন্নাথের মন্দির প্রভৃতি বহু পুরাকীর্ত্তির ধ্বংসাবশেষ অদ্যাপিও বিদ্যমান আছে। আইন-ই-আকবরিতে শীলবর্ষের



এডওয়ার্ড কলেজ

উল্লেখ আছে। শীলবর্ষ এই জেলার একটী পরগণার নাম। গুপ্তরাজন্যবর্গের রাজত্বকালে নিমগাছীর নিকট সুবৃহৎ দিঘী ও জাঙ্গাল প্রস্তুত হয় এবং তথায় রাজধানীর নিদর্শন অদ্যাপিও দৃষ্ট হইয়া থাকে। ৬২৯ খৃঃ চীনের পরিব্রাজক হুয়েনসান পৌণ্ড্রবর্দ্ধনের রাজধানীতে আগমন করেন। গুপ্ত নৃপতিগণের রাজত্বকালে এখানে একটী তান্ত্রিক উপাসনার কেন্দ্রস্থল ছিল। শুনাইগাছার নিকটবর্ত্তী অঞ্চলে বহু তান্ত্রিক ব্রাহ্মণের বাসস্থান আছে। নিমগাছী, তারাস, চৈত্রহাটী প্রভৃতি অঞ্চলে প্রস্তরমিশ্রিত ভগ্নস্তূপ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা প্রাচীন মহানগরীর ধ্বংসাবশেষ। উল্লাপাড়ার নিকটবর্ত্তী চৈত্রহাটীতে বহু চৈত্য-বিহার ও মঠের ধ্বংসাবশেষ আছে। তথায় বৌদ্ধ তান্ত্রিক মতের অবলোকিতেশ্বর মূর্ত্তি অদ্যাপি বিদ্যমান আছে।

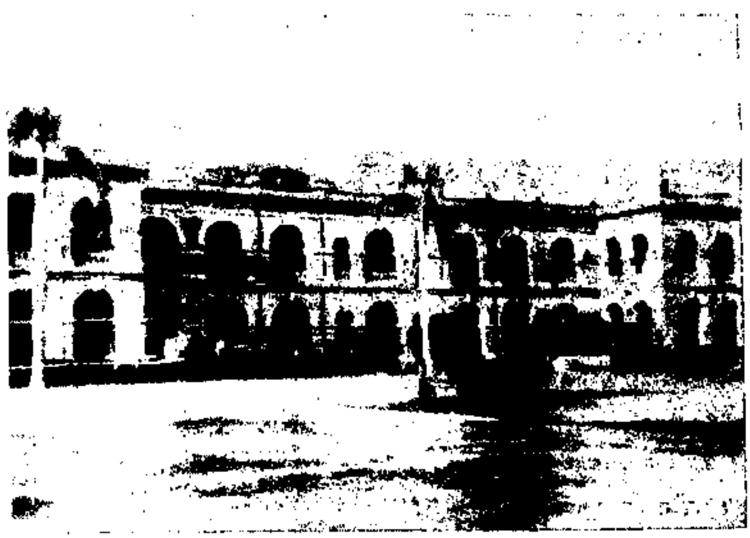
পাল রাজত্বের পর সেন রাজত্ব আরম্ভ হয়। ভীম ওঝা সম্রাট্ বল্লাল সেনের পুরোহিত থাকা কালে ছাতক আসিয়া বসবাস আরম্ভ করেন। ভীম ওঝার পৌত্র অনন্তরাম ওঝা রাজা লক্ষ্মণ সেনের গুরুদেব ছিলেন। রাজা লক্ষ্মণ সেন গুরুপত্নীর সিন্দূরের নামানুকরণে সিন্দূরীপরগণা ও শাঁখার নামানুকরণে শাখিনী পরগণা সৃষ্টি করিয়া গুরুদেবকে দান করেন। রায়গঞ্জ থানার অধীন মাধাই-নগরে মহারাজা লক্ষ্মণ সেনের তাম্রশাসন এই জেলা যে সেন বংশীয় রাজন্যবর্গের রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল তাহারই নিদর্শন। চাটমোহর বেদের যে চড়কপূজা স্মরণাতীত কাল হইতে চলিয়া আসিতেছে, তাহা বৌদ্ধ-ধর্ম্মের পরিচায়ক। নিমগাছী অঞ্চলে জয়সাগর, প্রতাপ দীঘি, উদয় দীঘি প্রভৃতি পাল রাজা ও সেন রাজন্যবর্গের জনহিতকর কার্য্যের সাক্ষ্য আজও প্রদান করিতেছে। রাজা লক্ষ্মণসেনের রাজত্ব কালে মকদম সাহেব সাহাজাদপুর আগমন করেন। তদীয় ভাগিনের খেজমুর সাহেব পোতাজিয়া গ্রামে এক দীর্ঘিকা খনন করেন। উক্ত খোয়াজ-দীঘি অদ্যাপিও পোতাজিয়াতে বিদ্যমান আছে। নিমগাছীর রাজা অচ্যুত সেনের দুর্গ ও সেনানিবাসের ভগ্নাবশেষ আজিও দৃষ্ট হয়। তিনি নিমগাছীতে অর্দ্ধ মাইল ব্যাপী জয়সাগর নামে এক দীর্ঘিকা খনন করেন—তাহার ২৮টী ঘাট ছিল। উদয় নামে তাহার বিশ্বস্ত সহচরের নামে উদয়দীঘি, প্রধান সেনাপতি প্রতাপের নামে প্রতাপদীঘি প্রতিষ্ঠা করেন। চাটমোহর থানার অন্তর্গত হরিপুরের নিকট সাণ্ডালগড়ের

ধ্বংসাবশেষ ও কালিকা মূর্ত্তি অদ্যাপিও বিদ্যমান আছে। উক্ত সান্যাল রাজবংশের শেষ মহারাণী ছিলেন ডেমড়া রায়-বংশের কন্যা রাণী সর্ব্বাণী। মহারাণী সর্ব্বাণী শিক্ষা বিস্তার কল্পে বহু জায়গীর দান করিয়া যান। রাজা হুসেন সাহের রাজত্বকালে বাঙ্গালায় এক নব যুগের সৃষ্টি হয়। সেই সময় শ্রীগৌরাঙ্গ দেবের আবির্ভাব হয় এবং প্রেমের বন্যায় দেশ ভাসিয়া যায়। তখন হইতেই গোহাইল বাড়ী, হাঁপালিয়া বৈষ্ণব প্রভৃতি স্থানে বৈষ্ণবগণের আখড়াদি প্রতিষ্ঠিত হয়, অদ্যাপিও তাহা বিদ্যমান আছে।

তারাসের অধীন নবগ্রামে ৯৩২ খৃঃ হুসেন সাহের পুত্র নসরৎ সাহ কর্ত্তৃক নির্ম্মিত এক প্রাচীনতম মসজিদ আজিও বিদ্যমান আছে। চাটমোহর থানার অধীন সমাজ গ্রামে এক প্রাচীন মসজিদের ভগ্নাবশেষ বিদ্যমান আছে, তাহা হিজরী ৯৫৮ অব্দে শের সাহের পুত্র সুলতান সলিম কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হয়।

১৫৬৩ খৃঃ সুলেমান কেরাণী বাঙ্গালা দেশ অধিকার করেন। এই সময় ছাতকের ভূঞা রাজা দেবীদাসের অভ্যুদয় হয়। রাজা দেবীদাস অত্যন্ত তেজস্বী ও ধর্ম্মপরায়ণ নৃপতি ছিলেন। কিন্তু নবাব, রাজার পুত্রগণের ব্যবহারে অসন্তুষ্ট হওয়ায় উমরু নামক সেনাপতির অধীনে ছাতকে একদল সেনা পাঠান। রাজা দেবীদাসের জ্যেষ্ঠ পুত্র কার্ত্তিক রায় যুদ্ধে নিহত হন। কাগরীখোলার নিকট গাজনের বিলে ভয়ানক নৌ-যুদ্ধ হয়। রাজা দেবীদাস শেষ পর্য্যন্ত যুদ্ধ করিয়া প্রাণ বিসর্জ্জন দেন। উমরু ছাতক অধিকার করে। এইরূপে পাবনার শেষ স্বাধীন নৃপতির স্বাধীনতাসূর্য্য অস্তমিত হয়। অদ্যাপি উক্ত অঞ্চলে ঘোড়াবাঁধা মাঠ নামে যে স্থানে উক্ত যুদ্ধের বাদশাহীসেনার ঘোড়া বাঁধা হইয়াছিল, তাহা বিদ্যমান আছে। গাজনার বিলের মধ্যে রাজা দেবীদাসের নৌবহর ছিল, তাহার ধ্বংসস্তূপ আজিও দৃষ্ট হয়। এবং গড়পার নামে রাজা দেবীদাসের দুর্গের শেষ নিদর্শন এখনও বর্ত্তমান আছে।

চাটমোহর অঞ্চলে পাঠান রাজ্যের নিদর্শন স্বরূপ পাঠান-পাড়া, আফ্রিদি পাড়া, কাজী পাড়া প্রভৃতি নামের অনেক পল্লী দৃষ্ট হয়। চাটমোহরে এক অতিপ্রাচীন মসজিদ ছিল, তাহা গত ভূমিকম্পের সময় ভূমিসাৎ হইয়াছে। উহা হিজরী ৯৮৯ অব্দে মাকুম খাঁ দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়। এই



জজ আদালত

মাকুমখাঁর পরিচয় আইন-ই-আকবরিতে লিপিবদ্ধ আছে। উক্ত মসজিদের প্রস্তরফলকের যে পৃষ্ঠায় উক্ত মসজিদ প্রতিষ্ঠার বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে তাহার অপর দিকে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবের মূর্ত্তি অঙ্কিত আছে। তাহাতে অনুমান হয়, উক্ত মসজিদ পূর্ব্বে মন্দির ছিল এবং পরবর্ত্তী কালে মসজিদে পরিণত হইয়াছিল। উক্ত মাকুমখাঁর সেনাপতি ছিল কালাপাহাড়।

১৫৭৫ খৃঃ আকবর শাহ বঙ্গদেশ জয় করিলেও চাটমোহর অঞ্চলে বিদ্রোহী পাঠানদের আশ্রয়স্থল ছিল। তাহাদিগকে পরাজয় করিবার জন্যই মহারাজা মানসিংহ বঙ্গদেশে প্রেরিত হন এবং তিনি মরিচপুরাণ, হিমাইতপুর, ছাতনী প্রভৃতি স্থানে সৈন্য সমাবেশ করেন। হিমাইতপুর মৃত্তিকাগর্ভে মানসিংহের দুর্গ আজিও বিদ্যমান আছে।

সহরতলীতে জোড়বাংলা নামে একটী অতি প্রাচীন মন্দির দৃষ্ট হয়। উক্ত জোড়বাংলার সন্নিকটে একটী প্রকাণ্ড দীঘি জরাট অবস্থায় আছে। *এখানে এইরূপ কিংবদন্তী আছে

যে, উক্ত মন্দির একজন স্বাধীন হিন্দুরাজার প্রতিষ্ঠিত ছিল। তিনি মোগল সম্রাটের নিকট পরাজিত হইলে উক্ত দীঘিতে বজরা আরোহণে রাজবংশের সম্মান রক্ষা হেতু মহিলা সহ বজরা নিমজ্জিত করিয়া সকলেই প্রাণ বিসর্জ্জন করেন।

আকবর বাদশাহের আমলে সিঁদুরীর কালিদাস রায়, সাঁতোলের গদাধর সান্যাল বাদশাহের সৈন্যকে পথ প্রদর্শন করিয়া বাঙ্গালা দেশে আনয়ন করেন এবং তাঁহারাই পাঠান-গণের অত্যাচারের প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য এই কার্য্য করেন এবং পাবনা অঞ্চলে মোগল সাম্রাজ্যের ভিত্তি স্থাপিত হয়। রাজা মানসিংহ মাসুমখাঁকে দমন করিতে আসিয়া পদ্মা নদীর সন্নিকটে ছাউনি ফেলেন এবং তজ্জন্যই উক্ত স্থানের নাম ছাউনী হইয়াছে এবং অপর সৈন্যদল চাটমোহরের সন্নিকট মথিচপুরাণে ছিল। সমাজ, চণ্ডীপুর, সুলতানপুর ও মথিচ-পুরাণ পাঠান সামরিক কেন্দ্রস্থল ছিল। তারাস অঞ্চলে বেণী রায় নামক এক সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত ব্রাহ্মণ ছিলেন। তদীয় পত্নী পাঠান সেনাপতি দ্বারা অপহৃতা হওয়ায় বেণী রায় এই অত্যাচারের প্রতিশোধার্থে এক হিন্দু ফৌজ সৃষ্টি করেন। এবং তিনি যবন-মর্দ্দিনী নামক এক কালীমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা



মহা শ্মশান

করেন। তিনি পণ্ডিতডাকাত নামে খ্যাত ছিলেন। তাঁহাকে দমন করার জন্য সুদূর দিল্লী হইতে আকবরশাহ রাজা মানসিংহকে পাবনা প্রেরণ করেন। রাজা মানসিংহের ভ্রাতা ভানু সিংহ বেণী রায়ের সহিত সন্ধি স্থাপন করেন এবং উক্ত কালী মাতার সেবা-পূজার জন্য এক প্রকাণ্ড জমিদারীর সনন্দ সম্রাটের নিকট হইতে রাজা মানসিংহ বেণী রায়কে আনাইয়া দেন।

বেণী রায়ের শিষ্য চণ্ডীপ্রসাদ রায় পোপজিয়া গ্রামে জমিদারী পাইয়া বসত-বাস করিতে থাকেন। পোপজিয়ার রায়গণ তাঁহারই বংশধর।

নগ্রামে রাজা মানসিংহের ভ্রাতা ভানু সিংহ কিছুদিন বাস করেন এবং তথায় ভানুসিংহদীঘি নামে এক দীঘি খনন করেন।

১৫৮০ খৃঃ মোগল-সচিব টোডরমল্ল বঙ্গদেশকে ভুক্তি ও পরগণায় বিভক্ত করিয়া রাজস্ব ধার্য্য করিয়া দেন। পাবনা জেলার অষ্টমণিষা নিবাসী গোপীকান্ত রায় তাঁহার অধীনে কাননগো নিযুক্ত হন। তখনকার দিনে কাননগোর ভয়ানক ক্ষমতা ছিল এবং কাননগো দেশের সর্ব্বেসর্ব্বা ছিলেন। যদুনাথ সরকার মহাশয় লিখিত "Extract form the Fort St. George of 2nd August" 1695" হইতে "The Quanangons are allowed 2. p. c of the produce of lands belonging to the farmers and husband men."

পাবনা ইচ্ছামতীর তীরে একদণ্ড পল্লীতেও মোগল সৈন্যের ছাউনী পড়িয়াছিল। উক্ত স্থানের নিকটবর্ত্তী হামিদপুর, ইয়াকুবপুর, জালালপুর প্রভৃতি গ্রামের নাম হইতেই মুসলমান সমাবেশের অনুমান করা যায়। ইদিল খাঁ পাঠানের নামানুসারে ইদিলপুর গ্রামের নামানুকরণ হয়।

মুর্শিদকুলিখাঁর অধীনে পাবনা জেলার হাটিকুমরুল গ্রামের রামনাথ ভাদুড়ী দেওয়ান ছিলেন। তিনি লক্ষাধিক টাকা ব্যয় করিয়া নিজ গ্রামে নবরত্নের মন্দির স্থাপন করেন। ইহাই পাবনা জেলার স্থপতি শিল্পের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। এতদ্ব্যতীত পোতাজিয়া গ্রামে নবরত্ন মন্দিরের ভগ্নাবশেষ

বিদ্যমান আছে। হাণ্ডিয়ালের শেঠের বাংলা ও জগন্নাথের মন্দির ও তারাসের কপিলেশ্বর শিবমন্দির এই জেলার পুরাকীর্ত্তির সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে।

যখন ইংরাজগণ বাণিজ্যের জন্য প্রথম এদেশে আসেন, তখন পাবনা জেলায় হাণ্ডিয়াল, নবগ্রাম, চাটমোহর, রতনপুর, মুন্সিদপুর প্রভৃতি স্থান বাণিজ্যপ্রধান ছিল। হাণ্ডিয়াল রেশমশিল্পের প্রধান কেন্দ্র ছিল এবং এক হাণ্ডিয়াল হইতেই বাঙ্গালা দেশের অধিকাংশ রেশম-বস্ত্র বিদেশে রপ্তানী হইত। এতদ্ব্যতীত এই সমুদয় অঞ্চলে কার্পাসের চাষ অধিক পরিমাণে হইত। ইংরাজ, ফরাসী, ওলন্দাজ প্রভৃতি বৈদেশিক ব্যবসায়ীরা তৎসমুদয় খরিদ করিয়া ইউরোপে চালান দিতেন। হাণ্ডিয়াল, অরণকোলা, কুমারখালী প্রভৃতি স্থানেও রেশমকুঠী ছিল। তখন কুমারখালী পাবনা জেলার অন্তর্ভুক্ত ছিল। ১৮২৮ সনের হামিল্টন সাহেবের ইষ্ট ইণ্ডিয়া গেজেটার হইতে জানা যায় যে, হিন্দুস্থান হইতে আমদানী রেশমের $\frac{১}{৪}$ অংশ এক হাণ্ডিয়াল হইতেই পাওয়া যাইত। ইহা কালে কুমারখালী রেসিডেন্সীর সহিত একত্রিত হয়। পাবনা সহরের Burial ground এর Tomb stone এ ১৮১২ সনের উল্লেখ দেখা যায়। তাহাতেই অনুমান হয়, ১৮১২ সনের পূর্ব্বকালে ইংরাজ ও বিদেশী বণিকেরা পাবনা যাতায়াত আরম্ভ করেন।

১৭৭৬ খৃঃ যখন দুর্ভিক্ষের করাল ছায়াপাতে ছিয়াত্তরের মন্বন্তর দেখা দিল, সেই সময় হাণ্ডিয়াল, সিদ্ধিনগর প্রভৃতি প্রসিদ্ধ নগর প্রায় জনশূন্য হইয়া পড়িল এবং তখন হইতেই শিল্পকলার বিশেষ ক্ষতি সাধিত হইল। ইহার পর পাবনার বুকের উপর দিয়া সন্ন্যাসী-বিদ্রোহ চলিয়া গিয়াছে। মথুরা, শ্রীনিবাসদিয়া, সাফলা প্রভৃতি অঞ্চলে চরম অত্যাচার অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। ১৮২৮ অব্দে পাবনা, খোতুপাড়া, মথুরা, রায়গঞ্জ, ধরমপুর, মধুপুর, কুষ্টিয়া ও পাংশা লইয়া পাবনা জেলা সর্ব্বপ্রথম গঠিত হয়। ১৮৫৫ সালে সিরাজগঞ্জও পাবনা জেলার অন্তর্ভুক্ত হয়। সিপাহীবিদ্রোহ আরম্ভ হইলে তাঁতীবন্দের বিজয়গোবিন্দ চৌধুরী মহাশয় নিজব্যয়ে ফৌজ রাখিয়া ঢাকা হইতে পাবনা পর্য্যন্ত স্থান সিপাহীবিদ্রোহের হস্ত হইতে রক্ষা করেন। ইহার পরে পাবনার বুকে নীল বিদ্রোহ দেখা দেয়, তখন পাবনা, মাঝিপাড়া, কুমিরপুর (বর্ত্তমানে পদ্মানদীর গর্ভে) ধুলাউড়ি প্রভৃতি স্থানে নীল কুঠি ছিল। তখন মিঃ



মহা-শ্মশান

কেনী ছিলেন নীলকুঠির বড় সাহেব। গভর্ণমেণ্ট বহু অর্থ ব্যয়ে উক্ত নীল বিদ্রোহ দমন করেন। তৎপর এই জেলার প্রজা-বিদ্রোহই বাঙ্গালার বুকে নব চেতনার সাড়া আনিয়া দেয়। এই স্থানের চাষীগণ নিজের স্বার্থ বলি দিয়া এই প্রজা আন্দোলন উপস্থিত না করিলে বাঙ্গালার প্রজাগণের দুঃখ-দৈন্যের দিকে কেহই দৃষ্টিপাত করিত না। সুতরাং এই জেলাই উক্ত আন্দোলনের অগ্রণী হওয়ায় ১৮৮৫ সনে প্রজা-স্বত্ব আইন প্রণয়ন করিতে গভর্ণমেণ্ট বাধ্য হন। ১৮৭৬ সনে পাবনা মিউনিসিপ্যালিটী এবং ১৮৭৯ সনে জজকোর্ট স্থাপিত হয়। ১৮৮৪ সনে বর্ত্তমান জজ আদালতের সৌধ নির্ম্মিত হইয়াছে। ইহার পর ১৯০৫ সনে বাঙ্গালার বঙ্গ-ভঙ্গ আন্দোলন আরম্ভ হয়। তখনও মাতৃপূজা বেদীমূলে এই জেলা অঞ্জলি ভরিয়া অর্ঘ্য প্রদান করিয়াছে। ১৯০৭ সনে পাবনা টাউন হলে Bengal Political Conference হয় এবং

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের সভাপতিত্বে বিদেশী বর্জন আন্দোলন আরম্ভ হয়। সমস্ত বাঙ্গালা দেশ, তথা সারা ভারত তখন এই নগণ্য পাবনার নির্দেশ মাথা পাতিয়া গ্রহণ করেন। এই পাবনার কান্ত কবি রজনীকান্ত তখন দেশের সম্মুখে এক নূতন আদর্শ ধরিয়াছিলেন, "মায়ের দেওয়া মোটা কাপড় মাথায় তুলে নে রে ভাই।" সমগ্র দেশ মায়ের দেওয়া স্বদেশী দ্রব্য মাথায় ধরিয়া ধন্য হইয়াছিল। তখন এই পাবনার দেশপ্রেমিক শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তীর নাম দেশ-বিদেশে মুখরিত হইয়া উঠিয়াছিল। আজ সে শ্যামসুন্দর দেশমাতৃকার বেদীমূলে আত্মাহুতি দিয়া সকল ক্লেশ হাসিমুখে বরণ করিয়া মায়ের কোলে ফিরিয়া গিয়াছেন।

"শিল্প ও বাণিজ্যে পাবনার স্থান"

পাবনা জেলা নদীমাতৃক বলিয়া প্রাচীনকালে শিল্প ও বাণিজ্যের প্রধান কেন্দ্রস্থল ছিল, ইতিপূর্ব্বেই তাহা উল্লেখ করিয়াছি। এই স্থানের রেশম-শিল্প, বস্ত্র-শিল্প, নৌ-শিল্প লৌহ-শিল্প ও কাগজ-শিল্প একদিন কত বৈদেশিক বণিককে সহস্র সহস্র মাইল পথ ও মহাসাগর অতিক্রম করিয়া পাবনার বুকে আকর্ষণ করিয়াছে।

রেশম-শিল্প :—রেশম-শিল্পের কুঠী মাঝিপাড়া, মুজিদপুর, হাণ্ডিয়াল প্রভৃতি স্থানে ছিল, তাহা ইতিপূর্ব্বেই লিখিয়াছি। এক হাণ্ডিয়াল হইতেই সারাবাঙ্গালার ১/৫ অংশ রেশম রপ্তানী হইত। ইহাতেই বুঝা যায়, তখন পাবনা জেলার কতখানি প্রাধান্য ছিল।

বস্ত্র-শিল্প :—বস্ত্র-শিল্প প্রাচীনকাল হইতেই বহুল পরিমাণে চলিয়া আসিতেছে। কোগাছী, সাহজাদপুর, আমিনপুর, দোগাছী, বড়ধুল ও ছোটধুল প্রভৃতি স্থান হইতে প্রস্তুত অতি সূক্ষ্ম বস্ত্রাদি ঢাকা মস্‌লিনের সহিত একদিন প্রতিযোগিতা করিয়াছে। আজিও বস্ত্র-শিল্প প্রাচীনকালের সুনাম অক্ষুণ্ণ রাখিতে সমর্থ হইয়াছে। বর্ত্তমানে সাহাজাদপুরে বস্ত্র-শিল্পের অধিকতর উন্নতি সাধিত হইয়াছে এবং পাবনার বস্ত্র সারাভারতে রপ্তানি হইয়া থাকে।

নৌ-শিল্প ও লৌহ-শিল্প :—একদিন এই জেলা নৌ-শিল্প, লৌহ-শিল্প, কাষ্ঠ-শিল্পের কেন্দ্রস্থল ছিল। পাবনার প্রস্তুত নৌ-বহর তখনকার দিনে নৌ-যুদ্ধে ব্যাপৃত হইত।

কাগজ-শিল্প :—প্রাচীনকালে এই জেলার অন্তর্গত কান্দাপাড়া ও কালিয়া-হরিপুরে কাগজ-শিল্পের উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছিল। এই জেলার প্রস্তুত কাগজ একদিন এই শিল্পে নবযুগ আনয়ন করিয়াছিল। ঐ কাগজ নবাব-সরকার প্রভৃতিতে ব্যবহার হইত। আজ পর্য্যন্ত কান্দাপাড়া গ্রামে ঐ কাগজ প্রস্তুত হইয়া থাকে। তবে বর্ত্তমান কলকারখানার যুগে এই হস্ত-শিল্প প্রতিযোগিতায় টিকিয়া থাকিতে পারিতেছে না। স্বর্গীয় রাধারমণ সাহা মহাশয় লিখিত 'পাবনার ইতিহাস' এই স্থানের প্রস্তুত কাগজে মুদ্রিত হইয়াছে।

এই জেলা একদিন শঙ্খ-শিল্প, পাটী-শিল্প ও সতরঞ্চ-শিল্পে বিশেষ খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিল।

গঞ্জী-শিল্প :—বর্ত্তমানে পাবনা সহরের গঞ্জী-শিল্প বাঙ্গালার মুখোজ্জ্বল করিয়াছে। এই গঞ্জী-শিল্পের প্রতিযোগিতায় জাপান পর্য্যন্ত পরাভব স্বীকার করিয়া ভারতবর্ষে গঞ্জী রপ্তানী বন্ধ করিয়াছে। এই সহরে অন্ততঃ ৩০০টী গঞ্জীর কল চলিতেছে। এইভাবে গৃহ-শিল্পরূপে গড়িয়া উঠিতেছে। পাবনা একজন্য বাঙ্গালার জাপান বলিয়া সম্মান ও খ্যাতি লাভ করিয়াছে। বঙ্গভঙ্গের সময় যখন 'বয়কট' আন্দোলন আরম্ভ হয়, তখনই পাবনা-শিল্প-সঞ্জীবনী কোম্পানী স্থাপিত হয়। আজ পাবনার গঞ্জী পৃথিবীবিখ্যাত বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

পাউরুটী-শিল্প :—বর্ত্তমানে এখানে পাউরুটী ও বিস্কুট cottage industry স্বরূপেই গড়িয়া উঠিয়াছে। এখানকার প্রস্তুত কেক্‌, বিস্কুট কোন বিলাতী কোম্পানীর জিনিষ অপেক্ষায় কোন অংশে নিকৃষ্ট নহে।

পাদুকা-শিল্প :—এখানে পাদুকা-শিল্প বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। শিক্ষিত ব্রাহ্মণ-সন্তানগণও এই শিল্পে যোগদান করিয়াছে; তাহারা ইহাই প্রমাণিত করিতেছে যে, শিল্প-কলা ও বিজ্ঞান সমস্ত জাতিভেদের উর্দ্ধে।

রং-শিল্প :—রং-শিল্প এখানকার একটী প্রধান ব্যবসা। এক পাবনা ছাড়া এই শিল্প আর কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। গভর্ণমেণ্টের রিপোর্টেও ইহাই প্রকাশ। এই রং-শিল্প পাবনা গৃহ-শিল্পে পরিণত হইয়াছে।

শৈলেন্দ্র নাথ কুণ্ডু

"শিক্ষা ও সাহিত্যে পাবনার স্থান"

পাবনা জেলার শিল্প, বাণিজ্য ও পুরাকীর্ত্তির বিষয় আলোচনা করিয়াছি। শিক্ষা ও সাহিত্যে পাবনার দানও কম নহে। এই জেলার মাটিতে কত কবি, সাহিত্যিক দার্শনিক, সাঁই, দরবেশ জন্ম গ্রহণ করিয়া ধন্য হইয়াছেন এবং বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালীর মুখোজ্জ্বল করিয়াছেন। প্রাচীন-কালে পাবনা একটী প্রধান শিক্ষাকেন্দ্র ছিল। এই জেলায় শত শত পণ্ডিতগণের টোলে ছাত্রগণ অধ্যয়ন করিয়াছে এবং জ্ঞানভাণ্ডার হইতে অমূল্য সম্পদ আহরণ করিয়া জাতিধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে বিশ্বের বুকে বিলাইয়া গিয়াছে। বড়শালিখা, গুণাইগাছা, সাঁড়েরা, হাণ্ডিয়াল প্রভৃতি স্থানসমূহ প্রধান প্রধান শিক্ষাকেন্দ্র ছিল।

সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতগণের মধ্যে ৺গোবিন্দকান্ত বিদ্যাভূষণের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনি ১২২৭ সালে শালিখা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ১২৫৩ সালে জজ-পণ্ডিত হন এবং পরে কালেক্টরের পদে নিযুক্ত হন। তাঁহার রচিত গ্রন্থাবলীর মধ্যে তত্ত্বাবলী নামক স্মৃতিগ্রন্থ ও ভুবন-বৃত্তান্ত নামক পৌরাণিক গ্রন্থ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বাগবাটী নিবাসী ৺ যদুনাথ ন্যায়রত্ন মহাশয় অতিশয় মেধাসম্পন্ন স্মৃতি-শাস্ত্রে ও কাব্যে অদ্বিতীয় পণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার রচিত দায়ভাগ-তত্ত্বাবলী ও ইন্দ্রায়ুধদূতম্ তাঁহাকে অমর করিয়াছে।

উধুনিয়া নিবাসী ৺ গোবিন্দ মোহন বিদ্যাবারিধি মহাশয় 'মৃন্ময়ী' গ্রন্থ লিখিয়া প্রমাণিত করেন যে, নিউটনের বহুশতাব্দী পূর্ব্বে ভাস্করাচার্য্যই সর্ব্বপ্রথম মাধ্যাকর্ষণ তত্ত্ব আবিষ্কার করেন, তৎপ্রণীত গ্রন্থরাজির মধ্যে লীলাবতী, অষ্টাদশ বিদ্যা প্রভৃতি গ্রন্থ হিন্দু বিজ্ঞান ও কৃষ্টির নব প্রেরণা দিয়াছে।

গুণাইগাছা নিবাসী ৺শশিভূষণ স্মৃতিরত্ন, শালিখা নিবাসী ৺রতিকান্ত বিদ্যাসাগর, ৺ শীতলচন্দ্র সার্ব্বভৌম, ৺ গোবিন্দ চন্দ্র সিদ্ধান্তবাগীশ, সারোরা নিবাসী ৺জয়দেব তর্কালঙ্কার, পাতাজিয়া নিবাসী ৺কৃপাময় সিদ্ধান্ত, হুদ নিবাসী ৺গোবিন্দচন্দ্র তর্কালঙ্কার প্রভৃতি মহাপণ্ডিতগণের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। হরিপুর, গুণাইগাছা প্রভৃতি অঞ্চলে এখনও ৪০০।৫০০ বৎসরের হস্তলিখিত তালপাতার পুঁথি পাওয়া যায়। রাধা-কৃষ্ণ লীলা, মহাভারত ও ভাগবত বিষয় কাব্যে রচিত আছে। এই পাবনার অন্তর্গত গুয়াপাড়া গ্রামে মনুসংহিতার প্রসিদ্ধ টীকাকার বিশ্ববিশ্রুত কুল্লুক ভট্ট জন্মগ্রহণ করেন। ইহা পাবনার পক্ষে কম গৌরবের বিষয় নহে। তদীয় বংশধর গুয়াপাড়া গ্রামে রমেশ চন্দ্র মজুমদার ও প্রকাশ চন্দ্র মজুমদার বর্ত্তমান আছেন।



জোড় বাংলা

ঘুরকা নিবাসী ৺ কৃষ্ণনাথ ন্যায়পঞ্চাননের পদাঙ্কদূতম্ শালিখা নিবাসী ৺ তারিণীকান্ত বিদ্যানিধির ত্রিলিঙ্গবোধকম্ শালিখা নিবাসী ৺ কাশী তর্কবাগীশ রচিত কারিকা-কুসুমাঞ্জলি-ব্যাকরণ, 'কলির ভারত' প্রভৃতি গ্রন্থ, ৺ মুকুন্দচন্দ্র লাহিড়ী প্রণীত ত্রিপুরাসুর কাব্য, বিজয়-সঙ্গীত, পুকুরপার নিবাসী ৺মুকুন্দরাম ন্যায়বাগীশ রচিত ব্যবস্থানির্ণয়, ৺জানকীনাথ ন্যায়বাগীশ কৃত কলাবতীকাব্য, হরিপুর নিবাসী ৺রামতোষণ তর্কালঙ্কার প্রণীত প্রাণতোষিণী-তন্ত্র, পাবনা এডোয়ার্ড কলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক ৺হেমচন্দ্র রায় এম, এ রচিত পরশুরামচরিতম্, হৈহয় বিজয়ম্, সত্যকাম-পরিগ্রহম্ প্রভৃতি গ্রন্থ পাবনার নাম উজ্জ্বল করিয়া রাখিয়াছে।

বঙ্গসাহিত্যের আলোচনা করিতে গেলে প্রথমেই কান্ত-কবি রজনীকান্ত সেনের নাম উল্লেখ করিতে হয়, যাঁহার দেশাত্মবোধক সঙ্গীত "মায়ের দেওয়া মোটা কাপড় মাথায় তুলে নে রে ভাই' বাংলা দেশে এক নূতন যুগের সৃষ্টি করিয়াছিল এবং যাঁহার আধ্যাত্ম-সঙ্গীত ও কবিতা সাহিত্যে নব প্রেরণা আনিয়াছিল। বঙ্গ-সাহিত্যে তাঁহার দান অতুলনীয়। তৎপর পাবনা শালবাড়ীয়া নিবাসী স্বভাব কবি ৺ বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয়ের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনি শিক্ষক ছিলেন এবং জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত তিনি শিক্ষকতা কার্য্যেই অতিবাহিত করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার রচিত শিশুপাঠ্য পুস্তকের তুলনা হয় না। জীবনসন্ধ্যায় অর্থাভাবে তাঁহাকে সিটি বুক সোসাইটীতে তাঁহার রচিত অমূল্য গ্রন্থাদি নাম মাত্র মূল্যে বিক্রয় করিতে হইয়াছিল।

তলট নিবাসী শ্রীযুক্ত শশধর রায় মহাশয় ৮৫ বৎসর বয়সে এখনও অক্লান্তভাবে সাহিত্যসেবা করিয়া আসিতেছেন। তাঁহার রচিত রাঘববিজয়, ত্রিদিববিজয় কাব্য ও উপনিষদ-গ্রন্থাবলী সুধীসমাজে বিশেষ ভাবে আদৃত হইয়াছে।

বড়ালপুর নিবাসী ৺ পূর্ণচন্দ্র সান্যাল মহাশয়ের লিখিত বাঙ্গালার সামাজিক ইতিহাস বিশেষ প্রশংসা লাভ করিয়াছে।

হরিপুর নিবাসী সবুজ-পত্রের সম্পাদক শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ চৌধুরী (বীরবল) বঙ্গসাহিত্যের মধ্যমণি। তাঁহার রচিত গ্রন্থের পুনরায় আলোচনা বঙ্গদেশে নিষ্প্রয়োজন মনে করি।

মহিষাদল রাজার সভাকবি বিধুরঞ্জন রায় রচিত গান, রত্নাকর উদ্ধার প্রভৃতি গীতিনাট্য অত্যন্ত মনোরম।

সাতবাড়িয়া নিবাসী ৺ বিহারীলাল গোস্বামী বিরচিত মেঘদূত, কুমার সম্ভব, গীতা, শেখ শাদীর পন্দনামা প্রভৃতির পদ্যানুবাদ কবিকে অমর করিয়াছে। প্রবাসীর পূর্ব্ববর্ত্তী 'প্রদীপ' প্রভৃতি বহু প্রথমশ্রেণীর পত্রিকার তিনি লেখক ছিলেন। তাঁহার লেখায় মুগ্ধ হইয়া রবীন্দ্রনাথ তাঁহাকে শান্তিনিকেতনে লইয়া যাইবার জন্য বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করেন, কিন্তু বিহারীলাল তাঁহার নির্ব্বাচিত কর্ম্মস্থল পোতাজিয়া স্কুলের হেড্‌মাষ্টারী ত্যাগ করিয়া যাইতে অস্বীকার করেন।

৺ সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার (রায় বাহাদুর) পাকুড়িয়াতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বিহারের ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট, প্রসিদ্ধ সঙ্গীতজ্ঞ ও সুসাহিত্যিক ছিলেন। তৎপ্রণীত 'কর্ম্মযোগের টীকা', 'ছোট ছোট গল্প' প্রভৃতি পুস্তক এবং 'নিধিরাম' ছদ্মনামে বহু প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। ৺ প্রিয়ম্বদা দেবী এবং তাহার মাতা স্বর্গীয়া প্রসন্নময়ী দেবী (হরিপুর নিবাসী কলিকাতা হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব জজ ৺ স্যার আশুতোষ চৌধুরী মহাশয়ের ভগ্নী) সুলেখিকা ছিলেন।

সিরাজগঞ্জের ৺ হেমেন্দ্রলাল রায় কবি ও কথা সাহিত্যিক ছিলেন। সাতবাড়িয়া নিবাসী ৺ বিহারীলাল গোস্বামীর পুত্র শ্রীপরিমল গোস্বামী একাধারে কবি, চিত্রকর ও গল্পলেখক। বর্ত্তমানে বঙ্গ-সাহিত্যে তাঁহার স্থান উচ্চে। ভারেঙ্গা নিবাসী ডাঃ অমিয়নাথ চক্রবর্ত্তী (রবীন্দ্রনাথের প্রাক্তন সেক্রেটারী) শান্তিনিকেতনের অধ্যাপক, বহু বাঙ্গালা ও ইংরাজী কবিতা লিখিয়া সুনাম অর্জ্জন করিয়াছেন। তদীয় মাতা স্বর্গীয়া অনিন্দিতা দেবী (বঙ্গনারী) বঙ্গসাহিত্যের মুখোজ্জ্বল করিয়াছেন।

ভারেঙ্গা নিবাসী শ্রীশকুন্তলা চৌধুরী 'জয়শ্রী'র প্রাক্তন সম্পাদিকা ছিলেন।

শ্রীযুক্ত জাহ্নবীচরণ ভৌমিক মহাশয়ের লিখিত 'সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস' এবং ৺ প্রসন্নারায়ণ চৌধুরী (রায় বাহাদুর) মহাশয়ের রচিত 'গায়ত্রী' বঙ্গসাহিত্যে শ্রেষ্ঠ দান।

১৯১৪ সালে পাবনা ইনষ্টিটিউসন স্কুল প্রাঙ্গণে মহারাজা জগদিন্দ্রনাথ রায় বাহাদুরের সভাপতিত্বে উত্তরবঙ্গ সাহিত্য-সম্মেলনের সপ্তম অধিবেশন হয়, তাহাতেই সাহিত্যে পাবনা জেলার স্থান নির্ণয় হইবে। এই জেলার হাঁসপুরের জঙ্গলে যে প্রস্তরফলক আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহাতে প্রাচীন ভারতে বাংলা অক্ষরের নিদর্শন পাওয়া যায়।

পাবনার মত একটী ক্ষুদ্র জেলায় 'পাবনা এডোয়ার্ড কলেজ' নামে একটী প্রথম শ্রেণীর এবং 'সিরাজগঞ্জ কলেজ' নামে একটী দ্বিতীয় শ্রেণীর কলেজ বিদ্যমান আছে। এবং উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের সংখ্যাও এই জেলায় ৪৫টির কম নহে। এতদ্ব্যতীত বহু মধ্য ইংরাজী ও প্রাইমারী স্কুল, টোল ও মক্তব জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার করিতেছে। বিশেষ স্কুলের মধ্যে পাবনা টেক্‌নিক্যাল স্কুল ও ট্রেনিং স্কুলের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। টেক্‌নিক্যাল স্কুলে সর্ব্বপ্রকার কারিকরী শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে এবং রাজসাহী বিভাগের মধ্যে এই স্কুলটী সর্ব্বপ্রকারে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছে।

এই জেলা হইতে যে সমুদয় পত্রিকা প্রকাশিত হইয়াছে তাহা উদ্ধৃত হইল :

			সম্পাদক
১। পাবনা দর্পণ	মাসিক পত্রিকা	পাবনা হইতে প্রকাশিত ১২৭১ সাল	৺রামসুন্দর রায়।
২। স্বদেশ হিতৈষিণী	পাক্ষিক পত্রিকা	১৮৭৬ অব্দে প্রচার বন্ধ হয়	৺গৌর গোবিন্দ উপাধ্যায়।
৩। জ্ঞান বিকাশিনী	সাপ্তাহিক	তলাইখানা হইতে প্রকাশিত	৺ভৈরব চন্দ্র সিদ্ধান্ত।
৪। আশালতা	মাসিক	সিরাজগঞ্জ হইতে প্রকাশিত	৺চন্দ্র মোহন সেন।
৫। অনুবীক্ষণ	"	পাবনা হইতে প্রকাশিত	৺হরিশ্চন্দ্র তলাপাত্র।
৬। বামাবোধিনী পত্রিকা	"	"	"
৭। বার্ত্তাবহ	সাপ্তাহিক	মালোঞ্চী হইতে প্রকাশিত	
৮। ভ্রমর	মাসিক		
৯। বিজলী	"	দিলপশার হইতে প্রকাশিত	
১০। উষা	"	পাবনা হইতে প্রকাশিত	
১১। জ্যোৎস্না	"	"	৺বরদা প্রসাদ বসু বি, এল।
১২। পাবনা ও বগুড়া হিতৈষী	সাপ্তাহিক	পাবনা হইতে প্রকাশিত ১৩০৯ সাল	বর্ত্তমানে শ্রীপ্রফুল্ল কুমার মুখোপাধ্যায়
১৩। প্রতিনিধি	"	সিরাজগঞ্জ হইতে প্রকাশিত	
১৪। স্বরাজ	"	পাবনা হইতে প্রকাশিত	
১৫। আরতি	ত্রৈমাসিক	"	শ্রীরাধারমণ দাস
১৬। শাশ্বত সংসদ	মাসিক	"	
১৭। পাবনার কথা	সাপ্তাহিক	"	কবিশেখর শচীন্দ্রমোহন সরকার।

পাবনা জেলা সাহিত্য সেবা পূর্ব্বাপরই করিয়া আসিয়াছে। সাহিত্যে নব প্রেরণা সৃষ্টির জন্য 'সাহিত্য চক্র' প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

পাবনা জেলার নিজস্ব বহু পল্লী-কবিতা ও পল্লী-গীতি, ভাসান, সাঁই, দরবেশী ও বাউল সঙ্গীত প্রচলিত আছে। ঐ সমুদয় এই প্রবন্ধে আলোচনা করিলে প্রবন্ধের কলেবর অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইবে, তজ্জন্য তৎসমুদয় পরবর্ত্তী প্রবন্ধে আলোচনা করিবার ইচ্ছা থাকিল।



মায়ের পূজা

শ্রীশৈলেন্দ্রমোহন রায়

বিষ্ণুপুরের রায়দের আর সেই অবস্থা নাই, বিশাল জমিদারী বহু অংশে বিভক্ত হইয়া গিয়াছে। অধিকাংশ সরিকই গ্রামের বাস উঠাইয়া সহরে চলিয়া গিয়াছেন। জমিদারীর আয়টা তাঁহারা উপরস্তু হিসাবেই ধরিয়া লন।

কিন্তু ছয় আনা অংশের সরিক রামেশ্বর রায় কিছুতেই গ্রামের সম্পর্ক ত্যাগ করিয়া সহরের বাসিন্দা হইতে পারেন নাই। অন্যান্য সরিকদের চেয়ে তাঁহার আর্থিক অবস্থা অনেক ভাল।

এবার রামেশ্বর রায়ের বাড়ীতে পূজার ধুমটা যেন অন্যান্য বারের চেয়ে বেশী। কারণ অবশ্য একটা আছে। আজ কয়েকমাস হইল প্রৌঢ় রায় মহাশয়ের গৃহে একটি নবীন অতিথির আগমন সম্ভাবনার কথা ঘোষিত হইয়াছে।

পূজার ব্যাপারে নায়েব হরমাধব একটু আপত্তি জানাইয়া বলিয়াছিলেন—"এখন জমিদারীর যে অবস্থা, তাতে এত টাকা পূজোর জন্যে বরাদ্দ করা কি ঠিক হবে?"

রায়ম'শায় পুরুষ্টু গোঁফ জোড়ায় আঙুল বুলাইতে বুলাইতে স্নিগ্ধ স্বরে বলিলেন, "হবে, খুব হবে নায়েব মশাই। তারপর যেন কতকটা অন্যমনস্ক ভাবেই দীর্ঘশ্বাস ছাড়িয়া বলিলেন,—মায়ের পূজো করে কেউ কোন দিন দেউলে হয়েছে শুনেছেন? আগে রায় বাড়ীতেই একশো পাঁঠা দশ বারটা মোষ বলি হোত, আর এখন, যাক গে সে কথা। পূজোর যা বরাদ্দ করেছি, তাই হবে।" নায়েব আর উচ্চবাচ্য করিতে সাহস করেন নাই।

সেদিন রায়-গৃহিণী নিস্তারিণীদেবী স্বামীকে বলিলেন,—"হ্যাগা, তোমাকে দেখে যেন আর চেনাই যায় না, আগে তোমার হাসি দেখতে হোলে তপস্যার দরকার হোত, আর আজ কাল সব সময়ই মুখে হাসিটি লেগে আছে। ব্যাপার কি বলতো।"

ব্যাপার তাঁহার অজ্ঞাত ছিল না, তবু তিনি আর একবার শুনিতে চান রায় ম'শায়ের মুখ দিয়া।

রায় হাসিয়া জবাব দিলেন, "বল কি গো! হাসব না তো মুখ গোমরা করে ঘুরে বেড়াব নাকি।" তারপর একটু থামিয়া বলিলেন, "যাক এতদিনে তবু স্বস্তির নিঃশ্বাস ছেড়ে বাঁচলাম, এত বড় জমিদারী যে সাত ভূতে লুটে খেত চোখ বুজলেই। এবার একটা পাকাপাকি ব্যবস্থা হোল।"

রায়-গিন্নী স্বামীকে অত সহজে নিশ্চিন্ত হইতে দেন না, মেয়েও তো হোতে পারে।

রায় যেন কতকটা নিরুৎসাহ হইয়া পড়েন, নিঃশ্বাস ছাড়িয়া বলিলেন, "তা পারে," তারপর একটু থামিয়া আবার বলিলেন, "মেয়ে হোলে তাকে বিয়ে দিয়ে জামাই শুদ্ধ কাছে এনে রাখব, তা'হলেই হবে।"

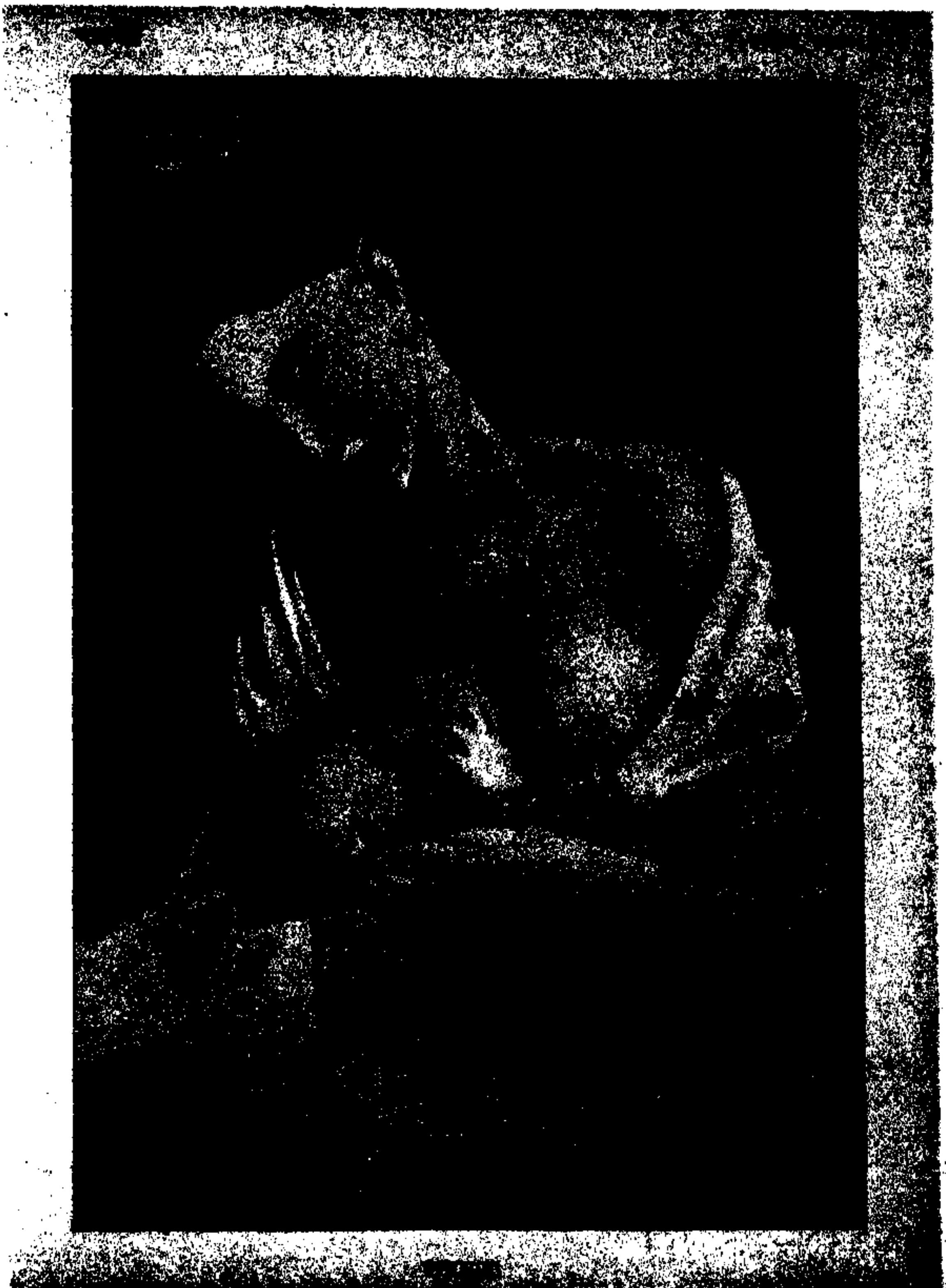
রায়-গিন্নী হাসিয়া ফেলিলেন, "থাক্ ও কথা, লোকে বলে না, গাছে কাঁঠাল গোঁফে তেল, তোমারও হয়েছে সেই দশা। হ্যাঁগা, এবার নাকি শুনলাম পূজার খুব ধুম-ধাম করবে?"

রায় হাসিয়া জবাব দিলেন, হ্যাঁ গো হাঁ, খুব ধুম-ধাম হবে। নানারকম বাজী ছাড়া হবে, কোলকাতা থেকে যাত্রাদল আসবে, গরীবদের একখানা করে নূতন কাপড় বিলানো হবে,—আরও কত কি হবে, সে সব ভেবে ঠিক করি নি এখনও।"

নিস্তারিণী দেবীর মুখ আনন্দে উজ্জল হইয়া উঠে, স্মিতমুখে তিনি স্বামীর মুখের দিকে তাকাইয়া থাকেন, মনে বলেন,—"হে ঠাকুর, ওঁর আশাই যেন পূর্ণ হয়—যেন ছেলে হয়।"

পূজা আসিয়া পড়িয়াছে। এই ক'টা দিনের জন্য বাঙালীজাতি গভীর উৎকণ্ঠার সঙ্গে অপেক্ষা করিতে থাকে। মরা গঙ্গায় যেন বান ডাকে এই সময়।

নহবৎ বাজনা বাজিতেছে। রায় চণ্ডী-মণ্ডপে বসিয়া আছেন। পুরোহিত এখন পূজায় বসিবেন, এই সময়টা তাঁহাকে না থাকিলেই নয়। তিনি এখানে বসিয়া আছেন, কিন্তু তাঁহার মন পড়িয়া আছে দো-তালার পুব দিকের



ঘরটার মধ্যে। কে জানে এখন কেমন আছে নিস্তারিণী। কত কষ্টই না পাইতে হইতেছে তাহাকে। আহা বেচারী!…

টাকা ব্যয় করিতে তিনি কার্পণ্য করেন নাই। সহর হইতে যাবতীয় ওষুধ-পত্তর লইয়া ডাক্তার আসিয়াছে, গ্রামের দাই তো আছেই।

রায় বসিয়া আছেন প্রতিমার দিকে চাহিয়া। স্থির নেত্র, উন্নত বক্ষ, প্রশস্ত ললাট। মনে হয় কোন যোগী যেন ধ্যানাসনে বসিয়াছেন। হঠাৎ একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়িয়া রায় নিম্নকণ্ঠে বলিলেন, "মা ইচ্ছাময়ী, সবই তোর ইচ্ছা মা।"

বৃদ্ধ হরিহর চাটুজ্জে আসিয়া দাঁড়াইতেই তিনি অভ্যর্থনা করিলেন, "আসুন, আসুন খুড়োমশাই।"

চাটুজ্জে ম'শাই আসন গ্রহণ করিয়া বলিলেন, "প্রতিমা এবার বড় চমৎকার হয়েছে রামেশ্বর। এরকমটি এ তল্লাটে নাকি আর হয়নি এবার। মা যেন আমার হাসছেন, আহা, মা, মাগো।"

ভক্তি গদগদ্ কণ্ঠে চাটুজ্জে মাকে ডাকিলেন। রায় উদাস কণ্ঠে বলিলেন, "সবই মা ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছে, আমরা তো নিমিত্ত মাত্র।"

চাটুজ্জে এবার আসল কথাটি জিজ্ঞাসা করিলেন, "হ্যাঁ, বাবাজী শুনলাম এবার নাকি ব্রাহ্মণদের একজোড়া করে কাপড় দেওয়া হবে?"

রায় হাসিমুখে ঘাড় নাড়িয়া কথাটি অনুমোদন করিলেন। চাটুজ্জে বলিলেন, "বেঁচে থাক বাবাজী, বাপ ঠাকুর্দার মুখ উজ্জ্বল কর। কল্যাণ হোক তোমার, ধনে জনে—"

কথাটা শেষ হইল না, রায় বাড়ীর ভৃত্য আসিয়া ডাকিল, "কর্তা।" রায় চমকিয়া উঠিলেন, "কিরে, রামচরণ, কি খবর।"

—"আজ্ঞে, দাদাবাবু ডেকে পাঠিয়েছেন আপনাকে।" দাদাবাবু মানে নিস্তারিণী দেবীর ভ্রাতা, পূজার সময় ভগ্নির কাছে বেড়াইতে আসিয়াছে।

—"কেন রে?" গভীর উৎকণ্ঠা ফুটিয়া উঠে রায়ের কণ্ঠস্বরে।

—"তা তো জানি না, কর্তা।"

—চল্, বলিয়া তিনি আর একবার প্রতিমার দিকে তাকাইয়া মনে মনে প্রার্থনা করিলেন, "গিয়ে যেন সব ভাল দেখি মা।"

…রায় বাড়ী আসিয়া সোজা উপরে উঠিয়া আসিলেন। উপরে উঠিয়া ডাক্তারের সঙ্গে দেখা হইল। রায় জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কেমন আছে ডাক্তার বাবু?"

ডাক্তার স্বীয় গাম্ভীর্য্য বজায় রাখিয়া বলিলেন, "আপনার স্ত্রী ভালই আছেন, তিনি একটি মৃত সন্তান প্রসব করেছেন।"

রায় কিছুক্ষণ বিহ্বল দৃষ্টিতে ডাক্তারের মুখের দিকে তাকাইয়া রহিলেন, তারপর ধীরে ধীরে মাথা নীচু করিয়া চলিয়া গেলেন।

ঘরে ঢুকিয়া দেখিলেন, নিস্তারিণী মৃত সন্তানকে বুকে চাপিয়া আকুলভাবে কাঁদিতেছেন। এক মুহূর্ত রায় স্থির হইয়া দাঁড়াইলেন, তারপর নিস্তারিণীর মাথায় একটা হাত রাখিয়া ডাকিলেন, "নীতু—"

স্বামীর গলার আওয়াজ শুনিয়া নিস্তারিণী মুখ তুলিয়া তাকাইলেন, পরক্ষণেই আবার লুটাইয়া পড়িয়া বলিলেন, "ওগো, এ কি হোলো?"

রায় প্রচণ্ড শক্তিতে নিজেকে স্থির করিয়া ফেলিলেন, ধীরে ধীরে বলিলেন, "কেঁদোনা নিতু, কেঁদে আর কি করবে। সবই তো ভগবানের হাত।"

আলুলায়িত কেশ দুই হাতে মুখের উপর হইতে সরাইয়া নিস্তারিণী দেবী ভাঙ্গা গলায় বলিলেন, "ভগবান! যে ভগবান শুধু শুধি—"

রায় নীরস কণ্ঠে বলিলেন, "ছি, ওকথা বলতে নেই। কথা বলিয়া তিনি হাত বাড়াইয়া ছোট্ট মাংসপিণ্ডটিকে তুলিয়া লইলেন, নিস্তারিণী দেবী এবার আর আপত্তি করিলেন না, বালিশে মুখ গুঁজিয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

…রায়-বাড়ীর বিশাল চণ্ডীমণ্ডপ থম্ থম্ করিতেছে। দুঃসংবাদ ছড়াইয়া পড়িতে বিলম্ব হয় নাই। ঢাক-ঢোল আপনা আপনি বন্ধ হইয়া গেল, কুলপুরোহিত পূজা থামাইয়া বড় চোখ করিয়া এদিক-ওদিক তাকাইতে লাগিলেন, অভ্যাগত সকলে যেন কি একটা গুরুতর কিছু আশঙ্কা করিয়া ভবিষ্যতের জন্য চুপচাপ বসিয়া আছেন।

খড়মের শব্দ শ্রুত হইল। সকলেই বুঝিল রায়-ম'শায় আসিতেছেন।

রায় আসিয়া মণ্ডপে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার মুখ শান্ত, কোন উদ্বেগের চিহ্নই সেই মুখে বর্ত্তমান নাই। ঝড়ের পরে প্রকৃতির অবস্থা যেমন শান্ত স্থির হয়, রায়ের অবস্থাও অনেকটা সেই ধরণের।

তিনি আসিয়াই বলিলেন, কৈ রে, তোরা বাজনা বন্ধ করলি কেন, ওকি পুরুত মশাই, পূজো সুরু করুন। সময় যে বয়ে যাবে।" ঢাক ঢোল আবার বাজিয়া উঠিল, পুরোহিত পূজার মন্ত্র উচ্চারণ করিতে সুরু করিলেন।

রায় বসিয়া আছেন প্রতিমার দিকে চাহিয়া, তাঁহার স্ফীত বক্ষধর আলোড়িত করিয়া একটি দীর্ঘশ্বাস বাহির হইয়া গেল, তিনি চাপা গলায় ডাকিলেন,—"মা ইচ্ছাময়ী, আমায় নিয়ে একি খেলা খেললি মা!"

কথা বলার সঙ্গে সঙ্গেই দুই বিন্দু অশ্রু তাঁহার চোখ দিয়া গড়াইয়া পড়িল।

রায়ের অশ্রু-অর্ঘ্যে মায়ের পূজা আরম্ভ হইল।

উর্ব্বশীর প্রতি

কোনদিন তুমি থামিবেনা কিগো ইন্দ্রপুরীর নটী
চপল চরণে নাচিয়া চলিবে যৌবন মধুমতী!
কতদিন,—কত যুগযুগান্ত এল আর গেল চ'লে'
তব চরণের নূপুর ছন্দে আপন হৃদয় দ'লে'।
কত হৃদয়ের বিরহ বেদন তোমার নৃত্য তালে
নির্ঝরে ঝরি' পড়ি ও চরণে মিলাল অসীম কালে।
যুগ কবিদের উতলা পরাণ, তব বন্দনা গানে
মর্ত্তের সুরে মুখরিল কত কবিতার অবদানে।
কেহ লভিলনা কিছুই তোমার, তুমি অন্তরে থাকি'
নৃত্যের অবগুণ্ঠন টানি নিজেরে রাখিলে ঢাকি।

থাম, থাম আজ, থামাও বারেক উতল নৃত্য তব
নন্দন বনে রূপসী তোমার আন নব অনুভব।
তনু বল্লরী ভঙ্গিমা তরে অনেক নেচেছ তুমি
কল্পলের মায়া অনেক মেখেছ সুখের স্বপন চুমি।
তবু ঐ নীল মোহিনী নৃত্যে আনোনি আজো যে আশা
নীল-নীবিতলে গোঠেনিক ফুটে শত জীবনের ভাষা।
আকাশ সাগর ধূলায় ধরায় কোটি হৃদয়ের তীরে
আলোকে আঁধারে আনো তারে আনো ফিরে।
অপসারি লও রসের আড়াল, উৎসব কর শেষ
তারে এনে দাও তোমার মাঝারে—যে তুমি নিরুদ্দেশ।

খোল উর্ব্বশি তোল তোল আজ, খোল যত আভরণ
মত্ত-আবেশ, মদিরতা হ'তে তুলে লহ দেহ মন।
ওগো নব্যসী!* আমি জীবনের যাপি বিনিদ্র রাতি-
তোমার লাগিয়া উৎসুক প্রাণে জ্বেলেছি একটি বাতি।

---

*নব্যসী—চিরনূতন, চিরপুরাতন (ঋগ্বেদ)

সাহিত্য পরিষদ ও রবীন্দ্রনাথ*

শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত

আজ পিতৃপক্ষীয় তর্পণারম্ভের প্রথম পুণ্য তিথিতে সাহিত্য-পরিষদের সভ্যগণ আমরা বীরশ্রেষ্ঠ পিতামহ ভীষ্ম সদৃশ সাহিত্য মহারথের তর্পণাঞ্জলি দিবার জন্য এই বাণীপীঠে সমবেত।

কবিসম্রাটের উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধাঞ্জলি তর্পণ করিবার পূর্ব্বে আমার একটী সামান্য নিবেদন আছে। এই নিবেদনটী মহাকবির সম্পর্কিত একদিনকার বিশেষ ঘটনার বিবরণ। সেই দিনটী আমার প্রথম জীবনের অতি ক্ষুদ্র সারস্বত সেবার এক গৌরবময় শুভ মুহূর্ত্ত। তুলনায় রবীন্দ্রনাথ মধ্যাহ্ন মার্ত্তণ্ড আর মাদৃশ অভাজন খদ্যোত অপেক্ষাও ক্ষুদ্র। তবে আমি ঐ শুভক্ষণের ব্যাপারটী জীবনে কখনও বিস্মৃত হইতে পারি নাই বলিয়া এখানে নিবেদন করিতেছি। ঘটনাটী বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্ সম্পর্কেই।

সে আজ ৪০ বৎসরের পূর্ব্বের কথা। ১৩০৮ সালের ১৪ই পৌষ, ইংরাজী ২৯শে ডিসেম্বর, ১৯০১, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্ কলিকাতার 'এলবার্ট হলে' এক সান্ধ্য সম্মেলনের উদ্যোগ করিয়া কলিকাতায় উপস্থিত ভারততিলক পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত বালগঙ্গাধর তিলক প্রমুখ কয়েকজন ভারতীয় মনীষীকে ও মফস্বলবাসী পরিষদ সদস্যগণকে সম্বর্দ্ধনা করেন।

এই সম্বর্দ্ধনার আয়োজনে যে সকল কীর্ত্তিমান প্রখ্যাতনামা সাহিত্যরথী ও কলাবিদ্‌গণ কার্য্য-সূচীর ভিন্ন ভিন্ন ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন তাঁহারা প্রায় সকলেই আজ মহাযাত্রা করিয়া পরপারের সাহিত্যমন্দিরের বাণী-পূজারীরূপে তথায় বিদ্যমান। সাহিত্য পরিষদের কোন বিশেষ অধিবেশনে এরূপ এক অপূর্ব্ব সাহিত্য-রথিগণের সমাবেশ ও সঙ্গে সঙ্গে কার্য্যভার গ্রহণ করিয়া সেই অধিবেশনটিকে গৌরবমণ্ডিত করিবার ইতিহাস নাই বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না।

এই সম্বর্দ্ধনার আয়োজনের কার্য্য-সূচীর প্রথম দফায় তাৎকালিক যন্ত্রসঙ্গীতাচার্য্য শ্রীযুক্ত নবীগোপাল নিয়োগী মহাশয়ের পরিচালনায় তাঁহারই সম্প্রদায় কর্ত্তৃক একতান বাদনের পর পরিষদের অন্যতম সহকারী সভাপতি কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ এক অপূর্ব্ব সঙ্গীত গান করিয়া সম্মানী অতিথিগণকে অভিনন্দিত করেন। এইবারই প্রথম পরিষদের প্রকাশ্য সাধারণ সভায় কবীন্দ্র রবীন্দ্র তাঁহার বীণাবিনিন্দিত কণ্ঠে স্বরচিত সঙ্গীতালাপ করিয়া সভাস্থ সকলকে মুগ্ধ করেন।(১)

পরে রবীন্দ্রনাথের স্বনামধন্য মধ্যমাগ্রজ পরিষদের সভাপতি মনীষিবর শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় ইংরাজী ভাষায় এক মনোজ্ঞ আবৃত্তি করেন। বাঙ্গালা ভাষায় আবৃত্তির ভার তাঁহাদের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বয়ঃকনিষ্ঠ তাৎকালিক পরিষদ্-গ্রন্থাধ্যক্ষ এ দীনের উপরই ন্যস্ত ছিল এবং মান্দ্রাজনিবাসী শতাবধানী পণ্ডিত বেমুরী শ্রীরামশাস্ত্রী মহাশয় সংস্কৃত ভাষায় এক অপূর্ব্ব আবৃত্তি করেন।

সঙ্গীত-বিশারদ শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক জয়দেব ও বিদ্যাপতির পদাবলী গীত হয়।

নটকুলচূড়ামণি অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তফী মহাশয়ের কৌতুকাভিনয় ও ভবানীপুরের বীণাপাণিসমিতি কর্ত্তৃক সংস্কৃত মৃচ্ছকটিক নাটকের অংশবিশেষের অভিনয় হয়।

স্বনামধন্য কবি ও নাট্যকার মিঃ ডি, এল, রায়, ও কান্তকবি শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত সেনের কল-হাস্য-মুখরিত গীতি ও সন্তোষের কুমার সুকবি ও গ্রন্থকার প্রমথনাথ রায় চৌধুরী মহাশয়ের সঙ্গীতের ব্যবস্থা ছিল।

মধ্যে মধ্যে শ্রীযুত গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও কুমার প্রমথ চৌধুরী কর্ত্তৃক গ্রামোফন আলাপেরও ব্যবস্থা ছিল।

ভারত-ভাস্কর রবীন্দ্রনাথের সাহচর্য্য করিবার প্রথম সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলাম বলিয়া ইহা আমার জীবনের স্মরণীয় ঘটনাগুলির অন্যতম শ্রেষ্ঠ দিন এবং ইহা পরিষদেরই একটী বিশেষ অনুষ্ঠানের বিবরণ—তাই এই নিবেদন। আজ পরিষদের এই বিশেষ অধিবেশনে সেই দিব্য কবির উদ্দেশে শ্রদ্ধাঞ্জলি দিবার সৌভাগ্যলাভ করিয়া নিজকে পুনরায় ধন্য মনে করিতেছি—কারণ, তিনি আমাদের সান্নিধ্যেই আছেন। কিমধিকমিতি।

---

* বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের রবীন্দ্র-স্মৃতিপূজায় পুরাতনী সম্বন্ধে আলোচনা ও অর্ঘ্যদান।

(১) রবীন্দ্রনাথ পরিষদের সহকারী সভাপতি—১৩০১।২।৩,৮।১২।১৩ ১৪।১৫।১৬ ও ১৩২৩—১০ বৎসর।

(২) ১৩০৬ সালের শেষ ভাগে পরিষৎকে রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুরের ভবন হইতে স্থানান্তরিত করিবার ১১ জন প্রস্তাবকারীর মধ্যে অগ্রণী। উহা ৪।১১।১৩০০ তারিখে কার্য্যে পরিণত।

(৩) ১৯০১—২০এ আগষ্ট ৫ জন ট্রাস্টরক্ষক নির্ব্বাচিত হন, ঐ পাঁচ জনের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ অগ্রণী।

(৪) পরিষৎ নিজ গৃহ (মন্দির) প্রবেশ উৎসব (২১এ অগ্রহায়ণ, ২৩১৫) সভায় রবীন্দ্রনাথ পরিষৎ উদ্দেশ্য প্রসার ও কর্ম্মধারা সম্বন্ধে এক বিশেষ বক্তৃতা করেন। (স্থানান্তরিত ১৯।৮।১৩১৫)

(৫) পরিষদের কর্ম্মক্ষেত্রের পরিধি বিস্তারের জন্য যে সকল আলোচনা চলিতেছিল, তাহার সহিত যোগদান করিয়া রবীন্দ্রনাথ ১৩১১ সালের শেষ ভাগে এক নূতন প্রস্তাব পাঠান, উহা ৬।১২।১৩১১ সালের কলিকাতা সমিতির বিশেষ সভায় আলোচিত হয়। ১৩১১ সালের ১৩ই ফাল্গুন কুণ্ডী পুষ্করিণী হইতে শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র রায়চৌধুরী মহাশয় (সুদীর্ঘ যাবৎ পরিষদের রঙ্গপুর শাখার নায়ক) এই বিষয়ে একটি প্রস্তাব পাঠাইয়া লিখেন যে, বঙ্গদেশের প্রতি জেলায় পরিষদের শাখা প্রতিষ্ঠা করিয়া প্রসার, বৃদ্ধি ও সঙ্গে সঙ্গে স্থানীয় ঐতিহাসিক বিবরণ ও প্রাচীন কাব্যাদির পুঁথি প্রভৃতি সংগ্রহ করা হউক। শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয় এই সময় মফঃস্বলের সাহিত্যসমিতি-গুলির সহিত পরিষদের একতা স্থাপনের উদ্দেশ্যে পত্র ব্যবহার করিতে-ছিলেন—ইহারই ফলে পরিষদের কয়েকটী শাখা বঙ্গের বিভিন্ন জেলায় প্রতিষ্ঠা হয়—এবং পরিষদের মফঃস্বলবাসী সভ্য-সংখ্যাও দিন দিন বাড়ে।

(৬) সাহিত্য পরিষদের একটি বৃহৎ অনুষ্ঠান—'বঙ্গীয় সাহিত্যসম্মিলন'। এই অনুষ্ঠানের আবশ্যকতা রবীন্দ্রনাথই সর্ব্বপ্রথম পরিষদের সম্মুখে উপস্থিত করেন। প্রথম সম্মিলন ১৩১২ সালে বরিশালে হইবার প্রস্তাব হয় এবং স্থির হয় যে, রবীন্দ্রনাথই (পরিষদের সহঃসভাপতি) ঐ সভার সভাপতি হইবেন। কিন্তু জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের আদেশে ঐ সম্মিলন ব্যর্থ হইবে বুঝিয়া রবীন্দ্রনাথ উহা স্থগিত রাখিবার পরামর্শ দিয়াছিলেন। কিন্তু পরে ১৩১৪ সালে মুর্শিদাবাদে মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুরের সহায়তায় ও বিশেষ চেষ্টায় বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের প্রথম অধিবেশন হয় এবং পরিষদের সহকারী সভাপতি রবীন্দ্রনাথই সভাপতিত্ব করেন। ইহাতে শ্রীযুক্ত ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী প্রমুখ বিখ্যাত মনীষিগণ যোগদান করেন। ১৯৩৭ খৃঃ, ২১শে ফেব্রুয়ারী চন্দননগরে অনুষ্ঠিত।

পরে পরিষদের বহু অনুষ্ঠানে রবীন্দ্রনাথ যোগদান করিয়া বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের উদ্বোধন করেন। এই সভায় মনীষিবর শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত সভাপতিত্ব করেন।

(৮) পরিষদের বিশেষ বিশেষ সভায় রবীন্দ্রনাথের যোগদান করিয়া নির্দিষ্ট কর্ত্তব্য পালন :—(ক) ১৩০৮ সালের ১৪ই পৌষ তারিখের গ্রলবাট হলে পরিষদের বিশেষ অনুষ্ঠানের বিস্তৃত বিবরণ উপরে লিখিত হইয়াছে।

(খ) ১৩১১ সালের ১৭ই চৈত্র—সহর ও মফঃস্বলবাসী পরীক্ষার্থী ছাত্রদের অভ্যর্থনা অনুষ্ঠানে রবীন্দ্রনাথ 'ছাত্রদিগের প্রতি সম্ভাষণ' প্রবন্ধ পাঠ করিয়া ছাত্রগণকে সাহিত্যপরিষদের সম্পর্কে স্বদেশ-সেবার্থে আহ্বান করেন।

(৯) সম্বর্দ্ধনা ও অভিনন্দন পত্র (ক) ১৩১৮ সালে ১৪ই মাঘ রবীন্দ্রনাথকে ৫১ তম জন্মতিথি উপলক্ষে টাউন হলে সম্বর্দ্ধনার অভিনন্দন পত্র দান।

(খ) ১৩২৮ সালে, ১৯শে ভাদ্র রবীন্দ্রনাথকে স্বদেশ প্রত্যাবর্ত্তনে সম্বর্দ্ধনা।

(গ) ১৩৩৮ সালে ৯ই পৌষ টাউন হলে 'রবীন্দ্র জয়ন্তী'- অভিনন্দন পত্র।

(ঘ) ১৩৩৮ সালে, ১৩ই পৌষ পরিষদ্ মন্দিরে রবীন্দ্রনাথের সম্বর্দ্ধনা উপলক্ষে সান্ধ্যসম্মিলন।

(ঙ) ১৩৪২ সালে ২৯এ বৈশাখ রবীন্দ্রনাথের পঞ্চসপ্ততিতম বর্ষে পদার্পণ উপলক্ষে সান্ধ্য-সম্মিলন।

(১০) মর্ম্মর মূর্ত্তি (Bas-relief) ১৩৩৮ সালে ১৩ই পৌষ শ্রীযুক্ত অমল হোম প্রদত্ত জনৈক ইটালিয়ান ভাস্কর নির্ম্মিত রবীন্দ্রনাথের মর্ম্মরমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা।



বিজয়ার প্রলাপ

শ্রীহরিপদ দত্ত

সত্যিই কি চলে' গেলে মা ? গেলে ত' ঘোড়া চড়ে' গেলে কেন ? স্বয়ং পশুরাজ তোমার বাহন, আর তোমার আগমন, গমন দুই-ই ঘোড়ার পিঠে ? হাতী বা বাঘ হ'লেও কথা ছিল, একেবারে পশুর অন্ত্যজ ঘোড়া ! মাঝে মাঝে জলযানেও ত' যাতায়াত করে থাক ; খবর পাঠালে একখানা মোটর লাঞ্চের ব্যবস্থা হ'য়ে যেতে পার্‌ত। তুমি বলে পাঠালে মোটর লাঞ্চ অনেকেই পাঠাতে পার্‌ত, মোটর গাড়ীর ত' কথাই নেই। তুমি মা বড় সেকেলে ; একবারও ত' মোটর গাড়ীতে বা মোটর লাঞ্চে এলে না, ব্যোমযানের অর্থাৎ aeroplane-এর ত' নামই কর না। তবে বোধ হয় এবারে সখ হ'লেও মোটর গাড়ী বা মোটর লাঞ্চ বা ব্যোমযানে আসা হ'ত না, কারণ, পেট্রোল-নিয়ন্ত্রণ আগেই আরম্ভ হয়েছে। কিন্তু ঘোড়া কেন ? তুমি পাহাড়ে মেয়ে বটে, কিন্তু সিমলার পাহাড়, দার্জ্জিলিং বা শিলং, কোথাও ত' পাহাড়ে মেয়েদের ঘোড়া চড়্‌তে দেখা যায় না। তুমি কি পাশ্চাত্যভাবাপন্না হ'লে না কি ?

এদিকে পঞ্জিকাকার বলেন, তোমার অশ্বপৃষ্ঠে গমনের বা আগমনের ফল ছত্রভঙ্গ। এবার তা' হ'লে ডবল্‌ ছত্রভঙ্গ ! তোমার গমনাগমন এবার শাঁখের করাতের মত। কিন্তু ছত্রভঙ্গ হবে কিরূপে ? ছত্র ত' বহুদিন ভগ্নদশায় পড়েছে। তোমার বসুন্ধরা আজকাল নামেই পর্য্যবসিত—যথেষ্ট পরিমাণে ফসলও প্রসব করেন না যে লোকে দু'বেলা দু'মুঠো পেট ভরে খায়। তোমার নদীগুলোর আষ্টে-পিষ্ঠে যে বাঁধন, তা'তে তাদের শ্বাসরোধের উপক্রম হ'য়েছে। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে তাদের পেট এমন ফুলে গেছে যে, কিঞ্চিৎ বেশী জল পেটে যেমন প্রবেশ করা, অমনি বমন। ফলে দেশও ভাসে, আর গরীব চাষারা মাথায় হাত দিয়ে পায়ে কেলে বসুন্ধরাকে তোয়াজ করে যে ফসলটুকু আদায়ের চেষ্টা করে, তাদের পরিশ্রম পণ্ড, চেষ্টা ব্যর্থ। একদিকে বসুমতীর অক্ষমতা বল, কৃপণতা বল, তা' ত' আছেই, উপরন্তু বন্যা। ফলং দুর্ভিক্ষং। পেট ত' কারো কথা শোনে না—খাদ্যের অভাবে অখাদ্য দিয়েই তা'র গহ্বর বোঝাই কর্‌তে হয় ; নির্ম্মল জলের অভাবে বন্যাদূষিত জল সে-গহ্বরে ঢাল্‌তে হয়। তা'র পরিণাম ব্যাধি ও মড়ক। তা'র ওপর তোমার গমনাগমন অশ্বপৃষ্ঠে। এবার শুধু ছত্রভঙ্গ নয়, ভগ্ন ছত্র চূর্ণ করাই বুঝি তোমার উদ্দেশ্য। ইউরোপে ত' ভীষণ অগ্নিবর্ষণ হচ্ছে, চীন দেশে ও আফ্রিকায় কথঞ্চিৎ অল্প মাত্রায় হচ্ছে, আমেরিকায় গরম হাওয়ার আবির্ভাব হয়েছে, মধ্য-এসিয়ায় হাওয়াকে কতুষ্ণ বল্‌লে নিতান্ত অত্যুক্তি হয় না। সে জন্য ভারতবর্ষের স্বাভাবিক উত্তাপের কিঞ্চিৎ বৃদ্ধি হয়েছে, আর আমরা ঘরে বসে' তোমার নাম জপ কর্‌ছি।

এলে ত' মাত্র তিন দিনের জন্যে। সেই তিন দিনই বাঙ্‌লায় আনন্দের বন্যা ব'য়ে গেল। তবু সে-কালে যে রকম আনন্দোৎসব হ'ত, এখন আর সেরকম হয় না। সেকালে গৃহস্থের বাড়ীর প্রত্যেকে, মায় চাকর-বাকর, ধোবা, নাপিত (গুরুপুরোহিতের ত' কথাই নেই) এক জোড়া ধুতি-চাদর পেত। নূতন ধুতিচাদর পরে তোমাকে দেখবার ইচ্ছা সকলেরই। ক্রমশঃ চাদরনিবারিণী সভার অনুগ্রহে চাদরের এক রকম তিরোধান হ'ল বটে, তবু এক খণ্ড নূতন বস্ত্রের সংগ্রহ ও দান অধিকাংশ লোকের পক্ষে কষ্টসাধ্য হ'য়ে উঠেছে। বিশেষতঃ এ বৎসর কাপড়ের দাম দ্বিগুণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হ'য়েছে। আগে কণ্ট্রোলের শাস্তির ব্যবস্থা না করে', ক'জন এমন বুদ্ধিমান্ আছে যা'রা চা'ল কেন্‌বার টাকায় পূজার কাপড় কেনে ? কাজেই সর্ব্বব্যাপী পূর্ণানন্দের বুঝি অভাব সঙ্ঘটিত হয়েছে !

আগে অনেক বাড়ীতে তোমার পূজা হ'ত,—অর্থাৎ প্রতিমা-পূজা—ধুমধামও হ'ত। আত্মীয়-স্বজন-বন্ধুবান্ধবের জন্য প্রচুর লুচিমোণ্ডার ব্যবস্থাও হ'ত, দরিদ্রনারায়ণ সেবার ব্যবস্থাও হ'ত। আজকাল প্রতিমার সংখ্যা অনেক কম ধুমধামও গেছে কমে। যাঁদের পূর্ব্বপুরুষগণ নিজ নিজ সম্পত্তি দেবোত্তর করে' পূজার ব্যবস্থা করে' গেছেন, তাঁরা পূজা বন্ধ কর্‌তে পারেন না, কিন্তু জিনিষপত্রের মূল্য বৃদ্ধি হওয়ায় উৎসবের পরিমাণ কমাতে বাধ্য। অবশ্য

যেক্ষেত্রে দেবোত্তরের আয় সেবায়েৎদের জঠরে ভস্মীভূত হয়, সেখানকার কথা স্বতন্ত্র। এইভাবে পূজার সংখ্যা কম হওয়ায় কয়েক বছর থেকে কেবল সহরে নয়, পল্লীগ্রামেও সার্ব্বজনীন বা বারোয়ারী পূজার অনুষ্ঠান হচ্ছে। কারণ কি মা? কারণ—অজন্মা, জলপ্লাবন, স্বাস্থ্যহীনতা, অর্থকৃচ্ছ্রতা, অন্নকষ্ট। তাই বলি মা, ছত্র ত' ভগ্নদশাপ্রাপ্ত হ'য়েছে, তা'কে কি চূর্ণ না করে' ছাড়্‌বে না?

ভাল কথা, পঞ্জিকায় তোমার যাত্রাকালের ছবি দেখ্‌লাম। লক্ষ্মী সরস্বতীকে দুইপাশে নিয়ে তুমি দাঁড়িয়ে আছ, আর ভোলানাথ গণপতির হাত ধরে' আস্তে আস্তে নাম্‌ছেন। গণপতি কি চিরদিন শিশু থেকে গেলেন? না, মা-বাপের কাছে সন্তান চিরদিন শিশু! জামাইবাবুর মতন কার্ত্তিকঠাকুরটি বুঝি ময়ূর উড়িয়ে আগেই সরে' পড়েছেন? তা' ছাড়া পশুরাজকে-ও দেখ্‌লেম না, অসুরকেও দেখলাম না। অসুরকে কি আগেই ভেজে পাঠিয়েছ? আর, আর পশুরাজ বুঝি তার চৌকিদার হ'য়ে গেছে? অসুরটিকে প্রত্যেকবার সঙ্গে আন কেন বল ত? অসুর কি পাপের প্রতিমূর্ত্তি? পাপের শাস্তি কিরূপ হয় জগতকে দেখাবার জন্য কি তা'কে সঙ্গে এনে সকলের সাম্‌নে শাস্তিদান কর? জগতের লোক কি তা' বোঝে, না সে দৃষ্টান্ত দেখে তা'দের চরিত্রের সংশোধন হয়?

শুনি ভোলানাথ ঘরে থাকেন না, শ্মশানে ঘুরে বেড়ান। তবে তোমাকে ঘরে ফিরিয়া নিয়ে যা'বার জন্য এত তাড়াতাড়ি কেন? আবার শুনি তিনি ভাঙ্গড়, সিদ্ধিতে বিভোর হ'য়ে থাকেন। সেই সিদ্ধি ঘোঁট্‌বার জন্য বুঝি তোমাকে ভোলানাথের কাছে কাছে থাক্‌তে হয়? সেইজন্য তিনি তোমাকে ছেড়ে থাক্‌তে পারেন না? শুনি ত গণেশ সিদ্ধিদাতা। তিনি বুঝি সিদ্ধি দেন, তুমি ঘোঁট, আর ভোলাথ পান করেন? গণেশের কি সিদ্ধির চাষ আছে? দেখো মা, তোমার ছেলেকে সাবধান করে' দিও। সিদ্ধির চাহিদা যথেষ্ট, কিন্তু কেউ-ই পরিশ্রম কর্‌তে' চা'ন না। *সিদ্ধির চাষ কিরূপে কর্‌তে হয়,* তা'-ই অধিকাংশ লোক জানেন না।

শুনি, শিব একেবারে আত্মবিস্মৃত। তাঁর কাছে চন্দন ও ভস্ম, গৃহ ও শ্মশান সবই সমান। আত্মবিস্মৃতির ফলে কখন্ কোথায় যান কিছুই ঠিক নাই। তাই বুঝি তুমি তাঁকে আগ্‌লে রাখ? আরও শুনি তুমিই শিবের শক্তি; তোমার অভাবে শিব শক্তিহীন। তোমাকে ছেড়ে যে শিব থাক্‌তে পারেন না, আর শিবকে ছেড়ে যে তুমি থাক্‌তে পার না, এ-ও বুঝি তা'র একটা কারণ? তোমার এ পতিপ্রেমের দৃষ্টান্ত কি জগৎ অনুসরণ করে?

সেকালের একটা চল্‌তি কথা—"গৃহিণী গৃহমুচ্যতে"। সেকালে গৃহিণীরা সংসার মাথায় করে রাখ্‌তেন—যত বড় লোকের মেয়েই হ'ন। তাঁরাই সংসারের শক্তিস্বরূপিণী ছিলেন। সেকালের কথা ছেড়ে দিলে, বোধ হয়, পল্লীগ্রামের মেয়েরা এখনও কতক এরূপ করেন। সহরের বা সহর-ঘেঁষা মেয়েরা সভাসমিতি করেন, ময়দানে হাওয়া খান, আর বায়োস্কোপ দেখেন, সংসার দেখ্‌বার সময় তাঁদের কোথায়? বাড়ীর লোক খেতে বসে' খাবার জল পেলে কি না, তা'-ও তাঁ'দের দেখ্‌বার সময় হয় না। আচ্ছা মা, কৈলাসে কি বায়োস্কোপ আছে? যদি না থাকে, মাঝে মাঝে সহরে এসে দেখে যাও না কেন? সহরের-ই বা দরকার কি? পল্লীগ্রামেরও অনেক জায়গায় বায়োস্কোপ প্রবেশ করেছে, সেখানে দামও সস্তা আজকালকার মেয়েদের এত বায়োস্কোপের নেশা, এই দুর্দ্দিনে দরকারী খরচ বাঁচিয়ে নেশা চরিতার্থ করেন, আর তোমার কি এক আধবারও দেখ্‌তে ইচ্ছা হয় না? তাই বল্‌ছিলেম মা, তুমি বড় সেকেলে।

এস মা, আবার বৎসরান্তে ফিরে এস। ধান ভান্‌তে শিবের গীত গাইলুম বলে' কিছু মনে কোরো না। পাগলে কি না বলে? তোমার যখন যে বাহন চাপ্‌তে ইচ্ছা হয়, সেই বাহনেই আসা-যাওয়া কোরো। 'তা'তে ছত্রভঙ্গ হয়, হ'ক। মা তাড়না কর্‌লে শিশু মায়ের-ই কোলে মুখ লুকিয়ে কাঁদে। আছাড় খেয়ে যে ধরিত্রী-পায়ে পড়ি, তা'ই ধ'রেই আবার উঠি। যতই তাড়না করুন, ক্ষিধের সময় মা ঠিক খেতে দেবেন।

লণ্ডন-তীর্থে

শ্রীমতিলাল দাশ

৬ই আগষ্ট, বৃহস্পতিবার। সার ফিরোজ খাঁনুনের সঙ্গে দেখা হইল। অমায়িক ভদ্রলোক, আমি ব্যারিষ্টারি পড়িবার জন্য আনুকূল্য করিতে বলিলাম। তিনি যথাসাধ্য সাহায্য করিবেন বলিলেন। Konaster আজ অত্যন্ত অভদ্র ব্যবহার করিল, কারণ বুঝিলাম না। শ্রীযুক্ত দত্তের সহিত ঘনিষ্ঠ আলাপ হইল। ইনি আলাপী, নানাবিষয়ে নানা জল্পনা করিয়া বাহির হইলাম। পথে পড়িল ৬ পেনী ও ৩ পেনীর দোকান। চার পেনী দিয়া এক বড়গ্লাস দুধ ও আইসক্রিম দিয়া মধ্যাহ্ন ভোজন শেষ করিলাম।

এখান হইতে ওয়েষ্টমিনষ্টার এবি দেখিতে চলিলাম। এই ভজনালয় কারুকার্য্যে এবং ঐতিহাসিক স্মৃতিতে সমৃদ্ধ। এই স্থানে স্তাকসনযুগে সবার্ট প্রথম মন্দির তোলেন। কিংবদন্তী যে, স্বয়ং সেণ্ট পিটার খেয়া পার হইয়া এই প্রথম মন্দিরকে উৎসর্গ করেন। ইহার সহিত অন্নপূর্ণার ভবানন্দ ভবনে যাত্রার যে বিবরণ ভারতচন্দ্র লিখিয়াছেন তাহার সাদৃশ্য চমৎকার। অন্নপূর্ণা পাটনীকে বর নিতে বলিলে পাটনী চাহিয়াছিল—"আমার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে।" বিলাতী পাটনী সামন মাছ চাহিয়াছিল। পিটার তাহাকে জাল ভরা সামন মাছ পাইবার বর দিয়াছিলেন। ৯৬০ খৃষ্টাব্দে এখানে একটী মঠ স্থাপিত হয়।

এডওয়ার্ড দি কন্‌ফেসার এখানে প্রথম রাজপদে অভিষিক্ত হন। সেই হইতে বিলাতের রাজারা এই স্মরণীয় মন্দিরে মুকুটোৎসব সম্পন্ন করেন। কনফেসার এই স্থানে সমাধি হয় এবং তারপর তৃতীয় জর্জ পর্য্যন্ত এই গির্জ্জায় তাঁহাদের শেষ শয়নে প্রসুপ্ত আছেন। পরে কবি, মনীষী রাজনীতিবিদ্ অনেকের স্মরণ-চিহ্ন এখানে রাখা হয় এবং তাঁহাদের কাহাকে কাহাকেও এখানে সমাধি দেওয়া হয়।

কালের রথচক্র এই মন্দিরের উপর দিয়া বহিয়া গিয়াছে। যুগে যুগে ইহা সংস্কৃত ও প্রতিসংস্কৃত হইয়া বর্ত্তমান রূপ ধারণ করিয়াছে। প্রবেশদ্বারের পাশেই বানিয়ানের পিলগ্রিমস্ প্রগেস্ নামক রূপক কাব্যের নানা ছবি একটী বাতায়নে অঙ্কিত আছে। গত য়ুরোপীয় যুদ্ধে লক্ষ লক্ষ মানুষ আপন শোণিত ধারা দান করিয়াছে। তাহাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিবার জন্ত প্রত্যেক দেশেই এক একজন অজানা সৈনিকের মৃতদেহ আনিয়া সগৌরবে সমাহিত করিয়া নিহত সকলের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা হইয়াছে। এমনই একজন অখ্যাত নাম গোত্রহীন সৈনিকের মৃতদেহ ইংলণ্ডের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নর ও নারীর পাশে চিরশয্যায় শয়ান। বেলজিয়ামের যুদ্ধ-ক্ষেত্র হইতে কালো পাথর আনিয়া তাহার উপর ব্যথার অঞ্জলি উৎকীর্ণ হইয়াছে।

কবির কোনটিকে আমার খুব ভাল লাগিল। যাহারা শব্দের যাদু দিয়া জাতির অন্তরকে মোহিত করেন, সেই সব সাহিত্যিকদিগকে এই স্থানে স্মরণ করিয়া রাখা হয়। সকলে এখানে সমাহিত নয়, তবে তাহার স্মৃতিচিহ্ন স্বরূপ কিছু না কিছু ব্যবস্থা আছে। আদি কবি চসারকে এখানে সমাহিত করা হয়, কিন্তু কবি হিসাবে নয়, এবির কর্ম্মচারী হিসাবে।

ব্রাউনিং ও টেনিসন এখানেই চিরনিদ্রায় শয়ান। লংফেলো, জনসন, মিল্টন, স্পেন্সার এবং গ্রের আবক্ষ মূর্ত্তি আছে। বার্ণস, ডিকেন্স, থ্যাকারে, হার্ডি ও সেক্সপীয়রের স্মৃতিচিহ্ন আছে। অষ্টম হেন্‌রীর অর্দ্ধমন্দির অতিশয় সুন্দর। ইহার ছাদে যে সুনিপুণ কারুকার্য্য তাহা অতিশয় সূক্ষ্ম এবং চমকপ্রদ। বাটালী দিয়া পাথরের যে এমন ছন্দ বাজে তাহা না দেখিলে বোঝা কঠিন।

এখান হইতে মিঃ ব্রাউনের ওখানে চলিলাম। তিনি পিয়ার্সন এবং East and West Fellowship নামক সমিতির নিকট পরিচয়-পত্র দিলেন। সেখান হইতে কুকের আফিসে গেলাম। অধ্যাপক নগেন্দ্র নাথ সেনের নিমন্ত্রণে সেখানে শ্রীমান শচীন্দ্র নাথ দত্ত ও শ্রীমান তেজেন্দ্র নাথ হোড়ের সঙ্গে আলাপ হইল। সকলে মিলিয়া গ্রেট ইণ্ডিয়ান রেস্তরাঁতে দেশী মতে ডিনার করিলাম। অধ্যাপক সেন শীঘ্রই দেশে ফিরিতেছেন। নানাবিধ আলাপে সময়টা বেশ কাটিল।

সেখান হইতে গাওয়ার ষ্ট্রীটে গিয়া হরিহরদা'র সহিত

অনেক আলাপ হইল। বাসায় ফিরিয়া চিঠির সন্ধান করিলাম। চিঠি না পাইয়া হতাশ হইয়া পড়িলাম।

প্রাত্যহিক জীবনের উত্তেজনাহীন যাত্রায় চিঠি একটা নূতন প্রেরণা আনে। তাই ডাকের জন্ত আমার প্রাত্যহিক চঞ্চলতা শেষ হয় না। হয়ত এটা ভাল নয়, কিন্তু নিরুপায়। এই আকুলতা স্বভাবের অঙ্গ হইয়া উঠিয়াছে।

গৃহে যাহারা নিশ্চিন্ত, তাহারা কেন যে এই প্রবাসীর কথা স্মরণ করে না, ভাবিয়া অবাক হই।

৭ই আগষ্ট, শুক্রবার। পনস কোডের সঙ্গে আলাপ হইল। তিনি পোলকের নিকট চিঠি দিলেন। বেঙ্গল ইণ্ডিয়ান রেস্তরাঁতে খাইলাম। তারপর বৃটিশ মিউজিয়ামে কাটিল। শরীরটা ভাল লাগিতেছে না—শীতবোধ হইতেছে—তাই বাসায় ফিরিলাম।

ফিরিয়া আর্য্যভবনে রাধাকৃষ্ণন্ ও সুব্রহ্মণ্য আমাদের সঙ্গে আলাপ হইল। লণ্ডনে দুইটি হিন্দু সমিতি আছে। সে সম্বন্ধে তাহারা দুঃখ করিলেন। বলিলেন, "ভারতবর্ষ ঐক্যকে গ্রহণ করিতে পারে না, এইটাই তার পতনের কারণ—" আমি বলিলাম—"আপনারা এসেছেন, দুটি সমিতিকে একত্র করুন" উত্তরে হাসিলেন। রাধাকৃষ্ণন্ বলিলেন,—"আমি কর্ত্তৃপক্ষদের সঙ্গে আলাপ করেছি, মিলন সম্ভবপর নয়।"

সুব্রহ্মণ্য বলিলেন,—মহীশূরের মহারাজা লণ্ডনে হিন্দু-গৌরব স্থাপন কিছু করবেন সংকল্প করেছিলেন—কিন্তু এই দলাদলির কথা শুনে ফিরে যাচ্ছেন—"

মহারাজার ইচ্ছা ছিল লণ্ডনে কোনও হিন্দু-মন্দির প্রতিষ্ঠা করিবেন। কিন্তু তাহা না করিয়াই তিনি দেশে ফিরিয়া গিয়াছিলেন।

দলাদলি আমাদের দেশে মানুষকে হীন করে। মতভেদ এবং দলভেদ থাকা স্বাভাবিক, কিন্তু সেটাকে আত্যন্তিক করিয়া তুলিয়া ঈর্ষ্যা ও বিদ্বেষের হলাহল প্রবাহিত করা বোধ হয় একমাত্র ভারতবাসীর স্বধর্ম্ম। তাই আমাদের কোনও সংঘই স্থায়ী প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারে না—মতান্তরকে বিরোধ মনে করিয়া যদি সংঘের কাজে লাগিতে পারি, তবেই সংঘ চলে, অন্যথায় নয়।

৮ই আগষ্ট, শনিবার। আজ শরীর ভাল নয়। চুপ করিয়া গৃহে বসিয়া রহিলাম। কাশীনাথ ঘুলবুটি মহাশয় আমাকে টিকিট কিনিয়া আনিয়া দিলেন, আমার চিঠি ফেলিলেন। পণ্ডিত লালবা ইউক্যালিপটাস তেল দিলেন। মানুষে মানুষে যে সহজ অন্তরঙ্গতা তাহার পরিচয় জীবনে বারবার পাইয়াছি, তাই cynicism-কে কখন প্রশংসা করিতে পারি না। ঘড়িটা সারিতে দিয়াছিলাম একটা ইহুদীর দোকানে। সে সারিয়া দিল, কিন্তু ঘড়ি ঠিক চলিতেছে না, তাই পুনরায় তাহাকে দিয়া আসিলাম। জুতার হাফ্‌সোল দিতে ছয় শিলিং চাইল। রাজা ও মিশ্রীর নিকট হইতে আইনের বই আনিয়া পড়িলাম। 'লুগার্ণে দুইদিন' নামক প্রবন্ধটী শেষ করিলাম। ইহা পরে ভারতবর্ষে প্রকাশিত হইয়াছে। শরীর খারাপ, কিছুই ভাল লাগে না। বাড়ীতে অসুখ হইলে অনর্থক প্রিয়জনকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলি। কিন্তু বিদেশে নীরবে রোগযন্ত্রণা সহিতে হইবে।

৯ই আগষ্ট, রবিবার। সকালে উঠিয়া গরম জলে স্নান করিয়া খুব আরাম লাগিল। অন্য একটা বাসার সন্ধানে চলিলাম। হাইকমিশনার আফিস মাদাম রকোরস্কির নাম দিয়াছিল। তাহার ঘর পছন্দ হইল না। তারপর শ্রীযুক্ত পি, কে, দত্ত মহাশয়ের বাসায় পৌঁছিলাম। তাঁহার সঙ্গে খানিক আলাপ হইল। সেখান হইতে ল্যাম্বেথ রোড, গ্রেস্‌লক রোড এবং গ্রেনমোর প্রভৃতি রাস্তায় বাসার সন্ধান করিয়া ফিরিলাম। ২৩ গ্রেনমোর রোডে রায়চৌধুরী নামক একজন বাঙ্গালী যুবকের সহিত আলাপ হইল। তারপর ৪২ গ্রেস্‌লক রোডে একটা বাড়ীর সন্ধান পাইলাম। এই স্থানটী পছন্দ হইল, মনে করিলাম এখানেই আসিব।

বিকালে মহানামব্রত ব্রহ্মচারী আসিলেন। ইনি সিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ে ডি ফিল পড়িতেছেন। মন্দ নয়, আলাপী, ইঁহার সহিত আমেরিকার কথা আলাপ হইল। ইনি ফরিদপুরের জগবন্ধুর শিষ্য—তাঁহার বই পড়িতে বলিলেন। অনেক বিষয়ে ইঁহার সহিত আলাপে একমত হইলাম। য়ুরো-আমেরিকায় প্রাণের ও দরদের অভাব নিয়া দুজনে দুঃখ প্রকাশ করিলাম।

আলাপে মনে কৌতূহল জাগিল। ভাবিলাম এই পথে আমেরিকাটা দেখিয়া যাই। গৃহের বন্ধন ছাড়িয়া যে মুক্তি পাইয়াছি, এই মুক্তি প্রতিদিন পাইব তাহার সম্ভাবনা নাই।

বাহিরে চলিবার জন্য যে আলো অন্তরে জ্বলিয়াছিল, সে

আলো চিরদিন জ্বলিবে না। দেখিবার যে আগ্রহ তাহা শান্ত হইবে।

কিন্তু এই প্রবল আগ্রহের সঙ্গে নির্ম্মম নিঃসঙ্গতা পীড়া দিতেছে। বাড়ীর চিঠি পাই নাই, তাই মন কাতর হইয়া উঠিতেছিল। আমার আদরের কন্যা তখন মৃত্যুশয্যায়। হয়ত তাহারই জন্য অজ্ঞাতে হৃদয় ব্যথাতুর হইয়া উঠিতেছিল।

সংসারে যে মায়া—তাহা বন্ধন, তাহা পিছু টানে, কিন্তু তবু সেই মমতায় মধু ভরা। তাই ত বিদেশে খবর যখন না পাই, তখন নিজেকে স্থির রাখিতে পারি না। নূতনত্বের মধ্যে যে মাদকতা তাহাও এই মায়ার স্পর্শকে ছাপিয়া উঠিতে পারে না।

১০ই আগষ্ট, সোমবার। সকালে উঠিয়া চিঠির জন্য তাড়াতাড়ি করিয়া গ্রিণ্ডলের আফিসে গেলাম। ওখানে দুরু দুরু বক্ষে লিখনের প্রত্যাশায় বসিয়া রহিলাম। হায় দুরাশা, কোনও চিঠি নাই। কারণ বুঝিতে পারি না, উতলা মন উতলা হইয়া ওঠে। বাহির হইয়া পিকাডেলির মধ্য দিয়া চলিলাম। ইহা লণ্ডনের সুন্দরতম রাজপথের অন্যতম। পিকাডেলি সার্কাস হইতে আরম্ভ হইয়া ইহা হাইডপার্ক পর্য্যন্ত গিয়াছে। পিকাডেলির মধ্য দিয়া পার্কলেন ধরিয়া মিস রেক্সের ওখানে পৌঁছিলাম। বুড়ী খুব ব্যস্ত। বলিলেন, তাঁহার ওখানে খরচ প্রতি সপ্তাহে চার গিনি—এলিং কমনে একটা ঠিকানা দিল সেখানে সস্তায় একটা ইংরেজ পরিবারে আশ্রয় নিবার উপদেশ দিল।

এখান হইতে বাহির হইয়া Cumberland প্লেসে এরিয়ান পাথ কাগজের লণ্ডন আফিসে একটা প্রবন্ধ দিয়া লিয়নস্ রেস্তরাঁয় মধ্যাহ্ন আহার শেষ করিয়া হাইড পার্কে গিয়া বসিলাম। হাইড পার্ক সুবিস্তৃত উদ্যান; ইহার আয়তন প্রায় ১১০০ বিঘা। ইহার পশ্চিমাংশে কেনসিংটন উদ্যান—তাহার পরিমাণ ৮২৫ বিঘা। দুইটি উদ্যান মিলিত হইয়া লণ্ডনের হৃৎপিণ্ডের কাজ করে। ইহা দীর্ঘে দেড় মাইল প্রস্থে প্রায় এক মাইল। ইহার মাঝখানে সার্পেন্টাইন নামক একটি আঁকা বাঁকা ঝিল আছে। এই উদ্যান নানা-প্রকার লোকের সমাগম স্থল। সন্ধ্যায় এখানে বক্তার দল নানাপ্রকার বক্তৃতা দিয়া লোকের মনোরঞ্জন করে। প্রণয়ী যুবকেরা ইহার তরুচ্ছায়ায় প্রেমের কাকলী গুঞ্জন করে। এখানে অভিসারিকারা প্রণয়-পাত্রের সন্ধানে ফেরে। কিন্তু সন্ধ্যায় লণ্ডনের এই কৌতুকময় জীবনের পরিচয় নেওয়া ঘটিয়া ওঠে নাই। বিশ্রাম শেষে নূতন নূতন অপরিচিত পথে বাহির হইলাম। একস্থানে সুকুমার শিল্পের প্রদর্শনী হইতে-ছিল। সেটা দেখিয়া লইলাম। রয়াল একাডেমি অব্ আর্টস দেখিলাম। ইহা সম্রাট তৃতীয় জর্জ্জ কর্ত্তৃক ১৭৬৮ খৃষ্টাব্দে স্থাপিত হয়। বিখ্যাত চিত্রকর জোসুয়া রেনল্ডস্ ইহার প্রথম সভাপতি। মে মাসে ইহার বার্ষিক প্রদর্শনী হয়। আমি কেবল গিবসন এবং ডিপ্লোমা গ্যালারি দেখিলাম। এখানে সমিতির সভ্যদের অঙ্কিত চিত্রের প্রদর্শনী দেখিলাম। লিওনার্ডো ডা ভিঞ্চির একখানি ছবি আছে।

সার পিয়ার্সনের সঙ্গে ইণ্ডিয়া হাউসে দেখা করিলাম। আমি তাঁহাকে আমাকে অল্পসময়ে ব্যারিষ্টারি পরীক্ষা দিবার সুযোগ করিয়া দিতে বলিলাম। তিনি সে বিষয়ে বিশেষ উৎসাহ প্রকাশ করিলেন না। বলিলেন, "আজকাল এসব বিষয়ে কোনও প্রকার সুবিধা দেওয়া যায় না, আমি প্রশ্ন করিলাম, "কি করতে বলেন?"

বলিলেন—'টাকায় যদি কুলায়, বার-এট-ল পড়ে যাও কিন্তু আমরা কোনও প্রকার সহায়তা করতে পারব না—"

নিরুৎসাহ হইয়া অশান্ত মনে ফিরিলাম। এলিং কমানে চলিলাম। লণ্ডনের দূরবর্ত্তী উপকণ্ঠ। সেখান হইতে আসা যাওয়ায় অনেক সময় যাইবে। তাই এস্থান পছন্দ হইল না।

বাসায় ফিরিয়া এম্বাসি থিয়েটারে অভিনয় দেখিতে গেলাম। বোধ হয় দেড় বা আড়াই শিলিং দিয়া টিকিট কিনিয়াছিলাম। গল্পটির নাম Zero। তরুণী বধূ স্বামীকে ফেলিয়া প্রণয়ীর সহিত মণ্টিকার্লো ভ্রমণে চলিবার ষড়যন্ত্র করিয়াছে। স্বামী জানিতে পারিয়া পরিণাম বর্ণনা করিতেছে। সেই বর্ণনাটি মুখে না দেখাইয়া অভিনয়ের দৃশ্যে বলা হইয়াছে। স্বামীর কথা শুনিয়া বধূ আপন ভ্রম বুঝিল এবং স্বামীর ঘরে রহিয়া গেল। বাংলা নাটকে সম্প্রতি শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র চৌধুরী মহাশয় 'মহামায়ার ঘরে' অনুরূপ কৌশল সার্থকতার সহিত অবলম্বন করিয়াছেন। অভিনয় সখের, মন্দ লাগিল না।

১১ই আগষ্ট, মঙ্গলবার। চিঠির প্রত্যাশায় কাতর মন। ঋতুর আলো-ছায়ায় লণ্ডনের এই সহরতলীর উপর যে অনির্ব্বচনীয় পুলক বহিয়া যায়, তাহা যেন দৃষ্টিতে পড়ে না। আমার ঘরটির পিছনেই আর্য্যভবনের ছোট বাগান। সেখানে এক বৃহৎ বনস্পতি—তাহার শাখায় পাখীদের গান শুনিতে পাই। কিন্তু নিসর্গের এই ভাবঘন রসটি উপভোগ করিবার মত মনের অবস্থা যেন নয়।

হোটেলে নবাগত প্যাটেলের সঙ্গে দক্ষিণ কেনসিংটনে গেলাম। বাসে চলিলাম। তাড়াতাড়ি করিয়া ভিক্টোরিয়া এবং আলবার্ট কলাভবন, বিজ্ঞানমন্দির, সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠান এবং লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্গত Imperial College of Science and Technology দেখিয়া লইলাম। সমস্ত জিনিষ তন্ন তন্ন করিয়া দেখা সম্ভব নয়। কতকাংশের উপর চোখ বুলাইয়া লইলাম। প্যাটেল আলাপী কৌতুহলী। বিজ্ঞানমন্দিরের ছেলেদের ঘরটি চমৎকার। ছেলেদের গ্যালারিতে আলোকিত ডাই ও রামা এবং মডেলগুলি খুব ভাল লাগিল। য়ুরোপ তাহার ঐশ্বর্য্য এবং সম্পদ বিজ্ঞান-লক্ষ্মীর প্রসাদেই পাইয়াছে। সেকথা তাই সে ভোলে না। জাতির বুদ্ধি ও প্রতিভা যাহাতে উদ্ভাবনী শক্তিকে না ভোলে তাহার আয়োজন তাই অপূর্ব্ব। নানাপ্রকার এঞ্জিন, নানাপ্রকার জাহাজ, খনির ও ধাতুর কাজের নানাবিধ পন্থা, টেলিগ্রাম, টেলিফোন, প্রভৃতি বিজ্ঞান ও শিল্পের সমস্ত অংশকে বুঝাইবার ব্যবস্থা আছে। আমাদের দেশে এইরূপ শিল্পশালা প্রতিষ্ঠার বিশেষ প্রয়োজন।

আধ্যাত্মিকতা করিয়া ভারতবর্ষ জগৎসভায় আপন আসন প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিবে না। ভারতবর্ষ আর তাহার শান্ত স্নিগ্ধ জীবনে ফিরিতে পারিবে না। কালের যাত্রাকে সে অবজ্ঞা করিতে পারে না। শিল্প এবং কারুকে গ্রহণ করিয়া তাহাকে উঠিতে হইবে। সেই উদ্দেশ্য সাধনে এইরূপ শিল্পশালা একান্ত প্রয়োজনীয়। মহারাণী ভিক্টোরিয়ার শাসন-জুবিলী উৎসবকালে সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়। সাম্রাজ্যের বাণিজ্য, ও শিল্পসম্ভার সুব্যবস্থার জন্যই ইহার প্রচেষ্টা। ভারতবর্ষ এবং ডোমিনিয়নগুলির কৃষি, শিল্প প্রভৃতির সংগ্রহ আছে। ইহারই একাংশে ভারতীয় কলাভবন। ভারতবর্ষের স্থাপত্য, কলা, ধর্ম্ম এবং আচার-ব্যবহারের পরিচয় দিবার আয়োজন আছে। আমাদের মনে হইল, ভারতের এই পরিচয় অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত। ভারতের গৌরবময় ইতিহাস ও সংস্কৃতি কোন দৃশ্যই দর্শকের মনে মুদ্রিত হয় না।

এই বিভাগে দর্শকের ভীড় খুব কম বলিয়া মনে হইল একটী ছোট মেয়ে জিজ্ঞাসা করিল, "সময় কত বলবেন কি?" বলিলাম। মেয়েটিকে ভারতীয় বলে মনে হইল। কিন্তু কৌতূহল নিবৃত্তি করিতে গিয়া পাছে অসৌজন্য করিয়া বসি, এই ভয়ে জিজ্ঞাসা করা হইল না।

একজন মেমসাহেব আসিয়া আলাপ করিলেন। বলিলেন, "এই প্রতিষ্ঠান বৃটিশের বিপুল বিরাট সাম্রাজ্যের পরিচয় দেওয়ার ক্ষীণ চেষ্টা করছে—"

আমরা সায় দিলাম। মহিলা হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "এই সাম্রাজ্যের গৌরবের অংশী আমরা সকলে—"

আমি বলিলাম, "আপনার শুভেচ্ছা চিত্তকে স্পর্শ করে, কিন্তু বাস্তবিক এই বোধ কোথাও কাজ করে না, এদিকে চেষ্টা করলে খুব ভাল হয়।"

তিনি বলিলেন, "তা ঠিক, এই গৌরববোধকে সত্য করে তুলবার প্রয়োজন আছে।"

সংসারে ঘৃণা আছে, বিরোধ আছে, দর্প ও অভিমান আছে। কিন্তু সেই জঞ্জালকে ছাড়াইয়া মানুষ আপনাকে জগতে মেলিয়া ধরিতে পারে, একথা ভাবিতে আনন্দ লাগে। এই মহিলাটির মনে যে ভাবটি ছিল তাহার প্রসারণে বৃটিশ সাম্রাজ্যের ভিত্তি সুদৃঢ় প্রোথিত হইতে পারে। কিন্তু সংসারে অস্ত্রের ঝঞ্ঝনা যত সহজ, ভয়ের শাসন যত সহজ প্রেমের ও মৈত্রীর শাসন তত সহজ নহে। মানুষ সাম্প্রতিক, অতীত ও ভবিষ্যতে সে আপনাকে সহজে বিস্তারিত করিতে পারে না, মানুষ আয়তনিক, দেশান্তরে সে আপনাকে ছড়াইতে পারে না। এই খানেই ভাবুকতার পরাজয়। কবি ও ভাবুকের স্বপ্ন বারে বারে ব্যর্থ হয়, তথাপি সে স্বপ্ন পোষণ করিতে ক্ষতি কি?

ডিনার খাইয়া শ্রীযুক্ত দত্তের বাসায় চলিলাম। তিনি সত্যকার গল্প-রসিক। আমার মন চঞ্চল। আমি হিসাব করি, আলাপ করিয়া কি লাভ হইতেছে তাহার চিন্তা করি। কিন্তু বে-হিসাবী হইয়া গল্পের আনন্দে ভাসিবার মধ্যে যে রস

আছে, তাহা উপভোগ করিতে পারি না। শ্রীযুত দত্ত কিন্তু সময়কে মানিতে চাহেন না। তাঁহার ভাণ্ডার অফুরন্ত। আমি চুপ করিয়া শুনি। রাত্রি বহিয়া চলে। সেদিকে তাঁহার দৃষ্টি নাই।

অধিক রাত্রে বিদায় দিলেন। বৃহস্পতিবার নৈশভোজনের নিমন্ত্রণ করিলেন। গম্ভীর, শান্ত রাজপথ বাহিয়া চলি। চিন্তাভারাকুল হইয়া লাভ কি? সংসারে চিন্তা করিয়া আমার কোনও উপকার করি না। তাহার চেয়ে যদি পৃথিবীতে লঘু আনন্দ পরিবেশন করি, তাহা হইলে হয়ত নিজেও আনন্দ পাইতে পারি এবং অপরকে আনন্দ দিতে পারি। কিন্তু মুক্তি নাই। ফলের খোসা যেমন বিভিন্ন, প্রত্যেক মানুষের চিত্তের আবরণও তেমনই বিভিন্ন। চিন্তাকুলতা আমাদের স্বধর্ম্ম, তাহাকে কিছুতেই ছাড়িতে পারি না।

তবে মনে মনে স্বীকার করি, যাহারা হাসিতে পারে, দিল-খোলা হাসি দিয়া প্রাত্যহিক জীবনকে উজ্জ্বলতর করিয়া তোলে, তাহারা আমাদের চেয়ে ভাল। ভাবপেচকের কপালে দুঃখ, লঘু আনন্দের কোকিলের কুহুধ্বনিতে সমস্ত জগৎ মুগ্ধ।

[ক্রমশঃ

অভিশপ্ত

কবিশেখর শ্রীশচীন্দ্রমোহন সরকার বি-এল

কাজল কাল মেঘটি দেখে
　　তোমায় প্রিয়া পড়ছে মনে,
বিজলি আলো চপল চোখে
　　চায় চমকি নয়ন কোণে!
কদম কেয়া উদাস করা
　　গন্ধ পাগল হৃদয় নিয়ে,
তোমার কেশের সুবাসটুকু
　　অন্তরে আজ যায় যে দিয়ে!
ধূপছায়া রং আচলখানি
　　মানাত যা তোমায় প্রিয়া!
মেঘলা দিনের বাদল রাণী
　　এসেছে তাই অঙ্গে দিয়া!
তোমার দু'টি সজল আঁখির
　　বিদায় ক্ষণের নীরবতা,
কি করে আজ জলভরা মেঘ
　　জান্‌ল ভাবি সেই বারতা!

এমন দিনে হয়ত তুমি
　　ভাবছ বসে আপন হারা,
নয়নে আজ বাদলা দিনের
　　ঝরনা ঝরে অঝোর ধারা!
হারান সেই মিলন মধুর
　　শুভ'ক্ষণের সুবাস বুকে,
আনমনে কি দৃষ্টিহারা
　　সেই অতীতের স্বপ্ন সুখে!
বঙ্গ বধূর বুকটি ভরা
　　ভবিষ্যতের স্বপ্ন ছিল,
তাই ত' অভিশাপের জ্বালা
　　এত দুঃখেও সইতে পেল!
মোদের ব্যথা বলব কা'কে
　　দেখবে কে হায় বক্ষ চিরে,
জীবন ভরা মৃত্যু নিয়ে
　　কা'র অভিশাপ সইছি শিরে।

নরোত্তম দাস ঠাকুরের নূতন পুঁথি

শ্রীনৃপেন্দ্রমোহন সাহা

বাঙ্গালা ভাষায় বৈষ্ণব-সাহিত্য এক অমূল্য সম্পদ্। গতানুগতিক রীতিনীতি পরিত্যাগ করিয়া বৈষ্ণব কবিগণই সর্ব্বপ্রথম বাঙ্গালা ভাষাকে এক নূতন পথে পরিচালিত করিয়া নূতন রসে সঞ্জীবিত করিয়া তোলেন। তাঁহাদের সময় হইতেই বঙ্গ-সাহিত্যে নূতন যুগের সূচনা হয়। বৈষ্ণব কবিগণের মধ্যে নরোত্তম দাস ঠাকুর অন্যতম। তাঁহার রচিত 'প্রার্থনা' 'হাট পত্তন' 'প্রেম ভক্তি চন্দ্রিকা' প্রভৃতি ভক্তিগ্রন্থ এক সময় ধর্ম্মপ্রাণ বাঙ্গালীর নিত্যপাঠ্য ছিল। কিন্তু কালের প্রভাবে ইহাদের আদর ক্রমশঃ কমিয়া আসিতেছে। নরোত্তম ঠাকুরের বিভিন্ন পুস্তকের বিষয় বঙ্গ-সাহিত্যের ভিন্ন ভিন্ন ইতিহাসে উল্লিখিত হইয়াছে। কিছুদিন পূর্ব্বে হস্তলিখিত তুলট কাগজের একখানি প্রাচীন পুঁথি আমার হস্তগত হইয়াছে। পুঁথিখানির নাম "প্রেমভাব চন্দ্রিকা"। বঙ্গ সাহিত্যের কোন ইতিহাস-গ্রন্থেই নরোত্তম ঠাকুরের এই পুস্তকখানির উল্লেখ নাই। তাই মনে হয়, পুঁথিখানি অপ্রকাশিতপূর্ব্ব। প্রাপ্ত পুঁথি খানি অতিশয় জীর্ণ এবং ৭ পাতায় সম্পূর্ণ। সমস্তগুলি পাতাই এক আকারের এবং প্রথম এবং শেষ পাতা দুইটী ভিন্ন সমস্তগুলি পাতাই দুই পৃষ্ঠে লেখা। পুঁথির শেষে নকল কারকের নাম দেওয়া হইয়াছে—গুপীকৃষ্ণ শর্ম্মা; কিন্তু নকল করার কোন তারিখ দেওয়া নাই। তাই পুঁথি খানির বয়স সঠিক স্থির করা সম্ভবপর হয় নাই। তবে অক্ষরের আকৃতি এবং লিখনভঙ্গি হইতে মনে হয়, পুঁথিখানি সুপ্রাচীন। বাঙ্গালা দেশে মুদ্রাযন্ত্র প্রচলিত হইবার বহু পূর্ব্বেই লিখিত। পুঁথিখানির 'অ' এবং 'য়' উভয় অক্ষরই ব্যবহৃত হইয়াছে, কিন্তু 'জ' মাত্র একটী। 'য়' অক্ষরটী লিখিত হইয়াছে অনেকটা সংস্কৃত 'য়'-এর মতন। 'উ' লিখিত হইয়াছে 'উ' রূপে। ক্র, কু, প্রভৃতি লিখিত হইয়াছে ঔ রূপে কিন্তু উপরে রঅংশটী নাই। 'ঠ' এবং 'চ' উভয় অক্ষর লিখিত হইয়াছে উভয়ের মাঝামাঝি এক অদ্ভুত ধরণে। 'ত্ত' লিখিত হইয়াছে আধুনিক 'ত্ত' রূপে। এইরূপ আরও বহুবিধ বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করা যাইতে পারে। প্রাপ্ত পুঁথিতে সম্ভবতঃ নকল অজ্ঞতার জন্য বহু বানান ভুল এবং ছন্দের ভুলও স্থানে স্থানে আছে।

পুঁথির বিষয়বস্তু

পুঁথি খানিতে সর্ব্ব সমেত ১১৩টী বাঙ্গালা শ্লোক আছে। তাহাদের অধিকাংশই পয়ার ছন্দে এবং কতকগুলি ত্রিপদী ছন্দে রচিত। প্রতিপাদ্য বিষয় প্রমাণ করিবার নিমিত্ত মধ্যে মধ্যে প্রামাণ্য সংস্কৃত শ্লোকও উল্লিখিত হইয়াছে। তাহার সংখ্যা মোট ১০টী। সমস্ত পুস্তকে "নরোত্তম" ভণিতা পাওয়া যায় ৫টী স্থানে। পুস্তকের প্রতিপাদ্য বিষয়কে বিভিন্ন অংশে বিভাগ করা যাইতে পারে। তাহাদের মধ্যে বৈষ্ণবী সাধন-ভজন পথে গুরুর আবশ্যকতা এবং তাঁহার অত্যাবশ্যক গুণাবলী কি এবং প্রেম-ভক্তি এবং ভাবের পার্থক্য ও বৈশিষ্ট কি—ইহার বর্ণনাই প্রধান। পুস্তকের ভাষা, ভাব এবং বর্ণনা-ভঙ্গি প্রায় সর্ব্বত্রই নরোত্তম ঠাকুরের প্রেমভক্তি-চন্দ্রিকা প্রভৃতি অন্যান্য প্রচলিত গ্রন্থের অনুরূপ। অনেক ক্ষেত্রে তাহাদের মধ্যে ভাব এবং ভাষাগত যথেষ্ট সাদৃশ্য বিদ্যমান। এইরূপ সাদৃশ্যের দুই একটী স্থান উল্লেখ করিতেছি।

আলোচ্য পুঁথির একস্থানে আছে "ছয় রিপু সদাহীন মনেতে করিয়া।" প্রেম-ভক্তি চন্দ্রিকায় আছে—"ছয় রিপু সদাহীন করিতে মনের অধীন।" পুঁথিতে আছে —

> সদা সাধু সঙ্গে থাকি প্রেমে কৃষ্ণ সেবা।
> অন্য অভিলাষ ছাড়ি আর দেবী সেবা।

প্রেম ভক্তি চন্দ্রিকায় আছে—

> হৃষীকেশ গোবিন্দ সেবা ...না পূজিবে দেবী দেবা
> এই অনন্য ভক্তি কথা।

আলোচ্য পুঁথিতে আছে—

> অপক্ব পক্ব হইলে সিদ্ধ দেহ পাইব।
> পাকিলে সে প্রেম ভক্তি অপক্বে নহিব।

প্রেমভক্তি চন্দ্রিকায়-আছে—

> "পাকিলে সে প্রেম ভক্তি অপক্বে সাধন কহি।"

এইরূপ আরও বহুবিধ সাদৃশ্য পুস্তকের সর্ব্বত্রই লক্ষ্য করা যাইতে পারে। বাহুল্য বিবেচনায় তাহাদের উল্লেখ করিলাম না। পুঁথির নাম প্রেম-ভাব চন্দ্রিকা। প্রেম এবং ভাবের

পার্থক্য এবং বৈশিষ্ট্য পুঁথির শেষের দিকে কয়েকটী পয়ারে সুপরিস্ফুট। তাহা এই—

বিনা মন্ত্রে নাহি ভাব বুঝই কারণ
সুধা ভাণ্ড কেবা লয় তার কেমন ॥ [?]
অতএব প্রেম মন্ত্রে আগে আরোপণ।
পশ্চাতে ভাব মন্ত্রে করিবে স্মরণ ॥
প্রেম ভাব হয় যার সেহি রসসিন্ধু।
প্রেম ছাড়া ভাব জান বিনাশের বিন্দু ॥
ভাব হইয়া প্রেম হয় ভাব হয় নাশ।
বিস্তৃত হইলে মনে কে করে তার বশ ॥
শ্রীলোকনাথ প্রভুর পদাম্বুজ করি আশ।
প্রেম ভাব চন্দ্রিকা কহে শ্রীনরোত্তম দাস ॥

ভজনপথে গুরুদেবের নির্দ্দেশ অত্যাবশ্যক এবং ভজন ব্যতীত এই মায়াময় সংসারের দুঃখ-কষ্ট হইতে পরিত্রাণ পাইবার দ্বিতীয় কোন উপায় নাই। তাই গুরু স্থির করিতে সবিশেষ বিবেচনা প্রয়োজন। সদ্‌গুরুর লক্ষণ সম্বন্ধে পুঁথিতে আছে—

গুরু পরে ত্রাণের হেতু নাহি দেখি আর
কর্ম্মী গুরু কেমনে শোভয়ে তাহার ॥
সদ্‌গুরু আশ্রয় করি ভজিবে সানন্দে।
তবে ইহ ভবখনি তরিবে আনন্দে ॥
কৃষ্ণের স্বরূপ করি গুরুকে ভজিয়া।
সদা ব্রজে বসতি কর হৃদি সুখী হইয়া ॥

ধর্ম্ম কর্ম্ম দুঃখ শোক সর্ব্ব শূন্য দিয়া।
শ্রীগুরুতে কর রতি সাধক মন হইয়া ॥
যেহি গুরু সেহি বৈষ্ণব সেহি কৃষ্ণধন।
এ সব ব্যতিরেকে আর নাহিক ভজন ॥

গুরু কৃষ্ণ বৈষ্ণব কেহ নহে অন্য।
জীব তারণ হেতু ধরে তিন চিহ্ন ॥

পুঁথি খানি যে নরোত্তম দাস ঠাকুরের রচিত তাহা ইহার বিষয় বস্তু এবং অন্যান্য গ্রন্থের সহিত আলোচনা করিয়া নিঃসন্দেহে বিশ্বাস করা যাইতে পারে। বঙ্গভাষার বিভিন্ন ইতিহাস গ্রন্থে ইহার কোন উল্লেখ নাই বলিয়া আমি অনুমান করি গ্রন্থখানি অপ্রকাশিতপূর্ব্ব। কেহ পুঁথিখানি দেখিতে ইচ্ছা করিলে আমার নিকটে দেখিতে পারেন।

আঘাত কর’

শ্রীবৈদ্যনাথ কাব্য-পুরাণতীর্থ

আমার আরো আঘাত করো প্রিয়
তবু আমায় মাঝে মাঝে বাহির হতে দিয়ো।
সাথীরা ঐ হাত ছানি দে’
যায় যে ফিরে আমায় ডেকে
কেমন ক’রে রইছি ঘরে তুমিই ভেবে নিয়ো।

সেই সেকালে ফিরে যেতে পারবো না আর আমি।
অমন করে আড়াল দিয়ে দাঁড়িও নাকো স্বামী।
একটু খানি খোলা হাওয়ায়
কেমন করে আমায় মাতায়
এই প্রগতির দিনেও তা’কি বুঝবে নাক তুমিয়ো।

তোমার পোষাক আজও আমি হাতে হাতেই দিই ;
আমার কাছে বড়োই প্রিয় তোমার আয়ামটিই।
হাতা বেড়ি তোমার তরে
নড়ে আজো আমার করে
কেবল আমার চলা ফেরার বিদ্রোহ ক্ষমিয়ো।



ইরাকের কথা

শ্রীসুরেশচন্দ্র ঘোষ

স্বল্পকাল পূর্ব্বে সমগ্র সভ্যজগতের দৃষ্টি সহসা ইরাকের দিকে আকৃষ্ট হইয়াছিল। পৃথিবীর ইতিহাসে ইরাক একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে। এই বৈশিষ্ট্যের প্রধান কারণ ইহা সুপ্রাচীন সভ্যতার লীলাস্থলী। পৃথিবীর প্রাচীনতম সভ্যতাসমূহের অন্যতম সুমেরীয় সভ্যতা এই দেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। পরবর্ত্তী বাবিলোনীয় ও আসিরীয় সভ্যতার অভিনয়-ভূমিও এই দেশ। বাইবেলের বর্ণনানুসারে পৃথিবীর প্রথম মানব-মানবী আদম ও ইভ (আদম ও হবা) এই দেশেরই কোন স্থানে অবস্থান করিতেন। সুতরাং সেই আদিম দম্পতির জন্য নির্ব্বাচিত 'ইডেন-উদ্যান' এখানেই ছিল। এই দেশের পশ্চিম পার্শ্বে যিশুর জন্মস্থলী যর্দ্দন-প্লাবিত ভূমিয়া এবং হিত্তাইত ও মিত্তানি সভ্যতার উৎপত্তি-স্থল সিরিয়া। প্রত্নতত্ত্ববেত্তাদের অক্লান্ত অনুসন্ধানের ফলে জানা গিয়াছে, হিত্তাইত ও মিত্তানি-সভ্যতার মূলে ভারতীয় সভ্যতার প্রভাব বিদ্যমান। ইরাকের দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্তে ইস্লামের উদ্ভব-ভূমি মরুময় আরব এবং খাস দক্ষিণে পারস্য-উপসাগর। একটি সঙ্কীর্ণ প্রণালী পারস্য-উপসাগরকে ভারতের পার্শ্বে প্রসারিত আরব সাগর হইতে পৃথক্ করিতেছে। ইরাকের সমগ্র পূর্ব্বপার্শ্বকে বেষ্টন করিয়া মহর্ষি জরাথুস্ত্রের জন্মস্থান ও পারসীক সভ্যতার অভিনয়-ভূমি ইরান বিরাজিত। সুতরাং এই দেশ কেবল নিজেই সুপ্রাচীন সভ্যতার লীলাস্থলী তাহা নহে, ইহার চারিপার্শ্বেই অতীতের সুপ্রসিদ্ধ সংস্কৃতিসমূহের উৎপত্তি ও উৎকর্ষ-স্থল অবস্থিত। ইরাকের একদিকে বসিয়া জরাথুস্ত্র বেদের অনুকরণে জেন্দাবেস্তা রচনা পূর্ব্বক অহুর মজদাবাদের ভিত্তি স্থাপন করিয়াছেন এবং অন্য দিকে বসিয়া মূসা, ঈশা ও মহম্মদ একই একেশ্বরবাদ হইতে এবং ইস্লামীয় মতবাদের মন্দির গড়িয়া তুলিয়াছেন।

ইরাকের আয়তন প্রায় ১ লক্ষ ৭৭ হাজার ১ শত ৪৬ বর্গ মাইল। ইহার লোক-সংখ্যা প্রায় ৩৫ লক্ষ ৬০ হাজার। বিগত মহাসমরের পরিণতিরূপে এই দেশ হইতে তুর্কদিগের প্রাধান্য অপগত হয় এবং ইহা বৃটিশদিগের কর্তৃত্বাধীন হইয়া পড়ে। ১৯২১ খৃষ্টাব্দে বৃটিশগণ হেজাজের রাজা হুশেনের পুত্র ফৈজালকে ইরাকের সিংহাসনে বসান। ১৯২৭ খৃষ্টাব্দে ইরাক স্বতন্ত্র রাষ্ট্র বলিয়া ঘোষিত হয়। হুসেন মক্কার গ্রাণ্ড শেরিফ ছিলেন। ইংরাজদিগের দ্বারা ইনি হেজাজের রাজা বলিয়া স্বীকৃত হওয়ার ফলে ইংরাজরা মহাযুদ্ধে ইঁহার সাহায্য প্রাপ্ত হয়। পরে ওহাবী-দলপতি ইবন সাউদ রাজা হুসেনকে পরাজিত করিয়া হেজাজের অধিপতি হইয়াছিলেন। এমির ফৈজাল মহাযুদ্ধের সময় আরব সৈন্যগণের অধ্যক্ষ হইয়া বৃটিশদিগের পক্ষ লইয়া সংগ্রাম করিয়াছিলেন। প্রায় ১২ বৎসর রাজত্ব করার পর রাজা ফৈজলের মৃত্যু হয় এবং তাঁহার পুত্র এমির গাজী ইরাকের সিংহাসনে বসেন। দুর্ঘটনার ফলে এমির গাজীর মৃত্যু হইলে তাঁহার বালক পুত্র দ্বিতীয় ফৈজাল রূপে সিংহাসনে উপবিষ্ট হন। ইনিই এখন ইরাকের রাজা। ইঁহার খুল্লতাত আবদুল্লা রিজেণ্টরূপে রাজকীয় কার্য্য করিতেছিলেন, কিন্তু সহসা ন্যাশনালিষ্ট দলের নেতা রসিদ আলি প্রভাবশালী হইয়া পড়িয়া রাজ্যের রশ্মি হস্তগত করিতে সমর্থ হন। পরে রসিদ আলি পলায়ন করিলে এখানে বৃটিশ-প্রভাব পুনরায় প্রতিষ্ঠিত হয়।

মিশরীয়, সুমেরীয় এবং সৈন্ধবী (যাহা সিন্ধুতটবর্ত্তী

মোহেঞ্জো-দারো ও হারাপ্পায় প্রকটিত হইয়াছিল) সভ্যতাকে সমসাময়িক বলিয়া সিদ্ধান্ত করিলে ভুল হয় না। অতি প্রাচীন কাল হইতে ইরাকের সহিত ভারতের আদান-প্রদান ছিল সে বিষয়ে সন্দেহ থাকিতে পারে না। জলপথে যাতায়াত সহজ বলিয়া এই আদান-প্রদানও সহজ হইয়াছিল। ইরাকের বস্রা বন্দর হইতে ভারতের পশ্চিমপ্রান্তবর্ত্তী করাচী বন্দরের দূরত্ব অধিক নহে। এক সময় সিন্ধুতটবর্ত্তী মোহেঞ্জো-দারোর সহিত প্রাচীন ইরাক বা সুমেরের কৃষ্টিগত ও রাষ্ট্র-নীতিক সম্পর্ক ছিল, এই সত্যের বহু নিদর্শন আমরা উভয় সভ্যতার ভগ্নাবশেষের ভিতর প্রাপ্ত হই। স্থলপথ অপেক্ষা জলপথে যাতায়াত সহজ এ বিষয়ে সংশয় নাই। দুরারোহ পর্ব্বতমালা, শ্বাপদসঙ্কুল দুর্গম অরণ্যানী, দুর্দ্দান্ত জাতিসমূহ, স্থলপথে বাধাস্বরূপ হইবার সম্ভাবনা আছে, কিন্তু দিগন্তবিস্তৃত অনন্ত বারিধি-বক্ষে ঝঞ্ঝা প্রভৃতি প্রাকৃতিক বিপ্লব ভিন্ন অন্য কোন বাধার সম্ভাবনা অল্প, এ সম্বন্ধে সন্দেহ থাকিতে পারে না।

সভ্যতার প্রথম প্রকাশ ও বিকাশ জলযান চালনযোগ্য বড় বড় নদ-নদীর তীরদেশে, এই সত্যে কেহই সন্দেহ করিতে পারেন না। যেমন কৃষির সহিত সভ্যতার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ, তেমনই নদীর সহিত কৃষির নিবিড় সম্পর্ক। যেমন কৃষি হইতে সভ্যতার উৎপত্তি, তেমনই বাণিজ্য হইতে তাহার উৎকর্ষ বা বিকাশ। দূর অতীতে নদ-নদীই বাণিজ্য-বিস্তারের একমাত্র উপায় ছিল। ভাবের আদান-প্রদান, ভাবধারার, প্রসার নদ-নদীর সাহায্যেই সম্পাদিত হইত। এই জন্যই পৃথিবীর প্রসিদ্ধনামা আদিম সভ্যতাগুলি বড় বড় নদীর তীরে জন্ম লাভ করিয়াছিল। পঞ্চনদ এবং গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতী ইহারাই অতুলনীয় বৈদিক সভ্যতার জন্মদাতা, এই সত্যে সংশয়ের অবকাশ কোথায়? সভ্যতার সহিত সুনিবিড় সম্পর্কের জন্যই নদ-নদী দেব-দেবীরূপে পূজিত হইয়া থাকে। ভাবপ্রবণ ভারতবাসীরা গঙ্গাকে দেবতা ও মাতা মনে করিয়া যেরূপ গভীর ভক্তির সহিত পূজা করে, অন্য দেশের অধিবাসীরা কোনও নদীকে ঠিক সেইরূপ দৃষ্টিতে দেখিতে না পারুক, অন্যান্য দেশেও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নদীকে দৈবী শক্তির অভিব্যক্তি বলিয়া মনে করা হইয়া থাকে। ইংরেজরা টেম্‌সকে "ফাদার টেম্‌স" আখ্যায় অভিহিত করে। জার্ম্মানীতে রাইন এবং মধ্যয়ুরোপ ও বল্কানে দানিউব, চীনে ইয়াংসি, তিব্বতে স্যাংপো বা ব্রহ্মপুত্র, ব্রহ্মদেশে ইরাবতী, মেসোপোটেমিয়ায় ইউফ্রেতিস ও তাইগ্রিস প্রায় দেবতারূপেই সম্মানিত।

"সুপ্রাচীন সভ্যতার লীলাস্থলী" এই আখ্যা পশ্চিম এশিয়ার অন্তর্গত ইরাকের পক্ষে যেরূপ উপযুক্ত, তেমন আর বোধ হয় কোন দেশের পক্ষেই নহে। অতীতে অভিব্যক্ত সেই সভ্যতাগুলি পরে বিলুপ্ত হইয়াছে বলিয়া তাহাদিগের স্মৃতি অতীতের প্রতি অনুরাগী অনুসন্ধিৎসু মানুষের মনে নানা



ইরাকী আরব

প্রকার বিচিত্র ভাবধারা জাগাইয়া তুলে। তাহাদিগের বিষাদগম্ভীর ধ্বংসাবশেষ দর্শকের মনে বিস্ময় বিজড়িত সম্ভ্রম সঞ্চারিত করে। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, মহাযুদ্ধের পূর্ব্বে এই দেশ তুরস্কের অধীন ছিল। তুর্কীরা ইহাকে তিনটি প্রদেশে বিভক্ত করিয়াছিল। এই তিনটির নাম, মোসুল, বোগদাদ ও বস্রা। দুইটি মহানদ এই দেশের বুকের উপর দিয়া সোজাসুজি দক্ষিণ দিকে বহিয়া গিয়াছে। ইহারাই সুপ্রসিদ্ধ ইউফ্রেতিস ও তাইগ্রিস্। একদিন যাহাদের তীরে

তীরে সুপ্রাচীন ও সমুন্নত সভ্যতা-সৌধ সগৌরবে গড়িয়া উঠিয়াছিল। এই নদদ্বয় সম্মিলিত হইয়া শ্যাট-এল-আরব আখ্যা ধারণ করিয়াছে। শ্যাট-এল-আরব এই সম্মিলনস্থল হইতে দক্ষিণে অগ্রসর হইয়া এক শত মাইল পরিভ্রমণের পর পারস্য-উপসাগরে পতিত হইয়াছে। এই ইউফ্রেতিস ও তাইগ্রিস অভিষিক্ত দেশ পূর্ব্বে মেসোপোটেমিয়া নামে পরিচিত ছিল। পরে ইরাক নামক স্বতন্ত্র রাষ্ট্রে পরিণতি পাইয়াছে। এই ইরাকই অতীতে বাবিলোনিয়া নামে বিশ্ব-বিখ্যাত হইয়াছিল। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে বাইবেল-বর্ণিত "গার্ডেন অব্ ইডেন' ইরাকের বক্ষে বিরাজিত ছিল। অবশ্য ইহার অবস্থান-স্থান সম্বন্ধে সঠিক সিদ্ধান্তে এখনও পৌছান যায় নাই।

সুমেরিয়ান সভ্যতা পৃথিবীর প্রবীণতম সভ্যতাসমূহের অন্যতম এ বিষয়ে সন্দেহ থাকিতে পারে না। খৃষ্টাবির্ভাবের ৯ হাজার বৎসর পূর্ব্বেও এই সভ্যতা বিদ্যমান ছিল। সম্ভবতঃ সুমেরিয়ানরা আর্য্যজাতির অন্তর্ভুক্ত কোন সম্প্রদায়। খৃষ্টপূর্ব্ব ৪০০৯ অব্দে সুমেরীর সভ্যতা-সূর্য্য মধ্য গগনে উপনীত হইয়াছিল বলিলে ভুল হয় না। পাশ্চাত্য পণ্ডিতদিগের মত, সর্ব্বপ্রথম সুমেরিয়ানরাই নক্ষত্র-বিদ্যা সম্বন্ধে জ্ঞান অর্জ্জন করিয়াছিল। তাহারাই দিবসকে দ্বাদশ ঘণ্টায় বিভক্ত করে, সুমেরিয়ানদিগের নিকট হইতেই মানুষ বাক্যকে লিপিবদ্ধ



ইরাক—মরুপথ

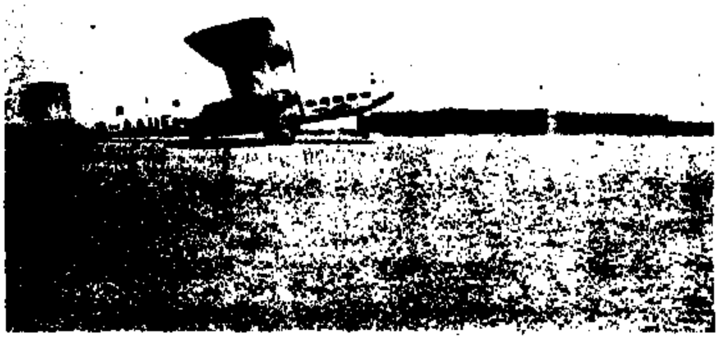
করিবার বা লিখিবার কৌশল প্রথম শিখিয়াছিল, ইহাও পাশ্চাত্য পণ্ডিতদিগের অভিমত। বাবিলোনিয়ার দক্ষিণে সুমেরিয়ানরা এবং উত্তরে আক্কাদিয়ান নামক সেমেটিক সম্প্রদায় বাস করিত। আক্কাদিয়ানরা ক্রমশঃ শক্তিশালী হইয়া সুমেরিয়ানদিগের আধিপত্য বা প্রাধান্য বিনষ্ট করিয়া সমগ্র দেশ অধিকার করিয়া ফেলে। আক্কাদিয়ানরা আরব দেশের লোক এবং যাযাবর জাতি ছিল বলিয়া জানা যায়। প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত করিবার পর ইহারা ক্রমশঃ বিজিত সুমেরিয়ানদিগের নিকট হইতে লিপি-কৌশল, আইন-কানুন এবং উন্নততর অনুষ্ঠান শিক্ষা করিয়া সভ্যতর জাতি হইয়া পড়ে।

ক্রমে আর্য্য সুমেরিয়ান এবং সেমেটিক আক্কাদিয়ান উভয়ের সম্মিলন ঘটে। এই সম্মিলন হইতে বাবিলোনিয়ান ও আসিরিয়ান নামক প্রবল প্রভাবশালী সম্প্রদায়দ্বয় সম্ভূত হয়। খৃষ্ট-পূর্ব্ব ৩৮০০ অব্দে আক্কাদের রাজা সার্গন বিশেষ শক্তিশালী হইয়া পড়েন। খৃষ্টাবির্ভাবের ২ হাজার বৎসর পূর্ব্বে বাবিলোনিয়ানদিগের দ্বারা শক্তিশালী সাম্রাজ্য গঠিত হয়। পরে প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার জন্য বাবিলোনিয়ান এবং আসিরিয়ান উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলিতে থাকে। এই প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ক্রমশঃ আসিরিয়ানরাই অধিকতর সাফল্য লাভ করে। আসিরিয়ানরা শুধু যে বাবিলোনিয়ান-দিগের উপর প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত করিতে সমর্থ হয় তাহা নহে, তাহাদিগের আধিপত্য মিশরেও প্রসারিত হয়। এই সময় তাইগ্রিস-তীরবর্ত্তী নিনেভে নগর আসিরিয়ার রাজধানী ছিল। তৎকালে সমগ্র পৃথিবীতে এইরূপ সৌধমালিনী সমৃদ্ধিশালিনী নগরী আর দ্বিতীয় ছিল না। যেখানে এখন মোসুল নামক নগর বিরাজিত, তাহারই পরপারে নিনেভে অবস্থিত ছিল। সেই বিশাল নগরের ধ্বংসাবশেষ আমাদিগের বিস্ময় উৎপাদন করে। খৃষ্ট-পূর্ব্ব সপ্তম শতকে সেই নয়নাভিরাম নিনেভে নগর ধ্বংস হইলে বাবিলো-নিয়ান প্রভাবের পুনরুত্থান ঘটে। বাবিলোনিয়ার প্রাধান্য পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে তাহার রাজধানী বাবিলন নগরও পুনরায় প্রভাবশালী হইয়া পড়ে। আসিরিয়ানদিগের দ্বারা বিনষ্ট বাবিলন নগর সম্রাট নেবুচাদরেজারের দ্বারা পুনর্নির্ম্মিত

হয়। তিনি ইহাকে সুরক্ষিত করিবার জন্ম চারিদিকে প্রকাণ্ড প্রাচীর নির্ম্মাণ করান। বাবিলনের দোদুল্যমান উদ্যান ইহারই অন্যতম কীর্ত্তি। এই উদ্যানটি পৃথিবীর সাতটি বিস্ময়কর বস্তুর অন্যতম বলিয়া গণ্য হইত। বোগদাদ নগরের দক্ষিণে ইউফ্রেতিস নদের তটদেশে বাবিলোন নগরের অবশেষ দৃষ্ট হইয়া থাকে। একসময় ইহাও নিনেভে নগরের ন্যায় পৃথিবীর সর্ব্বপ্রধান সহরে পরিণত হইয়াছিল।

পারস্যাধিপতি সাইরিস কর্ত্তৃক বাবিলোন নগর অধিকৃত হইবার কথা বাইবেলে বর্ণিত আছে। বাবিলোনিয়ায় কিছুকাল পারসীকদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত থাকিবার পর এই বাবিলোন-বিজেতা জাতিকেও বিশ্ব-বিজয়ী আলেকজেণ্ডারের আধিপত্য মানিয়া লইতে হয়। পারসীকদিগের দ্বারা স্থাপিত সমগ্র সাম্রাজ্য গ্রীকদিগের কর্ত্তৃত্বাধীন হইয়া পড়া অদৃষ্ট-চক্রের অদ্ভুত আবর্ত্তনের বার্ত্তা ঘোষিত করে। যেমন নির্ব্বাপিত হইবার পূর্ব্বে দীপশিখা সহসা দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠে তেমনই বিশ্ব-বিজয়ী সেকেন্দার শাহের সময় বাবিলন মহানগর আবার অকস্মাৎ উজ্জ্বলতর হইয়া অবশেষে কালের ফুৎকারে অনন্ত অন্ধকারে ডুবিয়া যায়। গ্রীকদিগের পর এই দেশের উপর পার্সিয়ানদিগের প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হয়। পার্সিয়ানদিগের পর রোমানদিগের এবং তৎপরে পুনরায় পারসীকদের প্রাধান্য প্রসার লাভ করে।

ইসলাম-ধর্ম্ম-প্রবর্ত্তক মহাত্মা মহম্মদের মহাপ্রস্থানের পর ৬৩২ খৃষ্টাব্দে তাঁহার শিষ্য-সম্প্রদায় বা অনুগামিগণ কর্ত্তৃক সমগ্র পারসীক সাম্রাজ্য বিধ্বস্ত হয় বলিলে ভুল হয় না। টেসিফন নামক নগর পার্সিয়ান এবং পারসীক সাম্রাজ্যের রাজধানী ছিল। এই নগরকে ধ্বংস করিবার সময় মুসলমানগণ তাহার ভিতর বহু ধন-রত্ন প্রাপ্ত হয়। এই শহরের বিস্ময়কর বিশাল সৌধাবলীর উপকরণসমূহ লইয়া তাহারা ৭৬৩ খৃষ্টাব্দে বিশ্ব-বিখ্যাত বোগদাদ নগর নির্ম্মাণ করে। প্রসিদ্ধনামা নৃপতি হারুণ-অল-রসিদের রাজত্বকালে বোগদাদ ইসলামীয় শিল্প ও সংস্কৃতির কেন্দ্রস্থল হইয়া পড়ে। ১৬৩৮ খৃষ্টাব্দে সুপ্রাচীন সভ্যতার লীলাস্থলী এই দেশে



মরুবক্ষে বিমানপোত

তুর্কীদিগের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয় এবং মহাযুদ্ধের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত সেই প্রাধান্য বিদ্যমান থাকে।

এক সময় যাহারা পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রাষ্ট্রে পরিণত হইয়াছিল, সেই বাবিলোনিয়া ও আসিরিয়ার ধ্বংসপ্রাপ্ত নগর সমূহের ইষ্টকাদি লইয়া বহু নূতন গ্রাম ও নগর গড়িয়া উঠিল। ব্যবহৃত হইবার পর যে ইষ্টকাদি অবশিষ্ট রহিল তাহা ক্রমশঃ পরিত্যক্ত ও উপেক্ষিত হইয়া আকৃতিবিহীন ধ্বংসস্তূপে রূপান্তরিত হইল। এই সকল ধ্বংসস্তূপ কাহারও মনে কোন কৌতূহল বা জিজ্ঞাসা জাগ্রত করিল না। বাবিলোন, নিনেভে, কিস, উর, লাগাশ প্রভৃতি সুন্দর ও সমৃদ্ধ নগরগুলি কোথায় গেল, সেই প্রশ্ন কাহাকেও কৌতূহলী করিয়া তুলিল না। ক্রমশঃ তাহাদিগের স্মৃতিও মানুষের মন হইতে মুছিয়া গেল। লোকে তাহাদের নাম পর্য্যন্ত বিস্মৃত হইল।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, পাশ্চাত্য পণ্ডিতদিগের মতে লিখিবার কৌশল সুমেরিয়ানরাই শিখাইয়াছিল। পরে এই দেশে বর্ণমালা বা অক্ষরের পরিবর্ত্তে এক প্রকার সূক্ষ্মাগ্র চিহ্ন ব্যবহৃত হইতে আরম্ভ হইয়াছিল। এই লিপি-কৌশল 'কিউনিফর্ম' আখ্যায় অভিহিত হইয়াছে। প্রথমে কোমল কর্দ্দমে নির্ম্মিত অপক্ক ইষ্টকের উপর চিহ্নগুলিকে উৎকীর্ণ করা

হইত এবং পরে সেই ইষ্টকগুলিকে পুড়াইয়া লইবার প্রথা প্রচলিত ছিল। এইরূপ বিচিত্র চিত্র বা চিহ্নযুক্ত কয়েকখানি ইষ্টককে একত্রিত করিলে একখানি পুস্তক প্রস্তুত হইত। কাল-স্রোতে এই লিপি-কৌশলের স্মৃতিও বিলোপ প্রাপ্ত হইয়াছিল। পরে নিনেভে নগরের ধ্বংসাবশেষের ভিতর এইরূপ লিপিবিশিষ্ট বহু ইষ্টক আবিষ্কৃত হইলে সকলের দৃষ্টি এই দিকে আকৃষ্ট হইল। এই বিষয়ে সার হেনরী রলিনসনের প্রচেষ্টা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

উত্তর ইরাকের প্রধান নগর মোজাল, তাইগ্রিস নদের পশ্চিম তীরে বিরাজিত। এখানকার বড় বড় বাড়ীগুলি উন্মুক্ত অঙ্গনের চারিদিকে রচিত হইয়া থাকে। গৃহগুলি অগ্নি-পক্ব ইষ্টকে প্রস্তুত। গৃহের পুরোভাগ নির্ম্মাণে এক-প্রকার ধূসর মর্ম্মর প্রস্তর ব্যবহৃত হইতে দেখা যায়। এই মর্ম্মর-প্রস্তরগুলি নিকটবর্ত্তী কোন আকর হইতে আনা হয়। অভ্যন্তর-ভাগের প্রাচীরে এবং কক্ষতলেও এইরূপ প্রস্তর দৃষ্ট হয়। মোসুল নগরে একটি মনোজ্ঞ মসজেদ দেখা যায়। ইহার কুপোলা এবং মিনারেটগুলি বিশেষ মনোরম। ইহারা নীলবর্ণ টালিতে নির্ম্মিত বলিয়াই অধিক নয়নাভিরাম। গ্রীষ্মের সময় এই নগরে অতিশয় উত্তাপ অনুভূত হইয়া থাকে। নগরবাসীরা তখন রাত্রিতে সমতল ছাদের উপর শয়ন করিয়া নিদ্রা যায়। এখানে শীতের সময় বৃষ্টি হয় এবং ঐ সময় প্রকৃতি মধ্যে মধ্যে কুহেলিকার আবরণ পরিয়া বিষাদ-মলিন মূর্ত্তি পরিগ্রহ করে।

রেলপথ প্রসারিত হওয়ার জন্য বাণিজ্য এবং যাতায়াতের অনেক সুবিধা হ'য়েছে সন্দেহ নাই। তবে এই দেশের বাণিজ্য এখনও বহু পরিমাণে তাইগ্রিস ও ইউফ্রেতিস বক্ষে বাহিত জলযানের সাহায্যে সম্পাদিত হইয়া থাকে। যেখানে জল অল্প, সেখানে এক প্রকার ভেলা ব্যবহৃত হইতে দেখা যায়। এই দেশে গুফা নামক এক প্রকার চর্ম্মনির্ম্মিত নৌকা অতি প্রাচীনকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে সাধারণতঃ খেয়ার কার্য্যে এইরূপ নৌকাই ব্যবহৃত হয়। ছোট ছোট গাছকে পরস্পর সংলগ্ন করিয়া এবং পরে উহার সহিত ছাগ-চর্ম্ম সংযুক্ত করিয়া ভেলা প্রস্তুত করা হয়। এই দেশের বিচিত্র বিধান অনুসারে বোগদাদ নগরে আগত প্রত্যেক ভেলার বিভিন্ন অঙ্গ খুলিয়া ফেলা হয় এবং তাহারা তথাকার বাজারে বিক্রীত হইয়া থাকে। সুতরাং যাহারা ভেলায় বোগদাদে যায় তাহারা স্থল-পথে ফিরিতে বাধ্য হয়।

ইরাককে বন-শ্যাম দেশ বলা চলে না। উৎকৃষ্ট কাষ্ঠ প্রভৃতি নিবিড় বন এখানে নাই বলিলেই হয়। অবশ্য কালস্রোতে এখানকার বাহ্য প্রকৃতি ও জলবায়ুর প্রবল পরিবর্ত্তন সম্পাদিত হইয়াছে। এই দেশের উত্তরাংশের অনেক স্থান বন্ধুর বা উচ্চ-নীচ হইলেও তথায় চারণ-ভূমি বিদ্যমান এবং গোধূম, যব, ছিমি প্রভৃতি উৎপন্ন হইবার উপযুক্ত কৃষিকার্য্যোপযোগী জমিও আছে। উপযুক্ত বৃষ্টি হইলে এখানে প্রচুর শস্য জন্মিতে পারে। বোগদাদের উত্তরে মহানদ তাইগ্রিস এবং ইউফ্রেতিসের দ্বারা আনীত পলি-মাটিতে উর্ব্বর যে প্রান্তর প্রসারিত রহিয়াছে উহা এক সময় সমগ্র পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা উর্ব্বর ও জলপূর্ণ স্থান ছিল বলিয়া কথিত। পূর্ব্বের মত উর্ব্বর নহে বলিয়া ইহার জন-সংখ্যাও ক্রমশঃ কমিয়া আসিয়াছে। নদী-তীরস্থ সঙ্কীর্ণকায় শস্য-ক্ষেত্রসমূহের পার্শ্বে বিরাজিত মঞ্জুল খর্জ্জুর-কুঞ্জগুলি ক্লান্ত পথিকের পক্ষে বিশেষ নয়নরঞ্জন ও মনোমদ হইয়া থাকে সন্দেহ নাই। এই প্রদেশের ভূমির প্রকৃতি এইরূপ যে জল-সেচনের ব্যবস্থা করিতে পারিলে অতি সত্বর শস্য উৎপন্ন হয়। ফসলের মধ্যে এখানে গোধূমই অধিক জন্মিয়া থাকে এবং এখানে উৎপন্ন গোধূমের পরিমাণ দিন দিন বাড়িতেছে এ বিষয়েও সন্দেহ নাই। যাহাতে কার্পাসের চাষ চলিতে পারে, বর্ত্তমানে সেই বিষয়েও প্রবল প্রচেষ্টা অনুষ্ঠিত হইতেছে।

ইরাকের বহু অংশ এখনও পতিতরূপে পড়িয়া আছে। তাইগ্রিস ও ইউফ্রেতিসের তীরবর্ত্তী ভূভাগ ভিন্ন অন্য অংশে জল-সরবরাহ সহজ নহে বলিয়াই শস্যক্ষেত্রের পরিমাণ এই দেশে অতিশয় অল্প। বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জ অপেক্ষা এই দেশ আকারে বৃহত্তর কিন্তু লোকসংখ্যা লণ্ডনের লোকসংখ্যা অপেক্ষা অনেক কম। পূর্ব্বের মত উর্ব্বর থাকিলে এইরূপ অবস্থা কখনও হইত না। কাদার সহিত ঘাস এবং নল জাতীয় উদ্ভিদখণ্ড মিশ্রিত করিয়া এক প্রকার ইষ্টক প্রস্তুত করা হয়। এই ইষ্টককে রৌদ্রপক্ব করিয়া উহার দ্বারা একতলা গ্রাম্য গৃহগুলি নির্ম্মিত হইয়া থাকে। নলজাতীয় উদ্ভিদে প্রস্তুত গৃহও এই দেশে দেখা যায়। এই দেশের

জলাগুলিতে এই সকল উদ্ভিদ জন্মায়। এই উদ্ভিদের কোন কোনটি ২০ ফিট পর্য্যন্ত দীর্ঘ হইয়া থাকে। এইরূপ কুটীর নির্ম্মাণে বেত্রও ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কুটীরের পার্শ্বে তৃণ বা খড়ের ছাউনি দৃষ্ট হয়। আবশ্যক হইলে এই সকল কুটীরের উপকরণগুলিকে গুটাইয়া অন্যত্র লইয়া যাওয়া চলিতে পারে।

কয়েক প্রকার যাযাবর সম্প্রদায় এই দেশে পালিত পশু-পক্ষী সহ ঘুরিয়া বেড়ায়। ইহারা ছাগ-লোম নির্ম্মিত তাঁবুতে বাস করে। নগরের গৃহগুলি দৃঢ়দেহ এবং দ্বিতল হইয়া থাকে। যাহাতে বাহিরের গরম হাওয়া প্রবেশ করিতে না পারে সেইজন্য নানাপ্রকার উপায় অবলম্বন করার নিয়ম প্রচলিত আছে। দরজা জানালায় রৌদ্র বা উত্তাপ নিবারক পর্দ্দা বা আবরণ ব্যবহার করা হয়। গৃহ ঠাণ্ডা রাখিবার জন্য তৃণরচিত পর্দ্দাকে সর্ব্বদা জলসিক্ত রাখা হয়।

বোগদাদ নগর পর্য্যন্ত তাইগ্রিস নদীতে ষ্টিমার যাতায়াত করিতে পারে। "এজ্‌রার সমাধি" নামক স্থানের পরবর্ত্তী অংশে বড় বড় জলযান যাওয়া সহজ নহে বটে, কিন্তু ঐ অংশ নানা প্রকার আকৃতির ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলযানে সর্ব্বদা পূর্ণ থাকে। এই সকল জলযান যাত্রী এবং পণ্য উভয়ই বহন করিয়া থাকে। আমরা গুফা নামক বিচিত্রাকৃতি নৌকার উল্লেখ পূর্ব্বেই করিয়াছি। ইহাদিগকে দূর হইতে দেখিলে মনে হয়, বড় বড় টুক্‌রি বা ডালা জলে ভাসান হইয়াছে। যখন নিজেকে নগর সমৃদ্ধির সমুচ্চ শিখরে সমারূঢ় তখনও তাইগ্রিস বক্ষে এই জাতীয় জলযান ভাসমান রহিত। শেখ সায়াদ নামক স্থান অতিক্রম করিবার পর গুফার পরিবর্ত্তে 'বেলাম' আখ্যায় অভিহিত কেন্দুস ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট নৌকা তাইগ্রিস বক্ষে দেখা যায়।

ইউফ্রেতিস নদীতে ষ্টিমার চলে না। এখানে দেশীয় জলযানের সাহায্যেই যাতায়াত করিতে হয়। তাইগ্রিসতীরে অরণ্য নাই বলিলেই হয়, কিন্তু ইউফ্রেতিস নদীর তীর সেইরূপ নহে। ইহার স্থানে স্থানে বন-শ্যাম ভূভাগ দৃষ্ট হয়। ইউ-ফ্রেতিসের নিম্নাংশের তটদেশে বিরাজিত জলাগুলি ক্রমশঃ উচ্চতর ও শস্যশ্যাম ক্ষেত্রসমূহে পরিণত হইতেছে। কুর্ণা নামক স্থানে তাইগ্রিস ও ইউফ্রেতিস মিলিত হইয়া শ্যাট-এল-আরব নাম ধারণ করিয়া পারস্য-উপসাগরের দিকে ধাবিত হইয়াছে। এই সঙ্গম স্থানের সন্নিকটবর্ত্তী ভূমিগুলিতে যেরূপ প্রচুর খর্জ্জুর জন্মায় তেমন আর পৃথিবীতে কোথাও জন্মে না। প্রায় দুইশত প্রকারের খর্জ্জুর এখানকার অধি-বাসীদিগের একটি প্রধান খাদ্য এবং অন্যতম প্রধান পণ্যও বটে।

এই খর্জ্জুর-কুঞ্জ-মঞ্জুল উর্ব্বর ভূভাগের বক্ষে এবং



নাজফের সাধারণ দৃশ্য

পারস্যউপসাগর হইতে ৭০ মাইল দূরে বসরা নামক বিখ্যাত নগর ও বন্দর দণ্ডায়মান। ইহাই ইরাকের প্রধান বন্দর। বিগত মহাযুদ্ধের সময় হইতে এই বন্দরের আয়তন ও সমৃদ্ধি বহুগুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। এখন এই সুন্দর বন্দরটি বহু মাইল ব্যাপিয়া বিরাজিত। বহু পয়-প্রণালীতে পূর্ণ বলিয়া ইহা "প্রাচীর ভেনিস" আখ্যায় অভিহিত হইয়া থাকে। ইরাকের অধিকাংশ অধিবাসী আরব। প্রায় সকল শ্রেণী ও সম্প্রদায়ের আরব এই দেশে দৃষ্ট হয়। আরবদিগের সহিত মিলিয়া বহু পার্শিয়ানও এই দেশে বাস করে। ইহাদিগের সকলেই মুসলমান সন্দেহ নাই। শিয়া এবং সুন্নি, এই দুই সম্প্রদায়ে ইহারা বিভক্ত। মুসলমানদিগের কতকগুলি পবিত্রতম তীর্থ-স্থান এই দেশে অবস্থিত। এই সকল প্রসিদ্ধ তীর্থের

অন্যতম নাজফ ইউফ্রেতিসের পশ্চিম তীরে বিরাজিত। শিয়া সম্প্রদায়ের দৃষ্টিতে ইহা মক্কার মতই মহাতীর্থ। মহাত্মা আলির সমাধি স্থান বলিয়াই শিয়া সম্প্রদায়ের দ্বারা ইহা পবিত্রতম তীর্থরূপে সম্মানিত। মরুভূমির পুরোভাগে বিরাজিত একটি পাহাড়ের উপর এই তীর্থস্থান দণ্ডায়মান। এই প্রাচীরপরিবেষ্টিত নগরের রাস্তাগুলি অতিশয় অপ্রশস্ত। সেই সঙ্কীর্ণ পথের উভয় পার্শ্বে দীর্ঘ-দেহ গৃহশ্রেণী দণ্ডায়মান রহিয়া আলোক ও বাতাসকে বাধা দিতেছে বলিলেও ভুল হয় না। এই নগরের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ভূগর্ভের অভ্যন্তরে বিরাজিত অন্ধকার কন্দরবৎ গৃহসমূহ। যেখানে চারিদিকে রৌদ্রতপ্ত মরু ধূ ধূ করিতেছে, সেখানে এইরূপ গৃহের প্রয়োজনীয়তাও অনুভূত হইতে পারে। যখন নগরের জনপূর্ণ পথে দুঃসহ গরম তখন ভূগর্ভের গৃহগুলি শান্তশীতল হওয়া স্বাভাবিক। এই সহরের বাজারটি লম্বায় সিকি-মাইলের বেশী নয়, কিন্তু প্রশস্ত। বাজারের প্রান্তে প্রধান উপাসনা-স্থান। এই ক্ষুদ্র নগরের লোকসংখ্যা ৪৫ হাজারের অধিক হইবে না, কিন্তু পর্ব্বোপলক্ষে বহু নরনারীর সমাগম হয়। নগরবাসীদিগের প্রত্যেক প্রয়োজনীয় পদার্থ অন্যত্র হইতে আনিতে হয়। যে জায়গা হইতে জল আনিতে হয়, তাহার দূরত্ব এক মাইলের কিছু কম হইবে। মশক বা চর্ম্মনির্ম্মিত আধারে জল আনীত হয়।

আরবের অন্তর্গত ইসলামীয় মহাতীর্থ মক্কা ও মদিনা হইতে মেসোপটেমিয়ার অন্তর্ভুক্ত নাজফ পর্য্যন্ত যাতায়াতের পথ আছে। মদিনা হইতে নাজফের দূরত্ব ৬ শত ৪০ মাইল। সুপ্রসিদ্ধ খলিফা হারুন-অল-রসিদের প্রিয়তমা পত্নী জোবা-দিয়ার আদেশে মক্কা ও মদিনা হইতে নাজফ পর্য্যন্ত প্রসারিত পথ প্রস্তুত করা হইয়াছিল। আজকাল মদিনা হইতে মোটরেও নাজফ যাওয়া যায়। তৃষাতুর মরুর বুকে প্রসারিত এই দীর্ঘ পথ অতিক্রম করিতে চারিদিনের কম সময় লাগে না। স্থানে স্থানে যে সকল 'খান' বা পান্থনিবাস দেখা যায় সেগুলিও সেই ধর্ম্মপ্রাণা রাজ্ঞীর আদেশে নির্ম্মিত হইয়াছিল। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, নাজফ শিয়া সম্প্রদায়ের দ্বারা পবিত্রতম তীর্থ বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে। শিয়াদিগের মতে হজরৎ মহম্মদের জামাতা মহাত্মা আলি সর্ব্বপ্রথম ইমাম। কথিত আছে, মহাত্মা আলি যখন ইউফ্রেতিস তটবর্ত্তী কুফা নামক স্থানের উপাসনাগৃহে উপাসনায় মগ্ন ছিলেন, তখন সহসা শত্রু কর্ত্তৃক সাংঘাতিক ভাবে আহত হন। কোন নির্জ্জন জায়গায় গিয়া দেহত্যাগ করিবার মানসে তিনি উষ্ট্রারোহণে কুফার পুরোভাগে প্রসারিত মরু-প্রান্তরের দিকে অগ্রসর হন। এই শোচনীয় দুর্ঘটনার বহু বৎসর পরে খলিফা হারুন-অল-রসিদ মৃগয়া করিবার জন্য কুফার সম্মুখবর্ত্তী সেই মরুবক্ষে গমন করেন। তিনি একটি মৃগের পশ্চাদ্ধাবন করিলে সে ভয়ার্ত্ত হইয়া একটি ঝোপের ভিতর আশ্রয় লয়। তিনি তাঁহার অশ্বকে সেই ঝোপের দিকে চালাইতে চেষ্টা করিলে সে এক পাও নড়িতে চাহিল না। তখন তিনি অশ্ব হইতে অবতরণ পূর্ব্বক সেই ঝোপের দিকে আগাইয়া গেলে অতিশয় বিস্ময়কর ও বেদনাপ্রদ দৃশ্য তাঁহার দৃষ্টিপথে পতিত হইল। খলিফা সেই ঝোপের ভিতর একজন মনুষ্য ও একটি উষ্ট্রের মৃতদেহ দেখিতে পাইলেন। বলা বাহুল্য, এই মৃত দেহদ্বয় মহাত্মা আলি এবং তাঁহার অনুগত বাহন সেই উষ্ট্রের। তখন খলিফার আদেশে সেই দেহ দুইটির উপর একটী সুন্দর সমাধিমন্দির নির্ম্মাণ করা হইল এবং সেই মন্দিরকে কেন্দ্র করিয়া যে নগর মরুবক্ষে গড়িয়া উঠিল তাহাই শিয়াসম্প্রদায়ের পুণ্যতম তীর্থ নাজফ।

এই সহরটী শুধু বালুকা-ধূসর মরুবক্ষে বিরাজিত তাহা নহে, ইহাকে বালুকাবৎ ধূসরবর্ণবিশিষ্ট বলিলেও ভুল বলা হয় না। কর্দ্দম-নির্ম্মিত প্রাচীরে পরিবেষ্টিত এই ক্ষুদ্র নগরের চিত্তাকর্ষক বৈশিষ্ট্য ইহার উপাসনাগৃহগুলির অম্বরচুম্বী গম্ভীর গম্বুজ ও মনোরম মিনারেট সমূহ। এই গম্বুজ ও মিনারেট-গুলি রবি-রশ্মিতে রঞ্জিত হইয়া রমণীয় দৃশ্য পরিগ্রহ করে। শিয়াসম্প্রদায়ভুক্ত ধর্ম্মপ্রাণ তীর্থযাত্রী ও দর্শনার্থীদিগের অন্তরে এই গম্বুজ ও মিনারেটগুলি অভূতপূর্ব্ব ভাবধারা সঞ্চারিত করে সন্দেহ নাই। এই তীর্থের প্রভাব শুধু ইরাক ও ইরাণে সীমাবদ্ধ নহে। দূরতর দেশ হইতে আগত যাত্রীর সংখ্যাও অল্প নহে। মহরম প্রভৃতি পবিত্র পর্ব্বোপলক্ষে আনুমানিক ১ লক্ষ ২০ হাজার তীর্থযাত্রী এই নগরে আসিয়া থাকে। শুধু দর্শনার্থী হইয়াই লোকে এখানে আসে তাহা নহে। দর্শন ছাড়া অন্য আকর্ষণও আছে। যেমন মোক্ষার্থী হিন্দু কাশীধামে মৃত্যু কামনা করে, তেমনই শিয়াসম্প্রদায়ের মুসল-মানরা নাজফের মৃত্তিকায় আলির সমাধির পার্শ্বে সমাহিত

হওয়াকে সদ্‌গতির সহায়ক পরম সৌভাগ্যের বিষয় বলিয়া মনে করে। বিশ্বাস, পার্থিব দেহ আলির সমাধির পার্শে স্থান লাভ করিলে শেষ বিচারের দিন বিশেষ সুবিধা পাইবার সম্ভাবনা আছে। এইরূপ বিশ্বাস হইতে নাজফ ক্রমশঃ শব বা সমাধির সহরে পরিণত হইয়াছে। সর্ব্বদা শত শত ব্যক্তি আত্মীয়জনের শব লইয়া এই সহরে আগমন করে। এখানে এমন অনেক লোক আছে যাহারা শবাবরণ তৈয়ারি করিয়া বা সমাধি খুঁড়িয়া জীবিকার্জ্জন করে। পয়সার বিনিময়ে কৃত্রিম শোকপ্রকাশকও পাওয়া যায়। এই সহরের একটী অংশকে জীবিতের বাসস্থান এবং অপর অংশটীকে মৃত্যুপুরী বলা চলে। জীবিত জনগণের বাসস্থান অংশটীর চতুর্দ্দিকেই কর্দ্দমে নির্ম্মিত ইষ্টকের পুরু প্রাচীর। প্রাচীরের বাহিরে কতিপয় যাত্রি-নিবাস ছাড়া অন্য কোন গৃহ দেখা যায় না। সহরের পূর্ব্ব এবং উত্তর পার্শ্বে সহস্র সহস্র সমাধি বিষাদগম্ভীর মূর্ত্তিতে বিরাজিত রহিয়া মানবদেহের অপরিহার্য্য পরিণতি মৃত্যুর বিজয়বার্ত্তা বিঘোষিত করিতেছে। সমাধির আকৃতি ও প্রকৃতি হইতে বুঝা যায়, সমাহিত ব্যক্তির পার্থিব জীবনে আর্থিক অবস্থা কিরূপ ছিল। দরিদ্রদের সমাধিগুলি সৌন্দর্য্য শূন্য সাদা-সিধা। সম্পত্তিশালীদিগের সমাধিমন্দির গম্বুজ এবং নীল, সবুজ ও গোলাপী বর্ণের টালিতে ভূষিত হইয়া বিশেষ সুদৃশ্য।

প্রিয়জনের শবকে আলির সমাধির পার্শ্বে সমাহিত করা সকলেরই ইচ্ছা, কিন্তু কেমন করিয়া ইহা সম্ভব হইবে? আমাদের মনে হয়, আলির সমাধির পার্শ্বে সমাহিত করিবার পর কোন কোন শবকে কিছুকাল পরে তথা হইতে তুলিয়া অন্যত্র লইয়া গিয়া প্রোথিত করার প্রথাও প্রচলিত আছে বলিয়াই অনেকের পক্ষে সেই ইচ্ছা পূর্ণ করা অসম্ভব হয় না। এক দিনের জন্যও মহাত্মা আলির সুপবিত্র সমাধির পার্শ্বে স্থান লাভ করাও সদ্‌গতির সহায়ক বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে।

এক প্রকার বিচিত্র ট্রামগাড়ীতে কুফা হইতে নাজফ পর্য্যন্ত যাওয়া যায়। এই ট্রামগুলি ক্ষুদ্রকায় অথচ দৃঢ়দেহ আরবীয় অশ্বের দ্বারা চালিত হইয়া থাকে। কুফায় নাজফ-গামী যাত্রীকে ইউফ্রেতিস নদের একটি শাখাকে সেতুর সাহায্যে অতিক্রম করিতে হয়। এই সেতু কতিপয় নৌকার সমষ্টি মাত্র। কোন আত্মীয়ের শব নাজফে সমাহিত করিতে হইলে সমাধি শুল্ক না দিলে চলে না। অবশ্য যার যেমন অবস্থা সে সেইরূপ ব্যয় করে। সম্পত্তিশালীরা ধর্ম্মসম্পর্কীয় প্রতিষ্ঠানসমূহে বই অথবা বহুমূল্য উপঢৌকন প্রদান করে। এই সকল প্রতিষ্ঠানে বিপুল ধনরত্ন সঞ্চিত আছে বলিয়া আমাদের মনে হয়। আলির সমাধি-মন্দিরের স্বর্ণনির্ম্মিত প্রকাণ্ড গম্বুজ এবং স্বর্ণশীর্ষ মনোজ্ঞ মিনারেটসমূহ দেখিলে বুঝা যায়, শিয়া সম্প্রদায়ের ধর্ম্মপ্রাণ ব্যক্তিগণ এই পরমপুণ্য তীর্থের জন্য অকাতরে অর্থদান করিতে কণামাত্রও কুণ্ঠা বোধ করেন নাই। মুসলমান ব্যতিরেকে আর কেহ এই সমাধি-মন্দিরের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে পারে না।

জীবিত জনগণের বাসস্থানপ্রাচীর পরিবেষ্টিত নগর এবং সমাধিপূর্ণ মৃত্যুপুরী ব্যতিরেকে নাজফের আর একটি অংশ আছে যাহা সহজে দৃষ্টিগোচর হয় না। নাজফের এই ভূগর্ভে বিরাজমান অংশের উল্লেখ আমরা পূর্ব্বেই করিয়াছি। নাজফের লোক-সংখ্যা এত দ্রুত বাড়িয়াছে যে, তাহার প্রাচীর-বেষ্টিত স্বল্প-পরিসর অংশটুকুতে তাহাদের সকলের স্থান সঙ্কুলান সম্ভব হয় নাই। অথচ মরুচারী দুর্দ্দান্ত দস্যু-দলের ভয়ে কেহ প্রাচীরের বাহিরে বাস করিতে সাহসী হয় নাই। সুতরাং অনেকে ভূগর্ভে গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া বাস করায় সাধারণ পথচারীর অগোচরে এই তৃতীয় সহর মাটির নীচে গড়িয়া উঠিয়াছে। সেখানে শুধু দ্বিতল, ত্রিতল নহে, চারিতল বিশিষ্ট গৃহও ভূগর্ভের অভ্যন্তরে দৃষ্ট হইয়া থাকে। ভূগর্ভে বিরাজিত প্রত্যেক গৃহের ব্যবহারের জন্য কূপ আছে এবং গৃহ হইতে গৃহান্তরে যাইবার রাস্তাও রহিয়াছে। সোপানের সাহায্যে উপর হইতে এই রহস্যপুরীর অভ্যন্তরে অবতরণ করা যায়।

দক্ষিণ পশ্চিম প্রাচীরের গাত্রে একটী সঙ্কীর্ণ দ্বার দেখা যায়। এই দ্বার পথে বাহির হইলে খলিফা হারুণ-অল রসিদের প্রিয়তমা পত্নী জোবাদিয়ার আদেশে প্রস্তুত নাজফ হইতে মক্কা পর্য্যন্ত প্রসারিত পথটিকে সম্মুখে দেখা যায়। পথটি নাজফ হইতে ক্রমশঃ নামিয়া একটি খর্জ্জুরকুঞ্জ মণ্ডিত মরু-দ্যানের ভিতর দিয়া মক্কার দিকে আগাইয়া গিয়াছে। এই পথটীর দিকে চাহিলে কত কথাই মনে পড়ে। মনে পড়ে, মরুময় আরবের বুকে ইসলামের জন্মের কথা। যিনি সর্ব্বদা

বিবদমান মরুচারী দুর্দ্দমনীয় বেদুইনদিগকে ধর্ম্মের বন্ধনে বাঁধিয়াছিলেন, উদার মৈত্রী-মন্ত্রে দীক্ষা দিয়াছিলেন, সেই অদ্ভুতকর্ম্মা মহাপুরুষকে মনে পড়ে। সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে আরবের ধর্ম্ম ভারতে গিয়া অদ্ভুত সমস্যা সৃষ্টি করার কথা। মনে পড়ে মহাত্মা আলির কথা এবং তাঁহার পুত্র ও হজরতের দৌহিত্র হাসেন ও হুসেনের করুণ কাহিনী। মনে পড়ে বোগদাদাধিপতি হারুণ-অল-রসিদের কথা যিনি প্রজা রঞ্জনের জন্য বোগদাদের পথে পথে ছদ্মবেশে ঘুরিয়া বেড়াইতেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার প্রিয়তমা পত্নী ধর্ম্মপ্রাণা জোবাদিয়ার কথাও স্মৃতি-পথে জাগরূক হয়, যাঁহার আদেশে পিপাসার্ত্ত মরুবক্ষে মক্কার সহিত নাজফের সংযোগ-সাধক এই সুদীর্ঘ পথ প্রস্তুত হইয়াছিল।

পৃথিবীতে এমন কতকগুলি শহর আছে, বৈচিত্র্য বা বৈশিষ্ট্যের জন্য যাহারা বিশ্বব্যাপী খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছে। বোগদাদ এই সকল শহরের অন্যতম। খলিফা হারুন-অল-রশিদের রাজধানী বোগদাদের সহিত কত রমণীয় রোমান্স, কত অপরূপ রূপকথার স্মৃতি বিজড়িত রহিয়াছে। বোগদাদ শব্দটি সমুচ্চারিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে রোমান্সের রাজা আরব্য রজনীর অদ্ভুত গল্পগুলির কথা মনে পড়ে। এক সময় ইসলামীয় সাম্রাজ্য স্পেন পর্য্যন্ত প্রসারিত হইয়াছিল। এই সাম্রাজ্যের পশ্চিমাংশ "ওয়েষ্টার্ণ ক্যালিফেট" এবং পূর্ব্বাংশ "ইষ্টার্ণ ক্যালিফেট" আখ্যা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। পশ্চিম ক্যালিফেটের কেন্দ্র ছিল স্পেনের কর্দ্দোভা নগরী এবং ইসলামীয় প্রাচ্য সাম্রাজ্যের রাজধানী ছিল বোগদাদ। খলিফা হারুন-অল-রশিদের শাসন সময়ে এই প্রাচ্য সাম্রাজ্য সমৃদ্ধির চরম সীমায় উপনীত হইয়াছিল। এই সাম্রাজ্য শুধু ইরাক ও আরবকে লইয়া গঠিত ছিল না, পারস্য, মিশর, সিরিয়া, উত্তর-আফ্রিকা এবং আর্জ্জিরা ও সার্কেশিয়া উহার অন্তর্গত ছিল। খলিফার দরবারের মত ঐশ্বর্য্যশালী ও সমারোহ সম্পন্ন দরবার পৃথিবীতে তৎকালে আর ছিল না। স্পেনের কর্দ্দোভায় বিরাজিত প্রতীচ্য খলিফার দরবারও বিশেষ সমৃদ্ধিশালী ছিল। পরে দিল্লীর দরবার খলিফাদিগের দরবারের ন্যায় বিস্ময়কর ঐশ্বর্য্য ও আড়ম্বরে পূর্ণ হইয়াছিল। সম্রাট হারুণ-অল-রশিদের প্রাসাদে আট হাজার পরিচারক আদেশ পালনের জন্য সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকিত। দরবারের যে অংশে বসিয়া খলিফা প্রজাগণের আবেদন শুনিতেন তথায় একটি স্বর্ণ-নির্ম্মিত বৃক্ষ রক্ষিত ছিল। এই বৃক্ষের বক্ষে স্বর্ণ ও রৌপ্যরচিত এবং রত্নখচিত কৃত্রিম পক্ষী রক্ষিত রহিত বলিয়াও জানা যায়। কিম্বদন্তী, সেই সকল কৃত্রিম পক্ষীর দেহে শুধু যে কৃত্রিম পক্ষসমূহ সংলগ্ন ছিল তাহা নহে, উহারা সেই পক্ষের সাহায্যে উড়িতেও পারিত। এমন কি উহাদিগের কণ্ঠ হইতে সুললিত সঙ্গীতের ন্যায় এক প্রকার শব্দও নির্গত হইত বলিয়া কথিত হইয়া থাকে।

তাইগ্রিস নদের তটের নিকটে বোগদাদ নগরের দক্ষিণাংশ অবস্থিত। যাঁহারা নৌকাযোগে তাইগ্রিসের বুকের উপর দিয়া বোগদাদ যাইতে চান তাঁহারা এই ইতিহাসপ্রসিদ্ধ নদীর দুই ধারে বালুকা-ধূসর উষর প্রদেশ প্রসারিত দেখেন। মধ্যে মধ্যে যাযাবর আরব বা বেদুইনদিগের বাসস্থান শিবির দেখা যায়। দেশীয় নৌকা ছাড়া পারস্য-উপসাগর হইতে আগত ষ্টিমারও নদী-বক্ষে লক্ষিত হয়। বোগদাদের পুরোভাগে প্রবাহিত তাইগ্রিসের বক্ষোদেশে বিরাজিত নানা-জাতীয় জলযান একপ্রকার কর্ম্মব্যস্ত বৈচিত্র্যের পরিচয় প্রদান করে বলিলে ভুল হয় না। নৌকাযোগে আসিয়া বোগদাদের ঘাটে নামিবার সময় মনে পড়ে নাবিক সিন্ধবাদের অদ্ভুত অভিযানসমূহের বিস্ময়কর কাহিনীগুলি। বোগদাদ হইতে ইউফ্রেতিসের দূরত্ব ত্রিশ মাইল। উভয় নদ সমরেখায় বহিয়া আসিয়া অবশেষে গাঢ় আলিঙ্গনে আবদ্ধ হইয়া স্যাট-এল-আরবে পরিণতি পাইয়াছে। সুমেরীয় ও আসারীয় সভ্যতার জন্মদাতা এই দুইটি মহানদ সুদূর অতীতের কত বিচিত্র চিত্র ভ্রমণকারীর মানস-পটে একে একে ফুটাইয়া তুলে। ইউফ্রেতিস অনতিদূরে বিরাজিত বলিয়া তাইগ্রিস-তীরবর্ত্তী বোগদাদের বাণিজ্যবিষয়ক গুরুত্ব বৃদ্ধি পাইয়াছে।

বোগদাদে প্রবেশ করিলে বিভিন্ন জাতি ও সম্প্রদায়ের লোক দৃষ্টিপথে পতিত হয়। আরব, সিরিয়ান, আর্ম্মেনিয়ান, পার্সিয়ান, তুর্কী, ভারতবাসী প্রভৃতি নানাদেশের লোক বোগদাদের পথে দেখা যায়। প্রধানতঃ, আরবী এবং তুর্কী এই দুইটি ভাষা এখানে প্রচলিত। অবশ্য অধিকাংশ অধিবাসীই মুসলমান। আমরা বোগদাদের বাজারে ঘুরিয়া বেড়াইলে শুধু যে নাগরিকদিগকে দেখিব তাহা নহে। চারিদিকের পল্লী-গ্রাম-অঞ্চল হইতে ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য

আগত বহুলোক আমাদের দৃষ্টিপথে পতিত হইবে। গ্রাম্য কৃষকগণ ক্ষেত্রজাত শস্যাদি এবং তাঁত-জাত বস্ত্রাদি বেচিবার জন্য লইয়া আসে। বিশেষ সঙ্গতিশালী সুবেশ-সজ্জিত বণিক হইতে আরম্ভ করিয়া ভিক্ষার জন্য দ্বারে দ্বারে বিস্তৃতহস্ত, জীর্ণবস্ত্র ভিক্ষুক পর্য্যন্ত, প্রায় প্রত্যেক স্তরের লোকই বোগদাদের রাস্তায় আমরা দেখিতে পাই। অপেক্ষাকৃত অপ্রশস্ত রাস্তাগুলির ধারে একশ্রেণীর লোককে বসিয়া থাকিতে দেখা যায়। সামান্য পয়সার বিনিময়ে লোকের ভাগ্যলিপি বলিয়া দেওয়া ইহাদিগের কার্য্য। গণক ছাড়া আর এক শ্রেণীর লোকও পথের পাশে বসিয়া থাকে। ইহারা কিঞ্চিৎ অর্থের বিনিময়ে লেখক ও পাঠকের কার্য্য করে। নিরক্ষর লোকেরা ইহাদিগের নিকট হইতে প্রিয় জনের পত্র পড়াইয়া লয় এবং লিপি লিখাইবার প্রয়োজন হইলে তাহাও ইহারাই করিয়া দেয়। প্রাচীন মিশর, বাবিলোনিয়া ও আসীরিয়ায় এইরূপ লেখক বা স্ক্রাইব অনেক ছিল। কোন দলিল-দস্তাবেজ দরকার হইলেও ইহারা তাহাও লিখিয়া দেয়। শিক্ষার প্রচার প্রতীচীর ন্যায় বিস্তৃত নহে বলিয়া এইরূপ লেখক ভিন্ন এখানে চলে না। গণক ও লেখক ছাড়া আর একপ্রকার লোক নগরের নানাস্থানে প্রায়ই দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। ইহারা ভিষক্। দেশীয় গাছ-গাছড়ার সাহায্যে ইহারা চিকিৎসা করে। ডাক্তার-কবিরাজের মত ইহারা নাড়ী ও জিহ্বা পরীক্ষা করিয়া ব্যবস্থা দেয়। ইহাদের ভাব-ভঙ্গী দেখিয়া মনে হয় পাণ্ডিত্যের ভান করিয়া ইহারা লোকের শ্রদ্ধাকর্ষণের চেষ্টা করে।

বোগদাদের আবহাওয়া চরম ভাবাপন্ন এবং এখানকার গৃহগুলি সেইরূপ আবহাওয়ার উপযোগী করিয়া নির্ম্মিত। এপ্রিলের শেষ হইতে অক্টোবরের প্রারম্ভ পর্য্যন্ত এই অঞ্চলে অত্যধিক গরম অনুভূত হয়। এই দুঃসহ গ্রীষ্মের জন্য এখানে গৃহগুলির অংশবিশেষ ভূগর্ভে নির্ম্মাণ করিবার নিয়ম প্রচলিত আছে। গ্রীষ্মের রাত্রিতে উন্মুক্ত ছাদের উপর শয়ন করা হয় এবং দিনে যখন রৌদ্র রুদ্ররূপ পরিগ্রহ করিয়া চারিদিক দগ্ধ করে, তখন ভূগর্ভের গৃহে আশ্রয় লওয়া হয়। সূর্য্যোদয়ের কিছুক্ষণ পরেই তাপ ১১০ ডিগ্রি হইয়া পড়ে। শীত ঋতুতে তীব্র শীত অনুভূত হয় এবং প্রায়ই তুষারপাত দেখা যায়।

প্রত্যেক পথেই মসজেদ বা ইসলামীয় উপাসনাগৃহ আছে কতিপয় মসজেদের সহিত মাদ্রাসা বিদ্যালয় সংশ্লিষ্ট আছে। মসজেদের আচার্য্য বা মোল্লা এই বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ। এই সকল বিদ্যালয়ে যৎকিঞ্চিৎ লেখাপড়া শেখানর সঙ্গে সঙ্গে কোরাণের কোন কোন অংশ কণ্ঠস্থ করানর চেষ্টা অনুষ্ঠিত হয়। যেমন আমাদের দেশে অর্থ না বুঝিয়াও অনেকে বৈদিক বা তান্ত্রিক মন্ত্র উচ্চারণ করেন, তেমনই মর্ম্ম না বুঝিয়া কোরাণের আবৃত্তি করা হয়। ছাত্রেরা ভূতলে বসে এবং তাহাদিগের সম্মুখে স্থাপিত কাষ্ঠখণ্ডগুলি ডেস্কের কাজ করে। প্রত্যেক পাঠকের সুর করিয়া আবৃত্তি করার নিয়ম প্রচলিত আছে। আমাদের দেশের মক্তব ও মাদ্রাসাগুলিতেও মুসলমান বালকগণের সুর সহযোগে পাঠ কণ্ঠস্থ করিবার দৃশ্য অনেকে দেখিয়া থাকিবেন। দিবা দ্বিপ্রহরে আহারের জন্য ছুটি হয়। ছাত্রেরা বিদ্যালয়েই আহার্য্য গ্রহণ করিয়া পুনরায় পাঠ আবৃত্তি আরম্ভ করে। সাধারণতঃ রুটি ও ফল খাওয়া হয়। সূর্য্যাস্ত-সময়ে বিদ্যালয়ের কার্য্য শেষ হইলে শিক্ষার্থিগণ স্ব স্ব গৃহে গমন করে।

হাটের দিনে বোগদাদের বাজারে গমন করিলে এই অঞ্চলের অধিবাসীদের পোষাক-পরিচ্ছদ ও আচার-ব্যবহার সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা লাভ করা যায়। এই প্রদেশের অধিবাসীরা প্রথমে একটি লম্বা শার্ট গায়ে দেয়, তারপর রঙীন কাপড়ের একটি কোট পরে। সর্ব্বশেষে উষ্ট্রলোমে প্রস্তুত চোগা বা চাপকান জাতীয় দীর্ঘ পরিচ্ছদ পরিধান করা হইয়া থাকে। অবশ্য সকলেই যে একই প্রকার পোষাক ব্যবহার করে তাহা নহে। উষ্ট্রচালকরা মাথায় একখানি রুমাল বাঁধিয়া রাখে এবং তাহাদের পরিচ্ছদ অপেক্ষাকৃত অধিক ঢিলা ও লম্বা হইয়া থাকে। বণিকরা মাথায় ফেজ এবং সাদা গাউন ও কালো আবাস (উপরে পরিবার ঢিলা পরিচ্ছদ) ব্যবহার করে। কাহারও কাহারও মস্তকাবরণ ঠিক পাগড়ীর ন্যায়। নারীরা মস্তক আবৃত করিয়া উপরের পরিচ্ছদ পরিধান করে এবং কালো অশ্বলোমে প্রস্তুত মুখাবরণ ব্যবহার করিয়া থাকে।

এই প্রদেশের অধিবাসীরা শস্যের মধ্যে গম, যব ও ভুট্টা খাদ্যরূপে ব্যবহার করে। মাংসের মধ্যে মেষমাংসই ইহাদিগের দ্বারা অধিক ব্যবহৃত হইতে দেখা যায়।

এই দেশের প্রধান আহার্যের অন্যতম। পানীয় পদার্থের মধ্যে কাফির ন্যায় জনপ্রিয় আর কিছুই নহে। প্রত্যেক আরব প্রভাত-কালীন প্রার্থনা শেষ করিবার পর একপাত্র কাফি পান করা কর্তব্য বলিয়া মনে করে। বোগদাদের নিকটবর্ত্তী অঞ্চলের অধিবাসী জনৈক আরব কর্ত্তৃক কাফি আবিষ্কৃত হইয়াছিল বলিয়া কথিত হয়। বোগদাদের কাফির দোকান-গুলিই গল্পগুজবের প্রধান আড্ডা। কোথাও কিছু ঘটিলে সেই সংবাদ এই সকল পান-শালাকে আশ্রয় করিয়া প্রচার লাভ করে। রমজান বা রোজার সময় কাফির দোকানগুলির গুরুত্ব আরও বাড়িয়া যায়। তখন সন্ধ্যা হইতে প্রত্যেক পানাগার পানার্থীতে পূর্ণ হইয়া পড়ে এবং ইহারা সমস্ত রাত্রিই আলোকিত ও কোলাহল-মুখরিত হইয়া খোলা থাকে।

বোগদাদের বুকে অতীত সমৃদ্ধির ও প্রাচীন সংস্কৃতির বহু নিদর্শন বিদ্যমান রহিয়াছে। এখানে প্রাচীনের সহিত নবীনের, অতীতের সহিত বর্ত্তমানের বিচিত্র সম্মেলন দৃষ্টি-গোচর হয়। চারিদিকে সুপ্রাচীন সভ্যতা ও সমৃদ্ধির দিগন্তবিস্তৃত বিষাদ-করুণ সমাধিস্থল মধ্যে এই নগর সমাধি-ক্ষেত্রে আলোকস্তম্ভের মত দাঁড়াইয়া আছে।

প্রায় ৮৭-হাজার ইহুদী এই দেশে বাস করে। আমরা বাইবেল পাঠে জানিতে পারি, ইহুদীরা বহুকাল বন্দী রূপে বাবিলনে বাস করিয়াছিল। ইহুদী গোষ্ঠীপতি আব্রাহাম এই দেশের উর নামক নগর হইতে গিয়াছিলেন। ইউফ্রেতিস নদ এবং স্যাট-এল-হাই নামক খালের সঙ্গমস্থলে এই বিখ্যাত নগর বিরাজিত ছিল। ইহুদীদিগেরও বহু তীর্থ এই দেশে অবস্থিত। ইহুদীরা সাধারণতঃ নগরে বাস করে, অনেকেই দোকানদারী বা ব্যবসা-বাণিজ্যের সাহায্যে অর্থা-র্জ্জন করিয়া থাকে। কেহ কেহ এখন মহাজনের কার্য্যও করে। দেশীয় খৃষ্টিয়ানদিগের সংখ্যা প্রায়ই ইহুদীদিগের অনুরূপ। ইহাদিগের অধিকাংশই মোসুল নগরের চতুর্দ্দিকে অবস্থান করে। আসিরিয়ানদিগের মধ্যেই খৃষ্টীয়ানের সংখ্যা অধিক। দেশীয়দিগের মধ্যে ইহারাই অধিকতর শিক্ষিত। ইহা ছাড়া কুর্দ্দ নামক দুর্দ্দান্ত সম্প্রদায়কে উত্তরাংশ হইতে আসিতে দেখা যায়। ইহারা নামমাত্র মুসলমান। মেসোপটেমিয়া-বাসী অমুসলমান ও অখৃষ্টান সম্প্রদায়সমূহের মধ্যে সাবিয়ান এবং ইয়েজিদি নামক সম্প্রদায় দ্বয়ের নামও উল্লেখযোগ্য। সাবিয়ান বা সুধিরা "নক্ষত্র-পূজক" বলিয়া অভিহিত। ইহারা উপাসনার সময় ধ্রুবতারার দিকে চাহিয়া উপাসনা করে। ইহাদিগের বিশ্বাস ধ্রুবতারা পরপারে পরমেশ্বরের আবাস। রবিবারকে ইহারা পবিত্র বলিয়া মনে করে। সপ্তাহে এক দিন করিয়া ইহাদের দীক্ষা লাভ করিবার সময়। এই দীক্ষা-দান ব্যাপারে মদ্য এবং রুটি ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইহারা খৃষ্টান নহে বটে, কিন্তু জন্ দি ব্যাপটিষ্টের প্রতি বিশেষ ভক্তি আছে। এই সম্প্রদায়ভুক্ত নরনারীর আকৃতি মনোরম। দক্ষিণের জলাবহুল প্রদেশে বাস করে বলিয়া নৌকা-নির্ম্মাণ ব্যাপারে ইহাদিগের বিশেষ নৈপুণ্য আছে। রৌপ্যসম্পর্কীয় কারুকার্য্যে অসাধারণ দক্ষতার জন্যও ইহারা বিখ্যাত।



বঙ্কিমচন্দ্র ও বাঙ্গালী মুসলমান

শ্রীব্রজেন্দুসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায়, এম; এ

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

বঙ্কিমচন্দ্রের চতুর্থ গ্রন্থ "বিষবৃক্ষ।" 'বিষবৃক্ষ'এ একমাত্র মুসলমান চরিত্র হইল, নগেন্দ্র দত্তের নৌকার মাঝি রহমৎ মোল্লা। বাঙ্গালীদের মধ্যে পূর্ব্ববঙ্গীয়েরাই নৌকাদি চালনে পারদর্শী। কথায় বলে 'বাঙ্গাল মাঝি।' পূর্ব্ববঙ্গের নদী-বাহুল্যই ইহার বোধ হয় একমাত্র কারণ। পূর্ব্ববঙ্গীয়দের ভিতর মুসলমানেরাই আবার এ বিষয়ে অধিকতর পারদর্শী, ইহার ঠিক কি কারণ বলা কঠিন। তবে আমাদের মনে হয়, মুসলমান শাসনের সময় নবাবি বহরাদির কার্য্যে মুসলমানেরাই নিযুক্ত হইত। এ কার্য্যে সুদক্ষ হওয়া তাহাদের বংশীয়দের পক্ষেই অধিকতর সম্ভব। চট্টগ্রামাঞ্চলে পর্ত্তুগীজদিগের উপনিবেশ স্থাপনও এ বিষয়ে কিছু সাহায্য করিয়াছে। কারণ চাটগেঁয়ে মাঝিই জগদ্বিখ্যাত; অতএব নগেন্দ্রের মাঝিকে মুসলমান করিয়া মহাকবি ঠিকই করিয়াছেন।

রহমৎ মোল্লার চরিত্র ক্ষুদ্র হইলেও উহাতে দুইটী বিশেষ করিয়া দেখিবার বিষয় আছে। প্রথমতঃ কবি বলিয়াছেন যে, রহমৎ মোল্লার মাঝিগিরির ইহাই একমাত্র অধিকার যে, তাহার ফুফার খালা অর্থাৎ পিসেমহাশয়ের ভগিনীপতি মাঝিগিরি করিতেন। দ্বিতীয়তঃ, যখন ঝড় বৃষ্টির সময় ভীত হইয়া তাহার প্রভু নগেন্দ্র দত্ত তাহাকে ঐ সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলেন, তখন সে নমাজ করিতেছিল বলিয়া তাহার ঐ কথার উত্তর দিল না। বিপদের সময় নৌকার লোকেদের নিরাপদে থাকা বা না থাকা নৌকার মাঝির উপর নির্ভর করে। অতএব সেরূপ সময়ে কোন নৌকার মাঝির নমাজে লিপ্ত হওয়া কর্ত্তব্য নহে। যদি কেহ হয় তাহা হইলে উহা তাহার অত্যধিক ধর্ম্মনিষ্ঠার পরিচায়ক। যদি বলা যায় যে, মোল্লা সাহেব সকল দিক দেখিয়া শুনিয়া সকল বিলি ব্যবস্থা করিয়া, অথবা তাহার নিজের সাহসের দরুণ তাহার নিকট বিপদ কিছুই নহে প্রতিভাত হওয়ায় সে নমাজে বসিয়াছিল, তাহা হইলেও আমাদের মাঝি মহাশয়কে অত্যধিক ধর্ম্মনিষ্ঠার চাপ হইতে মুক্ত করা যায় না। কারণ, এই সময়ে তাহার অন্নদাতা প্রভু ভয় পাইয়া তাহাকে ইতিকর্ত্তব্যতা সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলেন। কিন্তু মোল্লা মহাশয় তাঁহার কথার উত্তর দিল না।

উপাসনাদির সময় সাধারণতঃ কথা না কহাই বাঞ্ছনীয় সন্দেহ নাই, কিন্তু যদি কোন বিপদের সময় কোন ব্যক্তি কাহারও নিকট আশ্রয় বা পরামর্শ চাহে, বিশেষ ঐ ব্যক্তি যদি গুরুস্থানীয় বা প্রভু হয়েন, তাহা হইলে কাহারও কর্ত্তব্য কি যে সেরূপ ব্যক্তিকে উপাসনার অনুরোধে দ্বিধায় ফেলিয়া রাখা? বিপদের সময় মানুষ অনেক কিছু করিয়া ফেলে, সে সময়ে তাহাদিগকে সর্ব্বদাই আশ্বাসবাক্য বা উপযুক্ত পরামর্শ দিয়া শান্ত রাখা কর্ত্তব্য, যদি এ ক্ষেত্রে মাঝির উত্তর না পাইয়া তাহার প্রভু নগেন্দ্র দত্ত কিছু অন্যায় করিয়া ফেলিতেন, তাহা হইলে তাহার জন্য মাঝি মহাশয়ই কি দায়ী হইত না?

এইবার আমরা আমাদের প্রথমোক্ত বিষয়ের আলোচনা করিব। মধ্যে বাঙ্গলার মুসলমানেরা, বাঙ্গলায় কেন সমগ্র ভারতবর্ষের মুসলমানেরাই, তাঁহাদের ব্যক্তিগত যোগ্যতার বিষয়ে কিছু অমনোযোগী হইয়াছিলেন, তাঁহারা তাঁহাদের সমস্ত দাবী দাওয়াই বংশগত অধিকার বা মর্য্যাদার ভিতর দিয়াই করিতেন, অনেক সময় এই দাবী এত দূরাগত (farfetched) হইত যে, উহা বিশ্বাস করাই কঠিন হইয়া পড়িত। কবি মোল্লা সাহেবের মাঝিগিরির দাবীতে উহারই উল্লেখ করিয়াছেন। সাক্ষাৎ সম্বন্ধে যদি কোন পূর্ব্ব পুরুষ কোন বিষয়ে পারদর্শী হয়েন, তাহা হইলে সে বিষয়ে তাঁহাদের বংশধরদিগের কিছু জানা সম্ভব হইতে পারে, কেন না, একটা কথাই আছে, "বামুনের ছা বেদ পড়ে, ইঁদুরের ছা মাটী খোঁড়ে," কিন্তু যদি আমার পিসে মহাশয়ের ভগিনীপতি কোন বিষয়ে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া থাকেন তাহা হইলে সে বিষয়ে আমার কিছু জ্ঞান লাভের সম্ভাবনা আছে কি না তাহা পাঠকেরা নিজেই স্থির করিবেন।

বাঙ্গালী মুসলমানদিগের ভিতর যদি কিছু অবনতি কোন

সম্বন্ধে ঘটিয়া থাকে, তাহা হইলে উহার মূলে এই দুইটী— তাঁহাদের অত্যধিক ধর্ম্মনিষ্ঠা ও ব্যক্তিগত যোগ্যতার প্রতি অমনোযোগিতা। কবি রহমৎ মোল্লার চরিত্রে এই দুইটীর প্রতিই ইঙ্গিত করিয়াছেন।

মোল্লা মহাশয়ের প্রসঙ্গে কবি কিছু পরে লিখিয়াছেন যে, বৃষ্টি অধিক হইলে মোল্লা মহাশয়ের দাড়ি হইতে প্রস্রবণের সৃষ্টি হইল, ধর্ম্মপ্রাণ মুসলমান মাত্রেই দাড়ি রাখিয়া থাকেন, মোল্লা মহাশয়ও রাখিয়াছিলেন, দাড়িওয়ালা লোক অধিক বৃষ্টির মধ্যে পড়িলেই দাড়ি হইতে প্রস্রবণের সৃষ্টি হইবেই। অতএব মোল্লা মহাশয়ের সম্বন্ধে ঐ কথা বলায়, আশা করি, মহাকবি বঙ্গীয় মুসলমান সম্প্রদায়ের বিরাগ-ভাজন হয়েন নাই। লর্ড বায়রণ (Lord Byron) ডন জুয়ান (Don Juan) এর জাহাজ ভগ্ন নাবিকগণের সম্বন্ধে ঠিক এই ভাবের কথাই বলিয়াছেন।

বঙ্কিম চন্দ্রের পঞ্চম গ্রন্থ 'চন্দ্রশেখর'। 'বিষবৃক্ষ' ও 'চন্দ্রশেখর'-এর মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্র 'রাধারাণী' প্রভৃতি দুই একটী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গল্প লিখিয়াছিলেন। কিন্তু ঐ সকল ক্ষুদ্র গ্রন্থের আমাদের এ প্রসঙ্গের সহিত কোন সম্বন্ধ নাই। সুতরাং উহাদের কথা পরিত্যাগ করিলাম। আমরা 'মৃণালিনী'কে বাঙ্গালী মুসলমানদিগের মহাকাব্য বলিয়াছি। সেইরূপ 'চন্দ্রশেখর'কে হিন্দু ও মুসলমান লইয়া গঠিত সমগ্র বাঙ্গালী জাতির জাতীয় মহাকাব্য বলা চলে। এই মহাগ্রন্থে বঙ্কিমচন্দ্র দেখাইয়াছেন, যদি বাঙ্গলার হিন্দু ও মুসলমান এক হয় তাহা হইলে বাঙ্গালী জাতি শত্রুর নিকট কিরূপ ভীতিপ্রদ হইয়া উঠে ও ঐ জাতির ভিতর যদি হীন স্বার্থজড়িত আত্মদ্রোহ উপস্থিত না হয়, তাহা হইলে কোন বহিঃশত্রু কখন কোন দিন এ জাতির কোনরূপ অনিষ্ট করিতে পারে না, বা অতীতে পারিত না। এই গ্রন্থেরই ঠিক বিপরীত প্রতিমূর্ত্তি "আনন্দমঠ।" "আনন্দমঠে" কবি দেখাইয়াছেন যে, বাঙ্গালা দেশে যদি হিন্দু ও মুসলমান পৃথক্ হইয়া পড়ে তাহা হইলে বাঙ্গালী জাতির অবস্থা কি ভীষণ হয় এবং কি সহজেই উহা অপরের করায়ত্ত হইয়া পড়ে। এই দুই গ্রন্থের আলোচনা আমরা একত্র পরে করিব। উহা করিবার আরও একটী কারণ এই যে, এই দুই মহাগ্রন্থে যেমন একই বস্তুর দুইটী দিক দেখান হইয়াছে, তেমনি উহাদের ঐতিহাসিক ভিত্তিও একই। উহারা ইতিহাসের প্রায় একই সময়কে অবলম্বন করিয়া লিখিত হইয়াছে। কবি যেন দেখাইতে চাহেন যে, অবস্থার ভেদে একই স্থলে সম্পূর্ণ বিভিন্ন পুষ্প প্রস্ফুটিত হইতে পারে। একটী শোভায় ও সম্পদে অতুলনীয়, অপরটী দর্শন ও স্পর্শনে লোমহর্ষণকর।

"চন্দ্রশেখর" "দেবী চৌধুরাণী" লিখিত হয় ইংরাজী ১৮৭৫ সালে। "চন্দ্রশেখর" এর পর "কৃষ্ণকান্তের উইল"। তাহার পর ইংরাজী ১৮৮২ সালে অর্থাৎ "চন্দ্রশেখর" লেখার সুদীর্ঘ সাত বৎসরের পরে লেখা হয় আগেকার ক্ষুদ্র "রাজসিংহ।" তাহার পরেই সেই বৎসরেই আমরা পাই "আনন্দমঠ।"

'রজনী'তে মুসলমানদিগের কথা মোটেই নাই। 'কৃষ্ণকান্তের উইল'এ অতি সামান্য ভাবে এক জায়গায় আছে। যাহা আছে তাহা নিন্দাসূচক মোটেই নহে। ছদ্মবেশী গোবিন্দলাল যখন রোহিণীকে হত্যা করিয়া প্রসাদপুর হইতে পলায়ন করিলেন, তখন তাঁহাকে ধরা বড় কঠিন হইল। উহার জন্য সরকার হইতে ফিচেল খাঁ নামে একজন সুদক্ষ মুসলমান দারোগা প্রসাদপুরে প্রেরিত হইয়াছিল। 'কৃষ্ণকান্তের উইল'এ মুসলমান প্রসঙ্গ মাত্র এইটুকু। বলা বাহুল্য ফিচেল খাঁ কার্য্যে সফলকাম হইয়াছিলেন। তিনি গোবিন্দলালকে খুঁজিয়া ধরিতে পারিয়াছিলেন। সুতরাং এই শ্রেণীর কুটিল রাজকার্য্য করিতে হিন্দুর অপেক্ষা মুসলমান যে অধিকতর সক্ষম তাহা কবি স্পষ্টই সূচিত করিয়াছেন।

'ফিচেল' অর্থে ধূর্ত্ত। অতএব দারোগার নাম ফিচেল খাঁ দেওয়ায় কেহ কেহ ইহাতে কিছু ব্যঙ্গের আভাস পাইতে পারেন। আমরা বলি, কবি যখন ফিচেল খাঁকে কার্য্যে সফল করিয়াছেন তখন ব্যঙ্গের কথা কিছুমাত্রও এখানে নাই। নামটা দেওয়া কবিমনোচিত কৌতুক মাত্র।

'চন্দ্রশেখর' হইতে ক্ষুদ্র 'রাজসিংহ' পর্য্যন্ত সাত বৎসরের মধ্যে মুসলমান প্রসঙ্গ মাত্র এই টুকু। বোধ হয়, কবি 'চন্দ্রশেখর' লিখিয়া মুসলমানসমাজে উহার প্রতিক্রিয়া কিরূপ হয় তাহা দেখিবার জন্য এই দীর্ঘ সাত বৎসর অপেক্ষা করিয়াছিলেন। প্রতিক্রিয়া সুবিধাজনক হয় নাই। তাই তিনি সাত বৎসর পরে হিন্দুর প্রকৃত কর্ম্মক্ষেত্র কিরূপ তাহা বুঝাইবার জন্য প্রথমে 'রাজসিংহ' লিখেন। 'রাজসিংহ' লিখিয়া কবি তৃপ্ত হন নাই। 'রাজসিংহ' পরে পরিবর্দ্ধিতাকারে প্রকাশিত হয়। ইহাই বঙ্কিমচন্দ্রের শেষ উপন্যাস। আমরাও ইহার আলোচনা শেষে করিব। 'রাজসিংহ' পশ্চিম প্রদেশীয় হিন্দু মুসলমানের ব্যাপার লইয়া রচিত। উহাতে বাঙ্গালী হিন্দুর প্রকৃত কর্ম্মক্ষেত্র দেখাইতে পারা যায় নাই। তাই উহার সঙ্গে সঙ্গে আসিল 'বন্দেমাতরম্' ও 'আনন্দমঠ।' আমরা যথাস্থানে ইহার আলোচনা করিব। 'আনন্দমঠ' এর পর আবার বহুদিন বঙ্কিমচন্দ্র অপেক্ষা করেন। পরিশেষে ইংরাজী ১৮৮৭ সালে 'প্রচার' মাসিক পত্রে বাঙ্গালী হিন্দু ও বাঙ্গালী মুসলমান সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের পূর্ণাঙ্গ অভিমত বহন করিয়া 'সীতারাম' উপন্যাস প্রকাশিত হইল।

[ক্রমশঃ

দুলালের স্বপ্ন

শ্রীরেবতীমোহন সেন

(৩)

খুব ভোরবেলা দু'টি তরুণী শিউলি গাছের নীচে বসে ঝ'রে-পড়া শিশিরে-ধোওয়া ফুল তুলে মালা গাঁথ্‌ছিল। ঐ গাছটা ছিল বহির্বাটির আঙ্গিনার একধারে তুলসী গাছের কাছে। একটা দোয়েল তখন ঘরের চালের উপর ব'সে শিশ্‌ দিচ্ছিল। মন্দিরা রোজ ফুলের মালা গেঁথে এই তুলসীতলায় পূজার অর্ঘ্য দিতো। মন্দিরাদের বাড়ীতে বেশি ফুলের গাছ ছিল না ব'লে তার বন্ধু অশোকা পাড়া থেকে ফুল কুড়িয়ে এনে তাকে দিতো। আজ কয়েক দিন যাবৎ মন্দিরার শিউলি গাছে যেন ফুলের বন্যা এসেচে, তাই ফুলের জন্ত অশোকাকে আর পাড়ায় পাড়ায় ঘুরতে হয় না। তবুও সে রোজই সকালে একবার মন্দিরাদের বাড়ী আসে ও তার সঙ্গে ব'সে গল্প করে ও মালা গাঁথে।

দু'টি মেয়েই সুশ্রী ও স্বাস্থ্যবতী, তবে মন্দিরার গায়ের রং অশোকার চেয়ে একটু বেশি ফরসা। মন্দিরার প্রকৃতির সরলতা ও কোমলতা যেমন তার মুখে-চোখে কথা-বার্ত্তায় প্রতিক্ষণ ফুটে বেরুতো, অশোকার মনের দৃঢ়তা এবং তেজস্বিতাও তেমনি তার উজ্জ্বল চোখ দু'টির ভিতর দিয়ে যেন ঠিক্‌রিয়ে পড়তো; কিন্তু সহসা কোনো অসংযত বাক্যে তা প্রকাশ পেত না।

অশোকার পিতা রঘুনাথ সামান্ত আয়বিশিষ্ট গ্রাম্য কবিরাজ। এক সময়ে এঁদের অবস্থা খুবই ভালো ছিল। অদৃষ্টের বিড়ম্বনায় পূর্ব্ব-গৌরব বহুকাল লুপ্ত হ'য়ে গেচে। শিশু বয়সে মাতৃহীনা হ'লে অশোকার এক বিধবা পিসিমা এসে তাকে মানুষ করেন। সেই পিসিমা এখনও বেঁচে আছেন এবং ভাইয়ের সংসারে থেকে সব দেখাশুনা করেন।

এ অঞ্চলের পল্লীগ্রামে স্ত্রী-শিক্ষার তেমন প্রচলন না থাকলেও রঘুনাথ তার পক্ষপাতী ছিলেন এবং তাঁর একমাত্র কন্যা অশোকাকে তিনি নিজেই প্রাথমিক শিক্ষা দিচ্ছিলেন। তারপর একদিন মন্দিরাদের বাড়ীতে গিয়ে যখন দেখ্‌লেন মন্দিরা তার দাদা দুলালের কাছে অঙ্ক, ইতিহাস ও ইংরেজী শিখ্‌চে, তখন তাঁর ইচ্ছা হ'ল, অশোকাও ঐরকম শিক্ষা লাভ করে। একটু ইতস্ততঃ ক'রে তিনি দুলালের কাছে তাঁর মনের কথাটি ব্যক্ত করলে দুলাল বল্‌লো, "আপনি সঙ্কোচ বোধ কচ্চেন কেন, মন্দিরার সঙ্গে ব'সে অশোকাও পড়বে, এতে আমার কোনো কষ্ট বা অতিরিক্ত শ্রম হবে না। তবে আমি যে বেশি কিছু শেখাতে পারবো এমন ভরসা করবেন না; কারণ, আমি নিজেই ছাত্র এবং আমার বিদ্যাও অতি সামান্ত।"

মন্দিরার সঙ্গে অশোকার পূর্ব্বাবধিই ভাব ছিল। এখন থেকে তাদের বন্ধুত্ব আরো গাঢ় হ'ল। অশোকার পড়াশুনায় যেমন যথেষ্ট আগ্রহ ছিল, তেমনই তার মেধাও ছিল চমৎকার, সুতরাং অপেক্ষাকৃত অল্প সময়েই সে বেশ অগ্রসর হ'তে পারলো। দুলাল তাকে ঠিক ছোট বোনটির মতোই মনে করতো এবং অশোকাও তাকে দুলালদা ব'লে ডাক্‌তো। দুলাল যখন গ্রামের স্কুল ছেড়ে সহরের কলেজে পড়তে গেল, তখন তাদের ধারাবাহিক পড়ায় বাধা পড়লো। কলেজ ছুটির সময় বাড়ী এলে আবার তাদের পড়ার সুযোগ ঘটতো। দুলাল তখন পড়ার সঙ্গে সঙ্গে নানা দেশের ইতিহাস ও গল্প ব'লে তাদের জ্ঞান-পিপাসা বাড়িয়ে দিতো এবং প্রতি ছুটিতে ভালো ভালো বই এনে তাদের উপহার দিতো। এবার অশোকার উপহার বই হ'ল "রাজস্থান"। এই বইখানা প'ড়ে তার মনের ভিতর একটা তুমুল আন্দোলনের সৃষ্টি হ'ল। রাজপুত পুরুষ ও রমণীদের অপূর্ব্ব বীরত্ব কাহিনী, তাঁদের অসামান্ত দেশ-প্রাণতা ও আত্মোৎসর্গ তাকে একেবারে বিহ্বল ক'রে রাখ্‌তো। অশোকা ভাবতো, বাঙ্গালী রমণী কি তাঁদের মতো হ'তে পারে না? সমগ্র ভারতের রমণী যদি ঐ আদর্শে অনুপ্রাণিত হ'তে পারতো তা হ'লে ভারতের ইতিহাস হয় তো সম্পূর্ণ বদ্‌লে যেতো, কিন্তু তা হ'ল না কেন? আবার পুরুষদের সম্বন্ধে সে ভাবতো, রাজপুতের শৌর্য্য-সাহস কি বাঙ্গালীর ভিতর নেই? তখনই দুলালের মূর্ত্তিখানা তার চোখের সাম্‌নে ভেসে উঠ্‌তো।

তার চিত্ত বল্‌তো, রাজপুতানায় জন্মগ্রহণ করলে এই দুলালই হয় তো রাণা প্রতাপসিংহ হ'তে পারতেন। এইরূপে অলক্ষ্যে অশোকার চিত্তে দুলালের মূর্ত্তি আসন পরিগ্রহ করতে লাগ্‌লো, দুলাল কিন্তু এর কিছুই জান্‌তো না, এমন কি সন্দেহও করতো না। তার কাছে মন্দিরা যেমন, অশোকাও ঠিক তেমনটি ছিল।

মালা গাঁথ্‌তে গাঁথ্‌তে মন্দিরা অশোকাকে বল্‌লো, "কাজটা ভালো হ'ল কিনা বুঝ্‌তে পাচ্চি না। দাদা যেরকম রেগে গেচেন, না জানি কি একটা কাণ্ড ক'রে বসেন।"

—"না বলে চুপ ক'রে থাক্‌লেই কি ভালো হ'তো?"

—"কিন্তু আমার যেন কেমন একটা অমঙ্গলের আশঙ্কা হচ্চে।"

—"তুই মিছিমিছি ভাবচিস্‌। দুলাল-দা বেশ ভেবে চিন্তেই কাজ করবেন।"

—"এক একবার মনে হয় আমরা নিজেরা প্রতিকারের ব্যবস্থা করতে পারলেই হয় তো ভালো হ'তো।"

—"নিশ্চয়, কিন্তু শুধু মনে করলেই তো প্রতিকার হয় না, ইচ্ছার সঙ্গে চাই শক্তি; সাহস ও কৌশল-বুদ্ধি। এগুলো আরো বেশি পরিমাণে চাই যেখানে অত্যাচারী ব্যক্তি হচ্চেন ধনী জমিদার সন্তান।"

—"লোকটার আস্পর্দ্ধা কতো, অজানা অচেনা একটি মেয়ের কাছে এরকম ভাবে আর উপহার পাঠাতে একটু তার লজ্জা বোধ হ'ল না?"

—"এসব লোকের আবার লজ্জা-সরম আছে না কি? এরা মনে করে, টাকা থাকলে যা-খুসি-তাই করতে পারা যায়। বোধ করি, ক'রেও আস্‌চে তা-ই, নইলে সাহস পেলে কি ক'রে?"

—"ধর্ম্ম যেন নেই আর কি। একদিন না একদিন এসব অন্যায় অধর্ম্মের জন্য শাস্তি পেতেই হবে।"

—"ঐ ভেবে চুপ ক'রে থাকি ব'লেই তো যত লাঞ্ছনা অত্যাচার এ রকম বেড়ে চ'লেচে। সময় সময় শাস্তি দেবার কাজটা আমাদের নিজেদের হাতে নেওয়া দরকার। ধর্ম্মই বলিস্‌ আর ঈশ্বরই বলিস্‌, আমরা যদি আমাদের যতটুকু করা উচিত তা না করি, তা হ'লে কেউ আমাদের রক্ষা করতে আসবে না।"

—"আমিও তো তা-ই বল্‌চি—আমাদের আত্মরক্ষার উপায় নিজেদেরই ক'রে নিতে হবে। দাদা কাছে না থাক্‌লে যে কিরকম অসহায় হ'য়ে পড়ি, ভাবতে লজ্জা বোধ হয়।"

—"দুলাল-দা কি একাই বেরিয়ে গেচেন, না সঙ্গে আর কেউ গেচে?"

—"নিতাই-দাকে সঙ্গে নিতে বলেছিলাম কিন্তু দাদা তা শুনলেন না, বল্‌লেন শুধু তাকে সাবধান ক'রে দিয়ে আস্‌বো, তাতে আবার সঙ্গে লোক নিতে হবে কেন।"

অশোকার মালা গাঁথা তখন শেষ হয়েচে। মালাটি মন্দিরার পার্শ্বস্থিত ঝাঁপিতে রেখে সে উঠে দাঁড়ালো ও তারপর বল্‌লো, "আমি এখন যাই—খবরটা জানাস্‌

অশোকার একটা কুকুর ছিল, নাম "বাঘা", যদিও তার চেহারায় বাঘের সহিত মোটেই সাদৃশ্য ছিল না—তবে তার কর্ত্রীর হুকুম পেলে সে বাঘের চেয়েও হিংস্র আকার ধারণ করতে পারতো। বাঘা ছিল অশোকার বাইরের সহচর তাকে ছেড়ে অশোকা কোথাও বড় যেত না এবং অশোকাকে বাড়ীর বাইরে যেতে দেখ্‌লেই তার সঙ্গ নিতো এবং তারই সঙ্গে বাড়ী ফিরতো। মন্দিরাদের বাড়ী এসে অশোকা যখন মালা গাঁথায় ব্যস্ত ছিল, বাঘা তখন অদূরে ব'সে সুমুখের দু'পায়ের উপর তার মুখটি রেখে অর্দ্ধ-নিমীলিত চক্ষে যেন ঘুমুচ্ছিল কিন্তু আসলে সে ঘুমোয় নি—ঐ ভাবে থেকে সে তার কর্ত্রীর উপর দৃষ্টি রাখার সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বস্ত গার্ডের মতো পাহারায় নিযুক্ত ছিল। অশোকার উঠ্‌বার কয়েক মুহূর্ত্ত পূর্ব্বে সে হঠাৎ উঠে নিকটবর্ত্তী আম-বাগানের দিকে ছুটে গিয়েছিল। অশোকা তা দেখ্‌তে পায় নি, মন্দিরাও লক্ষ্য ক'রে নি। বাঘাকে না দেখে অশোকা তার নাম ধ'রে ডাক্‌লো। বাগানের ভিতর থেকে বাঘা দু'বার 'ঘেউ' 'ঘেউ' শব্দ ক'রে তার উত্তর জানালো, কিন্তু এলো না। অশোকা একটু বিচলিত হ'য়ে বল্‌লো, "তাই তো, বাঘার না আসা তো ভাল লক্ষণ নয়। ব্যাপারটা কি দেখা দরকার।"

আম-বাগানটা ছিল মন্দিরাদেরই বাড়ীর অন্তর্ভুক্ত। বাগানের পাশ দিয়েই গিয়েচে গ্রাম্য রাস্তা এবং এই বাড়ীতে

আনবার এটিই একমাত্র পথ। মন্দিরা ও অশোকা বাগানের দিকে খানিকটা এগিয়ে গিয়ে বাঘাকে আবার আহ্বান করলো। রাস্তা থেকে প্রায় ত্রিশ গজ দূরে বাগানের ভিতর থেকে 'ঘেউ' শব্দ এলো। ঐ শব্দ লক্ষ্য ক'রে চেয়ে তারা দেখ্‌লো, একটা বড় আমগাছের গোড়ার কাছে বাঘা যেন দু'পায়ে দাঁড়িয়ে আছে। কিছুই বুঝ্‌তে না পেরে অশোকা আর একটু গেল এবং একটু পরেই বিস্ময়ের সহিত ব'লে উঠলো :—"ও মা, বাঘা যে একটা লোক পাক্‌ড়াও ক'রেচে, —লোকটা চোর নয় তো ?"

অশোকার সাড়া পেয়ে বাঘা যেন ক্ষেপে উঠলো ও লোকটার পরণের কাপড় আঁচড়ে ছিঁড়ে দিতে লাগলো। আক্রান্ত লোকটা তখন নিরুপায় দেখে চীৎকার ক'রে ব'লে উঠলো,—"ও গো, তোমাদের কুকুর ডেকে নাও—জল্‌দি ডাকো। বাবা একেবারে খুনী কুকুর—এই মেরে ফেল্লে বুঝি—ওগো, ডাকো, ডাকো, কুকুরটাকে ডেকে নাও।"

অশোকার ইঙ্গিতে বাঘা তার আসামীকে ছেড়ে দিলো বটে, কিন্তু তার সঙ্গ ছাড়লো না—ঘেউ ঘেউ ক'রে তার চারদিকে ঘুরতে লাগলো। লোকটা তখন অশোকাকে লক্ষ্য ক'রে বল্‌লো,

"তোমরা আচ্ছা লোক তো, ভদ্রলোকের উপর কুকুর লেলিয়ে দাও ?"

—"ভদ্রলোক কে ? অপরের বাগানে ঢুকে যে চোরের মতো লুকিয়ে থাকে সে আবার ভদ্রলোক ? এখানে এই বাগানের ভেতর কি করা হচ্ছিল ?"

অশোকার তেজোদীপ্ত চেহারা, সম্পূর্ণ ভীতিবর্জ্জিত বাক্য ও আক্রমণোদ্যত কুকুরের একান্ত সান্নিধ্য—এই তিনের সম্মিলনে লোকটার পৌরুষ ভাব দ'মে গেল। আম্‌তা আম্‌তা ক'রে সে বল্‌লো,

—"মাছ ধরবার জন্য বোল্‌তার চাক খুঁজছিলাম।"

—"বোল্‌তা আবার কবে থেকে আম-বাগানে চাক তৈরি শুরু ক'রেচে ? বদ্‌মায়েসি করবার আর জায়গা পেলে না ? সত্যি কথা না বল্‌লে এই বাঘা এক্ষুনি টুঁটি কামড়ে ধরবে।"

বাঘা আবার তর্জ্জন করে উঠলো এবং সেই মুহূর্ত্তেই দুলাল এসে হাজির হ'ল। তাকে দেখেই লোকটা থতমত খেয়ে পালাবার মতলবে ছুট দিলো কিন্তু পালাতে পারলো না। দশ গজ না যেতেই বাঘা তার কাপড় কামড়ে ধরলো এবং সঙ্গে সঙ্গে দুলালের বজ্রহাত তার কাঁধের উপর পড়লো। ঘাড়ে একটা ঝাঁকানি দিয়ে দুলাল বল্‌লো,

পালাচ্চো কেন ? তুমি যে প্যারীলালের চেলা, তা তুমি না বল্‌লেও আমার জান্‌তে বাকী নেই, কি করা হচ্ছিল ?"

লোকটা কোনো উত্তর দিল না। অশোকা বল্‌লো, "উনি নাকি বোল্‌তার চাক খুঁজতে বাগানে ঢুকেছিলেন।"

—"বোল্‌তার চাক ? চমৎকার অজুহাত, কিন্তু এখানে তা চললো না। প্যারীলালের টাকা খেয়ে যতো দুষ্কার্য্য ক'রচো তার হিসেবের আমার এখন প্রয়োজন নেই। তোমায় চিনে রাখলুম। যদি ভালো চাও, এ পথ আর মাড়িও না। তোমার মুনিবটিকে আজ শুধু জুতো-পেটা ক'রে ছেড়েছি, বাড়াবাড়ি করলে ভবিষ্যতের ব্যবস্থা এত সহজ বা সামান্য হবে না, আর তোমার মতো কোনো কুকুরকেই তখন ছাড়বো না।"

গলা ধাক্কা খেয়ে লোকটা পাঁচহাত দূরে ছিটকে পড়লো। তারপর গা-ঝাড়া দিয়ে উঠে নিঃশব্দে চ'লে গেল। বাঘা তার অনুসরণে যাচ্ছিল কিন্তু দুলাল ও অশোকার ইঙ্গিতে থেমে গেল।

দুলাল তখন মন্দিরা ও অশোকাকে বল্‌লো,

—"এখন থেকে তোমরা খুব সাবধানে থাক্‌বে। প্যারীলালকে রাস্তায়ই পেয়েছিলাম। ভদ্র বংশের ছেলে যে এতো নীচু হ'তে পারে জান্‌তাম না। সাবধান করতে গিয়ে অনেক অন্যায় অশ্লীল কথা শুন্‌তে হ'ল। সইতে পারলাম না ব'লে তাকে জুতো-পেটা ক'রে ছেড়েচি। এই লোকটা হচ্চে তার সকল দুষ্কার্য্যের সাহায্যকারী, নাম গণেশ

মন্দিরা একটু ভীত হ'য়ে বল্‌লো, "দাদা, তুমি যা করেচো হয় তো ভালোই ক'রেচো, কিন্তু আমার ভয় হচ্চে, এরা বড় লোক, এই অপমানের প্রতিশোধ না নিয়ে ছাড়বে না।"

—"প্রতিশোধ নেয় তো নেবে। তা ব'লে আমি বেঁচে থাকতে তোদের অপমান করবে, আর আমি তা চুপ ক'রে স'য়ে যাবো, তা কিছুতেই হবে না।"

অশোকা বল্লো, "এই তো পুরুষের মতো কথা। তবে আমার মনে হয়, এই লোকটাকে এম্নি ছেড়ে না দিয়ে তাকে অন্ততঃ বুঝিয়ে দিলে হ'তো যে বোল্তার 'হুল' নামে একটা মোলায়েম জিনিষ আছে।"

মন্দিরা হেসে বল্লো, "তোর বাবা বোধকরি তা বোঝাতে মোটেই ত্রুটি করে নি।"

—"তুই কি যে বলিস্, বাবার আঁচড়-কামড়ে কি আর বোল্তার 'হুল' আছে? ঐ 'হুল' রয়েছে মেয়েদের পায়ের অবস্থ

(৪)

মন্দিরার আশঙ্কা অমূলক ছিল না। দুলালের হাতে লাঞ্ছিত হ'য়ে প্যারীলাল প্রতিশোধ নেবার জন্ম উঠে প'ড়ে লেগে গেল।

প্যারীলাল ছিল স্থানীয় জমিদার মতিলাল মুখোপাধ্যায়ের কনিষ্ঠ ভাই, বয়স প্রায় পঁয়ত্রিশ বছর। লেখা-পড়া শিক্ষার জন্ম তাকে রাখা হয়েছিল কল্‌কাতায় কিন্তু অল্পকাল মধ্যেই অনেক ইয়ার-বন্ধু জুটে তার মাথাটি খেয়ে বস্‌লো—ফলে চরিত্রটি একেবারেই গেল এবং লেখা-পড়াও বিশেষ কিছু হ'ল না। কিছুদিন পর বৃদ্ধ পিতা পরলোক গমন করলেন। তখন জমিদারীর অর্দ্ধেকের মালিক হ'য়ে প্যারীলাল আরো দুষ্ক্রিয়াসক্ত হ'য়ে পড়লো।

কল্‌কাতার শ্যামবাজারে তাদের একখানা বাড়ী ছিল। প্যারীলাল এ বাড়ীতেই থাক্‌তো। দেশের বাড়ীতে তার যাতায়াত বড় ছিল না, যদিও তার স্ত্রী থাক্‌তেন দেশের বাড়ীতেই। অল্প কয়েক বছরের মধ্যেই প্যারীলাল ঋণ-গ্রস্ত হ'য়ে পড়লো এবং ঐ ঋণ ক্রমে বেড়েই চল্‌লো। দেনার দায়ে শ্যামবাজারের বাড়ীখানা বাঁধা পড়তে বেশি দেরি হ'ল না। টাকার জন্ম প্যারীলাল তখন ঘোড়-দৌড় খেলা ও নানা প্রকার দুর্নীতিপূর্ণ ব্যাপারে জড়িত হ'য়ে পড়লো কিন্তু তাতেও যখন তার টাকার সমস্যা সম্পূর্ণ মিটলো না, তখন তার জমিদারির অংশ বিক্রয় করা ভিন্ন অন্ম পন্থা রইলো না। প্রধানতঃ এই সব ব্যবস্থার জন্মই প্যারীলালকে তখন বাড়ী আস্‌তে হ'য়েছে এবং সঙ্গে এসেছে তার সহচর ও পরামর্শদাতা গণেশ। এদের কীর্ত্তি-কাহিনী অনেকেই অল্প বিস্তর জান্‌তো এবং দু'একটি বিবরণ দুলালের কাণেও অনেক পূর্ব্বে পৌঁছেছিল।

মন্দিরার চিঠি পাবার পর বাড়ী এসে প্যারীলালের প্রেরিত চিঠি ও উপহারের কথা শুনে দুলাল অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হ'লেও রাগের মাথায় হঠাৎ কিছু করলো না। সে প্রথমতঃ প্যারীলালের গতিবিধি গোপনে পর্য্যবেক্ষণ ক'রে গণেশকে চিনে নিলো ও জান্‌তে পারলো, এরা কয়েক দিন যাবৎ খুব ভোরের বেলা বেড়াতে বেরিয়ে যায়। আজও তারা এক সঙ্গেই বেরিয়েছিল, তবে গণেশকে দুলালের বাড়ীর দিকে পাঠিয়ে দিয়ে প্যারীলাল নিজে একটু দূরে অপেক্ষা কচ্ছিল। প্যারীলালকে রাস্তায় পেয়ে দুলাল তাকে তার আচরণ সংশোধন করতে বলে। প্যারীলাল তা গ্রাহ্য না ক'রে দুলালকে তার দুঃসাহসের জন্ম উপহাস করে ও অনেক জঘন্ম ইঙ্গিত করে। প্যারীলালের ধারণা ছিল, দুলালের ন্যায় দরিদ্র ব্যক্তি স্থানীয় জমিদারকে ভয় তো করবেই, এমন কি তার মন-যোগাতে পারলে নিজেকে নিশ্চয়ই ধন্ম বোধ করবে। সুতরাং দুলাল যখন ঐ রকম আচরণের পরিবর্ত্তে প্যারীলালের গালে হঠাৎ এক চড় বসিয়ে দিলো ও এক লাথিতে তাকে মাটিতে ফেলে জুতো-পেটা করতে লাগলো, তখন সে একেবারে নির্ব্বাক্ হ'য়ে গেল।

দুলালের হাত থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে প্যারীলাল বাড়ীর দিকে ফিরে যাচ্ছিল, এমন সময় গণেশ এসে তার লাঞ্ছনার কথা বল্‌লো। উভয়েই পরামর্শ ক'রে স্থির করলো, দুলালকে জব্দ করতেই হবে এবং কি ভাবে তা করতে হবে গণেশ তার সহজ পন্থা বাৎলে দিলো।

ষড়যন্ত্রের ফল ফল্‌তে বিলম্ব হ'লনা। পরের দিনই সিপাহী—চৌকিদার নিয়ে থানার দারোগা গ্রামে উপস্থিত হ'ল ও জমিদার বাড়ীর জন কয়েক দারোয়ান ও কর্ম্মচারীর জবানবন্দী লিখে নিয়ে দুলালের বাড়ী ঘেরাও ক'রলো। তারপর ঘর-তালাসির ফলে দুলালের শোবার ঘরের ভিতর জানালার পাশে ঝুলানো একটা জামার পকেট থেকে তিনখানা দশটাকার নোট ও একগাছা রূপোর হাঁসুলি বেরিয়ে পড়লো। দারোয়ান রামসেবক সিং তখনই সেনাক্ত ক'রে বল্‌লো, আগের রাত্রিতে এই কয়েকটা জিনিষই তার ঘর থেকে চুরি গিয়েছিল। বরকন্দাজ গোকুল সিং সাক্ষ্য দিলো,

সে যখন আগের দিন রাত্রিতে বাইরে বসে আটার রোটি তৈরি কচ্ছিল, তখন সে এই আসামীকে রামসেবক সিংএর ঘরের দিকে যেতে দেখেছিল। দুলালের অপরাধ প্রমাণ পক্ষে এই প্রকার অনেক সাক্ষী জমিদার বাড়ীর তরফ থেকে হাজির হ'য়ে জবানবন্দী দিয়ে গেল। এতো সব প্রমাণের বিরুদ্ধে দুলালের মৌখিক প্রতিবাদ টিক্‌লো না। দারোগা বাবুর হুকুমে দু'জন সিপাহী তখনই দুলালের হাতে হাত-কড়া পরিয়ে দিলো ও আবার খানা-তল্লাসি করবার ছলে ঘরের যাবতীয় জিনিষ পত্র বাক্স-তোরঙ্গ ভেঙ্গে চুরে নষ্ট ক'রে দারোগা বাবু আসামী নিয়ে চ'লে গেল।

যথাসময়ে বিচারে দুলালের তিনমাসের সশ্রম কারাদণ্ড হ'ল। অশোকার পিতা দুলালের মুক্তির জন্ম উকিল নিযুক্ত ক'রে যথাসম্ভব তদ্বির ক'রেছিলেন কিন্তু কোনো ফল হ'ল না। জমিদারের ভয়ে ও টাকার মহিমায় ফরিয়াদির সঙ্গীরা অকাতরে হলফ ক'রে মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়ে গেল। প্যারীলালের অপমানের প্রতিশোধ পূর্ণমাত্রায় নেওয়া হ'ল। গণেশ কেমন কৌশলে সকলের অগোচরে দুলালের ঘরে ঢুকে তার জামার পকেটে তথা-কথিত চোরাইমাল রেখে দিয়েছিল, তা এই মাণিকজোড় ছাড়া অপর কেউ জান্‌তে না পারলেও, দুলালের এই নিগ্রহ যে একটা ষড়যন্ত্রের ফল এ সম্বন্ধে কারো সন্দেহ রইলো না।

এই ব্যাপারে মন্দিরা ও তার মার অবস্থা একান্ত সহায়শূন্য ও বিপন্ন হ'য়ে পড়লো। জমিদারের অত্যাচারের ভয়ে গ্রামের কেউ তাদের সাহায্যের জন্ম দাঁড়াতে সাহসী হ'ল না। দুলালের পক্ষে মোকর্দ্দমার তদ্বির করার অপরাধে অশোকার পিতাকে ডেকে এনে প্যারীলাল একদিন যথেষ্ট অপমান করলো। ঐ ভদ্রলোক তাতে ভয় পেলেও অশোকা ভীত হ'ল না—সে সর্ব্বদা মন্দিরাদের খোঁজ-খবর করতো এবং শক্তি-সাধ্য সাহায্য করতে ত্রুটি ক'রতো না।

চুরির অপরাধে জেল হবার ফলে দুলালের চাকরিটি গেল। এখন কয়েক বিঘা জমির ফসল ও খাজনায় আয় ছাড়া মন্দিরাদের গ্রাসাচ্ছাদনের জন্ম কোনো সম্বল আর রইলো না। এই দুঃসময়ে দরিদ্র নিতাই বাগদি ও তার মা সহায় না হ'লে এদের লাঞ্ছনার সীমা থাকতো না। নিতাই লাঠি হাতে বাড়ী পাহারা দিতো এবং তার মা ঢেঁকিতে ধান ভেনে তাঁদের চালের ব্যবস্থা করতো।

মন্দিরার মা এই অভাবনীয় ব্যাপারে শোকে দুঃখে হ'য়ে পড়লেন, অশোকার পিতা ভয়ে ভয়ে এসে তাঁর চিকিৎসা করতে লাগলেন। মন্দিরা ও অশোকা উভয়ে পরিচর্য্যার ভার নিলো। দু'টি মাস এইভাবে কেটে গেল কিন্তু মনোরমার অবস্থা উত্তরোত্তর খারাপের দিকেই যেতে লাগলো।

জননীর রোগ-মুক্তির কামনায় মন্দিরা কতো মানত, কতো পূজো, উপবাস করলো। মানসিক সুস্থতার জন্ম মাকে সে কতো ভাবে বোঝাতো, কিন্তু মা যখন দুলালের দুর্ভাগ্যের কথা তুলে চোখের জলে বুক ভাসাতেন, মন্দিরা তখন মাকে সান্ত্বনা দেবার ভাষা খুঁজে পেতো না। অশোকার সযত্ন সেবায় মনোরমা এতো মুগ্ধ হ'য়েছিলেন যে, একদিন তিনি মন্দিরাকে ব'লে ফেল্‌লেন, অশোকার মতো মেয়েকে বউ ক'রে ঘরে আন্‌তে পারলে তিনি নিশ্চিন্তে মরতে পারতেন, কিন্তু তার বাবা জেল-খাটা লোকের সঙ্গে তাঁর মেয়ের বিয়ে দেবেন? ব'লেই ঝর ঝর ক'রে চোখের জল ফেলে গণ্ড ভাসিয়ে দিলেন। মন্দিরা সান্ত্বনা দিয়ে বল্‌লো, "মা, তুমি মিছিমিছি দুঃখ কচ্চ। অশোকার মতো ভালো মেয়ে খুব কমই আছে—তাকে 'বৌ-দি' ভাবে পেলে আমার যে কি আনন্দ হবে তা বুঝতেই পারো। আমরা চাইলে যে তার বাবা আপত্তি করবেন, মনে হয় না দাদার নির্দ্দোষিতা সম্বন্ধে তাঁদের সম্পূর্ণ বিশ্বাস আছে। তুমি সেরে ওঠো, দেখবে সব ঠিক হ'য়ে যাবে।"

মাকে ভালো রাখবার জন্ম মন্দিরার চেষ্টার ত্রুটি ছিল না। সাবিত্রী-সত্যবানের উপাখ্যান শুন্‌তে মনোরমা খুব ভালোবাসতেন। মন্দিরা অবসর পেলেই তা পাঠ ক'রে মাকে শোনাতো। অশোকাও এই শ্রেণীর গল্প ব'লে তাঁর চিত্ত-বিনোদনের চেষ্টা করতো। এসব সত্ত্বেও মনোরমার দেহ ভেঙে পড়তে লাগলো।

একদিন সন্ধ্যাসময় কব্‌রেজমশা'য়কে ডাকবার জন্ম নিতাই বেরিয়ে যাবার পর মন্দিরা বহির্ব্বাটির তুলসী-তলায় ধুনো-প্রদীপ দিয়ে প্রণাম ক'রে মায়ের আরোগ্য প্রার্থনা কচ্ছিল, এমনি সময় দু'টি লোক এসে অকস্মাৎ তার মুখ চেপে ধরলো এবং কোনো শব্দ করবার পূর্ব্বেই মুখের ভিতর একখানা রুমাল ঢুকিয়ে দিয়ে অন্য একখানা রুমাল দ্বারা মুখ বেঁধে তাকে নিঃশব্দে তুলে নিয়ে গেল। কি যে ব্যাপার হ'ল বাড়ীর কেউ জান্‌তে পারলো না।

[ক্রমশঃ

গীতা

শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় এম, এল, এ, (কেন্দ্রীয়)

[উপক্রমণিকা]

ন মে বিদুঃ সুরগণাঃ প্রভবং ন মহর্ষয়ঃ
অহমাদির্হি দেবানাং মহর্ষীণাঞ্চ সর্ব্বশঃ

আমাকে সুরগণ জানে না, মহর্ষিগণও আমার তত্ত্ব জানে না, আমি দেবতাদের আদি এবং মহর্ষীদেরও সর্ব্বতোভাবে আমিই আদি।

এই কথা জানিয়া সৃষ্টিতত্ত্ব সম্বন্ধে কোন প্রকার বলিবার প্রচেষ্টা ব্যর্থ হইতে বাধ্য। যখন স্রষ্টা ভিন্ন সৃষ্টির আদি সম্বন্ধে আর কাহারও জানা সম্ভব নয়, তখন সৃষ্টির আদি নির্ণয়ের চেষ্টা বৃথা। অবশ্য ঋষিরা বহুভাবে সৃষ্টি তত্ত্ব সম্বন্ধে গবেষণা করিয়া নির্দ্দেশ দিয়াছেন এবং জ্ঞান বিজ্ঞান সম্মত মতের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন সত্য, কিন্তু সে গবেষণা ও নির্ণয় বর্ত্তমান যুগে সহজস্বীকার্য্য নহে, কারণ, ইহা বিজ্ঞানাগারের যন্ত্রাদি দ্বারা প্রমাণিত হয় না। যম নিয়মাদি দ্বারা সত্যের উপলব্ধি বিষয়ে বর্ত্তমান যুগ অবিশ্বাসী বা শ্রদ্ধাহীন। প্রত্যক্ষ প্রমাণ ভিন্ন কিছুই স্বীকার করিতে চাহে না। শ্রুতি স্মৃতি পুরাণে আস্থাহীন, বেদবাক্যে শ্রদ্ধাহীন। সুতরাং সৃষ্টিতত্ত্বে বর্ত্তমান যুগের বলিবার মত না আছে বিদ্যাবুদ্ধি, না আছে শ্রদ্ধা, বিশ্বাস, একেবারে জ্ঞানহীন। মানুষ নিজের বুদ্ধি, বিদ্যা, শক্তির দ্বারা যতটুকু বুঝিতে পারে ততটুকু বিশ্বাস করে। আপনার কার্য্যের কারণ কি তাহা জানিয়া এই সৃষ্টির কারণ কি এবং যিনি সৃষ্টি করিয়াছেন তাঁহার স্বরূপ কি জানিবার চেষ্টা করে। দুঃখের উদ্ভবের জন্য কেহ যে কার্য্য করে না ইহা সত্য। আনন্দের জন্যই জগতের সৃষ্টি, তাহা যদি না হইত তাহা হইলে সৃষ্টিই হইত না। সত্যই উপনিষদ বলিয়াছেন—

"আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে,
আনন্দেন জাতানি জীবন্তি
আনন্দং প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি"

স্রষ্টার নিজের আনন্দের অভিব্যক্তিই এই সৃষ্টি। শাস্ত্র এই কথাই বলিয়াছে। বিশ্ব-চরাচর এই আনন্দ হইতে জাত। সুতরাং সংসার আনন্দের স্থানই হওয়া সঙ্গত। কিন্তু এতাবৎকাল সংসারকে সকলেই দুঃখের স্থান বলিয়া আসিতেছেন এবং এই সংসার হইতে অর্থাৎ জন্ম, জরা, মরণ হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিবার জন্যই সমস্ত জীবনের ধর্ম্ম-কর্ম্মের সাধনার ব্যবস্থা করিয়াছেন। মুক্তি মোক্ষ করিয়া বহুজ্ঞানী মানব জগতে মুক্তি ও মোক্ষের পথ নির্দ্দেশ করিয়াছেন এবং সেই পথ নির্দ্দেশের বিভিন্ন মতানুসারে নানা মতবাদ সৃষ্ট হইয়াছে।

জগতে যে প্রতীয়মান দুঃখ অনেক তাহাও ত' অস্বীকার করা যায় না। জননী জঠরে আবদ্ধ হওয়া মাত্র যে দুঃখের আরম্ভ, মৃত্যুতে সে দুঃখের অবসান। জীব মাত্রই দুঃখের ভিতর দিয়াই জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করে, ইহাও ত' প্রত্যক্ষ। সেই জন্যই বোধ হয় বিশ্বমণ্ডলী এই দুঃখের হাত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন; নানা পন্থা আবিষ্কার করিয়াছেন। নানা মুনির নানা মত হওয়ায় শাস্ত্র-তর্ক এত জটিল হইয়া পড়িয়াছে যে, মুক্তিলাভ করিতে যাইয়া মানবসমাজ নানা মতবাদের মধ্যে পড়িয়া বিপর্য্যস্ত হইয়াছে, বিভ্রান্ত হইয়াছে, দুঃখের নিবৃত্তি ত' হইলই না—সংস্কারের বেড়াজাল বিস্তৃত হইল।

মানবসমাজকে এই বিপন্ন অবস্থা হইতে উদ্ধার করিতে তথা মানবের সমূহ কল্যাণ সাধনের জন্যই মনে হয় শ্রীকৃষ্ণ ভগবান্ স্রষ্টা ও সৃষ্টের সম্বন্ধ নির্ণয় করিয়া মানবের পথ ও পাথের নির্দ্ধারণ করিয়াছেন—"গীতায়"। শ্রীকৃষ্ণ ভগবান্ ধর্ম্মক্ষেত্রে যুদ্ধক্ষেত্রে মানবকে তার জীবনসঙ্গীত শুনাইয়াছেন। সেই জীবনসঙ্গীতই শ্রীশ্রীব্যাসদেব রচনা করিয়া মানব-সমাজের কল্যাণ বিধানে গীতাকারে দান করিয়াছেন। তাই গীতার মঙ্গলাচরণে দেখিতে পাই,

পারাশর্য্যবচঃ সরোজমমলং গীতার্থগন্ধোৎকটং
নানাখ্যানককেশরং হরিকথাসম্বোধনাবোধিতম্
লোকে সজ্জনষট্‌পদৈরহরহঃ পেপীয়মানং মুদা
ভূয়াদ্ভারতপঙ্কজং কলিমলপ্রধ্বংসি নঃ শ্রেয়সে॥

সর্ব্বোপনিষদো গাবো দোগ্ধা গোপালনন্দনঃ।
পার্থো বৎসঃ সুধীর্ভোক্তা দুগ্ধং গীতামৃতং মহৎ।

উপনিষদ্ পরমাত্মা ও জীবাত্মার সম্বন্ধ নির্ণয় করিয়া দৃশ্যমান জগতের সহিত ভগবানের বা পুরুষ-প্রকৃতির সম্বন্ধ নির্ণয় করিয়াছে। সেই উপনিষদরূপ গাভীকে দোহন করিয়া স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ ভগবান্ দুগ্ধামৃত দান করিয়াছেন, পার্থই সেই গাভীর বৎসস্বরূপ—ভোক্তা বুদ্ধিমান্ সুধীজন।

তাই বলিতে চাই "গীতাই" মানবজীবনের "মহাসঙ্গীত"। জীবনসংগ্রাম অহরহঃই চলিতেছে, মনের মধ্যে অনন্ত দ্বন্দ্ব চলিতেছে অবিশ্রান্ত। এ দ্বন্দ্ব না মিটিলে মানুষের শান্তি হয় না। শান্তিই মানবের কাম্য, সেই শান্তি পাইবার পথে মোহবশে শান্তি লাভের উপকরণ আহরণেই ব্যস্ত হইয়া পড়ে। চাহিয়া বসে যশঃ, মান, রূপ, বিত্ত। সে মনে করে, বোধ হয় রূপই কাম্য, কিন্তু রূপেরও অন্ত নাই, সুতরাং কামনারও অন্ত থাকে না—নিজের রূপের অপেক্ষা অপর রূপবান্‌কে দেখিয়া তার কামনার ভাবনা তীব্র হইতে তীব্রতর হয়। সেই প্রকারই অর্থের কামনা, যশের কামনা, পদের কামনা এমনই বৃদ্ধি পাইতে থাকেই। সুতরাং তাহার কল্পিত শান্তির উপকরণগুলির সংগ্রহে তাহার জীবন শান্তিহীন হইয়া পড়ে এবং শেষে ত্রাহি ত্রাহি করে। প্রকৃত যাহা লাভ করিলে আর লভ্য কিছু থাকে না—তাহা লাভ করিবার প্রবৃত্তি ইতিমধ্যে অদৃশ্য হইয়া যায়। তখনই বলিতে থাকে, দুঃখ হইতে পরিত্রাণ কর। দুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তিই সুখ। এই চিন্তা করিয়া বুদ্ধদেব কামনা-বাসনার নির্ব্বাণের পথ নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন।

কিন্তু তাহা ত সম্ভবপর হয় নাই। সমস্ত কর্ম্মের উৎসই আনন্দের বাসনা। এই উৎসটি না থাকিলে সৃষ্টি হয় না। "একোহহং বহু স্যাম"—এক আমি বহু হইব, এই বাসনাই সৃষ্টি কর্ম্মের মূল—ইহার ফলই আনন্দ। তাই গীতায় শ্রীকৃষ্ণ ভগবান্ কামনা বাসনা ত্যাগ করিতে উপদেশ দেন নাই। স্পষ্টই শ্রীকৃষ্ণ ভগবান্ অর্জ্জুনকে বলিতেছেন, "তস্মাৎ যশো লভস্ব জিত্বা শত্রূন্ ভুংক্ষ্ব রাজ্যং সমৃদ্ধম্।" সুতরাং তুমি উঠ, যশলাভ কর, শত্রু জয় করিয়া সমৃদ্ধ রাজ্য ভোগ কর।

কাম্য শান্তি, গীতায় এই কথাই বার বার বলা হইয়াছে। মানুষ চাহে ত তাই, শান্তি লাভের উপায়ও গীতায় নির্দ্দেশ করিয়াছেন শ্রীকৃষ্ণ ভগবান্ যুবক অর্জ্জুনকে উপলক্ষ্য করিয়া। সেই উপদেশ মানবসমাজ শ্রদ্ধার সহিত স্বীকার করিলে নিশ্চয় শান্তি লাভ করিবে। শ্রদ্ধাহীন সে জ্ঞান লাভ করিতে পারে না।

উপদেশ কে কাহাকে দিতে পারে? উপদেশ গুরু দিতে পারেন শিষ্যকে, জ্ঞানী দিতে পারেন জিজ্ঞাসুকে, সখাকে দিতে পারে সখা, বন্ধুকে দিতে পারে বন্ধু।

অর্জ্জুন যুদ্ধক্ষেত্রে আসিয়া বহু আত্মীয়-স্বজনকে বধ করিয়া তাহাদের শোণিতে হস্ত কলুষিত এবং পদধৌত করিয়া রাজ সিংহাসনে বসিতে হইবার আশঙ্কায় চঞ্চল হইয়াছেন। স্বজন-বধ জনিত পাপ ভয়ে ভীত অর্জ্জুন যুদ্ধ হইতে বিরত হইতে ব্যস্ত। রাজ্য, সুখ ভোগ করিবেন কাহাকে লইয়া। যাহাদের জন্য রাজ্য, তাহারাই যদি বিনিষ্ট হয়, তাহা হইলে কাহার জন্য রাজ্য। গুরুহত্যা, আত্মীয়হত্যা, নারী দুষ্টা, বর্ণসঙ্করদোষ জন্মাইবে—ইত্যাদি কত প্রকার দোষের ও পাপের ভীতি অর্জ্জুনকে গ্রাস করিল, এমন কি চিরতরে নরকে বাস করিবার ভয়ও হইয়াছে। সুতরাং অর্জ্জুন কোনক্রমেই এ যুদ্ধ করিবেন না বলিয়া—

কার্পণ্যদোষোপহতস্বভাবঃ পৃচ্ছামি ত্বাং ধর্ম্মসংমূঢ়চেতাঃ।
যচ্ছ্রেয়ঃ স্যাৎ নিশ্চিতং ব্রূহি তন্মে শিষ্যস্তেহহং শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নম্।

এই অবস্থায় গীতামৃতধারা জগতের কল্যাণার্থে জগতে নামিয়াছে। যাঁহারা জগতে আনন্দ লাভ করিয়া কর্ম্ম করিতে চাহেন, তাঁহাদের এ অমৃতধারায় স্নান এবং এই সুধা পান করিতেই হইবে। এই অমৃতের আস্বাদ ব্যতীত মানব-সমাজের শান্তিলাভের উপায় নাই। বর্ত্তমান ভারতের কল্যাণ এই গীতামৃত পানেই নিহিত। গীতা কণ্ঠস্থ করিয়া পাণ্ডিত্য দেখাইলে চলিবে না—গীতা অভ্যাস করিতে হইবে। জীবনকে গীতার ছন্দে বাঁধিতে হইবে

বন্ধন-মুক্তি

শ্রীকালীপ্রসন্ন দাশ

(৭)

"দিদিমা !"

"এই যে উর্মি, আয় দিদি ! কেন, আজ পড়তে যাস নি ?"

"কলেজ আজ ছুটী আছে। ভাবলাম, যাই একটিবার দিদিমার ওখানে, গল্প-সল্প ক'রব। শেষে পাতের দু'টি পেসাদ পেয়ে আসব। তা সব খেয়ে ফেলনি ত ? দুটি রেখেছ ত আমার তরে ?"

ভাগীরথী কহিলেন, "ভাত ত রাখি দু'টি ক'রে রোজই। তোর বাবা এসে খায়, ছেলে পিলেরাও এক একদিন এসে খেতে চায়। ঐ অরুণও এসে এক একদিন খেতে বসে। বলে, দিদিমা, তোমার পেসাদ বড় ভাল লাগে। কিই বা রাঁধি আমি ? তবে ওদের নাকি বামুনে রাঁধে—"

"তা আজকে যা রেঁধেছ আমাকে দেবে কিন্তু ? আমি ত' রোজ এসে খাইনে।"

"কপাল ! আজ যে রাঁধিই নি মোটে। তা বলিস্ ত' রেঁধে দেব'খন বরং—"

"রাঁধনি ? ও'মা, কি খেয়েছ তবে ?"

"খাই নি। সন্ধ্যে বেলায় শিবপূজো করে ফল-টল কিছু খাব। আজ সোমবার কি না ?"

"সোমবার—তার কি ?"

"সোমবার দিনের বেলায় উপোসী থেকে সন্ধ্যেয় শিব-পূজো ক'রতে হয়। তারপর কেউ হবিষ্যি করে, কেউ ফল-টল কিছু খায়—যার যেমন সুবিধে।"

"মাসের কি সোমবায় এমনি উপোস কর ? এই ত সেদিন শিবরাত্তির গেল !"

"শিবরাত্তির ত বছরে একদিন মোটে হয়। উপোস মাসে মাসে কেউ কেউ চতুর্দ্দশীতেও করে, কেউ আবার সোমবারেও করে। তা কি সোমবার কি আর পারি দিদি ? যে দিন পারি করি। রবিবারে হবিষ্যির উপোস করতে হয়, মঙ্গল চণ্ডী আছে, হয় ত আবার একটা একাদশী মাঝে প'ড়ে গেল। আবার আমাবস্যে পুন্নিমেতেও উপোস করতে হয়। সব সোমবারে হ'য়ে উঠে কই দিদি ?"

বিস্ময়ে উর্মি কতক্ষণ অবাক হইয়া চাহিয়া রহিল। তারপর কহিল, "বল কি দিদিমা ? অবাক্ করলে যে একেবারে ! রবিবার, সোমবার, মঙ্গলবার আবার একাদশী, অমাবস্যে পুন্নিমে—মাসে হয়ত পর পরই চার পাঁচটি উপোস প'ড়ে গেল ! সবই করতে হয় ? শাস্ত্রের শাসন ? না করলে লোকে ছাড়ে না ? বামুনরা আর গাঁয়ের মোড়লরা এসে জোর ক'রে করায় ? কি সর্ব্বনাশ ! কি ভয়ঙ্কর অত্যাচার !"

ভাগিরথী হাসিয়া উঠিলেন।

"ওমা ! বলে কি মেয়ে ? জোর কেন ক'রবে ? হাঁ, ঐ একাদশীটা বিধবার করতেই হয়। না করলে পাপ আছে। তা অনেক জায়গায় যারা না পারে জল-টল খায়। তাতে তো আর এমন ক্লেশ কিছু হয় না ? তাও জোর জুলুম আবার কে কোথায় এসে করে ? তবে নিন্দে করে লোকে। তা নিন্দে কেউ করুক না করুক, এমন আবাগী বিধবা কেউ নেই, একাদশীতে মুখে অন্ন তুলে দিতে পারে। জানিস, আমার এক খুড় শাশুড়ী ছিলেন একাদশীর দিন ভোরে তাঁর কলেরা হ'ল। সারাটি দিন গেল, সন্ধ্যে বেলায় গঙ্গায় শেষে দেহত্যাগ করলেন—"

"দেহত্যাগ ! সে আবার কি ?"

"বলিস্ কি উর্মি ? এই সাধারণ কথাটাও জানিস নি ? এই পাপ দেহটাই তো আর মানুষ নয়। মানুষের যে আত্মা সেই হ'ল আসল মানুষ। এই দেহটাতে সে থাকে—এই একটা জন্মে পৃথিবীতে যদ্দিন প্রারব্ধ নিয়ে সে আসে। তারপর প্রারব্ধ যখন ফুরোয়, যাবার সময় হয়, দেহটা ছেড়ে যার যেমন কর্ম্ম তেমনি লোকে সে চলে যায়। আবার সময় যখন হয়, নূতন আর একটা জন্মে নূতন একটা দেহ ধ'রে ফিরে আসে।"

"ও-হো ! দেহত্যাগ ! মরণকে তোমরা বল দেহত্যাগ ? দেহত্যাগ ! বাঃ ! ভারী চমৎকার কথাটি ত ! ওই একটি কথার ভেতর কত বড় যে একটি দর্শনতত্ত্ব নিহিত রয়েছে ! কোথায় শিখলে দিদিমা কথাটা ?"

"ওমা ! এও আবার শিখতে হয় নাকি ? সবাই তো জানে। সবাই তো সর্ব্বদা বলে।"

"বটে! সবাই জানে? সবাই সর্ব্বদা বলে? এত বড় কথাটা! বুঝে বলে?"

হাসিয়া ভাগীরথী কহিলেন, "এটা বুঝতেই বা কি এমন বিদ্যে লাগে দিদি? দেহটা যে এই এক একটা জন্মে মানুষের একটা থাকবার জায়গা কেবল, মানুষ যে মরে সে কেবল এই দেহটা ছেড়ে যায়, আবার নূতন জন্মে নূতন দেহ ধরে আসে—এগুলো ত খুব সহজ কথা, সবাই বোঝে।"

"হুঁ! আত্মা অমর, পরলোকে অনন্তকাল জীবিত থাকে—এটা আমরাও জানি যদিও একই আত্মার নূতন নূতন জন্মের কথা কেউ বড় মানেন না। কিন্তু দেহত্যাগ কথাটা তুমি এমন সহজ ভাবে ব'লে ফেল্লে দিদিমা! আবার ব'লছ সবাই জানে, সবাই বলে—কই, আমরা তো শুনি না বড় কারও মুখে। হাঁ, তোমার সেই খুড়-শাশুড়ীর কি হ'ল? ম'রে গেলেন, তবু একাদশী ব'লে একটু জল কি ওষুধ কেউ তাঁর মুখে দিলে না?"

"দূর পাগল! তাও কি হয় কখনও? মানুষ কি এতটা পাষাণ কখনও হ'তে পারে? সবাই সারাটি দিন কত বলা-কওয়া, কত সাধ্য সাধনা—কিছুতেই একটু ওষুধ, কি এক ফোটা জল কেউ তাঁর মুখে দিতে পারল না। কত সবাই ব'ল্লে, তোমার পাপ যদি কিছু হয়, সে পাপ আমরা নেব; তুমি একটু ওষুধ খাও, একটু জল খাও, কিছুতেই না। তাঁর ছেলে জোর করে দিতে গেল; দাঁতকপাটি মেরে প'ড়ে রইলেন, সাধ্যি হ'ল না খুলে একটুখানি ওষুধ গেলাতে পারে। ফ্যাঁস ফ্যাঁস ক'রে—গলার স্বর ব'সে গিয়েছিল কি না—তবু ফ্যাঁস ফ্যাঁস ক'রে শেষে ব'ল্লেন, ওরে চ'লেই তো যাচ্ছি, কতক্ষণ আর! দেহের ক্লেশ তো সবই শেষ হ'য়ে তখন যাবে। কেন যাবার বেলায় একটা অনাচার করাবি? একাদশীতে জল খেতে নেই—কখনও খাইনি। আজ এই মহাযাত্রার দিন কেন আর খাব? মরছি ব্যামোতে, জল-তেষ্টায় তো আর নয়? শেষ সময় যখন বুঝবি, মা গঙ্গার কোলে আমায় নিয়ে যাস, আর তখন কি জানি যদি বলতে না পারি, কুশাগ্রতে ক'রে গঙ্গাজল একটু আমার মুখে দিস।"

বিস্ময়ে অবাক্ হইয়া উর্ম্মি শুনিতেছিল। শেষে বলিয়া উঠিল, "আশ্চর্য্য বটে! মনের বলের তুলনা নেই। কিন্তু এটা বড় একটা অন্ধবিশ্বাস নয় দিদিমা?"

"অন্ধ! না, তিনি ত অন্ধ ছিলেন না। দিব্যি চোখে দেখতেন, চাল ডাল নিজের হাতে বেছে রেঁধে খেতেন, রামায়ণ মহাভারত পড়তেন তবে হাঁ, ধর্ম্মে খুব বিশ্বাস ছিল বটে।"

"না না, আমি তাঁর চোখের দৃষ্টির কথা বলছি না। অন্ধ—তাঁর চোখ নয়, অন্ধ অর্থাৎ ভুল ছিল তাঁর বিশ্বাস। এই ধর না, কলেরা হ'ল, ম'রে গেলেন, এক বিন্দু জল কি ওষুধ মুখে দিলেন না পাপ হবে ব'লে। পাপ কি সত্যি এতে হ'তে পারে? বড় একটা ভুল নয় এটা?"

"কি জানি দিদি, কোন্‌টা সত্যি কোন্‌টা ভুল, তা কি সামান্য মানুষ আমরা সব বুঝতে পারি? তবে শুনি, মুনি-ঋষিরা না কি ধর্ম্ম কি, আচার নিয়ম কি পালতে হয়, ব'লে গেছেন। তাই বিশ্বাস করি, যে যদ্দূর পারি মেনেও চলি। ঐ যে আমায় খুড় শাশুড়ীর কথা বল্লাম, অতটা কি সবাই পারে, না করে? আমারই যদি একাদশীতে অমনি কলেরা হয়! মাগো, যে তেষ্টার টান রোগীর দেখেছি, হয়তো চারদণ্ড বেলা না হ'তেই—দেবতার নাম একটি বার করবার আগেই ব'লব, জল একটু দে, খাই।"

"খেতে দেবে তো?"

"ওমা, তা দেবে না? বলিস কি? অমন সময় মুখে একটুখানি জল না দিয়ে কেউ পারে?"

"হু—তা, এই যে আরও কতকগুলো উপোসের কথা বল্লে—সে গুলোও কি সব বিধবাকেই করতে হয়?"

"না, এ গুলোতে সধবা বিধবা নিয়ম কিছু নেই, সবাই করতে পারে। যার ইচ্ছে হয়, শক্তিতে কুলোয়, করে না হয় না করে। ক'রতেই হবে, এমন কড়া নিয়ম কিছু নেই। না ক'রলে নিন্দে-মন্দও কেউ কিছু করে না।"

"তবে কেন করে?"

"কেন করে! ওমা বলে কি? পুণ্যি ধর্ম্ম কি কেবল নিন্দের ভয়ে লোকে করে? না তাই করলে পুণ্যি ধর্ম্মই কিছু হয়?"

"পুণ্যি-ধর্ম্ম কাকে বল দিদিমা? আর দেহটাকে ক্লেশ দিয়ে কেবল উপোস আর ঠাকুর দেবতার পুজো ক'রলেই যে পুণ্যিধর্ম্ম হয়, তাই বা কিসে বুঝলে? আর সব কি তা বেশ বুঝেই কয়?"

ভাগীরথী উত্তর করিলেন, "ও দিদি, অতখানি জ্ঞানই যদি থাকত, তবে ত যোগী-ঋষিদের তুল্যি একটা ব্যক্তিই আজ হ'তাম। তবে ছেলেবেলা থেকে শিখেছি, এইগুলিই পুণ্যি-ধম্ম, আর পুণ্যি-ধম্ম ক'রলেই পাপের ক্ষয় হয়। তাই করি। জন্মজন্মের কত পাপ নিয়ে এই পিথিমীতে এসেছি। ক্ষয় তো তার করতে হবে। যদ্দুর পারি করি। নইলে এই পাপের বোঝা নিয়েই ত আবার যেতে হবে। আবার তাই নিয়েই আসতে হবে। জন্ম জন্ম কেবল ভূতের বোঝা ব'য়ে যাওয়া আসাই সার হ'বে। পরমার্থ লাভ কখনও হবে না।"

"পরমার্থলাভ দিদিমা! তোমার এক একটা কথা শুনে সত্যি একেবারে অবাক্ হ'য়ে যাচ্ছি! এই সব কথা কি বাস্তবিক সত্যি ব'লেই মনে মনে বুঝেছ? যেমন দেহত্যাগের কথাটা ব'লে, তেম্‌নি এই পরমার্থ কথাটাও কি সাধারণ একটা কথা সর্ব্বদা তোমরা ব'লে থাক?"

হাসিয়া ভাগীরথী কহিলেন, "কি যে বলে মেয়ে! ব্রত-উপোস-পূজো-আহ্নিক যে লোকে করে, সে তো পরমার্থ ভেবেই করে।"

"তা এই পরমার্থ কি তোমাদের এই সব ব্রত-উপোস পূজো-টুজো ছাড়া আর কোনও সাধনায় কি উপাসনায় পাওয়া যায় না?"

"তা কেন যাবে না? তবে আমরা নাকি এই শিখেছি, এই-ই করি। যারা যেমন শেখে, তারা তেম্‌নি করে। মোছলমানরা নেমাজ করে, খিষ্টেনরা খিষ্ট ভজে, তোরাও তোদের বেহ্মকে ডাকিস। সবই ওই পরমার্থ পাবার তরে। যে পথ যে পেয়েছে, সেই পথেই সে চলে। আসল কথা কি জানিস পাপের ক্ষয় হওয়া চাই। তাতে ক'রে শেষে মনটা পরিষ্কার হ'য়ে আসা চাই। তবেই না পরমার্থ লাভ হবে।"

"হুঁ! তা পরমার্থ ব'ল্‌তে ঠিক কি বোঝ তোমরা?"

"বুঝলে ত পেয়েই যেতাম দিদি। তবে শুনেছি মনটা পরিষ্কার হ'লে, আর ভক্তি হ'লে, ইষ্টদেবতা এসে দেখা দেন।"

"দেখা দেন! কি ক'রে? চর্ম্মচক্ষের সাম্‌নে মূর্ত্তি ধ'রে?"

"তা সে দেবতাই জানেন দিদি! সত্যিকার মূর্ত্তি ধ'রে চর্ম্মচক্ষের সামনেই এসে দেখা দিন্ কি মনের ভেতরেই ধরা দিন্, তাঁকে পেলেই পরমার্থ লাভ হ'ল; আর কি?"

ঊর্ম্মি কিয়ৎকাল কি ভাবিল, শেষে কহিল, "হাঁ দিদিমা, তোমার পূজো-টুজো আমি কিছু দেখিনি, জানিওনা ও সব কিছু। আচ্ছা, যদি শিখতে পারি আর ক'র্‌তে পারি—"

"ও মা! পাগল মেয়ে বলে কি? তুই ক'রবি পূজো! হি-হি-হি!"

"না না, হাসবার কথা নয় দিদিমা। সত্যি ব'ল্‌ছি, যদি ক'র্‌তে পারি, আর করি, তবে—তবে মনটা আমার তোমার মত হবে?"

"হাঃ হাঃ হাঃ! আমার মত! বলিস কি ঊর্ম্মি, ক্ষেপলি নাকি? আমার মনও আবার মন! মুখ্যু একটা সেকেলে বুড়ী—আর কত লেখাপড়া শিখেছিস তোরা!"

"ছাই শিখেছি! যত বাজে কথা! আচ্ছা, তোমার মত নাই ব'ল্লাম। এমন ভক্তি বিশ্বাস যাতে মন পরিষ্কার হয়, আর যাতে ইষ্টদেবতাকে পাওয়া যায়—হাঁ, ইষ্টদেবতা তোমরা কাকে বল? ভগবান্ তো?"

"ওমা, ভগবান্ বই আর কে হবেন তিনি? তবে তিনি নাকি অনেক রূপ ধ'রে অনেক লীলা ক'রেছেন, কতরকম মাহাত্ম্য দেখিয়েছেন, আবার ভক্তরাও নাকি এক এক ভাবে তাঁকে পেয়েছে, তাই অনেক রূপ, অনেক ভাব তাঁর আছে। আবার তেম্‌নি অনেক নামও আছে। যে রূপে যে তাঁকে ভাবে, যে নামে তাঁর পূজো করে, তিনিই তাঁর ইষ্টদেবতা। পূজোর মন্তরও আলাদা আলাদা আছে। যে দেবতার যে ভাব, তাঁর মন্ত্রও তেমনি।"

"তোমার ইষ্টদেবতার নাম কি?—ভাব কি? মন্ত্র কি?"

"ওমা, তাই কি ব'ল্‌তে আছে? গুরুর নিষেধ যে।"

"ঐ ত তোমাদের দোষ! ধর্ম্মের কথা, উপাসনার কথা লুকিয়ে কেন রাখবে? কেন সবাইকে জান্‌তে দেবে না?"

একটু হাসিয়া ভাগীরথী কহিলেন, "গুরু তো সবারই আছেন দিদি। ভক্তি যখন হবে, চাইলে গুরুর কাছেই সব পাবে। আর তা না হ'লে জেনেই বা লাভ কি?"

"লোকসানই বা কি?"

"তা কি আর আমি ব'ল্‌তে পারি দিদি, গুরুদেব জানেন। তবে নিষেধ যখন আছে, লোকসান কিছু একটা আছেই



পুরীর সমুদ্র



এভারেষ্ট গিরিশৃঙ্গ

ইচ্ছামতী নদী



নইলে এমন একটা নিষেধই বা কেন হবে ? তবে একটা কথা কি জানিস দিদি, খুব দামী কোনও ধন যদি কারও থাকে, সে তা লুকিয়েই রাখতে চায়, সবাইকে দেখিয়ে বেড়ায় না।"

"বেড়ায় বই কি ? খুব বেড়ায়। গরব করেই লোককে দেখিয়ে বেড়ায়।"

হাসিয়া ভাগীরথী কহিলেন, "এ ধন যে গরব ক'রে দেখিয়ে বেড়াবার ধন নয় দিদি, গরব ক'রে দেখালে কি অমনি তা উপে গেল। কই, কখনও তো এমন ইচ্ছে হয় না ইষ্টদেবতার নাম মন্তর লোকের কাছে ব'লে বেড়াই।"

"বেড়াও বই কি দিদিমা ? অন্ততঃ যা কর, লোকে তা থেকে সহজেই বুঝতে পারে তোমার ইষ্টদেবতা কে ? আমিও তা না বুঝেছি, তা নয়। ব'লব ?"

"কি, বল্ দিকি ?"

"কেন, শিবঠাকুর !"

"হি-হি-হি ! কিসে তা বুঝলি ?"

"এই ত একরাশি শিব গড়িয়ে সেদিন শিবরাত্তির করলে। আজ আবার উপোস ক'রে রয়েছ, শিব পুজো ক'রবে।"

"ওলো, শিব পুজো সবাইকে ক'রতে হয়। ইষ্টদেবতা যিনিই যাঁর হ'ন, শিব পুজো আগে না ক'রে ইষ্টদেবতার পুজো হয় না।"

"বটে ! রোজ শিব পুজো কর ?"

"ওমা, তা করি না ? না ক'রে কি ইষ্টদেবতার পুজো করতে পারি ?—রোজকার পুজো রোজকার আছে আলাদা, যা রোজ করতেই হয়।—এ আর এই যে শিবরাত্তির, সোমবার, এগুলো হ'ল ব্রত, মাসে মাসে বার তিথি ধ'রে লোকে করে। তাও যার ই'চ্ছে হয়, যে পাবে, সে করে। সবাইকে যে ক'রতেই হবে এমন কোনও নিয়ম নেই। অনেক এমন ব্রত আছে, সময় মত যে পারে করে। এমন অনেক ব্রত আছে, অনেক দেবতার পুজো তাতে ক'রতে হয়, পুরুতঠাকুররা আসেন, যার ব্রত তার হ'য়ে তাঁরা পুজো করেন। অত সব দেবতার পুজো ত সবাই ক'রতে পারে না, তাই পুরুতদের ডেকে করায়। নিজেরা গুছিয়ে গাছিয়ে সব দেয়, না খেয়ে থাকে, ব্রতকথা শোনে, শুনে তারপর যা হয় খায়। আগে খেতে নেই। নিজের হাতে না ক'রলেও, ওতেই তার ঐসব দেবতায় পুজো করা হয়। আর যাঁকেই যখন পুজো করুক, নিজে করুক কি পুরুত দিয়ে করাক, সেই একেই তো গিয়ে পুজো সব পৌঁছোয়। নাম আর রূপ আলাদা আলাদা যতই হ'ক দেবতা তো আর সত্যি আলাদা আলাদা নয়। মূলে গিয়ে সবই এক।"

"হুঁ—আচ্ছা, দিদিমা, তুমি ত লেখাপড়া কিছু শেখ নি ?"

"লেখাপড়া !—আ কপাল ! লেখাপড়া কোত্থেকে শিখব ? আমাদের সময় মেয়েদের লেখাপড়ার চলন ত ছিল না, ইস্কুলও ছিল না।—তবে ঘরে কেউ একটু আধটু শিখত। এই যেমন তোর ঠাকুর দাদা—আমায় খুব ভালবাসতেন কিনা—পড়তে একটু শিখিয়ে ছিলেন। রামায়ণ মহাভারত পড়তে পারি, আর দেবতাদের স্তবস্তুতিগুলো—একখানা বই পেয়েছি—খেঁথলে থুঁথলে কখনও পড়ি।—তা সে কি আর পড়া ?"

"শাস্তর-টাস্তরের বই কিছু পড়তে পার ?"

"শাস্তর ! ওমা, শাস্তর কি মুখ্যু মেয়ে মানুষ আমরা কেউ পড়তে পারি ? শাস্তর সব বড় বড় বামুনপণ্ডিতদের কাছে থাকে; চোকেও ত দেখতে পাইনে।"

"কেন, শাস্তরের বই তো অনেক এখন ছাপা হ'য়েও বেরোচ্ছে।"

"তাই নাকি ? তা সে সব আমরা কোথায় পাব দিদি ? আর পড়তে পারলে তো ?"

ঊর্ম্মি কহিল, "হুঁ—তাই ভাবছি, দিদিমা, কি জান, তোমাদের সম্বন্ধে বড় একটা ভুল ধারণা ছিল। ভাবতাম, তোমরা কিছুই জান না। একেবারে অজ্ঞান, অকর্ম্মা। কিন্তু এখন দেখছি, তোমরা যা জান আমরা তা কিছুই জানি না। তোমরা যা পার তার কিছুই আমরা পারি না। তোমরা এই সব যা জান, জানবার মতই কথা সব। আর যা পার তোমরা, তা ক'রতে পারাও বড় ভাগ্যির কথা,—মানুষের যোগ্যতার বড় পরিচয়ের কথা।"

ভাগীরথী উত্তর করিলেন, "এসব তো কেউ শেখায় না তোদের কিছু, জান্‌বি কি ক'রে ? এসব কাজকর্ম্মও কিছু কেউ করায় না। শিখবি কোত্থেকে ? আমাদের সময় ছিল—"

"কি ছিল ? কি শেখাত ? কি ক'রে শেখাত ?"

"এই ছেলে বেলা থেকে কত ব্রতনিয়ম ক'রেছি, করতে সবাইকে দেখেছি, ব্রতকথায় কত পুণ্যিধর্ম্মের কাহিনী

শুনেছি। কত পূজো-আহ্নিক, জপ-তপ ক'রতে কত লোককে দেখেছি। স্তব-স্তুতি প'ড়তে শুনেছি। আবার রামায়ণ মহাভারতও পড়তাম, পুরাণপাঠ, কথকতা হ'ত, শুনতাম। কত যাত্রাগান হ'ত, পাঁচালী নাচালী হ'ত; মনে হ'ত যেন দেবতারা আর দেবতার মত সব মানুষরা চোকের সামনে এসে দাঁড়াচ্ছেন! মুখের সব কথা যেন তাঁরাই এসে বলছেন মনে হত: আর যত কাহিনী চোকে দেখা ছবির মত চোকের সামনে। মোটামুটি যে ফুটে উঠত ক'টা কথা জানি, তা শিখতে আর কি এমন লাগে? আর কি জানিস্, কেবল এতেই কিছু হয় না। যে যেমন বোঝে, মন দিয়ে ভক্তি ক'রে পূজো আহ্নিক ব্রত নিয়ম যদি করে—কথাগুলো এমন কঠিনই বা কি—আপনিই লোকে শেখে বোঝে। অনেক কথা মনেই যেন ডাক দিয়ে ওঠে। তারপর কাজকর্ম্ম—সে তো একটুকু বয়েস থেকেই কত ক'রতে হ'ত। এখন যেমন হ'য়েছে—ঘরে যদি দুটো পয়সা কারও হ'ল—আধাআধি যায় ঝিচাকর বামুনের মাইনেতে আর তাদের খোরাকপোষাকে। তখন কি আর তাই ছিল?"

ঊর্ম্মি কহিল, "আমি কেবল সংসারী কাজ কর্ম্মের কথা ব'লছি না দিদিমা। সেগুলো এমন কঠিন কিছু নয়, আমরাও অনেক করি। ইচ্ছে ক'রলে কি দরকার হ'লে আরও অনেক করতে পারি। তা এই যে অনায়াসে এত সব ব্রত নিয়ম কর, আর ধর্ম্ম ব'লে যা বুঝেছ তার সাধনায় এতদূর এগিয়েছ তোমরা—কই, আমরা তার কি বু'ঝি, সাধনাই বা কি করি? কেবল দুটো গান—তাও কেমন গাইছি, তারিফ তার কে কেমন ক'রছে, তাই ত কেবল ভাবি।"

"গাইতে পারিস নাকি ঊর্মি? আহা, শ্যামাবিষয় জানিস? দু'টো শোনাবি?"

হাসিয়া ঊর্ম্মি কহিল, "না দিদিমা, তোমাদের শ্যামার কোনও ধার আমরা ধারি না। ও সব নাম মুখে আনতেও আমাদের মানা! তা তোমার কাছে কোনও বই আছে শ্যামাবিষয় গানের?"

"আছে একখানা শ্যামাসঙ্গীত। গাইতে তো পারি না। তবে পড়ি মাঝে মাঝে।"

"বইখানা ক'দিনের তরে দেবে আমাকে? দেখি যদি শিখে নিতে পারি, গেয়ে শোনাব তোমাকে।"

ভাগীরথী তাকের উপর হইতে বইখানি নামাইয়া ঊর্ম্মির হাতে দিলেন।

ঊর্ম্মি কহিল, "কি স্তবস্তুতির বইএর কথা বলছিলে না?"

"হাঁ, তাও একখানা আছে। নিবি না কি?"

"নেব, দাও।"

সে বই খানিও ভাগীরথী নামাইয়া দিলেন। ঊর্ম্মি কহিল, "হাঁ, দিদিমা, এই বই দুই খানিতে তোমাদের ধর্ম্মের তত্ত্বের কথা কিছু পাওয়া যাবে?"

"তা কি আমি বুঝি দিদি? পড়ে দেখ। দেবতাদের মাহাত্ম্যের কথাইত ওতে আছে"—

"আচ্ছা, এ সব শিখতে পারি—কি জান দিদিমা—ব্রত পূজো তোমার মত না করি, জানতে বড় ইচ্ছে হয়—কেন জানব না? দেশের এতলোক তোমরা ধর্ম্ম বলে যা মানছ, এমন ভক্তিতে যার সাধনা করছ যাতে করে সত্যি মনটা তোমাদের এত—হাঁ, এত উন্নত আর নির্ম্মলই হয়েছে—হতে পারে, তার কথাটা কেন জানতে চাইব না? আচ্ছা, কি সব বই পড়লে এ সব জানতে পারব, শিখতে পারব, বলতে পার দিদিমা?"

"তা কি আর আমি কিছু জানি দিদি! অরুণকে বরং সুধো। সেও খোঁজ খবর নিতে চায়, কি বইটইও এনে পড়ে। ও অরুণ, অরুণ! না, বাড়ীতে নেই বুঝি—"

ঊর্ম্মি কহিল, "আচ্ছা, সে জেনে নেওয়া যাবে। আজ এই দু'খানা নিয়ে ত দেখি। বাবাকে বল্লে তিনিও খোঁজ করে বই এনে দিতে পারবেন

"তোর বাবা কি এ সব বই এনে তোকে পড়তে দেবে?"

"তা দেবেন। বলেছেন দেবেন। তবে মা—উঁহু—খুন করুন তবু দেবেন না। পড়তে দেখ্‌লেও হুলুস্থূল করবেন। তবে বাবা তো বলেছেন, লুকিয়ে বরং পড়ব। এখন তবে পালাই দিদিমা।"

"ওমা, দুটি ভাত খেতে চাইলি—"

"উপোস যে তোমার। ভাত তো রাঁধনি, খাব কি?"

"তা রেঁধেই বরং দিচ্ছি। বস্‌না একটুখানি। কুমড়ো কাঁচকলা কিছু ভাতে দিয়ে—এই তো দেখতে দেখতে হয়ে যাবে।"

"না দিদিমা, দোহাই তোমার। ও সব হাঙ্গামা আর এখন করো না। আমি পালাই!"

বই দুখানা হাতে লইয়া ছুটিয়া উর্মি বাহির হইল।

"ও উমি, ও উমি! ওলো, শোন্, শোন! দাঁড়া আবাগী! কতক্ষণ আর হবে? ওলো, আয় না?"

উর্মি ততক্ষণ দুপ দাপ সিঁড়ি বাহিয়া নামিয়া সদর দরজার কাছে গিয়া পৌঁছিয়াছে।

(৮)

বেলা তখন আটটা বাজিয়াছে। মিষ্টার কে, (কমল) মল্লিকের শয়নগৃহে ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল। সাহেবের নিদ্রা-ভঙ্গ তখন হইল। তোড়জোড় সব ঠিক ছিল, সাড়া পাইয়াই 'বয়' সাহেবের 'বেড্-টী' তৈরী করিয়া লইয়া গেল। ঘণ্টাটা টিপিলেই ভৃত্য গিয়া যখন যেরূপ প্রয়োজন সাহেবের পরিচর্য্যা করিতে পারে। উঠিয়া দরজা খুলিয়া দিবার ক্লেশটুকুও সহ্য করিতে না হয়, তাই শয়ন গৃহের একটি দরজা বাহির হইতে বন্ধ করা থাকিত, চাবিটি থাকিত এই ভৃত্যের হাতে।

চা-পানান্তে চুরুট মুখে, ঢুলু ঢুলু চোখে, ঢল ঢলা দেহে, টল টলা পায়ে, কমল মল্লিক বাহির হইল; পরিধানে ঢিলা পায়জামা ও কোট। শরীরের গড়নও কেমন ঢিলা ঢিলা ঢ্যাঙ্গা ধরণের; মুখখানিও তদ্রূপ লম্বা ছাঁদের। ঠোঁট দু'খানি কিছু পুষ্ট এবং অত্যধিক ধূমপানে কৃষ্ণাভ। চক্ষু দু'টি কিছু বসা হইলেও স্বাভাবিক অবস্থায় দৃষ্টি তীব্র ও উজ্জ্বল। সম্মুখের চুলগুলি আলু থালু ভাবে অনতি-প্রশস্ত ললাটের উপরে আসিয়া পড়িয়াছে। হাত দুখানি দেখিলে বর্ণ উজ্জ্বল শ্যাম বলিয়া মনে হইবে। কিন্তু ভাঙ্গা হাড়গাগুলির কাল ছায়ায় মুখখানি অপেক্ষাকৃত মলিন। তবে পুরুষ ছেলে, ধনি-গৃহের দুলাল, আবার বিলাতফেরত এঞ্জিনিয়ার। সুতরাং চেহারার কোনও ত্রুটিই কাহারও চক্ষে বড় পড়িত না; পড়িলেও আমলে কেহ আনিত না।

কমল আসিয়া একখানি আরাম-কেদারায় গা ছাড়িয়া পা দুখানি সম্মুখে একখানি ছোট টুলের উপরে তুলিয়া দিল। পাশেই একখানি টেবিলের উপরে খবরের কাগজ ছিল, 'বয়' হাতে তুলিয়া দিল। শিথিল ভাবে খুলিয়া টেলিগ্রামের পৃষ্ঠাটির উপরে কমল অলস দৃষ্টিপাত করিল। নাপিত আসিয়া তখন সেলাম করিয়া দাঁড়াইল, 'বয়' একখানি তোয়ালে আনিয়া দুইটি কাঁধ ঢাকিয়া বুকের উপরে পাড়িয়া দিল। নাপিত নিঃশব্দে দাড়ী গোঁপ কামাইয়া চুলের মাথাগুলি ছাটিয়া আঁচড়াইয়া ঠিক করিয়া দিয়া গেল 'বয়' তখন মুখে পাউডার মাখিয়া আর একখানি তোয়ালে আনিয়া বেশ করিয়া ঝাড়িয়া পুছিয়া দিল। খবরের কাগজের কয়েক পৃষ্ঠা উল্টাইয়া দেখিতে দেখিতে মুখের চুরুটা শেষ হইল। যথা-স্থানে রক্ষিত র‍্যাক্রে অবশেষটুকু নিঃশেষ করিয়া কমল উঠিয়া দাঁড়াইল। লম্বা একটা হাই তুলিয়া গামোড়া দিল। তার পর ধীরে ধীরে বাথ রুমে প্রবেশ করিল।

বাথ রুমের কাজ করিয়া আর এক 'সুট' ঢিলা পোষাক পরিয়া কমল যখন ফিরিয়া আসিল, দুইটা ডিম সিদ্ধ ও মাখন মাখা দু'খানা পাঁউরুটি সহ আর এক পেয়ালা চা তখন টেবিলের উপরে রাখা হইয়াছে। আহার ও পান করিয়া কমল আর একটা চুরুট ধরাইল। পিতা জে, মল্লিক তেমনই আর একটি চুরুট মুখে তেমনই ঢিলা পোষাকে তখন গৃহে প্রবেশ করিলেন।

"হালো! গুড্ মর্ণিং!"

চুরুটটা হাতে লইয়া একটু ঘুরিয়া কমল পিতাকে অভিবাদন করিল। করিয়া চুরুটটি আবার মুখে পুরিল।

পিতাও প্রত্যভিবাদন করিলেন, "গুড মর্ণিং!"

করিয়া সম্মুখে আর একখানি চেয়ারে উপবিষ্ট হইলেন।

এক গাল ধুম নিঃসরণ করিয়া কমল পিতার দিকে একবার চাহিল।

পিতা কহিলেন, "ক'দিন ধ'রে ভাবছি—তা আর অবসরই হ'য়ে ওঠে না। একটা কথা তোমাকে বলব কমল।"

"বল!"

বলিয়া অলস ভাবে একটা হাই তুলিল। একটু ইতস্ততঃ করিয়া পিতা কহিলেন,

"বিলেত থেকে ফিরে এসেছ, কাজকর্মও আরম্ভ ক'রেছ। মনে হয়—এখন তোমার বিয়ে করা উচিত।"

"Thanks for the kind suggestion. But I think it's primarily—rather to speak the truth—absolutely my concern. Is't not?"

বলিতে বলিতে চক্ষু টানিয়া একটু হাসিয়া কমল পিতার দিকে চাহিল।

"তা বটেই ত! তা বটেই ত! তবে কি না—"

"Well! you need not worry about it. There's no hurry. I shall think of it when I feel inclined."

চুরুটে কয়েকটা টান দিয়া পুত্র মুখবিনিঃসৃত ধূমকুণ্ডলীর সহিত নিজমুখবিনিঃসৃত ধূম কুণ্ডলী মিলাইয়া পিতা কহিলেন,

"অবিশ্যি তোমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমরা কিছু করতে চাই না। তবে মনে হচ্ছিল আপত্তির কারণ তোমার এখন কিছু থাকতে পারে না—"

"পারে না সেটাই বা কিসে মনে ক'রে নিতে পারলে ?"

"কি থাকতে পারে, বয়সও যোগ্য—এই তো সাতাশ বছর হ'ল—"

"হ'তে পারে। But I haven't consulted my horoscope lately, nor have I felt any urge for it. By the bye, have I got any horoscope at all ? Had you any faith in any such rubbish when I was born ? I don't think you had. But had you really, eh ?"

একটু হাসিয়া কমল পিতার দিকে চাহিল। পিতা কহিলেন, "না, তখন ছিল এটা ব'লতে পারি না। তবে পরে দুই একজন জ্যোতিষীর সঙ্গে—"

"Oh! জ্যোতিষীর সঙ্গে! হাঃ, হাঃ, হাঃ!—I see you are no exception to the common run of fools of this benighted country! Consulting [illegible] My God!—What next!"

"হেঃ, হেঃ, হেঃ!" একটু অপ্রতিভ হাসি পিতার মুখে ফুটিল। কহিলেন, "কি জান কমল, বিশ্বাস যে করতে করি ঠিক তা নয়। তবে ছেলেটিকে—এই বন্ধু-বান্ধবদের ছেলে মেয়ে—দুই একজন জ্যোতিষীর সঙ্গে—এই আলাপ যা [illegible]—তাকে নিয়ে এক একবার মনে হয় ও সায়েন্সটাকে একেবারে বোধ হয় উড়িয়ে দেওয়া যায় না।"

"Science! Damn it! Do you call that a science!"

পিতা কহিলেন, "ঠিক সায়েন্স বলা না যাক, বড় একটা অনুসন্ধানের বিষয় ত বটে। ইয়োরোপেও ও নিয়ে নাড়া চাড়া অনেকে ক'রে থাকেন; বিশ্বাসও অনেকের আছে।"

"There are fools everywhere!"

"থাক, ওনিয়ে ত কথা হ'চ্ছে না। আসল কথা"—

"বয়স আমার সাতাশ বছর হ'ল। হ'তে পারে—তোমরা ব'লছ। বয়েসের রেকর্ড আমি রাখিনি; রেখেছ তোমরা। তবে আমার academic career-এ যে রেকর্ড পাচ্ছি, তাতে ত মনে হ'চ্ছে পঁচিশের ওপরে ওঠে নি।"

"সেটা কি জান, ফিউচারটা ভেবে স্কুলে ভর্ত্তি করবার সময় দু'টো বছর কমিয়ে দেওয়া হয়েছিল।"

"Indeed! I see you did not strictly follow the truth there!"

"না, ঠিক তা করেছি একথা বলতে পারিনা।"

"Well! I don't care? Convenience is convenience. I think I have gained two years by your wise forethought."

পিতাকে মল্লিক সাহেব কহিলেন,

"সে যাক্। সাতাশ বছর হ'ল—যোগ্য বয়স ত বটে। তাই ব'লছিলাম,

"বিবাহ তোমাকে ক'রতেই হবে!

"তা তুমি কি মনে কর a fellow must marry because he is twenty seven and that only fits him to be exhibited in the marriage-market.?"

পিতা উত্তর করিলেন, "না, তা ব'লছিনি। তবে বয়েসের হিসেবেও ত যোগ্য অযোগ্য সময় একটা আছে। এদিক দিয়ে দেখলে বিবাহের যোগ্য বয়স তোমার হয়েছে এটা ব'লতেই হবে।"

"খুসী তোমার ব'লতে পার। কিন্তু সবাই সেটা বলবে না, আমিও ব'লবো না। হাঁ, ছিল একটা সময় যখন একুশ বছর বয়েসে সাবালক হলেই, লোকে মনে ক'রত বিবাহের ঠিক বয়েস ছেলে মেয়েদের হ'য়েছে। But those days are long gone by—একুশ ত একুশ, ক'টা লোক এখন এই

সাজাসে,—সাজাসে থাক, ত্রিরিশেও বিয়ে করে? Most people don't think even of marrying till long past thirty, if they at all care to do it.

"হুঁ, তা আর্থিক অবস্থারও একটা বিবেচনা আছে ত? দিনকাল ব'দলে গেছে। ত্রিশ বছরের আগে আর্থিক তেমন একটা স্থিতিই কারও বড় এখন হয় না। তবে তোমার পক্ষে ভাবনার কারণ ত কিছু নেই। ভাল চাকরীতে ঢুকেছ, মাইনেও কম নয়। তাছাড়া আমিও ত গরীব নই।"

কমল উত্তর করিল, "হাঁ, এটা স্বীকার করে নিতে প্রস্তুত আছি, নিজে যা রোজগার করব আর তোমার থেকেও decent যে একটা allowance expect করতে পারি, তাতে স্ত্রী নিয়ে seperate একটা family establishment maintain করা আমার পক্ষে অসম্ভব নাও হ'তে পারে। কিন্তু—"

"তবে আর কিন্তুর কথা কি থাকতে পারে, কমল?"

"Well, you must be a very queer fellow, Dad, to think that economic competence is the only consideration for marriage?"

একটু বাঁকা চটুল চোখে হাসিয়া কমল পিতার দিকে চাহিল। মুখের চুরুটটা তখন পুড়িয়া গিয়াছিল, আর একটা চুরুট ধরাইয়া লইল। পিতাও দেখাদেখি নিজমুখের নিঃশেষপ্রায় চুরুটটি ফেলিয়া দিয়া আর একটি ধরাইলেন। কমল চুরুটটা টানিতে টানিতে অপাঙ্গে পিতার দিকে এক একবার চাহিয়া মুখ টিপিয়া মিটিমিটি হাসিতেছিল। লক্ষ্য করিয়া পিতাও একটু হেসে কহিলেন, "তাহ'লে মনের কথাটা আসলে তোমার কি? কারও সঙ্গে প্রেমে এখনও পড়নি এই ত? তা ভাল ভাল ঢের মেয়ে রয়েছে দেখাশুনোও তাদের সঙ্গে—"

"Yes—a good lot of them and one has only to pick and choose. I might easily fall in love with a girl or for the matter of that, any number of them if I choose to. But I don't choose, neither do I want to. There's no hurry about it. কথা হ'চ্ছে কি জান বাবা, এই ত সবে ফিরে এসেছি, কাজে কেবল ঢুকেছি, ধাঁ করে অমনি কারও সঙ্গে প্রেমে পড়ে, বিয়ে ক'রে একটা শেকলে আপনাকে বেঁধে ফেলতে চাইনে। A bond is always a bond and liberty is always liberty! I prefer liberty—liberty to enjoy life freely and fully while it's best enjoyable, as all decent aud sensible young men want to. It is only the fools who let slip the opportunities youth offers in its hey-day and it comes only once in ones life —কি ভাবছ কি?—একদম থ' হয়ে বসে রইলে যে!—But you too had your youth in your time and its hey day you must have felt like it when it was with you—হাঃ হাঃ হাঃ—there your tell-tab face! But never mind! It's only nature and no weekness to hide from any body."

"না না, তা নিয়ে ত কোন কথা হচ্ছে না, তবে কিনা—এই—"

হাঁ, বুঝতে পারছি সব। You are parents and elderly people. They all like to see younger people marrying, and will be worrying and hurrying about it. But the pity of it is that they scarcely care to remember how they felt, thought and did when they themselves were younger. তা সে যাই হ'ক, তুমি বাবা—একটা ইচ্ছেও বোঝা যাচ্ছে—I don't want to be inconsiderate—তা দেখা যাক্,— চলছি যে ভাবে চ'লতে দেও, যদি এর ভেতর প্রেমে কারও সঙ্গে পড়ে যাই, তখন বিয়ের কথা ভাবা যাবে, তোমাদেরও জানাব। "I think, this ought to satisfy you. Ought it not? O just try it and be a good old Daddy dear, as you have ever been."

চটুল একটু হাসির চোখে হাসিচাপা মুখে পিতার দিকে একটি দৃষ্টিপাত করিয়া কমল আরাম কেদারাখানির উপরে লম্বা হইয়া পড়িল, পা দু'টিও লম্বা করিয়া ছড়াইয়া দিল। একটা হাই তুলিয়া চক্ষু দু'টি বুজিয়া চুরুটে লম্বা কয়েকটা টান দিল, যেন এ বিষয়ে পিতার সঙ্গে চূড়ান্ত একটা কথাই হইয়া গেল, আর কোনও আলোচনা এখন নিষ্প্রয়োজন এবং এই শ্রান্তিক্লান্তির পরে একটু বিশ্রামই এখন সে চায়।

কিন্তু পিতা সন্তুষ্ট হইলেন না। বাল্যাবধিই হালকা বিলাতী ভঙ্গীতে পুত্রের সঙ্গে যতই 'মিত্রবদাচরণ' করিয়া থাকুন, আর এই সব অতি-পাশ্চাত্তা প্রগল্‌ভতার প্রশ্রয় দিয়া থাকুন, পুত্রের অক্ষকায় এই 'অতি-মিত্রবদাচরণ' বিশেষ প্রীতিকর তাঁহার হইতেছিল না।

শেষ দিকের কথাগুলিতে যোগ্য পুত্রের মনোভাব ও রুচি প্রবৃত্তির পরিচয় যাহা পাইলেন, তাহা হজম করিয়া লওয়া তাঁহার পক্ষেও বিশেষ ক্লেশকর হইয়া উঠিল। হাঁ, ইয়ংম্যান—এ বয়সে এসব একটু—কিন্তু তাই বলিয়া কি খোলাখুলি এইরূপ সব কথা মুখের উপর তাঁহাকে তার বলা উচিত? আবার তাঁহার সম্বন্ধেও—যেরূপ সব ইঙ্গিত করিল, পিতার সম্বন্ধে কোনও পুত্র পিতার মুখের উপর—ওদেশেও এরূপ কিছু বলিতে পারে? কিন্তু কি করিবেন? স্বহস্তে সে বিষবৃক্ষ রোপন করিয়াছেন, আদরের বারিসেবনে বাড়াইয়া তুলিয়াছেন, তাহার ফলভোগ আজ তাঁহাকে করিতেই হইবে। এড়াইতে হইলে শানিত যে কৃপাণ কঠোর হস্তে ধরিতে হয়, তাহা ধরিবার মত শক্তি হাতে নাই, শান দেওয়া তেমন কোনও কৃপাণও গৃহে নাই। এই মুহূর্ত্তে গড়িয়া শান দিয়া লইতেও পারেন না। নীরবে একটু কাল কি ভাবিয়া শেষে ডাকিলেন, "কমল!"

"কি, বল।"

"অবশ্যি তোমার নিজের রুচির বিরুদ্ধে কিছু বলতে চাই না, আর সেটা বলাও বোধ হয় এখন চলে না।"

"ঠিক কথা!"

"তবে—কি জান বড় আশা করেছিলাম—বিবাহ করলে সুখীও হতাম আমরা।"

সেই ভাবে আরামে কেদারায় গা ঢালিয়া চক্ষু দুটি বুজিয়া থাকিয়াই কমল উত্তর করিল, "Well! I dont see any point in your any such concern about it. I think when a fellow marries, he marries to please himself, not any other people, whoever they might be. But I dont feel any thing like marriage pleasing me just at present."

"কিন্তু তোমার মার এত আগ্রহ—"

"হ'তে পারে। এই সব old ladies—mummies aunts' and grannies—ও সব দেশেই সমান। কারও বিয়ের কথা মনে হ'লেই ওরা ক্ষেপে ওঠে and go about matchmaking! তবে এটা ত ব'লতে পার না, আমি চাই আর না চাই, ভাল লাগুক কি না লাগুক, বিয়ে আমাকে করতেই হবে, যে হেতু মার এত আগ্রহ হয়েছে।"

পিতা উত্তর করিলেন, "আগ্রহ হ'য়েছে, হ'তেই পারে। তোমার এখন আপত্তির কারণ কিছু থাকতে পারে এটা মনেই স্থির করতে পারেন নি। বিশেষতঃ ভাল একটা প্রস্তাবও এসেছে—"

"প্রস্তাব! My God! বিয়ের প্রস্তাব এসেছে মেয়ের পক্ষ থেকে! আর মার কাছে! Well—I am, how absurd!"

পিতা কহিলেন, "এদেশে এটা বরাবরই হ'য়ে থাকে। এইটেই বরং রীতি; আমাদের ব্রাহ্ম সমাজেও বটে। তবে প্রস্তাব একটা এলে আর সেটা বাঞ্ছনীয় মনে হ'লে ছেলে-মেয়েদের মিশতে তখন দেওয়া হয় যে তারা আলাপ সালাপ ক'রে পরস্পরকে পছন্দ ক'রে নিতে পারে। তবে আগে প্রেমে প'ড়ে ছেলেমেয়েরাও যে প্রস্তাবটা কখনও না তোলে তা নয়।"

Indeed! তা প্রস্তাবটা কোত্থেকে এল? জানবার জন্যে একটু কৌতূহলও হ'চ্ছে বটে।"

পিতা কহিলেন, "মেয়েটির সঙ্গে নাকি আলাপও হ'য়েছে তোমার। শুনলাম, তোমার নাকি বেশ ভালও লেগেছে তাকে—"

হাসিয়া কমল উত্তর করিল, "আলাপ ত ফিরে এসে অবধি কত মেয়ের সঙ্গেই হ'চ্ছে, সুযোগও বাড়ীতে বাড়ীতে অহরহ ঘটছে! সবাই উঠে প'ড়ে লেগেছে কি ক'রে পাকড়াবে আমাকে। একটু আধটু Flirtation (প্রেমের ছলা-কলা) এ অবস্থায় এখানে ওখানে—সে হবেই, হ'চ্ছেও। All young people do it when they come together, particularly those who are considered very eligible matches and catches. কারও সঙ্গে কোথাও হয়ত একটু limit ছাড়িয়ে গেছি, কিন্তু তাতেই কাউকে অমনি ভালই লেগে গেল, আর ভালই অমনি বেসে ফেলব,

এইটে একদম ধ'রে নেওয়া—সেটাও কিছু বাড়াবাড়ি নয় কি? তা সে যাই হোক, আমার এমন ভাল লাগা সে মেয়েটি কে?"

পিতা উত্তর করিলেন, "মেয়েটির মা তোমার মার একজন বন্ধু। আর পিতাও আমার বিশেষ পরিচিত—খাসা ভদ্রলোকটি। অবিশ্যি ঠিক ফর্ম্মাল একটা প্রস্তাব যে হ'য়েছে তা নয়, তবে তোমার মাতে আর তাঁর সেই বন্ধুতে এ নিয়ে একটা কথা হ'য়েছিল সেদিন। মেয়েটির নাম হ'চ্ছে উর্ম্মিমালা—মহীন্ মোকার্জ্জির মেয়ে।"

"O! I see! উর্ম্মিমালা—হাঁ মনে প'ড়েছে—এই ত সেদিন সন্ধ্যায় একটা পার্টিতে তাকে দেখছিলাম বটে! খাসা গায়। Has a splendid voice and sweet as sweet can be! আলাপেও—হাঁ, বেশ attractive বলে মনে হল though quite unlike the common lot, not at all forward and aggressive in her attention. A very decent girl she appeared to be—rather too decent for me."

"তা aggressive একটা flapper-কে বিয়ে না ক'রে এই রকম একটি decent girl-কে বিয়ে করাই কি ঠিক হয়না?"

"হ'তে পারে। But I don't know yet who will catch at last, an aggressive flapper or an over-modest retiring girl."

প্রাতঃরাশের সময় তখন হইল। পিতাপুত্র উভয়ে উঠিয়া গৃহান্তরে গিয়া টেবিলে বসিলেন। অন্যান্য পুত্র কন্যাগণ সহ কমলের মাতা চিন্ময়ী সেখানেই অপেক্ষা করিতেছিলেন। পুত্রের অলক্ষ্যে স্বামীর ইঙ্গিত পাইয়া কোনও কথা তিনি আর তখন তুলিলেন না।

[ক্রমশঃ

পরিবর্ত্তন

—শ্রীহৃষীকেশ গায়েন

নির্ব্বাণ রবি নীল নভোতলে আঁকিছে স্নিগ্ধ ছবি,
নীরব চরণে নামিছে সন্ধ্যা রহিছে মুগ্ধ কবি।
রিক্ত নগ্ন কাঙালের বেশ ধ'রেছে মাটির ধুলা,
বিহগের গান থামিয়া গিয়াছে নিঝুম তাদের কুলা'।

গিরি গহ্বরে নির্ঝর বঁধুয়া ভুলে থাকে নিজ গানে,
তটিনীর জল কল কল করে কারো বাধা নাহি মানে,
জোছনার রাশি বাসা বাঁধিয়াছে মুক্ত অসীমাকাশে,—
ধ্রুবার শকতি হায় মানিয়াছে স্নিগ্ধ আলোর নাশে।

সুনীল সায়রে অরুণ তোমার পায়ের তলায় আসি'
প্রথম ভোরের আভাস পাইয়া উঠিবে যখন জাগি'—
কোলাহলে মাতি' পাখীরা গাহিবে ঘুম ভাঙানোর গান
তারকা সখিরা লাজনত মুখে জানাইবে অভিমান।

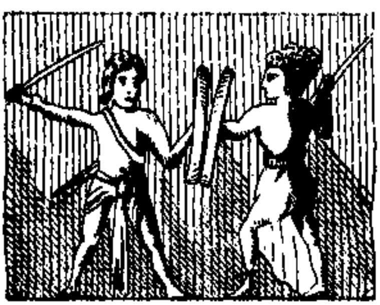
চুমিবে গগন জগতের ধূলিরাশি
ক্ষুরহত ধূলি তুলিবে আকাশে আঁধাররাশি
শুধু থাকিব না শুধু হাসিব না ধরনীর আমি নয়
আমারও যে হায় জীবন-সন্ধ্যা নহে দূর নহে পর।

আমিও একদা প্রভাতীর সুরে রচেছি স্বপন জাল,
আমার জোয়ারে উঠিত নাচিয়া কত ছবি কত কাল,
আবার আসিব এমনি প্রভাতে [illegible]র শুনিব গান,
আবার মাটির ধরণীর সাথে এক করি লব তান।

বীরত্বে বঙ্গনারী

শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র চৌধুরী, বি, এ

রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন, "অনেক প্রাচীন ইতিহাস স্মৃতির চূর্ণ ছড়ার মধ্যে বিক্ষিপ্ত হইয়া আছে; কোন পুরাতত্ত্ববিৎ আর তাহাদিগকে জোড়া দিয়া এক করিতে পারেন না, কিন্তু আমাদের কল্পনা এই ভগ্নাবশেষগুলির মধ্যে সেই বিস্মৃত প্রাচীন জগতের একটী সুদূর অথচ নিকট পরিচয় লাভ করিতে চেষ্টা করে।" "বাঙ্গালার "বারমাসীয়ার" করুণ গীতি বাঙ্গালী বণিকের সমুদ্র যাত্রার কাহিনী প্রচার করিয়া এখনও জনসাধারণকে বিস্মিত করিয়া থাকে। "ময়নামতীর পুঁথি", "গোপীচাঁদের গান" প্রভৃতি এখনও বঙ্গে বৌদ্ধ ধর্ম্মের অস্তিত্বের কথা প্রমাণ করিতেছে। বাঙ্গলার পল্লী কবি তাঁহার সমসাময়িক ইতিহাস উপকথার আকারে ঢালিয়া জনসাধারণের দ্বারে দ্বারে পরিবেশন করিয়াছেন। কালের ধ্বংস



নর ও নারীর অসিযুদ্ধ

প্রবণতায় তাহার অনেক কথাই বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে, যাহা আছে, তাহাতে এখনও প্রাচীন বাঙ্গলার অনেক ঐতিহাসিক ঘটনার পরিচয় পাওয়া যায়।

বাঙ্গলার বিলুপ্তপ্রায় ব্রতকথায় দেখিতে পাওয়া যায় বঙ্গকুমারীগণ যেমন "লক্ষ্মণের মত দেবর" "দশরথের মত শ্বশুর", "সভা-উজ্জ্বল জামাই" এবং "নিত্যানন্দ ভাই" চাহিয়াছে, তেমনই যুদ্ধ-নিরত স্বামীর নিরাপদে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তনের প্রার্থনাও করিয়াছেন। ব্রত কথায় শুনিতে পাই—

পাকাপান, মর্ত্তমান
আমার স্বামী নারায়ণ
যখন যাবেন রণে
নিরাপদে ফিরে আসেন যেন ঘরে। (১)

সেকালের বঙ্গকুমারীগণ দীর্ঘ চারি বৎসর কাল "রণে এয়োব্রত" পালন করিতেন (২) এবং ভক্তিভরে বলিতেন—

রণে রণে এয়ো হবো।
জলে জলে সো হবো॥
আকাশে লক্ষ্মী হবো।
সময়ে পুত্রবতী হবো॥

আবার কখনও তাঁহারা বলিতেন—

রণে এয়ো সনে যাই।
আকাশের ভাত সকালে খাই॥

ব্রত শেষ করিয়া প্রণাম করিবার সময় তাঁহারা বলিতেন,

রণে এয়োব্রত ক'রে হই যেন স্বামীর সো।
যতকাল থাকব বেঁচে যেন না পরে আমার নো॥

মৈমনসিংহ জেলার "কার্ত্তিক ব্রতকথা" আজিও বঙ্গরমনীর তীর ধনুতে নৈপুণ্যের স্মৃতি বহন করিতেছে। এই ব্রতের "বাঘমারা" উপাখ্যানে দেখা যায়, "ব্রতিনীরা তীর ধনু হাতে লইয়া ব্রতস্থান ছাড়িয়া বাড়ীর বাহিরের দিকে আসেন এবং বাঘের উদ্দেশ্যে তীর নিক্ষেপ করেন বা তীর নিক্ষেপ করিতেছেন এইরূপ দেখান" (৩)। পূর্ব্ববঙ্গের অনেক স্থানে "অরণ্য ষষ্ঠি" ব্রতে তীর ধনুর ব্যবহার দেখা যায়। "মাঘ মণ্ডল," "কুম্বা" প্রভৃতি ব্রতকথা এখনও বঙ্গরমনীর অশ্বারোহণ নৈপুণ্যের পরিচয় প্রদান করিতেছে (৪)।" "দোলায় আসি ঘোড়ায় যাই" এই ছড়া হইতে বুঝা যায় যে, সেকালের বিক্রমপুরবাসিনী নারীদের মধ্যে বোধ হয় অশ্বারোহণ প্রথা প্রচলিত ছিল (৫)।

এই সকল বিস্মৃত ব্রতকথার কাহিনীর দ্বারা বৈজ্ঞানিক প্রণালীর ইতিহাস রচিত হইবে না বটে, কিন্তু তাহা হইলেও ইহা সেকালের বঙ্গরমণীর অশ্বপৃষ্ঠে রণচণ্ডিকামূর্ত্তিই নয়ন সমক্ষে উপস্থিত করে। বিস্তৃত বঙ্গের নানা স্থানে অনুসন্ধান

১। গৌড়ের ইতিহাস—৺রজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী—২য় খণ্ড ২১৮ পৃঃ।

২। ভারতী—১৩১৯ সাল, আষাঢ়—২০৯ পৃঃ।

৩। বঙ্গলক্ষ্মী—১৩৩৯ সাল, মাঘ—১৫১ পৃঃ।

৪। মধ্যযুগে বাঙ্গালা—৺কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়—১২০ পৃঃ; বিক্রমপুরের ইতিহাস—১ম সংস্করণ—শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্র নাথ গুপ্ত—৩১৯ পৃঃ।

৫। বিক্রমপুরের ইতিহাস—শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্র নাথ গুপ্ত—৩৬১ পৃঃ।

করিলে এখনও হয় ত এইরূপ নানা ব্রতের নানা কথার ভিতর প্রাচীন ইতিহাসের ক্ষীণস্মৃতি জাগ্রত দেখিতে পাওয়া যাইবে। বঙ্গরমণীর অশ্বারোহণ নৈপুণ্য এবং যুদ্ধ যাত্রা "একটী সহজ ও সাধারণ ঘটনার মত পরিচিত না হইলে কি তাহার স্মৃতি বঙ্গকুমারীর ব্রতকথায় স্থান পাইতে পারিত? সকল আকাঙ্খার অধিক যাহা, সকল আশার শ্রেষ্ঠ যাহা, সকল কামনার সারভূত যাহা, যাহা নারী-জীবনের অতি স্বাভাবিক ও সহজ এবং প্রাত্যহিক আকাঙ্খার সামগ্রী, বঙ্গকুমারীর ব্রতকথায় শুধু তাহারই স্থান হইয়াছে। ইহার সহিত সেকালে মিথ্যার বা অত্যুক্তির সংশ্রব ছিল না।" (৬)

"মাণিকতারা" বা "ডাকাতের পালায়" সেকালে স্ত্রীলোকেরা তীরচালনায় এমন কি মল্লবিদ্যা ও অন্যান্য পুরুষোচিত ব্যায়াম ক্রীড়ায় দক্ষতা" লাভ করিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায়। (৭) এই কবিতায় শুনিতে পাওয়া যায়—

"তারা কৈল এক ধুনকির চাইর তারে সাধি চাইর জোড়।
এক বাটুলে পঞ্চ শিগার* মারি ধৈ কপল॥

*

শতেক দুষমন যদি ছামনে খাড়া হয়।
এক মানিকতারার তীরে পাবে তার ক্ষয়॥

*

যোনে যোনে জাইন আমি একা শতেক নারী।
বিশাল জোয়ানের § আমি মাথা খাইতে পারি॥"

বঙ্গরমণীর দ্বন্দ্বযুদ্ধের কথা, দ্বন্দ্বযুদ্ধে রমণীর নিকট বিশ্ববিশ্রুবীরের পরাজয়ের কথাও অন্য একটী পল্লী-কবিতা হইতে অবগত হওয়া যায়। (৮) পল্লী কবিতা হইতে আরও অবগত হওয়া যায় যে, একদা বিপন্নের প্রাণ রক্ষার জন্য বাঙ্গালার "দুই রাজকুমারী খড়্গ হস্তে তাহাদিগকে রক্ষা করিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন।" (৯) একটী পল্লী কবিতায় "কোন মুসলমান মহিলা সাতজন ডাকাতকে একা গৃহের ছাদ হইতে কিরূপে হত্যা করেন; তাহার বিবরণ দেওয়া আছে।" (১০) "লীলা-দেবীর পালা" হইতে অবগত হওয়া যায় যে, তিনি "ত্রিপুরার রাজকুমারের পার্শ্বে পুরুষ যোদ্ধার বেশে সৈন্য পরিচালনা" করিয়াছিলেন। (১১) "মুকুট রায়ের পালায়" জানা যায় যে, তাঁহার পত্নী "ধনুর্ব্বান হস্তে পুরুষের বেশে শিকার করিতেন।" (১২)

"একহাতে লোহের ধনু আর হাতে তীর।
আগে আগে চলে কন্যা উর্দ্ধমুখী† হইয়া॥"

"মহুয়ার" পালায় বঙ্গরমণীর অশ্বারোহণ ও অস্ত্রধারণ নৈপুণ্যের পরিচয় পাওয়া যায়। (১৩) "চৌধুরীর লড়াই" পল্লী কবিতার ভিত্তি ঐতিহাসিক, তাহাতে কয়েকটী বঙ্গরমণীর "অসাধারণ রণপাণ্ডিত্যের কথা বর্ণিত আছে।(১৪) উহার বর্ণনায় জানা যায়—



রমণীর শিকার যুদ্ধ—হাতী শুণ্ড।

"হিরাবিবি মুক্তাবিবি তিন বিবি আর।
তারা তিনজনে যুক্তি করি বুদ্ধি কইরলেন সার॥২
তিন জনে তিন কিরিচ টান দিয়া লইল।
পঞ্চ ভাঁড়ালীর সংগে যুদ্ধ লাগাইয়া দিল॥৩
হিরাবিবি মারে কিরিচ পঞ্চ ভাঁড়ালীর গায়।
লোহার জামা কাডি পঞ্চরে চাইর আঙ্গুল বসায়॥৪
তিন দিগে তিন জন যুদ্ধ করণ লইল।
মধ্যে পড়ি পঞ্চ ভাঁড়ালী ভাবিতে লাগিল॥৮"

এককালে পরাজিত ও বন্দী স্বামীকে উদ্ধার করিবার

৬। বাঙ্গালীর বল—শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রলাল আচার্য্য—২০৮ পৃঃ।
৭। পূর্ব্ব-বঙ্গ গীতিকা—৺দীনেশচন্দ্র সেন—২য় খণ্ড ২য় সংখ্যা, ২০ পৃঃ।
* শিগার = শিকার
§ বিশাল শক্তিমান পুরুষের
৮। বিচিত্রা—১৩৩৮ সাল, বৈশাখ।
৯। বৃহৎবঙ্গ—৺দীনেশচন্দ্র সেন—২য় খণ্ড—৮০৩ পৃঃ; পূর্ব্ববঙ্গ ৩য় খণ্ড—২য় সংখ্যা।

১০। বিচিত্রা—১৩৩৫ মাঘ, ১৯২ পৃঃ।
১১। পূর্ব্ববঙ্গ গীতিকা—৪র্থ খণ্ড, ২য় সংখ্যা, ৪১০ পৃঃ।
১২। ঐ ৪র্থ খণ্ড—২য় সংখ্যা—৫০৪ পৃঃ।
† উরমুখী = উর্দ্ধমুখী
১৩। মৈমনসিংহ গীতিকা—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়—১ম খণ্ড—২য় সংখ্যা—২৩-২৮ পৃঃ।
১৪। বৃহৎবঙ্গ গীতিকা—৺দীনেশচন্দ্র সেন—২য় খণ্ড—৮০৩ পৃঃ।

জন্ত বঙ্গবীরাঙ্গনা শত্রু সৈন্য আক্রমণ করিতেও কুণ্ঠিতা হইয়াছিলেন না।—

"আমার স্বামী বন্দী করে শরীলের কত জোর।
সাতাও দেখি রণের ঘোড়া গেল কত দূর॥
সিপাই জীরন্দাজে দীতাব কওত ডাকিয়া।
রণেতে যাইবাম আমি ঘোড়ায় সওয়ার হইয়া (১৫)॥

বাঙ্গালার রমণী সমাজে যুদ্ধ বিদ্যা প্রচলিত না থাকিলে কি পল্লীকবির পক্ষে এরূপ কাহিনী রচনা করা সম্ভব হইত?

ইতিহাস "পাথুরে" প্রমাণ না পাইলে কোনও কথা বিশ্বাস করে না। এইজন্য অনেকে নিরক্ষর পল্লীকবির



মোগল যুগে অশ্বারোহিণী নারী

রচিত ছড়া ও গাথাগুলিকে কবিকল্পনা বলিতে পারেন। কিন্তু ইহা ইতিহাস বিমুখ বাঙ্গালীজাতির আত্মতৃপ্ত স্বভাবের পরিচয় মাত্র। কারণ, তাম্রশাসন বা শিলালিপিতে বিঘোষিত নৃপতিগণের ইতিহাসই যে একটা দেশ বা জাতির ইতিহাস তাহা নহে; একটা জাতির যাহা হৃদস্পন্দন, যাহাদের সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের উপর দেশে রাজার অস্তিত্ব বিদ্যমান থাকে তাহাই প্রকৃত ইতিহাস। যুগধর্মের প্রভাব বাঙ্গালায় নিরক্ষর পল্লীবাসী—বাঙ্গালার রামধন মোবারকের অবস্থা কিরূপ হইত—তাহার ইতিহাসই বাঙ্গালার ইতিহাস। এইজন্য বাঙ্গালার পল্লী কবিতাগুলিকে কবিকল্পনা বলিয়া উড়াইয়া দিবার উপায় নাই। তাহা হইতে জাতির হৃৎস্পন্দনের পরিচয় পাওয়া যায়। বিশেষতঃ ইহা সরল স্বভাব পল্লী-কবি কর্তৃক রচিত হওয়ায় ইহাতে ব্যক্তিবিশেষের প্রভাব একেবারেই নাই। এইজন্য নিরপেক্ষ ঐতিহাসিকের নিকট জাতিকে চিনিবার সময় পল্লী-কবিতাগুলিও একেবারে মূল্য হীন নহে।

প্রাচীন সাহিত্য প্রমাণ করে যে, এককালে "তুরঙ্গাদি-রোহণ চিত্রং বেশ" এবং "যুদ্ধবেশ" বঙ্গরমণীর বিলাস সামগ্রীর স্থান পাইয়াছিল। বঙ্গরমণীগণ যে বর্ম সাঁজোয়া প্রভৃতি পরিধান করিয়া অশ্বারোহণে ভ্রমণ করিতেন তাহার পরিচয়ও প্রাচীন সাহিত্য হইতে অবগত হওয়া যায়। "গোপীচন্দ্রের গান" হইতে জানা যায় যে, এককালে বঙ্গরমণীগণ বেশবিন্যাসেও সামরিক হাবভাবের অনুকরণ করিতেন (১৬)। কবিকঙ্কণের রচনা হইতে জানা যায় যে, ষোড়শ শতাব্দীতেও বাঙ্গলার বাগদী ও ডোম জাতির "স্ত্রী-পুরুষেরা সকলেই ল্যাঠি, তীর ধনু প্রভৃতিতে পারদর্শী ছিল (১৭)।" এককালে বাঙ্গলার "কুল কামিনীগণও ধনুক ধারণ করিতে শিখিয়াছিলেন (১৮) এবং যুদ্ধ জয় করিয়া দুন্দুভি বাজাইয়া গৃহে প্রত্যাবর্তন করিতেন (১৯)। বিভিন্ন প্রাচীন কবির বর্ণনায়, বিশেষতঃ কাশীরাম দাসের "মহাভারতে" এবং ঘনরামের "ধর্ম্ম মঙ্গলে" বঙ্গরমনীর সমর কাহিনীর বহুপরিচয় পাওয়া যায়।

বঙ্গনারীর সমর কৌশলের পরিচয় প্রদানকালে কাশীরাম লিখিয়াছেন—

"নানাবাদ্য বাজাইয়া চলে যুদ্ধাবিণী।
নানা অস্ত্র হাতে নিল যুদ্ধাভিলাষিনী॥"

১৫। পূর্ব্ববঙ্গ গীতিকা—২য় খণ্ড, ২য় সংখ্যা।

১৬। গোপীচন্দ্রের গান—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়—মুখবন্ধ—১৩ পৃঃ।

১৭। আর্য্যাবর্ত্ত—১৩১৮ সাল, আশ্বিন—৩৩৯ পৃঃ।

১৮। মহানন্দের ইতিহাস—শ্রীযুক্ত প্রভাসচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—১ম খণ্ড—৬৭ পৃঃ।

১৯। বঙ্গভাষা ও সাহিত্য—৺দীনেশচন্দ্র সেন—২য় সংস্করণ—৪৮০ পৃঃ।

হরিপাল-রাজ-দুহিতা কামড়ার যুদ্ধ যাত্রা প্রসঙ্গে ঘনরাম লিখিয়াছেন—

"মার-মার হাঁকিছে মামুদা মূঢ়মতি।
হান হান হাঁকে রাণা কানড়া যুবতী।
ঢাল যুড়ে বহিলে মাতিল মহারাণা।
হান কাট হুঙ্কারে হাঁকরি হানাহানি।"

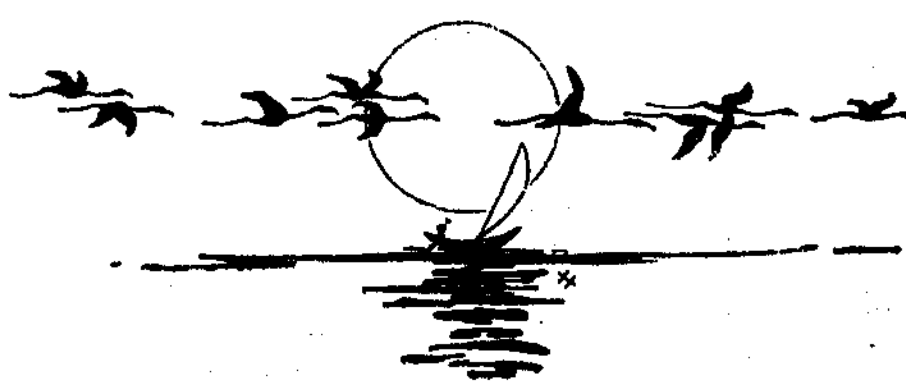
দাঁতে ধরে লাগাম রাণী দুহাতে ধরে খাঁড়া
সেনাগণে হানে রাণা রণে দিয়া তাড়া।
হাঁকে হাঁকে ঝাঁকে ঝাঁকে রাখে শরগুলি।
সমর সিংহিনী রাণী ঝিকে ঢাল ঢালি।"

লখ্যার রণ নৈপুণ্য—

"রঙ্গিণী রণজয়ী　　　দুন্দুভি বাজাই
ঘনঘোর বাজাইয়া লাখা।"

মুকুন্দরামের "অভয়া মঙ্গল কাব্য", অদ্ভুতাচার্য্যের "রামায়ণে" বঙ্গরমণীর সমর-কৌশলের পরিচয় দেখিতে পাওয়া যায়। ভবানীদাসের "ময়নামতির পুঁথি" হইতে জানা যায় যে, রাণী যখন "সাজ সাজ" বলিয়া ডাকিতেন তখন "এক ডাকে" "বাসত্তর লাখ" সৈন্য সজ্জিত হইয়া যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইত; তাঁহার "বাষট্টি উজির" আর "চৌষট্টি সিকদার" এবং ঢাল হস্তে "বিরাশি হাজার" ঢালী সৈন্য মুহূর্ত্তে অগ্রসর হইত—তাঁহার "বত্রিশ কাহন নাও" জলযুদ্ধের জন্য সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকি (২০)। এই সকল কাহিনীতে যতই অতিরঞ্জন থাকুক না কেন, কবিগণ যে নিতান্ত আকাশ কুসুম রচনা করেন নাই, তাহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। বাঙ্গালার ইতিহাসের যে সকল কথা সাহিত্যের মধ্যে অন্তর্নিহিত হইয়া আছে, বঙ্গ-বীরাঙ্গনাদের সমর কাহিনী তাহাদের অন্যতম। তাঁহাদের কথা বাঙ্গালার জনশ্রুতিতে মিশ্রিত হইয়া বংশানুক্রমে সঞ্চারিত হইত; উপকথায় প্রাণ সঞ্চার করিয়া গৃহে গৃহে কুল রমণীর অসীম সাহসের কথা প্রচারিত করিয়া জনসমাজকে বিস্মিত করিয়া দিত। বর্ত্তমান কালের পরাধীন বাঙ্গালীর নিকট একথা কবি-কল্পনা বলিয়া মনে হইতে পারে, কিন্তু ইহা কল্পনা নহে, কাহিনীও নহে—প্রাণ-স্পন্দনের ন্যায় তীব্র সত্য!

২০। বাঙ্গালীর বল—শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রলাল আচার্য্য—৪৭০ পৃঃ।



জনা ও বর্ত্তমান মহাসমর

শ্রীসৌরীন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য্য এম-এ ; বি-এল

ইউরোপের মহাসমরই বর্ত্তমানে সর্ব্বাপেক্ষা বড় সমস্যা হইয়া পড়িয়াছে। এই যুদ্ধে যে কত লোকক্ষয় হইতেছে তাহার ইয়ত্তা নাই। যুদ্ধে কে জিতে, কে হারে ইহা বলা কঠিন।

হের হিটলারের ধ্বংস নীতি কেহই সমর্থন করিতে পারে না, ইহাতে সমগ্র জগতে বিশৃঙ্খলা উপস্থিত করিয়াছে। কিন্তু হের হিটলার যে জার্ম্মান নারীগণকে যুদ্ধাদি পুরুষের কার্য্য হইতে অব্যাহতি দিয়া রন্ধন-শালায় ফিরিয়া যাইতে বলিয়াছেন তাহা প্রকৃতই ভাবিবার বিষয়। রন্ধন কার্য্য ভারতীয় মহিলাগণের প্রধান পবিত্র কার্য্যরূপে পরিগণিত ছিল, কিন্তু সময় চক্রে আজ উহা পশ্চিম প্রদেশীয় ও উৎকল নিবাসী পাচকের উপরে হস্তান্তরিত হইয়াছে। ফলে, ইহাতেও অস্বাস্থ্য ও অকাল-মৃত্যু ক্রমেই বাড়িয়া যাইতেছে। ডিস্‌পেপসিয়া বা থাইসিসের রোগীর পক্ষে জাতির উন্নতি করে কিছু করা দূরে থাকুক, প্রাণধারণই তো বিড়ম্বনা মাত্র।

হের হিটলার নারীজাতিকে যুদ্ধে পাঠাইতে ইচ্ছুক নহেন, কিন্তু নারীজাতির মধ্যে দেশাত্মবোধ সর্ব্বদা প্রবুদ্ধ থাকে, সে বিষয়ে তিনি সতত যত্নবান। ঘরে ঘরে মহিলারা স্বামী-পুত্রকে দেশ রক্ষায় ও দেশে প্রাধান্য-বিস্তারে উদ্বুদ্ধ করে, দেশের জন্য প্রাণ দিতে তাহাদিগকে উৎসাহিত করে এবং কথায় ও কার্য্যে সর্ব্বদা তাহাদের প্রাণে আশা ও উৎসাহ জাগরিত করিয়া দেয়। জার্ম্মনরা জীবনাহবে পতঙ্গের ন্যায় অবলীলাক্রমে যে অন্তিম বহ্নিতে ঝাঁপাইয়া পড়িতেছে, তাহার মূলেও ঐ উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা। আর এই উদ্বোধন ও অনুপ্রেরণার জন্য জার্ম্মান দেশে একটী নারী-সঙ্ঘও আছে। তাহাদের কাজ যুদ্ধক্ষেত্রের সৈন্যাধ্যক্ষগণের অপেক্ষা কম দায়িত্ব-পূর্ণ নয়। এই সঙ্ঘের নেতৃত্ব যিনি করেন তাঁহাকে লোকে ম্যাডেম ফুয়েহার বলিয়া থাকে। তাঁহার নাম "Fran Klink"। শুনিতে পাই তাঁহার নেতৃত্বাধীনে নাকি পাঁচ কোটি স্ত্রীলোক পরিচালিত হইতেছেন। প্রফেসার Peter Eangleman বলেন, "Fran Klink rules the lives of women in all things great and small, She tells women what they shall cook and how, what must be work and how what they shall say, laughing, to their husbands and sons, marching to war. How they shall behave smiling when their men are killed. Hers is the responsiblity for the Home spirit, the very core of national morale.
Vide "Hindusthan Standard" July 13, 1941.

বস্তুতঃ কোন দেশ বা জাতিই মাতৃশক্তির উদ্বোধন ব্যতীত এত বেপরোয়াভাবে মৃত্যু উপেক্ষা করিতে পারে না। সর্ব্বত্র মাতৃশক্তির উদ্বোধনেই মনুষ্যত্বের বিকাশ, জাতির প্রাধান্য, দেশের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি। জর্জ্জ ওয়াশিংটন, নেপোলিয়ান বোনাপার্ট, অলিভিয়ার ক্রমওয়েল সকলেই মাতৃশক্তিতে উদ্বুদ্ধ ছিলেন। ভারতীয় কবিগণের লেখনীতেও মাতৃত্ব খুবই বিকাশ লাভ করিত। যশোদা ও সুভদ্রা, কুন্তী ও সুমিত্রা, সীতা ও কৌশল্যা সকলে ছিলেন গরীয়সী মাতা। ইঁহাদের মাতৃত্বশক্তি তাঁহাদের পুত্রগণকে যে অপরিমিতরূপে যে খুবই প্রভাবান্বিত করিয়াছিল, সে বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই।

আধুনিক যুগে মহাকবি গিরিশচন্দ্র পৌরাণিক জনা ও সুভদ্রা চরিত্রে যেরূপ মাতৃশক্তি প্রতিভাত করিয়াছেন অন্য কোন কবি বা লেখক তাহা করিয়াছেন বলিয়া আমরা অবগত নহি।

গিরিশচন্দ্র "অভিমন্যু বধে"ই এই মাতৃত্বের প্রথম আভাস দিয়াছেন। শিব-মন্দিরে সুভদ্রা ও অভিমন্যু-পত্নী উত্তরা পূজার্থ গিয়াছেন, কেননা অভিমন্যু সমরে যাইতেছেন, যেন তিনি জয়ী হইয়া আসেন। কিন্তু উত্তরার অর্ঘ্য ভোলানাথের তুষ্টি সাধন করিতে পারিল না, উত্তরা কাঁদিয়া বলিলেন—

হা জননি !
পড়িল প্রমাদ হেথা,
দিগম্বর অর্ঘ্য নাহি নিল ;
ভাঙ্গিল কি কপাল আমার।
আশুতোষ কি হেতু করিল রোষ
না জানি গো সতি !

সুভদ্রা—পুনঃ ভক্তিভাবে দেহ অর্ঘ্য হরে।

উত্তরা—মাগো কৃতনাথে করিতে অর্চনা,
প্রাণনাথে পড়ে মনে ;
ঢালি জল ভাসি আঁখি-জলে !
দারুণ ক্ষত্রিয়-পণ,
যুদ্ধ নামে উন্মত্ত প্রাণেশ !
মাগো।
নাথ বিনা এ সংসারে নাহি জানি আর !

সুভদ্রা—কর পুনঃ শিব আরাধনা ;
নহে বীরাঙ্গনা-রীতি
বীরকার্য্যে দিতে বাধা।
কুলকার্য্যে রহ কুলবতী !

উত্তরা—বৃথা গঞ্জ গুণবতী মোরে ;
কিশোরে গো কে যায় সমরে—
ক্রীড়াস্থল ত্যাজি ?

সুভদ্রা—জান না বালিকা তুমি ক্ষত্রিয় নিয়ম,
শক্রর মরণ রণ-অঙ্গ-আভরণ ;
তপ করি যাচে যোগ্য অরি,
পতি-পুত্র যায় রণে
বীরাঙ্গনা সাজায় সমর-সাজে ;
ঘোর রণ স্তূপে ভ্রমে বীরকুলনারী,
সারথী হইয়ে রথে,
কাটে বেনী বিনাইতে গুণ।
কাঁদায়ে সন্তানে
খুলে দেয় আভরণ রণব্যয় হেতু।
বাল্যাবধি জানি রণ-রীতি
যাদব-কিয়ারী পাণ্ডুবংশ-কুলবধূ।
ত্যজ মোহ বীরবালা,
বীরকুল-রীতি স্মরি ;
মমতা হেলিতে
শিখে না ক্ষত্রিয় সুতা কুণ্ঠিত হইয়ে।

তবে মাতৃত্বের অভিব্যক্তি, জনা চরিত্রেই পূর্ণভাবে প্রকটিত হইয়াছে। অজেয় অর্জ্জুনের সহিত যুদ্ধ করিতে প্রথমে জনা বালক-পুত্র প্রবীরকে সম্মতি দেন নাই। তিনি বলিয়াছেন—

বৎস, ত্যজ মনস্তাপ,
প্রবল প্রতাপ পাণ্ডব ফাল্গুনী শুনি।
তুমি নৃপতির নয়নের নিধি—
তাই রাজা নিষেধে তোমারে
সমরে যাইতে যাদুমণি।

প্রবীর যতই বলিতেছেন—
মাতৃনাম অক্ষয় কবচ বুকে
সম্মুখ সমরে বিমুখ কে করে মোরে।

জনার ততই কেবল পুত্রের অকল্যাণ ভাবনায় প্রাণ কাঁদিয়া উঠিতেছে। কিন্তু প্রবীর যখন মাতাকে বলিলেন যে, 'কাপুরুষ' অপবাদে তিনি প্রাণ রাখিবেন না আর মাকে অনুযোগ করিলেন—

কে কোথায় ক্ষত্রিয় রমণী
সন্তানে অঞ্চলে ঢাকিয়া রাখে ?

অমনিই বীরজননী জনার হৃদয়ে মাতৃত্ব আত্মপ্রকাশ করিল। তিনি পুত্রের হইয়া স্বামীর সঙ্গে বহু তর্ক করিলেন—অনেক করিয়া বুঝাইয়া বলিলেন—

"পুত্রবর চায় রণে যেতে
পরাজিতে দাম্ভিক অরিরে
মম যদি তায় কভু হয় নরনাথ
না করিব বিন্দু অশ্রুপাত ;
প্রফুল্ল নয়নে
নন্দনে হেরিব রণস্থলে ;
বীরমাতা পুত্রের বীরত্ব করে সাধ
যদি হয় জয়, পূজা লোকময়
পাইবে নন্দন মম।

উচ্চ কার্য্যে ব্রতী সুতে কভু না বারিব
তুমিও না নিবার রাজন্।"

কিন্তু রাজ্যের রাজা কিছুতেই শক্রর সম্মুখীন হইতে ইচ্ছুক নহেন। কৃষ্ণার্জ্জুনের বিরুদ্ধে পুত্রকে অভিযান করিতে কিছুতেই রাজী হইলেন না—অধিকন্তু ক্রুদ্ধ হইয়া যখন বলিলেন—

"রণ যদি আকিঞ্চন তব বীরাঙ্গনা
যাও রণে নন্দনে লইয়ে
জেনে শুনে করিবনা নারায়ণে অরি।"

তখন জনা দৃঢ় স্বরে উত্তর করিলেন—

"দেহ আজ্ঞা—যাব রণে নন্দন লইয়ে
আজ্ঞা মাত্র চাই ;
এক গোটা পদাতিক সঙ্গে নাহি লব,
নারায়ণে ভেটিব সম্মুখ-রণে।"

তখন তাঁহার কেবল জপ হইল "রণ, রণ, রণ," কিন্তু সম্মুখে পুত্রবধূ মদন মঞ্জরী। জনা তাহাকেও বীরজায়ার কঠোর কর্ত্তব্য বুঝাইয়া বলিলেন—

ক্ষত্রিয়ের নিত্য কার্য্য রণ
জয় পরাজয়
যুদ্ধে নাহিক নিয়ম
যদি শুনে থাক পাণ্ডব কাহিনী

দ্রুপদ নন্দিনী এলাইল বেণী
স্বামীগণে সমরে উৎসাহ দিতে।
গভীর নিশায় বিরাট-আলয়ে
রন্ধন-শালায় পশি
ভীমে কৈল উত্তেজনা বধিতে কীচকে
শত ভাই কীচক নিধন তাহে।
উত্তর-গোগৃহ-যুদ্ধে একক অর্জ্জুনে
বিরোধিতে রাজন্যবর্গ ভীষ্মদেব সনে
পাঠাইল বীরাঙ্গণা;
বীর-পত্নী নিরুৎসাহ ক'রনা পতিরে
বীর কার্য্যে ব্রতী তব পতি
নিজ কার্য্যে রহ গুণবতি।
ত্যজি ভয়, ক্ষত্রিয় তনয়া
উচ্চ কার্য্যে স্বামীকে উৎসাহ কর দান।

কিন্তু মদন মঞ্জুরী কোন রকমেই প্রবোধ মানিলনা দেখিয়া উত্তেজিত কণ্ঠে জনা বলেন—

"এনেছি কি পুত্রবধূ নীচ কুল হ'তে?
যুদ্ধ-কার্য্য নিত্য যেই ঘরে,
আছে সদা অমঙ্গল আশঙ্কা সর্ব্বদা;
কিন্তু তোর সম
শুনি দূর সমীরণ ধ্বনি
রোদনের ধ্বনি অনুমানি
অকল্যাণ চিন্তা কেবা করে?
অরে হীনমতি,
পতিভক্তি এই কি তোমার?
কেবা সে অর্জ্জুন? কেবা নারায়ণ?
পতি শ্রেষ্ঠ সবা হ'তে।"

এই ভাবেই বোধ হয় ম্যাডেম্ ফুয়েহারের অনুবর্ত্তিনীগণ জার্ম্মাণ রমণীগণকে শিক্ষা দিয়া থাকেন, আজ হয়তো কৃষ্ণার্জ্জুনের ন্যায় চার্চ্চিল রুজভেল্টের সম্মুখীন হইয়া শক্তিশালী সেনাবাহিনীর ন্যায় জার্ম্মান সৈন্য পরাভূত হইয়া যাইবে। কিন্তু এই সমস্ত জার্ম্মাণ জননীগণের জনার প্রতিহিংসাপরায়ণা সন্তানদের কার্য্যের কথাই কি মনে আসিতেছে না? জনা বলিতেছেন—

মমতা এস না বক্ষে মম!
জ্বল জ্বল রে অনল—
প্রতিহিংসানল জ্বল হৃদে!
পুত্র হন্তা জীবিত রয়েছে,
মমতার নহে ত সময়।
নখাঘাতে উৎপাটন করিব নয়ন,
বিন্দু বারি যেন নাহি ঝরে
বীর অবতার
অসহায় পড়েছে কুমার,
প্রেত আত্মা তার—
নিত্য আসি মা ব'লে ডাকিবে
নিত্য আসি করিবে ভর্ৎসনা
পুত্রহন্তা অরি তোর জীবিত এখনো,
শোণিতের সনে বহু গরল প্রবাহ
বৈশ্বানর খেল শ্বাস সনে,
পুত্রহন্তা বৈরীরে নাশিতে।
চক্ষু হ'তে প্রলয় অনল ছোট,—
হিংসা-তৃষা শুষ্ক কর হিয়া,
কক্ষচ্যুত হও দিনকর,
উঠরে প্রলয় ধূম বিশ্ব আবরিতে
পুত্রঘাতি অরাতি জীবিত।
ঘুমাও নন্দন, অগ্রে করি বৈর-নির্য্যাতন
শোধ শেষে তোরে ধরে কোলে।

এই রূপেই জনার ন্যায় প্রবল প্রতিহিংসা পরায়ণা নারীগণের পুত্র বলিয়া দুর্দ্ধর্ষ জার্ম্মানগণ শত্রুর সম্মুখীন হইতে কোনরূপ ভয়েই ভীত নয়, কেন না তাহারা পুত্রশোকাতুরা জননীগণ কর্ত্তৃক উৎসাহিত হইতেছে। মনে হয় ব্রিটেন, আমেরিকা প্রভৃতি স্থানেও এইরূপ মাতৃপ্রভাব নিশ্চয়ই বিদ্যমান আছে। নতুবা এই সমস্ত দেশই বা অজেয় কেন? আজ সমগ্র যুদ্ধক্ষেত্রেই বোধ হয় এই সমস্ত মাতৃ-বাহিনী, চারণ ও বালিকা জননীগণের ন্যায় বলিয়া বেড়ায়—

দেখিবে জগতে— পুত্রশোকাতুরা নারী ভীষণা কেমন
সিংহিনীর দন্ত কাড়ি লব, ফণীণীর গরল হরিব
শোক-বলে বজ্র-অগ্নি নেব আকর্ষিয়ে।

মিষ্টার ইভলম্যানের কথা সত্য হইলে আজ এই মহাসমরে জার্ম্মান নারীগণ যে বিচিত্র অভিযান করিতেছে, ভারতের ইতিহাসে তাহা নুতন নয়। এখানেও রাজপুত রমণীগণ হাসিতে হাসিতে স্বামী-পুত্রকে যুদ্ধক্ষেত্রে যাত্রা করাইয়া দিতেন। এই রূপেই জীজীবাই শিবাজীকে মহাকার্য্যে উৎসাহিত করিতেন। এইরূপ অভিব্যক্তি আমরা প্রায় অর্দ্ধশতাব্দী পূর্ব্বে নাট্য সম্রাট গিরিশচন্দ্রের লেখনীতেই পাইয়াছিলাম—গিরিশচন্দ্র জনার মাতৃত্ব-বিকাশ করিয়া অমর হইয়াছেন। জনা আজ আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যগ্রন্থ। আজ এই ভাবে জনা চরিত্রের সমালোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাইব কত বড় ভাবের অগ্রদূত ছিলেন মহাকবি গিরিশচন্দ্র। আজ তাঁহার শতবার্ষিকী অনুষ্ঠানের প্রারম্ভে আমরা তাঁহার উদ্দেশে শ্রদ্ধাঞ্জলি দিই ও দেশবাসীকে 'জনা' নাটক খানির কথা স্মরণ করাইয়া দিই।১

১ কৃতজ্ঞতার সহিত জ্ঞাপন করিতেছি যে, এই প্রবন্ধ রচনায় আমি শ্রীযুক্ত ডাক্তার হেমেন্দ্র নাথ দাশগুপ্ত ও তাঁহার গিরিশচন্দ্র ও গিরিশ প্রতিভা হইতে যথেষ্ট সহায়তা পাইয়াছি। লেখক।

রাজসিংহের ভূমিকা

ডাঃ শ্রীহেমেন্দ্রনাথ দাশ গুপ্ত

(৪)

রাণা রাজসিংহের সহিত ঔরঙ্গজেবের যুদ্ধ

আমরা দেখিয়াছি যে, রূপনগরের রাজকুমারীকে ঔরঙ্গজেবের মুখের গ্রাস হইতে কাড়িয়া লইয়া রাণা রাজসিংহ সম্রাটের ক্রোধানলে ঘৃতাহুতি প্রদান করেন। সম্রাটের সহিত রাণার যুদ্ধে লিপ্ত হইবার ইহাই প্রধান কারণ বলিয়া বঙ্কিমচন্দ্র প্রকাশ করিয়াছেন। জিজিয়া সংস্থাপিত হইবার পরে রাণা যে নির্ভীক ভাবে তেজস্বিতাপূর্ণ পত্রখানি লিখিয়াছিলেন ঔরঙ্গজেব তাহাতেও অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া উঠেন। বঙ্কিম বলেন, যুদ্ধের ইহা দ্বিতীয় কারণ। তৃতীয় কারণ, মাড়োয়ার বিধ্বস্ত করিবার পরে ঔরঙ্গজেব যখন যশোবন্তসিংহের বিধবা পত্নী ও তাঁহার শিশুসন্তান অজিতসিংহের উপর প্রতিহিংসাবিষ প্রয়োগ করিবার নূতন উপায় উদ্ভাবন করিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন, যোধপুররাণী তখন রাজসিংহের শরণাপন্ন হন। এবারেও রাণা শরণাগত রক্ষায় পশ্চাদপদ হইলেন না, বিশেষতঃ, যশোবন্ত মহিষী তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রী। তিনি অজিতসিংহ ও তাহার মাতাকে মেবারে আশ্রয় দিলেন। ইহাতে ঔরঙ্গজেব ক্রোধে ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিলেন।

এই তিনটী কারণই কর্ণেল টড্ নিম্নলিখিত ভাবে দিয়াছেন,

This letter, the sanctuary afforded Ajit and (what the historical parasite of the Mogul's life dared not indite) the carrying off of his betrotted, made him pour out all the phials of his wrath against the devoted Mewar and his preparations more resembled those for the conquest of a potent kingdom than the subjugation of a Rajpoot Zemindar, a vassal of that colossal empire, on whose surface his domain was but a peak.

কিন্তু, এই তিনটী যুদ্ধের প্রধান কারণ হইলেও স্যার যদুনাথ বা তাঁহার authority মাসিরি আলমগিরী, ইহা সমর্থন করেন নাই। মাসিরি আলমগিরী যুদ্ধের কোন কারণই উল্লেখ করেন নাই তবে মাড়োয়ার ধ্বংসের পরেই মেবার আক্রমণের কথা বলিয়াছেন। আর স্যার যদুনাথ বলিয়াছেন যে, যে অজিতের সহিত রাণার সম্পর্ক থাকা বিধায় অজিতের মাতা মাড়োয়ারের জন্য সাহায্য চাওয়ায় তিনি প্রত্যাখ্যান করিতে পারিলেন না আর মাড়োয়ার ও মেবার একত্র না মিলিত হইলে সমস্ত রাজস্থানই ঔরঙ্গজেব কর্তৃক পদদলিত ও পিষিত হইয়া যাইবে তাহা বলাই বাহুল্য। আসল কথা অজিত ও তাহার মাতাকে মেবারে আশ্রয় দানের কোন উল্লেখই নাই। রাজসিংহের ভূমিকাতেও বলা হয় নাই যে, মেবারে অজিতের আশ্রয় দানের জন্যই যুদ্ধ হইয়াছিল। সাহায্য চাহিয়া পাঠাইবার কথা আছে বটে। কিন্তু কেবল সাহায্য দান আর শরণাগতকে আশ্রয় প্রদানে অনেক পার্থক্য। টড্ বলেন, রাণার এবম্বিধ আশ্রয় দানে শরণাগতের প্রতি প্রবল অনুকম্পা প্রকটিত হইয়াছে। কিন্তু স্যার যদুনাথ তাহা বলেন নাই।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, আর দুইটী কারণের কথা স্যার যদুনাথ তাঁহার History of Aurangzeb-এ কোন উল্লেখই করেন নাই। যথা, রাজসিংহ লিখিত লিপির কথা ও রূপনগরের রাজকুমারীর কথা। তবে রূপনগরের কথা তাঁহার হিষ্ট্রিতে কোন উল্লেখ না থাকিলেও বহুদিন পরে এবার রাজসিংহের ভূমিকাতে তিনি তাহা স্বীকার করিয়াছেন। এইখানে যে কারণেই হউক, তিনি যে একটু অগ্রসর হইয়াছেন তাহাতে সন্দেহ নাই। এখন আসল যুদ্ধক্ষেত্রের কথা বলিব।

বঙ্কিম লিখিয়াছেন, "রাজসিংহের রাজ্য ধ্বংস করিবার জন্য ঔরঙ্গজেবের যাত্রা করিতে যে বিলম্ব হইল, তাহার কারণ তাহার সেনোদ্যোগ অতি ভয়ঙ্কর। দুর্য্যোধন ও যুধিষ্ঠিরের ন্যায় তিনি ব্রহ্মপুত্র পার হইতে বল্মীক পর্য্যন্ত, কাশ্মীর হইতে কেরল ও পাণ্ড্য পর্য্যন্ত, যেখানে যত সেনা ছিল, সব মহাযুদ্ধে আহূত হইল। দক্ষিণাপথের মহাসৈন্য লইয়া বাদশাহের জ্যেষ্ঠপুত্র শাহ আলম্ দক্ষিণ হইতে উদয়পুরে আসিলেন, অন্যপুত্র আজমশাহ, বাঙ্গলার রাজপ্রতিনিধি, পূর্ব্ব ভারতবর্ষের মহতী চমূ লইয়া মেবারের পর্ব্বত মালার দ্বারে উপস্থিত হইলেন। পশ্চিমে মুলতান হইতে পাঞ্জাব, কাবুল, কাশ্মীরাদি অঞ্চলের যোদ্ধৃবর্গ লইয়া অপর পুত্র আকবর শাহ আসিয়া

সেনাসাগরের অনন্ত স্রোতে আপনার সেনাসাগর মিশাইলেন। উত্তরে স্বয়ং শাহানশাহ বাদশাহ দিল্লী হইতে অপরাজেয় বাদশাহী সেনা লইয়া উদয়পুরের নাম পৃথিবী হইতে বিলুপ্ত করিবার জন্য মেবারে দর্শন দিলেন। সাগর মধ্যস্থ উন্নত পর্ব্বত শিখর সদৃশ সেই অনন্ত মোগল-সেনাসাগর মধ্যে উদয়পুর শোভা পাইতে লাগিল।

"অনন্ত সর্পশ্রেণী পরিবেষ্টিত গরুড়, যতটুকু শঙ্কাভীত হওয়ার সম্ভাবনা, রাজসিংহ এই সাগর-সদৃশ মোগল সেনা দেখিয়া ততটুকু ভীত হইয়াছিলেন। ভারতবর্ষে এরূপ সেনোদ্যোগ কুরুক্ষেত্রের পর হইয়াছিল কিনা, বলা যায় না। যে সেনা চীন বা পারস্য বা রুষ জয়ের জন্যও আবশ্যক হয় না, ক্ষুদ্র উদয়পুর জয়ের জন্য ঔরঙ্গজেব বাদশাহ তাহা রাজপুতনায় আনিয়া উপস্থিত করিলেন। একবার মাত্র পৃথিবীতে এরূপ ঘটনা হইয়াছিল। যখন পারস্য পৃথিবীর মধ্যে বড় রাজ্য ছিল, তখন তদধিপতি শের (Xereses) পঞ্চাশ লক্ষ লোক লইয়া গ্রীসনামা ক্ষুদ্র ভূমিখণ্ড জয় করিতে গিয়াছিলেন। থার্ম্মপিলিতে Leonidas, সালামিসে Themistocles এবং প্লাতীয়ায় Paysaunis তাঁহার গর্ব্ব খর্ব্ব করিয়া তাঁহাকে দূর করিয়া দিল, শৃগাল কুকুরের মত শের পালাইয়া আসিলেন। সেইরূপ ঘটনা পৃথিবীতলে এই দ্বিতীয়বার মাত্র ঘটিয়াছিল। বহু লক্ষ সেনা লইয়া ভারতপতি—শেরের অপেক্ষাও দোর্দ্দণ্ড প্রতাপশালী রাজা, রাজপুতনার একটু ক্ষুদ্র ভূমিখণ্ড জয় করিতে গিয়াছিলেন।"

আর রাজসিংহ? বঙ্কিম বলেন, "রাজসিংহের সৈন্য সমাবেশের গুণে (এইটাই সেনাপতির প্রধান কার্য্য) বাঙ্গলার সেনা ও দাক্ষিণাত্যের সেনা বৃষ্টিকালে কপি দলের মত কেবল জড় সড় হইয়া বসিয়া রহিল। মুলতানের সেনা ছিন্ন ভিন্ন হইয়া ঝড়ের মুখে ধূলার মত কোথায় উড়িয়া গেল। বাকি খোদ বাদশাহ দুনিয়ারাজ বাদশাহ আলমগীর।" ঔরঙ্গজেবের বিপুল সেনা সমাবেশের বিপক্ষে রাজসিংহের অপূর্ব্ব সেনা সমাবেশের কথা স্যার যদুনাথ কিছুই বলেন নাই। বঙ্কিম সৈন্যসমাবেশের কথা এই ভাবে বলিয়াছেন,

"চতুর্ভাগে বিভক্ত ঔরঙ্গজেবের মহতীসেনা সমাগত হইলে রণপণ্ডিতের যাহা কর্ত্তব্য রাজসিংহ প্রথমেই তাহা করিলেন। পর্ব্বতমালার বাহিরে রাজ্যের যে অংশ সমতল, তাহা ছাড়িয়া দিয়া পর্ব্বতোপরি আরোহণ করিয়া সেনা সংস্থাপিত করিলেন। তিনি নিজ সৈন্য তিন ভাগে বিভক্ত করিলেন। একভাগ তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র জয়সিংহের কর্তৃত্বাধীনে পর্ব্বত-শিখরে সংস্থাপিত করিলেন, দ্বিতীয় ভাগ, দ্বিতীয় পুত্র ভীম সিংহের অধীনে পশ্চিমে সংস্থাপিত করিলেন; সেদিকের পথ খোলা থাকে, অন্যান্য রাজপুতগণ সেই পথে প্রবেশ করিয়া সাহায্য করেন, ইহাও অভিপ্রেত। নিজে তৃতীয় ভাগ লইয়া পূর্ব্বদিকে নয়ন নামে গিরিশঙ্কট মধ্যে উপবিষ্ট হইলেন।

"আজম শাহ সৈন্য লইয়া যেখানে উপস্থিত হইলেন, সেখানে তো পর্ব্বত মালায় তাঁহার গতিরোধ হইল। আরোহণ করিবার সাধ্য নাই, উপর হইতে গোলা ও শিলা বৃষ্টি হয়। ক্রিয়াবাড়ীর দ্বার বন্ধ হইলে কুক্কুর যেমন রুদ্ধদ্বার ঠেলাঠেলি করে, কিছু করিতে পারে না, তিনি সেরূপ পার্ব্বত্যদ্বার ঠেলাঠেলি করিতে লাগিলেন, ঢুকিতে পারিলেন না।

"রাজসিংহের সৈন্যব্যূহের ফলে দিল্লীশ্বরের অবস্থা হইল জাল নিবদ্ধ রোহিতের মত, কোন মতেই নিস্তার নাই। তিনি প্রত্যাবর্ত্তন করিতে পারেন, কিন্তু তাহা হইলে রাজসিংহ তাহার পশ্চাদ্বর্ত্তী হইবেন। তিনি উদয়পুরের রাজা অতল জলে ডুবাইতে আসিয়াছিলেন সে কথা দূরে থাকুক, এখন উদয়পুরের রাজা তাঁহার পশ্চাৎ করতালি দিতে দিতে ছুটিবে, পৃথিবী হাসিবে। মোগল বাদশাহের অপরিমিত গৌরবের পক্ষে ইহা অপেক্ষা অবনতি আর কি হইতে পারে? ঔরঙ্গজেব ভাবিলেন—সিংহ হইয়া মূষিকের ভয়ে পালাইব? কিছুতেই পলায়নের কথাকে মনে স্থান দিলেন না।

"তারপর বিপদের উপর খাদ্যের অত্যন্ত অভাব। সঙ্গে যাহা ছিল, তাহা তো রাজপুতেরা লুটিয়া লইয়াছে। যে রন্ধ্রপথে সেনা উপস্থিত—সেখানে অন্ন খাদ্যের কথা দূরে থাক, ঘোড়ার ঘাস পর্য্যন্ত পাওয়া যায় না। সমস্ত দিনের পরিশ্রমের পর কেহ কিছু খাইতে পাইল না। বাদশাহ কি বেগমেরাও নয়। ক্ষুধায়, নিদ্রার অভাবে সকলে মৃতপ্রায় হইল, মোগল সেনা বড় গোলযোগে পড়িল।

"এদিকে বাদশাহ উদীপুরী এবং জেবউন্নেসার হরণ সংবাদ প্রাপ্ত হইলেন। ক্রোধে আবিষ্কৃল্য জ্বলিয়া উঠিলেন।

একা সমস্ত সৈনিকদিগকে নিহত করা যায় না, নহিলে ঔরঙ্গজেব তাহা করিতেন। বিবরে নিরুদ্ধ সিংহ, সিংহীকে পিঞ্জরাবদ্ধ দেখিলে যেরূপ গর্জ্জন করে, ঔরঙ্গজেব সেইরূপ গর্জ্জন করিতে লাগিলেন।

"রাত্রি প্রভাতে ঔরঙ্গজেব সৈন্যচালনার আদেশ দিলেন। সেই বৃহত্তীসেনা-তোপ লইয়া চতুরঙ্গটি অতি দ্রুতপদে রন্ধ্র-মুখের উদ্দেশে চলিল। দেখিল, রন্ধ্র মুখ বন্ধ। রাত্রিতে রাজপুতেরা সংখ্যাতীত মহামহীরুহ সকল ছেদন করিয়া পর্ব্বত শিখর হইতে রন্ধ্র মুখে ফেলিয়া দিয়াছে—পর্ব্বতাকার সপল্লব ছিন্ন বৃক্ষরাশি রন্ধ্র মুখ একেবারে বন্ধ করিয়াছে। হস্তী-অশ্বপদাতিক দূরে থাক, শৃগাল কুকুরেরও যাতায়াতের পথ নাই, নির্গমের কোন উপায় নাই।

"ঔরঙ্গজেবের সৈন্যবাহিনী অনেক চেষ্টা করিতেছিল কিন্তু পর্ব্বত শিখর হইতে যে লৌহ ও পাষাণ বৃষ্টি হইতেছিল—শ্রাবণের বর্ষায় যেমন ধান্যক্ষেত্র ডুবিয়া যায়, মোগল সেনা তাহাতে তেমনি ডুবিয়া গেল।

"তারপর বিপদের উপর বিপদ, সম্মুখস্থ পর্ব্বত সানুদেশে রাজসিংহের শিবির। তিনি দূর হইতে মোগল সেনার প্রত্যাবর্ত্তন জানিতে পারিয়া, তোপ সাজাইয়া সম্মুখে প্রেরণ করিলেন।

"রাজসিংহের কামান ডাকিল। বৃক্ষ প্রাচীর লঙ্ঘিত করিয়া রাজসিংহের গোলা ছুটিল—হস্তী, অশ্বপতি, সেনাপতি সব চূর্ণ হইয়া গেল। মোগল সেনা রন্ধ্র মধ্যে হটিয়া গিয়া ক্রুদ্ধ সর্প যেমন অগ্নিভয়ে কুণ্ডলী করিয়া বিবরে লুকায়, মোগল সেনা রন্ধ্র বিবরে সেইরূপ লুকাইল। শাহানশাহ বাদশাহ, হীরক মণ্ডিত শ্বেত উষ্ণীষ মস্তক হইতে খুলিয়া দূরে নিক্ষিপ্ত করিয়া, জানু পাতিয়া, পর্ব্বতের কাঁকর তুলিয়া আপনার মাথায় দিলেন। দিল্লীর বাদশাহ রাজপুত ভুঁইঞার নিকট সসৈন্যে পিঞ্জরাবদ্ধ মূষিক। একটা মূষিকের আহার পাইলেও আপাততঃ তাঁহার প্রাণরক্ষা হইতে পারে।"

বঙ্কিম যে বর্ণনা দিয়াছেন, তাহা কি সত্য, না কাল্পনিক উপন্যাস মাত্র? যুদ্ধ সম্বন্ধে অনেকেই বর্ণনা দিয়াছেন, একদিকে সম্রাটের বেতন ভোগী ওঁমেদারগণ আর এক দিকে মাণুচী, অর্মি, টড ও হিন্দু ঐতিহাসিকগণ। কিন্তু এ বিষয়ে কাহার উক্তি সর্ব্বাপেক্ষা বিশ্বাসযোগ্য? নিশ্চয়ই কোন প্রত্যক্ষ-দর্শীর। এরূপ কেহ কি ছিলেন? হাঁ, ভিনিসীয়ান ডাক্তার মাণুচী ছিলেন। তিনি যুদ্ধক্ষেত্রেই উপস্থিত ছিলেন।

তাঁহার কথিত আখ্যানটী বর্ণনা করিবার পূর্ব্বে পাঠকের বুঝিবার জন্য যুদ্ধের কাল ও অবস্থা দুই ভাগে বিভক্ত করা যাউক :—

(১) ১৬৭৯, নভেম্বর মাস হইতে ১৬৮০ এপ্রিল অবধি—

(২) ১৬৮০ এপ্রিল মাস হইতে ১৬৮২ যে পর্য্যন্ত মোগল সম্পূর্ণরূপে বিপর্য্যস্ত হইয়াছিল।

স্যার যদুনাথ, খাঁফি খাঁ, মাসিরী আলমগিরী, মাণুচী, অর্মি, টড্ সকলেই এই দুইবারের যুদ্ধ সম্বন্ধে একমত।

বঙ্কিমও দুইবারের কথা বলিয়াছেন বটে তবে প্রথমবারের যুদ্ধের বিবরণই উপন্যাস খানির অধিকাংশ জুড়িয়া রহিয়াছে। যাহা হউক, প্রথমতঃ আমরা উপরোক্ত প্রথম বারের (নভেম্বর ১৬৭৯ হইতে ১৬৮০, এপ্রিল পর্য্যন্ত) অবস্থাই বলিব। বঙ্কিমের উক্তি যাহা দিয়াছি তাহাও প্রথম বারের অবস্থাই দিয়াছি। যে মাণুচী নিজে যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত ছিলেন, তিনি বলেন—

"রাণা যখন ঔরঙ্গজেবের সকল দাবীতেই দৃঢ় ও বিনীত ভাবে 'না' বলিয়া উত্তর দিলেন, বাদশাহ তখন দাক্ষিণাত্য হইতে মজ্জমকে ও দিলির খাঁকে আনিয়া, শিবাজীর প্রতিরোধ করিবার জন্য শুধু বাহাদুর খাঁকে পাঠাইলেন, তারপর শাহ আলাম সহ আমরা রানাসাগরের সন্নিকটে তাঁবু স্থাপন করি। We encamped near a great lake called Ranasagar, that is to say, made by the Rana. p. 239. II। বাঙ্গলা হইতে আসিলেন আজম খাঁ আর মুলতান হইতে আসিলেন আকবর। তাঁহার সঙ্গে তাহবার খাঁও আসেন।"

সৈন্য সমাবেশ সম্বন্ধে মাণুচী বলেন, "আশ্চর্য্য, যে নিজে যুদ্ধ করিতে ইচ্ছুক নয়, তাহার বিরুদ্ধে এরূপ বিরাট বাহিনীর পরিচালনার কি আবশ্যকতা?"

"Thus for this campaign Aurongzeb put in pledge the whole of his Kingdom, and the people were astounded at the whole realm being turned upside down for a war against a King who did not want to fight, who only relied upon the rights of his fore fathers and at the same time intended only to defend himself against the Mogul without undertaking the task of overthrowing him."

এই সব কার্য্যে রাজসিংহের যে মহত্ব প্রকটিত, এবং বঙ্কিমচন্দ্র যাহা বর্ণনা করিয়াছেন স্যার যদুনাথ রাজসিংহের ভূমিকায় কোনস্থানেই তাহা উল্লেখ করেন নাই। বঙ্কিম আরও লিখিয়াছেন—ঔরঙ্গজেবের আগমন বার্ত্তা শুনিয়া রাজসিংহ রাজধানী ছাড়িয়া পর্ব্বত শৃঙ্গে আরোহণ করিলেন। কিন্তু প্রাসাদে কার্পেটের বন্দোবস্ত পূর্ব্ববৎই রাখিতে বলিলেন। যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে মাণুচী বলেন—রাণা আবার ঔরঙ্গজেবকে অনুরোধ করিয়া পাঠান যে, সম্রাট যেন আর অগ্রসর না হয়েন। কিন্তু সম্রাট সে কথায় কর্ণপাতও করেন না, বরং সমগ্র দেবালয় মন্দিরাদি ধ্বংস এবং গোহত্যার আদেশ দেন। মাণুচী বলেন—হায়! বাদশাহ, রাণার মহত্বের মূল্য বুঝিলেন না—"But the Rana proved to him one day how easily he could destroy him and yet how much he desired his friendship." p. 241, II রাণা হাতে পাইয়াও যে, বেগম সহ বাদশাহকে ছাড়িয়া দিলেন তাহাতে সম্রাট মনে করিলেন যে, রাণা তাঁহার ভয়ে ভীত হইয়া এই সব আয়োজনই করিয়াছেন।

বঙ্কিমের কথা যে মাণুচী কর্ত্তৃক সমর্থিত হইয়াছে তাহা প্রমাণ করিবার সঙ্গে সঙ্গেই আমাদের বিচার করিবার সময় আসিয়াছে যে, (১) স্বয়ং ঔরঙ্গজেব যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত ছিলেন কি না, (২) উদীপুরী বেগম তাঁহার সঙ্গে সেবারে আসিয়াছিলেন কি না, (৩) তাঁহারা উভয়ে বন্দী হইয়াছিলেন কি না, এবং (৪) রাণা মহত্ত্ব বশতঃ তাঁহাদিগের রসদের বন্দোবস্ত করেন কি না এবং (৫) নিরাপদ ভাবে তাঁহাদিগকে পাঠাইয়া দেন কি না। বঙ্কিম লিখিয়াছেন যে, এই সমস্ত ঘটনাই ঘটিয়াছিল। কিন্তু স্যার যদুনাথ বলেন, এই সব কথা সত্য নহে, উপন্যাস মাত্র। এই সব ঘটনা সত্য হইলে রাজসিংহ এক জন আদর্শ বীর। কিন্তু সত্যের বিচার মাসিরী আলমগিরী ও খাপি খাঁর মুনতা খাবুল-লুবাব হইতে কিছুতেই হইতে পারে না। প্রথমতঃ রাজপুত বিদ্বেষী এই সমস্ত লেখকেরা বাদশার এই অসম্মান জনক ব্যাপারের উল্লেখ করিয়া লেখনী কলুষিত করিবেন কেন? দ্বিতীয়, ঔরঙ্গজেবের পরম শত্রু মহারাণার গুণগ্রামই বা তাহারা প্রকাশ করিবেন কেন। তৃতীয়তঃ, রাজসিংহকে mean spirited, infidel, reptile of the jungles কি [illegible] অন্য কোন মধুর বিশেষণে যাহারা বিভূষিত করিতে চান না, তাহারা যে বিদ্বেষ বুদ্ধি প্রণোদিত হইয়াই লিখিবেন তাহাতে আর বিচিত্র কি?

তাই বঙ্কিম বলিয়াছেন—

"মুসলমান ইতিহাস লেখকেরা অত্যন্ত স্বজাতি পক্ষপাতী, হিন্দুদ্বেষক; হিন্দুদিগের গৌরবের কথা প্রায় লুকাইয়া থাকেন—বিশেষতঃ মুসলমানদের চিরশত্রু রাজপুতদিগের কথা।"

আচ্ছা, দেখা যাউক, এইবারেও যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত ব্যক্তিগণের মধ্যে মানুচীর মুখে কিরূপ শুনা যায়। মানুচী বলিতেছেন:—

"রাণা এমন ভাবে গিরিবর্ত্মগুলি বন্ধ করিয়া দেন যে, মোগল চতুর্দ্দিকে গিরিমালায় বেষ্টিত হইয়া বহিঃপ্রবেশের আর পথ খুঁজিয়া পাইলেন না। তিনি এখন শৃঙ্খলাবদ্ধ সিংহের ন্যায় শেষ সময়ের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। হায়, তাঁহার প্রিয়তমা সঙ্গিনী উদীপুরীরও কোন সংবাদ পাইলেন না। তবে কি উদীপুরী শত্রুর হস্তে বন্দিনী? আর তাহাকে উদ্ধার করা যাইবে না? আর রসদই বা কোথায়, খাইব কি?"

কিন্তু রাণা রসদও দিলেন, উদীপুরীও প্রত্যর্পণ করিলেন। কিন্তু সম্রাট কি তাহাতে নিবৃত্ত হইলেন? না, বরং পুত্রগণকে তিনি আরও তীব্রভাবে যুদ্ধের গতি প্রবাহিত করিতে আদেশ দিয়া স্বয়ং আজমীর চলিয়া গেলেন।*"

* Rana barred the roads in such way that the Muguls being now surrounded by mountains could find no exit—Aurongzeb was amazed at finding himself by one stroke thus encircled, unable to move either forward or backward. He knew like wise that if the Rana upto that time had made no movement against his person, it was not because he could not, but because he would not. Still more was he alarmed when he found that his beloved Udepuri put in no appearance, nor was there slightest news of her. Neither was there word of any supplies. The Rana to show that he did not want to fight sent him supplies from his own country. He allowed him to suffer hunger for one day so that hunger might inspire him with good sense. Thus Aurongzeb, as well as his army had to content himself with a little khechari.

Then in the evening the Rana sent in the Mogal's wife (Udepuri Begum) in the company of his soldiers again begging him as a favour to withdraw and leave his kingdom in peace...But

not for such courtesies would Aurongzeb rafrain from his fixed purpose; on the contrary he sent order upon order to his sons and generals to penetrate further and further. He himself withdrew to Ajmir, so as not to incurr again any such fortune. p. 242, vol II.

এই সমস্ত কথাই প্রথম বারের কথা। এ-কথা বঙ্কিম লিখিয়াছেন, মান্থচী লিখিয়াছেন এবং অর্ম্মিও নিম্নলিখিত ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন—

"In the meantime Aurongzeb was carrying on the war against the Ranah of Chitore and the Rajah of Marwar, who on the approach of his army had abandoned the accessable country and drew their herds and inhabitants into the vallies, within the mountains; the army advanced amongst the defiles with incredible labour and went with so little intelligence that the division which moved with Aurongzeb himself, was unexpectedly stopped by insuperable defences and precipices in front; whilst the Rajputs in one night closed the straights in his rear, by pelling the overhanging trees and from their stations above, prevented all endeavours of the troops either within or without, from removing the obstacle. Udepuri the favourite and circassian wife of Aurongzeb accompanied him in his arduous war and with her retinue and escort was enclosed in another part of the mountains; her conductors dreading to expose her person to danger or public view, surrendered. She was carried to the Ranah, who received her with homage and every attention. Meanwhile the emperor himself might have perished by famine, of which the Ranah let him see the resque by a confinement of two days; when he ordered his Rajputs to withdraw from their stations, and suffer the way cleared. As soon as Aurongzeb was out of danger, the Ranah sent back his wife accompained by a chosen escort who only requested in return—"

সুতরাং দেখিতেছি অর্ম্মিও, মান্থচীকেই সমর্থন করিয়াছেন। হইতে পারে অর্ম্মি মান্থচী হইতে ইহা লইয়াছেন। কিন্তু অর্ম্মির ন্যায় অনুসন্ধিৎসু এত বড় পণ্ডিত যদি মান্থচীকে authority বলিয়া স্বীকার করিতে পারেন, তবে তো মান্থচীর উক্তি যে গ্রহণযোগ্য তাহাই প্রমাণিত হয়।

এই পর্য্যন্ত প্রথম যুদ্ধের কথা। টডেরও অনুরূপ বিবৃতি। কিন্তু এই সম্বন্ধে স্যার যদুনাথ বলিয়াছেন যে, টডের কথা বিশ্বাসযোগ্য নহে। টড্ যে বহু গবেষণা ও অনুসন্ধান করিয়া সমগ্র রাজপুতনা ঘুরিয়া ও কাগজপত্র দেখিয়া লিখিয়াছেন তাহা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, তথাপি "চারণের সঙ্গীত" বলিয়া টড্‌কে যদি উপেক্ষা করিয়াই ছাড়িয়া দিই, কিন্তু মান্থচী ও অর্ম্মি যে বঙ্কিমচন্দ্রকে সম্পূর্ণরূপে সমর্থন করিয়াছেন—স্যার যদুনাথের সেই কথার কি উত্তর রহিয়াছে? "রাজসিংহের ভূমিকায়" তিনি মান্থচী ও অর্ম্মির কথার প্রত্যুত্তর করিলেন না কেন? কিন্তু এই যে প্রথম যুদ্ধ—যাহাতে কথায় কথায় রাজসিংহের বীরত্বের পরিচয় পাওয়া যায়, স্যার যদুনাথ সেই অদ্ভুত কাহিনী কি ভাবে বিবৃত করিয়াছেন? তিনি কি উহা মানিষী ও থাঁপি থাঁর প্রতিধ্বনি করিয়া রাণার পরাজয় কাহিনীই ঘোষণা করেন নাই? রাজসিংহের ভূমিকায় তিনি বলিয়াছেন,

"ঔরঙ্গজেব স্বয়ং প্রথম আক্রমণ করিলেন। ১৬৭৯ সালের নভেম্বর-এর শেষ দিন আজমীর ত্যাগ করিয়া উদয়পুরের দিকে অভিযান চালাইলেন। ৪ঠা জানুয়ারী, ১৬৮০ মোগল সৈন্য জনশূন্য দেবারী গিরিশঙ্কট দখল করিল এবং তাহার কয়েক দিন পরে নির্ব্বিবাদে উদয়পুরে প্রবেশ করিল। মহারাণা তখন সসৈন্যে উদয়পুরের উত্তর পশ্চিমে…কমলমীর প্রদেশে লুক্কায়িত। উদয়পুর হইতে বাদশাহ সৈয়দ হাসান আলিখাঁকে একদল সৈন্য সহ এই পর্ব্বত মধ্যে পাঠাইলেন এবং তিনি অতি দৃঢ়তা ও দক্ষতার সহিত এই সাহায্যশূন্য অজ্ঞাত শত্রু অঞ্চলে নিজেকে বাঁচাইয়া এক যুদ্ধে মহারাণাকে হারাইয়া তাঁহার শিবির ও পথে রসদ লুট করিলেন। এই বিজয়কালে উদয়পুরে ১৭৩টী ও চিতোরে ৬৩টা মন্দির ভাঙ্গিয়া ফেলা হইল। তাহার পর মেবারপতন সুসম্পন্ন ভাবিয়া বাদশাহ আজমীরে ফিরিয়া গেলেন। পুত্র আকবরকে চিতোরে ঘাটি করিয়া সৈন্য সহিত মেবার দখলের জন্য রাখিয়া গেলেন (মার্চ্চ মাসের শেষ)

আর হিষ্টি অব ঔরঙ্গজেবেও লিখিয়াছেন—

Aurangzeb with his usual promptitude struck the first blow. He left Azmir (30th Nov, 1679) ....Hassan Ali was reinforced and freshly provisioned and inflicted a defeat on the Maharana (22nd January) capturing his camp and property and much grain on the way and destroying 173 temples in the environs of Udaipur. Chitor had been already occupied by the Moghuls and 63 temples of the place were destroyed when Aurangzeb visited it at the end of February. The power of Mewar having been seemingly crushed and its ruler being a fugitive among the hills, the emperor left Udaipur and returned to Azmir (on 22nd March), while a strong force under Prince Akbar held Chitor district as a base.

অর্থাৎ রাণা যেখানে কেবল জয়লাভই করেন নাই, পরন্তু মাহাত্ম্যের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছেন স্যার যদুনাথ সেই স্থলে মাসিরী আলমগিরীর প্রতিধ্বনি করিয়া রাণাকে পরাজক সাব্যস্ত করিয়াছেন, ঔরঙ্গজেবকে বিজয়ী স্থির করিয়াছেন ও

মেবার পতন কাহিনী বিবৃত করিয়া হিন্দুর প্রকৃত গৌরবে মসী ঢালিয়া দিয়াছেন। তবে, অতঃপরে রাণা যে বাধ্য হইয়া মাসিরী বর্ণিত সন্ধি করিলেন অথবা খাঁপি খাঁ বর্ণিত সত্য পালনে স্বীকৃত হইলেন সেইটুকুই বা স্যার যদুনাথ বাদ রাখিলেন কেন তাহা বুঝা যায় না। স্যার যদুনাথ যে মাসিরীকে কিরূপ অনুকরণ করিয়াছেন দুই একটি স্থান উদ্ধৃত করিয়া পরিচয় দিতেছি। মাসিরী বলেন—

On 6th January 1680, destruction of temples at Udaipur took place. These edifices were among the wonders of the age and had been erected by the infidels to the ruin of their souls and the loss of their wealth. Stephan VII. p. 187.

স্যার যদুনাথ বলেন—

"Even the capital Udaipur was found evacuated. The Moguls took possession of it and destroyed its temples" one of the wonders of the age and a building that had cost the infidels much money." Histroy of Aurangzeb p. 384, Part III.

এখন দেখা যাউক, সত্যই কি স্যার যদুনাথ মূল বিবরণিতেও মাসিরীকে অনুকরণ করিয়াছেন?

মাসিরী আলমগিরীতে রাজসিংহের জয়ের কথা দূরে থাকুক পরাজয়ই বরং ব্যক্ত হইয়াছে। মাসিরীতে আছে—

On the 12th Zi-l hijja 1090 A. H (6th January, 1680). মহম্মদ আজম এবং খান জাহান বাহাদুর উদয়পুর প্রবেশের অনুমতি লাভ করেন। রুহুল্লা খাঁন ও ইক্কাতাজ খাঁন কাফেরদের মন্দির ধ্বংস করেন।

২৪শে জানুয়ারী, ১৬৮০—সম্রাট রাণা বিনির্মিত উদয়সাগরে আগমন করেন। হিন্দুমন্দির ধ্বংসের অনুমতি দেন। কিছুদিন পরে হোসেন আলি খাঁ গিরিবর্ত্ম হইতে আসিয়া রাণাকে আক্রমণ করিয়া তাঁহার সৈন্যদল বিধ্বস্ত করেন ও অনেকগুলি মন্দির ধ্বংস করেন।

সম্রাট অতঃপরে চিতোরের দিকে অগ্রসর হন ও মন্দির ধ্বংস করেন।

রাণা জন্মভূমি হইতে বিতাড়িত এবং অপারগ হইয়া সন্ধি করেন। অতঃপরের ঘটনা আমরা Stephen's History VII. হইতে মাসিরীর ফারসী তাহার লিখিত উক্তির নিম্নলিখিত প্রামাণ্য অনুবাদটী পাঠকগণকে উপহার দিলাম,

The Rana had now been driven forth from his country and home. The victorious Ghazis has struck many a blow, and the heroes of Islam had trampled under their chargers' hoofs the land which this 'reptile of the jungles' and his predecessors had possessed for a thousand years. He had been forced to fly to the very limit of his territories. Unable to resist any longer, he saw no safety for himself but in seeking pardon. Accordingly he threw himself on the mercy of Prince Mohammed Azam and implored his intercession with the King, offering the Parganas of Mandil, Pur and Badhanor in lieu of the Jiziya. By this submission he was enabled to retain possession of his country and his wealth. The Prince touched with compassion for the Ranas forlorn state used his influence with His Majesty and this merciful monarch, anxious to please his son lent a favourable ear to these propositions. An interview took place at the Raj Sambar Tank on the 17th of Jumada-l-akher between the Prince and the Rana to whom Dilir Khan and Hasan Ali Khan had been deputed. The Rana made an offering of 500 ashrafis and eighteen horses with caparisons of gold and silver and did homage to the Prince, who desired him to sit on his left. He received in return a Khilat, a sabre, dagger, charger and elephant. His title of Rana was acknowledged and the rank of Commander of 5000 conferred on him.

এইতো মাসিরী আলমগিরীর নমুনা। অর্থাৎ তাঁহার বর্ণনায় রাণার সবই যাইত, কেবল বাদশাহজাদা আজমের অনুকম্পায় রক্ষা পায়।

খাঁপি খাঁও প্রায় মাসিরীর ন্যায় রাণাকে পরাজিত শত্রুর ন্যায়ই ব্যবহার করিয়াছেন। তিনি বলেন—

"ঔরঙ্গজেবের শাসনের দ্বাবিংশ বৎসরে দুর্বিনীত রাজপুতগণকে উপযুক্ত দণ্ডবিধান করিবার জন্য তিনি আজমীর হইতে যাত্রা করেন। বাদশাহ দাবী করিয়া পাঠান যে, রাণাকে জিজিয়া কর প্রদান ও যোধপুর রাজা হইতে যশোবন্ত সিংহের তথাকথিত পুত্রদ্বয়কে বাদশার হস্তে অর্পন করিতে হইবে। রাজসিংহ ক্ষমা চাহিয়া বলেন যে, উক্ত পুত্রদ্বয় তাহার নিকট হইতে কোন সাহায্যই পায় নাই, আর তিনি জিজিয়া কর দিতে বশ্যতা স্বীকার করিয়া প্রতিশ্রুত হন যে, উহার পরিবর্তে তিনি কয়েকটী পরগণা দিতে প্রস্তুত আছেন। ঔরঙ্গজেব খান জাহানকে সব

বন্দোবস্ত পাকা করিতে উপদেশ দিয়া দিল্লী চলিয়া আসেন। এই সব বন্দোবস্ত করিতে ৭।৮ মাস লাগে।"

খাঁপি খাঁর এই ৭।৮ মাসই স্তার যদুনাথ কথিত ১৬৭৯ সালের নভেম্বর হইতে ১৬৮০ সালের এপ্রিল পর্য্যন্ত। এই বিবরণে বিজয়ী বাদশাহের বিজয় অভিযানের কথাই সূচিত হয়।

এখন নিরপেক্ষ পাঠকই বলুন, কাহার কথা বিশ্বাস করিবেন—রাজপুতদ্বেষী মোগলের প্রসাদভোজী মুস্তাফা খাঁ ও খাঁপি খাঁর বিবরণ না নিরপেক্ষ মানুচী অর্ম্মি ও টডের ইতিবৃত্ত। স্তার যদুনাথ অনুসরণ করিয়াছেন—প্রথমোক্ত ব্যক্তিদ্বয়কে আর বঙ্কিমচন্দ্র করিয়াছেন—দ্বিতীয় শ্রেণীর ঐতিহাসিকগণকে। ইঁহারা পরস্পর বিপরীত দিকে অগ্রসর হইয়াছেন। বিপরীতগামী ইতিহাসজ্ঞ স্তার যদুনাথ বঙ্কিমচন্দ্রকে বুঝিবেন কি প্রকারে? তাই আমরা জিজ্ঞাসু হইয়াছিলাম যে, এই অবস্থায় স্তার যদুনাথের রাজসিংহের ভূমিকা লিখিবার যোগ্যতা আছে কি না? বস্তুতঃ বিপরীত পন্থী ব্যক্তির নিকট হইতে কখনই সরল সত্য সম্ভব নয়। তাই যখন স্তার যদুনাথ সম্পূর্ণরূপে বঙ্কিচন্দ্রের বিপরীত উক্তি বিবৃত করিয়া ও রাজসিংহের ও মেবারের পতন উল্লেখ করিয়া সঙ্গে সঙ্গেই আবার বলেন, "বঙ্কিম কল্পনার বেগে সত্যকে অতিক্রম করেন নাই, সত্যকে জীবন্ত আলোকে উদ্ভাসিত করিয়াছেন মাত্র।"* আমাদের যেন মনে হয় তিনি বোধ হয় কাহারও অনুরোধে জোর করিয়াই কথাগুলি বলিতেছেন কারণ ইহা তাহার মনের কথা হইলে, নিশ্চয়ই তিনি বঙ্কিমের বিপরীত উক্তি করিয়া বঙ্কিম বর্ণিত ইতিহাস মিথ্যা বলিয়া প্রমাণিত করিতেন না।

সুতরাং দেখিতেছি, স্তার যদুনাথ ১৬৭৯ সালের নভেম্বর হইতে ১৬৮০ সালের মার্চ্চ পর্য্যন্ত রাণার যে পরাজয় কাহিনী বর্ণনা করিয়াছেন তাহা নিরপেক্ষ ইতিহাস অনুমোদিত নয়। রাণা রাজসিংহ ঔরঙ্গজেবের নিকট কখনও পরাভূত হয় নাই। দ্বিতীয়তঃ, রাণা যে সবেগম ঔরঙ্গজেবকে বন্দী করিয়া ছাড়িয়া দেন এই ঐতিহাসিক ঘটনার সত্যতা স্বীকার না করিয়া বঙ্কিমচন্দ্রের রাজসিংহের উপর যৎপরোনাস্তি অবিচার করিয়াছেন।

* ভূমিকা পৃষ্ঠা ৶০, ৫ লাইন।

রাজসিংহ ঔরঙ্গজেবকে পিঞ্জিরাবদ্ধ করিয়া পরে যে ছাড়িয়া দিলেন, সেই সময়ে বঙ্কিম একটী সন্ধির কথা বলিয়াছেন। মাসিরী আলমগিরী এবং খাঁপি খাঁ বিবরণ অন্য ভাবে দিলেও বঙ্কিমের কথিত সন্ধিটী হইয়াছিল বলিয়াই মনে হয়। নিম্নলিখিত ভাবে বঙ্কিম সন্ধির কথা বলিতেছেন,

মানিকলাল আসিয়া রাজসিংহকে বলিতেছে—

"এখানে তো কোন কাজ নাই, কাজের মধ্যে ক্ষুধা ও মোগলদিগের শুষ্ক মুখ দেখা ও আর্ত্তনাদ শোনা।

রাণা বলিলেন—"অতএব, তোমার বিবেচনায় এই মোগল সেনাকে অনাহারে মারিয়া ফেলা অকর্ত্তব্য।"

মানিক, "বোধ হয়। যুদ্ধে লক্ষজনকে মারিলেও দেখিয়া দুঃখ হয় না। বসিয়া বসিয়া অনাহারে একজন লোকও মরিলে দুঃখ হয়।"

রাণা—"তবে উহাদিগের সম্বন্ধে কি করা যায়?"

মানিক—"মহারাজ! আমার এত বুদ্ধি নাই যে আমি এমন বিষয়ে পরামর্শ দিই। আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে সন্ধি স্থাপনের এই উত্তম সময়। জঠরাগ্নির দাহের সময়ে মোগল যেমন নরম হইবে, ভরাপেটে তেমন হইবে না। আমার বোধ হয় রাজমন্ত্রিগণ ও সেনাপতিগণকে ডাকিয়া পরামর্শ করিয়া এ বিষয়ে মীমাংসা করা ভাল।"

রাজসিংহ এ প্রস্তাবে সম্মত ও স্বীকৃত হইলেন।... দয়াল সাহ প্রভৃতি সমস্ত অমাত্যবর্গকে বুঝাইলেন এবং নিম্নলিখিত সর্ত্ত সমেত একখানি পত্র পাঠাইলেন—

"বাদশাহ সমস্ত সৈন্য মেবার হইতে উঠাইয়া লইয়া যাইবেন, মেবারে গোহত্যা ও দেবালয় ভঙ্গ নিবারণ করিতে এবং জিজিয়ার কোন দাবী করিবেন না। তাহা হইলে রাজসিংহ পথ মুক্ত করিয়া দিবেন, নিরুদ্বেগে বাদশাহকে যাইতে দিবেন।"

পত্র সভাসদ্ সকলকে পাঠ করিয়া শুনান হইল। শুনিয়া মানিকলাল বলিল, "বাদশাহের স্ত্রী কন্যা আমাদিগের হাতে বন্দী আছে। তাহারা কি থাকিবে?"

বলিবামাত্র সভামধ্যে একটা হাসির ঘটা পড়িয়া গেল। সকলে একবাক্যে বলিল, "ছাড়া হইবে না।"

কেহ বলিল, "থাক্, উহারা মহারাণার আশ্রিত

খাটাইবে।" কেহ বলিল "উহাদের ঢাকায় পাঠাইয়া দেও, হিন্দু হইয়া বৈষ্ণবী সাজিয়া হরিনাম করিবে।" কেহ বলিল, 'উহাদের মূল্য স্বরূপ এক ক্রোর টাকা বাদশাহ দিবেন।' ইত্যাদি নানাপ্রকার প্রস্তাব হইল। মহারাণা বলিলেন, "দুইটা মুসলমান বাঁদীর জন্য সন্ধি ত্যাগ করা হইবে না। সেই দুইটাকে ফিরাইয়া দিব, লিখিয়া দাও।"

সেইরূপ লেখা হইল। পত্রখানি মাণিকলালের জেম্মা হইল। তখন সভা ভঙ্গ হইল।

এই সন্ধির কথা আর যদুনাথ কিছু লেখেন নাই, লিখিতেও পারেন না। কারণ তিনি প্রথম বারের ঘটনায় মাসিরীর অনুকরণে রাজসিংহেরই পরাজয় ঘোষণা করিয়াছেন। বিজিত ব্যক্তি তো আর ইচ্ছানুরূপ সর্ত্ত দিতে পারে না।

তবে এইরূপ সন্ধি যে খুবই স্বাভাবিক তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। কারণ স-বেগম সম্রাট রাণার বান্দী, মুক্তি ও রসদের জন্য রাণার নিকট কৃপাপ্রার্থী। এ সম্বন্ধে অর্ম্মি বলিতেছেন—

Rana sent back his (Aurongzeb's) wife accompanied by a chosen escort who only requested in return that he would refrain from destroying the sacred animals of their religion which might still be left in the planes.

মানুচীও লিখিতেছেন,

In the evening the Rana sent in the Mogul's wife (Udepuri Begum) in the company of his soldiers again begging him as a favour to withdraw and leave his Kingdon in peace...this would have been enough to pacify the most barbarous of kings enraged by some great insult or another which he had received; while, on the contrary, this was a king unjustly assailed who yet granted life to his enemy when he could have killed him with impunity. But not for such courtesies would Aurongzeb refrain from his fixed purpose. On the contrary he sent order upon order to his sons and generals to penetrate further and further.

অতঃপরে বঙ্কিম লিখিয়াছেন,

উক্ত সন্ধিপত্রে স্বাক্ষরের পরে রাজসিংহ সন্ধিপত্র পাইয়া মোগল সেনা মুক্তি দিবার আজ্ঞা প্রচার করিলেন। রাজপুতেরা হাতী লাগাইয়া গাছসকল টানিয়া বাহির করিল। মোগলেরা হঠাৎ আহার্য্য কোথায় পাইবে, এইজন্য রাজসিংহ দয়া করিয়া বহুতর হাতীর পিঠে বোঝাই দিয়া অনেক আহার্য্যবস্তু উপঢৌকন প্রেরণ করিলেন এবং শেষে উদীপুরী, জেব-উন্নেসা ও মোবারককে তাঁহার নিকটে পাঠাইয়া দিবার জন্য উদয়পুরে আদেশ পাঠাইলেন। তখন নির্ম্মল, চঞ্চলকে ইঙ্গিত করিয়া কাণে কাণে বলিল—"বেগম তোমার দাসীপণা করিল কৈ ?"

এই বলিয়া নির্ম্মল উদীপুরীকে বলিল—"আমি যে নিমন্ত্রণ করিতে দিল্লী গিয়াছিলাম, সে নিমন্ত্রণ রক্ষা করিলেন না ?"

উদিপুরী বলিল "তোমার জিভ আমি টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া কাটিব। তোমাদের সাধ্য কি যে আমাকে দিয়া তামাকু সাজাও ?"—ইত্যাদি

এই সবই উপন্যাস মাত্র, পড়িলেই বুঝা যায়।

এইবার দ্বিতীয় বারের যুদ্ধ। এই যুদ্ধ সম্বন্ধে টড্ বলেন—

In Mewar the contest terminated with the expulsion of the Imperialists from the country and Aurongzeb was beaten and compelled to disgraceful flights with an immense loss in men and equipment, and on their continued success the Rana and his allies medicated the project of dethroning the tyrant and setting up his son Akbar in his place.

অর্থাৎ, আওরঙ্গজেব সম্পূর্ণ পরাজিত হইলেন, অনেক সৈন্য ও অস্ত্রশস্ত্র হারাইলেন এবং মোগলসৈন্য মেওয়ার হইতে সম্পূর্ণভাবে তাড়িত হইল।

এখন, দ্বিতীয় যুদ্ধ কেন হইল ? বঙ্কিম বলিতেছেন,

"রাজসিংহ যাহা যাহা চাহিয়াছিলেন ঔরঙ্গজেব সকলই দিতে সম্মত হইলেন···

তারপর ঔরঙ্গজেব আমদরবারে বসিয়া আপনার অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন। বলিলেন, আমরা ফাঁদে পড়িয়াই সন্ধি স্থাপন করিয়াছি। সে সন্ধি রক্ষণীয় নহে। ক্ষুদ্র একজন ভুঁইয়া রাজার সঙ্গে বাদশাহের আবার সন্ধি কি ? আমি সন্ধিপত্র ছিঁড়িয়া ফেলিয়াছি। বিশেষ সে রূপনগরের কুমারীকে ফেরৎ পাঠায় নাই। রূপনগরীকে তাহার পিতা আমাকে দিয়াছে। অতএব, রাজসিংহের তাহাতে অধিকার নাই। তাঁহাকে ফিরাইয়া না দিলে, আমি রাজসিংহকে ক্ষমা করিতে পারি না। অতএব যুদ্ধ যেমন চলিতেছিল, তেমনই চলিবে।

রাণার রাজ্যমধ্যে গরু দেখিলে মুসলমান তাহা মারিয়া ফেলিবে, দেবালয় দেখিলেই তাহা ভগ্ন করিবে এবং জিজিয়া সর্ব্বত্রই আদায় হইবে।

অর্ম্মি এবং মানুচীও তাহাই লিখিতেছেন। অর্ম্মি লিখিতেছেন—

But Aurongzeb who believed in no virtue but self-conciet imputed the generosity and forbearance of the Ranah to the fear of future vengence and continued the war. Soon after he was again well-nigh enclosed in the mountains. The second experience of difficulties beyond his age and constitution and the arrival of his sons Azim and Akbor, determined him not to expose himself any longer in the field; but to leave its operations to their conduct, superintended by his own instructions from Azmer, to which city he retired with the households of his family, the officers of his court and his body-guard of 4000 men, dividing the army between his two sons, who each had brought a considerable body of troops from their respective governments. They continued the war each in a different part of the country and neither at the end of the year had forced the ultimate passes of the mountains. p. 86

Aurongzeb withdrew to Azmer, so as not to incur again any evil fortune. Leaving himself with no more than two thousand men, made up of house-hold slaves and clerks, he divided up his forces and sent them to all four quarters to invade without hesitation. But the sons and generals more prudent than Aurongzeb himself perpetually made excuses for they knew how easy it is to get into a labyrinth, yet how difficult to follow it up to the appointed limit and then return by the same route. They knew the mishap that had happened to the king himself. Yet, he in his over boldness, would not agree to desist from the enterprise, and insisted on carrying all before him.

মানুচী এইবারেও শাহ আলমের সঙ্গে যুদ্ধক্ষেত্রে আসিয়াছিলেন।

এই দ্বিতীয়বারের যুদ্ধ সম্বন্ধে বঙ্কিম লিখিয়াছেন—

"আবার স্বয়ং ঔরঙ্গজেব রাজসিংহের সর্ব্বনাশ করিতে প্রস্তুত হইলেন। আজিম আসিয়া ঔরঙ্গজেবের সঙ্গে মিলিত হইয়াছিল। রাজসিংহ বিখ্যাত মাড়বারী দুর্গাদাসের সঙ্গে মিলিত হইয়া ঔরঙ্গজেবকে আক্রমণ করিলেন। ঔরঙ্গজেব পুনশ্চ পরাজিত ও অপমানিত হইয়া বেত্রাহত কুক্কুরের ন্যায় পলায়ন করিলেন। রাজপুতেরা তাঁহার সর্ব্বস্ব লুঠিয়া লইল। ঔরঙ্গজেবের বিস্তর সেনা মরিল।

"ঔরঙ্গজেব ও আজিম ভয়ে পলাইয়া রাণাদিগের পরিত্যক্ত রাজধানী চিতোরে গিয়া আশ্রয় লইলেন। কিন্তু সেখানেও রক্ষা নাই। সুবলদাস নামক একজন রাজপুত সেনাপতি পশ্চাতে গিয়া চিতোর ও আজমীরের মধ্যে সেনা স্থাপন করিলেন। আবার আহার বন্ধের ভয়। অতএব বারো হাজার ফৌজের সহিত সুবলদাসের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে পাঠাইয়া দিয়া ঔরঙ্গজেব স্বয়ং আজমীরে পলায়ন করিলেন। আর কখনও উদয়পুর মুখ হইলেন না।"

এই দ্বিতীয় বারের যুদ্ধের সম্বন্ধে খাঁপি খাঁ ও স্যার যদুনাথ যাহা দিয়াছেন তাহাতে বঙ্কিমের বিবরণীর সঙ্গে কিছু কিছু মিলিলেও অনেক কথারই উল্লেখ নাই। ঔরঙ্গজেব যে এবারও চিতোরে আশ্রয় লয়েন, আবার আহার বন্ধের ভয় হয়, এই সব কথার উল্লেখ নাই।

এই দুইবারের যুদ্ধ স্বতন্ত্র ভাবে পড়িতে হইবে। এবং পুনরুক্তি হইলেও আবার বলিতেছি যে, প্রথম বারের ঔরঙ্গজেবের স-বেগম অবরুদ্ধ ও রাণাকর্ত্তৃক মুক্ত হওন ও তৎপরে সবেগে আজমীরে প্রস্থান প্রভৃতি ঘটনায় রাজসিংহের বীরত্ব ও মহানুভবতা যে প্রকটিত স্যার যদুনাথ তাহা দেখান নাই।

দ্বিতীয়বারও যে ঔরঙ্গজেব স্বয়ং আসিয়া পরাজিত হয়েন সে কথাও নাই।

তবে দ্বীতীয়বার যুদ্ধ বিগ্রহে রাজসিংহের বীরত্বের বিষয় একেবারে অনুক্ত রাখেন নাই। তবে যে ভাবে দিয়াছেন, তাহাতে রাজসিংহের ন্যায় বীর চরিত্রের বিশেষত্ব কিছুই পাওয়া যায় নাই। তিনি লিখিয়াছেন—

(১) বাদশাহ আজমীরে ফিরিয়া যাইবার পর হইতেই এপ্রিল মাসে রাজপুতদের আক্রমণ দ্বিগুণ বেগে আরম্ভ হইল এবং খুব সফলতা লাভ করিল।

(পূর্ব্বে ঔরঙ্গজেব থাকিতে যেন ভয়ে তাহারা পালাইয়া গিয়াছিলেন !)

(২) মহারাণা আকবরকে অতর্কিতে আক্রমণ করিয়া লোক হানি করিলেন। (যেন ভীরুর স্থায় !)

(৩) আকবর মাড়বারে বদলী হইলেন।

(৪) মজম ও আজম আসিল, তাহাদের চেষ্টা বিফল হইল।

(৫) দুর্গাদাস ও রাজসিংহ আকবরকে কৌশলে পিতৃ-বিদ্রোহী করিলেন। (যেন খুবই নীচ উপায় অবলম্বন করিয়াছেন !)

প্রথম সংঘর্ষের ঘটনাগুলি যাহা ঐতিহাসিক সত্য স্যার যদুনাথ বর্ণনা না করায় রাজসিংহকে প্রকৃত রাজসিংহ বলিয়া কিছুতেই মনে হইতে পারে না। আর এই দ্বিতীয়বারের ঘটনায় বরং রাজসিংহের আকবরকে পিতৃদ্রোহী করিবার চেষ্টায় কতকটা নীচতা প্রকাশ পায়। কিন্তু যে ঔরঙ্গজেব সন্ধি ভুলিয়া, কৃতজ্ঞতা বিস্মৃত হইয়া দিল্লী ফিরিয়াই রাজসিংহের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিতে পারে, তাহার সঙ্গে চতুরতা খেলিলেও কেহ বড় একটা নিন্দা করিতে পারে না। আর প্রথম ঐতিহাসিক ঘটনাটী স্যার যদুনাথ না দিয়া রাজসিংহের প্রকৃত চরিত্র হইতে তিনি আমাদিগকে বঞ্চিত করিয়াছেন, মানুচী সেই ঘটনাটি দিয়াও রাজসিংহের চরিত্র মহত্তর করিয়া সমুপস্থিত করিয়াছেন।

Seeing how much Aurongzeb was willing to risk in order to master his kingdom, the Rana equally persistent not to attack Aurongzeb resolved to arrange matters so that the Mogal's own sons should make war against such an unjust.

তারপরে মনুচী বলেন, "ঔরঙ্গজেবের নিকট হইতে সংবাদ পাইয়া আমরা (শাহ আলমের দল ও আজম) আজমীরে গিয়া পৌঁছিলাম।......আমি নিজে শাহি এই বিদ্রোহে শাহ আলমকে বড়ই চিন্তান্বিত দেখিয়াছিলাম।"

আর একটা বিষয়েও স্যার যদুনাথ বঙ্কিমের প্রতি অবিচার করিয়াছেন। স্যার যদুনাথ লিখিয়াছেন, "রাজসিংহের জ্যেষ্ঠ পুত্র ভীমসিংহ আর এক দল সৈন্য লইয়া দেশময় ছুটিয়া বেড়াইতে লাগিলেন (যেন উন্মত্তের ন্যায়) যেখানে শত্রু দুর্ব্বল দেখেন, সেখানে পড়িয়া তাহাদের কাটিয়া ফেলেন।"

পক্ষান্তরে বঙ্কিম লিখিয়াছেন—

"দিগন্তরে রাজসিংহের দ্বিতীয় পুত্র কুমার ভীমসিংহ গুজরাট অঞ্চলে মোগলের অধিকারে প্রবেশ করিয়া সমস্ত নগর, গ্রাম, এমন কি মোগল সুবাদারের রাজধানীও লুঠপাট করিলেন; অনেক স্থান অধিকার করিয়া সৌরাষ্ট্র পর্য্যন্ত রাজসিংহের অধিকার স্থাপন করিতেছিলেন কিন্তু পীড়িত প্রজারা আসিয়া রাজসিংহকে জানাইল। করুণ হৃদয় রাজসিংহ তাহাদের দুঃখে দুঃখিত হইয়া ভীমসিংহকে ফিরাইয়া আনিলেন। দয়ার অনুরোধে হিন্দু সাম্রাজ্য পুনঃ স্থাপিত করিলেন না।"

এই দয়া ও স্বার্থত্যাগই রাজসিংহের মহত্ব। কিন্তু এ কাহিনী কি বঙ্কিমের স্বকপোলকল্পিত না প্রকৃতই সত্য। যদি সত্য হয় তবে স্যার যদুনাথ তাহা উল্লেখ করিলেন না কেন?

কিন্তু ইহাও কি বঙ্কিমের স্বকপোলকল্পিত? টড্ লিখিয়াছেন—

"While the Rana, his heirs and auxilaries were thus trumphant in all their operations, Prince Bhim with the left division was not idle, but made a powerful diversion by the invasion of Gujarat, captured Idar expelling Hassan and his garrison and proceeding by Birnagar, suddenly appeared before Patan, the residence of the provincial satrap which place he plundered. Sidipur and other towns shared the same fate and he was in full march for Surat when the benevolence of the Rana touched by the woes of the fugitives who came to demand his forbearance caused him to recall Bhim in the midst of his career.

মানুচী বলিতেছেন—

"ইহার পরে ঔরঙ্গজেব কোন দিকেই কিছু করিতে না পারিয়া সন্ধির প্রস্তাব করিলেন, আমি উভয় পক্ষে যাতায়াত করিতে লাগিলাম। রাণা বুঝিলেন, ঔরঙ্গজেব প্রকৃত পক্ষে সন্ধি চাহেন না। রাণা আজ কাল করিয়া বিলম্ব করিতে লাগিলেন। অবস্থার জন্ত বিবেচনা করিবার সময় লইলেন।

আমাদের অনেক ধোয়াধুয়ির পর সন্ধি হইল"—সন্ধির সর্ত্তে আছে—

Vol II p. 253. Thus was Aurongzeb satisfied at having secured peace with a king who had spared his life once, and would be able to do him still greater harm by merely delaying to make peace."

এই সন্ধির কথা বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছেন—

"চারি বৎসর ধরিয়া যুদ্ধ হইল। পদে পদে মোগলেরা পরাজিত হইলেন। শেষে ঔরঙ্গজেব সত্য সত্যই সন্ধি করিলেন। রাণা যাহা যাহা চাহিয়াছিলেন, ঔরঙ্গজেব সবই স্বীকার করিলেন। আরও কিছু বেশীও স্বীকার করিতে হইল। মোগল এমন শিক্ষা আর কোথাও পায় নাই।"

দ্বিতীয় যুদ্ধের বিবরণ স্যার যদুনাথ বিশেষ কিছু দেন নাই, খাঁপি খাঁ দিয়াছেন। খাঁপি খাঁর বিবরণে রাণার বীরত্বের কিছু আভাস পাওয়া যায়। তথাপি এই সব ইতিহাস রাণার প্রতি কিরূপ বিষোদ্গার করিতে সর্ব্বদাই শত মুখ, তাহার একটু আভাস দিব। স্যার যদুনাথ এই দ্বিতীয় যুদ্ধের বর্ণনায় খাঁপি খাঁকেই অনুসরণ করিয়াছেন। খাঁপি খাঁ বলিতেছেন—

"মেবারে সব বন্দোবস্ত করিয়া দিয়া অর্থাৎ মেবার পতন অবশ্যম্ভাবী জানিয়া ঔরঙ্গজেব যে দিল্লী আসিয়াছিলেন তাহার কিছু দিন পরেই নীচআত্মা রাণা (mean-spirited) সব সর্ত্তই ভঙ্গ করে। বাদশাহ এই সব কু-অভিসন্ধি বিশিষ্ট রাজপুতগণের প্রতিবিধানের জন্য আজমীরে উপস্থিত হইলেন। মজম দাক্ষিণাত্য হইতে উপস্থিত হন। আজম আসেন বঙ্গদেশ হইতে। ঔরঙ্গজেব আজমীরে তাঁবুতে অবস্থান করিয়া শাহজাদা আকবরকে রাণার বিরুদ্ধে মেবারে প্রবেশ করিতে আদেশ করেন ও সেনাপতি তাঁহবার খাঁ তাঁহার সহায়তা করেন। রাণা রাজকীয় বাহিনীকে প্রতি আক্রমণ করে। রাজপুতগণ অনেক সৈন্য প্রলোভিত করিয়া গিরিবর্ত্মের মধ্যে লইয়া যায় ও পরে তাহাদিগকে বিনাশ করিতে উদ্যত হয়। তাহারা অশ্বারোহী ও পদাতিক অনেক সৈন্যের প্রাণনাশ করে।

"যদি রাণা সমস্ত গিরিবর্ত্মেই সৈন্যাবেশে রক্ষা করিতে সমর্থ হয় এবং আচম্বিতে শাহাজাদার সৈন্য আক্রমণ করিয়া ছত্রভঙ্গ করিয়া দেন, তথাপি শাহজাদা খুব সাহসের সহিত যুদ্ধ করেন এবং পরিণামে রাজকীয় বাহিনীই জয়লাভে সমর্থ হয়।"

"এই ভাবে রাণা যখন প্রবল ভাবে আক্রান্ত ও হৃতবল হইয়া পড়েন, রাঠোর বীর দুর্গাদাসের সহায়তায় রাণা আকবরকে পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী করিয়া ফেলে। ৩০০০০ রাজপুত কুমার আকবরের পক্ষভুক্ত হন ও সম্রাটের বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করে। তাঁহাবর খাঁও এই বিদ্রোহে যোগদান করে। ইতিমধ্যে আকবরের বিশ্বস্ত অনুচর মুজাহিদ খাঁ তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া সম্রাটের নিকট আসে। তাঁহবার খাঁও (কেহ বলেন সম্রাটকে হত্যা করিবার জন্য, কেহ বলেন সম্রাটের সহিত যোগদান করিতে আসেন) নিহত হন। ঔরঙ্গজেব অতঃপর কৌশল করিয়া আকবরের নামে একখানি পত্র লিখিয়া রাজপুতদের কাছে পাঠাইয়া দেন। পত্রে লিখিত ছিল, "তুমি রাজপুতদিগকে প্রলোভিত করিয়া যে আমার কাছে আনিতেছ ইহাতে আমি বড়ই আনন্দিত। অচিরে আমার দুইটী বাহিনীর মধ্যস্থলে আনিলেই তাহারা বিনষ্ট হইবে।" পত্র পাইয়া রাজপুতগণ আকবরকে সন্দেহ করেন, তাহাদের মধ্যে মতদ্বৈধ হয় কিন্তু দুর্গাদাস ও রাণার কয়েকজন বিশ্বস্ত অনুচর ও সৈন্যাধ্যক্ষ ব্যতীত সকলেই তাহাকে পরিবর্জ্জন করেন। আকবরকে দুর্গাদাস দাক্ষিণাত্যে সম্ভাজীর নিকট পঁহুছাইয়া দেন।"

খাঁপি খাঁর উক্তিতে বঙ্কিম বর্ণিত সব কথাই সমর্থিত না হইলেও এবং ষোল আনা সম্রাটের প্রতি পক্ষপাতিত্ব থাকিলেও তাঁহার প্রদত্ত বিবরণ হইতে রাণার বীরত্বের অনেক কথা পাওয়া যায় এবং রাণা যে যুদ্ধে পরাভূত হইয়াছেন তাহার কোন নিদর্শন পাওয়া যায় না। বরং আকবরকে উত্তেজিত করিবার পরও শেষ পর্য্যন্ত রাণা বিজয়ী বীরের ন্যায়ই অবস্থান করিতেছিলেন। এই দ্বিতীয় বারের যুদ্ধে স্যার যদুনাথ খাঁপি খাঁকে সমর্থন করিয়াছেন বটে তবে রাণার প্রতি কোন অসম্মানজনক ভাষা প্রয়োগ করেন নাই। কিন্তু পূর্ব্বেই বলিয়াছি উভয়ের বর্ণনায় দ্বিতীয়বারের যুদ্ধে রাণাকে নির্ভীক যোদ্ধা হিসাবে দেখিতে পাইলেও বীর, উদার, মহৎ রাজসিংহ দেখিতে পাই না।

এইরূপে স্যার যদুনাথ মোগল মেবার সংঘর্ষ কথঞ্চিতভাবে

খাঁফী খাঁর ও মাসিরী আলমগীরের অনুরূপ দিলেও সমস্ত অবস্থা বর্ণনা না করিয়া রাজসিংহের প্রকৃত চরিত্রের স্বরূপ উপস্থিত করিতে বিরত হইয়াছেন এবং তাহাতে বঙ্কিমের উদ্দেশ্য বহুল পরিমাণে পণ্ড হইয়াছে। তাই বলিতেছিলাম, হৌন না কেন স্যার যদুনাথ অগাধ পাণ্ডিত্যের অধিকারী, তিনি বঙ্কিমের একমাত্র ঐতিহাসিক উপন্যাস রাজসিংহ সমালোচনার উপযুক্ত পাত্র নহেন বলিয়াই আমাদের দৃঢ় ধারণা। বরং বঙ্কিমের সমস্ত মূল কথাগুলিই যে ইতিহাস সম্মত তাহা না দিয়া বঙ্কিমের উপর তিনি ঘোর অবিচার করিয়াছেন।

এক স্থানে বঙ্কিম আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছেন—

"ভারতবর্ষের ইতিহাসে যত রণপাণ্ডিত্যের কথা আছে, রাজসিংহ কাহারও অপেক্ষা ন্যূন নহেন, ইউরোপেও এরূপ রণপণ্ডিত অতি অল্পই জন্মিয়াছিল। অল্প সেনার সাহায্যে এরূপ মহৎ কার্য্য ওলন্দাজবীর মুকাখ্য উইলিয়মের পর পৃথিবীতে আর কেহ করে নাই। রাজসিংহ ও উইলিয়াম— এই উভয় বীর বিশেষ প্রকারে তুলনীয়। উভয়ের কীর্ত্তি ইতিহাসে অতুল। উইলিয়ম ইউরোপে দেশহিতৈষী ধর্ম্মাত্মা বীরপুরুষের অগ্রগণ্য বলিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছেন—এদেশে ইতিহাস নাই, কাজেই রাজসিংহকে কেহ চেনে না ?"

প্রসিদ্ধ ইতিহাসবিদ্ স্যার যদুনাথ কি গবেষণা করিয়া রাজসিংহের একখানি ইতিহাস লিখিতে পারিতেন না ? সেই আদর্শে ভারতবাসী অনেক উন্নত হইতে পারিত। আরও ঔপন্যাসিকের আবির্ভাব হইত। গিরিশচন্দ্র ও দ্বিজেন্দ্রলাল আরও কয়েকখানি নাটক লিখিয়া ফেলিতে পারিতেন*। বাঙ্গালী ও ভারতবাসী একটা আদর্শবীর সম্মুখে পাইয়া ধন্য হইত।

*

শ্রাবণের "সাময়িক সাহিত্য", শূলপাণি লিখিত। ভাদ্রের সংখ্যা আমরা পড়িলাম। ইহার "সাময়িক সাহিত্য" প্রসঙ্গটী সময়োপযোগী হইয়াছে। আজকাল সাহিত্যের সমালোচনা প্রয়োজনীয়।

তবে সাময়িক সাহিত্য আলোচনায় যেরূপ পরিশ্রম ও চিন্তাশীলতার আবশ্যক অনেক সাময়িক পত্রসমালোচক তাহা না করিয়াই একেবারেই 'বঙ্গদর্শন' বা 'সাহিত্য' সম্পাদকের নাগাল পাইতে যশলিপ্সু হইয়া উঠেন। আবশ্যক মত গালাগালি দেওয়াও অন্যায় নয়, কিন্তু যিনি দিবেন তাহার বিদ্যার দৌড় 'হীরালালের' অপেক্ষা অন্ততঃ একটু বেশী হওয়া উচিত। স্বর্গীয় অক্ষয় সরকার মহাশয়কে অনুসরণ করিয়া সমালোচক মহাশয় 'বঙ্গশ্রী'র পত্রের "অজিতার মৃত্যু" রচয়িতাকে "অহিরাবণ লেখক" বলিয়া উপহাস করিয়াছেন কিন্তু চিন্তাধারা শূন্য অবিবেচক সমালোচককে অক্ষয় বাবু এবং তাঁহার বন্ধুগণ কি ভাষায় ভূষিত করিতেন তাহার খোঁজ তিনি রাখেন কি না জানি না ?

সমালোচক অনেকগুলি বিষয়েরই আলোচনা করিয়াছেন। তিনি প্রাচীন বাঙ্গলা বাক্যে যোজন ও গুঞ্জন বিলাসে উনপঞ্চাশ বায়ুর প্রকোপে একটু পীড়াগ্রস্ত হইয়াছেন, Kipling আওড়াইয়া সাম্প্রদায়িকতার মিথ্যা অভিযোগের প্রতিবাদে অমর্য্যাদা বোধ করিয়া থাকেন, তাঁহার "ভাষা ও ভাব পরস্পর গলাগলি হইয়া দাপাদাপি জুড়িয়া দেয়", কিন্তু বঙ্গশ্রীতে যে সমস্ত সমালোচনামূলক ও ইতিহাসঘটিত প্রবন্ধ বাহির হয়, তাহা তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণ করে নাই

"প্রবর্ত্তক" মাসিক পত্রিকা খানির সহিত আমরা বহুদিন হইতেই পরিচিত এবং শ্রীযুক্ত মতিলাল রায় মহাশয়ের সমালোচনা ও কর্ম্মশক্তির উপরে আমাদের খুবই শ্রদ্ধা আছে। কিন্তু ইদানীং প্রবর্ত্তকের ভাবের পরিবর্ত্তনে আমরা দুঃখিত। বেকার-সমস্যা ও দেশের অন্নাভাব দূর করিতে প্রবর্ত্তক-সঙ্ঘ বরাবরই চেষ্টা করিয়াছে। তবে কি আজ কোন নব্য সমালোচক আসিয়া 'প্রবর্ত্তকের' ভাব প্রবাহ আমূল পরিবর্ত্তন করিতে প্রয়াসী হইয়াছেন ? নতুবা একটী গ্রেজুয়েট যুবক রিক্সা টানিয়া সংসার চালাইতেছে, ইহাতে তিনি আঁৎকাইয়াই বা উঠিবেন কেন, আর আক্কেল সেলামীই বা দিবেন কেন। বহুদিন পরে সমালোচক পুরুষের যে গল্প পড়িবার সাধ হইয়াছিল, দারিদ্র্য সমস্যা দূরীকরণ যে সংবাদ-পত্রের মুখ্য উদ্দেশ্য মাসিক বঙ্গশ্রীর ন্যায় সেরূপ পত্রিকা তাহাকে কিছুতেই আপ্যায়িত করিতে পারিল না বলিয়া আমরা বড়ই দুঃখিত। তিনি গালাগালি করিতে থাকুন কিন্তু ইহাতে লেখকগণের নিকট সমালোচকের পাণ্ডিত্য প্রকাশিত হইবে না।

* ইঁহারাই তখন পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন, দীনবন্ধু তো ছিলেন না।

গল্প প্রতিযোগিতার ফলাফল

আমরা আনন্দের সহিত প্রকাশ করিতেছি যে, 'বঙ্গশ্রী'র গল্প-প্রতিযোগীতায় শ্রীযুক্ত মোহিনী চৌধুরী 'আত্মহত্যা' গল্প লিখিয়া ২৫৲ প্রথম পুরস্কার ও শ্রীযুক্তা প্রতিমা গঙ্গোপাধ্যায় 'সেতু' গল্প লিখিয়া ১৫৲ দ্বিতীয় পুরস্কার লাভ করিয়াছেন। এই মাসের বঙ্গশ্রী'তে (কার্ত্তিক) গল্প দুইটি প্রকাশিত হইল। গল্প লেখক ও লেখিকাকে আমরা অভিনন্দন জ্ঞাপন করিতেছি। ইতি—

সর্ব্বাধ্যক্ষ।



সায়াহ্ন

"লক্ষ্মীস্ত্বং ধান্যরূপাসি প্রাণিনাং প্রাণদায়িনী"

বঙ্গশ্রী

অগ্রহায়ণ,—১৩৪৮

৯ম বর্ষ— ১ম খণ্ড, ৬ষ্ঠ সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ ও আলোচনা

সত্যাগ্রহ আন্দোলন এবং গান্ধীজী

ভারতের বর্ত্তমান রাজনৈতিক অবস্থা সম্বন্ধে গান্ধীজীর বিরুদ্ধে কিছুদিন যাবৎ যে সমস্ত অভিযোগ উপস্থিত করা হইতেছে, গত ৩০শে অক্টোবর তারিখে ওয়ার্দ্ধা হইতে সাধারণের বরাবর এক বিবৃত পত্র প্রকাশ করিয়া তিনি সেই সমস্ত অভিযোগের প্রত্যুত্তর দিয়াছেন। প্রথমতঃ, অভিযোগগুলির স্বরূপ উদ্ধৃত করা যাক। অভিযোগগুলি মোটামুটি এইরূপ :—

(১) কংগ্রেসের কার্য্যে ও উৎসাহে বিশেষ ভাটা পড়িয়াছে ;

(২) পূর্ব্বের চেয়ে এখন অনেক অল্প সংখ্যক ব্যক্তিকে কার্য্যে অগ্রসর হইতে দেখা যায় ;

(৩) জেল হইতে একবার মুক্ত হইলে পুনরায় কেহ বড় আর একটা কারাবরণে রাজী হইতেছে না ;

(৪) সত্যাগ্রহী বন্দীদিগের মধ্যে সুশৃঙ্খলার বিশেষ অভাব পরিলক্ষিত হইতেছে। অনেকেরই আবার 'অহিংসা ও সত্যের' সংজ্ঞা সম্বন্ধেও বিশেষ কোন ধারণা নাই।

(৫) জেলে 'সি' শ্রেণীর বন্দীদিগকে অতি নিকৃষ্ট এবং অত্যল্প পরিমাণের খাদ্যদ্রব্য সরবরাহ করা হয়। ফলে, অধিকাংশ বন্দীর স্বাস্থ্যই অচিরে ভাঙ্গিয়া পড়ে। কাজেই কারামুক্ত হইয়া এই ভগ্নস্বাস্থ্যের পুনরুদ্ধার কল্পে বেশ কিছুদিন বিশ্রাম গ্রহণ না করিলে আবার সদ্য সদ্য কারাবরণ একপ্রকার দুঃসাধ্য হইয়া পড়ে। সংবাদপত্র, পুস্তকাদি এবং উপযুক্ত চিকিৎসা প্রভৃতির অভাবের অভিযোগও বড় কম নয়।

(৬) কংগ্রেস প্রোগ্রামের সহায়তায় সরকারকে বিপন্ন না করার নীতি নিতান্তই দুর্ব্বোধ্য। শাসকসম্প্রদায়ও স্বয়ং এই নীতি অনুমোদন করেন না। সরকারকে বিপন্ন করার অভিপ্রায়ে প্রচণ্ডভাবে সংগ্রাম চালাইতে হইবে।

(৭) কংগ্রেসের জীবনীশক্তি হ্রাস পাইয়াছে। সভা সমিতি, শোভাযাত্রা, প্রচার কার্য্য বা অন্য কোন কার্য্য-বিধিরই কোন অস্তিত্ব এখন নাই। কংগ্রেসের এই স্থবির অবস্থার সংস্কার সাধন করতঃ পুনরায় পার্লামেণ্টারি প্রথায় মন্ত্রীত্ব গ্রহণ করা উচিৎ, অর্থাৎ 'পুনা প্রস্তাবকেই' উপযুক্তরূপে সংশোধন করিয়া, কার্য্য আরম্ভ করা উচিত।

সঙ্গে সঙ্গে গান্ধীজী প্রদত্ত উক্ত অভিযোগের প্রতিবাদগুলির আলোচনাও আবশ্যক হইয়াছে।

প্রথম অভিযোগের উত্তরে তিনি বলিয়াছেন, "অহিংস সংগ্রামে, সোডাওয়াটারের ফেনিল উচ্ছাসের ন্যায় অসার উচ্ছসিত উৎসাহের কোন মূল্য নাই।" অর্থাৎ প্রকারান্তরে তিনি এই কথাই বলিতে চাহিয়াছেন যে, তৎপ্রবর্ত্তিত আন্দোলনে অবস্থা ও সময় বিশেষে প্রকৃতি উৎসাহের পরিবর্ত্তে উহার সফেন অসারতাই কেবল বিদ্যমান ছিল।

দ্বিতীয় অভিযোগের প্রত্যুত্তরে তিনি বলিয়াছেন, "আন্দোলনে যোগদানকারী প্রতিনিধির সংখ্যা পূর্ব্ব হইতেই সীমাবদ্ধ ; সুতরাং এই সংখ্যাবদ্ধ তালিকা একদিন না একদিন নিঃশেষিত হইবেই।"

এই উক্তি দ্বারাও গান্ধীজী একপ্রকার স্বীকার করিয়াছেন

যে, প্রতিনিধি ও কর্ম্মীমণ্ডলীকে যথোপযুক্ত শিক্ষাদানের এবং তাহাদের সংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধিকরণের সত্যকার পদ্ধতি তিনি কোনদিনই আয়ত্ত করিতে পারেন নাই।

তৃতীয় অভিযোগের উত্তরে তিনি স্পষ্টই স্বীকার করিয়াছেন যে, ইহা সত্য, একবার জেল হইতে বাহির হইয়া আসিলে অনেকেই আবার সেইখানে ফিরিয়া যাইতে নারাজ। ইহার উত্তরে তিনি বলিতে চাহেন যে, এইরূপ সংগ্রামে এমন সৈনিকেরই প্রয়োজন যিনি যত বড় ভীষণ ঝঞ্ঝা বিপদই সম্মুখে উপস্থিত হউক না কেন তাহা উপেক্ষা করিয়া উহার সম্মুখীন হইতে প্রস্তুত হইবেন এবং আবশ্যকানুযায়ী বারবার



মিঃ গান্ধী

কারাবরণ করিতে কখনও দ্বিধা করিবেন না। দুর্ভাগ্যবশতঃ আমাদের দেশে এরূপ লোক নিতান্তই মুষ্টিমেয়।

তাঁহার কথা খুবই ঠিক, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আর একটী সত্যও কি তিনি সুবিধা বুঝিয়া এড়াইয়া যান নাই? আমরা তাঁহার দায়িত্ব বোধের কথারই ইঙ্গিত করিতেছি। জনসাধারণের মধ্য হইতে কর্ম্মী, প্রতিনিধি ও উপনায়ক প্রভৃতি মনোনীত ও নির্ব্বাচিত করিয়া তাহাদিগকে উপযুক্ত করিয়া তোলার যে দায়িত্ব, তাহাও যে অন্যের নহে, সে দায়িত্বও যে তাঁহারই ন্যায় প্রধান সেনানায়কের, এ কথাটীও তাঁহাকে তো ভুলিলে চলিবে না!

চতুর্থ অভিযোগের প্রতিবাদকল্পে তিনি লিখিয়াছেন, "অহিংসাবাদীর ছদ্মবেশে কতিপয় হিংসাবাদী দুরাচার যে, কংগ্রেসকে কলুষিত করিতেছে, ইহা আমি অবগত আছি।" —অর্থাৎ তাঁহার জ্ঞাতসারেই এই সকল কলঙ্ক কংগ্রেসে প্রবেশ করিতেছে, অথচ এই কলঙ্ক স্খলিত করিয়া হিংসাবাদীদের অহিংসক করিয়া তোলার উপায়ও তাঁহার জানা নাই। এক্ষেত্রেও গান্ধীজী সুযোগ বুঝিয়া আরেকটী সত্যকথা বিস্মৃত হইয়াছেন। কথাটি এই যে, অবাঞ্ছিত ও অযোগ্য ব্যক্তি সৈন্যবাহিনীতে যাহাতে প্রবেশাধিকার লাভ করিতে না পারে, সেইরূপ সুনিয়ন্ত্রিত শৃঙ্খলা প্রণয়নও তো প্রধান সেনানায়কেরই প্রধানতম কর্ত্তব্য। শুধু তাই নয়, নিয়মশৃঙ্খলাকে এমনভাবে নিয়ন্ত্রিত ও নির্দ্দিষ্ট করা কর্ত্তব্য যে, যদিও বা কোনদিন কোন প্রকারে কোন অবাঞ্ছনীয় বা অনুপযুক্ত ব্যক্তি বাহিনীতে প্রবেশলাভে সমর্থ হয়, তাহা হইলেও সেই সুনির্দ্দিষ্ট ও সুনিয়ন্ত্রিত শৃঙ্খলার বলেই বাহিনীর আদর্শও সর্ব্বাবস্থায়ই চিরদিন যেন অক্ষুন্ন থাকে,—ইহাও প্রধান সেনানায়কেরই দেখা একান্ত কর্ত্তব্য।

৫ম অভিযোগের প্রতিবাদে তিনি আবার গভর্ণমেণ্টকেই পাল্টা এমনভাবে অভিযুক্ত করিয়াছেন, যেন কর্ম্মীবৃন্দের ভগ্নস্বাস্থ্যের প্রতিকারকল্পে তাঁহার ন্যায় প্রধান সেনাপতির আর কোন দায়িত্বই নাই।

৬ষ্ঠ অভিযোগের উত্তরে, গান্ধীজী দর্শনের অবতারণা করিয়াছেন, শতচেষ্টা করিয়াও উহা কিন্তু আমরা বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না; বস্তুতঃই উহা নিতান্তই অবোধ্য ও খেয়ালী ভাবাপন্ন! তাঁহার মতে আইন-অমান্য আন্দোলনটি নাকি প্রকৃতপক্ষে অধিমিশ্র অহিংস আন্দোলন ভিন্ন আর কিছুই নহে। প্রসঙ্গটির আরও বিশদ্‌ভাবে ব্যাখ্যা করিয়া অধিকন্তু তিনি বলিয়াছেন যে, এই আন্দোলনের উদ্দেশ্য নহে যে, শাসকসম্প্রদায়কে অহেতুক বিপন্ন করা হয়। কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে এই উক্তির যাথার্থ্য টিকিতেছে কি? বস্তুতঃ তাঁহার অনুসৃত কার্য্যে শাসকবর্গ সবিশেষভাবেই ব্যতিব্যস্ত হইতেছেন। অথচ স্বকীয় কর্ম্মপন্থার পরিবর্ত্তন করিতেও তিনি কদাপি রাজী নহেন। আর একটি লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, গান্ধীজীর ব্যাখ্যানুসারে আইন-অমান্য আন্দোলন—অহিংসাত্মক এবং উহা কাহাকেও অকারণ ব্যতিব্যস্ত করিবার অপক্ষপাতি; অথচ এই আন্দোলনের ফলেই যে, তাঁহার

অনুচরবর্গ সমূহ বিপদগ্রস্ত, গান্ধীজী সে বিষয় ভুলেও একবার মনে করেন না। ইহা যেন সেই উপপত্নীর প্রতি আদর ও আধিক্যতার চূড়ান্ত করিয়া বিবাহিত পত্নীর উপরেই বিরূপ ও নির্দ্দয় হওয়ার মতন। উপমাটি সম্ভবতঃ খুব রূঢ়, কিন্তু কথাটি যে নিরেট সত্য, ইহা অস্বীকার করা যায় না।

৭ম অভিযোগের প্রত্যুত্তরে গান্ধীজী লিখিয়াছেন, "কংগ্রেসের কার্য্যধারায় জীবনীশক্তি হ্রাস হইয়াছে, একথা আমি বিশ্বাস করি না।"

গান্ধীজীর ন্যায় একজন মর্য্যাদা-সম্পন্ন ব্যক্তির পক্ষে ইহাই কি উক্ত অভিযোগের একমাত্র সদুত্তর? এই উক্তির দ্বারা তো প্রত্যুতপক্ষে অন্যায়ভাবে সত্যকেই অস্বীকার করা হইয়াছে। অবশ্য একথাও আমরা বলিতে চাহি না যে, সভা-সমিতি, প্রচারকার্য্য প্রভৃতির অভাবমাত্রকেই কংগ্রেসের প্রাণহীনতা বলিয়া উল্লেখ করা চলে,— তবে, দেশীয় সমস্যাগুলির সমাধান কল্পে কংগ্রেস এতাবৎ যে সমুদয় কার্য্য-ধারা অনুসরণ করিয়াছে, তাহা কতদূর সাফল্যলাভ করিয়াছে, ইহাই আমরা দেশবাসীর তরফ হইতে জানিতে চাই। যদি তাহা হইয়া থাকে তবেই বুঝিতে হইবে কংগ্রেসের সজীবতা আছে, নতুবা নয়। কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে সেই সাফল্যের তো কোন চিহ্নই দেখিতেছি না। বস্তুতঃ গান্ধীজী যেকোন যুক্তি-তর্কের অবতারণা করুন না কেন, একথা সতঃসিদ্ধ যে, তৎ-প্রবর্ত্তিত আন্দোলন সুরু হইবার পর হইতেই ভারতবাসীর মধ্যে দারিদ্র্য এবং পারস্পারিক বিরোধের আতঙ্ক ঘণীভূত হইয়াছে। পক্ষান্তরে একথাও সত্যসিদ্ধ যে, ভারতবাসীর ন্যায় নিরস্ত্র জাতির রাজনৈতিক স্বাধীনতা-সংগ্রামে সর্ব্বান্তরিক একতাই একমাত্র আয়ুধ; এবং সেই স্বাধীনতার প্রধান লক্ষ্য দেশের দারিদ্র্য বা আর্থিক সমস্যার মীমাংসা সাধন।

অবশ্য যদি দেখিতাম দেশবাসী ঐক্যবদ্ধ হইয়া দিন দিন ক্রমশঃই স্বচ্ছলতর অবস্থায় উন্নীত হইতেছে, তাহা হইলে ইহা স্বীকার করিতে আমাদের বাধা ছিল না যে, কংগ্রেসের কর্ম্মধারা স্বাস্থ্যসঙ্গত ও সজীবতাপূর্ণ, এবং কংগ্রেস ও গভর্ণমেণ্ট নামধেয় দেশের রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান দুইটিও বস্তুতঃই কর্ম্মজীবন্ত। কিন্তু প্রকৃত কার্য্যক্ষেত্রে যখন ইহার ব্যতিক্রমই ঘটে, তখন—কি কংগ্রেস, কি গভর্ণমেণ্ট,—কাহারও মিষ্ট আশু-বাক্যেই আর দেশবাসী ভুলিতে চাহে না। হতভাগ্য জনসাধারণের দৃষ্টিতে তখন, বাধ্য হইয়াই, এই সব তথাকথিত নেতৃবৃন্দ ও শাসন পরিচালকবর্গ স্বীয় অকর্ম্মণ্য বলিয়া প্রতিপন্ন হয়

আমাদের বিশ্বাস, যথার্থ সত্যসন্ধানী হইলে, গান্ধিজীও নিজেই কংগ্রেসের ঈদৃশ অকর্ম্মণ্যতা অনুধাবন করিয়া লজ্জিত বোধই করিবেন, এবং এই সকল নিস্ফল কার্য্য বন্ধ করিয়া সাফল্যের প্রকৃত পথ অন্বেষণে কৃতসঙ্কল্প হইবেন। কারণ তাঁহার ন্যায় মহাজন ব্যক্তির একথা সর্ব্বদাই স্মরণ রাখা বিধেয় পথভ্রষ্ট দেশবাসীকে বিপথে চালিত করা দেশনায়কের পক্ষে জঘণ্যতম অপরাধ এবং এই অপরাধের শাস্তিও অবশ্যম্ভাবী। এতদ্ব্যতীত তাঁহাকে আমরা ইহাও স্মরণ রাখিতে অনুরোধ করি যে, ভারতীয় ঋষিগণ 'সত্য ও অহিংসার' যে সংজ্ঞা রচনা করিয়াছেন, গান্ধীজীর 'সত্য ও অহিংসা' মোটেই সেই সংজ্ঞানুযায়ী নহে। শেষোক্ত সত্যটি উপলব্ধি করিবার ধৈর্য্য থাকিলে তিনি নিশ্চিৎ বুঝিতে পারিবেন,—যে শ্রেণীরই হোক্, আইন-অমান্য মাত্রেই প্রাচীন ভারতের সত্য ও অহিংসার আদর্শ কখনও অনুমোদন করিবে না। তাই ব্যক্তি মাত্রেই এই আদর্শ অনুশীলনের যোগ্য নহে; ইহার জন্য প্রবৃত্তি দমনের শিক্ষাকেই সর্ব্বপ্রথম আয়ত্ত করা কর্ত্তব্য।

অতএব স্পষ্টই বুঝা যায়, স্বয়ং গান্ধীজীর ন্যায় ব্যক্তিও অহিংসা এবং সত্যানুশীলনের উপযুক্ত অধিকারী নহেন; কারণ তাঁহার কার্য্যধারা হইতে ইহাই প্রতীয়মান হয় যে, এখন পর্য্যন্তও তিনি প্রবৃত্তিবেগকে সম্পূর্ণরূপে সংযত করিতে সক্ষম হন নাই। এতদ্ব্যতীত কেবল সত্য ও অহিংসা অনুশীলনই যথেষ্ট নয়, সত্যকার দেশনায়ককে এই সমুদয় গুণাবলীর ও অধিকারী হইতে হইবে, যথা—

(১) যে উপার্জ্জনে কাহারও ন্যায্য অধিকার নাই, তদনু-শীলনে তাহার বিমুখতা;

(২) যৌন- প্রক্রিয়ায় সংযম রক্ষণশীলতা;

(৩) শত্রু মিত্র নির্ব্বিশেষে সকলের প্রতি সহানুভূতি;

(৪) সারল্য ও অকপট অদ্বৈত পন্থা গ্রহণ;

(৫) অনিষ্টকারীর প্রতিও বিরুদ্ধাচরণ না করা;

(৬) বাসনার বশবর্ত্তী হইয়া অত্যধিক ভোগ না করা, এবং স্বাস্থ্য মানসিক শান্তি ও বুদ্ধি-বিচারকে অব্যাহত রাখিতে যতটুকু ভোগের আবশ্যক, ঠিক ততটুক ভোগ করা

(৭) অকূল বিপদের মধ্যেও চিত্তের স্থৈর্য্য ও ধৈর্য্য অটুট রাখা;

(৮) সর্ব্বদা সকলপ্রকার পরিচ্ছন্নতা;

(৯) অন্তর্দৃষ্টিকে সর্ব্বথা অবিচলিত রাখা;

(১০) অবস্থা নির্ব্বিশেষে সন্তুষ্টি পোষণ;

(১১) পাপ-পুণ্য ধর্ম্মাধর্ম্ম সম্বন্ধে দৃঢ় সচেতনতা;

(১২) শত্রু মিত্র নির্ব্বিচারে সকলেরই প্রতিকারের যোগ্য হওয়া;

(১৩) সর্ব্বদা, সকল ক্ষেত্রে ঈশ্বরের প্রতি অটুট আস্থা;

(১৪) সৃষ্টি-রহস্য সম্যক উপলব্ধি করার তীব্র অনুসন্ধিৎসা;

(১৫) আত্মপ্রচার হইতে বিরত হইয়া স্বকৃত অসাফল্যে লজ্জাবোধ করা;

(১৬) এই অসাফল্যের যাহাতে পুনরাবৃত্তি না ঘটে সে সম্বন্ধে সচেষ্ট ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হওয়া;

(১৭) বিবেকের উৎস অন্তরের অন্তর্মুখীতাকে উপলব্ধি করিবার অনুশীলন;

(১৮) স্বকৃত কার্য্যে দোষগুণ সম্বন্ধে সর্ব্বদা সম্যক সচেতন হওয়া।

আমরা অকুণ্ঠ চিত্তে স্বীকার করি, ভারতবাসীর মধ্যে বহুলোক অপেক্ষা গান্ধীজী উপরোক্ত গুণাবলীর সর্ব্বাধিক গুণের অধিকারী, কিন্তু একথাও অবিসম্বাদিত সত্য যে, নেতৃজনোচিত গুণমাত্রেরই তিনি অধিকারী নহেন। তবে ইহাও সত্যকথা, বর্ত্তমান জগতে এইরূপ সর্ব্বগুণাধার সত্যদর্শী প্রকৃত নেতা কোন দেশেই বিদ্যমান নহে। এই কারণেই বর্ত্তমান জগৎ আজ এতখানি দুর্দ্দশা প্রপীড়িত। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে, এই সকল নেতৃজনোচিত গুণ, সাধারণের জীবনযাত্রায় অর্জ্জন-করা সম্ভব নহে; ইহা পরিপূর্ণরূপে লাভ করিতে হইলে জীবন যাত্রার সাধারণ ক্ষেত্রে প্রবিষ্ট না হইয়া পূর্ব্ব হইতেই যথোপযুক্ত অনুশীলন ও সাধনা বলে ঐ সকল গুণ আয়ত্ত করিতে হইবে। কাজেই এই সব গুণ অর্জ্জন না করিয়াই যদি কেহ জনসাধারণকে কেবল নিরর্থক অহিংসা বা সত্যাগ্রহ ব্রতেই ব্রতী করাইতে চাহেন, তবে সে ব্রত অচিরেই যে ব্যর্থ হইয়া যাইবে তাহাতে আর সন্দেহ কি?

এতদ্ব্যতীত এই সমুদয় গুণ সম্যক লাভ করিতে অত্যন্ত বিস্তৃত ও ব্যয়সাধ্য শিক্ষারও প্রয়োজন। ইহার সাফল্যের পথ নিতান্ত সরল ও ইচ্ছালভ্য নহে, এই পথ রীতিমত পিচ্ছিল ও দুর্গম। গান্ধীজীর কর্ম্মানুষ্ঠান হইতে সম্যক প্রতীতি হইতেছে, যে শিক্ষা বলে এই সমস্ত নেতৃজনোচিত গুণাবলী অর্জ্জন করা যায় সে শিক্ষা তাঁহার নাই। এই কারণেই তৎপ্রবর্ত্তিত আন্দোলন কেবল দেশব্যাপী দারিদ্র্য ও বিরোধের বৃদ্ধি সাধনই করিয়াছে। এই কারণেই তাঁহার ও তদ্‌শ্রেণীর কর্ম্মীগণের কার্য্যে জনগণের উপেক্ষাই বাঞ্ছনীয়; নতুবা দেশকে নিশ্চয়ই একদিন এক বিরাট অকল্যাণের সম্মুখীন হইতে হইবে। সময় থাকিতে দেশবাসী সতর্ক হইবেন কি?

বর্ত্তমান পরিস্থিতি ও কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের কর্ত্তব্য

সম্প্রতি গান্ধীজী তাঁহার অনুচরদিগকে এককভাবে আইন-অমান্য আন্দোলন চালাইবার যে উপদেশ দিয়াছেন, কোন ক্ষেত্রেই এরূপ আন্দোলন আমরা সঙ্গত বলিয়া সমর্থন করি না। কারণ আমাদের বিশ্বাস,—একক বা সমবেত যে ভাবেই হোক, উক্ত আন্দোলনের ফলে শাসক ও শাসিতের সম্বন্ধ ক্রমশই তিক্ত বৈরিতায় পরিণত হয়; ফলে দেশের প্রধানতম সমস্যাগুলির সমাধানের পথও দেশবাসীর নিকট রুদ্ধ থাকিয়া যায়। হয় তো, অনেকেরই মতের সঙ্গে আমাদের এই অভিমতের সংঘর্ষ হইবে; কিন্তু জিজ্ঞাসা করিতে পারি কি, আইন-অমান্য আন্দোলন শুরু করিয়া কোন্ কর্ম্মপদ্ধতির জোরে গান্ধীজী দেশীয় সমস্যাবলীর মীমাংসা সাধন করিবেন? আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস সেরূপ কোন সুনির্দ্দিষ্ট কর্ম্মপদ্ধতি তিনি কখনই উদ্ভাবন করিতে সক্ষম হইবেন না।

তবে, কংগ্রেসকর্ম্মীগণের-যথার্থ কর্ত্তব্য কি? ভারতের সমস্যাবলীর মীমাংসাই বা হইবে কি উপায়ে?

নিম্নলিখিত কার্য্যবিধি বা প্রোগ্রামের প্রতি আমরা কংগ্রেসী নেতৃবৃন্দের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

প্রথমতঃ, নিরর্থক কারাবরণের গৌরবার্ত্তভূমি পরিত্যাগ করিয়া সর্ব্বাগ্রে চিন্তা করিতে হইবে যে, জার্ম্মানী এবং তদীয়

মিত্র অক্ষশক্তি নরহত্যার সাহায্যে সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠায় কৃতকার্য্য হইলে এই নরপিশাচদের হস্তে ভারতের অবস্থাই কি হইবে! যদি তাঁহাদের চিন্তাধারা দুষ্ট বা ভ্রান্ত না হয়, যদি ঠিক ঠিক ভাবে তাহারা ভাবিয়া দেখেন তবে কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ নিশ্চয়ই উপলব্ধি করিতে পারিবেন যে, উক্ত নরপশুদের বিষাক্ত স্পর্শে পৃথিবীর কোন অংশেরই কোনদিন এতটুকুও পর্যন্ত কল্যাণ সাধিত হইবে না।

দ্বিতীয়তঃ, বুঝিতে হইবে, বর্ত্তমানের অবলম্বিত যুদ্ধ প্রণালীর দ্বারা বৃটেন সম্পূর্ণরূপে এ যুদ্ধে জয়ী হইতে পারিবে কি না। এ ক্ষেত্রেও অনুসন্ধানের ধারা সঠিক হইলে নিশ্চিৎরূপে জানা যাইবে যে, আংশিক বিজয় সম্ভব হইলেও বর্ত্তমান যুদ্ধ প্রণালীর দ্বারা পরিপূর্ণ বিজয়লাভ কদাপি সম্ভব হইবে না।

তৃতীয়তঃ, কংগ্রেস নেতৃবৃন্দকে বুঝিয়া দেখিতে হইবে যে, বৃটেনকে পরিপূর্ণরূপে জয়ী হইবার উপায় সম্বন্ধে ভারতবর্ষ তাহাকে সন্ধান দিতে পারিলে, সেই বিজয়, বৃটেনের সহিত, ভারতের বিজয়রূপেও গণ্য হইবে কিনা। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, যে ধীরভাবে সমস্ত ব্যাপারটী পর্য্যালোচনা করিলে তাঁহারা এই জিজ্ঞাসার অনুকূল উত্তরই লাভ করিবেন। আর দেখিতে পাইবেন যে, ভারতবাসীর পরিকল্পিত সমর প্রণালীর সাহায্যে বর্ত্তমান যুদ্ধে জয়লাভ হইলে, সেই জয় নিশ্চয়ই ভারতের জয় রূপেই পরিগণিত হইবে।

চতুর্থতঃ, অতঃপরে তাঁহাদের কর্ত্তব্য যুদ্ধজয়ের প্রকৃষ্ট প্রণালীর প্রকৃত পন্থা অনুসন্ধান ও নিরূপণ করা। কিন্তু ইহা বড় সহজ কার্য্য নহে। ক্রমাগ্রসারী শক্তিমান জার্ম্মান শক্তিকে প্রতিহত ও নিরস্ত্র করিতে পারিলে তবেই এই যুদ্ধ জয় সম্ভব। তজ্জন্য প্রয়োজন একনিষ্ঠ অনুশীলন ও বিশ্লেষণ ক্ষমতা,—তজ্জন্য চাই চিরাচরিত যুদ্ধ প্রণালী পরিত্যাগ করিয়া 'বুদ্ধিবিজ্ঞ' বা intellectual সমর কৌশল। কারণ, পুর্ব্বাপর দেখিতেছি যে, চিরাচরিত সমর কৌশলের দ্বারা আংশিকভাবে যুদ্ধ বিজয় সম্ভব হইলেও, সেই বিজয় কখনও স্থায়ী হইতে পারে না। বিজিত শক্তি বিজয়ীর বিরুদ্ধে বিদ্বেষ পোষণ করতঃ প্রতিহিংসা গ্রহণার্থে আবার একদিন রণ-তাণ্ডবের ঘনঘটা সৃষ্টি করিবেই করিবে। সুতরাং যুযুধান জাতিসমূহের পরস্পরের প্রতি এই প্রতিহিংসার দুর্দ্দম প্রবৃত্তিকেই দমন করিতে হইবে সকলের আগে, আর যে উপায়ে একার্য্য সফল হইবে, তাহারই নাম 'বুদ্ধিবিজ্ঞ' সমর যাত্রা বা intellectual warfare. মনে রাখিতে হইবে, যুযুধান জাতিসমূহের সমুদয় অভাব ও অভিযোগের প্রতিকার সাধনই হইবে এই সমর যাত্রার প্রধানতম উদ্দেশ্য এবং তাহা হইলেই প্রতিহিংসাদি দুর্দ্দম মনোবৃত্তি দমিত হইবে এবং সমর পরিচালনায় বুদ্ধিবিজ্ঞ প্রণালী সাফল্য লাভ করিবে।

পঞ্চমতঃ, কিন্তু পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে, এই কার্য্য সবিশেষ অনুশীলন ও বিশ্লেষণসাপেক্ষ। প্রশ্ন হইতে পারে,—জার্ম্মানী ও অক্ষশক্তি এবং বৃটেন ও মিত্রশক্তি—এই দুই যুযুধান পক্ষের সমুদয় অভাব অভিযোগের নিবৃত্তি হইবে কি উপায়ে? ইতিপূর্ব্বেও আমরা বহুবার বলিয়াছি যে, সমস্যার স্বরূপ যাহাই হোক, উহার মীমাংসা করিতে হইলে, সর্ব্বাগ্রে সমস্যার মূল-উদ্ঘাটন করিতে হইবে। কাজেই কর্ম্মীকে সর্ব্বপ্রথম জানিতে হইবে, বর্ত্তমানের সর্ব্বগ্রাসী বিশ্বব্যাপী যুদ্ধের মূল কারণ কি? আর অনুসন্ধান করিলেই দেখিতে পাইবেন যে মূল কারণ দুইটী।

প্রথম কারণ, দেশ ও জাতিসমূহের খাদ্য ও কাঁচামালের অভাব। এই অভাবের জন্যই এক শক্তিমান রাজ্য নিজদেশ-জাত শিল্পের বাজার প্রসারের জন্য এবং অন্য দুর্ব্বল দেশের উপর রাজনৈতিক আধিপত্য স্থাপনের জন্য ব্যাকুল এবং প্রধানতঃ ইহারই জন্য পরস্পরে এই বিরোধ।

দ্বিতীয় কারণ, জাতি সমূহের মধ্যে প্রবৃত্তি দমন করিবার যথাযোগ্য শিক্ষার অভাব। সুতরাং এই দুই সমস্যার প্রতিকারই এখন সর্ব্বাধিক বাঞ্ছনীয়।

ষষ্ঠতঃ, কিন্তু স্মরণ রাখিতে হইবে, এ কর্ত্তব্য বিশেষ দায়িত্বপূর্ণ। দেশের গভর্ণমেণ্টের সহযোগ ব্যতীত এ কর্ত্তব্য সম্পন্ন করা কিছুতেই সম্ভব নহে। তন্নিমিত্ত কংগ্রেস-নেতৃবৃন্দকে পুনরায় পরিত্যক্ত পরিষদে যোগদান করিয়া সুমনোনীত ও সুনির্ব্বাচিত মন্ত্রীসভা গঠন করিবার জন্য গভর্ণমেণ্টের নিকট আবেদন করিতে হইবে।

সপ্তমতঃ, অ-হিন্দু সদস্যদিগকে পরিষদ-দপ্তরে অবাধ প্রবেশের পরিপূর্ণ অধিকার প্রদান করিতে হইবে।

অষ্টমতঃ, অতঃপরে কংগ্রেসনেতাগণ প্রতিনিধিরূপে পরবর্ত্তী

কর্ত্তব্য হিসাবে, পুনর্গঠিত পরিষদের নিকট তাহাদের বাঞ্ছিত নূতন সমরযাত্রা-প্রণালী প্রবর্ত্তনের প্রস্তাব পেশ করিবেন। এজন্য কংগ্রেসী কর্ম্মীগণকে এরূপ গঠনমূলক প্রক্রিয়া অবলম্বন করিতে হইবে, যাহাতে স্বদেশের উৎপাদনেই স্বদেশবাসী এবং যুযুধান বিদেশবাসী কেহই যেন ন্যূনতম প্রয়োজনীয় লাভে এতটুকুও বঞ্চিত না হয়। সেই ভাবেই তাহাদিগকে নিশ্চিত সিদ্ধান্ত করিয়া অগ্রসর হইতে হইবে।

দ্বিতীয়তঃ, উৎপাদনের বণ্টন ব্যবস্থা এরূপভাবে করিতে হইবে যে, ন্যূনতম প্রয়োজনীয় লাভের পরেও স্বজাতি বিজাতি সকলেই সমভাবে যেন স্ব স্ব কৃত্তিত্বানুসারে উপার্জ্জনলাভে সক্ষম হয়।

নবমতঃ, দেশবাসী এবং বৃটীশ বন্ধুদের জ্ঞাতার্থে উপরোক্ত কর্ম্মপ্রস্তাবের পরিকল্পিত পদ্ধতিটি সাধারণের নিকট স্পষ্ট ভাষায় বিজ্ঞাপিত করিতে হইবে।

দশমতঃ, বড়লাট বাহাদুরের নিকট উক্ত প্রস্তাব কার্যে পরিণত করিবার অনুমতি প্রার্থনা করিবার জন্য একযোগে সমস্ত প্রদেশের পরিষদের কাছে অনুরোধ জানাইতে হইবে।

একাদশতঃ, বড়লাট বাহাদুর এবং প্রধান মন্ত্রী কর্ত্তৃক এই প্রস্তাব জার্ম্মানীর নিকটও যাহাতে উত্থাপিত হয় সে ব্যবস্থাও করিতে হইবে। অহেতুক নরহত্যা এবং বৃটীশ সাম্রাজ্য বিপন্ন করিবার চেষ্টা ত্যাগ করিলে, বৃটীশ সাম্রাজ্য প্রতিদান স্বরূপ অভাবগ্রস্থ জার্ম্মানীকে খাদ্য ও কাঁচামাল দিয়া নিশ্চিন্ত করিতে কখনও শৈথিল্য করিবে না।

চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রেই উপলব্ধি করিতে পারিবেন উপরোক্ত প্রস্তাবের কর্ম্মপ্রণালী নিছক অর্থহীন প্রলাপ নহে, বরঞ্চ সুচিন্তিত সম্যক অনুশীলীত, সবিশেষ তথ্য ও বিবেচনা-সিদ্ধ। হয়তো, এতদ্বারা সত্ত সত্ত কোন ফললাভ সম্ভব হইবে না, কিন্তু ইহার দ্বারা দেশ যে একদিন তাহার সমস্যার কাঙ্খিত সমাধানের সন্ধান পাইবে, অভাব অভিযোগ দূরীভূত হইবে, সর্ব্বত্র শান্তি বিরাজ করিবে সে বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। আশাকরি, গান্ধীজীও আমাদের এ প্রস্তাব অবহেলা করিবেন না; এবং আমাদের আলোচনায় সমস্ত সময় অবস্থাদৃষ্টে ভাষার যে তীব্রতা পরিলক্ষিত হয়, তাহাতে উত্যক্ত না হইয়া আমাদের বক্তব্যে সত্যকার করণীয় কিছু আছে কি না, তাহাই পরীক্ষা করিয়া দেখিতে যত্নবান হইবেন। কারণ, তিক্ত ঔষধ প্রদান করিলেও প্রকৃত বৈদ্যই সঙ্কট কালে একমাত্র বন্ধু।

প্রয়োজন হইলে বিস্তারিত ভাবে আমাদের বক্তব্যের পুনরালোচনা করিতেও আমরা সানন্দে প্রস্তুত আছি।



ভারতীয় বেদ, উপনিষদ ও দর্শন

শ্রীসচ্চিদানন্দ চট্টোপাধ্যায়

[২]

ঋষিপ্রণীত মূল দর্শন ও মূল তন্ত্রের মুখ্য বক্তব্য কি কি

ঋষিপ্রণীত মূল দর্শনের মুখ্য বক্তব্য কি কি তাহা জানিতে হইলে ঋষিপ্রণীত দর্শন কয়টী তাহা জানিতে হইবে ও মনে রাখিতে হইবে। সাধারণতঃ বলা হয় যে, দর্শন ছয়টী, যথা :—(১) বৈশেষিক, (২) সাংখ্য, (৩) ন্যায়, (৪) যোগ, (৫) পূর্ব্ব-মীমাংসা, এবং (৬) উত্তর-মীমাংসা। আমরাও এই প্রবন্ধে উপরোক্ত ছয়টীকেই দর্শন বলিয়া ধরিব এবং উহাদের প্রত্যেকের মুখ্য বক্তব্য কি কি তাহা পাঠকদিগকে শুনাইব। সাধারণতঃ ষড়্দর্শনের কথা প্রচলিত আছে বটে এবং এই প্রবন্ধে ষড়্দর্শনের কথাই বলিব বটে, কিন্তু বস্তুতঃ পক্ষে ভারতীয় ঋষিগণ ছয়টী দর্শনের কথা বলেন নাই। তাঁহাদিগের "দর্শন" চারিটী এবং "মীমাংসা" দুইটী। স্থূলতঃ মীমাংসাকেও "দর্শন" বলা চলে বটে, কিন্তু সূক্ষ্মতঃ "মীমাংসা" ও "দর্শন" একার্থক নহে। উহাদিগের মধ্যে প্রভেদ আছে। দর্শনের মুখ্য বক্তব্য সম্বন্ধে যে স্থানে আলোচনা করা হইবে, সেই স্থানে ঐ প্রভেদের কথাও আলোচিত হইবে।

দর্শনের মুখ্য বক্তব্য বুঝিতে হইলে বেদ ও উপনিষদের মুখ্য বক্তব্য কি কি তাহা স্মরণ করিতে হইবে। এতৎ সম্বন্ধে আমরা পূর্ব্বসংখ্যায় আলোচনা করিয়াছি।

ঐ আলোচনায় বেদের মুখ্য বক্তব্য সম্বন্ধে বলা হইয়াছে যে —

"প্রথমতঃ নীলাকাশের বাহিরে যে চারিটী আবেষ্টনী আছে, সেই চারিটি আবেষ্টনীতে ভূত-তত্ত্ব, ভাব-তত্ত্ব ও ন-তত্ত্ব সম্বন্ধীয় যে সমস্ত বিজাকারের বিকাশ ও উন্মেষ সংঘটিত হইতেছে তাহা বুঝিবার মত শক্তি সঞ্চয় করিতে হয় কোন্ উপায়ে এবং দ্বিতীয়তঃ ঐ শক্তি সঞ্চয় করিতে পারিলে ঐ চারিটী আবেষ্টনীর মধ্যে যে সমস্ত ব্যাপার সংঘটিত হইতেছে তাহা বুঝা সম্ভব হয় কি করিয়া তাহা দেখান চারিটী বেদের মুখ্য বক্তব্য।"

উপনিষদের মুখ্য বক্তব্য সম্বন্ধে বলা হইয়াছে যে —

"প্রথমতঃ ভূ-মণ্ডল ও তন্নিহিত চরাচর জীবের মধ্যে যে বদ্ধাকাশ আছে—সেই বদ্ধাকাশে, মুক্তাকাশে ও নীলাকাশে ভূত-তত্ত্ব, ভাব-তত্ত্ব, ও ন-তত্ত্ব সম্বন্ধীয় যে সমস্ত বীজাকারের বিকাশ সংঘটিত হইতেছে তাহা দেখিবার ও বুঝিবার মত শক্তি সঞ্চয় করিতে হয় কোন্ উপায়ে এবং দ্বিতীয়তঃ ঐ শক্তি সঞ্চয় করিতে পারিলে মায়া-মোহ-মুগ্ধ মানুষের পক্ষেও বদ্ধাকাশের ও মুক্তাকাশের যাবতীয় ব্যাপার সর্ব্বতোভাবে দেখা ও বুঝা সম্ভব হয় কি করিয়া তাহা দেখান উপনিষৎ-সমূহের মুখ্য বক্তব্য।"

বেদ ও উপনিষদের মুখ্য বক্তব্য কি কি তাহা বুঝিতে পারিলে দেখা যাইবে যে, উভয়েরই লক্ষ্য ভূত-তত্ত্ব, ভাব-তত্ত্ব ও ন-তত্ত্ব সম্বন্ধীয় জ্ঞান অর্জ্জন করায় সহায়তা করা। দুই-এর মধ্যে পার্থক্য এই যে, উপনিষদের চিন্তা ও সাধনার

স্থল—(১) জীবের শরীরাভ্যন্তরস্থ বদ্ধাকাশ, (২) ভূ-মণ্ডলের অভ্যন্তরস্থিত বদ্ধাকাশ, (৩) জল-মণ্ডলস্থিত বদ্ধাকাশ, এবং (৪) জীব-মণ্ডল, ভূ-মণ্ডল ও জল-মণ্ডলকে ঘিরিয়া যে মুক্তাকাশ রহিয়াছে এবং যে মুক্তাকাশ, জীব-মণ্ডল, ভূ-মণ্ডল ও জল-মণ্ডলের কার্য্যদ্বারা ঘাত-প্রতিঘাত প্রাপ্ত হয় সেই মুক্তাকাশ। আর বেদের চিন্তা ও সাধনার স্থল মুখ্যতঃ—(১) মুক্তাকাশ ও নীলাকাশের সন্ধিস্থল ও (২) নীলাকাশ।

এক্ষণে প্রশ্ন করা যাইতে পারে যে, ভূত-তত্ত্ব, ভাব-তত্ত্ব ও ন-তত্ত্ব সম্বন্ধে জ্ঞান অর্জ্জন করিবার প্রয়োজন কি? বাস্তবিক পক্ষে ভূত-তত্ত্ব, ভাব-তত্ত্ব ও ন-তত্ত্ব সম্বন্ধে জ্ঞান অর্জ্জন করিবার প্রয়োজন কি অথবা মানুষ উহা লইয়া তাহার মাথা ঘামাইবে কেন, তাহা জানিতে না পারিলে বেদ ও উপনিষদের সার্থকতা কোথায় তাহা বুঝা যায় না। ভূত-তত্ত্ব, ভাব-তত্ত্ব ও ন-তত্ত্ব সম্বন্ধে জ্ঞান অর্জ্জন করিবার প্রয়োজন কি, তাহা জানিতে হইলে মনুষ্যসমাজের প্রত্যেকে সাধারণ ভাবে কি কি চাহিয়া থাকে তাহা সাধারণ বুদ্ধির (common sense) দ্বারা বাছিয়া লইয়া শ্রেণীবদ্ধ করিতে হয়। সাধারণ বুদ্ধির দ্বারা পর্য্যবেক্ষণ করিলে দেখা যাইবে যে, আমরা যে যাহা করিতেছি তাহার প্রত্যেক কার্য্যটীর উদ্দেশ্য কোন-না-কোন রকমের দুঃখ দূর করিয়া সুখার্জ্জন করা। কেহ কেহ হয় ত বলিবেন যে, আমি আমার দুঃখ দূর করিতে চাহি না, সুখ-লাভের ইচ্ছাও আমার নাই: আমার একমাত্র কামা কর্ত্তব্য-প্রতিপালন করা। যাঁহারা কর্ত্তব্যপালন-পথের পথিক, তাঁহারা কর্ত্তব্য-প্রতিপালন করিতে চাহেন কেন তাহা বিশ্লেষণ করিবার চেষ্টা করিলে দেখিতে পাইবেন যে, উহার মূলেও কর্ত্তব্য-প্রতিপালন-না-করা-জনিত দুঃখ দূর করিবার কামনা বিদ্যমান আছে।

আমরা যে যাহা করিতেছি তাহার প্রত্যেক কার্য্যটীর মূলে কোন না কোন রকমের দুঃখ দূর করিবার এবং কোন না কোন রকমের সুখ লাভ করিবার চেষ্টা বিদ্যমান আছে এই সত্যটি সর্ব্বতোভাবে ধারণা করিতে পারিলে দেখা যাইবে যে, সর্ব্বতোভাবে সকল রকমের দুঃখ দূর করিতে হইলে দুঃখ কয় শ্রেণীর এবং প্রত্যেক দুঃখটীর মাত্রা কত শ্রেণীর হয় তাহা স্থির করিবার প্রয়োজন হয়। ইংরাজীতে বলিতে হইলে বলিতে হয়—How many classes of miseries there are, and what are the classifications of each class of miseries?—ইহা স্থির করিবার প্রয়োজন হয়।

"দুঃখ কয় শ্রেণীর"?—এই প্রশ্নের উত্তর সংস্কৃত ভাষায় দিতে হইলে বলিতে হয় যে, দুঃখ তিন শ্রেণীর, যথা:—আধিভৌতিক, আধ্যাত্মিক ও আধিদৈবিক। এই তিন কথার মধ্যেই যাবতীয় সর্ব্ববিধ দুঃখের কথা নিহিত আছে বটে, কিন্তু দুঃখের এতাদৃশ শ্রেণী-বিভাগ সকলের পক্ষে বুঝিয়া উঠা সম্ভব হয় না। এমন কি, বড় বড় পণ্ডিতগণের মধ্যেও অনেকে ঐ তিন কথার বক্তব্য যে কি তাহা সম্যক্‌ভাবে ধরিয়া উঠিতে পারেন না। এক কলসী দুধের মধ্যে এক ফোঁটা কোন নিন্দিত পদার্থ মিশ্রিত করিলে যেরূপ সমস্ত দুধই নষ্ট হইয়া যায়, সেইরূপ এই শ্রেণীর কথায় একটু ভুল প্রবিষ্ট হইলেই আসল বক্তব্য সর্ব্বতোভাবে অপরিজ্ঞাত থাকিয়া যায়। আধুনিক পণ্ডিতগণের লেখা পড়িয়া আমরা যাহা বুঝিয়াছি তাহাতে আমাদিগের মনে হইয়াছে যে, ভারতীয় ঋষিগণ তাঁহাদিগের দুঃখের এই শ্রেণীবিভাগে যাহা বলিতে চাহিয়াছেন তাহা ঐ পণ্ডিতগণের কেহই তলাইয়া বুঝিতে পারেন না এবং বুঝিতে চেষ্টা করেন না। কতকগুলি কথার চটক দেখাইয়া ঐ পণ্ডিতগণ আমাদিগকে বিভ্রান্ত করিয়া দেন। কাযেই আমাদিগকে সাধারণ বুদ্ধির আশ্রয় লইতে হইবে। আমাদিগের মধ্যে যিনি যত রকমের দুঃখ প্রতিদিন পাইয়া থাকেন তাহা মিলাইয়া লইয়া সাধারণ বুদ্ধির দ্বারা দেখিলে দেখা যাইবে যে, দুঃখ পাঁচ শ্রেণীর, যথা:—

(১) অর্থাভাবজনিত দুঃখ—

(২) অস্বাস্থ্যজনিত দুঃখ—

(৩) অশান্তিজনিত দুঃখ—

(৪) অকালবার্দ্ধক্যজনিত দুঃখ—

(৫) অকালমৃত্যুজনিত দুঃখ—

"যত রকমের দুঃখ আছে তাহার প্রত্যেকটীর মাত্রা অথবা মাপকাঠি কয় শ্রেণীর—?" এই প্রশ্নের উত্তর সংস্কৃত ভাষায় দিতে হইলে বলিতে হয় যে, প্রত্যেক দুঃখের মাত্রা অথবা মাপ কাঠি—তিন শ্রেণীর, যথা: (১) সত্ত্ব, (২) রজ ও (৩) তম অথবা (১) সাত্ত্বিক মাত্রার দুঃখ, (২) রাজসিক মাত্রার দুঃখ (৩) তামসিক মাত্রার দুঃখ। মূলতঃ এক

শ্রেণীর দুঃখ। (১) কেহ হয়ত বুঝেনও না যে উহা তাঁহার দুঃখের, পরন্তু যাহা বাস্তবতঃ দুঃখের, অস্বাস্থ্যের অথবা অশান্তির কারণ তাহাকেই স্বাস্থ্যের অথবা শান্তির উপাদান মনে করিয়া ব্যবহার করিতে থাকেন এবং অস্বাস্থ্য ও অশান্তি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে থাকে। (২) আবার কেহ হয়ত বুঝেন যে, উহা তাঁহার দুঃখের, কিন্তু উহা দূর করিবার যথার্থ সঙ্কেত নির্দ্ধারণ করিতে হয় কি করিয়া তাহা জানেন না এবং একটা কাল্পনিক সঙ্কেত অবলম্বন করিয়া দুঃখ দূর করিবার চেষ্টা করিতে থাকেন; ফলে কথঞ্চিৎ মাত্রায় সময় সময় দুঃখ কমিয়া যায় বটে, কিন্তু আবার দুঃখের উদয় হয় এবং আবার আর একটা কাল্পনিক সঙ্কেতের ব্যবহার করিতে থাকেন; কিন্তু কিছুতেই দুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তি হয় না। (৩) কেহ কেহ হয়ত বুঝেন যে, উহা তাঁহার দুঃখের এবং উহা দূর করিবার জন্য যাহা যথার্থ সঙ্কেত তাহাও তাঁহার জানা আছে, কিন্তু ঐ সঙ্কেত ব্যবহারের অক্ষমতা নিবন্ধন সময় সময় দুঃখের উদয় হয়। সাধারণ বুদ্ধির দ্বারা চিন্তা করিয়া দেখিলে দেখা যাইবে যে, উপরোক্ত তিনটী অবস্থার জন্য একই বিষয়ে দুঃখের মাত্রা তিন শ্রেণীর হইয়া থাকে।

দুঃখ কয় শ্রেণীর? এই প্রশ্নের উত্তরে যে সমস্ত দুঃখের কথা বলা হইয়াছে সেই সমস্ত দুঃখ মানুষের কোন্ কোন্ অঙ্গে অথবা ব্যাপারে অভিব্যক্ত হয় তাহার অনুসন্ধান করিলে দেখা যাইবে যে, অর্থাভাবজনিত ও অস্বাস্থ্যজনিত দুঃখের অভিব্যক্তি হয় মানুষের শরীর, ইন্দ্রিয় ও মনে। অশান্তি-জনিত দুঃখের অভিব্যক্তি হয় তাহার মনের কার্য্যে অথবা তাহার ভাব-প্রকাশ অথবা তাহার ভাবনায়। আর অকাল-বার্দ্ধক্য ও অকাল-মৃত্যু জনিত দুঃখের অভিব্যক্তি হয় তাহার শব্দ-স্পর্শ প্রভৃতি সামর্থ্যের সহিত সম্বন্ধ স্থাপনে অথবা অপরের সহিত তাহার ব্যবহারে। ইহা বলাই বাহুল্য যে, দুঃখ দূর করিতে হইলে যে যে স্থলে অথবা ব্যাপারে উহার লক্ষণ প্রকাশ পায় সেই সেই স্থলের অথবা ব্যাপারের আমূল তত্ত্ব জানা একান্ত প্রয়োজনীয়। এই প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করিয়া লইলে ইহাও স্বীকার করিতে হইবে যে, মানুষের অর্থাভাব ও অস্বাস্থ্য জনিত দুঃখ সর্ব্বতোভাবে দূর করিতে হইলে তাহার শরীর, ইন্দ্রিয় ও মনের তত্ত্ব, অশান্তি-জনিত দুঃখ দূর করিতে হইলে ভাবনা-তত্ত্ব অথবা ভাব-তত্ত্ব, এবং অকাল-বার্দ্ধক্য ও অকালমৃত্যু জনিত দুঃখ দূর করিতে হইলে শব্দস্পর্শ প্রভৃতি গুণতত্ত্ব অথবা অর্থতত্ত্ব অথবা ধর্ম্মতত্ত্ব আমূল ভাবে জানিবার প্রয়োজন হয়।

সংস্কৃত ভাষা জানা থাকিলে দেখা যাইবে যে, শরীরতত্ত্ব, ইন্দ্রিয়-তত্ত্ব ও মন-তত্ত্বকে ভারতীয় ঋষিগণ "ভূততত্ত্ব" এই নামে অভিহিত করিয়াছেন, ভাবনা-তত্ত্বের নাম দিয়াছেন ভাব-তত্ত্ব, আর গুণ-তত্ত্ব অথবা অর্থ-তত্ত্ব অথবা ধর্ম্ম-তত্ত্বের নাম দিয়াছেন "ন-তত্ত্ব"। রাজকীয় সংস্কৃত আসোসিয়েশন ও বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের অনুকম্পা জনিত উপাধি বিতরণের ফলে যে সমস্ত মানুষ "পণ্ডিত" নামে বিকাইতেছেন তাঁহাদিগের কাণে আমাদিগের উপরোক্ত কথা নূতন অথবা অদ্ভুত বলিয়া প্রতিভাত হইবে তাহা আমরা জানি, কিন্তু পাঠকদিগকে জানিয়া রাখিতে হইবে যে, ঐ সমস্ত উপাধিধারি-গণকে ঋষিপ্রণীত কোন গ্রন্থ বুঝিতে হইলে যে ভাষা জানিবার প্রয়োজন হয় সেই ভাষা শেখান হয় না এবং ঐ পণ্ডিতগণ প্রায়শঃ ঋষি-প্রণীত কোন মূল গ্রন্থ বুঝিবার সক্ষমতা অর্জ্জন করেন না। ভাষ্যের সহায়তা ছাড়া ঋষি-প্রণীত কোন মূল গ্রন্থ অধ্যয়ন করিবার সামর্থ্য অর্জ্জন করিতে পারিলে দেখা যাইবে যে ঋষিগণ "ভূত-ভাব-ন" এ কথাটী বহু স্থানে ব্যবহার করিয়াছেন এবং সর্ব্ববিধ দুঃখ সর্ব্বতোভাবে দূর করিতে হইলে যে ভূত-তত্ত্ব, ভাব-তত্ত্ব ও ন-তত্ত্ব আমূলভাবে জানিতে হইবে ইহা তাঁহাদিগের কথা। মোটের উপর বুঝিতে হইবে যে, ভূত-তত্ত্ব, ভাব-তত্ত্ব ও ন-তত্ত্ব জানিবার প্রয়োজন মানুষের সর্ব্ববিধ দুঃখ সর্ব্বতোভাবে দূর করিবার জন্য। ম্যালা সংস্কৃত গ্রন্থ পড়িলাম, নানারকমের পরীক্ষা দিয়া নানা রকমের উপাধি লাভ করিলাম, মানুষের অবোধ্য ভাষায় 'কাটাং মাটাং' করিয়া নানা রকম ভাবে পঞ্চ মহাভূতের গল্প করিলাম, নিজেকে অসাধারণ পণ্ডিত মনে করিয়া নিজের কথায় মজগুল থাকিলাম, অথচ প্রণয়িনীর ক্ষুধার ডাক মিটাইবার সময় ভূতকাধ্যাপকতা, নতুবা কোন টোলের বৃত্তি গ্রহণ, নতুবা কোন পুস্তক বিক্রয়ের ব্যবসা, নতুবা কোন কুপথগামী যজমান-শিষ্যের দান অবলম্বন করিলাম, প্রাণোপম পুত্রকন্যাদিগের অসুখের সময় সর্ব্বতোভাবে ডাক্তার-বৈদ্যের কৃপাপ্রার্থী হইলাম, অশান্তিতে সর্ব্বদাই

জর্জ্জরিত থাকিলাম, ইহাতে ভূত-তত্ত্বে অথবা ভাব-তত্ত্বে অথবা ন-তত্ত্বে জ্ঞানলাভ করিবার কোন পরিচয় পাওয়া যায় না। আসল ভূত-তত্ত্বের, ভাব-তত্ত্বের ও ন-তত্ত্বের জ্ঞান সর্ব্বতোভাবে লাভ করিতে পারিলে জীবিকার জন্ম ব্রাহ্মণ্য-বিরোধী কোন বৃত্তির অবলম্বন করিতে হয় না। অস্বাস্থ্যের জন্ম সর্ব্বতোভাবে কোন ডাক্তার অথবা বৈদ্যের কৃপাপ্রার্থী হইতে হয় না। অশান্তি ক্ষণিকের জন্যও উঁকি ঝুঁকি মারিতে পারে না। নিজের অর্থাভাব, অস্বাস্থ্য ও অশান্তিও আপনা হইতেই চলিয়া যায়, পরিজন এবং বন্ধুবর্গের দুঃখেরও অবসান করা সাধ্যায়ত্ত হয়। ভূত-তত্ত্ব, ভাব-তত্ত্ব ও ন-তত্ত্ব বলিতে কি বুঝায় তাহা সর্ব্বতোভাবে বুঝিতে পারিলে আমাদিগের উপরোক্ত কথা যে আজগুবি নহে তাহা সাধারণ বুদ্ধির দ্বারাও অনুমান করা যাইবে। পাশ্চাত্যগণ পদার্থ-বিদ্যা, রসায়ন ও নানারকমের "লজি" যথা—"ফিজিয়োলজি", "অ্যান্থ্রোপলজি", "সাইকোলজি", "জিওলজি", "জুয়োলজি", ইত্যাদি রচনা করিয়াছেন বটে, কিন্তু ভারতীয় ঋষির ভূত-তত্ত্বের কথায় এখনও উপনীত হইতে পারেন নাই। ভারতীয়গণের বিনা সহায়তায় কখনও পারিবেন কিনা তদ্বিষয়েও সন্দেহ আছে। ভারতীয় ঋষির ভাব-তত্ত্বে ও ন-তত্ত্বে যে সমস্ত কথা আছে, তাহার অনুরূপ কোন কথার কোন শাস্ত্র পাশ্চাত্যগণের চিন্তার মধ্যেই এখনও পর্য্যন্ত উদিত হয় নাই। ভারতীয় ঋষির সন্তানগুলি মনুষ্যাবয়বে কতকগুলি মেষরূপে পরিণত হইয়াছে বলিয়াই ভারত ও মনুষ্যসমাজ তাহাদিগের বর্ত্তমান অবস্থায় উপনীত হইয়াছে। প্রাণে অনেক বেদনা। তাই চেষ্টা সত্ত্বেও আবোল তাবোল অনেক কথা বাহির হইয়া যায়। নিজেকে লুক্কায়িত করিতে জানি না, পাঠকগণের নিকটে ক্ষমা চাই।

এক্ষণে ভারতীয় ঋষির দর্শনসমূহের মুখ্য বক্তব্য কি তৎসম্বন্ধীয় কথা আরম্ভ হইবে।

এতাবৎ দেখান হইয়াছে যে, মনুষ্যের সর্ব্ববিধ দুঃখ সর্ব্বতোভাবে দূর করিবার জন্ম ভূত-তত্ত্ব, ভাব-তত্ত্ব ও ন-তত্ত্ব সম্যক্‌রূপে জানিবার ও উপলব্ধি করিবার প্রয়োজন হয়। মানুষের ও চরাচর সমস্ত জীবের শরীর, ইন্দ্রিয় ও মন কোথা হইতে কোন্ গাণিতিক নিয়মে আইসে এবং তাহার প্রত্যেকটীর কত অবস্থা এবং কোন অবস্থার কি পরিণতি, তাহার কথা লইয়া ভারতীয় ঋষির ভূত-তত্ত্ব। মানুষের প্রমাণ-প্রবৃত্তি, প্রমেয়ানুসন্ধান, সংশয়োত্থান, প্রয়োজনানুসন্ধান, দৃষ্টান্তস্থিরীকরণ, সিদ্ধান্ত গ্রহণ, তর্কপ্রবৃত্তি, নির্ণয়-প্রবৃত্তি, বাদ-প্রবৃত্তি প্রভৃতির আবশ্যকতা কি, কেনই বা উহাদের উৎপত্তি হয়, কি হইলে উহাদের প্রত্যেকটী যথাযথ ও হিতকর হয়, এবং কি হইলেই বা উহারা অযথার্থ ও অহিতকর হইয়া পড়ে এই শ্রেণীর বিষয় লইয়া ভারতীয় ঋষির ভাব-তত্ত্ব। মানুষের শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধগ্রহণ শক্তি কোথা হইতে কোন গাণিতিক নিয়মে উদ্ভূত হয়, উহাদিগের প্রত্যেকটীর পরিণতি কি, কি করিলে ঐ শক্তিসমূহ দীর্ঘস্থায়ী হইতে পারে এবং কি করিলেই বা ঐ শক্তিসমূহ দুর্ব্বল ও নষ্ট হইয়া যায়,—এবম্বিধ কথা লইয়া ভারতীয় ঋষির ন-তত্ত্ব।

বেদ ও উপনিষৎসমূহের মুখ্য বক্তব্য কি কি তাহার আলোচনাকালে দেখান হইয়াছে যে, যে যে বিষয় লইয়া ভূত-তত্ত্ব, ভাব-তত্ত্ব ও ন-তত্ত্ব, সেই সেই বিষয়ের 'বিজ' কিরূপে উৎপন্ন হয় এবং তাহাদের পরিণতিই বা কি এবং ঐ "বিজের" উৎপত্তি ও পরিণতি প্রত্যক্ষ করিতে হয় কি করিয়া তাহার কথা লইয়া 'বেদ'। আর ঐ ঐ বিষয়ের 'বীজ' (অর্থাৎ "বিজের" পরিণতি) কিরূপে উৎপন্ন হয় এবং "বীজের" পরিণতিই বা কি এবং ঐ বীজের উৎপত্তি ও পরিণতি প্রত্যক্ষ করিতে হয় কি করিয়া তাহার কথা লইয়া "উপনিষৎ"। একটু চিন্তা করিয়া দেখিলে, সাধারণ বুদ্ধির দ্বারাও বুঝা যাইবে যে, যে যে বিষয় লইয়া ভূত-তত্ত্ব, ভাব-তত্ত্ব, ও ন-তত্ত্ব, সেই সেই বিষয়ের বিজ ও বীজ সম্বন্ধে যাবতীয় কথার আলোচনা হইলেই, ঐ তিনটী তত্ত্বের আলোচনা সম্পূর্ণ করা হয় না। ঐ তিনটী তত্ত্বের আলোচনা সম্পূর্ণ করিতে হইলে, যে যে বিষয় লইয়া ভূত-তত্ত্ব, ভাব-তত্ত্ব ও ন-তত্ত্ব, সেই সেই বিষয়ের বীজোদ্গম হইলে উহা অঙ্কুরিত, অভিব্যক্ত (অর্থাৎ ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য) এবং পরিণত হয় কি করিয়া এবং কোন নিয়মে, তাহার আলোচনা করাও একান্ত প্রয়োজনীয় হইয়া থাকে। এই আলোচনা রহিয়াছে ছয়টী দর্শনের মধ্যে। এক কথায় **ভূত-তত্ত্ব, ভাব-তত্ত্ব, ও ন-তত্ত্বের আলোচ্য যে যে বিষয়, মুক্তাকাশে ও বদ্ধাকাশে সেই সেই**

বিষয়ের বীজোদ্গম হইলে উহা অঙ্কুরিত অভিব্যক্ত ও পরিণত হয় কি করিয়া এবং কোন্ কোন্ নিয়মে, তাহার আলোচনা করা দর্শনসমূহের মুখ্য বক্তব্য।

বীজের "অঙ্কুর," "অভিব্যক্তি" ও "পরিণতি" বলিতে কি বুঝায় তাহা না বুঝিতে পারিলে ষড়্-দর্শনের কি কি মুখ্য বক্তব্য তৎ সম্বন্ধে পরিষ্কার ধারণা করা সম্ভব হয় না। গর্ভের প্রথম ক্ষণ হইতে আরম্ভ করিয়া জ্রূণরূপ পরিগ্রহ করিবার প্রাক্‌কাল পর্য্যন্ত বীজের অঙ্কুরাবস্থা। জ্রূণরূপ পরিগ্রহ হইতে আরম্ভ করিয়া হস্ত-পদ-কায়-বিশিষ্টাবস্থায় ভূমিষ্ঠ হওয়া পর্য্যন্ত বীজের অভিব্যক্তি অবস্থা। ভূমিষ্ঠ হওয়া হইতে আরম্ভ করিয়া মৃত্যু পর্য্যন্ত বীজের পরিণতির অবস্থা। বীজের অভিব্যক্তি ও পরিণতিতে ছয়টী ভাববিকারের উৎপত্তি হয়, ছয়টি ভাববিকারের সংস্কৃত নাম (১) জায়তে, (২) অস্তি, (৩) বিপরিণমতে, (৪) বর্দ্ধতে, (৫) অপক্ষীয়তে, (৬) বিনশ্যতি।

এই ছয়টী ভাব-বিকারের তাৎপর্য্য কি কি তাহা বিশ্লেষণ করিতে হইলে অনেক কথা বলিতে হইবে। উহা এ প্রবন্ধে আলোচনা করা সম্ভব নহে। বীজের অঙ্কুর, অভিব্যক্তি ও পরিণতি বলিতে কি বুঝায় তাহা ধারণা করিতে পারিলে ষড়্‌দর্শনের মুখ্য বক্তব্য কি কি তাহা অপেক্ষাকৃত সহজেই উপলব্ধি করিতে পারা যায়।

চরাচর সমস্ত জীবের উৎপত্তি হয় কি করিয়া তাহা বুঝাইতে বসিয়া ঋষিগণ তাঁহাদের বিভিন্ন উপনিষদে অতি পরিষ্কারভাবে দেখাইয়াছেন যে, জগতে যত শ্রেণীর জীব আছে তাহার প্রত্যেকের বীজ মুক্তাকাশে নিহিত হয় এবং ঐ বিভিন্ন বীজের বিভিন্ন গাণিতিক কর্ম্মফলে মুক্তাকাশের স্থানে স্থানে বদ্ধাকাশের উৎপত্তি হয় এবং তখন বীজের অঙ্কুরোদ্গম হইবার উপক্রম হয়। মনে রাখিতে হইবে যে, বীজের এই অঙ্কুরোদ্গমের উপক্রম পর্য্যন্ত উপনিষদের আলোচনার অন্তর্ভুক্ত। ইহার পরই মীমাংসা ও দর্শনের আলোচ্য বিষয়। "অঙ্কুরোদ্গম হইবার উপক্রম" এই বাক্যটী দার্শনিক এবং ইহা বুঝা অপেক্ষাকৃত দুরূহ। মাতা ও পিতার মিলনের ফলে প্রথম যে ক্ষণে গর্ভের উদয় হয়, সেই ক্ষণে জরায়ুস্থিত আকাশ কোন্ রকমের রূপ ধারণ করে, তাহা ধারণা করিতে পারিলে "অঙ্কুরোদ্গম হইবার উপক্রম হয়" এই বাক্যে কি বুঝিতে হয় তাহা বুঝা যাইবে।

মীমাংসা ও দর্শনের কথাগুলি উপনিষৎ ও বেদের কথার তুলনায় অপেক্ষাকৃত সহজ। ঐ কথাগুলি যতই সহজ হউক না কেন, সর্ব্বসাধারণের বুঝার মত সহজ নহে। দর্শন ও মীমাংসার মধ্যে প্রবিষ্ট হইতে হইলে একদিকে যেরূপ সূত্র বুঝিবার রীতি জানিবার প্রয়োজন হয়, অন্যদিকে আবার মন যাহাতে তাহার চাঞ্চল্য ছাড়িয়া দিয়া স্থির-প্রবৃত্তি-সম্পন্ন হয় তাহার জন্য কঠোর সাধনা করিতে হয়।

সূত্র বুঝিবার রীতি একমাত্র ছয়টী বেদাঙ্গ অধ্যয়ন করিতে পারিলে জানা যায়। ভগবদনুকম্পায় অনুকম্পিত না হইতে পারিলে কোন সিদ্ধ-গুরুর সাহায্য ব্যতীত ছয়টী বেদাঙ্গ অধ্যয়ন করা সম্ভবযোগ্য নহে। বেদাঙ্গের অষ্টাধ্যায়ী সূত্রপাঠ অথবা শিক্ষা অথবা কল্প অথবা ছন্দ অথবা নিরুক্ত অথবা জ্যোতিষ অন্য কোন ভাষায় সর্ব্বতোভাবে অনুবাদ করা সম্ভব কি না তদ্বিষয়ে সন্দেহ করিবার কারণ আছে। একমাত্র বেদাঙ্গ ছাড়া অন্য কোন প্রচলিত ব্যাকরণের সহায়তায় সূত্র বুঝিবার রীতি পরিজ্ঞাত হওয়া যায় না, কারণ, ঐ সমস্ত ব্যাকরণে উহা লিখিত হয় নাই।

মন যাহাতে তাহার চাঞ্চল্য ছাড়িয়া দিয়া স্থির-প্রবৃত্তি সম্পন্ন হয় তাহা করিতে হইলে তন্ত্রোক্ত বিভিন্ন অভ্যাসে অভ্যস্ত হইতে হয়।

মীমাংসা ও দর্শনের কথা জ্ঞান-বিজ্ঞানক্ষেত্রে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ও উপাদেয়। পাঠকবর্গকে ঐ সমস্ত কথা বিস্তৃতভাবে শুনাইতে পারিলে নিজেকে অত্যন্ত কৃতার্থ মনে করিতে পারিতাম। উহাদের দুরূহত্ব নিবন্ধন উহা বুঝান লেখকের সাধ্যায়ত্ত নহে বলিয়া ঐ সমস্ত কথা বুঝান কেন দুরূহ তাহা বুঝাইবার জন্য উপরোক্ত কথাগুলি লিখিত হইল।

ভূত-তত্ত্বের কথা লইয়া "বৈশেষিক দর্শন"। চরাচর জীবের অবয়বে যাহা কিছু ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য তাহা জীবাভ্যন্তরস্থিত বদ্ধাকাশ হইতে কিরূপে উৎপন্ন হয়, নানারকমের আকার তাহাদের কেন হয়, তাহাদের কি কি গুণ এবং ঐ ঐ গুণ তাহারা কি করিয়া কোথা হইতে পায়, তাহাদের কি কি

কর্ম্মশক্তি, এবং ঐ ঐ কর্ম্মশক্তি তাহারা কি করিয়া কোথা হইতে পায়, তাহাদের পরস্পরের মিলন কোন্ গাণিতিক নিয়মে হইয়া থাকে, তাহাদের পরিণতি কি কি, এবম্বিধ বিষয়গুলি বৈশেষিক দর্শনে আলোচনা করা হইয়াছে। চরাচর জীবের অবয়বে কি কি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য তাহা না বলিয়া দিলে আমাদিগের উপরোক্ত কথা পরিষ্কার হইবে না। মানুষ একটী চর-জীব। তাহার অবয়বে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু সতেরটী, যথা (১) মেদ; (২) অস্থি; (৩) মজ্জা; (৪) বশা; (৫) মাংস; (৬) রক্ত; (৭) চর্ম্ম; (৮-১২) পাঁচটী কর্ম্মেন্দ্রিয়; (১৩-১৭) পাঁচটী জ্ঞানেন্দ্রিয়। বৃক্ষ একটী অচর-জীব। তাহার অবয়বে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অঙ্গ ছয়টী, যথা (১) শিকড়; (২) শুঁড়ি; (৩) ডাল; (৪) পাতা; (৫) ফুল; (৬) ফল। এই ছয়টী অঙ্গের প্রত্যেকটীর মধ্যে আবার পাঁচটী ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু আছে, যথা (১) মেদ; (২) অস্থি; (৩) মাংস; (৪) রস; (৫] চর্ম্ম। গাছের মেদাস্থির কথা শুনিয়া পাঠকগণ শিহরিয়া উঠিবেন না। কাহাকে গাছের মেদ অথবা অস্থি বলা হয় তাহা জানিতে পারিলে ঐ কথায় শিহরিয়া উঠিবার কারণ থাকিবে না। পাঠকগণের মধ্যে যাঁহারা বর্ত্তমান বিজ্ঞানের সহিত পরিচিত তাঁহারা ভাবিয়া দেখুন, বৈশেষিক দর্শনে যে যে বিষয়ের আলোচনা করা হইয়াছে বলিয়া আমরা বলিলাম, সত্য সত্যই যদি বৈশেষিক দর্শনে ঐ সমস্ত বিষয়ের আলোচনা করা হইয়া থাকে, তাহা হইলে পদার্থবিদ্যা (Physics), রসায়ন (Chemistry), উদ্ভিদ্‌বিদ্যা (Botany), প্রাণিতত্ত্ব (Zoology), ভূ-তত্ত্ব (Geology), শরীরবিধান শাস্ত্র Physiology, ও মনস্তত্ত্বের (Psychology) পরাকাষ্ঠা উহাতে পাওয়া সম্ভব কি না। বাস্তবিক পক্ষে বৈশেষিক দর্শনে পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, উদ্ভিদ্ বিদ্যা, প্রাণিতত্ত্ব, ভূ-তত্ত্ব, শরীরবিধানশাস্ত্র ও মনস্তত্ত্ব সম্বন্ধীয় সমস্ত জ্ঞাতব্য বিষয় পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে লিখিত আছে। উহার বারোয়ানী কথা উপরোক্ত বর্ত্তমান বিজ্ঞানগুলির অপরিজ্ঞাত। ঐ বিজ্ঞানগুলি বৈশেষিক দর্শনের কথাগুলি পাওয়ার জন্য অজ্ঞাতভাবে গত দুইশত বৎসর হইতে হাতড়াইয়া বেড়াইতেছে। ঐ সমস্ত কথা যে বৈশেষিক দর্শনের আলোচ্য, তাহা উহার "ধর্ম্মবিশেষ-প্রসূতাদ্ দ্রব্য-গুণ কর্ম্ম-সামান্য-বিশেষ-সমবায়ানাং পদার্থানাং সাধর্ম্ম্য-বৈধর্ম্ম্যাভ্যাং তত্ত্বজ্ঞানাৎ নিঃশ্রেয়সম্" এই সূত্রটী যথাযথ ভাবে পরিজ্ঞাত হইতে পারিলেই বুঝা যাইবে।

ভাবতত্ত্বের কথা আলোচনা করা হইয়াছে "ন্যায়-দর্শনে"। এইখানে পাঠকগণকে মনে রাখিতে হইবে যে, মন-স্তত্ত্ব ও ভাবতত্ত্ব একার্থক নহে। মন, বুদ্ধি ও ইচ্ছার উৎপত্তি হইলে যে সমস্ত ভাবনা অথবা প্র-যত্ন জীবের মনে স্বতঃই উদয় হয় তাহার কথা লইয়া ভারতীয় ঋষির ভাব-তত্ত্ব। যাঁহারা মনে করেন পাশ্চত্ত্য লজিকের (Logic) ও ভারতীয় ঋষির "ন্যায়-দর্শনের" একই বিষয়বস্তু তাঁহারা ভ্রান্ত। যে উদ্দেশ্য লইয়া পাশ্চাত্ত্য লজিকের রচনা করা হইয়াছে সেই উদ্দেশ্য কি করিয়া সাধিত করিতে হয় তাহা ভারতীয় ঋষির ন্যায়-দর্শনে আছে বটে, কিন্তু তাহা উহার অতীব অকিঞ্চিৎকর অংশ মাত্র। যাঁহারা পাশ্চাত্ত্য Deductive ও Inductive Logic পাঠ করিয়াছেন এবং তৎসঙ্গে সঙ্গে ন্যায়দর্শনের "বিতণ্ডা"-বিষয়ক কথাগুলির সহিত যথাযথ অর্থে পরিচিত হইতে পারিয়াছেন, তাঁহারা আমাদিগের এই বক্তব্যটুকু বুঝিতে পারিবেন। ন্যায়-দর্শনের বিষয়-বস্তু এখনও পাশ্চাত্ত্যগণের একরূপ সম্পূর্ণভাবে অপরিজ্ঞাত এবং কল্পনার বহির্ভূত। চরাচর জীবের মন, বুদ্ধি ও ইচ্ছার উৎপত্তি হয় কেন এবং ঐ মন, বুদ্ধি ও ইচ্ছার তারতম্যের জন্য জীবের গুণ ও কর্ম্ম-শক্তিতে কোন্ কোন্ রকমের তারতম্যের উৎপত্তি হয় এবম্বিধ বিষয়ক আলোচনা রহিয়াছে বৈশেষিক দর্শনে। মন, বুদ্ধি ও ইচ্ছার উৎপত্তি হইলে স্বতঃই কোন কোন ভাবনা ও প্রযত্নের উৎপত্তি জীবের অন্তরে হইয়া থাকে, কেন ঐ সমস্ত ভাবনা ও প্রযত্নের উৎপত্তি হয়, ঐ সমস্ত ভাবনা ও প্রযত্নের পরিণতি কি, কেন উহা কখনও সঠিক এবং কখনও অঠিক হইয়া থাকে, কোন্ উপায় অবলম্বন করিলে ঐ ভাবনা ও প্রযত্নগুলিকে সঠিক করিয়া তুলিতে পারা যায় এবম্বিধ বিষয়গুলি ন্যায়-দর্শনে আলোচনা করা হইয়াছে। উপরোক্ত বিষয়গুলি মানুষের দৈনন্দিন জীবনে কত প্রয়োজনীয় তাহা পাঠকগণ একবার ভাবিয়া দেখিবেন কি? যদি সত্য সত্যই ঐ বিষয়গুলির সম্পূর্ণ ও ভ্রমহীন আলোচনা ভারতীয় ঋষির ন্যায়দর্শনে স্থান পাইয়া থাকে, তাহা হইলে এখন আর ন্যায়দর্শন পড়িয়া উহার কোনটীর গন্ধ তাহাতে পাওয়া যায় না কেন? এবম্বিধ

প্রশ্ন উত্থাপিত করিলে আমাদিগকে বলিতে হইবে যে, এখন আর কেহ ভারতীয় ঋষির সূত্রের অর্থ কোন্ উপায়ে গ্রহণ করিতে হয় তাহার রীতি পরিজ্ঞাত নহেন। প্রচলিত ভাষ্যকারগণও উহা বিদিত ছিলেন না। তাহার জন্যই এখন আর কেহ ন্যায়দর্শন পড়িয়াও উহার প্রকৃত বক্তব্য উদ্ধার করিতে পারেন না। সামান্য বৈদ্য-ব্যবসায়ীর লেখনী হইতে এই কথাগুলি বাহির হইতেছে বলিয়া ইহা স্থানবিশেষে উপেক্ষিত হইতে পারে বটে, কিন্তু সাধারণ পাঠকগণ জানিয়া রাখুন যে "কাল" আমাদিগের এই সমস্ত কথার সত্যতা প্রমাণিত করিবে। গঙ্গেশ উপাধ্যায় মহাশয়ের নব্য-ন্যায় মূল ন্যায়দর্শনের বদ-হজমের পরিচায়ক। ঋষি-প্রণীত মূল-ন্যায়দর্শনের আলোচনাগুলি মানুষের যথাযথভাবে জানা থাকিলে গঙ্গেশ উপাধ্যায় মহাশয়ের এবং তাঁহার অনুচরবর্গের কথাগুলিকে সমাজে স্থান দিতে মানুষ লজ্জা বোধ করিত। গঙ্গেশ উপাধ্যায় মহাশয়ের এবং তাঁহার অনুচরবর্গের কথাগুলি যেরূপ সর্ব্বতোভাবে নিন্দার যোগ্য, উদয়নাচার্য্যের কথাগুলি সেইরূপ সর্ব্বতোভাবে নিন্দার যোগ্য নহে। কিন্তু পরিতাপের বিষয় এই যে, উদয়নাচার্য্যের কথাগুলি সর্ব্বতোভাবে বুঝিতে হইলে তাঁহার সমসাময়িক ব্যাকরণ ও অভিধানের যে ব্যুৎপত্তি থাকা আবশ্যক তাঁহার পরবর্ত্তী পণ্ডিতগণের মধ্যে সেই ব্যুৎপত্তির অত্যন্ত অভাব পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। ইহার ফলে উদয়নাচার্য্যের কথাগুলিও আজকালকার পণ্ডিতগণ যথাযথ-অর্থে বুঝিতে পারেন না। ভাব-তত্ত্ব অথবা ভাবনা তত্ত্বের উদ্ঘাটন করা যে ন্যায়-দর্শনের প্রধান লক্ষ্য, তাহা উহার প্রথম সূত্রটী যথাযথভাবে উপলব্ধি করিতে পারিলেই পরিষ্কারভাবে বুঝা যাইবে।

ন-তত্ত্বের আলোচনা লইয়া পূর্ব্ব-মীমাংসা রচিত হইয়াছে। আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, গুণ-তত্ত্ব অথবা অর্থ-তত্ত্ব, অথবা ধর্ম্ম-তত্ত্বের নাম "ন-তত্ত্ব।" যাঁহারা ন্যায়-দর্শনের সাহায্যে ভূত, ইন্দ্রিয়, গুণ, অর্থ, মন ও বুদ্ধির সংজ্ঞা যথাযথ অর্থে উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন তাঁহাদিগের পক্ষে "ন-তত্ত্ব" কাহাকে বলে তাহা বুঝিয়া উঠা মোটেই দুরূহ হইবে না। কিন্তু সাধারণ পাঠকের পক্ষে উহা বুঝা সহজসাধ্য নহে। সাধারণ পাঠকগণকে তাঁহাদিগের সাধারণ বুদ্ধির দ্বারা লক্ষ্য করিতে হইবে যে, শিশুগণ তাহাদিগের জন্মিবার সঙ্গে সঙ্গেই এক শ্রেণীর শব্দ-শক্তি, স্পর্শ-শক্তি, রূপ-গ্রহণশক্তি, রস-গ্রহণ-শক্তি এবং গন্ধ-গ্রহণ শক্তি লাভ করিয়া থাকে। শৈশব অবস্থায় ঐ সমস্ত শক্তির স্পষ্ট কোন অভিব্যক্তি হয় না বটে, কিন্তু শিশুগণের অন্তরে যে ঐ সমস্ত শক্তির বীজ বিদ্যমান থাকে এবং ঐ সমস্ত শক্তির বীজের পরিপুষ্টির সহিত যে তাহাদিগের ইচ্ছার (অর্থাৎ এটা চাওয়া, ওটা চাওয়া প্রভৃতি কামনার) পরিপুষ্টি হইতে থাকে তাহা একটু লক্ষ্য করিলেই স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে। শব্দাদি-শক্তির সর্ব্বাপেক্ষা নিকটবর্ত্তী অথবা মুখ্য-মূল (গৌণ-মূল নহে) কোথায়, শব্দাদির মুখ্য-মূল হইতে শব্দাদি-শক্তির উৎপত্তি হয় কি করিয়া, শব্দাদি-শক্তি হইতে ইচ্ছা অথবা কামনা অথবা অর্থ-লোলুপতার উৎপত্তি হয় কি করিয়া, অর্থ-লোলুপতা কখনও মানুষের ও সমাজের হিতকর, কখনও অ-হিতকর, কখনও মোহমুগ্ধকর হয় কেন এবং কি করিয়া, কোন্ উপায়ে অর্থ-লোলুপতায় সর্ব্বদাই মানুষের ও সমাজের হিত-কারিতা রক্ষা করা সম্ভব হয়, এবম্বিধ বিষয় লইয়া ন-তত্ত্ব এবং মুখ্যতঃ তাহার আলোচনা করাই পূর্ব্ব-মীমাংসার বিষয়-বস্তু।

যাঁহারা সম্যক্ ভাবে পূর্ব্ব-মীমাংসার মূল সূত্র-গুলিতে প্রবিষ্ট হইতে পারিবেন, তাঁহারা পূর্ব্ব-মীমাংসার বিষয়-বস্তু সম্বন্ধে আমাদিগের সহিত একমতাবলম্বী হইতে বাধ্য হইবেন। যাঁহারা সম্যক্ ভাবে পূর্ব্ব-মীমাংসায় প্রবিষ্ট হইতে পারেন নাই, তাঁহারা যদ্যপি ন্যায়-দর্শনের "গন্ধ-রস-রূপ-স্পর্শ-শব্দাঃ পৃথিব্যাদিগুণাঃ তৎ অর্থাঃ" এই সূত্রটী বুঝিয়া লইয়া উহার সাহায্যে "অর্থ" কাহাকে বলে তাহা উপলব্ধি করেন, এবং পূর্ব্ব-মীমাংসার "অথাতো ধর্ম্ম-জিজ্ঞাসা" "চোদনা-লক্ষণঃ অর্থঃ ধর্ম্মঃ" এই দুইটী সূত্র যথাযথ ভাবে বুঝিতে পারেন তাহা হইলেও, আমরা যাহা বলিলাম তাহাই যে পূর্ব্ব-মীমাংসার বিষয়-বস্তু তাহা অনুমান করিতে পারিবেন।

যাঁহারা শাবর-ভাষ্য অথবা শ্লোক-বার্ত্তিক অথবা তন্ত্র-বার্ত্তিক পড়িয়া নিজদিগকে পূর্ব্ব-মীমাংসার পণ্ডিত বলিয়া মনে করিয়া থাকেন, তাঁহাদিগকে মনে রাখিতে হইবে যে সংস্কৃত ভাষার তিনটী রূপ আছে, যথা: মন্ত্র-রূপ, সূত্র-রূপ ও কারিকা রূপ। যে সমস্ত বক্তব্য ভাষার মন্ত্র-রূপ, ও সূত্র-রূপে ব্যক্ত হয়, সেই সমস্ত মূল বক্তব্য কোন ভাষ্যের দ্বারা বুঝান সম্ভব নহে। মন্ত্রে অথবা সূত্রে যাহা বক্তব্য

থাকে, তাহা ঘটিতে থাকিলে তাহার পরিণতিতে কি হয় কেবল মাত্র তাহাই ভাষ্যকার বর্ণনা করিতে পারেন এবং সমস্ত মূল ভাষ্যে কেবল মাত্র তাহাই বর্ণনা করা হইয়া থাকে। পরিণতিতে কি ঘটে তাহা বুঝিয়া লইয়া মূল-মন্ত্রের অথবা সূত্রের বক্তব্য কি তাহা কথঞ্চিৎ পরিমাণে অনুমান করা যায় বটে, কিন্তু সর্ব্বতোভাবে বুঝিয়া উঠা সম্ভব নহে। এক কথায়, মন্ত্র ও সূত্র বুঝিবার সহায়তা আচার্য্য অথবা ভাষ্যকার করিতে পারেন বটে, কিন্তু শিষ্য নিজে সাধনা না করিলে, তাহাকে আচার্য্য—অথবা ভাষ্যকার মূল বক্তব্য হুবহু বুঝাইয়া দিতে পারেন না। কাযেই ভাষ্য অধ্যয়ন করিয়া সূত্রের মূল বক্তব্য কখনও সর্ব্বতোভাবে বুঝিয়া উঠা সম্ভব হয় না। মন্ত্র ও সূত্রের মূল বক্তব্য সর্ব্বতোভাবে বুঝিবার একমাত্র উপায় স্ফোট-সাধনা। কিন্তু পরিতাপের বিষয় এই যে, স্ফোট-সাধনা কাহাকে বলে তাহার একটা সাধারণ ধারণা-সম্পন্ন একটী পণ্ডিতও আজকাল দেখা যায় না। রাজকীয় সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষপদে সমাসীন ডাঃ সুরেন্দ্রনাথ দাশ-গুপ্ত কিছুদিন হইল "কাব্য-বিচার" নামক একখানি গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন। এই গ্রন্থে স্ফোটের লক্ষণ সম্বন্ধে ডাক্তার সাহেব কয়েকটী কথা বলিয়াছেন। যাঁহারা স্ফোট-সাধনায় অভ্যস্ত হইয়া তাহার সাহায্যে সূত্র ও মন্ত্রের কার্য্য-কারণ-সঙ্গত অর্থ গ্রহণ করিবার সক্ষমতা অর্জ্জন করিবার সৌভাগ্য লাভ করিতে পারিয়াছেন তাঁহারা বুঝিতে পারিবেন যে, উপরোক্ত ডাক্তার সাহেবটী "স্ফোট-লক্ষণ" সম্বন্ধে কত অজ্ঞ অথচ কত অভিমানগ্রস্ত।

স্ফোটের লক্ষণ কি তাহা বুঝিতে হইলে তাহার আগে "শব্দ" ও "ধ্বনি" কাহাকে বলে এবং "শব্দ" ও "ধ্বনি" এই দুইটী ব্যাপারের মধ্যে পার্থক্য কি, তাহা উপলব্ধি করিবার প্রয়োজন হয়।

ডাঃ দাশগুপ্তের "কাব্য-বিচার" পড়িলে বুঝা যাইবে যে, "শব্দ" ও "ধ্বনি" কাহাকে বলে এবং এই দুইটী ব্যাপারের মধ্যে পার্থক্য কি তাহার বিন্দুমাত্র ধারণাও এই ডাক্তার সাহেবটীর নাই। অথচ তিনি "কাব্য-বিচার" প্রকাশ করিতে সঙ্কোচ বোধ করেন নাই। এই পণ্ডিতগণ জানেন না যে, মৌলিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের কথা লইয়া মনুষ্য-সমাজের ভ্রান্তিকর কোন আলোচনা প্রচার করিলে তাহাতে মনুষ্য-সমাজের কত অনিষ্ট করা হয় এবং এই অপরাধে প্রাকৃতিক কত কঠোর শাস্তি পাইতে হয়। পণ্ডিতগণের ও তাঁহাদের পরিবারের অর্থ-দৈন্য, অশান্তি, অস্বাস্থ্য ও নির্ব্বংশতা উপরোক্ত প্রাকৃতিক কঠোর শাস্তির অভিব্যক্তি। মনুষ্য-সমাজ আজ তাহা বোঝে না ও মানে না। মনুষ্য সমাজ বুঝুক আর নাই বুঝুক, মানুক আর নাই মানুক, প্রকৃতির কার্য্য ঠিক ভাবেই চলিয়া যাইতেছে এবং চলিয়া যাইবে। "কাব্য-বিচারে"র লেখকের মত লেখকগণ সমাজের হাতে কোন শাস্তি না পাইলেও চিরদিনই প্রাকৃতিক শাস্তি পাইয়া আসিতেছেন এবং পাইবেন।

স্ফোট-সাধনা কাহাকে বলে তাহার একটা সাধারণ ধারণা সম্পন্ন একটী পণ্ডিতও আজকাল দেখা যায় না—এই মন্তব্যের উদাহরণ দিবার জন্ম ডাঃ সুরেন্দ্র নাথ দাশগুপ্তের তথাকথিত "কাব্য-বিচারের" কথার অবতারণা করিয়াছিলাম। উপাধি ধারী পণ্ডিতের বাক্যের বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলে দেখা যাইবে যে, সকল পণ্ডিতই মূলতঃ ডাক্তার দাশ*গুপ্তের মত শাস্ত্র-বিষয়ে প্রায়শঃ অজ্ঞ অথচ অভিমানী।

আমাদের উপরোক্ত কথাগুলির আসল বক্তব্য এই যে, আধুনিককালে পূর্ব্ব-মীমাংসার কথা বলিয়া যে সমস্ত কথা চলিতেছে তাহা ঋষি-প্রণীত পূর্ব্ব-মীমাংসার কথা নহে। ঐ সমস্ত কথা প্রায়শঃ কাল্পনিক।

পাঠকগণকে সাধারণ বুদ্ধির দ্বারা বিচার করিয়া দেখিতে হইবে যে, আমরা যে সমস্ত কথা পূর্ব্ব-মীমাংসার বিষয়বস্তু বলিয়া তাঁহাদিগকে শুনাইলাম, যদি বাস্তবিকপক্ষে পূর্ব্ব-

* ডাঃ সুরেন্দ্র নাথ দাশগুপ্ত তাঁহার "কাব্য-বিচারে" "দাশ" লিখিতে "দাস" লিখিয়াছেন অর্থাৎ দন্ত্য "স" ব্যবহার করিয়াছেন। আমরা জানি না উহা ছাপাখানার ভুল কি না। যদি তিনি বলেন যে "দাশ" লিখিতে দন্ত্য "স" ব্যবহার করিতে হয়, তাহা হইলে আমরা তাঁহাকে উহার শাস্ত্রীয় প্রমাণ উদ্ধৃত করিতে অনুরোধ করি। প্রয়োজন হইলে আমরা "অষ্টাধ্যায়ী" সূত্র-পাঠের সূত্র ও "নাট্য-শাস্ত্রের" কারিকা উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতে পারিব যে "দাশ" শব্দটী সাধারণতঃ যে অর্থে ব্যবহৃত হয় তাহাতে উহা কখনও দন্ত্য "স"-কারান্ত হইতে পারে না। পরন্ত তালব্য-শকারান্ত হইতে বাধ্য। যাঁহারা নিজের নামের বানানটী পর্য্যন্ত শাস্ত্র-সঙ্গতভাবে লিখিতে জানেন না তাঁহারা যে শাস্ত্র জ্ঞানের অভিমান পোষণ করেন এবং শাস্ত্রজ্ঞ বলিয়া স্বকীয় স্মৃতি-রক্ষা পরি-কল্পনার পরিপোষকতা করেন, ইহা কি ধিক্কারের বিষয় নহে? মূঢ় সমাজ আর কতদিন এই পাপ-পরিপুষ্টির সহায়তা করিতে পারিবে তাহা ভগবান্ জানেন।

মীমাংসায় ঐ সমস্ত কথা থাকে তাহা হইলে উহা মানুষের হিতকর জ্ঞান-বিজ্ঞানের পূর্ণতা সাধনে নিতান্ত প্রয়োজনীয় হয় কি না। আবার বলি, ঐ পূর্ব্ব-মীমাংসায় এতাদৃশ হিতকর জ্ঞানবিজ্ঞানের কথাই আছে। এতাদৃশ হিতকর জ্ঞান-বিজ্ঞানের কথা আছে বলিয়াই মনুষ্য-সমাজ—উহা বর্ত্তমানে না বুঝিতে পারিলেও বা পণ্ডিতগণ উহাতে কতকগুলি অবান্তর কথা আরোপ করিলেও—প্রয়োজন ও পবিত্রতার সংস্কার বশতঃ স্মরণাতীত কাল হইতে বহন করিয়া লইয়া আসিতেছে এবং সূত্রগুলির লুপ্তি হইতে দিতেছে না।

পূর্ব্ব-মীমাংসার আর একটি দিক্ আছে। ঋষিগণ দেখাইয়াছেন যে—জ্ঞান দুই রকমের, যথা: (১) প্রবর্ত্তক এবং (২) নিবর্ত্তক।

যোগিযাজ্ঞবল্ক্যোর—

"জ্ঞানস্তু দ্বিবিধো জ্ঞেয়ো পন্থানৌ বেদচোদিতৌ।
অনুষ্ঠিতৌ তৌ বিজ্ঞস্তিঃ প্রবর্ত্তকনিবর্ত্তকৌ।"

এই শ্লোকটী আমাদিগের উপরোক্ত কথার প্রমাণ।

ঋষিগণ তাঁহাদিগের যুক্তিদ্বারা দেখাইয়াছেন যে, মানুষ প্রকৃতির কার্য্যবশতঃ জন্মের সঙ্গে সঙ্গে একটা চৈতন্য পাইয়া থাকে এবং ঐ স্বাভাবিক চৈতন্যবশতঃ তাহার ইচ্ছা অথবা কামের উদ্ভব হয়। শিক্ষা ও সাধনার দ্বারা ঐ ইচ্ছা অথবা কাম পরিমার্জ্জিত না হইলে উপরোক্ত স্বাভাবিক ইচ্ছা ও চৈতন্যই মানুষের ক্ষয় ও বিনাশের কারণ হইয়া থাকে। মানুষের স্বাভাবিক ইচ্ছা অথবা কামের পরিমার্জ্জন সাধন করিবার জন্য যে শিক্ষা ও সাধনা মানুষের ব্যবহারযোগ্য, তাহার মুখ্য উদ্দেশ্য হওয়া উচিত নিবর্ত্তক-জ্ঞান লাভ করা।

নিবর্ত্তক-জ্ঞান লাভে সিদ্ধ হইতে পারিলে মানুষের পক্ষে তাহার স্বাভাবিক ইচ্ছা অথবা কামকে সর্ব্বতোভাবে সংযত করা সম্ভবযোগ্য হয় বটে, কিন্তু উহা সময়সাপেক্ষ এবং উহাতে সিদ্ধ না হওয়া পর্য্যন্ত স্বাভাবিক ইচ্ছা অথবা কামে জর্জ্জরিত হইয়া ক্ষয় ও বিনাশের দিকে ধাবমানতা অপরিহার্য্য হইয়া পড়ে এবং নিবর্ত্তক জ্ঞান লাভে সিদ্ধ হওয়াও অসম্ভব হইয়া দাঁড়ায়। ইহারই জন্য "প্রবর্ত্তক-জ্ঞানের" প্রয়োজন। প্রবর্ত্তক-জ্ঞানের উদ্দেশ্য মানুষ তাহার স্বাভাবিক ইচ্ছা অথবা কাম-বশতঃ যাহা যাহা বাঞ্ছা করে, তাহা কিরূপে সামগ্রিকভাবে পূরণ করিয়া নিজেকে সর্ব্বতোভাবের ক্ষয় ও বিনাশ হইতে রক্ষা করিতে পারে—তাহার পন্থা দেখান। মানুষ তাহার স্বাভাবিক ইচ্ছা অথবা কামবশতঃ খাদ্য, পেয়, বস্ত্র, বাসগৃহ, সমাজ-বন্ধন ও নানা রকমের আরামের বস্তু চাহিয়া থাকে। বিচার করিয়া ঐ সমস্ত বস্তু ব্যবহার না করিলে যে উহাই মানুষের ক্ষয় ও বিনাশের কারণ হইয়া থাকে, তাহা আমরা আমাদিগের ব্যক্তিগত ব্যবহারিক জীবন লক্ষ্য করিলে বুঝিতে পারিব। যাহাতে উপরোক্ত বিচারের সহায়তা হয় তাহার জন্যই প্রবর্ত্তক-জ্ঞানের প্রয়োজন হইয়া থাকে।

প্রবর্ত্তক-জ্ঞানের সমস্ত মূল কথা পূর্ব্ব-মীমাংসায় স্থান পাইয়াছে। মানুষ যখন আবার পূর্ব্ব-মীমাংসার যথার্থ অর্থ উদ্ধার করিতে পারিবে, তখন দেখিতে পাইবে যে, সমাজ-তত্ত্ব (Sociology), রাষ্ট্রতত্ত্ব (Politics), অর্থ-তত্ত্ব (Economics) কৃষি (Agriculture), শিল্প (Industry), বাণিজ্য (Trade and Commerce) এবং চাকুরী (Services) প্রভৃতির মূল সূত্র (Principles) এবং ব্যবহার (applications) সম্বন্ধে পূর্ব্ব-মীমাংসায় যে সমস্ত কথা স্থান পাইয়াছে তাহা বর্ত্তমান বিজ্ঞান এখনও ভাবিতে পারে নাই। পূর্ব্ব-মীমাংসায় যে কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যনিয়মের কথা আছে তাহার প্রচলন সমাজমধ্যে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইলে কৃষক, বণিক ও শিল্পীকে কখনও লোকসানগ্রস্ত হইতে হয় না এবং কৃষক, শিল্পী ও বণিকের দ্বারা সমাজের কাহারও বিপন্ন হইতে হয় না। পূর্ব্ব-মীমাংসায় যে কৃষি ও শিল্প-ব্যবহারের কথা (Industrial applications) আছে তাহার পুনঃ প্রচলন হইলে বর্ত্তমান যন্ত্র-বিজ্ঞান তাহার সর্ব্বব্যাপী ধ্বংস-লীলা বন্ধ করিতে বাধ্য হইবে। উপরোক্ত কথাগুলির কোনটিই আমাদিগের কাল্পনিক নহে। লেখকের জীবনকালে উপরোক্ত কথাগুলির বাস্তব সাক্ষ্য মিলিবে কি না তাহা জগৎকারণের সর্ব্বতোভাবের নিয়ম-জ্ঞানের দ্বারা বলা যাইতে পারে। সর্ব্বোতোভাবের এই নিয়ম-জ্ঞান লেখকের নাই। কাজেই তাহার জীবনকালে উপরোক্ত কথাগুলির বাস্তব সাক্ষ্য মিলিবে কি না তাহা সে বলিতে পারে না। কিন্তু কাল যে উহার সাক্ষ্য অদূর ভবিষ্যতে দিবে তাহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে।

পরবর্ত্তী সংখ্যায় অন্যান্য দর্শনের বিষয়-বস্তুর কথা আলোচিত হইবার সম্ভাবনা রহিল।

পানাপুকুর

শিব্

পুরাণ জীর্ণ পিছল সোপান কূলে
বাতাস লাগিয়া ক্ষণে ক্ষণে উঠি দুলে,
জীবন-মৃত্যু ভাঙা গড়া যত কথা,
ঢেউ সাথে মোর মিশায়েছে নীরবতা !
ঐ যে হোথায় উঁচু ঢিবিটার পাশে
রজত চাঁদটি অটবীর শাখে হাসে,
সেথায় গোপনে বসেছিল তারা দুটি,
কাঞ্চন-কালু নিবে জীবনেতে ছুটি।
হোথায় ঐ যে ভাঙাসিঁড়িটার ধারে
কলসী-কাঁকন বাজিত যে বারে বারে,
আজি পূর্ণিকাতলে শুনি মোর বাজে
দুঃখ-সুখের কথা যে সকাল সাঁঝে।

বাদশা-ওমরা গড়েনিক মোর দেহ,
রাজবাগিচার পায়নি কুসুম-স্নেহ,
শুধু একদিন দীনপল্লীর তরে
বারি এনেছিল কুদালে খনন ক'রে,
তবু এ গাঁয়ের ছিল দিন যে সময়ে,
কাহিনী যে কত চ'লে গেছে তট বয়ে।

আগ্রা-দিল্লী-অলিঞ্জরের সঙ্গে কয়েছে কথা
গ্রামের মাটিতে তৈরী কল্সী, কুমোর যে নির্মাতা···
সে-দিন যে ছিল কালো-বৌ ঐ প্রাচীন বটের বাটে,
শ্যামের সঙ্গে পলায়ে এসেছে, সেও যে আমার ঘাটে,
এমন দিনও গিয়াছে আমার, ছিল বিলাসের জোর,
বেঁধেছে যে-দিন ধনিকে আমাতে শাসন-বাঁধন ডোর,
নিষেধের জাল দিয়াছে আমার অঙ্গে অঙ্গে তুলি,

সামাল, সামাল,
কলেরা, কলেরা,

কেহ যেন মোর
সোনার এ জল
ভুল ক'রে যেন না লয়ে কলসে ভুলি।

*

আজ চারিদিক্ নির্জ্জন আর
বনঘেরা দেহ মোর,
কেহ আসে না ক', শুধু কালো জল
আর শৈবাল ঘোর।
কেহ কোন দিন গড়েনি ক' হেথা
দেবতার দেবালয়,
হয়নি ক' কোন প্রদীপের শিখা
এ কূলে দীপ্তিময়।
স্মৃতির দেউল রচে নি ত' কেহ
মতিয়া ঝিলের মত,
পানাঢাকা মোর সবুজ অঙ্গে
বরষ বরষ কত,
ব্যর্থ জীবন যৌবন ব'য়ে,
চলি শীত সন্ধ্যায়,
শার্দ্দূল কোন আসে আজ শুধু
আমার তটের ছায়।

অলসে চাঁদখানা আজও নিশীথে ফিরে যোয়ে ভুলি-ভুলি,
যুগযুগান্ত ঘুমায়ে রয়েছে নীরব কাহিনীগুলি।
গ্রাম গেছে মুছে, ঘন বন আর এলো বাতাসের খেলা,
পাখী আর সাপ ভেক জম্বুক নেউল সারাটি বেলা।
ঠ্যাং-তোলা বক মুদে আছে আঁখি, কি যে চায় হেথা বলো,
আমি পুরাতন ব্যথা ব'য়ে শুধু আঁখিজলে ছলো ছলো।

পাণিহাটীতে শ্রীচৈতন্যদেব.

ডাঃ শ্রীহেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত

গত দীপান্বিতার দিনে পাণিহাটীর শ্রীগৌরাঙ্গ মহোৎসব দেখিবার সৌভাগ্য হইয়াছিল। অনেক দিন কলিকাতার বাহিরে যাই নাই, বেশী দিন সহরে থাকিলে প্রাণ যেন হাঁফাইয়া উঠে, তাই কলিকাতার নিকটস্থ এই উৎসবটী দেখিবার জন্ত খুব আগ্রহ হয়। মনে হইল, কয়েক ঘণ্টার জন্ম হইলেও একটী নূতন জায়গা দেখা হইবে, আর ধর্ম্মানুষ্ঠানে যোগদান করিবারও সুবিধা হইবে। ফলে আমি যাহা আশা করিয়াছিলাম, তাহাপেক্ষা অনেক বেশী লাভ হইয়াছে। নিশ্চয়ই তাহা মহাপ্রভুর কৃপায়।

অগ্রজ প্রতিম শ্রীযুক্ত বিপিন বিহারী দাশগুপ্ত একজন বৈষ্ণব ও সুলেখক। তাঁহার কন্যা ও জামতা পাণিহাটীতে থাকেন। তিনি আমাকে রবিবার সেখানে যাইতে বিশেষ অনুরোধ করিয়া নিজে শনিবারই চলিয়া আসেন। জামাতা শ্রীমান সুশীল পাণিহাটীতে বেঙ্গল কেমিকেলের প্রধান কেমিষ্ট। সকালে ৭টা হইতেই সে আমার জন্ত গেটে অপেক্ষা করিতেছিল। বেঙ্গল কেমিকেল গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডের ঠিক উপরেই।

প্রভাতে উঠিয়া কাগজ পড়িয়া আসিতে একটু দেরী হইল বটে, তবে শ্যামবাজার আসিয়া ৩২ নম্বরের বাস্ ধরিয়া এবং বারাকপুরের ৮ নম্বর বাসে আসিয়া পাণিহাটিতে পৌঁছিতে প্রায় ৯টা হইল। কারখানার সম্মুখে নামিতেই শ্রীমান সুশীলের নিয়োজিত লোক বাসায় লইয়া গেল। বাসাখানি খুব খোলা যায়গায়; বসিয়াই চেঞ্জের প্রভাব অনুভব করিলাম এবং শ্রীমান সুশীল, তাহার সহোদর অখিল, কন্যাদ্বয় এবং স্ত্রীর (ইন্দুমাতার) আদর, যত্ন ও আপ্যায়নে একেবারে মুগ্ধ হইয়া গেলাম। বিপিন দাদা আমারই জন্ত অপেক্ষা করিতেছিলেন। উভয়ে প্রচুর জলখাবার খাইয়া শীঘ্রই বাহির হইয়া পড়িলাম।

বিপিন বাবু বৈষ্ণব সাহিত্য সম্বন্ধে অভিজ্ঞ, তিনি রাস্তায় আমাকে গৌরাঙ্গের কথা বলিতে বলিতে চলিলেন। পাণিহাটী সহরটী বড় পুরাতন, দেখিয়া তৃপ্তি পাইলাম না। ক্রমে আমরা শ্রীযুক্ত অমূল্য ভট্টের বাড়ী আসিলাম। ইঁহারই বাড়ীতে গৌরাঙ্গদেবের ছবি সুরক্ষিত আছে। সেখানে কিছু কিছু যাত্রীও দেখিলাম।

অতঃপরে আমরা গঙ্গাতীরে বটবৃক্ষতলে আসিলাম। স্থানটীর মনোহরত্ব দেখিয়া প্রাণ জুড়াইয়া গেল। কত ভক্তের পদরেণু স্থানের পবিত্রতা দিন দিন বৃদ্ধি করিয়া দিতেছে। আহা, কি সুন্দর দৃশ্য! বিশাল বটবৃক্ষতলে একখানি মন্দির, পশ্চাতে গঙ্গা আর সম্মুখে বিস্তীর্ণ প্রাঙ্গন। নিকটে আবার কয়েকটী বটগাছ উহার বেষ্টনী ও ছায়াতে স্থানটীকে আরও স্নিগ্ধ ও মনোরম করিয়া রাখিয়াছে। পশ্চিমে একটী ঘাট, এই ঘাট দিয়াই মহাপ্রভু ও নিত্যানন্দদেব এই গ্রামে পদার্পণ করিয়াছিলেন। এই স্থানের উত্তর এবং দক্ষিণেও দুইটী প্রকাণ্ড ঘাট আছে।

অতঃপরে আমরা রাঘব পণ্ডিতের বাড়ী গেলাম। সেখানে দেখিলাম, একটী আপাদমস্তক গেরুয়া পরিহিত ভক্তকে ধরিয়া কয়েকটী স্ত্রীলোক রাঘবের সমাধির ঘর হইতে বাহির হইতেছেন। ভক্তটীর স্ত্রীবেশ, তাঁহার বর্ণ অতিশয় গৌর। আমার নিকটে তিনি স্ত্রী-ভক্তরূপেই অনুমিত হন। কিন্তু কেহ কেহ বলেন, নবদ্বীপের ললিতা-সখার ন্যায় তিনি স্ত্রীবেশ ধারিণী ভক্ত।

রাঘবের বাড়ী হইতে আসিয়া আমরা গঙ্গার ঘাটে স্নান করিতে নামিলাম। শরতাবসানে জল খুবই স্বচ্ছ, আর বড়ই স্নিগ্ধ, শীতল। অবগাহন স্নানে বড়ই তৃপ্ত হইলাম। আমরা যখন খেলাইয়া দুলাইয়া স্নান করিতেছি, পূর্ব্বদিকের বাড়ী হইতে মধুর কীর্ত্তনের ধ্বনি আমাদের কর্ণে প্রবেশ করিতেছিল। একটু পরে কে আসিয়া বলিল, "লেডী গৌরাঙ্গ কীর্ত্তন শুনিয়া অজ্ঞান হইয়াছেন।" স্নান সমাপন করিয়া পরে গিয়া দেখিলাম, অনেক ভক্ত এবং সেই গৌর-অঙ্গ স্ত্রীবেশ ধারিণী ভক্তটী বসিয়া কীর্ত্তন উপভোগ করিতেছেন। ইঁহাকেই রাঘব পণ্ডিতের বাড়ী দেখিয়াছিলাম। শুনিলাম, ইনিই লেডী গৌরাঙ্গ। অল্পক্ষণ থাকিয়াই চলিয়া আসিলাম।

শুনিলাম বাড়ীখানি অমৃতসমাজের বাবু হরিদাস মজুমদারের।

ওখান হইতে সেই বটবৃক্ষতলায় আবার আসিলাম। অনতিকাল পরে, প্রায় দেড়টার সময় গৌরাঙ্গের ঘাটে বড় ভীড় হইল, এবং বাদ্য-ভাণ্ড বাজিতে লাগিল, সকলে সতৃষ্ণ-ভাবে কোন এক পরমারাধ্য পুরুষের জন্য যেন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। দেখিলাম, দক্ষিণ দিক হইতে একখানি ডিঙ্গী নৌকায় গৌরাঙ্গদেবের সেই অমূল্য বাবুর বাড়ীর ছবিখানি সহ কয়েকজন লোক আসিতেছেন। বিপিন দাদা সেই ভীড়ে পুষ্পডালি হস্তে ঠাকুরকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন। ঠাকুরকে উঠাইয়া দোলায় চড়াইয়া প্রথমেই বাদ্য-ভাণ্ড সহ রাঘবের বাড়ীতে লইয়া যাওয়া হইল। সেখান হইতে পুনরায় আবার শোভাযাত্রা করিয়া উহা বট বৃক্ষতলস্থ মন্দিরে স্থাপিত করা হইল। শুনিলাম, ঠিক এই তিথিতেই নাকি শ্রীচৈতন্যদেব পাণিহাটীতে আসিয়াছিলেন। সে আজ চারিশত বৎসরের উপরের কথা। যাহা হউক, অতঃপরে আমরা মধ্যাহ্ন ভোজনের জন্য আবার বেঙ্গল কেমিকেলে গেলাম। পথে কংগ্রেস নেত্রী শ্রীযুক্তা লাবণ্যপ্রভা দত্তের সঙ্গে দেখা হইল। শুনিয়াছি ইনি শ্রীযুক্ত রামদাস বাবাজী মহাশয়ের নিকট হইতে দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছেন।

পাণিহাটীর দ্রষ্টব্য সবই দেখিলাম, এইবার আবারাজে কলিকাতা ফিরিয়া যাইব ভাবিতেছি, কিন্তু শুনিলাম শ্রীযুক্ত রামদাস বাবাজী আসিয়া কীর্ত্তন গান করিবেন। রামদাস বাবাজীর কীর্ত্তন গান! ইহাপেক্ষা আর আনন্দের বিষয় কি হইতে পারে? বহুদিন পূর্ব্বে একবার দেশবন্ধুর প্রাঙ্গনে তাঁহার গান শুনিয়াছিলাম। স্থির করিলাম বৈকালে নিশ্চয়ই আসিব।

বেঙ্গল কেমিকেলের বাসায় প্রায় আড়াইটার সময় ফিরিয়া আসিলাম। আহার্য্য সবই তৈরী হইয়া গিয়াছে। কেবল গরমভাত দেওয়ার জন্য চাউল চড়ান হইয়াছে। খাওয়ার জিনিষেরও অভাব ছিল না, ইন্দুবাবুর যত্নেরও অবধি ছিল না। চর্ব্য-চোষ্য লেহ্য-পেয় আহার করিয়া আবার শীঘ্রই বিপিন বাবুর আদেশ মত বাহির হইয়া পড়িলাম।

কম্পাউণ্ডের বাহিরে আসিতেই দেখিলাম কয়েকটী ভদ্রলোক ফিরিয়া আসিতেছেন। জিজ্ঞাসা করিলাম, "রামদাস বাবাজী কি আসিয়াছেন?" উত্তরে শুনিলাম, "হ্যাঁ তাঁহার কীর্ত্তন হইতেছে, প্রায় শেষ হইয়া গেল।" তাঁহাদের মধ্যে একজনের পরিচয় পাইলাম; তিনি দেশ-সম্পাদক বঙ্কিম চন্দ্র সেন; রাঘবের বাড়ীতে বক্তৃতা করিয়াছেন।

উত্তরে খুব তাড়াতাড়ি চলিলাম। কারণ রামদাস বাবাজীর কীর্ত্তন শুনিতে বড়ই আগ্রহ হইয়াছিল। মনে খেদ হইল, এতদিন পরে কাছে পাইয়াও তাহা শুনিতে পারিলাম না। আসিয়া দেখি, গঙ্গাতীরে সেই মন্দিরের সম্মুখেই কীর্ত্তন এখনও চলিতেছে। চক্ষু মুদ্রিত করিয়া বাবাজী এক একটী পদ গাহিতেছেন, আর তাঁহার গণ্ড বাহিয়া প্রেমাশ্রু বিগলিত হইতেছে। তিনি গাহিতেছেন, সঙ্গের লোকও গাহিতেছে, আর এক গভীর ক্রন্দনের রোলে সেই পবিত্র স্থান প্রতিধ্বনিত হইতেছে। গানের শেষ পদটী এই—

"ওহে পানিহাটী বাসী বন্ধুগণ, আমরা বহুদূর হ'তে এসেছি, তোমরা গৌরধনে ধনী, দয়া ক'রে আমাদিগকে গৌরকে দেখাও, তোমাদের গৌর তোমাদেরই থাকবে। আমরা নিয়ে যাব না, দয়া ক'রে একবার আমাদের দেখাও, এই ভিক্ষা চাই।"

গান চলিতে লাগিল আর এক অপূর্ব্ব ভাবতরঙ্গে সমগ্র স্থানটী প্রবাহিত হইল, ভক্তগণ যেন আনন্দ সাগরে নিমজ্জিত হইয়াছেন। ইঁহাদের সরল ও অকৃত্রিম ভক্তিতে আমাদেরও প্রাণ দ্রব হইল। অনেক দিন পূর্ব্বে পড়িয়াছিলাম, নাট্য-সম্রাট গিরিশচন্দ্র একটী গোঁড়া বৈষ্ণবের সরল ভক্তির কথা লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। আজ সেই কথাটী মনে পড়িল।

গিরিশচন্দ্র তখনও শ্রীরামকৃষ্ণ দেবের কৃপা প্রাপ্ত হয়েন নাই। তবে ভগবৎকৃপা লাভের জন্য মন অনেকটা অগ্রসর হইয়াছে। তাঁহার "চৈতন্যলীলা" নাটক তখন অভিনীত হইবে, তিনি কয়েকখানি চিত্রপট আঁকাইয়া লইতেছেন। চিত্রকর একজন গৌরভক্ত। আলাপ করিতে করিতে সেই সরল বিশ্বাসী ভক্তটী একদিন বলিল, "পতিতপাবন গৌর-চন্দ্রের মহিমার কথা আপনাকে আর কি বলিব? আর এ অধমের প্রতি তাঁর করুণাই বা কত? আমি সারাদিন পরিশ্রমের পর দিনান্তে রন্ধন করিয়া যখন তাঁহাকে ভোগ

দিয়া মহাপ্রসাদ গ্রহণ করিতে থাকি তখন সত্য সত্যই দেখিতে পাই, গৌর আমার সেই ভোগের অংশ গ্রহণ করিয়াছেন। কখনও রুটি লুচিতে দাঁতের স্পষ্ট দাগ পর্য্যন্ত দেখিয়াছি।" গিরিশ লিখিয়াছেন, "এই ব্যক্তির কথায় আমার চক্ষে জল আসিল।" বস্তুতঃ গৌরভক্তগণের এরূপ অকৃত্রিম সরল ভক্তির কথা অনেক শুনিয়াছি। পাঁচ শত বৎসর অতীত হইল শ্রীচৈতন্যদেবের তিরোধান হইয়াছে, কিন্তু আজও ভক্তমণ্ডলীর কি অনুরাগ! যে যে স্থানে তাঁহার পদ-রজঃ পড়িয়াছে, সেই সেই স্থান তাঁহারা কত পবিত্র মনে করেন!

অতঃপরে দেখিলাম, কীর্ত্তনের পরে রামদাস বাবাজী রাঘবের বাড়ীর দিকে রওনা হইতেই অসংখ্য লোক কলিকাতা যাইবার জন্য ঘাটের দিকে গেলেন। দক্ষিণের ঘাটটীতেই সকলে ঠেলাঠেলি করিয়া উঠিতে লাগিল। এক এক নৌকায় প্রায় বিশ পঁচিশ জন করিয়া বাগবাজার ও আহিরীটোলার ঘাটে যাইতে লাগিল। ভাড়াও মোটে জনপ্রতি ছয় পয়সা।

ঘাটের উপরে আসিয়া পশ্চিম গগনের বিচিত্র শোভা দেখিলাম। খরস্রোতা গঙ্গার উপরে অস্তাচলগামী সূর্য্যদেবের রশ্মি আসিয়া পড়িয়াছে। মনে হইল যেন, গলিত রজতরাশি স্রোতে ভাসিয়া যাইতেছে। ওপারে বৃক্ষরাজি ও ছায়া, গঙ্গাবক্ষে অগণিত তরী, আর এপারের বটবৃক্ষ, ভক্ত-সমাগম ও উৎসব। কি অপরূপ দৃশ্য!

সুশীলের বাসা হইতে বিদায় হইয়া আসিবার সময়, আবার সেখানে বৈকালের চা খাইয়া 'বাসে' উঠিবার অনুরোধ ছিল। আমারও তাহাই ইচ্ছা ছিল, কিন্তু পূর্ব্ববঙ্গবাসী জলপথপ্রিয়ই বেশী থাকে। তাই নৌকার লোভ ছাড়িতে পারিলাম না, দাদাকে ও অখিলকে অনেক অনুরোধে রাজী করাইয়া সেখান হইতেই নৌকা-যাত্রা করিলাম। ছাতের উপর বসিয়া গঙ্গার শোভা দেখিতে দেখিতে স্রোতের সঙ্গে চলিলাম। পশ্চিম গগনের কি অপূর্ব্ব শোভা! সেই তপ্তকাঞ্চন রূপরাশির মধ্যে বৃক্ষান্তরালে সূর্য্যদেব আপনাকে যেন বিসর্জ্জন দিলেন, গগন শূন্য হইল, তপন বিহনে ক্রমে উহা মলিন হইয়া আসিল, ক্রমে তমসাচ্ছন্ন নিশীথের কোলে উহার বিরাট দেহখানি ছাড়িয়া দিয়া নির্জ্জীব হইয়া পড়িয়া রহিল। এই ভাবেই আমরা বাগবাজার ঘাটে আসিয়া পঁহুছিলাম।

পাণিহাটী এত নিকটে, অথচ এই তীর্থস্থানটী আমার নিকটে একরকম অজ্ঞাতই ছিল। আজ ভক্তপ্রবর বিপিনবিহারী দাসের অনুকম্পা ও সৌহার্দ্দ্যে তাহা লাভ হইল।

এখন পাণিহাটীতে মহাপ্রভুর লীলা সম্বন্ধে কিছু নিবেদন করিব।

মহাপ্রভু জন্মগ্রহণ করেন ১৪৮৫ খৃষ্টাব্দে নবদ্বীপধামে। চব্বিশ বৎসর বয়সে (১৫০৯ খৃষ্টাব্দে) তিনি কাটোয়ায় কেশব ভারতীর নিকটে সন্ন্যাস-ধর্ম্মে দীক্ষিত হয়েন। অতঃপর কয়েক দিন অদ্বৈত গোস্বামীর বাড়ী থাকিয়া ছত্র ভোগ হইয়া পুরীধামে চলিয়া যান। দুই এক মাস থাকিয়া তিনি তীর্থ পর্য্যটনে বাহির হয়েন এবং মান্দ্রাজ, বোম্বাই, কন্যাকুমারিকা প্রভৃতি স্থান দর্শন করিয়া আবার নীলাচলে আসেন। গোদা-বরী তীরে রায় রামানন্দের সহিত এই সময়েই মিলন হয়। ষড়দর্শনাভিজ্ঞ বাসুদেব সার্ব্বভৌম এবং উড়িষ্যার রাজা প্রতাপ-রুদ্র ও মহাপ্রভুর বিশেষ অনুগত হইয়া পড়েন।

ছয় বৎসর পরে অনুমান ১৫১৫ খৃষ্টাব্দে মহাপ্রভু বৃন্দাবন যাওয়ার অভিপ্রায়ে নৌকাযোগে গৌড়দেশে আসেন। গৌড়ে প্রথমতঃ তিনি পাণিহাটীতে পদার্পণ করেন এবং এক রাত্রি রাঘব পণ্ডিতের বাড়ী থাকেন। এখানে অনেকেই মহাপ্রভুকে দেখিতে আসেন—

সেই নৌকা চলি প্রভু আইলা পাণিহাটী,
নাবিকে পরাইল প্রভু নিজ কৃপা শাটী।
প্রভু আইলা বলি লোকের হৈল কোলাহল,
মনুষ্য ভরিল সব কিবা জল স্থল।
রাঘব পণ্ডিত আসি প্রভু লঞা গেলা,
পথে যাইতে লোক ভিড় কষ্টে সৃষ্টে আইলা।
একদিন তথা প্রভু করিয়া নিবাস
প্রাতে কুমারহট্ট আইলা যাহা শ্রীনিবাস॥

—শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত মধ্যলীলা, ১৬ পরিচ্ছেদ।

পাণিহাটী, কুমারহট্টের পর শিবানন্দের বাড়ী ও বাসুদেব ভট্টাচার্য্যের বাড়ী, কুলিয়া হইয়া মহাপ্রভু শান্তিপুরে অদ্বৈতের বাড়ী আসেন। এখানেও শচীমাতাকে প্রণাম করেন। তৎ-পর রামকেলি গ্রামে যান। রামকেলি গৌড়ের সন্নিকটে এবং

এখানেই নিশীথে রূপ সনাতনের সহিত সাক্ষাৎ হয় সনাতন বলেন, "এইরূপে বৃন্দাবনে যাইবেন না।"—

যাঁহা সঙ্গে চলে এই লোক লক্ষ কোটি।
বৃন্দাবনে যাবার এ নহে পরিপাটী।।

—মধ্যলীলা, প্রথম পরিচ্ছেদ।

মহাপ্রভু কানাইয়ের নাটশালা পর্য্যন্ত আসেন এবং

মথুরা যাইব আমি এত লোক সঙ্গে
কিছু সুখ না হইবে হৈব রসভঙ্গে

বলিয়া পুনরায় শান্তিপুরে আসেন। এখানে রঘুনাথ দাস আসিয়া প্রভুর কাছে মিনতি জ্ঞাপন করেন। এই রঘুনাথ খুব ধনীর পুত্র। সপ্তগ্রামে হিরণ্য ও গোবর্দ্ধন নামে দুইজন মহাধনী সহোদর বাস করিতেন--

সপ্তগ্রাম বার লক্ষ মুদ্রার ঈশ্বর

এই রঘুনাথ গোবর্দ্ধনের পুত্র। পূর্ব্বে যখন মহাপ্রভু সন্ন্যাস-গ্রহণ করিয়া কাটোয়া হইতে শান্তিপুরে আসেন, তখনও রঘুনাথ আসিয়া তাঁহার পদ সেবা করেন—

আচার্য্যপ্রসাদে পাইল প্রভুর উচ্ছিষ্ট পাত,
প্রভুর চরণ দেখে দিন পাঁচ সাত।
প্রভু তারে বিদায় দিয়া গেলা নীলাচল,
তিঁহ ঘরে আসি হৈল প্রেমেতে পাগল।

এই রঘুনাথ দীর্ঘ ছয় বৎসর প্রেমাবিষ্টভাবে কাল যাপন করিয়া এবার আবার মহাপ্রভুর চরণে আসিয়া উপস্থিত হইয়া "সাত দিন শান্তিপুরে প্রভু সঙ্গে রহে"। কিন্তু প্রভু তাহাকে কিছুদিন অনাসক্তভাবে বিষয় ভোগ করিতে আদেশ করিয়া পরে পুরীতে যাইতে বলিলেন—

স্থির হঞা ঘরে যাহ না হও বাতুল,
ক্রমে ক্রমে পায় লোক ভবসিন্ধু কূল।
মর্কট-বৈরাগ্য না কর লোক দেখাইয়া,
যথাযোগ্য বিষয় ভুঞ্জ অনাসক্ত হঞা।

—চৈতন্যচরিতামৃত, মধ্যলীলা, ১৬ পরিচ্ছেদ।

ফিরিবার সময়েও মহাপ্রভু শ্রীবাস আলয় কুমারহট্ট হইয়া আবার পাণিহাটিতে আসেন। এখানেও রাঘবের ভক্তি উথলিয়া উঠিল এবং মহাপ্রভুও তাঁহাকে বক্ষে ধরিয়া অপার শক্তি পাইলেন—

কথোদিন আছে প্রভু শ্রীবাসের ঘরে,
তবে গেলা পাণিহাটী—রাঘব মন্দিরে।
দৃঢ় করি ধরি রমাবল্লভ চরণ,
আনন্দে রাঘবানন্দ করেন ক্রন্দন।
প্রভুও রাঘব পণ্ডিতেরে করি কোলে,
সিঞ্চিলেন অঙ্গতান নয়নের জলে।

— শ্রীচৈতন্যভাগবত, অন্ত্যখণ্ড, ৫ম অধ্যায়।

একদিন প্রভু রাঘবকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন।

"রাঘব, তোমাকে দেখিয়া আমার সব দুঃখ দূর হইল, তোমার বাড়ীতে আসিয়া গঙ্গাস্নানের তৃপ্তি অনুভব করিলাম"—

প্রভু বলে রাঘবের আলয়ে আসিয়া
পাসরিলুঁ সব দুঃখ রাঘব দেখিয়া
গঙ্গায় মজ্জন দৈতে যে সন্তোষ হয়
সেই সুখ পাইলাঙ রাঘব-আলয়

অতঃপরে রাঘবকে আদেশ করিলেন "রাঘব, শীঘ্র তুমি "কৃষ্ণের রন্ধন গিয়া করহ ত্বরিৎ"।

মহাপ্রভু এখানে নিত্যানন্দ প্রভু ও অন্যান্য সকলকে লইয়া ভোজন করিতে বসিলেন এবং তৃপ্তির সহিত রাঘবের সাত্ত্বিক রন্ধনের ও সর্ব্বব্যঞ্জনের প্রশংসা করেন—"সকল ব্যঞ্জন প্রভু প্রশংসে একান্ত"।

প্রভু বোলে রাঘবের কি সুন্দর পাক
এমত কোথাও আমি নাহি খাই শাক।
রাঘবো প্রভুর প্রীত শাকেতে জানিয়া
রান্ধিয়া আছেন শাক বিবিধ আনিয়া।

— অন্ত্যখণ্ড, ৫ম অধ্যায়।

এইরূপে—

পাণিহাটী গ্রামে হৈল পরম-আনন্দ
আপন সাক্ষাতে যথা প্রভু গৌরচন্দ্র।

এই যে মহাপ্রভু সন্ন্যাস গ্রহণ করিবার ছয় বৎসর পরে তিনি পাণিহাটীতে দুইবার পদার্পণ করিয়া পাণিহাটী গ্রাম

পবিত্র করিয়া দিয়াছেন, আজও সেই পবিত্রভূমি ভক্তগণ আসিয়া ভক্তি-পুষ্পে সুশোভিত করেন, ভক্তি অর্ঘ্যে পূজা সমাপন করেন আর ভক্তি-বিরহাশ্রুতে বিধৌত করিয়া থাকেন। তাই রামদাসবাবাজী প্রতিবৎসর আসিয়া কাঁদিয়া গাহেন—

> একবার দেখাও গো
> তোমাদের গৌর তোমাদেরই থাকবে
> একবারটী দেখাও।

আর তাই এখানে এত ভক্ত সমাগম হইয়া থাকে।

পাণিহাটীতে মহাপ্রভুর প্রথম পদার্পণ হয় কার্ত্তিক মাসের কৃষ্ণা চতুর্দ্দশীতে। এই উৎসবও হয় সেই সময়ে। পাণিহাটীতে আর একটী উৎসব হয় জ্যৈষ্ঠ মাসে, সেই সম্বন্ধে পরে বলিব।

মহাপ্রভুর ভোজনপ্রীতি সম্বন্ধে তাঁহার সহচরবৃন্দ ও ভক্তগণ খুবই জানিতেন। তাই তিনি যেখানে যাইতেন ভক্তগণ আহারের সুব্যবস্থাই করিতেন। এবার ভোজন বিলাস সম্বন্ধে একটী চিত্র প্রদান করিব। সন্ন্যাস গ্রহণের পরে নিত্যানন্দসহ যখন শান্তিপুরে অদ্বৈতগৃহে আসেন, নিম্নলিখিত রন্ধনদ্রব্যে আচার্য্যাণি ভগবদ্ সেবা করেন।

> বত্রিশ আঠিয়া কলার আঙ্গটিয়া পাতে
> দুই ঠাঞি ভোগ বাড়াইল ভাল মতে।
> মধ্যে পীত ঘৃত সিক্ত শাল্যন্নের স্তূপ
> চারিদিকে ব্যঞ্জন ডোঙ্গা আর মুদ্গসূপ।
> বাস্তুক শাক পাক বিবিধ প্রকার
> পটোল কুষ্মাণ্ড বড়ি মানকচু আর।
> চই মরিচ সুক্তা দিয়া সব ফলমূলে
> অমৃত নিন্দক পঞ্চবিধ তিক্ত ঝালে।
> কোমল নিম্বপত্রসহ ভাজা বার্ত্তাকী
> ফুলবড়ি ভাজা আর কুষ্মাণ্ড মানচাকি।
> নারিকেল শস্য ছানা শর্করা মধুর
> মোচাঘণ্ট দুগ্ধ কুষ্মাণ্ড সকল প্রচুর।
> মধুরাম্ল বড়া অম্লাদি অম্ল পাঁচ ছয়
> সকল ব্যঞ্জন কৈল লোকে যত হয়।
> মুদ্গবড়া মাষবড়া কলাবড়া মিষ্ট
> ক্ষীরপুলী নারিকেল পুলী যত পিঠা ইষ্ট।
> বত্রিশ আঠিয়া কলার ডোঙ্গা বড় বড়
> চলে হালে নাহি ডোঙ্গা অতি বড় দৃঢ়।
> পঞ্চাশ পঞ্চাশ ডোঙ্গা ব্যঞ্জনে পূরিয়া
> তিন ভোগের আশে পাশে রাখিল ধরিয়া।
> সঘৃত পায়স মৃৎকুণ্ডিকা ভরিয়া
> তিন পাত্রে ঘনাবর্ত্ত দুগ্ধ রাখয়ে ধরিয়া।
> দুগ্ধ চিড়া কলা কলকী* কুণ্ডিভরি
> চাঁপকলা কলাদধি সন্দেশ কহিতে না পারি।
> অন্নব্যঞ্জন উপর তুলসী মঞ্জরী
> তিন জলপাত্রে সুবাসিত জলভরি।

এত খাদ্য দেখিয়া প্রভু বলিলেন, "আমাকে অল্প কিছু দাও, এতখাদ্য সন্ন্যাসীর উপযোগী নয়—"

> প্রভু কহে সন্ন্যাসীর ভক্ষ্য নহে উপকরণ
> ইহা খাইলে কৈছে হবে ইন্দ্রিয় বারণ।
> আচার্য্য কহে ছাড় তুমি আপনার চুরি
> আমি জানি তোমার সন্ন্যাসের ভারিভুরি॥

কিন্তু প্রভু যদিও বলিলেন, "এত অন্ন খাইতে না পারি," কিন্তু তথাপিও আচার্য্য বার বার ব্যঞ্জনাদি পরিবেষণ করিতে ছাড়িলেন না—

> নানা যত্ন দৈন্যে প্রভু করান ভোজন
> আচার্য্যের ইচ্ছা প্রভু করিল পূরণ।
>
> —চৈতন্যচরিতামৃত, মধ্যলীলা, ৩য় পরিচ্ছেদ॥

এইরূপে পরে রাঘব পণ্ডিত যখন মহাপ্রভুর দর্শনে নিত্যানন্দ বসুদেব দত্ত, মুরারি প্রভৃতি সহ নীলাচলে যান, তিনি (রাঘব) একটী প্রকাণ্ড ঝালি সাজাইয়া মহাপ্রভুর জন্য নানাবিধ খাদ্য সামগ্রী লইয়া যান। এই সব জিনিষ রাঘবের ভগিনী দময়ন্তী তৈয়ার করিয়া দিয়াছেন—

> রাঘব পণ্ডিত চলে ঝালি সাজাইয়া।
> দময়ন্তী যত দ্রব্য দিয়াছে করিয়া॥

এই ঝালির নামই বৈষ্ণব সাহিত্যে "রাঘবের ঝালি বলি খ্যাতি যাহার।"

---

* দুগ্ধযোগে প্রস্তুত পিষ্টক বিশেষ।

অনেক পরিপাটি দ্রব্যে এই ঝালি সাজানো হয়। কেননা, প্রভু একবৎসর ধরিয়া ইহা উপভোগ করিবেন—

আম্র কাশন্দি আদা ঝাল কাশন্দি নাম,
নেমু আদা আম্র কলি বিবিধ সন্ধান।
আমসি আম্রখণ্ড তৈলাম্র আমতা,
যত্ন করি গুণ্ডি করি পুরাণ সুকতা।

সুকতা অবজ্ঞার জিনিষ নয়। কারণ "সুকুতার যে সুখ হয় নাহি পঞ্চামৃতে"। দময়ন্তী সুকুতা দিয়াছেন, গুরুভোজনে উদরে আম জন্মিতে পারে তাই—

সুকুতা খাইলে সেই আম হইবেক নাশ
সেই স্নেহ মনে ভাবি প্রভুর উল্লাস।

তারপরে আরও কত দিয়াছেন, তাহার তালিকা এই—

ধনিয়া মৌরী তণ্ডুল গুণ্ডি করিয়া,
নাড়ু বান্ধিয়াছে চিনি পাক করিয়া।
শুণ্ঠিখণ্ড নাড়ু আর আমপিত্ত হর।
পৃথক পৃথক বান্ধি বস্ত্রের কুথলী ভিতর,
কোলিশুণ্ঠি কোলি চূর্ণ কোলিখণ্ড আর,
কত নাম লব আর শতপ্রকার আচার।
নারিকেল খণ্ড নাড়ু আর নাড়ু গঙ্গাজল,
চিরস্থায়ী খণ্ডবিকার করিল সকল॥
চিরস্থায়ী ক্ষীরসার মণ্ডাদি বিকার,
অমৃত কর্পূর আদি অনেক প্রকার।
শালিকাচুটি ধান্যের আতপ চিড়া করি,
নূতন বস্ত্রের বড় কুথলী সব ভরি।
কথোক চিড়া হুড়ুম করি ঘৃতেতে ভাজিয়া,
চিনি পাকে নাড়ু কৈল কর্পূরাদি দিয়া।
শালি তণ্ডুল ভাজা চূর্ণ করিয়া,
ঘৃত সিক্ত চূর্ণ কৈল চিনির পাক দিয়া।
কর্পূর মরিচ লবঙ্গ এলাচি রসবাস,
চূর্ণ দিয়া নাড়ু কৈল পরম সুবাস।
শালি ধান্যের খৈ ঘৃতেতে ভাজিয়া,
চিনি পাকে উখড়া কৈল কর্পূরাদি দিয়া।
ফুট-কলাই চূর্ণ করি ঘৃত ভাজাইল,
চিনি পাকে কর্পূর দিয়া নাড়ু কৈল।

এইরূপ নানা সামগ্রী তৈয়ার হইল—রাঘব ও দময়ন্তী শ্রদ্ধা করিয়া প্রভুর জন্য সব প্রস্তুত করিলেন—

রাঘবের আজ্ঞা আর করে দময়ন্তী
দুঁহার প্রভুতে স্নেহ পরম শকতি।

কেবল রাঘবই যে সব জিনিষ আনিয়াছিলেন তাহা নয়। আচার্য্য আনিয়াছিলেন, শ্রীবাসও আনিয়াছিলেন—

আচার্য্যের এই পেড়া পানা সরপুড়ী,
এই অমৃতমণ্ডা এইত কর্পূর কুপী।
শ্রীবাস পণ্ডিতের এই অনেক প্রকার,
পিঠা পানা অমৃতমণ্ডা পদ্ম চিনি আর।

এই সব ও বাসুদেব দত্ত, মুরারি গুপ্ত ও বুদ্ধিমন্ত খাঁন আনীত নানা প্রকার জিনিষ সবই—

"শতজনের ভক্ষ্য প্রভু দণ্ডেকে খাইল।"

তারপরে জিজ্ঞাসা করিলেন—

"আর কিছু আছে বলি গোবিন্দে পুছিল
গোবিন্দ বলে রাঘবের ঝালি মাত্র আছে।"
আর দিন প্রভু যদি নিভৃতে ভোজন কৈল,
রাঘবের ঝালি খুলি সকল দেখিল।
সকল দ্রব্যের কিছু কিছু উপভোগ কৈল
স্বাদ সুগন্ধি দেখি বহু প্রশংসিল॥
বৎসরের তরে আর রাখিল ধরিয়া
ভোজন কালে স্বরূপ পরিবেশ খসাইয়া।

বস্তুতঃ, রাঘবকে মহাপ্রভু খুবই ভালবাসিতেন। ছয়বৎসর পরে যে এখানে আসেন সেই ফিরিবার পথে পানিহাটীতে মহাপ্রভুর মনে একটী প্রবল ভাবের উদয় হয়। তিনি মনে করিলেন, তিনি তো নীলাচলে থাকেন, সকলেই নীলাচলে যাইতে উদগ্রীব, সন্ন্যাস গ্রহণে সকলেই উৎসুক। সংসারী পাপী তাপিতগণ কিরূপে উদ্ধার হইবে, এই চিন্তাই তখন তাঁহার প্রবল হইল। তিনি রাঘবকে নিভৃতে সম্বোধন করিয়া বলেন, "রাঘব, নিত্যানন্দকে তোমরা আমারই ন্যায় জ্ঞান করিবে"—

রাঘব! তোমারে আমি নিজ গোপ্য কই
আমার দ্বিতীয় নাহি নিত্যানন্দ বই
এই নিত্যানন্দ যেই করাবেন আমারে।

সে-ই করি আমি, এই বলিল তোমারে
আমার সকল কর্ম নিত্যানন্দ দ্বারে
এই আমি অকপটে কহিল তোমারে
যেই আমি সেই নিত্যানন্দ ভেদ নাই
তোমার ঘরেই সব জানিবা এথাই
মহাযোগেশ্বরো যাহা পাইতে দুর্লভ
নিত্যানন্দ হৈতে তাহা হইবে সুলভ ॥
এতেক কহিয়া তুমি মহাসাবধান
নিত্যানন্দ যে হেন ভগবান।

তারপরে মহাপ্রভু নীলাচলে যাইবার পরে কিছুদিন নিত্যানন্দের সঙ্গে সুখে বাস করিয়া একদিন বলিলেন, "দাদা, আমি তো নিজ সুখ লইয়া কাল কাটাইতেছি। দেশের সকলে আমার দিকে চাহিয়া আছে, আমি তাহাদের জন্ম বড় আকুল, তুমি নবদ্বীপে গিয়া সেখানে মহাকার্য্য কর—

প্রভু বলে
শুন নিত্যানন্দ মহামতি
সত্বরে চলহ তুমি গৌড় দেশপ্রতি
প্রতিজ্ঞা করিয়া আমি আছি নিজমুখে
মূর্খ নীচ দরিদ্র ভাসাব' প্রেমসুখে
তুমিও থাকিলা যদি মুনিধর্ম্ম করি
আপন উদ্দামভাব সব পরিহরি
তবে মূর্খ নীচ যত পতিত সংসার
বল দেখি আর কেবা করিব উদ্ধার
ভক্তিরস দাতা তুমি, তুমি সম্বরিলে
তবে অবতার বা কি নিমিত্ত করিলে
এতেক আমার বাক্য যদি সত্য চাও
তবে অবিলম্বে তুমি গৌরদেশে যাও।

অতঃপরে মহাপ্রভুর আদেশে নিত্যানন্দ গৌড়দেশে গিয়া প্রথমেই পাণিহাটী আসিলেন—

হেনমতে নিত্যানন্দ শ্রী অনন্তধাম
আইলেন গঙ্গাতীরে পানিহাটী গ্রাম।
রাঘব পণ্ডিত গৃহে সর্ব্বাদ্য আসিয়া
রহিলেন সকল পার্ষদগণ লৈয়া

সেখানে সকলে তাঁহাকে অভিষেক করিলেন এবং পরে

খট্টায় বসিলা মহাপ্রভু নিত্যানন্দ
ছত্র ধরিলেন শিরে শ্রীরাঘবানন্দ

তারপরে নিত্যানন্দ মহাপ্রভু মালা চাহিলে রাঘব অক্ষমতা জানাইলে নিত্যানন্দ প্রভু তাঁহাকে বাড়ী যাইতে বলিলেন এবং সেখানে রাঘব জম্বীরের বৃক্ষে কদম্ব পুষ্প দেখিয়া একেবারে বিস্মিত হইলেন। নিত্যানন্দ মহাপ্রভু সিংহাসনে বসিতেন, আর—

যত পারিষদ নিত্যানন্দের প্রধান
সভাতে হইল সর্ব্বশক্তি অধিষ্ঠান।

জ্ঞানচক্ষে তাঁহারা নৃত্যসময়ে গৌরাঙ্গ দেবকে দেখিতে পাইতেন। এইরূপে তিনমাস কালপর্য্যন্ত পাণিহাটী গ্রামে ভক্তির স্রোত বহিয়া গেল—

এই মত পাণীহাটী গ্রামে তিনমাস,
করে নিত্যানন্দ প্রভু ভক্তির বিলাস।

অতঃপরে তিনি খড়দহ, নবদ্বীপ, সপ্তগ্রাম, শান্তিপুরে নাম মাহাত্ম প্রচার করিয়া ভক্তির স্রোত প্রবাহিত করিতে লাগিলেন। সপ্তগ্রামে উদ্ধারণ দত্ত ও অন্যান্য সুবর্ণগণকে তিনিই কৃপা করেন।

নিত্যানন্দ প্রভু যখন পাণিহাটীতে লীলাপ্রকট করিতে ছিলেন, আমাদের পূর্ব্বোক্ত রঘুনাথ দাসের মহাপ্রভু দর্শনের জন্ম ক্রমেই ব্যাকুলতা বাড়িতে লাগিল। কিন্তু পিতামাতা, জ্যেষ্ঠতাত প্রভৃতি কিছুতেই তাঁহাকে ছাড়েন না। তারপরে রঘুনাথ পাণিহাটিতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। গঙ্গাতীরে বটবৃক্ষতলে নিত্যানন্দ মহাপ্রভু বেদীর উপরে বসিয়াছেন। তাঁহার দেহ হইতে সূর্য্যকিরণ উদ্ভাসিত হইতেছে, ভক্তগণ উপবিষ্ট হইয়া তাঁহার উপদেশাবলী শুনিতে শুনিতে যেন ভক্তিরসামৃত পান করিতেছেন, এমন সময়ে রঘুনাথ

দণ্ডবৎ হইয়া পড়িলা কতদূরে।

নিত্যানন্দ প্রভু বলিলেন—

নিকটে না আইস চোরা ভাগ দূরে দূরে
আজি লাগি পাইয়াছি দণ্ডিব তোমারে ॥
দধিচিড়া ভক্ষণ করাহ মোরগণে
শুনিয়া আনন্দ হৈল রঘুনাথ মনে।

রঘুনাথ তৎক্ষণাৎ লোকজন সপ্তগ্রামে পাঠাইয়া ভক্ষ-

মণ্ডলীর জন্য নানাবিধ খাদ্য সামগ্রী আনাইলেন অচিরে চিঁড়া দধিদুগ্ধ সন্দেশ ও কলাতে স্থানটি ভরিয়া গেল।

চিড়া দধি দুগ্ধ সন্দেশ আর কলা
সব দ্রব্য আনাইয়া চৌদিকে ধরিলা।

এদিকে মহোৎসবের নাম শুনিয়াও চতুর্দিক হইতে জনসঙ্ঘ আসিয়া গঙ্গাতীরে সমাগত হইল। মহোৎসবে অসংখ্য লোক আসিল, গঙ্গাতীরে ভুরিভোজন হইতে লাগিল এবং নিত্যানন্দ মহাপ্রভু ধ্যানে মহাপ্রভুকেও মহোৎসবে আনাইলেন। ইহাই রঘুনাথের দণ্ডোৎসব বা চিঁড়া মহোৎসব।

এই রঘুনাথই অবশেষে পরম বৈরাগী হইয়াছিলেন। এই মহোৎসব হয় জৈষ্ঠ মাসের শুক্লাত্রয়োদশীতে। শ্রীশ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী মহাশয় নিম্নলিখিত ভাবে পাণিহাটী গ্রামের এই মহোৎসব কীর্ত্তণ করিয়াছেন :—

মহোৎসব নাম শুনি ব্রাহ্মণ সজ্জন
আসিতে লাগিলা লোক অসংখ্য গণন।
আর গ্রামান্তর হৈতে সামগ্রী আনিল
শত দুইচারি হোলনা তাহা আনাইল
বড় বড় মৃৎকুণ্ডিকা আনাইল পাঁচসাতে
এক বিপ্র প্রভু লাগি চিড়া ভিজায় তাতে
এক ঠাঞি তপ্তদুগ্ধে চিড়া ভিজাইয়া
অর্দ্ধেক ছানিল দধি চিনি কলা দিয়া
অর্দ্ধেক ঘনাবৃত দুগ্ধেতে ছানিল
চাঁপাকলা চিনি ঘৃত কর্পূর তাতে দিল
ধুতি পরি প্রভু যদি পিণ্ডাতে বসিলা
সাত কুণ্ডী বিপ্র তাঁর আগেতে ধরিলা

তারপরে নিত্যানন্দ মহাপ্রভু উচ্চ বেদীতে উপবিষ্ট হইলেন, আর আর প্রধান প্রধান ব্যক্তিরা সকলেই উপরে বসিলেন। তন্মধ্যে রামদাস, সুন্দরানন্দ দাস, গদাধর, মুরারী, কমলাকর, সদাশিব, পুরন্দর, ধনঞ্জয়, জগদীশ, পরমেশ্বর দাস, গৌরীদাস হোড়, কৃষ্ণদাস, উদ্ধারণ দত্ত প্রভৃতি অনেকেই ছিলেন। আর নিত্যানন্দ মহাপ্রভু—

শুনি পণ্ডিত ভট্টাচার্য্য যত বিপ্র পাইলা
মান্য করি প্রভু সবারে উপরে বসাইলা
দুই দুই মৃৎ-কুণ্ডিকা সবার আগে দিল
একে দুগ্ধ চিড়া আর দধি চিড়া কৈল
আর যত লোক সব চৌতারা তলাতে
মণ্ডলী বন্ধনে বসিলা নাহিক গণনে
একেক জনারে দুই দুই হোলনা দিল
দধি চিড়া দুগ্ধ চিড়া দুইতে ভিজাইল

কোন কোন বিপ্র উপরে স্থান না পাইয়া
দুই হোলনায় চিড়া ভিজায় গঙ্গাতীরে গিয়া
তীরে স্থান না পাইয়া আর যত জন
জলে নামি দধি চিড়া করয়ে ভক্ষণ।
কেহ উপরে কেহ তলে কেহ গঙ্গাতীরে
বিশজন তিন ঠাঞি পরিবেশন করে।
হেনকালে আইলা তথায় রাঘব পণ্ডিত
হাসিতে লাগিলা দেখি হইয়া বিস্মিত
নিস্‌কড়ি নানামত প্রসাদ আনিলা
প্রভুকে আগে দিয়া ভক্তগণে বাঁটি দিলা॥
প্রভুরে কহে তোমা লাগি ভোগ লাগাইল
তুমি উৎসব কর ঘরে প্রসাদ রহিল
প্রভু কহে এ দ্রব্য দিনে করিয়ে ভোজন
রাত্রে তোমার ঘরে প্রসাদ করিব ভক্ষণ
সকল লোকের চিড়া পূর্ণ যবে হৈল
ধ্যানে তবে প্রভু মহাপ্রভুকে আনিল
মহাপ্রভু আইলা দেখি নিতাই উঠিলা
তবে লঞা সভার চিড়া দেখিতে লাগিলা।
সকল কুণ্ডী হোলনার চিড়া একেক গ্রাস
মহাপ্রভু মুখে দেন করি পরিহাস
হাসি মহাপ্রভু আর এক গ্রাস লঞা
তাঁর মুখে দিয়া খাওয়ায় হাসিয়া হাসিয়া
কি করিয়া বেড়ায় ইহা কেহ নাহি জানে
মহাপ্রভুর দর্শন পায় কোন ভাগ্যবানে।

এই দুইটি মহোৎসব গৌরাঙ্গলীলার অপরূপ প্রতীক। গৌড়জন পাণিহাটী তীর্থস্থানের মহোৎসব দুইটিতে যোগদান করিলে গৌরাঙ্গলীলার কতক আভাস পাইবেন। আজ আমরা ইহা বর্ণনা করিয়া ধন্য হইলাম।

পানিহাটী দুইবার আসিবার পরে গৌরাঙ্গদেব অতঃপরে আর বাঙ্গলা দেশে আসেন নাই। মধ্যপথের রাস্তায় তিনি একবার কাশী, প্রয়াগ হইয়া বৃন্দাবনে গিয়াছিলেন বটে, কিন্তু কিছু দিন থাকিয়া নীলাচলেই চলিয়া আসেন এবং অবশিষ্ট ১৮ বৎসর নীলাচলে অবস্থান করিয়াই লীলা প্রচার করেন। ১৫৩৩ খৃষ্টাব্দে মহাপ্রভু গোপীনাথের মন্দিরে অন্ত্যলীলা লাভ করিয়া মহাপ্রস্থান করেন।

বন্ধন-মুক্তি

শৈলেন্দ্র নাথ গুপ্ত

শ্রীকালীপ্রসন্ন দাশ

(২)

সে দিন ছিল ছুটী। আহারবিরামাদির পর কমল তার সেই ঢিলা পোষাকে চুরুট মুখে সেই ঘরটিতেই আসিয়া বসিল। ডাকের চিঠি-পত্রগুলি টেবিলের উপরে রাখা হইয়াছিল, একে একে খুলিয়া দেখিল। বড় একখানি খামে ছিল সুন্দর ছাপা একখানি কার্ড,—মিষ্টার ও মিসেস্ এম, মোকার্জ্জি এবং মিস্ মোকার্জ্জি আগামী শনিবার সন্ধ্যা ৭টায় তাঁহাদের গৃহে একটি প্রার্থনা সভায় ও চায়ের পার্টিতে তাঁহাকে সাদরে আহ্বান করিয়াছেন।

আহ্বানের বয়ানটি ছিল ইংরেজী। তবে উপরের দুইটি কোণে দুই দিকে 'ওঁ তৎসৎ' এবং 'ব্রহ্মকৃপাহিকেবলম্' এই দুইটি আধ্যাত্মিক সূত্রও বাঙ্গলা অক্ষরে মুদ্রিত ছিল। পড়িয়া একটু হাসি কমলের মুখে ফুটিল। এঁরাও তবে জাল একটা ফেলিয়াছেন! তবে সেই জালটায় একটু ধর্ম্মের চ্যাবরা রঙও মাখান হইয়াছে! প্রার্থনা সভা! আবার ব্রাহ্ম ধর্ম্মের প্রচলিত দুইটি সূত্রও কার্ডের উপরে তুলিয়া দেওয়া হইয়াছে --বাঙ্গলা অক্ষরে!

কত মজার মজার রকমই যে আছে! হাঁ, কার কাছে সে দিন সে শুনিয়াছিল, মিসেস্ মোকার্জ্জির বেশ একটু 'পিউরিটানী' গোঁড়ামীও আছে।

আজকাল আবার সেকেলে সেই পিউরিটানী-গোঁড়ামী! রকমটা একটু দেখিলে মন্দ হয় না। প্রার্থনা সভা! সেই টানা টানা নাকিসুরে একঘেয়ে লম্বা প্রার্থনা আর অতি নীরস 'সার্মন' (sermon)। নাঃ, ওটা আর পোষাইবে না। একদম হাঁফাইয়া পড়িতে হইবে। আর গান— গাহিবে অবশ্য উর্ম্মিমালা, কিন্তু পুরাণ পচা সেই ব্রাহ্ম-সঙ্গীত ত? ওটাও বরদাস্ত হইবে না। তবে ঘণ্টা খানেক বাদে একবার যাইতে পারে। দু'টি গান—তা তার খাতিরে গোটা দুই অন্ততঃ গাহিবেই। তবে সেই ব্রাহ্ম-সঙ্গীত ব্যতীত আর কিছু বোধ হয় সে গৃহে প্রত্যাশা করিতে পারে না। কিন্তু গায় বড় মিঠা! সেদিনও গোটা দুই গাহিয়াছিল। কিছু ধর্ম্মঘেসা হইলেও খাসা দুইটি আধুনিক রবীন্দ্র-সঙ্গীত। একদম মুগ্ধ হইয়া সে গিয়াছিল। তার সেই মুগ্ধতার ভাব দেখিয়া অন্য মেয়েরা যেন হিংসায় জ্বলিয়া পুড়িয়া মরিতেছিল। রেষারেষি করিয়া রবীন্দ্রনাথের দুই একখানি নাটকের গানও কেহ তাহারা গাহিল; ওরিয়েণ্টাল ড্যান্সিং-এর কসরৎও কেহ কিছু দেখাইল। কিন্তু তেমন আকৃষ্ট তাহাকে কিছুই আর করিতে পারিল না। ইহাতে তাহাদের রাগও বেশ কিছু হইতেছিল! বড়ই ইচ্ছা তার হইতেছিল, উর্ম্মিমালা যদি তেমনই নাচিয়া ঐ রকম একটি গান গায়! ইচ্ছার একটু আভাসও সে দিয়াছিল। কিন্তু উর্ম্মিমালা যেন কাণেও তাহা তুলিল না। কে জানে, 'পিউরিটান' সেই মাতার শাসনে নাচটা হয় ত সে আদবে শিখেই নাই। আজকালকার এই মডার্ণিজমের (নব্য-তন্ত্রতার) দিনে এটাও বড় বাড়াবাড়ি 'পিউরিটানী' বাবা! চেহারাটিও এই উর্ম্মিমালার যেন সাজান বাগানে সদ্য ফোটা তরতাজা গোলাপ ফুলটির মত, যেমন নাকি আর কোনও মেয়েতে সে বড় একটা দেখিতে পায় না। আলাপেও বেশ স্মার্ট (smart) আর 'চিয়ার ফুল' (cheerful)—যদিও তাহার কথার উত্তরে সংক্ষেপে দুই একটি কথা ছাড়া নিজে যাচিয়া একটি কথাও তাহার সঙ্গে সে বলে নাই। হাঁ, মেয়েটি মোটের উপর খাসা মেয়েই বটে; মধ্যে মধ্যে গিয়া একটু মেলা-মেশার চেষ্টা করা যাইতে পারে, গানও দুই একটা শোনা যাইবে। যতই 'পিউরিটান' হউক, মাতা আগ্রহেই অনুমোদন করিবেন; মধ্যে মধ্যে খালি ঘরে কেবল তাহাদের দু'টিকে রাখিয়া একাজ-ওকাজের ছুতায় বাহিরেও যাইতে পারেন, অন্য অনেক মাতা যেমন যাইয়া থাকেন। এই রকম আলাপ-সালাপে প্রেমে যদি সেবে পড়ে, মন্দ কি? প্রেমে—তাই ত! বোধ হয় পড়িয়াছেই!—না! ঠিক পড়ে নাই বুঝি এখনও। তবে 'পড়পড়' যে হইয়া উঠিয়াছে, সে বিষয়ে সন্দেহ আর কিছু নাই। নাড়া চাড়া আর একটু পাইলেই ঝুপ করিয়া অমনই পড়িবে। যতই উর্ম্মিমালায়

কথা ভাবিতে লাগিল, তার সেই তাজা মিষ্ট চেহারা, মিষ্ট কথাগুলি আর অতিমিষ্ট সঙ্গীতস্বরের ঝঙ্কারগুলি যেন চক্ষু কর্ণের সম্মুখে ভাসিয়া ও মুখরিত হইয়া উঠিতে লাগিল। কার্ডখানি তুলিয়া আবার নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিল। মুখের কাছে আনিয়া 'মিস্ মোকার্জ্জি' এই নামটির উপরে একটু চুমা খাইতেও গেল। কিন্তু চুরুটটা তখনও মুখে, তপ্ত কতখানি ছাই গিয়া নামটার উপরে লাগিল—একটু হাসিয়া ছাইটুকু রুমাল ঝাড়িয়া পুছিয়া ফেলিল। কিন্তু কাল একটা দাগ নামটির উপরে রহিয়া গেল। অধরস্পর্শে যে তৃপ্তিটুকু চাহিয়াছিল, সেটা আর উপভোগ করা হইল না। এখন ঐ পোড়া কাল দাগটার উপরে—না, সেটা আর চলে না। আর ওটা কেবল একটা নাম বই ত নয়! ফটো হইলেও একটা কথা ছিল। কিন্তু শুধু ছাপা একটা নাম—তাও উর্ম্মিমালা নয় কেবল মিস্ মোকার্জ্জি মাত্র। ঐ উর্ম্মিমালার যে মাধুরীটুকু আছে, ওতে তাও নাই।

কিছুক্ষণ বসিয়া কি ভাবিল; তারপর অন্যান্য চিঠিপত্রগুলির সঙ্গে কার্ডখানি এক ধারে সরাইয়া রাখিয়া একখানি নভেল হাতে লইয়া একটি কৌচে গিয়া অর্দ্ধ-শায়িত হইল। আধ ঘণ্টা খানেক এই ভাবে গেল; ঘড়ীতে তখন সাড়ে তিনটা বাজিল। নভেলখানা টেবিলের উপরে ছুড়িয়া ফেলিয়া ঘড়ীর দিকে কমল চাহিল। ভাল লাগিতেছিল না। ভাবিল, পোষাক বদলাইয়া এখন বাহির হইয়া পড়িলে মন্দ হয় না। কিন্তু কোথায় যাইবে? বাহিরে রৌদ্র তখন খাঁ খাঁ করিতেছে। কোনও থিয়েটারে ম্যাটিনির সময়ও বোধহয় হয় নাই এই season-এ! তবে, এক কাপ চা খাইয়া পোষাক পরিয়া লইতে লইতে সময় বোধ হয় হইবে। কিন্তু সঙ্গে কাহাকে লইয়া যাইবে? প্রিয়-বান্ধবী কেহ—হাঁ, ফোনে ফ্যানী পাকড়াশীর সঙ্গে কথা বলিয়া একটা এনগেজমেন্ট (engagement) করিয়া লইতে পারে। তবে সে যদি প্রি-এনগেজড্ (pre-engaged) হইয়া থাকে—হাঁ, লীলি লাহিড়ী আছে, মীরা মুখার্জ্জী আছে, গার্গী গাঙ্গুলী, আত্রেয়ী আতর্থী, মৈত্রেয়ী মজুমদার, শুভা সরকার, দীপ্তা দত্ত, নন্দা নাগ, মন্দা মোকার্জ্জি—এদের কাউকে বা কাউকে কাউকে—যাকে বা যাদের পায় লইয়া যাইতে পারে। তারপর ম্যাটিনিটা দেখিয়া কোনও রেস্তরাঁয় গিয়া বসিতে পারিলে ইভনিংটা (evening) মন্দ কাটিবে না।

তারপর—নাঃ, বড় দুর্ভাগা বিলাতের মত নাইট ক্লাব (night club), ড্যান্সিং হল (dancing hall), মিউজিক হল (music hall) এখনও 'ফার ব্যাকোয়ার্ড' (far backward) 'বি-নাইটেড' (be-nighted) এই কাণ্ট্রীতে (country-তে) হইতেছে না। পুরাস্ফূর্ত্তিতে লাইফটা (life-টা) এন্‌জয় (enjoy) করাই হতভাগা এই দেশে এডভান্সড্ (advanced) কোনও ইয়ং ম্যানের (young man-এ) ঘটেই না বড়! লোক সব এখনও বহু পিছনে পড়া—মড়া! এ সবের প্রয়োজনই যেন তেমন কেহ অনুভব করে না। দেশ যে মড়া—অসাড়, সে কি সাধে? 'লাইফ' (life) কাকে বলে, লাইফটা এনজয়েব্‌ল্ (enjoyable) কিসে হয় তাই একদম যে দেশের লোক জানে না, বোঝে না, একটা তাগিদই তার তরে যে দেশের লোকের নাই, সে দেশ এমন প্রাণহীন জড়বৎ হইবে না ত কি?

তবে জীবনের একটা স্পন্দন দেখা দিয়াছে বটে। বিলাত যাইবার আগে যাহার কিছু কিছু সাড়া সে পাইয়া গিয়াছিল, সেটা এখন আরও বেশ জাগিয়া উঠিয়াছে, ছড়াইয়াও পড়িয়াছে। যৌবনোদ্গমেই মেয়েরা এখন বিবাহের বেড়ী পায়ে পরিয়া পর্দ্দার আড়ালে গিয়া লুকায় না। হিন্দু সমাজের ত' কথাই ছিল না, তাহাদের উদার উন্নত ব্রাহ্মসমাজেও মেয়েরাও বিবাহ অপেক্ষাকৃত অধিক বয়সে হইলেও, যুবক বন্ধুদের সঙ্গে খোলাখুলি ভাবে মিশিতে পারিত না। এ বিষয়ে অতি কড়া একটা 'পিউরিটানী' শাসনই বুড়াদের ছিল। কিন্তু এখন হিন্দু সমাজের মেয়েরাও কলেজে ছেলেদের সঙ্গে কো-এডুকেশন (co-education) নিতেছে, বাহিরে অবাধে চলা-ফেরা করিতেছে, বন্ধুদের সঙ্গে পার্কে পার্কে, লেকে, গড়ের মাঠে বেড়াইতেছে,—হোটেল রেঁস্তরায়, সিনেমা থিয়েটারে যাইতেছে; নৃত্যগীত অভিনয়ে অহরহ সকলকে আনন্দ বিতরণ করিতেছে! হোষ্টেল বোর্ডিং-এ যারা থাকে, তাহাদের ত কথাই নাই, নিজেদের বাড়ীতেও অভিভাবকেরা কেয়ারই বড় কিছু করেন না। মেয়েদের এক রকম 'ফুল ফ্রিডমই' (full freedom) দিয়াছেন। হইবে—হইবে! নাইট ক্লাব, ড্যান্সিং হল, মিউজিক হল—এ সবও দেখা দিবে, অগ্রস্রোতের এই গতি কেহই আর রোধ করিয়া রাখিতে পারিবে না। রাখিতে চায়ও না বড় কেহ।

আসিবে—আসিবে, সেদিন নিশ্চয় আসিবে! কিন্তু কত দিনে আর? এ সব উপভোগ করিবার সময় তাহাদের থাকিতে আসিবে কি? তবে যতটা আসিয়াছে, যতটা পাইয়েছে, সময় যতদিন আছে, উপভোগ করিয়া সে নিবে। কেন নিবে না? জীবনটা ত' উপভোগের জন্যই। কাজ?—হাঁ, তা কাজ আছে, আবার কাজের অবসরে উপভোগও আছে। আর কাজ ত এই সব উপভোগের সম্বলই মানুষের হাতে আনিয়া দেয়, উপভোগের ক্ষুধাকেও জাগ্রত করে। তাই না কাজের গরজ? তাতেই না কাজের সার্থকতা? নইলে কেবল কাজ ত নিছক একটা ড্রাজারী (drudgery)—নীরস কঠোর একটা গোলামী মাত্র!

হাঁ, এখন তবে ক্যানীকে একটা ফোন করিয়া দেখা যাউক, সে 'ফ্রি' আছে কি না।

ক্রীং—

উঠিয়া দাঁড়াইতেই ফোনটা বাজিয়া উঠিল।

"হ্যালো"—

"হাঁ, আমিই কমল। কে ডাকছেন?"—"ও লীলি! হাঁ, গলার সুরে আমারও তাই মনে হয়েছিল বটে।—ধরতে পারি নে? বল কি? তোমার গলার ঐ মিউজিক্যাল নোট ফোনে ফুটে বেরোয় যে!"—"

"তা ধর, ভুল চুক একটু হ'তেও ত পারে। স্পষ্টাস্পষ্টি জেনে নেওয়া ভাল নয় কি?"—

"হাঁ, তা গার্গীর গলাটাও মিউজিক্যাল বই কি? কিন্তু তোমার মত অতটা মিঠে বোধ হয় হবে না।"—

"ও, গার্গীও ওখানে আছে?"

"বটে! আত্রেয়ী আর মৈত্রেয়ীও আছে? ক্যানী?"

"ও, সে নেই?"—হাঁ, হাঁ; না, তাকে যে চাই-ই, তা নয়!"

—'তা কি বল ত!'—হাঁ, ফ্রিই আছি। কেন বল ত?'—'ও, তোমরা আসবে?'—বাঃ! তা এস না? Shall be damn glad to receive you! তা কি কাজ বল ত?'—'ও, surprise! All the more jolly! I too have a surprise ready for you.'—'বাঃ! আগে বলে ফেলে আর surprise হল কি? তোমরাও ত বলছ না?'—'হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ'—কেমন জব্দ! তা কখন আসছ?'—'এক্ষুনি? All right, Thanks!'

রিসিভারটা রাখিয়া কমল সরিয়া আসিল।—বয়কে ডাকিয়া কিছু টোষ্টসহ কয়েক পেয়ালা চায়ের জল প্রস্তুত রাখিতে আদেশ দিয়া তখন সজ্জাগৃহে প্রবেশ করিল। সান্ধ্য পরিচ্ছদে সুসজ্জিত হইয়া একটি চুরুট মুখে ফিরিয়া আসিয়া নিজের আসনে বসিল। ভস্ ভস্ শব্দে একখানি মোটর আসিয়া গাড়ী বারান্দায় থামিল। ত্রস্ত উঠিয়া কমল বাহিরে গেল, পরক্ষণেই কলহাস্যমুখরা সুসজ্জিতা, সুরঞ্জিতা, তরুণীচতুষ্টয়সহ গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল। ইহারাই কিছুপূর্ব্বে ফোনে আলাপ করিয়াছিল। নাম যথাক্রমে লীলি লাহিড়ী, গার্গী গাঙ্গুলী, আত্রেয়ী আতর্থী এবং মৈত্রেয়ী মজুমদার।

"ব'স, ব'স! Very kind of you to come. Awfully delighted! A real treat to a poor fellow in a dull holiday afternoon! A surprise indeed!"

"হস্! কথার ভণিতে শোন।"

"মনে মনে ত ভাবছেন আপদগুলো কেন এসে জুটল।"

"হাঁ, বেড়াতে বেরোব সন্ধ্যেবেলায় ক্যানীকে নিয়ে—"

"আর তৈরী হয়েও বসেছি।"

"ক্যানী? বটে! এটা কিসে আঁচ করে নিলে?"

"কেন, ক্যানীর খোঁজ করা হচ্ছিল না ফোনে?"

"আর তাকে নিয়ে যে বেড়াতে বেরোন হয় কেউ যেন তা জানে না।"

"তা ক্যানী না থাক, গার্গী ত আছে। কিলো গার্গী, বেড়াতে যেতে পারবি ত'? তৈরী হয়ে এসেছিস্ ত' মার অনুমতি নিয়ে?"

একটু চক্ষু টানিয়া মাথাটা নাড়িয়া ঈষৎ নাকী সুরে গার্গী উত্তর করিল, "না না, সে ভাই আমি আজ পারব না। কোথায় কোথায় নিয়ে যাবেন—হয় ত সেই কোন্ সিনেমায় গিয়ে আটকে থাকতে হবে রাত ন'টা তক। বাড়ীতে ফিরতে রাত হবে সাড়ে ন'টা দশটা! না না, সে ভাই আমি পারব না। বাড়ীতেও বলে ক'য়ে আসি নি।"

কমল মিটিমিটি হাসিতেছিল; কহিল, "তোমাদের

কাউকে আমি বেশী prefer করি আর কারুর চাইতে এ অনুযোগটা বড় অন্যায় দিচ্ছ না লীলি? তোমাদের সবারই যে সমান বন্ধু আমি।"

গার্গী বলিয়া উঠিল, "নিশ্চয়ই! তবে লীলি কেমন যেন একটু jealous হয়ে উঠছে, ফোঁপে ফোঁপেই বাঘ দেখে।"

লীলি উত্তর করিল, "বাঘ থাকলে চোখে পড়বেই। তবে বাঘ নেই, আমিও দেখি না। কমলদার মনটা যে কোথাও কারও শিকলীতে বাঁধা পড়েছে, এমন লক্ষণ ত' এখনও কিছু দেখা যাচ্ছে না।"

আত্রেয়ী ইহার উপরে ফোঁড়ন দিল, "তবে একটু আধটু টান কখনও এখানে কখন ওখানে—জোরটা যেখানে যেমন পড়ে—সেটা হতেই পারে।"

লীলি টিপ্পনী করিল, "তবে সে জোরটা সবাই দিতে পারেও না, চায়ও না দিতে সবাই। কৌশলটাও সবার জানা নেই।"

গার্গীর মুখখানি লাল হইয়া উঠিল।

"তাহলে বলতে চাও লীলি—"

একটু হাসিয়া বাধা দিয়া কমল কহিল, "বলবার কিছুই নেই গার্গী। তবে আমি এইটুকু বলতে পারি, বন্ধুত্বের সমান টানে সবাই তোমরা আমাকে টানছ। কোথাও টানটা কখনও বেশী গিয়ে পড়ে—কই, এটা ত অনুভব করতে পারি নি এখনও।"

মৈত্রেয়ী মুখ টিপিয়া টিপিয়া হাসিতেছিল; বলিয়া ফেলিল, "তবে কিনা অনুভূতিটা কারও চোখে পড়বার মত বস্তু ত নয়।"

"ভেতরের সেই অনুভূতিটা না পড়ুক, ভাবেসাবে বাইরে তার প্রকাশটা চোখে পড়বেই। কিন্তু সে রকম কিছু পড়বার মত অবসর তোমাদের কাউকে কখনও দিয়েছি—কই, এটা ত মনে হচ্ছে না। তবে হাঁ, কারও কারও সঙ্গে সঙ্গের বেরোবার সুযোগটা হয় ত' কখনও বেশী হয়। কিন্তু সে সুযোগ আমি নিজে কখনও খুঁজে নিই না, ঘটনাচক্রে এসে জোটে। আর এমন একটা আনন্দের সুযোগ যখন এসে জোটে, ছাড়তে সেটাকে পারি না। দুর্ব্বলতা বল, তাই সই। তবে এ দুর্ব্বলতাটুকু আমার আছে।"

'বয়' তখন কয়েক প্লেট খাবার সহ চা ইত্যাদি আনিয়া টেবিলের উপরে রাখিল। আত্রেয়ী হাসিয়া কহিল, "ও মা! এসব আবার কি? ঘরে ত গিন্নী ও নেই।"

কমলও হাসিয়া উত্তর করিল, "না, তা, নেই। অতিথি সৎকারের ব্যবস্থাটা নিজেকেই তাই করতে হচ্ছে। তা হ'লে এখন চা-টা কি আমি নিজেই তৈরী করে দেব, না তোমরা কেউ—"

মৈত্রেয়ী কহিল, "আপনি নিজে কি আর সত্যি পারবেন? নিচ্ছি বরং আমরাই কেউ তৈরী ক'রে—যদিও একাজটা ঠিক অতিথির কাজ নয়। তবে আপনি নাকি পুরুষ মানুষ—আরও ব্যাচেলর। আর যার কাজ—তা আয়না লীলি—তুই-ই আজকের মত—"

"আমি! আমি—তা গৃহস্বামী যদি আদেশ করেন—"

"আদেশ! করজোড়ে প্রার্থনা ক'রছি, আজকার মত এ অভাবটা আমার তুমিই পূরণ ক'রে দেও লীলি?"

"যে আজ্ঞে!"

বিলাতী বিবিদের কার্টসীর (curtsy-র) ভঙ্গীতে একটু রঙ্গাভিবাদন সহ এই বলিয়া লীলি উঠিল। ঈষৎ জয়োৎফুল্ল একটা দৃষ্টি গার্গীর প্রতি নিক্ষেপ করিয়া পেয়ালায় চা ঢালিতে সুরু করিল। মৈত্রেয়ী কহিল, "হাঁ, আজকের মত তুমিই এ অভাবটা পূরণ ক'রে দেও লীলি। এরপর—সে ক্যানী আছে, গার্গী আছে, আর—আর—ব'লব?"

হাসিয়া কমল কহিল, "তা ব'লেই ফেলনা? আর ত দেখছি, তুমি আছ, আত্রেয়ী আছে—"

"না, নাগো মশাই, আমরা কেউ নই। আছে—মনের পেছনে পর্দার আড়ালে উঁকি ঝুঁকি মারছে—ব'লব?"

চকিত দৃষ্টিতে সকলেই মৈত্রেয়ীর দিকে চাহিল। আবার হাসিয়া কমল কহিল, "ব'লেই ফেলনা ছাই? দেখা যাক্ 'ক্যাপ্টীর' দৌড়টা তোমার কদ্দুর! শুনি কার সঙ্গে আবার এ অভাগার নামটা জুড়ে দিতে চাও।"

"ইস্! একেবারে যেন সরল গোবেচারী বালকটি আর কি? মনকে চোখ ঠার দেওয়া হ'চ্ছে—কিছুই যেন জানেন না? জেগে ঘুমুচ্ছেন!"

"ঘুমুলে ঘুমিয়েই ঘুমোই, জেগে কখনও ঘুমুতে জানি না। কই, মনে ত হ'চ্ছেনা, কারও ওপর আলাদা রকম তেমন কোনও বিশেষ টান আমার—"

"মোটেই পড়েনি। কেন, সেদিন ঐ আত্রেয়ীদের বাড়ীতে—"

চা তখন তৈয়ারী হইয়াছিল। বলিতে বলিতে মুচকী হাসিয়া বাঁ হাতে এক টুকরা রুটি মুখে তুলিয়া ডান হাতে চায়ের পেয়ালায় একটা চুমুক দিল।

"আত্রেয়ীদের বাড়ীতে—" মুখখানি কমলের যেন একটু লালিম হইয়া উঠিল।

"হাঁ, হাঁ, মশাই! কেমন, মনে প'ড়েছে ত? উর্ম্মির সেই মিষ্টি মুখখানি আর সেই মিষ্টি মুখের অতি মিষ্টি গান দু'টি—"

"উর্ম্মি! ওহো—সেই উর্ম্মি—মানে মিস্ উর্ম্মিমালা মোকার্জ্জি—তার কথা ব'লছ।"

"ইস্, যেন আচমকা ঘুম ভাঙ্গল। সে দিনত জগৎটাই ওঁর তলিয়ে গেল তার সেই মধুমাখাসুরঝঙ্কারমুখরিত উর্ম্মিমালা হিল্লোলিত রূপ সিন্ধুর অতল তলে?"

আত্রেয়ী তখন কহিল, "তা যাই বল ভাই, উর্ম্মি কিন্তু গায় বড় খাসা! গান যখন তার শুনি আমারও মনটা তলিয়ে যায় তার—তার সেই সুর—উচ্ছ্বাসের তলায়।"

"তবু ভাগ্যি সেই উচ্ছ্বাসে ঢল ঢল রূপ সিন্ধুর তলায় নয়।" একটু চক্ষু টাটিয়া লীলি এই উক্তি করিল।

গার্গীও একটু টানা সুরে কহিল, "মৈত্রেয়ী যে মস্ত বড় একটা কবি হ'য়েই উঠলি। ভণিতেটা কি হচ্ছিল না? মধুমাখাসুরঝঙ্কার মুখরিত উর্ম্মিমালা-হিল্লোলিত রূপসিন্ধু।"

"তা সিন্ধু না হ'ক যেমন তেমন একটা খাল বিল নালাও নয়। আর তোর আমার তুলনায় সিন্ধু ব'লেও এমন অত্যুক্তি কিছু হয় না। কি বলিস্ আত্রেয়ী?"

"তা রূপের কথাই যদি বলিস্, রূপে তার কাছে আমাদের হার মানতেই হবে বই কি? যদিও লীলি আর গার্গী সেটা সহজে স্বীকার করবে না।"

লীলি ভ্রূকুটি করিল। গার্গীর মুখখানা আগুন হইয়া উঠিল। লক্ষ্য করিয়া কমল কহিল, "হাঁ, তা চেহারাটা মন্দ বল্‌তে পারি না। তবে লীলি আর গার্গী, আর তোমরা—সে থাকগে, তুলনাটা না তোলাই ভাল। চোখও সবার সমান নয়। তবে চেহারাটা যেমনই হ'ক্ আর গান সে যেমনই সেদিন গেয়ে থাক, অতটা মনে করবার কারণ তোমাদের কিছু নেই। সেই ত সবে একদিন একটু কাল তাকে দেখেছি, আর দুটো গানও কেবল সেদিন শুনেছি। তাও সাধারণ ব্রহ্মসঙ্গীত মাত্র, যা 'মডার্ণ' এই যুগে অচলই বলা যেতে পারে। তবে অনেক দিন ওসব গান শুনিনি কিনা—তাই হয়ত কিছু ভাল লেগেছিল।"

"তবে কিনা তার পর আর কারও নাটকের নাচগানও চোখে কাণে আর লাগল না।"

গার্গী বলিয়া উঠিল, "রেখে দে ভাই এখন, বড় বাজে কথায় সময় যাচ্ছে। কারও রূপের আর গানের তারিফী তুলনা ক'রতে ত আর আসিনি। এখন যে কাজে এসেছি—"

"হাঁ হাঁ, তোমাদের সেই surprise-টা—"

আত্রেয়ী কহিল, "তা বল্‌না লীলি? কেমন তার হ'য়ে একদম চুপ মেরে ব'সে রইলি যে!"

বেশ একটু গুরু-গম্ভীর ভঙ্গী ধরিয়া কবি জনোচিত ঈষৎ রস-রসাল টানা সুরে লিলি তখন আরম্ভ করিল, "আমাদের এটা হচ্ছে খেলা—যে খেলায় খেয়াল আপনি ওঠে নেচে সবুজ প্রাণে লালিম রক্তকরবীর স্তবক ফুটিয়ে নেচারের (nuture-এর) সঙ্গে। দুলে নাচা তরুণ হাওয়ায় মদির পরশ পেয়ে লালসবুজে নেচে উঠেছে আজ নেচার! তরুণের প্রাণে প্রাণে দুলেছে নাচের দোলানী লালসবুজে। Youth to youth!—তরুণ সব প্রাণ নেচে উঠেছে উতলা হ'য়ে মিশে যেতে আজ তরুণ নেচারের সঙ্গে এক হয়ে। এ খেলা—এ পূজা নেচারের খেলা, নেচারের পূজা; আজ, এতে চাই আমরা তরুণ সবারই সব সমান তরুণিমা-রঞ্জিল প্রাণে। স্থান নেই এর ভেতর মানুষ কারো বিশেষ সম্মানের—যাতে তুলে নেয় সেই মানুষকে অশোভন এক গুরু গম্ভীর স্তরে—চেপে গিয়ে তার জেগে ওঠা প্রাণে তরুণিমার নাচদোলানী।"

Bravo! That's just what a poor fellow wants! No other attraction can be stronger than this, if one is really a youth with a youthful soul surged with the wild irresistible urge of

nature and youth. ব্রহ্ম কৃপাহি! Well, if there is really anything like Brahma and His Grace to make man feel and do like a man, it is here in this world in its irresistible urge of youth and here in this alone? What else can make life happier merrier, jollier and fuller?

"All right! তা'হ'লে দেখুন দিকি এটা কি?"

মোহনহাস্তচটুল একটি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া লাল রেশমী ফিতায় বাঁধা লালসবুজে বিচিত্র লম্বা একখানি মোড়ক লীলি কমলের হাতে দিল।

ভিতরে মোড়কের সবুজ গায়ে উজ্জ্বল লাল অক্ষরে এই একটি আমন্ত্রণ লিপি মুদ্রিত :—

"যৌবন জলতরঙ্গ রোধিবে কে?"

ঐযে সবুজ বসন্ত দেখা দিয়েচে। মাতাল করা মলয়ায় নেচে গাছে গাছে ফুটিয়ে রক্তকরবীর লাল পুলক! ফুলে ফুলে তারা নাচছে দোল দেওয়া সেই মলয়ার ছন্দে—গন্ধে তার দিক্ ভরপুর! অলিরা, পাখীরা তান তুলেছে সুর মিলিয়ে সেই ছন্দে গন্ধে আর লুটিয়ে দিচ্ছে দিকে দিকে কেবল মধু মধু—মধু—মাতাল করা মধুর আবেশ। প্রাণে এসে আমাদের পৌঁচেছে সেই আবেশ উছল মধুরসের ঢেউয়ে ঢেউয়ে—ফুটে উঠেছে প্রাণে প্রাণে হাওয়ায় নাচা একটা সবুজ থরে থরে লাল পুলকে ভরা ছন্দে যারা গাইচে বুলবুল পাপিয়া, গন্ধে ছুটছে গোলাপ ফোয়ারা! অন্তরটা বাহিরটা বাজছে আজ এক সুরে, নাচছে এক পুলক লহরে লুটিয়ে পড়েছে পায়ে পায়ে একই গন্ধের মাতোয়ারা মধু মধুরে!

আয়োজন করেছি আমরা একেই একটুখানি রূপ দিতে—মুখর করে তুলতে—কয়েকটি রঙ্গদৃশ্যে নৃত্যগীত ছন্দে। প্রাণে এ পুলক আবেশ এসে কি পৌঁছেচে হে মিত্র! তবে এস, কাছে এগিয়ে এস—এই মধু-উৎসবকে আজ ক'রে তোল পরিপূর্ণ মধুময় তোমার প্রাণের সেই আবেশ রস এতে ঢেলে দিয়ে, এর সঙ্গে এক ক'রে তার মিলিয়ে!

ওঁ মধু, ওঁ মধু, ওঁ মধু!

প্রীতিপ্রফুল্ল মুখিত কমল বলিয়া উঠিল, "বাঃ! বাঃ—চমৎকার ত! কে এ কবিটি—a born poet of spring nature in full bloom and music! তোমরা কেউ কি? লীলির কথাগুলিতে এরই একটা ঝঙ্কার উঠছিল না?"

গার্গী উক্তি করিল, "ঝঙ্কারটা মন্দানিলদা'র, তবে লীলির মুখে তার প্রতিধ্বনিটা উঠেছে চমৎকার। সে আবার ওর বিশেষ বন্ধু কিনা? Inspiration-টা সহজেই পেয়েছে।"

"মন্দানিল দা'! কে ইনি?"

"আমারই একজন কাজিন্ (cousin) ওর দিদির দেওরেরও ঘনিষ্ঠ একজন বন্ধু—সর্ব্বদা যায় আসে তার সঙ্গে ওদের বাড়ীতে।"

"আর তোদের বাড়ীতে যাওয়া আসা বুঝি মোটেই হয় না?"

"আমাদের 'কাজিন' যে।"

"কাজিন ত পিসীর মামাত দেওরের ছেলে!"

"তা' হ'ক। ছেলেবেলা থেকেই পিসতুত দাদাদের যেমন, তাকেও তেমনি 'কাজিনের' মত দেখে আসছি। হাঁ, কাগজ টাগজেও ইনি খুব লিখে থাকেন। Ualtra-modern (অতি-নব্যতন্ত্রী) কবি বলে বেশ একটা নামও হয়েছে। কেন, পড়েন নি এঁর কোনও কবিতা?"

"না, সে সৌভাগ্য এখনও ঘটে নি। বাঙ্গালা কাগজ-টাগজ দেখবার অবসর এখনও তেমন হয়ে ওঠে নি দেশে ফিরবার পর। তা আমার hearty greetings এঁকে দিও। Simply charmed! হাঁ, তোমাদের এই স্টেজেও ইনি আছেন ত?"

"নিশ্চয়ই আছেন। তৈরীও সব ইনিই'ত করে নিচ্ছেন।"

"আর কে কে আছেন?"

"এই আমাদের ক'বাড়ীর ছেলে মেয়েরা আর নিকট বন্ধু কেউ কেউ। তা আপনাকে চাই কিন্তু। যাবেন ত ঠিক?"

"নিশ্চয়ই! এমন খাসা একটা entertainment—মিস্ (miss) কখনও করতে পারি?" মৈত্রেয়ী কহিল, "কিন্তু লীলি যা বলছিল, সত্যি ডাক যদি আর কোথাও ওঠে?"

"তোমাদের এ ডাকের উপরে কি আর কিছু উঠতে পারে?"

লীলি কহিল, "তা'হলে কথা দিলেন কিন্তু। মনে থাকে যেন।"

হাসিয়া কমল কহিল, "মন্দানিল বাবুর মত কবি হ'লে ব'লতাম, নিদ্রাজাগরণে বাজবে কাণে অবিরত যে এই ডাকেরই সুর, রাখবে চেপে, পৌঁছুতেই দেবে না সহজে অন্ত কোনও সাড়া—চাপা থাকে, পৌঁছায় না কাণে যেমন পটকার চটাপট ধ্বনি গর্জ্জে ওঠে যখন গগন ঘনঘোরে ঘন ঘন deafening roaring thunder গগন বিদারি।"

"বাঃ বাঃ। সত্যিই যে কবি হয়ে উঠলেন? একেবারে দ্বিতীয় একজন মন্দানিলদা'।"

"কবিত্বের এমন সাড়া পেয়ে প্রাণটা যার একটু সাড়া দিয়ে না ওঠে—সে—সে কি বলব, must be a stock or stone or mere dull cold clayey earth and no man pulsating with life and youth."

"বাস্, তাহ'লে উঠি এখন আমরা আজ?"

"কোথায় যাবে তোমরা এখন?"

"যাব—এই আর কারও কারও বল্‌তে হবে ত?"

"তা সেটা যদি কালতক put off করা চলে সময় ত আছে—তাহ'লে চলনা ভাল একটা সিনেমায় যাওয়া যাক। মেট্রোতে নূতন একটা ছবি দেখাচ্ছে, গ্রেটা গার্বো তাতে আছেন।"

"বেশ, চলুন তবে, কি বলিস্ তোরা?"

"বেশ ত, যাওয়াই যাক। নেমন্তন্ন—সে কাল আছে, পরশু আছে—করা যাবে।"

কমল কহিল, "ছ'টার শো সুরু হবে। ফোনে ক'টা সিট্ রিজার্ভ করে নিই। ময়দানে একটু খানি ড্রাইভের পর যাওয়া যাবে।"

উঠিয়া কমল গিয়া ফোনটি ধরিল।

(১০)

রবীন্দ্রনাথ এবং অন্যান্য দুই একজন কবির নূতন কয়েকটি গান ভাল করিয়া অভ্যাস করিয়া রাখিতে কন্যাকে সুকল্যাণী আদেশ করিয়াছিলেন। ভাবায়, ভাবে ও সুরে শীলতার সীমা একেবারে লঙ্ঘন না করিয়া গান কয়েকটি আধুনিক রুচির তুষ্টিকর যতটা হয় সেদিকে একটু দৃষ্টি রাখিলে তাঁহার আপত্তি এমন কিছু হইবে না, এরূপ ইঙ্গিতও করিয়াছিলেন। কেবল ব্রহ্ম-সঙ্গীত যে এ বৈঠকে সকলে পছন্দ করিবে না, দ্বিতীয়বার এরূপ আমন্ত্রণে আকৃষ্ট হইয়াও আসিবে না, এই সত্যকে তিনিও মনে মনে অস্বীকার করিতে পারেন নাই। প্রথমে প্রার্থনা-সভা আছে, সেখানে ত ব্রহ্ম-সঙ্গীতই হইবে। পরবর্ত্তী পার্টিটার লক্ষ্য হইতেছে নির্দ্দোষ একটু প্রমোদ। সেখানেও কেবল ঐ ব্রহ্ম-সঙ্গীত চালাইলে প্রমোদটুকু প্রমোদই আর থাকিবে না, সব কেমন মরা মরা 'মনোটনী' (monotony) হইয়া উঠিবে, 'ডাইভার্সন' (diversion)-এর একটু হাকছাড়া হাল্‌কা আনন্দ কেহ পাইবে না—ইহার প্রয়োজনও মানুষের পক্ষে আছে। তিনি নিজে সেটা তেমন পছন্দ না করুন, আর দশজনে ত' করে, এবং সেই দশ জনই তাঁহার গৃহে আমন্ত্রিত হইয়া আসিবে। এই সম্মেলন তাঁহাদের উপভোগ্য হয় এটাও তাঁহার দেখা উচিত। তা' স্বভাব-সঙ্গীত আছে, প্রাণের নানাবিধ উন্নত উচ্ছ্বাসও কবিরা সঙ্গীতে প্রকাশ করিয়া থাকেন। তারপর প্রেম-সঙ্গীত—উচ্চতর পবিত্র ভাবের হইলে তাহাতেই বা আপত্তি কি, যুবক যুবতীর পবিত্র উদ্বাহ-মিলন প্রেম হইতেই ঘটে। স্বয়ং ভগবানও প্রেমময়। সুতরাং—

যাহা হউক, প্রেম-সঙ্গীতও দুই একটা গাহিতে পার, স্পষ্ট এই কথাটা না বলিলেও এভাবে-ওভাবে আভাস যাহা দিলেন, তাহাতে রবীন্দ্রনাথের নূতন কোনও নাটকের প্রেম-সঙ্গীত দুই একটি গাহিলেও মাতার অতি প্রীতিকর না হইলেও আপত্তিকর তাহা যে হইবে না, ইহা ঊর্মি বেশ বুঝিল; মনে মনে একটু হাসিলও বটে

পরত পার্টি। নীচের বসিবার ঘরটি—তা' ধনিগৃহের প্রশস্ত একটি হলের মত না হইলেও—ছোটও এমন ছিল না, স্থান সেই ঘরেই হইতে পারে। যে ভাবে হউক স্থান করিয়া লইতেও হইবে। প্রার্থনা-সভায় অসুবিধা কিছু হইবে না। নিমন্ত্রিত লোক যদি সব তখন আসেনও, গাদাগাদি করিয়া বসিয়াও অনুষ্ঠানটায় যোগদান করিতে পারেন। তবে পার্টিটা—তা' উপায় আর কি? গৃহের পার্টি—গৃহ ছাড়িয়া বাহিরে একটা হল ভাড়া করিয়াও করা যায় না। বড় বাড়াবাড়িই সেটা দেখায়। কু-লোকে অনেক কু-কথাও কহিবে, দুষ্টবুদ্ধি অনেকে টিট্‌কারীও দিবে। তবে কার্নিচারগুলি বহু

দিলেন ; কিছু মলিন হইয়াও পড়িয়াছিল। নূতন পালিস ফ্রেমগুলিতে দেওয়া হইয়াছে। গদীমোড়া কয়েকটা চেয়ার-কৌচও ভাড়া করা হইয়াছে। পর্দাগুলিও পুরাতন, কিছু কিছু জীর্ণও বটে। ছিট বাছিয়া নূতন কতকগুলি পর্দার অর্ডার দেওয়া হইয়াছিল। দোকানের লোক সকাল বেলায় পর্দাগুলি লইয়া আসিয়াছে। নীচে নামিয়া আসিয়া সুকল্যাণী সেগুলি নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিলেন। হাঁ, বেশ পছন্দ-সই-ই হইয়াছে বটে। মুখ ভরিয়া মিষ্ট হাসিও ফুটিয়া উঠিল, যেরূপ হাসি অতি কচিৎ কখনও তাঁহার মুখে লোকে দেখিতে পায়! ভৃত্যকে পাশের ঘরের তাকের উপরে সাবধানে সেগুলি তুলিয়া রাখিতে আদেশ দিলেন ; দিয়া ঘরের নূতন চূণকাম ও রঙ কেমন হইয়াছে চক্ষু ঘুরাইয়া একবার দেখিলেন। হাঁ, বেশ খুলিয়াছে। আলোতে ঘরটি বেশ ফুট-ফুট করিবে বটে। ঠিক মনের মত— decent and tasteful—যেমনটি হইতে হয়—হইয়াছে। ভগবৎকৃপায় এখন পরশুকার প্রার্থনা-সভা আর পার্টি টা—হাঁ, তাও successful হইবে বই কি? খোস-মেজাজে, বেশ একটু মৃদু মিষ্ট হাসি মুখে, ধীরে সুকল্যাণী উপরে গিয়া উঠিলেন।

নিকটেই ছেলেমেয়েদের পড়িবার ঘর। মৃদুস্বরে উর্ম্মি কি গাহিতেছিল। সুরটি বড় মিঠাই লাগিল। হাঁ, উর্ম্মি তবে তাঁহার নির্দ্দেশ মত গান অভ্যাস করিতেছে! তাঁহার ইঙ্গিত পাইয়া হয়ত বা নূতন একটি প্রেমসঙ্গীতই অভ্যাস করিতেছে। সেটা বিশেষ দরকারই বটে। কারণ, এ সব সঙ্গীত চর্চ্চা করিবার সুযোগ ত গৃহে সে কখনও পায় নাই। তাঁহার অজ্ঞাতসারে কি অবাধ্য হইয়া অন্য কোথাও কোনও বন্ধু গৃহে গিয়াও করে না। তাই দুই একটা যাহা গাহিবে, ভাল করিয়া আয়ত্ত করিয়া তাহাকে লইতেই হইবে। কোন্ গানটা সে বাছিয়া লইয়াছে, অভ্যাস করিতেছে, শুনিবার জন্য বেশ একটু কৌতূহলও মনে জাগিয়া উঠিল। নিঃশব্দে পা ফেলিয়া দরজার কাছে গিয়া তিনি দাঁড়াইলেন। কিন্তু সঙ্গীতের পদ যাহা শুনিলেন, তাহাতে কাণের ভিতর দিয়া মরমে যাহা পশিল, তাহা অমৃতমধুর ত' কিছু নহেই, তিক্ত তীব্র বিষের উদ্দীপ্ত জ্বালা বলিলেও বোধ হয় ঠিক বর্ণনা হয় না। সে জ্বালা মর্ম্মস্থল হইতে মুহূর্ত্তে প্রত্যাহত হইয়া সমস্ত মন প্রাণ পরিব্যাপ্ত করিয়া দেহের অঙ্গে অঙ্গে যেন বহ্নিশিখায় প্রবাহিত হইল। সঙ্গীতের সেই পদটি ছিল—

"শ্মশানে শব শিবের বুকে
শ্যামা মা ওই দাঁড়িয়েছে,
(মায় সে) রাঙ্গা পায়ে বিল্বদলে
রক্তজবা সে দিয়েছে!"

কি সর্ব্বনাশ! বীভৎস সেই শ্মশান—তার মাঝে পড়িয়া আছে বর্ব্বর বিকটবেশভূষণ শিব, আর তার বুকে দাঁড়িয়ে কালো সেই ন্যাংটা বিভীষিকা। আবার তার রাঙ্গা পা—সেই পায়ে আবার বেলের পাতা রক্তজবা!

কেবল পৌত্তলিকতা নহে। তার বীভৎস বৈচিত্রের চরম প্রকাশ। এই গান গাহিতেছে, তাঁহার গৃহে, তাঁহারই কন্যা, শৈশবাবধি যাহাকে তিনি পৌত্তলিকতার সকল সংস্রব হইতে বহুদূরে অতি সাবধানে তিনি রাখিয়াছেন! আর আজ এই মাত্র যার কাছে প্রত্যাশা করিতেছিলেন—

অগ্নিমূর্ত্তি হইয়া সুকল্যানী গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন।

"উর্ম্মিমালা!"

বিকৃতফুৎকারপ্রসূত তীব্র তীক্ষ্ণ কঠোর একটা তূরীধ্বনি যেন জলন্ত কণ্ঠে নিঃসৃত হইল।

"উর্ম্মিমালা!"

আতঙ্কে উর্ম্মি লাফ দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, মলাট ছেঁড়া মোটা কাঁথার সুতায় ছেঁড়া পাতা সেলাই করা ময়লা একখানি বই হাত হইতে পড়িয়া গেল। সুকল্যাণী তুলিয়া লইয়া দেখিলেন,—শ্যামা সঙ্গীত!!! ঘৃণ্য জোঁকপোকে হাত পড়িলে যে ভাবে লোকে ঝাড়িয়া ফেলে, বিকৃত মুখে সেইভাবে বইখানা গৃহতলে ফেলিয়া দিয়া কয়েক পা তিনি পিছাইয়া গেলেন। হাঁকিলেন, "উর্ম্মিমালা!"

উর্ম্মি স্তব্ধ—নীরব।

"কোথায় পেয়েছ ওই বই উর্ম্মিমালা? কে দিয়েছে?"

নীরবে উর্ম্মি আনত মুখেই দাঁড়াইয়া রহিল। সমস্ত শরীর তার থর থর কাঁপিতেছিল। ক্রোধবিকৃত সুর আরও উচ্চ পর্দ্দায় তুলিয়া সুকল্যাণী কহিলেন "চুপ ক'রে রইলি যে হতভাগী! বল, কে দিয়েছে এ বই তোকে? কোথায় পেয়েছিস্?"

রুদ্ধকণ্ঠে কোনও সাড়া বাহির হইল না। ক্রোধের উত্তেজনা সুকল্যাণীর ধৈর্য্যের সীমা ছাড়াইয়া

কঠোর মুষ্টিতে কন্যার কেশাকর্ষণ করিয়া ঝাঁকি দিতে দিতে কহিলেন, "কী ? বল্‌বিনি ? বল্‌বিনি ? বলতে হবে। বল্‌, ভাল হবে না বল্‌ছি। বল্‌, কে দিয়েছে ও বই তোকে ? ওই পাপবুড়ী। তোর দিদিমা ?"

কাঁদিয়া দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া উর্ম্মি বসিয়া পড়িল।

"কী ? এতবড় জিদ্‌! তবু ব'লবিনি, বল্‌, বল্‌—বল্‌ বল্‌ছি। নইলে—নইলে—"

হিতাহিত বুদ্ধি একেবারেই তখন লোপ পাইয়াছিল। জোরে এক পদাঘাত তিনি উর্ম্মিকে করিলেন ঠিকরাইয়া উর্ম্মি দেওয়ালের গায়ে গিয়া পড়িল।

দরজার কাছে আসিয়া সুকল্যাণী হাঁকিলেন, "ঝি! ঝি!"

ঝি ত্রস্ত ছুটিয়া আসিল।

"'যা, নিয়ে যা! একুণি তুলে নিয়ে যা ঐটে! উনুনে নিয়ে গে ফেলে দে! দাঁড়িয়ে রইলি যে, নে না হতভাগী তুলে! বল্‌ছি, কথাই কাণে তুলছিস্‌ নি ?"

ঝি বইটা তু'লয়া লইয়া ছুটিয়া নীচে গেল। মনে হইল, দিদিমণির কোনও প্রিয় পুস্তকই এটা হইবে। হয়ত' ঠাকুর দেবতার কথাই আছে; বুড়ী দিদি ঠাকুরাণীর কাছে পাইয়াছে। মা ঠাকুরদেবতার নামগন্ধও সহিতে পারেন না। আবার সর্ব্বদাই বলেন, ঠাকুরদেবতার কথা সব পাপের কথা। পুজোমন্তর মহাপাপ! মাগো! এমন সব কথাও মানষ্যি কেউ মুখে আনে! কোনও জন্মে কখনও কোথাও ত' সে শুনে নাই! আছে ব্রহ্মজ্ঞানী আছে। তাই বলিয়া ঠাকুরদেবতাকে অত গালি পাড়িবে কেন ? ঐ ত' বাবু র'য়েছেন, আরও কত বেহ্মজ্ঞানী বাড়ীতে আসে। কই, ঠাকুর দেবতার নামে এমন অগ্নিবৃষ্টি ত কেউ করে না। না মানিস বাপু, নেই মানলি ? তা এত গালি পাড়িস্‌ কেন! ঠাকুর দেবতারা কেউ আসিয়া আস্ত ধরিয়া ত তোদের গিলিয়া খাইতেছে না। তা—এখন বইখানা—না ঠাকুরদেবতার বই—যাই উনি বলুন, হাতে ধরিয়া আগুনে ফেলিয়া দিতে পারিবে না। ছেলেপিলে লইয়া ঘর করে। একটা সর্ব্বনাশ শেষে হইবে। পাপের ফলে পরকালে নরকেও হয়ত অপগতি হইবে। আহা, দিদিমণি অমন লক্ষ্মী মেয়ে—তার এমন আদরের বইখানি—ঐ বুড়ী দিদিঠাকুরাণী আবার দিয়াছেন, প্রাণে ধরিয়া পোড়াইতে সে আজ পারে ? আহা, কি পুণ্যির শরীর গা! তা একটি দিন বাপী বাড়ীতে ঢুকিতে পারিল না—নিজের ভাইপোর বাড়ী! না, বইখানি সে লুকাইয়া রাখিবে। তারপর দিদিমণির হাতে লুকাইয়া একদিন দিয়া দিবে। বামুন ঠাকুরকে ইসারা করিয়া বইখানি সে মাথায় ঠেকাইয়া কয়লার বাক্সটার আড়ালে লুকাইয়া রাখিল। উনান জালিবার জন্য যাকে কাগজ যাহা আনিয়াছিল, তাহার অবশেষ কতখানি হাতের কাছেই ছিল। তাই তুলিয়া বামুন ঠাকুরের হাতে দিল। একটু মুচকী হাসিয়া ঠাকুর সেগুলি উনানের ভিতরে গুজিয়া দিল।

সুকল্যাণী ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "উনুনে দিয়েছিস বইটা ?"

মুখ বাড়াইয়া ঝি উত্তর করিল, "হাঁ, মা, এই ত দিলুম। দাউ দাউ ক'রে জ্বলছে। গন্ধ পাচ্ছেন না ?"

পোড়া কাগজের একটু গন্ধ সুকল্যাণীর নাকে গিয়াও পৌঁছিয়াছিল। বু'ঝলেন, বইখানি অগ্নিসাৎ হইয়াছে।

বাহিরের পাপ ত' উনানের অগ্নিতে দগ্ধ হইল। কিন্তু কন্যার মনে যে পাপ ঢুকিয়াছে, রসনায় যে পাপ কথা গীত হইয়াছে, তাহা ত এত সহজে দগ্ধ হইয়া যাইবার নহে। পাপ দুষ্টা বলিয়া কন্যাকে সত্যই ত তিনি আর আস্ত ধরিয়া উনানের অগ্নিতে দগ্ধ করিয়া ফেলিতে পারেন না। এখন উপায় কি ? মিষ্টার মোকার্জ্জি কোথায় ? সিঁড়ির দিকে কিছু অগ্রসর হইয়া হাঁকিলেন, "মিষ্টার মোকার্জ্জি! মিষ্টার মোকার্জ্জি!"

মেম সাহেবদের ন্যায় রাগ হইলে সুকল্যাণী স্বামীকে এই সম্বোধনই করিতেন। অন্য সময় আদরের 'মহীন' ডাকই চলিত।

মহীন্দ্রনাথ কোথায় গিয়াছিলেন, ঠিক সেই মুহূর্ত্তে বাড়ী ফিরিলেন। স্ত্রীর চণ্ডস্বরে এস্ত উপরে উঠিয়া চণ্ডীমূর্ত্তি দেখিয়া আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিলেন।

"কি, কি হয়েছে সুকু ?"

"কি হ'য়েছে! না হ'য়েছে কি ? সর্ব্বনাশ হ'তে ব'সেছে! অভিযোগ আমার তোমারই বিরুদ্ধে! তুমিই এর জন্যে দায়ী। এ সর্ব্বনাশের সূত্রপাত তুমিই করেছ।"

"কি, কি! বলি, ব্যাপারটা খুলেই বল না শুনি? সর্ব্বনাশটা কি হ'ল?"

"কি হ'ল! হ'ল না আর বাকী রইল কি? এত সাবধানে গৃহের পবিত্রতা আমি রক্ষা ক'রে চলছি—ওদের মনে যাতে পৌত্তলিক কুসংস্কারের ছায়াপাতও কখনও কিছু না হ'তে পারে, তার জন্মে শৈশব থেকে একেবারে একটা 'হট-হাউসে' (hot houseএ) পুরেই ওদের রেখেছি বল্লে হয়, আর আজ কি না—আজ কি না—আঃ! নাম ক'রতেও রসনা আমার স্তব্ধ হ'য়ে আসছে। তবু ক'রতে হবে। এত সাবধানে রক্ষা করছি ওদের এত আট ঘাট বেঁধে, আর আজ কিনা সেই আমার গৃহে শ্যামা সঙ্গীত!"

কোনও মতে হাসি চাপিয়া মহীন্দ্রনাথ কহিলেন, "শ্যামা সঙ্গীত! কি সর্ব্বনাশ! বল কি? কি ক'রে তা ঢুকল তোমার ঘরে দুর্ভেদ্য প্রাচীর ভেদ ক'রে!"

গভীর একটি নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া একটু স্খলিত ভার-গম্ভীর স্বরে সুকল্যাণী উত্তর করিলেন, "পাপ যে কোন্ অলক্ষ্য সূত্র ধরে কোথায় প্রবেশ করে, কে তা, হায়! আগে বুঝতে পারে? তাই সর্ব্বদা অতি সতর্ক হয়েই থাকতে হয়। কিন্তু তুমি থাক নি। আমি থাকতে চেয়েছি, পারি নি। যা পারতাম তা ক'রতে দেও নি। ঐ পাপ বুড়ীকে—"

"আঃ! থাম সুকু! অমন কথা ব'লতে নেই।"

"ব'লতে নেই! কেন, কেন ব'লতে নেই? ব'লব, দু'শো বার ব'লব! এই সর্ব্বনাশ তিনি ক'রলেন, এই পাপ আমার ঘরে ঢোকালেন, আর তা ব'লব না?'

"হাজার হ'লেও গুরুজন ত? অতবড় রূঢ় কথাটা মুখে আনতে আছে?"

"হ'তে পারেন তোমার গুরুজন। আমার কেউ নন্ তিনি। তোমার দাসী হয়ে আসি নি, যে তুমি যাকে গুরুজন ব'লবে, তাকেই অমনি গুরুজন ব'লে মাথায় তুলে আমাকে নিতে হবে, শ্রদ্ধার যোগ্য সে হ'ক্ কি না হ'ক্। ভুলে যেও না, এ সমাজে নারী স্বাধীন। সুবিধার খাতিরে প্রচলিত 'স্বামী' কথাটা ব্যবহার করা হয় ব'লে মনে ক'রো না, কোনও স্বামিত্ব, তোমাদের স্বেচ্ছায় বৈবাহিক সম্বন্ধে মিলিতা নারী আমাদের উপরে আছে।"

"আহা, কে স্বামিত্বের দাবী করছে গো? স্বীকার করছি আমি স্বামী নই, 'হাসব্যাণ্ড' (husband) অর্থাৎ গৃহস্থ পুরুষ মাত্র, যার সঙ্গে স্বেচ্ছায় তুমি মিলেছ সর্ব্বদা সমান অধিকারে। তা যাই হই, একটা মানুষত বটে। যাকে গুরুজন বলে আমি মানি, তাঁকে কি আমার মুখের ওপর অতবড় গালটা তোমার দেওয়া উচিত?"

"এত বড় অন্যায়টা কেন তিনি করলেন? এত বড় পাপ ঢুকিয়ে আমার গৃহের পবিত্রতা তিনি নষ্ট করলেন, আমার সন্তানদের উপরে পাপপৌত্তলিকতার এতবড় একটা প্রভাব এনে ফেল্লেন, আর এই বিশেষণটা তাঁকে দিতে পারব না? সাধু কি অসাধু যে কাজ যে করবে তার অনুরূপ বিশেষণের যোগ্য সে।"

"বস, বস!" নিকটবর্ত্তী গৃহে প্রবেশ করিয়া নিজে বসিয়া মহীন্দ্রনাথ কহিলেন, "বল, বল, শোনা যাক দিকি ব্যাপারটা কি হয়েছে?"

সুকল্যাণী বসিলেন।

"হাঁ, কি বলছিলে, না? শ্যামা সঙ্গীত! কে গেয়েছে শ্যামা সঙ্গীত? ঊর্ম্মি?"

"হাঁ, শ্যামাসঙ্গীতই গাইছিল, অবিশ্যি গুণ গুণ করে। দৈবাৎ আমার কাণে গেল। ঘরে ঢুকে দেখি একটা বই তার হাতে; ছেঁড়া, ময়লা, জোড়াতালি দিয়ে সেলাই করা! কি করে ও বই হাতে সে স্পর্শে করলে বুঝতে পারি না। তা সেটাও বরং মার্জ্জনা করা যেত। বইয়ের চেহারা মন্দ, সেটা আর কতটুকু মন্দ? বইটার ভেতরে কি জান?"

"ভেতরে—সে ত নামেই বোঝা যাচ্ছে শ্যামা সঙ্গীত।"

"হাঁ, আর গানটা যা গাইছিল সে আর আমি মুখেও আনতে পারি না। স্মরণ করলেও সমস্ত শরীর আমার শিউরে উঠে! পৌত্তলিকতার চূড়ান্ত বিভীষিকা, ঘৃণ্য, জঘন্য বর্ব্বর! ধর্ম্ম যতদূর হতে হয় গুকার জনক।

"হুঁ—তারপর?"

"আর সেই বই সে এনেছে কোত্থেকে বার বার জিজ্ঞাসা করলাম, উত্তরই দিলে না। এমনি অবাধ্য হয়েছে। কিন্তু বুঝতে কি বাকী থাকে? এনেছে তোমার পিসীমার কাছ থেকে।"

"সম্ভব।"

"সম্ভব ? কেবল সম্ভব বলছ ! একেবারে নিঃসন্দেহ। কোথায় আর ও বই সে পাবে ? অমন নোংরা বই কার কাছে আর থাকতে পারে ? তিনিই দিয়েছেন। বইএর পাপ বুদ্ধি তিনিই ওর মাথায় ঢুকিয়েছেন। গানও তিনিই শিখিয়েছেন।"

"গান গাইতে কস্মিন কালেও তিনি জানেন না।"

"তাহ'লে নিজে হতভাগী সুর করে শিখে লিখে নিয়েছে ! হাঁ, মনে পড়ছে এখন, সুরটা কেমন নতুন ধরণের লাগল, আমাদের আজ কালকার সব সঙ্গীতে শুনতেই বড় পাইনে।"

মহীন্দ্রনাথ কহিলেন, "আধুনিক সব ব্রহ্ম সঙ্গীতে শ্যামা-সঙ্গীতের সুর কি করে পাবে ? স্বয়ং ব্রহ্মই যে সে সুরের স্পর্শে দূষিত হয়ে পড়েন।"

"শুদ্ধং অপাপবিদ্ধম্ ! সেই ব্রহ্মকেও দূষিত করতে পারে, সে যে—সে যে কত বড় একটা দোষ।"

"হাঁ, খুবই বড় একটা দোষ বটে, কিন্তু অপাপবিদ্ধ যিনি, তাঁতে দোষই বা লাগে কি করে ?"

সুকল্যাণী কহিলেন, "বিঁধে ভেতরে ঢুকতে না পারুক বাইরে ত' লেপ একটা তার গিয়ে লাগতে পারে ? তাতেও ব্রহ্ম দূষিত হন বই কি ?"

"হতে পারে না, তবে তাঁকে আমরা পূর্ণও ত' বলে থাকি। সেই পূর্ণের বাইরেটা কি, আবার সেই বাইরের বাইরেটা থেকে একটা দোষই বা কি গিয়ে তাঁতে লাগতে পারে—"

"পূর্ণ তিনি পূর্ণ ! পাপটা তাঁর থেকে বাইরেই বটে।"

"কিন্তু একথাটাও আমরা বলে থাকি 'সর্ব্বংখল্বিদং ব্রহ্ম'। পাপটা তাহ'লে কোথায় আছে ? কোত্থেকে এল ? কে আনলে ? যাক্ সে কথা। উত্তর কেউ এঁরা দিতে পারেন নি। তবে ওঁরা বলে থাকেন, ওঁদের শ্যামা ব্রহ্মময়ী।"

"শ্যামা ব্রহ্মময়ী। শ্যামা—ঐ ন্যাংটা বীভৎস বিভীষিকা—সেও ব্রহ্মময়ী। কি ব'লছ তুমি ? তোমাতেও তবে দেখছি পৌত্তলিকতার প্রভাব বেশ এসে পড়েছে ? বুড়ী দেখছি সর্ব্বনাশ ক'রে তবে ছাড়বে। ঊর্ম্মির মাথাটা ত' খেয়েছেই। তোমারও—"

হাসিয়া মহীন্দ্রনাথ কহিলেন, "বুড়ীর কোনও অপরাধ নেই সুকু। আর কথাটা আমার কথাও নয়।—ওঁরা বলে থাকেন জানি—কথায় কথায় মনে হ'ল, বলে ফেল্লাম।"

"কিন্তু ব্রাহ্মধর্ম্মেও তোমার যে আন্তরিক একটা শ্রদ্ধা কি নিষ্ঠা আছে, তাও মনে হয় না। এই ত সপ্তাহে একটি দিন রবিবার—তাও মন্দিরের উপাসনায় গিয়ে যোগ দিতে কোনও আগ্রহ তোমার দেখিনি। এখন ত' একদম ছেড়েই দিয়েছ।"

"হুঁ। তা সপ্তাহে সবে একটি দিন—তাই টানটা হয়ত তেমন পড়েনি। রোজকার একটা অনুষ্ঠান হ'লে অভ্যাসেও হয় ত' মনটা অন্য রকম হ'ত।"

"কিন্তু যায়ও ত' ঢের লোকে।"

"সেই বা কয়জন ? উঁকি দিয়ে দুই একদিন দেখেছি' ঘর প্রায় খাঁ খাঁ ক'রছে। এর চাইতে ওদের সব মন্দিরের সন্ধ্যা আরতির সময় ঢের বেশী লোক গিয়ে জমে। কাছেই ত ঠন্‌ঠনের কালী বাড়ী—একদিন গিয়ে দেখে এলেই বুঝতে পারবে কি ভীড়টা হয়।"

"তা বর্ব্বর সব লোক—ঢাক ঢোল ঘণ্টা বাজে—"

"অর্গানের সুরে মিঠে গানও ব্রহ্মমন্দিরে যথেষ্ট হয়।"

সুকল্যাণী একটু ভ্রুকুটি করিলেন, কহিলেন, "থাক ওসব কথা এখন। ঘরে যে এই পাপটা ঢুকল তার কি প্রতিকার ক'রবে ? প্রতিকার কি হ'তে পারে ? কথায় উত্তর দিচ্ছিল না, আমি মেরেছি—"

"মেরেছ ! বল কি সুকু ? ঊর্ম্মিকে মেরেছ তুমি। গায়ে হাত তুলে ?"

চমকিয়া মহীন্দ্রনাথ বিস্মিত ও রুষ্ট দৃষ্টিতে চাহিলেন। একটু লজ্জা পাইয়া সুকল্যাণী কহিলেন, "অবিশ্যি, সেটা বোধ হয় আমার উচিত হয়নি—"

"একেবারেই নয়। অতি অনুচিত কাজই হ'য়েছে। অত বড় মেয়ে, আর অনায়াসে তার গায়ে হাত তুমি তুল্লে ! এই সব তাড়নার বয়স কি তার অতীত হয়নি ? তুমি কি মনে কর, এতখানি শাসনের অধিকার তার উপরে তোমার আছে ?"

চড়া সুরে স্বামীর অতগুলি কড়া কথাও সুকল্যাণীর সহ্য হইল না। এরূপ কোনও তিরস্কার স্বামীর নিকটে কখনও তিনি পান নাই। আঁধার মুখে কঠোর ভ্রুকুটি উঠিল। দুই এক পর্দা উঁচুতেই সুর চড়াইয়া তিনি কহিলেন, "তারও উচিত হয় নি আমাদের লুকিয়ে এই সব ঘরে এনে এই সব

সঙ্গীত উচ্চারণ ক'রে আমাদের পবিত্র গৃহকে কলুষিত করে! আর—

"লুকিয়ে সে কিছুই করেনি শুভু। একটা আগ্রহ তার হ'য়েছিল হিন্দু-ধর্ম্মের তত্ত্বটা কি অনুসন্ধান ক'রে একটু বোঝে—"

"বটে! কোত্থেকে এ আগ্রহ তার এল! তোমার ঐ পিসীর সঙ্গে অতটা মেলামেশার ফলে নয় কি?"

"হাঁ, তাই বটে। তা মানুষকে এরকম একটা হট হাউসে' চিরকাল কেউ আটকে রাখতে পারে না। বাইরের সংস্পর্শে তাকে আসতেই হবে। আর যখন আসবে, সেই বাহিরটা যে কি, সেটাও দেখবার আর জানবার ইচ্ছে তার হবে। এই বাইরেটার খবর একটুখানি সে আজ পিসীমার কাছে পেয়েছে এটা ঠিক। কিন্তু আজ না হ'ক কাল, আর কারও কাছে পেতই। সে যাই হ'ক, খবরটা সে পেয়েছে, তার সম্বন্ধে ভাল ক'রে কতকগুলো কথা জান্‌তেও তার আগ্রহ হ'য়েছে। আমাকে ব'লেছিল, হিন্দুধর্ম্মের বই-টই গুলো প'ড়ে সে বুঝতে চায়, তার কথাগুলো কি?"

"আর তুমি অমনি অনুমতি দিয়েছ!"

"হাঁ, দিয়েছি? কেন দেব না!"

কিছুকাল স্তব্ধ ও নির্ব্বাক্ থাকিয়া অতি গম্ভীর ভাবে শুভকল্যাণী কহিলেন, "তা হ'লে কি বুঝতে হবে পৌত্তলিকতার কুসংস্কারে আবার তুমি আত্মদান ক'রছ? শুদ্ধ, শুভ্র, সমুজ্জ্বল আলোক ছেড়ে বর্ব্বরতার পাপ, পঙ্কিল, দুর্গন্ধ, অন্ধকারে তুমি নিমজ্জিত হ'চ্ছ?"

"না, সেরকম কিছুই বুঝতে হবে না শুভু।"

"তা হ'লে উর্ম্মিমালার এই পাপ প্রবৃত্তিতে অনুমোদনের অর্থ কি?

"জ্ঞানের অনুসন্ধিৎসাকে পাপ প্রবৃত্তি বলা যায় না। তারপর, উর্ম্মি এখন বড় হ'য়েছে, এসব বিষয়ে তার স্বাধীন অধিকারেও হস্তক্ষেপ করা আমাদের উচিত হবেনা।"

"অবশ্য হবে! স্বাধীনতার নামে স্বেচ্ছাচারকে প্রশ্রয় দিতে আমি প্রস্তুত নই!"

মহীন্দ্রনাথ কহিলেন, "স্বাধীনতা আর স্বেচ্ছাচার—এদুটো কথায় যাই বোঝাক, তাদের পার্থক্যটার মধ্যে একটা সীমা রেখা টেনে দেওয়াও বড় সহজ একটা কথা নয় শুভু। কোথায় সে রেখাটা প'ড়বে তা নিয়ে বোধহয় দু'টি লোকও একমত হবে না।"

"বিবেক মানলে অবশ্য হবে।"

"বিবেক তুমিও মান, আমিও মানি। আর আমার ঐ যে পিসীমা—"

"তোমার পিসীমা! হাঃ-হাঃ-হাঃ! তিনিও বিবেক মানেন। বিবেক কথাটা কানেও কখনও শুনেছেন, মুখেও কখনও উচ্চারণ ক'রেছেন? বিবেক ব'লে কিছু তাঁর আছে?"

"মানুষ মাত্রেরই আছে। মানুষ ব'লে যদি তাঁকে গণনা কর, স্বীকার ক'রতে হবে, তাঁরও আছে। ভগবান্ কাউকে তাঁর এ আশীর্ব্বাদে বঞ্চিত করেন নি, যদি তিনি বিশ্বপিতা ভগবানই হন। নামটা হয়ত সকলে জানে না, মুখেও কথাটা বলে না—যেমন আমরা সর্ব্বদা ব'লে থাকি। তবে এর সত্যটা তার অস্তিত্ব নিয়েই সত্য, কেবল নামটা নিয়ে নয়। নামটা দিয়েছে মানুষ সত্যটাকে প্রকাশ ক'রতে। একটা নাম দিয়ে নূতন ক'রে সৃষ্টি তাঁকে কেউ করেনি। এই নামটা ছাড়া অন্য নামেও মানুষ এই সত্যটাকে প্রকাশ ক'রতে পারে। যে নামেই বলুক, কোনও নামে ব'লতে পারুক কি না পারুক, সত্যটাকে অনুভব ক'রতে পারলে কি বুঝতে পারলেই যথেষ্ট। আর সেই বিবেক যাকে তুমি ব'লছ, তাই কি সবার ঠিক এক হয়?"

"হ'তেই হবে। ভগবানের বাণী—"

"ভগবানের বাণী—হাঁ, তাই ব'লে থাকি বটে আমরা। কিন্তু সবাই যে আমরা সেই ভগবানের বাণী শুনি যখন বিবেকের দোহাই দিই তাও ত ঠিক না হ'তে পারে। এই ত বিবেকের কথা দুজনেই আমরা ব'লে থাকি। কিন্তু একমত ত হ'তে পারছি না। তুমি সেটাকে স্বেচ্ছাচার ব'লে গাল দিচ্ছ, আমি সেটাকে উর্ম্মির স্বাধীন অধিকার ব'লে অনুমোদন ক'রছি।"

"কিন্তু বিবেকের অনুমোদন এটাকে ব'লতে পার না।"

"তুমি ব'লছ পার না কিন্তু আমি ব'লছি পারি।"

"মিথ্যা কথা! ব'লতে তা পারই না, হয় ভুল বুঝছ, না হয় মিছে একটা জিদ ক'রছ, মেয়ের আবদার রাখবে বলে।"

"না, সে রকম কোনও জিদ আমার নেই শুভু। তবে

ভুল তুমি বুঝছ, কি আমি বুঝছি, সেটা বিচার ক'রে দেবে কে ?"

"বিচার ? এর আবার বিচার কি ?"

কোমল হস্তে টেবিলের উপরে অতি কঠোর একটা আঘাত করিয়া সুকল্যাণী কহিলেন, "বিচার ! পৌত্তলিকতার পক্ষে আবার বিচার ! ধিক্ ! ব্রাহ্ম হয়ে একথা ব'লতে তোমার একটু লজ্জা হ'ল না ?"

"ব্রাহ্ম হ'য়ে কারও স্বাধীনতায় বাধা দেওয়াই বরং লজ্জার কথা।"

"স্বাধীনতা ! না, না, স্বাধীনতা নয় এটা—(টেবিলে প্রচণ্ড করাঘাত) স্বেচ্ছাচার ! পাপের প্রবৃত্তিতে ঘোরতর স্বেচ্ছাচার ! আমি ব'লছি মিষ্টার মোকার্জ্জি, এর প্রশ্রয় আমি কখনও দিতে পারব না। ঐ বুড়ীকে যখনই নিয়ে এসেছ তখনই জানি, এই রকম একটা সর্ব্বনাশ না হ'য়ে যাবে না। সাধে আমি এত আপত্তি ক'রেছিলাম ? তা আমি ব'লছি আজ, তুমি নিজে বাইরে যা খুসী ক'রতে পার, সারাটি দিন গিয়ে ওখানে, ওর পায়ে গড়াগড়ি কর, পাতের ঐ নোংরা ঠাণ্ডা ডাল ভাত গিয়ে খাও, চিবোন ডাটাগুলো আবার মুখে তুলে চিবোও—থুঃ ! যা খুসী নিজে গিয়ে কর। কিন্তু ঘরে এসব কদাচারের প্রশ্রয় আমি কখনও দেব না ! কড়াভাবে শাসন ক'রব ! আর আমার নিষেধ, উর্ম্মি কি ছেলে মেয়েরা কেউ আর ও বাড়ীতে যেতে পারবে না, যদ্দিন ঐ পাপ বুড়ী না দেশে ফিরে যায় !

বলিয়া সুকল্যাণী উঠিলেন। পদশব্দে গৃহতল কম্পিত করিয়া বাহিরে চলিয়া গেলেন।

[ক্রমশঃ

তাহাদের সনে লাঠিও মরেছে

শ্রীপ্রফুল্লকুমার মুখোপাধ্যায়

দত্তপুরের যদু মধু সদু সংখ্যায় তারা তিন তো।
আবাল বৃদ্ধ বনিতা সবাই তাহাদেরে সদা চিন তো॥
গ্রামের মাঝারে উপাধি তা'দের ছিল নাক কিছু কম।
কেহ বা ডাকিত আপ্তেয়ে আর কেহ বা ডাকিত যম॥
ছেলেদের মাঝে তাহারাই ছিল সেনাপতি কোতোয়াল।
ইঙ্গিতে আসি জুটিত যে যার পৃষ্ঠে বাঁধিয়া ঢাল॥
মারামারি আর কাড়াকাড়ি ছিল নাহি ছিল ছাড়াছাড়ি।
তালে তালে সব উঠিত নাচিয়া যে যাহার মাথা নাড়ি॥
দেখিতে দেখিতে বাল্য কাটিল খেলা হ'ল অবসান।
কৈশোর গেল যৌবন এল হৃদয়ে ডাকিল বান॥
কাঠ কাটে আর বাঁশ ফাড়ে তারা মাঠে দেয় তারা হাল।
অভদ্র বলি ভদ্রেরা সব মাঝে মাঝে দেয় গাল॥
বিপদে ওদের আছে প্রয়োজন এ কথা ছিল না জানা।
উৎসবে কেহ ডাকে নি ওদেরে দেয়নি একটি দানা॥
গিরিশ বাবুর বড় হাকডাক চারিদিকে তাঁর নাম।
বসত বাড়টী প্রাচীরেতে ঘেরা ভিতরে ত্রিতল ধাম॥

কেহ বলে, "তিনি টাকার কুমীর লাখপতি নিশ্চয়।
গৃহিণী তাঁহার লক্ষ্মী স্বরূপা ভাগ্যের পরিচয়॥"
দস্যুরা আসি হানা দিল যবে পাঁড়েজি ভাকেন রুটি।
পাইক যারা ছিল দেখা না মিলিল সকলে পালাল ছুটি॥
ভদ্রেরা যত যে যাহার ঘরে কসিয়া আঁটিল খিল।
দুরু দুরু করি মরণাতঙ্কে কাঁপিয়া উঠিল দিল॥
যদু মধু সদু হাতে লয় লাঠি, মুখে মুখে ভাকে হাঁক।
পলক ফেলিতে লাঠি ঘুরে যায় বন বন ছাড়ে ডাক॥
দস্যুরা দেখি গণে পরমাদ বলে, "ঘেরিয়াছে মাছি।
কোনরূপে যদি পথ পাই কোথা পরাণ লইয়া বাঁচি॥"
লাঠির আঘাতে দস্যুর দল একে একে পড়ে ভুমে।
কারু গেল মাথা, হাত পা বা কারু, কেহ গেল চির ঘুমে॥
দত্তপুরের যদু মধু সদু আজ তারা বেঁচে নাই।
তাহাদের সনে লাঠিও মরেছে দুঃখের কথা তাই॥

গিরিশ-প্রসঙ্গ

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত

বাঙলা ১৩১৫ সন ও ইংরাজী ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে আমার নাট্যকার গিরিশচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের সহিত প্রথম পরিচয়ের সৌভাগ্য হইয়াছিল। আমি তখন ময়মনসিংহের অন্তর্গত কালীপুরের প্রসিদ্ধ জমিদার স্বর্গত ধরণীকান্ত লাহিড়ী চৌধুরীর ওখানে কাজ করিতাম। ধরণীবাবু একজন সদালাপী এবং সাহিত্য সেবক ছিলেন। পর্য্যটক হিসাবেও তাঁহার বিশেষ খ্যাতি ছিল। তিনি ভারতের নানা স্থান পর্য্যটন করিয়াছিলেন। তাঁহার লিখিত "ভারতভ্রমণ" একখানি বিখ্যাত গ্রন্থ। ধরণী বাবুর ওখানে বিধুমৌলী বাগচী নামে এক ভদ্রলোকও কাজ করিতেন। তাঁহার কাজ ছিল ধরণী বাবুর চিত্ত বিনোদন করা। লোকটি ছিলেন বেশ সুরসিক এবং এক সময়ে মিনার্ভা থিয়েটারের অভিনেতা এবং গিরিশচন্দ্রের অত্যন্ত প্রিয় ছিলেন। গিরিশচন্দ্রের একখানি গীতি নাট্য "মলিন মালা"র প্রকাশক ছিলেন এই বিধুমৌলী বাগচী। 'মলিন মালা' ১৩, বসুপাড়া লেন হইতে প্রকাশিত হইয়াছিল এবং কলিকাতা আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে শ্রীকালিদাস চক্রবর্ত্তী কর্তৃক মুদ্রিত হয়। সন ১২৮৯, ইংরাজী ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দ। এই গীতি নাট্যখানি গিরিশচন্দ্র উপহার দিয়াছিলেন রামতারণ সান্যাল মহাশয়কে। উহাতে লিখিয়াছিলেন :—

ব্রাহ্মণ!

তোমার অনুকম্পায় আমার পুস্তকগুলি উজ্জ্বল হইয়াছে। এ খানির তুমিই অধিকারী, তোমার চরণে উপহার রাখিলাম। সেবক, শ্রীগিরিশচন্দ্র ঘোষ।

বিধুবাবু সুগায়ক ছিলেন। আর সেতার, এস্রাজ ও অন্যান্য বাদ্যযন্ত্রের উপরও তাঁর বেশ অধিকার ছিল। ধরণী বাবু কলিকাতায় আসিয়া মাঝে মাঝে বাস করিতেন। এক সময়ে তাঁহার বাসা ছিল মিনার্ভা থিয়াটারের কাছাকাছি একটি বাড়ীতে। সে বাড়ীতে থিয়েটারের অভিনেতারা প্রায়ই আসিতেন এবং গিরিশ বাবুর সহিতও ধরণী বাবুর বেশ সৌহার্দ্দ্য ছিল। গিরিশচন্দ্রও অনেক সময় ধরণী বাবুর আদর আপ্যায়নে গল্প গুজব করিতে তাঁহার বৈঠক খানায় আসিতেন। সঙ্গে থাকিতেন বিধু বাবু। ক্রমে বিধু বাবু ধরনী বাবুর স্নেহ আকর্ষণে বিমুগ্ধ হইয়া থিয়েটারের কাজ ছাড়িয়া ধরণী বাবুর জমিদারি সেরেস্তার আসিয়া যোগ দিলেন।

বিধুমৌলী বাবুর নিকট আমরা গিরিশচন্দ্র সম্বন্ধে নানা গল্প শুনিতাম। ধরণী বাবুর বাস পল্লী কালীপুর, ব্রহ্মপুত্রের পূর্ব্ব পার। আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি, সে ১৯০৬-১৯০৭ খৃষ্টাব্দের কথা; তখন রেল হয় নাই। ঘোড়ার গাড়ী করিয়া ১০।১২ মাইল পথ অতিক্রম করিয়া কালীপুর ও গৌরীপুর যাইতে হইত কিংবা পদব্রজে যাইতে হইত। তবে সকলেই ঘোড়ার গাড়ীতে যাইতেন। গৌরীপুর, কালীপুর, কৃষ্ণপুর, গোলকপুর ও রামগোপালপুর সব কাছাকাছি জমিদার পল্লী। তখনকার দিনে প্রত্যেক জমিদার পরিবারের মধ্যে যেমন ছিল আন্তরিকতা তেমনি ছিল পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভক্তি। পূজা-পার্ব্বণে যাত্রা, কবি ও নাট্যাভিনয় হইত এবং শ্রোতা হইত অসংখ্য। আমরা যে সময়ে কালীপুর ছিলাম, তখন সেখানে একটি মধ্য ইংরাজী বিদ্যালয় ছিল। তা ছাড়া গৌরীপুরের বাজার ছিল বিশেষ প্রসিদ্ধ। জিনিষ-পত্র সুলভ ছিল। সন্ধ্যার পর পল্লীর পথ একেবারে নির্জ্জন হইয়া যাইত। বিস্তৃত মঠের মধ্যে শৃগালের রব শুনা যাইত। কাজেই সন্ধ্যার পর জমিদার বাড়ীর আসর জমাইতেন, বিধুমৌলী বাবু প্রভৃতির ন্যায় সুরসিক ব্যক্তিগণ।

বিধুমৌলী বাবুর মুখে প্রায়ই গিরিশ বাবুর বিরচিত কবি গান শুনিতাম। সে গান কয়টি তাঁহার সুমধুর স্বর লহরীর প্রভাবে শ্রোতৃবর্গের চিত্ত বিনোদন করিত। গান কয়টির মধ্যে দুইটি গান এখনও আমার মনে আছে। তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম।

"অপার সাগর ঘোর রণ-রঙ্গ,
ঊর্দ্ধ জটা ঘটা গরজে তরঙ্গ।
বেলা বিফল, সাগর দল বল,
প্রবল পবন বহে ঝড় ঘন ঘন।

মেঘ করাল, দামিনী মাল,
নিবিড় আঁধার মৃদু মৃদু হাসি
বিশ্ববিনাশী,
অশনি শ্রেণী, মহী কম্পিত অঙ্গ
ধারা প্রচণ্ড ধরাধর খণ্ড,
ভূতবৃন্দে কতক্রকুটি ভঙ্গ।"

অপর সঙ্গীতও বিধু বাবু সব সময়ই গুন্ গুন্ করিয়া গাহিতেন এবং আমি তাঁহাকে অনুরোধ করিলেই পরম উৎসাহের সহিত গাহিতে আরম্ভ করিতেন :

"মরাল-গঞ্জিনী, নিবিড় নিতম্বিনী,
রঙ্গিনী সঙ্গিনী, সাগর পারে।
বান রণ নূপুর, হিয়া বাজে দুর দুর,
বিকাশে বালুকা বেলা মেদিনী হারে।
ধীর চঞ্চল চরণ চলে :
গুরু উরু পরে বেণী পড়িছে ঢলে ;
যেন বাহিছে ছলে, বেণী দুলিয়ে চলে,
ধরামাঝে বল নারী বাঁধিতে কারে।"

আমাদের উৎসাহ ও বিশেষ করিয়া আমার প্ররোচনায় কালীপুরে সে সময়ে আমার লিখিত "আনার কলি" নামে একখানি গীতি-নাট্য ও গিরিশচন্দ্রের "বিল্বমঙ্গল ঠাকুর" অভিনীত হয়। 'আনার কলি' সম্বন্ধে বাঙ্গলা সাহিত্যে তাহার পূর্ব্বে কেহ কোনও প্রবন্ধ বা নাটক রচনা করিয়াছিলেন বলিয়া আমার জানা নাই। 'আনার কলি'তে মাহরুণ নামে একটি চরিত্র ও "বিল্বমঙ্গল ঠাকুর" নাটকে আমি বিল্বমঙ্গলের ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলাম। তখন আমি গিরিশ বাবুর লিখিত প্রত্যেক খানা নাটক, গল্প, প্রবন্ধ, গীতি-নাট্য ও প্রহসন প্রভৃতি পরম আগ্রহের সহিত অধ্যয়ন করিয়া তাঁহার প্রতি একান্ত অনুরক্ত হইয়া পড়ি, এবং গিরিশ বাবুর সহিত পরিচিত হইবার জন্য আগ্রহান্বিত হই। একদিন বিধু বাবুকে বলিলাম, "আপনি ত বলেন গিরিশ বাবুর সঙ্গে আপনার ঘনিষ্ঠ পরিচয় আছে, এবার যখন কলিকাতা যাইব, তখন তাঁহার সঙ্গে কিন্তু আমাকে পরিচিত করিয়া দিতে হইবে।" বিধু বাবু পরম উৎসাহের সহিত বলিলেন, "সে আর কি একটা কথা! নিশ্চয়ই দিব।"

বিধুবাবু গিরিশচন্দ্রের ম্যাকবেথ নাটকে একজন ডাকিনী বা witch সাজিয়াছিলেন। তিনি অত্যন্ত দীর্ঘাকার ছিলেন, ছয় ফুটেরও বেশী হইবেন। আর গিরিশচন্দ্রের মোহিনী-প্রতিমা গীতি-নাট্যে হীরালালের ভূমিকায় এত সুন্দর অভিনয় করিয়াছিলেন যে, গিরিশ চন্দ্রের ভ্রাতা অতুলচন্দ্র ঘোষ মহাশয় অত্যন্ত সুখ্যাতি করিয়া তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, "বাগচী, তুমি পার্টটিকে একেবারে জীবন্ত করে তুলেছ।" তার উত্তরে বিধুবাবু বলিয়াছিলেন, "আজ্ঞে ওটা ত আর পার্ট কিছু নয়, ও যে আমার নিত্যিকার ব্যাপার।" গিরিশ বাবু শুনিয়া শুধু হাসিয়াছিলেন।

ধরণী বাবুর 'ভারত ভ্রমণ' মুদ্রণ উপলক্ষ্যে আমাকে ১৩১৫ সালে বা ইংরাজী ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা আসিতে হয়। ধরণী বাবুও সে সময়ে কিছু দিনের জন্য কলিকাতা আসিয়াছিলেন এবং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটে একটি বাসা লইয়াছিলেন।

একদিন আশ্বিন মাসের প্রভাতে আমরা গিরিশচন্দ্রের বাড়ী চলিলাম। বিধুবাবু ও আমি বসু পাড়া লেনে তাঁহার বাড়ীতে গিয়া বরাবর উপরে উঠিয়া গেলাম। দেখিলাম, একটি হলের একপ্রান্তে গিরিশ বাবু যোড়াসন করিয়া বসিয়া আছেন। দুই দিকে বড় বড় তাকিয়া। সম্মুখে প্রকাণ্ড একটি ডাবর, তাহা সাজাপানে ভরা। গিরিশ বাবু সোজা হইয়া বসিয়া দুইজন লোককে কি যেন বলিয়া যাইতেছিলেন। একজন গেরুয়া কাপড় পরা সন্ন্যাসী। অপর জন, পরে জানিয়াছিলাম, অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়। সারা হলটি জোড়া ফরাস বিছানা পাতা। দেয়ালের গায়ে সারি সারি পুস্তক। গৃহে ঢুকিবামাত্রই গিরিশ বাবু আমাদের দিকে তাকাইয়া বাগচী মহাশয়কে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "এই যে বাগচী, তুই এলি কোথা থেকে? অনেক কাল পরে দেখলুম! খবর সব ভাল ত? কোথায় থাকিস্? একেবারে কলকাতা ছাড়া।" তারপর আমার দিকে তাকাইয়া বলিলেন, "বস বাবা, বস।" বিধুবাবু আমার পরিচয় দিতে বলিলেন, "ওরে আমি দেখেই বুঝেছি যে ছেলেটি সম্ভ্রান্ত ঘরের। বস বাবা, বস!"

আমার কেমন কৌতূহল হইল এবং গিরিশ চন্দ্রের আদর আপ্যায়ন ও সৌজন্যপূর্ণ ব্যবহারে আমার মন হইতে অনেকটা সঙ্কোচ দূর হইয়াছিল। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনি কি কোন প্রবন্ধ লিখিতেছিলেন?"

গিরিশবাবু বলিলেন, 'শান্তি কি শান্তি' বলে একটা

নাটক লিখছি। আমি বলে যাই এঁরা দয়া করে লেখেন। আমি বড় একটা লিখি না—নেহাৎ দায়ে না পড়লে।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "কি বিষয় নিয়ে লিখছেন?"

গিরিশবাবু বলিলেন, "widow marriage সম্পর্কে, একটা drama।"

এ সময়ে বিধুবাবু বলিলেন, "আপনার শরীর কেমন? হাঁপানিটা কেমন আজকাল?"

"ভাল নয়রে বাগচী। জানিস, সেই বামুন ছেলেটার অভিশাপ লেগেছে। যতদিন বেঁচে থাকবো ভুগিয়ে মারবে।"

আমি বলিলাম, "সে কি?"

গিরিশবাবু বলিলেন, "সে প্রায় পনেরো বছর আগেকার কথা, তোর মনে আছে কি না জানি না। আমার 'সপ্তমীতে বিসর্জ্জন' বলে একটা প্রহসন অভিনয় হচ্ছিল। সিংহ সাজবে কে? একটি ছোকরা এসেছিল থিয়েটারে এপ্রেণ্টিস করতে। সে ছোকরাকে বল্লুম, যাও ত সিংহ সাজগে। বেচারা সাজতে গেল। অর্দ্ধেন্দু সেজেছিল পুরুত, সে এমন মন্ত্র পড়া সুরু করলে যে, অনেক সময় কেটে গেল। বাইরে audience যেমন হাততালি দিচ্ছে, অর্দ্ধেন্দুর মন্ত্র আওড়ানোও তেমনি বেড়ে যাচ্ছে। ছোকরা সিংহের উপর পা দিয়ে যিনি দুর্গা সেজেছিলেন তাঁর ওজনও নেহাৎ কম ছিল না। যেমন সিন শেষ হোল—সিংহ গেল ধপাস করে পড়ে। মুখোস খুলে দেখা গেল, ছোকরা একেবারে অজ্ঞান হয়ে পড়েছে; বেচারা হাঁপাচ্ছে। ডাক্তার ডেকে নানা ব্যবস্থা করতে, তবে তার জ্ঞান হলো। উঃ, সে যে কি দৃশ্য, সে ভুলবার নয়, কি কষ্টেই না ছোকরা শ্বাস প্রশ্বাস ফেলছিল। কেন এমন হল! দেখা গেল সিংহের মুখোসের নাকের ছেঁদা ছিল না। উঃ! বেচারা দম বন্ধ করেছিল প্রায় একঘণ্টার কাছাকাছি। তাকে ত কোন রকমে সুস্থ করে বাড়ী পাঠালুম। যাবার সময় সে বলেছিল, "গিরিশবাবু, কি যে কষ্ট পেয়েছি, যদি কোনদিন আপনি তা পান তবে বুঝবেন, আমার যন্ত্রণা।" বাগচী, মনে হচ্ছে তার অভিশাপেই লেগেছে। তাই আমার হাঁপানি হয়েছে।"

বিধুবাবু বলিলেন, "ও আপনার মনের ভুল।"

গিরিশ বাবু বলিলেন, "যাই বলিস বাগচী, আমি কিন্তু ভাবছি সেই বামুনের অভিশাপই লেগেছেরে। আমার কিন্তু কোন দোষ ছিল না। বুঝলি ত, থিয়েটারের ম্যানেজারি করতে হলে কত দিকে নজর রাখতে হয়।

আমার সঙ্গে আমার 'আনার কলি' নাটকের পাণ্ডুলিপিখানি ছিল। আমি বলিলাম, "আপনার নিকট আমার লেখা নাটক পড়ে শুনাই এ আমার দুঃসাহস। তবে যদি দয়া করে একটু শোনেন। তবে—"

গিরিশবাবু বলিলেন—"পড়"।

আমি প্রথম অঙ্কটি পড়িয়া শেষ করিলাম।

গিরিশবাবু নীরবে শুনিলেন। পরে বলিলেন—"তোমাদের লেখার উপর রবিবাবুর প্রভাব আপনা হতে এসে পড়ে। তা ত' হবেই, অত বড় genius দেখ, তোমার লেখা বেশ মিষ্টি, কিন্তু একটা কথা বলি, বাঁদীগুলো যখন জানতে পারলে—আনার কলি সেলিমের প্রতি অনুরক্তা এবং সেলিমও তার প্রতি অনুরক্ত, এমন অবস্থায় তুমি বাঁদীদের আনার কলির প্রতি যে sympathy দেখিয়েছ এ কি ঠিক্ হয়েছে? এতে যে তাদের jealous হওয়াই স্বাভাবিক, কি বল? তুমি এ দিকটা ভেবে দেখ। তুমি বইখানা revise করে আমাকে দিও। Story-টি ভাল।

আমার লিখিত "আনার কলি" গীতি নাট্যখানি কাশীপুর অভিনীত হওয়ার পর, একে একে "ময়মনসিংহ আর্য্য নাট্য সমাজ", ঢাকা "ক্রাউন থিয়েটার", চট্টগ্রাম "রেলওয়ে ইন্‌ষ্টিটিউট" প্রভৃতি নানাস্থানে অভিনীত হইয়াছিল এবং অভিনয় করিয়া সকলেই বেশ অর্থলাভ করিয়াছিলেন। তখনকার দিনের কোহিনুর থিয়েটারে অভিনয় করিবার জন্য বিখ্যাত অভিনেতা শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রমোহন মিত্র মহাশয় উহা গ্রহণ করেন এবং স্বর্গত রায় বৈকুণ্ঠনাথ বসু বাহাদুর গানগুলিতে সুর সংযোজনও করিয়াছিলেন। এ বিষয়ে সাহিত্যপরিষদের এক যুগের কর্ণধার স্বর্গত ব্যোমকেশ মুস্তোফি মহাশয় নিজে উৎসাহী হইয়াই ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। কিন্তু কোহিনুর থিয়েটার কিছুদিন পরে ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় আর তাহা সম্ভবপর হয় নাই। "আনার কলি" মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছিল, কিন্তু আমার নিকট তাহার একখানিও মুদ্রিত গ্রন্থ নাই।

এইবার অন্য প্রসঙ্গ উঠিল। আমি বিল্বমঙ্গল ঠাকুরের কথা তুলিলাম। বলিলাম, "আমরা সম্প্রতি উহার অভিনয় করিয়া আসিয়াছি। ইহার সঙ্গীতগুলিও যেমন অতুলনীয়, তেমনি প্রত্যেকটি character একেবারে জীবন্ত।"

গিরিশবাবু হাসিয়া বলিলেন, "দেখ আমাকে অনেকে এসে একেবারে স্বর্গে তুলে দেন, এমন নাট্যকার নাই, এমন অভিনেতা নাই, কত কি কথা! কিন্তু আমি তাঁদের বলি—বাপু আমি মুক্ষু সুক্ষু মানুষ লেখাপড়ার ধার ধারিনে, তবে মানুষকে যেমন দেখে আসছি তেমনি তাদের এঁকে যাচ্ছি। আমার মনে হয় লোকে আমাকে গানের জন্য মনে রাখবে। হাঁ বলছিলে, "বিল্ব মঙ্গল" অভিনয় করেছ। বেশ কথা, বল দেখি বিল্বমঙ্গলের কোন Character-টা বিশেষ করে তোমার ভাল লাগে?"

আমি চুপ করিয়া রহিলাম। এতবড় একজন নাট্যকার ও অভিনেতার নিকট কোন কথা বলিতে সঙ্কোচ বোধ হইতেছিল। গিরিশবাবু তাহা বুঝিতে পারিয়াছিলেন, তাই বলিলেন, "তুমি নিঃসঙ্কোচে বল।"

আমি বলিলাম, "আপনার ভিক্ষুক চরিত্রটি আমার খুব ভাল লাগে। সে চোর, সে চুরি করিয়া কারাগারে গিয়াছে। পঁচিশ কোড়া খাইয়াছে। কাশীধামে জনৈক মোহন্তের চেলা হইয়া জলার মধ্যে সোনার বাট লুকাইয়া রাখিয়াছিল। তারপর একদিন কিনা সোনার বাট লইয়া অন্তর্দ্ধান করিল, তবু কি তার চরিত্রের পরিবর্ত্তন হইল, সে শান্তিপুর হইতে একটি সোনার বাটি চুরি করিয়া, জটা কাটিয়া ফেলিয়া ভিক্ষু সাজিয়া ভিক্ষা করিয়া খাওয়া পরার ব্যবস্থা করিয়াছে, তবু কিনা শেষটায় তার কৃষ্ণ দর্শন হইল, সে শুধু তার সরলতার জন্য ও ভক্তি বিশ্বাসের জন্য এবং পাপের প্রতি সহজাত ঘৃণার জন্য। গিরিশবাবু সন্তুষ্ট হইলেন মনে হইল এবং এইবার নিজে সাধক ও ভিক্ষুকের চরিত্রের বিশ্লেষণ করিয়া বুঝাইয়া দিলেন।

এমন সময়ে বিধুবাবু প্রশ্ন করিলেন, "আপনি আর কতদিন নাটক লিখবেন ও অভিনয় করবেন?"

গিরিশবাবু বলিলেন—"সে বলা বড় কঠিন। মনে হয় অনেক কিছু লিখবো কিন্তু অভিনয় আর ভাল লাগে না। দেহে যে শক্তি নেই, তবু কি আমায় লোকে রেহাই দিবে? আমি সব ঠাকুরের উপর ছেড়ে দিয়েছি। যেদিন ঠাকুর ছাড়াবেন, সেদিন ছাড়বো। আমি ত' নিমিত্ত ভাগী মাত্র।

এ সময় একটি যুবক আসিয়া গিরিশ বাবুকে প্রণাম করিলেন। গিরিশ বাবু বলিলেন, "কোথা থেকে আসা হয়েছে? কি নাম বাবা তোমার?"

যুবকটি নাম ও পরিচয় বলিলেন। সিমলায় বড় লাটের দপ্তরে কাজ করেন।

গিরিশ বাবু বিনীত ভাবে বলিলেন, "কি অন্যায় কাজ করেছ তুমি, বামুনের ছেলে হয়ে আমাকে কি না পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করলে!"

আমি যুবকটির নাম ভুলিয়া গিয়াছি। সম্ভবতঃ উপাধি ছিল মুখোপাধ্যায়। গিরিশ বাবু বলিলেন, "তোমার কি প্রয়োজন বল।"

যুবকটি বলিলেন, "আমি সিমলা পাহাড় হতে এসেছি। এবার আমরা সেখানে আপনার "প্রফুল্ল" নাটকের অভিনয় করবো। আমি যোগেশের ভূমিকা নিয়েছি। আপনি যদি একবার যোগেশের ভূমিকার Reading দিতেন, তবে আমার খুবই সুবিধে হ'ত!"

গিরিশ বাবু কহিলেন,—"দেখ বাবা, একটা কথা বলি, কিছু মনে করো না। তোমরা কি গিরিশ ঘোষকে অভিনয় করতে চাও, না যোগেশের অভিনয় করবে? যদি যোগেশের অভিনয় করতে চাও, তবে ঐ character-কে ভাল ভাবে study করে যেমন বুঝবে, তেমনি ভাবে অভিনয় কর, তা হলে যোগেশের ভূমিকার বিভিন্ন রূপ ফুটে উঠবে। নইলে আমি তোমাকে Reading দিব, তুমি তার হুবহু নকল করে বলবে, সে কি একটা ভেংচানো হবে না। সে যে গিরিশঘোষ হবে গো!—যোগেশ ত' হবে না। বিলাতের এক একজন অভিনেতা ভিন্ন ভিন্ন রূপে হ্যামলেট্, ম্যাকবেথ, কিং লিয়ার, সাইলক প্রভৃতির চরিত্র ফুটিয়ে তুলেছেন। তোমরা লেখাপড়া শিখেছ, বড় বড় নাট্যকারদের লেখা নাটক পড়েছ এবং অভিনয়ও হয়ত দেখেছ, তবে তোমাদের কেন যে নকল ক'রবার ইচ্ছা হয় তা ত' বুঝিনে। বিধাতা মানুষকে একই রকম করে ত' সৃষ্টি করেন নি। বিভিন্ন মানুষের কণ্ঠস্বর, হাত পা নাড়া, হাসি, কান্না সবই বিভিন্ন

রকমের হয়, কাজেই অভিনয় সম্পর্কেও এ আদর্শটা ভুললেও চলবে না। আচ্ছা, দাও দেখি বইটা। আমি তোমাকে দু’ একটা যায়গা পড়ে শোনাব, সবটা পারবে না, আমার সময় নেই।”

যুবক ‘প্রফুল্ল’ নাটকখানি গিরিশ বাবুর হাতে দিলে পর, যুবকের অনুরোধে তিনি জ্ঞানদার মৃত্যু দৃশ্যটি পড়িয়া শুনাইলেন। আস্তে আস্তে এমন ভাবে পড়িয়া গেলেন এবং ‘আমার সাজানো বাগান শুকিয়ে গেল’, কথাটি উচ্চারণ করিলেন যে, আজিও আমার কর্ণে তাহা ধ্বনিত হইতেছে। আমি রঙ্গমঞ্চে গিরিশ বাবুকে তাঁহার ‘প্রফুল্ল’ নাটকে স্বয়ং যোগেশের ভূমিকায় অভিনয় করিতে দেখিয়াছি, কিন্তু সে দিন তাঁহার বাড়ীতে তাঁহার কণ্ঠের সেই “আমার সাজানো বাগান শুকিয়ে গেল” যেমনটি শুনিয়াছিলাম, মনে হয় রঙ্গমঞ্চেও তেমনটি যেন শুনি নাই।’

যুবকটি প্রীত মনে গিরিশ বাবুকে নমস্কার করিয়া চলিয়া আসিলেন।

বিধুবাবু নীরবে সব শুনিতেছিলেন। আমি এইবার জিজ্ঞাসা করিলাম, “আপনার বাঙ্গালার ভবিষ্যৎ রঙ্গমঞ্চ সম্বন্ধে কিরূপ মনে হয়?”

তিনি আমাকে বলিলেন, “তুমি কি বলতে চাও? stage-এর improvement-এর দিক্ দিয়ে না Drama-র দিক্ দিয়ে, কোন্‌টা বলত?

আমি বলিলাম, “আপনারা যে ভাবে অভিনয় করে গেলেন, সেই অভিনয়ের দিক্ দিয়ে এবং Drama, এই উভয় দিক্ দিয়েই আমি বলিতেছি।

গিরিশ বাবু বলিলেন, “বলা বড় কঠিন। আমাদের দেশে প্রাচীন কালে যে সব নাট্যকারেরা জন্মেছিলেন, অভিনেতারা ছিলেন, তাঁদের খাওয়া পরার ভাবনা ছিল না। রাজারা নাট্যকারদিগকে উৎসাহ দিতেন, অভিনেতাদের ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা করতেন। যেমন ইউরোপে হয়। ইংল্যাণ্ডে রাজা রাণী রঙ্গমঞ্চের উৎসাহ দাতা। নিজেরা অভিনয় দেখতে আসেন, অভিনেতাকে ও অভিনেত্রীকে সম্মানিত করেন। আর আমাদের দেশে রাজা দূরে থাকুক, শিক্ষিত লোকেরাও অভিনেতাদের ঘৃণা করেন। বড় লোকেরা, মানে ধনীর বখাটে ছেলেরা, আসে অন্য ভাবে। কাজেই stage-এর উন্নতি বড় সম্ভব নয়। আমাদের যে ভাবে নাটক করতে হয়েছে, রঙ্গালয় তৈরী করতে হয়েছে যে কষ্ট, যে তাড়না ও লাঞ্ছনা আমরা সমাজের কাছে পেয়ে গেলুম, যদি ভবিষ্যতে কেউ এ সব ইতিহাস লেখে তবে তার কিছু কিছু জানতে পারবে। দেখ, আমরা সমাজে পতিত বলে গণ্য। আমি অনেক সময় ভাবি, তুমি বোস্ যে সভা সমিতিতে যাও, বক্তৃতা দেয়, তাকে কি চোখে ছেলেরা দেখে! ছেলেরা যদি জিজ্ঞাসা করে বসে মশাই, আপনি কি করেন? কি সে জবাব দিতে পারে? আমি ত দূরে সরেই আছি। Public-এর ব্যাপারে যেতে আমার মন সরে না। আমি আমার নিজের atmosphere-এর মধ্যে থাকতেই ভাল বাসি।

তারপর আমার কি মনে হয় জান? দিন দিন আমাদের উপর বড় বেশী রকমের western influence এসে পড়বে। তখন নাটক হবে না; হবে বিলেতি বিদেশী নাটক। চরিত্রগুলির নাম বাঙ্গলা হলেও হবে আসল বিলেতি। তারপর এই যে সিনেমেটোগ্রাফ, দেখছো তা যখন ছড়িয়ে পড়বে দেশের সর্ব্বত্র, তখন রঙ্গালয়ে অভিনয় দেখতে সারা রাত্রি জাগতে কে আসবে বল? ভবিষ্যতে বাঙ্গালার রঙ্গমঞ্চ বাঁচিয়ে তোলা হবে কঠিন। আমার ত’ এই মনে হয়।

গিরিশচন্দ্রের ভবিষ্যৎ বাণী যে আজ কতখানি সফল হইতে চলিয়াছে আজ তাহা আমরা কি উপলব্ধি করিতে পারিতেছি না?

আমরা যতক্ষণ আলাপ ও আলোচনা করিতেছিলাম, সেই সময় মধ্যে আরও অনেকে আসিয়াছিলেন। একজন ভদ্রলোক জিজ্ঞাসা করিলেন—“আপনার Mr. D. L. Roy-এর নাটক সম্বন্ধে কি মত?”

গিরিশবাবু খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া পরে বলিলেন, “দেখ বাপু, তোমার এ প্রশ্ন করাটা অন্যায় হয়েছে। তুমি যদি দ্বিজুবাবুকে গিয়ে পাল্টা প্রশ্ন কর, “ম’শাই, গিরিশবাবুর নাটক সম্বন্ধে আপনার কিরকম মনে হয়?” তিনিও যেমন কিছু বলবেন না, আমিও তেমনি কোন কথা সমালোচনার দিক্ দিয়ে বলবো না। তোমরা ত’ নিজেরাই দেখিতে পাচ্ছ, তিনি একজন powerful Dramatist। তিনি এক নূতন শক্তি এনে দিয়েছেন তাবার মধ্যে। তারপর দ্বিজেন্দ্রলাল এই স্বদেশীযুগে

বাঙালীর কাছে দেশপ্রেমের বন্যা প্রবাহিত করে দিয়েছেন। মরা দেশকে জাগিয়ে তোলা, সে বড় কঠিন কাজ। যে পারে সে মহাপুরুষ। দ্বিজেনবাবু অনেকদিন আমার এখানে এসেছিলেন, আমায় খুব ভক্তি শ্রদ্ধাও তিনি করেন। বয়সে বড় বলেও বটে, নাটক লিখে আর রঙ্গালয় এতদিন পরিচালনা করে আস্‌ছি বলেও বটে। এই যে তোমরা বর্ত্তমান যুগের লোক হয়ে আমাদের সমালোচনা কর, তা ঠিক্ হতে পারে না। ভবিষ্যতে কে বাঁচবো, কে মরবো তা ভবিষ্যতের লোকেরা বুঝতে পারবে। আমাকে তোমরা এরূপ প্রশ্ন না করিলেই ভাল হয়।"

ক্রমে বেলা বাড়িয়া গেল। গিরিশবাবু তাঁহার পাশে রক্ষিত ডাবরটি হইতে মাঝে মাঝে সাজানো পান মুখে তুলিয়া দিতেছিলেন। অবিনাশবাবুকে ডাকিয়া বলিলেন, "অবিনাশ, তুমি বাগচীকে বোধ হয় আগে আর দেখ নি?"

"আজ্ঞে না।"

"চিনে রাখ। বিধু আমাদের একজন পুরাণো Actor হে; ম্যাকবেথে একজন Witch সেজেছিল। গাইতে-বাজাতে পারে, আর অত্যন্ত obliging ছিল। এদের দু'জনকে একটু জল খাইয়ে দাও।"

বিধুবাবু মানা করিলেন, কিন্তু গিরিশবাবু শুনিয়া কহিলেন, "সে কি হয় বিধু মৌলী। তোর নামটা এমনি নূতন ধরণের যে আমার কখনও ভুল হয় নি। অনেক সময় তোর কথা ভাবি। অনেককাল পরে দেখা হলো।" বিধুবাবু বলিলেন, "আচ্ছা, একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, কিছু মনে করিবেন না কিন্তু।"

গিরিশবাবু হাসিয়া বলিলেন, "কি যে বলিস! বল না।"

আমাদের সাক্ষাতের অল্প কিছুদিন পূর্ব্বে সম্ভবতঃ ভাদ্রমাসে অর্দ্ধেন্দু শেখর মুস্তোফীর মৃত্যু হইয়াছিল। বিধুবাবু বলিলেন, "সাহেব ত চলে গেলেন। আপনার কি মৃত্যুকে ভয় হয় না?"

গিরিশবাবু গম্ভীর হইয়া বলিলেন, "ভয় ঠিক্ বলতে পারি না। জীবনে যেটা সবচেয়ে স্থির নিশ্চিত তাকে ভয় করলেই যে তার হাত থেকে রেহাই পাব তা ত' নয়। তবে কি জানিস্—এই শুধু ভাবি, বাবা, এমন দেশে যাব, যে দেশের পথ ঘাট জানা নেই, পরিচিতও কেউ নেই, কোন্ সে অন্ধকার রাজ্য তা ত' জানিনে! আর জানিস্ ত' ঈশ্বর নেহাৎ সুবোধ ছেলে করে আমাকে পৃথিবীতে পাঠান নেই, কি না কি করেছি জীবনে। তবে (হাত দু'খানি যোড় করিয়া মাথায় ঠেকাইয়া) ঠাকুরের কৃপা হলে হয় ত' হাসতে হাসতে মরতে পারব, নয় ত শেষকালে সব গুলিয়ে যাবে। ও বলা বড় কঠিনরে বাগচী। তুই কি ভাবিস?"

বিধুবাবু বলিলেন, "আমার কিন্তু মরতেই ইচ্ছে হয় না।"

গিরিশবাবু হাসিলেন।

আমরা জলযোগ করিয়া পরম হৃষ্ট মনে তাঁহাকে নমস্কার করিয়া চলিয়া আসিলাম। বিধুবাবুকে বলিলেন, "ধরণীবাবুকে আমার প্রণাম জানাস্। বড় অমায়িক ভদ্রলোক। যে ক'দিন কলকাতা থাকবি দেখা করতে ভুলবি নে।" আমাকে বলিলেন, "তুমিও এস। কোন সঙ্কোচ করো না।"

পথে আসিলে পর বিধুবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "গিরিশ বাবুকে কেমন লাগলো?" আমি বলিলাম, "বিরাট পুরুষ। যেমন দেখতে তেমনি আলাপে ও ব্যবহারে। আমাদের মত তরুণদের কথা যে তিনি এমনভাবে শুনিবেন তা' ভাবিতেও পারি নাই। আর আমার সব চেয়ে ভাল লাগিয়াছে তাঁর অপূর্ব্ব বিনয়পূর্ণ ব্যবহার। আমরা দুই একটি প্রবন্ধ, কবিতা বা বই লিখিয়াই গর্ব্ব বোধ করি, আর গিরিশবাবুর ন্যায় দেশ-প্রসিদ্ধ নাট্যকার নিজের মুখে বার বার বলিলেন—"আমার দু'চারটি গল্প হয় ত লোকে মনে করে রাখবে।"

প্রথম পরিচয়ের পর আমার গিরিশচন্দ্রের সহিত আরও কয়েকবার সাক্ষাৎ লাভের সৌভাগ্য হইয়াছিল। ইচ্ছা আছে বারান্তরে তাহা বলি। জানি না পাঠকদের তাহা ভাল লাগিবে কি না।

শেষ কথা

শ্রীসুধীরচন্দ্র ধর

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

একদল লোক আছেন যাঁরা মুখে প্রগতির নিন্দা করেন, ওদিকে মেয়েকে ভিতরে "চাপা প্রগতির" ছাঁচে গড়িয়া তোলেন। মুখে বলেন, 'মেয়েদের এমন স্বাধীন ভাবে মেলা মেশা করিতে দেওয়ায় দেশে 'করাপশন' বেড়ে চলেছে', ও দিকে মেলা মেশা করিতে দেখিলেও বাধা দেন না। হয় তো ভাবেন, মেয়ে-ছেলের ভাব হ'য়ে গেলে পণের কথাটা চাপা পড়ে যাবে। ভবেশবাবু এই প্রকৃতির লোক। আচমন করেন, তিলক কাটেন, আবার বাবুর্চ্চির হাতের খানাও খান। মেয়ে বাসন্তীকে স্কটিশ চার্চ্চ কলেজে ভর্ত্তি করিয়াছেন,—গিন্নির একান্ত অনুরোধে। মাহিনা দিয়া প্রফেসর রাখিবার ক্ষমতা তাঁর নাই। পুত্র সুবিমল সুট পরিয়া এম-এ ক্লাস করে, পিতা বাধা দেন না। অশোক খেয়ালী—অবসর সময়ে বাসন্তীর পড়াশুনা দেখিয়া দেয়। ভবেশবাবু ইংরাজী ভাষায় ধন্যবাদ দেন; মাঝে মাঝে নিমন্ত্রণ করিয়া লুচি মাংস খাওয়ান। দারোয়ানের কাছে প্রায় পাঁচশো টাকা ধার করিয়াছেন। আফিসের বড়বাবু। দারোয়ান আরও ধার দিতে কসুর করে না।

বন্ধুমহলে ছেলে ও মেয়ের মেধাশক্তি প্রচার করেন। মেয়ের বিয়ের কথা উঠিলে—পণপ্রথার নিন্দা করেন, ডাউরী সিষ্টেম উঠিয়া যাবার জন্য ভগবানের কাছে প্রার্থনা জানান। ছেলের বিয়ের কথা উঠিলে সুর বদলাইয়া দেন—

"আর তাই বলো না। মেয়েটাকে এত করে লেখাপড়া শেখালাম, গান বাজনা শেখালাম—তবু কেউ তিনটী হাজারের কমে কথা বলে না। আমার ছেলেই বা কি অপরাধ করেছে?—এম,এ-টা পাশ করুক, একবার 'ফরেন থেকে' ঘুরে এলেই দু'চার পয়সা আমিও চাইতে পারবো।"

ধীরেশবাবু মাথা নাড়াইয়া উত্তর দেন,—"তা'তো বটেই। তোমার বেয়ানও ঐ কথাই বলেন,—ততদিন ও বি, এ-টা পাশ করে নিক। আমারও ঐ একটা বই তো নয়। চোখ বুজলে সবই বাবাজীরই হবে। কে গো? বাসন্তী মা যে! এদিক এসো।"

বাসন্তী চা লইয়া আসে। মায়ের আদেশে চায়ের ভার অধিকাংশ স্থলেই চাকরের পরিবর্ত্তে মেয়ের ঘাড়েই পড়ে। চাকর বেচারী তবুও হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচে।

চার টাকার মাহিনায় উড়ে চাকর। দিনের মধ্যে ফর-মাসের তো আর অভাব নাই।—

"তা' ভবেশ, এখন আর চুপ করে বসে থাকা নয়। মায়ের আমার একটা সম্বন্ধাদি দেখো, আর ক'দিন-ই বা আছে, দেখতে দেখতে এই তো থার্ড ইয়ার হ'য়ে গেল।"

বাসন্তীর মুখ রাঙ্গা হ'য়ে ওঠে; একটা অজুহাত দিয়া যাই যাই করিয়াও একটু দাঁড়াইয়া যায়—"বাবা, তোমার চা'টা বোধ হয় ভাল হয় নি, কড়া ক'রে আর এক কাপ এনে দেবো?"

—"না মা আমার আর চাইনে। তোমার জ্যাঠা-ম'শাইকে বরং আর এক কাপ এনে দাও।"

ধীরেশ বাধা দেয়—

"না মা থাক, সকাল থেকে এই তিন কাপ হলো, আর চাই না। কি নেশাখোরই হয়েছি মা! পেটে কিছু থাকুক আর না থাকুক চা পেলে আর কথা নেই। এত নিত্য নূতন রোগসৃষ্টির চাও একটা কারণ।"

"তা জ্যাঠাম'শায়! আমরা বুঝি অনেক কিছু; কিন্তু সমস্তই আফিংখোরের বোঝার মত, ঐ বুঝিয়াই শেষ।"

পিতা সুর একটু গরম করিয়া বলিলেন—"তুমি বড় মুখ-পাতলা হয়েছ বাসন্তী। গুরুজনের সামনে কথা বলতেও শেখোনি।"

বাসন্তী একটু লজ্জিত হইল। ধীরেশ.বাবু বাধা দিলেন—"ভবেশ, যা সত্য.তা' বলতে কোনও অপরাধ নেই। আর মা আমার ব্যক্তিগত ভাবেও আমায় কিছু বলেনি। ঠিক বলেছ বাসন্তী, বৃদ্ধ বলিয়া চলিল—

"আমাদের আধুনিক সভ্যতার নিদর্শন আফিংখোরের

নিদর্শন ;—শুধু চা খাওয়ায় নয় মা, সর্ব্বত্রই—এ কথাটা আমিও অনেকদিন ভেবেছি, আবার একজনের মন রাখবার জন্ত যেন সব ভুলে গেছি। অপরকে তোষামোদ করা বরং ভাল। তাতে একটা দোষই হয়, কিন্তু নিজেকে তোষামোদ করায় দোষ বহু। আমরা শুধু আত্মবিস্মৃত হইনি, আত্মতোষামোদপ্রিয়ও হয়ে পড়েছি।"

অশোক এতক্ষণ কোন কথাই বলে নাই, চুপ করিয়া বসিয়া ছিল। এইবার বৃদ্ধের কথার উত্তর দিয়া বলিল, "ঠিক বলেছেন ; কিন্তু না করিয়াও উপায় নাই। সম্মান নিয়ে সমাজে বেঁচে থাকা দায়।"

বৃদ্ধ বাধা দিলেন,—"সম্মান বলছো কাকে—"False prestige.

"হোক False তবুও আধুনিক সমাজে যেন তার একটা দাম আছে ; কেননা, আধুনিক সমাজটাই যে একটা মিথ্যা ভিত্তির উপর গঠিত। বিদ্যাসাগরের বর্ণপরিচয়ে পঠিত 'সদা সত্য কথা বলিবে ; মানীর মান রক্ষা করিবে,' কথাগুলি অতি সত্য ; কিন্তু বাজারে চলন কোথায় ? আধুনিক সভ্যতা হইল, মানুষের দুর্ব্বল স্থানে ঘা দিয়া তাকে নির্ব্বাক করা। ইহাই কি মানীর মান রক্ষার নিয়ম ?"

"মান যে কখনও দুর্ব্বল নয়। সত্যিকারের সম্মান অটুট।"

"কিন্তু মানুষের দুর্ব্বলতা থাকবে একথা অস্বীকার করা চলে না। সমাজে বাস করিয়া সমাজের রীতিনীতিকে লঙ্ঘন করাও চলে না। ক্ষমতা না থাকলেও মেয়ের বিয়েতে পণ দিয়া সমাজের কাছে সম্মান বজায় রাখিতে হইবে।"

"সবই সত্য বাবা ! নিজের ওজন না বুঝিয়া চলাটা দুঃখের কারণ।"

"ওজন বুঝিয়া চলিলেও অনেক সময় নিরস্ত্র হইতে হয়।"

ভবেশ বাবু একমনে এদের তর্ক-বিতর্ক শুনিতেছিলেন, কিন্তু ভয় তাঁর, পাছে কেঁচো খুড়িতে সাপ বাহির হয়ে পড়ে। তাই কথাটাকে চাপা দেবার জন্ত বলিলেন—"বাসন্তী, তোমার পড়ার সময় হয়েছে, যাও অশোক ! চল দাদা আমরাও একটু বেরিয়ে পড়ি, লেকের ধার থেকে একটু ঘুরে আসি।"

"কিছু মনে করবেন না, তর্ক করলুম বলে।" অশোক হাসিমুখে বৃদ্ধের দিকে চাহিল।

"তর্ক জিনিসটাকে আমি চিরদিনই ভালবাসি বাবা। ওর মধ্যে শিক্ষার অনেক কিছু আছে। যাও মা, যাও ! প্রায় আটটা বাজে।"

অশোক ও বাসন্তী সিঁড়ি বাহিয়া উপরে উঠিতে লাগিল।

"ভবেশ, তোমার মেয়েটীতো বেশ যুক্তিপূর্ণ debate করতে শিখেছে, দেখছি।"

"ও অশোকের কাছেই শেখা। অশোক এম, এ-তে ফার্ষ্টক্লাস, সামনের বছরই বোধহয় এ্যাটর্নী হবে। ওর বাবাও এ্যাটর্নী ছিলেন কিনা।"

"তা বেশ বেশ, ছেলেটী দেখতে শুনতেও মন্দ নয়। বাপের পয়সা বোধ হয় বেশ কিছুই আছে। তা' আমার মায়ের সঙ্গে একবার চেষ্টা করে দেখলে পার।"

—"বাসন্তীর সঙ্গে ?" না দাদা, ও বড়গাছে দড়ি বাঁধবার মত পয়সা আমার নেই। 'মরে হাতী লাখ টাকা।' বড় জমীদারের ছেলে— নাই বলিতেও এখনও যা আছে—তা' ঢের।"

সে দিন এ বিষয়ে আর কোন কথাবার্ত্তাই হলো না।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

"অশোক বাবু, আজ আমরা কোথায় দাঁড়াই ?"

"অস্থির হচ্ছ কেন নীলু, বিপদে ধৈর্য্য ধ'রতেই হইবে।" অশোক অগ্রসর হইয়া নীলিমার হাত ধরিল। নীলিমা অশোকের কোলে মাথা রাখিয়া ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিল।

একটা সমাজ—তার নাম দরিদ্র সমাজ। গণনায় এরাই বেশী, দুঃখ এদের বেশী। দুঃখ পোষ মানিয়া যায় বলিয়া সুখও এদের বেশী। সমাজ এদের জন্ত ; আইন-কানুন এদের জন্ত। দারিদ্র্যকে লুকাইবার প্রবৃত্তিও এদের প্রবল— এই প্রাবল্যই এদের দারিদ্র্যকে সমাজের কাছে আরও প্রকটিত করিয়া তোলে। হাসিবার সময় প্রাণ খুলিয়া হাসে, আবার দুঃখের দিনেও কাঙাল ঠাকুরকে প্রাণ ভরিয়া ডাকে।

কাঙাল ঠাকুর সাড়া দেয় না। তার জন্ম দুঃখ ও বিরক্তি এদের নাই। কর্ম্মফলের দোহাই দিয়া মনকে প্রবোধ দেয়। মৃত্যুর সঙ্গে সংগ্রাম এদের জন্মলাভের পরদিন হইতেই; তাই বাঁচিয়া থাকিবার ইচ্ছাও এদের বেশী। রোগ এদের ঘরোয়া ব্যাপার। মা শীতলা, মা কালী, পীরের দরগা, বটতলার চণ্ডীঠাকুর, সবাই এদের হাত ধরা। মানত করে—পাঁঠা, খাসী, কিম্বা সিন্নি ঘুষ দেয়। অসুখ ভাল হয়—ঘুষখোর এই দেব-দেবী ক'টীর প্রশংসায় এরা পঞ্চমুখ হয়ে ওঠে।

ধনীর শোষণ নীতি এরা বোঝে। সহজে বিদ্রোহ এরা করে না। শান্তি এদের নাই, অথচ শান্তি-ভঙ্গ করিতে ভয় পায় এরাই বেশী।

বিভূতি সেন এই সমাজের একজন। জন্মলাভের পর হইতে সুখের স্মৃতি তার জীবনে নাকি একদিনেরও নেই, একথা পাড়ার সবাই বলে। পেপার মিল্‌সের চাকুরী—সামান্য মাহিনা। অথচ বিবাহ এদের করা চাই—নইলে বংশরক্ষা এদের হয় না। বংশ রক্ষা করিতে এ সমাজ দিন দিন ধ্বংসের দিকে ছুটিয়া চলিয়াছে। প্রেম ভালবাসা এদের আছে কাহারও চেয়ে কম নয়, তবে অভিনয় এরা করতে জানে না। পঁচিশ টাকার চাকুরে বিভূতি যখন বিয়ে করে, সংসার তখন খুব বড় না হলেও ছোট্ট নয়—বিধবা বোন, বুড়ো বাপ, মা, ছোট ভাই।

সুখ-দুঃখ হাসি-কান্নার মধ্য দিয়া বিশ বছর কাটিল। একমাত্র মেয়ে নীলিমা—বয়স আঠার। এই বিশ বছরের ইতিহাসে সাধারণ দরিদ্র সংসার থেকে নূতনত্ব কিছুই নাই। শুধু নূতনত্ব এইটুকু যে অনাগত অতিথিরা আসিয়া সংসারের ভার বাড়াইয়া দেয় নাই। নীলিমার বরাত ভাল—লোকে অন্ততঃ তাই বলে। কারণ—বাপের একমাত্র মেয়ে,—আদুরে। কথাটা নেহাৎ মিথ্যা নয়, রূপ যা' আছে তা' দেখবার মত। বাপ ছেলে না থাকায় মেয়েকেই লেখা পড়া শিখাইয়াছে—ম্যাট্রিকটা দিতে আর মাত্র কয়েকটা মাস বাকী। কিন্তু বিভূতির সেদিন সন্ধ্যাবেলা মিল থেকে ফিরিয়াই একটু জ্বর হইল। তার পর একটু রাত্রের দিকে বমির ভাব হইয়া বেশ খানিকটা রক্ত বমি হইল।

মাণিকতলা 'ন্যাশনাল ইন্‌ফার্মারী'—টি, বি, ডিপার্টমেণ্ট। খক্‌, খক্‌, খুক্‌, খুক্‌ কাশি। খান ১৮।২০ বেড্ডিং। বিভূতি অনেক কষ্টে আশ্রয় পাইল এই হাসপাতালে—বাঁচিতে নয় মরিতে।

অশোকের বাবা মাণিকতলায় একটা বাড়ী কিনেছিলেন গ্লাস-ফ্যাক্টরী খুলিতে। সে আজ দশ বছর আগের কথা—সে গ্লাস-ফ্যাক্টরী এখন আর নাই। এখন সেটা ভাড়াটে বাড়ী। সেই বাড়ীর ভাড়াটে বিভূতি সেন। দুঃখের দিনে খেয়ালী অশোক প্রাণ ঢালিয়া এদের সাহায্য করে।

"শোকে অভিভূত হ'লে চল্‌বে না নীলু। বাপ মা চিরদিন কারই বা বেঁচে থাকেন?"

"অশোক বাবু, আমরা এখন কোথায় যাবো; আমাদের কে দেখবে?"

"—কেন নীলু, সংসারে কি তোমাদের দেখবার মত কেউ নেই?"

"কে আছে?"

"ভগবানকে আর বিশ্বাস কর না বুঝি?"

"হাঁ করি।—কিন্তু ধৈর্য্য কোথায়?"

—"ভগবান্ নিজে কিছুই করেন না। মানুষকে দিয়েই তিনি তাঁর কাজ করিয়ে নেন। তাঁ'কে বিশ্বাস ক'রে আমার উপর নির্ভর করতে পার না?"

—"হাঁ পারি। তবে আপনি ধনী, খেয়ালী।"

নীলিমা মুখ তুলিয়া অশোকের মুখের দিকে তাকাইল। চোখ দিয়া তখনও অশ্রুর প্লাবন ছুটিয়াছিল। অশোক পকেট হইতে রুমাল বাহির করিয়া নীলিমার চোখ পুঁছিয়া দিল।—

"হ'তে পারি খেয়ালী, কিন্তু প্রাণ নাই—তা'র কোনও পরিচয় কি পেয়েছ?"

"না। বরং প্রাণের পরিচয়ই যথেষ্ট পেয়েছি। কিন্তু দুরাশা করা দরিদ্রের পক্ষে......"

নীলিমা আর কিছুই বলিতে পারিল না, কোথায় যেন বাধিয়া গেল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

পাঠক-পাঠিকা আমাকে নিয়ে এখন বড় চিন্তায় পড়েছেন। —না ? কা'কে আমি ভালবাসি ?—কেহ কেহ হয় তো মনে করছেন—নীলিমা যখন আমার কোলে মাথা রাখিয়াছে, তা'র চোখের জলে যখন আমার রুমালটাও ভিজিয়াছে, তখন আমার মনের রাণীও সেই হইয়া বসিয়াছে। মনে করেছিলাম সত্য কথাটা এখনই বলে দেবো, কিন্তু "এই যা, পিসিমা, তুমি আবার কি খবর নিয়ে ঘরে ঢুকলে ?"

পিসিমা মুখে রাগের ভান করিয়া উত্তর দিলেন, "যা'হউক বাপু, ছেলে হয়েছ তুমি, সারাটা দিনে একটিবারও তোমার টীকি দেখবার জো নেই।"

"রাগ করো কেন ? এখন তো আর ঘরছাড়া নই, যা বলবার আছে বলেই ফেল। এই যে বসছি।"

অশোক সামনের চেয়ারে বসিয়া পড়িয়াই টেলিফোনের হোল্ডার হাতে লইল—

"হ্যালো ! হ্যালো ! বড়বাজার ওয়ান নাইন জিরো টু—

"টেলিফোন করছিস, আবার কোথায় বেরুবি বুঝি ?"

পিসিমা অসহিষ্ণু হইয়া উঠিল। অশোক পিসিমার দিকে চাহিয়া একবার হাসিল, "কর্ কর্ কর্—টেলিফোনে কনেক্‌শন দেওয়া হইয়াছে।"

"হাঁ, আমি অশোক। নমস্কার, বীরেন বাবু, আপনাকে আজ টাকা দেবার কথা ছিল, কিন্তু ব্যাঙ্কের উপর নোটীশ জারী হয়েছে পেমেন্ট ষ্টপ করবার জন্য, কাজেই এখন আমাকে ক্ষমা করতে হবে ; নগদ দু' হাজার টাকাও ঘরে নাই, to speak you the truth"—

"হাঁ—হাঁ……তা' আমি জানি, মিষ্টার রায় নালিশ করেছেন টাকার জন্য, ওজুহাত দেখিয়েছে রেবার বে' ; তা' বেশ…তাকে জানিয়ে দেবেন যেভাবেই হোক্ তার টাকা শোধ ক'রে দেবো।

"হাঁ, আপনার সঙ্গে পরামর্শ করবো বই কি। প্রাণতোষ বাবুও তাই বলেছেন ; কেস্‌টা মিথ্যা সাজাতে চান ?"

"আমার কিন্তু তা' মত নয়, ডকুমেন্ট কিছু নেই, ফাঁকী দিলেও দেওয়া যেতে পারে,—তবে তা' আমি করতে চাইনে —নমস্কার।"

অশোক টেলিফোন রাখিতেই পিসিমা প্রশ্ন করিলেন—"রেবার বাবা বুঝি সেই টাকাটার জন্ম নালিশ করেছে ?"

"হাঁ—"

"নালিশ করলে কেন ?"

"তা' জানি না। তবে মনে হয় দিগম্বর বাবুদের সঙ্গে তোমাদের এই যে কথাবার্ত্তাটা চলেছে, এই বোধ হয় একটা কারণ।"

পিসিমা দিগম্বর বাবুর কথাটা উঠাইবার জন্যই আসিয়াছেন। কিন্তু কি করিয়া কথাটা তুলিবেন ওজুহাত খুঁজিতেছিলেন—

"তা' বেশ তুমি হাসিরাশিকে বে'কর, মেয়ে তো নেহাৎ মন্দ নয় ; আর দেনাপাওনাও খুব ভাল করবে। আর মহলানবিশ মশা'য়ের মত লোককে backing পেলে দেনা-পাওনা মিটতেও বেশী সময় লাগবে না। কি বল, তা' হ'লে আমি একটা কথা দি ; মহলানবিশ-গিন্নি কালও একবার এসেছিলেন ; ওরা তো করবার জন্ম পাগল।"

"পিসিমা, তুমিও কি শেষকালে ক্ষেপে উঠলে না কি ? এখন ওসব ছাড়—একটা পরামর্শ করা যাক্, কি ক'রে রায় মশা'য়ের টাকাটা অন্ততঃ এক সপ্তাহের মধ্যেই শোধ দেওয়া যায়।"

"আমার পরামর্শ তো তোমার মনে ধরবে না। তা' আমি জানি, তবুও শেষ পর্য্যন্ত আমি বলতে পারি, আমার হাজার পাঁচেক টাকার গয়না আছে। বাড়ী মর্টগেজ থেকে খালাস করতে টাকা ধার ক'রে আমার গয়না বাঁচিয়ে ছিলে,—এখন সম্মান বাঁচাবার জন্ম গয়না বিক্রী করো। তোমার প্র্যাক্‌টিস্ জমে উঠলে আবার সব হ'য়ে যাবে।"

অশোক তন্ময় হইয়া ভাবিতেছিল—

"ভাবনা ক'রে মন খারাপ করো না, অশোক। শরীর বড়—না টাকা বড় ? এমনি ক'রে দিনরাত ভেবে ভেবে শরীর নষ্ট করলে আর শরীর পাবে না। গয়না গেলে গয়না হবে।"

অশোক পিসিমার প্রাণে কখনই কষ্ট দিতে চায় না—"আমায় আবার ভাবতে কখন দেখলে ? দিনরাত হৈ হৈ ক'রেই তো বেড়াই।"

"ওরে পাগল, হৈ হৈ ক'রে বেড়ালেই কি মনের ভাবনা দূর হয় ? তোমার বাবারও ছিল ঐ প্রকৃতি। বড় চাপা—কাউকেও কিছু জানতে দিত না।"

"আচ্ছা পিসিমা, মাণিকতলার বাড়ীখানা বিক্রী ক'রে দিলে হয় না ?"

"না বাবা, তোমার বাবার বড় সাধ ছিল ঐ বাড়ীখানায়,—মাঝে মাঝেই বলতেন, 'দেখ শুধি, আমি ঐ বাড়ী থেকেই সোনা ফলাবো, বড় পয়মন্ত বাড়ী।' কথাটাও নেহাৎ মিথ্যা নয়, ঐ বাড়ী কেনার সঙ্গে সঙ্গে দাদার পশার বেড়ে উঠলো, বিপদের বন্ধু ঐ বাড়ীখানা, বিক্রী ক'রে কাজ নেই।"

অশোক পিসিমার কথায় প্রতিবাদ করিতে পারে না।

"আচ্ছা পিসিমা, বাবার দেশের সম্পত্তি কি এখন আর কিছুই নেই ?"

"আছে বাবা ! কিন্তু এখন আর তাতে হাত দেবার জো নেই,—এখন সবই বার ভূতের সম্পত্তি, ওর দখল নিতে গিয়ে তোমার পিসেম'শায় একবার জখম হ'য়ে প্রাণ নিয়ে ফিরে আসেন। কাজ নেই ওসব ভাবনায়।"

দীর্ঘকাল সহরে বাসের পর পল্লী সম্বন্ধে ধারণাটা খানিকটা এইরূপই হ'য়ে দাঁড়ায়।

অশোক বিপদে পড়িল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

অশোক সে দিন রেবার দাদার দেওয়া চিঠিখানা পড়েছিল, কিন্তু উত্তর দেবার প্রয়োজন বোধ করেনি। তাই আজ আবার ড্রয়ার হ'তে চিঠিখানি বাহির করিয়া পড়িতে লাগিল।

"প্রিয় অশোক !

আমি আজ সাতদিন বোম্বেতে এসেছি। আসবার সময় দেখা করে আসতে পারি নাই বলে বড়ই দুঃখিত। একখানা নূতন বইয়ের সুটিং চলেছে ? শেষ হলেই ফিরে আসবো। তোমার সম্বন্ধে একটা অপ্রত্যাশিত কথা শুনে বড়ই দুঃখিত হ'লাম। কথাটা কতদূর সত্য জানি না, কিন্তু মিথ্যা বলিয়া বিশ্বাস করতে পারছি না।

তোমার এতদূর অধঃপতন হবে এটা আমি কোন দিনই আশা করি নাই। সুলতা বীরেনবাবুর রক্ষিতার মেয়ে, ভদ্রভাবে ভদ্রসমাজে মিশিয়া বেড়ায়। একথা জানা সত্ত্বেও তুমি সুলতার উপর আকৃষ্ট—ইহা যেমন একদিকে অবিশ্বাস্য, আর একদিকে তেমনি বিশ্বাস না করিয়াও উপায় নাই। বয়স এবং সুলতার রূপের দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই আমাকে একথাই বলিতে হইতেছে।

তোমাকে একথা হয় তো এত দৃঢ়ভাবে কখনই বলিতাম না। কিন্তু রেবা তোমার সহিত যথেষ্ট মেলামেশা করে ও তোমাকে সম্মান করে। তাই পূর্ব্বেই বাধা দিতে বাধ্য হইতেছি।

আশা করি সন্তোষজনক উত্তর দিবে।—

ইতি—
অনাদি"

অশোক উত্তর লিখিল

প্রিয় অনাদি !

সত্য মিথ্যা প্রমাণ করিবার প্রয়োজন আমার কোন দিনই ছিল না, আজও নাই। আশা করি ভাল আছ। ভাল আছি। ইতি—

অশোক

হঠাৎ আবার সুলতা মেয়েটির আবির্ভাবে পাঠক-পাঠিকা বড়ই বিরক্ত হইয়াছেন। কিন্তু কি করিব, সত্য কথা না বলিয়াও উপায় নাই। আধুনিক সমাজে 'বেচিলারের' সংখ্যা বড়ই বাড়িয়া চলিয়াছে। কাজেই অবিবাহিতার সংখ্যা বৃদ্ধিতেও ভয় পাইবার কিছু নাই। অল্প আয়ের অজুহাতে বীরেনবাবু যদি এককালে বিয়ে না করেই থাকেন, তার জন্য মেয়ের বাবা হ'বার অধিকার তাঁর নাই একথা বলিলে বেচারীর উপর অত্যাচার করা হ'বে। যা'হউক যে একদিন 'ব্রিফলেশ ব্যারিষ্টার' ছিল কিন্তু আজ বড়বাজার অঞ্চলে তা'কে কে না চেনে ?—Contractor-B. Ghose. মাসে দু'হাজার টাকার উপর আয়। মোটর, ফোন, রেডিও, কত কিছুর মালিক। লোকে দুঃখ ক'রে বলে, "মিষ্টার ঘোষ ! দুঃখ র'য়ে গেল, কারও মনের মালিক তুমি আজও হ'তে পারলে না।"

বীরেনবাবু একটু হাসেন। সে হাসিতে দুঃখও নাই, সুখও নাই—ব্যবসাদারী হাসি। কিন্তু হয়তো সে হাসির অর্থ এও হতে পারে—"তোমরা জান না। বিয়ে না করলেই মনের মানুষ থাকবে না, এ তোমাদের ভুল ধারণা।"

কার হাসির কি অর্থ তাহা মনে মনে ভাবিতে অপরাধ নাই, রবীন্দ্রনাথ গেয়েছেন, "মনের মানা নাইরে নাই।"—

যাক্ কথার হেঁয়ালী রচনায় কাজের কথা চাপা পড়িয়া যায়। সুলতার মায়ের ইতিহাস যা-ই হো'ক, সুলতা রূপে লক্ষ্মী, গুণে সরস্বতী—শুধু উপন্যাসের কথা নয়, সত্য কথা।

অশোক তা'কে ভালবাসে কি না এটা জানার জন্য সবাই ব্যস্ত। কথাটা কে রটাইল জানা নাই—কিন্তু রটিয়াছে। নিত্যই আরম্ভ নিত্যই সমাপ্তি। একের আরম্ভ অন্যের সমাপ্তি। তাই শ্মশানের আগুনও নেভে না, 'প্রসূতি-আগার'ও বন্ধ থাকে না। অশোক তাই বসিয়া বসিয়া কেবলই ভাবে, আবার কখনও কখনও গুন গুন করিয়া গায়—

এলো গেলো কতজনা আমার আঙিনায়,
তা'দের সুখ দুঃখ লেখা,
স্মৃতির পটে রয়েছে আঁকা,
[আমি] ভুলেছি যা'রে
সবাই তারে
আজও আজও তারে যায় নি ভুলি হায়॥

ভুলের মালা গাঁথি
কূলের বনে বসি
মিছে তোদের কান্না হাসি
মিছে যে ভালোবাসাবাসি
আজও শেষ কথা মোর হয়নি বলা হায়।
জানবো ওগো তোমায় আমায় কবিতায়॥

গান শেষ করিয়া তন্ময় হইয়া ভাবিতে থাকে, সুলতা তো তাহাকে ভালবাসে না, সুলতাকে সেও ভালবাসে না। তবুও সমাজ কেন তাহাদের ঘাড়ে এমন অপমানের বোঝা চাপাইয়া দিল? আর সত্যই তো যদি সে সুলতাকে ভালোই বাসে, তা'কে বিবাহই করে, সমাজ তাহাতে বাধা দিবে কেন? সুলতার অপরাধ কোথায়? বরং সে সভ্যতাভিমানী 'সোসাইটি' গার্লদের চেয়ে শতগুণে সভ্য। সে ভীরু, সে লাজুক। প্রগতিকে সে ঘৃণা করে না, আবার সম্মানের চোখেও দেখে না। সে নিজের মধ্যে নিজেই সঙ্কুচিত হইয়া থাকে। সে স্পষ্টবাদিনী, মিথ্যা সে বলে না, ভড়ং সে করে না—তবুও জন্মলাভের অপরাধে সেই দোষী। সুলতার এ ব্যথা অশোক কিছুতেই সহিতে পারে না। মিথ্যা সভ্যতার মুখোস পরিয়া যে সব মেয়েরা পুঁথির বড় বড় কথা আওড়ায় তাহাদের মুখে সুলতার নিন্দা অশোক শুনিতে চাহে না।

অনুকম্পা হইতে অনেক ক্ষেত্রে প্রেমের সৃষ্টি হয়। অশোকেরও কি তাহাই হইল?

অষ্টম পরিচ্ছেদ

পয়সা না থাকিলে মেয়ের বিয়ে দেওয়া কষ্ট—কথাটা কম ভাবনার কথাও নয়। পর পর দু'টোর বেশী মেয়ে হইলেই নাম রাখা হয় "আন্না", 'ঘেন্না' আরও কত কি? যাক্ সে কথা—যাহাদের পয়সা আছে তাহাদেরও মুস্কিল কম নয়? মনের মানুষ মিলিল না বলিয়া যেবা বিয়ে ক'রতে রাজি নয়, অণিমা স্কুল-মাষ্টারী লইল, হাসিরাশি কতদিন চোখের জলে বালিশ ভিজাইয়াছে। আরও কত মেয়ে—নাম সবার জানা নাই, স্কুল ছাড়িয়া কলেজ, কলেজ ছাড়িয়া ইউনিভার্সিটিতে ঢুকিয়াছে। বাবা বলেন, "মেয়ের আমার লেখা-পড়ার উপর আগ্রহ প্রবল।" কিন্তু মেয়েব মনের খোঁজ রাখিয়াছেন কি?

অণিমা রংপুর আসিয়া স্কুল-মাষ্টারী লইয়াছে। মনে ভেবেছিল রংপুর আসিয়া অশোককে খুবই শাস্তি দেওয়া হ'বে। কিন্তু প্রায় দুইমাস হইতে চলিল অশোক একখানা চিঠি লিখিয়াও খোঁজ লয় নাই। অপরিচিত দেশে আত্মীয়বিহীন একাকী বাস করা যেন অণিমার কাছে অনেকটা নির্ব্বাসনদণ্ডের মতই মনে হয়। কিন্তু উপায় যেখানে নাই কান্নাকাটি সেখানে বৃথা। একদিন যে অশোকের একটু সান্নিধ্যলাভের জন্য কাঙ্গাল হইয়া বেড়াইত, আজ সে অশোককে দেখিতে হইবে এই ভাবনায়ও যেন শিহরিয়া ওঠে। বাবা লিখেছেন—

"অণু, মা আমার, সামনের ছুটিতে একবার আসা চাই। তোমার মা তোমার জন্য একরূপ সব সময় আনমনা থাকে।"

সত্যই মা'কে দেখার জন্য অণিমার প্রাণ কাঁদিয়া থাকে। জীবনে একটি দিনও যে মায়ের কাছছাড়া হয় নাই, সেই মাকে দেখবার আকাঙ্ক্ষা যে কত বড় তা ধারণারও অতীত। কিন্তু ফিরিয়া যাইয়া আবার অশোকের সহিত দেখা করিতে হইবে! তার অভিমানী চিত্তে কি একটু অব্যক্ত বেদনা বাজিতে থাকে। কিন্তু এই বয়স, এই দূরদেশে একা থাকিতেও যেন

তার কেমন বাধো বাধো লাগে। রূপের খ্যাতি অণিমার আছে। কয়দিন কেবলই মনে হইতেছে যেন তাহার উপর লোলুপ দৃষ্টি পড়িয়াছে। যতদূর সম্ভব সংযত হইয়া অণিমা চলে, কিন্তু তাতেও যেন নিস্তার নেই। কয়দিন ধরিয়া বৃষ্টি হইতেছে। একবারও থামে নাই। তখন প্রায় সন্ধ্যা। অণিমা বারান্দায় একখানা চেয়ার পাতিয়া বৃষ্টির লীলাময় ছন্দ শুনিতেছিল। পল্লীও নয় আবার সহরও নয়, এমন স্থানের বৃষ্টির মধ্যে একটা সৌন্দর্য্য আছে। শুধু কবির চোখে নয়, সাধারণের চোখেও তাহা ধরা পড়ে। গরমের ছুটী হইতে আর দু'দিন বাকী। অণিমা বসিয়া বসিয়া ভাবিতেছে ছুটিতে সে কি করিবে।

সহসা বৃষ্টির মধ্যে সেক্রেটারীর অপ্রত্যাশিত আবির্ভাবে অণিমা একটু শঙ্কিত হইয়া পড়িল। স্কুলে এ কয়েক মাসের মধ্যেই অণিমার যে বিশেষ সম্মান, তা' শুধু তার বিদ্যার জন্য নয়, রূপের জন্যও বটে। সেক্রেটারী তাহাকে একটু স্নেহের চোখেই দেখেন—কিন্তু অণিমা সে দৃষ্টি সহ্য করিতে পারে না। সেক্রেটারী কাছে আসিতেই নমস্কার করিয়া অণিমা চেয়ার ছাড়িয়া দিল। সেক্রেটারী একটু হাসিয়া চেয়ার গ্রহণ করিলেন, পাশে আর একখানা চেয়ার দেখাইয়া অণিমাকে বসিতে বলিলেন।

"মিসেস রয়, একটা বিশেষ প্রয়োজনে আপনার কাছে আসতে হ'লো; কিছু মনে করবেন না।"

"মনে ক'রবার কিছুই নাই। বলুন কি প্রয়োজন?"

সেক্রেটারী কথাটা বলিতে একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিয়া ফেলিলেন, "প্রয়োজনটা ঠিক আমার নয়—আমার বোনের। তার ইচ্ছা যে, এই গরমের ছুটীতে আমাদের সঙ্গে আপনিও দেওঘর যান। আমার বোন আপনার কথা প্রায়ই বলেন। আর এ অবস্থায় আপনি এখানে একা থাকেন সেটাও বোধ হয়, ওর ইচ্ছা নয়। তাই আমাকে [illegible]র মধ্যেই ছুটে আসতে হলো।"

অণিমা নতমুখে সমস্ত কথাই শুনিল। ইচ্ছা হইল একবার বলে, "তা আপনার বোনও তো সে প্রয়োজনটা জানাতে আসতে পারতেন আপনি এলেন কেন! কিন্তু জমিদারের একমাত্র মেয়ে সাধারণ একটা স্কুল শিক্ষকের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিবে, একথাটা বলিতে তাহার কোথায় যেন বাধিল। কাজেই কথাটা ঘুরাইয়া উত্তর দিল, "আমি বোধ হয় ছুটীতে ক'লকাতায় বাবার কাছেই যাবো। কাজেই এ বিষয় আমায় হয়তো ক্ষমা করতে হ'বে।"

সেক্রেটারী একটু দমিয়া গেলেন।

"তা' কয়েক দিন দেওঘর থেকে, তারপর না হয় চলে আসবেন; আমার বোনের মনও রাখা হ'বে কোলকাতায় বাবার সঙ্গেও দেখা করা হ'বে। জানেন তো স্কুলের সর্ব্বময়ী কর্ত্রীই তিনি; তাঁরই স্বামীর টাকাতে এই স্কুলটী প্রতিষ্ঠিত। আপনি তাঁর স্নেহ পেয়েছেন এ কম কথা নয়।"

অণিমা বিপদে পড়িল। এরপর আর কি উত্তর দেওয়া চলে। অণিমা অগত্যা কথার বাঁক ঘুরাইয়া দিতে চেষ্টা করিল—

"আপনার বোন কতদিন বিধবা হয়েছেন?"

"এই যতদিন আমাদের এই স্কুল প্রতিষ্ঠিত। ওর স্বামী ডেপুটী-ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন, টাকা পয়সা যথেষ্ট আছে। তাই মৃত্যুকালে ব্যাঙ্কে ৮০ হাজার টাকা দিয়া যান এই স্কুলটীর জন্য।"

"আপনার দিদিকে আমার একবার দেখতে বড়ই ইচ্ছা হয়।"

"বেশ, কালই দেখা করবেন; আর আজই যদি যেতে চান তাতে আরও খুসী হবো। সবই এখানে থাক, চাকর আসিয়া আপনার জিনিষপত্র লইয়া যাইবে। মিস্ সেন ও মিস গুপ্তা তা'দের দেশের বাড়ীতে যাবেন, কাজেই আপনার জিনিষপত্রও এখানে রাখা সঙ্গত হবে না।"

"তা' ওরা তো আর কালই যাচ্ছেন না। আমি হয় ত' ওদের দু'একদিন আগেই চলে যাবো। [illegible] বার বার করে লিখেছেন।"

সেক্রেটারীর মুখে একরাশ মেঘ আসিয়া জমা হইল। কিন্তু দুষ্ট শনি মানুষের ঘাড়ে যখন চাপিয়া বসে তখন দুর্ব্বুদ্ধিরও অভাব হয় না।

"আপনাকে একটা কথা বলি বলি করেও বলতে পাচ্ছি না।" সেক্রেটারীর মুখে বক্রহাসি—অণিমা বিপদে পড়িল। সেক্রেটারীর কথার গতি যে কোন দিকে ফিরিতেছে মনে মনে সে কথা ভাবিয়াও অণিমা শিহরিয়া উঠিল। সে কণ্ঠস্বরের যতদূর সম্ভব কোমলতা বর্জ্জন করিয়া উত্তর দিল—

"এমন কি কথা আমার সঙ্গে থাকিতে পারে, আমি মোটেই বুঝছি না। বলুন শুনি।"

সেক্রেটারী এবার সত্যই যেন একেবারে দমিয়া গেল, মনের ভাব গোপন করিল।

"দেখুন, ছুটীর পরই আপনাদের একটা increament দেওয়া হবে ! আমার ইচ্ছা আপনি ছুটীর আগেই Assistant Head Mistress হবার জন্ম একটা দরখাস্ত দেন।"

"কেন সরলাদেবী কি আর চাকুরী করবেন না ?"

"না, আমাদের স্কুলে তাঁ'কে আর রাখা হবে না, একথা তাকে একরূপ বলে দেওয়াই হয়েছে।"

"কেন, তার অপরাধ ?"

"অপরাধ বিশেষ কিছু না। তবে কমও নয়। উনি একজন নেটিভ খৃষ্টানের লাভে পড়েছেন, তাকেই নাকি বিয়েও করবেন। কাজেই দিদির ইচ্ছা নয়, ওকে আর এ স্কুলে রাখা হয়।"

"তা'বেশ, মিস্ গুপ্তারই ঐ পদ পাওয়া উচিত।" Assistant Head Mistress-এর সহিত অনেক সময়ই Secretary কে একযোগে কার্য্য করিতে হয়। কাজেই সরলাদেবীকে অপসারিত করিবার উদ্দেশ্য বুঝিতে আর কিছু বাকী রহিল না।

এদিকে বৃষ্টি থামিয়া গিয়াছে, ঝি আসিয়া অণিমার হাতে একখানা চিঠি দিয়া বলিল, "আজ সকালে যখন আপনি স্কুলে ছিলেন তখন এসেছে, দিতে ভুল হয়েছিল, মাপ করবেন।"

অণিমা সেক্রেটারীর দিকে চাহিয়া বলিল, "আচ্ছা, কাল আপনার দিদির সহিত দেখা করব, তেবে মতামত তাঁর কাছেই বলব।"

সেক্রেটারী একটু স্মিত হাসিয়া বিদায় লইলেন। চিঠি লিখিয়াছে অশোক। শিরোনামা দেখিয়াই অণিমা তাহা বুঝিতে পারিল। তাহার বুকের ভিতর যে বেগ বহিতেছিল, তা সুখ কি দুঃখজনিত, বোঝা কষ্ট। যুগপৎ সুখ দুঃখে মানুষের যে অবস্থা হয় অণিমার সেই অবস্থা। এতদিন পর চিঠি ? ভয় ও বিস্ময়ে অণিমা চিঠি খুলিয়া পড়িতে লাগিল—

অণিমা !"

তোমার মার অসুখ একটু বেশী। তাড়াতাড়ি চলিয়া আসিবে। অশোক

অণিমা মায়ের অসুখে যতটা না ভীত হইল, তার চেয়েও অধিক বিস্মিত হইল চিঠিটার ধরণ দেখিয়া, এমন কি শুভা-শুভের একটা কথাও পর্য্যন্ত নাই।

নবম পরিচ্ছেদ

কারও মনে চিরকাল বেঁচে থাকার প্রচেষ্টার মধ্যে আছে দুঃখ। একজন আমার কথা ভাবুক, আমায় মনে রাখুক, এই ইচ্ছার মধ্যেও কাঙ্গালীপনা কম নয়। আবার কাউকে মানস চক্ষে সর্ব্বদাই ফুটিয়ে রাখার যে ইচ্ছা, তাও জীবনের গতিকে দিন দিন পিছিয়ে দেয়। সকলের মধ্যে থেকেও সে দিন দিন সকলের বাহিরে চলে যায়। তার জগৎ স্বপ্নময়, তার সৃষ্টি শুধু তার জন্য,জগতকে সে বঞ্চিত করে। 'আহা ওর জীবনটাই ব্যর্থ হয়ে গেল'—সহানুভূতির ফোয়ারা হয় তো ছুটবে। কিন্তু মানুষের এই সহানুভূতির মধ্যেও কি একটা প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপ নাই ? হয় তো নাই—কিন্তু এ সহানুভূতিও তার অন্তরের কোথায় যেন একটা খোঁচা দেয়। 'কিছু পাই কি না পাই, আমি ভালবাসিব—' এই সাধনার মধ্যে মহানুভবতা আছে, কিন্তু প্রেমের ক্ষেত্রে এই সাধনার মধ্যে আত্মত্যাগ অপেক্ষা আত্মবিদ্রোহের প্রচেষ্টাই বড়। এই ত্যাগের মধ্যেও আছে প্রচ্ছন্ন স্বার্থ—"ওগো সুন্দর, প্রিয়তম হিসাবে আমায় মনে না রাখিলে, ত্যাগী হিসাবে আমায় মনে রাখো," এর মধ্যেও ভিক্ষা আছে, ভিক্ষার সাধনা কাঙ্গালের সাধনা। সুখ এখানে কোথায় ? কি পদার্থে মানব মনের সৃষ্টি জানা নাই, এই দুঃখের মধ্যে যে সুখ পায়, ধ্বংসের মধ্যেও সে প্রতিষ্ঠা দেখে।

অণিমার সাধনা এই মনে রাখা ও মনে রাখাইবার সাধনা। অশোককে সে ভুলিতে চায় না, অশোক তাঁ'কে ভুলিবে এও সে সহিতে পারে না।

সেক্রেটারী বেচারী দেওঘর গিয়াছে কিন্তু অণিমা আসিয়াছে ক'লকাতায়। মায়ের অসুখ একটু বাঁকা পথ ধরিয়াছে, খেয়ালী অশোক রাত জাগিয়া সেবা করে। শুধু 'ডাক্তার' মধ্যেও অজ্ঞাতসারে একটা বন্ধনের সৃষ্টি হয়। অশোক সেকথা আজ বুঝিতে পারিয়াছে। শুধু একা নয় এই সম্বন্ধবিহীন মমতার গুরুত্ব অণিমার মাও মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিতেছে।

"অশোক !" মা নিশ্বাস ছাড়িয়া অশোকের মুখের দিকে তাকায়। ঘরে বহু লোক, সকলের সম্মুখে অণিমার মা'কে 'মা' বলিতে অশোকের লজ্জা হয়। অশোক উত্তর দেয়—"বলুন !"

মা বোধহয় শুধু অশোকের মুখে 'মা' ডাকটুকু শুনিবার জন্ম ব্যগ্র হইয়াছিল। কিন্তু অশোক 'মা' বলিয়া ডাকে না। মায়ের দু'চোখে জল ভরিয়া আসে। মায়ের হৃদয় পুত্রের মুখে' 'মা', ডাক শুনিবার জন্ম কাঁদিয়া ওঠে। কিন্তু হায়, এ ব্যথা অশোক তো বোঝে না ! মা চক্ষু নিমীলিত করে—দুই গণ্ড বহিয়া জল পড়িতে থাকে।

ডাক্তার পরীক্ষা শেষ করিয়া অশোককে বাহিরের বারান্দায় ইঙ্গিতে ডাকিয়া লইয়া যায়। অণিমা উদ্‌গ্রীব হইয়া থাকে ডাক্তারের মতামত শুনিবার জন্ম। কিন্তু মুখ ফুটিয়া অশোককে কিছুই জিজ্ঞাসা করে না। সুলতাকে অশোক ভালবাসে এ কথাটা আকাশে বাতাসে বিষ-বাষ্পের মত ছড়াইয়া পড়িয়াছে, অণিমা শুনিয়াছে—নীরবে প্রতিজ্ঞা করিয়াছে। কোন মতেই অশোককে সে জানিতে দিবে না। সে অশোককে প্রাণ ঢালিয়া ভালবাসিয়াছে। কিন্তু ক্ষুধাতুর হৃদয়কে কতক্ষণ চাপিয়া রাখা চলে। অণিমার এই নীরবতাই অশোকের চোখে তা'র এই নীরব প্রেমকে ব্যক্ত করিয়া দিয়াছে।

"অণিমা !" রোগিণী চোখ মেলিয়া অণিমার মুখের দিকে তাকায়। "অশোক কোথায় ?"

অণিমার হৃদয় মরণোন্মুখ মাতৃ হৃদয়ের অব্যক্ত আশার কথা ভাবিয়া কাঁদিয়া ওঠে। মায়ের মনের কথা অণিমার কাছে অব্যক্ত নয়। খানিকটা থামিয়া গোপনে চোখের জল মুছিয়া অণিমা উত্তর দেয়, "আস্‌ছেন, ডাক্তারের সঙ্গে নীচে গিয়েছেন।" মা পাণ্ডুমুখের উপর কোটরগত চোখ দু'টী তুলিয়া দরজার দিকে তাকায়। অশোক আসে না। অণিমা মায়ের মাথায় হাত বুলাইতে থাকে। সহসা রোগিণীর দুই চক্ষু রক্তবর্ণ হ'য়ে ওঠে—রোগিণী সবলে উঠিয়া বসিতে চায়—অণিমা বিপদে পড়ে। রোগিণী প্রলাপ বকিতে আরম্ভ করে, "অশোক ! অশোক ! আমি তোমার মা, অণিমা আমার কেউ নয়,……হাঁ, হাঁ। ওগো, তুমি ভাবছো, আমি মরবো,…না, না, আমি মরবো না,—অশোকের বিয়ে দেখবো—"

অণিমা ফুঁফিয়া কাঁদিয়া ওঠে। অশোক রোগিণীকে জোর করিয়া চাপিয়া ধরে। ঝি মাথায় আইস ব্যাগ ধরে। ঘরের মধ্যে কোন কথাই নাই, সবাই নীরব। এমনি করিয়া প্রায় নীরবে আট ঘণ্টা কাটে, রোগিণীর একটু ঘুমের ভাব দেখা যায়। অণিমা আজ আর যেন কিছুতেই চাপিয়া রাখিতে পারে না ; ইচ্ছা হয় অশোকের পা দু'খানি চাপিয়া ধরিয়া চীৎকার করিয়া বলে, "ওগো, তুমি অন্ততঃ আমার মাকে জানতে দাও, তুমি তা'র ইচ্ছা পূর্ণ করবে। ওগো এটুকু করো, মা'কে শান্তিতে মরতে দাও।" কিন্তু সেকথা বলা হয় না, আস্তে আস্তে ডাকে—

'অশোকবাবু ?'

"অশোক মুখ তুলিয়া তাকায়।"

"ডাক্তার কি বলিলেন"—

"বললেন, বিশেষ কিছু ভয় নেই, তবে ভুগবেন অনেক দিন।" অশোক আর কিছু না বলিয়াই চুপ করিয়া যায়। অণিমার অভিমানে ঘা লাগে।

"অশোকবাবু, আজ আপনাকে রাত জাগতে দেবো না ; অসুখ করবে, আপনি একটু ঘুমোতে যান, আমি একাই জাগবো।

"তুমি ছেলে মানুষ ; রাতজাগা অভ্যাস নেই, পারবে না, অসুখ করবে।"

অণিমা অন্তরে আরও ব্যথা পায়। এম-এ পড়ে, তবু অশোকের চোখে সে ছেলে মানুষ।

"আমি ছেলে মানুষ হ'লে, আপনিও তো তাই, আমার চেয়ে না হয় পাঁচ বছরের বড়ই হ'বেন।" এই দুঃখের মধ্যেও অশোকের একটু হাসি পায়। একটু হাসে। কথা বলে না।

"অশোকবাবু, একটা কথা বলবো ?"

"বল।"

"আপনি আমাদের জন্ম এত পরিশ্রম ও কষ্ট করেন কেন ?"

"প্রয়োজন, তাই। লোকজনের অভাব—মা'কে বাঁচাতে চেষ্টা করতে হ'বে।"

অণিমা যে উত্তরের আশা করে, অশোক তা'র ধার দিয়াও যায় না।

রোগিণী ঘুমঘোরেই ডাকিয়া ওঠে—"অশোক।"

অশোক সাড়া দেয় না।

দশম পরিচ্ছেদ।

অনেকদিন পরের কথা। অণিমার মা সেই রোগেই মারা গিয়াছেন। অণিমা রংপুর গিয়াছে। রঞ্জিত বাবুও কর্ম্ম ছাড়িয়া রংপুর গিয়াছেন মেয়ের কাছে। নীলিমা আই, এ পড়ে। গোপনে অশোকই খরচা চালায়। পিসিমাকে অশোক একথা কিছুতেই জানিতে দেয় না। ভালবাসা ছোট বড় বিচার করে না। নীলিমা হয়তো অশোককে ভাল বাসিয়াছে—অন্ততঃ ব্যবহারে প্রকাশ পায় তাই। কিন্তু মুখ ফুটিয়া অশোকের নাম কখনও কারও কাছে বলে না। অশোককেও সে তার ভালবাসা জানিতে দেয় না।

"অশোক বাবু! আপনি বড় খেয়ালী, মানুষ হবার চেষ্টা কখনই করেন না। আপনাকে আমি আর খেয়ালী থাকতে দেবো না।"

নীলিমার শাসনটুকু অশোকের বেশ ভালো লাগে। হাসিতে হাসিতে উত্তর দেয়—

"বল কি করতে চাও? শিকল তৈরী করেছ?"—"হাঁ" —নীলিমা চায়ের কাপ লইয়া কাছে আসে। হাসিতে হাসিতে মুখের দিকে তাকায়। অশোকের বেশ ভাল লাগে।

"বেশ পরিয়ে দাও," অশোক নীলিমার দিকে জোড় হাত বাড়াইয়া দেয়।

"থাক্ থাক্ খুব হয়েছে। আমার কলেজের বেলা হয়েছে, এখন চা নিন্ তো।"

"কলেজ আর ক'দিন করবে?"

"তার মানে"?

অশোক খবরের কাগজের এক টুকরা বাহির করিয়া দেয়। নীলিমা পড়িতে থাকে,

পাত্র চাই—

"দক্ষিণ রাঢ়ী। বয়স ১৮, আই, এ, প্রথমবর্ষের ছাত্রী, সুন্দরী, স্বাস্থ্যবতী, গৃহকর্ম্মে নিপুণা, যৌতুকাদি সম্ভব মত, পাত্র উপার্জ্জনশীল, উচ্চ শিক্ষিত ও স্বাস্থ্যবান্ হওয়া চাই। নিম্নলিখিত ঠিকানায় অনুসন্ধান করুন—

রাসবিহারী এভেনিউ
"শান্তি-ধাম"

পড়া শেষ হইতেই নীলিমার মুখের উপর একটা ম্লান ছায়া পড়ে। অশোক লক্ষ্য করে না। হাসিতে হাসিতে উত্তর দেয়,

"মানে এবার বুঝতে পারলে তো, একেবারে বি, এ, পাশের বন্দোবস্ত।"

বিলক্ষণ। কিন্তু কর্ত্তার ইচ্ছা না লইয়া ক্রিয়া প্রয়োগ করায় বাক্য ভুল হয়।"

Nominative absolute-এর কথা বুঝি ভুলে গেছ?" অশোক হাসিতে থাকে। নীলিমার পিসিমা আসিয়া পড়েন।

"কি বাবাজীবন যে, আবার কেন?"

"শুভ কাজের অসময় নাই—শুভস্য শীঘ্রং"। পিসিমা কানে একটু কম শোনেন।

"শোভনের মা নেই? সে'কি! কবে মারা গেল?" অশোক বিপদ গণিল। নীলিমা হাসি চাপিতে পারে না, ওটা তার বদ্‌রোগ—"শোভনের মা আছে গো, মরেনি।"

"তবে ঐ যে অশোক কি বলছিল।"

"তোমার মাথা।"

পিসিমা রাগিয়া বলে, "আমার মাথা নয়লো, তোরই মাথা খাবার বন্দোবস্ত হচ্ছে।"

অশোক এইবার চেঁচাইয়া সায় দেয়,—"ঠিক বলেছ পিসিমা।" খবরের কাগজটা পিসিমার কাছে এগিয়ে দেয়।

পিসিমার মহা বিপদ 'একে লেখাপড়া জানে না তাতে আবার চোখেও আজকাল একটু কম দেখে। অশোকের দিকে কাগজখানা ফিরাইয়া দিয়া বলে,"তা তুমিই পড়না বাবা, আমি আজকাল আর চোখে কিছু দেখি না।"

নীলিমা একটু হাসে। হয়তো ভাবে, তুমি কোন্ দিনই বা দেখতে পেতে?

অশোক পড়িয়া শুনায়। পিসিমার এতদিনের বাঁধাধরা একদিনেই বেতাল হইয়া যায়। অশোকের গৃহলক্ষ্মী হ'বে নীলিমা, পিসিমা এতদিন তাই ভাবিয়া রাখিয়াছেন, কিন্তু আজ হঠাৎ সব যেন তালগোল পাকাইয়া গেল।

"তা বাবা, তোমার মত ছেলেটী না হ'লে আমি যা'কে তা'কে মেয়ে দিচ্ছি না।"

"ছেলে ভাল হ'বে বইকি পিসিমা। না হ'লে আমিই কি নীলুকে যার তার হাতে ধরে দেবো?"

পিসিমা খানিকক্ষণ আপন মনেই মাথা নাড়িয়া জবাব দেন,

"তা বাবা, আমার ইচ্ছাটা ছিল যে নীলুকে আমি তোমার হাতেই দি। তুমি আমাদের কাছে ভগবানের আশীর্ব্বাদ, সে কথা কখনই ভুলতে পারি না।"

নীলিমা পিসিমার কথার ধরণ দেখিয়া পালাইয়া বাঁচে। অশোকও এই কথার কি উত্তর দিবে প্রথমে কিছুই যেন ভাবিয়া পায় না। "তা পিসিমা, আমার মত ছেলেকে মেয়ে না দিয়ে নদীতে গলায় কলসী বেঁধে ফেলে দেওয়া ভাল।"

নীলিমার যেন আত্মসম্মানে কোথায় একটু বাধা লাগে।

"তা বাবা তোমারই সব, যা ভাল হয় কর, ওর একটা গতি হ'লে আমিও কাশী গিয়ে বাঁচি।"

কলেজের গাড়ী আসে। নীলিমা অশোককে প্রণাম করিয়া চলিয়া যায়।

একাদশ পরিচ্ছেদ

"অশোকবাবু, আপনি এখানে না এসে হয়তো পারেন, তবু কেন আসেন?"

—"না সুলতা, না এসে পারি না, আমি তোমাকে ভালবাসি।"

সুলতার দেহ-বল্লরী একটা শিহরণে কাঁপিয়া উঠিল, "না অশোকবাবু, সমাজে আপনার একটা স্থান আছে।"

অশোক সুলতার মুখের দিকে চাহিয়া একটু হাসে। "আছে, জানি, কিন্তু এ সমাজই আমায় তোমাকে ভালবাসতে শিখিয়েছে। একদিন হয়তো সত্যই ভালবাসতাম না, কিন্তু আজ মনে হয়, যেন সত্যই তোমাকে ভালবেসেছি।"

—"না অশোকবাবু, আপনার জীবন আমি এমনি ভাবে নষ্ট হ'তে দেবো না। মানুষ সমাজ ছেড়ে থাকতে পারে না।"

—"তুমি কি করে থাকবে, সুলতা? তোমারও তো সমাজ ডাকবে না।"

সুলতার অন্তরে প্রবল একটা আলোড়ন জাগিল, শিক্ষা, আত্মসম্মান যুগপৎ তার অন্তরের দ্বারে আসিয়া সমস্ত শক্তি দিয়া আঘাত করিয়াছে। কিন্তু বয়স হইবার সঙ্গে সঙ্গেই সুলতা এমনি অনেক আঘাত সহ্য করিয়াছে। সহপাঠিনীদের সহিত এককালে প্রাণ ঢালিয়া মিশিত—এখন তাদের সাথে কথা বলিতে ঘৃণা হয়। এক বন্ধুর বিয়েতে নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে গিয়া আত্মপরিচয় দিয়া যে অপমান সহ্য করিয়া ফিরিয়াছে, তারপর আর কাহারও সহিত মিশিবার প্রবৃত্তি তার নাই। সেই বিবাহসভার কথা মনে পড়ায় অশোকের উপস্থিতিকে অগ্রাহ্য করিয়াও বাঁধনহারা দু'ফোঁটা চোখের জল গণ্ডের উপর নামিয়া আসিল।

"আমায় ক্ষমা কর সুলতা।"

"কেন, অশোক বাবু? এযে আমার জন্মদাতের অপরাধ, মৃত্যু ভিন্ন এ চোখের জলের নিষ্কৃতি কোথায়?"

"সুলতা, আমায় বিশ্বাস করো?"

"এ কথা কেন বলছেন অশোকবাবু? বিশ্বাস আমি সবাইকেই করি, শুধু বিশ্বাস করি না নিজেকে।"

"আমার একটা কথা রাখবে?"

"রাখার মত হলেই রাখবো।"

"আমি তোমাকে বিয়ে করতে চাই। লজ্জা করবার সময় আমার নাই। জগতে আমার কেউ নেই সুলতা; সমাজ আমার চাই না। যে সমাজ তোমাকে না চায়, সে সমাজ আমি চাই না।"

সুলতা অনেকক্ষণ কোনও উত্তর দিবার মত শক্তি সঞ্চয় করিতে পারিল না।

"সুলতা, আমাদের সভ্য সমাজে সভ্যতার মুখোস পরিয়া যে অভিনয় হয়, সে আমি সহ্য করতে পারি না। যারা সংসারে জড়িত, তা'দের কথা স্বতন্ত্র,—আমার জন্য তা'দের আইন-কানুন নয়।"

"আপনার পিসিমা রয়েছেন, তিনি এতে কখনই সুখী হ'তে পারবেন না। শুনেছি, মায়ের মৃত্যুর পর তিনিই আপনাকে মায়ের মত পালন করেছেন। তারপর তাঁ'কে দুঃখ দেওয়া ভাল হ'বে না।"

—"পিসিমার মত আমি পাবো, সুলতা। তুমি আমার পিসিমাকে জান না, তাই এ কথা বললে, তাঁর মত আমার চেয়েও উদার।"

এর পরও সুলতার ভাবিবার আছে। কিন্তু সে কথা অশোকের কাছে বলিতেও লজ্জাবোধ হইল।

অশোকও সে কথা ভাবিয়াছে,—তা'র মেয়েকেও হয়তো সমাজ একদিন দিদিমার অপরাধের জন্য ক্ষমা করিবে না। অশোকের প্রগতিশীল হৃদয় তীব্র ভাবে সে চিন্তায় বাধা দিয়াছে।

সমাজে সে দিন হয় তো এমনি আর একটি অশোকের অভাব হইবে না।

"সুলতা, বীরেন বাবু কোথায় ?"

"কেন, বাবাকে আবার কেন ?" ঐসব কথা এখন বাবাকে বলবেন না, অশোক বাবু; ভাববার কথা এর মধ্যে অনেক আছে।"

সুলতার মা ঘরে ঢুকিলেন—

"কে, অশোক বাবু যে, খবর কি ?" সুলতার দিকে ফিরিয়া বলিলেন—"সুলতা অশোক বাবুকে চা দাও নি ?"

"না, চা উনি আর খান না।"

অশোক রেবার বাড়ী হইতে শেষ চা খাইয়াছে। তার পর হ'তে প্রতিজ্ঞা করেছে, চা আর খাইবে না।

"সেকি! অশোক বাবু চা খান না ? কথাটা শুনতেও হাসি পায়। তোমাকে ফাঁকি দিয়েছেন—চা না খান খাবার নিয়ে এসো।"

অশোক জানিত, এই নারীটীর স্নেহের মধ্যে ভড়ং নাই। বাহির হইতে দেখিলে মনে হয়, যেন এর সবটাই ভদ্রয়ানা। সেটা আজ দীর্ঘ বিশ বৎসর ভদ্রয়ানা প্রাকটিসের ফল। বিশ বৎসর যাকে কথায় ও ব্যবহারে সতর্ক থাকিতে হইয়াছে, তার ভিতরে কিছুটা মামুলীত্ব আসিবেই। কিন্তু ভদ্রতাও অন্তরহীন নয়। অশোক খাবারের কথায় বাধা দিল না। অশোক এদের কোন সঙ্গত আবদারেই কখনও বাধা দেয় না,—পাছে এ'দের অন্তরে কোথাও আঘাত লাগে।

সুলতা খাবার আনিতে চলিয়া গেল। ঝি চাকরের অভাব এদের নাই। কিন্তু সুলতার মা অশোকের কোনও কাজই কখনও চাকরের দ্বারা করিতে দেন না।

সে আজ বিশ বৎসরের আগের কথা। নন্দীগ্রামের একটা পড়ো বাগানের মধ্যে সমস্ত দিনটা কাটাইয়া দিয়া বীরেন মাষ্টার বালবিধবা অলোকাকে লইয়া সন্ধ্যার অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়া মার্টিনের লাইনের ধারে আসিয়া দাঁড়ায়। সম্বলহীন, নিঃস্ব বীরেন শ্যামবাজারের একটা গলির মধ্যে অলোকাকে লইয়া বাসা বাধে। সবাই জানে স্বামী, স্ত্রী। বীরেন রাত্রির অন্ধকার না ঘুচিতেই গা ঢাকা দিয়া বাহির হইয়া পড়ে অন্নের চিন্তায়; আবার রাত্রির অন্ধকারে ফিরিয়া আসে।

পাশের ঘরের ভাড়াটে বৌ প্রশ্ন করে, "হ্যাগা, তোমার স্বামী কি কাজ করে ? রাত থাকতে বেরিয়ে যায়, আবার সারাদিন বাদে সন্ধ্যায় ফিরে আসেন।"

চাকরী সম্বন্ধে অলোকার কোনই ধারণা নাই। বার বৎসর বয়সেই স্বামীকে হারাইয়া বাপের বাড়ী ফিরিয়া আসিয়া পুতুল খেলা আরম্ভ করে। বাপ মুদী দোকান করে। চাকরীর ধারণা অলোকার হওয়া শক্ত। অলোকা বিপদে পড়ে, উত্তর দেয়, "হাওড়ায় মুদী দোকান, যেতে সময় লাগে, তাই অত সকালেই যান।" অলোকা হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচে, মনে মনে শঙ্কিত হইয়া থাকে, 'বীরেন আসিলেই একথা স্মরণ করাইয়া দিতে হইবে।'

ভাড়াটে বৌ গল্প করিতে ভালবাসে, সে এ বাড়ীর সরকারী মাসী। "তা বৌমা, তোমার বাবার বাড়ী কোথায় ?" অলোকা বিপদে পড়ে, এবার আবার কি উত্তর দিবে ? যদি চেনা শোনার মধ্যে হইয়া পড়ে। তবুও উত্তর মাসীমাকে একটা দিতেই হয়। অলোকার রূপে ও গুণে মাসীমা মুগ্ধ। "নূতন বউ, তোকে ভাই আমার বেশ ভাল লাগে।"

অলোকার পাঁচ বছর আগের একটা স্মৃতি মনে পড়ে। সে তার ননদের কথা। সেও এমনি ভাবেই বলিত, "নূতন বউ, তোকে ভাই আমার বেশ ভাল লাগে।" সেদিন অলোকা মুচকি হাসিত; আজ তা'র চোখ ফাটিয়া জল আসিতে চাহিল।

মাসীর চোখ শকুনির চেয়েও সতর্ক। "ওকি বউ তোর চোখে জল এলো যেন ভাই; কারও কথা মনে পড়ল বুঝি ?"

"হাঁ মাসীমা, আমার ননদের কথা, সেও এমনি করেই বলতো।"

মাসীমা কোথায় যেন ব্যথা পাইল। ধরিয়া লইল, হয়তো সে ননদ মারাই গেছে।

এমনি ধারা সতর্কতার মধ্যদিয়া কাটাইয়া ১০ বৎসর পর অলোকা B. C. Ghose, Contractor-এর বাড়ীর সর্ব্বময়ী কর্ত্রী হইয়া ওঠে।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

বিমল মেসে থাকে। অশোক মাঝে মাঝে দেখা করিতে আসে। মেসে থাকিয়া ওকালতী করা দুর্দ্দশার পরিচায়ক সন্দেহ নাই। ব্যাকিং ছিন্ন পশার জমান শক্ত। অশোক একটা পার্টি ধরাইয়া দিয়াছে। দু'চার পয়সা হয়তো পাওয়া যেতে পারে। বিছানার উপর বসিয়া সিগারেট টানিতে টানিতে বিমল এই কেসটীর বিষয়ই ভাবিতেছে।

অশোক ঘরে ঢুকিল। "কাল এক ভদ্রলোক, অল্পদিনের পরিচয়, উকিল খুঁজছিলেন, তোর ঠিকানা দিলাম—এসেছিলেন?"

—"হাঁ, নীরদ ঘোষ ভদ্রলোকের নাম। কিন্তু কেস যা, সাজান বড় শক্ত। তবে টাকা খরচ করবেন। কালই অগ্রিম ৫০৲ টাকা দিয়ে গেছেন।"

"প্রথম দিনই ৫০৲ টাকা? বরাত ভাল তোর, কেসটী কি বলতো শুনি।"

"সে আর শুনে কাজ নেই। মুখ বিকৃত করতে হ'বে। যে বুড়টী কাল এসেছিলেন উনি ছেলের বাবা, দ্বিতীয় পক্ষের পত্নী ও ছেলের নামে কেস করবেন।

অশোক কথাটা শুনিয়া সত্যই একবার মুখ বিকৃত করিল।

—"ভালো, তোমারও পয়সা কিছু হ'বে।"

—"যাক্ সে কথা"—বিমল কথান্তরের অবতারণা করিল, "তুই কি সুলতাকে বে' না করে কোন রকমেই পারিস না অশোক?"

"বিয়ে না করে হয়তো জীবন কাটাতে রাজী আছি, কিন্তু বিয়ে করলে, সুলতাকেই বিয়ে করবো।"

"তা হ'লে আত্মীয় স্বজন সবাইকে ত্যাগ করতে চাস, বল?"

"আমি কাউকেই ত্যাগ করতে চাই না। কিন্তু জানি, তোমরা সবাই আমায় ত্যাগ করবে।"

"আমার কথা ছেড়ে দে, অশোক। কিন্তু তোকে দিয়ে একটা কতবড় আশা আমার ছিল তাতো জানিস। আর তুই আজ নিজেকে এমন ভাবে ধ্বংস করবি, এ আমি ঠিক সইতে পারবো না।"

"এই তো প্রকৃত গঠন। এর নাম তো ধ্বংস নয় বিমল। সামাজিকতার নাম ক'রে নিষ্ঠুরতা ও ভণ্ডামির প্রশ্রয় দেওয়ার চেয়ে, আমি মনে করি, এর দাম ঢের বেশী। অন্তঃসারহীন সভ্যতার মুখোস পরে আমি থাকতে চাই না। সবাই আমার নিন্দা করবে জানি,—কিন্তু আমার অন্তর সতেজ থাক্‌বে।"

"ভুল ধারণা অশোক, ভাঙনের মধ্যে শান্তি নাই, শান্তি গঠনের মধ্যে। ঝড়ের সময় ঝড় দেখতে আমার বেশ ভাল লাগে—চতুর্দ্দিকে হাহাকার উঠে যখন সব কিছু ভাঙতে থাকে, আমি বেশ একটা আনন্দ পাই। সমাজকে ভেঙ্গে ফেলার মধ্যে যারা আনন্দ পায়, তাদের এই ঝড় দেখার আনন্দ।"

"কবির মত সাজিয়ে কথা বলতে আমি জানি না, তবে সত্য যা তা' হয়তো কথার দৌলতে কোর্টেই মিথ্যা প্রতিপন্ন করা যেতে পারে, কিন্তু মনকে তা' দিয়ে বুঝ দেওয়া চলে না।"

বিমলের অন্তরে একটা ঘা লাগিল।

"কিন্তু অশোক, মানুষের মন নিয়ে খেলা করার যে প্রবৃত্তি —তা'র মধ্যে সৃষ্টির চিহ্ন কোথায়? হয়তো তা'তে তোমার উপন্যাসের খোরাক যোগাড় হ'তে পারে—সে তো পূর্ণ স্বার্থবাদ।"

অশোক একদিন মেয়েদের সঙ্গে মিশিত শুধু তার উপন্যাসের খোড়াক যোগাড় করবার জন্য। বিমল তাহা জানিত,—আজ সে বন্ধুকে আঘাত করিয়াও রক্ষা করিতে পশ্চাৎপদ নয়।

"যে মন খেলায় ভেঙ্গে পড়ে, সে মন অসাড়; সে মনের অস্তিত্ব না থাকাই ভালো।"

"ভালবাসার অভিনয় করতে তুমি খুবই পটু, আমি জানি,—সাক্ষাৎ অনিষ্ট ক'রেই তুমি করো না, তা' আমি মানি, কিন্তু তা'র চেয়ে বড় অনিষ্ট তুমি সমাজের কর—ব্যবহারের মধ্য দিয়ে মেয়েদের মনের ভালবাসা যাচাই করতে গিয়ে।"

অশোক প্রতিবাদ করে—

"কিন্তু যাচাই করতে যে জিনিষ ভেঙ্গে পড়ে তা' মেকী। প্রগতির নামে যারা এগিয়ে যায়—তাদের মন যদি কোন পুরুষের ব্যবহারে বিচ্ছেদে বিচ্ছেদানলে জ্বলিতে থাকে, তা'র জন্তে দায়ী অপটু মন নিয়ে পুরুষের সাথে মিশিবার প্রয়াস যাদের সেই সব নারী।"

"তোমার মত তুহিন মন ক'টা পুরুষের আছে শুনি? কংগ্রেসের কাজ করতে গিয়ে, ফ্লাড-রিলিফ ওয়ার্কস করতে গিয়ে তবে প্রেমের বন্যা বয়ে যায় কেন? মানুষ-মনের চির সত্য যে গতি তা'র বিরুদ্ধেও প্রগতি চালনের নাম ধ্বংস হওয়া।"

"কাউকে ঘুম থেকে ডাকতে গিয়ে, যারা নিজেরাই ঘুমিয়ে পড়ে,—তারা অনুতাপে একদিন কাজের মানুষ হবে।"

"ধ্বংসের উদ্দেশ্য নিয়ে যেখানে গঠনের প্রচেষ্টা, তার দাম কতটুকু?"

"তুমি আমায় ভুল বুঝেছ, বিমল। উপন্যাস আমি লিখি। জানি, এই লেখা পাঠের পর প্রগতিপন্থীরা মনের শক্তি বৃদ্ধি করিতে পারিবে। মুখের একটু হাসি, চোখের একটু ভঙ্গী দেখিয়া যে প্রেম গড়িয়া ওঠে তার স্থায়িত্ব কবির লেখার মধ্যেই থাকুক, বাস্তবের ঘরে তার দাম কিছুই নাই। 'পাই নাই' বলিয়া নিজেকে ধ্বংস করিবার উদ্দেশ্য যে প্রেমের মূলে, তা সমাজকে পঙ্গু করে।"

মেসের বয় আসিয়া খবর দিল, "কালকের সেই বাবুটি আপনার সঙ্গে দেখা করতে আসছেন।" বিমল শয্যার উপর উঠিয়া বসিল। অগত্যা তাহাদের আলোচনা এখানেই শেষ হল। বৃদ্ধ নীরদ ঘোষ ঘরে ঢুকিল, "নমস্কার! আপনি এখানে?" অশোকের দিকে চাহিয়া বৃদ্ধ বলিয়া যাইতে লাগিল, "আমি তো আপনার বাড়ী হয়েই আসছি।"

বৃদ্ধের উপর অশোকের যেন একটা ঘৃণার উদ্রেক হইয়াছে, "বেশ ভালো কথা। আচ্ছা বিমল, এখন উঠি।"

বিমল প্রশ্ন করিল,

"এখন কোথায় যাবি?"

"সেই ময়দার কলটা আজই start করা হবে। এখন সেখানেই যেতে হবে।"

"তুইও তো একজন ডিরেক্টর!"

"হাঁ, যাবি আমাদের মিল্‌স্ দেখতে?—এই নে কার্ড রেখে দে।"

বিমল হাত বাড়াইয়া কার্ড লইল।

[ক্রমশঃ

সুপ্রভাত

শ্রীমোহিনী চৌধুরী

(গান)

সুন্দর, তুমি এসেছ রুদ্রবেশে,
আজিকে সুপ্রভাত!
তন্দ্রাজড়িত জীবনে জাগালে এসে
হে মোর জীবননাথ।
ওগো প্রশান্ত, সেজেছ ভয়ঙ্কর,
ছিলে শ্যাম তুমি, হ'লে আজ শঙ্কর;
তিমির কারার রুদ্ধ দুয়ার দেশে
হেনেছ চরণাঘাত।

বাঁশরী তোমার বিষাণের মতো বাজে,
কণ্ঠে বিষের জ্বালা;
সাপ হ'য়ে দোলে তোমার বক্ষোমাঝে
চারু বনফুলমালা।
চিনেছি তোমারে ওগো হৃদিরঞ্জন,
ছলনা তোমার প্রলয় প্রভঞ্জন;
মোর দুরাশার সুদূর পথের শেষে
রেখেছ শুভ্রহাত।
—আজিকে সুপ্রভাত॥

পণ্টুর নিরুদ্দেশ যাত্রা

শ্রীমেঘেন্দ্রলাল রায়

[নক্সা]

বালীগঞ্জের হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক বিধুবাবু হঠাৎ একদিন সকালে এসে উপস্থিত। সেদিন রবিবার ছিল, পণ্টুর বাবা ধীরেনবাবু বাড়ীতেই ছিলেন। বিধুবাবুকে দেখে ধীরেনবাবু ব'ললেন, "আসুন, আসুন বিধুবাবু, একটু চা দেবে ?"

বিধুবাবু ব'ললেন "তা দিক—আমি আপনার ছেলের জন্যই এসেছি।"

ধীরেনবাবু ব'ললেন "তা আমি বুঝেছি—পুত্ররত্ন যেরকম সন্ধ্যার পর রাত করে বাড়ী ফিরছেন তখনই বুঝেছি যে তাঁর উন্নতি ঘন ঘন হচ্ছে।"

এই সময়ে রামু চাকর চা দিয়ে গেল। চা পান ক'রতে ক'রতে বিধুবাবু ব'ললেন "আপনার ছেলে বরাবর ফার্ষ্ট হয়ে ক্লাসে উঠ্‌ছিল। কিন্তু এবারে ম্যাট্রিক ক্লাশে প্রমোশান পেলে অঙ্কেতে ফেল হয়ে ও ভূগোলে কোন রকমে পাশ করে—অবশ্য ইংরেজী ও ইতিহাসে প্রথম হয়েছিল—এতো ভাল লক্ষণ নয়, তা ছাড়া মাঝে মাঝে স্কুলেই যায় না।"

ধীরেনবাবু চমকে উঠে ব'ললেন "স্কুলে যায় না ?"

বিধুবাবু ব'ললেন "না কুসঙ্গ হয়েছে নিশ্চয়, আপনি একটু দেখবেন—একটু লক্ষ্য রাখা দরকার।"

ধীরেনবাবু ব'ললেন, "দেখা তো দরকার নিশ্চয়ই, দেখি কখন ? এমন অধম কাজ যে সকালে উঠেই কাজে বেরোও, ইন্সপেকশন ক'রো, কার কতো ট্যাক্স হবে তাই দেখো, ভাতার বিল দেখো, খাতা দেখে তারপর বেলা সাড়ে এগারোটার সময় ফিরে এসো। আবার দু'টোয় অফিস, তা যদি দু'টোর বায়গায় তিনটের সময় অফিসে পৌঁছলাম অমনি ঘোষাল সাহেব রক্তবর্ণ চক্ষু নিয়ে চেঁচিয়ে উঠলেন—আগে শনিবারে আফিসে যেতে হ'তো না, ঘোষাল সাহেবের খেয়াল শনিবারেও আফিসে যেতে হবে। সকালে কাজ করেও যেন আমি মানুষ নই। অথচ আমি একজন পদস্থ কর্ম্মচারী—এই তো; তারপর আফিসে কাজ শেষ করতে প্রায় ৬টা বেজে যায়, বালীগঞ্জে ফিরতে ৭টা—এর পর কি আর সম্ভব, বিধুবাবু, ছেলেকে দেখা"।

বিধুবাবু ব'ললেন, "That is no explanation ধীরেনবাবু, ছেলেকে তাও দেখতে হবে, উপায় কি।"

ধীরেনবাবু ব'ললেন "আপনার কথাতে স্কুলের নারায়ণ বাবুকে শিক্ষক নিযুক্ত করলাম, বেশ ভাল মাষ্টার।"

বিধুবাবু চটে ব'ললেন, "মাষ্টারের কথা আর ব'লবেন না ধীরেনবাবু। ছেলেদের pure and simple humour করে স্কুল চালাচ্ছি, যদি discipline আনবার জন্য কড়া শাসন করতে যাবো অমনি স্কুলে strike—এতে কি করতে পারি বলুন—যাই হোক্ দেখবেন একটু, নমস্কার"। বিধুবাবু প্রস্থান ক'রলেন।

পণ্টুর জননী দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে হেড মাষ্টারের সব কথাই শুনলেন—তাঁর চোখে জল এলো। তিনি আর কি ক'রবেন। মেয়ের প্রতিমূর্ত্তি ছেলে, মেয়ের, স্বামীর, শাশুড়ীর, দেবরের খাওয়ার পরিপাট্য লক্ষ্য করতেই সময় কেটে যায়।

ধীরেনবাবু বাড়ীর মধ্যে এসে বললেন, "পণ্টু স্কুল পালাতে আরম্ভ করেছে—বিধুবাবু বলে গেলেন—কোথায় সে ?"

গৃহিণী বললেন, "কোথায় আবার ! সে কখনও রবিবারে সকালে বাড়ী থাকে ! পাড়াতে গিয়েছে কোথায়"—

ধীরেনবাবু বললেন, "আচ্ছা, আস্‌ছি বেড়িয়ে"—

গৃহিণী ভয়ার্ত্ত কণ্ঠে বললেন, "দেখো, দোহাই তোমার, মার ধোর করো না—বড় অভিমানী ছেলে।"

ধীরেনবাবু কোন উত্তর না দিয়ে ছাতা নিয়ে বাড়ী থেকে বেরিয়ে পড়লেন। ধীরেনবাবু বাড়ীর কম্পাউণ্ডের গেট পেরিয়ে যেই রাস্তায় এগিয়েছেন, বিপরীত দিক থেকে পণ্টু গেটে [illegible] বাড়ীতে এলো।

পণ্টু [illegible] বললে, "মা, আজ আলেয়ায় যাবে ? কাননবালা খুব ভাল [illegible] ক'রেছে ; তিনটের শো'তে চ'লো না।"

মা বললেন, "না—শোন্ বিধুবাবু এসেছিলেন, তুই না কি স্কুল পালাতে আরম্ভ করেছিস —"

পণ্টু বললে, "দুদিন গড়ের মাঠে গিয়েছিলাম ক্রীকেট খেলা দেখতে, আর দুদিন গিয়েছিলাম মেট্রোতে—তাতে হ'য়েছে কি।"

মা উত্তর দিলেন, "স্কুল পালিয়ে ম্যাচ দেখা বা সিনেমা দেখা কি ভাল—পড়াশুনোও তো ভাল হ'চ্ছে না—"

পণ্টু বললে, "অঙ্কেতে ফেল হয়ে গিয়েছি হঠাৎ, ভূগোল একেবারে পড়িনি—তা পাশ করবো নিশ্চয়ই।"

মা বললেন, "পাশ করলেই তো হোল না, ভাল করে পাশ করতে হবে।"

পণ্টু উত্তর দিলো, "ভাল পাশ করেই বা কি হবে!"

মা বললেন, "তোর বড় পাকা পাকা কথা হয়েছে, যা শীগ্গীর চান করে নে—" কথা শেষ হতে না হতেই ধীরেন বাবু বাড়ীতে প্রবেশ করে বললেন, "পণ্টু এ দিকে এসো।" সে ভীত ভাবে বাবার কাছে গেল।

ধীরেন বাবু বললেন, "তুমি না কি স্কুল পালাতে আরম্ভ করেছো, দেখছো তো সন্ধ্যার পর রাত করে বাড়ী আসার সঙ্গে সঙ্গে স্কুল পালানও আরম্ভ হয়েছে, এ সব বন্ধ করে দাও বুঝেছো, অঙ্কেতে ফেল—ভূগোলে কোন রকমে পাশ—যে ছেলে ফার্ষ্ট হয়—চশমাটা ঝুলছে কেন? কি হয়েছে।"

পণ্টু বললে, "হেড্মাষ্টার কাল দুই থাপ্পড় দিয়েছিলেন task করে নিয়ে যাই নি বলে—চশমাটা ভেঙ্গে গিয়েছে।"

ধীরেন বাবু বললেন, "উত্তম করেছেন—স্কুল থেকে যে ছেলে পালায়, তার বাড়ীতে না থাকাই ভালো। যাও, চান করে খেয়ে পড়তে বসো।"

পণ্টু কিছু উত্তর দিল না, কিন্তু মুখে বিরক্তির চিহ্ন ও রাগে পা ঘষছিলো মাটিতে—ধীরেন বাবু বললেন, "কাল থেকে সকালে বেরিও না, সন্ধ্যার আগেই বাড়ী ফিরবে।"

(২)

সোমবার সকালে পণ্টু যেমন নিয়মিত স্কুলে যায় সেই রকম স্কুলে গিয়েছে, ধীরেন বাবু সন্ধ্যায় সময় বাড়ী এসে শুনলেন, সে তখনও বাড়ী ফেরে নি।

তিনি একটু স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছেন, কাল সকালে তাকে বলেছেন সন্ধ্যার আগে বাড়ী ফিরে আসতে, আর আজ সে বাড়ীই ফিরলো না। তার সমগ্র শরীরে যেন বৃশ্চিক দংশন করতে লাগলো। পিতার পিতৃত্ব, প্রভুত্বকে এমন ভাবে পর্য্যুদস্ত করে সে বাড়ীতে প্রত্যাগমন করবে না তা তিনি কল্পনা করেন নি। তিনি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হ'য়েই চায়ের পেয়ালা নিয়ে তেতালায় ছাদে গিয়ে পায়চারী আরম্ভ করলেন। ক্রমশঃ পণ্টুর জন্ম স্ত্রী, পুত্র, কন্যাদের ব্যাকুলতা বৃদ্ধি পেতে লাগলো; যখন প্রায় রাত্রি ৮৷৷০ পণ্টুর মা ছাতে গিয়ে বললেন, "ওগো পণ্টু যে ফিরে এলো না, তুমি বেশ নিশ্চিন্ত হয়ে আছ—তুমি মানুষ না পাষাণ গো—একবার পুলিশে খবর দিলে হ'ত না?"

ধীরেন বাবু ব'ললেন, "না আমি পুলিশে খবর দেবো না, অমন ছেলে না ফেরাই ভাল। বাপকে এতোখানি তাচ্ছিল্য, অপমান—ছেলেকে খোষামোদ ক'রে চলতে হবে, কখনই না।

"জানো না, যখন এম-এ পড়ছি তখন একদিন, নেহাৎ বন্ধুবর্গের অনুরোধ না এড়াতে পেরে, গান করে ফিরতে রাত্তির দশটা বেজে গিয়েছিল, বাবা বলেছিলেন, 'যে রাস্তা দিয়ে এসেছো সেই রাস্তায়ই ফিরে যাও, রাত্তির ৮টার বেশী বাইরে থাকতে পাবে না।' তুমি তো জেনেই শুন, আমি কি তোমাকে নিয়ে বেরিয়ে গিয়েছিলাম বাড়ী থেকে? এমন হতভাগা হ'য়েছে আমার ছেলে।"

গৃহিণী ব'ললেন, "দিন কাল বদলে গিয়েছে গো, ও সব চলবে না গো, চলবে না। দেখছো না খবরের কাগজে নিরুদ্দেশ কত্তো হচ্ছে, রোজ ছবি বেরোচ্ছে।"

ধীরেন বাবু বললেন, "দিন বদলাক, আমি খবরের কাগজে ছেলের ফটো দিয়ে বিজ্ঞাপন দিতে পারবো না আর তাতে লিখতেও পারব না—বাবা, কোন ভয় নেই, ফিরে আয় বাবা, তোর মা মৃত্যু শয্যায়—"

গৃহিণী পুনর্ব্বার অনুরোধের স্বরে বললেন, "খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দাও আর না দাও, একবার পুলিশে খবর দাও অন্ততঃ—কোথায় হয় তো না খেয়ে পড়ে আছে, বড় অভিমান তার, হাতে পয়সা-কড়িও নেই, দাও পুলিশে খবর দাও।"

ধীরেন বাবু চ'টে বললেন, "পুলিশে আমি খবর দিতে পারব না। দিন যখন বদলেছে, নারী যখন পুরুষের সমান হ'য়ে গিয়েছে, তখন তুমি তার মা অনায়াসে রিক্স ডেকে বেলতলায়

থানায় গিয়ে খবর দিতে পারো। দিন যখন বদলেছে, তখন তুমিও ঘরের কোনে সেকেলে স্ত্রীর মত লুকিয়ে থাকবে কেন, বেরিয়ে পড়ো।"

গৃহিণী বলিলেন, "আমিই যদি যেতে পারব তবে তোমাকে এতো খোসামোদ করতে যাবো কেন? উঃ, বাপ মাতে কতো প্রভেদ!"

তিনি শয্যায় আশ্রয় গ্রহণ ক'রে ফুঁপিয়ে ফুপিয়ে কাঁদতে লাগলেন। ছেলে মেয়েরাও ক্রন্দনে যোগ দিল। ইতি-মধ্যে ধীরেন বাবুর বৃদ্ধা মাতা ভগিনীর বাটী থেকে প্রত্যাবর্ত্তন করে পন্টুর বাড়ী না ফেরার সংবাদে বিশেষ উদ্বিগ্ন হয়ে ছেলেকে ডাকলেন। মা বললেন, "ধীরু, তুই এখনো বসে আছিস? নিশ্চয়ই বৌমা বলেছিলো পুলিশে খবর দিতে, যা শিগ্‌গীর যা, পুলিশে খবর দে, বৌমা কাঁদছে।"

ধীরেন বাবু প্রমাদ গণিলেন, চতুর্দ্দিকে শ্রেণীবদ্ধ শত্রুর মধ্যে তিনি অতিষ্ঠ হয়ে পড়লেন, শেষ কালে বললেন তিনি, "যাই ওর মামার বাড়ীতে খিদিরপুরে, সেখানে যদি গিয়ে থাকে।"

মা বললেন, "তাই যা বাবা, তোর শ্বশুর বিজ্ঞ লোক, তাঁর কাছে জিজ্ঞাসা কর কি করবি, যদি সেখানে না গিয়ে থাকে।"

রাত্রি দশটার সময় বালীগঞ্জ থেকে ধীরেন বাবু শ্বশুরালয়ে গেলেন। পন্টু সেখানে যায় নি। শ্বশুর বললেন, "দেখো সব হাঁসপাতালগুলোতে খবর নাও, কোন accident হ'য়েছে কি না, কাহুকে নিয়ে যাও।" পারিপার্শ্বিক আবহাওয়াতে ধীরেন বাবুর মনের দৃঢ়তা ক্রমশঃই দূরীভূত হয়ে আসছে।

(৩)

তিন দিন গত হয়েছে। ধীরেন বাবুর জীবন অতিষ্ঠ হ'য়ে পড়েছে, পুত্রের কোন সংবাদ নেই। মঙ্গলবার সকালে কলকাতার যাবতীয় হাঁসপাতাল ঘুরে শরীর অবসন্ন হ'য়ে এসেছে তাঁর, কোন হাঁসপাতালেই নাম পেলেন না। এক দিকে ধীরেন বাবুর বৃদ্ধা মাতা আকুল হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন উপরের বারান্দায়, কখন তাঁর নাতি ফিরে আসবে এই আশায়—আর স্ত্রী বিয়োগ বিধুর হৃদয়ে অশ্রুপূর্ণ নেত্রে চেয়ে আছেন পথ পানে কখন পন্টু ফিরে আসবে। খুকু, মীনা পন্টুর বড় দুই বোন, তারাও ব্যস্ত হয়ে চেয়ে আছে বাবার দিকে, হয় তো বাবা কোন খবর আনবেন, ছোট ভাই আধ আধ স্বরে ডাকছে, "দাদা আয়, দাদা আয়।"

ধীরেনবাবু মুখে যতই চেঁচামেচি করুন, কিন্তু হৃদয়ে তাঁর স্নেহ প্রবল। তিনি যতই মুখে বলুন যে, তাঁর কোন দোষ নেই পুত্রেরই দোষ কিন্তু মনে মনে কিছুতেই স্থির ক'রতে পাচ্ছেন না যে যদি ফিরে না আসে কি ক'রবেন—

তিনি প্রত্যেক দিন যখন ট্রামে আফিস যান আর ফিরে আসেন বাজারের সম্মুখে কি সিনেমার সম্মুখে ঐ রকম পন্টুর মতন লম্বা, মাথার চুল কোঁকড়া কোঁকড়া, চশমা চোখে, সাদা হাফসার্ট পরা পায়ে স্যাণ্ডাল দেখে পন্টু মনে ক'রে কত ছেলেরই পিছু নিয়েছেন। হতাশার ব্যর্থতার দীর্ঘশ্বাস নিয়ে অশ্রু সজল চোখে ট্রামে উঠেছেন—এ সংবাদ তার স্ত্রী তো জানে না

কেন এমন হয়। ধীরেনবাবু এই কথাই ভাবেন, কেন এমন হয়—বাবা তাঁকে কতো মেরেছেন, মা সজ্‌নের ডাঁটা দিয়ে মেরে তাঁর সুন্দর গায়ে কতই দাগ করে দিয়েছেন, বাবা রেগে বাড়ী থেকে ঘাড় ধরে বের করে দিয়েছেন—তিনি তো কম্পাউণ্ডে গিয়ে আতাগাছের তলায় বসে থাকতেন—কখনও নিরুদ্দেশ যাত্রা ক'রবেন—এতো মনে হয় নি—

মনে হয় নি কেন তার কারণ ধীরেনবাবু না জানতে পারেন, আমরা জানি। তাঁর বাল্য বয়সে শিশু-সাহিত্যের উদয় হয় নি—তাঁরা পড়েছেন রামায়ণ, মহাভারত, তাঁর কাছে রামের পিতৃসত্য পালন করা, ভীষ্মের মহৎ চরিত্র, কল্পনায় নানা সাজে রাত্রে এসে দেখা দিত। তাঁর বালক মন স্বপ্নালোকে প্রহ্লাদ ধ্রুবের সঙ্গে নেচে বেড়াত। মার কাছে এসে আবার বালক-প্রাণ আকুলতা নিয়ে শুনতো প্রহ্লাদ ধ্রুবের কথা, শুনতে শুনতে বালকও কাঁদতো মাও কাঁদতেন। কিন্তু দিন বদলেছে আজ সত্যিই—পারিবারিক জীবন আজ কুসংস্কার, বাপ মাকে ভালবাসা ভাইকে স্নেহ করা কুসংস্কার এই সব কথাই শিশু-সাহিত্যে শিশুরা পড়তে শিখছে—রোমাঞ্চকর দুঃসাহসিক কাজ, খুন, হত্যা, ডাকাতির চরিত্র পশ্চিমে গল্প থেকে আমদানী ক'রে শিশুদের মনকে কোমল না ক'রে কঠিন ক'রে গ'ড়ে তুলেছে; সেটা প্রকৃতির বিরুদ্ধে

কাজ করা। সেই শিশু-সাহিত্য ও টকীর ছবি যে দেশের ভবিষ্যৎ আশা-ভরসা শিশুদের নষ্ট ক'রছে সেটা ধীরেনবাবু তলিয়ে দেখেন নি তাই ব্যর্থতায়, অশ্রু সজল চোখে মনকে জিজ্ঞাসা করছেন, কেন এমন হয়?

এই রকম নানান চিন্তায় জর্জ্জরিত হ'য়ে ধীরেনবাবু প্রত্যহ বাড়ীতে ফেরেন। বাড়ীতে প্রত্যহ সন্ধ্যার সময় গেটের কাছে তিন চারিখানা মোটর গাড়ী দাঁড়িয়ে আছে দেখে ভীত হন—বাহিরের ঘরে মুখ ম্লান করে বসে আছেন শ্বশুর, মামা শ্বশুর, ভ্রাতা, আত্মীয়স্বজন। মা চিন্তিত মুখে জিজ্ঞাসা করছেন, "কি বাবা, পণ্টুর কিছু খবর পেলি?"

স্ত্রী স্নেহ সজল চোখে জিজ্ঞাসা করেন, "কি গো কিছু খবর পেলে?"

ছেলের নিরুদ্দেশ যাত্রা নিয়ে বাড়ীতে যেন একটা মহা-প্রলয় ঘটেছে। এই রকমই মনে হ'চ্ছে ধীরেনবাবুর - রাত্রে যদি পাপি কুকুরটা গা ঝাড়া দিয়ে উঠার জন্তে শব্দ হয় তখনি বাড়ীশুদ্ধ লোক সজাগ, ভাবে ঐ বুঝি পণ্টু ফিরে এলো।

ধীরেনবাবুরও রাত কাটে না—তিনদিন কেটে গেল। অফিসের কর্ত্তা ঘোষাল সাহেব ধীরেনবাবুকে বিশেষ স্নেহ করেন, তিনি ডেকে ব'ললেন, "ধীরেন, ছেলের কিছু খবর পাচ্ছ না, চলো ফকির সাহেবের কাছে। তিনি ঠিক ব'লে দেবেন, ছেলে ফিরবে কি না, আর যদি ফিরে আসে কবে, কোন্ সময়ে, তাও বলে দিতে পারেন।" ধীরেনবাবুর মনের অবস্থা এরকম যে ফকিরের কথা বলাতে তাঁর মনে যেন আশার সঞ্চার হ'লো—

ঘোষাল সাহেব তাঁর গাড়ী করে ধীরেনবাবুকে ফকিরের কাছে নিয়ে গেলেন। কী সুন্দর চেহারা ফকিরের, কী সুন্দর সাদা দাড়ি, গায়ের রং দুধে-আলতায় মেশান, চোখে দিব্য জ্যোতি।

ফকির সামান্ত ঘরেই বাস করেন, অর্থ কারুর কাছ থেকে গ্রহণ করেন না। পিতার অগাধ অর্থ সম্পত্তি "আল্লার" নামে দান করেছেন—মসজিদ ক'রে দিয়েছেন।

ধীরেনবাবুকে ঘোষাল সাহেবের সঙ্গে দেখেই ফকির হেসে বল্লেন, "কি ঘোষাল, ভদ্রলোকের ছেলে পালিয়েছে, না? কাল সকালে ৮টার মধ্যে ফিরে আসবে, চিন্তা করো না বাবা।" ঘোষাল সাহেব বল্লেন, "ধীরেন আর ভয় কি, ফকির সাহেব বল্ছেন যখন আর কোন চিন্তা নেই।" ধীরেনবাবু ফকিরকে নমস্কার ক'রে দেওয়া, ফল ফুল দিয়ে ঘোষাল সাহেবের সঙ্গে অফিসে ফিরলেন।

কি আশ্চর্য্য! ধীরেনবাবু এ কদিন অশান্ত চিত্তে ট্রামে থেকে এদিক ওদিক, বাজারের সম্মুখে সিনেমার টিকিট ঘরের কাছে পণ্টুর মতো কতকটা দেখতে কোন ছেলে চোখে পড়লে, স্থির না থাকতে পেরে ট্রাম থেকে নেমেছেন, পেছনে পেছনে গিয়েছেন, কিন্তু আজ যেন তাঁর হৃদয়ে আর কোন চিন্তা উঁকি মারছে না। নিশ্চিন্ত নির্ভয়ে বাড়ীতে এলেন।

বড় মেয়ে খুকু তাড়াতাড়ি এসে বল্লে, "বাবা, পণ্টুদা বর্দ্ধমান থেকে চিঠি লিখেছে। মাকে দু' টাকা পাঠাতে বলেছে, বাড়ী ফিরে আসবে।"

পণ্টুর মা এসে চিঠি দিলেন, চিঠিতে এই লেখা ছিল—

শ্রীচরণেষু,

মা! আমি বর্দ্ধমানে আছি সুধাম পাণ্ডের বাড়ীতে। আমার হাতে এক পয়সাও নেই, দু'টো টাকা পাঠিও তা নইলে বড় বিপদ। পকেটে চার আনা পয়সা ছিল তাও পিকপকেটে মেরে নিয়েছে। চুঁচড়োতে পুলিশে ধ'রেছিল, কোন রকমে ছেড়ে দিয়েছে বাবার পরিচয় দিতে। নিশিকে লিখেছি তার কাছে ঠিকানা আছে, প্রণাম নিও। ইতি—

পণ্টু।

ধীরেনবাবু পণ্টুর বন্ধু নিশিকে ডেকে পাঠালেন, নিশিকে সঙ্গে করেই বর্দ্ধমানে যাবেন ঠিক করলেন। রাত্রি ৯টার সময় দুজনেই খেয়ে দেয়ে বাস ধরলেন হাওড়া ষ্টেশন অভিমুখে।

(৪)

ধীরেনবাবু ট্রেনে নিশিকে জিজ্ঞাসা করলেন, "পণ্টুর এ রকম মতিগতি হ'চ্ছে কেন?"

নিশি বল্লো, "ও দিদির কাছ থেকে পয়সা নিয়ে বায়োস্কোপ দেখে, কেবল adventure-এর শিশু-সাহিত্যের বই পড়ে ও মাঝে মাঝে বলে এরকম ক'রে বাড়ী থেকে পালালে কি রকম হয়।"

ধীরেনবাবু ব'ললেন, "তুমি এসব কথা জানাও নি কেন ?"

নিশি বললে, "আমরা কি ভেবেছিলাম যে সত্য সত্যই ও বাড়ী থেকে পালাবে ?"

বর্দ্ধমানে এসে গাড়ী পৌছল প্রায় রাত সাড়ে দশটায়। ধীরেন বাবু রিক্সওয়ালাদের কাছে এসে বললেন, "আমরা বর্দ্ধমানের কিছুই চিনি না, আমার ছেলে পালিয়ে এসেছে এখানে খোঁজ কয়তে হবে।"

এই শুনে এক সুন্দর স্বাস্থ্যবান যুবক মুসলমান রিক্সওয়ালা এসে বললে, "বাবু, আহা! আপনার ছেলে পালিয়ে এসেছে! আমি বর্দ্ধমানের সব রাস্তাঘাট জানি, চলুন বাবু।"

ধীরেনবাবু বললেন, "কতো নিবি, হয় তো দু'ঘণ্টা ঘুরতে হবে।"

রিক্সওয়ালা বললে, "বাবু আপনার বিপদ, যতো কমে হয়। এক টাকার মধ্যেই হবে। এখন চলুন আগে ছেলেকে পান আল্লার কৃপায়।"

মুসলমান যুবকের কথায়, তার সহানুভূতিতে ধীরেনবাবুর চোখে জল এলো।

রিক্সওয়ালাকে সুধাম পাণ্ডের বাড়ী বলতেই সে বুঝতে পারলে।

ঝুলনে বর্দ্ধমানে খুব জাঁক। যদিও রাত্রি তখন ১১টা বর্দ্ধমানের রাজপথ আলোকিত, পথে জনসমাগম এতো বেশী যে রিক্স আস্তে আস্তে অগ্রসর হ'চ্ছে, ধীরেনবাবু মন্দিরের পর মন্দিরে রাধা শ্যামের ঝুলনের বেশ দেখতে দেখতে অগ্রসর হ'লেন, মনে মনে প্রার্থনাও করলেন, "হে প্রেমের ঠাকুর, পুত্রকে যেন ফিরে পাই।"

সুধাম পাণ্ডের বাড়ীতে গিয়ে রিক্সওয়ালা উপস্থিত হ'লো।

সুধাম পাণ্ডে বললেন, "বাবু, আপনার ছেলে কাল সকালে এখানে ছিল, বলেছে টাকা এলে সে নিয়ে চলে যাবে, কিন্তু তার সঙ্গে একটা ছেলে আছে, তার নাম শশধর সে খালি বদ্‌ মতলব দিচ্ছে। আপনি নিজে এসে ভাল করেছেন।"

ধীরেনবাবু বললেন, "তা হলে এখন কোথায় তার খবর পাওয়া যাবে ?" সুধাম পাণ্ডে বললেন, "খান মাইনর স্কুলের হেড্‌মাষ্টারের বাড়ী, সেখানে সে যাবে বলেছিল।"

রিক্সওয়ালা বললে, "চলুন বাবু, আমি সে বাড়ী চিনি।"

আবার রিক্সতে চ'ড়ে ধীরেনবাবু আর নিশি হেড্‌-মাষ্টারের বাড়ী গেলেন, তখন রাত্রি প্রায় ১২টা হবে।

ধীরেনবাবু হেড্‌মাষ্টারের বাড়ীতে গিয়ে প্রায় আধ ঘণ্টা ডাকাডাকি করাতেও কোন উত্তর পেলেন না, তখন রিক্স-ওয়ালা বললে, "ও আপনার কাম নয় বাবু, আমি দেখছি"—রিক্সওয়ালা গিয়ে "বাবু বাবু" ব'লে এমন তারস্বরে চীৎকার আরম্ভ ক'রলে ও সঙ্গে সঙ্গে দরজায় নির্ম্মম আঘাত করলে যে হেড্‌মাষ্টার মহাশয়ের নিদ্রা ভাঙলো। তিনি অত্যন্ত বিরক্তির সঙ্গে চোখ রগ্‌ড়াতে রগ্‌ড়াতে উঠে এলেন—বিরক্ত হয়েই বললেন, "কি হয়েছেরে—দুপুর রাত্তিরে চীৎকার, দরজা ভেঙে ফেলবার যোগাড় করেছিস্‌, কি ব্যাপার ?"

রিক্সওয়ালা বললে, "এই বাবু কল্‌কাতা থেকে এসেছেন।"

হেড্‌মাষ্টার ধীরেনবাবুর চেহারা দেখে একটু অপ্রস্তুত হ'য়ে বললেন, "মশায়, মাপ কর্ব্বেন, দু'রাত্তির উপরো উপরি যাত্রা দেখে অঘোরে ঘুমোচ্ছি, আপনি সুধীরের বাবা ?"

ধীরেনবাবু বললেন, "হ্যাঁ।"

হেড্‌মাষ্টার বললেন, "সে কাল রাত্তিরে আমার বারান্দায় শুতে অনুমতি চেয়েছিলো; বলেছিলো, সে ঝুলন দেখতে এসেছে—পয়সা কড়ি পিক্‌পকেট হ'য়ে গিয়েছে—টাকার জন্ত লিখেছে, টাকা এলেই চ'লে যাবে। কাল রাত্তিরে এখানে ছিল, সকালে উঠে চ'লে গিয়েছে। দেখুন তো একবার রাধা-শ্যামজীর মন্দিরে—ওখানে কল্‌কাতা থেকে খুব ভালো যাত্রা এসেছে, সেখানে যারা যায় তাদেরও খুব ভাল খাওয়া হয়।"

আবার রিক্স ক'রে ধীরেনবাবু ও নিশি সেই মন্দিরে গিয়ে উপস্থিত হইলেন। মন্দির প্রাঙ্গণটি করোগেটেড আইরণ দিয়ে আবৃত; চতুর্দ্দিকে কাঁটাতারের বেড়া দিয়ে ঘেরা। প্রায় দুই হাজার লোক সমবেত হয়েছে—একটি মাত্র পথ প্রবেশ ও বহির্গমনের। খুব জোর অভিনয় হ'চ্ছে—ভীষ্ম ও পরশুরামের মহাযুদ্ধ চ'লছে—পরশুরাম পার্চ্ছেন না—ঘন ঘন করতালি—হৈ-হৈ ব্যাপার!

ধীরেনবাবু নিশিকে বললেন, "দেখো নিশি, তুমি ভিতরে গিয়ে দেখো যদি খুঁজে পাও; আমার পক্ষে অসম্ভব। আমি এই দরজার কাছে দাঁড়াই যদি বেরোয় ধরতে পারবো।"

নিশি ভিতরে গিয়ে অন্বেষণে প্রবৃত্ত হ'লো। ধীরেন বাবু দরজার নিকটে একটু প্রচ্ছন্ন ভাবেই দাঁড়িয়ে রইলেন—কিছুক্ষণ পরেই দেখেন, পুত্ররত্ন একটী ছেলের সঙ্গে বেরোচ্ছেন। মুখ শুকনো, পরণে ময়লা হাফপ্যান্ট, স্নান করে নি বোধ হয়, মাথায় চুল উস্কো-খুস্কো। চশমাটা অর্দ্ধ ভাঙ্গা অবস্থায় চোখে ঝুলছে, পায়ের স্যাণ্ডেল ছেঁড়া অবস্থায় পা থেকে বেরিয়ে পড়েছে। হঠাৎ অপ্রত্যাশিত ভাবে বাবাকে এখানে দেখে পল্টু স্তম্ভিত হয়ে গেল, সে ভীত হ'য়ে কেঁদে বললো, "আর কখ্খনো না বাবা।"

ধীরেন বাবুর এতো রাগ, এত কঠিন শাসন—সব ভেসে গেল পুত্রের করুণ স্বরে, তার এই অবস্থা দেখে তিনি শাসন করবেন কি, সস্নেহে তাকে ডেকে কাছে টেনে নিলেন। বর্দ্ধমানের রাজপথে মন্দির-প্রাঙ্গণে তার পুত্রকে এই হীন অবস্থায় দেখে তাঁর আত্মসম্মানে যে আঘাত লেগেছে তিনি যেন আর তা সাম্‌লাতে পার্‌লেন না, তাঁর চক্ষু সজল হ'য়ে এলো। কেবল তিনি একবার বল্‌লেন, "তুই কোন্ বংশের ছেলে, কার ছেলে সব ভুলে গেলি পল্টু?" এই সময়ে নিশি ফিরে এলো।

খাওয়া শেষে মুসলমান রিক্সওয়ালার গাড়ীতে পল্টু নিশিকে চ'ড়িয়ে, ধীরেনবাবু আর একটা রিক্সাতে চড়লেন। ধীরেনবাবুর কানে এলো ও দেখলেন, নিশি এক গাল হাঁসি নিয়ে বল্‌লো, "খুব adventure করেছিস্ যা হোক্।"

নিশির এই কথা শুনে ধীরেনবাবুর মনে হ'লো, আমাদের ছেলেরা এতই নির্ম্মম হয়ে পড়েছে যে, তার এই রিক্স ক'রে ছেলের অনুসন্ধানে ঘোরা, এতো কষ্ট, এ ছেলেদের কাছে কিছুই নয়—এতোই নিষ্ঠুর তারা।

বর্দ্ধমান ষ্টেশনে যখন নিশিকে আর পল্টুকে নিয়ে ধীরেন বাবু এলেন তখন রাত প্রায় ৪টা। রিক্সওয়ালাকে ধন্যবাদ দিয়ে এক টাকা দিলেন—সে খুশী হয়ে সেলাম ক'রে চ'লে গেল।

ধীরেন বাবু সপুত্র যখন বাড়ী ফিরে এলেন তখন সকাল আটটা। ফকিরের কথা বর্ণে বর্ণে সত্য হ'লো। আফিসে প্রফুল্ল মনে গিয়ে ধীরেনবাবু ঘোষাল সাহেবকে সন্দেশ খাওয়ালেন।

সন্ধ্যার পর প্রফুল্ল চিত্তে বাড়ী ফিরে এসে যা দেখলেন তাতে স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। পল্টুর প্রবল জ্বর—১০৫ ডিগ্রি। ভুল বক্‌ছে মাঝে মাঝে। বল্‌ছে, "বাবা পৈতার সময় ওই ফাউন্‌টেন পেন কিনে দিয়েছেন ও আমি কিছুতেই বিক্রী কর্ব্ব না। শশধর, ভাই, ওটা আমি বিক্রী কর্ব্ব না, কেড়ে নিস্‌নে, কেড়ে নিসনে ভাই।" খানিক পরে আবার বলছে, "চার আনা পয়সা আছে এখনও ফিরে যাই শশধর—মাকে ছেড়ে যাবো না।"

ধীরেনবাবুর সব শুনে চোখে জল এলো। ডাক্তারের ওখানে ছুটলেন। ডাক্তার মাথায় বরফ দিতে বললেন, shock-এ জ্বর হয়েছে, শীগগীর সেরে যাবে ব'লে আশ্বাস দিয়ে গেলেন।

অসুখ অবশ্য সেরে গেল, কিন্তু ধীরেনবাবু আর পল্টুকে বালীগঞ্জে না রেখে বিহারের এক কোণে তাদের কাছে মফঃস্বলে পড়তে পাঠিয়ে দিলেন,—সেখানে টকী ও শিশু সাহিত্যের এতো প্রভাব নেই।



ভারতীয় রূপাধারে মানব ও প্রকৃতি

শ্রীযামিনীকান্ত সেন

মানব ও প্রকৃতি বিশ্বের চিরন্তন রহস্যস্থানীয়। বাস্তবতার চরম প্রতীক হলেও অবাস্তব আলেয়ার মত জগতের শেষ সীমান্ত পর্য্যন্ত এদের আবির্ভাবে সমগ্র সৃষ্টি শিহরিত হচ্ছে। মানুষ আদম ও ইভের যুগে জ্ঞানবৃক্ষের ফল খেয়ে অধঃপাতে গেছে, এ যেমন খ্রীষ্টীয় বাইবেলের উক্তি, তেমনি "অমৃতস্য পুত্রাঃ" বলে সে চিরন্তন সুকৃতির ধারা বহন করেছে—একথা উপনিষদ বলে গেছে। ফলে,



নৃপতি —উত্তরভারত

মানুষের আন্তর্জাতিক ভ্রাতৃত্ব, কোথাও বা আদিম পাপ, (original sin) এবং কোথাও বা আদিম দেবত্বের উপর নিহিত, এরূপ কল্পনা হয়েছে। ফলে বিশ্বের রূপাধারে মানুষের বহুরূপ ও বিশ্বরূপ প্রকটিত হয়েছে। তেমনি প্রকৃতিও কোথাও বা প্রকটিত হয়েছে মানুষের চিরন্তন শত্রু ও বাধারূপে, যার উৎপীড়নকে দমন বা শাসন ক'রে মানুষ সুখের উৎস খুঁজে পেয়েছে। পঞ্চভূতের উপর কর্তৃত্ব করাই একাল চরম আহ্লাদের ব্যাপার বলে, রাবণের মত এ যুগ প্রকৃতি বিজয়ে অহোরাত্র ধ্যানমগ্ন হয়েছে। সেকাল যেমন অষ্টসিদ্ধির জন্য শবসাধন করতেও ত্রুটি করে নি এ যুগেও শবসাধন চল্‌ছে আরও কঠিন তপস্যাকে শিরোধার্য্য করে। অপর দিকে প্রকৃতি কোথাও বা চোখে পড়েছে আত্মীয়ের মত। এজন্য তপোবনে হরিণশিশু ও বৃক্ষবল্লরী মানুষের সুহৃদরূপে উদ্ভাসিত হয়েছে এবং প্রিয়জনের নিকট বার্ত্তা বহন করতে মেঘকেও দূতস্থানীয় করা হয়েছে। কাজেই প্রকৃতির রূপচর্চ্চায়ও এসেছে বিপরীত রসসঙ্গম। নানা সভ্যতা এসব সৃষ্টি করে, নিজেদের রসের অধিকার ও উপলব্ধির পরিধিকে নম্র করেছে।

বলা প্রয়োজন ইউরোপের তত্ত্বে সঙ্ঘাত ও বিরোধই হয়ে পড়েছে বড় কথা। পশ্চিমের কল্পিত বিবর্ত্তনের পথ হচ্ছে সঙ্ঘর্ষের। সেখানকার ভাবুকরা প্রকৃতির ভিতর দেখছেন, "struggle for existence" এবং "survival of the fittest", বেঁচে থাকবার সংগ্রাম ও যোগ্যতমের প্রতিষ্ঠা। সেক্সপীয়রের মত কবিরা যাদুর সাহায্যে প্রকৃতির উদ্দাম আন্দোলনকে শাসন করতে অগ্রসর—"Tempest" নাটকে এর প্রতিফলন আছে। কবিগুরু গোটের "Faust" নাটকেও প্রকৃতির গুপ্ত শক্তি আয়ত্ত করে তাকে বন্দীর মত উপস্থিত করা হ'ল একটা বড় রকমের কৃতিত্ব।

ভারতবর্ষে এর বিপরীত মনোভাবের প্রতিফলন দেখতে পাওয়া যায়। এখানে সৃষ্টিকে evolution বলা হয় না। প্রকৃতি হচ্ছে একটি তত্ত্বের প্রকাশক (expressia) এই প্রকাশের ভিতর সংগ্রামের স্থান নেই। বস্তুতঃ জগতের বহুত্ব একত্বের স্নিগ্ধ সূত্রেই বিধৃত। এই একত্বের প্রতিভূরূপে বুদ্ধদেব অসংখ্য জন্মগ্রহণ ক'রে পূর্ব্বজন্মাদিতে পশুপক্ষী প্রভৃতির রূপ ধারণ ক'রে সমগ্র জগৎ প্রপঞ্চের অন্তর্নিহিত মৈত্রী ও প্রেমকে প্রস্ফুট করে তুলেছে। এমন কি এখানে প্রাকৃতিক প্রলয়কেও সৃষ্টির আবেগের অন্যতম ভাবে দেখা হয়েছে। নটরাজের নৃত্য ধ্বংসের

নয় সৃষ্টিরই দ্যোতক। সমগ্র জগৎ একটা সৃষ্টির পরম্পরা মাত্র। এই আশ্লেষমূলক তত্ত্ব মানব ও প্রকৃতির ভিতর এক বন্ধুতা স্থাপন করেছে। এজন্য শকুন্তলা নাটকে লতাকে বলা হয়েছে "লতাভগিনী"। বৃক্ষেরা শকুন্তলার পতিগৃহ গমন কালে উপঢৌকন দান করিতে উদ্যত।

একদিকে এই ঐহিক মৈত্রীবাদ, অন্যদিকে এসেছে এক দিব্য সংস্পর্শ। ভারতের ব্রহ্মতত্ত্ব সমগ্র প্রপঞ্চের রহস্যকে অনুধাবন করে প্রকৃতির ভিতর আত্মাকে অনুস্যূত দেখেছে। সমগ্র ঐহিক বহুত্ব একেরই লীলা। কাজেই জলে, স্থলে, অনলে, অনিলে উপলব্ধি হয়েছে দেবতার শক্তি। জলের স্নিগ্ধতায় মানব মুগ্ধ, স্থলের কঠিনতা মানবকে স্থিতি দান করেছে অনলের দাহিক শক্তি মানুষের একটি সম্পদ্ এবং বায়ুর ব্যজন দক্ষিণ পবনের ভিতর দিয়ে আশীর্ব্বাদের মতই অনুভূত হয়েছে। কিন্তু এসমস্ত যে একান্তভাবে জড় পদার্থের দান নয় কয়েকটি রাসায়নিক সমবায়ের হাতেই যে এর কর্ত্তৃত্ব নেই ভারতীয় সভ্যতা তা বিশেষভাবেই উপলব্ধি করেছে। এজন্য হিন্দু কল্পনা এসব শক্তি প্রাচুর্য্যকে দেবতায় রূপদান ক'রে আনন্দ লাভ করেছে। ফলে অরণ্য-দেবতা ও জল-দেবতারা অপরূপ মূর্ত্তিলাভ করেছে ভারতীয় কলায়। এসব মূর্ত্তি প্রাকৃতিক বিভবকে অপূর্ব্ব রূপে মণ্ডিত করেছে।

কিন্তু রূপের এই সমস্ত আধার ঐহিক উপাদানকে তুচ্ছ করে নি। ভারতীয় তত্ত্বে ঐহিক ও তুরীয়ের ভিতর এক সমন্বয় সাধন করেছে—এজন্য যে হিসেবে Byzantine চিত্র-কলার খ্রীষ্ট বিষণ্ণ, কঠোর ও বিশীর্ণ রূপ অধ্যাত্মপদ বাচ্য হয়েছে—সে হিসেবে বিরোধমূলক কোন একদেশদর্শী তত্ত্বকে ভারতীয় রূপমণ্ডলে স্থান দেওয়া হয় নি। কাজেই ইউ-রোপীয়েরা এদেশের তথাকথিত বাস্তবতাহীন, (non-realistic) মানব ও প্রকৃতির রচনাকে আধ্যাত্মিক বলে এসমস্তের ভূমিষ্ঠ প্রেরণাকেই অবজ্ঞা করে থাকেন। ভারতের তন্ত্রকারগণ যোগকে ভোগ এবং ভোগকেই যোগ ব'লে রূপ-রস-গন্ধের আকর্ষণকে উচ্চতর পাদপীঠে স্থাপন করেছেন। এজন্য দেবমূর্ত্তিও মানুষের রূপ পরিগ্রহ ক'রে মানুষের বেশভূষা ও ভঙ্গীকে মর্য্যাদা দান করেছে। দেবতারা সুদর্শন, অলঙ্কারে ভূষিত, এবং কোনরকম শুষ্ক, রোগগ্রস্ত বা বিশীর্ণতা এসবের ভিতর নেই।

গ্রীক শিল্প শরীরকে মর্য্যাদা দিয়ে আর সকল স চিহ্নকে মুছে দিয়েছে। তা'তে ক'রে মাংসের পেশী স্পষ্ট



গঙ্গা　　—উত্তর ভারত

হয়েছে—মনের পেশী নয়, অথচ মানুষের যথার্থ সত্তা মনের—দেহের নয়। মনের আলোকই মানুষকে প্রাণবান্ করে—মাংসখণ্ডের সে বাণী নেই। গ্রীক শিল্প মনের উদ্ঘাটিত করতে পারে নি। ইউরোপীয় শিল্পে, সুতরাং-

প্রভৃতি সমালোচকেরা বলেছেন, গ্রীক শিল্প জটিল মনস্তত্ত্ব পাথরের মূর্ত্তিতে উদ্‌ঘাটিত করতে পারে নি। উইঙ্কেলম্যান বলেন, গ্রীক-মূর্ত্তির সব কয়েকখানি মুখই প্রায় এক রকম। অপরদিকে ডেগাসেটা বলেন যে, শরীর ভঙ্গীর সহিত মুখের



পূজারতা নারী — কুম্ভকোনম্

ভঙ্গীর মিল গ্রীক আর্টে নেই। এমন কি Laocoon নামক বিখ্যাত মূর্ত্তিতে যে যন্ত্রণার চিহ্ন আছে তা শরীরের, মনের নয়।

কাজেই দেখা যাচ্ছে, বস্তুতন্ত্র রচনা করতে গিয়েও গ্রীক-শিল্প হয়ে পড়েছে অ-বস্তুতন্ত্র। অপরদিকে অন্যান্য সভ্যতার রচনার কথাও বিচার করা যাক। মিশরের মূর্ত্তিতে খুঁটিনাটি বস্তুতন্ত্রের প্রয়াস নেই। মাংসপেশী, শিরাউপশিরা, চর্ম্মের কুঞ্চিত বা শিথিল অবস্থা এমন কি হাড়ের কাঠামোও তাতে অনুকৃত হয়নি। অথচ এই মূর্ত্তিশিল্প হয়েছে স্থিতিশীল ও গতিহীন শবের মত। অপরদিকে অসিরীয় মূর্ত্তি বাস্তবতার চরমস্তরে পৌঁছিয়েছে অথচ তা'তে ফল হয়েছে বিপরীত। প্রত্যেক খুঁটিনাটি ব্যাপার, কাপড়-চোপড়ের নিপুণ সূচিকর্ম্ম, চুলের আকুঞ্চিত গুচ্ছ, মুখের কেশপাশ, বাহু ও পদের পেশী-সমূহ এসবকে এমনি করে একটা বাস্তবতার অত্যুক্তির বাহু রচনা হয়েছে যে ফলে মূর্ত্তিটি অবাস্তবই হয়ে পড়েছে—মিশরীয় রচনার মত। অসিরীয় মূর্ত্তি স্থিতিশীল নয়, গতিবেগে মণ্ডিত। জন্তু রচনায় এ প্রাচীন জাতির দক্ষতা বেশী।

ভারতবর্ষের রচনায় গতি, স্থিতি এ দু'টি অবস্থাই প্রকটিত হয়েছে। নটরাজে গতিবেগ ও ধ্যানীবুদ্ধের স্থিতিত্ব অনেকেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। বস্তুতঃ ভারতীয় শিল্প আরও গভীরতর তত্ত্বের উপর নিহিত। ধ্যানীবুদ্ধের আপাত দৃষ্টিতে প্রতীয়মান স্থিতির ভিতর আন্তরিক মানসগতির অভ্রান্ত হিল্লোল দেখা যাবে এবং নটরাজের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের হিল্লোলের ভিতর অন্তরঙ্গ পরিপূর্ণ প্রশান্ত অবস্থা প্রকট হবে। মনে হবে, অসীম শান্তিকেই এই নৃত্য রূপগ্রাহী করেছে—এর ভিতর উত্তেজনা নেই, লঘু আস্ফালন নেই—সবই শান্ত ও শিবের দ্যোতক। বিরোধের ভিতর এই ঐক্য শুধু ভারতবর্ষই লক্ষ্য করেছে। এ সমস্ত কারণে ভারতের মূর্ত্তিও জগতের ইতিহাসে নিজের মহিমায় এককই হয়ে আছে—এর আর দ্বিতীয় কোথাও নেই। সাহেবদের পক্ষে এসব মূর্ত্তি বিচার একটা অসম্ভব ব্যাপার। স্কেলই হোক্, রদেনষ্টিনই হোক্ ভারতীয় শিল্প বিচারের অধিকার, ভারতীয় তত্ত্ব সম্বন্ধে অজ্ঞ কারও নেই। এজন্য পদে পদে এদের ভ্রান্তি। দুঃখের বিষয়, ওদের প্রতিধ্বনি করা ছাড়া এদেশের লঘু আলোচকদের পক্ষে আর কিছুই সম্ভব হয় নি।

মানব ও প্রকৃতি তাই ভারতীয় রূপাধারে অনির্ব্বচনীয় শ্রী-লাভ করেছে। ভারতবর্ষ যখন রাজার মূর্ত্তি রচনা করেছে—তখন তাকে রাজার রাজা যিনি তারই সঙ্গে যুক্তভাবে কল্পনা করেছে। রাজা ভূপতীন্দ্র মল্ল করযোড়ে মন্দিরের সম্মুখে

দীর্ঘ স্তম্ভের উপর রচিত সিংহাসনে তিনি উপবিষ্ট, মস্তকে রাজছত্র, পার্শ্বে সুতীক্ষ্ণ তরবারি। প্রতিজনের দিক হ'তে এ মূর্ত্তিকে আর কিছু পরাজয় করতে পারে না। ঐহিক ও তুরীয় সকল সম্পর্কে মণ্ডিত হ'য়ে রাজাধিরাজ গৌরবে উদ্ভাসিত। এ-রকম সৃষ্টি জগতের আর কোথাও নেই। অপর দিকে বিপরীত ক্ষেত্রে এসে বৌদ্ধ পুরোহিতের একটি মূর্ত্তি আলোচনা করলে দেখা যাবে অটল, নিভিকতা বলিষ্ঠ পৌরুষ আত্মসমর্পণ করেছে জগতের সেবায়। স্থির দৃষ্টি, প্রশান্ত ললাট, সামান্য বসনে যে ঊর্দ্ধ-লোকে বার্ত্তা বহন করে নিজকে ধন্য মনে করছে। সমগ্র রচনা মনের একটা বিশিষ্ট অবস্থাকে দ্যোতিত করছে, যা পাথরে ফুটিয়ে



বৌদ্ধ পুরোহিত —দক্ষিণভারত



দোলনা —রাজপুতচিত্র

তোলা কঠিন। বস্তুতঃ কোন ভারতের শিল্পই তা করতে পারে নি।

মানবত্বের অন্তদিকও প্রকাশ করা হয়েছে। অজন্তার বুদ্ধসমীপে উপনীত "মা ও মেয়ে" এক অভূতপূর্ব্ব রচনা। দক্ষিণ ভারতীয় ভাস্কর্য্যের নমুনা হতে একটি পূজারিণী নারীর প্রতিকৃতি দেওয়া গেল। বিনয়, ভক্তি, আত্মসমর্পণ, শ্রদ্ধা ও ভক্তিতে পরিপূতা এই রমণীর সাকার শ্রী অতুলনীয়। স্বাভাবিকতার দিক হ'তে এ-মূর্ত্তি গ্রীক রচনার নিকট হার মানে না। ভিনাসের মূর্ত্তিতে যে অসংলগ্ন ও মাংসল মানবিকতা আছে এ মূর্ত্তিতে তা নেই। এ সমস্ত মনপ্রাণ আত্মসমর্পণে উদগ্রীব—তাই পার্থিব অপার্থিব সম্পর্ক এই মূর্ত্তিটিকে একটা গভীরতর বাস্তবতা

দান করেছে। মানুষের একান্তভাবে যে অসীমের সহিত যোগ আছে তা'কে তার কোন প্রতিরূপ রচনা তুচ্ছ করতে পারে না—কারণ তা' হ'লে তাকে অঙ্গহীনই করা হবে।



নারী ও প্রাকৃতিক দৃশ্য —রাজপুতচিত্র

প্রকৃতির রূপব্যাঞ্জনাও এরূপে মানুষের সহিত যুক্ত হয়ে পূর্ণতর হয়েছে। ভারতের রাগিণীমূর্ত্তি অঙ্কনে মানব ও প্রকৃতির এই অঙ্গাঙ্গী ভাব দীপ্যমান হবে। তিনটি নারীর প্রশাখোপরি অবস্থানকে পশ্চাতের প্রাকৃতিক দৃশ্য একটি চমৎকার পটভূমি (back ground) দান করে রসসৃষ্টি করেছে। অপরদিকে নারীদ্বয়ের "দোলা" উচ্চভূমির অবকাশ-কুটির ও জলাশয়কে যেন প্রাণবান্ করে তুলেছে মনে হয়। এমনি করে একান্তভাবে মানব বর্জ্জিত গাছপালা রচনা করে ভারতীয় শিল্প তৃপ্ত হয় নি। কারণ মানুষের মন থেকে বিযুক্ত হলে প্রকৃতির কোন অস্তিত্বই থাকে না। তত্ত্বের দিক হ'তে তা' হ'য়ে পড়ে অবাস্তব—মানুষের সংস্পর্শ ই সোনার কাঠির মত প্রকৃতিরাণীর প্রাণদান করে। এজন্য তত্ত্বের দিক্ প্রতীচ্য landscape বা স্থলচিত্র একটি মায়িক রচনা মাত্র।

ভারতীয় শিল্প প্রাকৃতিক ব্যাপারকে আরও গভীরতর দিক দিয়ে দেখেছে। হিমালয়কে যেমন 'দেবতাত্মা' বলা হয়েছে তেমনি সমৃদ্ধা ও আত্মীয়া স্থানীয় ভারতীয় নদ-নদীকেও দেবতার মর্য্যাদা দান ক'রে ভারত তৃপ্তিলাভ করেছে। টেম্‌স্ নদী বা টাইবার নদী এ মর্য্যাদা লাভ কখনও করেনি। দেবীরূপে কল্পিতা গঙ্গা ও যমুনা ভারতীয় শিল্পের অতি উৎকৃষ্ট সৃষ্টি। কণারকের যমুনা ও নেপালের গঙ্গামূর্ত্তি ভূষণ-মণ্ডিতা বরাভয়করা। আদ্যোপান্ত বহু রূপক ও ইঙ্গিতে এ সব রচনা পরিপূর্ণ। নদ-নদীকে এ রকম বিস্ময়জনক রূপ দান করা শুধু ভারতেই সম্ভব হয়েছে। জল শুধু জল নয়, আমাদের জীবনদাত্রী মাতা। এই অপরূপ রূপে প্রকৃতি ভারতের নিকট বারবার আবির্ভূত হইতেছে।

ছেঁড়া চিঠি

শ্রীমতী পরিমলরাণী রায়

ঘুম ভাঙ্গিল বিকাল বেলায়।

রবিবারের দুপুর; কর্ম্মহীন অলস দিন; একেবারে অসাড় হইয়া পড়িয়াছিলাম। ঘুমাইয়াছিলাম সেই এগারটায়···আর ভাঙ্গিল পাঁচটায়; এবং ভাঙ্গিবার সঙ্গে সঙ্গেই চায়ের নেশাটা ভাঁতিয়া উঠিল ভয়ঙ্কর ভাবে—মেসের নিকটেই রেস্তোঁরা; মিনিট তিনেকের পথ। অর্ডার দিলে বয় আসিয়া মেসে চা পৌঁছাইয়াও দিয়া যায়। কিন্তু, মিনিট তিনেকের পথ আসিতে যেটুকু উত্তাপ তাহা হইতে উড়িয়া যায়, আমার কাছে তাহাই ঠাণ্ডায় বিস্বাদ বোধ হয়, কাজেই, চোখে মুখে একটু জল ছিটাইয়া দোকানের দিকে চলিলাম।

মিনিট খানেক আসিয়াই রাস্তার ডাষ্টবীন; একটু আগেই মেথরে পরিষ্কার করিয়া গিয়াছে। চারি পাশে এখনও তাহার একটু আধটু চিহ্ন পড়িয়া রহিয়াছে। সেই অল্প বিস্তর ময়লার উপর সাদা একখানা লেখা কাগজ পড়িয়া আছে। উপরের দিকে খানিকটা অংশ ছেঁড়া···হয় তো কাহারও চিঠি; পড়িয়া দেখিয়া নিষ্প্রয়োজনে ফেলিয়া গিয়াছে। নিতান্ত তুচ্ছ সামগ্রী···

রাস্তায় এমন কতই পড়িয়া থাকে। চোখে পড়িলেও, নজর করি না, করিবার ইচ্ছা বা দরকারও হয় না। কিন্তু খোলা চিঠি খানির উপর নজর পড়িতেই সহসা থমকিয়া দাঁড়াইলাম। বেশ একটু বড় বড় এবং কাঁচা অক্ষরে মাথা জুড়িয়া লেখা—বাঁচাও, বাঁচাও—মৃত্যুর কবল হইতে সমগ্র পরিবারকে রক্ষা কর; দোহাই তোমার—কৌতূহল অসম্বরনীয় হইয়া উঠিল। ডাষ্টবীনের তলা হইতেও মেথরে ছোঁওয়া চিঠিখানি কুড়াইয়া লইতে বাধ্য করিল। স্বতঃই মনে সন্দেহ জাগিল—হয় তো কোন হতভাগ্য পরিবারের মর্ম্মান্তিক দুঃখের কাহিনী বিবৃত আছে ঐ অবহেলিত চিঠিখানির বুকের পাতায়। হয় তো নিদারুণ অর্থাভাবের মর্ম্মন্তুদ আর্ত্তনাদ; কিন্তু···পত্রের ভাষায় আরও সাংঘাতিক ব্যাপারের সন্দেহ—ছায়ার মন আপনিই আচ্ছন্ন হইয়া পড়ে। সমগ্র পরিবারকে বাঁচাইবার জন্য কোন নির্দ্দিষ্ট ব্যক্তিকে আকুল আহ্বান··· যে ব্যক্তি বাঁচাইবার ক্ষমতা রাখে, তাহারই হাতে যেন ইহাদের বাঁচিবার সব কিছু উপায় রহিয়াছে··· অথচ, সে ইচ্ছা করিয়াই বাঁচাইতে বিমুখ···যেন নৃশংসতায় দূরে সরিয়া গিয়াছে। কিন্তু, এই সমগ্র পরিবারের মৃত্যুরই বা কারণ কি? আর রক্ষাকর্ত্তারই বা এমনভাবে দূরে পলাইয়া বেড়াইবার সঙ্গত হেতু কি? সেই বা বাঁচাইতে রাজী নহে কোন ভয়ে? এবং তাহারাই বা তবু তাহাকেই ধরিয়া বাঁচিতে চাহে কেন? রক্ষাকর্ত্তা আর করুণাপ্রার্থীর মধ্যে অতি কদর্য্য এক গূঢ় সংশ্লিষ্টতারই পরিচয় নিরূপণ করিতে মুহূর্ত্ত দ্বিধা করিলাম না। হয়তো কোন সম্ভ্রান্ত বংশের মর্য্যাদায় কলঙ্কের কালি লেপিয়াছে; তাহারই গ্লানি মুছিতে সমগ্র পরিবারের মৃত্যু ছাড়া উপায় নাই। বিশেষতঃ, কাঁচা হাতের অপরিপুষ্ট অক্ষরগুলি মেয়েলী হাতের লেখার মতই মনে হয়।

সেইখানে দাঁড়াইয়া চিঠিখানি আগাগোড়া পড়িয়া ফেলিলাম।—ছেঁড়া চিঠি প্রথম পাতা আদৌ নাই। দ্বিতীয় পৃষ্ঠারও উপরের দিকে একটুখানি ছেঁড়া; তারপর উপরোক্ত লাইনটি; ক্রমে পড়িয়া চলিলাম—

দোহাই তোমার বড়দা, তোমার পায়ে পড়ি; সংসারের দিকে একটু চাহিয়া দেখ। আমি তোমার ভাই; আমার দিকে না চাও, বাবা মার দুঃখের কথাটাও কি ভাবিয়া দেখিবে না? মায়ের পরণে কাপড় নাই! ঘরের বাহির হইবার উপায় নাই তাঁহার। আমি পড়াশুনা ছাড়িয়া দিয়াছি, দরকারও নাই। শিক্ষার শোচনীয় অবস্থা চোখের চারিদিকে অবিরত দেখিতেছি; তাহাতে লেখা-পড়ার উপর আমার ঘৃণা জন্মিয়া গিয়াছে। শিক্ষার অহঙ্কার লইয়া অন্যায় অপকর্ম্ম করার চেয়ে অশিক্ষিতের অবিবেচকতার অন্যায় অনেক ভাল। তাহাতে মনকে সান্ত্বনা দেওয়া মত একটা অবলম্বন পাওয়া যায়। অপরাধের মাত্রাও কম হয়। সুতরাং, আমার জন্য মাথা ঘামাইবার তোমায় দরকার নাই। কিন্তু বাবা···বাবা মৃত্যুশয্যায়। থাইসিস্ বলিয়াই সন্দেহ হয়। অনাহারের সঙ্গে তোমার জন্য দুশ্চিন্তাই আজ তাঁহার এই শোচনীয় অবস্থা। শেষ বৎসরটির

তোমার পড়া তিনি বন্ধ করিতে পারেন না। অথচ কি কষ্টে যে প্রতিমাসে তোমাকে নিয়মিত খরচ যোগাইতে হইতেছে? বাড়ীঘর সব অনেক আগেই বিক্রয় হইয়া গিয়াছে···সম্পত্তি বলিয়া কিছু আর অবশিষ্ট নাই···দেনায় তাঁহার মাথার চুল বিক্রয় হইতেছে। পাওনাদারের তাগিদ, নির্য্যাতন আর অপমান ভোগ লাগিয়াই আছে।

ইহার জন্ত দায়ী তুমিই। তোমারই ডাক্তারী পড়ার দুরূহ ব্যয় চালাইতে আজ তিনি সর্ব্বস্বান্ত···মানুষের কাছে ঘৃণার পাত্র···জীবন্মৃত অবস্থায় তাঁহার এই দুঃসহ জ্বালা প্রতি মুহূর্ত্তে তিল তিল করিয়া মৃত্যুর মুখে আগাইয়া যাইতেছেন। তবু, তোমাকে মানুষ করিবার চেষ্টা করিতেছেন। তুমি পাশ করিয়া ডাক্তার হইবে; তাঁহার মুখ উজ্জ্বল করিবে এবং উপায়ক্ষম হইয়া তাঁহার সকল দুঃখ ঘুচাইবে—এই আশায়ই তিনি বুক বাঁধিয়াছিলেন। কিন্তু, তুমি···তুমি তাঁহার সকল আশায় ছাই দিয়াছ!···

তোমার ন্যায্য খরচ অপেক্ষাও প্রতি মাসে তুমি তাঁহার গায়ের রক্ত শুষিয়া লইয়া স্ফূর্ত্তি আর আমোদ প্রমোদে উড়াইতেছ। তুমি গরীবের ছেলে। অন্যান্য ছেলেদের চেয়ে তোমার বরং কম খরচ লাগা উচিৎ। কিন্তু, তুমি ···থাক—

তোমার সম্বন্ধে সমস্ত সংবাদই তিনি পাইয়াছেন। সে সব মিথ্যাও নহে। ক্রমাগত তোমার টাকার চাহিদাই তাহার সাক্ষ্য দেয়। কারমাইকেল কলেজে ডাক্তারী পড়িতে হোষ্টেল খরচ শুদ্ধ প্রতি মাসে তোমার যাহা লাগে বা লাগা সম্ভব···তাহাও আমরা জানি। কিন্তু, যে টাকা তুমি লইয়া থাক, সে যে কতবড় অস্বাভাবিক অমিতব্যয়িতার পরিচায়ক, পরবর্ত্তী পৃষ্ঠায় দুই রকমেরই যে হিসাব দিলাম, তাহাতেই বেশ বুঝা যাইবে। দেখিও কত টাকা তুমি খেয়ালে উড়াও। ···আর আমরা দিনান্তে একমুঠা ভাতের কাঙাল···

তুমি কি বুঝিবে না বড়দা; তোমার কি একটু দয়ামায়া হয় না। তোমার সুখের জন্ত তোমারই বাপ, মা, ভাইকে অনাহারে রাখিতে তোমার হৃদয়ে একটু করুণা জাগে না?

এমনই আরও অনেক করুণ কাহিনী···ব্যথার গভীর ছাপ; কাগজের সাদা পাতায় যেন বুক ছেদিয়া দাগ বসিয়াছে। সব শেষে নাম সহি···ইতি দিয়া হতভাগ্য নিরুপম বসু...যেন অতি দুঃখের একটি টানা দীর্ঘশ্বাস!

ছেঁড়া পাতায় যতটুকু পাওয়া গেল, রুদ্ধ নিঃশ্বাসে সবটুকু পড়িয়া খানিকক্ষণ স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। ···এমনই সংসারের দিকে দিকে কত রকমের শয়তান যে খোলসে গা ঢাকিয়া কত লোকের কত রকমের সর্ব্বনাশ করিতেছে, কে তাহার খোঁজ রাখে?

অপরিচিত লোকটি আমার অ-দেখা; কিন্তু নির্দ্দয় তাহার অমানুষিকতা···অন্তর জ্বলিয়া উঠিতেছিল তাহার উপর···আর তাহারই নিরন্ন সংসারের অভাগাগুলির নিদারুণ দুঃখে যেন মোচড় লাগিয়াছিল আমারই বুকে। কিন্তু রাগ বা সহানুভূতি আমার পক্ষে সমানই নিরর্থক···

···নিকটেই কারমাইকেল হোষ্টেল; রাস্তার পাশেই ভিতরের দিকে তিনদিক বেড়িয়া প্রকাণ্ড তিনতলা বাড়ী, অসংখ্য ঘর; রান্নাই চলে অমন পাঁচ সাত যায়গায়—

ঠাকুর, চাকর, দারোয়ান কতকগুলি; এমন কি 'বয়' 'বেয়ারা' পর্য্যন্ত অহরহ বাবুদের ফরমাস খাটিয়া হয়রান হয়। আরাম নিকেতনের আরাম পিয়াসী বাবু সব···টিনের খোড়ের একতলার মেসে বাস করিয়া উহাদের দিকে তাকাই মহাসম্ভ্রমে...উহাদের জীবনযাত্রার সব কিছু বিলাসভরা স্বচ্ছলতায় প্রাণে ঈর্ষা জাগে···উহাদের সঙ্গে তুলনায় নিজেদের দৈন্যে ব্যথাও পাই···অথচ, উহাদেরই মধ্যে এমন হতভাগাও আছে; বাপ, মা, ভাইয়ের রক্ত শুষিয়া আসিয়াছে ডাক্তারী পড়িতে···অধিকন্তু, বিলাসস্রোতে গা ভাসাইয়া সগর্ব্বে উপভোগ করিতেছে আত্মপ্রসাদ—

বিতৃষ্ণার একটা ঝাঁঝ লইয়া রাস্তাতে চলিলাম। একটু যাইতেই দেখি, রাস্তায় গ্যাসপোষ্টের তলায় একজন লোক দাঁড়াইয়া আছে এবং একান্ত আগ্রহে রাস্তার দিকেই তাকাইয়া আছে। কাহারও প্রতীক্ষা করিতেছে সম্ভবতঃ। লোকটিকে চেনাচেনা, মনে হইল। একটু মনোযোগ করিয়া দেখিতেই চিনিতে পারিলাম—গ্রামের জগবন্ধু জ্যাঠা; রক্তের সম্বন্ধ কিছু নাই, জাতি গোত্রও

নহে; আমি ঘোষেদের ছেলে সত্যশরণ…তিনি ভগবতী দত্ত…গ্রাম-সুবাদের জ্যাঠা। কাছে আসিয়া পায়ের ধূলি গ্রহণ করিলাম। আহ্লাদে তিনি বলিয়া উঠিলেন, আরে সত্য যে! যাক্, বাঁচা গেল। বাঁচাইবার কারণ তখনও আমার কাছে অজ্ঞাত। কিন্তু মনে হইল যেন, মস্ত বড় একটা কিসের দুরূহ সমস্যা তাঁহার, আমাকে পাইয়াই হঠাৎ সমাধান হইয়া গেল। কি যে দুর্ভাবনা এবং আমার দ্বারাই বা বাঁচিবার কি অবলম্বন তিনি পাইলেন, বুঝিতে পারিলাম না। কৌতূহল হইল এবং জিজ্ঞাসাও করিলাম—ব্যাপার কি এবং কি জন্যই বা তাঁহার কলিকাতায় আসা?…

ভগবতী জ্যাঠা বলিলেন, "তোমার জ্যেঠাইমার সেই হাঁপানীর অসুখটা ছিল; সে তো তুমি দেখেই এসেছিলে?"

ঘাড় নাড়িয়া সম্মতি জানাইলাম—হাঁ; সে আমি দেখিয়াই আসিয়াছি।

এক আধ দিনের রোগ তাঁহার নহে, দীর্ঘকাল ধরিয়া কাটা মাছের মত তাঁহাকে ধুকাইতেছে। রক্তমাংস বলিয়া শরীরে কোন পদার্থ নাই। হাড় কয়খানি জোড়াতাড়া দিয়া একটি কঙ্কাল মাত্র অবশিষ্ট রাখিয়া ছাড়িয়াছে। বুকের হাড়ের মধ্যে পাতলা চামড়ার তলায় প্রাণটি যেন প্রতি মুহূর্ত্তেই ছুটিয়া বাহির হইবার জন্ত ধুক্ ধুক্ করিতেছে। অবস্থা দেখিয়া কষ্ট পাইয়াছিলাম। ভগবতী জ্যোঠাকে অনেক করিয়া বুঝাইয়া আসিয়াছিলাম, যে ভাবে হউক, জ্যোঠাইমাকে একবার কলিকাতায় লইয়া গিয়া যেন শেষ চেষ্টা করেন। হয় তো মরিতেও পারে… না মরিলেও, লোকটার এত কষ্ট তো অন্ততঃ একটু কমিবে?

জ্যাঠা উত্তর দিয়াছিলেন, অত্যন্ত করুণ এবং নিঃসহায় ভাবে—বুঝি বাবা…সবই বুঝি…কিন্তু—বড় দুঃখে একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়িয়া উদগত অসহায়তার কথাটা আর শেষ করিলেন না। বুঝিলাম, কোথায় তাঁহার আঘাতটা লাগিয়াছে। ইচ্ছা ছিল না—দারিদ্র্য দুঃখের অনুভূতিটা খোঁচাইয়া দগ্‌দগে করিয়া তুলিতে। তাঁহার অবস্থা আমার জানা ছিল। অত্যন্ত অভাব…একটি পয়সা রোজগার নাই… সংসারে সাহায্যেরও দ্বিতীয় প্রাণী নাই। নিজে তিনি সারাটি জীবন রোজগারহীন নিতান্ত একটি পরগাছার মতই সংসারের ভার হইয়া আসিয়াছেন। এবং অত্যন্ত সাধারণ গৃহস্থ ঘরের উল্লেখযোগ্যহীন যৎসামান্য সম্বল একটু একটু করিয়া খোয়াইয়াই এতকাল ধরিয়া সংসার চালাইয়া আসিতে বাধ্য হইয়াছেন। জীবন ভরিয়া এইরূপ ক্ষয়ে সমস্তই নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে। সংসারের ভার এখন অত্যন্ত ভয়ঙ্কর এবং মারাত্মক রূপ ধরিয়া তাঁহাকে একেবারেই মুসড়াইয়া দিয়াছে। বয়স্থা একটি অনূঢ়া মেয়ে…বিবাহের বয়সও অনেক কাল উত্তীর্ণ হইয়া অর্থহীন অযোগ্য বাপের গলায় কাঁটার মত অসহ্য হইয়া বিঁধিতেছে। তারপর—রুগ্না স্ত্রীর পথ্যাপথ্যও চিকিৎসা—

ইদানীং স্ত্রীর রোগটা আবার অতিমাত্রায় বাড়িয়া উঠিয়াছিল এবং যেন দারিদ্র্যের উপর ভগবানের অকারণ কশাঘাতের মতই রোগের উপসর্গগুলিও অতিমাত্রায় বীভৎস ভাবে নানা প্রকারে তিল তিল করিয়া দগ্ধাইতেছিল। হাঁপানীর সঙ্গে দম বন্ধ হইয়া প্রতিমুহূর্ত্তেই রোগিনীকে জীবন ও মৃত্যু যেন দুইদিক দিয়া হিঁচড়াইয়া টানাটানি করিতেছিল।

ভগবতী জ্যাঠার অপরাধ কি? তিক্তবিরক্ত ইহাতে সকলেই হয়। তিনিও অগত্যা যৎকিঞ্চিৎ যাহা কিছু শেষ সম্বল ছিল, তাহাই ধ্বংস করিয়া কলিকাতায় চলিয়া আসিয়াছেন এবং রোগিনীকে কারমাইকেল হাঁসপাতালের ফ্রি-বেডে সম্পূর্ণ পরানুগ্রহে ছাড়িয়া দিয়া দায়ীত্ব অনেকখানি হাল্কা করিয়াছেন। অভিভাবক শূণ্য বাড়ীতে মলিনাকে একলা ছাড়িয়া আসা সম্ভব নয়। সেইজন্ত তাহাকে লইয়া নিজে স্বতন্ত্র বাসা করিয়া বাস করিতেছেন।

সমস্ত ব্যাপার জানাইয়া ভগবতী জ্যাঠা বলিলেন, "সামান্ত যা কিছু সঙ্গে এনেছিলাম, তা তো এই পর্য্যন্ত আসতে গাড়ী ভাড়া, বাসভাড়া আর রুগীর 'পত্তি-পাচনেই' দেখতে দেখতে উড়ে গেল। কি যে দুর্দ্দশা হ'তো? বোধ করি না খেয়েই মরতে হ'তো। কিন্তু, বাবা, ভগবান বাঁচিয়ে দিয়েছেন। তিনি না দয়া ক'রলে, নিঃস্বপর যেচে প'ড়ে এত অনুগ্রহ ক'রবে কেন?"

অলক্ষ্য দয়াশীল ভগবানকে দুইহাত কপালে ঠেকাইয়া নমস্কার নিবেদন করিলেন। আমার বড় কৌতূহল হইল। জিজ্ঞাসা করিলাম, "কি রকম বলুন তো?"

রাস্তার মধ্যে আঙ্গুল দিয়া একটী ছেলেকে নির্দ্দেশ

করিয়া বলিলেন, "ঐ যে ছেলেটীকে দেখছো না ? উনিই আমাকে রক্ষা ক'রেছেন। ডাক্তার উনি···কারমাইকেলের ফোর্থ ইয়ারের ছাত্র। খুব বড়লোকের ছেলে। মেসে থাকেন। রুগীর দেখাশুনো, সমস্ত তদ্বির নিজের লোকের মতই করেন। এতটুকু অসুবিধা যাতে না হয়, সেদিকে সব সময় নজর আছে। আমার সমস্ত অবস্থা একটি একটি ক'রে খুঁচিয়ে জেনে নিয়ে নিজের থেকেই উনি আমাদের সব ভার গ'ছে নিয়েছেন। লজ্জা পাই বাবা ; কিন্তু 'না' বলবার জো নেই।"

রাঁস্তরার ভিতরে অনেকগুলি ছেলে ; সকলেই কারমাইকেলের ছাত্র ; হ্যাটকোটধারী, যেন সদ্য-বিলাত ফেরতের একটি দল। কোটের ইন্‌সাইড পকেট হইতে ষ্টেথিসকোপগুলি উঁকি দিয়া ডাক্তারের পরিচয় দিতেছে।

ভগবতী জ্যাঠার নির্দ্দিষ্ট ছেলেটির দিকে তাকাইয়া চোখ আর সহসা ফিরাইতে পারিলাম না। উন্নত বলিষ্ঠ চেহারার একটি সুশ্রী যুবক ; অনেকগুলি ছেলের মধ্যেও যেন কেমনই এক স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল হইয়া চোখে লাগে।···তাহারই ফরমাসে রাঁস্তরার কারিকর, 'বয়', মালিক পর্য্যন্ত অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছে। চা—টোষ্ট—চপ-কাটলেট···অবিরত প্রচুর ফরমাস চলিতেছে। সে-ই দলের কাপ্তেন এবং তাহারই পয়সায় টিফিন চলিতেছে। খাইবার অনাগ্রহ কাহারও নাই। খাওয়াইবার মালিকেরও কৃপণতা বা কুণ্ঠা নাই। খরচেরও অভাব নাই। ব্যয়ের প্রয়োজনীয়তায় যেন সে প্রশ্ন জাগিবারই ফুরসুৎ পায় না।

হয়তো অবস্থা যথেষ্ট ভাল ; সঙ্গে ছাত্র-প্রাণের স্বাভাবিক উদার মনোবৃত্তি আর অস্বাভাবিক বেপরোয়া ফুর্ত্তিপ্রয়াসীচিত্তে সংসারের অভাবের কোন দাগ পড়িবার সুযোগ পায় নাই। কিন্তু—

সহসা মনে প্রশ্ন জাগিল—এই ছদ্ম আবরণের নীচে পত্রোল্লিখিত সেই শয়তান লুকাইয়া নাই তো ? কিন্তু··· না, না, তাহা কি সম্ভব ? অতখানি অর্থস্বচ্ছলতা অন্ততঃ যাহার, তাহার সংসারে অভাবের অতখানি মারাত্মকতা থাকিতে পারে কি ? কি জানি ? ভগবতী জ্যাঠাকে একটু দাঁড়াইতে বলিয়া রাঁস্তরার ভিতরে ঢুকিয়া পড়িলাম। এমনি এক কাপ চা লইয়া তাড়াতাড়ি গরম গরম গলায় ঢালিয়া দিয়া বাহিরে আসিলাম।

যুবকের দলও বাহিরে আসিল এবং কারমাইকেলের পথ ধরিল। ছেলে একটি দু'টি নহে, অনেকগুলি—একগুলি ছেলের মধ্যে একজনকেও চেহারায় এমন দেখি না, যাহাকে পত্রোল্লিখিত হতভাগা বলিয়া ভাবিতে সাহস করি। দারিদ্র্যের এতটুকু মলিনতা, কুণ্ঠা বা আড়ষ্টতাও চোখে পড়ে না একজনেরও চেহারায় বা চালচলনে। সকলেরই সারাদেহে সদ্য ডাক্তারের সুষ্ঠু পরিচয় ফুটিয়া উঠিয়াছে। যেন অসংখ্য বিভিন্ন শ্রেণীর এবং বিভিন্ন অবস্থার ইতর ভদ্রলোকদের মধ্য হইতে সভ্যতায় শিক্ষায় এবং অবস্থায় সর্ব্বরকমে শ্রেষ্ঠ এবং বিশিষ্ট বলিয়া তাহাদের গৌরবময় স্বতন্ত্রতা জাহির করিতেছে।

হাঁটিবারও ভঙ্গী তাহাদের এক অভিনব...দৃপ্ত ; পাহাড়ে বুক লাগিলে বোধ করি পাহাড়ই গুড়াইয়া যায় ; চোখে মুখে ঠিকরাইয়া পড়িতেছে যেন একটা বেপরোয়া তাচ্ছিল্য ···আশে পাশের বস্তী, কোঠাবাড়ী এবং চলন্ত পথচারীদের উপর···পীচের রাস্তার শক্ত বুকেও ঘা দিয়া জানাইয়া দিতেছে তাহাদের অপরিমিত সপ্রতিভতা...আত্মতৃপ্তির কিন্তু তেমন স্নিগ্ধতা নাই···আত্মমর্য্যাদাবোধের তীব্র অনুভূতি আছে এবং তাহাই ফুটিয়া বাহির হইতেছে সর্ব্বাঙ্গ দিয়া।

...প্রকাশ্য রাস্তায় যাহা খুঁজিয়া পাওয়া সম্ভব নহে, হয়তো লোকচক্ষের আড়ালে ভিতরের নিজস্ব ক্ষুদ্র ঘরে তাহার একটু আধটু চিহ্ন পাওয়া অসম্ভব নহে। বিছানা এবং ঘরের আসবাবপত্রের কোন কিছুতে এমন একটা কিছু খুঁজে পাওয়া যাইতে পারে, যাহাতে নির্দ্দিষ্ট ছেলেটির সন্ধান হইতেও পারে—

কিন্তু, তাহা আমার অনধিকার চর্চ্চা, তেমন প্রয়োজনই বা কি ? কোথায়, কাহার বাপ, মা না খাইয়া কোন্ ছেলেকে বিলাসের খরচ যোগাইতেছে, তাহাতে আমারই বা এত মাথাব্যথা কেন ?

আবার দুঃখও হইতেছিল···সমগ্র চিঠিখানির প্রতিটি ছত্রে তাহাদের সংসারের যে বীভৎস করুণ চিত্রটি ফুটিয়া উঠিয়াছে, এবং সারা সংসারটার যে নিদারুণ বুকফাটা আর্ত্তনাদ তাহাকে বেপরোয়া স্বেচ্ছাচারীতার গতিপথ হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিবার জন্য আকুলভাবে ডুকরাইয়া

তাহার একটু দয়া, একটু অনুকম্পা আর একটু মিতব্যায়িতা মরণোন্মুখ একটি পরিবারকে ধ্বংসমুখ হইতে রক্ষা করিতে পারে; অথচ, সে কি না...

উত্তাপের অসহ্য ঝাঁঝ, ব্যর্থতায় নিজেকেই ঝলসাইতে লাগিল। ভগবতীজ্যাঠা যাহার প্রতীক্ষায় এতক্ষণ উদ্‌গ্রীব হইয়া রাস্তায় দাঁড়াইয়াছিলেন, সে একবার ফিরিয়াও চাহিল না তাঁহার দিকে। কিন্তু, দরকার তাঁহারই। তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিলেন, "ডাক্তার বাবু কলেজে যাচ্ছেন। তুমিও একবার চলোনা সত্য! তোমার জ্যাঠাইমাকে দেখে আসবে। তোমাকে দেখলে বোধ করি একটু শান্তি পাবে।"

কথা ঠিক; বিদেশে দেশের লোক পাইলে, স্বভাবতঃই মানুষের আনন্দ হয়, বিশেষতঃ, রোগ-জীর্ণ দেহ মন বিরক্তি ও ক্লান্তিতে একেবারে তিক্ত হইয়া পড়ে। এমন অবস্থায় আপনার জনের সান্নিধ্যে শান্তি ও তৃপ্তি বোধ হয়। ভগবতী জ্যাঠা অনুরোধ না করিলেও আমার কর্তব্য সম্বন্ধে আমি অচেতন ছিলাম না। বলিলাম, চলুন, আমিও তাঁকে দেখতে যাব। দুইজনেই অগ্রসর হইলাম। চলিতে চলিতে জ্যাঠা হঠাৎ একসময় বলিয়া উঠিলেন, "ভগবান আছেন রে সত্য! ভগবান আছেন। এই যে ডাক্তার বোস্ সাহেব···এঁকে জানি না, চিনি না, অথচ দেখ, কোথাকার কে এসে একেবারে সবখানি দায়িত্ব স্বেচ্ছায় নিজের ঘাড়ে তুলে নিয়েছে।"

মনটা খুব স্বাভাবিক অবস্থায় ছিল না। 'হুঁ' বলিয়া শুধু একটু সাড়া দিলাম মাত্র। জ্যাঠার কথার স্রোত তাহাতে দমিল না। বলিলেন, "তোমার জ্যোঠাইমার জন্তে তভটা ভাবনা আমার সত্যিই ছিল না। হয় বাঁচতো, না হয় মরেই যেতো···"

তা' ছাড়া কি? দরিদ্র বাঙ্গালী পরিবারে ইহার চেয়ে অধিক কিছু কর্তব্যনিষ্ঠা স্ত্রীর উপর আর কি হইতে পারে? যতকাল দেহের শক্তি এবং সামর্থ্যের সবখানি জল করিয়া সংসারে খাটিতে পারে, ততক্ষণই তাহার প্রয়োজন। শরীর যখন অচল হয়, সামর্থ নিশ্চিহ্ন হয়, বিশেষ করিয়া ব্যাধি যখন চিরন্তনী সঙ্গে দেহ মন নিষ্কর্মা পঙ্গু করিয়া সংসারের শুধু একটা ভার বা জঞ্জালে পরিণত করে, তখন তাহাকে মরণের মুখে ঠেলিয়াই পাঠায়।

বাঁচিলে হয় নিদারুণ অবহেলা আর বিরক্তির পাত্র। ইহাই তো সাধারণ নিয়ম! এ নিয়মের ব্যতিক্রম তাঁহারও হওয়া অস্বাভাবিক বই কি? এমনই নিস্পৃহ দার্শনিক মনস্তত্ত্বে বিমনা হইলাম। কথার জবাব এবারও দিলাম না।

কারমাইকেল হস্‌পিটালের 'মেইন' গেটে ততক্ষণ আমরা আসিয়া পড়িলাম। হস্‌পিটালে লোক যাতায়াতের ভিড়ক তখন রীতিমত আরম্ভ হইয়াছে। ভগবতী জ্যাঠার সঙ্গে আমিও ঢুকিলাম এবং কর্তব্য বোধে গেটের ফেরিওয়ালার কাছ হইতে গোটা কয়েক কমলা কিনিয়া লইলাম। জ্যাঠা একটু কুণ্ঠার সাথে মৃদু আপত্তি জানাইলেন—"থাক্ বাবা, থাক···কেন আর তুমি অনর্থক খরচা করছো?"—"তাতে আর কি···কতই বা খরচা এতে?" ···মুখে প্রতিবাদ জানাইলেও, মনে একটু আঘাত পাইলাম!···কোথাকার কে ঐ ডাক্তার ছেলেটি, দুই চারি দিনের পরিচয় উহার সাথে, নিঃসম্পর্কীয়, তাহারও অযাচিত দান গ্রহণ করিতে জ্যাঠার দ্বিধা নাই; পরন্তু, প্রশংসমান পরোপকার বৃত্তির নামান্তরে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতেছেন। অথচ, আমি তাঁহার···

অবরুদ্ধ ক্ষোভ লইয়া রুগীণীর 'বেড'-এর কাছে গিয়া কিন্তু নিজেই নিজের কাছে সঙ্কোচ বোধ করিতে লাগিলাম। আমার আনা ঐ সামান্ত লেবু কয়টি সেখানে নিতান্তই নিষ্প্রয়োজনীয়। লেবু ছাড়াও, রোগীর প্রয়োজনীয় পথ্য হিসাবে যত রকমের 'ফ্রুটস্' দরকার, 'বেড'-এর পাশে টেবিলের উপর প্রচুর পরিমাণে তাহা অযত্নেই অভুক্তই পড়িয়া রহিয়াছে।

আমাকে দেখিয়া জ্যোঠাইমা খুব আনন্দিত হইলেন। রোগ-শীর্ণ পাণ্ডুর মুখখানি পরিতৃপ্তির এবং নির্ভরতার নিবিড় ঘন প্রশান্তিতে উজ্জল হইয়া উঠিল। সহসা উঠিয়া বসিবার চেষ্টা করিতেই দুইহাত বাড়াইয়া তাঁহাকে ধরিয়া ফেলিলাম এবং আস্তে আস্তে শোওয়াইয়া দিতে দিতে বলিলাম, "ব্যস্ত হবেন না, শুয়ে পড়ুন। আমি বসছি—"

জ্যাঠা চুপ করিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন এতক্ষণ। এইবারে জিজ্ঞাসা করিলেন—ডাক্তার বাবু···একটু ইতস্ততঃ করিয়া

কহিলেন—মানে, বোস সাহেব কি তোমাকে দেখে গেছেন ?

'হুঁ'—জ্যাঠাইমার একটু নিস্পৃহ সাড়া মাত্র।

কিন্তু, মলিনাকে দেখতে পাচ্ছি না যে ? সে কোথায় গেল ?…"

"যেখানে তাঁরা বেড়ে থাকেন, আমার চেয়ে তুমিই তো সে খোঁজ ভাল রাখ। আমাকে বৃথা জ্বালাতন করো না…দেখে নাও গে, যাও।" বিরক্তির সঙ্গে রাগ ও উত্তেজনার খানিকটা ঝাঁঝ ঠিকরাইয়া জ্যেঠাইমা জবাব দিলেন। তাহারই মধ্যে প্রচ্ছন্ন থাকিয়া বিদ্রূপের সরু একটি তীরের খোঁচা দিয়া অলক্ষ্য মেয়েকেও বিঁধিলেন। কিন্তু, ইহার কারণ বুঝিলাম না। এবং মেয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট আর কে বা কাহারা যে তাঁহার বিতৃষ্ণার উষ্ণতায় ঝলসাইল, তাহাও আমার সম্পূর্ণ অজ্ঞাত রহিল।

জ্যাঠাও আর কোন উত্তর দিলেন না। একবার মাত্র জ্যাঠাইমার দিকে কটমট করিয়া চাহিলেন…ফাটিবার পূর্ব্বক্ষণের বোমার মত কি একটা অজানিত রাগের ঝাঁঝে, তাঁহার সে চোখের দৃষ্টি অত্যন্ত উত্তপ্ত।

কৌতূহল ও বিস্ময় একত্রে আমাকে সংশয়াকুল করিয়া তুলিল। নিছক একটা সহজ কথান্তরে উহাদের দাম্পত্য সম্বন্ধের স্বাভাবিকতা সহসা এভাবে বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল কেন ? অনধিকার এবং নিষ্প্রয়োজন বোধে নীরবই রহিলাম। কিন্তু, অস্বস্তি বোধ করিতেছিলাম। সহজে কাটাইবার জন্য জ্যাঠাইমাকে খাওয়াইবার আনিলাম একটি আঙুর উঠাইয়া লইলাম। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই তিনি মুখখানা বিকৃত করিয়া বলিয়া উঠিলেন, "ও তো রোজই খাচ্ছি…না খেলেও বাঁচবো না। তোমার আনা লেবু দাও বরং—তাই একটু মুখে দি।"

আমার জোড়টা সম্পূর্ণ কাটিয়া গেল। লেবুর কোয়া ছাড়াইয়া জ্যাঠাইমার গালে রস টিপিয়া দিতে লাগিলাম। খোলা দরজার ফাঁক দিয়া অকারণেই চোখ চাহিয়াছিলাম সামনের ইয়ার্ডের পাশ ঘেঁষিয়া রাস্তাটির উপর। হঠাৎ দেখিলাম, ডাক্তার বোস সাহেব, সঙ্গে তাহার সুন্দরী একটি তরুণী ; হস্পিটালের বাহিরে যাইতেছে। মেয়েটিকে চিনিতে একটুও কষ্ট পাইতে হইল না।

স্তব্ধ হইলাম ! পাড়াগাঁয়ের আড়ষ্ট মেয়ে মলিনা—সদ্য-পরিচিত যুবকটির সঙ্গে মিশিতে দিব্যি সাবলীল ও স্বচ্ছন্দা হইয়া উঠিয়াছে ! সপ্রতিভতা ও প্রগলভতায় সহসা যেন আধুনিকতার চরমে গিয়া পৌছিয়াছে, অকুণ্ঠ লজ্জায় খুশীর বেগে একেবারে লুটাইয়া পড়িতেছে। এবং রূপ-চর্চ্চায় যতখানি জৌলুস তাহার সর্ব্বাঙ্গে ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহাতে দারিদ্র্য বা অভাবের চিহ্নও নাই ; বোধ করি যে অনুভূতিও নাই।

অথচ, পরানুগৃহীত এই দরিদ্র ভগবতী জ্যাঠারই মেয়ে…

কোন দিকে একবার চাহিল না ; প্রয়োজনও বোধ করিল না। নির্ঝরিণীর মত আপনার স্বাধীন খেয়ালে বেপরোয়াভাবে সহরের বিলাসী বুকে কোন্ পার্কে অথবা লেকের নির্জ্জনতায় হাওয়া খাইতে বাহির হইয়া গেল।

জ্যাঠাও লক্ষ্য করিয়াছিলেন। অপ্রস্তুতায় কেমনই একটু কুণ্ঠিত দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকাইয়া অকস্মাৎ বলিয়া উঠিলেন, "ওদের দু'জনে খুব আলাপ পরিচয়—ছেলেটি মলিনাকে খুব পছন্দও করেছে।"

"তবেই একেবারে 'বয়ে' গেছে।…বয়স্থা মেয়ে, আজও বিয়ে হয় নি ; কোথাকার কোন্ বিদেশী ছেলে, ওর সাথে আত্মীয়তা নেই, সম্বন্ধ নেই, চেনা শুনা পর্য্যন্ত কোনকালে ছিল না ; দু'দিনের পরিচয়েই একেবারে চূড়ান্ত আস্কারা দিয়ে ছেড়েছে !"—রোগ-দুর্ব্বল দেহটা জ্যাঠাইমার উত্তেজনায় নিস্তেজ হইয়া পড়িল। চোখ বুজিয়া একটু আরাম পাইলেন। কিন্তু, মুহূর্ত্তমাত্র স্থির থাকিতে পারিলেন না। পুনরায় বলিয়া উঠিলেন, "বিয়ে যদি ওদের না হয়, তখন সে কেলেঙ্কারীতে কি আর মুখ দেখান যাবে ? না, ঐ ধেড়ে মেয়ের আর বিয়ে হবার আশা থাকবে ?" হাঁপানীর মত নিঃশ্বাসগুলি তাঁহার ঘন ঘন পড়িতে লাগিল। অতি কষ্টে তাঁহাকে সামলাইলাম।

বিবাহ সম্বন্ধে জ্যাঠার ধারণাটা অভ্রান্ত ছিল কি না, জানি না। কিন্তু দৃঢ় ছিল। জ্যাঠাইমার এতবড় প্রকৃত এবং সাংঘাতিক প্রতিবাদটাও সেই জন্য অনায়াসেই অগ্রাহ্য করিলেন এমন কি তাঁহাকে সম্পূর্ণ অবহেলা করিয়াই আমাকে বলিলেন, দু'জনেই "দু'জনকেই খুব ভালও বাসে।"

অন্ততঃ সেটা স্বাভাবিক, আর এই জন্যই এ জিনিষটা আমার কাছে ঢাকা দিতে তিনি আপ্রাণ চেষ্টা পাইয়াছেন। সমস্ত সংশয় আমার সম্পূর্ণরূপে নিরসন হইয়া গেল।

ভগবতী জ্যাঠা আমার মনোভাবটা কতকটা আঁচ করিয়া লইলেন সম্ভবতঃ এবং সেইজন্যই তাড়াতাড়ি গোড়ার কথার জের টানিয়া কহিলেন, "তোমার জ্যাঠাইমার জন্য আমার ততটা দুর্ভাবনা ছিল না। দুশ্চিন্তা হয়েছিল ইদানীং ঐ মেয়েটাকেই নিয়ে। কিন্তু, সে দায় থেকে ভগবান আমাকে নিষ্কৃতি দিয়াছেন। অনুপমের সঙ্গেই ওর বিয়ে দিয়ে ফেলবো।"

অনুপম!…চমকাইয়া উঠিলাম। নিরুপমের একান্ত সংশ্লিষ্ট অনুপম নহে তো? নিরুপমও বসু, অনুপমও বোস সাহেব…কিন্তু—

খুশীর আবেগে জ্যাঠা উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছিলেন। অর্থাভাবে তাঁহার মেয়ের বিবাহ হইত কি না সন্দেহ; অথবা হইলেও হয়ত কোন্ অপগণ্ড মূর্খ ও দরিদ্রের সংসারে চিরদুঃখের বোঝা বহন করিয়া শেষ হইয়া যাইত। তাহারই ভাগ্যে জুটিয়া গেল কিনা—ইহা যে তাঁহার সাতপুরুষের কামনার। ইহা তাহার কতখানি সৌভাগ্য! একটানা ভাবে জ্যাঠা বলিতে লাগিলেন, "ছেলেটিকে দেখলে তো বাবা? চমৎকার, খুব অবস্থাপন্নও, নইলে কি আর এই দুঃসাধ্য ব্যায়ে ডাক্তারী পড়তে পারে? আরও একটি সুবিধা আছে। সংসারে বিশেষ ঝামেলা নেই। বাপ, মা আর একটি মাত্র ভাই আছে—ছোট।"

মনের সমস্তখানি উৎসুক্য কানের পর্দায় আসিয়া জমা হইবার মুহূর্তেই শুনিলাম, "ছোট ভাইটি স্কুলে পড়ে—নাম নিরুপম। দু'টি মাত্র ভাই…চমৎকার হবে…কি বল?"

হয়তো সত্যই চমৎকার হইত। ডাক্তারী পাশ করিয়া বাহির হইতে পারিলে দু'পয়সা উপার্জন করিতে পারিবে। অন্ততঃ, আমাদের মত হা অন্ন করিয়া বেড়াইতে হইবে না। সংসার যাত্রা অর্থ সমস্যা ততখানি বিঘ্ন উৎপাদন করিবে না। ভগবতী জ্যাঠার ঘরে জন্মগ্রহণ করিয়াছে মলিনা, তাহার অদৃষ্টে ইহাই দুরাশা…কিন্তু—

জ্যাঠাইমার সংশয়টারই সত্যতা উপলব্ধি করিতেছিলাম অন্তর দিয়া। প্রকৃতি আর পুরুষে রক্ত-মাংসের যে আদিম ক্ষুধা পরস্পরের সম্বন্ধ নিবিড় এবং ঘনিষ্ঠ করিয়া তোলে, উহাদের এই মিলন বা ভালবাসার মধ্যে তাহার অধিক আর কিছু যদি সম্ভব না হয়? স্থান, কাল ও পাত্র ভেদে পরিণামের চিন্তাটা সাংঘাতিকরূপ লইয়া আমার মনে জাগিয়া উঠিল।

অমানুষ পশু অপেক্ষাও হৃদয়হীন অনুপম। সমস্ত সদ্বৃত্তিগুলিই তাহার শয়তানীর প্রচ্ছন্ন বহিরাবরণ। সুতরাং বিবাহের মর্য্যাদা ও সম্ভ্রমটুকুই মলিনাকে দিবে কিনা, সন্দেহ। তাহার সখের প্রয়োজনই মিটাইবে শুধু। তারপর আবর্জনার মতই অবলীলায় পায়ে দলিয়া সড়িয়া পড়িতে তাহার একটুও বাধিবে না। এসব লোক কখনও দায়ীত্ব ঘাড়ে করে না। দারিদ্র্যের সুযোগ লইয়া মানুষের সর্ব্বনাশের চেষ্টায় জাঁকজমকে মুগ্ধ করে। অথচ বুকভরা আশা জ্যাঠার।

সব কথা খুলিয়া বলি বা কেমন করিয়া? তাহাতে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হইবে। কিন্তু তাহার নিষ্পেষণ যে ইহাদের পক্ষে কতখানি ভীষণ হইবে! হয়তো অর্থাভাবে জ্যাঠাইমার জীবন সংশয় হইয়া উঠিবে। সমগ্র পরিবারটি অনাহারে ধ্বংস হওয়াও বিচিত্র নহে। আর আমি হইব তাহার নিমিত্তের ভাগী। সব জড়াইয়া কেমনই একটা নিস্পন্দ স্তব্ধতা আমাকে ক্রমে অভিভূত করিয়া দিতেছিল। সহসা ঝাড়া মারিয়া আড়ষ্টতা কাটাইলাম। বিবেক মাথা খাড়া করিয়া কর্ত্তব্যকে স্মরণ করাইয়া দিল—কঠোর যতই হউক, পালন করিতেই হইবে। জীবন ভরিয়া দগ্ধাইবার এ গতিপথ মলিনার রুদ্ধ করিতেই হইবে। একটুখানি ভুল বা অবিবেচনায় জগতের হেয়তার পঙ্ক-রাশির মধ্যে মিশিতে তাহাকে দেওয়া হইবে না। সর্ব্বাগ্রে তাহাকেই রক্ষা করিতে হইবে।

কিছুমাত্র ভনিতা না করিয়াই কহিলাম, "জ্যাঠামশায় শুনুন, মলিনার বিয়ে তো আপনিই দিয়ে ফেলতে চলি। কিন্তু আপনার একলার উপরই নির্ভর করে না। অনুপমেরও মত চাই, পেয়েছেন সেটা? সে কখনও মলিনাকে বিয়ে করবার কথা বলেছে আপনাকে?"

"হাাঁ…না; তা…সে আর বলবে কি? নিজের বিয়ের…

কথায় লজ্জা পায় তো? অমত তার হবে কেন? কারণ বিচার করিতে গেলে বহুবিধই মেলে। ততটার দরকার নাই।

বলিলুম, "অমত তার হবেই। কারণ, বিয়ে করবার যোগ্যতা এবং সাহস—কোনটাই তার নেই। বিয়ে সে কিছুতেই করবে না। জ্যাঠাইমার কথাই ঠিক। এ বিষয়ে আমিও নিঃসন্দেহ—"

"কি যে বল তুমি সত্য? তাকে তুমি জান না, চেন না, অথচ"—বাধা দিয়া বলিলাম, "খুব ভালরূপেই জানবার সুযোগ আমি পেয়েছি জ্যাঠামশায়! আপনাদের চেয়েও—"

আলোচনায় বাধা পড়িল। ব্যগ্রভাবে মলিনা ঘরে ঢুকিয়াই বলিল, "ডাক্তার বোসের সাথে আমি সিনেমায় যাচ্ছি বাবা! তোমায় বলতে এলাম। ফিরতে আমার রাত হবে কিন্তু"—এতক্ষণে আমার দিকে তাহার চোখ পড়িল; বলিল, "আরে…সত্যদা যে? ভাল আছ তো?…"

"হ্যাঁ, এক রকম…বসো"—বলিয়া তাহাকে জ্যাঠাইমার রোগ শয্যারই একটা অংশ নির্দিষ্ট করিয়া দিলাম।

মলিনা বসিল না, আগ্রহও দেখাইল না। বরং অত্যন্ত অস্থির ভাবেই বলিয়া উঠিল, "এখন আমার একটুও সময় নেই সত্য দা! রাত্রে তুমি আমাদের বাসায় যেও কিন্তু… সিনেমা আরম্ভ হবার টাইম প্রায় হয়ে এসেছে—"

"চুলোয় যাক টাইম—বসতে তোমাকে হবেই। সিনেমায় যেতে তুমি পাবে না। ধিঙ্গী মেয়ে—" কণ্ঠস্বর যতখানি সম্ভব রুক্ষ এবং রূঢ় করিয়াই জ্যাঠাইমা অনুজ্ঞা করিয়া আমাকে বলিলেন, "অনুপমকে তুমি কি আগে থাকতেই চিনতে সত্য?"

"না জ্যোঠাইমা, আগে থেকে তার সাথে আমার চেনা পরিচয় ছিল না; তবে—" ইতস্ততঃ করিয়া মলিনার রুক্ষ ও ক্ষুব্ধ মুখ খানির দিকে চাহিলাম। বিষণ্ণতায় অন্ধকার হইয়া উঠিয়াছে। তা উঠুক, উহারই কল্যাণ কামনায়—

চিঠিখানি জ্যেঠাইমার সামনে মেলিয়া ধরিয়া বলিয়া ফেলিলাম, "এতেই ওর পরিচয় পেয়েছি জ্যাঠাইমা…" নিজেই চিঠিখানি আগাগোড়া পড়িয়া, পুনরায় বলিলাম, এই নিরুপমই অনুপমের ছোট ভাই।"

"উঃ, কি শয়তান!"…জ্যাঠাইমা বলিয়া উঠিলেন ঘৃণার সঙ্গে ঝাঁঝিয়া।

কাহারও স্বপক্ষে বা বিপক্ষে জ্যাঠা কিন্তু একটি কথাও বলিলেন না। তখনও তিনি অবিশ্বাস করিতে চেষ্টা পাইতেছিলেন, অথবা অনুপমের অযাচিত অনুগ্রহ হারাইবার আশঙ্কায় মনে মনে 'হায় হায়' করিতেছিলেন—কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। কিন্তু মলিনার চোখ মুখ দিয়া যেন আগুন ছুটিয়া পড়িতেছিল। রাগ যতই অসহ্য হউক…তাহার নীচেয় আঘাতের ব্যথাটা কাটা ঘায়ের মত দগ্‌দগ্‌ করিতেছিল, তাহা বুঝিলাম। কি ভাবে তাহাকে সান্ত্বনা দিব, তাহাই ভাবিতেছি। কিন্তু, তৎক্ষণাৎ অনুপমের ব্যগ্র সাড়া আসিল, "মলিনা…মলিনা! টাইম এদিকে ওভার হয়ে গেল যে? শীগ্‌গীর এসো, এক মিনিটও দেরী করো না…"

এখানকার বিরুদ্ধ আলোচনা তাহার কাণে যায় নাই। বোধ করি নীচে অপেক্ষা করিতেছিল। দেরী দেখিয়া উপরে উঠিয়া আসিয়াছে এবং বারান্দা হইতে সাড়া দিয়া দরজার সামনে আসিয়া উঁকি দিতেই অপরিচিত আমাকে দেখিল। থমকিয়া সেইখানেই দাঁড়াইয়া পড়িল। মলিনা নিজেই বাহিরে আসিল এবং একটুও ইতস্ততঃ না করিয়া কহিল, "মাপ করো অনুদা…আমি যাব না।"

"মানে?"

"…মানে খুব সোজা; তোমার সাথে এক পা যাবার বিশ্বাসও আমার আর নেই। নিজের অবস্থা লুকাতে যার এতখানি চেষ্টা—সত্যি কথা প্রকাশ করতে যে ভয় পায়, মিথ্যে আর জোচ্চুরিই যার—"

অর্থাৎ?…অনুপম বাধা দিল। অজ্ঞতায় পরম বিস্ময়ে কহিল, "তুমি এ সব বলছ কি মলিনা? আমি যে কিছুই বুঝতে পারছি না?"

রাগের সঙ্গে বিদ্রূপের সরু চাবুক কসিল মলিনা, "বাপ তোমার জমিদার…আর তুমি জমিদারের একমাত্র আদুরে দুলাল…না? বাহাদুরি আছে তোমার পরিচয় দেওয়ার। অথচ,…যাক; তোমাকে কিছু বলবার প্রবৃত্তিও আর আমার নেই। শুধু দয়া করে আমাদের আর সাহায্য দিয়ে অপমান করতে এসো না—এইটুকুই আমার

অনুরোধ। আর যেটা আমাদের সাহায্য করবে, সেটা বরং তোমার বাবা মাকে পাঠিয়ে দিও; তাঁরা খেয়ে বাঁচবেন।" উত্তরের অবকাশ দিল না অনুপমকে; বিদ্যুদ্বেগে ঘরে ঢুকিয়া চিঠিখানা আমার হাত হইতে ছিনাইয়া লইল। এবং তন্মুহূর্ত্তেই তাহার সামনে ছুড়িয়া ফেলিয়া বলিল, "এই তোমার ছোট ভাই নিরুপমের চিঠি, তোমার স্বভাবের আসল পরিচয়—"

সহসা সামনে উদ্যত ফণা সাপ দেখিয়া অনুপম যেন চমকাইয়া উঠিল। কিন্তু, মরণ-মুহূর্ত্তেও বাঁচিবার নিদারুণ আগ্রহে মরিয়া ভাবে বলিয়া উঠিল, "এ কি…এ তুমি কার চিঠি আবার আমার ঘাড়ে চাপাচ্ছ? তোমার হলো কি নলিনা?"

অনেকক্ষণ সহিয়াছিলাম। আর পারিলাম না। অত্যন্ত অভদ্র এবং রুক্ষভাবে বলিয়া উঠিলাম, "মশাই, এটা হস্‌পিটাল; আপনিও মেডিক্যাল ষ্টুডেণ্ট…রোগীদের শান্তির ব্যাঘাত করা অনুচিত…বে-আইনীও; আপনারও তা জানা আছে। নিজের নির্দ্দোষিতা প্রমাণ করতে চান, বাসায় যাবেন। বেশী বাড়াবাড়ি করলে সুপারকে জানাতে বাধ্য হবো।…"

অপরাধীর দুর্ব্বলতায় খোঁচা লাগিল। প্রতিবাদ করিতে সাহসী হইল না।

বাহিরের লোকও জমিতে সুরু করিয়াছিল। সকলেরই দৃষ্টিতে অপরিমিত কৌতূহল। অনুপম অগত্যা ঘাড় নীচু করিয়া আস্তে আস্তে সরিয়া পড়িল।

লোকগুলিও ভীড় কমাইল। দুর্ভাবনায় এতক্ষণ জ্যাঠাইমার দম যেন আটকাইয়াছিল। নিঃশঙ্কতার একটি হাল্কা নিঃশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন, "তুমিই আমাদের রক্ষা করেছ বাবা, নইলে, কি বিপদই মাথার উপর ঘনিয়ে উঠেছিল! উঃ, যাক।" একটু থামিলেন। পরে আবার বলিলেন, "তুমি আপনার লোক…ধারে কাছে আছে…একটু খোঁজ খবর নিও কিন্তু; আর মেয়েটারও যা হোক একটা গতি করে দিতে হবে। তোমাকেই ও ভার দিয়ে নিশ্চিন্ত হলাম। আমাদের অবস্থা সবই তোমার জানা আছে। নূতন করে তোমায় আর কি বলবো? আমরা বড় নিঃসহায় বাবা"—নির্ভরতার সঙ্গে কাতরতা একত্রে মিশিয়া অত্যন্ত করুণ শোনাইল।

—কিন্তু, তাহার আবশ্যক ছিল না।

সর্ব্বরকমেই তাঁহাদের ভার লইবার প্রবৃত্তি স্বতঃই আমাকে উদ্বুদ্ধ করিতেছিল। সম্মতি দিয়া নলিনার মুখের দিকে একবার তাকাইলাম। বোধ হইল যেন, ছেঁড়া চিঠিখানা আমার সামনে পড়িয়াছিল কি একটা স্বপ্ন দেখিয়া।



বাঙ্গালার কথা

৺নিখিলনাথ রায়

সিরাজের পরিণাম

মুর্শিদাবাদে আসিয়া সিরাজ কিছু সৈন্য সংগ্রহের চেষ্টা করিলেন, কিন্তু তাহাতে কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। এজন্য তিনি নিজের শ্বশুর ইরেজখাঁকে অনুরোধ করিয়াছিলেন; সিরাজ ইরেজখাঁর কন্যা ওমদাদ উন্নিসাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। ইরেজখাঁ জামাতার কথায় কর্ণপাত করিলেন না। তখন সিরাজকে মুর্শিদাবাদ পরিত্যাগ করিতে হইল। তিনি তাঁহার প্রিয়তমা বেগম লুৎফউন্নিসা, তাঁহার একটী চারি বৎসরের কন্যা উম্মত জহুরা ও আরও কয়েকটী স্ত্রীলোককে লইয়া পদ্মাতীরে ভগবান গোলায় উপস্থিত হইলেন। সেখান হইতে নৌকাযোগে রাজমহলের দিকে যাইবার অভিপ্রায় করিলেন।

ইংরেজদিগের চন্দননগর অধিকারের পর সৈয়দাবাদ ফরাসডাঙ্গা কুঠীর অধ্যক্ষ মঁসিয়ে লা সাহেব ফরাসীদিগকে লইয়া পাটনার দিকে চলিয়া যান। সিরাজের সহিত লা সাহেবের বিশেষ পরিচয় ছিল। সিরাজ মনে করিয়াছিলেন যদি তাঁহার সহিত মিলিত হইয়া কিছু করিতে পারেন। সেই জন্য তিনি রাজমহলের দিকে যাইতেছিলেন। গ্রীষ্মকালে একটী ক্ষুদ্র নদীর মোহানা বন্ধ থাকায় তিনি আর অগ্রসর হইতে পারিলেন না। তিন দিন পর্য্যন্ত তাঁহাদের আহার হয় নাই, সঙ্গে একটী শিশু কন্যা। সিরাজ সামান্য কিছু খিচুড়ীর চেষ্টায় নদী তীরে নামিয়া দানাসাহ নামে এক ফকিরের আস্তানায় গমন করিলেন। সেই সময়ে তাঁহাকে ধরিবার জন্য মীরজাফর তাঁহার ভ্রাতা মীরদায়ুদ ও জামাতা মীরকাশিমের উপর আদেশ দিয়াছিলেন। তাঁহাদের লোকজন চারিদিকে ছুটাছুটি করিতেছিল। দানাসাহ প্রথমে সিরাজকে চিনিতে পারে নাই, পরে তাঁহার বহুমূল্য জুতা দেখিয়া নাকি চিনিয়াছিল। সিরাজ কোন সময়ে এই দানাশাহ ফকিরের প্রার্থণা পূরণ করেন নাই, অথবা তাহার প্রতি কঠোর ব্যবহার করিয়া থাকিতেও পারেন বলিয়া একটা কথা প্রচলিত আছে। সেই কঠোর ব্যবহারের কাহিনী আবার অনেকে নানারূপে চিত্রিতও করিয়াছেন। সে যাহা হউক, দানাসাহ গোপনে মীরকাশিমের লোকদিগকে সংবাদ দিলে তাহারা সিরাজউদ্দৌলা ও তাঁহার লোকদিগকে ধৃত করিল। মীরকাশিম লুৎফউন্নিসা বেগমের ও মীরদায়ুদ অন্যান্য স্ত্রীলোকদিগের ধন রত্নাদি লুটিয়া লইলেন। সিরাজউদ্দৌলা বন্দী হইয়া দীনবেশে মুর্শিদাবাদে আনিত হইলেন। সিরাজের এরূপ অবস্থা দেখিয়া কতকগুলি সৈনিক তাঁহার উদ্ধারের চেষ্টা করে। কিন্তু তাহাদের অধিনায়কগণ মীরজাফরের পক্ষ অবলম্বন করায় তাহাদের চেষ্টা ফলবতী হয় নাই।

সিরাজ যে সময়ে মুর্শিদাবাদে আসেন, তখন মধ্যাহ্নকাল। কেহ কেহ গভীর রাত্রিতে তাঁহার মুর্শিদাবাদে প্রবেশের কথাও বলেন। মীরজাফরখাঁ অবশ্য তখন নবাব হইয়াছেন। নূতন নবাব গঙ্গার পশ্চিম পারে সিরাজউদ্দৌলার হীরাঝিল বা মনসুরগঞ্জের প্রাসাদে সিদ্ধিপানে বিভোর হইয়া দিবা নিদ্রা ভোগ করিতেছিলেন। তাঁহার নিষ্ঠুর প্রকৃতির পুত্র মীরন সিরাজকে লইয়া গিয়া পূর্ব্ব পারের জাফরাগঞ্জে মীরজাফরের নিজ বাটীর একটী প্রকোষ্ঠ মধ্যে আবদ্ধ করিয়া রাখে। তাহার পর সে সিরাজকে হত্যাকরার ব্যবস্থা করে। কেহ কেহ বলেন যে, ইহাতে জগৎশেঠ ও ইংরেজ সর্দ্দারদের ও অভিমত ছিল। কিন্তু তাহা কতদূর সত্য বলা যায় না। সে যাহা হউক, মীরন অনেককে সেজন্য অনুরোধ করিয়াছিল। কিন্তু কেহই সম্মত হয় নাই। অবশেষে মহম্মদী বেগ নামে এক ব্যক্তি এই নিদারুণ কার্য্য করিতে সম্মত হয়। এই মহম্মদী বেগ আলিবর্দ্দী খাঁ ও সিরাজউদ্দৌলার পিতার অন্নে প্রতিপালিত হইয়াছিল। এক্ষণে সে এইরূপে অন্নদানের শোধ দিতে প্রবৃত্ত হইল। মহম্মদী বেগ যখন তরবারি হস্তে প্রকোষ্ঠ মধ্যে প্রবেশ করিল, সিরাজ তখন তাহাকে দেখিয়া চমকিত হইয়া উঠিলেন। তাঁহার অন্তিম সময় উপস্থিত বুঝিতে পারিয়া, তিনি অবনত মস্তকে ঈশ্বরের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। তাহার পর মহম্মদী বেগকে বলিলেন,—"তুমি আমাকে বধ করিতে আসিয়াছ? তাহারা

কি কোন নির্জ্জন প্রান্তে যৎসামান্য জীবিকাতেও আমাকে থাকিতে দিবে না ?" কিছুক্ষণ পরে আবার বলিয়া উঠিলেন, "না, তাহারা তাহা করিবে না। হোসেন কুলীখাঁর মৃত্যুর জন্য আমাকে মরিতেই হইবে।" এই কয়টী কথা বলিবামাত্র মহম্মদী বেগের শাণিত তরবারি তাঁহার উপর নিপতিত হইল। "আর না যথেষ্ট হইয়াছে হোসেনকুলীর মৃত্যুর প্রতিশোধ হইল—" বলিতে বলিতে সিরাজ বিশ্বনিয়ন্তাকে স্মরণ করিয়া ধরনীর ক্রোড়ে আশ্রয় লইলেন।

"উঠিল উজ্জ্বল অসি করি ঝলমল,
দুর্ব্বল প্রদীপালোকে নামিল যখন,
সিরাজের ছিন্ন মুণ্ড চুম্বিয়া ভূতল
পড়িল, ছুটিল রক্ত স্রোতের মতন।"

ইহাই সিরাজউদ্দৌলার পরিণাম। ষড়যন্ত্র ও বিশ্বাসঘাতকতার জন্য অবশেষে তাঁহাকে প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিতে হইয়াছিল। তোমরা সিরাজের বিবরণ ভাল করিয়া দেখিবে তাঁহার কতটুকু দোষ ছিল। কিন্তু তাঁহার কি শোচনীয় পরিণামই হইল! এখানে তোমাদিগকে একটা কথা বলিয়া রাখি, সিরাজ মৃত্যুকালে কেবল হোসেন কুলীখাঁর হত্যার জন্য দুঃখ প্রকাশ করিয়াছিলেন। অন্য কোন বিষয়ের কথা বলেন নাই। তিনি যে তাঁহার মাতামহীর উত্তেজনায় হোসেন কুলীখাঁকে হত্যা করিতে আদেশ দিয়াছিলেন এবং তাঁহার যে একটী গূঢ় কারণ ছিল, সে কথা তোমাদিগকে বলিয়াছি। তাহা হইলে কেবল হোসেন কুলীর হত্যাই যদি তাঁহার মনে আঘাত করিয়া থাকে, তাহা হইলে সিরাজ কিরূপ প্রকৃতির লোক ছিলেন, তাহা অবশ্য তোমরা বুঝিতে পারিতেছ। তোমাদের সিরাজ সম্বন্ধে যদি কোন ভুল ধারণা থাকে, আশা করি, ইহার পর তোমাদের মন হইতে তাহা দূর করার চেষ্টা করিবে।

সিরাজের ছিন্ন ভিন্ন দেহ হস্তিপৃষ্ঠে মুর্শিদাবাদের সকল রাজপথ ঘুরাইয়া নূতন নবাবের বিজয় ঘোষণা করা হইল। হস্তী সিরাজের মাতার বাস ভবনের দ্বারে আসিলে তিনি চারিদিকের গোলমাল শুনিয়া যখন সিরাজের পরিণামের কথা শুনিলেন, তখন ছুটিয়া বাড়ীর বাহির হইলেন ও হস্তিপৃষ্ঠ হইতে পুত্রের মৃতদেহ নামাইয়া তাহা পুনঃ পুনঃ চুম্বন করিতে লাগিলেন এবং তাহা বক্ষে লইয়া ভূতলে পড়িয়া গেলেন। সকলে তাঁহাকে ধরাধরি করিয়া অন্তঃপুরে লইয়া গেল। তাহারপর সেই মৃতদেহ নদীর পরপারে খোসবাগে সমাহিত করা হইল। এই খোসবাগে আলিবর্দ্দীখাঁও সমাহিত হইয়াছিলেন। তাঁহার পরিবারবর্গ ও সিরাজের লুৎফউন্নিসা প্রভৃতি বেগমও ঐখানে সমাহিত হন। লুৎফ উন্নিসা যতদিন জীবিত ছিলেন, এই সমাধির তত্ত্বাবধান করিতেন। আলিবর্দ্দী ও সিরাজের সমাধি আজিও খোসবাগে রহিয়াছে। তাহা সামান্য লোকের সমাধির ন্যায়ই দেখা যায়। সিরাজের পরিণাম সম্বন্ধে এইরূপ গ্রাম্য কবিতাও শুনা গিয়া থাকে,—

"কি হল রে জান।
পলাশী ময়দানে উড়ে কোম্পানী নিশান॥
ফুলবাগে ম'ল নবাব খোসবাগে মাটি।
চাঁদোয়া টাঙ্গায়ে কাঁদে মোহনলালের বেটী॥"

মীরকাশিমের হত্যাকাণ্ড

পলাশী যুদ্ধের পরে ক্লাইভ মুর্শিদাবাদে আসিয়া মীরজাফরকে নবাবের গদীতে বসাইয়া দিয়াছিলেন। ক্লাইভের আজ্ঞাবহ হওয়ায় মুর্শিদাবাদ দরবারের ব্যঙ্গপ্রিয় লোকে মীর জাফরকে "ক্লাইভের গর্দ্দভ" বলিয়া অভিহিত করিত। মীরজাফর গদীতে বসিলে সিরাজউদ্দৌলার হত্যাকাণ্ড সম্পাদিত হয়। সিরাজের ধনরত্ন নূতন নবাব তাঁহাদের কর্ম্মচারীদের মধ্যে ভাগাভাগি হইয়া যায়। নূতন নবাবের মহিষী মণি বেগম অনেক হীরা জহরতের অধিকারিণী হন। ক্লাইভের মুন্সী শোভাবাজার রাজবংশের আদি পুরুষ নবকৃষ্ণ ও ক্লাইভের দেওয়ান আঁড়লের রামচাঁদও যথেষ্ট অর্থ হস্তগত করিয়াছিলেন। তদ্ভিন্ন কোম্পানীর কর্ম্মচারীরা মীরজাফরের নিকট হইতে অনেক টাকা আদায় করিয়া লইয়াছিলেন। তাহাতে সন্ধির সর্ত্ত অনুসারে কোম্পানীকে যতটাকা দিবার কথা ছিল, তাহার সঙ্কুলান হয় নাই। সেই জন্য অবশিষ্ট টাকার জন্য বর্দ্ধমান, নদীয়া প্রভৃতির জমিদারীর রাজস্ব বরাত দেওয়া হয়। আর কোম্পানী ২৪ পরগণা জমিদারী লাভও করেন। ক্লাইভের নামে প্রথমে ২৪ পরগণা জায়গীর দেওয়া হয়। পরে উহা কোম্পানীরই অধিকারে আসে।

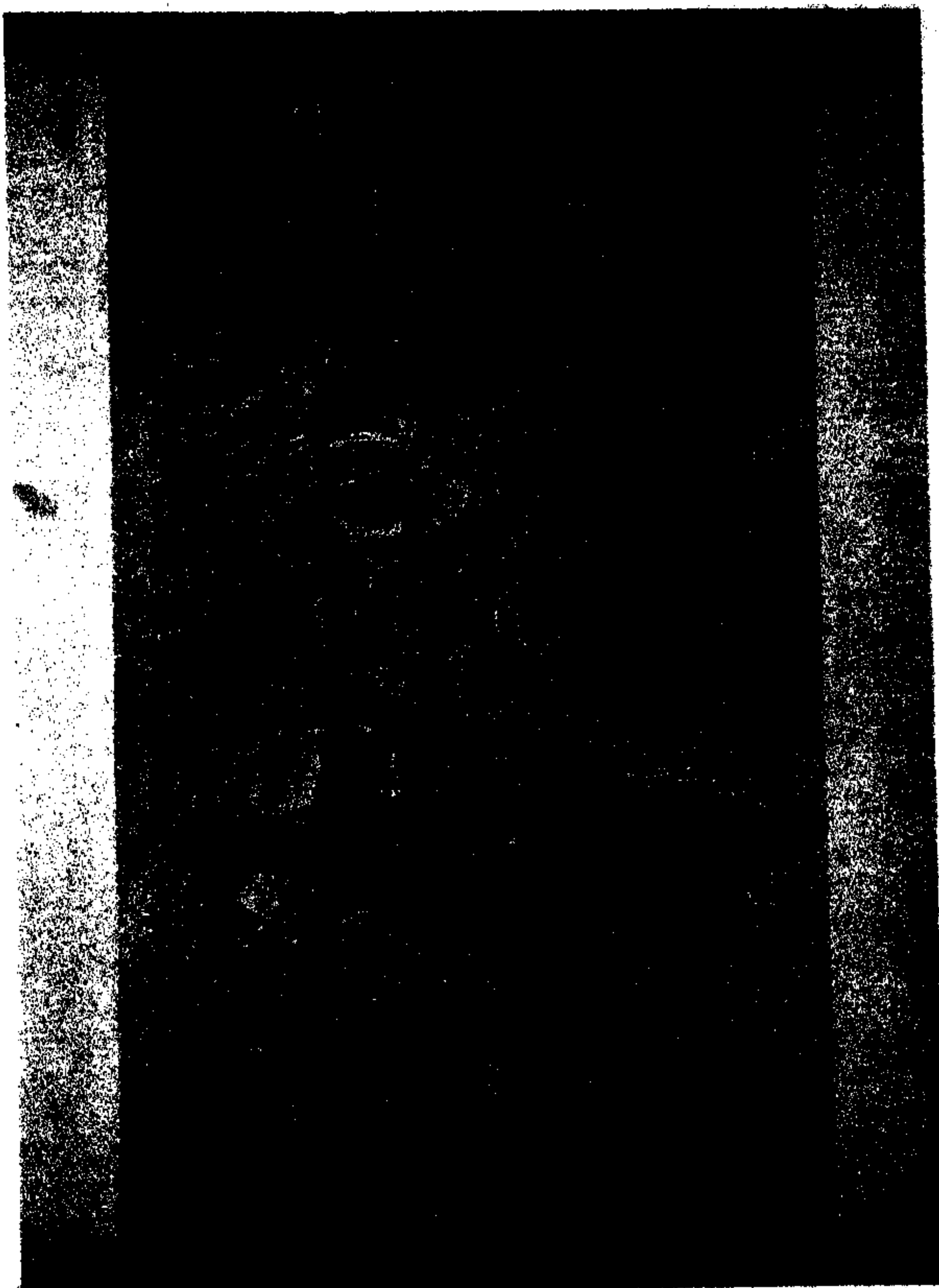
নূতন নবাব কিন্তু শান্তিতে কাটাইতে পারিলেন--না, তাঁহার অর্থাভাব ঘটিল, আর তিনি ষড়যন্ত্রেরও আশঙ্কা করিতে

লাগিলেন। মীরজাফরের সময় দুর্লভরাম প্রধানমন্ত্রী হইলেন। দুর্লভরাম পাটনার সহকারী শাসন কর্ত্তা রামনারায়ণ এবং আরও কাহাকে কাহাকে মীরজাফর সন্দেহ করিতে লাগিলেন। দুর্লভরামের সহিত তাঁহার বনিবনাও হইতেছিল না। ইংরাজেরা মধ্যস্থ হইয়া কোনরূপে গোলযোগ মিটাইয়া দিলেন। এ দিকে নবাবপুত্র মীরনও যথেষ্ট অত্যাচার আরম্ভ করিয়াছিলেন। তাঁহার আদেশে সিরাজউদ্দৌলার মাতা আমিনা বেগম ও মাতৃস্বসা ঘষিটী বেগমকে ঢাকায় নদীগর্ভে ডুবাইয়া নিহত করা হয়। তাঁহার মৃত্যুকালে নাকি এইরূপ অভিসম্পাত করিয়াছিলেন যে, মীরণ বজ্রাঘাতে মরিবে। সেই সময়ে শাহজাদা আলিগহর পরে যিনি শাহ আলম বাদশাহ হইয়াছিলেন, বিহার আক্রমণ করিতে আসেন। ইংরেজ ও নবাবের সৈন্যেরা তাঁহাকে পরাজিত করে। এই যুদ্ধের সময় মীরণের বজ্রাঘাতে মৃত্যু হয় বলিয়া শুনা যায়। কিন্তু মীরণের মৃত্যু সম্বন্ধে সে সময় অনেকের মনে সন্দেহ উঠিয়াছিল। মীরণ ইংরেজদিগের প্রতি সন্তুষ্ট ছিলেন না, নবাব মীরজাফরের সহিতও ইংরেজদিগের মনোমালিন্য আরম্ভ হইল। কোম্পানীর বিলাতের অধ্যক্ষেরা ড্রেক সাহেবকে পদচ্যুত করিয়া ক্লাইভ সাহেবকে বাঙ্গলার অধ্যক্ষ নিযুক্ত করিয়াছিলেন। ক্লাইভই বাঙ্গলার প্রথম গভর্ণর হন। এই সময় ক্লাইভ বিলাত চলিয়া যান। কিছু দিন হলওয়েল পরে ভান্সিটার্ট বাঙ্গালার গভর্ণর নিযুক্ত হন। মীরজাফরের সহিত ইংরেজদের গোলযোগ বাড়িতে লাগিল। তাঁহারা তাহাকে পদচ্যুত করিয়া তাঁহার জামাতা মীরকাশিমকে মুর্শিদাবাদের মসনদে বসাইয়া দিলেন। সেজন্য তাঁহার নিকট হইতে কোম্পানীর কর্ম্মচারীরা যথেষ্ট অর্থলাভও করিয়াছিলেন। মীরজাফর সিরাজের বিরুদ্ধে যে ষড়যন্ত্র করিয়াছিলেন একণে তাহার প্রায়শ্চিত্ত হইল

মীরকাশিম সিংহাসনে বসিয়া ইংরেজদের সাহায্য লইয়া শাহজাদা আলিগহরের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন। পরে উভয় পক্ষের মধ্যে সন্ধি স্থাপিত হয়। মীরজাফরের ন্যায় মীরকাশিমও অর্থাভাব অনুভব করিতে লাগিলেন তখনও পর্য্যন্ত কোম্পানীর প্রাপ্য টাকা শোধ হয় নাই। মীরকাশিম অবশেষে রাজস্ব বৃদ্ধি করিতে আরম্ভ করিলেন। জমীদার ও প্রজারা উৎপীড়িত হইয়া উঠিল। মীরকাশিম নূতন বন্দোবস্ত করিয়া কোম্পানীকে দত্ত দেওয়া জমিদারী ব্যতীত আর সকল স্থানে ২,৪১,১৮,৯১২ টাকা রাজস্ব স্থির করেন। কিন্তু ৬৪,৫৬,১৯৮ টাকা মাত্র আদায় করিতে পারিয়াছিলেন। এদিকে আবার বাণিজ্য ব্যাপারেও অনেক ক্ষতি হইতে লাগিল। কোম্পানীর বাণিজ্যের ত যথেষ্টই সুবিধাই ছিল, আবার কোম্পানীর কর্ম্মচারীরাও নানারূপ ব্যবসা আরম্ভ করিয়া দিলেন। কলিকাতায় কোম্পানীর দরবার হইতে এইরূপ নিয়ম জারি হইল যে, কলিকাতা দরবারের অনুমতি লইয়া যে কোন ইংরেজ বিনাশুল্কে সকল প্রকার পণ্য দ্রব্যের আমদানী রপ্তানী করিতে পারিবে। কিন্তু অন্য ব্যবসায়ীদিগকে সে জন্য অধিক পরিমাণে শুল্ক দিতে হইবে। ইহাতে যে সকল নৌকায় বৃটিশ নিশান ও কোম্পানীর সিপাহীর ন্যায় পরিচ্ছদ ধারী লোক থাকিত, সে নৌকা সকল নবাবের কর্ম্মচারীদের হাত হইতে অব্যাহতি পাইত। ক্রমে এবিষয়ে বাড়াবাড়ি আরম্ভ হইলে, নবাবের কর্ম্মচারীরা কোম্পানীর অনুমতি পত্রের অনুসন্ধান আরম্ভ করিল। তাহাতে কোম্পানীর কর্ম্মচারীরা তাহাদিগকে যারপর নাই অপমান করিতে লাগিল। এসকল ব্যাপারে নবাবের যথেষ্ট ক্ষতি হইতে আরম্ভ হইল। নবাব মীরকাশিম এসম্বন্ধে কলিকাতা দরবারে বারবার জানাইতে লাগিলেন

সে সময়ে কলিকাতা দরবারে দুইটী দল ছিল। একদল নবাবের পক্ষে, আর একদল তাঁহার বিপক্ষে। গভর্ণর ভান্সিটার্ট নবাবের পক্ষে ছিলেন। তিনি মুঙ্গেরে নবাবের নিকট এবিষয়ে মিটমাট করিতে যান। মীরকাশিম মুর্শিদাবাদ পরিত্যাগ করিয়া মুঙ্গেরেই থাকিতেন। নবাবের সহিত এইরূপ মীমাংসা হইল যে, ইংরেজেরা ব্যবসায়ের জন্য শতকরা ৯৲ টাকা শুল্ক দিবেন, কিন্তু অন্যান্য বণিকদিগকে ২৫৲ টাকা দিতে হইবে। আর ইংরেজদিগের অনুমতি পত্রে কোম্পানীর ও নবাবের উভয় পক্ষেরই কর্ম্মচারীর স্বাক্ষর থাকিবে। এ মীমাংসা কিন্তু কলিকাতা দরবার মানিয়া লইলেন না। তাঁহারা কেবল লবণের জন্য শতকরা ২৷৷০ টাকা শুল্ক দিতে চাহিলেন। আর ইংরাজদের লোকের সহিত নবাবের লোকের গোলযোগ ঘটিলে, ইংরেজ অধ্যক্ষেরাই তাহার বিচার করিবেন বলিয়া প্রকাশ করিলেন।

মীরকাশিম তাহাতে অত্যন্ত বিরক্ত ও ক্রুদ্ধ হইলেন।



তিনি রাজ্যমধ্যে সকলকেই বিনাশুল্কে বাণিজ্য করিবার জন্ম আদেশ দিলেন। ইহাতে ইংরেজের অত্যন্ত ক্ষতি হইতে লাগিল। কলিকাতা দরবার আবার অমিয়ট ও হে নামে দরবারের দুইজন সভ্যকে নবাবের নিকট পাঠাইয়া দিলেন, কিন্তু কোনই মীমাংসা হইল না। ক্রমে উভয় পক্ষের বিবাদ গুরুতর হইয়া উঠিলে যুদ্ধ বাধিবার উপক্রম হইল। নবাবের কোন কোন কর্ম্মচারী কলিকাতায় বন্দী থাকায় নবাব তাঁহাদের মুক্তি না হওয়া পর্য্যন্ত হে সাহেবকে আটক করিয়া রাখিলেন। অমিয়ট কলিকাতায় আসিতে আসিতে মুর্শিদাবাদে নবাবের লোকজনের হস্তে নিহত হইলেন। ওদিকে পাটনার অধ্যক্ষ এলিস সাহেব পাটনা অধিকার করিলে, সৈন্তেরা তাহা আবার দখল করিয়া লইল।

ক্রমে উভয় পক্ষের মধ্যে যুদ্ধ আরম্ভ হইল। মীরকাশিম তাঁহার সৈন্তদিগকে ইউরোপীয় রণকৌশলে সুশিক্ষিত করিয়াছিলেন। তিনি মুঙ্গেরে কারখানা করিয়া কামান, বন্দুক, গোলাগুলি নির্ম্মাণের ব্যবস্থা করেন। তাঁহার বন্দুক ইউরোপীয় বন্দুক অপেক্ষা ভাল হইয়াছিল বলিয়া শোনা যায়। গর্গিন খাঁ নামে একজন আর্ম্মেনীয় তাঁহার প্রধান সেনাপতি ছিলেন। কিন্তু তাহাকে সন্দেহ করিয়া নিহত করা হয়। মেজর আডাম্সের অধীনে ইংরেজ সৈন্ত যুদ্ধের জন্ত অগ্রসর হইল। পলাশীর নিকট নবাবের সেনাপতি মহম্মদ তকীখাঁর সহিত ইংরেজের যুদ্ধ আরম্ভ হয়। তাহাতে মহম্মদ তকী জীবন বিসর্জ্জন দেন।

"মোকামপুর পলাশীতে সিপুই হাতে সঙ্গে তুরুক সোয়ার।
আগুন পানি নাহি মানি করে মার মার পড়িল মামুদ তকী॥"

তাহারপর মুর্শিদাবাদের মতিঝিলের নিকট নবাব-সৈন্ত পরাজিত হইয়া সুতীতে পলায়ন করে। ইংরেজেরা আবার মীরজাফরকে গদীতে বসাইলেন। গিরিয়াতে দুই পক্ষের মধ্যে যুদ্ধ বাধিলে মীরকাশিমের সৈন্ত পরাজিত হয় ও উধুয়ানালায় গমন করে। সেখানে তাহারা শিবির সন্নিবেশ করিয়া অবস্থিতি করিতে থাকে। মীরকাশিমের সৈন্তেরা তাহাদের শিবির এরূপ দুর্ভেদ্য করিয়াছিল যে, ইংরেজেরা তাহার কিছুই করিতে পারেন নাই। একজন ইংরেজ সৈনিক কোম্পানীর কার্য্য হইতে বিতাড়িত হইয়া মীরকাশিমের সৈন্তদলে প্রবেশ করে, সে আবার বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া ইংরেজদিগকে পথের সন্ধান বলিয়া দেয়। ইংরেজেরা রাত্রিকালে সেই পথে গিয়া চুপে চুপে নবাব-শিবির আক্রমণ করেন। এইরূপ হঠাৎ আক্রমণে মীরকাশিমের সৈন্তেরা ভীত হইয়া পলায়ন করিতে আরম্ভ করে। ইংরেজ-সৈন্তও তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হয়।

ক্রমাগত যুদ্ধে পরাজয় ঘটিতেছে দেখিয়া মীরকাশিম মুঙ্গের হইতে পলায়ন করিলেন। পলায়নের পূর্ব্বে তিনি একটী ভীষণ কাণ্ডের অনুষ্ঠান করিতে আদেশ দিয়া যান। সিরাজউদ্দৌলার সময় হইতে যাঁহারা ইংরেজদের পক্ষে ছিলেন মীরকাশিম তাঁহাদিগকে মুঙ্গেরে আনিয়া বন্দী করিয়া রাখেন। জগৎশেঠ, মহাতপচাঁদ, তাঁহার ভ্রাতা স্বরূপচাঁদ, রাজা রাজবল্লভ, রামনারায়ণ, মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র প্রভৃতিকে বন্দী করিয়া রাখা হইয়াছিল। মীরকাশিম মুঙ্গের দুর্গ হইতে তাঁহাদিগকে গঙ্গায় নিক্ষেপ করিয়া হত্যা করিতে আদেশ দেন। তাঁহার সে আদেশ প্রতিপালিত হইয়াছিল। রাজা কৃষ্ণচন্দ্র কোনরূপে অব্যাহতি পাইয়াছিলেন বলিয়া শুনা যায়। মীরকাশিম পাটনায় উপস্থিত হইলে উধুয়ানালার পরাজিত সৈন্তগণও সেখানে আসে। পাটনায় যে সকল ইংরেজ বন্দী ছিল, মীরকাশিম তাহাদিগকেও হত্যা করিতে আদেশ দেন। অনেকে তাহাতে অসম্মত হয়। সমরু নামে একজন সেনাপতি সেই কার্য্যের ভার গ্রহণ করে। সে প্রথমে এলিস, হে প্রভৃতিকে কারাগার হইতে বাহিরে আনিয়া তাঁহাদিগকে হত্যা করিবার জন্ত অনুচরবর্গকে আদেশ দেয়। তাহারা অবিলম্বেই তাহাদিগকে হত্যা করে। অবশিষ্ট যাহারা ছিল, তাহারা বাহিরে আসিতে স্বীকার না করায় সমরুর সিপাহীরা গুলী চালাইতে থাকে। যাহারা প্রাণ রক্ষার জন্ত গৃহমধ্যে প্রবেশ করে, অবশেষে তাহাদিগকেও হত্যা করা হয়। স্ত্রীলোক ও শিশু পর্য্যন্তও অব্যাহতি পায় নাই। যুদ্ধ আরম্ভের পূর্ব্বে মীরকাশিম একদিনে সমস্ত ইংরেজ হত্যা করিবার জন্ত এক পরামর্শ আঁটিয়াছিলেন। কিন্তু তাহা প্রকাশ হইয়া পড়ায় কার্য্যে পরিণত হইতে পারে নাই।

পাটনা হইতে মীরকাশিম অযোধ্যায় চলিয়া যান ও তথাকার নবাব সুজাউদ্দৌলার আশ্রয় গ্রহণ করেন। সুজাউদ্দৌলা ও বাদশাহ শাহআলম ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিলে বক্সারে তাঁহারা ইংরেজদিগের নিকট পরাভূত হন। মীরকাশিম দীনবেশে দেশে দেশে ভ্রমণ করিয়া অবশেষে দিল্লীর নিকট মৃত্যুমুখে পতিত হন। মীরজাফরও অধিক দিন জীবিত ছিলেন না। তিনি কুষ্ঠরোগে আক্রান্ত হইয়া প্রাণ পরিত্যাগ করেন। লোকে ইহাকে সিরাজউদ্দৌলার বিরুদ্ধে ষড়্‌যন্ত্রের ফল বলিয়া মনে করিত। মীরজাফরের দেওয়ান মহারাজ নন্দকুমার মুর্শিদাবাদের প্রসিদ্ধ দেবতা কিরীটেশ্বরীর চরণামৃত আনাইয়া মৃত্যুকালে মীরজাফরের মুখে দিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। তাহাই পান করিয়া মীরজাফর চক্ষু মুদ্রিত করেন। সেকালে হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে কিরূপ সদ্ভাব ছিল, ইহা হইতে তোমরা তাহা বুঝিতে পারিবে।

[ক্রমশঃ

গুরু নানকসাহেব

শ্রীবিপিনবিহারী দাশগুপ্ত এম. এ

চতুর্থ প্রকরণ

ক্রমে ক্রমে গুরু নানকসাহেবের কীর্ত্তি চতুর্দ্দিকে ছড়াইতে লাগিল। প্রত্যেক দিন অসংখ্য লোক তাঁহার নিকট যাতায়াত করিতে লাগিল। সব সময়ই তাঁহার নিকট লোকের ভীড় লাগিয়া থাকিত। গুরুজী সমাগত লোকদিগকে খুব সমাদরে গ্রহণ করিতেন এবং তাহাদিগকে সুশিক্ষা দান করিতেন। সকল লোককেই তিনি এই শিক্ষা দিতেন,—পরমেশ্বরকে ভক্তি করো, সদা সত্য কথা বলো, নিজের অন্তঃকরণ শুদ্ধ এবং নির্ম্মল রাখো, কাহারও উপর অত্যাচার করিও না, পরমেশ্বর যাহা কিছু তোমাকে দিয়াছেন তাহাতেই সন্তুষ্ট থাক আর কখনও কাহারও দ্রব্য অপহরণ করিও না।

দিনদিন লোকের ভীড় বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। গুরু সাহেব সব সময় লোকদিগকে উপদেশ দিতে লাগিলেন। ভগবানের উপাসনা করিবার সময়ও তাঁহার মিলিত না। এইজন্ত সুলতানপুর হইতে লাহোর চলিয়া গেলেন। লাহোরে আসিয়া লালা পবাহরলাল রইসের ঘরে বাস করিতে লাগিলেন।

কিছুদিন পরে লাহোর হইতে রওনা হইয়া ভমনাবাদ পৌঁছিলেন। সেখানে লালু নামক এক তরখানের সহিত বাস করিতে লাগিলেন। লালু জাতিতে শূদ্র কিন্তু সাধু সন্ন্যাসীর উপর তাঁহার খুব ভক্তি ছিল। তিনি নিজে উপার্জ্জন করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন। লালু নিজ হাতে যে রুটী তৈয়ার করিতেন গুরুজী খুব সন্তোষের সহিত তাহা আহার করিতেন। কিন্তু তিনি আর কোনও রইসের নিমন্ত্রণ স্বীকার করিতেন না। এই জন্ত অনেক লোক গুরুসাহেবের বিরোধী হইল। তাহারা এই বলিয়া নিন্দা করতে লাগল যে, ক্ষত্রী হইয়া শূদ্রের ঘরে আহার করিতেছে।

দৈবযোগে এই সময় ঐ স্থানের প্রসিদ্ধ রইস মলিকভাগুর পুত্রের বিবাহ উপস্থিত হইল। তিনি গুরুসাহেবকে নিজের ঘরে নিমন্ত্রণ করিলেন। কিন্তু গুরুসাহেব নিমন্ত্রণ স্বীকার করিলেন না। এই জন্ম ভাগু অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন এবং নিজের ভৃত্যকে আজ্ঞা দিলেন যে নানককে ধরিয়া আন্।

গুরুসাহেব লালুর সহিত ভাগুর ঘরে গেলেন। মলিক ভাগু গুরুসাহেবকে বলিলেন, "আমার নিমন্ত্রণ আপনি অস্বীকার করিলেন কেন? আপনি তো ক্ষত্রী হইয়া শূদ্রের ঘরে আহার করেন; আর আমার ঘরে আহার করিতে আপনার আপত্তি!"

গুরুসাহেব উত্তর দিলেন, "আমি আপনার নিকট এখন আসিয়াছি, যাহা কিছু প্রস্তুত আছে লইয়া আসুন।"

গুরুনানক ঐ সময় লালুকে ইসারা করিলেন যে, ঘরে যাহা কিছু প্রস্তুত আছে লইয়া এস। লালু দৌড়াইতে দৌড়াইতে ঘর হইতে আধখান রুটী লইয়া আসিলেন।

এদিকে ভাগু হালুয়া, পুরী এবং নানারকমের মিঠাই থালে থালে গুরুসাহেবের নিকট রাখিয়া দিলেন। গুরুসাহেব ডান হাতে লালুর রুটী এবং বাম হাতে পুরী হালুয়া নিয়া পিসিতে লাগিলেন। লালুর রুটী হইতে দুধ বাহির হইতে লাগিল এবং পুরী হালুয়া হইতে রক্ত বাহির হইতে লাগিল। সকল লোক ইহা দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইল। ভাগু মনে মনে লজ্জিত হইল কিন্তু তাহার হৃদয় নির্ম্মল হইল না।

গুরুসাহেব বলিলেন, "যেরূপ মাতৃদুগ্ধে সন্তানের বল বৃদ্ধি হয় সেইরূপ ধর্ম্মের অর্জ্জিত গুরুটী হইতে আত্মার শক্তি বৃদ্ধি হয় এবং অসৎউপায়ে অর্জ্জিত সুস্বাদু খাদ্য মনুষ্যের রক্ত শোষণ করে।"

দৈবযোগে সেই সময় ভমনাবাদের আফগান হাকিমের পুত্রের খুব ব্যারাম হইল। তাহার প্রাণের আশা রহিল না। মলিক ভাগু আফগান হাকিমকে পরামর্শ দিল যে, ঈশ্বর ভক্ত কোন সাধু-ফকিরের খোঁজ করুন্। তাঁহার আশীর্ব্বাদে হয়ত পুত্রের ব্যারাম ভাল হইতে পারে।

আফগান হাকিম ভাগুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এইরূপ ফকির কোথায় পাওয়া যাইতে পারে?"

ভাগু উত্তর করিল, "যদি আপনার এলাকার সকল সাধু ফকির ধরিয়া আনা যায় তবে হয়তো উহাদের মধ্যে কোন না কোন ভাল সাধু মিলিতে পারে।"

আফগান হাকিম সেই সময় সিপাহীকে আজ্ঞা দিলেন, "সকল ফকির আনিয়া আমার সম্মুখে উপস্থিত করো।"

দুই এক দিনের মধ্যে এলাকার সকল সাধু ধরিয়া আনা হইল। তাঁহাদের মধ্যে গুরু নানকও ছিলেন। এই ব্যাপার দেখিয়া লালু অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন এবং গুরু নানকের নিকট গিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। গুরু নানক তাঁহাকে বলিলেন, "তুমি কোন চিন্তা করিও না। আর এক কাজ কর। জলদি গিয়া নিজ ঘরের এক টুকরা রুটী হাকিমের রুগ্ন পুত্রকে খাওয়াও এবং তাহাকে আমার নিকট লইয়া আইস।"

কথিত আছে, রুটীর টুকরা হাকিমের পুত্রকে খাওয়ান মাত্র সে শয্যা হইতে উঠিয়া দাঁড়াইল এবং মুহূর্ত্তের মধ্যে তাহার সকল রোগের অবসান হইল। হাকিমের পুত্র তখন দৌড়াইতে দৌড়াইতে গুরু সাহেবের নিকট গিয়া তাঁহার পদতলে পতিত হইল। মলিক ভাগু এই চমৎকার ব্যাপার দেখিয়া অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত হইল এবং গুরুসাহেবের চরণে পতিত হইয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিল।

একদিন মর্দানা তলবণ্ডী যাইবার জন্য গুরু সাহেবের নিকট অনুমতি চাহিলেন। গুরুসাহেব এই সর্ত্তে তাহাকে অনুমতি দিলেন যে, মর্দানা খুব শীঘ্র ফিরিয়া আসিবে।

যখন মর্দানা তলবণ্ডী গিয়া কালু রায়ের নিকট উপস্থিত হইলেন তখন কালু রায় তাঁহার উপর খুব অসন্তোষ প্রকাশ করিলেন। গুরু সাহেবকে ফিরাইয়া আনিবার জন্য তাহাকে সুলতানপুর পাঠান হইয়াছিল। কিন্তু মর্দানা নিজেই গুরুসাহেবের সঙ্গে রহিয়া গেলেন। কালু রায় মর্দানাকে বলিলেন, "তুমি বালাকে সঙ্গে নিয়া নানকের নিকট যাও এবং যে রকমে পার তাহাকে তলবণ্ডী লইয়া আইস।"

যখন মর্দানা রায় বুলারের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন তখন তিনি মর্দানাকে কহিলেন, "গুরুসাহেবকে বলিবে যে, প্রাণ তাঁহাকে দেখিতে চায়। কিন্তু আমি অত্যন্ত বৃদ্ধ হইয়াছি, নিজে গিয়া সাক্ষাৎ করিবার শক্তি নাই। যদি তিনি অনুগ্রহ পূর্ব্বক একবার আসিয়া দেখা দিয়া যান তবে অত্যন্ত বাধিত হইব।"

মর্দানা এবং বালা এমনাবাদ চলিয়া গেলেন। যখন তাঁহারা গুরু সাহেবের নিকট পৌঁছিলেন তখন তাঁহারা কালু রায় ও রায় বুলারের তাঁহাকে দেখিবার ইচ্ছা এইরূপ মর্ম্মস্পর্শী ভাষায় বর্ণনা করিলেন যে, গুরুসাহেব অতিশীঘ্র তলবণ্ডী চলিয়া আসিলেন। তলবণ্ডী আসিয়া গ্রামের বাহিরে একটী কূপ-পার্শ্বে রহিলেন।

তাঁহার আসিবার সংবাদ পাইয়া তাঁহার পিতামাতা এবং আত্মীয়স্বজন ব্যগ্রচিত্তে তাঁহাকে দেখিতে আসিলেন। কালু রায় পুত্রের সাধুবেশ দেখিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন এবং তাঁহাকে সংসারে আবদ্ধ করিবার জন্য অনেক চেষ্টা করিলেন। তাঁহার সকল চেষ্টাই ব্যর্থ হইল।

রায় বুলার খুব বৃদ্ধ হইয়াছেন, এইজন্য গুরুসাহেব নিজেই তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে তাঁহার গৃহে গেলেন। রায় বুলার অনেকদিনের পর গুরুসাহেবকে দর্শন করিয়া আনন্দে উৎফুল্ল হইলেন এবং একজন হিন্দু পাচক নিযুক্ত করিয়া তাঁহার জন্য ভোজনের নানা প্রকার জিনিষ প্রস্তুত করাইলেন। যখন গুরুসাহেবের ভোজন শেষ হইল, তখন রায়বুলার তাঁহাকে বলিলেন, "আপনি এই সন্ন্যাস ধর্ম্ম ছাড়িয়া এখানে থাকুন, আমি আপনাকে কিছু জমি দিয়া দিব; তাহাতে যে আয় হইবে সেই আয় দ্বারা আপনি এখানে চিরস্থায়ী রূপে থাকুন।"

গুরুসাহেব রায়বুলারের কথায় রাজী হইলেন না এবং তীর্থযাত্রার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন।

যখন তিনি ভাই বালা এবং মর্দানাকে যাত্রার কথা বলিলেন, তখন তাঁহারা দুইজনেই তাঁহার সঙ্গে যাইবার জন্যে প্রস্তুত হইলেন। তলবণ্ডী হইতে যাত্রা করিবার সময় গুরু সাহেব রায় বুলারকে কহিলেন, "এখানে স্নান করিবার জন্য কোন জলাশয় নাই। আপনি একটা জলাশয় খনন করাইয়া দিন। গুরুসাহেবের ইচ্ছানুসারে রায় বুলার এক জলাশয় খনন করাইলেন এবং তাহার নাম রাখিলেন নানকসর। এই জলাশয় এখনও বিদ্যমান আছে।

পঞ্চম প্রকরণ

প্রথম ও দ্বিতীয়বার দেশভ্রমণ

গুরু নানকসাহেব ভাই বালা এবং মর্দানাকে সঙ্গে করিয়া

তলবন্তী হইতে তমনাবাদ আসিলেন। এখানে কিছুদিন লালুর গৃহে থাকিয়া পূর্ব্বদিকে যাত্রা করিলেন এবং অবশেষে দিল্লী পৌছিলেন। সেখানে মজ্নুর গৃহে বাস করিতে লাগিলেন।

এই সময় দিল্লীর সিংহাসনে সেকেন্দর লোদী বিরাজমান ছিলেন। তিনি সাধুসন্ন্যাসীর পরম শত্রু ছিলেন। তিনি অনেক সাধুকে কারাগারে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। যখন তিনি সংবাদ পাইলেন যে, গুরু নানকসাহেব দিল্লী আসিয়াছেন তখন সে গুরুসাহেবকে দুইজন সঙ্গীর সহিত জেলে পাঠাইলেন এবং গুরুসাহেবকে দানা পিষিতে আজ্ঞা দিলেন। কথিত আছে যে, গুরুসাহেব, বালা এবং মর্দানার যাঁতা আপনিই চলিতে লাগিল। কেবল তাহাদিগকে দানা যোগাইতে হইত। যখন বাদশাহ ইহা শুনিতে পাইলেন তখন তিনি এই তিন জনকে কারাগার হইতে মুক্ত করিলেন।

গুরুসাহেব দিল্লী হইতে মথুরা বৃন্দাবন গেলেন এবং সেখান হইতে আগ্রা গেলেন। সেখান হইতে অযোধ্যা, লক্ষ্ণৌ এবং কাণপুর হইয়া বারাণসী গেলেন। সেখানে কিছু সময় ভক্ত কবীরের সঙ্গে ধর্ম্মচর্চ্চায় অতিবাহিত করিলেন। বারাণসী হইতে গুরুসাহেব ঢাকা গেলেন। এখানে তিনি এক বড় গুরুদ্বার প্রস্তুত করিলেন। এই গুরুদ্বার অদ্যাবধি বিদ্যমান আছে। ইহা বিরচ্ছাসাহেব নামে প্রসিদ্ধ। ঢাকা হইতে তিনি গয়া দর্শন করিয়া পুরী গেলেন। সেখানে জগন্নাথের মন্দির দর্শন করিয়া বিন্ধ্যাচল আসিলেন। সেখান হইতে পাঞ্জাবে ফিরিয়া গেলেন এবং এখানে সেখানে ভ্রমণ করিয়া সুলতানপুরে পৌছিলেন।

গুরু নানক সাহেব মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের ১৭ বৎসর পূর্ব্বে জন্মগ্রহণ করেন এবং মহাপ্রভুর অন্তর্দ্ধানের ৬ বৎসর পরে স্বর্গারোহণ করেন। যখন গুরুনানক জগন্নাথের মন্দির দর্শন করিতে পুরী গমন করিয়াছিলেন তখন মহাপ্রভুর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইয়াছিল কিনা বলা যায় না। হয় মহাপ্রভু তখন দেশ ভ্রমণে বাহির হইয়াছিলেন নচেৎ অবশ্যই তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছিল। কোন বৈষ্ণব লেখক গুরু নানক সাহেবের নাম করেন নাই। ভারতবর্ষের সকল দিক হইতে অসংখ্য সাধুসন্ন্যাসী মহাপ্রভুকে দর্শন করিতে পুরী আসিতেন। বৈষ্ণবগ্রন্থে তাঁহাদেরও অল্প লোকেরই নাম আছে। যাহারা গুরু নানকসাহেবের জীবনচরিত লিপিবদ্ধ করিয়াছেন তাঁহারাও শ্রীমন্ মহাপ্রভুর নাম জানেন না। সুতরাং তাঁহাদের এই কৌতূহল উপস্থিত হয় নাই।

কয়েক মাস সুলতানপুরে বিশ্রাম করিয়া গুরুসাহেব দ্বিতীয় বার ভ্রমণ-যাত্রায় জন্য প্রস্তুত হইলেন। এইবারও ভাই বালা এবং মর্দানা তাঁহার সঙ্গে ভ্রমণ করিবার জন্য বাহির হইলেন। গুরুসাহেব এই দুই জনের সঙ্গে সুলতান-পুর হইতে বাহির হইয়া কসুর আসিলেন। এখানে সেখ সাজক, সেখ অব্দুলকদুস এবং শেখ বোসিয়ার সহিত সাক্ষাৎ করেন এবং তাঁহাদের সঙ্গে অদ্বৈতবাদ সম্বন্ধে বিচার হয়। এখান হইতে ফিরোজপুর, সবসা, বিকানীর হইয়া আজমীর পৌছিলেন।

আজমীরের হাকিম খাওজা কুতুবুদ্দিন চিশতী গুরুসাহেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া বলিলেন, "আপনি ত হিন্দু এবং মুসল-মানকে এক রকম দেখেন এবং খোদা ভিন্ন কোন দেবদেবীর পূজা করেন না, তবে আপনি মুসলমান হয়ে মসজিদে যান না কেন এবং নমাজই বা পড়েন না কেন?"

গুরুসাহেব মুসলমান শাস্ত্র হইতে কিছু আবৃত্তি করিলেন, তাহার অর্থ এই—"লোকদিগকে প্রেম করাই আমার জন্য মসজিদ এবং সত্যপথে জীবিকা উপার্জ্জনই কোরাণ।"

গুরুসাহেব হাকিমকে বলিলেন, "আপনিও এরূপ মুসলমান হ'য়ে যান যেন ইসলামের সত্যস্বরূপ প্রকাশ পায়।"

ইহা শুনিয়া কুতুবুদ্দিন অত্যন্ত অপ্রস্তুত হইলেন এবং অবশেষে গুরুসাহেবের ভক্ত হইলেন।

আজমীর হইতে গুরুসাহেব উজ্জয়িনী পৌছিলেন। এখানে তিনি কিছুদিন বৈরাগী এবং সাধুদের সঙ্গে জ্ঞান, ধ্যান সম্বন্ধে নানা প্রকার আলোচনা করিলেন। উজ্জয়িনী হইতে রওনা হইয়া তিনি থানেশ্বর মহাদেব, জ্যোতির্লিঙ্গ, হর্ষদী দেবী প্রভৃতি তীর্থ বিচরণ করিয়া হায়দারাবাদ গেলেন। সেখান হইতে মাদ্রাজ, তাঞ্জোর, ত্রিচিনাপলী হইয়া লঙ্কাদ্বীপে পৌছিলেন। সেখানে দুই বৎসর ছিলেন। লঙ্কা হইতে ফিরিয়া আসিয়া মালাবারের তটে ভ্রমণ করিতে করিতে সুনগরে পৌছিলেন। সেখান হইতে দ্বারিকা, গুজাবাদ এবং মুলতান হইয়া তলম্বা আসিলেন।

তলম্বায় শেখ সজ্জন নামক একজন ঠগ বাস করিত। সে

হিন্দুদের জন্ত এক ধর্ম্মশালা এবং মুসলমানদের জন্ত এক মস্‌জিদ নির্ম্মাণ করিয়াছিল। যে কোন যাত্রি সেখানে গেলে সজ্জন তাহাকে অত্যন্ত বিনয়ের সহিত গ্রহণ করিতেন এবং যথেষ্ট আদর অভ্যর্থনা করিতেন। হিন্দুগণ ধর্ম্মশালায় থাকিতেন, মুসলমানেরা মস্‌জিদে থাকিতেন। রাত্রিকালে সজ্জন তাহাদিগকে বলিত যে, "এখানে চোরের ভয় আছে, আমার ঘরে চলুন" এই বলিয়া সে যাত্রিদিগকে নিজঘরে নিয়া গিয়া তাঁহাদের শিরশ্ছেদ করিয়া এক কুয়ার ভিতর ফেলিয়া দিত এবং তাঁহাদের মালপত্র সব আত্মসাৎ করিত।

সজ্জন গুরুসাহেবকে খুব আনন্দের সহিত গ্রহণ করিলেন এবং তাঁহাকে আদর সম্মান করিতে লাগিলেন। রাত্রিকালে সজ্জন গুরুসাহেবকে বলিলেন, "এখানে চোরের ভয় আছে, অন্ত ঘরে চলুন।" গুরুসাহেব উত্তর করিলেন, "এখনই একটা গান ক'রে যাচ্ছি।" গুরুসাহেব মর্দানাকে সেতারা বাজাইতে বলিলেন—এবং নিজে গান করিতে লাগিলেন।

ঐ গানের পদে গুরুসাহেব সজ্জনের সকল অবস্থা বর্ণনা করিয়া তাহার নির্ব্বেদ জানাইলেন। গান শুনিয়া সজ্জনের নেত্রে অশ্রুধারা বিগলিত হইতে লাগিল। সজ্জন গুরুসাহেবের চরণে পতিত হইয়া ক্ষমা ভিক্ষা করিলেন।

গুরুসাহেব বলিলেন, "যত মালপত্র ডাকাতি করিয়া উপার্জ্জন করিয়াছ, তাহা গরীব দুঃখীকে বিতরণ কর এবং সৎপথে অর্থ উপার্জ্জন করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে থাক।"

গুরুসাহেবের উপদেশানুসারে সজ্জন সকল মালপত্র দীন-দুঃখীদিগকে দান করিল এবং ঐ দিন হইতে ধর্ম্মপথে থাকিয়া অর্থ উপার্জ্জন করিতে লাগিল।

তলম্বা হইতে গুরুসাহেব তলবন্তী গেলেন সেখানে আত্মীয়-স্বজনদের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। সেখান হইতে সুলতানপুর গিয়া বিবি নানকী এবং জয়রামের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলেন। কিছুদিন সেখানে থাকিয়া লাহোর চলিয়া আসিলেন।

ষষ্ঠ প্রকরণ

কর্ত্তারপুর

গুরুসাহেব কিছুদিন লাহোর ছিলেন। তারপর লাহোর হইতে চল্লিশ ক্রোশ দূরে রাভী নদীর তীরে কোন এক বনে বাস করিতে লাগি[illegible]এক গ্রামে দুনদার নামক এক ব্যক্তি বাস করিত। সে প্রতিদিন গুরুসাহেবকে দুধ দিয়া যাইত। একদিন গুরুসাহেব তাহার প্রতি প্রসন্ন হইয়া বলিলেন, "তোমার যদি কিছু ইচ্ছা থাকে আমাকে বল।"

দুনদার উত্তর করিল, "মহারাজ! আমার কোন পুত্র সন্তান জন্মে নাই। আমার একটী পুত্র হইলে সুখী হইব।"

গুরুসাহেব বলিলেন, "কর্ত্তারের দয়ায় তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হবে।" কয়েকমাস পর তাহার একটী পুত্র সন্তান জন্মিল। ইহাতে গুরুসাহেবের যশ চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া পড়িল। প্রতিদিন চতুর্দ্দিক হইতে অসংখ্য লোক তাঁহাকে দর্শন করিবার জন্ত আসিতে লাগিল।

লাহোরের নবাবের অধীনে করোড়ীমল নামক এক ব্যক্তি ঐ এলাকায় থানেদার ছিল। ঐ ব্যক্তির হৃদয় হিংসায় পরিপূর্ণ ছিল। যখন সে গুরুসাহেবের যশ বৃদ্ধি হইতেছে দেখিতে পাইল তখন সে হৃদয়ের আগুণে জলিয়া উঠিল। এবং গুরুসাহেবকে অপদস্ত করিবার মানসে অশ্বারোহণে তাঁহার নিকট যাইবার জন্ত চলিতে লাগিল। কিছুদূর যাওয়ার পর ঘোড়া হইতে পড়িয়া গিয়া তাহার হাড় ভাঙ্গিয়া গেল।

কিছুদিন বিশ্রাম করিয়া দ্বিতীয়বার গুরুসাহেবের সর্ব্বনাশ করিবার জন্ত যাত্রা করিল। কিন্তু রাস্তায় তাহার চক্ষু অন্ধ হইয়া গেল। তখন সে অত্যন্ত ব্যতিব্যস্ত হইল এবং মনে মনে অনুতাপ করিতে লাগিল যে গুরুসাহেবকে ঐরূপ হিংসা করাতে তাহার এইরূপ দশা হইয়াছে। অনুতাপ করিতে করিতে হৃদয় নির্ম্মল হওয়াতে তাহার চক্ষুও পরিষ্কার হইয়া গেল। সে গুরুসাহেবের নিকট গিয়া ক্ষমা ভিক্ষা করিল এবং তাঁহার একজন অনুরক্ত ভক্ত হইল।

করোড়ীমল প্রতিদিন গুরুসাহেবের নিকট আসিতে লাগিল। একদিন সে গুরুসাহেবকে বলিল, "আপনি সদাসর্ব্বদা এখানে থাকুন্‌। আমি আপনার জন্ত এক ধর্ম্মশালা প্রস্তুত করিয়া দিতেছি। আর যত জমি চাহেন আপনার নামে লিখিয়া দিতেছি। গুরুসাহেব তাহার প্রার্থনা স্বীকার করিলেন। এবং সেখানে একটা বসতি করিবার ইচ্ছা করিলেন।

কিছুদিনের মধ্যে এক অতি সুন্দর ধর্ম্মশালা প্রস্তুত হইল। উহার নিকট করোড়ীমল এক কাঁচা ঘর নিজের থাকিবার জন্ত তৈয়ার করিল।

গুরুসাহেব আপনার পিতা-মাতা স্ত্রী-পুত্র সহিত সেখানে বাস করিতে লাগিলেন। গুরুসাহেবের অনেক ভক্তও ঘর নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিতে লাগিলেন। অল্প সময়ের মধ্যে এখানে একটা বসতি হইয়া গেল। গুরুসাহেব ঐ বসতির নাম কর্ত্তারপুর রাখিলেন। প্রতি বৎসর এইখানে এক বড় মেলা হয়। মেলায় সহস্র সহস্র লোকের সমাগম হয়।

সপ্তম প্রকরণ

তৃতীয় ও চতুর্থ যাত্রা

গুরুসাহেব পর বৎসর ভাই বালা এবং মর্দানাকে সঙ্গে করিয়া কর্ত্তারপুর হইতে তৃতীয় যাত্রায় বাহির হইলেন। এবং কাংগড়া হইয়া বানামুখী পৌছিলেন। সেখান হইতে পর্ব্বতমালা পার হইয়া হরিদ্বার পৌছিলেন। একদিন প্রাতঃকালে গঙ্গা তীরে গিয়া দেখিলেন যে, একব্যক্তি স্নান করিবার সময় পূর্ব্বদিকে মুখ করিয়া হাত ভরিয়া জল তুলিয়া তুলিয়া ফেলিতেছেন। গুরুসাহেব গঙ্গা তীরের লোকদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, এই ব্যক্তি কি করিতেছে। তাহারা উত্তর করিল, যে এই ব্যক্তি সূর্য্যদেবতাকে জল দিতেছে। ইহা শুনিয়া গুরুসাহেব গঙ্গায় অবগাহন করিয়া পশ্চিম মুখী হইয়া জল দিতে লাগিলেন। ইহা দেখিয়া লোকেরা জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি কি করিতেছেন?" গুরুসাহেব উত্তর দিলেন "পশ্চিমদিকে কর্ত্তারপুরে আমার এক ক্ষেত আছে। বর্ষা না হওয়াতে ক্ষেত শুকাইয়া গিয়াছে। আমি ঐ ক্ষেতে জল দিতেছি।"

লোকেরা বলিল, "তুমি এক অতি আশ্চর্য্য মানুষ। কর্ত্তারপুর এখান হইতে অনেক দূর। এই জল সেখানে কি করিয়া পৌছিতে পারে?"

গুরুসাহেব উত্তর করিলেন, "যদি আমার জল আমার ক্ষেতে পৌছিতে না পারে তবে তোমাদের জল কোটী কোটী মাইল দূরে আকাশে সূর্য্যদেবতার নিকট কি করিয়া পৌছিবে?"

ইহা শুনিয়া লোকেরা লজ্জিত হইল।

গুরু সাহেব এখান হইতে নৈনীতাল গেলেন এবং গোরক্ষপুর, সীতাপুর আদিস্থান হইয়া জলন্ধর আসিলেন। এখানে কিছুদিন থাকিয়া কর্ত্তারপুর আসিলেন।

কর্ত্তারপুরে প্রায় একবৎসর অতিবাহিত হইলে গুরু সাহেব পুনরায় বিদেশ যাত্রার সঙ্কল্প করিলেন। ভাই বালা এবং মর্দানা তাঁহার সঙ্গে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন।

গুরু সাহেব ভাই বালা এবং মর্দানাকে সঙ্গে করিয়া কর্ত্তারপুর হইতে উত্তর দিকে চলিলেন এবং গুজীরাবাদ হইয়া গুজরাট পৌছিলেন। সেখান হইতে পিণ্ডদাদন খাঁ, ডেহ্রাগাজীখাঁ, সক্কার এবং করাচী হইয়া বেলুচিস্থানের কলাত পৌছিলেন। সেখান হইতে শোরেনদী পার হইয়া আরব দেশে চলিয়া গেলেন। সেখানে তিনি হাজির বেশ ধারণ করিয়া মক্কার দিকে চলিলেন। রাত্রিকালে তিনি মক্কাসরীফ পৌছিলেন এবং কাবার মন্দিরের নিকট শুইয়া রহিলেন। দৈবযোগে তাঁহার পা কাবার মন্দিরের দিকে ছিল। প্রাতঃকালে মুসলমানগণ ইহা দেখিতে পাইয়া গুরু নানককে বলিল, "তুই কিরকম বেয়াদব! খোদার ঘরের দিকে পা রাখিয়া শুইয়া আছিস।"

গুরু সাহেব উত্তর করিলেন, "তোমরা অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমার পা সেই দিকে রাখ যেদিকে খোদার ঘর নাই।"

কথিত আছে, লোকেরা গুরু সাহেবের পা যেদিকে রাখিতে লাগিল কাবার মন্দির সেই দিকেই দেখা যাইতে লাগিল। লোকেরা হয়রান্ হইয়া কাজীর নিকট সংবাদ দিল।

কাজী সাহেব অচিরাৎ গুরু সাহেবের নিকট উপস্থিত হইলেন, এবং তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি হিন্দু না মুসলমান?"

গুরু সাহেব উত্তর দিলেন, "আমি হিন্দুও না মুসলমানও না। আমি পঞ্চভূতে তৈরী একটী পুতুল। আমি হিন্দু এবং মুসলমানের মধ্যে কোন প্রভেদ দেখি না। উভয়ের শরীরই এক প্রকৃতিতে খচিত। দেহের প্রত্যেক অংশের গঠন উভয়েরই একপ্রকার। খোদার নিকট উভয়েই সমান।"

ইহা শুনিয়া কাজী নিরুত্তর হইলেন। তাহার বিশ্বাস জন্মিল যে, এই ব্যক্তি খোদার একজন প্রিয় ফকির।

গুরু সাহেব এখান হইতে মর্দানা মুনব্বরা গেলেন। সেখানে কিছুদিন থাকিয়া বাগদাদ্ চলিয়া গেলেন। তখন বাগদাদে কারু নামে বাদ্‌শাহ ছিলেন। তিনি অত্যন্ত ধনলোভী এবং অত্যাচারী ছিলেন। তিনি প্রজার উপর অত্যাচার করিয়া অনেক ধন সঞ্চয় করিয়াছিলেন।

একদিন তিনি গুরু সাহেবের নিকট আসিয়া দেখিলেন যে গুরু সাহেব কাঁকর গণনা করিতেছেন। কারু গুরুসাহেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি ইহা কি করিতেছেন?"

গুরু সাহেব উত্তর দিলেন, "কাঁকর গণিতেছি।"

কারু জিজ্ঞাসা করিলেন "আপনি কাঁকর কেন গণিতেছেন?"

গুরু সাহেব উত্তর করিলেন, "মৃত্যুর পর যখন আপনি পরলোকে অনেক ধন-দৌলত নিজের সঙ্গে লইয়া যাইবেন তখন আমাকে খালিহাত দেখিয়া আপনি ও অন্যান্য লোক ঠাট্টা করিতে পারেন। এই জন্য আমি বিচার করিলাম যে, যদি আর কিছু না হয় তো কিছু কাঁকর নিজের সঙ্গে একত্র করিয়া রাখি যেন সেখানে গিয়া লজ্জিত হইতে না হয়।"

কারু বলিলেন, "আপনার মতলব এই যে, মৃত্যুর পর নিজের জমান ধন-দৌলত কেহ সঙ্গে নিয়া যাইতে পারে না। কিন্তু আমার প্রাণ ইহা কিছুতেই বোঝে না। আমি ধনলোভ ত্যাগ করিবার জন্য অনেক চেষ্টা করিতেছি কিন্তু কিছুতেই পারিতেছি না।"

গুরু সাহেব কারুকে অনেক উপদেশ দিলেন। কারুর উপর অবশেষে গুরু সাহেবের এইরূপ প্রভাব জন্মিল যে, কারু আপনার উপার্জ্জিত সকল ধন-দৌলত গরীবদিগকে দান করিয়া দিলেন এবং গুরু সাহেবের একজন ভক্ত হইলেন।

যখন গুরু সাহেব বাগদাদ হইতে চলিয়া আসিতেছিলেন তখন কারু তাহাকে এক চোলা ভেট দিলেন। এই চোলার উপর কোরাণসরীফ লেখা হইয়াছিল। ইহা এখন চোলা সাহেব নামে প্রসিদ্ধ। ডেহরাবাবা নানক গুরুদ্বারে এই চোলা সাহেব রক্ষিত হইয়াছে।

গুরুসাহেব বাগদাদ্ হইতে হলব এবং সেখান হইতে ইস্পাহান, ইস্পাহান হইতে তাতার এবং তাতার হইতে খারজম পৌঁছিলেন। এখানে মর্দানা রোগাক্রান্ত হইয়া পড়িলেন এবং কিছুদিনের মধ্যে দেহত্যাগ করিলেন। মর্দানার মৃতদেহ সমাহিত করিয়া গুরুসাহেব সেখান হইতে চলিলেন এবং কাবুল এবং কান্দাহার হইয়া হোসেন অব দালের পাহাড়ে আসিয়া পৌঁছিলেন। এখানে কিছুদিন বিশ্রাম করিলেন। এই পাহাড়ের উচ্চশৃঙ্গ হইতে এক ঝরনা পড়িত। এই ঝরনার জল খুব মিষ্ট ছিল। এই ঝরনার নিকট বায়অলী নামক এক ফকির ছিল। সে কাহাকেও এই ঝরনার জল পান করিতে দিত না। কথিত আছে যে, গুরুসাহেবের অভিসম্পাতে ঝরনা বন্ধ হইয়া পাহাড়ের নীচে যেখানে গুরুসাহেবের বাসস্থান ছিল সেখানে বহিতে লাগিল। বায়অলী ইহা দেখিয়া ক্রোধে রক্তিমলোচন হইয়া গুরুসাহেবের উপর একখণ্ড প্রস্তর নিক্ষেপ করিলেন। গুরুসাহেব হাত তুলিয়া প্রস্তরখণ্ডের গতি থামাইলেন। কথিত আছে, ঐ প্রস্তরখণ্ডের উপর গুরুসাহেবের পাঞ্জার দাগ পড়িল। এইজন্য এইস্থান পাঞ্জাসাহেব নামে প্রসিদ্ধ হইল। গুরুসাহেবের পাঞ্জার চিহ্ন এখনও বর্ত্তমান আছে। প্রত্যেক বৎসর সহস্র সহস্র লোক ইহা দেখিবার জন্য সেখানে যায়।

বায়অলী নিজের অপরাধ বুঝিতে পারিল এবং গুরুসাহেবের নিকট আসিয়া ক্ষমা ভিক্ষা করিল।

গুরুসাহেব সেখান হইতে চলিয়া আসিয়া স্যালকোট পৌঁছিলেন। সেখানে কিছুদিন থাকিয়া তমনাবাদ আসিয়া লালুর গৃহে রহিলেন। এই সময় বাবর বাদশাহ বিজয় ডঙ্কা বাজাইতে বাজাইতে তমনাবাদে প্রবেশ করিলেন এবং তমনাবাদের আফগান হাকিমকে পরাস্ত করিয়া নগর লুঠ করিলেন এবং অনেক লোককে বন্দী করিলেন। এই বন্দীগণের মধ্যে গুরুনানক সাহেব এবং ভাই বালাও ছিলেন।

যখন বাবরের ধারণা হইল যে, গুরুনানক ঈশ্বরের প্রিয় একজন মহাপুরুষ তখন তিনি তাঁহার খুব সম্মান করিলেন এবং তাঁহাকে একটা শরাবের বাটী উপহার দিলেন। কিন্তু গুরুনানক তাহা গ্রহণ না করিয়া বলিলেন যে, শরাব, ভাঙ প্রভৃতি মাদকদ্রব্যে নেশা অল্প সময়ের জন্য হয় কিন্তু পরমেশ্বরের নামের নেশা দিন রাত চলিতে থাকে। আমি প্রভুর নামের শরাব পান করিতেছি। এইজন্য আমার আর অন্য শরাবের আবশ্যকতা নাই।

বাবর গুরুসাহেবের নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করিলেন এবং

গুরুনানক এবং ভাই বালাকে খুব সম্মানের সহিত বিদায় দিলেন। গুরুসাহেব কর্তারপুর চলিয়া গেলেন।

অষ্টম প্রকরণ

স্বর্গবাস

কর্তারপুর পৌঁছিয়া গুরুসাহেব ভাই বালাকে নিজের ঘরে যাইতে অনুমতি দিলেন। বলিলেন যে, জীবনের বাকী অংশ স্ত্রীপুত্রদের সহিত অতিবাহিত করো।

বালা চলিয়া গেলে পর গুরুসাহেব কর্তারপুরে বাস করিতে লাগিলেন। ১৬৫০ সংবৎ ১৯শে কার্ত্তিক গুরু-সাহেবের মাতৃদেবী দেহত্যাগ করিলেন। তাহার বিশ দিন পর পিতৃদেবও স্বর্গারোহণ করিলেন। কর্তারপুরে প্রত্যেক দিন প্রাতে ও সন্ধ্যায় সৎসঙ্গ হইত। তাঁহাদের মধ্যে অনেকে দূর হইতে আসিতেন, অনেকে স্থানীয় লোক ছিলেন। গুরু-সাহেব তাহাদিগকে উপদেশ দান করিতেন। অল্প সময়ের মধ্যে গুরুসাহেবের মধ্যে শিষ্য সংখ্যা অত্যন্ত বৃদ্ধি হইল এবং কর্তারপুরে সহস্র সহস্র মনুষ্য যাতায়াত করিতে লাগিল।

গুরু সাহেবের শিষ্যগণ নিজগৃহ ও পরিবার পরিত্যাগ করিয়া গুরুসাহেবের নিকট থাকিয়া তাঁহার সেবা করিতেন। এই শিষ্যদের মধ্যে লহণা নামক এক শিষ্য অত্যন্ত উপযুক্ত এবং গুরুসাহেবের পরমভক্ত ছিলেন। গুরুসাহেব তাঁহার সেবা ও শ্রদ্ধা দেখিয়া এই মনোভাব প্রকাশ করিলেন যে, তাঁহাকে গদীতে বসাইবেন। কিন্তু তাঁহার স্ত্রীর ইচ্ছা ছিল যে তিনি নিজ পুত্রকে গদী প্রদান করেন। লহণা যেরূপ উপযুক্ত শ্রদ্ধাবান ছিলেন নিজের পুত্র সেরূপ ছিলেন না, এই জন্য গুরুসাহেব স্ত্রীর ইচ্ছা অগ্রাহ্য করিয়া লহণাকে গদীতে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলেন।

একদিন গুরুসাহেব অনেক শিষ্য একত্র করিয়া লহণাকে ডাকিলেন এবং তাঁহার পাঁচ পয়সা এবং একটা নারিকেল রাখিয়া মস্তক অবনত করিলেন এবং লহণাকে নিজের গদীর উপর বসাইয়া দিয়া শিষ্যদিগকে বলিলেন যে, আমি ইঁহাকে নিজের উত্তরাধিকারী নিযুক্ত করিতেছি।

গুরুসাহেব সত্তর বৎসর বয়ঃক্রম কালে ১৫৯৬ সংবতে অনিত্য সংসার ছাড়িয়া নিত্যধামে চলিয়া গেলেন। যখন গুরুসাহেব দেহত্যাগ করেন তখন অসংখ্য শিষ্য কর্তারপুরে উপস্থিত ছিলেন। ইহাদের মধ্যে অনেক হিন্দু ও মুসলমান ছিল। হিন্দু শিষ্যগণ মৃতদেহ অগ্নিসাৎ করিতে চাহিয়াছিলেন, মুসলমানগণ তাঁহাকে কবর দিতে চাহিলেন। কারণ তাহারা মনে করিত যে গুরুসাহেব মুসলমান ছিলেন। উভয় পক্ষের মধ্যে মৃতদেহ লইয়া তুমুল ঝগড়া বাঁধিল। ঝগড়া এইরূপ বাড়িতে লাগিল যে দুই পক্ষই তলবার বাহির করিল। অবশেষে এক বৃদ্ধ আসিয়া উভয় পক্ষকে এই বলিল যে, "লাশ দুইভাগ কর। অর্দ্ধেক হিন্দুরা জ্বালাইবে আর অর্দ্ধেক মুসলমানেরা সমাধীস্থ করিবে।" উভয়পক্ষ এই মীমাংসা স্বীকার করিয়া লাশের নিকট গেল। কথিত আছে যে, যখন লোকেরা লাশের উপর হইতে চাদর উঠাইতে প্রয়াস করিলেন তখনই লাশ লোপ হইয়া গেল। চাদরের নিচে কিছুই পাওয়া গেল না। তারপর হিন্দুগণ অর্দ্ধেক চাদর অগ্নিসাৎ করিলেন এবং মুসলমানরা অর্দ্ধেক চাদর কবর দিলেন।

চৌধুরীবংশের শেষ জমিদার

শ্রীরণজিৎকুমার সেন

বাপের মৃত্যুর পরে বিজয়শঙ্কর গ্রামের জমিদার হইয়া বসিল।

বিজয়শঙ্কর তাহার পিতার একমাত্র পুত্র নয়। গ্রাম্য স্কুলে পড়াশুনার অসুবিধা হয় বলিয়া কনিষ্ঠ হরিশঙ্করকে একান্ত মায়ের অনুরোধেই খরচের খাতায় মাসিক তিরিশ হইতে চল্লিশ টাকার অঙ্ক লিখিয়া কলিকাতার কোন প্রসিদ্ধ পাদ্রী স্কুল-বোর্ডিং-এ রাখিয়া পড়াইতে হয়। বিজয়শঙ্করের কিন্তু ইহা আদৌ ইচ্ছা নয়। তথাপি···হ্যাঁ তথাপি নির্জ্জলা কর্ত্তব্যের নিষ্ঠুর পীড়ণ ভিন্ন আর কি? লোকে এমন একটা কিছু বলিবে নিশ্চয়ই!

মস্তবড় প্রাঙ্গণ ঘেরা বিরাট ইমারৎ বাড়ী; সাবেকি ধরণের কারুশিল্পে খোদিত এর প্রতি প্রকোষ্ঠ। সম্মুখে বহুদিনের অযত্নে রক্ষিত লোহার তারে ঘেরাও করা পুষ্পোদ্যান। দেখিলে মনে হয়, এক কালে এই চৌধুরী পরিবারের শিল্পে ও সৌন্দর্য্যে বিশেষ রুচি ছিল। তাহাও অবিশ্যি খুব বেশী দিনের কথা নয়। বিজয়শঙ্করের পিতা কিরণশঙ্করের নিজের হাতে গড়া এই বাগান। সুদূর আমেরিকা হইতে নাকি তিনি বিভিন্ন ধরনের পাশ্চাত্য ফুলের কলম ও বীজ আনাইয়া নিজের বাগানের শোভাবর্দ্ধন করিতেন। শোনা যায়, কোনো কালে জিলা-ম্যাজিষ্ট্রেট ইন্‌স্‌পেকশন করিতে রসুইপুরে আসিলে কিরণশঙ্কর তাঁহাকে সম্বর্দ্ধনা করিয়া নিজ বাড়ীতে আনেন এবং নিজের হাতে ফুলের তোড়া বাঁধিয়া তাঁহাকে উপহার দেন। বিশেষ খুসী হইয়া ম্যাজিষ্ট্রেট্‌ সাহেব তাহাকে সার্টিফাই করিয়া বলেন, "Yours is a beautiful garden, I see. I have come in contact with many a fancy men in Bengal, but could never find such a good taste in them. Being a rural Zaminder you seem to surpass many a Highlanders in hobby-taste." হাইল্যাণ্ডবাসী ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের ইংরেজি স্তুতিবাক্য সেদিন কিরণশঙ্করের মনে কি যে প্রীতির সঞ্চার করিয়াছিল আজিকার দিনে তাহা বলা কঠিন।

অথচ কিরণশঙ্করের সাধের সেই বাগান আজ অসংখ্য কণ্টকাকীর্ণ আগাছায় ভরিয়া উঠিয়াছে।

স্বামীর মৃত্যুদিনের স্মৃতি লইয়া বৃদ্ধা করুণাময়ী মাঝে মাঝে পুত্রকে বাগানটার আবার সংস্কার করিতে বলেন বটে, কিন্তু বিজয়শঙ্করের সেদিকে দৃষ্টি দিবার আদৌ প্রবৃত্তি জন্মে না, বলে, "নিছক ফুলগাছের পেছনে দিনরাত লেগে থাকবার মত সময় নেই আমার মোটেই। ও তোমার ছোট পুত্তুর এসেই ক'রবে।" বস্তুতঃ ছোট পুত্তুর বলিতে হরিশঙ্করের সম্বন্ধে বিজয়ের আগাগোড়াই একটা বিরুদ্ধ মনোভাব প্রকাশ পাইয়া আসিতেছে। কারণ সঠিক না জানা গেলেও এইটুকু বেশ অনায়াসেই বোঝা যায় যে, বিজয়শঙ্করের আদর্শে না চলিয়া হরিশঙ্কর চিরকাল মায়ের পক্ষপাতিত্বে নিজস্ব রুচি অনুসারেই চলিয়া আসিতেছে। অন্ততঃ বিজয়ের মনোগতভাবে এটুকুই বোঝা যায় যে, বাপ মা'র পৌরাণিক রীতি ও আচার পদ্ধতি বা সেই আদর্শেই অনুপ্রাণিত অনুজের সান্নিধ্য তাহার পক্ষে অসহ্য।

বিষয়টা আর কিছুই নয়।···

কিরণশঙ্কর ছিলেন সেকালের ধর্ম্মভীরু মানুষ। জমিদারী করিয়া তিনি প্রভূত বিত্তশালী হইয়াছিলেন বটে, তথাপি প্রজার অকল্যাণ তিনি দেখিতে পারিতেন না কোনো দিনই। তাঁহার আদর্শ নিছক সাম্যবাদী না হইলেও স্ত্রীকে তিনি প্রায়ই বলিতেন, "প্রজাদের কখনো অত্যাচার ক'রে কোনো জমিদারী চলে না। প্রজাদের সুখেই জমিদারের সুখ। ওরা হোলো আমার লক্ষ্মী। ওদের অন্তরের ভাণ্ডার যদি নিঃশেষ হ'য়ে যায়, জমিদারের ঘরে তা হ'লে সোনা ফ'লবে কি ক'রে?"

করুণাময়ীরও স্বামীগত প্রাণ। বলিতেন, "অত্যাচার ক'রে কি কখনো মানুষের হৃদয় অধিকার করা যায়? লক্ষ্মী হলো ওরা, ওদের জীবনের মূল্য না বুঝলে চ'লবে কেন? ওদের দিয়েই তো আমরা,···সুখে থাক্‌ ওরা চিরদিন।"

বস্তুতঃ কিরণশঙ্করের জীবতকালে অসচ্ছলাবস্থায় থাকে নাই প্রজারা কোনোদিনই।

যখন যে অভাব, অভিযোগ নিঃশঙ্ক হৃদয়ে আসিয়া জানাইয়াছে সবাই জমিদারকে। জমিদার যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছেন তাহা পূরণ করিতে। এম্‌নি করিয়া জমিদার-প্রজায় একটা হৃদ্যভাব চলিয়া আসিয়াছে আগাগোড়াই। এতদ্ব্যতীত যাগ-যজ্ঞ, পূজা-পার্ব্বণ, দান-ধর্ম্মে কিরণশঙ্করের প্রাণ ছিল মুক্ত। করুণাময়ীও একটানা সুখের মধ্য দিয়াই কাটাইয়া আসিয়াছেন আজীবন।

লোকে বলে—বড় ছেলে নাকি বাপের গুণ পায়। কিন্তু বিজয়শঙ্কর হইয়াছে তাহার উল্টা। ও-সব লোকগুলির কোষ্টিখাতায় হয় তো বিজয়ের নাম নাই, নতুবা এমন একটা স্বাতন্ত্র্যভাব এ-বয়সেই ফুটিয়া উঠিবে কেন তার মনে? অথচ হরির কিন্তু তাহা নয়। ছেলেবেলায় গ্রামের ছোক্‌রা-দের ডাকিয়া সে খেলাঘরে ইঁট গাঁথিয়া বিরাট চণ্ডীমণ্ডপ বানাইয়াছে, কলার ডাঁটের কালীমা'র সামনে একাগ্রচিত্তে ধুপদানি লইয়া আরতি নাচিয়াছে, মায়ের আঁচল হইতে পয়সা খুলিয়া গরীব বন্ধুদের সাহায্য করিয়াছে। বড় হইয়াও সেই শিশুকালের গড়িয়া ওঠা আচার নিষ্ঠাকে সে দমাইতে পারে নাই অগ্রজ বিজয়শঙ্করের কটাক্ষপাতে। আর এখন না হয় সে গ্রামই ছাড়িয়াছে!

করুণাময়ীকে খোঁটা দিতে পারিলে তাই বিজয়শঙ্কর এক মুহূর্ত্তও দ্বিধা করে না। সে-দিন দ্বিপ্রাহরিক আহারে বসিয়া করুণাময়ী বলিতেছিলেন, "ত্থাখ বাবা, আজকাল যেন সংসারে কেমন একটা আবহাওয়ার সৃষ্টি হ'য়েছে। মনে হ'চ্ছে যেন সবাই আছে, অথচ প্রাণ নেই। আমার মন যে আর এ যক্ষপুরীতে থাক্‌তে চাইছে না এক মুহূর্ত্তও। সব সময় যেন দম আট্‌কে আস্‌চে। জানিস্ তো, তোর বাবা থাক্‌তে এ-বাড়ীতে কত লোক আস্‌তো যেতো,—পুজো-পার্ব্বণ লেগেই থাক্‌তো। এ-সব তো এখন এক রকম উঠে গেছে ব'ল্‌লেই চলে। তুই তো আমার পেটেই জন্মেছিলি, ভালকাজ তোর প্রাণ চায় না কেন বল দিকি? বাড়ীটা যে একেবারে শ্মশান ক'রে তুল্‌লি বাবা।"

রুক্ষমেজাজের লোক যাহারা, এ-সব কথা তাহাদের ভাল লাগিবে কেন! বিজয়শঙ্কর কহিল, "শ্মশান ক'রবো না, তবে কি পুষ্পকবন ক'রবো? তুমি ভুলে যাও কেন যে, এটা তোমাদের কাল নয়,—এটা হ'চ্ছে পূর্ব্বকালের সংস্কারের যুগ। ঐ তো বাড়ীর দক্ষিণে একটা শিবমন্দির খাড়া ক'রে রেখেছ কোন্ সত্যযুগ থেকে, নোনা ধ'রে গ'লে গ'লে পড়ছে ওর ইঁটগুড়কি। ভেবেচি কালকেই নায়েব মশাইকে ব'লবো ওটাকে ওখান থেকে একদম তুলে দিতে। যত সব nasty, দেখতে পারি না দু' চ'ক্ষে।"

করুণাময়ীর কোথায় যেন আঘাত লাগিল। বলিলেন, "শিবমন্দিরে কেউ হাত দিয়েছে তো আমি সে দিন মাথা খুঁড়ে মরবো। ছিঃ ছিঃ, এমন অলক্ষুণে কথাও তোর মুখে আসে! ত্থাখ বাবা, অন্ততঃ আর কিছু না পারিস, পূর্ব্ব-পুরুষের গৌরব রাখবার জন্যে ধর্ম্মে কর্ম্মে একটু মন রাখিস্। জগতের সব কিছু ভেঙে যায়, তবু ঐ একমাত্র ধর্ম্মই থাকে।" বলিয়া আহার সমাপন করিয়া উঠিয়া পড়িলেন। হয় ত অলক্ষ্যে কাপড়ের আঁচলে একবার নিজের অশ্রুসিক্ত চোখ দু'টিও মুছিয়া লইলেন. কিন্তু বিজয় শঙ্কর তাহা দেখিতে আসিল না।

করুণাময়ীর সব চাইতে বেশী দুঃখ তাঁর পুত্রবধুকে লইয়া। বিজয়ের সহিত সম্বন্ধ লইয়া বহু অবস্থাপন্ন মেয়ের বাপেই এই চৌধুরী বাড়ীর চতুষ্পার্শ্বে আনাগোনা করিয়াছেন; প্রত্যেককেই করুণাময়ী শুধু এই কথা বলিয়াই বিদায় দিয়াছেন যে, পুত্রবধূকে তিনি আধুনিক রুচিতে শিক্ষিতা ও বিত্তশালিনী পাইতে যতটা না চান, বুদ্ধিমতী ও ধার্ম্মিকা পাইতে চান তার চাইতে হাজার গুণে বেশী। বস্তুতঃ শেষ পর্য্যন্ত পাঁচ গ্রাম বাছিয়া জনমতে ধর্ম্ম-প্রাণা এক মেয়ের সাথে তিনি বিজয়ের বিবাহ দেন। কিন্তু দিন যতই চলিতে লাগিল, কিরণময়ীর সকল স্বপ্ন ততই একটা বিস্মৃতির অন্ধকারে ডুবিয়া যাইতে লাগিল। ধর্ম্মের কথা দূরে থাক্, সংসারে ক্রমশঃই যেন পাপাচারের সৃষ্টি হইতে লাগিল দিনের পর দিন। আজ মুরগীর মাংস, কাল পেঁয়াজের পায়েস—এ সব দেখিয়া শুনিয়া ইহারই মধ্যে করুণাময়ী একদিন স্থির করিলেন, এবারে তাঁহার কাশী যাত্রার সময় আসিয়াছে। মতামত তিনি একদিন বিজয় ও অরুণার কাছে প্রকাশও করিলেন বটে, কিন্তু আগ্রহের সহিত কেহই কথাটা কাণে তুলিল না। করুণাময়ী ভাবিলেন, এ সংসার হইতে তাঁহার অন্নজল একরকম উঠিয়াই গেল তাহা হইলে। অথচ সহসা তিনি কোথাও নড়িতে পারিলেন না। ভাবনা হইল

হরিশঙ্করের ভবিষ্যৎ চিন্তা করিয়া। ও যদি এতদিনে লেখা-পড়া শিখিয়া বাড়ী আসিত, তবু না হয় ওকে বিবাহ দিয়া গৃহে প্রতিষ্ঠা করিয়া রাখিয়া যাইতে পারিতেন। কিন্তু এ অদৃষ্টে কি আর তাহা আছে! হরি বলিয়াছে, এম,এ পাশ করিবার পূর্ব্বে এক পা-ও সে কোন দিকে নড়িবে না। শিক্ষাবিদ্‌দের কাছে এ আদর্শ খুব মূল্যবান হইলেও নিতান্ত আক্রর মধ্যে থাকিয়া নিজের মনে করুণাময়ী ইহার সার্থকতা বুঝিতে পারিলেন না কিছুই। তাই সংসারের এই বিশৃঙ্খলার কথা আদ্যোপান্ত লিখিয়া করুণাময়ী হরিশঙ্করকে এক পত্র দিলেন। হরি কিন্তু এখন আর সেই পাত্রী স্কুলের শান্ত ছেলেটী নয়। মায়ের পত্র যে দিন হাতে পৌছিল, হরির তখন ইণ্টারমিডিয়েট পরীক্ষা সম্মুখে। ছোট্ট দুই লাইনে সে মাকে লিখিয়া জানাইল যে, যাহা কিছু করিতে হয়, পরীক্ষা শেষে বাড়ী ফিরিয়া দেখিয়া শুনিয়া সে নিজেই সব করিবে। বৃথা চিন্তা যেন তিনি না করেন। ইত্যাদি।···কিন্তু তথাপি করুণাময়ীর চিন্তা তাহাতে কমিল কোথায়?

একটা দীর্ঘ ফুঁ'এর মত ইহারই মধ্যে দেখিতে দেখিতে কয়েক মাস অতিবাহিত হইয়া গেল।

পরীক্ষা শেষে হরিশঙ্কর বাড়ী আসিয়া কয়েক দিন নিতান্ত ভাল মানুষের মত চারিদিক দেখিয়া শুনিয়া অগ্রজ বিজয় শঙ্করকে একদিন সামনাসামনি বলিল, "আমি ইচ্ছে করি না যে, মা এখনো বর্ত্তমান থাক্‌তে সংসারে কোন অনাচার বা অনাসৃষ্টি হয়। মা এখন বুড়ো হয়েছেন, তাঁর মনে কষ্ট দিয়ে বা তাঁর আদর্শকে ক্ষুণ্ন ক'রে কিছু করা আমাদের কখনই কর্ত্তব্য নয়। আমি আশাকরি, তুমি বাড়ীটাকে এখনও ভাল ক'রে তুলবে দাদা।"

বিজয়শঙ্করের মনে যেন একটা জ্বালা উপস্থিত হইল, কহিল, "ভাল মন্দের বিচার কারুর কাছ থেকে ধার ক'রে চলা আমার প্রবৃত্তিগত পেশা নয়। সংসারে এমন কিছু ঘটছে না যার জন্যে মা এখানে তিষ্ঠুতে পারছেন না। তবে—অবিশ্যি আমার ভালোর সাথে তোমাদের ভালোর সামঞ্জস্য যদি না ঘটে, তবে তোমাদের রুচির ব্যবস্থা আমাকে ছাড়াই ক'রতে হবে। আমার মধ্যে ব্যতিক্রম কিছু ঘটবে না—এটুকু বলতে পারি।" ভিতরের ক্রোধে যেন বিজয়ের দুই চক্ষু লাল হইয়া উঠিল।

কিন্তু হরি তাহাতে দমিল না, বলিল, "তা হ'লে তুমি চাও যে তোমাদের সংস্পর্শ থেকে আমরা স'রে যাই? দেখ, এ মৎলবই যদি ক'রে থাকো, তা' হ'লে কালকেই আমার অংশ আমাকে লিখে প'ড়ে বুঝিয়ে দাও। মাকে তুমি অবহেলা ক'রলেও আমি পারি না। যে ক'টা দিন তিনি বেঁচে থাকেন, আমি পৃথক ভাবেই তাঁকে নিয়ে থাকবো। অনাচার সেখানে একতিলও ঢুকতে দেবো না।"

বস্তুতঃ, আকস্মিক একটা ঝকমারির জন্য হরিশঙ্কর প্রস্তুত হইলেও করুণাময়ী ইহাতে কিছুতেই সায় দিতে পারিলেন না। শেষ পর্য্যন্ত তাঁহাকে মধ্যস্থ করিয়া ভ্রাতৃবিচ্ছেদ ঘটিবে! সংসারে আর তাহা হইলে থাকিবে কি? ইহা তো স্বপ্নেও তিনি চিন্তা করিতে পারেন নাই কোনো দিন। পৃথিবীতে ভাইয়ের কাছে ভাইয়ের মত আর কি বস্তু আছে? করুণা-ময়ীর চোখে জল আসিল। গোপনে ডাকিয়া হরিশঙ্করকে বলিলেন, "কি দরকার ছিল তোর বিজয়ের সঙ্গে ঝগড়া ক'রবার? এই জন্যেই কি তোকে চিঠি দিয়েছিলাম? বেশ তো, ও যখন কিছুতেই ঘরের কোনো সংস্কার করতে রাজি নয়, তখন না হয় এক পাশে কোনো ভাবে আমি প'ড়ে থাকবো। তিন কাল তো কেটেই গেছে, আর বাকী ক'টা দিন কাটবে না? তবু দুঃখ রইল যে, আজ যদি আমি ম'রে যাই, তোর বউর হাতের এক বিন্দু জল পর্য্যন্ত পাবো না শেষ সময়ে।" একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া করুণাময়ী চক্ষু মুছিলেন।

মনে মনে হরিও এবারে কম আহত হইল না। কিন্তু সে-ই বা কি করিবে? দাদা যদি তাহার সে রকম হইত, তবে তো কোনো দুঃখই থাকিত না। একমাত্র তাহার বিবাহ করাটাই তো সব চাইতে বড় নয়। বরঞ্চ বিবাহ করিলে হয় তদুপরি আবার দুই বৌ-এর মধ্যে মনোমালিন্য ঘটিবে দ্বিগুণ করিয়া! এ সব নানা চিন্তা করিয়াই হরি স্থির করিল, সম্প্রতি মায়ের একটা স্বতন্ত্র ব্যবস্থা করিয়া দিয়া কলিকাতায় যাইয়া আবার সে বি,এ ক্লাসে ভর্ত্তি হইবে। নিজের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে হরি চিরদিনই সচেতন। তাই যথাশীঘ্র নিজেদের দালানবাড়ীর মধ্যে শিব-মন্দিরের দিকে ঘেঁষাইয়া মায়ের জন্য একটা পার্টিশান-কোঠা তৈরী করিয়া হরি একদিন আবার কলিকাতার ট্রেনে চাপিয়া বসিল। বিজয়শঙ্কর নীরবে তাহার

জমিদারী-চোখে অনুজের যাত্রাপথের দিকে লক্ষ্য করিয়া কি ভাবিয়া একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিল মাত্র।

ইহার পর একে একে বহু বৎসরই গত হইয়াছে। করুণাময়ীও জরাজীর্ণ দেহে যথেষ্ট দুঃখকষ্ট সহ্য করিয়া চিরদিনের মত সংসার ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন।…বিজয়শঙ্করের দুইটী নাবালক পুত্র জীবনের হিসাবখাতায় যথাক্রমে দশ ও বারোর ঘরে আসিয়া পৌঁছিয়াছে।

চৌধুরীপরিবারের চতুষ্পার্শ্বে আজ আর প্রকৃতির সেই স্নিগ্ধ শ্যামলতা নাই, দোয়েল-পাপিয়ার কণ্ঠে নাই সঙ্গীত, মানুষের মনে নাই আনন্দ। একটা প্রাণহীন নিস্তব্ধ মরুময়তা যেন চতুর্দ্দিকে নিঃশব্দে বিলাপ করিয়া মরিতেছে।… কিরণশঙ্করের আত্মার সহিত যে বাগানটা মিশিয়া ছিল চিরদিন, হাইল্যাণ্ডবাসী ম্যাজিষ্ট্রেটের কণ্ঠে আজও হয় ত যার গুণকীর্ত্তনের অন্ত নাই, সে স্থান এখন নাগরিক সভ্যতায় বিজয়ের পুত্রদের ব্যাড্‌মিণ্টন্ খেলিবার তুচ্ছ বিলাসভূমি হইয়া দাঁড়াইয়াছে। করুণাময়ীর রক্ত দিয়া গড়া অর্দ্ধভগ্ন সেই শিবমন্দিরের বুক জুড়িয়া প্রকাণ্ড গোলাঘর আজ সদর্পে অট্টহাসি হাসিতেছে।…

এম. এ পাশের পর সমগ্র বঙ্গদেশ পরিভ্রমণ করিয়া বহুদিন পরে গ্রামে ফিরিয়া আসিয়া হরিশঙ্কর এ সব কিছুকে মনেপ্রাণে কিছুতেই সহ্য করিয়া উঠিতে পারিল না। সারা বুক জুড়িয়া তাহার যেন আজ সত্যি সত্যি কান্না আসিল। দুঃখে-ঘৃণায় অগ্রজ বিজয়শঙ্করের সহিত একটি কথাও আর বলিতে ইচ্ছা করিল না তার। ভাবিল, সংসারের বিরুদ্ধে সে বিদ্রোহ করিবে, এক এক করিয়া সমস্ত কিছু সে ধ্বংস করিয়া দিবে।

পাঠ্যজীবনে ইকনমিক্স্ ও মার্কস্-দর্শন পড়িয়া যদিও হরির সমস্ত রুচি একদম বদলাইয়া গিয়াছিল, তথাপি জাতীয় বাস্তবজীবনের সহিত পিতৃপুরুষের আধ্যাত্মিক আদর্শবাদের যোগসূত্র একেবারে ছিন্ন করিয়া ফেলিতে পারে নাই আজ পর্য্যন্তও। মায়ের মুখে বাবার আদর্শজীবনের কথা শুনিয়া এবং মার্কস্-বাদের প্রকৃত বৈশিষ্ট্য মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করিয়া হরিও শ্রমজীবী কৃষক প্রজা সাধারণের অকৃত্রিম মনোধারার সহিত নিজের মনের গোপন মিলন সংস্থাপন করিতে চেষ্টা করিয়াছে। তাই অগ্রজের এসব নীতিধর্ম্মহীন কার্য্যাবলীর বিরুদ্ধে তাহার অসহিষ্ণু মনের বিদ্রোহ আজ কিছুতেই দমিতে চাহিল না। সোজা ভ্রাতৃবধূকে আসিয়া সে বলিল, "বৌদি, ভেবেছিলাম দাদার কাজে আর কেউ না হোক্ অন্ততঃ মেয়ে মানুষ হ'য়ে তুমি আপত্তি তুলে দাঁড়াবে। বাগানটা না হয় গেছেই, সেজন্যে আজ আর দুঃখ করি না, দুঃখ শুধু ঐ গোলাঘরটার দিকে চেয়ে। মা'র শেষ স্মৃতিটুকুও আজ আর নেই। শিবমন্দিরটা এতই কি চক্ষুশূল হ'য়ে দাঁড়িয়েছিল তোমাদের? তুমিও তো সেই মায়েরই জাত, সমস্ত ধূলিসাৎ ক'রে দিতে মন তোমার এতটুকুও কাঁদলো না? অন্ততঃ আমারও একটা মত নেওয়া উচিৎ ছিল। আজও আমার এসংসারে জন্মগত অধিকার ও দাবী র'য়েছে। সব সময়ই বয়োজ্যেষ্ঠের স্বাতন্ত্র্য নিয়ে দাদা যে সকল কাজ ক'রে চ'লেছে, তাতে মনুষ্যত্বের পরিচয় মেলে না একবিন্দুও। হ্যাঁ—এ কথা দাদাকে ব'লে দিও। সম্পত্তির অংশ আমাকে ভাগ ক'রে দিয়ে তবে যেন তিনি নিজের ব্যক্তিত্বের আদর্শে চলেন; তার পূর্ব্বে আর কিছু আমি সইব না।" হরিশঙ্করের সমস্ত দেহ ক্রোধে ও অনুশোচনায় যেন থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল।

অন্য সময় হইলে হয়ত অরুণার চক্ষু ফাটিয়া জল আসিত, কিন্তু দেবরের কথায় একবিন্দু অশ্রুও তার চোখের কোণ সিক্ত করিল না। বরঞ্চ তার নারীত্বের অবমাননায় অরুণার সারা দেহে যেন একটা প্রচণ্ড দাবদাহের সৃষ্টি হইল। কহিল, "তোমার দাদাকে যা বলবার তা তুমি নিজের মুখেই বোলো। আমি অতশত বুঝিও নে, আর বিশেষ করে কোনো বলাবলির মধ্যেও নেই।"

লঘু-গুরু কণ্ঠে কথাগুলি কহিয়া অরুণা সমস্ত কিছু জটিলতার বাহিরে থাকিবার মত ভাণ করিলেও নিস্তব্ধ রজনীর নীরবতায় স্বামীর শয্যাসঙ্গিনী হইয়া ইনাইয়া-বিনাইয়া বিজয়ের কাছে হরিশঙ্করের সমস্ত কথাই ব্যক্ত করিল।

জমিদারী-পৌরুষের তাহে আকস্মিক একটা গভীর আঘাতের অনুরণনে বিজয়শঙ্করের সমস্তগুলি শিরা উপশিরা মুহূর্ত্তে যেন টন্ টন্ করিয়া উঠিল।…চটিলে নাকি মানুষের জ্ঞান থাকে না! বিজয়েরও হল ত বা তাহাই হইল! স্ত্রীকে উপলক্ষ্য করিয়া উচ্চকণ্ঠে সে চীৎকার করিয়া উঠিল,

"আমাকে তক্ষুনি এসে জানালে না কেন অরুণা, পাজিটাকে দেখিয়ে দিতাম কত বড় তার মুখ। এম্-এ পাশ ক'রেছে, ভেবেছে নবাবী চাল চেলে গেলেই হোল। উল্লুক কোথাকার! সম্পত্তি ইচ্ছে ক'রলেই অমনি ভাগ করা গেল। লাটসাহেব এসেছেন উনি।"

আরও কি বলিতে যাইতেছিল বিজয়, অরুণা বাধা দিয়া চাপা গলায় কহিল, "সাথে সাথে তুমিও ক্ষেপে গেলে দেখছি। নাও, ওসব বাজে চিন্তা ছেড়ে এখন চক্ষু বুঁজে রাত্রিটা কাটিয়ে দাও দেখি।"

বিজয়ের তপ্তকণ্ঠে চীৎকার থামিল সত্য, কিন্তু মনের আগুন প্রশমিত হইল না এতটুকুও।

হরিশঙ্করেরও সেদিন সারারাত্রি ঘুম আসিল না। ঘুরিয়া-ফিরিয়া নানা কথা কেবল মনে পড়িয়া তাহাকে যেন ব্যথাতুর করিয়া তুলিতেছিল। তাই অদূর সংলগ্ন বদ্ধ দ্বার কক্ষ হইতে অগ্রজের কণ্ঠধ্বনি ভাসা-ভাসা গুম্ গুম্ শব্দে হরির কানে আসিল। প্রথমটা না বুঝিতে পারিলেও পরে সে প্রকৃতই ধারণা করিয়া লইল যে, তাহাকে লইয়া ওঘরে আলোচনা কিঞ্চিৎ উগ্র হইয়াই উঠিয়াছে। কারণ এই নিস্তব্ধ গভীর রাত্রে কণ্ঠের এমন বেপরোয়া কসরৎ বিশেষ করিয়া ও ঘরের কোনো ব্যাপক বৈঠকে হরিশঙ্কর তো কোনদিনই শুনিতে পায় নাই। তাহার অন্তরের মধ্য হইতে এতক্ষণে কে যেন একবার হাসিয়া উঠিল, বলিল, "আধুনিক ভারতীয় রাষ্ট্রবিপ্লবের বাহিরে এমন অনন্য-সাধারণ শয্যা-বৈঠকের একটা আদর্শ আছে বটে।"

ধীরে ধীরে ভোর হইয়া আসিল। সশব্দে দ্বার খুলিয়া হাত-মুখ ধুইয়া প্রাত᾽ভ্রমণের উদ্দেশে হরি বাহির হইয়া পড়িল খোলা মাঠের দিকে।

মেহের আলী ও করিম শেখ রসুইপুরের নিতান্ত দরিদ্র ঘরের চাষআবাদি লোক, চৌধুরী জমিদার বংশেরই একমাত্র অনুগতকর্মী। জমি চাষ করিয়া বাকী যে সময়টা পায়, দুধ বেচিয়া কিবা পাঁতিহাঁস ও মুর্গীর ব্যবসা করিয়া স্ত্রীপুত্রের আহারের সংস্থান করে। এককালীন দু'পাঁচ টাকা হাতে আসিলে স্ত্রীর অজ্ঞাতে যাইয়াই জমিদারকে সেলামী দেয়। তথাপি দরিদ্র-জীবনের ভাঙা পাঁজরে মনিবের আঘাত তাহাদের প্রাণপ্রবাহের সহিত ওতপ্রোতভাবে জড়াইয়াই আছে। যাহার হউক, পীড়ন হইলেও তাহার একটা সীমা আছে তো বটে। খাজনা প্রদান এবং জমি হইতে উৎপন্ন শস্য রপ্তানীর অক্ষমতার সুযোগ লইয়া জমিদারী শোষণ-নীতি তাহাদের উপর যে ভাবে অত্যাচার করে, তাহা কল্পনার অতীত। চিরজীবন নির্ব্বিবাদে সহস্র লাঞ্ছনা সহ্য করিলেও দেহ-যন্ত্রের 'ডিনামিক্' শক্তিরও একদিন চরম শৈথিল্যের লগ্ন আসেতো!

উষাগমে মাঠের পথে গরু বাঁধিতে আসিয়া হরিশঙ্করকে সম্মুখে দেখিতে পাইয়া মেহের আলী ও করিম শেখ প্রকাণ্ড দুই সেলাম ঠুকিয়া কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। জমিজমার হিসাবপত্র রাখিতে হয় না বলিয়া করিমকে পূর্ব্ব হইতে চিনিয়া আসিলেও মেহের আলীকে তার নামের সহিত মিলাইয়া হরিশঙ্কর কোনো দিনই চিনিত না। তাই বলিল, "কি করিম, শরীর যে আধখানা হয়ে গেছে, অসুখ ক'রেছিল বুঝি?"

গভীর সহানুভূতির স্পর্শে মানুষের হৃদয় মন যেমন দুঃখ-বেদনায় মিশিয়া অল্পতেই গলিয়া যায়, করিমেরও হয় ত তাহাই হইল। কহিল, "ছোট লোকের জাত আমরা, অসুখ বিসুখ ক'রলে চ'লবে কেন ছোটবাবু? গতরে সইতে পারি আমরা সবাই, সাঁঝ-ফজরে শুধু লাঠির গুঁতো বাদে। আপনি তো আমাদের দেবতা, আপনার হাতে হিসাব-নিকাশ চুকে গেলে আমাদের আর দুঃখ ছিল কিসে? বড় কর্ত্তার অত্যাচার যে আর দেহে কিছু রাখলো না ছোটবাবু? আপনাকে ছাড়া একথা আর কাকে ব'লবো বলুন।"

শুনিয়া হরিশঙ্করের মুখে প্রথমটা কথা ফুটিল না। ভাবিল, শুধু সংসারের উপরে নয়, দুঃস্থ কৃষকজীবনের উপরেও দাদার উচ্ছৃঙ্খলতা আজ প্রচণ্ড হইয়া উঠিয়াছে। গৃহে নাই লক্ষ্মী, বাহিরে নাই মঙ্গলের এতটুকু চিহ্ন। মনে মনে চিন্তা করিয়াও হরি বুঝিয়া উঠিতে পারিল না যে, তাহারই অগ্রজ-সহোদর বিজয়শঙ্করের মধ্যে এতখানি পশুত্ব ঢুকিতে পারে। অধঃপাতে যাইবার ইহার চাইতে আর বড় পথ কি আছে পৃথিবীতে? গ্রামের দুইশত কৃষকপ্রজা একযোগে যদি বিদ্রোহ করিয়া মুষ্টিমের লাঠির বিরুদ্ধে কোদাল আর লাঙলের ফালা লইয়া দাঁড়ায়, চৌধুরী বাড়ীর শেষ ইটখানা ধূলিসাৎ হইতে তবে কতক্ষণ?

এমনিধারা বহুক্ষণ অনেক কিছু চিন্তা করিবার পর হরিশঙ্কর কি যেন বলিতে যাইতেছিল, ইতিমধ্যে মেহের আলী বলিয়া উঠিল, "বড়কর্ত্তাকে আমরা আর কিছুতেই সহ্য ক'রবো না ছোটবাবু। গরীব ব'লে কি বিনা অন্যায়ে চিরদিন মার খেয়ে ম'রেই থাকবো? আজ থেকে আপনিই আমাদের মনিব। বড়কর্ত্তার একখানা লাঠিকেও আমরা আর ভয় ক'রবো না।"

মেহেরআলী উত্তেজনার মুখে আরো কি বলিতে যাইতেছিল, হরিশঙ্কর বাধা দিয়া কহিল, "হাজার হোক্ তিনি আমার বড় ভাই, তাঁকে না মেনে অপমান ক'রলে কি আমারই অপমান নয়? তার চাইতে যেমন আছো, তেমনিই থাকো; বরঞ্চ আমি তোমাদের দিকে সব সময় দৃষ্টি রাখবো।" বলিয়া সাময়িক ভাবে হরি নিজেকে ভুলাইতে চেষ্টা করিল সত্য, কিন্তু পারিল না।

করিম শেখ বলিল, "তবে আমাদের আর ভবিষ্যতে দেখতে পাবেন না, ছোটবাবু।"

কথাটাকে বাড়াইয়া মেহের আলী কহিল, "কারণ মনের একটা পিরবিত্তি চাইতো! কাজের ক্ষেত্রে তা' আমাদের অনেকদিনই নষ্ট হ'য়ে গেছে। এখন আছি শুধু একটা শেষ কথা প্রকাশ ক'রে দিতেই।"

বিষয়টাকে আর না ঘাটাইয়া হরিশঙ্কর পাশ কাটাইয়া পুনরায় চলিতে সুরু করিল, ভাবিল, বাড়ী ফিরিয়া আজই দাদার সহিত ইহার একটা চূড়ান্ত আলোচনা ও নিষ্পত্তি করিতে হইবে।

কিন্তু মনের কোন্ দুর্ব্বলতার জন্যে জানি না, হরি উপযাচক হইয়া বিজয়শঙ্করকে এ বিষয়ে একটি কথাও বলিতে পারিল না। বরঞ্চ কাছে পাইয়া কতকটা গম্ভীর কণ্ঠে বিজয়শঙ্করই তাহাকে বলিল, "ইদানিং বড় নীতিজ্ঞান বেড়ে গেছে দেখছি। বলি, ব্যাপারখানা কি, হরি? অতো হম্কি কিসের? লাটসাহেবি চাল বাড়ীর চাকরদের উপর চালিও আমার উপরে নয়।"

নিঃসন্দেহে হরি গত রাত্রের ব্যাপার মনে মনে বুঝিয়া লইল। ভাবিল, একবার অহিংসানীতি অবলম্বন করিয়া দেখা যাক, কিন্তু আকস্মিক মনের একটা তীব্র বিতৃষ্ণায় নিজেকে প্রসারিত করিতে পারিল না। তথাপি শান্ত কণ্ঠে কহিল, "বুঝতে পারছি না তোমার হঠাৎ চটে যাবার কারণ কি দাদা? ভেবেছিলাম, এতদিনে নিজের ভুল হয়তো তুমি ধ'রতে পারবে, কিন্তু দেখলাম, সংস্কার বদলাতে মানুষের অত্যন্ত সময় লাগে। প্রচণ্ড একটা ধাক্কা জীবনের উপর না এলে মজ্জাগত রুচির কখনো পরিবর্ত্তন হয় না। ভগবান্ না করুণ, কিন্তু তোমার জমিদারী প্রভুত্ববোধই হয়ত এক দিন তোমার সমস্ত সত্বার মূলে আঘাত করিবে! সৌহার্দ্দ আর প্রভুত্ব, পালন আর শাসন যে কখনো এক জিনিষ নয়, এইটুকুতো জানো। প্রজাদের ক্ষেপিয়ে তুলে বিশেষ ভাল করনি। বুঝলে, মঙ্গল তাতে আসে না, আসে বিদ্রোহ।"

বিজয়শঙ্করের রক্তচক্ষু দেখিতে দেখিতে জলন্ত কয়লা-খণ্ডের মত লাল হইয়া উঠিল, কহিল, "ধর্ম্মকথা তোমার কাছে শুন্তে চাইনি হরি। এম. এ পাশ করেছো, বিশ্ব-বিদ্যালয়ে গিয়ে বক্তৃতা দিও, এখানে নয়। কাকে কি বলে, না বলে, তা আমি বেশ জানি, উপদেশের তাতে প্রয়োজন হবে না। দরদ দেখাবার ইচ্ছে থাকে চাষাদের নিয়ে থাক'গে। এখানে থেকে আমার সম্মান ডুবোতে পারবে না। যাও।"

মানুষ একথার পরে কি করে জানি না, কিন্তু হরি আর একটী কথাও কহিল না। ভাবিল, প্রজাদের মনোগত ভাবটা শেষবারের মত একবার দাদাকে খুলিয়া বলে কিন্তু হয়ত প্রবৃত্তিতে বাধিল, তাই দ্রুতপদে সে সরিয়া পড়িল অগ্রজের সম্মুখ হইতে।

নায়েব ব্রজ বাড়ুয্যে আসিয়া বলিল, "উত্তরপাড়ার নটবর সিকদার আর রসিক প্রামাণিক মিলে প্রকাণ্ড জোট পাকিয়েছে। বল্‌ছে, বিলের মাছের অংশ একতিলও তারা ছেড়ে দেবে না; বিলের স্বত্ব নাকি তাদের নিজেদের!"

শুনিয়া বিজয়শঙ্করের ললাটের কুঞ্চিত পুরু রেখাগুলি যেন সদর্পে দাঁড়াইয়া উঠিল। কহিল, "হুঁ—বুঝতে পেরেছি, একটা কোনো দাঙ্গা না বাধানো পর্য্যন্ত তারা শান্তি পাচ্ছে না। শুনুন, কালকেই আপনি তাদের আমার নাম ক'রে ডাকিয়ে পাঠাবেন, তারপর যা' ক'রতে হয় বুঝে দেখবো।"

ব্রজ বাড়ুয্যে তখনকার মত অবিশ্যি তার নিজের কাজে চলিয়া গেল, কিন্তু পরদিন নটবর কিম্বা রসিককে ডাকিয়া

পাঠাইবার সময় যখন সত্যি সত্যি উপস্থিত হইল, তখন চৌধুরী বাড়ীতে মস্ত হুলুস্থুল পড়িয়া গিয়াছে।

বিজয়শঙ্কর বহুদিন হইতেই 'ব্লাডপ্রেসারে' ভুগিতেছিল। সহরে ডাক্তারের বিধানানুসারে কয়েকদিন চলাতে মাঝখানে কিছুটা কমিয়াছিল সত্য, কিন্তু সেদিন আবার রক্তের চাপ অত্যন্ত বৃদ্ধি পাওয়ায় ঘন ঘন মূর্চ্ছা আরম্ভ হইল। বড়বাবুর অসুখ,—এ তো আর রামা শ্যামা নয়,…চতুর্দ্দিকে মুহূর্ত্তে একটা হিড়িক পড়িয়া গেল। নায়েব ব্রজ বাঁড়ুয্যে দৌড়াইল ডাক্তার ডাকিতে। নিতান্ত প্রশান্তির মধ্যে যেন একটা অশান্তির সৃষ্টি হইল।…

হাজার হউক, এক মায়ের পেটে জন্ম তো! হরি কাছে আসিয়া অরুণাকে সাহস দিয়া কহিল, "ভয় নেই বৌদি, আমিই তো রয়েছি, খানিক বাদে তো আবার ডাক্তারই আসছে। তুমি বরঞ্চ চান, খাওয়া-দাওয়া সেরে আস।"

তথাপি অরুণা স্বামীর শিয়র হইতে এক পা-ও নড়িল না, বলিল, "ডাক্তার আগে দেখে না গেলে আমি কিছুই কোরবো না ঠাকুরপো। আমার জন্যে তোমার ভাবতে হবে না। মেয়ে মানুষের এটুকু মোটে কষ্টই নয়—"

হরিশঙ্কর আর দ্বিরুক্তি করিল না।

ঘণ্টা দু'য়েক পরে পার্শ্ববর্ত্তী সহর হইতে ব্রজ বাঁড়ুয্যে ডাক্তার লইয়া ফিরিল।

বিজয়শঙ্করকে পরীক্ষা করিয়া ডাঃ ক্যাপ্টেন নিয়োগী বলিলেন, "অন্ততঃপক্ষে half-a-pound blood বের ক'রে না ফেললে পেসেণ্টকে 'নর্ম্মাল ষ্টেজে' আনা কষ্টসাধ্য হ'য়ে দাঁড়াবে। তবে risk নিতে হবে যথেষ্ট বলে দিচ্ছি।"

শুনিয়া অরুণার বুকের ভিতরটা মুহূর্ত্তে একবার ছঁ্যাৎ করিয়া উঠিল।

হরি কহিল, "Everything depends on you, আপনি যা ভাল বোঝেন, করুন।"

ডাক্তার অতি সন্তর্পণে তাঁর অভিপ্রেত কার্য্য শেষ করিলেন। নিরানব্বই ভাগ জীবনের আশা ছাড়িয়া দিলেও বিজয়শঙ্কর ভোলাশঙ্করের আশীর্ব্বাদের জোরে ধীরে ধীরে আবার ভাল হইয়া উঠিল। অরুণার মুখে হাসি ফুটিল। আট চল্লিশে বৃদ্ধ ব্রজ বাঁড়ুয্যের পায়ের ব্যথা কমিল।

বিজয়শঙ্কর একরোখা মানুষ হইলেও অন্তরের অকৃত্রিম শুশ্রূষায় এবারে কতকটা মুগ্ধ হইয়া স্ত্রীকে কহিল, "হরিটা ছিল ব'লে রক্ষা পেলাম। কিসে কি হয়, তুমি আর কতটুকুই বা বুঝতে? হাজার হোক্, ভাই তো,—না কি বল অরুণা?"

ইহার পর একে একে মাসাধিক কাল অতিবাহিত হইল।

রসুইপুরের কৃষকদের মধ্যে ধীরে ধীরে যে বিদ্রোহের আগুন জ্বলিয়া উঠিতেছিল, এখন তাহা প্রচণ্ড হইয়া উঠিয়াছে! বিজয়শঙ্কর অবিশ্যি তার কিছু কিছু আভাষ ইতিমধ্যেই পাইয়াছিল, তথাপি উদ্ধতার চিহ্ন বড় একটা তাহার মধ্যে দেখা যায় নাই।

পরদিন ভোর হইতেই বিজয়শঙ্কর দেওয়ান কালীকৃষ্ণকে বলিল, "আমার সাথে বেরোতে হবে দেওয়ানজী, নায়েব মশাইও সঙ্গে যাবেন। যান—প্রস্তুত হয়ে নিন।"

ইহারপর অল্প সময়ের মধ্যেই জমিদারী-প্রাতঃরাশ শেষ করিয়া বিজয়শঙ্কর বাহির হইয়া পড়িল কৃষকদের আড্ডায়। —আড্ডা বলিতে স্বল্পপরিসর স্থানটিকে কেন্দ্র করিয়া চাষ-আবাদিদের একটা ছোটোখাটো তামাকুর মজলিস বসে, তাহা চৌধুরী বাড়ী হইতে প্রায় এক ক্রোশের পথ।

শীতকালের দিন। ভোরের রোদ সারা অঙ্গে যেন একটা অনাস্বাদিত স্নেহের স্পর্শ বুলাইয়া দেয়!…মেহের-আলীদের দল যে যাহার মত ক্ষেত-খামারে বাহির হইয়া পড়িবার পূর্ব্বে প্রতিদিনের মত অল্প অবসরের মাঝ দিয়া আজও সেই তামাকুর আড্ডাকে জাঁকাইয়া তুলিয়াছিল। সৌভ্রাত্রের এমন ক্ষেত্র যেন সারা পৃথিবীতে খুঁজিয়া পাওয়া দুর্লভ!

বিজয়শঙ্কর আসিয়া যথাস্থানেই পৌঁছিল বটে, কিন্তু জমিদারের আকস্মিক এই উপস্থিতিতে কাহারো মনে যে তেমন কোন চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইল, তাহা বোঝা গেল না। বৎসর কয়েক আগে হইলেও হয়ত বা এমতাবস্থায় সেলামের অন্ত থাকিত না, কিন্তু ভক্তিচিত্তের তেমন অভিনন্দন তো দূরের কথা, কাহারো হাতখানি পর্য্যন্ত আজ আর ললাট অবধি যাইয়া পৌঁছিল না।

বিজয়শঙ্কর মনে মনে যথেষ্ট ক্রোধান্বিত হইলেও সহসা কিছু বলিবার পূর্ব্বেই ব্রজ বাঁড়ুয্যে চাষী-সর্দার মনু খাঁকে

লক্ষ্য করিয়া কহিল, "বাবু এসেছেন, সেদিকে তোমাদের ভ্রূক্ষেপই নেই দেখছি, মনিবকে সম্মান করতে হয় কেমন ক'রে, তাও কি আজ ব'লে দিতে হবে তোমাদের? এতখানি অধঃপাতে নেমে গেছ তোমরা?"

বিদ্রোহী চাষী সম্প্রদায়ের মাঝখানে মন্নু খাঁ কিঞ্চিত ভ্রুকুঞ্চিত করিয়া নায়েবের কথায় জবাব দিয়া কহিল, "মনিবকে সম্মান আমারা যথেষ্টই ক'রতে জানতাম, তা' আমাদের কোনোদিন শিখুতে হয় নি। কিন্তু আজ জবাব চাই, আমাদের সেই অধঃপাতে নামাবার মূলে কে?"

মন্নু খাঁর উত্তেজিত রক্তচক্ষুর কাছে ব্রজ বাঁড়ুয্যের আর দ্বিতীয়বার কথা বলিতে সাহস হইল না। কালীকৃষ্ণের মুখেরদিকে একবার জিজ্ঞাসু নয়নে চাহিয়া মাথা নীচু করিয়া লইল মাত্র।

হাতের মোটা বেতের লাঠিখানা দোলাইতে দোলাইতে তীব্র কণ্ঠে বিজয়শঙ্কর কহিল, "কেন, যদি বলি—আমি?"

মন্নু খাঁ এবারে গা ঝাড়িয়া উঠিয়া কিঞ্চিত আগাইয়া আসিয়া বলিল, "সেলাম হুজুর। কিন্তু তা জেনেই তো আমিও কর্তার হুকুমে না চল্‌তে ব'লে দিয়েছি আমার ভাইজানদের। হুজুরের হয়ত জানা নেই যে, আমরাও মানুষ, গরীব বলে—শেয়াল কুকুর নয় যে ইচ্ছে হোলো আর লাঠি চালালেন। খাজনা শোধ করা আর লাঠি মারা এক জিনিষ নয়। নায়েবমশাই হয় ত জানা ছিল যে মন্নু খাঁও একটা দলের সর্দ্দার। হাঁ, মন্নু খাঁ ইচ্ছে ক'রলে"—

বিজয়শঙ্কর এতক্ষণ যেন এই ঔদ্ধত্যপনা কিছুতেই সহ্য করিয়া উঠিতে পরিতেছিল না। এবারে ঝাঁঝালো কণ্ঠে চিৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল, "মন্নু খাঁ ইচ্ছে ক'রলে জমিদারকেও সাজা দিতে পারে, না? ছোটলোক কোথাকার বদমায়সি পেয়েছ?" বেতের লাঠিখানা মুহূর্ত্তে একবার মন্নু খাঁর চোখের সম্মুখ দিয়া ঘুরিয়া আসিল।···

সেদিন হিসাব ঘাঁটিয়া যখন দেখা গেল, খাজনার বাকী অঙ্ক নগদের পাঁচশো গুণ উর্দ্ধে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, বিজয়শঙ্করের ক্ষমাহীন হৃদয় কিন্তু ধৈর্য্য না হারাইয়া পারিল না। সতীব্র কণ্ঠে নায়েবকে বলিল, "আমাকে এতদিন এসব জানাননি কেন? খাজনার নামে টাকা প'ড়ে থাকবে বাইরে, আর ঘরে ব'সে কি আমার আকাশের দিকে চেয়ে থাকলেই দিন যাবে? আর উত্তরপাড়ার সেই ব্যাপারটা,—কোন দিকেই যদি আপনার লক্ষ্য থাকে একটুকু!"

বয়সে ব্রজ বাঁড়ুয্যে প্রবীন হইলেও নবীন মনিবের কথার দাপটে ঘাবড়াইয়া যাইবার লোক নয়। কহিল, "আপনার অসুস্থাবস্থায় কৃষক-প্রজাদের অনেকবারই আমি এসম্বন্ধে নোটিশ দিয়েছি, কিন্তু টাকা পরিশোধ করে দিতে তারা কিছুতেই রাজি নয়। বলে—যতদিন পেরেছে ততদিন তারা উপোষ ক'রেও খাজনা জুগিয়েছে, এখন তাদের উপর জুলুম ক'রলেও ফল ফলবে না কিছু। তবে—বিলের ব্যাপারটা নিয়ে নটবরদের কাছে আমি আর যাইনি অবিশ্যি; তাও আপনার অসুখের জন্যেই—।"

বিজয়শঙ্কর বলিল, "বিলের ব্যাপারটা এখন না হয় আপাততঃ চাপাই থাক্, কিন্তু চাষাগুলোর মৎলব তো ভাল নয়। আমাকে কাজে না নাবলে দেখচি আস্পর্দ্ধা ওদের ক'মছে না। ব্যাটাদের মার খেয়েও যদি শিক্ষা হয়!··· কালকেই চলুন, এর একটা হেস্ত নেস্ত ক'রে আসি ওগুলোর সাথে। জোরের দিকেই তৈরী হ'য়ে নেবেন, বুঝলেন তো?"

আকস্মিক অজানা একটা আশঙ্কায় মনে মনে প্রমাদ গণিলেও ব্রজ বাঁড়ুয্যের মুখে আর কথা ফুটিল না। তখনকার মত মনিবের কথায় স্বীকৃতিসূচক মাথা নাড়িয়া নিজের কাজে চলিয়া আসিলেও আগামী কল্যের কথা চিন্তা করিয়া মনে মনে ভাবিল, আটচল্লিশের ধাক্কা এবারে সহ্য করিতে পারিলে হয়।

বস্তুতঃ জটিল সমস্যা জীবনে যথেষ্ট আসিলেও—এমন কঠিন দুর্ভাবনায় পড়িতে হয় নাই ব্রজ বাঁড়ুয্যেকে কোন দিনই। তাই কথাটা গোপনে একবার হরিশঙ্করকে না জানাইয়া সে পারিল না। বলিল, "চাষারা যেমন ভাবে ক্ষেপে র'য়েছে, তাতে ক'রে কর্ত্তাবাবুর তাদের সাথে যেয়ে বচসা করা মানে একটা কোন দাঙ্গা বাঁধান আর কি?"

হরিশঙ্করেরই বা ইহাতে আর কি বলিবার আছে? নিজ কানে সেও যে ইতিপূর্ব্বে প্রচলিত ঘটনার আভোপান্ত না শুনিয়াছে, তাহা নয়। কহিল, "এসব কথা আমাকে বলা আর একটা গাছকে বলা—একই কথা নায়েবমশাই। তার চাইতে যা ভাল বোঝেন দাদাকেই বলুন। একা

প'ড়ে আছি চুপ চাপ, কোন কথার মধ্যেই তো আর যাইনে দেখছেন ; মুখ বুজে আছি, তাই আমাকে থাকতে দিন।—"

দেওয়াও হইল তাহাই। বাজে বকিয়া হরিশঙ্করকেই বা মিথ্যা উত্যক্ত করিয়া লাভ কি ? মন্থর গতিতে ব্রজ বাঁড়ুয্যে আসিয়া আবার নিজের গদিতে বসিল।

*　　　*　　　*

দেখিতে দেখিতে কোথা দিয়া কুরুক্ষেত্র বাধিয়া গেল, কেহই টের পাইল না। অথচ বাক্‌যুদ্ধ যখন মল্লযুদ্ধে আসিয়া পরিণত হইল, তখন ইহা হইতে রেহাই পাইল না কেহই। একযোগে মেহেরআলী-সম্প্রদায় ঝাঁপাইয়া পড়িল আসিয়া চৌধুরী-গোষ্ঠির উপরে। বলিল, "আমাদের সর্দ্দারের অপমান আমরা সইবো না।"

নায়েব ব্রজ বাঁড়ুয্যের সর্ব্বাঙ্গে কম্পন উপস্থিত হইলেও মনিবকে রাখিয়া সরিয়া পড়িতে সাহস হইল না। যথাসাধ্য কালীকৃষ্ণের সাহায্যে বিজয়শঙ্করকে আক্রমণ হইতে মুক্ত করিতে চেষ্টা করিল বটে, কিন্তু বৃথাই।

এমনি ধারা কতক্ষণ কাটিল জানি না। সর্দ্দারের ইঙ্গিতে চাষী সম্প্রদায় যখন সকলেই এক রকম রণে ভঙ্গ দিল, তখন বিজয়শঙ্করের চেতনা লোপ পাইয়াছে। ব্রজ বাঁড়ুয্যের জানু-দেশ চিড়িয়া দরদর করিয়া রক্ত পড়িতেছে। তথাপি ব্রজ বাঁড়ুয্যে সেদিকে লক্ষ্য করিল না। ভয়ে ভয়ে কালীকৃষ্ণকে দিয়া একটা গরুর গাড়ী ডাকাইয়া যথাশীঘ্র মূর্চ্ছিত বিজয়-শঙ্করকে সহ রওনা দিল বাড়ীর দিকে। মিটিয়া গেল খাজনা আদায়, মিটিয়া গেল প্রজা-শাসন।···

আবার ডাক্তার নিয়োগী আসিলেন। ঔষধে-প্রেসক্রিপশনে কয়েক দিন কাটিল। বিজয়শঙ্করের সংজ্ঞা ফিরিল। শিয়রে বসিয়া অরুণা বলিল, "ভেবেছিলাম, যাবার আগে বাধা দি তোমাকে, কিন্তু সাহস পাই নি। জানি, সঙ্কল্প একবার যা ক'রবে, টল্‌বে না তা কিছুতেই। অথচ দেখ তো, কিছুর মধ্যে কিছু নয়, সামান্ত ব্যাপারে কি হ'য়ে গেল! নায়েব মশাইও তো কম জখম হ'লেন না।"

ক্লান্তকণ্ঠে বিজয়শঙ্কর জিজ্ঞাসা করিল, "তাঁকেও ডাক্তার দেখানো হ'য়েছে তো ?"

স্বামীর চুলগুলির মধ্যে অঙ্গুলী সঞ্চালন করিতে করিতে অরুণা জবাব দিল, "হ্যাঁ, বল্‌লেন ভয় নেই, ঘা শুকিয়ে এসেছে।"

কিছুক্ষণ নীরবে কাটিল।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বিজয়শঙ্কর কহিল, "আমার আর জমিদার-খেতাব ভাল লাগচে না অরুণা। দেখলাম, ও বড় ঝামেলা। আমার পক্ষে প্রজা তাড়িয়ে বেড়ানো অসাধ্য। তার চাইতে-খাই-দাই, দিন কেটে যাক্—এই ভাল, না কি বল অরুণা ?"

অরুণা কথাগুলি ঠিক বুঝিতে পারিল না। বলিল, "তোমার ভালো তুমিই জানো। আমাকে পায়ে রাখো পায়েই থাক্‌বো, মাথায় রাখো ছাতা ধরবো, রোদের তাপ গায়ে লাগতে দেবো না তোমার এতটুকুও।"

ম্লান হাসিয়া বিজয়শঙ্কর কহিল, "কিন্তু তাতে তুমি খুশী হবে ?"

দ্বিধাহীন কণ্ঠে অরুণা বলিল, "দুঃখেরই বা কি আছে বল ? বিত্ত-সম্পত্তিকে মাঝখানে খাড়া ক'রে তোমার হাতে হাত রেখে আমার তো বিয়ের মন্ত্র পড়তে হয় নি, জানো।"

বিজয়শঙ্করের মুখে কথা ফুটিল না। নিঃশব্দে চক্ষু বুঁজিয়া বহুক্ষণ অসাড়ের মত পড়িয়া রহিল। অরুণাও আর দ্বিরুক্তি না করিয়া অন্ত কাজে যাইয়া মন দিল।

এমনি করিয়াই সেই দিন সেই রাত্রি কাটিয়া গেল। বিজয়শঙ্কর আকাশ পাতাল অনেক কিছুই ভাবিল। ভাবিল তাহার মায়ের কথা, ভাবিল বাবার কথা,···অতীত ও ভবিষ্যৎ সব যেন একত্রে আসিয়া এতদিনে ভীড় জমাইয়া তুলিল তাহার মনে! বিজয়শঙ্করের ক্লান্ত চোখে একবার হয় ত জল আসিল ; কিন্তু অরুণার দৃষ্টির অন্তরালে তক্ষুণি আবার মিলাইয়া গেল।

পরদিন প্রভাতে কনিষ্ঠ হরিশঙ্করকে নির্জ্জনে ডাকিয়া বিজয় কহিল, "নিজের রুচি অনুসারে জীবনের বহু বছরইতো আমার কেটে গেল হরি। বুঝলাম, জমিদারী করা আমার কাজ নয় ; তাতে শক্তির প্রয়োজন। অথচ সে শক্তি আমার নেই। প্রতিমুহূর্ত্তেই মা-বাবার দীর্ঘশ্বাস এসে লাগছে আমার বুকে। আজ ভাবছি, শেষ কটা দিনও যদি তাঁদের শান্তি দিতে পারতুম এতটুকু···। তুই তো আমার ভাই, দাদার কথা অমান্ত করিসনে। এ জমিদারীর ভার আমি

তোর হাতেই ছেড়ে দিলাম হরি। জানি, চৌধুরীবংশ তোর হাতেই আবার উজ্জ্বল হয়ে উঠবে। আমি তাকে নষ্ট করেছি, প্রজাদের মনে অশান্তি বাড়িয়েছি। তুই আবার সব কিছুকে পরম প্রশান্তির মধ্যে ফিরিয়ে আন্। দেখে আমি শান্তি পাই।" বলিতে বলিতে বিজয়শঙ্করের দুই চোখ বাহিয়া দুই ফোটা জল গড়াইয়া পড়িল বালিশের উপর।

হরিশঙ্কর সহসা কি বলিবে বুঝিয়া উঠিতে পারিল না। কথাগুলি তাহার কাছে যেন স্বপ্নের মত বোধ হইল। অনেক দিন অনেক কিছু সে চিন্তা করিয়াছে, কিন্তু এমন রূঢ় বাস্তব চিন্তা তো হরিশঙ্করের মনে ক্ষণকালের জন্যও আসে নাই কোনদিন। প্রজারা একদিন তাহাকে যথেষ্ট বলিয়াছে সত্য, কিন্তু সত্যি সত্যি সেগুলি তো মনে স্থান দেয় নাই সে বিন্দুমাত্রও। তাই ক্ষণকাল নির্জ্জীব মূঢ়ের মত দাঁড়াইয়া থাকিয়া হরি কহিল, "এমন ছেলে মানুষি বুদ্ধি তোমার মাথায় ঢুকলো কেমন করে বলত? জমিদারী নিয়ে এমন কি হোলো, তাতো বুঝতে পারলুম না। তবে চাষীরা যা ব্যবহার করেছে, আমি তার উপযুক্ত step নেবো এই বল্‌ছি।"

হরি আরও কি বলিতে যাইতেছিল, বাধা দিয়া ধীর কণ্ঠে বিজয়শঙ্কর বলিল, "নারে বোকা, চাষীদের বিন্দুমাত্র দোষ নয়, দোষ এই অদৃষ্টের। তাই তো বল্‌লুম, এবারে আমাকে তুই ছুটি দে। ভার বইবার ক্ষমতা আর আমার নেই। তোর দাদাকে এখন মুক্তি দে হরি, একটু নিশ্চিত মনে প্রাণ ভ'রে ঘুমোতে দে।"

একথার উপরে প্রতিবাদ করিতে হরিশঙ্করের সত্যি একেবারে অসাধ্য হইয়া দাঁড়াইল। দাদার এমন আকস্মিক পরিবর্ত্তনের কথা একটু আগেও তো সে ভাবিতে পারে নাই। অগ্রজের পাদুখানি জড়াইয়া ধরিয়া একবার তাহার বলিতে ইচ্ছা করিল, 'একদিন তুমি ছিলে নিতান্ত সাধারণ মানুষ, আজ হ'লে সত্যিকারের দেবতা।' কিন্তু মুখে আর তাহা প্রকাশ পাইল না। শুধু নীরবে দক্ষিণ হাতখানি তাহার ধীরে ধীরে সরিয়া আসিল বিজয়ের কাছে।

বিজয়শঙ্কর তাহা নিজের হাতের মুঠায় টানিয়া লইয়া আশীর্ব্বাদ করিয়া কহিল, "জীবনে তুই বড় হ'য়ে ওঠ, এ প্রার্থনাই করি শুধু ভগবানের কাছে।"

কখন অরুণা আসিয়া পিছনে দ্বারপ্রান্তে দাঁড়াইয়াছিল, হাসিয়া বলিল, "আমার আশীর্ব্বাদটা কিন্তু জমা রইল ঠাকুরপো। আস্‌চে জ্যৈষ্ঠে বউ আন্‌বে ঘরে, তবে দেবো ধান-দূর্ব্বা।"

মুখ ঘুরাইয়া অবাক বিস্ময়ে শুধু চাহিয়া রহিল অরুণার হাস্য-কৌতুকোজ্জ্বল মুখের পানে।

বাহিরে খাঁচার ভিতর হইতে ময়না পাখীটা ডাকিয়া উঠিল, জয় রাধা—কৃষ্ণ।



সোভিয়েট রাশিয়ার কৃষিকর্ম্ম

শ্রীজীতেন্দ্রকুমার নাগ



লেনিন

সোভিয়েট রাশিয়া বলশেভিষ্টদের হাতে নূতনভাবে গড়ে ওঠার ফলে চাষবাস সম্বন্ধে নূতনতম পদ্ধতি অবলম্বন করেছে। সোস্থালিষ্ট বা সমাজতন্ত্রী সঙ্ঘ (Union) কৃষি প্রধান এত বড় দেশ রাশিয়াকে পুরোপুরি যান্ত্রিক (Industrialist) না ক'রে তার চাষীদের উন্নত কৃষি বিদ্যাশিক্ষা দিয়ে তার উৎপাদন শক্তিকে যথেষ্ট (দ্বিগুণের বেশী) বৃদ্ধি ক'রেছেন। মহামানব লেনিন, ট্রট্স্কি, কামেনেফ এবং যোসিয়ে ষ্ট্যালিন্ প্রভৃতি বলশেভিজম্ প্রবর্ত্তকরা সকলেই বুঝেছিলেন যে রাশিয়ার চাষাদের অবস্থার শ্রীবৃদ্ধি না হ'লে দেশের খাদ্য কষ্ট ঘুচবে না। পৃথিবীর মধ্যে কোন গবর্ণমেণ্টই এ সম্বন্ধে বিশেষ সুবিধা করতে পারে নি, কিন্তু রাশিয়া পেরেছিল। প্রায় দুই কোটী কৃষিক্ষেত্র প্রথমে সোভিয়েট গবর্ণমেণ্টের অধীনে এসে গেল – কোন গৃহস্থের নিজস্ব ফার্ম্ম বলতে কিছু রইল না। অথচ সমস্ত কৃষকদের খাটবার পরোয়ানা বেরোল—বসে খেতে পাবে না। ষ্টেটের পরিচালনায় ঐ সমস্ত কৃষিভূমিতে আবাদ হল প্রায় ডবল, কারণ একজন চাষী বা একটী পরিবার বিক্ষিপ্তভাবে অল্পসামর্থে ও অর্থে যা ক'রত সকলের যুক্ত সামর্থে এবং ষ্টেটের অর্থে ও পরিচালনায় তার ঢের বেশী শস্য উৎপাদন হতে থাকল।

বর্ত্তমান সোভিয়েট রাশিয়ায় তিন প্রকার কৃষিকর্ম্ম চলতি আছে শু'নি। প্রথম হল লোক বিশেষের চাষ, ইণ্ডিভিজুয়াল ফার্ম্ম—একজন কৃষকের বা একটী চাষী গৃহস্থের কৃষিক্ষেত্র। এর অস্তিত্ব এখনও আছে ; কেন আছে পরে তা বলছি। দ্বিতীয় হ'ল, 'খোলখোজ' (kholkhoz) যৌথিক কৃষিভূমি (collective farm) যার বিষয় গোড়ায় বলছিলাম। ষ্ট্যালিন নিজে অতি জোরের সহিত এবং অন্যদের বিরুদ্ধ মতে এই যুক্ত সরকারাধীন চাষকার্য্য প্রবর্ত্তন করেন। আর তৃতীয় হল, 'শোভখোজ' (Sovkhoz) ষ্টেট ফার্ম্ম খাটী সাম্যবাদ নীতিতে গঠিত। ইহা কারও নিজের সম্পত্তি নহে, কয়েক জনের মিলিত গোষ্ঠীরও নহে, একেবারে ষ্টেটের নিজ কৃষিভূমি, এখানকার খাসমহলের মত। গবর্ণমেণ্টের কোন বিভাগের খাদ্য সরবরাহের জন্য এই কৃষিক্ষেত্রগুলিতে চাষ করা হয়। এখানে যে সমস্ত চাষারা কার্য্য করে তাদের অধিকার বলতে কিছু থাকে না, তারা বেতনভোগী মাত্র—অর্থে বা শস্যে। শোভখোজ অর্থে আদর্শ কৃষিস্থল (model farm) বলে বুঝায়, এ গুলি গবর্ণমেণ্টের সম্পূর্ণ আয়ত্তাধীন শস্য উৎপাদনের কারখানার মত যেখানে পোলট্রি বা ডেয়ারী ও থাকে। এক একটা কৃষিক্ষেত্রের আয়তন বোধ হয় ৮০ হাজার একার হবে। গবর্ণমেণ্টের খাস অধীনে ও পরি-

চালনায় ভাল ভাল সার দিয়ে কতকগুলি ট্র্যাক্টর সাহায্যে লোক লাগিয়ে চাষ করা হয়। এই কর্ম্ম পরিচালিত হয় মস্কৌর নরকোমসোভখোজ (Norkomsovkhoz) অর্থাৎ ষ্টেট ফার্ম্মের একটী কমিসেরিয়ট দ্বারা। এই ডিপার্টমেন্টের কতকগুলি প্রাদেশিক শাখা আছে; সেখান থেকে ভিন্ন ভিন্ন স্থানের সোভখোজগুলিকে পরিচালিত (control) করা হয়।

রাশিয়ার উপরোক্ত তিন রকমের কৃষি সম্বন্ধে বিস্তৃত ভাবে কিছু বলবার পূর্ব্বে ঐ দেশের চাষীদের অবস্থা সম্বন্ধে কয়েকটা



ট্রট্স্কি

কথা বলা প্রয়োজন। ১৯১০ সালে টলষ্টয় লিখেছিলেন, রাশিয়ার অর্দ্ধেক লোক তাদের অবস্থার উন্নতির কথা ত ভাবতেই পারত না, শুধু কেবল অনাহারে যাতে না থাকতে হয় তার চেষ্টাই করত আর সেইটেই ছিল বড় কথা। সুখে থাকব বা ষ্ট্যাণ্ডার্ড অব লিভিং বাড়াবার কথা ত দূরের কথা। জার-এর আমলে রাশিয়ার চাষাদের এই ছিল অবস্থা।

১৯১৮ সালে বলশেভিক্ বিদ্রোহের ফলে যখন সোভিয়েট গবর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠা হল তখন নূতন সমাজতন্ত্রী শাসনসম্প্রদায়, জমিদারদের সমস্ত জমি-জমা কেড়ে নিয়ে প্রজাদের, কৃষকদের উন্নতি বিধান কি ভাবে করা যায় সেই বিষয়ে মন দিলেন। লোক বিশেষের নিজস্ব ব্যবসা বাণিজ্য যেমন কিছু রইল না, তেমনি চাষ-আবাদ কারুরও একেবারে নিজস্ব রইল না। সবই চ'লে এল ষ্টেটের অধীনে। সকলকে খাটতে হ'বে, সব চাষাকেই চাষ করতে হবে; তার বদলে পাবে তার জীবিকা নির্ব্বাহের যেটুকু দরকার। পূর্ব্বেই বলেছি প্রায় দুই কোটী কৃষিক্ষেত্র সোভিয়েট গভর্ণমেণ্ট লেনিনের কথামত নিজেদের অধীনে এনে পরিচালিত করতে থাকে।

কিন্তু কৃষিকর্ম্মে এই পুরাদস্তুর সোস্যালিষ্ট মতবাদ আরোপনে বিশেষ সুবিধা হয় নি। প্রায়ই চাষারা গোলমাল করত এবং শেষে এমন হল যে, তারা সাধারণ অসন্তোষ এবং বিক্ষোভ প্রদর্শন করাতে, ১৯২০ সালে এমন ধর্ম্মঘট আরম্ভ করে দিলে যে, তার ফলে ষ্টেটের অধীনে এসে মোটমাট চাষ করা জমিতে শস্য হল এত কম যে, সাধারণ অবস্থার তুলনায় তাহা প্রায় অর্দ্ধেক। সোভিয়েট গভর্ণমেণ্ট বড় মুস্কিলে পড়ল। লেনিন দেখলেন, এত বড় দেশে এত সংখ্যক চাষীদের তাঁর মতবাদে নিয়ে আসা কঠিন। ষ্টেট্ ফার্ম্মিং—সোভখোজ যাকে বলেছি—তাহা সর্ব্বস্থানে রাখা সুবিধা হবে না। সেইজন্য ১৯২১ সালে লেনিনের নির্দ্দেশে পূর্ব্বকথিত ডিক্রী তুলে দেওয়া হল। সোভিয়েট কংগ্রেসে লেনিন বলেন, "Experience has proved that we cannot immediately pass on to a pure socialist society…we must take into account the masses' will." অর্থাৎ অভিজ্ঞতা প্রমাণ করে দিচ্ছে যে এক্ষুণি একেবারে খাঁটী সোসালিষ্ট সমাজ করতে পারি না—সর্ব্বসাধারণের ইচ্ছাটাও বিবেচনা করতে হবে।" এই বলে রাশিয়ার চাষাদের না ঠ্যাকাতে পেরে লেনিন তাঁর সমাজতন্ত্রী মতবাদ হতে অল্প বিচ্যুত হলেন। কৃষকদের তিনি কিছুতেই সর্ব্বস্বার্থত্যাগ (sacrifice) করাতে পারেন নি। মূর্খ রুশ চাষারা এমন ধর্ম্মঘট আরম্ভ করল যে, তার ফলে সেই বৎসরে দেশে ভীষণ দুর্ভিক্ষ এসে উপস্থিত হল, লক্ষলক্ষ চাষী না খেতে পেয়ে মারা যায়।

শ্রমিকশ্রেণী বুর্জ্জোয়া বা মধ্যবিত্তশ্রেণী এবং বিত্তশালী রাশিয়ানদের সকলেই লেনিনের বলশেভিষ্ট নীতি শেষ পর্য্যন্ত মেনে নিয়েছিল। কিন্তু সরকার যখন চাষীদের অবলম্বন কৃষিভূমি বাজেয়াপ্ত করে নিল, তখন তাহারা সরকারের সৎ উদ্দেশ্য না বুঝে ভীষণ বিদ্রোহ করতে থাকে।

গোলমাল অনেকদিন চলেছিল, মনীষি লেনিন অসুস্থ হইয়া পড়িলেন। দলের মধ্যে agragrian policy (কৃষিকর্ম নীতি) সম্বন্ধে দু'টা মত হল। ১৯২৪ সালে লেনিনের মৃত্যুর পর ষ্টালিন সোভিয়েট রাশিয়ার ডিক্টেটর সম্পাদক হইলেন।

ষ্ট্যালিন খুব কঠিন ধাতুতে গড়া মানুষ। ১৯৩০ সালে তিনি খুব জোরের সহিত কৃষিভূমিগুলিকে সঙ্ঘবদ্ধ করে যৌথিক চাষ করার পদ্ধতি প্রবর্ত্তন করিলেন। এই 'খোলখোজ' বা কালেক্‌টিভ্‌ ফার্ম প্রতিষ্ঠা করতে ষ্ট্যালিনকে যে কত কঠিন হতে হয়েছিল তাহা যাঁহারা রাশিয়ার বলশেভিষ্ট ইতিহাসের খবর রাখেন তাঁহারাই জানেন। ক্ষুদে চাষী ও ভূস্বামী সবাইর হাত থেকে কর্ত্তৃত্ব কেড়ে নেওয়া হ'ল, যাহারা বিরুদ্ধাচরণ করল, তাহাদের এক ধার থেকে দেশ থেকে বা পৃথিবী থেকে বিদায় দেওয়া হ'ল, ইহাদের সংখ্যা প্রায় ৭ লক্ষ হইবে। রুশ কৃষকরা সংখ্যায় বড় কম বিরূপ হতে ছাড়েনি—মারামারি কাটাকাটি দলের লোককে হতাহত করা, রাগে পড়ে নিজেদের গরু ছাগল পর্য্যন্ত মেরে এমন বিদ্রোহের আগুন জ্বালাইয়া দিল যে, শেষ পর্য্যন্ত ষ্টালিনকেও তাহাদিগকে কিছু কিছু নিজস্ব সম্পদ রাখিবার অধিকার দিতে হয়েছিল। চাষীরা ২।১টা গরু, কতকগুলি মোরগ, মেষ কতগুলি, বাড়ী, ঘর-দোর প্রভৃতি নিজস্ব-সম্পদ রাখিবার অধিকার পাইল। ষ্টালিন চালাকি খেলিলেন—দেখিলেন জোর করিয়া কালেক্‌টিভ্‌ ফার্মিং—যৌথ চাষাবাদ প্রচলন সুবিধাজনক হবে না, তাই তিনি যাহারা তাঁহার মতবাদ মানিয়া নিল অর্থাৎ সঙ্ঘবদ্ধ ভাবে ভূমিকর্ষণ, বপন প্রভৃতি করতে রাজী হইল তাহাদের খাজনা, কর বা যে কোন ট্যাক্স থেকে মুক্তি দিলেন। ট্যাক্সদায় মুক্তির দৃষ্টান্ত দেখিয়া ক্রমশঃ সমগ্র রাশিয়ার কৃষকরা এখন খোলখোজ প্রতিষ্ঠা করেছে গ্রামে গ্রামে বা প্রতি ইউনিয়নে।

একক কৃষিভূমি অর্থাৎ একটী গৃহস্থের অধীনে ইন্‌ডিভিডুয়্যাল ফার্ম্ম রাশিয়াতে একপ্রকার উঠে যাচ্ছে বল্লেই হয় কারণ সোভিয়েট গভর্ণমেণ্ট এদের সুদৃষ্টিতে দেখেনা, এবং অনুমতিও দেন বেশীরভাগ তাদের যারা নিজে হাতে চাষ করে, লোক লাগিয়ে চাষ করে না। ষ্টেট্‌ অধীনে পরিচালিত শোভখোজ (state farm) ও সংখ্যায় কম যেহেতু খোলখোজ প্রবর্ত্তনে সরকারপক্ষ থেকে শোভখোজ সংখ্যা-বৃদ্ধির দিকে মন দেওয়া হয় নি।

খোলখোজ (রাশিয়ার কালেক্‌টিভ ফার্ম) জগতের কৃষির ইতিহাসে অভূতপূর্ব্ব কৃতিত্ব—বর্ত্তমান সোভিয়েট সমাজতন্ত্রী অর্থশাস্ত্রে (socialist economy) একটা খাঁটী অংশবিশেষ রূপে ধরা যেতে পারে। সকল ভূমির স্বামী সেই ষ্টেট কিন্তু তাতে চাষ করা এবং শস্য উৎপাদন করে ভোগ করার অধিকার রহিল এক একটী কৃষক গোষ্টীর (farming group) এর উপর। সেই দলটীর প্রত্যেকের



যোসিফ ষ্টালিন্

সমান অধিকার, কেহ যে পয়সা নিয়ে খাটছে তা নয়—সকলেই পরিশ্রম করে শস্য উৎপাদন করে এবং তাহার লাভ অনুযায়ী অংশ ভোগ করবে, এই হল এর নীতি। জমি জমা যখন ষ্টেটের তখন তার উন্নতির জন্য আর বিতরণে বা অন্যান্য সুবিধা দানে ষ্টেট সাহায্য করে এবং ষ্টেটের ডিপার্টমেণ্ট চালাবার জন্য অল্প লভ্যাংশ গ্রহণ করে।

ধরুন, একটী গ্রামে কতকগুলি চাষী পরিবার আছে; তারা যে যার জমিটুকু তার অন্নশক্তি সামর্থ এবং অর্থে সামান্য কিছু কিছু শস্য উৎপাদন করল—এই হল চিরাচরিত পদ্ধতি। জমিকে উন্নত করে দাঁড় করাতে সোভিয়েট রাশিয়া করলে কি, সেই গ্রামের সমস্ত কৃষকদের সঙ্ঘবদ্ধ করে তাদের সমস্ত জমিটাতে সীমানা ভেঙে দিয়ে সমস্ত যৌথ শক্তি সামর্থে এবং

ষ্টেটের সাহায্যে চাষ করতে উৎসাহিত করল। দেখা গেল, তার যা ফল—একক কার্য্যের চেয়ে দ্বিগুণ। রাশিয়াতে ভাগ্যক্রমে এই রীতি সফলকাম হয়েছে, তার কারণ, এই পথ হ'ল সোশ্যালিষ্ট বলশেভিষ্টদের মাঝা মাঝি। চাষাদের আরও কন্‌সেশন দিতে হয়েছে। যৌথ চাষী গোষ্ঠির প্রত্যেকের পরিবারকে তাদের নিজেদের বাড়ী ঘর দোর, একটা করে গরু, তিনটে বাছুর, দু'টো করে শূকর, ১৫টা করে শূকরের বাচ্চা, ১৫টা ভেড়া বা ছাগল প্রভৃতি রাখবার অধিকার দেওয়া হয়েছে। এই ব্যবস্থা হয়েছে ১৯৩৫ সাল থেকে।

অমৃত-রবি

শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত

সে কিগো মরিতে পারে
মরণে যে করে জয়!
অমর লেখনী যাঁরে
করিল চির অক্ষয়!

বিশ্ব-প্রকৃতির নাড়ী
যাবৎ স্পন্দিত হবে!
'রবি'র রজতরশ্মি
তাবৎ উজ্জ্বল রবে

'ভারত-ভাস্কর'-জ্যোতিঃ
জগত করেছে আলো!
জ্ঞানের মহান দীপ
নাশিল অজ্ঞান-কালো!

'রবি নাই,' 'রবি নাই'—
কেন তবে লোকে বলে!
তাঁর সে দেখান পথে
আজো লক্ষ লোক চলে!

'বাল্মীকি-প্রতিভা' গেয়ে
বাণী-পূজা উদ্বোধন!
আদি কবি আশীর্ব্বাদে
উচ্চ তাঁর সিংহাসন।

ধীরে ধীরে মুকুলিত,
অপূর্ব্ব সে নিরমল!
রূপ-রস গন্ধে ভরা
সহস্র-দল-কমল।

কিশোর, যৌবন, জরা—
তেজোদীপ্ত সব কাল!
নিত্য নব নব সৃষ্টি,
রচিল প্রতিভা-জাল!

ছানিয়া বিশ্বের রূপ
দেখালে সে বিশ্বরূপ!
আপামর সাধারণ
গায় কীর্ত্তি প্রজা-ভূপে!

স্বদেশ হিতৈষী নহ,
প্রেমিক পূজারী তুমি!
উদাত্ত সে পূজামন্ত্রে
গৌরবিত জন্মভূমি!

কুল যে পবিত্র তব,
জননী কৃতার্থ হ'ল!
মাতৃভূমি, মাতৃভাষা—
মাতৃকুল সমুজ্জ্বল!

দেশে দেশে ভ্রমিয়াছ
রাজরাজেশ্বর মত !
সসম্মানে রাজা-প্রজা
করিয়াছে মাথা নত !

অতুলন কাব্যকলা,
কলাশিল্পে বহুজ্ঞান !
জগৎ স্তম্ভিত, মুগ্ধ,
পেয়ে মহা অবদান !

পুণ্যভূমি ভারতের
সংস্কৃতি সনাতন !
নবরূপে নবকাব্যে
দেখালে সে পুরাতন !

অত্যাচার, অবিচার—
দেশে যত ঘটিয়াছে,
নির্য্যাতন যত যত
জাতি তব সহিয়াছে ;

ভৈরব নির্ঘোষে তুমি
করিয়াছ প্রতিবাদ !
শাসকের দল তাহে
করেনি বাদানুবাদ !

নিন্দা স্তুতি সমভাবে
করিয়াছ আলিঙ্গন !
ম্লানমুখে লজ্জানত
হ'ল প্রতিবাদিগণ !

যে যেখানে করিয়াছে
সুন্দরের কোন সৃষ্টি,
ছোট বড় সবে পায়
আশীর্ব্বাদ শুভদৃষ্টি !

অবজ্ঞা করনি তুমি
সংসারের খুঁটি নাটি !
সব কাযে, সব দিকে
দৃষ্টি তব পরিপাটি !

প্রাচীন ও প্রতীচীর
প্রাচীন ও নবীন জ্ঞান—
সমভাবে প্রকটিত
দানে তব সুমহান !

জ্ঞানে ও বিজ্ঞানে তুমি
কর নাই ভেদাভেদ !
পাশ্চাত্ত্য বিজ্ঞান সনে
সমন্বয় প্রাচ্য বেদ !

পরাৎপর পরব্রহ্মে
বিশ্বে হেরি প্রকটিত,
প্রকৃতির সবরূপে
পূজা দিলে অবিরত !

সুন্দরের উপাসক,
সৌন্দর্য্য-সাধনারত,
ফুটাইলে সে সুন্দরে
সবে তাতে, মহাব্রত !

বিশ্ব-রসামৃত-সিন্ধু
বিন্দু বিন্দু বিতরিলে,
বিশ্ব কবি ! কাব্য গীতে
অপ্রকাশ্যে প্রকাশিলে !

বাল্মীকি চরিত্রে ব্যক্ত
নিজ নাট্যে হে নটেশ !
ধরা নাট্যশালা ত্যাগে
পুন নিলে সেই বেশ !

জগতের শ্রদ্ধা স্তুতি
লহ লহ বিশ্বকবি !
'যাবচ্চন্দ্র দিবাকর'—
তাবৎ পূজিবে রবি !

কলিকাতার রাস্তার নামের উৎপত্তি

শ্রীবিপিনবিহারী রায়

কলিকাতা সহরে এখন প্রায় দুই হাজার রাস্তা আছে এবং প্রত্যেকটির একটি করিয়া নাম আছে। এই নামগুলি সম্বন্ধে বিচার করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারা যায় যে, কলিকাতার আদিম কাল হইতে এখন পর্য্যন্ত ক্রমে গড়িয়া উঠার ইতিহাস অনেকাংশে এই নামগুলির সঙ্গে জড়িত আছে। সেই কারণে, নামগুলির সম্বন্ধে আলোচনা করিবার আগে, কলিকাতা সহরের উৎপত্তি কাহিনী ও সহরটি আজ ২৫০ বৎসর ধরিয়া কেমন করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে তাহার কিছু বর্ণনা দেওয়া আবশ্যক।

ইংলণ্ডের এক বণিক-সঙ্ঘ ভারতে বাণিজ্য করিবার উদ্দেশ্যে "ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী" নাম লইয়া এদেশে প্রথমে আসেন ও ভারতের কয়েকটি স্থানে তাঁহাদের "কুঠী" স্থাপন করিয়া ব্যবসা করিতে থাকেন। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে তাঁহাদের হুগলীর কুঠী তথাকার ফৌজদারের উৎপীড়নে ও অন্যান্য কারণে ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়া তাঁহারা নূতন কুঠী স্থাপনের যোগ্য স্থান খুঁজিতে থাকেন। হুগলী কুঠীর অধ্যক্ষ জব চার্ণক্ সাহেব সদলবলে নৌকাযোগে গঙ্গার উপর দিয়া যাইতে যাইতে নদীর পূর্ব্বতটে পাশাপাশি অবস্থিত তিনটি বেশ বড় গ্রাম দেখিতে পান, এবং সেইখানেই কুঠী স্থাপনের মনস্থ করেন। গ্রাম তিনটির নাম ছিল সুতানুটি, কালীকোঠা ও গোবিন্দপুর। ১৬৯০ খৃষ্টাব্দের ২০শে আগষ্ট তারিখে জব চার্ণক স্বদল সহ এই স্থানে নৌকা বাঁধিয়া আস্তানা স্থাপন করেন এবং ইহা হইতেই ও এই তিনটি গ্রামকে কেন্দ্র করিয়াই কলিকাতা সহরের উৎপত্তি হয়। "কালীকোঠা" নামটি তখনকার ইংরাজি নথি পত্রে "Collecotta" লিখিত হইত এবং পরে নামটি পরিবর্ত্তিত আকারে "কলিকাতা" (Calcutta) হয়।

কলিকাতা সহর বলিতে এখন যতখানি স্থান বুঝায় তখন সে স্থানটির বেশীভাগ জলাভূমি, ঝোপ জঙ্গল, অথবা ধান্যক্ষেত্র প্রভৃতিতে পরিপূর্ণ ছিল। মধ্যে মধ্যে অপেক্ষাকৃত উচ্চভূমি বা "ডিহি"র উপরে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রামও ছিল। ইংরাজ বণিকগণ বড়িষা বেহালার সাবর্ণ চৌধুরী জমিদার বাবুদের নিকট হইতে উক্ত গ্রাম তিনটি "মৌজ" বা জমা লইলেন এবং লালদিঘি নামক বৃহৎ পুষ্করিণীর নিকট তাঁহাদের প্রথম উপনিবেশ স্থাপন করিলেন। তখনকার দিনে উত্তম পানীয় জলের বিশেষ অভাব ছিল এবং সেই জন্যই এই পুষ্করিণীটিকে কেন্দ্র করিয়া আশে পাশে তাঁহাদের আপিস, মাল-গুদাম, কেল্লা, আবাস-বাটী প্রভৃতি গড়িয়া উঠিতে লাগিল।......ক্রমে তাঁহাদের সহিত ব্যবসা-বাণিজ্যের সম্পর্কে অনেক লোক বাহিরের অন্যত্র হইতে বাস উঠাইয়া আনিয়া কলিকাতাতেই বসবাস আরম্ভ করিল। বহু লোক এই প্রকারে আসিয়া বাস স্থাপন করাতে একদিকে লালদিঘির উপনিবেশ অপর-দিকে যত্র তত্র এলোমেলো ভাবে ছড়ান একটি নূতন সহর গড়িয়া উঠিতে লাগিল। শুধুই যে ব্যবসা-বাণিজ্যের খাতিরে লোকজন আসিয়া বাস-স্থাপন করিতে লাগিল তাহা নহে, তখন সমগ্র দেশ একপ্রকার অরাজক, মুসলমান নবাবগণের পতনোন্মুখ দশা, দেশে নানারূপ অন্যায় ও অত্যাচারের স্রোত বহিতেছে, সে সময়ে এই শ্বেতকায় বীর জাতির সুরক্ষিত ব্যবসায়-কেন্দ্রের নিকটবর্ত্তী অবস্থান করা নিরাপদ মনে করিয়াও অনেকে পূর্ব্বপুরুষের বাসস্থান ত্যাগ করিয়া কলিকাতায় আসিয়া নূতন বাস স্থাপন করিতে লাগিল। বন-জঙ্গল কাটিয়া, জলাভূমি ভরাট করিয়া, অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রাম ও তাহার খড়ের চালাঘর উঠাইয়া দিয়া তৎ স্থানে নূতন ঘর-বাটি প্রস্তুত হইতে লাগিল। এক শতাব্দী ধরিয়া এই রূপে ধীরে ধীরে সহরের বিস্তার হইতে লাগিল। এই বিস্তার কার্য্য কিরূপ ধীরে ধীরে ঘটিতেছিল তাহা জানা যায় তখনকার নথিপত্রে। নথিপত্রের হিসাব হইতে দেখা যায় যে, ১৭০৬ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা সহরে মাত্র ৮ খানি "পাকা" বাটী ও ৮০০০ "কাঁচা" বাটী ছিল, মাত্র দুইটি "ষ্ট্রীট" বা বড় রাস্তা এবং দুইটি "লেন" বা গলি রাস্তা ছিল! প্রায় একশত বৎসর পরে ১৭৯৪ খৃষ্টাব্দের হিসাব পাওয়া যায় যে, ১১১৪ খানি পাকা বাটী, ১৩,৩৫৭ খানি কাঁচা বাটী, ১৬৩টী "রোড" বা

বড় রাস্তা এবং ১০৩৭টী "লেন" বা গলি রাস্তা ছিল। এইরূপে যখন রাস্তার সংখ্যা বাড়িয়া উঠিল তখন তাহাদের নাম দেওয়ার প্রয়োজন হইল।

এইখানে প্রথমেই সাধারণ ভাবে নামকরণের প্রণালীর কথা বলিয়া রাখা আবশ্যক। পল্লীগ্রাম অঞ্চলে দেখা যায় যে, তথাকার রাস্তার কোন নাম প্রায়ই থাকে না, কোন গ্রামে কোন লোকের "ঠিকানা" খুজিতে হইলে কতকগুলি জানা বা সকলের পরিচিত বস্তুর নাম করিয়া ঠিকানা বলিয়া দেওয়া হয়, যথা, শিবমন্দিরের পূর্ব্ব-গায়ের বা তালপুকুরের পশ্চিম পাশের রাস্তা অথবা বুড়া বটগাছের দক্ষিণে ইত্যাদি। কলিকাতায়ও প্রথম যুগে এই নিয়মেই রাস্তার নাম হয়, অর্থাৎ লোকে সহজে চিনিতে পারিবে এইরূপ কোন বিশিষ্ট বা চিহ্নিত বস্তু, গাছপালা, বাগান, পুষ্করিণী, মন্দির প্রভৃতির নাম দিয়া রাস্তার নাম হয়, যথা, ডালিমতলা, আতাবাগান, পেয়ারাবাগান, নেবুতলা, গোয়াবাগান (এ স্থলে গোয়া-শব্দটি "গুয়া" বা সুপারিগাছের নামের অপভ্রংশ), হরিতকি বাগান, মনসাতলা, পঞ্চাননতলা, ঝামাপুকুর, কাঁটাপুকুর ইত্যাদি। এই ধরণের নামের শেষে তলা, বাগান, পুকুর প্রভৃতি শব্দ আছে, তাহা হইতে বুঝা যায়। তৎপরে দেখা গেল, সহরটি গড়িয়া উঠার সঙ্গে সঙ্গে এক এক জাতির বা এক পেশা বা ব্যবসায়ী লোকের এক একটি বিশেষ স্থানে সমাবেশ হইতে লাগিল। ইহা খুব স্বাভাবিক, লোকে নূতন স্থানে আসিয়া প্রথমেই নিজের জাতির বা সমব্যবসায়ী লোকের সঙ্গ চাহে ও সেই জন্যই এই রূপ কতকগুলি "পাড়া" গড়িয়া উঠিল ও তাহাদের নামে তৎ স্থানীয় রাস্তার নাম হইল, যথা, উড়িয়া-পাড়া, ব্রাহ্মণ-পাড়া, কাঁসারি-পাড়া, দরজি-পাড়া, জাকরা-পাড়া, শাখারি-টোলা, আহিরী-টোলা (আহির অর্থাৎ পশ্চিমা গোয়ালা), গোয়াল-টুলি ইত্যাদি। এই ধরণের নামগুলির শেষে পাড়া, টোলা বা টুলি শব্দ থাকে, তাহা দেখিয়া চিনিতে পারা যায়। তৎপরে ক্রমে এক এক পল্লীর মধ্যে কোন লোক অধিক প্রভাবশালী বা বহু লোকের মানিত বা বিশিষ্ট গুণসম্পন্ন হইয়া উঠিলে, তাহার নাম দিয়া রাস্তার নাম হইতে লাগিল। কিন্তু প্রথম আমলে দেখিতে পাওয়া যায়, আমরা যাহাদের নিম্ন-স্তরের লোক বলি, রাস্তার নামকরণে সেরূপ লোকের নাম যথেষ্ট ব্যবহৃত হইত, রমজান ওস্তাগর, সরীফ দপ্তরী (অধুনা শেষ শব্দটি বাদ দিয়া রাস্তার নাম শুধু সরীফ লেন করা হইয়াছে), পাঁচু খানসামা, ছকু খানসামা, জমু ওস্তাগর, ছিদাম মুদী, ইত্যাদি। এইরূপ নাম করণে "মেথর"ও বাদ যায় নাই, খৈরু মেথরের নামে রাস্তা আছে, তবে আধুনিক রুচি সঙ্গত করিবার জন্য মেথর শব্দটি বাদ দিয়া নাম এখন "খৈরু লেন" হইয়াছে। এরূপ লোকের নাম ব্যবহারের একটি সঙ্গত কারণ নির্দ্দেশ করা যায়। তখনকার যুগে ইংরাজ বণিকরাই দেশের মালিক সম্পূর্ণভাবে না হইলেও, অর্থ ও ব্যবসা-বাণিজ্যের মালিক ছিলেন এবং তাঁহাদের আশ্রয়ে বা তাঁহাদের চাকুরি করিয়া অথবা তাঁহাদের সহিত ব্যবসার সূত্রে জড়িত থাকিয়া দেশের বহু লোক প্রভূত ধনী ও প্রভাবশালী হইতেছিলেন। সুতরাং ইহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে যে, বড় বড় ইংরাজ বণিক বা রাজ কর্ম্মচারীদের সম্পর্কিত নিম্নস্তরের লোকেরাও, অর্থাৎ খানসামা, চাকর প্রভৃতিরও ক্ষমতা বা প্রতিপত্তির অভাব ছিল না। ইহাও অনুমান করা যাইতে পারে যে, তখনকার যুগে দোকান পাট খুবই কম ছিল, সেই জন্যই দরজি, মুদি প্রভৃতি যাহারা নিজ নিজ ব্যবসায়ে লিপ্ত ছিল, পল্লীর মধ্যে সকলেই তাহাদের জানিত ও সেই জন্যই জমু ওস্তাগর প্রভৃতির নাম রাস্তার নামের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়।

এইরূপ প্রণালীতে অর্থাৎ পল্লীর বিশিষ্ট, সঙ্গতিপন্ন বা বিখ্যাত ব্যক্তির নামে রাস্তার নাম কলিকাতায় সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সংখ্যক আছে। কোন স্থলে উক্ত ব্যক্তির (বা বংশের) পদবীমাত্র ব্যবহৃত হইয়াছে, যথা, বারিক, ব্যানার্জ্জি, বসাক, চ্যাটার্জ্জি, ঘোষ, চৌধুরী, হালদার, কুণ্ডু, মিত্র, মুখার্জ্জি, ইত্যাদি। কোনস্থলে পদবী বা জাতি-বাচক শব্দের সহিত পাড়া বা টোলা শব্দ যুক্ত হইয়াছে যথা, বেনে পাড়া, বেনে টোলা, দাস পাড়া, দত্ত পাড়া ইত্যাদি। ইহা ছাড়া পূর্ণ নামও বহু স্থলে ব্যবহৃত হইয়াছে যথা, দুর্গাচরণ মুখার্জ্জি, হলধর বর্দ্ধন, ললিত মিত্র, রামমোহন দত্ত, হরকুমার ঠাকুর ইত্যাদি।…

আরো পরবর্ত্তী যুগে বড় বড় রাজকর্ম্মচারী, গবর্ণর, হাইকোর্টের জজ প্রভৃতি মান্যগণ্য ব্যক্তিদের নাম লইয়া রাস্তার নামকরণ হইতে লাগিল, যথা, আমহার্ষ্ট,

ওয়েলেস্‌লি, কর্ণওয়ালিশ প্রভৃতি গবর্ণর, মিডল্‌টন (কলিকাতার প্রথম বিশপ বা খৃষ্টীয় ধর্ম্মযাজক), রমেশ মিত্র, চন্দ্রমাধব (ঘোষ) প্রভৃতি জজ, শম্ভুনাথ পণ্ডিত (কাশ্মিরী ব্রাহ্মণ ও হাইকোর্টের প্রথম দেশীয় জজ) ইত্যাদি। তৎপরবর্ত্তী যুগে আসিল দেশ বিখ্যাত মনিষীদের নাম, যাঁহারা রাজনীতি, সমাজনীতি, সাহিত্য প্রভৃতি ক্ষেত্রে অথবা বদান্যতা, দানশীলতা প্রভৃতি গুণের জন্য দেশমান্য হইয়াছিলেন যথা, বিদ্যাসাগর, চিত্তরঞ্জন, মাইকেল দত্ত, বঙ্কিম চাটার্জ্জি ইত্যাদি। এখানে আর একটি কথা উল্লেখ করা আবশ্যক। প্রথমে যে প্রণালীতে নামকরণের কথা বলিয়াছি, যে বিশেষরূপে জানিত গাছ, পুকুর প্রভৃতি (যাহাকে ইংরাজিতে land mark বলে) হইতে নামের উৎপত্তি হইত, সে ধারাটি এখনো পরিবর্ত্তিতরূপে বর্ত্তমান আছে। এখন গাছ, পুকুর প্রভৃতির বদলে বিখ্যাত মন্দির, গির্জ্জা, মস্‌জিদ বা প্রতিষ্ঠান ইমারতাদির নামে অনেক রাস্তার নাম করণ হইয়া থাকে, যথা নন্দলাল জীউ, কালী টেম্পল (মন্দির), আক্‌তার মস্ক (মসজিদ) বদ্রীদাস টেম্পল, গ্যাস (গ্যাস কোম্পানীর কারখানা), হস্পিটাল, চার্চ্চ ইত্যাদি।

এখন আমরা আসিয়া পড়িয়াছি একেবারে আধুনিক যুগে, এবং নামকরণ বেশীর ভাগই বিখ্যাত, দেশমান্য লোকদের নাম লইয়া হইতেছে। তন্মধ্যে একটি কথা বিশেষরূপে উল্লেখ-যোগ্য আছে। গত ২০ বৎসর ধরিয়া "কলিকাতা ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাষ্ট" সহরের নানাস্থানে পুরাতন পল্লী ভাঙ্গিয়া চুড়িয়া নূতন পল্লী ও রাস্তা গড়িয়া তুলিতেছেন এবং অনেক স্থলে পুরাতন রাস্তার সংস্কার বা পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধন করিতেছেন। বিস্তর নূতন রাস্তা নির্ম্মিত হইয়াছে এবং মনে হয়, তাহাদের নামকরণ কলিকাতা কর্পোরেশনের পক্ষে এক বিষম সমস্যা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সেই জন্যই বোধ হয়, অনেকস্থলে তাঁহারা নামকরণের ধারা বা প্রণালী একটু অদ্ভুত রকম করিয়া তুলিয়াছেন। সাধারণতঃ ধরা যাইতে পারে যে, কলিকাতার সহিত কোন না কোন সম্পর্ক আছে এইরূপ ব্যক্তিরই নাম রাস্তার নামকরণে ব্যবহার হওয়া উচিত এবং ইহাও থাকে, কিন্তু সম্প্রতি অনেক বহু পুরাতন ঐতিহাসিক বা পৌরানিক নাম ব্যবহৃত হইতেছে যাহার সহিত কলিকাতার কোনরূপ সম্বন্ধ নাই, যথা অশোক, জনক, পরাশর, বাল্মিকী ইত্যাদি। পূর্ব্বোক্ত যে সকল নিয়ম বা প্রণালীর কথা লিখিয়াছি, এ ধরণের নাম সে সকল নিয়মের বহির্ভূত।

পরবর্ত্তী অধ্যায়ে "রাস্তার নামের শ্রেণী বিভাগ" সম্বন্ধে আলোচনা করিব এবং নামের উৎপত্তি পর্য্যায়ে যে সকল কথা আলোচ্য নহে তৎসম্বন্ধে বিশদভাবে আলোচনা করিব।



আজ ফিষ্ট

শ্রীশচীন্দ্রমোহন সরকার বি. এস

সেদিন রবিবার। সপ্তাহের হাড় ভাঙ্গা খাটুনির পরে আনন্দের স্রোত কেরাণীর জীবনেও বহিতেছে। আজ আর সাহেবের তাড়া, বড় বাবুর চোখ রাঙ্গানি নাই, তাই মেসে আনন্দের ফোয়ারা ছুটিয়াছে। কেহ তাস, কেহ রাজনীতি, কেহ পরচর্চ্চা করিতেছে। কেহ কেহ শুধু দাঁড়াইয়া বাহিরের মেঘাচ্ছন্ন আকাশের দিকে তাকাইয়া জীবনের অতীত ইতিহাসের রঙিন পৃষ্ঠা উল্টাইতেছে। কত স্বপ্ন ছিল—নির্ম্মম বাস্তবের কঠিন আঘাতে তাহা আজ বিচূর্ণ।

তাসের আড্ডায় মেসের চাকর জনা খবর দিল—'আজ ফিষ্ট'; সংবাদ পৌঁছিতেই সকলে সমস্বরে হিপ্ হিপ্ হুর্‌রে—দিয়া উঠিল! বোধ হয় হিটলারের সৈন্যগণও কোন যুদ্ধজয়ের পরে এমন প্রাণখোলা আনন্দের ধ্বনি করে নাই।

রমেশও কেরাণী। সে কলেজে ভাল ছাত্র ছিল। কলেজ পত্রিকাতে কবিতা ও প্রবন্ধ লিখিয়াছে—আর ভাবিয়াছে, হয় ত বাঙ্গলাভাষায় নোবেল-প্রাইজ আসিতে পারে। কিন্তু সে স্বপ্ন ষাট টাকার একটি অফিসের টেবিলেই শেষ হইয়া গিয়াছে।

আকাশ মেঘাচ্ছন্ন। রমেশ রাস্তায় লোক চলাচল দেখিতেছিল। বৃষ্টি মাথায় করিয়া রিক্সওয়ালা পথ চলে টুং টুং। ধনীর মোটর তাহার সিক্ত অঙ্গে ছিটায় কাদা। একটু বিরক্তিতে সে দিকে সে তাকায় কিন্তু থামিবার উপায় নাই—ট্রেনের সময় হইয়া গেছে! কুলী পথ চলে আর কপালের ঘাম মুছিয়া ফেলে! রমেশের আজ মনে হয় এই লোকগুলা জল কাদায় কি করিয়া পথ চলে। কিন্তু অফিস যাইতে যে সেও এদের সাথী হয় তাহা প্রায় ভুলিয়াই গিয়াছিল।

বৃষ্টি একটু ধরিতেই রমেশ ছাতা লইয়া একটু বাহির হইল। শ্রদ্ধানন্দ পার্কের পাশে ফুটপাথে কয়েকটি ভিখারী তাহাদের সারা দিনের সংগ্রহ ভিক্ষালব্ধ চাউল সিদ্ধ করিতে তিনখানা ইঁট লইয়া চুলা সাজাইতেছে, জ্বালানি কাঠের কাজ করিতেছে গাছের পাতা, ছেঁড়া কাগজ, দোকানের ঠোঙ্গা, পরিত্যক্ত কাঠের টুকরা আরও কত কি! তাহারা একটি ভাঙ্গা মেটে হাঁড়িতে চাউল ছাড়িয়াছে আর মাঝে মাঝে আকাশের দিকে তাকাইতেছে।

ভিখারিণীর একটি ছেলে—সারাদিন পেটে কিছু পড়ে নাই। সে হাঁড়িটির দিকে সতৃষ্ণ নয়নে চাহিয়া আছে—কখন জল ফুটিবে—কখন ভাত নামিবে। তাহার আর সহ্য হইতেছে না। চাউলগুলি হাঁড়িতে ছাড়িবার পূর্ব্বে সে শুকনা চাউল এক মুঠা খাইবার জন্য যে মার খাইয়াছিল সে স্থানটা এখনও মাঝে মাঝে বেদনায় টন্ টন্ করিতেছে।

রমেশের কবিজীবনের এক অধ্যায়, যাহা প্রায় মুছিয়া গিয়াছিল, তাহাতে আঘাত লাগিল—সে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিল। কিন্তু বেশীদূর অগ্রসর হইতে না হইতেই বৃষ্টি আসিল ঝুম্ ঝুম্। রমেশ উপায়ন্তর না দেখিয়া পার্কের বিপরীত দিকের একটি গাড়ীবারান্দার নীচে দাঁড়াইল। ভিখারিণীও তাহার অর্দ্ধসিদ্ধ চাউলের হাঁড়ি লইয়া ঐ গাড়ীবারান্দার নীচে আসিয়া দাঁড়াইল। তাহার অলন্ত চুলা গেল নিভিয়া—জ্বালানী কাঠ গেল ভাসিয়া। বালকটির সারাদিনের আশা এক নিমিষে নির্ম্মূল হইয়া গেল।

ক্রমে বৃষ্টি প্রবল বেগে মুষলধারে নামিল। ঝড় বহিতে লাগিল শন্ শন্। গাড়ীবারান্দার নীচে আর দাঁড়াইবার স্থান কুলাইল না। রমেশ মেসে ফিরিল।

ফিরিয়া দেখিল রান্না চলিতেছে মাংস, পোলাও আরও কত কি। মেসে একটা আনন্দের ফোয়ারা—

রমেন বলিল, কি হে কোথায় অভিসারে গিয়েছিলে। বলিয়াই গান ধরিল, এমন বাদরে বঁধু। বলিল, রান্না কতদূর দেখে এলে ভাই? আজ ফিষ্ট! জান না?

রমেশ ভাবিল—সকলেই আজ ফিষ্ট! কিন্তু অনেক চেষ্টা করিয়াও সেই ভিখারী বালকের করুণ মুখখানি ভুলিতে পারিল না।

বিদ্যাপতি

কবিশেখর শ্রীকালিদাস রায়, বি-এ

(৩)

সংস্কৃত কবিদের অনুকারক হইলেও বিদ্যাপতির আলঙ্কারিকতায় মৌলিকতাও যথেষ্ট আছে। মৌলিকতা এই হিসাবে বলিতেছি—সকল ক্ষেত্রে তিনি সংস্কৃত কাব্য-নাটোর দাগা বুলান নাই। সংস্কৃত কবিদের প্রবর্ত্তিত অলঙ্কারকেও তিনি অভিনব রূপ ও বিন্যাসভঙ্গী দান করিয়াছেন। কবি অলঙ্করণে মাঘ বা শ্রীহর্ষকে অনুসরণ না করিয়া অধিকাংশ-ক্ষেত্রে কালিদাসকেই অনুসরণ করিয়াছেন। উৎপ্রেক্ষা, অতিশয়োক্তি, ব্যতিরেক ও দৃষ্টান্ত অলঙ্কারের এত বৈচিত্র্য ও প্রাচুর্য্য কোন কবির কাব্যে আমরা দেখি নাই। কবি সকল ক্ষেত্রে চাতুর্য্যশ্রী ফলাইবার জন্যই অলঙ্কারের বীথি সাজান নাই, অনেক সময় দৃষ্টান্ত, প্রতিবস্তূপমা, উৎপ্রেক্ষা ইত্যাদির সমাবেশ রসকেই ঘনতর করিয়াছে। উদাহরণস্বরূপ—"সজনি কে কহ আওব মধাই" ইত্যাদি পদের উল্লেখ করা যাইতে পারে।

বিদ্যাপতির আলঙ্কারিকতার কয়েকটি উদাহরণ—

মালারূপক—

শীতের ওড়নী পিয়া গিরিষির বা।
বরিষার ছত্র পিয়া দরিয়ার না॥

সমুচ্চয়—

(ক) হরি গেও মধুপুর হাম কুলবালা।
বিপথে পড়ল যৈছে মালতীমালা॥
নয়নক নিঁদ গেও বয়ানক হাস।
সুখ গেও পিয়াসঙ্গ দুখ মঝু পাশ॥

(খ) ভাগে মিলয় ইহ শ্যাম রসবন্ত।
ভাগে মিলয় ইহ সময় বসন্ত॥
ভাগে মিলয় ইহ প্রেম সংঘাতি।
ভাগে মিলয় ইহ সুখময় রাতি॥

পরিণাম—

পিয়া যব আওব এ মঝু গেহ।
মঙ্গল যতহুঁ করব নিজ দেহ॥
বেদী করব হাম আপন অঙ্গমে।
ঝাড়ু করব তাহে চিকুর বিছানে॥
আলিপনা দেওব মোতিম হার।
মঙ্গল-কলস করব কুচভার॥

বিনোক্তি—

(ক) আন অনুরাগে পিয়া আনদেশে গেলা।
পিয়া বিনু পাঁজর ঝাঁঝর ভেলা॥

(খ) সরসিজ বিনু সর সর সরসিজ
কি সরসিজ বিনু সূরে॥
যৌবন বিনু তন তনু বিনু যৌবন
কি যৌবন পিয় দূরে॥

ব্যাজোক্তি—

নাহিয়া উঠিল তীরে রাই কমল মুখী
সমুখে হেরল বর কান॥
গুরুজন সঙ্গে লাজে ধনী নতমুখী
কৈছন হেরব বয়ান॥
উহি পুন মোতিহার টুটি ফেলাওল
কহত হার টুটি গেল॥
সভজন এক এক চুনি সঞ্চরু
শ্যামদরশ ধনী কেল॥

"ননদী স্বরূপ নিরূপহ দোষে" ইত্যাদি পদটিও ইহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

বিভাবনা—

চরণে যাবক হৃদয়ে পাবক
দহই সব অঙ্গ মোর।

অর্থধ্বনি—

(ক) সোই কোকিল অব লাখ লাখ ডাকই
লাখ উদয় করু চন্দা॥
পাঁচ বাণ অব লাখ বাণ হউ
মলয় পবন বহু মন্দা॥

(খ) করে কর ধরি যে কিছু কহল
বচন বিছুরলি মোর॥
ঐছে হিমকর মুখ পরিহরি
কুমুদ কমল কোর॥

(গ) চান্দ সারদ দুঁহু বদনী।
শিরীষ কুসুম সম কমলিনী নারী॥

স্বভাবোক্তি—

আওল যৌবন শৈশব গেল।
চরণক চপলতা লোচন লেল॥
কর দুহুঁ লোচন দূতক কাজ।
হাস গোপত ভেল উপজল লাজ॥
অব অনুখন দেই আঁচরে হাথ।
সগর বচন কহ নত করি মাথ॥

প্রতিবস্তূপমা—

(ক) পুন ফিরি সোই নয়নে যদি হেরবি
পাওব চেতন নাহ॥
ভুজঙ্গিনী দংশি পুনহি যদি দংশয়
তবহি সমর বিষ যাহ।

(খ) নিধনকা-জঞো ধন কিছু হোয়
কয়এ চাহ উছাহ॥
পিয়াসকা জঞো সিন্ধু জনমাজ
পিবি উপায়এ চাহ॥
পাপড়ীকা জঞো পাখা জনমএ
অম্বর করয়ে বখান॥
ছোটা ছোটা পানি চহচহ কর
পোঠি কে নহি জান।
যইও বকয় মুহ পেট সম
ভুখএ চাহএ আন।
হম তহ কে বিবহ আগর
চৌড়হ কাথিক ভান॥
বরুক পানি জোতক কোটি
গরব উপজু বাহি।
ভণে বিদ্যাপতি দহক কমল
ভুমর চাহএ তাহি।

অতিশয়োক্তি—

(ক) প্রথম পিরীতিক গরবে গমওলহ
লোচন পাইক আবে।
গেল যৌবন পুন পালটি না আবয়
কেবল রহ পচতাবে।

(খ) মালতি সফল জীবন তোর।
তোরে বিরহে ভুবন ভমরে
ভেল মধুকর ভোর॥
জাতকী কেতকী কত না আছএ
সবহি রস সমান।
সপনেহু নহি তাহি নিহারএ
মধু কি করত পান॥

"কণ্টক-দোষে কেতকী সঞো ক্ষমল হঠে আওল তুয় পাশে।" ইত্যাদি পদটিও ইহার দৃষ্টান্ত।

দৃষ্টান্ত—

(ক) অধর নীরস মধু কমলনি মন্দা।
রাহু গরাসি নিশি কেবল চন্দা॥

(খ) কুলকামিনী ভই নিজ পিয় বিলসে
অপথে নাহি যাই॥
কি মালতী মধুকর উপভোগল
কিংবা লতাহি শুখাই॥

যথাসংখ্য—

হরিণ ইন্দু অরবিন্দ করিনি হিম
পিকবর বুঝ অনুমানি॥
নয়ন বয়ন পরিমল গতিরুচি
অও অতি সুকলনী বাণী॥

নিদর্শনা—

(ক) কুচযুগ বসন হিয়া ভুজে রহ সাঁটি।
বাহর রত আঁচরে দেই গাঁঠি॥

(খ) যাবৎ জনম হাম তুয়া পদ না সেবিলুঁ
যুবতি মতিময় মেলি।
অমৃত তেজি কিয়ে হলাহল পীয়লুঁ
সম্পদে বিপদহি ভেলি॥

(গ) অধর সুরঙ্গ জনি নীরস পবার।
কোন লুটল তুয় অমিয় ভাণ্ডার॥

(ঘ) হরিণী জানয়ে ভাল কুটুম-বিবাধ।
তবহুঁ বাধক গীত শুনি কর সাধ॥

ভ্রান্তিমান

কতয়ে মদন তনু দহসি হামারি—পদটি ইহার দৃষ্টা।

সমাসোক্তি—

মাধমাস শিরি পঞ্চমী গঞাইলি নবএ
মাস পঞ্চমহ রুআই······
···যৌবন সপুনে বঞ্চিন মধযে
জনম গেল ঝিকুরাই হে। ইত্যাদি—

বিষমালঙ্কার—

(ক) পিয়া গরবেশ আন তুয় পাশহি
তেঁ বোলহ সখি কান॥
যে অভিলাখক সে ভেল পাবক
ইথি কি বোলব আন॥

(খ) কমল বদন কুবলয় দুই লোচন
অধর মধুরি নিরমাণে।
সকল শরীর কুসুমে তুয় সিরজল
কিয় দহি হৃদয় পখানে। (অনুবাদ) ১

ভাবিক—

অন্তরে আওব বব রসিয়া...
বিদ্যাপতি কহ ধনি তব ধেয়ানে। ইত্যাদি পদটি ইহার দৃষ্টান্ত।

পরিবৃত্তি—

কটিক গৌরব পাওল নিতম্ব।
একএ খীণ অওকে অবলম্ব॥
প্রকট হাস অব গোপত ভেল।
উরজ প্রকট অব তাহিক লেল॥
চরণ চপল গতি লোচন পাব।
লোচনক ধৈরজ পদতলে যাব॥২

একাবলী—

জনম হোয়ব জানি জনো পুনু হৈ।
যুবতী ভই জনমর জনু কোই॥
হোইহ যুবতী জনু হো রসবতী।
রসও বুঝর জনু হো কুলবতী॥

আক্ষেপ—

পিয়াক পিরিতি হাম কহই না পার।
লাখ বদন বিহি না দিল হামার।

যমক—

সারঙ্গ নয়ন বচন পুন সারঙ্গ
সারঙ্গ তসু সমাধানে।
সারঙ্গ উপর উগল দশ সারঙ্গ
কেলি করথি মধুপানে।

(সারঙ্গ—মৃগ, কোকিল, মদন, পদ্ম, ভ্রমর)

এইগুলি বিশিষ্ট অলঙ্কারের দৃষ্টান্ত। বহুস্থলেই অলঙ্কার-সাঙ্কর্যের সৃষ্টি হইয়াছে। রূপকের সহিত অন্যান্য অলঙ্কার মিশ্রিত আছে। অনেক স্থলে অতিশয়োক্তির মিশ্রণ ঘটিয়াছে।

মিশ্র:— (অতিশয়োক্তি, উৎপ্রেক্ষা ও যথাসংখ্য)

বদন হেরাএ রহল মুখমণ্ডল
কমল মিলল জনু চন্দা।
ভমর চকোর দুঅও অবসায়ল
পীবি অমিয় মকরন্দা॥

অর্থান্তরন্যাস ও বিষমালঙ্কার—

দিনকর বন্ধু কমল সবে জানয়ে
জল তঁহি জীবন হোয়।
পঙ্ক বিহিন তনু ভানু শুখায়ত
জলহি পচায়ত সোয়॥
নাহ সমীপে সুখদ যত বৈভব
অনুকূল হোয়ত সোই।
তাকর বিরহে সকল সুখ-সম্পদ
খেনে খেনে দগধই সোই।

শ্লেষাত্মক-অতিশয়োক্তি—

তড়িত লতা তলে জলদ সমারল...
......চক্রবিগণ কয় কোলে।—ইত্যাদি।

মালারূপাত্মক উল্লেখ—

হাথক দরপণ মাথক ফুল।
নয়নক অঞ্জন মুখক তাম্বুল।
হৃদয়ক মৃগমদ গীমক হার।
দেহক সরবস গেহক সার।
পাখীক পাখ মীনক পানি।
জীবক জীবন হম তুহু জানি।

সমাসোক্তি-মূলক পর্যায়োক্তি—

চাতক চাহি তিয়াসল অম্বুদ
চকোর চাহি রহু চন্দা।
তরু লতিকা অবলম্বনকারী
মধু মনে লাগল ধন্দা॥

এইগুলি ছাড়া বিদ্যাপতির পদে রূপক, উপমা, উৎপ্রেক্ষার ছড়াছড়ি। যে কোন পদ হইতেই ইহার দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে। অনেক স্থলে কবির বক্তব্য উপমা ও উৎপ্রেক্ষার দ্বারাই শুধু সফল হয় নাই—সুস্পষ্টও হইয়াছে। যেমন—সখীশিক্ষায় শিরীষকুসুম ও ভ্রমরের বারবার উপমা দ্বারাই উপদেশ সার্থকতা লাভ করিয়াছে।

উৎপ্রেক্ষা—

(১) কনককদলী অবলম্বনে উগল
হরিণহীন হিমধামা।

---

(১) ইন্দীবরেণ নয়নং মুখমম্বুজেন কুন্দেন দন্তমধরং নবপল্লবেন।
অঙ্গানি চম্পকদলৈঃ স বিধায় বেধাঃ কান্তে কথং ঘটিতবানুপলেন চেতঃ।

(২) কাহারও কাহারও মতে ইহা রায়শেখর কবিশেখরের, কিন্তু বিদ্যাপতিরই রচনাই মত।

(২) গিরিবর গুরুয়া পয়োধর পরশিত
গীম গজ মোতিম হারা।
কামকম্বু ভরি কনয়া শম্ভু পরি
ঢারত সুরধুনি ধারা॥

(৩) নীরে নিরঞ্জন লোচন রাতা।
সিন্দুর মণ্ডিত পঙ্কজ পাতা॥

(৪) একে তনু গোরা কনক কটোরা।
অতনু কাঁচলা উপাম।
হারে হরল মন জনু বুঝি ঐছন
ফাঁস পসারল কাম॥

(৫) লোচন জনু থির ভৃঙ্গ আকার।
মধু মাতল কিয়ে উড়ই ন পার॥

(৬) চিকুরে গলয়ে জলধার।
মুখশশি ডরে কিয়ে রোয়ে অন্ধকার॥

(৭) কেশ নিঙাড়িতে বহে জলধারা।
চামরে গলয়ে জনু মোতিম হারা॥

(৮) সুন্দর বদন সিন্দুর বিন্দু
সামর চিকুর-ভার॥
জনি রবি শশি সঙ্গহি উগল
পাছে কএ অন্ধকার॥

(৯) সুরত সমাপি সুতল বর নাগর
পানি পওধর আপি।
কনক শম্ভু জনু পুজি পুজারে—
কএল সরোরুহে ঝাঁপি॥

[গেলি কামিনি গজহু গামিনি—পদটি উৎপ্রেক্ষা মালার দৃষ্টান্ত।]

(১০) মরকতস্থলী শুতলি আছলি
বিরহে সে খীণ দেহা॥
নিকষ পাষাণে যেন পাঁচ বাণে
কষিল কনক রেহা॥

উৎপ্রেক্ষার দ্বারা এখানে বস্তুধ্বনি হইয়াছে।

উপমা—

(ক) তৈলবিন্দু যৈছে পানি পসারল
তৈছন তুয়া অনুরাগে॥
সিকতা জল যৈছে খনহি শুকায়ল
ঐছন তোহারি সোহাগে॥

(খ) তারাগণ মৈকতে বারি বিন্দুসম
সুতমিত রমণী সমাজে॥

(গ) যৌবন রূপ তাবে ধরি সাজত
যাবে মদন অধিকারী॥
দিন দশ গেলে সেহও পলায়ত
সকল জগৎ পরচারী॥
দিনে দিনে আগে সখি ঐছনি হোয়ব
যোষিনী যোরক মূলে॥

(ঘ) কাজরও যেই নিরসত পানি…
বিরহ বিয়োগ তবহু দূর গেল।

(ঙ) আঁচর পরশি পয়োধর হেরু।
জলদ পসু যেন জেটল সুমেরু॥

(চ) যেরি এক কর ধনি মুদিত নয়ান।
রোগী করয়ে জনি ঔখধ পান॥

(ছ) উরে দোলে শামর বেণী।
কমলিনী কোরে জনু কাল সাপিনী॥

রূপক-

(১) যে অতি নাগর তোকে সব সার।
পসরও মধী গেস পসার॥
যৌবন নগরী বেসাহরূপ।
তাতে মূল হইও বকে স্বরূপ॥

(২) চিত্রশিক লেখক মনি মকরন্দা।
কাঁপত্রময় পদ সাধা চন্দা॥

(৩) পানি পলব গত অধর বিম্বরত
দশন দাড়িম বীজ জোরে।
কীর দূর গেল পাশ ন আবয়
তোঁহি ধনুকি কে তোরে॥

আওল ঋতুপতি রাজ বসন্ত—পদটী সাঙ্গরূপকের প্রকৃষ্ট। 'আলিপন দেওব মোতিম হার…অভিষেকে' পর্যন্ত এবং 'হরি যব অওব গোকুলপুর—পদের অংশটিও একটী দৃষ্টান্ত।

কবি রাধিকার রূপ-বর্ণনায় বহুবার ব্যতিরেক অলঙ্কারের প্রয়োগ করিয়াছেন। উপমেয় রাধার অঙ্গের তুলনায় উপমানের অপকর্ষ দেখাইবার জন্য কবি নানা ছল-কৌশল অবলম্বন করিয়াছেন। নায়িকার রূপবর্ণনায় উপমেয় উপমাকে জয় করিতেছে,—এইরূপ অত্যুক্তি চিরপ্রচলিত আলঙ্কারিক প্রথা।

করিবর রাজহংস জিনি গামিনি
চলিহুঁ সঙ্কেত গেহা।
অমল তড়িত দণ্ড হেম মঞ্জরী
জিনি অতি সুন্দর দেহা॥

উরুযুগ কদলী করি-বর-কর
জিনি স্থলপঙ্কজ পদ পাণি।
নখ দাড়িম বীজ ইন্দুরতন জিনি
পিকু জিনি অমিয়া বাণী।

[এই দীর্ঘ পদটি রীতিমত উপমানের তালিকা, সংস্কৃত সাহিত্য হইতে সংগৃহীত]

কবি তাহাতেও তুষ্ট না হইয়া রাধার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের রূপজ্যোতির ভয়ে উপমানগুলিকে পলাতক করিয়াছেন।

কবরী ভয়ে চমরী গিরি কন্দরে
মুখ ভয়ে চান্দ আকাশে।
হরিণি নয়ন ভয়ে স্বর ভয়ে কোকিল
গতিভয়ে গজ বনবাস॥

ইহাতেও তুষ্ট না হইয়া কবি উপমানগুলিকে একত্র সন্নিবেশ করিয়া রাধার অঙ্গশ্রীর আভাস দিয়াছেন। এইরূপ উপমান-বিন্যাসকে প্রথমোক্তি অলঙ্কার বলে।

পল্লব রাজ চরণ যুগ শোভিত
গতি গজরাজক ভানে।
কনক কদলী পর সিংহ সমারূল
তাপর মেরু সমানে।
মেরু উপরে দুই কমল ফুটায়ল
নাল বিনা রুচি পাই।
মণিময় হার ধার বহু সুরসরি
তই নহি কমল শুখাই॥

আবার রাধার মুখে শ্রীকৃষ্ণের রূপ বর্ণনা—

বিমল বিম্বফল যুগল বিকাশ।
তারপর কীর থির করু বাস॥
তাপর চঞ্চল খঞ্জন জোড়।
তাপর সাপিনি ঝাঁপল মোর।

পরবর্তী কবিদের দ্বারা এই পদ্ধতি অনুসৃত হইয়াছিল। ইহা ছাড়া প্রসঙ্গান্তরে 'কদলী উপরে কেশরী দেখল, কেশরী মেরু চড়ল' ইত্যাদি আছে। রাধার বদনের সহিত চন্দ্রের উপমা দিতে গিয়া কবি রাধাকে চন্দ্রাপহারিকা বলিয়াছেন। কবি রাধাকে বলিতেছেন—রাজা চুরি ধরিবার জন্য লোক লাগাইয়াছেন,—

আঁচলে বদন ঝাঁপাহ গোরি।
রাজা শুনইছে চান্দক চোরী।

উপমা দিতে আরম্ভ করিয়া—কবি 'ব্যতিরেকে' শেষ করিয়াছেন—"ভয় নাই, প্রহরীকে বলিও—গগনের চাঁদ কলঙ্কী, এ চাঁদ সে চাঁদ নয়, এ চাঁদ নিষ্কলঙ্ক।"

কবি অঙ্গের উপমান গুলিকে প্রাধান্য দিয়া স্থলে স্থলে চমৎকার অর্থধ্বনির সৃষ্টি করিয়াছেন। এখানে উপমেয় গৌণ হইয়া পড়িয়াছে। উপমানের উৎকর্ষই ধ্বনিত হইয়াছে।

(১) এ ধনি মানিনি করহ সঞ্জাত
তুয়া কুচ হেম ঘট, হার ভুজঙ্গিনি
তাক উপরে ধরি হাত।
তোহে ছাড়ি হাম যদি পরশব কোয়।
তুয়া হার নাগিনি কাটবে মোয়॥

(২) পাণি পল্লব গত অধর বিদ্রুত
দশন দাড়িম বীজ তোরে।
কীর দূরে ভেল পাশ ন আবয়
তোঁহে ধনুকি কে জোরে।

রাধার অঙ্গবিশেষের উপমা যোগাইতে বিদ্যাপতি জড় জীব কিছুই বাকি রাখেন নাই।—বদরী, নারঙ্গ হইতে আরম্ভ করিয়া দাড়িম্ব, বেল, তাল, চকেবা (চক্রবাক), কনক-কটোরা, স্বর্ণকুম্ভ, গজকুম্ভ পর্য্যন্ত (বেলতালযুগ হেমকলস জিনি কটোর জিনিয়া কুচ লাজা। কিয়ে গিরিবর কনয়া কটোরে তা দেখি লাগয়ে ধন্দ) তাহাতে তুষ্ট না হইয়া কবি স্বয়ং শম্ভুকে টানিয়াছেন। শম্ভুর উপর সুরধুনীধারা ঢালিয়াই ক্ষান্ত হন নাই। শ্রীকৃষ্ণের করসরোরুহে পূজিত বলিয়াই ক্ষান্ত হন নাই। তাঁহাকে নখক্ষতের দ্বারা চন্দ্রচূড় করিয়া ছাড়িয়াছেন। (হিয়ায় উপর শম্ভু পূজিত বেড়িয়া বালকচন্দ্র)। কেহ কেহ বলেন, ইহাতে গঙ্গাধরের অমর্য্যাদা হয় নাই, পয়োধরেরই শুচিতা দ্যোতিত হইয়াছে।

এক একটি অঙ্গের লাবণ্য যেন বিশ্বপ্রকৃতির এক এক জনের নিকট হইতে পাইয়া রাধা তিলে তিলে উজ্জ্বলা হইয়াছিলেন। প্রিয়া যখন বৃন্দাবন ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন—তখন রাধার দেহে আর সে লাবণ্য থাকিল না। কবি কৌশলে সে কথা বলিয়াছেন, উপমানকে উপমেয়ের গৃহীত দান প্রত্যর্পণ করিয়া। রাধা বিশ্বপ্রকৃতিকে তাহার দান ফিরাইয়া দিতেছেন—

শরদক শশধর মুখরুচি সোপলক
হরিণক লোচন-লীলা।

কেশপাশে লয়ে চমরীকে গোপল
পায়ে মনোভব পীলা ॥
কুন্দদশনা, দাড়িমকে গোপলক
বন্ধুকে অধর রুচি দেলি।
দেহদশা সৌদামিনী গোপলক
কাজর সম সখি জেলি।

কবি অনেক স্থলে দৃষ্টান্ত, নিদর্শনা, প্রতিবস্তুপমা ও অর্থান্তরন্যাস অলঙ্কারের সাহায্যে (Epigram ও Maxim জাতীয়) সুভাষিতের সৃষ্টি করিয়াছেন। মৌলিক সমাশ্রয় হইতে বিচ্যুত করিলেও সেগুলি সার্থকতা হারায় না।

১। সুজনক প্রেম হেম সমতুল।
দহইতে কনক দ্বিগুন কর মূল ॥
টুটইতে নাহি টুটে প্রেম অদ্ভুত।
যৈছনে থারত মৃণালক সূত ॥

২। গণাইতে দোষ, গুণলেশ না পাওবি
যত তুহুঁ করবি বিচার ॥

৩। সুজনক পীরিতি পাষাণক রেহা।

৪। মাণিক তেজি কাচে অভিলাষ।
ক্ষীর সিন্ধু তেজি কূলে নিবাস ॥

৫। তিল তিল আধ যৌবন রাখবি
কহই দিবস সব যাব ॥
ভালমন্দ দুই, সঙ্গে চলি যাওব
পর উপকার সে লাভ ॥

৬। কুকুরক লাঙ্গুড় নহত সমান।

৭। আশাভঙ্গ দুখ মরণ সমান।

৮। চৌরি পিরিতি হয়ে লাখগুণ রঙ্গ।

৯। ভ্রমরা ভয়ে মঁাচরী ন ভাঁপে।

১০। বড়েও ভুখল নহি দুহু কওয়ে পাএ।

১১। সব সঞো বড় থিক আঁখিক লাজ।

১২। নিধনকা জঞো ধন কিছু হো
কয় এ চাহ উচাহ ॥
পিয়ার কা জঞো পিয় অনমএ
পিরি উপারএ চাহ ॥

১৩। কৌড়ি পঠওলে পাব নাহি থোর।
খীব উধার মাগ মতি জোর ॥
মান না পাবএ মাগ উপাতি।
লোভক হানি পুরুষ থিক জাতি ॥

১৪। সুন্দর কুলশীল ধনী বর যুবক
কি করব লোচনহীনে ॥
কি করব তপজপ দান ব্রতাদিক
যদি করুণা নহি দীনে ॥

১৫। ন থির জীবন, ন থির যৌবন
ন থির এ সংসার ॥
গেল অবসর পুনু না পাইঅ
কীরিতি অমর সার ॥

১৬। থির নহি যৌবন থির নহি দেহ।
থির নহি রহ বালভু সঞো নেহ ॥
থির জনু জানহ ইহসংসার।
একমাত্র থির রহ পর উপকার ॥

১৭। জলমধে কমল গগনমধে সূর ;
আঁতর চাঁদ কুমুদ কত দূর ॥
গগন গরজ মেহ শিখর ময়ূর।
কতজন জানসি নেহ কতদূর ॥ (অনুবাদ)

১৮। সহজে চাতক না ছাড়য় ধরত
না বৈসে নদীতীরে ॥
নবজলধর বরিখন বিনু
ন পিয়ে তাহারি নীরে ॥
যদি দৈবশে অধিক পিয়াস
পিবয় হেরয় থোর ॥
তবহুঁ তোহর নাম হৃদয়ি
গলে শতগুণ লোর ॥

১৯। পুন ফিরি সোই নয়নে যদি হেরবি
পাওব চেতন নাহ ॥
ভুজঙ্গিনী দংশি পুন যদি দংশয়
তবহি সমর বিষ যাহ ॥

২০। পিতল কাটারি কাযে নাহি আওত
উপরহি ঝকমকি সার ॥

[গত সংখ্যায় প্রকাশিত বিদ্যাপতি প্রবন্ধে কতকগুলি ছাপার ভুল আছে। "দাহিন নয়ন পিশুনগণ বারণ পরিজন বামহি আধ"—পদটি ভ্রমক্রমে বিদ্যাপতির বলিয়া ছাপা হইয়াছে।]

দুলালের স্বপ্ন

শ্রীরেবতীমোহন সেন

(৫)

চন্দননগরে গঙ্গার ঠিক উপরেই একখানা দ্বিতল বাড়ী। সকাল বেলা নদীর দিকের মুক্ত বারান্দায় বেতের চেয়ারে ব'সে প্যারীলাল ও গণেশ চা পান করছিল। গণেশের মাথায় ও ডান বাহুতে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা, কাজেই মেজাজটা তার তেমন ভালো ছিল না। বাম হাতে চায়ের পেয়ালা তুলে কয়েক চুমুক পান করবার পর সে অপ্রসন্ন ভাবে বললো, "যে কাজের গোড়াতেই বাধা, তার শেষ ফল ভাল হয় না।"

"তবু ভাল যে এত দিনে এই সত্যটা আবিষ্কার করতে পেরেছ।"

"ঠাট্টা নয়, ব্যাপারটা যেরকম গুলিয়ে গেছে তাতে এ দিকের তার বেয়ে বড় সত্যটাও আবিষ্কার হ'য়ে যেতে পারে।"

"ব্যাপারটা কতখানি গুলিয়েছে জানি নে, কিন্তু তোমার মাথাটা যে বেশ গুলিয়ে গেছে, ঐ ব্যাণ্ডেজটাই তার প্রমাণ।"

একে মাথায় আঘাতের যন্ত্রণা, তার উপর ঐ নিয়ে এ রকম নির্দ্দয় বিদ্রূপোক্তি! গণেশ দস্তুর মত চ'টে গেল, বলল, "মাথা যদি গুলিয়েই থাকে, তা তোমারই বদমায়েসীর সাহায্য করতে গিয়ে। কিন্তু এবার তাল সামলাতে হবে একা তোমার। ভুলে যেও না, ব্যাণ্ডেজটা আমার মাথায়, মুখে নয়।"

প্যারীলাল বেশ জানতো, গণেশের মুখ ফুটলে, বাঁধ-মুক্ত জলের মত বিপদের বন্যা এসে তাকে মুহূর্ত্তে ডুবিয়ে দিতে পারে। সুতরাং তাকে আর চটানো সঙ্গত হবে না বুঝে প্যারীলাল হাসি মুখে বলল, "বেশ রেগে গেছ দেখছি! আরে তোমার মুখ যে খুলবে না সে বিশ্বাস যদি না থাকতো, তা হ'লে কি আর নিশ্চিন্তে ঘুমুতে পারতুম? কিন্তু বলত, হ'য়েছে কি?"

প্যারীলালের ঠাণ্ডা সুরে গণেশের মেজাজের উষ্ণতা কয়েক ডিগ্রী নেমে এলো। তাকে খোস মেজাজে রাখাটাই যে প্যারীলালের পক্ষে মঙ্গলজনক, তা উভয়েই জানত এবং মাঝে মাঝে উভয়ের কথা কাটাকাটি হ'লেও কখনো তা বিদ্বেষপূর্ণ ঝগড়ায় পরিণত হ'তো না।

চা পানান্তে গণেশ একটা সিগারেট ধরিয়ে তাতে দু' তিন বার টান দিল এবং তারপর মুখ থেকে এক রাশ ধোঁয়া ছেড়ে বলল, "গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডের মতো চওড়া রাস্তায় এই রকম একটা মোটর accident হ'য়ে গেল, মেয়েটাকে নিয়ে বেরিয়ে পড়বার একটু পরেই। ধাক্কার ফলে মরল গরুর গাড়ীর গাড়োয়ান, মোটরটা হ'ল চুর, আর ভাঙলো আমার আর মেয়েটার মাথা—একেবারে ত্র্যস্পর্শ!"

"মোটরটা রাস্তার উপর ফেলে আসতে হ'য়েছে ব'লে এই accident-এর জন্য আমাদের দায়ী করতে বা trace করতে পারবে সে সম্ভাবনা মোটেই নেই। নম্বর-প্লেটে জাল নম্বর দেওয়া ছিল তা কি ভুলে গেছ?"

"মোটেই ভুলি নি, আর প্লেট-নম্বর দিয়ে যে আমাদের trace করতে পারবে সে আশঙ্কাও আমার হয় নি। তোমার তাড়াতাড়ির জন্য ভুলের যা বাড়াবাড়ি হ'য়ে গেছে, আশঙ্কা হচ্ছে তারই জন্যে।"

—"হেঁয়ালি ছেড়ে দিয়ে খুলেই বল না, বাড়াবাড়িটা হ'ল কোথায়?"

গণেশ আবার এক মুখ ধোঁয়া ছেড়ে বলল, "accident-এর পর তোমার তাড়া খেয়ে যখন মেয়েটাকে তাড়াতাড়ি তোমার গাড়ীতে তুলে দিচ্ছিলাম, তখন আমার নোট বইখানা পকেট থেকে মাটিতে প'ড়ে গেল। তারপর তুমি আবার এম্‌নি তাড়া দিলে যে, বইখানা তোলবার আর সময় হ'ল না, তাড়াতাড়ি তোমার গাড়ীতে চ'লে আসতে হ'ল। ঐ নোট বই-এর ভিতরে তোমার লিখিত যে সব কাগজ-পত্র আছে সেগুলো পুলিশের হাতে পড়লে আমাদের *এই আড্ডার সকল রহস্য বের ক'রে নিতে ওদের মোটেই* বেগ পেতে হবে না—এই হ'ল এক নম্বর ভুল। তার পর

হু'নম্বরের ভুল হ'য়েছে, মেয়েটার first aid-এর জন্য একজন বাইরের ডাক্তার নিয়ে আসা। এখন ভেবে দেখ, ব্যাপারটা গুলিয়েছে কতখানি।"

প্যারীলাল উদ্বেগ প্রদর্শন ক'রে বলল, "টাকা দিয়ে হয় তো বা ডাক্তারের মুখ বন্ধ করা যেতে পারে, কিন্তু নোট বইখানা ফিরে পাবার উপায় কি? এখুনি ঐ রাস্তায় বেরিয়ে গিয়ে একবার খুঁজে দেখলে হয় না?"

"তা কি আর বাকি আছে? মাথায় ব্যাণ্ডেজ বেঁধে আমিই আবার রাত্রে বেরিয়েছিলাম—কিন্তু নোট বইখানা পাওয়া যায় নি।

"তবে উপায়?"

"উপায়ের কথাই তো ভাবছি রাত্রি থেকে। হঠাৎ এই আড্ডা অর্থাৎ "নারী রক্ষাশ্রম" ভেঙে দেওয়া সম্ভব হবে না, সঙ্গতও হবে না—সকলের আগে পণ্ডিতজীই তাতে আপত্তি করবেন। ভিতরে যত গলদই থাক না কেন, বাইরের লোকে জানে, এই আশ্রম দ্বারা সমাজের উপকারই হচ্ছে। এখন হঠাৎ আশ্রমটা উঠে গেলে পুলিশের তো কথাই নেই, সাধারণ লোকেও ব্যাপারটাকে খুব সন্দেহের চক্ষে দেখবে।"

"সন্দেহের চেয়েও বেশী প্রমাণ পাওয়া যাবে ঐ নোট বইএর ভিতরের কাগজ-পত্র থেকে।"

"কাজেই আমরা যদি এরই মধ্যে ঘরটা একটু সামলে রাখি অর্থাৎ ঐ সব প্রমাণ সমর্থনের চিহ্নগুলি কিছু দিন লুকিয়ে রাখতে পারি, তা হ'লে পুলিশ সহসা কিছু করতে পারবে না—বিশেষতঃ, এই করাসী মুলুকে।

"তা যেন হ'ল, কিন্তু মল্লিরাকে লুকোবে কি ক'রে? তার মাথায় আঘাতের অবস্থা দেখে ডাক্তার যা ব'লেছেন, তাতে তাকে এখন নাড়াচাড়া করতে যাওয়া মানে, তাকে মেরে ফেলা।"

"তার মরার চাইতে বাঁচায়, আমাদের লাভ বেশী—অবশ্য যদি সামলে রাখতে পারি। বাঁচা-মল্লিরা বেচা চলবে, মরা-মল্লিরা চলবে না। আমার পরামর্শ যদি শোনো তবে এক কাজ করো। সে এখন যে ঘরে আছে, যে ঘরটা একেবারে পেছনের দিকে। মাঝখানে একটা ছোট পাঁচিল তুলে দিয়ে, আর ঐ বারান্দার বড় আলমারিটা ঘুরিয়ে দরজাটা ঢেকে দিলে—পুলিশের বাবাও বুঝতে পারবে না, ওটা একটা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র বাড়ী নয়। আমার মনে হয়, খুব অল্প সময়েই ঐ পাঁচিলটা উঠানো যাবে। তখন, ঐ বাড়ীর সঙ্গে আমাদের কোনো সম্পর্ক নেই বললেই চলবে।"

প্যারীলাল উৎসাহের সহিত বলল, "এ জন্যেই তো বলি, গণেশ ছাড়া কেউ ঠিক পরামর্শ দিতে পারে না। পণ্ডিতজীকে ব'লে আজই পাঁচিলটা খাড়া করাবো।"

"শুধু এ নয়, মাল-চালানির সব রকম সরঞ্জাম, কাগজ-পত্র, কিছুই এ বাড়ীতে রাখা চলবে না। আজই সব সরিয়ে ফেলো।"

"ঘণ্টা খানেকের মধ্যেই পণ্ডিতজী আসবেন, তখন পরামর্শ ক'রে নেবো।"

"কয়েক দিনের জন্য আমার থাকতে হবে গা-ঢাকা দিয়ে, কিছু টাকার যোগাড় রেখো। দশ দিনের মধ্যে পুলিশ না এলে, ধ'রে নেওয়া যেতে পারে নোট-বই তাদের হাতে পড়ে নি। আর একটা কথা, হরিরামপুরের এবারকার যাত্রাটা নিশ্চয়ই কুক্ষণে হ'য়েছিল। একটা ভাল দিন দেখে আমার আবার সেখানে না গেলে চলবে না। যে মেয়েটা কুকুর লেলিয়ে দিয়ে আমায় অপমান ক'রেছিল, তার সঙ্গে একটা বোঝা-পড়া করা চাই। তোমার "দু" নম্বর গাড়ীখানা যদি কোন দিন গেরাজে না পাও, হৈ-চৈ ক'রো না। কাজ হ'য়ে গেলে গাড়ী ঠিক সময়ে ফিরে আসবে। দিন কয়েক চুপ-চাপ থাকো।"

গণেশের উপদেশের বা ইচ্ছার প্রতিকূলে কাজ করবার সাহস বা ক্ষমতা প্যারীলালের ছিল না। সে যে কোনো মুহূর্তে প্যারীলালের সর্বনাশ ক'রে দিতে পারতো, অবশ্য তাতে গণেশের নিজের বিপদেরও সম্ভাবনা ছিল; কিন্তু প্যারীলাল জানত, এই শ্রেণীর লোক প্রয়োজন হ'লে নিজেকে বিপন্ন ক'রেও অপরের সর্বনাশ ক'রতে দ্বিধা বোধ করে না, এবং সেটা জানত ব'লেই গণেশকে কখনো অসন্তুষ্ট করত না।

এই স্থলে বলা আবশ্যক, চন্দননগরের এই বাড়ীতে অবস্থিত "নারী-রক্ষাশ্রম" প্রতিষ্ঠানটির উদ্দেশ্য যতই মহৎ হোক না কেন এবং বিজ্ঞাপিত উদ্দেশ্য অনুযায়ী কাজ মাঝে মাঝে হ'লেও, এর অন্তরালে সুন্দরী যুবতী মেয়ে সংগ্রহ ক'রে তাদের বেচা-কেনার একটা

বিরাট রকমের গোপন ব্যবসাও অবাধে চলছিল। এর প্রধান কেন্দ্র পাঞ্জাবে অবস্থিত হ'লেও, পাঞ্জাব থেকে বাঙ্গলা পর্য্যন্ত সমস্ত দেশের প্রধান প্রধান নগরে এর বহু শাখা-কেন্দ্র ছিল। পণ্ডিত অযোধ্যাপ্রসাদ মিশ্র ছিলেন বাঙ্গলার চন্দননগর কেন্দ্রের পরিচালক। এই কেন্দ্রে এই ব্যবসা ছাড়া অবৈধ-ভাবে আফিম্ ও কোকেন গোপনে আমদানি-রপ্তানি করারও অপর একটা লাভজনক ব্যবসা চলতো। পূর্ব্ব থেকেই গণেশ এ সকলের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিল। পরে সে প্যারীলালের মত মক্কেল হাতে পেয়ে তাকেও এর সঙ্গে জড়িত করে। অভাবের তাড়নায় প্যারীলাল এই দলে মিশতে আপত্তি করে নাই। ফলে, পণ্ডিতজী এই প্যারীলালের সাহায্যে অনেক কাজ হাঁসিল ক'রেছেন এবং প্যারীলালও বিনিময়ে অর্থ সাহায্য পেয়েছে ও পাচ্ছে। পণ্ডিতজীর বিরুদ্ধাচরণ করা প্যারীলালের পক্ষে এক রকম অসম্ভব।

দুলালকে জেলে পাঠিয়েই প্যারীলালের প্রতিশোধ-লিপ্সা তৃপ্ত হয় নাই। তার দৃঢ় সংকল্প ছিল, মন্দিরাকে হস্তগত ক'রে কিছুকাল নিজের কাছে রাখবে এবং তারপর টাকার বিনিময়ে এই আশ্রয়ের মারফতে তাকে অপরের হাতে ছেড়ে দেবে। তাই মন্দিরা আজ এখানে!

(৬)

মন্দিরার আকস্মিক অন্তর্ধানের প্রকৃত রহস্য গ্রামের কেউ জানতে পারে নি, সুতরাং এরূপ একটা ব্যাপারের নানা প্রকার কুৎসিৎ ব্যাখ্যা ছড়িয়ে পড়তে অনেক সময় লাগলো না। নিতাই অনেক খোঁজাখুঁজি ক'রেও যখন কোন সন্ধান পেল না, তখন দুষ্ট-চরিত্র প্যারীলালকেই সে সন্দেহ করলো, কিন্তু ঘটনার দিন প্যারীলালকে কেউ এই গ্রামে দেখেছে ব'লে জানা গেল না।

মন্দিরাকে পাওয়া যাচ্ছে না শুনে মনোরমা অজ্ঞান হ'য়ে প'ড়েছিলেন। সংবাদ পেয়ে অশোকা তার বাবাকে নিয়ে তখনই এ বাড়ীতে এসে তাঁর সেবায় নিযুক্ত হ'ল। মনোরমার এই সময়ের নিদারুণ দুঃখ ও মর্ম্মান্তিক যাতনার অবস্থা অবর্ণনীয়। অজ্ঞানাবস্থায় প্রায় তিন দিন কেটে গেল—মাঝে মাঝে যখন তাঁর জ্ঞান-সঞ্চার হ'তো, তখন তিনি অশোকার মুখের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে থেকে শুধু চোখের জল ফেলতেন ও ক্ষণে ক্ষণে দুলাল ও মন্দিরার নামোচ্চারণ করতেন। অশোকা এখন এ বাড়ীতেই থাকে। রাত্রিবেলায় তার বাবাও থাকেন।

এই ভাবে তিন সপ্তাহ কেটে গেল। একদিন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হবার ঘণ্টা খানেক পর অশোকার বাঁধা কুকুরটা ঘেউ ঘেউ ক'রে বাগানের দিকে ছুটে গেল এবং পরক্ষণেই আর একটা কুকুরের সঙ্গে ঝগড়ায় প্রবৃত্ত হ'ল। কুকুর দু'টার ভয়ানক গর্জ্জনে মনোরমার কষ্ট হচ্ছে ভেবে বাঘাকে ডেকে আনবার উদ্দেশ্যে অশোকা বাইরের আঙ্গিনায় এল। ঠিক সেই মুহূর্ত্তে অন্ধকারের ভিতর থেকে দু'জন লোক এসে তার মুখ চেপে ধ'রল এবং কোনোরকম শব্দ করবার পূর্ব্বেই তাকে নিয়ে স'রে পড়লো।

কয়েক মিনিট পর অশোকার বাবা রঘুনাথ অশোকাকে দেখতে না পেয়ে ব্যস্ততার সহিত বাইরে এসে তার নাম ধ'রে ডাকতে লাগলেন এবং তখনই বিস্ময়ের সহিত দেখতে পেলেন অনতি দূরে সদর রাস্তার উপর একটা মোটর গাড়ীর বড় বাতি জ্বলে উঠলো এবং পর মুহূর্ত্তে গাড়ীখানা বেগে বেরিয়ে গেল। রঘুনাথের বুঝতে বিলম্ব হ'ল না, মন্দিরার মতো অশোকাকেও কোন দুষ্ট লোক চুরি ক'রে নিয়ে গেল। তিনি অনেক চেঁচা-মেচি করলেন, কিন্তু অশোকার কিংবা তার অপহারকের কোন খোঁজই মিললো না।

এই ব্যাপারে রঘুনাথের হাত-পা যেন একেবারে ভেঙে পড়লো এবং তাঁর মনে হ'ল, হঠাৎ আকাশ থেকে যেন একটা বিরাট বজ্র তাঁর মাথার উপর প'ড়েছে। তিনি মনে করলেন, এটাও প্যারীলালেরই চক্রান্তের ফল, সুতরাং জমিদার বাড়ী থেকে প্রতিকারের কোন সম্ভাবনাই নেই। পুলিশের নিকটও সাহায্য পাবার আশা অল্প, যেহেতু তিনি দরিদ্র।

অল্প দিনের মধ্যে উপর্য্যুপরি এই রকমের দু'টি ঘটনা ঘটলো ব'লে গ্রামে নানা রকম আলোচনা হ'তে লাগলো এবং একটা আতঙ্কেরও সৃষ্টি হ'ল। দু'চার জন লোক এই ব্যাপারকে গুণ্ডার অত্যাচার বললেও বেশির ভাগ লোকই মেয়েদের চরিত্রের উপর দোষারোপ করলো।

ঘটনার পর দিন স্থানীয় পোষ্টমাষ্টার বাবু নিম্নোক্ত চিঠিখানা ডাকযোগে পেলেন:—

কলিকাতা,
সোমবার

"শ্রদ্ধেয় পোষ্টমাষ্টার বাবু,

নমস্কারান্তে নিবেদন এই, আপনার সহিত আমার পরিচয় না থাকলেও আমি শুনেছি, আপনি নিরপেক্ষ সজ্জন লোক, তাই সাহস ক'রে আপনাকে এই চিঠিখানা লিখছি।

আমার পিতা শ্রীযুক্ত রঘুনাথ কবিরাজকে আপনি নিশ্চয়ই জানেন—অতি নিরীহ ও শান্ত প্রকৃতির লোক তিনি। আমি কেন বাড়ী ছেড়ে চ'লে এসেছি সে কথাটা আমি নিজে তাঁকে লিখে তাঁর মনে বাথা দিতে চাই না। এ জন্তেই আপনার মারফতে সেই কথা ও মন্দিরার কথাটা জানাতে চাচ্ছি।

মন্দিরার সম্বন্ধে অনেক অপ্রিয় সমালোচনা গ্রামে হয়েছে এবং অনেকে সেগুলো হয় ত সত্য ব'লেই ধারণা ক'রে ব'সে আছে। আসল ব্যাপারটা আপনাকে জানাচ্ছি। মন্দিরা আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিল—আমাদের কোনো কথা কারো কাছে গোপন ছিল না। মন্দিরা জানতো আমি তার দাদার এক বন্ধুকে ভালবাসি, আবার সেও ঐ বন্ধুর প্রতি গভীর অনুরক্ত ছিল। আমাদের বন্ধুত্ব অক্ষুণ্ণ রাখার জন্ত আমরা স্থির ক'রেছিলাম, দু'জনেই তাঁকে বিয়ে ক'রে সমাজে একটা নতুন আদর্শ দাঁড় করাবো। এমনি সময় মন্দিরার দাদার চুরির অপরাধে জেল হ'য়ে গেল। যদিও আমরা জানি, চুরির অভিযোগটা একেবারেই মিথ্যা, তবুও জেল হ'য়েছে ব'লে পরিবারের উপর তাতে চিরদিনের জন্ত একটা কলঙ্কের ছাপ প'ড়ে রইলো। মন্দিরা বলল, এই কলঙ্ক নিয়ে বিয়ে ক'রে সে স্বামীর পরিবারকে কলঙ্কিত করবে না। তার ভয়ানক জেদ ছিল—সে আমার কোন পরামর্শেই কাণ দিবে না, বিশেষতঃ মিথ্যা অভিযোগে দাদার জেল হওয়াতে এবং তার ফলে মায়ের মৃত্যু সন্নিকট জেনে সে নিজের জীবনের প্রতি সম্পূর্ণ বিতৃষ্ণ হ'য়ে প'ড়েছিল। তবুও সে যে হঠাৎ কিছু ক'রে ফেলবে এমন আশঙ্কা আমার হয় নি। যে দিন থেকে তার খোঁজ—পাওয়া যাচ্ছে না তার পর দিন সকাল বেলা আমার বিছানার এক কোণে তার লেখা একখানি চিঠি পেলাম, তাতে সে আমায় জানিয়েছে, সংসারের সকল আকর্ষণ এড়িয়ে সে মুক্তির আকাঙ্ক্ষায় গলায় কলসী বেঁধে দামোদরের গভীর জলে সে ডুবতে যাচ্ছে। ঐ চিঠি পেয়ে কাউকে কিছু না ব'লে তখনই ছুটে গেলাম নদীর দিকে—দেখলাম যেখানটায় খুব বেশী জল সেই দিকে জলের ধারে বালির উপর তার পায়ের স্পষ্ট ছাপ প'ড়ে আছে। মন্দিরা যে ডুবে ম'রেছে এ সম্বন্ধে আর কোনো সংশয় রইলো না, কিন্তু এ কথাটা প্রকাশ করতেও পারলাম না, কারণ তার মৃত্যু সংবাদ কাণে গেলে তখনই তার মা হার্ট ফেল হ'য়ে মারা যেতেন। কাজেই আমার চুপ ক'রে থাকা ভিন্ন উপায় রইলো না। বাবাকেও কিছু বলতে পারলাম না।

কিন্তু এ রকম অবস্থায় মুখ-চেপে থাকা যে কেমন যন্ত্রণা দায়ক, তা হয় ত অনুমান করতে পারবেন। আবার আর এক সমস্তায় পড়লাম। যাঁকে বিয়ে করবো ব'লে সঙ্কল্প ক'রেছিলাম, তিনি আমাদের চেয়ে একটু নিম্ন সমাজের লোক—এই বিয়েতে বাবা রাজি হ'লেও, পিসিমা ভয়ানক আপত্তি করবেন। তাঁর কাছ থেকে সংবাদ পাওয়া গেল, তিনি একটা বেশ ভালো চাকরি পেয়ে চার দিন পরেই সিঙ্গাপুর চ'লে যাচ্ছেন এবং দু' বছরের মধ্যে দেশে ফিরতে পারবেন না—আমি ইচ্ছা করলে বিয়েটা রেজেষ্ট্রি ক'রে, তাঁর সঙ্গেই সিঙ্গাপুরে যেতে পারি—ইত্যাদি। সংবাদটা প্রীতিকর হ'লেও ভয়ানক সমস্তার সৃষ্টি করলো! বাবা কিংবা পিসিমা কেউ বিয়ের মতো পবিত্র অনুষ্ঠানকে শুধু একটা খাতার পৃষ্ঠায় লিখিত দেখে চূড়ান্ত ব'লে কক্ষনো মেনে নেবেন না—অথচ তাঁর সিঙ্গাপুরে চ'লে যাবার আগে হিন্দু মতে বিয়েটা সম্পন্ন করবার ইচ্ছা থাকলেও সময় হবে না। কোনো সদুপায় ঠিক করতে না পেরে তাঁকে লিখে দিলাম যেন অবিলম্বে গোপনে এসে আমায় নিয়ে যান। তাই তিনি ট্যাক্সি নিয়ে এসে আমারই ইচ্ছামতো কাজ ক'রেছেন। আমি এখন তাঁর বিবাহিতা পত্নী। আমরা আজই সিঙ্গাপুরে যাত্রা করছি। বাবা ও পিসিমার জন্ত খুবই কষ্ট হচ্ছে। দয়া ক'রে তাঁদের বলবেন, আমায় ক্ষমা করতে। আমি ভাল আছি ও সুখে আছি জানলে তাঁরা অনেকটা নিশ্চিন্তে থাকতে পারবেন।

বিনীতা

অভাগিনী অশোকা

পুঃ—আমার মনের অবস্থা তেমন ভাল নয় ব'লে আমার হ'য়ে তিনিই চিঠিখানা লিখে দিলেন। সিঙাপুর পৌঁছে, বাবার কাছে চিঠি লিখবে।

অশোকা

পোষ্টমাষ্টার বাবু সাদাসিদে মানুষ। কবরেজম'শায়কে ডেকে এনে চিঠিখানা তাঁর হাতে দিয়ে তিনি বললেন :—"এই চিঠিতে আপনার মেয়ের সংবাদ আছে—দুঃখ করবেন না, ভাল চাকুরে জামাই হ'য়েছে, মেয়ে বেশ সুখে থাকবে। সমারোহ ক'রে বিয়ে না হ'লে কি আর অন্যরকমে বিয়ে হ'তে পারে না? আর এতে নিন্দে বা লজ্জার কথাই বা কি আছে।"

কবরেজ ম'শায় চুপ ক'রে চিঠিখানা আগা-গোড়া দু'বার পড়লেন—তার পর বললেন,—"এ তার নিজ হাতের লেখা নয়, জামাইটি যে কে, তা-ও ঠিক বোঝা গেল না।"

"কেন, ঐ যে লিখেছে, মন্দিরার দাদার এক বন্ধু।"

"তাতে কি তার পরিচয় হ'ল?"

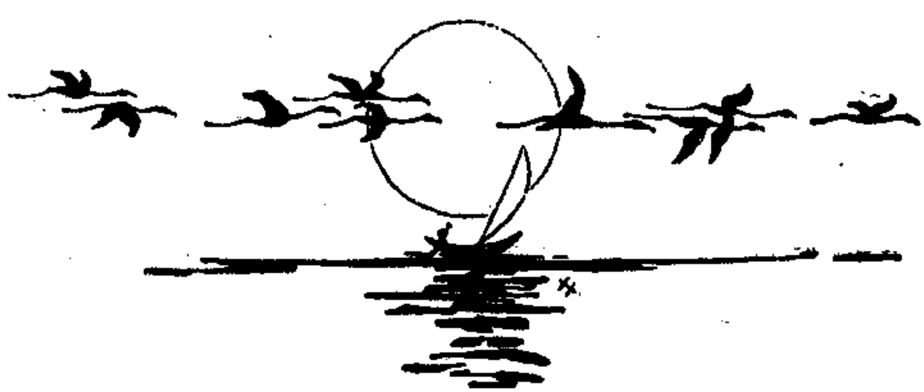
"পরের চিঠিতে হয় তো তা জানা যাবে।"

"বেশ, দেখা যাবে। কিন্তু মন্দিরা এমন ভাল মেয়ে ছিল, সে কি না জলে ডুবে আত্মহত্যা করলো! ভাবতেই পারি না, সে এমন কাজ করতে পারে। জল থেকে তার দেহটা উদ্ধার করা হ'ল না—এত দিন পরে কি আর কোন চিহ্ন পাওয়া যাবে? কিন্তু তার মাকে কি ব'লে প্রবোধ দেবো?"

বিধাতার অদ্ভুত বিধানে কবরেজ ম'শায়কে সেজন্ত আর ভাবতে হ'ল না। তিনি যখন ডাকঘরে ব'সে ঐ চিন্তায় আকুল, মন্দিরার দুর্ভাগিনী মা তখন সকলের অজ্ঞাত নীরবে অজ্ঞাত-লোকে চ'লে গেলেন। শেষ মুহূর্তে তাঁর কাছে একটি প্রাণীও উপস্থিত ছিল না।

মন্দিরা যে জলেডুবে আত্ম-হত্যা ক'রেছে, এ কথা অল্প সময় মধ্যেই গ্রামে রাষ্ট্র হ'য়ে পড়ল। অশোকার লুকিয়ে বিয়ে ও তারপর সিঙাপুরে চ'লে যাবার কথাও নানা আকারে প্রকাশ হ'ল।

[ক্রমশঃ



লণ্ডন-তীর্থে

শ্রীমতিলাল দাশ

১২ই আগষ্ট, বুধবার। গত রাত্রে শ্রীযুক্ত দত্ত বলিয়াছিলেন, লণ্ডনের নানাবিধ প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যেন পরিচয় করি। আমাদের দেশ হইতে এখন বহু লোক বিলাতে আসেন, কিন্তু তাঁহারা লণ্ডনের কর্ম্মশক্তির কোন পরিচয় না নিয়াই দেশে ফেরেন। মানুষের সাধনার পরিচয় যে বীর্য্য দেয় সে বীর্য্য তাহারা আহরণ না করিয়াই দেশে ফেরেন। তাহার কথামত লণ্ডনের পৌর শাসনের কিছু সাক্ষাৎ পরিচয় লইব সঙ্কল্প করিলাম। শ্রীযুক্ত দত্ত কেনসিংটনের টাউন ক্লার্কের পরিচিত বন্ধু। মিঃ উলসি সেদিন উপস্থিত ছিলেন না। দত্ত ফোন করিয়া তাঁহাকে না পাওয়ায় কোনও ব্যবস্থা করিতে পারিলেন না। তাহারপর Head of the General Department মিঃ আজমের সহিত পরিচয় করাইয়া দিলেন। মিঃ আজম উঠিয়া দাঁড়াইয়া আমাকে অভ্যর্থনা করিলেন। ওদেশে বিচারক জানিলে অতিশয় শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রম করে। আজমের নম্র ও মধুর ব্যবহার আমাকে খুব তৃপ্ত করিয়াছিল। তিনি ইণ্ডিয়া লাইব্রেরীতে চিঠি দিলেন। তাহারপর লেবানের নিকট গেলাম। তিনি হোম অফিসে সাক্ষাতের ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। পরে হরিহর দাদার সহিত লাঞ্চ খাইলাম। তিনিই খাওয়াইলেন।

তারপর কিছু জিনিষ পত্র কিনিয়া বাড়ী ফিরিলাম। জুতায় লাগিয়া পায় কড়া পড়িয়াছিল তজ্জন্য বিশেষ কষ্ট পাইতেছি। জুতার দোকানে জুতা সারাইতে দিয়াছিলাম, সেখানে জুতা পাইলাম না। ব্যবসায়ী হিসাবে ইংরাজের সুনাম খুব বেশী—জুতাওয়ালা সে সম্ভ্রম রাখিতে পারে নাই; তিনদিন ধরিয়া ঘুরিতেছে। ফিরিয়া ডিনার খাইয়া গ্যারিক থিয়েটারে অভিনয় দেখিতে চলিলাম। একাকী নৈশ বিচরণ আমার পোষায় না, বন্ধুবর প্যাটেল সঙ্গী ছিলেন। নাটকীর নাম A Storm in a Tea-cup হাস্য-রসের প্রস্রবণ। একটি কুকুরকে আটকানো নিয়া প্রোভোষ্ট ও তাহার স্ত্রীর মধ্যে বিবাহ বিচ্ছেদ হইল। সমস্ত রস বুঝিতে পারি না, কারণ, সারা জীবন ইংরাজী সাহিত্য পড়িলেও ইংরাজের সঙ্গে আলাপ পরিচয়ের সুযোগ কম ছিল। তাই অভিনয়ের সব কথা সহসা বুঝিয়া উঠিতে পারি নাই। মোটের উপর গল্পটি মন্দ লাগে নাই।

লেখক অজ্ঞাতনামা, ঘটনা সংস্থানে বিশেষ বৈচিত্র্য নাই। তথাপি অভিনয়ের সহজ স্বাভাবিকতা আমাদিগকে তুষ্ট করিয়াছিল।

বৃহস্পতিবার। উড়ো ডাকের চিঠির প্রত্যাশায় গ্রিগুলের ওখানে গেলাম। প্রত্যাশা মিটিল না। বারে বারে নিরাশ হইতেছি—তাই ব্যকুলতা দ্বিগুণতর হইতেছে। এখান হইতে হোম অফিসে গেলাম। এত বড় বিরাট সাম্রাজ্যের গতি এখান হইতেই নিয়ন্ত্রিত হয়। অথচ ইহার পরিবেশে না আছে ঐশ্বর্য্যের দীপ্তি, না আছে স্থাপত্যের গাম্ভীর্য্য। অনাড়ম্বর ক্ষিপ্রতায় কাজ চলিতেছে। আমার কথা শুনিয়া অতি অল্প সময়েই ব্যবস্থা করিয়া দিল। তাহারা Bow Street এবং Newington Street-এ অবস্থিত ফৌজদারী আদালতে চিঠি দিল। আমাকে সর্ব্ববিধ সুবিধা দিবার অনুরোধ তাহাতে ছিল। এখান হইতে ইণ্ডিয়া অফিসে গেলাম। এখানে ভারতীয় পুস্তক যথেষ্ট আছে। কিন্তু ইহাদের তালিকা করিবার প্রথা ভাল নয়, তাই সহসা কোনও পুস্তক বাহির করা দায়। এখানে দুইজন বাঙ্গালীর সহিত আলাপ হইল। ডাঃ চৌধুরী এইখানে কাজ করেন। শ্রীযুক্ত গুপ্ত সাহিত্যিক অতুল গুপ্ত মহাশয়ের পুত্র। তিনি এখানে ইতিহাসে থিসিস লিখিতেছেন। পড়াশুনা করিতে বেলা কাটিল। ফিরিয়া শ্রীযুক্ত দত্তের ওখানে নিমন্ত্রণ খাইতে চলিলাম। শ্রীযুক্তা দত্তের সহিত আলাপ হইল। ভদ্রমহিলা সাতসমুদ্র তেরোনদী পারে নির্ব্বান্ধব জীবন যাপন করিতে কষ্ট বোধ করিতেছেন বুঝিলাম। উঁহাদের একটী মাত্র পুত্র—সেও সঙ্গে থাকে না। নার্সারি স্কুলে থাকে। শ্রীযুক্ত দত্ত নার্সারি স্কুল এবং তাহার শিক্ষাপ্রণালীর খুব উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিলেন। শ্রীযুক্তা দত্ত চমৎকার রান্না করেন। বহুদিন পরে গৃহের

অন্নব্যঞ্জনের আস্বাদে পরিতৃপ্ত হইলাম। ডাক্তার ডি, এন দত্ত ও তাঁহার স্ত্রীও আসিয়াছিলেন।

আহার শেষে গল্প চলিল। বাঙ্গালীর স্বভাব সুলভ আত্মগরিমা ও পরনিন্দা যে ছিল না তাহা নয়, তবে অনেক ভাল কথাও শুনিলাম। শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্র মিত্রের গল্প শুনিলাম। তিনি তখন অসুস্থ—তাঁহার চিত্ত দেশের জল ও মাটীর জন্য কাঁদিয়া উঠিয়াছে, কিন্তু বোধ হয়, ফেরা হইবে না বলিয়া শুনিলাম। শ্রীযুক্ত দত্ত মনে প্রাণে ইংরাজ। ইংরাজের চরিত্রের অনেক গুণের কথা তিনি বলিলেন। রাত দুইটায় আসর ভাঙ্গিল। ডাক্তার দত্ত তাঁহার মোটরে আমাকে বাসায় দিয়া গেলেন।

১৪ই আগষ্ট, শুক্রবার। আজ পুলিশ কোর্টে চলিলাম। ইহাদের বিচারালয়ে যে জিনিষ সকলের আগে চোখে পড়ে, সেটী আসামীর প্রতি ইহাদের ভদ্র ব্যবহার। আসামী এখানে ভয়ে কাতর হয় না—তাহার উপর অত্যাচার চলে না। মজার এক মোকর্দ্দমা চলিতেছিল। লীজ ফাসিষ্ট কাগজের সম্পাদক, হোয়াইট গে মুদ্রাকর। তাহাদের জুলাই মাসের কাগজে ইহুদীদের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ প্রচার করিয়াছে। তাহারই জন্য তাহাদের বিচার চলিতেছিল।

জাতিবৈরী কি ভীষণ! লীজ তাহার বিবৃতিতে বলিতেছেন—"জু'রা জাত নয়, তারা রাজার প্রজা নয়, তাদের বিরুদ্ধে কিছু বলা অপরাধ নয়—"

নাৎসী জার্ম্মানীতে যে ইহুদী নির্যাতন চলিতেছিল—ইহা সেই আন্দোলনের ফলে জাত। মহাভারতে জন্মেজয়ের সর্পযজ্ঞের যে বিবরণ পাই, সেই সর্পোপাসক অনার্য্য জাতির সহিত আর্য্য বিদ্রোহের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। ইয়োরোপে এইরূপভাবে ইহুদীকে ধনে প্রাণে মারিবার বিরাট আয়োজন চলিয়াছে।

ইয়োরোপীয়ের চক্ষে ইহুদী অভিশপ্ত জাতি। যীশুর প্রতি নির্ম্মম ব্যবহারের জন্য তাহারা গৃহহীন হইয়া দেশ-দেশান্তরে দুঃখের বোঝা বহিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে।

হিটলার এই কুসংস্কারে রাজনৈতিক ধুঁয়া জুড়িয়া দিয়া ভীষণ অত্যাচার করিতেছিলেন। হিংসা ও দ্বেষ মানুষকে অত্যন্ত হীন করে। আদালতের কাজ শেষ করিয়া ভিক্টোরিয়া ষ্টেসনে মাদাম সোফিয়াকে অভ্যর্থনা করিতে চলিলাম।

নির্দ্দিষ্ট সময়ের অনেক পূর্ব্বে ষ্টেসনে পৌছিলাম। তাই সময় কাটাইবার জন্য নিউজ থিয়েটারে ছবি দেখিতে চলিলাম। এই সব ছায়া-ছবিতে সাম্প্রতিক সংবাদ দেখাইবার ব্যবস্থা। ছবিগুলি শিক্ষাপ্রদ কিন্তু যন্ত্র কদর্য্য ৬ পেনি দিলে এক ঘন্টার আনন্দ পাওয়া যায় কিন্তু চোখের পীড়া হয়। সস্তার তিন অবস্থা—সে কথা মিথ্যা নয়।

মাদাম নামিলেন। তাহার মুখের স্নিগ্ধ মধুর হাসি চিত্তকে প্রসন্ন করে। তাহার কণ্ঠস্বরে এক অনির্ব্বচনীয় মাধুরী। তিনি মোটরে করিয়া চলিলেন। ফিরিবার পথে একজন ইজিপসিয়ানের সঙ্গে আলাপ হইল। ডিনার খাইয়া থিয়োজফিকাল হলে মাদাম সোফিয়ার বক্তৃতা শুনিলাম। মাদাম চমৎকার বলিতে পারেন। লোকজন বেশী হয় নাই। সন্ধ্যাটি খুব আনন্দে কাটিল। বাসায় ফিরিতে খানিক রাত্রি হইল।

শনিবার মাদাম সোফিয়ার যে ছবি তুলিয়াছিলাম তাহা দিবার জন্য সকালে তাহার ওখানে গেলাম। মার্লবরো পুলিশ কোর্টে গেলাম। দুটি মজার মোকর্দ্দমা চলিতেছিল। সতের আঠারো বছরের একটী ছেলে চাকুরির সন্ধানে আসিয়াছে। নাপিতের দোকানের পরিচারিকা তাহাকে বসিতে বলিয়া ভিতরে গিয়াছে। সে তখন ৪ শিলিং চুরি করিয়া পালাইয়াছে। পরিচারিকাটি সাক্ষ্য দিল। তরুণী, তাহার বয়স ১৬।১৭ মুখে তাহার সংশয় ব্যাকুলতা। আখ্যানটি সত্য কিনা বুঝিতে পারিলাম না। ইহা চুরি না ফ্লার্ট করিবার অপরাধ ধরিতে পারিলাম না। অপরটি আত্মহত্যার অভিযোগ। একটী জার্ম্মান যুবক কর্ম্মহীন হইয়া ব্লেড দিয়া আত্মহত্যা করিতে গিয়াছিল। যুবক ম্যাজিষ্ট্রেটের প্রশ্নে বলিল, "আমি অপরাধ করি নি—আমার উপায় ছিল না তাই আত্মহত্যা করতে চলেছিলাম।"

নিজের জীবনের উপর নিজের অধিকার নাই, এ কথা সাধারণে কি বুঝিতে পারে না।

এখান হইতে বাসায় ফিরিয়া ত্রিবেদী প্যাটেল ও আমি জু দেখিতে চলিলাম। ত্রিবেদী পূর্ব্ব আফ্রিকায় কাজ করে। লণ্ডনে দিন কতক বেড়াইতে আসিয়াছে। এই চিড়িয়াখানায় দেখিবার মত বিশেষ কিছু নাই। তবে ইহার সুব্যবস্থা চোখে পড়ে।

এটা সরকারী প্রতিষ্ঠান নয়। বে-সরকারী অনুষ্ঠান। শ্রীযুক্ত দত্ত ইহাদের দেশের কর্ম্মদক্ষতার প্রশংসা করিয়া বলিয়াছিলেন যে, ভারতবর্ষের মানুষ রাজ মুখাপেক্ষী। কিন্তু ইংলণ্ডের বহু প্রতিষ্ঠান জনসাধারণের চেষ্টায় চলিতেছে। এই তফাতের অন্য কারণ আছে। একটী কারণ, আমাদের দেশের আবহাওয়া। প্রকৃতি তাহার দক্ষিণ হস্তে আমাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিয়াছেন। আমাদের নীল আকাশ, আমাদের রৌদ্রকরোজ্জ্বল সুষমা, আমাদের শস্য সমৃদ্ধ পূর্ণতা শীতের দেশে নাই, কিন্তু এই ভাগ্য আমাদিগকে লক্ষ্মীছাড়া করিয়াছে। একজন আমেরিকান লেখক এই বিষয়টী সুন্দরভাবে লিখিয়াছেন। তাহার কথাগুলি প্রণিধানযোগ্য বলিয়া তুলিতেছি :—

"But, at best, man's battle for tropic victory is, on the whole, a losing battle. Something he does; yet he or his children or his children's children one day give up the struggle. The tiger and the hyena man may drive from the jungle; even the venomous snakes he may exterminate. Possibly, also, he may hold afar off the pestilences of the night and the wasting fevers of the noon-day. But the torrid heat is still there: if he vonaius with it, he finally surrenders to it, is paralyzed by its bounties, lulled to its langours, relaxed to its temptation weakened to the level of its tasks. For it is evident that, with the passing centuries, civilization is not advancing its frontiers further into the tropics, rather it is progressively retreating, making good this loss by new conquests further towards the poles. From its sub-tropical cradle civilization has moved steadily north and west. The beginnings had to be made where the problem was easy, where some energy for progress could remain over from the sheer necessities of living. These early habituals were racial kindergartens. But their discipline once conferred, the problem grew too easy to be disciplinary. Thereafter only habituals more urgent in needs and more austere in gifts could afford the conditions of progress. The original habitat meant henceforth a determination of racial stock. Bread fruit introduced from the tropic is said to have carried the caribs back to savagery. Societies, like individuals when once mature, demand meat fit for men. The tests, the problems the gymnastics of childhood must be put away in the all other childish things. Tasks require to be apportioned to strength tapid baths for the sick, cold baths for the strong. The bett temperature is the reaction limit. Even for moral growth. ignorance and innocence are not one but two; one rightly prays that he be not led into temptation beyond his strength.

It may, then, be taken as established that a high level of civilization is impossible in these zones where the snow never falls. Precisely as progress is too difficult a problem in the frizid zones for any race yet fully to have solved it, so the problem of more existence in the tropics so over-easy of solution as to have degraded man though stagnation and ignorance, into an incapacity for civilization."—Davenport.

লেখার সকল কথা না মানিলেও একথা নিঃসন্দেহ যে, নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডলে মানুষের কর্ম্মদক্ষতা বাড়ে। চিড়িয়া-খানাটি একশ' বিঘার উপর জমিতে অবস্থিত। ইহার তিনটি অংশ। মাঝে একটী খাল আছে। পশুশালা দেখিয়া বাসায় ফিরিলাম।

১৬ই আগষ্ট, রবিবার। ত্রিবেণী, প্যাটেল ও আমি সারাদিনের ট্রাম টিকিট কিনিয়া বাহির হইয়া পড়িলাম। ওয়েষ্টমিনষ্টার সেতু পার হইয়া ক্লাপহাম কমন নামক স্থানে পৌঁছিলাম। ৬৫০ বিঘা জমি লইয়া এই সুবিস্তৃত ভূদ্যোন। ইহার মধ্যে খানিকটা ঘুরিয়া আমরা Imperial War Museum দেখিতে চলিলাম। মহাযুদ্ধের স্মৃতির উদ্দেশে এই রণ-ভবন সংস্থাপিত। ইহার সহিত একটি পাঠাগার আছে। তাহাতে ছয় লক্ষের উপর যুদ্ধসংক্রান্ত পুস্তকের সমাবেশ আছে। গত মহাযুদ্ধের বিজয়ের স্মারক নানা জিনিষ পত্রের সংগ্রহ আছে। তারপর উড়ো জাহাজের আড্ডা ক্রয়ডনে গেলাম। এই এরোড্রম হইতে অনবরত নানা

দেশ দেশান্তরে বাষ্প-পোত যাত্রা করিতেছে। ট্রাম ধীরে ধীরে চলে তাই কেনিংটন ওভালে আসিয়া টিউব ধরিলাম। এখানেই সারে ক্রিকেট ক্লাবের মাঠ এবং সেই মাঠে নানা প্রতিযোগিতামূলক খেলা হয়। মজা হইল উহারা ভুল করিয়া অন্যস্থানের গাড়ীতে উঠিল। পরের যথাগন্তব্য গাড়ীতে উঠিয়া দেখি, উহারা ভুল বুঝিতে পারিয়া পরের ষ্টেশনেই নামিয়া রহিয়াছে। বিকালে পুনরায় রণ-ভবন দেখিতে যাওয়া হইল। এখানে ফটো তুলিলাম। উহার পর গ্রীনউইচ চলিলাম। গ্রীনউইচের সহিত একটা আইনের ফাঁকি জড়িত আছে। সেকালের রাষ্ট্রবিদেরা বৃটিশের সমস্ত উপনিবেশকে Royal Manor of Greenwich নামক ম্যানরের অংশ বলিয়া ধরিতেন। এখানকার রাজবাড়ীতে বর্তমানে বিরাট হাঁসপাতাল স্থাপিত হইয়াছে।

আমরা কোথাও নামিলাম না। এখানে রয়াল ন্যাভাল মিউজিয়াম আছে। পরে আর একদিন এখানকার বিশ্ব-বিখ্যাত পর্য্যবেক্ষণ মন্দির দেখিয়া যাই। ট্রাম হইতে নামিয়া আমরা টেমসার তলে তলে যে subway বা অন্তঃপথ আছে, তাহাই বাহিয়া লণ্ডন ডকস নামক স্থানে উপস্থিত হইলাম।

টাওয়ার ব্রিজ হইতে নর্থ উলউইচ পর্য্যন্ত ঘাটের সারি চলিয়াছে। আমরা যেস্থানে উপস্থিত হইলাম তাহাকে East India Dock বলে। এখানে ভারতীয় লস্করদের জন্য একটি আড্ডা আছে।

এখান হইতে ট্রামে করিয়া চলিলাম। রাত্রে ফিরিয়া ডেলিমেলের একটা প্রতিযোগিতায় যোগ দিলাম। বিজ্ঞাপিত বস্তু লইয়া পাদপূরণ করিতে হইবে। তাহারা যে পংক্তি দিয়াছিল তাহা—

Most wonderful value I have come across here. আমি জুড়িলাম :—

Is Jerome's print, 'tis nice and brings cheer.

১৭ই আগষ্ট, সোমবার। বো ষ্ট্রীটে পুলিস কোর্টে গিয়াছিলাম। বো ষ্ট্রীটের সহিত প্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিক ফিল্ডিং মহাশয়ের স্মৃতি বিজড়িত। পুলিস কোর্টের ম্যাজিষ্ট্রেট খুব যত্ন ও অভ্যর্থনা করিয়া সমস্ত ব্যাপার বুঝাইয়া দিয়াছিলেন। এখানে তদনুরূপ সুবিধা হইল না। সমস্ত কথা বুঝিতে পারি না বলিয়া ইহাদের কার্য্যকলাপ অনুধাবন করা শক্ত লাগিতেছিল। এখান হইতে বৃটিশ মিউজিয়ামে পড়িতে গেলাম। হরিহর দাদার সহিত আলাপ হইল।

১৯শে আগষ্ট, বুধবার। মিস বেসউইকের অফিসে গেলাম। ইনি স্বভাব চিকিৎসার পদ্ধতিতে চক্ষু চিকিৎসা করেন। আমি বার বৎসর চোখের পীড়ায় কষ্ট পাইয়াছি। ডাক্তারের কাছে গিয়াছি—ডাক্তার চশমা দিয়াছেন, বলিয়াছেন, চশমা দিলেই চোখ সারিবে। সারে নাই, পুনরায় গিয়াছি, পুনরায় চশমা দিয়াছেন। এই ভাবে কত যে অর্থদণ্ড দিয়াছি, কত যে যাতনা ভোগ করিয়াছি তাহা বলিবার নহে। কিন্তু চোখের অসুখ কেবল চশমায় সারে না, এই সহজ বুদ্ধি আমাদের নাই তাই বৎসরের পর বৎসর চার-চোখওয়ালা লোক বাড়িয়াই চলিয়াছে। মিস বেসউইক স্বভাব চিকিৎসার অনুরাগী।

তিনি আমাকে বলিলেন, চোখের ওঠা নামার খেলা করিতে। পা নাচাইয়া নাচাইয়া কোনও কবিতার ছন্দে চোখ বুজিতে ও খুলিতে হইবে এবং ঠাণ্ডাজলে চোখ ধুইতে হইবে, মাত্র ইহাই ব্যবস্থা। উনি বলিলেন তাঁহার ব্যবস্থায় বহু সহস্র রোগী আরোগ্য হইয়াছে।

বিলাতে বিনা অর্থে কিছুই পাওয়া যায় না। কিন্তু মিস বেসউইক আমাকে বন্ধু বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন, কাজেই তাঁহাকে দক্ষিণা দিবার কথাটি লজ্জায় বলিতে পারিলাম না।

সেখানে হইতে কাপের বস্ত্রওয়ালা Erade-র ওখানে গেলাম। আমার একটা আত্মীয়ের জন্য প্রয়োজন। উহারা বস্ত্র দেখাইল না, কারণ বুঝিলাম না, অথচ প্রতিদিন বিজ্ঞাপন দেয়। বিলাতী জুয়াচুরি কিনা বুঝিতে পারিলাম না। তারপর হোয়াইট হলের রয়াল ইউনাইটেড সার্ভিস মিউজিয়াম দেখিতে গেলাম। ইহা ঠিক Horse Guards নামক বাড়ীর সম্মুখে অবস্থিত।

বৃটিশ চরিত্রের উদ্ভট প্রকৃতির পরিচয় পাওয়া যায় এই Horse Guard নামক গৃহে। বৃটিশ শক্তির পরাক্রান্ত শাসন যে সব ভবনে সম্পন্ন হয়, বাহির হইতে তাহাকে

চিনাইবার কোনই আয়োজন নাই। তাহার কোনই সমারোহ নাই। কিন্তু এই রাজকীয় অশ্বারোহী সৈন্যদের আবাস ভূমির দ্বারদেশে দুইজন বিচিত্র সজ্জায় সজ্জিত অশ্বারোহী দাঁড়াইয়া থাকে। বেলা এগারোটায় Changing the Guard নামক উৎসব অনুষ্ঠিত হয়, তখন বহু দর্শক দাঁড়াইয়া এই উৎসব দেখে।

১৮৩০ খৃষ্টাব্দে রয়াল ইউনাইটেড সভা স্থাপিত। বর্তমানে ইহার সভ্য সংখ্যা প্রায় ছয় হাজার। যে গৃহে শিল্পশালাটি অবস্থিত, সেটি একটী পরিকল্পিত রাজ প্রাসাদের অংশ এবং বহু রাজা এখানেই বাস করেন। এই শিল্পশালার বাড়ীতেই প্রথম চার্লস ফাঁসিকাষ্ঠে আরোহণ করেন। এখানে নানাবিধ রণসম্ভার, অস্ত্রশস্ত্র এবং রণজয়ের স্মৃতি সুরক্ষিত আছে। প্রবেশ মূল্য ৬ পেনি দিতে হইল। এখান হইতে বাহির হইয়া ৩ পেনির ফল কিনিয়া মাধ্যাহ্নিক ক্ষুধা নিবৃত্তি করিলাম। তারপর একটী News Theatre-এ ছায়-ছবি দেখিলাম। এইগুলি বিশেষ সুবিধার নয়, তবে সমসাময়িক ঘটনার ছবি বলিয়া কৌতূহল চরিতার্থ করে। একখানি অটোগ্রাফের বই কিনিলাম। তাহাতে চার পংক্তি কবিতা নিজে লিখিলাম,

আলোর প্রদীপ্ত রেখা জীবনের অন্ধকারে
আনুক আশ্বাস নব, আনন্দ অশেষ
যা পেয়েছি শুভ্র প্রাণে স্মরি তারে বারে বারে,
নম্র চিত্তে যাচি সদা সত্যের উন্মেষ।

ব্যারিষ্টার পোলকের সন্ধানে চলিলাম। দেখা পাইলাম না। ফিরিবার পথে সোয়ানি সংগ্রহ দেখিলাম। ভদ্রলোক স্থপতি, Bank of England ইঁহারই কল্পনা প্রসূত। ইঁহার সঞ্চিত পুস্তক, পাণ্ডুলিপি, ভারতীয় এবং মিশরীয় পুরাকালীন দ্রব্যাদি দেখিবার মত। এখানে হগার্থের আসল ছবি Rake's progress আছে। তাহা ছাড়া টার্ণার, রেণল্ডস, প্রভৃতির অনেকগুলি চমৎকার চিত্র আছে। পথে সেণ্টমেরি গির্জ্জা দেখিয়া লইলাম।

২০শে আগষ্ট, বৃহস্পতিবার। দ্বিপ্রহর কাটিল বৃটিশ মিউজিয়ামে। সন্ধ্যায় মিস বেসউইকের নিমন্ত্রণে ১৭ কাম্বারলাণ্ড প্লেসে চলিলাম। মিস একজন থিওজফিষ্ট, তিনি তাঁহার বন্ধু মিস বার্ণেট এবং মিঃ জেকি ব্রাউনকেও নিমন্ত্রণ করিয়াছেন। ইঁহাদের সহিত ভারতবর্ষ সম্বন্ধে নানাবিধ আলাপ হইল।

ব্রাউন সান্ডারল্যাণ্ডের India in Bondage নামক বই পড়িয়াছেন। তিনি প্রশ্ন করিলেন—"ভারতবর্ষে ইংরেজের সঙ্গে আপনাদের বিরোধ কেন হয়?"

আমি বলিলাম—"ভারতবর্ষে ইংরেজ শাসনতন্ত্রের প্রতীক, ভারতবাসীকে সে বন্ধুর মর্য্যাদা দেয় না। শাসকের দৃষ্টিতেই সে তাহার সঙ্গে ব্যবহার করে, কাজেই সম্প্রীতি ও বন্ধুত্ব সম্ভব হয় না।"

মিস বার্ণেট বলিলেন—"আপনারা মেয়েদের খুব অযত্ন করেন?"

আমি বলিলাম—"এটা আপনাদের ভুল ধারণা, আমাদের মেয়েরা আপনাদের দেশের চেয়ে অসুখী একথা সত্য নয়, গৃহের বাহিরের কাজে সাধারণতঃ তারা যোগ দেয় না, কিন্তু তারাই গৃহকর্ত্রী—"

"কিন্তু তারা কি খাঁচার পাখী নয়?"

বলিলাম—"মোটেই নয়, এটা রীতি, জননী ও ভগিনীদের জীবিকা অর্জ্জনের জন্য লড়াই করতে দিতে আমরা লজ্জিত, জীবন যাত্রার ঝড় আমরা নিজেরা পোহাই—মেয়েদের সেই আরাম আসন—কিন্তু সেখানে তাঁরা বন্দিনী নন—তাঁদের গৃহকোণ থেকে তাঁরাই পুরুষদের পরিচালিত করেন—"

মিস বেসউইক হাসিলেন।

ব্রাউন প্রশ্ন করিল—"গান্ধীর চরকা সম্বন্ধে আপনার কি মত?"

আমি বলিলাম—"প্রশ্নটি জটিল, চরকা জনসাধারণের একটী উপায় হিসাবে দেখলে এর প্রতি শ্রদ্ধা হয়, কিন্তু আমার ভয় হয় এই যন্ত্রদানবের আধিপত্যের যুগে অর্থনীতিক দিক দিয়ে চরকা সার্থক হবে না।"

ব্রাউন প্রশ্ন করিলেন—"জগতের তা'হলে উপায় কি?"

প্রশ্নকর্ত্তা মনে করিয়াছিলেন যে, গান্ধীবাদ পৃথিবীতে নবযুগ আনিবে। জাতি বৈর দূর করিয়া পৃথিবীকে নূতন আলো দিবে। আমি উত্তর দিলাম—

"সে উত্তর দিতে পারি নে—যুগে যুগে আর্ত্ত মানুষের কণ্ঠ এই কথাই বার বার জেগেছে—কিন্তু তার শেষ উত্তর

আনন্দ কেউ দিতে পারে নি—তবে utopia কোনও দিন হবে একথা বিশ্বাস করিনে—"

মিস বেসউইক বলিলেন—"আমাদের সভ্যতা যান্ত্রিক, এ সভ্যতা আমাদের সমস্ত আনন্দ, সমস্ত রস শুষে নিয়েছে—আমরা বিভ্রান্ত—স্পেনের রণাঙ্গনে যে তাণ্ডব পৈশাচিকতা তার কথা ভাবলে আমরা লজ্জিত ও বিমূঢ় হই।"

আমি বলিলাম, "আমার বিশ্বাস ইয়োরোপ যে জিগীষার পথে চলেছে, এ পথ প্রগতির আপাত-প্রতীয়মান জৌলুষে জ্বলছে, কিন্তু এটা শাশ্বত শান্তির পথ নয়—"

"তবে কোথায় তাকে পাব—"

"ভারতবর্ষ হয়ত উত্তর দিতে পারে—কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ তাঁর লেখায় ভারতের এই সনাতন মৈত্রীর বাণী প্রচার করেছেন—মহাত্মা গান্ধী সেটা রাজনৈতিক সংগ্রামে প্রয়োগ করেছেন—তা থেকে আমরা প্রেরণা পেতে পারি—"

মিস বার্ণেট বলিলেন—"শিব ও কালী সম্বন্ধে আমাদের কিছু বলুন—"

উত্তর দিলাম—"এই সব দেবতারা মানুষের বিরাটের কল্পনার অংশ—এদের নিয়ে আমাদের দেশে নানা পুরাণ গড়ে উঠেছে—সেই পৌরাণিক গল্পের আবরণ না থাকলে হঠাৎ এদের বোঝা মুস্কিল—তবে কালী ধ্বংসের ও মৃত্যুর প্রতীক—পৃথিবীতে সকলের যে তাণ্ডব নৃত্য চলছে—সেই নৃত্য করছেন শিব—আর বিবসন কালী—তার বক্ষের উপর দাঁড়িয়ে আপন শক্তিতে সৃষ্ট ধরিত্রীর রুধির পান করছেন—"

ব্রাউন বলিলেন—"কৃষ্ণ সম্বন্ধে কিছু বলুন—আমরা গীতাকে খুব অনুসরণ করি।"

বলিলাম—"কৃষ্ণ ঐতিহাসিক ব্যক্তি কিনা তা নিয়ে মতভেদ আছে—কিন্তু তিনি যে প্রাচীন ভারতের মনীষা ও সাধনার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ফল সে বিষয়ে সন্দেহ নাই—কৃষ্ণ তার চরিত্রে মহামানবতার ও নিষ্কাম কর্ম্মযোগের শিক্ষা দিয়েছেন—" কাফি ও চিজ খাইতে দিলেন। আমি চিজ খাইতে পারি না, কাফি পান করিয়া অনেক রাত্রে বাসায় ফিরিলাম।

২১শে আগষ্ট, শুক্রবার। হ্যাম্পষ্টেডের টাউন ক্লার্কের সহিত আলাপ হইল। সে লোকাল গভর্ণমেণ্ট সম্বন্ধে পুস্তক পড়িতে বলিল। বলিল, তাহাদের ওখানে দেখিবার ও শিখিবার বিশেষ কিছু নাই। উহাদের কাজের একটা বিবরণি দিল। সেখান হইতে বাহির হইয়া হ্যাম্পষ্টেড হিথের মুক্ত প্রান্তরে অনেকক্ষণ বিচরণ করিলাম, তারপর কীট্‌স্ মিউজিয়াম এবং লাইব্রেরী দেখিলাম।

কবি কীটস লন ব্যাঙ্ক নামক যে গৃহের উদ্যানে বসিয়া নাইটিঙ্গেল পাখীর প্রতি কবিতা লিখিয়াছিলেন, সেই বাড়ী কিনিয়া কবির স্মৃতি-মন্দির স্থাপিত হইয়াছে। কীটস্ রোমান্টিক রিভাইভালের তরুণতম কবি, কিন্তু সৌন্দর্য্য দেবতার চরণে তাহার অর্ঘ্য সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া বিবেচিত হয়। কীটস্‌ই লিখিয়াছিলেন, যাহা সুন্দর তাহা চিরন্তন আনন্দ দেয়। সত্য, শিব ও সুন্দর মানুষের জীবনের আরাধ্য ধন। কবি কীটসের রসিক চিত্ত অনুভব করিয়াছিল যে, সুন্দরকে পাইলেই সত্য ও শিবকে পাওয়া যাইবে। এই অসামান্য প্রতিভার বরপুত্রের স্মৃতি-মন্দিরে আমিও আমার শ্রদ্ধার নিবেদন রাখিয়া আসিলাম।

বিকালে হরিহর দাদা আসিলেন, তাঁহাকে চা খাওয়াইয়া মেনমোরে আমার দেখা বাড়ীতে নিয়া চলিলাম। দাদার পছন্দ হইল না। তারপর হাঁটিতে হাঁটিতে তাঁহাকে চক-ফার্মে উঠাইয়া দিয়া মিঃ পি, কে, দত্তর ওখানে ঘণ্টা দেড়েক গল্প করিয়া আসিলাম।

শ্রীযুক্ত দত্ত বিলাতের শিক্ষা-প্রণালীর উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিলেন। বলিলেন, ইহাদের বিদ্যায়তনে মানুষ গড়িবার চেষ্টা চলে। শিক্ষা-পদ্ধতির উদ্দেশ্য ছেলেদের পাশ করানো নয়, ছেলেদের মানুষ করিবার চেষ্টায় ইহারা পূর্ণশক্তি নিয়োগ করে।

২২শে আগষ্ট, শনিবার। শনিবার সকালে উঠিয়া পার্লামেণ্ট ভবন দেখিতে চলিলাম। পার্লামেণ্ট ভবনে দাঁড়াইয়া মনে পড়িল, এই আবাস শতাব্দীর পর শতাব্দী পরাক্রান্ত বৃটিশ জাতির ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করিয়াছে। এখানে কত উচ্চ কল্পনা সূচিত হইয়াছে, কত অন্যায় ভর্ৎসিত হইয়াছে, কত আশা অঙ্কুরিত হইয়াছে।

পার্লামেণ্ট ভবনের পরিবেশটি চমৎকার। ওয়েষ্ট মিনষ্টার পল্লীতে বিগবেন নামক ঘড়ি এক দিকে, পার্লামেণ্ট ভবন তাহার পাশে, অন্য দিকে ওয়েষ্ট মিনষ্টার এবি—আর অন্য দিকে চলিয়াছে অফুরন্ত জনস্রোত। তৃতীয় এড্‌ওয়ার্ড সেণ্ট

টিফেন গির্জ্জা নির্ম্মাণ করেন। সেখানেই বহুকাল হাউস অব কমন্সএর অধিবেশন হইত। গৃহদাহে তাহা নষ্ট হইলে স্থপতি ব্যারির নক্সা অনুযায়ী ১৮৪০ খৃষ্টাব্দে আরম্ভ হইয়া ইহা ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে সমাপ্ত হয়। ২৫ বিঘার উপর সুদীর্ঘ বাড়ী বসিয়াছে—ইহাতে ১১টি চতুষ্কোণ আছে।

দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে ৩৩৬ ফুট উচ্চ ভিক্টোরিয়া টাওয়ার। এই গম্বুজের পাশ দিয়াই সাধারণের প্রবেশ পথ। প্রবেশ করিলে দক্ষিণে রাজার পরিচ্ছদ কক্ষ। এই সাজ-ঘর হইতে রাজকীয় রীতিতে সুসজ্জিত হইয়া সম্রাট হাউস অব লর্ডস নামক ভবনে যাইয়া পার্লামেন্টের উদ্বোধন করেন। লর্ডদের কক্ষ বিশেষ সমারোহের সহিত সজ্জিত—সোনালি কাজ বলিয়া ইহাকে Gilded Chamber বলে।

হাউস অব কমন্স কিন্তু নিতান্ত সাদাসিদে। সমস্ত সভ্যের বসিবার স্থান এই ক্ষুদ্রায়তন কক্ষে নাই। বড় বড় বিতর্ক সভায় প্রবেশের স্থান পাওয়া অত্যন্ত দুর্ঘট। তাহার পর সেণ্ট ষ্টীফেন্স্ হল দেখিয়া বাহির হইয়া আসিলাম। সসম্ভ্রম নমস্কার জানাইয়া মিল ব্যাঙ্কস বাহিয়া টেট গ্যালারি দেখিতে চলিলাম। সার হেনরী টেট এই বাড়ীর মালিক। তিনি ইহা জাতিকে দান করিয়াছেন। ইহা ন্যাশনাল গ্যালারির অংশ বলিয়া বিবেচিত হয়। এখানে বৃটিশ শিল্পীদের সর্ব্বোত্তম চিত্র-সংগ্রহের চেষ্টা করা হইয়াছে। বর্ত্তমানে অন্যান্য দেশের সমসাময়িক চিত্রকর ও ভাস্করদের অবদান সঞ্চিত করা হইয়াছে। এই চিত্রকলা সম্পদের মধ্যে হগার্থ, গেন্সবরো, ওয়াট প্রভৃতি খ্যাত শিল্পীদের ছবি আছে। প্রি-র‍্যাফেলাইট সম্প্রদায়ের ছবির একটী চমৎকার সমাবেশও আছে। ইদানীন্তন ফরাসী চিত্রকরদের চিত্রমালা আমার ভাল লাগিল।

এখান হইতে ফিরিয়া ওডিয়নে ছায়া-ছবি দেখিলাম—Chatter Box এবং The amateur gentleman. প্রথমটী আমার ভাল লাগিল। গল্পাংশটী চিত্তাকর্ষক। একটী তরুণী তাহার দাদুর অবাধ্য হইয়া থিয়েটার দেখিতে গেল। দাদু ভয়ঙ্কর রাগী মানুষ—তরুণীকে প্রবেশ নিষেধ জানাইয়া গৃহের দরজা বন্ধ করিল। বিপন্ন তরুণী পরিচিত একজন শিল্পীর মোটরের পিছনে উঠিয়া তাহার বাড়ী গেল। সেখান হইতে তাহার সহিত থিয়েটারে গেল। সেখানে হাস্যাস্পদ হইয়া যখন সে ক্লান্ত, তখন তাহার দাদু আসিয়া তাহাকে ফিরাইয়া নিল। শিল্পী এবার লুকাইয়া মোটরে চলিল, তার পর মিলনের মাধুর্য্যে গল্প পরিসমাপ্ত হইল।

অপর গল্পটি, একজন সরাই রক্ষকের ছেলে ভাবুক। সে পিতাকে তর্ক করিয়া বলিল, ফাঁসি দেওয়া ঠিক নয়। পিতা তাহা মানিল না। বলিল, আইন বড়, আইনকে সকলের শ্রদ্ধা ও অনুসরণ করা উচিত। ভাগ্যচক্রে বিনা দোষে বাবার কারাগারে গমন—ফাঁসিরকাষ্ঠ তাহার জন্য উদ্গ্রীব—বুদ্ধিমান ছেলে চক্রান্ত ভেদ করিয়া পিতাকে উদ্ধার করিল। বাপ বুঝিলেন—ছেলের কথাই সত্য।

২৩শে রবিবার। আমার ষ্টীমারের সহযাত্রী জৈন পাশের বাড়ীতে বাসা নিয়াছিলেন। সকালে তাহার ওখানে গেলাম। জৈন মানুষটী ভাল কিন্তু একটু অল্প বুদ্ধির। যাহা করিয়া বসে তাহা কখনও কখনও পাগলামি হইয়া উঠে। দু'জনে গিল্ডহল দেখিতে চলিলাম। গিল্ডহল সিটি অব লণ্ডনের খ্যাতকীর্ত্তি পৌর ভবন। এখানে লর্ড মেয়র, সেরিফ এবং পার্লামেণ্টের সভ্য নির্ব্বাচিত হয়। এই গৃহের ১৪১১ খৃষ্টাব্দে নির্ম্মাণ আরম্ভ হয়। এইখানে প্রতিবৎসর ৯ই নভেম্বর লর্ড মেয়রের ভোজ দেওয়া হয়। এই ভোজে গভর্ণমেণ্ট সদস্যেরা সরকারী কর্ম্মপদ্ধতির পূর্ব্বাভাব ঘোষণা করেন। এই ভবনেই রাজ অতিথিদের সম্মান ভোজ দেওয়া হয়। ঘরের মধ্যে দুইটী বৃহৎ কাষ্ঠ পুত্তলি আছে, তাহাদের নাম গগ এবং ম্যাগগ। সুন্দর সুচিত্রিত বৃহৎ হল ঘর—দেশ গৌরব মহাত্মাদের স্মৃতি-চিহ্ন আছে। এই বাড়ীতেই ফুট, গজ ও চেনের সরকারী মাপ আছে। ইহার লাইব্রেরী ও পাঠাগার চমৎকার। পাঠাগারের নীচে একটী মিউজিয়াম আছে।

এই মিউজিয়ামে সিটির পুরাতাত্ত্বিক বহুবিধ সংগ্রহ বিদ্যমান। গিল্ডহল দেখিয়া আমরা লণ্ডন ব্রিজ দেখিতে চলিলাম। এই সেতু ১৮৩১ খৃষ্টাব্দে নির্ম্মিত—ইহার স্থপতি জন রেণী—এখানে টেমস নদীর বিস্তৃতি মাত্র ৯০০ ফুট—সেতুটি ৯২৮ ফুট দীর্ঘ এবং ৬৫ ফুটপ্রস্থ। ইহার পাঁচটি খিলান। এখান হইতে লণ্ডন টাওয়ারে গেলাম। ইহা রবিবারে বন্ধ থাকে। কাজেই হাঁটিয়া সেতু পার হইয়া ওপারে গেলাম। সেখান হইতে বাড়ী ফিরিলাম।

বাড়ী ফিরিয়া কিউ উদ্যান দেখিতে চলিলাম। জৈন দুপুরে ডিনার না খাইয়া ফল খাইয়া ক্ষুন্নিবৃত্তি করিল। উদ্দেশ্য বোধ হয় পয়সা বাঁচিবে, ফলে কিউ উদ্যানে পরিভ্রমণ করিয়া, ক্ষুধার্ত্ত হইয়া উঠিল। আমি তাহাকে পরামর্শ দিলাম, খাবার কিনিয়া বাহিরে বসিয়া খাও। জৈন শুনিল না—টেবিলে বসিয়া সামান্য চা ও খাবার খাইতেই তাহার আড়াই শিলিং খরচ হইল। কিউ উদ্যানটি খুব ভাল লাগিল। এই সুবৃহৎ অরণ্যের—অরণ্য বলিলে ইহাকে অন্যায় বলা হয় না—নির্জ্জনতায় তরুণ ও তরুণীর প্রেমাভিনয় চলে; সে অভিনয় কোথাও কোথাও কদর্য্য পাশবিকতায় পরিণত হয়—আমরা দূর হইতে এমনই একটা কদর্য্য বিলাস দেখিয়া মুগ্ধ হইলাম। কিউ টেমস নদীর বাঁকে বাঁকে হাজার বিঘা জমির উপর প্রতিষ্ঠিত—ইহাই সরকারী উদ্ভিদ বিদ্যার নিকেতন। সুবিস্তৃত হরিৎ তৃণভূমি— তাহাতে নানা জাতীয় বৃক্ষ নয়ন রঞ্জন করে। তালশালা Palm house ৮০° ডিগ্রি তাপে বাঁচাইয়া রাখা হয়। কিউ উদ্যানেই রবার গাছের হাজার চারা উৎপন্ন করিয়া মালয়ের রবার উদ্যানে চালান দেওয়া হয়। এখানেই দক্ষিণ আমেরিকা হইতে আনীত সিঙ্কোনা বৃক্ষ পালিত হইয়া ভারতবর্ষে প্রেরিত হয়। এখানকার চৈন প্যাগোডা এবং জাপানী তোরণ চমৎকার লাগিল। এই উদ্যানেই একটি প্রাসাদ আছে এবং কয়েকটী মিউজিয়াম আছে। সমস্ত দেখিয়া পরিশ্রান্ত হইয়া যখন বাসায় ফিরিলাম, তখন রাত্রির জন্য কিছু আহার মিলিল না।

[ক্রমশঃ



বৰ্দ্ধমান জেলার প্রাচীন কবিগণ

শ্রীসুধীরচন্দ্র রায়।

বাঙ্গলার প্রাচীন সাহিত্যের ইতিহাস যাহা পাওয়া যায়, তাহা আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, গত দশম শতাব্দী হইতে বাংলা সাহিত্যের জন্ম হইয়াছে। এই দশম শতাব্দী হইতে বৰ্দ্ধমান জিলায় বহু প্রাচীন সাহিত্যিক জন্মগ্রহণ করেন, এবং তাঁহাদের দ্বারা বাংলা সাহিত্য বিশেষভাবে পরিপুষ্ট ও উন্নত হয়। আমার মনে হয়, একমাত্র প্রাচীন বাংলা সাহিত্য বৰ্দ্ধমান জিলার সাহিত্যিক ও কবিগণ দ্বারাই উন্নত ও সমৃদ্ধ-সম্পন্ন হইয়াছিল, সেই হিসাবে বৰ্দ্ধমান জিলাকে বাংলা সাহিত্যের জনক বলিলে অত্যুক্তি করা হইবে না। নিম্নে সংক্ষেপে, আমি বৰ্দ্ধমান জিলার প্রাচীন সাহিত্যিকগণের পরিচয় দিলাম।

রমাই পণ্ডিত,—'শূন্য-পুরাণ' রচয়িতা রমাই পণ্ডিত, গত দশম শতাব্দীতে, বৰ্দ্ধমান জিলায় অন্তর্গত বরোয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি অধুনালুপ্ত ভল্লুক নদীর উৎপত্তি স্থানে প্রথম ধর্ম্মপূজার প্রবর্ত্তন করেন। 'শূন্য-পুরাণকে' প্রাচীন সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ পুস্তক বলিলে কোন অংশে অত্যুক্তি করা হইবে না। 'শূন্য-পুরাণই' বাঙ্গলার প্রাচীন সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ পুস্তক।

ভট্ট ভবদেব,—গত ৯৫০ শতাব্দে গুসকরার নিকটবর্ত্তী সিদ্ধলে গ্রামে ভট্ট ভবদেব জন্মগ্রহণ করেন। সেই সময় বাঙ্গলা দেশে বৌদ্ধ ধর্ম্মের অত্যন্ত প্রাবল্য। ভট্ট ভবদেব সমগ্র বাঙ্গলাদেশে হিন্দুধর্ম্মের পুনঃ প্রতিষ্ঠা করেন এবং বেদ, স্মৃতি, পুরাণ, ও তন্ত্র প্রভৃতি পুনঃ প্রচলন করেন। অনেকে বলেন, উড়িষ্যায় তিনি একটী সুন্দর মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন।

মালাধর বসু,—জামালপুর থানার অন্তর্গত কুলিন গ্রামে গত ১৪৭৩-৮০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণ বিজয় নামক একখানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। কথিত আছে, মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য-দেব, এই গ্রন্থ 'শ্রীকৃষ্ণ-বিজয়' পাঠ করিয়া অত্যন্ত মুগ্ধ হইয়া বলিয়াছিলেন, "কুলিন গ্রামের যে হয় কুকুর, সেই মোর প্রিয়, অন্যজন রহু দূর।" গৌড়াধিপতি, মালাধর বসুকে, "গুণরাজ খাঁ" উপাধিতে ভূষিত করিয়াছিলেন।

বৃন্দাবন দাস,—পূর্ব্বস্থলী থানার অন্তর্গত মামগাছী (মাউগাছি) গ্রামে বৃন্দাবন দাস ঠাকুর জন্মগ্রহণ করেন। ইনি 'চৈতন্য-ভাগবত' গ্রন্থ রচনা করিয়া অমর হইয়া রহিয়াছেন। বৃন্দাবন দাস শেষ বয়সে মন্তেশ্বর থানার অন্তর্গত, দেনুড় গ্রামে বাস করিতে থাকেন। বৃন্দাবন দাস ঠাকুরের ভিটার উপর বর্ত্তমানে গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। বৈষ্ণব আচার্য্যগণ তাঁহাকে কলির বেদব্যাস আখ্যা দিয়াছিলেন।

নরহরি সরকার,—পঞ্চদশ শতাব্দীতে শ্রীখণ্ডে নরহরি সরকার জন্মগ্রহণ করেন। তিনি মহাপ্রভুর পার্শ্বচর ছিলেন। নরহরি সরকারের রচিত 'শয়নে গৌর, স্বপনে গৌর, গৌর নয়ন তারা' পদ বিশেষ প্রসিদ্ধ।

বসু রামানন্দ,—কুলিন গ্রামের মালাধর বসুর পৌত্র রামানন্দ বসু, ১৫শ শতাব্দীতে বৈষ্ণব পদাবলী রচনা করিয়া বিখ্যাত হ'ন। ইনি বসু রামানন্দ নামে খ্যাত।

গৌরীদাস পণ্ডিত,—গৌরীদাস পণ্ডিত অম্বিকাকালনায় জন্মগ্রহণ করেন। গৌরীদাস পণ্ডিত মহাপ্রভুর খুব প্রিয় ছিলেন। তিনি গৌরাঙ্গ বিষয়ক পদ রচনা করিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন। অম্বিকাকালনায় এখনও তাঁহার শ্রীপাঠ রহিয়াছে। শোনা যায়, মহাপ্রভুর স্বহস্ত লিখিত, পুঁথি এখনও অম্বিকাকালনায় আছে।

কবিকঙ্কন মুকুন্দরাম,—রায়না থানার অন্তর্গত দামুন্যা গ্রামে কবিকঙ্কন মুকুন্দরাম জন্মগ্রহণ করেন। কবিকঙ্কন মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তীর 'চণ্ডী-মঙ্গল' কাব্য সর্ব্বাপেক্ষা পাণ্ডিত্য পূর্ণ। এই গ্রন্থে তদানীন্তন সমাজ জীবনের ছবি অতি সুন্দরভাবে ও নিখুঁৎভাবে পরিস্ফুট হইয়াছে। ১৫৭৭-৭৮ খৃষ্টাব্দের মধ্যে, তিনি উক্ত গ্রন্থ রচনা শেষ করেন। জনৈক বিখ্যাত বিদেশী সমালোচক, মুকুন্দরামকে, ইংরাজ কবি 'চসারের' সহিত তুলনা করিয়াছেন।

কৃষ্ণদাস কবিরাজ,—কাটোয়া মহকুমার অন্তর্গত ঝামটপুর গ্রামে, বিখ্যাত 'চৈতন্য-চরিতামৃত' প্রণেতা কৃষ্ণদাস কবিরাজ ১৫১৭ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। বৈষ্ণব সাহিত্যের

মধ্যে 'চৈতন্ত-চরিতামৃত' একখানি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ এই গ্রন্থখানি ক্রমান্বয় আট-বৎসর পরে রচনা শেষ হয়।

লোচন দাস,—১৫২৩ খৃষ্টাব্দে ত্রিলোচন দাস, অথবা লোচনদাস মঙ্গলকোট থানার অন্তর্গত কো-গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ইহার বৈষ্ণব পদাবলী বিশেষ জন-প্রিয়। লোচনদাস, চৈতন্ত-মঙ্গল' নামক বিখ্যাত বৈষ্ণব গ্রন্থ রচনা করেন।

গোবিন্দদাস,—বর্দ্ধমান সহরের নিকটবর্ত্তী, কাঞ্চননগর গ্রামে গোবিন্দদাস ১৬শ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার রচিত 'করচা' বিশেষ প্রসিদ্ধ। শোনা যায়, স্ত্রীর সহিত মনোমালিন্য হইয়া লোচনদাস সংসার ত্যাগ করেন। পরে সাধনায়, কবিত্ব শক্তি লাভ করেন।

কবি জয়ানন্দ,—বিগত ১৫১১ খৃষ্টাব্দে আকুইপুর গ্রামে, কবি জয়ানন্দ জন্মগ্রহণ করেন। কবি জয়ানন্দ 'চৈতন্ত-মঙ্গল' রচনা করিয়াছিলেন।

বলরাম দাস,—কালনা মহকুমার দোগাছি গ্রামে কবি বলরাম দাস জন্মগ্রহণ করেন। বলরাম দাসের নামে বহু পদাবলী আছে কিন্তু ঐ সময় বলরাম দাস নামে একাধিক লেখক দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু, যিনি বিখ্যাত বলরামদাস তিনি চৈতন্ত পরবর্ত্তী যুগের লোক এবং লেখক।

নরোত্তম দাস,—১৫৪০ খৃষ্টাব্দে খেতুরী গ্রামে নরোত্তম দাস জন্মগ্রহণ করেন। নরোত্তম দাস রস-কীর্ত্তন ও প্রার্থনা বিষয়ক বহু পদ রচনা করিয়া যশস্বী হন।

গোবিন্দদাস কবিরাজ,—ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে শ্রীখণ্ড গ্রামে কবি গোবিন্দদাসের জন্ম হয়। ইহার পিতার নাম চিরঞ্জীব সেন। অবশ্য, ইনি করচা লেখক, গোবিন্দদাস নহেন।

যদুনন্দন,—ষোড়শ শতাব্দীতে কাঁটোয়া সহরের নিকট অজয় নদীর অপর পারে যদুনন্দন জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার রচিত গ্রন্থের নাম 'সংগ্রহ তোষিণী।'

জ্ঞানদাস,—জ্ঞানদাস বর্দ্ধমান জেলার কাঁদড়া গ্রামের অধিবাসী। ইনি নিত্যানন্দ প্রভুর কনিষ্ঠ ভার্য্যা শ্রীমতি জাহ্নবী দেবীর মন্ত্রশিষ্য ছিলেন। ইহার 'ব্রজবুলি' পদই বেশী।

চিরঞ্জীব ভট্টাচার্য্য,—বর্দ্ধমান জেলার গুপ্তিপাড়া গ্রামে চিরঞ্জীব ভট্টাচার্য্য ষোড়শ শতাব্দীতে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি 'মাধব-চম্পু' নামক পুস্তকের লেখক।

কাশিরাম দাস,—কাঁটোয়া মহকুমার অন্তর্গত সিঙ্গীগ্রামে কায়স্থ বংশে কায়স্থ কুলতিলক প্রাতঃস্মরণীয় কবি কাশিরাম দাস ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার বাংলা পদ্যে রচিত মহাভারত আজ বাংলার ঘরে ঘরে শোভা পাইতেছে। তাঁহার ভ্রাতা গদাধর দাস 'জগৎ-মঙ্গল' কাব্যের লেখক ছিলেন।

রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র,—বর্দ্ধমান জেলার পাণ্ডুয়া গ্রামে ১৬শ খৃষ্টাব্দে রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার রচিত, 'অন্নদামঙ্গল' 'বিদ্যাসুন্দর' সম্বন্ধে নূতন করিয়া বলা নিষ্প্রয়োজন।

বলদেব বিদ্যাভূষণ,—সপ্তদশ শতাব্দীতে আকুইগ্রামে বলদেব বিদ্যাভূষণ জন্মগ্রহণ করেন। বলদেব বিদ্যাভূষণ সংস্কৃতে কাব্য রচনা করিতেন। ইনি 'গোবিন্দভাষ্য' লিখিয়া যশস্বী হ'ন।

কবি রূপরাম,—রায়না থানায় অন্তর্গত কাইতি গ্রামে কবি রূপরাম জন্মগ্রহণ করেন। কবি রূপরাম 'ধর্ম্ম-মঙ্গল' নামক পুস্তক রচনা করেন।

কবি ক্ষেমানন্দ ও কেতকা দাস,—গত ১৬৯২ খৃষ্টাব্দে দামোদরের পূর্ব্বতীরে সেলিমাবাদের নিকট কবি ক্ষেমানন্দ ও কেতকা দাস জন্মগ্রহণ করেন। ইহারা 'মনসা-মঙ্গল' রচনা করেন। ইহাদের 'মনসা-মঙ্গল' রচনা হইতে ভাসান গানের উৎপত্তি হয়।

রামাই ঠাকুর,—সপ্তদশ শতাব্দীর বৈষ্ণব কবি রামাই ঠাকুর পাটুলি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ইহার রচিত 'চৈতন্ত-চন্দ্রিকা' বিখ্যাত স্তোত্র। ইনি বাঘনাপাড়া গ্রাম প্রতিষ্ঠা করেন। এই সময় তালিত গ্রামের মাধব গুণাকর বর্দ্ধমান রাজ গজ সিংহের সভাকবি ছিলেন।

রামদাস আদক ও ভবাণী ঘোষ,—রামদাস আদক ও ভবাণী ঘোষ এই শতাব্দীতে, (সপ্তদশ শতাব্দী) 'অনাদি-মঙ্গল' রচনা করেন। ইহাদের বাড়ী জামালপুর থানার অন্তর্গত জাড়গ্রামে ছিল। ভবাণী ঘোষ 'লক্ষণ বিজয়' নামক পুস্তক রচনা করেন। এই সময় মাণিক গাঙ্গুলী, সভ বাবাজী, যথাক্রমে, 'ধর্ম্ম-মঙ্গল' ও 'কীর্ত্তন-পদাবলী' রচনা করেন।

কবি ঘনরাম,—খণ্ডকোষ থানায় কৈয়ড় ষ্টেশনের উত্তরে

কৃষ্ণপুর নিবাসী কবি ঘনরাম চক্রবর্ত্তী ১৭৭১ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি মহারাজ কীর্ত্তিচন্দ্রের সভাকবি ছিলেন।

বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার,—অষ্টাদশ শতাব্দীর কবি বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার বর্দ্ধমানে বাস করিতেন। তিনি মহারাজ চিত্রসেনের সভাকবি ছিলেন। ইহার রচিত 'চিত্র-চম্পু' নামক পুস্তকের পাণ্ডুলিপি বর্ত্তমানে এসিয়াটিক্ সোসাইটিতে আছে। বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার, বর্গীর হাঙ্গামার সময়, বর্গীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছিলেন।

দেওয়ান আকিঞ্চন,—১১৫৭ খৃষ্টাব্দে দেওয়ান আকিঞ্চন পুর্ব্বস্থলী থানার অন্তর্গত চুপীর বিখ্যাত দেওয়ান বংশে জন্মগ্রহণ করেন। দেওয়ান আকিঞ্চন রচিত বহু সঙ্গীত আছে। তাঁহার আসল নাম, রায় রঘুনাথ রায়।

শচীনন্দন, নরসিংহ ও হৃদয়রাম,—শচীনন্দন বিদ্যানিধি অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যে মঙ্গলকোট থানার অধীন চানক নামক গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। তিনি 'উজ্জল-চন্দ্রিকা' নামক একখানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। নরসিংহ বসু খণ্ডকোষ থানার অধীন শাখারী গ্রামে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। নরসিংহ বসু "ধর্ম্ম-মঙ্গল" রচনা করিয়াছিলেন। হৃদয়রাম সুরুল গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। হৃদয়রামও 'ধর্ম্ম-মঙ্গল" রচনা করিয়াছিলেন;

দ্বিজ কৃপারাম,—বর্দ্ধমানের দেবগ্রামে রাজা তেজচন্দ্রের সমকালিন দ্বিজ কৃপারাম (১৭৭৯—১৮৩২) পাঁচালী রচনা করেন।

তারাচরণ দাস,—বড়শুল অধিবাসী তারাচরণ দাস মহারাজ নবকৃষ্ণের আদেশ মত ১৭৯৭ খৃষ্টাব্দে 'মন্মথ-কাব্য' রচনা করেন।

রাজা মহাতাব চাঁদ,—বর্দ্ধমানরাজ মহাতাব চাঁদের সম্পাদনায়, বর্দ্ধমান রাজবাড়ী হইতে মহাভারতের বাংলা অনুবাদ বাহির হয়। সেই সময় মেমারী গ্রাম নিবাসী প্যারীচাঁদ কবিরত্ন তাঁহার সভাকবি ছিলেন।

মহিলা কবি রূপমঞ্জুরী,—১৮শ শতাব্দীতে আমরা-গড়ের নিকট কলাইঝুঁট গ্রামে মহিলা কবি রূপমঞ্জরী বাস করিতেন। ইনি ভাগবতের বাংলা অনুবাদ করেন। ইনি কবি ও দার্শনিক ছিলেন। বৈষ্ণব শাস্ত্রে বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। ঐ সময় শাকনাড়া গ্রামে আর একজন মহিলা কবি ছিলেন, তাঁহার নাম কুড়ানী দেবী। ইনি সংস্কৃত সাহিত্যে পণ্ডিত ছিলেন।

প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশ,—বিখ্যাত নৈয়ায়িক পণ্ডিত প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশ ১৮০৬ খৃষ্টাব্দে উক্ত শাকনাড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশ, ঈশ্বর গুপ্ত সম্পাদিত, সংবাদ প্রভাকরে প্রবন্ধাদি লিখিতেন। ইনি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের গুরু ছিলেন।

সাধক কমলাকান্ত,—সাধক কমলাকান্তের নাম কাহারও অজানা নাই। ইনি বর্দ্ধমানের অম্বিকা কালনায় জন্মগ্রহণ করেন। লাকুড্ডিতে কমলাকান্তের পঞ্চমুণ্ডির আসন ও কালীমূর্ত্তি বর্ত্তমান রহিয়াছে।

দাশুরথী রায়,—প্রসিদ্ধ পাঁচালীকার দাশুরথি রায় ১৮০৫ খৃষ্টাব্দে কাঁটোয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ইহার পাঁচালী সম্বন্ধে নূতন করিয়া বলা নিষ্প্রোয়জন।

জীবন গোস্বামী,—প্রসিদ্ধ কথককবি; জীবন গোস্বামী কালনা মহকুমার অন্তর্গত বাঘনাপাড়ায় জন্মগ্রহণ করেন। ইনি প্রহ্লাদচরিত্র, ধ্রুব চরিত্র, মুরলী বিলাস প্রভৃতি রচনা করেন।

প্রতাপ চন্দ্র রায়,—১৮৪১ খৃষ্টাব্দে গলসী থানার অধীন সাকো গ্রামে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। ইনি সর্ব্বপ্রথম মহাভারতের ইংরাজী অনুবাদ করেন।

রঘুনন্দন গোস্বামী,—মানকরের নিকট মাড়ো গ্রামে রঘুনন্দন গোস্বামী জন্মগ্রহণ করেন। 'রাম-রসায়ণ' নামক একখানি পুস্তক রচনা করেন। ইহা একখানা বিখ্যাত পুস্তক।

কমলাকান্ত দাস,—কাঁটোয়া থানার অধীন সিউর গ্রামে কমলাকান্ত দাস 'পদ রত্নাকরের' সঙ্কলন করেন। এই সময় বহু ছোট বড় কবির নাম জানা যায়। জয় গোবিন্দ দাস, ক্ষেত্রনাথ তর্কবাগীশ, অকিঞ্চন দাস, চন্দ্র শেখর, বিষ্ণুচরণ মৈত্র, আত্মারাম দাস, জগদানন্দ দাস, প্রভৃতি বহু কবি বর্দ্ধমানে জন্মগ্রহণ করেন। ইহা ছাড়া অন্যান্য বহু কবিগণের কাব্য ও কবিতা লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। সঠিক কোন কিছু পাওয়া যায় না। তারপর ঊনবিংশ শতাব্দীতে আমরা পূর্ব্বস্থলী থানার অন্তর্গত চুপী গ্রামে বাবু অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয়কে দেখিতে পাই। অক্ষয়কুমার দত্ত চারুপাঠ,

পদার্থ পরিচয়, প্রভৃতি রচনা করেন। প্রসিদ্ধ কবি ৺সত্যেন্দ্র দত্ত, অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয়ের পৌত্র।

রঙ্গলাল বন্দোপাধ্যায় ও লালবিহারী দে,—কালনার নিকট বাকুলিয়া গ্রামে রঙ্গলাল বন্দোপাধ্যায় জন্ম গ্রহণ করেন। ইনি পদ্মিনী উপখ্যান, সুর সুন্দরী, কর্ম্মদেবী, প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। রেভারেণ্ড লালবিহারী দে, পলাশী গ্রামের অধিবাসী। ইঁহার রচিত 'বেঙ্গল পিজেণ্টস্ ল্যাইফ' একখানি প্রসিদ্ধ গ্রন্থ।

ইন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়,—কাটোয়া মহকুমার অধীন গঙ্গাটিকুরীগ্রামে ইন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় জন্মগ্রহণ করেন। বঙ্গবাসী পত্রিকায় ইনি 'পঞ্চানন্দ' ছদ্মনামে লিখিতেন।

রামকৃষ্ণ রায়,—বর্দ্ধমানের নিকট রামচন্দ্রপুরে রামকৃষ্ণ রায় জন্ম গ্রহণ করেন। 'নিশিথ চিন্তা,' 'নিভৃত নিবাস' নামক, ইঁহার দুইখানা পুস্তক আছে।

মতি রায়,—যাত্রাওয়ালা মতিরায় ভাতশালা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ভাতশালা গ্রাম পুর্ব্বস্থলী থানার অধীন। মতিলাল রায় যাত্রা করিয়া ও যাত্রার পুস্তক লিখিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন।

রাজকৃষ্ণ মিত্র,—রাজকৃষ্ণ মিত্র দেবগ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার রচিত 'আর্য্যদর্শন' 'ভ্রমর' 'বীণা' প্রভৃতি বহু পুস্তক আছে।

ধনকৃষ্ণ সেন,—মেমারী থানার অধীন খারগ্রামে ধনকৃষ্ণ সেন জন্মগ্রহণ করেন। সেন মহাশয় যাত্রার নাটক লিখিয়া বিখ্যাত হন। 'বিল্ব-মঙ্গল' 'কর্ণ-বধ' 'শতাশ্ব-মেধ' প্রভৃতি নাটক লিখিয়াছেন।

দুর্গাদাস লাহিড়ী,—'পৃথিবীর ইতিহাস' প্রণেতা দুর্গাদাস লাহিড়ী পুর্ব্বস্থলী থানার অধীন চকবামুনগড় গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। 'স্বাধীনতার ইতিহাস' নামক তাঁহার আর একখানি পুস্তক আছে।

যোগেন্দ্র বসু,—বঙ্গবাসী পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা, যোগেন্দ্রনাথ বসু জামালপুর থানার অধীন বিরগ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি ইংরাজী ডেইলী টেলিগ্রাফ ও হিন্দী বঙ্গবাসীর প্রতিষ্ঠাতা। ইহার রচিত 'নেড়া হরিদাস', 'রাজলক্ষ্মী' প্রভৃতি প্রসিদ্ধ পুস্তক আছে।

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত,—কবি সত্যেন্দ্র দত্ত, টুপীর অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয়ের পৌত্র। স্বনামধন্য সত্যেন্দ্র দত্ত মহাশয়ের নাম আজ আর কাহারও অজানা নাই।

ইহা ছাড়া প্রাচীন কবিগণের মধ্যে, আমরা ভবানী বনিক, রসিক দাস, ভবতারণ চট্টোপাধ্যায়, পশুপতি হাজরা, ভোলানাথ কাব্যশাস্ত্রী, মন্দাকিনী দাসী, প্রভৃতি বহু কবি, কথক-গায়ক প্রভৃতির নাম জানিতে পারি। দামোদর নদীর দুই পারে, গঙ্গার কুলে কুলে, বর্দ্ধমান জিলায় বহু খ্যাত, অখ্যাত প্রাচীন কবি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু কালস্রোতে, বহু প্রাচীন কবির কাব্য, কবিতা, লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। বর্ত্তমানে কবি কুমুদরঞ্জন, কবি কালিদাস, কাজী নজরুল, কাদের নওয়াজ, কবি কনকভূষণ মুখোপাধ্যায়ের নাম বিশেষ প্রসিদ্ধ। ইহা ছাড়া, শ্রীযুক্ত হরিচরণ দাস বাহা ভাগবতরত্ন, ইনি চিকিৎসাবিদ্যা, হরিভক্তি রসায়ণ, সংসার ক্ষেত্র বিবরণ, ভেষজসংগ্রহ, কায়স্থতত্বানুসন্ধান, নামক পুস্তকগুলির রচয়িতা। ইহা ছাড়া বহু শ্যামাবিষয়ক সঙ্গীত ও যাত্রার উপযোগী নাটক লিখিয়াছেন।

সংক্ষেপে আমি বর্দ্ধমান জিলার প্রাচীন কবিগণের পরিচয় দিলাম। বারান্তরে, বর্দ্ধমান জিলার বর্ত্তমান সাহিত্যিকগণের পরিচয় দিবার চেষ্টা করিব। প্রাচীন সাহিত্যিক ও কবিগণের পরিচয় দেখিয়া আমাদের স্বতঃই মনে হয়, বাংলা সাহিত্য বর্দ্ধমান জিলায় যথেষ্ট বহু পুষ্ট ও উন্নত হইয়াছে। সম্ভবতঃ, ইহা আমার অতিশয়োক্তি নহে।

ভ্রম সংশোধন

কার্ত্তিক মাসের বঙ্গশ্রীতে শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের 'সাহিত্য-পরিষদে রবীন্দ্রনাথ' শীর্ষক যে প্রবন্ধ বাহির হইয়াছে তাহার ৬৭৯ পৃষ্ঠার ১ম স্তম্ভের ২য় প্যারার তৃতীয় পংক্তির '২৯শে ডিসেম্বর, ১৯৩১' স্থলে '১৯শে ডিসেম্বর ১৯০১' হইবে। ৬৭৯ পৃষ্ঠার দ্বিতীয় স্তম্ভের ২২ পংক্তির 'গণেন্দ্রনাথ ঠাকুর' স্থলে 'গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর' হইবে এবং ৬৮০ পৃষ্ঠার দ্বিতীয় স্তম্ভের ৪র্থ পংক্তির শেষোক্ত '১৯৩৭ খৃষ্টাব্দের ২১শে ফেব্রুয়ারী চন্দননগরে অনুষ্ঠিত'—এই কথাগুলি ৫ম পংক্তির ' পরে পরিষদের বহু অনুষ্ঠানে রবীন্দ্রনাথ যোগদান করিয়া' পরে বসিবে।

রাজসিংহের ভূমিকা

ডাঃ হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত

[৫]

রাজসিংহের কথা শেষ করিয়া এইবার আমরা জেব-উন্নেসা ও উদিপুরীর কথা বলিব।

বঙ্কিম বলেন, "ইহাদের চরিত্রও ইতিহাসে যেরূপ আছে, সেইরূপ রাখা গিয়াছে। তবে তাঁহাদের সম্বন্ধে যে সকল ঘটনা লিখিত হইয়াছে, সকলই ঐতিহাসিক নহে।"

আমরা ইঁহাদের চরিত্র সম্বন্ধেই আলোচনা করিব। বঙ্কিম আরও বলিয়াছেন,

"কথিত আছে, নৃত্যগীত কেহ না করিতে পারে এরূপ আদেশ ঔরঙ্গজেব প্রচার করিয়াছিলেন, তাঁহার নিজের অন্তঃপুরেই সে আদেশের অবমাননা ঘটিয়াছিল, এ উপন্যাসে এইরূপ লিখিয়াছি। আমার স্থির বিশ্বাস, ঐতিহাসিক সত্য আমার দিকে।

"ঔরঙ্গজেব নিজে মদ্যপান করিতেন না, কিন্তু ইঁহার পিতা ও পিতামহ খুল্লতাত এবং সহোদর প্রভৃতি অতিশয় মদ্যপ ছিলেন। তাঁহার পৌরাঙ্গনাগণও যে মদ্যপায়িনী ছিল, তাহারও ঐতিহাসিক প্রমাণ আছে। যদি এ বিষয়ে সন্দেহ করেন, তবে সে সন্দেহ ভঞ্জন করিতে প্রস্তুত আছি।"

—চতুর্থ সংস্করণের বিজ্ঞাপন।

প্রথমে আমরা উদিপুরী সম্বন্ধেই আলোচনা করিব। বঙ্কিম বলিতেছেন,

"যোধপুরী বেগম প্রধানামহিষী হইলেও, প্রেয়সী মহিষী ছিলেন না। যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রেয়সী, সে একজন খৃষ্টিয়ানী—উদিপুরী নামে ইতিহাসে পরিচিতা। উদয়পুরের সঙ্গে ইহার কোন সম্বন্ধ ছিল বলিয়া ইহার নাম উদিপুরী নহে। এশিয়া-খণ্ডের দূরপশ্চিমপ্রান্তস্থিত যে জর্জিয়া এখন রুশিয়ার রাজ্যভুক্ত, তাহাই ইহার জন্মভূমি। বাল্যকালে একজন দাস-ব্যবসায়ী ইহাকে বিক্রয়ার্থ ভারতবর্ষে আনে, ঔরঙ্গজেবের অগ্রজ দারা ইহাকে ক্রয় করেন। বালিকা বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে অদ্বিতীয়া রূপ-লাবণ্যবতী হইয়া উঠিল। তাহার রূপে মুগ্ধ হইয়া দারা তাহার অত্যন্ত বশীভূত হইলেন। উদিপুরী মুসলমান ছিল না, খৃষ্টিয়ান······

দারাকে বধ করিয়া ঔরঙ্গজেব দারার দুইটী প্রধানা মহিষীকে স্বীয় অর্দ্ধাঙ্গের ভাগিনী হইতে অনুরোধ করিলেন। একটী রাজপুত-কন্যা আর একটী উদিপুরী।*

"উদিপুরীর যেমন অতুল্য রূপ, তেমন মদ্যাশক্তি···

*এই উদয়পুরীকে হস্তগত করিবার ইতিহাস মানুচি বিস্তৃত ভাবে দিয়াছেন।

*As to how Aurangzeb secured Udepuri as his wife Manucci has given the following descriptions :—

After Dara's death, Aurangzeb sent for the two second wives of Dara, that is to say, the inconstant Udepuri—a Gregorian by race and the faithful Rana Dil, a Hindu by birth. Udepuri obeyed and appeared in the presence of Aurangzeb who made her his wife and by her he had prince Kambussh (Mar. 6, 1667) but Rana Dil, that is, clear heart sent to ask the king why he wanted to see her. They answered her that the king wished take her to wife because the law thus directed that the wives of a dead elder brother belonged to the living young-brother. On hearing this reply with what was he enamoured, the king sent word that he had an affection for her lovely hair. Owing to this answer she cut off her hair and sent it to Aurangzeb saying that here was the beauty he longed for, and she wished to live in solitude. But when Aurangzeb wanted to marry her sent words again, to say, thet her beauty was great that he would convent her as one of his wives. She ought to assume that he was the same Dara. Rana Dil went to her apartments and taking a knife slashed her face all over and collecting blood in her cloth sent to Aurangzeb saying that if her blood gratified him he was welcome. Then Auranzeb......solicitatious yielding high esteem to her treating her with courtesy deserved constancy.

(Vol. I. 361).

"জেবউন্নেসা হঠাৎ উদিপুরীর শয়নগৃহে প্রবেশ করিতে পারিল না। কেন না, ভারতেশ্বরের প্রিয়তমা মহিষী মদ্যপানে প্রায় বিলুপ্তচেতনা, বসন ভূষণ কিছু বিপর্য্যস্ত, বাঁদীরা সজ্জা পুনর্বিন্যস্ত করিল; ডাকিয়া সচেতন ও সাবধান করিয়া দিল। জেবউন্নেসা আসিয়া দেখিল, উদিপুরীর বাম হস্তে সট্‌কা, নয়ন অর্দ্ধনিমীলিত, অধর-বান্ধুলীর উপর মাছি উড়িতেছে; ঝটিকাবিচ্ছিন্ন ভূপতিত, বৃষ্টিনিষিক্ত পুষ্পরাশির মত উদিপুরী বিছানায় পড়িয়া আছে।

জেবউন্নিসা আসিয়া কুর্ণিশ করিয়া বলিল, "মা! আপনার মেজাজ উত্তম ত'?

উদিপুরী অর্দ্ধজাগ্রতের স্বরে রসনার জড়তা সহিত বলিল, "এত রাত্রে কেন?"

জে—একটা বড় খবর আছে।

উ—কি? মারহাট্টা ডাকু মরেছে?

জে—তারও অপেক্ষা খোস-খবর।

রূপনগরীর কথা হইল। (তারপরে)

...এই মহিষের মত বাঁদীগুলা হজরতের তামাকু সাজে আমি তাহা দেখিতে পারি না। রূপনগরের সেই সুন্দরী রাজকুমারী আসিয়া হজরতের তামাকু সাজিবে, বাদ্‌শাহের কাছে এই ভিক্ষা চাইব।"

উদিপুরী না বুঝিয়া নেশার ঝোঁকে বলিল, "বহুৎ আচ্ছা।"

ইহার কিছু পরে রাজকার্য্য-পরিশ্রমক্লান্ত বাদশাহ শ্রমাপনয়ন জন্য উদিপুরীর মন্দিরে উপস্থিত হইলেন। উদিপুরী নেশার ঝোঁকে চঞ্চলকুমারীর কথা, জেবউন্নিসার কাছে যেমন শুনিয়াছেন, তেমনই বলিল। ঔরঙ্গজেব শপথ করিয়া স্বীকার করিলেন।

অন্যত্র বঙ্কিম লিখিতেছেন—

আহারাদি, শয়ন ও পরিচর্য্যা সম্বন্ধে চঞ্চলকুমারীর নিজের যেরূপ বন্দোবস্ত, বেগম সম্বন্ধে ততোধিক যাহাতে হয় তাহা করিতে চঞ্চলকুমারী নির্ম্মলকুমারীকে আদেশ করিলেন।

নির্ম্মল বলিল, "তাহা সবই হইবে। কিন্তু তাহাতে ইহার পরিতৃপ্তি হইবে না।"

চঞ্চল—কেন, আর কি চাই?

নির্ম্মল—তাহা রাজপুরীতে অপ্রাপ্য।

চঞ্চল—সরাব? যখন তাহা চাহিবে তখন একটু গোময় দিও।

উদিপুরী পরিচর্য্যায় সন্তুষ্ট হইলেন। কিন্তু রাত্রিকালে উপযুক্ত সময় উপস্থিত হইলে, উদিপুরী নির্ম্মলকুমারীকে ডাকাইয়া মিনতি করিয়া বলিলেন—

"ইম্‌লি বেগম, থোড়া সরাব হুকুম কিজিয়ে।"

নির্ম্মল "দিতেছি" বলিয়া রাজবৈদ্যকে গোপনে সংবাদ পাঠাইলেন। রাজবৈদ্য এক বিন্দু ঔষধ পাঠাইয়া দিলেন এবং উপদেশ দিলেন যে, সরবৎ প্রস্তুত করিয়া এই ঔষধবিন্দু তাহাতে মিশাইয়া সরাব বলিয়া পান করিতে দিবে। নির্ম্মল তাহাই করাইলেন। উদিপুরী তাহা পান করিয়া অতিশয় প্রীত হইলেন। বলিলেন, "অতি উৎকৃষ্ট মদ্য।" এবং অল্পকাল মধ্যেই নেশায় অভিভূত হইয়া গভীর নিদ্রায় মগ্ন হইলেন।

এই কথোপকথনটুকু উপন্যাস বটে, কিন্তু ঘটনা সবই ইতিহাস উক্ত। কিন্তু এই যে উদিপুরী মদ্যপান করিতেন, পান করিয়া জ্ঞানশূন্যা হইতেন, ঔরঙ্গজেব জানিয়াও কিছু বলিতেন না, এ সমস্ত কথা স্যার যদুনাথ উল্লেখ করেন নাই কেন বুঝিতে পারিতেছি না। অথচ আলোচনা করিয়াছেন তিনি "রাজসিংহ", ইতিহাসের দিক্ দিয়া।

যাহাই হউক, উদিপুরী বেগম সম্বন্ধে অর্ম্মি বলেন, "Favourite and circassian wife."—p. 85.

মানুচী বলেন—His beloved Udepuri p. 148, Aurangzeb was very fond of her. অন্যত্র বলেন—

Formerly a wife of Dara became afterwards a much beloved wife of Aurangzeb.

Pringle Kennadi II.—a Georgian Christian, First of all a concubine of Dara Sanko and afterwards of Aurangzeb. (II 107).

তাহার মদ্যাশক্তি সম্বন্ধে মানুচী বলেন—

She was in the habit of drinking spirits and that more literally than discretion allows, thus frequently she was intoxicated. The other wives and concubines were jealous that Aurangzeb was so fond of Udepuri. They waited until one day this queen was in liquor then went all in a body to the presence of Aurangzeb. He was pleased at such a visit chiefly because they came in great

glee and resorted on this occasion to those cajolling ways which never fail women when they mean to conquer their husbands heart. After a little talk they prayed him to call for the attendance of Udepuri so that the conversation might take a more elevated tone. He sent a message to his beloved asking her to come and enjoy the cheerful hour. The maid servant replied that Udepuri was indisposed. After repeated callings when she did not come Aurangzeb went to see the patient. She was all in disorder, her hair flying loose and her head full of drink. Aurangzeb seated himself by her and touched her with his hand. Thinking it was her servant girl she asked (drunk though she was) for more. Aurangzeb was upset by the order of spirits and by such a request. He came down-cast out of her apartments and although she did not lose the love he had for her he turned in a fury upon the door-keepers who were bestinadoed for want of vigilance over the gates."

মাণুচীর বিবরণ হইতেও পাওয়া যায় যে, ঔরঙ্গজেব ইহাকে এতই ভাল বাসিতেন যে, তাহার পানাশক্তির বিরুদ্ধে কোন উপায়ই করিতে পারিতেন না। তাই বঙ্কিম একস্থানে বলিয়াছেন,

"এই কপটাচারী সম্রাট জিতেন্দ্রিয়তার ভাণ করিতেন—কিন্তু অন্তঃপুর অসংখ্য সুন্দরীরাজিতে মধুমক্ষিকা পরিপূর্ণ মধুচক্রের ন্যায় দিবারাত্র আনন্দধ্বনিতে ধ্বনিত হইত।"

ঔরঙ্গজেব ইহাকে কিরূপ ভালবাসিতেন আরও একটু প্রমাণ দিতেছি। ঔরঙ্গজেব কখন কাহাকেও ক্ষমা করিতেন না, এমন কি যে ভগিনী রোশেনারা তাঁহার সিংহাসনাধিকারে প্রধান সহায়া হইয়াছিল, যে প্রিয়তমা কন্যা জেবউন্নেসা রাজ্যশাসনে সহায়া, তাহাদিগকেও নয়। কিন্তু কামবক্স্ মহারাষ্ট্রীয়গণের সহিত ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইলেও, তাহাকে ক্ষমা করিয়াছিলেন। যদিচ জুলফিকর খাঁ কামবক্স্কে 'A pisari Mutribap' (বেশ্যাপুত্র, a dancing woman's child) বলিয়া গালাগালি দিতে দিতে ও চপেটাঘাত করিতে করিতে বন্দীশালায় পাঠাইয়া দেন, ঔরঙ্গজেব কিন্তু সেই পুত্রকে ক্ষমা করিয়া একটি গজলের মাত্র আবৃত্তি করেন—

There is a joy in forgiving that there is not in punishing. Manucci 316, II.

এখন জিজ্ঞাস্য এই—বঙ্কিম উদিপুরী সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন ও ইতিহাসোক্ত বলিয়া বলিয়াছেন সেই বিষয়ে ভূমিকায় কোন মন্তব্য না করিয়া অপর সামান্য সামান্য বিষয়ে স্যার যদুনাথ তাঁহার ত্রুটী দেখাইতে গেলেন কেন। ইহাই কি যথার্থ ভূমিকা? আর বঙ্কিমের প্রতি ইহাতে কি অযথা অশ্রদ্ধা প্রদর্শন হয় নাই?

এখন, এই মদ্যপান সম্বন্ধে আরও কিছু বলিব। রোশেনারাও সুরাসেবন করিতেন। মাণুচী বলেন, "Rosenara was generous and drank wine when she could get it." I. P. 239

মাণুচী আরও বলেন, There was a lady of rank named Distributor of liquor in the Harem.)

অন্যত্র জাহানারারও উৎকৃষ্ট সুরাসেবন সম্বন্ধে উল্লেখ আছে।

অতএব মদ্যপান সম্বন্ধে বঙ্কিম যাহা কিছু লিখিয়াছেন, সেই সবই ঐতিহাসিক সত্যের উপর নির্ভরিত। তাই বলিতেছি, যে প্রভুপত্নী ও প্রভুর পুরাঙ্গনাগণ (আর সেই প্রভু আবার যে সে নহেন) মদ্যপান করিতেন এই কথা ভৃত্যরচিত ইতিহাসে (অর্থাৎ মাসিরী আলমগীরী ও খাপিখাঁনের কাহিনীতে) কিরূপে স্থান পাইতে পারে? কিন্তু বিদেশী ডাক্তার মাণুচী কাহার তোয়াক্কা রাখিতেন? এই কারণে সত্য কোথায় দৃষ্ট হইবে, তাহা একটু বিবেচনা বুদ্ধির পরিচালনা করিলেই খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে।

এখন আসিতেছে জেবউন্নিসার কথা। বঙ্কিম বলেন,

"মুসলমান ইতিহাসে ইনি জেবউন্নিসা বা জেবে্ উন্নিসা নামে পরিচিতা।"

বঙ্কিম লিখিয়াছেন,

"ভারতবর্ষীয় মহিলারা রাজ্যশাসনে সুদক্ষ বলিয়া বিখ্যাত। পশ্চিমে কদাচিত একটা জেনোবিয়া, ইসাবেলা, এলিজাবেথ বা ক্যাথারাইন পাওয়া যায়। কিন্তু ভারতবর্ষের অনেক রাজকুলজারাই রাজ্যশাসনে সুদক্ষ। মোগল সম্রাটদিগের কন্যাগণ এ বিষয়ে বড় বিখ্যাত। কিন্তু যে পরিমাণ তাহারা রাজনীতি বিশারদ, সেই পরিমাণে তাহারা ইন্দ্রিয়-

পরবশ ও ভোগবিলাসপরায়ণ ছিল। ঔরঙ্গজেবের দুই ভগিনী জাহানারা ও রোশেনারা। জাহানারা সাজাঁহার বাদশাহীর প্রধান সহায়। সাজাঁহা তাহার পরামর্শ ব্যতীত কোন রাজকার্য্য করিতেন না তাঁহার পরামর্শের অনুবর্ত্তী হইয়া কার্য্যে সফল ও যশস্বী হইতেন। তিনি পিতার বিশেষ হিতৈষিনী ছিলেন। কিন্তু যে পরিমাণে এ সকল গুণবিশিষ্ট ছিলেন, ততোধিক পরিমাণে ইন্দ্রিয় পরায়ণা ছিলেন। ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তির জন্য অসংখ্য লোক তাঁহার অনুগৃহীত পাত্র ছিল। সেই সকল লোকের মধ্যে য়ুরোপীয় পর্য্যটকেরা এমন ব্যক্তির নাম করেন যে, তাহা লিখিয়া লেখনী কলুষিত করিতে পারিলাম না।

"রোশেনারা পিতৃদ্বেষিনী, ঔরঙ্গজেবের পক্ষপাতিনী ছিলেন। তিনিও জাহানারার মত রাজনীতি বিশারদ এবং সুদক্ষ ছিলেন। এবং ইন্দ্রিয় সম্বন্ধে জাহানারার ন্যায় বিচারশূন্য বাধাশূন্য এবং তৃপ্তিশূন্য ছিলেন। যখন পিতাকে পদচ্যুত ও অবরুদ্ধ করিয়া তাঁহার রাজ্য অপহরণে ঔরঙ্গজেব প্রবৃত্ত, তখন রোশেনারা তাহার প্রধান সহায়। ঔরঙ্গজেবও রোশেনারার বড় বাধ্য ছিলেন। ঔরঙ্গজেবের বাদশাহীতে রোশেনারা দ্বিতীয় বাদশাহ ছিলেন।

কিন্তু রোশেনারার দুরদৃষ্টক্রমে তাহার এক মহাশক্তিশালিনী প্রতিদ্বন্দ্বিনী তাঁহার বিরুদ্ধে মাথা তুলিল। ঔরঙ্গজেবের তিন কন্যা। কনিষ্ঠা দুইটীর সঙ্গে বন্দী ভ্রাতুষ্পুত্রদ্বয়ের তিনি বিবাহ দিলেন। জ্যেষ্ঠা জেবউন্নিসা বিবাহ করিলেন না, পিতৃস্বসাদিগের ন্যায় বসন্তের ভ্রমরের মত পুষ্পে পুষ্পে মধুপান করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন।

"পিসী, ভাইজী উভয়ে অনেক স্থলেই মদন মন্দিরে প্রতিযোগিনী হইয়া দাঁড়াইলেন, সুতরাং ভাইজী পিসীকে বিনষ্ট করিবার সঙ্কল্প করিলেন। পিসীর মহিমা তিনি পিতৃসমীপে বিবৃত করিতে লাগিলেন। ফল এই দাঁড়াইল রোশেনারা পৃথিবী হইতে অদৃশ্যা হইলেন, জেবউন্নেসা তাহার পদমর্য্যাদা ও তাহার প্রণয়ীগণকে পাইলেন।

...জেবউন্নেসা রঙ্গমহালের সর্ব্বকর্ত্রী ছিল।

......জেবউন্নিসার বিলাস গৃহ......এত মহাপাপ আর কোথাও নাই—

প্রেমিক যেখানে উপবিষ্টা মবারক খাঁ, তাহার নিকটে গিয়া বসিলেন এবং তাম্বুলাদি প্রসাদপ্রাপ্ত হইয়া চরিতার্থ হইলেন।"

এখন এই জেবউন্নেসাও যে ইতিহাসসঙ্গত সেই বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু স্যার যদুনাথ বলেন, বঙ্কিমচন্দ্রের উক্তি "পিসী ভাইজি অর্থাৎ রোশেনারা এবং জেবউন্নেসা, উভয়ে অনেক স্থানেই মদন-মন্দিরে প্রতিযোগিনী হইয়া দাঁড়াইতেন" ইহার প্রতিবাদ করিয়া বলেন যে "মানুচী হইতে এই সংবাদ লওয়া হইয়াছে, তাহার গ্রন্থে জেবউন্নেসার চরিত্রে কোন কলঙ্কপাত করা হয় নাই, তাহার কনিষ্ঠা ভগিনী ফকরুন্নেসার উপরে এই দুর্ণাম দেওয়া হইয়াছে।"

আমরা স্যার যদুনাথের এই অসম্পূর্ণ উক্তি পড়িয়া বিস্ময়ে অভিভূত হইয়াছি। কারণ জেবউন্নিসার কনিষ্ঠা ভগ্নী ফকরুন্নেসা—এই কথা তিনি কোথায় পাইলেন ?

তিনি তাঁহার 'হিষ্ট্রি অব ঔরঙ্গজেবে' ফকরুন্নেসার কোন নামও উল্লেখ করেন নাই। তিনি নাম করিয়াছেন—জেব-উন্নেসা, জিনতুন্নেসা, মেহেরুন্নেসা, জুবডট্‌উন্নেসা।

মাসিরী আলমগীরী বা খাফিখাঁন কেহই ফকরুন্নেসার নাম করেন নাই।

অতএব ফকরুন্নেসা নাম্নী কনিষ্ঠা ভগ্নীর কোন কথাই আসিতে পারে না। উইলিয়ম আর্ভিনও বলেন—

"No such name as Fakrunneasa is on the record."

সুতরাং যে ফকরুন্নেসার কথা মানুচী বলিয়াছেন তিনিই জেবউন্নেসা! পাদ্রী কফ্রও জেবউন্নেসাকেই ফকরুন্নেসা বলিয়াছেন। বঙ্কিমও বলেন, "মুসলমান ইতিহাসে যিনি জেবউন্নিসা, তিনিই ফকরুন্নেসা।"

আর মদন-মন্দিরে রোশেনারার প্রতিযোগিতা এক জ্যেষ্ঠা কন্যা জেবউন্নিসার সঙ্গেই সম্ভব। তাঁহার বয়স ১৬৭১ সনে ৩৩, আর রোশেনারার ৫৫ বৎসর কিন্তু ঔরঙ্গজেবের অপর কন্যাগণ সকলেই বয়োকনিষ্ঠা। বিশেষতঃ, জিনতুন্নেসা সর্ব্বদা কুমারী-জীবনের পবিত্রতা রক্ষা করিয়া মসজিদের ভিতরই দান, উপাসনা ও সেবাকর্ম্মে জীবনাতিবাহিত করিয়াছেন। তিনি সমধিক ধর্ম্মশীলা ছিলেন।

মানুচীও যে জেবউন্নেসার নাম করিয়াছেন, তাহাও স্পষ্ট ভাবে উচ্চারণ করেন নাই। তিনি উচ্চারণ করিয়াছেন

(Zebetnixa Begam)—ভিনিসায়ান ডাক্তার এখানে নিশ্চই নামের গোলমাল করিয়াছেন। বিশেষতঃ, তিনি বলেন, "মহম্মদ, মজ্জম ও ইনি (Zebetnixa) এক মায়ের গর্ভজাত সন্তান।" কিন্তু নবাব বাঈর গর্ভে মহম্মদ, মজ্জম ও বদরুন্নেসা জন্মগ্রহণ করেন আর আমাদের কথিত জেবউন্নেসা অপর এক মুসলমান বেগমের গর্ভজাত সন্তান। নবাব বাঈর কন্যা বদরুন্নেসা সম্বন্ধে মাসিরীর উল্লেখ আছে, আর তিনি ধর্ম্ম কার্য্যেই জীবন যাপন করেন ও অকালে তিরোধান করেন। সুতরাং মানুচীর একটু নামের ভুল হইয়াছে, জেবউন্নেসারই ডাক নাম ছিল ফকরুন্নেসা। কিন্তু মানুচী করিয়াছেন ভুইজন। আর যাহাকে জেব করিয়াছেন তিনি বদরুন্নেসা, ধর্ম্মকার্য্যে ও নামাজে কালাতিবাহিত করিয়া অল্প বয়সেই মৃত্যুমুখে পতিত হন।

এই বদরু সম্বন্ধে কোন কথা ঘটিতেই পারে না, বিশেষতঃ ইনি ছিলেন রোশেনারার কাছে নিতান্ত শিশু। আর অল্প বয়সে মৃতা হন।

অতএব মানুচীর ফকরুন্নেসাই মাসিরীর জেবউন্নেসা। মানুচী প্রকৃত নামটী দিতে ভুলিয়াছেন। তাঁহাকে সমর্থন করিয়া Pringle Kennedy'ও বলেন

Aurangzeb's eldest daughter Fakronnessa influenced the affairs of the state." (II. 86)

এই ফকরুন্নেসা বা জেবউন্নেসা (ঔরঙ্গজেবের জ্যেষ্ঠা কন্যা)ই সময় সময় রোশেনারার প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন তাহাতে সন্দেহ নাই। এবং তিনিই ইতিহাসোক্ত জেবউন্নেসা এবং তাই বঙ্কিম বলেন, "মুসলমান ইতিহাসে ইনি জেবউন্নেসা বা ফকরুন্নেসা নামে পরিচিতা।"

মানুচীও বলিতেছেন—

"If this year (1673) was a joyful one for marriages in the palace (Aurangzeb's daughters Zubidatunnessa and Meherunnessa being married to sons of Dara and Murad) it was a sad one through what occurred in the apartments of Roshenara Begum. She kept there nine youths in secret for her diversion. The discoverer of this noble conduct was Fakhrunnessa Begam, the daughter of Aurangzeb. This lady although not desirous of marriage had no intention of having deprived of her satisfaction. Therefore, she asked her aunt to make over to her at least one out of the nine. Roshan Ara Begum declined the request in spite of her niece's importunities moved by envy, the young revealad to her father what there were hidden in the apartment of Roshenara Begum, By deligent search they caught the youngmen who were well-clothed and good looking. They were made over to the criminal authorities being announced to the world as thieves, and following the orders he had received, the Kotwal Sidi Fulad destroyed these in less than a month by various secret tortures. Already angered at the misconduct of his sister Aurangzeb shortened her life by poison thus inspite of all she had done to get her brother made king, she experienced herself his cruelty dying swollen out like a hogshead and leaving behind her the wave of great lascirous.

মানুচীর উক্তি হইতেই মনে হয় ঔরঙ্গজেবের উপর ফকরুন্নেসার (জেব উন্নিসার) যথার্থ প্রতিপত্তি ছিল। এবং রোশেনারার প্রতিযোগিনী হইবার তাহারই বয়স ছিল। রোশেনারার বয়স ছিল ৫৫, আর জেবউন্নেসার বয়স ছিল ৩৩, ধর্ম্মশীলা মস্‌জিদ বাসিনী জিনতের ছিল ২৭, বদরুন্নেসার (নবাব বাঈর মেয়ে, মানুচী যাহাকে ভুল করিয়া জেবউন্নেসা বলিয়া ফেলিয়াছিলেন) তখন পরলোকে, জুবাদের ২০ মেহেরের ১০।

বস্তুতঃ জেবউন্নেসা ও রোশেনারা সম্বন্ধে এইরূপ ঘটনা না ঘটিলে মানুচী ইহার উল্লেখ করিবেন কেন।

সুতরাং মানুচী যে জেবউন্নেসা সম্বন্ধে কিছু বলেন নাই, স্যার যদুনাথের সেই উক্তি ঠিক নয়, তিনি বলিয়াছেন, আর এই সময়ে বার্ণিয়ার ও টেভার্নিয়ার প্রভৃতি ভারত ত্যাগ করিয়া অনেক পূর্ব্বেই (১৬৬৬) স্বদেশে চলিয়া গিয়াছিলেন। বেশী দিন ভারতে অবস্থান করিলে হয়তো তাহারাও বলিতেন।

অন্ততঃ স্যার যদুনাথ এই ফকরুন্নেসা কাহার কন্যা বা কাহার গর্ভজাতা, সে সম্বন্ধে কিছু বলিলে কি ভাল হইত না?

এখন জেবউন্নেসার চরিত্র সম্বন্ধে যে কেবল বঙ্কিমচন্দ্রই লিখিয়াছেন তাহা নয়। মানুচী হইতে অনেক

মুসলমান খ্যাতনামা গ্রন্থকারও লিখিয়াছেন। মুন্সী মহম্মদউদ্দীন খালেক প্রণীত "হায়েতি জেব-উন্নিসা" অবলম্বনে লাহোরের মৌলভী মুন্সী আহমদ-উদ্দীন জেবউন্নিসার একখানি জীবনী যে লিখিয়াছেন তাহাতেও এবিষয়ে উল্লেখ আছে। Mr. West Brook ও যে Dewan of Zebunnessa লিখিয়াছেন তাহার ভূমিকায় (১৯১৩) আকিল খাঁর সহিত জেব উন্নিসার প্রণয়ের কথা উল্লিখিত হইয়াছে। Sir Jadunath's article, Modern Review 1916, p. 34, Zebunnesa's Love Affair.

জেবউন্নেসা এই গল্পটীর কাহিনীতে তাহার প্রেমাস্পদ আকিলখাঁকে নাকি ডেগের ভিতর লুকাইয়া রাখিয়াছিলেন। স্যার যদুনাথ বলেন, এই ডেগের কথা যখন জাহানারার প্রণয় ব্যাপারেও একটা বিষয় বস্তু ছিল তখন ইহা বোধ হয় সেই স্থান হইতে ধার করিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। এ বিষয়ে স্যার যদুনাথ যখন গবেষণা করিয়াছেন, তাঁহার কথাই গ্রহণযোগ্য, তবে একই ব্যাপার দুই ক্ষেত্রেই কেন হইতে পারে না, তাহার অর্থ বুঝিলাম না। কিন্তু আসল কথা এরূপ একটা ব্যাপার না থাকিলে ঐ সমস্ত গ্রন্থকারগণ ইহা লিখিবেন কেন? উহাতে আছে যে, আকিল খাঁ নামক একজন পার্শি ভাবার কবির সহিত জেবউন্নেসা চিঠিপত্র লিখিতেন। কিন্তু সম্রাট ঔরংজেব তাহা বন্ধ করিয়া দেন। এই সম্বন্ধে উল্লিখিত আছে—

As the emperor has now ordered that no packet (Nalwo) bearing the seal of Aquil should be admitted to the ladies apartments of the palace, it is certain that papers will have to be now sent after careful consideration.

এই সমস্ত কথায় একটা ঘোর সন্দেহ উপস্থিত হয় এবং মনে হয় যে, জেবউন্নেসার চরিত্র সম্বন্ধে বঙ্কিমের ধারণার যথেষ্ট কারণ আছে। বিশেষতঃ মনুচীর রোশেনারার সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা সম্বন্ধে স্যার তো কোন যুক্তিসঙ্গত উত্তরই দিতে পারেন নাই। সমস্ত অবস্থা মনে করিয়া ধারণা হয় যে, বঙ্কিমের পরিকল্পনা প্রমাণ সঙ্গত ও ঐতিহাসিক।

সুতরাং দেখিতে পাই যে, জেবউন্নেসার প্রেম কাহিনী বঙ্কিমের স্বকপোল কল্পিত নহে। উর্দ্দু সাহিত্যিকগণও এ বিষয়ে আলোচনা করিয়াছেন। তবে বঙ্কিমচন্দ্র মানুচী হইতে এই চরিত্রের উপাদান সংগ্রহ করিয়াছেন। মানুচী, বর্ণিয়ার, টেভার্ণিয়ার সকলেই রোশেনারার চরিত্র সম্বন্ধে সমভাবে বলিয়াছেন। বর্ণিয়ার ও টেভার্ণিয়ার আরও অধিকদিন ভারতবর্ষে থাকিলে হয়তো জেব উন্নেসার সম্বন্ধেও বলিতেন।

কিন্তু ঐতিহাসিক বঙ্কিমচন্দ্র জেবউন্নেসার চরিত্র ইতিহাস অনুরূপ চিত্রিত করিলেও, ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্র জেবউন্নেসার চরিত্র আরও মহত্তর করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের হাতে জেবউন্নেসা অতঃপরে রূপান্তরিত হন, সত্য প্রেমিকার মূর্ত্তিতে, স্বার্থত্যাগিনী পতিব্রতা রমণী মূর্ত্তিতে। আমরা এইবারে বঙ্কিমের এই ভাবটী দেখাইব।

আকিল খাঁ সম্বন্ধে যেমন (লক্ষ্ণৌ লেখকদের কথানুযায়ী বলিতেছি) জেবউন্নেসা বলিত—

"আকিল এসে চলে গেল! যে কার্য্যের ভোগ অবশ্যম্ভাবী, বুদ্ধিমান ব্যক্তি জেনে শুনে তা কেন করবে।"

আকিল অর্থই বুদ্ধিমান।

জেবউন্নেসার প্রেমাস্পদও যুদ্ধ হইতে ফিরিয়া আসিয়া জেবউন্নেসার কাছে না আসায় জেবউন্নেসার রোষে প্রেমাস্পদ মোবারকের মৃত্যু দর্শনই হইয়াছিল। আমরা প্রথমে সেই প্রেমাস্পদ মোবারককে দেখিতে পাই জেবউন্নেসার বিলাস কক্ষে।

জেবউন্নেসা বলিল, না খুঁজিতে যে আসে, সেই ভালবাসে।

মোবারক—না ডাকিতে আসিয়াছি, বেয়াদবি হইয়াছে। কিন্তু ভিক্ষুক না ডাকিতেই আসিয়া থাকে।

জেব—তোমার কি ভিক্ষা প্রার্থনীয়?

মোবারক—ভিক্ষা এই যে, যেন মোল্লার হুকুমে ঐ শব্দে আমার অধিকার হয়।

জেবউন্নেসা হাসিয়া বলিল, ঐ সেই পুরাতন কথা। বাদশাহজাদীরা কখনও বিবাহ করে?

মোবারক—তোমার কনিষ্ঠা ভগিনীগণ ত বিবাহ করিয়াছে।

জেব—তাহারা শাহজাদা বিবাহ করিয়াছে। বাদশাহ-

জাদীরা শাহজাদা ভিন্ন বিবাহ করে না। বাদশাহজাদী দুইশতী মনসবদারকে কি বিবাহ করিতে পারে ?

মোবা—তুমি মালেকে মুলুক। তুমি বাদশাহকে যাহা বলিবে, তিনি তাহাই করিবেন, ইহা সর্ব্বলোকে জানে।

জেব—যাহা অনুচিত, তাহাতে আমি বাদশাহকে অনুরোধ করিব না।

মোবা—আর এই কি উচিত, সাহজাদী ?

জেব—এই কি ?

মোবা—এই মহাপাপ ?

জেব—কে মহাপাপ করিতেছে ?

মোবারক মাথা হেঁট করিল। শেষে বলিল, তুমি কি বুঝিতেছ না ?

জেব—যদি ইহা পাপ বলিয়া বোধ হয় আর আসিও না।

মোবারক সকাতরে বলিল, আমার যদি সে সাধ্য থাকিত, তবে আমি আর আসিতাম না। কিন্তু আমি ঐ রূপরাশিতে বিক্রীত।

জেব—যদি বিক্রীত, যদি তুমি আমার কেনা, তবে যা বলি, তাই কর। চুপ করিয়া থাক। যদি আমি একাই এ পাপের দায়ী হইতাম, না হয় চুপ করিয়া থাকিতাম আমি তোমাকে আপনার অধিক ভালবাসি।

জেবউন্নিসা উচ্চ হাসিল। বলিল, বাদশাহজাদীর পাপ !"

মোবারক বলিল পাপপুণ্য আল্লার হুকুম।

জেব—আল্লা এ সকল হুকুম ছোটলোকের জন্ত করিয়াছেন—কাফেরের জন্ত। আমি কি হিন্দুদের বামুনের মেয়ে, না রাজপুতের মেয়ে যে, এক স্বামী করিয়া, চিরকাল দাসীত্ব করিয়া, শেষে আগুনে পুড়িয়া মরিব। আল্লা যদি আমার জন্ত সেই বিধি করিতেন, তবে আমাকে কখনও বাদশাহজাদী করিতেন না

মোবারক একেবারে আকাশ হইতে পড়িল—এরূপ কদর্য্য কথা সে কখনও শুনে নাই। সেই পাপ-স্রোতোময়ী দিল্লীতেও কখনও শুনে নাই। অন্ত কেহ এ কথা তাহার সম্মুখে বলিলে সে বলিত, "তুমি বজ্রাহত হইয়া মর।" কিন্তু জেব-উন্নেসার রূপের সমুদ্রে সে ডুবিয়া গিয়াছিল—তাহার আর দিগ্বিদিগ জ্ঞান ছিল না। সে কেবল বিস্ময় হইয়া রহিল

জেব উন্নেসা বলিতে লাগিল 'ও কথা থাক্। অন্ত কথা আছে, ও কথা যেন আর কখনও না শুনি। শুনি যদি—'

মোবারক—আমাকে ভয় দেখাইবার কি প্রয়োজন ? আমি জানি, তুমি যাহার উপর অপ্রসন্ন হইবে, এক দণ্ডও তাহার কাঁধে মাথা থাকিবে না। কিন্তু ইহাও বোধ হয় তুমি জান যে, মোবারক মৃত্যুকে ভয় করে না।

জেব—মরণের অপেক্ষা আর কি দণ্ড নাই ?

মোবা—আছে, তোমার বিচ্ছেদ।

জেব—বারবার অসঙ্গত কথা বলিলে তাহাই ঘটিতে পারে।

মোবারক বুঝিলেন যে, একটা ঘটিলে দুইটাই ঘটিবে। তিনি যদি পাপিষ্ঠা বলিয়া জেবউন্নেসাকে পরিত্যাগ করেন, তবে তাহাকে নিশ্চিত নিহত হইতে হইবে। জেবউন্নেসা মোগল রাজ্যে সর্ব্বেসর্ব্বা, খোদ ঔরঙ্গজেব তাঁহার আজ্ঞাকারী, কিন্তু সেজন্ত মোবারক দুঃখিত নহেন! তাহার দুঃখ এই যে, তিনি বাদশাহজাদীর রূপে মুগ্ধ, তাঁহাকে পরিত্যাগ করিবার কিছুমাত্র সাধ্য নাই; এই পাপ পঙ্ক হইতে উদ্ধৃত হইবার শক্তি তাহার নাই।

অতএব মোবারক বিনীতভাবে বলিল—

"আপনি ইচ্ছাক্রমে যতটুকু দয়া করিবেন, তাহাতেই আমার জীবন পবিত্র। আমি যে আরও দুরাকাঙ্ক্ষা রাখি—তাহা দরিদ্রের ধর্ম্ম বলিয়া জানিবেন। কোন্ দরিদ্র না দুনিয়ার বাদশাহী কামনা করে ?"

তখন প্রসন্ন হইয়া শাহজাদী মোবারককে আসব পুরস্কার করিলেন। মধুর প্রণয় সম্ভাষণের পর তাঁহাকে আতর ও পান দিয়া বিদায় করিলেন।

এই যে জেব উন্নেসার চরিত্র বঙ্কিম চিত্রিত করিয়াছেন তাহা মানুচী ও লাক্ষৌ সাহিত্যিকগণের বর্ণনা সমর্থন করে। কিন্তু অতঃপরে বঙ্কিমচন্দ্র সোনা যেমন আগুনে গলাইয়া মালিন্য মুক্ত করা হয়, জেবউন্নেসাকেও সেইরূপ মহতী চরিত্রে পরিণত করিয়াছেন, এইখানেই বঙ্কিমের কৃতিত্ব।

অতঃপরেও জেবউন্নেসা কতবার বলিয়াছে "ভালবাসা দুঃখ মাত্র"—কিন্তু হায় সেই ভালবাসার আগুনেই জেব-উন্নেসাকে পুড়িয়া মরিতে হইয়াছিল

অতঃপরে রূপনগরের রাজকুমারী চঞ্চলকুমারীকে 'দিল্লী

আনিতে অসমর্থ হইয়া মোবারক আর প্রাসাদে আসিলেন না। ঔরঙ্গজেব তাহার বীরত্ব শুনিয়া তাহাকে বহাল রাখিয়াছিলেন বটে, কিন্তু জেবউন্নেসা তাহাকে ক্ষমা করিলেন না। যখন শুনিলেন, "মোবারক দরিয়াকে ঘরে আনিয়াছেন, তিনি আর মহালের ভিতর আসিবেন না" তিনি মোবারকের নিপাত সাধনের জন্য কৃত-সঙ্কল্প হইলেন। বাদশাহের আদেশে মোবারকের দণ্ড হইল "পিঞ্জর মধ্যে দুইটী কাল-সর্পের দংশনে তাহার মৃত্যু।"

এই পর্য্যন্ত জেবউন্নেসা ছিল বাদশাহজাদী। কিন্তু এইবার হইল সে সত্য প্রেমিকা। জেবউন্নেসা কাঁদিয়া ভাসাইলেন। তাহার অনুতাপের সীমা রহিল না, মোবারককে আবার বাঁচাইতে বদ্ধপরিকর হইয়া উঠিলেন, কিন্তু কোন উপায়েই তাহা না পারিয়া পাথরে লুটাইয়া পড়িয়া চাষার মেয়ের মত মাথা কুটিতে লাগিলেন।

দৈবক্রমে মোবারক বাঁচিয়া উঠিল। আর মাণিকলালের চেষ্টায় জেবউন্নেসার সঙ্গে সাক্ষাৎও হইল। জেবউন্নেসা বলিল, "আমায় দয়া কর, আমায় ক্ষমা কর।"

মোবারক বলিল, "তোমায় ক্ষমা করিয়াছি, না করিলে তোমার কাছে আসিতাম না।"

জেবউন্নেসা বলিল, "যদি আসিয়াছ, যদি ক্ষমা করিয়াছ তবে আমায় গ্রহণ কর। গ্রহণ করিয়া ইচ্ছা হয় আমাকে সাপের মুখে সমর্পণ কর, না ইচ্ছা হয়, যাহা বল তাহাই করিব। আমায় আর ত্যাগ করিও না। আমি তোমার নিকট শপথ করিতেছি যে আর যাইতে চাহিব না; আলমগীর বাদশাহের রঙমহালে আর প্রবেশ করিব না। আমি শাহজাদা বিবাহ করিতে চাহি না। তোমার সঙ্গে যাইব।"

মোবারক সব ভুলিয়া গেল······জিজ্ঞাসা করিল—

"তুমি কি এই গরীবকে স্বামী বলিয়া গ্রহণ করিতে সম্মত?"

জেবউন্নেসা যুক্তকরে সজল নয়নে বলিল,

"এত ভাগ্য কি আমার হইবে?"

মোবারক তাহাকে মসজিদে লইয়া গেলেন এবং মোল্লা ও উকীলের সম্মুখে উভয়ের বিবাহ হইল। জেবউন্নেসা আর বাদশাহজাদী নহে, মানুষী মাত্র। সে এখন বিনীতা, দর্পশূন্যা, স্নেহার্থিনী অশ্রুময়ী।

বিবাহের পরিণাম—মোবারকের মৃত্যু, যুদ্ধের পর জেবউন্নেসা শুনিল, মোবারক যুদ্ধে মরিয়াছে, তখন সে বেশভূষা ত্যাগ করিল, উদয় সাগরের প্রস্তর কঠিন ভূমির উপর পড়িয়া কাঁদিল—

বসুধালিঙ্গন ধূসর স্তনী
বিলপাপ বিকীর্ণ মূর্দ্ধজা।

আয়েষার পবিত্র চরিত্র স্মৃতিমাত্রেই নয়ন অশ্রুসিক্ত হয়। দারিয়ার পবিত্র প্রেমও স্বর্গীয়। কিন্তু জেবউন্নেসার মানবীয় প্রেম—যাহা তাহাকে সামান্য কৃষকবালার ন্যায় স্বার্থশূন্যা করিয়াছিল, আর রাজপ্রাসাদে ফিরিতে দেয় নাই, যাহার বলে ছুনিয়া নূতন রূপে তাহার নিকট উদ্ভাসিত হইয়াছিল, সংসারে সেই প্রেমেরও তুলনা কোথায়? আর সেই চরিত্র যে কত মহৎ, তাহা কেহ অনুধাবন করিয়াছেন কি?

জেবউন্নেসা চরিত্র সম্বন্ধে এইবার একটী প্রসিদ্ধ সমালোচনার উল্লেখ করিব।

যৌবনকালে রবীন্দ্রনাথ চষা মাঠের মাঝখানে ভাঙ্গা পথ বাহিয়া পাল্কীতে চড়িতে চড়িতে রাজসিংহ পড়িয়া যে সমালোচনাটী লিখিয়াছেন, তাহাতে অন্য চরিত্র সম্বন্ধে বিশেষ কিছু না থাকিলেও জেবউন্নেসা সম্বন্ধে তিনি যাহা লিখিয়া গিয়াছেন, এরূপ প্রকৃষ্ট বিশ্লেষণ অপূর্ব্ব চরিত্রালোচনা কল্পনা করা যায় না।

জেবউন্নেসা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন* :—

"জেবউন্নেসার সহিত ইতিহাসের যোগ আছে বটে কিন্তু সে যোগ গৌণভাবে। সে যোগটুকু না থাকিলে এ গ্রন্থের মধ্যে তাহার কোন অধিকার থাকিত না। যোগ আছে কিন্তু বিপুল ইতিহাস তাহাকে গ্রাস করিয়া আপনার অংশীভূত করিয়া লয় নাই, সে আপনার জীবন কাহিনী লইয়া স্বতন্ত্রভাবে দীপ্যমান হইয়া উঠিয়াছে।···

"···বঙ্কিমবাবু ইতিহাস এবং মানব উভয়কেই একত্র করিয়া এই ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনা করিয়াছেন। আর উভয়ের মধ্যে ভাবেরও যোগ রাখিয়াছেন।

"মোগল সাম্রাজ্য যখন সম্পদে এবং ক্ষমতায় স্ফীত হইয়া একান্ত স্বার্থপর হইয়া উঠিল, যখন সে সম্রাটের পক্ষে ন্যায়-পরায়ণতা অনাবশ্যক বোধ করিয়া প্রজার সুখদুঃখে একেবারে

*সাধনা ১৩০০ চৈত্র ৩১৩-৩১৭।

অন্ধ হইয়া পড়িল, তখন তাহার জাগরণের দিন উপস্থিত হইল।

"বিলাসিনী জেবউন্নেসাও মনে করিয়াছিল সম্রাট দুহিতার পক্ষে প্রেমের আবশ্যক নাই, সুখই একমাত্র শরণ্য। সেই সুখে অন্ধ হইয়া যখন সে দয়াধর্ম্মের মস্তকে আপন জরি-জহরৎ জড়িত পাদুকা খচিত সুন্দর বাম চরণখানি দিয়া পদাঘাত করিল তখন কোন অজ্ঞাত গুহাতল হইতে কুপিত প্রেম জাগ্রত হইয়া মর্ম্মস্থলে দংশন করিল। শিরায় শিরায় সুখ মন্থরগামী রক্তস্রোতের মধ্যে একেবারে আগুন বহিতে লাগিল। আরামের সুখশয্যা চিতাশয্যার মত তাহাকে দগ্ধ করিল—তখন সে ছুটীয়া বাহির হইয়া উপেক্ষিত প্রেমের কণ্ঠে বিনীত দীন ভাবে সমস্ত সুখ-সম্পদের বরমাল্য সমর্পণ করিল—দুঃখকে স্বেচ্ছায় বরণ করিয়া অভিষেক করিল। তাহারপর আর সুখ পাইল না, কিন্তু আপন সচেতন অন্তরাত্মাকে ফিরিয়া পাইল। জেবউন্নিসা সম্রাট প্রাসাদের অবরুদ্ধ অচেতন আরামগর্ভ হইতে তীব্র যন্ত্রণার পর ধুলায় ভূমিষ্ঠ হইয়া উদার জগতিতলে জন্মগ্রহণ করিল। এখন হইতে সে অনন্ত জগৎবাসিনী রমণী।

"ইতিহাসের মহা কোলাহলের মধ্যে এই নব-জাগ্রত হতভাগিনী নারীর বিদীর্ণপ্রায় হৃদয় মাঝে মাঝে ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া উঠিয়া রাজসিংহের পরিণাম অংশে বড় একটা রোমাঞ্চকর সুবিশাল করুণা ও ব্যাকুলতা বিস্তার করিয়া দিয়াছে। দুর্যোগের রাত্রে একদিকে মোগলের অভ্র-ভেদী পাষাণ প্রাসাদ ভাজিয়া ভাজিয়া পড়িতেছে আর এক দিকে সর্ব্বত্যাগিনী রমণীর অব্যক্ত ক্রন্দন ফাটিয়া ফাটিয়া উঠিতেছে, সেই বৃহৎ ব্যাপারের মধ্যে কে তাহার প্রতি দৃকপাত করিবে—কেবল যিনি অন্ধকার রাত্রে অতন্দ্র থাকিয়া সমস্ত ইতিহাস পর্য্যাঙ্ককে নীরবে নিয়মিত করিতেছেন তিনি এই ধুলি লুণ্ঠমান ক্ষুদ্র মানবীকেও অনিমেষ লোচনে নিরীক্ষণ করিতেছিলেন।

"এই ইতিহাস এবং উপন্যাসকে একসঙ্গে চালাইতে গিয়া উভয়কেই এক বাঁশের দ্বার বাঁধিয়া সংযত করিতে হইয়াছে। ইতিহাসের ঘটনা বহুলতা এবং উপন্যাসের হৃদয়বিশ্লেষণ উভয়কেই কিছু খর্ব্ব করিতে হইয়াছে—কেহ কাহারও অগ্রবর্ত্তী না হয় এ বিষয়ে গ্রন্থকারের বিশেষ লক্ষ্য ছিল দেখা যায়। লেখক যদি উপন্যাসের পাত্রগণের সুখ দুঃখ এবং হৃদয়ের লীলা বিস্তারিত করিয়া দেখাইতে বসিতেন তবে ইতিহাসের গতি অচল হইয়া পড়িত। তিনি একটি প্রবল স্রোতস্বিনীর মধ্যে দু'টী একটী নৌকা ভাসাইয়া দিয়া নদীর স্রোত এবং নৌকা উভয়কেই একসঙ্গে দেখাইতে চাহিয়াছেন। এই জন্য চিত্রে নৌকার আয়তন অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র হইয়াছে, তাহার প্রত্যেক সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম অংশ দৃষ্টিগোচর হইতেছে না। চিত্রকর যদি নৌকার ভিতরের ব্যাপারটাই বেশী করিয়া দেখাইতে চাহিতেন, তবে নদীর অধিকাংশই তাঁহার চিত্রপট হইতে বাদ পড়িত। হইতে পারে, কোন কোন অতি কৌতূহলী পাঠক ঐ নৌকার অভ্যন্তর ভাগ দেখিবার জন্য অতিমাত্র ব্যগ্র এবং সেইজন্য মনোক্ষোভে লেখককে তাঁহারা নিন্দা করিবেন কিন্তু সেরূপ বৃথা চপলতা পরিহার করিয়া দেখা কর্ত্তব্য লেখক গ্রন্থবিশেষে কি করিতে চাহিয়াছেন এবং তাহাতে কতদুর কৃতকার্য্য হইয়াছেন। পূর্ব্ব হইতে একটা অমূলক প্রত্যাশা ফাঁদিয়া বসিয়া তাহা পূর্ণ হইল না বলিয়া লেখকের প্রতি দোষারোপ করা বিবেচনা সঙ্গত নহে। গ্রন্থ পাঠারম্ভে আমি নিজে এই অপরাধ করিবার উপক্রম করিয়াছিলাম বলিয়াই একথাটা বলিতে হইল।"

তাই বলি ঔপন্যাসিক জেবউন্নেসার চরিত্র রবীন্দ্রনাথের হাতে চরম পরিণতি লাভ করিয়াছে কিন্তু ঐতিহাসিক জেবউন্নেসার—বঙ্কিমের বা রাজসিংহের তো কথাই নাই—ভূমিকা লিখিবার যোগ্যপাত্র কই ?

কিন্তু জেবউন্নেসা তো ভাল হইলেন, রোশেনারা যেরূপ ছিলেন সেই অবস্থায়ই সংসার হইতে বিদায় গ্রহণ করেন। রোশেনারা সম্বন্ধে স্যার যদুনাথ "রাজসিংহের ভূমিকায়" কিছু বলেন নাই বটে, কিন্তু হিষ্টি অব ঔরঙ্গজেবে তিনি স্পষ্টই বলিয়াছেন—

"মানুচী যে ১৮৯ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন যে, ৯টী সুদর্শন যুবক তাহার ঘরে লুকাইয়া রাখিয়াছিলেন এবং ঔরঙ্গজেবের সংবাদ পাইয়া আসিয়া তাহাদের তল্লাস করিয়া বাহির করান এবং গুপ্ত উপায়ে কোতোয়ালের সহায়তায় তাহাদের নিধন সাধন করেন, তাহা সত্য নয়, কাহিনী মাত্র। আর যে ভগিনী এত করিয়া তাহার সিংহাসনের যোগাড় করিয়া দিয়াছিলেন

তাঁহার যে বিষপ্রয়োগে মৃত্যু সংঘটন করিয়াছিলেন তাহার মুখ শুকরের মুখের ন্যায় ফুলিয়া উঠিয়াছিল, সে যে কামলীলার এই পরিণয় ভোগ করিয়াছিলেন তাহা সর্ব্বৈব মিথ্যা।”

স্যার যদুনাথের এই সিদ্ধান্তে আসিবার কারণ—মাসিরী আলমগিরী রোশেনারাকে ভালই বলিয়াছেন। মাসিরী বলেন—

“তাহার অনেক গুণ ছিল, এবং ঔরঙ্গজেবকে খুব স্নেহ করিতেন। তিনি আত্মার উন্নতির জন্য অনেক অর্থ দান করিয়াছেন এবং ভৃত্যদের উপর সদ্ব্যবহার করিতেন।”

Sarker's III 68. History of Aurangzeb.

এখন উপরোক্ত উক্তির সত্যতা নিরূপণ করা যাউক।

মানুচী বলেন, রোশেনারা জাহানারার মত এত সৌন্দর্য্যময়ী ক্ষমতাপন্ন ছিলেন না বটে, তবে বুদ্ধিমতী ছিলেন এবং ঔরঙ্গজেবের সিংহাসন প্রাপ্তির জন্য বিশেষ যত্ন করিয়াছিলেন। দারার উপর তাহার ভ্রাতৃক্রোধ এবং দারার মৃত্যু যাহাতে সত্বর সংঘটিত হয়, তদ্বিষয়ে তিনিই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক জেদ করিয়াছিলেন। রোশেনারার চরিত্র বিখ্যাত কবি ড্রাইডেন (Dryden)ও খুব স্পষ্টভাবে তাঁহার ট্রেজিডি অব্ ঔরঙ্গজেবে (Tragedy of Aurangzeb) চিত্রিত করিয়াছেন। এই নাটকখানি লিখিত হয় ১৬৭৫ খৃষ্টাব্দে এবং বাদশাহ ঔরঙ্গজেবের সম্মুখেই কয়েকজন ইউরোপ দেশবাসী কর্ত্তৃক অভিনীত হয়। এই নাটকে রোশেনারাকে আমরা দেখিতে পাই নুরমহল চরিত্রে, আর ঔরঙ্গজেবকে মোরাট চরিত্রে। মোরাট ইন্দুমোরার সহিত প্রণয়াসক্ত হয়। নুরমহাল ঔরঙ্গজেবকে ভালবাসে এবং তাহাকে প্রণয় নিবেদন করে। ঔরঙ্গজেব তাহা প্রত্যাখ্যান করিলে নুরমহাল ঈর্ষাবিষে জর্জ্জরিত হইয়া চুণের সঙ্গে বিষ মিশাইয়া তাহাকে পান করিতে দেয়। মোরাট আসিয়া পাত্রটী কাড়িয়া লয়। এখানে মোরাটই ঔরঙ্গজেব, আর ঔরঙ্গজেব দারা—

ঔরঙ্গজেব পান করিতে উদ্যত; সবেগে মোরাটের প্রবেশ—

Morat— Make not such haste, you must
my leisure stay
Your fate is deferr'd, you shall not
die to-day.
(Taking the cup from him).

Nurmahal—What foolish pity
Has possessed your mind
To alter what your prudence once
design'd

Morat— What if I please to lenghthen out
his date
A day and take a pride
To Cozen Fate!

Nurmahal—It will not be safe to let him live
an hour.

রোশেনারাও দারাকে এক মুহূর্ত্তও বাঁচিতে দিতে চাহে নাই। ১

মানুচী বলেন—

Roshanara Begum clamoured for the death of Dara more than the host of nobles whom Aurangzeb consulted—II. 356.

রোশেনারা দারার কন্যা জনী বেগমের উপরও অত্যন্ত নিষ্ঠুর ব্যবহার করেন। ঔরঙ্গজেব একবার ভয়ানক পীড়িত হইয়া পড়িলে তিনি আজমের সিংহাসন প্রাপ্তির পথ পরিষ্কার করিবার জন্য রাজ্যের অমাত্য ও বন্ধুবর্গকে পত্র লেখেন। জ্যেষ্ঠ মজমের (শাহ আলমের) মাতা এইরূপ গোলযোগে রাজ্যে অশান্তির সৃষ্টির সম্ভাবনা বলিয়া আপত্তি করিলে রোশেনারা বেগম তাহার কেশাকর্ষণ করিয়া তাড়াইয়া দেন।

এবম্বিধ দুঃশীলা চরিত্রের প্রতি পক্ষপাতিত্বে স্বতঃই অনুমান হয় যে, স্যার যদুনাথ ঔরঙ্গজেবের উপর ঘোর পক্ষপাতিত্ব বশতঃই তাঁহার পক্ষবর্ত্তিনী ভগিনীর চরিত্রের প্রতি আরোপিত কলঙ্ক কাহিনী সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে প্রস্তুত নহেন। এই অবস্থায় আমাদের কর্ত্তব্য যে অন্য দুইজন পরিব্রাজক বর্ণিয়ার ও টেভার্ণিয়ার এই সম্বন্ধে কি বলেন তাহা সম্যকপ্রকারে পর্য্যালোচনা করা। যদি তিনজন বিদেশী ঐতিহাসিকের কথায় অনৈক্য না থাকে, তবে তাহাই গ্রহণীয়।

এই ভ্রাম্যমান পরিব্রাজক দ্বয়ের উভয়েই ঔরঙ্গজেবের উপর পক্ষপাতী ছিলেন, সুতরাং তাহাদের মতামত সম্পূর্ণরূপে গ্রহণীয় নয়।

মাসুচী বলেন —

She drank to excess and was suspected of admitting the youngmen in the Seraglis and this scandalous behavior cost their lives. When intriguing to secure the crown for Sultan Azam during Aurangzeb's illness in 1662 she tore off the hair of Nawab Bai the Chief Begum and Aurangzeb too was angry with insolent behavior. (Manucci II 54-56,59-60). She died in 1671, Sept. 21 and it is said she was poisoned by Aurangzeb. I. 356.

Tavernier in P. 377 states—

Princess Roshenara conveyed into her appartment a handsome youth and wishing to get rid of him at the end of 15 or 20 days when she was tired of him the thing could not be accomplished so secretly but that he heard of it. The princess in order to anticipate the disgrace and reproach which he feared hastened with assumed terror to the king saying that a man had entered the harem even to her chamber that she was certain it was either to rob or stay, that it was not seen by anybody and all eunuchs must be punished.

The king hastened to thespot and the poor man could not do otherwise than leap from the window into the river which flows below. King ordered him to be taken to theChief Judge."

From Bernier exactly as he heard an old Portuguese woman who had been many years a slave in the Seraglis states (in pp. 132 & 133) ;—

"Roshenara after having for several days enjoyed the company of one of these youngmen Shom she kept hidden commited him to the care of her female attendants whopromised to conduct their charge out of the Serglis under cover of the night. But whether thy were detected or only dreaded a discovery or whatever else was the reason the woman fled and left the terrified youth to wander alone about the gardens: who when the king had interrogated him very closely, without being able to draw any other confession of guilt from him these that he had sealed the walls decided that he should go by the same and the poor man lept and died.

তবে স্যার যদুনাথ একটী ভুল করিয়াছেন। মাসুচী যে কোন পর্টুগাল নিবাসিনীর নিকট হইতে অন্দর মহলের খবর পাইয়া লিখিয়াছেন, তাহা সত্য নয়। তিনি নিজে শাহ আলমের সঙ্গে সঙ্গে থাকিতেন আর তাঁহার মাতা প্রধানা বেগম নবাব বাঈ ও তাহার (মনুচীর) সহিত কথাবার্ত্তা বলিতেন। তথাপি স্যার যদুনাথ যখন আপত্তি তুলিয়াছেন, তখন পোষকতা স্বরূপ প্রমাণ না পাইলে মাসুচীর উক্তি কিছুতেই সত্য বলিয়া গ্রহণ করিব না। আচ্ছা দেখা যাউক, বার্ণিয়ার ও টেভার্নিয়ার কি বলেন।

টেভার্ণিয়ার ফরাসী দেশবাসী, তিনি ১৬৬৬ সাল পর্য্যন্ত দিল্লীতে ছিলেন। তিনি বলেন, "আমি দ্বিতীয়বার দিল্লী পহুঁছিয়া দেখি, ঔরঙ্গজেব ও তাঁহার ভগিনীর সহিত পরস্পর আর তেমন ভাব নাই। এক সময়ে সিংহাসন পাইলে, রোশেনারাকে তাহার পার্শ্বে বসাইতেও নাকি প্রতিশ্রুত ছিলেন। কিন্তু এবার দেখিলাম সেই সৌহার্দ্দ্য কাটা পড়িয়াছে। কারণ অনুসন্ধান করিয়া জানিতে পারিলাম যে, রোশেনারা একটী যুবককে তাঁহার বিলাস মন্দিরে যাইতে দিতেন। ১৫।২০ দিন পরে নাকি বিরক্তি আসিয়া প্রেমের স্থান অধিকার করে; তিনি ঔরঙ্গজেবকে বলিয়া দেন, এবং যুবকটী ভয়ে যমুনা নদীতে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া পঞ্চত্ব লাভ করে।

বার্ণিয়ারও বলেন,

একবার দুইজন যুবককে তাহার কক্ষে যাইতে দেওয়ায় ঔরঙ্গজেব খুবই বিরক্ত হন। আর একবার একটী যুবককে রোশেনারা ডেগের ভিতর লুকাইয়া রাখেন।

বার্ণিয়ার ও ১৬৫৮ সাল পর্য্যন্ত ভারতবর্ষে ছিলেন, এবং পর্ত্তুগিজ মহিলার কাছে কোন কিছু শুনিবার জন্ত তাহার সব কথায় বিশ্বাস স্থাপন করা সমিচীন না হইলেও রোশেনারার চরিত্রের প্রতি তাহার ইঙ্গিত "Strange things take place in the enclosure where these women and girls are shut up." এই উক্তির প্রতিবাদ স্বরূপ স্যার যদুনাথের বলিবার কি আছে?

অতএব দেখিতেছি, তিনজন নিরপেক্ষ ঐতিহাসিকই রোশেনারার সম্বন্ধে একমত।

কিন্তু স্যার যদুনাথ রোশেনারা সম্বন্ধে আ[illegible]

ঐরূপ কলঙ্ক কাহিনীতে আস্থা স্থাপন করিতে নিষেধ করিয়া জাহানারা সম্বন্ধে এই কথা বিশ্বাস করিতে কেন বলিয়াছেন? তিনি লিখিয়াছেন,

"Now examining the above account in the light of known history we atonce find that the story of the smuggled lover being done to death in a day in the harem has been transferred to Zeb from her aunt Jahanara of whom it is told by Manucci." (Stona 1.218) and Barniar p. 13.

সত্য বটে তিনি মানুচি ও বার্ণিয়ারের দোহাই দিয়াছেন, কিন্তু তিনি তো এ কথা বলেন নাই যে, আমরা যেন কাহিনীতে বিশ্বাস না করি বরং known history-ই বলিয়াছেন। জাহানারা সম্বন্ধে যাহা কিছু লিখিয়াছেন, মানুচীকেই বেশীর ভাগ (p. 63 III) প্রমাণ স্বরূপ ধরিয়াছেন, কিন্তু মানুচী বার্ণিয়ার ও টেভার্নিয়ার কথিত রোশেনারার কলঙ্ক-কাহিনীর তো প্রতিবাদ করেন নাই। বরং জেবউন্নেসার চরিত্র সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গিয়া মানুচীর কথা মানিতেই তিনি বলিয়াছেন—

The European traveller Bernier and Manucci wrote for the eyes of the foreigners and had nothing to fear from the wrath of Aurangzeb or his posterity.—(M. R. 1916. p. 34).

বার্ণিয়ার বেগম সাহেবার চরিত্র সম্বন্ধে দোষারোপ করিয়া অনেক কথা বলেন, তাহা বিশ্বাস করিয়াই বঙ্কিম লিখিয়াছেন—

"ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তির জন্য অসংখ্য লোক তাহার অনুগৃহীত পাত্র ছিল। সেই সকল লোকের মধ্যে ইউরোপীয় পর্য্যটকেরা এমন ব্যক্তির নাম করেন যে, তাহা লিখিয়া লেখনী কলুষিত করিতে পারিলাম না।"

কিন্তু স্যার যদুনাথ আর একটী ভুল করিয়াছেন। মানুচী জাহানারার চরিত্র সম্বন্ধে বার্ণিয়ারকে সমর্থন করেন নাই, বরং প্রতিবাদই করিয়াছেন। মানুচী বলেন—

"আমি বেগম সাহেবাকে (জাহানারা বেগমকে) খুব ভাল ভাব জানিতাম—তাঁহার পিতা তাহাকে খুব ভালবাসিতেন— she was most lovely, descreet loving, generous, open-minded and charitable. She was loved by all and lived in state and munificence. "তিনি আমোদ-প্রমোদ ভালবাসিতেন এবং সুরা সেবনও করিতেন। কিন্তু সেই সুরা পারস্য, কাবুল অথবা কাশ্মীরের তৈয়ারী ভিন্ন অন্য কিছু নিতেন না। সুরা সেবন করিয়া কখনও কখনও তিনি দাঁড়াইতে পারিতেন না, এবং অন্য লোককে হাত ধরিয়া শয্যাগৃহে লইয়া যাইতে হইত। মাঝে মাঝে আমাকেও দুই একটী বোতল দিয়াছেন। আমি রংমহালের সব খবরই জানি বলিয়া সব লিখিতেছি, কারণ—

"I was admitted on familiar terms to this house and I was deep in the confidence of the principal tasks and eunuaches in her service."

মানুচী তাই বার্ণিয়ারকে প্রতিবাদ করিয়া বলেন, "যে কন্যাকে সম্রাট শাজাহান এত ভালবাসিতেন, তাহার কোন দুর্ব্বলতা থাকিলেই রাজ দরবারের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন স্থানের রাজ দূতবর্গের কুটিল দৃষ্টির সান্নিধ্যে সাজাহান এরূপ হীন কাজ করিবেন কেন?"

অতএব মানুচীর এই উক্তির পরে এবং মানুচী বেগম সাহেবার চরিত্র সম্বন্ধে কিছু প্রকাশ না করায় বার্নিয়ারের কথায় প্রত্যয় করিয়া আমরা সকলকে বেগম সাহেবের উপর চরিত্র সম্বন্ধে, কোনরূপ বিরুদ্ধ ভাব পোষণ করিতে নিষেধ করি। পাঠক বুঝিবেন যে জাহানারা ছিলেন দারার সমর্থনকারিনী এবং দারার স্বপক্ষে তিনি সর্ব্বদা সম্রাট সাজাহানকে বলিতেন। ঔরঙ্গজেব থাকিতেন দাক্ষিণাত্যে, কিন্তু তাঁহার পক্ষে ছিলেন রোশেনারা মহলের মধ্যে, আর বাহিরে অসংখ্য ব্যক্তি। এই দলাদলি ব্যাপারে সাজাহানের কন্যানুরাগই কলঙ্ক-রটনাকারীর পক্ষে প্রধান আয়ুধ হওয়া মোটেই অস্বাভাবিক নয়। বিশেষতঃ, জাহানারা ছিলেন আজীবন কুমারী আর সাজাহান মমতাজ বেগমের মৃত্যুর পরে অতীব কামাশক্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। কোন কোন সময়ে মদন ঘটিত ব্যাপারে না কি জাহানারা পিতার সহায়তা করিয়াছিলেন—তাই বার্নিয়ারের কুৎসিৎ উক্তি সমর্থনযোগ্য না হইলেও, বেগম সাহেবের স্বায়পরায়ণতা ও বিচক্ষণতার সঙ্গে যদি সর্ব্বত্র তাঁহার কঠোরতা পরিলক্ষিত হইত, তবেই তিনি মোগল প্রাসাদের আদর্শ রমণীরূপে ভারতইতিহাসে স্থান লাভ করিতেন।

বার্ণিয়ার বলেন—Travelee in the Mogul Empire II.

Begum Saheba, the elder daughter of Cheb Jahan was very handsome of lively parts and passionately beloved by her father. Rumour has it that his attachment reached a point which it is difficult to believe the justification of which be rested on the decision of the Mullas or Doctors of the law. According to them, it would have been unjust to deny the king the provilege of gathering the first fruit from the tree he had himself planted. *

কিন্তু আমরা তাহা প্রত্যয় করিতে পারিলাম না।

এখানে যদুপ্রণীত History of Aurongzeb এর লিখিত কাগজপত্র হইতে কিছু উদ্ধৃত করিয়া পাঠককে উপহার দিতেছি :--

But inspite of all the stories we hear from Bernier and Tavernier, there is no doubt that the story of the so-called incest which must have been circulated only for lowering her position and influence which were immense inthe palace was a malicious invention of enemis. Jahanara or the Begum Saheba was a higly accomplished, considerate, merciful and piou lady and even Aurangzeb, though he was relentless to his brothers, was highly respectful to her and after the death of the old king Shahan gave her a position and place which shoved to what esteem she had been held even by the fratricidal king. She was raised to the dignity of Badsha Begum and given the place of residene at his own building, a dignified position whichwas denied even to Roshenara the other sister, although the latter was her partisan and ally in the war of succession.

Indeed Begum Saheba was so far-sighted and generous that while Aurangzeb imposed Jezia on the Hindus, she as a lover of humanity in a supplicating that dignified tone choked voice and spirited words entreated the king not to proceed further in the affair and to touch his heart more deeply, brought forward the following comparison.—

"Just think Sire, that the lands of Hindusthan are like a vast ocean ; your Majesty and all other members of our royal family are like ships navigating its waters and ploughing through its wave. Where is then any sovereign prince who would desire to load with imposts the sea on which he sails ? Who has ever seen the physician pay the patient ? From this reasoning I conclude with your majesty's permission that if the sickman has to pay the physician who cures him, if the ships and sailors must always try to render the seas favourable and pacific towards them in order to navigate with success and arrive happily at port ; in the same way your majesty ought to appease and soften the ocean of your subjects. For in what way can you expect them to pay taxes if you overburden them and provoke their waves by this unaccustomed demand. Abandon then, Sire, this purpose lest there be a rebellion in this kingdom. Let your majesty reflect that violent winds usually raise and disturb the seas, swell high their waves and transform the whole into a terrifying tempest. By its violence everything is swept into the shore and the poor and persecuted people ruined."

To these words of counsels, full of concern for the subjects of the empire, coming from so wise a sister Aurangzeb as was usual with him, excused himself by repeating one sentence only.

"I am going to imitate Mohemed only, Sister." and dismissed her prayer with a smile of quiet contempt and his movement and attitude cut the grand old lady to the quick. Sir Jadunath also admits that her age enabled her to give Aurangzeb unpleasant but sound advice when none else durst give it. Vol. 3 page 58. Chap. XXVII.

"This was the character of Begum Shaheba and the readers in general should not miss the opportunity of visiting and paying due adoration to her tomb at Delhi.

* Tavernier ও বেগম সাহেবা সম্বন্ধে ঔরঙ্গজেবের সন্দেহের উল্লেখ করিয়াছেন। P. 377 Vol, I.

বাঙ্গালীর ইন্দ্রপ্রস্থে রাজ্য-স্থাপন

শ্রীতারানাথ রায় চৌধুরী

বর্ত্তমান দিল্লীর প্রাচীন নাম ইন্দ্রপ্রস্থ। খৃষ্ট জন্মের সাতশত বৎসর পর্য্যন্ত দিল্লীর নামাকরণ হয় নাই। এই ইন্দ্রপ্রস্থে ভারতীয় আর্য্যগণ মুসলমানদের ভারতাভিযানের সময় পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। যমুনার কূলে বহু বিস্তৃত জনপদ লইয়া ইন্দ্রপ্রস্থ নগরী প্রতিষ্ঠিত ছিল। অপর দিকে ইন্দ্রপ্রস্থ হইতে বহুদূরে বর্ত্তমান আগ্রার সন্নিকট পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ জনপদ তখন হস্তিনা নগরী নামে পরিচিত ছিল। ইন্দ্রপ্রস্থের শেষ আর্য্য রাজা যশপাল। এই যশস্বী রাজা যশপাল ইন্দ্রপ্রস্থে ৩৬ বৎসর ৪ মাস ২৭ দিন রাজত্ব করেন। সংবত ১২৪৯ সালে গজনী বা গিজনীর সুলতান সাহাবুদ্দিন গৌড়ীগড়ে রাজা যশপালকে আক্রমণ করিয়া পরাজিত করেন এবং প্রয়াগের দুর্গে (বর্ত্তমান এলাহাবাদে) বন্দী করিয়া রাখেন।

এই ইন্দ্রপ্রস্থে খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে বঙ্গদেশের তদানীন্তন একজন ক্ষত্রিয় রাজা অভিযান করিয়া ইন্দ্রপ্রস্থের যুধিষ্ঠির প্রতিষ্ঠিত সিংহাসন দখল করেন। অতঃপর এই প্রবন্ধে বঙ্গদেশীয় এই রাজগণের ইতিবৃত্ত লিখিয়া বাঙ্গালার সমাজের নিকটে বাঙ্গালীর এক অপূর্ব্ব বীরত্বের কাহিনী প্রকাশিত করিতে চাই। বাঙ্গালী কখনও ভীরু কাপুরুষ ছিল না, যুদ্ধ বিদ্যায় ভারতীয় অন্যান্য জাতির ন্যায় বাঙ্গালীও নিপুণ ছিল, একথা বহু ইতিহাসে পাওয়া যায়। বহুকাল আমরা ইতিহাসের সন্ধান লই নাই। বিদেশীয় জাতি কর্ত্তৃক লিখিত ইতিহাস আমাদিগকে পরাধীনতার কথাই শুনাইয়াছে, বীরত্বের কথা শুনায় নাই। প্রাচীনকালের ভারতীয় আর্য্যেরা পৃথিবীর মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ সামরিক জাতি ছিল। যুদ্ধ বিদ্যায় এইরূপ পারদর্শী ছিল যে ভারতীয় বীরগণের নিকটে চাল্‌দিয়ার রাণী সেমিরামিশ এবং মেসিডনিয়ার বীর আলেকজান্দারকেও পরাজয় স্বীকার করিতে হইয়াছিল। মোগল ও পাঠান যখন ভারতের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত অত্যাচারে, লুণ্ঠনে ভারতবাসীকে জর্জ্জরিত করিয়া তুলিয়াছিল, তখনও ভারতীয় আর্য্য বীরেরা বিক্রমের সহিত মোগল পাঠানকে পদে পদে বাধা দিয়াছেন। ঐক্যহীনতার দরুণ আর্য্যদের পতন হয়। বিস্তৃত ভারতবর্ষের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত আর্য্যগণ প্রভূত শক্তিশালী থাকিলেও সংঘবদ্ধহীনতার জন্য মোগল ও পাঠান ভারতীয়গণকে পরাভূত করিতে সক্ষম হইয়াছিল। কিন্তু মুসলমানগণের ভারত শাসনের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ভারতীয়গণ উপস্থিত ক্ষেত্রে বীরত্ব দেখাইতে কখনও পরাঙ্মুখ হয় নাই। বাঙ্গালী বিজয়সিংহের সিংহল বিজয় এবং বঙ্গবীর রাজা আধীসেনের ইন্দ্রপ্রস্থ জয় বাঙ্গালীর গৌরবময় ইতিহাসের যে পৃষ্ঠা এই পৃষ্ঠা বাঙ্গালী পড়িতে চায় নাই। তাই আজও দেশবিদেশে একদল লোক বাঙ্গালীকে নির্বীর্য্য কাপুরুষ বলিতে লজ্জা বোধ করিতেছে না।

মহাভারতীয় যুগের ইন্দ্রপ্রস্থ সেকালের ইতিহাসের গৌরবময় আর্য্য রাজধানী। মহারাজ যুধিষ্ঠির এই ইন্দ্রপ্রস্থের রাজা ছিলেন। হস্তিনা নগরীতে কুরুরাজ দুর্য্যোধনের সহিত পৃথক্ হইয়া রাজা যুধিষ্ঠির ইন্দ্রপ্রস্থে রাজধানী স্থাপন করেন এবং এইখানেই তিনি রাজসূয় যজ্ঞ করেন। যতদূর ইতিহাস সংগ্রহ করা যায়, তাহাতে দেখা যায় রাজা যুধিষ্ঠিরের বংশ রাজা ক্ষেমক পর্য্যন্ত এই ত্রিশ পুরুষ ১৭৭০ বর্ষকাল ইন্দ্রপ্রস্থে রাজত্ব করে। রাজা যুধিষ্ঠির ৩৬ বৎসর ৮ মাস ২৫ দিন ইন্দ্রপ্রস্থে রাজত্ব করেন। পরে যাদবপতি শ্রীকৃষ্ণ জগত হইতে অন্তর্হিত হইলে মহারাজ যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃগণ ও পত্নী সহ স্বর্গলাভের মহাপ্রস্থান করেন। যুধিষ্ঠিরের মহাপ্রস্থানের পরে মহাবীর অর্জ্জুনের পৌত্র (অভিমন্যুর পুত্র) রাজা পরীক্ষিত ইন্দ্রপ্রস্থের সিংহাসনে আরোহণ করেন। রাজা পরীক্ষিত ৬০ বৎসর কাল রাজত্ব করেন। পরীক্ষিত পুত্র রাজা জন্মেজয় ৮৪ বৎসর ৭ মাস ২৩ দিন ইন্দ্রপ্রস্থে রাজত্ব করেন। এই বংশের শেষ রাজা ক্ষেমক ৪৮ বৎসর ১১ মাস ২১ দিন রাজত্ব করার পরে রাজা ক্ষেমকের প্রধান মন্ত্রী বিশ্রবা রাজাকে হত্যা করিয়া ইন্দ্রপ্রস্থের সিংহাসন দখল করেন। বিশ্রবার বংশে ১৪ জন রাজা ৫০০ বৎসর ইন্দ্রপ্রস্থে রাজত্ব করেন। এই বংশের শেষ রাজা বীর সালসেন ৪৭ বৎসর ১৪ দিন রাজত্ব করার পরে তাহার প্রধান মন্ত্রী বীরমহা বীর সালসেনকে হত্যা করিয়া ইন্দ্রপ্রস্থের সিংহাসন দখল করেন। [ক্রমশঃ